রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

প্রবাসী

৬০শ ভাগ, প্রথম খণ্ড, ১৩৬৭

সূচীপত্র

বৈশাখ—আশ্বিন

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

বিষয়-সূচী

বিবিধ প্রসঙ্গ

চিত্রসূচী

রঙীন চিত্র

একবর্ণ চিত্র

প্রবাসীর ষষ্টিতম জন্মদিন

আজ ১লা বৈশাখ ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ। আজ হইতে ষাট বৎসর পূর্ব্বে 'প্রবাসী' জন্মলাভ করে। এই ষাট বৎসর পূর্ত্তির জন্ম-বৎসরে আমরা প্রতি মাসেই—বিশেষ করিয়া এমন এমন প্রবন্ধ গল্প উপন্যাস ইতিবৃত্ত চিত্র কবিতা প্রভৃতি প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিতেছি যাহাতে বর্ত্তমান পাঠকের নিকট প্রবাসীর রাষ্ট্র ও অর্থনীতি, দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্যকলা ও সঙ্গীত আলোচনা এবং ভারত তথা বাংলা দেশের নিজস্ব দীর্ঘকালব্যাপী পুনর্গঠন প্রচেষ্টার পূর্ণতর পরিচয় দেওয়া হয়।

প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন, "জীবনের নানাদিকে বাঙালী গত ৫০ বৎসরের মধ্যে যতটুকু কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছে, তার সবচেয়ে পূর্ণ পরিচয় এক 'প্রবাসী' ও 'প্রদীপ' ইত্যাদিই দিতে পারে।"

রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য রচনা প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে গোরা, জীবনস্মৃতি, অচলায়তন, রক্তকরবী, মুক্তধারা ও শেষের কবিতা—কয়েকটি প্রধান রচনা। শুধু রবীন্দ্রনাথই নহেন, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ, আচার্য্য যোগেশচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল, দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, যদুনাথ সরকার, মহেশচন্দ্র ঘোষ, শরৎচন্দ্র রায় (রাঁচি), বামনদাস, সত্যেন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষিগণ এই প্রবাসীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

ভারতীয় চিত্রকলার যে পুনঃপ্রচার ও অজন্তা, মোগল রাজপুত, কাংড়া চিত্রের সহিত আধুনিক ভারতের নূতন করিয়া পরিচয় করাইয়া দেওয়ার মূলে অবনীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা; ইহারও পূর্ণ পরিচিতি পুরাতন প্রবাসীর পৃষ্ঠায় চিহ্নিত হইয়া আছে। 'রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্দ্ধশতাব্দীর বাংলা' পুস্তকের (শান্তা দেবী রচিত) ভূমিকায় আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন লেখেন, "বোধ হয় ১৯০৬ সনে ভগিনী নিবেদিতা কিছুদিন কাশী তিলভাণ্ডেশ্বরের একটি বাড়ীতে বাস করেন। তিনি একদিন রামানন্দবাবুর 'প্রবাসী'র প্রচুর প্রশংসা করিলেন। ভগিনী নিবেদিতা কেমন করিয়া প্রবাসীর প্রশংসা করিলেন ইহাই ভাবিতেছিলাম। কারণ প্রবাসী ত বাংলা কাগজ। তবু দেখিলাম প্রবাসীর সব মতামত সব খোঁজখবর তিনি রাখেন এবং রামানন্দবাবুর মহত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি বেশ সচেতন।

"ভগিনী নিবেদিতা একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, এই যে ব্যক্তিটি এখন শুধু বাংলা ভাষায় বাংলার সুখদুঃখের কথা লইয়াই ব্যস্ত আছেন, এমন একদিন আসিবে যখন তিনি সারা ভারতের বেদনা প্রকাশের ভার লইবেন। এই ঘটনার পরেই ১৯০৭ সনের জানুয়ারী মাসে রামানন্দবাবু সমস্ত ভারতের অন্তরের বেদনাকে ব্যক্ত করিবার জন্য 'মডার্ণ রিভিয়ু' কাগজখানা বাহির করিলেন। ভগিনী নিবেদিতা আর একদিন বলিয়াছিলেন……তিনি বাঙালী, তিনি ভারতীয়, তিনি বিশ্ববাসী।"

প্রবাসী তাহার এই দীর্ঘজীবনে বাংলারই শুধু নয়, ভারতের ও সারা বিশ্বের যত দুঃখ, অত্যাচার ও অন্যায়ের সমাধান করিয়াছে, তাহার ইতিহাস অল্পে লেখা সম্ভব নয়। আমরা আশা করি ইহার পূর্ণ পরিচয় ক্রমশঃ দিতে সক্ষম হইব।

একখানি বিশেষ বৃহদাকার পুস্তক প্রকাশের পরিকল্পনাও আমাদের আছে—যাহাতে গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ চিত্র প্রভৃতি দিয়া এই ষষ্টিতম জন্ম-বার্ষিকীকে সার্থক করিয়া তোলা যায়। এ সম্বন্ধে পূর্ণ বিবৃতি আমরা অন্যত্র প্রকাশ করিয়াছি।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬০শ ভাগ
১ম খণ্ড | বৈশাখ, ১৩৬৭ | ১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পশ্চিম বাংলার অবনতির দায়িত্ব

পশ্চিম বাংলা আজ ভারতের দুঃখ-বাংলা গাথা। বাঙালীর বর্তমান ... অসম্মান ... অবস্থা ... ১৫ ... প্রদেশের ঐ সকল কল-কারখানার মালিক যাহাদের তাহাদের শতকরা ৯০ জন বাঙালী নহে ভিন্ন রাজ্যের। এ ছাড়া যানবাহন, কলকারখানা, বন্দর, খনি ইত্যাদিও মাত্র আয়ের মালিকানা স্বত্বের অধিকাংশ পশ্চিম বাংলার বাহিরে আছে। বাঙালীর অবস্থা শুধু দুঃখের বাসন চাটিবার ও মাজিবার। বলা বাহুল্য, এই অবস্থার জন্য দায়ী আমরা নিজেরাই। আমরাই কেন্দ্রীয় লোকসভায় ও রাজ্যসভায় এরূপ প্রতিনিধি পাঠাইয়াছি যাহারা নিজের গণ্ডা বুঝিবার সংস্থান ব্যতীত অন্য সময় মুখ-বাবদে শুধু কংগ্রেসের উচ্চাধিকারীবর্গের মুখ চাহিয়া মুখ নাড়েন মাত্র। এবং আমরাই এই অভাগা প্রদেশের সন্তান-সন্ততির সকল অধিকার তুলিয়া দিয়াছি এতোধিক অপরূপ এক শাসনতন্ত্রের হাতে যাহা দেশের লোকের স্বার্থরক্ষায় নিশ্চেষ্ট ও দেশের উন্নতি বিধানে অসমর্থ।

সুতরাং পশ্চিম বাংলার বাঙালীর দুঃখের গান গাহিবার কোনই প্রয়োজন নাই। অতীত গৌরবের কথা আমাদের ভুলিয়া যাওয়াই ভাল, কেননা সে অতীত গৌরবের শতকরা ৯০ ভাগ এই "গতগৌরব হৃত আসন" পশ্চিম বাংলার সন্তানেরই ছিল। এবং সেই কারণে পশ্চিম বাংলার উপর অন্যায় ব্যবস্থা—যেমন হইয়াছে নূতন টেলিফোনের শুল্ক নির্দ্ধারণে—বা অবহেলার কথা সামগ্রিক ভাবহীন ভূমিকায় দেখাই যুক্তিযুক্ত।

টেলিফোনের ব্যাপারে আমাদের ব্যথার ব্যথী আছেন দুই জন, বম্বাই এবং কয়লার খনি অঞ্চল। তাহার ... কয়লার খনি অঞ্চলের টেলিফোন যাহাদের তাঁহারা সারা ভারতই শাসন করিতেছেন সুতরাং তাঁহাদের নিকট টেলিফোনের শুল্ক বৃদ্ধি অতি সামান্য ব্যাপার। বম্বাই আপনার্থে নিজের স্বার্থরক্ষায় খুবই তৎপর, তবে শুল্কবাটা অর্থমন্ত্রীর নিকট বিশেষ সহানুভূতি তাঁহারা পাইবেন কি না সন্দেহ। কলিকাতা ও দুর্গাপুরের ... সুতরাং এখানের অবাঙালী দুগ্ধপায়ীদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে সরকার বাহাদুরের মুখের হওয়ার কথা। জানি না তাহাতে কি ফল হইবে। আমরা সেই জন্য টেলিফোনের ব্যাপারে এইখানেই শেষ করি শুধুমাত্র আমাদের লোকসভা ও রাজ্যসভার দলের পুতুলগুলিকে বাহবা দিয়া।

অন্য একটি বক্তব্য ছিল কলিকাতা বন্দর লইয়া। এই প্রসঙ্গ এইবারেই অন্যত্র দেওয়া হইয়াছে। উহার বিশেষ বিবরণে দেখা যায় যে, বন্দরের অবনতি যে দ্রুতগতিতে চলিয়াছে তাহাতে দুই বৎসরের মধ্যে—প্রতিকার না হইলে—এই বন্দর সমুদ্রগামী জাহাজের পক্ষে চলাচলের অযোগ্য হইয়া দাঁড়াইবে। যাহার ফলে সারা ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বন্দরের জীবনান্ত ঘটিবে।

বৈদেশিক বাণিজ্যই এখন ভারতের জীবন-মরণ সমস্যার মূল রক্ষাকবচ। এবং এই বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতের আয়ের অংশ সম্পূর্ণ নির্ভর করে রপ্তানীর উপর, যাহা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জনের একমাত্র পথ। এই রপ্তানির হিসাবে শতকরা ৪৫ ভাগের অধিক আজও যায় এই কলিকাতা বন্দরের পথে। এবং পূর্ণোদ্যমে এই বন্দরকে চালু করিতে পারিলে আরও অধিক পরিমাণে

রপ্তানি বাড়িতে পারিত। অথচ দীর্ঘদিনের অবহেলার ফলে এই বন্দরই ধ্বংসের পথে চলিতেছে। এই অবহেলার জন্য অজুহাত যাহা দেখান হইয়াছে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় উহার সবটাই ভুয়া। অন্য কোনও প্রদেশে এইরূপ গুরুতর সমস্যা উঠিলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডলী এত সহজে তাহা ঠেলিতে পারিতেন না সন্দেহ নাই।

অবস্থা এখন যেখানে দাঁড়াইয়াছে তাহাতে অন্য কোন দেশের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা সজাগ ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিত। কেননা এই অবস্থায় সারা দেশই সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তবে আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় যাঁহারা আছেন তাঁহাদের মোটা বুদ্ধি ভারেই কাটে, ধারে নয়, সুতরাং কলিকাতা বন্দরের শ্রাদ্ধ আরও অনেকদূর গড়াইবে মনে হয়। বন্দর আরও বেশ খানিক মজিয়া যাইলে তখন টনক নড়িবে যাহাদের, তাহাদের কলরবে কেন্দ্রের গবুচন্দ্র-মণ্ডলীর ঘুম ভাঙিতেও পারে।

আমাদের প্রশ্ন এই যে, ১৯৫৭ সন হইতে অদ্যাবধি এই কলিকাতা বন্দর ও ফারাক্কা বাঁধের ব্যাপারে, আমাদের মুখপাত্ররূপে যাঁহারা নয়াদিল্লীর লাড্ডুতে কামড় মারিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কে কয়বার মুখ খুলিয়াছেন। এবং ইহাদের পালের নেতা যিনি বা যাঁহারা, তাঁহারাই বা এ বিষয়ে কতটা কি করিয়াছেন।

দেশের অবনতি ত চতুর্দ্দিকেই হইতেছে। ইহার দায়িত্ব আমাদের নিজেদের, একথা প্রথমেই বলিয়াছি। শেষ করি এই প্রশ্নে, আমাদের চৈতন্য উদয় হইবে কবে?

সোসিয়ালিজম্ ও নেহরু

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু ইংরেজী ঢং-এর সোসিয়ালিজম্-এ বিশ্বাস করেন। অর্থাৎ বড় বড় কারখানা কিম্বা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যেগুলি এক বা অল্প সংখ্যক ব্যক্তির অধীনে চালিত হয়ে জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে অন্যায় ক্রয়-বিক্রয়-মাল সরবরাহ পদ্ধতি ও রীতির প্রতিষ্ঠা করে; সেইগুলিকে সম্পূর্ণরূপে জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে গঠন করা এবং তা ছাড়া অতি প্রয়োজনীয় কারবার ও কারখানাগুলিকেও সরকারী হাতে সুরক্ষিত করা; যাতে দেশরক্ষা কিম্বা সেইরকম বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সাধারণ লোকের হাতে নিয়ন্ত্রণ শক্তি চলে না যায়। অপরাপর ক্ষেত্রে দেশের লোকের ব্যক্তিগত অধিকারে বিশেষ হস্তক্ষেপ করা এই জাতীয় সোসিয়ালিজম্ প্রয়োজন মনে করে না; শুধু সরকারী অভিভাবকতা মেনে নিয়ে ও সরকারী রীতিনীতি বজায় রেখে চলতে কেউ আপত্তি করতে পারবে না, এই নিয়ম অকাট্যভাবে স্বীকার করে নিতে হবে। সরকারী অধিকার ও যথেচ্ছা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অপ্রতিহত রাখা এই জাতীয় রাষ্ট্রের প্রধান অর্থনৈতিক লক্ষ্য। এই আদর্শ বা লক্ষ্যকে স্থিরভাবে সামনে রেখে চলার একমাত্র উপায় সরকারী দপ্তর ও দপ্তরের কর্মচারীদের ক্রমশঃ শক্তিমান করে তোলা। রাজার রাজত্বচালনা বা সম্রাটের সাম্রাজ্য রক্ষা যেমন কর্মচারী বা আমলাদের সাহায্যেই হয়ে থাকে; রিপাবলিকের অর্থকরী প্রচেষ্টা প্রবল হয়ে উঠলে, তার ফলেও আমলাতন্ত্রের অভ্যুদয় না হয়ে যায় না। এবং আমলামাত্রই আমলাতন্ত্রবাদে পূর্ণ বিশ্বাসী। সেই কারণে একবার কোনক্ষেত্রে আমলাপ্রধান পরিচালনা প্রবর্ত্তিত হলেই; পাহাড়ের গা বেয়ে তুষার গোলক যেমন গড়িয়ে চলতে চলতে ক্রমশঃ আকারে বড় হতে থাকে, তেমনি আমলাশক্তি বর্দ্ধনশীল হয়ে শীঘ্রই সর্ব্বগ্রাসীরূপ ধারণ করে।

অনাচার, অত্যাচার, শক্তির অপব্যবহার বা অল্প-সংখ্যক লোকের সুবিধা ও লাভের খাতিরে জনসাধারণের অধিকার, সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দের ক্রমঃবিলোপ আমলা-পরিচালিত রাষ্ট্রে সর্ব্বদাই ক্রমঃবিকশিত হয়ে থাকে। একে অপর জাতীয়, অর্থাৎ এক বা অল্পসংখ্যক ব্যক্তি রাজত্বের, শোষণ পদ্ধতির থেকে বিভিন্ন বলে মনে করা উচিত নয়। কেননা, অধিকারের আরম্ভ কোথায় তার বিচার কখনও অধিকারের কার্য্যক্ষেত্রে অপব্যবহারের সাফাই হতে পারে না। যদি কোন রাষ্ট্র মূলতঃ ন্যায়ের বুনিয়াদের উপর গঠিত হয়, তাতে একথা প্রমাণ হয় না যে, সে রাষ্ট্রে অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, ব্যক্তির অধিকারবিলোপ বা সম্পদ অপহরণ ও অপরাপর শোষণ-কার্য্য চলতে পারে না। দেবতার মন্দিরেও যখন দুর্নীতি উগ্রগতিতে মূর্ত্ত হয়ে উঠতে পারে তখন সাধারণতন্ত্রের শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক অবতারণা দিয়ে জাতি ও ব্যক্তিকে, সব জুলুম, প্রবঞ্চনা ও লুঠের হাত থেকে বাঁচান সম্ভব হতে পারে না। সুতরাং সোসিয়ালিজম্ অথবা কম্যুনিজম্ কিছু দিয়েই মানুষের মানবীয় অধিকার ও দাবীগুলি সংরক্ষিত হবে, একথা জোর করে কেউ বলতে পারে না।

পণ্ডিত নেহরু যখন ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ান চেম্বারস অফ কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীজ (ভারতীয় ব্যবসা ও কারখানার মালিকমণ্ডলী) প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতাসূত্রে নিজ বিশ্বাসের অভ্রান্ততা প্রচার ও অপর সকলকে স্বার্থপরতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ধরে নিয়ে উপদেশ ও নির্দেশ প্রদান

করেন; তখন তাঁর সেই সব সতত পুনঃউচ্চারিত বাণী-গুলি শুনে আমাদের মনে যেসব সন্দেহ ও প্রতিবাদ-বোধের সৃষ্টি হয়, তার কিছু আমরা লিপিবদ্ধ করা দরকার মনে করি। কেননা, তাঁর সোসিয়ালিজম ও তার নক্সার ধাক্কায় আজ ভারতবর্ষ ক্রমশঃ বিদেশীয়ের ঋণজালে জড়িত হয়ে এবং মাশুল, রাজকর, ব্যবসা-বাণিজ্য, কারখানা, সংযমন-নীতি ও আরও অনেক ব্যক্তিস্বাধীনতা সঙ্কোচনসূচক নিয়মের চাপে পড়ে অত্যন্ত জর্জ্জরিত। এ অবস্থায় শুধু আশা ও উপদেশের বাণীর খোরাকে বেঁচে থাকা শক্ত হয়ে উঠছে। তাই কিছু কড়া কথা বলা দরকার হয়েছে।

সোসিয়ালিজম্ অর্থে সেইরকম সমাজ, জাতি বা রাষ্ট্র গড়ে তোলাই বোঝায় যাতে মানুষ সমবেত ও সমষ্টিগত ভাবে সকল মানবের উন্নতির ব্যবস্থা করতে পারে। অর্থাৎ সকল বা অধিক সংখ্যক মানুষের লাভ-লোকসান দিয়েই সোসিয়ালিজমের উত্থান-পতন বিচার করা হয়। যে ধরনের বিলিব্যবস্থার ফলে জাতির অধিক সংখ্যক লোকের কোন লাভ বা উন্নতি হয় না, এমনকি তাদের ক্ষতিই হতে দেখা যায়, সে জাতীয় সংগঠনকে সোসিয়া-লিজম্ বলা যায় না। রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা যদি অল্প লোকের সুবিধার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং সেসব লোকের মধ্যে যদি রাজকর্ম্মচারী এবং রাজনৈতিক দল বিশেষের নেতাদেরই বিশেষ করে সুবিধা ভোগ করতে দেখা যায়, তা হলে সে রাষ্ট্রকে সোসিয়ালিজম্ বলা চলে না। আমলা বা আমির-ওমরাতন্ত্র কিম্বা রাষ্ট্রনৈতিক দলপতিরাজ বলা চলতে পারে। কিন্তু রাজকর্ম্মচারী, ধনপতি ও দলপতিদের সুবিধার জন্য দেশের সব লোক সোপার্জ্জিত অর্থের টাকায় চার আনার থেকে সুরু করে পনের আনা অবধি রাজকর হিসাবে পরহস্তে তুলে দেবে, এই নীতিকে সোসিয়ালিজম্ বলে মানা চলে না। কেন না সোসিয়ালিজমের আসল মানে সমবেতভাবে সর্ব্ব-সাধারণের লাভ ও সুবিধার ব্যবস্থা। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির বা গণ্ডীর লোকেদের চাকুরি, ব্যবসা, লভ্যাংশ প্রাপ্তি, পরস্বাহরণব্যবস্থা বা বিনা কারণে ও পরিশ্রমে বড় লোক হওয়ার রাস্তা খুলে দেওয়ার সামাজিক পদ্ধতিকে সোসিয়ালিজম্ নামে অভিহিত করা নিছক মিথ্যার প্রশ্রয় দেওয়া। পণ্ডিত নেহরুর সোসিয়ালিজমের নক্সা এমতা-বস্থায় প্রকৃত অর্থে অভিধান বর্জ্জন করেই নিজ অসামাজিক প্রগতির অনুসরণে দেশের বুকের উপর দিয়ে উল্টা পথে গড়িয়ে চলেছে। এতে অনেক মূল্যবান প্রতিষ্ঠান গুঁড়িয়ে গেল, অনেক কর্মী বেকার হয়ে গেল, সকলের জমান টাকার ক্রয়শক্তি কমে অর্দ্ধেক বা টাকার চার আনা হ'ল এবং দেশবাসীর খাওয়া-পরার অসুবিধা দ্বিগুণ-চতুর্গুণে দাঁড়াল। কিন্তু পণ্ডিত নেহরুর বাণী ও উপদেশের বন্যা এতে কিছুমাত্র কমজোর হ'ল না। তিনি নির্লজ্জ আবেগে সকলকে হিতোপদেশ দিয়ে চলেছেন; কেন না রাজনীতির ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তিই শ্রেষ্ঠ অস্ত্র বলে সর্ব্বত্র স্বীকৃত হয়ে এসেছে। তা মিথ্যা, অর্দ্ধসত্য, জল্পনা বা কল্পনা যা কিছুরই হোক না কেন।

ভারতের ধনপতিদের তিনি সেদিন বল্লেন তাঁর পরিকল্পনার উপর অগাধ বিশ্বাসের কথা এবং সেই সোসিয়ালিজম্ ও জাতির মানুষের নিরেশ অবস্থা ত্যাগ করে সরেশ হয়ে ওঠার গল্প। ভারতীয় মানুষের সৃজন-শক্তি ও প্রতিভার পূর্ণ ব্যবহার আর একটা উচ্চ আশার আধার। এসব ছাড়া তিনি বল্লেন যে, তিনি পূর্ণরূপে "প্র্যাগম্যাটিক" অর্থাৎ সাক্ষাৎ ও বাস্তব ফলের সন্ধানী। এই প্রকৃত ও বাস্তব ফলতত্ত্বের বিচার, বিশ্লেষণ ও অনু-সন্ধানই বস্তুতন্ত্রের রহস্য উদ্‌ঘাটনের একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা। পণ্ডিত নেহরু তাই আজ বাস্তবের পশ্চাদ্ধাবনে পূর্ণ গতিতে নিযুক্ত। বাস্তব যদি নেহরু অপেক্ষা আরও দ্রুতগতি হয় এবং নেহরু অনেক জোরে দৌড়েও যদি বাস্তবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হেরে যান, তা হলে নেহরুর কি দোষ? কিন্তু ভারতীয় মানুষের সরেশত্বলাভ ও ভারতীয় প্রতিভার পূর্ণ ব্যবহার সম্বন্ধে আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, নেহরুর দলের ও দপ্তরের মানুষদের স্বভাব-চরিত্র চর্চ্চা করে সরেশ ভাব কোথাও লক্ষিত হয় না। এবং ভারতীয় প্রতিভার পূর্ণ ব্যবহারের জন্য নেহরু ও তাঁর বন্ধু ভারতীয় ধনপতিরা যেসব অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত এবং কর্ম্মে অপটু ও অপারগ শ্বেতবর্ণ নিষ্কর্ম্মাদের দেশে আমদানী করেছেন এবং আরও করবেন তাতে তাঁদের প্রচারিত আদর্শে তাঁরা বিশ্বাস করেন বলে মনে হয় না। ধনপতিদের উদ্দেশ্য করে নেহরু যা কিছু বলেন, সে কথাগুলি তিনি আসলে দেশবাসীদের শোনাতে চান। কেন না ধনপতিরা নেহরু পরিকল্পনা, সোসিয়ালিজম্ ইত্যাদির কথা ভাল করেই জানেন এবং তাঁরা জনমতকে উদ্দীপ্ত করে এবং আপাতদৃষ্টিতে তার সমর্থন করেই জনসাধারণকে খাটিয়ে নেন এবং তাদের মাল বিক্রি করে নিজেরা লাভবান হন। নেহরুর বাণী শুনে তাঁদের চিত্তে কোন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় না। ইংরেজী আলোকপ্রাপ্ত সোসিয়ালিজমের মানে জনমত বাঁচিয়ে রাজত্ব ও ব্যবসা কায়েম রাখা। নেহরু ও তাঁর সমা-লোচনার পাত্র ধনিকগোষ্ঠী পরস্পরের সাহায্যে নিজ নিজ

ক্ষেত্রে পূর্ণশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত আছেন ও থাকবেন। কেন না ডিমক্রাসি ও সোসিয়ালিজম্ নব অর্থে রাষ্ট্রীয় দলপতিদের প্রাধান্য এবং সরকারী নিয়মের অধীন ব্যবসায়ী মণ্ডলীর অর্থকরী কর্ম্মপদ্ধতি, উভয়কেই স্বীকার করে নিয়েছে। ব্যক্তি ও জনসাধারণ শুধু তাদের হারানো স্বাধীনতা ও সুখ-সুবিধার অন্বেষণে সরকারী দপ্তরে দপ্তরে ও ধনিকের আপিসে কারখানায় ঘুরে মরে। তথাকথিত বামপন্থী দলপতিদের মতলববাদ ও বিপ্লবের অভিনয় এ অবস্থার কোন উন্নতি করতে পারে নি। এই ক্ষেত্রে ভারতীয় মানবের একমাত্র উন্নতি ও মুক্তির পথ রাষ্ট্রীয় দলগুলিকে বর্জ্জন করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখা।

অ

ফরাক্কা বাঁধ তথা কলিকাতা বন্দর

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও ফরাক্কা বাঁধ নির্ম্মাণের কোনো সম্ভাবনাই নাই দেখা যাইতেছে। এই বাঁধ নির্ম্মাণের আশ্বাস প্রতিবারই পাওয়া যাইতেছে। এবারেও তাঁহারা আশ্বাস দিয়াছেন। কিন্তু কেবল আশ্বাস দিলেই তো তাহা নির্ম্মিত হইবে না। তবে এবারের আশ্বাসের সুরটা একটু বদলাইয়াছে। পূর্ব্বে এই দাবি আদৌ পূরণ হইবে কিনা, সে প্রতিশ্রুতি দিতেও সরকারের দ্বিধা ছিল, বর্ত্তমান আশ্বাসে অন্ততঃ তাহা নাই। কংগ্রেস পার্লামেণ্টারি দলের পরিবহন ও সংযোগরক্ষা ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি ফরাক্কা বাঁধের আবশ্যকতা সম্পর্কে প্রস্তাব পাস করিয়াছেন এবং শ্রীরাজবাহাদুরও নূতন করিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু কেহই বলিলেন না, কবে কাজে হাত পড়িবে। কৌশলে এই দিকটাই তাঁহারা এড়াইয়া যাইতেছেন। শ্রীরাজবাহাদুরের ঘোষণার মধ্যেই এমন ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন আছে যে, উহা নাও হইতে পারে। বাঁধ নির্ম্মাণের সঙ্গে নাকি বহু বিবেচ্য বিষয় জড়িত আছে। সেগুলি কি, রাষ্ট্রমন্ত্রী খুলিয়া বলেন নাই। মাত্র এইটুকু জানা গিয়াছে যে, সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় অনুসন্ধানকার্য্য চালাইবার জন্য সব রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন।

ইহাও একরূপ টালবাহানার সাফাই। তবে এবারে ধরনটা বদলাইয়াছে। আগে ধুয়া তুলিয়াছিলেন, না-জানি পাকিস্থান কি মনে করিবে ইত্যাদি আন্তর্জাতিক আইনের অজুহাত, আর এবারে যন্ত্রগত এবং বৈজ্ঞানিক বাধা-অসুবিধার কথা। অসুবিধা অবশ্যই আছে, বিশেষজ্ঞরা তাহা বিবেচনা করিবেন বই কি। তা ছাড়া, প্রস্তুতি-পর্ব্বেরও প্রয়োজন আছে, হিসাব-অঙ্ক-জরিপ সবই করিতে হইবে—আর এসব করিতে সময়ও লাগিবে। কিন্তু তাহারও তো একটা সীমা আছে। জাতীয় স্বার্থে যাহার রূপায়ণ একান্ত জরুরী, তাহাকে অযথা ফেলিয়া রাখিবার কোনো অর্থই থাকিতে পারে না। পাকিস্থানের নদীতে ওদিকে দ্রুতগতিতে বাঁধ বাঁধিবার কাজ সুরু হইয়া গিয়াছে, এদেশেও ভাখরা-নাঙ্গাল, তুঙ্গভদ্রা, হিরাকুদ, চম্বল প্রভৃতি পরিকল্পনাগুলি কবে আরম্ভ হইয়া একের পর এক শেষ হইতে চলিয়াছে—কেবল ফরাক্কাই ত্রিশঙ্কুর মতো শূন্যে ঝুলিতেছে।

অথচ এই তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকার কোচিনে দ্বিতীয় জাহাজ নির্ম্মাণ কেন্দ্রের জন্য কুড়ি কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। কারখানা বাংলায় না হইয়া কোচিনে কেন হইল সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর, তবে একটি প্রশ্ন মনে আসে, দ্বিতীয় একটি জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানার এমন কি জরুরী প্রয়োজন ছিল, যাহার জন্য সরকার অত টাকা খরচ করিয়া বসিলেন? অথচ, বন্দর হিসাবে কলিকাতার যোগ্যতা কাহারও অপেক্ষা কম ছিল না। ইহাকে কর্ত্তৃপক্ষের উদাসীনতা ছাড়া আর কি বলিব? কিন্তু এ উদাসীনতা কেন? কলিকাতা বাংলা দেশে বলিয়াই নয় কি? ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয়, কলিকাতা বন্দরের গুরুত্ব ক্রমশঃ হ্রাস করাই কর্ত্তৃপক্ষের মনোগত ইচ্ছা। তাই বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া কেবল ড্রেজিং করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ হাওয়া ঠাণ্ডা রাখিতেছেন।

খণ্ডিত সঙ্কীর্ণ পশ্চিম বাংলার প্রায় একমাত্র ভরসা কলিকাতা মহানগরী, আর সে-নগরীর প্রধান সম্বল তাহার বন্দর। আর এই বন্দরকে বাঁচাইয়া রাখার জন্যই ফরাক্কা বাঁধ। আজ ভাগীরথী শুকাইয়া যাইতেছে। তাহার ধারা যদি সঞ্জীবিত না থাকে, তবে এই রাজ্যই উৎসন্ন যাইবে। সেই সঙ্গে স্বাস্থ্য, কৃষি সবই বিপন্ন হইবে। বিচ্ছিন্নপ্রায় উত্তরবঙ্গ এবং আসামকে যাতায়াত ব্যবস্থা এবং ব্যবসায় বাণিজ্যের দিক হইতে আরও কাছে আনার সমস্যার সঙ্গেও ফরাক্কা বাঁধ জড়িত এবং দূরদৃষ্টি দিয়া বিচার করিলে, উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গেও। এত কারণ সত্ত্বেও সরকার নিশ্চেষ্ট। গ

ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনে বোম্বাই

অবশেষে এতদিন পরে দ্বিভাষিক বোম্বাই রাজ্য দ্বিধাবিভক্ত করিয়া মহারাষ্ট্র ও গুজরাট নামে দুইটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ একভাষাভাষী রাজ্যগঠন করিতে সরকার উদ্যোগী হইলেন।

দেখিতেছি, ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যপুনর্গঠন ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রে একযাত্রায় পৃথক ফল ঘটিতেছে। ইহার

জন্য দায়ী প্রধানতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বিধাগ্রস্ত নীতি। ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের প্রস্তাব প্রথমতঃ তাঁহারা সহজে এবং স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়া লন নাই। আবার এমনও দেখা গিয়াছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মূলনীতি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়াছে, কোথাও-বা দাবি পূরণ করা হইয়াছে আংশিকভাবে। এইরূপে দেশের নানাস্থানে যে অসন্তোষ জীয়াইয়া রাখা হইয়াছে, তাহা সব দিক দিয়াই ক্ষতিকর। কেন্দ্রীয় সরকার যদি প্রথম হইতেই কোনোরূপ দ্বিধা না করিয়া পক্ষপাতশূন্য হইয়া ভাষাভিত্তিক রাজ্যপুনর্গঠনের নীতি সকল ক্ষেত্রে পুরাপুরি প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে এ ব্যাপারে দেশের নানাস্থানে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইতে পারিত না। এখনও সর্ব্বত্র ন্যায্য দাবি পূরণ করিবার জন্য মূলনীতি অনুসারে সমস্যার পরিচ্ছন্ন সমাধান করা সম্ভব। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের সেরূপ সদিচ্ছা নাই বলিয়াই মনে হয়।

যাহারা ভাষাভিত্তিক রাজ্যপুনর্গঠন ব্যাপারে বঞ্চিত অনুভব করিয়া সুবিচার চাহিতেছে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত পন্থ তাহাদের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। তিনি ইহাকে 'আঞ্চলিক উন্মাদনা' বলিয়াছেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই কটূক্তিতে আমরা বিস্মিত হইয়াছি। তিনি নিজের কথার জালে নিজেই জড়াইয়া পড়িয়াছেন। স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা যদি 'আঞ্চলিক উন্মাদনা' হয় তবে কেন্দ্রীয় সরকার তাহা কোন্ নীতিতে ক্ষেত্রবিশেষে মানিয়া লইলেন? অর্থাৎ চাপে পড়িয়া সরকার কোথাও কোথাও তাহা মানিয়া লইতেছেন। ইহাকে আরও বিশ্লেষণ করিলে বলা যাইবে, আন্দোলন এবং বিক্ষোভের মারফত অত্যন্ত অবাঞ্ছিত অবস্থা সৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগঠন ব্যাপারে উদ্যোগী হইতে চাহেন না।

বাংলাদেশ কি উপেক্ষিত হইল এই কারণে? প্রায় ৭০ লক্ষ বাংলাভাষী-অধ্যুষিত অঞ্চল বিহার, আসাম প্রভৃতি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহার দ্বারা শুধু পশ্চিমবঙ্গের উপর অবিচার করা হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গের সন্নিহিত অন্যান্য রাজ্যের বাংলাভাষী অঞ্চলের অধিবাসীগণ শিক্ষা ও সংস্কৃতি ব্যাপারে, ব্যবসায় ক্ষেত্রে এবং সরকারী কর্ম্মে নিয়োগ ব্যাপারে নানাভাবে তাঁহাদের ন্যায্য রাষ্ট্রিক ও নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। এই বাস্তব দুর্গতি বাংলাভাষীদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ সৃষ্টি করিলে পণ্ডিত পন্থ তাহাকে কখনই 'উন্মাদনা' বলিয়া এককথায় উড়াইয়া দিতে পারেন না। কেন্দ্রীয় সরকার অন্যত্র পূর্ব্ব-সিদ্ধান্ত পালটাইয়া ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগঠনে উদ্যোগী হইতেছেন, সেক্ষেত্রে বাংলাভাষীরা তাহাদের ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত হইবে কেন? এ নীতি কি সরকারের পক্ষপাতদুষ্ট নহে?

গ

ভেজাল চলিবার মূলে গলদ কোথায়?

ভেজাল দ্রব্যের প্রসার ক্রমশঃ বাড়িতেছে, একথা বলার চাইতে বরং বলা ভাল, আমাদের দেশে ভেজাল ছাড়া খাঁটি কিছুই পাওয়া যায় না। ভেজালের কথা উঠিলেই সরকার নিয়ম-মাফিক একটি কথা আওড়াইয়া যান, মানুষের নৈতিক উন্নতি না হইলে ইহা রোধ করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু বিষয়টি আলোচনা হওয়া দরকার। ভেজালের কারবার ফলাও হইয়া উঠিবার জন্য কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিব জনগণের প্রতি ঢালোয়াভাবে যে দোষারোপ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ একদেশদর্শিতাপ্রসূত—এমনকি কটূক্তির পর্য্যায়ভুক্ত বলিলেও চলে। তিনি বলিয়াছেন, 'ইহার মধ্যে জনগণের চরিত্রই প্রতিফলিত হইতেছে। কেবলমাত্র জাতীয় চরিত্র ও নৈতিক মান উন্নয়নের জন্য সব দিক দিয়া চেষ্টা দ্বারা এই সমস্যা আয়ত্তে আনা সম্ভব।'

কিন্তু মোট জনসংখ্যার মাত্র একটা অংশ খাদ্য-উৎপাদন ও ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে। তাহাদের পক্ষে ভেজাল মিশানো সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই উহার সহিত সংস্রবশূন্য। ভেজালের জন্য তাহাদের দায়িত্ব কোথায়? স্বাস্থ্যসচিব হয়ত বলিবেন, ভেজাল কিনিয়া তাহারা এই ব্যবসায়ে প্রশ্রয় দিতেছে। সে অভিযোগও এখানে হাস্যকর। নিতান্ত বাধ্য না হইলে কেহই ভেজাল কিনিতে চাহে না। এদেশে এমন অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে যে, নামমাত্র দু-দশটি দোকান ছাড়া কোথাও খাঁটি জিনিস পাওয়া যায় না। এমনকি দোকানদারও খাঁটি জিনিস সংগ্রহ করিতে পারে না। কখনও উৎপাদনের সময়, কখনও আড়তদার-পাইকারের গোলায় ভেজাল মিশাইয়া দেওয়া হয়। অনেক খুচরা দোকানদারও হয়ত ভেজাল মিশাইয়া থাকে। তবে ইহাদের পক্ষে সেরূপ কারসাজির সুযোগ খুবই কম। যাহা হউক, স্বাস্থ্যসচিব নিজেই যখন স্বীকার করিতেছেন যে, 'দেশে ভেজালশূন্য কোন খাদ্যই পাওয়া যায় না, তখন জনসাধারণই বা ভেজাল খাদ্য কেনা বন্ধ করিবে কি করিয়া? এরূপ অবস্থার জন্য জনগণ দায়ী নহে, দেশের সরকারই দায়ী। অন্যান্য উন্নত দেশে ভেজাল বন্ধ করার জন্য নানারকম ব্যবস্থা বলবৎ আছে। এদেশে বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও কঠোর ও ফলপ্রদ ব্যবস্থাদি প্রবর্ত্তন করা হয় নাই।

অন্যান্য দেশগুলিতে খাদ্যে ভেজাল দেওয়া সমাজের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। সে দেশে জনমতও এ-বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক ও সচেতন। এই ধরনের অপরাধ ধরা পড়িলে, স্থানীয় জনসাধারণ সে-দোকান বয়কট করিয়া থাকে, ফলে তাহার রুজি-রোজগার বন্ধ হইয়া যায়। সেজন্য নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থের দিক দিয়াও ভেজালের ব্যবসা করিতে ভীতির উদ্রেক হয়। আর এদেশের আইন কি বিচিত্র! ভেজাল ধরা পড়িলেও হাজারকরা ৯৯৯টি ক্ষেত্রে মালিক অব্যাহতি পায় এবং বিক্রয়কারী কর্মচারী—যাহার মাসিক বেতন চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা, সে বেচারা দণ্ডভোগ করে! আর শাস্তি? সেও চমৎকার! অপরাধ প্রমাণ হইলে সামান্য জরিমানা—বড়জোর আটক মালটা নষ্ট করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা। এমন দিলদরিয়া আইনের জন্য ভেজাল ধরা পড়িলেও আর্থিক লোকসানের কোন ভয় নাই। এই আইনের ত্রুটি ছাড়া আরও গলদ আছে। যেমন, মুরুব্বির জোর থাকিলেও লাখ লাখ টাকার ভেজাল-কারবার চালাইয়াও আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করা যায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা শহরেই সেরকম একটি ঘটনা আদালত পর্য্যন্ত গড়াইয়াছিল। ১৫ই মার্চ্চের 'যুগান্তর' হইতে সেই অংশটি হুবহু তুলিয়া দিতেছি: "উত্তরপ্রদেশ হইতে শিয়ালকাটার নির্য্যাসমিশ্রিত সরিষা তৈলের দুইটা বিরাট চালান ধ্বংস করিয়া দেওয়ার এবং আমদানীকারী দুইজন ব্যবসায়ীর প্রতি অর্থদণ্ডের জন্য মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ দিয়াছিলেন। উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এবং বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিব ঐ রাজ্যের একজন বড় অফিসারকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন এবং অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, আটক মালটা যেন ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীও উহাতে সম্মতি দিয়াছিলেন। ফলে একটি মামলায় আসামী বামাল পাচার হইয়া যায়। কিন্তু আর একটি মামলায় বিচারক সোলে মীমাংসার প্রার্থনা বাতিল করিয়া দণ্ড বহাল রাখেন। পরে সুপ্রীম কোর্টেও ইহা বহাল থাকে এবং আটক মালটা নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়।"

তবু ত ইহা আদালত পর্য্যন্ত গড়াইয়াছিল। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে পর্য্যন্ত পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আইনের ধারকগণ হাত গুটাইয়া লইয়া ভেজাল ব্যবসায়ীর পৃষ্ঠ-পোষকতা করেন। লাখ লাখ টাকার ভেজাল-মাল ধরা পড়িবার অন্ততঃ দুই-চারটি খবর প্রতি বৎসরই ছাপা হয়। তাহার মধ্যে কয়টি মামলা আদালত পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে?

ভেজালের জন্য জাতীয় চরিত্রের উপর যে দোষারোপ করা হইয়াছে, তাহা নেহাৎই ফাঁকির কথা। ইহার জন্য একমাত্র দায়ী আইন ও শৃঙ্খলার রক্ষকগণ। তাঁহারা এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছেন, যেখানে ভেজালশূন্য খাদ্য দুষ্প্রাপ্য এবং ভেজাল মিশানো মজুতদারী প্রভৃতি কৌশলের আশ্রয় না লইলে এ বাজারে টিকিয়া থাকার সম্ভাবনা নাই। গ

রাজাজীর মুখ দিয়া হিন্দী বলাইবার চেষ্টা

হিন্দী ভাষাকে প্রাধান্য দিতে এক শ্রেণী লোকের আচরণ চরমে উঠিয়াছে। এই উগ্র সমর্থকদের মানসিক সুস্থতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিবার বোধ হয় সময় আসিয়াছে। অ-হিন্দীভাষীকে হিন্দী বলাইবার উপায় হিসাবে যাঁহারা জবরদস্তির পথ বাছিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের চিন্তা যে সুস্থ-স্বাভাবিকতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে সেকথা বলিতেই হইবে।

ব্যাপারটি ঘটিয়াছে, এই অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে। স্বতন্ত্র দল-নেতা শ্রীরাজাগোপালাচারী বারাণসীতে সভা করিতে গেলে তাঁহাকে হিন্দীতে বক্তৃতা করিবার জন্য তাঁহার সহিত যেরূপ আচরণ করা হইয়াছে তাহাকে জঘন্য জুলুমবাজি বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। তাহারা সভা পণ্ড করিয়া দিয়াছে; এ সভা রাজনীতিক মত-ভেদের জন্য পণ্ড হয় নাই, হইয়াছে রাজাজীকে দিয়া জোর করিয়া হিন্দী বলাইবার চেষ্টায়। রাজাজী হিন্দীতে বক্তৃতা করেন নাই। আত্মসম্মান সম্বন্ধে সচেতন কোনো ব্যক্তির পক্ষে এরূপ অবস্থায় তাহা করা সম্ভব নহে। কিন্তু উগ্র হিন্দীপন্থীরা তাঁহাদের আচরণের দ্বারা যে অশুভ পরিবেশ সৃষ্টি করিতেছেন, অন্য রাজ্যে তাহার প্রতিক্রিয়া প্রীতিপ্রদ না হইতে পারে। বারাণসী হিন্দীভাষী অঞ্চল। সেখানে যদি অ-হিন্দীভাষীকে হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা করিবার জন্য জুলুম করা হয়, তাহা হইলে অন্য রাজ্যে প্রচলিত ভাষায় বক্তৃতা করিবার জন্য সেই রাজ্যবাসীরা যদি দাবি উত্থাপন করেন, তবে হিন্দীভাষীদের পক্ষে তাহা খুব প্রীতিকর হইবে কি?

অবশ্য ইহার আর একটা দিকও আছে; এইরূপ আচরণের দ্বারা হিন্দী ভাষার উগ্র ভক্তগণ হিন্দী ভাষার কতটা উপকার করিতেছেন, আর কতটা শালীনতারই বা পরিচয় দিতেছেন—ইহার ফলে তাহা সাধারণের কাছে পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে।

পরিষ্কার অনেক দিনই হইয়াছে। শুধু পরিষ্কার হইতেছে না তাঁহাদের মস্তিষ্কই!

দক্ষিণ আফ্রিকায় দ্বিতীয় জালিয়ানওয়ালাবাগ

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বিদ্বেষ এবারে চরমে উঠিল। কেপটাউন ও জোহানস্‌বার্গের রাজপথ হতভাগ্য কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকানদের রক্তে রঞ্জিত হইয়াছে। এরূপ নির্মম হত্যার অনুশীলন—ভারতের জালিয়ানওয়ালাবাগের পর আর অনুষ্ঠিত হয় নাই। এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে গত ২১শে মার্চ। শ্বেতাঙ্গ পুলিস জাতিগত ও বর্ণগত সাম্রাজ্যবাদের দর্প ও দম্ভ লইয়া সেদিন গুলী চালনা করিয়া কৃষ্ণাঙ্গদের রক্তে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটি প্লাবিত করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা জানিত না যে, তাহাদের সেই অস্ত্র-প্রয়োগের ফলেই সমগ্র আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ-প্রভুত্বের মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। আফ্রিকার সুপ্ত ব্যাঘ্র কেবল জাগ্রত হয় নাই, অত্যাচারীর উপর প্রতি-আক্রমণে উদ্যত হইয়াছে। তাহারা ঘৃণ্য 'পাস বই' পুড়াইয়া ফেলিয়াছে—যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্বেতাঙ্গ পুলিসের এই গুলীবর্ষণ।

দক্ষিণ আফ্রিকার এই কুখ্যাত 'পাস' আইনটি ছিল শ্বেতাঙ্গ আধিপত্য বজায় রাখিবার এবং কৃষ্ণাঙ্গদের দমন-পীড়ন-শোষণের জঘন্যতম অস্ত্র। গোলামির সনদ অথবা পরিচয়পত্র হিসাবে এই 'পাস' আইন অনুযায়ী হরেক রকম বিধিনিষেধের সমতুল, আধুনিক পৃথিবীতে আর কিছু পাওয়া যায় না। কুখ্যাত 'পাস' আইন আপাততঃ রদ হইলেও, দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার শ্বেতাঙ্গ প্রভুত্ব বজায় রাখিতে এখনও দৃঢ়-সংকল্প। অবশ্য আফ্রিকার বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শাসকগণ কিছুতেই শেষরক্ষা করিতে পারিবেন না। শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ বিরোধ বর্ত্তমানে যেরূপ তীব্র হইয়াছে, তাহার উপশম না ঘটিলে দক্ষিণ আফ্রিকায় রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে উভয় সম্প্রদায়েরই সর্ব্বনাশ ঘটিবে। শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ এবং শ্যামাঙ্গ সকল শ্রেণীর মধ্যে মিলিতভাবে বুঝাপড়ার মারফত বহু জাতিক রাষ্ট্রগঠনই আধুনিক যুগোপযোগী একমাত্র সমাধান।

অবশ্য দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার ঐরূপ সমাধানের কথা কল্পনা করিতেও নারাজ। তাঁহারা নূতন দমননীতির কথা চিন্তা করিতেছেন। তাঁহারা নাকি আফ্রিকানদের গণ-সংগঠনগুলি ভাঙিয়া দিবার জন্য আইনজারী করিবেন। হায় রে দুরাশা! যাঁহারা এত অত্যাচার করিয়াও 'পাস' আইন মানিতে বাধ্য করাইতে পারিলেন না, তাঁহাদের নূতন করিয়া ভয়-দেখানোর কল্পনা হাস্যকর।

দক্ষিণ আফ্রিকার পরিস্থিতি আলোচনার জন্য রাষ্ট্র-পুঞ্জের এশীয়-আফ্রিকান প্রতিনিধিগণ স্বস্তি পরিষদের নিকট আবেদন করিয়াছেন। যদিও জানি, স্বস্তি পরিষদের সিদ্ধান্ত দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার মানিয়া লইবেন না।

তবে ইহা অস্বীকার করা যায় না, দক্ষিণ আফ্রিকার শাসকগণ শ্বেতাঙ্গ প্রভুত্বের শেষ সীমান্তে পৌঁছিয়াছেন। যে অন্ধ বর্ণ-গর্ব্বী-নীতি ও নিয়তির তাড়নায় তাঁহারা আফ্রিকায় এখনও শ্বেতাঙ্গ প্রভুত্ব কায়েম রাখিতে চেষ্টিত, তাহার অনিবার্য্য বিপর্য্যয় তাঁহারা কখনই রোধ করিতে পারিবেন না। কারণ, তাহারা চিরকাল 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' হইয়া থাকিবে না—ইহা নিশ্চিত।

যাই হোক, দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান-এশিয়ান অধিবাসিগণের মধ্যে সম্মানজনক বুঝাপড়া হওয়া প্রয়োজন, তাহা না হইলে বর্ণ বিদ্বেষের আগুনে কেবল দক্ষিণ আফ্রিকা কেন, সারা আফ্রিকা মহাদেশ জ্বলিয়া-পুড়িয়া ছাই হইবার গুরুতর আশঙ্কা। গ

শিল্প উৎপাদন ও সম্প্রসারণে বাধা কোথায়

সরকারী তহবিলের ঘাটতি পূরণের জন্য যে বিপুল হারে কর চাপানো হইতেছে, তাহাতে শুধু জনসাধারণই উৎপীড়িত হইতেছে না—ইহাতে বিবিধ শিল্প উৎপাদন-কার্য্যও বিঘ্নিত হইতেছে। ভারতীয় শিল্প-ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিস্থানীয় ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রি দিল্লীতে বার্ষিক অধিবেশনে গবর্ণমেণ্টের নিকট এই মর্ম্মে একটি দাবি উত্থাপন করিয়াছেন যে, দেশবাসীর উপর ট্যাক্সভার লাঘব করা হউক। তাঁহারা বলিতেছেন, ইহাতে দেশে উৎপাদনের হার বর্ত্তমানের তুলনায় বেশী হইবে এবং সেই সঙ্গে সরকারের রাজস্বের পরিমাণও বাড়িয়া যাইবে। সাধারণ বুদ্ধিতে ইহা পরস্পর-বিরোধী বলিয়াই মনে হইবে, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, এই অত্যধিক ট্যাক্স ধার্য্য করিবার ফলে দেশবাসীর সঞ্চয়ের পরিমাণ অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছে এবং তাহার পরে দেশবাসীর হাতে যে সঞ্চিত অর্থ থাকিতেছে তাহার অধিকাংশ ট্যাক্স ও ঋণের মাধ্যমে গবর্ণমেণ্টের কুক্ষিগত হইতেছে। ফলে দেশের বে-সরকারী শিল্প-পরিচালকগণ দেশ হইতে শিল্পের জন্য প্রয়োজনমত মূলধন সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। এইরূপ একটা অবস্থায় শিল্প-পরিচালকগণ শিল্পের সম্প্রসারণ ও নূতন শিল্প স্থাপনে উৎসাহ হারাইয়াছেন এবং যাঁহাদের হাতে টাকা আছে তাঁহারা উহা শিল্পের জন্য না খাটাইয়া ফাট্‌কামূলক ব্যবসায়ে নিয়োজিত করিতেছেন। এদিকে অত্যধিক ট্যাক্সের জন্য এবং তজ্জনিত পণ্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী ব্যক্তিদের সমস্ত সঞ্চয় বিলুপ্ত হইয়াছে এবং যাঁহারা কিছু

সঞ্চয় করিতে পারেন, তাঁহারাও এই ব্যাপারে উৎসাহ-বোধ করিতেছেন না।

সরকার যদি বর্ত্তমানে দেশবাসীর উপর ট্যাক্সভার লাঘব করেন, তাহা হইলে শিল্পের লাভ হইতে অধিক পরিমাণ টাকা শিল্পের পত্তন ও সম্প্রসারণে ব্যয়িত হইবে এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে অর্থ সঞ্চিত হওয়ার ফলে তাহা শিল্পের শেয়ার, ডিবেঞ্চার ইত্যাদিতে নিয়োজিত হইবে। এবং এই ব্যবস্থার ফলে সকলেরই মনে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি বাড়িবে ও শিল্প-ব্যবসায়ীরা ফাট্‌কামূলক কাজ হইতে বিরত হইয়া শিল্পের প্রসারে মনোনিবেশ করিবেন। তাহার ফলে, শেষ পর্য্যন্ত সরকারের রাজস্বের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইবে।

ফেডারেশনের এ যুক্তি অবহেলা করিবার মত নয়। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, সরকার নিজেই যখন দেশে শিল্পের প্রসারের জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেছেন, তখন বে-সরকারী শিল্প-পরিচালকগণকে এইরূপ সুযোগ-সুবিধা দিবার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, বে-সরকারী শিল্প-ব্যবসায়ের স্তরে যে কর্ম্মদক্ষতা আছে, সরকারী স্তরে তাহা নাই। বিশেষত ভারতের ৪২ কোটি অধিবাসীর অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদির সংস্থানের জন্য যে বিপুল পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন, সরকারের তাহা সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা নাই। একমাত্র দেশবাসীর স্বেচ্ছা-প্রদত্ত অর্থ ও শ্রমের সাহায্যেই এই মূলধন সংগ্রহ হইতে পারে এবং বে-সরকারী শিল্প-পরিচালকদের উহা সংগ্রহ করিবার ক্ষমতাও রহিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের যে এই ক্ষমতা নাই, তাহা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনামূলে সরকার যে ৪৬০০ কোটি টাকা ব্যয় করিতেছেন, তাহার মধ্যে বিদেশের সাহায্য ও ঘাটতি ব্যয়ের আশ্রয়ে ৩৩০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করিবার ব্যাপার হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে।

তবে সরকার এ যুক্তি গ্রহণ করিবেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ বিদেশের উপর নির্ভরতা সরকারের দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। অথচ ইহার প্রয়োজন ছিল না। যে ভাবে দেশের অর্থনীতিকে পরিচালনা করিলে উহা স্বয়ংক্রিয় ও স্বয়ং-সম্প্রসারণশীল হইয়া উঠিতে পারে, সে পরিচালন-ক্ষমতা সরকারের নাই। দেশের বে-সরকারী শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থাগুলিকে উপেক্ষা না করিলে, বোধ হয় অনেকটা সুফল পাওয়া যাইত। হয়ত এ অবস্থা ঘটিতও না।

শ্রীনেহরু সমাজতান্ত্রিক আদর্শের কথা বলিয়াছেন। উৎপাদন ও বণ্টনের সমগ্র ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া সরকার যদি তাহা সুপরিচালনা করিতে পারেন, তাহা হইলে সকল দেশই অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে অধিকতর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে। কিন্তু শ্রীনেহরু ভারতে যে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ বলবৎ করিতে চাহেন তাহা সমাজতন্ত্র নহে—উহা সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের একটা খিচুড়ি মাত্র। উহাতে সরকার প্রয়োজনীয় কর্ম্মদক্ষতা দেখাইতে অসমর্থ এবং বে-সরকারী শিল্প-ব্যবসায়ীরা অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত। ফলে দেশে উৎপাদন, বণ্টন ও কর্ম্মের সংস্থান—উহার কোনটিরই সমাধান হইতেছে না। এদিকে দেশে বৎসরে এক কোটি করিয়া জনসংখ্যা বাড়িতেছে। এই সময়ে ইংলণ্ড, পশ্চিম-জার্ম্মানি ইত্যাদির আদর্শে ভারতের অর্থনীতির বিবর্ত্তন হওয়া উচিত ছিল। তাহা করিলে, দেশের শিল্প-ব্যবসায়ীগণ তাঁহাদের প্রনষ্ট উৎসাহ-উদ্যম ফিরিয়া পাইতেন, উন্নয়নমূলক কাজের মূলধনের অধিকাংশ দেশ হইতেই সংগৃহীত হইত, দেশে বিদেশের ঋণ নহে—মূলধন পাওয়ার পথ সুগম হইত, উৎপাদন বাড়িত এবং জনসাধারণের কর্ম্মের অধিকতর সুযোগ হইত। কিন্তু তাহা হইবার নহে। যেহেতু সরকার যে-ভ্রান্ত কর্ম্মনীতি গ্রহণ করিয়াছেন—খাদ্যসমস্যা, বেকার-সমস্যা, পণ্যমূল্যের সমস্যা ইত্যাদি বহু প্রকার বিপাকে পড়িয়াও তাঁহারা এই কর্ম্মনীতির সংশোধন করিতে নারাজ। অর্থনীতিক ক্ষেত্রে উৎপাদন, সুষম বণ্টন, কর্ম্মের সংস্থান, ভোগ, সঞ্চয়, মূলধন গঠন—উহার কোন একটিতে ব্যাঘাত হইলে সমগ্র অর্থনীতিক কাঠামোই যে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে, উহা সরকার অনুধাবন করিতে অসমর্থ। তাঁহারা শুধু উৎপাদন ও মূলধন গঠনের জন্যই ব্যগ্র। গ

প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার

গত ২২শে মার্চ্চ পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের যে বিধানসভা অভিযান হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহারা একটি দাবিদাওয়া-সম্বলিত স্মারকলিপি মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের হাতে দিয়াছিলেন। এই দাবিগুলি সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রী কোনরূপ সদয় সিদ্ধান্ত করিবেন কিনা আমাদের জানা নাই। তবে প্রাথমিক শিক্ষাকে যদি দেশ ও সমাজের পক্ষে সত্যকার একটি উপযোগী বস্তু করিয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে এই দাবিগুলির সমীচীনতা স্বীকার করা এবং যথাশক্তি এইগুলি পূরণে অবহিত হওয়া যে একান্ত প্রয়োজন, ইহা যে-কোন বিচারশীল মানুষই স্বীকার করিবেন। দেশের যা সর্ব্বনিম্ন ধাপের শিক্ষা এবং সর্ব্বাধিক সংখ্যক মানুষের জন্য যে শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া

কথিত, তাহা যে প্রকৃতপক্ষে ভস্মে ঘি ঢালার মতই নিরর্থক হইতেছে এবং শিক্ষা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক কাহারও যে ইহা হইতে সত্যকার মঙ্গল হইতেছে না, ইহা একটু নজর করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের আন্দোলন এই অপচয়ের বিরুদ্ধেই। নিজেদের ন্যায়সঙ্গত বেতনের দাবিটা তাঁহারা তুলিয়াছেন ঠিকই, কিন্তু তাহাই একমাত্র বিষয় নয়। তাঁহারা চান সারা দেশে বাধ্যতামূলক সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন এবং প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্য-তালিকা ও পঠন-পাঠনের সম্পূর্ণ পরিবর্তন। যাহাতে পরবর্তী মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার সঙ্গে ইহার ধারাবাহিক যোগ থাকে, অথচ এইখানে যাঁহারা পড়ায় ইস্তফা দিবেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা একশ্রেণীর স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষাও হয়। এই সঙ্গে তাঁহারা চান, আজিকার বাজারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অনূ্যন এক-শত টাকা প্রাথমিক শিক্ষকের বেতন নির্দ্ধারণ এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধি বা বদলী, ছুটি-ছাটা ইত্যাদির ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য অপরাপর শিক্ষকদের সঙ্গে সম-পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা বণ্টন। দাবিগুলির কোনটাই যে অস্বাভাবিক, অসঙ্গত বা অন্যায় জুলুমস্বরূপ, এমন কথা কেহই বলিবেন না। বরং প্রাথমিক শিক্ষার নামে দেশে যে ছেলেখেলা চলে, তাহা রোধ করিবার জন্য কঠোরতর বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়নই তাঁহারা বেশী অভিপ্রেত মনে করিবেন।

ইহা সর্বজনবিদিত, ১৯১৯ ও ১৯৩০ সনের প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত আইন দুটির ছকেই আমাদের এই শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়। ইতিমধ্যে দেশ স্বাধীন হইয়াছে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি আমাদের সম্পূর্ণ পরি-বর্তিত হইয়াছে। মাধ্যমিক ও কলেজী শিক্ষার রাজ্যে আমূল ওলট-পালট আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার কাঠামো আমাদের সুগোচিত পরিবর্তনের কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। আমরা একদিকে বলিতেছি, উচ্চশিক্ষা অধিক লোকের জন্য নয়, বেশীর ভাগ মানুষকে চলনসই রকম ভাষা—ইতিহাস, ভূগোল, শারীর-বিজ্ঞান ও গণিত পড়াইয়া এবং একটা কিছু হাতের কাজ শিখাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। যাহাতে সে উপবাসে না মরে। আবার অন্যদিকে আমরা হাই স্কুল ও কলেজী-শিক্ষার বিস্তারসাধনেই সমস্ত মনোযোগ এবং অর্থ-সামর্থ্য ব্যয় করিতেছি। আমাদের এই স্ববিরোধিতার ফলেই প্রাথমিক শিক্ষা নানা দিক দিয়া ব্যাহত হইতেছে।

যে-দেশে অধিকাংশ লোক নিরক্ষর সে-দেশে শিক্ষার প্রাথমিক বুনিয়াদ প্রশস্ত এবং পাকা না করিতে পারিলে উপরের স্তরের শিক্ষা-ব্যবস্থা অস্বাভাবিক মাথাভারী হইতে বাধ্য। শিক্ষায় উন্নত দেশগুলিতে এইরকম অস্বাভাবিকতা নাই বলিয়া সেইসব দেশে সুবিস্তৃত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা সমাজের প্রয়োজন স্বচ্ছন্দে পূরণ করিতে পারিতেছে। আমাদের দেশেও বর্তমান অবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত বিস্তার এবং সুচারু বিন্যাসের দাবিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

১৯৫১ সনে খের কমিটি সুপারিশ করিয়াছিলেন, প্রত্যেক রাজ্যের শিক্ষাখাতে বরাদ্দ টাকার শতকরা ৬০ ভাগ প্রাথমিক শিক্ষা বাবদ খরচ করিতে হইবে। বোম্বাই এবং বিহারে তাহা করা হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাখাতে বরাদ্দের শতকরা ৩৭.১ ভাগ মাত্র প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইতেছে। বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা চালু করিতে হইলে কেবল স্কুল-বাড়ি এবং শিক্ষক বসাইলে কাজ হয় না। প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা যাহাতে খুশিমত পড়া ছাড়িয়া না দেয় সেজন্য কিছু বিধি-ব্যবস্থা প্রয়োজন। স্বাধীনতা-পরবর্তী বারো বৎসর কালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুরানো আমলের প্রাথমিক শিক্ষা-আইন সংস্কার করিতে পারেন নাই। ১৯৩০ সনে আইন করা হইয়াছিল যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একবার ভর্ত্তি হইলে কোনও গুরুতর কারণ ব্যতীত শিক্ষার্থী পড়া ছাড়িয়া দিতে পারিবে না। কিন্তু এই আইন কার্য্যতঃ প্রয়োগ করা হয় নাই। কাজেই গ্রামাঞ্চলে অনেক প্রাইমারী স্কুল নামেমাত্র টিকিয়া আছে। অর্থব্যয় হইতেছে, অথচ সংবিধানের এবং সরকারের বহু-বিঘোষিত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতেছে।

প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণের অসুবিধা হয়ত অনেক আছে, কিন্তু নানা অসুবিধা সত্ত্বেও অন্যান্য রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের জন্য সুদৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। মাদ্রাজে ১০৯টি, বোম্বাইয়ে ২৭৪টি, অন্ধ্রে ১৭৮টি, মহীশূরে ১২৬টি, মধ্যপ্রদেশে ১০০টি এবং উত্তরপ্রদেশে ৯৫টি শহরে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চলিতেছে। সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতায় মাত্র ৫টি ওয়ার্ডে, দার্জ্জিলিং এবং পুরুলিয়ায় ৮টি ওয়ার্ডে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা। ইহাও যতদূর সম্ভব নামেমাত্র। কারণ, অন্যান্য রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষার্থীকে স্কুলে না পাঠাইবার জন্য অভিভাবকগণের বিরুদ্ধে আইনভঙ্গের অভিযোগে আদালতে মামলা হইয়া থাকে। অন্ধ্রে ১৯৫৫-৫৬ সনে ৪৩,০০০ অভিভাবক এই কারণে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন—বোম্বাই এবং উত্তরপ্রদেশেও অভিযুক্তের সংখ্যা কম নয়। দুঃখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গে অনুরূপ কোন ব্যবস্থাই নাই।

বরং পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্ত্তমান বৎসরে শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দ বাট লক্ষ টাকা কমাইয়া দিয়াছেন। অবশ্য খের কমিটির সুপারিশ অনুসরণ করা হইলে প্রাথমিক শিক্ষা বাবদ ৫'১১ কোটি টাকার জায়গায় ১০'৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ করিতে হইত। বোম্বাই এবং বিহারে যাহা সম্ভব হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গে তাহা কেন সম্ভব নয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহা জানাইলে ভাল হয়। প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অক্ষমতা আরও এক কারণে দুর্বোধ্য। যে-কোনও রাজ্যে নূতন যে-সব প্রাইমারী স্কুল খোলা হইবে তাহার খরচের অর্দ্ধেক ভাগ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। অথচ গ্রামাঞ্চল পরের কথা, কলিকাতা শহরেই শতকরা পঞ্চাশ জন শিশু প্রাথমিক শিক্ষালাভের সুযোগ পাইতেছে না। কিন্তু কেন? গ

ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার প্রসারকল্পে সরকার

আমাদের দেশে আগে কারিগরী শিক্ষা—বিশেষ করিয়া ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা-শিক্ষার বড় একটা সুযোগ ছিল না এবং এই ধরনের শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কর্ম্ম-সংস্থানের ব্যবস্থাও না থাকার মতোই। কারণ তখন দেশের ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প সম্পূর্ণ ভাবে বিদেশীদের হাতে ছিল। অন্যান্য শিল্পক্ষেত্রেও তাহাদের প্রভুত্ব থাকায়, উচ্চপদে বিদেশীরাই নিযুক্ত হইতেন। ভারতে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সূত্রপাত হইতে ভারত সরকার দেশে অনেক নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠায় অবতীর্ণ হন এবং দেশবাসীর মধ্যেও অনেকে শিল্প-স্থাপনে সুযোগ-সুবিধা লাভ করেন। এই সব শিল্পের জন্য বহুসংখ্যক স্নাতকোত্তর শিক্ষা-প্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার, ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রাজুয়েট, ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপ্লোমা-প্রাপ্ত ব্যক্তি ও সাধারণ শ্রেণীর কারিগরের প্রয়োজন হয়। এজন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সূত্রপাত হইতে গবর্ণমেণ্ট দেশে ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার প্রসারে মনোনিবেশ করেন। ইহার সুফলও পাওয়া গিয়াছে। কারণ গত ১৯৫১ সনে যে স্থলে দেশের ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজগুলি হইতে ২,৬৯৩ জন ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রাজুয়েট ও ২,৬২৬ জন ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার পরীক্ষা পাস করিয়া বাহির হইয়াছিলেন, সেই স্থলে গত ১৯৫৯ সনে এই সংখ্যা যথা-ক্রমে ৩,৭০০ ও ৬,৪০০-তে বৃদ্ধি পাইয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। ১৯৬০ সনে এই সংখ্যা যথাক্রমে ৭,৩০০ ও ১০,৪০০-তে এবং ১৯৬১ সনে উহা যথাক্রমে ৮,৩০০ ও ১৩,০০০-এ বর্দ্ধিত হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। এইভাবে কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই ইঞ্জিনীয়ার, অধ্যাপক, গবেষক ইত্যাদি শ্রেণীর কর্ম্মের সুযোগ লাভ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। বহুসংখ্যক ইঞ্জিনীয়ার বিদেশে উচ্চতর শিক্ষালাভেও নিয়োজিত রহিয়াছেন।

কিন্তু আমাদের দেশে বর্ত্তমানে যে-হারে ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি স্কুল-কলেজ হইতে বাহির হইয়া আসিতেছেন, তাহা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। কারণ শুনা যাইতেছে, আগামী তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরি-কল্পনার আমলে দেশে আরও বহুসংখ্যক শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইবে এবং আরও শুনিতেছি, ঐ সঙ্গে বৃহদাকার শিল্পের উপরও সমধিক জোর দেওয়া হইবে। এবং সেইজন্য নাকি ভারতে অতিরিক্ত আরও ৪৯ হাজার ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার এবং সাধারণ কারিগরী-জ্ঞানসম্পন্ন ৭ লক্ষ ৭০ হাজার ব্যক্তির প্রয়োজন হইবে। এরূপ অবস্থায় বর্ত্তমানে দেশের ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজগুলিতে ডিগ্রীকোর্সের জন্য বৎসরে যে ১৩ হাজার সিট রহিয়াছে তাহা দেশের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের তুলনায় পর্য্যাপ্ত নহে। কমিটি বলিয়াছেন, এজন্য কলেজ স্থাপনের বেশী প্রয়োজন নাই। পরিবর্ত্তে কলেজগুলির সম্প্রসারণ এবং উহার গুণগত উৎকর্ষ সাধন দ্বারাই কাজ চলিতে পারে। কমিটি এরূপ সুপারিশও করিয়াছেন, সাধারণ শ্রেণীর কারিগরদের উৎকর্ষকল্পে দেশের বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রগণকে কারিগরী-বিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই ধরনের কার্য্যক্রমের জন্য ২৩ কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৬২ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ হইয়াছিল। কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ পরিকল্পনায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ১৭৭ কোটি টাকার একটি কার্য্যক্রম দাখিল করিয়াছেন।

মন্ত্রণালয়ের কার্য্যক্রমে আরও দুইটি উল্লেখযোগ্য বিষয় রহিয়াছে। ইহা হইতেছে, স্কুল-কলেজের ছাত্র-গণকে অবসর সময়ে শিক্ষাদান এবং যেসব মেধাবী ছাত্র অর্থাভাবে ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার শিক্ষালাভে অসমর্থ, তাহাদিগকে চাকুরি পাইবার পর সহজ কিস্তিতে পরি-শোধের সর্ত্তে পড়ার জন্য ঋণদান। এইভাবে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ২৪ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। আরও জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকারের উদ্যোগে খড়্গপুর, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কানপুরে যে চারিটি ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজি স্থাপিত হইয়াছে, তৃতীয় পরিকল্পনামূলে উপরোক্ত ভাবে অর্থব্যয় হইলে ঐ চারিটি সংস্থার প্রত্যেকটিতে ১৬ হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইবে এবং প্রত্যেকটিতে চারশত

করিয়া ছাত্র স্নাতকোত্তর ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার শিক্ষালাভের সুযোগ পাইবে।

এ পর্য্যন্ত বেশ। তবে এ ক্ষেত্রে কাগজের পরিকল্পনা কাগজেই রহিয়া যাইবে বলিয়াই মনে হয়। গ

নূতন ডিগ্রি-কোর্সে আমাদের লাভালাভ

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ঘোষিত হইয়াছে, বর্ত্তমান বৎসরের জুলাই মাস হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত সমস্ত কলেজে তিন বৎসরের ডিগ্রি-কোর্স প্রবর্ত্তিত হইবে। সেই সঙ্গে তাঁহারা ইহাও জানাইয়াছেন, তিন বৎসরের ডিগ্রি-কোর্সের পঠন-পাঠন যেমন চলিতে থাকিবে, তেমনি দশ শ্রেণীর হাই স্কুল হইতে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এক বৎসরের একটি প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স পড়ানোর ব্যবস্থাও প্রত্যেক কলেজকেই এক সঙ্গে করিতে হইবে। এই পরিবর্ত্তনের ফলে ইন্টারমিডিয়েট শ্রেণী এবং পরীক্ষা এখন হইতে বিলুপ্ত হইবে এবং এগারো শ্রেণীর হাই স্কুল হইতে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা সোজা ডিগ্রি শ্রেণীতে ভর্তি হইবে, দশ শ্রেণীর হাই স্কুল হইতে উত্তীর্ণেরা এক বৎসর প্রস্তুতি ক্লাসে পড়িয়া, পরে ডিগ্রি শ্রেণীতে প্রবেশাধিকার পাইবে। সমস্ত হাই স্কুল যখন এগারো শ্রেণীতে উন্নীত হইবে, তখন দুই রকম স্কুল ফাইনাল সহ এই অন্তর্বর্ত্তী ব্যবস্থা বাতিল হইয়া যাইবে।

পরিবর্ত্তন তো হইল। কিন্তু সুদীর্ঘ কাল হইতে চলিত দশ ক্লাসের হাই স্কুল ও চার ক্লাশের ডিগ্রি কলেজ রাতারাতি বদলাইবার প্রয়োজন কেন হইল এবং ইহার দ্বারা লাভই বা কতটা হইল—প্রশ্ন আমাদের সেইখানেই। তাঁহারা উত্তর যাহা দিয়াছেন, তাহা ভাসা ভাসা উত্তর। সময়-সংক্ষেপ করার যুক্তিও এখানে নিরর্থক। আসল কথা হইল, এই প্রথা পাশ্চাত্ত্য দেশের অনেক স্থানেই চলিতেছে—আমাদের চিত্ত-চাঞ্চল্যের কারণ সেইখানেই। আমাদের ইহাতে সত্যকার কোনো প্রয়োজন থাক বা না থাক, আমাদের সামাজিক পটভূমিতে রাতারাতি এই রূপান্তর ঘটানো ক্ষতিকর হইবে কিনা, সে সব কথা ভাবিয়া দেখারও প্রয়োজন হইল না। তথাপি হুকুম হইয়া গেল। ইহার জন্য মোটা মোটা থোক টাকা দেওয়াও সুরু হইল। তিন শ্রেণীর ডিগ্রি কলেজের জন্যও বিশ্ববিদ্যালয় গ্র্যাণ্টস কমিশন একই ভাবে প্রভূত টাকার থলি খুলিয়া বসিলেন। শিক্ষা-সংস্কারের নামে তাহারি আড়ালে এই সু-পরিকল্পিত শিক্ষা-সংহার কার্য্য বাস্তবে পরিণত করা হইল।

কেন, তাহা বলিতেছি। পশ্চিম বাংলায় হাই স্কুলের সংখ্যা প্রায় সাড়ে সতেরো শত। ইহার মধ্যে পাঁচ শতও এখনো এগারো শ্রেণীতে উন্নীত হয় নাই। আগামী পাঁচ বৎসরে আর বড় জোর আড়াই শত স্কুল এই পর্য্যায়ে আসিবে। তাহার বেশী স্কুল কোনো দিনই এগারো ক্লাসে পা বাড়াইতে পারিবে না। অধিকাংশ স্কুলের স্থান, সরঞ্জাম, সামর্থ্য প্রভৃতিই তাহার বাধা হইবে। তখন এইসব স্কুলের কি হইবে? ইহারা কি চিরদিনই দশ ক্লাসের হাই স্কুল হইয়া থাকিবে, না ইহারা একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর আট ক্লাসে নামিয়া জুনিয়ার হাই স্কুল হইবে? অর্থাৎ উচ্চ-মাধ্যমিকের প্রায় দ্বিগুণসংখ্যক নিম্ন-মাধ্যমিক স্কুল হইতে যাহারা অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত হইবে, তাহারা কোনোদিন আর নবম শ্রেণীতে প্রবেশই করিতে পারিবে না। কাজেই কলেজে পা দিবার সুযোগও তাহাদের মিলিবে না। গ্র্যাণ্টস কমিশন সর্ত্ত করিয়াছেন, কলেজে সর্ব্বাধিক এক হাজার, পশ্চিমবঙ্গে সর্ব্বোচ্চ দেড় হাজার ছাত্র ভর্ত্তি করিতে হইবে। সুতরাং স্কুল ফাইনাল হইতেই পাসের ভিড় মারিয়া না দিলে, সেটা সুসাধ্য হইবে কি করিয়া? কাজেই এক ঝটকায় স্কুল-ফাইনালের দশ আনা রকম প্রার্থীকে অদূর ভবিষ্যতেই খারিজের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

অবশ্য এ কথা ঠিক যে, পৃথিবীর কোনো দেশেই প্রতি বছর হাজার হাজার গ্রাজুয়েট ও এম, এ বাহির হয় না। বেশীর ভাগ মানুষই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা লইয়া তার পর হাতের কাজ শেখে এবং গায়ে-গতরে খাটিয়া খায়। আর আমরা সেই ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষাকে উপহাসের বস্তু করিয়া রাখিয়াছি, মাধ্যমিককে তো হত্যাই করিতে চলিয়াছি। কারিগরী শিক্ষালয় ও কল-কারখানা আমাদের প্রয়োজনের অনুপাতে এত নগণ্য যে, নাই বলিলেও অন্যায় হয় না। সুতরাং আগে এই গোড়ার কাজগুলি পোক্ত করিয়া, তার পর উপরের ধাপগুলি সংস্কৃত ও সঙ্কুচিত করিলে, কাজের কাজ হইত। কিন্তু নীচের ধাপকে রসাতলে ঠেলিয়া দিয়া, আমরা সর্ব্বাগ্রে উপর তলায় নজর দিতেছি কেন? যদিও জানি, এই 'কেন'র উত্তর পাওয়া যাইবে না। গ

পরীক্ষাগারে ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ

পরীক্ষা-কেন্দ্রে ছাত্রদের পরীক্ষা লইয়া গোলমাল—ইহা বাৎসরিক নিয়মানুষ্ঠানে পরিণত হইতে চলিল। প্রশ্ন-পত্র প্রতিদিনই এমন কিছু কঠিন হয় নাই, যাহার জন্য এইরূপ আচরণ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। আসল

কথা, হট্টগোল করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই তাহারা আসে। ইহা তাহাদের পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট প্ল্যান। সারা বৎসর না পড়িয়া অথবা কয়েকটা সম্ভাব্য প্রশ্ন আকণ্ঠ মুখস্থ করিয়া তাহারা পরীক্ষা দিতে আসে। তাহাদের সেই মুখস্থ-করা অংশগুলির বাহিরে প্রশ্ন আসিলেই চীৎকার ওঠে! ইহার কি কোন যুক্তি আছে? শিক্ষার মান যে কত নীচে নামিয়া গিয়াছে তাহার নিদর্শনও এবারে পাওয়া গিয়াছে। কোন্ প্রশ্নের কোন্ উত্তর ইহা বুঝিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত তাহাদের নাই। পদার্থ বিজ্ঞানের দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষার দিনে গোলমালটা যে দিন চরমে ওঠে, সেদিন চারুচন্দ্র কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের শান্ত করিবার জন্য পাঠ্যপুস্তক দেখিয়া উত্তর লিখিতে বলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় পাঠ্যপুস্তক সম্মুখে রাখিয়াও তাহারা উত্তর লিখিতে সমর্থ হয় না। কারণ কোন্ বিষয়ের কোন্ উত্তর ইহা বুঝিতে যে-বুদ্ধির দরকার, অধ্যয়ন দরকার, কেবলমাত্র ফাঁকি দিয়া "মুখস্থ" বিদ্যায় তাহা ধরা পড়ে না। বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির গুণে বিদ্যার দৌড় এই পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

যাহাই হউক, ছাত্রদের এই দুর্ব্বিনীত আচরণ কোন দিক দিয়াই সমর্থনযোগ্য নয়। ছাত্রেরা দেশের ও জাতির ভবিষ্যৎ। তাহাদের আচরণ যদি শালীনতা-শোভনতার মাত্রা ছাড়াইয়া যায় তাহা হইলে উদ্বেগবোধ না করিয়া পারি না। কারণটা এখানে অবান্তর। নানা অবস্থায় নানা পরিবেশে যে উচ্ছৃঙ্খলতা ছাত্রসমাজে প্রকট হইতেছে তাহাতে ছাত্রদের কল্যাণকামী কেহই চিন্তিত না হইয়া পারেন না। যেখানে অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে, সেখানেও ঔদ্ধত্য ও অবিনয়ের কুৎসিত প্রকাশ গর্হিত বলিয়াই বিবেচিত হইবে, আর যদি ধৈর্য্যচ্যুতি অকারণে ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে ত কথাই নাই। পরীক্ষার প্রশ্ন দুরূহ হইয়াছে, কি হয় নাই তাহা বিবেচনার বিষয়। যদিও বা তর্কের খাতিরে মানিয়া লওয়া গেল প্রশ্নপত্রে ত্রুটি আছে, পরীক্ষার্থীদের অসন্তোষ অহেতুক নয়—তবুও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়া কি তাহার কোনও প্রতিকার হইবে? না কি অশোভন আচরণ দ্বারা পরীক্ষা-ঘটিত সমস্যার দ্রুত ও সন্তোষজনক মীমাংসা হইবে? বরঞ্চ হট্টগোল বাধাইলে সমস্যাটা আরও জটিল হইয়া দাঁড়ায়। তখন প্রশ্নটা শিক্ষা-শিক্ষণ-শিক্ষার্থী হইতে সুনীতি-দুর্নীতি, সংযম-অসংযম, শৃঙ্খলা-বিশৃঙ্খলার পর্য্যায়ে গিয়া পড়ে। তাহাতে সমাধানের সূত্র পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। শিক্ষার মান ঠিক রাখা আর শৃঙ্খলা রক্ষা যে এক কথা নয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

আর ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, সংযত আচরণ করিলে ছাত্র-সমাজে লাভ ছাড়া ক্ষতি হইবে না। প্রশ্নপত্রের ত্রুটির দিকে শিক্ষার্থীরা যদি কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সৌজন্যসম্মত উপায়ে, তাহা হইলে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা সম্ভব ত হয়ই, তাঁহারা সকলের সহানুভূতিও পাইতে পারেন। কিন্তু প্রতিবাদ-জ্ঞাপনের পদ্ধতিটা যদি অশোভন হয়, তাহা হইলে লক্ষ্যটা গিয়া পড়ে সেই অশোভনতার দিকে, প্রতিবাদের মূল কারণটা তখন উচ্ছৃঙ্খলতার ঘূর্ণিপাকে তলাইয়া যায়। সম্ভবত এমনটাই প্রশ্নপত্র বিভ্রাটের ক্ষেত্রে হইয়াছে। বার বার দেখিতেছি পরীক্ষা-গ্রহণ ব্যাহত হইতেছে বৎসরের পর বৎসর পরীক্ষার্থীদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য। কিন্তু কেন এমন হয়? এক পক্ষের ঘাড়ে দোষ চাপাইলেই প্রশ্ন এড়ানো যাইবে না। দেখিতে হইবে, বার বার সমস্ত পরীক্ষায় একই সমস্যা কেন দেখা দিতেছে? প্রশ্নপত্র যে হেঁয়ালি নয়, ইহা যদি শিক্ষাতরীর বিজ্ঞ কর্ণধারেরা উপলব্ধি করেন ও প্রশ্নপত্র রচনার সময় মনে রাখেন, তাহা হইলে সমস্যার একটা দিক মিটিয়া যাইবে।

ইহা ছাড়া বিভ্রাটের অন্য কারণও আছে। অনেকেই জানেন, 'সিভিক্‌স', 'ইতিহাস' ও অপরাপর বিষয় এখন অধিকাংশ শিক্ষার্থী মাতৃভাষায় পড়ে, পরীক্ষার উত্তরও মাতৃভাষায় লেখে। কিন্তু প্রশ্নপত্র হয় ইংরেজীতে এবং এইসব প্রশ্নের বয়েন বুঝিতে না পারিয়াই তাহারা 'কঠিন' 'কঠিন' বলিয়া চীৎকার করে কি না কে বলিতে পারে? পড়া ও লেখার জন্য যখন মাতৃভাষা মঞ্জুর আছে, তখন প্রশ্নই বা ইংরেজীতে করা হইবে কেন?

সবকিছু জটিল অবস্থা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, প্রশ্নকারক পরীক্ষার্থীদের উপর আপন আপন বিদ্যা-বৈদগ্ধ্য জাহির করেন, মডারেটর চোখ বুঁজিয়া তাহাতে সায় দেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ ফিরিয়া তাকান না—তার পর পরীক্ষার হলে হল্লা বাধিলে সকলের টনক নড়ে এবং শেষ পর্য্যন্ত শান্তিরক্ষার ভার লইতে হয় পুলিসকে। এই অবস্থা বৎসরের পর বৎসর দেখিতে দেখিতে দেশবাসী উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার ছেদ এইখানেই টানিতে হইবে।

সবশেষে বলিতে হয় একদল শিক্ষা-কারবারীর কথা। আগে ইহারাই ছেলেদের "কোচ" করিতেন মোটা বিদ্যাপণ লইয়া এবং যে কোন উপায়ে হউক, প্রশ্নপত্রের রকম বুঝিয়া ছাত্রদিগেরও তালিম দিতেন সেই মত।

ইঁহাদের ব্যবসা-ক্ষেত্রের পরিধিও ছিল বড় এবং এখনও আছে বড়।

কয়েক বৎসর যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাদের কারচুপির সন্ধান পাইয়া প্রশ্নকর্তাদের মধ্যে অনেক রদবদল করায়, প্রশ্নপত্র সব ইঁহাদের সন্ধানী-চোখের আড়ালে গিয়াছে। এবং তার পর হইতেই ছেলেদের উস্কানি ও হট্টগোল আরম্ভ হইয়াছে শোনা যায়। গ

দণ্ডকারণ্য

উদ্বাস্তুজনের উদ্ভব কি কারণে হ'ল এ কথার আলোচনা পুরানো হলেও বারে বারে করা প্রয়োজন। কারণ ধর্মগ্রন্থের অখণ্ড পাঠের মতই সত্যের অখণ্ড আলোচনা চালিয়ে যাওয়া দরকার; কেননা আধুনিক জগতে সাজান মিথ্যার আয়োজন এত বিপুল ও তার গতিবেগ এত মারাত্মক ও দ্রুত যে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সেই পদ্ধতিরই অনুসরণ করা আবশ্যক যার দ্বারা মিথ্যাকে জাতীয় আদরে উচ্চস্থানে বসান হয়ে থাকে। কংগ্রেস নেতারা যখন ভারত সাম্রাজ্যের মালিক ইংরেজের সঙ্গে স্বাধীনতা লাভের জন্য দর-ভাও করছিলেন তখন তাঁদের প্রতিযোগী ছিলেন মহম্মদ আলি জিন্না। তিনি চাইছিলেন ভারতীয় মুসলমানদের জন্য একটা বিভিন্ন রাজ্য যার নাম হবে পাকিস্থান। রাষ্ট্রীয়, জাতীয় এবং অর্থনৈতিক হিসাবে এই দেশভাগের পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে অনিষ্টকর বলে জানা সত্ত্বেও কংগ্রেস নেতারা স্বাধীনতা লাভের লোভে, আগ্রহে এবং আবেগে দেশভাগ করা মেনে নিলেন এবং ভারতের উপর দিয়ে তার ফলে এমন একটা রক্তের স্রোত বয়ে গেল যার বর্ব্বরতা ও বীভৎসতার তুলনা হয় না। এই হত্যাকাণ্ডের অবসান হলে পরেও নারীহরণ, লুঠ, মারপিট, অপমান, অত্যাচার ও অপরাপর অসভ্য ও পাশবিক উপায়ে পাকিস্থান এলাকা থেকে হিন্দু বহিষ্কার কার্য্য পূর্ণ উদ্যমে চালিয়ে যাওয়া হতে লাগল। এর ফলে লক্ষ লক্ষ হিন্দু পরিবার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে নিজেদের বাসভূমি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হলেন। আমরা যে সব উদ্বাস্তুদের বিষয় আলোচনা করে থাকি এবং যাদের নিয়ে ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার সর্ব্বদাই যথেচ্ছাচার করে চলেছেন, তারা প্রায় সকলেই এই ভাবে নিজ জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত। এদের অশ্রুজলের পরিবর্ত্তেই কংগ্রেস রাজ্যলাভে সক্ষম হয়েছিলেন এক সময়। পশ্চিম ভারতেও বহুসংখ্যক পঞ্জাবী পরিবার এই ভাবেই বিতাড়িত হয়ে ভারত সরকারের আশ্রয়ে এসে পড়েন এবং তাঁদের উপরেও অনেক অবিচার হয়ে থাকলেও দিল্লীর সঙ্গে নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠতার খাতিরে তাঁরা ঠিক বাঙালী উদ্বাস্তুদের মত দুর্দ্দশায় কখনও পড়েন নি। তা হলেও একথা অবশ্যই মানতে হবে এবং ভুললে চলবে না যে, এই সব বাঙালী ও পঞ্জাবীরাই নিজেদের সব সুখ-সুবিধা বলিদান দিয়ে কংগ্রেসকে ভারতের সিংহাসনে বসিয়েছিলেন।

কংগ্রেস রাজ প্রতিষ্ঠিত হবার পরে ভারতের রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও জাতীয় উন্নতি বা অগ্রগমনের ক্ষেত্রে অনেক কিছু ঘটেছে। ভারত সরকার সবল পদ্ধতিতে কাশ্মীর ও হায়দ্রাবাদে ভারতীয় রাজ্য বিস্তার করে জনসাধারণের বহু উপকার করেন। তাঁরা বহু কারখানার প্রতিষ্ঠা, রেল-রাস্তার বিস্তার, সঙ্গীতকলা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠান, শত শত বা বহু সহস্র ভারতীয়কে সরকারী খরচায় বিদেশে পাঠান, এরোপ্লেনের কারবারে জগতে উচ্চ স্থান অধিকার করা, বিজলী শক্তির উৎপাদন ও বাঁধ বেঁধে বন্যা দমন, দলাই লামা ও পলাতক তিব্বতীদের আড়ম্বরের সঙ্গে আশ্রয়দান ও তিব্বত ধর্ষণকারী চীনাদের সঙ্গে শত্রুতা বা মিত্রতার ভয়ে ও আগ্রহে বহু চেষ্টা এবং অর্থ ব্যয়···ইত্যাদি অনেক কিছু করেছেন। সত্য সত্যই একাধারে এই রকম মোগলাই সমারোহ ও আড়ম্বর, বৈজ্ঞানিক পথে অগ্রগমন চেষ্টা ও কুসংস্কার সমর্থন, সুনীতি প্রচার ও দুর্নীতিরোধ প্রচেষ্টা, শত্রুর প্রতি ভক্তি ও নরমের উপর জুলুম; নির্বিরোধী ভদ্রলোকদের সম্পদ আইন প্রবর্ত্তনের সাহায্যে কেড়ে নেওয়া ও চোর-জুয়াচোর ঠগের সব অসামাজিক অপরাধ ও দেশ-শোষণ কার্য্যে অসহায় নির্বিরোধ পন্থা অনুসরণে কার্য্যতঃ সমর্থন করা, ইতিহাসে তুলনাহীন। কিন্তু ভারত সরকারের সব দোষ-ত্রুটির মধ্যে উদ্বাস্তুদের উপর অবিচার, অন্যায় ও নিজেদের দায়িত্ব ও কৃতজ্ঞতার ঋণ অস্বীকার চেষ্টা বিশেষ ভাবে দোষণীয় ও ঘৃণ্য বলে আমাদের মনে হয়। যে ভারত সরকার ন্যায় ও শান্তির আকর ও জগৎসভায় নিজ মহত্ত্ব গৌরবে বিস্তৃত পুচ্ছ-নৃত্য উন্মত্ত ময়ূরের মতই শোভমান ও নিজ রূপ গুণ মুগ্ধ, সেই ভারত সরকার যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ন্যায়ের ও সুবিচারের ক্ষেত্রে অপারগ হন তা হলে সে জাতীয় দোষের কোন ক্ষমা নেই। নিজেদের সুবিধার জন্য যাদের ঘর-ছাড়া ভিখারীর অবস্থায় ফেলা হয়েছে; তাদের বিহার বা উড়িষ্যার দ্বারে হীন অবস্থায় অপমানের পাত্র হিসাবে দাঁড় করানর কোন সাফাই নেই। বাংলার যেসব নিজস্ব অংশ ইংরেজ সরকার বাঙালীর বিপ্লববাদের শাস্তি হিসাবে বিচ্ছিন্ন করে বিহার-উড়িষ্যা-আসামে যুক্ত করেছিলেন সেই এলাকাগুলি বাংলাকে ফেরত দিয়ে দিলেই

বাংলা নিজের লোকদের নিজেই সামলে নিতে পারে। কিন্তু তা করলে উপরোক্ত প্রদেশবাসীরা অখুশী হতে পারেন এই ভয়, এবং বাঙালীরাও সংঘটিত ও শক্তিমান হয়ে উঠতে পারে। বোম্বাই ও মাদ্রাজে সরকারী নীতি অনুরূপ। কারণ তদ্দেশবাসীদের দরবারে উচ্চস্থান ও রাষ্ট্র-বান্ধবতা। ভারত সরকার ইংরেজের রাজত্বের উত্তরাধিকারী হয়ে তাদের অনেক দোষ দুষ্কর্মের বোঝাও নিজেদের স্কন্ধে তুলে নিয়েছেন। এর মধ্যে অনেকগুলি আবার সু-প্রতিষ্ঠিত অধিকার হিসাবে হয় কোন ব্যবসাদার নয় কোন রাষ্ট্রীয় গণ্ডির সুবিধার কেন্দ্র। সুতরাং বাঙালীর ন্যায়াধিকারের কচকচি বা প্রয়োজনের কাকুতি এর কোনটাই শক্তিমান ভারত সরকারের কাছে গ্রাহ্য হতে পারে না। তাঁরা শুধু বোঝেন ও মানেন "তাকত"কে। যারা সৈন্য বা প্রহরীর জাত তাদের সুখ-সুবিধা অন্যায় আবদার আগে এবং শিক্ষক, চাষী ও কেরাণীরা আসে সর্বশেষে। অবশ্য যারা সর্বস্বান্ত, ভারত সরকারেরই কর্মের দোষগুণেই, তারা কোথায় তা কেউ জানে না।

উদ্বাস্তুদের বহু নিন্দা ভারত সরকার ও তাঁদের তাঁবেদার পশ্চিম বাংলা সরকারের মারফতে প্রায়ই শোনা যায়। দোষ ভারত ও পশ্চিম বাংলা সরকারের আরও বেশী আছে। দোষ থাকলে কারুর অধিকার বিলুপ্ত হয় এ কথা কোন আইনজ্ঞ বলবেন না। আমাদের যে জাতীয় ঋণ উদ্বাস্তুদের কাছে আছে, তা যতক্ষণ না শোধ হয় পুরাপুরি ততক্ষণ মেহেরচাঁদের ছিদ্রান্বেষণে আমরা নিজেদের কর্তব্য ভুলতে পারি না। ভারত সরকার কর্তব্য অবহেলা, কংগ্রেসী প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, পেয়ারের লোক-দের আবদারে অন্যায়ে অবগাহন ইত্যাদি অবলীলাক্রমে করে থাকেন। ভাঙ্গা বাংলা জুড়ে এক করে দিতে তাঁদের বড়ই আপত্তি অপরের পরস্বগ্রাসেচ্ছার তাড়নায়। বাংলা কিন্তু এই সব অন্যায় কখনও মেনে নেবে না। অ

ডাক ও তার বিভাগের কাজ

ভারতের ডাক ও তার বিভাগের কাজের একদিন যথেষ্ট সুনাম ছিল। অপরাপর কয়েকটি বিভাগের ন্যায় ইহারও কর্মপটুতা বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে এবং জন-সাধারণ তাহার জন্য যথেষ্ট দুর্ভোগ ভোগ করিতেছে। লোকসংখ্যা এবং শিল্প-বাণিজ্যের সহিত নানা ক্ষেত্রে ইহার কাজও প্রসারলাভ করিতেছে। ১৯৫৮-৫৯ সনে এই বিভাগে ৩৫'৯৬ কোটি সাধারণ ও রেজিষ্টার্ড মাল হাত ফেরত করা হইয়াছে। ১৯৫৯-৬০ সনে অনুমান এই সংখ্যা ৩৮'৫০ কোটি হইয়া থাকিবে। ১৯৫৮-৫৯ সনের হিসাবে দেখা যায়, রেজিষ্টার্ড মালের সংখ্যা ১০'৩৮ কোটি, মণি-অর্ডার সংখ্যা ৭'৩০ কোটি এবং ইহার সাহায্যে প্রেরিত টাকার পরিমাণ ২৯'৬০ কোটি। (১৯৫৯-৬০ সনে ইহা ৩১'৭০ কোটি টাকা হইয়া থাকিবে।) সেভিংস্ ব্যাঙ্ক হিসাব সংখ্যা (১৯৫৮-৫৯) ২'২২ কোটি, টেলিগ্রাম সংখ্যা ৩'৪৩ কোটি ছিল। ইহা হইতে এই বিভাগের কাজের ব্যাপকত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যাইতে পারে। পূর্বে পোষ্ট-আপিসের ত্রুটি সম্বন্ধে অভিযোগ করিতে হইলে ডাক মাশুল লাগিত না। স্বাধীন হইয়া অভিযোগের জ্বালায় তাহা বন্ধ করিতে তাঁহারা বাধ্য হইয়াছেন। বহু লোকের চিঠিপত্র লেখার মত বিদ্যা নাই, অনেকে আলস্যবশতঃ লেখেন না, আবার শ্রম করিয়া কোনও ফল পাওয়া যায় না বলিয়াও অভিযোগ করেন না। তথাপি ১৯৫৯ সনে ৪,৯৮,৬৯৫টি অভিযোগপত্র পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব নিয়মানুসারে অভিযোগপত্র বিনা মাশুলে ডাকে দিবার ব্যবস্থা পুনঃ-প্রবর্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিশেষতঃ, যখন ডাক-টিকিটের দাম অত্যধিক বাড়িয়াছে। প

টালিগঞ্জের হাসপাতাল

হাসপাতাল সম্বন্ধে অভিযোগ প্রায়ই উঠে। কিন্তু টালিগঞ্জ হাসপাতালের বিষয়টি একটু স্বতন্ত্র। অভিযোগ উঠিয়াছে, গুরুতরভাবে অগ্নিদগ্ধ জনৈকা মহিলা ও তাঁহার শিশু-সন্তানকে কিছুদিন পূর্বে এই হাসপাতালের ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে লইয়া আসা হইয়াছিল। অথচ বিস্ময়ের কথা, যে ওয়ার্ডের নাম ইমার্জেন্সি ওয়ার্ড সেখানে একজন ষ্ট্রেচার-বয় ও দারোয়ান ছাড়া আর কাহাকেও দেখা যায় নাই। অনুসন্ধান করিয়া অন্যত্র যদি বা ডাক্তারের খোঁজ পাওয়া গেল, ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে আসিয়া পৌঁছিতে তিনি নাকি প্রায় আরও আধ ঘণ্টা দেরি করেন। রোগিণীর চিকিৎসার জন্য রক্তের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এ ব্যাপারেও ডাক্তারদের নিকট হইতে রিপোর্ট পাইতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করিতে হয়। তা ছাড়া রক্ত আনিবার ব্যাপারে, হাসপাতালের গাড়ীর সুবিধা পাওয়া যায় নাই। অথচ হাসপাতালে যে তখন গাড়ী ছিল না, এমন নয়।

অভিযোগকারী এই সমগ্র বিষয়টির প্রতি রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া জানান যে, অগ্নিদগ্ধ মহিলা ও শিশু উভয়েরই মৃত্যু ঘটিয়াছে। অভিযোগ যদি সত্য হয়, তবে আর না বলিয়া উপায় থাকে না যে, একটা মারাত্মক অবস্থা ও হৃদয়হীনতাই এই মৃত্যুর জন্য দায়ী। প

বিবিধ প্রসঙ্গ

[প্রবাসী, প্রথমবর্ষ, প্রথম সংখ্যা—বৈশাখ ১৩০৮, হইতে পুনর্মুদ্রিত]

• জয়পুর রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী রাও বাহাদুর কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জেলা চব্বিশ পরগনার অন্তঃপাতী রাহুতা নামক একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামাতা দারিদ্র্যবশতঃ তাঁহাকে উচ্চশিক্ষা দিতে পারেন নাই। তিনি প্রথমে জনাই স্কুলে তৃতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং পরে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে উন্নীত হন। তিনি হৃদয়-মনের সমুদয় শক্তি দিয়া শিক্ষকের কর্ত্তব্য পালন করিতেন। শিক্ষকতা করিবার সময় তিনি অবসর-কাল ইংরেজী ও সংস্কৃত নানা গ্রন্থ অধ্যয়নে যাপন করিতেন। এইরূপে তিনি এই দুই ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। জনাই স্কুল হইতে তিনি জয়পুর স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ পাইয়া তথায় গমন করেন। এই কার্য্যে তাঁহার দক্ষতা দেখিয়া জয়পুরের তদানীন্তন মহারাজা স্কুলটিকে কলেজে পরিণত করেন এবং তাঁহাকে কলেজের প্রথম প্রিন্সিপ্যাল বা অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। এই কার্য্যেও তিনি খ্যাতি-লাভ করেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা রামসিং তাঁহাকে দরবারের অন্যতম সভ্য নিযুক্ত করেন। এই সময় হইতে তিনি রাজস্ববিষয়ক নানা কার্য্যে অভিজ্ঞতালাভ করিতে আরম্ভ করেন। বর্ত্তমান মহারাজা যখন নাবালক ছিলেন, তখন রাজ্যশাসন করিবার জন্য একটি রাজপ্রতিনিধি-সভা নিযুক্ত হয়। কান্তিচন্দ্র এই সভার প্রধান সভ্য ছিলেন। মহারাজা সাবালক হইয়া যখন রাজ্যশাসনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করেন, তখন কান্তি বাবু প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। বিশ বৎসরের অধিক কাল তিনি এই উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। এইসময়ের মধ্যে তিনি রাজস্ব এবং শাসনসম্বন্ধীয় নানা কার্য্যে দক্ষতা দেখাইয়া বাঙালীর রাজ্যশাসন ক্ষমতা সপ্রমাণ করিয়াছেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এবং স্বীয় প্রভু উভয় পক্ষেরই নিকট তাঁহার সমান খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৮ বৎসর হইয়াছিল। প্রৌঢ়াবস্থা পর্য্যন্ত শিক্ষকতা করিয়া তৎপরে রাজকার্য্য পরিচালনে এরূপ দক্ষতা প্রদর্শন সচরাচর দেখা যায় না। ইহা হইতেই তাঁহার বহুতোমুখী প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবাসী বাঙ্গালী-দের মধ্যে তিনি পদমর্য্যাদায় শীর্ষস্থানীয় ছিলেন।

*
* *

এ বৎসর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় ৬১৩ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৫০ জন বাঙ্গালী। তন্মধ্যে একটি বালিকারও নাম আছে। সর্ব্বশুদ্ধ ৫৯ জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। তন্মধ্যে ৮ জন বাঙ্গালী। দুইজন বাঙ্গালী ছাত্র গুণানুসারে তৃতীয় ও অষ্টম স্থান অধিকার করিয়াছে। এখানে প্রবেশিকা পরীক্ষার যে শাখায় বৈজ্ঞানিক বিষয়ে পরীক্ষা দেওয়া যায়, তাহার নাম স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় ২০৮ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩২ জন বাঙ্গালী। প্রথম বিভাগে ৩১ জন পাস হইয়াছে। তাহার মধ্যে ৬ জন বাঙ্গালী। বাঙ্গালীদের মধ্যে গুণানুসারে কেহই দ্বাদশ অপেক্ষা উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারে নাই। এখানকার ইণ্টারমীডিয়েট পরীক্ষা কলিকাতার এফ. এ.-র মত। এই পরীক্ষায় এবার ২৪৪ জন ছাত্র পাস হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩০ জন বাঙ্গালী। এই ত্রিশের মধ্যে একটি ছাত্রীও আছেন। প্রথম বিভাগে মোটে ৪ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। তন্মধ্যে ২ জন বাঙ্গালী। তাহারা গুণানুসারে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণের সংখ্যা ১৭৬। বাঙ্গালী ২৪ জন। তাহার মধ্যে একটি ছাত্রী আছেন। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ৬ জনের মধ্যে একজনও বাঙ্গালী নাই। তিনজন বি. এস-সি পাস করিয়াছেন। তাহার মধ্যে একজন বাঙ্গালী। ৬ জন প্রথম ডি. এস-সি পাস করিয়াছেন। বাঙ্গালী একজনও নাই। দুইজন দ্বিতীয় ডি. এস-সি পাস করিয়াছেন। দুইজনই হিন্দুস্থানী। একজন তৃতীয় ডি. এস-সি পাস করিয়া ডি, এস-সি উপাধি পাইয়াছেন। ইনি মুসলমান। ইহার পূর্ব্বে আর একজন এলাহাবাদের

ডি. এস-সি উপাধি পাইয়াছিলেন। তিনি হিন্দুস্থানী। এখন গবর্ণমেন্ট বৃত্তি পাইয়া কেম্ব্রিজে উচ্চ গণিতের অনুশীলন ও গবেষণায় প্রবৃত্ত আছেন। মুসলমান ডি. এস-সি-টি গণিতে পরীক্ষা দিয়াছিলেন। ইহা বড় সুখের বিষয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। যাঁহারা গণিতের ইতিহাস জানেন, তাঁহারা জানেন উক্ত বিদ্যার প্রাচীন ইতিহাসে মুসলমানগণ যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা তুচ্ছ নয়। এবার এম. এ. পরীক্ষায় ২১ জন পাস হইয়াছেন। তাহার মধ্যে বাঙ্গালী তিন জন। কেহই প্রথম বিভাগে পাস হন নাই। এল-এল-বি অর্থাৎ বি-এল পরীক্ষায় ৮ জন পাস হইয়াছেন, তন্মধ্যে ৩ জন বাঙ্গালী। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা অবধি এই বৎসর এই প্রথম একজন এল-এল-ডি অর্থাৎ ডি-এল উপাধি পাইলেন। ইঁহার নাম শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি একজন প্রতিভাশালী ছাত্র। কলিকাতা ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ ও এম-এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছিলেন এবং প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পাইয়াছেন। ইনি কিছুকাল হুগলী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। এখন এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছেন। ইনি সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে ইংরাজীতে একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য দর্শন ও সাহিত্য-বিষয়ক কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন ও সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার কোন কোন পুস্তক অধ্যাপক মোক্ষমূলর, ফ্রেজার প্রভৃতির প্রশংসা লাভ করিয়াছে। ইঁহার চরিত্রে বিনয় ও পাণ্ডিত্যের দুর্লভ সম্মিলন পরিলক্ষিত হয়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম কুইন-এম্প্রেস পদক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, পাইয়াছেন। ইনি এখন বেরিলী কলেজে অধ্যাপকতা করিতেছেন। হিন্দুস্থানীর অনুপাতে এদেশে বাঙ্গালীর সংখ্যা খুব কম। কিন্তু প্রবাসী বাঙ্গালীদের অধিকাংশেরই জীবিকা লেখাপড়া জানার উপর নির্ভর করে। এইজন্য তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষার অধিকতর বিস্তার প্রার্থনীয়। প্রবাসী বাঙ্গালীর সন্তানগণ চরিত্র ও শ্রমশীলতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না রাখিলে যে অচিরেই সাতিশয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

* * *

এ বৎসর শিক্ষার উন্নতিকল্পে, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইটি দানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এখানকার প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন। উহার সুদ হইতে বি-এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রকে প্রতি বৎসর ৩৫ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। লক্ষ্ণৌ নিবাসী মহাজন ৺লালা সাঁওঅল দাসের বিধবা পত্নী শ্রীমতী ভগবানদেয়ী মাসিক মোট ৫০ টাকা পরিমিত কতকগুলি বৃত্তি স্থাপনার্থ বিশ্ববিদ্যালয়কে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ দিয়াছেন।

* * *

তাহার প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য কিরূপে আরম্ভ করা যাইতে পারে, কোন্ স্থানে উহা স্থাপিত হওয়া উচিত, কত টাকার কমে কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে না, অধ্যাপক নিয়োগ কিরূপে করিতে হইবে, উহাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা কিরূপ হওয়া সম্ভব, ইত্যাদি বিষয়ে রিপোর্ট করিবার জন্য প্রস্তাবক মহাশয় আর্গনের আবিষ্কর্ত্তা অধ্যাপক রামজেকে বিলাত হইতে আনাইয়াছিলেন। তাঁহার রিপোর্টের মর্ম্ম সংবাদপত্র পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। আমরা রিপোর্টের কেবল একটি অংশ সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলিতে চাই। অধ্যাপক রামজে বলিয়াছেন, এলাহাবাদ ও লাহোরে কলিকাতা অপেক্ষা উচ্চতর বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহার অর্থ কি? অর্থ এই। কলিকাতায় যদি কেহ রসায়ন ও পদার্থবিদ্যায় বি-এ কিংবা পদার্থবিদ্যায় এম-এ উপাধি পাইতে চান, তাহা হইলে তাঁহাকে কেবল পুঁথিগত বিদ্যার পরীক্ষা দিতে হয়, কার্য্যতঃ তিনি কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ব্যবহার করিতে পারেন কিনা, তদ্দ্বারা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন কিনা, তাহার কোনই পরীক্ষা লওয়া হয় না। যাঁহারা সম্মান (honours) পাইতে চান, তাঁহাদিগকেও পদার্থবিদ্যায় এরূপ পরীক্ষা দিতে হয় না। কেবল রসায়নে দিতে হয়। কিন্তু এলাহাবাদ ও পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁহারা পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে বি-এ, এম-এ প্রভৃতি পরীক্ষা দেন, তাঁহাদের প্রত্যেককেই কি পদার্থবিদ্যা কি রসায়ন উভয়েই হাতে-কলমে বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ব্যবহার ও তৎসাহায্যে তত্ত্ব-নিরূপণের ক্ষমতার পরিচয় দিতে হয়। পঞ্জাবের এণ্ট্রেন্স হইতে আরম্ভ করিয়া সকল পরীক্ষাতেই এই নিয়ম। পরীক্ষার নিয়ম হিসাবে কলিকাতা পশ্চাতে পড়িয়া আছেন। কলিকাতার পরীক্ষা প্রণালীর সংস্কার প্রার্থনীয়।

রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ

ডক্টর সুধীরকুমার নন্দী

আভিধানিক অর্থে মানবতাবাদ একদিকে যেমন বীরপূজা বা ব্যক্তিমানুষের পূজাকে সযত্নে পরিহার করে, অন্যদিকে তাকে ভগবদ্-ভক্তিকেও সযত্নে পরিহার করে চলতে হয়। মানবতাবাদ মনুষ্য সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের তত্ত্ব; এ তত্ত্বে মানুষই মানুষের কল্যাণ-প্রচেষ্টার শেষ লক্ষ্য। সমগ্র মানব সমাজের সুখ-দুঃখ-আনন্দ বেদনা-আশা-নিরাশায় সহমর্মিতা এই তত্ত্বের মধ্যে বিধৃত। ব্যক্তি-বিশেষের, জাতিবিশেষের বা কোন এক বিশেষ সমাজের কথা এ তত্ত্বের বাচ্যার্থের সঙ্গে সমার্থক বলে অগ্রাহ্য। এই তত্ত্বের লক্ষ্য যে বিশাল মানব সমাজ তা এক এবং অবিচ্ছেদ্য। তাদের মধ্যে স্বার্থ-সংঘাত নেই, বিরোধ নেই, বিসংবাদ নেই। এই স্বার্থ-দ্বেষ-নিষ্কলুষ বিরাট মানবগোষ্ঠী, এই গোষ্ঠীর চিন্তাই নব্য মানবতাবাদীদের উৎসাহিত করেছে। এই প্রেরণায় প্রাণিত হয়ে রোমাঁ রোলাঁ শিল্পের জগতে তাঁর 'People's Theatre'-এর প্রবর্তনা করেছেন। এই যে নাট্যসৃষ্টির কথা মানবতাবাদী রোলাঁ ভাবলেন তাঁর মূল কথা হ'ল মানুষের মহৎ শক্তির কাছে প্রাকৃতিক শক্তির নতি স্বীকার এবং সেই পরাহত শক্তিকে মানুষের সামগ্রিক কল্যাণে বিনিয়োগ। এই বিশ্ব-মানবতার ধারণাই মার্কিন জননায়ক ওয়েণ্ডেল উইল্‌কিকে তাঁর 'এক জগৎ' ধারণায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। আধুনিক বিজ্ঞান এই বিশ্ব-মানবতার ধারণাকে বাস্তব করে তোলায় সহায়তা করেছে। এই যে এক জগৎ, এই যে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, এদের মূলে রয়েছে পরস্পর সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান; এ দেশের মানুষ ও দেশের মানুষকে না জানলে, পরস্পরের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় না ঘটলে কেমন করে মানুষে মানুষে আত্মীয়তা গড়ে উঠবে? এই বিশ্ব-সৌভ্রাত্র গড়ে উঠতে পারে তখনই যখন পৃথিবীর এক প্রান্ত দেশের মানুষ আর এক প্রত্যন্ত প্রদেশের মানুষের সুখ-দুঃখের অংশভাগী হবে। **Lecomte Du Noiiy** তাঁর **'Human Destiny'** গ্রন্থে বললেন যে আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগমন কাল এবং স্থানকে সঙ্কুচিত করে দিয়েছে। আধুনিক যুগে বর্তমান কালের কুক্ষিতে বহুতর ঘটনার সংস্থান হচ্ছে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে। বেতার টেলিভিশন সুদূর আফ্রিকার নগণ্য পল্লীতে জলপ্লাবনের কথা আমাদের তক্ষুণি জানিয়ে দিচ্ছে। সেটা বর্তমানের কথা হয়ে আমাদের কাছে আসছে। যাঁরা ভাগ্যহত নন, তাঁরা উদার হস্তে সাহায্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন ঐ ভাগ্যহত মানুষদের দুঃখ লাঘব করবার জন্য। যদি দুর্ঘটনা ঘটে যাবার বেশ কিছু পরে এই খবর দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ত তা হলে তাকে অতীতের ঘটনা বলে দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া ঐ হতভাগ্য মানুষদের জন্য আমাদের আর কিছুই করার থাকত না। সহানুভূতি শুধু বাক্যমাত্র হয়ে থাকত; অতীত দুর্ঘটনার মৃত আত্মা অন্যান্য মানুষকে সমবেদনায় অনুপ্রাণিত করতে পারে না যেমনটি পারে দুর্ঘটনার তাৎক্ষণিক আবেদন। যে দুর্ঘটনা এখনও ঘটছে তার খবর যখন দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে তখন তার আবেদনের যে শক্তি এবং উত্তাপ থাকে, তার কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না যখন সেই দুর্ঘটনাকেই আমরা অতীতের অঘটন মাত্র বলে মনে করি। অতীতের অঘটনের জন্য আমরা দুঃখিত হই, মৃত এবং আহতদের জন্য লৌকিক সমবেদনা জানাই মাত্র। যখন দুর্ঘটনাকে বর্তমান কালের বলে মনে করি তখন আমাদের সহানুভূতি, আমাদের দরদী চিত্তের সহমর্মিতা দুর্বার হয়ে ওঠে। এ যুগের বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশল দূরদূরান্তের মানুষের দুঃখ-বেদনাকে বর্তমান কালের বস্তু করে তুলেছে সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে। তাই ত এ কথা বলা হয় যে, নব্যতম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে স্থান এবং কালের সীমা সঙ্কোচনের ফলে মানবতাবাদ নূতন অর্থ এবং ব্যঞ্জনায় ভূষিত হয়ে উঠেছে। সকল মানুষের মধ্যে আত্মীয়তাবোধের প্রতিষ্ঠা আজ আর প্রত্যেক্ চিন্তার অলস কল্পনাবিলাস নয়। আদর্শবাদী মানুষের স্বপ্ন বলে আজ আর সে উপহসিত নয়। মানবতাবাদের মহত্তম ব্যাখ্যাকে সত্য বলে গ্রহণ করা এ যুগে একান্তই সহজ এবং স্বাভাবিক। বিজ্ঞান মানবতা-বাদকে বিস্তার এবং মহত্ত্ব দিয়েছে এবং তাকে সত্য এবং বাস্তব হয়ে ওঠার দুর্লভ সুযোগ দান করেছে যা নিকট অতীতেও আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অলভ্য ছিল। মনীষী কার্লাইল তাঁর যুগের মানবতাবাদকে সাধুবাদ দিলেন; কার্লাইলের যুগে আর একজন ভূম্যধিকারী

যে মৃগয়ান্তে প্রাসাদে ফিরে জন দুই ক্রীতদাসকে হত্যা করে তাদের উষ্ণ রক্তে হস্তপদাদি প্রক্ষালন করেন না, এতেই তিনি খুশি হয়েছেন। মানবতাবাদ যে তাঁর যুগের মানুষের অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে একে তিনি তারই লক্ষণ হিসেবে দেখেছেন। কার্লাইলের যুগ অতিক্রান্ত; তার পরে অনেক সূর্য উত্তরায়ণ পার হয়েছে বহু লক্ষ বার। আধুনিক যুগ প্রাগগ্রসর মানবতার ধারণার লক্ষণাক্রান্ত। রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় সেই ধারণার স্বাক্ষর। তাঁর জীবন-সাধনায় পরিণত মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠা; তাঁর মননসাধনায় সেই মানবতাবাদকে উত্তীর্ণ হবার স্থির সঙ্কেত। জীবনের সায়াহ্ন বেলায় মহাকবি ঘোষণা করলেন,[১]

"আমি ভালবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে, যে মুক্তি পরমপুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে, আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে, যিনি জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।"

রবীন্দ্রমানসে মানবতাবাদের সব চেয়ে বড় শক্তি-পরীক্ষা ঘটল জালিয়ানওয়ালাবাগের অমানুষিক হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে। ১৯১৯ সনের এপ্রিল মাস, সেদিন আকাশে ছিল পূর্ণচন্দ্র; কৈরবীস্নাত আকাশ-বাতাসে মৃত্যুর সঙ্কেত ছিল বুঝি! সেই সঙ্কেত অগ্নিবর্ষণ করল নরঘাতক ডায়ারের নির্দেশে। প্রায় চারশো মানুষ রক্তাপ্লুত মৃত্যুর গর্ভে চিরদিনের মত হারিয়ে গেল। কত মানুষ যে নিষ্পেষিত হ'ল অশ্রুতপূর্ব অত্যাচারের যন্ত্রের চাকায় তার খবর লেখা হ'ল না। সে লেখাও ছিল সরকারের নিষেধরুদ্ধ। সারা দেশের কণ্ঠরোধ করল সরকারের উদ্যত শাসন। যে মনুষ্যত্বের স্বপ্ন, যে মানবতার আদর্শ দু' হাজার বছর ধরে ধর্ম এবং দর্শন সারা পশ্চিম দেশের সামনে তুলে ধরল তাকে ভূমিসাৎ করে দিল পশ্চিম দেশেরই একজন মানুষ প্রাচ্যদেশের বিজিত ভূমির তৃণাস্তরণে। ডায়ার সাহেব সেদিন যে শুধুমাত্র সহস্রাধিক নিহত এবং আহত মানুষের বুকের পাঁজর ভেঙে দিয়েছিলেন তাই নয়। তিনি সেদিন হনন করলেন সেই আদর্শকে যে আদর্শ উলম্যানকে ক্রীতদাসত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর করেছিল, যে আদর্শ জেসুইটদের পাটাগোনিয়ায় পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল এবং যে আদর্শ টম পেইনকে মানুষের আদিম পাপতত্ত্বকে অস্বীকার করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। ডায়ার সাহেব পশ্চিম দেশের দু' হাজার বছরের সযত্ন-পোষিত আদর্শবাদিতার[২] মূর্তিমান অস্বীকার। ইতিহাসের পরিহাস হ'ল এই যে, পশ্চিমী সাধনার মৌল তত্ত্ব যখন পশ্চিম দেশের একটি মানুষের হাতে লাঞ্ছিত হ'ল তখন পূর্ব দেশেরই আর একটি মানুষ পরম শ্রদ্ধায় একান্ত নির্ভয়ে সেই পরিত্যক্ত আদর্শবাদকে বুকে করে তুলে নিলেন। সেদিনকার ভারত ভূমিতে ভয়ের আধিপত্য, সত্য গোপনতার অন্ধ বিবরাশ্রয়ী! উদ্যত শাসনদণ্ডের ভয়ে সকলে নিরুদ্ধবাক্। জাতির সেই সামগ্রিক ভয়ের ঊর্দ্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করলেন মানবিক আদর্শে তাঁর সুগভীর প্রত্যয়কে, প্রকাশ করলেন তাঁর দেশের মানুষের অপমানে এবং লাঞ্ছনায় তাঁর মহৎ প্রতিবাদকে। ভারতবর্ষের বিক্ষুব্ধ আকাশের দিগন্তশায়ী মূক বেদনা একটি মানুষের অন্তরে যে তুফান তুলল তার উত্তাল প্রতিবাদ নির্ঘোষ দেশেদেশান্তরে ধ্বনিত হয়ে উঠল। সেই ভাষায় যে কারুণ্য, যে সহমর্মিতার মূর্ছনা বেজে উঠল তা কেবলমাত্র বিশ্বকবির একতারাতেই ধ্বনিত হতে পারত। অশান্ত দুঃখের পরম সংহতি ঘটাতে না পারলে প্রতিবাদের ভাষা এমন সুসীম, সংযত এবং আভিজাত্যমণ্ডিত হয়ে উঠত না। মানুষের ভাষাহীন সুগভীর বেদনার আগুন কবির বুকের পাঁজর পুড়িয়ে দিল।[১] কবি শোকে-দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। কথা ছিল ২৯শে মে তারিখে তিনি শান্তিনিকেতনে একটি সামাজিক উৎসবে পৌরোহিত্য করবেন। তিনি উৎসবে যেতে পারলেন না।[২] অথচ পরম আত্মীয়ের মৃত্যুর দিনেও তিনি পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচী কখনও বাতিল করেন নি। কবির চারিত্র্যলক্ষণ হ'ল উদারচরিত মানুষের চারিত্র্য-ধর্ম। এ আমার আপন জন, ও আমার পর, এই গণনা হ'ল লঘুচিত্ত মানুষের হিসেব; উদারচরিত মানুষের চোখে বসুধার সকল মানুষই আত্মীয়কুটুম্ব। কবি ছিলেন এই কোটির মানুষ। তাই ত প্রহারজর্জরিত, নিদারুণ-লাঞ্ছিত স্বদেশবাসী মানুষের দুঃখে আপনার মর্মবেদনাটুকু জানাবার জন্য কবি 'স্যার' উপাধি ত্যাগের যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন তা কবির সুপরিসর মানবতাবাদের কেতুযষ্টি বহন করছে। ভানুসিংহের পত্রাবলীতে তিনি লিখেছেন:

"কলকাতায় এসে বড়োলাটকে চিঠি লিখেছি আমার ঐ 'স্যার' পদবীটা ফিরিয়ে নিতে।···আমি লিখেছি বুকের

১। আত্মপরিচয়, পৃঃ ১০৩।

২। A. W. Whitehead প্রণীত Adventures of Ideas, পৃঃ ৫০

৩। ভানুসিংহের পত্রাবলী দ্রষ্টব্য।

৪। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত রবীন্দ্র-জীবনী, ৩য় খণ্ড দ্রষ্টব্য

মধ্যে অনেক ব্যথা জমে উঠেছিল তাই ভারের উপরে আমার ঐ উপাধির ভার আর বহন করতে পারছি নে, তাই ওটা আমার মাথার উপর থেকে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করছি।"

এই চেষ্টাটুকু কোন হাততালি পাবার মোহে কবির অন্তর থেকে উৎসারিত হয় নি। সমসাময়িক বিদেশী সমালোচকেরা একে দেখলেন শাসকশক্তির কাছে কবির 'challenge'৩ হিসাবে; এতদ্দেশীয় মানুষেরা কবিকে তাঁর নির্ভীকচিত্ততার জন্য বাহবা দিলেন, শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। কৈ, কোথাও কোন সমালোচক ত একথা বললেন না যে, কবির 'স্যার' উপাধি বর্জনের মূলে ছিল মানুষের প্রতি তাঁর সুগভীর মমত্ববোধ, তাঁর সুপ্রসর মানবতার ধারণা, যে ধারণা নব্য মানবতাবাদের লক্ষণাক্রান্ত। মানুষের প্রতি যে সহজ মমত্ববোধ কবিকে 'স্যার' উপাধিত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা-ই আবার তাঁকে একদিন হিন্দু-মুসলমানের মিলনের পথনির্দেশ করতে স্বতঃপ্রবৃত্ত করেছিল। কবি ডক্টর কালিদাস নাগকে একখানি পত্রে লেখেন:

"ধর্মকে কবরের মত তৈরী করে তারি মধ্যে সমগ্র জাতিকে ভূতকালের মধ্যে সর্বতোভাবে নিহিত করে রাখলে উন্নতির পথে চলবার উপায় নেই, কারো সঙ্গে কারো মেলবার উপায় নেই; আমাদের মানসপ্রকৃতির মধ্যে যে অবরোধ রয়েছে তাকে ঘোচাতে না পারলে আমরা কোন রকমের স্বাধীনতাই পাব না।···হিন্দু-মুসলমানের মিলন যুগপরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে; অন্য দেশে মানুষ সাধনার দ্বারা যুগপরিবর্তন ঘটিয়েছে। গুটির যুগ থেকে ডানা মেলার যুগে বেরিয়ে এসেছে। আমরাও মানসিক অবরোধ কাটিয়ে বেরিয়ে আসব; যদি না আসি তবে নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

মানসিক প্রকৃতির এই অবরোধটুকু নিঃশেষে ঘুচিয়ে ফেলাই হ'ল নব্য মানবিকতার লক্ষণ। এই অবরোধ ঘুচলে তবেই ত জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সকল মানুষের মিলন সম্ভবপর হবে। আদি ব্রাহ্মসমাজের ভিতর থেকে এই অবরোধ ঘুচল না বলেই ত তা পঙ্গু, অথর্ব হয়ে পড়ল অচিরেই। ১৩৩৬ সালে ইন্দিরা দেবীর এক পত্রের উত্তরে কবি তাঁকে জানান যে, আদি ব্রাহ্মসমাজ নির্বীর্য হয়ে পড়েছে। তার স্থবিরতার মূলে ছিল তার সংকীর্ণ অবরোধ-নীতি। ক্ষুদ্র গণ্ডীর সংকীর্ণতা তার প্রাণশক্তিকে অনায়াসে অবসিত করে ফেলল। যে আদি ব্রাহ্মসমাজ একদিন খ্রীষ্টান, মিশনারী এবং পাশ্চাত্ত্য অনুকরণের হাত থেকে বাঙালী হিন্দু-সমাজকে রক্ষা করেছিল তা ক্ষুণ্ণশক্তি হয়ে পড়ল নিজের চারদিকে কৃত্রিম গণ্ডী টেনে দেওয়ার ফলে। যেখানেই বৃহত্তর মানব সমাজের সঙ্গে যোগটুকু হারিয়ে যায় সেখানেই বিচ্ছেদের যবনিকা নামে, মৃত্যু আসে অবরোধের সুরঙ্গপথে। এই পরম সত্যটুকু কবির দর্শনের সকল পর্যায়ে প্রযোজ্য। এই যোগটুকু একদিকে যেমন তাঁর মানবতাবাদকে বিরাট বিস্তার দিয়েছে অন্যদিকে এই যোগটুকুই তাঁর অধ্যাত্মবাদেরও মূলকথা। তাই ত কবি তাঁর প্রার্থনায় বললেন:

"যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে
মুক্ত কর হে বন্ধ
সঞ্চার কর সকল কর্মে,
শান্ত তোমার ছন্দ।" [গীতাঞ্জলি]

ভগবানের সান্নিধ্যলাভের পূর্ব পর্বেই সকল মানুষের সঙ্গে যোগের কথা কবি আমাদের শোনালেন। এই যোগটুকুই অন্য মানুষের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনাকে আপনার করে দেখবার সুযোগ দেয়। আত্ম-স্বার্থ জনকল্যাণের অগ্নিতে পাবকশুদ্ধ হয়ে ওঠে। মানুষ অপরের আনন্দ-বেদনার খবরদারি করে তবেই আপন স্বার্থের কথা চিন্তা করবে। আপনার স্বার্থ-চিন্তায় উদ্বেলিত চিত্ত হয়ে অন্য মানুষের স্বার্থকে হনন করা মানবিকতার লক্ষণ নয়। তাই ত রবীন্দ্রনাথ কোথাও কখন কারো বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার করেন নি। অনাচারী শাসক ইংরেজকেও তিনি কোনদিন বিদ্বেষের চোখে দেখতে পারেন নি। মানুষের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আত্যন্তিক প্রীতি তাঁকে উগ্র জাতীয়তাবাদী হতে দেয় নি। তাঁর উদার মানবিকতাই তাঁকে রাজনীতিক মতবাদিতায় আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছে।

প্রবন্ধের সূচনায় আমরা বলেছি যে, মানবতাবাদের স্বরূপ লক্ষণ হ'ল সমগ্র মানব সমাজের সঙ্গে সহমর্মিতাবোধ। কবি বিপুলা পৃথিবীর সবাইকে জানতে চেয়েছেন, প্রাণের দরদ দিয়ে বুঝতে চেয়েছেন সমস্ত মানুষের সুখ-দুঃখকে। তিনি তাঁর কবি-জীবনের লক্ষ্য নির্দেশ করতে গিয়ে বললেন:

৩। ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ—(জুন ৩, ১৯১৯) সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখলেন:

"Rabindranath's abrogation of his Knighthood coupled with the challenge he has flung at the authorities is a far more serious stop than the surrender of his Knighthood by Dr. Subrahmaniya Iyer of Madras."

"সংসার মাঝে কয়েকটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর,
দু-একটি কাঁটা করি দিব দূর—
তার পরে ছুটি নিব।
সুখহাসি আরো হবে উজ্জ্বল,
সুন্দর হবে নয়নের জল,
স্নেহসুধামাখা বাসগৃহতল
আরো আপনার হবে।"

[পুরস্কার, সোনার তরী কাব্যগ্রন্থ]

কবি আপন অনন্ত শক্তির ঐশ্বর্যে অসীম শ্রদ্ধাবান। তিনি শুধু মানুষের দুঃখ দূর করবার মহান ব্রতেই ব্রতী হতে চান নি; মহত্তর কর্মে তিনি স্বেচ্ছাব্রতী। মানুষের সঙ্গে মানুষের হৃদ্যতাকে নিবিড় করবার ব্রত ত তাঁর ছিলই; মানুষের পরিবেশ, তার সমাজ, তার পরিপ্রেক্ষণী তাকেও কবি ভালবাসতে শেখালেন। সে পরিবেশ ত মানুষেরই সৃষ্ট, মানুষের গৃহ ত তারই সৃষ্টিধন্য। তাই কবি স্নেহ-সুধা-মাখা গৃহতলকে আরও আপনার করবার জন্য তাঁর অগণিত পাঠককে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এই যে বৃহত্তর মানবসমাজের সঙ্গে, তাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে একাত্ম হবার সাধনা, এই সাধনার স্বাক্ষর একদিকে যেমন কবির জীবনচর্যায় রয়েছে, তেমনি তা রয়েছে কবির বিচিত্র সাহিত্যসৃষ্টিতে এবং তাঁর তত্ত্বালোচনায়। অখ্যাত সাধারণ মানুষও তাঁর চোখে শ্রদ্ধেয়, কেননা সে যে মানুষ। মনুষ্যত্বের পরিচয়ই কবির চোখে মহত্তম পরিচয়। ভৃত্য কৃষ্ণকান্ত, ভৃত্য শঙ্কর, রাইচরণ, তাঁর আপন ভৃত্য মোমিন মিঞা এঁরা সবাই অপূর্ব রঙে ও রেখায় ভাস্বর। যে মানুষ সেবাব্রতী, যে মানুষ অপরের সেবায় আপনার জীবনের পরিপূর্ণ চরিতার্থতাটুকু আবিষ্কার করেছেন সেই মানুষেরা আদর্শ লোক থেকে নেমে এসেছেন রবীন্দ্র-নাথ-সৃষ্ট এই সব অনবদ্য সেবক মূর্তির মধ্যে। কবি তাঁর পরিপূর্ণ মানবিক দৃষ্টির প্রসাদগুণে এই সব অবজ্ঞাত মানুষের মধ্যে নিত্যকালের স্নেহপ্রবণ শোকার্ত পিতাকে আবিষ্কার করেছেন।১ এই আবিষ্কার আকস্মিক নয়; অতর্কিত সদয় সহানুভূতি-সজল কবির আকস্মিক উচ্ছ্বাসের দেহায়িত রূপ বললে এঁদের অন্তর্নিহিত নিগূঢ় সত্য কথাটি বলা হবে না। এঁরা কবির জীবনদর্শনে যে সুব্যাপ্ত মানবতাবাদ অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে সেখান থেকে প্রাণরস আহরণ করেছেন। 'সামান্য ক্ষতি'র হতভাগ্য প্রজারা কবির করুণায় অংশভাগী নন। কবি যে অকৃপণ ঔদার্যে তাঁদের প্রতি সুবিচার করেছেন, তারও মূলে রয়েছে কবির মানবতাবাদ। সমাজের যে কোন স্তরের মানুষ যেমন করেই জীবিকা অর্জন করুক না কেন, হোক না সে চাষা, হোক না সে কুলিমজুর, হোক না সে হরিপদ কেরাণী, সে কবির সত্য সহজ সহানুভূতিটুকু থেকে বঞ্চিত হয় নি। রূপোপজীবিনী বারবণিতা, অবজ্ঞাত যবনীপুত্র এঁরা কবির আত্মীয়তাধন্য হয়ে উঠেছে। যে বিরাট কল্পনার ঐশ্বর্য, যে কোমল রঙের বাহার এঁদের সারা অঙ্গে ঝলমল করছে তা শুধু কবির কল্পনারই বাহাদুরী নয়, তা কবির মমত্বপ্রবণ মানব-হৃদয়ের আত্ম-প্রক্ষেপের ফলেই সম্ভব হয়েছে। এই আত্মপ্রক্ষেপ নন্দন-তাত্ত্বিক তত্ত্বহিসেবে প্রশংসনীয় হলেও যখন তা মানবিক সহানুভূতি ধর্মের গুণে মাত্রা ছাড়িয়ে ওঠে, যখন কবি নিজেই রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মাধ্যমে চরিত্রের সব অপূর্ণতা এবং ত্রুটি আপনার ব্যক্তিত্বের বর্ণ-চাতুর্যের প্রসাদগুণে ঢেকে দেবার জন্য, তখন কবির মহৎ হৃদয়ের আগ্রহ-আতিশয্যটুকু বোদ্ধা পাঠকের প্রশংসা পেলেও সমালোচক বলেন যে, শিল্পকর্মে রসাভাস ঘটল। উদাহরণস্বরূপ 'অধ্যাপক' গল্প এবং 'মণিহারা' গল্পটির কথা ধরা যাক। অধ্যাপক গল্পটিতে নায়ক হলেন নিষ্ফল কবি যশপ্রার্থী একজন ভগ্নমনোরথ মানুষ। মণিহারা গল্পটিতে মণিমালিকার বিয়োগান্ত জীবন-কাহিনী একজন জীর্ণ অবহেলিত শিক্ষকের বিবৃতি। এই দুটি মানুষের মুখে কবি যে ভাষা দিয়েছেন, যে সূক্ষ্ম এবং সুনিপুণ ব্যঞ্জনা দিয়েছেন, যে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের শক্তিদান করেছেন তা বক্তা মানুষটির প্রত্যাশিত সম্ভাবনাকে লঙ্ঘন করে গেছে। সমালোচক বলেছেন যে, এই রসাভাসটুকু ঘটল কবির গীতিধর্মের আতিশয্যের ফলে।২ আমরা বলি যে, এই রসাভাস ঘটল কারণ, শিল্পী রবীন্দ্রনাথের ওপরে এখানে একটু-বেশীমাত্রায় খবরদারি করলেন মানুষ রবীন্দ্রনাথ, যিনি আপন জীবনদর্শনের প্রারম্ভ পদক্ষেপটি করেছিলেন মানবতাবাদের প্রশস্ত অঙ্গনে। যেখানেই শিল্পী বা কবির এই সহানুভূতিবোধটুকু উদগ্র হয়ে ওঠে সেখানেই রসাভাস ঘটে। শিল্পীর বৈরাগ্যটুকু শিল্প সৃজনের পথে অপরিহার্য। যেখানে আত্মীয়তাবোধটুকু ঘন হয়ে ওঠে, সেখানে এই বৈরাগ্যটুকুর অভাব হয়। উল্লিখিত গল্প দুটিতে এই অভাবটুকু ঘটেছে, তাই ত রসাভাস ঘটল।

১। অধ্যাপক শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত রবি-পরিক্রমা গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

২। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী প্রণীত 'রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প'।

শিল্পী রবীন্দ্রনাথের ত্রুটি ঘটলেও মানবপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ জয়ী হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ হলেন প্রকৃতির কবি, এমন কথা বলা হয়ে থাকে। এই তত্ত্বের মধ্যে সত্য অনুস্যূত। তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা কবির সামনে আদিগন্ত লুণ্ঠিত কবি তার মধ্যে জন্মজন্মান্তরের আত্মীয়তার বন্ধনগ্রন্থী খুঁজে পান। স্থল এবং জলের সঙ্গে অসংখ্য বন্ধনীর বন্ধনে তিনি আত্মীয়তাবদ্ধ। তাই ত শিমুল-সজিনার আনন্দের ভোজের অংশীদার হিসেবে তিনি তাদের কাছে ঋণ স্বীকার করেন। নীলমণি লতার পুষ্পসম্ভারে যখন তার জীবনে বসন্তের আগমনী ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে তখন কবির অন্তরও পুলক-উদ্বেল। গুলমোরের আনন্দবার্তা, রডো-ডেন্ড্রনের বর্ণোচ্ছ্বাস কবিকে আনন্দে উদ্বেলিত করে তোলে। কবি আনন্দের বন্যায় ভেসে যান—তাঁর কণ্ঠে কথা সুর হয়ে ঝরে পড়ে। প্রকৃতির সঙ্গে কবির এই আত্মীয়তা জন্মজন্মান্তরের—কত লক্ষ জন্ম-মরণের নদী পারাপার করে এই আত্মীয়তার সেতু গড়ে উঠেছে কে তার খবর রাখে! কবি প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর এই নিবিড় আত্মীয়তার কথাটুকু আমাদের বললেন :

"নাহি জানে কেউ—
রক্তে তোর নাচে আজি সমুদ্রের ঢেউ,
কাঁপে আজি অরণ্যের ব্যাকুলতা ;
মনে আজি পড়ে সেই কথা—
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে।"১

প্রকৃতির ক্রোড়ে জীববিবর্তনের অনন্ত রূপভেদ ঘটেছে ; কবি তার অন্যতম প্রতিনিধি। তাই ত প্রকৃতির সঙ্গে কবির নিত্যকালের যোগ আর সে যোগটুকু পরম আনন্দের। কবি বললেন তাঁর আত্মপরিচয় শীর্ষক গ্রন্থে২ :

"এখানে যেমন আহ্বান করেছি প্রকৃতির সঙ্গে আনন্দের যোগ তেমনি একান্ত ইচ্ছা করেছি এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগকে অন্তঃকরণের যোগ করে তুলতে।" এই ইচ্ছাটুকু কবির পক্ষে খণ্ড-ইচ্ছা নয়। এই ইচ্ছার আশ্রয় কবির সমগ্র জীবনধারণার মধ্যে ; সে ধারণা মানবতাবাদের রসধারায় পুষ্ট এবং বর্ধিত। মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগটুকু তাঁর চোখে আকস্মিক বা প্রক্ষিপ্ত নয়। কবি বৈদিক ঋষিবাক্য উদ্ধার করে বললেন, 'পশ্য দেবস্য কাব্যং', মানবরূপে দেবতার কাব্যকে দেখ। তা হলে এ তত্ত্ব গ্রাহ্য হবে যে, কবির মানবপ্রেমের শিকড় শুধু-মাত্র মানব সমাজেই প্রসারিত নয় ; তার বিস্তার ঘটেছে পরামানবীয় কোন মহাতত্ত্বে। এ তত্ত্ব হ'ল ভগবদ্‌তত্ত্ব। আত্মার দীপ্তিতে, পরমাত্মার জ্যোতিতে মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধটি প্রোজ্জ্বল। মানুষের মধ্যে আমরা বিভেদটাকে যখন বড় করে দেখি তখন বিচ্ছেদটা আত্যন্তিক হয়ে ওঠে। মানুষ মানুষকে আঘাত করে কারণ তারা মোহান্ধ হয়ে পরস্পরের মধ্যে যে আত্মিক সামীপ্য এবং সাযুজ্যবোধ রয়েছে সেটুকু আর অনুভব করে না। প্রাচীন ভারতবর্ষে আর্য ঋষিরা এই আত্মিক যোগসূত্রটিকে কখন হারিয়ে ফেলেন নি। মানবতাবাদ তাঁদের কাছে চরম এবং পরম জীবনদর্শন নয়। কবিগুরুর জীবনদর্শন এই ঋষিকবিদের অনুসারী। কবির চোখে প্রকৃতি, বিশ্বসংসার, মানবলোক এ সবই এক মহাশক্তির প্রকাশ :

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনম্।

এই ঈশ্বর পরিব্যাপ্ত চরাচরে, জড় এবং চেতনলোকে। কোথাও অপরকে বঞ্চিত করে আত্মতুষ্টির অবকাশ নেই। কেন না ভগবানই ত সর্বলোকে পরিব্যাপ্ত। তাই ত ত্যাগের এতো মহিমা। ভোগ করতে হলেও সে ভোগকে ত্যাগের মহিমামণ্ডিত করে দেখতে হবে। অপরের ধন-সম্পদে লোভের লালাসিক্ত অঙ্গুলি প্রসার ভারতের সাধনার বিরোধী। ভারতীয় ঐতিহ্য যে মানবতাবাদে আমাদের দীক্ষা দিল তার পাদপীঠ হ'ল ভগবদ্‌বাদ। পরমাত্মাই হ'ল পরম তত্ত্ব ; সর্বমূল্যবোধের শেষ আশ্রয় হলেন পরমাত্মা বা ভগবান। রবীন্দ্রনাথও এই তত্ত্বকে গ্রহণ করলেন। তিনি এই আর্য ঋষিদের উদ্দেশ করে বললেন :

"তাঁরা বিশ্বাসের সঙ্গেই বলতে পারতেন তমেবৈকং জানথ আত্মানম্—সেই একক জানো, সর্বব্যাপী আত্মাকে জানো, আত্মন্যেব, আপন আত্মাতেই, প্রথাগত আচার-অনুষ্ঠানে নয়, মানবপ্রেমে, শুভকর্মে, বিষয়বুদ্ধিতে নয়, আত্মার প্রেরণায়।" এই আধ্যাত্মিক শ্রদ্ধার আকর্ষণে রবীন্দ্রনাথও প্রকৃতি এবং মানবলোকের প্রেমে নিত্যবদ্ধ। অতীতকালে বালক বয়সে প্রভাতসূর্যের আলো এসে হঠাৎ একদিন সমস্ত মানবসম্বন্ধকে আত্মার জ্যোতিতে দীপ্তিমান করে কবিকে দেখিয়েছিল। সেই দেখাটুকুকে কবি আপন জীবনসাধনার মধ্য দিয়ে অক্ষয় করে রাখতে

১। চঞ্চলা, বলাকা কাব্যগ্রন্থ।
২। পৃঃ ১১৯

চেয়েছিলেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমে কবি-জ্ঞানের যজ্ঞভূমি রচনা করেছেন তার নিঃস্বার্থ অনুষ্ঠানে সেই মানবের আতিথ্যটুকুই রক্ষা করতে চেয়েছেন যাকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে অতিথিদেবো ভব। অতিথিদের মধ্যে আছেন দেবতা। তাই ত মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধটুকু কবির চোখে আত্মার চিন্ময় আলোকে নিত্যোদ্ভাসিত। তাই ত কবির মানবতাবাদ তাঁর জীবনদর্শনের অন্তিম পরিচ্ছেদ নয়; মানবতাবাদ তাঁর জীবনদর্শনের প্রাক্-অন্তিম পরিণাম। কবি-মানসের চরম এবং পরম আশ্রয় হ'ল পরমাত্মাতত্ত্ব। সেই পরমাত্মা সম্বন্ধে বেদে বলা হয়েছে :

"য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ
বর্ণাননেকান নিহিতার্থো দধাতি
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা-শুভয়া সংযুনক্তু।"

নূতন ও পুরাতন

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

পুরাতনে ভক্তি? নিশ্চয় নিশ্চয়। তবে
প্রচলিত, পরিচিত, আচরিত যাহা
সত্য সনাতন নহে একমাত্র তাহা,
নূতনও যে একদিন পুরাতন হবে।
নিযুত বর্ষের শুষ্ক প্রাচীন কঙ্কাল
ম্যামথের—পড়ে আছে হোথা। আর হেথা
আজিকার তরে নিয়ে সুখ, নিয়ে ব্যথা
ওড়ে প্রজাপতি ক্ষীণ,—মরে যাবে কাল,
চিহ্ন নাহি পাবে। তবুও আনন্দ ওর
কঙ্কালের চেয়ে সত্য, মনে হয় মোর।

প্রবীণে প্রণাম করি, জীবনের কাছে
চঞ্চল নবীন কিন্তু আরো মূল্যবান।
প্রাচীনে চিত্তের যত ভক্তি করি' দান
ভালবাসি নূতনেরে—যার প্রাণ আছে।

নববর্ষ ১৩৬৭

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

হে নববর্ষ, সাক্ষী সুহৃদ—
এসো, এসো, লই বরণ করি,
হেম চম্পক দামে পূজি এসো,—
শঙ্কা সকল হরণ করি।
কাল-সাগরের আনো সেই সুধা
মিটিবে যাহাতে ধরণীর ক্ষুধা,
ভারতকে দাও সেই ধন তুমি—
চিরদিন যেন স্মরণ করি।
যুগের যুগের হোমের গন্ধে
ধূপের ধোঁয়ায় তোমার প্রিয়
পথ হল হের শিব সুন্দর—
দশ দিশি হলো কি রমণীয়,
দিও না সে ধন—মোরা নাহি চাই
হে বন্ধু যাতে অমৃত নাই,
চিন্তামণিকে কাছে আনে যাহা
তুমি আমাদিকে তাহাই দিও

পাথুরে ভূতের গল্প

পরিমল গোস্বামী

১৯৪৬ সনের কথা। ঠিক তারিখ মনে না থাকলেও বছরটা মনে থাকে। বছরের অন্য কোনো বিশেষ ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে মনে রাখি। ১৯৪৬ সনটা যুদ্ধোত্তর বছর এবং দাঙ্গার বছর, তাই মনে আছে।

কলকাতার বাইরের একটি জায়গা। জায়গাটার নাম বিশেষ কারণে প্রকাশ করা সঙ্গত হবে না, কারণ সেখানে যে ঘটনা আমি ঘটতে দেখেছি, তার ব্যাখ্যা নিয়ে যে মত-ভেদ দেখা দেবে, তার জন্য আমি ভাবছি না। যে জমিতে সেই ঘটনা ঘটেছে, প্রকাশ হয়ে গেলে সে জমির দাম কমে যাবে, সেটাই আমার ভাবনা, এবং গল্প লিখে আমি এ ভাবে পরের অনিষ্ট করতে চাই না।

জায়গাটা পাড়া-গাঁ। শীতকাল। পাড়াগাঁয়ের শীত-কালের দিনগুলো বেশি ছোট মনে হয়, তার কারণ সেখানে গাছপালা, ঝোপঝাড়ের সংখ্যা বেশি, তাই সূর্যাস্তের অনেক আগেই সূর্য অদৃশ্য হয়, দিনের আলো দ্রুত নিবে যেতে থাকে।

আমি মাত্র তিন দিনের জন্য এক আত্মীয় বাড়ি গিয়ে ছিলাম। দেশে সামান্য একটু জমি ছিল সেটি বিক্রি ক'রে দেওয়াই ছিল উদ্দেশ্য। তখন সামান্য চাকরি করি, কলকাতাতেই থাকতে হয়, তাই দেশে জমি রাখার কোনো গরজ ছিল না।

কলকাতার জনারণ্যে থাকা অভ্যাস, তাই হঠাৎ পাড়াগাঁয়ে গিয়ে নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ বোধ হয়েছিল। আমি এদিকে বড় একটা আসি নি, বাল্যকালে এসে থাকব হয় তো, তাই পাড়াগাঁ সম্বন্ধে একটুখানি ক্ষীণ স্মৃতি ছিল মাত্র। আত্মীয়দের সঙ্গে বৈষয়িক বিষয়ে কথা বলারও অভ্যাস অত্যন্ত কম, তাই সেই নীরস আলাপ-শেষে নিজেকে যত শীঘ্র সম্ভব মুক্ত ক'রে নিয়ে একা বেরিয়ে যেতাম মাঠের পথে, নদীর দিকে। নদীটি ক্ষীণ-কায়, বর্ষায় স্রোতস্বিনী হয়, শীতের সময় রিক্ত এবং অসহায় ভাবে দুই পাড়ের গর্তে লুকিয়ে থাকে।

আমি যেখানে উঠেছি, সেখান থেকে এ নদীটি অন্তত এক মাইল দূরে। প্রায়-জনশূন্য গ্রামের ভিতর দিয়ে গিয়ে মাঠ, মাঠ পাড়ি দিলে তবে নদী। তবু দম বন্ধ করা জঙ্গলের অন্ধকার পরিবেশ থেকে কিছুক্ষণের জন্যও মুক্ত আকাশের নিচে এসে অনেক আরাম বোধ হত।

গ্রামের অনেক বাড়িতেই লোক নেই, সব পোড়ো বাড়ি, ভাঙাচোরা। ম্যালেরিয়ায় বংশ বংশ ভুগে তারা শেষ হয়ে গেছে। মস্ত বড় গ্রামখানায় তাই যেন এক শ্মশানের শূন্যতা, দিনের বেলাতেই গা ছম ছম করে। যে সব বাড়িতে লোক আছে তারা উৎসাহহীন ভাবে কোনো মতে দিন কাটাচ্ছে। কলকাতা শহরে দারিদ্র্যের চরম রূপ দেখা অভ্যাস আছে, মহামন্বন্তরের মহানাট্য বছর দুই হ'ল চোখের উপর অনুষ্ঠিত হতে দেখেছি। কিন্তু এখান-কার দারিদ্র্যের রূপ যেন আলাদা। তাই এ দৃশ্য যতদূর সম্ভব এড়িয়ে জঙ্গলের পথহীন পথ বেছে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতাম মাঠে। এ পথের বেশ আকর্ষণ ছিল। মনে হ'ত অতীত কালটা এখানে যেন একটা ছায়ামূর্তি ধ'রে স্তব্ধ হয়ে আছে। জানি, এ একটি কল্পনাবিলাস মাত্র, বাস্তবকে এড়িয়ে থাকার ফন্দি মাত্র। কিন্তু আমি গ্রাম-সংস্কার করতে আসি নি, এসেছি গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে, অতএব নীতি কথা থাক।

আমি যে বিপথে নদীর ধারে যেতাম সে পথে একটা জীর্ণ বাড়ির জীর্ণতর বাঁশ খড়ের সামান্য একটু অংশ এখনও খাড়া আছে, আর কিছুই নেই। এক কোণে একটা বেল গাছ, তার গোড়ায় ভারী পাথরের তিন-চারটি খণ্ড এক সঙ্গে মাটি ঘাস ও অন্য আগাছায় শক্ত হয়ে পরস্পর জমে আছে। গাছটি হয় তো এককালে পবিত্র-জ্ঞানে পুজো পেত, দেখলে অন্তত তাই মনে হয়।

পাথরের কথা ভাবতে মনে হ'ল এ পাথর মাত্র দু' এক পুরুষ আগে কেউ এখানে রাখে নি, এ যেন সেই আদিম প্রস্তর যুগের চিহ্ন, এগুলো আদিম মানুষের হাতের অস্ত্র। পুরনো পাথর দেখে এ রকম মনে হওয়া আমার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়, কেন না আমি মানুষের বিবর্তন এবং অন্যান্য তত্ত্ব পড়েছি, নৃতত্ত্বেরই ছাত্র আমি। তাই পাথরহীন নিতান্তই মাটির দেশে পুরনো কয়েকখণ্ড পাথর দেখে এমন একটা রোমাণ্টিক কল্পনা আমার মনে জাগা অন্যায় হয় তো নয়।

মুগ্ধ হচ্ছিলাম। যেন কত বড় একটা আবিষ্কার করলাম এই গ্রাম্য শ্মশানে। কিন্তু কে জানত, সত্যিই একটা বড় আবিষ্কারের কিনারায় এসেই দাঁড়িয়েছি। হঠাৎ ভীষণ চমকে উঠে দেখি সবচেয়ে বড় পাথরটি আর একটা পাথরের সঙ্গে বহু দিনের মাটি জমে সিমেণ্টের মত আটকে ছিল, তা সম্প্রতি কেউ সরিয়েছে। মনে হ'ল পাথরটা কেউ টানাটানি করে ভিতরে কোন গুপ্তধনের সন্ধান করেছে।

ঘটনাটা একটু অস্বাভাবিক বোধ হ'ল। এ পাথর এখান থেকে নড়াবার দরকার হ'ল কার? আশেপাশে মানুষের পায়ের চিহ্ন আবিষ্কারের চেষ্টা করলাম, কিন্তু বোঝা গেল না কিছু। পাথরখানার ওজন অন্তত দু' মণ হবে।

তখন আসন্ন সন্ধ্যা। নিস্তব্ধ পরিবেশ নিস্তব্ধতর মনে হচ্ছে। আকাশ পথে পাখীরা বাসায় ফিরছে। গ্রামের ভিতর এখন রাত এক প্রহর, সবাই এতক্ষণে রাত্রের খাওয়া-দাওয়া মিটিয়ে ফেলছে। এমন সময় আমি কার শূন্য ভিটেয় দাঁড়িয়ে কোন্ এক অজ্ঞাত রহস্য ভেদের চেষ্টা করছি। নিচে সত্যিই দামী কিছু লুকনো আছে কি? কোনো চোর. কি ডাকাত কাছেই লুকিয়ে আছে কি? ভাবতে গায়ে কাঁটা গজিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় মনে হ'ল পাথরখানা যেন একটু নড়ে উঠল। আমি চমকে তিন পা পিছিয়ে গেলাম—নিশ্চয় কোনো অজগরের বাসা এটা।

কিন্তু তার পর যে কি ঘটে গেল তা কোন্ ভাষায় বর্ণনা করি? আজ এতদিন পরে একটু একটু ক'রে মনে ক'রে যেটুকু খাড়া করতে পেরেছি তাই প্রকাশ করছি। কিন্তু এ শুধু সে দিনকার রহস্যের একটি কঙ্কাল মাত্র, এর উপর রক্তমাংস যোগ ক'রে একে জীবন্ত ক'রে তোলার ক্ষমতা আমার নেই। তেরো বছর ধ'রে চেষ্টা করে পারি নি। যেটুকু পেরেছি তাই আজ বলছি।

বলেছি ভয়ে তিন পা পিছিয়ে গেলাম, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। তার পর সে পায়ে কোনো শক্তি অবশিষ্ট রইল না। আমি বসে পড়লাম। শুধু যে পায়ের শক্তি গেল তাই নয়, মনটাও কেমন যেন শূন্য হয়ে গেছে। স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে সব। দেখে মনে হয়েছিল বিরাট এক ময়াল সাপ ওর নিচে আটকা পড়েছে, তারই বেরিয়ে আসার চেষ্টা চলছে পাথরের নিচে থেকে। কিন্তু তখনই মনে পড়ল সাপ তো শীতকালে নির্জীব হয়ে পড়ে থাকে। মনে পড়ামাত্র আবার আমার হাত-পা অসাড় হয়ে এলো, এবং তার পর যা দেখলাম, তা আমার কল্পনার অতীত, আমার চেতনার অতীত। স্পষ্ট দেখলাম, একটি মানুষের মূর্তি বেরিয়ে এলো সেই পাথর ঠেলে।

কিন্তু এক মুহূর্ত মাত্র, কারণ তার পর কি হ'ল অচেতন অবস্থায় তা আর কি ক'রে জানব। শুধু এইটুকু মনে আছে—সমস্ত গা ভিজে উঠেছিল।

জ্ঞান হ'ল যখন তখন রাত সাতটা, হাতে রেডিয়াম কাঁটার ঘড়ি বাঁধা ছিল। কিন্তু আমি কোথায় তা মনে আনতে বেশ কিছুক্ষণ লাগল। মনে হ'ল আমাকে নিশ্চয় আমার আত্মীয়েরা এতক্ষণ খুঁজছেন, কিন্তু তাঁরা জানবেন কি করে আমি কোথায়। চার দিক অন্ধকার, পিঠের নিচে শুকনো পাতার বিছানা। আস্তে আস্তে উঠে বসলাম। মনে পড়ল সব। মনে পড়তেই আবার একটা ভয়াবহ শিহরণ খেলে গেল সমস্ত গায়ে। আর ঠিক সেই সঙ্গে মাত্র হাত তিনেক দূরে হিঃ হিঃ হিঃ শব্দে কে হেসে উঠল আমাকে প্রায় চেতনাহীন করে। সে কি অমানুষিক হাসি! আমার মতো একটি জীবন্ত মানুষও যে পাথর হয়ে যেতে পারে তা সেই প্রথম বুঝতে পারলাম। শুধু কাত হয়ে পড়ে যাবার অপেক্ষা, এমন সময় একখানা ঠাণ্ডা হাত আমার গলায় এসে লাগল। হাতের মালিক আবার সেই অমানুষিক হাসি হেসে আমাকে গোটা দুই ঝাঁকানি দিয়ে বলে উঠল, "ভয় পাচ্ছিস কেন রে অবনীশ, আমাকে চিনতে পারছিস না, আমি দীনবন্ধু।"

আমার গলা দিয়ে কোনো শব্দই বেরোল না। আমি কি জেগে আছি, না স্বপ্ন দেখছি, আবার যেন সব ভুল

হয়ে গেল। অদৃশ্য ব্যক্তি বলতে লাগল, "আমি দীনবন্ধু দত্ত, তোর ক্লাস-মেট, চিনতে পারছিস না?"

আবার কিছু বলতে গেলাম, কিন্তু এবারেও গলায় একটুখানি অস্পষ্ট আওয়াজ ছাড়া আর কিছু বেরোল না। তবে চিনতে পারলাম তাকে। কিন্তু সে পাথরের নিচে থাকে, তার মানে কি? আর এখানেই বা সে এলো কোথা থেকে?

দীনবন্ধু আমার অবস্থা অনুমান ক'রে বলল, "ভয় ছাড়। আমি তোর বন্ধু, তোর কোন অনিষ্ট করব না, সে ক্ষমতাও নেই। যেটুকু ক্ষমতা আছে, তা ঐ পাথর সরাতেই খরচ হয়ে যায়।"

ভরসা পাবার মতো কথা এ সব নয়, কিন্তু আমার তো আর কোন উপায়ই ছিল না এক অজ্ঞান হওয়া ছাড়া। কিন্তু সেটি প্রাণপণ শক্তিতে এবার এড়িয়ে গেলাম। দীনবন্ধু দত্তকে আমি ভালই চিনতাম। সে আমার সহপাঠী, আমরা এক সঙ্গে নৃতত্ত্ব পড়েছি একসঙ্গে পাস করেছি। সে তো আজ বছর কুড়ি আগের কথা। তার পর আর তার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। শুনেছি সে যুদ্ধে অল্পদিনের মধ্যে চালের ব্যবসা করে ধনী হয়েছে। পাগলাটে। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব কি ক'রে হ'ল, তার বিস্ময়ে সে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। কোনো একটা নতুন বিষয়ে জ্ঞানলাভ ক'রে এ রকম উচ্ছ্বাস আমি আর কারও মধ্যে দেখি নি। কিন্তু বিস্ময় অভিভূত লোকটি আজ শুধুই ভূত! চমকে উঠলাম ভাবতে গিয়ে। সেই দীনবন্ধু এখন পাথরের নিচে কেন? কিংবা ভূত নয় সে। খুব সম্ভব চুরি-জোচ্চুরি করে এখন পুলিসের ভয়ে এখানে লুকিয়ে আছে।

আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই যেন দীনবন্ধু বলে উঠল, "তুই খুব অবাক হচ্ছিস, না? হবারই কথা। এটি যে আমারই জন্মস্থান, এইখানেই আমি প্রথম বাস করেছি। কিন্তু তুই এখানে কেন?"

এতক্ষণে আমার ভয় কিছু দূর হয়েছে, কারণ আমার তখন মনে হ'ল আমি নিশ্চয় স্বপ্ন দেখছি। আগাগোড়া সবটাই স্বপ্ন, আমি বাড়িতেই ঘুমিয়ে আছি।

কিন্তু এ ধারণা বেশিক্ষণ স্থায়ী হ'ল না। চেতন মানুষের সচেতনতাই তাকে বিচার করে এবং সে বিচার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নির্ভুল হয়। অবশ্য স্বপ্নেও এমন কথা মনে হয় 'স্বপ্ন দেখছি', কিন্তু 'স্বপ্ন দেখছি' এই মিথ্যা চেতনা মুহূর্তে মিলিয়ে যায়। জাগ্রত অবস্থার চেতনা কঠোর এবং দীর্ঘস্থায়ী।

দীনবন্ধুর ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ লাগতেই আমি ষোল আনা চেতনাপ্রধান হয়ে উঠলাম, যদিও ভয়ে সে চেতনা ধ'রে রাখা খুবই শক্ত বোধ হ'ল। ভূতের হাত, বরফের মতো ঠাণ্ডা। রাত্রির নিস্তব্ধতায় জঙ্গলের মধ্যে এক পোড়ো বাড়ির ভিটেয় ভূতের মুখোমুখি বসে আছি। ভূত আমার একখানা হাত ধ'রে আছে। এমন অবস্থায় মাথা ঠিক রেখে বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করার মধ্যে কোনো মনোহারিত্ব নেই, কিন্তু ভূত আমাকে ছাড়বে না। সে বলল, "কারও সঙ্গে কথা বলতে না পেরে হাঁপিয়ে উঠেছি, তা ছাড়া আমার অনেক কথা বলবার আছে, তুই ধৈর্য ধরে শোন। না বলতে পেরে আমি ছটফট করছি এতদিন। তুই ভয় ছাড়।"

আমার নিজের কোনো ক্ষমতা আর ছিল না, বুঝলাম, শুনতেই হবে। তাই ক্ষীণকণ্ঠে বললাম, "তা হ'লে হাত ছাড়।"

দীনবন্ধু হাত ছাড়ল। তার পর ভাল হয়ে বসে বলতে আরম্ভ করল তার কাহিনী।

"কল্পনাপ্রবণ ছিলাম অতিমাত্রায়"—

বললাম "সে ত জানি।"

"না, জানিস না। তার মাত্রা কতদূর উঠেছিল তা কেউ জানে না, আর তা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। তুই জানিস না, মানুষের আবির্ভাবের পরে প্রস্তর যুগটা আমাকে আকর্ষণ করেছিল সবচেয়ে বেশি। ভারী ভাল লাগত তাদের কথা পড়তে, কল্পনা করতে। ঐ যুগের সঙ্গে আমি এক রহস্যবন্ধনে বাঁধা পড়ে গেলাম। সে এক দুর্দান্ত মোহ। কিন্তু তার প্রায়শ্চিত্ত যে এভাবে করতে হবে তা ভাবি নি। কিন্তু একটুখানি অপেক্ষা কর, আমি একটুখানি আড়মোড়া ভেঙে নি, সমস্ত দিন পাথরের চাপে থেকে হাতপায়ে খিল ধরে গেছে। বেরিয়ে এতক্ষণ তোর পালস্ ধরে বসে ছিলাম, তোর অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।"

বলতে বলতে দেখি দীনবন্ধুর দেহটা হঠাৎ খুব বেড়ে যেতে লাগল। বাড়তে বাড়তে বেলগাছ ছেড়ে উপরে উঠে গেল তার মাথাটা। তার পর দু'হাত দুদিকে বিস্তার করে, ভেঙে, কিছু উঠ-বস করে আবার ছোট হয়ে আমার সামনে বসল। আমি আমার মাথায় একটা অদ্ভুত টান অনুভব করে হাত দিয়ে দেখি, মাথার সমস্ত চুল খাড়া হয়ে উঠে কাঁপছে।

সেই তারাভরা আকাশের আবছা আলোয়, আমারই সামনে, আমারই পরিচিত এক বন্ধুর প্রেতাত্মা, দেখতে দেখতে অতিকায় হ'ল, এবং আবার ছোট হয়ে আমার

বলে, বাড়িকেই তাদের অরণ্য মনে হয়, বাড়িতে এলে তাদের মাথা খারাপ হয়,বাইরে থাকলে মাথা ভাল থাকে।

"কিন্তু বাড়িতে কতক্ষণ থাকা যায়? অফিসে চাকরি করি। যথেষ্ট ছুটি নিয়েছি, আর নেওয়া যাবে না। চাকরি ছেড়ে দেওয়াই ঠিক করলাম। ভাবতে ভাবতে ভাবনার আর শেষ নেই। একদিন একখানা রিকশ ভাড়া করে গঙ্গার ধারে চলে গেলাম, সমস্ত পথ চোখ বুজে ছিলাম, কি জানি যদি পথের মানুষ দেখে ক্ষেপে যাই।

"গঙ্গার ধারে বসে নানা কথা ভাবছি, কিন্তু হঠাৎ দেখি আমার অজ্ঞাতসারেই কখন আশেপাশের ভাঙা ইটের টুকরো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছি জলে। হঠাৎ খেয়াল হতেই চমকে উঠলাম। এও কি সেই পাথর ছোঁড়ার পূর্বাভাস? আবার কি আক্রমণ আরম্ভ হতে চলেছে?

"তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলাম। এভাবে নিজের সঙ্গে আর লুকোচুরি খেলা যায় না বেশিদিন। মাথা সম্পূর্ণ খারাপ হওয়ার আগে আরও একবার শেষ চেষ্টা করতে হবে। মনস্তত্ত্বের নানা বই সংগ্রহ ক'রে পড়তে লাগলাম। আধুনিকতম মনোবিকলনের যত রকম বই পাওয়া গেল, তাও লাইব্রেরি থেকে আনিয়ে নিলাম। আমাকে বাঁচতে হবে। স্ত্রী এবং শিশুসন্তানদের বাঁচাতে হবে। মনে মনে কঠিন প্রতিজ্ঞা ক'রে কাজ আরম্ভ করলাম। আত্ম-চিকিৎসার কাজ। মনের অবস্থা বিশ্লেষণ করলাম নানা ভাবে। খাতায় সমস্ত নোট করলাম। মূলে দেখা দিল দুটি জিনিস, বর্বর যুগ এবং পাথর দিয়ে পশুহত্যা। অনেক চিন্তা, অনেক বিশ্লেষণের পর থীসিস দাঁড় করলাম এই যে, আমরা আবার বর্বর যুগেই ফিরে এসেছি, শুধু বাইরের চেহারাটা তার বদল হয়েছে মাত্র। অতএব এই যুগকেই যদি বর্বর যুগ বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, তা হলে আর কল্পনার আশ্রয় নিতে হবে না এবং তা বিশ্বাস করা কঠিন হ'ল না। মহামন্বন্তর দেখলাম চোখের সামনে। বর্বর যুগ না হ'লে এমন ক'রে অনাহারে লক্ষ লক্ষ মানুষ এভাবে পথে ধুঁকে ধুঁকে মরত কি?

"এই প্রশ্নই আমাকে আমার চিকিৎসার ইঙ্গিত দিল। যেমনি মনে হ'ল—এরা বাকী জীবিত মানুষদের পাথর দিয়ে মারছে, চালে পাথর মিশিয়ে মুনাফার অঙ্ক বাড়াচ্ছে, তখুনি আমি পথ পেয়ে গেলাম। আমি অবিলম্বে চালের ব্যবসা আরম্ভ করলাম। প্রথমে ব্যবসায়ীদের কাছে পাথরের গুঁড়োর যোগান দিতে লাগলাম, কেননা ব্যবসার জন্য আমার মত নগণ্য লোক চাল পাবে কোথায়? তাই ঘোরা পথে ব্যবসায়ীদের বিশ্বাস-ভাজন হয়ে, হঠাৎ একদিন চালের ব্যবসায়ী হয়ে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঠিক হয়ে গেল। পাথর দিয়ে মানুষ মারার এই পথটা যদি আমার মাথায় আগে আসত তা হলে কি আর মাসের পর মাস আমাকে ও রকম বিভীষিকার মধ্যে কাটাতে হ'ত? এক মণ চালে পাঁচ সের পাথর! অথচ আইন আমার দিকে। এক মণে দশ সের মেশালেও আইনে আটকাবে না, কিন্তু আমি অতটা নিষ্ঠুর হই নি মাথা ঠিক হবার পরে। কি অপূর্ব সুযোগ, ভেবে দেখ দেখি। চালে যত ইচ্ছে পাথর মেশাও কেউ কিছু বলবে না, বড় জোর খবরের কাগজে দু' একখানা চিঠি বেরোবে, দু' একটা গরম সম্পাদকীয় লেখা হবে।" বলতে বলতে দীনবন্ধু হাসতে আরম্ভ করল।

হঠাৎ হাসি। হাসির আওয়াজ ক্রমে চড়তে লাগল। হাসতে হাসতেই বলতে লাগল, একটা মোটর দুর্ঘটনায় মারা না গেলে আজ আমি রাজা। ওরে, আমি রাজা হতে পারি নি, কিন্তু ছেলে হয়েছে। তাকে হাতে ধ'রে সব শিখিয়েছি, পাথর দিয়ে মানুষ মারার বিদ্যায় সে এখন পাকা ওস্তাদ। এখন সমস্ত বাংলা দেশের অন্তত চার কোটি হরিণ বধ করেছে সে।"

দীনবন্ধুর হাসির তীব্রতা ক্রমে বাড়তে লাগল, ক্রমে তা সকল স্বাভাবিক সীমা ছাড়িয়ে গেল। আমি স্তম্ভিত। গাছের পাখীরা ভয়ার্ত স্বরে ডাকাডাকি শুরু করল। শেয়ালরা ছুটে পালাল। আমার পাশ দিয়ে বিদ্যুৎ বেগে একটি শুয়োর ছুটে গেল। দূরে—বহু দূরে অসংখ্য কুকুর ডাকতে লাগাল। সেই নিস্তব্ধ রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে সেই বিকট হাসি আমার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করল, তার পর কি হ'ল এখন আর তা কিছুই মনে নেই। যখন জ্ঞান হ'ল তখন আমি আমার সেই আত্মীয় বাড়ির বিছানায় শুয়ে। আমার শিয়রে আমার স্ত্রী, পাশে পুত্র। পাঁচ ছ' দিন পর আমাকে কলকাতা এনে হাস-পাতালে ভর্তি করে দেওয়া হ'ল।

মাসখানেক লাগল সুস্থ হতে। শক্ পেয়েছিলাম খুবই। এর পর আমার নিজের সামান্য একটু কাহিনী আছে। নিতান্তই সামান্য। হয় তো না বললেও চলত। কিন্তু দীনবন্ধু গৌণ ভাবে আমার যে উপকার করেছে তা স্বীকার ক'রে তার প্রতি আমি এই সুযোগে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

অর্থাৎ আমি নিজেই এখন চালের ব্যবসা করছি। প্রতি মণে দশ সের পাথর নির্বিবাদে চলে যাচ্ছে।

আমার দ্বিতীয় বাড়ি তৈরি আরম্ভ হয়ে গেছে, তৃতীয় বাড়ির প্ল্যান আলোচনা চলছে, জমি কেনা হয়ে গেছে।

জয় দীনবন্ধু!

ভারতের ভূমি সমস্যা

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

পরিধানের শাড়ীখানি যদি লজ্জাশীলা নারীর দেহের অনুপাতে খাটো হয়, তাহা হইলে টানাটানি করিয়া দেহের একাংশ আবৃত করিতে চেষ্টা করিলে অপর অংশ অনাবৃত হইয়া পড়ে। এই অবস্থার মধ্যে ভারতের সহস্র সহস্র মহিলা বাস করিতেছেন। বলা বাহুল্য, সমাজের মধ্যে বাস করিতে গেলে তাঁহাদের দুঃখের উপর আর সরমের অবধি থাকে না।

আমাদের ভারতমাতা স্বয়ং আজ এই বিপদের সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার পরিধানের বসনের আর প্রাচুর্য্য নাই—তাঁহার সমৃদ্ধি আজ অস্তগামী এবং বক্তৃতা-বিলাসে তাঁহার বসনের অভাব দূর করিবার চেষ্টা চলিতেছে। শান্ত-সমাহিত চিত্তে বাস করিবার কথা ছাড়িয়া দিয়া কোনও প্রকারে জীবনধারণের জন্য যাহা একান্ত প্রয়োজন তাহার অনুপপত্তি আজ ক্ষুদ্র বৃহৎ রন্ধ্র-পথে প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে।

ভণিতা ছাড়িয়া কাজের কথায় আসা যাক্। একটা স্বাধীন দেশের পক্ষে সমস্ত দেশবাসীর নানা প্রয়োজনে ভূমির প্রয়োজন। প্রয়োজনের মধ্যে অগ্রাধিকার কাহাকে দেওয়া যায়, তাহা নিশ্চিত ভাবে বলা বড় কঠিন। তবে বাস যেখানেই করা যাউক, অন্ন না হইলে জীবন ধারণ সম্ভব নয়; সুতরাং লোকসংখ্যার অনুপাতে ফসলের ক্ষেত একান্ত প্রয়োজন। তাহার বাসস্থানের জন্য জমি চাই। কেবল কাঠের জন্য নয় জমির সংরক্ষণ, বর্ষা-নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিশেষ কয়েকটি কারণের জন্য প্রচুর বন-ভূমি না থাকিলে দেশের সমূহ অমঙ্গল। রাস্তাঘাট, রেলপথ, খেলার মাঠ, কারখানা, বাঁধ, পার্ক, জাতীয় উদ্যান (national park), এয়ার পোর্ট (বিমানপোত নামা-ওঠার স্থান), সৈন্যদের ব্যারাক বা আবাসস্থান, রাষ্ট্রীয় সীমানা, উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন, গবেষণা মন্দির, হাসপাতাল ও বিশ্রামাবাস, বিশ্ববিদ্যালয়, পশুশালা ও অপরাপর 'বাগিচা' প্রভৃতি মিলিয়া বহু প্রতিষ্ঠান ক্রমেই প্রসারিত হইতে থাকিবে। মরুভূমি, পার্ব্বত্য ও প্রস্তরাকীর্ণ অঞ্চল, সমুদ্রের বেলাভূমি, জলাশয় ও নদীপথ প্রভৃতি প্রচুর স্থান অধিকার করিয়া আছে।

ভারতের লোকসংখ্যা প্রতি বৎসরই যে হারে বাড়িতেছে তাহাতে চিন্তিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রতি বৎসরের মাঝামাঝি লোকসংখ্যার একটা আনু-মানিক সরকারী হিসাব এইরূপ ধরা আছে :

১৯৪৯ হইতে ১৯৫৯ পর্য্যন্ত ভারতের

আনুমানিক লোকসংখ্যা

সন	লক্ষ লোক	সন	লক্ষ লোক
১৯৪৯	৩৫'৩৮	১৯৫৪	৩৭'৭১
১৯৫০	৩৫'৮৩	১৯৫৫	৩৮'২৪
১৯৫১	৩৬'২৮	১৯৫৬	৩৮'৭৪
১৯৫২	৩৬'৭৫	১৯৫৭	৩৯'২৪
১৯৫৩	৩৭'২৩	১৯৫৮	৩৯'৭৫

অনুমান, ১৯৫৯ সনে চল্লিশ কোটি অতিক্রম করিয়া আরও আটাশ লক্ষ লোক যোগ হইয়াছে।

অতিরিক্ত লোকের অন্ন-উৎপাদন ও বাসের জন্য অতিরিক্ত জমি চাই-ই। অপরাপর যাহা, যথা কারখানা দোকান পসার, সবই যা কিছু অনুপাতে বৃদ্ধি পাইবার কথা।

এখন বিচার করিতে হয়, জমি কতটা আছে এবং তাহার কতটা এবং কিভাবে কাজে লাগিতেছে।

ভারতের মোট আয়তন, সারভেয়ার জেনারল (Surveyor General)-এর যন্ত্রপাতির হিসাবে ৮১ কোটি ২৬ লক্ষ একর (১৯৫১)। ইহাতে ২'২৫ একর জমি প্রতি লোকের ভাগ্যে পড়িতেছে। যদি জ্যামিতিক মতে হিসাব করা যায়, তাহা হইলে মোটামুটি উত্তর হইতে দক্ষিণ এবং পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম একশত গজের এক চতুষ্কোণ ভূমি পাইবার কথা। কিন্তু তাহার মধ্যেও নানা আপদ আছে বিরাট পর্ব্বত, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পাহাড়, মাল ভূমি, মরুবন, সবই ইহার মধ্যে পড়িতেছে। সরকারী হিসাব (Census of India, 1951, Vol. 1, India, Part 1-A-Report, p. 8) সমস্ত জমিকে নিম্ন-লিখিত ভাবে বিভক্ত করিয়াছে :

ভারতের মোট জমি—লক্ষ একর হিসাবে

অঞ্চল	মোট স্থলভাগ	বিভিন্ন শ্রেণী পর্ব্বত	গিরি	মালভূমি	সমতল ক্ষেত্র	অব্যবহার্য্য (জমি বাদ)	মোট ব্যবহার যোগ্য জমি
উত্তর	৭,২৬	৭৯	৪১	৩৪	৫,৭২	১,৪৩	৫,৮৩
পূর্ব্ব	১৬,৭৫	১৫৫	৫,২১	২,০৪	৮,০৪	৬,২০	১০,৫৫
দক্ষিণ	১০,৭৫	৪	২,৭৮	২,৮৬	৫,০৬	৩,১০	৭,৬৫
পশ্চিম	৯,৫৭	..	১,৯৮	২,৮৪	৪,৭৬	৩,১৪	৬,৪৩
মধ্য	১৮,৫২	...	৩,৩৩	১১,২৫	৩,৯৫	৫,৫০	১৩,০২
উত্তর-পশ্চিম	১২,২৬	৯৭	৮৮	৩,০০	৭,৪২	৫,৮৩	৬,৪৩
ভারত (জম্মু- কাশ্মীর বাদ)	৭৫,৩২	৩,২৫	১৪,৭৯	২২,৩২	৩৪,৯৫	২৫,৩৫	৪৯,৯৭
ভারত (জম্মু-কাশ্মীর সমেত)	৮১,২৬	৮,৭৩	১৫,০৬	২২,৪৮	৩৪,৯৮	৩০,৮২	৫০,৪৪

১৯৫০ সন অর্থাৎ গত আদমসুমারীর রিপোর্ট লেখা হইবার পর যে জরিপ করা হইয়াছে তাহাতে সার্ভেয়র জেনারল (জরিপ অধিকর্ত্তা)-এর হিসাব অনুযায়ী (১৯৫৫-৫৬) মোট জমির পরিমাণ ৮০,৬২,৭০,০০০-একর। দলিলপত্র বা সরকারী নথিপত্রের হিসাবে ইহা ৭১,৯৫,৫৫,০০০ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। (পূর্ব্বের হিসাবে ইহা ৬২,৩৪,৭৭,১১৪ একর ছিল। বর্ত্তমানের হিসাবে ভারতের ভূ-পৃষ্ঠে নিম্নে বর্ণিত হিসাবে বণ্টন করা হইয়াছে :

	হাজার একর	মোট জমির শতকরা
বনভূমি	১২,৫৫,৫৪	১৭·৫
চাষের অযোগ্য	১১,৮৩,৮৮	১৬·৪
পতিত জমি বাদে	৯,৬৯,৭৯	১৩·৫
তন্মধ্যে		
(১) চাষের উপযুক্ত অনাবাদী	৫,৪৯,৩১	
(২) গোচারণ বা অনুরূপ ভূমি	২,৮৩,৯৪	
(৩) বিবিধ বৃক্ষ-সমন্বিত জমি	১,৩৬,৫৪	
পতিত	৬,০৪,১৪	৮·৪
মোট কৃষিক্ষেত্র	৩১,৮২,২০	৪৪·২

মোট জমির হিসাবের মধ্যে কিছু পতিত চিরকালই থাকিয়া যাইবে। হয়ত কতক পতিত জমিতে লাঙ্গল পড়িল, আবার অন্য বৎসরের চাষের ক্ষেত্রে লাঙ্গল-বীজের সহিত আর কোনও সম্পর্ক রহিল না। সুতরাং পতিত জমির সামান্য হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিতে পারে; মনে রাখিতে হইবে প্রাকৃতিক ইতি হইতে বহু জমি কোনও না কোনও স্থানে পতিত থাকিয়া যায়।

যাহার হিসাব পাওয়া যাইতেছে, তাহা লইয়া লোক-পিছু জমি বণ্টনের কথা বিচার করা হইয়া থাকে। ইহাতে দেখা যায় যে, লোকের প্রয়োজনের তুলনায় চাষ-আবাদের উপযুক্ত জমির অভাব বাড়িয়াই চলিতেছে। ইহার সঙ্গে আরও একটা হিসাব জুড়িয়া দেওয়া দরকার। ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের ক্ষয়হেতু জমি ক্রমেই অনুর্ব্বর হইয়া পড়িতেছে। যতদূর হিসাব পাওয়া যায় প্রতি একশত একর জমির মধ্যে কম-বেশী ২৮ একর জমি সদা সর্ব্বদা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। বর্ষা ও বাত্যা আলগা মাটিকে ধুইয়া বা উঠাইয়া লইয়া যাইতেছে। অতিরিক্ত বৃক্ষনাশই ইহার প্রধান কারণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। গবাদি-পশুর ক্ষুরের সাহায্যে মাটি আলগা হইয়া যায়, তাহার পর প্রকৃতি তাহার কাজ করে, লোকের ভাল-মন্দ দেখা তাহার স্বভাবে লেখা নাই। কাহারও কাহারও মতে চাষের ভুল প্রথা ও এই ক্ষয় কার্য্যের সহায়তা করিয়া থাকে।

বিশেষজ্ঞরা হিসাব করিয়া বলেন, কালের গতিতে এবং বাধাপ্রাপ্ত না হইলে দশ কোটি একর পরিমাণ চাষের জমি, পাঁচ কোটি একর পতিত এবং পাঁচ কোটি একর পরিমাণ রাজস্থানের মরুভূমি, সম্পূর্ণরূপে লাভজনক কোনও ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়িতে পারে। যাহা আছে সেই সংক্ষিপ্ত বস্ত্রের মধ্যে ছিদ্ররূপে দেখা দিতেছে; সুতরাং সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়া চলিতেছে।

বনবিজ্ঞানের হিসাবে রাজ্যের আয়তনের অনুপাতে বনের আয়তন ন্যূনপক্ষে সিকি ভাগ হওয়া প্রয়োজন। এখন মাত্র শতকরা ১৭·৫ ভাগ। ইহা বৃদ্ধি করিয়া শতকরা পঁচিশ ভাগ অর্থাৎ আরও অন্তত ৫·৪৪ কোটি একর জমি প্রয়োজন।

যেখানে রোপণ করিলেই গাছ সহজ ভাবে জন্মায় সেখানে নানা বনমহোৎসব করিয়া গাছের সংখ্যা কতটা বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা বলা যায় না। অপর পক্ষে প্রত্যহ

নূতন পুরাতন গাছ কাটিয়া, বিশেষতঃ পুরাতন বাগান কাটিয়া কল-কারখানা, চাষ, বাসগৃহ প্রভৃতির উপযোগী করিয়া লওয়া হইতেছে। বড় জঙ্গল সুন্দরবনের বহু বিস্তৃত এলাকা চাষের জমিতে পরিণত হইয়াছে। দণ্ডকারণ্য সত্যই কিরূপ অরণ্য অঞ্চল ছিল তাহা আমার জানা নাই, তবে তাহাকে যে সহজেই "বন" জঙ্গলে পরিণত করা যাইত তাহা কষ্ট কল্পনা নহে।

বনভূমি বৃদ্ধির বিশেষ চেষ্টা করিলে সুযোগের খুব অভাব নাই। কিন্তু যখন বৃক্ষরোপণ পর্ব্বের সহিত নৃত্য, গীত, শঙ্খধ্বনি এবং সর্ব্বোপরি ফটো তুলিবার ব্যবস্থা নাই, তখন বড় গাছ বসাইবার পক্ষে নানা অসুবিধা রহিয়া গিয়াছে। ভারতে চাষের অযোগ্য জমির পরিমাণ সম্ভবতঃ তাহা কচ্ছের ৫৩ লক্ষ একর পরিব্যাপ্ত লবণ-অধ্যুষিত ভূমির মত কেবল চাষ নয়, লতাগুল্ম জন্মিবার পক্ষেও অনুপযোগী।

যখন লোকসংখ্যা ৩৬ কোটি ছিল, তখনই চাষের জমি ও শস্যের ফলন অপর্য্যাপ্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। ১৯৫০-৫১ হইতে ১৯৫৮ পর্য্যন্ত ৮১৯ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকার গম, চাউল প্রভৃতি আমদানি করিতে হইয়াছে। ভারতের যে পরিমাণ জমিতে চাষ হইয়া একটা প্রকাণ্ড ঘাটতি চলিতেছে, অন্য দেশ সেই জমিতে ফসল উৎপাদন করিয়া স্বীয় অভাব সম্পূর্ণ মিটাইবার পর উদ্বৃত্ত দেখাইতে পারিত, কিন্তু সে কথা ভাবিয়া সান্ত্বনা লাভ করা যুক্তিযুক্ত নয়। চেষ্টা চলিতেছে, চাষের উন্নতি হইবে, ইহাই আশা করা যাউক। তা ছাড়া যে পরিমাণ ফসল বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা, তাহা লোকবৃদ্ধির সহিত সমতা রক্ষা করিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায় না। সুতরাং যে ঘাটতি রহিয়াছে তাহা বাড়িবে ছাড়া কমিবে না। এই দিক দিয়া বিচার করিলে বলিতে হয়, অন্ন উৎপাদনের জন্য আরও প্রচুর জমি চাই।

বাড়ীঘর, কারখানার জন্য জমি চাই। অন্ধ না হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, প্রতি রেল লাইনের, প্রতিটি বড় রাস্তার ধারে ধারে সুদূরপ্রসারী ভূখণ্ডের উপর বিরাটকায় আকাশচুম্বী অট্টালিকা শ্রেণী, অতিকায় কারখানা ও তৎসংলগ্ন চিমনি মাথা তুলিয়া উঠিতেছে। ইহা ধনের সৌকর্য্যে, প্রয়োজনের তাগিদে, মদ ও মাৎসর্য্যের প্রভাবে জলা, খাল, বাগান বাগিচা ধানক্ষেত্র, অন্যান্য চাষের উপযোগী জমি কিছুই বিচার করিতেছে না। বিশেষ করিয়া আম, জাম, কলা, কাঁঠাল প্রভৃতির বাগান বাগিচা ইহারা দাবানলের মত ধ্বংস করিয়া চলিতেছে। জমি চাই জমি চাই!

বাঁধগুলির সাহায্যে সৃষ্ট জলাধার কোথাও কোথাও দেড় শত বা ততোধিক বর্গমাইল-ব্যাপী। এই জল-নিমজ্জিত জমির হয় ত অনেকখানি কোনও ব্যবহারে লাগিত না; আবার অনেক স্থলে লোকালয় বাসভূমি ডুবাইয়া বিস্তার লাভ করিতেছে। সেই সব লোক আবার বহুক্ষেত্রে ধান জমি বাগান প্রভৃতি দখল করিতে বাধ্য হইতেছে। সুতরাং জমি চাই।

অর্ব্বাচীন না হইলে বলিবে না যে, যাহা ঘটিতেছে, তাহার কোনও প্রয়োজন নাই। কিন্তু যে ভাবে ঘটিতেছে, তাহার সম্বন্ধে বলিবার হয়ত অনেকেরই অনেক কিছু আছে। আজ লোক সংখ্যার তুলনায় সকল প্রকার জমির পরিমাণই পর্য্যাপ্ত নয়। ভূ-মাতৃকার অঞ্চল দিয়া বন ঢাকা দিতে, কতক বা চাষের ক্ষেত লইয়া টান পড়ে, চাষের ক্ষেত বাড়াইতে বনভূমির উপর। লোকালয় শহর গড়িতে, বাগান ,বাগিচা, শস্যের ক্ষেত লইয়া টানা-টানি পড়ে। উদাহরণ বৃদ্ধি করিয়া লাভ নাই। সমস্যা এই কয়েক বর্গমাইল স্থান ঢাকা দেওয়া কয়েক বর্গগজ ভূমিরূপ বস্ত্রের পক্ষে সম্ভব নয়।

ভারতবাসীর প্রয়োজনের তুলনায় ভূমির অপ্রতুলতা সম্বন্ধে একটা চিত্র দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অবস্থা যে গুরুতর এবং প্রত্যেক দিনই যে তাহা আরও কঠিন হইয়া পড়িতেছে সে বিষয়ে উপলব্ধি করিবার সময় আসিয়াছে। জমির ব্যবহার বা অপব্যবহার সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন। শহরে জমির ব্যবহার সম্বন্ধে একটা রীতি প্রায়শঃই আইনের সহায়তায় গড়িয়া উঠিয়াছে। গৃহনির্ম্মাণে যাহাতে কেবল প্রতিবেশী ও স্থানীয় লোকের অসুবিধা না হয়, তাহাই লক্ষ্যণীয় নয়। বাড়ীর মালিকের পরিবারবর্গও যাহাতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে বাস না করে, আইন সেইভাবে বাড়ী তৈয়ারি করিবার অনুমতি দিয়া থাকে।

ভারতের জমি ব্যবহার সম্বন্ধে আরও সতর্ক দৃষ্টি প্রয়োজন। যে কাজের যে জমি উপযোগী তাহার জন্য সেই প্রকৃতির জমি যাহাতে ব্যবহার করা হয়, আইন দ্বারা তাহাতে বাধ্য করা উচিত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, চাষের উপযোগী জমি লোপ করিয়া বিরাট কারখানা গড়িয়া উঠিতে দেওয়া কখনও বুদ্ধিমানের কাজ নহে। চাষের জমি অথচ তাহা নিম্নশ্রেণীর এবং তাহাতে ফলনের হার নিতান্ত কম, কেবল এই অজুহাতে বহু জমি চাষ ব্যতীত অপর কাজে ব্যবহৃত হইতেছে। এ অবস্থায় যে চাষের জমির উন্নতিসাধন করিবার প্রচেষ্টা করা উচিত, তাহা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। এই শিক্ষা যদি উন্নত

ধরনের হয়, তবে আজ যাহা চাষের অযোগ্য জমি বলিয়া বিবেচিত হয়, এক সময় তাহারই উন্নতি সাধনের সাহস জুটিবে, ফলে শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রের পরিমাণ সহসা বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা অল্প।

ঘনসন্নিবিষ্ট লোকালয়ের নিকট স্বাস্থ্যহানি বা বিরক্তিকর কারখানা করিতে দেওয়া হয় না। আইনমতে ইহাতে বাধা নিষেধ আছে। বড় কারখানার ময়লা নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা না থাকিলে তাহা স্থাপন করিবার পক্ষে আপত্তি হইয়া থাকে।

এইভাবে নানা ঘটনা লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায়, গবর্ণমেণ্ট বা তৎস্থলাভিষিক্ত আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি বা স্থানীয় জনমত জমির ব্যবহার কতক পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। আজ যে সময় আসিয়াছে, সামান্য পরিমাণ নির্দ্ধারিত জমির ব্যবস্থার সম্পর্কে কিছু উপেক্ষা করিয়া তদপেক্ষা বেশী জমির ব্যবহারে গবর্ণমেণ্ট বা তাহার স্থলাভিষিক্ত কর্তৃপক্ষের মনোনয়ন লাভ করা আইনসম্মত করা বাঞ্ছনীয়। আপন খুসীমত জমি ব্যবহার করার শক্তি থাকায় সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। অর্থবাহুল্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত এবং অপব্যবহারের জন্য লক্ষ লক্ষ একর জমির ফসল হইতে সাধারণ লোক বঞ্চিত হইয়াছে এবং হইতেছে।

এখন চলিতেছে নূতন নগরী এবং বড় কারখানা ও শ্রমিকের বাসস্থান নির্ম্মাণের যুগ। তাহার পরেই আছে সরকারী প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা মন্দির স্থাপন। কারখানার ব্যাপারে সরকারী ও বে-সরকারী উভয় পক্ষই অতিমাত্রায় উৎসাহশীল। স্বাধীন ভারতে তাহার প্রয়োজন নাই এ কথা বলা যায় না। কিন্তু এই সকল কারখানা ইমারত যে সকল জমির অপর ব্যবহার সম্ভব নয়, সেই সকল জমিতে স্থাপিত হইতে পারে। ইহাতে মূলধন বেশী পড়ে এবং মাল চলাচলের জন্য খরচ বেশী পড়িবার সম্ভাবনা। কিন্তু সেই কারণে যে কোনও ফসলের উপযোগী জমি ক্ষতিগ্রস্ত করিতে দেওয়া যায় না। যানবাহনের উপযোগী বিস্তৃত পথ হইলে বা দূর অঞ্চলে রেললাইন পাতিলে এ সকল অসুবিধার প্রশ্ন আপনিই দূর হইয়া যাইবে। যাঁহারা পয়সা ছড়াইয়া পয়সা কুড়াইতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট পথঘাট যানবাহন ব্যবহার করা অবশ্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য-তালিকায় স্থান পাইবে। বিশেষতঃ লোকালয় এবং কৃষিক্ষেত্র হইতে দূরে অবস্থিত জমির দাম অত্যন্ত কম পড়িবে এবং চড়া দামের জমি ক্রয় করিতে না হইলে যে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিয়া যাইবে, তাহা এই সকল আনুষঙ্গিক ব্যয়ের কতকটা মিটাইতে পারিবে।

জমির সুষ্ঠু বণ্টন বা র‍্যাশনিং-এর সময় অতিক্রান্ত হইতে চলিয়াছে। পরিকল্পনাকালে যেমন কোন খাতে কত ব্যয় হইবে তাহার একটা আন্দাজ বা বরাদ্দ ঠিক হয়, এখানেও কোন কাজে বা কোন্ শিল্পে কতটা জমি লাগিতে পারে, তাহার হিসাব করিয়া জমির বিলিব্যবস্থা করা প্রয়োজন। স্থাবর সম্পত্তির স্বত্ব হস্তান্তরের সময় জমি রেজিষ্টারী বা পঞ্জীভুক্ত করিতে হয়, সেই সময় ক্রেতার উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জমির ক্রয়েও বাধা দিবার উপায় উদ্ভাবন করা প্রয়োজন হইয়া পড়িতে পারে।

অনেকে বলিবেন ইহাতে ভারতীয় বিধান বা কনষ্টিউসনে হস্তক্ষেপ করা হইবে। তাহার উত্তর, যদি সত্যসত্যই ইহা প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়, তখন যেমন নয়বার "বিধান"-এর পরিবর্ত্তন সাধন করা হইয়াছে, আর একবার করিলে কোনও দোষ নাই। (বেরুবাড়ী সম্পর্কে আর একবার সংবিধান পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা ঘটিয়াছে।)

তবে একটা বড় কথা এবং তাহাতেই সব ব্যবস্থা বানচাল হইয়া যাইতে পারে। ইহা আর এক দফা ঘুষের পথ খুলিয়া দিতে পারে এবং সেই পথে যখন পিপীলিকা প্রবেশের কথা নয়, তখন হস্তী স্বচ্ছন্দে গলিয়া যাইবে।

সবার উপরে

শ্রীসীতা দেবী

রবিবার সকাল বেলা। ছেলেমেয়েরা সকলেই প্রায় আজ বেলা করে উঠেছে, কারণ স্কুল-কলেজে যাবার তাড়া নেই। কর্ত্তারা দুই ভাই, এক সংসারে থাকেন, কাজেই ষষ্ঠী দেবীর কৃপায় বাড়ীতে ছেলেমেয়ে নিতান্ত কম নয়। সংখ্যায় ছেলেই বেশী। এতক্ষণ মুখ ধোওয়া চা খাওয়া ও মায়েদের কাছে নানা কারণে বকুনি খাওয়াতেই কেটে গেছে, তার পর সকলে ছড়িয়ে পড়েছে ঘরে এবং বাইরে। ছেলেরা বেশীর ভাগই বাড়ীর থেকে বেরিয়ে গেছে। বাড়ীতে এখন অবিবাহিতা বড় মেয়ে দু'জন, সুমনা আর সুচিত্রা। তারা ছাদে উঠেছে পাশের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে গল্প করবার জন্যে।

সুমনা বড় কর্ত্তার মেজ মেয়ে, সুচিত্রা ছোট কর্ত্তার একমাত্র মেয়ে। দু'জনে প্রায় সমবয়সী, পনেরো-ষোল বছরের হবে। বয়স জানতে চাইলে মায়েদের কাছে কখনও সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। দু'জনেই স্কুলে পড়ছে এবং প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছে। এ বাড়ীর আবহাওয়া খুব কঠোর সনাতনপন্থী নয়, আবার উগ্র রকমের আধুনিকও নয়। গৃহিণীরা সাধারণ হিন্দু পরিবারের নিয়মগুলি মেনে চলাই বিশেষ মনে করেন এবং কর্ত্তারা এখন পর্য্যন্ত তা নিয়ে খুব কিছু বাধা সৃষ্টি করেন নি।

পাশের বাড়ীর মেয়ে মিণ্টুও এই সময় ছাদে ওঠে। সবে শীতের হাওয়া দিতে আরম্ভ করেছে, কাজেই সকালের রোদটুকু সবাই উপভোগই করে। সুমনাকে দেখেই মিণ্টু একটুখানি মুচকে হেসে বলল, "কি সব শুনছি যে গো, ঠাকরুণ?"

সুমনা মুখখানা একটু লাল করে জবাব দিল, "তোমরা কোথা থেকে কত কিছু শোন বাপু, আমার কানে ত কিছু আসে না।"

মিণ্টু বলল, "তা ইচ্ছে করে কানে তুলো দিয়ে রাখলে আর কি করে কানে কথা যাবে? আচ্ছা চিত্রা, তুই বল দেখি, মনুকে দেখতে আসবার কথা ওঠে নি?"

সুচিত্রা এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে নিল, কাছাকাছি বড়রা কেউ আছে কি না। তার পর বলল, "কে জানে বাপু, দেখতে আসবার কথা কিছু শুনি নি, তবে কিছু একটা কথা বাড়ীতে উঠেছে ঠিকই। মা আর জ্যাঠাইমা অবসর পেলেই ফিস্‌ফিস্ করে কি সব বলাবলি করছেন। জ্যাঠামশায়ও মাঝে মাঝে যোগ দিচ্ছেন, এবং জ্যাঠাই-মাকে কি একটা বোঝাতে চেষ্টা করছেন। একটা ছেলের নামও মাঝে মাঝে কানে আসছে।"

সুমনার ভালই লাগছিল কথাগুলো শুনতে, তবে লজ্জাও করছিল। তাদের বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের বিয়ের কথা তাদের সঙ্গে বড়রা কেউ আলোচনা করেন না। আগে সবই ঠিক হয়ে যায়, তার পর ছেলের বিয়ে হলে লোক-দেখান গোছের একটা সম্মতি নেওয়া হয় তার কাছ থেকে এবং ছেলে যদি বেশী শক্ত স্বভাবের হয় তা হলে তাকে একবার বন্ধু-বান্ধব সঙ্গে দিয়ে কনে দেখতে পাঠান হয়। মেয়ে হলে, সব পাকাপাকি ঠিক হয়ে যাবার পর বরের একটা ফোটোগ্রাফ তাকে দেখান হয় এবং তার পছন্দ হয়েছে কি না জিজ্ঞাসা করা হয়। এ বন্ধু-বান্ধব বা অন্য বোনরাই করে। বলা বাহুল্য, এখন অবধি কোন কনে অসম্মতি প্রকাশ করে নি নির্ব্বাচিত বরকে বিয়ে করতে।

সুমনা বলল, "কথা ত কত রকম উঠছে, আমার বারো বছর বয়স থেকেই। আমার কিন্তু এখনই বিয়ে করার একটুও ইচ্ছা নেই। অন্ততঃ বি, এ, টা পাশ করি, তবে ত? আজকাল এত মুখ্যু হয়ে সংসারে ঢোকা কিছু নয়। কেউ একদম গ্রাহ্য করে না। দেখছি ত সব ঘরে এবং বাইরে।"

সুচিত্রা বলল, "বল্ না গিয়ে জ্যাঠাইমাকে। দেবে এখন চুলের মুঠি ধরে এক চড়।"

ধরনের হয়, তবে আজ যাহা চাষের অযোগ্য জমি বলিয়া বিবেচিত হয়, এক সময় তাহারই উন্নতি সাধনের সাহস জুটিবে, ফলে শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রের পরিমাণ সহসা বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা অল্প।

ঘনসন্নিবিষ্ট লোকালয়ের নিকট স্বাস্থ্যহানি বা বিরক্তি-কর কারখানা করিতে দেওয়া হয় না। আইনমতে ইহাতে বাধা নিষেধ আছে। বড় কারখানার ময়লা নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা না থাকিলে তাহা স্থাপন করিবার পক্ষে আপত্তি হইয়া থাকে।

এইভাবে নানা ঘটনা লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায়, গবর্ণমেণ্ট বা তৎস্থলাভিষিক্ত আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি বা স্থানীয় জনমত জমির ব্যবহার কতক পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। আজ যে সময় আসিয়াছে, সামান্য পরিমাণ নির্দ্ধারিত জমির ব্যবস্থার সম্পর্কে কিছু উপেক্ষা করিয়া তদপেক্ষা বেশী জমির ব্যবহারে গবর্ণমেণ্ট বা তাহার স্থলাভিষিক্ত কর্তৃপক্ষের মনোনয়ন লাভ করা আইনসম্মত করা বাঞ্ছনীয়। আপন খুসীমত জমি ব্যবহার করার শক্তি থাকায় সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। অর্থবাহুল্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত এবং অপব্যবহারের জন্য লক্ষ লক্ষ একর জমির ফসল হইতে সাধারণ লোক বঞ্চিত হইয়াছে এবং হইতেছে।

এখন চলিতেছে নূতন নগরী এবং বড় কারখানা ও শ্রমিকের বাসস্থান নির্ম্মাণের যুগ। তাহার পরেই আছে সরকারী প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা মন্দির স্থাপন। কারখানার ব্যাপারে সরকারী ও বে-সরকারী উভয় পক্ষই অতিমাত্রায় উৎসাহশীল। স্বাধীন ভারতে তাহার প্রয়োজন নাই এ কথা বলা যায় না। কিন্তু এই সকল কারখানা ইমারত যে সকল জমির অপর ব্যবহার সম্ভব নয়, সেই সকল জমিতে স্থাপিত হইতে পারে। ইহাতে মূলধন বেশী পড়ে এবং মাল চলাচলের জন্য খরচ বেশী পড়িবার সম্ভাবনা। কিন্তু সেই কারণে যে কোনও ফসলের উপযোগী জমি ক্ষতিগ্রস্ত করিতে দেওয়া যায় না। যানবাহনের উপযোগী বিস্তৃত পথ হইলে বা দূর অঞ্চলে রেললাইন পাতিলে এ সকল অসুবিধার প্রশ্ন আপনিই দূর হইয়া যাইবে। যাঁহারা পয়সা ছড়াইয়া পয়সা কুড়াইতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট পথঘাট যানবাহন ব্যবহার করা অবশ্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য-তালিকায় স্থান পাইবে। বিশেষতঃ লোকালয় এবং কৃষিক্ষেত্র হইতে দূরে অবস্থিত জমির দাম অত্যন্ত কম পড়িবে এবং চড়া দামের জমি ক্রয় করিতে না হইলে যে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিয়া যাইবে, তাহা এই সকল আনুষঙ্গিক ব্যয়ের কতকটা মিটাইতে পারিবে।

জমির সুষ্ঠু বণ্টন বা র‍্যাশনিং-এর সময় অতিক্রান্ত হইতে চলিয়াছে। পরিকল্পনাকালে যেমন কোন খাতে কত ব্যয় হইবে তাহার একটা আন্দাজ বা বরাদ্দ ঠিক হয়, এখানেও কোন কাজে বা কোন্ শিল্পে কতটা জমি লাগিতে পারে, তাহার হিসাব করিয়া জমির বিলিব্যবস্থা করা প্রয়োজন। স্থাবর সম্পত্তির স্বত্ব হস্তান্তরের সময় জমি রেজিষ্টারী বা পত্রীভুক্ত করিতে হয়, সেই সময় ক্রেতার উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জমির ক্রয়েও বাধা দিবার উপায় উদ্ভাবন করা প্রয়োজন হইয়া পড়িতে পারে।

অনেকে বলিবেন ইহাতে ভারতীয় বিধান বা কন্‌ষ্টিটিউসনে হস্তক্ষেপ করা হইবে। তাহার উত্তর, যদি সত্যসত্যই ইহা প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়, তখন যেমন নয়বার "বিধান"-এর পরিবর্ত্তন সাধন করা হইয়াছে, আর একবার করিলে কোনও দোষ নাই। (বেরুবাড়ী সম্পর্কে আর একবার সংবিধান পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা ঘটিয়াছে।)

তবে একটা বড় কথা এবং তাহাতেই সব ব্যবস্থা বানচাল হইয়া যাইতে পারে। ইহা আর এক দফা ঘুষের পথ খুলিয়া দিতে পারে এবং সেই পথে যখন পিপীলিকা প্রবেশের কথা নয়, তখন হস্তী স্বচ্ছন্দে গলিয়া যাইবে।

সবার উপরে

শ্রীসীতা দেবী

রবিবার সকাল বেলা। ছেলেমেয়েরা সকলেই প্রায় আজ বেলা করে উঠেছে, কারণ স্কুল-কলেজে যাবার তাড়া নেই। কর্ত্তারা দুই ভাই, এক সংসারে থাকেন, কাজেই ষষ্ঠী দেবীর কৃপায় বাড়ীতে ছেলেমেয়ে নিতান্ত কম নয়। সংখ্যায় ছেলেই বেশী। এতক্ষণ মুখ ধোওয়া চা খাওয়া ও মায়েদের কাছে নানা কারণে বকুনি খাওয়াতেই কেটে গেছে, তার পর সকলে ছড়িয়ে পড়েছে ঘরে এবং বাইরে। ছেলেরা বেশীর ভাগই বাড়ীর থেকে বেরিয়ে গেছে। বাড়ীতে এখন অবিবাহিতা বড় মেয়ে দু'জন, সুমনা আর সুচিত্রা। তারা ছাদে উঠেছে পাশের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে গল্প করবার জন্যে।

সুমনা বড় কর্ত্তার মেজ মেয়ে, সুচিত্রা ছোট কর্ত্তার একমাত্র মেয়ে। দু'জনে প্রায় সমবয়সী, পনেরো-ষোল বছরের হবে। বয়স জানতে চাইলে মায়েদের কাছে কখনও সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। দু'জনেই স্কুলে পড়ছে এবং প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছে। এ বাড়ীর আবহাওয়া খুব কঠোর সনাতনপন্থী নয়, আবার উগ্র রকমের আধুনিকও নয়। গৃহিণীরা সাধারণ হিন্দু পরিবারের নিয়মগুলি মেনে চলাই বিধেয় মনে করেন এবং কর্ত্তারা এখন পর্য্যন্ত তা নিয়ে খুব কিছু বাধা সৃষ্টি করেন নি।

পাশের বাড়ীর মেয়ে মিন্টুও এই সময় ছাদে ওঠে। সবে শীতের হাওয়া দিতে আরম্ভ করেছে, কাজেই সকালের রোদটুকু সবাই উপভোগই করে। সুমনাকে দেখেই মিন্টু একটুখানি মুচকে হেসে বলল, "কি সব শুনছি যে গো, ঠাকরুণ?"

সুমনা মুখখানা একটু লাল করে জবাব দিল, "তোমরা কোথা থেকে কত কিছু শোন বাপু, আমার কানে ত কিছু আসে না।"

মিন্টু বলল, "তা ইচ্ছে করে কানে তুলো দিয়ে রাখলে আর কি করে কানে কথা যাবে? আচ্ছা চিত্রা, তুই বল দেখি, মনুকে দেখতে আসবার কথা ওঠে নি?"

সুচিত্রা এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে নিল, কাছাকাছি বড়রা কেউ আছে কি না। তার পর বলল, "কে জানে বাপু, দেখতে আসবার কথা কিছু শুনি নি, তবে কিছু একটা কথা বাড়ীতে উঠেছে ঠিকই। মা আর জ্যাঠাইমা অবসর পেলেই ফিস্‌ফিস্ করে কি সব বলাবলি করছেন। জ্যাঠামশায়ও মাঝে মাঝে যোগ দিচ্ছেন, এবং জ্যাঠাই-মাকে কি একটা বোঝাতে চেষ্টা করছেন। একটা ছেলের নামও মাঝে মাঝে কানে আসছে।"

সুমনার ভালই লাগছিল কথাগুলো শুনতে, তবে লজ্জাও করছিল। তাদের বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের বিয়ের কথা তাদের সঙ্গে বড়রা কেউ আলোচনা করেন না। আগে সবই ঠিক হয়ে যায়, তার পর ছেলের বিয়ে হলে লোক-দেখান গোছের একটা সম্মতি নেওয়া হয় তার কাছ থেকে এবং ছেলে যদি বেশী শক্ত স্বভাবের হয় তা হলে তাকে একবার বন্ধু-বান্ধব সঙ্গে দিয়ে কনে দেখতে পাঠান হয়। মেয়ে হলে, সব পাকাপাকি ঠিক হয়ে যাবার পর বরের একটা ফোটোগ্রাফ তাকে দেখান হয় এবং তার পছন্দ হয়েছে কি না জিজ্ঞাসা করা হয়। এ বন্ধু-বান্ধব বা অন্য বোনরাই করে। বলা বাহুল্য, এখন অবধি কোন কনে অসম্মতি প্রকাশ করে নি নির্ব্বাচিত বরকে বিয়ে করতে।

সুমনা বলল, "কথা ত কত রকম উঠছে, আমার বারো বছর বয়স থেকেই। আমার কিন্তু এখনই বিয়ে করার একটুও ইচ্ছা নেই। অন্ততঃ বি, এ, টা পাশ করি, তবে ত? আজকাল এত মুখ্যু হয়ে সংসারে ঢোকা কিছু নয়। কেউ একদম গ্রাহ্য করে না। দেখছি ত সব ঘরে এবং বাইরে।"

সুচিত্রা বলল, "বল্ না গিয়ে জ্যাঠাইমাকে। দেবে এখন চুলের মুঠি ধরে এক চড়।"

সুমনার মা রাশভারি মানুষ। ছেলেপিলেদের অন্যায় বাচালতা বা আবদার সহ্য করেন না। সুচিত্রার মা অন্য রকম। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খানিকটা গল্পগাছা করতে তাঁর আটকায় না। এ জন্যে তাঁর একটু অসুবিধা হয় আরও বড়দের মহলে। ছেলেমেয়েদের "আস্কারা দিয়ে মাথায় তোলা"র অভিযোগ মাঝে মাঝে ওঠে তাঁর নামে। তবে ছোটদের কাছে তাঁর একটু আদর আছে এই কারণে।

সুমনা বলল, "সেই ত হয়েছে বিপদ! আমাদের সংসারে মেয়েদের ত কেউ মানুষ মনে করে না! আমরা সব খেলার পুতুল। সাজিয়ে-গুজিয়ে যখন যেদিকে বসিয়ে দেবে, সেইখানেই বসতে হবে। দেখি যদি সাহস সঞ্চয় করতে পারি, একটু আপত্তি জানাতে—"

সুচিত্রা বলল, "বাপরে! আপত্তি করতে আর হয় না। যা দাবড়ি দেবেন তোমার মা! আমার মা হলেও বা কথা ছিল। অবিশ্যি তিনিও ত অধীন, তাঁর কথাতে ত আর কিছু হবে না?"

মিণ্টু বলল, "আজকাল অনেক বাড়ীর মেয়েরা বেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। ইচ্ছামত বিয়ে করছে বা না করছে। ঐ ত মাস দুই আগে আমার এক পিসতুতো বোন তার এক সহপাঠিকে বিয়ে করে বসল। তাও আবার ভিন্ন জাতের। বাড়ীতে একটু আপত্তি উঠল বটে, তবে শেষ অবধি সব ঠিক হয়ে গেল। সে মেয়ে ত দিব্যি এখন আসছে-যাচ্ছে বাপের বাড়ী।"

নিচ থেকে কি কারণে ডাক আসায় সুচিত্রা এই সময় চলে গেল। সুমনাও যাবে কি না ভাবছে এমন সময় মিণ্টু বলল, "আচ্ছা, সত্যি করে বল দেখি, তোর বিয়ে করতে ইচ্ছা করে কি না? বাইরে ত সবাই খুব ঢং দেখায় তাদের যেন সন্ন্যাসিনী হয়ে যাবারই একান্ত ইচ্ছে। অথচ মনের ভিতরটাও রসে টস্‌টস্‌ করছে।"

সুমনা বলল, "সন্ন্যাসিনী হব, তা ত বলছি না? সে রকম ইচ্ছে কিছু নেই। সংসার ত করতেই হবে। জন্মাবধি এই ত দেখে আসছি, শুনেও আসছি। তবে বেশ মানুষ হয়েই বিয়ে করার ইচ্ছা ছিল। বাঙালী সংসারে মেয়েদের বড় হীন মনে করে। এত যে আমার মায়ের বীরদর্প আমাদের কাছে, তিনিও ত সাহস করে নিজের জোরে কিছু করতে পারেন না, বাবার মতের জন্য তাকিয়ে থাকতে হয়।"

মিণ্টু বলল, "সেই ত হয়েছে বিপদ! যার খাবে তার মন জোগাতেই হবে। মেয়েরা সবাই যদি স্বাধীনভাবে রোজগার করতে পারত, তাহলে তাদের এত দুর্গতি হ'ত না।"

রোদটা কড়া হয়ে উঠছে, এর পর ছাদ থেকে নেমে পড়তেই হ'ল। শনি-রবিবারে বাড়ীর মেয়েদের খানিক-ক্ষণের জন্য ভাঁড়ারঘর আর রান্নাঘর তদারক করতে যেতে হ'ত। এ বিষয়ে বাড়ীর বড়গিন্নী সুমনার মা খুব কঠিন মত পোষণ করতেন। তিনি বলতেন, "যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না? পড়াশুনা করছ কর, তাই বলে ঘরকন্নার কাজ কিছু শিখবে না কেন? শ্বশুরবাড়ী যাবে যখন, তখন ত মা-খুড়ীকেই লোকে গাল দেবে? না বাপু, সেটি হচ্ছে না, কাজকর্ম কিছু কিছু শিখতে হবেই।"

সুমনা নেমে দেখল, সুচিত্রা অপ্রসন্ন মুখে ভাঁড়ারঘরে বসে তরকারি কুটছে। তাকে দেখেই বলল, "ঐ নাও গো, ঐ বড় থালায় ময়দা বার করা রয়েছে। জ্যাঠাইমা ঐটা তোমায় মাখতে ব'লে গেলেন। কি একটা খাবার তৈরি করা তোমায় শেখাবেন। আজ বিকেলে কে এক ভদ্রমহিলা নাকি বেড়াতে আসছেন। তাঁর কাছে বোধ হয় তোমার সব বিদ্যের পরিচয় দিতে হবে। মিণ্টুর কথাটা সত্যিই মনে হচ্ছে যেন।"

আরও কিছু কথা হয় ত হ'ত দুই বোনে, কিন্তু এই সময় সুমনার মা এসে পড়াতে তাদের আলোচনাটা থেমে গেল। গৃহিণী ঘরে ঢুকেই বললেন, "ওমা, ও কি রকম আলু ছাড়ানো হচ্ছে চিত্রা? অর্দ্ধেকটা ত খোসার সঙ্গে উঠেই গেল। আরও পাতলা করে খোসা ছাড়াও। আর মনু প্রথমেই একগঙ্গা জল ঢেলে দিয়েছ কেন ময়দাতে? ওতে ত সব নষ্ট হয়ে যাবে। প্রথমে অল্প করে জল দিতে হয়।"

সারা সকাল কাজকর্ম শেখা এবং তার পর নাওয়া খাওয়া করতেই কেটে গেল। সুমনার বাবা রাসবিহারী ছুটির দিনগুলো খুব বেলা করে খান। বাড়ীর কর্ত্তা না খেলে গিন্নীরাও খেতে পারেন না এবং চাকর-বাকরও ছুটি পায় না। কাজেই অন্য দিনগুলোয় দুপুরে যেমন নিশ্চিন্ত

শান্তি বিরাজ করে বাড়ীতে, রবিবারে হয় ঠিক তার উল্টো।

খেতে বসে রাসবিহারী বললেন, "মিত্র-গিন্নী আজ আসছেন তা হলে?"

সুমনার মা বললেন, "তাই ত এখন অবধি ঠিক আছে। চা খাওয়াবার জোগাড়-যাগাড়ও কিছু কিছু করে রেখেছি।"

কর্তা বললেন, "এর-ওর মুখে যা শুনছি, পাত্রপক্ষের পরিবারটা একটু বেশী সেকেলে। মেয়েরা যেন ঠিকভাবে চলে ফেরে। ওদের আবার একটু বেশী হৈ-হল্লা করা স্বভাব কি না!"

গৃহিণী গৌরাঙ্গিনী বললেন, "যেমন দেখবে ছেলে-পিলের তেমন শিখবে। বড়রা যদি বড়র মত থাকে, তাহলে ছোটরাও চালচলন ঠিকই শেখে। তা মনু বেশী ধিঙিপনা করে না এমনই। একবার বলে সাবধান করে দেব।"

বেলা আজকাল ছোট। দেখতে দেখতে রোদ পড়ে এল। বাড়ীর দুই গিন্নী উঠে পড়লেন। মেয়েদের ডেকে তোলা হ'ল। রাঁধুনীকেও গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকতে হ'ল। নানা রকম খাবারের সুগন্ধে বাড়ীটা আমোদিত হয়ে উঠল।

সুমনার বিবাহিতা বড় বোন জ্যোৎস্না আজ বাপের বাড়ী বেড়াতে এসেছে। সুমনার চেয়ে বছরচারেক বড় সে। বিয়ে হয়ে গেছে বছর তিন আগে। সঙ্গে এসেছেন তাঁর এক বছরের শিশুপুত্র, তাকে নিয়ে বাড়ীতে কাড়া-কাড়ি পড়ে গেছে।

গৌরাঙ্গিনী জ্যোৎস্নাকে ডেকে বললেন, "ওরে, মনুকে একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দেত। খুব বেশী সাজাবার দরকার নেই। তা হলেই ওদের সন্দেহ হবে যে মেয়ে হয় ত কালো। পাউডার ছাড়া আর কিছু মাখাবার দরকার নেই।"

জ্যোৎস্নার নিজের গায়ের রং ফরসাই বলা চলে। এ বিষয়ে মনে মনে বেশ জাঁকই আছে তার। মায়ের কথা শুনে বলল, "এঁদের বুঝি ফরসা বাতিক নেই?"

মা বললেন, "খুব নয় বোধ হয়। তবে সুশ্রী বৌ ত সকলেই চায়। আমার মেয়ের যা রং আছে, তাতেই চলবে। রং ছাড়া অন্য জিনিসও ত দেখবার আছে?"

জ্যোৎস্না বলল, "সে সবের পরিচয় ত পরে নেবে। প্রথমে দেখে পছন্দ হয় তবে ত? ঐ যে আমার ননদ ঝর্ণা, যত রকম গুণ মানুষের থাকা সম্ভব সবই তার আছে। বাপের ঘরে টাকা যে নেই তাও নয়। তবু মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না কেন? গায়ের রং কালো বলেই ত?"

পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে সুচিত্রা আর সুমনা বড়দির মন্তব্যগুলি শুনছিল। সুচিত্রা বলল, "বাপরে! রঙের অহঙ্কারে বড়দির আর মাটিতে পা পড়ে না! তবু যদি ঐ রকম থ্যাঁদা নাক না হ'ত!"

সুমনা বলল, "মেয়েদের চেহারা ছাড়া আর কিছুর মূল্য মানুষ যতদিন না দেবে, ততদিন তারা চেহারাটাকেই সব চেয়ে দামী জিনিস ভাববে। অথচ ক'দিনই বা মানুষের রূপ থাকে?"

বড়দি ঘরে ঢুকে বললেন, "কই, দে দেখি তোর আলমারির চাবি। কি কাপড় আছে দেখি। আগে-ভাগে মা যদি জানাতেন ত আমারই খান-কয়েক নিয়ে আসতাম।"

সুচিত্রা বলল, "আচ্ছা বড়দি, ব্যাপার কি বলত? কিছু ত আমরা শুনলামই না, হঠাৎ সাজিয়ে-গুজিয়ে মনুদিকে কাকে দেখান হচ্ছে?"

জ্যোৎস্না বলল, "আমিই কি কিছু জানতাম নাকি? আজ এখানে এসে তবে না শুনলাম। একটি ভাল ছেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। ঘর ভাল, তৈরী ছেলে, হলে খুব ভালই হয়। ছেলের বাপ নাকি স্কুলের কি একটা ব্যাপারে মনুর গান শুনে পছন্দ করেছেন। তা মেয়ে ত আর গ্রামোফোন বা রেডিও নয় যে কানে শুনতে ভাল হলেই ভাল হ'ল। তাই চক্ষুকর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন করতে বরের পিসীমা আজ আসছেন। বাবার সঙ্গে নাকি পিসেমশাইটির আগে থেকেই আলাপ আছে।"

সুমনা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বিয়ে সে এখনই করতে চায় না, কিন্তু বর যদি ভাল হয় এবং তারা যদি সুমনাকে পছন্দ করে, তবে সুমনার কোন কথা যে কেউই শুনবে না তাও সে ভাল করেই জানে।

সুচিত্রা বলল, "বর কি রকম ভাই? কি পাস? কি কাজ করে? দেখতে কেমন? নাম কি?"

জ্যোৎস্না আলমারি খুলতে খুলতে বলল, "অত কি জানি নাকি? নামটা শুনলাম নির্ম্মল। ইঞ্জিনিয়ার বোধ হয়।"

সুচিত্রা জিজ্ঞাসা করল, "খুব বড়লোক?"

জ্যোৎস্না আলমারি থেকে একগাদা শাড়ী টেনে বার করতে করতে বলল, "এমন রাজা-বাদশা কিছু নয়! সচ্ছল অবস্থা বলে শুনছি। তবে মস্ত বড় পরিবার। বরেরও ভাই-বোন অনেকগুলি।—স্থাখ ত এই বাসন্তী রং-এর মাদ্রাজী শাড়ীটাতে বেশ দেখাবে না মনুকে?"

সুচিত্রা বলল, "ভালই ত বেশ। জামা একটা জুৎসই দেখে বার কর।"

গৌরাঙ্গিনী হঠাৎ ঘরে এসে বললেন, "স্থাখ বাছা, একটা কথা বলি। তোমরা যেমন মা-খুড়ীর সামনে তড়-বড় করে কথা বল, এঁর সামনে সে রকম কর না। এরা সব সাবেকী চালে চলতে অভ্যস্ত। চুপচাপ থেক, কথা জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিও। তোমার করা খাবার কি তোমার করা সেলাই বলে যা দেখাব তা 'আমার করা নয়' বলে বস না যেন।"

সুচিত্রা অনেক কষ্টে হাসি চেপে রইল। সুমনার মুখখানা আরও গম্ভীর হয়ে গেল। জ্যোৎস্না বিয়ে করে মায়ের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে এখন, সে বলল, "মা যে কি বল তার ঠিক নেই। আমরা কি এখনও চলতে-ফিরতে শিখিনি নাকি?"

মা বললেন, "তোমাকে পেয়াদায় শিখিয়েছে তাই শিখেছ, এঁদের গায়ে এখনও ত কোন আঁচ লাগে নি। ছুনিয়া যে কি জিনিস তা জানতে বাকী আছে। আচ্ছা, আমার ঢের কাজ পড়ে রয়েছে।" তিনি নিচে চলে গেলেন।

জ্যোৎস্না সুমনার দিকে তাকিয়ে বলল, "কিরে, অমন হাঁড়িমুখ করে রইলি কেন? বর ভাল না হলে ত আর কেউ তোকে চুলের মুঠি ধরে বিদায় করে দেবে না? হিন্দু সমাজের মেয়ে হয়ে জন্মেছিস, এই ত ললাট-লিখন। বর যদি ভাল হ'ল ত সব ভাল, না হলেই দুর্গতি। তা মা-বাবা ত বোকা মানুষ নয়, তাঁরা সব দিক দেখে ত ঠিক করবেন? তোর এমন কিছু অরক্ষণীয়া অবস্থা হয় নি যে, সকালে উঠে যার মুখ দেখবে তারই সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিতে হবে।"

সুমনা বলল, "এত কি তাড়া পড়েছিল? আর একটু পড়াশুনো ত করতে পারতাম। আজকাল কত মেয়ে বি-এ, এম-এ পাস করে তবে বিয়ে করে।"

তার দিদি বলল, "বাবার ত তাই-ই মত। আমার বিয়েও ত অত তাড়াতাড়ি দিতে চান নি, অন্ততঃ আই-এ অবধি পড়াতে চেয়েছিলেন। মায়ের জন্যে হয় না। আঁতুড়ঘরেই বিয়ে দিয়ে দিতে না পারলে তাঁর আর আহার-নিদ্রা থাকে না। জুটেও যায় মাঝারি গোছের ভাল বর, কাজেই বিদায় করাও যায় না। তা ভাই কি আর করবি? বর যদি মানুষ ভাল হয়, আর তাকে হাত করতে পারিস,তা হলে বিয়ের পরেও পড়াশুনা করা যায়। অনেকে ত করছে।"

সুচিত্রা বলল, "হ্যাঁ যেমন তুমি করছ।"

জ্যোৎস্না বলল, "আমার মত জড়িয়ে না পড়লে ত করতে পারবি?"

এমন সময় সুচিত্রার মা ঘরে ঢুকে বললেন, "ওগো কন্যেরা, সাজসজ্জা একটু তাড়াতাড়ি সাঙ্গ কর। ফোন এসেছে যে, মিত্র-গিন্নী আধ ঘণ্টা আগেই আসবেন।"

জ্যোৎস্না সুমনাকে তাড়াতাড়ি খাটে বসিয়ে চুল বাঁধতে আরম্ভ করল। তার কাকীমা বললেন, "এমন চুল যার, তাকে চুল খুলেই দেখাতে হয়। আমাদের কালে হলে তাই করত। আমার এক জ্যাঠতুত বোন, তার ভারি সুন্দর চুল ছিল, তাকে সর্ব্বদা চুল খুলে দেখান হ'ত। ফোটো পাঠান হ'ত যখন, তখনও সামনের দিকের একটা, পিছন ফিরে তোলা একটা পাঠান হ'ত। চুলের গুণেই তার ভাল বিয়ে হয়ে গেল।"

জ্যোৎস্না বলল, "বাবাঃ, এখন ঐ রকম করলে লোকে উজবুক বলে হেসে মরবে। এখন সাজতে হবে এমন করে যেন মোটে সাজি নি। যাঁরা দেখতে আসবেন তাঁরাও আড়চোখে তাকিয়ে নেবেন, যেন দেখছেন না।"

ছোট গিন্নী বললেন, "আহা, তা আর না? এখনও হাঁটিয়ে, চলিয়ে, চুল খুলিয়ে কতরকম করে দেখে। প্রশ্ন

করে এমন, যেন মেয়ে মৌখিক পরীক্ষা দিচ্ছে ইউনিভার্সিটির।"

সুচিত্রা বলল, "মা যে কি বলে তার ঠিক নেই। আজকাল অনেক বাড়ী বেশ সভ্যভব্য হয়ে গেছে।"

সুমনা চুপ করে বসে শুনছিল। বয়সের পক্ষে সে একটু গম্ভীর প্রকৃতির। বিয়ের কথা ওঠায় মনটা তার একেবারে আন্‌চান্ না করছিল এমন নয়, কিন্তু তার মধ্যে একটা বিষাদের সুরও বাজছিল। কি হ'ত আর দু' চারটে বছর দেরী করলে? পড়াশুনোয় সে ভালই, পরীক্ষা দিতে পারলে ঠিকই পাস করত। কলেজের পড়া সবটা না হোক, কিছুটা ত শেষ করতে পারত? কলেজে যে সব মেয়ে পড়ে তারা ত বেশীর ভাগই হিন্দু-সংসার থেকে আসে। কই, তাদের ত জাত যায় না? বাবার উপর মনে মনে অভিমান হ'ল। তিনি মুখে বলবেন মেয়েদেরও ঠিক ছেলেদের মত উচ্চশিক্ষা দেওয়া উচিত, অথচ কাজের বেলা দুই মেয়েকেই স্কুলের পড়া শেষ হতে না হতে পার করে দিতে বসেছেন। মায়ের কথা তিনি একেবারেই কখনও ঠেলতে পারেন না, এমন ত নয়? কত ছোট এবং বড় ব্যাপারে সুমনা দেখেছে তাঁকে মায়ের কথা একেবারে উপেক্ষা করে উড়িয়ে দিতে। মেয়েরাই কি বানের জলে ভেসে এসেছে, যে তাদের হয়ে একটু লড়াও যায় না?

নিচে থেকে একটা অস্ফুট কোলাহলের শব্দ যেন হাওয়ায় ভেসে এল। "ঐ রে, এসে পড়েছে বোধ হয়," বলে সুচিত্রার মা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে প্রায় ছুটে চলে গেলেন। চুল বাঁধাটা সুমনার শেষই হয়ে গিয়েছিল। হাতমুখ ধুয়ে তাড়াতাড়ি তাকে শাড়ী, জামা, গহনা পরান আরম্ভ হ'ল। মায়ের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে জ্যোৎস্না তার মুখে এবং ঠোঁটে অল্প একটু কৃত্রিম রক্তিমারও সঞ্চার করে দিল।

সুচিত্রা বলল, "আমার যদি মন্থুদির মত বিয়ে করতে অমত থাকত, তাহলে আমি এমন বিশ্রী মূর্ত্তি করে তাদের সামনে হাজির হতাম যে দেখেই অপছন্দ করে দিত।"

সুমনা বলল, "হ্যাঁ, তার পর মায়ের কাছে কানমলা খেতাম। বুড়ো বয়সে মার খাবার সখ অত আমার নেই।"

কাতী ঝি এসে বলল, "দিদিমণিরা সব নিচে চল। মা সকলকে ডাকছেন।"

তাড়াতাড়ি কনের প্রসাধন শেষ করে এবং নিজেরাও একবার চুলে চিরুণি চালিয়ে এবং মুখে পাউডার পফ বুলিয়ে নিয়ে সকলে নিচে নেমে চলল। এ বাড়ীতে শোবার ঘরগুলি দোতলায়, বসবার ঘর, খাবার ঘর, অফিসরুম প্রভৃতি সব একতলায়।

সুচিত্রার মা খাবার ঘরের মেঝে ভাল করে ধুয়েমুছে বড় বড় কার্পেটের আসন পেতে জলযোগের জায়গা করছেন। বোঝা গেল, অভ্যাগতা একজন বা দুই জন যে ক'জনই এসে থাকুন, টেবল চেয়ারে বসে খাওয়া পছন্দ করেন না। বসবার ঘর থেকে পরিচিত ও অপরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। সুমনার মা অতিথির সঙ্গে কথা বলছেন। মেয়েরা ঘরে ঢুকে দেখল বড় সোফাটাতে গৌরাঙ্গিনীর পাশে একজন দশাসই চেহারার ভদ্রমহিলা বসে আছেন। গায়ের রং শ্যামবর্ণ, চুলে অল্প অল্প পাক ধরেছে, খুব চওড়া করে সিঁদুর পরা। গায়ে অলঙ্কারের বেশ প্রাচুর্য্য, পরণে জরির চওড়া পাড় শাদা শান্তিপুরী শাড়ী।

মেয়েরা সকলে এসে অভ্যাগতাকে প্রণাম করল। জ্যোৎস্না আর সুচিত্রা একটু দূরে গিয়ে বসল। সুমনাকে কাছে টেনে নিয়ে তার মা বললেন, "এইটি আমার মেজ মেয়ে, সুমনা।"

ভদ্রমহিলা সাদরে সুমনাকে নিজের পাশে বসিয়ে বললেন, "ওমা, এইবার চিনেছি। ইস্কুলের প্রাইজের দিন তুমি গান করেছিলে, না? কর্ত্তা গিয়ে বলাতে আমি বলি কোন্ মেয়েটি? তুমি অণিমাকে চেন, ঐ যে ফোর্থ ক্লাশে পড়ে?"

সুমনা মৃদুকণ্ঠে বলল, "চিনি।"

মহিলা বললেন, "ঐ আমার ছোট মেয়ে। ওকেও গান শেখাচ্ছি। কর্ত্তার আবার গান-বাজনার সখ খুব। এক আমিই বাড়ীতে গান জানি না।"

সুমনার সঙ্গে তিনি যে খুব বেশী কিছু কথা বললেন তা নয়, তবে তার মায়ের সঙ্গে অনর্গল কথা বলে চললেন। সুমনাকে খুঁটিয়ে ভাল করে দেখে নিলেন, তার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য যা কিছু তা আগেই বোধ হয়

সংগ্রহ করা হয়ে গিয়েছিল। শুধু একবার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এইবার তুমি ম্যাট্রিক দেবে বুঝি? আজকাল অনেকে ছোটতেই পরীক্ষা দেয়। তোমার বয়স কত হ'ল?"

সুমনা জবাব দেবার আগেই তার মা বললেন, "এই ত পনেরোয় পা দিয়েছে। খুব ছোটতেই ওর বাবা ওকে স্কুলে দিয়েছিলেন কি না?"

অকারণ মিথ্যা কথাটা সুমনার কানে বড়ই খারাপ শুনাল। কি দরকার বয়স ভাঁড়াবার? ছেলেটিও কিছু কচি খোকন নয়, চাকরি করছে যখন।

এর পর জলযোগের পর্ব্ব। ভদ্রমহিলা খেতে পারেন বেশ। জ্যোৎস্না ভাবল, "শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে খাওয়ার কষ্ট মন্থর হবে না বোধ হয়। অবশ্য এর ভাইয়ের বাড়ী কেমন রেওয়াজ তা কে বা জানে?"

২

সুমনাকে প্রথম দেখার পর দু'তিন দিন চুপচাপ কেটে গেল। চুপচাপ অর্থে বরের বাড়ী থেকে নূতন কোন সংবাদ আর এল না। তাঁরাও বোধ হয় নিজেদের মধ্যে সম্বন্ধটার ভাল-মন্দ আলোচনা করছিলেন। কনের বাড়ীতেও অনর্গল এই নিয়ে কথা চলতে লাগল। তলে তলে ছেলে কেমন তা জানবার যত রকম প্রাচীন ও নবীন উপায় আছে সবই অবলম্বন করা হ'ল। তার বন্ধু-বান্ধবদের কাছে খোঁজ নেওয়া হ'ল, সহকর্ম্মীদেরও কাছে খোঁজ নেওয়া হ'ল। স্বভাব-চরিত্র ভাল বলেই সবাই সার্টিফিকেট দিল। স্বাস্থ্যও মোটামুটি ভাল, চেহারাটা মন্দ নয়, তবে খুব যে কুমার কার্ত্তিকেয়ের মত রূপবান তাও নয়। তাদের বাড়ীতে ঝিয়ের কাজ করে এই রকম একটি স্ত্রীলোককে কাতী ঝির সাহায্যে জোগাড় করে আনা গেল। তার কাছ থেকে অনেক হাঁড়ির খবর সংগ্রহ করা হ'ল, যেমন, রোজকার খাওয়া-দাওয়া কেমন, বাড়ীতে কাঁশার বাসনে খাওয়া হয় না কাঁচের প্লেটে, টেবল-চেয়ারে খাওয়ায় আপত্তি আছে কি না, বাড়ীতে মাংস হয় কি না, মেয়েরা পায়ে চটি দেয় কি না শীতকালে সেটাও জানতে বাকি রইল না। ঝিটি অবশ্য সময়াভাবে বেশীক্ষণ বসতে পারল না। আধ ঘণ্টা খানেক বসে পান-দোক্তা খেয়ে এবং আনা আটেক বখশিস নিয়ে প্রস্থান করল। বাড়ীর মেয়েদের এই অনুসন্ধানের সময় ডাকা হ'ল না বলে তারা বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ হ'ল, তাদেরও ত কত রকম কথা জানবার ছিল। মেয়েরা সিনেমায় যায় কি না, ঘোমটা দিতে হয় কিনা বৌদের, বড়দের সামনে স্বামীর সঙ্গে বলা চলে কি না, এ সবগুলোও জানবার দরকার আছে ত? সব বাড়ীতে এক রকম নিয়ম নয় ত?

সুমনার মনের অবস্থাটা একটু দোলায়মান হয়ে রইল। কথাগুলো শুনতে মন্দ লাগে না, বর সকল দিক দিয়ে ভাল শুনলে প্রথম প্রথম ত ভালই লাগে। তার পরই মনে হয়, অত ভাল না হলেও ত চলত। খুঁৎ থাকলে সেইটা ধরে আপত্তি করা যেত। মায়ের কাছে বলতে সাহস না হয়, সুচিত্রা তার মাকে ত বলতে পারত, তিনি বলতেন বড় গিন্নীর কাছে। বাবাকেও জানান যেত জামাইবাবুর সাহায্যে। পড়াশুনা করে মানুষের মত মানুষ হবার ইচ্ছাটা সত্যিই তার খুব বেশী ছিল। সে আশাটাকে একেবারে বিসর্জ্জন দিতে তার একেবারেই ভাল লাগছিল না।

সুমনার মায়ের মোটেই ইচ্ছা ছিল না যে, সম্বন্ধটা পাকাপাকি হয়ে যাবার আগে কথাটা বাইরে ছড়ায়। বাঙালীর সমাজ ত কেউ কারো ভাল দেখতে পারে না। কত সম্বন্ধ তিনি দেখেছেন ভেঙে যেতে, পাড়া-প্রতিবেশী ভ্যাংচি দিয়েছে বলে। এমন কি আত্মীয়-স্বজনও বাদ যায় না। কিন্তু তাঁর যা ইচ্ছা থাক, এ সব খবর চাপা থাকে না। ছেলেমেয়ে, ঝি-চাকর, সবাই খবর রটাবার জন্য এমন ব্যস্ত হয়ে থাকে যে, দেখতে দেখতে খবর চারিদিকে ছড়িয়ে যায়।

সুমনাও স্কুলে গিয়ে শুনল যে, সহপাঠিনীরা মোটামুটি সব কথাই জেনে গেছে। সে সুচিত্রাকে তাড়া দিয়ে বলল, "এই, কি সব গুজব রটাচ্ছিস? মা শুনলে ভীষণ রাগ করবেন।"

সুচিত্রা অত্যন্ত ভাল মানুষের মত মুখ করে বলল, "আহা, আমি কেন রটাতে যাব? আমি কাউকে কিছু বলি নি। ঐ ওদের অণিমা যদি বলে থাকে ত জানি না।"

সুচিত্রার কথা সুমনা কতটা বিশ্বাস করল তা বলা যায় না। তবে অণিমার ভাবগতিকও খুব সুবিধার বোধ

হ'ল না। সে সুমনাকে দেখলেই মুচকে হেসে পালাতে লাগল। সুমনা বুঝল যে, সুচিত্রা হয়ত নির্দোষ নয়, কিন্তু অণিমারও অংশ আছে এই কথা রটানয়।

ক্লাশের মেয়েরা তার পিছনে ছিনে-জোঁকের মত লেগে রইল। "এই, বল না ভাই, কাদের বাড়ী চলেছিস? ঐ অণিমার দাদা নাকি? কি রকম দাদা, নিজের না মামাতো-পিসতুতো? কেমন দেখতে? ছবি দেখেছিস্? কি নাম? কি করে? ঈস, জানেন না কিছু! স্তাকা আর কি! মা-বাবার ঘরে আড়ি পেতে কিছু শুনিস নি? আচ্ছা, আচ্ছা, দেখা যাবে, ক'দিন লুকিয়ে রাখবি? আমরা যেন তোমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিতাম আর কি?"

সুমনার বিরক্তি ধরে গেল। আচ্ছা জ্বালা! তার যদি প্রাণে দারুণ পুলক কিছু না-ই জাগে, সেটা কি তার একটা অপরাধ? বিয়ের একটা কথা উঠেছে বলেই কি তাকে ধেই ধেই করে নাচতে হবে? এখন বিয়ে হওয়ার চেয়ে না হওয়াটাই যে সে কাম্য মনে করে, সেটা ত সে কাউকেই বিশ্বাস করাতে পারছে না?

জ্যোৎস্না এখন খুব ঘন ঘন বাপের বাড়ী আসতে আরম্ভ করেছে। এক্ষেত্রে আসা আইনসঙ্গত, কাজেই শ্বশুরবাড়ীর কেউ বাধা দিচ্ছে না। সুমনা তাকে বলল, "দিদি, এই ক্রমাগত বক্-বকানি বন্ধ করা যায় না ভাই? যখন হবে তখন হবে, এখনি সবাই লাফিয়ে মরছে কেন? ঘরে-বাইরে কোথাও কান পাতবার জো নেই।"

জ্যোৎস্না বলল, "আমাদের বাঙালীর সংসারে এই ত একমাত্র জিনিস হৈ-চৈ করবার, কাজেই বিয়ের একটু আভাস পেলেই সবাই পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। তা তুই এত বিরক্ত হচ্ছিস কেন ভাই? সত্যিই কি তোর একটুও ভাল লাগছে না?"

সুমনা বলল, "আমার এখন বিয়ে করবার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না জানই ত।"

তার দিদি বলল, "বর চোখে দেখলে হয় ত ভাল লাগবে। আরও খোঁজ-খবর পাওয়া যাক, ছেলে হয় ত বেশ ভালই।"

সুমনা বলল, "ছেলের কথা ত হচ্ছে না। আমার পড়াশুনা ত সব এখানেই শেষ হ'ল। জীবনটা এই রকম হবে তা আমি মোটেই ভাবি নি।"

জ্যোৎস্না বলল, "কেন যে ভাব নি, তাও ত জানি না। আমাদের জ্ঞাতিগুষ্টির মধ্যে কেই বা বি-এ, এম-এ পাস করেছে?"

সুমনা বলল, "আগে করে নি বলে কি কোন দিনও করতে নেই?"

জ্যোৎস্না বলল, "যতদিন মা-বাবাদের হাতে সংসার, ততদিন তাঁদের মতেই চলবে ত?"

এই দিনই সন্ধ্যাবেলা রাসবিহারীবাবু আপিস থেকে এসে খবর দিলেন যে, বরের পিসীমার প্রাথমিক রিপোর্টটা খুব ভাল হওয়াতে কথাটা আরও খানিক এগিয়েছে। পাত্রপক্ষ সামনের রবিবারে সদলে কনে দেখতে আসবেন, সেদিন অন্যান্য দেনা-পাওনার কথাও মোটামুটি হয়ে যাবে। তবে এঁরা দেখার পর বর স্বয়ংও একবার বন্ধু-বান্ধব নিয়ে দেখতে আসতে পারে। তাকেও তখন পাত্রীর বাড়ীর সকলে দেখতে পারেন। এই শেষ পরীক্ষায় পাস হয়ে গেলে আর বিয়ের কোনও বাধা থাকবে না।

বাড়ী এইবার গম্ গম্ করতে আরম্ভ করল। সুমনা দেখল, সত্যিই তার কথা যখন কেউ গ্রাহ্য করবে না, তখন আর লাভ কি কথা বাড়িয়ে? যা হবে, তা হবে। জ্যোৎস্না এইবার পাকাপাকি বাপের বাড়ী এসে অধিষ্ঠিত হ'ল। সুমনার সবচেয়ে বড় দাদারও বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। তার বউ এতদিন বাপের বাড়ী ছিল, তাকেও এইবার আনিয়ে নেওয়া হ'ল।

স্কুলে ত রটেই গেল যে, মাস খানেকের মধ্যে সুমনার বিয়ে হয়ে যাবে। সে আর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে পারবে না। অণিমার খুব দর বেড়ে গেল, সবাই এখন তার সঙ্গে ভাব করে গল্প করতে চায়।

রবিবারের জন্য যথোচিত আড়ম্বর সহকারে আয়োজন হতে লাগল। বসবার ঘর ঝেড়েমুছে নূতন করে সাজান হ'ল। খাবারঘরের জন্য নূতন খান তিন-চার চেয়ার কেনা হ'ল। বাসন-কোসন যা কম ছিল, তা হয় কেনা হ'ল, না হয় জোগাড় করে আনা হ'ল আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী থেকে। কনে কি শাড়ী পরবে, কি ব্লাউস পরবে, তরুণীদের মহলে তার জোর আলোচনা চলতে লাগল। সুমনার নিজের পোশাকী কাপড়-চোপড় খুব যে বেশী

আছে তা নয় ; কারণ, বিয়ের সময় যাদের অত শাড়ী, জামা, গহনা দিতে হবে, আগেভাগে তাদের জন্ত আর খরচ করা কেন ? তবে জ্যোৎস্না এবং নূতন বৌ গীতা তাদের সমস্ত সাজ-পোশাকের ভাণ্ডার একেবারে উজাড় করে দিতে প্রস্তুত, কাজেই এদিক দিয়ে কোন অসুবিধা হবে বলে মনে হ'ল না।

পাত্রপক্ষ থেকে আসবেন জন পাঁচ-ছয় বলে শোনা গিয়েছিল। কিন্তু সেদিন জলখাবারের আয়োজন হ'ল প্রায় ত্রিশ জনের। বাড়ীর লোকেরা খাবে, আত্মীয়, বন্ধুরা খাবে, সবাই ত এসে জুটেছে। পাশের বাড়ীর মিণ্টুরা এসেছে, এমন ব্যাপারে তাদের বাদ দেওয়া চলে না।

কনে সাজান আরম্ভ হ'ল। নূতন বৌদির সাজানোর হাত খুব ভাল, সেই আজ সাজাচ্ছে। জ্যোৎস্না তাকে সাহায্য করছে। আজ আর হাল্‌কা সাজ নয়, রীতিমত সাজ, যাতে চোখে ধাঁধাঁ লেগে যায়। খাটের উপর বেনারসী, বালুচরী, জর্জ্জেট ছড়াছড়ি যাচ্ছে। গহনার বাক্সও গোটা তিন-চার বিরাজমান। সুমনা মুখ গম্ভীর করে আছে, বাকী মেয়ের দল হাস্যমুখর। ছোট বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলোও ঘুরঘুর করছে ঐ ঘরেই, যত বারই তাদের দূরে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে, ততবারই তারা ফিরে আসছে। বাড়ীর গৃহিণীরা এবং বয়স্ক আত্মীয়ারা নিচেই থেকে গেছেন, অল্পবয়সীদের হাল্‌কা আলোচনার মধ্যে আসেন নি।

সুমনার সাজ প্রায় শেষ হয়ে এল। আজ আর অঙ্গরাগ ব্যবহারে কোন বাধা পড়ে নি। সুমনাকে মেম সাহেবের মত ফরশা দেখাচ্ছে। মাথার পিছনে এলো খোঁপাটা পাহাড়ের চূড়ার মত উঁচু হয়ে ঠেলে উঠেছে। তাতে বেলফুলের মালা জড়ান। গীতা বলল, "আজ আমাদের পছন্দ মত সাজিয়ে নিলাম মেজ ঠাকুরঝিকে। বিয়ের দিন ত সাবেকী সাজ, তাতে চেহারা খোলে না, জবড়জঙ্গ সং-এর মত দেখায়। মাথায় সোলার মুকুট, খোঁপায় লাল ফিতে, সে এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি !"

জ্যোৎস্না বলল, "আমার কিন্তু ভাই মন্দ লাগে না ! অন্তদিনের মত না হয়ে একটু বিশেষ মত হয়, ভালই ত ! দিনটা ত ঠিক অন্তদিনের মত নয় ?"

গীতা বলল, "কে জানে ভাই, আমার ভাল লাগে না। আমার আবার বি.য় হয়েছিল গরমকালে, ঐসব হাবিজাবি পরে ঘেমে মরি আর কি ? ইচ্ছে করছিল, সব ধড়াচূড়া দূর করে ফেলে দিই।"

নিচে অতিথির দল এসে পৌঁছলেন। মোটর-হর্ণের ঘোর রবে পাড়া মুখর হয়ে উঠল। অনেক কণ্ঠের কলধ্বনিও উপরে ভেসে এল। সুমনা বাদে সব মেয়েরাই একবার হুড়মুড় করে একতলায় নেমে গেল। আজ যাঁরা এসেছেন, তাঁরা বিশেষ কিছু দ্রষ্টব্য নন, প্রৌঢ়বয়স্ক ভদ্রলোক সব। তবু বরের বাড়ীর লোক ত ? খানিক পরেই এক এক করে সবাই ফিরে চলে এল।

আজ জলযোগের পর্ব্বই আগে। সেটা চললও বহুক্ষণ ধরে। মা, কাকীমার আয়োজন যে বৃথাই যাচ্ছে না, তা বোঝাই গেল। বেশ কিছুক্ষণ পরে কাকীমা উপরে এসে বললেন, "জ্যোৎস্না, মনুকে নিচে নিয়ে আয়।"

সুমনা দুরু দুরু বক্ষে বড়দির সঙ্গে নিচে চলল। আজকের পরীক্ষাটা আগের চেয়ে কঠিনতর। সেদিন শুধু একজন স্ত্রীলোকের সামনে দাঁড়াতে হয়েছিল, আজ অনেকগুলি পুরুষের সামনে দাঁড়াতে হবে। কি তারা বলবে কে জানে ? সুমনা ঠিকমত উত্তর দিতে পারবে ত ? গান শুনতে চাইবে নাকি, কে জানে ? কি গান গাইবে সে ? পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হবার সম্ভাবনা বেশী নেই। সে দেখতে-শুনতে রীতিমত ভাল, বাপের পয়সারও অভাব নেই।

সবে জলযোগ সেরে আগন্তুকের দল তখন আরাম করে এসে সোফায় ও গদীমোড়া চেয়ারে বসেছেন। অতজন লোককে ত আর এক এক করে নমস্কার করা যায় না, ঘাড়ে ব্যথা ধরে যাবে। সমবেত সবাইকে একটা নমস্কার করে সুমনা বসে পড়ল তার নির্দ্দিষ্ট আসনে। চকিত দৃষ্টিপাত করে দেখে নিল তার সামনে জন ছয়-সাত ভদ্রলোক বসে আছেন। যিনি সকলের সামনে তিনিই বরের বাবা বোধ হয়।

সুমনাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "নাম-ধাম, কি পড় সবই ত শুনেছি। একটা গান শুনিয়ে দাও ত মা। স্কুলে সেদিন তোমার গানটা ভারী মিষ্টি লেগেছিল।"

হার্মোনিয়ম এনে রাখা হয়েছিল। কাকার নির্দ্দেশমত

অল ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস এ্যাণ্ড ক্রাফ্‌টস সোসাইটি ভবনে অনুষ্ঠিত চিত্র-প্রদর্শনীতে
শিল্পী রোয়েরিকের সঙ্গে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ

মহাবলীপুরমে মন্দির-পরিদর্শনে ফিনল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ও তাঁহার সঙ্গিগণ

নেহরু পণ্ডিত পন্থের সহিত শ্রী ক্রুশ্চেভের পরিচয় করাইয়া দিতেছেন

জাতীয় ক্রীড়ার খেলোয়ারদের সহিত ডঃ রাধাকৃষ্ণণ আলাপ করিতেছেন

সে কবিগুরুর একটা হেমন্তের গান গেয়ে দিল। এই গানটা সে বাড়ীতে প্রায়ই করত, কাকা এটার খুব তারিফ করতেন।

গান শেষ হতেই শ্রোতার দল সমস্বরে বাহবা দিয়ে উঠলেন। একজন বললেন, "প্রথম দিনই মা লক্ষ্মীকে বেশী বিরক্ত করব না, কিন্তু এরকম গান বসে বসে দশ-পনেরটা শুনতে ইচ্ছা করে।"

সুমনাকে আবার গাইতে হ'ল। এবার সে গাইল মীরাবাঈ-এর ভজন। অতঃপর তার এবং অন্যের করা কয়েকটা জিনিস তার করা বলে প্রদর্শিত হ'ল। পুরুষ মানুষ, সেলাই-ফোঁড়াইয়ের ভাল-মন্দ অত বোঝে না। সব কটাই প্রশংসা পেল। এর পর মেয়েকে তুলে নিয়ে যাওয়া হ'ল, এখন ব্যাপারটার বৈষয়িক দিকটার আলাপ-আলোচনা হবে।

উপরে এসে সুমনা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বোন ও বৌদিরা সকলেই খাবার ঘরে এসে জুটেছিল, যতটা ওখান থেকে শোনা যায়। সুমনার সঙ্গে সঙ্গে সবাই উপরে চলে এল। গীতা বলল, "যাক, দেখতে ভাল বলে সহজে উৎরে গেল। নইলে কত কি সব বলত। এক একদল এসে কতরকম কথাই না জিজ্ঞাসা করে। সাবেকী লোক হলে রান্না জানে কি না তার খোঁজ নিত, আধুনিক হলে নাচতে জানে কি না, ফোটো তুলতে জানে কিনা, এমন কি গাড়ী চালাতে জানে কি না তাও জিজ্ঞেস করে বসে।"

জ্যোৎস্না বলল, "হ্যাঃ, গাড়ী বাবুরা ক'জন কিনতে পারেন যে, অত কথার দরকার?"

গীতা বলল, "তা বললে কি হয়? বাড়ীতে বারো মাস যার রান্না হয় খেঁসারির ডাল আর পুঁইডাঁটার চচ্চড়ি, তিনিও প্রথম এসে জিজ্ঞাসা করেন, পোলাও রাঁধতে জান কি না, কালিয়া রাঁধতে জান কি না।"

এর পর যে যার নিজের কাজে চলে যেতে লাগল। সুমনা কাপড়-জামা, গহনা সব খুলে ফেলে নিজের প্রতিদিনের সাধারণ সাজ পরে বলল, "বড়দি, এসব গুছিয়ে তুলে রাখ ভাই, আবার কখন কি হারিয়ে যাবে।"

সুচিত্রা আর বড়দি মিলে সব গুছোতে লাগল। গীতা খানিক পরে এসে নিজের শাড়ী-গহনাগুলো নিয়ে চলে গেল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, বাড়ীর কল-কোলাহলও স্তব্ধ হয়ে গেল ক্রমে। [ক্রমশঃ

শোকলগ্ন

শ্রীঅশনিভূষণ মজুমদার

অরূপা তোমার রূপের তুলনা নাই,
স্বপ্ন-সায়রে ডুব দিয়ে আমি রত্ন করেছি চয়ন
মনের মাধুরী মিশায়ে তোমায় করেছি গো রূপায়ণ,—
নয়নে আমার অপরূপা তুমি তাই।

মরণ-তোরণে হাতে ছিল দীপজালা
শেষবার যবে দেখেছিনু তব অবনত মুখখানি,—
জীবন-তোরণে দেখিয়া তোমারে মনে হ'ল যেন চিনি,
দাঁড়ালে আবার হস্তে বরণ-ডালা।

আবার কেন গো খেলায় ডাকিলে মোরে?
আলোকে আঁধারে লুকোচুরি খেলা খেলেছি জীবনে মরণে,
ক্লান্তি ভুলিয়া ছুটেছি যখনি বেজেছে নূপুর চরণে,—
এইতো এসেছি অরূপা, তোমারই দ্বারে!

শেষ খেলা হোক এইবার বধূ তবে,
এস তবে আজ খেলা-ভাঙিবার-খেলায় দুজনে মাতি;
সিন্ধুর বুকে মরণ-বাসরে অরূপা রূপের সাথী,—
সাগরবেলায় চরণ-চিহ্ন রবে!

ধর্মাধ্যক্ষ হলায়ুধ ও বাংলা দেশে বেদাধ্যয়ন প্রথা

অধ্যাপক শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে যে সব দিক্‌পাল পণ্ডিত লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় আশ্রয় নিয়ে বাংলার বিদ্যাবৈভবের দীপ্ত ছটায় চতুর্দিক আলোকিত করেছিলেন, ধর্মাধ্যক্ষ হলায়ুধ তাঁদের একজন। এঁর রচিত নানা গ্রন্থের মধ্যে একখানি মাত্র আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। এ গ্রন্থের নাম ব্রাহ্মণসর্বস্ব, বিষয়বস্তু বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা। এতে প্রথমেই বেশ একটি তথ্যবহুল মুখবন্ধে হলায়ুধ আত্মপরিচয় দিয়েছেন, তাঁর পূর্বরচিত গ্রন্থগুলির নাম করেছেন এবং তৎকালীন গৌড়বঙ্গে প্রচলিত বেদাধ্যয়নপ্রণালীর একখানা সুন্দর ছবি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন আর সে প্রণালীর সংস্কার-সাধনেও উদ্যোগী হয়েছেন।

হলায়ুধ এক সম্পন্ন পরিবারে বাৎস্যগোত্রীয় বারেন্দ্র বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ধনঞ্জয় ছিলেন নিষ্ঠাবান্ বেদপন্থী পণ্ডিত, জননী ছিলেন 'ধৈর্য, সংযম ও বুদ্ধির প্রতিমূর্তি' গোচ্ছাবণ্ডী বংশের কন্যা। হলায়ুধের পিতা রাজার ধর্মাধ্যক্ষ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং বিত্তশালীও হয়েছিলেন। কিন্তু ধনাগারের মণিরত্ন অপেক্ষা যাগস্থলীর দর্ভতৃণে ছিল তাঁর বেশী আগ্রহ, হর্ম্য-তোরণের হস্তী অপেক্ষা যজ্ঞযূপের বৃষভে ছিল তাঁর অধিক আদর।

বাল্যাতিক্রমসত্ত্বতেঽপি বিভবে জ্যোতির্জটালান্ মণীন্
হিত্বা যস্য জগন্নমস্তমহসো জাগর্তি কোশঃ কুশঃ।
অপ্যেতস্য বিলঙ্ঘ্য শৈলসদৃশঃ প্রাগ্‌দ্বারবদ্ধান্ দ্বিপান্
দূরোদ্দণ্ডিত যজ্ঞযূপবৃষভোৎকর্ষেণ হর্ষোঽভবৎ॥

হলায়ুধের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পশুপতি 'শ্রাদ্ধকৃত্যপদ্ধতি' আর 'পাকযজ্ঞপদ্ধতি' নামে দু'খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, ঈশান নামে অপর এক সহোদর 'দ্বিজাহ্নিকপদ্ধতি' রচনা করেন।

পৈতৃক পরম্পরাগত বৈদিক সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হলায়ুধ বাল্যকাল থেকে রাজপ্রসাদ উপভোগ করে এসেছেন। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি গুণগ্রাহী লক্ষ্মণ-সেনের কাছে বিভিন্ন বয়সের উপযুক্ত বিভিন্নরূপ সম্মান লাভ করেছিলেন—

আবৃত্ত্যা সদৃশী নিজস্য বয়সঃ প্রাপ্তা মহাপাত্রতা।

তিনি প্রথম বয়সে ছিলেন 'রাজপণ্ডিত', তার পর 'মহা-মহত্তকে'র পদ লাভ করেন। যৌবনসীমা অতিক্রম করার পর পরিণত বয়সে লক্ষ্মণসেন হলায়ুধকে রাজ্যের 'ধর্মাধিকার' পরিচালনার ভার দেন—

বাল্যে খ্যাপিতরাজপণ্ডিতপদঃ শ্বেতাংশুবিম্বোজ্জ্বল-
চ্ছত্রোৎসিক্তমহামহত্তকপদং দত্ত্বা নবে যৌবনে।
তস্মৈ যৌবনশেষযোগ্যমখিলক্ষ্মাপালনারায়ণঃ
শ্রীমাঁল্লক্ষ্মণসেননৃপতির্ধর্মাধিকারং দদৌ॥

প্রজাবর্গের ধর্মকর্ম, শাস্ত্রচর্চা প্রভৃতি কাজ যাতে নির্বাধে পরিচালিত হয়, তা দেখবার জন্য প্রাচীন যুগের হিন্দুরাজা একজন 'ধর্মাধ্যক্ষ' নিযুক্ত করতেন। শাস্ত্রসেবী পণ্ডিতদের বৃত্তিব্যবস্থার ভারও এঁর উপর ন্যস্ত থাকত। হলায়ুধ ছিলেন গৌড়রাজ্যের ধর্মাধ্যক্ষ।

হলায়ুধের জীবনে ধর্মানুগত ত্যাগের ও শাস্ত্রবিহিত ভোগের একটা সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায়। তিনি নিজেই সে কথার উল্লেখ করেছেন। মুনিজনযোগ্য অনাড়ম্বর যজ্ঞসামগ্রী আর ধনিজনভোগ্য মহামূল্য বিলাসবস্তু সবই তাঁর ছিল। স্বাধ্যায়, দেবার্চনা ও তপশ্চর্যায় দিনযাপন করলেও তাঁর জীবনে পার্থিব সুখসম্পদের অভাব ছিল না। তাঁর গৃহে এক দিকে শোভা পেত যজ্ঞিয় দারুপাত্র, পবিত্র কৃষ্ণাজিন, এবং সুরভি হোমধূম, অপর দিকে বিরাজ করত মহার্ঘ্য স্বর্ণভাণ্ড, সুশুভ্র দুকূল এবং মনোরম গন্ধধূপ। কর্মানুষ্ঠানরত হলায়ুধ ইহজীবনেই আপন কর্মের ফল লাভ করেছিলেন—

পাত্রং দারুময়ং কচিদ্ বিজয়তে হৈমং কচিদ্ভাজনং
কুত্রাপ্যস্তি দুকূলমিন্দুধবলং কৃষ্ণাজিনং কাপি চ।
ধূমঃ কাপি বষট্‌কৃতাহুতিকৃতো ধূপঃ পরঃ কাপ্যভূদ্-
অগ্নেঃ কর্ম ফলং চ তস্য যুগপজ্জাগর্তি যন্মন্দিরে॥

পশুপতি ও হলায়ুধ উভয়েই প্রতিদিন আবসথ্য (গৃহস্থিত) অগ্নিতে আহুতি দিতেন, এজন্য তাঁরা 'আবসথিক' আখ্যায় নিজেদের পরিচয় দিয়েছেন। এতে বোঝা যায় যে, খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকেও বাংলা দেশে এমন ব্রাহ্মণগৃহ বর্তমান ছিল, যেখানে সর্বদা যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত থাকত।

হলায়ুধ 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' ছাড়া 'মীমাংসাসর্বস্ব', 'বৈষ্ণব-সর্বস্ব', 'শৈবসর্বস্ব' ও 'পণ্ডিতসর্বস্ব' এই চারখানা 'সর্বস্ব' গ্রন্থ এবং 'সংবৎসরপ্রদীপ' নামে আরও একখানা স্মৃতি-

গ্রন্থ লিখেছিলেন। তিনি পারস্করগৃহ্যসূত্রের উপর একখানা ভাষ্যও রচনা করেছিলেন।

'ব্রাহ্মণসর্বস্বে' আছে—কাণ্বশাখীয় যজুর্বেদীগণের নানারূপ গৃহ্যকর্মের উপযোগী বেদমন্ত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যা। যে সব কর্মানুষ্ঠানে এই মন্ত্রগুলি পঠিত হয়, হলায়ুধ গ্রন্থারম্ভে তার এক সূচী দিয়েছেন। এই শ্লোকবদ্ধ সূচীতে দন্তধাবন থেকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্যন্ত চল্লিশ প্রকার কর্মের নাম আছে। দক্ষিণদেশীয় প্রসিদ্ধ বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্যের বহুপূর্বে বাংলা দেশে 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' রচিত হয়েছিল। সে দিক দিয়ে হলায়ুধের ব্যাখ্যার গুরুত্ব অনেক। বৈদিক মন্ত্রের অর্থ নির্ণয়ে হলায়ুধ সম্প্রদায়প্রাপ্ত ব্যাখ্যা পদ্ধতির সঙ্গে আপন সহজ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে পুরাণাদি নানা শাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন।

আজ থেকে আট শ' বছর আগেও যে বাংলা দেশে বেদবিৎ পণ্ডিতের অভাব হয় নি, 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' গ্রন্থ তার বিশিষ্ট প্রমাণ। কিন্তু হলায়ুধ তৎকালপ্রচলিত সাধারণ বেদাধ্যয়ন ব্যবস্থায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন—বাংলা দেশের উৎকলীয় (দক্ষিণাত্য) ও পাশ্চাত্ত্য বৈদিকেরা বেদ মুখস্থ করেন, কিন্তু অর্থবোধের চেষ্টা করেন না; অপর দিকে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রগণ বেদ মুখস্থ করেন না, কোন রকমে যাগানুষ্ঠানের উপযোগী কতিপয়মাত্র মন্ত্রের অর্থ জেনে নিয়ে কর্মমীমাংসার সাহায্যে যজ্ঞপ্রণালী বিচার করেন।

উৎকলপাশ্চাত্ত্যাদিভির্বেদাধ্যয়নমাত্রং ক্রিয়তে রাঢ়ীয়-বারেন্দ্রৈস্ত্বধ্যয়নং বিনা কিয়দেব বেদার্থস্য কর্মমীমাংসা-দ্বারেণ যজ্ঞেতিকর্তব্যতাবিচারঃ ক্রিয়তে।

হলায়ুধ এই দ্বিবিধ প্রথারই দোষ দেখিয়েছেন। কারণ এর কোনটি দিয়েই বেদের গ্রন্থপাঠ ও অর্থবোধ এই উভয়রূপ বিদ্যায় প্রাবীণ্যলাভ সম্ভবপর হয় না।—

উভয়োরপি গ্রন্থার্থতো বেদজ্ঞানং নাস্ত্যেব।

হলায়ুধের মতে বেদাধ্যয়নকালে মন্ত্রের আবৃত্তি ও অর্থবোধ উভয়ই আবশ্যক। শ্রুতিতে যে বেদাধ্যয়নের বিধান আছে, তার তাৎপর্যই এই যে, বেদমন্ত্র কণ্ঠস্থ করতে হবে, তার পর মন্ত্রার্থও বুঝতে হবে।—

বেদাধ্যয়নবিধের্বেদাধ্যয়নানন্তরং বেদমন্ত্রার্থজ্ঞানে হি তাৎপর্যম্।

হলায়ুধের মন্তব্য থেকে মনে হয় যে, তাঁর সমসাময়িক বাংলা দেশে বেদবিদ্যার যথাবিধি অনুশীলন মন্দীভূত হয়ে আসছিল। সেই জন্যেই হলায়ুধ ব্রাহ্মণসর্বস্ব রচনা করে প্রচলিত অধ্যয়নপ্রথার সংস্কারে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

ব্রাহ্মণসর্বস্ব রচনার পর অল্পকালের মধ্যেই হলায়ুধের পাণ্ডিত্যখ্যাতি বাংলার বাইরেও বিস্তার লাভ করেছিল। মিথিলার প্রাচীন স্মার্ত শ্রীদত্ত উপাধ্যায় এবং বিখ্যাত নিবন্ধকার রুদ্রদত্ত প্রভৃতি অনেকেই হলায়ুধের গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন এবং উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। পরবর্তী যুগকালেও শূলপাণি, রঘুনন্দন, মিত্রমিশ্র প্রভৃতি দেশ-বিদেশের গ্রন্থকারেরা শ্রদ্ধার সঙ্গে হলায়ুধের নাম করেছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে নেপাল, কাশ্মীর, পুণা, বরোদা, বারাণসী, মিথিলা ও উড়িষ্যার পুঁথিশালায় হলায়ুধরচিত গ্রন্থের প্রতিলিপি আজও সযত্নে রক্ষিত আছে। পঞ্জাবনিবাসী শত্রুঘ্নমিশ্র তাঁর 'মন্ত্রার্থদীপিকা' নামে প্রসিদ্ধ মন্ত্রব্যাখ্যার শেষে অকপটে হলায়ুধের ঋণ স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন—আমি এই গ্রন্থে যে সব বেদার্থ আলোচনা করেছি, সেগুলি হলায়ুধ আর উবটের ভাষ্যে আছে। কিন্তু সে জন্যে আমার নিন্দা করা উচিত নয়। কারণ, রত্নাকরে থাকে রত্ন, যে ব্যক্তি সে রত্ন সংগ্রহ করতে পারে সে হয় ধন্য।—

হলায়ুধেঽমী উবটেঽপি চার্থাস্ততো বিধেয়ো ময়ি নাবলেপঃ। রত্নাকরে কিং মণয়ো ন সন্তি তস্মাৎ সমুদ্ধরতি যঃ স ধন্যঃ॥

শত্রুঘ্ন তাঁর গ্রন্থের প্রায় সমস্ত অংশই হলায়ুধের 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' থেকে নিয়েছেন। সুদূর পঞ্জাবে রচিত শত্রুঘ্নের গ্রন্থে এভাবে স্বীকৃতি পেয়ে হলায়ুধ যে অপূর্ব সম্মান লাভ করেছেন, তা তাঁর ব্যাখ্যাশৈলীর উৎকর্ষের বড় এক প্রমাণ।
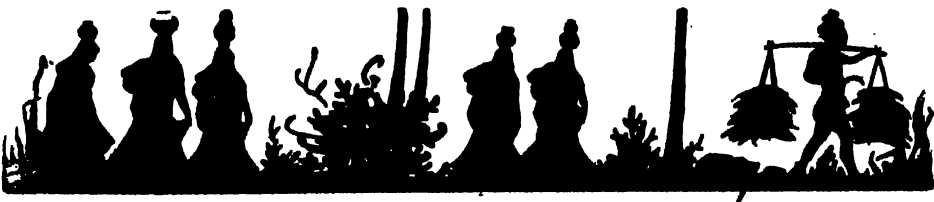
ভগবান তথাগত

শ্রীসলিল মিত্র

ধ্যান-গম্ভীর গিরি পদমূলে তোমার অভ্যুদয়
জ্যোতির্লোকের মহাদূত ধরণীতে—
তব আলোদ্যুতি বিচ্ছুরিত যে বিশাল বিশ্বময়
জরা-ব্যাধি-মরা-সংশয় মুছে দিতে।
রাজার কুমার দয়া-প্রেমে-ত্যাগে ক্ষমায় পূর্ণ প্রাণ
তুচ্ছ প্রাণীর বেদনায় ব্যথাহত—
তারই বিনিময়ে চেয়েছিলে তুমি করিতে রাজ্যদান
স্বার্থ-লালসা হ'ল তব পদানত।
মানুষ আসিল পৃথিবীর বুকে, তারো মাঝে জ্বালা এত?
জরা-ব্যাধি আর শোকেতে মুহ্যমান!
একদিন তার মনের বীণাটি স্তব্ধ, জীবন মৃত—
অপূর্ণতাতে জীবনের অবসান?
সিদ্ধার্থের তরুণ মনেতে ব্যথার করুণ ছায়া:
এ কি এ নিয়ম বিশ্ব বিধাতৃর?
আসা-যাওয়া এই জীবনের মাঝে কি বিশাল মোহ-মায়া—
জীবন কি মিছে তম-ঘন রাত্রির?
হঠাৎ কুমার পেল আশা বুকে, মিলিল সে নব পথ—
যে পথের দিকে চলেন সর্বত্যাগী,
জীবন-মৃত্যু তাহারি মাঝারে দেবে না সে দাসখত্
মায়া-সংসার ত্যাজি হবে বৈরাগী।
রাত্রি-নিশীথ, নিদ্রিতা গোপা, কোলের কাছেতে শিশু
গৌতম-মন ছুটে যায় অজানাতে—
জীবন চলেছে ত্যাগের খাতায় নাম করে দিতে 'ইসু'—
তবু কেন জানি জল জমে আঁখিপাতে!
এত ভালবাসা, রাজ্যৈশ্বর্য, আপন সৃষ্টিখানি
ফেলে যেতে হবে, মুছে যেতে হবে মায়া!
বারে বারে ডাকে সুদূরের সেই ধ্যান-মুখরিত বাণী,
স্বার্থলিপ্সা? সেতো কায়াহীন ছায়া!
জগতের মাঝে আনিতে শান্তি, আনিতে অমৃতধারা—
রাজার কুমার ভিখারীর বেশ পরি'

চলেন অজানা পন্থার টানে হইয়া আপনহারা—
সর্বস্বার্থ, মায়া-মোহ ত্যাগ করি!
কত সাধু এল, কত জ্ঞানী গেল—পারিল না বলে দিতে
প্রকৃত শান্তি কোথায় মিলিতে পারে;
চিন্তামগ্ন গৌতম-মন, 'এই বিশ্বের হিতে
কেমনে অর্ঘ দিতে পারি আপনারে!'
গয়ার সে বোধিবৃক্ষের মূলে ধ্যান-গম্ভীর প্রাণ
অনাহারে হয় ক্লিষ্ট, ক্ষীণ হিয়া—
সুজাতা আনিল আহার্য কিছু সাধুরে করিতে দান,—
তৃপ্ত—সেটুকু গৌতম মুখে দিয়া।
'কে গো তুমি নারী, জানালে আমারে জীর্ণ শীর্ণ মন
পারে না লভিতে সত্যের দর্শন?
মম সাধনার সফলতা লাগি তব এই আয়োজন!
এ কি মা তোমার অন্তর-দর্পণ!'
মনের গ্লানিরে দূরীভূত করি গৌতম অবশেষে
শান্তি লভিয়া পেলেন যে নির্বাণ,
সে মহাতীর্থে দেখিল বিশ্ব-মানব বুদ্ধ বেশে—
তাঁর মহাজ্যোতি উজ্জ্বল অনির্বাণ।
'হে মানুষ, তুমি কোন জীব প্রতি কভু না হিংসা কোরো
দয়া কর সবে, অন্তরে ভালোবাসো—
মনের যতেক বিদ্বেষ-বিষ ভেদাভেদ দূর কর,
নির্বাণ লভি' যত অশান্তি নাশো!'
অহিংসা-বাণী সত্যের বাণী হে ত্যাগী রাজকুমার—
মানবের রূপে দিয়ে গেলে কৃপা করি।'
আজি বিকৃত যুগে বলো হায় কে লবে কর্মভার?
আদর্শ তব গিয়েছি যে বিস্মরি'!
হে মহামানব সর্বত্যাগী মহান আত্মা তব
হিংসা-ক্ষুব্ধ মানুষে দেখাক্ পথ:
জাগাক্ চেতনা, অহিংসা-প্রেম—যুগ এক অভিনব;
লভুক পৃথিবী সুমহৎ সম্পদ।

'নমি নরদেবতারে'

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

মার্কিন কবি হুইট্‌ম্যান সেরা শহরের কতকগুলি লক্ষণের কথা বলেছেন। এই লক্ষণগুলির প্রথম হচ্ছে: সেরা শহর কবিদের প্রাণের প্রিয় আর বিনিময়ে ঐ শহর কবিদের ভালবাসে এবং তাঁদের বোঝেও। শব্দের মাধুর্য্যে কবিতা কানের তৃপ্তিসম্পাদন করতে পারলেই উঁচুদরের কবিতা হবে এমন কথা জোর করে বলা যায় না। কবিতাকে উঁচুদরের কবিতা হতে গেলে তার ক্ষমতা থাকা চাই কান এবং প্রাণ—উভয়েরই দাবী মেটাবার। হুইট্‌ম্যানকে যাতে আমরা ভুল না বুঝি তার জন্যে এখানে উল্লেখ থাকা ভাল, মার্কিন কবির মতে যেখানে কতকগুলি পর্ণকুটিরের সমষ্টি তাও সেরা শহরের গৌরব লাভ করবে যদি সেখানে সেরা সেরা নারীর এবং পুরুষের বসতি থাকে। সেরা শহরে গগনচুম্বী অট্টালিকার প্রাচুর্য্য থাকতে হবে এমন কোন কথা নেই।

একজন বড় কবিকে ভাল করে জানার উপরে এতটা জোর দেবার কি কারণ থাকতে পারে? মনুষ্যত্বের মহিমায় জীবনকে মহৎ করতে হলে কবিকে বুঝবার প্রয়োজন কেন? প্রয়োজন আছে। কবি সে আদর্শের পতাকা-বাহী! শুধু কথার মালা গেঁথে জনতার করতালি নেবার জন্যে ত তাঁর আবির্ভাব নয়। তিনি চলেছেন সকলের পুরোভাগে বাঁশী বাজিয়ে। বাঁশিওয়ালাদের পিছু পিছু চলতে মানুষ চিরকালই ভালবাসে। উপনিষদ, গীতা, বাইবেল এতকালেও পুরানো হ'ল না—কাব্যের ভাষায় রচিত বলে। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের কাছে এই সব ধর্ম্মগ্রন্থ নিত্যপাঠ্য হয়ে আছে কারণ ভাষায় ছন্দ রয়েছে, কবিত্ব রয়েছে। নইলে তারা পণ্ডিতমণ্ডলীর গবেষণার বস্তু হয়ে থাকত। কবি শুধু বাঁশী বাজিয়েই চলেছেন, তা নয়। সেই বাঁশীর সুরের মধ্যে এমনকিছু আছে যা আমাদের কানের ভিতর দিয়ে একেবারে মর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করে আর তাতে আমাদের মনপ্রাণ আকুল হয়ে ওঠে। প্রাণে আকুলতা না এলে সুখ-সম্পাদ-মায়া-মমতার বন্ধন ছিঁড়ে আমরা কি কোন বড় কাজের মধ্যে ঝাঁপ দিতে পারি? কেবল শুষ্ক কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে মানুষ কখন তার আসক্তি জয় করতে পারে? পৃথিবীতে যাঁরা কর্ম্মবীর বলে পরিচিত তাঁদের জীবনের উপরে কবিদের প্রভাবের কথা আমরা কখন ভেবে দেখেছি কি? ভেবেছি কি—ডেভিডের বীণাতে ছিল সললের প্রাণের আরাম, সান্ত্বনার উৎস? সেক্‌স্‌পীয়ারের আর বার্ণসের কবিতা এব্রাহাম লিঙ্কনের কত নিঃসঙ্গ তমসাচ্ছন্ন মুহূর্ত্তকে জ্যোতির্ম্ময় করে তুলেছে? বাইরণের কবিতা ম্যাজিনিকে প্রেরণা জুগিয়েছে? মহাদেব দেশাইয়ের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতগুলি গান্ধীর ভারাক্রান্ত হৃদয়ের অবসাদ ঘুচিয়ে দিয়েছে? যাঁরা বলেন বর্ত্তমান পৃথিবীর পুরোহিতেরা হচ্ছেন ইঞ্জিনীয়াররা আর ইঞ্জিনীয়ারদের যুগে কবিদের কোন স্থান নেই, তাঁদের বুদ্ধির খুব তারিফ করতে পারি নে। কেবল টেক্‌নলজির অলিগলিতে ঘুরে বেড়ালাম, সোক্রাতেস্‌, ভোল্‌টেয়ার, সেক্‌সপীয়ার, রবীন্দ্রনাথ, খ্রীষ্ট, গান্ধী, বুদ্ধ—এঁদের সঙ্গে তেমন পরিচয় হ'ল না,—তবে ত আস্ত মানুষ হব না, টুক্‌রো মানুষ হয়ে থাকব। আর টুক্‌রো মানুষের দাম কি? কিন্তু ভাবাবেগ সরবরাহ করা ছাড়া কবিদের আর একটা মহৎ কাজ আছে। এই কাজটি হোল আইডিয়া ছড়ান। কি সেই মহান্ আইডিয়া যার পতাকা বহন করে কবিরা চলেছেন সকলের পুরোভাগে? মার্কিন কবির ভাষায় এই আইডিয়াটি হ'ল the idea of free and perfect individuals.

এই পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষেরই জগতকে এমন-কিছু দেবার আছে যা দেওয়া অন্য কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। সে কথা ইংরেজ মনীষী চেস্টারটন্ (Chesterton) বলেছেন 'ব্রাউনিং'-এর জীবনীতে: Everyone on this earth should believe amid whatever madness or moral failure, that his life and temperament have some object on this earth. সমস্ত পাগলামির, সমস্ত নৈতিক ব্যর্থতার মধ্যেও প্রত্যেক মানুষেরই বিশ্বাস করা উচিত, এই পৃথিবীতে সে জন্মেছে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যকে সার্থক করবার জন্যে। চেস্টারটন্ ঠিকই বলেছেন: The crimes of the devil who thinks himself of immeasurable value are as nothing to the crimes of the devil who thinks himself of no value. যে শয়তান মনে করে অপরিমেয় তার মূল্য-অহঙ্কারে সে অপরাধী। কিন্তু যে

শয়তান নিজেকে কোন মূল্যই দেয় না সে আরও কত বেশী অপরাধী।

প্রত্যেক ব্যক্তিত্বের মধ্যেই এমন-কিছু আছে যা অনুপম ; you are forever you and I, I. আমাদের চলার পথগুলিও এক নয়। প্রত্যেক পথেরই একটা নিজস্ব অভিজ্ঞতা আছে, আছে একটা স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গিমা। সমস্ত শিক্ষার উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষের মধ্যে সেই বোধটাকে দৃঢ় করা যাতে সে বুঝতে পারে তার নিজের ব্যক্তিত্বের যেমন একটি পরম মূল্য আছে, অন্যদেরও ব্যক্তিত্বের তেমনি একটা পরম মূল্য আছে। মহৎ হতে হবে আমাকে, মহৎ হতে হবে তোমাকে, মহৎ হতে হবে জাতিধর্ম-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেককেই।

প্রত্যেক মানুষেরই ব্যক্তিত্বের মধ্যে এই যে একটি অনুপম মহিমা রয়েছে—এই মহিমারই স্বীকৃতি রবীন্দ্র-সাহিত্যের সর্ব্বত্র। এই যে 'sacredness of the personalities of individual human beings (ঐতিহাসিক টয়েনবীর ভাষায়)—এই ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি-তেই ত স্বাধীনতার ভিত্তি। জীবন ত অজানার পানে একটা অভিযান। নিজস্ব পথে জীবনের এই অভিযানকে পরিচালিত করবার অধিকার আছে প্রত্যেকের। এই স্বাধীনতা সমস্ত কল্যাণের উৎস। যেখানে এই স্বাধীনতা নেই সেখানে কর্ত্তব্য অর্থশূন্য, আত্মোৎসর্গের কোন মূল্য নেই, কর্তৃত্বের দোহাই দেওয়ার কোন মানে হয় না। রামরাজ্য সৃষ্টি করবার জন্যে মানুষ যে মানুষের সঙ্গে মিলবে সে ত এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে। অন্যান্য মানুষকে এমনভাবে ব্যবহার করব যেন তারা পৃথিবীতে এসেছে আর একজন আত্মসর্ব্বস্ব মানুষের হুকুম তামিল করবার জন্যে—এই আত্মকেন্দ্রিকতার মধ্যে না আছে যুক্তির আলো, না আছে কোন নৈতিক মূল্য। একজন মানুষকে আর একজন মানুষ কেন ব্যবহার করতে পারে না নিজস্ব প্রয়োজনসিদ্ধির তাগিদে? কারণ মানুষকে ভগবান আদরে তৈরি করেছেন তাঁর নিজেরই প্রয়োজনে। এই বিরাট সত্যটিকে কত রকম করে, কত বিচিত্র ভঙ্গিমায় রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন।

আমায় দেখবে বলে তোমার অসীম কৌতূহল!
নইলে তোমার সূর্য্যতারা সকলি নিষ্ফল! (বলাকা)

আকাশে আকাশে এত যে সূর্য্যতারার বেলোয়ারী ঝাড়-লণ্ঠন ঝুলিয়ে দিলে—সে ত আমাকেই দেখবার প্রবল আগ্রহে!

যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা
আপনাকে ত হয়নি তোমার দেখা।

× × ×

আমি এলেম, ভাঙলো তোমার ঘুম,
শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দকুসুম। (বলাকা)

'যোগাযোগ' উপন্যাসের মধ্যে বিপ্রদাস বলেছেন মোতির মাকে :

"আমি তোমাকে ব'লে দিচ্চি কুমুকে যিনি গ'ড়েচেন তিনি আগাগোড়া পরম শ্রদ্ধা ক'রে গ'ড়েচেন। কুমুকে অবজ্ঞা করে এমন যোগ্যতা কারো নেই, চক্রবর্ত্তী সম্রাটেরও না।"

এই মূল্যবান কথাগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শনের একটি মূলগত তত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। পুরুষ এবং নারী উভয়কেই বিধাতা আগাগোড়া পরম শ্রদ্ধা করে গড়েছেন। কেন গড়েছেন? মানুষকে তাঁর প্রয়োজন আছে বলে। কি প্রয়োজন? ঈশ্বরের স্বর্গ রচনার প্রয়োজন।

দিয়েছ আমার পরে ভার
তোমার স্বর্গটি রচিবার।

তাঁর স্বর্গরাজ্য রচনার ভার একমাত্র মানুষই পেয়েছে। এ গৌরব সৃষ্টিতে আর কারো নয়, একমাত্র মানুষেরই। ভগবান মানুষকে এই যে সম্মান দিয়ে গৌরবান্বিত করলেন এই সম্মানে কারও হস্তক্ষেপই বরদাস্ত করা চলে না। 'যোগাযোগ' উপন্যাসে কুমু তাই বলেছে দাদা বিপ্রদাসকে : 'এমন কিছু আছে, যা ছেলের জন্যেও খোওয়ানো যায় না।' এই এমন-কিছু হচ্ছে সম্মান। সম্মানের হানি ঘটতে দিলে যে ঈশ্বরকেই অসম্মান করা হয়।

'তুমি যা দিয়েছ মোরে অধিকার ভার
তাহা কেড়ে নিতে দিলে অমান্য তোমার।'
(নৈবেদ্য, রবীন্দ্রনাথ)

কেউ যদি অবজ্ঞাভরে আমার সম্মানের উপরে পদক্ষেপ করে

'তারে যেন দণ্ড দিই দেবদ্রোহী ব'লে
সর্ব্বশক্তি ল'য়ে মোর।'

মানুষকে যে অপমান করে—রবীন্দ্রনাথ তাকে দেবদ্রোহী বলেছেন। শুধু দেবদ্রোহী বলেই ক্ষান্ত থাকেন নি, দেবদ্রোহীকে সমস্ত শক্তি দিয়ে দণ্ড দিতে বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন ব্রাউনিং-এর মতই প্রতিটি মানুষকে ভগবান এমন যে আলাদা আলাদা করে তৈরি করেছেন তার একটা নিগূঢ় অর্থ আছে। প্রত্যেককে পৃথিবীতে তিনি পাঠিয়েছেন একটা বিশেষ বাণী দিয়ে যে বাণী পৃথিবীর আর কারও জন্যে নয়। এই বাণীকে

জীবনে যদি সত্য করে তোলা না যায় তবে জীবনের আর কোন সার্থকতা থাকে না। সমস্ত জীবনটাই একটা মিথ্যা হয়ে যায়। তাই অর্থের অহঙ্কারে যোগাযোগের মধুসূদন ঘোষাল যখন স্ত্রী কুমুকে করে রাখতে চাইল খেলাঘরের পুতুল, তার অনুপম ব্যক্তিত্বের প্রকাশকে চাইল অবগুণ্ঠিত করে রাখতে, তখন ঐশ্বর্য্যের সেই দম্ভের কাছে মাথা নোয়াতে কুমু দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করেছে। দাদা বিপ্রদাসকে বলছে কুমু:

"কিন্তু একদিন ওদেরকে মুক্তি দেব, আমিও মুক্তি নেব; চলে আসবোই এ তুমি দেখে নিও। মিথ্যে হয়ে মিথ্যের মধ্যে থাকতে পারবো না। আমি ওদের বড় বৌ, তার কি কোন মানে আছে যদি আমি কুমু না হই!"

মিথ্যে হয়ে মিথ্যের মধ্যে থাকতে কুমুর এই যে দৃঢ় অস্বীকৃতি—এ অস্বীকৃতি রবীন্দ্রনাথের পরিপূর্ণ সমর্থন লাভ করেছে। 'স্ত্রীর পত্র' নামক বিখ্যাত গল্পটিতেও বাড়ীর মেজ বৌ দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছে সম্মানকে বলি দিতে। আত্মঘাতিনী বিন্দু মেজ-বৌ মৃণালের আচ্ছন্ন চৈতন্যকে উদ্বোধিত করল। সেই চৈতন্যের আলোয় মৃণাল আবিষ্কার করল, নারী ও পুরুষের মতই বিধাতার হাতের আদরের সৃষ্টি আর পৃথিবীতে তার গৌরব রাখবার জায়গা নেই। নিজের ব্যক্তিত্বের এই অনুপম মহিমার আবিষ্কার মেজ-বৌকে দাসত্বের বন্ধনকে ছিন্ন করবার প্রেরণা দিয়েছে। সে অস্বীকার করেছে স্বামীর ঘরে পুতুল হয়ে থাকতে। যে সংসারে তার মতামতের কোন মূল্যই নেই, একজন সহায়সম্বলহীনা স্নেহের পাত্রীকে পাগল স্বামীর হাত থেকে রক্ষা করবার তার কোন শক্তিই নেই, সেই সংসারে সে মিথ্যে হয়ে থাকবে কেন? তাই মৃণাল অর্থাৎ মেজ-বৌ শেষ পর্য্যন্ত অপমানের মধ্যে স্বামীর সংসার করতে অস্বীকার করেছে। স্বামীকে পত্রে লিখেছে:

"কিন্তু আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না। আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয়টা যে কি তা আমি পেয়েছি। আর আমার দরকার নেই।"

রবীন্দ্রসাহিত্যের সর্ব্বত্র ক্ষমতার ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে এই যে বিদ্রোহের ডমরুধ্বনি—এর মধ্যে রয়েছে একটা গভীর অধ্যাত্মচেতনা। ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তাঁর ইচ্ছা মানুষের জীবনে পূর্ণ হয়। 'তোমারি ইচ্ছা করহে পূর্ণ আমার জীবন মাঝে।' কি তাঁর অনুশাসন? সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রেই একবাক্যে বিঘোষিত হয়েছে: ঈশ্বরের প্রথম অনুশাসন তাঁকে সমস্ত চিত্ত, সমস্ত আত্মা, সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসা, আর দ্বিতীয় অনুশাসন প্রতিবেশীকে আত্মবৎ ভালবাসা। এই সত্য হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রেরও মূল কথা। বাইবেলে খ্রীষ্ট বলছেন: Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul and with all thy mind.

This is the first and great commandment.

And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself.

অপমানকে অবিচারকে ভয়ে নিত্য সহ্য করলে তাঁর আদেশপালনে আর উৎসাহ থাকে না। তাঁর আদেশ হচ্ছে মানুষকে আত্মবৎ ভালবাসা। ভালবাসা ত ভাবের একটা উচ্ছ্বাস মাত্র নয়। ভালবাসা মানে যাকে ভালবাসি তার জন্যে অশেষ দুঃখকে বরণ করা; ঘরে বসে হাহুতাশ করায় আর যা কিছুর পরিচয় থাক ভালবাসার কোন পরিচয় নেই। আর মানুষকে যে ভালবাসে সে ত মানুষের প্রতি অন্যায়কে চুপ করে সহ্য করবে না, স্বার্থোদ্ধত অবিচারের সম্মুখে উদাসীন থাকবে না। তার কাছে সর্ব্বভূতে দয়া, সর্ব্বভূতে আত্মোপলব্ধি কেবল মতবাদ নয়, কেবল কাব্যকথা নয়: জীবনের মধ্যে তাদেরকে সত্য করে তোলবার জন্যে ভগবানের অনুশাসন। অন্যায়কে নিঃশব্দে সহ্য করলে মানুষের প্রতি প্রেমকেই অস্বীকার করা হয় আর যিনি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ তাঁকে যদি সকলের মধ্যে বোধের দ্বারা অনুভব না করি তবে ঈশ্বরকে ভালবাসার কোন মানে হয় না। এই অধ্যাত্মচেতনার প্রেরণা রয়েছে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত বিপ্লবাত্মক চিন্তাধারার পিছনে।

ত্রাসে লাজে নতশিরে নিত্যনিরবধি
অপমান অবিচার সহ্য করে যদি
তবে সেই দীনপ্রাণে তব সত্য হায়
দণ্ডে দণ্ডে ম্লান হয়! দুর্ব্বল আত্মায়
তোমারে ধরিতে নারে দৃঢ়নিষ্ঠাভরে;
ক্ষীণপ্রাণ তোমারেও ক্ষুদ্রক্ষীণ করে
আপনার মত,—যত আদেশ তোমার
পড়ে থাকে,—আবেশে দিবস কাটে তার!

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত চিন্তাধারার এবং কর্ম্মধারার মর্ম্মে রয়েছে ব্যক্তির এবং ব্যক্তির অধিকারের প্রতি একটা নূতনতর শ্রদ্ধা যাকে ইংরেজ মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন: That new respect for the individual and his rights. মানুষ রবীন্দ্রনাথের কাছে কেবলমাত্র মানুষ নয়; নর তাঁর কাছে দেখা দিয়েছে নর-দেবতারূপে। 'হেথায় দাঁড়ায়ে দু-বাহু বাড়ায়ে নমি নর-দেবতারে!' আত্মপরিচয়ের মধ্যে আছে:

"আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে—এখানে সর্বদেশ সর্বজাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নর-দেবতা—তাঁরই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহঙ্কার আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।"

সর্ব্বজাতির, সর্ব্বদেশের, সর্ব্বকালের মানুষের জীবনকে এমন করে শ্রদ্ধা করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়েছে:

এসো হে আর্য্য, এসো অনার্য্য,
হিন্দু মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ,
এসো এসো খৃষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন
ধর হাত সবাকার,
এসো হে পতিত, হোক অপনীত
সব অপমানভার।

'মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান' রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করেছে। নর-দেবতার এই অসম্মানকে জীবনের কোনক্ষেত্রেই তিনি সহ্য করেন নি। 'রক্তকরবী'তে যক্ষপুরীর রাজার জীবনব্রত হচ্ছে সোনার তাল জমানো; 'সোনার তালের তাল-বেতালকে বাঁধতে পারলে' পৃথিবী আসে মুঠোর মধ্যে। সোনার লোভে মানুষ খেয়ে ফুলে উঠতে রাজার মনে কোন কুণ্ঠা নেই। গাঁয়ের মানুষদের জীবনগুলিকে ছাই করে দিয়ে রাজার জীবন জলছে শিখার মতো। যক্ষপুরীতে শ্রমিকেরা আশাহীন আলোহীন জঠরের মধ্যে গেছে তলিয়ে আর তারা সবাই 'টুকরো মানুষ' অর্থাৎ কেবল সংখ্যা। তারা যন্ত্রের সামিল। কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম করে চলেছে। কাজে তাদের না আছে স্বাধীনতা, না আছে আনন্দ। তারা 'রাজার এঁটো'। 'মাংস-মজ্জা মনপ্রাণ' সব হারিয়ে ফেলেছে। নিজের প্রয়োজনসিদ্ধির তাগিদে একদল মানুষ আর একদল মানুষকে ব্যবহার করবে গবাদি পশুর মতো—এই আত্মকেন্দ্রিকতার ঔদ্ধত্য রবীন্দ্র সাহিত্যে কোথাও ক্ষমা পায় নি। নন্দিনী যক্ষপুরীতে এনেছে লড়াইয়ের হাওয়া। দাসত্বের গ্লানির মধ্যে অবিচলিত ছিল যারা তারা ধৈর্য্য হারিয়েছে। সমস্ত শক্তি দিয়ে নন্দিনী আরম্ভ করেছে রাজার বিরুদ্ধে লড়াই। তার অন্তে 'মৃত্যু'। রাজা শেষ পর্য্যন্ত পরাজয় স্বীকার করেছে। মানুষের অন্তরের মধ্যে অনন্তের জন্যে যে পিপাসা রয়েছে, 'দূরের পাওনাকে নিয়ে আকাঙ্খার যে দুঃখ' রয়েছে—তারই হয়েছে জয়। সবার থেকে হরণ করে রেখে নিজেকে সে বঞ্চিত করে রেখেছিল—সকলের সঙ্গে যোগে এই রাজার জীবন শেষ পর্য্যন্ত হয়েছে সার্থক।

'মুক্তধারা' নাটকেও আত্মকেন্দ্রিক রাজার ক্ষমতার ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের একই সুর। উত্তরকূটের রাজার ইচ্ছায় 'মুক্তধারা'র জলধারাকে বাঁধা হয়েছে শিবতরাইয়ের প্রজাদের বশে রাখবার জন্যে। মুক্তধারার স্রোত শিবতরাইয়ের প্রজাদের চাষের ক্ষেতে করে জলসেচন। শত্রুদমনের জন্যে রাজা সেই মুক্ত জলকে বন্ধ করে দিয়েছেন যন্ত্ররাজ বিভূতিকে সহায় করে। যুবরাজ অভিজিতের অন্তরে স্বাধীনতার জন্য অনুরাগ, উৎপীড়িতের জন্যে বেদনাবোধ। তার হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা: 'জন্মকালের ঋণ শোধ করতে হবে। স্রোতের পথ আমার ধাত্রী, তার বন্ধন মোচন করবো।' শেষ পর্য্যন্ত যুবরাজ 'মুক্তধারা'র বাঁধ ভেঙে দিয়েছেন যন্ত্রাসুরকে নিদারুণ আঘাত হেনে। যন্ত্রাসুরও আঘাত দিল ফিরিয়ে। 'মুক্তধারা' যুবরাজের আহত দেহকে মায়ের মত কোলে তুলে নিয়ে চলে গেল।

'মুক্তধারা' নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগী পাড়ায় পাড়ায় প্রজাদের ক্ষেপিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে—কারণ রাজা প্রজাদের উদ্বৃত্ত অন্নে নয়, ক্ষুধার অন্নে হাত দিতে উদ্যত হয়েছেন। 'মুক্তধারা'য় যন্ত্রকে রবীন্দ্রনাথ অসুর বলেছেন: কারণ যন্ত্ররাজ বিভূতি বালি-পাথর-জলের ষড়যন্ত্র ভেদ করে মানুষের বুদ্ধিকে জয়ী করতে চেয়েছে। কোন্ চাষীর কোন্ ভুট্টার ক্ষেত মারা যাবে সে কথা ভাববার সময় ছিল না তার। রবীন্দ্রসাহিত্যে মানুষের জীবনের মূল্য আর সব মূল্যকে ছাড়িয়ে আছে। সেই জীবনকে যা কিছু খর্ব্ব করতে চেয়েছে—সে রাজশক্তির অথবা পৌরোহিত্যের শক্তির ঔদ্ধত্যই হোক তার যন্ত্রশক্তির স্পর্দ্ধাই হোক—তাকে রবীন্দ্রনাথ মার্জ্জনা করেন নি কখনও। 'টেক্‌নলজি' যদি মানুষের জীবনকে মূল্য না দেয়—রবীন্দ্রনাথের কাছে তার মূল্য কাণাকড়িও নয়।

রামকৃষ্ণের জীবনীতে রলাঁ ঠাকুর সম্পর্কে লিখেছেন:

For, since Divinity is inherent in every man, every life for him was a religion, and should so become for all. And the more we love mankind, however diverse, the nearer we are to God.

এ কথা যেমন রামকৃষ্ণ সম্পর্কে প্রযোজ্য রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও সমভাবেও প্রযোজ্য। 'রুদ্ধদ্বার দেবালয়ের কোণে কাহারে তুই পূজিস্ সঙ্গোপনে?' নবযুগের

সামনে এই প্রশ্নই রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁকে দরকার নেই মন্দিরে খুঁজবার। তিনি রৌদ্রে জলে সকলের সঙ্গে রয়েছেন, 'ধূলি তাঁহার লেগেছে দুই হাতে।' তিনি আমাদের ভাই, আমাদের বন্ধু, আত্মার আত্মীয়। মানুষের মধ্যে 'দেবতার অমর মহিমা' দেখবার এই যে দৃষ্টি—এই দৃষ্টি থেকেই না রবীন্দ্রসাহিত্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠতার সৃষ্টি? রবীন্দ্রসাহিত্যের সর্ব্বত্রই মানুষের প্রতি এই শ্রদ্ধার বিকীরণ! আর এই জন্যেই রবীন্দ্রসাহিত্যের মুকুরে আমরা প্রতিবিম্বিত দেখি আমাদেরই বৃহত্তর সত্তাকে। ঐ সাহিত্য আমাদের মধ্যে জাগায় নূতনতর 'মনুষ্য মর্য্যাদা গর্ব্ব'কে, নূতনতর আত্মসম্মানবোধকে রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে আমরা কি অনুভব করি না আমাদেরই সুপ্ত আত্মার মহাজাগরণের আনন্দকে? অনুভব করি না এক নূতনতর শক্তির উৎসধারাকে?

পঁচিশে বৈশাখ

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

শতাব্দীর পদশব্দ ওই হোলো শেষ
লেখা হোলো নভ-পটে এ শব্দ অশেষ
অনাগত শতাব্দীর নৃত্য-ছন্দ এর সুরে বাঁধা।
তুমি কবি চেয়েছিলে বসন্তের মঞ্জু সুর সাধা
—একটি শতাব্দী শেষে।

দক্ষিণের দ্বার খুলি কিছুক্ষণ
প্রান্তরের প্রান্তপারে কান পাতি শুনিবারে তব গুঞ্জরণ।

সিন্ধু-ছোঁয়া দক্ষিণ অনিল
শ্যামলে নিখিলে আজো ঘটাইল মিল।

কুঞ্জে পুষ্পে প্রাণব উৎসবে
রেণু মাখা মধুপ গুঞ্জনে
মুহুর্মুহু বিহগের রবে
বনানীর দৈন্য ভার করি দিল নিমেষে মার্জনা
বিশ্বরসে মন্দ্রিল গম্ভীর সুন্দরের অপূর্ব বন্দনা।

মানুষের মনে কই অফুরন্ত জীবন ইঙ্গিত
দ্বারে তার নাহি বাজে ফাগুনের উদার সঙ্গীত।

যে বিশ্ব বিরচি গেলে,—তার পথ রেখা,
যে জ্যোতিষ্ক-রশ্মি জালে লেখা,

—তার অন্বেষণ
কোথা পাব! কোথা হায় আমাদের তৃতীয় নয়ন।

পঁচিশে বৈশাখ
বারে বারে পাঠাইবে ডাক এ মর্ত্তলোকে।
একটি করবী-গুচ্ছ কম্প্র-করে নিয়া
নম্র নতমুখে
যদি কোন আনন্দিত উৎসুক আনন্দে
ডেকে বলে,—চিত্তে স্মরিলাম
হে অনন্ত অসীম বিস্ময়—তোমারে প্রণাম।

—জানি তবে
জীবনের মহত্তম একটি উৎসবে
সে দিয়েছে সাড়া
সে পেয়েছে চিত্তলোকে অমর্ত্তের অমৃত ইসারা।

ভোলানাথ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

কাশী পৌঁছলাম বেলা একটায়। তুন এক্সপ্রেস লেট ছিল দু' ঘণ্টা। আমাদের কর্মসচিব মণিদা আসবার সময় একখানা পরিচয়পত্র দিয়েছিলেন। তাতে যে লোকটির নাম-ঠিকানা লেখা ছিল—তিনি জন্মাবধি নাকি কাশীবাসী। একজন নামী সমাজ-সেবকও। সুতরাং অপরিচিত শহর হলেও অকূল সমুদ্রে পড়ব না—এ ভরসা ছিল।

পরিচয়পত্রখানি হাতে দিয়ে মণিদা বলেছিলেন, এক-ডাকে সবাই যাঁকে জানে—তাঁর কাছেই পাঠাচ্ছি তোমায়। সমাজ-সেবার কতকগুলি অচলিত বিধি আছে—যা প্রথামাফিক নিয়মকানুনের আওতায় আসে না, অথচ সেগুলির সঙ্গে পরিচয় না থাকলে কাজের অসুবিধা ঘটে। শুনেছি এ বিষয়ে ওঁর অভিজ্ঞতা প্রচুর। সেই কারণেই ওঁর প্রতিষ্ঠানের অত সুনাম, উনিও লোকমান্য।

ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম মনে মনে। বলেছিলাম, অচলিত কানুনে আমাদের কি প্রয়োজন? ধনসাম্যবাদের মূল কথাটা আর তার প্রয়োগবিধি ঠিক মত জানলেই ত যথেষ্ট। আমাদের স্কুলের শিক্ষাটা তাহলে কি অসম্পূর্ণ?

হেসে জবাব দিয়েছিলেন মণিদা, না রে পাগল, অসম্পূর্ণ হবে কেন! বরং তা যুগোপযোগী এবং নিখুঁত। তবু ভারতবর্ষের মাটি আর মানুষের সঙ্গে সহজবোধ সম্বন্ধটা গড়ে তুলতে হলে এর ঐতিহ্যকে বাদ দেওয়া চলবে না ত। বৈচিত্র হিসাবেও সেটা পরখ করতে দোষ কি? যদি ভাল না-ই লাগে নেবে না, নতুন দেশ বেড়ানো হবে—পরিচয় হবে নতুন মানুষের সঙ্গে।

আর তর্ক তুলি নি। নূতন দেশ আর নূতন মানুষ চিরদিনই আমার চোখকে ভোলায়, মনকে টানে। ওদের সান্নিধ্যে প্রচুর আনন্দ উপভোগ করে থাকি।

অথচ আশ্চর্য্য, এমন যে এক-ডাকের মানুষ শঙ্কর শর্ম্মা, তাঁকে খুঁজে বা'র করতে পুরো একটি দিন লাগল। বারাণসী সমুদ্র বিশেষই। এখানে বাড়ীঘরের যেমন কূল-কিনারা করা যায় না—তেমনি গলির খেই ধরে ধরে পরিচয়ের ভূমিতে পৌঁছানোই কঠিন। একটি হোটেলে উঠে সে চেষ্টা করেছিলাম। হোটেলটি নতুন, ম্যানেজার বিদেশী যাত্রীরাও নব আগন্তুক; এঁরা কেউ সমাজ-সেবক শঙ্কর শর্ম্মার ঠিকানা বলতে পারলেন না। একটি দিন বৃথাই গেল।

পরের দিন সকালে দশাশ্বমেধ ঘাটে এক বৃদ্ধের সঙ্গে আলাপ হ'ল। কথায় কথায় জানলাম—উনি কাশীরই বাসিন্দা—'বার্দ্ধক্যের বারাণসী' হিসাবে এই তীর্থভূমিকে আশ্রয় করেন নি।

প্রথম আলাপেই বললেন, নতুন জায়গা কেমন লাগছে? কি বিশেষত্ব এর দেখছেন?

স্বীকার করলাম, কয়েকটি বিশেষত্ব এ শহরের আছে। এখানে চলতে গেলেই সিঁড়ি, পথ খুঁজতে গেলেই গলির গোলকধাঁধা আর পথে গেরুয়া রঙের ছড়াছড়ি। আবার গঙ্গার ধার সবটাই বাঁধানো। পাথর-বাঁধানো ঘাট ধরে ধরে কাশীর এ-মুড় ও-মুড় ঘুরে বেড়ালেও কোন কষ্ট হবে না। বরং এইটিই সহজ এবং আনন্দজনক।

শেষের কথাগুলি বললেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। বললেন, ওই যে দেখছেন মালবীয় সেতু—ওর কোলেই রাজঘাট। ওটা উত্তর দিক, আর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বাঁক নিয়ে শেষ ঘাট অসি। শঙ্কর শর্ম্মাকে খুঁজতে হলে অতদূর যেতে হবে না। এই দশাশ্বমেধের ডান দিক থেকে আরম্ভ করুন। সূর্য্যদেব যেমন এগিয়ে যাচ্ছেন দক্ষিণের পথ ধরে, আপনিও তেমনি এগিয়ে যাবেন—ঘাটের পথ ধরে। শুনে নিন—প্রথমেই এই হ'ল অহল্যাবাঈ ঘাট, তার পর মুন্সীঘাট, দ্বারভাঙ্গা ঘাট, রাণামহল ঘাট, চৌষট্টি ঘাট, পাঁড়ে ঘাট, রাজা ঘাট, মানসরোবর ঘাট, মুক্তেশ্বর ঘাট, নারদ ঘাট, কেদার ঘাট, হরিশ্চন্দ্র ঘাট…ব্যস এইখান থেকে একটা চওড়া সোজা রাস্তা পাবেন। সেখানে শুধোবেন, ভাঙ্গি পাড়াটা কোন্ দিকে? ওটা অবশ্য হরিজন কলোনী, কিন্তু হরিজন কথাটার তেমন চল নেই। বেশী দূর যেতে হবে না—বস্তিগুলো দেখলেই মালুম হবে পাড়াটা। ওইখানে আর একবার জিজ্ঞেস করবেন, ভোলানাথবাবু কোথায় থাকেন?

বললাম, ভোলানাথবাবু নয়—শঙ্কর শর্ম্মা।

বৃদ্ধ হেসে বললেন, যার নাম ভাজা চাল—তার নামই মুড়ি। জানেন ত শিবক্ষেত্র কাশী, এখানে শঙ্কর শর্ম্মা

আর ভোলানাথে কোন প্রভেদ নাই। যান—সোজা চলে যান, সকাল সকাল পৌঁছে যাবেন।

এখন গেলে ওঁকে পাব কি?

নিশ্চয়। ভোলানাথেরা সব সময়ে শ্মশানচারী।

ওঁর পরিহাস বুঝতে না পেরে বললাম, সর্ব্বক্ষণই কি উনি ভাঙ্গি পাড়াতেই থাকেন? ওঁর বাড়ীঘর আছে—কাজকর্ম্ম আছে ত।

বৃদ্ধ উচ্চহাস্ত করে উঠলেন। আমি অপ্রতিভ ভাবে মুখ নামাতেই মিষ্ট স্বরে বললেন, না রে ভাই—না, ভোলানাথ যদি গৃহবাসীই হবেন তাহলে ওঁর নামের মাহাত্ম্যটা কি! সর্ব্বক্ষণই উনি ওখানে থাকেন—গেলেই দেখা পাবে।

চললাম, আপনার ঠিকানা?

হেসে বললেন, সে-ও ত গলির গোলকধাঁধা, কাজ কি মিছে ঘোরাঘুরিতে। সকালে প্রাতঃস্নান, অপরাহ্নে ভাগবৎ-কথা শ্রবণ। এই অহল্যাবাঈ ঘাটে গীতাপাঠ করেন এক বাঙালী সাধু, তাঁর আসরেই বসি ঘণ্টাখানেক।

ওঁকে নমস্কার করে ঘাটের পথ ধরলাম।

ঘাটের পথ সোজা বটে, সরল নয়, সমতলও নয়। গঙ্গার ধারে ধারে বিরাট কায়া সব অট্টালিকা—তাদেরই খেয়াল-খুসীমত গড়ে উঠেছে বাঁক-কণ্টকিত পথ। না, বলাটা ঠিক হ'ল না। উত্তরবাহিনী গঙ্গাই অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টন করেছে বারাণসীকে, তাঁরই প্রসাদে প্রাসাদপুরী নিয়েছে কায়া; পথ তৈরী হয়েছে প্রাসাদের উদ্বৃত্ত অংশটুকু নিয়ে। আসলে খেয়াল-খুসীটা হরজটাস্থিতা জাহ্নবীরই—যিনি জ্ঞানমূর্ত্তার সর্ব্বক্ষণ স্থিত রয়েছেন। এ পথে চলতে চলতে বিচিত্ররূপিনী প্রকৃতি মোহাবিষ্ট করে মনকে। নদীর অপর পারে ধূ-ধূ বালুর চর—চর সীমা বনের কজ্জল-রেখা চিহ্নিত। উপরে অন্তহীন আকাশ। বারাণসীর মহিমা যুগ যুগ ধরে বহন করছে—এই গঙ্গার ঘাট—আর পরপারের নিরবয়ব প্রকৃতি।

হরিশ্চন্দ্র ঘাটে পৌঁছে ভোলানাথের ঠিকানা পেয়ে গেলাম, কিন্তু খুসী হ'ল না মন। ঘাটের মহিমা বস্তী কোথায় পাবে—সে জন্ত মনোক্ষুণ্ণ হই নি। আসল মনঃক্ষোভের কারণ—মানুষটি যাঁর কর্ম্মপ্রণালীর বিশেষত্ব অনুধাবন করবার জন্ত আমাদের কর্ম্মসচিব এতদূরে পাঠিয়েছেন আমাকে। এখন বুঝছি, বহুরঞ্জিত জনশ্রুতি ওঁকে যুক্তি-বিভ্রান্ত করেছে।

যেমন সাধারণ পরিবেশ—তেমনি সাধারণ মানুষ। এই পল্লীটি বারাণসীর অন্তর্ভুক্ত না হয়ে বাংলার যে-কোন শহরের একাংশে অবস্থিত হতে পারত। বা একটু ইতর-বিশেষ ঘরের ছাউনিগুলো। পথে ধুলো যত, ধুলো-কাদা মাখা উদোম-গা ছেলেমেয়ের হৈহল্লোরও তত। এক জায়গার পথের উপর দিয়েই বয়ে যাচ্ছে নর্দ্দমা—তার ধারে ধারে হাঁস-মুরগী চরছে—গরু-ছাগল চরছে—শুয়োরের পাল লুটোপুটি খাচ্ছে কাদায়। নাকে রুমাল চেপে জায়গাটা পার হয়ে গেলাম। তার পর কতকগুলো ভাঙ্গা খোলার চালাওয়ালা ঘর। রাস্তার উপর খাটিয়া পেতে ময়লা কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়েছে কেউ, কেউ বা রোদে পিঠ পেতে বসে উকুন বাছাচ্ছে। চটা-ওঠা কলাই-করা এঁটো বাসনগুলো—এখানে-ওখানে গড়াচ্ছে—রাজ্যের কাক আর শালিক পাখীরা ঝগড়া বাধিয়েছে সেখানে। কোন উনুনে সবে ধোঁয়া বার হচ্ছে—কোন ঘরে কোন্দলের কর্কশ স্বর উঠছে। এমনি পরিবেশের মধ্য দিয়ে বেশ খানিকটা চললাম। তার পর অকস্মাৎ দৃশ্যপট বদলে গেল। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন উঠোন—ঘরদোর—মানুষজন। বস্তীর এই প্রান্তে প্রকাণ্ড একটি অট্টালিকাও চোখে পড়ল। এই অট্টালিকার একখানি ঘরে শঙ্কর শর্ম্মা ওরফে ভোলানাথকে দেখলাম।

অতি সাধারণ মানুষ। না বেশবাসে—না আকৃতি অবয়বে—কিংবা আলাপ আলোচনায় কোন বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ল। বয়স হয়েছে—যদিও বয়োভারে শরীর নুয়ে পড়ে নি। এমনই শীর্ণকায় মানুষ—বয়সের ভার চাপবে কোন্ যুক্তিতে? ঘরের সামনে একটা বেতের চেয়ারে বসেছিলেন। পরণে আধ-ময়লা ধুতি—ওই রকমই একটা সার্ট গায়ে—তার উপরে জড়ান দোস্থতির একখানি রঙীন চাদর। সামনের টেবিলে একখানা রুলটানা খাতা নিয়ে কিসের হিসাব কষছিলেন যেন।

আমাকে দেখে মাথা নুইয়ে একটু হাসলেন। বললেন, বসুন। কি প্রয়োজন বলুন?

বললাম, আমি শঙ্কর শর্ম্মাকে খুঁজছি। তিনি আছেন কি?

আমিই শঙ্করনাথ। বলে একটু হাসলেন।

এতক্ষণে মানুষটির বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ল। শীর্ণমুখের কোমল চমৎকার হাসিটুকু আর কোমল সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর—আমার দৃষ্টি ও শ্রুতিকে একই সঙ্গে চমৎকৃত করল। অভিভূত ভাবে দু'টি হাত যুক্ত হয়ে ললাট স্পর্শ করল। এতক্ষণ ওঁকে সামান্ত কর্ম্মচারী ভেবে প্রশ্নই করেছি। সৌজন্ত দেখাবার অবকাশ ঘটেনি।

আমার বিহ্বল বিব্রত ভাব হয় ত উনি লক্ষ্য করলেন। নিজেও একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। বললেন,

জায়গাটা তেমন নয়; প্রথম এলেই খানিকটা অসুবিধায় পড়তে হয়। কিন্তু উপায় কি বলুন? চা খাবেন কি?

না—চা খেয়েই বার হয়েছি। আপনার সঙ্গে খানিকটা আলোচনা করবার ইচ্ছা; কিন্তু আপনি ত দেখছি কাজে ব্যস্ত।

না—না, ও এমন কিছু নয়। বলতে বলতে খাতাখানা বন্ধ করে এক পাশে সরিয়ে রাখলেন। আসুন—খানিক আলাপ করা যাক। এইখানেই থাকেন আপনি, না বাইরে থেকে আসছেন?

বললাম, আসছি কলকাতা থেকে। আপনার সমাজ-সেবার খ্যাতি শুনেই এসেছি—

উনি তাড়াতাড়ি আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন। ব্যস্ত ভাবে বললেন, ক্ষমা করবেন—এক মিনিট। আমি আসছি। বলে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হলেন।

বিস্মিত হলাম—ক্ষুণ্ণও হলাম। এ কেমন ভদ্রতা? আলাপের প্রথম মুখেই—ঘর ছেড়ে চলে গেলেন!

ফিরে এলেন অবিলম্বে। বললেন, কিছু মনে করবেন না—ও ঘরে একজন রোগী আছে, বেলা দশটায় তার ওষুধ আর ফুড খাওয়ার কথা—সেটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এলাম।

বললাম, এই বাড়ীটা কি হাসপাতাল?

না—না, তেমন কিছু নয়। বস্তীর মধ্যে একটিই ত বাড়ী—একে নানান ভাগে ভাগ করে নিতে হয়েছে—নানান প্রয়োজনে। কোনটা আপিস ঘর, কোনটা ডিস্‌পেন্‌সারী, কোনটা শিশুমঙ্গল, প্রসূতি আগার—এমনি সব। আবার এর মধ্যে কর্মীরাও থাকেন। খানিকটা অসুবিধা হয়, উপায় কি?

বাড়ীটা কি সরকারের?

এক রকম তাই। একটা ট্রাষ্টবোর্ড আছে—তাঁরাই কর্ত্তা।

প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম—আপনিই কি সেক্রেটারি? উনি সে অবকাশ দিলেন না। বললে, প্রতিষ্ঠান এমন কিছু বড় নয়, নাম করার মত কাজও কিছু হয় নি। বলতে পারেন শিশু প্রতিষ্ঠান।

কত বছর হ'ল? জিজ্ঞাসা করলাম।

হাত উঠিয়ে সামনের একখানা বোর্ড দেখিয়ে বললেন, ওতেই লেখা রয়েছে বয়স—তেরশো আঠারো। সেবার প্রথম মহাযুদ্ধের বিরতি হ'ল এগারোই নভেম্বর, পনেরোই নবেম্বর-এর জন্ম। চল্লিশ বছরের মাস কয়েক বেশী।

বিস্মিতকণ্ঠে বললাম, তবু বলছেন শিশু প্রতিষ্ঠান?

উনিও ততোধিক বিস্মতস্বরে বললেন, শিশু নয়? পৃথিবীর জন্মকালের সঙ্গে মানুষের জন্মকাল তুলনা করলে কিংবা উদ্ভিদ বা প্রাণীদের তুলনায় মানুষ কি শিশু নয়? তারও কত বছর পরে ধরুন সমাজবিধি তৈরী হয়েছে। গুণ অনুসারে জাতি-বর্ণের ভাগ—সেও চলছে কতকাল ধরে। আবার সেটাকে ভেঙে সব মানুষকে এক জাতিতে দাঁড় করানোর চেষ্টা চলছে—এর আয়ুই বা কতটুকু! কতদিনে এই চেষ্টা সফল হবে বলতে পারেন কি? দু' এক শতাব্দীও যদি লাগে—তার তুলনায় চল্লিশ বছর কতটুকু সময়?

বললাম, দু' এক শতাব্দী লাগবে কেন? উনিশশো আঠারোয় যুদ্ধ বিরতির পর এই চল্লিশ বছরে যে সমাজ-ব্যবস্থা প্রায় অর্দ্ধেক পৃথিবীতে চালু হয়েছে—তার পূর্ণ যৌবন বলতে পারেন। আইনের আওতায় এনে সময়ের ব্যবধান কমান অসম্ভব কি?

উনি হাসলেন, তর্ক তুললেন না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, মানুষের হৃদয় কিন্তু সব সময়ে সময়কে ছাড়িয়ে চলতে চায় না সহজে। ওর পরিবর্ত্তন সময়সাপেক্ষ।

বললাম, কিছুমাত্র নয়। রাশিয়ার দৃষ্টান্ত নিন, চীনকে দেখুন—

বললেন, তর্ক করব না, মেনে নিচ্ছি আপনার কথা। কিন্তু আপনি যদি কর্ম্মী হন—এই পরিবর্ত্তনকে নিশ্চয় সবিশেষ পরিবর্ত্তন মনে করবেন না। মানুষের মনই এমন জটিল বস্তু যে রামরাজ্যের সুখশান্তি পেয়েও নিশ্চিন্ত হতে পারে না।

আমিও তর্কের জের টানলাম না। এ ভাবে তর্ক করলে কোন মীমাংসায় পৌঁছব না জানি। তা ছাড়া বেলাও বাড়ছিল, ফিরতে হবে আমাকে। ওঁর সমাজ-সেবার কার্য্যক্রমটা জেনে নিতে হবে এর মধ্যে, যে অস্বাস্থ্যকর নোংরা পল্লী—দ্বিতীবার এখানে আসার ইচ্ছা করছিল না। বললাম, চলুন একটু ঘুরে দেখা যাক—কি ভাবে এই প্রতিষ্ঠানটি চলছে।

উনি হেসে বললেন, নিতান্তই শিশু প্রতিষ্ঠান—দেখবার কিই বা আছে। আসুন।

বাড়ীখানায় অনেকগুলি ঘর, নানা ভাগে সেগুলি ভাগ করা। আকারে কোনটি বৃহৎ নয়, কিন্তু শৃঙ্খলা-পরিপাট্য আছে। জমকালো কিছু চোখে পড়ল না—যা গল্প বা গর্ব্ব করে বলার মত। কর্ম্ম-প্রণালীও সহজ-সরল। হরিজন-উন্নয়নের চেষ্টা যে ভাবে গান্ধীজী করে গেছেন—এঁদের আদর্শও সেই ছকে বাঁধা। সেবার ভাবটিকেই এঁরা বড় করে দেখেন—কর্ম্ম-প্রণালীও সেই

অনুপাতে চলে। এমন ভাবে চললে সেবা-প্রতিষ্ঠানের শৈশবকাল অতিক্রান্ত হতে আরও দু'এক শতাব্দীই যে লাগবে সে আর আশ্চর্য্য কি! মণিদার উপর অভিমান হ'ল। জনশ্রুতিতে নির্ভর করে বৃথাই তিনি আমাকে এত দূরে পাঠালেন! এমন ধারা জাঁকজমকহীন মন্থরগতি প্রতিষ্ঠান বাংলার শহরে পল্লীতে ত দু'একটি মিলতোই।

বিদায়কালে শঙ্কর শর্ম্মা বললেন, অনেকখানি বেলা হ'ল—আহারের অনুরোধ করলেই ঠিক হ'ত। কিন্তু অতিথির জন্য আয়োজন ত কিছু নাই, বলতে সঙ্কোচ-বোধ হচ্ছে। আপনার হয়ত কষ্ট হবে—

ভদ্রতার খাতিরে বললাম, আপনাদের যদি কষ্ট না হয়—

বাধা দিয়ে বললেন উনি, আমাদের আবার কষ্ট—সব দিন কি সময় মত খাওয়াই হয়? দেখছেন ত পল্লীটা, দেখলেন ত মানুষগুলিকে—এদের নিয়মে আনাই মানে বরফের জলকে হাত দিয়ে মুছে ফেলা!

হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, তা হলে এই ব্যর্থশ্রম করেন কেন?

হেসে বললেন, একটা কিছু করতে হবে ত? সব কাজই কি সার্থক হবে বলে ধরতে পারে মানুষ! বলে অনেকক্ষণ ধরে হাসতে লাগলেন।

বিরক্তিভরে মুখ ফিরিয়ে বাইরে এলাম। উনিও উঠোন পার হয়ে পথে পড়লেন, আর কোন কথা বললেন না। শুধু দু' হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বললেন, একটি অনুরোধ করব? আসবেন আর একদিন?

ভদ্রতার খাতিরে বললাম, যদি দু' একদিন থাকি এখানে চেষ্টা করব।

মনে মনে বললাম, না আর আসব না। অতি সাধারণ এই প্রতিষ্ঠান দেখার আগ্রহ আমার নাই, এ থেকে কোন শিক্ষাই লাভ হবে না।

পরের দিন সকালেই কাশী ত্যাগ করব সঙ্কল্প করলাম।

বৈকালে দশাশ্বমেধ ঘাটে পায়চারি করছিলাম। অপরাহ্ণে এই ঘাটের একটি নতুন রূপ বেশীর ভাগ ইন্দ্রিয়কেই আকৃষ্ট করে। চক্ষু দেখে বিচিত্রবেশী জনতাকে, শ্রোত্র কীর্ত্তন-কথকতার স্বাদ গ্রহণ করে, দুটি বল্গা ধরে মন-তুরঙ্গ খুসীর চালে পা ফেলে ফেলে এ-ঘাট ও-ঘাটের সিঁড়ি ভাঙ্গতে থাকে। বাংলা থেকে দূরে এসেও বাংলার পরিবেশটি ফিরে পাওয়ার আনন্দ ঠিক নয়, কেমন একটি পূর্ণতার আভাস—একটু মহিমার ছোঁয়া মনকে আবিষ্ট করে তোলে। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সৌধ-নগরীর অদ্ভুত অবয়ব, পদতলে প্রসারিত স্বচ্ছসলিলা স্থির-প্রবাহিনী গঙ্গা, একেবারে ওধারে সুবিস্তৃত বালুচর পর্য্যন্ত বিছানো একটি রূপার শয্যা, সেই শয্যায় অপরাহ্ণের অপরূপ আকাশকে অনায়াস-আরামে বন্দী করার অবিরাম চেষ্টা—জলে নক্ষত্রের ঝিকিমিকিতে সেটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে··· দেখতে দেখতে কেমন যেন নেশা জমে যায়। সিঁড়িতে পায়চারি করছিলাম আবিষ্টের মত, হঠাৎ কার আহ্বানে পিছন ফিরে চাইলাম।

গঙ্গার নিম্নতর সোপানে একটি ছাতার নিচের বসে রয়েছেন—সেই পূর্ব্ব পরিচিত বৃদ্ধ যিনি আমাকে ভোলা-নাথের সন্ধান দিয়েছিলেন ওবেলা।

আমাকে চাইতে দেখে হাত উঠিয়ে ডাকলেন, আসুন গল্প করা যাক।

ছাতার নীচের কাঠের পাটাতনে ওঁর পাশে গিয়ে বসলাম। হেলানো ছাতার ও-পিঠে গঙ্গা আর বালুচর এবং উপরের আকাশের বেশীর ভাগ আড়াল পড়ল। উনি শুধালেন, গিয়েছিলেন ভাঙ্গী কলোনীতে? দেখলেন আমাদের ভোলানাথকে?

দেখলাম। নিরুৎসুক কণ্ঠে জবাব দিলাম।

কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলেন?

নাঃ, এমন আর কি! উৎসাহহীন কণ্ঠে বললাম, এমন লোক দেশে-গাঁয়েও দেখেছি। হঠাৎ খেয়াল হ'ল দেশ-সেবা করব—মানুষের সেবা করব, তেড়ে ফুঁড়ে লেগে গেলেন সেই কাজে। কিন্তু মনের ধোঁয়ায় সে আগুনটুকু বেশীদিন জ্বালিয়ে রাখতে পারেন না।

বৃদ্ধ একটু হেসে বললেন, আমাদের ভোলানাথের কথা আলাদা! যাঁদের আগুন অল্পেতেই নিভে যায়—ভোলানাথ সে দলের নন।

চুপ করে রইলাম।

উনি বললেন, ওর জীবনের কথা শুনলে বুঝবেন, কেন এ কথা বলছি। শুনবেন? কাজের তাড়া নেই ত?

না—কি আর কাজ! বলুন, বললাম বটে—বিশেষ কৌতূহল বোধ করলাম না। জানি আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের জীবন-কাহিনীর মত স্বাদহীন একটি কাহিনীই শুনব।

বৃদ্ধ আমার নিস্পৃহ ভাব লক্ষ্য না করে ততক্ষণে কাহিনী আরম্ভ করে দিয়েছেন।

আর পাঁচটা ধনীর দুলাল যেমন হয়, প্রথমটা আমরাও তাই মনে করেছিলাম—জন-সেবাটা শঙ্করের একটা সাময়িক খেয়াল মাত্র। প্রথমটা দুর্ভিক্ষ বন্যার্তের

জন্ত চাঁদা তোলা, দুঃস্থের জন্ত মুষ্টিভিক্ষা, ঔষধ, কাপড়, কম্বল, গুঁড়ো দুধ বিতরণ, হাসপাতাল, প্রস্থতি-সদন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা এইসব নিয়েই মেতে থাকত শঙ্কর। বাড়ীর লোকেরাও ঝোঁকটায় তেমন গুরুত্ব দেন নি, সঙ্গী-সাথীরাও নয়। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে যখন এই রকমই চলল, ভদ্র-সমাজ ছেড়ে নীচু মহলে ওর কর্ম্ম-প্রচেষ্টা সুরু হ'ল, তখন সবাই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে কলেজের গণ্ডী ছাড়িয়েছেন শঙ্কর। বাপ-মায়ের মনে ছেলেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার আশা জেগেছে, কিন্তু সবই বুঝি বিফল হয়। অভিভাবকরা চেষ্টা করলেন ওকে ফিরিয়ে আনতে, ফল হ'ল উল্টো। ওর মনে তখন গান্ধীজীর অচ্ছুৎ-সেবার ছোঁয়াচ লেগেছে। রবীন্দ্রনাথের 'পশ্চাতে রেখেছ যারে' কবিতার প্রভাবটাও তার সঙ্গে কাজ করছে। সুতরাং যাকে আমরা নীচ সংসর্গ বলি—তা পরিত্যাগ করা ত দূরের কথা, তাতেই যেন ও একাত্মতা লাভ করল, উঁচু মহল থেকে সরে পড়ল। একমাত্র ছেলে—বাবা রাগ করে কঠিন কিছু করলেন না, চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগলেন যদি কোনদিন ছেলের মতিগতি ফেরে! কিন্তু সে আশা সফল হ'ল না—দারুণ মনোবেদনা নিয়েই ওর বাবা গত হলেন। বিপুল ধনের উত্তরাধিকার পেয়ে আরও উৎসাহিত হয়ে উঠল শঙ্কর। হরিজন পল্লীতেই—হরিজন উন্নয়নে ও সর্ব্বস্ব ঢেলে দিতে লাগল। সেই সময়েই ওর ভোলানাথ নামটা চালু হয়। এই ভাবে ওর যৌবন-পর্ব্বের আরও খানিকটা এগিয়ে গেল। যৌবনের মাঝামাঝি এসে শঙ্কর পুরোপুরি ভোলানাথ হয়ে উঠল। সর্ব্বদাই হরিজন সংসর্গ, খাদ্যা-খাদ্য বিচারহীন, ওদের সঙ্গে রাত্রিবাস—যাকে বলে পুরোপুরি শ্মশানচারী, তাই। এমনি অবস্থায় এক দিন জাতি-গোত্রের খোলসখানিও ওর গা থেকে খসে পড়ল—সবাইকে চমকে দিয়ে ওই ভাঙ্গড় কুলকেই আশ্রয় করল ভোলানাথ। বিয়ে করল ওদেরই একটি মেয়েকে।

চমকে উঠলাম আমি। বলেন কি, বিয়ে করল ওদেরই একটি মেয়েকে?

বৃদ্ধ বললেন, তাই ত করল। উপরের সমাজে বেশ খানিকটা আলোড়ন হ'ল। অবশ্য দিন কয়েকের জন্তই। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সমাজের বাঁধন-কষণ আলগা হয়ে আসছিল—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আঘাত সহ্য করবার শক্তি ছিল না। কয়েকটা নিয়ম-আচার, যেমন অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান প্রভৃতি কুলাচার-দেশাচারের মধ্যে ওটা টিকে ছিল। তাও বড় বড় শহরে ওসবের বালাই বড় একটা ছিল না—লাভ ম্যারেজ, ইন্টারকাষ্ট ম্যারেজ প্রভৃতির চলন ক্রমেই বাড়ছিল ত। তবু সে-সবেরও একটা সীমা-পরিসীমা ছিল। এতটা অসম রক্ত-বন্ধনের জন্ত অতি উদারপন্থীরাও প্রস্তুত ছিলেন না। এই শহরেও আন্দোলন হ'ল বই কি!

কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলাম, ব্যাপারটা বুঝি ভাল-বাসা ঘটিত—

না, না, মোটেই তা নয়। তা হলে ত সান্ত্বনা ছিল। নিছক আদর্শের জন্তেই ওটা ঘটেছিল। একটি রূপহীনা অচ্ছুৎ মেয়ে বিদ্যায় নয়, বুদ্ধিতে নয়, চরিত্রে নয়, সেবা-কর্ম্মে নয়, কোন দিকেই তার বিন্দুমাত্র দীপ্তি ছিল না, অথচ তাকেই···একটু থেমে বললেন, আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম—এমন কাজ কেন করলে শঙ্কর?

ও হেসে বলেছিল, সেবাবৃত্তি নিয়েছি—ওটা অন্তরের জিনিস কিনা সেইটুকু শুধু যাচাই করে নিতে চাইছি ভাই। একটা জিনিসকে পুরোপুরিভাবে না নিতে পারলে কাজে সিদ্ধি আসবে কি?

সেই হরিজন মেয়েটিকে ত দেখলাম না ওখানে? সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম। সামান্তক্ষণের সাক্ষাৎ-পরিচয়ে ওকে যে দেখতেই পাব এমন প্রত্যাশা অবশ্য করা যায় না, কিন্তু শঙ্কর যখন তাঁর সেবায়তনের বিভিন্ন বিভাগগুলি দেখাচ্ছিলেন—ক্ষুদ্রাকৃতি প্রসূতি-সদনে কিংবা হাস-পাতালে ওই ধরনের একটি সেবিকাকে, যে নাকি শঙ্করের সহধর্ম্মিণী, অন্ততঃ দেখতে পাব এইটুকু আশা এই গল্প-শোনার মুহূর্ত্তে মনে জাগছিল বৈকি! অথচ মেয়েকর্ম্মী কাউকেই ওখানে দেখিনি, তাই প্রশ্নটা মুখ থেকে হঠাৎ ছিটকে পড়ল।

বৃদ্ধ খানিক তুষ্ণীভাব অবলম্বন করে বললেন, দেখবেন কোথা থেকে—সে-ও যে এক বিয়োগান্ত ঘটনা। সে প্রসঙ্গে আসার আগে ও কেন হরিজন কন্যাকে বিবাহ করলে সেই কথাটা বলি। বিবাহ করার যুক্তিস্বরূপ ও বলেছিল, ভাই যাদের আপন করে নিতে চাইছি তাদের হাজার কাছে টেনেও মনের মাঝখানে দাঁড় করান যায় না যদি না রক্তের বাঁধনটা থাকে। ওটা বিধাতারই সৃষ্টি। হাজার মুখে বলি—সবাই এক বিধাতার সৃষ্টি—এক জাত, মনে তবু ফাঁক থেকে যায় একটুখানি। এই ফাঁকটুকু ধরতে পারলাম একটা কথা থেকে। সেবার কাজ করতে করতে একদিন কানে এল, ওরা বলাবলি করছে, যতই করুন বাবু, উনি কি আর আমাদের জাতে জাত দিতে পারবেন? ওঁরা ওপর থেকে দয়া দেখাতে পারেন—আমাদের সঙ্গে এক মাটিতে দাঁড়াতে পারেন না—এক ঘরে বাস করতে পারেন না। আমাদের ঘরে বিয়ে করে

আমাদের ঘরে আমুন ত দেখি! কথাটা বিদ্যুতের কশার মত আঘাত করল। ভাবলাম সত্যিই কি সেবার নামে দয়া দেখাচ্ছি—খানিকটা উঁচুতে বসে আত্মপ্রসাদ লাভ! কি মূল্য এই আত্মসন্তুষ্টির? অনেকক্ষণ ধরে ভাবলাম। স্থির করলাম এ বাধাটুকু রাখব না। মন স্থির করেই এই কাজ করেছি ভাই।

আমরা বললাম, ভাল করলে না। ঝোঁকের মাথায় কাজ করলে শেষকালে পস্তাবে। সমাজের বেড়াটা ভাঙব বললে হয়ত একদণ্ডে ভাঙা যায়, কিন্তু আজন্মের সংস্কার, শিক্ষাদীক্ষা, রীতিনীতি ওগুলি তত সহজেই ভাঙা যায় না। হ'লও তাই। সেইদিক থেকেই আঘাত খেলে শঙ্কর। অথচ আশ্চর্য্য—সে আঘাত ওর পক্ষে বাধা হ'ল না, ওকে আরও খানিকটা এগিয়ে দিলে ওই দিকে, ওই অচ্ছুৎ সেবার দিকে।

কি রকম?

বৃদ্ধ বললেন, অমন মিলন সংসারে শান্তি আনে না—এক্ষেত্রে তাই হ'ল। শঙ্কর হয়ত মানিয়ে চলতে চেয়েছিল—মেয়েটা তার আজন্মের সংস্কার ছাড়তে পারলে না। যে সমাজে অস্পৃশ্য হয়েছিল এককালে উপরে উঠে সেই সমাজকেই দূরে ঠেলতে চাইল। বস্তির জীবন ওর ভাল লাগছিল না, ও চাইছিল এই পরিবেশ থেকে দূরে বাবু-সমাজে গিয়ে বিলাসবহুল জীবনযাপন করতে। ফলে সংসারে নিত্য অশান্তি। তাও সয়েছিল শঙ্কর—মেয়েটা সইতে পারল না। কিছু টাকা নিয়ে একদিন শঙ্করের ঘর ছেড়ে পালাল।

শঙ্কর খুব আঘাত পেলেন ত?

বৃদ্ধ হঠাৎ আমার পানে চেয়ে বললেন, আজই ত দেখেছেন ওকে—আলাপ করেছেন, কিছু ধরতে পারলেন?

বললাম, মোটেই না। এমন আশ্চর্য্য প্রশান্ত নিরুদ্বিগ্ন মুখ খুব কম মানুষেরই দেখেছি।

বৃদ্ধ বললেন, ঠিক—ঠিক! ওরা যে ভোলানাথের জাত! কণ্ঠে গরল রেখে জগতের কল্যাণ করাই ওদের স্বভাব। এই ঘটনার পর ও বললে কি জানেন—আশ্চর্য্য, সে কথা ওদের মত দরদী সেবকরাই বলতে পারে। বললে, আমার আর একটা ভুল ভাঙল ভাই, কোথায় যে গলদ সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে লছমী। লছমী মানে ওই মেয়েটার নাম। লছমী এভাবে চলে না গেলে বুঝতেই পারতাম না—আরও গোড়া থেকে কাজ আরম্ভ না করলে এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। শুধু আমাদের আজন্মের সংস্কার কাটলেই হবে না—ওদের আজন্মের সংস্কারটাও সেইসঙ্গে কাটাবার ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য চাই গোড়া থেকে শিক্ষা। পাতায় জল ঢাললে গাছে ফুল ফোটে না, ফল ফলে না, মূলে জল ঢালার প্রয়োজন। করলেও তাই। সমস্ত সম্পত্তি ওই কাজেই দান করে দিলে। সেবার কাজ ত রইলই, শিক্ষার কাজেও লেগে গেল। একটা স্কুল খুলল ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্যে। এমনি করেই কাটছে আজ পনেরোটা বছর, তেতাল্লিশ সাল থেকে আটান্ন সাল পর্য্যন্ত।

চুপ করলেন বৃদ্ধ। ছাতার নিচেকার স্থানটুকুই শুধু নয়, অহল্যাবাঈ ঘাটটি পর্য্যন্ত মনে হ'ল কান পেতে শুনছে এই কাহিনী। রীতিমত নিঃস্তব্ধতা নেমেছে চারিপাশে। এতক্ষণ বুঝতে পারিনি সন্ধ্যা উৎরে গেছে, রাত্রির ছায়া নেমেছে সর্ব্বত্র। কীর্ত্তন কথকতার আসর ভেঙে গেছে, ডন-বৈঠক, দেহচর্চ্চার পালাও শেষ হয়েছে, সৌখীন ভ্রমণকারীর দল নিশ্চিহ্ন—শুধু এখানে-ওখানে, চাতালে বা গঙ্গার কিনারায় জপধ্যানেরত অথবা প্রকৃতি-রূপমুগ্ধ দু'একজন ছায়ার মত নিশ্চল হয়ে রয়েছেন।

একটু পরে বৃদ্ধ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললেন, চলুন, উঠি। উঠতে উঠতে বললেন, আশ্চর্য্য মানুষ ওই ভোলানাথ—আমরা ছেলেবেলা থেকে অত কাছে কাছে থেকেও ওকে চিনতে পারি নি। তবে শুধু বিত্ত বিলিয়ে দিয়ে নিঃস্ব হ'ল তাই নয়—নিজেকেও সবদিক থেকে মুছে নিতে চাইল সংসার থেকে। কেমন জানেন—যে ট্রাষ্টবোর্ড তৈরী হ'ল তারই উপর যাবতীয় সম্পত্তির ভার তুলে দিল। যে বাড়ীখানায় আজ সেবা-সদন হয়েছে ওটা ওর পৈতৃক বাড়ী। ওটাও দান করে দিলে, নিজের মাথা গুঁজবার ঠাঁইটুকু পর্য্যন্ত রাখলে না। ও বলে, সেবার সূত্রে একটুও অহং যাতে মাথা তুলতে না পারে সেইটাই সেবকের কর্ত্তব্য। এখন এই প্রতিষ্ঠানের একজন মাইনে করা কর্ম্মচারী ও। মাস-মাইনে যা পায় তাতেই ওর গ্রাসাচ্ছাদন চলে। কার্য্যকরী সমিতিতে পর্য্যন্ত নাম রাখতে দেয় নি। আশ্চর্য্য নয়!

অন্য সময় হলে বলতাম—এটা বাস্তবিকই বাড়াবাড়ি। অতি ভাল হবার ঝোঁকের মত এই মানসিক ক্রিয়াটা একপাশে ঝুঁকেছে যাকে স্বাভাবিক বলতে দ্বিধা হয়। কিন্তু কোন কথা বললাম না। আমরা তখন ছাতার আড়াল থেকে বাইরে এসেছি। দশাশ্বমেধ ঘাটের উপরকার একটি মন্দির-চত্বরের আলোর ছটা—ও-ঘাট পেরিয়ে এ-ঘাটের সিঁড়িতেও ছায়া ফেলেছে, বাকীটা অন্ধকারে কেমন ছলছল্ করছে। অপরাহ্নের মহিমা ঘাটের কোথাও নাই, অথচ মনে হচ্ছে সে মহিমা

গভীর রাত্রির দিকে একটু একটু করে এগিয়ে যেতে যেতে নূতন রূপে মহিমান্বিত হয়ে উঠছে। নিঃশব্দচারী অলক্ষ্য-নির্মিত এই মহিমাকে উপলব্ধি করবার জন্য হয়ত একটু থেমেছিলাম।

বৃদ্ধ বললেন, দাঁড়ালেন যে? সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়ুন গে, কাল সকালেই ত রওনা হবেন?

সচকিত হয়ে উঠলাম ওঁর প্রশ্নে। একটু চুপ করে থেকে উত্তর দিলাম, না—কাল বোধ করি যাওয়া হবে না।

শ্রীঅরবিন্দের সমাধি

শ্রীক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

প্রার্থনা প্রার্থিত সন্ধ্যা কজ্জল ঝুমঝুম।
দিনান্ত তমসা ম্লান নিঃশব্দ নিঝঝুম।
দিগন্তের অঙ্কশায়ী প্রমত্ত সাগর
বিক্ষুব্ধ অশান্ত মন অতন্দ্র জাগর।

বিশাল বিস্তৃত বালু শ্বেতাভ্র সৈকত
তপস্যার তাম্রলিপি অক্ষয় শাশ্বত।
লবণাক্ত সিন্ধুজলে সিদ্ধির বল্কল,
বাতাসে বিকল্প আত্মা
সংযুক্তির সংকল্পে অটল।

আশ্রমিক পরিবেশ ভক্তি ভাবময়
জ্ঞান ভক্তি ত্যাগ মৈত্রী প্রেমে সমন্বয়।
শ্রীঅরবিন্দের আশ্রম পুণ্য তপঃভূমি,
শ্যাম স্নিগ্ধ এ মৃত্তিকা শ্রদ্ধায় প্রণমি।

যোগী শ্রেষ্ঠ সিদ্ধ ঋষি শ্রীঅরবিন্দ,
তোমার সমাধি প্রান্তে সঁপিনু আমার
অন্তরের ভক্তি আর প্রার্থনা ভূমার
তীর্থজাত সর্ব শুভানন্দ।

রাধাচূড়া পুষ্পাকুল কুঞ্জ বীথিকায়,
সমাধি শয়ানে প্রাজ্ঞ ক্রান্তি কবিতায়।
প্রদীপ্ত প্রদীপালোকে সুরভিত ধূপে
দেখেছে তোমার যোগী জ্যোতির্ময় রূপে।

জীবনের সর্বাঙ্গীণ কুশল কল্যাণে,
তোমার অনন্ত সত্ত্বা আশিস সিঞ্চনে।
সর্বত্র প্রতীয়মান অন্তরে আসীন।
জীবনে জীবন তুমি,
সমাধির বন্ধ মুক্ত কল্যাণে নিলীন।

এ সন্ধ্যা সার্থক আজ সুদুর্লভ অমৃতের
সান্নিধ্য পেলাম।
ঋষি শ্রীঅরবিন্দ তোমাকে প্রণাম।

কমনওয়েলথ

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

কমন্‌ওয়েলথ লইয়া ভারতের রাজনীতি মহলে অনেক সময় অপ্রীতিকর আলোচনা হইতে দেখা যায়। ভারত যদিও কমন্‌ওয়েলথ ভুক্ত অন্যতম স্বাধীন সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র তথাপি কোন কোন ভারতীয় রাজনৈতিক দল এই সম্পর্ককে ভারতের পক্ষে অশোভন বলিয়া মনে করেন। এতদিন ইহা "ব্রিটিশ কমনওয়েলথ" বলিয়া পরিচিত ছিল এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত স্বাধীন দেশগুলি আভ্যন্তরিক শাসন পরিচালন বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং বহির্জ্জগতের সম্পর্কে ইংলণ্ডের নামমাত্র অধীন থাকিলেও 'ব্রিটিশ' কথা ব্যবহারে বিশেষ কোন আপত্তি হয় নাই কারণ অন্তর্ভুক্ত স্বাধীন উপেনিবেশগুলির অধিবাসীগণ ছিল প্রধানতঃ ব্রিটিশ বা ইউরোপীয়। ভারতবর্ষ নিজেকে সার্ব্বভৌম সাধারণতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করিলে ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীদ্বারা নিযুক্ত গবর্ণর-জেনারেল কর্ত্তৃক ভারত শাসন অর্থহীন হইয়া পড়ে এবং এরূপ নামমাত্র সম্পর্ককে এতদিন যে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইত তাহাও পরিত্যক্ত হয়। এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গির এবং নবরূপায়ণের জন্য ভারতবর্ষের মত সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষেও কমন্‌ওয়েলথের মধ্যে থাকা সম্ভব হইয়াছে।

১

বর্ত্তমানে কমন্‌ওয়েলথ দশটি স্বাধীন এবং সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র ও ইহাদের অধীন দেশ সমষ্টি লইয়া গঠিত যথা: যুক্তরাজ্য, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ-আফ্রিকা, ভারত, পাকিস্থান, সিংহল, ঘানা এবং ফেডারেশন অব মালয়।

ফেডারেশন অব রোডেসিয়া এণ্ড নাইসাল্যাণ্ড ১৯৫৩ সনে স্থাপিত হয়—স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশ বা কলোনী দক্ষিণ রোডেসিয়া এবং উহার অধীন উত্তর রোডেসিয়া এবং নাইসাল্যাণ্ডকে লইয়া এই দেশটি গঠিত। দক্ষিণ-রোডেসিয়া দেশের সংবিধান অনুযায়ী স্বয়ংশাসিত কিন্তু ইহার অধীন দেশগুলিতে কেবল যে স্বায়ত্তশাসন নাই তাহা নহে এখানে ইউরোপীয়গণ বিশেষ সুবিধা ভোগ করে এবং আফ্রিকার অধিবাসীগণ বৈষম্যমূলক নানা অসুবিধার মধ্যে শাসিত হয়। দক্ষিণ রোডেসিয়া যাহাকে একপ্রকার স্বাধীন রাষ্ট্রই বলা চলে কমন্‌ওয়েলথ রিলেসন্স আপিসের মাধ্যমে যুক্তরাজ্যের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করে কিন্তু ইহার অধীন উত্তর-রোডেসিয়া এবং নাইসাল্যাণ্ড ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক দপ্তর কর্ত্তৃক শাসিত হয়। অনেক আন্তর্জ্জাতিক বিষয়ে ক্ষমতা ফেডারেশনের উপর ন্যস্ত থাকিলেও ইহার চরম দায়িত্ব যুক্তরাজ্যের সরকারের উপর।

যুক্তরাজ্য, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং ইউনিয়ন অব সাউথ আফ্রিকা—এই কয়টি দেশের অধীনে আরও অনেক দেশ আছে এবং এই সকল দেশের শাসন পরিচালনের জন্য ইহারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে দায়ী। যুক্তরাজ্য ইহার ঔপনিবেশিক দপ্তরের মাধ্যমে ত্রিশটি দেশ শাসন করে—এই সকলের মধ্যে আছে খাস উপনিবেশ, আশ্রিত দেশ, আশ্রিত রাজ্য এবং অছি দেশ; অষ্ট্রেলিয়ার অধীনে আছে পাপুয়া, অছিদেশ নিউগিনি, কোকোস দ্বীপপুঞ্জ, ইহা ব্যতীত অষ্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য এবং নিউ-জিল্যাণ্ডের সহিত যুক্তভাবে পাউরু নামক অছি দেশটি পরিচালন করে, নিউজিল্যাণ্ড দক্ষিণ সামেয়া নামক অছি দেশ শাসন করে; দক্ষিণ আফ্রিকা—দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা শাসন করে। ইহা ছাড়াও এই সকল দেশের অধীনে বহু দ্বীপ এবং দক্ষিণ মেরুঅঞ্চলের বহু ভূখণ্ড রহিয়াছে। এই সকল পরাধীন দেশের কোন কোনটি কিঞ্চিৎ পরিমাণে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে। এই সকল দেশ সম্পর্কে ব্রিটিশ রাজনীতির লক্ষ্য ১৯৫১ সনের ১৪ই নবেম্বরের ঔপনিবেশিক সচিবের বক্তৃতা হইতে জানা যায়। তিনি বলিয়াছেন—"আমাদের লক্ষ্য অধীন দেশ-গুলিকে ধীরে ধীরে ব্রিটিশ কমন্‌ওয়েলথের মধ্যে স্বায়ত্ত-শাসিত করিয়া তোলা। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক অঞ্চলে যাহাতে আবশ্যক অনুযায়ী কতগুলি প্রতিষ্ঠান যত শীঘ্র সম্ভব গড়িয়া উঠে তাহা চেষ্টা করা হয়। রাষ্ট্রীয় উন্নতির সঙ্গে তাল রাখিয়া যাহাতে প্রত্যেক অঞ্চলেই আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি হয় সেই বিষয়ে আমরা দৃঢ়সঙ্কল্প। অল্প-অগ্রসর এবং অগ্রসর প্রত্যেক দেশই যাহাতে আরও অগ্রসর হয় সেই বিষয়ে আমরা আশান্বিত।"

এই সকল দেশের অবস্থা এত বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং বিরাট যে, বর্ণনা করা সহজ নহে। বহুদিন পর্য্যন্ত এই সকলের একাংশকে বলা হইত "ব্রিটিশ সাম্রাজ্য" এবং স্বয়ংশাসিত

দেশগুলিকে ডোমিনিয়ন" নামে অভিহিত করা হইত। এখন এই সকল শব্দের পরিবর্তে "কমন্‌ওয়েলথ" বা 'কমন্‌ওয়েলথ অব নেশান্স' বা 'কমনওয়েলথের সদস্য' এই কথাগুলির ব্যবহার হয়।

২

কমন্‌ওয়েলথের সদস্যগণের মধ্যে একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেকটিতে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র বর্তমান অর্থাৎ স্বাধীনভাবে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ দ্বারা পার্লামেণ্টে আলোচনার পর আইন প্রণয়ন হয় এবং শাসকগণ পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠের যতদিন আস্থাভাজন থাকেন ততদিনই দেশ শাসন করেন। মন্ত্রীগণের সকলকেই পার্লামেণ্টের সদস্য হইতে হয় এবং তাহাদের শাসনের দায়িত্ব ব্যক্তিগত নহে সমষ্টিগত। পার্লামেণ্টে রাজস্ব আইনমতে অধিকাংশ আইনের খসড়াই মন্ত্রীমণ্ডল দ্বারাই আনীত হয় এবং মন্ত্রীমণ্ডলী তাহাদের কার্য্যের জন্য পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী থাকেন। নিউজিল্যাণ্ড, পাকিস্থান (বর্ত্তমানে ইহার পুরাতন সংবিধান বাতিল হইয়াছে), ঘানা এবং ফেডারেশন অব মালয় ব্যতীত কমন্‌ওয়েলথের অন্যান্য দেশের ব্যবস্থাপক মহাসভা বা পার্লামেণ্ট দ্বৈরাত্রিক কিন্তু উচ্চ-পরিষদের সদস্যগণ বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। যদিও আইনের প্রস্তাব পার্লামেণ্টের উচ্চ এবং নিম্ন যে কোন ব্যবস্থাপক পরিষদে আনা চলে তবু উচ্চ পরিষদের প্রধান কার্য্যই হইতেছে সংশোধন। গোপন সার্ব্বজনীন সাবালক ভোট দ্বারা নির্ব্বাচিত নিম্ন পরিষদই অধিক শক্তিমান এবং মন্ত্রী বা শাসন পরিষদ এই পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের বলেই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। 'অর্থ' সম্পর্কিত আইনে নিম্ন-পরিষদের ক্ষমতাই চরম একজন্য আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে তাহারাই শ্রেষ্ঠ। নিম্ন-পরিষদের সভাপতি বা 'স্পীকারে'র পদটি কমন্‌ওয়েলথ দেশের বৈশিষ্ট্য। তিনি কেবল অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন না, পরিষদগৃহে সকল সদস্যের বাক্‌স্বাধীনতা রক্ষা করেন—তিনি দেখেন যে সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের আপত্তি যেন পরিষদের কার্য্যে বাধার সৃষ্টি না করে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠগণ আইন প্রণয়ন করিবার অধিকারী বলিয়াই যেন সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতি অত্যাচারী না হয়। পার্লামেণ্টের কার্য্যকাল নিয়ম নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য যুক্তরাজ্যে এবং যে সকল দেশ ইংলণ্ডের রাণীর প্রতিনিধি দ্বারা শাসিত সেই সকল স্থানে রাণী বা তাঁহার প্রতিনিধির আদেশে ভারত ও পাকিস্থানে সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির আদেশে এবং মালয় ফেডারেশনে ইয়াং ডিপার্টুয়ান ঝ্যাগং (ইনি মালয়ের সুলতানগণ দ্বারা তাহাদের মধ্য হইতে পাঁচ বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হন)-এর আদেশে ভাঙিয়া দেওয়া হয়। অবশ্য মন্ত্রীমণ্ডলী যখন দেশের জনগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচনের আবশ্যকতা মনে করেন তখনই তাহাদের সুপারিশক্রমে পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দেওয়া হয়।

৩

প্রত্যেক কমনওয়েলথ দেশের গবর্ণমেণ্ট বা সরকার এবং পার্লামেণ্টের বা ব্যবস্থাপক মহাসভার শীর্ষে যুক্তরাজ্যের রাণী অধিষ্ঠিত এবং তাঁহার নামেই সকল দেশের শাসন পরিচালিত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষ, পাকিস্থান এবং মালয় ফেডারেশনের বেলায় এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রম। যদিও রাণীর নামে এই তিনটি দেশ ব্যতীত অন্যান্য দেশের শাসন চলে, তিনি নামে এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে শাসনকর্ত্রী হইলেও প্রকৃত শাসক নহেন। রাণীর নামে যুক্ত থাকার দরুন এই সকল দেশের শাসন-ব্যবস্থায় একটা পারম্পর্য্য রক্ষা হয় সন্দেহ নাই।

উপরোক্ত তিনটি দেশ অর্থাৎ ভারত, পাকিস্থান ও মালয় ব্যতীত কমন্‌ওয়েলথের অপর সকল দেশে, সেই সকল দেশের গভর্ণমেণ্টের অনুরোধক্রমে, রাণী একজন গবর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত করেন। গবর্ণর-জেনারেল সংশ্লিষ্ট সরকারের (মন্ত্রীসভার) পরামর্শমত কার্য্য করেন কিন্তু তিনি যুক্তরাজ্যকে গবর্ণমেণ্টের একতিয়ারের বাহিরে। কাজেকাজেই যুক্তরাজ্যের রাণী—যুক্তরাজ্য ব্যতীত কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ-আফ্রিকা সিংহল এবং ঘানারও রাণী; এই দেশগুলি সম্পূর্ণ স্বাধীন হইলেও রাণীর প্রতি ইহারা আনুগত্য স্বীকার করে।

বর্ত্তমানে কমন্‌ওয়েলথের দুইটি দেশ ভারতবর্ষ এবং পাকিস্থান প্রজাতন্ত্রী (পাকিস্থানে সাময়িকভাবে গণতন্ত্র স্থগিত আছে) এবং ইহাদের প্রত্যেকটির শীর্ষে রহিয়াছেন এক এক জন রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেণ্ট। রাণীর প্রতি আনুগত্য এই সকল দেশের নাই কিন্তু ইহারা কমন্‌ওয়েলথের নেত্রী (Head) বলিয়া স্বীকার করে। ১৯৫৬ সনে কমন্‌ওয়েলথের প্রধান মন্ত্রীগণের সম্মেলনে সিংহলের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, তাঁহার দেশে শীঘ্রই গণতন্ত্রের শাসন প্রবর্ত্তিত হইবে কিন্তু তাঁহারা কমন্‌ওয়েলথের সদস্য থাকিবেন।

মালয় ফেডারেশন প্রতি পাঁচ বৎসরের জন্য একজন নির্ব্বাচিত সুলতান (রাজা) দ্বারা শাসিত, ইংলণ্ডের রাণীর প্রতি আনুগত্য না দেখাইলেও তাঁহাকে কমনওয়েলথের নেত্রী বলিয়া স্বীকার করে।

৪

কমন্‌ওয়েলথ দেশসমূহের আর এক মিল দেখা যায়, আইনের বিষয়ে প্রায় সর্ব্বত্রই ইংলণ্ডের সাধারণ আইন প্রচলিত। তবে কিছু কিছু ব্যতিক্রমও আছে। কানাডার কুইবেক প্রদেশ এবং মরিশাস উপনিবেশ ফরাসী দ্বারা স্থাপিত হওয়ায় ফরাসী আইন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা, সিংহল এবং দক্ষিণ রোডেসিয়ায় রোমান-ডাচ আইন প্রচলিত। স্থানীয় অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য অবশ্য এই সাধারণ আইন কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে দেখা যায়। এক সময় ইংলণ্ডের প্রিভি কাউন্সিল সমস্ত কমন্‌ওয়েলথ দেশগুলির শ্রেষ্ঠতম আপীল আদালত ছিল কিন্তু এখন কোন কোন সদস্য-দেশ আইনের দ্বারা নিজ দেশেই চরম বিচারের ব্যবস্থা করিয়াছে। বর্ত্তমানে কলোনী ব্যতীত অষ্ট্রেলিয়া, নিউ-জিল্যাণ্ড, সিংহল, ঘানা এবং মালয় ফেডারেশনের আদালতসমূহের শেষ আপীল প্রিভি কাউন্সিলে যায়।

৫

সমস্ত কমন্‌ওয়েলথ ও উহার অধীন দেশগুলির আয়তন পৃথিবীর মোট আয়তনের এক-চতুর্থাংশ এবং অধিবাসীর সংখ্যাও জগতের মোট লোকসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ। সদস্য দেশগুলির ইতিহাস, আয়তন, ভৌগোলিক অবস্থান, জাতি, ধর্ম্ম, ভাষা, জনগণের প্রকৃতি, শিল্প-সমৃদ্ধি এবং পৃথিবীতে উহার বৈশিষ্ট্য পরস্পর হইতে পৃথক এবং প্রত্যেকটির বিকাশ হইয়াছে নিজ নিজ পথে। যুক্ত-রাজ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পশ্চিম ইউরোপের ও কানাডার সহিত; অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের অধিবাসী প্রায় সকলেই ইংরেজ জাতীয় এজন্য এই দেশগুলি ভৌগোলিক অবস্থানে এশিয়ার নিকট এবং প্রাচ্যে হইলেও পাশ্চাত্যের সহিত ইহাদের সাংস্কৃতিক বন্ধন। কানাডা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসীগণের মধ্যে অ-বৃটিশ ভাগই বেশী। এজন্য স্বভাবতঃই আন্তর্জাতিক সমস্যায় সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গি বেশ কিছু পৃথক হইয়া পড়ে এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের ভোটা-ভুটিতে পরস্পরকে বিপরীত দিকে ভোট দিতে দেখা যায় —যদিও মতানৈক্য প্রধান প্রধান মৌলিক ঐক্যের বিরোধী হইয়াছে এরূপ দেখা যায় না।

এশিয়া এবং আফ্রিকার নব স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলি কমন্‌ওয়েলথের সদস্য হওয়ায় কমন্‌ওয়েলথের কতকটা নবরূপায়ণ হইয়াছে তবে এক নূতন কমন্‌ওয়েলথ হইয়াছে এরূপ বলা চলে না। নূতন সদস্য দেশগুলির সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রাচীন এবং ধর্ম্ম পৃথক এবং পুরাতন সদস্যগণের সংস্কৃতি পাশ্চাত্যের, ইহা সত্ত্বেও উভয়েই ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টারী গবর্ণমেণ্ট এবং আইনের শাসন (Rule of Law) স্বীকার করা বিষয়ে একমত।

কমন্‌ওয়েলথের এসিয়ার সদস্যগণ প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে সেতু স্বরূপ। অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসীগণ পাশ্চাত্যের কিন্তু দেশ প্রাচ্যে অবস্থিত সুতরাং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পরস্পরকে বুঝিবার ও বুঝাইবার ভার বর্ত্তিয়াছে ইহার উপর। পশ্চিম গোলার্দ্ধে কানাডার উপরে ভার পড়িয়াছে যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র এই উভয়ের পরস্পরকে বুঝিবার ও বুঝাইবার ভূমিকা।

৬

কোন পূর্ব্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কমন্‌ওয়েলথ গড়িয়া উঠে নাই, ইহা ক্রমবিকাশের ফলমাত্র। ইহা বাঁধা-ধরা নিয়মেও চলে না, 'যখন যেমন, তখন তেমন', 'অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা' এই নিয়মে চলিতেছে। ভারত ১৯৪৯ সনের এপ্রিল মাসে 'সার্ব্বভৌম প্রজাতন্ত্র' রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও এক ঐতিহাসিক ঘোষণা দ্বারা কমন্‌ওয়েলথের সদস্য পদে থাকায় এক অ-দৃষ্ট এবং অভাবনীয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করা গেল। কমন্‌ওয়েলথের বিরামহীন ক্রমবিকাশ চলিয়াছে। ১৯১৪-১৮ সনের প্রথম মহাযুদ্ধের পর এই বিকাশ দ্রুত হইতেছে। মূল আদর্শ পরিবর্ত্তিত হয় নাই। ১৯৩১ সনের ষ্ট্যাটুট অব ওয়েষ্ট মিনিষ্টার সমসাময়িক অবস্থার স্বীকৃতি এবং আইনে রূপায়ণমাত্র।

উক্ত ষ্ট্যাটুট অব ওয়েষ্টমিনিষ্টার প্রণয়ন হইবার পূর্ব্ব হইতেই ডোমিনিয়নগুলি প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করিতে-ছিল। ষ্ট্যাটুটের ভূমিকায় বলা হইয়াছে, "It is in accord with the established Constitutional position that no law hereafter made by the Parliament of the United Kingdom shall extend to any of the said Dominions as part of the law of that Dominion otherwise than other request and consent of that Dominion.

আজ আর যুক্তরাজ্য সরকার কমন্‌ওয়েলথের অপর কোন সদস্যের হইয়া যুদ্ধঘোষণা, শান্তিচুক্তি করিতে পারে না, কোন সদস্যের পররাষ্ট্র নীতি কিম্বা করনীতি নির্দ্ধারণ করিতে এমনকি যুদ্ধের সময়ও অনুমতি ব্যতীত উহার সৈন্য যুদ্ধে নিয়োগে অধিকারী নহে। কমন্‌-ওয়েলথের প্রত্যেক সদস্যের অধিকারই সমান। প্রত্যেক সদস্যই নিজের আইন নিজে করে, রাষ্ট্রনীতি নির্দ্ধারণ করে, অপর রাষ্ট্রের সহিত আলাপ-আলোচনা ও চুক্তি সহি করে, যুদ্ধ ও শান্তির বিষয় নির্দ্ধারণ করে এবং নিজে-দের দৌত্য বিভাগ সংরক্ষণ করে। প্রত্যেক কমন্‌ওয়েলথ

দেশের নিজ নিজ বিদেশী রাষ্ট্রে দূত রাখিতে হয়; ইহা ব্যতীত প্রত্যেক কমনওয়েলথের দেশের রাজধানীতেও নিজ প্রতিনিধি রাখিতে হয়—সকলেরই আবার লণ্ডনে নিজ দূতাবাস আছে।

কমনওয়েলথের সদস্য দেশগুলির স্বাধীনতা 'পূর্ণ' কিনা এ সম্বন্ধে আর সন্দেহের অবকাশ নাই। পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীলতার প্রশ্নই আজ বড়। সম্পূর্ণ ভাবে স্বাধীন হইয়াও প্রত্যেক সদস্য কমনওয়েলথের সদস্য হিসাবে নিজেকে আরও নিরাপদ মনে করে, বাণিজ্য, সাংস্কৃতিক আদান প্রদানে বেশী সুযোগ সুবিধা ভোগ করে এবং জগৎসভায় বেশী সম্মান পায়।

১৯২৬ সনের ইম্পিরিয়াল কন্‌ফারেন্স কমনওয়েলথের সদস্যগণের পদমর্য্যাদার সংজ্ঞা দেওয়া হয়। ইহাকেই পাঁচ বৎসর পরে ১৯৩১ সনে ষ্ট্যাটুট্‌ অব ওয়েষ্টমিনিষ্টার নামক আইনে রূপ দেওয়া হয় ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ১৯১৪ সনে যখন যুক্তরাজ্য যুদ্ধ ঘোষণা (প্রথম মহাযুদ্ধ) করে তখন এই ঘোষণা কমনওয়েলথের প্রত্যেক সদস্যের তরফ হইতেই করা হইয়াছিল কিন্তু ১৯৩৯ সনে যখন গ্রেট বৃটেন যুদ্ধ ঘোষণা করিল তখন যুক্ত রাজ্যের অন্যান্য স্বাধীন কমনওয়েলথ দেশগুলির হইয়া ঘোষণা করিবার অধিকার ছিল না। অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড নিজেদেরও যুদ্ধে রত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। কিন্তু কানাডা নিজ পার্লামেণ্টের অনুমোদনক্রমে এক সপ্তাহ পরে যুদ্ধ ঘোষণা করে। দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার নিরপেক্ষ থাকিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু পরে পার্লামেণ্টের ভোটে পরাজিত হইয়া যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল। আয়ার (আর্ল্যাণ্ড) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিল এবং কমনওয়েলথের অন্যান্য সদস্যেরা ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছিল: ভারতবর্ষ তখন স্বাধীন ছিল না, ভারতের গবর্ণর-জেনারেল ভারতের পক্ষ হইতে যুদ্ধে যোগদানের কথা ঘোষণা করিলে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিল এবং ইহার পরবর্ত্তী ইতিহাস সকলেরই জানা আছে।

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা লাভ হয় যুক্তরাজ্যের পার্লামেণ্টের ১৯৪৭ সনের ভারতের স্বাধীনতা আইনের বলে পরে ভারতবাসী নিজেদের গঠনতন্ত্র পরিষদের দ্বারা দেশকে সার্ব্বভৌম প্রজাতন্ত্রে পরিণত করিয়াছে। 'ডোমিনিয়ান' অবস্থা অর্জন ও 'পূর্ণ স্বাধীনতা' ঘোষণার মধ্যে কোন বিরোধ নাই বলিয়াই সহজে ইহা সম্ভব হইয়াছে এবং যুক্তরাজ্যের আইন মোতাবেক হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশের বেলা ইহা আরও স্পষ্ট দেখা যায়। ১৯৪৮ সনে ঐ দেশ Burma Independence Act, 1947, অনুযায়ী 'ডোমিনিয়ন' হয় এবং পরে উহা কমনওয়েলথের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া প্রজাতন্ত্রে পরিণত হইয়াছে এবং তখন হইতেই এই দেশ কমনওয়েলথের বাহিরে।

৭

কমনওয়েলথের প্রত্যেক সদস্য দেশ নিজের নাগরিকত্ব ও জাতীয়ত্ব সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করে এবং নিজ দেশের আইন দ্বারা অপর কমনওয়েলথ দেশের নাগরিকগণের অধিকার নির্দ্ধারণ করে। যুক্তরাজ্য, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং মালয় ফেডারেশনে 'ব্রিটিশ প্রজা' হইলেই নাগরিক হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন নাগরিকত্বের সংজ্ঞা পৃথক এজন্য পূর্ব্বোক্ত দেশসমূহের মত সে দেশে সাধারণ নাগরিকত্বের ব্যবস্থা নাই। অথচ কমনওয়েলথের কোন রাষ্ট্রই সাধারণ ভাবে অপর কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রের নাগরিককে বিদেশী (alien) মনে করে না কিম্বা নিছক বিদেশী নাগরিককে এরূপ কোন অধিকার দেয় না যাহা হইতে কমনওয়েলথ নাগরিককে বঞ্চিত করে।

পরস্পর হইতে পৃথক, সম্পূর্ণ স্বাধীন অথচ পরস্পরের সহিত অনেক বিষয় ঐক্য রাখা স্বভাবতঃই প্রয়োজন এজন্য একদিকে যেমন পরস্পরের হাই কমিশন বা দূতাবাস আছে অপর দিকে ইংলণ্ডের কমনওয়েলথ রিলেসন্স আপিস বৈদেশিক নীতি, পরস্পরের দেশরক্ষা এবং নানা আর্থিক বিষয় যাহাতে সকলেরই স্বার্থ জড়িত সেই সম্বন্ধে সকল কমনওয়েলথ দেশগুলিকে আবশ্যকীয় সংবাদ পাঠায় এবং যোগাযোগ রক্ষা করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে কমনওয়েলথ দেশসমূহের মধ্যে মাঝে মাঝে Imperial Conference বা সাম্রাজ্যিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইত, ইহাতে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ অনেক সময় প্রধানমন্ত্রীগণ নিজেরাই যোগদান করিতেন। এই সকল সম্মেলনে আলাপ-আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইত। অবশ্য এই সকল সিদ্ধান্ত কোন গবর্ণমেণ্টের পক্ষে গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক ছিল না, তবে সর্ব্বসম্মতিক্রমে যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইত তাহা সংশ্লিষ্ট গবর্ণমেণ্টগুলি সাধারণতঃ কার্য্যে পরিণত করিত। সর্ব্বশেষ সাম্রাজ্যিক সম্মেলন হয় ১৯৩৭ সনে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ১৯৪৬ (এপ্রিল), ১৯৪৮ (অক্টোবর), ১৯৪৯ (এপ্রিল), ১৯৫১ (জানুয়ারী), ১৯৫৩ (জুন), ১৯৫৫ (ফেব্রুয়ারী), ১৯৫৬ (জুন),

১৯৫৭ (জুন) প্রধানমন্ত্রীগণের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত বিশেষ বিশেষ বিষয় সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীগণের সম্মেলনও বহু হইয়াছে এবং হইতেছে। ১৯৫০ সনে জানুয়ারী মাসে কলম্বো শহরে বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রীগণের এক সম্মেলন হয়—ইহাতেই দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-দক্ষিণ এসিয়া অঞ্চলের দেশসমূহের পরস্পর সহযোগিতায় আর্থিক উন্নয়নের জন্য "কলম্বো প্ল্যানের" জন্ম হয়। ১৯৪৭ সনে অষ্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরা শহরে জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তি আলোচনার জন্য এক সম্মেলন হয়। ১৯৫১ সনের জুন মাসে দেশরক্ষামন্ত্রীদের একটি এবং ঐ বৎসরই সেপ্টেম্বর মাসে সরবরাহ মন্ত্রীদের আর একটি সম্মেলন হয়। ক্যাবিনেট সভার মত কমন্‌ওয়েলথ মন্ত্রীগণের অধিবেশন গোপনে হইয়া থাকে তবে সভার পরে একটি প্রকাশ্য সম্মেলন হইয়া থাকে। সম্প্রতি (সেপ্টেম্বর ১৯৫৯) কমন্‌ওয়েলথ অর্থমন্ত্রীগণ লণ্ডনের এক সম্মেলনে আন্তর্জ্জাতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের (International Development Association) স্থাপন সমর্থন করিয়াছেন ও উহা বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হইবে ইহাও স্থির হইয়াছে। ইহার মূলধন হইবে ১০০ কোটি ডলার। উদ্দেশ্য অনুন্নত দেশসমূহে উন্নয়নের জন্য অর্থসরবরাহ।

ইহা ব্যতীত মন্ত্রীগণের ভ্রমণ, উচ্চকর্ম্মচারীগণের যাতায়াত, হাই কমিশনের তৎপরতা কমন্‌ওয়েলথ দেশগুলির মধ্যে সর্ব্বদাই সক্রিয় যোগাযোগ রক্ষা করে।

৮

আর্থিক ব্যাপারে প্রত্যেক কমন্‌ওয়েলথ দেশই স্বাধীন। কানাডা এই স্বাধীনতা ১৮৫৯ সনেই ঘোষণা করিয়াছিল। কমনওয়েলথ সদস্যগণের কিংবা বাহিরের স্বাধীন দেশগুলির সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক, শুল্ক ব্যবস্থা চুক্তি, আইন প্রণয়ন প্রভৃতিতে প্রত্যেক দেশই স্বতন্ত্র ভাবে করে, তবে এ বিষয়েও পরস্পরের মধ্যে সকল সময় যোগাযোগ রক্ষা করা হয় এবং সম্মেলন, সভা, আলাপ-আলোচনা করা হয়। আর 'ষ্টার্লিং এলাকা' প্রায় সকল কমন্‌ওয়েলথভুক্ত দেশগুলি সমবায়ে হওয়ার দরুন সকলের মধ্যে বিদেশী মুদ্রার আদান প্রদানের এক মহা সুযোগ ও আর্থিক বন্ধন রহিয়াছে। কানাডা ইহার ভৌগোলিক অবস্থান ও আর্থিক পরিবেশের জন্য 'ডলার এলাকা' ভুক্ত হইয়াও ষ্টার্লিং এলাকার সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় মধ্যপথাবলম্বী।

৯

প্রত্যেক কমন্‌ওয়েলথ দেশের দেশরক্ষা ব্যবস্থা নিজের। সংশ্লিষ্ট সদস্য-দেশের অনুমোদন ব্যতীত কেহ সামরিক ঘাঁটি বা সৈন্য সমাবেশ করিবার অধিকারী নহে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও পরস্পরের মধ্যে সামরিক বিষয়ে পলা-পরামর্শ হয়, একে অন্যকে সামরিক শিক্ষা বিষয়ে সাহায্য করে, অস্ত্র-শস্ত্র সরবরাহ করে, লণ্ডনের Imperial Defence College-এ উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারীগণের শিক্ষার সুযোগ দেয়।

প্রশ্ন উঠিতে পারে প্রত্যেক রাষ্ট্রই স্বাধীন অথচ সকলে মিলিয়া আবার 'কমন্‌ওয়েলথ' ইহা কিরূপে সম্ভব। ইহার সহিত কমন্‌ওয়েলথ বহির্ভূত স্বাধীন রাষ্ট্রের পার্থক্য কোথায়? ১৯২৬ সনের Imperial Conference-এ যে উক্তি করা হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিলেই জিনিসটা স্পষ্ট হইবে—"A foreigner seeking to underetand the truo character of the British Empire by the aid of this formula alone would be tempted to think that it was devised rather to make mutual interference impossible than to make mutual co-operation easy. Such a criticism, however, completely ignores the historic situation......The British Empire is not founded on negotiations. It depends essentially, if not formally, on positive ideals. Free institutions are its life-blood. Free co-operation is its instrument. Peace, security and progress are among its objects......And every Dominion now, and must always remain, the sole Judge of the nature and extent of its co-operation, no common cause will, in our opinion, thereby be imperilled."

তেত্রিশ বৎসর আগেকার কথা। ভারত স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'Empire' খসিয়া গিয়াছে। স্বাধীন ভারতবর্ষকে কমন্‌ওয়েলথ-এ রাখিবার জন্য 'British' কথা বর্জ্জন করা হইয়াছে এবং ইংলণ্ডের 'রাজা' বা 'রাণী'র প্রতি আনুগত্যও আজ আর আবশ্যক হয় না। ইংরেজ জাতির তথা ইংরেজ রাজনীতিবিদ্‌গণের এই বাস্তবের সহিত সামঞ্জস্য বিধানের সফলতা হইতে অনেক কিছু শিখিবার আছে। এককালে লোকে বলিত 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য্য অস্ত যায় না'। আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য লোপ পাইলেও বলা চলে 'কমনওয়েলথ দেশসমূহ হইতে সূর্য্য অস্ত যায় না'।

১০

কমনওয়েলথ দেশসমূহের আকার ও জনসংখ্যা নিম্নলিখিত পরিসংখ্যান হইতে জানা যাইবে। এক একটি কমনওয়েলথ দেশের অধীন বা তত্ত্বাবধানে আছে এরূপ দেশসমূহের নামও সংশ্লিষ্ট দেশের নামের পরে দেওয়া হইয়াছে :

(ক)

দেশ	ভূমির পরিমাণ (বর্গমাইল)	জনসংখ্যা
(১) যুক্তরাজ্য	৯৪,২০৫	৫,১২,০৮,০০০ (১৯৫৬)
(২) কানাডা	৩৮,৪৫,৭৭৪	১,৬৭,৪৫,০০০ (১৯৫৭)
(৩) অষ্ট্রেলিয়া (কমনওয়েলথ অব)	২৯,৭৪,৫৮১	৯৫,৩৫,৩৩৪ (১৯৫৬)
কোকোস দ্বীপপুঞ্জ	৫	৬৫২ (১৯৫৫)
নরফোক দ্বীপ	১৩'৩	৯৪২ (১৯৫৪)
পাপুয়া	৯০,৫৪০	৪,৬৪,৭০৯ (১৯৫৪)
নিউগিনি	৯৩,০০০ (আনুমানিক)	১২,০৬,৭৫৯ (১৯৫৪)
নাউরু	৮'২৫	৩,৪৭৩ (১৯৫৪)
দক্ষিণ মেরুদেশ	২৪,৭২,০০০ (আনুমানিক)	স্থায়ী অধিবাসী নাই
হার্ড এবং ম্যাকডোনাল্ড দ্বীপপুঞ্জ	১৫৯	স্থায়ী অধিবাসী নাই
(৪) নিউজিল্যাণ্ড	১,০৩,৭৩৬	২২,৪৩,৮৬৭ (১৯৫৭)
ইহার অধীন দ্বীপসমূহ	১৯৯	২৩,০৪৪ (১৯৫৬)
রসদেশ	১,৭৫,০০০ (আনুমানিক)	স্থায়ী অধিবাসী নাই
পশ্চিম সামোয়া	১,১৩৩	৯৭,৭৩২ (১৯৫৬)
(৫) দক্ষিণ আফ্রিকা (ইউনিয়ন অব)	৪,৭২,৬৮৫	১,৪১,৬৭,০০০ (১৯৫৭)
প্রিন্স এডওয়ার্ড ও মেরিয়ন দ্বীপপুঞ্জ	১৩৫	স্থায়ী অধিবাসী নাই
দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা	৩,১৭,৭২৫	৪,১৪,৬০১ (১৯৫৬)
(৬) ভারত (সাধারণতন্ত্র)	১১,৭৬,০০০	৩৭,৬৭,৫০,০০০ (১৯৫৪)
সিকিম	২,৭৪৫	১,৩৭,৭২৫ (১৯৫১)
(৭) পাকিস্থান (ইস্লামিক গণতন্ত্র)	৩,৬০,৭৮০	৮,৩৬,০৩,০০০ (১৯৫৬)
(৮) সিংহল	২৫,৩৩২	৮৯,২৯,০০০ (১৯৫৬)
(৯) ঘানা	৯১.৮৪৩	৪৬.৯১,০০০ (১৯৫৬)
(১০) মালয় (ফেডারেশন অব)	৫০,৬৯০	৬২,৭৭,০০০ (১৯৫৭)
(১১) রোডেশিয়া ও নাইসাল্যাণ্ড (ফেডারেশন অব)	৪,৮৭,৬৪০	৭০.৭১.০০০ (১৯৫৫)

নিম্নলিখিত দেশসমূহের শাসকের দায়িত্ব যুক্তরাজ্যের উপর এবং ইহাদের পরিচালন কমনওয়েলথ দপ্তর মারফৎ হইয়া থাকে :

(খ)

দেশ	ভূমির পরিমাণ (বর্গমাইল)	জনসংখ্যা
বাসটুল্যাণ্ড (কলোনী)	১১,৭১৬	৬,৪১,৬৭৪ (১৯৪৬)
বেচুয়ানাল্যাণ্ড (আশ্রিত রাজ্য)	২,৭৫,০০০	২,৯৩,৩১০ (১৯৪৬)
সোয়াজীল্যাণ্ড (আশ্রিত রাজ্য)	৬,৭০৪	২,৪১,৮৬৫ (১৯৫৬)
ম্যালদীভ দ্বীপপুঞ্জ	১১৫	৯০,০০০ (১৯৫৭)

দেশ	শাসন পদ্ধতি	ভূমির পরিমাণ (বর্গ মাইল)	জনসংখ্যা (১৯৫৬)
পূর্ব আফ্রিকা			
কেনিয়া	কলোনী এবং আশ্রিত রাজ্য	২,২৪,৯৬০	৬১,৫০,০০০
ট্যাঙ্গানিকা	অছিদেশ	৩,৬২,৬৮৮	৮৪,৫৬,০০০
ইউগ্যাণ্ডা	আশ্রিত দেশ	৯৩,৯৮১	৫৫,৯৩,০০০
সোমালিল্যাণ্ড	"	৬৮,০০০	৬,৫০,০০০
জাঞ্জিবার (পেম্বা সহিত)	"	১,০২০	২,৮০,০০০
মধ্য আফ্রিকা			
উত্তর রোডেসিয়া ন্যাইসাল্যাণ্ড	ইহারা কমনওয়েলথভুক্ত এবং দক্ষিণ রোডেসিয়া কর্তৃক পরিচালিত হইলেও কলোনীয়ান দপ্তরের অধীন।		
পশ্চিম আফ্রিকা			
গাম্বিয়া	কলোনী এবং আশ্রিত দেশ	৪,০০৩	২,৮৭,০০০
নাইজিরিয়া (ফেডারেশন অব)	কলোনী, আশ্রিত দেশ, ক্যামারুণ প্রদেশটি অছি এলাকাভুক্ত	৩,৭৩,২৫০	৩,৩৩,৬৮,০০০
সিয়েরালোন্	কলোনী ও আশ্রিত দেশ	২৭,৯২৫	২১,০০,০০০
দূর প্রাচ্য			
ব্রুণি	আশ্রিত দেশ	২,২২৬	৬৫,৯০০
হংকং	কলোনী	৩৯১	২৪,৪০,০০০
উত্তর বোর্ণিও	কলোনী	২৯,৩৮৭	৩,৬৪,০০০
সারাওয়াক্	কলোনী	৪৭,০৭১	৬,২৬,০০০
সিঙ্গাপুর	৩রা জুন ১৯৫৯ আভ্যন্তরিক স্বরাজ পাইয়াছে	২২৪	১২,৬৪,০০০
ক্রিসমাস দ্বীপ	কলোনী	৬২	
ভারত মহাসাগর			
এডেন	কলোনী ও আশ্রিত দেশ	১,১২,০৮০	৭,৮৮,০০০
মরিশস ও অধীন দেশসমূহ	কলোনী	৮০৯	৫,৮৫,০০০
সিসিলেস	কলোনী	১৫৬	৪০,৪০০
ভূমধ্য সাগর			
সাইপ্রাস	কলোনী	৩,৫৭২	৫,২৬,০০০
জিব্রাল্টার	কলোনী	২.২৫	২৫,০০০
মাল্টা	কলোনী (আভ্যন্তরিক স্বয়ংশাসিত)	১২২	৩,১৪,০০০
আটলান্টিক মহাসাগর			
ফক্‌ল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ	কলোনী	৪,৬১৮	২,২০০
সেণ্ট হেলেনা	কলোনী	৪৭	৪,৬০০
এসেনসন	সেণ্ট হেলেনার অধীন	৩৪	৩৯০
ক্রিষ্টান দা কুন্‌হা	সেণ্ট হেলেনার অধীন	৩৮	২৮০
বৃটিশ কেরিয়ান (বাহামা এবং বারমুডা সহিত)			
বাহামা	কলোনী	৪,৪০৪	৯৫,৫০০
বারবাডোক্	কলোনী	১৬৬	২,২৮,০০০
বারমুডা	কলোনী	২১	৪০,৮০০
বৃটিশ গায়েনা	কলোনী	৮৩,০০০	৪,৯৯,০০০
বৃটিশ হণ্ডিউরাস্	কলোনী	৮,৮৬৬	৮২,০০০
জামেইকা	কলোনী	৪,৪১১	১৫,৪২,০০০

কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ	জামেইকার অধীন	১০০	৮,১৬০
টার্কস্ ও কেইকস দ্বীপপুঞ্জ	জামেইকার অধীন	১৬৬	৫,২৫০
লীওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জ			
অন্টিগুয়া	কলোনী	১৭১	৫৩,০০০
মন্টসিরাট্	"	৩২	১৪,৪০০
সেণ্টকৃষ্টফর ও নেভিস্	"	১৫৩	৫৪,৮০০
ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ	"	৬৭	৭,৬৮০
ত্রিনিদাদ ও টোবাগো	"	১,৯৮০	৭,৪৩,০০০
ডোমিনিকা	"	৩০৫	৬২,১০০
গ্রেনাডা	"	১৩৩	৮৮,২০০
সেণ্ট লুসিয়া	"	২৩৮	৮৭,২০০
সেণ্ট ভিনসেণ্ট	"	১৫০	৭৬,৬০০
পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয়			
ফিজি	কলোনী	৭,০৪০	৩,৪৬,০০০
পিটকার্ণ	কলোনী	২	১৪০
টোঙ্গা	আশ্রিত দেশ	২৬৯	৫৩,৮০০
(হাইকমিশনের এলাকাধীন)			
বৃটিশ সলোমান দ্বীপপুঞ্জ	আশ্রিত দেশ	১১,৫০০	৯৯,২০০
জিলবার্ট ও এলিস দ্বীপপুঞ্জ	কলোনী	৩৬৯	৩৯,০০০
নিউ হেব্রিডিজ	ইঙ্গ-ফরাসী যুক্ত শাসন	৫,৭০০	৫২,৯০০

নিম্নলিখিত দেশসমূহের শাসনের দায়িত্ব যুক্তরাজ্যের এবং ইহাদের পরিচালন ঔপনিবেশিক দপ্তর মারফৎ হইয়া থাকে :

উপরোক্ত বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, যুক্তরাজ্য অর্থাৎ খাস গ্রেটবৃটেন ব্যতীত কমনওয়েলথ সদস্য অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকার অধীনে এখনও বহু অনুন্নত ও অধীন দেশ রহিয়াছে। এই সকল অঞ্চলকে স্বায়ত্ত শাসনের পথে লইয়া যাওয়া শাসক দেশের কর্ত্তব্য ইহাই রাষ্ট্রসঙ্ঘের আদর্শ ও নির্দ্দেশ। এজন্য অছি দেশসমূহ ছাড়াও শাসক দেশকে উহার অধীন দেশসমূহের ক্রমোন্নতি সম্বন্ধেও রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিকট রিপোর্ট পেশ করিতে হয়। বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একদিকে যেরূপ সকল দেশের পরাধীনতা দূর করা দরকার অপর দিকে প্রত্যেক দেশেরই নানাভাবে বিশেষতঃ খাওয়া-পরার অর্থাৎ আর্থিক উন্নতির প্রয়োজন। এই সকল আদর্শের রূপায়নের দায়িত্ব শাসক দেশসমূহের উপর বর্ত্তাইয়াছে। সুতরাং কমনওয়েলথ দেশসমূহের মধ্যে যুক্তরাজ্যের দায়িত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধীন।

"কুড়পাড়ি"

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

একই নিয়মে বলা যায়—গেঁয়ো যুগী যেমন ভিক্ষু পায় না, কাছের তীর্থেরও তেমনি আদর নেই মানুষের কাছে। কপিলেশ্বরস্থানের কথা বলছি। জায়গাটি এককালে কপিল মুনির আশ্রম ছিল বলে পরিচিত এখানে। আমাদের সহর থেকে পনের-ষোল মাইল, বড় রাস্তার ওপরে, পিচ-ঢালা হয়ে রাস্তা আরও সুগম, তবু এখানকার এই বাট বৎসরের বাসে মাত্র একবার গেছি। তাও কপিলেশ্বর-স্থান উদ্দেশ করেই নয়। পথে যেতে যেতে নেমে একবার ঠাকুরের সামনে মাথা ঠুকে আসা। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা, আমাদের তখন ফুটবলের যুগ চলছে। নির্ভেজাল ভক্তির যুগ। দেবতা বাছি না, পীর বাছি না, দেখলেই মাথা নোয়াচ্ছি, একমাত্র প্রার্থনা—"ঠাকুর, গোল করিয়ে দাও।"

ফুটবলের দল নিয়েই যাচ্ছিলামও সেবার। মনে আছে আবদুল গনি বলে দিয়েছিল, "ভাই হামারে বাস্তে ভি দোবের কপাড় ঠোক লেনা।" অর্থাৎ তার হয়েও যেন বার দুই কপাল ঠুকে নিই। ওরাও সমস্যার গুরুত্ব বুঝে দেবতা-পীর বাছত না।

আজ আবার এতদিন পরে কপিলেশ্বরস্থান টানল কেন বুঝতে পারলাম না। হয় তো এও সেই রকম ফাঁকির ভক্তি; ভয়ের ভক্তিই বলা যাক! কোন তীর্থই সারা হোল না তো জীবনে, এ দিকে জবাবদিহির দিন দ্রুত এগিয়ে আসছে, অন্তত হাতের কাছেরটা সেরে নিয়ে দোষ খণ্ডন করে রাখা যাক।

সঙ্গে নিলাম বাড়ির এক রকম সবাইকেই, নাতনী সুতপাটিকে পর্যন্ত। বছর খানেকের মানুষ, কিন্তু বয়সের দিক দিয়ে তীর্থ করবার মতো না হলেও মনের দিক দিয়ে এ রকম পাকা বুড়ী হয়ে গেছে এরই মধ্যে যে নেহাৎ বে-মানান হবে না। তা ভিন্ন আধুনিকা মেয়ে, এর পর ঠাকুর-দেবতাদের আমল দেবে কি না কে জানে, ভাবলাম একেবারেই যে বাদ দেয় নি তার একটা দলিল তোয়ের করে রাখা ভালো।

ঘণ্টাখানেকের পথও নয়; বিকাল হয়ে এলেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। শীতকাল, সন্ধ্যা হতে হতে ফিরে আসতে পারলেই ভালো।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে উত্তরমুখো হয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাদের মোটরটা সহরের প্রত্যন্ত ভাগে এসে পড়ল এবং তার পর একটু পূর্বমুখো হয়ে ছুটতে আরম্ভ করল। এদিকটা আমাদের সহরের খিড়কির দিক। মিথিলার সব চেয়ে বড় সহর আমাদের এটা, রাজধানীই বলা চলে, কিন্তু মিথিলার ছাপ পাওয়া যাবে না এখানে—এই জগাখিচুড়ির যুগে কোন্ রাজধানীতেই বা সে দেশের ছাপ আছে? কলকাতায় বাংলার ছাপ আছে? বোম্বাইয়ে মারাঠার ছাপ আছে? আসল কথা, সব সহরেরই কেন্দ্র থেকে নিয়ে সদরের দিকটা আগাগোড়াই বহির্বিশ্বের সঙ্গে ওতঃপ্রোতঃ। দেশকে খুঁজতে হলে তার খিড়কির দিকেই খুঁজতে হয়।

সহরে থেকে থেকে যেন দেখাই হয় নি এত দিন এই মিথিলা দেশটাকে। কিংবা বাল্য আর প্রথম-যৌবনের মুক্ত জীবনে কবে হয়েছিল একবার দেখা—পরে অশেষ-বিধ দেখার মধ্যে, জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে লুপ্ত হয়ে গেছে।

আবার আজ নূতন করে দেখতে দেখতে চলেছি।

মাঠের পর মাঠ একেবারে সেই দিগন্ত পর্যন্ত পড়েছে লুটিয়ে। শীতের ফসলে ঢাকা—গাঢ় নীল খেঁসারি, কলাইয়ের চাষ, তিসির নীল ফুলের বিন্দুগুলা বাতাসে দোল খাচ্ছে—তার পাশেই একখানা হলুদ চাদর এমুড়ো-ওমুড়ো রোদে বেছানো; সর্ষের ফুল ধরেছে। গমের-যবের মাঠেও সোনালী রং ধরতে আরম্ভ হয়েছে। একটার গায়ে একটা এই পাঁচরঙা ফসলের মাঠ একেবারে দূর-দিগন্তে গেছে মিশে। আজ আকাশ পরিষ্কার; উত্তরে আমাদের বাঁয়ে দিক-রেখার খানিকটা ওপরে পূব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত আকাশের গায়ে একটা উঁচু-নিচু রূপালী রেখা—হিমালয়ের তুষার শৃঙ্গমালা—এখান থেকে শ'দুয়েক মাইল তো বটেই। রোদ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানে-ওখানে সোনালী ছোপ ধরছে।

রাস্তার দু'ধারে, দূরে কাছে গ্রাম। বড় বড় আম-বাগানে একটা থেকে একটাকে করেছে আলাদা। আম-বাগান না হোল তো মাঠই। না হয় কমলা নদীর কোনও খুঁতি। অনেক ছেলেমেয়ে ঘিরে ঘর করে কমলা-মাঈ,

পশ্চিম-মিথিলার সমস্তটায় তারা আছে ছড়িয়ে। পূবে আছে কুশী তার বৃহত্তর পরিবারবর্গ নিয়ে।

ঢালু পথ, কত দূর থেকে এসে ঐ হিমালয়ের কোল লক্ষ্য করে চলেছে। শীতের পথ, বেশ লোক চলাচল। এক এক জায়গায় একটু ভীড়ের মতোই। বোধ হয় হাট বসবে কোথাও। চলেছে সবাই; খদ্দের, তার সঙ্গে বেচনদারও। কারুর ঝুড়িতে চারটে লাউ, কারুর মাথায় চালের থলে, হয় তো বা চিড়েরই। মিথিলা হচ্ছে কলায়ের দেশ। আমাদের মোটর হর্ণ দিতে দিতে চলেছে।

পুকুর ঘাটে গ্রাম্য মুখিয়াদের 'চণ্ডীমণ্ডপ' বসেছে। উপুর হয়ে ব'সে গামছা দিয়ে হাঁটু দুটো জড়ানো। খৈনি চলছে। একটা "ঠাহাক্কা" উঠল সমবেত কণ্ঠে। "ঠাহাক্কা" হচ্ছে এদের প্রাণখোলা হাসি; একেবারে আকাশ লক্ষ্য করে ছোটে।

একটি পাকুড় গাছের ছায়ায় একটি মাঝারি গোছের "বরিয়াৎ" আড্ডা জমিয়েছে। বরিয়াৎ অর্থাৎ বরযাত্রী। ফিরতি বরিয়াৎ। রাঙা মোজা, হলদে কাপড়, রাঙা উড়ানি, মাথায় রাঙা পাগ বর রয়েছে এক ধারে বসে। রং-করা বড় বড় চ্যাঙারিতে উপঢৌকন। বড় বড় মাটির গামলা আর আলপনা-আঁকা হাঁড়িতে দই। যাত্রীরা আশে-পাশে ছড়িয়ে রয়েছে; কেউ বসে, কেউ হেলান দিয়ে। একটু তফাতে শালু-ঢাকা পাল্‌কির ভেতর থেকে ক'নে-বৌয়ের স্তিমিত কান্নার স্বর আসছে ভেসে।

স্বপার মা দেশের মেয়ে, খাস হাওড়া-সহরের, অবাক হয়ে গেছেন। স্বপাকে ধরে রাখা দুষ্কর হয়ে উঠেছে গাড়ির মধ্যে। এত বিচিত্র সঙ্গী, নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়ার এমন খোলা জায়গা—অত মোটর গাড়ি বন্দী-শালা হয়ে উঠেছে তার পক্ষে।

স্বপার মার কথা ফুটল ত একেবারে যেন কোন্ সেই আদি যুগে চলে গিয়ে।

"হ্যাঁ সেজো কাকা, একটা কথা জিগ্যেস করি?"

"কি কথা মা?" প্রশ্ন করলাম আমি।

"রামচন্দ্র সীতাকে বিয়ে করে এই পথেই তো নিয়ে গিয়েছিলেন?"

"আর কোন্ পথে যাবেন মা? তবে আমাদের সময়ের মতন নিশ্চয় এমন পিচ-ঢালা ছিল না পথ।"

গাড়ির মধ্যে নানা কথা নিয়ে যে আলোচনা চলছিলো মেয়েদের মধ্যে, তা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। বুঝছি স্বপার মার কথার সূত্র ধরে সবার মনই চলে গেছে সেই যুগে। হস্তী-অশ্ব-পদাতিক নিয়ে ঋষি-মুনি রাজন্য আর সামান্য-জনের সে কী বিরাট মিছিল! বীর-বীরোত্তমদের মাথা হেঁট করিয়ে রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করলেন। মহামহিমান্বিত অযোধ্যাপতি রাজর্ষি জনকের অলোকসামান্যা দুহিতাকে পুত্র-বধূ করে নিয়ে যাচ্ছেন। এই পথই তো! সে আনন্দ-মিছিলের নৃত্যগীতের গুঞ্জন, তূর্য-ভেরীর নিনাদ যুগের অলিন্দ বেয়ে আজও আসছে ভেসে, এই পথের যাত্রী একটু কান পাতলেই শুনতে পাবে বৈকি!

অনেকক্ষণ পর্যন্ত একটা স্তব্ধতা ছেয়ে রইল গাড়ির ভেতর, শুধু মসৃণ পথে মোটরের একটা সির্‌সির্‌ শব্দ।

কথা জোগালে বধূমাতা বেশিক্ষণ চেপে রাখতে পারেন না। সেই সমারোহের স্মৃতি থেকেই যেন বেরিয়ে এসে বললেন—"আপনি যেমন বলছেন এমন চমৎকার পিচ-ঢালা রাস্তা ছিল না মেজ কাকা, তেমনি আমিও একটা কথা বলব?"

উত্তর করলাম, "বলো না মা!"

"সোনার-রাস্তা হয়ে গিয়েছিল। রাম-সীতা যাচ্ছেন, সোজা কথা।"

হেরে গিয়ে ওঁকেই করলাম সমর্থন—"তা যেমন বলেছ। পায়ের আঙুল ঠেকে পাথর মানুষ হয়ে গেল, মাটি সোনা হয়ে উঠবে এ আর বেশি কথা কি?"

এর পরে যে স্তব্ধতাটুকু এসে পড়ল তা আমাদের একেবারে কপিলেশ্বরস্থানের আনাচেয় পৌঁছে দিল।

পুরাদস্তুর তীর্থ কপিলেশ্বরস্থান, গাড়ি থেকে নামতে-না-নামতে পাণ্ডার দল ঘিরে নিল আমাদের। কিছু জানবার-বোঝবার আগে একজন দখল করেও নিল। "ঘ…ঝা।"

"আমি আছি অমুক ঝা বাঙালীবাবু। বাবার পাণ্ডা। খুব ভালো করে বাবার দর্শন করিয়ে দেবো মাঈজীদের; পুরনো, বনেদী পাণ্ডার ঘর আমাদের, সেই কপিলমুনির সময় থেকে এই কাজ করিয়ে আসছি হাম সব। কিছু দিতে ইচ্ছে হোয় দিবেন, না ইচ্ছে হোয় দরকার না আছে। পুরুষানুক্রমে এই কাজ হাম লোগোদের—ভক্তের সেবা—ভক্ত আবার ভগবানের চেয়ে বড় কি না, গোস্বামী তুলসীদাসজী বলিয়েছেন…"

কি বলেছেন জানা না থাকার জন্যই হোক, অথবা দখল করবার একটা চমৎকার আইডিয়া হঠাৎ মাথায় এসে যাওয়ার জন্যই হোক, "ঘ… ঝা" মাঝখানেই কথাটা থামিয়ে দিয়ে হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "এসো খোঁখী।…আহা কী রূপ আছে! যেনো সাক্ষাৎ পার্বতী মাঈ!"

বন্দীদশা থেকে মুক্ত হুপাও আমার কোল থেকে পড়ল ঝাঁপিয়ে। "ঘ···ঝা"র কাছে বন্দী হলাম।

একেবারে রাস্তার ধারেই দুটি মন্দির, মুখোমুখি হয়ে। মাঝখানে একটা বাঁধানো চত্বর। পাশেই একটা ছোট-খাট বাজার; গোটা তিন-চার দোকানে চিঁড়া-মুড়ি, বাতাসা, পানতুয়া-জিলাপি-প্যাঁড়া—কতকালের বলা শক্ত—এক মেলা থেকে অন্য মেলা পর্যন্ত আয়ু তো—কত আয়ু নষ্ট করবে এর মধ্যে, ভূতের পাল বাড়াবে বাবা কপিলেশ্বরের···

"হাত-পা ধুয়ে নিবেন চলুন আগে—মাঈজীরা আসুন।"

গাড়ির জড়তা ঝেড়ে ফেলে পুকুরের দিকে এগুলাম আমরা। প্রশস্ত পুকুর। অনেক আগে যা দেখেছিলাম তার চেয়ে অবস্থাটা এখন যেন অনেক ভালো বলে মনে হোলো। সমস্ত পুকুরটা ঝালিয়ে, পাড় ঠিক করে দিয়ে চমৎকার একটি ঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছেন দ্বারভাঙার মহারাণী। তরতরে জল, আকাশের নীলিমা বুকে করে আছে পড়ে। ঝিরঝিরে হাওয়ায় শীতের কুঞ্চনের মতো একটা বিচিভঙ্গ উঠেছে।

সবাই নেমে মুখ-হাত-পা ধুয়ে নিলাম। মাথায় জল ছিটিয়ে মনে হোলো একটা যেন হোলো পরিবর্তন। বলে তীর্থ-পুষ্করিণীতে গঙ্গা অধিষ্ঠান করেন। অন্তত এখানে তো করতেই হবে, শিব-তীর্থই তো।

যতটা পারছি পেছনের জঞ্জাল ঝেড়ে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি মন্দিরের দিকে, কিন্তু হায়! মাটির মলা এড়ানো কি এতই সহজ?

সেই কথাই ভাবছিলাম ঘাটের একটা পৈঠায় বসে।

দেব দর্শন হয়ে গেছে আমাদের। বেশ হচ্ছিল—আপনভোলা ভোলানাথের মন্দিরে গিয়ে যেমন বরাবর হয়ে এসেছে, সঙ্কোচ নেই, অন্য সব দেবমন্দিরের মতো পদে পদে অপরাধের শঙ্কা নেই। জল ঢেলে, দুটো বিল্বপত্র আর দু'খানা বাতাসা ফেলে দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া, এই তো পূজা। বেশ মনে হয় না যে নিতান্ত আপনজনের কাছে এসে পড়েছি? হুপার মাথাটা জোর করে ঝুঁকিয়ে বেদিতে ঠেকিয়ে দিতে মাথা তুলে "উঃ!" করে একটা ধমকই দিল ঠাকুরের দিকে চেয়ে—যেমন আর সবাইকেই দিচ্ছে কথায় কথায় আজকাল, বুড়োর-শিশুতে কি বোঝা-পড়া হোলো। "ঘঝা"র মতে যদি পার্বতী মাঈ-ই তো কলহের পূর্বাভাস নাকি কর্তা-গিন্নিতে? একটা অপরূপ তৃপ্তিতে ভরে এসেছে মনটা, ঠিক এই সময় আঘাতটা এসে পড়ল।

"ঘ···" ঝা বেদীর ওপর থেকে বিল্বপত্র, আলোচাল, বাতাসা সরিয়ে পয়সা-রেজগিগুলা তুলে তুলে নিচ্ছিল, আমি হাত পেতে বললাম—"একটু প্রসাদ বাবার।"

"শিবের প্রসাদ তো খেতে নেই!" বেশ বিস্মিত হয়েই "ঘঝা" চাইল আমার পানে। বিস্ময়ে চোখ ফেরাতে পারছে না, এত বয়সেও এই সামান্য কথাটা জানি না আমি! আরও সবাইয়েরও যেন তাক্ লেগে গেছে, অনেকে তো জড়ো হয়েছে মন্দিরে, সহর থেকে বাঙালীবাবু এক এসেছে সপরিবারে, মোটরে করে।

আমার বিস্ময় ওর চেয়ে কম নয়। ধাক্কাটাও তাই তেমনি রূঢ়। শিবঠাকুরের সঙ্গে আমার আদান-প্রদান এক ছিল সেই পরীক্ষা দেওয়া আর ফুটবল-খেলার যুগে। বাল্য-যৌবনের কথা। মাথায় হাত বুলিয়ে মাথা ঠুকে চাল-কলা-বাতাসা, যা পেয়েছি, তুলে নিয়ে গালে ফেলে দিয়েছি। পাশ করেছি, গোলও করেছি। তার পর আর সবার কাছে যখন জীবনের তত্ত্ব অন্বেষণের যুগ, আখেরের জন্য সঞ্চয় করছে তখন আর দেখা সাক্ষাৎ কোথায়?

আঘাতের প্রতিক্রিয়াতে কিন্তু দেরি হোলো না আমার। "ঘ···ঝা" বাইরের ছেলেমেয়েগুলাকে দেওয়ার জন্য এক মুঠা বাতাসা তুলে নিয়েছিল, বললাম—"না, দাও, আমার খেতে আছে।"

খান দুই তুলে নিয়ে উঠে পড়লাম। একটা নিজের মুখে ফেলে দিলাম, চূর্ণ করে একটু হুপার মুখে।

এদিককার মন্দিরে পার্বতীর মূর্তি। প্রসাদময়ী রাজরাজেশ্বরী।

ঘাটের রাণায় এসে বসলাম। ওপারে, অনেকখানি তফাতে মেয়েরা চৌত জেলে ঘিরে বসেছে; চা, হুপার দুধ।

বড় আঘাত পেয়েছি। হিন্দুধর্মের জটিলতা, যতই পাক খুলতে যাচ্ছি, যেন জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে আরও। এ কি করে সম্ভব? কবে কোথায় যেন পড়েছিলাম, শিব হচ্ছেন অনার্যের দেবতা, সেই জন্যই কি ব্রহ্মণ্য আর্যের এই ঔদ্ধত্য? অথচ বরদানে খোলা-হাত বলে বেশ স্বীকার করে নিল তো দেবাদিদেব বলেই। আর তা কি সত্যই নয়?

আকাশ মলিন হয়ে আসছে, যেন আমার মনের,

প্রতিচ্ছায়া নিয়েই। সব কেমন যেন বিষাদ বলে মনে হচ্ছে কিছু নয়, অথচ যেন সহ্য হয় না।

একটু আলো দাও আমায়···

"বাবুজী!"

একটু চকিত হয়েই ঘুরে দেখি "ঘ···ঝা" পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

প্রশ্ন করলাম, "কি?"

একটু তফাৎ হয়ে পাশে বসল।

"আপনি তোখন, বাবার পরসাদ অমন করে ছিনিয়ে নিলেন···"

বিমূঢ়তার মধ্যে ওর ওপরই বিরক্তিটা এসে পড়ল আর কিছু হাতের কাছে না পেয়ে। ঘুরে বসে বললাম— "ঠিক কথা পাণ্ডাজী, আপনারা তো বংশানুক্রমে বাবার সেবায় লেগে রয়েছেন, সব দেবতার ওপরে তিনি—দেখতেও পাওয়া যায় তাই—সবারই কোন না কোন গলদ আছে, একেবারে নিদাগ, তবু তাঁর প্রসাদ খাওয়া হবে না কেন বুঝিয়ে দিতে পারেন আমায়?"

একটু হকচকিয়ে গেছে। আমতা-আমতা করে উত্তর করল,—"উঠো ঠিক না আছে বাবুজী।"

"কিন্তু কেন ঠিক নয়?—সেই কথাই জানতে চাই আমি।"

"এথি···শাস্ত্রের মানা আছে।"

"কিন্তু মানাটা কেন? একটা হেতু থাকবে তো? এক্ষেত্রে তা তো নেই-ই, আরও যেন উলট কাণ্ড।"

মাথা চুলকাতে লাগল হেঁট হয়ে "ঘ···ঝা"। বার দুই কুণ্ঠিত ভাবে আড় চোখে চাইলও আমার মুখের দিকে, আবার চেয়ে ওর সমস্যাটা কম নয়; দক্ষিণাটা পায় নি এখনও।

এক সময় মুখটা ওর উজ্জ্বল হয়ে উঠল, যেন হঠাৎ মস্ত বড় একটা সমাধান পেয়ে গেছে। মাথা তুলে বেশ সপ্রতিভ হাসি নিয়ে বলল—"আছে কারণভি বাঙালী-বাবুজী—আছে, আছে, আপনি নাহক গোস্‌সা করছেন···"

"কারণটা তাহলে?···" প্রশ্ন করলাম আমি।

"ফুড্‌ পাজনি বাঙ্‌লীবাবুজী।"

"সেটা আবার কি জিনিস?"

"এটা অঘন্ মাস আছে। গেলো শাওন মাসে আমাদের গ্রামে ফুদ্দি ঝার বালকের উপনয়ন ছিল। সব গৌয়াদের ভোজ দিলে, যেতো বরাহমন ছিল। ঘরে এসে সোবার পেটে দরদ, তার থেকে সে এক রকম কলেরাই বোলা যায়। একলা হীরাবাবু ডাগদর কি করবে? পাশের গাঁও থেকে দু'জন অওর ডাগদর এসে কোন প্রকারসে সামলে নিল। পরদিন হল্লা—খোঁজ্‌ খোঁজ্‌ কি বাত আছে। দেখা গেলো তামার বর্তনে খট্টা (অম্বল) ছিল, একেবারে···"

"বুঝেছি—ফুড পয়েজনিং (Food Poisoning) কিন্তু শিবের প্রসাদ তো একটু চাল, কলা বা বাতাসা, তাও পরিষ্কার পাথরের ওপর—নিত্যি জলঢালা হচ্ছে—বিল্বপত্রের কাছেও শুনেছি রোগের বীজ ঘেঁষতে পায় না···"

"অ-হ-হ, আপনি সোমঝালেন না। মহাদেবজী তো গাঁজা-ভাং-ধুতুরা নিয়ে আছেন। একবার ভাবিয়া দেখুন বাবুজী—পরসাদ তো তাঁর মুখের উচ্ছিষ্টই আছে—ফুড-পাজনি হোবে কি হোবে না।···আপনার হাঁসি আসছে বাবু, লেকিন খেয়াল করুন—বাজারের ভেজাল মাল নোর, খাস হিমালোয়ের এক নম্বর গাঁজা-ভাং-ধুতুরা—রত্তিভর পরসাদিতে লাগিয়ে গেলে ভক্তদের কি হালত হোবে—তামার বর্তনে যে-লোকদের একটু খট্টা বরদাস্ত হোয় না···"।

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীরেণু গঙ্গোপাধ্যায়

স্রোতস্বিনী জীবনের নদী, মিশে গেছে মৃত্যুর সাগরে,
তাই আজ সর্ব্বহারা বাঙালীর ঘরে,
অশ্রুর অশ্রুত বাণী উঠে গুমরিয়া,
দিনান্তে নিশান্তে শীত-শরৎ ব্যাপিয়া,
কাঁদে ব্রীড়ানতা বধূ গুণ্ঠনেতে আনন আবরি,
কে তাহার গুপ্ত ব্যথা স্মরি,
অমর কাব্যের ছন্দে প্রদানিবে অনন্ত আশ্বাস,
কেবা বারো মাস
ঋতুচক্রে রসচক্র করিবে সৃজন।
নর-কে নরের মূল্য দিতে কেবা হবে আগুয়ান?
নির্ভীক উদাত্ত স্বরে কে গাহিবে দাব-দগ্ধ জীবনের গান?
পল্লীর মালঞ্চ-ভরা মধুকর গুঞ্জিত ছায়ায়,
গোলাপের ঘুম-ভাঙ্গা লজ্জারুণ হাসির আভায়,
নগরের হেম-হর্ম্মে, বাসর শয্যায়,
কিশোরীর কলভাসে, তরুণীর বিরহ ব্যথায়,
ঝিল্লিমন্ত্রে, কেকারবে, বাঁশরী নিঃস্বনে,
রুদ্র-ঋষি বৈশাখের অশান্ত পবনে,
ছাতারের শালিখের ভোজনের মাঝে,
কর্ম্মক্লান্ত দিবসের খুঁটিনাটি দৈনন্দিন কাজে,
যে সুর ধ্বনিয়া উঠে মাটি হতে আকাশের পানে,
কে তারে রাখিবে ধরি ছন্দোময়ী গানে?

কাঁদে আমলকী বন,
তুমি তার নিতান্ত আপন,
শীতের কাঁপনে যবে শাখা তার উঠিবে শিহরি,
একে একে হিমবারে পাতা যাবে ঝরি,
কে মুছাবে অশ্রু-আঁখি তার?
ঝটিকায় বারংবার
তালী-বীথি মাথা করে নত।
তোমা বিনা তাহার জীবন-কাব্য রবে অনাখ্যাত,
কাঁদে শিশু, তাহার অবুঝ ভাষা কে বুঝিবে আর?

কে নামাবে হৃদয়ের ভার?
অশ্রুমুখী ভারত জননী
তুমি তার নয়নের মণি
প্রচারেছ সারা বিশ্বে বেদ উপনিষদের কথা।
ভূমানন্দে উদ্বেলিত হৃদয়ের অপূর্ব্ব বারতা,
পরাধীনতার পঙ্কে এ জাতির বিষাদ সন্ধ্যায়,
কাব্যে, গানে, অমর গাথায়,
পৌরুষ উদার কণ্ঠে মুক্তিধারা বয়ে এনেছিলে।
দেশাত্মবোধের বাণী তুমিই শোনালে।
যান্ত্রিক সভ্যতা
গর্ব্বোদ্ধত পশ্চাত্ত্যেরে শুনাইলে যবে মোহমুক্ত কথা
প্রাচ্যের উদয়াকাশে তব দিব্যজ্যোতি
অকপটে জানাইল নতি
নীবার ধানের মুষ্টি, বল্কল বসনে,
নিত্য সত্য-মুখরিত মঞ্জু সম-গানে,
তুমি চাহ নাই কভু পাশ্চাত্ত্যের বস্তুতান্ত্রিকতা
আর্থিক উন্নতি লাগি আত্মার দীনতা,
তাই তব অমর্ত্ত্য রাগিনী
মিথ্যারে উপেক্ষা করি গেয়েছিল সত্য শিব সুন্দরের বাণী
তাই তব উদার কামনা
বক্ষ পাতি' নিয়েছিল ব্যথিতের ভাবনা-বেদনা,
হয়ত বা রেবার কিনারে
তোমার সঙ্গীত শুনি মালবিকা নয়নাশ্রুধারে
বাহিরিবে ক্ষীণ তনু ধরি,
গত মধুযামিনীর সুখ-স্মৃতি স্মরি।
উচ্ছ্বসিত বসন্তের আনন্দ বাসরে
তোমার কবিতা লয়ে তরুণীর দল
আপন হৃদয় কথা ব্যক্ত দেখি হইবে বিহ্বল।
তোমার সঙ্গীত ভর করি
ভেসে যাবে, গলে যাবে, মুছে যাবে, আপনা পাসরি,
ভাব ও ভাষার ইন্দ্রজালে
কাব্যলক্ষ্মীর ভালে যে টিপ পরালে,
তাহার বৈদূর্য্য দ্যুতি চিরদিন রহিবে অম্লান
তুমি রবে চির জ্যোতিষ্মান,
তব অন্তশেষে
মহাকাল রথচক্র কৌতুক-আবেশে
আবর্ত্ত রচেছে কতবার,
সময়ের মহা-পারাবার
অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল আবেগ ক্রন্দনে, পারে নাই ডুবাইতে'
তাই বিচিত্র ভঙ্গীতে
হৃদয় গুমরি উঠে,
স্মৃতিমূলে বেদনার শতদল ফুটে,
শুধু করি আশা
তোমার লেখনী স্পর্শে জীবন্ত হয়েছে যেই ভাষা
তারি মাঝে তুমি চিরদিন রবে অমলিন।
তোমার নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে পাইয়াছে লয়।
তোমার সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টা তুমি অক্ষয় অব্যয়।

রবীন্দ্রনাথের চোখে মৃত্যু

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্র

রবীন্দ্রনাথ কবি, তাঁর সাধনা কবির সাধনা, তাঁর ধর্ম কবির ধর্ম। তাই আমাদের দেখা ও অনুভূতির সঙ্গে তাঁর দেখা ও অনুভূতির অনেক পার্থক্য। আমাদের দেখা ও জানার মধ্যে থাকে স্থূল বাস্তবতা, তাঁর দেখা ও জানার মধ্যে পাই বাস্তব বোধের সঙ্গে হৃদয়ের অনুভূতি। তাই আমরা একই রবীন্দ্রনাথকে দেখি বিভিন্ন রবীন্দ্রনাথ হিসেবে। তাঁর সাহিত্য আমাদের কাছে "নানা রবীন্দ্র-নাথের একখানি মালা।"

রবীনাথ কবি হলেও সাধারণ কবিদের থেকে আপন বৈশিষ্ট্যকে সব সময় তফাৎ করে রেখেছেন। কবি সাধনার দ্বারা শুধু জ্ঞানলাভ করেই সন্তুষ্ট হতে পারেন নি, সাধনা করেছেন অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে। এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব, এই হৃদয়ের যোগ থাকাতে তিনি একই জায়গায় বদ্ধ থাকতে রাজি হন নি। আর এই হৃদয়-অনুভূতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাধনারও হয়েছে পরিবর্তন।

কবি জন্মলাভ করেছেন এই পৃথিবীতে। পৃথিবীর মাটিকে তিনি ভালবাসেন, ভালবাসেন মাটির মানুষকে। তাই কবি বললেন :

"আমি তোমাদেরি লোক
আর কিছু নয়—
এই হোক শেষ পরিচয়।"

পৃথিবীর আলো, পৃথিবীর বাতাস, পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ সবই তিনি উপভোগ করেছেন, অনুভব করেছেন মর্মে মর্মে। পৃথিবীর পশুপক্ষী, গাছপালা, এমনকি পৃথিবীর ধূলিকণার মধ্যে তিনি অনুভব করেছেন জীবনের সাড়া। তাই বিশ্বভুবনকে তিনি সুন্দরের প্রতীক হিসাবে দেখতে পেলেন, তিনি চাইলেন না এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে —"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে"।

তাই বলে কবি মৃত্যুভয়ে ভীত নন। মৃত্যুর বিভীষিকা দেখে তিনি শিউরে ওঠেন নি, দুই বাহু দিয়ে জীবনকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চান নি তিনি। "জন্মিলে মরিতে হবে।" মৃত্যুর যবনিকা একদিন না একদিন জীবনের ওপর আসবে। এই যবনিকার অন্তরালে বিরাজমান রহস্যটা আমাদের সকলকে বিকল করে ফেলে। এই অজানা রহস্যটার সম্মুখীন হ'লে আমাদের মনে জাগে সন্দেহ, সংশয়, দ্বিধা। কবির মনেও ঐরূপ ভাবের উদ্রেক হয়। তাই কবি বললেন, "মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

আসলে কবি চান, "অমরতা।" এই অমরতা তিনি কি করে লাভ করবেন?—"আমি এই সুন্দর ভুবনে মানব জীবনে, অমর হইয়া থাকিতে চাই। এই জগৎ চিরদিন এমনই সুন্দর থাকিবে, মানুষের জীবনও ধরার প্রাণের খেলায় চির তরঙ্গিত, অর্থাৎ মানব-জীবন-ধারা কখনও শেষ হইবে না। ব্যক্তির জীবনেই মৃত্যুর ছেদ আছে, কিন্তু ঐ মানব জাতির জীবনে ছেদ নাই, তাহাতে মৃত্যু নাই। আমি কবি সেই ব্যক্তি-জীবনকে অতিক্রম করিয়া ঐ সর্ব-জীবনে জীবিত থাকিব—যদি মানুষের সুখ-দুঃখ লইয়া এমন কাব্য রচনা করিতে পারি যে, তাহা সর্ব-কালের, সর্ব-মানবের চিত্তে তাহাদের জীবন্ত হৃদয়ে সাড়া জাগায়, কারণ তাহাতেই তাহারা যেমন আমার কবি-হৃদয়কে অনুভব করিবে আমিও তেমনই তাদের সেই অনুভূতিতে বাঁচিয়া থাকিব।" এমনই করে মৃত্যুকে জয় করে এই সুন্দর ভুবনে মানবের মাঝে বেঁচে থাকবেন।

মানব চেতনা দু'প্রকার। একটা "খণ্ড", অপরটা "অখণ্ড"। খণ্ড চেতনার মধ্যে পাই সত্তার স্বীকৃতি, তবে প্রত্যেকটি সত্তা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিরাজ করে। তাদের মধ্যে যোগ-সূত্রের সন্ধান উহা দিতে পারে না। যখন এই বিচ্ছিন্ন সত্তাগুলিকে একই সূত্রে গাঁথা দেখি, অর্থাৎ একটি সত্তার মধ্যে দেখতে পাই তখনই হয় অখণ্ড চেতনার উন্মেষ।

প্রথম পর্বে কবিরও সাধনা খণ্ড চেতনার মধ্যেই সীমা-বদ্ধ ছিল। জীবনের সত্তাকে যেমন তিনি স্বীকার করে-ছেন, মরণের সত্তাকেও তেমনই অস্বীকার করেন নি।

"মরণরে তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান।"

"এই যে মৃত্যুকে প্রিয়তম বলে সম্বোধন, এ শুধু এক-মাত্র রবীন্দ্রনাথই বলতে পেরেছেন। ইহা বৈষ্ণব-ভাবতো নহেই, দেশীও নহে। সমগ্র বৈষ্ণব-সাহিত্যে, এমন কি ভারতীয় প্রেম-কবিতায় মৃত্যুর পূজা নেই। পূজা বলছি, কেন না বেদনাকাতর হৃদয়-রাধা যেন আশ্রয় খুঁজিছে মৃত্যু-রূপী শ্যামের কাছে।"

"তুঁহুঁ মম মাধব, তুঁহুঁ মম দোসর
তুঁহুঁ মম তাপ ঘুচাও,
মরণ, তু আওরে আও।"

"এই যে হৃদয়-বেদনা শ্যাম-বিরহ-যাতনায় মৃত্যুকে অর্থাৎ সকল যাতনার অবসানকে শ্যামের মতই মনে করছে —এর ভাব জগৎই স্বতন্ত্র।"

কিন্তু কবির চেতনা তখনও "খণ্ড" চেতনার মধ্যে

সীমাবদ্ধ। তাই জীবন ও মরণকে বাধা ও ছায়ের মধ্যে ভিন্ন সত্তারূপে উপলব্ধি করলেন। "খণ্ড" চেতনা থেকে মুক্ত হতে পারলেন না তিনি।

"মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর।" মানুষের কাছে যা অজ্ঞাত, স্বভাবতই মানুষের কাছে তা ভীতিপ্রদ। মরণের হাত থেকে জীবনকে বাঁচিয়ে রাখতে সদা-প্রয়াসী মানুষ তাই জীবনকে ছেড়ে অজ্ঞাত "মৃত্যু-মাধুরী" উপভোগ করতে চায় না, চায় না তাকে উপলব্ধি করতে। কবিও মৃত্যুর হাত থেকে "প্রাণ"কে সযতনে রক্ষা করে তাকে আদর করে, সোহাগ করে, এক সাথে বাসর শয্যা রচনা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই একান্ত প্রিয় কবির যে প্রাণ, সে-ও "সুখের শয়নে শ্রান্ত" পরশ করিলে জাগে না সে আর।"

"বদ্ধ জল যেমন বোবা, গুমোট হাওয়া যেমন আত্মপরিচয়হীন, তেমনি প্রাত্যহিক আধমরা অভ্যাসের এক-টানা আবৃত্তি ঘা দেয় না চেতনায়, তাতে সত্তাবোধ নিস্তেজ হয়ে থাকে।"

তাই কবি প্রাণের সাথে মরণ খেলা খেলে একান্ত প্রিয় "প্রাণ"কে আরও নিবিড় করে পেতে চান।

"তাই ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে নূতন খেলা
রাত্রি বেলা

মরণ দোলায় ধরি রশি গাছি,
বসিব দু'জনে বড়ো কাছাকাছি,
ঝঞ্চা আসিয়া অট্ট হাসিয়া মারিবে ঠেলা,
আমাতে প্রাণেতে খেলিব দু'জনে ঝুলন খেলা।"

যা সহজে জানা যায় মন তাতে তৃপ্ত হয় না। যাকে পাই না তাকে পাবার, যাকে জানি না তাকে জানবার, যা দৃষ্টির অগোচর তাকে দেখবার মানব প্রকৃতির স্বভাবতই ব্যাকুলতা। তাই কবিও অনায়ত্ত, অজ্ঞাত মৃত্যুকে বরবেশে আবাহন করেছেন পরাণ-বধূর সহিত অন্তিম মিলন-মাধুরীর জন্যে।

"ওগো মৃত্যু, সেই লগ্নে নির্জ্জন শয়ন প্রান্তে
এসো বরবেশে,
আমার পরাণ-বধূ ক্লান্ত হস্ত প্রসারিয়া
বহু ভালোবেসে
ধরিবে তোমার বাহু, তখন তাহারে তুমি
মন্ত্র পড়ি নিয়ো—
রক্তিম অধর তার নিবিড় চুম্বন দানে
পাণ্ডু করি দিয়ো।"

মানুষের ইচ্ছা, কামনা থেকেই আসে মানুষের বিশ্বাস। মানুষের মনে একটা প্রবল ইচ্ছা "আমি মরিব না।" সত্যি বলতে কি মরণের পর কি আছে তা আজও আমাদের কাছে অজ্ঞাত। পরলোক নেই, একথা যেমন বলা চলে না—পরলোক আছে এ কথাও জোর করে বলা যায় না। জীবনে আছে শান্তি, আছে অশান্তি, আছে সুখ, আছে দুঃখ, আছে আনন্দ,আছে বেদনা, আছে হাসি, আছে কান্না, আছে আশা, আছে নৈরাশ্য—সবই ছড়িয়ে আছে ছাড়া ছাড়া ভাবে, মৃত্যু এসে সেই বিক্ষিপ্ত প্রাণ-ধর্মগুলোকে এক সূত্রে গেঁথে দেয়। যে দ্বিধা, যে সংশয় কবিকে আচ্ছন্ন করেছিল সেই মোহপাশ হতে কবি মুক্তি পেলেন, মৃত্যুর সত্য-রূপ প্রকটিত হ'ল কবির কাছে, কবি মৃত্যুকেও চিনতে পারলেন "মৃত্যুর প্রভাতে" অর্থাৎ জীবনের আলোতে।

"মৃত্যুর প্রভাতে
সেই অচেনার মুখ হেরিবি আবার,
মুহূর্তে চেনার মতো।"

কবি বললেন, জীবন ও সংসারকে যে রকম ভালবাসি, "মৃত্যুরে এমনি ভালবাসিব নিশ্চয়।" কবির কাছে "মৃত্যু" মাতৃপাণির ন্যায় পরম নির্ভরযোগ্য বলে মনে হ'ল।

"সে যে মাতৃপাণি
স্তন হতে স্তনান্তরে লইতেছে টানি।

* * *

স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।"

তাই তো দেখি সীমার সঙ্গে অসীমের, সান্তের সঙ্গে অনন্তের মিলন-সাধনার জন্যে কবি-মনের অধীরতা। তাই ত শুনি বিশেষের মধ্যে অবিশেষের রূপের মধ্যে অরূপের উপলব্ধির জন্যে কবির মনে আকুলতার সুর—

"প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা—
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।"

বিশ্বলোক-দৃষ্টি দিয়ে কবি খণ্ড ও অসম্পূর্ণতাকে অখণ্ড ও সম্পূর্ণতার মাঝে দেখতে পেলেন। খণ্ড-জীবনের পূর্ণতা সেইখানে যেখানে সে অখণ্ড জীবনের মধ্যে নিজেকে বিলীন করতে পারে এবং তা সম্ভবপর হয়ে ওঠে মৃত্যুর দ্বার পেরিয়ে। জীবন ও মরণকে এক মহাজীবনের মধ্যে দেখলেন, দেখলেন জাগরণ ও নিদ্রা—আলোক ও অন্ধকার-রূপে। তাই কবি জীবনের সঙ্গে মরণ-মাধুরী ঘটালেন।

রুদ্রবেশী মহাদেব গৌরীকে বিয়ে করতে আসছেন। তাই দেখে "সুখে গৌরীর আঁখি ছল ছল"—

"তাঁর বাম আঁখি স্ফুরে থর থর,
তাঁর হিয়া দুরু দুরু দুলিছে,
তাঁর পুলকিত তনু জর জর,
তাঁর মন আপনারে ভুলিছে।"

অন্তরের মিল যেখানে ঘটেছে, বাইরের রূপ সেখানে কোন অঘটন ঘটাতে পারে না, ভ্রান্তি বা ভীতির কোন চিহ্ন সেখানে প্রকাশ পায় না। তাই রুদ্রবেশী প্রিয়তম মহাদেবকে দেখে প্রণয়িনী গৌরীর আঁখি ছল ছল করে ওঠে।

জীবন ও মরণকে আমরা দেখলাম একটা অখণ্ড সত্তার মধ্যে—শিবদুর্গা রূপে। উমা শক্তিরূপিণী, রক্ষাকারিণী। শঙ্কর ধ্বংসকারী, সংহার-রূপী। একদিকে উমা সৃষ্টি করে চলেছেন, মাতৃরূপে সেই সৃষ্টিকে রক্ষা করছেন ধ্বংসের করাল গ্রাস হতে। অপর দিকে সংহার-রূপী শঙ্কর সেই সৃষ্টিকে ধ্বংস করে চলেছেন প্রাণ-বিনাশী ত্রিশূল দিয়ে। সৃষ্টি ও ধ্বংস, ধ্বংস ও সৃষ্টি, জগতের লীলা। অথচ এই সৃষ্টিকারিণী উমা সংহাররূপী শঙ্করের কোলে অধিষ্ঠিতা—যেন মৃত্যুর কোলে অধিষ্ঠিতা প্রাণ।

সীমা থেকে অসীমে, রূপ থেকে অরূপে, খণ্ড থেকে অখণ্ড জগতে কবি যাত্রা সুরু করলেন। কবি উপলব্ধি করলেন মৃত্যুই প্রাণের শেষ পরিণতি নয়, মৃত্যু থেকেই প্রাণের উৎস। প্রাণ নিজেকে প্রকাশ করে চলেছে যুগে যুগে নানা ভাবে। মৃত্যু আছে বলেই জীবন আছে, মৃত্যুতেই জীবনের প্রকৃত প্রকাশ। আর এই প্রকাশ মৃত্যুর দ্বার পেরিয়ে। মৃত্যু প্রাণের সমাপ্তি নয়, প্রাণের বৃহত্তর বিস্তৃতি। জীবন কেবল সুন্দর নয়, মৃত্যুও সুন্দর, এ দেহের বন্ধন হতে মুক্তির প্রকাশই মৃত্যুর। তাই কবি চান না এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে অবরুদ্ধ করতে। বার বার মৃত্যু পথে যেতে চেয়েছেন নব নব জন্মলাভের আশায়।

"কে চাহে সঙ্কীর্ণ অন্ধ অমরতা কূপে
এক ধরাতল মাঝে শুধু এক রূপে
বাঁচিয়া থাকিতে। নব নব মৃত্যু- পথে
তোমারে পূজিতে যাব জগতে জগতে।"

আত্মা অবিনশ্বর, অক্ষয়। মৃত্যু আমাদের মর জগতের প্রাণ-প্রদীপ নিভিয়ে দিতে পারে, ধ্বংস করতে পারে অস্থি, মজ্জা, মাংস দিয়ে তৈরী এই জড় দেহটাকে। কিন্তু আত্মার ওপর প্রভাব বিস্তার করবার শক্তি মৃত্যুর নেই, কারণ আত্মা অনন্ত। বার বার সে এই পৃথিবী ছেড়ে যায় সত্য, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধরে আবার ফিরে আসে এই পৃথিবীতে। কবি মনে করেন—পৃথিবীর এই যে গাছপালা, পশুপক্ষী, কোন অতীত হতে এদেরই রূপ ধরে বার বার এই পৃথিবীতে যাওয়া-আসা করেছেন, ভবিষ্যতেও বার বার যাওয়া-আসা করবেন এদেরই মাঝে বিভিন্ন রূপ ধরে।

"তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি।
নতুন নামে ডাকবে মোরে, বাঁধবে নতুন বাহুর ডোরে,
আসব যাব চিরদিনের সেই-আমি।"

"জন্ম জন্মান্তরের স্মৃতি কবিকে ব্যাকুল করেছে, যে নেই সে ফিরে এসেছে সেই ব্যক্তি দেহে নয় সমগ্র প্রকৃতি-রূপে।"

মৃত্যুর পরে কবির যে ধারণা, মানব-জন্ম লাভ করবার পূর্বেও সেই ধারণা কবির। কবি একটি পত্রে লিখেছেন—

"এক সময়ে যখন আমি পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়েছিলাম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূর-বিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত—আমি কত দূর-দূরান্তর কত দেশ-দেশান্তরের জল-স্থল-পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধ ভাবে শুয়ে পড়ে থাকতাম, তখন শরৎ-সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দ-রস, একটি জীবনী শক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড ভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে—সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থর থর করে কাঁপছে। এই পৃথিবীর উপর আমার একটি আন্তরিক আত্মীয় বৎসলতার ভাব আছে—

কবির কাছে মৃত্যুও মোহনরূপে ধরা দিল। কবি জয় করলেন মৃত্যুকে।

"তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড়ো নও।
"আমি মৃত্যু-চেয়ে বড়ো" এই শেষ কথা বলে
যাব আমি চলে।"
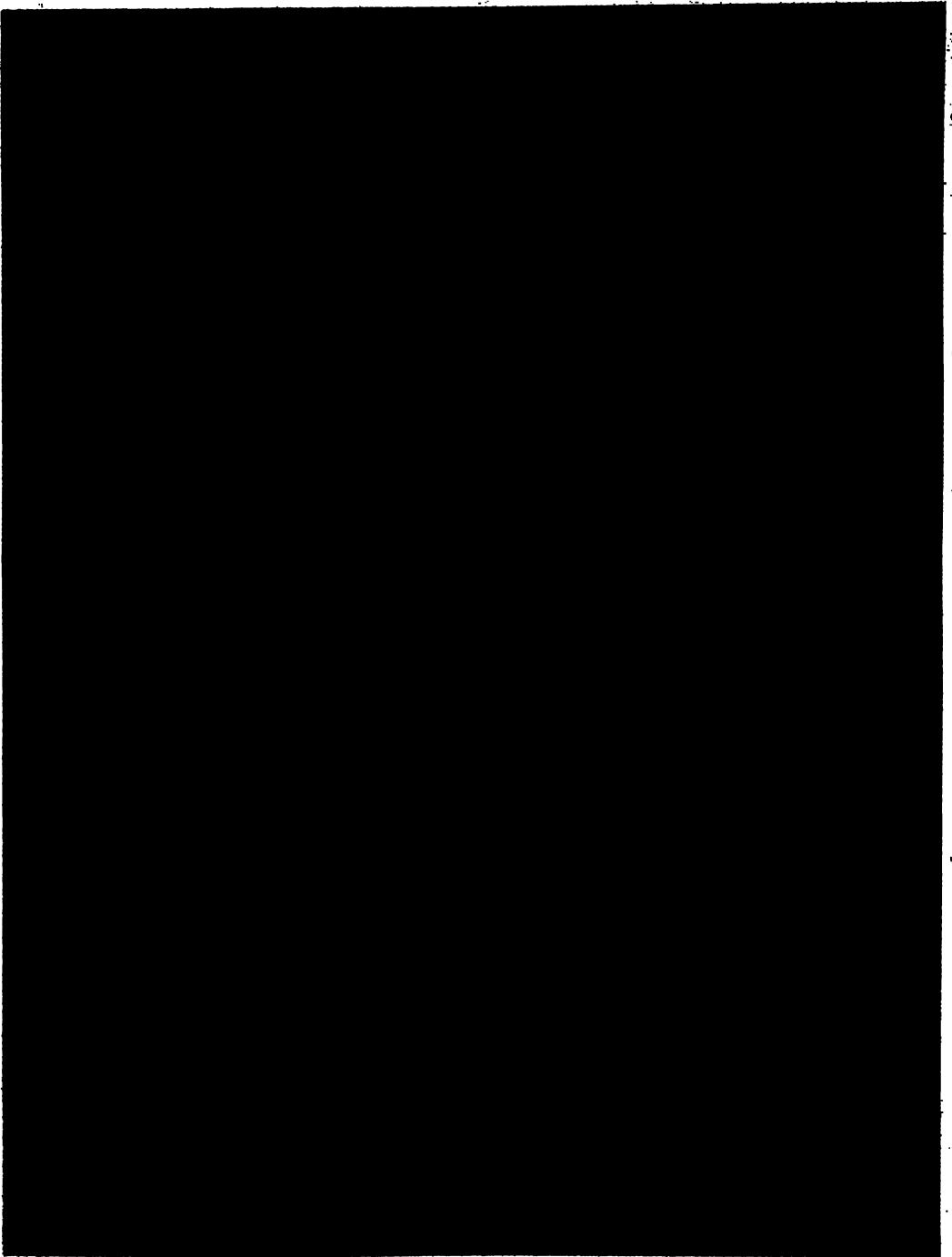
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

কালবৈশাখী

শ্রীসারদাচরণ উকীল

(প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০ হইতে পুনর্মুদ্রিত)

ক্ষিতিমোহন সেন [শিল্পী : শ্রীচিত্রনিভা চৌধুরী

শান্তিনিকেতন

১৪।১২।৫৯

কল্যাণীয়াসু

তোমার লেখা ৯ই ডিসেম্বরের চিঠি পেলাম।

তোমরা কলকাতায় গিয়েও এখানকার সাধনা ভোল নাই। এটাই আনন্দ।

যাঁরা তোমার চিত্র প্রদর্শনী দেখেছেন তাঁরা খুসী। সকলেই সুখ্যাতি করেছেন। তোমার ছবির যে প্রশংসা হবে-সেকথা জানতাম। কিন্তু গিন্নিপনার কথা বুঝলাম ৩টি প্রদর্শনীঘর একেবারে ভরে আছে তোমার চিত্র সংগ্রহে।

কলকাতায় যাওয়া তো আমার এখন সহজ নয়। না হলে গিয়ে দেখতাম। তবু আমি দূর থেকে তোমার চিত্র সাধনার মহত্ত্ব উপলব্ধি করি।

আশীর্ব্বাদ করি তোমার শক্তি ও গিন্নিপনা-যুক্ত হয়ে তোমার সাধনাকে সর্ব্বজনসেব্য করে তুলুক।

আমার শরীরের কথা-তো শুনতেই পাও। তোমাদের কুশল কামনা করি। ইতি

শুভার্থী

ক্ষিতিমোহন সেন

পত্রখানি শিল্পী চিত্রনিভাকে লিখিত

মিমোঁক

শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

দাম্পত্যজীবন যে কত মধুর হতে পারে, এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কত সহজ ও সুন্দর হতে পারে তা জানা যায় মিঃ ও মিসেস চক্রবর্তীকে দেখলে।

বাস্তবিক সারা লক্ষ্ণৌ শহরের বাঙালী-সমাজে এই দুটি নর নারীর জীবনযাত্রা একটি সাধারণ উদাহরণে দাঁড়িয়ে গেছে। আমরা আগন্তুক হলেও মাত্র সাতদিনের লক্ষ্ণৌ-বাসের মধ্যে অন্ততঃ চোদ্দবার তাঁদের নামের উল্লেখ পেলাম। ঠিক করলাম যাওয়ার আগে এই দু'জনের সঙ্গে আলাপ করতে হবে। সত্যিকার সুখী দম্পতির চিত্র প্রায় দুর্লভ বলা চলে। বাড়ী ফিরে অন্ততঃ আমার স্ত্রীর কাছে এদের কথা গল্প করা যাবে।

নীলেশ ঐ সব ব্যাপারে একেবারে নিরেট। অনেক কাল আগে তার স্ত্রীবিয়োগ ঘটেছে। তার একমাত্র সখ বা নেশা ইতিহাসের কবর খুঁড়ে তার অস্থিমজ্জা টেনে বার করা। শুধুমাত্র এই লোভেই সে লক্ষ্ণৌ আসতে রাজি হয়েছিল। নইলে পূজার ছুটির মাত্র কয়েকদিনের অবসরে এতদূরের পথে একা আসা আমার পোষাতো না।

এসে উঠেছিলাম আমারই এক পুরোনো বন্ধু নীরদ রায়ের বাড়ী। বন্ধুটি কোন নামকরা ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। ভালো মাইনে পান, বাসা ভালো পেয়েছেন। এবং স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই অত্যন্ত মিশুক প্রকৃতির। আতিথ্যে তাঁরা উদার এবং সহৃদয়। কাজেই নীলেশকে এখানে এনে তুলতে আমার এমন কিছুই সঙ্কোচবোধ হয় নি। আর নীলেশও লক্ষ্ণৌতে এসে দিনরাত বাইরে বাইরেই ঘুরছে, যত প্রত্নলিপির উদ্ধারের আগ্রহে।

প্রথম দিনেই বন্ধু নীরদ বললো, এসেছো, এখানে আমরা কি ভাবে থাকি দেখে যাও। তোমাদের বাংলা দেশের চেয়ে অন্ততঃ অনেক সুখে আছি।

তা হয়ত আছে। ওদের চিন্তাহীন সুগোল মুখ-মণ্ডল দেখলেই সেকথা বোঝা যায়। কিন্তু তার পরেই বন্ধুটি বললো—আমরা এখানে একটি নিখুঁত বাঙালী কালচার গড়ে তুলেছি। তোমাদের চেয়ে আমরা খুব দূরে তা মনে কোরো না। এখানে আমাদের ক্লাব, লাইব্রেরী আছে। সাহিত্য আলোচনার বৈঠক আছে; বাংলাগানের চর্চা আছে।

আমাকে কৌতূহলী হয়ে উঠতে দেখে নীরদ বললো—অবশ্য আমাদের মধ্যে এ আবহাওয়া গড়ে তুলেছেন দুটি লোকে। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী, মিঃ ও মিসেস চক্রবর্তী। বছর দশেক হলো তাঁরা লক্ষ্ণৌ এসেছেন। কিন্তু এখানকার বাঙালী-সমাজের মধ্যমনি তাঁরাই। এখানকার কলেজে অধ্যাপনার কাজ নিয়ে এসেছেন মিঃ চক্রবর্তী। এখান থেকে আর ফিরে যাবার ইচ্ছে ওঁদের নেই।

নীরদের স্ত্রী উর্মিলাও কখন যেন পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। এবারে সে বললে—জানেন প্রদোষবাবু, ওরা একটি আদর্শদম্পতি। স্বামী-স্ত্রী দু'জনের কেউই কাউকে ছেড়ে থাকতে পারেন না। ওঁরা বেড়াতে যান একসঙ্গে। একসঙ্গে বাজার করতে যান। একজনকে নেমন্তন্ন করলে কেউ আসবেন না। দু'জনকে বললে তবে দু'জনে একত্রে আসেন।

আমি হেসে বললাম— চখাচখি বলো?

—তা বলতে পারো। নীরদ বললো—ভারী অমায়িক দু'জনেই। স্বামী বেচারীত' নেহাতই নিরীহ। আর স্ত্রীটি বেশ বুদ্ধিমতী। আমাদের কাছেও ওঁরা উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

একদিন আলাপের সুযোগ ঘটে গেল। ওঁরা দু'জনে একসঙ্গে এসেছিলেন বেড়াতে। আর দেখে মনে হলো—হাঁ, একটুও অত্যুক্তি করেনি প্রদোষ। মিঃ চক্রবর্তী একটু গম্ভীর কিন্তু বিনয়ী। কিন্তু মিসেস চক্রবর্তী যেমন সপ্রতিভ তেমনি তীক্ষ্ণ বাক্‌চতুরা। হাসিতে, ঠাট্টায়, গানে-আলাপে আড্ডা জমিয়ে রাখতে পারেন ভদ্রমহিলা; স্বামীর ওপরে তাঁর অবাধ ও অকুণ্ঠ অধিকার।

নীলেশ যথারীতি অনুপস্থিত ছিল। সে বোধ হয় তখন ইমামবারার দেয়ালের ইঁট পরীক্ষা করে বেড়াচ্ছে। তাছাড়া আড্ডায় সে নেহাৎ বেমানান হয়ে পড়ে। কিন্তু আমার এই পরিবেশটিই ভালো লাগছিল।

ওঁদের সঙ্গে আমার পরিচয়পর্ব সমাপ্ত করে নীরদ

বললো—জানো প্রদোষ, নীলিমা দেবী হচ্ছেন আমাদের লক্ষ্ণৌর বাঙালী সমাজের প্রাণ। এখানে আমরা বাঙালী হিসেবে যা কিছু করছি তার মূলে রয়েছেন ওঁরা দু'জনে।

মিসেস চক্রবর্তীর মুখে আত্মপ্রসাদের হাসি দেখা দিলো। স্বামীর দিকে একবার চেয়ে বললেন তিনি—একার চেষ্টায় কি আর হয় কিছু? আপনাদের উত্তমই বা কম কি?

উর্মিলা দেবী এগিয়ে এলেন, বললেন—কোন্ গুণটা তোমার নেই ভাই? গানে তুমি সকলকে পাগল করেছো। তোমার গুণেই আমাদের নাট্যপরিষদ গড়ে উঠেছে। সাহিত্যের বৈঠক জমে না যতক্ষণ না তোমরা দু'জনে আসো।

নীরদ যোগ দিলো—মিঃ চক্রবর্তীর শক্তিকে আমরা কাজে লাগাতেই পারতাম না যদি সঙ্গে নীলিমা দেবী না থাকতেন।

ঘরের এক কোন থেকে মিঃ চক্রবর্তীর করুণ স্বর ভেসে এলো এবার—ওঁর কিন্তু একটা গুণের অভাব আমি দেখতে পাচ্ছি। স্বামী বেচারাকে উনি বড় করুণার চোখে দেখেন।

সকলে হেসে উঠলো। নীলিমা দেবী অপ্রস্তুত হয়ে বললেন—সবার সামনে তুমি অমন করে বলো না ত!

মিঃ চক্রবর্তী মৃদু হেসে বললেন, না, না, ধমকিয়ো না আমাকে। আমি চুপ করছি।

যাওয়ার আগে ওঁরা দু'জনে এক সঙ্গে নেমন্তন্ন করলেন আমাদের।

রাত্রে খেতে বসে বললাম নীরদকে—ভারী সুন্দর ব্যবহার ওঁদের। ভদ্রমহিলা এত সুন্দর···

—ভদ্রলোকও।

নীরদ যোগ করলো।

পরের দিন নীলেশকে বললাম, বেরোস নি আজ একা একা। এখানে একটি বাঙালী পরিবার আছেন, যাঁরা লক্ষ্ণৌর বাঙালী-সমাজকেই জমিয়ে রেখেছেন প্রায়। আজ তাঁদের বাড়ী যাব বেড়াতে। তুইত মেয়েদের ওপর চটা। মিসেস চক্রবর্তীকে দেখলে বুঝবি, আদর্শ স্ত্রী কাকে বলে।

—মিসেস চক্রবর্তী? হঠাৎ কৌতূহলে নীলেশের ভুরু কুঁচকে গেল। বিরসকণ্ঠে বলল, সে—

—কি নাম ভদ্রমহিলার?

—নীলিমা চক্রবর্তী।

—ও। আবার নিরুৎসুক হ'ল সে।

—পরের দিন সকালে আবার একাই বেড়াতে গেল নীলেশ। কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরেই ফিরে এসে বলল, আমি আজ বিকেলের মেলে ফিরবো।

—সে কি? আমার চমক লাগলো। আমাদের আরও তিন দিন থাকার কথা। আর আজই যাব কেন?

নীলেশ বলল, কেন বলতে পারবো না। তুই থাক না হয়। আমাকে ফিরতেই হবে।

নীলেশকে বোঝানো বৃথা। জানি, তার কথার নড়চড় হয় না। আমি ত আমি···একদা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও তার একগুঁয়েমি ভাঙতে পারে নি। '৪২ সালে জেলে গিয়ে চরমতম নির্যাতন ভোগ করেছে সে। মনটা মাটির নয়, পাথরের মত শক্ত।

অগত্যা আমিও বাঁধতে বসলাম আমার বিছানাপত্তর। নীরদ রাগ করলো। তার স্ত্রী বেরিয়ে এসে আর একটি দিন থাকবার জন্যে অনুরোধ করলেন। কিন্তু নীলেশ অটল।

ঘরে বসে দ্বিতীয় বারের চা খাচ্ছি। আমি, নীলেশ আর নীরদ। এমন সময়ে বাইরে কলকণ্ঠ শোনা গেল। নীরদের স্ত্রী ছুটে গেলেন, পেছনে পেছনে নীরদও।

—কি আশ্চর্য! মিসেস চক্রবর্তী আজ সকালেই এসেছেন?

—নেমন্তন্ন করতে এলাম আপনাদের সকলকেই। আজ রাত্রে আপনারা সকলে বাড়ীশুদ্ধ দয়া করে আমার ওখানে···

গলার স্বর গলাতেই আটকে গেল। কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি। পলকে যেন একটা পাথরের মত মূর্তি। হয়ত পড়ে যেতেন মাটিতে যদি না নীরদের স্ত্রী দুই হাতে আঁকড়ে ধরতেন তাঁকে।

শুধু আমিই লক্ষ্য করলাম, আমার পাশ থেকে নীলেশ নিঃশব্দে উঠে গেল।

কিছুক্ষণ পরে একটু সুস্থ হলেন নীলিমা দেবী। ম্লান কণ্ঠে বললেন, বুকের এখানটায় কেমন করে উঠলো। বোধ হয় ব্লাড প্রেসার! আমি বাড়ী যাবো।

নীরদ আর তার স্ত্রী দু'জনেই গেল নীলিমা দেবীকে পৌঁছে দিতে। আর আমি এলাম আমাদের ঘরে। দেখি, নীলেশ সুটকেশের ডালা বন্ধ করছে। আমায় দেখেই বললো—ছুটোর ট্রেন।

—তা এখনই ষ্টেশন যাবি নাকি?

নীলেশ উত্তর দিলো না। মাথা নিচু করে বসে রইলো। কাছে এসে ওর ঘাড়ে হাত দিয়ে বললাম—

কি ব্যাপার রে নীলেশ? ভদ্রমহিলা তোকে দেখে অমন আঁতকে উঠলেন কেন? তোর আজই ফিরে যাওয়ার একটা কারণ বুঝতে পারছি। কিন্তু ব্যাপারটা কি খুলে বল দেখি!

নীলেশ গম্ভীর নির্লিপ্তস্বরে বললো—বলবো। এখন নয়। এখন পারছি না কথা বলতে।

ট্রেন বারবেরিলী পার হয়ে গেলে নীলেশ ঘুরে বসলো। গাড়ীতে দৈবাৎ ভীড় ছিল না। নীলেশকে এতক্ষণে একটু স্বাভাবিক বোধ হলো। জিজ্ঞেস করলাম—তুই কি চিনিস নীলিমা দেবীকে? নিশ্চয়ই পেছনে একটা ইতিহাস আছে! কি বলতো?

নীলেশ বললো—হ্যাঁ, বলবো। তার আগে একটা গল্প শোন। আর একটি দম্পতির গল্প। মনে কর স্বামীটি সাধারণ বাঙালী ঘরের একটি ছেলে। বি. এ. পাশ করে ইস্কুলের মাষ্টার হয়েছে। আর তার স্ত্রী ভারতী কলকাতার কলেজ-পড়া মেয়ে। নাচে, গানে, কথায় পুরোপুরি আধুনিকা।

বাধা দিয়ে বললাম—ছেলেটির নাম?

—মনে কর সীতেশ। ওদের বাড়ীতে লোকজন আর কেউ নেই। শুধু বিধবা মা—তা তিনি ঠাকুরঘর নিয়েই থাকেন। আর সীতেশের বড় দাদা...তেজেশ কলকাতার কলেজে অধ্যাপক। রাজনীতি চর্চা করেন। এক বিশেষ মতবাদের সমর্থক। চোখা চোখা প্রবন্ধ লেখার জন্যে বাঙ্গালায় নাম আছে। বিয়ে করেন নি এবং করবেন না বলে জানিয়েছেন। কাজেই সীতেশকে বিয়ে করতে হয়েছে।

সীতেশের বিয়েতে কিন্তু তেজেশের অপরিসীম উৎসাহ। ওদের ঘর বেঁধে দেওয়ার জন্যে তাঁর প্রচুর আগ্রহ। কলকাতা থেকে প্রায়ই প্রত্যেক ছুটিতে জিনিসপত্র নিয়ে আসেন। সীতেশ তার দাদাকে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। ভারতীকে সে বলে দিয়েছে, তার এই দাদাকে যেন যত্ন-শ্রদ্ধা করে সে। তিনি এখানে এসে যেন কোন রকম অসুবিধে বোধ না করেন।

তেজেশ গান ভালোবাসে। ভারতী তাকে গান শোনায়। তর্ক করে তার সঙ্গে রাজনীতি আর সাহিত্য নিয়ে। দাদা এলে সে সঙ্গী পায় একজন। সীতেশ নিশ্চিন্ত হয়েই গ্রামের ক্লাব, পুজোমণ্ডপ ইত্যাদি নিয়ে থাকে।

সে সময়টা উনিশশো বিয়াল্লিশ সাল। কলকাতার ওপরে তখন নিদারুণ দুর্যোগ। বোমা পড়বে এই ভয়ে সকলেই কলকাতা ছেড়ে পালাতে সুরু করলো। স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে গেল। আর তেজেশও বাড়ীতে এসে বসলো।

সীতেশ অনেকটা নিশ্চিন্ত। দাদাকে ওই অবস্থায় কলকাতায় ছেড়ে সে কিছুতেই শান্তি পেতো না। আর বাড়ীতে এসে দাদাও এখন খুব খুশী খুশী থাকে। তেজেশ তাদের সঙ্গ উপভোগ করে। ভারতীর ব্যবহারেও তিনি খুশী।

দেশজুড়ে তখন আন্দোলন সুরু হয়েছে। "ভারত ছাড়ো" ধ্বনি দিয়েছেন গান্ধী। শহরে-গ্রামে সুরু হয়েছে সন্ত্রাসমূলক কার্য। পুলিস কখন যে কোথায় হানা দেয় তার ঠিক ঠিকানা নেই।

একদিন অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরলো সীতেশ। সেদিন শেষ রাত্রে দু'মাইল দূরের ষ্টেশন লুট করা হবে। যারা যাবে তাদেরকে সঠিক নির্দেশ দিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা করে ফিরলো সে। ভাবছিলো, অত রাত্রে নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে ভারতী। ডেকে ঘুম ভাঙ্গাতে হবে। হয়ত সে রাগ করবে, অভিমান করবে।

বাইরের দরজাটা নিঃশব্দে আঙুল গলিয়ে খুলে ফেললো সীতেশ। বাড়ীর ভেতরে ঢুকে—সে পেছনের দিকে চলে গেল। পেছনের দিকে তার ঘর। ভাবলো জানলা থেকে ডাকবে ভারতীকে—যাতে দাদা জানতে না পারে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, ভারতী ত ঘরে নেই! মৃদু দীপের আলোতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ভেতর পর্য্যন্ত। তার বিছানা টান করে পাতা। একটু আগে কেউ শুয়ে ছিলো এমন চিহ্নও নেই। তবে?

একটা অজানা কৌতূহল জেগে উঠলো তার মনে। ভারতী কি বারান্দায় বসে থাকতে থাকতেই ঘুমিয়ে পড়েছে! উঠোনের পাঁচিলটা স্বচ্ছন্দে ডিঙিয়ে ভেতরে এলো সে। মার ঘর বন্ধ, রান্নাঘরও। কোনখানেই নেই ভারতী।

নিঃশ্বাস আটকে গেল তার। তেজেশের ঘরে মৃদু গুঞ্জন। দরজা ভেজানো মাত্র।

সীতেশ আবার নেমে এল উঠোনে। বাইরে যাওয়ার দরজা খুলে সে বাইরে এসে দাঁড়ালো। আর দরজা বন্ধ করে শুধু একটা ফাঁকে চোখ রেখে সে কড়া নাড়তে লাগলো।

সেই ফাঁক দিয়েই দেখতে পেলো সীতেশ—ভারতী তেজেশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। তার বেশবাস শিথিল। তার চুল বিস্রস্ত। মুখে উত্তেজনার রক্তাভা। ভারতী বেরিয়ে আসতেই দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

ভারতী দরজা খুলে দিতে এসে উঠোনে শীতেশের মুখোমুখী দাঁড়ালো। শীতেশ দরজার ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে বিহ্বল হয়ে। সে যেন ভূত দেখেছে এমন আড়ষ্ট তার দেহ। আর ভারতী তাকে খোলা দরজায় দাঁড়াতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে বললো—খোলা ছিলো দরজা?

শীতেশ উত্তর দিলো না। কিন্তু আবার সে বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে। হাঁটতে লাগলো নির্জন মাঠের ওপর দিয়ে। হাঁটতে লাগলো জঙ্গল ডিঙিয়ে, পুকুরের কাদা মেখে আর উঁচু-নিচু পথে হোঁচট খেতে খেতে।

হাঁটতে হাঁটতে নলখাগড়ার মাঠ পার হ'লো সে। সামনে যেন একটা আলোর ঝলক। রেল ষ্টেশন। নিঃশব্দে বসে সে অপেক্ষা করতে লাগলো। লুকিয়ে বসে রইলো যেন কেউ দেখতে না পায়। প্রতীক্ষা করতে লাগলো একটি ঈপ্সিত মুহূর্তের। ষ্টেশন লুট হ'লো সে রাত্রে। ঘণ্টা দুই পরে এলো পুলিস। আর একজন দুষ্কৃতিকারীকে তারা ধরে ফেললো। তার নাম শীতেশ।

নীলেশ হাসলো—জেলে বসেই খবর পেয়েছিলো সে যে, ভারতী আর তেজেশ উধাও হয়েছে। তাদের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি কোথায় গেছে। কিন্তু···

নীলেশ মৃদুকণ্ঠে বললো—নাম পালটিয়ে ভারতী যে নীলিমা হয়েছে তা কেমন করে জানবো? একটু আগে টের পেলে এই অস্বস্তিকর অবস্থায় ওকে ফেলতাম না আমি।

ভুখা ভগবান

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

১

কত রূপে তুমি সংসার মাঝে
ফিরিছ বিশ্বনাথ!
কালি রাজপথে ভিখারীর সাজে
পেতেছ কি প্রভু, হাত?
চেয়েছিলে ভিখ্,—দিয়েছিনু গালি!
একি পরীক্ষা! একি চতুরালি!—
আপন পাপের অগ্নিদহনে
দহিয়াছি সারারাত!

২

কাঙাল দেখিয়া রে চিরকাঙাল,
ঘৃণায় ফিরালি মুখ;—
ওরে বঞ্চিত, প্রবঞ্চিতের
বুঝিলি না তুই দুখ!
যার হতে যারে করিস্ ভিক্ষা,
আজো তবু তোর হয়নি শিক্ষা!—
অর্থবিত্তবশের আশায়
প্রাণ তোর উৎসুক।

৩

ভিখারী হইয়া ভিখারীরে ঘৃণা!—
ব্যাপার চমৎকার!
কেবা দাতা আর কেবা ভিক্ষুক—
এ কথাটি বোঝা ভার।
আজি তাই নিয়ে অন্নের থালা,
পারি না গিলিতে! হ'ল একি জ্বালা!
ভুখা ভগবান! চরণে তোমার
ক্ষমা চাই বার বার!

৪

কোটি কোটি হাতে বিলায়ে অন্ন
কোটি মুখ দিয়া খাও!
কেমনে বুঝিব—দিয়েছিলে যাহা,—
আবার ফিরিয়া চাও!
হায়, কার হাতে কার-দেওয়া ধন
কারে দিতে প্রভু, নাহি সরে মন!
দুর্ব্বার মোহে জর্জ্জর হিয়া,—
আজি ভুল ভেঙে দাও।

আফ্রিকাকে যেমন দেখেছি

যাদুসম্রাট পি. সি. সরকার

১

আমার আফ্রিকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নানা কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আফ্রিকা বন-জঙ্গলের দেশ, বনের গাছপালা, পশু-পাখী আর ফলমূল হ'ল ওদের প্রধান সম্পদ। ওখানে গেলে আমাদের দেশের পার্ব্বত্য আসামের কথা সর্ব্বাগ্রে মনে আসে। বিদেশ থেকে লোকেরা এসে ওখানকার কেনিয়া, উগাণ্ডা ও টাঙ্গানাইকার জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে সেখানে বসতি স্থাপন করেছে। রাস্তা-ঘাট, রেলপথ, সেতু তৈরি করে নূতন জনপদের সৃষ্টি করেছে। জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে ভারতের ভাগ্যান্বেষীরা চা-বাগান, কফি-বাগান এবং ইক্ষুর চাষ করে বড় বড় চিনির কল বসিয়েছে। কলিকাতায় যেমন ব্যবসায়ে স্থানীয় অধিবাসী বাঙালীদের চেয়ে বহিরাগত মাড়োয়ারীরা যেমন বেশী প্রতিপত্তি করে নিয়েছে—সমগ্র পূর্ব্ব-আফ্রিকাতেও তেমনি ভারতীয়রাই সবচাইতে বড় শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ী। বোম্বাই, সিন্ধু, গুজরাট ও পাঞ্জাব থেকে এসে এরা এদেশের রাজনীতি, সমাজনীতি ক্ষেত্রেও যথেষ্ট প্রতিপত্তি করে নিয়েছে।* মোমবাসা, নাইরোবী, কাম্পালা, জিঞ্জা প্রভৃতি শহরে গেলে মনে হয় বোম্বাইয়ের বাজারে গিয়েছি। রাস্তা-ঘাটে শুধু ধুতি-শাড়ী পরিহিত গুজরাটীদের দেখা যায়—মাঝে মাঝেই আছে হিন্দু মন্দির, ব্রাহ্মসমাজ হল, শিখ গুরুদ্বার, ভারতীয় স্কুল, ভারতীয় নামাঙ্কিত বড় বড় বাড়ী ও রাস্তাঘাট। ইংরেজদের বড় বড় দোকানপাট বিশেষ নেই—তবে ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স প্রভৃতি জাতীয় ব্যবসা সমস্তই ওদের প্রতিপত্তিতে রয়েছে। তাহা বাদেও ফল্গু নদীর মত প্রত্যেক জিনিসের উপর শুল্ক ধার্য্য করে ইংরেজ শাসকগণ তাঁদের ব্যবসায়ী-বুদ্ধিকে জয়ী করে রেখেছে।

ভারতবর্ষে যেমন নাগা, কুকী, সাঁওতাল, ভীল, কোল প্রভৃতি নানা শ্রেণীর আদিম অধিবাসী আছে, আফ্রিকাতেও ঠিক তেমনি বহু জংলী সম্প্রদায় আছে। আফ্রিকাবাসী বলতে শুধু এই সব অশিক্ষিত জংলীদেরই বুঝায় না। এদের মধ্যেও অনেক লেখা-পড়া জানা সভ্য, মার্জ্জিত রুচিসম্পন্ন, দেশপ্রেমিক লোক আছেন। তাঁদের একমাত্র ব্যতিক্রম এই যে, তাঁদের গায়ের রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ আবলুষের মত কালো। তাঁদের চুল নিগ্রোদের চুলের মত ঘন, কাল এবং কোঁকড়ান। বিদ্যা, বুদ্ধি ও দৈহিক শক্তিতে তাঁরা কম নন। আমি নিজে একজন রোটারী ক্লাবের সভ্য এবং এই 'রোটারিয়ান' হিসাবে ওদেশের অনেকগুলি রোটারী ক্লাবের সভায় গিয়েছি—নাইরোবীর ইংরেজ মেয়র এবং কাম্পালার ঘন কৃষ্ণকায় কাফ্রী মেয়র উভয়ের মধ্যে বিদ্যা-বুদ্ধির উৎকর্ষতায় কোনও পার্থক্য লক্ষ্য করি নাই। আরও ওদেশীয় বহু শিক্ষিত লোকদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে দেখেছি তাঁরা সবাই খুব সদালাপী, বুদ্ধিমান ও সদাহাস্যময়।

কেনিয়া রাজ্যের জঙ্গলের মধ্যে বাস করে কিকুয়ু উপজাতির লোকেরা—যারা দেশ স্বাধীন করবার জন্য লড়ে চলেছে প্রাণপণে তাদের 'মাউ মাউ' নামক এক বিপ্লবী আন্দোলন চালিয়ে। নাইজিরিয়া আর রোডেসিয়াতে চলেছে প্রবল জাতীয়তার আন্দোলন। সেখানে যেন ভারতের '৪২ সনের "ভারত ছাড়" আন্দোলন সুরু হয়ে গিয়েছে। আমি থাকা কালে দেখেছিলাম ওদের আন্দোলনে স্বর্গে ইন্দ্রের আসন পর্য্যন্ত নড়ে উঠেছিল। সোমালী অঞ্চলেও ঠিক তাই লক্ষ্য করেছি—সেখানেও ঐ একই অবস্থা। ওদের মহাদেশে শ্বেতাঙ্গ এবং ভারতীয় দুই-ই বিদেশাগত। তারা এই বিদেশাগতদের থেকে মুক্ত হতে চায়—এদের হাত থেকে স্বাধীন হবার জন্য তারা তাদের মুক্তি আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এরা পোষা-হাতী দিয়ে বহিরাগতদের ঘর ভেঙে দিয়ে তাদেরকে উচ্ছেদ করতে চায় না, কৌশলে জঙ্গলের বুনো-হাতী লেলিয়ে দিয়ে সহজে কাজ সমাধা করতে চায়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়াবে—তা শুধু অন্তর্য্যামীই জানেন।

কেনিয়া রাজ্যে 'মাউ মাউ' ওদের সবচাইতে বড় জাতীয় আন্দোলন, শ্বেতাঙ্গ ঐতিহাসিকগণ একে শিবাজীকে মারাঠা দস্যু রূপ দিবার মতই একটা অসামাজিক উপদ্রব বলে উপেক্ষা করলেও এই আন্দোলন অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। জঙ্গলের মধ্যে এই 'মাউ মাউ'

---

* উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, টাঙ্গানাইকা রাজ্যের রাজধানীর বর্ত্তমান মেয়র একজন ভারতীয় ব্যবসায়ী, ওখানকার রোটারী ক্লাবের বর্ত্তমান সভাপতি ও একজন ভারতীয় (গুজরাটী) ব্যবসায়ী।

আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে এবং মালয়দেশের জঙ্গলে সন্ত্রাসবাদীদের কোণঠাসা করবার যতপ্রকার উপায় অবলম্বন করতে দেখেছিলাম—শ্বেতাঙ্গ শাসকগণ এই আফ্রিকার বনভূমিতেও এই অসামাজিক সন্ত্রাসবাদ দমনকল্পে অনুরূপ কঠোর দণ্ডসঞ্চালন করছেন। বাইরে থেকে এই আন্দোলন দেখা যায় না কিন্তু ভিতরে ভিতরে তুষের আগুনের মত চাপা-চাপা অবস্থায় এগিয়ে চলেছে—চক্ষুতে দেখা যায় না কিন্তু সামান্য একটু ইন্ধন পেলেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে, আবার ছাই চাপা হয়ে নিবু নিবু মনে হচ্ছে। কেনিয়ার 'মাউ' নামক পর্ব্বতের কাছে বলে এটা 'মাউ মাউ' আন্দোলন অথবা এদেশের আন্দোলনের শব্দের আদ্যাক্ষর থেকে এটা গঠিত হয়েছে কিনা সেকথা জানা যায় নি। Mount Africa Union (পার্ব্বত্য আফ্রিকা সম্মেলন) এর ইংরেজী আদ্যক্ষর থেকে M-A-U 'মাউ' এই কথাটি পাওয়া যায়। একই শব্দের দুই বার ব্যবহার, ওদেশের সোমালীভাষার একটা বিশেষত্ব দেখা যায়। যেমন 'মোজা মোজা' অর্থ প্রত্যেক, 'পো-পো' অর্থ বাদুড়, 'কাটি কাটি' অর্থ মধ্যস্থল, 'পারা পারা' অর্থ খাবামারা, 'পিলি পিলি' অর্থ গোলমরিচ, 'সওয়া সওয়া' অর্থ ঠিক, 'নাইয়া নাইয়া' অর্থ টমাটো ইত্যাদি।

আফ্রিকাতে এখনও বহু জংলী জাতি আছে—যারা বর্ত্তমান সভ্যতার ধার ধারে না। কেনিয়া রাজ্যের কৃষ্ণকায় অধিবাসীরা ভুট্টার ছাতু জল দিয়ে গুলে খায়। কেনিয়া রাজ্য তার ভুট্টার জন্য প্রসিদ্ধ—ওটা নাকি ওদেশে ভারতীয়ের আমদানী। সোমালী ভাষায় 'মঁহিন্দী' অর্থ ভারতবাসী আর 'মহিন্দী' অর্থ ভুট্টা। ভারতীয়রা এই মকাইভুট্টার আমদানি করেছিল কি না তার স্থির মত না থাকলেও, ওদেশে ইক্ষুর চাষ ভারতীয়রাই আরম্ভ করেছেন। বর্ত্তমানে আফ্রিকাতে যতগুলি বড় ইক্ষুর বাগান এবং চিনির কল আছে তার প্রায় সবগুলিই ভারতীয়দের সম্পত্তি। উগাণ্ডা রাজ্য তার কলা এবং তুলার জন্য বিখ্যাত। প্রকৃতপক্ষে কলা আর তুলা ছাড়া অন্য কোনও শস্যের চাষ ওখানে নেই বললেই চলে। তাই উগাণ্ডার আফ্রিকানরা শুধু কলা খেয়েই জীবন ধারণ করে। ওরা কলাকে বলে 'মেই ফুঃ' আমার মতে ওটা যেন 'মেইন ফুড'। উগাণ্ডার প্রতিটি কৃষ্ণকায় আফ্রিকাবাসী ঐ 'মেই ফুঃ' খেয়ে বেঁচে আছে। কাঁচাকলা জলে ভিজিয়ে ওরা ওদের প্রধান খাদ্য তৈরি করে নেয়। আমরা একবার প্রায় পাঁচ'শ মাইল রাস্তা (এক শহর থেকে অন্য শহরে যাবার কালে) মোটরে গিয়েছিলাম। রাস্তায় ভাল হোটেল ছিল না, গাড়ীর ইঞ্জিনের গোলযোগে অসময়ে হোটেলে খাদ্যও ঠিকমত পাওয়া যায় নি, তাই একদিন কলা খেয়ে কাটিয়েছিলাম। আমরা সোমালী ভাষা জানি না—আমাদের গাইড ড্রাইভার গিলাণ্ডো ভাল ইংরাজী জানে না। আমরা একটি জার্মান ভোকসওয়াগণ মোটর গাড়ীতে যাচ্ছিলাম। বনভূমির মধ্য দিয়ে সুন্দর রাস্তা, দুই পাশে নিবিড় বন, মাঝে মাঝে জংলীদের বাড়ীর সামনে অনেক কলা ঝুলানো দেখতে পেলাম। ক্ষুধায় কাতর হয়ে গিলাণ্ডোকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ঐ কলাগুলি বিক্রয়ের জন্য কি না এবং প্রতি ডজন কত দাম।" গিলাণ্ডো এসে জানালো দুই শিলি' দাম অর্থাৎ প্রায় পাঁচসিকে। কলাগুলি সুন্দর সুপরিপক্ক। আমাদের দেশের মাঝারি আকৃতির মর্ত্তমান কলারই মত, তবে দুই শিলিং ডজন—এ যে কলিকাতার বাজারের দাম! আমি অনন্যোপায় হয়ে দু ডজন কিনবার জন্য চার শিলিং আমার দোভাষীর হাতে দিলাম। কিছুকাল পরে দেখি কলার বড় বড় ছড়ি মাথায় করে সব কাফ্রিরা হাসিমুখে আমাদের গাড়ীর দিকে এগিয়ে আসছে। আমরা ভয়ে গাড়ীর কাঁচ বন্ধ করে দিলাম—পরে দেখি তারা প্রায় পুরা চার ছড়া কলা আমাদের গাড়ীর ড্রাইভারের পাশের আসন ভর্ত্তি করে দিয়ে গেল। আমি ভাবছি কত টাকা দাম লাগবে—অনেক পয়সা অপব্যয় হবে। ড্রাইভার বলল, "ভেরী গুড মাই ডিয়ার স্যার, ভেরী গুড মেই ফুঃ—ফোর শিলিং স্যার।" আমরা অবাক হলাম, পাঁচসিকি দিয়ে পুরা পাঁচশত কলা কিনেছি, আমরা দলবেঁধে খেলেও ফুরোতে পারব না। আমরা সেদিন কলা খেয়ে খুশী হয়েছিলাম, কারণ কোন রকম অসুখ করে নি, আর খেতেও খুব ভাল লেগেছিল। ইংরেজী প্রবাদে আছে, "Act as Romans while in Rome"—রোমে গেলে রোমানদের মতই আচার-ব্যবহার করবে। তাই উগাণ্ডাতে কলা খেয়ে অনেক দিনই কাটিয়েছি—কলা খেয়ে দিন কাটাতে মজাই লেগেছিল, আমাদের কারুরই স্বাস্থ্যহানিও হয় নি। ওদেশের লোকদের প্রধান খাদ্য কলা, আমরাও ওখানে অনেক দিন কলা খেয়েছি। দেশের জলবায়ুর তারতম্য অনুসারেই সেখানকার অধিবাসীদের খাদ্য আচার-ব্যবহার প্রভৃতি সৃষ্ট হয়। আফ্রিকার টাঙ্গানাইকার মাসাই অঞ্চলে মরুময় আগ্নেয়গিরি-সৃষ্ট জংলাভূমি আছে, সেখানে এক প্রকার ঘাস আর কাঁটা গাছ ছাড়া অন্য কিছুই জন্মায় না—শতাধিক মাইলব্যাপী ঐ মরুময় অঞ্চলে কোন প্রকার খাদ্যশস্যই পাওয়া যায় না। আমরা কিন্তু ওখানকার অধিবাসীদের অনুকরণ করে তাদের খাদ্য খেতে পারি

নি। ইংরেজী প্রবাদকে ওখানে আমাদের অনুসরণ করা অসাধ্য। ওখানকার অধিবাসী মাসাই জাতির লোকেরা শুধুমাত্র গরুর দুধ এবং গরুর টাটকা রক্ত খেয়ে বেঁচে থাকে। ওরা জংলী জাতি, জঙ্গলেই বাস করে, গরু পোষে এবং গরুর দুধ খায়। গরুর দুধ সংগ্রহ করে প্রথমে দেবতার জন্ম উৎসর্গ করে, তার পর ওরা নিজেরা পান করে। এক প্রকার তীর-ধনুক দিয়ে গরুর গলায় ছিদ্র করে সেখান থেকে প্রচুর রক্তপাত করাতে আরম্ভ করে। সেই রক্ত সংগ্রহ করে ওরা বাড়ীর সকলে দল বেঁধে পান করে। অনেকগুলি গরুকেই এই ভাবে ঐ মাসাইদের 'ব্লাড ব্যাঙ্কে' রক্ত দান করতে হয়। ওরা দেশী লাউয়ের খোলস দিয়ে তাদের পানপাত্র 'কিবুয়ু' তৈরি করে নয়—আর প্রত্যেক মাসাই-এর হাতেই ঐ একটি করে 'কিবুয়ু' দেখা যায়। পুরুষ মাসাইরা সর্বদাই তীর-ধনুক আর বল্লম নিয়ে চলাফেরা করে। মাসাইদের স্বাস্থ্য খুবই ভাল—শরীর কৃষ্ণবর্ণ এবং চকচকে। ওরা মেটে লাল রং খুবই পছন্দ করে, গায়ে গেরুয়া মাখে এবং রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধান করলে খুশী হয়। একটা বল্লম হাতে ওরা অবাধে বনজঙ্গল চলাফেরা করে—বনের সিংহ পর্য্যন্ত ওদেরকে ভয় পায়, মাসাইদের শরীরের গন্ধ পেলে সিংহ-বাঘেরা দূরে পালিয়ে যায়। ওদেরকে দেখলে সত্যি ভয় করে, ওরা যেন দুর্জয়তার প্রতিমূর্ত্তি। আর একটি জাত আছে যারা শুধু জঙ্গলের প্রাণী বধ করে তাদের মাংস খায়। এরা সবাই অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ, রাস্তায় যাত্রীদের মোটর গাড়ী লুটপাট করে, নরহত্যা করা এদের পক্ষে কিছুই নয়।

আমরা নাইরোবী শহরে এশিয়ান থিয়েটারে (লিবার্টি সিনেমা) যাদু প্রদর্শন আরম্ভ করি। কৃষ্ণাঙ্গদের থিয়েটারে কখনও শ্বেতাঙ্গরা 'শো' দেখতে আসেন না। আমাদের ইন্দ্রজাল প্রদর্শনীতে তার ব্যতিক্রম হয়েছিল, উদ্বোধন রজনীতে ভারতীয় হাই কমিশনারের স্ত্রী শ্রীমতী বাহাদুর সিং কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীকে নিমন্ত্রণ করে সঙ্গে নিয়ে যান। তার পর দিন থেকে আমাদের এশিয়ান থিয়েটার সম্পূর্ণভাবে শ্বেতাঙ্গদের দিয়েই ভর্তি হতে লাগলো। নানা জাতির নানা রং-এর দর্শকদের সাথে মিলেমিশে, তাদের সঙ্গে জড়ো হয়ে, এক সঙ্গে ভীত-বিহ্বল হয়ে এবং একই সঙ্গে অচৈতন্ত হয়ে পড়ে, প্রমাণিত হ'ল সাদা কালো প্রভেদটা বাইরের, কিন্তু ভিতরে সব মানুষই সমান।

তবে বাইরের হ'লেও আফ্রিকায় এই প্রভেদটা সহজে ভুলবার নয়। বর্ণবিদ্বেষ ওখানে এমন ভাবে পেয়ে বসেছে, যা ধারণাতীত। আমরা নাইরোবীতে একটা হোটেলে থাকতে গিয়েছি—টেলিফোনে SORCAR নাম লিখিয়ে 'বুক' করেছি—কিন্তু যে মুহূর্ত্তে জানতে পারলো যে আমরা ভারতীয়, অমনি বলল, "আমরা এশিয়ার লোক রাখি না।" মোটকথা তাদের হোটেলে শ্বেতকায় ছাড়া পীত বা কৃষ্ণকায় কারো স্থান নেই। থিয়েটার, ক্লাব—সবকিছু আলাদা করে নিয়েছে—এরা নিজেদের গণ্ডীর বাইরে যায় না—অন্ত দিকে কৃষ্ণকায়দেরও আলাদা গণ্ডী গড়ে উঠেছে। আমাদের ইন্দ্রজাল প্রদর্শনী আফ্রিকায় এত বর্ণবিদ্বেষের মধ্যে যে নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে যা সত্যই স্মরণীয়। ইংলণ্ডের বিখ্যাত যাদুবিদ্যাবিষয়ক পত্রিকা (ABRACADABRA)-র ২১শে মার্চ ১৯৫৯ সংখ্যায় ইংরেজ সম্পাদক স্বয়ং লিখেছেন:

"SORCAR,—all praise to him—has broken tradition in Nairobi, for through colour segregation European whites rarely go to Asian theatres there, but many hundreds have attended his shows at the Liberty Cinema Hall"

—"সরকারকে অশেষ ধন্তবাদ—কারণ তিনি নাইরোবীর সংস্কার ভঙ্গ করেছেন। ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গগণ বর্ণবৈষম্যের জন্ম কখনও এশিয়ান থিয়েটারে যান না, কিন্তু লিবার্টি সিনেমা হলে শ্রীযুক্ত সরকারের খেলাতে বহু শত শ্বেতাঙ্গ দর্শক হিসাবে গিয়েছিলেন।"

শ্রীনিকেতনে দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ সাহেব

শ্রীপুষ্প দেবী

আমার বাবা স্বর্গত সুকুমার চট্টোপাধ্যায় যখন বিশ্বভারতীর সঙ্গে যুক্ত হন তখন বোধ হয় ১৯৩৮ সাল। বাবা শ্রীনিকেতন-সচিব হয়ে যে বাড়ীতে ছিলেন, ঠিক তার অনুরূপ বাড়ীতে তখন ছিলেন দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ সাহেব। অমন মিষ্টভাষী, অমন সরল, অমন কৌতুক-প্রিয় মানুষ আমি আর দেখি নি। জানি না তাঁর দীনবন্ধু নাম কে দিয়েছিলেন। এক-একটি ছোট ঘটনা মনে পড়ে। ক'দিন ধরে শ্রীনিকেতনে চলছে অবিশ্রান্ত ঝড়-বৃষ্টি, সাইক্লোনের মতন। বাবা তখন সবে নিমোনিয়া থেকে উঠেছেন, আমি ছিলুম বাবার কাছে। যখনই খবর আসে, কার বাড়ীর চাল উড়ে গেছে—কোথায় কার ক্ষেতে জল জমে ফসল নষ্ট হচ্ছে—আর বাবাকে আটকানো যায় না। খালি পায়ে সর্বক্ষণ পথে পথে ঘুরছেন দরিদ্রদের বাঁচাবার জন্ত ব্যাকুল হয়ে। গেছলুম বাবার সেবার জন্তে, পেলুম জনসেবার ভার। যখন তখন বাবা ঠাকুর চন্দ্রদেওকে ডাক দিয়ে বলতেন, চন্দ্রদেও এক হাঁড়ি ভাত চড়াও তো। ঠাকুরের বিরক্ত মুখের দিকে চেয়ে আমিই উদ্যোগী হয়ে উঠি, কারণ জানি, তাদের সময়ে খেতে না দিতে পারলে বাবার দুঃখের সীমা থাকবে না।

সে আজকের শ্রীনিকেতন নয়, যা কিছু দরকার তার জন্ত সাইকেলে লোক ছোটাতে হবে,ভরসা বোষ্টম ভোলা। বাবার ছোট্ট একজনের সংসারে আমিই প্রচুর, আমি এবং আমার তিন মেয়ে। তার ওপর ওরকম সংখ্যাহীন মানুষের সংসার চালানো সহজসাধ্য নয়। ঐ সময় সেই বিপন্ন দুঃস্থদের প্রাথমিক ক্ষুন্নিবৃত্তির ভার নিতেন এণ্ড্রুজ সাহেব। আমি আজো ভেবে পাই না, অত অজস্র পাঁউরুটি তাঁর ভাঁড়ারে কেমন করে পাওয়া যেতো। একদিন সে সম্বন্ধে তাঁকে প্রশ্ন করে উত্তর পেয়েছিলুম, পাঁউরুটির গাছ পুঁতেছি। ঐ ভাবে চিঁড়ে মুড়িও তাঁর ভাঁড়ারে অজস্র পাওয়া যেত, অবশ্য চিঁড়ে-মুড়ির চাষের সম্বন্ধে তাঁকে কোনদিন প্রশ্ন করি নি।

আর একদিনের কথা মনে পড়ে, গুরুদেবের একখানি ছবি বাবা শ্রীনিকেতনের কাঠের কাজের স্কুল থেকে বাঁধিয়ে এনে আমায় দেন। সন্ধ্যেবেলা এণ্ড্রুজ সাহেব এলেন বেড়াতে—বাবা সেই ছবিটি তাঁকে দেখাতে তিনি ত মহা খুশী! বললেন, ঠিক এইরকম ছবি একটি আমার চাই। বাবা হেসে বললেন "বুঝছি এটি আপনার মত নির্লোভ মানুষের মনেও লোভের উদয় করেছে, কাজেই এটিই আপনি নিন, এটি রাখা নিরাপদ নয়। কারণ যতই চেষ্টা করি না কেন অন্য ছবিটি কিছুতেই আপনার মনোমত হবে না।" এণ্ড্রুজ সাহেব তো অপ্রস্তুত—শেষে অনেক বাদানুবাদের পর সে ছবিটি এণ্ড্রুজ নিয়ে যান। তার অনুরূপ ছবি আজো আমার ঘরে সযত্নে রক্ষিত আছে। ঐ সময় আমার স্বামী (শ্রীশান্তনুকুমার মুখোপাধ্যায়) মহাশয়ের সঙ্গেও এণ্ড্রুজ সাহেবের ঘনিষ্ঠতা হয়। গাছের সারের বিষয় ও বড় গাছ কি ভাবে টবে করতে হয়, এ বিষয় নাকি তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। একজন জাপানী অধ্যাপকের কাছে নাকি এণ্ড্রুজ সাহেব এ বিষয় শিক্ষালাভ করেছিলেন। একে নাকি বান্‌সাই করা বলে।

ঐ সময়ের আরো একটি ঘটনা মনে পড়ে আজ নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী মনে হয়। রোজ সন্ধ্যায় বাবার ও এণ্ড্রুজ সাহেবের গল্প। গল্পের বিষয় ছিল কি ভাবে জনহিত ও জনশিক্ষা দিয়ে দুঃস্থজনকে রক্ষা করা যায়। এই আলোচনায় বিভোর দুটি বাহ্যজ্ঞানশূন্য মানুষকে নিজেদের ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা মনে করিয়ে দেওয়া সহজসাধ্য নয়। বাবার সন্ত কঠিন রোগমুক্তির কথা মনে করে আমি শঙ্কিত হতুম। বিরক্তও হতুম অনেক সময় এণ্ড্রুজ সাহেবের ওপর মনে মনে। যাঁরা আমার বাবাকে চিনতেন তাঁরা জানেন, তাঁর অন্তিম সময়ে কঠিন হৃদ-রোগের কষ্টও তাঁকে সচেতন করতে পারে নি তাঁর নিজের দেহ কষ্টের দিকে। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ যখন আমার বাবাকে দেখতে আসেন তখনও বাবা দুঃস্থদের কথা, দেশের কথাই বলেছেন, নিজের কথা একেবারেই নয়।

আমার এর পরের কথা অত্যন্ত বেদনাদায়ক, এর পর এণ্ড্রুজ সাহেবকে মাত্র দু'বার দেখি, একদিন প্রেসিডেন্সী জেনারল হস্‌পিটালে, তার পর নার্সিং হোমে, এই দুদিনই সেই মুমূর্ষু মানুষটির মুখের প্রশান্তি একবিন্দু ব্যাহত হতে আমি দেখি নি। আমার মেজ ভাই শ্রীমান অজয়কুমার

চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্রুজ সাহেবের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল। সে তখন এ্যাকাউণ্টেন্সী পরীক্ষার জন্য বিলাত যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। তখন সে বিষয়ে অনেক আলোচনা ও পরামর্শ এণ্ড্রুজ সাহেব সস্নেহে তাকে দিতেন। আজো সেই স্নেহ স্মরণ করে সে অভিভূত হয়। এণ্ড্রুজ সাহেবের শেষ সময়ে ও সমাধির সময়ে বাবার সঙ্গে অক্ষয়ও উপস্থিত ছিল। এণ্ড্রুজ সাহেবের মৃত্যুর পর বাবা দশদিন অশৌচ বেশ ধারণ করেন ও একবেলা হবিষ্য গ্রহণ করতেন, ঐ সময় আমি বাবার কাছে ছিলুম। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, দু'জনে দু'জনের অন্তরের আত্মীয় ছিলেন। বাবার ঘরে এণ্ড্রুজ সাহেবের একখানি ছবি চিরদিন সযত্নে রক্ষিত ছিল। মৃত্যুর কয়েকদিন আগেও বাবা তাতে আমাদের দিয়ে মালা দিইয়েছেন।

এর পর বাবার মৃত্যুর পর একবার পশ্চিমবঙ্গ বয়স্ক শিক্ষা পরিষদের পক্ষ থেকে আমরা কয়েকজন এণ্ড্রুজ সাহেবের জন্মদিনে তাঁর সমাধিস্থলে মিলিত হই। ঐ সময় সেই দেবপ্রতিম বৃদ্ধের অভাব স্মরণ করে আমি কিছুতেই অশ্রু সম্বরণ করতে পারি নি। তখন আমার সান্ত্বনা দিয়ে রেভারেণ্ড বিলাস মুখার্জ্জী বলেন, "দুপ আমাদের খুব সৌভাগ্য যে, আজ এণ্ড্রুজ সাহেব ও সুকুমারবাবু জীবিত নেই। এই সময় যদি ওঁরা বেঁচে থাকতেন, তাঁরা দাঙ্গার লাঠির তলায় বুক পেতে দিতেন, তুমি আটকাতে পারতে না।" তখন ১৯৪৮ সাল, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা চলছে। ঐ শ্রীনিকেতনে থাকাকালীন এঁদের দু'জনের নিরলস কর্ম্মপ্রচেষ্টা ও দুঃস্থজনের সেবার আগ্রহ এবং বহু আলোচনা শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সে সব কথা আমার সারা জীবনে শিক্ষার আদর্শ হয়ে আজীবন মনে থাকবে। তাঁর বিষয় অনেক কথাই আমার স্মরণে আসছে, কিন্তু তার স্থান এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তাই তাঁকে ও তাঁর মহত্তর জীবনকে স্মরণ করে জানাচ্ছি আমার শ্রদ্ধায় ভরা প্রণাম।

পাড়াগাঁয়ের বিপর্য্যয়

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

পাড়াগাঁ পাড়াগাঁই রহিয়াছে; স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর পরেও ইহার খ্যাতি তেমন কিছুই বর্দ্ধিত হয় নাই; সহরবাসীদিগের মধ্যে অনেকেই এখনও পাড়াগাঁয়ের কথা শুনিলেই পূর্ব্বেকার মতই নাক সিটকান। সকল স্তরেই এই মনোভাব বিদ্যমান। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই আমার কথা হয় ত বুঝা যাইবে।

বর্ত্তমানে কলিকাতা এবং অন্যান্য সহর হইতে অনেক গ্রাম পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে; মোটর, লরী প্রভৃতি যাতায়াত করে; গ্রামের অভ্যন্তরে কিন্তু পাকা রাস্তা নাই, পূর্ব্বেকার মতই পায়ে চলার উপযুক্ত পথ আছে, বর্ষার সময়ে জল-কাদা ভাঙ্গিয়া যাইতে হয়। বর্ত্তমান নিয়মানুসারে কয়েক শ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জমি দিতে হয়; জমি দিবার পর সরকার বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ মঞ্জুর করেন। এখন মুস্কিল হইতেছে এই জমি লইয়া; গ্রামের অভ্যন্তরে, (যেখানে মোটর যাইবার রাস্তা নাই) বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ উপযুক্ত জমি প্রদান করিলে সরকার সেই জমি গ্রহণ করিতে নারাজ হন, যেহেতু সেখানে যাইবার জন্য মোটরের উপযুক্ত রাস্তা নাই, এবং ইহার ফলে বিদ্যালয়ের সরকারী পরিদর্শকগণ বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে পারিবেন না: এই কথা নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই লিখিতেছি। এবং ইহার ফলে আমার গ্রামে একটি বিদ্যালয় স্থাপনের পথে অযথা বিলম্ব ঘটিতেছে। মোটরের রাস্তার উপরে উপযুক্ত পরিমাণ উপযুক্ত জমি সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না। গ্রামের অভ্যন্তরে যে জমির কথা বলিতেছি, সে জমি মোটরের রাস্তা হইতে ১০।১৫ মিনিটের পথ, এবং সেই জমি নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের মধ্যস্থলে অবস্থিত।

যদিও ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন—স্থানীয় অনুষ্ঠানে স্থানীয় কর্ম্মী পৌরোহিত্য করিবেন; কিন্তু তাহা হইলে সেই অনুষ্ঠানের প্রতি জনসাধারণের কোন আগ্রহ,

উৎসাহ, উদ্দীপনা থাকে না, অনুষ্ঠানে লোক সমাগমও হয় না ; সুতরাং একজন নামজাদা লোককে (V. I. P.) ধরিতে হয় ; এইরূপ একজন নামজাদা লোককে ধরিতে এবং পল্লী অঞ্চলের কোন অনুষ্ঠানে তাঁহাকে পৌরোহিত্য করিতে রাজী করাইতে যে কত বেগ পাইতে হয় তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা যায় যে, ইহার ফলে স্থানীয় বহু অনুষ্ঠান অযথা বিলম্বিত হয়, এবং স্থানীয় জনসাধারণের উৎসাহ, উদ্দীপনা প্রভৃতি হ্রাস পায় ; বিশেষতঃ এই কারণে স্থানীয় বিদ্যালয় সমূহের পুরস্কার বিতরণে বিলম্ব ঘটিলে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ ত হ্রাস পায়ই, তাঁহাদের অধ্যাপনের পথেও একটা নিরুৎসাহের ভাব আনিয়া দেয়। এই প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে ইহাও বলিতে পারি যে, কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন নামজাদা ব্যক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইলেন বটে, কিন্তু অনুষ্ঠানের সমাপ্তি পর্য্যন্ত তাঁহারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিতে পারিলেন না ; তাঁহারা অনেক অজুহাত দেখান। অথচ তাঁহারা একবারও চিন্তা করিয়া দেখেন না, ইহার ফলে অনুষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ এবং সমাগত জনসাধারণ কতটা নিরুৎসাহ হন। বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী সভায় তাঁহারা পুরস্কার বিতরণ না করিয়া চলিয়া আসেন ; ইহার ফলে ছাত্রছাত্রীগণের মনোভাব কি-হয় তাঁহারা ভাবিয়াও দেখেন না।

পল্লী অঞ্চলের এইরূপ বহু বিপর্য্যয় আছে। পল্লী অঞ্চলে সহরবাসীদের, বিশেষতঃ, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের, উপযুক্ত সজ্জিত বৈঠকখানা, শয়ন ঘর, ভোজন ঘর, স্নান, মলমূত্র ত্যাগ করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থাও নাই ; এই কারণে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ পল্লী অঞ্চলে "এক কাপড়ে যান, এক কাপড়ে ফিরিয়া আসেন"—তাঁহারা যথাসম্ভব শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে পারিলে যেন "হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন।" এ কথা স্বীকার করি, তাঁহাদের অভ্যাস অনুযায়ী কোন ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হইলে তাঁহাদের অসুবিধা হইবেই ; কিন্তু উপায় কি ? জাতিগঠনমূলক বিভাগসমূহের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেলাতেও এই কথা খাটে। এই কথাও নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই বলিতেছি।

পল্লী অঞ্চলের কোন বিদ্যালয়ের সম্পাদক হিসাবেও বলিতেছি যে, প্রধানতঃ উপযুক্ত বাসস্থান, স্নান করিবার উপযুক্ত ঘর, মলমূত্র ত্যাগ করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা ইত্যাদি না থাকার জন্ম উপযুক্ত ও নির্দ্দিষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকাও পাইতেছি না ; ইহার ফলে ছাত্রছাত্রীগণের লেখাপড়ার ভীষণ ক্ষতি হইতেছে ; এই ক্ষতি আর পূরণ করা যাইবে না ; ছাত্রছাত্রী জীবনের প্রথম অবস্থাতেই তাহাদের এই বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে ; তাহাদের অগ্রগতির পথে এই বাধার সৃষ্টির জন্ম কে বা কাহারা দায়ী ?

আজ সমগ্র ভারতে যে কর্ম্মচাঞ্চল্যের সূত্রপাত ঘটিয়াছে তাহা সাফল্য লাভ করিবে না যদি পল্লী অঞ্চলে সেই কর্ম্মধারাকে পরিব্যাপ্ত করিতে পারা যায়। আজিকার সরকার নির্ভর সমাজ ব্যবস্থায় যে কোন সরকারী আন্দোলনকে জনসাধারণের মধ্যে প্রসারিত করিবার মুখ্য দায়িত্ব সরকারী কর্ম্মচারীদের। সুতরাং তাঁহাদের সহরমুখী দৃষ্টিভঙ্গীকে সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া ফেলিতে হইবে। গ্রাম্যজীবন ধারাকে যদি স্বীকার না করিয়া লন তাহা হইলে জনসাধারণের হৃদয় কিরূপে তাঁরা জয় করিবেন ? সরকারী কর্ম্মচারীদের এবং শিক্ষিত জনসাধারণের এই বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গীর মূল কারণ সরকারী পরিকল্পনার ত্রুটি। বিকেন্দ্রীক অর্থনীতি কাগজে-কলমে গৃহীত হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে তাহার ব্যাপক প্রয়োগ বিশেষ পরিলক্ষিত হইতে দেখি না। ফলে দেশের প্রধান প্রধান শহরে এবং তাহার সন্নিহিত চারিপার্শ্বে কর্ম্মোদ্যমের প্রধান প্রচেষ্টা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। যাহার ফলে আধুনিক জীবনের উপযোগী প্রায় সকল প্রকার আরামপ্রদ বিলাস উপকরণ এতদঅঞ্চলেই কেন্দ্রীভূত। তাই শহর বা শহরতলী ছাড়িয়া গ্রামে যাইতে কাহারও মন সরে না। কারণ যেখানে আলো সেখানেই ত পোকা আসিবে। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত আরামপ্রদ অফিস-ঘর ত্যাগ করিয়া যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি কি কারণে গ্রামের বৈদ্যুতিক সংযোগশূন্য বিদ্যালয়ে পড়াইতে আসিবেন ? বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে দেশপ্রেমের আদর্শে আমাদের দেশের বিশেষ কেহ উদ্বুদ্ধ হইতে চাহে না। কারণ স্বাধীনতালাভের পর দেশপ্রেমের চিরাগত অর্থ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং গ্রামের বিপর্য্যয় দূরীকরণের প্রধান উপায় বিকেন্দ্রীক শিল্পায়ন।

জ্ঞানকর্ম সমুচ্চয়বাদ

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

(২)

পূর্বসংখ্যায় শঙ্কর কি ভাবে তাঁর গীতা-ভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভাষ্য-ভূমিকায় জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়-বাদ খণ্ডন করেছেন, সে সম্বন্ধে কিছু বলা হয়েছে।

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ভাষ্য-ভূমিকাতেও শঙ্কর জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়-বাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

এস্থলে তিনি বলছেন যে, গীতায় নিবৃত্তি-মার্গ বা "সাংখ্য-বুদ্ধি" এবং প্রবৃত্তি-মার্গ বা "যোগ-বুদ্ধি"—এই "দ্বিবিধা-বুদ্ধি"র কথা বলা হয়েছে, "সাংখ্য-বুদ্ধির" দ্বারা মোক্ষলাভের কথাও বলা হয়েছে, কিন্তু "যোগ-বুদ্ধিও" একই ভাবে শ্রেয়প্রাপ্তি বা মোক্ষলাভের উপায়স্বরূপ কিনা, সে কথা কিছুই বলা হয় নি। সেজন্যই অর্জুন এই তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভেই জ্ঞান কর্ম অপেক্ষা শ্রেয়ঃ হলে, কেন তাঁকে কর্ম করতে বলা হচ্ছে, সে বিষয়ে ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করেন। অর্জুনের এই প্রশ্নের এবং শ্রীভগবানের উত্তরের ভ্রান্ত অর্থ করে কেহ কেহ এস্থলে বলেন যে, জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়-বাদই গীতার মূলীভূত তত্ত্ব। এই মতানুসারে, প্রত্যেক আশ্রমাধিকারিগণের পক্ষেই কর্ম অত্যাবশ্যক, এবং জ্ঞানের সঙ্গে শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত কর্ম সম্মেলিত না হলে মোক্ষলাভ অসম্ভব।

শঙ্কর এই জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়-বাদেরই খণ্ডন করেছেন এস্থলেও পূর্বের ন্যায়।

প্রথমতঃ, এই মতবাদ স্ববিরোধ-দোষদুষ্ট। যাঁরা এই মতবাদ প্রপঞ্চিত করেছেন তাঁরা একবার বলছেন যে, বেদে যে সকল কর্ম যাবজ্জীবন করণীয় বলে বিহিত হয়েছে, সেই সকল কর্ম পরিত্যাগ করে কেবল জ্ঞান আশ্রয় করলেই মোক্ষলাভ হয় না; আরেকবার বলছেন যে, জ্ঞান-মার্গ ও কর্ম-মার্গ ভেদে কর্মেরও বর্জন বা অনুষ্ঠান হয়।

দ্বিতীয়তঃ, যদি বলা হয় যে, কেবল গার্হস্থ্যাশ্রমেই শ্রুতি-বিহিত-কর্ম পরিত্যাগ করে কেবল জ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ অসম্ভব,—অন্য, অর্থাৎ, সন্ন্যাসাশ্রমে নয়—তার উত্তর এই যে, সেক্ষেত্রেও স্ববিরোধ-দোষ থেকেই যায়। কারণ, জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়-বাদ প্রপঞ্চনা প্রসঙ্গে প্রথমেই একবার বলা হয়েছে যে, জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় প্রত্যেক আশ্রমেই অত্যাবশ্যক। সেক্ষেত্রে, পুনরায়, কেবল গার্হস্থ্যাশ্রমের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য—তা পরে বলা যায় কি করে?

তৃতীয়তঃ, যদি বলা হয় যে, গৃহস্থগণের ক্ষেত্রে স্মার্ত-কর্ম থাকলেই হবে না, শ্রৌত-কর্ম থাকাই অত্যাবশ্যক, অর্থাৎ, শ্রৌত-কর্মের সঙ্গেই জ্ঞানের সমুচ্চয় এক্ষেত্রে মোক্ষের জন্য অবশ্য-প্রয়োজনীয়—তার উত্তর হ'ল এই যে, গার্হস্থ্যাশ্রম ও অন্যান্য আশ্রমের মধ্যে যে এই দিক থেকে প্রভেদ আছে, তা কিরূপে নিশ্চয় করা সম্ভব হবে? কিরূপে স্থিরভাবে জানা যাবে যে, গৃহস্থের পক্ষে শ্রৌত-কর্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয় অত্যাবশ্যক, যেক্ষেত্রে সন্ন্যাসীদের পক্ষে স্মার্ত-কর্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয়ই যথেষ্ট?

চতুর্থতঃ, যদি এইভাবে বলা হয় যে, সন্ন্যাসীদের পক্ষে স্মার্ত-কর্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয় মোক্ষলাভের জন্য প্রয়োজন, কিন্তু শ্রৌত-কর্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয় তাঁদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন নয়—তার উত্তর হ'ল এই যে, সেক্ষেত্রে গৃহস্থগণের জন্য একটি বিশেষ ও স্বতন্ত্র নিয়মের প্রয়োজন কি? অর্থাৎ, সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে যেরূপ, গৃহস্থদের ক্ষেত্রেও সেরূপ, স্মার্ত-কর্মের সঙ্গেই জ্ঞানের সমুচ্চয় প্রয়োজন বলে স্বীকার করা উচিত। গৃহস্থদের ক্ষেত্রে শ্রৌত-কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের সমুচ্চয় অত্যাবশ্যক বলার অর্থ কি?

পঞ্চমতঃ, যদি বলা হয় যে, গৃহস্থগণ সন্ন্যাসিগণের অপেক্ষা নিম্নস্তরের, সেইজন্যই কেবলমাত্র স্মার্ত-কর্মের সঙ্গেই জ্ঞানের সমুচ্চয় মোক্ষলাভের দিক্ থেকে সন্ন্যাসিগণের পক্ষে অত্যাবশ্যক হলেও গৃহস্থগণের পক্ষে শ্রৌত-স্মার্ত উভয়বিধ কর্মের সঙ্গেই জ্ঞানের সমুচ্চয় অত্যাবশ্যক—তার উত্তর এই যে, সেক্ষেত্রে আয়াস-বহুল, ব্যয়সাধ্য ও বহুদুঃখজনক দ্বিবিধ কর্ম গৃহস্থগণের উপর ন্যস্ত করা হয়।

"তত্রৈবং সতি গৃহস্থস্যায়াস-বাহুল্যাৎ শ্রৌতং স্মার্তং চ বহুদুঃখরূপং কর্ম শিরস্যারোপিতং স্যাৎ।"

(গীতা-ভাষ্য-ভূমিকা, তৃতীয় অধ্যায়।)

ষষ্ঠতঃ, যদি বলা হয় যে, আয়াসসাধ্য শ্রৌত-কর্মানুষ্ঠান থেকে কেবল গৃহস্থগণেরই মোক্ষলাভ হয়, শ্রৌত ও নিত্য-কর্মত্যাগী সন্ন্যাসিগণের নয়—তার উত্তর এই যে,

"তদপ্যসৎ, সর্বোপনিষৎসু ইতিহাস-পুরাণ-যোগশাস্ত্রেষু চ জ্ঞানাঙ্গত্বেন মুমুক্ষোঃ সর্ব-কর্ম-সন্ন্যাস-বিধানাৎ।"

(গীতা-ভাষ্য-ভূমিকা, দ্বিতীয় অধ্যায়।)

এই মতবাদ সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। কারণ, সকল উপনিষদ্, ইতিহাস, পুরাণ ও যোগশাস্ত্রে জ্ঞানাঙ্গ বা জ্ঞানোৎপত্তির সহায়করূপে সর্ব-কর্ম-ত্যাগ বিহিত হয়েছে।

সপ্তমতঃ, যদি বলা হয় যে, গার্হস্থ্যাশ্রমই শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলে গৃহস্থদেরই যে কেবল মোক্ষ হয়, সে কথা ত অযৌক্তিক নয়— তার উত্তর এই যে, শাস্ত্রে যখন অন্যান্য আশ্রমও বিহিত হয়েছে, তখন কেবল গৃহস্থগণই মোক্ষের অধিকারী, অন্যেরা নয়, এ কথা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক।

অষ্টমতঃ, যদি বলা হয় যে, শ্রুতিতে যখন সকল আশ্রমেরই বিধান আছে, তখন সকল আশ্রমেই নির্বিশেষে জ্ঞান-কর্মের সমুচ্চয় অত্যাবশ্যক—তার উত্তর এই যে, শ্রুতি অনুসারেই মোক্ষার্থীর পক্ষে সর্ব-কর্ম-ত্যাগ বিহিত হয়েছে—

"মুমুক্ষোঃ সর্ব-কর্ম-সন্ন্যাস-বিধানাৎ।"

(গীতা-ভাষ্য-ভূমিকা, তৃতীয় অধ্যায়।)

নবমতঃ, পূর্বেই যা বারংবার বলা হয়েছে, মোক্ষ নিত্যসিদ্ধ, সৃজ্য কার্য নয়, সেজন্য মোক্ষের ক্ষেত্রে কর্ম অনর্থক—

"মোক্ষস্য চ অকার্যত্বাৎ মুমুক্ষোঃ কর্মানর্থক্যম্।"

(গীতা-ভাষ্য-ভূমিকা, তৃতীয় অধ্যায়।)

দশমতঃ, যদি বলা হয় যে, নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান না করলে যে পাপ হয়, তার ক্ষালনের জন্য অন্ততঃ নিত্য-কর্মানুষ্ঠান সকলের পক্ষেই অত্যাবশ্যক—তার উত্তর এই যে, নিত্যকর্মও জ্ঞানী বা সন্ন্যাসীর পক্ষে অত্যাবশ্যক নয়।

এক্ষেত্রে যাঁরা সন্ন্যাসী নন, তাঁদের ক্ষেত্রেই কেবল নিত্যকর্মানুষ্ঠানের অভাবে পাপের সৃষ্টি হতে পারে—সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে সেই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। বস্তুতঃ অগ্নিহোত্রাদি প্রমুখ কর্মানুষ্ঠান না করলে যে সন্ন্যাসীদের পাপ হয়, তা ত কল্পনামাত্রও করা যায় না। প্রকৃতকল্পে, নিত্যকর্মের 'অকরণ' অভাব পদার্থ, 'পাপ' ভাব পদার্থ। কিন্তু 'অভাব' থেকে 'ভাবের' উৎপত্তি হবে কি করে?

একাদশতঃ, যদি বলা হয় যে, বেদের বিধানানুসারেই নিত্যকর্মের অকরণে পাপের উদ্ভব হয়, সেক্ষেত্রে এরূপ হয় না বললে 'বেদেরই আনর্থক্য ও অপ্রামাণিকত্ব স্বীকার করে' নিতে হয়,—তার উত্তর এই যে, যদি বেদকে "কারক" অথবা কর্ম-বিধায়করূপেই গ্রহণ করা হয়, তা হলে "করণই" হোক বা "অকরণই" হোক, উভয় ক্ষেত্রেই বেদ ত অনর্থক ও অপ্রমাণ হয়েই পড়ে। কারণ, বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বিহিত-কর্ম সম্পাদন করলেও যথাযথ ফললাভ হয় না (আনন্দগিরি টীকা)। উপরন্তু, বিহিত-কর্মের করণেও দুঃখ বা সংসার, অকরণেও দুঃখ বা পাপ—এরূপে বেদের বিধিবিধান ত স্বতঃই অর্থহীন হয়ে পড়ছে।

দ্বাদশতঃ, যা পূর্বেই বলা হয়েছে, যদি গীতার শ্রীভগবান জ্ঞান ও কর্ম উভয়কেই মোক্ষের অবশ্য অনুষ্ঠেয় সাধন বলে নির্দেশ করে থাকেন ত অর্জুনের প্রশ্ন (গীতা—৩-১)——কর্ম থেকে জ্ঞান শ্রেয়ঃ হলে, কেন শ্রীভগবান তাঁকে অকারণে সেই নিকৃষ্টতর কর্মমার্গেই প্রবৃত্ত করছেন— নিরর্থক হয়ে পড়ে।

ত্রয়োদশতঃ, জ্ঞান ও কর্ম পরস্পরবিরোধী। যা পূর্বেই বারংবার বলা হয়েছে, কর্ম হ'ল অসংখ্য ভেদমূলক, 'অহংজ্ঞান'-প্রসূত, কামনা-কলুষিত, অসম্পূর্ণতা-দ্যোতক, এবং সর্বশেষে অবিদ্যাজনিত। প্রথমতঃ, ভেদের দিক্ থেকে বলা চলে যে, কর্মের কর্তা, ঈপ্সিত ফল বা বস্তু, উপাদান, নিমিত্ত, প্রণালী, কর্তার দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন প্রভৃতি পরস্পর ভিন্ন হয়েও একই পুরুষের একই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য একত্রে গ্রথিত বা সম্মেলিত হয় সত্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও, তারা সর্বদাই পরস্পরভিন্নই থাকে, নিঃসন্দেহ। দ্বিতীয়তঃ, 'অহং'-জ্ঞানের দিক থেকে বলা চলে যে, কর্তৃত্বাভিমান, অর্থাৎ 'আমিই এই কর্ম করছি' 'আমি নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টা' নই, 'সক্রিয় কর্তা'—এরূপ বোধ না থাকলে কর্ম হয় না। তৃতীয়তঃ, কর্মের পশ্চাতে থাকে কর্ম-ফলের, কর্ম-লভ্য বস্তুর জন্য তীব্র, অদম্য কামনা, যার জন্যই সেই বিশেষ বস্তুটি লাভের আশায় সেই বিশেষ কর্মটি আরম্ভ করা হয়। চতুর্থতঃ, কর্ম অপ্রাপ্ত কামনা, অপূর্ণ ইচ্ছারই পরিচায়ক, অথবা, অভাব ও অপূর্ণতার লক্ষণ। পঞ্চমতঃ, কর্ম ওতপ্রোত-ভাবে অবিদ্যামূলক। ভেদ, অহঙ্কার, কামনা, অপূর্ণতা—সবই অবিদ্যামূলক। প্রকৃতকল্পে, আত্মায় ভেদ নেই, আত্মা নির্বিশেষ, আত্মায় অহঙ্কার নেই, আত্মা নিষ্ক্রিয়; আত্মার কামনা নেই, আত্মা আপ্তকাম, আত্মায় অপূর্ণতা নেই, আত্মা নিত্যপূর্ণ। এরূপে, কর্মের যে প্রধান পঞ্চ-লক্ষণ: ভেদ, অহঙ্কার, কামনা, অপূর্ণতা ও অবিদ্যা, তা জ্ঞানের উদয়ে মুহূর্তমাত্রও থাকতে পারে না। সেজন্যই,

আলোক ও অন্ধকার যেমন একত্রে থাকতে পারে না, জ্ঞান ও কর্মও ঠিক তাই।

এই ভাবে, এস্থলেও বিবিধ যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে শঙ্কর সিদ্ধান্ত করছেন :—

"তস্মাৎ সন্ন্যাসিনাং কর্মাণি অতো জ্ঞান-কর্মণোঃ সমুচ্চয়ানুপপত্তিঃ।"

"তস্মাৎ কেবলাদেব তত্ত্বজ্ঞানান্মোক্ষ ইত্যেষোঽর্থঃ নিশ্চিতো গীতাসু সর্বাসু উপনিষৎসু চ।" (গীতা-ভাষ্য-ভূমিকা, তৃতীয় অধ্যায়)।

অতএব, জ্ঞানী বা সন্ন্যাসিগণের কোনো কর্ম নেই, সেজন্য জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়-বাদ অযৌক্তিক।

অতএব, কেবল জ্ঞান দ্বারাই যে মোক্ষলাভ হয়—এই তত্ত্বই গীতা এবং সকল উপনিষদে নিশ্চিত ভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের এই ভাষ্য-ভূমিকার পর, প্রথম তিনটি শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্কর স্পষ্ট ভাবে জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়-বাদ খণ্ডন করে প্রমাণ করেছেন যে, অর্জুন ও শ্রীভগবানের প্রশ্নোত্তর থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, জ্ঞান ও কর্ম একই মার্গ নয়; এমন কি উভয়ের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ পর্যন্ত নেই।

"যদি চ কর্ম-নিষ্ঠায়াং গুণভূতম্ অপি জ্ঞানং ভগবতোক্তম্।"
—(গীতা-ভাষ্য, ৩-২।)

যদি কর্মের অঙ্গরূপে জ্ঞান নির্দিষ্ট হত, তা হলে দুটির মধ্যে কেবল একটির সম্বন্ধেই বিচার প্রার্থনা করা হত না। কিন্তু—

"উভয়-প্রাপ্ত্যসম্ভবম্ আত্মনো মন্যমান একতরমেব প্রার্থয়েৎ।"
(গীতা-ভাষ্য, ৩-২।)

দুটি মার্গের একত্রে অনুসরণ অসম্ভব মনে করে, একটির বিষয়ে প্রার্থনা করা হয়েছে।

সেজন্য এক্ষেত্রেও শঙ্কর সিদ্ধান্ত করছেন :

"তস্মাৎ কয়াপি যুক্ত্যা ন সমুচ্চয়ো জ্ঞান-কর্মণোঃ॥"
(গীতা-ভাষ্য ৩-৩)

এই কারণে, কোনো যুক্তির দ্বারাই জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় সিদ্ধ হয় না।

গীতার যে শেষ অষ্টাদশ অধ্যায়কে শঙ্কর সকল শাস্ত্র এবং সমগ্র গীতার উপসংহারস্বরূপ, অথবা, পূর্বে প্রতিপাদিত তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত পুনরুল্লেখরূপে গ্রহণ করেছেন (গীতা-ভাষ্য, ১৮-১), সেই শেষ অষ্টাদশ অধ্যায়ে তিনি জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়-বাদও পুনরায় বিস্তৃত ভাবে খণ্ডনে ব্রতী হয়েছেন। সেই সুবিখ্যাত শ্লোকের ভাষ্যে :—

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"
(গীতা-ভাষ্য, ১৮-৬৬।)

শঙ্কর তিনি পুনরায় প্রথম থেকেই আরম্ভ করেছেন সেই সুপরিচিত প্রশ্ন বা সংশয় নিয়ে, যে প্রশ্ন বা সংশয় যে কোন গীতা-পাঠকের মনেই বারংবার উদিত হয় :—

"অস্মিন গীতা-শাস্ত্রে পরং নিঃশ্রেয়সসাধনং নিশ্চিতং, কিং জ্ঞানং, কিং কর্ম, বা আহোস্বিদুভয়ম্ ইতি।"

এই গীতা-শাস্ত্রে মোক্ষলাভের পরম সাধন নিরূপিত হয়েছে। কিন্তু সেই সাধন বা উপায় কি জ্ঞান, অথবা কর্ম, অথবা উভয়ই?

এই প্রশ্ন বা সংশয়ের কারণ হল এই যে, গীতায় বহুস্থলে জ্ঞানকে মোক্ষলাভের উপায়রূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পুনরায়, বহু স্থলে কর্ম যে অবশ্য কর্তব্য, তাও বলা হয়েছে। সেজন্য স্বভাবতঃই সন্দেহ হতে পারে যে, যখন জ্ঞান ও কর্ম উভয়েরই অবশ্য কর্তব্য বলে প্রপঞ্চিত করা হয়েছে, তখন উভয়ে সমুচ্চিত ভাবে, একত্রে সম্মেলিত হয়ে অনায়াসে মোক্ষের সাধন হতে পারে।

"অতো বিস্তীর্ণতরং মীমাংস্যমেতৎ।"
(গীতা-ভাষ্য, ১৮-৬৬।)

এই বিষয়টি বিস্তৃতভাবে মীমাংসা করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে আরো কিছু আলোচনা পরে করা হবে।

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ॥

শরীর ভস্মাবসিত। পঞ্চভূত পঞ্চভূতে বিলীন। হে কর্মী, কর্মকে স্মরণ করো, কর্মকে স্মরণ করো।

যে প্রতিভাবান পুরুষ দীর্ঘ অশীতিবর্ষাধিক কাল এই পৃথিবীতে অবস্থান করছিলেন, তিনি মহাপ্রয়াণ করলেন। তাঁর সেই গৌরাঙ্গ পার্থিব দেহ অনলে ভস্মসাৎ হলো। প্রিয়তমা পত্নী, স্নেহাস্পদ পুত্রকন্যা, পৌত্র দৌহিত্র, অসংখ্য আত্মীয়স্বজন, অগণিত ভক্তবৃন্দ সকলের প্রীতির বন্ধন ছিন্ন করে', এই পৃথিবীর সর্বসম্পদ পরিত্যাগ করে', সর্বত্যাগী নিঃস্ব নিরাবরণ পুরুষ পরলোকে পাড়ি দিলেন। এই পৃথিবীর সর্বশেষ অবলম্বন তাঁর সেই পার্থিব দেহও এখানেই আকাশে, বাতাসে, জলে, স্থলে, অনলে বিলিয়ে দিয়ে গেলেন।

দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী যাবৎ, এই আশ্রমে, তিনি পরম তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। এখানের বায়ুমণ্ডল তাঁর সাধনায় পরিপূর্ণ। এই আশ্রমের প্রতি অণুপরমাণুতে তাঁর পদচিহ্ন বার বার অঙ্কিত হয়েছে। এখানের আকাশে তাঁর উদাত্ত বাণী প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তাঁর অপূর্ব মধুর বাচনভঙ্গি আমাদের কর্ণে মধুবর্ষণ করেছে। তাঁর সম্মোহনী ভাষা আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করেছে। তাঁর কণ্ঠ আজ নীরব। বাচস্পতি আজ বাক্যহারা।

তিনি ছিলেন ভ্রমণ-বিলাসী। এই ভারতের দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে, অরণ্যে, তিনি পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করেছেন। ভ্রমণ-পিপাসা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর মেটে নি। তাই সেই ভ্রমণ-পিপাসু মহাপথিক নূতন নূতন দেশ-ভ্রমণের আকুল আকাঙ্ক্ষায় পরলোকে পাড়ি দিলেন।

আমরা তাঁকে বিদায় দিলাম। দেহ তাঁর পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করে', ললাট তাঁর চন্দন-চর্চিত করে', মহর্ষির মহাসঙ্গীতের করুণ মধুর সুরে, আমরা আশ্রমবাসিগণ সেই বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ আশ্রমিককে আমাদের বিদায়-সম্ভাষণ জানালাম। শতশতাব্দী পূর্বে, যে-ভাষায়, যে-পদ্ধতিতে আমাদের বৃদ্ধ-প্রপিতামহগণ তাঁদের পরমাত্মীয়কে বিদায় দিতেন, আমরাও সেই ভাবে তাঁকে বিদায় দিলাম :

প্রেহি প্রেহি পথিভিঃ পূর্বেভির্যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেয়ুঃ।
সংগচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সংযমেনেষ্টাপূর্তেন পরমে ব্যোমন্।
হিত্বায়াবদ্যং পুনরস্তমেহি সংগচ্ছস্ব তন্বা সুবর্চাঃ ॥

যাত্রা করো! যাত্রা করো! হে পান্থ, তুমি লোক-লোকান্তরে যাত্রা করো। যে পথে আমাদের পূর্ব-পিতামহগণ গমন করেছেন, সেই পথে, তুমিও তোমার মহাযাত্রা শুরু করো।

তুমি কি একাকী? তুমি কি নিঃসঙ্গ? না! অসংখ্য প্রিয়জন, অগণিত বন্ধুবর্গ, ভক্তবৃন্দ, তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। তুমি তাঁদের সঙ্গে মিলিত হও। ইহলোকে তোমার সমস্ত সম্পদ তুমি পরিত্যাগ করে' গেছ। তাই বলে' তুমি কি নিঃস্ব? নাঃ। তোমার অপরিমিত সুকৃত। তাই তোমার অমূল্য সম্পদ। তাই তোমার এই মহাযাত্রার পাথেয়। সেই পাথেয়কে সম্বল করে' তুমি স্বর্গলোকে অবগাহন করো। সেই স্বর্গীয় অবগাহনে তোমার যা কিছু অবদ্য—যা কিছু মালিন্য, তা অপনীত হবে। তুমি নূতন দেহ লাভ করবে। জ্যোতির্ময় দেহ ধারণ করে', হে তপস্বী, তুমি নিজগৃহে গমন করো।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়—

জীর্ণ বসন পরিত্যাগ করে' মানুষ যেমন নূতন বসন পরিধান করে, জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করে', তুমিও সেইরূপ নূতন দেহ ধারণ করো। হে প্রবাসী, নিজগৃহে গমন করো।

আমরা তোমাকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করে' এপারে বিদায় দিলাম; পরপারে পারিজাতপুষ্পে সজ্জিত করে' তোমাকে সেই স্বর্গবাসিগণ আবাহন করে' নেবেন।

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ ॥

আজ তোমার আনন্দের দিন। বাতাস তোমার জন্য মধু বহন করছে, আকাশ মধুবর্ষণ করছে, স্রোতস্বিনীগণ মধু ক্ষরণ করছে। রাত্রি মধুময়, ঊষা মধুময়, পৃথিবীর ধূলিকণাও মধুময়।

একি কেবল কথার কথা! আমরা কি এ প্রত্যক্ষ করছি না? আশ্রমের শালবীথি মুঞ্জরিত। আম্রকুঞ্জ মুকুলিত। মধুকপুষ্প প্রস্ফুটিত। ধূলিকণা শালপুষ্পের পরাগে সমাচ্ছন্ন, আম্রমুকুলের মধুতে পরিসিক্ত। বায়ুমণ্ডল সুগন্ধিত।

আকাশ হতে সুধার ধারা বর্ষিত হচ্ছে—রজনী জ্যোৎস্নাস্নাতা। পাপিয়ার সুললিত সঙ্গীতে উষা পরিপূর্ণ। এই অপূর্ব সৌন্দর্যের, অপরিমেয় মাধুর্যের অপরূপ লীলার মধ্যে, তোমার মহাযাত্রা শুরু হয়েছে।

বহু দূরে, এই পার্থিব জগৎ হতে বহু দূরে, তুমি চলে' গেছ। তোমার সঙ্গে আমাদের পার্থিব যোগ ছিন্ন হয়েছে। আমরা তোমাকে আজ কি দেব? কি ভাবে আমরা আজ তোমার সহায় হব? আমাদের দেয় কোন পার্থিব সম্পদই আজ তোমার কাছে পৌঁছাবে না।

আমাদের এই পার্থিব জীবনের অপার্থিব শ্রদ্ধাই আজ তোমাকে দান করতে পারি। আমাদের শ্রদ্ধাই কেবল-মাত্র তোমার কাছে যেতে পারে। তোমার হৃদয় স্পর্শ করতে পারে। তাই আজ আশ্রমিকগণ, বহিরাগত ভক্ত-বৃন্দ, আত্মীয়স্বজন সকলে এই মন্দিরে সম্মিলিত হয়ে এক-যোগে আমাদের শ্রদ্ধা তোমাকে সমর্পণ করছি।

তোমার পিপাসু আত্মা আমাদের শ্রদ্ধার বারি গ্রহণ করে' তৃপ্তিলাভ করুক। আমাদের এই শ্রদ্ধার অমৃত দিয়ে আমরা তোমার তর্পণ করছি;

শুধু কি তোমারই তর্পণ করছি? তোমার সঙ্গে, তৃষিত, তাপিত বিশ্ববাসী সমস্ত প্রাণীর তর্পণ করছি।

শোক এব পরা পূজা—

শোককে বলা হয়েছে—পরম দেবতার পরম পূজা। পরম পবিত্র যিনি, কেবলমাত্র পূতচরিত্র ব্যক্তিই তাঁর পূজা করতে পারেন। শোকের অশ্রুজলে হৃদয়ের সমস্ত কলুষ ধৌত হয়। তখনই সেই মানুষ পূজার অধিকারী হয়।

বর্ষার বারিধারা কঠিন মাটিকে নরম করে। উর্বরা করে। শস্যশ্যামলা ফলপ্রসূ করে। সেইরূপ শোকের অবারিত অশ্রুধারা মানুষের হৃদয়ের কাঠিন্য দূর করে। অন্তঃকরণকে কোমল, সরস, স্নেহশীল করে।

দুঃখের অনুভূতি, জগতের সমস্ত দুঃখীর প্রতি সমবেদনা আনে। তাই নিজ প্রিয়জনের তর্পণের সঙ্গে, জগতের যে যেখানে আছে, সকলেরি সে তর্পণ (তৃপ্তি-সাধন) করে:—

দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্বাপ্সরসোঽসুরাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ॥
বিদ্যাধরা জলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্মে রতাশ্চ যে॥
আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষি-পিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্॥

দেব, দানব, উচ্চ, নীচ, দীনহীন, শত্রুমিত্র সকলেই তৃপ্ত হোন। নরনারী, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, সরীসৃপ, উদ্ভিদ সকলেরি তৃপ্তি হোক। জলের মধ্যে, আকাশের মধ্যে, বাতাসের মধ্যে, যে-সব ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র জীব জীবন ধারণ করছে, পাপী, তাপী, ক্রূর, কুটিল বিষধর সর্প, সমস্ত তৃষিত প্রাণীই, আমার এই শ্রদ্ধাপ্রদত্ত জলাঞ্জলির দ্বারা পরিতৃপ্ত হোন।

আমার পিতা, পিতামহগণ, মাতা, মাতামহগণ, সেই সঙ্গে তৃপ্তিলাভ করুন। যে-প্রাণীগণের বংশলোপ হয়েছে, কোটী কোটী পরলোকবাসী সেই প্রাণীগণ, সপ্তদ্বীপবাসী জীবগণ, সকলেরই আজ আমি পরিতৃপ্তি কামনা করি।

শত শত বর্ষ পূর্বে, ভারতের কোন্ অজ্ঞাত ঋষি, প্রিয়তমের মহাপ্রয়াণে এই অপূর্ব দিব্যদৃষ্টি লাভ করে-ছিলেন? যে-দৃষ্টির আলোকে আত্মপর ভেদ, শত্রুমিত্রের পার্থক্য দূর হয়েছিল। সমস্ত বিশ্ব তাঁর মিত্রে পরিণত হয়েছিল। এক আত্মা তাঁকে ত্যাগ করে বিশ্বের সমস্ত আত্মাকে তাঁর আত্মীয় করে গেছলেন।

আমাদের সেই অজ্ঞাত প্রপিতামহ আমাদের আশীর্বাদ করুন। আমাদের সেই দিব্যদৃষ্টি দান করুন। আমাদের আত্মপর ভেদ বিলুপ্ত হোক। অন্তরের অন্তঃ-স্থল হতে উদার স্নিগ্ধকণ্ঠে তাঁরই মত আমরাও যেন প্রার্থনা করতে পারি:—

"সকলেই তৃপ্ত হোন। দেব যক্ষ হতে আরম্ভ করে' দীনহীন সর্ব প্রাণী পরিতৃপ্তি লাভ করুন। ক্ষুধিত, তৃষিত, পাপরত, ধর্মরত, সবারই আজ তৃপ্তি হোক। আমার এই তর্পণে যেন ত্রিভুবনের তর্পণ হয়।"

অন্তর আমার মহামৈত্রীর মাধুর্যে পূর্ণ হোক। তবেই আকাশ আমার জন্য মধুবর্ষণ করবে। বাতাস আমার জন্য মধু বহন করবে। রাত্রি আমার মধুময় হবে। দিবস মধুময় হবে। পৃথিবীর তুচ্ছ ধূলিকণাগুলিকেও আমি মধুর দৃষ্টিতে দর্শন করবো।

২

মানুষ ঐ সৌরজগতের মত বিরাট, তার অন্ত পাওয়া যায় না। একসঙ্গে অর্ধশতাব্দী বাস করলেও একটি সাধারণ মানুষকেও "সম্পূর্ণ বুঝেছি" এমন কথা

বলতে পারি না। অসাধারণ মানুষের তো কথাই নাই। প্রায় অর্ধশতাব্দী (দীর্ঘ ৪৪ বৎসর) আচার্য ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রীর আমি অন্তেবাসী ছিলাম। অতি ঘনিষ্ঠ ভাবেই তাঁর সাহচর্য পেয়েছি। এই দীর্ঘকাল অনবরত তাঁর সংস্পর্শে এসেছি। কিন্তু তাঁর শেষ পাই নাই। মৃত্যুর সপ্তাহ পূর্ব পর্যন্ত, তাঁকে নিত্য নূতন রূপে দেখেছি। নিত্য তাঁর নূতন কথা শুনেছি।

প্রতিদিন তাঁর অন্তরের সুধা, আমার অন্তর পূর্ণ করেছে। যখনই অবসর পেয়েছি, তাঁর কাছে ছুটে গেছি। শেষ দিন পর্যন্ত প্রাণ তাঁর সরস ছিল। তাঁর সেই রসমাধুর্য নিকটবর্তীদেরও সরস করেছে। সেই রস-পরিবেশনের দাক্ষিণ্য হতে তাঁর ভৃত্যবর্গও বঞ্চিত হয় নাই। কি সহানুভূতি, কি অনুকম্পাই না তাঁর দাস-দাসীদের প্রতি। তাঁর পরিবারে তাদেরও একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। তাই তাঁর ভৃত্যবর্গ কখনো তাঁকে পরিত্যাগ করতো না। দীর্ঘ বিশ-পঁচিশ বছর যাবৎ এক একজন ভৃত্যকে তাঁর গৃহে অবস্থান করতে দেখেছি—অন্যত্র যারা প্রতি বৎসর প্রভু পরিবর্তন করে।

তাঁর ভৃত্যবর্গ পুত্রের ন্যায় তাঁর সেবা করেছে—তাঁকে ভালবেসেছে। ভৃত্যের এমন স্নেহ, এমন সেবা অন্যত্র কচিৎ দেখেছি। পিতৃবিয়োগের মত তাঁর বিয়োগ তাদের বুকে বেজেছে।

বাল্যকালে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে, অতি নিম্ন শ্রেণী হতে তাঁর কাছে শিক্ষা শুরু করি। বিশ্বভারতীর সর্বোচ্চ শ্রেণীতে বিদ্যাভবনেও তাঁর কাছে অধ্যয়ন করি। বাল্যকালে, আমার কাছে তাঁর শিক্ষা যেমন সরস ও চিত্তাকর্ষক ছিল—যৌবনেও তাঁর অধ্যাপনা তেমনি সরস ও আনন্দ-দায়ক হয়েছিল। পঞ্চাশ—উর্ধ্বে, পঞ্চান্নের নিকটবর্তী হয়েও আজও আমি তাঁর অন্তেবাসী ছিলাম। এই বয়সেও তাঁর শিক্ষা তেমনি সরস, তেমনি চিত্তাকর্ষক তেমনি আনন্দদায়ক হতো।

মধ্যযুগের ভারতীয় সাধনার লুক্কায়িত সম্পদ তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি ছিলেন কাশীর পণ্ডিত। বেদ-বেদান্ত, দর্শন, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, সাহিত্য সমস্তই তিনি সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্যদের নিকট অধ্যয়ন করে-ছিলেন। উচ্চ জাতির উচ্চ সংস্কৃতির শিখরে অবস্থান করে', অস্পৃশ্য অবনতদের সাধনার দিকে দৃষ্টি দেওয়া, তাঁর মত পাণ্ডিত্যের কৌলিন্যসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে কেমন করে সম্ভব হ'ল—তাই আমাদের বিস্মিত করে' দেয়। অথচ তাই সম্ভব হয়েছিল। অবশেষে তিনি তারই মধ্যে নিমগ্ন হলেন।

তিনি যে-সম্পদ উদ্ধার করেছেন, তা আজ সমস্ত বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

এত বড় পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়েও তিনি শিশুদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ছিলেন—তাঁর চরিত্রের এও এক বিশেষত্ব। রবীন্দ্রনাথের পরেই যে-প্রতিভাবান আশ্রমিকের, পাঠন, বাচন, ভাষণ-পদ্ধতি শিশুদেরও সম্মোহিত করেছিল—তিনি আচার্য ক্ষিতিমোহন। ক্লাস ছুটি দিলেও ছেলেরা ছুটি নিতে চাইতো না—তাঁর কাছে। তাঁর গল্প শোনার সাক্ষী যে-শিশুরা ছিলেন—তাঁরা আজ প্রৌঢ়, বৃদ্ধ। আজও তাঁরা সে গল্পের কথা ভুলতে পারেন নি।

আর তাঁর ভাষণ? বাক্যের মধ্যে যে কি সম্মোহনী শক্তি আছে, তা যে তাঁর ভাষণ শুনেছে—সে কোনদিন তা ভুলতে পারবে না। ভাষার যাদুকর গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের আশ্রমে, রবীন্দ্রনাথ বর্তমান থাকতে, শ্রোতাদের সম্মোহিত করা কি সহজ কথা!

শান্তিনিকেতনের বাইরে, বৃহত্তর বাংলা দেশে, তথা সমস্ত ভারতবর্ষে তাঁর অদ্ভুত প্রভাব ছিল, বাঙালী, হিন্দুস্থানী, গুজরাটি, মারাঠি ভক্তবৃন্দ, তাঁদের নিজ নিজ প্রদেশে, পরমৌৎসুক্যে, শ্রদ্ধাবিগলিত চিত্তে তাঁর আগমন প্রতীক্ষা করতেন। তাঁদের কাছে তিনি অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন আধ্যাত্মিক পথ-প্রদর্শক ছিলেন।

শান্তিনিকেতনের বাইরে তাঁর সঙ্গী হবার, তাঁর ভাষণ শোনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। একদিনের ঘটনা আজ পঁচিশ বছর আমার চক্ষের সম্মুখে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে।

উত্তরবঙ্গের এক ব্রহ্মমন্দিরে বাৎসরিক উৎসব। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত। ভক্তমালের উপাখ্যানের উপর তিনি ভাষণ দিচ্ছেন। নীরব নিঃস্পন্দ হয়ে শ্রোতৃগণ শ্রবণ করছেন। অবশেষে একস্থানে হিন্দু-মুসলমান সকল শ্রোতাই আর অশ্রুসংবরণ করতে পারলেন না। তখন আমি যুবক—প্রায় নাস্তিক। আমার চক্ষুও শুষ্ক ছিল না, পার্শ্বে চেয়ে দেখি, সম্ভ্রান্ত সুশিক্ষিত মুসলমান ভ্রাতৃদ্বয় অঝোরে অশ্রুবিসর্জন করছেন, এ দৃশ্য ভুলবার নয়।

অনাড়ম্বর জীবন ও উচ্চ চিন্তার উজ্জ্বল উদাহরণ ছিলেন—আচার্য ক্ষিতিমোহন। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের দারিদ্র্যের দিনে তাঁর চালচলন যেমন ছিল, পরিণত বয়সে সম্পদের দিনেও তার কোনোই পরিবর্তন হয় নাই। যখন তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্য, তখনও তাঁর বেশভুষা, চলন চালন অতি সাধারণ কর্মীর ন্যায়। ঘরের তৈরি মামুলী ফতুয়া, কেটের চাদর গায়ে—অতি পুরাতন চপ্পল পায়ে, যখন

তিনি সুবক্তা চলাফেরা করতেন. তখন বিদেশী বিদ্যার্থিদের বলতে শুনেছি—"পৃথিবীর সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল উপাচার্যের মধ্যে, এমন সাধাসিধে উপাচার্য আর একটি মিলবে না।"

আজ বসন্ত পূর্ণিমা। দোলযাত্রা। পরম উৎসবের দিন। আজকের দিনে আমরা যে তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সমবেত হয়েছি; এরও তাৎপর্য লক্ষ্যণীয়:

শান্তিনিকেতনের সমস্ত উৎসবের প্রাণস্বরূপ ছিলেন তিনি। তাঁকে ছাড়া এখানের কোনো উৎসবের কথা ভাবতে পারি না। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ছিলেন যেমন উৎসবের নায়ক, আচার্য ক্ষিতিমোহন ছিলেন তেমনি উৎসবের সূত্রধার। যে-বৈদিক মন্ত্রগুলি শান্তিনিকেতনের সমস্ত উৎসবের বীজমন্ত্র, তার প্রায় সমস্তই আচার্যদেব সংগ্রহ করে গেছেন। প্রতি পুষ্প হতে যেমন কণা কণা মধু সংগ্রহ করে' মধুমক্ষিকা মধুচক্র নির্মাণ করে, আচার্যদেবও তেমনি, বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্র হতে মন্ত্র সংগ্রহ করে' বসন্তোৎসব, বর্ষামঙ্গল, হলকর্ষণ, বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি আশ্রমিক উৎসবগুলিকে সরস ও অলঙ্কৃত করেছিলেন। আজ অর্ধশতাব্দী যাবৎ আমরা তাঁর প্রদত্ত সেই 'মধুচক্রের' আস্বাদ গ্রহণ করছি। আরও কতকাল না জানি আমাদের উত্তরাধিকারিগণ তার আস্বাদ গ্রহণ করবে!

পূর্ণ সফলতার সহিত জীবনযাপন করে' সেই মহামনীষী পরিণত বয়সে মহাপ্রয়াণ করেছেন। তাঁর এই মহাপ্রয়াণ তাঁর নিকট পরম আনন্দদায়ক, আমরা তাঁর নিকট প্রার্থনা করি:

মা ছিথা অস্মাল্লোকাদগ্নেঃ সূর্যস্য সংদৃশঃ।

এই লোক হতে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন কোরো না। সূর্য যেমন অতি দূরে অবস্থান করেও আমাদের অন্ধকার দূর করেন, তুমিও তেমনি আমাদের চিত্তের অন্ধকার দূর করো। অগ্নির ন্যায়, সূর্যের ন্যায়, তুমি আমাদের আলোক দান করো। পথ প্রদর্শন করো।

হায়! আমরা কি তোমার বিয়োগ-দুঃখ ভুলতে পারি? আশ্রম যে আজ রিক্ত হয়ে গেল! এই ক্ষতি কি পূরণ হবে?

কেবল শান্তিনিকেতনে কেন, সমস্ত ভারতে তাঁর স্থান সহজে পূরণ হবে না।

রবীন্দ্রনাথের পরম অন্তরঙ্গ সমধর্মী, রবীন্দ্রকাব্যের, রবীন্দ্রদর্শনের মর্মগ্রাহী বোদ্ধা, রবীন্দ্রনাথের উত্তরসাধক; সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী, আমরণ পরমনিষ্ঠ ভক্ত, আচার্য ক্ষিতিমোহনের তিরোধান বিশ্বভারতীকে নিঃস্ব করে গেল। আমরা তাঁর অভাব ভুলবো কেমন করে?

এই নিরাশার মধ্যে একমাত্র আশা—আমার সম্মুখে উপবিষ্ট এই শিশুগণ। এই অনাগত, ভবিষ্যৎ। আমরা বালগোপালের পূজা করি। সম্মুখে আমার সেই বাল-গোপাল। সেই শিশু-ভগবান। সেই অনন্ত সম্ভাবনা। এদের মধ্য থেকেই আচার্যগণ আবির্ভূত হবেন। বিধুশেখর, ক্ষিতিমোহন, হরিচরণের সত্তা পুনরুজ্জীবিত হবে। কে জানে, এদের মধ্য থেকে হয়তো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের পুনরাবির্ভাব হবে।

এই শিশু-ভগবানের সেবার, শিক্ষার ভার আমাদের উপর! আমার ভয় হয়, আমরা কি এদের শিক্ষা দেবার যোগ্য!

ভারতবর্ষ স্বর্ণপ্রসূ। সহস্র সহস্র বর্ষ পূর্বে; এখানে কত ঋষি, কত মহর্ষি জন্মগ্রহণ করেছেন। কত বুদ্ধ, তাঁর পার্শ্বচর সারিপুত্ত, মহামোগ্গল্লান, আনন্দ প্রভৃতিকে নিয়ে বার বার জন্মগ্রহণ করেছেন।

হাজার বছর পরাধীনতার শৃঙ্খলের মধ্যে বদ্ধ থেকেও এর প্রাণশক্তি নষ্ট হয় নি—এই দুর্গতি-লাঞ্ছিত অবসাদ-পরিপূর্ণ যুগেও কত মহাপুরুষ, কত সাধক, কত মনীষী, মহামনীষী, কবি, মহাকবি জন্ম নিয়েছেন এই ভারতবর্ষে।

আজ পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত ভারতে আরও কত মহামানব জন্মগ্রহণ করবেন। এই শিশুদের মধ্যেই তাঁদের আবির্ভাব হবে। যেখানেই তাঁদের আবির্ভাব হোক, ভারতসংস্কৃতির কেন্দ্র এই বিশ্বভারতী নিশ্চয়ই তাঁদের আকর্ষণ করে' নিয়ে আসবে। আমাদের এই রিক্ততা সেদিন পূর্ণ হবে।

আমরা শোকদগ্ধ আশ্রমিকগণ একান্তচিত্তে সেই শুভ-দিনের প্রতীক্ষা করছি। মহাকাল আমাদের বর্তমান দুঃখ দূর করবেন।*

ওঁ শান্তিঃ

* ২৯শে ফাল্গুন দোলপূর্ণিমার দিন প্রভাতে, শান্তিনিকেতনমন্দিরে প্রদত্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি।

অঙ্কের নিয়ম

শ্রীতরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

মনে মনে অনেক হিসেব-নিকেশ করে দেখছে শোভনা যে, এ দুনিয়ার সবকিছুই একটা আঙ্কিক নিয়মে বাঁধা। এ নিয়মটা ধরতে পারলেই অনেক ভাবনা-চিন্তাকে অর্থহীন মনে হয়, একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা যায়। যেমন, এই চলন্ত ট্রাম গাড়িতে একটু আগে উঠে ঐ ফিটফাট্ সুদর্শন যুবকটি অন্য জায়গা থাকতেও কোণের লেডিজ সীট আলো-করে বসে-থাকা মেয়েটির কাছ ঘেঁসে ওপরের হ্যাণ্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে আড়চোখে ওর দিকে যে তখন থেকে তাকিয়ে আছে, প্রথমটা দৃষ্টিকটু লাগলেও একটু ভেবে দেখলে আর তেমন মনে হয় না। দেখার এবং দেখাবার আয়োজন যেখানে সম্পূর্ণ, সেখানে ও ধরনের সান্নিধ্য না ঘটে উপায় নেই।

শোভনা ভেবে দেখেছে সংসারের অনেক কিছুই আমাদের কাছে অশোভন ও অসঙ্গত মনে হয়, বিশেষ একটি অঙ্কের নিয়মে তাদের আমরা যাচাই করে দেখতে পারি না বলে। নিজের জীবনটাকে এ নিয়মে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত বসে আছে শোভনা। বাবা যদি রিটায়ার না করতেন, আর এখন দোকানে দোকানে খাতাপত্তর লিখে যৎসামান্য যা উপায় করছেন তা যদি না করতে হ'ত, বাড়িতে চার-পাঁচ জন ছোট ছোট ভাইবোনে আর রুগ্ন মাকে একটা বোঝা মনে হ'ত না। শোভনার মেট্রিকের বুড়ি ছুঁয়ে পড়াশুনা বন্ধ রেখে সকাল, দুপুর বিকেল টিউশনি করে ঘুরে বেড়াবার প্রয়োজন থাকত না। এতদিনে বিয়ে থা হয়ে অন্ততঃ দু' একটি সন্তানের মা হয়ে নিজের সংসার গুছিয়ে বসতে পারত।

চীৎকার-চেঁচামেচির সঙ্গে সঙ্গেই ট্রাম দাঁড়িয়ে গেল। পাশেই একটি ছেলে বাসে চাপা পড়ে থেঁতলে গেছে—বিকৃত-বিধ্বস্ত দেহটা রক্তাক্ত। বাস ড্রাইভার নিখোঁজ! চারিদিকে ভিড়, তর্কাতর্কি, বচসা। কি করে হ'ল, কেন হ'ল, কে দায়ী? একদল বলছে—দায়ীটা যে কে ঠিক বলা মুস্কিল। চলন্ত ট্রাম থেকে যদি কেউ লাফিয়ে নামে, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই দ্রুতগামী বাস বা ট্যাক্সি একটা বাঁ দিক থেকে এসে পড়ে এমন একটা দুর্ঘটনা নাকি না ঘটে উপায় নেই। মনে মনে হাসল শোভনা—এখানেও সেই অঙ্কের নিয়ম।

ট্রাম ছাড়তে দেরি দেখে নেমে পড়তে হ'ল শোভনাকে। মাইল খানেক হেঁটে গেলেই ছাত্রীর বাড়ি। ভিড়ের মধ্যে ফুটপাথ ধরে একটু দ্রুত পা বাড়িয়ে দিল। খানিকটা গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল শোভনা। পায়ের কাছের মনিব্যাগটি বোধ হয় সামনের ভদ্রলোকটির। কোঁচাটা হয় ত পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল। আবার পকেটে গুঁজতে গিয়েই খোঁজার ভঙ্গীতে এদিক-ওদিক তাকাল। সুযোগ মন্দ নয়। ব্যাগটা কুড়িয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে ভদ্রলোকের কাছে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল শোভনা। হাসিমুখে ব্যাগটি হাত বাড়িয়ে এগিয়ে দিয়ে বললে—এইটিই খুঁজছেন বোধ হয়।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি কোথায় পেলেন?

কালো মোটা ফ্রেমের চশমার মধ্য দিয়ে দীর্ঘ টানা টানা চোখ দুটো ঝকঝক্ করছে। বেশ চোখে পড়ার মত সুপুরুষ সুন্দর চেহারা। ওদিকটার চেয়ে কিন্তু চেহারা দেখে আর্থিক সঙ্গতি কতটুকু আন্দাজ করা যায়, সেদিকটাই একবার খুঁটিয়ে দেখে নিতে হ'ল শোভনাকে। তার পর আবার একটু নম্র হেসে বললে—এত অন্যমনস্ক হাঁটেন যে, পকেট থেকে কখন কি পড়ে যায় হুঁস থাকে না? ভাগ্যিস আমি দেখতে পেয়েছিলাম।

সাজ-পোষাকে এমন একটি আড়ম্বরহীনা ভদ্র মেয়ের আন্তরিক ব্যবহারে ভদ্রলোক অভিভূত হয়ে পড়েছে। বললে—সত্যিই, আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব ভেবে পাচ্ছি না।

শোভনা স্মিতমুখে চেয়ে রইল ভদ্রলোকের দিকে। কাউকে উপকার করলে এমন একটা কৃতার্থভাব আশা করা স্বাভাবিক। ওটাও ছকে বাঁধা। কিন্তু তার মধ্যে কতটুকু অকৃত্রিমতা আছে সেটুকুই বিচার্য্য। কেন না শোভনার এর পরের ব্যবহারগুলো ঐ অনুপাতে বাঁক কষে কষে এগিয়ে যাবে।

শোভনা ভদ্রলোকের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বললে—থাক, আর কিছু বলতে হবে না। আপনার জিনিস আপনাকে ফিরিয়ে দিয়েছি, এ আর এমন বড় কথা কি?

—বড় কথা অবশ্য নয়, কিন্তু…

—কিন্তু ওটা ত আমি ফেরৎ নাও দিতে পারতাম, এই কথাই না ভাবছেন আপনি?

—না না, আমি তা ভাবছি না। ভদ্রলোককে অপ্রস্তুতে ফেলবার জন্তেই কথাটা বলেছে শোভনা। তাই মিটিমিটি হাসতে লাগল।

খানিকটা দূর এগিয়ে গিয়ে ভদ্রলোক ইতঃস্তত করে বললে—কোথায় যাবেন আপনি?

শোভনাকে এবার খানিকটা হিসেব কষতে হ'ল, এখন ছাত্রীর বাড়িতে পড়াতে যাওয়াটা বেশী সুবিধের হবে না···। একটু ভেবে নিয়ে মুখ তুলে বললে—বাসায় যাচ্ছি।

—বাসা কতদূর?

—টালিগঞ্জ ছাড়িয়ে আরও খানিকটা।

— সে ত অনেক দূর। যাবেন কি ট্রামে না বাসে?

—হেঁটে। মৃদু হাসল শোভনা।

থমকে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক একটু অবাক হয়ে বললে—এ তটা পথ হেঁটে! কেন?

ওর এই সহজ সরল প্রশ্ন করার ভঙ্গী দেখে শোভনা একটু আশ্চর্য্য হ'ল, হাসিও পেল। এ ভাবে আবার কেউ প্রশ্ন করে নাকি! বললে—সখ করে এতটা পথ কি কেউ হাঁটে? কেন হাঁটতে হয় বোঝেন না?

কথাটা বোঝবার জন্তে ভদ্রলোককে চকিতে একবার শোভনার আপাদমস্তক চেয়ে দেখতে হ'ল। ছোট্ট পায়ে লাল রবারের ধূলিমলিন চটি, পাতলা দেহলতাটি ঘিরে সস্তা ছিটের শাড়ি, হাতে কয়েকগাছা কাঁচের চুড়ি, আর কোথাও অঙ্গ-সজ্জার বালাই নেই। প্রসাধন-বর্জ্জিত শুভ্র-নিটোল মুখটায় ভাসাভাসা গভীর কালো দুটি চোখ। ভদ্রলোক একটু অপ্রস্তুত হয়ে দ্রুত ধাবমান এক ট্যাক্সিকে হাত তুলে থামাল। শোভনাকে সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি জানাতে হ'ল। এক্ষেত্রে আপত্তি না জানালে খেলো হয়ে যেতে হয়, আর আগেভাগেই যদি খেলো হয়ে যেতে হয়, পরিচয়টাকে বেশী দূর গড়িয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। শোভনা বললে—একি! না না···এমন করলে মনে করব প্রত্যুপকার করছেন।

কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল ভদ্রলোক। মুখটা থমথমে। বললে—প্রত্যুপকার ঠিক নয়! তার চেয়ে বেশীই কিছু। আপনার ভদ্র, শিষ্ট ব্যবহারে সত্যিই আমি মুগ্ধ। প্রত্যুপকার করতে যাওয়া মানে আপনাকে ছোট করা, সে জ্ঞান আমার আছে।

ঠিক এ ধরনের জবাব আশা করে নি শোভনা। ওর কথার উত্তরে বেশ খানিকটা হেসে হাসিয়ে জবাব দিতে পারত ভদ্রলোক। আলাপটাকে আরও ঘনিষ্ঠ করে তোলার সুযোগ নিতে পারত। তা না করে বেশ কয়েকটা ভারী ভারী কথা শুনিয়ে দিল। খানিকক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল শোভনা। কি বলবে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ল, এ নিয়ে ভাবার ত কিছু নেই। ভারী ভারী কথাগুলোর উত্তর ভারী সুরে দিলেই মানানসই হয়। শোভনা যেন লজ্জা পেয়েছে কথাটা বলে—তাই মুখ নীচু করে বললে—মাপ করবেন, আপনি যে আমার কথাটা এত তলিয়ে দেখবেন তা ভাবতে পারি নি।

ট্যাক্সির সীটে গা এলিয়ে দিয়ে বাইরে মুখ করে বসে রইল শোভনা। পাশে ভদ্রলোক। দমকা বাতাস ঢুকছে ভেতরে, কাপড়-চোপড় সামলে ভাল হয়ে বসতে হ'ল বার কয়েক। আড় চোখে একবার চেয়ে দেখতে ইচ্ছে হ'ল ভদ্রলোককে। এর আগে বেশ স্পষ্টভাবে শোভনাকে দেখার যে সুযোগটুকু ছিল না, এখন কি তার সদ্ব্যবহার করছে না ভদ্রলোক? সেই থেকে অপর দিকে মুখ করেই তো রাস্তার ধারে তাকিয়ে আছে শোভনা। এদিকে চেয়ে শোভনা কিন্তু দেখল ভদ্রলোক মোটেই ওর দিকে চেয়ে নেই, রাস্তার অপর দিকে তাকিয়ে আছে। বেশ নরম কোমল মুখখানা, কোথাও কোন খাঁজ নেই, তাজা ফোটা ফুলের মত। হাত গোটান জামার ফাঁক দিয়ে শুভ্র মাংসপেশীগুলো স্পষ্ট দেখা যায়। দুঃখ পেতে হয় নি ভদ্রলোককে হয়ত কোনদিন। কিন্তু ও কি ভাবছে বসে বসে? তখনকার কথাটাই ভাবছে না তো? সামান্য কথাতেও কেমন আঘাত পেল। মনটা আর পাঁচ জনের মত নয়, অন্য ধরনের।

কাল চশমার ফ্রেম আঁটা ঝকঝকে চোখজোড়া হঠাৎই একবার ফিরে তাকিয়ে একটু হেসে অপ্রতিভ করে দিল শোভনাকে—কি ভাবছেন সেই থেকে বসে?

একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গিয়ে থতমত খেয়ে চোখ তুলে কিছুক্ষণ আর তাকাতে পারল না শোভনা। সব ঘটনাটুকু নিয়মের বাইরে ঘটে গেছে। এমন ব্যতিক্রম মাঝে মাঝে হয়। হিসেব কি কখনও ভুল হয় না মানুষের? সেটা আবার শুধরে নিতে হয়। অবশ্য এমন ভুল বড় একটা হয় না সাধারণতঃ। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল শোভনা। লজ্জায় সঙ্কোচে ভেঙে পড়ার ভান করল। দমবন্ধ করে চেষ্টা করল মুখটা যাতে রাঙা হয়ে ওঠে। তার পর অস্ফুটস্বরে বললে—কিছু না। রাস্তার ধারে মুখ করে বসে রইল জড়সড় হয়ে।

এবার ঠিক মিলে গেছে। স্পষ্ট বুঝতে পারছে শোভনা যে, ওর আড় হয়ে বসার ভঙ্গীটুকু খুঁটিয়ে দেখছে ভদ্রলোক। আর হয়ত মৃদু মৃদু হাসছে। ট্যাক্সি ছুটছে

হু-হু শব্দে। এর পরের ঘটনাগুলো মনে মনে সাজিয়ে নিল শোভনা। কোনটার পর কি হবে, সব চোখের সামনে ভাসছে।

বড় রাস্তা, ছোট রাস্তা, অলিগলি পার হয়ে যখন নিজেদের সেই মার্কামারা ভাঙা পোড়ো বাড়ীটার সামনে এসে দাঁড়াবে ট্যাক্সিটা তখন বেশ সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসবে। শোভনাকে নামিয়ে ট্যাক্সিতে বসে ভদ্রলোক বলবে,—আসি তা হলে?

শোভনাকে বলতে হবে—সে কি হয়, গরীবের দোরে একটু পায়ের ধুলো দেবেন না?

ভদ্রলোক নিশ্চয়ই লজ্জিত হয়ে পড়বে, বলবে—আজ থাক, অন্য একদিন আসা যাবে। এবার একটি মোক্ষম কথা বলতে হবে শোভনাকে। বলবে, আমাদের যা অবস্থা আপনার মত লোককে বাড়ীতে নিয়ে যেতে সঙ্কোচই হয়। কিন্তু গেলে কত যে খুসী হব তাকি আর···।

বাকিটা নিশ্চয়ই আর শেষ করতে হবে না। ভদ্রলোক নেমে আসবে। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে শোভনার পিছু পিছু এসে ঢুকবে বাইরের ঘরে। খান দুই ভাঙা চেয়ার-টেবিলের ওপর দস্যিবৃত্তি করতে দেখা যাবে ভাই-বোনেদের। নব আগন্তুককে দেখে নেচে ওঠবার আগেই ওদের ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেবে শোভনা। তার পর একটা চেয়ারের সামর্থ্য পরীক্ষা করে সেটা এগিয়ে দিয়ে ভদ্রলোককে বসতে বলে ভেতরে চলে যাবে। একেবারে মার শয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়াবে। চার-পাঁচটা ছেঁড়া কাঁথা জড় করা বিছানার সঙ্গে মার দড়ি পাকান শীর্ণ শরীরটা মিশে আছে। খবরটা ওঁর কাছে আগেই পৌঁছে যাবে। কেন না, ওঁর ফ্যাকাশে মুখখানা আর কোটরগত চোখজোড়া বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। মেয়েকে ডেকে সব কথা জিগেস করে নেবেন। কেমন আছে মা সে কথাটা জিগেস করার আর সুযোগ পাবে না শোভনা।

এর পরেই চায়ের যোগাড়ে চলে যেতে হবে। চা ও দুটি বিস্কুট প্লেটে নিয়ে বাইরে এসে ভদ্রলোকের হাতে তুলে দিয়ে বলবে, একটু চাই খান, এর বেশী তো আর সাধ্য নেই। অমন কথার উত্তরে আপত্তি করার ইচ্ছে থাকলেও ভদ্রলোক আপত্তি করতে পারবে না। নীরবে চায়ে চুমুক দেবে, তার পরেই একটু একটু করে আলাপ জমে উঠবে।

এই পর্য্যন্ত বেশ হিসেব মত নিয়ম মত ঘটনাগুলো ঘটে গেল। একচুল এদিক ওদিক হয় নি। ভদ্রলোকের নাম জয়ন্ত চৌধুরী, তাও জানা হয়ে গেল। কিন্তু এর পরের ঘটনার জন্তে মোটেই প্রস্তুত ছিল না শোভনা। অতটা ভেবে রাখে নি। বাড়ীর ভেতর থেকে একটা গোঙানির শব্দ একটু একটু করে সুরু হয়ে বাড়ি কাঁপিয়ে তুলল। শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার মত যেন অসহ্য যন্ত্রণা। একটি ছোট ভাই ছুটে এসে কি যেন বলল ফিসফিস করে দিদির কাণে। ভয়ই পেল শোভনা। ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ে জয়ন্তর কাছে অনুমতি নিতে গিয়ে দেখল সেও উদ্বেগাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। বললে—কি ব্যাপার বলুন তো? শোভনা কাঁচুমাচু মুখে বললে—মার একটা কলিক পেনের রোগ আছে। মাঝে মাঝে চাড়া দিয়ে উঠলে যমে মানুষে টানাটানি। কথাটা শেষ করে তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে গেল। মার বিছানার পাশে এসে দাঁড়াতেই পলকের মধ্যে সব ব্যাপারটা বুঝতে পারল। ইশারায় মা অভয় দিতেই বুঝল যন্ত্রণা যতটা তার বেশীই কাতরাচ্ছেন মা। এবং তার কারণটাও বুঝতে বাকি রইল না, যখন কাতরানিটা আর একটু চড়া পর্দায় উঠতেই জয়ন্ত আর অনুমতির অপেক্ষা না রেখে এসে ঢুকল ঘরে। তার পরের দৃশ্যগুলো বালি ঝুর ঝুর দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে দেখে গেল শোভনা।

এমন একটা ঘরে কখনও আসতে হয় নি জয়ন্তকে। দারিদ্র্য যেন নিজের পূর্ণ প্রকাশের গৌরবে নিজেই আত্মহারা। এমন একটা দৃশ্যও দেখতে হয় নি নিশ্চয়ই ওকে। জয়ন্তর হতচকিত বিমূঢ় ভাবটা থেকে সবকিছু বোঝা যায়। কাটা ছাগলের মত ছটফট করছেন মা। কাছে এসে দাঁড়াতেই মা জয়ন্তর হাতটি ধরে অঝোরে কেঁদে ফেললেন। ওঁর সকাতর আর্তনাদ জয়ন্তকেও গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। একবার বিহ্বলভাবে তাকাল শোভনার দিকে, বললে, বাড়ীতে কেউ পুরুষ মানুষ নেই?

শোভনা বিড় বিড় করে বললে, পুরুষ মানুষ বলতে বাবা, কিন্তু তিনি তো এখন কাজে গেছেন।

তার পরে কি করা উচিত মুহূর্তে ঠিক করে নিল জয়ন্ত, তখুনি বেরিয়ে গেল বাইরে। কিছুক্ষণের মধ্যে ডাক্তার এল, ওষুধ পড়ল, ইনজেকসন দেওয়া হ'ল, যতক্ষণ না যন্ত্রণাটার উপশম হয় ডাক্তারকে ধরে রাখল জয়ন্ত। অনেকক্ষণ পর মার ক্লিষ্ট মুখটায় মৃদু হাসি ফুটে উঠল—একটা স্বস্তির হাসি। ধীরে ধীরে বললেন, এবার অনেকটা ভাল আছি।

জয়ন্তও যেন এতক্ষণে হাসতে পেল, বললে, কোন ভাবনা নেই, আপনি সেরে উঠবেন একেবারে।

ডাক্তার চলে যেতে মা নিঃশব্দ ইসারায় শোভনাকে জানাতে চাইলেন জয়ন্তকে সে যেন একটু এগিয়ে দিয়ে আসে। শোভনা সেই ভাবেই দাঁড়িয়ে থেকে সব ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করছিল আর হিসেব কষছিল এতক্ষণ, প্রথমটা মার অমন একটা অপ্রত্যাশিত আচরণে হিসেবটার খেই হারিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একটু ভাবতেই আবার সব মিলে গেছে। মার অনেকদিন হ'ল পেটের ব্যামো হয়েছে। চিকিৎসা করাবার কোন উপায় নেই বলেই বাইরের আগন্তুককে এইভাবে ঘরে এনে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। জয়ন্তকে কোনদিন কারুর এমন একটা অসহায় মুহূর্ত্তে একমাত্র দর্শক হিসেবে নিশ্চয়ই উপস্থিত থাকতে হয় নি। তাই ও অমন বিচলিত হয়ে পড়েছিল। আর সজ্জন পরোপকারী লোকের মত নিজের কর্ত্তব্য করেছে। এতটা উপকার করেছে বলেই তাকে খানিকটা এগিয়ে দিতে ইসারা করেছেন মা। শুধু এগিয়েই দেওয়া নয়—ওকে আরও একটু ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ দেওয়া। মার ওপরণের চাউনির মধ্যে এমন একটা করুণ মিনতি ফুটে ওঠে যে, ওকে অবহেলা করার কোন উপায় থাকে না।

রাত প্রায় দশটা। রাস্তা ধরে কিছুটা দূর এগিয়ে এসে মোড়ের মাথায় দাঁড়াল দুজনে। কোন কথাবার্ত্তাই হয় নি এতক্ষণ। চারিদিক বেশ নির্জ্জন—এদিকটা লোক চলাচল একটু রাত হলেই কমে আসে। শোভনা একবার জয়ন্তর মুখের দিকে চেয়ে দেখল সে কি যেন ভাবছে। কি আর ভাববে, ভাবছে নিশ্চয়ই শোভনাদের কথা। সব ব্যাপারটাকে একটু তলিয়ে দেখে তার বিপরীত দিকটা দেখার বুদ্ধি রাখে না মানুষটা। ভাবলে ওর মুখটায় কেমন একটা সরল আন্তরিকতা ফুটে ওঠে। শোভনাই প্রথমে বললে, কি ভাবছেন?

ঝকঝকে চশমাজোড়া দিয়ে একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে শোভনার দিকে তাকাল জয়ন্ত। এক রাস সহানুভূতি যেন ঠাসা আছে চোখ দুটোয়, ঐ সঙ্গে বেদনার ছাপ। এমন ভাবে চেয়ে কি যে দেখছে কে জানে! শোভনার দৃষ্টি নত হয়ে এল। জয়ন্ত একটু হেসে বলল, কি আর ভাবব? ভাবছি আপনার কথা, আপনাদের কথা।

অল্প একটু হাসল শোভনা, বললে, বেশী ভাববেন না, কেন না, যত ভাববেন তত আমরা ভাবিয়েই তুলব।

কথাটা হঠাৎ অসতর্কভাবেই বেরিয়ে গেল। সামলাবার আগেই জয়ন্ত কেমন যেন ভরাট সুরে বললে, দেখুন কোন একটা পরিবারের ঠিক এমন একটা অবস্থা আমি কানে শুনলেও, বইএ পড়লেও—স্বচক্ষে কোন দিন দেখিনি। তাই ভাবছি···। চুপ করে গেল জয়ন্ত।

শোভনা ভাবল, জয়ন্তর বিস্ময় যা আন্দাজ করা গিয়েছিল তা মিলেছে। কিন্তু আশ্চর্য্য লাগে, এমন লোকও সংসারে আছে যারা এমন একটা অবস্থার সঙ্গে পরিচিত নয়, কখনও চোখে দেখবার সুযোগ হয় নি। এত বড় একটা বাস্তব সত্য কি করে কারুর অজ্ঞাত থাকতে পারে ধারণাই করতে পারে না শোভনা।

এরপর খানিকক্ষণ কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল শোভনা। একটু একটু করে প্রশ্ন করে অনেক কথাই জেনে নিল জয়ন্ত। এমন একজন দরদী শ্রোতা পেয়ে প্রয়োজনাতিরিক্ত কথাই বলে ফেলল শোভনা। এক সময় হঠাৎ হুঁস হতে চুপ করে গেল। মনে মনে সব কথাগুলো একবার ভেবে দেখল। নাঃ—যতটুকু বলা হয়েছে তাতে কাজের কাজই হবে। গলাটা অবশ্য অনেক সময় ধরে গিয়েছিল। কিন্তু অমন একজন শ্রোতাকে বিশ্বাস করাবার জন্যে ওরও প্রয়োজন ছিল। সব কথার এবার একটা পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়ে শোভনা বললে, অনেক রাত হল, এবার আমি আসি।

জনবিরল রাস্তায় আনমনে নানা কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরে এল শোভনা। জয়ন্তর বিষাদগম্ভীর মুখটা ভাসছে চোখের সামনে। ওকে নিয়ে এতটা কেউ ভাবতে পারে ধারণাই ছিল না এর আগে। ইতিমধ্যে বাবা এসে গেছেন। মার কাছে বসে ফিস্ ফিস্ করে কি সব কথা বলছিলেন। মার কথা শুনছিলেনও। শোভনাকে দেখে একটু অপ্রতিভ হাসি হাসলেন বাবা। তার পরেই পাশের ঘরে চলে গেলেন। এই ভাবেই কচিৎ কখনও দেখা হয় বাবার সঙ্গে। শোভনা জানে, উনি কেন আগের মত মেয়ের চোখের ওপর চোখ রেখে কথা বলতে পারেন না। একটা অপরাধবোধ যদি মাঝে এসে দাঁড়ায়, অতিবড় আত্মীয়দেরও তা তফাৎ করে দেয়। এবার মা ডাকবেন, ডাকলেনও। শোভনা জানে মেয়ের থমথমে মুখটা মার বুকে খোঁচা দেবেই। এ ধরনের ঘটনা ঘটলেই মেয়ের মুখটা অমনই হয়ে ওঠে। কেন যে এখনও হয় ভেবে পায় না ওর মা। এখনও কেন সয়ে যাচ্ছে না সব। পাশে বসিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন মা। সেই স্পর্শে সান্ত্বনার খানিকটা প্রলেপ আছে। যেন বোঝাতে চান—দুঃখ করে কি করবি মা। দুঃখ আমাদের থাকতে নেই! আমরা অসহায় নিরুপায় বলেই এভাবে নেমে যাচ্ছি। ওভাবটা না থাকলে এটা হ'ত না।

শোভনা জানে সব। দুঃখকষ্ট বলে সত্যিই কিছু

নেই। ও সব মনের পাগলামি। সংসারে এটা হয় বলেই ওটা হয়, আর এটা না হলে ওটা হ'ত না। মার কাছেই এ নিয়মটা ভালভাবেই শেখা হয়েছে। মা'ই কি ছিলেন এমন কোন দিন? তাঁকে এমন হতে হয়েছে বলেই হয়েছেন। মার রুক্ষ চুলগুলোয় সযত্নে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল শোভনা।

তার পরের দিন থেকে জয়ন্ত নিয়মিত এল। ও আসবেই জানা ছিল। দশ টাকা ভিজিটের ডাক্তারের বদলে বত্রিশ টাকার নিয়ে এল। সেবাযত্ন চিকিৎসার কোন ত্রুটি রাখল না। সব ব্যাপারটাতেই তার যেন কেমন বেশী বেশী ভাব। শোভনার একটা আড়ষ্ট ভাব কেটেও কাটে না। মা অনেকটা ভাল হয়ে উঠেছেন। মোড়ের মাথা পর্য্যন্ত রোজই পৌঁছে দেয় জয়ন্তকে শোভনা। এক দিন সে আর না বলে পারল না। বললে, আপনি এ কি সব করছেন বলুন তো? দু'দিক রেখেই কথাটা বলা হ'ল। এক তো শুধু উচিত বলে, আর এক নিজের আড়ষ্ট ভাবের তাগিদে।

জয়ন্ত কথাবার্ত্তায় আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে। হেসে বললে, আপনার প্রথম দিনের উপকারের শোধ তুলছি, এ কথা যে বলেন নি এই ঢের।

শোভনা কুণ্ঠিতভাবে বললে, না না। এ ভারি অন্যায়। আপনার হয় ত অনেক আছে। তাই বলে যে···

জয়ন্ত বললে,—আছে সত্যিই অনেক। বাবার একমাত্র ছেলে, ওঁর আছে ব্যবসা, রোজগার কম নয়—আর ভোগ করার লোক তো আমি একা।

শোভনা মুখ নিচু করে বললে, সাহায্য করার লোক তো অনেক ছড়িয়ে আছে। আমাদের চেয়ে তাদের প্রয়োজন হয়ত অনেক বেশী।

—তাদের যে আমরা করি না তা নয়। অমন অনেক পোষ্য আছে যাদের টাকা পাঠিয়ে সাহায্য করতে হয়। কিন্তু তাদের করতে হয় বলেই করা, অনেকটা বাতিকের মত। কিন্তু আপনাদের বেলায় তা নয়।

—তবে কি? কথার পিঠে কথা বলতে গিয়ে বুকটা একবার অজান্তে দুলে উঠল শোভনার। কি একটা কথা যেন আভাসে ছড়িয়ে আছে জয়ন্তর সারা মুখটায়। কি যে আছে তা কি জানা নেই শোভনার? আছে, তবু জানার আগ্রহটা কিছুতে সামলান যাচ্ছে না। চুপ করে আছে জয়ন্ত। শোভনা বললে, কৈ কিছু বলছেন না কেন?

জয়ন্ত একবার এদিক ওদিক চেয়ে বললে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে আর কতক্ষণ কথা বলা যায়? কাছে-পিঠে বসার কোন জায়গা নেই?

আছে বৈকি একটা পার্ক এবং খুব কাছেই, শোভনার খুব চেনা।

বেশ নিরালা কোণই একটা খুঁজে পাওয়া গেল। পাশে একটা সাদা ফুলের ঝাড়, গন্ধে ভরে আছে। এ পাশে সারি সারি কয়েকটা টগর ফুলের গাছ পার্কের আলোটাকে আড়াল করে আছে। বড় বড় ঘাসে পা ডুবিয়ে বসল দু'জনে। শোভনা একবার নিজের মনের মধ্যে আঁক-জোক কেটে নিল। বেতাল হয়ে পড়ছে না তো? না না—ওকি বলতে চায় সেটুকুই শুধু শোনার আগ্রহ আছে। শুধু শোনায় আর কি যায় আসে। চুপ করেই বসে রয়েছে জয়ন্ত। শোভনা বললে, চুপ করে বসে রইলেন যে?

জয়ন্ত এবার মুখ তুলে তাকাল, একটু হেসে বললে, কি যে বলব তাই ভাবছিলাম। দেখুন, রেখে-ঢেকে কথা বলা আমার স্বভাব নয়। আমাদের পোষ্যদের সাহায্য করা আর আপনাদের করা এক কথা নয়। আপনাদের বেলায় কিছু করে যা আনন্দ পাই ওদের বেলায় পাই না।

—আমাদের বেলায় কেন এত আনন্দ পান? কথাগুলো আপনা থেকেই বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে শোভনার।

জয়ন্ত এবার খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। একটু পরে মুখ তুলে থেমে থেমে বললে, সব কথার জবাব সব সময় কি দেওয়া যায়?

এর পর আর কোন প্রশ্ন চলে না। চুপ করে গেল শোভনা। ভাবল, হয়ত এই প্রথম, এই প্রথম কোন মেয়ের এত ঘনিষ্ঠ হয়ে কাছে বসার সুযোগ পেয়েছে জয়ন্ত। আর নয় পেয়েছে, কিন্তু এমন একজনকে পায় নি। ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে, সেই ফুলটার মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ। ঘাসের ডগা ছিঁড়ে ছিঁড়ে দাঁত দিয়ে কাটতে কাটতে কিছুক্ষণ সময় গেল। এক সময় উঠে পড়ে শোভনা বললে, বেশ রাত হ'ল। এবার ওঠা যাক।

বাড়ীতে যখন ফিরল শোভনা তখন রাত এগারটা। মা উদ্বিগ্ন হয়ে শুয়ে আছেন বিছানায়। শোভনা কাছে এসে দাঁড়াতেই ভয় ভয় প্রশ্ন করলেন, এত রাত হ'ল কেন রে?

শোভনা জানে এ ভয়টা কেন মার হয়। মেয়ে যদি কোথাও বাঁধা পড়ে যায় ভেসে যাবে বাড়ীর সবাই। কিন্তু বাঁধা পড়বার যখন কোন উপায় নেই,

কেন শুধু শুধু ভাবেন। ভেবে ভয় পান, কষ্ট পান। শোভনা বললে, তোমার কোন ভয় নেই মা।

পার্কের ধারে সন্ধ্যাবেলাটায় এবার থেকে প্রত্যেক দিনই দু'জনে বসে পাশাপাশি। অনেক কথা হয়। অর্থহীন, অসম্বদ্ধ। শুধু সময়টাকে দীর্ঘ বিলম্বিত করে তোলা। ক্রমশঃ অনেক জড়তা কেটে গেছে জয়ন্তর। নিজের কথায়ই নিজে মেতে থাকে। শোভনা হাসিমুখে শোনে আর ভাবে, মানুষটার হৃদয়টা ওর ঝকঝকে চাউনির মতই স্বচ্ছ পরিষ্কার। কথাগুলো অবশ্য বেশ গুছিয়ে মেপে মেপে বলতে হয়। যদি বা কখনও খেয়ালের বাইরে খাপছাড়া হয়ে যায়, তখুনি সামলে নিতে হয়।

মা ভাল হয়ে উঠেছেন। ডাক্তারের আনাগোণা বন্ধ হয়েছে। একদিন বিকেলে টিউশনি করে ক্লান্ত হয়ে শোভনা বাড়ীতে এসে ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখে জয়ন্তকে পাশে বসিয়ে মা কথা বলছেন। কথা আর কি দুঃখ গাইছেন সংসারের। এমন সময় জয়ন্ত কোন দিন থাকে না। শোভনার অসাক্ষাতেই ওকে তবে ডেকেছেন মা, আর যত কথাবার্ত্তা এখন হচ্ছে সব শোভনাকে লুকিয়েই। জয়ন্ত মাকে হাতে কি একটা গুঁজে দিতেই চমকে উঠল শোভনা। একটা চাবুকের আঘাতে ছট্‌ফটিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। তার পর রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল। টাকা দিয়ে এভাবে সাহায্য তো এর আগেও অনেকে করেছে। এটা এমন কিছু নূতন নয়। কিন্তু জয়ন্তর সঙ্গে তাদের তুলনা হয় না। প্রতিদান হিসাবে জয়ন্তর অনেক কিছু দাবি করার ছিল, তা সে করে নি। ওর কাছেও মার হাত পেতে টাকা নিতে বাধল না। আর তাছাড়া মা মেয়েকে অবিশ্বাস করেছেন, এ কথাটাই সবচেয়ে বেশী খোঁচা দিচ্ছে মনে। কোন পর্য্যায় পৌঁছলে মা-মেয়ে এ ভাবে অবিশ্বাস করেন, পর করে দেন, নতুন করে শিখতে হ'ল আজ।

তার পরের দিন সিনেমার টিকিট কেটে নিয়ে এসে উপস্থিত হ'ল জয়ন্ত। শোভনাকে বললে, একটা খুব ভাল ছবি হচ্ছে, চলুন না দেখে আসা যাক। মাকে নিয়ে ত আর ভাবনা নেই!

জয়ন্তর সামনে দাঁড়াতেই কেমন আড়ষ্ট বোধ করছিল শোভনা। বললে, আমি ত সিনেমা বিশেষ দেখি না।

মা ধমক দিলেন, বললেন, যানা, ও আগ্রহ করে টিকিট কেটে এনেছে।

মার মুখের দিকে একবার চেয়েই শোভনার চোখ দু'টি নিষ্প্রভ হয়ে গেল। তারপর জয়ন্তর সঙ্গে তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়ল।

সিনেমা ভাঙল রাত ৯টায়। বাড়ী ফেরার, মুখে জয়ন্তর অনুরোধে দু'জনে এসে বসল সেই পার্কের কোণে। রাত্রি হয়ে যাওয়ায় বেশ নির্জ্জন চারিদিক। কথাবার্ত্তা আজ গোড়া থেকেই বেশী কিছু বলতে পারে নি শোভনা। মনটা কেমন ভার ভার হয়ে আছে।

সিনেমার প্লটটা নিয়ে এতক্ষণ অনর্গল আলোচনা করে যাচ্ছিল জয়ন্ত। শোভনার গম্ভীর ভাবটা দেখে এক সময় বললে, আজ আপনার কি হয়েছে বলুন ত?

হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে চুপ করে বসেছিল শোভনা। ভাবছিল, জয়ন্ত আজ থেকে টাকা দিয়ে সাহায্য করা শুরু করেছে বলে মা ওর সিনেমাসঙ্গিনী হতে ইশারায় আদেশ দিয়েছিলেন। কতটুকু এগোতে হবে, কতটুক বা মার মিনতি ভরা দৃষ্টির অন্তরালে তার হিসেব কষা থাকে। সব ব্যাপারটা যেন ছলনা ও প্রবঞ্চনায় ভরা, তা কি এতটুকু বুঝলে পারল না এতদিনে জয়ন্ত? তার পাওনা-গণ্ডা সবই হিসেব মত এগিয়ে চলেছে, সে না বুঝুক শোভনা বোঝে। কেন না তাকে বুঝে চলতে হয়। জয়ন্তর প্রশ্নে তার সরল সুন্দর মুখের দিকে অপলকে চেয়ে রইল শোভনা। কোন মলিনতা নেই, কোথাও সন্দেহের ছিটেফোঁটাও নেই। শোভনা বললে, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

—করুন, আগ্রহভরে তাকিয়ে রইল জয়ন্ত।

—অভাবের সংসারে অভাব কোন দিন মেটে না। কতদিন এভাবে সাহায্য করবেন আমাদের?

এই ভয়টাই ছিল জয়ন্তর। টাকাটা সে কিন্তু খারাপ মনে দেয় নি। যাদের অভাব নেই, তারা যাদের অভাব আছে তাদের যদি সাহায্য না করে আর কে করবে? কিন্তু এসব কথা ওকে বোঝাতে যাওয়া বৃথা। কোনটার অর্থ কি ভাবে নেবে কে জানে! চুপ করে বসে রইল জয়ন্ত।

শোভনা আবার ধীরে ধীরে বললে, আপনার আমার সম্বন্ধটা যেন মনে হয় ব্যবসাদারি ছকে বাঁধা।

আরও অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল জয়ন্ত, বললে, না না, এসব কি বলছেন আপনি। আপনি নিজে যদি তাই মনে করেন আমার কি বলার আছে। তবে আমি কোনদিন ওভাবে কথাগুলো ভাবি নি।

শোভনা হাসল। শান্ত নম্র চোখ দু'টি তার দূরের গ্যাস-পোষ্টের দিকে নিবদ্ধ, বললে, আপনার দিকটা আপনি বেশ ভেবে রেখেছেন। কিন্তু আমরা আত্মসম্মানের বালাই ঘুচিয়ে এই যে হাত পেতে সাহায্য নিচ্ছি,

তাতে প্রতিদিন আমরা যে কত ছোট হয়ে যাচ্ছি, তা কি আপনি কোন দিন ভেবে দেখেছেন?

জয়ন্তর স্বর এবার গাঢ় হয়ে এল। শোভনার হাতটি আলতোভাবে হাতে তুলে নিয়ে আরও একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বললে, আমি ভাবতাম, আপনারা আমাকে স্নেহ করেন, ভালবাসেন—তাই ওসব বালাইগুলো আমল পাবে না।

এর কোন জবাব নেই শোভনার কাছে। কেন না স্নেহ, ভালবাসা এ সবের যথার্থ মূল্য কিছু আছে কি না এখনও জানা নেই শোভনার। মনে হয় ওসবও হিসেবের দরে বাঁধা। এই যে নিজের হাতটা নিঃসাড়ে জয়ন্তর হাতের মধ্যে ছেড়ে দিতে হয়েছে, আরও পরম আগ্রহে আঁকড়ে ধরে আছে—তারও একটা অর্থ আছে। আজ এই মুহূর্ত্তে যতটুকু উচ্ছ্বাস দেখিয়ে ফেলেছে জয়ন্ত, তার মান রাখতে হাতটাকে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্তেও ওর নিজের মনে করতে দেওয়া উচিত।

শোভনা মৃদু হেসে বললে, অমন অযাচিত উপকার করলে স্নেহ ভালবাসা পাওয়া কিছু দুষ্কর নয়। আমরা আপনার জন্তে কি করতে পেরেছি জানি না, আপনাকে কি দিতে পেরেছি তাও জানি না···

—অনেক দিয়েছেন, অনেক দিয়েছেন আপনারা—কত দিয়েছেন জেনে-শুনেও যদি আপনি না বুঝতে চান না বুঝুন—কিসের এক আবেগে উচ্ছ্বাসে কথা বলতে লাগল জয়ন্ত। বললে, আপনি কি বুঝতে পারেন না, আপনার জন্তেই ওদের করি। আপনাকে অতি আপনজন মনে হয় বলেই ওদের পর মনে করতে পারি না। আর, আর—হঠাৎ চুপ করে গেল জয়ন্ত, নিজের অত্যধিক উচ্ছ্বাসটাকে বুঝি সামলে নিল।

হাঁ করে ওর দীপ্ত শুভ্র মুখের দিকে চেয়ে রইল শোভনা। সারা শরীরটা একবার নাড়া দিয়ে একটা তরল খুশী খুশী ভাব অপূর্ব্ব স্পর্শ বুলিয়ে গেল। আপনজন—আপনজন হয়ে উঠেছে শোভনা জয়ন্তর কাছে। এমন আপনজন কেউ হতে পারে নাকি ওর জীবনে? জয়ন্তর চোখে সেদিনকার সেই আভাসে ছড়িয়ে থাকা কথাগুলো আজ কি রকম স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শোভনা সেই ভাবে মুখ তুলে অস্পষ্ট স্বরে বললে, আমি বুঝি আপনার আপন-জন হয়ে উঠেছি? কৈ, সে কথা ত আমি জানি না।

জয়ন্ত বললে, আমার কথাটা যে মিথ্যে নয়, তা'ত আপনার মুখ দেখেই বোঝা যায়।

সেই তরল খুশী খুশী ভাবটা ক্রমশঃ যেন বড় বেশী দাপাদাপি শুরু করেছে সারা শরীরে। মুখ নিচু করে নিল শোভনা। এই ছায়াঘন পার্কের কোণটা আজ যেন একেবারে নতুন মনে হচ্ছে। ঘাসের ডগা ছিঁড়তে ছিঁড়তে তেমনি অধোমুখে বসে বললে—আমি মনে করতাম আপনি ভারি সরল, এ সব কিছু বোঝেন না। কিন্তু আমার মুখ দেখে আমায় যখন বুঝতে শুরু করেছেন···

জয়ন্ত বাধা দিয়ে বললে, আমার ধারণাটা কি সত্যি নয়? আমি যেমন করে ভাবতে পারি আপনাকে, আপনি আমাকে···

আর মুখ তুলে তাকাতে পারল না শোভনা। হঠাৎ একটা দুরন্ত হাওয়া বইতে লাগল সর্ব্বাঙ্গে; দেহের প্রতি শিরা-উপশিরায় কিসের এক অজানা প্রস্রবণ ঢেউ তুলে চলেছে। আরও যেন কাছে এগিয়ে এল জয়ন্ত, একে-বারে কাছাকাছি। ঝড়টা তেমনি বইছে—তার হু হু শব্দের মধ্যেও শোভনা শুনতে পেল, জয়ন্ত অস্ফুট স্বরে বলছে—আমার কথাটার কিন্তু জবাব চাই।

কিন্তু জবাব কিছু নেই শোভনার কাছে। এসব প্রশ্নের জবাব থাকেও না বোধ হয়—জবাব দিলেই ত মিটে যাবে প্রশ্নের সব মাদকতা। তাই শোভনা ভাবল, ও শুধু প্রশ্নই হয়ে থাক। সেই বেসামাল হাওয়াটা, কিছুতেই আয়ত্তে আনা যাচ্ছে না। আরও যেন কাছে এগিয়ে আসছে এ আপনজন বলে দাবী-করা মানুষটা, ওর উদার প্রশস্ত বুকটায় শুধু শোভনার জন্তেই একটা নিবিড় নিশ্চিন্ত আশ্রয় যেন লুকিয়ে আছে। মাথাটা ঘুরে যেতেই আর কিছু মনে রইল না শোভনার। নিরন্ধ্র অন্ধকারে রাজ্যের ঘুম যেন চোখ জুড়িয়ে দিল। কিন্তু মুহূর্ত্তমাত্র। হঠাৎ ধোঁয়া ধোঁয়া ঘুম-ঘুম ভাব ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে মার সেই হিসেবী চোখের ইশারাটা জল জল করে উঠল চোখের সামনে। আর সেই সঙ্গেই ওর খেয়াল হ'ল, জয়ন্তর বুকের মধ্যে, তার নিবিড় বাহুবেষ্টনে নিঃসাড়ে কখনই বা লুটিয়ে পড়ল সে? আর জয়ন্তর সেই আবেশ-মুগ্ধ চোখ-জোড়াই বা কখন এত সুযোগ পেল কাছে এগিয়ে আসার? দু' হাতে জোর করে জয়ন্তর মুখটা ঠেলে দিয়ে ছিটকে সরে এল শোভনা। হাত কয়েক দূরে গিয়ে বসল ভাল হয়ে। দুরন্ত মনটাকে সজোরে রাস টেনে থামিয়ে দিল একেবারে—এক পাও যেন বেসামাল না চলতে পারে আর। এমন ভুলটা কেমন করে হ'ল কে জানে। এ ভুল হতে নেই, হওয়া উচিত নয়। মাথাটা বার কয়েক ঝাড়া দিল শোভনা। না, যতটা এগিয়ে ছিল অতটা এগোয় যায় না। একটু যেন নিয়মের বাইরে চলে গিয়েছিল মনটা—আবার সেটাকে টেনে নিয়ে আসতে হয়েছে ঠিক পথে। শুনতে পেল জয়ন্ত বলছে—কি হয়েছে আপনার? শরীর খারাপ হয় নি ত?

ওর কথা শুনে এবার সোজা ও শক্ত হয়ে বসল শোভনা—মেরুদণ্ড খাড়া করে। তার পর গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বেশ স্পষ্ট স্বরে বললে—আপনি যে কথাটা আমায় জিগ্যেস করছিলেন, তার জবাব দিই। আপনি আমার আপনজন নন, কেউ নন। আমার মুখ দেখে যা বুঝতে চেয়েছিলেন, ওসব মিথ্যে। আপনি গোড়া থেকেই সব ভুল করেছেন।

স্তব্ধ বিস্ময়ে কোন কথাই প্রথমটা বলতে পারল না জয়ন্ত। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে অতি কষ্টে একবার বললে—এ সব আপনি কি বলছেন !

এক ঝলক বাঁকা হাসি হেসে শোভনা বললে, ঠিকই বলেছি। আপনার যদি বুদ্ধি না থাকে এসব বোঝবার, সে দোষ আপনার। আমাদের মধ্যে যে একটা ব্যবসা-দারি সম্বন্ধ আছে একটু আগে বোঝাতে চাইলেও, বুঝতে চান নি। এবার ভাল করে বুঝিয়ে দিই। বাড়িতে আপনার মত একজন সাহায্যকারী লোকের খুব দরকার ছিল বলে প্রথম দিন ব্যাগটা কুড়িয়ে দিয়ে উপকার করে বাড়িতে এনেছিলাম আপনাকে। মার চিকিৎসাটা ভাল করে করাচ্ছিলেন তাই প্রতি সন্ধ্যায় পার্কে আপনার সঙ্গে বসে আপনাকে আনন্দ দিতাম। আজ থেকে টাকা দিয়ে আপনি সাহায্য করা যদি না সুরু করতেন, আপনার সিনেমা-সঙ্গিনী হতাম কি না সন্দেহ। এই একটু আগে উচ্ছ্বাসভরে আপনি যে আমার হাতটি তুলে নিয়েছিলেন, সে উচ্ছ্বাসটাকে আমাদের সংসারের স্বার্থে কায়েমী রাখবার জন্যে আমার হাতটা নির্ব্বিকারভাবে আপনার হাতের মধ্যে ছেড়ে দিতে হয়েছিল।···এক সঙ্গে এত কথা বলে হাঁপিয়ে উঠেছিল শোভনা। একটু সামলে, জিরিয়ে বললে—কিন্তু এর পরেও আপনি যতটা এগিয়ে ছিলেন ততটা আমার পক্ষে এগোন সম্ভব নয়। আমাদের সংসারটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে বলেই আর এগোন চলে না। এই পর্য্যন্ত এসে পৌঁছলেই আমায় আর একটি নতুন লোক খুঁজতে হয়···। এবার আপনি আসতে পারেন।

শোভনার মুখের সেই বাঁকা হাসিটা তেমনি জলছে। সর্ব্বাঙ্গে একটা অসহ্য জ্বালা নিয়ে আর কোন কথা না বলে উঠে দাঁড়াল জয়ন্ত। সব কথার যখন এমন পরিষ্কারভাবে পূর্ণচ্ছেদ টানা হয়ে গেছে, তখন আর কোন কথা থাকে না। এক পা এক পা করে হেঁটে চলে গেল পার্কের বাইরে।

শোভনার মুখের সেই হাসিটা ক্রমশঃ আরও উৎকট রূপ নিয়ে সশব্দে ফেটে পড়ল। ঠিক হিসেব মত চলতে পেরেছে সে। একটুকুও এদিক-ওদিক হয় নি। না—একটুকুও না। সব কথা শুনে জয়ন্তর ব্যথাতুর পাংশু মুখটা ছাইয়ের মত কি সাদাই না হয়ে গিয়েছিল ! যাবার সময় পা দুটো টলছিল। দুনিয়ার সব কিছুকে অঙ্কের নিয়মে শোভনার মত কেন যাচাই করতে শেখে নি সে ? শিখলে এমন আঘাত পেতে হ'ত না। জয়ন্ত বোধ হয় জীবনে এই প্রথম আঘাত পেল। ওর স্বভাবকোমল মনটি এ আঘাত সহ্য করবে কি করে কে জানে—আর এ আঘাত শোভনার মত মেয়ের কাছেই পেতে হবে তা কি ও বেচারী স্বপ্নেও কোনদিন···।

কিন্তু একি ! সারা মুখ, বুক জলে ভেসে যাচ্ছে কেন শোভনার ! চোখ দুটোয় কখন এত বর্ষার প্লাবন নেমে এল ! না না, এমন ত হবার কথা ছিল না। আঁচল দিয়ে চোখ দুটো রগড়ে রগড়ে পুঁছে ফেলতে চাইল শোভনা। কিন্তু নাঃ হৃদয়ের কোন গোপন অন্তঃস্থলে একটু একটু করে এত অশ্রু জমে উঠেছিল কে জানে। ফুলে কেঁপে বেরিয়ে আসছে সব। নিজেকে আর স্থির না রাখতে পেরে চোখে আঁচল-চাপা দিয়ে ঘাসের ওপর লুটিয়ে পড়ে শোভনা ভাবল যে, এই অবাধ্য অশ্রুধারাকেও কি কোন একটা অঙ্কের নিয়মে বাঁধা যায় না ?

হিম-সাগর

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য

১৮ই জুন, ১৯৫৭।

রাতে ঘুমিয়েছি বলে মনে পড়ে না। ভোরের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। টপ্ করে চোখের ওপর এক ফোঁটা গরম জল পড়লো। উঠে বসলাম।

"তোমার যদি এতো কষ্ট যেতে দিতে, বললে কেন? তোমাকেই তো প্রথম জিজ্ঞেস করেছিলাম।"

"তা করেছিলে; শান্ত জবাব। "তখনও বলেছি, এখনও বলছি! যাও, ঘুরে এসো। তিন বছর কীই বা সময়। কেটে যাবে। তোমার এতো দেশ দেখার সখ। যাও ঘুরে এসো।"

এমনি শান্ত হয়েই বরাবর কথা বলে।

"কাঁদছো কেন তবে?"

"এ ক'দিন কাঁদিনি। ঠিক দেড় মাস আগে তোমার তার এসেছে। তার পর থেকে এতোদিন কাঁদিনি। আজও কাঁদছি না। ভোরবেলা তোমায় দেখছিলাম। ভাবছিলাম, ঘুমটি ভাঙলেই আবার তাড়া; গাড়ী এসে যাবে। সাড়ে আটটায় প্লেন। তার পরেই সোজা তিন বছর।...ভাবছিলাম। চোখে জল এসে গেলো। কাঁদিনি। ভালো মনেই বলছি, যাও, ঘুরে এসো। ক'মাস ধরে বড়ো অশান্ত হয়ে পড়েছিলে। কেবল বলছিলে 'যাই', 'যাই'; কোথাও না পালালে চলছিলো না।"

আমি কিছু বলছিলাম না।

স্বভাবতঃ কখনও যে কিছু বলে না, প্রগল্‌ভতা যার মধ্যে কখনও কেউ দেখেনি, তার মুখে অনর্গল কথা শুনছিলাম।

"উঠো না। শুয়ে থাকো। তোমার কফিটা এনে দিই।"

এই ও উঠে গেলো, তার পরে কাজের চাকা। গুরুজনদের যাতায়াত। ছোটদের জড়িয়ে ধরা। শিশুদের কাকলী। কোথায় যেন ও হারিয়ে গেলো।

সাড়ে আটটায় প্লেন ছেড়ে গেলো। তখন অবধি আর ওকে একটুও পেলাম না।

* * *

যে কখনও প্লেনে চড়ে নি তার পক্ষে প্লেনে চড়ার একটা উত্তেজনা স্বাভাবিক। তা ছাড়া গোটা ইয়োরোপ পাড়ি দিয়ে অতলান্তিক পার হয়ে ক্যারাবিয়ানের দক্ষিণে গায়ানায় যাওয়া, এরও একটা উত্তেজনা থাকা উচিত।

আশ্চর্য্য! কোন উত্তেজনা নেই।

মনে হচ্ছে সমস্ত ব্যাপারটা যেন আমার স্বপ্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে অনেক দিনের চেনা। ও নিয়ে অযথা একটা দাপাদাপি করার কিছু নেই।

এমন কি নিউ দিল্লীর উইলিংডন এয়ার পোর্টে যখন ছেলেমেয়েরা হাত পেতে পেতে টাকা নেবার অছিলায় একটা বিষম কোলাহল তুলে রুদ্ধ আবেগের অনেকখানি ভদ্র পোষাকে মুক্তি দিচ্ছিলো, তখনও একটুও কোনো রকম নতুনতা পেয়ে মনকেন্দ্রে কোনো প্রসন্নতা আসেনি।

সেটা এলো পাকিস্তানে পৌঁছে।

করাচীতে প্লেন বদলে বড় প্লেনে চড়তে হবে। অপেক্ষা করতে হবে ছ'ঘণ্টা। পথে কোনো বৈচিত্র্য নেই।

বিচিত্রকে স্বাদ করার আশা নিয়ে ঘোরাই তো পায়ের নেশা, চোখের নেশা, মনের ধ্যান। অথচ সেই বিচিত্র থাকে ধূলোর বন্ধনে বৈরাগীর বেশে। বিচিত্রের মাধুরী পৃথিবীতে; আলস্য-বিলাস, রিপু-বিকলন, মাংসল পরিচয়, সবই পৃথিবীর। পৃথিবীর বুক ছেড়ে নিরালম্ব অম্বরে লম্ববান হলে কিছুই আর বন্ধনে পড়ে না। ব্যোমে গিয়ে ইন্দ্রিয় পায় তুরীয় কৈবল্য। যা করো তখন মন নাড়াচাড়া করে। ইন্দ্রিয়ের কৈবল্যই যদি প্রেয় হোতো তবে আর দেহ নিয়ে ষোলো হাজার মাইল পাড়ি দেওয়া কেন?

জুন মাস। দিল্লী তখন ভাটিখানা। করাচীও তাই। নেহাৎ সমুদ্রের বাতাস, তাই তবু মান সম্মান আছে।

আসার দু-দিন আগে এক ধাক্কা জ্বর গেছে। তখন দিল্লীতে জ্বর মানেই তো এশিয়াটিক ফ্লু! ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। যদি, প্লেনে না চড়তে দেয়। আসলে ব্যাপারটা সর্দিগর্মি। দিল্লীর সেই দুর্দান্ত রোদে পাসপোর্ট ইত্যাদি নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে; তাই জ্বরের মতো গা তেতেছিলো। প্রচুর স্নান করে, এবং ঘোল ইত্যাদি খেয়ে জ্বরের হাত থেকে যদিও পরিত্রাণ পেয়ে

ছিলাম, তবুও মনে মনে ভয় ছিলো পাকিস্তানে না ভোগায়।

হোলোও তাই। থাকবো তো এয়ার-লাইন হোটেলে ছ'ঘণ্টা! ভেতরে যেতে দেবে না; পাসপোর্ট নেই। তবু সেই মেডিক্যাল রুমে ঝাড়া দেড়ঘণ্টা দাঁড়িয়ে; জ্বর না থাকলেও জ্বর আসার কথা। থাকলে ছেড়ে যাওয়া উচিত।

সব প্যাসেঞ্জার চলে গেলো। দু'জন কুতবিদ্য ডাক্তার আমায় নিয়ে নাজেহাল। আমি বলি দিল্লীর লু লেগে গা তেতেছে। ওরা বলে ফ্লু। অন্যথায় অন্ততঃ কোরেণ্টাইনে থেকে প্রমাণ করতে হবে যে ফ্লু নয়।

মরিয়া হয়ে বল্লাম, "বেশ থাকবো!"

গলার স্বরে কি ছিলো জানি না। ওরা হেসে ফেললো। আমার ফ্লু ছেড়ে গেলো। একটু মস্করা করে নিলে! নেহেরুকে নিয়ে ইউনাইটেড নেশনে যারা মস্করা করে, আমায় নিয়ে এয়ার পোর্টে তারা একটু মস্করা করবে, এতে আর আশ্চর্য কি!

তার পরে কাষ্টমস্।

"ঘড়ি, ক্যামেরা?"

একটি বাড়তি ঘড়ি ছিলো। সেটা নিয়ে জমা রাখলো, আর ক্যামেরাটি।

তার পর টাকা। কতো কি আছে তার হিসেব।

কিন্তু ছ'ঘণ্টায় আমি তিন চার টাকা খরচ করে-ছিলাম।

তাই নিয়ে সে কী হাঙ্গামা।

আমায় ভুক্তভোগীরা বার বার সাবধান 'করেছিলেন', "করাচী হয়ে যাচ্ছেন, সাবধান। বড়ো "কনসেনশাস্" জায়গা। কোনো অফিসিয়ালই কাজে ফাঁকী দেন না। গোলমাল করবেন না।"

অথচ প্রমাণিত হোলো গোলমাল করেছি।

কনসেন্শাস্ অফিসিয়াল ছাড়বেন না।

কাষ্টমস্ বলে, "অফিসার খেতে গেছে। তার কাছে আয়রন্ সেফের চাবি। সে এলে ঘড়ি আর ক্যামেরা মিলবে।" তার পর সেখানেই প্লেটে করে শিককাবাব এলো। চা এলো। দুটী কনসেনশাস্ অফিসিয়াল সে-গুলোর সদ্ব্যবহার করলেন। চাবি আসছে।

আমি দাঁড়িয়েই আছি।

পরে, শিককাবাব শেষ হোলো; চা শেষ হোলো; পান, বিড়ি নয় অবশ্য, পাসিং শো সিগারেট, দোক্তা, সব শেষ করে একায় বয়িসী কনসেনশাস, বাইশ বয়িসী কনসেনশাস্কে বল্লেন, "দেখ না যদি কোথাও পাস্। ভদ্র লোকটা কতোক্ষণ এমন দাঁড়িয়ে থাকবে?"

বাইশ বছরের কনসেনশাস্ সবই ঠিক করেছিলো। কেবল এতো তাড়াতাড়ি লোকটিকে 'পেয়েছিলো', ও প্যাণ্টের এতো গভীরে হাত দিয়ে চাবি বার করেছিলো যে বুঝতে দেরী হয় নি যে চাবি ঐ পকেটেই বসে বসে শিককাবাব চিবুচ্ছিল।

কিন্তু সত্যিকার 'ক্রিমিন্যাল' সাব্যস্ত হয়ে গেলাম তার পরক্ষণেই।

"এঁ্যা করেছেন কি? টাকা খরচ করেছেন? ভারতীয় টাকা এখানে ভাঙ্গিয়েছেন বিনা অনুমতিতে? এ তো ভারী ফ্যাসাদ বাধালেন! পুলিশের কাছে এক্সপ্লানেশন দিতে হবে।"

বাঙ্গালী হতে পারি, মাষ্টার হতে পারি, ব্রাহ্মণও হতে পারি; তা বলে চামারী নিয়ে কতো ঘাঁটাঘাঁটি করবো, আর নীরবে দুর্দশা কতো সহ্য করবো? বোতাম আঁটা জামার নিচে প্রাণ আর শান্তিতে থাকতে চাইছে না যেন।

এমন সময়ে আর একজন কনসেনশাস অফিসিয়ালের আগমন। গোঁফ যদি তার উঠেও থাকে হয় তো সেই দিনই উঠেছে, আর সেই দিনই সে কামিয়েছে। পরনে কালো স্যুট। সবে চাকরিতে ঢোকার কনসেনশাস্নেশ চোখে, কথায়, ব্যবহারে কিলবিল করছে। ইংরিজী বলতে আরম্ভ করে দিলো—

এতোক্ষণ উর্দ্দু চলছিল, চালাচ্ছিলামও—

তুই বাবা সেই নোয়াখালি কি কুমিল্লার! তোর ইংরিজী যদি না চিনতে পারলাম তো ঘিয়াসুদ্দীন বলবনকে মোহনদাস গান্ধী বলেও ভুল করতে পারি।

সোজা বাংলায় চলে এলাম।

হতে পারে পাকিস্তান, কিন্তু তুইও মার কোল ছেড়ে স্রেফ পেটের দায়ে এই করাচীতে এসে বাংলা ভুলতে সুরু করেছিস্, আমু-ও বাংলা ভাবার শেষ কামড়টা দেবার লোভ ছাড়তে নারাজ।

বাংলায় যে কনসেস্শাসনেশ এতো সহজেই গলে যায় কে জানতো। 'তা' হলে ওই সব পাঠানী গাটারেলদের সঙ্গেও বাংলায় কথা বলতাম।

"আপনি লিখে দিন না যে তিনশো সাত টাকা সঙ্গে যেমন ছিলো তেমনি তিনশো সাত টাকা নিয়েই ফিরে যাচ্ছেন। খরচ করেছেন বলছেন কেন?"

—"অভ্যেস দাদা, অভ্যেস। মিছে কথা আলজিভ

যে বেরুতে চায় না ভাই। নৈলে পাকিস্থানে আমায় পেতো কে?"

বাংলার চোখের হাসি করাচীর ধুলোতেও মিষ্টি দেখায়, বাংলার চোখের কালো, করাচীর আলোতে চিকচিক করে উঠলো।

'ভাইকিঙ্গে' গিয়ে বসলাম।

বেল্ট বাঁধার আলো জ্বললো।

বেল্ট বাঁধলাম।

আবার আকাশ।

২

"কোয়াণ্টাস্" কোম্পানীটা অষ্ট্রেলিয়ান। ওদের প্লেন ভর্ত্তি অষ্ট্রেলিয়ান উঠেছে, একটা বড়ো দল। ছোটো ছোটো বাচ্চা সমেত গোটা পরিবারও চলেছে বসন্তে ব্রিটেন দেখার প্রত্যাশে। ইচ্ছে আছে পথে "to do, Athens, Rome and Paris"—অর্থাৎ এথেনস, রোম, প্যারীসেরে নেওয়া।

বেশ লাগছিলো একটি যুবতীর হাতে ঝোলানো বেতের ঝুড়িতে ঘুমন্ত একটি শিশু, যেন নদীর ওপারে বেতবনের বুকে ধরা ঘুমন্ত একটা সকাল। পাশে বসলেন একটি অল্পবয়সিনী। করাচী থেকে এঁদের দলটি উঠেছে। এঁরা সকলেই পাকিস্থানী, জাতে বালুচ, থাকেন লাহোরে।

বেশ একটা মজার ঘটনা ঘটেছিলো এই দলটি নিয়ে করাচী এয়ার পোর্টে।

সেই দুর্বিপাক কেটে গেছে। ঘড়ি আর ক্যামেরা পেয়েছি। টাকা খরচ করার এক্সপ্লানেশনের হাত থেকেও অব্যাহতি পেয়ে গেছি। আপেক্ষিক সুস্থ মনে B. O. A. C-র কাউণ্টারের সামনে বেঞ্চে বসে পাখার হাওয়া ভোগ করছি।

হঠাৎ একটা এমন কোলাহল উঠলো যেটা হাওড়া ষ্টেশনের পক্ষে যতোটা স্বাভাবিক, এয়ার পোর্টের পক্ষে ততোটাই অস্বাভাবিক। চেয়ে দেখি দশটি মহিলা ও একটি পুরুষ অনেক গ্যাঁটরা-গাঁটরী নিয়ে উপস্থিত। চোখ-কান চুল-নাক দেখে বোঝা যায় না সহজে কোথাকার বাসিন্দা। রং একেবারে খাঁটি ভারতীয়, একটু যেন ধুলো-ধুলো ভাব। পোশাক দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়।

মজা দেখছি বসে বসে। ভদ্রলোকটির উপস্থিতি মনে হয় এদের সহকারিতা করার জন্ত। কিন্তু ভদ্র-লোকের চক্ষু চড়কগাছ! এরা সঙ্গে মাল এনেছে যেমন ট্রেনে চড়ার সময়ে আমরা করে থাকি। এক মণ যখন প্রাপ্য তখন সাত মণ অনায়াসে নিই। ভরসা রাখি রেলকর্তৃপক্ষ সত্যি সত্যি এমন কিছু করিৎকর্ম্মা হয়েও ওঠেন নি, বা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও হন নি। চোখের ফাঁকী দিতে না পারলেও, ট্যাঁকের মধ্যে কিছু গুঁজে দিলেই চলে যায়।

এখানে তা নয়। প্রত্যেকটি মাল ওজন করতে করতে দেখা গেলো প্রায় দু'মণ মাল বেশী।

মেয়েদের দল, সহজে হার তো মানেই না; বরং হেরে যাবার পরেই বিক্রম দম্ভটা বেশী দেখা যায় প্রথম কয়েক মিনিট। আমি ওদের ভাষা বুঝবার কোনো দায় রাখি না, কিন্তু ভদ্রলোককে যে ওরা একখানা গোবর ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছিলো না তা ভদ্রলোকের মুখ দেখে বুঝছিলাম, আর বুঝছিলাম, তাঁর সে কি অকৃত্রিম অপাংগুল চেষ্টা—শুধু এইটুকু বোঝাবার জন্ত যে গোবর হতে উনি রাজী, তবে ওই মহিলা কয়টির থুলির ভেতরের।

একজন গাউন পরিহিতা, ক্রুশধারিণী কৃষ্ণবসনা এগিয়ে গেলেন। কটমট করে চাইলেন ভদ্রলোকের দিকে, ভাবটা "দেখো,, গোবরগণেশ, দেখো। কি করে ম্যানেজ করতে হয় শেখো।" তার পরে নীল কোর্ত্তা আঁটা সেই অফিসিয়ালের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধস্তা-ধস্তি, চোখের জল, অবশেষে চ্যালেঞ্জ। বেশ, ভাড়াই দেবো। কতো লাগবে শুনি?"

হাসলো নীল কার্ত্তাপরা যুবকটি। হিসেব করে দেখা গেলো ওদের মাল বইতে গেলে দু জন লোকের টিকিটের দাম গুণতে হবে।

এর পরে সেই মাল কমানোর প্রলয়ঙ্কর পর্ব।

সে ব্যাপার না বলাই ভালো।

এঁরা সব বালুচিস্থানের লোক। রোম্যান ক্যাথলিক চার্চ্চের সন্ন্যাসিনী। রোমে তীর্থ দরশনে চলেছেন।

তারই একজন আমার একধারে বসে। আমি একটু একটু করে আলাপ করার চেষ্টা করছি। কিন্তু প্রতিবারেই তিনি আমায় আভাসে, ইঙ্গিতে আর দু চোখের মধ্যে ভরা অদ্ভুত এক ধরনের আলোয় বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, প্রথমতঃ আমি পুরুষ, দ্বিতীয়তঃ আমি সন্ন্যাসী নই, তৃতীয়তঃ এবং সেটাই চরম, তিনি সন্ন্যাসিনী।

আমার আবার অত্যন্ত উৎসাহ এই সব জট খোলায়। আমি মাঝে মাঝেই পার্শ্ববর্ত্তিনীকে বিরক্ত করতে লাগলাম

… ওটা প্রশ্ন করে, এবং ছোটো-খাটো শিভালরির ছিটেফোঁটায়।

অন্য ধারে এক মৈনাক পাহাড়। সাত থেকে সতেরো মণ ভারী এক ল্যাপাপোঁছা অষ্ট্রেলিয়ান। গলার বোটা কালো! তার পরে ওপর অবধি কোথাও কালোর চিহ্ন নেই। চোখ নীল, ভ্রূ প্রায় নেই। মাথা চক্‌ চক্‌ করছে, গলায়, গায়ে, ঠোঁটে (চিবুক আর গলা এক হয়ে গেছে) বিলিয়ার্ড খেলা যায়। একেবারে তৈজসাধার চেহারা। ক্রমাগত মদ্য পান করছে আর চুরুটের ধোঁয়ায় মশগুল হয়ে আছে।

রাত তিনটায় প্লেন নামছে বাহরিণ দ্বীপে। তেল নেবে। আমরা মিনিট ৪৫ অবকাশ পাবো হাত-পা নেড়ে-চেড়ে নেবার।

বাইরে নামতেই ঝরঝরে বাতাসে মন স্নিগ্ধ হয়ে গেলো। কৃষ্ণাসপ্তমী। শেষরাতে প্রায় আধখানা চাঁদের আলোয় সমস্ত মনটা ঝকঝক করছে। দূরে দূরে গোছা বাঁধা খেজুর গাছের ঝাঁক আকাশের পালিশ করা গায়ে কালো হয়ে দুলছে।

আমার মনে হচ্ছে এখানে সাগরে মুক্তা, মাটিতে পেট্রল। ইংরেজ জবরদোস্তী পাতিয়ে সাঙ্গাৎ করে নিয়েছে এই আরবী বিদ্যুৎকে। মধ্য-প্রাচ্যের তৈলনীতিই আজ পৃথিবীর আন্তর্জাতিক রাজনীতির অর্দ্ধেক। অথচ এর মানুষরা কতো প্রাচীন, কতো নরম; এ দ্বীপের বাসিন্দারা কতো গরীব, কতো অসহায়; এ দেশের অতীত কতো লাল; ভবিষ্যৎ কতো কালো।

আকাশে চাঁদ মিষ্টি হাসি হাসছে। খানা-ঘরে উন্মুক্ত যাত্রীরা পান করছে, কিছু কিছু আহারও করছে। সুন্দরী পারসীক রমণী খানা জোগান দিচ্ছেন। মাটি তেতে আছে। বাতাসে সমুদ্রের প্রসারতা।

বাহরিণ দ্বীপ। এনসাইক্লোপিডিয়া লিখছে:

Bahrain Islands: Arabian islands in the Persian Gulf; noted for dates, white donkeys, pearls, etc, Oil was discovered 1932, pop. 100,000.

৩-৪৫ Quantas-এর viking আবার নিয়ে চললো আমাদের এশিয়া মাইনরের দিকে।

ভোর হচ্ছে। আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে আকাশে। প্লেনের শব্দটা এখন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। মালুম হচ্ছে না।

সকাল বেলার রেডিও থেকে বলছে—প্লেনের লাউড-স্পীকার, বলছেন তরুণী পরিদর্শিকা—"নিচে তাইগ্রীস নদী। আমরা এশিয়া মাইনর-এর ওপর দিয়ে চলেছি। ডান ধারে দেখা যাচ্ছে মাউন্ট আরারাতের চূড়া। এইবার ব্রেকফাষ্ট দেওয়া হবে…"

সত্যিই এবার দেখা যাচ্ছে। পৃথিবীর সেই চাঁচা-ছোলা চেহারা পালটে গিয়ে সবুজের বনাত মোড়া চেহারাটায় নীলের পাড়, শাদা-লালের বুটী দেখা যাচ্ছে। আরারাত—আরারাত! মাউন্ট আরারাত! আর্মানিয়া, আরারাত, ১৭,৩২৫ ফুট, প্রায় অমরনাথ পাহাড়ের কাছাকাছি উচ্চতা। নোয়ার জাহাজ সেই প্রলয়ের দিনে ঠেকেছিলো এই আরারাতের চূড়ায়! একটু আগে ভান্‌-হ্রদ, উর্মিয়া হ্রদ পার হয়ে এসেছি। উত্তরে, আরও উত্তরে ককেসাস চলে গেছে। দুর্দান্ত জর্জিয়া, রূপোর সামোভর গড়ার জন্য প্রসিদ্ধ তিফলিস, যে শহরে সূর্য্যের কিরণকে আলুমুনিয়মে বেঁধে নাইবার জল গরম করার ব্যবস্থা, বাকু আর বাটুম! সেই দেশ। নিচে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সবুজ পাহাড়ের গায়ে ফিতের মতো পথ। আরারাতের গায়ে বরফের ভারী পর্দা। সূর্য্যের তরুণ কিরণ ঝলকাচ্ছে যেন সেই শাদার সমুদ্র থেকে।

প্লেন চলেছে… পার হবে বিখ্যাত এশিয়া মাইনর। সেকালের আইকোনিয়ম, এন্টিওক, ট্রোয়াস শহর পার হবো! ট্রোয়াস, ট্রয়! আজ ট্রয় স্মৃতির নৈবেদ্য, ইতিহাসের শ্মশান!

এটা পাহাড়ের দেশ। বেশ বোঝা যাচ্ছে এখন ওপর থেকে। সূর্য্য উঠছে। পাহাড় ভেদ করে এমন সূর্য্যোদয় আগে কখনও দেখি নি। তন্ময় হয়ে দেখছিলাম। চমৎকার একটা স্বপ্নরাজ্য যেন। এশিয়ার শেষ প্রান্ত। বড় নদী নেই, ছোট ছোট স্রোতস্বিনীর প্রাচুর্য্য।

Quantas-এর পাখা চারটে ঘুরছে; জানলায় পাশেই আমার সীটটা হলে পাখার আড়াল হ'ত। একটু দূরে বসেছি। পার্সপেক্টিভটা বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

এখেন্সে নামার সময় ন'টা। আমার ঘড়ি তখন একটা পার করে গেছে। এও ত এক কম চিন্তার বস্তু নয়। এমনি করে ক্যারাবিয়ান পৌঁছতে পৌঁছতে এই মন্দমতি-তীব্রগতি প্লেন-যাত্রা আমার জীবন থেকে যে গোটা আধখানা দিনের ওপর কেড়ে নেবে। ভাবতে বেশ লাগে। কেতাবে পড়া, মাথা দিয়ে বোঝা এক বস্তু; আর রক্তে-মাংসে তাকে চাখা অন্য ব্যাপার। কি সর্ব্বনাশ! বলা নেই, কওয়া নেই, আয়ু কমিয়ে দেবে একদিন?

ধৈর্য্য! সহিষ্ণুতার বাড়া ধর্ম্ম নেই। **Patience to prevent that murmur soon replies**—"বাপু, ভেশের ছাওয়াল, ভেশে যেদিন ফিরবে, খোয়া যাওয়া দিন

তোমার প্রতি সেকেণ্ড মেপে ফেরৎ দেওয়া হবে।' সত্যিই ত! সূর্য্যের সঙ্গে পাল্লা দেবার খেসারৎ হিসেবে ওটা যেন আমানত রাখা হ'ল। ফেরবার সময়ে কড়ায়-ক্রান্তিতে আমানত ফেরৎ পাওয়া যাবে।

এসে গেল দার্দ্দানালিসের খাঁড়ি। এমন নীল দেখি নি আগে। নীলের রাজাকে শুয়ে থাকতে দেখেছি কন্যাকুমারীর তটে, ধনুস্কোডির ডান ধারের আরব সাগরের দিকটায়। নীলের এক স্বপ্নঝরা মায়ার চাহনি দেখেছি কাশ্মীরে অমরনাথের পথে শেষনাগের হ্রদে। এ নীলে নেই সেই সমুদ্রের মহিমতা, সেই হ্রদের পেলবতা। এ নীল যেন আমেরিকান মাসিকপত্রে ছাপানো টেলিফোটোর ঝরঝরে চারুকল্প রূপ। শেষনাগের সেই নীলে খানিক সবজে-নীল আলো গুলে তাকে তেল চিকচিকে করে দিলে পাওয়া যায় দার্দ্দানেলিসের এই নীল, দু' ধারের সবুজ পাড়ের মধ্য দিয়ে বইছে: ষ্টীমার যাতায়াতে তার বুকে শাদার রেখা ফুটে উঠছে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে শহর আর গাঁয়ের চারখুপী আঙ্গরাখা রোদে শুখুচ্ছে। শহর আসছে, তাই পাহাড়ের গায়ে ছাপমারা যোষ্টম-তিলক দেখা যাচ্ছে। কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে যে গাছের নিবিড়তার মধ্য দিয়ে তার তলায় রান্নাঘরে কোন কিষাণী উনুন জ্বেলে জলপাইয়ের তেলে ভাজছে স্পিনাকের কেক্।

বেলা আটটা। পার্শ্ববর্ত্তিনী হঠাৎ ঝোলা বার করে বাইবেল খুলে বসলেন। একটু একটু আলাপ করার চেষ্টা করতে লাগলাম। এ পাশের চুরুটের ধোঁয়া দিব্যি ঝাঁঝিয়ে রেখেছে। অষ্ট্রেলিয়ানরা একটা দল করে বসে খুব হৈ-হল্লোড় করছে। কয়েকটা বাচ্ছা ছুটোছুটিও লাগিয়েছে।

পার্শ্ববর্ত্তিনীর সঙ্গে ধার্ম্মিক গল্প জুড়ে দিয়েছি। দেখলাম হাসি একেবারে ভুলে যায় নি। মাঝে মাঝে হাসতে জানে; ভয় পায় হাসতে, তবে হাসে।

যন্ত্র থেকে শব্দ বেরুল—"ট্রয়! দার্দ্দানেলিস। আমরা খুব নিচে দিয়ে চলেছি। আপনারা ট্রয় দেখতে পাচ্ছেন। দার্দ্দানেলিসে বাণিজ্য করার অধিকার নিয়েই হেলেন-চুরি। ট্রয়ের ধ্বংস।"...

আর আমার মন বলে উঠল ট্রয়ের ধ্বংসের ওপরেই গ্রীসের সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হ'ল। ট্রয়ের কারিগর, ট্রয়ের শিল্পী, ট্রয়ের কলা, ট্রয়ের জ্ঞানবিজ্ঞান। এশিয়ার শিল্প, এশিয়ার মণীষা প্রাণবহা নাড়ীর মত রক্তের উত্তাপে সঞ্জীবিত করেছিল গ্রীস—ইউরোপ! নিচে নীল ভূমধ্যসাগর!

আজকের নয়। মেয়ার নষ্ট্রাম্! এর তীরে-তীরে ইউরোপের শত-জীবনের শত মৃত্যু। কঙ্কাল থেকে সভ্যতার—কোরাল নতুন সভ্যতার সবুজ নিশান উড়িয়েছে। ককটিক্, ক্রীট, বাইজান্টাইন, কার্থেজিয়ান, মিশরের রামেশিসের প্রতাপ, ক্লিওপাত্রার-পরাজয়, ডিডোর-চিতা, ঈশপের গল্প, জ্যাসেনের পরিক্রমা, ইউলিসিসের অভিযান, গ্রীসের সঙ্গে ট্রয়ের যুদ্ধ, রোমের বিশাল গ্যালির দু'পো। দাঁড়-এর বুকের নীল জলকে ঘোলা করেছে। ভূমধ্যসাগরের ঢেউয়ে ইতিহাস গা ধোয়, পুরোণো মলিনতা মুছে আবার নতুন হয়—আজও। সেই ভূমধ্যসাগর। কত সাম্রাজ্য জন্ম নিয়েছে, কত লয় পেয়েছে।

Thy shores are empires changed in all
save thee—
Assyria, Greece, Rome, Carthage, what
are they?

এথেন্স এসে গেল ন'টার একটু আগে। আধঘণ্টা আগেই এসেছি। প্লেনটা কোথায় যেন কি বেয়াড়াপনা করেছিল; তাই সেটাকে তাড়াতাড়ি এনে ফেলে দুষ্টু-ছেলের সাজা দেওয়া হ'ল। এক ঘণ্টার জায়গায় চার ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখা হ'ল।

যাত্রীদের যদি এমনি শুধু শুধু টাঙ্গিয়ে রাখে "প্যানিক" নামক ব্যামো ত হবেই, কোম্পানীর বদনাম হবে। সঙ্গে সঙ্গে প্লেন নামার সময়ে পরিচারিকা বলছেন, "আমাদের চার ঘণ্টা এথেন্সে থাকতে হবে। বিশেষ কারণে এই বিলম্ব অনিবার্য্য। যাত্রীদের যাতে কষ্ট না হয় সে জন্য এ চার ঘণ্টা তাঁদের একরোপলিস্ দেখিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এয়ার পোর্টের বাইরে বাসে চড়বার জন্য মাত্র পনেরো মিনিট সময় দেওয়া হবে।"

কারুর কাছেই গ্রীসে ঢোকার ছাড়পত্র নেই। তাই শহরের উপকণ্ঠ দিয়ে বাস সোজা একরোপলিসের পাহাড়ে যাবে। সেখানে সব দেখে ফিরে আসবে। সোজা প্লেনে উঠতে হবে। প্লেনে উঠেই লাঞ্চ। পাসপোর্ট, বাড়তি ঘড়ি, ক্যামেরা জমা রেখে যেতে হবে। ক্যামেরা জমা রাখার ব্যাপারে বহু আপত্তি উঠলো। কিন্তু শেষ অবধি লক্ষী ছেলের মত বিনা ক্যামেরাতেই বাস বোঝাই হয়ে গেলো।

পাকিস্থানী রুস্তান সম্প্রদায় এয়ার পোর্টেই রয়ে গেলেন। অষ্ট্রেলিয়ানদের মধ্যে মায়েরা বাচ্চা নিয়ে অনেকে রয়ে গেলেন। এথেন্স দেখবো! গ্রীস!!

"Fair Greece! sad relic of departed worth

Immortal, though no more; though
fallen, great." গ্রীস; সেই গ্রীস।

একরেপোলের পথটা সুন্দর। মাটির চেহারা রুক্ষ! মাটেই তন্দ্রালু নয়। রগরগে রোদ। পথের এক ধারে দূরে দূরে বাড়ী, ক্ষেত, খামার; অন্য ধারে ফলের বাগান। জলপাইয়ের বাগানই বেশী। এতো শ্যামলতা সত্ত্বেও মাটির রুক্ষ ভাবটা রয়েই গেছে। তার কারণ এথেন্স শহরটা কাঁকর ভরা পাহাড়ী রুক্ষতার ওপর গড়ে উঠেছিল আড়াই হাজার বছর আগে। আজ যে এথেন্স শহর বিশ লক্ষ লোকের ভীড়ে, জাহাজের আসা-যাওয়ায় ব্যস্ত, আড়াই হাজার বছর আগে নির্জ্জনতার আস্বাদেই সেখানে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিলো। সে এথেন্স ছিলো পাঁচিল দিয়ে ঘেরা শহর, যেমন ছিলো ট্রয়। নতুন এথেন্স চার মাইল দূরের পাইরিয়াস বন্দর থেকে এই পাঁচিলের বাইরে পর্য্যন্ত গড়ে উঠেছে। পারসিক সম্রাট দারায়ুসের আক্রমণের ফলে সেই প্রাচীন এথেন্সও নেই, তার সে প্রাচীরও নেই।

আমাদের সময় অল্প। বাস সোজা একরোপোল পাহাড়ের তলায় এসে দাঁড়ালো। ওপর অবধি বাস যায়। এখানে খানিকটা ঘুরে দেখা।

একরোপলিস এথেন্সের প্রধান নগরী ছিলো। যখন সিটি ষ্টেটের সংগঠনে গ্রীসের জনসাধারণ অলিগারকী থেকে ডেমক্রাসীর মুক্তিতে নবজন্ম নিচ্ছে তখন এই একরপলিসের মাথায় মন্দিরের পর মন্দির, অট্টালিকার পর অট্টালিকা, নাট্যমঞ্চ, ক্রীড়াঙ্গন সবকিছু তৈরী হয়েছে। ধনরত্ন, ঐশ্বর্য্যসম্ভার সব এই পাহাড়ের চূড়ার প্রধান নগরে এসেছে। গ্রীসের সেই যুগে ফিসিষ্ট্রেটাস্ থেকে পেরিক্লিস পর্য্যন্ত একরোপলিসই গ্রীসের কেন, ভবিষ্যৎ ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণ ছিল।

অনেক সময়ে মনে হয়েছে গ্রীস এমন উৎকর্ষ পেলো কোথা থেকে নিঃসন্দেহ এ দেশের মানুষগুলোর ব্যক্তিগত প্রতিভা, মনীষা, কর্ম্মশক্তি এর মূল কারণ। তবু একথাও সত্য যে, মধ্য-এশিয়া থেকে একটা কৃষ্টি, শিল্প ও মনীষার ধারা ফিনিসীয়, সভ্যতায় প্রবেশ করেছিলো। ব্যাবিলন্, ট্রয় এবং সর্ব্বপ্রধান ক্রীটের কাছে সত্যই হয়তো এথেন্স ঋণী। কিন্তু এই ঋণকে সে কাজে লাগিয়েছে বিস্ময়কর প্রতিভায়।

সেই প্রতিভার তীর্থ এই একরোপলিস্। যতটুকু পথ চলি মনে হয় সেই তীর্থরেণুর সঙ্গে মিতালি হয় যেন। পায়ে পায়ে যেন অতীত দিনের মর্ম্মবাণী বাজে:

Where'er we tread 't is haunted holy ground;
No earth of their is lost in vulgar mould,
But one vast realm of wonder spreads around,
And all the Muse'stales seem truly told.

* * *

Age shakes Athena's Tower, but spares gray
Marathon!

একরোপলিসের প্রধান দ্রষ্টব্য প্রপিলিয়া, ইরেক্‌থিয়ম, এবং পার্থিনন্। দূরে লাইকাবেটাস্ পাহাড়ের চূড়া দেখা যায়। লাইকাবেটাসের ছায়ায়, একরোপলিসের গায়ে ডায়ানোসিয়াসের মন্দির সংলগ্ন প্রতিভাময় রঙ্গমঞ্চ যেখানে সফোক্লীস, ইস্কিলাস্ ইউরিপিডীসের কতো কোরাস্ প্রতিধ্বনি তুলেছে, কতো এণ্টেগনী, ঈডীপাস, এলসেষ্টীস্, ইলেকট্রা অভিনয়-কলায় সহস্র সহস্র নর-নারীকে যুগের পর যুগ হাসিয়েছে, কাঁদিয়েছে। এখানে দাঁড়িয়ে মনে এল ইউরিপিডিস্—A worthy man is not mindful of past injuries. আরও মনে এলো সেই মর্ম্মান্তিক পংক্তিগুলো—"I hate a learned woman. May there never be in my abode a woman knowing more than a woman ought to know."

প্রপিলিয়া আর কিছু নয়, পার্থিননে উঠে যাবার গেট ও সিঁড়ি। আজ সে সৌন্দর্য্যের কিছুই নেই। পার্থিনন দেবী এথিনার মন্দির। তার গৌরব আজও আছে। এথিনার বিখ্যাত ব্রঞ্জের মূর্ত্তি এখানে ছিলো। মিনার্ভা আর এথিনা একই দেবী, বীর্য্য, শৌর্য্য, শিল্পকলার দেবী। ২২৭ ফুট লম্বা, ১০১ ফুট চওড়া এই মন্দির, ফীড়িয়স্ ৪৪২ খ্রীষ্টপূর্ব্বে নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। সুবিখ্যাত "এলগিন মার্ব্বলস্" যা এখান থেকে নেবার সময়ে প্রতিভাবান্ লর্ড এলগিন্ না-বলিয়া-পরের দ্রব্য নেবার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়েছিলেন, এখানকার চমৎকার একটা সম্পদ ছিলো। ভারতবর্ষে মর্ম্মর-স্থাপত্য আমরা অনেক দেখেছি। কিন্তু ডোরিক পদ্ধতির এমন রেখার বৈশিষ্ট্য, সরলতার এমন কমনীয়তা কখনও দেখি নি। ইরেকথিয়মে পোর্ট অব দি মেডেন্স্ দেখবার মতো বস্তু। কিন্তু সেই ভাস্কর্য্য, আর পার্থিননের থামের সারের মধ্যে, ঐ থামগুলোকেই যেন বেশী ভালোবেসেছিলাম।

জিয়ুসের মন্দির দেখে ফিরছি। ম্যুজিয়ম দেখার সময় নেই। পথে, বাসে চড়বার আগে গাইড মহোদয় আবৃত্তি শোনালেন:

Lo, he is fallen, and around great storms
and the outstretching sea!

Therefore, O Man, beware, and look towards
the end of things to be,
The last of sights, the last of days;
and no man's life account as gain
Ere the full tale be finished and the darkness
find him without pain.

Oedipus থেকে বলছে গাইড, প্রফেসর গিলবার্ট মারের অনুবাদ ইংরিজী-জানা টুরিষ্টদের শোনাচ্ছে। মনে হোলো আমাদের দেশের ক'টা গাইড এমন চমৎকার মানসিক পরিপ্রেক্ষিতে এমন রস পরিবেশন করতে পারে।

সক্রেটীস্ প্লাতোর, দেশ, পেরিক্লিস ডেমস্থেনীসের দেশ! চলেছি আবার এয়ার পোর্ট। চার ঘণ্টা শেষ হয় হয়। বাসে উঠেছে সক্রেটিসের কথা। সকলেই উচ্ছ্বাসে গদগদ। আমি শুধু চুপি চুপি একজনকে বললাম, "প্রশংসা আর সাধুবাদ করা একটা ফ্যাশন। এই সাংঘাতিক আত্মপ্রতারণা যখন ফ্যাশন হিসেবে চলন হয়ে যায় তখনই জীবন-বেহালার তার একেবারে ঢিলে হয়ে যায়। মানুষের চরম দুর্গতির দিন তা। মানুষ যেন কোনো কারণেই আত্মসমীক্ষা না হারায়। এককালের মানুষকে আজকে প্রশংসাবাদ করার আগে তাকে বেশ করে বাজাতে হয়। কেন, মানেন না আপনি?"

ভদ্রলোকের সঙ্গে গ্রীক ভাস্কর্য আর এলগিন মারবেল নিয়ে কিছু কিছু কথা হয়েছিলো। একটু বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন,—"কেন? সক্রেটিসেরও পদচ্যুতির দিন আসন্ন নাকি?"

আমি হাসতে হাসতে বললাম, "রাসেল সাহেব কি বলেন জানেন?—এই সক্রেটিসের সম্বন্ধে?"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ভদ্রলোক। গাইড না শুনতে পায়, চুপি চুপি বললাম,—"As a man we believe him admitted to the communion of Saints; but as a philosopher he needs a long residence in a scientific purgatory."

"কেন বলুন তো?" অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন ভদ্রলোক। "বোধহয় মাথাখারাপ। নৈলে নোবেল প্রাইজ পেয়েছে!"

দুজনেই হাসতে থাকি।

এমন বিচিত্র কিছু নয়। এর চেয়ে ভালো ভালো বাড়ী চার্চ আজকাল অনেক দেখা যায়। পার্থিননের মডেল ন্যুইয়র্কের মুজিয়মে গড়ে রাখা হয়েছে। সেটা সম্পূর্ণ এবং সুন্দর। কিন্তু এখানকার ধুলো? মাটী? আকাশ? এই জলপাই ক্ষেত আর এটিকার বাতাস? এর যুগযুগান্তব্যাপী স্মৃতি? এর তীর্থমনতা? এখানে দাঁড়ালে যে কত ভুলে-যাওয়া পথ, হারানো মন, উজ্জ্বল চিন্তার ভাবের কথা মনে আসে তা পাবো কোথায়?

হঠাৎ এথেন্স দেখা হোলো। ভাগ্যের কথা। ক্যামেরা পেলাম না, দুর্ভাগ্যের কথা। আরও মস্তর দুর্ভাগ্য কপালে ছিলো।

তখনও প্লেনের দেরী আছে। প্লেন ছাড়লেই লাঞ্চ পাবো। তবু ওয়েটিং হলে একটু গলা ভেজালাম ঠাণ্ডা এক গ্লাস লেমোনেড পান করে। ওখানেই নানা দর্শনীয় বস্তু সাজানো আছে। কড়ির জোর থাকলে কেনা যায়। আমার যেমন কড়ির জোর ছিলো না তেমনি আবার ওজন বাড়াবার উপায়ও ছিলো না। তাই কিছু পোষ্ট কার্ড বাছা গেলো।

এইবার দাম দিতে হবে।

দিল্লীতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ঘোষমশায় যথেষ্ট সাহায্য করা সত্বেও একটা আশ্বাস দিয়েছিলেন, Rupee is very strong throughout Europe. কাজেই পকেটে ভারতীয় টাকা ছিলো। Traveller's Cheque শুদ্ধ Portfolio-bagটা প্লেনেই ছিলো। ত্রি-সিঙ্গী মার্কা টাকা দিতেই তো শ্রীমতী হেলেনমণির চক্ষুস্থির। বলে, 'No good here', বলে কি? ঘোষমশায় বলেছেন "Rupee very strong"—কিন্তু না—কিছুতেই না। ভীষণ ব্যাপার। বিশুদ্ধ বাংলায় বলি, "দিচ্ছো না, বেশ; কিন্তু পণ্ডিতজী শুনলে কি রাগ করবেন ভেবে দেখেছো কি? আর পণ্ডিতজীর রাগের সঙ্গে তো পরিচিত নও। তাই ত্রি-সিঙ্গীর ছাপকে এতো হেনস্থা।" অবশ্য বাংলা ভাষাও "No good here"—কিন্তু একটি বাঙ্গালী দম্পতী এই প্লেনে মালায়া থেকে এডিনবরা যাচ্ছিলেন। অনেকক্ষণ ধরে মহিলাটিকে দেখে বাঙ্গালী মনে হওয়া সত্বেও কথা বলিনি। এবার তাঁর মুখে বিমলহাস্য দেখে মনে মনে বললাম, "yet it is good somewhere"; এবং উৎসাহভরে বলতে লাগলাম, "আমাদের দেশে এক সিঙ্গীর এতো প্রতাপ ছিলো। ল্যাজ মুমড়ে তাকে ভাগালাম। ল্যাজবিহীন ত্রি-সিঙ্গী তোমাদের এতো অরুচির? বুদ্ধি যদি থাকতো তবে কি আর সাইপ্রাসে এতো ত্রাসে পড়ো। যাক্-গে ছেড়ে দিলাম। এবং পণ্ডিতজীকেও বলবো না। পীসফুল কো-এক্‌জিষ্টেন্স্-মানি আমরা; আমু-ও গাঁধির দেশের ছ্যল; আর তুমিও মামাশ্বশুরের বোনঝি, সাধু সক্রাতুসের দেশ-বালা। পারিবারিক কলহ। মাওফ করে দিলাম।"

পোষ্ট কার্ড না কিনেই প্লেনে চড়লাম। পয়সার একটা

হয়ে হয়ে যেতে পারতো, যদি হাত পেতে নিতে পারতাম। পারিনি। তবে পরিবারটির সঙ্গে কয়েক মিনিটের আলাপ হয়ে গিয়েছিলো।

প্লেনে খানা-খোনা যা চলছে তাতে তর্কালঙ্কার বংশ ধুরন্ধর ভট্টাচার্য নন্দনের উদরাবস্থা তাবৎ ভাগীরথীর পুণ্য-তোয় যেন ভোরের মুর্গীর ডাক ডেকে উঠছে। তা উঠুক। কাণে তালা মেরে বসে আছি। কিন্তু জাত গেলো, পেট যে ভরে না।

ঘন ঘন এসে তরুণী পরিচারিকা রক্তাক্ত অধরে ঝাড়াটে হাসির তরঙ্গ ছুটিয়ে প্রশ্ন করেন, "কেমন আছেন? লজেঞ্জস্ নিন না: গোল্ডফ্লেক। কোল্ড ড্রিঙ্কস্?" ক্রমাগতই 'না' বলে বলেও নিজের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে। নিচ্ছি না, সাহস নেই। কিন্তু 'না' বলার সাহসেরও একটি সীমা আছে। শেষ পর্য্যন্ত একটা ড্রিঙ্কস্ নিয়েই ফেলি। ফলে কি চমৎকার মিথ্যে-হাসির কুজ্ঝটিকা!

খাবার আনলে। কচু! এক চিমটি প্যাঁচমারা রুটী: নস্যির টিপের মতো এক টিপ নুন আর এক টিপ মরিচের গুঁড়ো: তিনটি মোড়কে তিন টিপ চিনি। সাত জন্মের আরকে জমিয়ে রাখা ছাল ছাড়ানো প্যাক্-প্যোঁকে এক আপেলের ফ্যাকাশে মাংস: ছোটো ছোটো কাগজের জাগ, মুখ-আঁটা, লেখা cream, কিন্তু আছে বিচ্ছিরি শুকনো দুধকে আবার গুলে জলীয় করে রাখা: তেতাল্লিশটি ফ্লেকের পাঁপড়ি। একটু জ্যাম আর মাখন। দুটো টাকাকে পর পর রাখলে যতটা পুরু হয় আর তেমনি গোল। তবে হ্যাঁ, কাগজে মোড়া ঝকঝকে ছুরি-কাঁটা একটি রাশ। নানা রকম, নরম, পাৎলা, মোটা, শক্ত: কাগজেরই বাহার। মাংস দিয়ে সসেজ, আর প্লেটে করে আর একটা কি আনলে যেন, বাবারে, গন্ধে প্রাণ যায়! কিন্তু মেমসাহেব বারবার শুধান, "কেমন লাগছে—আরো আনবো নাকি? হেল্প ইয়োরসেল্ফ।" মনে মনে বলি, "পালা, পালা, রাজ্য জয়, মানুষ চোষা আর জোরজুলুম চালাতেই পাঁচশো বছর কাটালে কি আর রান্নাবান্না শেখা যায়?"

রান্নাবান্না হোলো শান্তির সংসারের নিত্য নব আবিষ্কার। বোতাম আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান মনপ্রাণ, বিশেষতঃ উদর না থাকলে কোনো জাত রান্না শেখে? বাঙ্গালীর দেশজয়ের বাতিকও নেই, বদ্‌রান্না খাবার ঝামেলাও নেই। সেরা রান্না তিন দেশের। মেলায় বাংলা। যোগাড় করবে আকাশ-পাতাল, ছুচর-খেচর সব। কিন্তু রান্নাঘর থেকে বেরুবার পর কচুর শাক আর শুশনির ঘন্টও মাৎ করে দেয় অষ্টাঙ্গ আর পোর্কসসেজ কে। বাংলা হোলো শান্তিপ্রিয় ঘুমন্ত জাত। কিন্তু সে ঘুমুতে পারে যতক্ষণ তাকে 'ছার-পোকা' না কামড়ায়। ছারপোকার কামড়ে অকাল-নিদ্রা ভঙ্গ ঘটলে বাংলা কুম্ভকর্ণের মতো জেগে হঠাৎ একটা বিরাট সোরগোল ক'রে, বোমা আছড়ে, গুলি চালিয়ে একটা খণ্ড প্রলয় বাধাবে। তার পর শত্রু নিধন হয়ে গেলো তো আবার ঘুম। এ দেশে রান্না ঘরেই কৃষ্টি, জীবন, তপস্যা। বাংলার রান্নার খোশবয় সর্বত্র। না অমন ছেঁচ্‌কি হয় কোথাও, না অমন রসগোল্লা। দোসরা রান্না কাশ্মীরী। যখন ওদের দেশজয় আর কীর্ত্তিজয়ের বেমারী ছিলো তখনকার রান্নার কোনো হদিস নেই। কিন্তু ললিতাদিত্যের পর থেকে সেই যে ওরা যুদ্ধ করা আর দেশ জয় করা ছাড়লো তার পরে রান্নার তার-ও বাড়তে থাকলো। আজ কাশ্মীরে যেমন মেয়ে-পুরুষের এক পোষাক, তেমনি রান্নাও ওদের এক-বারে ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি। তরিবৎ করে রান্না শেখার সময় পেলো। দেশ দেশ থেকে লোক যাচ্ছে কাশ্মীরী রসোয়ের তারিফ করতে। তেসরা নম্বর মোগলদের রান্না। তা বলে বাবুর বাদশা বা তার লড়ায়ে টাট্টু হুমায়ুঁর সময়কার নয়। ভারতবর্ষের তেলে-জলে মানুষ আকবর মিঞার সময়কার রান্নাও মোগলাই নয়। খানদানী মোগলাই রান্নার জন্য ঘুম দরকার, নৈষ্কর্ম। সিদ্ধির আগের পর্ব নিদ্রা, সাধক মাত্রেই জানে। সুপ-শিল্পের সাধনার প্রধান সোপান নিদ্রা। জহাঁগীর বাদশা থেকে একেবারে ফরুকশায়র—এমন কি ওয়াজেদ-আলি শা পর্যন্ত ধাপে ধাপে নিদ্রালু থেকে নিদ্রালুতর যুগে যেমন যেমন নৈষ্কর্ম বাড়ছে, তদনুপাতে ধাপে ধাপে রান্না, সুপ-শিল্পের তরিবৎও বাড়ছে। ফলে মোগলের স্মৃতি আজ বায়ুভরে দিল্লীর পথের ধূলি পরে খতম হয়ে গেছে সত্য, কিন্তু "ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া"কে বলছে?—মোগলাই রান্না—পিলাও, মুসল্লম্ আর শিক-কাবাব। যদিও ইতিহাসে লেখে না, আমার বিশেষ সন্দেহ, ভারতবর্ষে ইংরেজদের কাছে যে গোঁফ-চোমড়ানো রাজারা এমন কাবু গোঁফ দোমড়ানো হয়ে থাকতো তার একটা কারণ এই টেবল-ষ্ট্রেটেজি। ইংরেজ-রান্না খাবার পর স্রেফ বুদ্ধু হয়ে থাকা ছাড়া বোধ হয় আর অন্ত পথ ছিলো না। "তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যু মেতি, নান্যপন্থা বিদ্যতে"—লেখা চলে একমাত্র লোকান্তরে ব্রহ্ম সম্বন্ধে, আর ইহলোকে ইংরেজী রান্না সম্বন্ধে।

৩

রোমের এয়ার পোর্টে মিঃ···চর থাকার কথা ছিল না ঠিকই। তবু আশা করছিলাম। কিন্তু কেউ নেই।

প্রথমেই একটা বড় রকম বিপদ অনুভব করলাম। ভাষা জানি নে এদের। এরাও বোঝে না। গ্রীসে শিক্ষা হয়ে গিয়েছিলো। এখানে প্রথমেই টাকা বদলে লীরা করে নিলাম। বাব্বাঃ, লীরা যেন নীরা, জল। এ্যলুমিনিয়মের মুদ্রা! যেমন ওজনে হাল্কা, তেমনি দামে। হাজার লীরা যায় একটা খানা খেতে। কড়ি পকেটে করে ভারতবর্ষে ঘোরার মতো আর কি।

কিন্তু রোমে যাই কোথায়?—

অগত্যা মিঃ চ'কে ফোন করলাম। দু'বার দপ্তরে। নেই। বাড়ীতে করি খুবই সন্ত্রস্ত হয়ে।

বাংলায় জবাব এলো। বামাকণ্ঠ। উনি তো আমায় ডাকলেন, আমি যাই কি করে!

ওদিকে কি কিছু ভাববার জো আছে? পোর্টারটা ক্রমাগত "কম্-ভা-পাম-তোয়" করছে। অর্থাৎ বুঝছি তাড়া দিচ্ছে আমার জন্য কোম্পানীর বাস একগাদা লোক শুদ্ধ আটকে আছে।

ওরে তোরা কি বুঝবি আমার মর্মবেদনা। এই দারুণ মরশুমে রোমের মতো পর্যটক-চসা ক্ষেতে আমার মতো আগাছা কোথায় শান্তি পাবে!

বাসে উঠতেই—ও বাব্বাঃ, গেছি—সেই তিরিশ জোড়া চোখ আমায় ভস্ম করে আর কি! কালো আচকানের বোতাম বেশ করে এঁটে জুৎসই হয়ে বসলাম। ভাজা-বোবার শত্রু নাই!!

এ কোথায় নামালি রে বাবা?

হোটেল "কুইরিনামে" অর্থাৎ রাম-হোটেল, বোম্বাই-হোটেল তাজের তাজ! আমার পকেটে লীরাগুলো হাসছে!

পোর্টার একমাত্র সুটকেশটা নিয়েছে। বলিই বা কেমন করে—"নিসনি রে বাপধন, নিস্‌নি। গন্ধ শুঁকে বুঝছিস্ না, আমি সর্বসাকুল্যে একখানি টীচার ছাড়া কিছু নই।"

কিন্তু ওরা তো পাঁড় শুঁকিয়ে। ঠিক বুঝেছে। চাইছে মিটিমিটি।

সন্দেহ হচ্চে ওর।

আমি চলে যাই রিসেপশনিষ্টের দরবারে।

ফোন করবো মশায়। একটা ট্যাক্সি দরকার।

ফোন আর করতে হোলো না। ঘড়েলে ঘড়েল চেনে। ট্যাক্সি নিয়ে চললো আমায়।

সত্যিই, ছোটো বছর বারোর বাঙালী মেয়েটা প্লেনে দাঁড়িয়ে। লিফ্‌ট্ যোগে ওপরে গেলাম। সে অনেক, অনেক ওপরে।

ভদ্র মহিলা একটুও আতিশয্য না দেখিয়ে বললেন, "মুখ-হাত-পা ধোবেন, না স্নান করবেন?"

কাজেই প্রথমেই বলে দিই যে, প্লেনে লাঞ্চ খেয়েছি। একটু স্নান দরকার।

ইনি মনে করেছেন স্বামীর বন্ধু। থাকবো।

দুটোর কোনোটাই নয়।

বন্ধুর দাদার জানাশোনা। ভারতের পররাষ্ট্র বিভাগের একজন অফিসিয়াল। দূতাবাসে রোমে আছেন। তিনি যদি একটা হোটেল দেখে দেন। বাড়ীতে থাকার মতো অন্তরঙ্গতা যেখানে নেই, সেখানে বাড়ীতে থাকলে রঙ্গ-মাটী।

যাক্, স্নানটা সেরে নিয়েছি।

এখানে দিব্যি গরম। পোষাকটাও বদলে নিয়েছি।

"উনি"-ও এসে পড়েছেন।

ও বাব্বাঃ "উনি"র মেজাজ একেবারে যে ভীষণ মার্কার "ক্ষেপচুরিয়াস্"। ডাক্তার চক্রবর্তী এলাহাবাদে প্রায়ই এই শব্দটা ব্যবহার করতেন। বেশ প্রাণভারী শব্দ। আভিধানিক নয়, কিন্তু প্রাঞ্জল। "ক্ষেপচুরিয়াস্!"

আমি অল্পক্ষণের মধ্যে পরিচয় করে নিয়েছিলাম শ্রীমতী চ'র সঙ্গে। ওঁর পিতৃকুলের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, আমার শ্বশুরকুলের সঙ্গে ওঁর। তাই কথাবার্তা বেশ সহজ হয়ে এসেছিলো তো বটেই, অনেক দিন পরে বাড়ীতে বাঙ্গালী পরিচিতকে আপ্যায়ন করায় সরল আকুতিটুকু মিষ্টি লাগছিলো।

কিন্তু মিষ্টি লাগাটা বরাতের জোর। শ্রীযুক্ত চ'য়ের অযথা এমন বাঁকা বাঁকা মানসিক আড়ামোড়ার মধ্যে জানা গেলো, রোমে তিনি বড় বিপন্ন।

—"জানেন মশায়, ভারতবর্ষ থেকে যাঁরাই আসেন, ভাবেন এম্ব্যাসিগুলো যেন বাবুদের রিসেপ্‌শান অফিস। ঘেন্না ধরে গেলো মশায় এই রোম অফিসে এসে। রোজ-না-রোজ কেউ-না-কেউ আসছেই; আর এই ট্যুরিষ্ট-ব্যুরোর খেদমত করতে করতেই গেলাম। থাকতে বলবো কি মশায়, নিজেদেরই চলে না। আবার টেন্-পার্সেণ্ট কাট করার তালে আছেন বাবুরা। এসেছেন তো রোমে, খরচ করে দেখুন, লীরা কেমন হড়হড়ে পদার্থ। এই যে চা খাচ্ছেন, এর এক কাপ দেবার মতো ক্ষমতা আমার থাকার কথা নয়। আগুন মশায়, আগুন! বাড়ী থাকার

প্রশ্ন-ই তো ওঠেই না, এক বেলা স্বস্তিতে খেতে দেবার কথাও ভাবতে হয়।"

হাসিও পাচ্ছিলো; কষ্টও হচ্ছিলো, কারণ দূরে দরজার মধ্য থেকে রান্নাঘরের ভেতরে শ্রীমতীর মুখখানা ঘন ঘন দেখা যাচ্ছিলো। মাঝে মাঝে ফিরে ফিরে শুনছিলেন কথাগুলো। তাঁর মুখের চেহারা দেখে বেশ ব্যথা অনুভব করছিলাম।

এসে বললেন,—"চলো, খাবার দেওয়া হয়েছে।"

শ্রীযুক্ত চ' বললেন, "এই যে উঠি!"

পাশের ঘরে চলে গেলেন, হাত-পা ধোবার জন্য বোধ হয়।

ওই একটু নিরুদ্ধ অবকাশ পাওয়া গেছিলো।

শ্রীমতী এসে বললেন,—"কি, আপনি খাবেন নাকি? দাল রেঁধেছিলাম!"

সে মুখের বর্ণনা দিতে পারবো না।

কিন্তু আমার ক্ষমতা ছিল না যে বলি,—"খাবো না।"

পেট ভরা। লাঞ্চ খেয়েছি ঘণ্টা দুই হবে। তখুনি খাবার খাদো আকুতি নেই। তবু বললাম,—"জানেনই তো, বলেছি লাঞ্চ খেয়ে এসেছি। খাবার একটুও দরকার ছিলো না। কিন্তু তবু খাবো; নিশ্চয় খাবো।"

দু'জনেই হেসে ফেললাম।

"এই যে দাল খাচ্ছেন এর দাম কতো শুনবেন?" পররাষ্ট্র বিভাগ আবার সুরু করলেন।

ভদ্রমহিলা বললেন,—"উনি এসেই বলেছেন হোটেলের কথা। একটা হোটেল ঠিক করে দাও না।"

—"আসলে বিদেশে এসে হোটেলে না থাকলে বিদেশ ঘোরাই হয় না যেন। তাই হোটেলে থাকতে চাই, এবং থাকবোও। ও সাহায্য আপনাকে করতেই হবে যতই খরচ হোক্ তাতে। তা নৈলে কিছুতেই এ বাড়ী ছাড়তাম না। সবাই যখন আপনাকে খরচ করায়, আমিও করাতাম; ছাড়তাম না। পরে গালাগাল দিতেন! বেশ মনে থাকত!"

ভদ্রমহিলা হাসলেন। ভদ্রলোক একটু সহজ হলেন।

হোটেল একটা পেয়ে গেলাম।

ভদ্রলোকের সঙ্গে বিকেলটা একটু বাজার ঘোরা গেলো। তার পর উনি বিদায় নেবার পরই রোমে আমার স্বাধীন জীবন আরম্ভ হোলো।

আমি কিন্তু শ্রীযুক্ত চ'র সঙ্গে কথাবার্তা বলে ঠিক করে নিয়েছিলাম, আসছে কাল অপেরায় যাবো। সবাই মিলে। খরচ আমার। উনি শুধু জায়গা আর বই বেছে আমার হয়ে বুকিংটা করাবেন।

যতদূর মনে হচ্ছে উনি রাজী হয়েও গেলেন।

বিকেলে কোথায় গেলাম? বড়ো ষ্টেশনটা হোটেলের কাছেই। মুসোলিনী এই সেণ্ট্রাল ষ্টেশন করিয়েছিলেন। সত্যিই একটা বিরাট ব্যাপার! ওপরে লাইন, নীচের তলায় লাইন, যতোগুলো এয়ার লাইন আছে, সকলের দপ্তরখানা, বাসের কেন্দ্র। সব একটা বিল্ডিংয়ের ভেতর।

পনের মীটর উঁচু হলটা কাঁচ আর লোহার তৈরী। আলোর কোনো বাধা নেই। হাওড়ায় আলোর অভাবটা খুব বোধ হয়। ভূগর্ভে রেললাইনগুলো যে পথে পাতা তারও বিস্তৃতি বারো মীটার। এই পথ খোঁড়ার সময়ে প্রাচীন রোমের সার্ভিয়ান প্রাচীর আবিষ্কৃত হয়। ষ্টেশনের বাইরে ডান দিকে প্রাচীন শহরের প্রাচীর। রোম তো প্রাচীর ঘেরা শহর ছিলো। লক্ষ্য করার বিষয় যে, রোমের স্থাপত্যের আদি প্রকৃতিটা এথিনীয়।

এথিনীয় সভ্যতার গোড়াপত্তনেই যে তা এশিয়ার কাছে ঋণী, ব্যাপারটা অবিসম্বাদিতসত্য হওয়া সত্ত্বেও ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের গলায় কাঁটা আটকে যায় কথাটা স্বীকার করতে। তাঁদের এই গোঁড়ামি আর বর্ণবৈষম্যের বালাই আজকালকার অনেক চিন্তাশীলের পরিহাসের বিষয়বস্তু।

চেষ্টার বাওয়েলস্ সহজ কথায় পশ্চিমের বিদ্বজ্জনের এই বৈমনস্য সম্বন্ধে লিখেছেন!

Thus when Sam came home from his first day at school in Essex, after our return from India, and announced that next year he was to study World History, I could not resist being sceptical.

"I will make a bet", I said, that the World History which you will study, begins in Egypt and Mesopotamia, moves on to Greece by way of Crete, takes you through Rome and finally ends with France and England.'

আমেরিকার নিজস্ব কোনও প্রাচীনতার দাবি না থাকায় পৃথিবীর ইতিহাস লেখায় আমেরিকান পণ্ডিতের স্পষ্টতা আছে। Will Durant-এর লেখা ইতিহাসে Toynbee-র লেখার আড়ষ্টতা নেই। কিন্তু য়োরোপের পণ্ডিতদের 'পৃথিবী', 'সভ্যতা', 'মানবতা', 'উন্নতি' সবই যেন জেরুজালেম থেকে লণ্ডনের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

রোম দেখতে দেখতে কেবলই মনে হচ্ছিলো যে, এই যে স্থাপত্য, শিল্প, কলা, বিজ্ঞানের পাণ্ডুলিপি পাথরে, রংয়ে, ব্রোঞ্জে আজও পড়া যাচ্ছে এর আদি কোথায়?

এথেন্স ? একরোপোলিস ? ট্রয় ? নিনেভা ? গান্ধার ? মহেঞ্জোদারো ? কোথায়, কোথায় ?

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে। আমি আর শ্রীযুক্ত চ'য়ের অপেক্ষা না করে খাবার টেবিলে বসেছি। বহু যাত্রীর সমাগমে খানাঘর ঝলমল্ করছে। যাত্রী তোলা হোটেল যেন।

বিদেশ ঘুরতে আসা যেন নবযৌবনের লীলার গান। দেশের একঘেয়েমিতে বছর-মাসের মিছিল যেন সার বেঁধে পার হয়ে যায়, ওদের রুখে রাখা হয় দুঃসাধ্য। 'বসন্ত যায় কথায় কথায়'। কিন্তু ঘড়ি যেন থেমে যায় ঘরের ঘাঁটি পেরুলেই। খানাঘরে অনেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়াকে দেখলাম, ব্যর্থ-প্রাণের আবর্জনা কুড়িয়ে আগুন জেলে দিয়ে, জলন্ত শিখার চারধারে আনন্দের নাচ নাচছেন। জীবনকে থামিয়ে রেখে তার জল নিয়ে খেলা করা ; দেখতে বেশ ভালো লাগছিলো।

আমার টেবিলটায় আমি একা। আরও তিনজন বসার জায়গা ছিলো ; 'জন'-ই ছিলো না।

ইতালিয়ানে লেখা মেনু। পড়ে যে হুকুম করবো এ সাধ্য নেই। একটা কাগজে মোটামুটি ইংরেজিতে তিনটে খাদ্য এবং কফি লিখে টেবিলে রেখে দিলাম। হা, হন্ত ! কেউ আসে না।

পরে আছি কালো সার্জের ট্রাউজারের ওপর কালো সার্জের আচকান ! গলার ধার দিয়ে শাদা কলার বেরিয়ে আছে। বোধ হয় ভদ্রগোছের কোনো রোম্যান ক্যাথলিক পাদ্রীর মতো দেখাচ্ছিল। আগামী কাল কর্পাস ক্রাইষ্টি-র উৎসব। মহর্ষি পোপ স্বয়ং ভাষণ দেবেন। পেল্লায় গোছের এক উৎসব—যেন প্রয়াগের মাঘ-মেলা,কাশীতে শিবরাত্রি। বহুদেশ থেকে ক্যাথলিকরা এসেছেন। আমেরিকানই বেশী। বেশের মহিমায় গোলে-হরিবোল হয়ে গিয়েছিলাম।

আমার টেবিলের দিকে একটি বর্ষীয়সী আমেরিকান মহিলা এগিয়ে আসছেন। এতো লম্বা মহিলা, দেখলে আমার প্রথমেই মইয়ের কথা মনে পড়ে। অনেকক্ষণ সমস্ত ঘরটা দেখে তার পর এগিয়েছেন। এসে জিজ্ঞাসা করলেন,—"সীট কি রিজার্ভড ?"

আমি জবাব দিই,—"হ্যাঁ, স্থানহীন বন্ধুদের জন্য। বসুন।" এবং সঙ্গে সঙ্গে বলি,—"কি খাবেন ?"

আলাপ আরম্ভ হয়ে গেলো। কনেক্টিকাট্ থেকে ইউরোপ ভ্রমণে এসেছেন। একটা পুরোদল। আমেরিকা থেকে ট্যুরিষ্ট বাস এসেছে। বাসে করে বন্ধুরা বেড়াতে গেছেন। ওঁর শরীর ভালো ছিল না বলে যান নি। রাতে আবার বাস চলবে। তখন যাবেন। একটু পরে এসে বসলেন তাঁর ধারে আর একটি মহিলা। প্রায় একই বয়েসী। ওজনেও একই হবেন। তবে সমস্ত ওজনটাই খাড়ায়ের দিকে না হয়ে চওড়ায়ের দিকে। অনর্গল হাসতে পারেন। নাম—লম্বায় মিস ম্যাকৃগ্রিগর আর চওড়ায় মিস কে।

মিস কে ছিলেন বলেই খাওয়াটা জুৎসই হোলো। ম্যাকারুণী চিংড়ি দিয়ে আর ইতালিয়ান কফি ! মিস কে অপেরায় যাবেন। মিস ম্যাকৃগ্রিগর আমায় নিমন্ত্রণ করলেন মিস কে'র সীটে রাতের রোম দেখার জন্য— "নটা থেকে বারোটা। বেশ লাগবে। চলুন মিঃ বাতাশারিয়া।

আমি প্রথম একঘণ্টা বাসে চলে যা বুঝলাম তাতে দ্বিতীয় ঘণ্টায় প্রবেশের রুচি আর রইলো না।

বিরাট বাস ষাট জন বসেছে। ষাট জন আমেরিকান মানে দুশো ষাট জন বাতাশারিয়া। তাদের জাঁদরেল চেহারা, জাঁদরেলতরো পোষাক-আশাক। গাইড সামনের সীটে বসে মুখস্থ-করা বক্তৃতা আওড়াচ্ছে। আর গাড়ীর ছাদে লাগানো লাউডস্পীকারের এমপ্লি-ফায়ার থেকে ধাতব-তীক্ষ্ণতায় সেই রস পরিবেশন মর্মদাহ করছে। 'কোথা হা হন্ত চির বসন্ত আমি বসন্তে মরি !' রোমের রোমান্স আমিরিকানায় গেলে।

প্রথম ঘণ্টার শেষে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি রোমের অন্যতম পাহাড়ের মাথায়। এখান থেকে সারা রোম দেখা যায়। রাতের আলোয় ঝলমল্ করছে। জায়গাটার নাম 'ফারো !' পাহাড়ের গায়ে গায়ে বাগানের কেয়ারী। একটা ধার শাদা সিমেন্টের রেলিং গাঁথা। রেলিঙের গায়ে আলো-আঁধারে তরুণ-তরুণীরা প্রায়শঃই জোড় বেঁধে বসে আছে। অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই পরস্পরকে আদরও করছে। গ্যারিবল্ডি আর তাঁর প্রিয়তমা পত্নী আনিতার মূর্তি এইখানে স্থাপনা করেছে রোমান নাগরিক, বর্তমান ইটালির আদি জনক ও ত্রাতা এই জোসেফ গ্যারিবল্ডি। পথে আসার সময়ে দেখে-ছিলাম অনেককটা বস্তু—আলোয় ঝলমল্ করছে ফঁতানা দেলে তার্তারুঘে—অর্থাৎ কাছিমের পিঠের ঝর্ণা। রোমের পথে পথে এমনি ঝর্ণার বাহার অনেক। বিশিষ্ট বিশিষ্ট শিল্পী ঝর্ণার শিল্পে রোম শহরকে রমণীয় করে গেছেন। রাতে এই ঝর্ণার চার ধারে জোড় বেঁধে বেঁধে কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী বসে গাল-গল্প করে। কিন্তু চমক লেগেছিলো গাইডের একটা কথায়। কোর্সোর মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। সেন্টপীটার রোমের বৃহত্তম গির্জা।

উ...জটাও বৃহত্তম। কিন্তু তার পরেই বৃহত্তম গম্বুজ চেইজা দ আঁন্দ্রা দেলা ভালে'র গির্জা। আলোয় উদ্ভাসিত। সে এমন কিছু নয়! এ সময়ে পর্যটকদের মনোরঞ্জন করার জন্ত রোম কর্পোরেশন সমস্ত দ্রষ্টব্য বিল্ডিং আলোয় সাজিয়ে রাখার ব্যবস্থা করে থাকেন। কিন্তু গাইড বললো, "এই গির্জ্জার পেছনেই ছিলো 'তিয়াত্রো-দ্য-পঁপিও' যেখানে জুলিয়স সীজরকে হত্যা করা হয় খ্রীষ্ট জন্মের ৪৪ বছর আগে। সেটা মার্চ্চ মাস। লোকে তাঁকে সাবধান করেছে। পত্নী যেতে নিষেধ করেছে। কিন্তু নিয়তির বিধান। সীজর গেলেন। আর শিক্ষিত, ভদ্র, প্রতিভাবান বাগ্মী এবং যোদ্ধারা, সীজরের একদা প্রিয়পাত্রেরা তাঁকে হত্যা করলো! রোমের ইতিহাসের সেই পাপ রোমকে তিলে তিলে শোধ করতে হয়েছিলো। পরে ফোরামে রোম্যানরা সীজারের মন্দির তৈরি করে সীজরকে 'দেবতা' বলে পূজা করেছে। কিন্তু তবু ইতিহাস সেই নির্মম দিনকে ধরে রেখেছে উচ্চাশার ও ব্যক্তিগত চিন্তার বিষে সমষ্টিগত চেতনাকে হত্যা করার আশ্চর্য কালো একটা অধ্যায় হিসেবে।"

আর মনে আছে একটা ওক্ গাছ। বলে তাসোর-ওক্ গাছ। পিয়াৎসা ফার্নিস্ একটি প্রাসাদ। রোমের বহু প্রাসাদের মতো সাজানো। মিকেলেঞ্জেলো, ভিট্রনোলা, দালাপোর্তা—সকলেরই কাজ আছে। দরজার আকৃতি দেখলে কলসিয়মের প্রকৃতি মনে পড়ে যায়। ভিয়া-মার্গা দিয়ে বাস এসেছে পিয়াৎসা-দেল কাম্পোতে। আজ এখানে জনকোলাহল, আনন্দ, উচ্ছলতা। একদিন এখানে মেষপালকরা গরু চরাতো। সেদিনও ভীড় হয়েছিলো। সে অনেক দিন আগে। সেটা ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ। ক্যাথলিক চার্চে তখন ইনকুইজিশনের ঘোরতর প্রতাপ। এক যুবক সন্ন্যাসী, নাম তার গিওর্দানো ব্রুনো। পনেরো বছর বয়স থেকে সন্ন্যাস নিয়ে সে সত্যের সাধনা করেছে। সে দেখেছে জ্যোতির্বিদ্যার সত্য রূপ। 'চলা পৃথ্বী স্থিরা ভাতি'—কপার্নিকাসের জ্যোতির্বিদ্যার রশ্মিতে তার চিত্ত উদ্ভাসিত। সে বলছে পৃথিবীই চলছে, সূর্য্য স্থির। সে দর্শনতত্ত্বে মানুষের সত্য মূল্য খুঁজে পেয়েছে। বাইবেলের পরিপন্থী সে সব সত্যভাষণ। চার্চ তাকে ধর্ম-দ্রোহী বলে বিচার করবে। কিছুদিন পালিয়ে ছিলো। কিন্তু স্বদেশের মায়ায় পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে আবার ফেরে। ফিরতেই, বন্দীদশায় কাটায় সাত বছর। তার পর যূপকাষ্ঠে বেঁধে তাকে জ্বালানো হয় ধর্মের নামে। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীর সতেরো তারিখে এই মেষ-চরানো প্রান্তরে সেদিন সারা রোম ভেঙে পড়েছিলো বাহান্ন বৎসরের সত্যাশ্রয়ীর দাহ-উৎসব চাক্ষুষ করতে। এইখানে, এই পিয়াৎসা-দেল-কাম্পোতে। ফার্নেস প্যালেস, চানসেলেরিয়া প্যালেস্ সবই সুন্দর, ভালো। কিন্তু সান্তোনো-ফ্রিওতে যেই তাসোর কথা শুনলাম, মনে পড়ে গেলো 'জেরুজালেম লিবারেটেডে'র ভাগ্যহীন লেখকের কথা। এইখানে এই ওকের তলায় বসে তাঁর বিভ্রান্ত দিনগুলো তিনি কাটিয়েছেন। তর্কুয়াতো তাসো উনপঞ্চাশ বছর বয়সে ১৫৯৫-তে মারা যান। ওক্ গাছ কি না জানি না, সেই ওক্ গাছ কি না তাও জানি না। কিন্তু তীর্থ বলে জানি। স্মৃতি বলে মানি।

Peace to Tarquato's injured shade,
In life and death to be the mark where wrong
Aim'd with her poisoned arrows,—but to miss.
Oh victor unsurpassed in modern song!

বাস ফন্তানা পাওলা হয়ে চলেছে। আমি বাসে উঠছি না দেখে মাকৃগ্রিগর ডাকে,—"এসো বাতাশারিয়া,এসো।"

আমি হাসি।

বুড়ী এগিয়ে আসে।

—"যাবে না?"

—"না। বড় ভীড়। ভালো লাগছে না।"

—"একা নতুন শহরে এই রাতে কি করবে?"

—"ঘুরবো।"

—"হারাবে না?"

—"হারিয়েই তো আছি। ছ' সাত হাজার মাইল দূরে আছি। না হারিয়ে কি আর আছি? এদেশের কুঠীতে ফিরে যেতে কষ্ট হলেও আপন দেশে ঠিক ফিরতে পারবো।"

—"এমনি যদি বলতে পারতাম আমরা—মানুষের জগতে পথ ভুললেও আসল যেখানে যাবার তার পথ ভুলবো না। দাঁড়াও, ওদের বলে আসি। আমিও তোমার সঙ্গ ধরি। ভীড় হবে না তো?"

—"একা থাকার মতো ভীড় নেই। দু'জন হলেই সত্যি একা হওয়া যায়।"

সত্যিই ভালো লেগেছিলো সে রাতে মাকৃগ্রিগরের সঙ্গে ঘোরা।

বিদেশে অচিন দেশে পায়ে হেঁটে ঘোরার মতো তত্ত্ব নেই। বুকে না জড়াতে পেলে প্রেম যেমন ফোগলা হয়ে থাকে, পায়ে না জড়াতে পেলে দেশ তেমনি দূরেই থেকে যায়।

প্রশস্ত আলোকিত পথ। যারা ঘোরাফেরা করছে

বেশীর ভাগই ইতালিয়ান। অনেকেই ইতালির এদিক-ওদিক থেকে এসেছে ; আবার রোমের নাগরিকও যথেষ্ট। বেলা চারটেয় পিয়াৎসা এসেড্রার চত্বরে মিঃ চ-কে নিয়ে যখন ঘুরেছি তখন একটা মোটামুটি ব্যবসায়িক সরগরম নগর দেখেছি। আবহাওয়াটা কলকাতার আশ্বিনের প্রথম দিকটা। মোটা জামা-কাপড় পরা যায় না, ঘাম হয় ; পাৎলায় বেশ ভালো লাগে। ধুলো, ভীড় আর কর্মব্যস্ততা। সেই পথের মোড়ে মোড়ে খবরের কাগজের দোকান। বেশীর ভাগ দোকানই কোনো বুড়ী ইতালিয়ান চালাচ্ছে। অঢেল ফুটপাথ, থামে-ছাতে ঢাকা। পিয়াৎসা এসেড্রার তিন ধারে চক্রাকারে এমনি দোকান। দোকান ঘরে ভীড় নেই। ফুটপাথ আর ফুটপাথের বাইরে পথের ওপরে দড়ি ঘেরা ও ছোটো ছোটো বেতের টেবিল আর চেয়ার কাতারে কাতারে পাতা। জল ছিটিয়ে পরিষ্কার করে টেবিল-চেয়ার পাতা হচ্ছে। দু'চার জন বসে কফি খাচ্ছে। তবে ততো ভীড় নেই।

কিন্তু রাতে ভোল একেবারে পাল্টে গেছে। এগারোটার কাছাকছি। সুন্দর, নরম, ঝিরঝিরে বাতাস দিচ্ছে। শত শত লোক, প্রায় প্রত্যেকে বন্ধু বা বান্ধবী বা আরও নিকটের কারুকে সঙ্গে করে, কেউ চলেছে, কেউ বসেছে, কেউ নাচছে, কেউ গাইছে, কেউ আইস-ক্রীম খাচ্ছে। এ যেন সেই চারটের শহরই নয়।

ত্রেভীর নির্ঝরের ধারে এসেছি—হাঁটতে হাঁটতে। 'থ্রী কয়েনস্ ইন্ দি ফাউণ্টেন্' চলচ্চিত্রের দৌলতে ত্রেভীর নামডাক খুব। এতো আলো যে, যদিও ক্যামেরায় ছবিটা একদম ভালো উঠলো না তবুও উঠলো। বহু জনসমাগম। অনেক আনন্দ, অনেক উচ্ছলতা। —সারা ইতালিতে ত্রেভীর জলের মতো নাকি জল নেই। সম্রাট আর পোপেরা এই জল খেতেন।

ফিরছি ত্রেভীর নির্ঝরের ধার দিয়ে।

ম্যাকগ্রিগর লম্বা মেয়ে। খুব জোর হাঁটতে পারে না, হঠাৎ ভিয়া দেন্ ক্রচিফেরি ধরে এসে পড়েছি চার্চ অব সেণ্ট মারিয়াতে।

রোমের চার্চ আর কাশীর শিবমন্দির এর বোধ হয় সংখ্যা গণনা করা যায় না। যে কোনো অট্টালিকার সংলগ্ন একটি করে উপাসনার মন্দির তো আছেই, তা ছাড়াও প্রাচীন রোমকদের প্রসিদ্ধ যে সব প্রাসাদ, রঙ্গালয় স্নানাগার ছিলো, রোম খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করার পর, রোমে পোপা, পাপা বা ধর্মপিতার থাকবার প্রধান স্থান হবার পর থেকে সেই সব প্রসিদ্ধ স্থান চার্চে রূপান্তরিত হয়েছিলো।' এমন কি, বহু প্রসিদ্ধ ইমারতের স্মৃতিস্তম্ভ পাথর, থাম, সিঁড়ি, রেলিং, এমন কি কার্ণিস আর ছাদ খুলে নিয়ে পোপেদের প্রাসাদ বা গির্জা তৈরি করা হয়েছিলো ? কলসিয়মের পাথর-খোলা এই সেদিন বন্ধ হয়েছে। রোম্যান ফোরামের, কাপিটলের, পালাটিনের বড় বড় প্রাসাদের পাথর এই ভাবে স্থানান্তরিত বা অন্তর্হিত হয়েছে।

তাই রোমে গলিতে গলিতে গির্জা, পথে পথে নির্ঝর। রোম যে প্রাচীন শহর, দেখলেই মালুম হয়। পুরাকালের বহু প্রাসাদ ব্যবহারযোগ্য ভাবে আজও আছে, আজও ব্যবহৃত হচ্ছে রোমে। আমার চোখে এ ব্যাপারটা বেশী করে লাগলো, কেন না, আমি দেখেছি দিল্লীর প্রাচীন ইমারতের অবস্থা ও তার বর্তমান ব্যবহার।

ভিয়া দেন্ এচিফেরি ধরে এসে পড়েছি চার্চ অব সেণ্ট মেরিয়াতে। বাইরে থেকে দেখতে এমন কিছু নয়। ম্যাকগ্রিগর চার্চটা দেখেই ভেতরে ঢুকলো। ও রোম্যান ক্যাথলিক। সমস্ত ভেতরটা ছবিতে, মূর্তিতে সাজানো। বসে খানিক মালা জপ করে ফিরে আসছে। সামনে মারিয়ার কোমল মূর্তি ঢলঢল করছে। দেখলে একটা শান্তভাব আসে।

ম্যাকগ্রিগরের নয়ন সজল। আমায় বললে,—"তুমি তো হিন্দু। মূর্তিপূজা বিশ্বাস করো। এই মূর্তির গল্প শোনাই।

পথে আলো। আইসক্রীম বেচছে। লোকে ভিক্ষাও করছে। খালি খালি মেয়েরা ঘুরছে, যদি রাতের সঙ্গী পায়। একটা ঝর্ণার ধারে ম্যাণ্ডোলিন বাজিয়ে একটি অন্ধ গান গাইছিলো। অনেকটা ইমন কল্যাণের সুর। তার উল্টানো টুপীতে পয়সা জমেছিলো ঢের।

ভিয়া সেণ্ট মারিয়া ছেড়ে ভিয়া দে ত্রিতোন-এর প্রশস্ত পথ মিশেছে গিয়ে পালাৎসো চিগি। গল্প শুনছি : কার্ডিনাল পিয়েত্রো কাপোচি-র প্রাসাদে একটা কুয়া ছিলো। রাতে কুয়ার জল ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। কুয়াটা ছিলো আস্তাবলে। জল ব্যবহার করা হোত ঘোড়াদের জন্য। আস্তাবলের লোকেরা কুয়ার ভেতরে অদ্ভুত শব্দ শুনে দৌড়ে ঘটনা দেখতে এসে অবাক। ঘোড়াগুলোও অদ্ভুতভাবে চীৎকার করতে থাকে। জল আর থামতে চায় না। জল একেবারে কানায় কানায় ভসে উঠেছে। আর তার ওপরে ভাসছে একখানা পাথর। পাথরের উপর বসে মারিয়ার মর্মর-মূর্তি। ওরা যতই সেই পাথর ধরতে যায়, জল কেবল নেমে যায় ; ধরতে পারে না। অবশেষে কার্ডিনালকে ডাকা হয়। কার্ডিনাল স্বয়ং এসে এই মর্মরমূর্তিকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। জলও নেমে যায়।

ধর্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত। মূর্তিপূজাই শুধু নয়, স্বপ্ন, স্বপ্নাদেশ, জলে পাথরের মূর্তি ভাসা, সবই আছে, সে সম্বন্ধে বিশ্বাসও আছে। আসল কথাই বিশ্বাস। বিশ্বাসই মত্ততা, বিশ্বাসই আনন্দ—কৃষ্ণে বিশ্বাস, খ্রীষ্টে বিশ্বাস, হিটলারে বিশ্বাস বা মার্ক্সে বিশ্বাস—আসল কথা, তর্ক-বুদ্ধির মৃত্যু যেখানে, সেই শ্মশানের ফুল বিশ্বাস।

পালাৎসো চিঘি মস্ত বড় প্রাসাদ। বহু খানা-পিনার মোচ্ছব হয়েছে এখানে। এর জানালা দেখিয়ে লোকেরা বলে, ধনীদের খাদ্যাবশিষ্ট এখান থেকে ছুঁড়ে নিচে ফেলে দিয়ে ধনীকন্যারা মজা দেখতেন বুভুক্ষু জনতা কেমন দৌড়ে আসতো খাদ্য লুট করে খাবার জন্য। আমরা যেমন জলে খই ছড়িয়ে মাছের লোলুপতা দেখে তৃপ্ত হই। মানুষদের বেলায় আরও উপভোগ্য হোতো যখন ক্ষুধার্ত কুকুরের সঙ্গে কামড়া-কামড়ি বেধে যেতো।

একটু এগিয়ে সাইনবোর্ডে লেখা দেখি, "কাফে গিগ্লিও"। এই কাফে ইতিহাস প্রসিদ্ধ—গ্যারিবল্ডি, ম্যাটসিনী, কভুরের সময়ে ইতালির বহু দেশসেবক এই কাফেতে বসে রাজনীতির প্রথম পাঠ পেয়েছে, সস্তা কফির পাত্রের আবডালে। পিয়াৎসা কলোনায় প্রসিদ্ধ মার্কাস অরেলিয়াসের স্মৃতিস্তম্ভ আলোয় ঝলমল্ করছে। এই কলোনায় চারধারে বড়ো বড়ো প্রাসাদ। প্রথমেই চোখে পড়ে প্রেস এ্যাসোসিয়শনের বিরাট ইমারত। এককালে এটা পোপের ডাকঘর ছিল। ষোলোটা সুদৃশ্য মর্মরের স্তম্ভই ভিইওর পুরোনো মন্দির থেকে খুলে এখানে 'কাজে' লাগানো হয়েছে। একধারে পালাৎসো সিয়েরা কলোনা, অন্যধারে পিয়াৎসা-দেলা-পিয়েত্রা। আজ তা ষ্টক্ এক্স্চেঞ্জ। এককালে রোমের মুখ্য দেবতা নেপচুনের মন্দির ছিলো এখানে।

কিন্তু বিশেষ করে এ জায়গায়টায় এসে ভালো লাগছিলো। এখানে মন অনেকটা সাঁতার কাটতে পারছিলো ইতিহাসের সমুদ্রে। এই ভিয়া-দেলা-পেত্রার একটা বাড়ীতে এককালে দেশী-বিদেশী মহা মহা ধনুর্দ্ধর কল্যাণকৎরা বাস করেছেন। ম্যাটসিনি, মোমজেন, গ্যারিবল্ডি, স্তেঁদল, গ্রেগোরোভিয়স্—তাদের মধ্যে সেরা নাম। ম্যাক্‌গ্রিগর এর মধ্যে অনেককেই জানতেন না। পরিচয় করালাম ধীরে ধীরে, কিন্তু কথা বলতে ভালো লাগছিলো না।

রাতও গভীর তখন। একটা বেজে গেছে। পথে ভীড় তা বলে একটুও কমে নি। গলা-খোলা শার্ট গায়ে দিয়ে তরুণীর হাত ধরে গান গাইতে গাইতে যৌবনিত জীবন বয়ে চলেছে। ম্যাক্‌গ্রিগর আমার হাত ধরেছে। আমি বিনা আপত্তিতে ওর হাত ধরে চলেছি। জীবন-মদিরার নেশা বাতাসের নিঃশ্বাসে ছড়িয়ে পড়ে তন্দ্রালু স্নায়ুকোষে।

—"আমরা হোটেল থেকে কতো দূরে?"

—"কেন? কষ্ট হচ্ছে আপনার? ট্যাক্সি ডাকবো?"

ম্যাক্‌গ্রিগর আমার দিকে চেয়ে হাসলো।

হঠাৎ মনে হোলো ম্যাক্‌গ্রিগর খুব ছোটো মেয়ে। তরুণী। তার চোখে একটা নরম আনন্দের লোভ।

—"কনেকটিকটের ফার্মেও হাঁটতে এতো সুন্দর লাগে না। কতো কম আমরা হাঁটি যদি ভাবি, মনে হয় হেঁটে বেড়ানো যেন এক ধরনের স্বাধীনতা। আমি ভাবছিলাম এ কয়দিন হাঁটা যাক। পায়ে বেড়িয়ে না দেখলে দেশ দেখার আনন্দ নেই।"

—"আমি তাই নতুন দেশে গিয়ে একা একা থাকতে ভালোবাসি। যেন গোপনে গোপনে প্রথম-দেখা। অনেক অল্পে অনেক বেশী কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই।"

—"তুমি কবি!"

"ও আমার গালাগাল!"

"লেখো বুঝি?"

আমি আর কথা বাড়তে দিই না।

পাবলিক স্কুল, লাইব্রেরি—আর এথ্নোগ্রাফিক্ এবং এষ্ট্রোনমিক ম্যুজিয়ামের ধার দিয়ে রোমের বড়ো ব্যাঙ্কের কাছে এসে পড়লাম। এই ব্যাঙ্কের বাড়ীতে এককালে ফ্রাঁসোয়া রেনেশাতো ব্রাঁ থাকতেন,রোমে নেপোলিয়নের রাজনৈতিক প্রতিনিধি হিসেবে।

এখান থেকে পিয়াৎসা ভেনেৎসিয়া বেশী দূর নয়। প্রশস্ত চত্বরের মতো জায়গাটার চার ধারে বড়ো বড়ো পথ। মাঝখানটায় বাঁধানো। দেখলে মনে হয় যেন রেস কোর্স। শুনলাম প্রাচীনকালে রথের-রেস হোতো এখানে, পরে ঘোড়ার রেস। কিন্তু কোণের বিরাট প্রাসাদটায় নেপোলিয়নের মা মাদাম লেতিসিয়া থাকতেন এবং এখানেই ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারা যান শুনে খানিক দাঁড়ালাম।

পিয়াৎসা ভেনিসিয়া থেকে হোটেল বেশী দূরে নয়। মিনিট পনেরোর মধ্যে ফিরে প্রথমেই বারে গেলাম। দু'জনেই বোতলে বন্ধ দুধ এক এক বোতল খেয়ে রাতের মতো বিদায় নিলাম। কাল সাড়ে নটায় ট্যুরিষ্টদের বাস আবার রওনা হবে। জিজ্ঞাসা করলাম না ম্যাক্‌গ্রিগরকে কালও সে আমার সঙ্গে যাবে কি না।

ক্রমশঃ

পরিবর্তন

পটল বাবুর মেস। অনেকেই সেখানে থাকে। আমি থাকি, বিজয় থাকে, ভোলাও থাকে। আমরা এক ঘরেই থাকি। বিজয়, ভোলা চাকুরী করে। আমি বেকার। বেকার আমি তিন বছর। টিউশনিতে পেট চলে। সন্ধ্যে সকাল চক্রবর্ত্তী বাবুর ছেলেমেয়েদের পড়াই। গোটা চল্লিশেক টাকা মাসে হাতে আসে। ওরই ভেতর থাকা, খাওয়া, কাপড়-চোপড়, পান, চা সবকিছু। কষ্ট করেই চলতে হয়। সকালে চায়ের নেশা। শুধু এক কাপ চা। দোকানটা একটু দূরে। ভুবনেশ্বর মটর ষ্ট্যাণ্ডটার কাছে। মেস থেকে কিছুটা পথ হাঁটতে হয়।

সোজাই হাঁটতে হয়। একটা মোড়। চৌরাস্তার মিতালি। কোণের বটগাছটার তলায় দাঁড়িয়ে সরকারী পুলিশ ট্রাফিক কন্ট্রোল করে। তারপর বাঁ দিকে ঘুরতে হয়। ঘুরতেই দোকানটা, তেমন বড় নয়। আবার একেবারে ছোটও নয়। চালু চায়ের দোকান। তবে সাইন বোর্ড নেই। ভাজাভুজি, মিষ্টি, জলখাবার সবই পাওয়া যায়। বরাবরই এখানে আমি এক কাপ চায়ের খদ্দের। এর ওপরে এগুবার সাধ্যি আমার নেই। আর ভাগ্যি জোরে এগুলে বড় জোড় একটা চালু সিঙ্গারা নয়ত জিলিপি পর্য্যন্ত। তবে রোজই যাই।

পয়সা জুটলে কোন কোন দিন বিকেলের দিকেও এক একবার ঢু মারি। দোকানের মালিক রঘুনাথ সরকার। বাঙালী। মহাজন টাইপের লোক। রোজ সকালে তাঁর সাদর অভ্যর্থনা। আরে আসুন, আসুন, আপনাদেরই দোকান। ওরে টেঁপা, বাবুর জন্য এক কাপ চা নিয়ে যায়। ... টেঁপাও হাঁক ছাড়ে, 'এক চালু......'

ঐ চালু চায়ের খদ্দের সেজে মিনিট পাঁচেক ইলেকট্রিক পাখার ঠাণ্ডা হাওয়া খায়। সেই সাথে রোজকার ইংরিজি কাগজটাতেও চোখ বুলোয়। কাগজের অন্য খবরে আমার বিশেষ প্রয়োজন থাকে না। শুধু সিচুয়েশন 'ভ্যাকেন্ট'র কলমটাই দেখি। রোজই দেখি। এ কলমের প্রতিটি লাইন মন দিয়ে পড়ি। খালি চাকুরীর খবর চটপট টুকে রাখি। তারপর মেসে ফিরে পিটিশন ঠুকি, ঐ পর্য্যন্তই। বিজ্ঞাপনদাতারা দয়া করেও কোনদিন খবর দেন না। তবু পত্রিকা দেখি, চাকুরী খালির খবর পড়ি। রোজই পিটিশন ঠুকি, দিনগুলো কোনমতে কেটে চলে।...

বছর খানেক হয়ে গেছে, একটা চাকুরী পেয়েছি। তা-ও কিন্তু ঐ দোকানটার পত্রিকারই সৌজন্যে, কেরানীর চাকুরী। ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট আপিসে দশটা পাঁচটা কলম পেশার কাজ। মন্দ নয়। মাইনে একশো পাঁচ টাকা। এখনও পটল বাবুর মেসে থাকি, তবে চায়ের দোকানটাতে আর যাওয়া হয় না, চালু চা সিঙ্গাড়ার স্বাদও প্রায় ভুলতে বসেছি।...বেকার জীবনের রোজনামচাটা চোখের সামনে ভেসে উঠছে। রোজকার সেই এক কাপ চা, সরকার মশাইয়ের চায়ের দোকানটা, টেঁপার হাঁকডাক সবই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো।

পুরোনো দিনের স্মৃতিসব, ভুলবার নয়, ভুলতে আমি চাইও না। রোববার সকালে গেলাম দোকানটায়। বটতলা পেড়িয়ে মোড় ঘুরতেই দোকানটা দেখা যাচ্ছে। সরকার মশাই ক্যাশে বসে আছেন। আমায় দেখতে পেয়েই একেবারে ছুটে এলেন, আদর করে ভেতরে নিয়ে বসালেন। মনে হলো পুরোনো গ্রাহকটিকে পেয়ে তিনি খুশীই হয়েছেন। কাপড়-চোপড়ের চেহারা দেখেই অবশ্য আন্দাজ করেছিলেন আজকাল কিছু একটা করছি।... আগের মতো আজও হুকুম হলো, 'ওরে টেঁপা, বাবুর জন্য এক কাপ চা, দুটো সিঙ্গাড়া, চালু নয় স্পেশাল। গরম জলদি।'

স্পেশাল? বোধগম্য হলো না, হঠাৎ যেন একটা পরিবর্ত্তন মনে হচ্ছে, জীবনভোর চালু চা সিঙ্গাড়া খেয়েছি। আজকে হঠাৎ স্পেশাল কথাটা শুনে একটু অবাক হলাম। ...স্পেশাল চা সিঙ্গাড়া এলো, সত্যিই স্পেশাল! অপূর্ব চা! সিঙ্গাড়া দুটোও বেশ বড় সাইজের। খেতে চমৎকার লাগছে, চালু জীবনে প্রথম স্পেশালের আস্বাদ! আগেও কয়েকবার সিঙ্গাড়া এ দোকানে খেয়েছি, তবে স্পেশাল নয়। জিজ্ঞেস করে জানলাম স্পেশাল সিঙ্গাড়া 'ডালডা'য় ভাজা! 'সরকার মশাই তা'হলে 'ডালডা'র ভক্ত।' কথাটা মুখ থেকে লুফে নিয়ে সরকার মশাই শুরু করলেন —'ভক্ত কি মশাই, সাধক বলুন। নিজেইতো দেখেছেন 'ডালডা'য় ভাজাতে সিঙ্গাড়ার স্বাদ কি চমৎকার হয়েছে।'

কথা পেলে আর যাবে কোথায়, সরকার মশাইয়ের চিরাচরিত স্বভাব। 'আমার বাড়ীর সব রান্নাই 'ডালডা'তে হয়। আর গুণের তুলনায় দামেও খুব সস্তা।

কি না'—এক নজর বপুটার দিকে তাকিয়ে নেন রঘুনাথ সরকার। 'এমন জিনিষ আর হয় না।' সরকার মশাই বোধ হয় থামবেন না। বাধা দিলাম না। ছুটীর দিন। তেমন তাড়া নেই। তবু এবার ফেরা দরকার। নইলে হয়ত চায়ের আবার জল পাবো না! 'সব সময় সিলকরা টিনে। ধুলো ময়লা ভেজালে ভয় নেই। তারপর এর প্রতি আউন্সে কোম্পানীর লোকেরা ৭০০ ইণ্টারন্যাশনাল ইউনিট ভিটামিন 'এ' এবং ৫৬ ইণ্টারন্যাশনাল ইউনিট ভিটামিন 'ডি' জুড়ে দেয়।' এবার কিন্তু কথার মাঝে কথা বলতে হলো। 'ডালডা'তো আমি খারাপ বলিনি সরকার মশাই।'

সরকার মশাই মুহূর্ত্তের জন্য থমকে গেলেন। 'ওহো, তা হ'লে আপনিও 'ডালডা'র ভক্ত বলুন, একা আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছেন কেন!' হোঃ হোঃ হোঃ অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন রঘুনাথ সরকার। ভাবখানা একেবারে যেন যুদ্ধ জিতে এলেন। আমাকেও হাসতে হলো, সরকার মশাই এখনও ওদের আমার অবস্থা বুঝতে পারেন নি। মেসের হাল হকিকৎ তাঁর জানা নেই। পাঁচুর রাঁধা ডালের কথা মনে হলে, চোখ দুটো ছলছলিয়ে ওঠে। শুধু এক বাটি জল, ডালও নয়। গামছা দিয়ে ছাঁকলেও হয়ত ডালের দানা পর্য্যন্ত পাওয়া যাবে না।···

যাক্‌গে সে কথা। পাঁচুরও দোষ নয়। দোষ আমাদের ভাগ্যের। চোখের ওপর কত পরিবর্ত্তন দেখছি। পথ-ঘাট, ঘর-দোর, লোকজন সবই পাল্টাচ্ছে। সরকার মশাইয়ের দোকানটারও পরিবর্ত্তন হয়েছে। আমাদের এই একঘেয়ে জীবনটাতে কি পরিবর্ত্তন আসবে না?

এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া ভার।···

স্পেশাল চা সিঙ্গাড়ার দাম চুকিয়ে মেসের পথ ধরলাম। ধীরে ধীরে দোকানটা বটগাছের আড়ালে চলে যাচ্ছে। মোড় ঘুরলাম, এবার সোজা পথ। একটু পরেই পৌঁছে যাবো. মাথায় আজ নানা চিন্তা উঁকি মারছে···আশায় আছি, একদিন এ মেস জীবনেও পরিবর্ত্তন আসবে, হয়ত আমাদের মেসের খাবারও 'ডালডা'তেই রান্না হবে।··· P

অসমাপ্ত ডাইরী। আজ এইখানেই শেষ করি···

রবীন্দ্র বৈজয়ন্তী

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

"I am the eye with which the universe beholds itself
and knows itself divine—" P. B. Shelley

অধরে অমৃত বহ্নি বক্ষে তব পূত অশ্বমেধ
বেদবিদ্যা রসনাগ্রে চিত্ত তবু নিতান্ত নির্বেদ
কণ্ঠে তব বীণাপাণি বীণাখানি বাঁধিল মধুর
চক্ষে দৃষ্টি অভিনব তাহে নব বালিকাবধূর
লাজনম্রমধুরিমা ; কী মহিমা মিলাইল বিধি
তিলে তিলে তিলোত্তম মন্থনিয়া অমৃত বারিধি
পাঠাইল পূর্ণ করি ধরিত্রীর শূন্য ক্রোড়খানি
কালিদাস সেক্সপীর বিরহ পীড়িত। নাহি জানি
অলৌকিক অপূর্ব চরিত, পুষ্পাঘাতে জর্জরিত
বক্ষে তবু নাহি ভয় মনে হয় অতি অশঙ্কিত।
চিত্তময় চিত্রকলা প্রাণময়গান, তব দান
ভারতীর তীর্থতপোবনে, বিরচিল সুমহান
সুরম্য নির্মাণ মহার্ঘ মর্মর বেদী। তব স্পর্শে
মঞ্জরিত কাব্যকল্পলতা শাহু সফলতা হর্ষে
মকরন্দভরা, নিরন্তর ভ্রমর গুঞ্জন তাহে
শ্রবণ রঞ্জন সুখে বারম্বার চিত্ত অবগাহে ॥

বরষি কিরণরাশি হৃদয়ের অরবিন্দদলে
হে রবীন্দ্র ! তুমি আসি মিলাইলে অপূর্ব কৌশলে
ধরাসনে অমরারে, প্রাচীসহ প্রতীচীরে আর
ব্রজভূমে মাধুকরী করি পূর্ণ অমৃতসম্ভার
বিলাইলে ভানুসিংহরূপে। 'প্রভাত সঙ্গীত' তব
'নির্ঝরের স্বপ্ন ভাঙি' পূর্ণ করি প্রভাত উৎসব
'সন্ধ্যা সঙ্গীতে'র গান শুনি সন্ধ্যা আঁখি ছলছলে
তোমার সাধের বাঁশী উঠে বাজি 'কড়ি ও কোমলে'
রচিয়া 'ছবি ও গান' চিত্রে গীতে করি পূর্ণপ্রাণ
প্রভাত মধ্যাহ্ন যায় দিবা যবে প্রায় অবসান
নিরুদ্দেশ যাত্রাপথে সোনার তরীর পরে ভেসে
সহযাত্রী 'মানসী'র মুখপানে চেয়ে মুগ্ধ শেষে
অজানার অন্বেষণে ঘননীল তরঙ্গমালায়
বাহিয়া চলেছো তরী বক্ষে ধরি আশা নিরাশায়
দূরে ডুবে যায় সূর্য দিবসের চিতা যেথা জ্বলে
তরল অনল জল দিগঙ্গনা ঢালে অশ্রুজলে ॥

ছন্দে সুরে সাবলীল সঙ্গীতের গতি ভঙ্গিমায়
আভাসে ইঙ্গিতে করি পরিপূর্ণ চরিতার্থতায়
উজ্জ্বল মধুর রসে, অগাধে অচলে নিয়া টানি
আহরিয়া এক ঠাঁই অনায়াসে মিলাইলে আনি
আনন্দনিবিড়নীড় ধরিত্রীর স্নিগ্ধ সমতলে
বঙ্গের অঙ্গনে বনে ঘনচ্ছায় শ্যামল অঞ্চলে।
পরিবেশি বিশ্বজনে আপনার পীযূষ সঞ্চয়
তৃষিতে নিষিক্ত করি সকলের চিত্ত করি জয়
তবু রয় তেমনি অক্ষয়। সর্বজনে অকৃপণ
বারে বারে বিলাইলে সাধনার সারস্বত ধন
বিশ্বে বিশ্বজনে ধরি, সেইক্ষণে অলক্ষিতে মরি !
গীতিপাত্রখানি তব কানায় কানায় উঠে ভরি
স্বয়ম্ভুর মন্ত্রপূত জলে। তুমি স্বয়ম্প্রভ রবি
আজি তুমি নহ শুধু আমাদের ভারতের কবি
নিখিলের আনন্দ নিলয়। বিস্ময়ে বিপুলতম
ঐশ্বর্যে মাধুর্যে তব আহ্লাদে ভরিল চিত্ত মম ॥

বৃহস্পতি পুত্র কচ বিনয়ে বিদায় মাগি যবে
বিদ্যাসিদ্ধি লাভ করি দেবলোকে ফিরে যাবে তবে
ব্যর্থপ্রেম দেবযানী দিল সে 'বিদায় অভিশাপ'
প্রেমে ও ঈর্ষায় পূর্ণ কি কঠোর করুণ সংলাপ।
বিচিত্র রূপিণী 'চিত্রা' কিবা চিত্র চিত্রিলে মায়ায়
ভক্তের আকৃতি দিয়া সুন্দরীরে প্রভাতে সন্ধ্যায়
স্নিগ্ধ নীল আঁখি দুটী হাসিখানি উষালোক সম
বিদ্যুৎ চঞ্চলা নটী দ্যুলোকে ভূলোকে প্রিয়তম।
অচ্ছোদ সরসীনীরে স্নানার্থিনী নারী একাকিনী
তাহারে বর্ণনা করি বিরচিলে বিচিত্র কাহিনী
সমর্পিল পুষ্পধনু পুষ্পশরভার পদতলে
বিজিত কন্দর্প পানে বিজয়িনী চাহে কৌতূহলে।
বৃন্তহীন পুষ্পসম ইন্দ্রজালে সৃজিলে উর্বশী
বিলোল হিল্লোলা বালা ইন্দ্রলোকে অকলঙ্ক শশী,
বিশ্ব বাসনার জলে প্রস্ফুটিত তামরসখানি
পদপ্রান্তে ত্রিভুবন লুটাইয়া পড়ে ধন্য মানি।

রেক্সোনা সাবানে আপনার ত্বককে আরও লাবণ্যময়ী করে।

RP.164-X52 BG

রেক্সোনা প্রোপাইটরী লিঃ অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ভারতে হিন্দুস্থান লিভার লিঃ তৈরী

দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে বসি কাব্যলোকে পশি অনুরাগে
ঋতুসংহারের গানে বিরহের মেঘদূত জাগে
গাঁথিলে কাজরীগাথা রসভরে গাহিলে 'চৈতালি'
বসন্তের বৃন্ত হতে ফলে ফুলে পূর্ণ করি থালি।
'কণিকায়' 'ক্ষণিকা'য় কুচি কুচি সোনালি কল্পনা
ঊর্ণনাভসম বুনি নানা বর্ণে দিলে আলিপনা,
অপরূপ রূপকথা কত 'কথা' কত যে কাহিনী
'গান্ধারীর আবেদন' 'বন্দীবীর' 'দাসী পূজারিণী'।
'নৈবেদ্য' উৎসর্গ করি দিলে তুমি কাহার 'স্মরণে'
বৈরাগ্যের মুক্তি নহে মুক্তি তব অসংখ্য বন্ধনে।
একাকী জাগিয়া আছো দুয়ারে রাখিয়া জ্বালি আলো
কার ভালোবাসা স্মরি একাকী তাহারে বাসো ভাল ?
রঙিন খেলেনা দিয়ে খেলাঘরে খেলায় জননী
তাথেই তালির সাথে আঙিনায় নাচিছে বাছনি।
জননীর বক্ষে থাকি শোনে 'শিশু' জন্মকথা তার
হে কৌশলী শিল্প তব বাৎসল্যে মধুরে চমৎকার।

কেহ বা 'নিষ্কৃতি' লভে কেহ 'মুক্তি' কেহ বা উভয়
কেহ মৃত্যুলাভ করে কেহ বা মৃত্যুর 'ফাঁকি' বয়।
মরণ বাসরঘরে জীবনের শেষরাত্রি জাগি
কেহ বা ঘুমায়ে যায় এক ঘুমে শেষ শান্তি মাগি।
নিপীড়িত গৃহকোণে কোন লতা ফলভারনতা
বৃষভ চর্বণপিষ্ট ব্রততীর কে জানে বারতা ?
অসম্বৃত দিগম্বর ভুলাইলে 'শিশু ভোলানাথে'
খেলার বাঁশরী কিম্বা যাহা ইচ্ছা কিছু দিয়া হাতে।
সদানন্দে করে নৃত্য করে বাদ্য কৃতার্থ মুরতি
কল কল কণ্ঠে কথা খল খল হাসে শিশুমতি।
রিক্ত রক্ত করতলে হাতে হাতে দেয় করতালি
কভু অমনি খুসি থাকে সব পেয়ে কভু কাঁদে খালি।
অনুজে অগ্রজ বলি সত্যেন্দ্রের বিদায় বন্দনে
নিখিল তিলক লিপ্ত সাজাইয়া কুসুমে চন্দনে।
গাহিলে 'পূরবী' গাথা সন্ন্যাসীর তপোভঙ্গ করি
শ্যাম বহ্নি অরণ্যের ফুটাইলে কিংশুক মঞ্জরী।

'শিবাজি-উৎসব' তব শিবাজির ঐতিহ্য উদ্ধার
ভারতের সুপ্রভাত অরবিন্দে তব 'নমস্কার'।
দিবাশেষে তন্দ্রালসা 'খেয়া' তরী পরে যাদুকরী
পার করে তারে যার মাঝখানে বানচাল তরী।
গৃহহীন আশাক্ষীণ পথহারা পথিকের প্রাণে
পীবর ভরসা রাশি দাও তুমি পথ মধ্যখানে।
বেলাশেষে নামে সন্ধ্যা কণ্ঠে তব ফুটে 'গীতাঞ্জলি'
সুরসূত্রে 'গীতিমাল্য' 'গীতালি'র গাঁথো রক্তকলি।
ফুটাইলে কত ফুল ভারতীর ভূর্জপত্র বনে
'বলাকা'র সারি করি উড়াইলে সুশুভ্র কেতনে।
জনপদে জনে জনে প্রচারিলে বিশ্বভারতীর
সুগভীর তপস্যার বাণী আজো তারি জয়শ্রীর,
শান্তিনিকেতনে হেরি তাহারো কেতন তুমি কবি
আদর্শের বৈজয়ন্তী তোমারি গৌরব দীপ্ত রবি
সমুজ্জল মধ্যাহ্ন আকাশে। মৃত্যুমুখে বজবধূ
মৃত্যুপথে 'পলাতকা' দিয়া যায় বক্ষভরা মধু।

ফেনিল সপিল গতি বহাইলে নব 'প্রবাহিণী,'
ভগীরথ সম কবি,—বহি চলে সেই নির্ঝরিণী
মিলন চঞ্চল ছন্দে, চক্ষে দীপ্ত জাগরণ তার
নব আশা নব ভাষা নিত্য নব দেশ আবিষ্কার।
সন্ধ্যায় গোধূলি লগ্নে সীমন্তে সে পরিয়া সিন্দুর
তরঙ্গে সঙ্গীত রঙ্গে লগ্ন হয় হৃদয়ে সিন্ধুর।
কাল বৈশাখীর দিনে মেঘের অন্তরে বহ্নি জ্বালো
বক্ষ হতে উল্কা তার চক্ষে জ্বালে বিদ্যুতের আলো।
হাটে হাটে করি মোরা বেসাতির নিত্য বেচা-কেনা
মহাজনে অভাজনে পণ্য বিনিময় লেনাদেনা।
তোমার বিবিধ কাব্য চিত্রে ও বিচিত্র সজ্জাবেশ
বুঝি বা না-বুঝি কবি শিরে ধরি তোমার আদেশ।
তোমার দেখা না পাই নাহি পাই পরশ তোমার
তোমার পরশমণি বিকশ্বর দ্যুতি চমৎকার।
প্রভাত সূর্যের মত প্রতিভার ইন্দ্রধনুরেখা
মর্মের মর্মর মূর্তি আলেখ্য তোমারি সব লেখা।
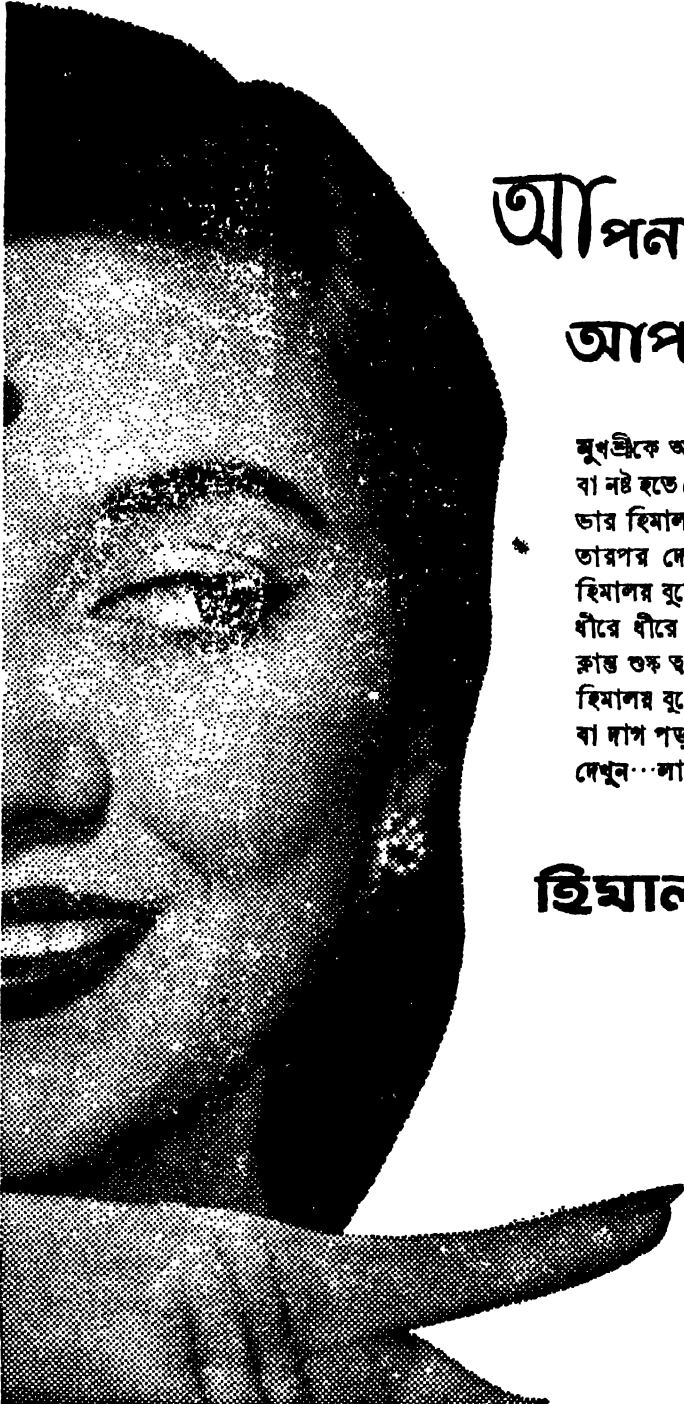
আপনার রূপ লাবন্য
আপনারই হাতে !
মুখশ্রীকে অকারণ রোদে—ধুলোয় কালো
বা নষ্ট হতে দেন কেন? চেহারার লাবণ্যতা রক্ষার
ভার হিমালয় বুকে স্নোর ওপরই ছেড়ে দিন—
তারপর দেখুন চেহারার চমক । একটু খানি
হিমালয় বুকে স্নো ঘষে দেখুন, হারানো কান্তি
ধীরে ধীরে আবার কেমন ফিরে আসছে !
ক্লান্ত শুষ্ক ত্বক সজীব হয়ে উঠছে !
হিমালয় বুকে স্নো আপনার মুখে কখনও ব্রণ
বা দাগ পড়তে দেবে না । নিজের চেহারায়
দেখুন···লাবণ্যতা এনে ধরেছে···
হিমালয় বুকে স্নো !
HIMALAYA BOUQUET SNOW
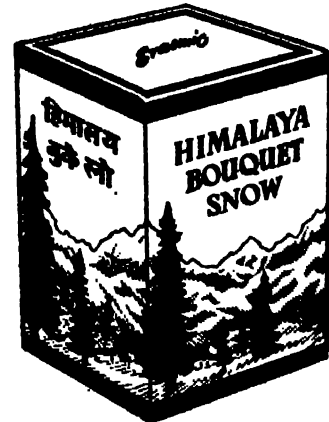
অর্ধনিমীলিত আঁখি চন্দ্রচূড় রজত গিরিরে
সমর্পিল সসঙ্কোচে ধূর্জটিরে অতি-ধীরে ধীরে
পর্ণহীন অনশনে অপর্ণার রূপে যে বালিকা
তুমি তারে দিলে কবি শরতের ফুল্ল শেফালিকা
ভেসে চলে সে নির্মাল্য জটা হতে জাহ্নবীর জলে
সেই পুষ্প শিরে ধরি সিদ্ধ হলে তপস্যার বলে।
সেই হতে ধরণীর যাহা কিছু তৃণ পর্ণ ধূলি
স্বর্ণ হয় স্পর্শে তব যাহা পাই শিরে লই তুলি।
কোথায় মালব দেশ যেথা মালবিকা শিপ্রাতীরে
জনপদ বধূ যেথা সুগোপনে বন্ধুসহ ফিরে
নেহারিলে মনোরথে মরকতে মণ্ডিত সুন্দর
সুদূর অবন্তীপথে মানসের পূর্ণ সরোবর।
রামগিরিপুর হতে অতি দূর অলকা নগরে
মেঘপরে করি ভর তার দৌত্যে চল তারপরে।
মুক্ত বাতায়ন পথে কোনোমতে হানো তব আঁখি
যেথা যক্ষপুর বধূ দীর্ঘশ্বাস ফেলে থাকি থাকি।

অলকে সুশুভ্র কুন্দ কর্ণে তার শিরীষ দোদুল
উদ্‌গ্রীব শ্রবণে শুনে সান্ত্বনার বাণী সুমঞ্জুল
মুখশোভা ম্লান পাংশু প্রসাধিত লোধ্র রেণুরাশে
চূড়াপার্শ্বে কুরুবক সীমন্তের কদম্বে সম্ভাষে।
বহি আনে 'বনবাণী' বন হতে মধুমক্ষিদল
কিঞ্জল্কের মধুগন্ধ 'মহুয়া'র স্পর্শ সুকোমল।
বিরচিলে মধুচক্র কুঞ্জবনে কিশলয়চ্ছায়
করিবে পীযূষ পান চিরদিন বিশ্বজন তায়।
শুক্তিতে রজতভ্রম সৃষ্টি মিথ্যা ইন্দ্রজাল নহে
বেদনা বন্ধনে গূঢ় আনন্দের পারাবার রহে।
বিচিত্র এ দৃশ্যপট বহুরূপে বাস্তব বিস্তার
অবিদ্যার মায়া নহে শুভঙ্করী বিদ্যা বিধাতার।
ঊর্ধ্বাকাশ চন্দ্রাতপে গ্রহতারা জ্যোতিষ্ক ভাস্বর
আলোময় ছায়াময়ী শিব শিবা অর্ধনারীশ্বর।
মৃদঙ্গ মন্দিরা মাঝে নটরাজ নাচে তা তা থেই
তার ছন্দ লাগে যারে সে ছন্দ নাচায় তাহাকেই।

যেদিন বঙ্গের লক্ষ্মী প্রতীচীর স্বর্ণমৃগ পানে
লুব্ধচিত্তে মুগ্ধনেত্রে বারংবার দৃষ্টি তার হানে,
সেদিনো সৌমিত্রিরূপে কল্যাণের গণ্ডিরেখা টানি
বুঝাইলে তারে কত বিধিমত যুক্ত করি পাণি।
স্বদেশের রুক্ষবাস শ্রেষ্ঠতর বিদেশের চেয়ে
বিদেশের সূক্ষ্মবাস আসে হেথা সপ্তসিন্ধু বেয়ে,—
লুপ্ত করে দেশপণ্যে নিরীহের চক্ষে দিয়া ধুলা
বক্ষে ধরে সমাদরে মূঢ়জনে ছাইভস্মগুলা'।
সাধু বেশ ধরি সাধ্বী জানকীরে নিল অপহরি
যাদুকর দশানন জাতুধান মায়ামূর্তি ধরি।
ব্যবচ্ছিন্ন বঙ্গদেশ ছিন্নপক্ষ জটায়ুর প্রায়
মাতার লাঞ্ছনা হেরি ক্ষীণকণ্ঠে করে হায় হায়!
তথাপি বঙ্গের লক্ষ্মী দেশ হতে সমুদ্রের পারে
নিয়ে গেল নিশাচর চরাচর কাঁদে হাহাকারে।
হত্যা অত্যাচার চলে হিংসায় গোপন রাত্রিছায়ে
তাই 'প্রশ্ন' করিয়াছো 'পরিশেষে' দুঃখিতের দায়ে।

প্রভুশক্তি হানে শক্তিলেশহীন নিঃসহায় দীনে
বিচারের দাবী কাঁদে মাথাঠুকে প্রতিকার বিনে
বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে তাই শুধায়েছো করি অভিমান
কত না প্রশ্রয় হায়! দানবেও দাও ভগবান!
শত শত নারী-নর হত হয় জালিয়ানাবাগে
মৃতাস্থি কঙ্কালস্তূপ সঞ্জীবনমন্ত্রে তব জাগে,—
মৃতেরা তর্পণ মাগে জীবিতের স্মরণের ঋণে
ইতিহাস সাক্ষী তার রহে যেন ক্ষতচিহ্ন চিনে।
তারপরে তারস্বরে অজ্ঞান তিমির অন্ধচোখে
গুরুরূপে জ্ঞানাঞ্জনে জনে জনে জাগালে আলোকে,—
অসহ্য সে অপমান বুঝাইতে দেশবাসিগণে
দূর করি দিলে তুচ্ছ রাজদত্ত পদবী সেক্ষণে।
ত্রিংশ কোটি শুষ্ক সাল শমী বৃক্ষে অগ্নি দিলে জ্বালি
জ্বলিয়া উঠিল তার সপ্তজিহ্বা ধূমাঙ্কিত কালি,—
সে-কাহিনী সে-দাবাগ্নি সে-কলঙ্ক আজো রয় লিখা
দলিতের বক্ষে জ্বলে আজো তার অন্তর্গূঢ় শিখা।

জলে জলময় দেশে বুভুক্ষায় ভিক্ষাবৃত্তি চলে
গৃহে অন্ন নাহি শস্য এককণা ক্ষেত্রে নাহি ফলে,—
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মৃত্যু হাহাকার প্রতি ঘরে ঘরে
আশাহত নরনারী মহামারী মাগে মৃত্যু তরে।
মৃত্যু আজি নহে মৃত্যু, মৃত্যু যেন দেবতার দান
আত্মহত্যা মহাপাপ সমস্যার মহা সমাধান !
ভিক্ষাবেশে শিবমূর্তি বাহিরিলে তুমি অতঃপর
আঁখি ছলছলি সবে বাহিরিল ছাড়ি গৃহ ঘর।
কে কাহারে দিবে ভিক্ষা এ উহার পানে চায় এসে
শাসনে শোষণে শস্য উবে গেছে এ-সোনার দেশে।
বরষার বারিবর্ষে আউসের কলম মঞ্জরী
শীর্ষে শস্য নাহি তার, নাহি আর তব স্বর্ণতরী।
হেমন্তের অন্তোপরে শরৎ সুপক্ক শস্যাবলী
নাহি করে সমর্পণ নীবারের কনক অঞ্জলি,—
শান্তি সুখ ছাড়ি কবি তুমি যবে দাঁড়াইলে এসে
সর্বহারা নারী নর সরোদনে এল দ্বারদেশে॥

শিবিরে আবদ্ধ বন্দী হিজলীতে যবে হত্যা করে
(শিকারী এমন বীর মারে ব্যাঘ্রে রুধিয়া পিঞ্জরে !)
তোমার আহ্বান শঙ্খ তুমি তবে দিলে নিনাদিয়া
আনন্দমঠের মন্ত্রে জলদের মন্দ্র মিশাইয়া।
উঠে গর্জি জনগণ চণ্ডিকারে সম্বোধি বোধনে :—
আবির্ভূতা হও মাতা আজো কি মা মগ্ন অচেতনে !
জাগরিতা দেশমাতা সংহতির শক্তি ভয়ঙ্করা
সিংহীসম হিংস্রনাদে উর্দ্ধগ্রীবা স্ফুরিত অধরা,—
ধরা কাঁপে পদতলে। তুমি ঋষি ক্রান্তদর্শী কবি
ভাস্বচিত্ত আঁকি দেশ হিংসায় উন্মত্ত তার ছবি,—
নব জন্মেক্ষণ চাহে তোমারে করিতে পুরোহিত
তুমি না সান্ত্বনা দিলে না জানি কি হত বিপরীত !
ভারত স্বাধীন হল তারপরে গেল কতদিন
পরিবর্তনের পটে কত দৃশ্য ইতিহাসে লীন
আজো তুমি নরলোকে থাকো তুমি দেবলোকে থাকি
হতভাগ্যদের পানে অপমানিতের ভালো রাখি !
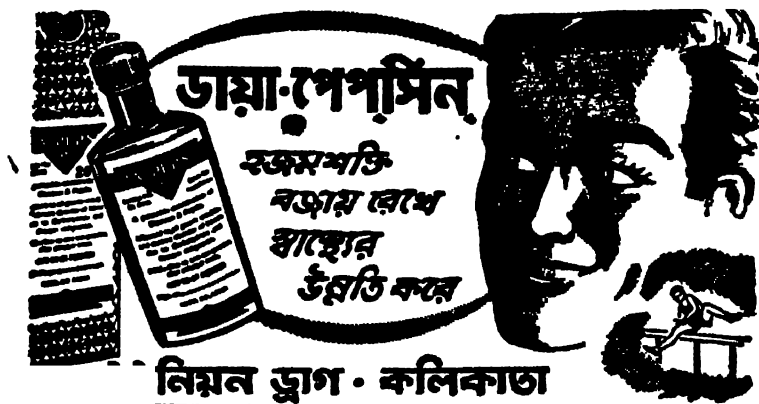
পশ্চিম বাঙ্গলার হিসাব নিকাশ

জ্ঞানচন্দ্র

সভ্য দেশের চিরাচরিত প্রথামত বাঙ্গলা সরকার এবারও আয়ব্যয়ের বাজেট তৈয়ারি করিয়াছেন। ১৯৬০-৬১ সনে রাজস্ব আদায় ৮৮·১৭ কোটি টাকা এবং তাহা হইতে ব্যয়ের পরিমাণ ৮৯·২৩ কোটি টাকা। ঋণ বাবদ এবং অন্যান্য তহবিল (সরকারী ভাণ্ডার, সাধারণের জমা অর্থ প্রভৃতি) এবং হাতে মজুত লইয়া সর্ব্বসাকুল্যে ৩৩০·৩২ কোটি টাকা আয়ব্যয় হইবে বলিয়া আভাস দেওয়া হইয়াছে।

জনসাধারণ অত বাড়াবাড়ি হিসাব লইয়া মাথা ঘামায় না, তাহাদের পক্ষে রাজস্ব খাতে বার্ষিক ব্যয় লইয়া আলোচনাই যথেষ্ট। আয়ের দিকে সেল্‌স্ ট্যাক্স ও অপরাপর ট্যাক্স (ইলেক্‌ট্রিসিটি ব্যবহার, প্রমোদ ট্যাক্স) বাবদ ২৫·৯৪ কোটি টাকাই বড় আয়। অপরাপর বড় আয়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক (৬·০২ কোটি), আয় কর (৫·৯৩ কোটি), ভূমি রাজস্ব (৫·৮০ কোটি), রাজ্য আবগারী (৫·৭৩ কোটি), ষ্ট্যাম্প (৩·০১ কোটি), শিক্ষা (৪·৬৪ কোটি), কৃষি (৩·২৮ কোটি টাকা) প্রভৃতি প্রধান।

ব্যয়ের দিকে শিক্ষা বিভাগের স্থান প্রধান, অর্থের পরিমাণ ১৩·৭৬ কোটি টাকা। পরেই আসছে পুলিশ (৮·০৯ কোটি), চিকিৎসা (৬·৬১ কোটি), কৃষি (৪·৬০ কোটি), ভূমি রাজস্ব (৪·২৫ কোটি), ঋণের সুদ (৪·৫৫ কোটি), জনস্বাস্থ্য (৩·৭৬ কোটি টাকা) প্রভৃতি দেখা যায়।

আয়ব্যয়ের অঙ্ক ক্ষুদ্র পশ্চিম বাঙ্গলা রাজ্যের পক্ষে অতি বিরাট বলা চলে। ইহার মধ্যে বড় কথা লোকের এই পরিমাণ ট্যাক্স দিবার সঙ্গতি বা শক্তি আছে কিনা। প্রতিনিয়ত জিনিসপত্রের দর বাড়িয়া গৃহস্থের জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমানে প্রধান আয় বিক্রয়কর। যে সকল বস্তু আইন প্রণয়নের সময় বাদ পড়িয়াছিল তাহা ক্রমে ট্যাক্স আমলে আসিতেছে; তদপেক্ষা বিপদ যে হারে ট্যাক্স আদায় হইত, তাহা চড়িতেছে এবং মালপত্রের দর চড়া হওয়া সহজ নিয়মে ট্যাক্সের পরিমাণ বাড়িতেছে।

আয় যাহা হয়, তাহার সদ্ব্যয় হইলেও কতকটা দুঃখ নিবারিত হইতে পারিত। তাহা হইবার নহে। সরকারী দপ্তরের ব্যয় বাড়িতেছে যে হারে, তাহার বিপরীত অনুপাতে কাজে বিলম্ব ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিতেছে। শিক্ষা বিভাগ আজ শিক্ষার সংস্কার না সংহার সাধন করিতে, তাহা লইয়া বিতণ্ডার অন্ত নাই। তাহার সবটাই যে নিরর্থক নয়, তাহা ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছেন, বিস্তারিত আলোচনায় লাভ নাই। সরকারী ব্যবস্থায় যে শিক্ষা ছাত্ররা পাইতেছে, তাহাতে তাহারা নামমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা লাভ করে। বাকীটা তাহারা জীবন যুদ্ধে কোন প্রকারেই উপযোগী নহে। শিক্ষা সমাপনান্তে যে অন্ধকার তাহার সম্মুখে ফুটিয়া উঠে, তাহারই ভয়ে সে সর্ব্বদাই আতঙ্কিত এবং প্রধানতঃ তাহারই ফলস্বরূপ তাহার মধ্যে নানারূপ চাঞ্চল্য আত্ম-প্রকাশ করিয়া থাকে।

চিকিৎসা বিভাগের মধ্যে হাসপাতালগুলি পড়ে; তাহার পরিচালনার অবস্থা আজকাল আর কাহারও অপরিজ্ঞাত নয়। প্রতি বিভাগ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, বাজেট হিসাবে মোট টাকা নানারূপে ভাগ হইয়া থাকে, তাহা ব্যয় করিলেই গভর্ণমেণ্টের কাজ সুসম্পন্ন হইল।

যত টাকা ব্যয় হয়, তাহা অপেক্ষা অপব্যয় হয় বেশী। যাঁহারা নিজের বিভাগ সুচারুরূপে চালাইতে অক্ষম, বার্দ্ধক্য, অসুস্থতা, শিক্ষা সম্বন্ধীয় অযোগ্যতা, আলস্য পোষ্য ও দলপরায়ণতা প্রভৃতি দোষে যাঁহারা দুষ্ট—তাঁহা-দের বেতন ভাতা প্রভৃতি সবই—অপব্যয়ের পর্য্যায়ে পড়ে। রাজ্যপাল যে কি কাজ করেন বিশেষতঃ, যে রাজ্যে জবরদস্ত মুখ্যমন্ত্রী আছেন, সেখানে রাজপাল একটি বিরাট প্রহসনের অভিনয় মাত্র। বাঙ্গলায় তাঁহার জন্য কম্-সে-কম্ প্রতি বৎসর সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা খরচ হইয়া থাকে। যে ব্যবস্থা আছে তাহাতে "দরিয়া মে" না ঢালিলে বরাদ্দ টাকার খরচ সম্ভব নয়। ১৯৬০-৬১ সনে 'ফার্ণিচার' ও কার্পেটের জন্য ও কার্পেট বাবদ ৯,০০০৲ খরচ হইবে, আবার "রিনিউয়াল অফ্ ফার্ণিচার এ্যাণ্ড কার্পেটস্" অর্থাৎ নূতন করিয়া তাহার ব্যবস্থা করিতে ১৭,৫০০৲ খরচ হইবে। সরকার বাহাদুর ইহার পার্থক্য বুঝিতে পারে, সাধারণ লোক মনে করে প্রতি বৎসর
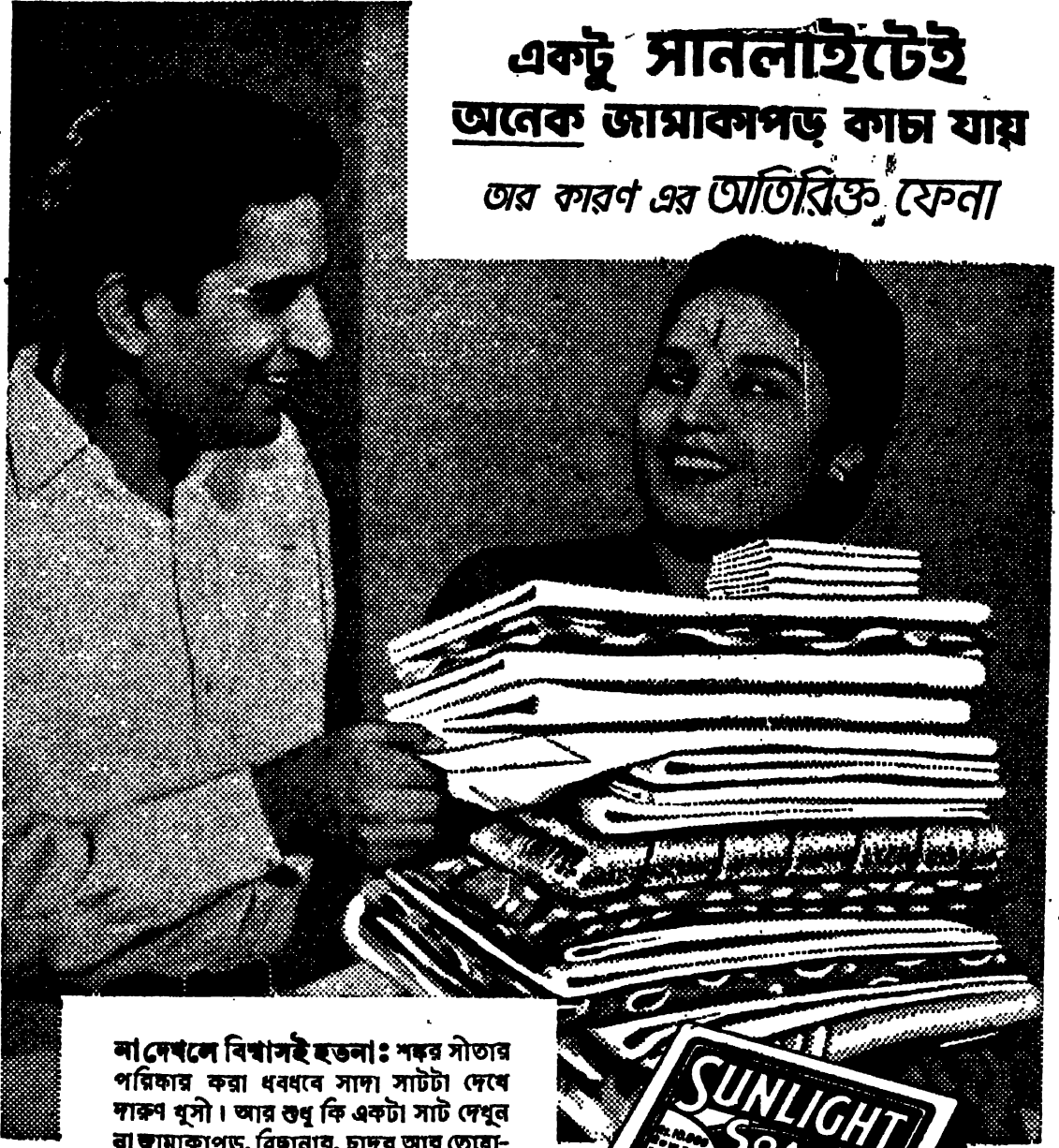
একটু সানলাইটেই
অনেক জামাকাপড় কাচা যায়
আর কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা
না দেখলে বিশ্বাসই হতনা: শঙ্কর সীতার পরিষ্কার করা ধবধবে সাদা সার্টটা দেখে দারুণ খুসী। আর শুধু কি একটা সার্ট দেখুন না জামাকাপড়, বিছানার, চাদর আর তোয়ালের স্তূপ—সবই কিরকম সাদা ও উজ্জ্বল এসবই কাচা হয়েছে অল্প একটু সানলাইটে! সানলাইটের কার্য্যকরী ও অফুরন্ত ফেণা কাপড়কে পরিপাটী করে পরিষ্কার এবং কোথাও এক কুচিও ময়লা থাকতে পারেনা! আপনি নিজেই পরীক্ষা করে দেখুনা না কেন...আজই!
SUNLIGHT SOAP
সানলাইটে জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে

একই কার্পেট ও গৃহ সরঞ্জামের (কাঠ-কাটরা) জন্য ২৩,৫০০৲ টাকা খরচ করা সম্ভব নয়, কারণ উহাদের কোনটারই পরমায়ু এক বৎসর নয়। তাহা ছাড়া আছে পর্দা ও আস্তরণ (cartains and covers) প্রতি বৎসর ৬,০০০৲ এবং অপরাপর সরঞ্জাম (other equipments) প্রতি বৎসর ১০,০০০৲। সুতরাং যাঁহাদের এই খরচ করিতেই হইবে, না করিলে বৎসরের শেষে 'অযোগ্য' (inefficient) বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, তাঁহারা যোগ্য খরচ করিতে গেলে যে ক্বচিৎ-কদাচিৎ ফৌজদারী মামলায় জড়িত হইতে পারেন, তাহার সম্ভাবনা গভর্ণমেণ্টই করিয়া রাখিয়াছে।

বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নাই। আর এক ক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্টের কৃতিত্বের পরিচয় দেওয়া যাউক।

পশ্চিম বাঙ্গলা সরকার প্রত্যক্ষভাবে ১৬টী কারবার বা ব্যবসা করিয়া থাকে। তন্মধ্যে পরিবহন ব্যবস্থাই সর্ব্বপ্রধান। এই সকল ব্যবসায়ে ৭,০৬,৮৯,০০০ টাকা মূলধন নিয়োজিত হইয়াছে এবং সর্ব্বসাকুল্যে (১৯৬০-৬১) ৯৯,০০০৲, এক লক্ষ টাকাও নয়, মুনাফা হইবে বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে। ধার করা মূলধনের উপর বাৎসরিক দেয় সুদের পরিমাণ ২৯,১০,০০০ টাকা। গড় প্রতি কারবারে ৪৪,৭০,৫৬২·৫০ টাকা মূলধন খাটিতেছে, তাহাতে মুনাফার বহর বাৎসরিক ৬,৬২৫ টাকা। ইহার মধ্যে পরিবহন বিভাগে (২টী) ৬,০৪,০৪,০০০ টাকা মূলধন আছে। এই লাভ শতকরা হিসাবে কি দাঁড়ায়, তাহা পাঠক হিসাব করিয়া দেখিবেন। এই ১৬টী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৮টায় লাভ এবং ৮টায় লোকসান দেখানো হইয়াছে। কারিগরী শিক্ষা ও বাণিজ্য যুক্ত প্রতিষ্ঠান ২টীতে অবশ্য লাভ হইবার কথা নহে। পরিচালনা ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টই দেশের আদর্শস্থানীয় হওয়া উচিত। কারণ তাহাদের কাজ হইতেছে অপরের দোষ-ত্রুটি ধরা এবং সংশোধন করা। বিক্রয়কর, আয়কর সংক্রান্ত তাহার কর্ম্মচারী দোকান কারবার পরীক্ষাকালে বলেন যে, কারবার যখন চলিতেছে, তখন এত (তাহার খেয়ালখুসী মত) হারে লাভ হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট কারবারে কি হারে লাভ হয় তাহা তখন তাঁহাদের স্মরণে রাখিলে ভাল হয়।

বৎসরের পর বৎসর এইভাবে লোকসান করিলে দেশে সকল ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বন্ধ হইয়া যাইত। কিন্তু "গৌরী সেনের টাকা" লইয়া ছিনিমিনি খেলা চলিতেছে। যে সকল কারবার সাধারণ লোকেও চালাইয়া কেবল জীবিকা উপার্জ্জন নয়, গভর্ণমেণ্টকে প্রচুর ট্যাক্স দেয়, তাহাও সরকারী "সুদক্ষ" পরিচালনার ফলে বিরাট ক্ষতি স্বীকার করিতেছে। কলিকাতা পরিবহন ব্যবস্থায় ৫,২০,৫৬,০০০ টাকা মূলধন খাটাইয়া (১৯৫৯-৬০) মাত্র ৫০,০০০ টাকা লাভ হইয়াছে। যদি এই হারে অপর বেসরকারী পরিবহন প্রতিষ্ঠান কাজ করিত, তাহা হইলে এতদিনে তাহাদের পাততাড়ি গুটাইতে হইত। কারণ ঐ সনে মোট আয় ৩,২৫,৬৭,০০০ টাকা দেখানো হইয়াছে। এই সব ব্যাপারে তাহাদের সেলস্ ট্যাক্স, ইনকম ট্যাক্স প্রভৃতি দিতে হইত। তাহার উপর নানাবিধ "ত" খরচ আছে, যাহা গভর্ণমেণ্টকে দিতে হয় না। কাষ্ঠ-শিল্পকেন্দ্রে ১৬ লক্ষ টাকা মূলধনে ৩,৩৫,০০০ টাকা (১৯৬০-৬১); পল্লী অঞ্চলে ইট-টালির নির্ম্মাণ ও বিক্রয় কারবারে ২,৯১,০০০ মূলধনে ৮২,০০০ টাকা ক্ষতি হইবে। (১৯৫৯-৬০ সনে ক্ষতির পরিমাণ ১,৬৬,০০০ টাকা ছিল)। এই লোকসান বছরের পর বছর দেওয়া হইতেছে। দুর্গাপুর প্রধান শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হইতেছে। সেখানে ইটের কারবারে প্রচুর লাভ হইবার কথা। সেখানে মূলধন ৭,৪৩,০০০ টাকা লাগাইয়া ১৯৫৮-৫৯ সনে সুদ ২৮,০০০ টাকা সমেত ১,৮৭,০০০ টাকা, ১৯৫৯-৬০ সনে (সুদ ৩০,০০০ টাকা সমেত ১,৪৩,০০০ টাকা এবং ১৯৬০-৬১ সনে সমপরিমাণ সুদ দিয়া ১,৯৮,০০০ টাকা ক্ষতি হইবে।

গভীর জলের মাছ যাহারা, তাহারা ট্রলার সাহায্যে সাগর হইতে মাছ ধরিয়া পশ্চিম বাঙ্গলার মাছের দুঃখ দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। প্রতি বৎসরে লোকসানের পরিমাণ নয় লক্ষ টাকা, কিছু কম, কিছু বেশী। মূলধনের পরিমাণ ২৬,৩৬,০০০ টাকা। যেখানে মাছ ধরা পড়িতেছে ৭,৮৩১ মণ, দাম ১,২৬,২৩৬ টাকা সেখানে কেবল কর্ম্মচারীদের বেতন ২,৫০,০০০ টাকা; আর ট্রলারের মেরামতাদি খরচ বার্ষিক আড়াই হইতে তিন লাখ টাকা। বাৎসরিক দেয় সুদের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে (১৯৬০-৬১) ১,০৫,০০০ টাকা।

লোকে দোকানপসার করে লাভ তত করিতে না পারুক, অন্ততঃ খরচ খরচা মিটাইয়া সৎভাবে সময় কাটাইতে পারে। চিত্তরঞ্জন এ্যাভেনিউস্থিত মনোহারী চাকচিক্যময় দোকানটিতে ২,৭৩,০০০ মূলধন খাটিতেছে। মাল প্রভৃতি বিক্রয় দ্বারা (১৯৫৯-৬০) ৪৮,০০০ টাকা পাওয়া গেল; আর লোকজনের মাহিনা বাবদ ৭৩,০০০ টাকা খরচ হইয়াছে। ঐ বৎসর ক্ষতির পরিমাণ ৬৮,০০০ টাকা; ১৯৬০-৬১ সনে ১৭,০০০ টাকা লোকসান হইবে,

বলা হইতেছে। কার্য্যক্ষেত্রে কি দাঁড়াইবে তাহা পরে দেখা যাইবে।

বাজেট অর্থে কেবল নামমাত্র হিসাব রাখিয়া প্রতি বৎসর দরিদ্র দেশবাসীর নিকট জবরদস্তি আদায় করা টাকা খরচ করার বাহাদুরী নয়, তাহার সুষ্ঠু হিসাব রাখিয়া প্রতি টাকার মত মাল বা কাজ আদায় করা। এমন বেপরোয়া গভর্ণমেণ্ট আর কোনও দেশে একদিনও টিকিয়া থাকা সম্ভব নয়, সরকারী হিসাবপরীক্ষক যে সকল দোষ-ত্রুটি ধরিয়া দেন, তাহা সংশোধন করিবার কোনও চেষ্টাই নাই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটা গোঁজামিল দেওয়ার চেষ্টা বর্ত্তমান, আর না হয়ত বৎসরের পর বৎসর কেহ তাহার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না। ১৯৫৮-৫৯ সনের টাকার বাবস্থা এবং তাহার ব্যয় এবং ১৯৬০ সনের খরচের হিসাব পরীক্ষায় দেখা গেল ৪০,৬৩৩ দফায় ৬৯.৪৪ কোটি টাকার হিসাবে কমবেশ গোলোযোগ রহিয়াছে, ইহার মধ্যে কোনও কোনও খরচ সম্বন্ধে আপত্তি ১৯৪৮-৪৯ সন হইতে চলিয়া আসিতেছে। কল্যাণী কংগ্রেস সম্বন্ধে সরকারী ব্যয়ের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অপূর্ব্ব এবং অভাবনীয়। যদৃচ্ছা খরচ দেখাইয়াও হিসাবে বহু টাকার গরমিল রহিয়া গিয়াছে। অপরাপর বিবরণ বৃদ্ধি করিয়া আর লাভ নাই। এক্ষেত্রে একমাত্র উপায়, বাঙ্গলা সরকারের হিসাবপরীক্ষক রাখিয়া আর অযথা অর্থব্যয় করিয়া লাভ নাই। তাহা অর্থসচিব মহাশয়কে ব্যক্তিগত শ্রমের ভাতা স্বরূপ দিবার ব্যবস্থা করিলে সমীচীন হয়। যে বিভাগ খরচ করিয়া হিসাব ঠিক রাখিতে পারে না, তাহার মাহিনা ছাড়াও ভাতা প্রয়োজন, কারণ যাহারা হিসাব ঠিক রাখে তাহাদের পক্ষে মাসিক বেতনই যথেষ্ট।

উদাহরণ বৃদ্ধি করিয়া লাভ নাই। যাঁহারা প্রত্যেক ক্ষেত্রে নিজেদের অযোগ্যতা প্রমাণ করিয়া আমরণ গদি আঁকড়াইয়া বসিয়া আছেন, তাঁহাদের হাতেই দেবতার অভিশাপে সারা বাঙ্গলার জনসাধারণের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে। যখন চাপ দিলেই রক্ত টুপিয়া পড়ে, তখন ব্যয়বৃদ্ধি হইলে চিন্তার কারণ নাই; নূতন ট্যাক্স বসিতে পারে, যাহা আছে তাহার হার বৃদ্ধি পাইতে পারে। ট্যাক্স আদায় আর যথেচ্ছা খরচ, ইহার নাম "বাজেট"। বোধ হয় ইংরেজি "budget" শব্দের ইহা অপপ্রয়োগ মাত্র। এই অনাচার বাঙ্গালী নিঃশব্দে সহ্য করিতেছে; কোনও অশান্তির কারণ সৃষ্টি করে নাই। ব্যষ্টি বা সমষ্টিগতভাবে ইহারা নোবেল শান্তি পুরস্কার পাইবার যোগ্য।

একটি কোমল হাত

শ্রীশান্তশীল দাশ

একটি কোমল হাত: স্পর্শ তার পেয়েছে কি মন?
তবু কেন উতলা, যখন
গভীর আঁধার রাত নেমে আসে, নেমে আসে ভয়;
চারিদিক থম্‌থমে; চুপে চুপে কারা কথা কয়
সেই অন্ধকারে:
শিহরণ সারা অঙ্গে; মনে পড়ে যায় বারে বারে
সেই একখানি হাত—
কোমল উত্তাপে আর নিবিড় আশ্বাসে
ভরা; স্পর্শ তার এতটুকু; তবু নিয়ে আসে
শঙ্কাহীন নির্ভরতা। ত্রস্ত সে রজনী
সরে যায়। ফিস্ ফিস্ অশরীরী ধ্বনি
কোথায় মিলিয়ে যায়। অন্ধকার—তবুও নির্ভয়:
সেই হাতখানি, সেই কোমল উত্তাপ,
সেই প্রসন্ন আশ্রয়।

এমন কোমল হাত কোথাও কি আছে কোনখানে
তবু এ হাতের স্বপ্ন দেখে মন, কেন যে, কে জানে!

বাঘের চোখ—লীলা মজুমদার। প্রবর, কলিকাতা-৬। দাম দু'টাকা পঞ্চাশ নয় পয়সা।

গল্প সঙ্কলন। উনিশটি ছোট গল্প পুস্তকখানিতে স্থানলাভ করিয়াছে। ভূতুড়ে, আধা-ভূতুড়ে ও মনস্তত্ত্বমূলক বিভিন্ন রসের গল্পগুলির মধ্যে লীলা মজুমদারের গল্প বলার সহজ অনায়াস ভঙ্গিটি চোখে পড়ে। প্রায় প্রত্যেকটি গল্পের মধ্যেই রূপ এবং রসের চমক মনকে আবিষ্ট করিয়া রাখে। এত স্বল্প-পরিসর গল্পের মধ্যে মূল বক্তব্য এমন সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিতে পারা কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়। যাঁহারা ছোট গল্প পড়িতে ভালবাসেন পুস্তকখানি তাহাদের ভাল লাগিবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। প্রচ্ছদপট নয়নাভিরাম। ছাপা ঝরঝরে।

কাঞ্চনজঙ্ঘার পথে—বিমলেন্দু বিশ্বাস। প্রজ্ঞা প্রকাশনী। কলিকাতা। দাম ২'৫০।

লেখক নিজে হিমালয় অভিযান শিক্ষার্থীরূপে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন তাহাই এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অজানাকে জয় করা মানুষের চিরন্তন নেশা। কয়েক বৎসর পূর্বে এবং এখনও এই অসাধ্য সাধনে পৃথিবীর বহুস্থান হইতে পর্যটক দল ভারতে উপস্থিত হইয়া এই গিরিশৃঙ্গকে জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু ভারতবাসীর মধ্যে এই প্রচেষ্টা প্রবল ছিল না। ভারত স্বাধীন হইবার পর সরকারের উৎসাহ ও সদিচ্ছার ফলে দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। এই শিক্ষা-কেন্দ্রে বর্তমানে বহু ভারতীয় যোগদানও করিতেছেন। লেখক এই যোগদানকারীদের মধ্যে একজন। ধৈর্য, কষ্টসহিষ্ণুতা ও নিয়মনিষ্ঠা থাকিলে কোন শক্ত কাজই যে মানুষের সাধ্যাতীত নয় এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে এই কথাটাই স্পষ্ট হইয়া উঠে। শুধু পর্বতারোহণ শিক্ষার্থী বা যে কোন শিক্ষার্থীর পক্ষেই এই পুস্তকখানি আশার আলো দেখাইতে সক্ষম হইবে।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

ডোভার পেরিয়ে—মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়। ন্যু এম, সি সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২। ৪'৫০।

ঝরঝরে ভাষা, তর তর গতি। কবি লেখকের এই সরস ভ্রমণ কাহিনীর প্রায় প্রতিটি অনুচ্ছেদেই পদ্যছন্দের মধুর ঝঙ্কার শোনা যায়, বর্ণনায় পাওয়া যায় চিত্রের আভাস।

১৯৫৫ সনে লণ্ডনপ্রবাসী গ্রন্থকার এক বিলাতী ভ্রমণ ব্যবস্থাপক কোম্পানীর প্রযোজনায় আলমাক সাহেব-মেম সহযাত্রী ও সহযাত্রিনীর সঙ্গে ইউরোপে "তীর্থযাত্রা" করেছিলেন। ডোভার থেকে ষ্টীমারে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ওপারে অষ্টেণ্ড। সেখান থেকে বাহন মোটর বাস। একই গাড়ীতে কেবল রাত্রিবাসের জন্য থেমে থেমে বেলজিয়ম, জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, সুইজারল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের বড় বড় শহরের ভিতর দিয়ে ঐ ইংরেজীতে যাকে বলে ঘূর্ণাবর্তের বেগে ভ্রমণ করা, তাই করেছেন তিনি। কোন কিছুই গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করবার না ছিল সময়, না সুযোগ। হয়ত তেমন ইচ্ছাও লেখকের ছিল না। তবে সত্যাই দু চোখ ভরে দেখেছেন তিনি। আর তিনি নিজে যা দেখেছেন তার অনেকটাই এই গ্রন্থে আমরাও দেখতে পাচ্ছি।

ইউরোপের কিছুটা এলাকার শহর, নদী, পর্বত এবং হ্রদ, গির্জা, দোকান এবং হোটেল, জোড়া জোড়া স্ত্রী-পুরুষ প্রণয়ী-প্রণয়িনী এবং দোকানে ও হোটেলে একা একা যুবতী পরিচারিকা ইত্যাদি যে যে দৃশ্য ও যে কজন মানুষের ফটো তাঁর চোখের ক্যামেরাতে তিনি তুলে নিতে পেরেছিলেন সে সব তাঁর নিজস্ব মনের রঙে রাঙিয়ে এই গ্রন্থে পাঠকসাধারণের জন্য পরিবেশন করেছেন তিনি। চলার পথে আসল ক্যামেরাতে তোলা অনেকগুলি আলোক চিত্রও এ গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে। কিন্তু কথার তুলিতে আঁকা ছবিগুলির তুলনায় সেগুলি মনে হয় নিষ্প্রভ। সার্থক ভ্রমণ কাহিনীর জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় সুরের ঐক্য, বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি এবং তথ্যের সত্যার এতে না থাকলেও লেখকের ভাষার যাদু এবং বর্ণনার কৃতিত্বের জন্য রচনাটি খুবই সুখপাঠ্য হয়েছে।

বর্ণনায় চিত্রের মত গল্পের আভাসও থেকে থেকেই পাওয়া যায়। গ্রন্থের উপসংহারে যে কাহিনী সংযোজিত হয়েছে তা একটি সরস ও সম্পূর্ণ ছোট গল্প—যেমন মধুর, তেমনি করুণ। আর রোমাঞ্চকরও—উভয় অর্থেই। তবে অবাস্তব। তাতেও ক্ষতি ছিল না যদি ওটি সম্পূর্ণ অবাস্তব না হ'ত! বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যে এ রকম প্রক্ষেপের দৃষ্টান্ত থাকলেও সবিনয়ে বলব যে তার ফলে এ ক্ষেত্রে ছন্দপতন ঘটেছে।

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

প্রবাসী ষষ্টিবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ

বাংলা ১৩৬৬ সালের চৈত্র মাসে প্রবাসীর ৬০ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইল। এই ষষ্টি-বার্ষিকী উপলক্ষে ১৩৬৭ সালের মাঝামাঝি, পূজার পূর্ব্বে, একটি বৃহদাকার স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করিবার আয়োজন হইতেছে।

খ্যাতিমান লেখক-লেখিকাদের লেখা চিত্তাকর্ষক গল্প, উপন্যাস, কবিতা, রস-রচনা প্রভৃতি ছাড়াও এই গ্রন্থটি বহু বিচিত্র বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধ ও সন্দর্ভাদিতে সমৃদ্ধ হইবে। গ্রন্থটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য আমরা চেষ্টার ত্রুটি করিব না।

জন্ম সময় হইতেই প্রবাসী কয়েকটি বিশেষ বিষয়ে অগ্রণী ও পথপ্রদর্শক ছিল। দেশ-বিদেশের প্রাচীন ও সমসাময়িক চিত্রকলা, চারুশিল্প প্রভৃতির সঙ্গে দেশের জনসাধারণের পরিচয়-সাধন তাহার অন্যতম। স্মারক গ্রন্থটিকেও চিত্র-সম্ভারে সমৃদ্ধ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইবে।

রাষ্ট্র, সমাজ, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে প্রবাসীর একটি যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী, আমরা আশা করি—সেই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীটি এই গ্রন্থে যথোচিত পরিমাণে প্রতিফলিত হইবে এবং যে-সমস্ত আদর্শের অনুপ্রাণনা লইয়া প্রবাসী বহু বৎসর দেশবাসীর সেবা করিয়া আসিয়াছে, সেই সমস্ত আদর্শের ধারা এই গ্রন্থেও অব্যাহত থাকিবে।

অতীতে কোনও না কোনও সূত্রে যাঁহাদের সহকারিতা লাভ করিবার সৌভাগ্য প্রবাসীর কখনও হইয়াছে তাঁহাদের সকলেরই সহানুভূতি-প্রণোদিত সাহায্য পাইব আশা করিয়া এই কাজে আমরা হাত দিয়াছি। ইঁহাদের মধ্যে তাঁহাদের কাছে এ পর্য্যন্ত আবেদন জানানো হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই সানন্দে সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন। যাঁহাদের কাছে আমাদের আবেদন এখনও পৌঁছায় নাই তাঁহারা ও আমাদের নিরাশ করিবেন না, এই ভরসা রাখি।

যে-সমস্ত নূতন লেখক, নূতন চিত্রশিল্পী, যে-কোনও কারণেই হউক, প্রবাসীর সংস্পর্শে এতকাল আসেন নাই—তাঁহাদেরও সহযোগিতা আমরা আগ্রহের সহিত কামনা করি।

রচনা ইত্যাদির জন্য আমাদের সাধ্যমত দক্ষিণা-মূল্য আমরা দিব।

স্মারক গ্রন্থের জন্য রচনাদি ১৫ই শ্রাবণের মধ্যে আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক।

প্রবাসী ষষ্টি-বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ সম্পাদনা-বিভাগ
৭৫, লেক টেম্পল্ রোড, কলিকাতা-২৯

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

‘সাদা-কালো’

সূর্য্যাস্ত

ফটো : তপনকুমার বর্মন

৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬০শ ভাগ
১ম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

লোকসভার উপনির্ব্বাচন

কলিকাতার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে লোকসভা উপ-নির্ব্বাচনে কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রার্থী শ্রীইন্দ্রজিৎ গুপ্ত নির্ব্বাচিত হওয়ার নানা কথাবার্ত্তা ও মতামত প্রকাশ চলিতেছে। কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীঅশোককৃষ্ণ দত্ত ১৩৩১৩ ভোটে পরাজিত হইয়াছেন। ভোটের ফলাফল নিম্নরূপ ঘোষিত হয়:

কম্যুনিষ্ট: শ্রীইন্দ্রজিৎ গুপ্ত ৭১৫৪৮ ভোট, কংগ্রেস: শ্রীঅশোককৃষ্ণ দত্ত ৫৮২৩৫ ভোট এবং প্রজা-সমাজতন্ত্রী: শ্রীঅধীর ব্যানার্জ্জী ৫৫৩৬ ভোট পাইয়াছেন। আঞ্চলিক হিসাবে ভোট এই ভাবে পড়িয়াছে যথা:

	কংগ্রেস	কম্যুনিষ্ট	প্রজা-সমাজতন্ত্রী
চৌরঙ্গী	৭৭৮১	৩৯০০	১৭১
আলিপুর	৮৭০০	১৩৫৬১	৯২১
কালীঘাট	১১৩১২	১২৫৪৭	১০৭১
একবালপুর	৮১২১	৭৭১৭	৭৮৫
ফোর্ট	৬৫২৬	৫৮৪৫	১২৭০
গার্ডেনরীচ	৬৮২১	১০৫৭৯	২৯৪
বেহালা	৯৪২৯	১৭৩০০	৯২০

গত সাধারণ নির্ব্বাচনে কম্যুনিষ্ট ও অন্য চারটি বামপন্থী দলের সমর্থনে শ্রীবীরেন রায় ১২৫৭৮ ভোটে কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীঅশোককৃষ্ণ দত্তকে পরাজিত করেন। কিন্তু পরে নির্ব্বাচন ট্রাইবিউনালের বিচারে ঐ নির্ব্বাচন অসিদ্ধ প্রতিপন্ন হওয়ায় এই নির্ব্বাচন।

এই লোকসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকায় ৩ লক্ষ ৪০ হাজার নাম আছে। বর্ত্তমান উপনির্ব্বাচনে ফোটো তোলানোর অতি জঘন্য ব্যবস্থা করার দরুন মাত্র ২ লক্ষ ৩৮ হাজার ভোটার ফোটো পাইয়াছেন। লক্ষাধিক ভোটারের এই নির্ব্বাচনের অধিকার ফোটো তোলার ব্যবস্থার গোলমালে নষ্ট হয়। ইহার দায়িত্ব কাহার জানি না। তবে আমরা জানি যে, আমাদের এই এলাকার বাসিন্দা হিসাবে যে ভোটের অধিকার তাহা নষ্ট হইয়াছে যেহেতু কোনও সরকারী ক্ষমতাপ্রাপ্ত লোক এখানে ফোটো তুলিতে আসে নাই। পরে শোনা গেল যে, নিকটস্থ এলেন গার্ডেন্স্-এর উন্মুক্ত বাগানে ফোটো তোলাইবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। এই নির্দ্দেশ কয়জন জানিয়াছে জানি না এবং যাহারা ফোটো তোলাইয়াছে তাহারা যে যথার্থ লোক তাহা নির্দ্ধারণ করার কি ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহা খোঁজ করিয়াও জানিতে পারি নাই। অনেকের ধারণা এই ভাবে তোলা ছবির মধ্যে বহু ছবি মৃত বা স্থানান্তরগত লোকের হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। মোটের উপর এই জঘন্য ব্যবস্থা বর্ত্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্য সকল ব্যবস্থারই অনুরূপ হইয়াছে।

নির্ব্বাচনের ফলাফল সম্বন্ধে নানাজনে নানামত দিয়াছেন। কিন্তু স্থানীয় লোকের অভিজ্ঞতা কি তাহার খোঁজ করা কেহই কর্ত্তব্য মনে করেন নাই। কম্যুনিষ্ট পার্টির দলের এখন অকাল চলিতেছে তাহার মধ্যে এরূপ জয়লাভে তাঁহারা আত্মহারা হইয়া তাঁহাদের বাঁধাধরা গৎ গাহিয়া আকাশ ফাটাইতেছেন। কংগ্রেসের চৌরচক্র টাকার বস্তা উদরস্থ করিয়া এখন ঢোক গিলিতেছেন।

সাধারণ নির্ব্বাচনে যিনি ১২০০০ ভোটে পরাজিত হইয়াছিলেন, উপনির্ব্বাচনে তাঁহারই পুত্রকে দাঁড়

করাইলেন কি ভাবিয়া সে কথার কৈফিয়ৎ আমরা চাই শ্রীমান অতুল্য ঘোষ মহাশয়ের কাছে। কাগজে দেখা যায় যে, তিনি শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখিত এক পত্রে এই পরাজয়ের নানা কারণ দর্শাইয়াছেন, যার মধ্যে এই ফোটোগ্রাফের বিষয়ও রহিয়াছে। কিন্তু যে সকল কারণ দেখানো হইয়াছে তাহার প্রতিকারের কথা বা চিন্তা যে কেহই করিতেছেন তাহা ত শোনা গেল না।

আমরা জানি যে, এই অঞ্চলে এবং ইহার আশেপাশে কম্যুনিষ্ট পার্টি ব্যাপক ভাবে ভোট অভিযান করিয়াছিল। তাহাদের বক্তার দলের মধ্যে মুসলমান, হিন্দুস্থানী ও বাঙালী সবই ছিল। সেস্থলে কংগ্রেস কাজ আরম্ভ করে অনেক পরে এবং অতি অল্প ও বাজে লোকের দ্বারা, যাহাদের বলার উৎসাহ, ক্ষমতা এবং বিষয়বস্তু তিনটারই অভাব। মজুরি-পোষা বক্তৃতায় শ্রোতারও অভাব ছিল। ঘরে ঘরে ভোটের চেষ্টায় আমাদের কাছে কম্যুনিষ্ট প্রার্থীর কর্মীরা চারি বার আসেন, কংগ্রেসীদল একবার এবং "পি-এস-পি" একেবারেই নয়।

কম্যুনিষ্ট প্রার্থী দীর্ঘদিন পার্টির কাজ চালাইয়াছেন সুতরাং দলের ও দলের বাহিরে সুপরিচিত। ভোট অভিযান কি করিয়া চালাইতে হয় সে বিষয়ে তাঁহার পার্টির সুদক্ষ কর্মীদল ইঁহার কাছে সকল সহায়তাই পায়। কংগ্রেস প্রার্থী অল্পবয়স্ক এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে একেবারে অপরিচিত। তাঁহার পিতা গতবারের পূর্ব্বের বারে লোকসভায় গিয়াছিলেন এইমাত্র তাঁহার সপক্ষে ছিল। তাও তাঁহার পিতা যতদিন লোকসভায় ছিলেন ততদিনে বাংলার বা বাঙালীর স্বার্থরক্ষার জন্য বা দেশসেবার জন্য কি করিয়াছিলেন তাহার কোন নির্দ্দেশ প্রার্থীর পরিচয়-পত্রে নাই।

আমাদের প্রশ্ন এই যে, পরাজিত কংগ্রেস প্রার্থী অপেক্ষা অভিজ্ঞ বা পরিচিত লোক কি কংগ্রেসী দলে নাই? কত দিন আর এই ভাবে "জোড়া বলদ" প্রতীক্ সার্থক করার চেষ্টা চলিবে? বাংলার কংগ্রেসে এখন পুঁজিবাদ একটা অভিশাপ দাঁড়াইয়াছে এবং তাহারই ফলে এদেশের সন্তানসন্ততি অভিশপ্ত হইয়া চলিতেছে। আসামে বাঙালী ও বাংলা ভাষার অবস্থা তাহার উদাহরণ।

লোকসভায় এখন বাংলার হয়য়া বলিবার লোক নাই, ফলে আমরা সেখানে প্রতিপদে হটিতেছি। শ্যামাপ্রসাদ, লক্ষীকান্ত মৈত্র, মেঘনাদ সাহা, ইঁহাদের মহাপ্রয়াণের পর লোকসভায় এদেশের অবস্থা মূক-বধির ভিক্ষার্থীর। এবং এই অবস্থা সৃষ্টির দায়িত্ব কাহার তাহা সর্ব্বজন-বিদিত। প্রশ্ন এই যে, কবে ও কি করে এই অপগ্রহের শান্তি হইবে?

আসামে সরকারী ভাষা লইয়া আন্দোলন

অন্যান্য রাজ্যের মতোই আসাম রাজ্যে অসমীয়া ভাষাকে রাজ্যের সরকারী ভাষা করার পক্ষে তুমুল আন্দোলন সুরু হইয়া গিয়াছে। আসাম সাহিত্যসভা, আসাম কংগ্রেস এবং বিধানসভার অসমীয়া ভাষাভাষী সদস্যেরা একযোগে দাবি তুলিয়াছেন, আসামের সরকারী ভাষা হইবে অসমীয়া। শুধু বিধানসভায় নহে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, হাইকোর্টে, ডাক, তার, রেলপথ ও শুল্ক বিভাগেও এই ভাষা স্বীকৃত হইবে। অবশ্য এ আন্দোলন যুক্তিপূর্ণ এবং ইহা হওয়া উচিতও। কারণ, আমাদের সংবিধানেই বলা হইয়াছে, প্রতি রাজ্যের মাতৃভাষাই সেই রাজ্যের সরকারী ভাষা এবং সকল পর্য্যায়ের শিক্ষার মাধ্যম হইবে। তবে দেখিতে হইবে, আসামের মাতৃভাষা প্রকৃত কোন্‌টি। আসামে অসমীয়া, বাংলা এবং পাহাড়ী এই তিনটি ভাষার চলন। এই তিন ভাষাভাষীর সংখ্যা কাহারো অপেক্ষা কেহ ন্যূন নহে। ১৯৩১ সনের আদমসুমারিতে দেখা যায়, আসামে অসমীয়া ভাষাভাষীর সংখ্যা ছিল ২০ লক্ষ, বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা ৪০ লক্ষ। বিশ বৎসর পরে ১৯৫১ সনের লোকগণনায় দেখা গেল, অসমীয়া ভাষাভাষীর সংখ্যা বাড়িয়া ৪৯ লক্ষ হইয়াছে এবং বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা কমিয়া হইয়াছে ১৭ লক্ষ। এই পরিবর্ত্তন তাঁহারা আনিয়াছেন, শ্রীহট্ট জেলাটিকে আসাম হইতে বাহির করিয়া দিয়া। যাহার ফলে এই অসম্ভাব্য পরিণতি ঘটিয়াছে।

একদা লীগ মন্ত্রিসভার আমলে আদমসুমারির কৌশল কিভাবে অবিভক্ত বাংলার হিন্দুকে সংখ্যাল্প পরিণত করা হইয়াছিল এবং তাহার পরিণাম শেষ পর্য্যন্ত সমগ্র জাতির পক্ষে কি মারাত্মক হইয়াছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই আদমসুমারির দুমুখো আরোহণ-অবরোহণের অর্থ বুঝিতে কাহারও কষ্ট হয় না। বাংলা ভাষাভাষীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলে তো নহেই, সমান সংখ্যক হইলেও, অসমীয়া ভাষাভাষীরা তাঁহাদের লইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন না। আর তা পারিবেন না বলিয়াই, এই কৌশলের আশ্রয় তাঁহাদের লইতে হইয়াছে। এইজন্যই প্রয়োজন হইয়াছিল একদা বঙাল খেদা আন্দোলনের। বাংলা ভাষার কণ্ঠরোধের উদ্যম তাঁহাদের আজিকার নহে।

শুধু আসামেই কেন, এ ব্যবস্থা সর্ব্বত্রই। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, প্রশাসন সকল ক্ষেত্র হইতে তাঁহাদের মাতৃভাষা উৎখাতের আয়োজন চলিতেছে। এই ব্যাপারে উপরওয়ালার এই ভাষা-বৈরিতার পিছনে যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার হরণের মনোভাবটিই সুস্পষ্টভাবে কাজ করিতেছে তা যে-কোন চিন্তাশীল মানুষই বুঝিবেন। মানভূম, সিংভূম ও সাঁওতাল পরগণার বৃহৎ তল্লাট জুড়িয়া বঙ্গভাষাভাষীদের যেভাবে হিন্দীর রশারশি দিয়া বাঁধার আয়োজন চলিতেছে, কাছাড় এবং গোয়ালপাড়াতেও হইতেছে ঠিক তাহাই।

ইংরেজ যাহা করিয়া গিয়াছিল, তাহাদের উপর আমাদের হাত নাই। কিন্তু স্বাধীন ভারতে সীমানা কমিশন গঠিত হওয়ার পর অনেকে আশা করিয়াছিলেন, সাম্রাজ্যবাদী বিদেশীরা বাংলার যে-অনিষ্ট করিয়া গিয়াছে তাহা প্রতিকারের ব্যবস্থা হইবে। কিন্তু তাহা হইল না। বিহার মাতিয়া উঠিল তাহার আপন কোলে ঝোল টানিবার জন্য, আর আসাম গায়ের জোরে বাংলাকে দূরে সরাইয়া দিল। যদিও সীমানা কমিশন আসামের আদমসুমারির খতিয়ানকে মোটেই সন্দেহবিমুক্ত দৃষ্টিতে দেখেন নাই। যাই হোক, ইংরেজ-শাসকদের কৃত্রিম বিভাগই স্বাধীন ভারতে অকৃত্রিম বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এই অবিচারের প্রতিকার বাঞ্ছনীয় হইলে, বিহার ও আসামের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলগুলি পশ্চিমবঙ্গে ফিরাইয়া আনিয়া ভাষাভিত্তিক রাজ্যসীমা গঠনের সংবিধান-স্বীকৃত নীতিকে কার্য্যকরী করিয়া তোলার জন্যই আমাদের সচেষ্ট হওয়া উচিত। মাতৃভাষার স্বাধিকার বিসর্জ্জন দিয়া বঙ্গ ভাষাভাষীরা বিহারে ও আসামে যথাক্রমে হিন্দী ও অসমীয়ার তাঁবেদার হইবে, আর বাংলা দেশ নিশ্চেষ্ট হইয়া তাই দেখিতে থাকিবে, এ সম্ভবও নয়, সম্মানজনকও নয়। বলা বাহুল্য, সর্ব্বভারতীয় ঐক্যে আমাদের কাহারও অপেক্ষা কম আস্থা বা শ্রদ্ধা নাই। বরং এই প্রাদেশিক মনোভাব অন্যত্র প্রকট হইয়া উঠিতেছে, বাংলায় নহে। কিন্তু চিৎকার উঠিয়াছে বাংলা দেশ লইয়াই। আপন স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া ঐক্যের কথা কেহই চিন্তা করিতেছেন না। বিহারও নয়, আসামও নয়। যদি দেখিতাম, অসমীয়ার সঙ্গে বাংলাকেও আসাম যুগ্ম রাজ্যভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে এবং ভাষার স্বাধিকার রক্ষার জন্য তাহার আন্তরিকতার অভাব নাই, তাহা হইলে আমাদের বলিবার কিছুই ছিল না। কিন্তু কোথায় তাঁহাদের সে মনোভাব? সুতরাং আত্মরক্ষার প্রয়োজনে আজ বাঙালীকেও সতর্ক হইতে হইবে। গ

দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে ডাঃ রায়

দণ্ডকারণ্য দেখিয়া আসিয়া এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত আলোচনা করিয়া পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবারে মুখ খুলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বাসন-মন্ত্রী শ্রীখান্না ও তাঁহার মন্ত্রণালয়ের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে যে বিরূপ সমালোচনা সংবাদপত্রে ও জনসভায় হইয়াছে, তাহা অতিরঞ্জিত নয় এবং তাহা বিদ্বেষ প্রসূতও নয়। দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার রূপায়ণ এ পর্য্যন্ত ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে, যাহার ফলে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত বাস্তুহারাদের পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা একরূপ বানচালই হইয়া গিয়াছে। ইহার জন্য কে কতটা দায়ী, এ প্রশ্ন এখানে অবান্তর। তবে একথা জোর করিয়াই বলা চলে, পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের নীতি অনুসারে শ্রীখান্না তাঁহার দপ্তরের বিফলতার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। এজন্য শ্রীখান্নাকে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হইতেই হইবে।

শ্রীখান্না ঘোষণা করিয়াছিলেন, আগামী বৎসরেই এই পুনর্ব্বাসন দপ্তরের বিলোপসাধন করিবেন। ডাঃ রায় বলিয়াছেন, তাহা কখনই সম্ভব নহে। আগামী বৎসরে কেন, আর চার-পাঁচ বৎসরেও পুনর্ব্বাসন মন্ত্রণালয়ের বিলুপ্তি সম্ভব হইবে না। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও এই দপ্তরের জন্য ব্যয়-বরাদ্দের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, এই পুনর্ব্বাসন মন্ত্রণালয় কখনই শাসনযন্ত্রের একটা স্থায়ী অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না এবং যত শীঘ্র ইহার অবসান ঘটে ততই মঙ্গল—কি দেশের পক্ষে, কি উদ্বাস্তুদের পক্ষে। কিন্তু তাই বলিয়া শুধু বাহবা কুড়াইবার লোভে বা তাহাদের প্রয়োজন না ফুরাইতেই এই দপ্তর তুলিয়া দেওয়া যায় না। যতদিন না পুনর্ব্বাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়, ততদিন পর্য্যন্ত এ মন্ত্রণালয় চালু রাখিতে হইবে। মনে রাখা দরকার, উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন একটা প্রশাসনিক সমস্যা মাত্র নয়—ইহা প্রধানত একটি মানসিক সমস্যা। যাহার জন্য দায়ী ভাগ্যবিড়ম্বিত বাস্তুহারার দল নয়, ভারত রাষ্ট্রের বর্ত্তমান কর্ণধারদের রাজনীতি। পুনর্ব্বাসনের প্রশাসনিক দায়িত্ব যাহারই হউক না কেন, ইহার নৈতিক দায়িত্ব সমগ্র জাতির—সে দায়িত্ব আজ কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। সরকারও নয়, কংগ্রেসও নয়।

তথাপি একথা বলা চলে, একটা সুপরিকল্পিত নীতি গ্রহণ করিয়া চলিলে, এতদিনে উদ্বাস্তু সমস্যা সম্পূর্ণ মিটিয়া না গেলেও, অনেক কাজ হইতে পারিত। কিন্তু তাহা হয় নাই। আর তাহা হয় নাই বলিয়াই আজ এত

বিক্ষোভ। উদ্বাস্তু হইয়াও, আজ তাহারা সেখানে যাইতে আতঙ্কিত হইতেছে। তাহারা যে যাইতে চাহিতেছে না, তাহার মূলে রহিয়াছে শ্রীখান্নার দপ্তরের অক্ষমতা এবং হয়ত হৃদয়হীনতা। সেই ব্যর্থতার স্বাক্ষর হিসাবে আরও কিছুদিন উদ্বাস্তু শিবিরগুলি বজায় থাকিবে—শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, রাজ্যের বাহিরেও। খয়রাতী দানও বন্ধ করা চলিবে না—যে পর্য্যন্ত না শিবিরবাসী ছিন্নমূল পরিবারগুলির বিপর্য্যস্ত জীবনযাত্রা পুনর্ব্বিন্যস্ত হয়। এই যে অতিরিক্ত অর্থব্যয়—যাহাকে কোনোক্রমেই সদ্ব্যয় বলা চলে না, তাহার জন্যও দায়ী শ্রীখান্নার মন্ত্রণালয়ের অকর্ম্মণ্যতা।

সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, উন্নয়নের প্রাথমিক পর্ব্ব শেষ না করিয়া উদ্বাস্তুদের আর দণ্ডকারণ্যে পাঠানো হইবে না। কারণ তাঁহারা দেখিয়াছেন, এখনও সেস্থান বাসের অযোগ্য। যাহারা যাইবে, তাহাদের জমি চাই, জমির স্বত্ব নির্ব্যূঢ় হওয়া দরকার, চাসের বা ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের যোগান চাই, জল সরবরাহের ব্যবস্থা দরকার, আর দরকার সহানুভূতিশীল প্রশাসনের ব্যবস্থা। এই অভাবগুলি পূর্ণ হইলে, তখন আর দণ্ডকারণ্যে যাইতে কাহারও আপত্তি হইবে না। দণ্ডকারণ্য অঞ্চল সম্ভাবনায় পূর্ণ। সেই সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটিবে যদি আমরা সময় থাকিতে সাবধান না হই। সরকারও তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন। গ

শিক্ষাক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক জাতিসেবা

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ শ্রীমালীর পুণা-বিবৃতিতে সরকারের যে পরিকল্পনার আভাস সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা মধ্যশিক্ষার নিয়মতন্ত্রের একটি চমকপ্রদ পরিবর্ত্তন ঘটাইবার প্রয়াস। মধ্যশিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার পর ছাত্রকে এক বৎসর কাল জাতিসেবার কাজে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। ইহা বাধ্যতামূলক হইবে। এক বৎসর কালের জাতিসেবার কাজের অধ্যায় সমাপ্ত করিবার পর ছাত্র কলেজে প্রবেশ করিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও ডঃ শ্রীমালীর বিবৃতিতে একটি উল্লেখ আছে, যাহাকে অবশ্য শিক্ষাদর্শ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অথবা সম্পর্কচ্যুত কোন উদ্দেশ্য বলিয়া সন্দেহ করিবার যুক্তি নাই। ছাত্রদিগকে জাতি-সচেতন করিবার জন্য এই পরিকল্পনা উদ্ভাবিত হইয়াছে। কথাটির সরলার্থ একটু ব্যাখ্যা করিয়া লইয়া বুঝিতে পারা যায়, ছাত্রকে জাতীয় কল্যাণে আগ্রহশীল করিবার জন্য এই এক বৎসরের বাধ্যতামূলক জাতিসেবার কোর্স পরিকল্পিত হইয়াছে।

কিন্তু পরিকল্পনার শিক্ষার নীতিগত আদর্শের দিক হইতে দুইটি প্রশ্ন দেখা দিতেছে। মূলপ্রশ্ন, জাতিসেবার কাজ বলিতে কি ধরনের কাজ বুঝাইবে? এবং ইহা বাধ্যতামূলক করা হইবে কেন? যে নূতনত্ব পরিকল্পিত হইয়াছে তাহা সাধারণ প্রকারের পরিবর্ত্তন নহে। ছাত্রজীবনের শিক্ষার পক্ষে এক বৎসর কালের মূল্যও সামান্য নহে। এরূপ অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি নূতনত্ব প্রবর্ত্তন করিবার সার্থকতা সম্বন্ধে যেমন সকল দিক ভাবিবার ও বুঝিবার তেমনই সন্দেহ করিবারও প্রয়োজন আছে। সরল বিশ্বাসের আতিশয্যে এইরূপ বৃহৎ পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে উৎসাহিত হইবার যুক্তি নাই, উদ্দেশ্য যতই ভাল হউক না কেন। জাতিসেবার কাজ বলিতে যদি এমন কাজ বুঝায় যাহা ছাত্রের শিক্ষা-তন্ত্রের মান উন্নত করিবে এবং কলেজে উচ্চতর শিক্ষালাভের প্রার্থী হিসাবে তাহার যোগ্যতা বর্দ্ধিত করিবে, তবে এই ধরনের একটি এক বৎসরকালীন জাতিসেবামূলক কাজের অধ্যায় ছাত্রের জন্য নিয়মিত করিবার সার্থকতা সম্বন্ধে আপত্তি করিবার খুব বেশী যুক্তি থাকিতে পারে না। ছাত্রের জন্য সামরিক শিক্ষার সুযোগ সুলভ করিবার উদ্দেশে যেমন জাতীয় ক্যাডেট কোর গঠিত আছে। প্রত্যক্ষ সেবামূলক কাজের এক বৎসরের কোর্সও তেমনই ছাত্রের মানসিক ও নৈতিক উন্নয়নের শিক্ষাক্রম হিসাবে সার্থক হইতে পারে। কিন্তু সেবামূলক কাজ হইয়াও ইহা মূলতঃ শিক্ষামূলক হওয়া উচিত। তাহা না হইলে ইহা বস্তুতঃ বাধ্যতামূলক শ্রমদানের ব্যাপার হইয়া উঠিবে, যাহা নিছক শ্রমিকতা ছাড়া আর কিছু হইতে পারিবে না।

সুতরাং এই নিয়মকে প্রবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। মনে হয় বাধ্যতার প্রশ্নটিই এক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি করিতেছে। এমনকি সংবিধানে বিহিত ব্যক্তির মৌলিক অধিকারের প্রতিশ্রুতির সহিত এইরূপ বাধ্যতামূলক জাতিসেবার কাজের নীতিগত অসামঞ্জস্য লক্ষিত হইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ স্মরণ করিলে বলিতে হয়, কেন্দ্রীয় সরকারের উৎসাহ মধ্যশিক্ষার ছাত্রদিগের সম্পর্কে ভিন্ন নীতির ভিত্তি অবলম্বন করিতে চাহিতেছেন। ডঃ রাধাকৃষ্ণনের নেতৃত্বে গঠিত সেই কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের জন্য এবং সেই প্রসঙ্গে মধ্যশিক্ষার ছাত্রের জন্যও সমাজসেবার কোর্স বিহিত করিবার সুপারিশ করিয়া সুস্পষ্টভাবে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই সমাজসেবার কোর্স সম্পূর্ণভাবে ছাত্রের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত

আগ্রহের বিষয় হইবে। এবং ইহা হইবে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছা-ভিত্তিক। আমরাও মনে করি, বাধ্যতার বিষয় হইলে এইরূপ জাতিসেবার কাজ যদি সার্থক শিক্ষাক্রম হিসাবেও প্রবর্ত্তিত হয় তবুও ইহার মধ্যে নানা জটিলতার ও বিড়ম্বনার সম্ভাবনা নিহিত থাকিবে। অত্যুৎসাহের সহিত একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিবার মতো ইহা লঘু বিষয় নহে।

অবশ্য ছাত্রদলের চরিত্রগঠন ও কর্ম্মপটুত্ব বিষয়ে বর্ত্তমানে যে সকল কঠিন সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহার সমাধানের জন্য শেষ পর্য্যন্ত বাধ্যতামূলক কঠোর ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন হয়ত করিতেই হইবে। কিন্তু সেখানেও শিক্ষক বা পরিচালক সমস্যা থাকিবে। তাহার ব্যবস্থা কি হইবে? গ

বেরুবাড়ি সম্বন্ধে সুপ্রীম কোর্টের রায়

বেরুবাড়ি লইয়া যে মামলা চলিতেছিল, এতদিনে তাহার অবসান হইল। সুপ্রীম কোর্ট রাষ্ট্রপতিকে জানাইয়া দিয়াছেন, বেরুবাড়ি ইউনিয়ন ভারতেরই অঙ্গ, সংবিধান সংশোধন না করিয়া এই এলাকার অংশবিশেষও পরহস্তে সমর্পণ করা চলে না। এই সংবিধানের বিধি ভাঙিবার সাধ্য সরকারেরও নাই।

চরম কথা! অথচ শ্রী নেহরু বহু পূর্ব্বে ইহা হস্তান্তর করিয়া দিয়াছেন। রাতারাতি এবং চুপি চুপি কয়েক হাজার অধিবাসী সমেত ভূমিখণ্ড পররাষ্ট্রেপাচার—কেন্দ্রীয় সরকার ভাবিয়াও দেখেন নাই যে, তাঁহারা যাহা করিতে বসিয়াছিলেন তাহা আইনত নিষিদ্ধ। যে নেহরু-নূন চুক্তি বেরুবাড়িকে পর করিয়া দেওয়ার আয়োজনের মূলে, তাহার নৈতিক ভিত্তি বলিয়া কোন বস্তু নাই। সীমান্ত রক্ষায় অক্ষম প্রধানমন্ত্রী প্রতিবেশীর কাছে ভিক্ষা চাহিলেন শান্তি। প্রতিপক্ষ বিনিময়ে যৌতুক চাহিল। বেরুবাড়ি সেই যৌতুক—চুক্তি-পত্রটা আসলে দানপত্র। ইহা মন-স্তুষ্টি ছাড়া কিছু নয়। ১৯৫০ সনের নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি, আর ১৯৫৮ সনের নেহরু-নূন চুক্তি একই জনমত-নিরপেক্ষ নির্ব্বিকার মনোভাবের ফল।

কথা হইল, তিনি জনমতকে উপেক্ষা করেন কি হিসাবে? বাংলার জনসাধারণ জানিয়াছে, রাজ্য-সরকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তবু বাংলার বিধানমণ্ডলী তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। সেই প্রতিবাদের প্রতি-ধ্বনি তুলিয়াছে প্রাদেশিক কংগ্রেস এবং বিরোধী প্রত্যেকটি দল।

যদিও জানি, এইখানেই ইহার পরিসমাপ্তি ঘটিবে না। কারণ, সংবাদে দেখিতেছি, নাকি সংবিধানই বদলাইয়া ফেলা হইবে। তুচ্ছ সংবিধানের কাছে ভারতের প্রধান মন্ত্রী ছোট হইয়া যাইতে পারেন না। তাই সংবিধা[ন] সংস্কার অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। দেখিতেছি, শ্রী নেহরুর কাছে জনমতের চেয়ে একটা চুক্তিপত্রের মূল্য বেশী। কিন্তু চুক্তি হইয়াছে কাহার সঙ্গে? সেই পাকি[-] স্থান সরকার আর নাই, সেই নূন সাহেবও নাই। দেশে[র] মন পায়ে ঠেলিয়া, বিদেশের মন-জয়ের এই রীতিকে দেশবাসী কোনদিনই প্রশ্রয় দিবে না। তোষণ-নীতি[র] পরিণাম যাহাই হউক, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি [যে] অসঙ্কোচে আপনার মত ব্যক্ত করিয়াছেন, ইহার মূল্য কম নয়। সুপ্রীম কোর্টের অভিমত গণতান্ত্রিক বিশ্বাসকে নূতন মর্য্যাদা দিয়াছে। নানা দেশে উচ্চতম ধর্ম্মাধিকরণ গণতন্ত্রের প্রহরী। সকলের স্বার্থকে সমদৃষ্টিতে সে-ই দেখে, আইনের রক্ষাকবচ, সংবিধানে স্বীকৃত মৌলি[ক] অধিকারের আদর্শকে ভূলুণ্ঠিত হইতে দেয় না সে-ই। তাহার সতর্ক দৃষ্টি আছে বলিয়া 'জনগণের শাসন জন-গণের দ্বারা, জনগণের জন্যই'—গণতান্ত্রিক মন্ত্রের এই প্রতিশ্রুতি প্রহসনে পরিণত হয় না।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্যের কথা, শ্রী নেহরু—যিনি গণ-তন্ত্রের প্রবর্ত্তক, তিনিই সব সময় গণতন্ত্রকে অনুসরণ করিয়া চলেন না। আমরা অনুরোধ করিব, তিনি একটা নীতি মানিয়া চলুন। গণতন্ত্র ও 'ডিক্টেটরশিপ'-এর খিচুড়ি বানাইবেন না। গ

রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী আয়োজনে সরকার

প্রতি বৎসর রবীন্দ্র জন্ম-বার্ষিকী যেভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহাতে আর সবই আছে কেবল রবীন্দ্রনাথ নাই—এইরূপ একটি কথা উঠিয়াছে। পূজা-পার্ব্বণাদিতে অবশ্য এই আনুষ্ঠানিক অত্যাচারের কথা খাটে বটে। সেখানে দেখিয়াছি, 'মা'র পূজায় 'মা' নাই, আর সবই আছে। নাচ আছে, গান আছে, হৈ-হুল্লোড় এবং কর্ণ-পীড়াদায়ক মাইক আছে। পূজার নামে এই অত্যাচার আমরা প্রতি বৎসর করিয়া আসিতেছি। কিন্তু রবীন্দ্র-নাথের বেলায় সেকথা খাটে না। উৎসবের অত্যাচার হয়ত কিছু আছে, কিন্তু সবই রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করিয়া। তাঁহারই রচিত গান, কাব্য, নাটক এবং তাঁহাকে লইয়াই আলোচনা বক্তৃতাদি হইয়া থাকে। এক কথায় তাঁহাকে ঘিরিয়াই আমরা 'মধুচক্র' রচনা করিয়া থাকি। যাহা কিছু হয় তাহা রবীন্দ্রনাথকে লইয়াই। সুতরাং মূল উদ্দেশ্য আমাদের ঠিকই থাকে।

রবীন্দ্রনাথ ভারতবাসীর কাছে ঠিক একটা মানুষ মাত্র ছিলেন না—তিনি ছিলেন একটা জীবন্ত ভাবাদর্শের মত। সারা দেশের বিহ্বল অনুরাগ ও বিমুগ্ধ প্রণতি—তাঁহাকে ঘিরিয়া নিত্য গুঞ্জরিত হয়। অবশ্য একথা বলাই নিষ্প্রয়োজন যে, এই অবুঝ বিহ্বলতার সোপান পার হইয়া আমাদের পূর্ণ উপলব্ধিতে পৌঁছিতে হইবে এবং তাহা করিতে হইলে সর্বাগ্রে ও সর্বতোভাবে আমাদের করিতে হইবে, তাঁহার রচনার অনুশীলন। কারণ, সত্যকার যে রবীন্দ্রনাথ—তিনি আজ আর কোথাও নাই, আছেন তাঁহার বহু বিচিত্র রচনার মধ্যে। কিন্তু এই অনুশীলন করা তো সহজ কথা নয়। সে সময়, সুযোগ ও সামর্থ কয়জনের আছে? তিনি সহস্রাধিক কবিতা ও অনুরূপ সংখ্যক গান, শতাধিক গল্প, ছয় শতাধিক প্রবন্ধ নাটক প্রহসন গীতিনাট্য উপন্যাস—কয়েক হাজার পত্র এবং ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ ও ইংরেজী গ্রন্থ কত যে লিখিয়া গিয়াছেন তাহার আর সংখ্যা নাই। এই দুস্তর সাগর পাড়ি দেওয়া এবং দিয়া পূর্ণ উপলব্ধির কিনারায় পৌঁছানো বড় সহজ কথা নয়। অর্থ সামর্থ, জ্ঞান ও মানসিক যোগ্যতা কোনটাই এ পথে সাধারণ মানুষের সহায়ক নয়।

কিন্তু এই কার্য্যকেই সহজ করিয়া তুলিতে হইবে। এই দুরধিগম্যতার বেড়া ভাঙিয়া রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ মানুষের কাছে আনিতে হইবে। তা আনিবার একমাত্র উপায়, রবীন্দ্র-রচনাগুলি সাধারণের হাতে তুলিয়া দিবার মত সুলভ মূল্য নির্দ্ধারণ। মনে রাখিতে হইবে, চলনসই রকম লেখাপড়া করিতে সমর্থদের মধ্যেই সত্যকার রবীন্দ্রনাথ এখনও প্রায় অনাবিষ্কৃত। এই যে এত বড় একটা অসামান্য মানুষ আমাদের মধ্যে আসিয়াছিলেন এবং একাদিক্রমে অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল দুই হাতে ভাবের ঐশ্বর্য্য ছড়াইয়া গেলেন, ইহাকে আমরা বুঝিলামও না, বুঝাইলামও না। ইহা অপেক্ষা বড় অকৃতার্থতা ভ্রান্তির আর কি হইতে পারে? কাজেই শহরের উৎসব-মঞ্চে রবীন্দ্রোৎসব যাহা হইতেছে তাহা হউক, প্রকৃত (রবীন্দ্র-প্রচারের জন্য অন্য রাস্তা ধরিতে হইবে।) আগামী বৎসর রবীন্দ্র-জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব। আমরা শুনিতেছি, ভারত সরকার এই শতবার্ষিকীকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিবেন। কিন্তু যাহা সর্বাগ্রে প্রয়োজন—(রবীন্দ্র-রচনাবলী অতি সুলভ মূল্যে সর্বসাধারণের ক্রয়-সামর্থের ভিতর যাহাতে থাকে, সেরূপ ব্যবস্থা সরকার করেন নাই।) পূর্ব্ব ইতিহাস স্মরণ করিয়া বলিতে বাধ্য হইতেছি, সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ সংস্কৃতিই সীমাবদ্ধ থাকিয়াছে শুধু সহরে মধ্যবিত্তদের মধ্যে, সাধারণ মানুষ তাহার নাগাল পান নাই। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিম সকলের সাধনাই তাই এক হিসাবে ব্যর্থ হইয়াছে—হইয়াছে রবীন্দ্রনাথেরও। কারণ দেশের যাঁহারা বারো আনা অংশ, তাঁহারাই রহিয়াছেন দূরে পড়িয়া। এই দূরের মানুষকে কাছে আনিবার দায়িত্ব আজ সরকারকেই লইতে হইবে। যে অর্থ তাঁহারা এই উপলক্ষ্যে ব্যয় করিতে যাইতেছেন, সেই অর্থের একটা মোটা অংশ ব্যয়িত হোক, যাহাতে রবীন্দ্র-রচনাগুলি সকলে অতি সুলভ মূল্যে পাইতে পারে। কারণ রবীন্দ্রনাথ রহিয়াছেন তাঁহার রচনার মধ্যে। তাঁহাকে চিনিতে হইলে, জানিতে হইলে তাঁহার বাণীর মধ্য দিয়াই জানিতে হইবে। গ

দিল্লীতে চৌ-নেহরু বৈঠক ব্যর্থ

নয়া দিল্লীতে ছয়দিন ধরিয়া চীন-ভারত সীমান্ত লইয়া শ্রীনেহরু এবং শ্রী চৌ-এন-লাইয়ের মধ্যে যে ঐতিহাসিক বৈঠক হইয়া গেল, একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে ইহা কোন দিক দিয়া সার্থক ত হয়ই নাই, বরং বলা যাইতে পারে ব্যর্থ হইয়াছে। আশাবাদী যাঁহারা তাঁহারা হয়ত অনেক কিছুই আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা জানিতাম, চীন কোনদিক দিয়াই অবনমিত হইবে না। এবং যাহা তাহারা দখল করিয়া বসিয়াছে তাহা হইতে এক পাও পিছু হটিবে না। শুনা যাইতেছে, আরও আলোচনার জন্য শ্রীনেহরু পিকিংয়ে আমন্ত্রিত হইয়াছেন। কিন্তু হইবে কি? হইবে, কতকগুলি দলিল নথিপত্র ঘাঁটাঘাঁটি এবং পরস্পরের মধ্যে কথা কাটাকাটি। কিন্তু অকারণ কথা বৃদ্ধি করিয়া ত লাভ নাই, যেখানে চৌ-এন-লাইয়ের অভিমত সুস্পষ্ট। "আমরা ম্যাকমেহন লাইন মানিয়া লইতেছি। তোমরা ইহার বদলে আকসাই চীন বা লাডাক অঞ্চলের চীনের অধিকার মানিয়া লও।"

এই কথা তাঁহার শেষ কথা। সুতরাং মীমাংসার পথ কোথায়? বলা বাহুল্য, শ্রীনেহরু এ অধিকার মানিয়া লইতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, ইহা কোন বিনিময়ের প্রশ্ন নয়। অর্থাৎ ম্যাকমেহন লাইনের বদলে আকসাই চীন ও লাডাক অঞ্চলের দাবি স্বীকার করা যায় না এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী মনে করেন যে, আমাদের হাতে যে সমস্ত দলিল ও প্রমাণপত্র আছে, সেগুলির দ্বারা ভারতবর্ষের দাবীই সপ্রমাণিত হইবে। শ্রীনেহরু আরও পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন যে, মূলগত

তথ্যগুলি সম্পর্কেই দুই গবর্ণমেণ্টের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। যেখানে মূলগত তথ্য সম্পর্কে মতভেদ, সেখানে স্বভাবতই যুক্তিতর্ক ও বিশ্লেষণেরও তফাৎ ঘটিবে এবং এই তফাতের জন্যই দুই পক্ষ কোনও মীমাংসায় পৌঁছিতে পারেন নাই। অর্থাৎ সীমানা-বিরোধ সম্পর্কে মূলগত মতবৈষম্য আগের মতই রহিয়া গিয়াছে এবং শীঘ্র এই বৈষম্য দূর হইবে কিনা, তাহাও নিতান্ত অনিশ্চিত। কারণ জুন মাস হইতে যে সমস্ত সরকারী এক্সপার্টদের বৈঠক বসিবে, তাঁহাদের হাতে বিরোধ-মীমাংসার কোনও ক্ষমতা বা অধিকার নাই। তাঁহারা কেবলমাত্র ঐতিহাসিক ও দলিলগত তথ্যগুলির অনুসন্ধান করিবেন এবং সেগুলি সাজাইয়া গুছাইয়া স্ব স্ব গবর্ণমেণ্টের কাছে দিবেন। সুতরাং ভবিষ্যৎ খুব আশাপ্রদ, এমন কথা বলা যায় না।

চীনের মানচিত্র অনুসারে ভারতের হিমালয়বর্ত্তী মোট ৫০ হাজার বর্গ মাইল চীনারা দাবি করিতেছেন। ইহার মধ্যে ম্যাকমেহন লাইনের প্রায় ৩৬ হাজার বর্গ মাইলের উপর তাঁরা দাবি ত্যাগ করিতে ও বর্ত্তমান সীমানা মানিয়া লইতে সম্মত আছেন, কিন্তু ইহার সর্ত্ত এই যে, উত্তর-পশ্চিমে লাডাক অঞ্চলের বাকি ১৫ হাজার বর্গ মাইলের উপর চীনের দখলদারি মানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু এই প্রকার ভূমি-বিনিময় সর্ত্তে ভারত সরকার রাজী হইতে পারেন না। সুতরাং বর্ত্তমান আলোচনা-বৈঠক সে দিক হইতে ব্যর্থ হইয়াছে।

প্রায় অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে কাশ্মীর-জম্মু লইয়া। ঠিক এমনি করিয়াই একদা পাকিস্থানী হানাদাররা জম্মু অধিকার করিয়া লইয়াছিল—যেখান হইতে আজও তাহাদের সরানো গেল না। এই পাকিস্থানী হানাদারদের সময়মত খেদাইয়া বিদায় করিবার সুযোগ ভারতবর্ষ পাইয়াছিল। সে সুযোগ শ্রীনেহরু কেন যে বিসর্জ্জন দিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জের দরবারে ছুটিলেন তাহা আজও লোকে ভাবিয়া পায় না। বার বৎসর পূর্ব্বে পাকিস্থানী হানাদারদের তাড়াইয়া দিয়া সমগ্র কাশ্মীরভূমির উপর ভারতের ন্যায্য এবং আইনসঙ্গত অধিকার দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ করিবার কোন বাধা ছিল না—না বাহিরের বাধা, না ভিতরের। সে সময় বাদ সাধিয়াছিলেন শ্রীনেহরু স্বয়ং। তাহার ফলেই কাশ্মীর আজও দ্বিধাবিভক্ত।

কাশ্মীর রক্ষার জন্য ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সশস্ত্র অভিযান যখন পূর্ণ সাফল্য অর্জ্জন করিতে প্রবল শক্তিতে আগাইয়া চলিতেছিল, তখন শ্রীনেহরু সেই অভিযান অকস্মাৎ থামাইয়া দিয়া কার্য্যতঃ কাশ্মীরের এক অংশের উপর পাকিস্থানী দখলদারী কায়েম হইবার সুযোগ করিয়া দেন। দ্বিধাগ্রস্ত নেহরুনীতির এই হিমালয়-সমান ভুলের ফলে আজও কাশ্মীর-প্রশ্ন লইয়া বৃথাই চরকি-পাক চলিতেছে। কাশ্মীর হইতে পাকিস্থানী হানাদার বিতাড়নের ব্যাপারে শ্রীনেহরু যে শোচনীয় দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার বিষময় ফল ফলিতেছে আরও নানা দিকে। সুচতুর চীন সরকার লক্ষ্য করিয়াছেন, ছলে বলে কৌশলে ভারত-ভূখণ্ড একবার দখল করিয়া বসিতে পারিলেই হয়—ভারত সরকার প্রতিবাদমাত্র করিতে জানেন, প্রতিকারে অশক্ত। চীন ভালরূপেই জানে, একবার জাঁকিয়া বসিতে পারিলে আর তাহাকে হটায় কে?

গ

লণ্ডনে কমন্‌ওয়েলথ অধিবেশন

গত ৩রা মে লণ্ডনে কমন্‌ওয়েলথ-এর অধিবেশন সুরু হইয়াছে। এই কমন্‌ওয়েলথ পুরাতন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরই রূপান্তর। কালচক্রের আবর্ত্তনে প্রাচীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মূলগত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ব্রিটেনের সহিত কমন্‌ওয়েলথ রাষ্ট্রগোষ্ঠীর এখন আর প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক নাই। কমন্‌ওয়েলথ গোষ্ঠীর সকলেই এখন মর্য্যাদায় ও রাজনৈতিক কৌলীন্যে সমান—কেহ কাহারও অপেক্ষা নীচু নহে।

এই কমন্‌ওয়েলথ জন্মগ্রহণ করিয়াছে গত মহাযুদ্ধের পর। বর্ত্তমানে ডোমিনিয়ন বলিয়া এখন আর কিছু নাই, সেগুলি ইদানীং কালে কমন্‌ওয়েলথ রাষ্ট্র আখ্যা পাইয়াছে। তাহাদের এখন ব্রিটেনের তাঁবেদার বলা চলে না। ১৯৪৭ সনে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পর কমন্‌ওয়েলথের পুরাতন কাঠামোটা বজায় থাকিলেও, তাহার যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে তাহা বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন। এক, কমন্‌ওয়েলথের ব্রিটিশ অভিধাটি খসিয়াছে, দুই, ব্রিটেনের প্রাধান্য সঙ্কুচিত হইতে হইতে প্রায় শূন্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তিন, শ্বেতাঙ্গ জাতিগুলির একাধিপত্য বিলুপ্ত হইয়াছে, চার, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত যে কোন দেশই স্বাধীনতা লাভ করিলেই ইহার পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন সদস্য বলিয়া গণ্য হইবে এমনই একটা অলিখিত নীতির সৃষ্টি হইয়াছে।

বর্ত্তমানে এই কমন্‌ওয়েলথ-গোষ্ঠীতে আছেন ব্রিটেনকে লইয়া শ্বেতাঙ্গ প্রধান পাঁচটি এবং বাকী পাঁচটি—ভারতবর্ষ, পাকিস্থান, সিংহল, ঘানা, মালয় এবং এশিয়া ও আফ্রিকার অশ্বেত অধিবাসীদের দেশ।

কমন্‌ওয়েলথ সংস্থার সুবিধা এই যে, ইহার বাঁধা

নিয়মকানুন বলিয়া কিছু নাই। অতএব কমনওয়েলথে যোগদান করিতে গেলে কোন কিছু বর্জ্জন করিতে হয় না এবং কোন হীনতাও স্বীকার করিতে হয় না—এমনকি পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রকেও মানিয়া লইবার প্রয়োজন নাই। যেমন পাকিস্থানে গণতন্ত্র বলিয়া কিছু নাই, কিন্তু তাহাতে কমনওয়েলথের মধ্যে থাকা তাহার আটকায় নাই। আবার সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার না করিয়াও একাধিক রিপাবলিক কমনওয়েলথের মধ্যে রহিয়াছে। কমনওয়েলথের যোগসূত্র এত ক্ষীণ, এত প্রচ্ছন্ন এবং এত দুর্লক্ষ্য যে, তাহার অস্তিত্ব কিসের উপর নির্ভর করে তাহা বলা বড়ই কঠিন। কিন্তু তবুও যে কমনওয়েলথের অস্তিত্ব বিপন্ন হয় নাই তাহার কারণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে না হইলেও অর্থনীতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু সুবিধা ইহার গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি পাইয়া থাকে। লাভটা পারস্পরিক. সম্ভবত ইহাই কমনওয়েলথকে আজও সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে।

আজকের এই কমনওয়েলথ সম্মেলন হইতেছে ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণ-বৈষম্য যে সঙ্কটের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার পরিসমাপ্তি না ঘটিলে কমনওয়েলথ আর থাকিবে কিনা সন্দেহ। ইহার পূর্ব্বে কমনওয়েলথকে বহু বিরোধের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা যে ভাবে সভ্যতার ভিত্তিকে লইয়া টান দিয়াছে, এরূপ আর কেহ করে নাই। রাজনৈতিক আদর্শ লইয়া মতের অমিল হইলেও সেখানে মৈত্রী ও সহযোগিতা সম্ভব, কিন্তু মানবিকতার যেখানে চরম অপমান হয় সেখানে কোনও বোঝাপড়া, কোনও জোড়া-তালি সম্ভব হয় না। এই মূল প্রশ্নই এখন রহিয়াছে কমনওয়েলথের সম্মুখে। ইহারই জবাবের উপর নির্ভর করিবে কমনওয়েলথের অস্তিত্ব। যদি ইহার সদস্যেরা বৈষয়িক বা রাজনৈতিক সুবিধার খাতিরে মানবিকতার মূল সূত্র বিসর্জ্জন দেয়, তাহা হইলে এমন রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সহিত সম্পর্ক রাখা ভারতবর্ষের কি প্রয়োজন? মনুষ্যত্বের অবমাননার প্রতিবাদ আর কেহ না করুক, ভারতবর্ষের করা উচিত। গ

আমেরিকার সহিত ভারতের নূতন চুক্তি

আমেরিকার সহিত ভারতের আবার একটি নূতন চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। চুক্তি ইহার পূর্ব্বে আরও অনেক হইয়াছে, তবে এবারের চুক্তি একটু ভিন্ন রকমের। এ চুক্তির ফলে আগামী চারি বৎসরের মধ্যে ভারত এক কোটি সত্তর লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য আমেরিকা হইতে আমদানী করিতে পারিবে।

খবরটি সু-খবর। কারণ ইহা দ্বারা ঘাটতি নিরসন ত হইবেই, উপরন্তু দেশ পৌনঃপুনিক খাদ্য-সংকট হইতে অব্যাহতি পাইবে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিতে পারিবেন। তবে একটা কথা ভাবিবার আছে। এত বেশী খাদ্যশস্য আমদানী হইলে, তাহা ভাল ভাবে মজুত রাখার এবং অপচয় ও শস্য নাশ বন্ধ করার ব্যবস্থাদি বিশেষ আয়োজন-সাপেক্ষ। সে বিষয়ে সরকার নিশ্চয়ই সতর্কতা অবলম্বন করিবেন।

তবু বলিতে হইবে, সদ্যস্বাক্ষরিত চুক্তিটি নানাদিক দিয়া বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মাকিন সরকার মূল্য বাকী রাখিয়া দীর্ঘকাল পরে ভারতীয় মুদ্রা দ্বারা পরিশোধের সর্ত্তে ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষকে প্রায় পাঁচশত কোটি টাকার খাদ্য-শস্য সরবরাহ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে কখনও একটি চুক্তি দ্বারা পৃথিবীর কোথায়ও এত বড় লেনদেন হয় নাই। এবং চারি বৎসরের মেয়াদে কোন লেনদেনও ইতিপূর্ব্বে হয় নাই। পূর্ব্বে এ ধরনের লেন-দেন দ্বারা মাত্র সাময়িক ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা হইত। এই প্রথমবার একটি দেশকে স্থায়ী শস্য-ভাণ্ডার স্থাপনের এবং তদ্দ্বারা স্থায়ী ভাবে খাদ্য-সংকট সমাধানের জন্য সাহায্য দেওয়া হইতেছে। চুক্তিতে নির্দ্দিষ্ট শস্যের মূল্য এবং ভারতে উহা স্থানান্তরের ব্যয় সর্ব্বসাকুল্যে সাতশত কোটি টাকারও বেশী। গম ও চাউলের মূল্য এবং মাশুলের অর্দ্ধেক বাবদ কিঞ্চিদধিক ১২৭ কোটি ডলার (ছয় শত কোটি টাকার কিছু বেশী) মার্কিন সরকার ভারতবর্ষকে সাহায্য করিবেন। প্রথম বৎসরের জন্য নির্দ্দিষ্ট মাল স্থানান্তরের জন্য আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁহারা প্রায় ৩২ লক্ষ কোটি ডলার বরাদ্দ করিতেছেন। ভবিষ্যতে প্রতি বৎসরের প্রথমদিকে ভারত সরকারের সহিত আলোচনার পরে এ সম্পর্কে বার্ষিক বরাদ্দ ও রপ্তানীর ব্যবস্থাদি স্থির করা হইবে।

আলোচ্য চুক্তিতে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য—মার্কিন সরকার ভারতীয় মুদ্রায় ইহার মূল্য গ্রহণ করিবেন, এবং এই বাবদ তাঁহাদের পাওনার মধ্যে শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ উন্নয়ন-পরিকল্পনায় লগ্নীর জন্য ভারত সরকারের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। ইহার মধ্যে অর্দ্ধেক দান হিসাবে, বাকী অর্দ্ধেক দীর্ঘ-মেয়াদী কর্জ্জ হিসাবে। অর্থাৎ মোট মূল্যের মধ্যে প্রায় ২৬৮ কোটি টাকা সাহায্য ও ২৬৮ কোটি টাকা কর্জ্জ হিসাবে দেওয়া হইবে। চুক্তিটির তাৎপর্য্য বহুমুখী ও সুদূর-প্রসারী। চারি বৎসরের মত খাদ্য-সংকটের দুশ্চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার ফলে ভারত সরকার উৎপাদন

বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিতে পারিবেন, আমদানী শস্য বিক্রয়ের দ্বারা দেশবাসীর নিকট হইতে বৎসরে প্রায় পৌনে দুই শত কোটি টাকা রাজকোষে টানিয়া লওয়ায় বাজারে অর্থ সরবরাহ সমপরিমাণে হ্রাস পাইবে, ফলে মুদ্রাস্ফীতির কিছুটা সঙ্কোচ ঘটিবে। এবং প্রায় ২৬০ কোটি টাকা সাহায্য ও সমপরিমাণ দীর্ঘ-মেয়াদী কর্জ্জ-পাওয়ার ফলে থোক পাঁচশত কোটি টাকারও বেশী উন্নয়ন পরিকল্পনায় লগ্নীর জন্য হাতে আসিবে। ইহা হইতে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির উপযোগী ব্যবস্থাদি প্রবর্ত্তনের এবং ভালভাবে শস্য মজুত রাখার জন্য আধুনিক ধরনের গোলা তৈয়ারীর ব্যয় সংকুলান করা যাইবে। ইহা ছাড়া, সরকারী ও বে-সরকারী স্তরে শিল্প-কারবারের জন্যও মজুত অর্থের একটা অংশ পাওয়া যাইবে। অর্থাভাবে বিব্রত ভারতের পক্ষে ইহা যে বিশেষ স্বস্তিদায়ক, সে কথা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নাই। সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয়—আলোচ্য চুক্তি দ্বারা ভারতের উন্নয়ন-পরিকল্পনা সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য মার্কিন সরকারের আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছে। নতুবা একটি চুক্তির মাধ্যমে এত বেশী সাহায্য করিতে তাঁহারা আগাইয়া আসিতেন না।

যাহা হউক, তৃতীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রাক্কালে ইহা বিশেষ আশার কথা।

গ

পাকিস্থানের সহিত ভারতের নূতন বাণিজ্য-চুক্তি

আবার পাকিস্থানের সহিত ভারতের বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। এই নূতন চুক্তির মেয়াদ দুই বৎসর-কাল। এই নূতন চুক্তিতে স্থির হইয়াছে, ভারত পাকিস্থান হইতে পাট, পাটের ছাট, তুলা, চামড়া, পান, সুপারি, সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ, কাগজ, শুকনা মাছ, সৈন্ধব লবণ, শিমুল তুলা প্রভৃতি তেতাল্লিশ রকম পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিবে এবং পাকিস্থান ভারত হইতে লইবে—অভ্র, রঞ্জন ও ট্যান করিবার দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য, কলকব্জা, বৈদ্যুতিক তার, বাই-সাইকেল, সিনেমার ফিল্ম, চিনি, চা, কফি, মসলা, লৌহ ও ইস্পাত, সিমেন্ট, সেলাইয়ের কল প্রভৃতি ছেষট্টি প্রকার পণ্যদ্রব্য। স্থির হইয়াছে যে, উভয় দেশ উভয় দেশ হইতে বৎসরে ৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকার মত পণ্যদ্রব্য কিনিবে এবং এই আদান-প্রদানে যদি কোন দেশের বাণিজ্যে ঘাটতি হয়, তাহা হইলে এই ঘাটতির টাকা ষ্টার্লিং মুদ্রা দিয়া পরিশোধ করিতে হইবে।

এই চুক্তি দেখিয়া সকলেই বুঝিবেন যে, উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য-প্রসারের যেরূপ সুযোগ-সুবিধা ছিল, এই চুক্তিতে তাহার অতি সামান্য অংশই লওয়া হইয়াছে। ভারত ও পাকিস্থান একই সীমান্তবর্ত্তী দুইটি দেশ। উহার মধ্যে ভারতে এমন অনেক শিল্পদ্রব্য, শিল্পের কলকব্জা, রাসায়নিক দ্রব্য, খনিজ দ্রব্য, ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পজাত দ্রব্য প্রভৃতি উৎপন্ন হইতেছে, যাহা পাকিস্থানে হয় না এবং পাকিস্থান উহা সুলভ মূল্যে ভারত হইতে ক্রয় করিতে পারে। আবার অন্যপক্ষে পাকিস্থানেও তুলা, পাট, মাছ, হাঁস, মুরগী, ডিম, তরিতরকারি প্রভৃতি এমন অনেক দ্রব্যের যোগান রহিয়াছে—যেসব পণ্যের অভাব ভারতে পুরাপুরিই রহিয়াছে। পাকিস্থান ভারতকে এই সব দিয়া সাহায্য করিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ভারত ও পাকিস্থান—এই দুইটি দেশের অর্থনীতি পরস্পর পরস্পরের পরি-পূরক এবং এই অবস্থা মানিয়া লইয়া কাজ করিলে উভয় দেশই আর্থিক দিক হইতে সমূহ উপকৃত হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে যে বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদিত হইল, তাহার ফলে উভয় দেশের মধ্যে উভয় দেশের মাত্র ৮ কোটি ২০ লক্ষ টাকার পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদান হইবে। অথচ দেশবিভাগের অব্যবহিত পরে উভয় দেশের মধ্যে এক শত কোটি টাকার বেশী মূল্যের পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদান হইত। ভারত হইতে পণ্যদ্রব্য ক্রয় সম্বন্ধে পাকিস্থানের বিরূপ মনোভাবই উহার কারণ। আলোচ্য বাণিজ্য-চুক্তিতেও পাকিস্থানের এইরূপ মনোভাব প্রকটিত হইয়াছে। কারণ, অনেকদিন ধরিয়া আলাপ-আলোচনার ফলেও ভারতের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গ-বিহার-আসাম এবং পূর্ব্ব-পাকিস্থানের সীমান্তে পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদান সম্পর্কে পাকিস্থানের সহিত একটা বুঝাপড়া করা সম্ভবপর হয় নাই। যে সময়ে পৃথিবীর নানাস্থানে পরস্পরের নিকটবর্ত্তী দেশসমূহের মধ্যে শুধু বাণিজ্যের প্রসারের জন্যই বহুদেশ কতকগুলি সাধারণ বাজার প্রতিষ্ঠা করিয়া একজোটে কাজ করিতেছে, সেইস্থানে ভারতের সহিত পাকিস্থানের এইরূপ বিপরীত মনোভাব কেবল নিন্দনীয়ই নহে—উহা পাকিস্থানের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিজনকও বটে। যেমন ক্ষতি করিয়া তাঁহারা ভারতকে পাট দেওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন। ভারতকে বাধ্য হইয়া পাটের চাষ করিতে হইয়াছে। আজ ভারত পাট সম্বন্ধে স্বাবলম্বী। ইহাতে ক্ষতি হইল কার? পাটের সর্ব্বাপেক্ষা বড় ক্রেতা ভারত—পাটের বাজার হইতে সরিয়া আসার ফলে পাকিস্থানে পাটের দর অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। ক্ষতি চাষীদেরই হইয়াছে। অবশ্য ইহাতে ভারতেরও ক্ষতি হইয়াছে—তাহাকে ধানচাষের অনেক জমি পাটের জন্য ছাড়িয়া

দিতে হইয়াছে। যাহাই হউক, এইভাবে নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ করিবার যে কোন যৌক্তিকতা নাই, তাহা পাকিস্থান আজও বুঝিতে পারে নাই।

গ

পাকিস্থান ও ভারতের মধ্যে ট্রেন চলাচল

এতদিন পরে ভারতের মধ্য দিয়া সরাসরি ঢাকা হইতে লাহোর যাতায়াতে পাকিস্থানী ট্রেন চালাইবার সুযোগ দেওয়া এবং পাকিস্থানের মধ্য দিয়া পশ্চিমবঙ্গে দার্জ্জিলিং এবং আসাম ও ত্রিপুরার সংযোগের জন্য ভারতীয় ট্রেন চালাইবার সুযোগ দেওয়ার কথা আলোচিত হইতেছে। ইহার প্রয়োজনীয়তা কেহই অস্বীকার করিবে না। কিন্তু ইহার মন্দ দিকটাও আছে। যদি সুবিধাজনক যাতায়াতই ইহার উদ্দেশ্য হয়, অন্তত তাহাই হওয়া উচিত—উচিত হইবে না পাকিস্থানী ট্রেন ভারতের মধ্য দিয়া বা ভারতের ট্রেন পাকিস্থানের মধ্য দিয়া যাতায়াত করা। যে দেশের ট্রেন সেই দেশের অভ্যন্তরে সেই দেশের ট্রেনেই চলাচলের বিধান হওয়া উচিত। ইহাতে সীমান্তে ট্রেন বদলের সামান্য অসুবিধা হইতে পারে, যাতায়াতের কোনই অসুবিধা হয় না। কিন্তু এক দেশের ট্রেন অন্য দেশের অভ্যন্তর দিয়া যাতায়াত করিবে ইহা নানা কারণেই অসঙ্গত এবং আপত্তিকর। পাকিস্থানী ট্রেন পাকিস্থান সীমান্ত পর্য্যন্ত আসিবে, উহার পরে ভারতীয় ট্রেনে ভারতের অভ্যন্তর দিয়া পাকিস্থান সীমান্তে গিয়া পাকিস্থানী ট্রেনে গন্তব্যস্থলে পৌঁছিবে। ভারতীয় ট্রেনগুলিও অনুরূপভাবে ভারতীয় সীমান্তে থাকিয়া পাকিস্থানী ট্রেন ধরিয়া পাকিস্থানের ভিতর দিয়া তাহাদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবে। এক দেশের ট্রেন অন্য দেশে প্রবেশ করিবে না।

বিষয়টি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ভারত সরকার যে ভাবে ইহা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা আপত্তিকর এবং আত্মঘাতী। লোকসভা ও রাজ্যসভার প্রস্তাবটি বিশদ ভাবে আলোচিত হইয়া, অনুমোদনের পূর্ব্বে এই ব্যাপারে কোনও চুক্তির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হওয়া অনুচিত।

গ

রাশিয়ার আকাশ-পথে মার্কিন গোয়েন্দা-প্লেন

সকলেই জানেন, কিছুদিন পূর্ব্বে সোভিয়েট রাশিয়ার অভ্যন্তরে সাড়ে বারো শত মাইল অতিক্রম করিয়া একখানি মার্কিন গোয়েন্দা-প্লেন সাড়ে বারো মাইল ঊর্দ্ধ আকাশে টহল দিয়া নরওয়ে অভিমুখে যাইবার পথে সোভিয়েট রকেট কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া মাটিতে পড়ে।

আমরা বিস্ময়ে হতবাক্‌ হইয়া গিয়াছি, অত দূর-পাল্লার লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া রকেট নিক্ষেপ—লক্ষ্যভেদের এই আশ্চর্য্য নৈপুণ্যকে প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। অবশ্য একথাও সত্য, মার্কিন গোয়েন্দা-বৈমানিকের কৃতিত্ব এক্ষেত্রে কম নয়। ধ্বংসোন্মুখ বিমান হইতে প্যারাসুটযোগে নিম্নে অবতরণ করিয়া সে সকলকে হতবাক্‌ করিয়া দিয়াছে। চিন্তা করিলে বিস্ময়বোধ না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু এই বিস্ময় বেদনামিশ্রিত। কারণ, ঘটনাটি সৎকার্য্যের নহে, ভবিষ্যতে মানুষ মারিবার কুৎসিত ষড়যন্ত্র ইহার মর্ম্মমূলে। যাই হোক, যে মনোবৃত্তি হইতে এই ধরনের ঘটনার উদ্ভব, তাহা সকল দিক দিয়াই নিন্দনীয়।

সকলেই বিস্ময়বোধ করিতেছেন এই ভাবিয়া, শান্তিকামী আইসেনহাওয়ারের এ কোন্ নীতি? তবে আমরা যতদূর শুনিয়াছি, প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার নাকি এ ব্যাপারের কিছুই জানিতেন না। না জানাই সম্ভব। কারণ মার্কিন গবর্ণমেণ্ট ও মার্কিন সামরিক বিভাগ কিছুদিন হইতে ভিন্নপথে চলিতেছে, ইহা লক্ষ্য করিয়াছি। শান্তিকামী আইসেনহাওয়ারের শান্তি প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিবার জন্য এবং আসন্ন শীর্ষ সম্মেলনকে বানচাল করিবার জন্য এই গোয়েন্দা-বিভাগ শূন্য আকাশে প্লেন উড়াইয়াছে, ইহা মনে করা অসঙ্গত হইবে না—বিশেষ করিয়া পরলোকগত পররাষ্ট্র-সচিব জন ফষ্টার ডালেসের ভ্রাতা মিঃ এ্যালেন ডালেস যেখানে গোয়েন্দা-বিভাগের বড় কর্ত্তা। এই ভদ্রলোকের কার্য্যকলাপের কিছুটা খবর পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছে।

অবশ্য ইহা বলাই বাহুল্য যে, বর্ত্তমান আমেরিকায় বহু সৎ মানুষ আছেন এবং অনেক চিন্তাশীল নরনারীও আছেন, যাঁহারা এই সমস্ত কুৎসিত ঘটনায় উদ্বিগ্ন এবং যাঁহারা বিভিন্ন জাতির মধ্যে সদ্ভাব রক্ষা করিতে চাহেন। আমরা বিশ্বাস করি, ব্যক্তিগতভাবে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার এই সৎ মানুষের দলে। পৃথিবী হইতে যুদ্ধ এবং যুদ্ধের সম্ভাবনা রোধ করিবার জন্য তিনি আগ্রহশীল। যে পরিচয় পূর্ব্বে আমরা তাঁহার পাইয়াছি, তাহা নিছক অভিনয়—এ বিশ্বাস করিতেই পারি না। এখন প্রয়োজন হইয়াছে, শক্ত হাতে এই সব কুচক্রীদের ধ্বংস করা। নহিলে এই চক্রিদল ভবিষ্যতে তাঁহার আরও সর্ব্বনাশ করিয়া বসিবে। তবে আমাদের বিশ্বাস আছে, জগতে কোনো পাপই বেশীদিন টিকিয়া থাকিতে পারে না।

গ

বর্ত্তমান ছাত্র সমাজ ও সরকার

ছাত্র-সমাজের নৈতিক পতন বর্ত্তমানে যে ব্যাপক আকারে দেখা দিয়াছে, তাহা লইয়া বেশ সকলেই কিছু না কিছু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী আলোচনা-প্রসঙ্গে সেদিন রাজ্যসভাতেও সমস্যাটির বিশ্লেষণ নানা দিক দিয়াই করা হইয়াছে। আবার নিখিল বঙ্গ শিক্ষক-সম্মেলনের মেদিনীপুর অধিবেশনেও একাধিক শিক্ষাব্রতী ইহা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং এই অবস্থা যে সকলকেই ভাবিত করিয়া তুলিয়াছে ইহা বুঝা যাইতেছে। প্রতিকারের উপায়ও তাঁহারা চিন্তা করিতেছেন। কিন্তু চিকিৎসার পূর্ব্বে দেখিতে হইবে, ব্যাধির কারণ কি? নানা জনে নানা কারণ দর্শাইতেছেন।

রাজ্যসভায় একদিকে বক্তা দোষ চাপাইয়াছেন শিক্ষকদের উপর, শিক্ষক-সমাজের প্রতিনিধিরা দোষ দিতেছেন শিক্ষা-ব্যবস্থা ও তাহার পরিচালনা-পদ্ধতিকে, অভিভাবকেরা দোষ দিতেছেন শিক্ষণ-প্রণালী ও পাঠ্যপুস্তকের ভারকে। রাজনৈতিক নেতারা শিক্ষক-সমাজের ব্যক্তিগত আচরণের নিন্দা তো করিতেছেনই, ছাত্র-সম্প্রদায়ের মানসিক বিপর্য্যয়কেও দায়ী করিতেছেন তাহাদের এই শোচনীয় অবনতির জন্য। আবার একাধিক বিজ্ঞ পর্য্যবেক্ষক রাজনৈতিক দলগুলিকেই নাটের গুরু বলিয়া মনে করিতেছেন। দলীয় রাজনীতির তীব্র বিষ তরলমতি ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া তাহাদের স্বাভাবিক চরিত্র-মাধুর্য্য ও শালীনতা নষ্ট করিতেছে। যাহার ফলে এই অশিষ্ট আচরণ ও উচ্ছৃঙ্খলতা ক্রমশ ব্যাপক হইতেছে বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস। বর্ত্তমান সামাজিক পরিবেশও যে ছাত্র-সমাজের মানসিক ভারসাম্য হরণ করিতেছে, একথাও পণ্ডিতেরা বলেন।

ভুল সম্ভবত কেহই বলিতেছেন না। তবে ইহাও অনেকটা অন্ধের হস্তি-দর্শনের মত হইল। গোটা হাতিটা কেহই দেখিতেছেন না—অনুভব করিতেছেন তাহার একটা অংশ। এবং তাহাকেই সম্পূর্ণ হাতি বলিয়া ভুল হইতেছে। অবশ্য সমস্যাটি যেমন ব্যাপক তেমনই বহু বিচিত্র। যাঁহার যে দিকটা নজরে পড়িতেছে, তিনি সেই দিক দিয়াই সমাধানের পথ খুঁজিতেছেন। ফলে মূল সমস্যাটা অবিকৃতই থাকিয়া যাইতেছে—যদিও আংশিক মীমাংসা কোনো কোনো ক্ষেত্রে হইতেছে। কিন্তু ইহা তো অসম্পূর্ণ। সামগ্রিক ভাবে বিচার না করিলে, সামগ্রিক সমাধানের ব্যবস্থা না করিলে বর্ত্তমান অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটিবে না। মূল থাকিয়া যাওয়ার বিপদ অনেক। ইহাতে আরও জটিলতার সৃষ্টি হইবে। এবং সমাধানের পথও দূরে চলিয়া যাইবে। অতএব সময় নষ্ট না করিয়া ছাত্র-সমাজের নীতিবোধ ও নিয়মনিষ্ঠা ফিরাইয়া আনিবার ব্যাপক পরিকল্পনা এখনই গ্রহণ করিতে হইবে।

কিন্তু ব্যাধির কারণ বা নিদান এখনও নিরূপিতই হইল না, চিকিৎসা হইবে কোন্ পথ ধরিয়া? এই নিদান ধরিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা সরকারকেই করিতে হইবে। কিন্তু কি কেন্দ্রে, কি রাজ্যগুলিতে সরকার যদি এটিকে একটি প্রশাসনিক সমস্যা বলিয়া মনে করেন, তবে ভুল করিবেন। প্রথমত, সমস্যাটিকে আমলাতান্ত্রিক মনোভাব ও দলীয় রাজনীতি—এই দুইয়েরই ঊর্দ্ধে রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষক-সমাজের আন্তরিক সহযোগিতা ইহার জন্য প্রয়োজন এবং সেই সহযোগিতার পথে যে সকল অন্তরায় আছে সেগুলি দূর করিতে হইবে। সবার উপরে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইবে, তাহা যাহাতে কার্য্যকর হয় সে সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে। কি পশ্চিমবঙ্গ, কি নিখিল ভারত—কোথাও এ সমস্যা নূতন নয়। কিন্তু সমস্যা সমস্যাই রহিয়া যাইবে, আর আমরা শুধু চিৎকারই করিতে থাকিব, তাহাতে রোগ দূর হইবে কি? গ

ক্ষুদ্র শিল্প ও বৃহৎ শিল্প

ভারত পরিভ্রমণে আসিয়া মিঃ হফম্যান মাদ্রাজে এক সাংবাদিক বৈঠকে মন্তব্য করিয়াছেন, "শিল্পক্ষেত্রে অন্যান্য জাতির সহিত প্রতিযোগিতার অভিপ্রায় থাকিলে, ভারতের পক্ষে বৃহৎ শিল্পের উপর অধিকতর গুরুত্ব অর্পণ করা উচিত। ক্ষুদ্র শিল্প দ্বারা দেশকে স্বাবলম্বী করিয়া তোলা কিংবা উহা দ্বারা বেকার-সমস্যার সুরাহা করা যাইবে না। কেননা, ক্ষুদ্র শিল্প দেশের পক্ষে একটা বিলাসিতার সমান।"

তাঁহার এই অভিমত ভারতের বর্ত্তমান পটভূমিকা সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞানের অভাবের পরিচায়ক। কারণ, বৃহৎ শিল্প দ্বারা দেশ ছাইয়া ফেলিবার মতো পর্য্যাপ্ত মূলধন, সুদক্ষ কর্ম্মী ও কারিগর এবং যন্ত্রপাতি এদেশে নাই। সুতরাং ব্যাপকভাবে বৃহৎ শিল্পের প্রসার সম্ভব নহে। অন্যদিকে, দেশে কর্ম্মক্ষম লোকবলের মধ্যে শতকরা বড় জোর পাঁচজন সংঘবদ্ধ শিল্পে কাজ করিতেছে। ইহার মধ্যেও অধিকাংশ ক্ষুদ্রাকার, ন্যূনপক্ষে কুড়িজন কর্ম্মী এবং শক্তি দ্বারা যন্ত্র চালাইবার ব্যবস্থা থাকিলেই এদেশে সংঘবদ্ধ শিল্প-প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য করা হয়। মিঃ হফ-

ম্যানের সংজ্ঞা অনুসারে এগুলি বৃহৎ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত নয়, খাঁটি বৃহৎ শিল্পে কর্ম্মরত লোকের সংখ্যা মোট ৭৫ লক্ষও হইবে কিনা সন্দেহ। অথচ কর্ম্মক্ষম বেকার ও বেগারের সংখ্যা দুই কোটিরও বেশী। ইহাদিগকে কাজ যোগাড় করিয়া দেওয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্র অস্বীকার করিতে পারে না। ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার ব্যতীত এই দায়িত্ব পালন করা অসম্ভব। সুতরাং ক্ষুদ্র শিল্প এদেশের পক্ষে 'বিলাসিতা' নহে, বর্ত্তমান অবস্থায় অপরিহার্য্য। এ বুঝিয়াছিলেন গান্ধীজী। তাই তিনি ক্ষুদ্র শিল্পের সম্প্রসারণে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য এ কথা অনস্বীকার্য্য, আধুনিক ধারায় উন্নত যন্ত্রপাতি লইয়া ক্ষুদ্র শিল্প পরিচালনার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন, নতুবা ইহার উন্নতি সম্ভব নহে।

তবে একথাও সত্য, এবং বোধ হয় মিঃ হফম্যানের মন্তব্যের মূলে সে কথাই আছে, যে ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদন-প্রথা ব্যয় ও সময়সাধ্য এবং সে কারণেই ক্ষুদ্রশিল্পজাত পণ্যের মূল্য অনেক বেশী। সুতরাং ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার অতি যথাযথভাবে হওয়া উচিত, যাহাতে লোকে সহজে ও প্রসন্ন মনে গুণের মূল্যদানে ইচ্ছুক ও সক্ষম হয়। ক্ষুদ্র শিল্পজাত বলিয়া দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ মূল্যে খেলো জিনিস ক্রয় করিতে লোককে বাধ্য করা অনুচিত কাজ। গ

হাসপাতাল ও সরকার

হাসপাতালগুলি সম্বন্ধে অভিযোগ দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। রোগীদের অভিযোগ, আত্মীয়স্বজন অভিভাবকগণের মনঃকষ্ট এবং হয়রাণি—ছোটবড় এইরূপ বহু ব্যাপারে হাসপাতালগুলি অভিযুক্ত। অবশ্য সব অভিযোগই যে যুক্তিসঙ্গত এমন কথা বলি না। এবং কর্ত্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলেই সকল অভিযোগের প্রতিকার করিতে পারেন এমন অসম্ভব দাবিও করিতেছি না। হাসপাতালের অনেক অভাব ও অস্বাচ্ছন্দ্য জনসাধারণও মুখ বুজিয়া মানিয়া লইয়াছে ইহাও অস্বীকার করা যায় না। হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসা এবং সেবাযত্নের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি দেওয়া হয় না, এই অভিযোগ নূতন নয়। একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝা যায়, কলিকাতার হাসপাতালগুলিতে অব্যবস্থার কারণ শুধু পরিচালনায় অবহেলা বা দায়িত্বহীনতা নয়। অবশ্য দায়িত্বহীনতা এবং অবহেলার দৃষ্টান্তও প্রায়ই পাওয়া যায়। দুর্ঘটনায় আহত মরণাপন্ন রোগীকে ভর্ত্তি করা হয় নাই, কিংবা অবিলম্বে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় নাই এমন ঘটনা বিরল নয়। এসব ক্ষেত্রে ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার এবং কর্ম্মীদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব নির্দ্ধারণ করা সম্ভব, দায়িত্বের গুরুতর অবহেলা ঘটিয়াছে প্রমাণ পাওয়া গেলে, হাসপাতাল কর্ত্তৃপক্ষ উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। কিন্তু সর্ব্বক্ষণ কাজের জন্য প্রয়োজনের তুলনায় ডাক্তার, নার্স এবং কর্ম্মীদের সংখ্যা কম হইলে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব ভাগ করিয়া দেওয়া যায় না। সে অবস্থায় রোগীদের চিকিৎসা সেবাযত্ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যাপারে কোনরকম মারাত্মক বিভ্রাট ঘটিলে ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্ব নিরূপণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। কলিকাতার হাসপাতালগুলিতে কতকগুলি অব্যবস্থা জাঁকিয়া বসিতে পারিবার একটি কারণ সম্ভবতঃ রোগী-সংখ্যার তুলনায় ডাক্তার, নার্স এবং কর্ম্মীর অপ্রতুলতা।

অপরাধের সংখ্যা অবশ্য বাড়িয়াছে। যেমন হাসপাতাল হইতে রোগী নিখোঁজ হওয়া ইহা ত নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। রোগীর সংখ্যা অবশ্য পূর্ব্বের তুলনায় বাড়িয়াছে। তাহাদের খবরদারি করা অল্প লোকের পক্ষে বড় সহজসাধ্য নয়। তবু বলিব, অপরাধ অপরাধই। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের চক্ষু-চিকিৎসা হাসপাতালে ভর্ত্তি একটি বালক-রোগী যে অবস্থায় মারা গিয়াছে, তাহা অনেকের মনেই ভীতির সঞ্চার করিবে। হাসপাতালে ভর্ত্তি রোগীর নিরাপত্তার দায়িত্ব হাসপাতাল কর্ত্তৃপক্ষের। ব্যাধির যন্ত্রণায়, ভয়ে কিংবা সাময়িক বুদ্ধিবিকারের ফলে রোগী নানারকম অস্বাভাবিক কাণ্ড করিয়া বসিতে পারে। ইহা অভাবনীয় নয়। সেক্ষেত্রে কোনও রোগী যাহাতে হাসপাতাল হইতে পলাইয়া না যাইতে পারে, প্রাণহানিকর কিছু না করিতে পারে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্ত্তৃপক্ষের একটি আবশ্যক কর্ত্তব্য। কি উপায়ে সেই বালকটি আহত অবস্থায় দ্বিতল-স্থিত শয্যা হইতে হাসপাতালের বাহিরে আসিল, সে রহস্য আজও আবিষ্কৃত হয় নাই। রহস্য যাহাই হউক, হাসপাতালে রোগীদের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থার যে গুরুতর গলদ আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, শিশু-ওয়ার্ডে ভর্ত্তি অল্পবয়স্ক রোগীদের রাত্রে সর্ব্বদা দেখাশোনা করিবার জন্য কোনও পৃথক নার্স ছিল কিনা? অবশ্য নিখোঁজ ইহার পূর্ব্বে শিশু ছাড়া বয়স্ক রোগীও হইয়াছে এবং ইহা নিঃসংশয়েই বলা চলে, সম্পূর্ণ অবহেলার জন্যই এরূপ ঘটনা বার বার হইতে থাকে। হয়ত লোকাভাব। কিন্তু ইহা যুক্তি নহে। কারণ তাহাদের অবহেলার বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। তাঁহারা রোগীদের সহিত মিষ্ট ব্যবহার করিতেও ভুলিয়া গিয়াছেন।

যে কারণেই হোক, এ শৈথিল্য অমার্জ্জনীয়। এই হাসপাতালগুলির আমূল সংস্কার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। নিয়ত অভিযোগ এবং তাহাদের কাজের সমালোচনা করিয়া কোন লাভ নাই। যাহা দেখিতেছি, কেন্দ্রীয় সরকারের ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। নহিলে অবস্থা যাহা দাঁড়াইতেছে, ভবিষ্যতে হাসপাতালে যাইতে আর কেহ সাহস করিবে না। গ

ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনে বোম্বাই

গত ১লা মে তারিখে দ্বিভাষিক বোম্বাই রাজ্য স্বতন্ত্র ভাবে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট নামে দুইটি রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। ইহা একটি স্মরণীয় ঘটনা। কারণ বহু রক্তপাত, অগ্নিকাণ্ড, লুঠ-তরাজ ইত্যাদির পরে অবশেষে জনসাধারণের দাবি প্রতিষ্ঠিত ও জয়যুক্ত হইয়াছে। মহারাষ্ট্র ও গুজরাট প্রধানত ভাষার ভিত্তিতে দুই রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। ছাব্বিশটি জেলা লইয়া মহারাষ্ট্র রাজ্য গঠিত হইয়াছে, উহার আয়তন ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৯০৩ বর্গমাইল। ১৯৫১ সনের লোক গণনা অনুযায়ী এই রাজ্যের অধিবাসী সংখ্যা ৩ কোটি ২১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৬১৪। নূতন মহারাষ্ট্রের আয়তন ভারতীয় ইউনিয়নের শতকরা দশ ভাগের কিছু বেশী। এইদিক হইতে গুজরাট অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহার আয়তন ৭২ হাজার ১৩৭ বর্গমাইল এবং ১৯৫১ সনের আদমসুমারী অনুযায়ী জনসংখ্যা ১ কোটি ৬২ লক্ষ ৬২ হাজার ১৩৫। আঞ্চলিক হিসাবে গুজরাট, পঞ্জাব ও উড়িষ্যা হইতে কিছু বড় হইলেও, কার্য্যতঃ ইহা উড়িষ্যা, পঞ্জাব ও রাজস্থানের অনুরূপ হইবে। গুজরাটে আদিবাসী অনগ্রসর বা অনুন্নতের সংখ্যা প্রায় ত্রিশ লক্ষ। সুতরাং তাহাদের উন্নতির সমস্যাও এই রাজ্যের একটি বিশেষ সমস্যা হইয়া থাকিবে। নূতন গুজরাট ১৫টি জেলা লইয়া গঠিত হইয়াছে।

তবে একথা স্মরণ রাখিতে হইবে, বর্ত্তমান মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচ্যবন ও গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজীবরাজ মেটার সম্মিলিত সহযোগিতার ফলেই এই রাজ্যবিভাগ সহজ হইয়াছে।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত বহু বিতর্কের পর গৃহীত হইয়াছিল। স্বাধীনতা লাভের পরেও জনসাধারণের পক্ষ হইতে এই দাবিই সঙ্গত বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু ভারতীয় ঐক্য ব্যাহত হইতে পারে এই সন্দেহে কংগ্রেস শাসকগণ সে-নীতি বর্জ্জন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সময়েও এই দাবি প্রবল হইয়া উঠা সত্ত্বেও বোম্বাইকে গুজরাট সহ দ্বিভাষিক রাজ্যে পরিণত করা হইয়াছিল। কিন্তু উহাতে শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তি ও অসন্তোষ উগ্র হইয়া উঠে।

ভারতবর্ষ একটি দেশ হইলেও, ইহার ভাষা বিভিন্ন। এই ভাষা, আচার ও আচরণগত বহু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই এদেশের বিশেষত্ব। এই ঐক্য যাহাতে আরও দৃঢ় হয়, সে চেষ্টা সকলেরই করা উচিত। সাধারণভাবে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গঠিত হইলে, প্রত্যেক রাজ্যই তাহার উন্নতির পথ প্রশস্ত করিতে পারিবে। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য রক্ষা করিয়া চলার সংকল্প যদি সুদৃঢ় না হয়, তাহা হইলে এই ভাষার বিরোধই এককালে অনৈক্যের কারণ হইয়া উঠিতে পারে। বর্ত্তমানে যে অতিশয়তা বা উগ্রতার ফলে সমস্যা আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এদিক দিয়া কতকটা উদারতা লইয়া অগ্রসর হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

প্রসঙ্গত একটি কথা বলা দরকার। ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের ব্যাপারে কিছু কিছু অসঙ্গতি আজও রহিয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারি, পশ্চিমবঙ্গের সীমানার বাহিরে এমন-কিছু অঞ্চল আজও রহিয়াছে, ভাষা এবং সংস্কৃতির বিচারে যেগুলিকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এমন অসঙ্গতি আরও অনেক ক্ষেত্রে আছে। ভারতবর্ষের ভাষাভিত্তিক মানচিত্রটাকে পূর্ণাঙ্গ এবং ত্রুটিহীন করিয়া তুলিবার জন্যই এই অসঙ্গতিগুলিকে এখন দূর করা দরকার। গ

খণ্ড বিখণ্ড ভারত

ভারতবর্ষের মহানেতা পণ্ডিত নেহরু ও তাঁহার অনুসরণকারী কংগ্রেস দলের অপরাপর মহারথিবৃন্দ, পৃথিবীর সকল দেশের স্বাধীনতা সম্বন্ধে সর্ব্বদা অতি-জাগ্রত। কেহ কোথাও কিছুমাত্র স্বাধীনতা হারাইলে অথবা হারাইবার মত হইলেই পাটনায় ও অপরাপর কংগ্রেসী আখড়ায় হাহাকার পড়িয়া যায়। পণ্ডিত নেহরু অপরের স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য অমনি দৌড়াইতে আরম্ভ করেন এবং দুনিয়ার সর্ব্বলোকে শুনিতে পায় তিনি ও তাঁহার দলের অন্য সকল স্বাধীনতার সৈন্যগণ কি কি উপায়ে ধরণীর বক্ষে মুক্তিবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। এই যে সকল কংগ্রেসী দেশ মোক্তার দল ইহারা নিজগৃহে ও প্রদেশে কিন্তু স্বাধীনতা অথবা রাষ্ট্রীয়

অধিকার সংরক্ষণের জন্য শুধু উল্টা পথে চলিয়া থাকেন। ইঁহাদিগের সমালোচক বামপন্থী নেতৃবৃন্দ আবার এত অধিক পরমুখাপেক্ষী যে, তাঁহারা নিজ দেশের কথাই নিজে ভাবিতে শেখেন নাই। মস্কো অথবা পিকিংয়ে অপরের পদলেহনের জন্য না যাইলে এই সকল দেশ-দ্রোহীজনের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে। ভারতের জনসাধারণের অজ্ঞানতার সুবিধা থাকাতে ইঁহারা একাধারে দেশের লোকের মুক্তির ও দাসত্বের ব্যবস্থা করিয়া চলিতে পারেন। কংগ্রেসী নেতারাও প্রায় সেই রকমই দেশের বাহিরে স্বাধীনতার ভক্ত ও দেশের ভিতরে স্বাধীনতার যমরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। প্রথমতঃ কংগ্রেস দেশকে দুই টুকরা করিয়া ব্রিটিশের নিকট রাজ্যভার প্রাপ্ত হয়েন। পরে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন নীতির অনুসরণ করিয়া তাঁহারা কোথাও এক প্রকার ও কোথাও অপর প্রকার জুলুমের সৃষ্টি করেন। ভারতীয় কনষ্টিটিউশনে যে সকল মূল অধিকারের কথা লিখিত আছে সেগুলিকে অবলীলাক্রমে বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহারা নিজেদের "প্ল্যান" ও মতলব হাসিল করিতে লাগিয়া পড়িয়াছেন। কোথাও বেশী গোলমাল দেখিলে তাঁহারা তখন নিজ সুবুদ্ধি জাগ্রত করিয়া কোন না কোন প্রকার গোঁজামিলের সাহায্যে বিপদ হইতে বাঁচিবার ব্যবস্থা করেন। বোম্বাই বিভাগ এইরূপ একটি গোঁজামিল। ভারতীয় রাষ্ট্রের যদি কোন নিজস্ব রূপ থাকে তাহা হইলে ভারতের অন্তর্গত জাতিগুলির দাবির খাতিরে ভারতীয় মহাজাতির বিনাশের ব্যবস্থা কোনরূপেই উচিত নহে। অথচ নেতারা এরূপে প্রাদেশিক দাবি স্বীকার করিয়া দেশকে খণ্ড বিখণ্ড করিতে ব্যস্ত, তাঁহারাই আবার হিন্দি প্রতিষ্ঠিতির জন্য অকারণে ও স্থানীয় লোকের বহু অসুবিধা ঘটাইয়া উক্ত জড় ভাষার প্রচারে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। মানভূম সিংভূম প্রভৃতি জেলায় হিন্দী কেহ কোন দিন বলে নাই। বাংলা অথবা ইংরেজীতেই সে এলাকায় সকল কার্য্য হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমানে ঐ সকল স্থানে অর্দ্ধশিক্ষিত ভোজপুরীদিগকে আনিয়া বসাইয়া চেষ্টা হইতেছে হিন্দী "আবহাওয়া" সৃষ্টি করিবার। হিন্দী এতই জাগ্রত ভাষা যে, নিজ দেশেই শতকরা দুই জন লোক হিন্দী লিখিতে পারেন কি না সন্দেহ। তৎপরে বিহারে হিন্দীর প্রচলন নাই—চলে ভোজপুরী, মৈথিলি প্রভৃতি ভাষা ও উপভাষা। হিন্দীর ধাক্কায় ভারতবর্ষ আরও কিছুটা বিভক্ত ও অনৈক্য অভিভূত হইয়া পড়িবে। নেতারা সে কথা জানিয়াও ভুল পথে অগ্রসর হইতেছেন।

ভারতবর্ষে যদি এক দেশ, এক মহাজাতি, এক সামরিক মহাশক্তি ও এক বিরাট সভ্যতা গড়িয়া তোলাই আমাদের ইচ্ছা ও আদর্শ হয় তাহা হইলে দেশকে খণ্ড বিখণ্ড করিবার এই যে সকল প্রচেষ্টা এগুলিকে অবিলম্বে বন্ধ করিতে হইবে। স্থানীয় স্বাধীনতা পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়া এই মহাদেশ নিজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে। শুধু সেই আদর্শ বজায় রাখিতে হইলে প্রাদেশিক নেতাদিগের সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধি প্রচেষ্টার দমন প্রয়োজন। আমরা বাঙালীরা বহু অন্যায়, অবিচার, লুণ্ঠন ও অপমান সহ্য করিয়া কংগ্রেসী মুক্তি উপভোগ করিয়া চলিতেছি। এই মুক্তির পরিবর্ত্তে রুশী-চিনি মুক্তিলাভের আশঙ্কাও সম্মুখে দেখা যায় না তাহাও নহে। এ অবস্থায় আমরা হয় মহাজাতি গঠনের খাতিরে পূর্ণাঙ্গ বঙ্গ না চাহিতে পারি, কিন্তু আমাদের প্রাদেশিক পূর্ণাঙ্গতা লাভের জন্যই সংগ্রাম করিতে হইতে পারে।

অ

সরকারি অর্থ লইয়া ছিনিমিনি

কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের সরকারী বিভিন্ন বিভাগগুলিতে কিরূপ খামখেয়ালী ভাবে জনসাধারণের অর্থ অপচয় হইয়া থাকে, তাহার প্রকৃষ্ট একটি দৃষ্টান্ত সম্প্রতি উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে ভারতীয় লোকসভায়।

গত ১৯৫৬ সনে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কোনো টেণ্ডার গ্রহণ না করিয়াই, কানাডার একটি ফার্ম্মের সহিত এক কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা মূল্যের মোটর গাড়ির অতিরিক্ত অংশ ক্রয় করিবার এক চুক্তি করেন। কিন্তু মোটর গাড়ির অংশ সরবরাহকারী কোম্পানী এই চুক্তির একটি সর্ত্তও পালন করেন নাই। ইহার ফলে সরকারের বহু অর্থের অপচয় হইয়াছে। এ সম্বন্ধে অডিটর জেনারেল তাঁহার রিপোর্টে ভারতীয় পার্লামেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া পার্লামেণ্টের পাবলিক অ্যাকাউণ্টস কমিটি অডিটর জেনারেলের অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন এবং সাব-কমিটির মতের সহিত পার্লামেণ্টের পাব্লিক অ্যাকাউণ্টস কমিটিও একমত হইয়াছেন। তবে ব্যাপারটির এখানেই শেষ হয় নাই। সাব-কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে এই ব্যাপার সম্বন্ধে আরও তদন্তের জন্য একটি নিরপেক্ষ সংস্থা গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। এই সংস্থার আলোচ্য বিষয় হইবে—প্রকাশ্য টেণ্ডার আহ্বান না করিয়া একটি ফার্ম্মের সহিত চুক্তি করা হইল কেন? চুক্তিতে গবর্ণমেণ্টের স্বার্থ রক্ষার কি ব্যবস্থা ছিল? চুক্তির পূর্ব্বে প্রতিরক্ষা-বিভাগের কি পরিমাণ মোটর গাড়ির অংশের দরকার

হইবে তাহা স্থিরীকৃত হইয়াছিল কিনা? এই ব্যাপারে কে বা কাহারা দায়ী? ইত্যাদি।

এই তদন্তের পরিণাম কি হইবে আমাদের জানা নাই। তবে এ কথা আমরা জোর করিয়া বলিব, সরকারের পক্ষে এই ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট থাকা এবং এই ব্যাপারে যাহারা দায়ী তাহাদিগকে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে দেওয়া কিছুতেই উচিত হইবে না। একটা কেলেঙ্কারিকে চাপা দিতে গিয়া আরও বহু কেলেঙ্কারি না ভবিষ্যতে বাহির হইয়া পড়ে! সরকার এ দিক দিয়াও বিবেচনা করিবেন মনে করি। গ

বর্দ্ধমানে বাড়ীর নম্বর

'আর্য্য' পত্রিকার এই সংবাদটির প্রতি পৌর-সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

'দেশের সকল রাজ্যে একই পদ্ধতিতে বাসগৃহের স্থায়ী নম্বর দেওয়া সম্ভব কিনা তাহা ভারতের লোক গণনা সংস্থার রেজিষ্ট্রেসন জেনারেল জানিতে চাহিয়াছেন। প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, একটি রাস্তায় সকল বাসগৃহের নম্বর মহল্লা অনুযায়ী এবং পল্লীগ্রামের সকল বাসগৃহের নম্বর ব্লক অনুযায়ী দেওয়া উচিত। এভাবে বাসগৃহের নম্বর দিলে পৌরসভা প্রভৃতি ছাড়াও নির্ব্বাচন কমিশন, ডাক কর্তৃপক্ষ, লোক গণনা সংস্থা এবং অন্যান্য সকল প্রশাসনিক বিভাগেরই সুবিধা হইবে। এ ভাবে বাসগৃহের নম্বর দেওয়ার উদ্দেশ্য হইতেছে এই যে, এক মাত্র ভাঙ্গিয়া না ফেলা পর্য্যন্ত প্রতিটি বাসগৃহই নম্বর দেখিয়া অনায়াসে বাহির করা চলিবে। একমাত্র মাদ্রাজ রাজ্যে গত দশ বৎসর যাবত এ ভাবে শহর ও পল্লী অঞ্চলে বাসগৃহের নম্বর দেওয়া হইতেছে।

বর্দ্ধমান পৌরসভার পৌরপতির এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তিনি জানান যে, পৌরসভার গণতান্ত্রিক বোর্ড বর্দ্ধমানে বাড়ীর নম্বর করিয়া যাইবে। বর্দ্ধমানে বাড়ীর নম্বরের অভাবে ডাক বিলিতে গোলযোগ হইতেছে। ১৯৬০-৬১ সনের বাজেটে বাড়ীর নম্বরের জন্য সম্ভবতঃ কোন অর্থ ধরা হয় নাই।' গ

গামা রশ্মির সাহায্যে আলু সংরক্ষণ

সোভিয়েট বিজ্ঞান পরিষদের জৈব-রসায়ন বিভাগের বিজ্ঞানীরা আলুকে দীর্ঘকাল ভাল অবস্থায় গুদামজাত করিয়া রাখার সমস্যাটির সমাধান করিয়াছেন। জৈব-রসায়নবিজ্ঞানী বোরিস রুবিন ও লিও মেৎলিৎস্কি এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় তাজা আলুর উপরে অতি সামান্য মাত্রায় গামা রশ্মি প্রয়োগ করিয়া উহাকে "দীর্ঘ জীবন" দান করেন এবং প্রায় আড়াই বৎসর সেই অবস্থায় রাখিয়া দেন। দেখা যায়, আড়াই বৎসর পরেও সেই আলুর স্বাদ ও গুণ অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে এবং উহার পুষ্টি-ক্ষমতাও কিছুমাত্র কমে নাই। এই বিজ্ঞানী দুইজন এমন ভাবে আলুর উপরে গামা রশ্মি প্রয়োগ করার পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন যাহাতে উহা আড়াই বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে খাওয়া যাইতে পারিবে।

রুবিন ও মেৎলিৎস্কি-র এই পদ্ধতি অনুসারে আলু দীর্ঘকাল সংরক্ষিত করিয়া রাখার জন্য মস্কোয় একটি বৃহৎ কারখানা-গুদাম নির্ম্মাণের কাজ সুরু হইয়াছে। এখানে আগাগোড়া যান্ত্রিক পদ্ধতিতে আলুর উপরে নির্দ্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় গামা রশ্মি প্রয়োগ করা হইবে এবং ২৫ হাজার টন পর্য্যন্ত আলু গুদামজাত করিয়া রাখা যাইবে। গ

বালুরঘাটে রেলপথ

বালুরঘাটের 'আত্রেয়ী' পত্রিকা জানাইতেছেন:

বালুরঘাট পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত কৃষি অঞ্চল। এই অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য কোনরূপ কার্য্যকরী সরকারী ব্যবস্থা এযাবৎ অবলম্বিত হয় নাই। কৃষি নির্ভর এই অঞ্চলের অধিবাসীরা ক্রমশঃ বেকার হইয়া অর্থ নৈতিক বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইতেছেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী ও অন্যান্য অঞ্চলের সহিত রেলপথে বালুরঘাটের যোগ না থাকার ফলেই এই অঞ্চলে কোনরূপ শিল্প-বাণিজ্য গড়িয়া উঠে নাই। এই অঞ্চলের শতকরা ৮৫ জন অধিবাসী কৃষির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু উপযুক্ত সেচের অভাবে এই অঞ্চলের কৃষি জমিতে এক ফসলের বেশী হয় না এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা অপেক্ষা উৎপাদনের হারও অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। এরূপ অবস্থায় এই অঞ্চলকে রেলপথ দ্বারা যুক্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

মালদহ জেলার খেজুরিয়াঘাট হইতে মালদহ পর্য্যন্ত নূতন রেলপথ স্থাপন করা হইতেছে। এই সঙ্গে বালুরঘাট পর্য্যন্ত মাত্র ৬০ মাইল পথে রেল লাইন প্রসারিত করিলে কেবলমাত্র এই অঞ্চলেরই চারি লক্ষ অধিবাসীর অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

এই ব্যাপারে যথাক্রমে ১৯৫০ এবং ১৯৫৫ সালে খেজুরিয়াঘাট হইতে বালুরঘাট পর্য্যন্ত চূড়ান্ত জরীপকার্য্য সম্পন্ন হয়। এই লাইনটি কেন্দ্রীয় রেলওয়ে বোর্ড কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন এই রেলপথ পরিকল্পনাটি রূপায়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ না করায় অত্যাবশ্যকীয় বিষয়টি চাপা পড়িয়া রহিয়াছে। গ

মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ

গত ২১শে বৈশাখ মহামহোপাধ্যায় ডঃ যোগেন্দ্রনাথ তর্কবেদান্ত-সাংখ্যতীর্থ মহাশয় ৭৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার এই লোকান্তরে প্রাচ্যবিদ্যার ক্ষেত্রে বাংলা তথা ভারত একটি বিশিষ্ট মনীষীকে হারাইল। ভারতীয় সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার মূর্ত্ত বিগ্রহ যোগেন্দ্রনাথ সমগ্র জীবনব্যাপী অনলস জ্ঞানসাধনায় মগ্ন ছিলেন এবং এই সাধনা মৃত্যুর পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছে। তাঁহার এই জীবনব্যাপী-সাধনার ফল যাহা তিনি উত্তর-সূরীদের জন্য রাখিয়া গেলেন, তাহা আরও এক শতাব্দীকালের সঞ্চয় বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না।

মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথের প্রথম কর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়, হরিদ্বার গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ে। পরে তিনি বেদান্তের অধ্যাপকরূপে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে এবং তাহার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে কাজ করেন। গবেষক অধ্যাপকরূপে সংস্কৃত কলেজেও তিনি কিছুদিন কাজ করেন।

প্রাচ্যশাস্ত্রে ও সাহিত্যে যোগেন্দ্রনাথের অশেষ পাণ্ডিত্যের জন্য ভারত সরকার তাঁহাকে সর্ব্বোচ্চ সম্মান 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত করেন। শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে অনারারী 'ডক্টরেট' উপাধি দেন।

যোগেন্দ্রনাথের লেখনীপ্রসূত বহু গ্রন্থের মধ্যে 'প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি', 'ভারতের দর্শন সমন্বয়,' প্রভৃতি এবং 'মহামতি বিদুর', 'মহারাণী কুন্তী', 'অদ্বৈত সিদ্ধি' প্রভৃতি কয়েকটি চিন্তামূলক নিবন্ধ তাঁহার সুগভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করে।

তাঁহার মৃত্যুতে দর্শন ও চিন্তাশীলতার ক্ষেত্রে যে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হইল, তাহা অদূরভবিষ্যতে পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। গ

রাজশেখর বসু

প্রখ্যাত নামা সাহিত্যিক ও মনীষী শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু গত ২৭শে এপ্রিল তাঁহার কলিকাতার বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স আশী বৎসর হইয়াছিল।

১৮৮০ সনের ১৩ই মার্চ্চ বর্দ্ধমান জেলার ব্রাহ্মণপাড়ায় মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা দ্বারভাঙ্গা ষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। দ্বারভাঙ্গা রাজস্কুল হইতে রাজশেখর এণ্ট্রান্স পাস করেন এবং পাটনা হইতে ফার্ষ্ট আর্টস পাস করিয়া কলিকাতা হইতে বি. এ পাস করেন। ইহার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কেমিষ্ট্রিতে এম. এ পাস করেন। তিনি এই পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ছিলেন। বিজ্ঞানে এইরূপ পারদর্শিতা লাভ করায়, তাঁহার উত্তর জীবনে এই বিজ্ঞানই সাধনার ক্ষেত্র হইবে বলিয়া তাঁহার আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই ছিল এবং সেই আকাঙ্ক্ষার বলে একটি রাসায়নিক কর্ম্মশালার পরিচালন কর্ম্মেও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন তিনি। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার আবির্ভাব প্রৌঢ় বয়সে এবং তাহাও 'পরশুরাম' ছদ্ম নামে। বাংলার জনচিত্তের অতি সমাদরের সেই প্রিয় নাম—'পরশুরাম' বাংলার সাহিত্যাকাশে অক্ষয় হইয়া থাকিবে। বস্তুতঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এই নামটিকে একটি নূতন ঐতিহ্যের প্রতীকরূপে চিরকাল বহন করিবে।

তিনি কৃতী রাসায়নিক ছিলেন, কিন্তু সাহিত্য-প্রীতি বোধ হয় তাঁহার মর্ম্মের ঐশ্বর্য্যরূপে সঞ্চিত ছিল। তাহা না হইলে তিনি প্রৌঢ় বয়সে কথাশিল্পের সাধক হইয়া লেখনী ধারণ করিবেন কেন? এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অক্লান্ত ভাবে সাহিত্যেরই হিত চিন্তায় ব্যাপৃত থাকিবেন কেন? সাহিত্যের আহ্বান তাঁহার জীবনে সাধকতার তৃপ্তি আনিয়া দিয়াছে। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার দান অবিস্মরণীয়। তাঁহার কর্ম্মজীবনের একটি দিক বিশেষ লক্ষ্যনীয়। তিনি সভা-সমিতি হইতে সর্ব্বদাই দূরে থাকিতেন। যতখানি প্রভাব ও প্রতিষ্ঠার অধিকারী তিনি ছিলেন, তাহাতে এতটা নিস্পৃহ নিঃশব্দতায় দিন কাটানো আজিকার দিনে খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। তাঁহার গড্ডালিকা, কজ্জলী, হনুমানের স্বপ্ন, ধুস্তরীমায়া চিরকাল অমর হইয়া থাকিবে। রসরচনা ছাড়াও তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ দান বলিয়া স্বীকৃত হইবে। বাংলা পরিভাষা নির্ম্মাণে তাঁহার দান অনেক। তাঁহার রামায়ণ, মহাভারতের বঙ্গানুবাদ বাংলা দেশে অমূল্য সম্পদ হইয়া থাকিবে। কিন্তু জাতির মনোলোকে তিনি চিরস্মরণীয় থাকিবেন হাসির গল্প-লেখক পরশুরাম রূপেই। মানুষ হিসাবে তাঁহার ধৈর্য্য ও কর্ম্মনিষ্ঠা দেখিবার বস্তু ছিল। আমরা তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছি অনেক। কিন্তু তিনি ছিলেন নিন্দা-স্তুতির বহু উর্দ্ধে। তিনি নিজেকে মিস্ত্রী ও কেরানী বলিয়াই প্রচার করিয়াছেন, শিল্পী ও স্রষ্টার মর্য্যাদা দাবী করেন নাই। এই বিনয়ই তাঁহার মহৎ শিল্পিত্বের পরিচয়। ম

জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

(৩)

জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ শঙ্করের শুদ্ধ জ্ঞানবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী বলে, শঙ্কর গীতা-ভাষ্যে বারংবার, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই মতবাদ খণ্ডন করেছেন। সে বিষয়ে, পূর্ব দুই সংখ্যায় কিছু বলা হয়েছে।

পূর্ব পূর্ব যুক্তির সার-সংক্ষেপ করে, শঙ্কর জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়-বাদের বিরুদ্ধে কয়েকটা আপত্তি উত্থাপিত করছেন গীতা-ভাষ্যে :—

'প্রথমতঃ, কর্ম ও জ্ঞান পরস্পরবিরোধী, এবং সেজন্য কর্ম থাকলে জ্ঞান, জ্ঞান থাকলে কর্ম থাকতেই পারে না। এরূপ পরস্পর-বিরোধের হেতু কি? হেতু হ'ল এই যে, "ক্রিয়া-কারক-ফল-ভেদ-বুদ্ধিঃ", ক্রিয়া, কারক ও ফলের ভেদ অবিদ্যা-প্রসূত, এবং

"ইয়মবিদ্যা অনাদি-কাল-প্রবৃত্তা।"—

এই অবিদ্যা অনাদিকাল থেকে চলে আসছে।

এরই ফলে, "মম কর্ম, অহং কর্তা, অমুষ্মৈ ফলায় ইদং কর্ম করিষ্যামি" —

"আমার কর্ম, আমিই কর্তা, ফলের জন্য আমি এই কর্ম করব"—এরূপ বোধ হয়। এই ভাবে, এই কর্ম, কর্তা, ফল প্রভৃতির মধ্যে ভেদ-জ্ঞানই হ'ল কর্মের মূল ভিত্তি।

অপর পক্ষে—"অহমস্মি কেবলোঽকর্তা, অক্রিয়ঃ, অফলঃ, ন মত্তোঽন্যোঽস্তি কশ্চিদ্"—

'আমি কেবল, আমি কর্তা নই, আমার ক্রিয়া নেই, আমার কোনো ফল নেই, আমা থেকে ভিন্ন কোনো বস্তু নেই'—এই হ'ল তত্ত্বজ্ঞান।

স্বভাবতঃই, এরূপ তত্ত্বজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, অভেদজ্ঞান ভেদজ্ঞান বিনষ্ট করে। সেজন্য এরূপ জ্ঞানোদয়ে ভেদজ্ঞান এবং তন্মূলক কর্ম ত নিমেষে নিবৃত্ত হয়ে যায়।

সেজন্য, জ্ঞান ও কর্ম যখন স্বভাববশতঃই একত্রে থাকতে পারে না, তখন জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়ের ত কোনো প্রশ্নই উঠে না।

দ্বিতীয়তঃ, মোক্ষ কার্য বা সৃষ্ট পদার্থ নয় যে সাধনরূপ কর্মের দ্বারা সাধ্যরূপ মোক্ষ সিদ্ধ হতে পারে। বস্তুতঃ,

"নহি নিত্যং বস্তু কর্মণা বা জ্ঞানেন ক্রিয়তে।" (গীতা-ভাষ্য, ১৮-৬৬)।

নিত্য বস্তু কর্ম বা জ্ঞান কোনো কিছু দ্বারাই সৃষ্ট হয় না।

একই ভাবে, নিত্য মোক্ষ কর্ম বা জ্ঞান কোনটারই কার্য নয়।

তৃতীয়তঃ, যদি বলা হয় যে, সেক্ষেত্রে, স্বয়ং জ্ঞানও ত নিরর্থক হয়ে পড়ে—তার উত্তর এই যে, জ্ঞান মোক্ষকে নূতন সৃজ্য কার্যরূপে উৎপাদন না করলেও, একমাত্র জ্ঞানই মোক্ষসাধক, যেহেতু জ্ঞান অজ্ঞানের আবরণ বিনাশ করে, আত্মার নিত্যমুক্ত স্বরূপটী উদ্ভাসিত করে তোলে। জ্ঞানের এই অজ্ঞানের আবরণ দূরীকরণ ব্যতীত আর অন্য কোনো ফল নেই, যেমন, আলোকের একমাত্র ফল হ'ল অন্ধকার দূরীকরণ। এইভাবে আলোক দ্বারা অন্ধকার দূর হলেই সেই স্থানের পূর্ব থেকেই বিরাজমান ঘট-পটাদির প্রকাশ বা আবির্ভাব হয়ই মাত্র, কিন্তু নূতন কোনো কিছু সৃষ্ট হয় না। একই ভাবে, জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান দূর হলেই, নিত্যসিদ্ধ আত্মার স্বরূপটী, তার নিত্যমুক্ত ব্রহ্মরূপটী প্রকাশিত হয় মাত্র, নূতন করে জ্ঞানের দ্বারা সৃষ্ট হয় না। জ্ঞান এই ভাবে মোক্ষকে কার্যরূপে সৃষ্টি না করেও, মোক্ষের সাধন হতে পারে, মোক্ষাবরক অজ্ঞানেরই মাত্র বিনাশ করে। কিন্তু কর্ম এইভাবে মোক্ষের সাধন হতে পারে না, যেহেতু, কর্মের একমাত্র ফল হ'ল নূতন, সৃজ্য কার্যের উৎপাদন করা। মোক্ষের ক্ষেত্রে তা যখন অসম্ভব, তখন মোক্ষের ক্ষেত্রে কর্মের ত স্থানই নেই। সেক্ষেত্রে মোক্ষের সাধক জ্ঞানের সঙ্গে মোক্ষের অসাধক ও মোক্ষ-বিরোধী কর্মের সমুচ্চয় হবে কি করে? কর্ম দ্বারা যে মোক্ষলাভ অসম্ভব, তা ত পূর্বেই বলা হয়েছে।

চতুর্থতঃ, জ্ঞান যে নিজ ফল মোক্ষের জন্য কর্মের সাহায্যের অপেক্ষা করে, তা অসম্ভব।

"নাপি জ্ঞানস্য কৈবল্যফলস্য কর্ম-সাহায্যাপেক্ষা, অবিদ্যা-নিবর্তকত্বেন বিরোধাৎ।" (গীতা-ভাষ্য, ১৮-৬৬)

জ্ঞান নিজ ফল মোক্ষের জন্য কর্মের সাহায্যের অপেক্ষা

করে না, যেহেতু অবিদ্যা-নিবর্তক রূপে জ্ঞান কর্মের বিরোধী।

যে যার বিরোধী, সেই তার নিবর্তক হতে পারে। যেমন, আলোকই অন্ধকারের নিবর্তক হতে পারে—

"ন হি তমস্তমসো নিবর্তকম্।"

(গীতা-ভাষ্য, ১৮-৬৬)

অন্ধকার অন্ধকারের নিবর্তক নয়।

সেজন্য অজ্ঞান-নিবর্তক জ্ঞান অজ্ঞান-বিরোধী, এবং সেজন্য অজ্ঞানমূলক কর্ম-বিরোধীও সমভাবে। দুই বিরোধী বস্তুর সমুচ্চয় বা সহাবস্থিতি ও সম্মেলন অসম্ভব বলে, জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়ও সমভাবে অসম্ভব।

পঞ্চমতঃ, যদি বলা হয় যে, অন্যান্য সকাম-কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের সমুচ্চয় অসম্ভব না হয় হোক; কিন্তু নিষ্কাম, নিত্যকর্মের সঙ্গে জ্ঞানের সমুচ্চয় যে কেবল সম্ভব, তা নয়, সেই সঙ্গে অত্যাবশ্যকও—এর উত্তর পূর্বেই দেওয়া হয়েছে (গীতা-ভাষ্য-ভূমিকা, তৃতীয় অধ্যায়)।

জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়-বাদ প্রসঙ্গে অবশ্য নিষ্কাম, নিত্য কর্মের সঙ্গে সমুচ্চয়ের প্রশ্নই একমাত্র প্রকৃতপক্ষে উঠে। সকাম, কাম্য কর্ম যে মোক্ষবিরোধী, তা ভারতীয় দর্শনের মূলীভূত তত্ত্ব কর্মবাদ থেকেই জানা যায়। এই তত্ত্বানুসারে, যা পূর্বেই বলা হয়েছে, সকাম-কর্মই "বন্ধ" বা সংসার বা জন্মজন্মান্তরের কারণ। সেক্ষেত্রে যে সকাম-কর্ম মোক্ষের সাধক হতে পারে না, তা ত বলাই বাহুল্য। সে বিষয়ে, জ্ঞানবাদী, ভক্তিবাদী, কর্মবাদী, অদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী—সকলেই একমত। কিন্তু পূর্বেই যা বলা হয়েছে, সমগ্র ভারতীয় দর্শন নিষ্কাম-কর্মের মহিমায় সমুজ্জ্বল। এহেন নিষ্কাম-কর্মের যে মোক্ষের ক্ষেত্রে কোনো সাক্ষাৎ দান নেই, তা অনেকের পক্ষেই বিশ্বাস করা কঠিন। সেজন্যই শঙ্করও বারংবার প্রমাণিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন যে, এমন কি নিষ্কাম-কর্মও মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধক নয়; এবং এই গীতাসার-স্বরূপ অষ্টাদশ অধ্যায়ের ভাষ্যে (গীতা, ১৮-৬৬) তিনি পুনরায় এ বিষয়ে বিশদতর খণ্ডন-প্রচেষ্টা করেছেন এই ভাবে:

জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়-বাদীদের মতবাদ হ'ল এই:

এই জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়-বাদানুসারে, জ্ঞানের সঙ্গে সকাম-কর্মের বিরোধ হয় হোক্, কিন্তু নিষ্কাম নিত্য কর্মের বিরোধ হতে যাবে কেন? উপরন্তু, নিষ্কাম নিত্য কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের সমুচ্চয় অত্যাবশ্যক। কারণ, বেদবিহিত নিত্য কর্মের নিষ্কাম ভাবে যথাযথ অনুষ্ঠান না করলে পাপ হয়, পাপের ফল নরকবাস, নরকবাসের ফল অসীম দুঃখযন্ত্রণা। এই কারণে, নিত্য কর্মের অনুষ্ঠান না করলে সর্ব-দুঃখ-নিবৃত্তি-রূপ মোক্ষলাভ হবে কি করে? সেজন্য কেবল জ্ঞানের দ্বারাই যে মোক্ষলাভ হতে পারে—এই মতবাদ ভ্রান্ত।

যদি বলা হয় যে, এরূপ জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়-বাদানুসারেও কর্মকে মোক্ষের কারণ বলে গ্রহণ করা যায় না, যেহেতু সেক্ষেত্রে মোক্ষ সৃজ্য কার্যরূপে অনিত্য হয়ে পড়ে—যা অসম্ভব—তার উত্তরে জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়বাদী বলছেন যে, মোক্ষ যে নিত্য, অনিত্য নয়, সে বিষয়ে ত বাদী প্রতিবাদী কারোই মতদ্বৈধ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও, জ্ঞানকে যেমন মোক্ষের সাধন বলে গ্রহণ করা হয়, নিষ্কাম নিত্য কর্মকেও ঠিক সেই ভাবেই গ্রহণ করতে হবে। এরূপে, মোক্ষ যদি জন্মজন্মান্তরের অভাব বা শাশ্বত নিবৃত্তিই হয়, তা হলে নিষ্কাম-কর্মের দ্বারাই ত তা পাওয়া যায়। এই ভাবে, নিষ্কাম নিত্য কর্মের যথাযথ অনুষ্ঠান করে চললে, পাপের উদয় হবে না; নিষিদ্ধ কর্ম না করলে অনভিলষিত শরীরের উৎপত্তি হবে না; কাম্য কর্ম না করলে অভি-লষিত শরীরেরও উৎপত্তি হবে না। এরূপে, বর্তমান শরীরপাতের পর, নূতন শরীরের উৎপত্তির কারণ রাগ-দ্বেষ বা সকাম-কর্ম বিদ্যমান না থাকায়, আত্মস্বরূপাব-স্থিতিরূপ মোক্ষ স্বতঃই সিদ্ধ হয়। সেজন্য, মোক্ষ "অযত্ন-সিদ্ধ", অর্থাৎ কর্ম-প্রচেষ্টা দ্বারা সৃজ্য, অনিত্য পদার্থ নয়।

এস্থলে নিত্য মোক্ষই নিষ্কাম নিত্য কর্মের অনুষ্ঠান এবং সকাম নিষিদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠানাভাব দ্বারা প্রকাশিত হয়, জন্ম-জন্মান্তর-অভাব সিদ্ধির মাধ্যমে। অতএব কর্ম-বাদিগণের মতানুসারে যে নিত্য মোক্ষ অনিত্য হয়ে পড়েন—এই আপত্তিও অযৌক্তিক।

যদি বলা হয় যে, বহু অতীত জন্মের বহু অভুক্ত কর্মই ত জীবের সঞ্চিত হয়ে থাকে। স্বর্গোপভোগ বা নরক-ভোগ ব্যতীত সেই সকল কর্মের ক্ষয় হতে পারে না। সেজন্য, বর্তমান দেহপাতের পরই জন্মান্তর নিবৃত্তি ও মোক্ষ হতে পারে কি করে?—তার উত্তরে জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়-বাদী বলছেন যে, নিত্য কর্মের অনুষ্ঠান কালে, যে পরিশ্রম, প্রচেষ্টারূপ দুঃখভোগ করতে হয়, তার দ্বারাই সঞ্চিত কর্মেরও ভোগ হয়ে যায়। কিংবা, এক্ষেত্রে এও বলা চলে যে, প্রায়শ্চিত্ত করলে যেমন পূর্ব পাপের ক্ষয় হয়, নিষ্কাম ভাবে নিত্য কর্মের যথাযথ অনুষ্ঠান করলেও তেমনি পূর্বসঞ্চিত কর্মেরও ক্ষয় হয়ে যায়। সেজন্য যে সকল কর্মের ফল হ'ল এই বর্তমান দেহ, সে সকল কর্মের ভোগ ও ক্ষয় হয়ে যায় বর্তমান দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গেই; এবং পূর্বেই যা বলা হয়েছে, নূতন কোনো

দেহোৎপত্তির কারণস্বরূপ নূতন কোনো সকাম-কর্ম এক্ষেত্রে না থাকায়, বর্তমান দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গেই "অযত্ন-সিদ্ধ", মোক্ষেরও আবির্ভাব হয়।

জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়-বাদীদের উপরের এই মতবাদের বিরুদ্ধে শঙ্কর এই সকল আপত্তি উত্থাপন করছেন (গীতা-ভাষ্য, ১৮-৬৬):

প্রথমতঃ, সমস্ত শ্রুতি-স্মৃতি অনুসারে একমাত্র জ্ঞানই মোক্ষের সাধক:—

"বিদ্যায়া অন্যঃ পন্থাঃ মোক্ষায় ন বিদ্যতে।"

(গীতা-ভাষ্য, ১৮-৬৬)

বিদ্যা বা জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষের আর অন্য কোনো পন্থা নেই।

দ্বিতীয়তঃ, এই মতানুসারে কর্মক্ষয়ের কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। পূর্বসঞ্চিত, ফলদানে অপ্রবৃত্ত, দুঃখহেতু পাপকর্ম যেমন বদ্ধজীবের আছে, ঠিক তেমনি পূর্বসঞ্চিত ফলদানে অপ্রবৃত্ত, সুখহেতু পুণ্যকর্মও ত তার আছে। সেক্ষেত্রে, নিত্য কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা যে দুঃখভোগ হয়, তার দ্বারা পূর্বসঞ্চিত, ফলদানে অপ্রবৃত্ত, দুঃখহেতু পাপ-কর্মের ভোগও ত কেবল হতে পারে, পূর্বসঞ্চিত, ফলদানে অপ্রবৃত্ত, সুখহেতু পুণ্য কর্মের নয়—যেহেতু, যে কর্মের ফল সুখ, সেই কর্মের ভোগ ও ক্ষয় দুঃখ দ্বারা হবে কিরূপে? সেজন্য এক্ষেত্রে, নিষ্কাম নিত্য কর্মের অনুষ্ঠান এবং কাম্য নিষিদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠানাভাব দ্বারাও, সঞ্চিত সকল কর্মের, অর্থাৎ পুণ্যকর্মের ভোগ ও ক্ষয় না হওয়াতে, মোক্ষও অসম্ভব হয়ে পড়ে।

"তেষাং চ দেহান্তরমকৃত্বা ক্ষয়ানুপপত্তৌ, মোক্ষানুপপত্তিঃ।"

(গীতা-ভাষ্য, ১৮-৬৬)

এই সকল পুণ্যকর্মের ভোগের জন্য আরেকটা দেহ, বা আরেকটা জন্মের প্রয়োজন বলে, বর্তমান দেহপাতের পরই মোক্ষ সম্ভবপর হয় না।

তৃতীয়তঃ, পুণ্য-পাপরূপ সকাম-কর্মের অভাব জন্ম-জন্মান্তরের অভাব সত্য। কিন্তু সেই সকাম-কর্মের মূলীভূত রাগ-দ্বেষ বা বাসনা-কামনার বিনাশ হতে পারে একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই। কারণ, অজ্ঞান বা অবিদ্যাই হ'ল এরূপ রাগ-দ্বেষের একমাত্র হেতু। জগতের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে, জাগতিক সকল বস্তুই যে অনিত্য, দুঃখকারণ, মোক্ষপরিপন্থী ও হেয়, এই জ্ঞানও হয়, এবং স্বতঃই জাগতিক বস্তুর জন্য আর বাসনা-কামনা থাকে না। সেজন্য অজ্ঞান-বিনাশক জ্ঞানই হ'ল সকাম-কর্মেরও বিনাশক। বস্তুতঃ

"নিত্যানাঞ্চ কর্মণাং পুণ্যলোক-ফলশ্রুতেঃ স্মৃতেশ্চ কর্মক্ষয়ানুপপত্তিঃ।"

(গীতা-ভাষ্য, ১৮-৬৬)

শ্রুতি-স্মৃতি অনুসারে, নিত্য কর্মের ফলও হ'ল পুণ্যলোকলাভ।

সেজন্য, নিত্য কর্ম দ্বারা পাপ-পুণ্যের ক্ষয় হবে কিরূপে? একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই ত এরূপ ক্ষয় সম্ভবপর।

চতুর্থতঃ, নিত্য কর্মের অনুষ্ঠান দুঃখস্বরূপ বলে স্বীকার করে নিলে, নিত্য কর্মকেও পূর্বজন্মকৃত পাপের ফল বলেও সেই সঙ্গেই স্বীকার করে নিতে হয়। কারণ, এজন্মে কৃত নিত্য কর্মের ত স্বতন্ত্র ও বিশেষ কোনো ফলের উল্লেখ শ্রুতিতে নেই। যেমন যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্রের বিধান শ্রুতিতে আছে। এই অগ্নিহোত্র একটি অবশ্যকরণীয়, নিত্য কর্ম, কিন্তু তার কোনো কোনো ফলের বিধান শ্রুতিতে নেই। সেজন্য স্বীকার করে নিতে হয় যে, এরূপ অগ্নিহোত্রাদিরূপ দুঃখময় নিত্য কর্ম পূর্বকৃত পাপ-কর্মের ন্যায্য ফলই মাত্র, কিন্তু স্বয়ং অন্য কোনো ফলের জনক নয়।

পঞ্চমতঃ, প্রকৃতকল্পে দুঃখময় নিত্য কর্ম যে পূর্বসঞ্চিত, ফলদানে অপ্রবৃত্ত, কর্মেরই ফল—এবং সেজন্য এরূপ নিত্য কর্মের মাধ্যমে পূর্বসঞ্চিত, ফলদানে অপ্রবৃত্ত কর্মেরও ভোগ ও ক্ষয় হয়ে যায়—এই মতবাদই ত সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত।

"অপ্রবৃত্তানাং কর্মণাং ফলদানাসম্ভবাৎ, দুঃখ-ফল-বিশেষানুপপত্তিশ্চ স্যাৎ।" (গীতা-ভাষ্য, ১৮-৬৬)।

ফলদানে অপ্রবৃত্ত বা অনারব্ধ কর্মের ফল বর্তমান জন্মে হতে পারে না, কেবল আরব্ধ কর্মেরই ফল এজন্মে হয়। সেজন্য, সঞ্চিত, অনারব্ধ কর্ম যে এজন্মে দুঃখরূপ বিশেষ ফল উৎপাদন করবে, তা ত যুক্তিযুক্ত নয় কোনো ক্রমেই।

"যদুক্তং পূর্ব-জন্ম-দুরিতানাং কর্মণাং ফলং নিত্য-কর্মানুষ্ঠানায়াস-দুঃখং ভুজ্যতে ইতি তদসৎ।"

(গীতা-ভাষ্য, ১৮-৬৬)

সেজন্য দুঃখময় নিত্য কর্ম যে পূর্বসঞ্চিত, অনারব্ধ পাপ-কর্মের দুঃখরূপ, ন্যায্য ফল—এই মতবাদ অসত্য ও অযৌক্তিক। কারণ, মরণকালে যে কর্ম পরজন্মে ফল-দানের জন্য অঙ্কুরিত না হয়, সেই কর্ম সেই জন্মে কোনো ফল দান করতে পারে না। এরূপ কর্ম যে অন্য কর্মের ফল দান করবে, তা'ও ত কর্মবাদানুসারে সম্পূর্ণ

অযৌক্তিক। কর্মবাদানুসারে প্রত্যেক কর্মই স্ব স্ব ফল দান করতে পারে, অন্য কর্মের ফল নয়। তা যদি না হ'ত, তা'হলে বলতে হ'ত যে, কাম্য অগ্নিহোত্রাদির ফল স্বর্গ হলেও সেই সময়ে অন্য কর্মের ফলস্বরূপ নরক-বাসও হতে পারে। কিন্তু তা ত কোনোদিন হয় না।

ষষ্ঠতঃ, দুঃখময় নিত্য কর্ম যে পূর্বকৃত পাপের দুঃখস্বরূপ স্বাধ্য ফলই মাত্র, একথাও তুল্যভাবে অযৌক্তিক। সঞ্চিত, অনারব্ধ, অসংখ্য বিভিন্ন পাপকর্মই ত আছে। সে সমস্তই একত্র হয়ে যে একই প্রকারের দুঃখময় নিত্য কর্মরূপ ফলের সৃষ্টি করছে, তা, অসম্ভব, যেহেতু বহু বিভিন্ন প্রকারের পাপকর্মের ফল বহু বিভিন্ন প্রকারের দুঃখই ত হওয়া উচিত, একই প্রকারের নিত্য কর্মরূপ দুঃখ হতে যাবে কেন? পুনরায় যদি এই আপত্তির খণ্ডনের জন্ত বলা হয় যে, বহু বিভিন্ন পাপকর্ম একত্রে একই নিত্য কর্মরূপ ফলের সৃষ্টি করে না সত্য, কিন্তু কয়েকটি বিশেষ পাপকর্ম এই জন্মে দুঃখময় নিত্য কর্মরূপ ফল উৎপাদন করে—তা হলেও আরেকটি আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে। সেটি হ'ল এই যে, এই সঞ্চিত, অনারব্ধ, অসংখ্য পাপকর্মের মধ্যে অন্যগুলি এ জন্মে কোনো ফলই উৎপাদন করে না, হঠাৎ দুঃখময় নিত্য কর্মরূপ ফলের হেতুভূত সঞ্চিত, অনারব্ধ, পাপকর্মগুলিই এ জন্মে ফল উৎপাদন করতে আরম্ভ করে দেবে কেন? দুঃখ ত অনেক রকমই আছে—শীত-গ্রীষ্ম, রোগ, বাধা, "শিরসা পাষাণ বহনাদি", মস্তকে প্রস্তর বহন প্রভৃতি। তাদের হেতুরূপ পাপ কর্মও অনেক প্রকারের। সে ক্ষেত্রে সেই সকল পাপকর্ম তাদের স্ব স্ব যোগ্য দুঃখফল এ জন্মে উৎপাদন করছে না; কেবল দুঃখস্বরূপ নিত্য কর্মের হেতুভূত পাপকর্মই তা করছে—এরূপ প্রভেদ কল্পনার কোনো যুক্তিসঙ্গত হেতু ত এক্ষেত্রে নেই।

সপ্তমতঃ, নিত্য কর্ম অনুষ্ঠানকালে যে আয়াস বা শ্রম হয়, এবং এই আয়াস বা শ্রমের ফলে যে দুঃখ হয়, সেই দুঃখই হ'ল পূর্বসঞ্চিত পাপের ফল—এই মতবাদও সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক। পূর্বেই যা বলা হয়েছে, কর্মবাদানুসারে, আরব্ধ কর্মেরই ফল পরজন্মে হতে পারে, অনারব্ধ কর্মের নয়। সেজন্য নিত্য কর্মের আয়াস বা শ্রম থেকে যে দুঃখের সৃষ্টি হয়, তা প্রারব্ধ কর্মেরই ফল, সঞ্চিত কর্মের নয়—এই কথাই বলা উচিত। যদি বলা হয় যে, সঞ্চিত সমস্ত পাপকর্মই প্রারব্ধ কর্ম, অনারব্ধ নয়—তা হলে তাদের মধ্যে একমাত্র দুঃখস্বরূপ নিত্য কর্মের হেতুভূত প্রারব্ধ পাপকর্মগুলিই কেবল সত্যই ফল উৎপাদন করল, অন্যান্য অসংখ্য প্রারব্ধ পাপকর্মগুলি নয়, এরূপ প্রভেদেরও কোনো যুক্তিসঙ্গত হেতু খুঁজে পাওয়া যায় না।

তীর্থযাত্রা হবে কি গো শেষ?

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

বৈদিক মন্ত্রের মত শুনি কানে প্রস্রবণ গীতি
পদব্রজে যেতে যেতে তীর্থযাত্রা পথে।
বন্য কুসুমের ঘ্রাণে লভিতেছি যে আনন্দ-প্রীতি
ব্যক্তাতীত। যাযাবর হৃদয়েরে নিয়ে কোনমতে
দিনে দিনে হোলো পরিক্রমা! মত্ত মন,
দুর্লভের আকাঙ্ক্ষায় কোথা যেন ধ্বনিছে ক্রন্দন!

বিচিত্র বর্ণের লতা নুয়ে পড়ে মৃদু সমীরণে
চলেছে পার্ব্বত্য নারী বীথিকার মাঝে।
কল্লোল-কাকলীসুরে কুসুমের গন্ধ নিবেদনে
কার যেন অর্চ্চনার সমারোহ অহরহ রাজে।
অসংখ্য উপলশ্রেণী, দোলে ঘন ছায়া,
হেথায় পেলো কি মুক্তি মোর প্রতি দিবসের মায়া!

বাসনার নগ্ন শিশুদল নাহি গিরিপথ ঘিরে,
হেথা শান্ত সৌম্য পরিবেশ, আর আমি
হেরিতেছি ধ্যানমগ্ন উপাসক গুহায় মন্দিরে
হিম অধিত্যকা মাঝে ব্রহ্মবিহারের অনুগামী।
দূরে রাখি সংসারের সর্ব্বকলরব,
শোনা যায় দিকে দিকে লীলামুখী দেবতার স্তব।

নিঃশব্দতা! সর্ব্বোত্তম নির্ভরতা লয়ে পথচলা,
নিত্যঝরা নির্ঝরিণী সম চিত্ত রহে।
আলোর চেতনা পেয়ে ভূমানন্দে কোন কথা বলা
নিরালায় নাহি লাগে ভালো; নয়নে ভাবাশ্রু বহে।
আত্মার প্রার্থনা মোর চায় চিরস্থিতি অবসর
অসীমের পানে ছুটে জন্ম মাঝে কেন জন্মান্তর?

তীর্থযাত্রা হবে কিগো শেষ?
সহস্র ভাবনা মোর বিহঙ্গের মত নিরুদ্দেশ।

নিরুপমা

শ্রীসুবোধ বসু

নিরুপমা দার্জ্জিলিং আসিয়াছে। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ পড়িয়াছে। এ সময় পাহাড়ে পালাইয়া আসা তাহাদের সমাজের রেওয়াজ। তার ছোট বোন অনু দার্জ্জিলিঙে বাড়ী লইয়াছে। সঙ্গে আসিবার লোক নাই। গ্রীষ্মের ভয়ে স্বামীর অফিস ছুটি দেয় না; তাই বেচারীকে কলিকাতায় থাকিয়া খাটিয়া মরিতে হইবে। ঈস্টারের সঙ্গে দু'চার দিন ক্যাজুয়েল লীভ্ লইয়া একবার বড় জোর বেড়াইয়া যাইতে পারে! অনু তাই দিদিকে গিয়া ধরিল।

কলিকাতার সমাজে যেসব স্ত্রী ও পুরুষ নিরুপমাকে সামাজিক কর্ম্মতৎপরতার জন্য অপরিহার্য্য মনে করিত, তারা ক্ষুণ্ণ হইল। পার্টিতে, বল-নাচে, পিকনিকে নিরুপমা সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। সুন্দরী, সুরসিকা, ফুর্ত্তিবাজ মেয়ে নিরুপমা। টাকার অভাব নাই; স্বামীর সঙ্গে ডিভোর্সের পর নিজেই নিজের অভিভাবক। সমাজের কেওকা-চোমরা পুরুষেরা তাকে ডিনারে লইয়া যাইতে পারিলে বা সান্ধ্যমোটর বিহারে তার সঙ্গী হইতে পারিলে বর্ত্তিয়া যায়। নিরুপমার অনুগ্রহলাভের জন্য প্রতিযোগিতা রেষারেষিতে পর্য্যন্ত দাঁড়াইবার উপক্রম হয়।

সেই নিরুপমা হঠাৎ কলিকাতা ছাড়িয়া দার্জ্জিলিঙে হাজির হইলে কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ নাগরিকের দার্জ্জিলিঙে হাজির হইবার প্রয়োজনীয়তা যে বাড়িয়া যাইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি!

'তোর সঙ্গে দিদিভাই বের হওয়াই মুস্কিল।' অনু অভিযোগ করিয়া বলে। 'কলকাতার চেনা এ বের হয়, ও বের হয়। নিরিবিলি যে ক'দিন কাটাব, তার উপায় নেই। কাল সন্ধ্যেবেলা ঘোষালসাহেব কল করেছিলেন, বলেছি কি? বললেন, কালিম্পঙে ট্যুর-এ আসতে হয়েছিল, ভাবলাম, দার্জ্জিলিংটাও একবার ঘুরে যাই। মিসেস মুখার্জ্জিও আপনার সঙ্গে এসেছে শুনলাম?'

'তুই কি বললি?' নিরুপমা চৌরাস্তার দোকানের শো-কেসে নতুন ডিজাইনের ফারকোটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল।

'বললাম, হাঁ, এসেছেন। এখন বাড়ী নেই। চারু গাঙ্গুলীরা এসে ডিনারে নিয়ে গেছে।'

'অত খবর দেবার কি দরকার ছিল?' একটু বিরক্ত-ভাবেই নিরুপমা কহিল। 'সীজনের সময় এক গাদা লোক এখানে এসে হাজির হয়। পাশ কাটিয়ে যেতে চাইলেও চেনা লোক এড়াবার উপায় নেই। ভদ্রতা করতে করতে জীবন অস্ত।...এটা দেখেছিস? তিন শো পচাত্তর টাকাতে বারগেন্ নয় কি? আমি তো কিনবই ঠিক করেছিলাম। সুদাম দত্ত বলছেন, ওটা আমাকে প্রেজেন্ট না দিলে তার চলবেই না। বল তো কি করে নিই?...'

'নিয়ো না, দিদি।' অনু সরলতার সঙ্গে কহিল। 'ওরা তা হলে আরও পেয়ে বসবে।'

'হ্যাঃ, পেয়ে বসলেই হলো। নিয়ে ওদের আমি ধন্য করি। তা বলে, পেয়ে বসার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। পেয়ে বসার বয়স আমার অনেকদিন পার হয়ে গেছে। তোরা মনে মনে ভাবিস্, দিদি খুব হল্লোড়বাজ...,

'বাঃ রে, তা আমরা ভাবতে গেলাম কেন!' অনুপমা তার রঙিন ছাতাটা বন্ধ করিয়া তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করিল।

'সবাই জানে আমি হল্লোড়বাজ। হল্লোড় না করে কি করি বল? লোকের পাঁচটা নিয়ে বাঁচার আছে। আমার কি আছে বল?'

দার্জ্জিলিঙের কুয়াশার মত এক নিমেষে উজ্জ্বল কণ্ঠ-স্বরকে আর্দ্র অস্পষ্ট করিয়া তুলিল বাষ্পাভাস। অনুপমা ভীত হইয়া উঠিল। চৌরাস্তার ভিড় এখন জমিয়া ওঠে নাই। দূরবর্ত্তী বেঞ্চগুলিতে অগ্রগামীদের দু'পাঁচ জন আসিয়া আসন লইয়াছে মাত্র। তবু বড় প্রকাশ্য জায়গা ওটা। দোকানের শো-কেসের সামনে দাঁড়াইয়া দিদি যদি চোখে রুমাল রগড়াইতে থাকে, তবে তাহা নজরে না পড়িয়া উপায় নাই। দিদি বড় ভাবপ্রবণ। কোন্ কথায় যে তার চোট লাগিবে বলা যায় না। জীবনে দিদি জটিলতা টানিয়া আনিয়াছে। এটা তার নিজের দোষ অথবা অপরপক্ষের দোষ সে সম্বন্ধে বিচার করিয়া

লাভ নাই। এক সময় ইহা লইয়া পরিবারে বহু বাদানুবাদ হইয়াছে। কিন্তু যাহা অতীত তাহা লইয়া অনুশোচনা করিয়া লাভ নাই। নিরুপমা যদি নিজের দুঃখটা হাল্কা করিতে পারে, তাতেই তার আপন জন খুশি। তার অনেক আচরণ অনুমোদন না করিলেও সাধারণতঃ ইহা লইয়া কেহ উচ্চবাচ্য করে না।

'ঘোড়া, মেমসাব্?'

পিছন হইতে পরিচিতকণ্ঠে আহ্বান শুনিয়া অনুপমা তাকাইয়া দেখিল, লেপ্‌চা ঘোড়াওয়ালী তেন্‌জী তাহাদের আবিষ্কার করিয়া ঘোড়া ভাড়া দিবার আশায় কাছে হাজির হইয়াছে।

'চল না, দিদিভাই, জলাপাহাড় পর্য্যন্ত একবার ঘুরে আসি। ওকে বললেই তোমার সেই বড় ঘোড়াটা নিয়ে আসবে। আস্তাবলের ভেতর দাঁড়িয়ে আছে দেখেছি।'

'না আমার ভালো লাগছে না।' নিরুপমা সংক্ষেপে কহিল।

অনু আর পীড়াপীড়ি করিল না। ঘোড়ায় চড়া নিরুপমার বিশেষ পছন্দ। দার্জ্জিলিঙের সাধারণ ভাড়ার টাট্টুগুলিতে চড়িয়া তার সুখ হয় না, তাই যারা ঘোড়া ভাড়া দেয় তাহারা 'বড় মেমসাবে'র জন্য বৃহদাকার এবং তেজী ঘোড়ার জোগাড় রাখে। একা একা বহু জায়গায় সে ঘোড়ায় চড়িয়া ঘুরিয়া আসে অহরহ। অনু পারত-পক্ষে যায় না, গেলেও ছোট এবং নিরীহ ঘোড়া বাছিয়া লয়। কিন্তু দিদিকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য সে-ই আজ ঘোড়ায় চড়িবার প্রস্তাব করিয়াছিল।

'তা হলে চলো, মিনিদির বাড়ীতেই আজ ঘুরে আসি। অনেকদিন ধরে বলছেন…'

'হাঁ' 'না' কিছু না বলিয়া নিরুপমা হাঁটিতে আরম্ভ করিল। ডান দিকে মোড় লইলেই নেহরু রোড। বাঁ দিকের ফোয়ারার অদূরে তেন্‌জী তখনও ঘোড়ার লাগাম হাতে দাঁড়াইয়া আছে; এখনও কোনও ভাড়াটে জোটে নাই। এইবার দলে দলে স্বাস্থ্যান্বেষী বৈকালিক টহলের জন্য চৌরাস্তায় হাজির হওয়া শুরু করিবে। তখন ঘোড়া পাওয়াই মুস্কিল।

'তুই ঘুরে আয় মিনিদির বাড়ী থেকে। আমি এখানে একটু বসি। যাবার সময় ডেকে নিয়ে যাস।'

অনুপমা পাশের রেস্তরাঁটার প্রতি একবার তাকাইয়া দেখিল। এখানে একটু বসিবার অর্থ সে বেশ বোঝে। তার উপর যদি দলের কেউ জুটিয়া যায়, তবে সন্ধ্যা নাগাদ দিদির অবস্থা যা দাঁড়াইবে, তাহা কল্পনা করিয়া সে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। অবশ্য ওটা প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। খাওয়ার নিমন্ত্রণ থাকিলে নেশাটা তবু মাত্রার মধ্যে থাকে। যেদিন মন-খারাপ দূর করিবার জন্য দিদি গ্লাস ধরেন, সেদিন কেলেঙ্কারী ব্যাপার। এ লইয়া অনুযোগ করিলে লাভ নাই। 'আমার ভবিষ্যৎ কি বল? আমার আশা করার কি আছে? বিষ খেয়ে যদি ভুলে থাকতে পারি, তবে ক্ষতি কি!' এ জবাব অহরহ পাওয়া যায়।

'এদের কাউকে বিয়ে করো না।' অনু একদিন সাহস করিয়া বলিয়াছিল।

'একবারের অভিজ্ঞতাই কি যথেষ্ট শোচনীয় নয়! পুরুষদের আমি আর বিশ্বাস করিনে। ওরা নিজেদের অহঙ্কার ছাড়া আর যদি কিছু বোঝে তো তা নিজের স্বার্থ।'

'কত মেয়ে তো স্বামী নিয়ে, সংসার নিয়ে সুখী হয়।'

'সে তোর মতো ঠাণ্ডা নিরীহ মেয়ে, সাত-চড়ে যে কথা বলবে না। নিজের ইচ্ছে-অনিচ্ছে বলে যার কিছু নেই, অন্যকে খুশি করতে পারলেই যে ধন্য। আমি তো সে রকমের মেয়ে নই।'

নিরুপমার বিবাহিত জীবন ভণ্ডুল হওয়ার মূলে প্রধানতঃ এই জিনিসটা, তাহা আত্মীয়জনেরা বেশ ভালই জানেন। কেউ ভালো করিয়া বলেন, স্বাতন্ত্র্যবোধ। কেউ বলেন, স্বেচ্ছাচার।

নিজে পছন্দ করিয়া, প্রেম করিয়াই নিরুপমা প্রসূনকে বিবাহ করিয়াছিল। বরঞ্চ তখন তার বাড়ীর গুরুজনদের কাছ হইতেই আপত্তি উঠে। প্রসূন নামকরা ভাল ছেলে। ষ্টেট-স্কলারশিপ লইয়া বিলেত যায়। কেম্ব্রিজ হইতে রসায়নের ডক্টরেট লইয়া দেশে ফেরে। সরকার হইতে ডাকিয়া প্রথমেই হাজার টাকা মাহিনার চাকরি দেয় তাকে। লম্বায় ছ'ফুটের কাছাকাছি, গায়ের রং ফর্সা, সুদর্শন পুরুষ। বুদ্ধিদীপ্ত চোখের দৃষ্টি; কথাবার্ত্তায় রসিকতার ছোঁয়াচ, মেজাজ ঠাণ্ডা ও সহিষ্ণু। পাত্র হিসাবে তার তুলনা নাই। তবু নিরুপমার মা আপত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন, 'সবই তো খুব ভাল। কিন্তু ওদের সমাজ আলাদা। খুকী যে-সমাজে বড় হয়েছে, তার হাল-চাল ওদের মধ্যবিত্ত সমাজের চালচলনের সঙ্গে বেখাপ্পা হবে না তো?'

তিন পুরুষে বনিয়াদী ঘরের মেয়ে তিনি। বুনিয়াদের সমস্যা ভাল করিয়াই জানেন। কিন্তু নিরুপমা তখন মনস্থির করিয়া ফেলিয়াছে। লেডী ব্যানার্জ্জির পরিজনেরা তাঁকে বুঝাইয়া বলিল যে, বিলাতের পালিশ যার উপর পড়িয়াছে, তাকে উপরসমাজভুক্ত করিয়া লওয়া

সম্ভব। বিশেষতঃ, এমন প্রতিভাবান ছেলে বনিয়াদী শ্রেণীতে সুদুর্লভ। তা ছাড়া, নিরুপমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথাও ভাবিতে হইবে। ইহার পর লেডী ব্যানার্জ্জি আর আপত্তি তোলেন নাই।

কিন্তু তাঁর মৃত্যুর আগেই তাঁর আশঙ্কা এবং সতর্কবাণী যে ফাঁকা কথা ছিল না, তাঁর প্রমাণ তিনি পাইয়া গিয়াছেন। মেয়েতে জামাইতে খিটিমিটি ঘরের চৌহদ্দি ছাড়িয়া সাধারণ্যে প্রকাশ পাইতে থাকে। স্বামী যদি সভায় সভাপতিত্ব করিতে যায়, স্ত্রীকে ক্যালকাটা ক্লাবের নাচের ফ্লোরে অন্যের সঙ্গে জুড়ি মিলাইয়া নাচিতে দেখা যায়। সভার টেকনিক্যাল বিষয়ক বক্তৃতায় নিরুপমা রসের সন্ধান না পাইলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। স্বামীর সঙ্গে জ্ঞানের ক্ষেত্রে ঐক্য কম স্ত্রীরই থাকে। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল, পরস্পরের সময় কাটাইবার পদ্ধতিতেও স্বাতন্ত্র্য দেখা যাইতেছে। স্বামী সন্ধ্যায় ময়দানে পায়চারি করিতেছেন। স্ত্রী পুরুষ-বন্ধুকে পাশে বসাইয়া ডায়মণ্ড হারবার রোড দিয়া মোটর ছুটাইয়াছে। স্ত্রীর বাহিরে ডিনার লাগিয়াই আছে। স্বামী একা বাড়িতে নৈশ আহার সমাপ্ত করিতেছেন; নিরুপমা অভিযোগ করিয়া বলেন, 'উনি যদি সমাজে মিশতে না চান, আমি কি করব। আমার সমাজের লোকদের আমি ছাড়তে পারি নে। সভ্য সমাজের আদব আমাকে মেনে চলতেই হয়।'

প্রসূনও জেদী মানুষ। তার প্রিন্সিপ্ল সে কিছুতেই বিসর্জ্জন দিবে না। কিন্তু তার বিরাগ প্রকাশের পদ্ধতি কোলাহলময় নয়। ঝগড়া সে যথাসাধ্য এড়াইয়া চলে। তার প্রতিবাদের রূপ অসহযোগ।

কিন্তু বিস্ফোরণ আসিল লেডী ব্যানার্জ্জির মৃত্যুর পর। নিরুপমা ও অনুপমা পিতামাতার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হিসাবে তখন এত সম্পত্তি ও সঞ্চিত অর্থ লাভ করিয়াছে যে, বেপরোয়া খরচ করিলেও একটা জীবনে তা নিঃশেষ করা অসম্ভব! এই অর্থ লাভের সঙ্গে নিরুপমার স্বাতন্ত্র্যবোধ আরও উদ্ধত হইয়া উঠিল। পরামর্শ দিবার এবং হল্লোড়ের সঙ্গী হইবার লোকের একেই অভাব ছিল না; এইবার তাহা প্রায় প্ররোচনাতে রূপান্তরিত হইল। 'তোমরা দু'জনে দুই আলাদা ট্রাডিশনের লোক', নিরুপমার বন্ধুরা প্রকাশ্যেই বলা শুরু করিল। 'চাল-কলার সঙ্গে কখনও লেগ-রোস্টের সামঞ্জস্য সম্ভব নয়!'

সুতরাং সেতু ভাঙিয়া ফেলিতে হইল। প্রসূন নীরবেই রাজী হইল। তার সঙ্গে যে সুখী হইতে পারিবে না, তাকে মুক্তি দিয়াই সে সুখী করিবে। আপোষে বিবাহবিচ্ছেদের ব্যবস্থা হইল। প্রসূন ইষ্ট আফ্রিকার চাকরি লইয়া দেশ ছাড়িল। নিরুপমা দেশ ছাড়িতে পারিবে না। সুতরাং বিবাহবিচ্ছেদের জন্য মিলিত আবেদন পেশ করার একটা সঙ্গত অজুহাত সংগ্রহ হইল। এর পর এক বছর যাইবার পর মিলিত আবেদনের ফলে বিবাহবিচ্ছেদ পাকা হইল। ইহা প্রায় বছর চারেক আগেকার কথা।

'চলো, আমিও তোমার সঙ্গে যাই। আজ আর চলতে ইচ্ছে হচ্ছে না। এদের কফিটা ভালো হয়।' বলিয়া অনুপমা অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া দিদির পিছনে হাঁটিতে শুরু করিল। ক'ধাপ নামিয়া রেস্তরাঁটার সিঁড়ি। এই সিঁড়ি ধরিয়া উভয়ে উপরের তলায় উঠিয়া আসিল।

'কফি এক। বড়া পেগ এক।'

নেপালী ওয়েটার রাস্তার ধারের জানালার পাশের টেবিলে চেয়ার টানিয়া উপবেশন সুগম করিয়া খাতির দেখাইবার পর নিরুপমা পানীয়ের ফরমাস দিল।

'দিদি!'

'আপত্তি! এই জন্যই বুঝি সঙ্গে এসেছিস্? মাষ্টারগিরি করা…'

'ঘরের ওদিকটায় চেয়ে দেখ।' অনুপমা হলঘরের অপরপ্রান্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া চাপা উত্তেজনার কণ্ঠে কহিল। 'প্রসূনদা!'

নিরুপমার অলস দৃষ্টি সচকিত হইয়া উঠিল এক পলকে।

ডাইনিং-হলের অন্যপ্রান্তে সব চেয়ে বড় টেবিলটায় গোটা চার-পাঁচ মেয়ে ও গোটা দুই পুরুষের সঙ্গে সহাস্যমুখে বসিয়া আছে নিরুপমার ভূতপূর্ব্ব স্বামী। অনেকগুলি খাবার প্লেট, অনেক রকম পানীয়ের গ্লাস। প্রসূনের সামনের গ্লাসটা এখনও রক্তিমবর্ণ পানীয়তে অর্দ্ধপূর্ণ।

নিরুপমা দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিল নিজেদের টেবিলে। চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কফি তৈরীতে সময় লাগে। মদের পাত্র প্রস্তুতই থাকে। প্রথমেই বোতল, সাইফন, ডিকেন্টার ও সোডাওয়াটারের বোতল শোভিত ট্রে হাজির হইল। তাকাইয়া দেখিল একবার নিরুপমা। বিরক্তভাবে হাত নাড়িয়া ফিরাইয়া লইয়া যাইবার ইঙ্গিত করিল। বিব্রত পরিচারকের বিস্ময় অপোদনের চেষ্টা করা তো দূরের কথা তার প্রতি দ্বিতীয় দৃষ্টিপাত করিল না

নিরুপমা। 'একবার দেখেছিস্ কাণ্ড! মদ ধরেছে! এক গাদা হাব্বা মেয়ে-পুরুষ জোগাড় করে হল্লোড় করছে।'

'কবে এসেছেন, প্রসূনদা? জানো নাকি?' অনু নিম্নস্বরে প্রশ্ন করিল।

'জানলে পরের দিনই দার্জ্জিলিং ছাড়তাম। কে জানত ঈষ্ট আফ্রিকা হিমালয় পর্ব্বতের এতটা কাছে!'

'ড্রিংক্‌সের ওপর প্রসূনদার তো দারুণ রাগ ছিল।'

'রাগ নয়। কুসংস্কার। এ নিয়ে আমাকে কম কাঁদিয়েছে? বলেছে, আনন্দ করতে যাদের উত্তেজক পানীয়ের দরকার, তারা সুস্থ মানুষ নয়, বনিয়াদী কবরের তলা থেকে খুঁড়ে-তোলা মমীর স্বল্পায়ু elan vital! বনিয়াদী হাল-চালের উপর সারাক্ষণ এই রকম সূক্ষ্ম খোঁচা দিয়ে কথা বলত। অথচ এখন নিজেই সেই চাল ধরেছেন। এখন নিশ্চয়ই বলবে, আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের এটাই সব চেয়ে সঙ্গত আচরণ। আমাকে কম জালিয়েছে!'

অনুপমা সকৌতূহলে কয়েকবার দূরবর্ত্তী টেবিলের দিকে দৃষ্টিপ্রেরণ করিল। এত চেনা লোক, অথচ তার স্বীকৃতির অভাব যেন ভারি অস্বাভাবিক বোধ হইতে লাগিল তার কাছে। অতঃপর মনোভাব আর চাপিতে না পারিয়া সে কহিল, 'একবার ডাকব, দিদিভাই? আমাদের দেখতেই পান নি, প্রসূনদা!'

'কেন, আমাদের কে যে ডাকবি? ছেলেমানষি করো না।' প্রায় বিরক্ত স্বরে বলিয়া উঠিল নিরুপমা। 'তার সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক যে ডেকে খাতির দেখাতে হবে?···দেখে নি আবার! খুব দেখেছে। এক গাদা মেয়ে জোগাড় করে মজলিশ বসিয়েছে। গায়ে-পড়ে চেনা জানাতে গেলে অপমান হবি। আমাদের জব্দ করবার কোনও সুযোগই ছাড়বে না।···নে, কফি খেয়ে নে। উঠব!'

লুকোচুরি খেলায় দার্জ্জিলিং শহরের তুলনা নাই। ফগের সাদা চাদর মুড়ি দিয়া ক্ষণে ক্ষণে আপনাকে সে অদৃশ্য করিবার চেষ্টা করে; আজ সকাল হইতেই শুরু হইয়াছে এই খেলা। বেলা আটটার পরিপুষ্ট সূর্য্যিঠাকুর এ-পাহাড়ের ফাঁকে ও-পাহাড়ের ফাঁকে তাকে খোঁজ করিতেছে: লম্বা পাইনের উপর দিয়া উঁকি মারিতেছে; নিচের উপত্যকায় গড়াইয়া পড়িয়া অনুসন্ধান করিতেছে। এখনও শহরটা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে নাই।

এই শাদা অন্ধকারে পাহাড়ের গায়ে ঘোড়ার খুরের শব্দের প্রতিধ্বনি তুলিয়া কদম ছুটাইয়া চলিয়াছে নিরুপমা। পাকা ঘোড়সওয়ার সে। জলাপাহাড় রোডের নির্জ্জনতা ও চড়াই দুই তার পছন্দ। সেণ্টপল্‌স্ স্কুলের কাছে মোড় লইয়া ক্যাণ্টনমেণ্টের দিকে ঘোড়া ছুটাইয়াছে। কুয়াশা-অস্পষ্ট উঁচু পাইন গাছগুলি উষ্ণীষ-ধারী সৈন্যের মত অ্যাটেনশনে দাঁড়াইয়া যেন সম্মান দেখাইতেছে আরোহিণীকে। চার হাত দূরের রাস্তাও চোখে পড়ে না ঘন কুয়াশায়, কিন্তু অশ্বের গতি হ্রাস করিবার কোনই চেষ্টা নাই।

সহসা বিপরীত দিক হইতে একাধিক অশ্বের আগমন-বার্ত্তায় আরোহিণীর অন্যমনস্কতা দূর হইল। সচকিত হইয়া নিজের ঘোড়ার রাস টানিয়া তাড়াতাড়ি বেপরোয়া গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে সচেষ্ট হইল নিরুপমা। প্রতিধ্বনি দিয়া বিচার করিলে একটা সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। উল্টোদিকের সওয়ারেরা নিরুপমার মতই সমান বেপরোয়া ভাবে ঘোড়া ছুটাইয়া আসিতেছে তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

কিন্তু বুঝিতে না বুঝিতেই ছুটো বলিষ্ঠ তেজী ঘোড়া দুই কলহাস্যপরায়ণ-আরোহী পৃষ্ঠে বহন করিয়া ছুটো জীবন্ত ইঞ্জিনের মত কটাকট খটাখট করিতে করিতে নিরুপমার পাশ দিয়া বাহির হইয়া গেল। নিরুপমার রেকাবে-বদ্ধ-পায়ের সঙ্গে সামান্যতম সংস্পর্শ ঘটা ছাড়া আর বড় কোনও বিপদ ঘটিল না। কিন্তু বিপদ ঘটিল অন্য প্রকার। নিরুপমা পলকে অশ্বারোহীকে চিনিল। চিনিল তার সঙ্গিনীকে। কাল সন্ধ্যায় রেস্তরাঁর মজলিশে প্রসূনের সঙ্গে ইহাকেও নিরুপমা লক্ষ্য করিয়াছিল।

এত হাসি! একত্রে এমন বিহার! নতুন স্ত্রী প্রসূনের? অথবা নতুন বান্ধবী, হবু-স্ত্রী! এই অন্তরঙ্গ হাসির তাৎপর্য্য নিরুপমা ভাল রকমই জানে।

যদি স্ত্রী হয়ই, বা প্রেয়সী হয়, তবে নিরুপমার কি? নিরুপমা তো স্বেচ্ছায়ই তাকে ত্যাগ করিয়াছে। প্রসূনের চেয়ে অনেক সম্ভ্রান্ত পুরুষকে বিবাহ করিতে পারে সে। সে বলিলে, একাধিক পুরুষ নিজেদের স্ত্রী ত্যাগ করিয়া তাকে গ্রহণ করিবে। তার পরিত্যক্ত স্বামী অপর স্ত্রী গ্রহণ করিলে তার আক্ষেপের কি আছে!

কিন্তু অশ্বারোহণের উৎসাহ চলিয়া গেছে নিরুপমার। ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া অলসগতিতে সে জলাপাহাড় রোড দিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল। ফগ্ ক্রমে পাতলা হইয়া উঠিল। জলাপাহাড়ের উচ্চতা হইতে সমগ্র দার্জ্জিলিং শহরটা ছবির মতো চোখে পড়ে। ইতিমধ্যেই মার্কেট স্কোয়ারে রৌদ্রের ছোঁয়া লাগিয়াছে। নিচের রাস্তায়

বহু লোক বাহির হইয়া পড়িয়াছে। এখান হইতে তাদের লিলিপুটের বাসিন্দার মতো মনে হয়। কিন্তু নিরুপমা কোনও দিকেই দৃক্‌পাত করিল না। অশ্ব পরিচিত পথে তাকে চৌরাস্তার দিকে লইয়া চলিল।

'দিদি, তুমি এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে? কাটা-পাহাড় হয়ে গেল?'

অনুপমা চৌরাস্তার একটা বেঞ্চ একাই অধিকার করিয়া উল বুনিতেছিল। প্লাষ্টিকের ঝুড়িতে নানা রঙের উলের বল এবং শিশুর জামার বিভিন্ন অংশ। অদূরে চৌরাস্তার মাঝখানে মায়ের কালের আয়া রুক্মিণী তার তিন বছরের ছেলে হামিরকে সামলাইতেছে। দিনে অন্ততঃ একবার সে টাট্টু ঘোড়ায় চাপিয়া অবজারভেটরী পাহাড়টা প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। এখনও তার চেনা ঘোড়াওয়ালী হাজির না হওয়ায় অশ্বভ্রমণ মুলতুবী আছে।

'প্রসূন আবার বিয়ে করেছে জানিস।' নিরুপমা ভগ্নীর প্রশ্নের কোনও জবাব না দিয়া তার পাশে সহসা বসিয়া পড়িয়া কহিল। 'অন্ততঃ, কোর্টশিপ চলছে।'

'কই, শুনিনি তো!'

'করুক গিয়ে বিয়ে। আমার তাতে কি? আমার তাতে বয়ে গেল।'

'তা তো ঠিকই।' কি বলা উচিত বুঝিতে না পারিয়া অনু কহিল।

'মা, মা, ঘোড়ায় চড়ব? তেন্‌জী ঘোড়া এনেছে।'

দু' বোনই চমকাইয়া তাকাইল। ব্যস্ত কণ্ঠস্বর, ব্যস্ত হামিরের দেহভঙ্গি। 'বুমেরাং' অস্ত্র যেমন যেখান হইতে নিক্ষেপ করা যায়, আবার সেইখানেই ফিরিয়া যায়, হামিরের ভাবটাও সেই রকম। মার মামুলি অনুমতি লইতে আসিলেও গন্তব্যস্থান তার ঠিকই আছে।

'রুক্মিণীকে নিয়ে যাবে। একা যেও না।' অনু প্রশ্রয়সদয় কণ্ঠে অনুমতি দিল।

'একা কোথায়। তেন্‌জী তো সঙ্গে থাকে। কেবল 'বাবা বাবা' করে।···টা টা, মাসি!' শেষোক্ত উক্তিটি নিরুপমার সম্মানে।

নিরুপমা কোনও জবাব দিল না, বাঁ হাতটা ঈষৎ উঁচু করিয়া আঙুলগুলি সামান্য নাড়িল।

'অথচ', সহসা সে পূর্ব্বের প্রসঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কহিল, 'কত বড় বড় লেক্‌চার দেওয়া হতো সর্ব্বক্ষণ। "তুমি যদি সুখী হও, যাও। যাকে পছন্দ, যার সঙ্গে তোমার সাংস্কৃতিক মিল সম্ভব, নিজের সোসাইটির সেই রকম কাউকে বিয়ে করো। তুমি সুখী হও, এটাই আমার কাম্য। আমার সুখের আশা শেষ হয়েছে। আমার সুখ আর সম্ভব নয়। স্মৃতিই আমার অবলম্বন রইল"···এতো বাজে উচ্ছ্বাস দেখাতে পারে পুরুষেরা। হিপোক্রেসির অন্ত নেই!'

'কিন্তু বিয়ে করেছে আগে সঠিক জেনে নাও।

'নাই করল।' নিরুপমা বেশ রুষ্টকণ্ঠে কহিল। 'কিন্তু নিজের চোখে যে দেখে এলাম, ঘোড়ায় চড়ে দু'জনে বিহার করছে, তার কি? উনি তো খুব মর‍্যালিষ্ট। অথচ দেখছি, মদের গেলাস উড়োচ্ছেন। তরুণী বন্ধু নিয়ে বিহার করছেন! তবে আমাকে দোষ দেওয়া হতো কেন?'

অনুপমা নীরব রহিল। দিদি যে সত্যই আহত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বেচারী দিদি। অনর্থক জটিল করিয়া তুলিয়াছে সে নিজের জীবনটা। কি দরকার ছিল এ সবের? প্রসূনদা লোক ভাল ছিলেন। স্ত্রীর কাছে এত বড় ধাক্কা খাইয়া সে যদি আবার সুখী হইতে চেষ্টা করে তবে কি সত্যই তাহাকে খুব দোষ দেওয়া যায়?

'দেখাব তোকে মেয়েটাকে। কাল সন্ধ্যাবেলার ককটেল পার্টিতে হাজির ছিলেন সুন্দরী। এত বড় একটা নাক! জানলা দিয়ে বেরিয়ে যাবার মতো। লোকের রুচির বলিহারি যাই! এই রুচির দরুণ আমাকে কম ভুগতে হয়েছে? ছাড়া পেয়েছি, বেঁচেছি!' প্রায় করুণ আক্রোশের সঙ্গে বলিতে লাগিল নিরুপমা।

প্রায় সারাটা দিনই অনুপমা দিদির মেজাজ লইয়া বিব্রত ছিল। নিরুপমার কাছে বেয়ারা বকুনি খাইয়াছে, রুক্মিণী ধমক শুনিয়াছে। খাওয়ার টেবিলে বাবুর্চ্চির রন্ধননৈপুণ্যের গর্ব্ব চুরমার করিতে সামান্য দ্বিধাও বোধ করে নাই নিরুপমা। মন্ত্রী অতনু দাস টেলিফোন করিয়া রাতের ডিনারের কথা স্মরণ করাইতে গিয়া দুই কথা শুনিয়াছেন। অনু নিজে যে সরাসরি ধমক খায় নাই, তা নিতান্ত নীরবতা ও দূরদর্শিতার পুরস্কার। কিন্তু অনুপমা ভাল মেয়ে। সহিষ্ণুতা ও সহানুভূতি তার সহজাত গুণ। দিদি যে দারুণ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন প্রসূনদাকে দেখার পর হইতে এটা সে সহজেই বুঝিয়াছে। কিন্তু অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে তাকে ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে দেখিয়া সে এতটা বিচলিত হইবে কেন, তা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। স্বেচ্ছায়ই দিদি প্রসূনের সঙ্গে বিবাহ ভাঙিয়াছে। তার প্রতি তাহার কোনও বিশেষ অনুরক্তিই বজায় আছে, এমন কোনও স্পষ্ট আভাস বিগত চার বছরের মধ্যে প্রকাশ পায় নাই।

এমন কি নিরুপমা কাহাকে বিবাহ করিতে পারে, তাহাও ঠিক আছে। অথচ আশ্চর্য্য এই ঈর্ষ্যা! কে ঐ মেয়েটা? প্রসূনের নূতন স্ত্রী? নূতন প্রিয়া? কথা প্রসঙ্গে বার বার নিরুপমা এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছে। সারা দিনব্যাপী অস্বস্তির পর সন্ধ্যাবেলা ইহা জানিবার সুযোগ উপস্থিত হইল।

মন্ত্রী অতনু দাসের ডিনার পার্টি প্ল্যান্টার্স ক্লাবে। দিদিকে ল্যান্ডেন্‌লা রোডের মোড় পর্য্যন্ত আগাইয়া দিবার জন্ত অনুপমাও সঙ্গে আছে। পরিষ্কার সন্ধ্যা। কুয়াশার আভাস মাত্র নাই। চৌরাস্তার দোকানের শো-কেস্‌গুলি আলোয় ঝলমল্। এই শো-কেসগুলি বহু স্ত্রীলোককেই আকর্ষণ করে। নিরুপমার তো প্রকাণ্ড দুর্ব্বলতা এগুলি। জিনিস দেখিবার মত এখন মনের অবস্থা এবং হাতের সময় কোনটাই ছিল না। তবু একবার দৃষ্টি পড়িল সেদিকে। দেখিল, ইহাদের একটির সামনে একক দর্শক সকালবেলার দুঃস্বপ্ন সেই মেয়েটি!

'ঐ সেই মেয়েটা!' অনুপমার গলা চাপিয়া ধরিয়া ইঙ্গিতে সে তাকে দেখাইয়া দিল। 'সাজের ডালা! বোকাদের ভোলাতে হলে ওটাই তো বড় মূলধন!··· এক কাজ করবি ভাই অনু? তুই একটু এগিয়ে যা। সুযোগ করে একবার কথা বল। জেনে আয় ওটা কে। পারবি তো? কিছু কঠিন নয়। আমি দাঁড়িয়ে থাকব ল্যান্ডেন্‌লা রোডের জংশনে আমাকে এসে বলে যাস। আমি কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকব···'

'ওঃ বাবা? আচ্ছা ঠিক আছে।' প্রথমে একটু ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল অনুপমা, তার পর দিদিকে সাহায্য করিবার সুযোগের সদ্ব্যবহারের জন্ত সে প্রস্তুত হইল।

'আরে! কে? খবর ভাল তো? কেমন আছ?'

পায়চারি করিতে করিতে পা ব্যথা হইবার উপক্রম, তবু অনুর দেখা নাই। প্রায় উপরেই প্ল্যান্টার্স ক্লাব। অতনু দাসের নিমন্ত্রিতদের বড় আনাগোনা এখানটায়। ইতিমধ্যেই প্রায় অর্দ্ধ ডজন পরিচিতকে এখানে পায়চারির কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছে। সহসা পিছন হইতে আবার আহ্বান শোনা গেল। গলার আওয়াজ পরিচিত। সচকিতভাবে পিছনে তাকাইল নিরুপমা। সভয়ে দেখিল, মাত্র এক হাত দূরে প্রসূন!

'ভালো।'

'কতদিন হলো এসেছ?'

'কিছুদিন।'

'আমরা এক সপ্তাহ। জানোই তো, ইষ্ট আফ্রিকায় আছি। নৈরোবী থেকে মাইল সত্তর। তিন মাসের ফার্লোতে দেশে এসেছি। কে ভেবেছিল, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে!'

'না হলেও নিশ্চয়ই খুব ক্ষতি হতো না।'

'ক্ষতি যা হওয়ার, তা তো একবারেই হয়ে গেছে। তার জের টেনে লাভ কি?'

'ক্ষতি তোলবার খুব জোর চেষ্টা চলছে শুনতে পাচ্ছি।'

জবাবের সংক্ষিপ্ত ভাবটাকে ঔদাসীন্ত বলিয়াই বোধ হইয়াছিল, পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নে সে সন্দেহ দূর হইল। নিরুপমার অন্তদিকে-ফেরানো মুখের দিকে একবার দ্রুত দৃষ্টিপাত করিয়া প্রসূন প্রশ্ন করিল, 'চেষ্টাটা কি রকম?'

'অনেক অনেক বান্ধবী জুটেছে। তাদের নিয়ে হোটেল-রেস্তরাঁ হচ্ছে। অশ্ববিহার চলছে···'

'তাতে দোষ কি?' প্রসূন গম্ভীরভাবেই জবাব দিল। 'মেয়েদের পুরুষ-বন্ধু থাকবে, পুরুষদের মেয়ে-বন্ধু থাকবে, তাদের স্বচ্ছন্দ স্বাধীন সখ্য চলবে, তবে জীবন মধুর হবে—তুমি নিজেও তো সে কথা বলতে। এখন কি সমাজের পুরুষ-বন্ধুদের সব ত্যাগ করেছ?···'

'না, করি নি। মোটেই করি নি। নিরুপমা' ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল। 'এটা আমাদের সমাজের রেওয়াজ। তুমিই বড় বড় লেকচার দিয়েছ। এখন নিজেই তার অনুকরণ করছ। হিপোক্রেসি!'

'যার নিজের স্ত্রী নেই, অন্তদের স্ত্রী নিয়েই তাকে ঘুরে বেড়াতে হয়।' পরিহাসতরলকণ্ঠে কহিল প্রসূন।

'ড্রিঙ্ক করা খুব গর্হিত অভ্যাস!' সব্যঙ্গে বলিয়া চলিল নিরুপমা। 'এখন নিজেই তার ভক্ত হয়ে উঠেছ। এক গাদা মেয়ে জুটিয়ে গেলাস ওড়াচ্ছ! এটা যে পৃথিবীর সকল ভদ্রসমাজের একটা সামাজিক ভব্যতা তা শত চেষ্টা করেও তোমাকে বোঝাতে পারি নি'···

'তোমার কথা সময়মত শুনিনি বলে আক্ষেপ রয়ে গিয়েছিল', প্রসূন মৃদু হাস্ত করিয়া কহিল। 'সেই আক্ষেপ মিটিয়ে ফেলছি। ভাবি নি, ড্রিঙ্কস্ সম্বন্ধে আমার কুসংস্কার তোমার ঘাড়ে গিয়ে বাসা বাঁধবে! সামাজিক উৎসবে আজকাল কি আর যাচ্ছ না, না অন্তদের বিশেষ অনুরোধ আজকাল উপেক্ষা করা শুরু করেছ?···ঐ দেখ, তোমাকেই বোধ হয় কেউ ডাকছেন। নিচে গাড়ী থেকে নামার পর থেকেই হাত নাড়ছেন।'

নিরুপমা আড়চোখে তাকাইয়া দেখিল। পুরো দ্রেস—স্যুট-পরা। মাথার চাঁদিতে সামান্ত টাক। পঞ্চাশের

কাছাকাছি, মোটাসোটা লোকটি। ল্যান্ডেনলা রোডের মোড় হইতে গান্ধী রোডে উঠিয়া আসিতেছে এবং অনবরত হাত নাড়িতেছে।

'দাস গাড়ী নিয়ে গেছে তোমাকে আনতে। এদিকে আমার ভাগ্যে সামনেই তুমি দাঁড়িয়ে আছ। হাঁফাইতে হাঁফাইতে সহর্ষভাবে উপরে চড়িতে চড়িতে সহর্ষ সম্বোধনকারী। সেই মুহূর্তে ঘোষালকে দুই নখে ছিঁড়িতে পারিলে কিছুটা সান্ত্বনা পাইত নিরুপমা। কিন্তু সে চেষ্টা করিল না। সভয়ে একবার প্রসূনের দিকে তাকাইয়া দৃষ্টিটা সে মিউনিসিপ্যালিটির ক্লক্-টাওয়ারের দিকে প্রেরণ করিল। কৃত্রিম ব্যস্ততার সঙ্গে নিচের ল্যাডেনলা রোডকে কহিল, 'আর সময় নেই। মায়াপুরী যেতে হবে।' বলিয়া অকস্মাৎ সে স্বল্পালোকিত গান্ধী রোড ধরিয়া সোজা হাঁটা দিল। পিছন হইতে ঘোষাল চেঁচাইতে লাগিলেন। কোনই সাড়া আসিল না। সঞ্চরিণী ছায়া শীঘ্রই দূরত্বে অদৃশ্য হইল।

'মাই গড্! স্ত্রীলোককে বোঝা অসম্ভব!' বলিয়া ঘোষাল হাঁ করিয়া রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মেয়েটির নাম মঞ্জু। প্রায় অনুপমারই বয়সী। ইস্ট আফ্রিকায় একই জায়গায় প্রসূনের সঙ্গে একই কারখানায় কাজ করেন তার স্বামী। প্রসূন বড়সাহেব, মঞ্জুর স্বামী ছোটসাহেব, অর্থাৎ সহকারী ম্যানেজার। প্রসূনকে দাদা ডাকিয়াছে মঞ্জু এবং দুষ্টু বোনের মতো তার উপর সকল দৌরাত্ম্য ও আব্দার চালায়; স্বামীর "বস্" বলিয়া একটু রেহাই দেয় না। রাতের ডিনারের পর সে প্রসূনের সন্ধানে তার কামরায় আসিল। দেখিল, ইজিচেয়ারে প্রসূন চুপ করিয়া বসিয়া আছে। খোলা জানালা দিয়া দৃষ্টি বাহিরের অস্পষ্ট তরঙ্গিত দিগন্তে নিবদ্ধ।

'প্রসূনদা, খুব মজার খবর আছে।'

সামান্য চমকাইয়া প্রসূন চেয়ারে সোজা হইয়া বসিল। কহিল, 'কি খবর?'

'বৌদির বোনের সঙ্গে আলাপ হলো চৌরাস্তায়। কোকা-কোলা পার্টিতে ভাগ্যিস দু'জনকেই দেখিয়ে দিয়েছিলেন। দু'চার কথার পরই প্রশ্ন হলো: "প্রসূনদা কি আবার বিয়ে করেছেন? আপনি তার কে হন? আপনারা দু'জনে বুঝি খুব ঘোড়ায় চড়তে ভালবাসেন?" আরও কত রকম জেরা। নিশ্চয়ই সব বৌদির শেখানো। দু'জনকেই একসঙ্গে চৌরাস্তায় ঢুকতে দেখেছিলাম।'

'তুমি কি জবাব দিলে?' সহাস্যে প্রশ্ন করিল প্রসূন।

'শুধু জবাব নয়। পাল্টা প্রশ্ন করে আমি প্রায় হাঁড়ির খবর বের করে ছেড়েছি। আর ভাবও করে ফেলেছি ভীষণ রকম। বাড়ী যাবার নেমন্তন্ন পর্য্যন্ত জোগাড় করে ফেলেছি। যাব একদিন শীগগিরই...'

'তা যেও।' প্রসূন সকৌতুকে মন্তব্য করে, 'কিন্তু সাবধান, নিরু অনুপমা নয়। তাকে ঘাঁটালে বিপদে পড়বে!'

'সে নিজেই বিপদে পড়েছে।' মঞ্জু না ঘাবড়াইয়া কহিল।

বস্তুতঃ অনুপমার প্রশ্নের চাঞ্চল্যকর জবাব দিয়াছিল মঞ্জু। এসব কথা বাধ্য হইয়াই তাকে প্রসূনের কাছ হইতে গোপন রাখিতে হইয়াছে। কিন্তু অনুপমা দিদির কাছ হইতে গোপন করে নাই।

রাত প্রায় নটারও পরে বাড়ী ফিরিয়া সে অনুপমাকে জানাইল যে, দাসের পার্টিতে তারই জন্ত তার যাওয়া হয় নাই। ল্যাডেনলা রোডের মোড়ে সে অবশ্যই দাঁড়াইয়াছিল। অন্ততঃ আধ ঘণ্টা দাঁড়াইয়াছিল। অনন্তকাল সে অপেক্ষা করিতে পারে না। এমন সময় স্বয়ং প্রসূনের সঙ্গে দেখা। কথাবার্তা শুনিয়া গা জ্বালা করে। মোটেই এখন আর সেই ভালো মানুষটি নাই। কথায় কথায় খোঁচা! নড়িবার নামও নাই। প্ল্যাণ্টার্স ক্লাবের পার্টির সদর্থ সে কিছুতেই করিতে পারিত না। তার চোখের সামনে দিয়া প্ল্যাণ্টার্স ক্লাবে যাওয়া এড়াইবার জন্তই সিধা হাঁটিয়া সে মিনিদির বাড়ি উপস্থিত হয়। এই নীরস ভদ্রমহিলার সাংসারিক কাহিনীতে জর্জ্জরিত হইয়া এতক্ষণ কাটিয়াছে।

'তার পর, কথা হলো মেয়েটার সঙ্গে? কি বলে?'

'খবর ভালো নয়। তুমি শুনতে চেয়ো না। এসো আগে, খেয়ে নিই।'

'যা বলেছিলাম, তাই সত্যি, তাই তো? এতে আমার বিলাপ করার কি আছে?' বলিয়া নিরুপমা সামনের সোফাটায় হঠাৎ বসিয়া পড়িল। 'কবে বিয়ে করেছেন আমাকে চিরজীবন ধ্যান করবার লোকটি?'

'না, বিয়ে এখনও হয় নি।' অনুপমা কহিল। 'আর বিয়ে এর সঙ্গে নয়। এর দিদির সঙ্গে। ওর দিদির আগে বিয়ে আছে। ডিভোর্সের মামলা চলছে। পাকা ডিক্রি পেলে বিয়ে হবে...'

'সেই সুন্দরীটি কি এদেরই দলে আছেন?'

'তিনি নাকি এ হপ্তায়ই এসে পৌঁছবেন। এখন

আসেন নি। আচ্ছা দিদিভাই, তার আগে প্রসূনদাকে একবার ডাকলে হয় না?'

'কেন, কেন তাকে ডাকতে যাব? কি আমার দরকার?' উত্তেজনার সঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিল নিরুপমা। 'তাকে স্বেচ্ছায় আমি ছেড়েছি। ছেড়েছি বলে একটু আমার দুঃখ নেই। এমন ভণ্ডামি পৃথিবীতে দুর্লভ। বিয়ের আগে আমার যে সব পুরুষ-বন্ধু ছিল তারা নাকি উস্কিয়ে আমাদের ছাড়াছাড়ি ঘটিয়েছে। তাদের একে ওকে কতজনকে নাকি আমি বিয়ে করছি। আর নিজে? নিজে কি? আর একজনের সংসার ভেঙে, আর একজনের স্ত্রী ফুসলিয়ে এনে নিজে কি করছ? যেতে দাও সে সব।...আমার শরীরটা ভালো নেই। আমি খাব না। তুই খেয়ে নে, অনু। আমি শুয়ে পড়ব। সারাদিন আমার অনেক কষ্ট গেছে। আমার ভালো লাগছে না। আমার কেমন জানি করছে? সব অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। ওরে, আমি মরে যাচ্ছি।' বলিতে বলিতে নিরুপমা কাৎ হইয়া মেঝের কার্পেটের উপর ঢলিয়া পড়িল।

তীব্র চীৎকার করিয়া দিদির কাছে ছুটিয়া গেল অনুপমা। রুক্মিণী ছুটিয়া আসিল। বেয়ারা ছুটিয়া আসিল।

ডাক্তারের কাছে টেলিফোন গেল।

আগের সন্ধ্যায়ও এর কোনও আভাস ছিল না। কিন্তু ইহাই দার্জিলিঙের প্রকৃতি। পাইন বনের পেছনে চাঁদ বড় হইয়া উঠিয়াছিল কাল রাতে; মেঘের চিহ্নমাত্র ছিল না। আজ সকাল হইতেই টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। আবহাওয়া গাঢ় সাদা কুয়াশায় ঢাকা। পাইনের চূড়া কচিৎ চোখে পড়ে আবার তাহা কুণ্ডলী-পাকানো কুয়াশায় অস্পষ্ট হইয়া যায়। পিচের রাস্তার ছোটখাট গর্ত খুঁজিয়া বৃষ্টির জল তাহাতে ঘাঁটি বাঁধিতেছে। যে সব রাস্তায় মোটর চলিতে দেওয়া হয়, সেখানে তাহারা মোটরের চাকায় পিষ্ট হইয়া পথচারিদের জামাকাপড়ের ম্যাকিন্টসমুক্ত অংশে লাফাইয়া চড়িতেছে। এমন দিনে নিতান্ত জরুরী দরকার না থাকিলে কেহ ঘরের বাহির হয় না। একঘেয়ে বৃষ্টি, অস্পষ্ট দিগন্ত, জনবিরল রাস্তা। মনকেই দমাইয়া দেয় এমন দিন।

'দিদিভাই, দিদিভাই।' দরজায় মৃদু আঘাত করিয়া অনুপমা ডাকিল।

প্রায় আধ মিনিট কোনও জবাব পাওয়া গেল না। তার পর নিরুপমার গলা শোনা গেল, 'ভেতরে এসো।'

'ভাবছিলাম, তুমি হয়তো ঘুমিয়ে আছ। এখন কেমন বোধ করছ?

'ভালো।'

'ডাক্তারবাবু দশটায় আসবেন। বলেছেন, কিছু ভয় নেই। কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার। অতনুবাবু টেলিফোন করেছিলেন। তুমি যেতে পারো নি বলে সবাই খুব দুঃখিত। তোমার অসুখের কথা শুনে খুব উদ্বিগ্ন হলেন। বললেন, ন'টায় ক্যাবিনেট মিটিং আছে। দু'তিন ঘণ্টার আগে ছাড়া পাবেন না। তার পর এসে দেখে যাবেন...'

'বলে দাও।' নিরুপমা কহিল, 'ডাক্তারবাবু লোকজনের আসা বারণ করেছেন।'

'ঘোষাল সাহেব আর গাঙ্গুলী সাহেব নিজেরাই এসেছিলেন। দেখা করার ইচ্ছে ছিল। ডাক্তারের কথা বলে আটকেছি।' অনুপমা জানাইল।

'ভাগাড়ের শকুনের মতো এরা টহল দিয়ে বেড়ান। এদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করো। বলো, এখনও একেবারে শেষ হই নি। দুর্গন্ধটা আগেই উঠেছে।'

'ছিঃ, এসব কি যে বলছ দিদি!' অনুপমা অনুযোগের সুরে কহিল। 'শত হউক, এরা চেনা লোক; খোঁজখবর নেওয়া এঁরা কর্ত্তব্য মনে করেন।'

'ভগবান এদের হাত থেকে আমাকে বাঁচান!' নিরুপমা ও-কাৎ ফিরিয়া কহিল। 'কি রোগ বলেন ডাক্তার? হিষ্টিরিয়া? ফেন্টিং! কাঁপুনি! কোথা থেকে এলো আমার এই রোগ!...'

'কে বললে হিষ্টিরিয়া!' অনুপমা প্রতিবাদ করিয়া কহিল।' এই মাত্র প্রসূনদা ডাক্তারকে ফোন করেছিলেন। তিনি বললেন, সামান্য নার্ভাস একজস্শান...'

নিরুপমা সবিস্ময়ে এদিক ফিরিল। 'কে টেলিফোন করেছিল বললে? প্রসূনদা! সে খবর পেল কোথায়? সেও কি এখানে এসেছিল?'

'এখানেই বসে আছেন। দেখা করবেন। তুমি ঘুমিয়ে আছ কি না দেখতে পাঠিয়েছেন...এই তো! আসুন! দিদি, প্রসূনদা!'

নিরুপমা তীব্রদৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখিল, দরজার পর্দা সরাইয়া প্রসূন ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। অনুমতির অপেক্ষা রাখে নাই। চোখে উদ্বেগের দৃষ্টি। কপালে উদ্বেগের রেখা।

'কেমন আছ নিরু?'

নিরুপমার খাটের সঙ্গে লাগিয়া দাঁড়াইয়া সম্নেহকণ্ঠে প্রশ্ন করিল।

'ভালো।'

'পাল্‌সটা দেখি।' বলিয়া নিরুপমার ডান হাতটি সে উঠাইয়া লইল। নিরুপমা সামান্য চেষ্টা করিল হাত ছাড়াইয়া লইতে, কিন্তু সফল হইল না।

'কিছু নয়। সামান্য নার্ভাস প্রোস্টেশান। স্বাভাবিক পালস বিটিং...'

'তুমি খুব বড় ডাক্তার হয়েছ দেখছি!'

'ডক্টর অব সায়েন্স তো নতুন হই নি! কি বল অনু?' ইতিমধ্যে অনুপমা চুপে চুপে ঘর হইতে সরিয়া পড়িয়াছিল। প্রসূন কোনও সমর্থন লাভ করিল না। কিন্তু নিরুপমার বিছানায় বসিয়া পড়িয়া কহিল, 'মাথাটা একটু টিপে দেব?'

'হঠাৎ এত দরদ কেন?' ঝাঁজের সঙ্গে বলিল নিরুপমা।

'অসুস্থ লোকের সঙ্গে কেউ ঝগড়া করে না।'

'তিনি যদি খবর পান, কি বলবেন?'

'কিনি?' সবিস্ময়ে নিরুপমার চোখের দিকে চাহিল প্রসূন।

'আর ন্যাকামি করো না। প্রসূনের চোখের দৃষ্টি এড়াইয়া নিরসকণ্ঠে নিরুপমা প্রত্যুত্তর করিল। 'ভেবেছ, কেউ কিছু জানে না। তুমিই খুব চালাক। তখন বলা হতো, "যারা আমার ঘর ভেঙেছে, ভগবান তাদের ক্ষমা করবেন না।" আর তুমি যার ঘর ভেঙে যার স্ত্রীকে ফুসলিয়ে এনেছ, তার অভিশাপ কি তোমায় মাথায়...'

'এসব কি বলছ তুমি, নিরু!' প্রসূন ভীত হইয়া কহিল। 'তুমি একটু শান্ত হয়ে শোও। আমি বাইরে যাই। এ অবস্থায় আমার ভেতরে আসা কখনও উচিত হয় নি...'

বস্তুতঃ ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও অনুপমা তাহাকে ভিতরে ডাকিয়া আনিয়াছে। স্নায়ুর এই বিকৃত অবস্থায় উহা যে ক্ষতিকর হইবে, তাহা প্রসূনও বিচার করিয়া দেখে নাই। এইবার নিরুপমার চোখেমুখে অস্বাভাবিক লক্ষণ আবিষ্কার করিয়া সে ভীত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। হিস্টিরিয়ার আক্রমণের সুস্পষ্ট পূর্বাভাস!

'কবে তাকে বিয়ে করছ শুনি? চাপা দিতে চেয়ো না। সব প্রকাশ পেয়েছে ঐ মেয়েটার কাছ থেকে। কি নামটা মেয়েটার? যার সঙ্গে সর্বদা ঘোড়ায় চড়ে শৈলবিহার করো...'নিরুপমা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল।

'মঞ্জু! কি বলেছে মঞ্জু? সে বসার কামরায় বসে আছে। ডেকে আনব?' ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া রোগিণীকে খুশি করিবার জন্ম প্রসূন কহিল।

ডাকিয়া আনিতে হইল না। মঞ্জু পর্দার বাহিরেই হাজির ছিল। নিজের উপস্থিতি বাহির হইতে ঘোষণা করিয়া সে লজ্জিত অপরাধীর হাস্য মুখে লইয়া ভিতরে আসিল। সরাসরি নিরুপমার খাটের কাছে আগাইয়া আসিল। কহিল, 'দিদি, আমি ডাক্তারের মেয়ে। রোগ কঠিন হলে, কড়া ওষুধ দিতে হয়, ছেলেবেলা থেকেই জেনে এসেছি। কিন্তু শত হোক, আনাড়ী হাত, একটু বেশি কড়া হয়ে গেছে। কিন্তু ক্ষতি হবে না, উপকারই হবে...'

নিরুপমা সবিস্ময়ে চোখ তুলিয়া চাহিল। কোনও মানে বুঝিতে পারিল না। প্রসূনও সকৌতূহল দৃষ্টিপাত করিল। খুব হেঁয়ালির মত মনে হইল সব।

'অনুদির কাছ থেকে সব ভেতরের খবর জেনে নিয়ে ওষুধ ছেড়েছিলাম। এখন দেখা গেল, আমার ডায়াগনোসিস্ আশ্চর্য্যরকম ঠিক। কিন্তু মিথ্যে কথা বলি নাই, ভাই দিদি।' বলিয়া মঞ্জু বিছনায় নিরুপমার মাথার কাছে বসিয়া পড়িল এবং তার একটা হাত নিজের হাতের মুঠোয় চাপিয়া কহিল, 'প্রসূনদা শীগগিরই আমার এক দিদিকে বিয়ে করছেন। দিদির এক স্বামী ছিল। কিন্তু সেই বিয়ে ভেঙে গেছে। প্রসূনদাই তার জন্ম দায়ী। আর মজা হচ্ছে এই যে প্রসূনদা নিজেই সেই প্রথম স্বামী বেচারি! আর তুমিই সেই দিদি! খুব মজা নয় কি?' সহসা নিজের রসিকতায় হি হি হি করিতে করিতে বিছনার উপর গড়াইয়া পড়িল মঞ্জু। সভয়ে পাশের ঘর হইতে ছুটিয়া আসিল অনুপমা।

বস্তুতঃ গত রাত্রে অনুপমা খুবই ভয় পাইয়া গিয়াছিল। কোনও সম্পূর্ণ সুস্থ লোক যে সহসা এমন কাৎ হইয়া মাটিতে গড়াইয়া পড়িতে পারে তাহা সে ভাবিতেও পারে নাই। ডাক্তারবাবু প্রশ্ন করেন, 'খুব বড় রকম কোনও মেন্টাল শক্ পেয়েছেন কি?' জবাবটা অসম্পষ্ট রাখিলেও কারণটা সম্বন্ধে অনুপমার কোনও সন্দেহ থাকে নাই।

এই বিপদে প্রথম যার কথা অনুপমার মনে পড়ে সে প্রসূন। তাদের পরিবারের সঙ্গে এত বড় ছাড়াছাড়ি সত্ত্বেও দার্জ্জিলিং শহরে তাকেই নিজের লোক বলিয়া মনে হইয়াছিল। সকালে উঠিয়া প্রথমেই সে টেলিফোন করে প্রসূনকে। প্রকৃত অভিভাবক হইবার মতো লোক প্রসূনদা। দিদির সঙ্গে তার বিচ্ছেদ চিরকালই শোচনীয় মনে হইয়াছে অনুপমার। চিরকালই সে কেন জানি সন্দেহ করিয়াছে, মনে মনে দিদি অনুতপ্ত। প্রসূনকে দার্জ্জিলিঙে দেখিবার পর হইতে দিদির আচরণ এই সন্দেহকে প্রায়

সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু বড় দেরি হইয়া গেছে। দিদির আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া সে যদি নূতন করিয়া জীবন আরম্ভ করিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকে তবে সত্যই কি তাকে দোষ দেওয়া যায়? মঞ্জুর নিজের আত্মীয়া দিদির সঙ্গে বিয়ে। নইলে হয়তো সব কথা প্রকাশ করিয়া তার সহায়তা চাওয়া যাইত। খুব চালাক মনে হইয়াছে মেয়েটিকে। বেশ ভাল ধরনের মেয়েও মনে হইয়াছে।

সকাল হইতে বৃষ্টি পড়িতেছিল। প্রসূনের আসিবার কথা আটটায়। সওয়া আটটাও পার হইয়া গেল। অনুপমার সন্দেহ হইতে লাগিল। মোটেই আসিবে তো প্রসূন? কিসের সম্পর্ক তাদের সঙ্গে তার। কাঁদাইয়া তারা তাঁকে বিদায় দিয়াছিল একদিন।

এমন সময় ম্যাকিন্টস্ ও ছাতা বাগাইয়া আধ ভিজিয়া প্রসূন ও মঞ্জু উপস্থিত হইল। সে প্রায় এক ঘণ্টা আগের কথা। ইতিমধ্যে মঞ্জুর কাছ হইতে অপরাধ স্বীকারের সঙ্গে সে প্রকৃত ব্যাপারটা জানিয়া লইয়াছে। মৃদু তিরস্কারের সঙ্গে বলিয়াছিল, 'তুমি তো ভয়ানক লোক ভাই!' কিন্তু কড়া দাওয়াইয়ের উপকারিতা অস্বীকার করিতে পারে নাই।

'তোমরা এবার সবাই যাও তো। আমি একটু বিশ্রাম করব। আর জ্বালিও না।' বলিয়া জনতার দিকে পিঠ দিয়া নিরুপমা কাৎ হইয়া শুইল।

'অনু।' কামরা জনমুক্ত হইবার সঙ্গেই সঙ্গেই দুর্বল ক্লান্ত কণ্ঠের ডাক আসিল আবার।

'দিদি।' বলিয়া অনুপমা তাড়াতাড়ি আবার আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

নিরুপমা ফিরিয়া তাকাইল না; মৃদুকণ্ঠে কহিল, 'ওর প্যাণ্টের পা দুটো একদম ভিজে গেছে। না পাল্টালে অসুখ করবে।'

দোলা

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

ফেনের বুদ্বুদ ওঠে স্থির হ্রদে। মুহূর্তে সময়
দুর্বার ক্ষিপ্রতা ভুলে একটু স্তম্ভিত যেন হয়—
একটু আশ্চর্য লগ্ন সঞ্চারিত। প্রেম, অনুভূতি
অতর্কিতে সাড়া দেয়, চলে তার নিঃশব্দ প্রস্তুতি।
সমস্ত হৃদয় ভরে ব্যাপ্ত সুর—ব্যঞ্জনা মূর্ছনা;
ছড়ায় নিঃসীম নভে যেন মত্ত লক্ষ ধূলিকণা
ঝটিকা ঘর্ষণঘায়। নির্জন রাত্রির আকর্ষণ
একটি সহজ শান্তি আজ কি কুড়িয়ে পেল মন?
তোমাকে পেলাম কাছে। চন্দ্রমল্লিকার রাত্রি স্থির।
নিলাম দু'হাত তুলে, শ্লথভার চ্যুত কবরীর
অজস্র স্পর্শের স্বাদ। জানি যে অনেকদিন পরে
দুইটি হৃদয় পায় তীব্র দোলা রক্তের ভিতরে।
চোখের গভীর নীলে উত্তাল কথার স্রোত কাঁপে,
যদি এলে, উপলব্ধি দাও আরো স্পর্শের উত্তাপে।

মহুয়া কাব্য পাঠে

শ্রীতপতী চট্টোপাধ্যায়

মহুয়ার প্রেম

জলদর্চী তনু তার রুদ্রবহ্নি নিকষিত হেম
চপল পুলকভরা গতিহীন প্রেম নাম ধরে
দেহেই সীমিত হয়ে মর্মে চির কলঙ্কিত করে
রুদ্রের প্রণয় লভি হোক তার শাপ বিমোচন
চির সত্য সুন্দরের অপরূপ নব উন্মোচন।
সে সুন্দরে নাই গ্লানি নাই আত্মকেন্দ্র সীমা তার
নিজেরে দিয়াই পূর্ণ তেজময় হৃদয় তাহার,
প্রিয়ার বিচিত্র কর্মে বারে বারে করে উত্তেজিত
আপনার বাহু দিয়া করে নাই তাহারে সীমিত'
চক্ষে তার জলে স্থির কল্যাণের অম্লান বর্তিকা
হাতে তার প্রিয় তরে পরিপূর্ণ বাৎসল্যের শিখা
নয়নে সম্ভ্রম দোঁহা তুচ্ছতার বহু ঊর্ধ্বে যারা
মহুয়ার ঋষি কবি মানস সন্তান তব তারা।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে 'রোমান্স ও রোমান্টিক ভাবধারার প্রভাব

অধ্যাপক শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশ গুপ্ত

'দুর্গেশনন্দিনী' হইতে আরম্ভ করিয়া 'সীতারাম' পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক এবং অনৈতিহাসিক বঙ্কিমের সবগুলি উপন্যাসই কম-বেশী রোমান্সধর্ম্মী। সুতরাং তাঁহার উপন্যাসের রসবিচারে রোমান্টিক ভাবধারা তাঁহাকে কি ভাবে কতখানি প্রভাবিত করিয়াছে তাহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এ স্থলে প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে: রোমান্স্ ও রোমান্টিক বলিতে আমরা কি বুঝি? ইহাদের সংজ্ঞা কি?

'রোমান্স্' ও 'রোমান্টিক' শব্দ দুইটি বৈদেশিক আমদানি এবং যে সকল বিদেশী শব্দের বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলন রহিয়াছে ইহারা তাহাদের অন্যতম। আমরা কথায় কথায় এই দুইটি শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকি, অথচ এত বিভিন্ন প্রসঙ্গে ইহাদের প্রয়োগ হইয়া থাকে যে, 'রোমান্স' ও 'রোমান্টিক' বলিতে ঠিক কি বুঝায় তাহার কোনরূপ আভিধানিক সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা কঠিন। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, আলোকোজ্জ্বল, সঙ্গীতমুখর বাসর-ঘরে যেমন রোমান্স রহিয়াছে, তেমনই রোমান্স রহিয়াছে দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতারোহণে অথবা তুষারাচ্ছন্ন মরুদেশে অভিযানের ভিতর—কিন্তু এই উভয় প্রকারের রোমান্সের ভিতর যোগসূত্র কোথায়?

এই যোগসূত্রের অনুসন্ধান করিতে হইলে, অর্থাৎ 'রোমান্সে'র অর্থ বুঝিতে হইলে এই শব্দটির গোড়ার ইতিহাসের সহিত পরিচয় প্রয়োজন। 'রোমান্স' শব্দটি মধ্যযুগীয়। 'রোমান' বা 'রোমান্স' লাটিন ভাষা হইতে উদ্ভূত মধ্যযুগের ফরাসী দেশের অন্তর্গত প্রোভেন্সের প্রাদেশিক ভাষা। তৎকালীন ট্রুবাডুর সম্প্রদায় (Troubadours) এই ভাষায় তাঁহাদের কাব্য রচনা করিতেন। এই শ্রেণীর কাব্যের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপতঃ এই-রূপ:—ইহাতে কোন সুপরিকল্পিত কেন্দ্রীয় কাহিনী নাই। সর্ব্বত্রই নায়ক একজন প্রখ্যাত বীরপুরুষ এবং কাহিনী-গুলি আগাগোড়াই তাঁহার অভিযানের সূত্র ধরিয়া গড়িয়া ওঠে। এই সকল অভিযানই কাব্যের বিষয়বস্তু। অভিযানের উদ্দেশ্যের প্রকারভেদ থাকিতে পারে: কোথাও স্বাধিকারচ্যুত বীরপুরুষ হৃত অধিকার পুনঃ-প্রতিষ্ঠার জন্য অভিযান করিয়াছেন, কোথাও প্রেমিকাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা, কোথাও অত্যাচারী দুর্বৃত্তের কবল হইতে অসহায়া নারীর উদ্ধারের সঙ্কল্প, কোথাও হিংস্র ড্র্যাগনকে হত্যা করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অভিযানের প্রেরণা যোগাইয়াছে। কিন্তু উদ্দেশ্য যাহাই হউক, সর্ব্বত্রই অভিযান এবং তৎসংশ্লিষ্ট যুদ্ধবিগ্রহ লইয়া গল্পের কাঠামো তৈয়ারী হইয়াছে এবং যেখানে প্রণয় অভিযানের মুখ্য কারণ নহে, সেখানেও গৌণভাবে কোনরূপ প্রণয় ব্যাপার ইহার সহিত জড়িত রহিয়াছে। কাহিনীর পর কাহিনীর ভিতর দিয়া নায়কের বিভিন্ন অভিযানের জের টানিয়া যাওয়াই কাব্যের একমাত্র লক্ষ্য। কাহিনীগুলিও সাধারণতঃ একই ধরনের, সুতরাং একঘেয়ে। কোন কোন কাহিনীতে প্রাকৃতের সহিত অতি প্রাকৃতের মিশ্রণও লক্ষিত হয়; নিছক আজগুবী কাহিনীও বিরল নহে। 'রোমান' বা 'রোমান্স' ভাষায় লিখিত বলিয়াই এই শ্রেণীর কাব্যকে 'রোমান্স' বলা হয়। উপন্যাসের সহিত ইহার মৌলিক পার্থক্য এই যে, উপন্যাসে একাধিক কাহিনী থাকিলেও সবগুলিই মূল কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া ওঠে এবং কেবল কাহিনীর পরিবেশন নহে, কাহিনীর মাধ্যমে সুষ্ঠু চরিত্রাঙ্কন ঔপন্যাসিকের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। পক্ষান্তরে, রোমান্সে সুষ্ঠু চরিত্রাঙ্কন নাই এবং ইহার গল্পাংশ কতগুলি বিচ্ছিন্ন কাহিনীর সমষ্টিমাত্র; ঘটনার চমৎকারিত্ব ইহার প্রধান আকর্ষণ। বঙ্কিম ঔপন্যাসিক; তিনি এই জাতীয় রোমান্স রচনা করেন নাই।

'রোমান্সে'র প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির সূত্র ধরিয়া ক্রমে যে অর্থে 'রোমান্স' ও 'রোমান্টিক' শব্দ দুইটির ব্যাপকভাবে প্রয়োগ হইয়া থাকে তাহা এইরূপ: যাহা সাধারণ দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বাহিরে, সুতরাং যাহাতে নূতনত্বের ছাপ এবং কিছুটা অনিশ্চয়তা, হয়ত কিছুটা বিপদের ঝুঁকি রহিয়াছে তাহাই রোমান্টিক, অর্থাৎ তাহার ভিতরেই রহিয়াছে 'রোমান্স'। এই অর্থেই বিমলার দৌত্য, বীরেন্দ্রসিংহের দুর্গে জগৎসিংহের গোপন অভিসার, শৈবলিনীর উদ্ধারের সঙ্কল্প লইয়া সুন্দরীর নাপতানির ভূমিকা গ্রহণ এবং প্রতাপের উদ্ধারকল্পে শৈবলিনীর পাগলিনীর অভিনয় এবং ইংরেজের বন্ধনমুক্ত প্রতাপ ও শৈবলিনীর গঙ্গাবক্ষে সন্তরণ রোমান্টিক।

বঙ্কিমের বিভিন্ন উপন্যাসে যে সকল রোমাণ্টিক ঘটনার সমারোহ রহিয়াছে তাহা যেমন বিচ্ছিন্নভাবে উপভোগ্য, তেমনই মূল কাহিনীর অবিচ্ছেদ্য অংশ। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহাই উপন্যাসের প্রথম গতিবেগ যোগাইয়াছে। বিমলার দৌত্য ইহার দৃষ্টান্তস্থল। এইরূপ, সাগরের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে যাইয়া (এই প্রতিজ্ঞার পশ্চাতেও রহিয়াছে প্রফুল্লের রোমান্স-প্রিয় মনের প্রভাব) প্রফুল্ল যে ছোটখাটো রোমান্সের সৃষ্টি করিল, সেইখানেই কাহিনীর ক্লাইম্যাক্স (climax) এবং সেইখান হইতেই নায়ক-নায়িকার জীবনের মোড় ফিরিল। 'সীতারামে' প্রধানতঃ শ্রীর সুন্দর মুখের আকর্ষণে সীতারাম কর্ত্তৃক গঙ্গারামের উদ্ধারে যে কাহিনীর গোড়াপত্তন, তোরাব খাঁর বাহিনীর বিরুদ্ধে একক সংগ্রামে বিজয়ী 'বারুদমাখা মহাপুরুষে'র চিত্রে তাহার ক্লাইম্যাক্স।

রোমান্সধর্ম্মী মন চিরাভ্যস্ত গদ্যময় জীবনে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। সাধারণ জগতের বাঁধাধরা নিয়ম-কানুন তাহাকে শৃঙ্খলিত করিতে পারে না। সে শান্তি চায় না। চায় বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে জীবনের বিকাশ। এই হিসাবে রোমান্স যৌবনের ধর্ম্ম। ইহারই প্রেরণায় জগৎসিংহ মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া দুরন্ত পাঠানের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করিয়াছিলেন এবং হেমচন্দ্র স্বহস্তে পিতৃহত্যার প্রতিশোধের উদ্দেশ্যে বখতিয়ারকে মত্ত হস্তীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহারই প্রেরণায় চঞ্চল-কুমারী রাজসিংহের বীরত্বের নিকট আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। সমপর্য্যায়ের না হইলেও হেমচন্দ্রের দৌত্যে যে রোমান্স রহিয়াছে প্রধানতঃ তাহারই আকর্ষণ রঙ্গপ্রিয়া গিরিজায়াকে তাঁহার দৌত্যগ্রহণে প্রলুব্ধ করিয়াছিল এবং পরবর্ত্তীকালে সে যে মৃণালিনীর ভাগ্যের সহিত ভাগ্য মিলাইয়া হেমচন্দ্রের সন্ধানে নবদ্বীপ যাত্রা করিল, তাহার পশ্চাতে শুধু পরোপকারচিকীর্ষাই ছিল না, পরোপকারচিকীর্ষার সহিত ছিল এইরূপ অনিশ্চিত যাত্রার রোমাণ্টিক আকর্ষণ।

রোমাণ্টিক কল্পনা বৈচিত্র্যহীন বাস্তব জীবনের ঊর্দ্ধে আদর্শ স্বপ্নলোকে বিচরণ করে। এই কারণে প্রকৃত রোমাণ্টিক শিল্পী আদর্শবাদী। বঙ্কিম ইহার অন্যতম দৃষ্টান্তস্থল। শিল্পী বঙ্কিম বাস্তবকে অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু তাঁহার বহু চরিত্র আদর্শমূলক। অবশ্য ইহার এক কারণ সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিম শুধু সৌন্দর্য্যস্রষ্টা নহেন, তিনি স্পষ্টতঃই নীতিবেত্তার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার রোমাণ্টিক দৃষ্টিভঙ্গিও উপেক্ষণীয় নহে। আদর্শ-বাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও অনেক উপন্যাসেই বঙ্কিম এমন এক প্রতিবেশ রচনা করিয়াছেন যাহা নায়ক-নায়িকা জীবনে আনিয়াছে বিস্ময়কর রোমাণ্টিক ঘটনার সমাবেশ। 'কপালকুণ্ডলা' ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। রোমাণ্টিক সাহিত্যজগতে কপালকুণ্ডলা অনন্যা এবং কালিদাস ও সেক্সপীয়ার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াও তরুণ শিল্পী যে এই চরিত্রের পরিকল্পনা ও রূপায়ণে পুরাপুরি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে পারিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার শিল্পপ্রতিভার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন বলিলেও হয়ত কোনরূপ অত্যুক্তি হইবে না।

কিন্তু পক্ষিরাজের রাস ছাড়িয়া কল্পনাবিলাসী যখন যথেচ্ছা কল্পনারাজ্যে বিচরণ করেন, তখন অতি সহজেই সম্ভাব্য ও অসম্ভাব্যের সীমারেখা মুছিয়া যাইতে পারে। দক্ষ শিল্পী এ ক্ষেত্রে এমন এক আবহাওয়ার সৃষ্টি করেন যাহার ছোঁয়াচমাত্র পাঠকের বিচারবৃত্তি ঘুমাইয়া পড়ে। এখেন্সের উপকণ্ঠে ঘন বনানী মধ্যে পরীরাজ এবং পরীরাণীর এলাকায় অথবা প্রস্‌পারোর যাদুদ্বীপে সম্ভাব্য অসম্ভাব্যের প্রশ্ন অবান্তর। বঙ্কিমের উপন্যাসে অনুরূপ কোন সৃষ্টি নাই। 'ইন্দিরায়' বিদ্যাধরীবৃত্তান্ত (ইহাও রোমাণ্টিক পর্য্যায়ভুক্ত) ছেলেভুলানো রূপকথার কাহিনীর ন্যায় আজগুবী। এখানে পাঠককে ভুলাইবার জন্য কোনরূপ মায়াজাল সৃষ্টির প্রয়াস নাই। পক্ষান্তরে, ইহা স্বামীকে ছলনা করিবার উদ্দেশ্যে কৌতুকপ্রিয়া ইন্দিরার কৌশলমাত্র এবং উপন্যাসে ইহা নিছক হাস্য-রসের যোগান দিয়াছে। আখ্যায়িকার ক্রমবিকাশেও ইহা অপরিহার্য্য নহে।

অতিপ্রাকৃতের পরিবেশন দ্বারা ভীতিমিশ্রিত বিস্ময়ের সঞ্চার রোমাণ্টিক আর্টের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'ম্যাকবেথে'র ডাইনিত্রয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বঙ্কিমের উপন্যাসে যেমন কোনরূপ অতিপ্রাকৃত চরিত্র নাই, তেমন তিনি যে সকল অতিপ্রাকৃত ঘটনা পরিবেশন করিয়াছেন অনেকক্ষেত্রেই তাহা উদ্দেশ্যমূলক এবং আর্য্য-বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসাবে যে মূল্য থাকুক, আর্টের বিচারে তাহা দোষশূন্য নহে। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ-সূর্য্যমুখীর পুনর্মিলনের চিত্রে, দুর্য্যোগের রাত্রে ঘনান্ধ-কারময় পর্ব্বতগুহায় শৈবলিনীর রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ও তাহার সপ্তাহব্যাপী প্রায়শ্চিত্তের চিত্রে এবং উদয়পুরের ভীতিপ্রদ প্রতিবেশে উদিপুরীর মবারকদর্শনের চিত্রে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ঘটনার উপর বঙ্কিম এমন এক অতি-প্রাকৃতের ছাপ দিয়াছেন যাহা প্রথমশ্রেণীর শিল্পপ্রতিভার পরিচয় দেয়। এই সকল চিত্র শ্রেষ্ঠ রোমাণ্টিক আর্টের নিদর্শন।

রোমান্টিক সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে একটি বিশিষ্ট অর্থে রোমান্টিক শব্দের প্রয়োগের উল্লেখ করা প্রয়োজন। যে সকল স্থলে সহজ অর্থের অন্তরালে অতীন্দ্রিয় জগতের এমন এক গূঢ় ইঙ্গিত রহিয়াছে যাহা বুঝিতে হইলে বিশেষ রকমের অনুভূতি বা অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন সাহিত্যের ভাষায় তাহাও রোমান্টিক। মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিতা হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথের মিষ্টিক কাব্য এই পর্য্যায়ভুক্ত। এ স্থলে যাহা দৃশ্য তাহাতেই তুষ্ট না হইয়া কবি দৃশ্যের মাঝে অদৃশ্যের, সীমার মাঝে অসীমের অনুভূতি লাভ করেন। অতীন্দ্রিয় জগতে ইহাও এক প্রকারের অ্যাড্‌ভেন্চার এবং এই হিসাবে ইহা রোমান্টিক। বঙ্কিমের উপন্যাসে অতিপ্রাকৃত এবং স্থানে স্থানে সঙ্কেতের (symbolism) মাধ্যমে অতীন্দ্রিয় জগতের আভাস থাকিলেও কোথাও এই শ্রেণীর রোমান্টিকতার দৃষ্টান্ত নাই।

সমালোচনাসাহিত্যের ভাষায় 'রোমান্টিক' 'ক্ল্যাসিক্যালে'র বিপরীতধর্ম্মী সাহিত্য। 'ক্ল্যাসিক্যাল' আইনমুগ, বাঁধাধরা নিয়ম দ্বারা শৃঙ্খলিত, রক্ষণশীল এবং প্রচলিত আদর্শের পূজারী। 'রোমান্টিক' আর্ট প্রচলিত নিয়মের বন্ধন মানে না অথবা প্রচলিত আদর্শেও তুষ্ট নহে; পরন্তু কর্ত্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হইতেই ইহার সৃষ্টি। 'ক্ল্যাসিক্যাল' নিয়মশৃঙ্খলার নিকট ব্যক্তিত্ব সঙ্কুচিত করে, 'রোমান্টিক' ব্যক্তিত্বের সম্প্রসারণ করিয়া গতানুগতিকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই আদর্শানুযায়ী বঙ্কিম পুরাপুরি রোমান্টিক। তাঁহার উপন্যাসে কাহিনী, ভাষা ও ব্যঞ্জনায় বঙ্কিম নূতন পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। ঔপন্যাসিক বঙ্কিম পথকৃৎ।

রোমান্টিক মতবাদের মূলকথা গ্রহণ নহে, বর্জ্জন। ইহা সহজ জীবনপথ ছাড়িয়া দুর্গম পথ বাছিয়া লয়, সহজ অভিব্যক্তির পরিবর্ত্তে রূপকের আশ্রয় লয়, বাহিরে যাহা প্রকট তাহার অন্তরালে গূঢ় অর্থ খুঁজিয়া বেড়ায়, দৃশ্যকে ছাড়িয়া অদৃশ্যের সন্ধান করে। বর্ত্তমানে অসন্তুষ্টির ফলে রোমান্সধর্ম্মী শিল্পী অতীতের পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহার দৃষ্টি অতীতের পৃষ্ঠায় খুঁজিয়া বেড়ায় ভবিষ্যতের আদর্শ, তাঁহার সৃষ্টিতে থাকে অতীতের পটভূমিতে ভবিষ্যতের রেখাঙ্কন। বঙ্কিমের সম্বন্ধে এই উক্তি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্ঘাতে পুরাতন সভ্যতা ও সমাজজীবন ভাঙিয়া যেদিন নূতন সভ্যতা ও সমাজজীবন গড়িয়া উঠিতেছিল, বঙ্কিম বাংলার সেই যুগসন্ধিক্ষণে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং অকুণ্ঠিতচিত্তে এই শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্তরে তিনি ছিলেন খাঁটি ভারতীয় এবং আর্য্যঋষি ও আর্য্যবিদ্যার প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাশীল। তিনি চাহিয়াছিলেন পাশ্চাত্ত্য বহির্বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ আর্য্যসভ্যতার পুনরভ্যুত্থান। এই কারণেই বর্ত্তমানকে অস্বীকার না করিলেও তাঁহার দৃষ্টি স্বভাবতঃই ভারতের অতীত ইতিহাস খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে। বঙ্কিম তাঁহার পারিবারিক উপন্যাসে ভবিষ্য-মন্দয় মিশানো সমসাময়িক সমাজজীবনের চিত্র আঁকিয়াছেন। এমনকি, ঐতিহাসিক উপন্যাস 'মৃণালিনী'তেও অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তৎকালীন সামাজিক সমস্যা বিধবাবিবাহের প্রশ্ন তুলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার রোমান্সধর্ম্মী মন বর্ত্তমান অপেক্ষা অতীতের প্রতিবেশেই অধিকতর স্বস্তিবোধ করিত। অতীত তাঁহার দৃষ্টিতে শুধুই অতীত নহে; অতীতের পৃষ্ঠায় তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন ভাবীকালের ইতিহাসরচয়িতাদের অলক্ষ্য পাদক্ষেপ। তাঁহার প্রতাপ, জীবানন্দ, সত্যানন্দ, মহাপুরুষ চিকিৎসক, তাঁহার শান্তি, দেবীচৌধুরাণী অতীতের পটভূমিতে সৃষ্ট হইলেও অতীতের নহেন। বঙ্কিমের কল্পনা ভবিষ্যতের যে রঙিন চিত্র আঁকিয়াছে, ইঁহারা তাহাতেই বর্ণবৈচিত্র্য যোগাইয়াছেন এবং ঋষি বঙ্কিমের স্বপ্ন যে নিছক কল্পনাবিলাসীর স্বপ্ন নহে, গত অর্দ্ধ শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয়। এই দিক দিয়া বিচার করিলে 'আনন্দমঠ' এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। উপন্যাসখানি পড়িতে পড়িতে মনে হয় সত্যানন্দের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ই বুঝি বা বঙ্কিমোত্তর যুগে বাস্তব বিপ্লবীর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহাও লক্ষণীয় যে, ভারতের মুক্তিসংগ্রামের বিপ্লবী বীরগণ 'আনন্দমঠ' হইতে প্রেরণা লাভ করিলেও সশস্ত্র বিপ্লব 'আনন্দমঠে'র শেষ কথা নহে। সত্যানন্দের হিমালয়-প্রয়াণ স্বতঃই শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচারীপ্রয়াণ স্মরণ করাইয়া দেয়। বঙ্কিম কি বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতের স্বাধীনতা সশস্ত্র বিপ্লব দ্বারা অর্জ্জিত হইবে না? সত্যানন্দের হিমালয়প্রয়াণ কি তারই ইঙ্গিত দেয়?

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা ও 'মহুয়া'

শ্রীছায়া চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতার একটি বৈশিষ্ট্য বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নরনারীর হৃদয়ের সংযোগের সন্ধান। কবি স্বয়ং এক জায়গায় বলিয়াছেন—"প্রেম যখন অহং-এর শাসন অতিক্রম করে বিশ্বের মধ্যে, অনন্তের মধ্যে মুক্ত হয়, তখন সে যা পায় তাকে যে নামই দাও না কেন, সে কেবল ভাষার বৈচিত্র্য মাত্র, কিন্তু সেই মুক্তি।"

রবীন্দ্রনাথ প্রণয়ীর বেদনাকে সর্ব্বত্রই বিশ্ববেদনার অঙ্গ করিয়া লইয়াছেন। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে চিরন্তন প্রেমের যে আদান-প্রদান চলিতেছিল কবি তাহার প্রণয়-রহস্য যেন হঠাৎ প্রকাশ করিয়া দিলেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রেমের এই ব্যাপকতার অভাব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কেন না শ্রীরাধার সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির সংযোগ নাই। শ্রীরাধা একজন নায়িকা মাত্র। এই বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা রবীন্দ্রনাথের কাব্যের বৈশিষ্ট্য। তিনি বৈষ্ণব-কাব্য ও অন্যান্য কবির প্রেমের কবিতার তীব্রতা অটুট রাখিয়া তাহার মধ্যে বিরাট ব্যাপকতা আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম বয়সের 'যৌবন-স্বপ্ন' কবিতায় তিনি বলিতেছেন :

আমার যৌবনস্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ
ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর পরশের মত।···

তথাপি কবির জীবনের প্রথম-প্রহরের প্রেমের কবিতার রূপের সঙ্গে শেষ-প্রহরের প্রেমের কবিতার ভেদ অনেক।

প্রথম বয়সে অনেক কবিতায় কবি নারীর দেহ ও দেহের মিলনের বর্ণনা করিয়াছিলেন। তিনি নারীর দেহকে পাপ ও লালসার লীলাভূমি বলিয়া পরিত্যাগ করেন নাই। তাহার রমণীয়তাকে তিনি স্বীকার করিয়াছেন, তাহার মাধুর্য্য তাঁহার কাব্যে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন :

নীলাম্বরে কিবা কাজ তীরে ফেলে এস আজ
ঢেকে দিবে সব লাজ সুনীল জলে।
(সোনার তরী)

তথাপি 'কড়ি ও কোমলে'র যে প্রেমের আবেগ তাহা একান্তই পার্থিব ভোগক্ষুধার। তিনি তখন ছিলেন একান্তই ইন্দ্রিয়জ সৌন্দর্য্যের উপাসক। সে যুগে নারীর দেহসৌন্দর্য্য কবিচিত্তকে মুগ্ধ করিয়াছে। তখন পর্য্যন্ত কবি বিশ্বজগতের বাহ্য সৌন্দর্য্যকে দেখিয়াছেন, দেখিয়াছেন খণ্ড বিচ্ছিন্নরূপ। সসীম সৌন্দর্য্যোপলব্ধির ক্ষেত্রে কবি ঐ যুগে বিচরণ করিয়াছেন। তখনও সাধনার প্রদীপ্ত অনলে 'অতনুর তনু ভস্ম' হয় নাই, সৌন্দর্য্যের অন্তঃপুরে কবি তখনও তাঁহার দৃষ্টিকে প্রসারিত করিতে পারেন নাই। সেখানে তাঁহার বাসনা ছিল তীব্র ও প্রদীপ্ত। সেখানে ইন্দ্রিয়জ প্রেমের কবি আতুর :

ব্যাকুল বাসনা দুটি চাহে পরস্পরে
দেহের সীমায় আসি দুজনার দেখা?

সেখানে প্রকৃতির মধ্যেও তিনি কালিদাসের মত এই ভোগক্ষুধারই সঙ্কেত দেখিতেন :

আকাশের দুই দিক হতে দুইখানি মেঘ এল ভেসে
সহসা থামিল থমকিয়া আকাশের মাঝখানে এসে···
দুটী চুম্বনের ছোঁয়াছুঁয়ি, মাঝে যেন সরমের হাস,
দুখানি অলস আঁখিপাতা, মাঝে সুখ-স্বপন আভাস।

আবার বলছেন :

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গতরে।
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন।···
হৃদয় লুকানো আছে দেহের সায়রে
চিরদিন তীরে বসি করি গো ক্রন্দন,
সর্ব্বাঙ্গ ঢালিয়া আজি আকুল অন্তরে
দেহের রহস্য মাঝে হইব মগন।
(দেহের মিলন, কড়ি ও কোমল)

'শকুন্তলা' কাব্যে কালিদাসের দুষ্মন্ত, শকুন্তলার কথা স্মরণ করিয়া বলিয়াছেন :

অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিশলয়মলূনং কররুহৈঃ
অনাবিদ্ধং রত্নং মধু অনাস্বাদিতরসম্।

হাফেজ তাঁহার "মাশুকে"র কথা স্মরণ করিয়া বলিয়াছেন :

রুজিয়ে মা বাআদ লালে শকর্‌ক্ আফশানে তুরা।
(লাল শীরীণ ঠোঁট প্রিয়ার রোজপাই তরাই লাখ লাখ চুম্বনে)।

আর Burns তাঁহার Highland Mary-র কথা স্মরণ করিয়া বলিতেছেন :

How sweetly bloom'd the gay green birk
How rich the hawthorn's blossoms,
As underneath the fragrant shade
I clasp'd her to my bosom!
The golden hours on angel wings
Flew o'er me and my dearie
For dear to me as light and life
Was my sweet Highland Mary.

এই সমস্ত কবিতার মধ্যে ভোগ আত্মসম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ তৃপ্ত। তবে কালিদাসের ভোগ কেমন গোলাপগন্ধী; আর হাফেজে, Burns-এ মত্ততা আর আবেগ কিছু বেশী।

এই সবের সঙ্গে মিলাইয়া রবীন্দ্রনাথের ভোগের স্বরূপকে উপলব্ধি করিতে গিয়া দেখিতে পাই যে, 'কড়ি ও কোমলে'র যুগেই সীমাবদ্ধতার সঙ্কীর্ণতা কবিকে পীড়িত করিয়া তাঁহার অধ্যাত্মদৃষ্টি খুলিয়া দিয়াছে। দেহের মধ্যে সন্ধান করিয়াছেন দেহাতীত সৌন্দর্য্যকে। খুঁজিয়া ফিরিয়াছেন বস্তুর মধ্যে বস্তুর অতীত সৌন্দর্য্যকে। উহার সন্ধানও তিনি পাইয়াছেন, তাই বস্তুদেহ ভাব-দেহের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ফলে কবির মনে আসিল শ্রান্তি ও বৈরাগ্য। তিনি বলিলেন:

নহে নহে এ তোমার বাসনার দাস
তোমার ক্ষুধার মাঝে আনিও না টানি।—

কবিচিত্ত তখন ভোগময় প্রেম হইতে ধীরে ধীরে ভোগাতীতের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। তাই শুনি নব চৈতন্যের জন্য কবির আর্তি:

এ মোহ ক'দিন থাকে এ মায়া মিলায়
কিছুতে পারে না আর বাঁধিয়া রাখিতে
কোমল বাহুর ডোর ছিন্ন হয়ে যায়
মদিরা উথলে নাকো মদিরা আঁখিতে।

নারীসৌন্দর্য্যের দিকে চাহিয়া, কবির মনে পড়িয়াছে জন্ম-জন্মান্তরের স্মৃতি। বলিয়াছেন:

যেন গো আমারি তুমি আত্মবিস্মরণ
অনন্ত কালের মোর সুখ দুঃখ শোক···
সেই হাসি, সেই অশ্রু, সেই সব কথা
মধুর-মুরতি-ধরি দেখা দিল আজ।
তোমার মুখেতে চেয়ে তাই নিশিদিন,
জীবন সুদূরে যেন হতেছে বিলীন।
(স্মৃতি, কড়ি ও কোমল)

সব ভোগ, সব অনুভূতির ভিতরে পরম রহস্যমণ্ডিত সত্যের সন্ধানই যে কবির মজ্জাগত, মানসীর 'হৃদয়ের ধন' কবিতায় তা পরিস্ফুট:

নাই নাই কিছু নাই শুধু অন্বেষণ।
নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাঁকিয়া
কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন,
দেহ শুধু হাতে আসে শ্রান্ত করে হিয়া।
প্রভাতে মলিন মুখে ফিরে যাই গেহে,
হৃদয়ের ধন কভু ধরা যায় দেহে!

নরনারী যখন 'দুহুঁ কোড়ে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া' এবং 'নিমেষে শতেক যুগ দূর হেন মানে' তখন তাহারা অনেক সময় কামনার কলুষে প্রিয়তমকে কলঙ্কিত করে, তাই কবি বলিতেছেন:

যে প্রদীপ আলো দেবে তাহে ফেল শ্বাস
যারে ভালবাসো তারে করিছ বিনাশ।
(পবিত্র প্রেম, কড়ি ও কোমল)

যখন মানবচিত্ত পূর্ণ মিলনের জন্য ব্যাকুল হইয়া প্রিয়ের মধ্যে আপনাকে এবং আপনার মধ্যে প্রিয়কে বিলীন করিয়া দিতে চাহে অথচ পারে না, তখন তাহাদের সেই ব্যর্থতাকে দেখিয়া কবি বলিয়াছেন:

এ কি দুরাশার স্বপ্ন হায় গো ঈশ্বর
তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোন্ খানে।
(পূর্ণ-মিলন, কড়ি ও কোমল)

'কড়ি ও কোমলে'র পরবর্তী কাব্য 'মানসী'। এখানে তিনি ইন্দ্রিয়জ ভোগকে প্রেমের স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিলেন না। মানবীর মধ্যে মানসীর, রূপের মধ্যে রূপাতীতকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কবি এই যুগে। প্রেম যে ইন্দ্রিয়ভোগের অতীত, অসীম, অখণ্ড, প্রেমের প্রকাশ বা উপলব্ধি যে অন্তরে, ইন্দ্রিয়ে নহে, এ বোধ কবির মধ্যে বড় বেশী করিয়া জাগিয়াছে মানসীতেই:

বিশ্ব জগতের তরে ঈশ্বরের তরে—
শতদল উঠিতেছে ফুটি;
সুতীক্ষ্ণ বাসনা ছুরি দিয়ে,
তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে?
লও তার মধুর সৌরভ
দেখ তার সৌন্দর্য্য বিকাশ
মধু তার, কর তুমি পান
ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী
চেয়ো না তাহারে।
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।—

অমূর্ত্ত সৌন্দর্য্য হৃদয় দিয়া অনুভব করিবার জন্ত তিনি ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিলেন :

'হৃদয় আকাশে থাক না জাগিয়া দেহহীন তব জ্যোতি।'

বাহ্যিক রূপ যে বহির্জ্জগতের ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের মধ্যে নাই, তাহার প্রকাশ যে একান্ত অন্তরের মধ্যে এই তথ্যটি অনুভব করিয়াই কবি বলিয়াছেন :

অপবিত্র ও কর পরশ
সঙ্গে ওর হৃদয় নহিলে !
মনে কি করেছ বঁধু, ও হাসি এতই মধু
প্রেম না দিলেও চলে শুধু হাসি দিলে,

'অনন্ত প্রেম' কবিতাটিতে কবি অনুভব করিয়াছেন যে, দুইটি নরনারীর প্রেমের মধ্যে সমস্ত নিখিলের প্রাণের প্রীতি ও বেদনা প্রকট হইয়া উঠে :

নিখিলের সুখ নিখিলের দুখ
নিখিল প্রাণের প্রীতি,
একটি প্রেমের মাঝারে মিশিছে
সকল প্রেমের স্মৃতি,
সকল কালের সকল কবির গীতি।

সংস্কৃত কাব্যে কালিদাস প্রভৃতি অনেক কবির কাব্যে নারীর প্রেম অধিকাংশ স্থলেই নিছক ঐন্দ্রিয়জ কামরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অধিকাংশ প্রেমের কবিতাতেই রূপ-বর্ণনা ও শরীর-বিকারের বর্ণনাই মুখর হইয়া উঠিয়াছে। দেহজভোগ ও ইন্দ্রিয়জতৃপ্তিই প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একমাত্র ভবভূতির বর্ণনায় ইন্দ্রিয়জতৃপ্তি যেন ইন্দ্রিয়কে ছাড়াইয়া এক অতীন্দ্রিয় আনন্দলোকের মধ্যে মনকে সমাধিসমাপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। ভবভূতি যেমন বলিয়াছেন :

'ইন্দ্রিয়জতৃপ্তি ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা।'

রবীন্দ্রনাথও তেমনি বলিয়াছেন :

এ প্রেম আমার সুখ নহে দুখ নহে।

'মানসী'তে নরনারীর প্রীতির মধ্যে যে অনন্তকালের এবং বিশ্বভুবনের প্রীতি আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে, ইহা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে দুর্লভ। এই প্রীতি একটি প্রেমস্বরূপ আত্মার একটি অনির্ব্বচনীয় উপলব্ধির সার্থকতা নহে। ইহা যেন ভিতর হইতে বাহিরে, যুগল হইতে বিশ্বে, অন্তকাল হইতে অনন্তকালে আপনাকে প্লাবিত করিয়া দিতেছে।

তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি
শতরূপে শতবার—
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার—

বলিয়াছেন :

আমরা দু'জনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদিকালের হৃদয় উৎস হতে
আমরা দু'জনে করিয়াছি খেলা
কোটি প্রেমিকের মাঝে
বিরহ-বিধুর নয়ন-সলিলে, মিলন মধুর লাজে
পুরাতন প্রেম নিত্য নূতন সাজে—

মানসীর পরবর্ত্তী কাব্য 'সোনার তরী'। কবির সৌন্দর্য্যতন্ময়তা এই কাব্যে প্রকাশিত। নানা রেখা ও বর্ণ-বৈচিত্র্যের মধ্যে যে সৌন্দর্য্য তিনি ইতিপূর্ব্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহাকে অখণ্ড সৌন্দর্য্য প্রতিমারূপে—মানস-সুন্দরীরূপে কবি এ যুগে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। অধীর হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন :

আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী
বলো কোন্ পাড় ভিড়িবে তোমার সোনার তরী।

সোনার তরীতে কবিকল্পনা প্রেমকে অতীন্দ্রিয়, অমূর্ত্তরূপে প্রত্যক্ষ করিল। এদিক হইতে তাঁহাকে Shelley-র সহিত তুলনা করা যায়। Shelley-র কাছে ভালবাসা একটা Inspiration-এর মত এবং তাহা অতীন্দ্রিয়। যেমন :

The worship that the heart lifts above
And the heavens reject not,—
The desire of the moth for the star
Of the night for the morrow,
The devotion to something afar
From the sphere of our sorrow.

Episychidion-এ এই কথাই Shelley বলিয়াছেন :

Her limbs, as underneath a cloud of dew
Embodied in the windless heaven of June
Amid the splendour-wing'd stars, the moon
Burns inextinguishably beautiful.

রবীন্দ্রনাথও এই কথাই বলিয়াছেন :

আজ বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ প্রিয়ে
তোমারে দেখিতে পাই সর্ব্বত্র চাহিয়ে !
ধূপ গন্ধ হয়ে গেছে গন্ধ বাষ্প তার
পূর্ণ করে ফেলিয়াছে আজি চারিধার।

যাহাকে ভালবাসি তাহার দেহ যেন দেহ নয়, সমগ্র প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-নির্য্যাস। Shelley-র ভাষায় বলা যায় :

An image of some bright Eternity

A shadow of some golden dream ;—

Keats-র কবিতায় প্রেম পবিত্রতার প্রতীক :

She seemed a splendid angel, newly drest,
Save wings, for heaven :—
She knelt, so pure a thing, so free from
mortal taint.
(The Eve of St. Agnes)

'সোনার তরী'র পরবর্তী কাব্য 'চিত্রা'য় রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্যবোধের চরম অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। এখানে আসিয়া প্রেম কিছুটা মূর্ত্ততা লাভ করিয়াছে। কিন্তু ইন্দ্রিয়ঘন (Sensuous) হইলেও এ প্রেমকে ইন্দ্রিয়জ (Sensual) বলা যায় না। তিনি বলিয়াছেন :

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।
অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে,
আকুল পুলকে উলসিছ ফুল কাননে,
দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চল-চরণে
তুমি চঞ্চলগামিনী।

কিন্তু বাহিরে যে সৌন্দর্য্য বিচিত্র চঞ্চল, অন্তরে তাহাই এক, অদ্বিতীয়, অখণ্ড, স্থির, গম্ভীর :

অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তরবাসিনী।

'উর্ব্বশী' ও 'বিজয়িনী' কবিতা দুইটিতে দেহ হইতে দেহাতীতে যাত্রার স্পষ্টরূপ যেমন দেখা যায়, তেমন অন্যত্র দেখা যায় না। 'চৈতালী'তে কবি তাই স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন :

অর্দ্ধেক মানবী তুমি অর্দ্ধেক কল্পনা।

'মানসী' হইতে 'চৈতালী' পর্য্যন্ত রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেমের যে স্বরূপ প্রকাশিত, সে প্রেম অতীন্দ্রিয়—সে প্রেমের পাত্রী সৌন্দর্য্যময়ী, নিষ্ঠাবতী—সে প্রেম চিরন্তন, অক্ষয়, অমর। তাহাতে স্খলন নাই, চ্যুতি, বিচ্যুতিও নাই।

দ্বিতীয়তঃ, এই যুগের কবিতা প্রধানতঃ পুরুষের উক্তি। নারীর প্রেম তাহার স্বাতন্ত্র্যের যে পরিচয় দেয়, তাহার সন্ধান মহুয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী পর্য্যায়ে স্পষ্ট হইয়া ওঠে নাই।

'মহুয়া' কবির অপরূপ সৃষ্টি। ইহাতে উৎকৃষ্ট প্রেমের কবিতা অসংখ্য। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বেকার প্রেমের কবিতার কমনীয়তার, স্নিগ্ধ নম্রতার সঙ্গে আসিয়া মিশিল এবার মহুয়ার বীর্য্য।

'মহুয়া'র মধ্যে অনেকগুলি কবিতায় যে প্রেমের পরিচয় পাই, তাহা বীরের প্রেম, তাহা পৌরুষের দ্বারা মহিমান্বিত। মহুয়ার প্রেমের যে শক্তি, তাহা অন্তরের সাহসের উপর প্রতিষ্ঠিত। 'কল্পনা'তে কবি বলিয়াছিলেন :

পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি সন্ন্যাসী
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে—
ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিঃশ্বাসী
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।

এই কবিতায় অতীন্দ্রিয়তার জন্যে কবি-হৃদয়ের আর্ত্তি বেদনাবহ। কিন্তু মহুয়ার 'উজ্জীবন' কবিতায় কবি মৃত্যুঞ্জয় প্রেমের তেজোময় স্বরূপকে উপলব্ধি করিয়াছেন—দেহের আকাঙ্ক্ষা ভস্ম হইয়াছে। কিন্তু সেজন্য বেদনা নাই, আছে প্রেমের সত্যস্বরূপ উপলব্ধির চেতনা।

যাহা রূঢ়, যাহা মূঢ় তব,
যাহা স্থূল, দগ্ধ হোক ; হও নিত্যনব।

কামনা, বাসনা-মুক্ত, নিষ্কলঙ্ক প্রেমের নিত্য জ্যোতির্ম্ময়রূপ ফুটিয়া উঠুক—সে প্রেমের অধিকারী হইবে যে নারী ও নর, তাহারাই বীরত্বের গৌরবের অধিকারী। সে প্রেম হইবে প্রখর দীপ্তিময়, তাহাতে কামনার ক্ষুদ্রতা ও লোলুপতা থাকিবে না, সংসারের কঠিন বাস্তবভীতি সেখানে থাকিবে না—সে প্রেম চলিবে জীবনের পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পথ বাহিয়া, সমস্ত লৌকিক লজ্জা ভয় অপেক্ষা করিয়া।

দুঃখে সুখে বেদনায় বন্ধুর যে পথ
সে দুর্গমে চলুক প্রেমের জয়রথ।

অমিত, বীর্য্যশালী, সত্যপ্রতিষ্ঠ প্রেমকে কবি আহ্বান করিয়াছেন 'মহুয়া'য়। প্রেমের আগমনের অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে 'বোধন' হইতে 'মাধবী' পর্য্যন্ত কবিতায়। প্রকৃতিতে একটা উন্মাদনা ও মিথুন-ভাবের সৃষ্টি প্রেমের আবির্ভাবের পক্ষে স্বাভাবিক ও উপযুক্ত, তাই কবি এই কবিতাগুলিতে সুন্দর পটভূমিকা-টুকু গড়িয়াছেন। 'অর্ঘ্য' কবিতাটিতে তিনি বলিতেছেন :

এই ভুবনের একটি অসীমকোণ—
যুগল প্রাণের গোপন পদ্মাসন,
সেথায় আমায় ডাক দিয়ে যায় নাই জানাকে,
সাগরপারের পাস্থপাখীর ডানার ডাকে ;—

প্রকৃতির মধ্যে যুগলপ্রাণের যে পদ্মাসন রহিয়াছে তাহার মধ্য হইতে অজানা লোকের দিকে যে প্রেমের বাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে তাহাই কবির চিত্তের মধ্যে প্রেমের আবেশ ফুটাইয়া তুলিতেছে।

মহুয়ার দ্বিতীয় ধারার কবিতার মধ্যে চলিয়াছে প্রেমের প্রসাধনলীলার রূপবৈচিত্র্য। প্রেম প্রণয়িনীকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করে। চোখে আসে নূতন দৃষ্টি, কণ্ঠে

নূতন বাণী, হাসিতে বাঁশীর সুর, সারা দেহমন বাসন্তী-রঙে রঙীন হইয়া ওঠে :

আমার প্রকাশ নতুন বচন ধরে,
আপনাকে আজ নতুন রচন করে,
ফাগুন-বনের গুপ্ত ধনের
আভাস ভরা,
রক্তদীপন প্রাণের আভায় রঙিন-করা।

প্রিয়ার দেহমনে অপূর্ব্বছন্দে প্রিয়-বরণ-গান বাজিয়া উঠিয়াছে, প্রাণের পূর্ণস্রোতে পূজার অর্ঘ্য ভাসিয়া আসিয়াছে :

অর্ঘ্য তোমার আনিনি ভরিয়া
বাহির হতে,
ভেসে আসে পূজা পূর্ণ প্রাণের
আপন স্রোতে।
মোর তনুময় উছলে হৃদয় বাঁধন-হারা
অধীরতা তারি—মিলনে তোমারি—
হোক-না-সারা।

'মায়া' কবিতায় কবি বলিতেছেন যে, প্রিয়া প্রিয়তমের অন্তরের গহনতলে প্রবেশ করিয়া বর্ণগন্ধ, গানে প্রিয়তমের হৃদয়কে নূতনরূপে গড়িয়া তুলিবে। প্রিয়তমের দেহমন লীলায়িত হইবে সেই বর্ণগন্ধ ও গানের লীলায়, এক ভাবময়, মায়াময় রাজত্বে হইবে তাহাদের বাস। এ এক অপূর্ব্ব জগৎ, নূতন জগৎ, বস্তুজগৎ মিলাইয়া গিয়া সেই পরমসুন্দর জগৎ সত্যরূপে ফুটিয়া উঠিবে :

হাওয়ায় ছায়ায় আলোয় গানে
আমরা দোঁহে
আপন-মনে রচব ভুবন
ভাবের মোহে।

বিশেষ বিশেষ নারীপ্রকৃতির মধ্যে নারীমাধুর্য্যের যে বিচিত্র বর্ণচ্ছটা প্রতিফলিত হয় তাহা 'নারী' শীর্ষক কবিতাগুচ্ছে অসীম সহৃদয়তার সহিত কবি চিত্রার্পিত করিয়াছেন। এইগুলিকে বিশ্বসাহিত্যের নায়িকারত্নমালা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

পরিবর্ত্তমানের সঙ্গে অপরিবর্ত্তনের সম্বন্ধ ও সংঘর্ষ—ইহা কবির চিত্তকে বারংবার আলোড়িত করিয়াছে। কবি ইহাদের সুন্দরতম সমন্বয় করিয়াছেন 'শেষের কবিতা' ও 'মহুয়া'য়। জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা ও প্রণয়ের আদান-প্রদান তাহাদের স্বকীয় বেগে ও ভঙ্গিতে চলিতেছে ও চলিবে, তাহাদের সঙ্গে অপরিবর্ত্তনীয় প্রেমের আনাগোনা নাই। কিন্তু এই দৈনন্দিন জীবনের পাছের আসে সেই অচঞ্চল সত্তা হইতে। অমিত-শোভনলাল-লাবণ্য-কেতকীর প্রেমকাহিনীর ইহাই প্রথম ও শেষ-কথা। লাবণ্যের শেষের কবিতায় প্রেমের এই দিকটি সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

ওগো বন্ধু
সেই ধাবমানকাল
জড়ায়ে ধরিল মোরে ফেলি তার জাল—

কিন্তু তাই বলিয়া অপরিবর্ত্তন অর্ঘ্যের মূল্যের হ্রাস হয় নাই। লাবণ্য উভয়ের এই তুলনামূলক বর্ণনা দিয়াছে :

তবু সে তো স্বপ্ন নয়,
সবচেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয়
সে আমার প্রেম।
তারে আমি রাখিয়া এলেম
অপরিবর্ত্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশে।
পরিবর্ত্তনের স্রোতে আমি যাই ভেসে
কালের যাত্রায়—হে বন্ধু বিদায়।

'চলে যাওয়া' এবং 'রয়ে থাকা'র মধ্যে যে বিরোধের সূচনা 'বলাকা'য় আছে, 'মহুয়া'য় তাহার অবসান হইয়াছে, 'রয়ে থাকা'র মধ্যেই সঞ্চিত রহিয়াছে 'চলে যাওয়া'র রস।

নারীকে নূতন রূপ দান করিয়া, তাহার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে পূর্ণ মর্য্যাদা দান করিয়া কবি নারীকে উচ্চ স্থান দিয়াছেন। 'মহুয়া'র মধ্যে তাহারই প্রকাশ। তিনি নারীকে পুরুষের পুরোভাগেও রাখেন নাই, তাহাকে অবহেলায় পশ্চাতেও রাখেন নাই। তিনি নারীকে রাখিয়াছেন পুরুষের পার্শ্বে তাহার সহচরী করিয়া। সকল নারীর আদর্শরূপে চিত্রাঙ্গদা বলিতেছেন অর্জ্জুনকে :

আমি চিত্রাঙ্গদা
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সে-ও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সে-ও আমি নহি।
যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর—
কঠিন ব্রতের—তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।

গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ নারীকে আহ্বান করিয়াছেন মুক্ত হইতে। গান্ধীজী কলম্বোতে সিংহলী নারীদের এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন :

If I was born a woman, I would rise in rebelion against any pretension on the part of man that woman is born to be his plaything.

যুধিষ্ঠির নরক দর্শন করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু পৃথিবীর হাজার হাজার মেয়ে নরকবাস করিতেছে এমন একটা দাম্পত্য সম্পর্ককে স্বীকার করিয়া, যাহার মধ্যে ভালবাসা নাই, নাই পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা। কিন্তু নারী পুরুষের হাতের খেলার পুতুল নহে, তাহারও যে আত্মমর্য্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য আছে, কবি তাহাকেই বারংবার প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন।

'যোগাযোগ' উপন্যাসে কুমুর দাদা বিপ্রদাস বলিয়াছেন মোতির মাকে—

'আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, কুমুকে যিনি গড়েছেন তিনি আগাগোড়া পরম শ্রদ্ধা করে গড়েছেন। কুমুকে অবজ্ঞা করে এমন যোগ্যতা কারও নেই, চক্রবর্ত্তী সম্রাটেরও না।'

গর্ভিনী কুমু যেখানে স্বামীর ঘরে ফিরিয়া যাইতেছে সেখানে একটি অমূল্য-কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে। কুমু বলিয়াছে তাহার দাদাকে—

'এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্তেও খোওয়ানো যায় না।'

এই 'এমন কিছু' হইল মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। এই স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া কালে মানুষের গৌরবের আর কিছু থাকে না। জীবন হইয়া যায় একটা প্রহসন, বাঁচিয়া থাকাটা হয় একটা বিড়ম্বনা। অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে তাহার সার্থকতা। কুমু বলিতেছে তাহার দাদাকে—

'মিথ্যে হয়ে মিথ্যের মধ্যে থাকতে পারবে না। আমি ওদের বড় বৌ, তার কি কোন মানে আছে যদি আমি কুমু না হই?'

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে বলি দিয়া কুমু যদি শ্বশুরবাড়ীতে থাকিতে রাজী হইত, তবে সেই স্বীকৃতির দ্বারা সে আত্মঘাতিনী হইত।

রবীন্দ্রসাহিত্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের জয়ধ্বনি, স্বাধীনতার বন্দনা-গান। ব্রাউনিং সম্পর্কে চেষ্টার্টন লিখিয়াছেন:

The sense of absolute sanctity of human difference was the deepest of all his senses.

মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বাতন্ত্র্যের পবিত্রতাকে খুব ভালবাসতেন রবীন্দ্রনাথ। তাই বিপ্রদাসের মুখ দিয়া কুমুকে বলাইয়াছেন:

'কুমু, অপমান সহ্য করে যাওয়া শক্ত নয়, কিন্তু সহ্য করা অন্যায়।

মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর গভীর শ্রদ্ধা ছিল বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ নারীর অসম্মানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে কখনও দ্বিধা করেন নাই। তাই দেখি কুমু বলিতেছে অসুস্থ দাদা বিপ্রদাসকে:

'আমার ভয় হচ্ছে, আজকেকার এই সব কথাবার্ত্তায় তোমার শরীর আরও দুর্ব্বল হয়ে যাবে।'

'না কুমু, ঠিক তার উল্টো। এতদিন দুঃখের অবসাদে শরীরটা যেন এলিয়ে পড়ছিল। আজ যখন মন বলছে, জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত লড়াই করতে হবে, আমার শরীরের ভিতর থেকে শক্তি আসছে।'

'কিসের লড়াই দাদা?'

'যে সমাজ নারীকে তার মূল্য দিতে এত বেশী ফাঁকি দিয়েছে তার সঙ্গে লড়াই।'

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে সংগ্রামের আহ্বান। সাহিত্যের ভিতর দিয়ে তিনি দেশের মধ্যে আনিয়াছেন 'দল গড়া শাস্ত্র গড়া নির্ব্বিকার ক্ষমতা'র বিরুদ্ধে লড়াইয়ের হাওয়া। বিপ্রদাস এক জায়গায় বলিতেছে কুমুকে:

'মেয়েদের অপমানের দুঃখ আমার বুকের ভিতর জমা হয়ে আছে।'

ভালবাসার বন্ধন ছাড়া আর যে কোন বন্ধন মূল্যহীন। অন্তরে যদি ভালবাসার আলো নিভিয়া যায় পুরোহিতের মন্ত্রের কি দাম হইতে পারে? কুমুরও শ্বশুরবাড়ীতে কোন স্বাধীনতা নাই। যেখানে স্বাতন্ত্র্য নাই, সম্মান নাই, সেইখানেই তো নরক। বোনকে শ্বশুরবাড়ীতে পাঠাইতে তাই দাদার এত আপত্তি। বিপ্রদাস বলিতেছে কুমুকে—

'আজ যেখানে তোর স্বাতন্ত্র্য কেউ বুঝবে না, সম্মান করবে না, সেখানে যে তোর নরক। আমি কোন্ প্রাণে তোকে সেখানে নির্ব্বাসিত করবো?'

নারী কবির কাছে অবলামাত্র নহে, তাহার মধ্যে যে আত্মশক্তির অমিত সম্ভাবনা নিহিত হইয়া আছে, তাহার সম্বন্ধে সে অচেতন বলিয়াই সে অবলা হইয়া অবহেলিত ও নির্য্যাতিত হয়। তাই তো কবি সাধারণ মেয়েকে সম্বোধন করিয়া দুঃখ করিয়াছেন।

হায় রে সামান্য মেয়ে,
হায় রে বিধাতার শক্তির অপব্যয়!

তাই তিনি সকল নারীকে বিধাতার শক্তির অপব্যয় হইয়া না থাকিয়া 'সবলা' হইতে আহ্বান করিয়াছেন, নারী সেখানে দাবী করিয়াছে:

নারীকে আপন ভাগ্য-জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার—
হে বিধাতা।

বলিতেছে দীপ্তকণ্ঠে :

যাব না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী—
আমারে প্রেমের বীর্য্যে করো অশঙ্কিনী।
বীরহস্তে বরমাল্য লব একদিন—
…বিনম্র দীনতা—
সম্মানের যোগ্য নহে তার—
ফেলে দেব আচ্ছাদন দুর্বল লজ্জার।

'নির্ভয়' কবিতাটিতে 'মহুয়া'র একটি নূতন সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। সেইটিই 'মহুয়া'র নিজস্ব। কবি বলিতেছেন :

আমরা দু'জনা স্বর্গ-খেলনা
গড়িব না ধরণীতে,
মুগ্ধ ললিত অশ্রু গলিত গীতে।
পঞ্চশরের বেদনা-মাধুরী দিয়ে
বাসর-রাত্রি রচিব না মোরা, প্রিয়ে;
ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে—
ভিক্ষা না যেন যাচি।
কিছু নাহি ভয়, জানি নিশ্চয়, তুমি আছ, আমি আছি।

নারী শুধু বাক্‌বাদিনী বা বীণাবাদিনী সরস্বতী নহেন, তাঁহার বিদ্যা কেবলমাত্র মৈত্রী করুণার ব্রহ্ম-বিহারের মধ্যে পর্য্যাপ্ত নহে; তিনি আজ দেবসেনানী স্কন্দমাতার জননীরূপে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূতা হইয়াছেন।

নারীর প্রেম আর আজ শুধু ঘরের কোণায় বাঁধিয়া রাখে না, সে প্রেম বহির্জ্জগতের মধ্যে নায়ককে উন্মুক্ত করিয়া দেয়। পৃথিবীর যজ্ঞ-বেদিকায় যে দুঃখের হোম-শিখা জ্বলিতেছে, যে প্রাণের আহুতি চলিয়াছে তাহারই চতুর্দ্দিকে সে পুরুষের সঙ্গে সপ্তপদী গমনের সহযাত্রিনী।

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি
আমরা দুজনে চলতি হাওয়ার পন্থী।

পুরুষও এখানে স্বীকার করিয়াছে :

সেবাকক্ষে করি না আহ্বান
শুনাও তাহারি জয়গান
যে বীর্য্য বাহিরে ব্যর্থ, যে ঐশ্বর্য্য ফিরে অবাঞ্ছিত;
চাটুলুব্ধ জনতায় যে তপস্যা নির্ম্মম লাঞ্ছিত।

বলিতেছে :

হে নারী, হে আত্মার সঙ্গিনী,
অবসাদ হতে লহো জিনি—
লাঞ্ছিত কুণ্ঠিতা মিথ্যা যতই করুক সিংহনাদ
হে সতী সুন্দরী, আনো তাহার নিঃশব্দ প্রতিবাদ।

'মহুয়া'র মধ্যে দেখি কবি আধুনিক কবিদের ভাব-ধারায় কিছুটা প্রভাবিত হইয়াছেন। কবি এতদিন বলিয়া আসিয়াছেন—প্রেম চিরন্তন। তাহার মৃত্যু নাই—তাহার পরিবর্ত্তন নাই। বলিয়াছেন :

আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে—
অনাদি কালের হৃদয় উৎস হতে—

বলিয়াছেন :

তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি শতরূপে শতবার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।

কিন্তু 'মহুয়া'য় তিনি বলিতেছেন :

প্রেমেরে বাড়াতে গিয়ে মিশাব না ফাঁকি
সীমারে মানিয়া তার মর্য্যাদা রাখি—
যা পেয়েছি সেই মোর অক্ষয় ধন
যা পাইনি বড় সেই নয়।
চিত্ত ভরিয়া রবে ক্ষণিক মিলন
চিরবিচ্ছেদ করি জয়।

এই প্রথম কবি প্রেমের ক্ষণিকতাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তথাপি কবি-মন তাহাকে সম্পূর্ণ মানিয়া লইতে পারে নাই। তাই তিনি 'প্রেমের চলিয়া যাওয়াকে' স্বীকার করিলেও তাহার স্মৃতি যে অক্ষয়, সে কথাও বলিয়াছেন।

(ছবি ও গানের যুগ) এতদিন কবির নায়িকা তাহার প্রিয়তমকে জোর করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে চাহিয়াছে—সেখানে প্রেম থাকুক বা না থাকুক—সে প্রশ্ন নায়িকার মনে ওঠে নাই:

শুনেছি আমারে ভালোই লাগে না,
নাই বা লাগিল তোর।
কঠিন বাঁধনে চরণ বেড়িয়া
চিরকাল তোরে রব আঁকড়িয়া
লোহার শিকলডোর।
(রাহুর প্রেম, ছবি ও গান)

কিন্তু 'মহুয়া'য় কবির এই মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। 'দায়মোচন' কবিতাটিতে নারী তাহার প্রিয়তমাকে প্রেমের ঋণ হইতে মুক্তি দিতেছে।

মনে করাবো না আমি শপথ তোমার
আসা-যাওয়া দুদিকেই খোলা রবে দ্বার
যাবার সময় হলে যেয়ো সহজেই
আবার আসিতে হয় এসো।

সে তাহার প্রিয়তমকে তাহার সম্মুখের গতিপথ হইতে

রূপ হতে রূপান্তরে

শান্তির প্রহরী

ফটো : অমল সেনগুপ্ত

ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডঃ রাধাকৃষ্ণণ, নেহেরু প্রভৃতি দিল্লীর পালাম বিমানঘাঁটিতে আরব রাষ্ট্রাধিপ … যাচ্ছেন।

তুষারাচ্ছন্ন হিমালয় প্রদেশে পাহারারত ভারতীয় সৈন্য

টানিয়া আনিয়া তাহার প্রেমের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চায় না। অবাধগতির মধ্যে তাহাকে মুক্ত করিয়া দিয়া মুহূর্ত্তমিলনের সহজপ্রাপ্তির মহিমাকে হৃদয়ের মধ্যে অক্ষয় অমর করিয়া রাখিতে চাহিয়াছে।

চিরকাল রবে মোর প্রেমের কাঙাল
একথা বলিতে চাও বোলো।
এই ক্ষণটুকু হোক সেই চিরকাল—

নারী পুরুষকে ডাকিয়া বলিতেছে সে তাহার বন্ধন নয়, সে তাহার পথের সম্বল। দুর্গম নীরস নিষ্ঠুর আতিথ্যবিহীন পথে যখন পুরুষ চলিবে তখন ক্লান্তিহীন সঙ্গ দিয়া নিঃশঙ্ক অন্তরে শুশ্রূষার পূর্ণ শক্তি দিয়া সে তাহার সেবায় নিরত থাকিবে। সে সেবা এমন যে,—

শুকায় না রসবিন্দু প্রখর নির্দ্দয় সূর্য্যতেজে;
নীরস প্রস্তর তলে দৃঢ় বলে রেখে দেয় সে-যে
অক্ষয় সম্পদরাশি। সঙ্কটে উজ্জ্বল গতি তার
দুর্য্যোগে অপরাজিত, অবিচল বীর্য্যের আধার।

নারী কামের লালসাকে দুঃসহ ঘৃণায় বর্জ্জন করিয়াছে:

ক্ষণপ্রাণ দুর্ব্বলের স্পর্দ্ধা আমি কভু সহিব না।
লোলুপ সে লালায়িত, প্রেমেরে সে করে বিড়ম্বনা,
ক্লেদঘন চাটুবাক্যে বাষ্পে বিজড়িত দৃষ্টি তার,
কলুষ-কুণ্ঠিত অঙ্গে লিপ্ত করে গ্লানি লালসার,
আবেশ মন্থর কণ্ঠে গদগদ সে প্রার্থনা জানায়,

জীর্ণমজ্জা কাপুরুষে
নারী যদি গ্রাহ্য করে, লজ্জিত দেবতা তারে দূষে
অসহ্য সে অপমানে। নারী সে যে মহেন্দ্রের দান
এসেছে ধরিত্রীতলে পুরুষেরে সঁপিতে সম্মান।

আধুনিক কবি দুঃখ বেদনার দুঃসহ ব্যথায় জর্জ্জরিত। তাই সর্বস্থানেই তার যুদ্ধঘোষণা—প্রেমের লালিত্য তার নাই। তাদের সাক্ষাৎ সময়—

মোদের সাক্ষাৎ হোল অশ্লেষার রাক্ষসী বেলায়
সমুদ্ভত দৈব দুর্বিপাকে।

কবি এতদিন বলিয়াছেন প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন হইবে—

সেই স্নিগ্ধ ক্ষণে, সেই স্বচ্ছ সূর্য্যকরে—
পূর্ণতায় গম্ভীর অম্বরে—
মুক্তির শান্তির মাঝখানে
তাহারে দেখিব যারে চিত্ত চাহে,
চক্ষু নাহি জানে।

এখন কবি আধুনিক কবিদের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া বলিতেছেন:

দেখা হবে ক্ষুব্ধ সিন্ধুতীরে
তরঙ্গগর্জ্জনোচ্ছ্বাস মিলনের বিজয় ধ্বনিরে
দিগন্তের বক্ষে নিক্ষেপিবে।
মাথার গুণ্ঠন খুলি কব তারে, মর্ত্ত্যে বা ত্রিদিবে
একমাত্র তুমিই আমার।
সমুদ্র পাখির পক্ষে সেই ক্ষণে উঠিবে হুংকার
পশ্চিম পবন হানি,
সপ্তর্ষি আলোকে যবে যাবে তারা পন্থা অনুমানি।

মহুয়া কাব্যখানির মধ্যে কিংশুক, অশোক, বকুল ও মালতী-মল্লিকার রূপ ও গন্ধের লঘু আহ্বান নাই। অরণ্য সভায় বনস্পতিগোষ্ঠী মধ্যে শালতাল সপ্তপর্ণ অশ্বত্থের সহিত আকাশের দিকে শাখা বাড়াইয়া মহুয়া পুষ্পের সূর্য্যাভিনন্দনের গভীর বন্দনা চলিয়াছে! অপ্রসন্ন আকাশের ভ্রূভঙ্গে অবশ্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে, কালবৈশাখের রুদ্ধ কলরোলে যখন মুক্ত পথচারী বিহঙ্গম আর্ত্ত হইয়া উঠে, মহুয়া তখন তাহার শাখাব্যূহের মধ্যে তাহাকে আশ্রয় দেয়। অনাবৃষ্টির ক্লিষ্টদিনে বন্য-বুভুক্ষুরা তাহার তলায় দুর্ভিক্ষের ভিক্ষাঞ্জলি ভরিয়া নেয়। বহু দীর্ঘ সাধনায় সুদৃঢ় উন্নত তপস্বীর ন্যায় বিলাসের চাঞ্চল্য বিহীনতায় সুগম্ভীর হইয়া সে দাঁড়াইয়া আছে। অথচ তাহার অন্তরের মধ্যে অধীর বসন্তের ফাল্গুনীর পুষ্প দোলে তাহার পুষ্পপুট পূর্ণ করিয়া মদিরার রস উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে।

রবীন্দ্রনাথের মহুয়ার প্রেমের ভাবকল্পনার সহিত ইংরাজ কবি Browning-র প্রেমের ভাবকল্পনার কিছুটা সাদৃশ্য আছে। এই তেজোময়, বলিষ্ঠ, অচপল, তপঃসিদ্ধ প্রেমই ব্রাউনিংয়ের প্রেম।

জীবন অনন্ত ও অসীম। এই জীবনের পরাজয় ভবিষ্যৎ জয়ের সূচনা করিতেছে। মানবসত্তার অমরত্ব ও তাহার অনন্ত সম্ভাবনীয়তায় ব্রাউনিং রবীন্দ্রনাথের মত আশাবাদী। জীবনকে রবীন্দ্রনাথ আর্ট ও ধর্ম্মের উপরে স্থান দিয়াছেন। মর্ত্ত্যজীবনের উদ্দেশ্যই প্রেমের সাধনা। এই প্রেম দুই প্রকারের—ভগবৎ প্রেম ও মানব প্রেম। মানব প্রেমই জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ইহা মানুষ ও ভগবানের মিলনের হেতু। এই প্রেমসাধনার সুযোগ-লাভের জন্যেই তো জীবন।

For life, with all it yields of joy and woe
And hope and fear......
Is just our chance o' the prize of learning love
(A Death in the Desert)

প্রেমই এই মরুভূমির মত জীবনকে চিরবসন্ত সৌন্দর্য্যে

মণ্ডিত করে। জীবন ছিল হিম-শীতল অন্ধকারা। প্রিয়ার আগমনে সে রুদ্ধগৃহ আজ অপূর্ব বাসন্তী সুষমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

This life was as blank as that room
I left you pass in here......
Wide opens the entrance ; where's cold
Now where's gloom ?

প্রেম তাহার জীবনে এক অক্ষয় আশীর্ব্বাদস্বরূপ নামিয়া আসিয়াছে—তাহার আত্মার শক্তি ও সম্ভাবনীয়তা বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। তাহার ক্ষুদ্র জীবন পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

Asolando-র Summum-Bonum নামক কবিতাটিতে কবি প্রেমকে সংসারের সমস্ত বস্তুর মধ্যে সারবস্তু বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

Truth, that's brighter than gem
Trust, that's purer than pearls—
Brightest truth, and purest trust in the
Universe—all were for me
In the kiss of one girl.

প্রেম দেহমনকে কেন্দ্র করিয়া আবির্ভূত হইলেও ইহা অসীম ও অনন্ত। প্রেমের অনুভূতির মধ্যে একটা অতৃপ্তি ও চিরন্তন বেদনা আছে। মানুষের সসীম হৃদয় সেই অসীম অনুভূতিকে ধারণ করিতে পারে না, তাই নিরন্তর চাঞ্চল্য অনুভব করে। 'Two in the Campagna' কবিতাটিতে প্রেমিক-প্রেমিকার দেহমনের নিবিড় মিলনে তৃপ্তি পাইতেছে না। মিলন মুহূর্ত্তের আবেশ এক লহমায় কাটিয়া যাওয়ায় কি এক অপ্রাপ্ত বস্তুর সন্ধানে সে ব্যাকুল হইয়াছে। শুধু সে অনুভব করিতেছে—

Infinite passion, and the pain
Of finite hearts that yearns.

প্রেম যে কত অমিতবীর্য্যশালী মহিমাময় তাহার প্রমাণ আমরা পাই Evelyn Hope নামক কবিতাটিতে। প্রেমিকা জানিলও না যে প্রিয়তম ভালবাসিয়াছে। মৃত্যু আসিয়া তাহার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়া দিলো, কিন্তু প্রিয়তম জানে প্রেমের দাবীতেই সে তাহাকে পাইবে। এই প্রেম জড়দেহকে পোড়াইয়াদিয়া দিব্য-দেহে চিরদীপ্তিতে শোভা পাইতেছে। ইহাই 'নিকসিত হেম'। ইহা কোন মানসিক মোহ নয়—কোন ভাববিলাস নহে, ইহা দেহসাগর হইতে উত্থিত অমৃত।

Shakespeare, Burns, Lawrence ও বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেমের ন্যায় রবীন্দ্রনাথের প্রেম নয়, একমাত্র ব্রাউনিংয়ের কবিতার সহিত তাঁহার মিল আছে।

এ প্রেম দেহমনের উর্দ্ধস্তরের, ইহা প্রেমের অন্তর্নিহিতস্বরূপ, মানবজীবনে প্রেমের প্রভাব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা—প্রেমের জয়ঘোষণা, ইহা প্রেমের তত্ত্ব ও দর্শনের অপূর্ব্ব কাব্যরূপ। মহুয়ার প্রেম এই ধরনের॥

বাবার লাঠি

শ্রীসুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়

তোমার লাঠিটি বহে দেহভার
মনে হয় তুমি পাশে
লুব্ধ এ আঁখি বারেক তোমার
দরশ পাবার আশে ;

লাঠির মাঝেতে পাই সে পরশ
আজো আছ কাছে তুমি .
শিশুর মতই ধরে আছ হাত
স্নেহ ভরে শির চুমি।

বয়সের ধাপে উঠে যাই যত
মনে বার বার আসে
বড় কেহ নাই ছায়া দিতে আজ
তুমি নাই আজ পাশে :

কে করিবে স্নেহ অক্ষম দেহ
কে বুঝিবে মোর ব্যথা
মুখে না বলিতে কে বুঝিবে আর
না বলা মনের কথা।

তোমার পরশে পূত এই লাঠি
তব দক্ষিণ করে
থাকিত যে আজ তাহার মাঝেতে
তোমার আশিস ঝরে।

পূর্বরাগ

শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী

১

লক্ষ লক্ষ লোকের শহর কলকাতা। এত মানুষের পায়ের চাপে সমুদ্রের গ্রাস থেকে ছিনিয়ে আনা নরম মাটি যে ফেটে যায় না, ধ্বসে পড়ে না, এটাই আশ্চর্য। কিন্তু এতো লোকের মাঝখানে থেকেও যে নিঃসঙ্গ একাকীত্বের পরিমণ্ডল রচনা করে তার ভেতরে কেউ বাস করতে পারে তাও কম আশ্চর্যের নয়।

কিন্তু তাই করে চলেছে অলক আজ বিশ বছর ধরে। নারীসমাগম-মুখর রেডিও ষ্টেশন আর নারীবর্জিত গৃহকোণে, এ দু-এর বাইরে যে বিচিত্র রসের অফুরান মিছিল চলেছে তার দিকে তাকিয়েও দেখে না অলক। নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে নিরাসক্ত যোগীর মতো। সেই বিশ বছর আগে মনের যে দুয়ারটি বন্ধ করে দিয়েছে আজও সেই দুয়ার তেমনি ভাবেই বন্ধ আছে। কিঙ্কিণী সিঞ্চিত যে দুটি কোমল করাঘাতে এ দুয়ার খোলার কথা তা গেছে পৃথিবীর জনারণ্যে হারিয়ে।

কিন্তু স্মৃতির কুসুম মনের ভেতর গন্ধ বিলায় আজও। কস্তুরি মৃগের মতো সে গন্ধে যেন পাগল হয়ে যায় অলক। চেষ্টা করে বিস্মৃতির অন্ধকারে সবকিছু বিলীন করে দিতে। কিন্তু কোনোও ফল হয় না। হৃদয়ের পুরাতন ক্ষতগুলি রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। ঝর্ণার দীর্ঘ চোখের যে চকিত চাহনী বিদ্যুতের মতো তার মনের ভেতর জ্বলে উঠে তার হৃদয়কে আলোয় আলোময় করে তুলেছিল একদিন, অন্ত এক দুর্যোগময় দিনে সেই আলো নিভে গিয়ে তার হৃদয়কে চিররাত্রির অন্ধকারে ঢেকে দিয়েছে। আর সেই বিদ্যুতের দাহ তার মনের ভেতরে দগ্‌দগে তীব্র ক্ষত সৃষ্টি করেছে।

সেই দিনগুলির তীব্র অসহ্য সুখ আর অসহ দুঃখ এই দুই বিপরীতের মাঝখান দিয়ে অলকের মনের পেণ্ডুলামটি দোলে।

প্রৌঢ়ত্বের উন্মুক্ত তোরণ দেখা যাচ্ছে সুমুখে।

পেছন দিকে যৌবনের ধূধূ করা দিনগুলি ধূসরতায় ঢাকা। তার মাঝে একটি মাত্র শ্যামল পত্রগুচ্ছ—ঝর্ণার কাজল দুটি দীর্ঘায়ত চোখ, যে চোখের গভীরে ডুব দিয়ে অলক আবিষ্কার করেছিল নিজের প্রেমিক সত্তা, চৈতন্যের আলোকে সে উপলব্ধির প্রথম শিহরণ যেন আজও তার রোমাঞ্চিত দেহের প্রতি রোমকূপ দিয়ে অনুভব করে সে। এক অপরিজ্ঞাত তীব্র আনন্দে হাওয়া-লাগা বেতসপত্রের মতোই কাঁপতে থাকে, দুলতে থাকে তার মন। কালের স্রোতের উজান বেয়ে মন চলে যায় কোন সুদূরে।

শান্ত শহর, নিরিবিলি শহর ঢাকা। বুড়িগঙ্গার মতো বুড়িয়ে যায় নি কিন্তু তার অঙ্গের সজল স্নিগ্ধতাটুকু মেখে নিয়েছে নিজের সর্ব অঙ্গে। তার প্রশস্ত বুকের উদারতাটুকু ছড়িয়ে আছে সারা রমনা মাঠের আশ্চর্য সবুজ বিস্তারে।

নবাবপুর রোডের ওপর দোতলা বাড়ি। রাস্তার দিকের ছোট ঘরখানাতে বসে পড়া তৈরি করছিল অলক। কেমিষ্ট্রির বই খুলে এক মনে পড়ে যাচ্ছিল তার ডিষ্টিলেশন প্রোসেস। রাস্তার ওপারে লালুপালের ঠাকুরবাড়িতে সন্ধ্যারতির বাদ্যভাণ্ড এইমাত্র থেমে যাওয়াতে একটা তীক্ষ্ণ স্তব্ধতা ঘনিয়েছে ঘরের ভেতরে।

"আসেন দিদি—এই ঘরটা বেশ খোলামেলা আছে, এই ঘরে বসেন আইসা।"

মার গলা শুনে আর আপ্যায়নের ঘটা দেখে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল অলক। মার সঙ্গে একটি অপরিচিতা আধা বয়সী মহিলা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অলকের দিকে তাকিয়ে আছেন।

তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে।

"অরে চিনলেন না?" হাসির সঙ্গে বলতে থাকেন অলকের মা—"ও হইল অলক—আমার বড়ো পোলা।"

"ওমা এই নাকি অলক!" বিস্ময় প্রকাশ করে মহিলাটি বলেন, "কতটুকু দেখছিলাম—এখন কত বড় হইয়া গেছে।"

"খাড়াইয়া আছস্ ক্যান্ অলক? আয়, প্রণাম কর আইসা। তোর শুচি মাসিমারে প্রণাম কর—" অলকের মুখের দিকে তাকিয়ে অলকের মা সুনন্দা বলেন।

অলক এগিয়ে যায়, অপরিচিতা শুচি মাসিমার পায়ে হাত দেবার জন্ত নত হয়।

"থাউক, থাউক, আর প্রণাম করতে হইবো না।"

মাথা দিয়ে শুচি বলেন,—"বাঃ! দিব্যি গোলাখান তোর নন্দা—এখনো পড়ে বুঝি?"

খুশীর উজ্জল আলো পড়ে সুনন্দার মুখে, ঝল্‌মল্‌ করতে করতে তিনি বলেন, "বি-এস-সি পাশ কইরা এখন এম, এসসি পড়তাছে।"

পাশের ঘর থেকে কে যেন হাওয়ায় উড়তে উড়তে এসে শুচির পিঠ ঘেঁষে দাঁড়ায়। অলক লক্ষ্য করে, বড়ো বড়ো দুই চক্‌চকে চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে একটি বছর আঠারোর সুন্দরী মেয়ে।

চোখাচোখি হতেই অলকের ওপর থেকে দৃষ্টিটা সরিয়ে খোলা জানালার ফাঁক দিয়ে কালো আকাশের গায়ে ফুটে-ওঠা উজ্জল কয়েকটি তারার দিকে তাকায় সে মেয়েটি।

তার হাত ধরে তাকে সামনে টেনে আনেন শুচি, বলেন, "এই হইল আমার বড় মাইয়া ঝর্ণা, ইডেন কলেজে ভর্তি কইরা দিছি। কিন্তু পড়ায় একেবারে মন নাই, বই দেখলেই গায়ে জ্বর আসে।"

"আসে তো বেশ হয়," অলকের সামনে এ ভাবে অপদস্থ হয়ে কুপিত চোখে কটাক্ষ হেনে ঝর্ণা বলে, পরমুহূর্তে পাখা-মেলা পাখির মতো উধাও হয়ে যায়।

চুরি করে ঝর্ণার আরক্ত, রুষ্ট, অপ্রতিভ মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল অলক, তাকিয়ে দেখছিল, মার ওপর রাগ করে ছুটে চলে-যাওয়া ঝর্ণার উড়ন্ত বেণী, কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে সে। ঝর্ণার ঐ বেশ কথাটির রেশ অনেকক্ষণ ধরে সুরের ঝঙ্কার তুলতে থাকে তার মনে।

"পাগলি মাইয়া," হেসে স্নেহ ও প্রশ্রয়ের সুরে শুচি বলেন, "চল দেখি নন্দা, কোন্‌ দিকে গেল, খুইজ্জা দেখি গিয়া।"

সবাই চলে যেতে ফাঁকা ঘরের মাঝখানে খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অলক, তার পর আস্তে আস্তে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসে।

খোলা বইয়ের পাতায় চোখ দুটো নিবদ্ধ থাকলেও এলোমেলো মনে পড়া এগোয় না। একটা হঠাৎ-আসা হাওয়া যেন তার মনকে নাড়া দিয়ে গেছে—স্থির হতে চায় না চঞ্চল মন।

ভেতরে বসবার ঘরে তখন চা-এর টেবিলটা ঘিরে বসে ঝর্ণা, শুচি ও সুনন্দা নানা কথায় মুখর হয়ে উঠেছেন, মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসিত হাসির ধাক্কায় ঘরের বাতাস কাঁপতে থাকে।

উঠে ওদের সঙ্গে যোগ দেবার হাজার ইচ্ছে থাকলেও উঠতে পারে না লাজুক ছেলে অলক। খোলা বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুলে রাস্তার ওপারের রামধন পসারীর আদি পাঁচনের দোকানের বিরাট সাইন বোর্ডটার দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকে।

ঘণ্টাখানেক পরে ওদের যাবার জন্য পাল্কী-গাড়ী ডেকে আনে অলক। গাড়ির গরম গদীতে বসে জানালা দিয়ে অলকের মুখে এবার তাকায় ঝর্ণা, ঠোঁট দুটি অল্প হাসির আভাসে কেঁপে ওঠে।

জিজ্ঞাসা করি করি করেও মাকে কোনো প্রশ্ন করতে পারে না অলক। রাত্রে বাবার সঙ্গে খেতে বসে আগন্তুকদের পরিচয় পায় সে।

ইলিশ মাছের ঝোলের বাটিটা এগিয়ে দিয়ে হাসিমুখে সুনন্দা বলেন, "আইজ কে আইছিল বেড়াইতে, কও তো?"

"দেখি নাই যখন তখন কেমনে কমু কও?" দাঁতের ফাঁকে আটকে ধরা ইলিশ মাছের সরু কাঁটা বার করতে করতে অলকের বাবা শ্যামল বলেন।

"শুচিদি আর তার মাইয়া ঝর্ণা—" রহস্যময় সুরে বলেন সুনন্দা।

"তাই নাকি?" খুশীর ছোঁয়া লাগে শ্যামলের কথায়, "আমি না আসা পর্যন্ত ধইরা রাখতে পারলা না?"

"সময় থাকতে তুমিই যারে ধইরা রাখতে পারলা না, তারে আমি কেমনে আটকামু কও?" যেন অলকের উপস্থিতির কথা ভুলে গিয়েই প্রগলভ সুরে বলে ওঠেন সুনন্দা।

আড়চোখে অলকের নত মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে যান শ্যামল। ভুল বুঝতে পেরে চুপ করে থাকেন সুনন্দা।

আর কোনো কথা হয় না। নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করে আঁচাবার জন্য উঠে যান শ্যামল। তাঁর পাতে নিজের ভাত বেড়ে নেন সুনন্দা।

অপরিচয়ের রহস্যময় কালো পর্দার রং অনেকটা ফিকে হয়ে আসে অলকের কাছে।

২

ঝর্ণার বাবা প্রবীর সেন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, হালে বদলী হয়ে এসেছেন ঢাকায়। বাসা করেছেন কায়েৎ-টুলিতে। বাইশ বছর পরে ঢাকায় এসে প্রথম ক'দিন সারা শহর চষে বেড়ালেন শুচি। জানা, চেনা ও আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে মর্চে-পড়া পরিচয় নতুন করে ঝালিয়ে নিলেন। দু'দিন এলেন অলকদের বাড়ী বেড়াতে।

এর পর মার ক্রমাগত তাগাদার হাত থেকে বাঁচবার

আর কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে মাকে নিয়ে ঝর্ণাদের বাসায় যেতেই হয় অলককে।

দরজা খুলেই সুমুখে সুনন্দাকে দেখে খুশীর আলো ছড়িয়ে পড়ে শুচির সারা মুখে, বলেন, "একলা যে? তোর কর্তা কই?"

"কর্তার আশায় বইসা থাকলে তো আর আসা হয় না, তাই কর্তা ছাড়াই আইলাম দিদি—" ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে সুনন্দা বলেন।

"ও, শ্যামলদার বুঝি পায়া ভারী হইছে—গরীবের বুইন্‌রা আসতে চায় না এইখানে—" ভারী হয়ে ওঠে শুচির কণ্ঠস্বর।

তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করেন সুনন্দা, "না না দিদি, সেই কথা না। আসলে সময়ই পান না মোটে—একা মানুষ, ব্যবসার সমস্ত কাজকর্ম নিজেরই দেখন লাগে—নাইলে আপনের লগে দেখা করনের খুব ইচ্ছা তাঁর—।"

মুখ অন্ধকার করে শুচি বলেন, "তুই আর তারে কতটুকু চেনস্ নন্দা—এতটুকু বয়েস থেইকাই চিনি আমি শ্যামলদারে—আমি জানি, শ্যামলদা কোনো দিন পাও দিব না এই বাড়ীতে। যাউক গিয়া সে সব পুরাণ কথা—আর উপুরের ঘরে বসি গিয়া—ওমা, এ কি, অলক দেখি দূরে রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইয়া আছে?"

"দেখেন দিদি, দেখেন—পুরুষমানুষের কি এত লাজুক হওয়া ভাল?—" বলতে বলতে হাতছানি দিয়ে অলককে আসতে ইঙ্গিত করেন সুনন্দা।

তিন জনে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে যান।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই হারমোনিয়ামের আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল অলক। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে ঝর্ণার গলা-সাধা শুনতে পায়।

"বাঃ, কি সুন্দর মিষ্টি গলা—" কে গাইতাছে দিদি? ঝর্ণা, না? মুগ্ধস্বরে বলে উঠেন সুনন্দা।

"হ, ঝর্ণাই—" সিঁড়ি-ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর একটু দম নিয়ে শুচি বলেন, "গান গান কইরা একেবারে পাগল আমার মাইয়া। আইচ্ছা, তোর জানাশোনার মইধ্যে ভালো গানের মাষ্টার আছে?"

সুনন্দা একবার অলকের নিবিষ্ট নতমুখের দিকে তাকান, তার পর ফিস্ ফিস্ করে শুচির কানের কাছে বলেন, "শিখাইতে চাইলে তো অলকই শিখাইতে পারে কত গান, তবে রাজি হইব কি না কইতে পারি না। মাইয়ালোকের কাছে অর বড় লজ্জা—"

"ওমা, তাই নাকি?" খাটো গলায় শুচি বলেন, "রাখ, ঝর্ণারে লুলাইয়া দেই গিয়া। মজা দেখিস্ তার পরে—"

সুনন্দা ও শুচি পাশের ঘরে বসে গল্প করছেন। এ ঘরে একা বসে আছে অলক। রাস্তার দিকের খোলা জানালা দিয়ে রাস্তার ওপারের রেল লাইন দেখা যায়, তার ওপারে বহু দূর বিস্তৃত ঘন সবুজপ্রান্তর। একটা গাছের ডালে ছুটো বাঁদর বাচ্চা লম্ফ-ঝম্ফ করছে আর মুখ দিয়ে কিচ্‌কিচ্ শব্দ করছে। তন্ময় হয়ে তাই দেখছিল অলক।

পেছনে খুক্ খুক্ হাসির শব্দ শুনে চমকে ঘাড় ফেরায় অলক। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মুখে আঁচল গুঁজে হাসি চাপবার চেষ্টা করছে ঝর্ণা, অলক মুখ ফেরাতেই বলে ওঠে, "কি শুনতাছেন—বান্দর-সঙ্গীত?"

হাসির আভায় রাঙা ঝর্ণার মুখ আর তার কৌতুকোজ্জ্বল চোখের দীপ্তি দেখে চোখ নামিয়ে নেয় অলক। কি বলবে ভেবে পায় না।

এগিয়ে এসে পাশের চেয়ারটা টেনে নিয়ে অল্প ব্যবধানে বসে পড়ে ঝর্ণা, তার পর ভনিতা ছেড়ে সোজা-সুজি বলে ওঠে, "মাসিমার কাছে শুনলাম যে ভালো গান জানেন আপনে?"

"কে কইছে, মা?" মৃদুস্বরে অলক বলে।

"হ—"

অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে অলক বলে, "ভাল কি না কইতে পারি না, তবে চর্চা আছে অল্প-স্বল্প—"

আনন্দে ঝর্ণার ছু' চোখের তারা নাচতে থাকে, বলে, "ভীষণ সখ আমার গান শেখার, আগে যেটুকু শিখছিলাম তাও ভুইলা যাইতে বইছি এইখানে গান শিখানের লোক না পাইয়া, বাবা আবার যার-তার কাছে গান শেখা পছন্দও করে না। আপনে আমারে শেখান না অলকদা—"

ঝর্ণার কথার সুরের গভীরতা, একটু বা আবদার আবদার ভাব অলকের মনকে স্পর্শ করে, তার গভীর চোখের সরল-সোজা চাউনি মুগ্ধ করে তাকে, কিন্তু তবু সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হতে পারে না সে।

একটু অপেক্ষা করে হাত নেড়ে মাথা ছুলিয়ে ঝর্ণা বলে, "কই জবাব দিলেন না যে বড়—"

একটু ইতস্ততঃ করে অলক বলে, "দেখেন সঙ্গীত হইল অনেক সাধনার জিনিস, লঘু চাপল্যে তারে পাওয়া যায় না, অনুশীলনের ধৈর্য চাই, মনোযোগ চাই—"

একটা রক্তাভা দেখা দিয়েই চকিতে মিলিয়ে যায়

ঝর্ণার মুখ থেকে—একটু কঠিন সুরে বলে, "কেমনে বুঝলেন যে, আমার মইধ্যে অনুশীলনের ধৈর্য বা মনোযোগ নাই? ও, সেদিনের মায়ের কথা শুইনা—"

ভারিক্কিচালে কথা বলতে গিয়ে অপ্রস্তুত হয়ে যায় অলক। এখন সংশোধনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে বলে, "না না, তা না, কথাটা আমি সাধারণ ভাবেই কইছি। মানে আইজ-কাইল অনেকেই ভাবে কি না যে দুই দিন সারে-গামা করলেই বুঝি গান শেখা হইয়া যায়, কিম্বা গ্রামোফোনের রেকর্ড থেইকা দুই-তিনটা গান কপি কইরা বন্ধু-বান্ধবের বাহবা শুইনাই ভাবে যে আমি কি হনু রে, কিন্তু যারাই একটু-আধটু ভাল ভাবে চর্চা করছে তারাই জানে যে কতখানি ধৈর্য আর কত অখণ্ড মনোযোগ আর অবসর লাগে গান শিখতে গেলে—" প্রিয় প্রসঙ্গ পেয়ে উৎসাহের সঙ্গে বলতে থাকে অলক।

তার উদ্ভাসিত মুখের দিকে চুপ করে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কি যেন ভাবে ঝর্ণা।

অনেকক্ষণ একটানা কথা বলার পর লজ্জা পেয়ে থেমে যায় অলক। তখন আস্তে আস্তে ঝর্ণা বলে, "বেশ তো পরীক্ষা কইরা দেখেন না অলকদা, ধোপে টিকি কি না। তার আগে আমার প্রাক্তন অনুশীলনের পরিচয়টা নেন—" হাসি মুখে চেয়ার ছেড়ে উঠে যায় ঝর্ণা।

আসর বসে বড় ঘরটাতে। তানপুরায় সুর বেঁধে হাঁটু মুড়ে শতরঞ্চির মাঝখানে বসে ঝর্ণা। পাশে বসে তবলায় ঠুক-ঠাক আওয়াজ করে অলক। এক কোণে বসেন শুচি ও সুনন্দা, ঝর্ণার ছোট দু' ভাই-বোন।

তবলার সুর বাঁধা শেষ হতেই কেদারায় আলাপ সুরু করে ঝর্ণা। রিণ-রিণে মিষ্ট গলায় কেদারার প্রসন্ন গম্ভীর রূপ পরতে পরতে খুলতে থাকে। বড় ভালো লেগে যায় অলকের।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়। ঝর্ণার গান শেষ হলে নিজে কয়েকটি গান গেয়ে শোনায় অলক। প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন শুচি। ঝর্ণা তাতে মুখর হয়ে যোগ দেয় না বটে, কিন্তু তার উজ্জ্বল চোখ দু'টির দিকে একবার তাকিয়েই তার মনের কথাটি বুঝে নেয় অলক।

পরিপূর্ণ চিত্তে মাকে নিয়ে বাড়ী ফেরে সে।

যে লজ্জার বর্ম তার মনকে অহরহ ঢেকে রাখতো সেটা যেন অনেকখানি পাতলা হয়ে যায়।

৩

গান শোনা আর শোনানো,—এর মধ্যে যে এত সুখ, এত তৃপ্তি লুকিয়ে থাকতে পারে তা আগে কল্পনাও করতে পারে নি অলক। প্রায় দিনই সন্ধ্যার দিকে ইয়ুনিভার্সিটি থেকে ফেরবার পথে ঝর্ণাদের বাড়ি যায়। গান শেখানোর ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্য ও রাজনীতির তর্কও চলে মাঝে মাঝে। ঝর্ণাধারার মতোই উচ্ছল কলস্বরে কত কথা বলে যায় ঝর্ণা; কান পেতে তাই শোনে অলক। সোম ফাঁক না-ই থাক, সুর আছে ঝর্ণার প্রতি কথায়। বিশেষ এক জনের কথা শোনার মধ্যেও কতোই না আনন্দ লুকিয়ে আছে। কথা শুনতে শুনতে ঝর্ণার ঠোঁট, মুখ, মাথা-নাড়া, চোখের বিচিত্র চাউনি, হাত ঘুরাবার ভঙ্গী দেখতে দেখতে দম বন্ধ হয়ে আসে অলকের, কান গরম হয়ে যায়। বুকের ভিতরটা গুরুগুরু করে ওঠে। কি একটা গভীর পিপাসায় ছটফট করতে থাকে তার মন। যৌবনের ছন্দ কি অপরূপ মায়াই না রচনা করেছে ঝর্ণার দেহে। কাঁচা সোনার রং যেন ভেতর থেকে ফুটে বেরুচ্ছে। সুনির্বাচিত শাড়ীটি যেন রহস্য-নিকেতনের দ্বারে কারুকার্যখচিত পর্দার মতো আন্দোলিত হচ্ছে।

অলকের চোখের মুগ্ধ দৃষ্টি লক্ষ্য করে কথার মাঝখানে হঠাৎ থেমে যায় ঝর্ণা। লজ্জা পেয়ে মুখ নিচু করে অলক, আর সেই স্পন্দিত স্তব্ধতা দু'জনার বুকেই আঘাত হানতে থাকে।

চা-এর পেয়ালা হাতে শুচি এসে ঘরে ঢোকেন, বলেন, "বাপরে বাপ, কি বকতেই পারস তুই ঝর্ণা। বেচারা অলক আসে তোরে গান শিখাইতে, আইসা তোর লেকচারের ঠ্যালায় পালাই পালাই ডাক ছাড়ে—"

"না মাসিমা—" মৃদুকণ্ঠে প্রতিবাদ করে অলক,—"গানের মেজাজ তো সব দিন থাকে না, তাই একটু-আধটু অন্য কথাবার্তা কয় ঝর্ণা, অন্য পাঁচরকম আলোচনা করি আমরা—"

"আইচ্ছা আইচ্ছা—কর আলোচনা যত খুশী তোমরা আগে চা খাইয়া লও—" বলে চা ও খাবারের প্লেট অলকের সুমুখে নামিয়ে দেন তিনি।

কিন্তু শুচির প্রশ্রয় থাকলে কি হবে, শুচির স্বামী প্রবীর সেন যেন একেবারে পাক্কা সাহেব। তিনি ধুতি-পরা উস্কো-খুস্কো চুল অলককে প্রথম দিন থেকেই সুনজরে দেখেন নি। বি-সি-এস্ থেকে আই-সি-এস্-এ প্রমোশন পাবার জন্য ইদানীং পুরোপুরি সাহেবিয়ানায় দীক্ষিত হয়েছেন তিনি, মেলা-মেশা করছিলেন সহরের হোমরা-চোমরা চাঁইদের সঙ্গে। তাঁর বাড়িতে অলকের রক্তো

কাছা-খোলা ছেলেকে, যার রক্ত যথেষ্ট পরিমাণে নীল নয়, যার কাঞ্চন কৌলিন্যও নেই, কিছুতেই বরদাস্ত করতেন না যদি ঝর্ণাকে গান শেখানো বাবদ মাসে ত্রিশটি মুদ্রার সঞ্চয় সম্ভাবনা না থাকতো। তার কুঞ্চিত ভ্রূ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সমুখে পড়ে অলকও কেমন যেন কুঁকড়ে যেত, কাঁচুমাচু হয়ে যেত। দাঁত দিয়ে পাইপটা চেপে ধরে সেন সাহেব অস্পষ্ট স্বরে বলে উঠতেন, "ইমবেসাইল—"

কচিৎ কখনো, যেদিন সেন সাহেব কোনো পার্টিতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতেন, ওরা দু'জন বেরিয়ে পড়তো মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতে। দু'ধারে সবুজ মাঠের বুক চিরে ঋজু সরল পীচ বাঁধানো পথের শেষ দেখা যায় না। তারই বাঁ পাশ ঘেঁষে রাধাচূড়া ও কৃষ্ণচূড়ার ফুল-বিছানো তলা দিয়ে ধীরে ধীরে পাশাপাশি হাঁটতো ওরা দু'জনে। নীল আকাশের গায়ে এখানে-ওখানে থমকে-থামা সাদা মেঘের টুকরোগুলো আস্তে আস্তে কালো হয়ে আসতো, কালো হয়ে আসতো ঘাস ও গাছের দীর্ঘ সারি। একটি-দুটি তারা ফুটে উঠতো আকাশে। তখন অলক ও ঝর্ণা ঘোড়দৌড়ের মাঠের একপাশে বসে চারিদিকের নিঃসীম নির্জনতার স্বাদ উপভোগ করত। হঠাৎ এক সময়ে পরিপূর্ণ চিত্তে মৃদুকণ্ঠে গান গেয়ে উঠতো অলক :

"আমার না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে
তোমার ভাবনা তারার মতন রাজে॥
নিভৃত মনের বনের ছায়াটি ঘিরে
না দেখা ফুলের গোপন গন্ধ ফিরে,
লুকায় বেদনা অঝরা অশ্রুনীরে—
অশ্রুত বাঁশী হৃদয় গহনে বাজে॥"

নিমেষহীন চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতো ঝর্ণা। অদূরের ল্যাম্পপোষ্টের বাতির আলো পড়ে তার চোখের গভীর কালো তারা দুটি যেন চারদিকের অন্ধকার অতল রাত্রির মতোই গহন গভীর, রহস্যময় হয়ে উঠতো। সেদিকে তাকিয়ে গানের কথা হারিয়ে ফেলত অলক।

মৃদুস্বরে ঝর্ণা বলতো, "থামলা ক্যান, গাও। ভারি মিষ্টি গানটা। যেমন কথা তেমনি সুর—"

একটা গভীর দুরন্ত আবেগ তরঙ্গিত হয়ে উঠতো অলকের মনে, প্রাণপণে তাকে চাপা দিয়ে আবার গান ধরতো :

"খনে খনে আমি না জেনে করেছি দান
তোমায় আমার গান।
পরাণের সাজি সাজাই খেলার ফুলে,
জানি না কখন নিজে বেছে লও তুলে—
অলখ আলোকে নীরবে দুয়ার খুলে
প্রাণের পরশ দিয়ে যাও মোর কাজে॥"

গানের কথা শেষ হয়ে গেলে অনেকক্ষণ বিহ্বলের মতো বসে থাকতো ওরা দু'জন। এ গানের গভীর বাণী ধূপের গন্ধের মতো হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে প্রাণ-মন অভিভূত করে রাখে।

সুরের স্পর্শ যেন ঐন্দ্রজালিকের যাদুদণ্ডের স্পর্শ, প্রাণের গভীরতম সত্তাকে উদ্ঘাটিত করে দেয় এক নিমেষে।

বাণীর অতীতে থাকে যে বোধ, তারই মাধ্যমে একের মনের কথাটি অপরের মনে সঞ্চারিত হয়ে যায়। কোলের ওপর পড়ে-থাকা ঝর্ণার ডান হাতটি নিজের হাতে তুলে নেয় অলক। ঝর্ণার দীর্ঘায়ত চোখ দুটি অলকের চোখের ভেতর কি যেন খোঁজে।

একটু পরে উঠে পড়ে দু'জনে। হাত ধরাধরি করে রমনার নির্জন পথ দিয়ে হাঁটতে থাকে সহরের দিকে।

৪

নিজের পড়া আর ঝর্ণার ভালোবাসার ভেতর এতই মগ্ন ছিল অলক যে, ইদানীং শ্যামলের ভাব পরিবর্তন একবারও চোখে পড়ে নি তার। সদা প্রফুল্ল শ্যামল অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে গেছেন, কোন এক গভীর চিন্তায় সব সময়েই নিমগ্ন থাকেন। দোকান থেকে বাড়ি আসেন অনেক রাত্রে, চুপি চুপি, চোরের মতো পা টিপে টিপে। কথা বলেন কম।

ভয় পেয়ে সুনন্দা কাছে এসে প্রশ্ন করেন, "কি হইছে তোমার ?"

রুক্ষস্বরে জবাব দেন শ্যামল, "হইবো আবার কি? কিছুই না!"

সুনন্দা যদি তেমন অনুসন্ধিৎসু হতেন তবে শ্যামলের মানসিক বিপর্যয়ের কারণটি ঠিকই বার করতে পারতেন। কিন্তু তখন তিনি এর ওপর মোটেই গুরুত্ব আরোপ করলেন না। ভাবলেন, পুরুষের মন, অমন হয় মাঝে মাঝে। দু'দিন পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।

আশ্বিনের ভোর, শেষরাতে অল্প বৃষ্টি হয়েছে, স্নিগ্ধ প্রকৃতির প্রসন্নতার ছোঁয়া মানুষের মনেও লেগেছে।

সকাল আটটা বেজে গেলেও শ্যামল বিছানায় শুয়ে আছেন দেখে কাজের ফাঁকে সুনন্দা এসে জিজ্ঞাসা করেন, "কি, এখনো শুইয়া আছ যে? দোকানে যাইবা না?"

চোখ মেলে স্থির দৃষ্টিতে সুনন্দার মুখে তাকিয়ে

থাকেন শ্যামল, নিদ্রাহীন চোখ দুটি জবাফুলের মতো লাল। একটা নিঃশ্বাস ফেলে গভীর স্বরে বলে ওঠেন, "আর দোকান—"

কি একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় বুকটা ছাঁৎ করে ওঠে সুনন্দার, দ্রুতপদে কাছে এসে শ্যামলের কপালে হাত রাখেন। বলেন, "নাঃ, জ্বর না, তবে কপালটা একটু গরম লাগতাছে—"

হাত বাড়িয়ে কপালের ওপর-রাখা সুনন্দার ঠাণ্ডা হাতটা চেপে ধরে শ্যামল বলেন, "ভালো কইরা চাইপা ধইরা থাক কপালটা, এখনও যদি কিছু বাঁচান যায়—"

দিশেহারা হয়ে সুনন্দা প্রশ্ন করেন, "কি বকতাছ তুমি পাগলের মতো?"

"পাগল? না, পাগল হই নাই এখনো, তবে হইতে বড় বেশী বাকিও নাই—"

"বাজে কথা রাখ, খুইলা কও কি হইছে—" আশঙ্কায় পরিপূর্ণ চিত্তে অস্থিরকণ্ঠে সুনন্দা বলেন।

শ্যামলের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি শান্ত হয়ে আসে, আস্তে আস্তে খুলে বলেন তাঁর বিপর্যয়ের ছোট্ট কাহিনী।

সব কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে যান সুনন্দা।

শ্যামলের চালু কারবারটি তাঁর কয়েকজন কর্মচারীর অসাধুতার জন্য হঠাৎ ফেল পড়েছে। বাজারে অনেক দেনা তাঁর। কিছুদিন ধরে সামলাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন শ্যামল। পাওনাদাররা নালিশ ঠুকে দিয়েছে কোর্টে।

"তোমরা উতলা হইয়া পড়বা বইলা কোনো কথা কই নাই এতদিন—" উদাস স্বরে শ্যামল বলেন, "ভাবছিলাম যে,সামলাইয়া নিতে পারুম, কিন্তু এখন আর কোনো আশাই নাই—" শেষের দিকে করুণ হয়ে ওঠে তাঁর কণ্ঠস্বর।

কি বলবেন ভেবে পান না সুনন্দা। খেয়ে-পরে মোটা-মুটিরকমে চলে যাচ্ছিল তাঁদের। আজ হঠাৎ দুর্দিনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দিশেহারা হয়ে যান তিনি।

কিন্তু সত্যকারের বিপদের চেহারাটি তখনো দেখেন নি তিনি। দেখলেন কয়েকদিন পরে।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই দেখতে পেলেন বসবার ঘরের কড়িকাঠের সঙ্গে দড়ি বেঁধে সেই দড়ির ফাঁস গলায় পরে শূন্যে ঝুলছেন শ্যামল।

পাড়ার সবাই এসে জোটে। ধরাধরি করে শ্যামলের বিগতপ্রাণ দেহ নিচে নামায়। কেউ ছোটে কোতোয়ালী থানায় পুলিসে খবর দিতে।

ওপরের ঘরে মেঝের ওপর গড়াগড়ি দিতে থাকেন সুনন্দা, শোকের ভারে হৃদয়টা বুঝি ছিঁড়ে পড়তে চায়। পড়ার ঘরের কোণে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে চুপ করে বসে থাকে শুকনো মুখ, রুক্ষ কেশ অলক।

একটি রাত্রির ভেতরেই কি করে যেন ওলট-পালট হয়ে যায় সবকিছু।

ঠিক সে সময়ে ঘরে ঢোকেন শুচি ও ঝর্ণা। তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে এগিয়ে এসে সুনন্দাকে জাপটিয়ে ধরেন শুচি। তার কোলে মাথা গুঁজে নিঃশব্দে কাঁদতে থাকেন সুনন্দা। শুচির চোখ দুটোও শুকনো থাকে না।

আস্তে আস্তে অলকের পাশে এসে বসে ঝর্ণা। সদ্য পিতৃহারাকে কী বলবে, কোন্ সান্ত্বনার বাণী শোনাবে ঠিক করতে না পেরে নিঃশব্দে চেয়ে থাকে।

"বল হরি হরিবোল"—নিচ থেকে ভেসে আসে শেষ-যাত্রার কঠিন সঙ্গীত। শিউরে উঠে দু'হাতে মুখ ঢাকে অলক।

পায়ের শব্দ শোনা যায়। অলকের পিসতুতো ভাই বসন্ত এসে দাঁড়ায়, বলে—"আর তো তোর বইসা থাকলে চলব না—অলক—চল এখন—"

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল অলক। মাথা নিচু করে বসন্তর পেছনে পেছনে নিচে নেমে যায়।

ব্যথা-ভরা চোখ দুটি মেলে তার যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে থাকে ঝর্ণা।

আশ্বিনের সোনাঝরা দিনগুলি শেষ হয়ে যায়, আকাশ থেকে নেমে আসে হৈমন্তিক কুয়াশা। ঝাপ্‌সা দেখায় চারদিক।

পিতৃঋণ শোধ করতে অলকের পৈতৃক বাড়িটা বিকিয়ে যায়। মার হাত ধরে গেণ্ডারিয়ার ওধারে সস্তায় বাসা ভাড়া করে অলক। পড়া ছেড়ে দেয়। সংসারের চাকাটি সচল রাখবার জন্য গানের টিউশানি করে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে।

নিরবচ্ছিন্ন কাজের চাপে হৃদয়ের সূক্ষ্ম সুকুমার বৃত্তিগুলি চাপা পড়ে যায়, অনুভূতির তীক্ষ্ণতা যায় কমে। একটু নিঃসঙ্গ চিন্তারও অবকাশ পায় না অলক। এত দিন যেন তীরে বসে সমুদ্রের ঢেউয়ের সৌন্দর্য্য দেখছিল সে, এখন সমুদ্রের ভেতরে পড়ে হাবুডুবু খেতে খেতে, তলিয়ে যেতে যেতে শুধু লবণাক্ত বিস্বাদটাই বড়ো হয়ে ওঠে তার কাছে।

তবু কখনো কখনো আশ্চর্য্য ইসারার মতো ঝর্ণার

কথা মনে ভেসে আসে। পথ চলতে চলতে কোন মেয়ের সাড়ির আঁচলটি দেখে কিংবা অন্য কারুর কবরীবন্ধ লক্ষ্য করে মনে ভাবে যে, ঝর্ণাই বুঝি হেঁটে যাচ্ছে। বুকের ভেতরটা দুলে ওঠে, প্রত্যাশার আলো জ্বলে দু'চোখে। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখে, না। ঝর্ণা নয়, তারই বয়সী অন্য কোনো মেয়ে।

ঝর্ণার সঙ্গে একবার দেখা করবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগে তার মনে, বহু কষ্টে সে ইচ্ছা দমন করে অলক। সে জানে যে, এখন ঝর্ণার সঙ্গে দেখা করলে মনের জ্বালা শুধু বাড়বেই। তার চেয়ে দূরে থাকাই ভালো। নির্বোধ নয় সে। সে জানে যে কায়েৎটুলির বাসা থেকে গেণ্ডারিয়ার বাসা যত না দূর, তার ও ঝর্ণার মাঝখানের ব্যবধান তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী।

ছ' মাস কেটে যায়। নববসন্তের উতল হাওয়ায় পাতায় পাতায় মৃদু মর্মর জাগে। এমন সময়ে এলো ঝর্ণার চিঠি—ঝর্ণার প্রথম চিঠি।

স্পন্দিত বুকে ঝর্ণার চিঠি পড়ে অলক, ঝর্ণা লিখেছে :

অলকদা,

অনেক দিন তোমার পথ চেয়ে বসে ছিলাম। একবার এলে কী এমন ক্ষতি হ'ত তোমার? বহু কষ্টে তোমার ঠিকানা যোগাড় করে আজ চিঠি দিচ্ছি।

তুমি আমাকে ভুলতে চাও তা জানি। তবু একটি বার দেখা দিলে তোমার ব্রতভঙ্গ হবে না। আমরা শিগ্‌গিরই ঢাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। বাবা জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে বদলী হয়েছেন চব্বিশ পরগণায়। আর হয় তো কোনো দিন দেখা হবে না। একটিবার এসো।

ইতি—

তোমার ঝর্ণা—

"তোমার ঝর্ণা"। অনেকক্ষণ ধরে জলজলে অক্ষরগুলির দিকে তাকিয়ে থাকে অলক। এ কী করল ঝর্ণা! যে আগুন প্রায় নিভে এসেছে তাকে আবার কেন জ্বালতে চায় সে।

চিঠির তারিখটা দেখে অলক। ডাক বিভাগের কৃপায় ও-পাড়া থেকে এ-পাড়ায় চিঠিটা আসতে সময় লেগেছে মাত্র সাত দিন।

সন্ধ্যায় ছাত্রের বাড়ি না গিয়ে গেণ্ডারিয়া ষ্টেশনে গিয়ে টিকিট কিনে ঢাকা গেল অলক। ষ্টেশনে নেমে দোলা-লাগা বুকে বহুপরিচিত হলদে রঙের বাড়িটার দিকে এগিয়ে যায়।

সদর দরজায় প্রকাণ্ড তালা ঝুলছে। তালাটার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে বিমূঢ় অলক।

দূর থেকে অলককে দেখে মুদীর দোকানের ছোকরাটা কাছে এসে বলে, "সেন সাহেব তো বদলী হইয়া গেছেন এইখান থেইকা। এই তো তিন দিন আগে চইলা গেলেন সবাইরে নিয়া—"

একফুঁয়ে নিভে-যাওয়া প্রদীপের মতো মুখ হয়ে যায় অলকের। উল্টো দিকে হাঁটতে থাকে সে। মনে মনে ভাবে, দেখা হ'ল না ভালোই হ'ল। তাদের অসম প্রণয় পরিণয়ে পূর্ণতা যখন পাবে না, তখন এ দেখায় দু'জনই দুঃখ পেত শুধু।

ভেঙ্গে-পড়া মনকে দৃঢ় করে অলক। রবীন্দ্রনাথের গানের কয়েকটি কলি গুঞ্জরণ করতে থাকে তার মনে :

"আরো আঘাত সইবে আমার, সইবে আমারো।
আরো কঠিন সুরে জীবন-তারে ঝংকারো॥"

অলক জানে যে, তার পক্ষে ঝর্ণা চিরকালের জন্য সুদূর আকাশের তারা হয়েই থাকবে। তার জাত আর গোত্র চিরকালের জন্য ঝর্ণার জাত আর গোত্র থেকে ভিন্ন হয়ে গেছে।

কিন্তু চাওয়ার পরিসমাপ্তি কি শুধু স্থূল পাওয়াতেই? অলকের মনের আকাশে ঝর্ণা যে একদিন পূর্ণিমার জ্যোৎস্না বিতরণ করেছিল তার কি কোন দাম নেই? সেই মহৎ স্মৃতি কি তার জীবনের দৃঢ় অবলম্বন হতে পারে না?

পারে। এতদিন, প্রখর যৌবনের সব জ্বালা ফুরিয়ে প্রৌঢ়ত্বের অবসন্ন বৈকালে পৌঁছে অলক জেনেছে যে, চাওয়া আর পাওয়ার ভেতর উপলব্ধির যে তারতম্য রয়েছে তাই টেনে আনে সুখ আর দুঃখ। কিন্তু জীবনের বেদীমূলে স্মৃতির প্রদীপখানি জ্বালতে পারলে নিষ্কলুষ আলোক-বন্যায় মনের সব অন্ধকার দূর হয়ে যায়।

আমি পৃথিবীরে ভালোবেসেছি

শ্রীমমতা কর

জীবনের এই মদির সুখের একটুকু ছোঁয়া দিয়ে
স্বপনের এই মাধুরী মাখানো সোনালী আভাস নিয়ে
তারুণ্যের এ মুগ্ধ দিনের গান বেঁধে নিতে এসেছি—
আমি পৃথিবীরে ভালোবেসেছি।
যেথা তন্বী ধরার খুশী ছুটে আসে নিবিড় গন্ধ হয়ে,
পুঞ্জ সবুজ ঘুমে থাকে তার যৌবনভার বয়ে,
চুম্বনঘোর মাখা সে বাতাসে আবেশ ঢালা সে রাতে
জ্যোৎস্না-আলোর সাথে
আমি যে মিতালী পেতেছি,
রূপ দিয়ে আর গান দিয়ে আমি মনের পেয়ালা ভরেছি ;
তাই বিহ্বল চোখে ঘোরাফেরা করি পৃথিবীর আশে পাশে
রূপালী আলো যে আসে—
ঘাসে ঘাসে এ কি মায়া ওঠে ছেয়ে,
পাগল কোকিল শুধু মরে গেয়ে ;
চঞ্চল হাওয়া ছুঁয়ে যায় দেহ কি মধুর উচ্ছ্বাসে।
মোর বুক দুলে ওঠে পুলকে
মোর আঁখি ভরে ওঠে আলোকে
বিশ্বভরা এ মাধুরীর আমি, শেষ খুঁজে খুঁজে পাই না।
মধুযামিনীর এ অসহ সুখ কেমনে যে রাখি জানি না।
ওগো আলো,
আমি প্রাণ খুলে তাই বলে যেতে চাই তোমারে
বেসেছি ভালো।
ওগো ফুল,
আমি ত্রিভুবনে খুঁজে পাই নি তোমার তুল।
ওগো সুর,
তুমি ছুঁয়েছ আমার হিয়ার গোপনপুর।
আমি তোমাদেরি কাছে নিজেরে করেছি দান।
তোমাদের এই গীত-উৎসবে, আমি ভাষাহারা তান।
এ সংসারের সব কলরোল সব কালিমার শেষে
আকাশের গায়ে তারাগুলি যেথা চেয়ে রয় অনিমেষে
জীবনমরণ থেমে গেছে যার মাঝে
যেখানে কেবল অন্তবিহীন আনন্দ ধ্বনি বাজে
সে সুরলোকের আবছা আভাস তোমাদের গানে গানে
ছুঁয়ে যায় মোর প্রাণে।
দিগঙ্গনার নীল চোখে আজ তারই যে স্বপ্ন মাখা
পাতায় পাতায় ঝিলিমিলি আলো তারই আনন্দ আঁকা।
দখিনা হাওয়ার চঞ্চল তরী বেয়ে
আমার অঙ্গে যে পুলক যেন তরঙ্গে আসে ধেয়ে।
জীবনের সীমা মুছে যায় মোর, ঘুচে যায় কাঁদা হাসা।
আমার এ দেহখানি,
একি অপরূপ সঙ্গীতে আজ বেজে ওঠে নাহি জানি।
বেঁচে থাকা মোর ক্ষণেকের তরে,
এ কি আনন্দে ওঠে আজ ভরে
এ জীবন হ'তে সব কিছু মধু আমি পান করে নিয়েছি।
আমি যে আজি, এ মোহময় রাতে,
পৃথিবীরে ভালোবেসেছি।

বাঙ্গালী

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

[প্রবাসী, ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা—জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮ হইতে পুনর্মুদ্রিত]

যাহারা বাঙ্গালা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচিত হইতে লজ্জাবোধ করে; তাহারা বলে,—বাঙ্গালা দেশে জন্মগ্রহণ করিলেই বাঙ্গালী হয় না। যাহাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা, তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ বাঙ্গালী বলিয়া পরিচিত হইতে ইতস্ততঃ করিয়া থাকে; তাহারা বলে,—বাঙ্গালা ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিলেই বাঙ্গালী হয় না। তবে কাহাকে বাঙ্গালী বলিব?

যাহারা স্মরণাতীতকাল হইতে বাঙ্গালা দেশে বংশানুক্রমে বাস করিয়া আসিতেছে,—কদাপি বাঙ্গালার চতুঃসীমার বাহিরে পদার্পণ করে নাই, কেবল তাহারাই কি বাঙ্গালী? সে হিসাবে গারো কুকী এবং সাঁওতালেরাই খাঁটি বাঙ্গালী। বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি সভ্যজাতি বিদেশাগত উপনিবেশনিবাসী মাত্র!

জন্মস্থান এবং মাতৃভাষা লইয়া বিচার করিতে হইলে বঙ্গদেশপ্রসূত বঙ্গভাষাভাষী ব্যক্তিমাত্রকেই এখন বাঙ্গালী বলিয়া অভিহিত করিতে হইবে। কাহার পূর্ব্বপুরুষ কোন্ অজ্ঞাত পুরাকালে বঙ্গদেশে প্রথম পদার্পণ করিয়াছিলেন, সে কথা এখন বিচার করিবার প্রয়োজন নাই।

কিন্তু জন্মস্থান নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে কোন্ ভূভাগকে বাঙ্গালা নামে অভিহিত করিব, তদ্বিষয়ে নানা তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইতে পারে। যেখানে বাঙ্গালা ভাষাই সচরাচর কথোপকথনের ভাষা, তাহাকে বাঙ্গালাদেশ বলিতে হইলে,—আসাম, উৎকল, বিহার ও ছোটনাগপুর পরিত্যাগ করিয়া রাজসাহী, বর্দ্ধমান, ঢাকা ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের কয়েকটি জেলা লইয়াই বাঙ্গালা দেশের সীমানির্দ্দেশ করিতে হইবে। এই সকল জেলার জন-সাধারণের সচরাচর কথোপকথনের ভাষা বাঙ্গালা;—এখানে যে অল্পসংখ্যক ভিন্ন-ভাষা-ভাষী অন্য লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা তীর্থের কাক, দুইদিনের প্রবাসী, দেশের ভূমির সহিত তাহাদের কোনরূপ স্থায়ী সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয় নাই। ইহারা অদ্যাপি শারীরিক শ্রম বা শিল্পকৌশল বিনিময়ে জীবিকার্জ্জন করিবার জন্য বাঙ্গালা দেশে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। বাঙ্গালার এই চারিটি বিভাগকে যথাক্রমে উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বাঙ্গালা নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। উত্তর বাঙ্গালার উত্তরে পার্ব্বত্য জনপদে ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন জাতি; সুতরাং উত্তর বাঙ্গালার উত্তরাংশ খাঁটি বাঙ্গালা নহে। পশ্চিম বাঙ্গালার পশ্চিমে বিহার ও ছোটনাগপুর, দক্ষিণে উৎকল; সুতরাং পশ্চিম বাঙ্গালার পশ্চিম ও দক্ষিণাংশ খাঁটি বাঙ্গালা নহে। পূর্ব্ব বাঙ্গালার উত্তরে আসাম, পূর্ব্বে ব্রহ্ম রাজ্য; সুতরাং পূর্ব্ব বাঙ্গালারও উত্তর এবং পূর্ব্বাঞ্চল খাঁটি বাঙ্গালা নহে। কেবল দক্ষিণ বঙ্গই এই হিসাবে খাঁটি বাঙ্গালা। খাঁটি বাঙ্গালা হউক, কিন্তু দক্ষিণ বঙ্গ আধুনিক জনপদ;—পুরাকালে ইহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত সমুদ্র-নিহিত ছিল। উত্তর পশ্চিম ও পূর্ব্ব বাঙ্গালা যখন শৌর্য্যে বীর্য্যে সাহিত্যে শিল্পে সদাচারে ও সভ্যতায় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সুপরিচিত, দক্ষিণ বাঙ্গালা তখনও গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের স্রোতবিধৌত বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গতাড়িত নবোদ্গত বালুকাতট ভিন্ন আর কিছু নহে! সেই বালুকাতটগুলি কালক্রমে মানব-নিবাসের উপযোগী হইয়া প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপোপদ্বীপ ও পরে সুবিস্তৃত সমতল রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। ভূগর্ভ খনন করিবার সময়ে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়; পুরাতত্ত্বের আলোচনা করিবার সময়েও ইহার কিছু কিছু পরিচয় প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস প্রথমে দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা উচিত; দক্ষিণ বঙ্গের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তীকাল লইয়া ইতিহাসের কালবিভাগ করা যাইতে পারে। দক্ষিণ বঙ্গ অভ্যুদিত হইবার পূর্ব্বকালে বাঙ্গালা দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, সে দেশে কাহারা বাস করিত, তাহাদের দ্বারা বাঙ্গালা দেশে কোন্ কোন্ কীর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল,—সে কত দিনের কথা—এই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। তৎকালে আর্য্যাবর্ত্তে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ এই তিনটি প্রাচ্য জনপদের নাম পরিচিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। তন্মধ্যে বঙ্গ বলিতে কেবল পূর্ব্ব বাঙ্গালাকেই বুঝাইত; পশ্চিম বাঙ্গালা কলিঙ্গের ও উত্তর বাঙ্গালা মিথিলা বা ত্রিহুতের অভিভুক্ত ছিল বলিয়াই বোধ হয়।

অঙ্গ রাজ্যের পূর্ব্বে কলিঙ্গ রাজ্যের এক দেশে বনখণ্ডের অভ্যন্তরে আরণ্য গজের প্রাদুর্ভাব ছিল; পশ্চিমবঙ্গের লোকে সেই আরণ্য গজ সুশিক্ষিত করিয়া রণক্ষেত্রে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের গ্রন্থে

ইহারাই গঙ্গারাঢ়ীয় নামে পরিচিত। তৎকালে উত্তর বঙ্গ মিথিলা বা ত্রিহুতের অন্তর্গত থাকিয়া কৃষি শিল্প ও সাহিত্য সেবায় নিযুক্ত ছিল, পূর্ব্ববঙ্গ এক প্রান্তে আসাম ও অপর প্রান্তে ব্রহ্মরাজ্যের অধিবাসিবর্গের সহিত নিয়ত সংগ্রামে লিপ্ত থাকিয়া আত্মরক্ষা করিত। পুরাকালের পশ্চিম ও পূর্ব্ব বাঙ্গালায় শৌর্য্য বীর্য্য এবং উত্তর বাঙ্গালায় শিল্প ও সাহিত্যোন্নতির এই অনুমান নিতান্ত ভিত্তিহীন বলিয়া বোধ হয় না। শিল্প ও সাহিত্যের ক্রমোন্নতির জন্য যে শান্তি ও বিশ্রাম-সুখের প্রয়োজন, পূর্ব্ব বা পশ্চিম বাঙ্গালায় তাহা তখনও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। কিন্তু পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাঙ্গালা অতি প্রাচীনকাল হইতেই বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়া জলপথে নানা দিগ্দেশে গমনাগমন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তদুপলক্ষে সমুদ্রপথে প্রশান্ত মহাসাগরমধ্যস্থ দ্বীপপুঞ্জে ও চীনরাজ্যে যে ভারতীয় সভ্যতা সুবিস্তৃত হয়, পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাঙ্গালার লোকেরাই তাহার প্রধান নিদান। তাহাদের বীরবাহু স্বদেশরক্ষার্থ নিয়ত নিযুক্ত থাকিয়া স্বদেশের পণ্যভাণ্ডার বিদেশে বহন করিয়া বিদেশের রত্নরাশি স্বদেশে আনয়ন করিত। ইহার ফলে ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চল নানা দূরদেশেও সুপরিচিত হইয়াছিল।

তৎকালে আর্য্যাবর্ত্তের সহিত পশ্চিম ও উত্তর বাঙ্গালার যেরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বর্ত্তমান ছিল, পূর্ব্ব বাঙ্গালার সেরূপ সংস্রব লাভের সুযোগ ছিল না। পূর্ব্ব বাঙ্গালা আর্য্যাবর্ত্তের সুসভ্য আর্য্যনিবাস হইতে বহু দূরে বিচ্ছিন্নভাবে বিন্যস্ত বলিয়া, তথায় যাহা কিছু সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল, তাহা একরূপ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাবেই বিকশিত হইয়াছিল। বোধ হয় এই সকল কারণে তৎকালে বঙ্গ বলিতে কেবল পূর্ব্ববঙ্গকেই বুঝাইত; পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গ বঙ্গমধ্যে পরিগণিত হইত না। পূর্ব্ববঙ্গের প্রতাপ জলে স্থলে পরিব্যাপ্ত হইবার পর হইতেই কালক্রমে উত্তর ও পশ্চিম বাঙ্গালাও বঙ্গমধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছে—এইরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

বঙ্গ বহুদিনের সভ্য জনপদ। এখানকার ভাষা, এখানকার লিখনপ্রণালী, এখানকার গৃহনির্ম্মাণকৌশল ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতে পৃথক। উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের বাঙ্গালা ভাষা যখন সংস্কৃত সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া ভিন্নরূপধারণ করিতেছিল, পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় তখনও সংস্কৃতের ছায়া সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত হইত, অদ্যাপি তাহার অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। লিখনপ্রণালী পুরাতন পালি বা দেবনাগরী বা মৈথিলী আকার পরিত্যাগ করিয়া যে ধীরে ধীরে স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাও পূর্ব্ব বাঙ্গালা হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্ববঙ্গের গৃহনির্ম্মাণকৌশল ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের কেন—উত্তর ও পশ্চিম বাঙ্গালার গৃহনির্ম্মাণ-কৌশল হইতেও বিভিন্ন; বরং এতদ্বিষয়ে উত্তর ও পশ্চিম বাঙ্গালা প্রায় একরূপ, কেবল পূর্ব্ববাঙ্গালাই পৃথক্। পূর্ব্ববাঙ্গালার শিল্পোন্নতিও পৃথক্ পথে ধাবিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। যাহারা নিয়ত মাতৃভূমির সহিত সংলগ্ন থাকিয়া তাহার আদর্শের অনুকরণ করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহারা ভিন্ন দেশে বাস করিবার সময়েও সে দেশের নূতন দ্রব্যাদির ফললাভ করিতে পারে না। যাহারা জন্মভূমি হইতে বহুদূরে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তাহারা বাধ্য হইয়া নূতন দেশের নূতন দ্রব্যাদি আত্মকার্য্যে নিয়োগ করিবার জন্য বুদ্ধিকৌশলে নবশিল্পের অবতারণা করিয়া থাকে। শিল্পালোচনা করিলে পূর্ব্ব-বঙ্গেরও যে একদা এইরূপ অবস্থা ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিবে না। পশ্চিম ও উত্তর বাঙ্গালা কৃষিজাত দ্রব্যে সুসম্পন্ন বলিয়া তাহার বিনিময়ে ধনোপার্জ্জন করিবার জন্যই ধাবিত হইত। পশ্চিম বঙ্গের রত্নবণিগ্ বর্গ আমলকি হরিতকির ছড়াছড়ি করিতেন; তাহারই বিনিময়ে বিদেশ হইতে ধনাহরণ করিতেন। উত্তর বঙ্গের লোকেও কৃষিজাত দ্রব্যের আদান প্রদান দ্বারা ধনোপার্জ্জনে ব্যস্ত ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের কৃষিদ্রব্য অধিক হইলেও, কৃষিজাত রূঢ়দ্রব্য শিল্পকৌশলে রূপান্তরিত হইয়া ধনোপার্জ্জনের সহায়তা করিত। যাহারা ধরিত্রীকে যেরূপ অবস্থায় পাইয়াছিল সেইরূপ অবস্থায় রাখিয়া যায়, তাহারা অলস ও মূর্খ। যাহারা ধরিত্রী হইতে ধনাহরণ-কালে কৃষির সঙ্গে শিল্পের সংযোগ করিয়া লয়, তাহারা কর্ম্মঠ ও সুপণ্ডিত। এই হিসাবে পূর্ব্ববঙ্গ কর্ম্মঠ ও সুপণ্ডিত বলিয়া সম্মানের পাত্র। অতি পুরাকালে স্থলপথ অপেক্ষা জলপথেই বাঙ্গালীর ভ্রমণনৈপুণ্য বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল। এখনকার বাঙ্গালী ষ্টীমারে চড়িয়াও পদ্মাপার হইতে আশঙ্কা বোধ করে, তখনকার বাঙ্গালী ভেলায় সমুদ্র পার হইত—তৎকালপ্রচলিত অর্ণবযানে আরোহণ করিয়া সাহস, সহিষ্ণুতা ও বাহুবলমাত্র সম্বল করিয়া দ্বীপোপদ্বীপে বিচরণ করিত। তখন গৃহে অন্ন-সংস্থানের অভাব ছিল না, তথাপি বাঙ্গালী গৃহকোণে জীবনপাত না করিয়া নানা দিগ্দেশে বিচরণ করিত কেন? স্বদেশে স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া চর্ব্ব্য চোষ্য উপভোগ করিবার সুবিধা থাকিতেও তরঙ্গসঙ্কুল সাগরযাত্রায় অনশন অর্দ্ধাশন বা উপবাসক্লেশ সহ্য করিবার জন্য লালায়িত হইত কেন?

যাহারা সমুদ্রতীরে বাস করে, তাহারা কৌতূহল ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াই প্রথমে সমুদ্রবেলায় বিচরণ করে; পরে কূলে কূলে পরিভ্রমণ ও ক্রমশঃ সমুদ্রবক্ষে বিচরণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পোতাদি নির্ম্মাণ করিতে থাকে; অবশেষে সমুদ্রই তাহাদের শৌর্য্য বীর্য্য ও ধনাগমের নিদান হইয়া পড়ে—স্থলপথ অপেক্ষা জলপথেই অধিক অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। নিত্য নূতন দেশে পদার্পণ নিত্য অপরিজ্ঞাত-পূর্ব্ব শোভাসন্দর্শন, নিত্য নবোৎসাহে ধনাহরণ, এবং নিত্য নবকীর্ত্তি সংস্থাপনের লোভে সমুদ্র-কূলনিবাসী মানবসমাজ সমুদ্রভ্রমণে সুদক্ষ হইয়া উঠে। পৃথিবীর সমুদ্রকুলনিবাসী সমস্ত জনপদেই ইহার পরিচয় প্রকাশিত রহিয়াছে; বাঙ্গালার সমুদ্রকূলেও ইহার পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছিল; এখনও তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

দক্ষিণ বাঙ্গালা সমুদ্রনিহিত থাকিবার সময়ে মুরশিদা-বাদের নিকটবর্ত্তী রাঙ্গামাটী নামক স্থানে একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়; তৎকালে সমুদ্র রাঙ্গামাটীর পদধৌত করিত এবং সিংহলের অর্ণবপোত বাণিজ্যোপলক্ষে রাঙ্গামাটী পর্য্যন্ত গতায়াত করিত। এই স্থানে একটি জলযুদ্ধ সংঘটিত হইবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিলুপ্ত কাহিনীর পুনরুদ্ধার সাধিত হইলে এইরূপ আরও কত পুরাতন বন্দরের পরিচয় প্রকাশিত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

অন্যান্য দেশের ন্যায় বঙ্গদেশের সভ্যতা আধুনিক নহে; ইহার শৌর্য্য বীর্য্যের কথা, ইহার শিল্পগৌরবের কথা, ইহার শিল্পশালাসঞ্জাত বিচিত্র পণ্যদ্রব্যের পরিচয় প্রাচীন গ্রীক ও রোমক রাজ্যেও সুপরিজ্ঞাত ছিল। তৎকালে বাঙ্গালার পশ্চিম ও উত্তরাংশের পুরাতন জন-পদের স্থানে স্থানে যে সকল বৌদ্ধ কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া-ছিল, অদ্যাপি তাহার নিদর্শনের অভাব নাই; চৈনিক ভ্রমণকারিগণও তাহা দর্শন করিবার জন্য এদেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তখনও পূর্ব্বোপসাগরের বাণিজ্যপোত বাঙ্গালীর শাসন ও পরিচালন কৌশলের অধীন ছিল। যাহারা তৎকালে বাঙ্গালাদেশে বাস করিত, তাহাদের ভাষা ও সাহিত্য কিরূপ ছিল তাহার নিদর্শন বিলুপ্ত হইলেও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। বাঙ্গালা-দেশে তাহার নিদর্শন দুর্লভ, কিন্তু সমুদ্রবেষ্টিত যবদ্বীপ বালিদ্বীপ প্রভৃতি পুরাতন জনপদে তাহা অদ্যাপি দেদীপ্যমান।

ভারতবর্ষের মধ্যে আর্য্যাবর্ত্তই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন সভ্য জনপদ। আর্য্যাবর্ত্ত যখন শিক্ষা দীক্ষা ও সভ্যতায় সমুন্নত, দাক্ষিণাত্য তখন তালীবন-সমাচ্ছন্ন অজ্ঞানতার ঘনান্ধকারে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন। তাহার পর ক্রমে দাক্ষিণাত্যেও আর্য্যোপনিবাস সংস্থাপিত হইয়া দুই একটি করিয়া গ্রাম নগর সংস্থাপিত হইতে আরম্ভ করে। দাক্ষিণাত্য এইরূপে আর্য্যনিবাসে পরিণত হইবার পূর্ব্বে আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বসীমা কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করিয়া-ছিল, তাহার অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বে বাঙ্গালা পর্য্যন্ত পূর্ব্বে ও কলিঙ্গ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-দক্ষিণে আর্য্যপ্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎকালে বঙ্গোপকূলে তিনটি সম্পন্ন জনপদ বিদেশে কলিঙ্গ নামে পরিচিত ছিল; সংক্ষেপে উড়িষ্যা হইতে আরাকানের উপকূল পর্য্যন্ত কলিঙ্গের অধিকার ছিল। এই কলিঙ্গ জনপদের অধিবাসি-বর্গই প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে আর্য্য সভ্যতা, আর্য্য-ভাষা আর্য্য সাহিত্য ও আর্য্যপ্রতাপ সুবিস্তৃত করে। যবদ্বীপ ও বালিদ্বীপের হিন্দু অধিবাসিবর্গের বিশ্বাস, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এই কলিঙ্গ রাজ্য হইতেই দ্বীপে দ্বীপে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সে সকল আর্য্যোপনিবেশের ভাষা ও লিখনপ্রণালীর পরিচয় অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। সে ভাষার নাম ছিল কবি ভাষা, লিখনপ্রণালীতে সংস্কৃতের অনুরূপ ক খ গ ঘ ঙ ইত্যাদি সুপরিচিত বর্ণ বিন্যস্ত! কবি ভাষার শব্দাবলী বিকৃত উচ্চারণে যৎকিঞ্চিৎ বিকৃত হইলেও বাঙ্গালীর পক্ষে একেবারে দুর্ব্বোধ্য নহে। কবিভাষানিবদ্ধ সাহিত্যও ভারতবর্ষের সুপরিচিত রামায়ণাদি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই সাহিত্যে ও লিখনপ্রণালীতে সংস্কৃতের সম্পূর্ণ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বাঙ্গালা ভাষার সাহিত্য ও লিখনপ্রণালীতেও সেই প্রভাব বর্ত্তমান। সুতরাং সেকালের বাঙ্গালা দেশেও যে সংস্কৃতের প্রভাব বর্ত্তমান ছিল, তাহাই সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। আর্য্যা-বর্ত্তের সংস্কৃত হিন্দীতে ও এদেশের সংস্কৃত কালক্রমে বাঙ্গালায় রূপান্তরিত হইয়াছে। লিখনপ্রণালীও সংস্কৃতের অক্ষরমালার আদর্শেই গঠিত, কেবল স্থান ও কালের পার্থক্যে ক্রমশঃ পৃথক হইয়া পড়িতেছে।

বিহার ও উৎকলের ন্যায় বাঙ্গালাদেশে পালি অক্ষরের প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায় না; পালবংশীয় বৌদ্ধ নর-পালবর্গের শাসনলিপিতেও মৈথিলী অক্ষরের প্রাদুর্ভাব; তাহাই বাঙ্গালার পুরাতন লিপিপ্রণালী ছিল বলিয়া বোধ হয়। সেই লিপিপ্রণালীলিখিত যে সকল অতি পুরাতন তাম্র বা প্রস্তরফলক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সংস্কৃত ভাষায় রচিত; সচরাচর কথোপকথনের ভাষা সংস্কৃত হইতে কতদূর স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা না

জানিলেও, ধর্ম্ম ও রাজকার্য্যে ব্যবহৃত ভাষা যে বিশুদ্ধ সংস্কৃত ছিল, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। মধ্য ভারতে পালি ভাষাই সাহিত্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল, পূর্ব্ব ভারতে তখনও সংস্কৃতের প্রভাব বর্ত্তমান ছিল।

বৌদ্ধাবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে বাঙ্গালা দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহার যৎসামান্য সাধারণ আভাস ভিন্ন বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হইবার আশা নাই। বৌদ্ধাবির্ভাবের পরবর্ত্তী যুগে বাঙ্গালার অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সময়ে মগধ রাজ্য গৌরবের উচ্চচূড়া স্পর্শ করিয়াছিল; মগধেশ্বরের নাম ও কীর্ত্তিকাহিনী পৃথিবীর বহু দূরদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং এসিয়াখণ্ডের নানা স্থানে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অথবা ধর্ম্মনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দক্ষিণ বঙ্গ এই যুগে সমতট নামে পরিচিত, লোকনিবাসে পরিণত ও কৃষিকার্য্যের উপযোগী হইয়াছিল; পশ্চিম ও পূর্ব্ববঙ্গ এই সময়ে সমুদ্র পথে বাণিজ্য ব্যবসায়ে ধনোপার্জ্জনের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল; উত্তর বঙ্গ এই সময়ে বহু বৌদ্ধকীর্ত্তিতে সুসজ্জিত হইয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধপ্রভাব বর্দ্ধিত হইবার সময়ে উত্তর বঙ্গের পূর্ব্বোত্তরাংশে কামরূপের পুরাতন জনপদ ভিন্ন বাঙ্গালার সকল স্থানই বৌদ্ধাচারে দীক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ এইরূপে সৌরাষ্ট্র ও মগধের ন্যায় পুরাতন ধর্ম্মমত পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধভূমি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল।

ভাষা ও সাহিত্য, ধর্ম্ম ও লোকাচার বৌদ্ধপ্রভাব-সময়ে সকল স্থানেই যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল; বাঙ্গালাদেশেও তাহার পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সময়ে বাঙ্গালাদেশের সহিত ভারতবর্ষের অন্যান্য জনপদের কলহবিবাদের অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সময়ে বাঙ্গালা কখন মগধের, কখন কলিঙ্গের, কখন অঙ্গের, কখন বা বঙ্গের অধীন হইয়াছে; আবার বাঙ্গালীরা কখন বাহুবলে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ মিথিলা গুর্জ্জর ও কাশ্মীর পর্য্যন্তও রাজনৈতিক প্রবলপ্রতাপ বিস্তৃত করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই সংঘর্ষ উপলক্ষে বাঙ্গালা-দেশে প্রতিনিয়ত নানা দেশের নানা জাতির লোক প্রবেশ করিয়াছে। কেহ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে, কেহ বা সপরিবারে বাঙ্গালায় বাসস্থান স্থাপন করিয়াছে, কেহ আবার বাঙ্গালীর সহিত বৈবাহিকসূত্রে মিলিত হইয়া বাঙ্গালীর দলপুষ্টি করিয়াছে। আজ যাহারা বাঙ্গালী নামে পরিচিত, তাহারা এইরূপে কতবার নবাগত অতিথিগণকে আপনাদিগের দলভুক্ত করিয়া লইয়াছে, তাহার তথ্যানুসন্ধান করা এখন অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

কালক্রমে মোসলমানেরা আসিয়া বাঙ্গালীর দলপুষ্টি করিয়াছেন। এখন হিন্দু এবং মোসলমানেরাই বাঙ্গালার প্রধান অধিবাসী। যাহারা একদা হিন্দু বলিয়া পরিচিত ছিল, তন্মধ্যে বহু লোকে ইসলামের ধর্ম্ম গ্রহণ করায় মোসলমানের সংখ্যা অল্পদিনের মধ্যেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এখন বাঙ্গালার সুখদুঃখের সহিত যাহাদের চিরসংস্রব, তাহারা মিশ্রজাতি—কেহ হিন্দু, কেহ মোসলমান, কেহ বা খৃষ্টীয়ান; কিন্তু সকলেই বাঙ্গালী।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বকালের বাঙ্গালার ইতিহাসে কেবল হিন্দুর কথা, তৎপরবর্ত্তীকাল হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর কিয়দংশ পর্য্যন্ত হিন্দু ও মোসলমানের কথা, এবং তাহার পর হইতে হিন্দু মোসলমান ও খৃষ্টীয়ানের কথা। এই ত্রিবিধ যুগেই বাঙ্গালীর অগৌরবের অনেক পরিচয় বাহির করিতে পারা যায়। সেরূপ অগৌরবের কথা কোন্ জাতির ইতিহাসেই বা একেবারে নাই? কিন্তু এই ত্রিবিধ যুগেই বাঙ্গালীর অনেক গৌরবের কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। বিদেশীয় ইতিহাস-লেখক-গণ কেবল অগৌরবের কথাই নানা ছন্দোবন্ধে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন; বাঙ্গালী লেখকগণ অনুসন্ধান করিলে তাহার মূলে সত্যের সঙ্গে অনেক মিথ্যাও মিশ্রিত দেখিতে পাইবেন।

বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই; সুতরাং বাঙ্গালীর কীর্ত্তি-কাহিনী সাধারণ্যে সুপরিচিত নহে। বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালী নানা দেশে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। যাহারা প্রবাসী, তাহারা ভিন্ন দেশ, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন আচার ব্যবহারে জড়িত হইয়াও আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া কত ভাবে আত্ম-প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিতেছে, এতদিনের পর তাহার কাহিনী সঙ্কলিত হইবার উপায় হইল। প্রবাসী বাঙ্গালী মাতৃভাষার পুষ্টি-সাধনের জন্য মাসিক পত্রিকা প্রচার করিতেছেন, ইহা বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে নিরতিশয় আশা ও আনন্দের সমাচার। বাঙ্গালীর অতীত যাহাই হউক, ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। সে ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যসোপান গঠন করিবার ভার কেবল স্বদেশবাসী বাঙ্গালীর উপরেই ন্যস্ত নহে; প্রবাসী বাঙ্গালীকেও তাহার জন্য শ্রম স্বীকার করিতে হইবে। প্রবাসী এতদিন অর্থোপার্জ্জনে ব্যস্ত ছিলেন, এখন স্বদেশ ও স্বজাতির কথা স্মরণপথে পতিত হইয়াছে। ভগবান এই নবজাত সাধু সংকল্পের সহায় হউন।

সবার উপরে

শ্রীসীতা দেবী

সন্ধ্যার পর রাসবিহারীবাবু নিজের শোবার ঘরে এসে ঢুকলেন। গৌরাঙ্গিনী অনেকক্ষণ থেকেই তাঁর অপেক্ষায় ব'সে আছেন। কর্ত্তা বললেন, "গেল এতক্ষণে! এমনিতে ত ভদ্রতা দেখাল খুব। মেয়ের সুখ্যাতিও করল খুব। সব দিক দিয়েই পছন্দ হয়েছে। তবে আসল জায়গায় খুঁটি বেশ শক্ত। বড় জামাইটি এর চেয়ে এমনি কি নিরেস? কিন্তু তার বিয়েতে যা দিতে হয়েছে, এর বিয়েতে তার চেয়েও বেশী খরচ করতে হবে। গহনাই ত তিন সেট্ চাইছে, তা ছাড়া বৌভাতের খরচ, তত্ত্বের খরচ, ইত্যাদি ব'লেও হাজার তিন টাকা চায়।"

গৌরাঙ্গিনী ঠোঁট কুঞ্চিত ক'রে বললেন, "বাবাঃ, মেয়ে হওয়া মহাপাপের ফল। আমরাও ত ছেলের বিয়ে দিয়েছি, কিন্তু অমন গলা কাটতে যাই নি কারো। আমাদের ছেলেই কি মন্দ নাকি?

পাশের ঘরে ব'সে সুমনার মনটা আরো যেন মুষড়ে গেল।

৩

কথাবার্ত্তা চলতে লাগল। মেয়ে তাঁদের খুব পছন্দ হয়েছে, ছেলের সকল রকম বর্ণনা শুনে এঁদেরও খুব পছন্দ হয়েছে, কিন্তু দেনা-পাওনায় বনছে না।

দু'দিন পরে গীতা হাসতে হাসতে এসে বলল, "এই-বার ফাইন্যাল্ পরীক্ষা ভাই। খোদ্ কর্ত্তা দেখবেন আজ।"

সুচিত্রা এক লাফ দিয়ে বলল, "বর আসবে বুঝি? আজ?"

গীতা বলল, "না গো না, আসবে না, আমরাই যাব।"

সুচিত্রা হাঁ ক'রে রইল, বলল, "মেজদি কি স্বয়ম্বরা হবে নাকি? যাবে আবার কোথায়?"

গীতা বলল, "আহা, নব্য যুবক, তার কি আর ঐ সনাতনী ষ্টাইলে কনে দেখতে ইচ্ছা করে? মোট কথা, সে যাচ্ছে আজ বিকালে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যালের বাগানে বেড়াতে। সঙ্গে তারও ভাই বোন বৌদির দল থাকবে। আমরাও দল বেঁধে যেন না জেনেই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হব। তার পর শ্রীমান্ শ্রীমতীকে দেখবেন, শ্রীমতীও ইচ্ছা করেন ত তাঁকে দেখে নিতে পারেন। আমি ত খুব ভাল ক'রেই দেখে নিয়েছিলাম ভাই। না দেখে কখনও কনের পিঁড়েয় বসতে নেই বাপু, হঠাৎ শুভদৃষ্টির সময় যদি দেখা যায় একটি সাক্ষাৎ ঘটোৎকচ তোমার দিকে কটমট্ ক'রে চেয়ে আছে, তা হ'লে কি হয় বল ত? কনে ত তখনি ভির্মি যাবে।"

সুচিত্রা বলল, "হ্যাঁ, ভির্মি যায় না। আর কিছু! ঐ যে মিণ্টুর খুড়তুতো ভাই ধনশ্যাম, তার মূর্ত্তি ত দেখেছ, একেবারে জন্তুর মত চেহারা, সে বউ নিয়ে ঘর করছে না?"

জ্যোৎস্না বলল, "ঘর করবে না ত কি বনে চলে যাবে? কি রকম কান্নাকাটি করেছিল?"

সুমনা বলল, "বাবাঃ, কত দিনে যে এ পর্ব্বের শেষ হবে জানি না। আমি কিন্তু আজ সং সাজতে পারব না। সর্ব্বদা যে ভাবে বেড়াতে যাই, তাই যাব।"

গীতা বলল, "তাই যেও গো, তাই যেও। ওতেই কাৎ হয়ে পড়বে।"

গীতার স্বামী জিতেন ঘরে ঢুকে বলল, "তাড়াতাড়ি চা খেয়ে সকলে তৈরী হয়ে নাও। দিনের আলো থাকতে থাকতে ওখানে পৌঁছান চাই। ওখানে ত আর ফ্ল্যাশ্-লাইট নিয়ে যাওয়া যাবে না?"

একটু হুড়োহুড়িই প'ড়ে গেল। চা খাওয়া, গা ধোওয়া, সাজ-সজ্জা করা চারটিখানি কথা ত নয়? অল্প একটু দেরিই হ'ল গীতার জন্যে। কিছুতেই আর তার প্রসাধন শেষ হয় না। জিতেন বলল, "জ্বালা রে বাবা! দেখতে আসছে কি তোমাকে? মনু কতক্ষণ থেকে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর তোমার কিছুতেই হয়ে উঠছে না?"

গীতা রাগের ভান করে মুখ ঘুরিয়ে বলল, "যাও, ও-রকম করলে আমি যাব না। আমি কি তোমার বোনের মত সুন্দরী যে, যেমন করেই বেরোই, লোকে দে'খে মুগ্ধ হয়ে যাবে? আমাদের একটু সময় লাগে।"

জিতেন বলল, "মুগ্ধ আবার কাকে করতে হবে? একজনকে ভেড়া বানিয়ে হয় নি বুঝি?"

বোনরা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, "তোমরা বাড়ী ফিরে

এসে ঝগড়া কোরো বাপু, এখন চল দেখি। অন্ধকার হয়ে এল।"

বাড়ীর গাড়ী ও একটা ট্যাক্সি সংগ্রহ করে সবাই বেরিয়ে পড়ল। যথাস্থানে পৌঁছতে বেশী দেরি হ'ল না।

সুমনার মনের অবস্থাটা হয়েছিল একটু মিশ্রিত রকমের। ভাবী স্বামীকে দেখবার একটা ঔৎসুক্য যে না ছিল তা নয়। আবার জ্বালাতনও লাগছিল। কি বারে বারে খালি চেহারা দেখান। মেয়েদের কি চেহারা ছাড়া আর কিছুই নেই? কই তার স্বভাব-চরিত্র, লেখাপড়া এ সব ত কেউই যাচাই করতে চায় না? মেয়েদের কি সত্যিই আর কোন দাম নেই? খালি সে দেখতে কেমন আর তার বাবা কত টাকা খরচ করতে পারবেন এই জানলেই সব জানা হ'ল? তাকে কি কাঁচের আলমারিতে সাজিয়ে রাখা হবে, মূল্যবান্ গৃহসজ্জাস্বরূপ?

বাগানের কাছে এসেই জিতেন বলল, "যাঃ, ওরা আগেই এসে পড়েছে! ঐ যে বরের মামা ভগীরথবাবু দাঁড়িয়ে।"

সুমনা চেয়ে দেখল, গেটের কাছে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখছেন। এঁকে কনে দেখার দিন সুমনা দেখেছিল তাদের বাড়ীতে। ভদ্রলোক তাদের গাড়ী দেখেই এগিয়ে এসে বললেন, "এই যে, আমরাও এই এলাম আর কি! ওরা সব ভিতরে ঢুকে গেছে। চলুন আপনারা।"

সকলে মিলে বাগানের ভিতর ঢুকে পড়ল। কৃত্রিম ঝিলের ধারে উপবিষ্ট একটি দলকে দেখিয়ে ভগীরথবাবু বললেন, "এই যে আমাদের বাড়ীর এরা। চলুন, পরিচয় করিয়ে দিই।"

তারা কাছাকাছি আসতেই দলটি উঠে দাঁড়ায়। দু'জন যুবক, তিন-চারটি তরুণী ও কিশোরী। একটি শ্যামবর্ণ যুবককে দেখিয়ে ভগীরথ বললেন, "এই আমার ভাগ্নে নির্ম্মল, ইনি আমাদের জামাই নরেন, আর এঁরা সব ভাগ্নীর দল।"

জিতেন তাদের নমস্কার করে বলল, "এই আমার বোন জ্যোৎস্না, আর এই মেজবোন সুমনা। ইনি ওদের বৌদিদি, আর সব ছোট জন আমার খুড়তুতো বোন সুচিত্রা।"

নির্ম্মল একবার ভাল করে সুমনার দিকে তাকিয়ে নিয়ে একে একে মেয়েদের সবাইকে নমস্কার করল। মেয়েরা সব ক'জন অবশ্য সুমনা বাদে, তাকে আপাদমস্তক খুঁটিয়ে বেশ ভাল করে দেখে নিল। সুমনা একবার তার দিকে তাকিয়ে মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল। ভাবল, "পুরুষ মানুষ, ওদের ত রূপের দরকার হয় না, বিদ্যে বা পয়সা থাকলেই হ'ল। ইনি যদি মেয়ে হতেন, তবে চেহারার জোরে বিকোতেন না।"

দলটি এখন আস্তে আস্তে হেঁটে এগোতে লাগল। ভগীরথবাবু পরিচয়টা করে দিয়েই কোথায় উবে গেলেন, তাঁকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। নির্ম্মল জিতেনের সঙ্গে গল্প করতে লাগল, তবে কানটা খাড়া রাখল, সুমনা কোনো কথা বলে কি না সেটা শুনবার জন্য। দুঃখের বিষয়, অন্যদের প্রশ্নের উত্তরে "হাঁ" বা "না" ছাড়া সুমনা বিশেষ কিছুই বলল না।

গীতা আর জ্যোৎস্না ওদের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিল। গীতার সঙ্গে একস্কুলে একজন পড়েছে সেটাও প্রকাশ হয়ে পড়ল। সুমনা মোটে কথা বলছে না দেখে নির্ম্মলের এক বোন জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি সত্যিই এত গম্ভীর ভাই? না আমাদের দেখে ভয়ে কথা বলছ না?"

নির্ম্মল অল্প একটু দূরেই ছিল। সে হঠাৎ পাশ ফিরে বোনের দিকে তাকিয়ে বলল, "ভয় হবে কেন? আমরা ত বাঘ বা ভালুক নয়? যদিও গায়ের রং দেখে আমাকে ভালুক মনে করা অসম্ভব নয়।"

দলশুদ্ধ সবাই উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল। সুমনাও হাসল, তবে তত জোরে নয়। দলের ভিতর জ্যোৎস্নার রংই সব চেয়ে ফরসা, সে মুরুব্বিয়ানা চালে বলল, "আহা, কি যে বলেন। ভালুক মনে করতে যাবে কেন? বাংলা দেশ শ্যামলা রঙেরই দেশ, আমরা ত আর কাশ্মিরী নয়? সকলেরই রং প্রায় শ্যামবর্ণ।"

নির্ম্মল বলল, "শ্যামবর্ণও নানারকম আছে ত? আমার মত গভীর শ্যামলও আছে, আবার আপনার মত তপ্তকাঞ্চন শ্যামও আছে।"

জ্যোৎস্না বলল, "বাব্বাঃ, পড়েছেন ত ইঞ্জিনীয়ারিং, কথা বলছেন একেবারে মহাকবির মত। আপনার দেখছি সব গুণই আছে।"

কথা বলতে বলতে তারা সারা বাগানটাই ঘুরে এল। নির্ম্মলের ইচ্ছা ছিল সুমনার সঙ্গে দু' একটা কথা বলে বা তার একটা গান শোনে, কিন্তু একটু ঠাণ্ডা শিরশিরে বাতাস দেওয়ায় সবাই বাড়ী যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। শীত পড়বার মুখে, কিন্তু তরুণ-তরুণীরা সাজে-পোষাকে তাকে এখনও আমল দিতে চায় না। সকলেই গরম-কালের পোষাকেই এসেছে। সুতরাং এখন বাড়ী ফিরে না গিয়ে উপায় রইল না।

গাড়ীতে উঠে গীতা বলল, "আমার কিন্তু ভাই মন্দ

লাগল না। চেহারা সুন্দর না হলেও কুৎসিত নয়। কথাবার্ত্তা বেশ সুন্দর বলে।"

জিতেন বলল, "তোমার ভাল লাগলেই ত আর হবে না? সুমনা কি বল?"

সুমনা উত্তরই দিল না। সুচিত্রা বলল, "মহদি অমন হ্যাবলা মেয়ে নয় যে, একবার দেখেই একটা মতামত প্রকাশ করে ফেলবে।"

গীতা বলল, "মতামত প্রকাশ করলেই বা কি? কে শুনবে তার কথা? এই ত আমার আর বড় ঠাকুরঝির বেলায়ও বরেরা কনে দেখতে এসেছিল, কিন্তু তার পর আমাদের কেউ ডেকেও জিজ্ঞেস করল না যে, আমাদের মত আছে কি না।"

জিতেন বলল, "মত ছিল না বুঝি?"

গীতা বলল, "সে থাক বা নাই থাক, জানতে চাওয়াটা ত উচিত ছিল?"

সুমনা সারা পথ ভাবতে ভাবতে চলল। নির্ম্মলকে কি তার পছন্দ হয়েছে? চেহারাটা কিছু 'আহামরি' নয়, তবে চেহারা মানুষের কতটুকুই বা? বড়দি ত বেশ ভাল দেখতে, কিন্তু তাতে কি তার বেশী কিছু সুবিধা হয়েছে? ঝগড়া ত লাগে খুব জামাইবাবুর সঙ্গে। তবে কথাবার্ত্তায় নির্ম্মল ছেলেটি ভাল, বোকা বা অসভ্য মনে হয় না। বিয়ে করবারই তার এখন ইচ্ছা ছিল না, তবে করতেই যদি হয় ত মানুষটা সচ্চরিত্র ও বুদ্ধিমান হওয়া দরকার।

বাড়ী ফিরবার পর বড়রা ছেঁকে ধরলেন মেয়েদের, কি রকম বর, কেমন দেখতে, কথাবার্ত্তা কেমন, স্বাস্থ্য কেমন। কর্ত্তারা একটু আড়ালে রইলেন, গিন্নীরাই সামনে এগিয়ে এলেন। বর কনেকে ভাল করে দেখেছে কিনা, ধরনধারণে কি মনে হ'ল, পছন্দ হয়েছে কিনা। কনের বরকে পছন্দ হয়েছে কিনা সেটা জানার জন্য কারো খুব বেশী আগ্রহ দেখা গেল না। বর যখন তখন তাকে পছন্দ হবেই, এই গোছের ভাব সকলের।

খালি গীতা সুমনাকে জিগগেস করল, "তোমার পছন্দ হয়েছে ভাই?"

সুমনা বলল, "কে জানে? চেহারা দেখে কিই বা বোঝা যায়? চেহারাটা এমন কিছু সুন্দর নয়।"

গীতা বলল, "তার মানে তোমার ভাল লাগে নি।"

সুমনা বলল, "যা বল। বিয়ে এখন করতে হবে ভাবলেই ভাল লাগে না, তা বর দেখতে যেমনই হোক।"

নির্ম্মলের যে কনে পছন্দই হয়েছে তা অবিলম্বেই জানা গেল। বরপক্ষের দাবি হঠাৎ কিছুটা নেমে গেল। পণ খানিকটা কম দিলে হবে, আর গহনাগাঁটিও সংখ্যায় কম না হোক, কিছু হাল্কা হলে চলবে এ রকম একটা আভাস পাওয়া গেল। এও শোনা গেল যে, নির্ম্মল প্রথমে বিয়ে করতে চায়ই নি, তার ইচ্ছা ছিল বিলেত যাবার। কিন্তু পরিবারের ভিতর কে একজন ছেলে বিলেতে গিয়ে এক কদাকার মেম বিয়ে করে আনাতে সবাই অত্যন্ত ভীত হয়ে উঠল। বিলেত যদি যায়ও পরে তবু আগে একটা বিয়ে দেওয়া দরকার। তাড়াতাড়ি মেয়ে দেখা সুরু হ'ল। মোটামুটি যতগুলি দেখা হ'ল, তার ভিতর সুমনাই সবদিক দিয়ে ভাল। অবশ্য আরো ধনীঘরের মেয়ে হলে এঁদের ভাল লাগত, ছেলের বিলেত যাওয়ার খরচটাও আদায় করে নেওয়া যেত। কিন্তু এখানে অত টান সইবে না, তা তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন। সুমনার বাবা গরীব নয়, কিন্তু মহা ধনীও কিছু নয়। বেশী দরাদরি করে সম্বন্ধটা যদি ফসকে যায় ত নির্ম্মল আবার বেঁকে বসবে কিনা কে জানে? তার চেয়ে মন্দের ভাল এই হোক্।

সুমনার মায়ের তিনটি মেয়ে, দুটি ছেলে। বড় ছেলে মানুষ হয়ে গেছে, বড় মেয়েরও বিয়ে হয়ে গেছে। এখন একটু দম নিতে পারতেন তিনি, দু'এক বছর। কিন্তু কর্ত্তার রক্তের চাপটা যে ভাবে থেকে থেকে বেড়ে যাচ্ছে, তাতে তিনি রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছেন। কোনোমতে সুমনার বিয়েটা হয়ে গেলে তিনি বাঁচেন। ছোটটা এখনও একেবারেই ছোট, তার কথা এখনও ভাববার সময় হয় নি। ততদিনে ছোট ছেলে জিতেনও মানুষ হয়ে কাজে ঢুকে যাবে। দুই ভাইয়ে কি আর একটা বোনের বিয়ে দিতে পারবে না, কর্ত্তা যদি অক্ষমই হয়ে পড়েন?

তাই বরপক্ষের সুর একটু মৃদু হতেই তিনি স্বামীকে ধরে পড়লেন, "নাও বাপু, আর দর কষতে হবে না, এইখানেই ঠিক করে ফেল। ছেলেটি ভাল সকল দিকে, সবাই বলছে। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে নেই। এর চেয়ে কমে ভাল ছেলে তুমি পাবে বা কোথায়? ঘর ভাল, ছেলের ঘাড়ে ভারও কিছু নেই।"

কর্ত্তা বললেন, "একটু আরো দেরি করলে হয়ত আরো দু'পাঁচ শ' কমতে পারে। হট্ করে অতগুলো টাকা বার করে দেওয়া যায়? অন্য কোনো দিকেও ত বেশী ঢিলে দিচ্ছে না, ফার্ণিচার, গহনা, কাপড়, বরসজ্জা সবই পুরোপুরি চাই। তত্ত্বতালাশও আছে। বারো-চোদ্দ হাজার টাকা ত হেসেখেলে খরচ হয়ে যাবে। আসে কোথা থেকে?"

গৌরাঙ্গিনী বললেন, "এর কমে ভাল বিয়ে হবে না

গো। ভাল ঘর, ভাল বর চাইলে টাকা খরচ করতেই হবে। আমার অমন স্বর্ণপ্রতিমা মেয়ে কোন্ হাঘরের সংসারে পড়ে কষ্ট পাবে, সে আমার সইবে না। আচ্ছা, সোনার গহনার সেট্‌টা না হয় আমিই দেব, যদি টাকায় খাঁকতি পড়ে।"

কর্তা দেখলেন প্রস্তাবটা ফেলে দেবার মত নয়। গৃহিণীর গহনা আছে প্রচুর, সেগুলি তাঁর বুকের রক্তের চেয়েও প্রিয়। জ্যোৎস্নার বিয়েতে তিনি একখানিও ভাঙতে রাজী হন নি। মেয়ের বিয়ের খরচের দায় বাপের, তিনি কেন নিজের স্ত্রীধন অপব্যয় করতে যাবেন? কাজেই নগদ টাকা দিয়েই জ্যোৎস্নার সব গহনা গড়িয়ে দিতে হয়েছিল। জিতেনের বিয়েতে গৃহিণী নিজের সবচেয়ে অপছন্দের একটা জড়োয়া নেকলেশ দিয়ে মুখ দেখেছিলেন বৌয়ের। এক্ষেত্রেও সোনায় হাত পড়ে নি। সুতরাং এখন যখন তিনি স্বেচ্ছায় গহনা দেবার প্রস্তাব করছেন, তখন অবস্থাটা খুবই সঙ্গীন হয়ে উঠেছে বুঝতে হবে। এটা প্রত্যাখ্যান করা ঠিক বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। অন্ততঃ হাজার আড়াই-তিন টাকা ত এখন বেঁচে যাবে। যদি দেখা যায় গৌরাঙ্গিনী বিশেষ মনমরা হয়ে পড়েছেন এগুলির অভাবে, তাহলে প্রভিডেন্ট ফণ্ডের টাকা পাওয়া যাবার পর তাঁকে না হয় ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কয়েকখানা গহনা আবার গড়িয়ে দেওয়া যাবে। সেও ত ঘরের টাকা ঘরেই থাকবে?

সম্প্রতি স্ত্রীর কথায় সায় দিয়েই বললেন, "তা যদি দাও এখন কিছুদিনের মত ত খুব সুবিধাই হয়। তা হলে নগদ টাকায় অতটা টান পড়ে না। তা হলে বরের পিসেকে জানিয়েই দিই আমাদের মত আছে। আসছে মাঘ মাসেই হয়ে যাক তবে। আমারও যা শরীর গতিক, একটা ভার কমে যাক, তুমিও একটু নিশ্চিন্ত হও।"

গৌরাঙ্গিনী মহা খুশী হয়ে বেরিয়ে গেলেন। গহনা যায় যাক, সে পরে ভাবা যাবে। ছোট ছেলের বিয়েতেও ত টাকাকড়ি পাওয়া যাবে কিছু? তা ছাড়া, কর্তা কাজে অবসর নেবার সময় মোটা টাকা হাতে পাবেন, তখন কি আর চেপে ধরলে গৌরাঙ্গিনীর কথা তিনি ঠেলতে পারবেন? রাগ-ঝাল শরীরে একটু বেশী বটে, কিন্তু কিপ্‌টে মানুষ নয়। টাকার জন্যে কখনও বড়-গিন্নীকে ঠেকতে হয় নি, এতদিন ত সংসার করছেন?

এখন আত্মীয়বন্ধু সবাইকে খবর দেওয়া যেতে পারে। এতদিন তিনি ব্যাপারটাকে লুকিয়ে রাখতেই চেষ্টা করেছেন, যদিও তাতে তিনি বিন্দুমাত্রও কৃতকার্য্য হন নি। সকলেই আগেভাগে সব জেনে ব'সে আছে, বরং তাঁর চেয়েও আগেভাবে জেনেছে। যা হোক এখন আর ঢাকবার চেষ্টা করতে হবে না। তার পর ঠাকুরাকে খবর দেওয়া, বেনারসীওয়ালাকে খবর দেওয়া, আস্‌বাব-পত্রের ফরমাস দেওয়া। সব তাঁকে করতে হবে, আর কারো পছন্দের উপর তাঁর বিশ্বাস নেই। দরদস্তুর করতেও তাঁর সমান কেউ পারবে না। এক জামা-কাপড় তৈরি করার ব্যাপারে তাঁকে মেয়ে এবং বৌয়ের সাহায্য নিতে হবে, কারণ আধুনিক ফ্যাশান তাঁর বিশেষ কিছু জানা নেই। শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা দে'খে নাক না সিঁট্‌কোয় এমন হওয়া চাই। গীতার বাপের বাড়ী বেশ ভাল দরজী আছে, তাকে একবার আনাতে হবে।

তার পর আত্মীয়স্বজনদের আনান। একেবারে নিকট আত্মীয় যাঁরা, তাঁদের না এনে উপায় নেই, ভীষণ নিন্দা হবে তা না হলে। কিন্তু যত দেরি করে আনা যায় ততই মঙ্গল; একবার এলে সহজে আর তাঁরা যে বিদায় হবেন এমন দুরাশা গৌরাঙ্গিনীর নেই। মাসখানিক ত সব চেপে বসে থাকবেই। পাকা দেখার দিন ঠিক হোক আগে, তার পর এদিক্‌টায় হাত দেওয়া যাবে।

নিচতলায় এসে খাবারঘরে ঢুকেই দেখলেন ছোট জা সেখানে ষ্টোভ জেলে বার্লি জাল দিচ্ছেন। বললেন, "খোকন আছে কেমন ছোট বৌ? জ্বর কমে নি?"

ছোট বৌ চামচ দিয়ে বার্লি নাড়তে নাড়তে বললেন, "কমে ত গেছে, কিন্তু একেবারে যাচ্ছে না কেন সেটা ত বুঝতে পারছি না!"

বড়গিন্নী বললেন, "চট্‌পট্ সারিয়ে তোল্ বাপু। এর পর কোমর বেঁধে কাজে লাগতে হবে, রুগীর সেবা করবার ত তখন ফুরসৎ পাবে না।"

সুচিত্রার মা হাসিমুখে বললেন, "ও, তাহলে সব ঠিক হয়ে গেছে? দিনটিনও ঠিক হয়েছে নাকি?"

"দিনটিন এখনও ঠিক হয় নি। আমি সাত-পাঁচ ভেবে-চিন্তে মত দিয়েই দিলাম ভাই। ছেলে ভাল, ঘরও ভাল, টাকা খরচ না করে পাচ্ছি কোথায় আর? যা তোমার ভাসুরের শরীর হয়েছে, এখন যত শীগ্‌গির দায়মুক্ত হওয়া যায় ততই ভাল। কাল ওদের জানিয়ে দেওয়া হবে।"

ছোটগিন্নী বললেন, "ভালই করেছ দিদি। আজকাল সব মেয়ে বুড়ো করে রাখার এক ফ্যাশান হয়েছে, ও আমার ভাল লাগে না। আমরা সব তের-চোদ্দ বছরে এ ঘরে এসেছি, এই সংসারই এখন আমাদের আপন হয়েছে, বাপের বাড়ী দূরে সরে গেছে। পঁচিশ-ত্রিশ বছরের মেয়ে এলে কি আর তা হ'ত? যেন চিরকালই আলাদা আলাদা থেকে যায়। আমার মেয়েটাও যদি এই সঙ্গে পার করে দিতে পারতাম ত খুব ভাল হ'ত।

তা বাপের গেরাহ্যিই নেই। বলে, যে ক'দিন হেসেখেলে বেড়াচ্ছে, বেড়াক না? ভালমন্দ কার কখন কি হয় কিছু কি বলা যায়? বয়স বাড়ছে না কমছে?"

গৌরাঙ্গিনী বললেন, "থাক ভাই অত ভাবনা তোমার এখনই ভাবতে হবে না। মনুর চেয়েও ত চিত্রা ছোট। ঠাকুরপোর কিই বা বয়েস? ভগবানের আশীর্ব্বাদে এখনও বহুদিন কাজ করতে পারবেন।"

বার্লির বাসন নামিয়ে অতঃপর ছোট গিন্নী উপরে চলে গেলেন। গৌরাঙ্গিনীর হাতে তখন খুব বেশী কাজ ছিল না। চাল-ডাল বার করে ঠাকুরকে রাত্রের রান্না বুঝিয়ে দিয়ে তিনি দেরাজ ঘেঁটে জ্যোৎস্নার বিয়ের সব জিনিসের তালিকা, নিমন্ত্রিতের তালিকা বার করতে লাগলেন। কিছুই তিনি ফেলেন নি, এখনও ঢের বার এগুলিকে কাজে লাগাতে হবে।

৪

পরবর্ত্তী জীবনে এই সময়ের দিনগুলোর কথা যখন সুমনা ভাবত, তার মনে হ'ত সে যেন একটা ঘূর্ণীবায়ুর মধ্যে ছিল। অবশ্য ঝড়টা আনন্দ ও উত্তেজনার। বাড়ীতে ক্রমাগত আত্মীয়স্বজন আসছেন, কেউ গল্প-গাছা করে মিষ্টি খেয়ে চলে যাচ্ছেন; কেউ বা একেবারে গুছিয়ে বসে যাচ্ছেন, বিয়ে দেখে তবে উঠবেন। এত লোক দেখে মনে মনে গৌরাঙ্গিনী চটে যাচ্ছেন, কিন্তু বলবারও কিছু নেই, এই হল দেশাচার। দরিদ্র আত্মীয়েরা এমন সুযোগ সহজে ছাড়ে না। যতদিন পারা যায় অন্যের পয়সায় খেয়ে নিতে, ততই লাভ। এটা-সেটা পাওয়া যায়, যজ্ঞি বাড়ীতে থাকলে। সুমনার নিজের মাসী ও মামী এলেন ছেলেপিলে নিয়ে, বাপের বাড়ীর দিক্‌ও ফেলা যান না, এক পিসী এলেন, এক জ্যাঠাইমা এলেন। তিনতলায় ছাদের উপর একটা মাঝারিগোছের ঘর ছিল, ছেলেমেয়েরা পড়াশুনো করত, সেটা খালি করে তক্তপোষ পেতে কয়েকজনের শোবার জায়গা করে দেওয়া হ'ল। ক্যাম্পখাট বাড়ীতে দু'চারটে ছিল, এর-ওর কাছ থেকে চেয়েচিন্তে আরো দু'চারটে জোগাড় করে খাবারঘরে বসবার ঘরে রাত্রে পাতা হতে লাগল। বাড়ীর অধিবাসীদের শোবার ঘরেও দু'চার জন স্থান পেল। শীতকালের দিন, যেখানে-সেখানে ত মানুষ শুতে পারে না, কাজেই একটু অসুবিধার মধ্যেই দিন কাটতে লাগল।

গৌরাঙ্গিনী আড়ালে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, "এর পর লোক এলে বাপু, আপিস ঘরে কার্পেট পেতে শুতে হবে।"

রাসবিহারী বললেন, "অতিথিরা হলেন নারায়ণ, তাঁদের কি অমন অবহেলা করা যায়?"

গৌরাঙ্গিনী বললেন, "অতিথি কাকে বলে, না 'ন দ্বিতীয়া তিথির্যস্য', তা এ সব লোক জো পেলে ত এক বছর থেকে যাবে।"

কর্ত্তা বললেন, "আরে না, সবাই ঘরবাড়ী, কাজকর্ম্ম ফেলে এসেছে, ও রকম ক'রে কি থাকতে পারে? বড় খুকীর বিয়ের সময় কেউ ত ভয়ানক বেশীদিন থাকে নি।"

তার পর সুরু হ'ল, কাপড় কেনা, জামা করান, গহনা গড়ান। স্যাকরার সঙ্গে বকাবকি দুই গিন্নীতে করতে লাগলেন, ছোটরা এসব গুরু ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবার অধিকার পেল না। খালি দু'চারটে প্যাটার্ণ তারা বলে দিল। তবে শাড়ী কেনা, ব্লাউজ ইত্যাদি করান, দরজীর সঙ্গে দরদস্তুর করার কাজে গীতা আর জ্যোৎস্নারই আধিপত্য হ'ল। তবে কত খরচ করা হবে সেটা অবশ্য বড়গিন্নীই ঠিক ক'রে দিলেন। আর একটা কথা ব'লে দিলেন, "আর বাপু, আর যা কর তা কর, কিন্তু বিয়ের শাড়ীটা যেন লাল ছাড়া অন্য রঙের কিনো না। কনের অঙ্গে লাল শাড়ী না থাকলে তাকে যেন কনে বলেই মনে হয় না আমাদের চোখে।"

শাড়ীওয়ালা হরেক রকম বাড়ীতেও আসতে লাগল, আবার গাড়ী চ'ড়ে দোকানে দোকানেও ঘোরা হতে লাগল। সুমনাকে দলে টানবার চেষ্টা তার বোনেরা যথেষ্টই করত, কিন্তু তাকে বার করতে পারত না। তবে বাড়ীতে কাপড়ওয়ালা এলে অন্যদের সঙ্গে সেও এসে দাঁড়াত। তারি পছন্দে ফুলশয্যার শাড়ী কেনা হ'ল সোনালী রঙের। সুমনার মায়ের ইচ্ছা ছিল একখানা জংলা বেনারসী কেনা হয় বেগুনী রঙের। কিন্তু সুমনার সেখানা ভাল লাগল না।

আসবাবপত্র সব অর্ডার দিয়ে আসা হ'ল, বাসন-কোসন গৌরাঙ্গিনী নিজে দোকান থেকে আনলেন। সুমনা অত ভাল গান করে, কাজেই তাকে একটা নূতন টেবল হার্ম্মোনিয়ম কিনে দেওয়া হ'ল। বরের বাড়ী রেডিও আছে, সেলাইয়ের কলও আছে, কাজেই এ দুটোর খরচ বাঁচল।

আর এক দিকে খরচ বাঁচালেন রাসবিহারীবাবু। 'গেস্ট কনট্রোল অর্ডার' চলছে, কাজেই তিনি প্রথম বললেন যে, অমন পাত পেড়ে অঢেল খাওয়ান চলবে না, জলযোগ করিয়েই সারা হবে। চারিদিক্ থেকে ভীষণ-ভাবে আপত্তি উঠতে লাগল। বড়গিন্নী ত প্রায় ক্ষেপেই গেলেন। তিনি গালে হাত দিয়ে খালি বলতে লাগলেন,

"ওমা, কোথায় যাব! এ কি হাবাতের ঘর? লোকে ছি ছি করবে যে গো! সকলের বাড়ী গিয়ে বিয়ের সময় গোগ্রাসে পিণ্ডি গিলে এসেছি, এখন নিজের মেয়ের বেলায় লোককে শুধু জল খাইয়ে বিদায় করব?"

কিন্তু কর্ত্তা তখন বেজায় আইনভক্ত হয়ে গেছেন, তিনিও কোট ছাড়বেন না। অনেক ঝগড়া-ঝাঁটির পর শেষে ঠিক হ'ল যে, বরযাত্রীদের ষোড়শোপচারেই খাওয়ান হবে, অন্যদের মিষ্টি, দই, মাছ মাংস তরকারি সবই দেওয়া হবে, সঙ্গে দু'চারখানা ক'রে ডালপুরীও দেওয়া হবে।

পাকা দেখার দিন এসে পড়ল। সেদিন যে কত পদ রান্না করা হ'ল তা সুমনা গুণেও শেষ করতে পারল না। সেদিন তাকে প্রাণভরে সাজিয়ে দিল বোনেরা আর বৌদিরা, কারণ বিয়ের দিন ত আর ইচ্ছামত সাজান যাবে না? বরের বাড়ীর এক পাল লোক, নিজের বাড়ীর আত্মীয়স্বজনও সব জুটে গেল। প্রণাম করতে করতে সুমনার ঘাড়ে দারুণ ব্যথা হয়ে গেল, আর কপালে গণ্ডা পঁচিশ চন্দনের ফোঁটা পরে তার মনে হতে লাগল তার সমস্ত মুখটাই কে যেন প্ল্যাষ্টার করে দিয়েছে। বরের বাড়ী থেকে ভাল জড়োয়া নেক্‌লেশ দিয়ে তাকে আশীর্ব্বাদ করা হ'ল। দেখে কনের বাড়ীর লোকেরা খুসীই হ'ল।

পরের দিনই আবার বরকে আশীর্ব্বাদ করার পালা। এতে মেয়েদের কোনো অংশ নেই, বাড়ীর কর্ত্তারা ও ছেলেরাই চললেন। কত পদ রান্না হয় সেখানে, সেটা ভাল ক'রে গুণে আসতে ব'লে দিলেন গৌরাঙ্গিনী ছেলেদের। বরের বাড়ীর কাছে খাওয়নোতে হেরে গেলে সেটা দুঃখের বিষয় হবে। তা জিতেন ফিরে এসে তাঁকে নিশ্চিন্ত ক'রে দিল। তাদের বাড়ীর চেয়ে নির্ম্মলদের বাড়ী রান্না এক পদ কম হয়েছে, মিষ্টিও একটা কম হয়েছে।

তার পর এল গায়ে-হলুদের পর্ব্ব। সকাল থেকে বাড়ীতে আর কান পাতবার জো নেই। নিমন্ত্রিতেরা সবই মহিলা ও ছোট ছেলেমেয়ে। যে যতটা পারে আগে এসেছে, সবাই তত্ত্ব দেখতে চায়। মেয়ের দলের কোথাও আটক নেই, বাড়ীর সব জায়গায় তারা ছড়িয়ে পড়েছে। সুমনা নিজের ঘরে খাটের উপর বসে আছে, সঙ্গিনীর দল সেখানেই তাকে ছেঁকে ধরেছে। বার-বাড়ীতে গেটের কাছে নহবৎ বাজছে, করুণ রাগিণীতে। এই সুরটা কানে এলেই কেমন যেন চোখে জল এসে যায়। কিন্তু এখনত হাজার জোড়া চোখের সামনে কাঁদতে বসা যায় না! সুমনা চুপ করেই আছে, মাঝে মাঝে সঙ্গিনীদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে।

নিচে বসবার ঘর, খাবার ঘরের কোল ঘেঁষে চওড়া বারান্দা। সকাল থেকে গীতা পাশের বাড়ীর মিনুকে নিয়ে সেখানে আলপনা দিচ্ছে, তার হাত খুব পাকা, বারান্দাটা যেন ফুলের বাগানের শোভা ধরেছে। এখানে তত্ত্ব নামান হবে। বারান্দার নিচে বাঁধান উঠান এখানে ভোর রাত্রি থেকে তরকারি, মাছ-কোটা, মশলা-বাটা আরম্ভ হয়েছে। একদিকে দরমার বেড়া ও চাল দিয়ে রান্নার জায়গা করা হয়েছে, সেখানেও রাত থেকে ভিয়েন চলেছে, দু'তিন রকম মিষ্টি তৈরি হচ্ছে। আজ আর 'গ্যেষ্ট কন্‌ট্রোল' কেউ মানছে না, যত খুসি ময়দা চাল খরচ করা হচ্ছে। মেয়েরাই এসব ব্যাপারে খুঁৎ ধরে বেশী, তাদের মুখ ভাল ক'রে বন্ধ করার ব্যবস্থা বড়গিন্নী করেছেন।

তত্ত্ব আসবার কথা ছিল দশটার মধ্যে, তবে বাঙালী বাড়ীতে যেমন হয়, খানিকটা দেরি হয়ে গেল। সাড়ে দশটা আন্দাজ দেখা গেল রাস্তার মোড়ে তিন চারখানা গাড়ী এসে দাঁড়াল। ভিতর থেকে দাস-দাসীর দল নেমে দাঁড়াল, তার পর থালা ও ট্রে হাতে কনের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হ'ল। বাইরে নহবৎ সুরু হ'ল, তার সুর ছাপিয়ে ভিতর বাড়ী থেকে এক সঙ্গে চার পাঁচটা বড় শাঁক ঘোর রোলে বেজে উঠল। সবাই দল বেঁধে বাইরের দিকে ছুটল তাদের অভ্যর্থনা করতে। বড়গিন্নী বাড়ীর পুরনো চাকর রঘুকে তালিম দিতে লাগলেন তার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে। কুটুম্ব বাড়ীর ঝি-চাকরদের যেন কোনো রকম আদর যত্নের ত্রুটি না হয়, ভাল করে যেন তাদের খাওয়ান-দাওয়ান হয়। তাদের উপযুক্ত বিদায় দেবার মত ভাঙান টাকা ঘরে রাখা হয়েছে কিনা সেটারও তদারক করে এলেন।

সার দিয়ে তত্ত্ববহনকারীরা বাড়ীর ভিতর ঢুকল। তখনও শাঁক বেজেই চলেছে। এক এক করে উপহারের থালা বারকোষ ট্রে সব যথাস্থানে নামিয়ে রাখা হ'ল। মাছ এসেছে বিপুলকায়, তার মুখে আবার পান গোঁজা। মেয়েরা মহাখুসী মাছ দেখে। কুটুমবাড়ী থেকে সরকারের মত এক ব্যক্তি এসেছিল, সে অগ্রসর হয়ে জিতেনের হাতে গহনার কেস্ একটা তুলে দিল। জিতেন তাড়াতাড়ি সেটা জ্যোৎস্নার হাতে দিল। মেয়েরা সবাই ঝুঁকে পড়ল তার উপর। এবার এসেছে জড়োয়া বালা। তা টাকা নিচ্ছে যেমন, তেমন এদের দেবার হাত ভাল। গায়েহলুদের শাড়ী জামা খুব দামী দিয়েছে। সুমনার রংও

বেশ ফরশা, এই নীল রং তার গায়ে বেশ মানাবে, ব্রোকেডের ব্লাউজটিও সুন্দর। শাড়ীই সব শুদ্ধ গোটা পঁচিশ দিয়েছে, রেশম ও সুতি মিলিয়ে। তা পছন্দ ভাল এদের। খাবার-দাবারও যথেষ্ট দিয়েছে। দুই গিন্নী মিলে তাড়াতাড়ি গুণে ফেললেন, কতগুলি ট্রে আর থালা এসেছে। আবার ফুলশয্যার তত্ত্বেও তাঁদের এই রকম সাজিয়ে দিতে হবে, বরং কিছু বেশী করেই দিতে হবে।

কুটুম বাড়ীর ঝি-চাকররা সব বোঝা নামিয়ে অতঃপর বারান্দার এক দিকে সার দিয়ে ব'সে গেল। এ-বাড়ীর চাকরেরা তাদের তত্ত্বাবধান করতে লাগল। ঝিরা এদিক ওদিক তাকাচ্ছে দেখে গীতা তাড়াতাড়ি সুমনাকে সেখান থেকে সরিয়ে দিল। এখনি তারা কনে দেখতে চাইবে। কিন্তু কনের এখনও স্নান হয় নি, সাজসজ্জা হয় নি, এ রকম চেহারা বরের বাড়ীর লোকদের না দেখাই ভাল।

এখন আরম্ভ হ'ল আসল গায়ে-হলুদের পালা। ভাঁড়ার ঘরের জিনিসপত্র ঠেলেঠুলে খানিকটা জায়গা করা হয়েছে। শীতের দিন, খোলা জায়গায় কিছু করা যায় না। নইলে বাইরে এই সব ব্যাপার করে নিতে পারলে ঘর-দোর অপরিষ্কার হয় কম। কিন্তু কি আর করা যায়? ভাঁড়ার ঘরেই এয়োরা মিলে মেয়ের গায়ে তেল-হলুদ মাখালেন, হলুদ গোলা জল ঢাললেন। তরুণী আর বালিকার দল সকলে মিলে পাগল হয়ে উঠল যেন। এ ওর গায়ে হলুদ দেয়, ও এর গায়ে দেয়। চেহারা সব কিম্ভূতকিমাকার হয়ে উঠল। ছেলে ও জামাইয়ের দলরাও আক্রান্ত হলেন, তবে বেশীর ভাগই বাইরে পলায়ন করে আত্মরক্ষা করলেন। কর্ত্তাদের সমীহ করে কেউ হলুদ মাখাল না। কচি-কাঁচার দল তেল-হলুদে পিছল মেঝেতে আছাড় খেয়ে পড়ে চেঁচিয়ে আকাশ ফাটাতে লাগল। মা-রা তখন আবার তাদের নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। মোট কথা এটা যে উৎসবের বাড়ী সে বিষয়ে কারো কোনো সন্দেহ রইল না।

সুমনার বোনরা তাড়াতাড়ি গরম জলটল জোগাড় করে তাকে স্নান করতে পাঠিয়ে দিল। নিজেরাও যতটা পারল তাড়াতাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে নিতে লাগল। আসল নিমন্ত্রিতারা আসার আগে বাড়ীর মেয়েদের সভ্য-ভব্য হয়ে নিতে হবে ত! ছোটদের ক্ষিদে পেয়ে গিয়েছে, তাদের একদলকে বসিয়ে দেওয়া হ'ল, বারান্দার পাতা করে। তখনও সব রান্না সারা হয় নি, তত্ত্বের মাছ সবে কাটা হচ্ছে। কিন্তু তা বললে কি হয়? বাচ্চা-কাচ্চাদের কান্না থামাবার জন্যে তাদের ডাল, মাছ ভাজা ও হ্যাঁচড়া দিয়েই খেতে বসিয়ে দেওয়া হ'ল। মিষ্টি, দই, রাবড়ী এ সব ত আছেই। ছোটরা খেল যত, ছড়াল তার চেয়ে বেশী। মা-রা তুলে নিয়ে গিয়ে হাত মুখ ধুইয়ে আনল। বড়রা যখন খেতে বসবে, তখন এরা আবার জুটে যাবে। কাজেই এখন ভাল করে পেট ভরে না খেলে কিছু ক্ষতি নেই।

এ দিকে দোতলার শোবার ঘরে সুমনাকে সাজান হচ্ছে। চুল খোলাই থাকল। ভিজে চুল বাঁধা চলে না, তা ছাড়া ও-বাড়ীর ঝি-চাকরগুলো দেখে যাক্ না ভাবী বৌয়ের কি সুন্দর চুল! খোলা চুলে ওরা কেউ তাকে দেখে নি ত! তত্ত্বে যে শাড়ী জামা এসেছে তাই তাকে পরান হ'ল। বিয়ের জন্য গড়ান গহনা আজ সে পরবে না। দিদি ও বৌদির গহনা পরিয়েই আজ তাকে সাজিয়ে দেওয়া হ'ল। এ গুলোতে তত সময় লাগল না, তবে কপালে চন্দনের ফুল রচনা করতে অনেক সময় লাগল। বাইরের নিমন্ত্রিতার দল একটি দু'টি করে আসতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে এদের সাজসজ্জার পর্ব্বও চুকল। এর পর সকলকে অভ্যর্থনা করার পালা। সবাই স্নান করে সেজেগুজে এসেছে, কাজেই এখন আর কাউকে সং সাজান গেল না। মহিলাদের আদর করে বসবার ঘরে বসাবার চেষ্টা হ'ল বটে, তবে নিতান্ত স্বল্পপরিচিতা ছাড়া কেউ আর এক স্থানে বসে রইলেন না। তত্ত্বের জিনিস তখনও বেশীর ভাগ বারান্দায় সাজানই রয়েছে। মেয়েরা সব সেইখানেই ভীড় করতে লাগলেন। কার বাড়ী কখন কি রকম তত্ত্ব এসেছে তার তুলনামূলক সমালোচনা চলতে লাগল খুব। মোটের উপর, বরের বাড়ীর লোকেরা বেশ ভালই তত্ত্ব করেছেন সকলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন।

বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে, এর পর খেতে না বসালে নয়। নিমন্ত্রিতদের জায়গা হয়েছে ছাদের উপরে। মাঝখানে আলপনার মধ্যে কার্পেটের আসনে সুমনার জায়গা। শঙ্খধ্বনির মধ্যে তার আইবুড় ভাত খাওয়া শেষ হ'ল। খাওয়ার পর্ব্ব দু'ব্যাচেই শেষ হ'ল, কারণ মেয়েষজ্ঞির দিন নিমন্ত্রিতের সংখ্যা খুব বেশী থাকে না।

নিচের তলায় বারান্দায় সার দিয়ে বসে বরের বাড়ীর ঝি-চাকররাও খাওয়া শেষ করল। ঝিরা গিয়ে সুমনাকে একবার দেখেও এল। "সোনার পিরতিমে বৌ হবে" এই মন্তব্য করে এবং যথোপযুক্ত বকৃশিস গ্রহণ করে তারা প্রস্থান করল।

সমারোহ চুকতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। অনেকেই খাওয়ার শেষে চলে গেলেন। কেউ কেউ একটু দেরি

করে, ভদ্রের মিষ্টান্ন সহযোগে চা খেয়ে শুয়ে গেলেন। এ সব জিনিস বিলোনই নিয়ম, কাজেই গিন্নীরা সবাইকে পেট ভরেই খাইয়ে দিলেন। অভ্যাগতারা সবাই যেতে যেতে রাত হয়ে গেল। গুরুভোজনের ফলে রাত্রে অনেকেই আর খেলো না। ক্লান্ত হয়ে ছেলেপিলেরা যে যেখানে পারল শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, মা-রা তাদের আর জাগালেন না। বাড়ীঘর পরিষ্কার করতে আর গোছাতেই প্রায় রাত বারোটা বেজে গেল, তার পর কর্ত্তা গিন্নীরা শুলেন।

পরদিনটা হাঙ্গাম কম তবে খাটুনি কম নয়। আসছে কালই বিয়ে, কেনা-কাটা যা বাকি সব আজ করা হতে লাগল। খাওয়ানোর জন্য আর যা-কিছু বাজার করা দরকার সব জোগাড় হতে লাগল। বাড়ীর সামনে মণ্ডপ বাঁধা হ'ল, নহবতের জন্য মাচা আগেই বাঁধা হয়েছিল। সুমনা উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে সব দেখতে লাগল। তার আজন্ম পরিচিত সংসার ছাড়বার সময় এসেছে। মনের ভিতরে তার অশ্রুসাগর ফুলে ফুলে উঠছে, কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ করবার জো নেই। শুভকার্য্যের মধ্যে চোখের জল ফেলা যায় না।

এর পর কোথায় কাদের মধ্যে চলে যেতে হবে তাকে। সেইটাই হবে তার চিরকালের ঘর, যে ঘরে জন্ম নিয়েছে সে ঘর দূরে সরে যাবে। মেয়েরা কি করে এটাকে স্বীকার করে নেয়? আনন্দের সঙ্গেই নেয় যেন মনে হয়! মাকে কি কাকীমাকে দেখলে কি মনে হয় যে, তাঁদের মনে এর জন্য কোনো কষ্ট আছে? একেবারেই ত তা মনে হয় না। নববিবাহিতারা তবু এখনও বাপের বাড়ী যাবার জন্যে, বেশীদিন থাকবার জন্যে লালায়িত হয়। কথাবার্ত্তায় প্রকাশও করে যে, ওখানেই এখনও তাদের বেশীর ভাগ মন পড়ে রয়েছে। কিন্তু স্বামীর মায়া কাটাতে পারে না। অদৃশ্য ডোরে তাদেরও মন বাঁধা থাকে শ্বশুরবাড়ীতে এরই জন্যে। ক্রমে ক্রমে বাপের বাড়ীর টান কমে আসে।

সুমনারও কি তাই হবে? যার হাতে তাকে দেওয়া হচ্ছে, সে মানুষটা কিরকম তাও সে কিছুই জানে না। চেহারাটা দেখেছে বটে, গলার স্বরটাও শুনেছে। চেহারা সুন্দর কিছু নয়, শ্যামবর্ণ, দোহারা একটি মানুষ, চোখ দুটো মন্দ নয়। কথাবার্ত্তা ভালই বলে, প্রাণে রসকষ আছে। কিন্তু স্বভাব-চরিত্রের তার কি-ই বা সুমনা জানে? পুরুষ মানুষ যতগুলি সে দেখছে চারদিকে, কারো মনেই যেন বিশেষ দয়ামায়া নেই। স্ত্রীদের সঙ্গে সকলেই কেমন যেন কঠোর ব্যবহার করে। হেসে কথা যে কখনও বলে না তা নয়, অল্পবয়সীরাও খুবই রসিকতা করে, বৌদের আদরও দেখায়, কিন্তু মতে অমিল হোক দেখি, তখন সকলেই দাঁত নখ উঁচিয়ে দাঁড়ায়। মেয়েদের ত কোনো অস্ত্র নেই মুখের কথা আর চোখের জল ছাড়া, তারা সব সময় হেরেই আছে। একেবারে পরাধীন যে। যা তাদের মানমর্য্যাদা, সবই স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া। নিজের জোর তাদের কিছুই ত নেই? সুমনাও ত মানুষের মত মানুষ হতে পারল না। অজ্ঞ মূর্খ অবস্থায় তাকে অচেনা পরের হাতে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কি তার দাম হবে কে জানে? সুমনার মনের ভিতরটা বড় কোমল, আঘাতকে অপমানকে সে বড় ভয় করে।

সুচিত্রা বলল, "কি এত ভাবছিস্? একটু ঘুমিয়ে নে না ভাল করে, কাল ত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একবারও চোখে পাতায় এক করতে পারবি না।"

সুমনা বলল, "ঘুম আসছে না। বড় ভয় করছে।

গীতা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে কথাটা শুনতে পেয়ে বলল, "ভয় আবার কিসের জন্যে? তোকে কি নির্ম্মল কামড়ে দেবে? নিজেকে ভালুক বলছিল বলে সত্যিই ত সে ভালুক নয়? তোর ষোল বছর বয়স হতে চলল, এখনও যেন খুকীটি আছিস্? আনন্দ হচ্ছে না কিছু? ভাল বরে বিয়ে হলে সব মেয়েই খুসী হয়, মুখে যাই দেখাক না কেন।"

সুচিত্রা বলল, "দেখ না কাণ্ড! এ যেন হাত-পা বেঁধে কেউ জলে ফেলে দিচ্ছে।"

সুমনা হাসবার চেষ্টা করে বলল, "দিচ্ছে না যে তা তুই কি করে জান্‌লি?"

গীতা বলল, "এঁরা কি আর কিছু খোঁজ-খবর নেন নি? সব জেনে শুনে তবে ত দিচ্ছেন।"

এমন সময় নিচে কি কারণে একটা কোলাহল ওঠায় সবাই ছুটে চলে গেল। সুমনার যেতে ইচ্ছা করল না, সে খাটে শুয়ে পড়ল।

তার পরদিন সুরু হল পুরো দস্তুর বিয়েবাড়ী। প্রতিদিনকার নিয়মিত জীবনযাত্রা আজ যেন কোথায় হাওয়ায় উড়ে গেল। নাওয়া খাওয়া শোওয়া কোনো কিছুরই ঠিক রইল না। যে যখন পারল স্নান করল, কেউ বা করলই না, ছোটগুলোকে তবু খানিকটা নিয়ম রক্ষা করে খাইয়ে-দাইয়ে দেওয়া হ'ল, বড়রা যখন যে পারল খেল, কেউ বা খেলই না। সুমনা আর তার বাবা উপোস করেই রইলেন, তবে মিষ্টি, সরবৎ প্রভৃতি খেলেন। জ্যোৎস্না বার বার আক্ষেপ করতে লাগল যে, মেয়েদের জীবনের এই পরম লগ্নটিতে তাদের উপোস করিয়ে কষ্ট

দেওয়া হয়, তাদের মুখ শুকিয়ে বিশ্রী দেখতে হয়ে যায়। সকাল থেকেই বাড়ী আত্মীয় বন্ধুতে ভরে গিয়েছে, কোথাও তিল ফেলবার জায়গা নেই। গৌরাঙ্গিনী মাঝে মাঝে ভাঁড়ারঘরে গিয়ে চোখ মুছে আসছেন, সেটা অবশ্য আর কেউ টের পাচ্ছে না। সুমনার মনের ভিতরটা কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গিয়েছে, ভাল করে সে কিছু ভাবতে পারছে না।

গোধূলি-লগ্নে বিয়ে, বিকেল থাকতেই কনে সাজাবার পর্ব্ব আরম্ভ হ'ল। যারা সাজাচ্ছে, তারা তাড়াতাড়ি কাজ করছে, কারণ কনে সাজিয়ে তারপর নিজেদেরও সাজবার সময় চাইত!

কনে সাজাবার একটা বাঁধাধরা নিয়ম আছে, এর ভিতর ব্যক্তিগত রুচি খাটাবার অবকাশ বিশেষ নেই। সেই ভাবেই সাজান হল। গহনায় কনের সর্ব্বাঙ্গ ঝলমল্ করতে লাগল। যা দিয়েছেন তার সব ক'খানা না পরিয়ে গৌরাঙ্গিনী ছাড়বেন না। এইটাই ত নিয়ম, সবাই দেখুক। সুমনার রং উজ্জ্বলই, তাকে আরো উজ্জ্বল করে দেওয়া হ'ল। কপালে কনে চন্দনের অলকা তিলকা, ঠোঁটে লিপ্‌ষ্টিকের ডগ্‌ডগে রং। তার উপর শোলার এক মুকুট পরিয়ে তার স্বাভাবিক শ্রীটাকে আরও খানিকটা অবলুপ্ত করে দেওয়া হ'ল। কিন্তু এই দেখেই বৃদ্ধা ও প্রৌঢ়া মহিলাদের চোখে জল এসে গেল। ঠিক যেন দুর্গা প্রতিমার মত দেখাচ্ছে।

কোলাহল ক্রমেই বাড়তে লাগল। সুরু হ'ল নহবৎ, অসংখ্য লোকের উচ্চ কণ্ঠধ্বনি। অতিথিরা আসতে লাগলেন। তাঁদের অভ্যর্থনা করার জন্য বাড়ীর ছেলে-মেয়ের দল ভীড় করে এগিয়ে এল। গীতা আর জ্যোৎস্নাকে বেশী সাজার জন্যে সবাই ক্ষেপাতে আরম্ভ করল। বর ত তাদের ওখানেই আটকে যাবে, সুমনার কাছ অবধি পৌঁছবেই না। কে যে কনে তা বিন্দুমাত্র বোঝা যাচ্ছে না।

বরযাত্রীর দল এসে পড়ল অল্প পরেই। এইবার সুমনাও উঠে জানলা দিয়ে একবার তাকিয়ে দেখল। বরকে চেনা অবশ্য যাচ্ছে, কিন্তু টোপর পরে তাকেও সঙের মত দেখাচ্ছে। শাঁখের শব্দে এবারেও আকাশ বাতাস কেঁপে উঠল।

আরম্ভ হ'ল বিয়ের কাজ। স্ত্রী আচারটাই দেখবার, সেখানে স্ত্রী পুরুষের বিষম ভীড় লেগে গেল। বরকে বরণ করবার জন্য গৌরাঙ্গিনী তৈরী হয়েছিলেন, বেনারসী শাড়ী ও অষ্ট অলঙ্কার পরে। তবে তিনি নামেও গৌরাঙ্গিনী, কাজেও গৌরাঙ্গিনী, তার উপর চেহারাটা গোলগালও ছিল, কাজেই নিতান্ত মন্দ দেখাচ্ছিল না। অন্য এয়োরাও যথাসাধ্যি সেজেগুজেই এসে দাঁড়ালেন।

কনেকে পিঁড়েয় করে তুলে আনল, ভাই এবং ভগ্নি-পতির দল। তাকে সাতবার ঘোরান হ'ল, শুভদৃষ্টির সময় একবার চট্ করে তাকিয়ে সুমনা চোখ নামিয়ে নিল। মালাবদলটাও তার হাত ধরে একরকম করিয়েই দেওয়া হ'ল।

তার পর সম্প্রদান, হোম, আরও কত কি। সুমনা সব কিছুর মধ্যে কেন্দ্রস্থলে আছে, কিন্তু তাকে কিছু করতে বা বলতে হচ্ছে না। গোলেমালে, ঘিয়ের ও ফুলের গন্ধে, সারাদিনের উপবাসের ফলে তার মাথাটা কেমন যেন গরে উঠল।

সাজান বাসরঘরে গিয়ে বসে সে একটু সুস্থ বোধ করল। মাথার মুকুটটা এর পর নামান গেল। গোলমাল কিন্তু এখনও সমানেই চলতে লাগল। তবে খাবার পাতা হয়েছে এখন লোকজন বেশীর ভাগই সেইদিকে চলল।

ক্রমশঃ

'শেষসপ্তক'

শ্রীবারীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

রবীন্দ্রকাব্যজীবনের প্রবহমানধারায় নিত্যনবীনতা, নবতর বৈচিত্র্য। সুদীর্ঘ ষাট বছরের কাব্যকৃতি কতোবার নতুন নতুন বন্দরে নোঙর ফেলেছে। নির্দিষ্ট কক্ষপথে স্থিরলক্ষ্য নিয়ে সৌরজগতের অনেক গ্রহের মত রবি-জগতের ভাবনা আবর্তিত হতে হতে বিবর্তনের পথে এগিয়ে চলেছে। এই চলার পথে 'শেষসপ্তক' বিশিষ্ট দিগ্‌দর্শন না হলেও বিশেষ স্থানের অধিকারী। রবি-প্রদক্ষিণ-রত সমালোচক তাঁর রচনায় আইডিয়াল ও রিয়াল-এর দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ী লীলাকে প্রত্যক্ষ করেছেন 'বলাকা' অবধি। কিন্তু সীমানা-নির্ধারণে দেখা যায়, এর পরিধি আরও বিস্তৃত। তাই 'বলাকা-পূরবী'র যুগে চিন্তাচেতনা তিরিশোত্তর 'শেষসপ্তক'-এও স্বতঃপ্রকাশিত। সেই গতিবাদ ও জীবনমৃত্যুর সংশয়দোলা, প্রকৃতির রূপ-রেখা ও ভাগবত অনুভূতির অভিসারী গূঢ়তা। তবে মানসদৃষ্টির পালাবদলে ভাবনাগুলিও ঋতুবদল করেছে। বস্তুজীবনে কবির আহত মনের প্রতিক্রিয়া ও সাধনার দিক থেকে রবিচিত্তে যে চরম উপলব্ধি—তারই কাব্যরূপ 'শেষসপ্তক'। এখানে কবির দৃষ্টি ধ্যানীর নিরাসক্তের উদাসীনের, পরিভ্রমণ ব্রহ্মলোকে; রূপোল্লাস আত্মরসে।

এখানে কবির আধ্যাত্মিক মনটি জীবনমৃত্যু পেরিয়ে সৃষ্টির আদিম বিন্দুতে উপনীত হয়েছে। সত্যের হিরণ্ময়ী আবরণটি উন্মোচিত। কাজেই বস্তুবিরহও থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, আত্মদৃষ্টি ও বস্তুদৃষ্টি এখানে যেন সহোদর। কবি-হৃদয়ের নির্মম মমতা তাদের দান করেছে কঠিন লাবণ্য। এগুলিকে রসাত্মক না বললেও কাব্যাত্মক বলতেই হবে। হয়তো, অধ্যাত্ম-সাধনার চরমতম পর্যায়ে উপনীত হলে এইরকমই ঘটে থাকে। আত্মা আর বস্তু তখন এক, আবার বস্তুলীন প্রীতির মধ্যেও নিরাসক্তির গেরুয়া রঙ—

> 'আজ শরতের আলোয় এই যে চেয়ে দেখি,
> মনে হয়, এ যেন আমার প্রথম দেখা।
> আমি দেখলেম নবীনকে,
> প্রতিদিনের ক্লান্ত চোখ
> যার দর্শন হারিয়েছে।'

আবার কয়েকটি বাস্তব বৃন্ত কবিতায় আধ্যাত্মিক ফুল ফুটেছে। এগুলিতে কবির আত্মচেতনা ও বস্তুচেতনা দুই বিপরীত মেরুবাসী হয়েও একটি রসবিন্দুতে মিলিত হয়েছে।

কতকগুলি কবিতায় কবি গল্প বলে চলেছেন, শুধুই বর্ণনা করেছেন; সহজভাবে একরঙা তুলিতে। কোথাও ছবি এঁকে চলেছেন; কেবলই রূপ, কেবলই আকার। লোকাতীত জ্যোতির দীপ্তি বা রূপাতীত নিরাকারের আভাস সেখানে অপ্রত্যক্ষ। সেখানে কেবলই দর্শন, কেবলই অংকন, নেই ভাবনা নেই দার্শনিকতা। রবীন্দ্র-নাথ এখানে সাধক নন, কবিও নন; আসক্তিবিরহী নিছক দ্রষ্টামাত্র।

এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিখ্যাত চিত্রগুলি রচনা করতে থাকেন। এর আগে তিনি পরকীয়া চিত্রাংকনের অনুসারী ছিলেন। এখন থেকে স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে অংকিত চিত্রকলার পালা। এই সময়ে প্রকৃতি ও মানুষ তাঁর চোখে ও মনে কি রূপে দেখা দিত, তার পরিচিতি আছে 'পথে ও পথের প্রান্তে' এবং ভানুসিংহের পত্রাবলীর ফাঁকে ফাঁকে। এখন তাঁর মনে হয়—'সংসারটা আকারের মহাযাত্রা', 'আকারের নৃত্য'; আবার যিনি স্রষ্টা তিনিও সাধনা করেছেন রূপের সীমানায়। তাই কবি ছুটি পেলেই ছুটে যান 'রূপ-ফলানোর অন্দরমহলে তাঁর কাব্য এখন চিত্রময়ী বিচিত্রতা; লেখনী 'ছবি-আঁকা-কলম।' চিত্রকরের হাতে 'শেষসপ্তক' তাই অপূর্ব চিত্রধর্মী হয়ে উঠেছে। তথ্য ও তত্ত্বের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা বস্তু-আশ্রয়ী কবিতাগুলিও এই রূপগ্রহণের মাধ্যমেই রসতা লাভ করেছে।

আর সেই রসরূপই বস্তুভিত্তিক কবিতাকে করে তুলেছে পারিপার্শ্ব-সচেতন। উত্তর-তিরিশের রবীন্দ্র-কাব্যে যে পৃথ্বীচেতনা তার পূর্বগামী 'মুক্তধারা' 'অচলা-য়তন' 'রক্তকরবী' রূপকনাট্যগুলি; তার উত্তরপুরুষ 'নবজাতক' 'জন্মদিনে' 'প্রান্তিক' ইত্যাদি। মধ্যবর্তী—'শেষসপ্তক'। তার সঙ্গে মেলাতে হয় 'পলাতকা'র ঘরোয়া পরিবেশকে। কল্পলোক কবির মনে হলেও মনঃপূত হয় নি; তাই সেই স্বর্গ থেকে সরে এসেছেন মর্ত্যের কাছাকাছি। ভালোবেসেছেন, আনন্দ পেয়েছেন, বলেছেন—

'আমার শেষবেলাকার ঘরখানি
বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে।
তার নাম দেব শ্যামলী।'

বা

'আমি ভালোবেসেছি
বাংলা দেশের মেয়েকে।'

এ রসাবেশ আধ্যাত্মতত্ত্ববিরহী রিয়ালিষ্ট কবির; আসক্তিবিহীন ব্রহ্মবিহারী সাধকের নয়। তাই শুনি—

আমি তো সাধক নই,
আমি কবি, আছি
ধরণীর অতি কাছাকাছি
এপারের খেয়ার ঘাটায়।'

এবং এপারের মানুষদেরই অন্তরংগ তিনি, এই তাঁর শেষ পরিচয়।

'শেষ সপ্তক'-এর সার্থকতা আর একদিক থেকে। 'পুনশ্চ' থেকেই কবির বস্তুচেতনা বস্তুঘনিষ্ঠ হ'তে থাকে। যে রোমান্টিক ও দার্শনিক জগতে তিনি এতদিন নিরবচ্ছিন্ন বসবাস করে এসেছেন, জাগতিক সমস্যার কাল্পনিক তাত্ত্বিক বা আধ্যাত্মিক দর্শনে বিচার করেছেন, আজ তা থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন করে নিতে পেরেছেন নিজেকে। বিরামবিহীন স্বপ্নদর্শন থেকে মুক্তি ঘটেছে তাঁর—

'রূপনারায়ণের কূলে জেগে উঠিলাম।
জানিলাম
এ জীবন স্বপ্ন নয়।'

'শেষসপ্তকে' বললেন—

'যৌবনের প্রান্তসীমায়
জড়িত হয়ে আছে অরুণিমার ম্লান অবশেষে—
যাক্ কেটে এর আবেশটুকু;
সুস্পষ্টের মধ্যে জেগে উঠুক
আমার ঘোর-ভাঙা চোখ।'

এই ঘোর-ভাঙা—এই স্বপ্নভংগ রবীন্দ্রজীবন-ধর্মে কম কথা নয়। অভিজাত কবি যে 'ব্রাত্য' 'মন্ত্রহীন' 'জাতি-হারা' রূপে আগামীকালে দেখা দিলেন, এ হ'ল তারই পূর্বাভাব। কালের পুতুলের কালের শিল্পীরূপে আত্মপ্রকাশ। এই বৈপ্লবিক মানস-পরিবর্তনের সূক্ষ্ম অথচ স্পষ্ট ইংগিত আছে আলোচ্য কাব্যের বাস্তব সপ্তকগুলিতে। অন্যদিকে, কবি ধ্যানের মাধ্যমে নিকটতর সান্নিধ্য অনুভব করেছেন তার ইষ্টদেবতার জগৎ-জীবনের রহস্যের মূলকেন্দ্রে উপনীত হয়েছেন, জয় করেছেন খণ্ড সীমিত মনোভাবকে। তাই আজ তিনি 'মৃত্যু-রাখাল' মৃত্যুকে তাড়িয়ে বেড়ান এক জন্মচারণ-ক্ষেত্র থেকে জন্মান্তরে।

আধ্যাত্মিক আকুতি ও উপলব্ধি এবং বাস্তবিক আরতি ও অনুভূতি দুদিক থেকেই রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহের ছেদহীন স্রোতোধারায় 'শেষসপ্তক'-এর এক বিশিষ্ট মূল্যবান ও ভারসহ স্থান আছে।

ঝিনুকের স্বপ্ন

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দত্ত

ও হৃদয়, চুপ-চুপ-চুপ!
তোকে যে সাগর হতে হবে;
এই সব ব্যর্থ কলরবে
ভুলে যাবি নিজের স্বরূপ!

ও হৃদয়, আপন অতলে
যে রত্ন ক্রমশঃ ভারী হয়,
তার অসামান্য পরিচয়
পাওয়া যায় সব স্তব্ধ হলে!

ও হৃদয়, আত্মস্থ হৃদয়,
আঁধারে তৃতীয় চোখ মেলে
ঝিনুকের স্বপ্ন খুঁজে পেলে,
অবশ্যই হবে তোর জয়॥

রিক্সওয়ালা

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

রমেশের জন্মদিন উপলক্ষে ভূরিভোজনের ডাক পড়ল। এই জাতীয় নিমন্ত্রণ আমি পারতপক্ষে প্রত্যাখ্যান করি না। বিশেষ করে রমেশের বাড়ীতে কারণ ওখানে জমকাল প্রত্যাশা থাকে।

নিমন্ত্রিতদের ভিতর প্রায় সকলেই এসেছিলেন। কেবল পুরুষের সমাবেশ। বৈঠক গুলজার হয়ে উঠতে সময় লাগল না। বেপরোয়া দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা, তার সঙ্গে বিশুদ্ধ কেচ্ছার সুব্যবস্থা থাকায় তর্ক ও গল্প গড়াতে গড়াতে রীতিমত রাত হয়ে গেল। চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় আহারান্তে ঢাক পেটান ঢেকুর যখন আকণ্ঠ ভরাটের সঙ্কেত দিল তখন ঘড়ীর কাঁটা এগারটার ঘর পার হয়ে গিয়েছে।

সর্ব্বান্তঃকরণে ভোজনকে গ্রহণ করায় দেহের ওজন দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল। তার উপর শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বলতে হয়, আমার শরীরটিও বেশ পুষ্ট। হেঁটে বাড়ী ফেরার ক্ষমতা নেই। এদিকে ট্রাম বাস বন্ধ। বন্ধুর বাড়ীতে রাত্রি কাটানও চলে না। যে অজুহাতই গৃহিণীর সামনে ধরি না কেন একটা তুমুল কাণ্ড বেধে যাবে। এই সূত্রে রমেশের উপর অভিযোগ জড় হয়ে উঠতে লাগল। ভাবতে লাগলাম, ভাল করেই যদি খাওয়ালি ত আমার মত নিমন্ত্রিতকে বাড়ী পৌঁছিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলি না কেন। ঘরে গোটা তিনেক গাড়ী মজুত আর আজই রবিবার বলে চালকদের ছুটি দেয়া হ'ল। মনে মনে বিচার করে দেখলাম, ছুটি না দিয়েই বা করে কি। কলের টাকায় বড় লোক। প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধ ঘড়ীর ঘণ্টা ধরে। ইচ্ছা করলেই কি এ যুগে মুনিবের মত মুনিব হওয়া যায়।

ইতিমধ্যে, স্বল্পাহারী স্লিম (slim) মার্কা ছিপ্‌ছিপে ছোকরার দল, "বেজায় খেলাম, বেজায় খেলাম, বড় ভাল লাগল, many happy returns of the day" ইত্যাদি মামুলি বোল মুখস্থ আওড়ে, যে যার গাড়ী চালিয়ে বাড়ী ফিরল একজনও বলল না, মশাই আসুন, আমার গাড়ীতে lift দিয়ে দিচ্ছি। আমি একজন প্রফেসার মানুষ, মোটা শরীর, বেশী খেয়ে ফেলে হাঁই ফাঁই করছি সে দিকে কাহার ভ্রূক্ষেপ নেই, যে যার নিজেরটা নিয়েই ব্যস্ত। নয়া যুগের কাণ্ডই আলাদা।

আমি তখন "বেশ লাগলর" পালা শেষ করে রাস্তায় নেমে পড়েছি। জিদ চেপে গিয়েছিল, ঠিক করে ফেলেছিলাম নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নেব। চৌমাথার দিকে হাঁটতে লাগলাম, রিক্স অথবা ট্যাক্সির আশায়। শহর হলেও এ অঞ্চলের বাসিন্দারা রাত্রিটা ঘুমিয়েই কাটায়। ট্যাক্সি বা রিক্স ষ্ট্যাণ্ড একটু দূরে। যথাস্থানে পৌঁছিয়ে দেখি ষ্ট্যাণ্ড খালি, আমার অবস্থাও কাহিল। গুরু আহারের পর ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি। পা অচল, টেনে হিঁচড়ে কোন প্রকারে চলেছি। শেষ পর্য্যন্ত একটা ল্যাম্প পোষ্ট ধরে দাঁড়ালাম। চোখ একেবারে জুড়ে আসছে। পোষ্টের তলায় বসে পড়ার ইচ্ছা এল, কিন্তু দোপ-দোরস্ত পরিচ্ছদসহ ভদ্র সন্তানকে রাস্তার মাঝখানে আসীন দেখলে, পাহারাওয়ালার নজর সহজেই আকৃষ্ট হবে, তার পর হাজত বাসের ব্যবস্থা হলেই চমৎকার।

অনেকক্ষণ সময় কেটে গেল। বোধ হয় গলীর দিকে রিক্সর ঘণ্টা শুনলাম। ভুল করি নি, আওয়াজ আমার দিকে চলে আসছিল, ধড়ে প্রাণ এল, সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু কপাল খারাপ, রিক্সওয়ালা সওয়ারী নিয়ে চলেছে এবং আরোহী অকথ্য জড়ান ভাষায় লোকটাকে গালাগালি দিচ্ছে। এই সময় পাশের বাড়ীর দেয়াল ঘড়িতে বারটা বাজল। আর তো দাঁড়িয়ে থাকা যায় না, ঘুম কাটিয়ে ওঠার জন্য একটি নতুন সিগার ধরালাম। শরীরের যে অবস্থা তাতে ধোঁয়াকে মৌতাতের স্তরে নিতে পারছিলাম না। এমনি সময় আবার রিক্সর ঘণ্টা বাজল। শব্দ গলির দিক থেকেই আসছিল। রিক্সর গতি মন্থর। আওয়াজ বড় রাস্তার কাছে আসার আগেই গলীর মোড়ে গাড়ী থেমে গেল। অনুমান করতে হোলো খদ্দের জোগাড় হয়ে গিয়েছে, দমে গেলাম। ঐ গলিটার শুনেছি রাতে বাজার বসে। কারবারীর ভীড় বাড়ে গভীর রাতে। বিড়ি মুখে রিক্সয় চড়া এখানে একটি বিলাসের অঙ্গ। ভাবলাম রিক্সওয়ালা কোন সম্ভ্রান্ত

খদ্দের বাগিয়ে ফেলেছে। কিন্তু অনেকক্ষণ ঘণ্টার আওয়াজ শুনছি না। এ ত খদ্দের পাওয়ার লক্ষণ নয়। একবার মনে হ'ল এগিয়ে দেখি। কিন্তু গলিটার দিকে যেতে সাহস পেলাম না। জানা শোনা কোন লোক যদি দেখে ফেলে তা হলে চরিত্র চিরকালের জন্য দাগী হয়ে যাবে। দুষ্ট লোকদের কথা কিছুই বলা যায় না। ওরা সুবিধা পেলেই কম বয়সের অনিচ্ছাকৃত ঘটনাকেও টান মারে এবং পুরাতনের সঙ্গে নতুনের যোগ দিয়ে কেলেঙ্কারীকে রসাল করে ছাড়ে। অবস্থার শাসনে পূর্ব্বোক্ত স্থানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। আবার ঘণ্টা বেজে উঠল। এইবার দেখলাম, রিক্স বড় রাস্তার দিকে মোড় ঘুরেছে। রিক্স খালি। আর কথাটি নয়, চিৎকার করে ডাক দিলাম, "এই রিক্সওয়ালা।" ক্ষীণস্বরে উত্তর এল, "হাঁ বাবু আসি" লোকটার চলার গতি এমনই অসুস্থ মানুষের মত যে, আমাকেই মান-সম্ভ্রম পরিত্যাগ করে গাড়ীর দিকে এগুতে হ'ল। লোকটার চেহারা দেখে গাড়ীতে ওঠা সম্বন্ধেও দ্বিধান্বিত হয়ে গেলাম। একেবারে অস্থিসার, তার উপর খক্ খক্ করে কাশছে। মাথাটাও মাঝে মাঝে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। সন্দেহ রইল না, রাতের বাজারে সস্তার মাল বেশী খেয়ে ফেলেছে। এখন কি করা যায়? দোমনা অবস্থায় যখন দাঁড়িয়ে আছি তখন লোকটা বললে, "ভয় পেয়োনা বাবু, তোমাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছিয়ে দেব। উৎসাহিত হবার মত কিছু পেলাম না, বরং মনে হ'ল কোন লুকান মতলব আছে। রিক্সয় একবার চড়াতে পারলেই কোন একটা বদখৎ জায়গায় নামিয়ে দেবে তখন চরিত্র সামলান একটি সমস্যা হয়ে উঠতে পারে। আমার ইতস্ততঃ ভাব দেখে রিক্সওয়ালার ঠোঁটে মুচকি হাসির ঢেউ খেলে গেল। হাসি সোজা হাসি নয়, রাতের বাজারে অনেক খদ্দের ঘাঁটিয়ে শিখতে হয়েছে। বললাম, "আমি যেখানে যেতে চাই ঠিক—সেইখানে পৌঁছে দিতে হবে।"

গম্যস্থলের নাম শুনে লোকটা আঁতকে উঠল, বললে, সে যে অনেক দূরে। বুঝলাম, ভাড়া বাড়াবার একটি প্যাঁচ খেলল। যে অবস্থার ফেরে পড়েছিলাম তাতে নত না হয়ে উপায় ছিল না। জানালাম যা পাওনা, তার চেয়ে বেশী দেব। কত বেশী দেব, কি দেব, কিছুই জানা দরকার বোধ করল না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, "বসুন বাবু, বসুন।"

রিক্সয়ে উঠলাম, বসেই আছি, গাড়ী আর চলে না। বলাই বৃথা—ধমকের দাবী কাছে ছিল, হুঙ্কার দিয়ে উঠলাম। যেখানে যেমনটি দরকার, ধমক কাজে লেগে গেল, চাকা চলল, ধীরগতি ক্রমান্বয় দ্রুত হয়ে উঠল। মনে মনে বললাম, এতক্ষণ কেন ন্যাকামি করছিলে বাছাধন।

গভীর রাত, নিঝুম রাস্তা, রিক্স চলেছে ঠুং ঠুং শব্দ করে। ফুর্-ফুরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুম এসে গেল। রিক্স-ওয়ালার পরিশ্রমে কতক্ষণ আরাম ভোগ করেছিলাম বলতে পারি না। বসা অবস্থাতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বিঘ্ন ঘটল আচমকা গাড়ী থেমে যেতে। হেঁচ্‌কায় রিক্স-ওয়ালার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলাম প্রায়। টাল সামলে দেহের সমভার রক্ষা হবার পর, যখন বুঝলাম অপমৃত্যুর ফাঁড়া কেটে গিয়েছে তখন লোকটাকে এমন একটি সম্বোধন দ্বারা আপ্যায়িত করলাম যা নিরীহ মানুষের রক্তকেও চঞ্চল করে তুলতে পারে। কিন্তু রিক্স-ওয়ালা নির্ব্বিকার।

গালাগালি সম্বন্ধে মানুষ নির্লিপ্ত হলে বুমারাঙের মত আঘাত নিজের দিকে ফিরে আসে। গাড়োয়ান গাল খেয়েও কিছু না বলায় আমার রাগ আরো চড়ে গেল, কিন্তু উপযুক্ত ভাবে মনবাঞ্ছা প্রকাশ করার অসুবিধা ছিল। জনমানবহীন স্থানে চেঁচামেচিতে লোক জড় হলে বিপদে পড়ব আমি। এ সব জায়গায় চাঁদার মারের ব্যবস্থা নির্ব্বিচারে হয়ে থাকে এবং ভদ্রলোককে পিটাতে পারলে ওরা ভাবে কিছু পুণ্য ব্যবস্থা হয়ে গেল। এদিকে রাগকে আর ধরে রাখা যায় না, দাঁত কামড়ে চাপা গলায় বললাম, "গাড়ী নিচু কর, এইখানেই নেমে যাব। ছোট-লোক, যদি বেশী খেয়ে ফেলেছিস ত সওয়ারী নিলি কেন? তোকে এক পয়সাও ভাড়া দেব না, হেঁটেই বাড়ী যাব।"

"ভাড়া দেব না" কথাটা যেন তীরের মত গিয়ে বিঁধল। পয়সার কি মহিমা, এক কথায় লোকটার মাতলামি ছুটে গেল। বার কয়েক গলা খাকরানি দিয়ে গাড়ীটানা সুরু করলে। চাকা সামনের দিক খানিকটা চলে আবার আপনা থেকে পিছিয়ে আসে। ওঠা-নামার উৎপাতে আমার ঘুমের ঘোর একেবারে কেটে গিয়েছে। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি আমরা একটা পোলের তলায় এসে পড়েছি। জায়গাটি চেনা, তবে ভুল রাস্তায় নিয়ে এসেছে। খাড়াই আর ঢালু রাস্তার টানা-পোড়েনে আমার প্রাণান্ত অবস্থা। এবার দৃঢ় ভাবেই বুঝিয়ে দিলাম, আমাকে নামতে হবে।

সঙ্গত প্রস্তাব শুনে রিক্সওয়ালা বললে, "পোলের উপর গাড়ীটা নিতে পারলে আর কোন অসুবিধা নেই, যদি একটু নামেন তা হলে ভাল হয়।"

অন্য সময় হলে ভাবতাম, আন্দার মন্দ না। বাবু সাহেব খালি গাড়ী টানবেন আর হেঁটে পরিশ্রান্ত হয়ে পয়সা দেব আমি। উপস্থিত ক্ষেত্রে ওর প্রস্তাব ভাববার বিষয়, লোকটার শরীর যে রকম তাতে সওয়ারিসহ খানিকটা উপরে ওঠার পর যদি দম ফুরিয়ে যায় তা হলে সামনের দিকে মুখ রেখে পিছন দিকে গড়াতে হবে। বিপদসঙ্কুল পরিণতি থেকে বেঁচে যাওয়ার আশায় খালি গাড়ী নিয়েই উপরে উঠতে দিলাম। গাড়ী থেকে তখন নেমে পড়েছি, কিন্তু টানা-পোড়েনে পুরান চাল সুরু হ'ল। সামনের দিকের চাকা একটু টানলেই, পিছন দিকে বেশী গড়াতে আরম্ভ করে। বেগতিক দেখে আমিও পিছন থেকে ঠেলতে আরম্ভ করে দিলাম। শেষ পর্য্যন্ত রিক্স পোলের উপর এসে পৌঁছাল! আমি তখন হাঁপাচ্ছি, গলদঘর্ম হয়ে উঠেছি।

ভদ্রলোকের ছেলে রিক্স টানা পোষায়? একটু জিরিয়ে নিয়ে গাড়ীতে উঠতে যাব, এমন সময় লোকটা বলল, "বাবু, আপনার ওজন বেশী, নামবার সময় আরও কষ্ট। নতুন তেল দেয়া চাকা নীচের দিকে টান যদি সামলাতে না পারি তা হলে···। ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল, ঢালুর দিকে গাড়ীতে চড়লে হাসপাতালে যেতে হবে। আমিও মনে মনে ঐরকমটি যে ভাবছিলাম না এমনটি নয়। বিপদ সুনিশ্চিত জেনে, দয়া দেখানর সুযোগ ছাড়তে পারলাম না। বললাম, তোর যখন অত কষ্ট হচ্ছে তখন পথটা হেঁটেই যাই। কিন্তু ভাড়ার কথা মনে রাখিস। যতটা হাঁটতে হ'ল ততটা হিসাব করে ভাড়া বাদ দিতে হবে।"

হিসাবের কড়াকড়ি শুনে লোকটা কেবল আমার দিকে তাকাল—কিছু বলল না। মৌন সম্মতিতে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কিছু খরচ কমল।

আমি পোলের উপর দাঁড়িয়ে রইলাম। রিক্সওয়ালা খালি গাড়ী নিয়ে চলতে লাগল। খানিকটা যাবার পর দেখি চাকার গতি বেগমান হয়ে উঠেছে। ক্ষণে ক্ষণে গাড়ীর গতি বেড়ে চলেছে। চাকার কাঁকে রিক্সওয়ালার চলন্ত পা-দুটোকে দেখলে মনে হয় কিছুতে যেন ঠেলা মেরে সামনে এগিয়ে দিচ্ছে। গাড়ী তাড়া করেছে লোকটাকে চাপা দেবার জন্য। দেখতে দেখতে যা আশঙ্কা করছিলাম তাই ঘটল। গাড়ী পোলের তলায় পৌঁছাতেই হুড়মুড় করে রাস্তার পাশে ডাষ্টবিনের উপর গিয়ে পড়ল। লোকটার কি হ'ল কে জানে! দৌড়বার ক্ষমতা আমার ছিল না—যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখি গাড়ীটা ডাষ্টবিনের ঠেকায় দাঁড়িয়ে গিয়েছে, আর লোকটা মাটিতে পড়ে গোঙাচ্ছে। মুখময় রক্ত, কিন্তু সম্পূর্ণ জ্ঞান হারায় নি। কথা বলার চেষ্টা করছে কিন্তু উচ্চারণ এমনই শ্লেষ্মাজড়িত যে কথা যা বার হচ্ছে তার থেকে কোন মানে করা যায় না।

ঘটনাটি ঘটেছিল আলোর কাছেই—পরীক্ষা করে দেখলাম মাথা বা বুক কোথাও জখম হয় নি। কাছে যেতে সুরার উৎকট গন্ধও পেলাম না। তবে কি রক্ত মুখের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে? খক্ খক্ করে কাশি, শ্লেষ্মাজড়িত ভাষা তার সঙ্গে ঐরূপ রক্তপাত, আমাকে ভাবিয়ে তুলল। এই অবস্থায় লোকটাকে ফেলে যেতে মন চাইল না। মনে পড়ল রাস্তার ওপারে আমার চেনা ডাক্তারের বাড়ী। পরিচয় প্রাচীন হলেও অনেক দিন দেখা-শোনা নেই, হয়ত আমাকে চিনতে পারবে না। তা হলেও কি একটা মরণোন্মুখ মানুষকে দেখবে না?

রিক্সওয়ালার দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিল না। উপায়ান্তরে তারই গাড়ীতে বসিয়ে ডাক্তারের খোঁজে রাস্তা পার হলাম। ভুল করি নি, ঠিক জায়গায় পুরান ডিস্‌পেন্‌সারীর সাইনবোর্ড ঝুলছে। দরজায় কড়া নাড়লাম, কাহারও সাড়া পেলাম না। শেষ পর্য্যন্ত ডাক্তারের নাম ধরে ডাকতে হ'ল। গলা ছেড়েই ডাক দিয়েছিলাম, একটু বাদে দোতলার জানালার সামনে ডাক্তারবাবু মুখ বার করলেন, কাতরভাবে জানালাম, "তাড়াতাড়ি নিচে আসুন। একজন লোক মরে।"

প্রশ্ন শুনলাম, রোগী কোথায়?"

বললাম, রাস্তার ওপাশে আছে—এখুনি নিয়ে আসছি।

রিক্সওয়ালাকে তারই গাড়ীতে চড়িয়ে ডাক্তার বাবুর দরজার সামনে নিয়ে এলাম। অপ্রত্যাশিত দৃশ্য ডাক্তারকে অবাক করে দিয়েছিল। ভদ্রসন্তান রিক্স টানে এবং রিক্সওয়ালা আরোহী হলে অনেক কিছুই ভাবা সম্ভব। হঠাৎ রুঢ় হয়ে উঠলেন। চিৎকারকে সংযমিত স্বরে আটকে বললেন, "মাতলামি করার আর জায়গা পেলে না? তোমার সঙ্গে জানাশোনা না থাকলে এখুনি পুলিস ডাকতাম। আর একটি কথা বোলো না, ভদ্র-পাড়া থেকে চলে যাও।"

কথা শেষ হতেই সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলেন। এর পর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকার কোন মানে হয় না, রিক্সওয়ালার কাছে ফিরে এলাম। দেখি লোকটা নিঃশ্বাস নেবার জন্য হাঁপাচ্ছে। কথা বলার চেষ্টা করল কিন্তু যা শুনলাম তা জড়ান ভাষায় কোন ঠিকানা। শেষপর্য্যন্ত বহু কষ্টে জানাল, "ভাড়াটা আমার রোগা ছেলেটাকে দিও, সারা দিন না খেয়ে আছে।"

এর পর কথা বন্ধ হয়ে গেল। বুঝলাম সব শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন ভাড়া দি কাকে?

বিপ্লবীর জীবন-দর্শন

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী

উৎস সন্ধানে

(পান্থ তুমি পান্থজনের সখা হে
পথে চলা সেই ত তোমার পাওয়া,
যাত্রাপথের আনন্দগান যে গাহে
তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া ;
চায়না সে জন পিছন পানে ফিরে,
বায়না তরী কেবল তীরে তীরে,
তুফান তারে ডাকে অকূল নীরে,
যার পরাণে লাগল পাগল হাওয়া।
...রবীন্দ্রনাথ)

আমি আজ জীবনের অপরাহ্ন বেলায় উপস্থিত। পূর্বাহ্নের গতিপথ নাতিদীর্ঘ ষাট বছরের উজান পথে। যে পরিবেশের মধ্যে সে জীবন-ধারা বয়ে এসেছে তা আজকের কর্মপদ্ধতি, আদর্শ,এমনকি জীবনের মূল্যবোধ—সবকিছু থেকেই যেন আলাদা। একটা সমাজ বা জাতির জীবনে ষাট বছরের পরিক্রমা অতি নগণ্য, কিন্তু এ ব্যবধানেই কেমন করে এমন একটা বিপ্লব ঘটে গেল তা মনকে বিস্মিত করে। কিন্তু কোন কিছুই আকস্মিক ঘটে না। কখনও বা চোখের সামনে, কখনও বা অন্তরালে, যে প্রস্তুতি চলতে থাকে তাই যখন সহসা আমাদের কাছে প্রকাশিত হয় তখন ভাবি এমনটি ত হওয়ার কথা ছিল না !

আমাদের ছোটবেলায় দেখেছি বালকদের মনে একটা প্রশ্ন জাগত বা জাগান হ'ত—এই জীবনের উদ্দেশ্য কি, কিসে হবে এর সার্থকতা ? জীবনটা কি কেবল আহার, নিদ্রা, বিবাহ এবং সংসার প্রতিপালন মাত্র ! এ ছাড়া কি আর কোন আদর্শ বা কাম্য নেই ! চিন্তাধারা এমনি মহৎ পর্যায়ে উন্নীত করবার কৃতিত্ব অবশ্য ছিল বিপ্লবী পথিকৃতদের। চরিত্রগঠন, সদাচরণ, ধর্মবিশ্বাস এ সবই মনে হ'ত মনুষ্যজীবনের ভিত্তি। এই বনিয়াদই হ'ত জীবন-পথের পাথেয়। পিতামাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, গুরুজন, সমবয়সী, শিক্ষক-সহপাঠী, সকলের সঙ্গেই আচরণ নিয়ন্ত্রিত হ'ত একই নৈতিক মূল্য-বোধ দিয়ে।

এইভাবে চলতে গিয়েই সমিতিবদ্ধ হয়ে পরিচালকের নিয়ন্ত্রণাধীনে জীবনগঠন সহজ হয়ে আসত। জীবনের সবক্ষেত্রেই নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলতে হ'ত। ক্রমে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হ'ত। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ, বোমা, পিস্তল, গুপ্তসমিতি, বৃটিশ বিতাড়নের কথা আসত অনেক পরে। বহু বৎসর বিপ্লবী সমিতির বিশ্বাসী দায়িত্বশীল সভ্য থেকেও একটা বোমা বা পিস্তল দেখে নাই, হাতে ধরা ত দূরের কথা, এমন লোক অনেক ছিল। আর এ নিষ্ঠা ও একাগ্রতার ফলেই ক্রমে মমপ্রাণ দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মবিসর্জন বা কারাগারে তিলে তিলে নিজেকে ক্ষয়, সর্বোপরি ফাঁসির মঞ্চে কিংবা গুলীবিদ্ধ হয়ে আত্মদান করে জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেত। সবচেয়ে বড় কথা হলো এই যে, পরিচালকরাই হতেন এমনি বিপ্লবী চরিত্রের আদর্শ স্বরূপ !

যে কাহিনী বলতে গিয়ে এত কথার অবতারণা করলাম, সে আমার নিজের জীবনে এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি না যা রূপায়িত করে রাখবার মত। বিপ্লব এবং বিপ্লবী জীবন গঠনের ইতিকথা ভিন্ন আর কিছুই নিজের বলে স্মরণ করতে পারছি না। আমার বয়স তখন তের কি চৌদ্দ। ১৯০৬ সনে একদিন আমার পিতৃদেবের আদেশে অনুশীলন সমিতির প্রাঙ্গণে গিয়ে সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হলাম—প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। অনেকগুলি প্রতিজ্ঞার সূত্রই সেদিন গ্রহণ করতে হয়েছিল, তার মধ্যে এ কয়টিও ছিল—"এই সমিতি হইতে কখনও বিচ্ছিন্ন হইব না ; সর্বদা সমিতির নিয়মাধীন থাকিব ; দেশের, ক্রমে জগতের মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত হইব।" বিদেশী ইংরেজের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করবার ব্রত গ্রহণ করলাম। কায়মনোবাক্যে এই কার্যে ব্রতী হব, প্রয়োজন হলে সর্বস্ব, এমনকি প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করে কর্তব্যসাধনে প্রবৃত্ত হব।

সেই যে ধ্রুবতারা লক্ষ্য করে অজানাপথে চলতে শুরু করেছি, আজও সেই চলার যেন শেষ হ'ল না। এই বন্ধুর পথে বারে বারে নিভে গিয়েছে আলো, পথে নেমে এসেছে ঝড় ঝঞ্ঝা দুর্যোগের তিমির রাত্রি ! তখন সেই বাত্যাবিক্ষুব্ধ তাণ্ডবকেই সাথী করে এগিয়ে গিয়েছি। নৈরাশ্য কিংবা অবসাদে পথে ভেঙ্গে পড়ি নি। "পথে চলা

সেই ত তোমার পাওয়া'—এই আনন্দই প্রাণকে সজীব রেখে চলার গতি করে তুলেছে দুর্বার। কেন যে এমনি করলাম, এ বয়সী ছেলেদের দ্বারা এ কেমন করে সম্ভব হলো সে কথাই খুলে বলতে চেষ্টা করছি।

আগেই বলেছি কার্যকারণ সম্বন্ধ বিরহিত আকস্মিক কিছুই ঘটে না। আর একটা কথা এই যে, কোন একটা মানুষকে আর সমস্ত-কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে বুঝতে গেলে কিছুই বোঝা যায় না। সমাজের ক্রমাভিব্যক্তির মধ্যে, কখনও বা বৈপ্লবিক সংঘাতের মধ্যে, এবং নানা প্রতিবেশের আওতার মধ্যে ঠিক তদ্রূপ মানুষই সৃষ্টি হয়। আমার জন্ম ও পুষ্টি হয় বৈপ্লবিক পরিবেশ এবং আবহাওয়ার মধ্যে। একটা সদ্যজাগ্রত জাতির আত্মচেতনা লাভের কলকোলাহলে আমার প্রথম নিদ্রাভঙ্গ হয়। সেই স্রোতের মধ্যে নিজের জীবনধারা মিশিয়ে দিয়ে পঞ্চাশ বছরেরও ওপর বৈপ্লবিক জীবনযাপন করে আজ এক বিচিত্র অবস্থার মধ্যে এসে পড়েছি। কার্যকারণ খুঁজতে গিয়ে যে সূত্রে সবকিছু গাঁথা তার যেন সমস্ত সন্ধান করে উঠতে পারছি না।

বৈপ্লবিক আবহাওয়ায় বাস করে, বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জীবনসমস্যার সম্মুখীন হয়ে কত বিচিত্র মানুষের সঙ্গলাভ করেছি, কতরকম অবস্থার মধ্য দিয়ে চলতে গিয়ে জীবনের কত বিচিত্র আস্বাদ গ্রহণ করেছি, তারা সবাই আজ আমার স্মৃতির দুয়ারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই এসে হাজির হয়েছে এমন কথা বলতে পারিনে। কত মানুষ, কত ঘটনা যা এক সময় জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল তার অনেক দাগ আজ মুছে গিয়েছে বা লুপ্তপ্রায়। তথাপি যে সব মানুষের ছবি আমার মনে আজও স্পষ্ট, যে সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার মধ্যে মানুষ হয়েছি, যা কিছু আমার বিপ্লবী জীবন গড়ে তুলেছে বলে আমার মনে হয় তারই কতকটা পরিচয় দেবার জন্য এই কাহিনীর সূত্রপাত করলাম। এর মূল্যনিরূপণ জনসাধারণের হাতেই ছেড়ে দিলাম।

২

প্রথমেই প্রণাম করি আমার মামাবাড়ী ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর মহকুমার অন্তর্গত হরিণা চালিতাতলী গ্রামকে। কেন না, সেখানেই আমার জন্ম হয় বাংলা ১৩০১ সালের ৩রা বৈশাখ। আমার পিতৃকুল এখন পর্য্যন্তও নৈকষ্য কুলীন ব্রাহ্মণ। বর্ণাশ্রম মতে ব্রাহ্মণই বর্ণশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত। তদুপরি হাজার বছর আগে বল্লাল সেন যে সমাজব্যবস্থা করে যান তাতে কুলীনরা পরিগণিত হলো শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরূপে।

"আচারো, বিনয়ো, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠা, বৃত্তি, স্তপোদানম্, নবধা কুললক্ষণম্॥"

যদিও কৌলিন্যের এই নয়টি লক্ষণ ছিল কিন্তু তথাপি আজ মূর্খ হলেও কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে কুলীনই থেকে যায়, আবার যত গুণবানই হোক না কেন চণ্ডালের ছেলে চণ্ডালই হয়।

বল্লাল সেনের পরে ব্রাহ্মণসমাজের পুনর্গঠন করে যান দেবীবর ঘটক। চার কি পাঁচশ' বছর আগে। খড়দহ, ফুলিয়া, আচার্যসাগরী, সর্বানন্দ প্রভৃতি নানাপ্রকার মেল বন্ধন করে যান। এর মধ্যে আবার খড়দহ ও ফুলিয়া মেল শ্রেষ্ঠ এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন বলে পরিগণিত হয়। বোধ হয় তিনিই ব্যবস্থা করে যান যে, কুলীনদের মধ্যে যারা কোনপ্রকারে ভঙ্গ হয় নি—অর্থাৎ একেবারে নিকষ, তারাই গণ্য হবে নৈকষ্য কুলীন হিসেবে।

একেইত হিন্দুসমাজ নানাবর্ণে বিভক্ত। তদুপরি নানাপ্রকার মেলবন্ধন ও উচ্চ-নীচ শ্রেণী বিভাগের ফলে ব্রাহ্মণরাও শতধাবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। আর তারই প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ ঘটকসমাজ হলো প্রবল প্রতাপান্বিত। তাঁরাই ছিলেন হিন্দুসমাজ-কুলশাস্ত্রের রক্ষক ও ব্যাখ্যাকর্তা। কে ছোট, কে বড়, কার কি দোষ আছে, তার খবরই যে শুধু এঁরা রাখতেন তা' নয়, সমাজে প্রচারও করতেন বটে। এমনকি এক জোট হয়ে ইচ্ছা করলে যে কোন বংশকে ওঠাতে কিংবা নামাতে পারতেন। গল্প শুনেছি যে, অর্থলোভে ঢাকা জেলার ভাওয়ালের ব্রাহ্মণ জমিদার বংশকে এঁরা উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলে ঘোষণা করেছিলেন; এবং তন্তুবায় নন্দলাল বসাককে কায়স্থ বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এ নিয়ে জনসাধারণের মনে কম কৌতূহল হয় নি। লোকে ব্যঙ্গ করে বলত:

"তাঁতি ছিল, কায়েত হ'ল মুন্সী নন্দলাল;
ভাওয়ালেতে উদয় হলো বজ্রযোগিনীর পুসিল্লাল।"

এই 'মুন্সী' উপাধি মুসলমান আমলের স্মৃতিবিজড়িত। তখন অনেক হিন্দু নিজ নিজ ব্যবসা বা চাকুরি অনুযায়ী পারিবারিক উপাধি গ্রহণ করেছিল। মুন্সী, বক্সী, চাকলাদার, খাসনবিশ, খাঁ, মজুমদার প্রভৃতি উপাধি আজও হিন্দুদের উপর মুসলমান রাজত্বের প্রভাব ঘোষণা করছে। কেবল হিন্দুরাই নয়, মুসলমানরাও এ উপাধি বংশানুক্রমে ব্যবহার করে আসছে। ছড়ায় বজ্রযোগিনীর কথা উল্লিখিত আছে। এই বজ্রযোগিনী ঢাকা জেলার পুরবিক্রম পরগণার একটি সুপ্রসিদ্ধ গ্রাম। আর এই

গ্রামের 'পুসিল্লাল' ব্রাহ্মণগণ শ্রোত্রীয় রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

পূর্বেই বলেছি, আমার জন্ম হয় মামাবাড়ীতে। এ ঘটনা আকস্মিক না হলেও এর মধ্যে একটা সামাজিক বৈচিত্র্য লুকিয়ে আছে। পুরুষানুক্রমে স্থায়ী বাসস্থান কুলীনদের বড় একটা থাকত না। তার কারণস্বরূপ বলা যায় যে, তাদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। সকল স্ত্রী নিয়ে ঘর করা সম্ভব হ'ত না। তা ছাড়া তখন কুল ও সামাজিক বন্ধন ছিল বিবাহের প্রেরণা। আর্থিক অবস্থার সঙ্গে কারুর বিবাহ হওয়া না হওয়ার আজকালকার মত এত কড়াকড়ি ছিল না। সুতরাং কিছুসংখ্যক লোকের পক্ষে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রতিপালন ছিল অসম্ভব। তারা হ'ত ঘরজামাই। কখনও বা বিত্তশালী শ্রোত্রীয় পরিবার কুলীনে কন্যা বিবাহ দিয়ে কন্যাজামাতাকে সম্পত্তি দান করে স্বগ্রামেই কুলীন স্থাপন করতেন। শ্রোত্রীয়দের মধ্যে এমনি কুলীন স্থাপন একটা সম্মানের কাজ বলে পরিগণিত হ'ত। তা ছাড়া ছেলেও ঘরজামাই হওয়ার অপবাদ থেকে রেহাই পেত। আমার মামাদেরই বাড়ী ও সম্পত্তির একাংশের অধিকারী ছিল এমনি কুলীন জামাতার বংশধরগণ।

ঢাকা জেলার দক্ষিণ পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে কীর্তিনাশা পদ্মা। প্রতি বৎসর গ্রামের পর গ্রাম এর করাল গ্রাসে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এর ফলেও বহু পরিবার ঘন ঘন বাসস্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছে। তিন পুরুষের মধ্যে পদ্মার ভাঙনে বাসগৃহ বদলাতে হয়নি এমন পরিবার কমই আছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বাড়ী ছিল বিক্রমপুর অন্তর্গত তেলীরবাগ গ্রামে। তা আজ পদ্মার গর্ভে বিলুপ্ত। হিন্দুরাজা চাঁদরায় কেদার রায়ের আমলের রাজাবাড়ীতে ছিল একটা বিশালকায় মঠ। এ মঠ বিক্রমপুরের প্রাচীন কীর্তির স্তম্ভস্বরূপ ছিল। নদীর বুকের উপর দিয়ে ষ্টীমারে কিংবা নৌকোয় যেতে যেতে এই প্রকাণ্ড মঠ যাত্রীসাধারণকে কৌতূহলী করে তুলত। তাও আজ কয়েক বছর পূর্বে পদ্মার ভাঙনে বিলীন হয়ে গেছে।

সে যাই হোক, যে কথা বলতে গিয়ে এসব অবতারণা করলাম, তা হচ্ছে এই যে, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে কখনও কখনও কুলীনরা শ্বশুরালয়েই বসবাস করতে বাধ্য হ'ত। সন্তানাদি মামাবাড়ীতেই মানুষ হয়ে সেখানেই স্থায়ীভাবে থেকে যেত। আমাদের বর্তমান বাড়ী পিসতুত ভাই শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েরও বাড়ী। আবার শ্রীশবাবুর ভাগিনেয়রাও সেই বাড়ীতেই বাস করছে। আমার খুড়তুত বোনদের ছেলেদেরও এই বাড়ীই বাসস্থান। অর্থাৎ মামাবাড়ীই আপন বাড়ীতে পরিণত হয়েছে।

আমরা আজও নৈকষ্য কুলীন। বহুবিবাহ করতেন বলে কুলীনদের যে বদনাম বা সুনাম ছিল তা থেকে আমাদের পরিবারের যে সবাই একেবারে মুক্ত ছিল এমন কথা বলতে পারি নে। তবে আমাদের পরিবারে এক কাকা ভিন্ন আর কেউ এক স্ত্রী বর্তমান থাকতে দ্বিতীয় বার পাণিগ্রহণ করেন নি। বিপত্নীক হয়ে আমার পিতামহ পুনরায় দারপরিগ্রহ করেছিলেন।

আমার এক অনাত্মীয় বৃদ্ধকে দেখেছি যাঁর তখনও আটটি স্ত্রী বর্তমান। তবে আমার আত্মীয়দের মধ্যে অনেকের একাধিক স্ত্রী বর্তমান দেখেছি। খুড়তুত ও পিসতুত বোনদের অনেকেরই সপত্নী ছিল। স্বামীরা মাঝে মাঝে এসে বেড়িয়ে যেতেন। একাধিক বিবাহ অনেক সময় এরা বাধ্য হয়ে করত। কুলীন ছেলেদের শ্রোত্রীয় বংশের মেয়ে বিয়ে করতে কোন বাধা ছিল না। পরন্তু আগেই বলেছি, শ্রোত্রীয়রা নিজেদের কন্যা কুলীন করবার জন্যই ব্যগ্র থাকত। কিন্তু মুস্কিল হ'ত এই যে, শ্রোত্রীয় ছেলেরা কুলীনের মেয়ে বিয়ে করতে পারত না। তার ফলে কুলীনের ঘরে যেমন মেয়ের সংখ্যা বেশী হ'ত তেমনি শ্রোত্রীয়দের মধ্যে ছেলে হ'ত বেশী। তাই অনেক সময় বদল বিবাহ করতে বাধ্য হ'ত—এক স্ত্রী বর্তমান থাকতেও। অর্থাৎ নিজের বোন বিয়ে দিয়ে সেই পরিবারের কন্যা গ্রহণ করতে হ'ত। একই সঙ্গে তিন ভগ্নীর বিবাহ একই লোকের সাথে এ আমি নিজেই দেখেছি।

তখনকার সেই কৃষিজীবি-সমাজে নানাবিধ গৃহকর্ম সম্পন্ন করতেও অনেক সময় একাধিক বিয়ে করতে লোক প্রলুব্ধ হ'ত। তা ছাড়া, স্বল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণরা আবার নানা মেল-গোষ্ঠি বন্ধনের কড়াকড়িতে বিবাহাদির ব্যাপারে কঠোর বাধানিষেধের সম্মুখীন হ'ত বলে পুরুষরা একাধিক বিয়ে করে সমাজসংস্কার বজায় রাখতেন। কেন না, বিবাহ তখনকার দিনে ধর্মসম্প্রদানের অঙ্গ ছিল। অনূঢ়া নারী সমাজে নিন্দার বিষয় ছিল। আমার এক আজন্মপাগল অস্পষ্টভাষী মামাত বোনের একটা যেমন তেমন বিয়ে দেওয়া হয়েছিল—অবশ্য কুলশীল বজায় রেখে। পাত্রটি কুলশ্রেষ্ঠ হলেও বিয়ে করা ছিল তার পেশা! এ লোকটি পঁচিশ টাকা নগদ একজোড়া ধুতি ও জুতোর বদলে একেবারে সজ্ঞানে, অর্থাৎ সব জেনেশুনেই, আমার পাগল মামাত বোনকে বিয়ে করে তাকে সমাজে পতনের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিল!

যেসব কারণে সমাজে বহুবিবাহ প্রচলিত হয়েছিল তারই ফলস্বরূপ বা প্রভাবে বাল্যবিবাহ স্বীকৃতি পেয়েছিল। শুনেছি, আমার জন্মের পূর্বে কুলীনসমাজে শিশুকে থালায় বসিয়ে বিয়ে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য আমি নিজে এমন কোন বিবাহ দেখি নি। তবে আমার এক দূরসম্পর্কিত আত্মীয়াকে দেখেছি যার বিয়ে হয়েছিল মাত্র ছ'মাস বয়সে। আর বিধবা হন আড়াই বছরে। তিনি বেঁচে ছিলেন একশ' দশ বৎসর। আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় ১৯৩৯ সনে। তিনি এসেছিলেন কলকাতায় তাঁর চক্ষু চিকিৎসার জন্য। তখন তাঁর বয়স ১০৫। ভাবতেও অবাক লাগে! এমনি কলঙ্কিত সমাজের ভাল'র দিক যে ছিল না তাত নয়!

কুলীনসমাজে বাল্যবিবাহ যেমন প্রচলন ছিল, তেমনি বেশী বয়সে বিবাহও খুব নিন্দনীয় ছিল না। চিরকুমারীর দৃষ্টান্তও বিরল ছিল না। আসল কথা, কুলশীল বজায় রেখে বিয়ে দাও ভাল কথা, তা না হলে বয়স নিয়ে সমাজে খুব একটা আলোড়ন কিছু হ'ত না। আমার আত্মীয়দের মধ্যেই দেখেছি পঁচিশ, তিরিশ, এমনকি পঞ্চাশ বছরে মেয়ের বিয়ে হয়েছে। এসব কারণে কুলীনের ঘরে মেয়েদের চলাফেরার স্বাধীনতা ছিল অনেক বেশী অনেক সমাজের অপেক্ষা।

শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে কিন্তু এমনটি হওয়ার উপায় ছিল না। যথাসম্ভব রজঃ দর্শনের আগেই বিয়ে দিতে হ'ত। ঘরে যুবতী অনূঢ়া মেয়ে থাকলে সমাজে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকত।

বিবাহের ব্যাপারে আজকের মত সেদিনও পণপ্রথার প্রচলন উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের কমবেশী সকলের মধ্যেই ছিল। কিন্তু কুলীনসমাজে পণপ্রথা এক রকম চরমেই উঠেছিল বলা যায়। এজন্য কত যে করুণ কাহিনীর অবতারণা হ'ত তার অন্ত নেই। শুনেছি, স্নেহলতা নামে একটি মেয়ে তার বাপকে কন্যাদায় থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য কাপড়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। বাংলা দেশের ঘরে ঘরে স্নেহলতার কথা আলোচিত হতে লাগল। পণপ্রথা খারাপ, এ কথা একবাক্যে সবাই প্রায় স্বীকার করল। আমাদের ছেলেবেলাতেই পণপ্রথা নিবারণের জন্য প্রবল আন্দোলন হয়। এমনকি তখন অনুশীলন সমিতির নেতৃবর্গের মধ্যে একবার এ আলোচনাও হয়েছিল যে, যারা পণপ্রথা গ্রহণ করবে তাদের শাস্তিবিধান করে সমাজসংস্কারের সাহায্য করা উচিত হবে কি না! অবশ্যকর্তব্য মনে করেও নানাদিক বিবেচনা করে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নি।

কুলীনদের অনেক দোষই ছিল। কিন্তু নিজেদের মধ্যে তাঁরা একটা মর্যাদার সমতা মেনে চলতেন। কুলীন কন্যার বিবাহ হ'ত কুলীন ছেলের সঙ্গেই। কিন্তু বরের পক্ষে শোভাযাত্রা হ'ত অশোভন। কেন না মিছিল করে গেলে বরকে বেশী মর্যাদা দেওয়া হয়ে যায়। বর নিজেই মেয়ের বাড়ী এসে বিয়ে করে যাবে। পাত্রপক্ষের তরফ থেকে কোনরূপ মর্যাদা আদায়ের ব্যবস্থাই থাকত না এমনি বিবাহে। দানসামগ্রীর মধ্যে খাট-পালঙ্ক প্রভৃতি কতকগুলি জিনিস দান নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু কুলীন যখন শ্রোত্রীয় কন্যা বিয়ে করত তখন কিন্তু বরপক্ষ পূর্ণ মর্যাদা আদায় না করে ছাড়ত না। আজও এ প্রথা একেবারে উঠে যায় নি।

কুলীনের বাড়ীতে বোনের আদর ও প্রতিপত্তি থাকত খুব। তারাই ছিল ভ্রাতার বংশ-গৌরবের মাপকাঠি। ছোট বংশে বোন বিয়ে দিলে ভ্রাতারা বংশে নেমে যেত। আগেই বলেছি, ভাগনে-ভাগনীরা মামাবাড়ীতেই মানুষ হ'ত এবং অতি আদরেই। তাইত আজও আদর-আবদারের তুলনা দিতে লোকে বলে—"যেন মামাবাড়ীর আবদার।" এর মধ্যে মাতৃপ্রধান (matriarchal) সমাজের চিহ্ন থেকে গেছে। দক্ষিণ ভারতের মালাবারে এখনও কোন কোন শ্রেণীর মধ্যে ভাগনেরা পিতৃপদবীতে পরিচিত হয় না। মামাবাড়ীর পরিচয়ই তাদের পরিচয়।

৩

আমার জন্ম মামাবাড়ীতে হলেও পৈতৃক ভিটা ছিল ঢাকা জেলার অন্তর্গত চুড়াইন গ্রামে। যদিও সেখানে জায়গাজমি পাকাবাড়ী সবই আমার পিতৃদেব করেছিলেন কিন্তু চুড়াইন গ্রামে বসবাসের গোড়াপত্তন করেন আমার পিতামহী বিশ্বরূপা দেবী। তিনি ছিলেন সাহসী, জেদী এবং সঙ্কল্পে অটল।

ঠাকুরমা ছিলেন প্রসিদ্ধ এক জমিদার বংশের কন্যা। কিন্তু আমার পিতামহ রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন দরিদ্রের সন্তান। দরিদ্র হলেও তিনি ছিলেন গৌরকান্তি সুপুরুষ মানুষ। সদানন্দ পরোপকারী আত্মভোলা বলে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। পরের কাজে মন দিতে গিয়ে ঘরের কাজ নাকি তিনি কোনদিনই করতে পারেন নি। অবশ্য এ সবই আমার শোনা কথা। কেন না তাঁকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি। আমার পিতৃদেবের মাত্র ষোল বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

আমার পিতামহকে না দেখলেও ঠাকুরমার সান্নিধ্য লাভ করেছি প্রচুর। এবং তাঁর প্রভাব যে আমার

জীবনের অনেকখানি জুড়ে আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ঠাকুরমার যখন বিয়ে হয় তখন ঠাকুরদার অপর এক স্ত্রী বর্তমান।

বিশ্বরূপা দেবীর পিতা চাইলেন না কন্যা দরিদ্র স্বামীর সংসারে গিয়ে থাকুক। আমার পিতামহীরও বোধ হয় সতীনের সঙ্গে ঘর করার ভয় ছিল। সুতরাং আমার পিতামহ ঘরজামাই থেকে গেলেন। ঘরজামাই হলে কি হয়, ঠাকুরমার প্রখর আত্মসম্মানবোধ থাকায় তিনি স্বামীর অসম্মান হতে পারে এমন কোন ব্যবহার সহ্য করেন নি। এমনকি এক সময় বাড়ীর লোকের কি একটা ইঙ্গিত তাঁর কাছে মর্যাদাহানীকর বলে মনে হওয়ায় নিজ কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। স্বামীর হাত ধরে একবস্ত্রে পিতৃগৃহের সুখৈশ্বর্য পরিত্যাগ করলেন। পিতা-মাতার অশ্রুজল, আত্মীয়-গুরুজনের অনুরোধ, উপরোধ কিছুই তাঁর পথরোধ করতে পারল না।

তখন পর্যন্ত ষ্টীমার চলাচল তেমনভাবে প্রবর্তন হয় নি। স্বামীকে সঙ্গে করে তিনি নৌকাযোগে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করলেন। অনেক ছোট-বড় নদী পার হলেন, কত জায়গায় গেলেন, কিন্তু কোথাও উপযুক্ত স্থান মিলল না। অবশেষে চুড়াইন গ্রামে এক দূরসম্পর্কীত আত্মীয়ের বাড়ীতে কোনরকমে কুটীর তৈরি করে বসবাস করতে লাগলেন।

স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করেছিলেন যে শক্তিতে বলীয়ান হয়ে,তাই তাকে রক্ষা করেছে অপরের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করতে। উপবাসী থাকলেও পরের দ্বারস্থ হন নি। খোঁজ করে পিত্রালয় থেকে ফিরিয়ে নেওয়ার অনেক চেষ্টা হয়, কিন্তু তিনি যে শুধু সেখানে ফিরে যান নি তা নয়, প্রচণ্ড দরিদ্রতার মধ্যেও তাঁদের সাহায্য গ্রহণ করেন নি।

পরে যদিও পিতৃদেবের আমলে চুড়াইনে জায়গা-জমি রেখে পাকা বাড়ী তৈরী হয়, কিন্তু বিশ্বরূপা দেবী ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুতে গড়া। গৃহ-প্রবেশের শুভদিনে আমার খুল্লতাতের সঙ্গে কি কথা কাটাকাটি হওয়ার ফলে তিনি একদিনের জন্যও সেই অট্টালিকায় বাস করেন নি। নিজের জন্য নির্মিত একটা সাধারণ টিনের ঘরেই জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত যাপন করে গেছেন।

এই ত গেল তাঁর জেদের কথা। তিনি রাজপুত-রমণীদের মতই সাহসী ছিলেন। নিজের অধিকার রক্ষা করবার জন্য নিজ হাতে লাঠি ধরতে কসুর করেন নি। ব্যাপারটা এই—

আমাদের বাড়ীর সম্মুখে একটা রাস্তা ছিল। আমরা দাবি করতাম ওটা আমাদের বাড়ীর অন্তর্গত। এবং এ নিয়ে একটা মামলাও চলছিল। এমনি অবস্থায় বাড়ীর লোকের আপত্তি সত্ত্বেও গ্রামের এক বাড়ীর বিয়ের শোভাযাত্রা ঐ পথ দিয়ে নিয়ে যাওয়ার জেদ ধরেন সে বাড়ীর কর্তা। তিনি ছিলেন পুলিস কর্মচারী, আর পুলিসের ছিল তখন প্রবল প্রতাপ। এমনিতে ঐ রাস্তা দিয়ে লোক যাতায়াতে আমাদের পক্ষের কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু শোভাযাত্রা যেতে দিলে অধিকার নষ্ট হয়ে সর্বসাধারণের রাস্তায় পরিণত হবে। এ জন্য আমাদের আপত্তি।

তখন আমাদের বাড়ীতে পুরুষের মধ্যে ছিলেন মাত্র আমার এক কাকা এবং দু'জন পিসতুত ভাই। এমতা-বস্থায় গায়ের জোরে বাধা দেওয়া সম্ভব নয়, বিচার করে প্রতিপক্ষকে অনুরোধ করা ছাড়া আর উপায় রইল না। এমনি অবস্থা জেনেই অপরপক্ষ জয়ধ্বনি করে শোভাযাত্রা নিয়ে বাড়ীর ঐ রাস্তায় প্রবেশ করল। অশীতিপর বৃদ্ধা পিতামহী অধিকার রক্ষায় দৃঢ়সঙ্কল্প! বাড়ীতে পুরুষ মাত্র তিন জন। এই এত বড় জনতার সম্মুখীন হতে তারা ইতঃস্তত করছিল। ঠাকুরমা পুরুষদের উদ্দেশ করে বললেন, "তবে তোরা ঘরেই বসে থাক। আমি ঘরের বউদের ও মেয়েদের নিয়েই যাচ্ছি বাধা দিতে।" আমার কাকা কিংবা পিসতুত ভাইরা কেউ ভীরু ছিলেন না। ঠাকুরমা নিজে তাঁর পুত্র ও দৌহিত্রদ্বয়ের হাতে লাঠি তুলে দিয়ে অনতিদূরে দাঁড়িয়ে উৎসাহ দিতে লাগলেন। ভীষণ দাঙ্গা বাধল, শোভাযাত্রার পরিচালক পুলিস কর্ম-চারীটির মাথা ফেটে গেল। অনেকে আহত হ'ল, এবং শেষপর্যন্ত শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আমার কাকা রক্তাক্ত দেহে গৃহে ফিরলেন। বৃদ্ধা ঠাকুরমার চোখে জল, কিন্তু মুখ তখন জয়ের গর্বে উদ্ভাসিত।

তখনকার দিনে ঠাকুরমা-দিদিমারা নাতি-নাতনীদের নিয়ে রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে কিংবা বারান্দায় বসে মালা জপ করতে করতেই ইতিহাস, পুরাণ, রূপকথা এবং নানা দেশের গল্প বলতেন। ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক জ্ঞানার্জন ঠাকুরমা পিসীমা বা মায়ের কাছেই হ'ত। আমিও রামায়ণ-মহাভারতের গল্প এঁদের কাছেই শুনেছি।

ঠাকুরমা বলতেন, "ভারতভূমি পুণ্যভূমি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবরা এদেশে বাস করত। আমরা হলাম গিয়ে জ্ঞানী, সর্বত্যাগী, মানবহিতে দারিদ্র-ব্রতধারী মুনি-ঋষির সন্তান।" তাদের অলৌকিক শক্তির যে কত গল্প শুনেছি তার আর ইয়ত্তা নেই! কতবার নাকি দৈত্যদানব-

রাক্ষসরা এই ধর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ ধ্বংস করেছে, মানুষের উপর কত নির্যাতন করেছে, মুনি-ঋষিদের আশ্রম ভেঙে দিয়েছে এবং ধর্মকার্যে বাধা দিয়েছে; কিন্তু মুনি-ঋষিদেরই পুণ্যফলে ভগবান বার বার মনুষ্যদেহ ধারণ করে দেশবাসীকে একত্র করে দৈত্যদানবদের পরাস্ত করে দেশ ও ধর্ম রক্ষা করেছেন।

আমার ঠিক মনে আছে, একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আচ্ছা ঠাকুরমা, দৈত্যদানব-রাক্ষসরা গেল কোথায়? এখনও কি তারা আছে?" তিনি বলেছিলেন, "আছে" এবং আমাদের নারায়ণগঞ্জের বাড়ীর সামনে রাস্তার অপরদিকে ইউরোপীয় ক্লাবের ইংরেজদের দেখিয়ে ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য বলতেন, "এরা সর্বভুক্‌, এরাই আমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে অধর্মের রাজত্ব স্থাপন করেছে।"

যুধিষ্ঠিরের সত্যবাদিতা ও ধর্মপ্রাণতা, ভীম, অর্জুন ও কর্ণ প্রভৃতির বীরত্বগাথা, ভীষ্মের মহত্ব ও আত্মদান, দ্রৌপদীর দুর্জয় সংকল্প, রামের আদর্শ চরিত্র, লক্ষ্মণের বীরত্ব, সীতার সতীত্ব, শিবি রাজার পারাবত রক্ষার্থে আত্মদান, হরিশ্চন্দ্রের হাসিমুখে সর্বস্বদান, দধীচির অস্থি-দান—এমনি আরও কত কথা, কাহিনী ঠাকুরমার কাছে শুনে হৃদয়ে গাঁথা হয়ে আছে। এখনও আমার এই বৃদ্ধ বয়সে যেন মাঝে মাঝে দেখতে পাই বৃদ্ধা আমার মাথায় শরীরে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে পুরাণের কাহিনী শুনিয়ে যাচ্ছেন আর আমি সেই শিশু তার কোলঘেঁষে বসে তন্ময় হয়ে শুনছি সেসব অপূর্ব গাথা।

বল্লালসেন, আদিশূর, সাত্বিক পঞ্চব্রাহ্মণের কান্যকুব্জ থেকে বাংলাদেশে আগমনের কিংবদন্তী, লক্ষ্মণসেনের পলায়ন ও মুসলমানের বঙ্গজয়, মুসলমান বাদশাহদের অপকীর্তি, কালাপাহাড়ের ধ্বংসলীলা এমনি আরও যে কত গল্প শুনেছি আজ তার অনেক কিছুই মনে নেই। যা মনে আছে তা সবিস্তারে বর্ণনা করলে রামায়ণই হয়ত হয়ে যাবে এ কাহিনী। তবে এটুকু বলতে পারি যে, যা তিনি বলতেন তার সব কথাই ইতিহাসসম্মত ছিল না। তা না হোক, তিনি সেগুলি ইতিহাসের মতই এমন জলন্ত করে তুলেছিলেন যে, আজও দু'একটার কথা উল্লেখ না করে পারছি নে।

বল্লালসেনের সঙ্গে নাকি মুসলমান আক্রমণকারীদের ঘোরতর সংগ্রাম হয়। মুসলমানরা হয় পরাজিত। রণক্লান্ত বল্লালসেন এক গাছের নিচে বসে বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময় এক মুসলমান ফকির গুপ্তভাবে পেছনে এসে বল্লালসেনের যুদ্ধ-পারাবত তার পিঠে-বাঁধা খাঁচা থেকে উড়িয়ে দেয়। বল্লালসেন ক্ষোভে, দুঃখে, নৈরাশ্যে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। ব্যাকুল হৃদয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন রাজধানীর দিকে। কিন্তু তার অনেক আগেই পারাবত উড়ে এসে প্রাসাদশীর্ষে বসল। পুরনারীরা মনে করলেন যুদ্ধে রাজার পরাজয় ঘটেছে। বিদেশী বিধর্মীর হাতে মর্যাদাহানির ভয়ে তাঁরা পূর্ব নির্দেশমত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে জহরব্রত উদ্‌যাপন করলেন। ঐতিহাসিক সত্যতা এর পেছনে যাই থাক্‌ না কেন, ঠাকুরমার মুখে ঐ কাহিনী এমন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল যে, আমার শিশুমনকেও উদ্বেলিত করেছিল।

তিনি বলতেন, দেবাদিদেব মহাদেবকে নাকি ম্লেচ্ছরা মক্কায় আবদ্ধ করে রেখে দিয়েছে। যদি কোন আচার নিষ্ঠ, শুদ্ধ এবং নিষ্পাপ ব্রাহ্মণ বন্দীশিবের মাথায় বিল্বপত্র দান করতে পারে, তবেই মহাদেব রুদ্রমূর্তি ধারণ করে ম্লেচ্ছদের ধ্বংস করবেন। শিবের মুক্তির জন্য অনেকেই ব্যাকুল। কিন্তু মুশকিল হ'ল বিশুদ্ধতা রক্ষা করে মক্কায় গিয়ে শিবের নিকটবর্তী হওয়া। সে নাকি কিছুতেই সম্ভব ছিল না। গল্প শুনতে শুনতে শিশুমন উদ্বেলিত হয়ে উঠত সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে ম্লেচ্ছ-অধ্যুষিত অজানাদেশে গিয়ে নীলকণ্ঠের উদ্ধার কামনায়।

বিষ্ণু কল্কি-অবতারে কি ভাবে ধূমকেতুর মত করাল-মূর্তি ধরে তরবারীর দ্বারা ম্লেচ্ছকুল নিধন করে ভারত-ভূমিকে পুনরায় পুণ্যভূমিতে পরিণত করলেন তার সবিস্তার বর্ণনা শুনতাম।

আজ আমার বাষট্টি বছর বয়সেও দেখতে পাচ্ছি সেই পাড়াগাঁয়ে টিনের ঘরে গাছপালায় পরিবৃত হয়ে অন্ধকার জমাট বেঁধেছে। ঝিঁঝিপোকার আওয়াজে রাতের নিস্তব্ধতা যেন আরও গভীর হয়ে উঠেছে। ঘরের কোণে জলছে তেলের মাটির বাতি। ঠাকুরমা ঘরের দাওয়ায় বসে রুদ্রাক্ষের মালা জপ করছেন। আমি চিরশিশু তার কোল ঘেঁষে বসে নিবিষ্টচিত্তে গল্প শুনছি। মালা ফেরাতে ফেরাতেই তিনি এসব গল্প করতেন।

এ সমস্ত গল্প সেদিন শিশুমনে যে স্বপ্ন জাগিয়ে তুলত তাই হয়ত ভবিষ্যৎ জীবনের মানুষটাকে চিরাচরিত জীবনযাত্রার বিপরীত দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। পরের জীবনে—দ্বীপান্তরে, দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত শৃঙ্খলিত বন্দীদশায়, নানা দুঃখ-লাঞ্ছনায় এবং নানা প্রলোভনের মধ্যেও যে শির উন্নত রাখতে সমর্থ হয়েছি, তার জন্য সেই অন্ধকার-নির্জন-কুঠরীতে মালাজপরতা ঠাকুরমার উদ্দেশ্যে বার বার প্রণাম জানাই।

ক্রমশঃ

ভারতের বহির্বাণিজ্য

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

যত দিন ধরিয়া মানুষ জলযানের সাহায্যে দেশ বিদেশে যাতায়াত সুরু করিয়াছে এবং এক দেশের পণ্য অন্য দেশে ক্রয় বিক্রয় করিতেছে, ততদিন হইতে ভারত আপনার বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। অতি প্রাচীন কালেও ভারতের শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ বিদেশী বণিককে আকৃষ্ট করিয়াছে এবং অতি কঠোর বিপদ ও অমানুষিক ক্লেশ সহ্য করিয়া ভারতের উপকূলে তাহারা আপন আপন বাণিজ্য তরী ভিড়াইয়াছে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এ সকল কথা লিপিবদ্ধ ত আছেই, ইতিহাস রচিত হইবার পূর্ব্বেও যে শিল্পপণ্য দর্শন ও সংস্কৃতি লইয়া ভারত দূর দূরান্তের সাগরপারে নিজস্ব পরিচয় স্থাপন করিয়া বেড়াইয়াছে তাহা কেবল মৌখিক কিম্বদন্তী নহে সেই সকল দেশের স্থাপত্য, চিন্তাধারা, বিশিষ্ট নাম প্রভৃতি হইতে ইহার নানা নিদর্শন পাওয়া যায়।

বিদেশী ইংরেজের শাসনকালে ভারতবর্ষের বিশিষ্ট শিল্পপণ্য ছাড়া অসংস্কৃত (কাঁচা) মালের রপ্তানি বৃদ্ধি পায় এবং তাহাই আবার পরিবর্ত্তিত আকারে বহুগুণ মূল্য বৃদ্ধি করিয়া এ দেশে আসিতে থাকে। ভারত স্বাধীন হইবার পর ইহার কিছু উন্নতি হইয়াছে। এবং ক্রমে রপ্তানি তালিকা শিল্পজাত পণ্যের আধিক্য দেখা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে; ভারতের রপ্তানি মালের মূল্য আমদানী অপেক্ষা অনেক কম, তাহাতে বিদেশী মুদ্রার সমস্যা আসিয়া দেখা দেয়।

আমদানী সকল সময়েই যে দেশের পক্ষে ক্ষতিকর তাহা নহে। সকল শিল্প-সমৃদ্ধ দেশই বিরাট পরিমাণ বিদেশী মাল আমদানি করিয়া থাকে, কারণ পৃথিবীর এমন কোনও দেশ নাই যেখানে প্রয়োজনের সকল প্রকার কাঁচা মাল সংগ্রহের সম্ভাবনা আছে। দেশের নানা শিল্পের প্রয়োজনেও কাঁচা মাল প্রয়োজন। তবে যে দেশ যত অধিক পরিমাণে পরনির্ভর, তাহার সমস্যা ততই বেশী, বিশেষতঃ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিষয়ে যদি সর্ব্বদাই পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে কোনও কারণে মাল চলাচলের অসুবিধা ঘটিলে এক জটিল অবস্থার উদ্ভব হয়।

এখন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ বিদেশী মালের উপর অতি মাত্রায় নির্ভর করিয়া থাকিতে বাধ্য রহিয়াছে, বিশেষতঃ অন্ন ও যন্ত্রপাতি, এই দুইটি প্রধান পণ্যের জন্য অতি মাত্রায় পরনির্ভরতা গুরুতর চিন্তার কারণ হইয়া পড়িয়াছে। যন্ত্রপাতি ভারতের মধ্যেই তৈয়ারি আরম্ভ হইয়াছে এবং আশানুরূপ ফলও পাওয়া যাইতেছে, অন্ন সম্বন্ধেও অনুরূপ চেষ্টা চলিতেছে, বহু গবেষণা, প্রচার চিৎকার সত্ত্বেও এই ঘাটতি কতদিনে দূর করিতে পারা যাইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই।

গত তিন বৎসর (১৯৫৭, ১৯৫৮ ও ১৯৫৯) মোট আমদানী ও রপ্তানির পরিমাণ হইতে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের একটা চিত্র পাওয়া যায়।

(হাজার টাকা)

	১৯৫৭	১৯৫৮	১৯৫৯
আমদানী	১০২৫,৮২,১৩	৮৭২,৮১,৩১	৮৯৫,৪২,৫৫
রপ্তানি	৬৩৭,৭৩,৮৬	৫৭৬,৫৫,৪৫	৬১৮,৭১,০২

ইহার সহিত আমদানী-করা মালের পুনঃরপ্তানির পরিমাণ, যথাক্রমে ৫·০৮ কোটি টাকা, ৮·৫০ কোটি টাকা ও ৭·০৭ কোটি টাকা। মোট বাণিজ্যের তুলনায় ইহার পরিমাণ নিতান্ত অল্প বলিয়া পুনঃরপ্তানি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার কোন প্রয়োজন নাই বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

ভারতের মাল রপ্তানি অপেক্ষা আমদানীর প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে। বহু বাধানিষেধ আরোপ করিয়া নিয়ন্ত্রণের কঠোর প্রয়োগ দ্বারা বহুতর মালের আমদানী বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহার দুইটি অত্যন্ত কুফল দেখা যাইতেছে। পণ্যদ্রব্যের অভাবে সাধারণ দেশবাসী বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে, কি ভাবে আমদানী নিয়ন্ত্রণ হয়, সাধারণতঃ দেশের লোক বুঝিতে পারে না। দেখা যায়, গবর্ণমেন্টের যাহা প্রয়োজন তাহা আমদানীতে বিশেষ অসুবিধা দেখা যায় না, ফলে বহুমূল্যের একই মাল কয়েক বার আসিতেছে বা আসিবার পর অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হওয়ায় পড়িয়া নষ্ট হইতেছে। বিদেশে যে ক্রয় করা হইল বলিয়া মনে হয়, দেশে আসিয়া তাহা ভিন্নরূপে দেখা দেয়, অর্থাৎ নিকৃষ্ট মাল সরবরাহ হইয়া

ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। প্রতিরক্ষা বিভাগের জীপ, বন্দুক, মদ ক্রয়ে, ঢালাই বাড়ী সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, হীরাকুর বাঁধ, জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা সংক্রান্ত মাল, যন্ত্রপাতি ক্রয়ে সহস্র কোটি টাকা অপব্যয়ের নজির পাওয়া যায়। এই সকল মালের দাম জোগাইবার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র, শিশুখাদ্য, কাগজ, ক্ষৌরকর্ম্মের সামান্য সরঞ্জাম প্রভৃতি মাল আমদানী বন্ধ করিয়া রাখা হয়। ইহার ফলে দেশের মধ্যে একটা দারুণ অভাব অনুভূত হয় এবং মালের দর কল্পনার মাত্রাও অতিক্রম করিয়া যায়।

আমদানী বন্ধ রাখিলে দেশের মধ্যে শিল্পের উৎপত্তি প্রসার প্রভৃতির সম্ভাবনা যে বৃদ্ধি পায়, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার ফল যে কি দাঁড়াইয়াছে, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছে। অন্যান্য দেশে যে মাল যে দরে উৎপন্ন হইয়া বাজারে যে দরে বিক্রয় হয়, তুলনায় দেখা যায় ভারতের জলমাটী মানুষের গুণে তাহার দর কয়েক গুণ বেশী পড়ে। বিদেশী মালের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই, সুতরাং উৎপাদক মালিক যে দর বলিয়া দেয়, তাহাতেই ক্রেতা কিনিতে বাধ্য; কারবারে লাভ বেশী হইলে কর্ম্মীরা তাহার সন্ধান রাখে। ধর্ম্মঘট যন্ত্রপাতি ভাঙিয়া, মারধোর প্রভৃতি অত্যাচার করিয়া মজুরি বৃদ্ধির দাবী করে। মালিক ভয় পায়; শ্রমিকদের প্রতি সরকারী সমর্থন থাকায় প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তাহাদের জয় অবধারিত। তাহার উপর সরকারী উৎপাদন শুল্কের যথেচ্ছাচার আছে। তাহাতেও মালের দর বৃদ্ধি পায়। বহু শিল্পেই এই নিয়ম কাজ করিতেছে; এখানে কেবল মাত্র চিনির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

রপ্তানির ব্যাপারে বিদেশের প্রয়োজন বুঝিয়া ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। যাহার যাহা কাজে লাগে, তাহার জন্য নানা বাজার ঘুরিয়া ক্রেতা এক দেশে মাল ক্রয় করে। ভারতের এমন কয়েকটি (কাঁচা) পণ্য আছে, যাহাতে তাহার প্রায় এক চেটিয়া অধিকার ছিল। উৎপাদন ব্যয় বেশী হওয়ায় দাম চড়ে এবং যথেচ্ছা রপ্তানি শুল্ক চড়াইয়া দিলে বিদেশী ক্রেতা ভারত উপকূল ছাড়িয়া পলাইয়া যাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। নানা দেশে সেই সকল পণ্যের উৎপাদনের বা আবিষ্কারের চেষ্টা হয়, অথবা বিকল্প বস্তুর সাহায্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে। বিজ্ঞান নানা পথ খুলিয়া দিতেছে, সুতরাং ভারতের রপ্তানির পরিমাণ দেখিয়া গভর্ণমেণ্টের মুখে যে লালা নিঃসৃত হয়, তাহা সংযত করার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। পাট এক সময় কেবল ভারতেরই ছিল; আজ পাকিস্তানে আছে। চা সম্বন্ধে যে প্রতিষ্ঠা ছিল, তাহা সিংহল, জাভা পাকিস্থান এমন কি সোভিয়েট দেশও ক্ষুণ্ণ করিয়া দিতেছে। জাপান এমন কি ভূমধ্য সাগরতীরবর্ত্তী দেশ বিশেষতঃ ইটালী ভারতের রেশম শিল্প খর্ব্ব করিয়াছে। যৌগিক রং এক দিনে বহু লোভনীয় বস্তু নীলের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। রপ্তানি ব্যাপারে সরকারী হস্তক্ষেপ অভ্র ও ম্যানগানিজের অপূরণীয় ক্ষতির কারণ বলিয়া গণ্য করা হয়। উহাই সর্ব্ব প্রধান কারণ জাপান চীন প্রভৃতি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়াইতেছে।

রপ্তানির মধ্যে আজ চা সর্ব্ব প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহা হইয়াছে; কারণ বহুকাল হইতে পাটজাত দ্রব্যই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে। গত বৎসর চা রপ্তানি হইয়াছে ১২৬,৩৯,৩৯,৫৭২ টাকার; ইহা পূর্ব্ব বৎসর (১৯৫৮) হইতে ১০,১৫.০৪ লক্ষ টাকা কম। ইহা হইতে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের বিপদ সম্বন্ধে একটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

বিশদ আলোচনা করিবার পূর্ব্বে ভারতের প্রধান পণ্য কয়টির নাম ও রপ্তানির মূল্য উল্লেখ করা যাইতে পারে:

(লক্ষ টাকা)	১৯৫৯
চা	১২৬,৩৯.৪
(কার্পাসবাদে) প্রধানতঃ পাট বস্ত্র	৬৫,৭৭.৮
কার্পাস বস্ত্র	৬১,৩১.৪
সংশোধিত চর্ম্ম	২৮,৬৫.২
লৌহেতর খনিজ প্রস্তর	১৬,৬৩.৬
ফল (কঠিন আবরণ যুক্ত)	১৬,৬০.১
(তন্মধ্যে কাজু বাদামের শাঁস ১৫১৬)	
কার্পাস (তুলা)	১৬,৩৬.৮
উদ্ভিজ তৈল	১৩,৯৭.১
পশম	১২,২২.৪
লৌহ (খনিজ) প্রস্তর	১২,৯৩.১
তামাক (পাতা)	১২,৯২.৮
চামড়া	১০,৬৭.৩
বয়নের যোগ্য তন্তু (সুতা)	১১,০৯.৯
(তন্মধ্যে কার্পাসজাত সুতা)	৪,৮৩

ভারতীয় চা'র প্রধান ক্রেতা ইংলণ্ড, (সেখান হইতে কিছু মাল অপর দেশে বিক্রীত হয়)। ১৯৫৯ সনে প্রায় ৭৬ কোটি টাকার চা ইংলণ্ড ক্রয় করে। অপরাপর প্রধান ক্রেতা রুশ ৯.১১ কোটি, আমেরিকা ৬.১৩ কোটি টাকা, সেরিলিস ৫.৭৪ কোটি টাকা, ইজিপ্ট ৪.৮৪ কোটি

টাকা, কানাডা ৪'৪১ কোটি টাকার মাল লইয়াছে। আইরিশ রিপাবলিক, ডেনমার্ক, তুরস্ক, ইরাণ প্রভৃতি কয়েকটি দেশের নামও উল্লেখযোগ্য।

অপরাপর কয়েকটি পণ্যেরও প্রধান ক্রেতা ইংলণ্ড, এমন কি কালের গতিতে ইংলণ্ডে প্রচুর কার্পাস বস্ত্র যাইতেছে এবং ইংলণ্ডের লোক ঘোর আপত্তি জানাইতে আরম্ভ করিয়াছে। কার্পাস বস্ত্র এক বৎসরে ৭২ কোটি টাকা পর্য্যন্ত রপ্তানি হইয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ লৌহ প্রস্তরের প্রধান ক্রেতা জাপান ; পরে চেকোশ্লোভাকিয়া। উদ্ভিজ্জ তৈলের মধ্যে ইরাণ লয় বেশী চীনাবাদামের, আমেরিকা রেড়ী, ইংলণ্ড মসিনার তেল। চামড়ার ক্রেতা ইংলণ্ড প্রধান হইলেও রুশ (ছাগচর্ম্ম) একটি প্রধান স্থান অধিকার করে।

পাটের কথা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা সমীচীন। বলা বাহুল্য পাটজাত দ্রব্য (চট, থলে, সুতালী প্রভৃতি) এবং কাঁচা পাট ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রপ্তানি পণ্য ছিল। ইংরেজ আসিয়া বাংলার পাট-শিল্পে মনোযোগ দেয় এবং তাহার ডাণ্ডি প্রভৃতি স্থানে মিলের জন্য কাঁচা পাট প্রচুর লইতে হইত। ১৯২৫-২৬ সনে কাঁচা পাট ৩৮ কোটি টাকার রপ্তানি হয়। এমন কি ভারত বিভাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে ও পরেও প্রচুর কাঁচা পাট রপ্তানি হইয়াছে তাহা নিম্নের সংখ্যা তালিকা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে—

সাল	টন	টাকা
১৯৪৫-৪৬	৩৩৮,৩১৮	১৫,৮৩,৫৯,১৮৫
১৯৪৬-৪৭	৩৫৬,২৪৬	১৯,১২,১১,৭০১
১৯৪৭-৪৮	২৬৫,০১৭	২৫,৮৩,১৬,৫৩৫
১৯৪৮-৪৯	২১৩,৬০৩	২৩,৯৫,৪১,১৬০
১৯৪৯-৫০	১৪৭,৬৫০	১৬,৭৩,৬৬,৩৫১

ভারতের মিলের চাহিদায় ইহার পর পাট রপ্তানি বন্ধ করিয়া দিতে হয়, সুতরাং হিসাবের খাতায় তাহার আর কোনও পরিচয় নাই।

পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি হ্রাস একটি প্রধান চিন্তার কারণ বলা যাইতে পারে। পাকিস্থান স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হওয়ায় এরূপ হওয়া স্বাভাবিক ; কারণ কেবল যে পাকিস্থানে পাটকল হইতেছে তাহা নহে। পাকিস্থানের ভাল পাট বিদেশে প্রচুর রপ্তানী হইতেছে এবং ভারতবর্ষকে বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন পাটের জন্য পাকিস্থানের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। ভারতবিভাগের পূর্ব্ব হইতে পরের কয়েক বৎসরের রপ্তানির অঙ্ক পাঠে প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারা যাইবে :

সন	মূল্য (হাজার টাকা)
১৯৪৬-৪৭	৬৯,৮৮,৪২
১৯৪৭-৪৮	১২৭,৮২,১০
১৯৪৮-৪৯	১৪৬,৫৬,০৯
১৯৪৯-৫০	১২৬,৯৮,৫১
১৯৫০-৫১	১১৩,২৯,৩৮
১৯৫১-৫২	২৬৯,৭৩,২৬
১৯৫২-৫৩	১২৮,৯১,৮৬
১৯৫৩-৫৪	১১৩,৮৮,৭২

১৯৫১-৫২ সনই পাটজাত দ্রব্য রপ্তানির সর্ব্বোচ্চ বৎসর ; তাহার পর হইতে ধীরে ধীরে হ্রাস পাইয়া ১৯৫৯ সালে ৬৫ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ভারতের পাটজাত দ্রব্যের গুণের উপর বিদেশী ক্রেতা আস্থা হারাইয়াছে বলিয়া এক রব উঠিয়াছে ; ইহা সত্যমিথ্যা নিরাকরণ করা বিধেয়।

কাজু বাদামের শাঁস (Kernel) গত মহাযুদ্ধের পর হইতে আমেরিকায় বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে এবং কয়েক কোটি টাকার সাশ্রয় করিতেছে। ইহার মধ্যে আবার ৬ কোটি টাকার খোলাসমেত কাজু বাদাম আমদানি করিতে হয়। হঠাৎ গোলমরিচ এক বৎসর ২২ কোটি টাকার রপ্তানি হইয়া গিয়াছে।

আমদানী মালের (১৯৫৯) আলোচনায় প্রথমেই প্রধান কয়টি বিভাগের উল্লেখ করা প্রয়োজন ; যথা,

পণ্য	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা
খাদ্য (তণ্ডুল ও তণ্ডুলজাত দ্রব্যাদি ও বিবিধ)		১৫৪,৭৪
তন্মধ্যে গম	১০৯,৮৫,৭৮	
চাউল	৯,১১,৫৮	
শিল্পের কাঁচা মাল		৯৪,৩৭
তন্মধ্যে নারিকেল তৈল	১১,২২	
তুলা	৩৪,৭৬	
খনিজ জ্বালানী দিঃ		৭৮,০২
তন্মধ্যে পেট্রলজাত দ্রব্য	৬৮,৭২	
অসংস্কৃত পেট্রল	৯,৩৩	
রাসায়নিক দ্রব্যাদি		৮৫,২০
তন্মধ্যে সার	১৪,৫২	
অজৈব রাসায়নিক	২৩,২২	
জৈব রাসায়নিক	১৭,৮১	
যৌগিক রং	৭,১৪	

শিল্পজাত বিবিধ দ্রব্য		১৮২,৮১
তন্মধ্যে বয়নের উপযুক্ত সূতা	১৪,৮৩	
লৌহ ইস্পাত	৮৪,০১	
তামা	১৬,৩৮	
শক্তি উৎপাদক যন্ত্র	২৫,৩৭	
ধাতু সংক্রান্ত যন্ত্র	২৭,৮৭	
খনি সংক্রান্ত যন্ত্র	৮৯,১২	
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি		৫০,০১
রেলগাড়ী		২৯,৪০
মোটর যান প্রভৃতি		২৯,৬৩
বিমানপোত		৯,৪৬

আমদানীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা চিন্তার কথা খাদ্যদ্রব্য; বিদেশের উপর খাদ্যের জন্য নির্ভর করিয়া থাকার মত বিড়ম্বনা আর কিছুই নাই। এ অবস্থা কতদিনে দূর হইবে তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই। গমের ১০৯·৮৫ কোটি টাকার মধ্যে আমেরিকা দিয়াছে ১০২·১৯ এবং কানাডা ৬·৫৫ কোটি টাকার মাল দিয়াছে।

তুলার আমদানী সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না : হ্রাস করা যাইতে পারে মাত্র, কারণ লম্বা ও সূক্ষ্ম আঁশের তুলা না হইলে মিহি বস্ত্রাদি প্রস্তুত করা সম্ভব নয়; আর লোকের, বিশেষতঃ মহিলাদের রুচি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া উঠিতেছে। কেনিয়া, ইজিপ্ট, সুদান ও আমেরিকা প্রধান বিক্রেতা। যথাক্রমে তাহাদের অংশ ৪·৭২, ৭·৩৩, ৯·৮১ ও ৬·৯৬ কোটি টাকা। যখন আমদানী ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট খুব কড়াকড়ি আরম্ভ করে, তখন দেশের মধ্যে কাপড়ের অপ্রতুলতার নানা কারণের মধ্যে ইহা অন্যতম প্রধান হইয়া উঠে। অপরপক্ষে প্রায় ১৬ কোটি টাকার মত ছোট আঁশের তুলা রপ্তানি আছে; সুতরাং তুলার ব্যাপারে আরও একটু দরাজ নীতি অবলম্বন করিলে ক্ষতি নাই।

অন্ন এবং বস্ত্রের ব্যাপারে আমাদের গুরুতর অভাব রহিয়াছে; বিশেষতঃ অন্ন সম্বন্ধে। কারণ দেশে উৎপাদিত সূতী বস্ত্রের একটা বড় অংশ রপ্তানী হইয়া যায়।

নারিকেল তৈল সম্বন্ধে যে পরনির্ভরতা রহিয়াছে তাহা আংশিক পরিমাণেও দূর করা যাইতে পারে। নারিকেল আবাদ বিস্তারের জন্য সরকারী কমিটি আছে; তাহাদের বাৎসরিক রিপোর্টও আছে। কাজের পরিচয় বিশেষ কিছু পাওয়া যায় নাই। উত্তরোত্তর ভাবের ব্যবহার যে হারে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে ঝুনা নারিকেলই আর পাওয়া যাইবে না, এবং ছোবড়া হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদির ক্রমেই অভাব ঘটিবে; রপ্তানি করিয়া যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহাতেও অসুবিধা হইবে।

পেট্রলজাত দ্রব্যাদি মোটা টাকা লইয়া যায়। দেশের মধ্যে অপরিশুদ্ধ খনিজ তৈল আনিয়া পরিশুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং কাম্বে প্রভৃতি অঞ্চলে যত বেশী তৈল উদ্ধার করা যাইবে, ততই এ সকল কারখানা বৃদ্ধি পাইবে। পরিত্যক্ত ময়লা তৈল হইতে নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় পেট্রলজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইবার আশা আছে।

রাসায়নিক সার দেশের মধ্যে প্রস্তুত হইলেও আমদানীর পরিমাণ কম নয়। আরও কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব চলিতেছে; তন্মধ্যে কয়েকটি সম্পূর্ণ হইলে আমদানী হ্রাস পাইবার কথা। কিন্তু দেশের মধ্যে জৈব সারের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখা অধিক প্রয়োজন। কারণ ইহার ব্যবহারের বিরুদ্ধে কোনও মত নাই, অথচ কারখানার রাসায়নিক সারের বিরুদ্ধে আছে।

লৌহ-ইস্পাত লইতেছে ৮৪·০১ কোটি টাকা। ইহা হ্রাস পাইবার কথা। কারণ দেশের মধ্যে বহু অপব্যয়ে কয়েকটি নূতন বড় কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নিজের চাহিদা প্রচুর; সাধারণ লোকেও সামান্য ঘরবাড়ী, যন্ত্রপাতি হাতিয়ার নির্ম্মাণের জন্য লৌহ-ইস্পাত পায় না। প্রচুর পরিমাণে লৌহাদি সরবরাহ হইলে দেশের মধ্যে নানা শিল্প দ্রুত গড়িয়া উঠিবে।

যন্ত্রপাতি দেশের মধ্যে নির্ম্মিত হইতেছে, সুতরাং যাহা আমদানী হইতেছে, তাহার জন্য চিন্তার বিশেষ কারণ নাই। বর্ত্তমানে বৈদেশিক মুদ্রার অনটন আছে, সেই জন্য প্রধান অসুবিধা। খনি সংক্রান্ত যন্ত্র একাই প্রায় ৯০ কোটি টাকা লইয়া যায়; ইহার পরিমাণ খর্ব্ব করা অসম্ভব নয়।

আরও নানা বিষয় আলোচনা করিবার রহিয়াছে; কিন্তু স্থানাভাব ও পাঠকের ধৈর্য্য সম্বন্ধে একটু সতর্ক হওয়ার সময় আসিয়াছে।

বর্ত্তমানে ১৯২টি রাষ্ট্রের সহিত ভারতের বাণিজ্য চলিতেছে, ইহা কম আনন্দের কথা নহে। ব্যবসা-বাণিজ্য সাহায্যে ভিন্ন দেশের লোকের সহিত নানা ভাবে যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং ক্রমে মৈত্রী জন্মিয়া থাকে। কূটরাজনীতির চালে না পড়িলে ইহা বিনা বিরোধে চিরকাল চলিয়া থাকে। প্রধান কয়টি দেশের সহিত আমদানী রপ্তানির পরিমাণ দেওয়া যাইতেছে :

দেশ	১৯৫৯ রপ্তানি (ভারত হইতে) (হাজার টাকা)	আমদানী
এডেন	৫,৫৪,৬৫	১,১৪,৫৭
আফগানিস্থান	৪,৪৫,৮৫	৫,৬৯,৬০
আর্জেণ্টাইনা	৭,৯৭,৮৩	৬,৮০
অষ্ট্রেলিয়া	৯,১৪,৬৪	১১,৭৯,৮২
বেলজিয়ম	৫,১৬,৬৭	১৩,৪৭,৪০
ব্রহ্ম	১২,১৬,৮৫	১৩,১৭,১৮
কানাডা	১৫,১১,৬৭	২০,২০,৭৩
সিংহল	২২,১৪,১৯	৬,০৪,৫২
চীন	৭,৮০,৫৩	৪,৮৬,৪১
মালয়	৪,৬৯,৫২	১০,৫৪,৫৩
মিশর	৮,৮৭,০৬	৮,০৪,০৩
ফ্রান্স	৮,১৪,২৫	১৯,১০,৮৬
জার্ম্মানী-পশ্চিম	১৯,৪৩,৭১	১১৮,৭২,১৯
আইরিশ গণতন্ত্র	৬,০৯,২১	১,৭৬
ইটালী	৫,৫৮,৩০	২৫,৮৬,৪২
ইরাণ	৪,৩৬,১২	৩৫,৫৫,৬৩
জাপান	৩৪,৩৮,২৬	৪০,৯৬,৪৩
নেদারল্যাণ্ড	৮,৯৫,৭০	১৩,০৬,৫৮
সিঙ্গাপুর	৭,৫০,৭৬	৯,০৮,৬৭
সাউদি আরব	৩,৬৮,০৩	২০,০৫,৩৩
সুদান	১৪,৬২,১৫	১০,৬৭,৩৯
ইউনাইটেড কিংডাম্	১৬৭,৬৩,৮৪	১৭২,৭২,২৯
সোভিয়েট গণতন্ত্র	৩০,৩২,৭২	১৬,৬৫,৪৬
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৯৫,১১,৬০	১৯৫,৪২,৬১

গম না দিলে আমেরিকা ভারতের আমদানীতে প্রধান স্থান অধিকার করিতে পারিত না। ইংলণ্ডের সহিত বিরোধের মধ্য দিয়াও বন্ধুত্ব রহিয়া গিয়াছে, এ বিষয়ে মাউণ্টব্যাটেন ও তদীয় পত্নীকে ধন্যবাদ জানাইতে হয়। পশ্চিম জার্ম্মানী মাথাচাড়া দিয়া উঠিতেছে, ভারতের আমদানী ব্যাপারে তাহার মাল সরবরাহ কার্য্যটি বিশেষ লক্ষণীয়। গত মহাযুদ্ধের ধ্বংসের পর জার্ম্মানীর পুনর্গঠন যে ভাবে সম্ভব হইয়াছে, তাহা ভারতবর্ষ অনুকরণ করিলে প্রচুর লাভবান হইবে। ইংরেজের নিকট শাসন আমেরিকার নিকট শিল্প প্রতিষ্ঠান ও জার্ম্মানীর নিকট পুনর্গঠন শিক্ষার জন্য ঐ সকল দেশের যন্ত্রপাতির সহিত বিশিষ্ট মনীষী কিছু আমদানী করিতে পারিলে মঙ্গল।

ভারতের বহির্বাণিজ্যের হিসাবপত্র দেখিলে মনে হয় অন্যান্য বহু বিষয়ে যে শিথিলতা ও অবিবেকিতা আছে, তাহা এখানেও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। অপর দেশের সহিত জগতের বাজারে পাল্লা দিতে হইলে যে শক্তি প্রয়োজন, তাহা সঞ্চারিত হইবার লক্ষণ কচিৎ দৃষ্ট হয়। অসময়ে রপ্তানী বা আমদানী শুল্ক এবং উৎপাদনের উপর কর চাপাইয়া গবর্ণমেণ্ট নানারূপে বিব্রত করিতেছে। তাহার উপর আছে শিল্পপতি ও কাঁচা পণ্য উৎপাদকদের উৎপাত। ভেজাল এবং অযোগ্য মাল চালাইয়া লোককে প্রতারিত করিবার অপচেষ্টা সদাই বর্ত্তমান। তাহার উপর অপটুতা এবং বিশেষ জ্ঞানের অভাবে উৎপন্ন মালের দর বেশী পড়িয়া যায়, সুতরাং কেবল যে দেশের হতভাগা লোকগুলি বেশী দাম দিয়া মরে, বিদেশের বাজারে মাল দাঁড়াইতে না পারিয়া মার খায়। সকল দিক বিচার করিলে নিঃসঙ্কোচে বলা যায়, উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণ সতর্কতা অবলম্বন এবং প্রতারণা করিবার বাসনা সংহত করিতে পারিলে শীঘ্রই উন্নতির আশা করা যায়। গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বজ্ঞ. সর্ব্বশক্তিমান, বেদান্তের ব্রহ্ম আছেনও বটে, নাইও বটে, সুতরাং তাহার সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার চেষ্টা না করাই মঙ্গল।

কবিতিলক অক্ষয়কুমার বড়াল

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

বিগত ২রা এপ্রিল শনিবারে এবং ৩রা এপ্রিল রবিবারে কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের শতবার্ষিক জন্মোৎসব পালিত হয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে এবং সাহিত্য তীর্থে। উভয়ত্রই কবিবর শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক সভাপতি ছিলেন। তিনি দুঃখ করিয়া মন্তব্য করেন যে, তাঁহার শতবার্ষিক জন্মোৎসব রাজোচিতভাবে পালিত হওয়া উচিত ছিল, এবং দানসাগরের পরিবর্তে কবির এই তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধ দেশবাসীর দুর্ভাগ্য এবং উদাসীনতার পরিচায়ক।

অধুনা দেশবাসী প্রতিভাবান কবি অক্ষয়কুমারকে এবং অন্যান্য অপেক্ষাকৃত স্বল্পোজ্জ্বল বা অনুজ্জ্বল কবিদের নাম ও রচনাবলী ভুলিতে বসিয়াছেন। তাঁহাদের কাব্য-কীর্তিগুলি স্মরণ করা, রক্ষা করা, তুলনামূলক সমালোচনা ও অনুশীলন করা প্রত্যেক সাহিত্য প্রতিষ্ঠান এবং সাহিত্য সম্মিলনীর অবশ্য কর্তব্য।

[কবির জীবনপঞ্জী: জন্ম ইং ১৮৬০, বং ১২৬৭, স্থান ৯ নং শ্রীনাথ রায় লেন, চোরবাগান। কবি ১৭ বৎসর বয়সে কবি বিহারীলালের সংস্পর্শে আসেন। ২৫ বৎসর বয়সে কবির পিতৃবিয়োগ হয়। ইং ১৯০৭, বং ১৩১৩, ১৯ মাঘ কবি-পত্নী সুবাসিনীর মৃত্যু হয়—কবির ৪৬ বৎসর বয়সে। কবির মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে বঙ্গধর্ম মহামণ্ডল তাঁহাকে 'কবিতিলক' উপাধি দেন। কবির মৃত্যু হয় ইং ১৯ জুন, ১৯১৯, বং ১৩২৬, ৪ঠা আষাঢ়।

গ্রন্থপ্রকাশ পঞ্জী: ১। প্রদীপ ১২৯০ বঙ্গাব্দ, ২। কনকাঞ্জলি ১২৯২, বং, ৩। 'ভুল' ১২৯৪ বং, ৪। শঙ্খ ১৩১৭ বং কবির ৫০ বৎসর বয়সে সঙ্কলিত। (১৩১৩, ১৯ মাঘ কবির পত্নীবিয়োগে তাঁহার দ্বিধাবিভক্ত জীবনের দ্বিতীয় বা শেষ পরিচ্ছেদ আরম্ভ হয়। শঙ্খের 'বিপত্নীক' কবিতা হইতেই প্রকৃতপক্ষে 'এষার' আরম্ভ।) ৫। এষা ১৩১৯ শেষ কাব্যগ্রন্থ, ৬। বিবিধ (কবিতা ও গান) অপ্রকাশিত বা বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন পত্রিকায় কবিতাগুলি মৃত্যুর পরে সঙ্কলিত হয়, ৭। চণ্ডীদাস নাটক অসম্পূর্ণ।]

কবি অক্ষয়কুমার 'জাত কবি' ছিলেন অর্থাৎ সহজাত কবিত্বের অধিকারী ছিলেন। বড়াল কবির রচনা তাঁহার কবিমানসের এক মহতী অভিব্যক্তি। তাঁহার দৃষ্টি উদার এবং অসীম, তাঁহার কল্পনা বলিষ্ঠ, ভাব গম্ভীর, ভাষা ও ছন্দযোজনা সাবলীল এবং সুষমাপূর্ণ, তাঁহার বাস্তবদৃষ্টি ও কাব্যসৃষ্টির মধ্যে সংযোগ সহজবোধ্য স্বচ্ছ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁহার হৃদয়াবেগ সুসংযত এবং প্রকাশভঙ্গী মধুর ও মর্মস্পর্শী।

সমসাময়িক মনীষিগণের মধ্যে সুরেশ সমাজপতি, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন পাল, ডক্টর ব্রজেন শীল, ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা, ডক্টর সুশীল-কুমার দে, মোহিতলাল মজুমদার, ম ম হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও প্রিয়লাল দাস বড়াল কবি সম্বন্ধে বিশেষ সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার সহিত সমালোচনা করিয়াছেন। সুরেশ সমাজপতি সমালোচনার শলাকা দিয়া কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রদীপে'র উজ্জ্বল শিখা উজ্জ্বলতর করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "কবিতার যে উপাদানে কবির গূঢ় শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহাই ব্যঞ্জনা। কবিতা সুন্দর, ব্যঞ্জনা সুন্দরতর। প্রদীপের অধিকাংশ কবিতা এই ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথের মত অক্ষয়কুমারও কবি বিহারীলালের দ্বারা প্রভাবিত হন। তবে রবীন্দ্রনাথ স্বকীয় শক্তিতে,—সে প্রভাব অতিক্রম করিয়া "স্বে মহিম্নি"—বা স্বকীয় মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিহারীলালের ভাবভঙ্গী ও ভাষা, রূপ এবং রীতি অক্ষয়কুমারেই পরিণতি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার ১৭ বৎসর বয়সে তিনি বিহারীলালের সংস্পর্শে আসেন ও শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

কাব্য সাহিত্যকে বিহারীলাল ভগীরথের মত এক অভিনব পবিত্র এবং গভীর খাতে প্রবাহিত করেন, কাব্যে একটি নূতন ধারা উৎসারিত করেন। কবির অন্তর থেকেই সে ধারার উদ্ভব, সে উৎসের উৎসরণ এবং গঙ্গাবতরণের মতই তাহা মহিমান্বিত এবং ঐশ্বর্যে মাধুর্যে পরিপূর্ণ। এই ধারা আত্মকেন্দ্রিক বা Subjective ভাব থেকে রূপে এবং রূপ থেকে ভাবে abstract to concrete & vice versa যাতায়াতের যে অনির্বচনীয় রীতি, প্রতীতি ও প্রকাশভঙ্গী তাহার পথ বাংলা কাব্যে প্রথম আবিষ্কৃত হইল, খাঁটি গীতিকাব্যের এই প্রথম সূত্রপাত। উপনিষদে পাই—

পরাঞ্চিখানিব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎপরাং পশ্যতি নান্তরাত্মা।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্ত চক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্।

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

অভিসারিকা

শ্রীরামগোপাল বিজয়বর্গী

(প্রবাসী, ১৩৪০, মাঘ হইতে পুনর্মুদ্রিত)
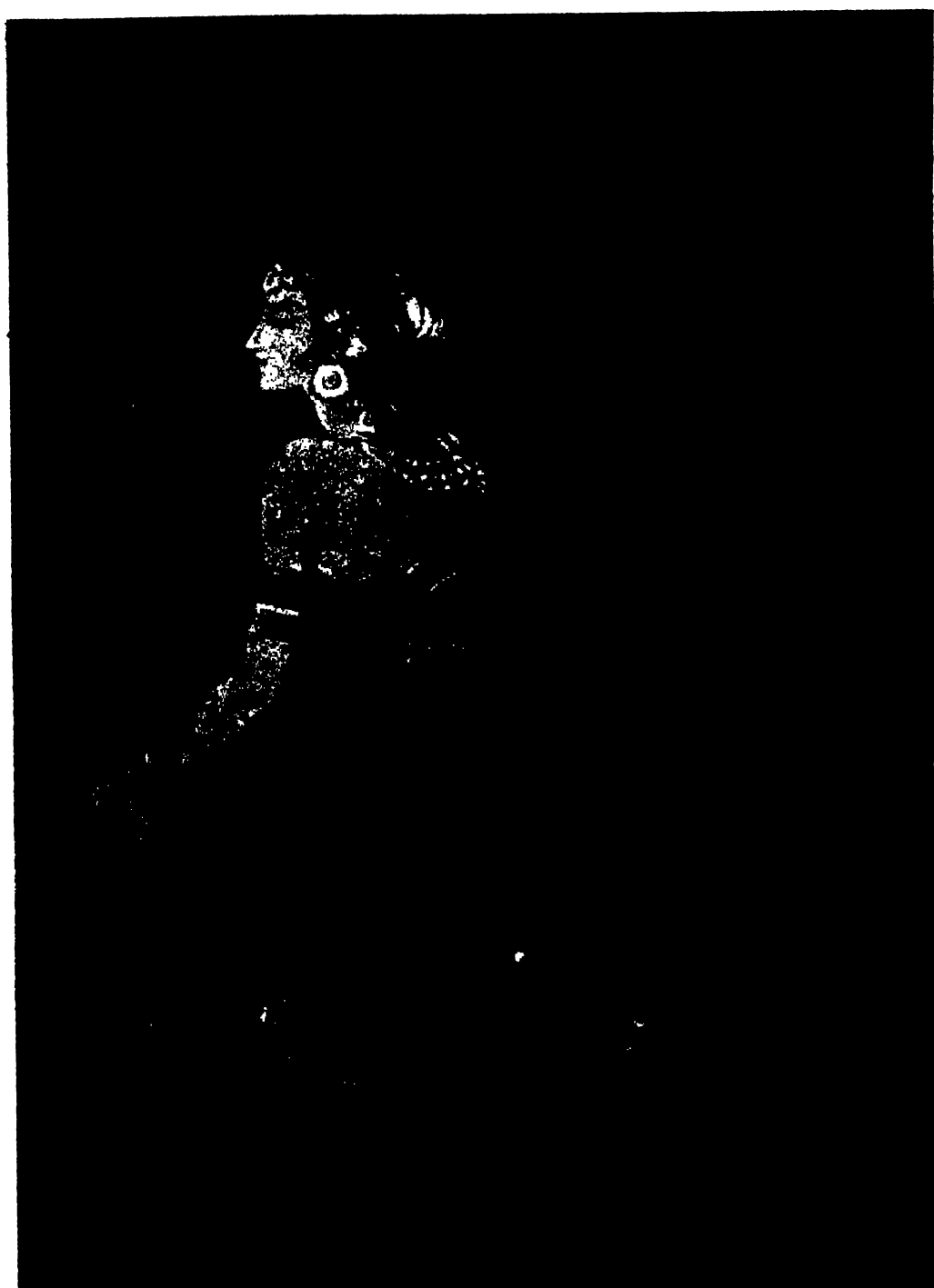
আবৃত চক্ষু হয়ে অন্তরাত্মাকে দর্শন করার মতই বাংলার কবি আপনার ভাবসমুদ্রে অবগাহন করে ডুবুরির মত মুক্তাচয়ন সুরু করলেন।

প্রদীপের একটি কবিতা 'হৃদয় সংগ্রাম' পাঠ ডক্টর ব্রজেন শীল বলেন, এইখানে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের Romanticism-এর জন্ম হয়। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কুরুক্ষেত্রে 'হৃদয় সংগ্রামে' ও 'জীবন সংগ্রামে' সকল আত্মীয় স্বজন প্রিয়জন পরিজন যেন এক একজন 'যোদ্ধা বিচক্ষণ'!

কী ভীষণ চলেছে সংগ্রাম, প্রিয়জন সনে অবিরাম!
"পূজ্য বৃদ্ধ পিতামাতা, স্নেহের পুত্তলী ভ্রাতা,
সহোদরা বালিকা সুঠাম
তাহারাও জনে জনে, উন্মত্ত এ মহারণে, হা জীবন!
হায় ধরাধাম!
প্রাণাধিকা প্রাণেশ্বরী, তারো সনে যুদ্ধ করি সেও
শত্রুসেনা একজন
শত তপস্যার ফল, এই শিশু সুকোমল, এও এক
যোদ্ধা বিচক্ষণ!"

এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কুরুক্ষেত্র—এ এক "দেবাসুর রণক্ষেত্র সর্বতীর্থসার"। ইহা পাপাসুর এবং পুণ্য দেবতার রণ-ভূমি। কবি তাঁর মনোময়ী মূর্তিকে অন্তরের ছায়ালোক থেকে উদ্বোধন করে আহ্বান জানিয়েছেন নিজের অহং মমত্ব অভিমান নাশ করে—সত্য শিব ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করতে—এই চিত্রে রূপক কাব্যের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। 'প্রদীপে' আদিরসাত্মক কবিতা আছে কিন্তু তাহার সংযম ও শুচিতাই তাহার বিশেষত্ব। সমাজপতি বলেন, "প্রথম বয়সের কবিতায় এমন সংযম প্রায় দেখা যায় না। উত্তরকালে কবি যে সুরুচি ও সুনীতির পরিচয় দিয়াছেন এই প্রদীপেই তাহার প্রথম সূচনা।"

বড়াল কবির গীতি কবিতায় দুঃখ আছে, দুঃখের কথা আছে কিন্তু তাহা দুঃখবাদ নহে,—Pessimism বা Cynicism নহে। এ দুঃখ তাঁহার 'বিষাদ যোগ'। ইহা হইতে যাহা বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয়, যাহা 'সুখমাত্যন্তিকম্' যাহা সুখের নন্দনকানন তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দুঃখবাদের মত দুঃখেই তাহার উৎপত্তি এবং দুঃখেই তাহার নিবৃত্তি নহে। সে দুঃখবাদ নিরাশ্রয়,—নিরাশ্রয়ের কারণ নাস্তিকতা এবং তাহার ফল নাশ ধ্বংস মৃত্যু।

বড়াল কবির দুঃখবাদ গীতার বিষাদ যোগ,—তিনি দুঃখে অভিভূত হন কিন্তু নিষ্পিষ্ট হন না,—এই দুঃখবাদ আধ্যাত্মিকতার প্রথম তোরণ,সাধনস্বর্গের প্রথম সিংহদ্বার, এই দুঃখ অতিক্রম করাই তাঁহার পরম পুরুষার্থ। এখানে অবিশ্বাস নাই, নাস্তিকতার স্থান নাই। এ-দুঃখ তাপ যেন তপস্যার তাপ, পঞ্চতপা সন্ন্যাসীর সাধনার অঙ্গমাত্র,—ইহা আত্মজ্ঞানদায়ক আত্মনাশের কারণ নহে। মেঘের পশ্চাতে সূর্যালোকের ন্যায় দুঃখের পরপারে ভূমানন্দের আভাস। কেননা ইহার পিছনে গীতার আশ্বাসবাণী "নহি কল্যাণ কৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।"

কবি তাঁর অন্তর দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করেন এবং অনন্ত সান্ত্বনা লাভ করেন 'এষা'র সমাপ্তি পংক্তিতে:

ভাঙ্গিতে গড়নি প্রেম ওহে দয়াময়
মরণে নহিত ভিন্ন, প্রেমসূত্র নহে ছিন্ন
স্বর্গে মর্ত্যে বেঁধে দেছ সম্বন্ধ অক্ষয়
শোকে ধূ ধূ হৃদিমরু, আছে তার কল্পতরু
নেত্রনীরে ইন্দ্রধনু হইবে উদয়।

*　　*

মরণে কি পুড়ে প্রেম অনলে কি পুড়ে প্রাণ
বাতাসে কি মিশে গেল সে নীরব আত্মদান?

এই বেদনা তাঁহাকে আত্মহারা করে নাই, আত্মস্থ করিয়াছে, ভগবন্মুখী করিয়াছেন তাই তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন—

দাও প্রেম, আরো প্রেম চির প্রেমময়
আরো জ্ঞান আরো ভক্তি আরো আত্মজয়শক্তি
তোমার ইচ্ছায় কর মোর ইচ্ছা লয়
জীবন মরণ পানে বয়ে যাক্ সুরে গানে
হোক প্রেমামৃত পানে অমর হৃদয়।

তিনি ঈশ্বরকে মানুষের সুখ-দুঃখ প্রণোদিত ভালো-মন্দ বিচারের ঊর্ধ্বে রাখিয়াছেন:

"অনাদি অনন্ত তুমি অসীম অপার
আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি ধরি কত ভাঙ্গি কত গড়ি
করি কত সত্য মিথ্যা নিত্য আবিষ্কার—
নিজ সুখ দুঃখ দিয়া তোমারে গড়িয়া নিয়া
বসি কত ভালমন্দ করিতে বিচার।"

বড়াল কবির কবিতায় নারী পুরুষের ভোগবিলাসের উপাদান পিশিত পুত্তলী মাত্র নহেন, যাহার বর্ণনায় শঙ্কর বলেছেন:

নারী স্তনভরণাবিনিবেশা মিথ্যামায়া মোহা বেশা।
এতন্মাংসবসাদি বিকারং মনসি বিচারয় বারংবারম্॥

কবির চক্ষে নারী "এ নির্মম জীবন সংগ্রামে তুমি বিধাতার আশীর্বাদ", "বিধাতার মহাকাব্য তুমি, সসীমে অসীমে সম্মিলনী"—

অথবা—"অসম্পূর্ণ এ সংসারে, তুমি পূর্ণতার দীপ্তি, সান্ধ্য মেঘে স্বর্গের আভাস।"

এই কবি দৃষ্টি Seens Helens beauty in the brow of Egypt, কবি নারী প্রকৃতিকে বিশ্ব প্রকৃতির মতই উদার মুগ্ধ নেত্রে দর্শন করেছেন", "আহা প্রাণারাম কিবা, নির্মল উজ্জ্বল বিভা, চারিদিকে খেলিছে তোমার, ছড়াইছে সৌন্দর্য অপার।"

অথবা—"একবার নারী তব প্রেমমুখ হেরি
আর বার প্রকৃতির শ্যামবুক হেরি
মনে হয় দুই জনে দুখানি মেঘের মত
রহিয়াছে জগতেরে ঘেরি,—
আমি তোমাদের মাঝে একটি বিদ্যুৎসম
চকিতে জলিয়া
মিশায়ে মিলায়ে যাই মিশিয়া মিলিয়া।"

কবির দৃষ্টি এখানে সসীম হইতে অসীমে—শান্ত হইতে অশান্ত—গৃহাকাশ হইতে অন্তরীক্ষে মহাকাশে পরিব্যাপ্ত।

অক্ষয়কুমার সাধক এবং ভক্ত। রবীন্দ্রনাথ রূপসাগরে ডুব দেন অরূপ রতন আশা করি। বড়াল কবিও রূপে নিমগ্ন হয়ে অরূপের এবং অপরূপের সন্ধান পান।

তিনি সৌম্যা সৌম্যতরাশেষ সৌম্যাভ্যোস্বতি সুন্দরীর পরাপরাণাং পরমা সুন্দরীর সৌন্দর্যের আভাস পান, যাহা দেখিতে দেখিতে, সমাজপতির ভাষায় বলি: কবি অনুভব করেন যে, "তাঁহার দৃষ্ট রূপ অরূপের সৌন্দর্যে মগ্ন হইয়া যায়। বাসনার তরঙ্গ প্রেমের বিক্ষোভহীন পারাবারে মিশিয়া লুপ্ত হইয়া যায়।"

তাঁহার প্রেমের কবিতায় লালসার পঙ্কিলতা নাই,— "সে প্রেম সর্বত্র অগ্নিপূত শুদ্ধ হেম। তাহা ভোগতৃষ্ণার হাহাকার নহে, আত্মবিস্মৃত ভক্তের আত্মবিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা।"

অক্ষয়কুমারের কবিতা মানবিকতা (Humanism) ধর্মে এবং মানবিক সমবেদনায় সমৃদ্ধ। তিনি মানুষকে ভালবাসেন, মানুষের সুখে তিনি হাসেন দুঃখে কাঁদেন, আর্তি এবং সহানুভূতি প্রকাশ করেন। সমাজপতি বলেন—"এই জন্যই তাঁহার কবিতার ঝঙ্কারে আমাদের প্রাণের তন্ত্রী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। তাঁহাকে এই বিপুল মানব পরিবারের একজন নিতান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলিয়াই মনে হয়।"

কবি মানবহৃদয়ের কাঙাল—তাই তাঁর কবিতায় পাই:

"কাব্য নয়, চিত্র নয়, প্রতিমূর্তি নয়
ধরণী চাহিছে শুধু হৃদয় হৃদয়।" (শঙ্খ)

'কণকাঞ্জলি' (১২৯২ বঙ্গাব্দ)-র ভূমিকায় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মন্তব্য করিয়াছেন যে, কবির "প্রেমে লালসা নাই, আত্মবিসর্জন আছে। যাহা স্থায়ী রস তাহাই কাব্যের প্রকৃত রস, সেই রসে অক্ষয় গীতি কাব্য চির-অভিষিক্ত।"

অনির্বচনীয়কে প্রকাশ করিতে গিয়া তাহার অন্তরের আকুতি এবং দৈন্যের প্রকাশ লক্ষণীয়—

"ঘুমায়ে পড়েছে জগৎ সংসার পত্রেপুষ্পে সমাবৃত মলয়
নিঃশ্বাসে
বিমূঢ় হৃদয় ভাবে কোথা ভাষা তার, কি দিয়া নবীন
পিক বসন্তে সম্ভাষে?
জানি কি বলিতে চাই,—জানি না কি বলি
ক্ষম এই অক্ষমতা সত্যে নাহি ছলি।" (কণকাঞ্জলি)

'মহতো মহীয়ান'কে 'অণোরণীয়ানে'র মধ্যে দর্শন করার দিব্য দৃষ্টি তাঁহার আছে:

"ক্ষুদ্র বনফুল বাসে, সারাটা বসন্ত ভাসে
ক্ষুদ্র উর্মিমূলে বুলে প্রলয় প্লাবন,—
ক্ষুদ্র শুকতারা কাছে চির ঊষা জেগে আছে
ক্ষুদ্র স্বপনের পাছে অনন্ত ভুবন।"

স্বর্গীয় অতৃপ্তি (Divine discontent) তাঁহার কবিতায় লক্ষ্য করিবার বিষয়. মিলনের তৃপ্তি অতৃপ্তির খেলা বিদায় মুহূর্তে কি রসমূর্তি পরিগ্রহ করে, তাহা আঁকিয়া বা আঁকিতে গিয়া কবি যে দার্শনিকের রসাত্মক প্রতিরূপ তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন।

"অসমাপ্ত এ চুম্বন অপূর্ণ পিপাসা—
এইত প্রেমের বন্ধ বাস্তবে স্বপনে দ্বন্দ্ব
কবিতার চিরানন্দ কল্পিত নিরাশা
খুলে দাও বাহু পাক, অপূর্ণ অপূর্ণ থাক
আজ যদি কেঁদে যাই, কাল ফিরে আসা
থাকুক পিপাসা।

* * *

অথবা
হা হৃদয়, বিনির্মিত রক্তমাংস মেদে
পরিমলে কুতূহলী ফুলে শেষে পায়ে দলি
তৃপ্তির নরকে জলি অতৃপ্তির খেদে—।
বুঝি না সঞ্চারী পরে স্থায়িরস মূর্তি ধরে
অসীম মিলন স্ফুরে সসীম বিচ্ছেদে॥

প্রেমের কথা বলিতে কবি অক্ষমতা প্রকাশ করিতে গিয়া আভাসে এবং ইঙ্গিতে চোখের ভাষায় কিছুটা আভাস সহজ মুখের ভাষায় দিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং সে চেষ্টা সার্থক হইয়াছে—প্রেম কি বুঝানো যায়?

নয়নে নয়ন না মিলিল যদি কেমনে বুঝাবো তায়?
চলিয়া সে যায় ফিরিয়া না চায় আমি শুধু চেয়ে থাকি
বুঝিতে চাহিলে সকলি বুঝিত আঁখিতে মিলিত আঁখি।

প্রেম কি বুঝানো যায়
নিশাসে নিশাসে বুক ভেঙে আসে কেমনে বুঝাব তায় ?
দাঁড়াইলে কাছে দুরু দুরু হিয়া গুরু গুরু গরজন
বুঝিতে চাহিলে সকলি বুঝিত দেহে মনে প্রাণপণ।
প্রেম কি বুঝানো যায়
আপন মরণে আপনি মরিয়া কেমনে বুঝাব তায় !

'ভুল' কাব্যগ্রন্থ রচিত হয় ১২৯৪ বঙ্গাব্দে। ইহাই কবির জীবনের প্রথমাধ্যায়ের শেষ গ্রন্থ। তাঁহার দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হয় তাঁহার পত্নী সুবাসিনীর মৃত্যুতে ১৯শে মাঘ, ১৩১৩ সাল। তাঁহার চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ শঙ্খ প্রকাশ হয় ১৩১৭ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে (ইং ১৯১০), ইহা তাঁহার পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়সে প্রকাশিত হয়। পত্নী বিয়োগের আঘাতে কবির জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যায়। সজনীকান্ত দাস বলেন—"শঙ্খের শেষাংশ 'এষার' সমপর্যায়-ভুক্ত হইয়া পড়ে। প্রকৃতপক্ষে শঙ্খের 'বিপত্নীক' কবিতা হইতেই এষার আরম্ভ।"

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের কথা। নন্দগোপাল সেনগুপ্ত—তাঁহাকে তৎকালীন রবীন্দ্র সমসাময়িক কবিদের মধ্যে 'সর্বশ্রেষ্ঠ' আখ্যা দিয়েছেন। "তাঁর কবিতায় সুতীব্র ভাবাবেগের সঙ্গে বল্গাহীন অসঙ্কোচে অন্তরকে উজাড় করে দেবার অনায়াসতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।"

(বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা)

গোবিন্দ দাস 'বেপরোয়া যৌবনের কবি,'—'তাঁর লাইনে লাইনে অশান্ত রক্তের উন্মাদ নৃত্য।'

অক্ষয় বড়ালে আবেগের উত্তপ্ততা বা উন্মত্ততা নাই। তাঁহার ভাবের গাম্ভীর্য, ভাষার মাধুর্য এবং প্রকাশের সংযম ও শুচিতা অনন্যসাধারণ।

'এষা'র সূচনাতেই কবি বলিয়াছেন, 'মানবীর তরে কাঁদি চাহি না দেবতা।' তাঁহার রচনায় তাঁহার 'মানবী' কিন্তু দেবীর সহিত, প্রিয়ার সহিত, দাসীর সহিত একাত্মতা লাভ করিয়াছেন—

এস এ হৃদয়ে মম অস্ফুট চন্দ্রিকা সম
এস প্রেমে স্নিগ্ধ করুণায়
ঢেকে দাও সব ব্যথা অসমতা অক্ষমতা
ছড়ায়ে জড়ায়ে মমতায়—।
লয়ে প্রেম সুধা হাসি এসো দেবী এসো দাসী
এসো সখী এসো প্রাণ প্রিয়া
সব সুখ দুঃখ ঘুরে জন্ম মৃত্যু ভেঙে চুরে
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ব্যাপিয়া।

নন্দগোপাল বলেন :

"পদ্মাতীরে বেলকাঠ মাথায় দিয়ে চিতা-শয্যায় শায়িতা প্রিয়ার স্মৃতিতে উদ্‌ভ্রান্ত গোবিন্দ দাসের উচ্ছ্বসিত কান্না এ নয়,—আবার মৃত্যু মহোৎসবের ভেতর দিয়ে চিরন্তন অমরত্বে অভিষিক্তা প্রিয়ার স্মৃতিতে আশ্বস্ত রবীন্দ্রনাথের নৈর্ব্যক্তিক তাত্ত্বিকতাও এ নয়—এই হ'ল সেই সুগভীর বেদনার অভিব্যক্তি যা আপামর সাধারণের নিত্যকার অনুভূতি।" বড়াল কবির আছে 'সমাহিত স্নিগ্ধতা'—যা গোবিন্দ দাসের 'বাঁধন ছেঁড়া ভাবোন্মত্ততার পাশে আরও সুস্পষ্টরূপে প্রতীত হয়।

'শঙ্খ' সম্বন্ধে ডক্টর সুশীলকুমার দে বলিয়াছেন,

'ঝটিকার শেষে প্রকৃতির শান্ত প্রসন্নতা'ই শঙ্খের প্রধান সুর। ইহাতে আর…"যাতনার জ্বালা নাই ইহা একটি বিষণ্ণ মধুর আকার ধারণ করিয়াছে। উষার শুকতারাই সন্ধ্যার সন্ধ্যাতারা হইয়া দেখা দিয়াছে কিন্তু। সায়াহ্নের কোমল স্নিগ্ধতায় তাহার রূপ অপরূপ হইয়াছে।" (নানা নিবন্ধ, পৃঃ ২৭৯-৮১)

'বিপত্নীক' হইতে অল্প কিছু উদ্ধৃত করিতেছি—

বিশাল সংসার সেই পড়ে আছে হায় !
সেই দিন যায় বয়ে, আলোক আঁধার লয়ে
একা আছি শূন্যে চেয়ে এ শূন্য ধরায়।
সে-ই নাই হায় !

*　　*　　*

কতদিন গেছে চলে নাহি আর গৃহতলে
লুণ্ঠিত অঞ্চল চিহ্ন চরণের দাগ
নাহি আর এ শয্যায় সেরূপ আভাস হায় !
সে পবিত্র দেহগন্ধ সে স্বপ্ন সজাগ !

*　　*　　*

তার সে আদুরে মেয়ে দ্বারে বসে পথ চেয়ে
ঠোঁটে আর হাসি নাই মুখে নাই রব
কোলে তুলে নিতে গেলে অমনি কাঁদিয়া ফেলে
ঘরে যেন কেহ নাই পথে যেন সব !
দাস দাসী পরিজন সকলেই ভাঙামন
ফিরিয়া পলাতে গেলে প্রাণ যেন পায়—
আঁধারে দুঃস্বপ্ন সম কি দীর্ঘ জীবন মম
কারে কি সান্ত্বনা দিব কে দিবে আমায় ?

ডক্টর লাহা বলেন—অক্ষয়কুমারের প্রদীপ প্রভৃতি চারখানি গ্রন্থে তাঁহার কবি প্রতিভার অসামান্য পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু "এষাতেই তাঁহার রচনা মাধুর্যের ও কবিত্বের পূর্ণ বিকাশ ও পরিণতি লক্ষিত হয়। পুত্র,

কন্যা, স্বামী, স্ত্রী বা আত্মীয় বিয়োগের ফলে বঙ্গ-সাহিত্য যে সমস্ত গদ্য ও পদ্য রচনা দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছে 'এষা' তাহাদের মুকুটমণি। কেননা এষা বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবনের একখানি আলেখ্যকে অতি দক্ষতার সহিত কাব্যের শ্রেষ্ঠ রূপান্তরে পৌঁছাইয়া দিতে পারিয়াছে।

শোক সাহিত্যে গদ্যে চন্দ্রশেখরের 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' মানকুমারীর প্রিয়প্রসঙ্গ স্মরণীয় রচনা। পদ্যে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের পত্নী বিয়োগের কবিতাবলী, গিরিজাকুমারের পত্রপুষ্প, কায়কোবাদের 'অশ্রুমালার', গিরীন্দ্র মোহিনীর 'অশ্রুকণা', যদুনাথ চক্রবর্তীর সতী প্রভৃতি শোকাত্মক কাব্য সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছে। তন্মধ্যে 'এষা'র বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মোহিতলালের বিশ্লেষণাত্মক মন্তব্য হইতে সারাংশ উদ্ধৃত হইল।

সমগ্র এষা কাব্যখানি বাঙালী কবির দাম্পত্য প্রীতির একটি মহিমময়ী মূর্তি···বিহারীলাল যাহাকে আপন ইষ্টদেবতার আসনে বসাইয়া ছিলেন, সুরেন্দ্রনাথ যাঁহাকে সংসারে ও সমাজে তাঁহার স্থায় সঙ্গীত অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন এবং দেবেন্দ্রনাথ ভাবভোলা কবিত্বের আবীর কুঙ্কুমে যাহার অর্চনা করিয়াছেন, অক্ষয়কুমার তাহাকেই বাঙালীর গৃহপ্রাঙ্গণে নিত্য লক্ষ্মীপূজার উৎসবে বাস্তব সুখ দুঃখের গন্ধপুষ্প ও সুগভীর স্নেহ রসের আলিপনায় হৃদয়েশ্বরীরূপে বন্দনা করিয়াছেন। ···যেরূপ একাধারে রাধিকা ও অর্পণা আত্মবিগলিত অথচ আত্মস্থ গ্রহণে দুর্বল, ত্যাগে রাজরাজেশ্বরী, যেরূপ যুগল প্রেমের রসাবেশে ও দাস্য সখ্য বাৎসল্যের এক অপূর্ব সংমিশ্রণে প্রাণে ভাবের ঘোর সৃষ্টি করে—অক্ষয়কুমার জীবনে সেইরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া সেই নারীবিগ্রহের আরতি করিয়াছেন।"

অর্থাৎ যে দেবী "স্ত্রীয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু" বিরাজ করিতেছেন, কবি তাঁহারই গৃহীনাং গৃহদেবতারূপকে অন্তরের সমস্ত আকুতি দিয়া প্রেমের পঞ্চপ্রদীপে আরতি করিয়াছেন।

মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল—সর্ব সংস্কারশূন্য হইয়া কবির 'এষা' কাব্যখানি সর্বপ্রথম পড়িয়া মন্তব্য করিয়াছেন: "আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অক্ষয়কুমার এই শোকাত্মক গীতি কাব্যে এক অপূর্ব বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন। এই শ্রেণীর কাব্যসৃষ্টির মধ্যে এই এষাখানি বিশ্বসাহিত্যেও অতি উচ্চস্থান পাইতে পারে, ইহাতে বিন্দুমাত্র অতিশয় উক্তি আছে বলিয়া আমি মনে করি না।"

শোক সঙ্গীতের মধ্যে এষা "একটি অনন্তলব্ধ সত্য ও সৌন্দর্য লাভ করিয়াছে।" "অক্ষয়কুমার এষাকে যে শোকের উপর গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহা বিশ্বজনীনত্ব লাভ করিয়াছে···কবি এখানে সমগ্র মানব জাতির সঙ্গে একাত্ম হইয়া সমগ্র মানবপ্রাণের সঙ্গে সঙ্গতি মিলাইয়া আপনার শোকগাথা গাহিয়াছেন, তাই তাঁহার এষার মধ্যে প্রত্যেক শোকার্ত পাঠক আপনাকে দেখিতে পাইয়া আপনার অন্তরের শোকের বা শোকস্মৃতির বিশ্বজনীনত্বটুকু উপলব্ধি করিয়া চকিত স্তম্ভিত ও পুলকিত হইয়া উঠেন।"

"দর্পণে লোকে যেমন আপন আপন মুখ দেখিয়া থাকে সেইরূপ এই প্রস্ফুট ও উজ্জ্বল রসচিত্রের মধ্যে বিশ্বজন আপন আপন অন্তরের অদৃষ্ট পূর্বরসের, রূপের ও স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া বিস্মিত পুলকিত মুগ্ধ ও তৃপ্ত হয়। এইরূপ কাব্য সৃষ্টিই রসবিচারে সর্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হয়। শোক চিত্রের মধ্যে, এই গুণেই এষাখানি অসাধারণ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।"

"এষার প্রথম ও প্রধান গুণ—এই ভারতচন্দ্র কাব্যের অসাধারণ বস্তুতন্ত্রতা। কবি আপনার জীবনের, বাহিরের ও ভিতরের অতি ঘনিষ্ঠ ও পরিচিত অভিজ্ঞতার উপর এই কবিতাগুলি গড়িয়াছেন।···এষার চিত্রগুলিতে কোথাও অস্পষ্টতা দেখিতে পাই না, ইহার মধ্যে কোথাও কিছু দুর্বোধ্য বা অবোধ্য নাই। অক্ষয়কুমার সুকুমার গোধূলিলগ্নে তাঁহার কবিতাসুন্দরীর অবগুণ্ঠনখানি ঈষদপসৃত করিয়া সেই আলো আঁধারের ইন্দ্রজালের মধ্যে তাহার অপ্রাকৃত মাধুর্যের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করেন নাই।"

"সুললিত শব্দ সাজাইয়া ইন্দ্রসভার অনিন্দ্য সঙ্গীতের ঝঙ্কার তুলিয়া কবিতার নামে কেবল মোহিনী হেঁয়ালির রচনা করেন নাই।"

তিনি প্রকৃত পক্ষে প্রাকৃত উপলব্ধিলব্ধ অভিজ্ঞতাপ্রসূত সুস্পষ্ট এবং সুবিন্যস্ত একখানি প্রাণবন্ত কাব্যের আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন।

টেনিসনের 'ইন মেমোরিয়াম' ইংরেজী শোকাত্মক কাব্যের একটি অনবদ্য শিল্প, ইহার সহিত তুলনা করিয়া বিপিনচন্দ্র বলিয়াছেন যে, উহা তিনি তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়াছেন শোকার্ত হৃদয়ে মৃত্যুর অন্ধকারে বসিয়া দিবানিশি পড়িয়াছেন, কিন্তু তাহা জীবনমৃত্যুর সমস্তাকে এষার মত ফুটাইতে পারে নাই, যদিও তাহাতে অতি সুন্দর অতি গভীর অতি মধুর অনেক কথা আছে। কারণ, টেনিসন বহু বর্ষ ধরিয়া বিবিধ বিষয় কর্মের বিক্ষেপের মধ্যে ইহার এক একটি অংশ রচনা করিয়াছিলেন, যোগস্থ হইয়া রসানুভূতিতে বিভোর হইয়া লেখেন নাই, সেজন্য তাহাতে অপ্রাসঙ্গিক অনেক কথা আছে। একটি রসঘন

ভাব দানা বাঁধিয়া উঠে নাই। তাই বিপিনচন্দ্র বলেন, "এ বিষয়ে এষা 'ইন মেমোরিয়ম' অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। ইন মেমোরিয়মের বুহুনি আলগা, এষার বুহুনি ঠাসা। শোক কাব্যের মূল লক্ষ্য করুণ রসের অভিব্যক্তি। টেনিসনের কাব্যে সে গভীর কারুণ্য কোথায়? অক্ষয়কুমারের এই কাব্যখানির প্রতি ছত্রে নিদারুণ মর্ম্মস্পর্শী কারুণ্য অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে।" কারুণ্যের অভিব্যক্তিতে একমাত্র প্রাচীন পদকর্ত্তাদের বিরহ গাথা ভিন্ন এষা বাংলার অন্য সকল কবিতাকে অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া তাঁহার ধারণা। এষার কবি এষার নিপুণভাবে যে অপূর্ব কারুণ্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন সে নৈপুণ্য—"টেনিসনের ইন মেমোরিয়মে নাই, কালিদাসের 'রতিবিলাপে' নাই, 'বেহুলার গানে' নাই, আছে কেবল কোথাও কোথাও বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের দৃঢ় বিরহ বর্ণনায়।"

এষার পদসমাবেশ কৌশল কৃত্রিম নহে, কষ্টসাধ্য নহে, নিতান্ত সহজ সরল এবং স্বাভাবিক। মনস্তাত্বিকতার বিচারেও কাব্যখানি শ্রেষ্ঠ। পত্নীশোকাতুর কবির মর্ম্মের স্তরে স্তরে যে আর্তি যে বিয়োগ-বেদনা জাগিয়া উঠে—"তাহার একখানি পরিষ্কার প্রামাণ্য ধারাবাহিক ইতিহাসরূপেও এষা অনন্যসাধারণ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে।"

এই শোকচিত্রপটে কবি শুধু নিজের শোকচিত্র আঁকিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহার সমস্ত শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের মর্মবেদনা যেন একটি উজ্জ্বল তৈলচিত্রের রেখায় রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"এই কবিতাগুলিতে যেন বিশ্বের সার্বজনীন দাম্পত্য বিরহের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি, আলেখ্যটির প্রতি অঙ্গে প্রত্যঙ্গে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। ইহা যেন কবিতা নহে, ভাবোচ্ছ্বাস বা ভাবের তরঙ্গমাত্র নহে—ইহা যেন আমাদের স্বকীয় অভিজ্ঞতালব্ধ পুরাতন পরিচিত বস্তু। বিপিনচন্দ্র বলেন—

"চক্ষে যাহা দেখিয়াছি এই শব্দ চিত্রে তাহাই প্রত্যক্ষ করিতেছি। প্রাণে যাহা ভুগিয়াছি তাহাই এখানি পুনর্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। পড়িতে পড়িতে সেই পুরাতন বিস্মৃত ভাবগুলি প্রাণের অন্তস্তলে যেন নড়িয়া চড়িয়া উঠে।"

এষার কবিতাগুলি ব্যঞ্জনায় পরিপূর্ণ, কবির ইঙ্গিতে তাঁহার কথিত অর্থের আভাসে পাঠকের অন্তরে নিগূঢ় অনুভূতি তাঁহার নাড়ীতে নাড়ীতে সঞ্চারিত হয়—তাঁহার সমস্ত মর্মদেশ টনটন করিয়া উঠে। "কবি একটি দুইটি কথায় ইঙ্গিতে এক-একটি বিশাল রসরাজ্য পাঠকের মনশ্চক্ষে খুলিয়া দিয়াছেন।"

বিপিনচন্দ্র সত্যই বলিয়াছেন যে, "এষার কবিতাগুলির দৃশ্য সাধারণ এবং উপকরণ সামান্য কিন্তু এই কবিতাগুলির উপজীব্য যে কারুণ্য—তাহা অলোকসামান্য। এই সামান্য উপকরণ লইয়া অক্ষয়কুমার যে এমন সজীব উজ্জ্বল রসমূর্তি গড়িয়াছেন ইহাই তাঁহার অলোকসামান্য কবি প্রতিভার পরিচয়।"

পাশ্চাত্য চিন্তাশীল সমালোচকের মন্তব্য মনে পড়ে—'A poet creates a Lear or a Hamles...to show the working of the human heart' কারণ the substitution of the concrete for the abstract is an aid to the untrained. অর্থাৎ ভাবকে রূপায়িত করলে বা মূর্তি পরিগ্রহ করালে সহজে সাধারণ জনের গ্রহণযোগ্য হয় নচেৎ "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাং অব্যক্তাসক্তচেতসাং।"

তাই কবি দাম্পত্যের বিয়োগ বেদনাকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। মনস্তাত্বিক বলেন: In the arithmetic of life the smallest unit is a pair—এবং এই pair-এর একটি আর একটি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াতেই আদি কবির প্রথম কবিত্ব ভাষায় ব্যক্ত হইয়া উঠে, নিষাদের প্রতি অভিশাপে প্রযুক্ত হয় সেই অমর শ্লোকে—

মা নিষাদঃ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ
যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥

কবি অক্ষয়কুমার দুঃখের কবি নন দুঃখবাদী তো ননই—তিনি বেদনার সংবেদনশীল কবি যিনি সাময়িক স্বকীয় শোকের বস্তুতান্ত্রিক ভিত্তিতে শাশ্বতিক সার্বজনীন ভাবের হর্ম্যনির্মাণ করেছেন। যেন সেটি শোকের আলেখ্যের চারুচিত্রশালা।

মহাকবি রবীন্দ্রনাথের তিনি এক বৎসর পুরোবর্তী ছিলেন—তাই মনে হয় যেন তিনি উদয় রবির রথাগ্রে অরুণের মতই সার্থক অগ্রগামী ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাই অক্ষয়কুমারের স্মরণে মনে হয়:

"অপরূপ আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেয় তার বক্ষে বেদনা অপার
তার নিত্য জাগরণ, অগ্নি সম দেবতার দান
ঊর্দ্ধ শিখা জ্বালি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ॥"

---

* এই প্রবন্ধটি বিগত ১০ই এপ্রিল '১৯৬০ তারিখে বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনীর কাব্যশাখার অধিবেশনে পঠিত।

বনের হরিণী

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

ভাগ্যলক্ষ্মী সমীরের গলায় বিজয়মাল্য পরিয়ে দিয়েছে। অনেকেই ঈর্ষান্বিত হৃদয়ে এমনকি বন্ধুরাও ভাবে কি ভাগ্যবান, কি মূর্খ সমীর, ফাটা কপাল তার, সৌভাগ্য চুঁইয়ে পড়ছে—তার মত সুখী কে?

সেই সমীরের রাত দুটোয় ঘুম ভেঙে গেল, পার্শ্ববর্তী পালঙ্কের শূন্য শয্যা দেখে হঠাৎ একটা অব্যক্ত ব্যথায় মন ছেয়ে গেল। উঠে বসল খানিকক্ষণ; কিছুই ভাল লাগছিল না। খাট থেকে নেমে পড়ল, ফাইলের গাদা নিয়ে বসল অশান্ত মনটাকে শান্ত করতে। একটানা কাজ করে যখন উঠল, তখন ভোর হয়ে গেছে।

পায়চারি করতে করতে সমীর নিজের চিন্তায় তন্ময় হয়ে গেল। পায়ে-চলা পথের দু'পাশে গোলাপ গাছের সারি, এদিকে-সেদিকে মরশুমী ফুলের কেয়ারী। সমীর একবার বাগানের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল। বসন্ত যাই যাই করছে, এতদিন বিচিত্র রঙের বাহার খুলে মরশুমী ফুলগুলো বাগান রূপের আভায় উজ্জ্বল করে রেখে ছিল, এখন যেন তা কেমন নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। যে সবুজ লনের কোমল ঘাসগুলোর বুকে হীরের কুচির মত শিশিরকণা ঝলমল করে উঠত তা দেখে সুলতা আর সে দু'জনে মিলে এক সঙ্গে গুরুদেবের সেই কবিতাটা আওড়াত—

বহু দিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে, বহু ব্যয় করে বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্ব্বতমালা, দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু,
দেখা হয় নাই শুধু চক্ষু মেলিয়া, ঘর হতে শুধু দু'পা মেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপরে একটি শিশির বিন্দু।

সেই অজস্র শিশিরকণার অভাবে সেই শ্যামল লনের ঘাসগুলো স্থানে স্থানে হরিদ্রাভ হয়ে উঠেছে, মনে হ'ল এ যেন তারই উত্তপ্ত হৃদয়ের ছবি।

ধীরে ধীরে পাখীর কাকলীতে নিস্তব্ধ বাগান মুখরিত হয়ে উঠল। ঘুঘু একটানা ডেকে চলেছে ঘু—ঘু। বিরহীর মর্ম্ম থেকে যেন প্রাণকাড়া উদাস সুর বেরুচ্ছে। সমীর অস্থির ভাবে ঘুরতে ঘুরতে এসে দাঁড়াল সবুজ লনের সেই পাইন গাছের নিচে, যেখানে কয়েকটা খঞ্জনা পাখী নাচের ভঙ্গিতে হেঁটে হেঁটে চলেছে। হঠাৎ বহু বৎসর আগের একটা চিত্র ভেসে উঠল প্রথম যেদিন তারা এই নতুন বাড়ীতে এসেছিল। খঞ্জনার নাচ দেখে সুলতা বালিকার মত চঞ্চল হয়ে ছুটেছিল খঞ্জনাকে ধরতে। আর সে দেখেছিল তার সেই ছন্দোময় সুঠাম দেহ লীলায়িত হয়ে উঠেছে, অবিন্যস্ত কেশভার চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। অরুণ কিরণস্নাত তরুণ মুখ সমীরের মনে এক মোহজাল ছড়িয়ে দিয়েছিল। সমীর পদমর্য্যাদা ও বয়স ভুলে সুলতার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল পাখী ধরায়। প্রেমভরে সমীর ডেকেছিল, 'সু'। কৌতুকোজ্জ্বল মুখ তুলে সুলতা মিঠে গলায় ডেকেছিল 'স', তার পর দু'জনে পা ছড়িয়ে বসে-ছিল সেই পাইন গাছের নিচে।

পুরাণো স্মৃতি মধুর আমেজ এনে দিল মনে। বহুদিন পর সমীর গিয়ে বসল সেই পাইন গাছের নিচে, আনমনা ভাবে চেয়ে রইল সে দিকটায় যে দিকে ইউকেলিপ্‌টাস গাছ সগর্ব্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। কোণের নিমগাছটায় মাধবীলতা ঠাসাঠাসি করে শ্যামলশ্রীতে ভরে তুলেছে। নাম-না-জানা বেগুনে রঙের ফুলগুলো ছড়িয়ে সবুজ ঘাসের বুকে বুটি বুনে দিয়েছে। সমীর সে অজস্র মধুর স্মৃতিজড়িত স্থানে আর বসতে পারল না। ভাল লাগছে না, উঠে দাঁড়াল। এক জোড়া ছোট্ট পক্ষি-দম্পতি পাইনের নীচের ডালটাতে এসে বসল, মাদি পাখীটা ছোট কালো ঠোঁট দিয়ে নিজের গলা বুক চুলকাচ্ছে। ফুরুৎ করে উড়ে যাচ্ছে, আবার এসে ডালে বসছে, আর পুরুষ পাখীটা গলা ফুলিয়ে চুপ করে বসে আছে। বোধ হয় ভাবছে, কি করে পাখীনীর এই উড়ু উড়ু ভাব বন্ধ করতে পারে।

সমীর ত্রস্তে এসে ঘরে দাঁড়াল। বড় বড় ঘরগুলোও আর সহ্য করা যায় না, ওরা যেন নীরবে মৌন আবেদন জানাচ্ছে, কবে আসবে গৃহস্বামিনী। অশান্ত চিত্তে ভাবে এর চেয়ে অফিসই ভাল ছিল। শূন্যগৃহে শূন্যমনে আর থাকা যায় না। সমীর ভাঁড়ারে ঢুকে দু'হাত ভরে দানা নিয়ে গেল রেডহর্ণ মুরগীর খাঁচার কাছে। আয় আয় করে ডেকে তাদের কাছে দানাগুলো ছড়িয়ে দিল, কিছু-ক্ষণ এদের খাওয়া নিয়ে কাড়াকাড়ি ছুটোছুটি দেখল, তার পর বারান্দায় এসে আরাম কেদারায় নিজের দেহটা এলিয়ে দিল। যে দিকে চাওয়া যায়, সে দিকেই সুলতার

অজস্র স্মৃতি বহন করে আছে প্রতিটি জিনিস, সে কোন্‌টা তুলবে, কোন্‌টা ভেঙ্গে ফেলবে? সে যদি গোটা বাড়ীটাই ধ্বংস করে দেয় তবু কি সুলতাকে নিজের জীবন থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারবে? সুলতা বারে বারে তার মনে এসে কি উঁকিঝুঁকি দিবে না? একবার চঞ্চল চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে কপট ভঙ্গিতে কি বলবে না—এই রইল তোমার ঘর দুয়ার, চললাম, চললাম। আমি আমার সেই মাটির কুঁড়েঘরে। আঃ কি আরাম, পা ছড়িয়ে বসব ঘরের দুয়ারে, মঙ্গলার ঝুলেপড়া গলার লতিটাতে হাত বুলিয়ে দেব, ঘাস তুলে দেব মুখে। সন্ধ্যায় গলায় আঁচল দিয়ে তুলসী তলায় ছোট্ট একখানি মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রণাম করে বলব, ঠাকুর, আমার "স"কে বাঁচিয়ে রেখো। তার পর গাল ফুলিয়ে বলবে —কাজ, কাজ, কেবল কাজ, আমার প্রাণ হাঁফিয়ে উঠেছে তোমার এই বিলাসিতা ভরা জীবনের চাপে। সারাদিন সাজোগোজো, পার্টি দাও, খাও, কাঁটাচামচের ঠন্‌ঠন্ "মৌমাছির" গুঞ্জন, আর এসব ভাল লাগে না, আমি ফিরে যেতে চাই আমার সেই রাঙা মাটির গাঁয়ে।

সমীর ভাবনার জালে ডুবে গেল। আজ ত বনের হরিণীকে সোনার শিকলে বেঁধে রাখবার সব উপাদান তার হাতে আছে, তবু কেন তাকে বেঁধে রাখতে পারল না? যখন কিছু দিতে পারে নি, তখন ত সুলতা তার প্রাণঢালা প্রেমে সমীরকে তন্ময় করে রেখেছে, আর আজ সেই সুলতা কি করে পাষাণী হয়ে গেল? সে ত সুলতাকে তার সর্বস্ব দিতে কার্পণ্য করে নি। কত সুন্দর সুন্দর শাড়ী-ব্লাউজে তার কোমল তনু সাজিয়ে তুলেছে। আলমারিতে থরে থরে আজও তা সাজান আছে। শাড়ী গয়না, সৌখীন আসবাবপত্র যখনই যে জিনিসটা মনে ধরেছে, তা সুলতার হাতে তখুনি এসে পৌঁছেছে। সে ত নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবেই সুলতার হাতে ছেড়ে দিয়েছে, তার জীবন-মন সবই সুলতাময়। আজকাল কাজের চাপে সে আগের মত হয়ত সুলতার সঙ্গী হতে পারে না সত্যি, কিন্তু সেটাই তার সবচেয়ে বড় অপরাধ।

মান-সম্মান, সুখ-বিলাস যা পাবার জন্য লোক লালায়িত, সুলতা কি করে সেসব ঐশ্বর্য্য-বৈভব নিঃশব্দে ছেড়ে চলে গেল? কেন এ অভিমান, কেন এ বৈরাগ্য? তারা ত আর তরুণ-তরুণী নয়, যৌবন উত্তীর্ণ হয়েছে, তবে কেন আমার জীবনে এই বিপ্লব ঘটল সমীর ভেবে পায় না। অভিমানে ব্যথায় সমীরের মনটা মুচড়ে উঠে। বিশ বছর আগে কত সংক্ষিপ্ত জীবনযাত্রা স্বল্প আয়েই দু'জনে মনের আনন্দে কত সুন্দর ভাবে সংসার চালিয়েছে; দু'জনেই স্বার্থত্যাগ করেছে দু'জনকে সুখী করতে। সুলতা কল্যাণময়ী গৃহলক্ষ্মী হয়ে নিবিড় প্রেম-ভালবাসায় তার হৃদয় ভরে তুলেছে অনির্ব্বচনীয় আনন্দে, আর সমীর নিজকে ভেবেছে অতি সুখী, অতি ভাগ্যবান।

দু' যুগ আগের কথা, যুবক সমীরকে নিয়ে কত হাসা-হাসি, কত সমালোচনা—নামকরা বাপের ছেলে, বাপের নামটা ডোবালে দেখছি! আভিজাত্যে, আধুনিকতায়, শিক্ষা-দীক্ষায় যার সমকক্ষ খুব কম পরিবারই আছে। এমন পরিবারের ছেলে হয়ে সমীরের এ কি মতি-গতি? খালি পায়ে খদ্দর পরে ঘুরে বেড়ায়, সাহেবীয়ানার ধার ধারে না, বড়লোকের গা ঘেঁষে চলে না। বড় ভাইরা বলেন, দেখ এমন জংলী হোস্‌নে, একটু মানুষ হতে চেষ্টা কর, এটিকেট শেখ, নইলে তুই ত আমাদের নাম ডোবাবি।

সমীর নীরবে শুনে, কিছু বলে না, কিন্তু নিজের কাজ সমভাবেই করে যায়। কোথায় কংগ্রেসের লোকেরা ঘুরে ঘুরে চাঁদা তুলছে সমীর সেখানে, কোথায় কোন্ নতুন স্কুল খোলবার পরিকল্পনা হচ্ছে, সমীর সেখানে। তার পর আরও অবাক কাণ্ড ভাইরা বলতেন, সমীর এত ব্রিলিয়াণ্ট, ইউনিভার্সিটির ডিগ্রীগুলি সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে সে নাকি সরকারী চাকুরি ছেড়ে, কোথায় কোন্ এক মফঃস্বল টাউনে চলে গেল নতুন কলেজ গড়বে বলে; মাথায় ছিট আছে দেখছি। সবার নিন্দা-তিরস্কার অগ্রাহ্য করে সে মন ঢেলে দিল নিপুণ ভাবে কলেজটিকে গড়বে বলে, আর তার পাশে এসে দাঁড়াল মূর্ত্তিমতী আনন্দ ও উৎসাহের খনি হয়ে, লাবণ্যে ঢলঢল হাস্যোজ্জ্বলা কিশোরী সুলতা।

সমীর হঠাৎ একদিন ঐ ছোট শহরেরই স্কুলের শিক্ষক-কন্যা সুলতাকে বিয়ে করে নিয়ে এল। চারদিকে আত্মীয়-স্বজন ছি ছি করে উঠল, সমীর এ করল কি? ভাই দুটি বিয়ে করে এনেছে জজ-ব্যারিষ্টার দুহিতা, তাদের উঁচু-হিলের খট্‌খটানি, মিহিসুরে আয়াকে ডাকা, কাঁটাচামচের টুংটাং আওয়াজে বাসভবন ঝঙ্কৃত হয়। আর সেই পরিবারেই কিনা বধূ হয়ে এল খাদি-শাড়ীপরা, চপ্পল পায়ে সুলতা। দেশী মেমসাহেব জায়েরা একটু নাক কুঁচকে মুখ ফেরালেন, কিন্তু বধূর বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল সতেজ মুখখানাতে এমন একটু বৈশিষ্ট্য ছিল যে, শেষ পর্য্যন্ত তাঁরা মনে মনে নিজেদের একটু নিষ্প্রভ অনুভব না করে পারলেন না।

নববধূ সুলতা যে-কয়দিন শ্বশুরবাড়ীতে ছিল, ভয়ে-

সঙ্কোচে দিন কাটাত। চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে মনে করত, এই বুঝি কেউ তার খুঁৎ ধরছে, শুধু রাত্রে যখন সমীরের বক্ষোলগ্না হয়ে থাকত, তখন সে ভুলে যেত সারা দিনের গ্লানি। এক অপূর্ব্ব আনন্দে তার মন ভরে উঠত।

সুলতা শ্বশুরবাড়ী ছেড়ে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। চিত্রা নদীর তীরে ছোট্ট শহরটিতে সুলতা সুখের নীড় গড়ে তুলল। সমীরের সামনে সেই বিগত দিনের জীবন-চিত্র একের পর এক দৃশ্য বদলাতে লাগল।

সমীর একটু নড়ে-চড়ে বসল। এক কৌতুকোজ্জ্বল প্রভাতের কথা মনে পড়ল, সে বলেছিল, সু, আমি তো গরীব, তোমায় প্রাচুর্য্যে ভরিয়ে রাখতে পারব না। সুলতা কৃত্রিম কোপে উত্তর দিয়েছিল, বুঝেছি তোমার মুরোদ কত, সেদিন না বলেছিলে আমাকে হীরে-মোতির গয়নায় জড়িয়ে দেবে, সেগুলো কোথায়? চললাম আমি তোমায় ছেড়ে?

সমীর উঠে বিছানার পাশে-রাখা বেলীফুলের এক গাছা মালা তুলে সুলতার খোঁপায় জড়িয়ে দিয়ে বললে, এই তো হীরের হার পরিয়ে দিলাম তোমার খোঁপায়, তার পর গেয়ে উঠল—

একদা তুমি প্রিয়ে বসেছিলে ফুলসাজে
সে কথা কি গেছ ভুলে?

আর আজ, আজ তো সত্যই সমীরের জীবনধারা পাল্‌টে গেছে, চিত্রানদীর তীরের সেই ছোট শহর ছেড়ে সে এখন বড় শহরের বাসিন্দা, পদস্থ কর্ম্মচারী। যে ভাইরা বলতেন, সমীর মানুষ হ, এটিকেট শেখ। তারাই আজ তাকে খাতির করে কথা বলেন, জায়েরা সুলতার সান্নিধ্য কামনা করেন। আজ তো বিশ বছর পূর্ব্বের সেই কিশোরী সুলতাকে শুধু ফুলসাজে নয়, হীরেমোতির অলঙ্কারেই সাজাতে পেরেছে। তবে, তবে কি হ'ল? এই প্রাচুর্য্য, শাড়ী, গয়না হেলায় ফেলে সুলতা কোথায় চলে গেল? আর কি সে ফিরবে না?

কি চায় সে? চিত্রানদীর তীরে সেই ছোট শহরটিতে কিসের আকর্ষণে সে ছুটে যেতে চায়? এমন কি পেয়েছে সেখানে যে ধন-ঐশ্বর্য্য, মান-সম্ভ্রম, বড় শহরের মোহ তাকে ধরে রাখতে পারছে না?

ইদানীং সুলতা প্রায়ই তার বাবার প্রিয় ছাত্র বিকাশের কথা বলত, সে নাকি দেশের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেছে। সে নাকি একটা ছোট আশ্রম তৈরী করেছে, আর অনাথ গরীব, দুঃখী ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভার নিয়েছে আধুনিক শিক্ষায় উন্নত ধরনের মানুষ করে তুলবে বলে। মাঝে মাঝে সুলতা খোঁটা দিত, হতে পার তোমরা বড় কর্ম্মচারী, কিন্তু মনের ঔদার্য্যে বিকাশের মহত্ত্ব তোমার চেয়ে অনেক বেশী। সুলতার চোখে বিকাশ দেবতারই সামিল।

হঠাৎ বিদ্যুতচমকের মত একটা সংশয় জেগে উঠল মনে। তবে, তবে কি সুলতা আজো বিকাশকে ভোলে নি? সমীরের দেহে মনে তীব্র আলোড়ন সুরু হ'ল। স্তব্ধ হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে রইল। পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে, কি করে যে সারা দিন কেটে গেল বুঝতেও পারে নি। পুরানো খানসামার তাগিদে শুধু কয়েকবার চা খেয়েছে আর সামান্য খাবার মুখে দিয়েছে।

সমীর স্তব্ধ হয়ে আকাশের দিকে চাইল, আকাশে একটা ম্লান নিষ্প্রভ রঙের খেলা। হঠাৎ একরাশ দমকা হাওয়া এসে ফুলের গাছগুলোকে এলোমেলো করে দিল, খস্ খস্ করে কয়েকটা শুকনো পাতা লনে ঝরে পড়ল। ভোরে বনলক্ষ্মী এসে সবুজ লন ফুলেপাতায় আলো করে হাসিমুখে দাঁড়িয়েছিল, অপরাহ্নে সেই বনলক্ষ্মী রিক্তা মূর্তিতে দেখা দিল। ইউকেলিপ্‌টাস্ গাছের ডালে ডালে দোলা লাগল। মর্ম্মর আওয়াজ তুলে পাতাগুলো যেন ফিস্ ফিস্ করে বলতে লাগল—

না, না বনের হরিণী সোনার খাঁচায় বন্দিনী হতে আর আসবে না।

সমীরের সারা অন্তর মথিত করে দীর্ঘনিঃশ্বাস বের হ'ল। অস্পষ্ট স্বরে বলে উঠল—

সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে, ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা
এই স্মৃতিটুকু কভু ক্ষণে ক্ষণে যেন জাগে মনে ভুলোনা।

'পরশুরাম'-প্রসঙ্গে

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১৪ই বৈশাখ সন্ধ্যাবেলার আকাশবাণীতে ঘোষিত হলো আজ দ্বিপ্রহরে বাংলার জনপ্রিয় প্রবীণ রস-সাহিত্যিক রাজশেখর বসু অকস্মাৎ পরলোকগমন করেছেন। বৈশাখের খরসূর্য্যদীপ্ত আকাশে বিন্দুমাত্র মেঘ ছিল না, তবু এই নিদারুণ বিয়োগবার্ত্তা বজ্রপাতের মতই বর্ষিত হলো। রাজশেখর বসু অর্থাৎ পরশুরাম শুধুমাত্র একটি নাম নয়, বাংলা রস-সাহিত্যে এক অত্যুজ্জ্বল স্বাক্ষর। তাঁর সাহিত্য-কর্ম্ম ভূরি প্রসবিত নয়, গুণগত বিচারে তার গুরুত্ব। জ্ঞানবুদ্ধি পরিশীলিত—কণ্টক জ্বালা বিবর্জ্জিত সুমার্জ্জিত সরস কৌতুক-কলিত এমন সুনিপুণ বাক-বৈদগ্ধ্যের নমুনা বাংলা সাহিত্যে বিরল। সবচেয়ে আশ্চর্য্য প্রৌঢ়ত্বে সুরু হয়ে সুপরিণত বার্দ্ধক্য কাল পর্য্যন্ত সে সাধনা ছেদহীন অক্লান্ত। প্রাকৃতিক নিয়মে জরা দেহ দুর্গটি অধিকার করলেও মনোভূমিকে স্পর্শ করতে পারে নি। রসতরঙ্গ লালিত সেই চির শ্যামল ভূমিতে কৌতুক-স্রষ্টা এক প্রাজ্ঞ পুরুষ জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সাধনার আসনখানি পেতে রেখেছিলেন।

সাধারণ মানুষ বলবে—পরিণত বয়সের প্রয়াণ নিয়ে শোক কেন, উচ্ছ্বাস কেন? সে কথা সত্য, শোক বা উচ্ছ্বাস প্রকাশ আমরা তাঁকে নিয়ে করি না—সৃষ্টি ক্ষমতার দিক দিয়ে যিনি নিঃশেষিত, অথবা মৃত্যু যাঁর দেহকে ধীরে ধীরে জীর্ণ করে এনেছে। কিন্তু আয়ুর প্রান্তে পৌঁছেও যিনি অফুরন্ত,যাঁর সৃষ্টি রসকামীদের পরিতৃপ্ত ও মুগ্ধ করেই চলেছে—বয়সের নজীর তুলে তাঁর বিয়োগ বেদনাকে লঘু করার চেষ্টা আমরা করি না। করলেও সত্যকার রসিকসুজন ও সাহিত্য সুহৃদরা তাতে সান্ত্বনা লাভ করবেন না। আমরা সেই বিচিত্র নিঃসঙ্গ সাধকের জীবন প্রবাহ থেকে কয়েকটি বিন্দু তুলে ধরে দেখাবার চেষ্টা করব—যা জীবন ধর্ম্মের সঙ্গে সাহিত্য কর্ম্মকে অদ্ভুত নিষ্ঠায় একাত্ম করে রেখেছিল।

বিয়োগ বার্ত্তা শোনার পর থেকেই মানুষটিকে আর একবার দেখবার চেষ্টা করা স্বাভাবিক। সেই উদ্দেশেই ডায়েরির পাতা খুলে বসেছি। পনেরো বছর আগেকার লেখার প্রথম সাক্ষাৎকারের কয়েকটি অত্যুজ্জ্বল মুহূর্ত্তকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছিলাম। সেই সময়ে মনে হয়েছিল—ওই সাক্ষাৎকারের বিষয়টি কোন পত্রিকায় প্রকাশ করা উচিত। একদিন কথা প্রসঙ্গে সেই অভিলাষ ব্যক্ত করেছিলাম। উনি মাথা নেড়ে বলেছিলেন, এখন নয়—এখন নয়। আমি যখন থাকব না—তখন যা হয় করবেন।
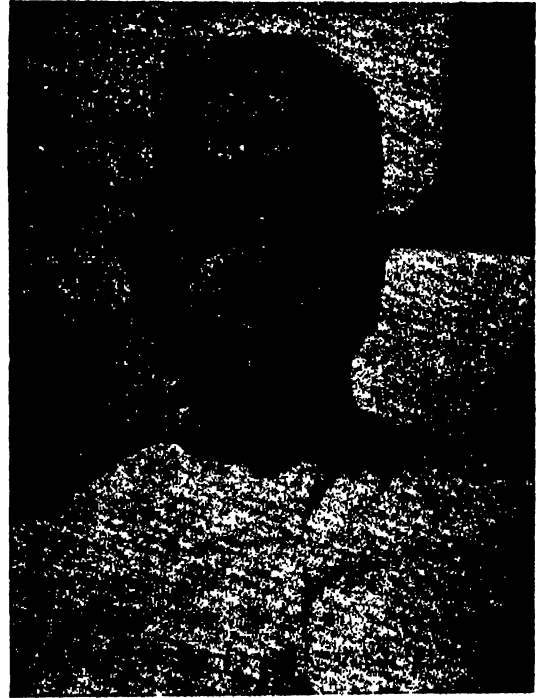
রাজশেখর বসু

বিস্মিত হয়েছিলাম। অদ্বিতীয় রসস্রষ্টা পরশুরামের এত সঙ্কোচ কেন আত্মপ্রকাশে? গল্পকারের দৃশ্য বেশটি সরিয়ে আসল মানুষটি কি কোন মতেই আসরে এসে বসবেন না?

আর একটি ঘটনায় স্পষ্ট বুঝেছিলাম—নিরালা গৃহ-কোণের সাধক প্রকাশ্য সভামঞ্চে জনতার জয়ধ্বনির স্রোতে ভেসে যেতে চান না। সে কথাটি পরে। আপাততঃ ডায়েরিটাকে চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক।

সেই প্রথম সাক্ষাতের কথা বলতে গেলে নিজের কথা কিছু এসে পড়বেই—সে জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। সে প্রসঙ্গে আমার কৃতিত্বের চেয়ে তাঁর রসগ্রাহিতার শক্তির পরিচয়ই মিলবে। একজন প্রাজ্ঞ পুরুষ এক অর্ব্বাচীনের রচনা থেকে কি পরিমাণ আনন্দ লাভ করে সে কথা মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করতে পারেন সে এক আশ্চর্য্য ঘটনা। এমন বিকারহীন সুস্থ মনোবৃত্তি ক'জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের আছে জানি না। পরশুরাম ছিলেন সে সম্পদের অধিকারী। তাঁর কথাটাই বলি।

একদিন প্রবাসী কার্য্যালয়ে বসে গল্প করছি—এক সাহিত্যিক বন্ধু কথা প্রসঙ্গে বললেন, কাল একজন নামী সাহিত্যিকের মুখে আপনার লেখার প্রশংসা শুনলাম।

কে তিনি? সাগ্রহে প্রশ্ন করলাম।

রাজশেখর বসু। আপনার শাশ্বত পিপাসা ও মায়া-জালের খুব প্রশংসা করছিলেন।

আনন্দ ও সঙ্কোচ যুগপৎ অভিভূত করল আমায়। চুপ করে রইলাম।

আমাকে নিরুত্তর দেখে বন্ধু বললেন, আপনার সঙ্গে ওঁর আলাপ পরিচয় আছে?

না।

আলাপ করুন।

আলাপ করুন বললেই কি আলাপিত হওয়া যায়। কি মনে করবেন? শুনেছি উনি গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ।

বন্ধু হেসে বললেন, আপনার সঙ্কোচ বুঝি? বেশী লোকের সঙ্গে উনি মেশেন না এ কথা ঠিক। যদিও দেখা করেন বাঁধাধরা সময়ের মধ্যে আলাপ সেরে নিতে হয়। তা হোক, দেখা করা আপনার উচিত।

ক'দিন ধরে মনে মনে আলোচনা করতে লাগলাম—যাব কি যাব না? আলাপের একটা সূত্র চাই তো। আচ্ছা আমার নব প্রকাশিত বইখানি যদি ওঁকে উপহার দিয়ে আসি। একটা মতামত নিশ্চয় দেবেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে সেটি মূল্যবান নিশ্চয়। কিন্তু এই তুচ্ছ লাভের কথা ভেবেও ঠিক নয়, সাহিত্য-জগতের অদ্বিতীয় রসস্রষ্টা পরশু-রামকে দেখবার দুর্নিবার লোভই আমায় উৎপীড়ন করতে লাগল। দেখেই আসি না সেই রসোময় মানুষটিকে—শুনেই আসি না তাঁর মুখের দুটি কথা।

বইখানি নিয়ে একদিন সসঙ্কোচে গেলাম ভবানীপুরে বকুলবাগানের বাড়ীতে। চমৎকার গাছপালায় ঢাকা ছোট বাড়ীখানি। বাইরেটায় পরিপাটি করে গোছানো, পরিবেশটি শান্ত, যেন একটি শান্ত রসাস্পদ আশ্রম। বাড়ির ভিতরটা আরও নিস্তব্ধ। ছেলেদের লাফালাফি দাপাদাপি নাই—শিশুকণ্ঠের কোলাহলও শোনা যায় না। বড় রাস্তার উপরে থেকেও একটু বিচ্ছিন্ন যেন। স্বল্প-পরিসর উঠোনে ছেঁড়া কাগজ বা সামান্য কুটোটুকু পড়ে নেই। যে ঘরটিতে গিয়ে বসলাম—সেটির মেঝে জুড়ে তক্তাপোষ তার উপর সাদা ফরাস পাতা। তাকিয়াগুলি ধপধপ করছে। খান চারেক ছবি মাত্র দেওয়ালে টাঙানো—জানালার ধারে একটি সেটি। টেবিল চেয়ার চোখে পড়ল না। মানুষটিকেও দেখলাম তেমনি অনাড়ম্বর। একটি মাত্র গেনিয়ান গায়ে চটি পায়ে ঘরে ঢুকলেন। তক্তাপোষের একপাশে বসতেই বইখানি ওঁর হাতে দিলাম।

সেখানির পাতা উল্টে বললেন, আপনি?······সামান্য আলাপের পর বললেন, আপনার বয়স কত?

বললাম, পঁয়তাল্লিশ চলছে।

পঁয়তাল্লিশ! তবে তো অনেক কম।

ওঁর বয়স তখন ষাট পেরিয়েছে বলেই কি আমাকে ছেলেমানুষ মনে করছেন?

ভ্রম ভাঙ্গল একটু পরে। বললেন, আপনার লেখা পড়ে ভেবেছিলাম আপনার বয়স অনেক বেশী। এত ভাল লেগেছিল আপনার ওই গল্পটি। যখন প্রবাসীতে বার হচ্ছিল, প্রথম থেকেই পড়ে এসেছি।

সবিস্ময়ে বললাম, বলেন কি—মাসের পর মাস ধৈর্য্য ধরে পড়া—

তা কি করব—ভাল লাগত যে। আপনি পাড়াগাঁয়ে থাকেন বুঝি?

পাড়াগাঁয়ে বাড়ী, কলকাতায় থাকি। প্রতি সপ্তাহে অবশ্য দেশে যাই।

তাই। কোন্ জেলায় আপনার বাড়ী?

নদীয়ায়।

মুখখানি ওঁর ঈষৎ উজ্জ্বল বোধ হলো। বললেন, আমার বাড়ী বীরনগরে। তবে অনেকদিন সেখানে যাই নি। আপনার লেখার মধ্যে সেকালের গ্রাম আর মানুষকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম তাই ভাল লাগল।

একটু থেমে বললেন, কি জানেন—মাঝে মাঝে মনে কেমন অবসাদ আসে তখন কিছুই ভাল লাগে না। না পড়তে না লিখতে। মাঝে মাঝে অনেক জঞ্জালও তো পাঠ্যের মধ্যে এসে জোটে, ভারি বিরক্তি বোধ হয়। সেই সময়েই এক-একটি বই পড়ে মনে এমন তৃপ্তি আসে। মনে হয় ওই জঞ্জাল থেকে মুক্তি পেলাম। ভারি আনন্দ হয়। আপনার গল্পটি পড়ে তেমনি আনন্দ পেয়েছি।

এযে আশার অতীত! মানুষকে আনন্দ দেওয়ার কথা

শুনলে সেই আনন্দ কত গভীর হয়ে যে ফিরে আসে মনে। নিজেকে সার্থক বোধ হ'ল।

খানিক অভিভূতের মত চুপ করে বসে রইলাম। হঠাৎ মনে হলো এই প্রশংসা বাক্য বইয়ের সার্টিফিকেট হিসাবে যদি পাওয়া যায়! এর পর একথা ভেবে বহুবার নিজেকে ধিক্কার দিয়েছি। অর্থ উপার্জ্জনের জন্য তো লেখা আরম্ভ করি নি তবে এ দুর্মতি কেন ঘটলো? কেন বললাম, আপনি যদি কোন কাগজে বইটির সমালোচনা করেন—

বাধা দিয়ে উনি বললেন, তার আগে আমার একটি কথা শুনুন। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি কোন কাগজে বইয়ের সমালোচনা আর করব না। অনেক বন্ধুবান্ধব এই অনুরোধ নিয়ে আসেন। না দিতে পারলে মনোক্ষুণ্ণ হ'ন তাই।

চুপ করে ভাবতে লাগলাম, প্রথম আলাপেই বেশ অভদ্রভাবে নিজেকে জাহির করলাম তো!

আমার মনোবেদনা উনি বুঝলেন কিনা জানি না—বললেন, বইখানি পড়ে এ সম্বন্ধে আমার মতামত চিঠি লিখে জানাব।

সানন্দে বলে উঠলাম, তাই দেবেন।

একটু পরে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি আর লেখেন না?

সে সময়ে পরশুরাম প্রায় কিছুই লিখছিলেন না।

বললেন, না। তাগিদে পড়ে কোনদিন লিখতে পারিনি। একটু হেসে বললেন, যদিও তাগাদা দিয়ে ব্রজেনবাবু (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) আমাকে লিখিয়েছেন।

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। হঠাৎ এক সময়ে প্রশ্ন করলেন, কোন্ স্টেশনে নেমে চিত্রকূট যেতে হয় জানেন?

ঠিক জানি না। শুনেছি এলাহাবাদ থেকে জি, আই, পি, লাইনে (তখন সেণ্ট্রাল রেলওয়ের জন্ম হয় নি।) যেতে হয়। একটু থেমে বললাম, বেড়াতে যাবেন কি?

না। একটু যেন ইতস্ততঃ করলেন। পরে বললেন, বাল্মীকির রামায়ণখানা অনুবাদ করছি। ঠিক অনুবাদ নয়—সকলে যাতে সহজে বুঝতে পারে এমনভাবে লিখছি। অনেক অংশ বাদ দিচ্ছি। তা হলেও মূল গল্পটি এবং অনেক জিনিস থাকবে যাতে করে সেকালের সমাজব্যবস্থা, রাজ্যশাসন পদ্ধতি, সংসারযাত্রা সম্বন্ধে মোটামুটি একটি ধারণা হবে। আশ্চর্য্য কবি এই বাল্মীকি। কোন কোন স্থানে মনে হয় কালিদাসের চেয়েও বড়।

একটু থেমে বললেন, এই রামায়ণ বাংলা ভাষাভাষী-দের জানা দরকার। একদিন রবিবাবুর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে এর প্রেরণা পাই। তাঁকে বলেছিলাম, অনুবাদ করুন। তিনি বলেছিলেন, ওটি তুমিই করো।

বললাম, আপনার মেঘদূতও সুন্দর হয়েছে। বললেন, রামায়ণ আরও বিরাট ব্যাপার। তবে তাগিদের লেখা নয়—খুসিমাফিক শেষ করব। কতদিন লাগবে জানি না। এখন অযোধ্যা কাণ্ড চলছে। আমার মনে হয় বইয়ের মধ্যে সব চেয়ে সেরা কাণ্ড এইটি। আশ্চর্য্য দেখুন—বাল্মীকি কোথাও রামচন্দ্রকে অবতার বলে ভক্তি গদ গদ হন নি। সেকালের সমাজের পট-ভূমিকায় যথার্থ মানুষকে যথাযথ এঁকেছেন। অনেক বীভৎস চিত্রও আছে—সেগুলি আমি বাদ দেব না। সেকালের সমাজের রীতিনীতি ভালয়-মন্দয় মেশানো—যা বাল্মীকি এঁকেছেন সবই ধরে দেব।

দু'একটা দৃষ্টান্ত দিলেন। পুত্রার্থে রাজা দশরথ যে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন সেই ঘোড়াকে তিন কোপে কাটলেন কৌশল্যা এবং প্রথামত সেই মৃত ঘোটকের সঙ্গে এক রাত্রি যাপন করলেন। শ্রীরামের বন-গমনবার্ত্তা শুনে লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, আপনারা আজ্ঞা দিন রাজাকে (দশরথকে) আমি বলপ্রয়োগে স্থানান্তরিত করি, কিংবা গুম করি। বধ করতেও লক্ষ্মণের দ্বিধা নাই। বাল্মীকির লক্ষ্মণ গোঁয়ার-গোবিন্দ। কৌশল্যা বললেন, লক্ষ্মণ মন্দ কথা বলে নি। দেখুন কত স্বাভাবিক নারী-চরিত্র!

অনেকক্ষণ কেটে গেল। এক সময়ে সচেতন হয়ে বললাম, এবার উঠি, আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম।

উনি হেসে বললেন, আমি তো বসেই আছি। যথেষ্ট সময় পাই। তার পর বললেন, একদিন আসবেন, রামায়ণ খানিকটা শোনাবো আপনাকে। কাউকে না শোনালে ঠিকমত বুঝতে পারছি না—কেমন হচ্ছে।

নিশ্চয় আসব। কবে আসব বলুন। আপনি তো প্রবাসীতে প্রায়ই যান, সেইখান থেকে আগের দিন আমাকে ফোন করবেন, কোথাও যাব না।

সেই ভাল। আরও একজনকে না হয় সঙ্গে করে আনব।

বাধা দিয়ে বললেন, না, না, আপনি একাই আসবেন। এ কথা এখনও কাউকে জানাতে চাই না। নিজে লিখে সব সময়ে বোঝা যায় না বিষয়টা নীরস হচ্ছে কিনা—তাই।

নমস্কার করে উঠলাম। এগিয়ে দিলেন দুয়ার পর্য্যন্ত। প্রথম পরিচয়েই আমাকে রামায়ণ শোনানোর আগ্রহে

কত সহজ নিঃসঙ্কোচ ঘরোয়া মানুষটি হয়ে গেছেন ভেবে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম।

পরের সপ্তাহে রামায়ণ শুনতে গেলাম। বেলা তিনটা হবে। এবার অন্য পাশের বৈঠকখানাতে বসালেন। এ ঘরটি ওঁর পাঠাগার। বইয়ের আলমারি আছে তিন-চারটি, তাদের মাথায় লেখা—'এই সব বই বাইরে যাবে না।' আলমারির কোলে ফালিমত একখানি তক্তাপোষ—তাকিয়া সমেত একটি বিছানা পাতা। ঘরের মাঝখানে একটি টেবিল ও খান তিনেক চেয়ার। টেবিলে দোয়াত, কলম ও হরেক রকমের পেন্সিল। অনেক কিছুতে জবর-জঙ্গ নয় টেবিল। এ ছাড়াও কয়েকটি ব্যাঙ্ক-বইয়ে ভর্ত্তি। অভিধানের তো প্রদর্শনী বলা যেতে পারে। ঘরের এক কোণে একটা আধ লতানো গাছ সুন্দর করে সাজানো আর একটি কোণে সামুদ্রিক কড়ি-শঙ্খ প্রভৃতির সংগ্রহ। সব জিনিসই পরিপাটি করে গোছানো, পরিষ্কার ঝকঝকে।

বসে আছি, উনি তখনও আসেন নি। কোথা থেকে একটি অপ্রিয় দর্শন অপরিচ্ছন্ন খোঁড়া কুকুর ল্যাজ নাড়তে নাড়তে ঘরের মধ্যে ঢুকলো। এমন পরিচ্ছন্ন বাড়ীতে ওটা অত্যন্ত বেমানান। ল্যাজ নাড়তে নাড়তে সে টেবিলের তলায় ঢুকে আমার পা শুঁকতে লাগল। ভয়ে পা সরিয়ে নিই নি—একটু অস্বস্তি বোধ করছিলাম। জানি যে কুকুর ল্যাজ নাড়ে না—তাকেই ভয় করা চলে।

একটু পরে পরশুরাম এলেন। পিছনে চাকর ট্রেতে করে খাবার ও চা নিয়ে এলো।

সসঙ্কোচে বললাম, চা তো আমি খাই নে।

একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, কেন, স্বাস্থ্যের জন্য কি—

বললাম, না—না, সে সব কিছুই নয়, এমনিই—

তবে এক কাপ খেতেই হবে।

ওঁর সস্নেহ অনুরোধ এড়াতে পারলাম না।

উনি একখানি খাম ইতিমধ্যে আমার সামনে এগিয়ে দিয়ে বললেন, আপনার বই সম্বন্ধে মতামত—

বললাম, আমি তো ওর জন্য আসি নি। রামায়ণ শুনব বলে—

হাঁ—সে তো শোনাবোই। খাবার ফেলে রাখলে চলবে না।

ইতিমধ্যে নজরে পড়েছে কুকুরটি আমার পায়ের কাছে ঘুরছে, আমি ঈষৎ সঙ্কুচিত হয়ে বসে আছি। আদরের স্বরে বার দুই ডাকলেন, খুঁড়ি—খুঁড়ি।

আমার পানে চেয়ে বললেন, ভয় নেই—স্বচ্ছন্দ হয়ে বসুন। ওটা সামনের রাস্তায় একদিন বাস চাপা পড়ে পা'টি খুইয়েছে। কাদের কুকুর জানি নে—সেই থেকে এই বাড়ীতেই আছে।

যাক, এইবার রামায়ণ শুনুন।

পাণ্ডুলিপি খুলে বসলেন সামনে। বললেন, সবটা অবশ্য শোনাবো না—যে সব জায়গা বেশ ইন্টারেষ্টিং আর কবি এঁকেছেন সুন্দর করে তাই থেকে কিছু কিছু পড়বো। বাল্মীকি রামায়ণ পড়ে আমার মনে হয়েছে এর মাঝে মাঝে অন্য লেখকের লেখাও ঢুকেছে। এত বড় রামায়ণ-খানায় সেটা কিছু বিচিত্র নয়। তবে মন দিয়ে পড়লে অসঙ্গতিগুলি ধরা যায়। এই দেখুন না প্রথমটা, বাল্মীকি লিখেছেন বই অথচ গল্পের মধ্যেও তিনি একটি চরিত্র।

এর পর পাঠ সুরু করলেন। চমৎকার আরম্ভ। কথকতার সুরে আরম্ভ করেছেন গল্পটি—অত্যন্ত ঘরোয়া ভঙ্গিতে বলে গেছেন কাহিনী।

বললেন, রামায়ণের শক্ত ভাষাকে সাধ্যমত বর্জ্জন করেছি কিন্তু মূল সুরটুকু বজায় রাখতে হয়েছে। অনেক কথা অবশ্য রামায়ণের রেখেছি। কেউ কেউ বলছেন ওগুলি শক্ত হয়েছে। কিন্তু ওগুলি না রেখে তো উপায় নাই। একটি কথার বদলে দু'লাইন মানে করে বুঝিয়ে দিই এমন বড় করে তো অনুবাদ করতে বসিনি। বাল্মীকির মূল কাব্যের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় সাধন করিয়ে দেওয়াই হলো আমার উদ্দেশ্য।

বলে আরও খানিকটা পড়ে শোনালেন।

খানিক পরে মুখ তুলে বললেন, ওকি, খাবার খাচ্ছেন না যে! না, না, গল্প শুনতে শুনতে খেয়ে যান—তা হলে গল্প ভালই লাগবে।

এমন সস্নেহ অনুরোধ। আমার সমস্ত কুণ্ঠাকে মুছে দিলেন সেই মুহূর্ত্তে।

গল্প দিব্য এগিয়ে যাচ্ছে। ভালই লাগছে। অনুবাদের আড়ষ্টতা কোথাও নাই—মূল সুরটিকে অব্যাহত রেখে স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে চলেছে লেখা। মাঝে মাঝে থামছেন, কিছু বা মন্তব্য করছেন—আবার পড়ছেন।

মন্তব্য করছেন: মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোক তুলে দিয়েছি এসব যে আমার কথা নয় এটি বোঝাবার জন্য। দেখুন রাম নির্ব্বাসনে—প্রত্যেকের মনোভাব কি চমৎকার ফুটিয়েছেন কবি। অদ্ভুত চরিত্র দশরথ। কৌশল্যা, লক্ষ্মণ, কৈকেয়ী এরা সবাই রক্ত মাংসের মানুষ। বাল্মীকি কোথাও দেবতার সৃষ্টি করেন নি। কতকাল আগেকার লেখা অথচ মানুষের চিরন্তনী বৃত্তির কেমন নিখুঁত ছবি যা আজকের দিনেও দুর্লভ। যেগুলি বীভৎস বলে বোধ

হচ্ছে সেসব সেকালের সামাজিক প্রথায় চলিত ছিল।

এক ঘণ্টার উপর কেটে গেল। খাতা বন্ধ করে বললেন, কেমন লাগল? কোথাও দুর্বোধ্য লাগল কি?

বললাম, এটি শীঘ্র শেষ করুন। বাল্মীকির সঙ্গে আমাদের পরিচয় গাল গল্পের আসরে—তাঁর রচনার স্বাদ কম লোকেই জানে।

সেই জন্যই তো চেষ্টা করছি। যাঁরা সংস্কৃত ভাল জানেন না অথচ সেই সাহিত্যকে বা তার গল্প-রসকে জানতে উৎসুক তাঁদের জন্যই লিখছি। পণ্ডিতদের জন্য এ নয়? আর দেখুন বেশী পাণ্ডিত্য আমার নাই।

বললাম, বেশী পাণ্ডিত্য আমরা সাধারণ মানুষেরা পরিপাক করতে পারি না। সুরের চেয়ে সুর বিস্তারের ভয়টা আমাদের প্রচুর।

হাসলেন। বললেন, সংস্কৃত উচ্চারণ আমাদের ঠিক হয় না। বাঙালী জিভের হয়তো দোষ আছে। আমার কাছে এক পণ্ডিত আসেন মাঝে মাঝে। তাঁর বাড়ী ইউ-পিতে। তিনি এলে আমি তাঁর অপূর্ব উচ্চারণ শুনবার জন্য মেঘদূতের শ্লোকগুলি আবৃত্তি করতে বলি। শুনতে শুনতে মনে হয় ধ্বনির মধ্যেই শ্লোকগুলির প্রাণ। ঠিকমত উচ্চারিত হলে অর্থবোধ সহজ হয়।

বিনয় করে বললেন বটে তাঁর পাণ্ডিত্য নাই, কিন্তু পাণ্ডিত্য না থাকলে দুরূহ শ্লোকের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে কাব্যের মূল রসটিকে আস্বাদন করা চলে কি? সে রস আস্বাদন করাও হয়তো সম্ভব, পাঠকের সামনে অবিকৃত ভাবে শক্ত কথাগুলি সহজভাবে গুছিয়ে পরিবেশন করা সহজসাধ্য কি? আবার রসাভাস না হয় সেদিকেও প্রখর দৃষ্টি রয়েছে। পাণ্ডিত্য, রসগ্রাহিতা এবং রস পরিবেশন ক্ষমতা এই তিনটির সমাবেশ না ঘটলে এমন সুন্দর জিনিস কখনও সৃষ্টি হয়।

পাঠশেষে আরও ঘণ্টাখানেক আলোচনা চলল। আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধেও দু'একটি প্রশ্ন করলাম।

কয়েকজন প্রগতিবাদী লেখকের নাম করে বললেন, ওঁদের লেখার রস ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না। ইজ্‌ম্-মার্কা জিনিস দেখলেই কেমন আতঙ্ক হয়। মনে হয় ওসব বাংলার বস্তু নয়। আটপৌরে ধরনের যে বাংলাকে আমরা জানি ওরা তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ওদের পোষাকী চালচলন কথাবার্তা অমিত-সন্দীপের নকলে; কৃত্রিম সমস্যার মাঝে কৃত্রিম জীবন নিয়েই ওরা ব্যস্ত। এক কথায় আমার ভাল লাগে না।

বলেই সচেতন হলেন। একটু থেমে আরম্ভ করলেন, ভাল লাগে না এটা বলা অবশ্য আমার স্পর্দ্ধা। গেল মহাযুদ্ধের পর পাশ্চাত্যে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তা আগের যুগের থেকে ভিন্নধর্মী। অথচ বহু মনীষী ব্যক্তি সেই সাহিত্যের প্রশংসা করে থাকেন। এঁরা কেউ কিছু বোঝেন না এটি বলা উচিত নয়।······রস ওর মধ্যেও নিশ্চয় আছে তবে আমরা তা উপলব্ধি করতে পারি না। সে ক্ষমতা আমাদের নাই।

বললাম, মহাযুদ্ধের পর ওদেশের সমাজে রাষ্ট্রে ধর্মে যে বিপ্লব ঘটেছিল সাহিত্যে তারই প্রতিচ্ছবি দেখা গেছে। কিন্তু আমরা সেই সমস্যা না বুঝে সেই বিপ্লবকে কল্পনায় টেনে এনেছি; অনুকরণ করেছি বলেই হয়তো রসগ্রাহ্য হয়নি। ইজ্‌মের মধ্যে ওরা পেয়েছে চলার তাগিদ—আমরা পেয়েছি কথা বলার প্রেরণা। তাই অধিকাংশ লেখাই বাস্তববিমুখ কৃত্রিম সমস্যায় ভরে উঠছে।

উনি হাসলেন। বললেন, হবে। খানিক চুপ করে থেকে টেবিল থেকে একখানি কাগজ তুলে নিয়ে বললেন, পণ্ডিতমশায় এখানে এলেই আমাকে একটি করে শ্লোক উপহার দেন। শেষবারে এইটি দিয়ে গেছেন।

শ্লোকটি পড়ে শোনালেন। বললেন, এর অর্থ—যেখানে বৈয়াকরণিক থাকেন, সেখানে আমি ন্যায়ের তর্ক তুলি। যেখানে ন্যায়াচার্য্য থাকেন, সেখানে আওড়াই ব্যাকরণ। কিন্তু যেখানে দু'জনেই বিদ্যমান সেখানে থাকি নিঃশব্দ। কেননা আমাকে আমি জানি তো।

কথাটা কত সত্য আমাদের সম্বন্ধে।

তার পর হেসে বললেন, এই পণ্ডিতমশায় মাঝে মাঝে আমাকে পরোটা উপহার দিয়ে থাকেন, আমি বলি, পুরোডাশ।

এমনি সরস আলোচনায় দু'ঘণ্টা কাটলো। উঠতে ইচ্ছা করছিল না, কিন্তু ঘড়ির পানে চেয়ে লজ্জিত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম।

না, না, সময় আমার যথেষ্ট।

ঘরের বাইরে একটি লেখার প্রতি চাইতেই সহাস্যে বললেন, ওটি আপনাদের জন্য নয়—বাইরের লোকের অত্যাচারে ওটি টাঙাতে হয়েছে। বেঙ্গল কেমিক্যালে চাকরি করতাম এক সময়ে—আবেদন-নিবেদন নিয়ে যখন তখন লোক আসত। তাই বাধ্য হয়ে ওই নোটিশ দিতে হয়েছে।

আপনার কাছে সাহিত্যিকরা আসেন না?

হেসে বললেন, খুব কম। সবাই জানেন, আমি

অসামাজিক লোক। কারো সঙ্গে মিশিনে—কোন সভায় যাইনে।

গেলবার দিল্লীতে তো···প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে অভিভাষণ দিয়েছিলেন—সঙ্কেতময় সাহিত্য।

ওখানে যাই নি—পাঠিয়ে দিয়েছিলাম অভিভাষণ। ওসব আমার ভাল লাগে না। তাগিদেও কিছু লিখতে পারি না। এই রামায়ণ শেষ হতে হয়তো কয়েক বছরই লাগবে।

না, না, শীগ্‌গীর শেষ করুন। এই রকম ভাবে মহাভারতকেও যদি বাংলায় সংক্ষিপ্ত করেন—

সে বিরাট ব্যাপার। মহাভারতের দু'টি খণ্ড করলে তবে তা সম্ভব। আপাততঃ এইটি তো শেষ করি।

বিদায় দেবার জন্য দুয়োর পর্য্যন্ত এলেন।

বললেন, আপনাকে কষ্ট দিলাম—

কিছু না, বড় আনন্দ হ'ল। কিন্তু আমাকে 'আপনি' বললে সত্যিই দুঃখ পাব।

উনি হেসে বললেন, কি জানেন—প্রাপ্তে তু ষোড়শ বর্ষে—

উচ্চ হাসির মধ্যে বিদায় নিলাম।

এর পর বহুবার এসেছি ওঁর কাছে। বহু কথা আলোচনা হয়েছে। ওঁর নিরলস সাহিত্য সাধনার কথা উল্লেখ মাত্রই উনি প্রসঙ্গান্তরে আসতেন—নিজের লেখার প্রশংসা খুব বেশীক্ষণ ধরে শুনতে চাইতেন না। আর একবার ভারি বিপদে পড়েছিলাম—ওঁকে অভিনন্দন দেবার প্রস্তাব পেশ করে। সাহিত্য বাসর না সংসদ কি যেন একটি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন ভারতবর্ষ-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। একবার সেই প্রতিষ্ঠান ঠিক করেছিলেন, রাজশেখর বাবুকে অভিনন্দন দেবেন। কিন্তু কাজটি খুব সহজ ছিল না। ওঁরা কয়েকবার প্রস্তাব এনে ব্যর্থকাম হয়ে অবশেষে আমায় বললেন, একবার চেষ্টা করুন না! বললাম, চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু কঠিন কাজ। খ্যাতি যাঁকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারে না—নিজের সৃষ্টিকে উপভোগ করতে করতে যাঁর মুখ চোখ উদ্ভাসিত হয় না—প্রকাশ্য সভায় ডেকে এনে তাঁর গলায় সম্মান মাল্য পরানো খুব সহজ ভাববেন না। তবে চেষ্টা করব। কথামত শ্রীমান গোপাল রায়কে নিয়ে একদিন ওঁর স্কুল বাগানের বাড়ীতে গিয়ে প্রস্তাবটি পেশ করলাম।

গম্ভীর হয়ে বললেন, মাপ করবেন। হাজার লোকের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে সভায় গিয়ে বসতে পারব না।

গোপাল রায় হাত জোড় করে বললেন, আমাদের নিরাশ করবেন না।

উনিও দু'হাত জুড়ে বললেন, আমি চার ডবল হাত জোড় করে বলছি—মাপ করবেন। আপনারা যদি চার ডবল হাত জোড় করেন, আমি আট ডবল হাত জোড় করব।

শেষে বললেন, আমি বেঁচে থাকতে সম্বর্দ্ধনা সভায় গিয়ে বসতে পারব না, নিজের স্তুতিবাদ শুনতে পারব না।

শেষ চেষ্টাস্বরূপ গোপাল রায় বললেন, আপনি না হয় সভায় যাবেন না, আমরা আপনার বাড়ীতে এসে অভিনন্দন দিয়ে যাব।

হাত জোড় করে মাথা নাড়লেন পরশুরাম।

নিরাশ হয়ে আমরা ফিরে এলাম।

এর কিছু পরে জনতার চাপে পড়ে ওঁকে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল। কিন্তু কি বেদনা ও সঙ্কোচ নিয়ে সেই সম্বর্দ্ধনা সভায় গিয়ে বসেছিলেন পরশুরাম—সে যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরাই জানেন।

সেই সভায় বলেছিলেন পরশুরাম, একটু-আধটু প্রশংসা শুনতে মন্দ লাগে না, কিন্তু বেশী প্রশংসা শুনলে মনে হয় গাল দেওয়া হচ্ছে। সুখের বিষয়, এতক্ষণ আপনারা যা বললেন, তার বেশীর ভাগ আমার কানে পৌঁছয় নি কারণ, ইদানীং কানে কম শুনছি।

অট্টহাসির ধ্বনিতে সভাস্থল মুখরিত হ'ল। মুখ নামিয়ে প্রচার কুণ্ঠ নির্ব্বিকার মানুষটি নিজের আসনে গিয়ে বসলেন।

অ-প্রতিভের কথা

শ্রীজ্যোতির্ময়ী দেবী

'অপ্রতিভ' বলতে আমি অপ্রস্তুত হয়ে যাওয়া মানুষের কথা বলছি না। কাঁচুমাচু মুখে থাকা অপ্রতিভ কারুর কথাও নয়। আমি বলছি প্রতিভা যাদের নেই তাদের কথা। এবং প্রতিভা নেই বলেই যারা চিরজীবন অপ্রস্তুত হয়েই কাটায়।

যাদের পণ্ডিতজনেরা অবজ্ঞা করেন। জ্ঞানী মানুষ উপেক্ষা করেন। কর্মীলোকেরা অকর্মণ্য মনে করে অগ্রাহ্য করেন। প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা জনান্তিকে করুণা ভরে হাসেন···প্রকাশ্যে অবশ্য পিঠ চাপড়ে দেন। বৈজ্ঞানিকরা নানা তথ্য সহ প্রমাণ করেছেন মস্তিষ্কের ওজনটা অবধি কম। গ্রামবৃদ্ধ-বৃদ্ধারা কিছু খুঁত বা অপছন্দ দেখলে বলেন যাদের বারো হাত কাপড়ে লজ্জা নিবারণ হয় না, তাদের ইত্যাদি ইত্যাদি।

এবং স্বয়ং আমাদের কমলাকান্তও বলে গেছেন, "স্ত্রী-জাতির বিদ্যা নারিকেলের মালার মত আধখানা। কখনো পরিপূর্ণ দেখিলাম না।" এ ছাড়াও স্বদেশী পণ্ডিত মুনি-ঋষিদের নানা মত ও মতভেদ আছে মেয়েদের সম্পর্কে। বিদেশী পণ্ডিত শোপেনহর নিট্‌শে আদি দার্শনিকদের কটূক্তির কথাও বিদ্বান পণ্ডিত পুরুষ সমাজের অজানা নেই।

লোকে বলতে পারেন তা বিদ্যেবুদ্ধি প্রতিভা নেই-ই যদি জানো তা হলে এত আড়ম্বর করে ভণিতা করে সেকথা বলা বা লেখার কি দরকার আছে?

উত্তরে নিবেদন করি কিছুদিন ধরে আমাদের মনে একটি সংশয় জেগেছে সেটা এই যারা অপ্রতিভ হয়েও নিজেদের লেখায় 'প্রতিভা' আছে ভাবেন। যার পরিচয় আমাদের দৈনিক মাসিক সাপ্তাহিক পত্রের পাতায় পাতায় রয়েছে। সেই আমাদের লেখাগুলি কারা পড়েন? এবং আমাদের বহু বিদগ্ধ সমালোচকদের রচিত নানা বিষয়ের সমালোচনা গ্রন্থ পড়ে মনে হয়েছে মোটেই কেউ পড়েন কিনা?

একটি গল্প শুনেছিলাম মনে পড়ছে। একজন তাঁর মেয়েকে বহু যত্নে ওস্তাদ রেখে গান-বাজনা শেখাচ্ছিলেন। এখন অনেক সময়ে যেমন হয়—পাড়ার লোক বন্ধু-স্বজন তার বেতালা বেসুরো গানে অস্থির হয়ে উঠলো। তার গলায় সুর নেই সুরের জ্ঞান নেই।

অবশেষে এক অকরুণ হৃদয়হীন ব্যক্তি তার বাপকে বললেন, 'কি হবে এত খরচপত্র করে ওস্তাদ রেখে মেয়েকে গান শিখিয়ে, কে শুনবে ওর ঐ বেসুরো গান?'

রুষ্ট বাপ গম্ভীর মুখে বললেন, আমি শুনব আমার মেয়ের গান। আপনাদের ডাকব না শোনবার জন্য।

বলা বাহুল্য, আমাদের অপ্রতিভ দলের পিতারা ও স্বজন বান্ধবরা কিন্তু কখনো 'আমরা পড়ব আমাদের মেয়েদের লেখা' সেকথা বললেন না, এবিষয়ে তাঁদের অনুরাগও দেখা যায় প্রতিভাবান স্বজাতির প্রতিই আর সমর্থনও আছে মনে হয় ও পূর্বে উল্লিখিত পণ্ডিত বিদ্বানদের অভিমতগুলিকেই। তা হলে কি সত্যই এঁরা এই আলোচনায় নারী রচিত লেখার পাঠক নন? এঁরা ছাড়া অন্য লেখক ও সাধারণ মানুষগুলি নিজেদের কথা বলতে আর শুনতে এত ব্যস্ত যে, এঁদের কথা ভাববার অবসরই তাঁদের নেই।

সকলেই ভাববেন তা হলে এই অপ্রতিভদের লেখা পড়ে কারা? তা হলে কি তাঁরা নিজেরাই পড়েন এবং ছাপার অক্ষরে স্ব স্ব রচনা দেখে মুগ্ধ হয়ে ভাবেন প্রতিভার স্বাক্ষর রয়েছে তাতে।

এখন তাই দুর্বুদ্ধি কারুর কারুর মনে সন্দেহ সংশয় জাগে, সত্যি সত্যি শোনাবার মত কথা এঁদের পুঁজিতেই আছে কিনা! (সেই মেয়েটির গানের মত নয়ত?)

এবারে আমাদের মত লোকের কথা থাক্‌। শুনুন বিখ্যাত বিদেশিনী লেখিকা ভার্জিনিয়া উলফের কথা। তিনি তাঁর (A Room of one's own) একখানি নিজের বা নিজস্ব ঘর নামের ছোট্ট চটি বইতে বলেছেন এই চিরকালের প্রতিভাহীনা বা অপ্রতিভদের বিষয়ে কিছু কথা।

লেখিকারও মনের ভাবনা ও উদ্দেশ্য ছিল জানবার—মেয়েদের হাতে কখনো কোনো অসাধারণ সাহিত্য সৃষ্টি হ'ল না কেন? যখন পুরুষ (তাঁদের দেশের) রাম শ্যাম হরি যদু মধু সকলেই কবি ও লেখক সাহিত্যিক হয়েছেন, হচ্ছেন, হতে পারছেন। তাঁর মোট কথা

মেয়েদের প্রতিভা নেই কেন? 'জিনিয়স' নয় কেন? হয় না কেন?

তার পর তাঁর মনে এসেছে অনেক কথা···। তখন মেয়েদের সম্পর্কে স্বদেশীয় নানা মুনির নানা মত, সাধারণ অসাধারণ সকলেরই মন্তব্য ও মতামতের আভাস ইঙ্গিত সংগ্রহ করেছেন। অবশ্য বলা বাহুল্য, মতামত দাতারা সকলেই পুরুষ। মুনি ঋষি বিদ্বান্ পণ্ডিত বলতে তো পুরুষই বোঝায়।

অতঃপর মতামত সংগ্রহ করে ও দেখে লেখিকা চমৎকৃত হয়ে যা বলেছেন, তার নির্গলিতার্থ এই দেখলাম, একটি মাত্র বিশিষ্ট অধিকার বা গুণেই শুধু পুরুষ হয়ে জন্মেছেন বলেই জগতের তাবৎ শিক্ষিত অশিক্ষিত বিদ্বান্ মূর্খ পণ্ডিত সকলেই মেয়েদের সম্বন্ধে যথেচ্ছ অভিমত প্রকাশ করেছেন। এবং চিরকালই করতে পারছেন। এবং পারবেন।

এখন লেখিকার সংগ্রহ থেকে সংক্ষেপে শোনাই, নেপোলিয়ান বলেছেন মেয়েদের শিক্ষা দেবার যোগ্যতা নেই···'। জনসন বলেছেন ঠিক তার বিপরীত কথা। বলেছেন, 'পুরুষ জানে মেয়েরা তাদের ছাড়িয়ে যেতে পারে তাই তারা হয় খুব নির্বোধ কিংবা নিরীহ মেয়ে নির্বাচন করে। একথা যদি তারা না ভাবত তা হলে নিজের সমকক্ষ মেয়ে বিয়ে করতে ভয় পেত না বা দ্বিধা করত না।'

মহাকবি "গেটে" নারীকে শ্রদ্ধা করেছেন। স্যামুয়েল বাটলার বলেছেন—ডীন ইঙ্গে কি অভিমত দিয়েছেন··· শেক্সপীয়ারের কি মতামত ছিল, পোপ বলেছেন 'নারী জাতির কোনো ব্যক্তিত্বই (ক্যারেকটার) নেই। মুসোলিনী অবজ্ঞা করেছেন" ইত্যাদি।···অনেক কথা খ্যাত অখ্যাত অনেকের মুখের কথাই তাতে দিয়েছেন বিস্তৃত ভাবেই। বোঝা যায় কৌতূহলী লেখিকা নানা পুঁথিপত্র ঘেঁটে দেখতে পেলেন মানুষের (পুরুষের) মতামত যেমন বিচিত্র তেমনি বিভিন্ন। অবশেষে তিনি এই মতামত থেকে সত্য ও তথ্য নির্ণয়ের হাল ছেড়ে দিলেন।

তার পর তাঁর মনে এসেছে এর অন্যদিকের কথা। পৃথিবীর আদিকাল থেকে নারীর অবস্থা···। তার দৈন্য তার লাঞ্ছনা তার পরাধীনতা তার গলগ্রহতা সব আলোচনা করে খানিকদূর গিয়ে নতুন করে কথা আরম্ভ করেছেন নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকা সহজ গতিবিধির বিধিনিষেধের নানা বাধার কথা বলে। এবং নানা ভাবে আলোচনা করেছেন এই সম্পর্কে আরও বহু তথ্য ও সত্য নিয়ে "তাদের নিজস্ব গৃহকোণ নিজস্ব ব্যক্তিগত বেশ কিছু বাঁধা আয় থাকলে কি হতে পারত বা পারবে। সেক্সপীয়রের কাল্পনিক কোন অবধি সে কল্পনা পৌঁছেচে। কি হলে তিনি সেক্সপীয়রের মত কেউ হতে পারতেন। পৌঁছেচে জেন অস্টেনের ভাইপোর (?) লেখা স্মৃতিকথা অবধি। কি ভাবে তার পিসিমা বা মাসীমা সকলের বসবার ঘরের কোণে বসে সাহিত্য রচনা করতেন। এবং কেউ এসে পড়লে ব্লটিং পেপার বা অন্য কাগজ চাপা দিয়ে দিতেন। এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই লোকজন চাকর-বাকর আসতই। আরও অনেক নারীর রচনায় আলোচনাও আছে। ব্রণ্টে ভগিনীদের ও অন্য অনেক লেখিকার বিষয়ে।

শেষ অবধি পাতায় পাতায় লেখিকার এই অভিমতই ব্যক্ত হয়েছে একখানি নিজের ঘর নিজের আর্থিক স্বাধীনতা থাকলে তবে মানুষ স্বাধীন ভাবে স্বচ্ছন্দ ভাবে কিছু সৃষ্টি করতে পারে। এর সঙ্গে বহু সার্থক ও ব্যর্থ জীবন পুরুষ ও নারী কবি ও লেখকের জীবনের ঐশ্বর্য্য দারিদ্র্যের কাহিনীর নানা তথ্যও সংগ্রহ করে তাঁর অভিমতের সপক্ষে প্রমাণ দিয়েছেন।

তাঁর মত এই 'যদি মেয়েরা কোনো দিন স্বাধীন জীবন যাপন করতে পায় একটি নিজের ঘরে কিঞ্চিৎ নিজস্ব আয় সহ তা হলে মেয়েদের জীবনে হয়ত প্রতিভার জন্ম হবে।' আমাদের কবির ভাষায় আমরা বলি 'হয়ত সে নহে কাহিনী এ নহে স্বপন আসিবে সে দিন আসিবে' এ হতে পারে।

কিন্তু এমন চমৎকার বইয়ের সরস মতামত ও আলোচনাময় তথ্যে আমাদের আর কাজ নেই, যাঁরা কৌতূহলী নিজেরাই পড়ে দেখে নেবেন। স্বনামধন্য লেখিকার সূক্ষ্ম সমালোচকদৃষ্টির বিশেষত্ব অনেকেই জানেন।

আমি বলি এখন অপ্রতিভদলের একজন হিসেবে থাকায় ব্যক্তিগত মন ও মত লেখিকার সর্ব মতামতে সায় দিতে পারছে না।

ধরেই নেওয়া যাক আমাদের অনেকেরই একখানি করে ঘর বা চমৎকার নির্জ্জন গৃহকোণ আছে। এবং বেশ কিছু বাঁধা আয়ও আছে।

তা হলে? কি তা হলে? তা হলে কি আমাদের মধ্যে নারী মহাকবি ব্যাস বাল্মীকি কালিদাসের আবির্ভাব হ'ত? নারী কৃত্তিবাস কাশীরাম দাস তুলসী দাস রামমোহন মাইকেল বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র জন্মাতেন? বুদ্ধ চৈতন্য খ্রীষ্ট মহম্মদ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মত মহামানবীরা আবির্ভূত হতেন?

এবং গৃহকোণের কথায় বলি—আদিকবি বাল্মীকি বনবাসী দরিদ্র দস্যু ছিলেন কিম্বদন্তী বলে। গৃহকোণ-হীন ব্যাসদেব নিতান্তই ভবঘুরে পরাশর মুনির সন্তান ছিলেন, তাও মৎস্যনারীর পুত্র। মহাকবি কালিদাসের সম্বন্ধে কিম্বদন্তী বা জনশ্রুতি আছে তিনিও ধনীর সন্তান ছিলেন না…। মুর্খও ছিলেন। কাষ্ঠ আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

কবি মুকুন্দরাম ভারতচন্দ্র প্রমুখ কবিদের অনেকের জীবনই সঙ্ঘাতময় ছিল। তুলসীদাস কবীর ভক্ত কবি অনেকেরই জীবনকথা দুঃখময়।

আধুনিক কালের লেখক কবিদের মধ্যে রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বিশিষ্ট ধনী ও সম্পন্ন ঘরের সন্তান কেহই ছিলেন না।

বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলাল যাযাবর রাজকার্যের অবসরক্ষণে বাগদেবীর অর্চনা করেছেন। শরৎচন্দ্রও ধনীর সন্তান ছিলেন না।

সুতরাং একখানি ঘর আর কিঞ্চিৎ অর্থের কথায় আর কাজ নেই। শুধু বলি অট্টালিকা প্রাসাদবাসিনী নারী ইতিহাসের জগতে কি কেউ ছিলেন না? কিন্তু কে নারী কখনও এক পাতাও এমন কাব্য সাহিত্য লিখেছেন মহাকালের অমর ইতিহাসের পাতায় যাঁর নাম আছে? (অবশ্য লেখিকা এতেও নানা তথ্য সংগ্রহ করে বলেছেন নারীর রচনা উপেক্ষিত অনাদৃত হ'ত ঈর্ষাতুর প্রতিভাবানদের কাছে। এদেশেও লোকে বলে আমাদের কবি চন্দ্রাবতী ময়মনসিংহ গীতিকায় উপেক্ষিতা ছিলেন।)

নাঃ, তবু ঘর দুয়ার টাকা কড়ির আর থাক। আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় অভ্রভেদী সাহিত্য সৃষ্টির প্রতিভা তাঁদের নেই। কি হলে কি হতে পারত। কি হলে কি হবে 'নিরবধিকাল আর বিপুল পৃথিবী'তে সে কথা কবির কথা। অতএব সে কথা মহাকালই জানেন। তবে জ্ঞানীরা এও বলেন যা কখনো ছিল না তা কখনো হয় না।

দেখে শুনে আমাদের মনে হয় এঁরা প্রতিভাহীন হয়েই জন্মান—সেই ভাবেই বাঁচেন মরেনও তেমনি ভাবেই। এবং মরে অমরও হয়ত হবেন না। আর আমাদের সম্বল ত মাত্র কয়েকজন গার্গী মৈত্রেয়ী মীরাবাই খনা লীলাবতী ম্যাডামকুরি ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল জোয়ান অব আর্ক মাত্র। তাতে অবশ্য লেখিকার মত কিছু সত্যই হয়—এঁদের জন তিনেককে প্রতিভাবানরা সহ্য করতে পারেন নি। কিন্তু এখন আমার নিজের বক্তব্য বলি। নাই বা থাকল বিরাট প্রতিভা তাঁদের। তাঁরা তার চেয়েও বড় কিছু বা অন্য কিছু পেয়েছেন ও দান করেন, যেখানে প্রতিভাশালীদের কোনও প্রতিভাই নেই। সেটা হচ্ছে এই যে, এই অপ্রতিভ জাতিই তো প্রতিভাবানদের সৃষ্টি করেন। আদিমাতা দেবজননী অদিতি মানবমাতা ইভ থেকে পৃথিবীর এই অপ্রতিভ অপ্রস্তুত সঙ্কুচিত মানুষগুলিই প্রতিভার সৃষ্টিকর্ত্তাদের রক্তমাংস দিয়ে সৃষ্টি করলেন, স্তন্য দিয়ে পুষ্ট করলেন, লালন করলেন। প্রথম কাব্য গান শোনালেন গুন গুন করে ঘুম-পাড়ানী সুরে গান গেয়ে। যে কাব্য রামায়ণ মহাভারত বেদ-পুরাণের ও আদি সঙ্গীত প্রথম কাব্য কথা। যে সুরের যে গানের বীজ থেকে অঙ্কুর থেকে ব্যাস-বাল্মীকি কাব্য অমৃতরস আস্বাদন করেছিলেন, যা পরে মহীরুহ হ'ল। সেই অ-প্রতিভরা সেদিনের কবিদেরও আদি কবি ছিলেন। এবং আজো প্রতিভাবানের জন্মদাত্রী তাঁরাই 'প্রতিভা' না হলেও আদি কবিই আছেন। যাঁদের বুকের অমৃত না পেলে মুখের সঙ্গীত না শুনলে প্রতিভাবানের জন্ম, জীবন ও প্রতিভার সৃষ্টি হ'ত না।

যাদের নাম ইতিহাস কেউ জানে না কেউ বলে না। মহাকবি কালিদাসের জননীর কথা কে জানে? কেমন ছিলেন তিনি? যিনি অদ্বিতীয় কবির কানে প্রথম মধুর সুরের ছন্দের বাণীর গুঞ্জন শুনিয়েছিলেন। কবিও পিতামাতার কোনো প্রশস্তি লিখে যান নি।

আদি কবি বাল্মীকিরও জননীর কথাই বা কে জানে? তাঁর কাব্যে তাঁর আত্মকথা কিছুই নেই।

আসলে মনে হয় এই প্রতিভার সৃষ্টিকর্ত্রীরা সৃষ্টিকর্তার মতই আত্মপ্রচ্ছন্ন আপনভোলাভাবে থাকেন। আর সৃষ্টিকর্তার মতই তাই তাঁদের দশাও। কখনো পূজা পান কখনো অবজ্ঞা উপেক্ষা। এবং যুগে যুগে যেমন প্রশস্তি নিন্দারও শেষ নেই, তাঁদের স্তাবক নিন্দুকেরও শেষ নেই।

দেশ দেশের সাধুসন্ত ধার্মিক ধর্ম্মগুরু মুনি ঋষি দার্শনিকদের মুখের বাণী বচনের কথা কেনা আর জানেন, কবিরাও নানা ভাষায় স্তুতিবাদ বা নিন্দা না করেছেন এমন নয়। তাই হয়ত সৃষ্টিকর্তার মতই এই সৃষ্টিকারিণীরাও রহস্যময়ভাবে অপ্রতিভভাবেই আড়ালে গোপনে রয়ে গেলেন। সঙ্কোচের সীমা নেই তাঁদের যেন। জানেন না পৃথিবী তাঁদের কাছে কি পায়।

জানেন না বিধাতা সৃষ্টি করলেন পৃথিবী। পৃথিবী সৃষ্টি করলেন এই প্রতিভাহীনদের আর তাঁরা সৃষ্টি করেন প্রতিভাবানদের। যাঁদের প্রতিভাচ্ছটায় জগত মুগ্ধ,

অপ্রস্তুত নির্বোধ তাঁরাও বিমুগ্ধ। তাঁরা যাঁরা চিরদিন যৌবনের ও জীবনের শ্রেষ্ঠ বর্ষ দিন মাসগুলি দিনের পর দিন একটির পর একটি করে প্রতিভাবান জাতির প্রতিভা-গুলিকে দান করে দিয়ে এক নিঃস্ব রিক্ত নিঃসম্বল অখ্যাত জগতের কোণে বসে বিস্মিত গর্বিত আনন্দে নিজেদের দৃষ্টি সমারোহের দিকে মুগ্ধভাবে চেয়ে থাকেন?

এখন এতদিন এযাবৎকাল তাইতেই তো বেশ ছিলেন তাঁরা।

অকস্মাৎ এ যুগে তাঁদের মনের সুখ স্বস্তি শান্তি সব গেলো। শুধু প্রতিভাবানদের সৃষ্টি করে তাঁদের নিয়ে গর্ব গৌরব করে আর তাঁদের সুখ-শান্তি স্বস্তি গর্ব হয় না। সাধ গেল নিজেরা প্রতিভাবতী হবার—তাঁদের মতই সাহিত্য শিল্পকলার লীলাময় স্রষ্টা হবার। এবং দিকে দিকে বিশ্বামিত্রের মত নতুন জগত সৃজনের প্রয়াস সুরু হ'ল। (জনান্তিকে বলা যায় সেই প্রবচন যার জাতিভ্রষ্ট তাঁতির কথা 'যে তাঁত বুনে খাচ্ছিল'।)

তার পর থেকে এই অপ্রতিভদের লেখায় লেখায় কত কাগজ কালো হয়ে যাচ্ছে। সেই কালিমাখা কাগজ বইয়ের আকারে স্তূপে স্তূপে দোকানে বিপণিতে নগরে নগরে ঘরে ঘরে জমা হচ্ছে। মনে কত সান্ত্বনাও পেলেন তাঁরা সৃষ্টি করেছেন মনে করে।

কিন্তু সে লেখা পড়েন শুধু তাঁরাই যাঁরা লেখেন।

* (বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের কোলাঘাট অধিবেশনে মহিলা শাখায় পঠিত)—১৩৬৬, ২৭শে চৈত্র

স্রোতের ফুল

শ্রীবিভা সরকার

প্রভাতের আলো জাগে নিত্ব বনে
ঘোচে নি রাতের রেশ
নামহারা ফুল খুঁজিতে কাহার
চলেছে কি উদ্দেশ?
সুনীল আকাশে ভেসে যাওয়া চিল
বিলাসে মেলেছে ডানা
ডানায় ডানায় সোনা রোদ মাখি
নীলে রচে আলপনা।
কেউ মনভুলে নেবে কি এ ফুলে
আনিয়া গাগরী হাতে

যাবার বেলায় স্নান করি শেষ
পরিবে আপন মাথে!
অচেনা সে ঘাট অচেনা পথটি
অচিন গাঁয়ের মেয়ে
দেবে কি এ ফুলে সার্থক করি
কাজল কবরী ছেয়ে!
ভেসে যাওয়া ফুল খুঁজে পাবে কুল
সার্থক স্রোতে ভাসা—
অজানা এ ফুল লুকায়ে রেখেছে
বুঝি ভীরু এই আশা!

রমাকান্ত রায়

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাস

শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত জলসুখা গ্রামে ১৮৭৩ খৃঃ রমাকান্ত জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি পিতামাতাকে হারাইয়া পিতৃব্য মথুরচন্দ্র রায়ের দ্বারা লালিত-পালিত হন। স্বনামধন্য পিতা কালীকিশোর রায়ের ছিলেন পাঁচপুত্র—কমলাকান্ত, রাধাকান্ত, রমাকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ শ্রীকান্ত। মহাবীর নেপোলিয়ান বলিতেন, "সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবনের চারিত্রিক উৎকর্ষ এবং অপকর্ষ তাহার মাতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। রমাকান্তের মাতা অতি বুদ্ধিমতী, ন্যায়পরায়ণা ও ধর্মনিষ্ঠা রমণী ছিলেন। তাঁহার সততা ও ন্যায়নিষ্ঠার জন্য সকলেই তাঁহাকে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। গ্রামের সামাজিক দলাদলি, এমনকি জমিদারি কি বাণিজ্যসংক্রান্ত কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে তাঁহার স্বামী, পিতা ও পরিবারের অনেক জ্যেষ্ঠ গুরুস্থানীয় ব্যক্তিগণও এই অলোকসামান্যা প্রতিভাশালিনী মহিলার পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতেন এবং তাঁহাকে মধ্যস্থ মানিয়া বহু মামলা ও দরবার আপোষে মিটমাট করিতেন। গ্রামের মেয়েরা সকল বিষয়ে তাঁহার অনুগত ও অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার মধুর ব্যবহারে এবং স্নেহ, প্রীতি ও দয়ার গুণে উপকৃত হইয়া পাড়ার সকলে তাঁহাকে আপনার জন এবং পরমাত্মীয়া জ্ঞান করিত। এহেন শক্তিময়ী মাতার সুসন্তান রমাকান্ত মানব-কল্যাণে আত্মশক্তি নিয়োগ করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

বাল্যজীবন ও শিক্ষা

রমাকান্ত ১৮৯৪ সনে শ্রীহট্ট গভর্ণমেণ্ট হাই স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় সিটি কলেজে দুই বৎসর অধ্যয়ন করেন। শুনিয়াছি, ইংরাজীতে সামান্য কয়েক নম্বর কম পাওয়ায় তিনি ফার্ষ্ট আর্টস্ পরীক্ষা পাশ করিতে পারেন নাই। কিন্তু জগতে যাঁহারা উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছেন, শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ দ্বারা তাঁহাদের জীবন-ধারা নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। বাল্যকাল হইতেই বিবিধ জনহিতকর কার্য্যে তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এজন্য সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা, সম্মান ও স্নেহের চক্ষে দেখিত।

খেলাধূলায় রমাকান্ত

রমাকান্ত একজন পাকা খেলোয়াড় ছিলেন। ক্রিকেট, কবাটি ইত্যাদি খেলায় কেহ তাঁহার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। তিনি যখন মধ্য-ইংরাজী স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র তখন একবার খুনের অভিযোগে রাজদ্বারে নীত হন। ক্রিকেট খেলার সময় ঘটনাবশতঃ একটি বালক সাঙ্ঘাতিক ভাবে আহত হয় এবং সেই আঘাতেই মারা যায়। এই উপলক্ষ্যে শত্রুপক্ষের একজন জমিদারের উত্তেজনায় রমাকান্ত ও অন্য কয়েকজন বালকের নামে খুনের অভিযোগ আনা হয়। এই সময় গ্রেপ্তার করিয়া যখন তাঁহাদিগকে থানায় আনার চেষ্টা করা হয়, তখনও রমাকান্ত অটল ও নির্ব্বিকার। এমন গুরুতর অভিযোগে পড়িয়াও নির্ভীকচিত্তে বালক রমাকান্ত উকীলদের জটিল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিয়া প্রশংসালাভ করেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ টিকিতে পারে নাই।

নেতার আসন

ইংরাজীতে যাহাকে বলে, "A born leader of men" রমাকান্তের জীবনে বাল্যকাল হইতেই তাহার পরিচয় আমরা পাই। রমাকান্তের সঙ্গে সর্ব্বদাই একদল শিষ্য ঘুরিত। তিনি তাহাদিগকে সমাজ-সেবায় আর্ত্তত্রাণ, স্ত্রী-শিক্ষা, ছুঁৎমার্গ পরিহার, শুশ্রূষা ইত্যাদি নানাবিধ জনহিতকর কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলেন। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি নেতার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সর্ব্বাগ্রে তিনি থাকিতেন এবং পশ্চাতে তাঁহার শিষ্যবর্গ তাহাদের নেতার অনুসরণ করিত। জীবনে তাঁহাকে কাহারও সহিত শত্রুতা করিতে শুনি নাই, তবে অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া তাঁহার স্বভাবসুলভ রীতিবিরুদ্ধ ছিল। তিনি একাধারে বজ্রের ন্যায় কঠোর এবং কুসুমের মত কোমল প্রকৃতিবিশিষ্ট ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করিতে গেলে একখানা প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া পড়ে। যে দিকে তাকাই, সেদিকে দেখি তিনি একজন দিকপাল, সুতরাং এই প্রসঙ্গের রেখা এইখানেই টানি।

জাপান-যাত্রা

১৮৯৮ সনের জুলাই মাসে তিনি দেশ-বরেণ্য কৃষ্ণকুমার মিত্রের উৎসাহে এবং যুবক জমিদার, তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অর্থানুকূল্যে শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য জাপান-যাত্রা করেন। এস্থলে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, রমাকান্ত রায়ই প্রথম বাঙালী যিনি জাপানে শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য গমন করেন। ১৯০৩ সনে তিনি ইয়োকোহামা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে খনিতত্ত্ব বিদ্যায় 'মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার' উপাধিলাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

জাপানে চরিত্র-মাধুর্য্য

দেবোপম-চরিত্র রমাকান্ত জাপান প্রবাসকালে জাপানী নর-নারী ও শিশুদের সুখ-দুঃখের ভাগী হইয়া তাহাদের নিতান্ত আপনার জনে পরিণত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার উন্নত চরিত্র, স্বভাব-সুলভ উদারতা এবং লোক-হিতে নিঃস্বার্থ অবদান, জাপানী নর-নারী ও শিশুদের হৃদয় জয় করিয়াছিল। শিশুদের তিনি শিশুপাঠ্য পুস্তক, খেলনা, ছবি, মিষ্টি ইত্যাদি বিতরণ করিতেন শিশুরাও সর্ব্বদা তাঁহার পেছনে পেছনে ঘুরিয়া বেড়াইত। রমাকান্তের শিশু-প্রীতি দেখিয়া মহাত্মা যীশুখ্রীষ্টের অমর বাণী মনে পড়ে, "Remember the little children to come unto me, for theirs is the Kingdom of heaven." তাই দেখিতে পাই, তাঁহার জাপান পরিত্যাগ কালে তথাকার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা রমাকান্তের জন্য কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিল। শুধু চরিত্র-মাধুর্য্যে একজন বাঙালীর পক্ষে একটি বিদেশী জাতির উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করা কম গৌরবের পরিচায়ক নহে।

স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন—কলিকাতায় অভ্যর্থনা

১৯০৩ সনের শেষভাগে রমাকান্ত স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কলিকাতায় শ্রীহট্ট সম্মিলনীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে একখানা মানপত্র প্রদান করা হয়। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ও স্বনামখ্যাত বিপিনচন্দ্র পালের জামাতা ৺সুরেশচন্দ্র দেব উক্ত মানপত্র রচনা করিয়াছিলেন। এলবার্ট হলের অন্যতম ট্রাষ্টি 'ইণ্ডিয়ান মিরার' সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন সভার জন্য বিনা ভাড়ায় হলটি ব্যবহার করিতে দেন। 'শ্রীহট্ট-সম্মিলনী'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস মহাশয় এই সভায় পৌরোহিত্য করেন। সমগ্র হলটি দর্শকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। প্রধান বক্তা ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে এবং (তখনকার) মিঃ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। সুরেন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব বাক্-বিভূতি শ্রোতৃমণ্ডলীকে মন্ত্রমুগ্ধের মত করিয়া ফেলিয়াছিল। বিশাল জনতার মধ্যে 'টু' শব্দটি শোনা যায় নাই। গোখলের বক্তৃতার গতি ছিল দ্রুত এবং বাক্-বিন্যাস আন্তরিকতা পূর্ণ। মিঃ গান্ধীর বক্তৃতা ছিল সুচিন্তিত কিন্তু উহার গতি ছিল মন্থর।

জন্মভূমি জলসুখায় গমন

রমাকান্ত কলিকাতা হইতে বাটীতে গিয়া কিছুকাল অবস্থান করেন। তখনকার দিনে বিদেশ যাওয়ার অর্থ ছিল জাতিচ্যুত হওয়া। রমাকান্তও এই গোড়ামী ও গ্রাম্য দলাদলি হইতে রেহাই পান নাই। বাল্যকাল হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ তাঁহার হৃদয়ে উপ্ত হইয়াছিল, কাজেই এই সামাজিক নির্য্যাতনে তিনি ভীত বা মর্ম্মপীড়িত না হইয়া ধীর ভাবেই স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। তিনি ছিলেন অকুতোভয়। জীবনে বহু ঝড়, ঝঞ্ঝাবাত তাঁহার উপর দিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার উন্নত মস্তক কখনও অবনমিত হয় নাই।

শ্রীহট্টে আগমন ও সম্বর্দ্ধনা

তিনি জলসুখা হইতে ১৯০৪ সনে শ্রীহট্টে আসেন। শ্রীহট্টের গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক রমাকান্ত-অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয়। আমরা তখন এন্‌ট্রেন্স ক্লাশের ছাত্র। প্রায় ৫৬ বছর আগেকার কথা, ক্ষীণ স্মৃতির সাহায্যে যথাসাধ্য বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। স্থানীয় রতনমণি লোকনাথ টাউন হলে শ্রীহট্টের জনসাধারণ কর্ত্তৃক তাঁহাকে বিরাট সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। টাউন হলে তিল ধারণের স্থান ছিল না। টাউন হলের বাহিরের বিস্তৃত আঙ্গিনা হইতে সুর্ম্মা নদীর তীর পর্য্যন্ত বিপুল জন-সমুদ্র—'ন স্থানং তিলধারণে।' বহু চেষ্টা করিয়াও ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া আমার মত অনেককেই বাধ্য হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতে হয়। আমরা ছাত্রগণও তাঁহাকে টাউন হলে এক সম্বর্দ্ধনা সভায় সম্বর্দ্ধিত করি। বলা বাহুল্য স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক এই সম্বর্দ্ধন-সভার আয়োজন করা হয়। আমাদের কার্য্যসূচীর প্রথমেই ছিল রমাকান্তের গলায় মাল্যদান (Garlanding), এই মাল্যদান এত সুসম্পন্ন ভাবে আমরা করিয়াছিলাম যে সকলেই একবাক্যে প্রশংসা করিয়াছিলেন। আমরা নিজেদের মধ্যে রমাকান্তের শারীরিক উচ্চতার একটা মাপকাঠি ঠিক করিয়া নিয়াছিলাম। তিনি প্ল্যাটফরমের উপর উপবিষ্ট হইলে পর প্রথমেই স্কুলের নীচের ক্লাসের

একটি ছোট ছেলে ছোট্ট একটি ফুলের মালা তাঁহার গলায় পরাইয়া দেয়: তাহার পর উহার অপেক্ষা বড় আর একটা ছেলে আর একটু লম্বা একটা মালা তাঁহার গলায় দেয়। ছেলেগুলির শারীরিক উচ্চতা এবং মাল্যগুলির দৈর্ঘ্য স্তরে স্তরে তাহাদের ধারাবাহিকতা বজায় রাখিয়া করা গিয়াছিল। সর্ব্বশেষ মাল্য দৈর্ঘ্যে যাহা রমাকান্তের কোমর পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল, তাহা দান করেন সতীশচন্দ্র দাস, এম,এ, বি,টি। সতীশ বাবু তখন মুরারীচাঁদ কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। ছাত্রদিগের পক্ষ হইতে রমাকান্তকে যে মানপত্র দেওয়া হয়, তাহা পাঠ করেন মুরারীচাঁদ কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র কামিনীকমল দাস। উক্ত মানপত্রে তিনি বোম্বাইয়ের ভীষণ দুর্ভিক্ষে জাপান হইতে প্রায় এক লক্ষ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নরনারীর সাহায্যার্থে প্রেরণ করার জন্য ছাত্র সমাজের পক্ষ হইতে তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। রমাকান্তের সতীর্থ ও বন্ধু অশ্বিনীকুমার গুহ (যিনি পরে পুলিসের বড় সাহেব হইয়াছিলেন) তাঁহার বিবিধ সদ্গুণাবলী ও চরিত্র-মাধুর্য্যের উল্লেখ করিয়া নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বিদায়-সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন আমাদের সতীর্থ সুগায়ক সেনাসিংহ মণিপুরী। নিম্নে উহা উদ্ধৃত হইল:

"যাও, যাও রমাকান্ত রেখো মোদের স্মরণে,
মনেতে রাখিও তবু প্রিয় ছাত্রগণে।
তব উপদেশ-বাণী, জ্ঞানী-শিরোমণি,
রহিবে রহিবে সদা আমাদের মনে।
প্রার্থনা করি হে মোরা বিভুর চরণে,
সুখেতে রাখুন তিনি তোমা হেন ধনে।"

শ্রীহট্ট ব্রহ্মমন্দিরে আর একটি সভা আহূত হয়। ইহা 'Conversazione'এর আকারে হইয়াছিল। যে কেহ তাঁহাকে যে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি তাহার যথাযথ উত্তর তাঁহাকে দিয়াছিলেন। এই সভায় রমাকান্তবাবু জাপানীদের রীতিনীতি, চালচলন, আচার-ব্যবহার, শ্রমশীলতা, অতিথি-বাৎসল্য, শ্রমগৌরবানুভূতি (Dignity of Labour) ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। আরও বলিয়াছিলেন, জাপানে সংযত ভাবে থাকিলে পড়াশুনার ব্যয় ৪০৲ টাকার বেশী লাগে না। তাঁহার এই কথায় কয়েকজন ছাত্র জাপান যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন, কারণ কলিকাতাতেই তখনকার দিনে ২০৲।২৫৲ মাসিক ব্যয় লাগিত। এই সভায় জনৈক প্রশ্নকারী ভদ্রলোকের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, জাপান সম্বন্ধে জানিতে হইলে "Kokoro" নামক একখানা পুস্তক আছে, তাহা পাঠ করিলে অনেক বিষয় জানিতে পারা যাইবে। শ্রীহট্টে আমার মেসোমহাশয় ৺বঙ্কবিহারী দাস একদিন রমাকান্তকে ভূরি-ভোজনে আপ্যায়িত করেন।

১৫ ফকিরের বাসা

এ স্থলে ১৫ ফকিরের বাসা সম্পর্কে ২।৪টি কথা লিপিবদ্ধ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৫ নং ফকিরচাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীট বাড়ীতে শ্রীহট্টের একটি মেস্ ছিল। কৌতুকচ্ছলে সকলেই ইহাকে ১৫ ফকিরের বাসা বলিতেন। ১৮৯৫ সনের জুলাই মাসে রমাকান্ত তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকান্ত এবং অপর এক বন্ধু সহ এই বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া বাস করিতে থাকেন। শ্রীহট্টের গড়দুয়ারের স্বনামখ্যাত হামিদবক্ত মজুমদার সাহেব (মরহুম) ঐ সময়ে হামিদনগর চা-ক্ষেত্র (Hamidnagar Tea Estate) নামক একটি চা-বাগান খুলেন এবং মদীয় পিতৃদেবকে ইহার কলিকাতাস্থ এজেন্ট নিযুক্ত করেন। পিতৃদেবের ৺মহেন্দ্রনাথ দাসের অফিস (M. N. Das & Co.) ৫২ নং হেরিসন রোডে অবস্থিত ছিল, তাঁহার বাস ছিল ১৫ নং ফকিরচাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীট মেস্ বাড়ীতে। শ্রীহট্টের রামপাশার ৺প্যারীচরণ দাস মহাশয় এম, এ, পাস করিয়া উক্ত মেসবাড়ীতে থাকিয়া বি, এল পড়িতেছিলেন। সুতরাং মদীয় পিতৃদেব, প্যারীবাবু প্রভৃতির সঙ্গে রমাকান্ত রায়, শ্রীকান্ত রায় প্রভৃতির অত্যন্ত হৃদ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। বাবার কাছে রমাকান্ত আমার নাম শুনিয়াছিলেন। তিনি শ্রীহট্টে আসিয়া আমার বাড়ীতে আমাকে দেখিবার জন্য আসেন এবং আমাকে না পাইয়া 'ভিজিটিং কার্ড' রাখিয়া যান। বলা বাহুল্য পিতৃদেব কালাজ্বরে ইতিপূর্ব্বে মারা যান। ইহা ৫৬ বৎসর আগের কথা। আজ পর্য্যন্ত কার্ডখানা সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছি। ঐ দিনই তিনি গবর্ণমেন্ট হাই স্কুলে প্রায় ২॥ ঘটিকার সময় যান। তখন হেড পণ্ডিত আনন্দমোহন ভট্টাচার্য্যমহাশয় আমাদিগকে সংস্কৃত পড়াইতে ছিলেন। তিনি তাঁহাকে দেখিয়া "কি হে রমাকান্ত, কেমন আছ?" বলিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিতেই রমাকান্ত তাঁহার পদধূলি লইলেন।

রমাকান্তের শরীরের গঠন দেখিয়া আমরা ছাত্রমণ্ডলী স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম। সংস্কৃত "শালপ্রাংশু মহাভুজ" বাক্য রমাকান্তের বেলায় সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য। তাঁহার উন্নত দেহ, প্রশস্ত ললাট, সুদীর্ঘ বাহু, সুগঠিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দৃষ্টে তাঁহাকে দীর্ঘকায় ও দৃঢ়াবয়ব শিখ যুবক

বা কাবুলীওয়ালার ন্যায় মনে হইয়াছিল। আমরা এই বীরত্বের প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্টে বিস্ফারিতনেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছিলাম। তিনি পণ্ডিতমহাশয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়া শেষে আমাদের হেড মাষ্টার ৺দুর্গাকুমার বসুর কামরায় গিয়া অনেকক্ষণ আলাপ করেন। তাঁহার সহিত শেষে আলাপ পরিচয় হওয়ায় আমার জীবন ধন্য হইয়াছিল। এমন স্নেহ-প্রবণ হৃদয় আর দেখিব না।

কাশ্মীরে চাকুরি

কাশ্মীরে এক চাকুরি পাইয়া রমাকান্ত তথায় চলিয়া যান। কিন্তু তথায় অধিকদিন চাকুরি করেন নাই। দেশ-মাতৃকার সেবার জন্য তিনি ছটফট করিতেছিলেন। মনে ঘোরতর অশান্তি। তথায় আবার ফিরিয়া যাইতে তাঁহার এক বন্ধু পত্র দেওয়ায় তিনি তাঁহাকে উত্তরে লিখেন, "আমি আর কাশ্মীর যাইব না। স্বদেশের সেবায় সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিব মনে করিয়াছি।"

স্বদেশী-আন্দোলনের পুরোভাগে

বঙ্গ বিভাগের প্রতিবাদে বাংলা দেশে স্বদেশী-আন্দোলনের জন্ম হয়। রমাকান্ত এই আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ঢিলা পায়জামা ও ডোরাকাটা স্বদেশী কাপড়ের কুর্ত্তি গায়ে দিয়া প্রায় মণ খানেক ওজনের কাপড়ের গাঁট মাথায় নিয়া কলিকাতার অলিতে গলিতে রাস্তায় রাস্তায় দেশী কাপড় বিক্রী করিতে লাগিলেন, তাঁহার পেছনে একদল যুবক-কর্ম্মী। যোগ্য ব্যক্তি যোগ্য আসনে বসিলে ঘড়ির কাঁটার মত সব কাজ অনায়াসে চলিতে থাকে। তাই রমাকান্তের নেতৃত্বে সৃষ্ট এই যুবক-বাহিনী উত্তরকালে মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতেও কুণ্ঠাবোধ করিত না। আহার নিদ্রার দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, তাঁহাদের দলপতির আজ্ঞাবাহী এই বিরাট বাহিনী যখন অনশন ও অর্দ্ধাশনে ক্ষুৎপিপাসাক্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িয়া বলিত, "আর যে পা চলে না," তখন দলপতি জিজ্ঞাসা করিতেন, "তোমাদের কারও কাছে পয়সা আছে?" একজন উত্তর দিলেন, দু' পয়সা আছে। তখন দু' পয়সার ছোলা ভাজা কিনিয়া দলপতি ২।৪টা ছোলা সকলকে বিতরণ করিয়া ২।১টা ছোলা অবশিষ্ট থাকিলে নিজে খাইয়া রাস্তার কলের জলে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন। কোনো দিন একটা রুটি কিনিয়া সকলে ভাগ করিয়া একটু একটু খাইয়া ক্ষুধা নিবারণ করিতেন। রমাকান্তের দেশ সেবায় ভাঁজ ছিল না। ইহা নিখুঁৎ ও সম্পূর্ণ খাঁটি ছিল বলিয়া স্বদেশী-আন্দোলন পরিণামে জয়যুক্ত হইয়াছিল। যখনই যুবকদল অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িয়াছেন, তখন তাহাদের দলপতি তাদের মাথায় হাত বুলাইতেন ও মৃদু হাস্যসহকারে বলিতেন, "ভাই যে কাজে বাহির হইয়াছি, তাহা যে এখনও বাকী রহিয়া গিয়াছে। মায়ের সেবক সন্তান তোমরা, এই কথাটা কি ভুলিয়া যাইতেছ?" রমাকান্তের মিষ্ট উত্তেজনায় যুবকের দল দ্বিগুণ উৎসাহে আবার কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইত। ইংরাজীতে একটা কথা আছে "Great men think alike" কিন্তু আমি দেখিতেছি, "Great men act alike" যাঁহারা কর্ম্মযোগী তাঁহাদের কার্য্যক্রম এক ভাবেই নিয়ন্ত্রিত হয়। এই বিষয়ে অযাচক আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা মদীয় গুরুদেব, অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসের সহিত রমাকান্ত রায়ের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখিতে পাই। মহামানব স্বরূপানন্দ ঊর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসী। স্কুলে পাঠ্যাবস্থায় থাকার সময় হইতে একদল বালক তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত এবং তিনি তাহাদের পুরোধা হিসাবে নামজপ শিক্ষা দিতেন। রোজই ক্লাসে আসিয়া কেহ দশ হাজার, কেহ পাঁচ হাজার বার নামজপ করিয়াছে এরূপ একটা প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হইত। রোজ এক লক্ষ বার জপ করার নির্দ্দেশ ছিল। ইঁহারা ব্রহ্মচর্য্য পালন সম্বন্ধেও স্বামীজীর উপদেশলাভ করিয়া জীবনে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। পুপুন্‌কী অযাচক আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় স্বামীজী সেখানের পাথর কঙ্করময় স্তূপে স্বহস্তে কোদাল গাঁইতি ইত্যাদি লইয়া কোনো দিন অনশন, কোনো দিন অর্দ্ধাশন কোনো দিন কর্ম্মীগণ সহ পাহাড়ে পাতালতা ইত্যাদি খাইয়া বিশ্রামহীন অবস্থায় কাজ করিয়া গিয়াছেন। এই প্রস্তরময় স্থানে একটি আশ্রম হইতে পারে তাহা স্বপ্নেও কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই। কিন্তু আজ পুপুন্‌কী আশ্রমের ফুলের সুন্দর বাগান, জলাশয় ইত্যাদি দেখিতে সাহেবেরা পর্য্যন্ত আসিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যান। স্বাবলম্বী অযাচক এই সন্ন্যাসী এবং তাঁহার পরিচালনায় কর্ম্মীবৃন্দের কঠোর পরিশ্রমের সহিত রমাকান্ত রায় ও তাঁহার কর্ম্মীবৃন্দের আশ্চর্য্যজনক সাদৃশ্য দেখিতে পাই। ঊর্দ্ধরেতা এই মহাতাপসের সহিত অকৃতদার রমাকান্তেরও সুসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তাই বলিতেছিলাম, এ সংসারে যাঁহারা কর্ম্মযোগী তাঁহাদের কার্য্যক্রম একই ধারায় পরিচালিত হয়। ১০২°।১০৩° জ্বর গায়ে লইয়াও কোদাল, গাঁইতি দিয়া পাথর সরাইতেছেন দেখিয়া একজন বলিয়াছিলেন "স্বামীজী, আজ বিশ্রাম করুন, তা না হইলে রোগ বাড়িয়া যাইবে।" স্বামীজী উত্তর দিয়াছিলেন, "Rest? After death please" রমাকান্তও ঠিক এই রকম মরণপণ করিয়া সেবায় আত্ম-

নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই দিকেও উভয়ের সুসাদৃশ্য দেখিতে পাই।

এন্টি সার্কুলার সোসাইটি

কুখ্যাত রিজলি (Risley) ও লায়ন (Lyon) সার্কুলারের প্রতিবাদে কলিকাতায় এন্টি সার্কুলার সোসাইটি (Anti-Circular Society) স্থাপিত হয়। রমাকান্ত ইহার নেতা হিসাবে যে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। এই সোসাইটির কর্ম্মীরা গভর্ণমেন্টের চক্ষুশূল ছিল। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের পর ৭ই আগষ্ট ১৯০৫ টাউনহলে যে বিরাট সভার অধিবেশন হয়, তাহা বাঙ্গালার রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা। বাঙ্গালী যে এরূপ বিশাল জনতাকে সংযত ও সংহত করিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে চালাইয়া লইয়া যাইতে পারে, এ বিশ্বাস পূর্ব্বে অনেকেরই ছিল না। ৭ই আগষ্টের বিরাট বাহিনীর নেতৃত্ব করেন জাপানপ্রত্যাগত রমাকান্ত রায়। ইহা হইতেও তাঁহার আশ্চর্য্য সংগঠন ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাই আবার বলি, বাল্যকাল হইতে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি যে দিকেই গিয়াছেন, সেদিকেই নেতার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ও দুর্জ্জয় সাহস এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তাঁহাকে এই আসনে অভিষিক্ত করিয়াছিল। রমাকান্ত মিছিলের পুরোভাগে যাওয়া কালে রাস্তার জনমণ্ডলী তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত-মস্তক হইত। "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই, দীন-দুঃখিনী মা যে তোদের এর বেশী তার সাধ্য নাই" গানে কলিকাতার আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া মিছিলের যুবকদল স্বদেশী বস্ত্র বিক্রয় করিতেন।

বদান্যতায় রমাকান্ত

জাপান প্রবাসকালে একটি ভারতীয় যুবককে আমেরিকা গমনে সাহায্য করার জন্য কাল কি খাইব চিন্তা না করিয়া তিনি নিজের একমাত্র সম্বল ৫০০৲ ধার দিয়াছিলেন। কর্ম্মজীবনেও যখন ২৫০৲ মাসিক বেতনে রাণীগঞ্জে চাকুরি করিতেন, তখন নিজের খরচ মাত্র ৫০৲ টাকায় চালাইয়া বাকী ২০০৲ টাকা মাসিক সাহায্যে চারিজন বাঙ্গালী যুবককে শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য তিনি আমেরিকায় প্রেরণ করেন। রমাকান্ত রায়ের জীবনে এরূপ বহু দৃষ্টান্ত তাঁহার জীবনালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই।

আত্মাহুতি

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, এন্টি সার্কুলার সোসাইটির কর্ম্মীরা গবর্ণমেন্টের চক্ষুঃশূল ছিল। কুখ্যাত বরিশাল কন্‌ফারেন্সে পুলিশ, সোসাইটির যুবকবৃন্দের উপর যে

রমাকান্ত রায়

অমানুষিক অত্যাচার করে, তাহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনা। রমাকান্ত তখন রাণীগঞ্জে। অমানুষিক পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য পূর্ব্বেই ভঙ্গ হইয়াছিল। এমতাবস্থায় 'সোসাইটি'র সভ্যদের পুলিশ লগুড়াঘাতে জর্জ্জরিত করিয়াছে জানিতে পারিয়া ভগ্নস্বাস্থ্য রমাকান্ত পাগলের মত হইয়া যান। ঘুস্‌ঘুসে জ্বরে তখন তিনি ভুগিতেছিলেন। ইহা ক্রমে বিকারজ্বরে পরিণত হয়। 'প্রতিহিংসা' 'প্রতিহিংসা' বলিয়া প্রলাপ বকিতেন। ১৯০৬ সনের ৩রা মে তেত্রিশ বৎসর বয়সে অবিবাহিত অবস্থায় তিনি সাধনোচিতধামে গমন করিয়াছেন।

তিন-সাগর

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য

৪

বড় পরিশ্রান্ত !

হোটেলের ছোটো ঘরখানা যেন পরিচিত মনের মতো আরামে কোমল হয়ে আছে। লম্বা জানলাটা খুলে দিলাম। কৃষ্ণা ষষ্ঠীর চাঁদ নগরীর এক পাশে লাল হয়ে আছে। কাঁচের কুঁজোর জল ছিলো। একটা গেলাসে ঢেলে একটু একটু সিপ্ করতে লাগলাম।

আসলে মনটা তখনও তৈরী নেই বিছানায় শুয়ে পড়ার খাতিরে ! মনে তাসোর কথা, তর্কুয়াতো তাসো। লর্ড বায়রণের The Lament of Tasso. তাসো লিও নোরোর কাহিনী, গ্যয়টে পর্য্যন্ত তাসোর করুণ জীবন নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। 'উন্মাদ' আখ্যা দিয়ে তাসোকে ফেরারার ডুাক সাত বছর বন্দী করে রেখে-ছিলেন। লিও নোরার জন্য তাসো ঘুরে ঘুরে ফিরেছেন। বন্দিত্বের পরে চিরজীবন তিনি আতঙ্কে কাটিয়েছেন। আবার যদি কেউ বন্দী করে, তাঁর কাব্য অ-লেখা থেকে যাবে। রোম যখন "জেরুজালেম ডেলিভার্ড" পড়তে পেলো, "অমিন্তা"র অভিনয় দেখলো, সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান দেবার জন্য ব্যগ্র হোলো। কবির অভিষেকের দিন স্থির হোলো। কিন্তু সেদিনের সূর্য তাসোকে জাগতে দেয় নি। অভিষেকের আগেই তাসো মারা গেলেন। তাসো, যিনি লিখেছিলেন "সম্মান, খ্যাতি, যশঃ—পেলাম না তোমায় ? কতো করে ঘোরালে, কতো পথে ঘোরালে, পেলাম না, পেলাম না।"

বলেছেন :

"T'was thou, thou, Honour first
That didst deny our thirst
Its drink, and on the fount thy
covering set…"

পরে তুচ্ছ করেছেন সেই যশ পিপাসা। মর্ম্মদাহে চিৎকার করেছেন :

"We here a lowly race
Can live without thy grace,
After the use of mild antiquity,
Go, let us love ; the daylight dies, is born ;
But unto us the light
Dies once for all ; and sleep brings on
eternal night."

খুট করে দরজায় শব্দ !

আমি শোবার পোষাক পরেছি।

বিস্মিত কণ্ঠে বললাম "আসুন"

ছোটো দেখতে, পাঁচ ফুটও নয় হয়তো ; হয়তো একদিন লম্বা ছিলো, সুন্দরী ছিলো, ছিলো তারুণ্য, যৌবন, চমক। এখন বড়ই কুঁকড়ে গেছে, দুমড়ে গেছে দেহ। ফ্যাকাশে সবুজ একটা গাউন পরে শাদা চকচকে চুলের ওপর শাদা একটা ফেটি বেঁধে, বুড়ী এসে ঘরে ঢুকলো।

"আর কিছু চাই আপনার ? আরামের অভাব নেই তো ? কিছুর দরকার আছে কি ?"

আমি সমস্ত ঘটনাটা পরিপাক করার চেষ্টা করছি।

বুড়ীর চোখ চক্‌চক্ করছে।

"আমি এই হোটেলেরই পরিচারিকা। ঘরদোর তদারক করি। ধোয়া-মোছা করি। একটু ইংরেজী জানি তাই এই হোটেলে চাকরি পেয়েছি। যাত্রীদের যা কিছু দরকার আমাকেই বলা যায়, আমি সবই ব্যবস্থা করে দিই।…"

শেষ অবধি এক সময়ে থেমে যেতেই হয়।

বুড়ী থামে।

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে আমার শূন্য দৃষ্টির দিকে।

হঠাৎ চমক ভাঙ্গে আমার।

তাড়াতাড়ি মনিব্যাগ থেকে কিছু বার করে ওর হাতে দিয়ে বলি, "তোমাকেই আমার দরকার ছিলো। আর কোথাও কাজ আছে তোমার ? তোমায় একটু বসতে হবে। ঘুম আসছে না। একটু গল্প করতাম।"

বুড়ী বলে, "আমায় এখনও চারখানা ঘরে প্রশ্ন করে আসতে হবে। গল্প করতে চাও ? আমায় কেন ? আমি তেরেসাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তেরেসা বেশ গল্প করবে।"

ব্যস্ত হয়ে বলি, "না, না, তেরেসা নয়। আমি তোমার প্রেমেই পড়েছি, তোমাকেই দরকার।"

যোগাযোগ

রমেন দীর্ঘকাল পরে বিলেত থেকে ফিরে এলো। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রী নিয়ে। একে সুদর্শন সুপুরুষ, তায় বিরাট চাকুরে আর সবচেয়ে বড়কথা অবিবাহিত। পয়সাওয়ালা লোকদের বিবাহযোগ্যা মেয়েদের মধ্যে হৈ হৈ পড়ে গেল। এমন ছেলেকে হাতছাড়া করতে আছে? রীনা, শ্যামা, কেতকী অর্থাৎ যারা বিয়ের আগে রমেনকে চিনতো তারা পালা করে রমেনের সঙ্গে পার্টি, পিকনিক আর সিনেমা দেখার ব্যবস্থা করল।

এই রকম একটি পার্টিতে কমলার সঙ্গে রমেনের প্রথম দেখা। পার্টি ছিল শ্যামার বাড়ীতে। কমলার এমন পার্টিতে থাকার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণই ছিল না। কমলার বাবা নিম্ন মধ্যবিত্ত স্কুলের শিক্ষক। শ্যামারা সেদিন পার্টির কথা আলোচনা করছিল কমলা কলেজের কমনরুমে সেই একই জায়গায় ছিল তাই চক্ষুলজ্জার খাতিরে কমলাকে ডাকা।

কমলা পার্টিতে আলাদা একটা কোণে বসেছিল সাদাসিধে জামাকাপড় পরে। চারিদিকে দামী সাড়ী, সেট—ইংরিজী বুকনি আর বেশির ভাগই রমেনকে ঘিরে। রমেন একটা কিছু চাইতেই চার জন দৌড়ে যাচ্ছে এই-রকম একটা ব্যাপার! হঠাৎ ঘটল একটা অঘটন। কমলা চা খাচ্ছিল।

হঠাৎ তার হাত থেকে পড়ে পেয়ালা প্লেট দুটোই চৌচির। অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে কমলা নীচু হয়ে ভাঙ্গা কাঁচ তুলতে যাচ্ছিল—শ্যামার মা বাধা দিয়ে বললেন "থাক বেয়ারাই তুলবে। দামী সেটে চা খাওয়া অভ্যাস নেই তো!" কমলার মুখ লজ্জায় অপমানে কালো হয়ে গেল। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটল কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে—বিশেষ কেউ লক্ষ্য করার আগেই। কমলা আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। ওর চলে যাওয়াটা কেউ লক্ষ্য করল না কারণ ওরা তখন রমেনকে নিয়ে ব্যস্ত।

পরদিন সকালে। কমলাদের বাড়ীর দরজা খটখট করে নড়ে উঠল। দরজা খুলে কমলা অবাক।

সুদর্শন রমেন দাঁড়িয়ে আছে—পরনে ধুতি, পাঞ্জাবী, চাদর। রমেন নমস্কার করে বলল—"আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। শ্যামার কাছ থেকে আপনার ঠিকানা নিলাম। কাল পার্টিতে সবই আমি লক্ষ্য করেছিলাম কিন্তু আপনাকে কিছু বলার আগেই আপনি চলে গেলেন। আমি সত্যই দুঃখিত। আমার নিজেকেই দায়ী মনে হচ্ছে।"

কমলা বলল—"না আমারই যাওয়া উচিৎ হয়নি। ওঁরা এত বড়লোক—" "হ্যাঁ, বড়লোক, কিন্তু অমানুষ—" রমেন বাধা দিয়ে বলল। কমলা রমেনকে ভেতরে নিয়ে এলো। বাবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। তারপরে ভিতরে গেল চা আনতে। কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এলো চা আর জলখাবার নিয়ে। রমেন বলল—"এ কি, এর মধ্যে এত খাবার? আপনি কি যাদু জানেন?" কমলা লজ্জিত হয়ে বলল "না না, কাল বাড়ীতে পুলিপিঠে আর গজা বানিয়েছিলাম।" রমেন এক কামড় খেয়ে—আহা কি অপূর্ব পিঠে। প্রায় ছয় বছর বিলেতে এই পিঠের স্বপ্ন দেখেছি। আরও কত রান্না খেতে ইচ্ছে করে—চচ্চড়ি, শুক্তো, ডালনা! এখানে থাকি হোটেলে আর মিশি যাদের সঙ্গে তাঁরা খান বিলিতি খানা। আচ্ছা এত ভাল পিঠে বানালেন কি করে?" কমলা—"কেন? নারকেল কুরে, ময়দায় পুর দিয়ে, ডালডায় ভেজে—" রমেন—"ডালডায় এত ভাল রান্না হয়?"

কমলা "হ্যাঁ, আমাদের বাড়ীর সব রান্নাই সেইজন্যে 'ডালডায়' হয়। আজ খেয়েই যাননা এখানে। চচ্চড়ি, শুক্তো, ডালনা—যা যা আপনি খেতে চান সবই রাঁধব আজ।" কমলার বাবাও সায় দিলেন—হ্যাঁ, হাঁ, বাবা এসেছ যখন খেয়েই যাও।" রমেন উৎসাহভরে বলল, "নিশ্চয়ই, আমি নিজে বলতে পারছিলাম না, যা পিঠে খাওয়ালেন আজকে না খেয়ে আমি উঠি?"

খাওয়া দাওয়ার পরে রমেন আরও অবাক হোল। কমলা শুধু রান্নাবান্নায় পারদর্শীই নয় ও খুব ভাল গায়িকাও বটে, ছবিও আঁকতে পারে। কমলার গান শুনতে শুনতে আনন্দে রমেনের চোখ বুজে গেলো………

বুড়ীর চোখের গভীর কোটর থেকে কৌতুক ঝরে পড়ছে।

হঠাৎ সম্মানিতের অসহজ ভাবে কৃপণ-কণ্ঠে সে বলল, "আচ্ছা বাপু, তোমার কাছে আমিই আসছি।"

এলো যখন হাতে একটা ট্রে। ট্রেতে কফি তৈরীর সরঞ্জাম সাজানো। মেঝেতেই কার্পেটে বসে পড়লো। আগেই আমি বড় বাতিটা নিভিয়ে দিয়েছিলাম। শোবার খাটের পাশের গোল টেবিলের একধারে টেলিফোন রাখা, অন্যধারের টেবিল-বাতিটা জ্বলছিলো। তার হাল্কা গোলাপী ক্রীমের ঢাকাটা থেকে একটা স্তিমিত আলো ঘরটার নানা আসবাব, রং-কাটা-নক্সী কাগজের পলস্তারা আর নীলে-খয়েরীতে সাজানো কার্পেটে পড়ে যেন এক ধরনের লোকান্তরী আমেজ এনে দিয়েছে।

যতো ভাবি রোমান্টিকতা করবো না। সোজা সোজা খাড়া খাড়া বুলিতে কথা বলে যাবো, আমার নসীবে রোম্যান্টিক প্রাচীনতা ঝুলবেই ঝুলবে। যদি বুড়ী না হয়ে টুসটুসে ডালিমের কোয়ার মতো কোনো তেরেসা এসে দাঁড়াতো, নিভৃতে সাক্ষাৎ এক মিনিটে খতম হয়ে যেতো। এগিয়ে যেতাম এই কাহিনীর পাঁজরার হাত ধরে কেবল রিয়ালিজম্ থেকে রিয়ালিজমে। কিন্তু জীবন থেকে আকস্মিকতা আজও যায় নি, হোটেলে বুড়ী পরিচারিকা আজও আছে। বিশ-পঞ্চাশ লীরা খরচ করলে তারা সময় করে গল্প বলতে আসেও। আবার মনটিও এমন বদমেজাজীর তেরেসার পরিবর্তে এই জরতীকে জুড়ানোর লোভও পরিত্যাগ করতে নারাজ।

নিরুপায়। আমি একা; ঘর শূন্য। বাতি জ্বলছিলো টিমটিমে, ঘর সাজানো নানা চিত্রে-বিচিত্রে; রাত মধ্যাহ্ন কাবার। নিঃশব্দ এই দামী হোটেল, অন্ততঃ সভ্য হোটেল। এ সবটাই সত্য রিয়ালিজম্। মনের পরকালয় যদি কাজল থাকে, সূর্যকেও ছোটো দেখায়। রোম্যান্স কোনো একটা উপস্থিতি, বা অস্তিত্ব নয়; রোম্যান্স একটা পরিচয়। বস্তুতে আর মনেতে যে দেখাসাক্ষাৎ, বোঝা-পড়া, তার পরিচয়ের রং-ফেরি-কেই রোম্যান্স বলে। কোনো ফুলে কাঁটা থাকে, কোনো ফুলে আঠা। রং আর বৈচিত্র্য সব ফুলেই। কারুকে কাঁটায় মারে, কারুকে আঠায় ধরে। তাতে ফুলের পরিচয়ের তারতম্য হলেও ফুলত্বে তারা যমজ।

"কি গল্প করবে?" বুড়ী হেসে বলে? তুমি তো ভারতীয়; সাধু, না রাজা?"

"আমি সাধু-রাজা, রাজা-সাধু। তোমার এখানে কতো দিন?"

গল্প চললো। জেনে নিলাম এই বুড়ী নিপোলিনার যখন আঠারো বছর বয়েস তখন দক্ষিণ ইতালীর এক গ্রাম থেকে এক যুবক আর্কিটেক্ট (স্থপতি) একে নিয়ে আসে বিয়ের লোভে ভুলিয়ে। সে ছেড়ে দেবার পর অনেক দিন এর জীবিকা ছিলো মডেল হিসেবে কাজ করায়। তার পরই ও প্রথম ভালোবাসে একজন ডাক্তারী ছাত্রকে। ওরা বিয়ে করে। বেশ কিছুদিন সংসারও করে। সেইটুকু ছিলো সুখের দিন। যুদ্ধ বাধে ১৯১৪র যুদ্ধ। ওর স্বামী মারা যায়। আবার ও অসহায় হয়ে পড়ে। তখন ওর প্রথম মেয়ের জন্ম হয়। তার পর হোটেলের চাকরি নেয়। গণিকার দলে নাম না লিখেও এখানে ম্যানেজারের কাছে থেকে ওর সারা জীবনটাই কেটে গেছে। আটটি বাঁধাধরা মেয়ে আছে যাদের ও দরকার মতো ডেকে আনে। ও বিশেষ করে সাবধান থাকে যাতে মেয়েদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে, যাতে তারা "বাজারে"র না হয়, যাতে তাদের রুচি, ব্যবহার ভদ্র হয়, নৈলে ওদের হোটেলের সম্মান থাকে না। বেশীর ভাগই তাদের বিবাহিত স্বামী আছে, সংসার আছে। কিন্তু বড়ো দরিদ্র। কারুর স্বামী রুগ্ন, কারুর স্বামী জেলে, কারুর স্বামীর পুরো আয় নেই, সংসার বড়ো— তো জানো এতে কারুর বিশেষ ক্ষতি হয় না কারণ হোটেলে কেউ বেশী দিন থাকেও না, বা এসব মেয়ে বার বার এক লোকের কাছে আসেও না।"

"আর তোমার মেয়ে?"

"ঐ তো তেরেসা।"

"বিয়ে হয়েছে?"

"হ্যাঁ। ওর স্বামী পাথরের নক্সীর কাজ করে। কিন্তু বিয়ে ওদের অল্প কিছুদিন হয়েছে। তেরেসা বরাবরই এই কাজ করেছে।"

"তোমার মেয়ের এই জীবনে তুমি খুশী?"

"সত্যি কথা বলতে কি, দেখো শরীর নিয়ে খুঁৎ খুঁৎ করা আমাদের কোনো কালেই ছিলো না। আমরা জানি শরীরটা রোগে, ক্ষুধায় নষ্ট করে লাভ নেই। কিছু আয় দরকার। তার ফলে সংসারের অভাব দূর হলে বরং গরীবের বিবাহিত জীবন, বিশেষ করে শহরে, ভালোই থাকে। তোমরা ভারতীয়রা একটু একটু খুঁৎ খুঁৎ করো, দেখেছি আমি। আমার বেশ লাগে তোমাদের এই ভয়-ভয় ভাবটা। আর ভাবি ভারতীয় মহিলারা কতো ভাগ্যবতী। সমাজে ভালোভাবে থাকার দায়ে শরীরকে এমন করে খাটাতে হয় না।"

"কিন্তু তোমার সারা জীবনের আয় বাকী আছে কিছু? এখনও তো তোমায় কাজ করতে হয়।"

"কিন্তু বেশ লাগে আমার। এই হোটেলে সমস্ত যৌবনটা আমি বইয়ে দিয়েছি। খারাপ লাগবে কেন? সকলেই যতটা পারে আদর করে, সম্মান করে। আর আশ্চর্য হবে শুনলে এখনও আমায় লোকে ভালোবাসে।'

বুড়ীর গালভরা হাসি। চোখের চাহনি যেন কুড়ি বছরের ওপারে চলে গেলো।

আমিও খুশী হয়েই হাসলাম।

"ভালোবাসা তো মনের নেশা। বুড়ো হতে দেয় না জীবনকে। তাই ওটা দরকার। মানো?" বলে বুড়ী।

হ্যাঁ।

"হ্যাঁ। আমি অনেক জানি ভালোবাসার বেদান্ত। অনেক শুনেছি, শুনিয়েওছি।"

"তা তো বটেই!"

"অতো গম্ভীর হচ্ছো কেন? ভালোবাসো কারুকে বুঝি?"

আমি হাসি। "অনেক রাত হয়েছে। তোমায় তো ভোরবেলা উঠতে হবে।"

"ওমা তা জানো না বুঝি? বুড়ো বয়সে ঘুম থাকে না। জানো, যৌবনে কোনও যাত্রীর বিছানা থেকে উঠে যাবার পর কি ঘুমই পেতো। অথচ সকালেই আবার সব দরকার। তখন বড়ো কষ্টের দিন গেছে। তখনই তো রিওতো আমায় সাহায্য করতো।"

"রিওতো কে?"

বুড়ী হাসে। "কাল বলবো। ওকেই আমি ভালো-বাসি। ও-ও আমায় ভালোবাসে। তাই বাঁচতে ভালো লাগে। বুড়ো বয়সকে ভয় করে না। কাজে কষ্ট হয় না। ভালোবাসা থাকলে সব ঝড়জল সয় জানো। আমায় বুড়ী বলে অবহেলা কোরো না। রিওতো ভাবে, আমি এখনও নবযুবতী।"

দু'জনেই হাসি।

আমি বলি, "আমিও তোমায় ভালোবাসি।"

এইবার বুড়ী দাঁড়ায়।

"তোমার কাছে কিছু নেই? টাকা-পয়সা নয়। কিছু: যাতে মনে থাকে।"

সত্যি কিছু তো নেই।

বাক্সটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকি।

হঠাৎ মনে হয় একটা রূপোর ব্যাজ আছে "আত্মানং বিদ্ধি" লেখা। সূর্য্য আর পদ্মের নক্সী কাটা। সেটা ওর বুকে আটকে দিই।

সকালবেলা উঠেই স্নান সেরে চা-য়ের জন্য খানাঘরে গিয়ে দেখি কেউ তখনও নামে নি।

একটি বৃদ্ধ খানসামা, তদারক করছে টেবিলের গোছগাছ।

কাছে এসে বলে, "চা-য়ের সময় সাতটা।"

আমি বলি, "আমি এই ভোরের আলোয় কয়েকটা ছবি নেবো। যা আছে আমায় দাও আর একটু কফি।"

ট্রেতে করে ক্রীম, রোল্স্ আর কফি নিয়ে এলো।

বলে দিলাম বলে দুটো সিদ্ধ ডিমও আনলো।

বেরুবার সময়ে বলল, "কোন্ দিকে যাবেন? গাড়ী ডেকে দিই?"

আমি বলি, "না হেঁটে যাবো। ফোরামের দিকে যাবো, পথটা বলে দাও তো।"

ও বলে, "এই পথ ধরে চলে যান—ভিক্টর ইম্যানুয়েলের স্মৃতি আর ট্রোজান কলামের কাছে পৌঁছে যাবেন। ফোরামে বিকেলে গাড়ী যাবে।"

"বেশ!" ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি—

ও দোর অবধি এগিয়ে পথটা আমায় বুঝিয়ে দেয়।

পথের আলোয় ওর বুকে ব্যাজটা দেখতে পাই।

ও লক্ষ্য করে বলে, "আমার এক বান্ধবীর দেওয়া। বলে যে, কি যেন মন্ত্র লেখা আছে। আপনি জানেন কি ভাষা?"

বুড়োর চোখে চেয়ে বলি, "বোঝো না তো পরেছে কেন?"

বুড়ো চোখ পাকিয়ে বলে, "সে কি কথা! সে বিশ্বাস করে দিয়েছে আমার ভালো হবে বলে। আমি ফেলে দেবো? কেউ না কেউ এ ভাষা-জানা লোক আসবেই। জিজ্ঞাসা করবো।"

আমি এগিয়ে যাই পিয়াৎসা এসেড্রার দিকে।

পথে মিউনিসিপ্যালিটির ধাঙড়রা কাজ করছে। কফির দোকান খুলছে। সাইকেলে করে খবরের কাগজওয়ালা চীৎকার করে ফেরি করছে। ডাষ্টবিনেরা ধারে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কি সব জিনিস বেছে বেছে ব্যাগে ভরছে।

পিয়াৎসা এসেড্রা মস্ত জায়গা। অনেকটা খোলা। বৃত্তাকারে বড় বড় বাড়ী উঠেছে দু' ধারে। একবারে পুরোনো স্নানাগারের ধ্বংসাবশেষ। এখন সেটার খানিকটা চার্চ, খানিকটা মুজিয়ম। অন্য ধারটা খোলা-মেলা। মাঝখানটায় খানিকটা বাগান মতো। দূরে দেখা যায় পিয়াৎসা কিন্কোয়েকেন্তো আর তার গৌরব টার্মিনাল ষ্টেশন।

সমৃদ্ধ ব্যবসায় কেন্দ্র ছিলো। এটা মাটির তলায় চাপা পড়েছিলো। হঠাৎ আবিষ্কার করা হয়। যথাসাধ্য চেষ্টায় অবিকৃত ভাবেই উদ্ধারের চেষ্টায় প্রত্নতাত্ত্বিকরা পরিশ্রম করেছিলেন। কিন্তু রোমের পতনের পর এর সুন্দর সুন্দর পাথর আর মর্ম্মরমূর্তির লোভ অনেকেই তুচ্ছ করতে পারে নি। খুব অপরিচ্ছন্ন ও ভগ্ন অবস্থায় ফোর‍্যাম আবিষ্কৃত হয়।

ত্রজানস্তম্ভের ধারেই ভিক্তর ইম্যাহুয়েলের বিরাট স্মৃতিসৌধ। সারা রোমে আজ আর এমন সুপরিকল্পিত ও বিস্ময়কর স্মৃতিসৌধ নেই। পিয়াৎসা ভেনিৎসিয়া দিয়েই কাল রাতে ফিরেছি। এই ভিক্তর ইম্যাহুয়েলের স্মৃতিসৌধ পিয়াৎসা ভেনিৎসিয়ারই একটা ধারে সারা রোমের ভেতর থেকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

ঘুরে ঘুরে ত্রজান ফোর‍্যাম দেখছি। সাততালা উঁচু বিরাট সৌধের দু'তালা এখনও আছে। এটা ছিলো ত্রজানের সময়কার অভিজাত বাজার। ত্রজানের পরে আদ্রিয়ানও এই বাজারে অনেক অংশ যোজনা করেছেন। এর ধ্বংসের জন্য প্রধানতঃ দায়ী সেকালের খ্রীষ্টান পাদ্রীরা। রোমানরা খ্রীষ্টানদের ওপর যা অত্যাচার করেছিলো তার ইতিহাস যীশুর রক্তে লেখা হয়ে আছে। কিন্তু রোমান পাদ্রীরা যে অত্যাচার রোমের ওপর করেছে তার ইতিহাস কে লিখবে? একদিন লেখা হবে। কারণ সে অত্যাচারও বড়ো কম নয়। পাদ্রী-সম্রাটদের বিলাস-ভবনের পাথরের যোগান দিতে অনেক রোমান মন্দির অনেক ফোরামের শোভা নষ্ট হয়েছে।

খ্রীষ্টান অভ্যুদয়ের ইতিহাস বড় বিচিত্র। সীজরের হত্যার চল্লিশ বছর পরে যীশুর জন্ম হয়। ৩০ থেকে ৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পূর্ণ যুবক যীশুখ্রীষ্টকে যখন ক্রুশে হত্যা করা হয় রোমের সম্রাট তাইবেরিয়াস তখন পারিবারিক অশান্তির চরম সীমায়। কাপ্রির প্রাসাদে নানা ষড়যন্ত্রের মধ্যে তাঁর সময় কাটছে। তার পর ক্যালিগুলা ক্লডিয়াস, নীরো—একের পর আর জন অত্যাচারে অত্যাচারে ইহুদী আর খ্রীষ্টানদের অতিষ্ঠ করে তুলেছে। টাইটাস্ জেরুজালেমে আগুন লাগিয়ে জেরুজালেম ধ্বংস করেছে। সেন্টপল্, সেন্টপিটরকে হত্যা করা হয়েছে। এতো পাপ—যেন সইতে না পেরে বিসুবিয়াস্ ক্ষেপে উঠেছে; হারকুলেনিয়াম আর পম্পির মতো সমৃদ্ধ নগরী ছাইচাপা হয়ে রইলো। রোমের পতন আরম্ভ হোলো। ২৮৫ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুই ভাগে রোম সাম্রাজ্য দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেলো। ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টধর্ম্ম রাজধর্ম্ম বলে স্বীকৃত হোলো।

কতো রক্তক্ষয়, কতো অত্যাচার ৩০০ বছর ধরে চলেছে ধর্ম্মের নামে। তার পর রোমে যখন পাদ্রীর সভ্যতা সুরু হোলো, সঙ্গে সঙ্গে পাদ্রী-অসভ্যতাও মাথা-চাড়া দিলো। এত দিনের অত্যাচারের ফলে বিস্ফোরণের আরম্ভ হোলো।

রোমের পতন হোলো খুব দ্রুত। এ পতন না হলে পাদ্রী সভ্যতা মাথা তুলবে কি করে? ১৮০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে পতন সুরু বলছেন গিবন। ২৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব্ব য়োরোপের কোণে গথেরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এশিয়া মাইনর দিয়ে তারা এফিসাসের ভুবনবিখ্যাত ডায়ানার সমৃদ্ধ মন্দির লুঠ করলো। মন্দিরে মন্দিরে সমৃদ্ধির সঞ্চয় দেবতার নামে—সর্ব্বত্র। আর সে সমৃদ্ধ মন্দিরের, প্রাচীরের বাইরে কাঙাল হাতে জনতা ভিক্ষা চেয়েছে, সেকালেও, একালেও। মাঝে মাঝে কাঙালরা যখন শতাব্দীর সাহস, শতাব্দীর ক্ষুধায় জেলে দপদপিয়ে উঠেছে তখনই এই সব গথ্, ভাণ্ডালরা জেগে ধনী দেবতার স্বর্গ ভণ্ডুল করেছে। তারা সেই সভ্যতাকে স্বীকার করে নি, যে সভ্যতা তাদের অনশনে, উলঙ্গতায়, কুশ্রীতায় ভরে দিয়েছে; সেই ধর্ম দেবতাকে স্বীকার করে নি, যা শক্তি, অহঙ্কার, বিলাস-ব্যভিচারের হিমালয় থেকে তাদের ভিক্ষার মুষ্টি ছুঁড়ে দিয়েছে। তাই রোম সভ্যতার অঙ্গ-চ্ছেদে আর পাদ্রী-সভ্যতার জন্মের মাঝামাঝি সময়ে একটি আলোড়ন এলো অবহেলিত জনতার মধ্য দিয়ে। তারা গ্রাস করতে থাকলো, ধ্বংস করতে থাকলো একের পর এক। শতাব্দীর অত্যাচারকে তারা শতাব্দীর বীভৎসতায় মুছে দিলো। ২৫৯-এ এর প্রথম কোপ পড়লো এশিয়া মাইনরে ডায়ানার মন্দিরে। ২৭০-এ দেসিয়ার পতন হোলো। কনষ্টান্টিনোপলে কনষ্টানটাইন নতুন করে রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী করে বাজীমাৎ করার চেষ্টা করে—অবশেষে খ্রীষ্টধর্ম্মকে রাজধর্ম্ম স্বীকার করে শেষ পরাজয় বরণ করলেন বিমথিত জনতার কাছে। ৩৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সাম্রাজ্য ভেঙ্গে তিন টুকরো হোলো। ৩৫০-এ এলো হুনেরা—এশিয়ার প্রচণ্ড শক্তি ছুটে এলো ঘোড়ার পিঠে। তীব্র বেগ, দুর্জ্জয় সাহস, তড়িৎ-চকিত আক্রমণ; বর্ব্বর আক্রোশে দুর্মদ—এই আরণ্য-শক্তি, এই মরুভূমির দাপট, ঝাঁপিয়ে পড়েছে যৌনব্যাধি-পীড়িত, ধাপ্পা আর জুয়াচুরির জঞ্জালে নিগৃহীত, রোমের সভ্যতার বিষে পাংশুল, পদাতিক বাহিনীর উপর। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো প্যাক্স রোমানা। সে ঝড়ের যৌবন সহ্য করার মতো দেহলাবণ্য, জীবশক্তি ছিলো না বৃদ্ধা রোমের। গথেদের নেতা এলারিক এগিয়ে

আসে আল্পস্ বেয়ে ; ভিসিগথেরা বলকানের পাহাড় বেয়ে নামতে থাকে। হুনেরা ভল্গা আর কৃষ্ণসাগরের ধার বেয়ে মশাল নিয়ে ছোটে। পশ্চিমে গল্ প্রদেশে ফ্রাঙ্কোরা লুঠতরাজ সুরু করে। রোমের নেকড়ের চার-পাশে বুনো কুকুরের পাল লেগেছে। ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে তার জরাজীর্ণ মাংস। ৪০৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন থেকে রোম্যানরা বিদায় নিলো, গল্ বাঁচাবার ক্ষীণ আশা তাদের। ৪১০ ভিসিগথেরা আলরিকের নেতৃত্বে রোম জয় করে রোমের বুকে আগুন জালিয়ে দেয়। বন্যার মতো স্পেনে গিয়ে ভাণ্ডালদের তারা জয় করে নেয়। এটিলা ৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তারা হুনেদের নিয়ে নামে রোমে। ৪৫১-য় গলে এটিলা যদিও হেরে যান, রোম বাঁচে না। ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে আবার রোমে লুঠ, আগুন, হত্যা, হাহাকার। এবার ভাণ্ডালেরা ৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দে গথেদের বিরাট নেতা—জার্মাণ থিওডোরিক ইটালি জয় করে নিলো। খানিকটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে না ফেলতে এলো মড়ক, এলো প্লেগ, ৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে, এশিয়ার প্রান্ত থেকে প্লেগ এলো। য়োরোপের নাড়ীতে নাড়ীতে সে প্লেগ এসে ঢুকলো। গথেরা ইটালি ছেড়ে পালালো। মক্কায় ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ জন্ম নিলেন, যে মুসলমানদের হাতে রোমের শেষ নিগ্রহের ভার ছিলো, তার পত্তন হোলো।

৬০০ খ্রীষ্টাব্দে রোমের অবস্থা চরমে। গ্রেগরি তখন পোপ। পোপকেই বেশী মান্য করে সকলে। সামাজিক ক্লীবত্ব যখন মানুষের ইহলোকের সমস্ত আশা-ভরসা পুড়িয়ে খাক করেছে, তখনই পরলোকের হুরী, স্বর্গ, শান্তি আর সুধার লোভে মন করে আঁকু-পাঁকু। সমাজ-মনের এই গল্‌গলে অবস্থাই ধর্মালোচকদের ছুরি চালাবার বিশিষ্ট অবসর। পোপের তখন পারা চড়ছে। খ্রীষ্টধর্ম্ম ছড়াচ্ছে। লোকে ভাবছে প্লেগ ছড়ানোর চেয়ে ভালো। মহম্মদের মৃত্যুর নয় বছরের মধ্যে মিশর হয়ে গেলো মুসলমান। কর্থেজে মুসলমান এসে গেলো ৬৯২তে। ৭১১-র মধ্যে স্পেন, এশিয়া মাইনর, সার্দ্দিনিয়া সব হয়ে গেলো মুসলমান। এবার সূচনা হলো ধর্ম্মের লড়াইয়ের। মুসলমান আর খ্রীষ্টান, যীশুখ্রীষ্টের শিষ্য আর মহম্মদের শিষ্য। যদিও নিজে মহম্মদ যীশুখ্রীষ্টকে নমস্ত বলে স্বীকার করে গেছেন! শার্লমেন তখন খ্রীষ্টানদের বড়ো রাজা, ফ্রাংক, পোপ তাঁকে সম্রাট বলে অভিনন্দিত করলেন নোমেন্তানোর সেতুতে,রোমে। ৮০০ খ্রীষ্টাব্দ এসে গেলো। তার ৩০০ বছরের মধ্যেই ক্রুজেড আরম্ভ হয়ে গেলো। রোমের তখন কোনো চিহ্নই নেই। পোপই সর্ব্বেসর্ব্বা।

এই বিচিত্র ক্ষয়ের ইতিহাসের মধ্যে একমাত্র লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, ৮০০ বছরের পতন-অভ্যুদয়ের বন্ধুর পন্থার রথঘর্ঘর ছাপিয়ে খ্রীষ্টানরা মাথা নাড়া দিয়ে উঠেছে। যে রোমে পিটরকে, পলকে হত্যা করা হয়েছে সেই রোমে পাদ্রী-সাম্রাজ্যের অচলগড় সেন্ট পিটরের গির্জ্জা স্থাপিত হয়েছে, ভ্যাতিকানের প্রাসাদে মহর্ষি পোপের হাতের কব্জী পর্য্যন্ত বিলাসের সুরুয়ায় ডুবেছে, সেন্ট পলের সমাধিতে শিশিভরা জল বিক্রী হচ্ছে 'পাদোদক' বলে, এবং আসমুদ্র-আল্‌প্‌সের জনসাধারণ তা পরম ভক্তিভরে পান করছে।

মহর্ষি পোপের তপোবন ভ্যাতিকানের অনেক মাল পুরাকালের রোমক প্রাসাদ ও মন্দিরের অবদান। শত শত মন্দির ধ্বংস করে তার পাথরে গির্জ্জা নির্ম্মাণ করায় খ্রীষ্টের সেবকদের হিংসা ও পিপাসা চরিতার্থ হয়েছিলো। আমি ভারতীয়, আমি হিন্দু। মুসলমানের ইতিহাস ও কার্যকলাপ পড়তে পড়তে যখন পড়ি গির্জ্জা ও মন্দির ধ্বংস করায় মুসলমান ওস্তাদী দেখিয়ে গেছে বহুতর এবং যখন ঐ জাতীয় ওস্তাদীর ব্যাখ্যায় য়োরোপীয় ঐতি-হাসিক বলেন, 'Oriental Barbarism', 'এশিয়া-সুলভ-বর্ব্বরতা' তখন ভাবি রোমের পথে পথে, গায়ে গায়ে, গির্জ্জায় গির্জ্জায় এতো যে মর্ম্মরের আর্ত্তনাদ, এরা কোন্ ভাষায় নিজেদের কাহিনী গাইছে।

ত্রজানস্তম্ভের পাশের চবুতরায় বসে ভাবছি এই ত্রজান ফোর‍্যাম, এই ত্রজান বাজার, এইখানে ছিলো মিনার্ভার মন্দির, সীজরের বড়ো সাধের ভীনাসের মন্দির, সীজরের নামে গড়া তার নিজের মন্দির—প্রতিটি পাথর খুলে নিয়ে গির্জ্জা, প্রাসাদ বানিয়েছেন, পাদ্রী-সন্ন্যাসীরা, যাঁরা সর্ব্বত্যাগী, এবং অহিংস যীশুর ধ্বজাধারী।

বেশী দেরী করা চলবে না। ম্যুজিয়ম খুলেছে এতক্ষণে। ম্যুজিয়মে যেতে হবে। থারমী ম্যুজিয়ম—আমার স্বপ্ন দেখা থারমী ম্যুজিয়ম।

থারমী ম্যুজিয়মের আয়ু আজকের নয়। রোমের ধ্বংস এমন সম্পূর্ণ হয়েছিলো যে ত্রাজান স্মৃতিস্তম্ভ থেকে ক্যাপিটল, কুইরিনালে সমস্ত মাটিতে ঢেকে গিয়েছিলো, ঘাস জন্মাতো, ছাগল ভেড়া চরতো। যখন প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ থেকে খনন সুরু হয় তখন নানা আশ্চর্য উঁকি মারতে থাকে। গথেরা, ভ্যাণ্ডালেরা কিছু আর আস্ত রাখে নি, তার পর পাদ্রী মহাশয়রা। তবু যা ছিলো তাই কুড়িয়ে রোমের জাতীয় ম্যুজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হলো এই "থারমী" ; আর পরে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে লুডোভিসি-র প্রসিদ্ধ সংগ্রহের যোজনা হলো যখন এই ম্যুজিয়মে তখন এর

সম্পদ বেড়ে গেলো শতগুণ। ম্যুজিয়ম বাড়ীটা গিকেলেঞ্জোর নক্সার উপরে তৈরি। এ ম্যুজিয়ামের বাড়ীটাই দেখবার মতো। বিরাট বিরাট হলে চমৎকার করে সাজানো সব রকমের দ্রষ্টব্য। এজন্য দপ্তর আছে পণ্ডিতে ভরা। সকলেই সর্ব্বদা সাহায্যের জন্য উদ্‌গ্রীব।

যদি রোজ এসে চার-পাঁচ ঘণ্টা করে দেখতাম, আর এই ভাবে এক মাস দেখতাম, থারমী ম্যুজিয়মের রসে ঘাটতি পড়তো না। এক একটা মূর্ত্তি ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেখার মতো। সত্যি এ কথা যে এ শিল্পের ধারায় মাংস আর প্রতিকরণকে বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, তবু এও সত্য যে পাথরের কঠোরতাকে বাটালি মেরে সরিয়ে তার গা থেকে পৃথিবীর দুঃখ, শোক, প্রেম, বিলাপ সংগীত, হিংসা, কোমলতা প্রভৃতি রসসৃষ্টি করা এক দুরূহ সাধন। এর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ে মাথা সম্ভ্রমে নত হয়, মানুষ হবার প্রকাণ্ড গর্ব্ব আত্মবোধকে জাগিয়ে তোলে। মনে হয় শ্রদ্ধায়, সাধনায় মানুষই এমনটা করতে পারে।

গল্প আছে বাঘ আর মানুষ ছবি দেখছিলো। ছবিতে আছে বাঘের পিঠে মানুষ বসে। মানুষ মুরুব্বিয়ানা দেখিয়ে বাঘকে বলল, "দেখছো, বাঘ হলে হবে কি? মানুষ বড়ো। বাঘের ঘাড়ে মানুষকে চড়িয়েছে।"

বেচারী বাঘ সামলে নিয়ে ঢোঁক গিলে প্রশ্ন করে, "কিন্তু ছবিটা আঁকা কার দাদা?"

তেরিয়া হয়ে মানুষ বলে, "কেন? মানুষ! মানুষ নৈলে কি বাঘে আঁকবে ছবি?"

এবার বাঘ গোঁফ চুমড়ে বলে, "তাই বলো! মানুষে একেছে! দেখতে যদি বাঘ আঁকতো, তা হলে দেখতে মানুষের নাকে দড়ি পরিয়ে বাঘই তাকে চালাচ্ছে।"

মানুষটি চোপে মেরেছে বাঘ একটা কমুনিষ্ট থাবড়া। কিন্তু টোরি তাতে ঘাবড়ায় না। মানুষ বলে, "তাই নাকি? হয়তো বাঘ মানুষ চালাতে পারতো। ভয়ে কি না হয়! কিন্তু ভয় দেখিয়ে মানুষ চালানো, আর ছবি আঁকা এক জিনিস নয়। ভালোবাসা আর মানবতা না হলে সব হবে, কেবল চারুশিল্পটি জন্ম নেবে না। ওতেই বাঘ, পশু আর মানুষ, মানুষ। সত্যিই তাই।

মানুষে আর পশুতে তফাৎ এই শিল্প সাধনায়, রুচির প্রশ্নে। রুচির অভাবে মানুষও পশু।

আর এই সাধনার দামে মানুষ জীবন, যৌবন, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সব পুড়িয়েছে।

একে একে দেখছি ঘুরে ঘুরে। একা একা দেখছি। তবু চমৎকার লাগছে। থার্মিক-স্নানাগার ছিলো, তারই কঙ্কালে গড়া এই ম্যুজিয়ম। হলের পর হল, শ্রেণীর পর শ্রেণী, ঐতিহাসিক সম্বদ্ধতার সঙ্গে সাজানো। এক নম্বর হলের আর্টেমিস, আর নাইরোবীওস দেখে যেন চোখ ফেরানো যায় না। Ludovisi-র সংগ্রহ জমা আছে Cloister of the Certosa Hall-এ। প্রসিদ্ধ এখেনার মর্ম্মর মূর্ত্তি, স্ত্রীহত্যায় লিপ্ত গল্, Orestes and Electra যতো দেখা যায় নতুন বলে বোধ হয়। "আঁখি না জুড়ায়।" প্রসিদ্ধ মর্ম্মর মূর্ত্তির মধ্যে ডিস্‌কাস-ধারী রোম্যান, ভীনাস অব সাইরীণ, মেডুসা ও নেকড়ে, মার্স—এই মূর্ত্তিগুলো আজও মনে গেঁথে আছে। এ ছাড়া ছবি আছে দেয়ালের গায়ে আঁকা। ম্যুজিয়মের ভিতরে Antiquarium আছে, মুদ্রা-সংগ্রহের জন্য বিশেষ একটা অংশ আছে, আর আছে—সাঁস্তা মারি দেগলী আঞ্জেলীর গির্জ্জা। একদিন স্নানান্তে বাস পরিবর্ত্তনের কক্ষ ছিলো: আজ সেখানে ধূপ পুড়ছে, স্তবগান হচ্ছে। মিকেলে জেলোর হাতের স্পর্শে বিলাসাগার শুচিতার ও সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি হয়ে উঠেছে। ব্যাপটিজম্ অব্ ক্রাইষ্ট আর মার্টার্ডম্ অব সেণ্ট সিবাষ্টিয়ানের ফ্রেস্কো দেখার জন্য বহুদূর থেকে পরিশ্রান্ত হয়ে আসাও আনন্দের, শান্তির।

কিন্তু তাড়া আছে। হোটেলে ফিরে আবার বার হতে হবে গাড়ীতে রোম দেখতে। ম্যাকগ্রিগর এতোক্ষণে হয়ত পুলিসে খবর পাঠিয়েছে। বেশী দূরে নয় হোটেল। পথে ইটালিয়ন মার্ব্বেলের দোকান অনেকগুলো। টালির কাজ ইটালিয়ানরা চমৎকার করে। দু' একটা দোকানে গিয়ে এদের মুন্সিয়ানা দেখার চেষ্টা করলাম। বিশেষ যে কিছু বুঝলাম তা মনে হোলো না। কিন্তু এদের কাজের মধ্যে সংযম আর শৃঙ্খলা দেখে খুব ভালো লাগলো।

ক্রমশঃ

রবীন্দ্র-কবিতায় নারী

শ্রীসাগরিকা শ্যাম

নারী রহস্যময়ী। যুগে যুগে এই নারীকে নিয়ে রচিত হয়েছে অনেক ইতিহাস, সৃষ্ট হয়েছে অনেক সাহিত্য। নারী হয়েছে প্রেরণার উৎস। সংস্কৃত কবিরা প্রকৃতি ও নারীকে নিয়ে অনেক অশ্রু-মধুর কাহিনী করেছেন রচনা। সে যুগে কালিদাস দিয়েছেন নারীকে পরম সম্মানের অর্ঘ্য, শুধু প্রিয়ারূপে নয়, গৃহিণী, সচিব, সখী ও শিষ্যারূপেই নারীকে তিনি দেখতে চেয়েছেন। বৈষ্ণব কবিরাও এক রাধার মধ্যে দিয়ে নারী মনের অপূর্ব্ব মাধুরী তুলেছেন ফুটিয়ে।

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে চোখ ফিরিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর পাতায় চোখ বুলালেও দেখতে পাই, সাহিত্যে অন্যতম অংশ গ্রহণ করেছেন নারী। ঔপন্যাসিকদের প্রসঙ্গ উত্থাপন না করে শুধু কবিদের কাব্যেই দেখি নারী বৈচিত্র্যময়ী রূপে হয়েছেন প্রকাশিত। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রঙ্গলাল এঁরা নারীর বিভিন্ন রূপকে সু-অঙ্কিত করে গেছেন। প্রেমিকা নারীর তেজোদীপ্ত মূর্ত্তির আভাসও দিয়ে গেছেন এঁরা। বিহারীলালের "সারদা-মঙ্গল কাব্যে" দেবী ও মানবীর যে সৌম্য সমন্বয় অনুভূত হয় নারী-মনের সেই অভিনব রূপই পরিপূর্ণ মূর্ত হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের কবিতায়। বিহারীলালের কবিতার যোগীরা ধ্যানের আসনে বসে যে নারী-মনকে উপলব্ধি করতে চান, রবীন্দ্রনাথের দেবযানী সেই মনটিকেই বিভাসিত করেছেন নিম্নোক্ত উক্তিটির মাধ্যমে :

"রমণীর মন—সহস্র বর্ষেরি সখা, সাধনার ধন।"

আধুনিক যুগের কাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে নারীর স্থান আলোচনা করতে গেলে পুরোভাগেই রবীন্দ্রকাব্য জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রকাব্যে নারীর স্থান আলোচনা করা ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয়। তাই বিষয়বস্তুকে সীমিত করে এনে রবীন্দ্রনাথের মাত্র কয়েকটি কবিতার ভাবধারাকেই অবলম্বন করছি। কবি-দৃষ্টি নারীকে করে বৈচিত্র্যময়ী। নারীর সত্তা থেকে নারীর সৌন্দর্য্যের দাবিই সেখানে বেশী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নারীর সৌন্দর্য্যকে করেছেন মহিমান্বিত—সত্তাকে করেছেন প্রখর। মর্য্যাদার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূষণে তিনি নারীকে করেছেন শোভিত। দরদীর মনো-ভঙ্গিতে তিনি নারীর অন্তর্লোকের ছায়া পেয়েছেন দেখতে। তাঁর স্পর্শকাতর মন অনুভব করেছে নারীর হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রীর বেদনা। তাই 'মুক্তি' কবিতায় দেখি ব্যর্থ নারী-মনের ব্যথাময় আত্মপ্রকাশ। একেবারে মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এসে তার যান্ত্রিক জীবন চরম বিরামের আশ্বাস পেয়েছে। মৃত্যুর প্রেম নিবিড় আলিঙ্গনে আত্ম-সমর্পণ করার জন্যই তার আকুতি। দায়-দায়িত্ব ভরা জীবনের সমাপ্তি বলেই মৃত্যু তার কাছে সুন্দর-মধুর। এ ছোট্ট কবিতায় মরমী কবি বাংলাদেশের সাধারণ নারী-জীবনের বেদনাময় সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। "দশের ইচ্ছা বোঝাই করা" তার জীবন, নিজস্ব ইচ্ছার স্থান নেই সেখানে। নিজের সম্পর্কে কিছু ভাবনা চিন্তা করার অবকাশও নেই তার। এজন্য মৃত্যুর সান্নিধ্যে এসে নিজের প্রতি হয়েছে সে উৎসুক। এতদিন "রাঁধার পরে খাওয়া আবার খাওয়ার পরে রাঁধা"—এই তো ছিল তার জীবন। ব্যক্তিত্বহীন জীবনে লক্ষ্মী মেয়ে বলে আদর পাওয়াই ছিল তার কাছে পরম প্রাপ্তি। তার আনমনা মনে বসন্তের হাওয়া হয়তো দিয়েছিল দোলা কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য। কিন্তু আজ মরণ এসেছে তাকে বরণ করে নিয়ে যেতে—তাই পুলকের আবেশে আচ্ছন্ন সে। এতদিনে বুঝতে পেরেছে সে, প্রকৃতির বুকে নারীর মাধুর্য্য :

"আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যা তারা ওঠা ;
মিথ্যা হত কাননে ফুল ফোটা।"

সেজন্য আজ এই মুমূর্ষু নারীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে যে মৃত্যু—সেই তার কাছে 'অনন্ত ভিখারী' সেই জাগিয়েছে তার মনে চেতনার সাড়া। তাই মৃত্যুই তার কাছে মুক্তি। আবার নারী মনের এই চেতনার পরিপূর্ণ রূপায়ণ দেখতে পাই 'সবলা' কবিতায়। "দুর্ব্বল লজ্জাকে" নারী এখানে আর তার ভূষণ করে রাখছে না। সে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। নারী-মনের ও তেজস্বিতার অপূর্ব্ব সমন্বয় করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর সবলা কবিতায়। মূক নারী যে দিন কাটিয়ে যাচ্ছিল অনার মনে—সে হয়ে উঠেছে মুখর। 'রুদ্রবীণা' বেজে উঠেছে তার অন্তরে। স্বকীয়ত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যে

'বাক্যহীনা' থাকতে সে আর নয় সম্মত। সার্থকতার পথ নির্বাচিত করতে পারবে সে নিজেই। মুক্তি কবিতার নারী-মনের গোপন গভীর সুধা সিঞ্চনেই শুধু তার প্রেমের প্রকাশ হবে না—তেজস্বিতার দীপ্তি তাকে করবে আলোকিত। এই অভিনবত্বটুকু দিয়েই সে তার দয়িতকে করবে নন্দিত। এতেই তার প্রেমিক পাবে যোগ্য সম্মান। মুক্তি কবিতায় দেখি মুমূর্ষু নারীর অবশ মনে জেগেছে চেতনার সাড়া। কিন্তু এই কবিতাটিতে কবি নারীর স্বাভাবিক সচেতন মনে জাগিয়ে দিয়েছেন তার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব বোধকে। ব্যক্তিত্বের দাবিতে সে সবলা। কিন্তু নারীকে আরও মহিমময়ী করে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রসঙ্গক্রমে এখানে 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতাটির একটুখানি ইঙ্গিত না এনে পারছি না। নারীর যে মোহময়ী রূপ সাধারণের দৃষ্টিতে বিশেষ হয়ে ওঠে—সেই দৃষ্টিটুকুকেই অন্ধ করে দিতে চাইছেন কবি।

"এ আঁখি আমার শরীরে তো নাই, ফুটেছে মর্ম্মতলে—
নির্ব্বাণহীন অঙ্গার সম নিশিদিন শুধু জ্বলে।"

কিন্তু "বাসনা সঘন এ কালো নয়ন"কে অন্ধ করে দেওয়া তো আত্মহত্যার মতই জীবনের কাছে চরম পরাজয় স্বীকার করা। তাই তাঁর মনে প্রশ্ন উঠেছে—"বিশ্ব বিলোপ বিমল আঁধার চিরকাল রবে সে কি।" কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কবিচিত্তের দুর্ব্বলতা নত হলো নারীর মহিমার কাছে। নারী শক্তির পরম বিকাশ উপলব্ধি করতে চাইলেন তিনি—

"তোমাতে হেরিব আমার দেবতা, হেরিব আমার হরি—
তোমার আলোকে জাগিয়া রহিব অনন্ত বিভাবরী।"

নারীর প্রতি শ্রেষ্ঠতম মর্য্যাদা আরোপ করেছেন রবীন্দ্রনাথ 'বিজয়িনী' কবিতায়। বিশ্বকবির দৃষ্টিভঙ্গি এখানে আরও উদার। বসন্তসখা মদনের যে ফুলশর সৃষ্টির আদিকাল থেকে পুরুষ ও প্রকৃতির বুকে আছে ছড়িয়ে—সে মোহময় বিহ্বলতাকেও জয় করেছে নারীর স্নিগ্ধ সৌষম্য। স্নানরতা এক অপূর্ব্ব সুন্দরীর সৌন্দর্য্যের অনবদ্য বর্ণনা করেছেন কবি এই কবিতায়—পড়তে পড়তে মন আবেশে হয়ে যায় মুগ্ধ,

"জল প্রান্তে ক্ষুব্ধ ক্ষুদ্র কম্পন রাখিয়া
সজল চরণ চিহ্ন আঁকিয়া আঁকিয়া
সোপানে সোপানে, তীরে উঠিলা রূপসী
স্রস্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি গেল খসি।"

তার পর সুন্দরীর হৃদয়ে প্রকৃতির দাবি জাগিয়ে দেবার জন্য অতনুদেব হলেন উদ্যত। কিন্তু অন্তর্লোকের পবিত্রতার জ্যোতি রমণীর দৈহিক লাবণ্যকে ছাপিয়ে উঠল। মদনদেব অসীম বিস্ময়ে নিমেষহীন দৃষ্টিতে রইলেন চেয়ে। নারীর শান্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে ফুটে উঠেছে তার প্রখর সত্তার আভাস—তার তেজোদীপ্ত ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। আদিম প্রবৃত্তিও তার কাছে মানল হার। তাই—

"...জানু পাতি বসি, নির্ব্বাক বিস্ময় ভরে,
নত শিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশর ভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা উপচার
তূণ শূন্য করি। নিরস্ত্র মদন পানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে॥"

এই কবিতায় অসীম সম্মানে নারী হয়েছেন ভূষিত। যে অপূর্ব্ব ভাব কবি এখানে প্রকাশ করেছেন তার প্রতি শ্রদ্ধা না জানিয়ে আমরা পারি না। এ ধরনের কবিতায় নারীকে কবি নিয়ে গেছেন অতীন্দ্রিয় লোকে। নারী এখানে সাধারণের ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে। কিন্তু নারীকে অলৌকিক, সৃষ্টিছাড়া করলে সৃষ্টিই তো অচল। তাই রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার মধ্যে যে সুষ্ঠু নারী-চরিত্র বিকশিত দেখি, নারীর সেই রূপটিকেই লৌকিক এবং সার্থক বলে মনে হয়। চিত্রাঙ্গদা কাব্যে অর্জ্জুনের প্রতি চিত্রাঙ্গদার শেষ উক্তিটি আলোচনা করলে দেখতে পাই; নারী সাধারণের সীমার মধ্যে থেকেও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। প্রখর ব্যক্তিত্বময়ী চিত্রাঙ্গদা যেখানে বলছে—"দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী" সেখানেই নারী মনের পরিপূর্ণ রূপায়ণ। নারীকে পূজার আসনে বসিয়ে পুষ্পাঞ্জলি দিলেও চরম সম্মান দেখানো হবে না—আবার অবহেলায় ঘরের কোণে পুষে তুচ্ছ করলেও চলবে না, যদি তাকে প্রিয়তমের ধর্ম্ম, মর্ম্ম ও কর্ম্মের সহচরী করা যায়—তবেই পুরুষ পাবে নারীর প্রকৃত পরিচয়। এতেই নারী হবে মর্য্যাদাময়ী।

বিদ্যাসাগর পরিচয়—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭। মূল্য দুই টাকা।

গ্রন্থ-পরিচিতি তার নামকরণের মধ্যেই পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহা বিদ্যাসাগরের জীবনী নহে। সমাজ-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তাঁহার বৈপ্লবিক আন্দোলন, কর্মবহুল জীবনের বিবিধ দিগদর্শন, অনন্যসাধারণ প্রতিভার একটি সম্পূর্ণ ছবি ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে। পাঁচটি অধ্যায়ে এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ। আবির্ভাব ও সমসাময়িক বঙ্গ, শিক্ষা সংস্কারে বিদ্যাসাগর, শিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগর, সাহিত্য-সাধনায় বিদ্যাসাগর এবং সমাজহিতে বিদ্যাসাগর। এই অধ্যায়গুলির মাধ্যমে কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচদিনের বক্তৃতায় গ্রন্থকার বিদ্যাসাগরের সমগ্র জীবনের আলোচনা করিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্ম্ম-জীবন সম্বন্ধে অনেকেই বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তথাপি বাগল মহাশয়ের এই গ্রন্থের প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যায় না। কারণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্ম্ম-জীবন একই খাতে বহিয়া যায় নাই। যে শতাব্দীতে ঈশ্বরচন্দ্রের আবির্ভাব—সেই শতাব্দীর প্রয়োজনেই, কি সমাজ-জীবনে, কি শিক্ষার প্রয়োজনে, কি ধর্ম্মের প্রয়োজনে, কি জাতি-সংরক্ষণে বিবিধ কর্ম্মের মধ্যে তাঁহাকে আত্মনিয়োগ করাইতে বাধ্য করা হইয়াছিল। তিনি ছিলেন বিপ্লবী। এই বিপ্লবী-মনই তাঁহার জীবন-চরিত্রের বিশিষ্ট দিক। তাঁহার এই চারিত্রিক দৃঢ়তার গুণেই বহুবিধ কুসংস্কারের পঙ্কছেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তিনি। বিপরীতগামী জাতির মনন-ধর্ম তাঁহারই চেষ্টায় একদা রক্ষা পাইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে অন্ধ পরানুকরণে মত্ত হিন্দু জাতির রক্ষক হইয়াই আসিয়াছিলেন এই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি গোঁড়া ছিলেন না। ছিলেন, জাতীয়তার মূর্ত্ত প্রতীক। ধুতি-চাদর এবং চটকী জুতা পরিয়া, সেকালের ইংরাজ যুগকে তিনি ব্যঙ্গই করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুয়ানীর কোন সংস্কারই তাঁহাকে বাঁধিতে পারে নাই, কিন্তু হিন্দু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের টিকিকে তিনি সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার বিপ্লবী-মনেরই পরিচায়ক। এই যে তাঁহার চরিত্রের বিভিন্ন দিক—ইহা লইয়া আলোচনা ও গবেষণা করিবার কাজ এখনও নিঃশেষ হয় নাই। এই জন্যই বহু গ্রন্থের মধ্যে যোগেশবাবুর 'বিদ্যাসাগর পরিচয়' একটি অমূল্য সংযোজন।

সাহিত্য সাধনায় বিদ্যাসাগর এই গ্রন্থের একটি অত্যাবশ্যকীয় পরিচ্ছেদ। বাংলা ভাষা বলিতে বিদ্যাসাগর-পূর্ব্বযুগে সত্যই কিছু ছিল না। সে হিসাবে বাংলা ভাষার জনক তিনি। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্ব্বে বাংলায় গদ্য সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন… বিদ্যাসাগর বাংলা লেখায় সর্ব্বপ্রথমে কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি ছেদচিহ্নগুলি প্রচলিত করেন।"

এই জন্যই শিক্ষা এবং সাহিত্য ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের দান চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। বস্তুতঃ সে যুগে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব না হইলে জাতি হিসাবে বাঙালী বহু পশ্চাতে পড়িয়া থাকিত। জাতির প্রয়োজনেই যেন তিনি আসিয়াছিলেন, কাজ শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। যেখানে যেটুকু প্রয়োজন সেখানেই তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছে। না হইলে অত বড় পণ্ডিত হইয়াও তিনি 'বর্ণপরিচয়' লিখিতে যাইতেন না। সে যুগে এই প্রয়োজনগুলি তিনি মিটাইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া আজ বাঙালী নিজের পায়ে দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছে। সেদিক দিয়া তাঁহার দান অপরিসীম। জাতি হিসাবে বাঙালী সেকথা চিরদিন স্মরণ রাখিবে।

যোগেশবাবুর এই গ্রন্থ সেইসবের দিক দর্শন করাইয়াছে। সেইজন্য ইহার মূল্য অসামান্য। বিশেষ করিয়া এরূপ তথ্যবহুল প্রামাণ্য গ্রন্থ পরবর্ত্তী গবেষকদিগের প্রয়োজনসিদ্ধির সহায়ক হইবে বলিয়া মনে করি। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া সাহিত্য-সম্পদই শুধু বৃদ্ধি করেন নাই, জাতির কল্যাণসাধন করিলেন।

চরৈবেতি—মৈনাক চট্টোপাধ্যায়, ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বইখানি কয়েকটি গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি ভাল। লেখকের গল্প বলিবার শক্তি আছে এবং মোচড় দিতেও জানেন। এই টেক্‌নিকের খবর অনেকে রাখেন না বলিয়া যথার্থ গল্প হয় না। যে বৈশিষ্ট্য ছোটগল্পের প্রাণ, লেখক সাহিত্য-ক্ষেত্রে নূতন হইলেও তাহা তিনি আয়ত্ত করিয়াছেন। ভাষা স্বচ্ছ, সরল। কোথাও সাহিত্য করিবার প্রচেষ্টা নাই। একটা সহজ গতি আছে। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ লেখকের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।

দ্বিতীয় গল্পের নামানুসারে গ্রন্থকার বইখানির নামকরণ করিয়াছেন। গল্প হিসাবে কিন্তু ইহা অপেক্ষা ভাল গল্প ছিল। যেমন 'সেতু' গল্পটি। ভাল বলিয়াই শুধু নয়—সেতু নামের অন্য সার্থকতাও আছে। কারণ তাঁহার সকল গল্পের মধ্যেই একটি সেতু বর্ত্তমান। শেষের গল্পটি—'একটি সত্যিকার গল্প', দুর্ব্বল গল্প। এ গল্পটি না দিলেই ভাল হইত। বইখানি পাঠক-সমাজে সমাদর পাইবে বলিয়া মনে করি। প্রচ্ছদপটটি আধুনিক রুচি-বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ। সুন্দর বয়না, সুন্দর অঙ্গরাগ।

শ্রীগৌতম সেন

একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় কাচা যায়
এর কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা
SUNLIGHT SOAP
ঠাকুমারও পছন্দ : ঠাকুরমা কি আজকের লোক- তাঁর এতদিনের অভিজ্ঞতা। তিনিও খুশী হয়েছেন লক্ষ্মীর সানলাইট সাবানে কাচা কাপড় দেখে। কি ধপধপে ফর্সা, আর ঝকঝকে রঙীন।
লক্ষ্মী জানে যে অল্প একটু সানলাইটেই অনেক কাপড় কাচা যায় এবং লক্ষ্মী এটাও দেখেছে যে ধুতি, সার্ট, বিছানার চাদর, তোয়ালে—সব কিছুই আশ্চর্য্য রকম সাদা ও উজ্জ্বল হয় সানলাইটে। সানলাইটের কার্য্য-করী, প্রচুর ফেনা ময়লার প্রতিটি কণাকে বার করে দেয়, কাপড় আছড়ানোর দরকার হয়না। আপনার পরিবারের কাপড় কাচার জন্য আপনিও সানলাইট সাবান ব্যবহার করুন না কেন?
সানলাইট জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে
S. 268 C-X52 BG
হিন্দুস্থান লিভার লিঃ কর্তৃক প্রস্তুত।

মধুসূদন : কবি ও নাট্যকার—শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। এ. মুখার্জী এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড। ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য টাকা ৩.৫০ ন. প.।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে শরৎচন্দ্র স্মারক বক্তৃতা দেবার জন্য লেখক আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তাঁর সেই বক্তৃতাই ঈষৎ পরিমার্জিতরূপে বর্তমান গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। চারটি পরিচ্ছেদে গ্রন্থখানি বিভক্ত : মহাকাব্য, তিলোত্তমাসম্ভব ও মেঘনাদবধ, গীতিকাব্য, উপসংহার। আলোচনা সুবিস্তৃত। প্রথমে দেশী ও বিদেশী সুধীজনের মত উল্লেখ করে তিনি মহাকাব্যের স্বরূপ নির্দেশ করেছেন। জাতীয় এবং আলঙ্কারিক উভয় প্রকার মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে লেখক সিদ্ধান্ত করেছেন, তিলোত্তমাসম্ভব ও মেঘনাদবধকে আলঙ্কারিক মহাকাব্যরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। তাঁর মতে "কাশীরামদাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণের পরে তিলোত্তমাসম্ভবই বাংলা-সাহিত্যে প্রথম সার্থক মহাকাব্য।" প্রচলিত ধারণা এই যে, মেঘনাদবধে মধুসূদন রামায়ণের আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেছেন এবং রাম-লক্ষ্মণকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। গ্রন্থকার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন এ ধারণা ভ্রান্ত। বস্তুতঃ, রাম-লক্ষ্মণের মহত্ত্বকে তিনি অস্বীকার করেন নি; রাক্ষসানুরাগ সত্ত্বেও তিনি মেনে নিয়েছেন, 'নিজকর্মফলে'ই রাবণ সবংশে মরেছেন। অন্যান্য ভাষার মহাকাব্যের সঙ্গে লেখক মধুসূদনের কাব্যদ্বয়ের যে তুলনা করেছেন তা অভিনিবেশযোগ্য। গীতিকাব্য-বিচারে 'ব্রজাঙ্গনা'কে তিনি উচ্চস্থান দেন নি। 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' সম্পর্কেও তাঁর প্রশংসা উচ্ছ্বসিত নয়, যদিও নবরীতি উদ্ভাবনের কৃতিত্ব তিনি সশ্রদ্ধচিত্তে স্বীকার করেছেন এবং মধুসূদন এতে যে বৈচিত্র্য এনেছেন তাও সযত্নে দেখিয়েছেন। 'বীরাঙ্গনা'—লেখকের মতে—মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য। ওভিদের কাছ থেকে প্রেরণা পেলেও আমাদের কবি তাঁর কাব্যকে আপন প্রতিভায় সমুজ্জ্বল করে তুলেছেন। নাটকেও তাঁর দান অসামান্য। সব ক'খানি নাটকেরই মোটামুটি বিচার এ বইয়ে করা হয়েছে। তাঁর সব সিদ্ধান্ত সকলে না-ও মানতে পারেন; যেমন, 'কৃষ্ণকুমারী'কে সকলে 'সম্পূর্ণাঙ্গ ট্র্যাজেডি' বলতে হয়ত দ্বিধাবোধ করতে পারেন, তবু তাঁর আলোচনা ও মতামত শ্রদ্ধাযোগ্য।

উপসংহারে লেখক মধুপ্রতিভার 'মূলসূত্র' নির্দেশ করেছেন। মধুসূদনের সমগ্র সাহিত্যকীর্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়াই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য। হয়তো পরিসরের সঙ্কীর্ণতা বশতঃ কোন কোন বিষয়ের বিশদ আলোচনা সম্ভব হয় নি। তবু পাঠক এ বই পড়বার সময়ে একটি অধ্যয়ন-সমৃদ্ধ চিন্তাশীল মনের সান্নিধ্য অনুভব করে আনন্দ পাবেন। তাতে সন্দেহ নেই।

অমৃত অতীত—মন্মথ রায়। পরিবেশক : ডি. এম. লাইব্রেরী। ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ১৲ টাকা।

অষ্টম শতাব্দীতে বাংলা দেশে অরাজকতা দেখা দিয়েছিল। তখন প্রজাপুঞ্জের নির্বাচিত প্রতিনিধি গোপাল দেব রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তিনিই পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা। গ্রন্থাকার ঐ সময়ের কথা নিয়ে নাটক লিখেছেন। তিনি জনপ্রিয় নাট্যকার। এ নাটকও জন-উপভোগ্য হবে বলে মনে হয়। গোপাল দেব ব্যতীত অন্যান্য চরিত্র কাল্পনিক। সুন্দরী মল্লিকাণী, গোপালের প্রেম-নিবেদনের ভঙ্গি, ভেজালের বিরুদ্ধে মিছিল—প্রভৃতিতে আধুনিকতার ছাপ পরিস্ফুট। পুরাণো যুগের পরিবেশ ফোটে নি। তবে তাতে মঞ্চসাফল্যে হয়তো বাধা হবে না।

পথিকের প্রাণকাব্য—প্রথম পর্ব। চুণীলাল গঙ্গোপাধ্যায়। গাঙ্গুলী গ্রন্থাগার। ৬, বেনিয়াপুকুর লেন, কলিকাতা-১৪। মূল্য পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

দেশের অতীত ও ভাবী গৌরবের স্বপ্নকে কবি রূপ দিতে চেয়েছেন। "রাণি সময় হয়েছে" প্রভৃতি পংক্তি ছন্দে ও ভাষায় দুর্বল।

কবীরবাণী—যোগেশচন্দ্র মজুমদার। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস। ৫৭, ইন্দ্রবিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭। মূল্য ১।০।

ইতঃপূর্বে লেখক দাদুর 'সবদ' অনুবাদ করে বাঙালী পাঠককে উপহার দিয়েছেন। এবার দিয়েছেন কবীরের একশ'টি কবিতা। তাঁর অবলম্বন রবীন্দ্রনাথ-কৃত ইংরেজী অনুবাদ গ্রন্থ 'ওয়ান হাণ্ড্রেড পোয়েমস অব কবীর' এবং ৺ক্ষিতিমোহন সেন সঙ্কলিত কবীরের রচনা। দু-এক জায়গায় ছন্দের ত্রুটি সত্ত্বেও অনুবাদ সরস এবং সরল। আরম্ভে 'কবীরের সংক্ষিপ্ত জীবনী' সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান—শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, এম. এ., পি-এচ-ডি, ভাগবতরত্ন, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি, মোয়াট পদক ও গ্রিফিথ-স্মৃতি-পুরস্কার প্রাপ্ত। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। মূল্য পনর টাকা।

একুশ বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইলে কিছু কিছু বাদানুবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইতিমধ্যে প্রকাশিত নূতন গ্রন্থ ও নিবন্ধে আলোচ্য গ্রন্থের অন্তর্গত কোন কোন বিষয় সম্পর্কে নূতন তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। নূতন সংস্করণ প্রকাশের সময় লেখক সে সমস্ত বিচার করিয়া গ্রন্থের প্রয়োজনানুরূপ সংস্কার করিয়াছেন। লেখক জানাইয়াছেন—'বিরুদ্ধ আলোচনার প্রধান প্রধান বক্তব্যের সম্বন্ধে আমার মতামত এই সংস্করণে সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ের রচনাকাল সম্পর্কে আমার পূর্বমত পরিত্যাগ করিয়াছি। অন্যান্য অধিকাংশক্ষেত্রে মত পরিবর্তন করিবার কোন সঙ্গতকারণ দেখি নাই। দ্বিতীয় ও ঊনবিংশ অধ্যায় নূতন করিয়া লেখা হইয়াছে।' পূর্ব সংস্করণে গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে মহাপুরুষদের জীবনী আলোচনার বিভিন্ন পদ্ধতির পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে বর্তমান গ্রন্থে অনুসৃত পদ্ধতির ইঙ্গিত প্রদান করা হইয়াছিল। উহা বর্তমান সংস্করণে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হওয়ায় তত্ত্ব-

জিজ্ঞাসু পাঠক ক্ষুণ্ণ হইবেন। পরিশিষ্টাংশের 'বৈষ্ণব সাময়িক পত্রিকার ইতিহাস ও সংগ্রহ' বিভাগ গ্রন্থ মধ্যে স্থান লাভ না করিলেও সূচীপত্র হইতে বাদ পড়ে নাই। লেখকের মতামত লইয়া খুঁটিনাটি আলোচনা এখানে সম্ভবপর নহে—মতামতের পার্থক্যও অপরিহার্য। তবে ভাল হউক মন্দ হউক একই বিষয়ে লিখিত কোনও গ্রন্থের একেবারে অনুল্লেখ একটু বিসদৃশ মনে হয়। যাহা হউক, দীর্ঘকাল পরে গ্রন্থখানি আবার সুপ্রাপ্য হওয়ায় অনুসন্ধিৎসু পাঠক-সমাজ আনন্দিত ও উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

আমাদের শান্তিনিকেতন—শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ। বিশ্বভারতী। মূল্য ৫৲ টাকা, শোভন ৭৲ টাকা।

বিশ্বভারতীর বর্ত্তমান উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন দাশ বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের প্রথম যুগের ছাত্র। তখন আশ্রমের ছাত্রসংখ্যা পনর কি ষোল। আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। শান্তিনিকেতন বলতে তখন ধু ধু বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে শালবীথি আর বেণুকুঞ্জ ঢাকা কয়েকটা বাড়ীই বোঝাত। যজ্ঞেশবাবু এবং ভূপেনবাবু এই দু'জনই প্রধানতঃ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সহায়ক কর্মচারী। শিক্ষক ছিলেন হরিচরণবাবু, জগদানন্দবাবু এবং অজিত চক্রবর্ত্তী। মোহিতচন্দ্র সেন ছিলেন সর্ব্বাধ্যক্ষ। কিছুকাল পর এলেন বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন, কালীমোহন ঘোষ, শরৎকুমার রায়, তেজেশচন্দ্র সেন। শিশু আশ্রমটিও ক্রমে ভরে উঠতে লাগল। নতুন শিক্ষক নতুন নতুন ছাত্রের দলে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ক্রমেই প্রসারিত হতে লাগল। আর সুধীরঞ্জন ফিরে এসেছেন আশ্রমসেবকরূপে।

বিশ্বভারতীর সেই প্রথম যুগের ইতিহাস (তখনও বিদ্যালয় বিশ্বভারতী নামে পরিচিত হয় নি) আমরা নানা ভাবে জানতে পারি সত্য, কিন্তু ছবিটি পাব কোথায়? যে কিশোরচিত্তের উপর জীবনের প্রথম আলো ফেলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সেই কিশোরের মুগ্ধ স্মৃতির সঙ্গীত বেজেছে এই বইতে—'এই রকম পরিবেশের মধ্যে বেড়ে উঠবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমরা ছিলাম আনন্দে বিহ্বল, অকারণে চঞ্চল; গুরুদেবের ভাষায় আমাদের হৃদয় তখন নবীন ছিল, কৌতূহল ছিল সজীব এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তি ছিল সতেজ। সেই সময় মেঘ ও রৌদ্রের লীলাভূমি অবারিত আকাশের তলায় আমরা খেলা করেছি এবং ভূমার আলিঙ্গন থেকে আমরা বঞ্চিত হই নি। স্নিগ্ধ নির্ম্মল প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় আমাদের প্রত্যেক দিনকে জ্যোতির্ম্ময় অঙ্গুলি দ্বারা উদ্ঘাটিত করেছে এবং সূর্য্যাস্তদীপ্ত সৌম্যগম্ভীর সায়াহ্ন আমাদের দিবাবসানকে নক্ষত্রখচিত অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে নিমীলিত করে দিয়েছে।' এক দিকে ঋতুচক্রের নিঃশব্দ আবর্ত্তন আর একদিকে এক নৈসর্গিক প্রতিভা—এই দুয়ের মধ্যে কিশোরচিত্তের ক্রমোন্মেষের এক রমণীয় ছবি ফুটেছে এই বইতে। প্রকৃতির সঙ্গে শিশুমনের সুর মেলাবার যাত্রী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নিবিড় ঘরোয়া পরিবেশ, পিতৃতুল্য শিক্ষক, মাতৃসমা কমল বৌঠান এবং হেমলতা দেবী, বীরভূমের সেই আদিম মানুষ ছটি কোলো আর আকতাবুদ্দিন আর সেই রোমান্টিক কল্পনার সচল উপাখ্যান ডাকাত দলের সর্দার—এমনি চরিত্রগুলি সুধীরঞ্জনের লেখনীতে কোমল রেখার টানে এঁকেছে যত ফুটে উঠেছে। ইচ্ছা করেই একে চিত্র বললাম না। ছবির বর্ণবিভায় এতে নেই বরং স্বভাবের ঋজু রেখান্বিত বর্ণনা আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি যেমন বিশুদ্ধ রেখার টানে ক্যারেকটার নিয়ে ফোটে, সুধীরঞ্জনের বর্ণনাও তেমনি করেই ফুটেছে। প্রসঙ্গত বলা যায়, এই বইয়ের ছবিগুলি বইয়ের বর্ণিত প্রকৃতি, মানুষ এবং পরিবেশকে চমৎকার ভাবে ভাষা দিয়েছে। এ কথা বলা অবশ্য বাহুল্য। কারণ শিল্পীরা সকলেই অতি বিখ্যাত।

'আমাদের শান্তিনিকেতন' বইটির একটি বিশেষত্ব সহজেই অনুভব করি। সেটা এই যে, বিভিন্ন পরিচ্ছেদে আশ্রমের বিভিন্ন দিকের গল্প বলা হলেও সবটা বই যেন একটি সমগ্র সত্তারই বর্ণনা। তুলনা দিয়ে বলা যায় পরিচ্ছেদগুলি যেন একটি ফুলেরই বিভিন্ন দল। সব মিলে একটিই জীবন একটিই আকৃতি একটিই হৃদয়। লেখক আশ্রম-জীবনের যে ভাবটি পাঠকের মনে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন সেটা এই নিবিড়তর সমগ্রতা বোধের। বালকেরা বিদ্যাভ্যাস করে, অভিনয় করে, পৌষালীতে যায়, ভ্রমণে যায়, প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারণ করে ক্রীড়ারত হয়—সবই যেন এক বৃহৎ সঙ্গীত বা হার্মনি। এই হার্মনির কবি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বালকচিত্ত-গঠনে তিনি আশ্চর্য্য ভাবে এই হার্মনির স্বরূপ প্রতিফলিত করেছিলেন। লেখক 'নিবেদনে' মার্জ্জনা ভিক্ষা করে বলছেন, 'স্মৃতিকথা লেখার বিপদ এই যে, সময়ের দূরত্ব হেতু ঘটনাপরম্পরায় স্থানকালভেদ বহুল পরিমাণে অস্পষ্ট হয়ে গিয়ে ঘটনাগুলি অনেক সময় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়ায়। এমনও হয় যে, পরের ঘটনাগুলি আগেই মনে এসে যায় এবং আগের ঘটনাগুলি পিছিয়ে পড়ে।

এই রচনায় একটি ছবি আঁকবারই চেষ্টা করেছি—ইতিহাস প্রণয়নের চেষ্টা এতে নেই।' ইতিহাসের সন তারিখ ঘটনা পরম্পরা জানার জন্য চারখণ্ডে প্রকাশিত সুবৃহৎ 'রবীন্দ্র-জীবনী' আছে। কিন্তু যাঁরা মনে করেন রবীন্দ্রনাথের আদর্শ শুধুই ইতিহাসের বিষয় নয়, আলো আর বায়ুর মতই নিত্য আশ্রয়, তাঁরা এই বইয়ের মধ্যেই বায়ুঃনিলমমৃতমথেদংকে পাবেন। সুধীরঞ্জনের 'আমাদের শান্তিনিকেতন' পড়ে আমরা সেই অমৃতকুম্ভে স্নিগ্ধ অবগাহনের আভাস পেলাম।

শ্রীভবতোষ দত্ত

আভি লে বাগদাদ—শিশিরপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী। লেখক কর্তৃক ৫৫ ৪, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা-২৯। মূল্য তিন টাকা। প্রেমেন্দ্র মিত্র ভূমিকা লিখেছেন।

এই বইখানি উপন্যাস নয় এবং এর বিষয়বস্তু সাম্প্রতিককালের কথা নয়। তবুও প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন, পাঠকরা এই

আপনার রূপ লাবন্য আপনারই হাতে!

বইটিতে একটি বলিষ্ঠ মনের বিচিত্র পর্যবেক্ষণ-শক্তির সহায়তায় জীবনের বিস্তৃত এক অপরিচিত ক্ষেত্রে উত্তেজনাময় বিচরণের স্বাদ পাবেন। প্রথম মহাযুদ্ধে একদল তরুণ বাঙালী বাগদাদের যুদ্ধে গিয়েছিলেন। বাগদাদ সেবার অধিকার করা যায় নি। পশ্চাদ-পসরণ করে আসতে হয়েছে। যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁরা সবাই ফেরেন নি, কিন্তু এই দলটি সুনাম অর্জন করে এসেছেন। এরা গিয়েছিলেন বাঙালী যাতে সামরিক বিভাগে ঢুকে সামরিক শিক্ষা নিতে পারে সেই পথ প্রশস্ত করার দায়িত্ব নিয়ে ও দূরদর্শী নেতাদের প্রেরণায় তাঁরা তাঁদের কর্তব্য সার্থক ভাবে পালন করেছেন। শিশিরবাবু জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে এখন এই দলের সঙ্গে থেকে দুরন্ত যৌবনে যে কষ্ট-দুঃখ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, একদা তারই বিবরণী শুনিয়েছেন। তাঁর বলার ভঙ্গি সুন্দর, কিন্তু ঠিক যুদ্ধ-সাহিত্যের পর্যায়ে এ বই উন্নীত হয় নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ প্রসঙ্গে জাপানী আক্রমণের কথা তিনি বলেছেন—ওটা সম্ভবতঃ সুভাষচন্দ্রের অভিযানই ছিল ; সে কথা উল্লেখ না করে তিনি দায়িত্ববোধের পরিচয় দেন নি। বইটি পড়ে আমরা অন্য ভাবে তৃপ্তই হয়েছি। মলাটের ছবি কিন্তু ভাল হয় নি।

রূপান্তর—ফ্রেডরিক লিউইস অ্যালেন। অনুবাদিকা ইন্দ্রাণী রায়। পার্ল পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, বোম্বাই-১। মূল্য পঁচাত্তর নয়া পয়সা। পৃষ্ঠা, ৩২৪।

১৯০০ সন থেকে ১৯৫০ সন পর্যন্ত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সমাজ যে বিপুল ও ব্যাপক পরিবর্তনের আন্দোলনে আলোড়িত হয়েছে তার তুলনা সমগ্র মানবেতিহাসেই কম মেলে। যে আমেরিকা ছিল বিশ্বব্যাপার থেকে দূরে সরে আপনাতে আপনি মগ্ন হয়ে প্রথম ও বিশেষতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে সেই আমেরিকা আজ একটি আন্তর্জাতিক শক্তিশিবিরের প্রধান নায়কে পরিণত হয়েছে। পরিবর্তন আরও বহু দিকেই দেখা গেছে, কিন্তু সবচেয়ে নিগূঢ় যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা হচ্ছে, আমেরিকানদের মতে, আমেরিকার অর্থনৈতিক প্রথার গণতান্ত্রিক রূপায়ণ বা গণতান্ত্রিক লক্ষ্যের সঙ্গে ধনতন্ত্রের সামঞ্জস্যসাধনের ফলে মার্কিন জীবনের যে সব প্রকৃতিগত পরিবর্তন, আর শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অদ্ভুত প্রসার এবং বিচিত্র রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তিধারার সংযোগের ফলে মার্কিন জীবনযাত্রার মান এবং মার্কিন জনসাধারণের চিন্তাধারা, আর নাগরিক মর্যাদার ক্ষেত্রেও যে সব পরিবর্তন এসেছে—এ সব নিয়েই এ বইখানি লেখা হয়েছে। বহু তথ্য লেখক এ বইয়ে উপস্থিত করেছেন, তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে এবং তথ্য বিশ্লেষণেও লেখক নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। অনুবাদ সাবলীল হয়েছে। বইখানি অল্প মূল্য হওয়ায় এ বই পাঠকরা সহজেই সংগ্রহ করতে পারবেন এবং এ বই সত্যই সংগ্রহযোগ্য।

টমাস পেন-এর রাজনৈতিক রচনাবলী—অনুবাদক প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পার্ল পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, বোম্বাই-১, কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৫০ নঃপঃ।

টমাস পেন-এর জীবন ছিল বৈচিত্র্যময় : ইংলণ্ডে তিনি জন্মেছেন, বড় হয়েছেন, আমেরিকার মুক্তি-সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছেন, পত্রিকা সম্পাদনা, ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠা, লোহার পুল নির্মাণ, ফ্রান্সের সংবিধান রচনায় অংশ গ্রহণ, বই রচনা এ সব কিছুই তাঁর জীবনের কর্মতালিকা থেকে বাদ যায় নি। পেন কিন্তু আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁর বিচিত্র রচনাবলীর জন্য—স্বাধীনতার মন্ত্র প্রচারে, জনগণের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আহ্বানে এই রচনাগুলির অবদান অপরিসীম। ব্যক্তি-মানুষের স্বাধীনতা আজ যে ভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে তাতে পেন-এর চিন্তাধারার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া একটা সময়োচিত কাজ বলেই পরিগণিত হবে। এই সংকলনে কমনসেন্স, আমেরিকার সঙ্কট, রাইটস অব ম্যান ও সরকার গঠনের প্রাথমিক নীতি সংক্রান্ত আলোচনা প্রভৃতি গ্রন্থের অংশ-বিশেষ স্থান পেয়েছে। অধ্যাপক পিয়েন্ট এই সংকলনের একটি দীর্ঘ ভূমিকা লিখে পাঠককে খুব সাহায্য করেছেন। ২৫০ পৃষ্ঠার এই সুমুদ্রিত বইখানি এত অল্প মূল্যে দেবার ব্যবস্থা করে প্রকাশক কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। অনুবাদ সুন্দর ও স্বচ্ছ হয়েছে।

ভারত-ই আমার দেশ—সিনথিয়া বোলস। অনুবাদিকা ইন্দ্রাণী রায় পার্ল পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। মূল্য পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

চেষ্টার বোলস ভারতবর্ষে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতরূপে এসেছিলেন। তিনি এসেছিলেন সপরিবারে। তাঁর পঞ্চদশী কন্যা সিনথিয়া সেই সুযোগে ভারতে কিছুকাল থেকে গিয়েছেন। সিনথিয়া বলছেন, আসার আগে স্বদেশ ছেড়ে আসতে তাঁর মন চায় নি। কিন্তু ভারতের নানা প্রান্তে বেড়াবার ও বাস করবার পর যখন তিনি ফিরে গেলেন তখন তাঁর মনে হয়েছে : "ভারতবর্ষকে আমার দ্বিতীয় জন্মভূমি বলে ভাবতেই ভাল লাগে। এদেশ (তাঁর নিজের দেশ) ছাড়া অন্য কোন জায়গায় আমার এত করে মনে হয় নি যে, আমি এখানকারই মানুষ।" তিনি দিল্লী, চণ্ডী, শান্তিনিকেতন, মায়েকরা, ফতেপুর, বরখরদারপর, নাজাল, অমৃতসর প্রভৃতি জায়গার মনোরম পরিবেশকে বিশেষভাবে প্রশংসা করেছেন। সিনথিয়া অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি মনের পরিচয় এ বইয়ের পাতায় পাতায় রেখেছেন এবং ভারতে আসা যে তাঁর সার্থক হয়েছে এ বিষয়ে আমরাও নিঃসংশয়। অনুবাদে ইন্দ্রাণী রায়ের কৃতিত্ব আছে। বইখানি সুখপাঠ্য করায় তিনিও প্রশংসা পাবেন।

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী

কেদার-বদরী—জ্যোতিষচন্দ্র রায়। প্রকাশক : শ্রীপ্রহ্লাদ-কুমার প্রামাণিক, ১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ২.৫০ নঃ পঃ।

দেশসেবা ও জনসেবার ক্ষেত্রে শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র রায় অনেকেরই পরিচিত। কর্মব্যস্ত কঠিন বুদ্ধিমান মানুষটি যে শেষ বয়সে একদিন 'জয় বদরী-বিশাল' বলে হিমালয়ের পথে তীর্থযাত্রা করবেন

তা কখনো ভাবি নি। 'কেদার-বদরী'র ছ'চার পাতা পড়তেই কিন্তু বুঝতে পারলাম তাঁর অন্তর্লোকে পাহাড়ী ঝরণার মত ভক্তি-বিশ্বাসের একটি নির্মল ধারা বড় বড় পাথরের পাশ দিয়ে চিরদিনই বয়ে চলেছে। আমরা এতদিন পাথরগুলোই দেখেছি, ঝরণাটি লক্ষ্য করি নি, তাই এই ভুল বোঝা।

সাধারণ ভক্ততীর্থযাত্রীর লক্ষ্য হচ্ছে মন্দিরে দেবদর্শন, যতক্ষণ দেবদর্শন না হচ্ছে ততক্ষণ তাদের যাত্রা সার্থক হচ্ছে না, অন্তর পরিপূর্ণ হচ্ছে না। জ্যোতিবাবুর অন্তর পূর্ণ হোল হিমালয়ের পথে পা দিয়েই, লছমনঝোলা থেকে বদরীনারায়ণের মন্দির পর্যন্ত চলল তাঁর একটানা দেবদর্শন, প্রতি পদক্ষেপ হোল তাঁর কাছে অনির্বাচনীয়। এখানেই জ্যোতিবাবুর তীর্থযাত্রার বিশেষত্ব।

জ্যোতিবাবু সুলেখক, চলার পথের ছবিগুলি একের পর এক তিনি অতি সুন্দর ভাবে এঁকে গেছেন। যাত্রা সুরু হোল, তিনি লিখছেন—"আমাদের ডাইনে-বাঁয়ে পাহাড়ের সার চলেছে। মাঝখানে সঙ্কীর্ণ গিরিনদী গঙ্গা। বাঁদিকের পাহাড়ের গায়ে গায়ে আমাদের রাস্তা। রাস্তার ডান-পাশেই খাদ, পাহাড় নেমে গিয়েছে গঙ্গা পর্যন্ত। গঙ্গার পরপারে আর এক সার পাহাড়। চড়াই আর উতরাই। পাহাড়ের গা বেয়ে ঘুরে ঘুরে একটা পাহাড় অতিক্রম করে আর একটা পাহাড়, সেটা ছাড়িয়ে আর একটা, আর একটা, এমনি করে ক্রমাগত পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করে চলেছি।" অলকনন্দা ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে দেব-প্রয়াগ, সেখানে এসে জ্যোতিবাবু লিখছেন—"সিঁড়ি বেয়ে সঙ্গমের কাছে নেমে গেলাম। গঙ্গার অশান্ত কলরোল ও দুরন্ত প্রবাহ আর অলকনন্দার নিঃশব্দ ক্ষিপ্র গতি। দেখতে বেশ লাগল। অঞ্জলি করে জল মাথায় দিলাম। পিতৃ-পুরুষদের উদ্দেশে অঞ্জলি পূর্ণ করে জল নিবেদন করলাম। নিজেদের অত অতীতের যোগসূত্রে যেন একটু টান পড়ল। মনে হ'ল, যেখানে জল সেখানেই তার চার পাশে প্রাচীনকালে মানুষের সমাজ ও সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। জল নারায়ণ। তাই প্রাকৃতিক জলধারার মর্যাদা দিয়েছিলেন আমাদের পিতৃপুরুষেরা। প্রকৃতির সঙ্গে তাদের যোগ ছিল সহজ ও সুন্দর।

সত্যতায় সেই প্রত্যুষ-মুহূর্তে যেন কণকালের জন্যে ফিরে গেলাম।" তারপরে বিনায়ক চটি পার হয়ে লিখছেন, "এখান থেকে যাত্রার চেহারা বদলাতে আরম্ভ করল। গাছপালা ক্রমে বিরল হয়ে এল। পাহাড়ের চেহারা হয়ে উঠল রুক্ষ ও গম্ভীর। পথ হ'ল বন্ধুর। পথশ্রী যেন কমে গেছে মনে হ'ল। দিকে দিকে পাহাড়ের চূড়া বরফে মণ্ডিত।" এইবার এসে পড়েছেন দেবদেখনায়—এখান থেকে বদরীনারায়ণের মন্দির দেখতে পাওয়া যায়, জ্যোতিষবাবু লিখছেন, "পায়ের নীচে তুষার, আশে-পাশে তুষারমণ্ডিত গিরিচূড়া, তুষার-স্তম্ভিত অলকনন্দা।...জমাট সৌন্দর্য্য। স্তম্ভিত কালপ্রবাহ। নিস্তব্ধ শান্তি। দেবতা নিজের মধ্যে নিজে সংহৃত। অখণ্ড কাল ছাড়া এখানে কিছুই নাই। সৃষ্টির প্রথম প্রত্যুষ। প্রত্যুষের যেন আগে। মন একটা নিবিড় সমগ্রতার মধ্যে নির্বাক নিস্তব্ধ হয়ে গেল। এই তো দেবতার স্থান। এই তো পরমতীর্থ।... অনির্বচনীয় সেই দেবতা। এখানকার জলে স্থলে পর্বতে অরণ্যে গিরি প্রবাহিণীর তুহিনময় নিঃসীম মৌনতায়, গিরি-শীর্ষের হিম-মণ্ডলের অকলঙ্ক শুভ্রতায়, সেই দেবতারই প্রকাশ। এই প্রকাশ বিপুল, মহৎ, বিশাল। জয় সেই বদরী-বিশালের। সেই বিশালকে নমস্কার, ডাইনে নমস্কার, বাঁয়ে নমস্কার, সামনে থেকে নমস্কার, পেছন থেকে নমস্কার। হাজার মুখে তাঁকে নমস্কার। নমস্কার, নমস্কার, আবার নমস্কার।"

হিমালয়ের মহান সৌন্দর্য্য জ্যোতিষবাবুর মনকে উচ্চ গ্রামে তুলে ধরলেও পথের সুখ-সুবিধার খুঁটিনাটি বিষয়গুলিও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি, তিনি সে সবেরও উল্লেখ করেছেন। যিনি কেদার-বদরীর পথে পা বাড়ান নি তাঁর তো এ বই খুবই ভাল' লাগবে, যিনি ও দুই মহাতীর্থ সেরে এসেছেন তাঁরও ভাল লাগবে। বইতে অনেকগুলো সুন্দর ফটো আছে।

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত
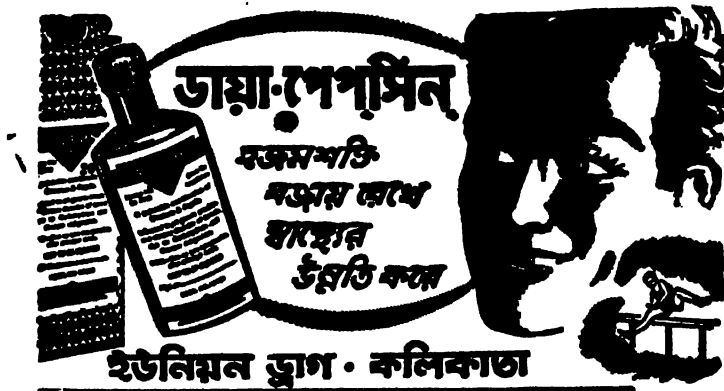
দেশ-বিদেশের কথা

কবি অক্ষয়কুমার বড়াল শতবার্ষিকী

বিগত ১৯শে চৈত্র ১৩৬৬, শনিবার অপরাহ্নে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে কবিবর অক্ষয়কুমার বড়ালের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে একটি সভার অধিবেশন হয়। কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক এই অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন। কবির শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান পালন করিয়া পরিষৎ সমুচিত কাজই করিয়াছেন। অক্ষয়কুমার বড়াল ভুলিয়া যাইবার মত কবি নহেন। কৌতূহলী দর্শকের ভিড় না হইলেও সেদিন পরিষদে বহু সাহিত্যিক এবং সাহিত্যরসিকের সমাগম হইয়াছিল। বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি বটে, কিন্তু কবিকে যে সে মনে রাখিয়াছে সেদিনের সভাই তাহার প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক যে কয়জন কবি কাব্যে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছিলেন অক্ষয়কুমার তাঁহাদের অন্যতম। শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কবিবৃন্দ, শ্রীমন্মথ সান্যাল, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ সাহিত্যিকবৃন্দ, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন প্রভৃতি অধ্যাপকবৃন্দ অক্ষয়কুমারের কাব্যের এক একটি দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার উভয়েই কবি বিহারীলালের কাব্যশিষ্য। রবির উজ্জ্বল কিরণে ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্য সব সাহিত্যজ্যোতিষ্ক স্পষ্ট ভাবে দৃষ্টিগোচর হয় না। বিহারীলালের ন্যায় বড়াল-কবির অস্বচ্ছ সুরটি যাঁহারা উপভোগ করিয়াছেন তাঁহারা অক্ষয়কুমারকে চিরকাল মনে রাখিবেন। রোমান্টিক কাব্যে অক্ষয়কুমারের এক বিশিষ্ট স্থান আছে। বিবিধ বক্তা তাঁহার কাব্যে চিত্রকল্প, শব্দ-মাধুর্য্য, অবহেলিত জনের প্রতি তাঁহার দরদ, ভাবপ্রকাশের বিশিষ্ট ভঙ্গি, দার্শনিকতা প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীত্রিদিব রায়,

শ্রীনরেশ মল্লিক প্রভৃতি তাঁহার কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করেন।

কাব্য বিচারে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির একান্ত প্রয়োজন। রসজ্ঞ পাঠক অক্ষয়কুমারের "প্রদীপ," "কনকাঞ্জলি," "ভুল" বা "শঙ্খ" যে কোন কাব্য পাঠ করিলে মুগ্ধ হইবেন। "এষা"র মত মরণ-কাব্য বিরল। কবির কাব্য কালজয়ী। সভাপতি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বলেন, "অক্ষয়কুমার কত বড় কবি ছিলেন, তাহা যাঁহারা জানিতে ইচ্ছুক তাঁহারা স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীবৃন্দ তাঁহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। ১৩১৯ সালে ১৬ই চৈত্র স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা আজও তেমনি সত্য আছে, তবে অধিক উজ্জ্বল ও সামাজিকে তাৎপর্য্যপূর্ণ হইয়া বিরাজ করিতেছে। অক্ষয়কুমার সাধক ও ভক্ত। তাঁহার কবিতার নারী ভোগের উপাদান নাই। কবি নারীকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানসপুষ্পে অর্ঘ্য দিয়াছেন। তাঁহার প্রেমের কবিতাগুলি শুচিতায় ভরপুর। তাঁহার কবিতা মানবিকতায় পূর্ণ, সমবেদনায় সমৃদ্ধ বলিয়াই তিনি বর্ত্তমানকালের ব হীনতা ও দীনতা অতিক্রম করিয়া অণু হইতে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ব্রহ্মসত্ত্বকে অনুভব করিয়াছেন।" তিনি বলেন, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ ধনী নহেন, তবু দেশবাসী যে সব কবিকে ভুলিতে বসিয়াছেন পরিষদ তাঁহাদের কাব্যকীর্ত্তিগুলি রক্ষা করিয়াছেন বা করিতেছেন। পরিষদের পক্ষে ইহা গৌরবের কথা। কিন্তু অক্ষয়কুমারের শতবার্ষিকী যথোচিতভাবে হওয়া উচিত ছিল। দানসাগরের পরিবর্ত্তে তিলকাঞ্চনে শ্রাদ্ধ দেশবাসীর প্রশংসার পরিচায়ক নহে। উপসংহারে তিনি বলেন যে, যদি অক্ষয়কুমারকে ছোট করা হয় তবু তিনি যাহাই ছিলেন তাহাই থাকিবেন। তাঁহার যশ ও কীর্ত্তি অক্ষয়।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের কলিকাতাস্থিত বাসভবন

গত ২৬শে চৈত্র অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকায় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র সোসাইটির উদ্যোগে, কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলের ৫ নং প্রতাপ চ্যাটার্জ্জি লেনের যে গৃহে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সেই গৃহে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোভাব উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এই উৎসবে পৌরোহিত্য করেন।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র সোসাইটির সম্পাদক শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন প্রস্তাব করেন যে, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিবিজড়িত কলিকাতার এই ৫নং প্রতাপ চ্যাটার্জ্জি লেনস্থ বসতবাটীটি, যেখানে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং কলিকাতা করপোরেশন যেন এই বসতবাটীটি ন্যায্যমূল্যে অধিকার করিয়া জাতীয় সম্পত্তিরূপে পরিগণিত করেন এবং তথায় একটি সংগ্রহশালা ও Culture Institute স্থাপন করেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ইতঃপূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ-নৈহাটি শাখার সম্পাদকরূপে শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানকে এই মর্ম্মে এক আবেদন জানান। গত ১১-৪-৬০ তারিখ সোমবার সোসাইটির সম্পাদক শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন, উপরিউক্ত বাসভবনটি দখল করিয়া রাজ্য সরকার যাহাতে সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করেন ও জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করেন, সেই সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নিকট এক স্মারকলিপি পেশ করেন।

জীবন স্বপ্ন

শ্রীমায়া বসু

একটি মধুর স্বপ্নের স্মৃতি, রাত্রির কালো ছায়,
ভরেছে আমার আকুল হৃদয় প্রশান্ত বেদনায়!
জানি এ তো কিছুক্ষণ—
ভুলায়েছে মোর মন।
জানি প্রভাতের প্রখর আলোকে,
কিছু রবে নাকো মনে,
ক্ষণিক স্বপ্ন মিলাবে দীপ্ত বহ্নি উদ্গীরণে।

হাজার তারার দীপান্বিতায় আলোকোজ্জ্বল রাতি;
জানি ও জ্যোতির মহা অঙ্গনে, জ্বলিবে না মোর বাতি।
কোন প্রয়োজন নাই—
তবু দীপ জ্বেলে যাই।
জানি নিভে যাবে এ ক্ষীণ প্রদীপ খর বায়ু বেগ ভরে
মনোবাসনার অম্লান শিখা সে জ্বলুক চিরতরে।

মিলায় গোধূলি ছড়ায়ে আকাশে পূরবীর শেষ সুর—
মাটির জঠরে ক্ষণপরমায়ু কাঁদে নব অঙ্কুর!
শুধু দুদিনের ভুল,
এই মরসুমী ফুল!
তবু সার্থক জীবনস্বপ্নে এই ক্ষণ মনোলোভা—
ঝরিবার আগে বাড়ালো যে সখি
তব কবরীর শোভা!

শুধু এই ক্ষণ মোহের ছলনা করে যাই সুন্দর,
দুরাশার কালো মেঘেতে ধনাক সম্ভাবনার ঝড়।
জানি মুছে যাবে নাম,
তবু এঁকে রাখিলাম—
জ্যৈষ্ঠের রোদে মাটির ফাটলে জলের আলিম্পন,
তৃষ্ণার বারি না থাকে থাকুক—
ক্ষণিকের শিহরণ।

প্রবাসী ষষ্টিবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ

বাংলা ১৩৬৬ সালের চৈত্র মাসে প্রবাসীর ৬০ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইল। এই ষষ্টি-বার্ষিকী উপলক্ষে ১৩৬৭ সালের মাঝামাঝি, পূজার পূর্ব্বে, একটি বৃহদাকার স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করিবার আয়োজন হইতেছে।

খ্যাতিমান লেখক-লেখিকাদের লেখা চিত্তাকর্ষক গল্প, উপন্যাস, কবিতা, রস-রচনা প্রভৃতি ছাড়াও এই গ্রন্থটি বহু বিচিত্র বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধ ও সন্দর্ভাদিতে সমৃদ্ধ হইবে। গ্রন্থটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য আমরা চেষ্টার ত্রুটি করিব না।

জন্ম সময় হইতেই প্রবাসী কয়েকটি বিশেষ বিষয়ে অগ্রণী ও পথপ্রদর্শক ছিল। দেশ-বিদেশের প্রাচীন ও সমসাময়িক চিত্রকলা, চারুশিল্প প্রভৃতির সঙ্গে দেশের জনসাধারণের পরিচয়-সাধন তাহার অন্যতম। স্মারক গ্রন্থটিকেও চিত্র-সম্ভারে সমৃদ্ধ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইবে।

রাষ্ট্র, সমাজ, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে প্রবাসীর একটি যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী, আমরা আশা করি—সেই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীটি এই গ্রন্থে যথোচিত পরিমাণে প্রতিফলিত হইবে এবং যে-সমস্ত আদর্শের অনুপ্রাণনা লইয়া প্রবাসী বহু বৎসর দেশবাসীর সেবা করিয়া আসিয়াছে, সেই সমস্ত আদর্শের ধারা এই গ্রন্থেও অব্যাহত থাকিবে।

অতীতে কোনও না কোনও সূত্রে যাঁহাদের সহকারিতা লাভ করিবার সৌভাগ্য প্রবাসীর কখনও হইয়াছে তাঁহাদের সকলেরই সহানুভূতি-প্রণোদিত সাহায্য পাইব আশা করিয়া এই কাজে আমরা হাত দিয়াছি। ইহাদের মধ্যে তাঁহাদের কাছে এ পর্য্যন্ত আবেদন জানানো হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই সানন্দে সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন। যাঁহাদের কাছে আমাদের আবেদন এখনও পৌঁছায় নাই তাঁহারাও আমাদের নিরাশ করিবেন না, এই ভরসা রাখি।

যে-সমস্ত নূতন লেখক, নূতন চিত্রশিল্পী, যে-কোনও কারণেই হউক, প্রবাসীর সংস্পর্শে এতকাল আসেন নাই—তাঁহাদেরও সহযোগিতা আমরা আগ্রহের সহিত কামনা করি।

রচনা ইত্যাদির জন্য আমাদের সাধ্যমত দক্ষিণা-মূল্য আমরা দিব।

স্মারক গ্রন্থের জন্য রচনাদি ১৫ই শ্রাবণের মধ্যে আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক।

প্রবাসী ষষ্টি-বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ সম্পাদনা-বিভাগ
৩৫, লেক টেম্পল্ রোড, কলিকাতা-২৯

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

প্রবাসী প্রেস কলিকাতা

অভিজ্ঞান

শ্রীসতীন্দ্রনাথ লাহা

প্রভাতের অবসর—শ্রীনগর

পাহাড়ী ফুল [ফটো : শ্রীসচ্চিতকুমার চট্টোপাধ্যায়

:: ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬০শ ভাগ
১ম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩৬৭

৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

কলিকাতা পৌরসভায় কংগ্রেস

রবিবার ২৯শে জ্যৈষ্ঠ কংগ্রেস ভবনে কলিকাতা পৌরসভার কংগ্রেসী কাউন্সিলারদের এক জরুরী বৈঠক বসে। এই বৈঠকে প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল ডাঃ সুখবিহারী মুখার্জ্জি নামক জনৈক কংগ্রেস কাউন্সিলারের, কংগ্রেস দলের বিশেষ নির্দ্দেশ (হুইপ) অমান্য করিয়া, কর্পোরেশনের ষ্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটির চেয়ারম্যানের পদে নির্ব্বাচিত হওয়া। যে দিন এই নির্ব্বাচন করা হয় সেদিন ও সে সময় কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের কর্ত্তাব্যক্তিরা যাঁহাকে উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান করা স্থির করিয়াছিলেন, তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। বিপক্ষ দল এই সুযোগে ডাঃ সুখবিহারী মুখার্জ্জিকে ঐ পদের জন্য যোগ্য বলিয়া প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবের সপক্ষে ও বিপক্ষে সমান ভোট দাঁড়ায় এবং সভাপতি—উক্ত ডাঃ সুখবিহারী মুখার্জ্জি—তাঁহার "কাষ্টিং ভোট" নিজেকে প্রদান করায় তিনিই নির্ব্বাচিত হন। ইহার পর তাঁহার পদত্যাগে অনিচ্ছা দেখানোয় তাঁহাকে কংগ্রেস দল হইতে বহিষ্কার-করণের কথাও শোনা গিয়াছে। ডাঃ মুখার্জ্জি বলেন যে, যেহেতু তিনি সংখ্যাধিক্যের ভোটে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন সেজন্য তিনি পদত্যাগে ইচ্ছুক নহেন এবং বর্ত্তমানে তিনি স্বতন্ত্র সদস্য হিসাবেই কাজ করিবেন, কোন গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হইবেন না।

বৈঠকে আরও অনেক কথা ওঠে। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রশ্ন করেন যে, পৌরসভার অধিবেশনে কার্য্যসূচীর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি কেন আলোচনা না করিয়া অন্যান্য বিষয়ে কালক্ষেপ করা হয়। ইহার উত্তরে জানান হয় যে, বিরোধী পক্ষের "গলাবাজীতে" কংগ্রেসী দলের কার্য্যক্রম বানচাল হইয়া যায়। বিশেষ বর্ত্তমান আইনে "অবাধ্য" কাউন্সিলারকে অধিবেশন হইতে বাহির করিয়া দিবার কোনও ব্যবস্থা না থাকায় ঐ "মেছোহাটা" সৃষ্টির অন্তরায় কিছুই হয় নাই। এই অবস্থার প্রতিকার হওয়া প্রয়োজন এ-কথা মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেন এইরূপ শোনা গিয়াছে। কর্পোরেশনের কর্ম্মচারী ও স্বয়ং কমিশনার ষ্টাণ্ডিং কমিটিসমূহের নির্দ্দেশ প্রায়ই অমান্য করেন বলিয়া অভিযোগ আসে যখন মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, কর্পোরেশন যথাযথ ভাবে কাজ না করায় এই নগরের করদাতাদিগের স্বার্থ উপেক্ষিত হইয়া থাকে। ডাঃ রায় পৌর কর্ম্মচারীদিগকে বাধ্য করার জন্য "রুলস", অর্থাৎ কার্য্যক্রমের নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করিতে পরামর্শ দেন। তাঁহার ধারণা ইহাতে পৌরসভার কাজও দ্রুত সম্পন্ন হইবে।

কাউন্সিলারগণ এই বৈঠকে নিজেদের জন্য ভাতা এবং পৌর কর্ম্মচারীগণের জন্য বর্দ্ধিত মাগ্গী ভাতার দাবি জানাইলে ডাঃ রায় তাহাতে অসম্মতি জানান। তাঁহার এই অসম্মতির কারণ, নূতন করিয়া অর্থ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে সরকার অপারগ।

বৈঠকের বিবরণে আরও বলা হইয়াছে যে, মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কংগ্রেস কাউন্সিলারদিগকে আরও সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে "দল ও করদাতাদিগের" স্বার্থে কাজ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

আমরা দেশের নানা প্রতিষ্ঠানে—যাহার মধ্যে কলিকাতা পৌরসভা একটি—কংগ্রেসী দলসমূহের কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া এই ধারণায় উপনীত হইয়াছি যে, বর্ত্তমানে কংগ্রেসী দলের স্বার্থ ও জনসাধারণের স্বার্থ

পরস্পরবিরোধী এবং সেই কারণেই এ-দেশের এরূপ অবস্থা। সুতরাং করদাতাদিগের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিলে কংগ্রেসী দলের স্বার্থে আঁচড় পড়িবেই। কংগ্রেসবিরোধী দলগুলির কথা না বলাই ভাল, তাঁহাদের মধ্যে কে কি আদর্শ লইয়া চলেন তাহার পূর্ণ পরিচিতি দেওয়ার এখানে স্থানাভাব। তবে যাঁহারা কংগ্রেসের নামে দেশে কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন তাঁহাদের দায়িত্বজ্ঞান কোথায় নামিয়াছে তাহার নিদর্শন এই নগরের পথঘাট ও এখানের নাগরিকগণের দুরবস্থা।

তবে অবশ্য নাগরিকগণ নিজেরা দায়িত্বজ্ঞানশূন্য না হইলে, এইরূপ লোকেরা কর্ত্তৃত্ব অধিকার করিতে পারিত না।

প্যারিস-বৈঠকের অপমৃত্যু

প্যারিসে যে শীর্ষ সম্মেলন পণ্ড হইবে ইহা পূর্ব্বেই অনুমান করা গিয়াছিল। যখনই শোনা গেল, মার্কিন-গোয়েন্দা-বিমান লইয়া সোভিয়েট নায়ক মিঃ ক্রুশ্চভ বড় বেশী মাতামাতি সুরু করিয়াছেন, তখনই ইহার পরিণাম সম্বন্ধে আশঙ্কা আসিয়াছে। অথচ গত কয়েক বছর ধরিয়া এই শীর্ষ সম্মেলন বসাইবার জন্য মিঃ ক্রুশ্চভ প্রায় সারা জগৎ তোলপাড় করিয়াছিলেন এবং অনিচ্ছুক মার্কিন ও পশ্চিমী শক্তিবর্গকে যতপ্রকারে সম্ভব নরম করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আর ক্লান্তিহীন উদ্যমে দেশদেশান্তর পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন শান্তি প্রতিষ্ঠা ও জাতিতে জাতিতে সদ্ভাব সৃষ্টির জন্য।

তাঁহার আচরণ দেখিয়া সন্দেহ করিবার কিছুই ছিল না। আইসেনহাওয়ারের সহিত হৃদ্যতাপূর্ণ মিলন দেখিয়া সকলে অনেক-কিছুই আশা করিয়াছিল। তথাপি এরূপ হইল কেন? একথা সত্য যে, পরের দেশে গোয়েন্দাগিরি কোন নূতন ব্যাপার নহে, ইহা রাষ্ট্র-শাসনের অন্যতম অঙ্গ। কিন্তু নূতন নহে বলিয়াই ইহা বৈধ কিংবা সঙ্গত এমন কথা কোন যুক্তিবাদী লোকই বলিবেন না। কোন সার্ব্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বেচ্ছায় সীমানা লঙ্ঘনপূর্ব্বক গুপ্তচর বৃত্তির অনুষ্ঠান নিঃসন্দেহে গর্হিত কাজ। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার সেই গর্হিত কাজ এবং বে-আইনী কাজ প্রকাশ্যে সমর্থন করিয়া কেবল ভুল করেন নাই, অন্যায় করিয়াছেন।

কিন্তু এই অন্যায়ের প্রতিকার ঠিক ঐভাবে হওয়া উচিত ছিল না। সম্মেলনে সে-প্রস্তাব তুলিয়া যাহাতে ভবিষ্যতে এরূপ কার্য্য না হয়, তাহার একটা সম্মানজনক সহজ মীমাংসায় আসা উচিত ছিল। কিন্তু মিঃ ক্রুশ্চভ সে-পথ দিয়া যান নাই। মার্কিন সমরনায়কদের আচরণ এবং মনোভাব যাহাই হউক, প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার শ্রী ক্রুশ্চভ অপেক্ষা অনেক বেশী ধীরতা ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। সোভিয়েট আকাশপথে মার্কিন-গুপ্তচর-বিমান প্রেরণ বন্ধ করা হইয়াছে, প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের এই ঘোষণাতেই শ্রী ক্রুশ্চভের শান্ত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনি তাহা হন নাই। তিনি চাহিয়াছিলেন, আইসেনহাওয়ার প্রকাশ্যে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন এবং ক্ষমা না চাহিলে সম্মেলনে যোগ দিবেন না। মিঃ ক্রুশ্চভের এইরূপ অসম্ভব দাবি আদৌ যুক্তিসঙ্গত বা সময়োচিত হয় নাই। এইরূপ দাবি লইয়া প্যারিসে শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিবার জন্য সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর সশরীরে ও সদলবলে আসার প্রয়োজন ছিল না। মস্কো হইতে ওয়াশিংটনে কূটনৈতিক পত্র পাঠাইলেই চলিত। কাজেই ধরিয়া না লইয়া উপায় নাই যে, শীর্ষ সম্মেলন যাহাতে না বসিতে পারে তাহার জন্য মস্কোতে বসিয়াই মিঃ ক্রুশ্চভ ও তাঁহার সহযোগিগণ দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বুঝা যাইতেছে যে, মস্কো হইতে প্যারিস পর্য্যন্ত এই সমগ্র পথটাই মিঃ ক্রুশ্চভ অতিক্রম করিয়াছেন একটিমাত্র উদ্দেশ্য লইয়া এবং তাহা হইতেছে, সামিট্ কনফারেন্সকে সাবোটাজ বা ধ্বংস করিবার জন্য!

ক্রোধ ভয়ানক বস্তু। এই ক্রোধ হইতেই পৃথিবীতে যত অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। দেখিতেছি, শান্তিকামী মিঃ ক্রুশ্চভের এখনও সংযম-শিক্ষা হয় নাই। অথচ মিঃ ক্রুশ্চভের কাছেই এই সংযম প্রত্যাশিত। কারণ, এই যুগের তিনিই শান্তির দূত এবং তিনিই যুদ্ধের বিরুদ্ধে, ঠাণ্ডা লড়াইয়ের বিরুদ্ধে, বিস্ময়কর উদ্যমের সঙ্গে এক প্রচণ্ড আশাবাদিতার ভূমিকা রচনা করিয়াছিলেন। এশিয়া তথা পৃথিবীর মানুষ একটি নবযুগের প্রত্যাশায় ছিল। কিন্তু একদিকে আইসেনহাওয়ারের বে-আইনী গোয়েন্দাগিরি সমর্থন এবং অন্যদিকে প্যারিসে নিকিতা ক্রুশ্চভের ধৈর্য্যচ্যুতি সেই প্রত্যাশা ও শান্তির ভূমিকাকে রূঢ়ভাবে আঘাত হানিয়াছে। যারা যুদ্ধ বাধাইতে উৎসুক, তাদের দায়িত্ব নাই, কিন্তু যারা শান্তি-প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী, তাদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব মহত্তর। সেই মহত্তর কর্ত্তব্যের দিকে তাকাইয়া এবং ঠাণ্ডা লড়াইয়ের মূল কারণগুলিকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য শীর্ষ সম্মেলন চালাইয়া যাওয়া উচিত ছিল। বিশেষতঃ যখন অপরের দেশে গুপ্তচর প্রেরণে ও পঞ্চমবাহিনীর সৃষ্টিতে সোভিয়েট সকল দেশের অগ্রণী।

একদল বলিতেছেন, মিঃ ক্রুশ্চভের এই উদারতার এবং পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার সঙ্গে আঁতাতের এই চেষ্টার সোভিয়েট রাশিয়া ও নয়াচীনের অভ্যন্তরে স্ট্যালিন-পন্থীরা বিরোধিতা করিয়া আসিতেছিলেন। মিঃ ক্রুশ্চভের স্বকীয় পার্টির ভিতরেই এই বিষয়ে তীব্র মতভেদ ছিল। সুতরাং গোয়েন্দা-বিমানের ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া মিঃ ক্রুশ্চভ শেষ পর্য্যন্ত শীর্ষ সম্মেলন বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, অথচ গোড়ার দিকে তিনি শীর্ষ সম্মেলন বর্জ্জনের কোন ইঙ্গিত দেন নাই।

আবার আর একদল বলিতেছেন, মুখে শান্তি ও গণতন্ত্রের কথা বলা হইতেছে বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ মার্কিন সামরিক বিভাগই এই পররাষ্ট্র নীতিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র সামরিক ঘাঁটি, সর্ব্বত্র সৈন্য মোতায়েন, সোভিয়েট রাশিয়া ও চীনের বিরুদ্ধে চারিদিকে বেষ্টনী সৃষ্টি, যুদ্ধাস্ত্র তৈয়ার ও সামরিক সাহায্য দান, নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাবে দ্বিধা এবং পরমাণু অস্ত্রাদির নিষিদ্ধকরণে অনিচ্ছা ইত্যাদি সবকিছুই একত্র বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমান মার্কিন সরকারের গণতন্ত্র ও শান্তি যেন গোলা-বারুদ এবং এটম ও হাইড্রোজেন বোমার উপর বসিয়া আছে। ফলে, কোন সুস্থ, জীবন্ত এবং বলিষ্ঠ নীতি অর্থাৎ যে-নীতির ফলে পৃথিবীর মানুষ নিঃশঙ্কবোধ করিতে পারে, তেমন নীতির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

এই যেখানে অবস্থা, সেখানে শীর্ষ সম্মেলন বানচাল হইতে বাধ্য। শীর্ষ সম্মেলনের এই ব্যর্থতা এবং সোভিয়েট-মার্কিন সম্পর্কের এই সঙ্কট ভারতবর্ষের পক্ষেও অত্যন্ত অকল্যাণকর হইবে। কারণ, আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা শান্ত না থাকিলে, ভারতবর্ষের সাধারণ অগ্রগতি যেমন সম্ভব নহে, তেমনি চীন-ভারত সীমান্তে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারও প্রতিকার সম্ভব নহে। এ-কথা স্পষ্টরূপে মনে রাখা দরকার যে, ধনতান্ত্রিক জগতের বিরুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়া ও নয়াচীন অভিন্নমত এবং সমগ্র কম্যুনিষ্ট জগতই একত্র হইয়া চলিবে এবং যুদ্ধের সম্ভাবনায় ভারতবর্ষের সঙ্গে চীন সম্ভবতঃ আপোষ মীমাংসায়ও সম্মত হইবে না। কারণ, ভবিষ্যৎ ভারতের নীতি কম্যুনিষ্ট শিবিরের প্রতি বন্ধুতাব্যঞ্জক থাকিবে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে—অন্ততঃ চীনের কম্যুনিষ্ট নেতাদের মনে সেই সন্দেহ অত্যন্ত গভীর। সুতরাং শীর্ষ সম্মেলনের মাথা কাটা যাওয়া এক হিসাবে ভারতবর্ষেরও অপকারসূচক।

খাদ্যবিষয়ে ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা

অনেকদিন আগে ভারত সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল সার জন মেগ (Megaw) মন্তব্য করিয়াছিলেন, ভারতের শতকরা পঁচিশ জন মাত্র লোক দুইবেলা উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য খাইয়া থাকে, আর শতকরা পঁচিশ জন কোনরূপে তাহাদের খাদ্যের সংস্থান করে এবং বাকী পঞ্চাশ জন পেট ভরিয়া খাওয়া দূরে থাক, খাদ্য সংগ্রহই করিতে পারে না।

তখন এদেশ ব্রিটিশের অধীন ছিল। আজ দেশ স্বাধীনতা লাভ করিয়া একযুগ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। ইহার মধ্যে দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু যে-হারে খাদ্যের উৎপাদন বাড়িয়াছে, তাহার তুলনায় দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে অনেক বেশী। এই কারণে বর্ত্তমানে দেশ-বিদেশ হইতে প্রভূত পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানি করা সত্ত্বেও দেশের গড়পড়তায় প্রতি ব্যক্তির ভাগে কম খাদ্য পড়িতেছে।

মেগ ধরিয়া লইয়াছিলেন, দেশের শতকরা পঁচিশ জন মাত্র ব্যক্তির স্বচ্ছল অবস্থা, যাহার ফলে তাহারা দুই-বেলা পেট ভরিয়া খাইবার মত খাদ্যের সংস্থান করিতে পারে। ইহার পর অনেক বৎসর চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমানেও যে স্বচ্ছল অবস্থার লোকের পরিমাণের কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে এমন মনে হয় না। কারণ ওয়াকি-বহাল ব্যক্তিদের মতে সরকারের কর্ম্মনীতির দোষে বর্ত্তমানে দেশে ধনসম্পদের অধিকারের তারতম্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে ও পাইতেছে। একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে গড়পড়তায় দেশের প্রতি ব্যক্তি বর্ত্তমানে যত কেলোরি খাদ্য পাইতেছে বলিয়া বলা হইতেছে, প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের অধিকাংশ ব্যক্তি তাহা অপেক্ষা কম পরিমাণ খাদ্য পাইতেছে। খাদ্য সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে খাদ্যের উৎকর্ষ। এদেশের অধিকাংশ ব্যক্তি খাদ্য অর্থে একমাত্র খাদ্যশস্যই বুঝিয়া থাকে। অথচ শরীর পুষ্টি ও শরীরকে কর্ম্মক্ষম রাখিতে হইলে প্রত্যেক ব্যক্তির ডাল, চিনি, শাকসব্জি, ফল, তৈল, ঘৃত ইত্যাদি স্নেহপদার্থ এবং ডিম মাছ দুধের প্রয়োজন। খাদ্যবিশেষজ্ঞদের মতে এজন্য প্রত্যেক ব্যক্তির প্রত্যহ ৩ আউন্স ডাল, ২ আউন্স চিনি অথবা গুড়, ৪ আউন্স শাকসব্জি, ৩ আউন্স ফল, ২ আউন্স স্নেহপদার্থ এবং ১টি করিয়া ডিম, ৩ আউন্স মাছ-মাংস ও ১০ আউন্স দুধের প্রয়োজন।

কিন্তু ভারতের খুব কম লোকই প্রয়োজনানুরূপ

পরিমাণে এইসব শ্রেণীর খাদ্য পাইয়া থাকে। অথচ ভারতে প্রায় দশ বৎসর ধরিয়া জাতীয় উন্নয়নের পরিকল্পনা লইয়া কাজ চলিতেছে। উহার মূল উদ্দেশ্য, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। আর এই জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন অর্থে ইহাই বুঝায় যে, জনসাধারণ বর্ত্তমানের তুলনায় অধিকতর পরিমাণে অধিকতর উৎকৃষ্ট খাদ্য পাইবে, তাহারা অধিকতর পরিমাণে বস্ত্র ব্যবহার করিবে এবং উন্নততর গৃহের অধিকতর স্থান লইয়া বসবাস করিবে। জীবনযাত্রার মান বলিতে এই তিনটিই মুখ্য বিষয়। উহার মধ্যে খাদ্যের গুরুত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; অন্যান্য বিষয় গৌণ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পরিকল্পনার খাদ্যের ব্যাপারটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপেক্ষিত। খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য বর্ত্তমানে চেষ্টা অবশ্য কিছু কিছু হইতেছে, কিন্তু সফল হইতেছে না। কেবল দেখা যাইতেছে বিদেশ হইতে শত শত কোটি টাকা মূল্যের খাদ্যশস্য আসিতেছে। কিন্তু যাহা আসিতেছে তাহা জনসাধারণের ভোগে লাগিতেছে না। অভিযোগ করিলে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে সেই একই উত্তর পাওয়া যায়—অধিক পরিমাণে মাছ, মাংস, ডিম্ব, দুধ ইত্যাদি খাও। তাঁহারা উপদেশ দিতেছেন, কিন্তু তাহার উৎপাদন বাড়াইবার কোন চেষ্টাই করিতেছেন না। অথচ একটু চেষ্টা করিলেই তাহার উৎপাদন বাড়ানো যায়। ইহার জন্য বিদেশী মুদ্রা বা বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয় না। দরকার একটু সংগঠনের। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহারই অভাব। সুতরাং ভারত যে অন্যান্য দেশের তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক খাদ্যাভাবক্লিষ্ট দেশে পরিণত হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি! স্মরণ রাখিতে হইবে, খাদ্য সম্বন্ধে ভারতের এই অবস্থা দেশের শাসনযন্ত্রের কর্ণধারদের সুনামের পরিচয় নয়। গ

গণতান্ত্রিক তুরস্কের পতন

গণতন্ত্র-তুরস্কের পতন হইল। পতন অবশ্য অনেকদিনই হইয়াছিল—কোনরূপে এতকাল ঠাট বজায় রাখিয়াছিলেন মাত্র। না হইলে এত শীঘ্র, একটা সামান্য হাওয়ায় এমন করিয়া ভাঙিয়া পড়ে কেন? একদা কামাল আতাতুর্ক এই তুরস্কে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সে আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। বুঝা যাইতেছে, বহুদিনব্যাপী অবক্ষয়ের ফলে তাহার প্রতিরোধ ক্ষমতা একেবারে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। না হইলে কয়েকজন মাত্র তরুণ ছাত্রদের বিক্ষোভেই ইহার পরিসমাপ্তি ঘটিত না।

ঘটনাপ্রবাহ পর্য্যালোচনা করিলে অবশ্য এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয় যে, ছাত্রেরা নিমিত্তমাত্র ছিল। জনগণের চিত্তে যে অসন্তোষ, যে বিরাগ পুঞ্জীভূত হইয়াছিল তাহাই তরুণ-সমাজের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। তাই নব্য তুরাণের জন্মদাতা কামাল আতাতুর্কের সহকর্ম্মী সৈন্যাধ্যক্ষ কামাল গুরসেলের পক্ষে তুর্কী জাতির ত্রাণকর্ত্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়াটা কঠিন হয় নাই—বিনা রক্তপাতেই তুরাণে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তুরস্কের অধিবাসীরা অবশ্য ইহাতে দলীয় কলহের হাত হইতে মুক্তি পাইয়া খুশীই হইয়াছে। ১৯৫৭ সনে যে নির্ব্বাচন হইয়াছিল, তাহাতে জয়লাভ করিয়াছিলেন শ্রীবেয়ার ও শ্রীমেণ্ডেরিসের ডেমোক্রাটিক দল। কিন্তু ইহা তাঁহাদের রাজনৈতিক দলের তৃতীয় বিজয়, সাত বৎসরে। বোধ হয়, এই যে একটানা জয়লাভ ইহাই তাঁহাদের পক্ষে কাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং এখানেই হয়ত বর্ত্তমান বিড়ম্বনার সূত্র পাওয়া যাইবে। দীর্ঘকাল নিরঙ্কুশ আধিপত্য গণতান্ত্রিক দেশে কখনও কল্যাণকর হয় না। কারণ ইহার ফলে ক্ষমতার শীর্ষে আসীন নেতৃবৃন্দের মনে একটা অহমিকা, একটা দাম্ভিকতা, একটা ক্ষমতামত্ততা জাগিয়া উঠে এবং জনগণের সহিত তাঁহাদের সংজ্ঞ সম্পর্ক লুপ্ত হয়—তা ছাড়া প্রতিকূল সমালোচনার প্রতি তাঁহাদের একটা অবজ্ঞার ভাব আসে। চোখের উপর তখন যে পর্দ্দা নামিয়া আসে, তাহাতে হয় সত্য তাঁহারা দেখিতে পান না, নয় তাহার এক অপ্রকৃত বিকৃতরূপ তাঁহাদের নজরে পড়ে। আত্মস্বার্থসিদ্ধি বা দলীয় সংহতি রক্ষাই তখন তাঁহাদের একমাত্র ধ্যানের বস্তু ও কর্ম্মের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। জনস্বার্থ তখন হয় উপেক্ষিত ও অবহেলিত। ইহাই হইয়াছিল ইরাকে, লেবাননে, পাকিস্থানে এবং দক্ষিণ-কোরিয়ায়। আজ আবার তাহার পুনরাবৃত্তি ঘটিল।

শ্রীকামাল গুরসেল তাঁহার বেতার-ভাষণে দেশবাসীকে জানাইয়াছেন, একনায়কত্ব স্থাপনের সংকল্প তাঁহার নাই। তাঁহার অভিপ্রায় কু-শাসনের অন্ত ঘটাইয়া দেশে সত্যকারের জনপ্রিয় সরকারের প্রতিষ্ঠা করা। তাহার জন্য গণতান্ত্রিক পথ হইতে বিচ্যুতি যদি ঘটে, তবে তাহা হইবে সাময়িক। তিনি গণতন্ত্রের পুনরুজ্জীবন গণতান্ত্রিক উপায়েই করিবেন। অর্থাৎ নিরপেক্ষ নির্ব্বাচনের পথে। নির্ব্বাচন যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় এবং জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধির হাতে যাহাতে শাসনকার্য্যের ভার অবিলম্বে ন্যস্ত হয়, তাহারই জন্য

সাময়িকভাবে পুরাতন শাসন-ব্যবস্থা রহিত করিয়া তিনি দেশের স্বার্থরক্ষার গুরুদায়িত্ব লইয়াছেন।

ঠিক অনুরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, ব্রহ্মদেশের জেনারেল নে উইন। তিনি শাসনভার স্বহস্তে লইয়াছিলেন শুধু নির্বাচন-পর্ব্ব নিরপেক্ষভাবে সুসম্পন্ন করিবার জন্য। নির্বাচন শেষ হইবার পর আবার তিনি সরিয়া দাঁড়ান। তুরস্কের সমর-নায়ক শ্রীগুরসেল সেই আশ্বাসই দিয়াছেন।

যাহা হউক, তুরস্কের অবস্থা দেখিয়া অনেক গণতন্ত্র রাষ্ট্রই শিক্ষালাভ করিবে। বিশেষ করিয়া, দীর্ঘকাল নিরঙ্কুশ আধিপত্য করিবার মোহ—ইহাতে অনেকেরই ভাঙিবে।　　গ

প্রকৃতির কোপে চিলি ও জাপান

বিজ্ঞানে বড়াই মানুস যতই করুক, প্রকৃতির কাছে তাহাকে হার মানিতেই হইবে। দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলস্থিত চিলি রাজ্যে যা ঘটিয়া গেল তাহাতে উহাই প্রমাণ করিবে। ভূমিকম্প, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, আগ্নেয়গিরি একই সঙ্গে রুদ্ররোষের মতো আসিয়া পড়িল চিলির বুকে। কিন্তু তাহাতেই উন্মাদিনী প্রকৃতির ক্রোধ প্রশমিত হইল না—প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়া সেই ক্রোধ গিয়া পড়িল জাপানের পূর্ব উপকূলে। ধাক্কা সহজ নয়—সমুদ্র-তলবর্ত্তী পৃথিবী আলোড়িত করিয়া, পর্ব্বত-প্রমাণ ঢেউ একের পর এক বিপুল বজ্রনির্ঘোষে অন্যূন কুড়িবার মূল ভূখণ্ডের পূর্ব্বপ্রান্তে আছড়াইয়া পড়ে। ইহার ফলে বহু গ্রাম, বহু নগর ধ্বংস হইয়া গেল। প্রাথমিক হিসাবেই অন্ততঃ আট শত লোক মারা গিয়াছে বলিয়া ধরা হইতেছে এবং আহত ও অন্নবস্ত্র আশ্রয়হীন হইয়াছে খুব কম করিয়াও চার-পাঁচ লক্ষ লোক। সেন্দাই অঞ্চলটি গুরুতররূপে বিধ্বস্ত হইয়াছে। এ ছাড়া, মনো-এশি, সিজু, কাওয়া প্রভৃতি অঞ্চলেও ঘর-বাড়ী, কল-কারখানা, শস্যক্ষেত্র কোনকিছুই আজ নজরে পড়ার মত অবস্থায় নাই। বহু এলাকায় গ্রামের পর গ্রাম জলমগ্ন হইয়া লোকালয়ের নামগন্ধ মুছিয়া গিয়াছে। বহু স্থান, বিশেষতঃ ছোট ছোট দ্বীপাঞ্চলে, শত শত লোক আটক হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের উদ্ধারের প্রশ্ন যেমন গুরুতর, তেমনি বিপজ্জনক এলাকা হইতে লোকজন অপসারণও মস্ত একটি সমস্যা। ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস জাপানে কোনো নূতন ঘটনা নয়। কিন্তু এবারের মতো সমুদ্রের অপর পার হইতে আলোড়ন আসিয়া তাহাকে এমন বিপুল ভাবে ইতিপূর্বে আর বিধ্বস্ত করে নাই। আসলে চিলির ঘটনাই সব চেয়ে অদ্ভুত। উপর্য্যুপরি কয়েকবার ভূ-কম্পনের ফলে নির্ব্বাপিত আগ্নেয় পর্ব্বতগুলি সক্রিয় হইয়া উঠিল এবং তাহা হইতে অগ্ন্যুৎপাত সুরু হইল। এবং সঙ্গে সঙ্গে সুরু হইয়া গেল তুফান।

এমন ত্রিমুখী বিপর্য্যয় স্মরণীয় কালের মধ্যে মানুষের মুল্লুককে কমই বিড়ম্বিত করিয়াছে। এই বিপর্য্যয়েরই প্রতিফলিত দোলা আসিয়া তিন দিন পরে ধাক্কা দিয়াছে জাপানকে এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অন্যান্য অঞ্চল-গুলিকে। ভূ-তাত্ত্বিকদের একটা সিদ্ধান্ত আছে যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম আমেরিকা পর্য্যন্ত প্রসারিত একটি সমুদ্র-নিহিত ভূকম্প-বলয় আছে। এই বলয়-সম্ভূত ভাঙনের ফলে পৃথিবীর এই অংশে কোন-দিন বৃহৎ একটি ভৌগোলিক পরিবর্ত্তন ঘটিবে। বর্ত্তমান ঘটনা কি তাহারই পূর্বাভাস?　　গ

আবার ইন্‌জেক্‌সন দেওয়ার ফলে মৃত্যু

ইন্‌জেকসন দিবার পর রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, এরূপ ঘটনা আজকাল প্রায়ই শুনা যাইতেছে। সম্প্রতি উত্তর কলিকাতায়—দেশবন্ধু পার্কের নিকট এক ব্যক্তি, নাম সুশীলকুমার মিত্র, যে ভাবে এবং যে অবস্থায় মারা গিয়াছেন, তাহা জনসাধারণের পক্ষে যেমনই উদ্বেগজনক তেমনি চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞদের পক্ষেও অনুসন্ধানযোগ্য। ঐ ব্যক্তিকে কলেরা হইতে সাবধানতার জন্য টি-এ-বি-সি ইন্‌জেক্‌সন দেওয়া হইয়াছিল। পাড়ার একজন এম-বি ডাক্তার এই ইন্‌জেক্‌সন দিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি ইন্‌জেক্‌সন গ্রহণের এক ঘণ্টার মধ্যেই নিদারুণ ভাবে অসুস্থ হইয়া পড়েন। এখানে উল্লেখযোগ্য তিনি অত্যন্ত সুস্থ ও সবলকায় ব্যক্তি ছিলেন—তাঁহার ঐরূপ হইবার কথা নয়। যাহা হউক, তাঁহাকে বেল-গাছিয়া আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। গত ২৯শে মে তিনি মারা যান।

ঘটনাটি যেমন নিদারুণ, তেমনি উদ্বেগজনক। কারণ এই আকস্মিক মৃত্যুর ফলে প্রশ্ন উঠে, কেন এমন হইল? আজকাল অনেক রকমের ইন্‌জেক্‌সন এত প্রচুর ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে এবং সরল বিশ্বাসে হাজার হাজার নরনারী এত রকমের টীকা ও ইন্‌জেক্‌সন লইতেছেন যে, এই ধরনের দুর্ঘটনা স্বভাবতঃই জনচিত্তে অত্যন্ত সন্দেহ ও অবিশ্বাস জাগাইয়া তুলিবে। ইহার পর ইন্‌জেক্‌সন লইতেও অনেকে ভয় করিবে। ইহা

স্বাভাবিক। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন এবং বেলগাছিয়া আর.জি. কর মেডিক্যাল কলেজের কর্তৃপক্ষের নিকট আমরা আবেদন করিতেছি, যেন তাঁহারা ইহার সম্পূর্ণ তদন্ত করেন এবং কোন সত্য না চাপিয়া, এ-বিষয়ে একটি প্রামাণিক রিপোর্ট দেন যাহাতে লোকের মন হইতে আতঙ্ক দূর হয়। না হইলে সন্দেহ একটা থাকিয়াই যাইবে।

গ

ভারতে লোক-গণনার প্রাথমিক আয়োজন

আগামী ১৯৬১ সনে ভারতবর্ষে নূতন করিয়া লোক-গণনা সুরু হইবে। আয়োজন ইহার মধ্যেই সুরু হইয়া গিয়াছে শুনা যাইতেছে। তবে এবারের আয়োজন দেখিয়া মনে হইতেছে, বেশ সমারোহ করিয়াই এবারের গণনা-কার্য্য সম্পন্ন হইবে। শুনিতেছি, লোক-গণনার জন্য যে সমস্ত স্লিপ, ফর্ম্ম প্রভৃতি দরকার হয়, তাহা ছাপাইতে নাকি দুই হাজার টনের বেশী কাগজ প্রয়োজন হইবে। কলিকাতা, আলিগড় এবং নাসিকে অবস্থিত তিনটি সরকারী ছাপাখানায় এই সমস্ত কাগজপত্র ছাপা হইতেছে। মাসখানেকের মধ্যেই ছাপার কাজ শেষ হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। যাঁহারা লোক-গণনার কাজে নিযুক্ত হইবেন তাঁহাদের সংখ্যা নাকি হইবে দশ লক্ষের কাছাকাছি। এই সকল কর্ম্মচারীকে যে পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে তাহার আনুমানিক হারও প্রকাশিত হইয়াছে। গণনা-করা নর-নারীর জন্য মাথা-পিছু সাড়ে তিন নয়া পয়সা গণনাকারীদিগকে পারিশ্রমিকরূপে দেওয়া হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে। তথাপি গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে গণনাকারীদিগকে প্রদত্ত পারিশ্রমিকের মোট পরিমাণ নাকি দেড়-কোটি টাকা ছাড়াইয়া যাইবে।

এখন কথা হইতেছে, মোট টাকার পরিমাণ যাহাই হউক, লোকপিছু কত পড়িতেছে? সরকার হয়ত অন্য বাবদে বিপুল অর্থ ব্যয় করিতে কৃপণতা করিবেন না, কিন্তু মুঠি খুলিবে না শুধু লোককে খাইতে দিবার বেলায়! ফাঁকির পথ তাঁহারাই রচনা করিয়া যাইতেছেন। শুনিতেছি ফেব্রুয়ারীর ১০ই হইতে মার্চ্চ মাসের ৩রা পর্য্যন্ত এই গণনাকার্য্য চলিবে। এখনও সময় আছে, ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে এই প্রধান দিকটির প্রতি সরকারকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

গ

বিনোবাজীর নূতন অভিযান

আচার্য্য বিনোবা ভাবে 'ভূদান যজ্ঞ' হইতে সহসা বর্ত্তমানে যে দুরূহ কাজে নামিয়াছেন, তাহা অতীব বিস্ময়কর। বিনোবাজীর উদ্দেশ্য, ভারতবর্ষের এক সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলকে তিনি দস্যুভয় হইতে মুক্ত করিবেন। কত বড় ব্যক্তিত্ব এবং কতখানি মনের জোর থাকিলে এরূপ কথা দৃঢ়তার সহিত বলা যায়—এ-কথা ভাবিতেও বিস্ময় লাগে। অনুরূপ সঙ্কল্প লইয়া অগ্রসর হইতে একমাত্র গান্ধীজীকেই আমরা দেখিয়াছি। আজ দেখিতেছি, সেই শক্তি বিনোবাজীও অর্জ্জন করিয়াছেন।

বিনোবাজী অহিংসার সাধক। সুতরাং অহিংসার সাহায্যেই তিনি হিংসাকে পরাস্ত করিতে চাহিয়াছেন। সেই অহিংসা, প্রেম এবং শান্তির বাণী লইয়া তিনি এখন মধ্যপ্রদেশের দস্যুভয়পীড়িত অঞ্চলগুলিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। উদ্দেশ্য, হৃদয়ের পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াই সেই মানুষগুলিকে তিনি অন্য পথে ফিরাইয়া আনিবেন। সকলের মনেই সংশয় ছিল। সংশয় ছিল বিনোবাজীর অনুসৃত এই শান্তি-নীতির ঔচিত্য সম্পর্কেও। অনেকেই বলিতেছিলেন, দস্যুতার অবসান ঘটাইবার জন্য বিনোবাজী যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে দস্যুতা তো হ্রাস পাইবেই না বরং আরক্ষা-ব্যবস্থার দুর্ব্বলতা আরও প্রকট হইয়া উঠিবে। এবং দস্যুদের অত্যাচার শতগুণে বৃদ্ধি পাইবে। ইহা ছাড়া, বিনোবাজীর বর্ত্তমান পরিক্রমা সম্পর্কে নীতিগত কিছু কিছু আপত্তিও কেহ কেহ তুলিয়াছেন।

বিনোবাজী যখন মধ্যপ্রদেশে প্রবেশ করেন, তখন এই সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল যে, চম্বল উপত্যকার দস্যু-দলের অত্যাচার হয়ত অনতিকালের মধ্যেই আরও তীব্র হইয়া উঠিবে। বিশেষ করিয়া দস্যু লক্ষণ সিং সম্পর্কে তখন এই আতঙ্কের গুজব রটিয়াছিল যে, সে কাহাকেও ভয় করে না—ইহা বিনোবাজীকে সমঝাইয়া দিবার জন্য সে নাকি সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে।

প্রতীক্ষা সে করিয়াছিল, কিন্তু আশঙ্কা সত্য হয় নাই। বিনোবাজীর আগমনে যাদুমন্ত্রের মত সব কিছুরই বদল হইয়া গেল। চম্বল উপত্যকার দুর্দ্ধর্ষ এগারজন দস্যু আসিয়া বিনোবাজীর কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। সংবাদটি উৎসাহিত হইবার মত। বিশেষ, দস্যুদলের এই নিঃসর্ত্ত আত্মসমর্পণই প্রমাণ করে যে, দস্যুতা দমনের জন্য বলপ্রয়োগের নীতির পরিবর্ত্তে বিনোবাজী যে প্রেম এবং অহিংসার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা ব্যর্থ হয় নাই। গান্ধীজীও যে ভাবে মানুষের শুভবুদ্ধির কাছে

আবেদন জানাইয়া জয়যুক্ত হইয়াছিলেন, মানুষের মনুষ্যত্বের উপর আস্থা অবিচল রাখিয়া বিনোবাজীও ঠিক সেই ভাবেই জয়যুক্ত হইয়াছেন।

কিন্তু কথা হইতেছে, শুধু দস্যুদলই তো নয়, অগণিত ভূস্বামী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তির সহিত ইহাদের যোগাযোগ রহিয়াছে—তাঁহারাই ইহাদিগকে পোষণ ও প্ররোচিত করেন। সেই প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে? তথাপি বলিব, বিনোবাজীর এই অসামান্য সাফল্য আমাদের উৎসাহিত করিয়াছে। এখন আশা করা যায়, বিনোবাজীই একদিন হয়ত দেশের বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন আনিতে সক্ষম হইবেন। এখানে এ-কথাও বলা উচিত যে, ঐ অঞ্চলের সশস্ত্র পুলিস ও আরক্ষী দলের দীর্ঘকালব্যাপী দস্যু-দমন-অভিযান বিনোবাজীর শান্তি অভিযানের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিল। গ

স্কুলের সেসন আবার জানুয়ারীতে

অবশেষে জানুয়ারীতেই পশ্চিমবঙ্গ স্কুলসমূহের শিক্ষা-বৎসর প্রবর্তন করার পক্ষে মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ মত দিলেন। আগামী ১৯৬১ সন হইতেই এই পরিবর্তন কার্য্যে পরিণত করা হইবে। এই পরিবর্তন আরও একবার করা হইয়াছিল। বার বার এইরূপ রদবদলে বুঝা যাইতেছে, ইহাদের মধ্যে স্থিরমস্তিষ্ক ব্যক্তি একটিও নাই। তবে এবারে বলা হইয়াছে, হঠাৎ এই পরিবর্তনের ফলে ছাত্রদের পঠন-পাঠনের সময় দুই-তিন মাস কমিয়া যাইবে। সুতরাং আগামী বৎসরের জন্য ফেব্রুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহ পার করিয়া স্কুলের শিক্ষা-বৎসর সুরু করা হইবে। পর বৎসর হইতে যথারীতি জানুয়ারী হইতে সেসন আরম্ভ হইবে।

সর্বভারতে স্কুল সেসন আরম্ভের একটা সময়গত সমতাবিধান এবং পাঠ্য তালিকায় সামঞ্জস্য আনয়ন নীতির দিক দিয়া প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রায় দেড় শত বৎসর ধরিয়া ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে স্কুলের পঠন-পাঠনে যে বিশেষ বিশেষ নিজস্ব ধরনগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে, রাতারাতি তা পাল্টাইয়া একটা নূতন কিছু করা সমীচীন কি না, অথবা এজন্য ধীরে সুস্থে ভাবিয়া চিন্তিয়া তবেই কাজে হাত দেওয়া শ্রেয় কিনা, সে কথা অনুধাবন করার মত ধৈর্য্য ও মানসিকতা যাঁহাদের নাই, দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের হাতেই আজ বাংলা দেশের শিক্ষার ভবিষ্যৎ ন্যস্ত হইয়াছে। তাই কয়েক বৎসর একাদিক্রমে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রভূত ক্ষতিসাধন করিয়া এবং শিক্ষক, ছাত্র, গ্রন্থকার, প্রকাশক সকলকে চরম অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলায় ফেলিয়া সংস্কারের নামে যাহা খুশী তাহাই করিতেছেন। একবার রেলগাড়ীর ক্লাস লইয়া এই পাগলামির খেলা চলিয়াছিল। বেশ কয়েক কোটি টাকা খেসারত দিবার পর মাথা ঠাণ্ডা হইল। আসলে ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে—ইংরেজের হাত হইতে আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি, যাহার ফলে আমরা সবকিছুই বদল না করিতে পারিলে মনে স্বস্তি পাই না। অর্থাৎ যেখানে যা আছে, তাহা ভাঙিয়া-চুরিয়া মুহূর্তে বদল করিয়া স্বকীয় মৌলিকতা ও উদ্ভাবনী প্রতিভার স্বাক্ষর রাখিয়া যাইতে চাই। ষোল আনার টাকায় চলিবে না, দশমিক মুদ্রাব্যবস্থা রূপান্তরিত হইল। সের-পোয়া-ছটাকের ওজন বাতিল করিয়া মেট্রিক ওজন আসিল। দশ ক্লাসের হাই স্কুল ও চার ক্লাসের ডিগ্রী-কলেজ তুলিয়া দিয়া, স্কুলে একটি ক্লাস বাড়ান হইল এবং কলেজে একটি কমানো হইল।

এই যা-খুশী করিবার মৌলিকতার পাল্লায় পড়িয়া সারা দেশ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে সুরু করিয়াছে। বদল আবার ও ভাঙিবে। সেরূপ সূচনাও দেখা দিয়াছে। এগারো ক্লাসের হাই স্কুলের পরিকল্পনা হয়ত শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থই হইবে। কারণ এত করিয়াও এ পর্য্যন্ত পাঁচ শতের বেশী হাই স্কুল এগারো শ্রেণীতে উন্নীত হয় নাই। সুতরাং আর এক দফা টাকার শ্রাদ্ধ হইবে। তবে আমাদের উতলা হইলে চলিবে না; সরকারকে বুঝিবার সময় দিতে হইবে—তাঁহারা দেরিতে বুঝেন। গ

ট্রাম-কোম্পানীর অব্যবস্থায় যাত্রিদের দুর্ভোগ

কলিকাতায় লোকসংখ্যা যেরূপ বাড়িয়াছে, সেই অনুপাতে তাহাদের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের সংখ্যা বাড়ে নাই। শুনিতেছি ষ্টেট-বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে। কিন্তু কবে হইবে তাহা তাঁহারা জানান নাই। সুতরাং দুঃখ মানুষকে ভোগ করিতেই হইতেছে। স্বানাভাবে প্রায় লোককেই ট্রামে-বাসে ঝুলিতে দেখা যায়। ইহার ফলে দুর্ঘটনাও কম হয় না। বিশেষ করিয়া ট্রাম-কণ্ডাক্টারদের অসাবধানতায়ই এই দুর্ঘটনা হইয়া থাকে। যাত্রিদের নামিবার অবকাশ দেওয়া হয় বটে, কিন্তু উঠিবার দিকে লক্ষ্য রাখা হয় না। অভিযোগ করিয়াও, ইহার প্রতিকার হয় নাই। বর্তমানে আবার তাহাদের নূতন নিয়মে গাড়ির ষ্টপগুলি—হয় কোথাও দূরে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে, না হয় একেবারে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এরূপ ব্যবস্থা কেন করা হইল, ইহা আমাদের জানিবার কথা নয়, কিন্তু যাত্রিদের সুবিধার

দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস অর্থনীতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে আমাদের স্মরণীয় কাজ যাহা হইয়াছে, তাহা ইংরেজীতেই এবং ইহা লজ্জারই কথা।

সেই লজ্জা আমাদের দূর করিতে হইবে। বাংলা ভাষাকে সকল প্রকার জ্ঞানের বাহন করিয়া তুলিতে হইবে, সর্ব্ববিভাগের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধ্যান-ধারণার বার্ত্তা বাঙালীর মানস-লোকে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে বাংলা ভাষার মাধ্যমে। তবেই বাঙালীর মননশীলতা সমুন্নত হইবে, উচ্চ-শিক্ষিতের শিক্ষার স্তর উচ্চতর হইবে এবং মধ্য ও নিম্ন-শিক্ষিতের বিদ্যা-বুদ্ধির পরিধিও প্রশস্ততর হইবে। বাস্তবিকই এ কি দুর্ভাগ্যের কথা যে, কোন মাহুষ চিন্তা, অনুভূতি ও বিচার-শক্তির পূর্ণ সঞ্চয় থাকা সত্ত্বেও, কেবলমাত্র ইংরেজী না জানার জন্যই বিশ্বের প্রধান প্রধান পণ্ডিতদের জ্ঞান-গরিমার কোন কথা জানিতে পারিবেন না। এমনকি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মহত্তর জ্ঞানলাভের সুযোগও তিনি কমই পাইবেন। পৃথিবীতে এমন দুর্ভাগ্য ও বিড়ম্বনা কোন দেশের মানুষই কখনো ভোগ করেন নাই। ইউরোপের বৃহৎ দেশগুলির কথা ছাড়িয়াই দিতেছি, বল্‌কান মুলুকের বা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার ছোট ছোট দেশগুলিও স্ব স্ব মাতৃ-ভাষায় বিশ্বের সমস্ত জ্ঞান যথাশক্তি আনিয়া সঞ্চয় করিয়াছেন। শিক্ষা দান ও গ্রহণে বা আবিষ্কার, গবেষণা ও সংস্কৃতি বণ্টনে মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষার প্রতিপত্তির কথা ত ভাবিতেই পারেন না। আমরাও চেষ্টা করিলে, অনায়াসে তাহা করিতে পারি। বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ ভাষা, বিপুল পরিমাণ ঐশ্বর্য্য তাহার সঞ্চিত হইয়াছে, তবে আমরা পারিব না কেন?

তথাপি ইহা বার বার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইতেছে। ইহার কারণ, আন্তরিকতার অভাব। বাংলা দেশের সরকারী কর্ম্মকাণ্ড অদ্যাবধি ইংরেজীতে নির্ব্বাহিত হইতেছে। আদালতে, ডাকঘরে, রেল-ষ্টেশনে, থানায়, বন্দরে, কোথাও ইংরেজী না-জানা মানুষের মুরুব্বি না ধরিয়া এক পদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই। ইহার অর্থই হইল, যে ইংরেজী জানে না সে মনুষ্যপদবাচ্যই নয়—তাহাকে ইংরেজীওয়ালাদের পদানত হইয়া থাকিতেই হইবে। কোন স্বাধীন দেশে জাতীয় মর্য্যাদার দিক হইতে এত বড় অপমানকর রীতি আর কিছু নাই। এখন দাঁড়াইয়াছে অনেকটা স্বার্থের ব্যাপার। ইংরেজী না-জানা লোক তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিবে ইহা কি করিয়া সহ্য করা যায়? তাই ইংরেজী ভাষার আশ্রয়টা হইয়াছে যেন একটা কায়েমি-স্বার্থের ব্যূহ বিশেষ। এই ব্যূহ ভেদ করিতেই হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সে কাজে অগ্রণী হইলে, গোটা দেশের সমর্থন তাঁহাদের পিছনে থাকিবে। এ কথার অর্থ এই নয় যে, আমরা ইংরেজী শিখিব না। আন্তর্জ্জাতিক ও সর্ব্বভারতীয় ক্ষেত্রে ইংরেজীর প্রয়োজন আছে বলিয়াই তাহা শিখিব। কিন্তু ইংরেজী আমাদের জাতীয় শিক্ষার বাহনও হইবে না, রাজ্য-সরকারের ভাষাও হইবে না। গ

এভারেষ্ট অভিযাত্রিদলের সাফল্য

এভারেষ্ট জয় করিবার জন্য যে ভারতীয় দলটি এবারে অভিযান সুরু করিয়াছিলেন, জয়ের শেষ মুহূর্ত্তে তাঁহারা তাঁহাদের যাত্রা স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহারা দারুণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ২৭,৬০০ ফুট উচ্চে উঠিয়া সপ্তম শিবির স্থাপন করেন, এবং সেখান হইতে ২৮,৩০০ ফুট উচ্চে আরোহণও করিয়াছিলেন, কিন্তু আকস্মিক বর্ষা আসিয়া পড়ায় তাঁহাদের নামিয়া আসিতে হয়।

এই অসাফল্যের মধ্যেও আমরা তাঁহাদের স্বাগত জানাই। সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়দের লইয়া গঠিত দলটির এভারেষ্ট অভিমুখে যাত্রা এই প্রথম। শুধু তাহাই নয়, এই দলের সদস্যদের পরিচ্ছদ এবং পর্ব্বতারোহণের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সরঞ্জাম ভারতে প্রস্তুত। এক কথায় অভিযাত্রী দলটি ছিল ষোল আনা ভারতীয়। ইহাই তাঁহাদের কৃতিত্ব। গিরিশৃঙ্গের পদপ্রান্ত হইতে তাঁহাদের বাধ্য হইয়া ফিরিতে হইল বটে, তবুও তাঁহাদের প্রচেষ্টা অসামান্য। ইহা সাফল্যেরই নামান্তর। ইহার পূর্ব্বে বহু অভিজ্ঞ পর্ব্বতারোহী প্রতিকূল অবস্থায় এভারেষ্টে পৌঁছিবার প্রয়াস ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সুতরাং ভারতীয় দলের এই অসাফল্য তাঁহাদের পক্ষে অগৌরবের নহে।

এই সংবাদটি পরিবেশিত হইবার অব্যবহিত পরেই আর একটি সংবাদে দেখিতেছি, একটি চৈনিক অভিযাত্রিদল উত্তর দিক হইতে এভারেষ্টে পৌঁছিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে ১৯৫৩ সনে সার জন হাণ্টের নেতৃত্বে সার এড্‌মাণ্ড হিলারী ও শেরপা তেনজিং এভারেষ্টে পৌঁছিয়াছিলেন। ১৯৫৬ সনে একটি সুইস দলও এভারেষ্টে পৌঁছান। পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গে মানুষের পদার্পণ এই তৃতীয়বার। কিন্তু সকলেই দক্ষিণ দিক হইতেই অভিযান চালাইয়াছেন; উত্তর দিক হইতে অভিযান এই প্রথম। যাই হোক, চৈনিক-বাহিনীর এই সাফল্য প্রশংসনীয়—অবশ্য যদি সংবাদ সত্য হয়।

তবুও তাঁহাদের এই সাফল্য লইয়া একটি প্রশ্ন

উঠিয়াছে। প্রশ্নটি হইল, সীমান্ত সম্পর্কিত। কথাটি উঠিয়াছে নেপাল হইতে। গত এপ্রিল মাসে চীনা প্রধানমন্ত্রী মিঃ চৌ এন-লাই যখন কাঠমণ্ডুতে যান, তখন এই সম্পর্কে কোনও মীমাংসা হয় নাই। নেপালের বিনা অনুমতিতে এভারেষ্ট অভিমুখে চীনের অভিযাত্রী বাহিনী প্রেরণে এবং সে গিরিশৃঙ্গে তাঁহাদের সাফল্যজনক আরোহণে নেপালের সার্ব্বভৌমত্ব লঙ্ঘিত হইয়াছে বলিয়া নেপালের এক শ্রেণীর রাজনীতিকদের অভিমত। তাঁহারা মনে করেন, চীন এই ভাবে এভারেষ্টে তাহার অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। গত এপ্রিল মাসে নেপালের প্রধানমন্ত্রী কৈরালার সহিত আলোচনার সময় চৌ এন-লাই প্রথমে এভারেষ্টের উপর চীনের দাবির কথা উল্লেখ করেন। এই দাবি প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় এভারেষ্ট শৃঙ্গকে চীন ও নেপালের মধ্যবর্ত্তী সীমানা বলিয়া গ্রহণের প্রস্তাব করা হয় এবং বলা হয় যে, ভবিষ্যতে কোনও অভিযাত্রী দলকে এভারেষ্ট অভিমুখে প্রেরণ করিতে হইলে, নেপাল ও চীন দুইটি দেশের নিকট হইতেই অনুমতি লইতে হইবে। কিন্তু নেপাল এই প্রস্তাবে সম্মত হয় না। এভারেষ্ট সম্পর্কে চীনের দাবির সমর্থনে এই যুক্তি দেখান হয় যে, উত্তর দিকে ১৭ হাজার ফুট উঁচুতে রংবুক মঠটি সর্ব্বদাই তিব্বতের প্রভুত্বাধীন ছিল। আবার নেপালের পক্ষ হইতেও বলা হয় ঐ পর্ব্বতগাত্রের কুম্ভ তুষার নদের দক্ষিণে অবস্থিত মঠটি চিরদিনই নেপালের কর্ত্তৃত্বাধীন। যাহা হউক, দুই পক্ষের পরস্পর-বিরোধী দাবির কোনও সঙ্গত মীমাংসা হয় নাই। এই সময় চীনা অভিযাত্রী-বাহিনীর এই সাফল্যজনক এভারেষ্ট-আরোহণের সমস্যাটি নূতন ভাবে ও জটিল আকারে উপস্থাপিত হইল এবং নেপালে অসন্তোষ ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল। কৈরালা গবর্ণমেণ্ট চীনের সহিত সদ্ভাব রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। তবে আশঙ্কা হইতেছে, এই ব্যাপার লইয়া না ভবিষ্যতে চীন-নেপাল সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

কিন্তু আমাদের কথা হইতেছে যে, ব্যাপারটা যখন শুধুই স্পোর্ট ছিল তখন কোনো গোল ছিল না, কিন্তু আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক এই অভিযানকে কিঞ্চিৎ সামরিক তাৎপর্য্যও দিয়াছে—জটিলতা সেইখানেই। চীনের আশা কেবল উচ্চ নহে, বিস্তৃতও—একথা জানিতে আজ বাকি নাই—জানাইতে বাকি তাহারাও রাখে নাই। এভারেষ্ট অভিযান যদি তাহাদের লক্ষ্যই ছিল, তবে কাজটা এমন চুপি চুপি আরম্ভ করিল কেন, ইতিমধ্যেই এই সন্দিগ্ধ প্রশ্ন উঠিয়াছে। নেপালের অনুমতি তাহারা লয় নাই—আপত্তি উঠিয়াছে সেইখানেই। এই সংশয় বা ভয় একা নেপালেরই নহে। কতকটা এক-তরফা ডিক্রীর জোরে চীন এভারেষ্টকে খাস তালুক করিয়া লইতে চাহিতেছে এমন অভিসন্ধির কথা অনেকেই ব্যক্ত করিয়াছেন। গ

প্যারিসে পুনরায় বৈঠক সম্পর্কে শ্রীনেহরু

শীর্ষ সম্মেলন ভাঙিয়া যাওয়া এবং পুনরায় সেই বৈঠক বসাইবার চেষ্টা সম্বন্ধে শ্রীজবাহরলাল নেহরু পুণায় নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, প্যারিসে শীর্ষ সম্মেলন বসিবার আগে এবং পরে যাহা কিছু ঘটিয়াছে, তাহার ফলে অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন, মার্কিন-গোয়েন্দা-বিমান কর্ত্তৃক সোভিয়েট আকাশ-সীমা লঙ্ঘন আন্তর্জ্জাতিক আইনের বিরোধী এবং তাহার ফলেই শীর্ষ সম্মেলনের ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়া গেল এবং সম্মেলন ভাঙিয়া গেল। এবং তার পর সুরু হইল, পারস্পরিক ব্যক্তিগত আক্রমণ। শ্রীনেহরুর মতে যে-সমস্ত ব্যক্তি এক-একটি রাষ্ট্র ও জাতির প্রতিভূ ও প্রতিনিধিরূপে পরিচিত, তাঁহাদের এরূপ আচরণ এই ব্যাপারের সবচেয়ে শোচনীয় দিকরূপে প্রতিভাত হইবে। শ্রীনেহরু ভারতবর্ষের দিক হইতে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলিয়াছেন। সেটি হইল, ভারতবর্ষ গায়ে পড়িয়া শীর্ষ সম্মেলনের মধ্যে নাক ঢুকাইতে চাহে না। কিন্তু ভারতবর্ষের দিক হইতে একটি বিষয় অত্যন্ত পরিষ্কার এবং তাহা এই যে, পৃথিবীর তিনটি বা চারটি রাষ্ট্রশক্তি একত্রে বসিয়া সারা পৃথিবীর ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। কারণ সমস্যাগুলি সকলের সহিত পরস্পর যুক্ত। যেমন, উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব। এই প্রস্তাব সম্পর্কে ভারতবর্ষেরও কিছু বলিবার থাকিতে পারে। অবশ্য বৃহৎশক্তিগুলি প্রেরণা দিতে পারেন, অনেকদূর আগাইয়াও যাইতে পারেন, কিন্তু সমস্যার মীমাংসা তাঁহারা একা-একা করিতে পারেন না।

শ্রীনেহরু যুক্তিসঙ্গত কথাই বলিয়াছেন। কারণ, নিরস্ত্রীকরণ এমন একটা জিনিস, যার সঙ্গে আধুনিক কালের সমস্ত ছোট-বড় রাষ্ট্রেরই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। তবে সেই সঙ্গে একথাও সত্য যে, সোভিয়েট রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রপ্রমুখ শক্তিপুঞ্জ, যাঁহাদের হাতে এটম ও হাইড্রোজেন বোমা রহিয়াছে এবং যাঁহারা দুনিয়াকে অনায়াসে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষ হইতেই নিরস্ত্রীকরণের প্রথম প্রস্তাব ও প্রথম প্রেরণা

আসা উচিত। সৌভাগ্যক্রমে সোভিয়েট রাশিয়ার এবং পৃথিবীর বহু চিন্তাশীল রাষ্ট্রনায়ক এটম্ ও হাইড্রোজেন অস্ত্রাদি নিষিদ্ধকরণ এবং অন্যান্য অস্ত্রও ব্যাপকভাবে হ্রাস করিবার জন্য গত পাঁচ-ছয় বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত আন্দোলন, চেষ্টা ও প্রস্তাব করিয়া আসিতেছেন। গ

পিতা কর্ত্তৃক পুত্র হত্যা

সুন্দরবন অঞ্চলের এক চাষী-গৃহস্থ—নাম তার প্রভুদান দলুই, তাঁহার দুই পুত্রকে নোড়ার আঘাতে হত্যা করিয়াছেন। আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ তাঁহাকে সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। যথাক্রমে নয় ও সাত বৎসর বয়স্ক দুইটি পুত্রকে দিনের পর দিন খাইতে দিতে না পারিয়া হতভাগ্য পিতা দুঃখে-ক্ষোভে উন্মাদ হইয়া দুই-দুইটি পুত্রকে শমন-সদনে পাঠাইয়া ক্ষুধার দায় হইতে চির-নিষ্কৃতি দেন।

ঘটনা হিসাবে ইহা মর্ম্মান্তিক। অপত্যস্নেহ এমনি জিনিস যে, ইহা কোন শিক্ষার অপেক্ষা রাখে না, কোন উপদেশেরও ধার ধারে না। নিজ জীবন বিপন্ন করিয়াও সে তাহার সন্তানদের জীবনরক্ষার চেষ্টা করেন, নিজে না খাইয়াও তাহাদের মুখে অন্ন তুলিয়া দেন। সেই পিতা স্বহস্তে পুত্র হত্যা করিতেছে—ইহা মনুষ্যত্বের সোপান হইতে স্খলিত হইয়া পিশাচে পরিণত না হইলে পারে না। কিন্তু সুস্থ ও সমাজবদ্ধ সাধারণ মানুষই হিংস্র পিশাচ হইয়া উঠেন, যখন তিনি দেখেন, জীবনধারণের আর কোন অর্থই হয় না—সমস্ত আশা,সব আলো নিভিয়া গিয়াছে, বাঁচিয়া থাকা ও মরার মাঝখানে ক্ষীণ সীমা-রেখাটুকুও গিয়াছে নিঃশেষে মুছিয়া, তখন নিজে মরা ও অন্যকে মারা কোনটাই তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নয়।

আইনের চোখে হতভাগ্য পিতা অবশ্যই অপরাধী এবং আদালত তাঁহাকে আইনানুমোদিত দণ্ডই দিয়াছেন। কিন্তু আদালতের বাহিরে—মানুষ যেখানে দরদ দিয়া ভাবিতে যাইবে সেখানে দুই ফোঁটা চোখের জল না ফেলিয়া পারিবে না।

ঘটনাটি আদালত পর্য্যন্ত আসিয়াছে এবং সংবাদ-পত্রেও ইহা প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়াই সকলের নজরে পড়িল। না হইলে খাদ্যাভাবে হত্যা, আত্মহত্যা, সন্তান-বিক্রয়, চুরি, ডাকাতি এ ত নিত্যই লাগিয়া আছে। যে দেশে পঁচিশ-ত্রিশ টাকার কমে চাউল মেলে না, তিন টাকা মাছের স্থায়ী দর, কাপড়ের জোড়া দশ-বারো টাকা—আবার প্রতি পাঁচজনের মধ্যে তিনজন বেকার, সে দেশে ইহা ঘটিবে না ত কোথায় ঘটিবে? উন্নয়ন পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ সুখের স্বপ্ন দেখাইয়া আর কতকাল চলিবে? যাহাদের পেটে ভাত জুটে না, পরনে কাপড় মেলে না, রোগে ঔষধ আসে না, তাহারা মরিয়া হইয়া ত উঠিবেই। তাই সে মরিয়া বা মারিয়াই প্রমাণ করিয়া দেয়, এ-দেশে বাঁচিয়া থাকাটাই নিতান্ত আকস্মিক!

প্রায় একই সঙ্গে আর একটি ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। আসামের চা-বাগান হইতে চাকরী ও স্ত্রী দুই খোয়াইয়া রামদাস কলিকাতায় আসেন তাঁহার ছয় বৎসরের পুত্রকে লইয়া এবং গ্রে ষ্ট্রীটের ফুটপাতে আস্তানা পাতেন। এই পথেই ক্ষুধার্ত্ত পুত্রের আর্ত্ত-ক্রন্দনে অস্থির হইয়া একদিন তিনি তাহাকে পা ধরিয়া শানে আছড়াইয়া তাহার ভবযন্ত্রণার শেষ করেন। প্রভু-দানের মত রামদাসও অপরাধ অস্বীকার করেন নাই, পালাইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন নাই। ধৃত হইয়া সরলভাষায় তিনি বলেন, "খাইয়া বাঁচিয়া থাকিবার মত কোন খাদ্য নাই এবং কিনিয়া খাইবার মত পয়সাও নাই। এ ভাবে বাঁচাইয়া রাখায় লাভ কি? আমি তাই উহাকে হত্যা করিয়া মুক্তি দিয়াছি।"

এই উক্তির পিছনে যে কি কান্না লুকাইয়া আছে, যাঁহার প্রাণ আছে তিনিই উপলব্ধি করিবেন। কিন্তু শুধু কি কান্নাই? আমরা দেখিতেছি, তাঁহার এই উক্তির মধ্যেই রহিয়াছে নীরব অভিসম্পাত। এ অভিসম্পাত রাষ্ট্রের প্রতি, সমগ্র মানব-সমাজের প্রতি।

এত বড় ঘটনায় সরকারের চৈতন্য হবে কিনা জানি না, আমরা কিন্তু লজ্জায় মরিয়া যাইতেছি। আমরা অপদার্থ অচেতন বলিয়া নিশ্চিন্ত আছি। কিন্তু ইতিহাসের দেবতা ঘুমাইয়া নাই! গ

নলকূপ মেরামতে ঔদাসীন্য

বালীর 'সাধারণী' পত্রিকা নিম্নোক্ত সংবাদটি পরিবেশন করিয়াছেন—

"বালী পৌরসভার বর্ত্তমান শাসন-কার্য্যের বিশৃঙ্খলা, অব্যবস্থা ও কর্ত্তৃপক্ষগণের অযোগ্যতা, অক্ষমতার কথা বলে শেষ করা যায় না এবং বলেও বিশেষ কোন ফল হয় বলে মনে হয় না। আমরা ইতিপূর্বে বহু গুরুত্বপূর্ণ, জরুরী জনকল্যাণকর বিষয়ের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি এবং ক্ষেত্র বিশেষে জনসাধারণের দুঃখ ও দুর্ভোগ লাঘবের জন্য গঠনমূলক প্রস্তাবও দিয়েছি। কিন্তু ক্ষমতা-মত্ত, আত্মতৃপ্ত, স্বার্থমগ্ন কর্ত্তৃপক্ষগণ নির্বিকার—যে কর-দাতাগণের অর্থে তাঁরা কর্ত্তৃত্ব করছেন তাঁদেরই স্বার্থের প্রতি, অভাব অভিযোগের প্রতি চরম ঔদাসীন্য ও অবহেলা প্রকাশ করে আসছেন। পৌরসভার বহুবিধ কার্য্যাবলীর মধ্যে শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, পানীয় জল সরবরাহ,

সাফাই প্রভৃতি কার্য্যগুলিই সর্বাপেক্ষা প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু যতদূর জানা যায় যে, এই বিভাগগুলিই সর্বাপেক্ষা অবহেলিত—বোধ হয় যেন নিয়ম রক্ষার জন্য রাখা হয়েছে।

"আপাততঃ অন্যান্য কাজের উল্লেখ করলাম না কিন্তু এই দারুণ গরমে চারিদিকে নিদারুণ জলকষ্ট দেখা দিয়েছে, লোকে জলের জন্য হাহাকার করছে। অন্যদিকে কলেরা রোগের ব্যাপক প্রকাশের আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু পৌরসভার এ বিষয়ে কোন দায়িত্ব আছে বলে মনেই হয় না। একে ত পৌর এলাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক নলকূপ নেই তার ওপর যে কয়টি আছে তারও কয়েকটি পাইপ খারাপ হয়ে যাওয়ার ফলে বা অন্যান্য কারণে জল পানের যোগ্য নয় কিন্তু সেখানে নূতন নলকূপ দেবার ব্যবস্থা দেখা যাচ্ছে না।" গ

জঙ্গল সংরক্ষণে অব্যবস্থা

বাঁকুড়ার 'হিন্দুবাণী' জানাইতেছেন—

"সরকার জঙ্গল খাস করার পর জঙ্গল সংরক্ষণ যে বিরাট তোড়জোড় সহকারে হইতেছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এত চেষ্টা সত্ত্বেও জঙ্গলগুলি ক্রমশঃ বৃক্ষবিরল হইতেছে। জঙ্গল বিলোপে জঙ্গল-বিভাগীয় কৃতিত্ব কিছু কম নয় এ বিষয়ে সকলেই এক মত।

"বাঁকুড়া সহরের লোকপুরস্থ ফরেষ্ট অফিসের সামনে বহু কাঠ পড়িয়া আছে তার মধ্যে বড় বড় গাছের অংশও আছে। বড় এবং ভাল শালগাছগুলিকে কাটিয়া জ্বালানীতে পরিণত করা হইতেছে। কোন্ অধিকারে দেখিবার তো কেউ নাই। তবে রেঞ্জ অফিসের লোকেরা বলেন যে, সেগুলি তাহাদের নীলাম খরিদা। এই নীলামগুলি কি ভাবে হয়? ভাল ভাল গাছ জ্বালানীর জন্য নীলাম করা হয়, ইহা দুঃখের কথা। নীলাম ঘোষণা জনসাধারণ জানিতে পারে না কেন? নীলামের ঘোষণা ঠিক মত উঠিলে কাঠগুলির দাম ভালই হইতে পারে। এ বিষয়ে দেখিবার কেউ নাই কি?"

দেখিবার লোকও আছে টাকাও খরচ হইতেছে। কিন্তু যাহা হইতেছে না তাহা ব্যবস্থা। গ

হুগলী জেলা গ্রন্থাগার

হুগলীর 'বর্ত্তমান ভারত'-এর এই সংবাদটির প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি—

"চুঁচুড়া মল্লিককাসেম হাটের সন্নিকটে সরকার কর্ত্তৃক প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হুগলী জেলা গ্রন্থাগার বর্ত্তমানে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইতে চলিয়াছে। ইহাকে এক কথায় কতকগুলি পুস্তকের একটি 'গুদাম ঘর' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রচুর মূল্যবান গ্রন্থ একটি ঘরে সংগৃহীত হইলেই উহাকে গ্রন্থাগার বলা যায় না। তাহা হইলে মূল্যবান গ্রন্থের প্রকাশকদের গুদাম ঘরগুলি সমস্তই গ্রন্থাগার হইয়া যাইত।

"এই গ্রন্থাগারের সভ্যের মাসিক চাঁদা ২৲ টাকা। সভ্য-চাঁদার অনুরূপ উচ্চ হার ভারতবর্ষের অন্য কোন গ্রন্থাগারে নাই। সেজন্যই বহু চেষ্টার ফলে মাত্র সামান্য কয়েকজন অর্থশালী ব্যক্তি উহার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

"'ফ্রী রিডিং রুমে' পাখা নাই, বসিবার চেয়ার নাই। কেবলমাত্র পাঠশালার মত কতকগুলি লম্বা বেঞ্চি পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রকাশ, পাখার টাকা আসিয়াছে, কিন্তু এখনও উহা ক্রয় করা হয় নাই। সেজন্য এখানেও খুব অল্প সংখ্যক পাঠককে দেখা যায়।

"ওয়াকিবহাল মহলে প্রকাশ, শিশু সাহিত্য বিভাগের জন্য মঞ্জুরীকৃত অর্থ অন্য ব্যাপারে ব্যয়িত হওয়ায় উক্ত বিভাগেরও কোন উন্নতি নাই।

"এইরূপ একটি গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল,—৬৲ টাকা বার্ষিক চাঁদার পরিবর্ত্তে এই গ্রন্থাগার জেলার অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলিতে মাসে মাসে পুস্তক সরবরাহ করিবে এবং এই কার্য্যের জন্য একটি মোটরগাড়ী, তাহার ড্রাইভার ও ক্লিনার প্রভৃতি সকলেই আছেন। কিন্তু উপযুক্ত অর্থাভাবে (পেট্রোলের খরচ) নাকি উক্ত প্রথা এখনও চালু করা হয় নাই। অথচ এই মোটরগাড়ীটিকে অপ্রয়োজনেও হুগলী ও চুঁচুড়া ষ্টেশনে, তথা চুঁচুড়া শহরে প্রত্যহই পরিভ্রমণ করিতে দেখা যায়। ইহার অর্থ কোথা হইতে আসে?" গ

একটি আদর্শ গ্রামের কথা

ভারতের অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করে এবং এই গ্রাম হইতেই দেশের প্রায় সকল সম্পদ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এক কথায় ভারতের প্রাণকেন্দ্র এই গ্রাম। অথচ এই গ্রামগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা অবহেলিত। বর্ত্তমানে সমাজ-উন্নয়ন-পরিকল্পনা সত্ত্বেও দেশের অধিকাংশ গ্রাম শিক্ষা, সংস্কৃতি, জীবনযাত্রার মান ইত্যাদির দিক হইতে পিছনে পড়িয়া আছে। অথচ গ্রামে প্রচুর সম্পদ রহিয়াছে এবং উহাকে কার্য্যকর করিবার মত শ্রমশক্তিও আছে। কিন্তু এই শ্রমশক্তির অপচয় ঘটিতেছে। গ্রামের দুরবস্থার ইহাই কারণ।

কিন্তু সংবাদে দেখিতেছি, এ বিষয়ে মহীশূরের এভারেজিয়ার নামক গ্রামটি সমগ্র ভারতের সম্মুখে একটি আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছে। এই গ্রামের অধিবাসীরা খরিফ-শস্য অভিযান, কৃষি বিষয়ে শিক্ষালাভ, সার উৎপাদন, জমিতে জলসেচন, সমবায় সংগঠন, উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বীজ উৎপাদন ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে। অধিকন্তু গ্রামের অধিবাসীরা পশুপক্ষী পালন করিয়া নিজেদের প্রয়োজনীয় দুধ, ডিম, পশম ইত্যাদির চাহিদা মিটাইয়া ও বাহিরে এক বৎসরে ২৩,৫২০ সের দুধ, ২,৫৬০টি ডিম ও ৩৫৮ পাউণ্ড পশম রপ্তানি করিতে সমর্থ হইয়াছে। গ্রামবাসীর এইরূপ সাফল্য দেখিয়া, সমাজ-উন্নয়ন-পরিকল্পনা বিভাগে উহাকে ভারতের সর্ব্বোত্তম গ্রাম বলিয়া চিহ্নিত করিয়া উহার অধিবাসীদের পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দিয়াছেন। পশুপক্ষী পালনের সাফল্যের জন্য উহাদিগকে জেলা পর্য্যায়ের দ্বিতীয় পুরস্কারও প্রদান করা হইয়াছে। তাহার ফলে ভবিষ্যতে এই গ্রামের অধিবাসীরা কৃষি ও পশুপক্ষী পালনের ব্যাপারে অধিকতর উৎসাহী হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ভারতের সকল গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে যদি এইরূপ কর্ম্মতৎপরতার বিকাশ ঘটে তাহা হইলে অদূরে ভবিষ্যতে দেশ সমস্ত প্রকার খাদ্যবস্তুর ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইতে পারে, এবং কৃষি ও পশুপালনের মাধ্যমে জাতীয় আয় শত শত কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইতে পারে। এজন্য সমাজ-উন্নয়ন বিভাগ কর্ত্তৃক ভারতের সমস্ত গ্রামে এই গ্রামের কর্ম্মতৎপরতা সম্বন্ধে প্রচারকার্য্য চালানো আবশ্যক। তাহা করিলে অন্যান্য গ্রামের অধিবাসীরাও এই গ্রামের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে পারে। গ

বর্দ্ধমান পৌরসভা

'জি টি রোড' পত্রিকার নিম্নোক্ত সংবাদটির প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। পৌরসভা দেশের কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান—এ বিষয়ে তাঁহারা কবে সচেতন হইবেন?

"বর্দ্ধমান পৌরসভার বার্ষিক আয় আট লক্ষের অধিক হইলেও এর পূর্ব্ব বোর্ড কর্ত্তৃক রিবেট প্রথা প্রবর্ত্তনের ফলে করদাতাগণ যথারীতি ট্যাক্স আদায় দেওয়া সত্ত্বেও বর্ত্তমানে গণতান্ত্রিক নাগরিক সমিতির পৌর পরিচালনায় প্রমাণিত হইতেছে—লরী ক্রয়ের ক্ষমতা না থাকায় পুরাতন লরীগুলি প্রায়ই বিকল হইয়া থাকে, ফলে সদর রাস্তাগুলি হইতে নিয়মিতভাবে আবর্জ্জনা অপসারণ করা হয় না। (২) হুইল বেরো (ট্রেলার গাড়ী) ক্রয়ের পর্য্যন্ত ক্ষমতা না থাকায় গলি রাস্তা হইতে আবর্জ্জনাগুলি সদর রাস্তায় আনা সম্ভব হয় না। (৩) সামান্য ১।১ লরী পাথর কুচা ও পীচ দ্বারা একান্ত প্রয়োজনীয় রাস্তাগুলির গর্ত্ত ভরাটি করার ক্ষমতা নাই। গত ছয় মাস ধরিয়া পাথর কুচার অভাব শুনা যাইতেছে। (৪) শহরের যে সকল অঞ্চলে জলের কল আছে সেই সকল স্থানে প্রায় ৬০টি নলকূপ অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়া আছে। সেগুলি উঠাইয়া লইয়া যে সকল অঞ্চলে কলের মেন পাইপ যায় নাই—সেই সকল বসানর ক্ষমতা নাই। এইরূপ গণতান্ত্রিক নাগরিক সমিতি করদাতাদের সেবা করিয়া আসিতেছে।"

গ

মল্লবীর গামা

গত ২৩শে মে বিশ্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় মল্লবীর গামা ৮০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। লাহোরের নিকটস্থ পেহুরীতে নদীর পাশে নির্ম্মিত এক নির্জ্জন কুটীরে গামা তাঁহার শেষ জীবনযাপন করিতেছিলেন।

১৮৮০ সালে পঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে গামা জন্মগ্রহণ করেন। শিশুকাল হইতেই মল্লযুদ্ধে গামার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। মল্লভূমির মাটি ছিল তাঁহার জীবনের ধ্যানজ্ঞান। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আখড়ার মাটিতে নিজের বুক রেখে সতীর্থদের সহিত তিনি মল্লযুদ্ধের অনুশীলন করিতেন। ভারতের মল্লক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিবার পর ইউরোপ ও আমেরিকা সফরের জন্য ১৯১০ সনে গামা এক বিদেশী সার্কাস দলের সহিত ভারত ত্যাগ করেন। কিন্তু এ জীবন তাঁহার ভাল লাগে না। মল্লযুদ্ধে ইউরোপ ও আমেরিকা জয় করিয়া আসিয়া ১৯১১ সনে গামা ভারতের কীর্ত্তিমান মল্লদের সহিত লড়াই সুরু করেন। ক্রমে বিশ্ব জয় করেন।

ভারতের চতুঃসীমা ছাড়াইয়া যাঁহাদের কীর্ত্তি পৃথিবীতে ভারতের মান বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিল, গামা ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। তিনি পৃথিবী-শ্রেষ্ঠ মল্লবীর হইয়াছিলেন, এবং সে গৌরব অর্জ্জন করিতে তাঁহাকে কম বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হয় নাই। দেশ বিভাগের ফলে তিনি পাকিস্তানের অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইলেও আমরা তাঁহাকে স্বজন বলিয়াই জানি। এ তাঁহার মৃত্যু নয়—মল্ল-জগতে এ ক্ষতি কোনদিন পূরণ হইবার নয়।

গ

বিবিধ প্রসঙ্গ

(আষাঢ় ১৩০৮ হইতে উদ্ধৃত)

জ্যৈষ্ঠের "প্রবাসী"তে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় পুরাকালে বাঙ্গালীর সমুদ্রযাত্রা ও উপনিবেশস্থাপন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হয় ত এখনও অনেকের নিকট বিস্ময়কর মনে হইবে। কিন্তু বাস্তবিক ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। সর্ উইলিয়ম্ হণ্টর্ উড়িষ্যা-নামক পুস্তকে (Orissa, p. 314) লিখিয়াছেন—

"The ruin of Tamluk as a seat of maritime commerce affords an explanation of how the Bengalis ceased to be a sea-going people. In the Buddhist era they sent warlike fleets to the east and the west and colonised the islands of the Archipelago."

অর্থাৎ, "সামুদ্রিক বাণিজ্যের আড্ডা তমলুকের ধ্বংস হইতে বুঝা যায় যে, বাঙ্গালীরা কিরূপে সমুদ্রযাত্রা হইতে নিরস্ত হইতে বাধ্য হয়। তাহারা বৌদ্ধযুগে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে যুদ্ধপোতাবলি প্রেরণ করিত, এবং ভারত-মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল।" ডারুইনের সহিত একই সময়ে অভিব্যক্তিবাদের আবিষ্কর্ত্তা ওআলেস্ সাহেব তাঁহার মালয়দ্বীপপুঞ্জ (The Malay Archipelago, vol. I, p. 160) নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

"In the house of the Waidono or district-chief at Modjo-agong, I saw a beautiful figure carved in high relief out of a block of lava, and which had been found buried in the ground near the village...It represented the Hindu Goddess Durga,..."

অর্থাৎ, "আমি যবদ্বীপের মোজো আগং নামক স্থানে জেলার শাসনকর্ত্তার বাড়ীতে একটি সুন্দর খোদিত মূর্ত্তি দেখি; উহা মাটীতে প্রোথিত ছিল, খুঁড়িয়া বাহির করা হয়। উহা হিন্দুদেবী দুর্গার মূর্ত্তি।" ওআলেস সাহেব তাঁহার গ্রন্থে এই দুর্গামূর্ত্তির একটি ছবি দিয়াছেন। তাহা অষ্টভুজা; এক হস্তে মহিষাসুরের কেশ ধৃত রহিয়াছে। ভারতবর্ষের পূর্ব্বোপকূলে যে সকল জাতি বাস করে, তাহাদের মধ্যে কেবল বঙ্গোপসাগরকূলবাসীরাই দুর্গার মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া পূজা করে। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর হিন্দুরা দুর্গার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করে না। সুতরাং এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই যুক্তিসঙ্গত যে পুরাকালে বাঙ্গালীদের পূর্ব্বপুরুষেরা যবদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া আপনাদের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

* * *

গত জ্যৈষ্ঠমাসের ৪ঠা, সূর্য্যগ্রহণ হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে পূর্ণগ্রাস হয় নাই। মরিশ্যস, সুমাত্রা, প্রভৃতি দ্বীপে পূর্ণগ্রাস দৃষ্ট হইয়াছিল। এবার পূর্ণগ্রাস যেরূপ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল, সচরাচর সেরূপ দেখা যায় না। উহা মরিশ্যসে ৩ মিনিট ৩৫ সেকেণ্ড এবং মালয় দ্বীপপুঞ্জের কোন কোন স্থানে সাড়ে ছয় মিনিট কাল স্থায়ী হইয়াছিল। সুতরাং এবার সূর্য্যসম্বন্ধীয় নানা জ্যোতিষিক বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিবার বিশেষ সুযোগ হইবার কথা। কিন্তু গ্রহণের দিন মেঘ করায় অনেক স্থানে ভাল ফল পাওয়া যায় নাই। এশিয়ার মধ্যে কেবল জাপানীরাই স্বতন্ত্র পর্য্যবেক্ষণের বন্দোবস্ত করিয়াছিল। যে যে স্থানে পূর্ণগ্রাস দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার অনেকগুলির নিকটে অসভ্য জাতি থাকায় সর্ব্বত্র পর্য্যবেক্ষণের বন্দোবস্ত করাও সম্ভবপর হয় নাই। একেই ত অসভ্যজাতি যন্ত্রাদি দেখিলেই নানাপ্রকার সন্দেহ করে; তাহার উপর আবার কুসংস্কারবশতঃ তাহারা গ্রহণের সময় অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠে। গ্রহণ সম্বন্ধে অনেক অসভ্য জাতির বিশ্বাস বড়ই কৌতুকজনক। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে, অসভ্য-জাতিরা মনে করে যে গ্রহণের সময় হয় সূর্য্য ও চন্দ্র ঝগড়া করিতেছেন, কিম্বা অপদেবতারা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। এই জন্য অসভ্যলোকেরা গ্রহণকালে সূর্য্য-চন্দ্রকে সাহায্য করিতে চেষ্টা করে। গ্রীনল্যাণ্ডবাসীরা চন্দ্রসূর্য্যকে ভাই ভগিনী মনে করে। চন্দ্র ভাই, সূর্য্য ভগিনী। তাহারা মনে করে, চন্দ্রগ্রহণের সময় চন্দ্র তাহাদের খাদ্যদ্রব্য এবং পরিধেয় ও পাতিবার চামড়াগুলি চুরি করিবার জন্য গৃহে গৃহে ঘুরিয়া বেড়ান। এমন কি তাহারা মনে করে যে, যে সকল লোক জীবনে মিতাচার ও সংযম অবলম্বন করে নাই, চন্দ্রগ্রহণের সময় তাহা-দিগকে বধ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করেন। গ্রহণের সময় তাহারা তাহাদের সিন্দুক এবং কটাহগুলি বাড়ীর ছাদ ও চালের উপর লইয়া যায়, এবং তদুপরি আঘাত করিয়া এই অদ্ভুত বাদ্য দ্বারা চন্দ্রকে তাড়াইবার চেষ্টা করে। সূর্য্যগ্রহণের সময় স্ত্রীলোকেরা কুকুরগুলার কাণ

মচড়াইয়া দেয়। যদি কুকুরগুলা কেঁউ কেঁউ করে, তাহা হইলে তাহারা মনে করে, যে প্রলয় কাল এখনও উপস্থিত হয় নাই। আমেরিকার ইরোকোয়ি জাতি মনে করে যে একটা রাক্ষস সূর্য্যচন্দ্রের আলোক রোধ করায় গ্রহণ হয়। গ্রহণের সময় তাহারা সকলেই রাক্ষসটাকে তাড়াইবার চেষ্টা করে। এই জন্য তাহারা ক্রন্দন, চীৎকার, ঢক্কা-নিনাদ, বন্দুক ছোড়া প্রভৃতি উপায়ে তাহাকে ভয় দেখাইবার চেষ্টা করে। এবং তাহাদের চেষ্টা সফলও হয়; কারণ কিছুক্ষণ পরেই আবার চন্দ্র বা সূর্য্যের আলোক তাহাদের উপর পতিত হয়! য়ুকেটানের আদিম নিবাসীরা মনে করে যে সূর্য্য বা চন্দ্রকে তাঁহাদের শত্রুরা আক্রমণ করায় গ্রহণ হয়। এই জন্য তাহারা এই সকল শত্রু বিতাড়নার্থ আপনাদের কুকুরগুলাকে ঠেঙ্গাইতে আরম্ভ করে, এবং অন্যান্য প্রকারে ঘোর কোলাহল করে। চিকুইটোরা মনে করে গ্রহণের সময় আকাশবাসী কতকগুলা কুকুর চন্দ্রসূর্য্যকে কামড়াইয়া ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে, এবং এইরূপ দংশনে রক্তপাত হওয়াতে গ্রহণের সময় তাহাদের রং লোহিতবর্ণ হয়। আকাশনিবাসী কুকুর-গুলাকে তাড়াইয়া দিবার জন্য তাহারা চীৎকার করিতে করিতে আকাশে তীর ছুড়িতে থাকে। প্রাচীন পেরু-নিবাসীরা মনে করিত যে চন্দ্রগ্রহণের সময় চন্দ্র মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়েন। তাঁহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইবার জন্য তাহারা কুকুর ঠেঙ্গাইয়া একটা বিকট গোলমাল করিত। কাম্বোডিয়ানিবাসীরা মনে করে যে গ্রহণের সময় কোন অপদেবতা চন্দ্রসূর্য্যকে গ্রাস করে। ইহা আমাদের দেশের রাহুতে বিশ্বাসের অনুরূপ। তাহারা চন্দ্রসূর্য্যকে উদ্ধার করিবার জন্য ভীষণ শব্দ করে, ঢাক বাজায়, এবং আকাশে তীর ছুড়ে।

* * *

উত্তর পশ্চিম ও অযোধ্যা প্রদেশে বিশ পঁচিশ হাজার বাঙ্গালীর বাস। কিন্তু বাঙ্গালা এই প্রদেশের প্রচলিত ভাষা নয় বলিয়া সরকারী কোন ইস্কুলে ইহা শিখাইবার কোন বন্দোবস্ত নাই। বাঙ্গালীরা নিজের চেষ্টায় কাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি যে যে শহরে ইস্কুল স্থাপন করিয়াছেন, সেখানে কিন্তু এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা পড়ান হইয়া আসিতে-ছিল। গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত ইহাতে কোন আপত্তি করেন নাই। কিন্তু সম্প্রতি সরকারী শিক্ষাবিভাগ হইতে এক আদেশ প্রচারিত হইয়াছে যে, যে সকল ইস্কুলের ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা বা শিক্ষাবিভাগের কোন সাধারণ পরীক্ষা দিতে অধিকারী, তথায় বাঙ্গালা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারিবে না। সুতরাং এখন বাঙ্গালীর ছেলেকে ইস্কুলে বাঙ্গালা শিখিবার পূর্ব্বেই হিন্দী বা উর্দ্দু শিখিতে হইবে। কেবল কি তাই? ৮।৯ বৎসরের বাঙ্গালী ছেলেকে হিন্দী বা উর্দ্দুতে সকল বিষয়ে উচ্চ প্রাইমারী পরীক্ষা দিতে হইবে। মাতৃভাষা ও জাতীয় সাহিত্যের সহিত কোন জাতির সম্বন্ধ ছিন্ন হইলে যে তাহার অবনতি হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আমরা এখন সেকথার আলোচনা করিব না। আমরা এখন কেবল এই বলিতে চাই, যে সর্ আণ্টনী ম্যাকডনেলের এই আদেশটি সর্ব্বপ্রকার প্রকৃষ্ট শিক্ষাপ্রণালীর এবং তাঁহার নিজের শিক্ষানীতির বিরোধী হইয়াছে। মাতৃ-ভাষার সাহায্যেই শিশুদিগকে শিক্ষা দেওয়া স্বাভাবিক এবং সহজ। মাতৃভাষা ভাল করিয়া না শিখিয়া কোন ছাত্র অপর ভাষা শিখিতে গেলে তাহাও ভাল করিয়া শিখিতে পারে না। ইহা সোজা কথা। সর্ আণ্টনীও যখন প্রথম এই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসেন, তখন, এখানকার সাধারণ পরীক্ষাগুলিতে ইংরাজীতে অনুত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক দেখিয়া, এই অনুমান করেন যে ছাত্রেরা নিজ মাতৃভাষা না শিখিয়াই অনেক স্থলে ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করে, এই জন্য এরূপ কুফল ফলে। এই কারণে তাঁহার শাসনকালে এইরূপ নিয়ম হইয়াছে যে ইংরাজী স্কুলগুলিতেও সর্ব্বনিম্ন দুইটি শ্রেণীতে কেবল মাতৃভাষা ও তৎসাহায্যে সকল শিক্ষনীয় বিষয় শিখান হইবে। তৃতীয় বৎসরে ছাত্রেরা ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু তখনও অপরাপর বিষয় মাতৃভাষার সাহায্যে শিখাইতে হইবে। এই নিয়ম ষষ্ঠবার্ষিক শ্রেণী পর্য্যন্ত চলিবে। হিন্দুস্থানী বালকদের প্রাথমিক শিক্ষা যদি হিন্দী বা উর্দ্দুতে দেওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালী বালকদের বেলায় বাঙ্গালা কেন ব্যবহৃত হইতে পারিবে না? সত্য বটে, হিন্দুস্থানী গবর্ণমেণ্ট এজন্য কোন বন্দোবস্ত না করিতে পারেন; কিন্তু বাঙ্গালীরা নিজে বন্দোবস্ত করিলে তাহাতে কেন বাধা দেওয়া হয়? এডুকেশন কমিশনের রিপোর্টেও এইরূপ মন্তব্য অনেক স্থলে প্রকাশিত হইয়াছে যে বেসরকারী ইস্কুলসমূহ যাহাতে ঠিক্ সরকারী ইস্কুলের ছাঁচে ঢালা না হয়, তজ্জন্য পূর্ব্বোক্ত ইস্কুলগুলিকে তাহাদের আভ্যন্তরিক বন্দোবস্ত সম্বন্ধে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। এপ্রদেশে কিন্তু সর্ব্বপ্রকার ইস্কুল একই প্রকার পদ্ধতি ও পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করিতে বাধ্য। সকল ইস্কুলকে কঠোরতার সহিত এই নিয়ম পালন করিতে বাধ্য করিয়া গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালীদের ঘোরতর অনিষ্ট করিতে বসিয়াছেন।……

মিগের বাত

শ্রীসুখময় সরকার

প্রচণ্ড দুঃসহ গ্রীষ্মের পর সে বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের ২৫।২৬ তারিখে বৈকালের দিকে সহসা কৃষ্ণবর্ণ পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিল। দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে হিল-হিল করিয়া শীতল বায়ু বহিতে লাগিল। এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল ; আতপ-তাপিত ধরণী শীতল হইল ; জীবজগতের তপ্ত দেহ জুড়াইয়া গেল। মাসীমা এতক্ষণ দ্বারপিণ্ডে বসিয়া মহাভারত পাঠ করিতেছিলেন ; বৃষ্টির ঝাপ্‌টা গায়ে লাগিতেই মহাভারতটি বন্ধ করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "মিগের বাত পড়েছে। মিগের বাতে বৃষ্টি হলে সারা বছর বর্ষণ ভাল হয়।"

প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। আমরা তখন বালকমাত্র, তখনও ইস্কুলের পড়ুয়া। ইস্কুলের বাহিরে প্রকাণ্ড যে জগৎ রহিয়াছে, তৎসম্বন্ধে জ্ঞানদাত্রী ছিলেন আমাদের মাসীমা। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মিগের বাত কী, মাসীমা?"

"মিগের বাত জানিস নে? তোরা তো কেবল ইংরেজী পড়বি, কেমন করে আর জানবি এসব? ওরে, খনার বচনে আছে—

জ্যৈষ্ঠের সাত আষাঢ়ের সাত।
তবে জানবি মিগের বাত।"

"তার মানে? ৭ই জ্যৈষ্ঠ থেকে ৭ই আষাঢ় পর্যন্ত একমাস মিগের বাত—এই তো?"

"ওরে, না না। তা নয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ সাতদিন আর আষাঢ় মাসের প্রথম সাতদিন—এই চোদ্দদিন সময়কে বলে মিগের বাত।"

"আর খনার বচন কাকে বলে, মাসীমা?"

"রাজা বিক্রমাদিত্যের নাম শুনেছিস তো? তাঁর সভায় বরাহ নামে একজন মস্তবড় জ্যোতিষী ছিলেন। বরাহের ছেলে মিহির। মিহির কিন্তু জ্যোতিষ জানতেন না। মিহিরের স্ত্রী খনা। খনা শ্বশুরের কাছে জ্যোতিষ শিক্ষা করেছিলেন। শেষে জ্যোতিষশাস্ত্রে শ্বশুরের চেয়েও বিদুষী হয়েছিলেন। বরাহ যখন মারা গেলেন, তখন মিহির বাপের জায়গায় হলেন বিক্রমাদিত্যের রাজ-জ্যোতিষী। তিনি যে জ্যোতিষ জানতেন না—এটা রাজা জানতেন না ; অন্য লোকেও জানত না। রাজা তাঁকে কোন কিছু গণনা করতে বললে তিনি সঙ্গে সঙ্গে কোন উত্তর দিতেন না ; বাড়ীতে এসে খনাকে দিয়ে গণনা করিয়ে নিতেন ; পরদিন রাজসভায় গিয়ে গণনার ফল জানিয়ে দিতেন। এই খনা কতকগুলো ছড়া তৈরি করে গেছেন। ছড়াগুলোতে জ্যোতিষের কথা, আবহাওয়ার কথা, চাষবাসের কথা বলা হয়েছে। এই ছড়াগুলোকে বলে খনার বচন।"

"আচ্ছা, সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু 'মিগের বাত' কথাটার মানে কি?"

"তা ঠিক জানি নে, বাছা। তবে মনে হয়, 'মেঘ' থেকেই 'মিগ' কথাটা এসেছে। 'মিগের বাত'—সম্ভবতঃ মেঘ সঞ্চারের কাল।"

মনে পড়িতেছে, সে বৎসর রোহিণী-উদয়ে * এক পশলা বৃষ্টি পাইয়া কৃষকেরা ধানের বীজ ছড়াইয়াছিল। ইতোমধ্যে ধানের অঙ্কুরগুলি বেশ বড় হইয়া উঠিয়াছিল। মিগের বাতে আর এক পশলা বৃষ্টি পাইয়া কৃষকেরা জমিতে একটা করিয়া চাষ দিয়া রাখিল। অম্বুবাচীতে রীতিমত বর্ষা আরম্ভ হইয়া গেল। সেবার সত্যই কৃষি-কর্ম্ম স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল ; শস্যের ফলন উত্তম হইয়াছিল।

বাল্যকালে মাসীমার মুখে 'মিগের বাত'-এর যে ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলাম, তাহাতেই তুষ্ট হইয়াছিলাম। আজিও দশজনের মুখে ঐ ব্যাখ্যাই শুনিতে পাই। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনে খটকা লাগিল। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত বৃষ্টি না নামিলে, "মিগের বাত পড়ল, এখনও বৃষ্টির নাম নেই!"—বলিয়া যখনই গ্রামের কৃষকেরা চিন্তিত হইয়া পড়িত, তখনই মনে হইত, 'মিগের বাত' কথাটার কোন গূঢ় অর্থ থাকিতে পারে। বহু বৎসর কাটিয়া গেল। আমাদের পূজাপার্ব্বণের উৎপত্তি ও প্রাচীনতা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিবার বাসনা হইল। এই উদ্দেশ্যে ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলাম ; তখন 'মিগের বাত'-এর রহস্যদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল।

মেঘ শব্দ বিকৃত হইয়া 'মিগ' হইতে পারে না। মৃগ

---

* ১৩ই জ্যৈষ্ঠ রোহিণী-উদয়। ১৩৬২ বঙ্গাব্দে জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে 'রোহিণী-উদয়' সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে।

শব্দের বিকারে 'মিগ'। কালপুরুষ (Orion)-নক্ষত্র অনেকেই চেনেন। ইহার বৈদিক নাম মৃগ। নক্ষত্রের উদয়াস্তকাল নির্দিষ্ট আছে। মৃগ নক্ষত্রকে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ সপ্তাহে পশ্চিম দিগন্তে অস্ত যাইতে দেখা যায়। কালপুরুষ বা মৃগ নক্ষত্রের অধিপতি রুদ্র। ঋগ্বেদে রুদ্রদেবকে 'ভীম (ভয়ঙ্কর) 'মৃগ' বলা হইয়াছে। কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলের তারাগুলি একভাবে যোগ করিলে যেমন এক বীরমূর্তি কল্পনা করা যায়, অন্যভাবে যোগ করিলে তেমনই একটা অতিকায় মৃগের আকৃতি পাওয়া যায়। নক্ষত্রচক্রের সাতাইশ নক্ষত্রের অন্যতম মৃগশিরা, ইহা সকলেই জানেন। মৃগশিরা, মৃগ বা কালপুরুষ নক্ষত্রের শির। ইহা তিনটি তারা লইয়া গঠিত। তারা তিনটি তেমন উজ্জ্বল নহে, তৃতীয়-চতুর্থ প্রভার (magnitude)। বাত শব্দের অর্থ বায়ু। অতএব সূর্য মৃগ নক্ষত্রে থাকিলে যে বায়ুপ্রবাহ আরম্ভ হয়, তাহাই 'মিগের বাত'। ইহাই মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ। সত্যই জ্যৈষ্ঠের শেষ সপ্তাহ এবং আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহ, এই দুই সপ্তাহকাল সূর্য মৃগশিরা নক্ষত্রে থাকেন।

সূর্য মৃগশিরা নক্ষত্রে থাকুন, তাহাতে আমাদের কি? আমাদের কিছু আছে বৈকি, নচেৎ 'মিগের বাত' লইয়া কৃষকেরা এত মাথা ঘামাইবে কেন? নক্ষত্রচক্রে মৃগশিরার পরবর্তী নক্ষত্র আর্দ্রা। আর্দ্রা তারাটি কালপুরুষের দক্ষিণ বাহু। আর্দ্র শব্দের অর্থ সিক্ত। আর্দ্রার গা ঘেঁসিয়া সুরগঙ্গা (ছায়াপথ) বহিয়া গিয়াছে; যেন তাহার জলে আর্দ্রা তারা ভিজিয়া গিয়াছে। বাস্তবিক, আর্দ্রা যেন জলতলে পতিত রক্তবর্ণ একটি ক্ষীণপ্রভ রত্ন (চিত্র পশ্য)। আর্দ্রা নামের অন্য অর্থও হইতে পারে। যাঁহারা জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা জানেন, বর্তমানকালে সূর্য আর্দ্রা নক্ষত্রে সংক্রমিত হইলে দক্ষিণায়ন আরম্ভ হয়। রবির দক্ষিণায়নের সঙ্গে সঙ্গে বর্ষা ঋতু আরম্ভ হয়। তখন ধরিত্রী জলবর্ষণে আর্দ্র হয়। 'আর্দ্রা' নামের পশ্চাতে এই ইঙ্গিতও থাকিতে পারে।

বর্তমানকালে ৭।৮ই আষাঢ় (২১শে জুন) রবির দক্ষিণায়ন হয়, অম্বুবাচী হয়। সেদিন জলের ভাষায় দিগ্‌দেশ মুখর হইয়া উঠে; কৃষকের প্রাণে আনন্দ ধরে না। রবির দক্ষিণায়ন কবে হইবে, তাহা জানিবার প্রয়োজন সকলেরই আছে। কৃষকদের ইহা জানা বিশেষ প্রয়োজন। দক্ষিণায়ন না হইলে বর্ষা ঋতু আরম্ভ হয় না, বর্ষা না হইলে কৃষিকর্ম হইতে পারে না। এই কারণে অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের কৃষিপ্রধান দেশে দক্ষিণায়ন দিনের গুরুত্ব অধিক অনুভূত হইয়া থাকে। প্রাচীনেরা নক্ষত্রের
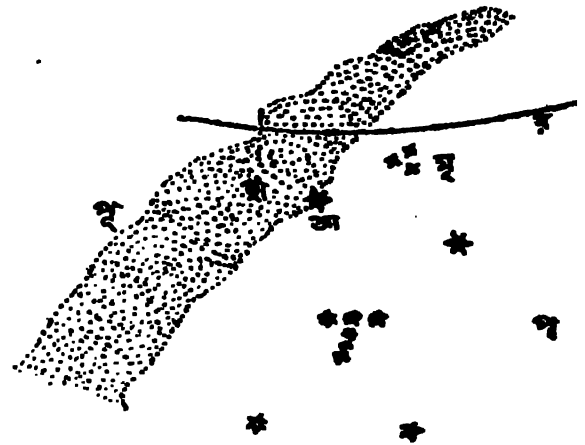
মৃগ নক্ষত্র। মৃ-মৃগশিরা; আ—আর্দ্রা
ছা—ছায়াপথ (সুরগঙ্গা); র—রবিপথ
পূ—পূর্ব; প—পশ্চিম

উদয়াস্ত দেখিয়াই ঋতুর আগমন অনুমান করিতেন। নক্ষত্রের 'উদয়' বলিতে কি বুঝিব? ঊষাকালে পূর্বদিক চক্রবালে সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্বে কোন নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হইলে তাহাকেই সেই নক্ষত্রের 'উদয়' (heliacal rising of a star) বলে। রবি যখন আর্দ্রা নক্ষত্রে থাকেন, রবিকরের তীব্রতা হেতু আর্দ্রা তখন দৃষ্টিগোচর হয় না। রবি আর্দ্রায় থাকিলে সূর্যোদয়ের একদণ্ড কাল পূর্বে পূর্ব দিগন্তে মৃগশিরাই দৃষ্টিগোচর হয়। অর্থাৎ ঊষাকালে মৃগশিরার উদয় দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায় যে, রবি আর্দ্রায় আছেন। তখনই জানিতে পারা যায় যে, দক্ষিণায়ন দিন সমাগত; বৃষ্টি নামিতে আর বিলম্ব নাই। এই কারণে কৃষকের নিকট 'মিগের বাত' এত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। মৃগশিরা ও আর্দ্রা, উভয় নক্ষত্রই মৃগ (কালপুরুষ) নক্ষত্রমণ্ডলের অন্তর্গত। পূর্বে বলিয়াছি, মৃগশিরা কালপুরুষের মস্তক, আর্দ্রা কালপুরুষের দক্ষিণ বাহু। সুতরাং সূর্য যখন আর্দ্রায় থাকেন, তখনও তিনি মৃগ নক্ষত্রেই থাকেন।

মাসীমা বলিয়াছিলেন, 'মিগের বাত' শব্দের অর্থ মেঘ সঞ্চারের কাল। কথাটা এক হিসাবে মিথ্যা নহে। তবে ইহা ভাবার্থ; বাচ্যার্থ নহে। পূর্বাকাশে মৃগশিরার উদয় দেখিলেই রবির দক্ষিণায়ন দিন আসন্ন হয়; তখন আকাশে মেঘের সঞ্চার হইতে থাকে। 'খনার বচনে' এইরূপ কত তথ্য বিবৃত আছে, তাহা ব্যাপকভাবে আলোচনা করিবার সময় আসিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন।

কিংবদন্তী আছে, রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিত বরাহের পুত্র ছিলেন মিহির এবং মিহিরের পত্নী ছিলেন খনা। ঐতিহাসিকগণ ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে বরাহ ও মিহির দুই পৃথক ব্যক্তি নহেন, একজন জ্যোতির্বিদেরই নাম ছিল বরাহ-মিহির। তিনি খ্রীঃ পঞ্চম শতকে জীবিত ছিলেন। উজ্জয়িনীতে তাঁহার নিবাস ছিল। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সভায় রাজজ্যোতিষীর আসন অলঙ্কৃত করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। তাঁহার 'বৃহৎ সংহিতা' নামক জ্যোতিগ্রন্থ বিশ্ববিখ্যাত। কিন্তু খনা নামে তাঁহার পত্নী বা পুত্রবধূর অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ সম্পূর্ণ সন্দিহান। আমাদের আলোচ্য 'খনার বচন'টিও এই সত্য সমর্থন করিবে। খনা বরাহ-মিহিরের পত্নী বা পুত্রবধূ হইলে তাঁহারও খ্রীঃ ৫ম-৬ষ্ঠ শতকে জীবিত থাকিবার কথা। কিন্তু খ্রীঃ ৫ম-৬ষ্ঠ শতকে মৃগ নক্ষত্রে রবির দক্ষিণায়ন হইত না। যাঁহারা জ্যোতিষ চর্চা করেন তাঁহারা জানেন, অয়ন দিন চিরকাল একই সময়ে হয় না, শনৈঃ শনৈঃ পশ্চাদ্গত হয়। অয়ন-চলন (Procession of the Equiroxes) হেতু অয়ন দিন ২১৬০ বৎসরে এক মাস পশ্চাদ্গত হয়; অথবা অয়ন দিন এক নক্ষত্র-ভাগ পশ্চাদ্গত হইতে প্রায় এক সহস্র বৎসর সময় লাগে। খ্রীঃ ৫ম-৬ষ্ঠ শতকে, অর্থাৎ অদ্যাবধি প্রায় ১৪০০।১৫০০ বৎসর পূর্বে কোনক্রমেই মৃগ নক্ষত্রে দক্ষিণায়ন হইতে পারিত না। জ্যোতিষিক গণনায় পাইতেছি, তখন পুষ্যার তৃতীয় পাদে রবির দক্ষিণায়ন হইত। 'বৃহৎ-সংহিতা'র জ্যোতিষিক উল্লেখও এই গণনা সমর্থন করে। অতএব খনা সে যুগে জীবিত থাকিলে তাঁহার পক্ষে 'মিগের বাত'-এর কল্পনা অসম্ভব হইত।

আর একটা কথা। 'খনার বচন' নামে প্রসিদ্ধ ছড়াগুলির ভাষাবাংলা। খনার নিবাস উজ্জয়িনীতে হইলে বাংলাভাষায় তাঁহার 'বচন' রচিত হইবে কিরূপে? কেহ কেহ তর্কের খাতিরে বলেন, খনার পিত্রালয় সম্ভবতঃ বঙ্গদেশে ছিল। কিন্তু তাহাতেও সংশয়ের নিরসন হইবে না। খ্রীঃ ৫ম-৬ষ্ঠ শতকে বাংলা ভাষার জন্মই হয় নাই। খ্রীঃ ৯ম-১০ম শতকে অপভ্রংশের গর্ভ হইতে বাংলাভাষা যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন তাহার আকার-প্রকার এতই ভিন্নরূপ ছিল যে, তাহাকে সহজে বাংলা বলিয়া চিনিবার উপায় ছিল না। অথচ 'খনার বচনে'র ভাষা স্পষ্ট ও সুবোধ্য বাংলা। আবার কেহ কেহ বলেন, খনা হয়ত সংস্কৃত বা অন্য কোন ভাষায় তাঁহার 'বচন' রচনা করিয়াছিলেন, পরে বাংলাভাষায় তাহা অনূদিত হইয়াছে। এই যুক্তিও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ, সংস্কৃতে এমন কিছু পাওয়া যাইতেছে না যাহাকে 'খনার বচনে'ই আদিরূপ বলা যাইতে পারে। অন্য ভাষাতেও 'খনার বচনে'র অনুরূপ ছড়া পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ, 'খনার বচন' নামে প্রসিদ্ধ ছড়াগুলি বঙ্গদেশের কৃষকগণেরই রচনা এবং এগুলি তিন-চারি শত বৎসরের অধিক পুরাতন নহে। অধিক পুরাতন হইলে এগুলির অন্তর্নিহিত জ্যোতিষিক তত্ত্ব অন্যরূপ হইত। আমাদের দেশের নিরক্ষর কৃষকদের প্রকৃতির লীলা পর্যবেক্ষণের অসাধারণ ক্ষমতা অনুধাবন করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।

সমাধান

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

জীবনের ছন্দ আজ হারায়েছে মিল,
কিছুতে পাই না খুঁজে পূর্ব্বের বিশ্বাস।
যে ধরণী পূর্ণ ছিল রূপে, রসে, গানে,
আজ সে ধূসর রুক্ষ, নয়নের ত্রাস।

কোথায় মিলায়ে গেল শ্যাম সম্ভাবনা
অন্তরের তীর্থ বুঝি পরিত্যক্ত, ম্লান,
দৃষ্টির অতীত হ'ল সৌন্দর্য্য-কমল
হৃদয় নিঙাড়ি উঠে বেহাগের গান।

কর্ম্মের ঘর্ম্মের দ্বন্দ্ব, বাক্যের সঙ্ঘাত,
নিন্দা, ক্ষেদ, মূঢ়তার মিথ্যা অভিলাষ
এই সত্য পরিচয়। আর আছে শুধু
বিমর্ষ ব্যথায় ভরা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস।

মধুর ধ্যানের রসে শূন্য পাত্র ভরি
প্রত্যহের কোলাহল যাইব পাশরি।

অপবাদ

ডক্টর হরেন্দ্রনাথ রায়

টুর থেকে ফিরে এসেই সোমেশ ডেকে পাঠায় নীপাকে তার বসবার ঘরে। দেখলেই বোঝা যায় সে উত্তেজিত। দেহের উপর অবসাদের প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্ট হলেও মন উত্তেজনায় পূর্ণ। চুলগুলি উস্কখুস্ক, বেশবাস অবিন্যস্ত। চোখের কোল দুটি ঈষৎ লাল। চেয়ারের উপর সে ধপ করে বসে পড়ে রগ দুটিকে দু'হাতে টিপে ধরে।

নীপা এসে ঘরে ঢোকে। কাজ করতে করতে সে যে উঠে এসেছে, এ বোঝা যায় তার হাতের দিকে তাকিয়ে। হাত দু'খানি তখনও আধ ভিজা। তাদের সে শুষ্ক করবার চেষ্টা করেছে সাড়ীর প্রান্তে ঘসে ঘসে। ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ায় সে। স্বামীকে বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে, কি ব্যাপার! পোষাক পরিচ্ছদ না বদলেই বসে পড়লে যে? রাত্রিতে ট্রেনে ঘুমুতে পার নি বুঝি? খুব কষ্ট হয়েছে?

—হুঁ, সোমেশ উত্তর দেয় গম্ভীর ভাবে।

নীপা তাড়া দেয়, ওঠ। আর একটু কষ্ট করে মুখে হাতে একটু জল দাও। আমি চা জলখাবার নিয়ে এলুম বলে। গরম গরম চা খেলে রাত্রের গ্লানিটা কেটে যাবে অনেকখানি।

—তা হয় ত যাবে। তবে ও সব এখন থাক। তুমি বস, কথা আছে।

নীপা বিস্মিত হয়। স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে বিস্ময় ভরা চোখে।

সোমেশ একখানা চেয়ার স্ত্রীকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে একটু কঠিন কণ্ঠেই বলে, বস ঐখানে। সঙের মত হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থেক না।

নীপা স্বামীকে চেনে। জানে, স্বামী মিলিটারী নয় কাজে কিন্তু সময় সময় মিলিটারী হয়ে উঠে মেজাজ। তাই নীপাকেও মাঝে মাঝে মিলিটারী হতে হয়, কাজে এবং মেজাজেও। হাতের কাছে যা পায় হয় তার ঊর্দ্ধ পতন আর না হয় জানলার বাইরে লম্ব পতন। নীপার চরিত্রে যেমন মাধুর্য্য আছে, তেমনি দৃঢ়তাও আছে। কিন্তু দৃঢ়তা নেই সোমেশের চরিত্রে। তাই শেষ পর্য্যন্ত হার মানতে হয় তাকেই। এ সব জানা আছে নীপার। তাই স্বামীর অনুদার সম্বোধনে মনে মনে একটু আহত হয় বটে কিন্তু আদেশ অমান্য করে না। গম্ভীর মুখেই নির্দ্দিষ্ট চেয়ারখানিতে বসে পড়ে।

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে সোমেশ দাঁতে দাঁত চেপে একটু অশোভন ভঙ্গীতেই প্রশ্ন করে, শোভনকে চেন?

নীপার বুকের ভিতর যেন বিদ্যুৎ চমকে উঠে। একটু স্খলিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে সে, শোভন? কোন শোভন?

সোমেশ একটু বাঁকা হাসি হাসে। বলে, তোমার জীবনে ক'জন শোভনের উদয় হয়েছে নীপা? আমি বলছি ভবানীপুরের ভুবন চাটুয্যের ছেলে শোভন চাটুয্যের কথা গো! যে ভুবন চাটুয্যে সাব জজ হয়ে ছিলেন পরে। এম. এ. তে শোভন ফার্ষ্ট হয়েছিল তাদের সময়ে। তাকে চেন?

নীপার গলায় হয় ত ঈষৎ কাঁপন জাগে। বলে, কেন?

সোমেশের রূপ পাল্টে যায়। মিলিটারী মেজাজে বলে, প্রশ্নের বদলে পাল্টা প্রশ্ন শুনতে আমি রাজি নই। আমি উত্তর চাই। যা জিজ্ঞাসা করেছি তার সোজা, সরল উত্তর।

এবার নীপার গলা কাঁপে না। চোখের পাতা নড়ে না। স্বরের মধ্যে অস্পষ্টতাও কিছু থাকে না। শান্ত দৃঢ়তা ব্যঞ্জক স্বরে বলে, চিনি।

কথাটা সোমেশ যেন লুফে নেয়। বলে, চিনবে বই কি। চিনবে বলেই ত আমার প্রশ্ন। এখন তার কোথায় থাকা হয় শুনি? সোমেশ বাঁকা চোখে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকায়।

—জানি না।

—জান না? কিন্তু এটা ঠিক ঋত ভাবণ হ'ল না নীপা। তুমি জান, অথচ গোপন করছ আমার কাছ থেকে।

নীপা উত্তেজিত হতে গিয়েও নিজেকে সামলে নেয়। দৃপ্ত ভঙ্গিমায় বলে, না। আমার শিক্ষা একটু ভিন্ন ধরনের। সেখানে লুকোচুরির স্থান নেই। ঋত অনৃতেরও স্থান নেই। কিন্তু ও নিয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক করতে আমি রাজি নই। এ তুমি বুঝবে না।

সোমেশ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। বলে, তোমার অহঙ্কার,

তুমি একজন অসাধারণ বুদ্ধিমতী, সূক্ষ্ম বোদ্ধা। আর আমি বোকা, স্থূল বোদ্ধা। এই অহঙ্কারেই আমার চোখে ধুলো দিয়ে এসেছ এতদিন। কিন্তু এবার বোকাও চালাক হয়েছে, জানতে পেরেছে সব। শোভন কোথায় থাকে জান?

—বলেছি ত, না।

—শোন, শোভন থাকে ঝাড় গ্রামে।

—থাকুক। মানুষ বেঁচে থাকলে তাকে পৃথিবীতে কোথাও না কোথাও বাস করতেই হবে, তা সে ঝাড় গ্রামেই হোক, আর হরিদ্রা গ্রামেই হোক। কিন্তু তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি?

—বিলক্ষণ! সম্বন্ধ গভীর। আর সেই জন্যই ত আমার মাথা ব্যথা এত।

—এ মাথা ব্যথা তোমার অনর্থক।

—জানি না। কিন্তু এর মধ্যে রসের তত্ত্ব অনেক। ঝাড়গ্রামে আমি গিয়েছিলাম। শোভনেরই অতিথি হয়েছিলাম। তিন দিন কাটিয়েছি আমরা এক সঙ্গে। তার মুখ থেকেই ত তোমাদের সব রস-তত্ত্বের কথা শুনলাম গো! শেষের কথাগুলি সে বলে ব্যঙ্গ করে।

অকস্মাৎ নীপার মুখখানা ছাইয়ের মত সাদা হয়ে উঠে। একটু স্খলিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে, কি শুনলে?

—বলছি। সেই কথা শোনাব বলে তোমায় ডেকেছি। জান নীপা, শুনে পর্য্যন্ত কাল সারাটা দিন আর রাত চোখের পাতা দুটি এক করতে পারি নি। মাথার মধ্যে এক অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করেছি, আর ভেবেছি তুমি—তুমি কি নীপা?

নীপা চোখ দুটি বিস্ফারিত করে তাকিয়ে থাকে স্বামীর মুখের দিকে, কিন্তু কোন প্রশ্ন করে না।

সোমেশ দু'হাতে মাথা টিপে ধরে বলতে থাকে, শোভনের সঙ্গে আমার পরিচয় কলেজ-জীবন থেকে আর সে পরিচয় গভীর হয় খেলার সুবাদে। সে যে ঝাড়-গ্রামের ফরেস্ট-অফিসর এ খবর জানতুম না আমি। জানতে পারলুম সেখানে গিয়ে। সেই ধরে নিয়ে গেল আমায় তার বাংলোতে। তিন দিন তিন রাত ধরে রাখল সেখানে।

নীপা আবার শুষ্ককণ্ঠে প্রশ্ন করে, শোভন কি বলল তোমায়?

সোমেশ বলে, ব্যস্ত হয়ো না। এখুনি জানতে পারবে সব। শোভন জানে না যে, তুমি আমারই গৃহ অলঙ্কৃত করে আছ। জানলে এত কথা সে বলত না নিশ্চয়ই। কি বললে জান? চাপা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সোমেশ গর্জ্জে উঠে।

—না।

—বললে তার এই বনবাসের ইতিহাস। বললে, তার ব্যর্থ জীবনের কাহিনী যার মূলে রয়েছে এক বিচিত্র-ধর্ম্মী নারী। বললে, তাদের রাগ অনুরাগের কথা, ভাল-বাসাবাসির কথা। বললে—।

নীপা পাংশু মুখে প্রশ্ন করে, বললে এই সব? তুমি বিশ্বাস করেছ?

—সব। তার প্রতি কথাটি বিশ্বাস করেছি আমি। অকাট্য প্রমাণ সে তুলে ধরল আমার চোখের সামনে। তাকে অবিশ্বাস করা যায় না। আমি ভুলতে পাচ্ছি না—ভুলতে পাচ্ছি না নীপা, সেই ফটোখানাকে যাকে সে বুকে করে রেখে দিয়েছে আজও। ভুলতে পাচ্ছি না সেই চিঠিগুলোকে যা সযত্নে রক্ষিত হয়ে শোভা বর্দ্ধন করছে তার সুটকেশের। ইচ্ছে হচ্ছিল ওগুলো ছিনিয়ে নি তার হাত থেকে, তার পর কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দি আস্তাকুঁড়ে। কিন্তু পারি নি। শুধু নিজেই জ্বলে পুড়ে মরছি সেদিন থেকে। নীপার মুখে ভাষা জোগায় না। সে কেবল তাকিয়ে থাকে স্বামীর মুখের দিকে কেমন একটা বিহ্বলতা মাখান দৃষ্টি নিয়ে।

সোমেশ কঠিন কণ্ঠে বলতে থাকে, যে মেয়ে পারে এত বড় অনাচার করতে, স্বামীর ঘরে বাস করে পর-পুরুষের সঙ্গে প্রণয়লীলা চালাতে, কি তার শাস্তি জান?

নীপার ঠোঁট দুখানি একবার কেঁপে উঠে। তার পর ফেটে পড়ে, না।

—না? কারণ?

—প্রয়োজন বোধ করি না। যা মিথ্যে তার মূল্য আমি দি না।

—মিথ্যে! আমার নিজের চোখ দিয়ে দেখা—।

—থাম, তুমি ভুল দেখেছ।

—ভুল দেখেছি! বল কি? তোমার ফটো, তোমার হাতের লেখা চিঠি—সব ভুল? সোমেশ থামে। এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করে উত্তরের প্রত্যাশায়। পর মুহূর্ত্তেই দাঁতে দাঁতে চেপে গর্জ্জে উঠে দ্বিগুণ বেগে, আমি কচি খোকা নই নীপা বা ভেড়ুয়াও নই যে, যা বোঝাবে তুমি তাই বুঝব আমি। এতদূর অধঃপতন তোমার হয়েছে যে—। নীপার চোখ দুটো ধক করে জ্বলে উঠে, কিন্তু কোন উত্তর দিতে পারে না সে। সোমেশ বিষ ঢেলে দিয়ে তীব্রভাবে বলে চলে, তুমি না মা; সন্তানের জননী! স্বামীকে ছলনা করে, তার চোখে ধুলো দিয়ে একজন পরপুরুষের সঙ্গে আনন্দে রাসলীলা করে চলেছ। লজ্জা

করে না ও মুখ দেখাতে তোমার। অসচ্চরিত্র নারী কোথাকার! জবালা জননী!

—কী! কী বললে তুমি! জবালা জননী! আমি? নীপা চীৎকার করে উঠে দেহের সমগ্র শক্তিকে একত্রিত করে। সারা দেহ তার কাঁপতে থাকে বেতস পাতার মত। সে চেয়ারের হাতলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ায়। হয়ত ঘর ছেড়ে চলে যাবার উপক্রম করে।

কিন্তু সোমেশ বাধা দেয়। পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে রুদ্ধ আক্রোশে ফেটে পড়ে। বলে, না, যেতে পাবে না তুমি। যাবার আগে তোমার কীর্ত্তিকাহিনী নিজের মুখে তোমার বলে যেতে হবে। তোমার দুটি ছেলে—রমেশ আর দেবেশ। সংশয়াকুল দৃষ্টি দিয়ে এদের ঠিক চিনতে পাচ্ছি না আমি। তোমায় বলতে হবে এদের মধ্যে কোনটি—।

সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। এর মধ্যে অস্পষ্টতা কোথাও নাই। অপমানে লজ্জা। নীপার সুগৌর মুখখানা টকটকিয়ে উঠে। কিন্তু সে প্রাণপণে নিজেকে সামলে নেয়। দাঁতে দাঁত ঘসে সোমেশের মুখের উপর জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে, থাম। নির্লজ্জতা দেখাবার সময় এ নয়। পথ ছাড় তুমি।

—ছাড়ব। কিন্তু তার আগে তোমায় বলে যেতে হবে তোমার অকীর্ত্তি কুকীর্ত্তির কথা।

নীপা দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দেয়, বলব না। পার ত নিজের চোখ দিয়ে যাচাই করে নাও। আমি নারী। সহস্র ছেলের মাঝ থেকেও আমি চিনে নিতে পারি নিজের ছেলেকে। তুমি পুরুষ, পার ত দুটির মাঝ থেকে চিনে নাও তোমারটিকে। উত্তেজনায় নীপা কাঁপতে থাকে। সমস্ত অন্তর তার বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বামীর বিরুদ্ধে। সে দাঁড়িয়ে থাকে বিদ্রোহিনী মূর্ত্তিতে।

সোমেশ উন্মাদের মত চীৎকার করে বলে, কথার ছলনায় তুমি আমার প্রশ্নকে এড়িয়ে যেতে পারবে না নীপা। আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে যেতে হবে তোমার।

—দেব না। অপদার্থ বর্ব্বর কোথাকার।

—দেবে না? সোমেশ লাফিয়ে উঠে। হাত বাড়িয়ে দেওয়ালে টাঙান ছড়িটিকে নিতে যায়। বলে, কেমন করে দেওয়াতে হয় আমি জানি। উত্তর দাও, নইলে চাবকে পিঠের ছাল ছাড়িয়ে নেব তোমার। শয়তানি!

—কী! শয়তানি! সিংহীনীর মত দৃপ্ত ভঙ্গিমায় ঘাড় বেঁকিয়ে ফিরে দাঁড়ায় নীপা। ছাল ছাড়িয়ে নেবে আমার? স্পর্দ্ধা!

সোমেশ ভড়কে যায়। স্ত্রীর দৃপ্ত ভঙ্গিমায় সে এক পা পিছিয়ে আসে। স্বরের তেজও কিছুটা নিষ্প্রভ হয়ে আসে। তবুও ঠাট বজায় রাখতে তাকে বলতে হয়, স্পর্দ্ধাই ত। তোমাকে এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যেতে হবে। সে লাঠিটা মাটিতে ঠোকবার চেষ্টা করে।

নীপা জলন্ত দৃষ্টি মেলে স্বামীর মুখের দিকে তাকায়। তার পর বলে, দেব। তবে তোমার ঐ লাঠির জোরে নয় বা ছাল ছাড়িয়ে নেবার ভয়েও নয়। দেব, শুধু আমার মাতৃত্বের সম্মান রক্ষার জন্যে, ছেলেদের অপযশের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে, আর তোমার ঐ সাধুতার মুখোস খোলবার জন্যে। কত বড় পরমহংস দেবটি তুমি সেইটাই দেখিয়ে দেব তোমার চোখে আঙুল দিয়ে। তবে এখন নয়। এখন তুমি উত্তেজিত, আমিও ক্লান্ত, ঠিক সময়ে জানতে পারবে সব।

সন্ধ্যার পর আবার দেখা হয় দু'জনার। নীপা ঘরে ঢুকে বলে, এত তাড়াতাড়ি আমায় ডেকে পাঠাবার কোন প্রয়োজন ছিল না তোমার। আমি নিজেই আসছিলুম আর তার জন্যে প্রস্তুতও হচ্ছিলুম।

—প্রস্তুত হচ্ছিলে মানে রিহার্সাল দিয়ে নিচ্ছিলে? সোমেশের স্বরে শ্লেষ মাখান।

—না, পিঠের ওপর একটু প্রলেপ দিয়ে নিচ্ছিলুম যাতে ছাল ছাড়াবার সময় ব্যথা না পাই।

—হুঁ। তা হলে ভয় পেয়েছ বল?

—ভয়? তা পেয়েছি। তবে তোমাকে নয়, নিজেকে। এতদিন কি করে যে তোমার ঘর করে এসেছি সেই কথা ভেবে আমি শিউরে উঠছি। কিন্তু বিশ্বাস কর, তোমার দিব্যি বলছি, তোমাকে ভয় পাবার মত আমার কিছু নেই।

—কিছু নেই? কারণ?

—কারণ শুনবে? যে সরষে দিয়ে ভূত ছাড়াবে ভেবেছ সেই সরষেকেই ভূতে পেয়ে বসেছে।

সোমেশ ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলে, মানে?

নীপা উত্তর দেয়, ব্যস্ত হয়ো না, সব জানতে পারবে এখুনি। আশ্চর্য্য! ভূতগ্রস্ত সরষে ভূত ছাড়াবার জন্যে ব্যস্ত। এ এক আচ্ছা তামাসা নয়?

—তামাসা? বলতে চাও তোমার সঙ্গে আমি তামাসা করছি?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তামাসা ছাড়া আর কি। তুমি পুরুষ তাই তোমার নাকে এসে ঠেকেছে পুরুষের গন্ধটা, কিন্তু আমার নাকে ঠেকেছে মেয়েলী গন্ধটা। তবে তোমার

গল্পটা নির্ভেজাল নয় এই রক্মে, আমারটা একেবারে নির্ভেজাল।

সোমেশ কঠোর কণ্ঠে বলে, থাম, ছেঁদো রসিকতা রাখ তোমার। ওসবে আমায় ভোলাতে পারবে না। আমার প্রশ্নের উত্তর চাই।

নীপার স্বরের পরিবর্ত্তন হয়। কণ্ঠস্বর তারল্য বর্জ্জন করে অকস্মাৎ গম্ভীর হয়ে উঠে। গম্ভীর ভাবে সে বলে, পাবে। উত্তর দেবার জন্যেই আমি প্রস্তুত হয়ে এসেছি। তবে তাড়া হুড়ো করে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে চাই না তোমার মত। একটু ধীরে সুস্থেই বলতে চাই।

সোমেশ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করে বলে, কি, কি বলতে চাও তুমি?

নীপা ভয় পায় না। নির্ভীক কণ্ঠে বলে, কি বলতে চাই শুনবে? বলতে চাই যে-প্রশ্নটা আমারই উচিত তোমাকে করা, ঠিক সেইটাই তুমি করে বসেছ আমাকে। আশ্চর্য্য! এতদিন একসঙ্গে ঘর করেও নিজের স্ত্রীকে চিনতে পার নি তুমি! পরিচয় পাও নি তার চরিত্রের। কিন্তু আমি ত চিনেছি তোমাকে। চিনেছি তোমার চরিত্রের দুর্ব্বলতাকে। সেখানে ত ভুল হয় নি আমার এতটুকু। অসচ্চরিত্র আমি আর চরিত্রবান পরমহংসদেবটি তুমি! নীপা আবার দাঁতে দাঁত ঘসে।

—নীপা! সোমেশ চীৎকার করে উঠে।

—আস্তে! অসভ্যের মত চেঁচিও না। মেয়েমানুষকে অপমান করবারও একটা সীমা আছে। সে সীমা ছাড়িয়ে গেছ তুমি। তোমার মনের মধ্যে নিজের যে অসাধুতা দিবারাত্র জাগ্রত রয়েছে তারই প্রতিফলন তুমি দেখছ অপরের মধ্যে। নিজের অসচ্চরিত্রতার গ্লানি অর্পাতে চাইছ অপরের কাঁধে।

—উঃ অসহ্য!

—বড্ড লাগছে না? চাবুকের চাইতেও? কিন্তু কি করব বল, উপায় নেই। এ তোমায় সইতেই হবে। থুতু ছুঁড়েছ ওপরের দিকে, গায়ে পড়বেই। আমার স্ত্রীধর্ম্মে তুমি দোষারোপ করেছ; ধ্রুব বিশ্বাস করেছ আমার অসচ্চরিত্রতায়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ভীষ্মদেব, চরিত্রের মাপকাঠির মান আজ তোমার কতখানি উঁচুতে? কতখানি আদর্শনিষ্ঠ স্বামী তুমি?

সোমেশ ফেটে পড়ে। বলে, প্রশ্ন করছ আমাকে, আমার চরিত্র সম্বন্ধে? স্পর্দ্ধা তোমার বেড়ে গেছে নীপা।

—বাড়ে নি। বরং অধোগতিই হয়েছে তার। নাকের ডগায় গন্ধ পেয়েও এ প্রশ্ন করি নি। হয় ত করতুমও না। কিন্তু সুযোগ দিলে তুমি। এর পর না করে আর উপায় নেই আমার।

সোমেশ কঠোর হবার প্রয়াস করে বলে, তোমার হেঁয়ালী রাখ। আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। এর হেস্ত-নেস্ত না করে ছাড়ছি না আমি।

নীপা সহজ কণ্ঠেই বলে, ব্যস্ত হয়ো না। হেস্তনেস্ত না করে ছাড়তে বলি না তোমায়। এই চিঠিখানা পড়, হয় ত হেস্তনেস্তর পথ সুগম হবে অনেকখানি। এ তোমার মালার চিঠি। বলেই একখানা চিঠি সে ছুঁড়ে দেয় স্বামীর দিকে।

সোমেশ চমকে উঠে। আকস্মিক প্রচণ্ড আঘাতে মানুষ যেমন অসাড় হয়ে পড়ে ক্ষণকালের জন্য, চিঠিখানা হাতে করে সোমেশও নিস্পন্দ হয়ে পড়ল কিছুক্ষণের জন্য। মুহূর্ত্ত মধ্যে মুখের রঙের পরিবর্ত্তন হয়ে পাণ্ডাস বর্ণ ধারণ করল। চিঠিখানার দিকে ভীত বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে স্খলিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, এ চিঠি এখানে এল কি করে?

নীপা উত্তর দিল, এসেছে সে শুধু তোমার দুর্ভাগ্য, আমার দুর্ভাগ্য আর মালার দুর্ভাগ্য বাড়াবার জন্যে। এ বিধিনির্ব্বন্ধ অথবা অদৃষ্টের পরিহাস। নইলে যে চিঠি গিয়েছিল তোমার অপিসে, তুমি টুরে ছিলে বলে তিন দিন পর সেই চিঠি তোমার পিয়ন ঘাড়ে করে বয়ে এনে দিয়ে গেল বাড়ীতে। ঝরঝরে মেয়েলী হাতের লেখা দেখে কৌতুহল দমন করতে পারলুম না কিছুতেই। চিঠিখানা খুলে ফেললুম সঙ্গে সঙ্গে।

—তুমি পড়েছ? সোমেশ প্রশ্ন করে অত্যন্ত অসহায়ভাবে।

নীপা একটু হাসে। বলে সব। প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। গড় গড় করে বলে যেতে পারি, শুনবে? শুধু ঐখানা পড়েই ক্ষান্ত হই নি। আরও পড়ছি।

—আরও? সোমেশ নিজের অজ্ঞাতসারেই প্রশ্ন করে।

নীপা বলে, আরও। প্রায় সবগুলোই। রক্তের স্বাদ পেলে বাঘ যেমন লোলুপ হয়ে ওঠে, তেমনি লোলুপ হয়ে উঠলুম আমিও। চুরি করে তোমার সুটকেশ খুলে মালার সব চিঠিগুলো পড়ে ফেললুম একে একে।

—সব?

—সব। পড়তেই যখন সুরু করলুম তখন বাদ দেব কেন। নীপা একটুখানি হাসে।

সোমেশ মুহূর্ত্তের তরে উত্তেজিত হয়ে উঠে। বলে, কেন? কোন্ অধিকারে তুমি পড়লে আমার চিঠি?

—অধিকার! নীপা আবার তেমনি করেই হাসে,

অধিকারের প্রশ্ন এখানে ওঠে না। স্বামীর সামাজিক জীবন, নৈতিক চরিত্রের ওপর অধিকার আছে সব স্ত্রীরই। যেমন আমার ওপর আছে তোমার। চিঠিগুলো পড়ে পর্য্যন্ত একটা জিজ্ঞাসাই মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে কেবল, এর পর কি করা উচিত মালার। স্বামীকে সব কথা খুলে বলা, না অপরের লালসার ইন্ধন হয়ে থাকা। নিজের অজান্তে একদিনের যে ভুল সে করেছিল, তারই মাশুল গুণে চলেছে আজও। স্বামীর স্বার্থে তোমাকে খুশী করতে সে একদিনের সিনেমার সঙ্গী হয়েছিল তোমার। সেই দিন তার এক মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতার সুযোগে তাকে গ্রাস করে বসলে তুমি। তাকে তুমি প্রলুব্ধ করেছ তার স্বামীর পদোন্নতি করে দেব বলে। এই টোপ সে গিলেছে, আর তোমাকে তুষ্ট করতে—। আচ্ছা এতখানি অধোগতি তোমার কি করে হ'ল বল ত? এতেও তুমি সন্তুষ্ট নও? নিজের অপরাধের বোঝা নিজের স্ত্রীর কাঁধে চাপিয়ে তৃপ্তি পেতে চাও? সন্তান স্নেহেও কলঙ্ক আরোপ করতে চাও?

সোমেশ দপ করে যেমন জ্বলে উঠেছিল তেমনি দপ করে নিভেও গেল। স্ত্রীর দৃঢ়চিত্ততাকে সে চেনে, ভয়ও করে মনে মনে। নীপার যেটুকু দুর্ব্বলতার সন্ধান সে পেয়েছিল তারই সুযোগ নিয়ে তাকে দাবিয়ে রাখতে চেয়েছিল। ভেবেছিল হয় ত ভয় পাবে সে। কিন্তু ফল হ'ল বিপরীত। ভাবতে পারে নি, এত বড় দুঃস্বপ্ন তার জন্ম লুকান থাকতে পারে। যা ছিল গোপন, একান্ত নিজস্ব, তা পরস্ব হয়ে মাথাটিকে তার মাটিতে লুটিয়ে দিল। সে বিহ্বল দৃষ্টিতে স্ত্রীর কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

নীপা থামে না, বলে চলে, আমার গল্পের কথা শেষ হ'ল এইখানে। এবার তোমার গল্পের কথা বলি শোন।

সোমেশ অস্ফুট কণ্ঠে বলতে যায়, না, থাক।

নীপা মাথা নাড়ে। বলে, থাকবে কেন? আজকের মূল প্রশ্ন ত ঐটাই। আর সেইটাই শোনাব বলে ত আমার রিহার্সাল দেওয়া। তবে ভয় নেই, অশ্রাব্য কিছু শোনাব না। শোভনের কথা তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে। তার কথাই বলি শোন। একদিন তার সঙ্গে বিয়ে স্থির হয়েছিল আমার।

সোমেশ ফস্ করে জিজ্ঞাসা করে, হ'ল না কেন?

—হ'ল না সে আমার ভাগ্য দোষে ঠাকুর। হ'ল না, অদৃষ্টে এই লাঞ্ছনা, নারীত্বের মাতৃত্বের প্রতি এই অসম্মান লেখা আছে বলে।

—ওটা মুখ্য নয়, গৌণ।

—তবে মুখ্যটাই শোন। হয় ত তার পছন্দ হয় নি আমাকে।

—পছন্দ হয় নি তোমাকে? এ কথা আমায় বিশ্বাস করতে বল?

—বিশ্বাস অবিশ্বাস অন্তরের জিনিস। ইচ্ছে হয় কর, না হয় কর না। তবে সবাই তোমার মত অন্ধ, বোকা নয়। শোভনের মত চক্ষুষ্মান চালাক লোকও পৃথিবীতে বাস করে। তাই তার অপছন্দ হয়েছিল আমাকে। শোভনেরা ছিল আমাদের প্রতিবেশী। বাস করত একেবারে সামনা সামনি। হৃদ্যতা ছিল খুব। কথা ছিল তাদের মেয়ে রেখা আসবে আমাদের ঘরে আমার জাঠতুতো ভাই সমীরদার বৌ হয়ে। বিনিময়ে তারা আমায় নিয়ে যাবে তাদের ছোট ছেলে শোভনের বৌ করে। পাকা কথা, এর মধ্যে নড়-চড় হবার কিছু নেই। সুতরাং, ভবিষ্যতের স্বপ্ন-মধুর দিনগুলিকে ধ্রুব বলেই মেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলুম আমরা। এর মধ্যে রেখা একদিন সত্য সত্যই এসে উপস্থিত হ'ল আমাদের ঘরে আমার বৌদিদি হয়ে।

সোমেশ শ্লেষ ভরে বলে, ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক অর্থাৎ আগমনই হ'ল শুধু নির্গমন আর হ'ল না।

নীপা ঠোঁট উল্টায়। ঘাড় নেড়ে বলে, হ'ল আর কই ঠাকুর। হলে তোমার ঘর আলো করত কে? মালা?

সোমেশ রাগ করে বলে, মালা কেন যমে।

—ছিঃ, রাগ করে অপভাষণ করতে নেই আর্য্যপুত্র। যমে আলো করে না, অন্ধকার করে। যা করবার তা করতে হ'ত আমাকেই—যেখানেই থাকি না কেন। এ বিধি নির্ব্বন্ধ। এর নড়-চড় হবার যোটি নেই। এখন মাথা গরম না করে শোভন-নীপা সংবাদটা শোন। শুনতে বিশেষ খারাপ লাগবে না তোমার।

সোমেশ উত্তেজিত হয়ে উঠে। উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, দোহাই তোমাকে নীপা। দয়া করে তুমি থাম। কোন সংবাদই আমি শুনতে চাই না এর পর।

নীপা থামে না, বরং কঠিন কণ্ঠেই বলে, থামবার কোন উপায় নেই। তুমি শুনতে না চাইলেও আমাকে শোনাতেই হবে। অপমানে আমার নারীত্ব আজ উদ্বেলিত। এ কাহিনী তোমায় না শুনিয়ে সে স্বস্তি পাবে না। তোমরা পুরুষ, জান না মেয়েদের মাতৃত্ব কত শ্লাঘার জিনিস। এর ওপর কলঙ্ক সইতে পারে না তারা। আমিও অপারগ। তাই সবটা শোনাতে চাই তোমায়। তুমি জান নিশ্চয়ই, লেখা পড়ায় শোভন বরাবরই ছিল ভাল ছেলে। এম-এ পরীক্ষার ফল ভাল হওয়ায় একটা

করেন স্কলারসিপ জুটে গেল তার ভাগ্যে। বিলেত যাবে সে, সেখান থেকে প্যারিস, তার পর জার্ম্মানী,তার পর—। বাবা প্রমাদ গুণলেন। মা ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। ভাবলেন, এ তার পরের হয় ত শেষ হবে না কোন দিন। তাই ছুটে এলেন আমার কাছে। লজ্জার মাথা খেয়ে বললেন, তুই একবার চেষ্টা করে দেখ নীপা, যদি তোর কথা শোনে সে। ভেবেছিলেন, হয় ত মেয়ে রূপের জোরে, সম্প্রীতির জোরে আটকাতে পারবে ছেলেকে। লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল আমার। বড় ভাগ্যাহত মনে হ'ল নিজেকে। তবুও কেন জানি না, ছুটে গিয়েছিলুম তার কাছে। ভেবেছিলুম, যেটুকু প্রীতি, ভাল লাগালাগি জন্মেছিল আমাদের মধ্যে, তারই জোরে ফেরাতে পারব তাকে। কিন্তু কিশোরী মনে এ ধারণাটুকু তখনও জন্মায় নি যে, ভাল লাগা আর ভালবাসা এক জিনিস নয়। একটা চোখের আর একটা প্রাণের। চোখ দিয়ে প্রাণকে যাচাই করা যায় না। তাই আমার হার হ'ল।

সোমেশ বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে, হার হ'ল মানে? শোভন কথা রাখল না তোমার?

—না।

—কি বললে সে?

—বললে, বিয়ে করা আর বিলেত যাওয়া এক জিনিস নয়। একটা অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু আর একটা পারে না।

—বললে সে এই কথা?

—বললে, তবুও বেদনার্ত্ত বাপ মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে গোপনে চিঠি লিখেছিলুম পর পর তিন-খানা। সে চিঠিগুলিতে হয় ত উচ্ছ্বাস ছিল, কিন্তু অসংযম মনের পরিচয় ছিল না। ভীরু মেয়ের ততোধিক ভীরু মনের কিছুটা আকুতি মেশান ছিল। বিয়ে না করে এভাবে চলে গেলে বাপ মা, আত্মীয় স্বজনের কাছে আমার যে মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না, এরই জন্মে হয় ত আত্মঘাতী পর্য্যন্ত হতে পারি একদিন, এই কথাটা বেশী করে তাকে জানিয়েছিলুম শেষ চিঠিতে।

—কি উত্তর পেলে তার?

—বুঝতেই পাচ্ছ আজ আমাকে তোমার ঘর আলো করতে দেখে।

—তোমার এত বড় প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করে চলে গেল সে?

নীপা একটু হাসে। বলে, এর মধ্যে প্রেম কোথায় দেখলে ঠাকুর। প্রেম থাকলে তাকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। যা ছিল তা একটা মোহ। আর সে মোহ ছুটে গেল পরিবেশের পট পরিবর্ত্তনে।

—ব্যস্, এতেই সব শেষ?

নীপা ঘাড় নাড়ে।

—মানলুম, মুখ দেখা-দেখির না হয় উপায় রইল না। কিন্তু চিঠিপত্তর?

—তাও শেষ। পট পরিবর্ত্তনে সবেরই শেষ হয়ে গেল।

—এ তুমি বিশ্বাস করতে বল আমায়?

—বলাটা আমার খুশি। কিন্তু বিশ্বাস অবিশ্বাস করাটা তোমার খুশি। এ নিয়ে আমি তোমায় মাথার দিব্যি দেব না। তবে শোভনের একখানা চিঠি আমি পেয়েছিলুম। সেখানা বিলেত থেকে লেখা।

—বিলিতি-চিঠি! কি লিখেছিল শোভন? অবশ্য সে কথা বলতে বাধা যদি কিছু না থাকে।

—কিছু মাত্র না। তবে দুঃখের কথা, সে চিঠি আমি পড়ি নি।

—পড় নি? আশ্চর্য্য ত! কি করলে তা হলে?

—না খুলে সোজা পাঠিয়ে দিলুম তার বাপ মায়ের কাছে। তারপর তার অদৃষ্টে কি হ'ল আমার জানা নেই।

—কিন্তু এতখানি বীতরাগের হেতু?

—বীতরাগ নয় খেয়াল। ভাল লাগে নি, তাই পাঠিয়ে দিলুম। হয় ত মায়ের সতর্ক বাণীটাও তলায় তলায় কাজ করেছিল অজান্তে। রোগে ক্ষোভে মা আমায় একান্তে ডেকে মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, আত্মসর্ব্বস্ব পুরুষদের বিশ্বাস করিস নি নীপা, ঠকবি। যে তোর মর্য্যাদা বুঝল না, আমার মেয়ে হয়ে তার মর্য্যাদা কোন দিনই দিতে যাস নে তুই। মায়ের সে কথা আমি ভুলতে পারি নি। আজও সে কথা অন্তরে গাঁথা আছে আমার। তার পর বছর না ঘুরতেই—।

—আমার ঘর আলো করলে তুমি?

—মনে করেছিলুম তাই হয় ত আলোই করেছি। কিন্তু ভুল হয়েছিল সেইখানে। এ ভুলের মরীচিকা। আলোর চিহ্ন কোথাও নাই। সব অন্ধকার, আর সেই অন্ধকারে তলিয়ে যেতে বসেছি আমি। জীবনে ব্যর্থ হয়ে গেলুম।

—হুঁ, সোমেশ একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। বলে, নিজের দোষেই ব্যর্থ হয়ে গেলে নীপা। সেদিন অতোখানি মাতৃভক্তি না দেখিয়ে যদি শোভনের বিলিতি চিঠিখানি পড়ে দেখতে একবার আর তার উত্তর দিতে মনের মত করে, তা হ'লে আজ এতখানি খেদের কারণ তোমার ঘটত না। ফুলে ফলে শোভান্বিতা হয়ে উঠতে পারতে

আরও ভাল ভাবে। অনুরাগ কখনও চাপা থাকে না। তা প্রকাশ পাবেই। আচ্ছা, আমার দিব্যি বলত, এখন তুমি শোভনের কোন খবর রাখ?

নীপা এক মুহূর্ত স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার চোখ দুটি জলে উঠে দপ্ করে। পরমুহূর্তেই সে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে, এ প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন।

—কারণ? প্রশ্ন করে সোমেশ।

নীপা আবার কঠিন হয়। বলে, কারণ বোঝাবার ক্ষমতা তোমার নেই। তবে এইটুকু জেনে রাখ, যেখানে অকারণে নারীত্ব মাতৃত্ব লাঞ্ছিত হয়, অপমানিত হয়, সেখানে কারণের কোন মূল্য নেই। আজ ছ' বছর এক সঙ্গে ঘর করেও যে মেয়েকে চিনলে না তুমি, যার চরিত্রের গুণাগুণকে বুঝলে না, তারই তুচ্ছ একটা 'হাঁ না'য়ে তোমার সকল সন্দেহ নিরসন হবে, এ তুমি বিশ্বাস করতে বল আমায়। আমি অবোধ নই বা কচি খুকীটি নই যে বুঝতে পাচ্ছি না কি সন্দেহ তোমার মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে আজ।

সোমেশ অপ্রস্তুতে পড়ে। অপ্রতিভ কণ্ঠে বলে, আমি স্বামী। আমার কাছে কোন কথা গোপন থাকা উচিত নয়।

নয়ই ত। নীপা জোর দিয়ে বলে, কিন্তু যে স্বামী স্ত্রীর মর্য্যাদা দিতে জানে না, তার কাছে গোপন করাই বা কি আর প্রকাশ করাই বা কি। তবে গোপন আমি করব না। শোন বলি, সে দিনের শোভনের প্রত্যাখ্যান আমার যেমন বেজেছিল তেমনি আমার মুকুলিত নারীত্বকে জাগিয়েও তুলেছিল। সে তার খুশির রথ চালিয়ে এক-জন কিশোরীর অন্তরের আধ বিকশিত কোমল অনুভূতি-গুলিকে পিষ্ট করে দিয়ে গেল বটে, সেই সঙ্গে কোমলের পাশাপাশি যে কুলিশ আত্মগোপন করে থাকে তারও ধ্যান ভাঙিয়ে দিয়ে গেল। তাই সে দিনের শোভন সেই কুলিশের কাছে চিরদিনের অশোভন হয়ে রইল।

নীপা থামে। সোমেশ তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে অসহায় দৃষ্টি মেলে। স্ত্রীর নারীত্বের কাছে তার ব্যক্তিত্ব ম্লান হয়ে যায়।

নীপা আবার বলে চলে, সব অবন্ধনা বা অবিবাহিতা মেয়েদের একটা না একটা কৈশোর মরীচিকা থাকে। এ তাদের নিজস্ব জিনিস। এ রাজ্যে তারা নিজেরা প্রবেশ করে কিন্তু অপরের অনুপ্রবেশ সহ্য করে না। কিন্তু সেই অবন্ধনা মেয়ে যেদিন সীমন্তে একবিন্দু সিঁদুর পরে 'বন্ধনা' হয়, সেদিন তার সারা রূপটাই পাল্টে যায়। সীমন্তের ঐ যে এতটুক রক্তবিন্দু তার মর্য্যাদা সে বোঝে। বোঝে, এ তার সৌভাগ্যের পরিচয়। এ সৌভাগ্যের চরম পরিণতি মাতৃত্বে। তারই স্নেহ-মন্দাকিনীর ধারায় তার সব গ্লানিই ধুয়ে মুছে যায়। তার একাগ্র দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ থাকে শুধু স্বামী আর সন্তানের মঙ্গলের দিকে। অন্য দিকে এ দৃষ্টি সম্প্রসারিত করবার সময় থাকে না। তুমি বিশ্বাস কর আর না কর, এই হ'ল আমার মতো মেয়েদের ছোটখাটো একটা ইতিহাস।

সোমেশ কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ে। অপলক চোখে সে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার পর অকস্মাৎ সে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকে, নীপা?

নীপা বাধা দেয়। বলে, না না নীপা নয়। নীপা মরে গেছে। আজই সে আত্মহত্যা করে বেঁচেছে।

সোমেশ তেমনি ভাবেই বলে, শুধু বাঁচে নি, বাঁচিয়েছে। নীপার পুণ্যাত্মা সোমেশের প্রেতাত্মাকে বাঁচিয়েছে। তাকে পুণ্য মার্গের পথ দেখিয়ে দিয়েছে। তুমি আমায় ক্ষমা কর নীপা।

নীপা উঠতে যায়। কিন্তু সোমেশ এগিয়ে এসে তার দুটি হাত চেপে ধরে অনুনয়ে ভেঙে পড়ে বলে, তোমাকে অসম্মানিত করেছি, তোমার মর্য্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করেছি, তার জন্যে আমায় যে শাস্তি দিতে চাও, আমি নিতে প্রস্তুত আছি নীপা। শুধু এবারের মত আমায় ক্ষমা কর। আমার দিব্য চক্ষু ফুটেছে আজ।

নীপা নিজেকে সামলে নেয়। নির্নিমেষ দৃষ্টি দিয়ে স্বামীকে দেখে নিয়ে বলে, করব। কিন্তু দুটি সর্ত্তে।

—বল, আমি রাজি। কি সর্ত্ত তোমার।

—প্রথম সর্ত্ত মালাকে ভুলতে হবে তোমার। তার নিরিবিলি সংসারে অধর্ম্মের উৎপাত বাড়িয়ে অশান্তির সৃষ্টি করতে পারবে না তুমি।

সোমেশ স্থির হয়ে শোনে। তার পর বলে, বেশ। তোমার দ্বিতীয় সর্ত্ত।

—আমার মুক্তি। আমি মুক্তি চাই।

সোমেশ চমকে উঠে। বলে, মানে?

—মানে, যে স্ত্রী স্বামীর চিত্ত জয় করতে পারে না, সে ব্যর্থ। তাই আমিও ব্যর্থ। ব্যর্থ জীবন বড় দুর্ব্বহ। এর ভারে আমি তোমায় বিব্রত করতে চাই না। আমি নিঃশব্দে সরে যেতে চাই তোমার কাছ থেকে। সঙ্গে নিয়ে যাব রমেশ আর দেবেশকে। তাদের গর্ভে স্থান দিয়েছি যখন, অন্নেও স্থান দেব তখন।

সোমেশ আহত হয়ে বলে, এ তোমার অভিমানের

কথা নীপা। একে ক্ষমা বলে না, বলে, প্রতিশোধ নেওয়া। কোথায় যাবে তুমি?

—জানি না। শুধু জানি আমায় যেতে হবে।

—আমি দেব না যেতে। যাও দিকিনি, কেমন করে যেতে পার তুমি?

নীপা একটুকরা ম্লান হাসি হাসে। বলে, সে অধিকার তুমি হারিয়েছ। আমায় ধরে রাখবার মত জোর তোমার নেই। এর পর আমাদের একত্রে বাস করা আর সম্ভবপর হবে না।

সোমেশ হতবাক হয়ে যায়। নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে স্ত্রীর দৃঢ়প্রত্যয় মুখের দিকে। তার পর এক সময় ধীরে ধীরে বলে, বেশ, যাও, আমি বাধা দেব না। কিন্তু একটা কথা জেনে যাও। আমি দুর্ব্বল হলেও একেবারে মনুষ্যত্ব বর্জিত নই। বাপ হয়ে ছেলেদের অসম্মান করেছি, তোমায় অসম্মান করেছি, এর প্রায়শ্চিত্ত আমায় করতেই হবে। তাই এ সংসারে আমিও আর থাকতে চাই না। যে দিকে দু' চোখ যায় চলে যাব। এই বাড়ী ঘর বিষয় সম্পত্তি সব রইল ছেলেদের। ইচ্ছে হয় তাদের দিও। না হয় বিলিয়ে দিও তোমার খুশিমত। বলতে বলতে তার স্বর রুদ্ধ হয়ে আসে। সে ভাবাবেগে চালিত হয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

নীপা পিছন থেকে ডাকে, শোন।

সোমেশ দাঁড়ায়। স্ত্রীর দিকে ফিরে তাকায়।

নীপা বলে, বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে না?

সোমেশ উত্তর দেয়, হয় ত হচ্ছে। কিন্তু উপায় কি। স্বামীকে অসম্মান করে স্ত্রী যদি বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে চায়, আর সেটা যদি বাড়াবাড়ি না হয়, তা হলে এটাও হচ্ছে না।

—কিন্তু—।

—না, এর মধ্যে কিন্তু কিছু নেই। তুমি আমার বাধাকে গ্রাহ্য কর নি, স্বীকৃতি দিতে চাও নি আমার অনুরোধকে, আমিও প্রশ্রয় দেব না এ সবের।

—বেশ দিও না। তবে এক মিনিট দাঁড়াও, আমি এলুম বলে। বলতে বলতে নীপা স্বামীকে পাশ কাটিয়ে ঘর ছেড়ে বার হয়ে যায়।

অল্প সময়ের মধ্যেই সে ফিরে আসে। সঙ্গে নিয়ে আসে রমেশ আর দেবেশকে। রমেশ বড়, বুদ্ধি দীপ্ত বছর পাঁচেকের বালক। দেবেশ ছোট। দু' বছরের হৃষ্টপুষ্ট শিশু, একেবারে সোমেশেরই প্রতিকৃতি। উজ্জ্বল চোখ দুটিতে দুষ্টুমি মাখান। ক্রীড়া চঞ্চল বালক, সর্ব্বাঙ্গে ধুলা কাদা লাগান। বাপকে দেখেই ছুটে আসে দু' জনেই। হাঁটু দুটি জড়িয়ে ধরে দাঁড়ায়। দেবেশকে দু' হাত দিয়ে কোলে তুলে নেয় সোমেশ। বুকের উপর নিবিড় ভাবে চেপে ধরে। তার পর তার কোলা কোলা গাল দুটি এবং সারা মুখখানি চুমায় চুমায় ভরিয়ে দেয়। রমেশকেও এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে সে তার মাথার উপর ডান হাতখানি রেখে হয় ত মনে মনে আশীর্ব্বাদ করে। পরমুহূর্ত্তে নীচু হয়ে তার কপালে পরম স্নেহভরে চুমা খায়।

নীপা এ দৃশ্যটি উপভোগ করে। তৃপ্তিতে অন্তর তার ভরে যায়। স্বামীকে প্রশ্ন করে, চিনতে পেরেছ?

সোমেশ স্বীকার করে, পেরেছি। এ ভুল হবার নয়। কাণ্ডজ্ঞানহীনতা সুস্থ মনের পরিচয় নয় নীপা। আমার কাণ্ডজ্ঞানহীনতাকে প্রশ্রয় দিয়ে অপরাধের বোঝা আর বাড়তে দিও না তুমি।

নীপা স্বামীর দিকে তাকায় পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে। বিজয়িনী মূর্ত্তি তার। মুখে বিজয়িনীর হাসি। দৃষ্টিতে প্রীতির ধারা। মাতৃত্বের আর পত্নীত্বের গরিমায় মুখখানি উদ্ভাসিত। সে ঘাড়খানি বাঁ দিকে ঈষৎ হেলিয়ে যেন সোমেশকে সমর্থন করে। তার পর স্বামীর কাছে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে বরাভয়ের ভঙ্গিমায় ডান হাতখানি সামনের দিকে প্রসারিত করে।

দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

নানা মুনির নানা মত। সেদিন বার্ট্রাণ্ড রাসেলের একখানি বই পড়ছিলাম। পাশ্চাত্যের একালের এবং সেকালের প্রথিতযশা দার্শনিকদের মতবাদের উপর লেখকের টীকাটিপ্পনি যেমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ তেমনি হৃদয়-গ্রাহী। নীট্শের উপরে রাসেলের লেখাটি পড়ে মনের মধ্যে ভিড় করে এলো চিন্তার প্রবাহ। সেই চিন্তাপ্রবাহের প্রকাশ এই প্রবন্ধে।

মেয়েদের সম্পর্কে নীট্শের মন্তব্যগুলি অদ্ভুত। জার্মান দার্শনিকের মতে: Man shall be trained for war and woman for the recreation of the warrior. All else is folly. পুরুষকে দিতে হবে অস্ত্রে দীক্ষা। সে নেবে যোদ্ধার ভূমিকা। আর যোদ্ধার চিত্তবিনোদন করতে পারে—এমন শিক্ষা দিতে হবে মেয়েদের। অন্য যা-কিছু সবই বাজে। কিন্তু মেয়েরা পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্যে নাচবে বাঁশীর সুরে নয়, চাবুকের ঘায়ে। নীট্শে বলছেন:

Thou goest to woman? Do not forget thy whip.

আবার বলছেন:

What a treat it is to meet creatures who have only dancing, and nonsense and finery in their minds! অর্থাৎ সাজবো-গুজবো, নাচবো-কুঁদবো, আজে-বাজে নিয়ে মেতে থাক্‌বো—এ ছাড়া আর কি থাকতে পারে মেয়েদের মনে?

নারী সম্পর্কে নীট্শের এই ধরনের মন্তব্যের উপরে রাসেলের টীকা হচ্ছে:

His opinion of women, like every man's, is an objectification of his own emotion towards them, which is obviously one of fear.

নীট্শে মেয়েদের রীতিমত ভয় করতেন। নারী-জাতি সম্পর্কে তাঁর ধারণার মধ্যে নীটশের নিজেরই ভাবাবেগের প্রতিফলন। প্রত্যেক পুরুষই মেয়েদের সম্পর্কে যে-মত পোষণ করে থাকে সেই মতের মধ্যে আমরা খুঁজে পাই তার ভাবের আবেগকে। রাসেল বলছেন, মেয়েদের সম্পর্কে নীট্শে যে-মত প্রকাশ করেছেন তাকে সমর্থন করে না ইতিহাসের নজীর। নীট্শের নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যেই বা তাঁর মতের সমর্থন কোথায়? মেয়েদের সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের দৌড় ছিলো ভগ্নী পর্য্যন্ত। ভগ্নীর সাহচর্য্য থেকে যে-অভিজ্ঞতা তিনি কুড়িয়েছিলেন তা দিয়ে সমস্ত নারীজাতি সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত করা চলে না।

Amiel's Journal পড়তে পড়তে দেখতে পেলাম, মেয়েদের সম্পর্কে এমিয়েলের ধারণা নীট্শের ধারণার প্রায় কাছাকাছি। লিখেছেন:

A woman is something fugitive, irrational, indeterminable, illogical, and contradictory. A great deal of forbearance ought to be shown her, and a good deal of prudence exercised with regard to her, for she may bring about innumerable evils without knowing it.

নারীর মধ্যে এমন-কিছু আছে যার জন্যে তাকে পলাতকা বলা যেতে পারে। সেই এমন-কিছু যুক্তিকে মান্‌তে চায় না, লজিকের ধার ধারে না, নির্দ্দিষ্ট কিছুর বাঁধনের মধ্যে ধরা পড়ে না, যাকে বলা যেতে পারে স্ববিরোধী। তাই নারীকে আমাদের সহ্য করা উচিত এবং সেই সহনশীলতা হওয়া চাই প্রচুর। তার সঙ্গে ব্যবহারে বিচক্ষণতারও প্রয়োজন; কারণ নিজের অজ্ঞাতসারে কত যে অনর্থ সে ঘটাতে পারে তার কোন ইয়ত্তা নেই।

এমিয়েল আবার বলছেন:

To man belong law, justice, science, and philosophy, all that is disinterested, universal, and rational. Women, on the contrary, introduce into every thing favour, exception, and personal prejudice. As soon as a man, a people, a literature, an epoch, become feminine in type, they sink in the scale of things.

আইন, ন্যায়, বিজ্ঞান এবং দর্শন, যা-কিছু বিশ্বজনীন,

নৈর্ব্যক্তিক এবং যুক্তিসঙ্গত—এদের প্রতি একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে পুরুষের মনে। মেয়েরা কিন্তু স্বতন্ত্র-প্রকৃতির। সব-কিছুর মধ্যে তারা আনবে পক্ষপাতিত্ব, ব্যতিক্রম, ব্যক্তিগত পছন্দ বা অপছন্দ। যখনই কোন মানুষ, কোন জাতি, কোন সাহিত্য, কোন যুগ আদর্শের দিক থেকে মেয়েলি হয়ে যায় তখনই তাদের অবনতি ঘটে।

অতএব এমিয়েলের মতে নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দিলে বিপদ। সে হয়ে উঠবে কলহপরায়ণা। তাকে প্রাধান্য দিলে সে হবে নিষ্ঠুর। তা হলে সমাজে নারীর স্থান হবে কোথায়? পুরুষের পদপ্রান্তে, না মাথায়? এমিয়েল বলছেন:

To honour her and to govern her will be for a long time yet the best solution.

তাকে একাধারে মর্য্যাদা দিতে হবে এবং শাসনেও রাখতে হবে—দীর্ঘকাল ধরে এটাই হবে, বোধ হয় সমাধানের শ্রেষ্ঠ পথ।

একজন জার্মান মনীষী এবং একজন ফরাসী মনীষী নারীজাতি সম্পর্কে কি মত প্রকাশ করেছেন তার পরিচয় পাওয়া গেল। এবার একজন ইংরেজের এবং একজন আমেরিকানের চিন্তাজগতে প্রবেশ করা যাক। বার্ট্রাণ্ড রাসেল Principles of Social Reconstruction গ্রন্থে নারী-পুরুষের সম্পর্কে যা লিখেছেন তার মর্ম হচ্ছে:

মেয়েরা সংসারে থাকবে বিশ্বস্ত পরিচারক, রাজভক্ত প্রজা এবং চার্চ্চের গোঁড়াভক্ত যেমন থাকে অনুগত হয়ে। মেয়েরা শৈশবে পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং পরিণত বয়সে উপযুক্ত পুত্রের তত্ত্বাবধানে থেকে শুধু ত্যাগের জীবনযাপন করে যাবে—মধ্যযুগের এই আইডিয়া সভ্য-জগত থেকে আজ অন্তর্হিত। ন্যায়ের এবং স্বাধীনতার নূতন আদর্শের ধাক্কায় পুরাতনের শাসন গেছে বিলুপ্ত হয়ে। পুরাতনের বিলোপসাধনের পালা সুরু হয় ধর্মে। বিপ্লবের এই অভিযান রাজনীতির সীমানাকে পেরিয়ে পারিবারিক সম্পর্ককেও আজ জটিল করে তুলেছে। দাম্পত্যজীবনের সমস্যাও বিপ্লবের আবর্ত্তের মধ্যে পড়ে আজ ফেনিল হয়ে উঠেছে। কেন একজন নারী পুরুষের প্রাধান্য স্বীকার করে নেবে—এ প্রশ্নের শাস্ত্রগত জবাবে মানুষ তৃপ্ত থাকতে পারলো না যখন থেকে তখন থেকেই পুরাতনের শাসনকে অক্ষুণ্ণ রাখার সম্ভাবনা চিরতরে গেল বিলুপ্ত হয়ে। রাসেল শেষকালে মন্তব্য করেছেন:

To every man who has the power of thinking impersonally and freely, it is obvious, as soon as the question is asked, that the rights of women are precisely the same as the rights of men. Whatever dangers and difficulties, whatever temporary chaos, may be incurred in the transition to equality, the claims of reason are so insistent and so clear that no opposition to them can hope to be long successful.

স্বাধীনভাবে অনাসক্ত হয়ে যার চিন্তা করবার ক্ষমতা আছে তার কাছে এটা সুস্পষ্ট যে, পুরুষের অধিকারগুলির সঙ্গে মেয়েদের অধিকারগুলির কোনই তফাৎ নেই। সাম্যের স্বপ্ন সত্য হবার পূর্ব্বে পরিবর্ত্তনের যুগে যতই-কিছু বাধা-বিপত্তি আসুক, যতই-কিছু সাময়িক বিশৃঙ্খলা দেখা দিক, যুক্তির দাবিগুলি এমনই নাছোড়বান্দা এবং এমনই সুস্পষ্ট যে দীর্ঘকাল ধরে তাদের ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

নর-নারীর এই সাম্যের জয়ধ্বনি মার্কিন কবি হুইট্‌ম্যানের ছন্দেও:

The wife, and she is not one jot less than
the husband,
The daughter, and she is just as good as
the son,
The mother, and she is everybit as much
as the father.

পত্নী—সে তো পতির তুলনায় এক তিলও কম নয়,
কন্যা—সে তো পুত্রের মতোই অনবদ্য,
মাতা—সত্তার প্রতি অনুপরমাণুতে পিতার মতোই গরিয়সী!

হুইট্‌ম্যান দুনিয়ার সেরা শহরের কতকগুলি লক্ষণ দিয়েছেন। লিখেছেন, পৃথিবীর সেরা শহর হচ্ছে সেই শহর:

"Where women walk in public processions in the streets the same as the men;

Where they enter the public assembly and take places the same as the men";

যেখানে রাস্তায় রাস্তায় শোভাযাত্রায় মেয়েরা পুরুষেরই মতো চলেছে অকুণ্ঠ পাদক্ষেপে;

যেখানে সাধারণ-সভায় তারা পুরুষের মতো অবাধে প্রবেশ করে এবং পুরুষের মতো স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করে তাদের আসন;

মার্কিন হুইট্‌ম্যান আর ইংরেজ রাসেল—এঁদের দুই-এরই লেখায় মেয়েদের অধিকারের দাবি অবাধ

স্বীকৃতি পেয়েছে। এঁরা দু'জনেই যে নবধর্মের জয়ধ্বনি করেছেন সেই ধর্মের ভিত্তি হবে স্বাধীতায়, ন্যায়ে এবং প্রেমে, কর্তৃত্বে এবং অনুশাসনে এবং নরকাগ্নির বিভীষিকায় নয়। এঁদের দলে নাট্যকার ইবসেনকে এবং তাঁর যোগ্য শিষ্য বার্ণার্ড শ'কেও নিশ্চয়ই টানতে পারি। রবি ঠাকুর এবং গান্ধীকে তো বটেই।

ইউরোপের অন্যতম প্রথিতযশা লেখক এবং নাট্যকার মেটার্লিঙ্ক (Maeterlinck) নারীকে যে দৃষ্টিতে দেখেছেন তার মধ্যে নুতনত্ব এবং প্রজ্ঞার পরিচয় আছে যথেষ্ট। উনি বলছেন: যাঁরা নারীজাতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে থাকেন তাঁরা জানেন না কোন্ মেঘলোকে অধরে অধরে নর-নারীর সত্যিকারের মিলন সম্ভব। নীটশের এবং তাঁর সগোত্রদের প্রতি মেটার্লিঙ্কের মনে অবিমিশ্র করুণা! বাইরে থেকে দেখলে মেয়েদের মনে হয় কতই অকিঞ্চিৎকর! ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরে ঘরে। কেউ সেলাই করছে, কেউ গান গাইছে, কেউ বা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আমাদের একজনের কাছেও কি তাদের সত্য পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে? আমরা তাদের কাছে যাই মনের মধ্যে সংশয় নিয়ে। তাদের প্রশ্ন করি মনের মধ্যে একটা অবিশ্বাসের ভাব নিয়ে। প্রশ্নের জবাব কবে থেকে তারা জানে! তাই তো নিরুত্তর থাকে! আমরা চলে যাই দৃঢ়নিশ্চয় হয়ে যে, মেয়েরা কিছু বোঝে না। কিন্তু সত্যিই কি তারা জ্ঞানের রাজ্যে অপাংক্তেয়? মেটার্লিঙ্ক বলছেন, মেয়েরা হচ্ছে the veiled Sisters of all the great things we do not see. যা কিছু মহৎ মেয়েরা হচ্ছে তাদেরই অবগুণ্ঠিতা সহোদরা। আমরা পুরুষেরা সেখান থেকে নির্বাসিত। They are indeed nearest of kin to the infinite that is about us, and they alone can smile at it, with the intimate grace of the child, to whom its father inspires no fear. যে অনন্ত আমাদের ঘিরে আছে মেয়েরা রয়েছে তার একান্ত কাছাকাছি। অসীমের এত কাছে আমরা নই। তারা অনন্তের সন্তান। শিশু যেমন নির্ভয়ে তাকায় তার পিতার পানে তেমনি সকান্তে তারা তাকিয়ে থাকে অনন্তের দিকে। এই পৃথিবীর মাটির ধুলায় আমাদের আত্মার নির্মল সৌরভকে মেয়েরাই ধরে রেখেছে। মেয়েরা যদি পৃথিবীতে না থাকতো, আত্মা থাকতো মরুর নির্জনে নিঃসঙ্গ রাজার মতো। পৃথিবীর সেই আদিম ঊষার ঐশী ভাবাবেগে মেয়েদের চিত্ত আজও সমৃদ্ধ। যা কিছু অসীম তারই গভীর তাদের সত্তার উৎস। সেই উৎসগুলি আমাদের তুলনায় আরও গভীর। 'নারী'র সত্তাকে ঘিরে রয়েছে অনন্তের অনির্ব্বচনীয় যে মহিমা—তা মেটার্লিঙ্কের লেখায় যেমন স্বীকৃতি পেয়েছে এমন আর কয়জন আধুনিকের লেখায়?

মেয়েদের সম্পর্কে উইলিয়াম্ জেম্সের প্রশস্তিও কত সত্য এবং কত সুন্দর! উনি বলছেন, যে নৈতিক উদ্দীপনা থেকে মেয়েরা সংসারের সেবা করে যায় তার শিখার কাছে পুরুষের নৈতিক উদ্দীপনা সত্যিই হার মানে। সন্তানের অথবা স্বামীর অসুখে মেয়েদের ক্লান্তিহীন পরিচর্য্যা কি এই সত্যকেই প্রমাণিত করে না? দরিদ্রের হাজার হাজার কুটিরে ঐ যে মেয়েরা দিনরাত্তির কাজ করে চলেছে, সেবা করছে রোগীর, ব্রতী রয়েছে শিক্ষাদানের কাজে, রেঁধে স্বামীপুত্রকে খাওয়াচ্ছে, সেলাই করছে, বাসন মাজছে, আরও কত না সেবার খুঁটিনাটি কাজের মধ্যে নিজেকে ঢেলে দিচ্ছে নিঃশব্দে—ওরা যদি কখনো-সখনো রেগে গিয়ে দুটো কড়া কথা শোনায় তা নিয়ে কি খুব খুঁত খুঁত করা উচিত? কিন্তু চুপচাপ করে সহ্য করাই তো মেয়েদের স্বভাব। ছেলেমেয়েগুলোকে কেমন নাইয়ে-ধুইয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখছে, অফিস-ফেরৎ কর্তার মেজাজটিকে মধুর কথায় কেমন ঠাণ্ডা করে দিচ্ছে, বলয়িত হস্তের স্নিগ্ধ সেবায় সমস্ত পরিবেশের মধ্যে কি আশ্চর্য্য পরিবর্তন আনছে! উইলিয়াম জেমসের এই সব উক্তির মধ্যে কি কেবলই কল্পনার খেলা? সত্য নেই?

সমুদ্রের ওপারের মহারথীদের চিন্তা নিয়ে তো অনেকক্ষণ কারবার করা গেল। আমরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যুগের মানুষ। বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য এঁরা আপন আপন স্ত্রীকে ত্যাগ করে সন্ন্যাসের পথকে বরণ করে নিয়েছিলেন। সাধনপথে স্ত্রীকে সঙ্গিনী করেন নি। ঠাকুর কিন্তু সারদামণিকে দূরে সরিয়ে রাখেন নি। দেবীর আসনে তাঁকে বসিয়ে রীতিমতো পূজা করেছিলেন, পত্নীর পদতলে রেখে ছিলেন জপের মালা। নারীকে এই মর্য্যাদাদান ধর্মজীবনের ইতিহাসে অনুপম।

মেয়েদের প্রতি ঠাকুরের মনে ছিল একটি অকপট শ্রদ্ধার ভাব। বস্তুতঃ, মেয়েদের দুঃখ তিনি দেখতেই পারতেন না। চাবুক হাতে মেয়েদের কাছে যাওয়ার কথা কোন পণ্ডিতের লেখনীমুখে বেরুতে পারে—এ তাঁর ধারণার অতীত ছিল। সেই স্বর্গীয় দৃশ্যটি! অবগুণ্ঠনবতী দুই জা এসেছেন ঠাকুরকে দর্শন করতে। দু'জনেই উপবাস করে আছেন। শুনেই ঠাকুর রামলালকে আদেশ করলেন বধূদের জলযোগ করাতে। মেয়েরা

প্রসাদ পাচ্ছে আর ঠাকুরের কোমল মনটি শীতল হয়ে যাচ্ছে। বলছেন: "মেয়েরা আমার মার এক একটি রূপ কি না; তাই তাদের কষ্ট আমি দেখতে পারি না। জগন্মাতার এক একটি রূপ।" কথামৃতের তৃতীয় ভাগে আর একটি স্বর্গীয় দৃশ্যের বর্ণনা আছে। ঠাকুর গাড়ী করে যাচ্ছেন—বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে দুই বারবণিতা। ঠাকুর দেখলেন সাক্ষাৎ ভগবতী—দেখে প্রণাম করলেন।

বিবেকানন্দের লেখা এবং বাণীতেও নারীজাতির প্রতি একই শ্রদ্ধার প্রকাশ। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের স্বাধীনতায়। পত্রাবলীতে পড়ছিলাম, To advance oneself towards freedom, physical, mental and spiritual and help others to do so is the supreme prize of man···Those institutions should be encouraged by which men advance in the path of freedom.

মুক্তির দিকে আগিয়ে যাওয়া, শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক মুক্তি—অন্যদেরও এই সর্বাঙ্গীন মুক্তির দিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করা, এই হচ্ছে মানুষের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। স্বাধীনতার এই বিকাশের পথে যে সকল সামাজিক বিধিনিষেধ বাধার সৃষ্টি করে স্বামীজী তাদের বিনাশ কামনা করতেন। বলা বাহুল্য, স্বাধীনতাকে যিনি এতখানি ভালোবাসতেন তিনি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে চাইতেন মেয়েরা বন্ধনমুক্ত হোক।

এবারে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের চিন্তাধারার পতাকা-বাহী মহাত্মা গান্ধীর মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতি-হাসে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে কি মন্তব্য করেছেন, দেখা যাক। "প্রসব বেদনার চাইতে তীব্রতর বেদনা আর কি হতে পারে? কিন্তু সেই বেদনাকেও নারী ভোলে জীবন সৃষ্টির আনন্দে। শিশু যাতে দিনে দিনে বেড়ে ওঠে তার জন্যে কে আর এমন করে প্রাত্যহিক দুঃখকে সহ্য করে? নারী ঐ অপত্য স্নেহকে ছড়িয়ে দিক সমগ্র মানব-সমাজে, ভুলে যাক, পুরুষের কামনার বস্তু হয়ে থাকবার জন্যে তার নারীজন্ম নয়। তখন পুরুষের পাশে সে তার গৌরবের আসন অধিকার করবে জননীর ভূমিকায়, পুরুষের স্রষ্টার এবং নীরব অধিনায়িকার ভূমিকায়। হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী আজ অমৃতের পিপাসু। কি করে এই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা যায় তার কৌশল শেখানোর দায় নারীর।" গান্ধীজী আবার বলছেন, ব্যক্তির বা জাতির জন্যে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সত্য এবং অহিংসার আদর্শকে অনুসরণ করবার কথা আমি বলেছি। আমি আগ্রহের সঙ্গে এই আশা পোষণ করে আসছি যে, এই সত্যের এবং অহিংসার অনুসরণের ব্যাপারে নিঃসংশয়ে নারী চলবে পুরোভাগে এবং মানুষের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে সে তার নিজের স্থান সম্পর্কে সচেতন হয়ে হীনমন্যতা থেকে মুক্ত হবে। যেখানে পুরুষ নারীকে তার সম্পত্তি ভেবে তাকে রাখতে চায় নিজের ছায়া আর প্রতিধ্বনি করে সেখানে নারীর কি কর্তব্য? স্বাধীনতার পূজারী গান্ধী বলছেন, "সেখানে মীরাবাঈয়ের মত তার অধিকার আছে নিজস্ব পথকে অনুসরণ করবার। উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয় এবং স্ত্রী যদি জানে সে সত্য পথে আছে তবে নিজের পথেই সে চলবে, এবং দুঃখ কষ্ট যা আসবে সে সমস্ত নম্রতার অথচ সাহসের সঙ্গে বরণ করে নেবে।"

নারীর স্বাধীনতার ব্যাপারে রবিঠাকুরকে অনায়াসে বলা যেতে পারে বঙ্গসাহিত্যের ইবসেন। সত্যের এবং স্বাধীনতার স্তম্ভ দুইটির উপরে নর-সমাজ যাতে গড়ে ওঠে তার জন্যে এ যুগে ইবসেনের মত আর কে লেখনীকে তরোয়ালের মত ব্যবহার করেছেন, জানি নে। রবীন্দ্র-নাথের লেখায় ইবসেনের বলিষ্ঠ সুর। যত দল-গড়া শাস্ত্র-গড়া নির্বিকার ক্ষমতার বিরুদ্ধে সমস্ত জগতে আজ লড়াইয়ের হাওয়া উঠেছে। এই সংগ্রামের ঝড়কে বঙ্গসাহিত্যে নিশ্চয়ই বহন করে এনেছেন রবীন্দ্রনাথ। স্ত্রীর পত্রের মেজ বৌ মৃণাল যেন ইবসেনের Doll's House-এর 'নোরা'। স্বামীর ঘরে পুরুষের খেলার পুতুল হয়ে থাকতে মেজ বৌ শেষ পর্য্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করেছে। স্ত্রী লিখেছে স্বামীকে, "কিন্তু আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না। আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে মেয়ে মেয়ে মানুষের পরিচয়টা যে কি তা আমি পেয়েছি। আর আমার দরকার নেই।" বার্ট্রাণ্ড রাসেল লিখেছেন তাঁর Marriage and the Population Question প্রবন্ধে:

As religion dominated the old form of marriage, so religion must dominate the new. But it must be a new religion based upon liberty, justice and love, not upon authority and law and hell-fire.

স্বাধীনতায়, ন্যায়ে এবং প্রীতিতে প্রতিষ্ঠিত যে দাম্পত্যজীবন—তারই জয়ধ্বনি রবীন্দ্রসাহিত্যে। 'যোগাযোগ' উপন্যাসখানিতে বিপ্রদাসের কণ্ঠে এই

গরিমাময় দাম্পত্যজীবনেরই জয়গান। 'চিত্রাঙ্গদা'র সমাজ-জীবনে নারীর আসন হবে কোথায় তার একটা সুস্পষ্ট ঘোষণা আছে।

"আমি চিত্রাঙ্গদা
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সে-ও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখো
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে
যদি সুখেদুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।"

প্রবন্ধকে দীর্ঘতর করা যেতে পারে আরও অনেক প্রাচীনের এবং আধুনিকের মত উদ্ধৃত করে। মনুর মতের মধ্যেই কত রকমের স্ববিরোধী মন্তব্য মেয়েদের সম্পর্কে। মহাভারতের মধ্যে মেয়েদের প্রকৃতি সম্পর্কে এমন সব মন্তব্য আছে যা পড়ে মনে হয় ওঁরা আদৌ শ্রদ্ধার যোগ্য নয়। তুলসীদাস তো মেয়েদের রক্তপিপাসু বাঘিনী বলেছেন। কিন্তু পরের মুখে ঝাল খাওয়ার কোন মানে হয় না। এ কথা ঠিক যে, নারীর মধ্যে এমন কিছু আছে যা দুর্বার টানে পুরুষকে টানে। এই টানে কত পুরুষ হারিয়েছে আত্মসংযম, হারিয়েছে বুদ্ধি! সংসার-সমুদ্রে তাদের জীবনতরী গেছে বানচাল হয়ে। এ কথা মনে রেখেও নারীকে আমরা কি সত্যই অবজ্ঞার চোখে দেখতে পারি? তাকে কি পুরুষের প্রয়োজন নেই? পরম দুঃখের দুর্দিনে তার কোলটিতে মাথা রেখে নিঃশব্দে অশ্রুমোচন করতে না পারলে তার হৃদয়ের ভার যে হাল্কা হতে চায় না! অন্তরের গোপনে যে-সব কথা সঞ্চিত হয়ে আছে নারীর কাছে তা নিঃশেষে নিবেদন না করে পুরুষের গত্যন্তর নেই। মেটার্লিঙ্কই বোধ হয় নারী সম্পর্কে শেষ কথা বলেছেন, মেয়েরা সর্বোপরি mystic, কোন্ স্বর্গের পবিত্র হোম-হুতাশনের শিখা জ্বলছে ওদের অন্তরের মণিকোঠায়! যদি ওদের না বুঝতে পারি—সে দোষ আমাদের। অজানার সঙ্গে নারীর যোগ আজও ছিন্ন হয় নি। আমরা পুরুষেরা সেই যোগ বহুল পরিমাণে হারিয়ে ফেলেছি। তাই না নারী সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশের বেলায় আমাদের আর স্ফুট নম্র হওয়ার প্রয়োজন আছে!

উপনিষদ নির্মাল্য

পুষ্পদেবী

সূর্য্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষুর্নলিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্য দোষৈঃ
এক স্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোক দুঃখেন বাহ্য।
কঠোপনিষদ দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় বল্লী ১১

সূর্য্য যেমন আলোকিত করি রহিয়াছে এ ভুবন
তাহারি আলোকে নয়ন মোদের করে সব দরশন,
চোখের মধ্যে দৃষ্টি যে জন
দৃষ্টিতে তবু দূষিত না হন
সূর্য্য যেমন কালোরে হরিয়া কালো কভু নাহি হয়
তেমনি সেজন দুখরাশি নাশি আপনি সে সুখময়।

সূর্য্য যেমন সৌরলোকের হইল আলোর খনি
তেমনি সেজন উজ্জ্বল মালায় উজ্জ্বল মধ্যমণি,
পরাণের দীপ সেই ত জ্বালায়
আলোকের ধারা সেই ত বহায়
বাসনা কামনা বাঁধন রহিত সুখ দুঃখের পার
সেই জন রাজে যাঁহারে পাইলে অভাব রহেনা আর।

একো বশী সর্ব্ব ভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা স্তেষাং সুখং শাশ্বতং।

সকলের মাঝে যেই জন রাজে সকলেরে করে বশ
সকলেরে ঘিরি উঠে উছলিয়া যাঁর কল্যাণ রস
অন্তরযামী অন্তরে রহে
তবু যেইজন সব ভার বহে
তাঁহারে চিনিয়া জ্ঞানী সুধীজন শাশ্বত সুখ পায়
সৃষ্টি প্রলয় যখন যা হয় পরাণ সঁপে সে তায়।

সবার উপরে

শ্রীসীতা দেবী

৫

সুমনার শরীর খারাপ লাগছে শুনে তার মা বাসরের হুড়োহুড়ি খানিকটা কমিয়ে দিলেন। নিতান্ত নাছোড়-বান্দা কয়েকটি তরুণী বাদে আর সকলকে তিনি ডেকে-ডুকে বার করে নিলেন। যারা রইল তারা বরের সঙ্গে খানিকক্ষণ ঠাট্টা তামাসা চালাল, বরকে দিয়ে গান গাওয়াবার খানিক বৃথা চেষ্টা করল। তার পর ক্ষিদে পাওয়ায় উঠে চলে গেল। তখন রাত বেশ গভীর হয়ে এসেছে। গীতা এসে বর কনের কাপড়-চোপড় ছাড়ার সব ব্যবস্থা করল। সুমনা তারপর বাসর ঘরে গিয়েই এলিয়ে পড়ল। তাকে জল ওষুধ প্রভৃতি খাইয়ে একটু সুস্থ করে জ্যোৎস্না বলল নির্ম্মলকে, "ওর শরীরটা ক'দিনই ভাল যাচ্ছে না। তার উপর দিনের পর দিন এই ষ্ট্রেন্। আরো ত সামনে রয়েছে।"

নির্ম্মল বলল, "যা হাঙ্গাম, এতে কুস্তীগীর পালোয়ানও দমে যায়। একটু ঘুমিয়ে নিন এই বেলা। টাট্‌কা বিয়ে ত সবে চুকল, আবার কাল বাসি বিয়ের উৎপাত।"

গীতা বলল, "বিনা দামে কি ভাল জিনিস কিছু পাওয়া যায়?"

নির্ম্মল বলল, "তা যায় না হয়ত, কিন্তু দামটা ঠিক এই ভাবে না দিতে হলে ভাল হ'ত।"

আর বেশী কথা না বাড়িয়ে বৌদি এবং দিদি চলে গেল। বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে নির্ম্মল বলল, "ঘণ্টা চারেক এখনও আছে ভোর হতে, যতটা পার ঘুমিয়ে নাও, নইলে সকালে আর দাঁড়াতে পারবে না।"

সুমনা সকৃতজ্ঞচিত্তে পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তন্দ্রার ঘোরে একবার তার মনে হ'ল কে যেন তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু ঠিক বুঝল না। অত্যন্ত ক্লান্ত থাকাতে ঘুমটা খুবই গাঢ় হয়েছিল, হঠাৎ অনেক-গুলো নারীকণ্ঠের কলরবে তার ঘুমটা ভেঙে গেল। চোখ তাকিয়ে দেখল নির্ম্মল এরই মধ্যে উঠে হাতমুখ ধুয়ে জানলার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সুমনা জেগে গিয়েছে দেখে নির্ম্মল গিয়ে দরজা খুলে দিল। শালী শালাজরা সব দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে, বর 'শয্যাতুলুনি' না দিলে তাকে ঘর থেকে বেরতে দেওয়া হবে না। অনেক কৃত্রিম দর-দস্তুরের পর পঞ্চাশ টাকা আদায় করে তবে তারা দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল।

তারপর আবার বাসি বিয়ের হাঙ্গাম। বাড়ীর সকলে ভয়ানক ক্লান্ত, ভাল করে চা জলখাবার না খেয়ে কেউ নড়তে চায় না। কোনমতে বাসি বিয়েটা সমাপ্ত হ'ল, কেউ সেটা দেখতে গেল, কেউ বা গেল না। নূতন জামাইকে প্রথম ভাত খাওয়ানোর আয়োজনে গিন্নীরা এমনি ব্যস্ত রইলেন যে, তাঁরা ওদিকে ঘেঁষতেই পারলেন না। বৌ-ঝিরা মিলে কোনমতে পুরোহিতের সাহায্যে ব্যাপারটা শেষ করল।

আজ বাইরের লোক কাউকে ডাকা হয় নি, তবে পরিবারে যেখানে যত জামাই আছে সবাই এসেছে। বাড়ীতেই এত আত্মীয় সমাগম হয়েছে যে, আর লোকের দরকারও নেই, খেতে দেতে প্রায় বেলা শেষ হয়ে এল।

এরপরই বিয়ের সবচেয়ে মর্ম্মান্তিক অংশ। মেয়ে চিরদিনের জন্য বাপের বাড়ী ছেড়ে চলল। গৌরাঙ্গিনী কাজ করতে করতে ক্রমাগত চোখের জল ফেলতে লাগলেন। সুমনার বাবা একেবারে গিয়ে উঠলেন তিনতলার ছাদে। অন্য মেয়েরা কনেকে সাজ-গোজ করাতে লাগল, সামান্য কিছু কাপড় চোপড়ও গুছিয়ে দিল। বাকি সব যাবে ফুলশয্যার তত্ত্বে।

বরের বাড়ী থেকে একজন যুবক ও একটি বালিকা মস্ত বড় গাড়ী চড়ে এসে হাজির হ'ল বৌ নিয়ে যাবার জন্য। তাদের আদর করে বসিয়ে জলযোগ করান হ'ল।

বরকন্যাকে আশীর্ব্বাদের পালা সুরু হ'ল। অনেক উপহার জুটল। বর পেল বেশীর ভাগই টাকা, আর কনে পেল হরেক রকমের ছোট বড় অলঙ্কার, টাকা, বই, সিঁদুর-কৌটো, ইত্যাদি। যাঁরা বিয়েতে উপহার দিয়েছেন, তাঁরা সেই উপহারটাই আর একবার করে দিলেন। তারপর গৃহস্থিত দেববিগ্রহকে প্রণাম করে, পরলোকগত আত্মীয়দের ছবিকে প্রণাম করে, উপস্থিত গুরুজন সকলকে প্রণাম করে, মাথায় ধানদূর্ব্বার চিহ্ন নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সুমনা বিদায় হয়ে গেল। গৌরাঙ্গিণী ও মেয়েরা এইবার উচ্চকণ্ঠেই কাঁদতে লাগলেন, পুরুষদেরও চোখে জল এসে গেল। বাড়ীর দু'একটি

ছেলেমেয়ে সুমনার সঙ্গে চলল, তাদের তত্ত্বাবধান করতে ঝিও দু'জন চলল।

গাড়ীতে উঠেও সুমনা অনেকক্ষণ নিজেকে সামলাতে পারল না। একবার শুধু চোখের জলের ভিতর দিয়েই দেখল যে, নির্ম্মল তার পাশে বিব্রতমুখে চুপ করে বসে আছে। এ পাশে ও পাশে শ্বশুরবাড়ীর ছেলেমেয়েরা বসে, তাই বোধহয় কথা কিছু বলল না। সুমনা চেষ্টা করে নিজেকে শান্ত করল একটু পরে, রুমাল দিয়ে চোখ মুখ মুছে ফেলল। গাড়ী অনেক দূর চলে এসেছে তাদের পাড়া ছাড়িয়ে। তারা থাকত বালিগঞ্জে, শ্বশুরবাড়ী ভবানীপুরে। এঁদেরও নিজের বাড়ী বলে সুমনা শুনেছে।

মিনিট পনেরোর মধ্যে তারা যথাস্থানে এসে গেল। উচ্চকণ্ঠে হুলুধ্বনি ও শাঁখের শব্দের সঙ্গে গাড়ী এক জায়গায় ঘ্যাঁচ করে থেমে গেল। দরজার কাছে মহা ভীড়, ফুটপাথের উপর দিয়ে নূতন কাপড় পাতা, মঙ্গলঘট আর আমপাতায় সুসজ্জিত দরজা। গাড়ীর দরজা খুলে নির্ম্মল নামবার জোগাড় করতেই কে একজন বলল, "বর-কনেকে কোলে করে নামাতে হয়।"

"ধ্যেৎতেরি" বলে নির্ম্মল হুড়মুড় করে নেমে গেল, কাকে যেন ঠেলে সরিয়ে দিয়ে। সুমনা আতঙ্কে কণ্টকিত হয়ে উঠেছিল, এই বুঝি তাকে কোলে নিতে গিয়ে কেউ টিপ করে ফেলে দেয়। কিন্তু নির্ম্মলই তাকে বাঁচিয়ে দিল। একজন শীর্ণাঙ্গী প্রৌঢ়াকে সামনে দেখে বলল, "মা, এই শরীর নিয়ে তুমি ওসব পালোয়ানী করতে যেয়ো না। নিজেও উল্টে পড়বে, আর বৌকেও ফেলে দেবে। হাত ধরে নামিয়ে নাও।"

একটি যুবতী বলল, "দাদার সব তাতে সর্দ্দারি। কথায় বলে 'বর না চোর', তা চোর হওয়া ত দূরের কথা, হাঁক ছাড়ছে দারোগার মত। নাও মা, হাত ধরে বৌকে নিয়ে ভিতরে ঢোক।"

তখন হুলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি সমানে চলছে। হাত ধরেই শাশুড়ী সুমনাকে নিয়ে অগ্রসর হলেন। মেয়ে পুরুষে বাড়ী একেবারে গিজ্ গিজ্ করছে। হলঘরের মত একটা জায়গায় দুধে আলতায় কনেকে দাঁড় করিয়ে বরণ করা হ'ল। তারপর প্রণাম আর আশীর্ব্বাদের পালা, ননদ একজন পাশে দাঁড়িয়ে বলে দিতে লাগলেন, কাকে কাকে প্রণাম করতে হবে। মুখ দেখে অনেকে গহনা দিলেন, টাকা দিলেন। শাশুড়ী সোনার কঙ্কণ পরিয়ে মুখ দেখলেন। তারপর উপরে নিয়ে গিয়ে সুমনাকে তার জন্ত নির্দ্দিষ্ট ঘরে বসান হ'ল। নির্ম্মল জানিয়ে দিয়েছে যে, বৌ অসুস্থ, তাকে খুব বেশীক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখে উৎপাত যেন না করা হয়। উৎপাত করুক বা নাই করুক, ঘর একেবারে লোকে ঠাসা হয়ে রইল। বৌকে দেখে সকলের আর আশ মিটছে না। বেশীর ভাগই মত দিচ্ছে বৌ বেশ সুন্দর বলে, আবার শ্বশুরবাড়ীর মর্য্যাদা রাখতে দু'একজন একটু আধটু খুঁৎও ধরছে। ননদ শ্রেণীর একজন কে বলল, "কই, যতটা ফরশা শুনেছিলাম তা ত মনে হচ্ছে না?" আর একজন গিন্নীমত আত্মীয়া বললেন, "বড় রোগা বাপু, গায়ে গতরে একটু মাংস না লাগলে মেয়েমানুষকে যেন মানায় না।"

যিনি বলছিলেন তাঁর গায়ে গত্তির কোনো অভাব ছিল না, তবে নিদারুণ মোটা নয়। একটি ছোট মেয়ে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল।

সুমনা যদিও মাথা নীচু করে বসেছিল, তবু একটু আধটু এদিক ওদিক দেখছিল। শাশুড়ী ও একজন ননদ ছাড়া এতগুলি মানুষের মধ্যে কারো পরিচয় সে জানে না। শাশুড়ী বোধহয় তার মায়ের চেয়ে বয়সে বড়। ননদ দেখতে কিছু ভাল নয়, অনেকটা নির্ম্মলের মত। ঘরখানা মন্দ নয়, বড় আছে। জানলাও অনেকগুলো। আজও তার মাথাটা কেমন যেন ভার হয়ে আছে। কতক্ষণে শুয়ে সে একটু চোখ বুঁজতে পারবে? উঃ, তাদের দেশের লোকাচার এমন নির্ম্মম কেন? ছোট ছোট মেয়েগুলোকে এমন ছিঁড়ে নিয়ে আসা হয় কেন মা বাপের কোল থেকে? সে ত তবু কিছুটা বড় হয়েছে, আর কলকাতাতেই থাকতে পারছে। মা কাকীমাদের যুগে দশ বারো বছরের মেয়েগুলোকে এমনি করে কাঁদিয়ে কোথায় নিয়ে যেত। বছরের পর বছর তারা মা, বাপ, ভাই, বোনের মুখও দেখতে পেত না। ভাল ব্যবহারও ত বৌদের সঙ্গে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই করা হয় না। তার চোখে আবার জল এসে পড়ার উপক্রম হ'ল, অনেক কষ্টে নিজেকে সে সংযত করে রাখল।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল এই ভাবেই। তার পর একটু একটু করে ভীড় কমতে লাগল। তখন নির্ম্মলের বোন নমিতা আর একজন দূর সম্পর্কের বৌদিদি এসে সুমনার বধূসজ্জা খুলে সাধারণ কাপড়-চোপড় পরতে তাকে সাহায্য করতে লাগল। একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সুমনা। পাশের স্নানের ঘরে গিয়ে হাতমুখ একটু ধুয়ে এল। তার মুখ দেখে নমিতা জিগ্গেস করল, "মাথা ধরেছে নাকি বৌদি? মুখ বড় শুকনো দেখাচ্ছে।"

সুমনা বলল, "একটু ধরেছে।"

অন্ত মহিলাটি বললেন, "চা খাবে একটু? তাতে মাথা ধরা একটু কমতে পারে।"

সুমনা বলল, "থাকগে, চা আমি বেশী খাই না।"

বাড়ীতে উৎসবের কোলাহল চলেইছে। মেয়েরা সুমনার ঘরে ঢুকছে আর বেরচ্ছে, কোন সময়ই সে একলা থাকছে না। নির্মল একবারও এদিকে আসছে না। আজ কালরাত্রি, বৌয়ের সঙ্গে দেখা হওয়া তার বারণ।

খাওয়া-দাওয়া চুকতে রাত হয়ে গেল। এদের খাবার ঘর বোধহয় ওপরেই, সুমনাকে সিঁড়ি নামতে হ'ল না। খেতে সে বিশেষ কিছু পারল না। একজন ঝি আত্মীয়তা দেখিয়ে বলল, "অত লজ্জা করলে চলবেনি বৌদিদি, এই ঘরেরই ভাত চিরকাল খেতে হবে।"

আবার উপরে নিজের ঘরে চলে এল। বিছানা-টিছানা পরিপাটি করে পাতা। একজন ননদ আজ তার সঙ্গে শোবে। অত্যন্ত ক্লান্ত বলে থেকে থেকে তার মাথাটা ঢুলে পড়ছে, আবার সে চমকে সচেতন হয়ে বসছে। তার শয্যাসঙ্গিনী বোধহয় তার অবস্থাটা বুঝতে পারল, বলল, "তুমি ভাই শুয়ে পড়, ঘুমতে চেষ্টা কর। আবার কালকের হৈ চৈ আছে ত? মেয়েদের এই এক জ্বালা। বরটাকে নিয়ে অত বেশী টানাটানি কেউ করে না, কনে বেচারীর যত বিপদ। এক মাস ধরে কি যে তাণ্ডব চলতে থাকে।"

সুমনা শুয়েই পড়ল। মন তার বিষাদ ভারাক্রান্ত শরীরও ভাল লাগছে না। কবে আবার সে নিজের আজন্ম পরিচিত বাড়ীতে যেতে পারবে? প্রথমেই যদি তারা এত ধরে না রাখে, মাঝে মাঝে যাওয়া আসা করতে দেয়, তা হলে হয়ত তার এত খারাপ লাগে না। কি করবে এরা কে জানে?

ভাবতে ভাবতে কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে। মাঝ-রাত্রে তার কেমন যেন শীত শীত করতে লাগল, পায়ের কাছে একটা চাদর ছিল সেইটা নিয়ে সে গায়ে চাপা দিল।

সকাল বেলা বেশ ভোর থাকতে ওঠাই তার অভ্যাস। ঘুমটা তার ঠিকই ভেঙে গেল। তার ননদ পাশে শুয়ে তখনও অঘোরে ঘুমচ্ছে। বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে এসে সে খাটের উপরেই চুপ করে বসে রইল। মাথাটা তত ধরে নেই, কিন্তু শরীরটা মোটেই ভাল লাগছে না। অতক্ষণ কাল দুধে আলতায় দাঁড়িয়ে ছিল, হয়ত ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছে। তার আবার সহজেই ঠাণ্ডা লাগে।

লোকজন উঠে পড়ল। আবার কলকোলাহল আরম্ভ হ'ল। সুমনাকে সকালেও ভাল করে খাওয়ান গেল না। চা খাবার জায়গায় নির্মলকে একবার দেখা গেল, তবে দু'চার মিনিট পরেই সে বাইরে চলে গেল। আজকেই বৌভাত, আর ফুলশয্যা। বাড়ীর লোকে মহাব্যস্ত। সুমনা বসে বসে ঘরদোর মানুষজন সকলকে দেখতে লাগল। বাড়ীটা বেশ বড়, তার বাপের বাড়ীর চেয়ে বড়ই হবে। তিনতলা মনে হচ্ছে। তবে বেশ পুরনো বাড়ী, দরজা জানলার রঙ জ্বলে গিয়েছে। দেওয়ালের রঙও বিবর্ণ। তার বাপের বাড়ীতে লোকজন মন্দ নয়, তবে এখানে যেন আরও বেশী। অনেক ভাইয়ের সংসার এটাও মনে হচ্ছে। শাশুড়ী বোধহয় মেজকর্তার স্ত্রী, কারণ ঝি চাকরেরা তাঁকে "মেজ মা" বলে ডাকছে। একজন বৃদ্ধা গোছের মহিলা, বেশ চুল পাকা, তিনিই বোধহয় সকলের বড়। বাড়ীর বৌও দু'তিন জন আছে বোধ হ'ল। ছেলেমেয়ে অনেকগুলি চারদিকে ঘুরছে। তবে কতগুলি এবাড়ীর চিরকেলে বাসিন্দা আর কতগুলি বিবাহ উপলক্ষ্যে বাইরের থেকে এসেছে, তা সে জানে না।

দিনটা যেন চটপট কেটে গেল। আবার বিকেল হতেই সেই কল-কোলাহল, লোকের ভীড়। তাকে সাজানোর পালা। আজ এ বাড়ীর মেয়েরাই সাজাবে, সুমনার কিছু বলবার নেই। চুল বাঁধতে এসে নমিতা বলল, "বৌদি, তোমার মুখচোখ কেমন যেন থম্‌থম্‌ করছে, জ্বরটর এসেছে নাকি?"

সুমনা বলল, "কি জানি, বুঝতে পারছি না।"

নমিতা গিয়ে তার মাকে ডেকে নিয়ে এল। তিনি এসে সুমনার কপালে হাত বুলিয়ে বললেন, "হবেও বা। যা আজকাল সর্দ্দিজ্বরের পালা। তা কি আর এখন করা যায়? খানিকক্ষণ সেজেগুজে বসতেই হবে। সকাল সকাল পর্ব্ব চুকিয়ে শুইয়ে দিস্।"

আর এক গিন্নী বললেন, "তাই ত গা। জ্বরই এসে গেল, এত লক্ষণ ভাল না।"

সাজসজ্জা নিয়মমত হ'ল। এদের দেওয়া শাড়ীটা সুমনার ভাল লাগল না। কেমন যেন ম্যাট্‌মেটে রং। যাকগে, কাপড় ত সে অসংখ্য পেয়েছে। বিয়ের দিনের চেয়ে গহনা আজ আরো বেশী পরান হ'ল। শাশুড়ীর সেই রকম নির্দ্দেশ। দু' বাড়ীর দেওয়া সব কিছুই প্রায় তাকে পরিয়ে দেওয়া হ'ল। শরীরে স্থানাভাব হওয়াতে উপহারের কিছু কিছু গহনা বাদ পড়ল। তার উপর আবার ফুলের গহনা। সুমনার মনে হতে লাগল যে, সে উঠে দাঁড়াতে গেলে আভরণের ভারে বসে পড়বে। কিন্তু

ননদ, জা-রা মহাখুশি। লোকজনের তাগ লেগে যাবে বৌ দেখে।

নিমন্ত্রিতেরা আসতে লাগলেন। আজ ত আর ক্রিয়া-কলাপ কিছু নেই, বসে বসে মুখ দেখান শুধু। শাশুড়ী বলে দিয়েছেন সবাইকে নমস্কার করতে, শরীর ভাল নেই, উঠে প্রণাম করতে না যায়। দুই-তিনটা টেবিল্ সুমনার ঘরে এবং পাশের ঘরেও সাজিয়ে রাখা হয়েছে, উপহার গাদা করা হচ্ছে সেগুলির উপর। শাড়ী, বই, চীনা মাটির জিনিস, কাঁচের জিনিস, পিতলের জিনিস।

অন্তদের বিয়ের বৌভাতে উপহার দেখে বেড়াতে সুমনার বেশ ভাল লাগত। নিজের বেলা ততটা ভাল লাগল না, বোধহয় শরীর মন খারাপ ছিল বলেই।

ফুলশয্যার তত্ত্ব এল। সবাই দৌড়ল তত্ত্ব দেখতে। আবার সেই হুলুধ্বনি, আবার সেই শঙ্খধ্বনি। সুমনার প্রাণটা যেন ছুটে যেতে চাইল সেই দিকে, বাপের বাড়ীর সব লোক আসছে। কিন্তু সে বৌমানুষ, ইচ্ছামত যেতে পারে না কোথাও। একটি তেরো-চোদ্দ বছরের মেয়ে দাঁড়িয়েছিল তার পাশে, সে বলল, "এই জানলার কাছে এসে দাঁড়াও বৌদি, সদর দরজাটা এখান থেকে বেশ দেখা যায়।"

সুমনা সেইখানে গিয়ে দাঁড়াল। ঐ ত সব চেনা মুখ সার দিয়ে আসছে। ঝি চাকর সবাইকে সে চেনে। গণেশদাও এসেছে সঙ্গে, সে তার মাসতুতো ভাই। উঃ, কত জিনিস পাঠিয়েছেন মা, সাধে কি আর তিনি গায়ে হলুদের তত্ত্বের থালা গুনতে বলেছিলেন? জিনিসগুলো দেখতে পেলে তার ভালই লাগত, কিন্তু এখন আর তাকে ওখানে কে নিয়ে যাবে?

রঘু খানিক পরে সুমনার সঙ্গে দেখা করতে এল। বললে, "নাও দিদিমণি, এরপর আমাদের পর্ব্ব চুকল। তা তুমি আছ কেমন?"

সুমনা বলল, "ভালই। মা-রা কখন আসবেন?"

রঘু বলল, "এই এলেন বলে। তত্ত্ব সাজিয়ে আমাদের রওয়ানা করে দিলেন, তারপর নিজেরা তৈরি হয়ে চলে আসবেন এরপর।"

নীচের থেকে ডাক পড়ায় রঘু চলে গেল। সুমনা আবার নিজের জায়গায় এসে বসল। এমনিতেই তার ভাল লাগছিল না, তার উপর আবার জ্বর এসে গেল? কি করবে সে? কবে এরা তাকে ফিরে পাঠাবে? জোড় ভাঙতে সে ফিরে যাবে শুনেছিল, কিন্তু সেটা কবে তা সে জানে না। আজ এ ঘরে নির্ম্মল শোবে, তাকে কি জিজ্ঞেস করা যায়? সে হাসবে না ত? দিদির কাছে তার ফুলশয্যার অনেক রকম রসাল গল্প সে শুনেছিল। তার নিজের যেন কেমন কেমন ভয় ভয় করতে লাগল।

এমন সময় মা, কাকীমা, বোনেরা, বৌদি প্রভৃতি বাপের বাড়ীর সব আত্মীয়া দল বেঁধে তার ঘরে ঢুকে পড়ল। সবাই এসে দাঁড়াল তার চারপাশে। সুচিত্রা ছুটে এসে তার হাত চেপে ধরল, "ও ভাই মনুদি, তোর হাত এত গরম কেন? জ্বর এসেছে নাকি?"

গৌরাঙ্গিনী তাড়াতাড়ি এসে মেয়ের কপালে হাত দিলেন, "ওমা তাইত, গা ত পুড়ে যাচ্ছে। কখন জ্বর এল?"

সুমনা বলল, "কাল রাত থেকে হয়েছে বোধহয়। আমাকে বাড়ী নিয়ে যাবে মা?"

মা বললেন, "আজ আর কি করে হয়? দেখি বেয়ানকে বলে কাল যদি পাঠান।"

বিয়েতে যত লোক ডাকা হয়েছিল, বৌভাতে তত হয়নি বোধহয়। এক দল এরই মধ্যে খেতে বসে গিয়েছে। চারিদিকে হাঁকডাক চলেছে। তাদের পর্ব্ব চুকে যেতেই দ্বিতীয় দলের পাতা করা হয়ে গেল। এঁরা বৌয়ের অসুস্থতায় একটু সন্ত্রস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি ব্যাপারটাকে চুকিয়ে দিতে চেষ্টা করছেন।

কনের বাড়ীর মেয়েদের এই সময় ডাক পড়ল খেতে বসবার জন্য। গৌরাঙ্গিনী কি একটা সংস্কার বশে খেতে গেলেন না। মেয়ের কাছ থেকে নড়তেও তাঁর ইচ্ছা করছিল না। এই ঘরেই বসে বসে প্রচুর পরিমাণে দই, মিষ্টি আর রাবড়ী খেলেন। সুমনা বলল, "মা, তুমি খেলে না যে?"

গৌরাঙ্গিনী বললেন, "নাতি নাতনী না হলে বেয়াই বাড়ী খেতে নেই।"

এমন সময় নির্ম্মলের মা খাবার জল নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। গৌরাঙ্গিনী বললেন, "দেখছেন ত বেয়ান, আপনার বৌ ত জ্বর বাধিয়ে বসেছে। জ্বর হলে ও বড় কাতর হয়। অনুমতি করেন ত কাল ওকে নিয়ে যাই।"

সুমনা ব্যগ্র দৃষ্টিতে শাশুড়ীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। তিনি বললেন, "তাই ত দেখছি। দেখি ঠাকুরমশায়কে জিজ্ঞেস করে; যদি দিন ভাল থাকে ত কালই পাঠিয়ে দেব। সকালেই খবর দেব আপনাকে।" মনে মনে বললেন, "রক্ষে কর বাপু, যার মেয়ে তার কাছেই যাক্। এত খাটুনীর উপর আবার বৌয়ের রোগের সেবা করতে পারব না।"

সকলের খাওয়া দাওয়া চুকতে সময় লাগল কিছু।

সুমনা বেশী কিছু খেল না, যদি আরো জ্বর বাড়ে। অনেক করে আশ্বাস দিয়ে মেয়েকে, গৌরাঙ্গিনী সদলে প্রস্থান করলেন। যাবার আগে গীতা ফিস্‌ফিস্ করে বলে গেল, "তুমি আচ্ছা বেরসিক ভাই, শেষে ফুলশয্যার রাতে জ্বর করে বসলে?"

আর আধ ঘণ্টাখানিকের মধ্যে বাড়ী অনেকটাই নীরব হয়ে এল। মেয়েরা নির্ম্মলকে ধরে আনল, ফুলশয্যা করতে হবে। নির্ম্মল ঘরে ঢুকে বলল, "এ বেচারীর ত আজ কণ্টকশয্যাই হবে দেখছি। আজ এ সব বাদ দিলে হ'ত না? সেরে গেলে পর আর এক দিন হবে।"

তার এক বৌদি বললেন, "তা কি হয়? নিয়ম যা তা করতেই হবে। খানিকক্ষণ ত থাক, তারপর দেখা যাবে।"

যা লোকাচার তা করা হ'ল। অতঃপর বরকনেকে রেখে রঙীন আলো জ্বালিয়ে আর সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজাটা বাইরে থেকে টেনে দিল।

নির্ম্মল বলল, "সত্যি, তোমার জন্যে দুঃখ হচ্ছে। একে ত অপরিচিত নূতন বাড়ী, তার উপর আবার জ্বর। তুমি এ সব গড়াচুড়া ছেড়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোও। যদি বাতিটা চোখে লাগে ত বল এটাও নিভিয়ে দিচ্ছি।"

সুমনা বলল, "না থাক, একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকারে আমার বড় অস্বস্তি বোধ হয়।"

চারদিক থেকে নানা রকম মৃদু শব্দ শোনা যাচ্ছে, নিশ্বাসের শব্দ, অত্যন্ত নীচু গলায় কথা বলার শব্দ, অতি সাবধানে পা ফেলার শব্দ। বাড়ীর মেয়েরা সব এরই মধ্যে আড়ি পাতছে। নির্ম্মলের হাসি পেল। এই পীড়িতা কিশোরীর সঙ্গে সে কি এমন প্রেমালাপ করবে যা শুনবার জন্য এত আগ্রহ তাদের? সুমনা আস্তে আস্তে সব গহনা-গাঁটি খুলছিল, নির্ম্মল তার ফুলের গহনাগুলোও খুলে দিল। এ ঘরেই সুমনার আটপৌরে শাড়ী, জামা রয়েছে। পাশের স্নানের ঘরে গিয়ে সে বেনারসী শাড়ী-টাড়ি ছেড়ে এল। এনে সেগুলো আলনার উপরে রেখে দিল।

নির্ম্মল তার হাত ধরে বলল, "তুমি শুয়ে পড়। আমি একটু পরে শোব। আলোটা জ্বলছেই যখন, তখন আজকের কাগজটা পড়ি।"

সুমনা কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ল। নির্ম্মল খানিকক্ষণ কাগজ পড়ে এসে শুল। সুমনার মাথায় হাত বুলতে বুলতে বলল, "তোমায় একটু কিছু ওষুধ দিলে হ'ত। এই গণ্ডগোলে সে কথা কারোই মনে পড়ল না। যাক, শুনছি কাল তুমি ও বাড়ী ফিরে যাবে। অসুস্থ অবস্থায় সেইটাই এখন তোমার ভাল লাগবে। বিয়ের উৎপাতটা ত পুরোপুরি উপভোগ করলে, এরপর যদি কিছু ভালো জিনিসের পরিচয় পাও।" সুমনা একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল। মাঝ রাতে একবার ঘুম ভেঙে যাওয়ায় দেখল সে একলাই ঘুমুচ্ছে খাটে। নির্ম্মল কখন এ ঘর ছেড়ে চলে গেছে। একটা ঝি মেঝেতে শুয়ে আছে।

৬

সুমনার সৌভাগ্যক্রমে ঠাকুরমশাই ভাল দিন আছে ব'লেই মত দিলেন। নইলে সে ভারি বিপদে পড়ত, তখন তার পুরোপুরি জ্বর এসে গেছে। সকালেই টেলিফোন ক'রে রাসবিহারীবাবুকে খবর দেওয়া হ'ল, ঘণ্টাখানিকের মধ্যেই গাড়ী নিয়ে জ্যোৎস্না আর জিতেন এসে উপস্থিত। জিনিসপত্র খানিক সঙ্গে নিয়ে, খানিক সুমনারই নূতন আল্‌মারীতে বন্ধ ক'রে রেখে জ্যোৎস্না বোনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। নিয়ম যখন জোড়ে যাওয়া, তখন নির্ম্মলও সঙ্গেই গেল।

সুমনার শরীরটা বিয়ের পর্ব্ব সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খারাপ হয়েছিল। তার উপর ক্রমাগত অনিয়ম আর অত্যাচারে কাতর হয়ে সে একেবারেই শয্যা নিল। ডাক্তার ডাকা হ'ল, তিনি ভাল ক'রে দেখে শুনে একরাশ ওষুধপত্রের ব্যবস্থা ক'রে গেলেন। বিয়ের জন্য যে সব আত্মীয়েরা এসেছিলেন, তাঁরা ব্যাপার দেখে পোঁট্‌লা-পুঁটলি বাঁধতে লাগলেন যাবার জন্য। এখন আর কেউ তাঁদের চাইছে না, সেটা গৌরাঙ্গিনীর বিরস গম্ভীর মুখ দেখেই তাঁরা বুঝলেন।

বাড়ীতে লোকের অভাব নেই, সুমনার সেবা শুশ্রূষার কোনো ত্রুটি হচ্ছিল না। শুয়ে শুয়ে সে ক্রমাগতই এই ক'দিনের কথা ভাবছিল। স্বামীর সঙ্গে ত তার পরিচয়ই হ'ল না। কবে হবে তা কে জানে? নির্ম্মলের ভাল চাকুরী হবার কথা হচ্ছে সে শুনেছিল। সে অনেক দূর দেশে, হায়দ্রাবাদের দিকে। সেখানে একবার গেলে, কবে আবার সে আসতে পারবে কে জানে?

বিকালের দিকে নির্ম্মল তার সঙ্গে দেখা করতে এল। বলল, "আজ তা হলে আমি চলি সুমনা, আমি থেকে এখন শুধু কাজের ব্যাঘাত করছি। আমাকে আদর আপ্যায়ন করতে এখন এঁদের বাধ্য করা উচিত নয়। কাল এসে আবার দেখে যাব", বলে সে চলে গেল।

সুমনার জ্বর ক্রমেই বাড়তে লাগল। বাড়ীতে আনন্দ কোলাহলের পরেই যেন ঘনিয়ে এল একটা আশঙ্কার ছায়া। জ্যোৎস্নাকে তাড়াতাড়ি শ্বশুরবাড়ী ফেরৎ

পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল, তার সঙ্গে ছোট বাচ্চা রয়েছে, কে জানে সুমনার অসুখটা ছোঁয়াচে কিছু কিনা। জ্বর ত ছাড়তেই চাইছে না। ডাক্তারবাবু প্যারাটাইফয়েড বলে সন্দেহ করতে লাগলেন।

নির্ম্মল প্রায়ই এসে তাকে দেখে যায়। কথাবার্ত্তা কিছু বলে না, বল্‌বার আছেই বা কি? আর বেশী কথা শুনবার মত সুমনার অবস্থাও নয়। টেলিফোনেও রোজ শ্বশুরবাড়ীর থেকে কেউ না কেউ খবর নেয়। শাশুড়ী ননদরা এসে দেখেও গেলেন দু' একবার।

দশ-বার দিন পরে জ্বরের গতি একটু নামবার ধরন দেখাল। নির্ম্মল সেদিন এসে বল্‌ল, "আজ একটা ভাল খবর এনেছি।"

শালা শালীর দল লাফিয়ে উঠল, "কি খবর, কি খবর?"

নির্ম্মল বল্‌ল, "সেই কাজটা আমি পেলাম। পরের হপ্তায়ই কাজে যোগ দিতে হবে। কাজেই দু'দিন পরে আমাকে বেরিয়ে পড়তে হচ্ছে।"

গীতা সুমনাকে বল্‌ল, "দেখ ত বাপু, কি সময়ে অসুখ বাধালে? কেমন দিব্যি 'হনিমুন' করতে যেতে পারতে, না, শুয়ে শুয়ে শুধু ওষুধ গিলছ। তা এখন না হয় গেলেন, ফিরবেন কবে, ঠাকুরঝিকে নিয়ে যাবেন কবে?"

নির্ম্মল বলল, "তা কি বলা যায় এখন? আগে গিয়ে ত হাজির হই, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। আর বড়রা কেউ সঙ্গে না গেলে, ওকে এখন নিয়েই বা যাব কি ক'রে?"

বাড়ীতে আনন্দ সংবাদটা ছড়িয়ে পড়ল। বড়রাও এসে খুঁটিনাটি সব খবর নির্ম্মলকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। ভাল কাজ, মাইনে অনেক, সবাই খুব খুশী। সুমনার মনটা খুশী ও অখুশীর মধ্যে দুলতে লাগল। শারীরিক অসুস্থতা তার মনকে এমন দমিয়ে দিয়েছিল যে, বেশী আনন্দ বা বিষাদ কিছুই যেন সে পুরোপুরি অনুভব করতে পারল না।

যাবার আগের দিন নির্ম্মল এসে দেখা করে গেল। সুমনা সেদিন খাটের উপর উঠে বসেছে। "চিঠি লিখলে উত্তর দেবে ত?" উত্তরে সুমনা বল্‌ল, "দেব।"

বৌ যখন সম্প্রতি শ্বশুরবাড়ী আর যাচ্ছে না, তখন তার অধিকাংশ জিনিসপত্র এই বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। ভারি ভারি আসবাবপত্র অবশ্য সেখানেই থেকে গেল। গীতা বল্‌ল, "ভালই হ'ল বাপু যার জিনিস তার কাছে যত্নে থাকবে। পরের জিনিস কেউ যত্ন করে না।

জ্যোৎস্না বল্‌ল, "অতিরিক্ত যত্নও কোনো কোনো বাড়ী হয়, আমাদের সুব্রতার যেমন হ'ল। বৌয়ের জিনিসের উপর যেন ডাকাত পড়ল। বছর ঘুরতে না ঘুরতে তার একখানা ভাল কাপড় অবশিষ্ট রইল না, সব ছিঁড়ে খামসে শেষ। ননদ, জা, ভাসুরঝি মিলে 'আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু' ভজে সব ব্যবহার করে নষ্ট করে দিল। খান কয়েক গহনা শুধু বাকি রইল।"

গীতা বল্‌ল, "তাই বা সব জায়গায় থাকে কোথায়? আমার এক মামাতো বোনের এমন এক অসভ্য বাড়ীতে বিয়ে হয়েছিল যে, তারা নিজের মেয়ের বিয়ের সময় বৌ-এর গহনাগুলো গা থেকে খুলে নিল। বল্‌ল বটে, যে আবার গড়িয়ে দেবে, তা ঐ পর্য্যন্ত।"

গৌরাঙ্গিনী দাঁড়িয়ে মেয়েদের গল্প শুনছিলেন, বল্‌লেন, "মেয়েদের খোয়ারের কথা আর বল কেন মা? তারা যেন বানের জলে ভেসে এসেছে। আপনার বলতে তাদের ত ঐ ক'খানা গহনা, তাও তাদের রাখবার জো নেই। কোথাও ঠেকা পড়লেই বাড়ীশুদ্ধ তাকিয়ে থাকবে সেইদিকে।"

সুমনা এরপর আস্তে আস্তে ভাল হতে লাগল। তবে খুব দুর্ব্বল হয়ে রইল। টাইফয়েডের ছোঁওয়া ছিল, তাই ভাতটাত খেতেও দেরি হ'ল ঢের। মনের ভিতরটা আবার আস্তে আস্তে সজাগ হয়ে উঠতে লাগল। বিয়ের দিনগুলোয় সে যেন কেমন একটু হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত জিনিস ভালভাবে অনুভব করতে পারছিল না, খালি মনে হচ্ছিল, তার উপর দিয়ে একটা যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছে। খুশী হচ্ছে কি না হচ্ছে তাও বুঝছিল না। বিয়েতে তার মত ছিল না, মায়ের জেদে হ'ল। নির্ম্মলের মধ্যেও দেহে বা মনে এমন কিছু ছিল না যা তাকে প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ ক'রে দেয়। তবে সে যে বেশ সভ্যভব্য ছেলে তা সুমনা নিজের কাছে স্বীকার করে। সুমনাকে পীড়িত-অবস্থায় সে কোনো দিক দিয়ে বিরক্ত করে নি। বোন এবং বৌদিরা তাকে অবশ্য বিধিমতে জেরা করল, নির্ম্মল তাকে ফুলশয্যার রাত্রে কি বলেছে না বলেছে তাই নিয়ে, কিন্তু সুমনা তাদের কৌতূহল বিন্দুমাত্রও চরিতার্থ করতে পারল না।

নির্ম্মল কর্ম্মস্থানে পৌঁছে একটা টেলিগ্রাম করেছিল শ্বশুরের নামে, চিঠিপত্র প্রথম কয়েকদিন কিছু আসেনি। চিঠি লিখবে সুমনার কাছে ব'লে গিয়েছিল, কিন্তু প্রথম ক'দিন হয়ত খুব ব্যস্ত থাকবে, সময় পাবে না চিঠি লিখবার।

দিন সাত পরে সুমনার নামে একখানা চিঠি এল। তরুণীদের মহলে মহা কোলাহল বেধে গেল।

সকলেরই ইচ্ছা চিঠিটা দেখে। এ বিষয়ে ব্যক্তিগত গোপনতাকে স্বীকার করতে কেউ বেশী রাজী নয়। লিখেছে একজনকে, কিন্তু সেটা যেন সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি। এর অন্তর্নিহিত কুরুচিটা শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের কাছেও ধরা পড়ে না।

যা হোক্ কোনোমতে চিঠিটা সুমনার কাছে এসে পৌঁছল। সাধারণ খাম, রংচং কিছু নেই। সুমনা চিঠি খুলে পড়ে দেখল। ছোট চিঠি, কয়েক লাইন মাত্র লেখা।

সুমনা,

আমি ভালয় ভালয় এসে পৌঁছেছি। ট্রেনে বেশী ভীড় ছিল না, ঘুমতে পেরেছি। তবে কর্ম্মস্থানে এসে মন বসছে না। ধারে কাছে বাঙালী কেউ নেই। ক্রমাগত ভাঙা হিন্দী আর ইংরেজী বলে বলে মুখের স্বাদ বিগড়ে গেছে। খাচ্ছিও সব আশ্চর্য্য জিনিস, মুখের স্বাদ বিগড়বার সেটাও একটা কারণ। বাঙালী রান্নার মত রান্না কোথাও নেই, এই বিশ্বাসটা আমার ক্রমেই দৃঢ় হচ্ছে। তুমি চটপট সেরে ওঠ, এবং ভাল করে রান্নাবান্না শিখে নেও। তোমার মা খুব ভাল রান্না জানেন শুনেছি, কাজেই তুমি ভালই শিখতে পারবে।

আজ আর সময় নেই, পরে একটা বড় চিঠি লিখব। উত্তর দিও।

নির্ম্মল

কৌতূহলী মেয়ের দল বড়ই নিরুৎসাহ হয়ে গেল। এ আবার কিরকম প্রেমপত্র? ঠিক যেন খুড়োমশাই ভাইঝিকে লিখেছেন। একটা ভালবাসার কথা মাত্র নেই। লোহা পিটে পিটে লোকটা লোহাই হয়ে গেছে দেখা যাচ্ছে। সুমনা কিন্তু খুব আরাম অনুভব করল। বোনেরা, বৌদিরা যে তাকে ক্ষ্যাপাবার একটা মস্ত সুযোগ হারাল, এতে সে নির্ম্মলের কাছে খুবই কৃতজ্ঞ হয়ে রইল।

গীতা বলল, "তুমিও ভাই ঐরকম করে উত্তর দাও। যেন মাষ্টার মশাইকে লিখছ।"

সুমনা বলল, "আবার কিরকম লিখব, না হলে?"

জ্যোৎস্না বলল, "আহা, মেয়ে ন্যাকা যেন। বরকে লোকে কিরকম করে চিঠি লেখে জান না যেন।"

সুমনা বলল এতক্ষণ পরে একটু রসিকতা করে, "তাহলে বাপু তোমরাই চিঠিটা লিখে দাও, আমার ওসব বিদ্যে নেই।"

সুচিত্রা বলল, "বাব্বাঃ, মনুদিরও মুখ ফুটেছে দেখছি, বিয়ের জলের গুণ আছে।"

জ্যোৎস্না বলল, "তা আবার নেই? পুঁটে পুঁটে মেয়েরা বিয়ে করেই কেমন সেয়ানা হয়ে যায়, তা যদি দেখতে। মনু ত বয়স আন্দাজে অত্যন্তই কাঁচা থেকে গেছে। ষোলো-সতেরো বছরের মেয়েরা আগেকার কালে ছেলের মা, বাড়ীর গিন্নী হয়ে বসত।"

উত্তরে সুমনাকে দিয়ে একটা যথারীতি প্রেমপত্র লেখাবার চেষ্টা হ'ল খুব। বৌদি আর দিদি মিলে তাকে তালিম দিল অনেক কিন্তু সুমনা ঘাড় পাড়ল না। সে নিজে যেমন বুঝল, তেমনই লিখল, চিঠিটা বালিকাসুলভ এবং সরলই হ'ল। গীতা টিপ্পনি কেটে বলল, "এ যেন পুতুলখেলার বিয়ে। কেউ রক্ত মাংসের মানুষ নয়।"

জ্যোৎস্না বলল, "ভালই হয়েছে বাপু। মনু যেরকম ছেলেমানুষ, তার সঙ্গে নির্ম্মল যদি বেশী রস করতে যেত, তাহলে ও ভীষণ ভড়কে যেত। আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

সুমনা খানিক সেরে উঠতেই গৌরাঙ্গিনী তাকে ঘর-করণার কাজ শেখাতে উঠে পড়ে লেগে গেলেন। এমনিতেই মেয়েদের শিক্ষা বলতে তিনি এই শিক্ষাটাকেই উঁচু স্থান দেন, তার উপর জামাই যেন এইটাই চায় মনে হচ্ছে। একলা ঘরের গিন্নী হতে হলে এসব ত জানতেই হবে। সুমনা একটু অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, "আমি কি আর পড়াশুনো করব না মা? ওখানে যেতেত আমার এখনও দেরী আছে?"

মা বললেন, "বিয়েই যখন হয়ে গেছে, তখন আবার পড়ার কি দরকার? যেটা কাজে লাগবে সেইটাই শেখ।"

সুমনার মন মানল না। বই খাতাপত্র খুঁজে পেতে সে আবার গুছিয়ে রাখল। সুচিত্রা আর সে একসঙ্গেই পড়ত। নিজের থেকেই সে অল্প অল্প পড়তে আরম্ভ করল। বেশী পড়তে দেখলে আবার সবাই বকাবকি করবে, এই সবে অসুখ থেকে উঠেছে। কিন্তু অঙ্কটঙ্ক সব নিজে নিজে করা শক্ত। সুচিত্রার কাছে বিশেষ কিছু সাহায্য পাওয়া যায় না, সে পড়াশুনোয় বিশেষ ভাল নয়। অনেক ভেবে চিন্তে সে দাদার কাছে গিয়ে হাজির হ'ল, "দাদা আমার একজন মাষ্টার রেখে দাও না? নিজে নিজে আমি সব পারছি না।"

জিতেন বলল, "তুই কি পরীক্ষা দিবি, ঠিকই করে ফেলেছিস্? নির্ম্মলের মত আছে?"

সুমনা বলল, "অমত ত কিছু জানাননি।"

জিতেন বলল, "মাষ্টার আমি রেখে দিতে পারি, যদি ওদের কোনো অমত না থাকে। তুই পড়ায় বেশ ভালই ছিলি, পরীক্ষাটা দিয়ে ফেলা ভাল। সুবিধে হলে পরে

কলেজেও পড়তে পারবি। কিন্তু সব নির্ভর করছে তুই কতদিন এখানে থাকবি তার উপরে। আরম্ভ করেই যদি চলে যেতে হয় তাহলে সব কষ্ট করাই বৃথা। বরং নির্ম্মলকে লিখে দেখ, সে এ বিষয়ে কি বলে?"

অগত্যা সুমনাকে তাই করতে হ'ল। পড়াতে সে বেশ ভাল ছিল, তা লিখল এবং চিরদিনই তার ইচ্ছে ছিল ভাল করে পড়াশুনো করে, অন্ততঃপক্ষে বি-এ পাস করবার, সেটাও জানিয়ে দিল। উত্তরে নির্ম্মল লিখল যে, সুমনা আরো পড়তে চায় শুনে সে খুবই খুসী হয়েছে, সেও তাই চায়। তবে সুমনা বাবা-মা ও শ্বশুর-শাশুড়ীর মত না নিয়ে এখনই স্কুলে যেন না যায়। কবে যে তাকে নির্ম্মল এখানে নিয়ে আসতে পারবে তার কিছুই ঠিক নেই। জায়গাটা তার বিশেষ ভাল লাগছে না। তবে কাজ ছেড়ে দেবার কোনো প্রশ্ন ওঠে না, কারণ মাইনে ভাল এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা খুব বেশী। খাটুনি খুব। সে মাসখানেক পরে ছুটি নিয়ে একবার কলকাতায় যাবার চেষ্টা করবে, তখন সুমনার সঙ্গে পড়াশুনোর বিষয়ে ভাল করে আলোচনা করে দেখবে। সম্প্রতি সে বাড়ীতেই পড়তে থাক, যদি মাষ্টার দরকার হয়ত মাষ্টার নিশ্চয়ই রাখতে পারে। যদি সুমনার বাবা-মা কিছু মনে না করেন তাহলে সে সুমনাকে কিছু কিছু টাকা পাঠাতে পারে, পড়ার খরচের জন্ম। তবে খুব বেশী চাপ যেন সুমনা নিজের উপরে না দেয়, সবে সে একটা শক্ত অসুখ থেকে উঠেছে।

সুমনা গিয়ে জিতেনকে জানাল। জিতেন মা-বাবাকে বলাতে রাসবিহারীবাবু বললেন, "পড়তে চায় অল্প অল্প পড়ুক, সারাদিন হাঁ করে বসে থেকে করবেই বা কি? নির্ম্মলকে আর টাকা পাঠাতে হবে না, আমি এখনও অথর্ব্ব হয়ে পড়িনি ত? হরি মাষ্টারকে ফোন করে দে একটা। ঘণ্টাখানেক করে পড়িয়ে যাবে।"

গৌরাঙ্গিনী বললেন, "এই শোন কথা! যেমন ভাবা তার তেমনি দেবী। এই ত ক'দিন আগে অত বড় শক্ত অসুখটা থেকে উঠল, এরই মধ্যে বইয়ের বোঝা নিয়ে বসতে হবে? একে ত চুল উঠতে আরম্ভ হয়েছে, এইবার মাথাটা স্তাড়া হয়ে যাক্। তখন মেয়ে একেবারে রূপের ডালি হয়ে উঠবেন।"

সুচিত্রা বলল, "মহুদির কি মজা! যা বলে তাই হয়। কিন্তু আমি যা চাই তা কখনও হয় না। আমার ত পড়তে একেবারে ভাল লাগে না কিন্তু যদি পড়া ছাড়তে চাই এখন ত সবাই ঝাঁটা নিয়ে মারতে আসবে।"

গীতা ঠাট্টা করে বলল, "তুমি আর তোমার মহুদি জায়গা বদল করে নাও। ও স্কুলে গিয়ে পড়াশুনো করুক আর তুমি পাল্কী চড়ে শ্বশুরবাড়ী যাও।"

যা হোক সুমনার জন্তে মাষ্টার এসে গেল। পড়াশুনো সে করতে আরম্ভ করল। শ্বশুরবাড়ীর লোকেরাও কথাটা শুনল তবে কেউ কোনো অমত প্রকাশ করল না।

নির্ম্মলের চিঠি খুব বেশী আসে না, তবে মাঝে মাঝে আসে, সুমনাও মাঝে মাঝে উত্তর দেয়। নির্ম্মল নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, সময় পায় না বেশী। কলকাতায় যাবার কথাও দু'চারবার লেখে।

স্কুলে পড়তে যাক বা নাই যাক, বেড়াতে দু'চার দিন সুমনা গেল। তাকে ঘিরে সে কি কলরব। সুমনার গহনা শাড়ী সব দেখবার জন্তে মহা ঠেলাঠেলি লেগে গেল। ভাগ্যে গীতা তাকে খুব খানিক সাজিয়ে পাঠিয়েছিল, নইলে দেখবার কিছু থাকত না। তবে অসুখে ভুগে সে যে দেখতে অনেকটা খারাপ হয়ে গিয়েছে এই নিয়ে সকলে খানিকটা হা-হুতাশ করে নিল।

শীতের দিন ক্রমে কেটে আসতে লাগল। কলকাতার শহরে ঋতুর পরিবর্ত্তন খুব চটপট বোঝা যায় না, তবে বালীগঞ্জের দিকে খানিক খানিক বোঝা যায়। সন্ধ্যা বেলার ধোঁয়ার যবনিকা একটু পাতলা হতে থাকে। বাতাসের ধরনটাও কিছু বদলে যায়। গাছপালা এ দিক্ ও দিক্ আছে কিছু কিছু। পাতা খসে যাওয়া, চিকন সোনালী নূতন পাতা বেরনো দেখা যায় মাঝে মাঝে। বাড়ীর ভিতরেও লেপ কম্বল তোলবার সব আয়োজন দেখা যায়। তরুণ ও তরুণীর দল মা-মাসীর বকুনি অগ্রাহ্ম করে গরম জামা বাক্সে উঠিয়ে রাখবার জোগাড় করে। তাদের চেয়ে ছোটরাও তাদের অনুকরণ করতে গিয়ে কানমলা আর মার উপহার পায়।

সুমনা ক্রমে যেন আগের জীবনের মধ্যে ফিরে যেতে আরম্ভ করল। অভ্যাস একটা মস্ত জিনিস। বিয়ের ছায়া, ক্ষণেক দেখা স্বামীর ছায়াও যেন তার মনের ভিতর ক্রমে ঝাপসা হয়ে আসছে। যেদিন নির্ম্মলের চিঠি আসে সেদিন তাকে বেশী করে মনে পড়ে। ক'টা কথাই বা সে তার সঙ্গে বলেছে। অন্তরঙ্গ হবার কোনো সুযোগ সুবিধা তাদের হয়নি। সুমনা সুন্দরী, হয়ত সেই হিসেবে নির্ম্মলের মনে তার ছায়াটা একটু গভীর ভাবে পড়েছে। তা ছাড়া সে পুরুষ, তার বয়সও বেশী। সুমনা ছেলেমানুষ, মনটা তার দেহের চেয়েও অনেক বেশী ছেলেমানুষ। নির্ম্মলের অতি সাধারণ মূর্ত্তিটা তার মনে বেশী রেখাপাত করেনি।

নির্ম্মল কবে কলকাতায় আসবে তার একটা আন্দাজ

চকিত চপল আঁখি ফটো : শ্রীতপনকুমার বর্ম্মণ

যুগোস্লাভিয়ার 'কোলো' নৃত্য

মণিপুরী নৃত্যে নাগা-রমণী

এতদিন পরে একটু একটু পাওয়া যেতে লাগল। ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে কিছুদিনের ছুটি পাবার জন্যে সে আবেদন করেছে। যদি সেটা মঞ্জুর হয় তাহলেও সে এসে পড়বে। এ দিকে অনেক সৌখীন জিনিস পাওয়া যায়, যদি সুমনা কিছু চায় তা হলে সে নিয়ে যেতে পারে। মেয়েরা যে কি পেলে খুসী হয় তা সে ঠিক জানে না। বাড়ীর লোকদের জন্যও কিছু নেওয়া উচিত, কিন্তু কার জন্যে যে কি নেবে তা সে ভেবেই পাচ্ছে না।

এ নিয়েও সুমনাকে খানিক ক্ষ্যাপান হ'ল। কেউ বলল, "অমূল্যরতন শাড়ী চাও," কেউ বলল,"গজমোতির মালা চাও!" সুমনা কি যে চায় তা ভেবেই পেল না, লিখে দিল তার কিছুই মনে আসছে না। নির্ম্মলের যা খুসী তাই আনতে পারে।

গৌরাঙ্গিনীর মনে অনেকদিনের একটা সখ ছিল। সংসারের চাপে সে সখটা লুকোনোই ছিল। এখন বড় ছেলে এবং দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, মনে আগের চেয়ে শান্তি এসেছে সুমনার বিয়েতে খুব খরচ হলেও একেবারে ভিটেমাটি বাঁধা পড়ার অবস্থা হয়নি। গৌরাঙ্গিনী দেশের তীর্থগুলি ঘুরে ঘুরে দেখতে চান। বাল্যকালে এক ঠাকুরমার কাছে এই সব তীর্থযাত্রার কত সুন্দর সুন্দর গল্প তিনি শুনতেন। কত কষ্ট করেও তখনকার দিনে সবাইকে যেতে হ'ত, পায়ে হাঁটতে হ'ত, গরুর গাড়ীতে যেতে হ'ত নৌকাতে যেতে হ'ত। এখন ত কোন হাঙ্গাম নেই, পয়সাটি ফেল আর ট্রেনে চেপে বস। আরো পয়সা ঢালতে পার ত উড়েই চলে যেতে পার প্লেনে। গৌরাঙ্গিনীর অবশ্য সে সখ ছিল না। আকাশে ওড়াকে তিনি নিদারুণ ভয় করতেন। ট্রেনেই যাবেন, সঙ্গী সাথীর অভাব হবে না, জুটে যাবে। এখন কর্ত্তা অনুমতি করলেই হয়।

রাসবিহারীর খুব যে মত ছিল তা নয়। কোথায় যাবে টো টো করে ঘুরতে? এক রাশ পয়সা খরচ হবে, অনিয়ম করে, নানা জায়গার জল হাওয়া ক্রমাগত বদলে অসুখ বিসুখ করে পড়বে। বাড়ীতেও হবে অসুবিধার একশেষ। স্ত্রীর আবেদনের উত্তরে তিনি বললেন, "তীর্থ করা সে ত খুব ভাল কথা। কিন্তু এখন কি? পেনসনটা পাই, তার পর তুমি আর আমি একসঙ্গে যাব এখন।"

গৌরাঙ্গিনী বললেন, "ও সব ছেঁদো কথায় আমি ভুলি না। তুমি যা যাবে তা আমার জানা আছে। যা ধম্মকম্মে মন! কোনোদিন ত ঠাকুর দেবতার কাছে মাথা নোয়াতে দেখি নি, একখানা ভাল বইয়ের পাতা উল্টতে দেখি নি। তুমি যাও-ও যদি, তখন না হয় আমি দু'বার করে যাব। ভাল জায়গায় দু'বার গেলে ক্ষতি ত নেই কিছু? মোট কথা একবার আমি বেরবই। কাশী, গয়া, প্রয়াগ, পুরী আর ভুবনেশ্বর; এ ক'টা দেখবই। দূরের গুলো না হয় এখন তোলা রইল।"

রাসবিহারী বললেন, "টাকা কোথায়? এই একটা এত বড় খরচ গেল।"

স্ত্রী বললেন, "ও খরচ যে এ সময়ে হবে তা ত জানতেই, তার জন্যে তৈরিও ছিলে। আমি ত তবু গহনা দিয়ে তিন-চার হাজার টাকা বাঁচিয়ে দিলাম। কিছু টাকা এখন আমায় দিতেই হবে।"

টাকা-পয়সার ব্যাপারে গিন্নীকে ধাপ্পা দেওয়া অসম্ভব। সব হিসাব তাঁর নখদর্পণে। কোথায় কি টাকাকড়ি আছে বা না আছে, তা রাসবিহারীর চেয়ে তিনি বেশী বই কম জানেন না। কাজেই রাসবিহারীকে বলতে হ'ল, "আচ্ছা তা না হয় দিলাম। কিন্তু নিয়ে যাবে কে, দেখাশোনা করবে কে? বয়স ত বাড়ছে, সামর্থ্য কমছে, সঙ্গে ভাল লোক থাকা দরকার।"

গৌরাঙ্গিনী বললেন, "সে আমি জোগাড় করব এখন। ভাল লোক পেলে যেতে দেবে ত?"

তখনকার মত কর্ত্তাকে বলতেই হ'ল, "আচ্ছা।"

এরপর বাড়ীর ছেলেমেয়েরা চেঁচামেচি সুরু করল। ছোটরা বলল, "মা গেলে আমরাও যাব।" তাদের ধমক দিয়েই চুপ করিয়ে দেওয়া হ'ল। বড়রা অবশ্য যেতে চাইল না, তবে খুসীও হ'ল না।

নির্ম্মলের ছুটি মঞ্জুর হ'ল। আসবার দিন ঠিক হ'ল। দু' বাড়ীতে আবার একটু আনন্দের হাওয়া বইতে সুরু করল। সুমনাকে এখন আবার পড়াশুনো ফেলে কিছু দিনের জন্য হয়ত শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করতে হবে। অবশ্য ডাক আসে নি এখনও।

কোন্ ট্রেনে কবে আসছে জানিয়ে নির্ম্মল টেলিগ্রাম করল সবাই মিলে সেজেগুজে তাকে অভ্যর্থনা করতে যাবে, সুমনাকে কেমন করে সাজাতে হবে,তাই নিয়ে চলল জল্পনা।

তার পর দিন সকালে খবরের কাগজ হাতে নিয়েই বাড়ীটা যেন বজ্রাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। যে ট্রেনে নির্ম্মল আসছিল সেটা একটা সেতু ভেঙ্গে রাত্রে এক বিরাট নদীর মধ্যে পড়ে গিয়েছে। অসংখ্য লোক হত, অসংখ্য আহত, অনেক নিখোঁজ।

গৌরাঙ্গিনী আর্ত্তচীৎকারে বাড়ী কাঁপিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। পুরুষরা ছুটলেন ভাল করে খোঁজ খবর নিতে। ছেলেরা হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, মেয়েরা কাঁদতে লাগল। সুমনা প্রথমে যেন কিছু বুঝতে পারল না, তারপর "মা" বলে কেঁদে উঠে মায়ের গায়ের উপর মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল। (ক্রমশঃ)

ঈশ্বর ও ঐহিকতা

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়

তথাগত বুদ্ধের বাণীর একটি অংশকে নিয়েই আজকের আলোচনা সুরু করছি। যুগাবতার শ্রীবুদ্ধ এক প্রশ্নোত্তর-প্রসঙ্গে বলেছিলেন—'ভগবান আছেন কি না, তা বাপু আমি জানি না। আর তোমরাও নিজেরা ভগবানের অস্তিত্ব নিয়ে মাথা ঘামিও না।'

ভগবান বুদ্ধের এই উক্তি হিন্দুধর্মাবলম্বী এক শ্রেণীকে বিমূঢ় করেছে বললে মোটেই অত্যুক্তি হয় না। যাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ত্যাগ ও নৈতিক অবদান ভারতবাসীর অধ্যাত্ম রাজ্যের এক অমূল্য সম্পদ, সার্ধ পৃথিবীর আত্মার মুক্তিদাতা; এমনকি হিন্দুর স্বাতন্ত্র্যবাদের পঙক্তির বাইরে থেকেও যিনি আজও হিন্দুর অবতার বলেই প্রচারিত হচ্ছেন, এহেন কালজয়ী মহামানবের এ-ধরনের শ্রুতিকটু উক্তির ব্যাখ্যা পরবর্তীকালে হিন্দু ধর্মগুরুদেরও শাস্ত্রসম্মত বিধানে পরিবেশণ করার একটা ঝোঁক চেপে গেল।

তাঁদের কেউ বলেছেন, বুদ্ধদেব সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। শুধু ঐতিহাসিক তৎকালীন পারিপার্শ্বিক কারণেই সে-কথা তিনি প্রকাশ্যে প্রচার করেন নি।

আর এক শ্রেণীর বুদ্ধ-সমর্থক বলেছেন, তথাগত কখনও ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নি। হ্যাঁ, তবে তিনি প্রকাশ্যে স্বীকারও করেন নি। এর তাৎপর্য হ'ল এই যে, শাক্যমুনি ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করতে যে কোন কারণেই হ'ক, অনিচ্ছুকই ছিলেন। তা বলে শ্রীবুদ্ধ ঈশ্বর বিষয়ক তত্ত্বে অজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ কোনটাই ছিলেন না। তবে বলতে পারি, তিনি ঐতিহাসিক কারণে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই ঐশ তত্ত্বে মৌনাবলম্বন করেছিলেন।

এই উভয় শ্রেণীর প্রাজ্ঞ ধর্মগুরুদের মতামতকে অতিক্রম করে আপাতত আমাদের নূতন কোনও কথা বলার সাহস বা উৎসাহ কোনটাই নেই। তবে এই উভয় মতেরই সামঞ্জস্য রক্ষা করে তথাগতের উক্তির ইঙ্গিত পর্যালোচনা করলে এ-কথাই সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক প্রশ্নই মনুষ্য-জীবনের মূল প্রতিপাদ্য নয়। জীবনকে সার্থকতার পথে, পূর্ণতার রূপায়ণেই তার সর্বশ্রেষ্ঠ মূল্যায়ন। হিন্দু-সমাজের তৎকালীন নৈতিক পতন তার অন্তঃসারশূন্য বহিরঙ্গ ক্রিয়াকলাপের জন্যই দায়ী। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় সূক্ষ্ম তর্ক, তথাকথিত দার্শনিক পাণ্ডিত্য ও হৃদয়হীন বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই হিন্দুত্ব খুঁটি গেড়ে নিশ্চিন্ত ছিল। ঋষি-প্রণীত উপনিষদের বাণীসমূহকে পুঁথির পাতায় আবদ্ধ করেই ধর্মগুরুগণ নৈতিক কর্তব্য শেষ করছিলেন এক দিকে হিংসামূলক সকাম যাগ-যজ্ঞ ও অপর দিকে উদ্যমবিহীন ভক্তিবাদের ভাবালুতা যুগ-জীবনকে অর্থহীন কুসংস্কারে পরিণত করেছে। ঠিক এমন যুগ-সন্ধিক্ষণেই ভগবান বুদ্ধ সময়োপযোগী আদর্শ নিয়েই এসেছিলেন এই ধরাধামে ত্রিলোকোদ্ধারকারী গীতা গ্রন্থের সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে—"যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত—" ইত্যাদি। ঐশতত্ত্বে উৎসাহ না দেওয়ার এটাই হয়ত ঐতিহাসিক পটভূমিকা।

যুগের আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক, এ উভয়বিধ প্রয়োজন মেটানোই হ'ল যুগের অবতারদের প্রতিশ্রুতি পালন করা। যুগোপযোগী মনন-বিপ্লব সাধন করে যাওয়ার জন্যই তাঁরা ধরাধামে আবির্ভূত হন। পয়গম্বর, প্রফেট বা অবতার—এঁরা সকলেই স্থান-কাল-পরিবেশ অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় জীবনের যুগসন্ধিক্ষণের পথ-প্রদর্শক। মূল লক্ষ্য সকলেরই এক। অতৃপ্ত জীবাত্মাকে সে অরূপ-রাজ্যের অমৃত-বারির সন্ধান দেওয়া।

এই দৃষ্টিতে বিচার করতে গেলে আমরা দেখতে পাই, শুধু উপনিষদের বাণীই, সে-সব সত্যদ্রষ্টাদের দর্শনই, জীবজগতের অগ্রগতির শাশ্বত পথ-প্রদর্শক।

আত্মার চর্যাই উপনিষদসমূহের আদর্শ। আবার আত্মাই বিশ্বের কেন্দ্রীভূত সার সত্তা ও অক্ষয় তত্ত্ব। কাজেই আত্মানুসন্ধিৎসাই জীবজগতের শাশ্বত জিজ্ঞাসা। উপনিষদসমূহে এ সনাতন প্রশ্নেরই সমাধান করা হয়েছে স্থূল ইন্দ্রিয়াশ্রয়ী বুদ্ধিগ্রাহ্য ভিত্তিতে। তাই উপনিষদীয় তত্ত্বজ্ঞান সনাতন তথ্য, তাই উপনিষদাশ্রিত ধর্ম, অর্থাৎ হিন্দুধর্ম, সনাতন ধর্ম। উপনিষদের আত্মিক ব্যাখ্যা কোন একটি বিশেষ জাতি কর্তৃক প্রচারিত হয়ে থাকলেও তা সমগ্র মানবজাতিরই আদি অধ্যাত্মজ্ঞান বা বেদ।

'বেদ' শব্দের অন্যতর ব্যাখ্যা এ-ক্ষেত্রে সমীচীনও নয়। কল্প-কল্পান্তরে এই অধ্যাত্মজ্ঞান বা বেদ উৎক্রান্তিবাদের নিয়মানুসারে শ্রেষ্ঠ মানস-চৈতন্যে অব্যক্ত থেকে নূতন করে অভিব্যক্ত হয়। এবং তখন থেকেই মানবের আত্মোপলব্ধির প্রচেষ্টা সুরু হয়।

ব্যবহারিক বুদ্ধির প্ররোচনায় বেদের চারটি অঙ্গ কল্পনা করা হয়েছে—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। তবে তাত্ত্বিক বিচারে এসব-কিছু অঙ্গ একত্র বা বিচ্ছিন্ন, যে ভাবেই থাক বেদই বটে। দুধে মাখন ওতপ্রোত হয়েই থাকে, প্রয়োজন বোধে তাকে আবার বিশ্লিষ্টও করা যায়। সেরূপ কর্ম ও জ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ তথ্যই অর্থাৎ সমগ্র মানব-জীবনের পূর্ণতা বিধানের মহামন্ত্রই বেদে নিহিত। পরবর্তীকালে ব্যবহারিক প্রয়োজনেই মূল বেদ চতুর্ধা বিভক্ত এবং জ্ঞান ও কর্মকাণ্ডদ্বয়ে বিশ্লিষ্ট হয়েছিল। এমনকি প্রয়োজন হ'লে ভবিষ্যতে ব্রহ্মসূত্রের (বেদান্ত) ন্যায় বেদের বহিরঙ্গ সংস্কার আরও হতে পারে। বেদ-প্রসঙ্গ আপাততঃ এখানেই ইতি করছি। পরে যথা সময়ে আলোচনা করা হবে।

নিরীশ্বরবাদী কোনও কোনও সম্প্রদায় মনে করেন, আদিমযুগের অকল্পনীয় নৈসর্গিক প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ভয়-ভীতির মৌল প্রেরণার তাড়নায়ই ঐশতত্ত্ব জন্মলাভ করেছে। এ-ধারণা হয়ত একেবারে অমূলক নয়। তবে গোড়াতেই একটি কথা আমাদের পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার যে, ঐশতত্ত্ব ও অধ্যাত্মতত্ত্ব এক কথা নয়।

উপরোক্ত বেদে ঐশতত্ত্বের বালাই নেই, আছে অধ্যাত্মতত্ত্বের সংকলন। যেমন ধর্ম ও দর্শনে আমরা সব সময়ে প্রভেদ স্মরণ রাখতে অভ্যস্ত নই, ঠিক সে ভাবে ঐশতত্ত্ব ও অধ্যাত্মতত্ত্বের পার্থক্য ভুলে গিয়ে ধর্মীয় ব্যাখ্যায় তাল-গোল পাকিয়ে ফেলি।

ঐশতত্ত্বে আস্থা মানুষের প্রাচীন যুগে ভয়-ভীতি হতে জন্মাতে পারে। তা বলে অধ্যাত্মতত্ত্বে বিশ্বাসও সে ভাবে আমাদের পূর্বপুরুষদের ভিতর সংক্রামিত হয়েছে, এ কথা মানতে পারি না।

অধ্যাত্মজ্ঞানের উন্মেষের দু'টি কারণ মনীষীগণ উল্লেখ করেছেন।

প্রথমটি হ'ল এই যে, মানুষ তার আদিম যুগের নিঃসঙ্গতার মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই অন্তরের সান্নিধ্য লাভ করেছিল সুগভীর আত্মচিন্তার মাঝ থেকে। তা ছাড়া শ্বাপদসঙ্কুল জান্তব হিংস্রতার পরিবেষ্টন তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পক্ষে সহায়কও ছিল না মোটেই। তাই তার মনন-রাজ্যের জ্যোতির্ময়কেই সে তার যাত্রা-পথের একমাত্র আশার প্রদীপ বলে জেনেছিল।

দ্বিতীয় মতটি এরূপ—আদিম যুগে জীবনযাত্রার জটিলতা ছিল না। প্রাকৃতিক পরিবেশও তখন স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের অনুকূলই ছিল। উদরপূর্তি ও দৈনন্দিন জীবন-যাপন অনায়াসলভ্যই ছিল, বাসনা-কামনার পরিধি ছিল অত্যন্ত পরিমিত। তাই অফুরন্ত অবসরও তখন সুযোগ বুঝেই প্রকৃতির সৌন্দর্য-বিস্ময়ের অনুভূতির প্রেরণায় আত্মসাধনার পথ আবিষ্কার করলো।

নেহাৎ জড়-বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে অবশ্য উভয় মতেই প্রচুর যুক্তি আছে। সেসবই আপেক্ষিক সত্য মাত্র। খাঁটি কথা এই যে, অধ্যাত্ম প্রেরণা জীবের জন্মগত আহরণ। এটা কর্ণের সহজাত কবচ-কুণ্ডলের ন্যায় দেহাশ্রিত আত্মার স্বধর্ম। কল্পারম্ভের সুরু থেকে নব-সৃষ্টির বিকাশ (অভিব্যক্তি) হতে থাকে জড়ের থেকে চৈতন্যের দিকে। সে-বিচারে বর্তমান কল্পের আদিকালের জড়বুদ্ধি মানুষও উৎক্রান্তির পথে উন্নততর মনন-ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে—সন্দেহ নেই। আর এ মানবিক মনন-শীলতার ক্রমোন্নতির ধারা এতোটা শ্লথগতি যে, সামান্য দশ-বারো হাজার বৎসরের ব্যবধানে এর কোনও উল্লেখ-যোগ্য পরিবর্তন লক্ষিত হয় না। তাই কেউ কেউ মনে করেন প্রথমে বেদের কর্মকাণ্ডের (সংহিতা-ব্রাহ্মণ ভাগ) বহু পরে, দীর্ঘদিনের ব্যবধানে জ্ঞানকাণ্ডের (আরণ্যক-উপনিষদ ভাগ) সৃষ্টি হয়েছে।

এ-ধারণা একেবারে ভ্রমাত্মক। কোন কোনও পণ্ডিত-সম্প্রদায় ভাষাতত্ত্বের বিচার করেও এ সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছেন। নিখুঁত ভাবে বিচারের অবসর এখন আমাদের না থাকলেও শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, যে কোনও একটি বেদের ভাষা ও বাক্‌ভঙ্গির মধ্যে বহু প্রকার ভেদ রয়েছে। তাই বলতে হয়, সমগ্র বৈদিক জ্ঞান-কর্মবাদ একই সময়ে যুগপৎ সৃষ্ট হয়েছে। বিভাজন ও সংযোজন হয়েছে অনেক পরে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ (বেদব্যাস), জৈমিনী ও বাদরায়ণ একে একে সে-সব কাজ করেছিলেন।

এবার ঐশতত্ত্বের কথায় ফিরে আসছি। ঐশতত্ত্বেরও আবার দু'টি দিক আছে। এক দল নির্গুণ নিরুপাধি পরমাত্মাকেই (ব্রহ্মকে) ক্ষুদ্র বুদ্ধির সীমায় সীমায়িত করেই আত্মবিনোদন ও আত্মিক প্রেরণার জন্য ঈশ্বরত্ব আরোপ করেছেন। এ ধরনের ঐশতত্ত্ব অধ্যাত্মতত্ত্বেরই নামান্তর।

আবার অপরাপর বহু সম্প্রদায় ঈশ্বরকে কর্তৃত্বাভিমানী জগৎ-পরিচালক ও বহু গুণান্বিত পরমপুরুষ রূপেই

বহুধা কল্পনায় বিভূষিত করেছেন। এ-ধরনের ঐশবাদ দৈবতত্ত্বেরই নামান্তর। হিন্দুদের কোনও সম্প্রদায়েই এ শেষোক্ত মতের ঐশবাদ স্থান পায় নি। প্রথমোক্ত ধারণা অবশ্য দার্শনিক ব্যাখ্যায় স্বীকৃত না হলেও ভারতীয় ধর্মীয় মতবাদে স্থান পেয়েছে।

প্রথমোক্ত অভিধায় ঈশ্বরের ভক্ত কখনও দুঃখ-দারিদ্র্য পীড়িত হওয়ার ভয়ে বা কোনও প্রলোভনের ইঙ্গিতে বা রোষের হুঙ্কারেই ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করেন না। ঈশ্বরকে তিনি অনন্ত বিস্ময় ও প্রেমের খনি রূপেই জেনেছেন। ঈশ্বরানুরাগই তার আত্মানুরাগ বা আত্মতৃপ্তি। নদী যেমন সাগরে আত্মবিলোপের জন্য আকুল, পতঙ্গ যেমন অগ্নিতে আত্মাহুতির জন্য উন্মত্ত, ভক্ত ঠিক তেমনি তাঁর অভীপ্সিত ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করে কৃত-কৃতার্থ। সে এক ভিন্ন জগৎ। আপাতত আমাদের সে-সব জটিলতার ভিতর প্রবেশ করার প্রয়োজন নেই।

তবে ভারতীয় দর্শনসমূহের রায় মোটামুটি ভাবে নিরীশ্বরবাদের দিকেই। প্রাচীন শাস্ত্রীয় সংজ্ঞায় নাস্তিক-আস্তিকের প্রশ্ন বিচার করা হয়েছে জন্মান্তরে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাপকাঠিতে; ঈশ্বরে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে নয়। বৌদ্ধযুগের সমসাময়িককালে বৌদ্ধবাদ তার নিরীশ্বরীয় ব্যাখ্যার জন্য কখনও ভারতীয় অধ্যাত্মবাদীদের দ্বারা নিগৃহীত হয় নি, যা-কিছু উৎপীড়িত হয়েছে অনাত্মবাদের জন্য। বৌদ্ধ দর্শন শাশ্বত সর্বব্যাপী পরমাত্মার অস্বীকার করে কেবলমাত্র সসীম, অস্থায়ী ও খণ্ডিত জীবাত্মাকেই স্বীকার করেছেন, বিশিষ্ট এক ভঙ্গিতে শূন্যবাদের ব্যাখ্যায়। এ-ভাষ্য পুরোপুরি জড়বাদীও নয়, আবার যথার্থ অধ্যাত্মবাদীও নয়। এ-কারণেই বৌদ্ধবাদ (শূন্যবাদ) ভারতীয় দর্শনে অগ্রাহ্য হয়েছে। তবে তার ধর্মীয় ব্যাখ্যা বা নীতিবাদ সমগ্রভাবেই আমরা গ্রহণ করেছি। কারণ অধ্যাত্মতত্ত্বের যতোখানি শীর্ষে আরোহণ করা যায় জীবদ্দশায়—এ স্থূল দেহকে আশ্রয় করে তা শূন্যবাদের ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ ও নৈতিক আচারের (শীলের) মধ্য দিয়েও সমভাবে লাভ করা যায়। বৌদ্ধ নির্বাণতত্ত্ব ও আর্য বিদেহমুক্তির তত্ত্ব দার্শনিক পর্যায়েই মাত্র বিবেচিত হয়ে থাকে—ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়। সে-সব জটিল তত্ত্ব 'কারণ-দেহ' বা অব্যক্ত সত্তা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। স্থূল দেহের সাধনে প্রযোজ্য নয়।

অধ্যাত্মতত্ত্বে বা দর্শনে আত্মার প্রশ্নটাই মুখ্য। আবার অধ্যাত্মদর্শনকে বাস্তব জীবনে রূপায়িত করার দায়িত্ব পালন করতে হয় ধর্মকে। অনুশাসন কিন্তু শুধুমাত্র স্থান-কালপাত্রের মধ্যেই সীমায়িত। ধর্ম আবার পরিবেশ অনুযায়ী বহুবিধ নৈতিক বিধান তৈরি করে থাকে। নৈতিক বিধান আবার দ্বিবিধ—আত্মিক ও সামাজিক। সামাজিক বিধানকেই আমরা সাধারণতঃ moral code বলে থাকি আর আত্মিক বিধানগুলিকে বলি ethical code।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখা গিয়েছে, যে-ধর্মশাস্ত্র সমগ্র সমাজের বাস্তব জীবনযাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আত্মার কল্যাণ বিধান করতে যতোখানি কার্যকরী হয়েছে, সে-বিধানবলীই সেই সেই সমাজসমূহে দীর্ঘস্থায়িত্বের গৌরব অর্জন করেছে। আমাদের ভারতীয় সমাজে সমগ্র 'বেদ' কর্ম ও জ্ঞানের মধ্য দিয়ে আত্মার পরিচর্যার বাণী শুনিয়েছেন সুস্পষ্ট ভাবে ও সার্থক রূপে। সমাজ-জীবনের কোনও অঙ্গই সেখানে অবহেলিত হয় নি। তাই শুনি—'অয়মাত্মা অবিনাশী', 'আত্মানং বিদ্ধি' ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গেই উচ্চারিত হয়েছে—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য', 'অন্নং কুর্বীত' ইত্যাদি। তারই কিঞ্চিৎ পরে ঋষিকণ্ঠেই ধ্বনিত হয়েছে শরীর ও মনের উপযুক্ত পরিচর্যার নির্দেশ, যজ্ঞ ও পূর্তকর্মের আবশ্যিক বিধান ইত্যাদি। আমাদের দেশে এ ভাবেই যুগযাত্রার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মসাধন ও বস্তু-তান্ত্রিকতার সামঞ্জস্য রক্ষা করেই আধ্যাত্মনীতি গঠিত হয়েছে। ধর্মীয় নীতি ও অধ্যাত্মদর্শনকে একীভূত করেই বৈদিক যুগে জীবনাদর্শ রচিত হয়েছিল। আরও অগ্রসর হলে দেখা গেল, যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মীয় মতবাদ দারুণ অপঘাতের ঠোক্কর খেয়েছে। এটা ঘটেছে কখনও বা অজ্ঞতায়, আর কখনও বা বিবেককে ফাঁকি দেবার প্রচেষ্টায়, আবার কখনও বা পাণ্ডিত্যের দাপটে। তবে এটা ভাল ভাবেই পরীক্ষিত হয়েছে যে, অজ্ঞতা আত্মানুশীলনের যতোটা না ক্ষতি করে, তার চেয়ে বেশি ক্ষতি করে পাণ্ডিত্যের বড়ামি ও জ্ঞানের ভাঁড়ামি।

Ignorance is bliss—কথাটা ব্যঙ্গোক্তি হলেও এর মূলগত সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবমুক্ত শুদ্ধ বিবেক যে নীতিবোধের সৃষ্টি করে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুর্বিনীত পাণ্ডিত্যের চাকচিক্য তাকে পদে পদে অপদস্থ করেছে জীবনের প্রতি স্তরে।

ঈশ্বরবাদের প্রভাব কিভাবে আমাদের অধ্যাত্মজীবনে তথা জাতীয় জীবনে কার্যকরী হচ্ছে, সে-প্রসঙ্গ নিয়েই এবার আলোচনা করব। এক কথায় বলা যেতে পারে, ঈশ্বরবাদ সামগ্রিক ভাবে জগতের মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলই বেশি উৎপাদন করেছে। ন্যায়-অন্যায়ের বিচারকর্তা ঈশ্বর, ধর্মের পরিপোষক ঈশ্বর, কর্মফলের বিধাতা ঈশ্বর—

ইত্যাদি ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা হয়তো প্রকৃতির প্রবল তাড়নার বিরুদ্ধেও কখনও কখনও অন্যায় আচরণ থেকে বিরত থাকি। এর চেয়ে ঈশ্বরবাদের লাভ যা-কিছু অতিরিক্ত আছে, তা' ভক্তিতত্ত্বে সমাহিত। সে-কথা পরে আলোচনা করব।

আপাতত দেখছি, উপরোক্ত ধরনের ঈশ্বরের নামে নৈতিক শাসন যা-কিছু নিহিত আছে, তা তো ঈশতত্ত্বে বিশ্বাস না করেও জন্মান্তরবাদ বা কর্মফলের ব্যাখ্যায়ই সমাধা করা যায়। এবং শুধুমাত্র বৌদ্ধদর্শনেই নয়, পরন্তু সমগ্র জাগতিক অধ্যাত্মশাস্ত্রেই উভয় কথাই মানা হয়েছে। তবে খ্রীষ্টীয় দর্শনের ব্যাখ্যায় এ-তত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে কিছুটা অস্পষ্ট ভাবে। জন্মান্তরের প্রশ্নে সেখানে কিছুটা ভিন্নতর মতবাদ থাকলেও কর্মফলবাদ তো পুরোপুরিই মানা হয়েছে—Doomsday-র বর্ণনায়। তা ছাড়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম ব্যাপার হলেও খ্রীষ্টীয় দর্শন বলতে তেমন কিছুই নেই। কাজেই জগতের সমস্ত অধ্যাত্মমার্গের বিচার করেই বলা যায়, নৈতিক শাসনের মোক্ষম উপায় হিসাবেও ঐশতত্ত্ব অপরিহার্য্য নয়।

এবার সেই আগের কথায় ফিরে আসছি। অর্থাৎ ভক্তিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ঐশতত্ত্বের বিচার করছি। অনাদি, অনন্ত ও নিরুপাধি পরব্রহ্মকে মানবীয় প্রতীকে ঈশ্বরত্বের প্রচলনের মূল কথাই ভক্তিবাদ। ভক্ত বিশ্বপ্রাণের প্রতীকরূপে ঐশতত্ত্ব স্থাপন করেছেন নিজের প্রেম-প্রীতির অর্ঘ্যকে অখণ্ডপ্রবাহে চিরঞ্জীব করে রাখার জন্য। এঁরা মনে করেন ভক্তি একটি স্বতন্ত্র অধ্যাত্মমার্গ। আসলে ভক্তি হ'ল জীবের ব্রহ্মোপলব্ধির একটি অবস্থা। প্রগাঢ় শ্রদ্ধাই ভক্তি। আবার প্রগাঢ় ভক্তিই জ্ঞান। আবার জ্ঞানই হ'ল শক্তি, শক্তিতেই মুক্তি। তাই উপনিষদের ঋষি বলেছেন—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য'। প্রকৃত ভক্ত জ্ঞানী না হয়ে যায় না। আবার যিনি যথার্থ জ্ঞানী ভক্তি তাঁর মননসত্তায় ওতপ্রোত হয়েই আছে। আর জ্ঞানী বা ভক্ত উভয়ই শক্তিমান। কাজেই প্রকৃত ভক্তের আপন ঐশতত্ত্বের প্রয়োজনই বা কি? তিনি সর্বভূতেই ঈশ্বর দেখেন।

ঈশ্বরবাদ সাধারণভাবে পুরুষকারের শত্রুতাই সাধন করেছে বেশি। আমরা দোষ-ত্রুটি যা-ই করি না কেন, আমাদের সমস্ত দায়িত্ব 'করুণাময়' ঈশ্বরই পালন করবেন, এই বুদ্ধি থেকেই আমাদের মধ্যে দারুণ নৈষ্কর্ম্য ও জাড্যতা স্থায়িভাবে বাসা বেঁধেছে। সহস্র সাম্প্রদায়িক অজস্র ঈশ্বরের ধারণায় উপকথার সংকলনই হয়েছে আমাদের সর্বশেষ ধর্মীয় অবলম্বন। বৌদ্ধযুগের প্রারম্ভে ভারতে ঈশ্বর ও স্বর্গের রম্য কল্পনা সকাম যাগ-যজ্ঞের রাজসূয় দম্ভে অধ্যাত্মজগৎ ধূমায়িত করেছিল। অন্যদিকে পাঞ্চরাত্র ও ভাগবত সম্প্রদায়ের ভক্তিবাদের প্রাবল্য যথেষ্ট ভাবালুতার প্রশ্রয় দিচ্ছিল। তাই বুদ্ধদেব যুগের প্রয়োজন বুঝেই ঐশতত্ত্বের উস্কানি দেন নি। তা ছাড়া পূর্বেই বলেছি, ঐশতত্ত্ব দার্শনিক ব্যাখ্যার ও অধ্যাত্ম বিচারে চরম লক্ষ্য নয়। তারও উপরে রয়েছে ব্রহ্মতত্ত্ব বা মোক্ষতত্ত্ব।

রুশদেশ ভ্রমণের পর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ রুশজাতির (বিশেষভাবে রুশীয় সরকারের) নিরীশ্বরবাদকেও এক সময় সমর্থন করেছিলেন মন্দের ভাল বলে। কবিগুরুর 'রাশিয়ার চিঠি'তে এক জায়গায় যা বলেছেন তার অন্তর্নিহিত অর্থ দাঁড়ায় এই যে, বর্তমান কালের ঘোর ধনবৈষম্যমূলক ও জাতিবিদ্বেষপ্রণোদিত আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে রাশিয়ার পুরুষকার-ভিত্তিক নিরীশ্বরবাদ প্রভূত কল্যাণবিধান করেছে। তবে কবিগুরুর মতে এ ব্যবস্থাকে সাময়িক বলেই মেনে নিতে হবে, শাশ্বত নীতিতে নয়। কোনও কোনও ইন্দ্রিয়ের (যা স্থূল বা সূক্ষ্ম যাই হোক না কেন) অত্যধিক ব্যবহারের দরুন ইন্দ্রিয়বিশেষের ক্ষতি হলে তাকে যেমন সাময়িকভাবে বিশ্রাম দিয়ে কখনও বা উল্টারীতিতে চিকিৎসা করে নিরাময় করতে হয় ঠিক তেমনি ঈশ্বরের নামে জাড্যকে প্রশ্রয় দিয়েও আধ্যাত্মিকতাকে ভোগ ও অভিচারের ব্যসনে বঞ্চিত করে পৃথিবীকে যখন মাঝে মধ্যে কলুষিত করা হয়—তখন সাময়িক সুচিকিৎসার জন্য ঐশবাদকেও অকাতরে বিসর্জন দেওয়া উচিত আশু কল্যাণের জন্য। বিবেকানন্দ যেমন চৈতন্যদেবের ভক্তি-বাদের প্রাবল্য রোধ করতে চেয়েছিলেন খোলকরতাল ভেঙ্গে ফেলে, শ্রীচৈতন্য যেমন শঙ্কর-প্রবর্তিত মায়াবাদ ও কর্মযোগের অশুভ পরিণতির পথ বন্ধ করলেন ভক্তিবাদের আত্মসমর্পণ যোগে, তথাগত বুদ্ধও ঠিক তেমনিভাবাবেগাশ্রিত ঐশতত্ত্বের বাড়াবাড়ি, একাধিক দার্শনিক কচকচি, মীমাংসকদের সকাম যাগ-যজ্ঞানুষ্ঠান ও অথর্ব-বেদের আভিচারিক ক্রিয়া-কলাপ ইত্যাদিতে বিব্রত হয়েই সে-যুগে আর ঐশতত্ত্বের দার্শনিকতা ও ভক্তির বেনামীতে ক্লৈব্যাশ্রিত নৈষ্কর্মের প্রশ্রয় দিতে চান নি।

বেদের প্রাচীনতম যুগে যে যজ্ঞ ছিল ঈশ্বরের প্রীতিবিধানের প্রতীক—পরবর্তীকালে তাই রূপ নিল ইন্দ্রত্বপ্রাপ্তি—তৎপরে রাজ্যপ্রাপ্তি, আরও পরে সর্পকুলনিধনের আয়োজনে—জিঘাংসার নিবৃত্তিতে। তাই রাগ-যুগে শেষ পর্যন্ত মনুষ্যবলি, পশুবলিতেই পর্যবসিত

হ'ল। সেই যুগেই অথর্ব বেদের ক্রিয়াকলাপকেই বেদের সার মনে করে প্রচার করার মূলে তামসিকতার মাধ্যমে আত্মপ্রতারণার চূড়ান্ত ব্যবস্থা হ'ল। বুদ্ধ এ-কারণে বেদের কর্মকাণ্ডকেও নিন্দা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। গীতাতেও স্বয়ং ভগবান ও-সব সকাম যজ্ঞানুষ্ঠানকে মন্দের ভালই বলেছেন—আসলে অনুমোদন করেন নি। আর্য-অনার্য বিষয়ক প্রশ্ন এ-সব সংস্কারের প্রেরণা জুগিয়েছে বলে মনে করার পর্যাপ্ত কারণ নেই।

বৈচিত্র্যকে অভিনন্দিত করাই সৃষ্টির ধর্ম। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় রীতি-নীতির পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। জীবনের প্রতিটি আচরণ বেদের আক্ষরিক অনুশাসনের সঙ্গে বা বুদ্ধ-মহম্মদ-খ্রীষ্টের নির্দেশের সঙ্গে মিললো কি-না বিচার করা নির্বুদ্ধিতার সামিল। আসলে দেখতে হবে, প্রচলিত নীতিবোধ ইন্দ্রিয়ধর্মী কি আত্মধর্মী। যখনই জাতি আত্মার উপাসনা ভুলে ইন্দ্রিয়ের দাসত্বকে বরণ করে আত্মপ্রতারণার মধ্য দিয়ে, ধর্মাচরণের ভাঁড়ামিতে—তখনই শ্রীহরি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে আসেন বিভিন্ন কলেবর ধারণ করে। অপরাপর দেশের ঈশা-মুষার ন্যায়, আমাদের দেশেও শ্রীবুদ্ধই সেই যুগসন্ধিক্ষণের ধর্মের ভাঁড়ামি চুরমার করতে এসেছিলেন। আবার যুগোচিত প্রয়োজনে তাকেই স্থানীয় পরিবেশে চুরমার করলেন আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ। তথাগত বুঝেছিলেন, অধ্যাত্মদর্শনের জন্মভূমি ভারতে ঈশ্বরতত্ত্বের আর-প্রয়োজন তখনকার সাময়িক পরিস্থিতিতে না থাকাই বাঞ্ছনীয়, আছে শুধু আদর্শ জীবন-যাপন ও আত্মিক চর্যার যথাযথ প্রয়োজনীয়তা।

যুগের দিশারী মহামানবগণ (মতান্তরে অবতারবৃন্দ) যাঁরা যে-সব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন ও অনুমোদন করে গেছেন সে-সব-কিছুই বিশ্ববিধানের গূঢ় উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। কখনও কখনও ধর্মের বিকৃতি মোচন করে তাকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, আবার কখনও বা অন্তঃসারশূন্য ক্রিয়াকলাপ ও ভাবাবেগসর্বস্ব ভক্তিবাদের অবসান ঘটিয়ে জ্ঞান-সন্ন্যাসধর্মী অধ্যাত্মবোধের সৃষ্টি করেছেন বিশেষ বিশেষ নীতি স্থাপনের দ্বারা। চলমান জাগতিক জীবনযাত্রার যে বৈচিত্র্য মানুষকে স্বধর্ম ভুলিয়ে পরধর্মী করে—ঘোর বস্তুতান্ত্রিকতা, ওরফে ইন্দ্রিয়ের সিংহাসনকে কুর্নিশ জানায় ভ্রান্তিলালিত ঐশবাদের বেনামায়—কোনও যুগপুরুষই তাঁকে নির্বিকারচিত্তে সমর্থন করতে পারেন না।

সার্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পরে যুগাবতার বুদ্ধের ঐশতত্ত্বের নীরবতার সম্বন্ধে আবার নূতন করে আমাদের ভেবে দেখা দরকার। তবে বুদ্ধের ভগবান কিঞ্চিৎ অন্তরালে থাকার অবসর পেলেও সমগ্র ভারতবাসীর ভগবান, তথা সমগ্র বিশ্বের ভগবান শ্রীবুদ্ধেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। একেই বলে শুভঙ্করের ফাঁকি। এখন বুঝুন।

আশা

শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

কতটুকু সে চাওয়া আমার ?
জীবনের অন্ধকার ধ'রে
কতদিন জোনাকীর মত
জ্ব'লে ওঠা আলোর ঝলকে
পেয়েছি যে ছবি অবিরত,
কিম্বা মনে শ্রাবণের রাতে
যদি তীক্ষ্ণ বিদ্যুতের ধারে
দেখি তার হৃদয় লাবণি
অবিরাম মুক্ত জলভারে ;
যদি তারে ভালোবেসে থাকি ?

দুর্য্যোগের আচ্ছন্ন আকাশে
যদি এক মুহূর্ত্তের তীরে—
ঝোড়ো মেঘ ভরা দীর্ঘশ্বাসে
অন্তহীন হতাশার ভীড়ে
যদি এই বেদনায় নীল
হৃদয়েতে আঁকি আশা তার ;
বলো তবে জীবনের কূলে
কতটুকু সে-চাওয়া আমার ?

রাজা রাণীর যুগ

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

"অসূর্য্যম্পশ্য-লোকে"

অসূর্য্যম্পশ্যাদের কথা সেকালের কাব্য নাটকেই শোনা গেছে, লোকে পড়েছেন গল্প শুনেছেন। তাঁরা সেদিনো ছিলেন বহু জায়গায়, এখনও আছেন অনেক জায়গায়। সকলেই তাঁরা সেকেলে রাজা মহারাজা নবাব জমিদারের ঘরণী রাণী মহারাণী বেগম: পর্দ্দা যাঁদের সম্মান ও পদমর্য্যাদার বিশেষ চিহ্ন। এখনো অনেক ধনী গৃহেও আছে এ পর্দ্দা।

কাজেই রাণী বা বেগমদের দেখতে পাওয়া বা নাগাল পাওয়া সেকালেও কবিদের কল্পনাতেই রূপ বা আকার ধরত। সত্যিকার সাধারণ মানুষের চোখের আয়ত্তের বাইরেই সে জগৎ ছিল। এ যুগেও রাজা রাণীর দেশে বাস করলেও—আমাদেরও ব্যক্তিগত ভাবে সে সৌভাগ্য অনেক দিনই হয় নি।

হেনকালে সহসাই একদিন ১৯০৭ সনের ভাদ্র মাসে রাজার জন্মতিথি বা 'সালগিরা' উৎসব এসে পড়ল, আর আমরা বড় ছোট সকলে আশ্চর্য্য হয়ে শুনলাম দাদা (পিতামহ) "তাজিমী" সর্দ্দার হলেন। বাড়ীতে খুব একটা আনন্দ উৎসবের ঢেউ উঠল।

"তাজিমী" কথাটার ঠিক মানে কিন্তু আমাদের বিশেষ ভাবে জানা নেই। কথাটা মনে হয় উর্দ্দু। ক্রমে শুধু তার বিশেষত্বের ও সম্মানের কথাই শুনলাম যে, রাজা 'তাজিমী' যাঁদের দেন তাঁদের পায়ে সোনার মল বা পায়ের গহনা উপহার স্বরূপ প্রদান করে ছুঁয়ে পরতে দেন বা পরানোর আদেশ দেন। এবং ঐ সম্মানিত ব্যক্তিরা সভায় এলে স্বয়ং উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করেন। তাঁরা সকলেই 'তাজিমী' সর্দ্দার নামে অভিহিত হ'ন। এই হ'ল 'তাজিমী'র বিশেষত্ব।

এখন রাজপুত জাতের সকলেরই ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে ও সর্দ্দারদেরও গায়ে সোনা রূপা হীরামতির গহনা পরার প্রচলন আছে। উৎসবে অনুষ্ঠানে কানে হীরা মুক্তার ফুল পরেন। পাগড়িও মণি মুক্তায় ভূষিত করা হয়। এবং হাতে হীরার সোনার বালা আংটি, গলায় মুক্তার মালা সোনার হার ইত্যাদিও তাঁরা পরেন। এ ছাড়া সকলেই পায়েও মোটা রূপার মল (কড়া) পরেন। শুধু 'তাজিমী' পেলেই পায়ে সোনা পরার অধিকার জন্মাত। সাধারণ শ্রেণীর রাজপুত ব্রাহ্মণ বৈশ্যাদি অন্য জাতেরাও হাতে পায়ে সোনা রূপার গহনা পরেন কিছু না কিছু। সে সব গহনা মেয়েদের গহনার মত সূক্ষ্ম কারুকার্য্যময় নয়, বহু সংখ্যায়ও পরা হয় না। তবে ওজনে অবশ্য কম ভারি নয়। কিন্তু সকলেই প্রায় পরেন, পরতেনও সে সময়ে।

এখন রাজ-সম্মানিত 'তাজিমী' সর্দ্দাররা স্বদেশীয় প্রথায় হাতে পায়ে কানে গলায় মাথায় নানা রকম গহনা অলঙ্কার ধারণ করলেও বাঙালী সর্দ্দাররা যত সম্মানেরই হোক, কোনো চাপকান পাগড়ি গোঁপ দাড়ীর সঙ্গে পায়ে জুতা মোজার উপর মল পাঁইজোড় পরাটা ঠিক গলাধঃকরণ বা বরদাস্ত করতে পারলেন না বোধ হয়। নিশ্চয় মনে মনে কৌতুকও বোধ করেছিলেন এবং কিছু বিব্রতও হয়েছিলেন। আপত্তি করেছিলেন কি না অবশ্য জানি না। আমরাও সহসা শুনলাম যদি দাদাই 'তাজিমী' পেলেন কিন্তু মল তো পরবেন না! কাজেই পিতামহীকে সেই সোনার মল পাঁইজোড় দেওয়া হবে। রাধাষ্টমী (জয়পুরের রাজবংশে রাধাগোবিন্দজীর ভক্ত ও সেবাইত বা 'সওয়াই' নামে প্রখ্যাত, যেমন উদয়পুরের মহারাণা একলিঙ্গজীর দেওয়ান) উপলক্ষে বা তখনকার মহারাজা তাঁর ইষ্টদেবী শ্রীরাধা "লাডলী"জী বা আদরিণী শ্রীরাধিকাজীর ভক্ত ছিলেন তাই শ্রীরাধার জন্মতিথিতে রাজার বিশেষ সম্মান দেওয়ার একটি প্রথা ছিল। এবারেও কয়েকজনকে 'তাজিমী' ও অন্যান্য খেতাব বা সম্মান দেবেন শোনা গেল। সেই সঙ্গে আমাদের পিতামহীও 'পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য' ফল 'তাজিমী' প্রসাদ সোনার মলটা লাভ করবেন। এও শোনা গেল রাজা তাঁকে দেখলে দাঁড়িয়ে বা অর্দ্ধ-উত্থিত ভাবে সম্মান জানাবেন অন্য 'তাজিমী'দের মত।

রাত্রিবেলা সেই রাধাষ্টমীর উৎসব। শোনা গেল গভীররাত্রে খানকয়েক রথ আসবে আমন্ত্রিতা পুরবাসিনী-দের নিতে। পুরানো ঐতিহাসিক কালের মতই চোপদার, মশালচি, দরোয়ান আদি নিয়ে।

এই প্রথম রাজান্তঃপুরে নিমন্ত্রণ। তার আগে লোক-

বসবাসহীন অম্বর প্রাসাদ কেল্লাদুর্গ আদি আমাদের দেখা ছিল বটে। কিন্তু প্রাসাদের ভিতর দেখি নি কখনো। অন্তঃপুরের অসূর্য্যম্পশ্যা নারীদের রাণীদের নানা মহল, চন্দ্র মহল হাওয়া মহল, নানা 'রাওলা' আবাস অট্টালিকা শুধু বাইরে থেকেই দেখা হয়েছে। কোন্‌খান দিয়ে কোন্ পথ দিয়ে কোন ব্যূহ ভেদ করে তার আনাগোনা চলে—অন্তঃপুরের সীমানা রেখাই বা কোথায়—কোন্ মহল কোথায় কিছুই কেউই কখনো দেখি নি।

২

মহা উৎসাহ ও বিষম কৌতূহল বাড়ীর সকলের মনে। কে কে যাবে কতজন যাবে? কি পরবে তারা? রাজ-প্রাসাদে যাবার মত গহনা কাপড় কার কি আছে? মেয়েদের সেই ভাবনাই মন জুড়ে বসল অনেকটা।

এই দেখায় এবারে নিতান্তই ব্যক্তিগত পারিবারিক ঘটনাই বলি। কেননা তা ছাড়া তো উপায় নেই।

দাদা ও পিতামহ ছিলেন অত্যন্ত নির্লিপ্ত শান্ত প্রকৃতির মানুষ। বাড়ীতে কর্তৃত্বের ধারে-কাছেও তাঁকে পাওয়া যেত না। নিয়মমত রাজকার্য্য বা প্রধানমন্ত্রিত্বটি করেই খালাস ছিলেন। বাড়ীর যাবতীয় বিষয়ের কর্ত্তা ও সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন তাঁর ভাই নঠাকুর্দ্দা ও তাঁর জ্যেষ্ঠ-পুত্র—আমার পিতা।

ক'জন বা কারা কারা নিমন্ত্রণে যাবে তার হিসাব-নিকাশ করতে বসলেন তাঁরাই।

বিশাল একান্নবর্ত্তী পরিবার। নানা সম্পর্কের স্বজন আত্মীয় জামাতা কন্যা কুটুম্ব ভরা বাড়ী। মেয়েদের সকলেরই কৌতূহল যত, দুরাশাময় উৎকণ্ঠাও তত, কে কে যেতে পাবে? কতজনকে রথে ধরবে।

এখন রথগুলি আকার-প্রকারের কথা বলি। রথগুলি দেখতে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের ছবির রথের মতই একেবারে। মন্দিরের মত গোল চুড়ো দেওয়া আকার, সরু বাঁশ ও বাঁকারির তৈরী তার দেহখানি, লাল রঙের ঘেরাটোপ ঢাকা সর্ব্বাঙ্গ, আর একেবারেই অসূর্য্যম্পশ্য তার অন্তরভাগ, মশা-মাছিও ঢুকতে পারে না। তবে দু'খানি বা চারখানি করতল আকারের পেতলের চাকতি বসানো জানলা থাকত তাতে চালুনির মত ছোট ছোট ফুটো করা। অসূর্য্যম্পশ্যারা সেই বাতায়ন ছিদ্রপথে হাঁকা বায়ু সেবন (?) এবং নগর, প্রান্তর, পথও পথিকদের দর্শন করতে চেষ্টা করতেন। ভিতরের আসনে সম্পন্ন ঘরের রথে বেশ গদীপাতা থাকত যাতে আরামে বসা বা একটু শোওয়া যায়। জন তিন-চার আরামেই বসতে পারত। তবে মেলা উৎসবের দিনে ঠেসেঠুসে ৮।৯ জনও বসতে দেখেছি পা বার করে দিয়ে বা কুঁকড়ে-সুঁকড়ে। বেশ ঝাঁকানি লাগত 'বেহারে বিঘোরে চড়িনু একা'র মতই। কেননা স্প্রিং তো রথের ছিল না মোটা চারখানি চাকার ওপর রথখানি বসানো। সে রথযাত্রা জগন্নাথের রথ-যাত্রার মতই সময়সাপেক্ষ পথের সমতলতা, বন্ধুরতা ও দূরত্ব হিসাবে। এবং এই ঘেরাটোপ ঢাকা রথের মধ্যে কি যে অসম্ভব গরম লাগত সে কল্পনাতীত। বৈশাখ থেকে আশ্বিন অবধি ও দেশে গরম বেশ থাকে তার মধ্যে চার মাস খুব গরম।

মাইল চার-পাঁচ যেতে হলে ঘণ্টা দুই লেগে যেত কেননা এ রথ ঘোড়ায় টানা নয় বলীবর্দ্দ বাহিত সুতরাং চলিত বাংলায় বলা যায় পৌঁছবার প্রাক্কালে "গতর" বা "গাত্র চূর্ণ" প্রায় হয়ে যেত। অনভ্যস্তদের নিয়ে কঙ্কাবতীর ভূতের মত গা হাত পা ঠিক আছে কিনা দেখতে হ'ত এমনি ঝাঁকানি লাগত ও টাটিয়ে উঠত। পাহাড় পথে, উঁচু-নিচু এবড়ো-খেবড়ো পথে এই রথ আর হাতি ঘোড়া উটই সুবিধাজনক বাহন ছিল। তা মেয়েরা তো সাধারণতঃ হাতি, ঘোড়া, উট-বাহিনী হতে পারতেন না, রথই তাঁদের সেজন্য সব সময়ে প্রশস্ত বাহন ছিল। যার আনুষঙ্গিক নিশ্চিত পাওনা ছিল ঝাঁকানি ও গরম। গরমের সময়ে হাতে পাখা আর বসার গদীতে তার কিঞ্চিৎ প্রতিকার হ'ত।

মোটামুটি এই রথ বর্ণনা থেকে বোঝা যাবে এক একখানি রথে মানুষ মন্দ ধরত না। এবং তার আরাম ও অসুবিধা আমরা আশান্বিত নানা রকম কল্পনা করছি।

বড়দেরও যাবার পরামর্শ সভা বসল। কে কে যাবেন। ঠিক হ'ল পিতামহী তো আসল, কাজেই তিনি ছাড়া বাড়ীর লোক আর জন চার-পাঁচ যেতে পারেন। এবং বিশেষ সম্মানিতের কায়দা মাফিক জনচারেক ঝি বা দাসী।

এই ভাবে ভেবেচিন্তে অনেক ছাঁটাই ও বাছাইয়ের পর চার জনের যাবার ব্যবস্থা হ'ল। ঠিক হ'ল খুড়িমা বিদেশে চলে যাবেন কাকার কর্মক্ষেত্রে শীঘ্রই, তাই তিনি যাবেন এবং একজন পুত্রবধূও বটে। আমার দিদিও শ্বশুর বাড়ী চলে যাবেন ঠাকুরমার আদরের প্রথম পৌত্রীও সুতরাং তিনিও নির্ব্বাচিত হলেন। কনিষ্ঠা পিসি—সব চেয়ে ছোট মেয়ে পিতামহীর আর বাবার আদরের ছোট বোনও বটে সে যাবে। আর যাবেন ঠাকুর্দ্দার খুল্লতাত ভাইয়ের স্ত্রী আমাদের আর এক ঠাকুমা।

নানা সম্পর্কের এক-বাড়ী কন্যা বধূরা প্রথম রাজান্তঃপুর ও রাণীদের দেখার মহাকৌতূহলটা নীরবে গলাধঃকরণ করলাম।

মনে ভাবি তবে তিন-চারখানা রথে যাবেন মোটে পাঁচজন? আর ঐ চারটা পরিচারিকা বা ঝি মান-মর্য্যাদা পদ-সম্মানের জন্য?

৩

এবারে সমস্যা এলো সাজ-পোষাকের। মন্ত্রীর বাড়ী এবং মন্ত্রী-পত্নী হলে কি হয়—সেই সেকালে ঠাকুমাদের আমলে সাধারণতঃ দু'একখানা করেই বিয়ের সময়ের বেনারসী বালুচরী শাড়ী কিম্বা চেলির কাপড় থাকত। সেই একখানি বা দু'খানি শাড়ী বিবাহের পর থেকে যাবৎকাল ধরে বৃহৎ পরিবারে যাবতীয় উৎসবে—অন্নপ্রাশন-বিয়ে-পৈতে-ঠাকুরবরণ-বর-কনে বরণের সময় বাক্স থেকে বেরুতো। তাঁরাও নির্লজ্জের মত অর্থাৎ সরল নিরহঙ্কার মনে সেই চির-পুরাতন দশহাতি (এখারো বারোহাত শাড়ী বা বড় লম্বা শাড়ী মারাঠি মেয়েরাই পরতেন সেকালে) লাল বা বেগুনী রঙে জরীর ফুল ও ফুল বসানো ও লতা পাতা খচিত বেণারসী শাড়ীখানি পরে উৎসব ক্ষেত্রে নেবে পড়তেন। সেই বিয়ের কনের শাড়ীখানি কালক্রমে তাঁদের বহু মাতৃত্বে অথবা বয়সোচিত পরিণত শরীরে বেশ সঙ্কুলানও হ'ত না। তা হলেও তাঁদের সেই একখানি শাড়ীই নানা উৎসবে পরাতে কোনো সঙ্কোচই ছিল না। একালের মত নানা নামের নানা রঙের বেণারসী এবং গরদ তসর রেশমী ও সিল্কের শাড়ী সেকালে ছিলও না। গরদ তসর থাকলেও তাঁরা চোখেও দেখেন নি। সুতরাং সকলেরই সেই সব বিয়ের শাড়ীই বেরুলো সিন্দুক থেকে। তার লালে নীলে বেগুনী রঙে সতরঞ্চি পাতা ঘর জম জম করতে লাগল। তখনকার কালে জামার ব্যবহার কম ছিল, কিন্তু শাড়ীর সঙ্গে বেণারসী ওড়না থাকত শাড়ীর ওপর গায়ে দেওয়া হ'ত!

কিন্তু জামা? গৃহিণীদের জামা তো নেই! সেকালে পিতামহীদের সময়ে জামা সেমিজ সায়া নিয়ম মত পরার অভ্যাস বা প্রথা ছিল না। এক বস্ত্রেই তাঁদের পশ্চিমী শীত ও লজ্জা নিবারণ এবং পৃথিবী ভ্রমণ (!) অনায়াসেই হয়ে যেত। কিন্তু, রাজপুতের দেশে নানাবিধ জামা ও ওড়নার ব্যবহার হয়। শীতে গরমে সব সময়েই এক বস্ত্র বলে কোনো জিনিস ওদেশে নেই। ঘাঘরা লুগড়ী (ওড়না) কাঁচুলী ও জামা এ তাদের দেশে নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তু।

সেকালে ওখানে একটু সম্পন্ন ঘরে প্রতিদিন দর্জ্জি বসত। এদের বাড়ীতেও একটা দর্জ্জি ছিল। সে দর্জ্জি কর্ত্তাদের গায়ের কোন চাপকান পাজামা পাতলুন বালক-বালিকাদের জামা থেকে নিয়ে 'কঙ্কাবতী'র গল্পের খলিফার মত পর্দ্দা মাজিম লেপ তোষক বালিস তাকিয়ার খোলও সেলাই করত। অত বড় পরিবারের জামা পোষাক পরিচ্ছদ বিছানা নানাবিধ রিপু মেরামতী কিছু না কিছু নিয়ে তার নিত্যকার কাজ। তৎক্ষণাৎ বাজার থেকে একটা গোলাপী রঙে না ফিকে লালের সিল্কের একটি টুকরা কিনে এলো। এখন মাপ? পর্দ্দানসীনের মাপ নেবে কে? একটা আন্দাজী মাপ দেওয়া হ'ল বাইরে। তাঁরা তো একালের মত বেরুতেন না সকলের সামনে। রাজবাড়ী যাওয়ার সময়টি প্রায় অর্দ্ধরাত্রে। শ্রীরাধার জন্মলগ্নের কাছাকাছি সময়ে—রাত ১২টা। আর কি? তৎক্ষণে সন্ধ্যা নাগাদ সেকালের ফ্যাসান মত হাতে গলায় চওড়া লেসের ঝালর ও রাজস্থানী মতে জরী দেওয়া তখনকার আধুনিক একটি জামা তৈরী হয়ে এলো। এখন দরকার একটি সেমিজ বা সায়া। সে-কালের আধুনিকা তাঁর কন্যা বধূদের ও নাতনীদের কল্যাণে তার আর অভাব হ'ল না।

তার পর এলো গহনার ভাবনা। সেকালে গহনা মেয়েদের নানা রকম থাকত সবাই জানেন। এবং সে গহনা বেশ ওজনদার হ'ত তাও সবাই জানেন। বাহার বা সূক্ষ্মতার চেয়ে ওজনের দর তখন বেশী। বেশ দশ পনের পঁচিশ চল্লিশ ভরি ওজনের সে সব অলঙ্কার হ'ত।

বাড়ীতে প্রত্যেকের পৃথক পৃথক বাক্সতে বা সিন্দুকে সকলের আলাদা করে গহনা রাখার রেওয়াজ সেকালে ছিল না। সুতরাং একটি লোহার সিন্দুক খুললেই ছোট বড় নানা আকার নানা ওজন ও নানা গড়নের অলঙ্কার বেরিয়ে পড়ল।

মাথার ঝাপটা, মুকুট, ফুল চিরুণী, গলার সাতলহরী বা সাতনরী জড়োয়া কণ্ঠশ্রী, সরস্বতী হার, চিক, চেন, বিছে হার, গোটহার, নানা নামের হার, হাতের বাজু-জশম, তাবিজ, বাঁক, অনন্ত আদি তারপর কঙ্কন, চুড়, চুড়ী, বালা, রতনচুড়, কোমরের চন্দ্র-সূর্য্য হার গোট, কত কি বেরুলো। আর বেরুলো পায়ের মল পাঁইজোর রূপার। এদেশী ও দেশী নানা কর্ণ-ভূষণ ও আংটীও বেরুলো। নাকের কানের গহনা। আবার সৌভাগ্যবতীদের জন্য পরিধেয়। ও-দেশী গহনাও বেরুলো।

বাছা হ'ল গহনা। কে কি পরবেন। ছোট মেয়েরা

মুকুট ও অন্ত গহনা পরল। বড়রা মুকুট বাদে যেখানে যত গহনা ধরে সব পরতে লাগলেন।

আমরা অবাক বিস্ময়ে প্রৌঢ়া পিতামহীর—যাঁকে জীবনে কখনও লেশ দেওয়া জামা আর অত গহনা পরতে দেখিনি—সাজসজ্জা দেখতে লাগলাম এমন কি পায়েও মল-পাঁইজোর পরতে হ'ল। সেদেশের আচার অনুযায়ী।

৪

আহারাদি সেরে রাত্রি প্রায় দশটা অবধি সাজসজ্জার সমারোহ চলতে লাগল। এমন সময়ে শোনা গেল বাইরে চার-পাঁচখানি রথও এসে পড়েছে। তার প্রত্যেকটির পাশে পাশে যাবে লাল পোষাক পরা আসা-সোঁটা হাতে চোপদার, সেপাই, মশালচি, দৌবারিক বা দরোয়ান। তারা অনেকগুলি এসেছে। ভেঁপু বাজাতে বাজাতে যাবে নকীবও ছিল মনে হয়। খিড়কি দরজার কাছে রথগুলি এসে দাঁড়াল।

রাত্রি প্রায় ১১টার সময় প্রাসাদযাত্রিনীরা রথে আরোহণ করবার জন্য প্রস্তুত হলেন। মাথায় দীর্ঘ অবগুণ্ঠন দিলেন গৃহিণী ও বধূরা। মেয়েরা নয়।

ওখানকার মতই কঠোরভাবে রাজস্থানী পর্দা মানা হ'ত। বিয়ে হলেই পর্দা। প্রৌঢ়া গৃহিণী থেকে বালিকা অবধি সকলেরই সমান পর্দার আভিজাত্য মানতে হ'ত।

মহা সমারোহে খিড়কি দরজার চারদিক কানাত দিয়ে ঘেরা হ'ল। বাঁশের খুঁটি মাঝে মাঝে দিয়ে সেলাই করা মোটা রঙীন কাপড়ে তৈরী একটি বস্তু তাকেই 'কানাত' বলে। চিকের মত গুটিয়ে রাখা যায়। দাঁড় করিয়ে খুলে ঘিরে দিলেই পর্দা ঘেরা হয়ে যায়। সেই কানাত ঘেরার মাঝখানে রথ চারটি ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়াল।

নকীব চোপদার সেপাই শাস্ত্রী সবাই বাইরে চলে গেল। মশালচীও বাইরে গেল। দু' একটি হেরিকেন লণ্ঠন নিয়ে ঝিয়েরা দাঁড়াল। প্রাসাদ অভিযাত্রিণীরা এক একজন করে রথে আরোহণ করলেন। আগেই বলেছি রথ বেশ বড় হ'ত। যাই হোক, দু'জন তিনজন হিসাবেই বোধ হয় বসলেন। একটাতে দাসীরা বসল। সকলের হাতে পাখা। জলের কুঁজোও একটা দুটা সঙ্গে রইল, রথের বন্ধ গরম অসম্ভব আগেই বলেছি।

দেওয়াল ঘেরা জয়পুর শহরের সীমানার বাইরে আমাদের বাড়ীখানা ছিল। সেখান থেকে প্রাসাদ প্রায় দেড় ক্রোশ দু' ক্রোশ, হয়ত আরো বেশী ছিল মনে নেই। শহরের সাতটা গেট। পূর্ব্বে সূরযপোল, পশ্চিমে চাঁদ-পোল, আজমেরী গেট (আজমীর যাবার পথ অভিমুখে) সাঙ্গানেরী গেট 'সাঙ্গানে'র যাবার অভিমুখী, ঘাট দরওয়াজা গেট, গণগৌরী গেট, যেখান থেকে গণগৌরী মেলার শোভাযাত্রা বেরোয় এবং আমেরী (অম্বরের) গেট। এই সাতটি তোরণদ্বার শহরের প্রাচীরের ঘেরার ভিতর যাওয়া ও আসার পথ। প্রধানপথ অবশ্য এর চারটি-পাঁচটি। এইগুলিতে প্রকাণ্ড করে লোহার দরজা ছিল। তখনকার দিনে ঐ দরজাগুলি রাত্রি ৯টার সময় একসঙ্গে বন্ধ হয়ে যেত—নাহারগড় কেল্লা থেকে একটা তোপ পড়লে। শুধু বড় লোহার দরজার গায়ে ছোট্ট একটি এক মানুষ যাবার পথ খোলা থাকত। সেটা খোলা থাকত রাত্রি ১১টা অবধি। তার পর সেও ১১টা রাত্রিতে একটা তোপের শব্দের সঙ্গে বন্ধ হয়ে যেত। এবং সারা রাত্রির মত শহরের মানুষ আর বাইরের লোকে কোনও সংযোগ থাকতে পেত না। সেকালে শত্রুর ভয় ছিল। অতর্কিতে আক্রমণের ভয়। সেই ব্যবস্থাই এই সেদিন অবধি ছিল।

আর ঐ ১১টায় রাত্রির তোপের সঙ্গে শহরের ও বাইরের যত পথের আলো গ্যাসের আলোগুলি একসঙ্গে নিবে যেত। সঙ্গে সঙ্গে শহরের দোকানপাটও বন্ধ হয়ে যেত। গৃহস্থবাড়ীও অন্ধকার হয়ে আসত। সমস্ত শহরই যেন একটি রূপকথার রাজ্যের ঘুমের দেশের অন্ধকার নিঃশব্দ নিরালোক পুরীতে পরিণত হয়ে যেত। অবশ্য নৈশ বিলাসী ও তাঁদের প্রমোদ-ভবনের কথা ঠিক জানি না। এ ছাড়া রাত্রে যাঁদের ভিতরে যাবার বা বাইরে আসার প্রয়োজন হ'ত তাঁরা অনুমতি নিয়ে রাখতেন, বা পাশ নিয়ে রাখতেন—একটা পিতলের 'চাকতি' অনুমতিপত্র। এবার নকীবের বাঁকানো বাঁশী বা ভেঁপু বেজে উঠল। কানাত খোলা হ'ল। অতঃপর লাল রঙের ঘেরাটোপ ঢাকা রথ চারখানি ঘোর লাল লাল চাপকান-আচকান-পরা মশালচী নকীব সেপাই চৌকিদার চোপদার শাস্ত্রী নিয়ে রাত্রির কালো আকাশের নিচে অন্ধকার নিঃশব্দ রূপকথার রাজ্যের মতই রাজপথে মশালের আলো জেলে বেরিয়ে গেল। শহরের আজমেরি গেটের দ্বারীদের কাছে 'পাশ' দেখানো হলে তবে লোহার সিংহদ্বার খুলবে। কার বাড়ীর 'সওয়ারী' কি প্রয়োজন শহরে, আজ বিশ্বাসযোগ্য জবাব তারা নেবে এই প্রথা। সকলের কাছেই নেবে। তবে নিশ্চয়ই এই-রকম রথ ও 'সওয়ারী' বা যাত্রীদের কথা তাদের আগে-ভাগেই জানা থাকত। শহরের সামনে পাহাড়ের ওপর অম্বরদুর্গ সেকালের রাজধানী। তিনদিক পাহাড়ে অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে ঘেরা অন্তদিকে সমতল। পাহাড়ে পাহাড়ে

নানা দুর্গ বা কেল্লা গণেশগড় নাহারগড় ইত্যাদি।

এর পরের কথা আর নিজে দেখা-কথা নয়—শোনা-কথা। পরদিন সকালবেলা বাড়ীর দুয়ারে আমের পল্লব টাঙানো হ'ল। মঙ্গলঘট পাতা হ'ল উৎসব বাড়ীর মত।

প্রায় ১১টার সময় সারা রাত্রির উৎসবে বিনিদ্র বসে-থাকা ক্লান্ত মুখচোখ নিয়ে প্রাসাদ-যাত্রিণীরা ফিরে এলেন। গৃহিণীর বা পিতামহীর পায়ে সোনার মল আর পাইজোড় ভূষিত হয়েছে দেখলাম। কথার জবাব দিয়ে বাড়ীশুদ্ধ লোকের কৌতূহল মেটাবার মত অবস্থা তখন তাঁদের নয়। তখন যেন স্নানাহার করতে পেলে তাঁরা বাঁচেন।

সারারাত্রি কি উৎসব হ'ল, কত লোক গিয়েছিল, রাজান্তঃপুর কেমন সাজানো রাণী-মহারাণীরা কেমন দেখতে? রূপকথার মেঘবরণ চুল কুঁচবরণ কন্যাদের মত কি? রাজার মল পরানোর ব্যাপারটাই বা কি! সকলেরই আর কৌতূহল এবং প্রশ্নের শেষ নেই!

সারারাত্রি ঠায় বসে থেকে সখিদের নৃত্য-গীত শ্রবণ ও দর্শনের ক্লান্তি তো বড় কম নয়। তবু তারই ফাঁকে দিদি, খুড়িমা আর খুল্লপিতামহীর কাছে কিছু কিছু বর্ণনা শুনলাম। সে বর্ণনা খাপছাড়া এবং মোটেই রাজা-রাণীদের রূপকথার মত মন ভোলানো বা ভরানো নয়। রাজার বাড়ী সাতমহলা পুরী কিনা, নানা ঐশ্বর্য্যময়, নানা উপকরণ দিয়ে সাজানো কিনা কেউই জানেন না। কারণ অন্তঃপুর প্রবেশের পথও যেমন কানাত ঘেরা অজানা জায়গা ভিতরে আসার পথও। তার পর উৎসব ক্ষেত্রও তেমনি। আলিবাবার গল্পের চোখ বেঁধে পথ চলার মত অচেনা অদ্ভুত অলিগলি সুড়ঙ্গ পথের মাঝ দিয়ে পথ। সে পথের গাইড বা পথনির্দ্দেশক ছিলেন রাজপুরীর খোজার দল। অন্তঃপুর ও বাইরের সেতু তারাই। আর জনমনুষ্য কেউ নয়। তার পর এক জায়গাতেই বসে থাকা এবং রাণী-মহারাণীদের দেখা। না, কেবলমাত্র মহারাণী 'যাদুন'জীকেই সবাই দেখেছেন। আর সব রাণীই আবক্ষ অবগুণ্ঠনবতী ছিলেন, তাই থাকা নিয়ম।

রাজোয়াড়ার রাণী-মহারাণীরা তাঁদের পিতৃকুলের কিংবা পিতৃদেশের নামেই অভিহিত হন। বেশীর ভাগ প্রায় সকলেই পিতৃবংশের নামে পরিচিত। যেমন মহা-রাণী 'যাদবনজী' 'যাদব' বংশের কন্যা। মেজো রাণীকে বলা হ'ত 'ঝালিজী'। ঝালোয়ার বংশের মেয়ে। অন্য আর তিন রাণীও পিতৃকুলের নামে অভিহিত হতেন যেমন তোমর বংশের মেয়ে মহারাণী বা রাণী 'তোমরজী'। 'চন্দাবৎজী' রাণা চন্ডের বংশের কন্যা ছিলেন। কিষণগড় বা 'রূপনগর' কন্যাও ছিলেন দু'জন। অনেকটা যেমন কৌশল্যা, কৈকেয়ী, গান্ধারী, মাদ্রী আদি দেশের নামে আখ্যাত ছিলেন।

সেদিন তো রাধাষ্টমীর উৎসবের শোনা বিবরণে কল্পনা ও মন ভরানো হ'ল সকলের। সে ব্যাপারটি মোটামুটি এই শুনলাম:

'লাড়লীজী' বা শ্রীরাধার জন্মোৎসব করা হ'ল ব্রজ-বাসীদের একটি শিশু মেয়েকে হলুদ রঙের জরী-জড়োয়া-খচিত 'আঙরাখা' (জামা) ঘাগরা ওড়না ও গহনাদি পরিয়ে 'লাড়লীজী' রূপে জন্ম কল্পনা ও অভিষেক এবং পূজা করে একটি রূপার দোলনায় শুইয়ে দেওয়া হ'ল। এই হ'ল মোটামুটি রাধাজন্মোৎসবের তিথি পালন। সভার কাজ তার পরে আরম্ভ হ'ল একটি প্রকাণ্ড উঠানে ও দালানে। দালানের শিরোভাগে দেওয়াল ঘেঁসে বা কোন বিশিষ্ট মাঝখানে বসলেন রাজা ও মহারাণী। নাঃ, সিংহাসন আসন গালিচা মসনদ কিছুই নয়। শুধু দুটি গোল তাকিয়া আর পাতলা সাদা গদী—এই হ'ল সেদিনের রাজাসন।

আঙিনা জোড়া মস্ত জাজিমে চাদর ঢেকে ফরাস বিছানা পাতার ওপরই একদিকে প্রান্তভাগে রাজা ও রাণীর আসন। সকলের দিকে মুখ করে বসেছেন।

তার দু'পাশে রাজার বামে দক্ষিণে সারি সারি বসেন ডান দিকে অন্য রাণীরা এবং প্রধান প্রধান অন্তঃপুরিকা অর্থাৎ রাজার প্রিয় পাত্রীদল। রাণীরা ছাড়া এই অন্তঃ-পুরিকাদেরও বিশেষ পদমর্য্যাদা খেতাব দেওয়া হ'ত রাজার প্রীতিপাত্রিত্ব ও অভিপ্রায় অনুসারে।

এঁদের খেতাব ও মর্য্যাদা রাণীদের পরেই। এঁরা আসলে সখিদেরই দলের বিশেষ বিশেষ নারী। রাজার বিশেষ অনুগ্রহের ও সুনজরের ফলেই বিশিষ্টতমা হয়ে ওঠেন। পরে খেতাব ও জায়গীর দিয়ে তাঁদের 'রাওলা' বা মহল দেওয়া হয়। প্রায় কনিষ্ঠা রাণীদের সম্মানের মতই সম্মানিতাও হ'ন। কিন্তু মর্য্যাদা কখনই বিবাহিতা রাণীদের মত নয়।

এঁদের কারো কারো খেতাব ছিল লছমী রায়, বসন্ত রায়, রূপ রায় ইত্যাদি। 'রাণী' বলা হ'ত না। (রাজা-বাহাদুর না হয়ে যেমন রায় বাহাদুর খেতাব।) এই খেতাবেই তাঁরা পরিচিত হতেন, জায়গীরও পেতেন নিকর। 'তাজিমা'ও পেতেন—সোনা পায়ে পরার

অধিকার। এঁদের সংজ্ঞা ছিল দু'রকমের—'পাপোয়ান' ও পর্দায়েত। পাপোয়ানদের পদ হ'ল প্রথম শ্রেণীর প্রিয়পাত্রী, পর্দায়েতরা ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রিয়। এই সারির মুখে রাজার বাঁদিকে বসতেন এই পাপোয়ান ও পর্দায়েতদের ছেলেরা মেয়েরা। লালজী সাহেব ও 'বাইজী লালের' দল। এঁরা রাজপুত্র ও রাজকন্যা হলেও বাঁদী-সন্তান। বিবাহিত রাণীর সন্তান ন'ন, তাই রাজকুমার বা রাজকুমারী বলা হ'ত না। 'লাল' সংজ্ঞাটি হ'ল আদরের ডাক। এ রাজার রাণীদের গর্ভের কোন সন্তান ছিল না।

এই অসূর্য্যম্পশ্য অন্তঃপুরে উৎসব জলসার দিনে এই সব যুবক লালজী সাহেবরা প্রবেশ করতে পেতেন। ঐ অসংখ্য সখি-পাত্রী পর্দায়েত ও আমন্ত্রিতা মেয়েদের মধ্যে তাঁদের আসা এই সব দিনে নিষিদ্ধ ছিল না। অবশ্য মহারাণী মাজুনজী ছাড়া নারীদের সকলেরই মুখ একেবারে ঘোমটায় ঢাকা।

এখন আমন্ত্রিতাদের সভা প্রবেশের কথা বলি।

এই আসরে অথবা সভায় প্রবেশের পর প্রথা হচ্ছে পদসম্মান অনুসারে অপেক্ষা করে রাজা ও রাণীর কাছে কুর্ণিশ করতে করতে অগ্রসর হয়ে যাওয়া—(নীচু হয়ে এগিয়ে এগিয়ে তিনবার সেলাম করা হ'ল কুর্ণিশ করা)। তার পর হাতে একটি পরিষ্কার রুমালে নিজেদের পদানুযায়ী দেয় 'নজরে'র টাকা বা মুদ্রাকটি রেখে নীচু হয়ে দাঁড়াবেন। রাজা ও রাণী সেটা তুলে নেবেন, পাশের খোজাকে দেবেন, সেটি একটি রূপার থালায় জমা করবে এবং সেই সময়ে প্রধান খোজাই রাজার কাছে পরিচয় দেবে যারা নজর করল তাদের। ইনি অমুক শেঠানীজী —বা অমুক 'ঠাকুরাণী' (জমিদার ঘরণী) কিংবা অমুক বাবুজীর বাড়ীর মহিলা ইত্যাদি।

তার পর আবার তাঁরা পিছু হটে ফিরে আসবেন। এসে নিজেদের নির্দ্দিষ্ট জায়গায় বসবেন। পিতামহী ভারীসারি মানুষ ছিলেন। তাঁকে ক'দিন ধরে ঐ নজর সেলাম কুর্নিশ করা দেখানো ও শেখানো হ'ল। আর সকলেও শিখলেন।

এই সমস্ত নজর ভেট কিন্তু যারা রাজার কর্ম্মচারীর স্ত্রী তাদের কাছেই নেওয়া হ'ত। কন্যা ভগিনী বা ঐ ধরনের আর কারুর কাছে নেওয়ার নিয়ম ছিল না। রাজস্থানে কিছু বহিন বেটীর কাছে নেওয়া হয় না। জামাতা কুটুম কুটুম্বিনীর কাছেও কিছু নেওয়ার প্রথা নেই। এক কথায় কন্যা-ভগিনী শ্রেণীর ভাগিনেয়ী বোনঝি কারুর কাছে নজর নেওয়া হ'ত না। শুধু ছুঁয়ে দিয়ে 'নজর' মুদ্রাগুলি ফিরিয়ে দেওয়া হ'ত। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক দেবার।

এই 'নজরে'র পর এলো—'তাজিমী' ও খেতাব বিতরণের পালা। এক বাক্স ভরা সোনার পায়ের অলঙ্কার ভূষণ এলো প্রথম খোজা নিয়ে এলো। সেদিন খেতাব পেলেন অনেকেই—যাঁরা পর্দায়েত থেকে পাপোয়ান হলেন। এঁদের সম্মান ও খেতাব হ'ল 'রায়' খেতাব পেলেন যাঁরা অনেকেই পূর্ব্ব-ইতিহাসে বাইজী ও সখি ছিলেন।

অনেকে 'তাজিমী' পেলেন। প্রধান খোজাও পেলেন 'তাজিমী'—পায়ের স্বর্ণ ভূষণ। আগের কোনো জন্মতিথিতে পেয়েছিলেন "খুপনজর" খেতাব।

অতঃপর সেই এক বাক্স সোনার পদভূষণ মল মঞ্জীর পাইজোর থেকে যাদের যাদের দেওয়া হবে তাদের কাছে এসে মহারাজা সেগুলি ছুঁয়ে খোজার হাতে দিয়ে পরিয়ে দিতে বললেন। প্রধানা দাসীরা সেগুলি পরিয়ে দিল।

মোটামুটি এই হ'ল 'তাজিমী'র সম্মান পাওয়ার কাহিনী। এবং এর একটি কৌতুকময় দিকটা হ'ল যা নিমন্ত্রণটা মোটেই নিমন্ত্রণ খাওয়া নয়। রাত্রি ১২টা থেকে সকাল প্রায় ১২টা অবধি অনাহার অনিদ্রায় বিশুদ্ধ আমন্ত্রণ উৎসব। রাজভোগ্য রাজভোগ আহার্য্যের এক কণিকাও রাজপ্রাসাদের কেউ কখনো দেখেনি এই সব উৎসব জলসায়। এক কথায় নিমন্ত্রিতদের বাড়ী থেকে খেয়ে যেতে হ'ত, খাওয়া-দাওয়া মোটেই জুটত না সেখানে। এবং ঐ সারা রাত্রির উৎসবে রাজা-রাণীদের কখনো আহারাদি করতে দেখিনি। কিন্তু পানীয় থাকত একটা। অবশ্য সে পানীয়ও রাজপরিবারের জন্য। সে পানীয়টি ছিল মদিরা। একখানি রূপার থালায় কয়েকটি ছোট ছোট ওষুধ খাবার মত কাঁচের গ্লাস ও এক বোতল বিশিষ্ট মদিরা থাকত রাজা ও রাণীর আসনের সম্মুখে।

আনুষ্ঠানিক 'লাড়লীজী' জন্মোৎসব এবং তাজিমী দেওয়ার পর আরম্ভ হ'ত সখিদের দলের নৃত্য ও গান।

এক এক রাণীর তো সখির দল কম নয়—তিন-চার শো করে তো বটেই। তারা কিছু রাণীদের পিতৃরাজ্য থেকে বিয়ের সময়ে পাওয়া, কিছু স্বামীর ঘরে এসে পাওয়া—জায়গীর পদমর্য্যাদা বসন-ভূষণ 'সওয়ারী' (যানবাহন) মুন্সী কামদার (কর্ম্মচারী নায়েব গোমস্তাদি) সখি পাত্রী প্রাসাদমহল 'রাওলা' সহ।

এই সখির দল সকলেই প্রায় অভিনয় ও নাচে গানে সুশিক্ষিত আর পরম রূপবতী। রাজার নিজেরও সখির দল ছিল—তাঁর পিতামাতার (পূর্ব্ব রাজার) সখিরা পরে

তাঁরই খাস সখি রয়েছে। পদ অনুসারে প্রথমে তারা গান নাচ করত। তার পর মহারাণীর প্রিয় সখিরা নাচতে গাইতে আসত। এর পরে অন্য রাণীদের সখিরা পদ অনুসারে এসে নেচে গেয়ে যেত। প্রায় সকলেই এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা করে নাচ-গান করে যেত। আবার ফিরে আসত ক্রম অনুসারে সারারাত্রি ও সকাল অবধি।

রাজা ও রাণীদের সখিদের দলের এক এক দিনের এক এক রঙের ওড়না দিয়ে চেনার ব্যবস্থা থাকত। গোলাপী, নীল, লাল, সবুজ—শ' দুই সখি বেগুনী রঙের ওড়না থেকেই এক এক দলের পরিচিতি হ'ত। হয়ত বা গোলাপী ওড়না পরা শ' দেড়েকের নীল বা পীত উত্তরীয় মন্দ লাগত না রঙের বৈচিত্র্যে। কথাকলি বা মণিপুরী বা দেবদাসী নৃত্য নয় সেটি। নাচের ধরনটা কিন্তু বাইনাচের মত।

আর ঐ যে নির্জলা পানীয় বস্তুটা—ঐটা এই নাচ-গানের ফাঁকে ফাঁকে মহারাণী ছোট গেলাসে ঢেলে প্রথমে রাজার মুখের কাছে ধরতেন। তার পর এক এক করে—সব সপত্নীদের কাছে ধরতেন। অবশেষে ঐ 'পাশয়ানজী'দের ও তাঁদের ছেলেদের লালজী সাহেবদের হাতেও দিতেন। এবং ঐ একটি গেলাসেই সেটি পরিবেশন হ'ত। সেই একই উচ্ছিষ্ট গ্লাসটির পানীয়টুকু সকলেই একবার মাত্র ঠোঁটে ঠেকাতেন। তার পর খাস ও উপস্থিত রাজপরিবারের মুখে ঘুরে ফিরে এসে আবার রূপার থালাতে গেলাসটি রাখা হ'ত। এই পানীয় পরিবেশনটি মহারাণী ছাড়া আর কারুকে করতে দেখিনি. আর সারারাত্রিই ক্ষেপে ক্ষেপে এই সুরাপাত্র মুখে মুখে ঘুরত ঐ একই পাত্রে।

৬

সত্য সত্য স্বচক্ষে অসূর্য্যম্পশ্য-লোকে প্রবেশের সুযোগ—তার পর এক সময়ে সহসা আমাদের কাছে এসে পড়ল।

কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় রাধাগোবিন্দজীর দেশে রাসলীলার উৎসব খুব বড় উৎসব। সেই সময়ে মহারাণী যাদবনজী সহসা একটা জলসা করলেন। তাতে আবার একটা আমন্ত্রণ এলো বাড়ীতে।

এ ধরনের উৎসবে রাজা বা অন্য রাণীদের দরবার করলে আমন্ত্রণ বা অবশ্য উপস্থিতির খুব একটা প্রয়োজন সব সময়ে বোধ হয় হ'ত না।

এ এক ভারি মজার উৎসব। যেন অনেকটা এক্‌জিবিশন দেখার মত ব্যাপার। পরে বলছি।

এর আগের আমন্ত্রণটি প্রথমও বটে না জানাও বটে। সে জন্যে খুব একটা সঙ্কোচও ছিল। এ ছাড়া একটা কৌতুকময় ঘটনা এই সঙ্কোচের ও ভয়ের কারণ ছিল। সেটা হচ্ছে এই, এর বহুদিন আগে কোন একটি এমনি আমন্ত্রণ আর একটি পদস্থ পরিবারে আসে। কোন গ্রাম্য স্বভাবের কৌতুহলী নারী সেই বাড়ীতে বিশেষ পরিচিতও ছিলেন। তিনিও নির্ব্বন্ধ সহকারে ঐ আমন্ত্রণ-সভায় যেতে চাইলেন। সে বাড়ীর গৃহিণী তাঁকে সঙ্গে নিলেন।

তার পর সেই প্রগল্‌ভ-প্রকৃতি নারীটি রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করে সেখানকার আদব-কায়দা কিছুই না জেনে অথবা না মেনে কোথাও বা গল্প করার চেষ্টা করেন, কোথাও প্রশ্ন করেন।

অবশেষে সহসা কৌতূহলভরে এক অবগুণ্ঠনবতী রাণীর মুখের ঘোমটা সরিয়ে মুখ দেখবার চেষ্টা করেছিলেন! 'হ্যাঁ গা রাণীর মুখটি কেমন দেখি না?' বলে।

তার পরের কথা। প্রাসাদে তো একটা প্রবল বিরক্তির স্রোত বয়ে গেল। এ রকম মুখ দেখা-দেখির অসৌজন্যময় পাড়াগেঁয়ে ব্যাপার প্রাসাদের অন্তঃপুরে আসে, কেউ কখনো দেখে নি। জানেও না।

তার পর থেকে সব জলসা উৎসবে অনুষ্ঠানে সেই পরিবার ও অন্য অনেক জায়গায়ও আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ করা বেশ কিছুকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। অর্থাৎ কোন পরিবার কেমন কায়দাদুরস্ত কে জানে!

যাই হউক এই কার্ত্তিকী পূর্ণিমা উৎসবের দিন শোনা গেল দরবার বসবে না। তাই 'নজর' নেওয়া বা দেওয়াও দরকার হবে না। নাচ-গানও নয়—শুধু একটা জলসার আয়োজন,মেলামেশা রাণীদের ও পর্দায়েত পালোয়ানদের নিয়ে। হয়ত গভীর রাত্রে নৃত্যগীত হতে পারে।

এবারে কিছু সঙ্কোচ ও ভয় ভেঙেছে বাড়ীর লোকের এবং পিতামহীরও। তিনি একেবারে সবান্ধবে তিনখানি রথভরা পুত্রবধূ-পৌত্রীরা দেবর কন্যারা, যারা যারা যায় নি প্রায় সকলকেই নিয়ে রথে উঠলেন।

এ রথ এলো সন্ধ্যার সময়ে। তেমনি সমারোহময় চোপদার দারোয়ান ইত্যাদি নিয়ে। তেমনি কানাত পড়ল পথ ঘিরে। ঝি বা দাসীও নেওয়া হ'ল সম্ভ্রম রাখার জন্য। সাজসজ্জাও কম হ'ল না মেয়ে-বৌদের।

যথা সময়ে রাত ৯টা আন্দাজ আমরা শহরের ত্রিপোলিয়া (তে-মাথা পথ) পার হয়ে গণগৌরীর দরওয়াজার গোটা তিনেক তোরণপথ পার হলাম। এগুলো জানা পথ ছিল আমাদের। শহরের পাঁচিলের ঘেরার মাঝে এটা আবার রাজপ্রাসাদ গোবিন্দজীর মন্দির

এবং যাবতীয় অফিস হাতিশালা ঘোড়া গোশালা, নানা ধরনের গাড়ী ও রথশালা নিয়ে আর এক পাঁচিল ঘেরা রাজপ্রাসাদ মহলের এলাকা ও সীমানা।

এর পর যে কোথায় এসে পৌঁছলাম, কোন্ তোরণ-দ্বারে 'শ্রী'জীর (রাজাকে বলা হয়) মহলের গণ্ডীর মাঝে সে আর রথযাত্রিণী আমাদের গোচর হ'ল না।

সহসা এক জায়গায় এসে রথ থামল। তার পর রথের ওপরে ঘেরা দড়ি খোলা হ'ল। রথগুলি দড়ি দিয়ে ঘিরে বেঁধে দেওয়া নিয়ম ছিল।

চারদিকে কানাত ঘেরা ঠিকঠাক করে গাড়ীর সঙ্গেতে লোকজন সব বাইরে চলে গেল।

রথের পর্দা তুলে রাজপ্রাসাদের দাসীরা আর খোজা মুখ বাড়াল। 'আওজী আওজী' উত্‌রো (এসো, এসো, নেমে এসো।)

দাসীরা জনান্তিকে বললে, ঘুঁঘট কাড়ো (ঘোমটা দাও) ছোট ছোট দু'একটি অবিবাহিত মেয়ে ছাড়া সকলে বিপুল ঘোমটা টেনে নেবে গেলেন।

রথ ও পথ থেকে নেবে যে কোন্ পথে এলাম সে আজো জানি না। শুধু অল্প ঘোমটার আড়াল থেকে দেখলাম একটি লম্বা গলিপথে এসেছি, তার একধারে একটি প্রকাণ্ড তিন-চার হাত উঁচু পিলসুজে আধসের-দেড়পোয়া তেল ধরে এমনি একটি মস্ত প্রদীপ জ্বলছে। তার সল্‌তেটি আঙুলের মত মোটা। সেই আলোতে ঐ সব অবগুণ্ঠনবতী নারীর সারি পথ দেখে চলেছেন। দেখতে দেখতে এ গলি শেষ হ'ল, আবার মোড় ফিরে অন্য গলিতে পড়লাম। এরও কোণে তত বড়ই প্রদীপ পিলসুজের মাথায় জ্বালানো আছে। আবার গলির মোড় ঘুরল সেখানেও ঐ আলো। অর্থাৎ এগুলি সবই সুড়ঙ্গ-পথ, উপরে মহল নিচে অলি-গলি সুড়ঙ্গময় পথ। এ পথ কোন্ দিকে কোথায় গেছে কোথায় তার গোড়া আর কোথায় তার শেষ শুধু খোজারাই জানে! তাদেরই হাতে এই পথের নিশানা আর পথিক যাত্রিণীদের পথনির্দ্দেশের দায়-দায়িত্ব। প্রাসাদবাসিনী রাওনা বা মহলবাসিনী নারীরাও কিছুই জানেন না, আমাদের মতই।

মলিন দেওয়ালের গায়ে উপরের দিকে ছোট ছোট ঘুলঘুলি আছে, সেগুলি কোন্ প্রাঙ্গণে পড়ে জানি না—দিনের বেলা একটু রৌদ্রের আলো আসে নাকি শোনা যায়।

সহসা এক সময়ে এক জায়গায় এসে পথ শেষ হয়ে গেল, একটি বিস্তৃত প্রাঙ্গণ কিংবা দালান ঠিক তা আর মনে নেই।

ঝাড়লণ্ঠন নানাবিধ আলোয় সেখানটা ঝলমল করছে। চারদিকে নানা রঙের বসন-ভূষণ পরা নারী হয়ত আমন্ত্রিত কিংবা প্রাসাদবাসিনী পুরনারী। প্রায় মেলার মতই ভিড় জমেছে এখানে-ওখানে দলে দলে। মহারাণীও আজ তাদের কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

আমাদের পৌঁছনোর পরে মহারাণীকে পিতামহী যথারীতি কুর্নিশ সেলাম করে বিনীত ভাবে দাঁড়ালেন। আশে-পাশে দলের সবাইকে নিয়ে! কিন্তু নারী-চরিত্র সব জায়গাতেই সমান। সন্তানহীনা মহারাণী এই সন্তান বধূ পৌত্র-পৌত্রীশালিনী স্বজন পরিবেষ্টিত গৃহস্থ গৃহিণী পিতামহীকে দেখে যেন খুশী হয়ে হাসিমুখে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন। কে কোন সম্পর্কের জন, কত বয়স, বিয়ে হয়েছে কিনা, নানা কথা।

যেন ঘরোয়া দুটি মানুষ কথা বলছেন। সেদিন দুটি বালবিধবা পিসিমাও গিয়েছিলেন। আমাদের দেশাচার মত সাদা রেশমের শাড়ী ও সামান্য গহনা পরে। তাঁদের নিয়েও কোন প্রশ্নই তিনি বাদ দিলেন না। যেন একটি ঘরের গৃহিণী আর এক ঘরের গৃহিণীর সুখ-দুঃখের কথা শুনছেন। দরবারী আদব-কায়দাময় চেনা-পরিচয় সেদিন আর খোজা মারফৎ হ'ল না।

তার পর আমরা দেখতে গেলাম জলসায় ঠাকুর-সাজানো জায়গাটি।

সেইটিই খুব আশ্চর্য্য জিনিস দেখেছিলাম। অপূর্ব্ব এক শিল্পকলা সেটা। সেটা আর কোথাও দেখি নি। এবং এখনো কোনোখানে, কোনো দেবালয়ে, বা কোথাও আছে কিনা জানি না।

দেখলাম একটা জায়গায় একটু ঘিরে নিয়ে সেখানে জলভরা বড় বড় গামলা—পরাত থালা সাজানো রয়েছে। এবং সেই জলের ওপর রাধাকৃষ্ণের নানা লীলা নানা রকম রং ছড়িয়ে দিয়ে দিয়ে আঁকা হয়েছে। পীতবাস কৃষ্ণ নীল রঙের শাড়ী বা ঘাঘরা পরা শ্রীরাধা তাঁদের জামা ওড়না গহনা তাঁদের গায়ের হাতের পায়ের মুখের রং গড়ন চোখ মুখ নাক সে যে শুধু রং ফেলে গুঁড়ো রং ছড়িয়ে দিয়ে একটি করে স্পষ্ট আকার ধরছে কোন শিল্পী-হাতের ছোঁয়ায় যেন কল্পনা আর ধারণার অতীত বলে আজো মনে হয়। তুলি রং কাগজ ক্যান্‌ভাস দিয়ে তৈরী ছবি নয়। ছেনি বাটালি দিয়ে গড়া মূর্ত্তি নয়। শুধু জলের ওপর রং ছড়িয়ে রচনা করা এক চিত্রকলা। রাসলীলা দোললীলা নানা রকম কৃষ্ণলীলা রচনা করা হয়েছে। তখনো কেউ কেউ করছে। জল স্থির। সূক্ষ্ম হাতে কিভাবে রংয়ের পর রং ছড়িয়ে জলের ওপর ছবি

রচনা করা হচ্ছে। আমরা সকলেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম আশ্চর্য্য হয়ে কতক্ষণ।

বড়রা জিজ্ঞাসা করলেন কেউ কেউ, কতদিন রাখা যায়, শুকিয়ে যাবে তো? তারা বললে, দু-তিন দিন থাকে তার পর ঘুলিয়ে যায়। তখনো অনেক প্রশ্ন মনে এলো—আজো ভাবি—রঙে কি দেয়, কি করে জলের ওপর হালকা ভাবে ছড়িয়ে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। শ্রীরাধার ওড়নার নীল রং শ্রীকৃষ্ণের পীত উত্তরীয়ে মিশিয়ে গিয়ে একাকার হয়ে যায় না—সোনার বাঁকীটুকুও তারি মাঝে পৃথক রঙ থাকায় ছিদ্র নিয়ে ফলানো রয়েছে। কৃষ্ণের মাথার ময়ূরপাখার চূড়া—রাধার সোনার মুকুট, সবই স্পষ্ট রয়েছে। জলে ডুবে যায় নি। মিশে যায় নি।

এই ক্ষণস্থায়ী অথচ অপূর্ব্ব শিল্পকলা জলের ওপর রঙের আলপনা, আলপনার মতই ক্ষণিকের জিনিস। আর কোথাও কখনোই দেখিনি এবং জানি না, আজো এর কোনো শিল্পী আছে কিনা। শুধু ভাবি, ছবি আঁকার চেয়েও এই কঠিন কলাবিদ্যা আর একান্ত ক্ষণস্থায়ী শিল্পের সৃষ্টি কারা করেছিল, এর বিশেষ উপাদান ও কলাচাতুর্য্যই বা কি ছিল? রংই বা ঘুলিয়ে গুলে যায় না, ভাসে কেমন করে? রঙ ছড়ানোর হাতের নৈপুণ্যও কি অসাধারণ মনে হয়।

সেদিন ফিরে এলাম ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই। যে পথে এসেছিলাম সেই পথ দিয়েই ফেরা। অনেকগুলি মোড় ফেরা ফেরা সেই-প্রদীপ জ্বালা সুড়ঙ্গপথে সেই খোজা ও দাসী পথপ্রদর্শক নিয়ে হারেমবাসিনীদের মতই। তবে তারা শুধু একদিন প্রবেশ করেছিল—ফিরে আসে নি আর কখনো কিন্তু পথটি তাদের মত আমাদেরও কিন্তু চির অচেনা।

আর এই দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পরে—সন্তানহীনা মহারাণীর কথা মনে করে—মনে হয়—দুটি মেয়ে তাঁর হয়েছিল। জীবিত নেই। তখন রাণী হননি—পূর্ব্ব-রাজা ভাইপোকে পোষ্য নেন। তখন রাজার নাম ছিল কায়েম সিংহ। এবং রাণীও কোনও ঠাকুর সাহেব বা জমিদার ঘরের মেয়ে ছিলেন। রাজার চেয়ে বয়সে বছর তিনেক বড়। রাজোয়াড়ায় কুলীন বামুনের মত—বয়সের বড় ছোটতে বাধা হয় না—এ রকম বিবাহ হয়। বিবাহিত জীবনে রাজা হবার আগে মেয়ে দুটি হয়। এবং তাঁর শাউড়ী রাজার (কায়েম সিং-এর) মা একটু বৌকাঁটকী ছিলেন। মেয়ে দুটি মৃত্যুর আগে যত্ন পায় নি। নিজেও আঁতুড়ে সেবা যত্ন পাননি। সেই সময়ের অসুস্থতা তাঁর চিরদিন ছিল। গৌরবর্ণ সুন্দর মুখশ্রী, প্রৌঢ়া মহারাণী, চুলগুলি মনে হয় কিছু অকালেই পেকে ছিল। খুব লম্বা ছিলেন না। চোখ দুটি একটু ধূসরবর্ণ, শান্ত চিন্তিত বিশণ্ণ ভাবের প্রসন্নতাভরা সে মুখ, কিন্তু একটি সৌম্য হাসি কথাবার্ত্তার সময়ে মুখে ভেসে থাকৃত।

আজ মনে হয়, কি একটা দুঃখ তাঁর মনে ছিল। কি, সেটি? আজ মনে হয়, বলা যায় মহারাণীত্বের নিঃসঙ্গতার দুঃখ সেটি। স্বামী রাজা হওয়ার পর বহু নারী বিলাসী হয়েছেন অন্তঃপুরের নানা চক্রান্তে। সন্তানহীনা। বন্ধুহীন জীবন। সপত্নীরাও সুখী নন। বন্ধুও নন।

মনে হয়, হয়ত অভ্যাগত আমন্ত্রিতাদের সুস্থ সহজ স্বচ্ছন্দ পারিবারিক জীবন, আমাদের পিতামহীর পুত্র পৌত্র পৌত্রী বধূস্বজন বেষ্টিত জীবনযাত্রা তাঁর মনে এক কৌতূহলময় কল্পনা জাগাত। তাই যেন আকস্মিক ভাবেই পিতামহীকে তিনি আহ্বান করতেন নিজের প্রাসাদে। অবশ্য কি কথাবার্ত্তা হ'ত জানি না কিছুই। শুধু মনে হয় তাঁর মনের কথা বলবার ও শোনবার লোক তিনি পাননি মহারাণী-জীবনে। কিন্তু বলেছেন কি? না কিছুই বলেননি। মনে মনেই যেন সেই কথাও বলা হ'ত। আমার অন্ততঃ তাই মনে হয়।

এর পরেও আবার দু' একবার গিয়েছি—একটিবার মাত্র কোনো উৎসব ভোজের দিনে, ও এক শোকের বিয়োগের দিনে। বারান্তরে বলব।

প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ

শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য্য

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন বৃটিশ শাসক বাঙলা দেশে শিক্ষা-সংস্কারের প্রতি মনোনিবেশ করিল তখন এদেশে টোল-চতুষ্পাঠী, মাদ্রাসা ও পাঠশালা এই ত্রিবিধ শিক্ষায়তন প্রচলিত ছিল। শিক্ষাদীক্ষার সেই নব-অভ্যুদয়ের যুগে যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ইংরাজ মনীষী ও সহৃদয়গণের প্রচেষ্টায় এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা-দের মধ্যে 'কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ' অন্যতম। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আগ্রহে ও হোরেস হেম্যান উইলসন-এর প্রযত্নে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে যে কয়েক-জন মনীষী প্রাচ্য বিদ্যার চর্চায় আপনাদের জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

বংশপরিচয় ও বিদ্যাচর্চা

প্রেমচন্দ্র (বা, প্রেমচাঁদ) তর্কবাগীশ ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল বর্দ্ধমান জিলা মধ্যরাঢ়ের শাকনাড়া গ্রামে প্রখ্যাত চট্টোপাধ্যায় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার বহুতর গ্রন্থে আপন জন্মভূমি ও পিতৃপিতামহের পরিচয় দিয়াছেন। সেকালে সংস্কৃত শিক্ষাদীক্ষার জন্য এই বংশ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। এই বংশেই সাহিত্য দর্পণের প্রখ্যাত টীকাকার রামচরণ তর্কবাগীশের জন্ম। প্রেমচন্দ্রের বংশাবলী নিম্নরূপ :—মুনিরাম বিদ্যা-বাগীশ—রামকান্ত—রামসুন্দর—রামনারায়ণ—প্রেমচন্দ্র। প্রেমচন্দ্র তাঁহার কাব্যাদর্শের টীকার শেষে আপন বংশ-পরিচয় দিয়াছেন :—

"উৎকর্ষঃ কশ্যপর্ষেবলবলিজরিনোর্জন্মনোজ্জ্বিতশ্রী—
বংশা বিদ্যাবতংসোঽবসথিকুলমিতশ্চামলং প্রাদুরাসীৎ।
এতস্মান্ মধ্যরাঢ়া বিততগুণগণো গ্রামণীঃ সজ্জনানাং
সম্ভূতো রামনারায়ণধরণিসুরঃ শাকরাঢ়ানিবাসী॥"

প্রেমচন্দ্রের বৃদ্ধপিতামহ নৃসিংহ তর্কপঞ্চানন একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কাশীতে বেদান্ত ও জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া স্বদেশে টোল স্থাপন করেন। এই টোলে প্রেমচন্দ্র প্রথম ব্যাকরণ শাস্ত্রের পাঠ লন। পরে রঘুবাটী গ্রামে সীতারাম ন্যায়বাগীশের নিকট ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। শাকনাড়ার কিছু দূরে অবস্থিত হুয়াড় গ্রামের জয়গোপাল তর্কভূষণের নিকট প্রেমচন্দ্র কাব্য ও অলংকার পড়েন। বস্তুতঃ তর্কভূষণ মহাশয়ের পাঠন-রীতিই প্রেমচন্দ্রের হৃদয়ে কবিত্বের বীজ রোপিত করিয়াছিল। তর্কভূষণ মহাশয় যখনই গ্রামান্তরে গমন করিতেন প্রেমচন্দ্রকে সঙ্গে লইতেন। পথে যাত্রা-কালে তিনি প্রেমচন্দ্রকে পথিপার্শ্বের প্রাকৃতিক শোভা সংস্কৃত শ্লোকে বর্ণনা করিতে বলিতেন। এইরূপে মুখে মুখে কবিতা রচনায় তিনি উত্তরকালে খ্যাতি অর্জন করেন।

প্রেমচাঁদ সাত-আট বৎসরকাল জয়গোপাল তর্ক-ভূষণের টোলে অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে বাঙালীর সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণ। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ব্যাপিয়া কেবল রাজ্য বিস্তার ও শাসনব্যবস্থা দৃঢ় করিবার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকার পর এদেশীয়দের শিক্ষা-দীক্ষার দিকে তৎকালীন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ মনোনিবেশ করিলেন। গবর্ণমেণ্টের জুনিয়র সেক্রেটারী হোরেস হেম্যান উইলসন-এর প্রস্তাবে ১৮২৪ সনের ১লা জানুয়ারী কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল প্রাচ্যবিদ্যার চর্চা, সংস্কৃত গ্রন্থাদি প্রকাশ এবং সংস্কৃতের মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিদ্যার পরিবেশন। সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে তৎকালীন অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত অধ্যাপনাকার্য্যে ব্রতী হন। কাব্যে জয়গোপাল তর্কালংকার, ন্যায়ে নিমাইচাঁদ শিরোমণি প্রভৃতি পণ্ডিতগণের যশোগৌরবে প্রেমচন্দ্র আকৃষ্ট হন। এবং ১৮২৭ সনের আগষ্ট মাসে সংস্কৃত কলেজের কাব্য শ্রেণীতে ছাত্ররূপে প্রবেশ করেন। প্রেম-চন্দ্র ভর্তি হইবার জন্য সংস্কৃত কলেজে আসিয়া সেক্রেটারী উইলসন সাহেবের সহিত দেখা করেন। 'শ্লোক রচনা করিতে পার কিনা' উইলসন কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, প্রেমচন্দ্র তৎক্ষণাৎ নিম্নোক্ত শ্লোক দুইটি রচনা করেন—

"শ্রীসংস্কৃতকলেজস্য ভিত্তিবং শ্রীউইল্‌সন
শ্রীগোপাল-নিমাই-শম্ভু-নাথুরামচতুষ্টয়ম্।

---

* সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী প্রাচীন নথিপত্র দেখিতে অনুমতি ও উৎসাহ দিয়াছেন।

গঙ্গাধর-যোগধ্যান-হরনাথ ইমে ত্রয়ঃ
ছাদাঃ সুনির্ম্মিতা নিত্যং চতুঃস্তম্ভোপরি স্থিতাঃ
"কোম্পানেরখিলক্ষমাতলভুতঃ সম্মানিতো বিক্রতঃ
শ্রীযুক্তো জগতীতলে বিজয়তামুইলসন সাহবঃ।
যস্তানন্তগুণাবলীবিলসিতং প্রেক্ষাবতাং প্রীতিদম্
মন্যে মন্থরতাং ব্রজন্তি ভণিতুং বাচোঽপি বাচস্পতেঃ॥"

সংস্কৃত কলেজের প্রাচীন নথিপত্র হইতে জানা যায় যে, ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস১ হইতে প্রেমচন্দ্র সাহিত্য বিভাগে জয়গোপাল তর্কালংকারের ছাত্ররূপে প্রবিষ্ট হন। তখন সাহিত্য বিভাগে ছাত্র ছিল ১৮ জন। প্রেমচন্দ্র ৫৲ টাকা মাসিক বৃত্তি পাইতেন। ঐ স্থলে "প্রেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়" নামে তাঁহার স্বাক্ষর আছে। তখন তাঁহার বয়স ২৬ বৎসর। ১৮২৭ সনের আগষ্ট মাস হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রেমচন্দ্রের পঠিত পুস্তক-সমূহের বিবরণ এইরূপ:—শিশুপাল বধ, সর্গ ৬-১০, কিরাত ৪-১০, পূর্ব নৈষধ, মালতীমাধব অঙ্ক ১-২, দশকুমারচরিত ১-৪ অধ্যায়, অনর্ঘরাঘব ১-৪ সর্গ। এই স্বল্পকালের মধ্যে অতগুলি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া প্রেমচন্দ্র বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং মেজর ০. প্রাইস তাঁহার রিপোর্টে প্রেমচন্দ্রের সম্বন্ধে কলেজের সেক্রেটারীরূপে শিক্ষাবিভাগকে লেখেন, "Very considerable progress and proficiency. By far the best scholar of the class"(২)। ইহার পর ১৮২৮ সনের ফেব্রুয়ারী হইতে ১৮২৯ সনের জানুয়ারী পর্যন্ত প্রেমচন্দ্র অলংকার শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। নাথুরাম তখন অলংকারের অধ্যাপক। এই সনের অধিকাংশ সময়ে প্রেমচন্দ্র অসুস্থতার জন্য উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তথাপি তিনি পরীক্ষায় আশানুরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দেন ("Moderate progress and considerable proficiency")। ১৮২৯ ফেব্রুয়ারী হইতে ১৮৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রেমচন্দ্র নিমাইচাঁদ শিরোমণির নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এ সময়ে তিনি মাসিক ৮৲ টাকা বৃত্তি পাইতেন। ন্যায়শ্রেণীতে পাঠ সমাপনান্তে প্রেমচন্দ্র "ন্যায়রত্ন" উপাধি পান। পরে "তর্কবাগীশ"রূপেই পরিচিত হন।

অধ্যাপনা

অলংকার শাস্ত্রের অধ্যাপক নাথুরাম শাস্ত্রী (প্রখ্যাত নৈয়ায়িক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের গুরু) অসুস্থতার জন্য ১৮৩১ সনের আগষ্ট মাস হইতে ছয় মাসের ছুটি গ্রহণ করেন। ঐ পদে অস্থায়ীরূপে প্রেমচন্দ্র নিযুক্ত হন। কলেজের নথিপত্রে ১৮৩২ সনের জানুয়ারী মাস হইতে অলংকার শ্রেণীর অধ্যাপকরূপে প্রেমচন্দ্রের নাম লিখিত আছে। বেতন ৮০৲। তাঁহার নিয়োগ প্রসঙ্গে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী W. Price জেনারেল কমিটি অব পাব্লিক ইন্‌স্ট্রাকসন-এর জুনিয়ার সেক্রেটারী উইলসন সাহেবের নিকট লিখিয়াছিলেন :

"...With the sanction of the Committee the Secretary proposes to appoint Promchand, a young man of every considerable attainments, and who is the most distinguished scholar in the college, to take the charge of the Alamkara class during the absence of Nathooram"৩

১৮৩২ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে নাথুরাম শাস্ত্রীর মৃত্যু হইলে ঐ পদের জন্য প্রেমচাঁদ ও অখিলচন্দ্র দরখাস্ত করেন। কলেজের সেক্রেটারী প্রেমচন্দ্রের নাম প্রস্তাব করিয়া পাঠান :

"Premchandra has been acting as Pundit of the Alamkara class since Nathoorama's departure on leave and as it appears from the accompanying memorandum of the late Secretary that his qualifications are superior to those of the other candidates the committee will probably think proper to appiont him permanently to the vacant office."৪

১৮৩২ সনের মার্চ হইতে প্রেমচন্দ্র স্থায়ীভাবে অলংকার শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। প্রেমচন্দ্রের ঐ পদে স্থায়ী-

---

১ সংস্কৃত কলেজের রিপোর্ট বুক (প্রথম খণ্ড) এ আছে, ১৮২৭ সনে জুলাই মাসে প্রেমচন্দ্র সাহিত্য শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু জুলাই মাসের বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রদের মধ্যে তাঁহার উল্লেখ নাই। আগষ্ট মাস হইতে তাঁহার নাম বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের তালিকাভুক্ত হয়। (Establishment Book. vol I.

(২) Report of the Fourth Annual Examination, dated 1st January 1828 :(Govt. Sanskrit College Report Book, Vol. 1)

(৩) Sanskrit College Records (Letters sent vol 1, dt. 16th September, 1831)

(৪) Letter dt. 8th March, 1832 (Letter sent, Sanskrit College Records vol. 1)

ভাবে নিয়োগের মূলে ডাঃ উইলসন্-এর অনেকখানি হাত ছিল।[৫]

সংস্কৃত কলেজে প্রেমচন্দ্রের অধ্যাপনাকালে উহা তৎকালীন শিক্ষাজগতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজে প্রেমচন্দ্রের নিকট অধ্যয়ন করেন। পণ্ডিত গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, রামনারায়ণ তর্করত্ন, হরিশচন্দ্র কবিরত্ন, তারাকুমার কবিরত্ন, শিবনাথ শাস্ত্রীর পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য, শিবনাথ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন (ইনি সংস্কৃত কলেজ ছাত্র নহেন, প্রেমচন্দ্রের নিকট গৃহে অধ্যয়ন করেন), আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, মহামহোপাধ্যায় নীলমণি ন্যায়ালংকার প্রভৃতি তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে অগ্রগণ্য। সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন লিখিয়াছেন: "তিনি এক বৎসরে সমগ্র সাহিত্যদর্পণ শেষ করিয়া দিতেন। তদ্ভিন্ন নয়খানি নাটক পড়াইতেন। ইহা ছাড়া প্রতি শনিবার আমাদিগকে এক একটি সমস্যা দিতেন। ঐ সমস্যা আমরা সোমবার পূর্ণ করিয়া আনিয়া দিতাম। ঐগুলির দোষগুণ তিনি বিচার করিয়া দিয়া পরে পাঠনা আরম্ভ করিতেন" (সেকালের সংস্কৃত কলেজ, প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩১, পৃঃ ৬৪৯)। সংস্কৃত কলেজের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। উইলসন সাহেব অক্সফোর্ডের বোডেন প্রফেসর বা অধ্যাপক পদ গ্রহণ করিয়া ভারত ত্যাগ করিলে গবর্ণমেণ্ট মেকলে সাহেবের পরামর্শে সংস্কৃত কলেজ উঠাইয়া দিবার সংকল্প করেন। হরিশচন্দ্র কবিরত্ন তাঁহার স্মৃতিকথায় লিখিয়াছেন, "মেকলে সাহেব সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃতপুস্তকপূর্ণ লাইব্রেরী দেখিয়া বড়ই চটিয়া উঠিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন এই রাশিগুলি গঙ্গার জলে ফেলিয়া দেওয়া উচিত"। দুঃখিত চিত্তে উইলসন সাহেবের নিকট প্রেমচন্দ্র নিম্নোক্ত কবিতাটি রচনা করিয়া পাঠাইলেন:

"গোলন্ত্রীদীর্ঘিকায়া বহুবিটপিতটে কোলিকা তানগর্য্যাঃ
নিঃসঙ্গো বর্ত্ততে সংস্কৃতপঠনগৃহাখ্যঃ কুরঙ্গঃ কৃশাঙ্গঃ।
হন্তুং তং ভীতচিত্তং বিগতশরণকং মেকলে ব্যাধরাজঃ
সাক্ষ ক্রতে স ভো ভো উইলসন-মহাভাগ মাং রক্ষ রক্ষ॥"

প্রেমচন্দ্রের শ্লোকটির উত্তরে উইলসন নিম্নোক্ত শ্লোকটি পাঠাইয়াছিলেন:

"নিষ্পিষ্টাপি পরং পদাহতিশতৈঃ শশ্বদ্ বহু প্রাণিনাম্
সন্তপ্তাপি করৈঃ সহস্রকিরণেনাগ্নিস্ফুলিঙ্গোপমৈঃ।
ছাগাদ্যৈশ্চ বিচর্বিতাঽপি সততং মৃষ্টাপি কুদ্দালকৈঃ
দূর্বা ন ম্রিয়তে কৃশাঽপি নিতরাং ধাতুর্দয়া দুর্বলে॥"

প্রেমচন্দ্রের অধ্যাপনাকালে এই সংস্কৃত কলেজ গৌরবের উচ্চশীর্ষে আরোহণ করিয়াছিল। দর্শনে জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, স্মৃতিবিভাগে ভরতচন্দ্র শিরোমণি, সাহিত্যে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, ব্যাকরণে তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রমুখ শাস্ত্রনিষ্ণাত পণ্ডিতজনের এবং বিদ্যাসাগর, কাওয়েল প্রভৃতি মনস্বী অধ্যক্ষগণের পরিচালনায় সংস্কৃত কলেজ ঊনবিংশ শতকের শিক্ষাধারার ক্রমবিবর্তনে আপন আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

১ম বৎসর	উপক্রমণিকা				(বিদ্যাসাগর রচিত)	
২য় বৎসর	ঋজুপাঠ	১ম ভাগ	ও	ব্যাকরণ কৌমুদী		১ম ভাগ
৩য় বৎসর	ঐ	২য় ভাগ	ও	ঐ		২য় ভাগ
৪র্থ বৎসর	ঐ	৩য় ভাগ	ও	ঐ		৩য় ভাগ
৫ম বৎসর	রঘুবংশ	১—৯	ও	ঐ		৪র্থ ভাগ
৬ষ্ঠ বৎসর	ঐ	১০—১৯	ও	মুগ্ধবোধ		
৭ম বৎসর	কুমারসম্ভব	১—৭ সর্গ		মেঘদূত ও		মুগ্ধবোধ
৮ম বৎসর	কিরাতার্জুনীয়ম্		ও	মুগ্ধবোধ		
৯ম বৎসর	শিশুপাল বধ ও মুগ্ধবোধ					

১০ম বৎসর সাহিত্যদর্পণ, শকুন্তলা, রত্নাবলী, মুদ্রারাক্ষস, মৃচ্ছকটিক, বিক্রমোর্বশী, বীরচরিত, উত্তরচরিত, মালতীমাধব, বেণীসংহার

১১শ বৎসর দায়ভাগ, মিতাক্ষরা (ব্যবহারাধ্যায়) দত্তকমীমাংসা ও দত্তকচন্দ্রিকা।

১২শ বৎসর ভাষাপরিচ্ছেদ, সৌত্রমঠ, ব্যাপ্তপঞ্চক শেষ পূর্বভাগ।

ছাত্রগণকে তিনি মৌলিক সংস্কৃত রচনায় উদ্বুদ্ধ করিতেন। ১৮৩৮ সন হইতে সংস্কৃত কলেজে এই নিয়ম প্রবর্তিত হয় যে, স্মৃতি, ন্যায়, বেদান্ত এই তিন শ্রেণীর ছাত্রগণকে বার্ষিক পরীক্ষার সময় গদ্যে ও পদ্যে সংস্কৃত রচনা করিতে হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন কলেজের ছাত্র। তিনি প্রেমচন্দ্রের অতি স্নেহের পাত্র ছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন,"পূজ্যপাদ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় আমায় অতিশয় ভাল বাসিতেন। তিনি পরীক্ষাস্থলে আমার অনুপস্থিত দেখিয়া বিদ্যালয়ের তৎকালীন অধ্যক্ষ চিরস্মরণীয় কাপ্তেন জি. টি. মার্শল সাহেব মহোদয়কে বলিয়া বলপূর্বক আমায় তথায় লইয়া গিয়া একস্থানে বসাইয়া দিলেন।" বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই রচনায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। অধ্যক্ষ কাওয়েল

---

(৫) অক্সফোর্ডের অধ্যাপক থাকাকালীন ডাঃ উইলসন-এর ছাত্র ও পরবর্তীকালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এডওয়ার্ড বাইলস্ কওয়েল এ সম্বন্ধে লেখেন: **"he is a very able and hard working pundit . having been appointed by the late Professor Wilson when he was the Secretary to the General Committee, of the Public Instruction" (Sanskrit College Record Letters sent, 14. 9. 1861)**

(৬) তৎকালে (বিদ্যাসাগরের অধ্যক্ষতাকালে) দ্বাদশ বর্ষব্যাপী সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যক্রম নিম্নরূপ ছিল:

সংস্কৃত কলেজের কথা বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, প্রেমচন্দ্র, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি ও তারানাথ তর্কবাচস্পতি—ইঁহারা সংস্কৃত কলেজের চারিটি স্তম্ভস্বরূপ—

"শ্রীতর্কবাগীশস্তর্কপঞ্চাননশিরোমণিঃ।
তর্কবাচস্পতিঃ শ্রীমানিতি স্তম্ভচতুষ্টয়ম্ ॥"

অধ্যক্ষ কাওয়েল প্রেমচন্দ্রের সহিত নিয়ত শাস্ত্রবিষয়ক আলোচনা করিতেন। প্রেমচন্দ্র সুদীর্ঘ ৩১ বৎসর ৯ মাস কাল সংস্কৃত কলেজে অলংকারের অধ্যাপকরূপে কার্য্য করিয়া ৬ই অক্টোবর ১৮৬৩ বার্দ্ধক্যের জন্য পেন্‌সনের দরখাস্ত করেন। প্রেমচন্দ্র তখন অধ্যাপকরূপে ৯০ টাকা ২ আনা বেতন পাইতেন। সংস্কৃত কলেজের প্রাচীন নথিপত্র হইতে প্রেমচন্দ্রের পেন্‌সনের আবেদন পত্রটির নকল দিলাম—

To Edward B. Cowell, Esq , M. A.

Sir,

I have the honour to state that in consequence of old age, impaired vision and decayed health I am unable to discharge my duties with that degree of energy with which I have hitherto performed them. I have accordingly made up my mind to retire from the service of Govt. and beg therefore that you will be good enough to lay this my application for a super-annuation pension before the authorities. I have served in my present post for a period of thirty one years and nine months commencing from January 1832 and have always discharged my duties to the entire satisfaction of my superiors. I am thus entitled under the rules to a good service pension for which I humbly trust you will be kind enough to recommend me

I have the honour to be
Sir
Your most obedient servant
Sd/ Premchand Tarkavagis.

Calcutta
6th October,
1863

অধ্যক্ষ কাওয়েল প্রেমচন্দ্রের পেন্‌সনের দরখাস্ত কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করিয়া লিখিলেন, "He is quite unrivalled among the modern pundits of Bengal. I know of no pundit who has an equal power of writing elegant Sanskrit poetry and prose." (৭) কাওয়েল পেন্‌সন ব্যতীত এক হাজার টাকা অধিক দিতে বলিলেন।

১৮৬৪ সনে ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রেমচন্দ্র অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার পেন্‌সনের পরিমাণ ছিল ৪৫ টাকা ১ আনা।(৮) সংস্কৃত কলেজ হইতে প্রেমচন্দ্রের অবসর গ্রহণের পর বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী সভায় অধ্যক্ষ কাওয়েল বাংলায় বক্তৃতা দেন। তৎকালীন প্রখ্যাত সাপ্তাহিক পত্র 'সোমপ্রকাশে'ঐ বাংলা বক্তৃতার "অবিকল নকল"টি মুদ্রিত হয়। ঐ বক্তৃতাটির প্রেমচন্দ্র-সম্পর্কিত অংশ এইরূপ—

"অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক মহামান্য পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় লব্ধবৃত্তি হইয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতেছেন।…আমি প্রায় বিংশতি বৎসর হইল অধ্যাপকবর উইলসন সাহেবের নিকট শিষ্যভাবে পরিচিত হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। অদ্যাপি সেই গুরুর সদয়মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। এই কলেজে পদার্পণ করিয়াই অন্বেষণ দ্বারা জানিতে পারিলাম, প্রস্তাবিত পণ্ডিত মহাশয় আমার উক্ত গুরুর প্রতিষ্ঠাপিত। আমি সেই গুরুর নিকটস্থ না হইয়াও তৎপ্রতিষ্ঠাপিত পণ্ডিত মহাশয়কে দেখিলেই তাঁহাকে স্মরণ করিতে পারিব এই সুবিধার বিষয় উইলসন সাহেবের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম। তিনিও তদুত্তরে পণ্ডিত মহাশয়ের বিস্তর প্রশংসা লিখিয়াছেন। যাবৎ পণ্ডিত মহাশয় অধ্যাপনা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন তাবৎ উইলসন সাহেবের স্মরণচিহ্ন আমার নেত্রগোচর হইত। এক্ষণে আমাকে সে সুখে বঞ্চিত হইতে হইতেছে ইহা অল্পক্ষোভের বিষয় নহে।

যাহা হউক, পণ্ডিত মহাশয়ের চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি অক্ষর-নিবদ্ধা আছে। সুতরাং সে কীর্ত্তি আমাদের বিস্মরণীয় হইবার যোগ্য নহে। বিশেষতঃ যাবৎ তৎকৃত গ্রন্থসকল এই সংস্কৃত বিদ্যালয়ে প্রচলিত থাকিবে তাবৎ বিস্মরণের সম্ভাবনাও নাই।(৯)

---

(৭) Letter dated 29. 10. 1863.

(৮) প্রেমচন্দ্রের পেনসন রিপোর্টে তাঁহার সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে তাহা এই, **"Premchandra Tarkavagis, son of Ram narayan Bhattacharyya, Brown Complexion and a small wart on the right cab'er bone. Size 5 feet 3 inches, Age 58 years 5 months 20 days."**

(৯) সোমপ্রকাশ, ৪ঠা ফাল্গুন, ১২৭০ বঙ্গাব্দ (ইং ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৪) পৃঃ ২১২-২১৩

কাশীবাস ও মৃত্যু

পেন্‌সন গ্রহণান্তে প্রেমচন্দ্র কাশীধামে গিয়া তথায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। কাশীতে কুইন্‌স্ কলেজের অধ্যক্ষ গ্রিফিথ্ সাহেবের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। সেখানে স্বগৃহে তিনি অধ্যাপনা করিতেন এবং শেষে ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৪৫।৪৬ জনে দাঁড়াইয়াছিল। কাশীতে প্রেমচন্দ্রের ছাত্রদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য, এম্. এ. অন্যতম। কাশীতে ২৫শে মার্চ ১৮৬৭ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়। প্রেমচন্দ্রের মৃত্যুর পর অক্সফোর্ড হইতে কাওয়েল সাহেব সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন সহাধ্যক্ষ সোমনাথ মুখোপাধ্যায়কে এক পত্রে লেখেন :

"I shall always remember him with great respect and affection. He was surely a great scholar and I look back with deep interest to my intercourse with him."

চরিত্র ও সাহিত্যচর্চা

প্রেমচন্দ্রের শিক্ষাদান পদ্ধতি অপূর্ব ছিল। সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁহার স্মৃতিকথায় লিখিয়াছেন যে, জয়গোপাল তর্কালংকারের ন্যায় প্রেমচন্দ্রের অধ্যাপনার সময় ভাবোচ্ছ্বাস হইত। তিনি কুমারসম্ভবে যখন পড়িতেন :

'ত্রিভাগশেষাসু নিশাসু চ ক্ষণং
নিমীল্য নেত্রে সহসা ব্যবুধ্যত।
ক নীলকণ্ঠ ব্রজসীত্যলক্ষবাক্
অসত্যকণ্ঠার্পিতবাহুবন্ধনা॥'

তখনই আহা হা, করিয়া উঠিতেন, তাঁহার ভাব লাগিয়া যাইত, আমাদেরও সেদিনকার মত পাঠ বন্ধ হইত।"১০

শৈশব হইতে প্রেমচন্দ্রের বাংলা সাহিত্য বিষয়ে অনুরাগ ছিল। স্বগ্রামে কবিওয়ালাদের সহিত মিশিয়া তিনি কবিতা রচনা করিতেন। সংস্কৃত কলেজে আসিবার কিছুদিন পরেই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। পাথুরিয়াঘাটার যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সাহায্যে ঈশ্বরচন্দ্র "সংবাদ প্রভাকর"১১ প্রকাশ করেন। পূর্ববর্তী পত্রিকা বিশেষত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সমাচার চন্দ্রিকার" উপর কটাক্ষ করিয়া নিম্নোক্ত শ্লোক দুটি রচনা করেন। শ্লোক দুইটি "সংবাদ প্রভাকরে"র শিরোভূষণ ছিল :

"সতাং মনস্তামরসপ্রভাকরঃ, সদৈব সর্বেষু সমপ্রভাকরঃ।
উদেতি ভাস্বৎকলয়াঽপ্রভাকরঃ, সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ॥"

"নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিৎ
ভ্রামং ভ্রামমতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ।
অম্ভোজস্বিমলপ্রভাকরকরপ্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে
স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরাঃ স্বান্তদ্বিরেফা রসম্॥"

প্রেমচন্দ্র বাংলাও লিখিতেন এবং 'সংবাদ প্রভাকরে' তাঁহার অনেক বাংলা রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মাঝে মাঝে বৈশাখ সংখ্যার প্রভাকরে লেখকদের নাম উল্লেখ করিতেন। ১৮৪৬ সনের ১২ই এপ্রিল তারিখের সংখ্যায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লেখেন :

"শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, যিনি এক্ষণে সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কারের অধ্যাপক তিনি লিপি বিষয়ে বিস্তর সাহায্য করিতেন। তাঁহার রচিত সংস্কৃত শ্লোকদ্বয় অদ্যাবধি প্রভাকরের শিরোভূষণ রহিয়াছে।"

গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ 'সংবাদ ভাস্কর' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস হইতে প্রকাশ করেন। ঐ পত্রের শীর্ষদেশে যে কবিতাটি শোভা পাইত তাহা প্রেমচন্দ্রের রচিত। কবিতাটি এইরূপ :

"ভ্রাতর্বোধসরোজ! কিং চিরয়সে মৌনস্ত নায়ং ক্ষণঃ
দোষদ্ধ্বান্তদিগন্তরং ব্রজ ন তেঽবস্থানমত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সৎকর্ত্তব্যমত্যাদরাৎ
গৌরীশঙ্কর-পূর্ব-পর্বতমুখাদুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥"

"কলিকাতা বার্ত্তাবহ" (প্রকাশকাল, ১৮৩৮ সনের ১৮ই জানুয়ারী) সংবাদপত্রের শিরোভাগে "কিং চান্দ্রী বিশদপ্রভা কিমথবা প্রাভাকরী চাতুরী" ইত্যাদি যে কবিতাটি ভূষিত ছিল তাহাও প্রেমচন্দ্রের রচনা। এইরূপ সুললিত সংস্কৃত কবিতা রচনায় প্রেমচন্দ্র সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আচার্য কৃষ্ণকমল আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, "আমার বোধ হয়, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের পর প্রকৃত কবিতা-পদবাচ্য সংস্কৃত শ্লোকরচনা একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়" (পৃঃ ২২৪)।

প্রেমচন্দ্র প্রাচীন পদ্ধতিতে শিক্ষিত হইলেও সেকালে প্রতীচ্যের পণ্ডিতগণের মধ্যে ভারতীয় বিদ্যাচর্চার যে নূতন পদ্ধতির প্রচলন ছিল তাহার সহিত তিনি বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা কালেই প্রেমচন্দ্র তাম্রশাসন, প্রস্তর-লিপি প্রভৃতির পাঠোদ্ধার করিতেন এবং এই সূত্রে জেমস্ প্রিন্সেপ-এর সহিত তাঁহার পরিচয়

---

১০ পুরাতন প্রসঙ্গ, পৃঃ ২২৩-২৬,

১১ ১২৪৪ বঙ্গাব্দের ২রা বৈশাখের সংখ্যার "জীবিত লেখকদের" নামের সূচী মুদ্রিত হয়। উহাতে প্রেমচন্দ্রের উল্লেখ আছে। (দ্রষ্টব্য, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাময়িক পত্র)

হয়। প্রিন্সেপ (১৭৯৯-১৮৪০) ১৮১৯ সনে কলিকাতা টাঁকশালে সহকারী 'এসে মাষ্টার' হইয়া আসেন। তিনি পরে এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ও জার্নালের সম্পাদক নিযুক্ত হন। প্রেমচন্দ্র প্রিন্সেপের প্রাচীন ভারতীয় লিপির পাঠোদ্ধারে অন্যতম সহায়ক ছিলেন। বিশিষ্ট পুরাতত্ত্ববিদ্ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও রাজা রাধাকান্ত দেবের সহিত তাঁহার বিশেষ জানাশোনা ছিল।

গ্রন্থাবলী

সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রথমযুগে কলেজের ছাত্রগণের পাঠের জন্য General Committee of Public Instruction-এর তত্ত্বাবধানে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। প্রেমচন্দ্র এইরূপ কয়েকটি গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়া সম্পাদিত করেন। উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দিলাম।

১। রঘুবংশ, পৃঃ ৬৬৮, ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ। পাণিনির অধ্যাপক গোবিন্দরাম উপাধ্যায়, নাথুরাম শাস্ত্রী ও প্রেমচন্দ্র ঐ গ্রন্থের টীকা রচনা করেন।

২। নৈষধচরিত।

৩। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্। প্রাকৃত ভাষার টীকা সহিত। ইং ১৮৩৯, বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত, পৃঃ ১০৯।

৪। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্। ব্যাখ্যা সমেত। পুস্তকটির পাঠনির্দ্ধারণের জন্য কাওয়েল পুঁথি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। প্রথম প্রকাশ ১৮৫০। পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক রামময় তর্করত্ন কর্তৃক পরিশোধিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইং ১৮৬৪।

৫। রাঘবপাণ্ডবীয়, 'কপারিবিপাটিকা' নামে সংস্কৃত টীকা সমন্বিত। পৃঃ ৪২৫, সংবৎ ১৯১০।

৬। সপ্তশতীসার (দেবী মাহাত্ম্যের টীকা), শকাব্দ ১৭৮০, পৃঃ ২২, বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত।

৭। মুকুন্দমুক্তাবলী, শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র ও চাটুপুষ্পাঞ্জলি, শ্রীরাধাস্তোত্র। বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত, শক ১৭৮১।

৮। অনর্ঘরাঘব, টীকাসহিত। পৃঃ ২৪২, বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত, ইং ১৮৬০।

৯। উত্তররামচরিত, টীকাসহিত। কাওয়েলের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত ইং ১৮৬২। এই গ্রন্থের সম্পাদনার জন্য কাওয়েল কাশী ও তেলাঙ্গানা হইতে পুঁথি আনাইয়া দেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে কাওয়েলের "নোটিশ" আছে।

১০। কুমারসম্ভব (৮ম সর্গ) পৃঃ ৪৭, ইং ১৮৬২। ১৮৬২ সনের এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নাল-এ Notices of Books-এ এই গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হয়।

১১। কাব্যাদর্শ, মালিন্যপ্রোঞ্ছনী নামক টীকাসহিত। পৃঃ ৪৪৮, ইং ১৮৬৩, এসিয়াটিক সোসাইটির তত্ত্বাবধানে "বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা সিরিজ"-এ প্রকাশিত হয়।

১২। সমস্যাকল্পলতা। সমস্যাপূরণশ্লোক সংগ্রহ। হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন লিখিয়াছেন, "এই গ্রন্থে দেখা যায় যে, তৎকালীন কলেজের পণ্ডিতগণ প্রায় সকলেই সমস্যাপূরণ করিয়া শ্লোক লিখিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়, আমার পিতৃদেব গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়, তারাশংকর তর্করত্ন মহাশয়, মদনমোহন তর্কালংকার মহাশয়, ইত্যাদি পণ্ডিতগণের নাম ঐ পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়।" (প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৩২ সন)। "সমস্যাকল্পলতা" জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

ইহা ব্যতীত "পুরুষোত্তম রাজাবলী" নামক একটি কাব্য রচনা সুরু করেন। উহা মাত্র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। প্রেমচন্দ্রের মৃত্যুর পর "সোমপ্রকাশ" পত্রে তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হয়। উহাতে লিখিত আছে যে, প্রেমচন্দ্র "কয়েকখানি নূতন গ্রন্থ করিতে আরম্ভ করিযাছিলেন, কিন্তু কোনও কারণে তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই। শালিবাহন চরিত প্রথম, ইহা মহাকাব্য হইত, ইহার চতুর্থ সর্গ পর্য্যন্ত রচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় নানার্থসংগ্রহ নামক অভিধান, ইহাতে অকারাদিক্রমে মকারাদি শব্দ পর্য্যন্ত সংগৃহীত হইয়াছিল। সম্প্রতি একখানা নূতন অলংকার গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছিলেন। উহার দুই পরিচ্ছেদ মাত্র লিখিত হইয়াছে।" (সোমপ্রকাশ, ২৬শে চৈত্র, ১২৭৬ বঙ্গাব্দ।)

বউ

ত্রিপুরানেনী গোপিচন্দ
অনুবাদ—সোমানা বিশ্বনাথম্

তায়ারাম্মা কাঁদছে। ভারতীয় নারী এর বেশী আর কি করতে পারে!

আগেকার দিনের মহিলা হলে বুক চাপড়ে চিৎকার করে কাঁদত। আজকাল কাঁদে রান্নাঘরের কোণে বসে। যে কোন ভাবে শোক কাঁদলেই হ'ল। কাঁদতে কাঁদতে আগেকার দিনে স্বামীর সঙ্গেই চিতেয় উঠত। 'মহান্ পতিব্রতা! কী সুন্দর মৃত্যু বরণ করেছে!' বলে লোকে প্রশংসা করে অন্যদের উৎসাহিত করত ঐ ভাবে মরতে। ঐ ব্যবস্থাকে প্রশংসা করে পুরুষেরা গ্রন্থ রচনা করেছে বহু। চোখের কোণে কি ভাবে অশ্রু মুক্তোর মত চিক্ চিক্ করছে—তা তাদের বর্ণনা থেকে বাদ পড়ে নি। কোথায় ঐ মুক্তাবিন্দু পড়েছে তাও তাদের চোখ এড়িয়ে যেতে পারে নি। এই সব ঐতিহ্যের বার্তা বর্তমান নারীকুল-এর ঊর্ধ্বে আর কতখানিই বা উঠতে পারে। দুঃখে ব্যথায় কাঁদে। দিনের পর দিন কেঁদে সমাধান খোঁজে। শেষ পর্য্যন্ত পাতিব্রত্য গ্রহণ করে চুপ করে। আর কাঁদতে পারে না। এই ভাবেই তো চলেছে আমাদের হিন্দুরাজ্য।

থাক্, আমি কিন্তু এখন লিখছি তায়ারাম্মা সম্পর্কে—হিন্দুরাজ্য সম্পর্কে নয়। পাতিব্রত্য সম্পর্কেও নয়।

তায়ারাম্মা কাঁদছে বলেছি। এই কান্নার ব্যাপারে তার নিজের যে কোন দোষ নেই সেটাই এখন বলব। না কেঁদে কি বা করবে? একজনকে সে বিশ্বাস করেছে। নিজের জীবন তার হাতে সঁপে দিয়েছে। এখন সে তার অপছন্দ। সে স্বামীর কোন অনিষ্ট করে নি। দোষ করে নি। এমন কিছু সে করে নি যাতে স্বামী অপমানিত হয়। ওসব কিছুই নয়।

বছরখানেক ধরে সে বাতে ভুলছে। খুব মোটা হয়েছে তায়ারাম্মা। তার অনিচ্ছাতেই মোটা হয়েছে। মোটা হলে যে বিশ্রী দেখায় তা সে জানে। তাই রোগা হওয়ার অনেক চেষ্টা-চরিত্র করেছে। ওষুধ খেল, খাওয়া কমাল। যোগ, ব্যায়াম করল। মাঝে মাঝে সামান্য একটু ওজন কমে কিন্তু আবার পরবর্তী দু'চার দিনের মধ্যেই ফুলে ওঠে। শরীর খারাপ, একটু বয়সের ব্যাপার তো হবে কি? তার জন্য অত দুঃখ করার কি আছে।

বিয়ের প্রথম প্রথম তায়ারাম্মাকে স্বামী কি ভালই না বাসত। ছায়ার মত তার কাছাকাছি থাকত। একদিন বলেছিল, 'তায়ারাম্মা, তোমার নামটা আমার কাছে ভাল লাগছে না। পালটে দি, কেমন?'

'থাক্না।'

'না। ওসব শুনব না। আমার অনুরোধ রাখতেই হবে তোমাকে।'

নাম বদলাতে রাজী হ'ল। কিন্তু কি নাম রাখা যায় তাই নিয়ে দেখা গেল এক বিভ্রাট। স্বামী রাখল, 'পুষ্পাবতী।'

'ধেৎ।' তার মনে পড়ল রজস্বলা হওয়ার দিন, বিয়ের দিন। স্বামী আর একটা নাম রাখে, 'রাজ রাজেশ্বরী।' সেটাও ভাল লাগল না।

'তা হলে তুমি নিজেই বল কি নাম রাখা যায় তোমার।' কথাটা শুনে বউও আকাশ পাতাল ভেবে কিছু ঠিক করতে পারল না। সেদিন থেকে ঐ প্রসঙ্গ চাপা দিল।

কিন্তু অন্য একদিন স্বামী বলে, 'তোমার নাম শ্যামলী রাখছি। গররাজী হলে কিন্তু চলবে না।'

সে দিনের তায়ারাম্মা আর আজকের স্থূলাঙ্গী তায়ারাম্মার সঙ্গে ব্যবহারের ক্ষেত্রে কত পার্থক্য ধরা পড়ে। আজকাল সে বউকে বেড়াতে নিয়ে যায় না। গেলেও রাত বেশী হলে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যায়। শেষের ট্রিপটি দেখিয়ে আনে। নিয়ে যায় আর সোজা নিয়ে আসে ঘরে। অন্য দম্পতি সঙ্গে থাকলে পার্কে নিয়ে যায়। ভরসা এই যে, দর্শকরা ধরতে পারবে না কে তার বউ। পথ চলার সময়ও একটু দূরে দূরে থাকে। সন্ধ্যায় তায়ারাম্মা চুল বাঁধে। স্নো মাখে। অফিস ফেরতা স্বামীর প্রতীক্ষায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। স্বামী আসে আর তাকায় তার স্থূল অঙ্গের দিকে নাসিকা কুঞ্চন করে।

এই অবস্থায় স্বামীর ঘর করবে কি করে তায়ারাম্মা। কেন থাকবে? পাতিব্রত্যের প্রশ্নও তাকে জড়িত বটে। মনে মনে বলে আমার জীবনে তো আর কোন সুখ নেই। 'ওকে' সুখী করার জন্যই বাপের বাড়ী চলে

যাওয়া উচিত। বাপের বাড়ী রওনা হয়ে গেল। নিজের ভারী শরীরটাকে অনেক কষ্টে নিয়ে গেল বাস ষ্ট্যাণ্ডে।

বাস আসছে যাচ্ছে। যারা নাবার নাবছে, যারা যাওয়ার যাচ্ছে। যাত্রীদের দেখে তার কেমন যেন লাগল। অসহ্য লাগল তার। এই পোড়া পৃথিবীতে একের খবর অন্যে যেন রাখতেই চায় না। কোথায় যাচ্ছে তারা। এত তাড়া কেন? একটু দেরী করে গেলে এমনকি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে। সেই মুহূর্তে তার মনে হ'ল যেন এই বিরাট মানব জাতির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। অগণিত মানুষের মাঝে থেকেও সে একা। একান্ত ভাবেই একা। এখন একমাত্র তার সাথী হবে একটি বাস। না, কতক্ষণ আর ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা যায় বাসের অপেক্ষায়। একটা বাস এসে তার বিরাট শরীরটাকে যেন অনেক কষ্টে নেড়ে গাঁ গাঁ করে আর্তনাদ তুলে চলে গেল। তার বাপের বাড়ীর যাওয়ার বাসটা এখন আসছে না। বিরক্তি লাগছে দাঁড়িয়ে থাকতে। গজ কুড়ি দূরে গিয়ে দাঁড়াল সে। অদূরে একটি তরুণী বসে আছে। পাশে একটি পুঁটলি। গাছে হেলান দিয়ে বসে আছে সে। তায়ারাম্মা তার কাছে গেল। তাকে দেখেই তার মন ছটফট করতে লাগল। কি সুন্দর ছিপছিপে নিটোল স্বাস্থ্য! কি চমৎকার দেখাচ্ছে! নিখুঁত একটি প্রতিমা যেন! পাশ দিয়ে দেখলে গালের রেখাগুলো অপূর্ব দেখাচ্ছে। মহান শিল্পীর অবকাশ মুহূর্তের ফসল যেন। যতবার তার দিকে তাকাচ্ছে ততবারই তায়ারাম্মার মনে হচ্ছে যেন তার নিজের শরীরের ভার বাড়ছে। বুকটা যেন আরও ভারী ঠেকছে। সামনের দিকে হাত রেখে আস্তে আস্তে মাটিতে বসে পড়ে। হঠাৎ একটা উপায় উদ্ভাবন করার ইচ্ছা পেলে গেল তার মাথায়। দারুন ইচ্ছা করল কি ভাবে অমন সুন্দর ছিপছিপে চেহারা করা যায় জিজ্ঞেস করতে।

কিন্তু কি ভাবে জিজ্ঞেস করা যায়। কি বলে সম্বোধন করা যায়। কিছুই ঠিক করতে পারল না।

কিছুক্ষণ পর তায়ারাম্মা বলল, 'পাতা ঝরছে।'

'হুঁ' বলে ঐ তরুণীটি তার দিকে মুখ ফেরাল।

ইস্পাতের ফলার মত তার চোখ চিক্ চিক্ করছে। মেয়েটি তায়ারাম্মার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। যেন গিলছে তাকে। চোখ ফেরাতে পারছে না। ফেরাচ্ছে না।

তায়ারাম্মার শরীরটা থর্ থর্ করে কেঁপে উঠল। মেয়েটি এখনও তার দিকে তাকাচ্ছে।

কিছু একটা বলা দরকার, 'এই দেশে ঝরা পাতার চেয়ে পুরুষের সংখ্যা বেশী।'

মেয়েটি কোন জবাব দিল না। তেমনি অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল। স্বামীর মতই কি সেও আমার শরীরের ওজন নিচ্ছে? মনে মনে ভাবে তায়ারাম্মা। না, তার চোখ অন্য দিকে ফেরাতে হবে।

'শুকনো পাতাগুলো মচ মচ করছে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' মেয়েটি বলে।

'মাড়ালে বেশ শব্দ হয়।'

'না মাড়ালেও হয়।'

কি চমৎকার কণ্ঠস্বর মেয়েটির। ঠোঁট নাড়লেই যেন সুধা ঝরে পড়ছে। কথা নয় ত যেন জলতরঙ্গ। কি মিষ্টি গলা, যেন সিমেন্টের মেঝেতে কিছু ঘসছে। তার স্বর শুনে তায়ারাম্মার মনে নিজের প্রতি একটা ধিক্কার জন্মাচ্ছে। যাই হোক, জিজ্ঞেস করতে হবে কি ভাবে এত সরু গলা করেছে সে। ওর দিকে না তাকিয়ে বালিতে রেখা টানতে টানতে বলে, 'দেখছেন?'

'কি?'

'ওটা।'

'কোনটা?'

'ঐ যে।'

'বাস?'

'হুঁ'

আর কথা চালানো গেল না। দুটো বাস ভারিক্কি-চালে এসে থামল। একটা ঐ চালেই চলে গেল। অত ভারী বাসের অল্প সময়ের মধ্যে তীব্র গতি দেখে অজানিত কারণে যেন তায়ারাম্মার খুব ভাল লাগল। মনে বেশ সাহস সঞ্চারিত হ'ল।

বলে, 'কি বিশ্রী রকমে ভারী।'

'কি।' চোখের পাতা না ফেলেই বলে ঐ তরুণী।

'ভারী।'

'কোই?'

'ঐ যে।'

'কোনটা?'

'ঐ বাসটা।'

ঐ মেয়েটি তায়ারাম্মার দিকে তখনও অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তাকে যেন গিলছে। লজ্জায় মারা যাচ্ছে তায়ারাম্মা। স্নানাগার মনে পড়ে যায় তার। বাসে লোক উঠছে, নামছে। এই বাসগুলো কি মানুষকে

এক দুনিয়া থেকে আর এক দুনিয়ায় নিয়ে যাচ্ছে? কোথাও না নেবে ক্রমাগত যদি ঘোরা যায়, বেশ হয়। ভবঘুরেরা বেশ ঘোরে বাসে বাসে। ওদের এইটাই ঘর, বাড়ী, এইটাই দুনিয়া।

'কোথায় সে যাচ্ছে?' তায়ারাম্মা জিজ্ঞেস করল।

'কি?'

'বাসগুলো।'

'কে জানে।'

তায়ারাম্মা সাহস করে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

'আমি?'

'হুঁ।'

'এই যাচ্ছি আর কি।'

'কোথায় যাচ্ছেন বলুন না?'

'বাপের বাড়ী।' মেয়েটি চিন্তিতস্বরে বলে।

অমন সুন্দর স্বাস্থ্যবতীকেও একা একা বাপের বাড়ী যেতে হচ্ছে কেন? তায়ারাম্মা চিন্তা করছে···

বাস ছেড়ে দিল। একটি বৃদ্ধা প্রশ্ন করতে এগিয়ে যায় বাসের দিকে। বাসের কণ্ডাক্টারগুলো তার হাত ধরে টানাটানি করছে। হঠাৎ একজন তার পুঁটলিটা নিয়ে তুলে নিল বাসে। বুড়ীটি ঠায় দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল কিছুক্ষণ।

তায়ারাম্মা বলল তরুণীটিকে, 'আপনার স্বাস্থ্যটা চমৎকার ছিপছিপে?'

'আমার?'

'হুঁ।'

'ছিপছিপে?'

'হুঁ।'

মেয়েটি আর কথা বলল না।

'কি করে হ'ল বলত?'

'আমার কর্মফল।'

তায়ারাম্মা চমকে উঠল। তাদের মাঝে ব্যবধানের যে পর্দা ছিল তা যেন সরে গেল। তায়ারাম্মা তার দিকে বিস্মিত ভাবে তাকিয়ে বলে, 'কেন?'

'আমার চেহারা রোগা বলে 'উনি' পছন্দ করেন না।'

'পছন্দ করেন না?'

'না।'

'কারণটা কি?'

'মোটা নই বলে!' মেয়েটি'র চোখে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু চিক্ চিক্ করে ওঠে। চোখের কোণা বেয়ে টপটপ করে জল পড়ে।

তায়ারাম্মার শরীরে বিদ্যুৎ খেলে যায় যেন। নতুন এক চেতনা তার মস্তিষ্কে খেলে যায়। অজানা কোন এক কারণে তার শরীরে যেন নতুন শক্তি সঞ্চারিত হয়। নতুন করে কয়েকটা প্রশ্ন মনে জাগে। ছিপছিপে স্বাস্থ্যও আবার কয়েকজনের অপছন্দ। এই স্বামীদের মধ্যে আবার কত রকমকের। এক এক রকমের স্বামীর সঙ্গে এক এক রকমে খাপ খাওয়াতে হয় বউদের। তাঁদের মত অনুযায়ী। বউদের নিজস্ব ইচ্ছা বলে কিছু থাকবে না। স্বামীর সঙ্গে তাল রেখে গুটি গুটি পা পা করে সারা জীবন কাটাতে হবে। কেন, স্বামীরাই ত অনুসরণ করতে পারে বউদের। পাশের মেয়েটির উপস্থিতিও ভুলে গিয়ে তায়ারাম্মা গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ে।

'আমাকে একটা কথা বলবেন না?' মেয়েটি চোখের জল মুছে নিয়ে চোখের ভেজা পাতা পিট পিট করতে করতে প্রশ্ন করে

কিন্তু তায়ারাম্মা তার কথায় কান পাতলো না। কারো কথা কান পেতে শোনার অবস্থায় নেই যে। দুটি দম্পতি তার সামনে দিয়ে বাসের কাছে এগিয়ে গেল। স্বামী এমনভাবে এগিয়ে যাচ্ছে যেন পিছনের ঐ পদার্থটির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। পিছনের ঐ বস্তুটি কিন্তু বগলে একটি পুঁটলি নিয়ে, স্বামীর উপরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তার কাছাকাছি পৌঁছানোর জন্য দ্রুতগতিতে হাঁটছে।

তরুণীটি আবার দীনকণ্ঠে প্রশ্ন করে, 'কই বললেন না, আপনি কি ভাবে মোটা হলেন?'

তায়ারাম্মার নজর ঐ তরুণীর দিকে পড়ছে না। তার কথা কানে ঢুকছে না।

অন্য দম্পতির স্বামী বাসে উঠে পড়ল। একটি বাচ্চাকে কোলে করে বউটি বাসে উঠার চেষ্টা করছে। বাচ্চাটি কোল থেকে নেবে যাচ্ছে। বউ লজ্জায় যেন মরে যাচ্ছে। বেচারী উঠতে পারছে না বাসে। অসহায় ভাবে স্বামীর দিকে তাকায়। স্বামী ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে একবার তাকিয়ে চট করে মুখ ঘুরিয়ে নেয় অন্য দিকে। বাচ্চা মেয়েটি কেঁদে ওঠে। কণ্ডাক্টর বলে, 'এই হয়েছে এক ঝামেলা।' স্বামীটি মনে মনে রাগে ফুঁসে উঠলেও মুখ আর ঘোরাচ্ছে না বউ-এর দিকে। এই অবস্থায় কেউ তার বউ বলে চিনে ফেলুক—এটা যেন চায় না। রাগ যতই থাকুক, দমন করে বসে ছিলেন।

তায়ারাম্মা চিন্তা করল, সব স্বামীই কি একই ধরের।

বিভিন্ন ধরনের স্বামীর মধ্যে তার স্বামীও তো একজন। তার চোখের উপর দুটি দৃশ্য ভাসে।

একটি : পাশের বাড়ীর মুক্তামার ছেলেপুলে হয় নি বলে অহর্নিশি বউকে জ্বালিয়ে মারত। ডুবে মরতে বলত প্রায়ই। অবশেষে সে আর একটি বিয়ে করল।

অন্যদৃশ্য : ভেজামা নজরে পড়ল। না চাইলেও বহু ছেলেপুলে হয় তার। এর জন্য বউকেই দায়ী করে সে। মুখে যা আসে তাই বলে বউকে গালাগাল দিত। কেরোসিন তেল ঢেলে নিজেকে পুড়িয়ে শেষে একদিন বউ আত্মহত্যা করে মরে বাঁচল।

ওসব ভেবে তায়ারাম্মা দারুণ ভাবে বিচলিত হ'ল। সব বিষয়ে বউরাই কি বাধ্য থাকবে! তা হবে কেন? কার দোষে? আমিই বা ছিপছিপে হব কেন? আমার স্বামীই আমার মত মোটা হোক না।

হঠাৎ তার মনে হ'ল, তার স্বামী কত রোগা। গালগুলো খোবড়ানো। তারই তো উচিত মোটা হওয়া। আমি তাকে বলব, বলব মোটা হতে। স্বাস্থ্য ভাল করতে।

ঐ তরুণীটি জিজ্ঞেস করল, 'বলবেন না? আমার ভাগ্যে কি আর স্বামীর ঘর করা হবে না। আপনি কি এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করবেন না?'

তায়ারাম্মা তার কথায় কান না দিয়ে ফিরে গেল ঘরের দিকে। অত ভারী শরীর নিজের কাছে এখন মনে হচ্ছে তুলোর মত হাল্কা, ওজন যেন কমে গেছে অনেকখানি। দ্রুতগতিতে হাঁটতে থাকে। ঘরে গিয়ে দেখে স্বামী রান্নাঘরে হাত পুড়িয়ে ফেলেছে। বঁটিটা পায়ের কাছেই পড়ে আছে। একটা থালে আছে ট্যাঁড়স ভাজা।

উনুনে কি যেন ফুটছে। তার ঐ দুরবস্থা তায়ারাম্মার মনে নাড়া দেয়। সহানুভূতিতে ভরে ওঠে তার মন। রাগ কমে গেল। যে প্রশ্নগুলো স্বামীকে করার জন্য এতক্ষণ তোলপাড় করছিলো মনে সেগুলো কোথায় যেন হারিয়ে গেল। ওসব দেখতে দেখতে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে তায়ারাম্মা।

স্বামী একটা ন্যাকড়া নিয়ে এল। ঐ ন্যাকড়া দিয়ে হাঁড়ি নাবাতে গিয়ে হাত পুড়লো তার।

তায়ারাম্মার মন ছটফট করে ওঠে। সব পুরুষই নাবালক। আকৃতিতে সামান্য তারতম্য আছে বটে। এদিক দিয়ে সবাই অনভিজ্ঞ। অনাদিকাল থেকে অর্জিত দাস মনোবৃত্তি (কবির ভাষায় মাতৃহৃদয়) তায়ারাম্মার মনে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু চোখের কোণে জমে গেল। তায়ারাম্মা বলল, 'কি দরকার ছিল তোমার এসব করতে যাওয়ার?'

স্বামী মাথা তুলে দেখল বউকে। গোটা আঙিনায় যেন দেখতে পেল তায়ারাম্মাকে। রাগ হ'ল তার। পৌরুষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, মুখে গোঁজা আঙুল বের করে আবার হাঁড়ি নাবাতে হাত বাড়াল। তৎক্ষণাৎ তায়ারাম্মা এক টানে স্বামীর হাত সরিয়ে বলে, 'থাক্ খুব হয়েছে, আর বাহাদুরী দেখাতে হবে না। যাও, স্নান করে এসো। ইতিমধ্যে আমার রান্না হয়ে যাবে।'

স্বামীর চোখে যেন আগুন জ্বলছে। কাঁঝালো গলায় বলে, 'এতক্ষণ ছিলে কোথায়? কোন জাহান্নমে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে?' যা মুখে এসেছে তাই এক নিঃশ্বাসে বলে আবার আঙুলগুলো মুখে পুরে নিল।

তার রাগ দেখে তায়ারাম্মার ভালই লাগল। তার রাগ আনন্দের খোরাক জোগাল। জীবনে তার পদদলিত, অবহেলিত মনুষ্যত্ব যেন কিছুটা শান্তি পেল।

'হুঁ, আর কিছু বলবে?' বলে তার দিকে তাকিয়ে তায়ারাম্মা মুখ টিপে টিপে হাসে।

এ সব স্বামীর কাছে অসহ্য লাগে। সেখান থেকে গজ গজ করে যেতে যেতে হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে তাকাল বউয়ের দিকে। ততক্ষণে তায়ারাম্মা উনুনের কাছে ভূদেবীর মত পা ছড়িয়ে বসে ফুঁ দিতে উবু হয়েছে।

'ঈস্! কি মুটকী হয়েছে বউটা', মনে মনে বলে অসহ্য এক বিরক্তিতে স্বামী বেরিয়ে যায় রান্না ঘর থেকে।

রবীন্দ্রনাথ ও চন্দননগর

শ্রীহরিহর শেঠ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নবনবতিতম জন্মোৎসবে তাঁর উদ্দেশে আমাদের অন্তরের স্বতঃ উৎসারিত শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। পূজ্যপাদ মহাপুরুষদের কথা স্মরণ করে শ্রদ্ধাভক্তি স্বতঃই উদয় হয়ে থাকে, কিন্তু এমন গর্ব্ব এমন গৌরবের সঙ্গে এর পূর্ব্বে কোন মহামানবের স্মৃতিতর্পণের সৌভাগ্য আমাদের বাংলা বাঙালী জাতি তথা ভারতবাসীর কখন হয় নাই। আমরা জন্মাষ্টমী রামনবমী বুদ্ধ পূর্ণিমা প্রভৃতি তিথিগুলি শ্রদ্ধার সহিত পালন করে থাকি, দেবোদ্দেশে পূজাদি করি। কিন্তু সেও বুঝি এই ভারতের মধ্যে এত ব্যাপক ভাবে নয়।

রবীন্দ্রনাথ কবি, দার্শনিক, দেশপ্রেমিক, নাট্যকার ঔপন্যাসিক, রাজনীতিজ্ঞ প্রভৃতি বহু গুণের অধিকারী এক মহামানব ছিলেন। জগতে কালে কালে অনেক কবি অনেক দার্শনিক বহু প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে কিন্তু একাধারে এত গুণসম্পন্ন এত বড় কবি কেহ জন্মগ্রহণ করেছেন কি? এর একমাত্র উত্তর 'না'। সেক্সপিয়র, মিল্টন, কালিদাস, বাল্মীকি, গেটে, স্কট, বায়রণ প্রভৃতি বহু শ্রেষ্ঠ কবির উদ্ভব হয়েছে। তাঁরা জগৎবাসীর কাছে অমর হয়ে আছেন। সংবাদপত্রাদি হতে অবগত হই, আমেরিকা ইউরোপ প্রভৃতি বিশ্বের দূরতম মহাদেশেও রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উৎসবের আয়োজন হচ্ছে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বরেণ্য কবিদের মধ্যে কাহারও জন্য কোন উপলক্ষ নিয়ে এমন বিশ্বব্যাপী উৎসবের আয়োজন এর পূর্ব্বে হয়েছে বলে কেহ শুনেন নাই বা কল্পনাও করেন নাই। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বা বিশ্বকবি এ আখ্যা আজকের নয়, কোন সরকারদত্ত উপাধিও নয়। কবির অগণিত অনুরক্ত ভক্তদের স্বতঃ উৎসারিত অভিব্যক্তি হইতে ইহার উৎপত্তি।

রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী ভাষাতেও কবিতাগ্রন্থ লিখিলেও তিনি বাংলা ভাষা ও বাংলার কবি ছিলেন। সুতরাং তাঁর দ্বারা জগৎ সমীপে বাংলা ভাষা ও বাংলা তথা ভারতের যে গৌরব বৃদ্ধি হয়েছে তাহার তুলনা হয় না। এ দিক দিয়া বিচার করতে হলে এ যুগে বা এর পূর্ববর্তী যুগে এ হেন আর দ্বিতীয় ব্যক্তি বাংলায় জন্মগ্রহণ করেন নাই একথা নিঃসঙ্কোচেই বলা যায়।

কবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন কলকাতায়। জোড়াসাঁকোয়, তাঁর বাসকক্ষ তীর্থরূপে আজ সাধারণের জন্য অবারিত মুক্ত রাখা হয়েছে। সহস্র সহস্র ভক্ত নর-নারী সে পুণ্যস্থান দর্শন করে কৃতার্থ বোধ করছেন। স্বার্থান্ধ কূপমণ্ডুক বলে আমি হয়ত কোথাও কোথাও অভিহিত হলেও, এই পুণ্য দিনে শুভ অনুষ্ঠানে এখানে এমন যদি কেহ থাকেন যাঁর জানা নাই তাঁর জন্য না বলে পারি না। যে পুরুষোত্তমের শ্রেষ্ঠ পরিচয় কবি, তিনি কলিকাতায় পিতৃগৃহ জোড়াসাঁকোর ভবনে পৃথিবীর আলোক প্রথম দর্শন করলেও, যে প্রতিভার আলোকপ্রভায় আজ তিনি বিশ্বে পরিচিত, বাংলা তথা ভারত যার প্রভায় আলোকিত, সেই প্রতিভার প্রথম উদ্বোধন হয় এই শহরের গঙ্গার ধারে অধুনা লৌহদন্তদন্তুর কলের কবলে কবলিত একটি বাড়িতে। এ আমার কথা নয়, আমার গবেষণার ফল নয়। ১৩৩৪ সালের ২১শে বৈশাখ তারিখে এমনই এক সন্ধ্যায় নাগরিক সম্বর্দ্ধনার উত্তরে এই কক্ষে এই মঞ্চোপরি বসে কবি স্বহস্তে এই নগরীর ভালে যে সোনার তিলক অঙ্কিত করে দিয়ে গেছেন তা অক্ষয় হয়ে চির ভাস্বর হয়ে থাকবে। তখন তাঁর জীবনস্মৃতি লেখা হয় নাই। তখনই তাঁর নিজের কথা হতে জগৎ জনের প্রথম জানবার সুযোগ হয়, যে তাঁর কবি-জীবনের উদ্বোধন হয় এইখানে। সে দিনের তাঁর নিজের কথা—

"ছেলে মানুষের বাঁশি, ছেলে মানুষী সুরে যেখানে বাজত সে আমার মনে আছে। মোরাণ সাহেবের বাগানবাড়ী, বড় যত্নে তৈরি, তাতে আড়ম্বর ছিল না, কিন্তু সৌন্দর্য্যের ভঙ্গী ছিল বিচিত্র। তার সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় একটি ঘর ছিল, তার দ্বারগুলি মুক্ত, সেখান থেকে দেখা যেত ঘন বকুল গাছের আগডালের চিকণ পাতায় আলোর ঝিলিমিলি। চারদিক থেকে দুরন্ত বাতাসের লীলা সেখানে বাধা পেত না, আর ছাদের উপর থেকে মনে হ'ত মেঘের খেলা যেন আমাদের পাশের আঙিনাতেই। এইখানে ছিল আমার বাসা, আর এইখানেই আমার মানসীকে ডাক দিয়ে বলেছিলাম—

এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর
তোর তরে কবিতা আমার।"

ঠিক এই কথাই পরে তাঁর জীবনস্মৃতিতে লিখেছিলেন,

"বাড়ীর সর্ব্বোচ্চতলে চারিদিক খোলা একটি গোল ঘর ছিল। সেইখানে আমার কবিতা লিখিবার জায়গা করিয়া লইয়াছিলাম। সেখানে বসিলে ঘন গাছের মাথাগুলিও খোলা আকাশ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়িত না। তখনো সন্ধ্যাসঙ্গীতের পালা চলিতেছে—এই ঘরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই লিখিয়াছিলাম:

অনন্ত এ আকাশের কোলে
টলমল মেঘের মাঝার—
এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর
তোর তরে কবিতা আমার।"

এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'কবি মানসী' নাম দিয়া প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে 'শনিবারের চিঠি'তে লিখেছিলেন,—"জীবনস্মৃতিতে কবি নিজেই লিখেছেন, তাঁর কাব্য লেখার ইতিহাসের মধ্যে এই সময়টাই তাঁর পক্ষে সবচেয়ে স্মরণীয়। এই চন্দননগর-পর্ব্বই কবিজীবনে 'সন্ধ্যাসংগীতে'র পর্ব্ব। 'সন্ধ্যাসংগীতে'র পূর্ব্ববর্ত্তী কবিতাগুলিকে কবি কাঁচা বয়সে পরের লেখা নক্শা-করা কপিবুকের লেখার সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, 'সেই কপিবুকের চৌকাঠ পেরিয়েই প্রথম দেখা দিল 'সন্ধ্যাসংগীত'। 'সন্ধ্যাসংগীতে'ই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয়'।"

এই বলা বা এই লেখাই তাঁর চন্দননগরের সঙ্গে সম্পর্ক সম্বন্ধে শেষ কথা নয়। এ বিষয় কবি আরও স্পষ্ট করে বহু মনীষী, বাংলার প্রায় সকল প্রখ্যাত সাহিত্যিক কবি দার্শনিক ঐতিহাসিক প্রভৃতির সমক্ষে ১৩৪৩ সালে চন্দননগরে অনুষ্ঠিত বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন উদ্বোধন প্রসঙ্গে তাঁহার শারীরিক দীনতার কথা জ্ঞাপনান্তে প্রথমেই বলেন, "আজ আমার প্রতি ভার অর্পণ করেছেন এই সম্মেলনের উদ্বোধনের। উদ্বোধন এই কথাটি শুনে আমার মনে আর এক দিনের কথা এল। সেই সময় এই শহরের এক প্রান্তে একটা জীর্ণপ্রায় বাড়ী ছিল: সেইখানে আমার দাদার সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলাম। তার পর মোরাণ সাহেবের বিখ্যাত হর্ম্ম্যে আমাকে কিছু দীর্ঘকাল যাপন করতে হয়েছিল। বস্তুত এই গঙ্গাতীরে এই নগরের এক প্রান্তেই আমার কবি-জীবনের উদ্বোধন। সেটা ছিল আমার জীবনের সত্য ও সহজ উদ্বোধন।"

তিনি পুনরপি বলেন—"সেটা হ'ল প্রথম বয়স। তখন বাণী ফোটেনি, সুর বেরোয় নি। তার কিছুকাল পরে আমি মোরাণ সাহেবের বাগানে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেম। গঙ্গার তীরের উপর সেই হর্ম্ম্যের অলিন্দে ও সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় আমি অনেক রাত্রি কাটিয়েছিলেম এবং আকাশের মেঘের সঙ্গে ছিল আমার মনের খেলা। মনে করেছিলাম, যেন বিশ্ব কত কাছে নেমে এসেছে। তখনই আমার কবি-জীবনের প্রথম সূচনা হয়েছিল।"

"এটা ব্যক্তিগত কথা নয়। আমাদের দেশে সাহিত্যের সমাগম হয়েছে বসন্ত ঋতুর মত। কখন, কিভাবে, কেমন করে বসন্ত-দূতের মত এল তা জানি না, তবে তা বিকশিত করেছে সমস্ত মাধুর্য্যকে—রসকে পূর্ণ করেছে। যে উদ্বোধন সেদিন হয়েছিল, তার ইতিহাস ভাল করে লেখা হয় নাই। যখন ইংরেজী ভাষার অত্যন্ত গৌরব ছিল, তখন কেমন করে কোন আহ্বানে তা এল—সেই বসন্তের আহ্বানের মত—যাতে করে কবি-হৃদয়ে গান মুখরিত হয়ে উঠল, বাণী জাগরিত হয়ে উঠল—তার পরিচয় আজও হয় নি। যে বসন্ত সমাগম—তা চির-বসন্ত হয়ে রইল। আমার জন্মের পূর্ব্বেই তার সূচনা হয়েছিল।"

চন্দননগরের প্রতি যে প্রীতি যে আকর্ষণ তা কবির শেষ পর্য্যন্ত সমানই ছিল। জানি না সেটা মহান হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার মত কিছু কিনা। যাই হোক, আমি চন্দননগরের কীট, আমি ত তাই নিয়েই মেতে আছি। ভাষণ দানে আমার অক্ষমতার কথা জেনেও আজ যে রবীন্দ্রনাথ ও চন্দননগর সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, সেও তারই ফল। বলা বাহুল্য, সে জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনেও এখানকার গঙ্গার ধারে পাতাল-বাড়ী নামে অভিহিত বাড়ীতে একবার কিছুদিন বাস করেছিলেন। তিনি কলিকাতা হতে বোটে করে এখানে মাঝে মাঝে বেড়াতে আসতেন। এমনকি কখনও কখনও দুই-এক রাত্রি গঙ্গাবক্ষে কাটিয়েও যেতেন। আমি জানি, তিনি পুনরায় পূর্ব্বোক্ত বাটীতে আসবার জন্য শ্রীযুক্ত সত্যবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাড়ীটি ঠিক করে দিবার জন্য বলেছিলেন এবং তাহা না পাওয়ার অনুযোগ করেছিলেন।

শেষবার তিনি যখন চন্দননগরে আইসেন তখন তাঁহার শরীর অশক্ত, আমাদের একান্ত আগ্রহে সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্বোধন উপলক্ষেই এসেছিলেন। সে সময় আমার "জাহ্নবী-নিবাস" নামক যে বাটীতে সম্মিলন হয়েছিল, সেইখানেই আমাকে বলেছিলেন যে, দিন কতক তিনি ঐ বাড়ীতে এসে থাকবেন। আমার আর সে সৌভাগ্য হ'ল না। তিনি এখান থেকে ফিরে গিয়ে কিছুদিন পর শান্তিনিকেতন থেকে পত্রদ্বারা আশীর্ব্বাদাদি জানালেন—"কিছু দিনের জন্য তোমার গঙ্গাতীরের বাড়িতে বাস করতে পারলে খুসি হতুম, হয়ে উঠল না।

ভবিষ্যতের প্রত্যাশা রইল।" দুর্ভাগ্য আমাদের ভবিষ্যতের সে দিন আর এল না।

কৈশোর বা প্রথম যৌবনে চন্দননগরে বাসকালে তাঁর কবি-জীবনের সূচনা হয়েছিল, পরিণত বয়সে যখন তিনি এখানে ছিলেন, তখন এখানে বসে কি লিখেছিলেন না লিখেছিলেন তা জানবার সুযোগ হয় নি। তবে শুনেছি তিনি গঙ্গার দিকে চেয়ে প্রায়ই কি সব ছবি আঁকতেন। এখানে ১৩৩৪ সনে যখন এসেছিলেন, মনে আছে কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষা মন্দির পরিদর্শনকালে শিক্ষয়িত্রীগণ তাঁহার স্বহস্তাক্ষর সংগ্রহার্থ তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরেন। সেই সময় একজন শিক্ষয়িত্রীর বিনীত অনুরোধে দু'ছত্র কবিতা লিখিয়া দেন—

"বসন্ত যে লেখা লেখে বনে বনান্তরে,
নামুক তাহারই মন্ত্র লেখনীর পরে।"

মনে পড়ে সেই সময়ে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘেও বসে একটি ছোট কবিতা লিখেছিলেন, আর জানি ১৩৪২ সনে পাতাল-বাড়িতে বাসকালে আমাদের সত্যবিকাশবাবুর অনুরোধে তাঁহার আত্মীয়া শোভনার শুভবিবাহে কয়েক-ছত্র আশীর্বাণী কবিতায় লিখে দিয়েছিলেন, যা তাঁর হস্তা-ক্ষরের প্রতিলিপিতেই ছাপান হয়েছিল। এ ছাড়া আমার আর কিছু জানবার সুযোগ হয় নাই।

যাঁর দেওয়া অমূল্য সম্পদে আজ বঙ্গ-ভারতী সমুজ্জল, বাঙালী শত ব্যাধির পীড়ন সত্ত্বেও গৌরবে গর্ব্বে সমৃদ্ধ, তাঁদের মস্তক উন্নত। আমরা দীন হীন চন্দননগরবাসী ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হয়েও আজ মহামনীষীর নাম নিয়ে যেন কতকটা আত্মবিস্মৃত। আমাদের আর কিছু না থাকলেও রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার উন্মেষ এইখানে, কানাইলাল রাসবিহারী এইখানকার, একথাও ভুলবার নয়। তাঁদের পুণ্যস্মৃতি স্মরণ করে আমরা ধন্য। তাঁদের যোগ্য পূজার শক্তি ভগবান আমাদের দিন। তাঁরা চিরপূজ্য হয়েই থাকবেন তা হলেও এ সম্পর্কে আমাদের যে কর্ত্তব্য আছে তা যেন পালনে সক্ষম হই। শুধু বাহিরের দেখাদেখি এই সব অনুষ্ঠান কেবলমাত্র নিয়মরক্ষার আন্তরিকতাহীন একটা বাহ্যিক দৃশ্য মাত্র না হয়। আমরা এখনও অনেকে আছি যাঁরা তাঁদের প্রত্যক্ষ দেখেছি। এঁদের সুমহান কর্ম্মের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচিত। যদিও এঁদের কৃত কার্য্যাবলীই এঁদের চির অমর করে রাখবে, তা হলেও যেমন হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন পূজার জন্য সাক্ষাৎ প্রতিমার প্রয়োজন। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশীয়দের এ সকল লোকোত্তর মহাপুরুষদের পুণ্য স্মৃতি যাতে চিরজাগরূক থাকে সে ব্যবস্থা করার দায়িত্বও আমাদেরই।

বড়ই আশা ও আনন্দের কথা আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার কবির জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব যাতে উপযুক্তরূপে পালিত হয়, যদ্দ্বারা সাক্ষাৎ ভাবে তাঁর স্মৃতি চিরজাগরূক রাখবার ব্যবস্থা হয় সে বিষয় বিশেষ ভাবে অবহিত হয়েছেন। এ সম্পর্কে চন্দননগরের সম্বন্ধে যে বিশেষত্বটুকু আছে, আশা করি কর্তৃপক্ষ তাহার সম্বন্ধে বিবেচনা করতে বিস্মৃত হবেন না।*

* চন্দননগর মহকুমার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী কমিটির উদ্যোগে রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে পঠিত।

শ্রীলা গঙ্গোপাধ্যায় স্মরণীয়াসু

কল্যাণী দত্ত

যে গৃহে বিপুল বিত্ত বিত্তেরে করেছে আলিঙ্গন,
ব্রহ্মনিষ্ঠা সত্য যেথা সর্বোত্তম পেয়েছে আসন,
শুচি শ্রীমানের সেই গৃহে তুমি ছিলে অলঙ্কার
জীবন প্রসন্ন হেসে এনেছে বিচিত্র উপচার—
পিতার দাক্ষিণ্য আর মাতার জাহ্নবী স্নেহধারা,
বান্ধব জনের প্রীতি উচ্ছলিত বাধাবন্ধহারা।
বিত্তার মন্দিরে তুমি সুন্দরের করেছ সাধনা,
নিগূঢ় দর্শন সাথে মিলেছিল সঙ্গীত বাসনা,
পরিপূর্ণতার ছবি মূর্তিমতী আনন্দ প্রতিমা
লজ্জার বিনয়ে নম্র গৌরবের সৌভাগ্যের সীমা।

কি জানি কি প্রয়োজনে ব্যর্থ হোল এত আয়োজন
অকস্মাৎ চূর্ণ হোল মমতার সহস্র বন্ধন
ঘুচালে সংসার খেলা ভুলিলে শিশুর কচিমুখ
দুই পায়ে ঠেলে গেলে মৃত্তিকার তীব্র তপ্ত সুখ
সে রহিল পিছে পড়ি ছিলে যার সখী ও সচিব
আঁকিলে হৃদয়ে তার বিরহের স্মৃতি চিরজীব
রহিল কর্মের ক্ষেত্র কীর্তির অনন্ত সম্ভাবনা
অসম্পূর্ণ রয়ে গেল প্রতিভার দিব্য আরাধনা
অসীম নক্ষত্রলোক করিয়াছে তোমারে আহ্বান
জয়ী হোক পূর্ণ হোক শান্তির পশ্চিম অভিযান।

আধুনিক বাংলার ছাত্র ও শিক্ষক

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

গানের সঙ্গে বাজনার মিল না হইলে যেমন গানের আসর জমে না, তেমনি বিদ্যার্থীর সঙ্গে শিক্ষকের সংগত না হইলে বিদ্যাদান ও গ্রহণ সুসম্পন্ন হয় না। বাংলা দেশের শিক্ষার আসরে সে সংগত নষ্ট হইয়াছে, কাজেই সে আসরে আজ বেসুরা আওয়াজ ও কোলাহলের রাজত্ব।

ছাত্রের সঙ্গে পুত্র ও পুত্রীবৎ আচরণই এদেশের শিক্ষকের স্বধর্ম। সে ধর্মে 'পুত্রাৎ শিষ্যাৎ' পরাজয় শ্লাঘার বস্তু। সে পরাজয় শিষ্য-স্নেহের কষ্টিপাথর। এদিকে ছাত্রের তপস্যা জ্ঞানের। সে জ্ঞান কেবল পারমার্থিক জ্ঞান নয়। সে জ্ঞানের পরিধি বহু বিস্তৃত; পরিপূর্ণভাবে মনুষ্যত্বের বিকাশই তাহার লক্ষ্য। সে তপস্যার পথিকৃৎ কুশলী আচার্য। আচার্যের সঙ্গে শিষ্যের সম্পর্ক নিবিড়। সে সম্পর্ক শ্রদ্ধা ও ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েই আজ স্বধর্মচ্যুত, কাজেই তাহাদের সম্পর্কও আজ বিকৃত। কিন্তু কেন এমন হইল?

ছাত্র ও শিক্ষকের ব্যক্তিগত গভীর পরিচয়ের কথা এখন প্রায় ইতিকথার রূপ ধারণ করিয়াছে কিন্তু এই যোগসূত্রই যে বাংলা দেশের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সে কথা বাঙালীকে বার বার স্মরণ করাইয়া দেওয়া দরকার। বাংলার মনোরাজ্যে শিক্ষক একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন। তরুণ-তরুণীর ভাবজগতে শিক্ষকের প্রভাব ছিল অপরিসীম; এমনকি অনেকক্ষেত্রে সে প্রভাব ছিল পিতা-মাতার প্রভাব অপেক্ষাও বেশি। ইহা বেশি দিনের কথা নয়। তখন শিক্ষকের সঙ্গে তর্ক চলিত, আবদার চলিত, বিচার চলিত এমনকি বিবাদও চলিত—কোথাও কিছু বাধা ছিল না। আর সে তর্ক ও বিচার কেবল পুঁথিগত বিদ্যার নয়। পুঁথির বাহিরে যে বিরাট বিশ্ব আছে তাহার শত সহস্র রহস্য ছিল সে আলোচনার উপজীব্য। সর্বপ্রধান আলোচনার বিষয় ছিল চরিত্র। সমস্ত ঐশ্বর্যের মূলে যে চরিত্র গঠনের প্রয়োজন একথা সে শিক্ষকগোষ্ঠী মর্মে মর্মে বুঝিতেন আর তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টাও ছিল তাহাদের। অশ্বিনী দত্তের 'ভক্তিযোগ', স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী ছাত্রসাধারণের হাতে হাতে ফিরিত।

গীতার শ্লোক, হিতোপদেশের শ্লোকের সঙ্গে তাহাদের পরিচয় ছিল। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতের গল্পের মধ্যে তাহারা নিবিড় আনন্দ পাইত। শিক্ষকও ছিলেন অনেকাংশে আদর্শবাদী। শিক্ষাদানকে অর্থোপার্জনের পন্থা বলিয়া গণ্য না করিয়া তাঁহারা সাধারণতঃ জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিতেন। সবাই যে করিতেন তাহা নহে। তথাপি ছাত্রদের নিরন্তর সাহচর্যে তাহাদের মন থাকিত সতেজ আর দৃষ্টিভঙ্গীও থাকিত সহজ।

এই সংযোগ যতদিন গভীর ছিল, বাঙালী ছাত্রের চরিত্র ততদিন ছিল উন্নত। সমস্ত ভারতবর্ষে চরিত্রে, বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে সে ছিল অগ্রণী। এ সংযোগ যতই ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, বাঙালী ছাত্রের চরিত্রে ততই আবিলতা দেখা গিয়াছে আর ছাত্রসাহচর্যহীন শিক্ষকের মনও ক্রমে ক্রমে বিরসতা ও আদর্শহীনতা গ্রাস করিয়া বসিয়াছে।

এই অশুভ পরিবর্তন কিন্তু একদিনে হয় নাই। আজ হইতে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে ইহার সূচনা হইয়াছে। বাংলা দেশের এই অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ লেখা হয় অসহযোগ আন্দোলনের সময় ১৯২১ সনে। সারা দেশের ছাত্রসমাজকে তখন এ আন্দোলনের সঙ্গে ব্যাপকভাবে যুক্ত করা হয়। সুকুমারমতি বালকদের তপস্যা ভঙ্গ করিয়া তাহাদের বিচারশক্তি, শালীনতাবোধ, সংযম ও শৃঙ্খলার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। ফলে, স্কুল, কলেজ ছাড়িবার হিড়িক পড়িয়া যায়। বাঙালী ছাত্র চিরদিনই চরম আদর্শবাদী। তাহার উপর তাহারা আবার অত্যধিক ভাবপ্রবণ। কাজেই দেশমাতৃকার নামে ডাক দিলে তাহারা নির্বিচারে সাড়া দেয়। হইয়াছিলও তাই। মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনে বাংলার অর্বাচীন ছাত্রসমাজ নির্বিবাদে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। তাহাতে কোন্ রাজনৈতিক কার্য সিদ্ধ হইল, জানি না, কিন্তু সেই পাদক্ষেপে সমগ্র ছাত্রসমাজের যে স্বধর্মচ্যুতি ঘটিল তাহার পাপ আজ পর্যন্তও আমাদিগকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। চিন্তাশীল শিক্ষক ও অভিভাবকের দল তখন তীব্র স্রোতের মুখে দাঁড়াইয়া এ পাদক্ষেপ, এ অনর্থ রোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এমনকি কেহ কেহ এজন্য স্বদেশদ্রোহী বলিয়াও অভিহিত হইয়াছেন কিন্তু তাহাদের বুদ্ধি ও যুক্তিবাদ ভাবপ্রবণ বাংলার প্রাণে রেখাপাত করে নাই।

এই অসহযোগ আন্দোলনই বাংলার ছাত্রসমাজের প্রথম উচ্ছৃঙ্খলতার ইতিহাস। ইহাই তাহার প্রথম স্বধর্মচ্যুতি। তাহার পর বহুবার তথাকথিত রাজনৈতিক, এমনকি নেতাদের নিজস্ব স্বার্থেও এ বিদ্যার তালিম দেওয়া হইয়াছে। তাহার ফল হাতে হাতেই পাওয়া গিয়াছে। বাংলার চিন্তাশক্তি হুজুগের চিৎকারের মধ্যে লুপ্ত হইয়াছে, বাংলার শালীনতা ও শৃঙ্খলাবোধ আজ দুর্বলতার লক্ষণ বলিয়া অভিহিত হইতে বসিয়াছে।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় যাহারা কিশোর ছাত্র ছিল আজ তাহারা প্রবীণ শিক্ষক। তাহাদের মধ্যেও অনেকেরই স্বধর্মচ্যুতি ঘটিয়াছিল ; হয় বাক্যে নয় কর্মে, নয় মনে। তাহার পর বৎসরের পর বৎসর যে সব যুবক শিক্ষাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাহারা কেহই আর প্রায় স্বধর্মে ফিরিয়া আসিতে পারেন নাই। তাহার প্রধান কারণ রাজনৈতিক, দ্বিতীয়তঃ শিক্ষাজগতে নানাবিধ আন্দোলন। ফলে, শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের মধ্যে সংযোগ ও সম্পর্ক ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আজ তাহা এমন স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, তাহাতে আর স্নেহের, শ্রদ্ধার বা প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না। কাজেই শিক্ষকের কথা শুনিবার মত ছাত্রও আজ বিরল, আবার ছাত্রের কথা ভাবিবার মত শিক্ষকেরও অভাব। ইহা জাতির দীনতার ইতিহাস।

এই স্বধর্মচ্যুতি যে একমাত্র রাজনৈতিক কারণেই ঘটিয়াছে এ কথা বলা চলে না। ইহার আরও অনেক কারণ আছে।

প্রথমতঃ শিক্ষা সম্পর্কে দেশের দৃষ্টিভঙ্গী গত কয়েক বৎসরের মধ্যে পুরোপুরি বদলাইয়া গিয়াছে। পূর্বে শিক্ষাকে মনুষ্যত্ববোধের ধারক ও বাহক বলিয়া মনে করা হইত। জ্ঞানের পরিধি নির্দিষ্ট ছিল না ; বিদ্যার দেবীকে বিশেষ কোন বেদীতে বসাইয়া পূজা করিবার চেষ্টা হইত না। শিক্ষার সংজ্ঞা ছিল ব্যাপক। পরিপূর্ণ জীবনদর্শনে যাহা সাহায্য করিত তাহাকেই শিক্ষা বলা হইত। জীবনের মর্মবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারই ছিল শিক্ষার উদ্দেশ্য। কিন্তু ক্রমশঃ সে সংজ্ঞা সঙ্কুচিত হইতে হইতে এখন প্রায় চরমে আসিয়া ঠেকিয়াছে। শিক্ষা বলিতে এখন মাত্র কোন বিশেষ বিষয়ে পারদর্শিতা ছাড়া আর কিছু বোঝা যায় না। আর সে বিশেষ বিষয়ও এমন হইবে যেন তাহা অর্থকরী বিদ্যা হয়। অর্থকরী বিদ্যা ছাড়া আর সমস্তই অর্থহীন ; তাহার কোন মূল্য নাই। বিদ্যা ও জ্ঞানের দেবীকে একমাত্র অর্থের বেদীতে বসাইয়া পূজা করিবার চেষ্টা যেদিন হইতে চলিতেছে সেদিন হইতেই ছাত্র কেবল অর্থমূলে বিদ্যা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে আর শিক্ষকও অর্থ বিনিময়ে বিদ্যাদানে ব্রতী হইয়াছেন। উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমশঃ ক্রেতা বিক্রেতার সম্বন্ধে পরিণত হইয়াছে আর তাহার ফলে বিদ্যালয়ে হাটের কোলাহল দেখা দিয়াছে।

অর্থকরী বিদ্যার প্রতি অসীম আকর্ষণ যে জাতির পক্ষে কিরূপ অকল্যাণকর হইতেছে সে কথা ভাবিবার সময় আমাদের নাই। জাতির সজীবতা, জাতির কৃষ্টি, জাতির প্রাণ শুধু অর্থকরী বিদ্যার দ্বারা বাঁচিতে পারে না। সে প্রাণের উৎস থাকে সাহিত্যে, দর্শনে, ইতিহাসে আর শিল্পকলায়। আজ সে সকলই আমাদের কাছে গৌণ হইয়া গিয়া অর্থকরী বিদ্যা মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রের দল আর সাহিত্য দর্শনের পাঠ নিতে চায় না কারণ দেশ ও সমাজ সে বিদ্যার গৌরব স্বীকার করে না। ফলে, সাধারণ ছাত্রের দলও নিতান্ত ঠেকিয়াই যেন সাহিত্য ইতিহাস দর্শনের পাঠ নেয়। জাতিকে মনুষ্যত্ববোধের পথে চালিত করিবার ভার পড়ে তাহাদের উপরে। জাতির কৃষ্টি রক্ষা ও প্রচার করিবার দায়িত্ব তাহাদের উপরেই ন্যস্ত হয়। একদিকে অর্থনেশায় জাতির মেধাবী ছাত্রের দল মিস্ত্রি মজুরের বৃহৎ সংস্করণে পরিণত হয় আবার অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত অক্ষম হস্তের পরিচালনায় জাতির জীবনের উৎস উচ্ছল না হইয়া ক্রমাগত শুষ্ক ও ক্ষীণ হইতে থাকে। বাংলা দেশের শিক্ষা সম্পর্কে যাঁহারা কিছুমাত্র চিন্তা করেন তাহাদের বোধ হয় আর এ কথাটা বুঝাইয়া বলিতে হইবে না যে, অবস্থা এইরূপ চলিতে থাকিলে আর দশ-পনের বৎসর পরে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য কোনো শিক্ষক পাওয়া দায় হইবে। চিন্তার প্রাচুর্য, জ্ঞানের ধারা ও প্রাণের উৎস ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া জাতিকে দুর্বল হইতে দুর্বলতর করিয়া ফেলিবে। আর অদূর ভবিষ্যতের কথাই বা বলি কেন? এখনই তো বাংলা দেশে উপযুক্ত বিদ্যালয় ও সুযোগ্য শিক্ষকের অভাব দেখা দিয়াছে।

বিদ্যাকে নিতান্ত অর্থকরী করিবার প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষায় পাশ্চাত্য ভঙ্গীর প্রাবল্য অবস্থাকে আরো সঙ্গীন করিয়া তুলিয়াছে। পাশ্চাত্যের সভ্যতাকেই আমরা একমাত্র সভ্যতা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি ; পাশ্চাত্যের শিক্ষা-দীক্ষাকে আমরা নির্বিচারে সর্বোচ্চ আসন দান করিয়া বসিয়াছি। ইহার মধ্যে যে কোনো খুঁত থাকিতে পারে এ কথা আমাদের মনেই হয় না। আমাদের শিক্ষার মধ্যে জাতীয়ভাবোধের প্রয়াস কতটুকু? পাশ্চাত্যের দান, বিজ্ঞান কিন্তু বিজ্ঞানই জীবনের পরম দেবতা নয়।

এই দান আমাদের জ্ঞান বাড়াইয়া দিয়াছে ও দিতেছে সত্য কিন্তু তাহার মধ্যে না আছে হৃদয়চর্চা, না আছে মনুষ্যত্ববোধ। হৃদয়কে দূরে ঠেলিয়া দিয়া শুধু মেধাবৃত্তিতে মানব-সমাজ যেটুকু উন্নতি লাভ করিবে তাহার শেষ হইবে নিদারুণ সংঘাতের মধ্যে। মনুষ্যত্ববোধের অভাবে মানুষে মানুষে বিদ্বেষ, জাতিতে জাতিতে সংগ্রাম লাগিয়াই থাকিবে।

যে বিশ্ববিদ্যালয় আমরা সৃষ্টি করিয়াছি, যে শিক্ষার ধারা আমরা বাছিয়া নিয়াছি তাহা মূলতঃ বিদেশী। সে শিক্ষার ফলে আমরা আচারে, ব্যবহারে, আহারে, বিহারে, আলাপে, পোশাকে এখনও বিদেশীকে নকল করিয়া লজ্জা পাইতেছি না। ইহা কি চিন্তা করিবার বিষয় নহে? এই অস্বাভাবিকতার মধ্যে ছাত্রসমাজ কি আরো অব্যবস্থিতচিত্ত হইয়া যাইতেছে না?

পাশ্চাত্য সভ্যতা এখন তাহার জুড়ি হাঁকাইয়া চলিতেছে। তাহার এক ঘোড়া বিজ্ঞান অন্যটি শ্রমশিল্প। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সে জুড়ির জন্য রাস্তা তৈরির কাজে ব্যস্ত। আমরা কি নির্বিচারে সেই পথই অনুসরণ করিয়া চলিতেছি না? রাষ্ট্রনেতাদের চিন্তার ধারাও বিদেশী। তাহারা শান্তি, স্বস্তি অপেক্ষা ঐশ্বর্যের প্রসারে ব্যস্ত। জনসাধারণের খাদ্য বস্ত্রের ব্যবস্থা না করিয়া বসবাসের জন্য অট্টালিকার বন্দোবস্ত করাই তাহাদের অভিপ্রায়। কারণ তাহাতে বিদেশীর নিকট মুখরক্ষা হইবার সম্ভাবনা বেশি। শিক্ষা ব্যাপারেও সেই একই ভঙ্গী বর্তমান। এখন বিজ্ঞান ও শ্রমশিল্পের উপর ক্রমাগত জোর দেওয়া হইতেছে। জাতির চরিত্র গঠনের কোনো ব্যবস্থাই হয় নাই। এদিকে সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাসাদি শিক্ষার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইয়া ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের মনই গভীর চিন্তাবিমুখ হইয়া পড়িতেছে। ছাত্র চাহিতেছে, কোনো মতে কতকগুলি তথ্য মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় পাশ করিতে আর শিক্ষকের আকাঙ্ক্ষা কি করিয়া তাহার অর্থোপার্জন বেশি হইবে। পরীক্ষা পাশের পথ যে-শিক্ষক যত সুগম করিয়া দিতে পারিবেন তিনি তত ছাত্রপ্রিয়। আধুনিক-কালে ইহাই দক্ষ শিক্ষকের সংজ্ঞা। পরীক্ষা পাশের জন্য ছাত্রকে যে কোনো শিক্ষকের নিকট যতটুকু নির্ভর করিতে হয় ততটুকু শ্রদ্ধাই তাহার প্রাপ্য। কিন্তু ইহাও কপট শ্রদ্ধা। ইহাতে ছাত্রদেরই বা দোষ কি? শিক্ষানীতিই তো এই। এই অশুভ মনোবৃত্তির বিলোপ না ঘটিলে ছাত্রের রক্ষা নাই—শিক্ষকের মুক্তি ঘটিবে না।

ছাত্র ও শিক্ষকের যথাযথ সম্পর্ক রক্ষা করিতে অভিভাবকেরাও কোনো সাহায্য করিতেছেন না। করিবার কথাও নয় কারণ আধুনিক আবহাওয়ার বিষ সর্বদেহেই সংক্রামিত হইয়াছে। আধুনিক অভিভাবক শিক্ষককে সামাজিক মর্যাদা দান করেন না। তিনি নিজেও হয়ত অর্থকরী শিক্ষাই পাইয়াছেন; হয়ত বিদ্যাকে শ্রদ্ধা করিবার মত মানসিক অবস্থা তাহার নয়। নয়ত অর্থকেই শ্রদ্ধার মাপকাঠি বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। যে কারণেই হউক, শিক্ষকের প্রাপ্য শ্রদ্ধা তিনি দেন না বরং তাহাকে হতাদরই করেন। সে বিষ অভিভাবক হইতে ছাত্রের মধ্যে সংক্রামিত হয় আর তাহাতে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের কর্মই নিষ্ফল হইয়া যায়। পরিবারের আবহাওয়াও এখন আর নীতিবোধ বা মনুষ্যত্ববোধের সহায়ক নয়। দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততার অজুহাতে অভিভাবক তাহার পরিবারস্থ ছাত্রদের দিকে দৃষ্টি দিতে পারেন না। কারণ একদিকে অর্থই তাঁহার জীবনের পরম সম্পদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে আবার অন্যদিকে নিদারুণ আত্মপরায়ণতা তাঁহার জীবন-দর্শনকে গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। অন্যের জন্য তো দূরের কথা, নিজের পুত্রের জন্যও কোনো সময়, এমনকি অবসর সময়েরও, অপব্যবহার করা তাহার অনভিপ্রেত হইয়া উঠিয়াছে। সে অবসরটুকু সিনেমা দেখিয়া, তাস, পাশা খেলিয়া বা গল্পগুজব করিয়া কাটাইলে তাহার চিত্ত-বিনোদন বেশি হয়। তাই শিক্ষার ভার একমাত্র গৃহ-শিক্ষকের হাতে ছাড়িয়া দেওয়ার রেওয়াজ আজ বাংলা দেশের ঘরে ঘরে। এত গুরু দায়িত্ব যাহার উপরে ন্যস্ত করা হয় সেই গৃহশিক্ষকের উপরও না থাকে অভিভাবকের শ্রদ্ধা না থাকে ছাত্রের ভক্তি। এত অশ্রদ্ধার মধ্যে থাকিয়া শিক্ষকও নিজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন।

তারপর, আধুনিক শিক্ষাধারার মধ্যে ঈশ্বরের স্থান নাই। রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজ দায়িত্বহীন, পরিবার আত্মপরায়ণ এই অকল্যাণকর পরিবেশের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের নীতিবোধের সম্ভাবনা কতটুকু? ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে আমরা সব সংস্কার মুক্তির সাধনা করিতেছি। তাহাতে শিব না গড়িয়া বানর গড়িবার সম্ভাবনাই বেশি। সহজ সংস্কার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও ব্যক্তি উভয়ই বন্ধ জীবনের আস্বাদে মুগ্ধ হইতেছে। ছাত্রদের প্রলোভন তো এদিকে আরো বেশি।

নীতিবোধের জন্য যে সাধনার দরকার, সাধনার জন্য যে বন্ধনের প্রয়োজন এ কথা কি বাংলা দেশকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে? একদিকে অসঙ্গত বন্ধনমুক্তি অন্য-দিকে প্রচণ্ড ব্যক্তিতাবাদ আজ বাংলার ছাত্র-সমাজকে গ্রাস করিতেছে। ঐতিহ্য, নিজেদের আদর্শ ও নিজেদের শক্তিতে তাহারা বিশ্বাস হারাইতে বসিয়াছে।

রসাবেশ

শ্রীকালিদাস রায়

পড়িতেছি বই খুলি গুরুর কবিতাগুলি
বহুদিন আগে ছিল পড়া।
আমার যৌবনে দেখা কবির যৌবনে লেখা
আঙুরের মত রসভরা।
যৌবনের দিনগুলি রসের তুফান তুলি
হৃদয়ের তটে এসে লাগে।
ফিরে যাই সেই ঘরে বিছানো মাদুর 'পরে
পঞ্চাশ বছর কাল আগে।
পড়িতে পড়িতে মোর নয়নে ঘনাত ঘোর
প্রাণ মোর হইত উদাস।
কভু মন উচাটন, কভু তনু শিহরণ,
কখনো বা তাপিত নিঃশ্বাস।
পিয়ারা গাছের ডালে শ্যামল পল্লবজালে
খেলে যেত ছায়া আর আলো,
ভিজিত চোখের কোণা, কলেজের পড়াশোনা
একেবারে লাগিত না ভালো।
পাখীরা নতুন সুরে ডাকিত নিকটে দূরে
জাগাইয়া নতুন পিয়াস,
মনে হ'ত কি যে নাই কি হারাই কি যে চাই
কেন মোর জীবন নিরাশ।
মনে মুকুলিত আশা ফুটাত তাহার ভাষা
কবিতা লিখিতে হ'ত সাধ।
সৃজন বাসনা মোর ত্যজি যোগ নিদ্রাঘোর
জেগে উঠে গণিত প্রমাদ।
বহু বর্ষ হ'ল গত সে দিনের স্মৃতি যত
মুছে গেছে, আছে শুধু রেশ।
জীবনের গোধূলিতে আবার জাগিল চিতে
পুনঃ সেই প্রভাতী আবেশ।

বড়দিদি

শ্রীঊর্ম্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমার সাথে জড়িয়ে আছে পুতুল খেলার প্রীতি
হাঁড়ি কুড়ি খেলনা মাঝে আছে তোমার স্মৃতি।
এখন যাহা তুচ্ছ বলে ভুলেছিলাম আমি
এই জীবনে সেই জিনিসই সবার চেয়ে দামী।
ছোট্ট পুতুল পুঁথির মালা মাটির কড়া-হাঁড়ি
পেরজাপতি মাথার ক্লিপ রঙীন কাঁচের চুড়ী,
ছিল তাহা রাজার ঘরের ঐশ্বর্য্যের মত
তোমার আসার আশায় মোদের কাটত সেদিন কত।
তুমি যখন আসতে তখন উঠতো পরাণ নেচে
জীর্ণ তোমার চাদর তলায় কতই জিনিস আছে,
রাজার রাণী ছিল নাতো বিলাসিতার লেশ
জীর্ণ মলিন বসন তোমার রুক্ষ তোমার কেশ;
কিশোর বেলায় স্বামীর সাথে হয়েছে সব গত
বিলাস ভূষণ ত্যাগ করিলে চিরদিনের মত।
দিবস রাত্রি ভাবতে শুধু সবার ভালোর তরে
সরল মনে ভাবতে যাহা বলতে ঘরে পরে
সবার তরেই কাঁদতো পরাণ বিশ্বজননী
তুচ্ছ ধনে নওগো ধনী উচ্চ মনে ধনী।
আজকে ভাবি বাড়ী গাড়ী গয়না শাড়ী পেয়ে
হইকি খুসী? তখনকারের তুচ্ছ জিনিস চেয়ে
তোমার সাথেই হারিয়ে গেছে তখনকারের মন
খুসীতে যা উঠতো নেচে কারণ অকারণ।
ভুলে যাওয়া তোমার কথা ছেলেবেলার সাথে
আজো দেখি তেমনি উজল মনের সোনার পাতে।

প্রান্তিক

শ্রীসুরঞ্জন দত্ত রায়

সূর্য্যোদয়ের পর কয়েক ঘণ্টা উত্তীর্ণ হয়েছে। মাঠে-প্রান্তরে গাছে-পালায় পথে-ঘাটে বেশ সুন্দর রোদ ঝলমল্ করছে। এমনি সময় নীলমণিবাবু ভারী ক্ষিপ্ত হয়ে উচ্চকণ্ঠে কাকে শাসাচ্ছিলেন, যা যা, খুব বেঁচে গেলি আজ। খুব বাঁচা বাঁচলি।

বীরু মোক্তার বাজার থেকে ফিরছিলেন। নীলমণির তিনি প্রতিবেশী। ধুঁতো দাড়ি পরেই থাকেন। বললেন, কি হ'ল মৈত্রমশায়?

নীলমণি বীরুবাবুর কথা শুনলেন কি শুনলেন না, একবার তাঁর দিকে তাকালেন মাত্র। তেমনি উচ্চকণ্ঠেই বলতে লাগলেন, যত সব বজ্জাতির জায়গা হয়েছে। পুষতে যদি না পারে ত রাখে কেন? সকালবেলা ছাড়া পেয়ে এসে আমার কচি কুমড়ো গাছটাকে একেবারে নির্ম্মূল করে দিয়েছে। তাঁর গলায় রাগ ও দুঃখ দুটোই মিশে ছিল এবার।

বীরু মোক্তার দাঁড়িয়েই ছিলেন। তাঁর হাতে বাজারের ব্যাগ। বললেন, আহা দেখুন ত কি সর্ব্বনাশ। এমন ভাবে বললেন যেন কি ভয়ানক একটা সর্ব্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। তার পর নীলমণিবাবুর দৃষ্টি লক্ষ্য করে দূরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, যার উদ্দেশ্যে এসব তাঁর ভর্ৎসনা-বর্ষণ, সেই গরুটি আন্দাজ হাত ত্রিশ-চল্লিশ দূরে নির্ব্বিবাদে ঘাস চর্ব্বণরত।

নীলমণি এবারও বীরুবাবুর দিকে চেয়ে দেখলেন, তখনও তাঁর উত্তেজিত উত্তপ্তকণ্ঠ শোনা যাচ্ছিল। একটা আধ হাত প্রমাণ বাঁশের লগি গরুটার দিকে তুলে তিনি শাসাচ্ছিলেন।—বার বার তিনবার। আর যদি কোনো দিন আমার বাড়ীর চতুঃসীমানায় দেখি তবে তোরই একদিন কি আমারই। রাগে কাঁপছিলেন তিনি তখনও, একটু বেশীই কাঁপছিলেন। গায় একটা হাত-কাটা ফতুয়া, মাথায় কদম-ছাঁট পাকাচুল, দন্তহীন মাড়ি। রোগা পাতলা খর্ব্বকায় মানুষটি।

এমন সময় প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে বড় বৌ নন্দরাণী তাকে ধরল।

—বাবা শিগগির ঘরে আসুন।

তার চাপা-কান্না গলা, ভয়ার্ত্ত। ছুটে আসবার জন্যে হাঁফাচ্ছে সে; মাথার ঘোমটা খুলে পিঠে লোটাচ্ছে। বাঁ-হাতে সেটা তুলতে তুলতে বলল, আবারও আপনি কথা না শুনে বাইরে এসেছেন? আপনার ছেলে সেদিন আপনাকে পষ্ট-পষ্ট করে বারণ করে দেয় নি?

বীরুবাবু আর দাঁড়ালেন না। এই আশী বছরের বৃদ্ধ শিশুটির প্রকৃতির সঙ্গে তিনি—শুধু তিনি কেন—এ পাড়ার প্রায় সকলেই কম-বেশী পরিচিত। সকলেই এটা বেশ উপভোগ করেন। একটা নূতন আমোদের মত। তা ছাড়া একটু আকর্ষণও আছে। সবারই একদিন এমন দিন আসবে। বাজারের ব্যাগ নিয়ে তিনি বাড়িতে ঢুকে পড়লেন। নন্দরাণী তখন মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়ে কোমরে শক্ত করে আঁচল পেঁচিয়ে নীলমণিকে ধরে ধরে নিয়ে আসছে।

একটু পরে নীলমণি বারান্দার জলচৌকিতে এসে বসলেন। এ জলচৌকিটায় তিনি প্রায় সর্ব্বদাই বসে থাকেন। বড় ছেলে মৃত্যুঞ্জয় এটা কিনে দিয়েছে। দিয়ে বলেছিল, বাবা এটাতে আপনি বসবেন। জিনিসটা তাঁর পছন্দ হয়েছিল। বেশ কাঁঠাল কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরী। পায়াগুলোও বেশ ভারি-ভারি। ভাঙবার বিশেষ ভয় নেই। ছেলেকে আর কিছু বলেন নি। ছেলের চাইতে বড় বৌয়ের সঙ্গেই তাঁর ভাব বেশী। নন্দরাণীকে বলেছিলেন মৃত্যুঞ্জয় ইস্কুলে যাবার পর, যাই বল আজ কাল ওর বেশ পছন্দ হয়েছে। এ চৌকিটা খুব ভাল হয়েছে।

একটু পরে তিনি সবিস্তারে ছেলের শিশুকালের এক দিনের ঘটনা বর্ণনা করতে করতে হাসছিলেন। বলছিলেন, কি ছেলেমানুষ যে ও ছিল তা যদি জানতে। একবার জন্মাষ্টমীর মেলায়—বুঝলে মা, একটা টিয়েপাখী দেখে বলে, ছ' আনা দিয়েই কিনব। তা-ও আবার মাটির তৈরী নেহাৎ একটা খেলনা পুতুল। শুনেছো কোথাও, ছ' আনা দিয়ে একটা মাটির টিয়ে কেউ কিনতে চায়? অমন বোকা ছিল সে।

বলতে বলতে শিশুর মত দন্তহীন মাড়িতে বার বার হেসে উঠছিলেন।

জলচৌকিটায় তিনি বসেছিলেন। একটু আগের

উত্তেজনাজনিত চাঞ্চল্যের অবসাদ আসছিল এখন। পা ছটো হাল্কা লাগছিল হাঁটুর নীচু থেকে, বুকটা দ্রুততালে ধুকধুক করছিল। কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমছিল। নন্দরাণী পাখা নিয়ে বাতাস করছিল। বলছিল, কথা ত শুনবেন না বাবা। কতবার নিষেধ করেছি, বাইরে যাবেন না এই শরীর নিয়ে।

একটু থেমে বলছিল, ঘরে চলুন বাবা। ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে একটু বিশ্রাম করবেন—

তিনিও তাই ভাবছিলেন। কিন্তু মুখ ফুটে প্রকাশ করতে লজ্জা হচ্ছিল তাঁর। যতই বয়স বাড়ছে, সকলে বার বার করে মনে করাচ্ছে সেটা, ততই তিনি আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছেন। এ এক রকমের মানসিকতা, বার্দ্ধক্যে সবারই আসে। কেন আমি দুর্ব্বল হয়েছি, কোথায় আমি অশক্ত হলাম, এ সব প্রমাণ করতে গিয়ে সর্ব্বদাই একটু বেসামাল হয়ে পড়া।

নন্দরাণীর কথার উত্তরে বললেন, না থাক, একটু বসি।

নন্দরাণী বলছিল, আপনার এত বয়স হয়েছে, বাবা —কিন্তু একটুও আপনার বুদ্ধিশুদ্ধি হ'ল না। এ বয়সে লোকে কি অমন ছুটোছুটি করে। ডাক্তার আপনাকে বারবার মানা করেছে, আপনার বুক দুর্ব্বল—

এই একটা কথা তিনি সহ্য কর্‌তে পারেন না।—ডাক্তার সবই ওরকম বলে। বুক দুর্ব্বল না হাতী। আসলে এ সব পয়সা মারবার বুদ্ধি।

—সব ডাক্তারই পয়সা মারে না, বাবা।

—আঃ। এই তোমাদের দোষ। কেবল মুখে মুখে তর্ক। বিরক্ত হয়ে তিনি বললেন, আসলে এটাত মান, বুকটা আমার নিজের? আমার চাইতে ভাল করে তাকে কেউই জানে না।

নন্দরাণী চুপ করে বাতাস করতেই থাকল।

—এই বুক নিয়ে কত গাছে উঠেছি। কত দৌড়-ঝাঁপ করেছি। সে সব যদি দেখতে—

নন্দরাণী ফিক্ করে হাসল এবার। হেসেই আবার চুপ করল তাড়াতাড়ি। তাড়াতাড়ি বলল, সে সব আপনার ছেলের কাছে শুনেছি—

—তবে? দাও পাখাটা আমার হাতে।

—আমিই ত করছি, বাবা।

—না, না—আমার হাতে দাও। পরের হাতে বাতাস খেতে ভাল লাগে কখনও? একটু পরে বললেন, তুমি জান না বুঝি, বলিনি তোমাকে? তোমার শাশুড়ী খুব বাতাস করতে পারত। শুধু বাতাস কেন, খুবই সেবা করতে জানত। আজকালের মেয়েদের মত নয়।

নন্দরাণী কৃত্রিম অভিমান করে বলে উঠল, কেন আমি বুঝি সেবা করতে পারিনে?

নীলমণি তাতেই বিচলিত হয়ে উঠলেন, তোমার কথা কি আর বলছি। তোমার মত মেয়ে আর ক'টা আছে?

একটু পরেই তিনি পুরাণ প্রসঙ্গটা তুললেন হঠাৎ, ছাখ ত, কি ক্ষতিটা করলে একবার। কচি কুমড়ো গাছটা কি করে খেয়ে শেষ করল। নতুন নতুন ডগা ছাড়ছিল সবে। এমন গরু যদি আর একটাও দেখেছি। একেবারেই গরু। খুবই দুঃখজড়িত গলায় বললেন।

—আমি দেখলাম বাবা। তেমন কিছু অনিষ্ট করেনি।

—করেনি?

এক মুহূর্ত্তে তিনি তাকিয়ে রইলেন। পরে খুশি খুশি গলায় বললেন, তবে যে আমি দেখলাম কুমড়োর ডগা মুখে করে—

একটু পরেই তিনি চুপ করে গেলেন। স্বগতোক্তির মত বললেন, চোখেও কম দেখছি তাহলে। অন্ধ হয়ে যাব নাকি?

নন্দরাণী বলল, বালাই ষাট। কি-সব অলক্ষুণে কথা যে আপনি বলেন। দাঁড়ান, আসুন আজ আপনার ছেলে।

একটু পরে রান্নাঘরে ঢুকল সে।

নীলমণি চুপ করেই বসে থাকলেন। নন্দরাণীকে আটকাবেন উপায় কই। সংসার-ঘরকন্না নিয়ে ভয়ঙ্কর ব্যস্ত সে। নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই। ছটো টিউশন সেরে এই ত মৃত্যুঞ্জয়ের আসবার সময় হ'ল। সাইকেল থেকে নামতে নামতেই হাঁক-ডাক সুরু করবে, কই গো, তেল দাও এক বাটি। চট করে মাথায় জলটা দিয়ে আসি গে। কি ভীষণ দেরী হয়ে গেল আজ। কিছুতেই আর সময় কুলানো যায় না। এ প্রায় প্রতিদিনেরই কথা। নীলমণিবাবু এ সময় বারান্দাতেই বসে থাকেন। আর ছেলের আসবার প্রতীক্ষায় সামনের রাস্তার দিকে তাকান। একটু পরে দেখা যায় তাকে। রোগা-লম্বা, সাদা একটা পাঞ্জাবী গায়ে, চুলগুলো বাঁ থেকে ডাইনে আঁচড়ান।

বাস্তবিক সময়াভাব তার। এবং তাই নিয়ে অভিযোগ। কারুর উপরে নয়, বোধ করি বিধাতার উপরেও নয়। নীলমণিবাবু তা জানেন। এমন নির্ঝঞ্ঝাট ছেলে হয় না। পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন তিনি অনেকদিন। না—তেমন একটি ঘটনাও মনে পড়ে না—

যা নিয়ে তিনি চিন্তিত বা দুঃখিত হয়েছেন। মৃত্যুঞ্জয় চিরকাল ভাব-স্থির, ধীর-শান্ত। খাঁটি ভাল ছেলে যাকে বলে। মাষ্টাররা কত প্রশংসা করতেন তাঁর। নিরঞ্জনবাবু একদিন বলেছিলেন, এ ছেলে আপনার হীরের টুকরো মৈত্রমশায়। ডেপুটি না হয়ে যায় না।

সেই ছেলে ডেপুটি না হয়ে হ'ল মাষ্টার। এজলাসে না বসে ইস্কুলের টেবিল-চেয়ার অধিকার করল। আর মেজ যে ছেলে, যাকে প্রায় হাত ধুয়ে রেখেছিলেন, সে হ'ল সরকারী কর্ম্মচারী। রেলের এ. এস. এম. হয়ে ঢুকেছে। আশা আছে, ষ্টেশন মাষ্টার হবে একদিন। বেশ মোটা রোজগার তার। বড় ছেলের দু'গুণ ত বটেই। লোকে তাই বলে। সে ছেলের সঙ্গে ত তাঁর দেখাই হয় না। পাঁচ বছরে পাঁচটি চিঠি দিয়েছে কিনা সন্দেহ।

—আচ্ছা অনেক নাকি মাইনে পায় সে শুনি? এক ছুটির রবিবার বড় ছেলেকে প্রশ্ন করেছিলেন।

—কে বলে? উল্টে বড়ছেলে বাপকেই প্রশ্ন করল।

—শ' দুই টাকা নাকি কামায়? একটু যেন বোকা-বোকা, বিস্মিত, গর্ব্বিত, আবার খানিকটা অভিমানী পিতার মত বলেছিলেন তিনি। কাঁপা-কাঁপা চোখের তারায়, বার কয় তার পাতা পিটপিট করে, তার পর আবার বলেছিলেন, শুনি, কাঁচা পয়সাও অনেক নাকি আছে—

—কি জানি বাবা। অত কামায় বলে শুনিনি। শান্ত নিরুত্তপ্ত গলা ছিল মৃত্যুঞ্জয়ের। একটু পরে আবার বলেছিল, লোকেরা অনেক বেশী বলে। আর কথা বলেননি নীলমণি।

বিকেলে নন্দরাণী জিজ্ঞেস করছিল, বাবা কি চিঠি লিখবেন মণি-ঠাকুরপোকে? মণি তাঁর মেজছেলের ডাক নাম।

—চিঠি লিখতে বলছ? মণিকে? চোখ অল্প অল্প কুঁচকেছিলেন।

—না,—আপনি যদি লিখতে চান, পোষ্টকার্ড আছে আমার কাছে—

—কি হবে লিখে, বললেন তিনি অনায়াসে। এবং ভাবলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, কতযুগ তিনি চিঠি লেখেন না কারুকে। ছেলেই কি লেখে তাকে?

—যাঃ। লিখব না।—বলে তিনি চুপ করে বসে থেকেছিলেন। অসীম নির্লিপ্তি তাঁর চোখে। বিকেলে তখন সূর্য্য ডুবুডুবু হচ্ছিল অনেক দূরে। রাঙা আকাশের পটভূমিকায় একটা খেজুর না নারকেল গাছ দাঁড়িয়েছিল স্থির হয়ে। নিস্তরঙ্গ উদাস সুর চারদিকে।

নন্দরাণী দাঁড়িয়েছিল দরজার চৌকাঠ ধরে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখছিল। গা ধুয়ে সে ধোয়া শাড়ি পরেছিল একটা জাম-রঙের। অনেক চুল তার। মস্ত বড় খোঁপায় একটা গন্ধরাজ। কপালে টকটকে সিঁদুরের কৌটাটি। কি এক পরিপাটি নিশ্চিন্ততা। নির্বিঘ্ন সংসার। পাঁচ বছর বিয়ে হয়েছে, কিন্তু সন্তান আসে নি। তাই তার সবকিছু শৃঙ্খলাময়, সুন্দর।

—আমি দেব মণি-ঠাকুরপোকে চিঠি। একটু পরে বলেছিল সে নিজের মনে, কেমন ছেলে তোমার বাবা। কারুর জন্যে ভাবে না। কতবার বলি বিয়ে দাও, বিয়ে দাও। তা ত আর শুনবে না।

রাগ করে সে দুপদাপ পা ফেলে চলে গিয়েছিল ঘরে।

আজ কিন্তু অন্যমনস্ক হয়ে আছেন নীলমণি। কিছু ভাবছেন না। সেই যে জলচৌকিতে বসিয়েছিল নন্দরাণী তেমনি বসে আছেন। নিজের বুকের উপর হাত দিয়ে তার দুরু দুরু অনুভব করতে চেয়েছিলেন একবার। তার পর কখন সেটা ভুলেই গিয়েছেন।

—আমি কি খুব রেগে যাই? খুব অল্পেই রেগে যাই? —ভাবলেন তিনি সাদা ভ্রূ দুটো বাঁকিয়ে। না। এ ভাল লক্ষণ নয়। নিশ্চিন্ত জীবন তাঁর। নির্ঝঞ্ঝাট। কেন রাগ করবেন? কার উপরে রাগ করবেন?

কিন্তু তবু বে-সামাল হয়ে যায় মাঝে মাঝে। মনের রাশ টানতে পারেন না। আরো কি আলগা হবে নাকি বয়স হলে? আরো কতদিন বাঁচবেন তিনি? স্ত্রীর কথাটা মনে পড়ল।

অভিশাপ দিতেন তিনি কথায় কথায়। ঠাট্টা বুঝতে পারতেন না। সামান্য খোঁচায় অধীর হয়ে বলে উঠতেন, বুঝবে মজা। একশ' বছর বেঁচে থেকে বুঝবে কে তোমার আপনার।

বেলা বোধ করি সাড়ে ন'টা। মেয়েদের ইস্কুলের গাড়ীটা এল। বসে বসে ভাবছিলেন, এমন সময় পাড়ারই আরেকজন বৃদ্ধ অনাদিবাবু এলেন। নীলমণির ছোট। গলায় মাফলার; চোকাপো মুখ, কাঁচা-পাকা গোঁফ। পাশে-রাখা বেতের মোড়াটায় বসলেন।

কথায় কথায় প্রশ্নটা করলেন তাঁকে নীলমণি, কি মনে হয় আপনার? একশ' বছর বেঁচে থাকার কোনো মানে হয়?

অনাদি বললেন, ইচ্ছে করলেই কি বাঁচা যায়?

এই কি তাঁর কথার উত্তর? নীলমণি তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

একটু বাদে অনাদি বললেন, আমি আপনার সঙ্গে

দেখা করতে এলাম। আজই যাচ্ছি কিনা। বেলা ছটোর গাড়ী।

—যাচ্ছেন? যেন কথার সূত্রই খুঁজে পেলেন না উনি। কিসের যাওয়া? কোথায় যাওয়া?

মুখটা ফিরিয়ে নিলেন অনাদি অন্যদিকে। বললেন, হাঁ, চলেই যাচ্ছি। ভাবছি কলকাতায় ত হোটেল-মেস অনেক আছে, তাইতেই কোথাও থাকব। দেখলাম ওঁদেরও সেই ইচ্ছে। বৌমা ত স্পষ্টই বললেন, থাকুন গিয়ে। যা পারব পাঠাব। গলাটা এমনি ভারি ভারি, আরও নামিয়ে বললেন, তা গেলামই যদি, ওদের পয়সা নেব কেন? চোখে তাঁর জল আসছিল।

নন্দরাণী চা নিয়ে এল এই সময়। চা, কটা ক্ষীরের নাড়ু। তিনি বললেন, বেঁচে থাক বৌমা। জন্ম-জন্ম সতী হও। চা ত আমি খাইনে। ছেড়ে দিয়েছি।

—এটা খান তাহলে—

—এটা আমি নিচ্ছি। তুলে নিতে নিতে সজল গলায় বললেন, তুমি আশা করে দিলে মা। অবশ্যই খাব।

একটু পরেই তিনি চলে গেলেন। নীলমণি চুপ করে বসে থাকলেন। সংসারে এমনও হয়। মন খারাপ হ'ল খানিক। তার পর ভুলে গেলেন।

এর মধ্যে কখন এসেছে মৃত্যুঞ্জয়। স্নান করেছে, খেয়েছে। আজ তার একটু বেশী তাড়া। জামা-কাপড় পরে সাইকেল নিয়ে যখন বেরুচ্ছে, তিনি বললেন, সাড়ে দশটা বেজে গেল, অ্যা?

মৃত্যুঞ্জয় দাঁড়িয়ে পড়ল। বলে, তোমার কথার আর আমি উত্তর দেব না, বাবা।

নীলমণি বুঝতেই পারলেন না। কেমন বোকা-বোকা চোখে চেয়ে রইলেন।

—আজও আবার তুমি গরুর পিছন পিছন তাড়া করেছিলে।—মৃত্যুঞ্জয়ের অভিযোগ। সাইকেল দাঁড় করিয়ে তাতে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল সে। রোজ রোজ যদি তুমি এমন কর বাবা, কথা না শোনো, তাহলে—

থামল। কথা শেষ করল না, বলল, কি দরকার তোমার এ সবে?

—গরুতে গাছ খেলে তাড়াব না?—বিহ্বল ভাবটা কেটে গেলে তিনি প্রশ্ন করলেন।

—খেয়ে যাক গাছ গরুতে। গাছের দাম কত?—মৃত্যুঞ্জয় বলল, কত করে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে হচ্ছে জান?

জেনে আর কাজ নেই। সব জানা হয়ে গেছে তাঁর। এমনি করে আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাও? এর নাম বাঁচা? কি লাভ এ ভাবে বেঁচে থেকে? সকলের দয়ার উপর, ডাক্তারের কৃপার উপর?

মন খারাপ হয়ে গেল তাঁর। নন্দরাণী এল খানিক বাদে। জল দিয়েছি বাবা, স্নান করবেন আসুন।

সাড়াশব্দ নেই। নীলমণি চুপ করে একদিকে তাকিয়ে আছেন।

—বাবা। নন্দরাণী আবার ডাকল।

—না, না,। স্নান করব না। যাও। নীলমণির চোখে জলের আভাস ছল ছল করছে।

—কি হ'ল বাবা?

—কিছু না, কিছু না। সব এক রকম তোমরা। বুড়ো হয়েছি কি না। বললেন।

—কি অপরাধ করলাম। নন্দরাণী শঙ্কিত উদ্বিগ্ন গলায় প্রশ্ন করল।

—ভালই করেছ। হঠাৎ নীলমণি বললেন, বেশ করেছ মৃত্যুঞ্জয়কে বলে।

—তিনি কি আপনাকে কিছু বলেছেন নাকি? নন্দরাণী ভ্রূ বাঁকা করল। বলল, থাক, তাহলে আমারও নাওয়া-খাওয়া। আসুন দেখি আজ। বলে হন্ হন্ করে ঘেয়ে ঢুকল।

নীলমণি বললেন, কই কিছুত বলে নি সে। যা বলবার তুমিই ত বলেছ তাকে।

—পরের মেয়ে কি না। নিজের ছেলে খুব ভাল। নন্দরাণী রাগ করে ভিতর থেকে বলল।

দুপুরটা ভালই কাটল নন্দরাণীর। রোজ যেমন কাটে। নীলমণি খাওয়া-দাওয়া করেছেন, বিছনায় গিয়ে শুয়েছেন। খানিকবাদে স্নান করে সে নিজেও খেয়েদেয়ে এসে দেখে ঘরে নেই তিনি। খুঁজে খুঁজে তাঁকে আবিষ্কার করল এসে পুকুর ঘাটের কাছাকাছি। বাড়ীর পিছনে আমবাগানে।

—কি করছেন এখানে বাবা?

—কে? চমকে উঠলেন তিনি। ধরা পড়ে যাওয়া অপরাধীর ভঙ্গীতে বললেন, শুয়েই ত ছিলাম। ঘুমোতে গিয়ে হঠাৎ মনে হ'ল হিম-সাগরের চারাটায় বুঝি কলম আসে নি এবারও। তাই একটু দেখতে এলাম।

নন্দরাণীর দিকে ফিরে বললেন, যত্ন-আত্তি ত কিছু হয় না গাছের। কেমন করে হবে। দিতাম যদি একটু সার-গোবর দিয়ে, ঘাস-ময়লা সরিয়ে—

—ঘাস-ময়লা কোথায় বাবা?

—আছেই ওখানে কোথাও। নইলে—বুঝলে না

তুমি মা, এবার নিয়ে দু'বছর ত হ'ল আশা করে আছি। কই বোল আসল না এবারও।

পরে নিচু গলায় বললেন, যত্ন না করলে কি ওরা আসে। কেউ আসে না।

—হয়ত সামনের বছরেই আসবে।

—খুব জান কি না তুমি! অবিশ্বাসের সুরে তিনি হেসে উঠলেন। তার পর বললেন, ছেলেই জানে না ত জানবে তুমি!

—আপনার ছেলেও এসব জানে না বুঝি?

প্রশ্নের উত্তরটা ঘুরিয়ে দিলেন নীলমণি। বললেন, না, মানে···তার সময়ও ত নেই। সেটাও অবশ্য দেখতে হবে। তা ছাড়া বিষয়বুদ্ধি তার চিরকালই খুব কম।

নন্দরাণী বলল, এখন চলুন বাবা। ঢের হয়েছে।

ফিরে আসতে আসতে তিনি দুঃখ করে বললেন, আমাকে এই ভাবে তোমরা অকর্মণ্য করে দিতে চাও। তোমাদের হাতের পুতুল বানিয়ে রাখ—বলতে বলতেই হঠাৎ তিনি থেমে গেলেন, তাঁর চোখের তারা দুটো ব্যথায় নরম আর অসহায় হয়ে উঠল। ব্যাকুলভাবে তিনি বলে উঠলেন, এই দ্যাখ, কে এই দশা করলে পেয়ারা গাছটার? গঙ্গাজলি পেয়ারা যে! আর বছর আমি আনলাম সেই সৈদপুরের কেষ্টদের বাড়ী থেকে। নিশ্চয় সেই গরুটার কাণ্ড!

নন্দরাণীর ভয় করছিল বুঝি সকাল বেলার মত একটা কিছু কাজ করে বসবেন। কিন্তু তার পরিবর্ত্তে তিনি একেবারে মিইয়ে বিমর্ষ হয়ে গেলেন। একটা কথাও আর বললেন না। আস্তে আস্তে হেঁটে চলে এলেন, নিজের ঘরে বিছানায় এসে চুপ করে বসে রইলেন।

নন্দরাণী বলল, আসুন আজ উনি। দেখি পেয়ারা গাছে বেড়া উনি দেবেন কি না। তার পর অন্য কথা।

নীলমণি তারও উত্তর দিলেন না।

বেলা চারটের কয়েক মিনিট বাদে মৃত্যুঞ্জয় ফিরল। এ সময় সাধারণতঃ ফিরবার কথা নয় তার। ইস্কুল শেষে একটা টিউশন সেরে ফিরতে তার সন্ধ্যে হয়। আজ যায় নি সে পড়াতে। নন্দরাণীকে বলল, মনটা খারাপ লাগছিল বাবার জন্য। বুড়ো মানুষকে না হোক কটা কথা শুনিয়ে গেলাম।

—শোনালে কেন?

—তাই এলাম বাড়ী। তা ছাড়া তোমাকেও একবার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।

নন্দরাণী বলল, সে ত তুমি কতবারই নিলে।

—না, না—আজ নেবই তোমাকে। শরীরটা তোমার দিন দিনই—

—থাক থাক। নন্দরাণী মুখ ঝামটা দিল, কত দরদের শরীর তোমার। বৌ-বাপ—

—বাবা কি করছেন?

—সারা দুপুর ঘুমিয়েছেন নাকি? ওই ভাবে বসে আছেন গালে হাত দিয়ে। যাও দেখে এস গিয়ে।

মৃত্যুঞ্জয় নীলমণির ঘরে ঢুকল।

আরও বিকেলে বেরোয় সে নন্দরাণীকে নিয়ে রিক্সায়। ডাক্তারের কাছে যাবে। বীরুবাবুর মেজ-মেয়ে রাণুকে রেখে গেল বাপের কাছে।

—আমার পাহারা না বসালে চলবে কেন? বললেন তিনি মৃত্যুঞ্জয়কে নন্দরাণীকে শুনিয়ে শুনিয়ে, সংসারে ত এখন আমি বন্দী—নজরবন্দী। চব্বিশ-ঘণ্টা চোখে চোখে থাকব!

মৃত্যুঞ্জয় বলে, বাবার যেমন কথা। একজন মানুষ থাকলে ভাল না? বেশ কেমন গল্প-গুজব করবে।

—তোমাদের সংসারে আর আমি থাকব না।

ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরে দেখে বসে আছেন একা-একা সেই জলচৌকিটায়।

—একা নাকি তুমি? রাণু কই?—বারান্দায় উঠতে উঠতে দু'জন উর্দ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করল।

—বাড়ী চলে গেছে। আমিই পাঠিয়ে দিলাম।

—আলো জ্বালল কে? ঘরে পা দিতে দিতে নন্দরাণীর বিস্মিত প্রশ্ন। তার পর আবার বলল, ঠাকুর আসনে প্রদীপও জ্বলছে দেখি—

—আমি জ্বেলেছি। জলচৌকি থেকে উঠতে উঠতে বললেন নীলমণি। বললেন, কেমন পারি কি না আমি? দুর্ব্বল হয়ে গেছি? বাতিল হয়ে গেছি?

আশী বছরের বৃদ্ধ খড়ম পায় দিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

ছেলে ছেলে-বৌ হতভম্ব হয়ে এ-ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ডাক্তারের কাছ থেকে ফিরবার খানিক পরেই খবরটা দিয়েছিল মৃত্যুঞ্জয় নীলমণিকে! শুয়ে-থাকা মানুষটা গুন-ছিঁড়ে-যাওয়া ধনুকের ছিলার মত সোজা হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

—ছেলে হবে? অ্যাঁ, কি বলল ডাক্তার? রক্তশূন্যতা?

—কিছুটা তাই।

—কালই একটা গরু কিনে ফেল তাহলে।

—কে দেখবে ?

—কেন, আমি দেখব।

—গাছ-পালা যা আছে সব খাবে। অবিশ্বাসের গলা মৃত্যুঞ্জয়ের, সংশয় ভয়ের।

—খায় খাবে। নীলমণি অবলীলাক্রমে বললেন, আমার জিনিস খাক তাতে তোর কি ? তা বলে এত বছর পরে যে আসছে তাকে ঠিক রাখতে হবে না ? মৃত্যুঞ্জয় চলে যাচ্ছিল। ছেলেকে ডেকে বললেন, শিন্টুকে তোর মার হাতবাক্সে একটা গিনি আছে। যত্ন করে রাখিস সেটা। ছেলে হলে ওই দিয়ে তার মুখ দেখব আমি।

পাশের খোলা জানালাটা দিয়ে দূরের অগণিত তারকা-খচিত আকাশখানার দিকে তিনি তাকিয়ে রইলেন।

রেণুর চিঠি

শ্রীকরুণাময় বসু

বৃষ্টি ধোয়া নতুন পাতায় শরতের খুসির আকাশ
চোখ মেলে :
কান্না থামিয়ে ছোট ছেলে যেমন মায়ের দিকে তাকায় :
চিক্‌চিকে রোদে পদ্মপাতার দিন শুয়ে আছে গা এলিয়ে,
গাঁয়ের ধারে মাঠের উপর সবুজ ঘাসের শীতলপাটি পাতা,
মিষ্টি গন্ধে ভরা আশ্বিনের দিন
বাঁশি বাজিয়ে ডাক দেয়।

ডাক দেয় আমার ছোট বোন রেণু,
দাদা পুজো এলো, বাড়ী আয়,
শিউলি বনে ফুল আর ধরে না,
আমাদের চন্দনা পাখিটা কেমন কথা শিখেছে :
দাদা তোর মনে পড়ে গেল বছরের কথা,
সোনাডাঙার ঘাট থেকে ডিঙি চুরি করে
কোজাগরী পূর্ণিমা রাত্তিরে
কেমন মজা করে খাল বিলে বেড়িয়ে আসা :—
উঃ মনে করতেই গা'টা কাঁটা দিয়ে ওঠে !
তারপর কতো কাণ্ড করে বাড়ী ফেরা,
দাদা তুই নেই, আমার কিছু ভালো লাগে না।

কতো কালের চিঠি, অক্ষর অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে,
ভুরু কুঁচকে পড়তে হয়.
তবু দেখতে পেলাম ডুরে শাড়ী-পরা রেণু দাঁড়িয়ে আছে,
দুষ্টুমিভরা হাসিতে চোখের পাতা নেচে ওঠে,
হেসে হেসে বলে, পুজোর মেলায় ওই মনসাপোতার হাটে
তুই আর আমি তেলে ভাজার দোকান দেব,
আমি ভাজব, তুই বিক্রী করবি, ভারী মজা হবে।
আমি হেসে হেসে বলি, তা কেমন করে হবে ?
সে অবাক হয়ে ভাবে।

পুরোনো চিঠির ফাইল ঘাঁটতে
এই চিঠি আজ সকালেই পেলাম।
বাইরে তাকিয়ে দেখি
সোনার শরৎ আঙুলে হীরের আংটি পরে
কচি ঘাসের উপর পা ফেলে দাঁড়িয়ে আছে :
আমার ঘরের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে
হাসি-মুখে বললে, আমি আবার এলাম।
চোখে জল এল আমার,
ধরা গলায় বললাম, আমার রেণু কোথায়,
রেণুকে কোথায় রেখে এলে আজ ?

ভারতের সেচ ব্যবস্থা—কথা ও কাজ

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

সারা বৈশাখ মাস চলিয়া গেল, সমস্ত বাংলা দেশের কোথায়ও এক ফোঁটা আকাশের জল পড়ে নাই। ক্ষেতে ফসলের যে গাছ ছিল, তাহা শুকাইয়াছে। যাহারা অমানুষিক ক্লেশ ও প্রচুর অর্থব্যয়ে সেচ সাহায্যে পাট ও আউস ধান রোপণ করিয়াছিল তাহাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। চৈত্র-বৈশাখে মাটি ফুটিফাটা হইয়া যায়, তাহা বেশী কথা নহে; কিন্তু তৃষ্ণার জল যে সকল কুয়া পুষ্করিণী দীঘি নদী হইতে পাওয়া যাইত, তাহাও শুকাইয়া উঠিয়াছে।

এতদিন খরা থাকিলে যাহা হইবার কথা, হইয়াছে তাহাই। দুঃখ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতির প্রহার সহ্য করিতেই হয়, কারণ—তিনি কাহারও চোখের জলের তোয়াক্কা রাখেন না। অপর পক্ষে, উদ্যোগী মানুষ প্রকৃতির সহিত নানা ভাবে লড়াই করিয়া বাঁচিয়া আসিতেছে, কালের গতিতে বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ নিজের প্রভাব বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দুর্দ্দিনে যাহাতে সে বিপন্ন না হয়, তাহারও জন্য অসময়ে প্রচুর জল পাইবার ব্যবস্থা করিতেছে।

সকল সভ্য ধনশালী দেশে এ সকল ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই করা হইয়াছে। স্বাধীন ভারত তাহা হইতে পিছাইয়া থাকিবার কথা নহে। সুতরাং ভাতে মারিয়া, ধার কর্জ্জ করিয়া জমি জরু এবং তিন পুরুষের কল্যাণ বন্ধক দিয়া নানা ভাবে বিশালায়তন জলাধার নির্ম্মাণে উদ্যোগী হইয়াছে।

অভাবের সময় জল সরবরাহ করিতে গেলে সময়ে অর্থাৎ প্রধানতঃ বর্ষাকালে জল সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হয়। ইহাতে আরও কয়েকটি সদুদ্দেশ্য সাধিত হইবার কথা। বিরাট-পরিসর জলাধার ভরিতে যে জল প্রয়োজন, সে পরিমাণ জলের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে না পারিলে বন্যার উপদ্রব হয় এবং ভারতবর্ষ বিশেষতঃ পশ্চিম বাংলার এই উপদ্রব চিরন্তন হইয়া উঠিয়াছে। জলাধার হইলে মাছের চাষ হইবে, আশ-পাশের জমি আর্দ্র থাকায় ভাল গাছপালা হইয়া উহা সুষমামণ্ডিত হইবে। লোকের বিলাস-ভ্রমণের স্থান হইবে। এই জলাধার হইতে বছরের সকল সময় খাল সাহায্যে দূর-দূরান্তরের ক্ষেত্রে যে জল সেচন করা সম্ভব হইবে তাহা নহে, একটু বড় খাল বা নদীতে জল ছাড়িয়া নৌকা সাহায্যে মাল-বহন, যাত্রী চলাচল সহজ হইবে।

ত্রুটি হয় নাই। সেচ ও আনুষঙ্গিক ফললাভের উদ্দেশ্যে প্রথম পরিকল্পনায় ৩৪০ কোটি এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১৭২ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে, বরাদ্দ হইয়াছে, যথাক্রমে ৭৪০ ও ৩৮০ কোটি টাকা। আশা করা যায়, ভারতীয় মন্ত্রী ইঞ্জিনীয়ার হইতে মাটি কাটা শ্রমিক সাহায্যে দুই পরিকল্পনায় অন্ততঃ ৫১২ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় ব্যয়ের পরিমাণ ৬৫০ কোটি টাকা হইবে বলিয়া অনুমান।

পশ্চিম বাংলার নানা স্থান ঘুরিয়া দেখা গেল তৃষ্ণাতুর ক্ষেত্রে ত জল নাই, এমনকি বারিবহ খালগুলি হয় সম্পূর্ণ শুষ্ক আর না হয় কচুরীপানা জীয়াইয়া রাখিবার মত জল ধারণ করিয়া আছে। যখন চাষের ক্ষেতে জলের এত প্রয়োজন তখন জল পাওয়া যাইতেছে না। যখন পাওয়া যাইবে, তখন বর্ষার জলই চাষের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে হইবে। তাহার পরের একটা চাষে পরিকল্পনাগত সেচ ব্যবস্থার জল পাইবার সম্ভাবনা থাকে এবং কিছু সাহায্য হয় না, এ কথা বলা যুক্তিযুক্ত নয়।

পশ্চিম বাংলার সেচ উদ্দেশ্যে দামোদর উপত্যকা ও মোর বা মেসোঞ্জর বাঁধ পরিকল্পনা এই দুইটিতে কাজ বহু পরিমাণ অগ্রসর হইয়াছে। জল সরবরাহ বিষয়ে কতটা সফলতা লাভ করা গিয়াছে, তাহা বলা কঠিন ব্যাপার। ব্যয়ের ত নয়ই, প্রয়োজনের অনুপাতেও জল যে পাওয়া যায় নাই, তাহার প্রমাণ ক্ষেতের দিকে চাইলেই পাওয়া যায়। এক একটি সেচ বাঁধ পরিকল্পনা কালে কতটা জমিতে জল সরবরাহ করা যাইবে, তাহার একটা আনুমানিক হিসাব ধরা হয়। তাহার উপর ব্যয়ের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয় এবং সেচ সাহায্যে কত বেশী পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হইবে, তাহা হইতে কত টাকা অতিরিক্ত মুনাফা হইবে, জাতীয় আয় এবং ব্যক্তিগত মাথাপিছু গড় আয় কত স্ফীত হইবে, তাহা কষিয়া মাজিয়া জনসমক্ষে প্রচার করা হয়। কাগজ কলমের অঙ্ক আর প্রয়োগ-ক্ষেত্রের ফলে কত পার্থক্য থাকে তাহার

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

বাউল
শ্রীনন্দলাল বসু
(প্রবাসী চৈত্র, ১৩৪৫ সন হইতে পুনর্মুদ্রিত)

পায় নাই। এতদিন আশ্বাসবাণীর উপর নির্ভর করিয়াছিল। আজ চারিদিক হইতে সন্দেহের সুর কাণে আসিতেছে; চক্ষেও তাহার কিছু কিছু প্রমাণ মিলিতেছে। সুতরাং মন সন্দেহে পরিপূর্ণ হওয়া খুব অস্বাভাবিক নহে। কত দিনে চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হইয়া সাধারণ মানুষ বুক ফুলাইয়া চলিতে পারিবে, গভর্ণমেণ্ট সেই বাণী শুনাইয়া, হাতেনাতে ফল দ্বারা প্রমাণ করিয়া দেশবাসীকে আশ্বস্ত করিবেন ইহাই প্রধান কাম্য।

সংখ্যাগুরু

শ্রীভূদেব চট্টোপাধ্যায়

সেই যে কখন জন্মলগনে কান্না হয়েছে সুরু
আজিও তাহার হ'ল না শেষ, কাটিল না কালো রাত
ব্যর্থ আশার লয়ে গুরুভার বুক কাঁপে দুরু দুরু
আঁধার জীবনে আসিল না কভু মধুর সুপ্রভাত।
পাথেয় বিহীন পথ চলা হ'ল বিফল পরিক্রমা
ব্যাধি আর ব্যথা একসাথে আসি ধরিল উভয় কর
পরাজিত প্রাণ কেঁদে মরে হায়, কোথাও মেলে না ক্ষমা
হালভাঙা তরী অকূল পাথারে খুঁজে ফেরে বন্দর।
অর্জ্জুন হতে হিটলার যুগে আমরা যে পদাতিক
জগতের হাটে আমাদের প্রাণ হয়েছে যে বেচাকেনা
লাঞ্ছনা আর অপমানে ভরা জীবনে মোদের ধিক্
দীনহীন হয়ে যুগ যুগ ধরে পেয়েছি কেবল ঘৃণা।

মুষ্টিমেয়র তুষ্টি বিধানে গোষ্ঠীরা আজ সারা
কালো নিগ্রোর জলভরা চোখে প্রলয় নিশান তাই
যন্ত্রযুগের নিঠুর পেষণে লাখে লাখে যাই মারা—
লাল চীন তবু ফুকারিয়া কহে, 'ভয় নাই ভয় নাই'।
দিগ্বলয়ের নীল নভোতলে ঘন কালো মেঘ জমে
গুরু গুরু রবে নটরাজ করে বেজে ওঠে ডম্বরু
আধমরাদের যায় না যে মারা বিশাল এ্যাটমবমে
শত জীবনের অভিশাপ শেষে জেগেছে সংখ্যাগুরু!

বঞ্চনা

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

যে নব গীতি—যে রাঙা প্রীতি করিতে এলে দান,
নেব না বলে যাব কি দলে' করি তা অপমান?
নদীর মতো উথলে যেথা তোমার যৌবন
সে-বরষায় কি ভরসায় ভাসাতে পারি মন!
বিগত হায় প্রীতি যে ধায় রাঙায়ে ফেরে চোখ;
শুধু কি তবে জীবিত রবে জীবনে দুর্ভোগ?

সেকথা আর করিতে বার সাহস নাহি পাই,
তবু কি আশা সে-ভালোবাসায় আনিতে চায় ক্লেদ?
আমি যে হীন অথচ দীন—তোমারই প্রেম চাই,
ফাগুনে তাই ব্যর্থতাই জানায় বিচ্ছেদ?
বঞ্চনায় শেষে কি হায় সোহাগ সুমধুর
কাছের ধনে বিরূপ মনে রাখিবে করি দূর?

তিন সাগর

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য

৫

হোটেলে আসতেই ম্যাকগ্রিগর হৈ চৈ লাগিয়ে দিয়েছে। "ট্রেটর তুমি, একা একা চলে গেলে। আমি কেবল ফুলের পাপড়ি গুনি—ভালবাসে,কি ভালবাসে না!"

দু' জনেই এক রাশ হাসির হর্‌রায় তলিয়ে যাই।

আমার খাওয়া হয়ে গেছে তবু কে বলে একা একা খাওয়া আবার খাওয়া নাকি? চলো চলো।"

খাবার ঘরে একটা টেবিলে বেছে বসতে বসতে কে বললো, "ম্যাকেগ্রিগর তো একবার টেবিলে একবার বাইরে ব্যাপার যা দেখছি ম্যাক ভারতবর্ষের যোগী না হয়ে যায়!"

ম্যাকগ্রিগরের লম্বা গলা ডিঙিয়ে রক্তের ঢেউ খোলা-বুক অবধি বয়ে গেলো। মুক্তার মালায় আর লালে সকালটায় যেন বিলাস বয়ে গেলো।

"অপেরা কেমন হোলো?"

"সে পরে হবে। কিন্তু প্রাচীনা কুমারীকে নিয়ে এ রঙ্গ কেন?"

কৌতুকের নেশায় কে-র তৃতীয় চিবুকের স্তরে থর থর কম্পন।

ম্যাকগ্রিগর নাকি খালি আমার গল্প করেছে কে-র কাছে। চুপ করে তখন কে শুনেছে। আজ সকালেও তাই। এখন কড়ায়গণ্ডায় শোধ তুলছে। খুব সুন্দর লাগছে সকালটা।

আমি যে এক পাক দিয়ে এসেছি শুনে ওরা খুব একটি বঞ্চনায় ভুগেছে এমন ভাব প্রকাশ করলো। তার পর সব শুনে বললো "চারটে? স্নান? খাও, আর একটু কফি খাও। বুঝেছি; বাড়ী ছেড়ে ঘুম গেছে। এক ধরনের হোম-সিক্‌নেশ।"

"অপেরা কি দেখলেন, শুনি?"

"রিগোলেত্তো।"

"ভার্ডির অপেরা? খুব সুন্দর জিনিস। এই একটি আর্ট ইংরেজরা চেষ্টা করেও পারে নি। জার্মানরা চেষ্টা করতে গিয়ে একে অদ্ভুত ড্রামাটিক করে ফেলেছে। যদিও বিখ্যাত সব অপেরাই প্রায় জার্মানরাই লিখেছে: মোজার্ট, ওয়েবর, ওয়াগনর, ষ্ট্রস্ প্রত্যেকে অপেরা লিখেছে। রাশানরাও বাদ যায় না। অপেরা য়োরোপের নেশা। ধরুন বোরোদিন—চেষ্টা করেছে; কিন্তু নির্ভেজাল জাত অপেরা তো ইতালিয়ন অপেরা। এটা অপেরার জন্মভূমি! রসেনি, ভার্ডি, ম্যাসকাগ্‌নি, পুচিনি—এদের তুলনা হয় না।"

ম্যাকগ্রিগর বললো, "কি একটা অপেরা তো খুব বিজ্ঞাপন দিচ্ছে সাঁ-সেয়ন্—যাবে নাকি?"

"সামসন্ দেলাইলার কাহিনী—ফরাসী লেখক বিজেঁর লেখা খুব ভালো বই। তবে গুজোর ফাউষ্টের কাছে নয়।"

কে বলে, "আমার তো মনে হয় অপেরার প্রাণ প্রোডাক্‌সান আর মুজিক। বই লেখা নয় অপেরা। ও যেন ছবির স্বপ্ন গড়া, সুরের আলোয়।"

চমকে উঠি। বলি, "তাই তাই। আমাদের দেশে চিত্রাঙ্গদার রূপ দেখে আমার এমনিই মনে হয়েছিলো। বড়ো বেশী কবিতাভরা কথা বলে বলি নি।"

ম্যাকগ্রিগর এবার ফুৎ পেয়ে বলে, "বুড়ী কুমারীর স্বপ্নের দোলনায় দোল খেতে আরম্ভ করেছো বাতা-শারিয়া। গাড়ী কিন্তু হর্ণ দিচ্ছে।"

সকালটা যেন আলোয় ভরে গেছে। ইটালিয়ান জীবন জেগে উঠেছে। ঘনসংবদ্ধ পথগুলোর অন্ধকার দেখলে চীৎপুরের পথ মনে পড়ে। কলকাতার প্রাচীন রূপ তো বাগবাজার আর চীৎপুর। রোম পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম নগরীর অন্যতম, যেমন দামাস্কাস্, কায়রো, পিকিং আর বারাণসী। তাই পথে বেরুলেই মনে প্রাচীনতার অন্ধকার ছায়া ফেলে। তবু সেই সঙ্কীর্ণ পথের মধ্যেই ট্রামও চলছে, বাসও।

এখন খুব চেষ্টা চলছে পথ চওড়া করার, নতুন ধরনের স্থাপত্যের, ট্রাম লাইন স্কাই স্ক্রেপারের। তেমন তেমন ব্যারাকপুরী পরিকল্পনা গতিশীল। ভালো লেগেছিলো কর্ম্মমুখর প্রাচীন রোমের সঙ্কীর্ণ পথের ধারে ধারে কফির দোকান, চিত্র-বিচিত্র বেচার মনোহারী দোকান। বেশীর ভাগ দোকানদারী করে মেয়েরা। ফলে বেচা-কেনার মধ্যে সহজ একটা সংযম ও সৌম্যতা আসে। কিনতে ভালো লাগে।

চমৎকার একটা বাগানের মধ্য দিয়ে চলেছে বাস। যাচ্ছি বার্গিজ চিত্রশালায়। রোমে বেশীর ভাগ সম্পদ আছে গির্জায়। এমন গির্জা নেই যেখানে ছবি নেই, সাজানো নেই। সান্তা মারিয়া পপেলো গির্জায় কণ্ডানা এবং র‍্যাফায়েলের কাজ আছে।

মাউণ্ট অব ত্রিনিতি বহুখ্যাত। পাহাড়ের গায়ে ধাপ কেটে চওড়ায় লম্বায় শতাধিক সিঁড়ি। খাঁজে খাঁজে বাগান। ধাপে ধাপে সুন্দরকে সুন্দরতর করার চেষ্টা। তার শীর্ষদেশে গির্জা। এ গির্জার চূড়া থেকে দেখলে সামনে বার্গিজ বাগান, বার্গিজ খাল, নোমেন্তানোর পুল, টাইবর সব দেখা যায়। প্রত্যেক রোম পর্য্যটক এ দৃশ্যের চমৎকারিত্ব বর্ণনা করেছেন। পোর্তা দেল পপেলো রোমের উত্তর দিকের সিংদরজা। দিল্লীর পুরোনো দেয়াল ভেঙে মাত্র ঐতিহাসিক প্রতীক হিসেবে খানিক খানিক প্রাচীর রেখে দেওয়া হচ্ছে; প্রাচীন রোমের প্রাচীরের কিছু কিছু অবশেষ তেমনি এই সব সিং-দরজার সংলগ্ন অঞ্চলে আজও আছে।

পোপ পল (পঞ্চম) বিলাস-ব্যসনের জন্ত ভাগ্নের নামে এক প্রাসাদ করেন। "নেফু"—ভাগ্নে; পোপেদের এই ভগ্নী আধিক্য, ভাগ্নে আধিক্য ও প্রীতির কথা নিয়ে ঐতিহাসিক চক্ষুষ্মানরা অনেক রকমের আলোচনা করেন। সে যাই হোক, মামা-ভাগ্নের চিরন্তন সম্বন্ধের জটিলতা অতিক্রম করে পোপীয় ভাগ্নেরা মামা-পোপ্‌দের কাছ থেকে বাৎসল্য যা পেয়েছে তা পুত্রকেও পিতা সহজে দেয় না।

এমনি এক ভাগ্নে সিকিওনী কাকারেলী বোর্ঘিজ। তার মামা মহর্ষি পঞ্চম পল। বাগানখানার পেরিমিটারের মাপ ৬ কিলোমীটর, আর পুরো ক্ষেত্রফল এক বর্গ কিলোমীটর। গ্যেয়টের স্মৃতিস্তম্ভ দেখে অনেকক্ষণ চুপটি করে ছিলাম। গ্যেয়টের চেয়েও শিল্পী এবারহীনের মহিমার কথা বেশী মনে হোলো। ভিক্তর হ্যগোর স্মৃতিস্তম্ভও দেখতে চমৎকার। প্রকাণ্ড হ্রদ। চারধারে সুসজ্জিত বাগান। হ্রদের মাঝে কেয়ারী করা, লতাকুঞ্জে ঘেরা একখানা বিলাসকুঞ্জ। চারধারে রঙের বাহার। মনের মতো করে সাজিয়ে ছিলো বার্ঘিজ। একটি খাল চলে গেছে তাইবর অবধি।

বার্ঘিজের প্রাসাদ একদিন বিলাস-ভবন ছিলো। নাচে, গানের প্রেমের বাণিজ্যে পোপ-ভাগ্নে তখন "এ" দুনিয়ার তাবৎ রসের ভার নিয়েছিলেন, স্বয়ং মামার চাবির মধ্যে "ও" দুনিয়ার তাবৎ সুখ। এমনি করে দু'জনার স্বর্গ-নরক ভাগাভাগি করে গোটা বিশ্বকে ভোগ করার তোফা ব্যবস্থা করেছিলেন!

আজ সেই প্রাসাদে চিত্রশালা। ছাতের সিলিংয়ে বিরাট বিরাট চিত্র। কোথাও এতোটুকু অবকাশ নেই। প্রতি কক্ষে এবং এক একটি কক্ষই বা কি—যেমন চওড়া, তেমনি লম্বা। সিলিং থেকে মেঝে পর্য্যন্ত বড় বড় জানালা। মেঝেগুলো পালিশ করা কাঠের। একটু অসাবধানে চললে হড়কে পড়ে যাবার ভয় যথেষ্ট। সেই সব কক্ষের এপার থেকে ওপার পর্য্যন্ত সারি সারি মর্ম্মর-মূর্ত্তি, দেয়ালে দেয়ালে বিখ্যাত চিত্রের সারি। দেশ-বিদেশের ছাত্র-শিল্পীরা এক এক কোণে বসে আঁকছে। একটি মহারাষ্ট্রী ছেলেকে দেখলাম আঁকছে।

বার্ঘিজ চিত্রশালার প্রধান দ্রষ্টব্য বার্নিনির কাজ। রেপ অব প্রসার্পিন আমার খুব ভালো লেগেছিলো। পাওলিনা বার্ঘিজের মর্ম্মরমূর্ত্তির মধ্যে কোথায় যেন কিসের অভাবে বড়ই মর্ম্মরমূর্ত্তি বলে বোধ হোলো। নৈলে চমৎকার। বিখ্যাত এপোলো ও দাফনীর, ট্রুথ, ডাভিড, এই ম্যুজিয়মেই আছে। চিত্রেও এই ম্যুজিয়ম অদ্ভুত সম্পাদিত। র‍্যাফায়েলের 'ডিসেণ্ট ফ্রম দি ক্রস' করেগ্‌জিওর 'দানাই', টিশিয়ানের "সেক্রেড এণ্ড প্রফেন লভ" সবই এই ম্যুজিয়মে দেখেছিলাম।

চমৎকারকে দলের মধ্যে পাওয়া যায় না। মানস-লোকের পদ্ম একা একা ফোটে। যদিও ভীড়, প্রকাণ্ড ভীড়, তবুও ব্যাকগ্রিগর আর কে-কে ধরা দিই নি। তাই বেশ লাগছিলো। সমস্ত সত্বা দিয়ে এতোদিনকার পিপাসা মেটাচ্ছিলাম।

হঠাৎ মনটা কেন যেন অন্ধকার হয়ে গেলো। মনে হোলো আমি পুরো নই। এ আমার পুরো দেখা নয়। কোথায় যেন স্বার্থপরের মতো এক একা চুরি করে রস খাচ্ছি। এই অবগাহনের মধ্যে হৃদয় যেন ভিজছে না।

কিন্তু এ নিয়ে ভাবার সময় নেই। বাস ছাড়ছে। যাচ্ছি এবার পাঁথিয়ন—রোমের মধ্যে প্রাচীন স্থাপত্যের এমন সুসম্পূর্ণ পরিচয় আর নেই।

পাঁথিয়নের মুখে বেশ ভীড়। ঝকঝকে রোদ। গায়ে কালো বনাতের আচকান রাখা যাচ্ছে না। ইতালির আইসক্রীম বিক্রী হচ্চে ঠেলা গাড়ীতে। সুন্দর সুন্দর মেয়েরা নানা রকমের ছবি, মালা ইত্যাদি বেচছে। পায়রার দল উড়ে বেড়াচ্ছে। প্রশস্ত পথের চারধারে বড়ো বড়ো বাড়ী। অনিবার্য্য গির্জাঘর। মাঝখানে একটি মিশরীয় স্তম্ভ—ওবেলিস্ক।

এই পাঁথিয়ন:

Simple, erect, severe, austere, sublime—
Shrine of all saints and temple of all Gods.

বলেছেন, Byron: বলেছেন, "Pantheon—Pride of all Rome." সেই পাঁথিয়নে এসেছি।

> Relic of nobler days, and noblest arts!
> Despoiled, yet perfect, with thy
> circle spreads
>
> A holiness appealing to all hearts—
> To art a model; and to him who treads
> Rome for the sake of ages, Glory sheds
> Her light through thy sole aperture...

প্রতিটি পংক্তি, প্রতিটি শব্দ যেন জল্ জল্ করে ওঠে।

জায়গার নাম পিয়াৎসা-দেল্লা-মিনার্ভা। আজ যেখানে চার্চ অব সেন্টমেরী (পুরো নাম—চিয়েসা-দি-সান্তা মারিয়া-সোপ্রা মিনার্ভা—অর্থাৎ মিনার্ভার ওপরের সান্তা-মারিয়ার গির্জা) এককালে সেখানেই মিনার্ভার মন্দির ছিলো। সারা রোমে গথিক পদ্ধতির গির্জা এই একটি-ই। তা ছাড়াও এর ভেতরে শিল্প-সম্পদ রয়েছে অনেক। দু'খানা মহর্ষি পোপের দেহ গাঁথা আছে এর মাটিতে তো বটেই, সে কিছু নয়। দশম লিও এবং সপ্তম ক্লিমেটের নামও আজ কারুর মনে নেই। কিন্তু মিকেলেঞ্জেলোর 'ক্রাইষ্ট'-এর মর্ম্মর মূর্ত্তি এই গির্জ্জায়। ফিলিপিনো লিপ্পি, রাফায়েলিনো-দেল্-গার্কোর ফ্রেস্কো আছে এই গির্জ্জায়। সেটাই বড়ো কথা।

চার্চের সামনে, পাঁথিয়নের সামনে মিশরীয় একটি স্তম্ভ খাড়া আছে একটি মর্ম্মরের হাতীর পিঠে। আর সবটা বসানো একটা চৌকো পাথরের বেদীর ওপর। স্তম্ভটি খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর এবং মিশরীয়। গায়ে মিশরী ভাষায় সূর্য্যবন্দনা লেখা। বেদীর গায়ে লেখা—"গভীর জ্ঞান দৃঢ় মনের পরিচয়।" বোধ হয় বার্নিনির লেখা। কারণ স্তম্ভ ছাড়া বাকী সব কাজটাই বার্নিনির।

পুরাকালে এইখানটায় একটি সাধারণ যজ্ঞবেদী ছিলো। নিরন্তর অগ্নিরক্ষা করা হতো এই হোমকুণ্ডে। অগ্নিহোত্র ব্রাহ্মণ এই যজ্ঞাগ্নি রক্ষা করতেন না, সে ভার ছিলো মন্দিরের সেবাদাসীর। বলা হতো ভেষ্টাল ভার্জিন্‌স্। প্রতি মন্দিরে যজ্ঞাগ্নি রক্ষার ব্যবস্থা ছিলো। জাতীয় উৎসবে, ক্রীড়ামোদের দিনে, বিশিষ্ট কোনও পর্ব্বে, মন্দিরের যজ্ঞকুণ্ডের আগুন নিয়ে আগে অর্চ্চনা হতো, পরে আসল কাজ আরম্ভ হতো। অ্যাপোলোর মন্দিরের যজ্ঞাগ্নি থেকে মশাল জেলে নিয়ে গিয়ে অলিম্পিক খেলার আগুন জ্বালা হতো। সেই প্রথা আজও চালু আছে। ধরনটা একটু বদলেছে, এই যা।

ভেষ্টাল ভার্জিনরা বড় ঘরের মেয়ে। মোটামুটি মেনে নেওয়া হতো এঁরা চিরজীবন কুমারী থাকতেন। বৌদ্ধদের সন্ন্যাসিনী প্রথা, সঙ্ঘের ব্যবস্থা, পেগানদের ভেষ্ট্যাল ভার্জিনের ব্যবস্থা, খ্রীষ্টীয় ব্যবস্থায় নানারি, সবই যেন একতারে বাঁধা। বুদ্ধের ততো মত ছিলো না এই ভেজাল তৈরি করার। যে যীশু মেয়েদের ব্যাপারে চির-জীবন সসম্ভ্রমে কথা বলেছেন, তিনিও নেহাৎ খুশী ছিলেন না এই সন্ন্যাসিনী ব্যবস্থায়।

আজ আর সেই ভেষ্ট্যাল ভার্জিনও নেই, যজ্ঞবেদীও নেই, আগুনও নেই, মিনার্ভা মন্দিরও নেই। ছিলো মন্দির, আছে গির্জ্জা; ছিলো হোমের আগুন, আছে মোমবাতির দীপ; ছিলো ভেষ্ট্যাল ভার্জিন, আছে নানারি। কায়া পলটুই হয়েছে। নৈলে মেয়ে আর মন্দির নিয়ে হিজিবিজি আগেও যেমন কাটা হয়েছে, এখনও তাই।

কিন্তু পাঁথিয়নের মধ্যে একটা ভাণ্ডে আগুন জ্বলে। লোকে তাতে ধূপ দেয় আজও।

রোমকরা বহু দেবতায় বিশ্বাস করতো হিন্দুদের মতো। হিন্দুরা পান্থিজম মানতো মনোথিজমের বিকাশ হিসেবে। পান্থিজম শাখা-প্রশাখা। মনোথাজম বীজ। রোমকদের ওসব বালাই ছিলো না। জীবন্ত প্রেমিক, প্রেয়সী, বা সরাসরি প্রসিদ্ধা গণিকা বা নর্ত্তকীকে উলঙ্গ করে তার প্রতিমা খাড়া করেই দেবতার প্রতিমা কল্পনা করতো। গ্রীসেও তাই ছিলো। তা-বড়ো তা-বড়ো রাজা রাজড়া আর উর্ব্বশী মেনকাদের নামে মন্দিরই ছিলো! তাদের পুজোও হতো।

আসলে গ্রীসের ব্যবস্থার আমদানীই রোমের সভ্যতা, শিল্পকলার আশ্রয়। গ্রীকেদের পান্থিজম ছিলো। রোমক-দেরও তাই। প্রত্যেক দেবতারই আলাদা আলাদা মন্দির ছিলো। কিন্তু একটা মন্দির ছিলো যেখানে সব দেবতার সম্মিলন স্থান। সেটি পাঁথিয়ন। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৭ অব্দে—সে বছরেই অক্টেভিয়ানকে 'অগষ্টস্' উপাধি দেওয়া হয়, এই মন্দির তৈরী হয়। প্রকাণ্ড মন্দির, গোল, ওপরে কংক্রীটের বিশাল গম্বুজাকৃতি ছাদ। একটি দরজা। কোনো জানালা নেই। তবু এতো আলো যে, ভেতরে দাঁড়িয়ে দিব্যি ফোটো নেওয়া যায়। এই আলোর কারণ ছাদের মাঝে একটা গোল অবকাশ এই অবকাশ দিয়ে আকাশ দেখতে মনে হয় যেন মানুষের গড়া মাটির উৎসবে যোগ দিয়েছে আকাশের চন্দ্র-সূর্য্য।

অবকাশ দিয়ে জল ঝরে পাছে তলার কাজ করা পাথরের মেঝে নষ্ট করে, তাই সারা মেঝেটায় কাছিমের পিঠের মতো ঢল্। চার দিকে জালি করা। জল ছড়াতে পায় না। জালি দিয়ে বেরিয়ে যায়।

ভেতরে এককালে নানা দেব-দেবীর মূর্তি ছিলো। আজ নেই। ৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে একে গির্জায় রূপান্তরিত করা হয়। উপাসনা হয় খ্রীষ্টীয় প্রথায়। পাঁথিয়নে ঢুকতেই বিরাট বিরাট ষোলোটি গ্রানাইটের থাম। এই থামের মাথায় পোর্টিকো। পোর্টিকোর মুখটার তিন-কোণা খাড়াই টাইম্পেনাম। টাইম্পেনামটা পুরো ব্রোঞ্জের বাসরিলিফে মোড়া ছিলো। সে কাজের সৌন্দর্য্যের বহু ব্যাখ্যা সেকালের কাব্যে পাওয়া যায়। সেই ব্রোঞ্জ এবং এই মন্দিরের যাবতীয় ব্রোঞ্জ শ্রীমান্ মহর্ষি পোপ অষ্টম আর্বান সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে খুলিয়ে নিয়ে গালান এবং ব্যবহার করেন সেন্ট পিটরের সিংহাসন তৈরি করার জন্য। কিন্তু বিশাল দরজার ব্রোঞ্জ এখনও আছে। তালাটাও সে কালেরই আছে।

এই পোর্টিকোতে গাঁথা এক শিলালেখে পাওয়া যায় যে, এটাই আগ্রিপ্পার মন্দির। কিন্তু ব্যাপারটি ভুল। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৮০ অব্দে ভীষণ এক অগ্নিকাণ্ডে আগ্রিপ্পা মন্দির পুরোপুরি ধ্বংস হবার পরে তার গায়ের পাথরখানা এনে কেউ এখানে বসিয়ে রেখেছে মাত্র। পাঁথিয়নও অনেকাংশে নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। আদ্রিয়ান পোড়া পাঁথিয়ান পূর্ণ সংস্কার করান, পরে সেভেরাস ও কারা-কাল্লার সময়েও আরও সংস্কার করা হয়।

ফলে সমগ্র রোমে আজ পাঁথিয়নের মতো সুসম্পূর্ণ সৌধ আর নেই। এর ভেতরে আজ রোমের বিশিষ্ট সন্তানদের সমাহিত করা হয়। যতক্ষণ পাঁথিয়নে ছিলাম বেশীর ভাগই দাঁড়িয়ে ছিলাম রাফায়েলের সমাধির ধারে।

চমৎকার একটি কবিতা লেখা আছে রাফায়েলের সমাধির ওপর লাতিনে। তার বাংলায় তর্জ্জমা হয় অনেকটা এই ধরনের :—

> "এইখানে সেই রাফায়েল শুয়ে—
> যাঁর জীবিতাবস্থায় বিশ্বজননী ছিলেন ভীতা,
> পাছে তিনি পরাজিতা হ'ন্
> আজ যাঁর মৃত্যুতেও তিনি ভীতা, পাছে
> তিনিও মারা যান্"

রাফায়েলের সমাধিতে রাখলাম একটি গোলাপের গুচ্ছ। রোমে তখন গোলাপ মহার্ঘ্য।

রাফায়েল! কোনদিন রাফায়েলকে প্রবীণ বলে মনে হয় নি। যেন তার অচপল কৈশোর নিয়েই সে মারা গেছে। দা-ভিঞ্চি, মিকেলেঞ্জেলো, রাফায়েল। ১৪৫২ থেকে ১৪৮৩, এই ৩১ বছরের মধ্যে এই তিন দিকপাল কলাজগতে দেখা দিয়েছিলেন ইতালিতে। মিকেলেঞ্জেলো দা-ভিঞ্চিকে উপলক্ষ্য করে বহু হাস্য-পরিহাস করেছেন। প্রবাদ, এদের মধ্যে যুদ্ধও হয়ে গেছে। কিন্তু দা-ভিঞ্চির শিল্পী হিসেবে খ্যাতি বাইশ বছরে যখন সুপ্রতিষ্ঠিত তখন জন্ম মিকেলেঞ্জেলোর। আর দা-ভিঞ্চিই প্রথম রঙের ছোপ ছেড়ে আলো-ছায়ার কারখানা রঙে রং মিলিয়ে দেখাতে লাগলেন। সেকালে এই রঙের কারিগরি দেখিয়ে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী বলে খ্যাত হন। মিকেলেঞ্জেলো তাঁর সঙ্গে টেক্কা দিতে আসেন ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু সেদিনের সেই জগদ্বরেণ্য বৃদ্ধের শিল্প দেখে একুশ বছরের রাফায়েল অভিভূত হয়ে গিয়েছিলো। যে সময়ে কলাভবনে এমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সে সময়েও রাফায়েল ছিলেন অজাতশত্রু। কি রাজসভায়, কি জনসভায়, কি অন্দরে, কি বাহিরে, কি শিশুর কাছে, কি যুবার কাছে, কি বৃদ্ধের কাছে, বিস্ময়কর চরিত্রের মাধুরীতে রাফায়েল সর্ব্বত্র প্রিয়। মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে এই অদ্ভুত শিল্পী মারা যান। তাই আজও স্মরণে তিনি চিরযুবা হয়েই আছেন। দা-ভিঞ্চি ৬৭ বছর বয়সে মারা যান; আর মিকেলেঞ্জেলো ৮৯ বছর বয়সে। এঁদের তুলনায় কতো অল্প সময়ে কি বিরাট কীর্ত্তি রাফায়েল রেখে গেছেন। ভাতিকানে, পোপের ব্যক্তিগত কক্ষে আর সেন্ট পিটর চার্চ্চে রাফায়েল চিরজীবন্ত যৌবনের প্রতীক হয়ে আছেন। প্রথম জীবনে রাফায়েল তখনও ধারণা করতে পারছেন না কি করবেন। প্রাণের ভাষায় তীব্র একটা আকুতি। সুর দিতে পারেন না। এমন একটা সুর যার স্রোতে তাঁর অন্তরতম বন্দনার বাণী আপনি বেরিয়ে আসবে।

কবি, শিল্পী, সুন্দরের প্রত্যাশী—প্রতিটি প্রাণ, এমনি খুঁজে বেড়ায়। সাধক খোঁজে গুরু, গুরু খোঁজেন শিষ্য, প্রেম খোঁজে মানুষ, মানুষ খোঁজে প্রেম, সুর খোঁজে ছন্দ, ধূপ খোঁজে গন্ধ। এই তীব্র অনিবার্য্য অনুসন্ধানের কবলে পড়ে কতো সর্ব্বনাশ, কতো ট্রাজেডী। La Belle Dame Sans Merci—কতো Knight-কে অকালে মৃত্যুর পথে নিয়ে গেছে। শুধু দেহের মৃত্যু নয়, মানুষ বিবাহিত জীবন ছেড়ে অন্য নারীর আশ্রয় খুঁজে কলঙ্কে মজেছে; রাধারা আয়ান ছেড়েছে; নরেন দত্ত পরিবার ছেড়েছে; সিদ্ধার্থ গোপা ছেড়েছে। সকলের উল্লাস একটি উপযুক্ত উত্তর সাধনার যন্ত্র। একটা এমন মাধ্যম যা দাঁড়াবে রূপ দিতে স্বপ্নকে। স্বপ্ন আর চরিতার্থতার মাপের ধাপ যার বুকে; জপ-ধ্যান আর সিদ্ধির মাপের বিকার সইবার যার ক্ষমতা আছে। রাফায়েল কখনও কবিতায় গেছেন, কখনও পাথরে, কখনও স্থাপত্যে,

কখনও টেরাকোটায়, কখনও ব্রোঞ্জে; ঘুরেছেন পরশ-পাথর চেয়ে। এ সময়ে তাঁর জীবন যেন ভৈরবের মতো উদ্দাম; যদিও ইতিহাসে, সমাজে রাফায়েল চিরশান্ত। মনে তাঁর ঝড় বইছে।

তখন পেলেন রং, তুলি; রঙে রং মিলিয়ে আলো-ছায়ার খেলা। এই রং মেলানোর সাধনায় দা-ভিঞ্চি পথিকৃৎ—রাফায়েল তাঁর উত্তরসাধক। আজও ম্যাডোনার ছবিতে রঙের খেলা দেখতে দেখতে মনে হয়, "ছবিতে এতো মায়া, এতো গভীরতা, এতো প্রাণের দরদ দিয়েছে আর কে?"

প্যাঁথিয়নের পর কলসিয়াম যাবার কথা। আমি তখন অন্ত কোথাও যেতে নারাজ। প্যাঁথিয়ন আর রাফায়েল যথেষ্ট। আমি doing Rome-এ নেই।

সত্যি এ কথা যে রোমের যা কিছু সম্পদ, সবই প্রাণ পেয়েছে গ্রীসের কাছে। গ্রীসের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্যকে রোম ছাপিয়ে যেতে পারে নি। গ্রীস জয়ের পর রোমকরা প্রাণপাত পরিশ্রম করেছে ভূমধ্যসাগরে রোমকে একটা রাজধানীর মতো রাজধানী গড়ে তোলার আশায়। মানুষ যাতে কার্থেজ, কায়রো, নিনেভা, এথেন্স ভুলে যায়। রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে নগরী স্থাপনার হিড়িক চললো। দীর্ঘ, সরল, ব্যাপ্ত রাজপথ, শিরার মতো ধমনীর মতো, সাম্রাজ্যের দেহময় ছড়িয়ে পড়লো। সৌধে বিপণিতে, স্নানাগারে, ক্রীড়াক্ষেত্রে সে এক নূতন স্থাপত্য-কলা বিকাশের যুগ। যদিও একথা সত্য ও ঐতিহাসিক যে একটা দীপ্ত সত্তজাগা জীবনের বান ডেকেছিলো রোমক সভ্যতায়, তবু সে রোমের আদর্শ ছিলো গ্রীসের শিল্প। বেশীর ভাগ কারিগর আমদানি করা হোলো গ্রীস, সাইপ্রাস, ক্রীট, এশিয়া মাইনর, মেসোপোটেমিয়া, ব্যাবিলন থেকে।

কিন্তু নতুন প্রবাহ নিজেই পথ রচনা করে। মোটামুটি গঠনের ভিতটা প্রতীচ্য থাকলেও শিল্পের মধ্যে গ্রীসের সরলতার জায়গায় কারুকার্য্য করার, পঙ্খের কাজ করার, ভাস্কর্য্যের অবতারণা করার প্রথার প্রচলন হোলো। তোরণে ও সৌধে নানা রকম সজ্জার প্রবর্ত্তন হোলো। এর মধ্যে যুগান্তকারী বিবর্তন হোলো তোরণের বিচিত্র বিকাশ। এই তোরণের ওপর নির্ভর করে বিরাট সৌধ কলসিয়াম, বড় বড় নদীর ওপরের সাঁকো আজও রোমক স্থাপত্যের জলন্ত ছবি হয়ে আছে। গ্রীসের সরলতাও নেই, বাইজান্টাইনের বৈচিত্র্যও নেই, দুইয়ের খিচুড়ি বলে অনেকে রোম্যান স্থাপত্যকে তুচ্ছ করলেও, তোরণের ব্যবহারের বিরাট শক্তির প্রকাশে রোমক স্থাপত্য-কলা পৃথিবীর অন্ততম গৌরব হয়ে আছে।

হঠাৎ খবর পেলাম আজকের কর্পাস ক্রাইষ্টি উৎসবে মহর্ষি পোপ ভক্তদের বহাল তবিয়তে দেখা দেবেন। মর্ত্তে স্বর্গের চাবির বাহক, ভগবানের অছিকে দেখার লোভ হোলো। পথে পিয়াৎসা নাভোনায় বার্নিনির গড়া ফাউন্টেন অব ফোর রিভার্স ছাড়াও মোয়ো ফাউন্টেন দেখলাম।

৬

পোপের দেরী আছে। এই অবসরে ঝাঁ করে দেখে নিলাম কাস্‌ল্ সন্তাঞ্জেলো সেকালের আড্রিয়ান মোল সেতু। টাইবারের ওপর সুন্দর সেতু। সেতু পার হয়ে বিশাল দুর্গের মতো প্রাসাদ। পারিবারিক সমাধি-মন্দির গড়ার পরিকল্পনায় বিশালতাকে মুখ্য লক্ষ্য করে আড্রিয়ান এই প্রখ্যাত সৌধ রচনা আরম্ভ করেন। শেষ করেন তারপরে আণ্টোনিয়স পায়াস্, তাঁর ছেলে। মিশরীয় সমাধির বিশালতা দেখে আড্রিয়ান এমনি একটি সমাধি-প্রাসাদের পরিকল্পনা করেন।

> Imperial mimic of old Egypt's piles,
> Colossal copyist of deformity.

চতুষ্কোণ প্রাসাদের প্রতিটি দিকই ৯০ মীটর লম্বা। এই সৌধের নির্ম্মাণ কৌশলের নামডাক খুব, কিন্তু দেখার মতো সময় ছিলো না।

২৭১ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট অরেলিয়ানের সময়ে প্রথমে এই প্রাসাদকে আরও সুরক্ষিত করে দুর্গ হিসেবে ব্যবহার করার আয়োজন হয়। কিন্তু এর বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য্য রোমের প্রতিটি ধর্ষণকারীর চোখে শূলের মতো বিঁধেছে। গথ, গল্, ভ্যান্ডাল প্রত্যেকে একে ভেঙেছে, লুঠেছে, পুড়িয়েছে, যা খুশী করেছে।

পরে এটা মহর্ষিদের চোখে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে দৈব-বাণীর ব্যবস্থা হয়। ৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে মহান্ মহর্ষি গ্রেগরি তখন পোপ-রোমে প্লেগের হুজুত। মানুষের মন ভয়ে আতঙ্কে তলতলে হয়ে আছে। মহর্ষির কোনো সাক্ষাৎ দেখলেন স্বর্গের কোন্ এঞ্জেল তার নিষ্কোষিত তরবারি এই প্রাসাদের চূড়ায় দাঁড়িয়ে কোষবদ্ধ করছেন। ব্যস্—তৎক্ষণাৎ এটা গির্জ্জা হয়ে গেলো, নামকরণ হোলো সেন্ট এঞ্জেলোর গির্জ্জা। ক্রমশঃ সেই উট আর আরবের কাহিনী। প্রথমে ক্রশ সেঁদিয়ে তারপর ক্রশের প্রভুদের বিলাসভবন হয়ে গেলো। দেবতার বেলায় লীলাখেলা। পোপেদের প্রমোদকক্ষ এবং বিশিষ্ট সজ্জিতকক্ষগুলো সবই প্রায় এই প্রাসাদে। বেনভেনুতো সেলিনীর অনেক কাজ এই আড্রিয়ান মোলে বা কাস্‌ল্ সেন্ট আঞ্জালোতে আছে।

ফ্র-ব্রীজ পেরিয়ে পথটায় দেখবার কিছু নেই বলে, লম্বা হলেও অন্ত পথটা দিয়েই উঠি। ঘুরে ঘুরে ক্রমশঃ উঁচুর দিকে উঠেছে। রোম সম্রাটদের সমাধি তোরণ-গুলোর পরে খিলান দেওয়া খোলা জায়গায় পাথরের গোলা সাজানো। তখন কামানে পাথরের গোলা ব্যবহার করা হতো। একটা ঘরে প্রাচীন সব অস্ত্র-শস্ত্র, বর্ম ইত্যাদি আছে। সময় নাই, সময় নাই, চলি। মহর্ষি সপ্তম ক্লিমেন্টের স্নানাগার দেখে যেমন বিরমি, তেমনি যেন তীর্থ মনে হলো পোপের বিশিষ্ট কারাকক্ষ দেখে। এই কারাকক্ষে বন্দী ছিলেন বড়ো বড়ো মহাত্মা—গিওর্দানো ব্রুনো, বিয়াত্রিচে চেঞ্চি, কার্ডিনাল কারাদা, বেনভেনুতো সেলিনী।

একটা দেয়ালে কাঁচে ঢাকা কয়লার আঁচড়ে ছবি আঁকা। বলে, সেলিনী বন্দী অবস্থায় কিছু না পেয়ে কয়লা দিয়েই ছবি এঁকেছেন। কাব্য আর শিল্প যাঁদের মনের সুর, গহনের প্রদীপ, যতই তারা আঘাত-সংঘাতের দুর্বিপাকে পড়ুক, ততই আরও আঁকড়ে ধরবে সেই সুর, সেই শিখা। ও হারাবার নয়, বাঁধবার নয়, মারবার নয়, মরবার নয়। বড় বড় তৈলাধারগুলো দেখে কাশ্মীরে মার্ত্তণ্ডস্বামী মন্দিরের বিরাট জালাগুলোর কথা মনে পড়ে গেলো।

তার পরে ওপর তলায় প্রসিদ্ধ পাপাল্ এপার্টমেন্টস্। ছবিতে ছবিতে ভরা। সন্ন্যাসীর এই সব পরম ভক্তরা একেবারে নির্বিঘ্ন, নিরাসক্ত ছিলেন বলে সামনে যতো ছবি এঁকে রাখতেন কারুকে আর বসনের আবরণে জড়াতে দিতেন না। একেবারে "মুক্তসঙ্গঃ সমাচর"। আভরণ ছিলো, আচরণ নেই। যদিও পাগান দেব-দেবীর ওপর ঘেন্না ছিলো, তবু দেয়ালে দেয়ালে হোমার, ভার্জিলের রূপকথার চিত্রের ঘাটতি নেই। একটা পুরো ঘরই আছে নাম 'হল অব কিউপিড এণ্ড সাইকি'। একটা আছে—একটা কেন কয়েকটা পর পর,—রাফায়েলের কাজে ভরতি। এ সব ছবি দেখতে দেখতে অনেক সময় গেলো। ম্যাডোনার কয়েকটি বিস্ময়কর ছবি আছে।

এর পরে আছে পালাৎসো দি জাস্তিসিয়া। তার পাশে সান্তা মারিয়া দেল পেসা গির্জ্জায় রাফায়েলের বিখ্যাত সিবিলের চিত্রগুলি আছে। এই সিবিলের চিত্র নিয়ে এক কাহিনী আছে। অগস্তিনো চিগী ছিলেন পোপের দপ্তরখানার খাজাঞ্চি। শিল্পীকে মেহনতী দেবার সময়ে সে বুড়ো নেহাৎ খেঁচাখেঁচি সুরু করে। পোপের খাজানার বড় বড় অঙ্ক এই সব শিল্পীরা কয়েকটা তুলির আঁচড় কেটে নিয়ে যায়। বুড়োর সয় না। তখন মিকেলেঞ্জেলোকে মধ্যস্থ রাখা হলো। তিনি যা বলবেন রাফায়েলকে তাই দিতে হবে। মিকেলেঞ্জেলো তো সিবিলের চিত্র দেখে স্তম্ভিত! আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলেন—"এর একটা মাথাই তো এক'শো স্কুডি দাম।" "মানে"?—চিৎকার করে বলে ওঠেন খাজাঞ্চি। "মানে কি তবে এই হলো যে, প্রতিটি মাথা পিছু এক'শো স্কুডি এই লোকটাকে দিতে হবে?"

মিকেলেঞ্জেলো হাসেন। "আমায় বাপু মধ্যস্থ রাখা কেন? যদি ঠগাতেই পারতাম, তা হলে পোপ তো আমাকেই খাজাঞ্চি করতেন!"

বেচারী অগস্তিনো তখন প্রতিটি মাথা পিছুই এক'শো স্কুডি দাম গুণে দেন ঐ তুলির পোঁছগুলোর দরুণ। একটা স্কুডির দাম প্রায় তিন টাকা।

এখানেই ভ্রাকেলির 'ডিসেন্ট ফ্রম দি ক্রশ' আর 'সেণ্ট ক্যাথারিন' আছে।

ভাতিকানে যাবার সময় হলো। যাবার পথে আর কোথাও দাঁড়ালাম না। সোজা হন্ হন্ করে দৌড়োই। মাথার উপর রোদ গন্ গন্ করছে। সহস্র সহস্র নর-নারী পোপের প্রাসাদের বড় রাস্তা ধরে চলেছে। দেশ-বিদেশ থেকে তারা এসেছে, আসছে, আসবে।

সুন্দর পথ। পথের দু'ধারে পাথরের থামের ওপর আলো। দু'ধারে বড় বড় বাড়ী। একটা আন্তর্জ্জাতিক রোম্যান ক্যাথলিক দপ্তর। অন্যটা যাত্রীদের থাকার হোটেল। শেষের দিকে একটা চ্যাপেল—তার মধ্যে দুটি থাম। বলে এই থামের একটায় সেন্টপীটারকে আর অন্যটায় সেন্টপলকে বেঁধে রাখা হয়েছিলো। আজ সেখানে অরিয়েন্টাল চার্চ্চ সেখানেই একটা বাড়ী রাফায়েলের থাকার জন্য তৈরি করা হয়েছিলো। শিল্পী সেখানেই মারা যান।

এর পরেই এসে পড়া যায় বিশ্ববিদিত পিয়াৎসা সেন্ট-পিয়েত্রো। মিকেলেঞ্জেলোর বিরাট কীর্ত্তি। দেবতা হয়ত জীবন্ত হয়ে দেখা দেবে না এখানে। কিন্তু চির দরিদ্র মিকেলেঞ্জেলোর সম্পূর্ণ পরিচয়, তার প্রতিভার জড় আশ্চর্য্য এইখানে পাওয়া যায়। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকি। অতো রোদ, অতো কোলাহল, জনতা—তবু মনে আসে মিকেলেঞ্জেলোর সারা জীবন, জীবন ব্যাপী তপস্যা।

**But lo! the dome—the vast and
wondorous dome,
To which Diana's marvel was a cell—**

Christ's mighty shrine above his
martyr's tomb!
... ...Majesty,
Power, Glory, Strength and Beauty,
all are aisled
In this eternal ark of worship undefiled.

ধারণা করতে পারা যায় না এই গোল খোলা অংশের সৌন্দর্য্য। ধারণা করা যায় না মিকেলেঞ্জেলোকে এমন রাজকীয় কল্পনা কে দিয়েছিলো।

মাইকেল যখন দারিদ্র্যের শেষ সীমায় তখনও রাজকীয় চাল আছে, দান আছে, পান আছে। মনমোহন বললেন, সংযমের প্রয়োজনীয়তা; আয়ের মধ্যে জীবন যাপনের উপযোগিতা। মাইকেল দুঃখ করে বলেছিলেন, "আমার মেঘনাদ স্বর্গ জয় করবে। অমরাবতী লুট করা সেই রাজসভার বর্ণনা করবো, ইন্দ্রের নন্দন-কানন আর ঐশ্বর্য্য বর্ণনা করবো, থাকবো কৃপণের মতো দীনাতিদীন হয়ে, এ হবে না।"

আর মনে হয় ফ্রান্সে পীড়িত, লাঞ্ছিত, বিধ্বস্ত অস্কার-ওয়াইল্ডকে। ফ্রাঙ্ক হ্যারিস গেছেন বন্ধুর মতো উপদেশ দিতে, সাহায্য করতে। এখনও তাঁর ক্ষমতা আছে। এখনও যদি বই লেখেন হ্যারিস তা থেকে অর্থ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করবেন। সেদিন ওয়াইল্ড বলেছিলেন, "নীল স্বপ্নের হ্রদে রেশমী পালের নৌকা বেয়ে যে কল্পনা চিরদিন আমার সঙ্গ করেছে, এ দারিদ্র্যের মধ্যে সে আমার দিকে ফিরেও চাইবে না ফ্রাঙ্ক; ও আশা তুমি ছাড়ো। বরং কিছু ধার দাও। মহান্ উদার অন্তঃকরণে দাও; আবার মহান্ উদার অন্তঃকরণে নিতে ভুলে যেও।"

কিন্তু মিকেলেঞ্জেলো?

শিল্পীদের মধ্যে এমন সুন্দর জীবন কার ছিলো?

১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দ। কাপ্রিসের মেয়রের ছেলে; তাঁর ভবিষ্যৎ কতো রঙীন। হঠাৎ মা মারা গেলেন; সঙ্গে সঙ্গে মেয়রের পদই বাতিল হয়ে গেলো। এককালে যারা ধনী ছিলো, নির্দ্ধনতার দিনে তাদের বংশগর্ব্ব যেন দ্বিগুণ বেড়ে উঠলো, মিকেলেঞ্জেলোর কাকারা তাকে শিক্ষা-দীক্ষায় ভদ্র গড়বে বলে কটিবদ্ধ। কিন্তু মাতৃহারা শিশুকে স্তন্য দিয়েছিলেন যিনি তিনি ছিলেন ভাস্করের গৃহিণী। বাচ্চা বয়স থেকে বাটালি আর হাতুড়ি আর ছেনী ছিলো মিকেলেঞ্জেলোর খেলার সাথী। কাকারা মারধর করে সেই নেশা ছাড়াতে পারে নি।

বারো বছর বয়সেই লোকে জানতে পারলো এ ছেলে সহজ নয়। অল্পবয়সেই মিকেলেঞ্জেলো জানতেন, জীবনই শিল্পের উপাদান। হাটে, বাটে, মাঠে কেবল দেখে দেখে বেড়াতো সে ছেলে। কিছু যেন তার অদর্শনীয় নয়। অনোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান সবই যেন জীবনের বিকাশ। এক জীবন সর্ব্বত্র। এই জীবনকে ধরে রাখতে হবে রং আর পাথরের উপাদানে।

বাল্যকালেই লরেঞ্জো-ডি-মেডিসির চোখে পড়ে যান। সেই থেকে দীর্ঘ ৮৯ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কিছু চান নি তিনি। কেবল জীবনকে ভালোবেসে তার পলাতক রূপকে ধরে রাখার চেষ্টা। কবিতা লিখেছেন, ভাস্কর্য্যে চরম কলা দেখিয়েছেন, স্থাপত্যে তাঁর জুড়ি ছিলো না; রোমে, ফ্লরেন্সে, নেপলসে—আজ যতো প্রখ্যাত সৌধ, নগরীর এতো রূপ, সবই মিকেলেঞ্জেলো। বলিষ্ঠ হাতে ও বলিষ্ঠতর মনে দীর্ঘ, মাংসল, পেশীবহুল জীবনকে তিনি মূর্ত্ত করেছেন।

কতো কলহ, কতো বিবাদ, ঈর্ষ্যা, বিদ্রূপ, কটাক্ষ—সব তুচ্ছ করে শিল্পের জন্য জীবনপাত করেছেন। অজস্র অর্থ ও সম্মান উপার্জ্জন করেও চিরজীবন দরিদ্র। টাকা এলেই কোথা থেকে দরিদ্র বন্ধু, নিগৃহীত আত্মীয়—দলে দলে এসে সে টাকা নিয়ে যেতো; শিল্পী নিজে পড়ে থাকতেন দারিদ্র্যের মধ্যে। লোকে বলতো পাগল, শত্রু বলতো কৃপণ। কিন্তু সমস্ত জীবন তিনি প্রাণ দিয়ে দেহ সৃষ্টি করেছেন, মন দিয়ে রূপ। তাই সামগ্রীর লোভ ছিলো না; শুধু মন আর স্বপ্ন নিয়েই বেঁচে ছিলেন; স্বাচ্ছন্দ্য, সুখ-সুবিধা তাঁর দেহকে বাঁধতে পারতো না।

ঘুমুতে পারতেন না। রাতের পর রাত একাগ্র মনে কাজ করেছেন। টুপীর উপরে জলন্ত মোমবাতি গুঁজে অন্ধকারের বুকে বাটালী চালিয়েছেন। রাতে কাজ চলেছে। সিষ্টাইন চ্যাপেলের সিলিংয়ে ছবি আঁকা হবে। ভারা বেঁধে তাতে কাৎ হয়ে শুয়ে ছবি এঁকেছেন, সারা গা রঙে ভরে গেছে, ঘাড় বেঁকে গেছে, সে ঘাড় আর জীবনে সোজা হয় নি; তবু তাঁর সেই সাধের কল্পনাকে রূপ দিতে ভোলেন নি। অব্যবহার্য্য বলে দা-ভিঞ্চি যে পাথর বাতিল করে দিয়েছেন, সেই পাথর কেটে, তার অদ্ভুত খাপছাড়া আকারকে কাজে লাগিয়ে খোদাই করেন জগদ্বিখ্যাত "ডেভিড।"

মিকেলেঞ্জেলোর কতো গাঢ় বিশ্বাস ছিলো নিজের উপর, একটা গল্প শুনলে বোঝা যায়। ডেভিড তৈরী শেষ হয়ে গেছে। নানা জায়গা থেকে লোক আসছে দেখতে। একজন মুরুব্বী আর্ট ক্রিটিক দেখে শুনে বুকনী ঝাড়লেন—"বাপুহে, সবই তো ঠিক বুঝলাম; কিন্তু

নাকটার-মানুষ হয়ে গেছে ; একটু ছোটো করে ওটাকে মাকের-মানুষ করা যায় না ?

বাটালি নিয়ে মিকেলেঞ্জেলো তখনি ভারায় উঠে—খুব একটা তৎপরতা আর ক্ষিপ্রতা দেখিয়ে ঠনা ঠন্ শব্দ তুললেন। নাক থেকে পাথরের টুকুরো, গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়তে লাগলো। খানিক পরে নেমে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—"কেমন ? হোলো ছোটো ?"

সমালোচকের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। "দেখো তো বাপু, কেমন মানানসই হয়েছে এবার !"

খুসী হয়ে চলে গেলেন তিনি।

আর এক ধরনের হাসি ফুটে উঠলো মিকেলেঞ্জেলোর মুখে। মুঠোর করে লুকিয়ে যে পাথরের কুচিগুলো নিয়ে তিনি ওপরে উঠেছিলেন সেগুলোর বাকী অংশ ফেলে দিয়ে হাসতে লাগলেন। ওপরে গিয়ে কতকটা বৃথা শব্দ তুলে মুঠোর ভেতরের গুঁড়ো ইচ্ছে করে ঝরিয়ে সমালোচককে খুসী করেছিলেন। বিবাদ চান নি। আসলে নাক যেমন ছিল তেমনিই রইলো। একটুও বদল হয় নি !!

সিষ্টাইন চ্যাপেলে কাজ করতে করতে একটি কবিতা লেখেন মিকেলেঞ্জেলো তাঁর দুঃখ দুর্দ্দশা বর্ণনা করে। এক বন্ধুকে লিখে পাঠান—

I've grown a goitre by dwelling in this den—
As cats from stagnant streams in Lombardy,
Or in what other land they hap to be,
Which drives the belly close beneath the chin :
My beard turns up to heaven, my nape turns in,
Fixed on my spine : my breast-bone visibly
Grows like a harp : a rich embroidery
Bedews my face from brush drops, thick and thin.
My loins into my paunch like levers grind ;
My bullock like a creepper bears my weight ;
My feet unguided wander to and fro ;
In front my skin grows loose and long : behind,
By bending it becomes more tant and strait ;
Crosswise I strain me like a Syrian bow :
Whence false and quaint, I know,
Must be the fruit of squinting brain and eye
For ill can aim the gun that bends awry,
Come then, Giovanni, try
To succour my dead pictures, and my fame,
Since foul I fare, and painting is my shame.

কবি হিসেবেও মিকেলেঞ্জেলোর খ্যাতি ছিলো অসামান্য। Vittoria Colonna সুন্দরী রমণী, কবি। যে শিল্পীকে সারা জীবনে কোনো নারী কোনোদিন বিচলিত করতে পারে নি, নারীসঙ্গ থেকে বিমুখ ছিলেন বলে সন্ন্যাসী বলে যাঁর খ্যাতি, তিনি কবি ভিটোরিয়া কোলোনার প্রেমে আত্মহারা হলেন। যদিও পার্থিব জীবনে, দেহ দিয়ে কখনও তিনি তাঁর প্রেয়সীকে চান নি, তবু তাঁর কাব্যের গন্ধে ফুলের মতো কোলোনা এখনও বেঁচে আছেন মিকেলেঞ্জেলোর প্রেয়সী হিসেবে। কোলোনার মৃত্যুর পরে মিকেলেঞ্জেলোকে আরও অনেক কাল বাঁচতে হয়েছিলো। অনেক কাজ করতে হয়েছিলো। তবু এই মনস্বী, যশস্বী, ঋষিকল্প শিল্পী শেষদিন পর্য্যন্ত কোলোনাকে ভোলেন নি। তাঁর আর্ত্তনাদ শোনা যায় যখন পড়ি—

"Now hath my life across a stormy sea,
Like a frail bark, reached that wide port where all
Are bidden, ere the final reckonieg fall
Of good and evil for eternity......
... ...
Painting, nor sculpture now can lull to rest
My soul......"

ভাতিকানে এলে মিকেলেঞ্জেলোকে মনে না করে উপায় নেই। বলে, ভাতিকান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম প্রাসাদ। সাড়ে তেরো একর জমির ওপর প্রাসাদ, ৭,০০০টি কক্ষ আছে। মঁ ভাতিকানাস্ পাহাড়ের ওপর সেন্ট পীটর গীর্জ্জার লাগাও এই কারখানা! কিন্তু এই বিশালতাকে মিকেলেঞ্জেলো এমন একটি ছন্দে বেঁধেছেন, যেন কবিতা। যেন মহাকাব্যের পয়ারে বেঁধেছেন স্বর্গ-মর্ত্ত্যের কাহিনী! স্থাপত্যের চরম নিদর্শন! বিশাল তাজকে দেখে যেমন ছোট্ট একটি প্রাসাদের কথা মনে হয়, এই অতিকায় প্রাসাদও মিকেলেঞ্জেলোর স্থাপত্যের গুণে যেন একটি সমগ্র সুষমার মতো ফ্রেমে বাঁধা পড়েছে।

১৪৫০ খৃষ্টাব্দে মহর্ষি পোপ পঞ্চম নিকোলাসের সময়ে এই প্রাসাদ প্রধানতঃ আরম্ভ হলেও, ১৪৮০-তে চতুর্থ সিক্সাটেসের সময়েই এই অতিকায় ধর্ম্ম-প্রাসাদের রোয়াব জাঁদরেল হয়ে ওঠে। ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে মহর্ষি পোপ তৃতীয় পলের সময়ে মিকেলেঞ্জেলো পোপের চীফ আর্কিটেক্টের পদে নিযুক্ত হন, ফলে সেন্ট পলের গম্বুজ মিকেলেঞ্জেলোর অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি হয়ে আছে।

সারা ভাতিকানই যেন মিকেলেঞ্জেলো। ভিত থেকে চূড়া পর্য্যন্ত।

১৯২৯ থেকে ভাতিকান স্বাধীন রাজ্য (!) অর্থাৎ

ইতালির বা তাবৎ দুনিয়ার উত্থান-পতনের সঙ্গে পোপের জমিদারী ভাতিকানের কোনো ওয়াস্তা নেই। ভাতিকানের নিজের ট্যাঁকশাল, সিপাহী, সৈনিক এবং দূতাবাসও! সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা!

য়োরোপের সামন্ত যুগে পোপেরা ধর্মের নামে চুটিয়ে রাজত্ব করেছেন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পোপের ক্ষমতা সরাসরি সম্রাটের ক্ষমতা ছিল। এই ক্ষমতারআদি-পর্ব্বে পোপেরা নাকানি-চোবানি খাচ্ছেন রোম সাম্রাজ্যের পতন-অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে। লম্বার্ডির রাজারা পোপের ঐহিক ক্ষমতাকে নগণ্য মনে করে তাদের কর্ত্তৃত্বকে বার বার খাবলাচ্ছেন। এই ক্যাসাদের সময়ে কীর্ত্তিমান ফরাসী যোদ্ধা শার্লমেন মাথা চাড়া দিলেন। পোপেরা ভাবলো, হোক ফরাসী। কণ্টকেনৈব কণ্টকং—এই লোম্বার্ডিয়ান্‌দের উচ্ছেদ করো। শার্লমেনের তরোয়াল আর পোপের ক্রশে একজোট হয়ে গেলো। ইটালি, স্পেন, জার্ম্মানী—সব শার্লমেনের তাঁবেতে এসে গেলো। ৮০০ খৃষ্টাব্দে পোপ তৃতীয় লিও চড়ান শার্লমেনের মাথায় তাজ—"সম্রাট হোলি রোম্যান এম্পায়ারের চক্রবর্ত্তী সম্রাট—দেবদ্বিজে পরম আসক্ত, পরম ভট্টারিক—শ্রীমান্ শার্লমেন"; আর শার্লমেন চড়ান পোপের মাথায় তাজ—"পারত্রিক আত্মার সদ্গতির নিয়ামক, লোকান্তরের সারথি, মর্ত্ত্যে ঈশ্বরের প্রতিভূ, স্বর্গের চাবির রক্ষক—পোপ-মহাপিতা, সর্ব্বপিতা, পাপা, পোপ।" এই বাহানায় রাজায় ও চার্চ্চে মিলেমিশে দিব্যি চলতে লাগলো। মাঝে মাঝে টাকা-পয়সা, ক্ষমতা এমন কি মেয়েমানুষ নিয়েও একটু-আধটু কাট-ফুট বিঘ্নিত করতো মহাচক্রের তপস্তা। কিন্তু তাপ্পি-তাপ্পা দিয়েও ব্যাপারটা চলতে লাগলো প্রায় আরও হাজার বছর। তখন সবাই বলতে আরম্ভ করলো—"হ্যাঁ বাপু, হোলি রোম্যান এম্পায়ার নামটায় তো জাঁক খুব, যেন মতিহারি তামাক। কিন্তু রেখে রেখে ওর বস্তু যে কাবার হয়ে গেছে, তার কি? ও তো না হোলি, না রোম্যান্, না এম্পায়ার! ও তো এখন রোদে শুখিয়ে ঝেড়ে-মুছে অন্ত কোনো আকার দেওয়া ভালো।" সে ঘটনা ঘটলো ভিক্টর ইম্যানুয়েলের সময়। গ্যারিবল্ডি, ম্যাটসিনী—এদের ভারী ক্যাসাদে ফেলেছিলেন পোপেরা। ক্যাভুর জানতেন, ইতালিকে একতায় বাঁধায় অন্তরায় হবেন পোপ। টুকরো ইতালি পোপের ক্ষমতার পক্ষে ভারী সুবিধার ব্যবস্থা। তাই স্বাধীন ইতালির সংগ্রামে পোপেরা কখনও সাড়া দেন নি; বরং প্রতিযোগিতাই করেছেন। ম্যাটসিনির কথায় ভিক্টর ইম্যানুয়েল ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে পোপকে বললেন—"প্রভু, ওপারের সব ভার আপনার থাকুক—এপারের খবরদারিতে আর মাথা গলাবার চেষ্টা করবেন না।" পার্থিব সব রকম ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে পোপকে ঐ ভাতিকানে থাকার অধিকার দিয়ে ও ধর্ম্মোপদেশকদের পাণ্ডা করে রেখে একটি রফা হোলো। সে রফাও প্রায় যায় যায় মুসোলিনী আর হিটলারের সময়ে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে কিছু অর্থ বিনিময়ে পোপেদের সব অধিকার কেড়ে কেবল ধর্ম্মের অধিকার রেখে ভাতিকানের ভেতরে রাজত্ব করার অধিকার দেওয়া হোলো। পোপেরা সেই ১৮৭০ থেকে আর ভাতিকান থেকে বেরুতে পান্ না। ঐ ১৯৩০ সনে একবার বেরিয়েছিলেন, সেও নামমাত্র। বস্তুতঃ, পোপেরা ক্ষমতার লোভে চলাফেরার স্বাধীনতা হারিয়েছেন। সেটা বোধ হয় যে কোনো ক্ষমতার বিনিময়ে প্রত্যেককেই অল্পবিস্তর হারাতে হয়।

বর্ত্তমান পোপ-পায়াস্ আজ দেখা দেবেন কর্পাস্ ক্রাইষ্টী উৎসবে। আমরা এগিয়ে চলেছি ভেতরের দিকে।

ম্যাক্ ঠিক আছে সঙ্গে সঙ্গে।

"কি খাচ্ছো বুড়ী খুকী?"

হাসে ম্যাক্। "খাবে? একটা লজেঞ্জস্ দেব? যা বিশ্রী গরম! গলা ভিজবে। খাও।"

কে হাত বাড়ায়।

ম্যাক্ চোখ রাঙায়?

কে হতাশ হয়ে মুখ ফেরায়।

"কি সাহসে এখনও এতো মিষ্টি খাওয়ার সখ!"

কে হাসে। "কি আশায় আর ওসব ছাড়া। আর কি ভবিষ্যৎ আছে?"

আমি বলি, "কি!!! স্লীমীং ডায়েট? এখনও? ওর মাপে কবর খোঁড়া হয়ে গেছে হয়তো এতোকাল!"

কে-র হাসি তরঙ্গে তরঙ্গে আছড়ে পড়তে লাগলো ম্যাকের দীর্ঘ সরল দেহের আসে পাশে।

আমি বলি, "করো কি, করো কি! বন্যার মুখে খড়ের মতো বেচারী ম্যাক্ ভেসে যাবে। বরং আমায় ধরো। আমায় ধরে হাসি সামলাও।"

"না, তোমায় ধরবো না। নাচবার পার্টনার পেতে হিমশিম খেয়ে যেতে হয়, এখন তোমায় ধরে কি হবে? নাচ জানো?"

"এতোদিন না জানাটা লোকসান মনে হয়েছে। আজ প্রথম লাভ বলে বোধ করছি।"

হাসতে হাসতে ম্যাক বলে, "কিন্তু বলছি বাতাশারিয়া, হাসিও মেদ বৃদ্ধি করে।"

"তাই নাকি!" বলেই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বাবায়

বলে, এবার সত্যিই কে-কে ধরতে হলো, নৈলে ও ঐখানে পথেই বসে পড়তো।

তাতে অবশ্য বিশেষ কিছু ক্ষতি হতো না। কারণ অনেক মেমকে দেখলাম হাঁটু গেড়ে সিঁড়ির পর সিঁড়ি কত কষ্টে উঠছেন। ধাপগুলো উঁচু নয়। চার ইঞ্চির বেশী কোনোটা নয়। তবু পাথর তো। আর ধাপের সুরু থেকে দরজা পর্য্যন্ত অনেকখানি। অনেকে আবার তারকেশ্বরের পালা খাটছেন। তা-ও দেখলাম। ধর্ম্মের ঢাক সব মন্দিরে এক তালেই বাজে। এবং থামলেই বেশী ভালো লাগে।

সেন্ট পীটরের গির্জ্জায় ঢোকবার পাঁচটি দোর। সব-গুলোই খোলা। ডানদিকের শেষের দিকটা বন্ধ।

ওটা বন্ধ কেন? জিজ্ঞাসা করে জানলাম ওটা ধর্ম্মের-দোর। প্রতি ২৫ বছরে পোপ নিজের হাতে একবার এ দোর খোলেন, আর সারা বছর খোলা থাকার পর নিজের হাতেই উনি তা বন্ধ করেন। সে এক মহামারী উৎসব। আমাদের দেশের কুম্ভমেলার 'বাবা' আর কি! কুম্ভ বারোয়, এ পঁচিশে। সেই সময়ে সাধারণ ভাবে স্বয়ং পোপ প্রতি ভক্তের আবেদনে তার জ্ঞাতাজ্ঞাত সমস্ত পাপের আপাদমস্তক 'মাওফ' লিখে দেন। প্লিনারি ইনডালজেনস্ পাওয়া যায় এই জুবিলী-বছরে।

দরজার সামনেই লাল রঙের চেঁড়া কাটা গোল জায়গাটায় নাকি শার্লমেন নতজানু হয়েছিলেন। অর্থাৎ মন্দিরে প্রবেশের আগে আমরা যেমন জুতো খুলি, রোম্যান ক্যাথলিকদের তেমনি নতজানু হওয়াটা একটা বড় রকমের ভক্তির ব্যাপার।

গম্বুজের তলায় এসেছি। গম্বুজে অনেকগুলো ফুকর। তা দিয়ে আলো এলেও হিন্দু মন্দিরের মতোই অন্ধকার ভাব। এ বিষয়ে মস্‌জিদ্ আমার সবচেয়ে ভালো লাগে। নিরাবরণ, মুক্ত, আলোয়-বাতাসে ভর্ত্তি।

বিশাল গম্বুজ, বিশাল গম্বুজ! তাজের গম্বুজ দেখেছি, আওরাঙ্গাবাদের গম্বুজ দেখেছি, বিজাপুরের গম্বুজ দেখেছি। তেমন বড় বলে মালুম হলো না। ব্যাস প্রায় ১৩৮ ফুট বা ছেচল্লিশ গজের একটু বেশী। তার তলায় সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলে কবর। সেন্ট পীটরের সমাধি।

আলো ঝল্‌মল্ করছে ভেতরটা। ধূপ পুড়ছে। মোমবাতি জ্বলছে সারে সার। দামি সিল্ক আর সোনার কাজে মোড়া ভেলভেট দিয়ে ঢাকা। চারধারে মহা-মূল্যবান বহু ক্রসিফিক্‌স। ভেতরে না গেলেও (যেতে দেয় না) বাইরে থেকে দিব্যি দেখা যায়।

তার ওপরে একটু দূরে চৌখুপী মঞ্চ। অলটার;— হাই অলটার। একমাত্র পোপ এখানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা বা উপদেশ বা বাণী দিতে পারেন।

একটা বাতিদানে ৯৫টা বাতি জ্বলছে। তার সুমুখে ষষ্ঠ পায়াসের প্রতিকৃতি।

হলটার দু'ধারে সারি সারি থাম। থামে থামে খিলান। খিলানের মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন মন্দির। চ্যাপেল বলে। জগন্নাথের গর্ভ-মন্দিরের চারপাশে যেমন নানান মন্দির, তেমনি। তবে সে সব মন্দির জগন্নাথের মূল মন্দিরের বাইরে অঙ্গনের চারধারে। এখানে মূল হলটারই চারপাশে খিলানের মধ্যে মধ্যে চ্যাপেল।

ডান ধার থেকে আরম্ভ করবো। এ দিকে ভেতরটায় তখন ভীষণ ভীড়। বলে সেন্ট পীটর হলে এককালীন চল্লিশ হাজার লোক ধরে। আজ চল্লিশ হাজার নয় ঠিকই, তবে অন্ততঃ দশ হাজার লোক হবে। সে অনুপাতে গোলমাল নেই। কে এবং ম্যাকের মধ্যে ম্যাকের মনে ধর্ম্মের গন্ধ কড়া। জানি না হয়ত বা ইচ্ছে করেই কেমন যেন আলাদা হয়ে গেলো। পীটরের সমাধির পর আর দেখতে পেলাম না। আমিও পা করলাম না। দেখার সময়টা গাইডদের মতো বড় বড় করতে ভালো লাগে না। যেন রসহানি ঘটে।

একা একা হাঁটছি। Multiplicity is loneliness —সত্যিই তাই। ভীড়ে যেন বড় একা একা লাগে। তবু যেন কেউ পাশে থাকলে নিজেকে পাওয়া যায়। একেবারে নিঃসঙ্গতা সঙ্গহীনতার চেয়েও ভয়ানক। এই সব সময়ে হঠাৎ একটা ধাক্কা খায় মন।

সুন্দরী তরুণী হাঁটু গেড়ে একটা খিলানের তলায় বসে। ভেতর থেকে হাল্কা একটা আলো পড়েছে ওর কটা চুলে, টিকোলো নাকের ওপরে কচি কচি ঘামের কণার ওপর। পাশে হাঁটু গেড়ে বসে একটি বৃদ্ধ। মাথায় চুল নেই। পাশে পাশে শাদা ধবধবে চুলের ঘের। হাতে একটা বাইবেল। মেয়েটির হাতে কিছু নেই। অনেকেই অমনি বসে। কিন্তু মনে হলো এই দুটি তরুণী আর বৃদ্ধের মতো, জীবনের দুটো রূপকে জড়িয়ে, যেন কেউ নেই। সত্য হোক, মিথ্যা হোক, কোনো একটা বিশ্বাসকে জড়িয়ে জীবনের গানের আরম্ভ আর পরিণতি একই অর্কেষ্ট্রায় এসে মিশছে।

সামনে যেতেই আমার মনও পিছলে গেলো। অজানিতে মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমিও নতজানু হলাম। বাধ্য হলাম। সব ভুলে গেলাম। সহস্র সহস্র লোকের যাতায়াত, বিদেশ, বিধর্ম, প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য, সবার

অতীতে,—মানবচিত্তের যে লোকোত্তরতা, অবিনশ্বরতা, যেন সমস্ত সত্তার মধ্যে রিণ রিণ করে ব্যাপ্ত করে দিলো। ভুলে গেলাম এ মূর্ত্তি পাষাণের। যেন মনে হয় যীশু কখনও কোনো সাধনা করেন নি, কোনো ধর্ম্মের নায়ক ছিলেন না তিনি, তিনি ছিলেন এক অরুন্তুদ মায়ের বড় কষ্টের, বড় সাধনার নিধি। দরিদ্রের কুটিরে অভাগিনী মা নানা সংঘাত, সন্দেহ, কলঙ্ক পান করে যে অমৃত জঠরে লালন করেছেন, যে মা কোন্ এক শীত-কম্পিত রাত্রির গভীরে দুরন্ত বেদনায় সন্তানের জন্ম দিয়ে আশার তারার দিকে চেয়েছিলেন, আস্তাবলের নোংরামির মধ্যে ফুলের মতো সুন্দরের অঞ্জলি রক্ত দিয়ে যিনি সত্য করেছিলেন, তাঁর শোকের গাঢ় ছায়া, ললিত-বেদনা যেন এইখানে আজ তরঙ্গে তরঙ্গে বয়ে যাচ্ছে। মৃত্যুহীন শোকের মতো মহান্ শীতল সত্য বোধ হয় আর কিছু নেই। তাই সাহিত্যে অশ্রু এতো সত্য, ট্রাজেডি এতো মহৎ প্রেরণা এনে দেয়। যীশুর মৃতদেহ কোলের ওপর পড়ে আছে। কতো মমতায় ডান হাতখানা সেই অপূর্ব্ব জ্যোতিষ্মান মাথাটির তলায় রাখা। যেন নিজের প্রাণ মা ধরে আছেন। যেন এখনও বিশ্বাস হয় নি পুত্রের মৃত্যু। যেন এখনও ও দেহে ব্যথা আছে, অনুভূতি আছে, মমতা ও কোমলতার জন্ত আকুতি আছে। পাছে ব্যথা পায় তাই কতো সন্তর্পণে, কতো নিবিড় আদরে ডান হাতের সমগ্র বাহুর ওপর নির্ভর যীশুর কাঁধ, পিঠ, হাতের আঙুলগুলো চেপে আছে ছেলের বুকের পাঁজর, বগলের তলা দিয়ে; চুলগুচ্ছ মাথাটি ঢলে পড়েছে একধারে। কোল-জোড়া সেই অন্তহীন শিশু, মায়ের শিশু, সমগ্র জীবনভোর যার বুকে মানুষের মঙ্গলের চিন্তায় ঝড় বয়ে গেছে। সে ঝড় আজ শান্ত। সেই কৃশ দেহ আজ মায়ের কোলে। নগ্ন দেহের সেই মৃত্যু-নিথর নির্ভরতা লম্বমান দুটি জানু আর পায়ের গ্রন্থিতে ফুটে উঠেছে। আর মেরীর বাঁ হাতখানা। সে হাতের দিকে যেন চাওয়া যায় না। বিশ্বের মাতৃ-হৃদয়ের সমস্ত হাহাকার, জীবনের পরিণামের ব্যাকুল ব্যর্থতা যেন নির্ব্বাক চিৎকারে রূপায়িত হয়েছে বাঁ হাতের ঐ আঙুল কটায়। মর্ম্মরে নির্ম্মিত এ মূর্ত্তিকে পাষাণ একমাত্র পাষাণই বলবে; এর সামনে মাথা নোয়ানোয় মূর্ত্তিপূজা যেন অমূর্ত্ত অনন্ত আত্মার নৈবেদ্য! শুনেছিলাম ২৫ বৎসর বয়সে "পিয়েতা"র বিস্ময়কর মর্ম্মর মূর্ত্তি রচনা করে মিকেলেঞ্জেলো শিল্পী দুনিয়ায় বরেণ্য হয়েছিলেন। এই সেই পিয়েতা। এখানে শিল্পীর চেয়েও শিল্প বড়ো হয়েছে। ভাবাঙ্কে অতিক্রম করে ভাব যেন টল টল করছে। জীবনে মর্ম্মরের এমন অপূর্ব্ব ছন্দ শুনি নি।

কতক্ষণ বসেছিলাম জানি না। কি ভেবেছিলাম জানি না। দাঁড়াতেই মনে হোলো ভাবালুতার দাসত্ব আর কতো করবো? কিন্তু না। আবার চাই মূর্ত্তির পানে; সেই মা, সেই ছেলে। যীশু ও মেরী নয়, চিরমাতৃকার কোলে চিরশিশু, আশার কোলে প্রেম। মৃত্যু নেই তার, মৃত্যু নেই।

ভাবলাম আর কিছু দেখবো না। অন্ততঃ আজ আর নয়। এ যেন সব দেখার শেষ।

কিন্তু সময় নাই। চলি এগিয়ে। বার্ণিনির তৈরি কণ্ডেসা মাতিলদার মাউসোলিয়ম, বা সাক্রামেণ্টাল চাপেলের সোনার জলে আঁকা ব্রোঞ্জের পাত্রী ওসব আর চোখেই ধরে না। মনে হয় "বস্তু", "বস্তু", কেবল ভার, তৃপ্তি নেই ওতে। ওরা শেষ হয়ে যায়। শেষ যা হয় না তাই দেখে এলাম এইমাত্র। বার্ণিনির কাজ আরও অনেক আছে পাশাপাশি। ত্রয়োদশ ক্লিমেণ্টের সমাধি, অষ্টম আর্ব্বানোর সমাধি। সবই চমৎকার কাজ। কিন্তু প্রাণহীন। ক্লিমেণ্ট চাপেল, সপ্তম লিও-র সমাধি। এমনি পর পর বহু পোপের সমাধি। একটা বিশেষ করে মনে আছে। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় জেমস্ ষ্টুয়ার্টকে বিতাড়ন করে ইংরেজরা। তার স্ত্রীর সমাধি আছে এখানে।

এর পরে আর ভালো লাগে নি কিছু। বিশেষ করে যখন দেখলাম পরম সমারোহে একটা জায়গায় আরতি হচ্ছে। তার পর স্তব পাঠ। তার পর বিরাট শোভা-যাত্রা করে পাদ্রীরা চলেছেন বাইরের দিকে। সে শোভা-যাত্রার পুরোভাগে বৃদ্ধ পাদ্রী। শাদা সিল্কের পোশাক, জরিতে আর হলদে বা লাল সিল্কের কাজে ঝলমল করছে। কারুর হাতে আশাসোটা, কারুর হাতে ধূপদান, কারুর হাতে শেকলে ঝোলানো ধূপদান, দুলছে আর দুলছে, কারুর হাতে পাখা, জমকালো জরির কাজ করা মখমলের ছাতা, অন্ততঃ কুড়ি জন পাদ্রী। প্রধান পাদ্রীর মাথায় মুকুট, পিঠের ওপর দিয়ে আঙরাখা লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে, সেই আঙরাখার প্রান্ত ধরে নিয়ে চলেছে অন্ত পাদ্রীরা। সঙ্গে বারো থেকে সতেরো আঠারো পর্য্যন্ত কিশোরেরা, সুসজ্জিত কিশোরেরাও নানা তৈজস নিয়ে বা আঙরাখা ধরে চলেছে। সবই হাতীর দাঁত, মেহগনি, চন্দন, সিল্ক, জরী, সোনা রূপোর কারবার। স্বর্গীয় ছাড়া অন্ত কোনো পদার্থ সেই শোভা-যাত্রার মধ্যে ছিলো না। মৈশুরের দশহরা উৎসবে

রাজার শোভাযাত্রার জমক, মৎসরতা, নোংরামী-এর জমক, মৎসরতা, নোংরামীর চেয়ে বেশী নয়। পিয়েতার উলঙ্গ শিশু যদি জীবন্ত হয়ে এই বিলাসের দিকে চাইতো, কি ভাবতো কে জানে।

ভাতিকান চিত্রশালায় ঢুকতেই একাদশ শতাব্দীর ইতালিয়ন শিল্পের নিদর্শন লাষ্ট জাজমেণ্ট দেখা যায়। এর পরে আছে শিল্পী গিওত্তো, ফিলিপ্পো লিপ্পি, এঞ্জেলিকো, গোৎসোল্লি, এঁদের কাজ। একটা হলে ক্রানাক্, বেল্লিনী আর ক্রিভেলি তিনজনারই পিয়েতা রাখা আছে। কিন্তু মিকেলেঞ্জোলোর কাছে ও কিছু নয়, কিছু নয়। এঁরা শিল্প করেছেন। মিকেলেঞ্জেলো যেন নিজের নিজের সমগ্র সত্বাকে রূপ দিয়েছেন তাঁর পিয়েতার মূর্ত্তিতে। আট নম্বর হলে সবই রাফায়েলের কাজ। ম্যাডোনা, করনেশন অব ভার্জিন, আর তাঁর শেষ কাজ ট্রান্সফিগারেশন। সারা ঘরেই রাফায়েলের কাজ। দা-ভিঞ্চির সেণ্ট জেরোম, টিশিয়ানের ম্যাডোনা আর ভার্নিসের সেণ্ট হেলেন। মুরিল্লো, ভান ডাইক সবই ছবি।

বেলেভেডিয়ার ভাতিকানের অন্যতম ম্যুজিয়াম। তার ইতিহাস বহু প্রাচীন, বেলেভেডিয়ার মর্মর মূর্ত্তির জন্য প্রখ্যাত। সালা রোটাণ্ডা হলের মেঝের কাজ দেখবার মতো। টিটোর স্নানাগার থেকে উদ্ধার করা রক্তবর্ণ মিশরীয় পোরোফিরির বিশাল একটা ভাস্ এই হলের মাঝে রাখা। হারকিউলিস, আণ্টিনু, অগ্রিকোলি জুপিটার দেখে, অষ্টকোণ দেলে-মুসে হলে এলাম। ঘুমন্ত এরিয়াডনি, আনাতুস্, কিশোর অগষ্টসের আবক্ষ মূর্ত্তি, এসব দেখে এলাম পাশের হলে। গ্রীসের শিল্পী প্যারাকসাইডেলিসের আফ্রোদিতের মূর্ত্তি দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম। পাথর অথচ কি নমনীয়, কমনীয়। গ্রীস থেকে যেমন রোমানরা নিয়ে এসেছিলো, তেমনি রোম থেকে চুরি করে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। শুধু আফ্রোদিতে নয়, স্লীপিং ভীনাস্, এপোলো, পার্সিয়ুস, হার্মিস্, মার্কারি, পেনিলোপী, সিরিস্ পর পর যেন ধাঁধাঁ লেগে যায়। এরা কল্পনা নয়, কল্পনা নয়। দেবদেবী নাম বটে; কিন্তু বলতে ইচ্ছে হয় এরা শিল্পীর প্রিয়তম বন্ধু বা বান্ধবীর শিলীভূত রূপ।

"আর পাবো কোথা!
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা!"

দেখছি—মনে হচ্ছে একদিন বায়রণ এই ঘরে এসে এই সব মূর্ত্তি দেখে আমার মতো অস্থির হয়েছিলেন। দেখার এতো জিনিস যে, কি দেখবো ভেবে ওঠা দায়, "Thou seest not all, but piecemeal thou must break to separate contemplation, the great whole।" খুব খাঁটি কথা!

ম্যুজিয়মের পর ম্যুজিয়ম। শেষ আর হয় না। লোভাতুর চোখ, মদাতুর মন, দুই-ই যেন ঝিমিয়ে আসে। রক্তে তবু সাড়া, "এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও।" ভীড়! অনেক ভীড়।

হঠাৎ পেছন থেকে ম্যাক এসে কাঁধ ছোঁয়! চোখে কথা বলে! আমি হাসি। আইসীসের মন্দির খনন করার সময় বিরাট "নাইলের ষ্টাচ্যু" বেরিয়েছিলো। একটা ঘরে রাখা। ঘুরে ঘুরে দেখছি। অগষ্টসের আবক্ষ মর্মর মূর্ত্তি। এর পরে ভাতিকান লাইব্রেরির কাছে এসে পড়েছি। হাতে-লেখা পুঁথির সংগ্রহের জন্য এ লাইব্রেরির বিপুল খ্যাতি। হাতে-লেখা পুঁথি ৩৫,০০০ আর অন্যান্য বই ২৫০,০০০। সর্ব্ব সমেত প্রায় ৫০০,০০০ বই আছে। লাইব্রেরিতে বিশেষ বিশেষ বিদ্বজ্জন ও ধর্ম্মযাজক ছাড়া অন্যের প্রবেশ নিষেধ। প্রত্যেককেই ছাড়পত্র নিয়ে ঢুকতে হয়। কয়েকটি ঘর পর পর বাদ দিয়ে যেতেই হোলো। তখনও সিষ্টাইন্ চ্যাপেল দেখা বাকী। বর্জিয়া হলের মধ্যে সবচেয়ে ভালো 'হল অব সেণ্টে'র পিণ্ডরিকুচিত্ত-র কাজ। প্রফেন ম্যুজিয়মে খানিকক্ষণ থাকার পর সেক্রেড্ ম্যুজিয়মে এলাম। এখানেই সিষ্টাইন চ্যাপেল। এখানে পোপেদের নির্ব্বাচন হয়। হলটার মাঝখানটায় একটা মার্ব্বেলের পর্দা। চমৎকার কাজ। সারা ঘরে ফ্রেস্কো। এক ধারে লাইফ অব মোজেস্, অন্যধারে লাইফ অব ক্রাইষ্ট। বহু প্রখ্যাত শিল্পীর কাজ এই হলে; সীনোরেল্লী, বত্তিচেলী, রসেলী, পিণ্ডরিকচিত্ত, কসিমো, পেরুজিনো,—একা এই ঘরটাই যেন একটা ম্যুজিয়ম।

একটা মজার কথা বলে রাখি এইখানে। এই যে এতো সব মূর্ত্তি, কেউ বা পাথরে, কেউ বা তেলরঙে,—এরা সকলে শিল্পীর কল্পনায় যে নয় তা আগেই বলেছি। দু'চারটি ছাড়া, (যেমন পিয়েতা) বাকী মূর্ত্তিগুলো ভাস্কর্য্যের চরম উদাহরণ হওয়া সত্বেও, মনকে জাগিয়ে তুললেও একেবারে মগ্ন করে দিতে পারে না। কোথায় এসে যেন "জীবন" বাধা দেয়। যেন "জীবন্ত"; যেন "মাংস" আর "প্রাণ"; যেন যথার্থতা বড় বেশী স্পষ্ট। জীবনাতীত, ধ্যানধারণার যে প্রতীক-কামী ইঙ্গিত তা যেন নেই। ইঙ্গিতের চেহারা বড়ো স্পষ্ট, বড়ো কাছাকাছি। এই যে সব ছবি, খোঁজ করলে দেখা যাবে অনেকের চেহারা তখনকার সমাজের বহু পরিচিত

ব্যক্তির প্রতিরূপ। দেবতার নামে যে ছবি তা যদি জীবিত ব্যক্তির প্রতিরূপ হয়, সংস্কারবদ্ধ মন যেন কুঁকড়ে যায়। এ ঘরে এতো সুন্দর সুন্দর ছবি, সবই ধার্মিক, কিন্তু বহু ছবির রূপ জীবন-থেকে ধার নেওয়া। এ যেন শিল্পের আধ্যাত্মিক আবেদনের ঘরে ভাবের চুরি।

কিন্তু লোকে সিষ্টাইন্ চ্যাপলে আসে সিলিংয়ের কাজ দেখতে। ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মিকেলেঞ্জেলো এ কাজ আরম্ভ করেন আর অনবরত দিনরাত চার বছর এমন পরিশ্রম করেন যে, লোকে বলতে লাগলো মিকেলেঞ্জেলো পাগল হয়ে গেছে। খাওয়া নেই, ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই; শুয়ে পড়ে, ঘাড় কাৎ করে, দিনরাত ভারার ওপর চিৎ হয়ে কেবল কাজ আর কাজ। ছবি আঁকার ক্ষেত্র সমতল ছিলো না। বাঁকা, ঘোরালো, গোল; তাই তাই-ই; তাকেই কাজে লাগিয়ে পার্সপেক্টিভের এমন যাদু দেখিয়ে গেছেন মিকেলেঞ্জেলো যে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেতে হয়।

ম্যাক্ ক্রমাগত রুমাল ঘষছে চোখে। ওকে ধর্ম নাড়া দিয়েছে। আমি বলি "শিল্পীর কথা ভেবেছো? কি সাধনায় ঐ বাঁকা বাঁকা বুকে এমন সোজা সোজা রসের ধারা বইয়েছে?"

ম্যাক বলে, "চুপ করো। দেখতে দাও। শুনতে দাও। I can hear them. Let them speak!"

ছবিটা যখন মিকেলেঞ্জেলো আঁকেন তখন ছবির ভেতরের মূর্তির অনেকের পরণে কিছু ছিলো না। পোপ চতুর্থ পায়াসের বড়ো "লজ্জা লাগে" তাতে। লোক লাগিয়ে ছবির উলঙ্গতা ঢাকার ব্যবস্থা করেন। যে শিল্পী এই সব মূর্তিকে কাপড় পরান, লোকে কটাক্ষ করে তার নাম দিলো—ব্রাঘেটোন্ অর্থাৎ "জবরদস্ত পাজামা" অনেকে বলেন, মিকেলেঞ্জোর প্রেয়সী ভিটোরিয়া কলোনার মুখের ছায়া লাষ্ট জাজমেন্টের অনেক মহিলার ছবিতে পাওয়া যায়। যাই থাক, এই কাজ, মাত্র এই ঘরটি দেখতে আসার জন্যই ভারতবর্ষ থেকে রোমে আসা সার্থক।

এর পরে রাফায়েলের কাজ দেখা গেলো অন্য ঘরে। প্রখ্যাত "ট্রান্সফিগারেশন" এবং "এথেন্সের বিদ্যালয়" যাতে প্লাতো আরিষ্টটলের ছবি আছে। এ ছবিতেও তখনকার কালের চেনা মুখের ছবি। প্লাতোর মুখখানা লিওনার্দো দাভিঞ্চির, ইউক্লিডের মুখে ব্রামাণ্ডি; হিরাক্লিটাসের মুখে মিকেলেঞ্জেলো, এক কোণে রাফায়েল, এক কোণে সডোমা, এমনকি আর্বিনোর ডুাকের ছবিও এথেন্সের পণ্ডিতদের মধ্যে সাজানো!

লিফট চলছে। নেমে এলাম। পা ব্যথা করছে। হঠাৎ যেন একটা গোলমাল। সবাই দৌড়চ্ছে। ম্যাক বলে—"পাপা, পাপা!"

সেকি! মনে পড়ে গেলো তাইতো মহর্ষির সাক্ষাতের কথা তো। সত্যিই দৌড় তখন।

বাইরে লোকে লোকারণ্য। অন্ততঃপক্ষে কুড়ি হাজার লোক ঠা-ঠা রোদে দাঁড়িয়ে। তোপ পড়লো একটা।

দূরে, বহু উঁচুতে, একটা জানলা খুললো। শ্রীমান্ মহর্ষি দেখা দিলেন। একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন উঠলো। দলে দলে সুসজ্জিত নর-নারী মাটিতে নতজানু হোলো। হাত তুলে প্রণাম করলো। অনেকে মাটিতেই মাথা ঠেকালো। পোপ কিন্তু সেই টোজে। তার পর জলদগম্ভীর শব্দে পোপের কণ্ঠ বেজে উঠলো ইতালিয়ানে। লাউড স্পীকার মারফৎ আশীর্বচন শোনা গেলো। আবার তোপ। জানালার দোর বন্ধ হয়ে গেলো।

ক্ষিদে পেয়েছে। ম্যাককে বলি "লজেঞ্জস্ দাও।"

কে বলে,—"ও সব নয়। এখন সোজা হোটেল?"

হোটেলে টেবিলে বসেছি তখন বেলা পৌণে দুটো।

বুড়ো রিয়েতোর ভোল বদলেছে। ভালো পোশাক পরে এসে বলছে,—"কি খাবেন? কি আনাবো।"

কে-কে দেখিয়ে বল্লাম,—"উনি জানেন।"

ক্রমশঃ

লাদকে বাঙ্গালী পরিব্রাজক

শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায়

আজ লাদক সকলের পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় পর্য্যটকরা কাশ্মীর পর্য্যন্ত যাওয়া করেন। লাদক কেহ যান না। আজও লাদক দুর্গম স্থান। পঞ্চাশ বৎসরেরও পূর্ব্বে এক বাঙ্গালী পরিব্রাজক লাদকে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার অভিজ্ঞতা ১৩১৩ সালের মাঘ সংখ্যা "নব্য-ভারতে" প্রকাশ করেন। সেই প্রবন্ধ হইতে এই রচনা সঙ্কলিত হইল। তিনি লিখিয়াছেন :

"পরিব্রাজকগণ জম্বু ও শ্রীনগর পরিভ্রমণ করিয়া কহিয়া থাকেন, 'কাশ্মীর ভারতের ভূস্বর্গ'।...লাদক প্রদেশের শোভা, মানব-মানবীর অপূর্ব্ব শারীরিক সৌন্দর্য্য, তরুলতাদির আশ্চর্য্য বিশেষত্ব, পর্ব্বত ও কানন সমুদয়ের বিশিষ্টতা, অধিবাসীবর্গের অদ্ভুত আচার ও বিচার সম্বন্ধে আলোচনা করিলে পথিকেরা বলিতে বাধ্য হইবেন, লাদকের সমতুল্য দেশ আসিয়া খণ্ডে দ্বিতীয় নাই।...

"একদা লাদকের গবর্ণর পদে প্রতিষ্ঠিত সর্দ্দার হেয়াৎ খাঁ কহিয়াছেন, সমস্ত আসিয়া মহাদেশের মধ্যে লাদক এক অপূর্ব্ব স্থান। বিশেষত্বের প্রাধান্তে ইহা অতুল। লাদক না দেখিয়া প্রত্যাগমন করিলে প্রাচ্য দেশের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠতম স্থান দেখিতে বাকী থাকিয়া যায়।

..."লাদক, কাশ্মীরাধিপতির শাসন ও অধিকারভুক্ত। কিন্তু এই অদ্ভুত প্রদেশ কাশ্মীর দেশের সীমান্তবর্ত্তী বা অন্তঃস্থিত নহে।...কাশ্মীর সীমান্ত হইতে লাদক অতিদূরে অবস্থিত।

"লাদকের তরুলতা, কুঞ্জ, গুল্ম, ফুল, ফল সংখ্যায় কাশ্মীর অপেক্ষা প্রচুরতর এবং তুলনায় শ্রেষ্ঠতর। কাশ্মীরের রমণী সৌন্দর্য্যের খনি বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। কিন্তু গোলাপপ্রসূনভরা কাশ্মীরের গোলাপী রংভরা রমণীর মুখমণ্ডলের সুগঠন কই? বর্ণটাই ভাল, কিন্তু চোখ, মুখ, ভ্রূ, নাসিকা ইত্যাদির সুগঠন কোথায়? কাশ্মীরের রমণী কুড়ি হইলেই বুড়ী হইয়া যায়' আর লাদকের রমণী? দুইটি বা তিনটি ছেলে-মেয়ের 'মা' হইলেই কাশ্মীরের সুন্দরী একেবারে সৌন্দর্য্যের সীমা হইতে সম্পূর্ণ সুদূরে আসিয়া পৌঁছেন। লাদকের নারীকুল চিরযৌবনে ভরা, ইহাদের ঘরে, বাহিরে ও শরীরে চিরদিনই বসন্ত। বর্ণে ও গঠনে কাশ্মীর-রমণী ইহাদের পরিচারিকা; পঞ্চাশ বৎসর বয়স হইলেও যৌবন, উৎসাহ, তেজ, বীরত্ব ও সাহসাদি নষ্ট হয় না। তখনও তরবারি হাতে লইয়া, আবশ্যক হইলে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইতে পারে। দুই-চারিটা সন্তানের প্রসূতি হইলেও যৌবনের সৌন্দর্য্য, মানসিক তেজ, দৈহিক শক্তি প্রভৃতি নষ্ট হয় না। লাদকের প্রত্যেক রমণীই স্বাস্থ্য-সুখভোগিনী, ব্যায়ামে শিক্ষিতা, বীরগৃহে পালিতা, বলবতী, বুদ্ধিমতী ও স্বদেশপ্রিয়া।...অথচ লাদকের রমণী সতীশ্রেষ্ঠা।

"লাদকে গমন করিতে হইলে মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, তিব্বতীয় 'ইয়াক' নামক ষণ্ড অথবা বলদ-শকট আবশ্যক হয় না, কারণ এই সকল যানযোগে লাদক যাইবার সুবিধা নাই। অশ্বপৃষ্ঠে অনেক পথ অতিক্রম করা যায়, কিন্তু সমুদয় পথ নহে। এই অশ্ব পার্ব্বতীয় বলবান ও অভ্যস্ত অশ্ব। কাশ্মীর ও লাদকের মধ্যস্থলে 'যোজী লা' নামক ১১,৩০০ ফিট উচ্চ গিরিরাজ দণ্ডায়মান, এই পর্ব্বতমালা লাদককে কাশ্মীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। কোতিলা, নাম্বিকা লা প্রভৃতি পাহাড়ের শাখাসমূহ স্থানে স্থানে পথকে আরও দুর্গম করায় পরিব্রাজকগণকে অত্যন্ত ক্লান্তি ও ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। কোনও পাহাড়ই দশ হাজার ফিটের নিম্ন নহে। এই সকল পর্ব্বত অতিক্রম করিতে পারিলে লী নাম্নী মনোহারিণী নগরীতে পথিকেরা পৌঁছিতে পারেন। শ্রীনগর হইতে লী নগরী একশত চল্লিশ ক্রোশ। অনেকে অষ্টাদশ দিবস মধ্যে এই দুর্গম পথ অতিক্রম করিতে পারেন। উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া লাদকে যাইবার সুবিধা সর্ব্বোত্তম। মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে মরুভূমি আছে, উষ্ট্র না হইলে তাহা অতিক্রম করা যায় না। পথ কষ্টদায়ক ও অসুবিধা-জনক বটে, কিন্তু পথের বিচিত্রতা ও অপার সৌন্দর্য্যে পর্য্যটক অনেক সময় পথের কষ্ট ভুলিয়া যান। উপরিউক্ত লী নগরী লাদক প্রদেশের রাজধানী। তিব্বত রাজ্যের পশ্চিম সীমায় ইহা অবস্থিত। অতি অল্প সময়ে এখান হইতে তিব্বতে প্রবেশ করা যায়।

"শ্রীনগর হইতে লী পর্য্যন্ত পথ কোথাও অরণ্য, কোথাও সমতলভূমি, কোথাও উপত্যকা এবং কোথাও অত্যুচ্চ পর্ব্বত। হিংস্রপশ্বাদি হইতে বিপদাশঙ্কা আছে বটে, তাহা হইলেও এই দুর্গমপথ নিরাপদ। স্থানে স্থানে তিব্বতীয় সাধুদিগের আশ্রম আছে, তথায় ভোজ্যদ্রব্য পাওয়া যায়, বিশ্রামেরও সুবিধা আছে। দুগ্ধ, ফলমূল

সুখাদ্য পাওয়া যায়।···কোনও কোনও স্থানে হয়তো দুই দিবসের মধ্যে পানীয় সলিল পাওয়া যায় না।··· পথের অনেক স্থান অত্যন্ত শীতল এবং অনেক স্থান অত্যন্ত উষ্ণ বলিয়া অনুভূত হয়।

"লী নগরীতে প্রবেশ করিলে বিদেশী দেখিতে পাইবেন, ছোট ছোট বালক-বালিকারা আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া পয়সা ভিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিছু না দিলে সহজে ছাড়িয়া দেয় না।···উহারা যে-গান গাহিয়া পয়সা চায় তাহার মূল আমি দিতে পারিব না, কিন্তু তাহার অর্থ এই :

নবীন দেশে, নবীন বেশে, হেসে হেসে আও।
আমাদের হস্তে, আস্তে আস্তে কিঞ্চিৎ পয়সা দাও॥
পয়সার বদলে ভোজন দিও, ভোজনের বদলে চিনি।
চিনির বদলে ফলমূল কিম্বা গাখোরঙ্কিণি॥

গাখোরঙ্কিণি পশুমাংসে প্রস্তুত মিষ্ট বাতাসা বিশেষ। ইহা খুব সস্তা, এক পয়সায় আট বা দশখানি প্রাপ্ত হওয়া যায়। চিনি দুর্মূল্য।

"রাজধানীর সর্ব্বত্র জাপানী, তিব্বতী, চৈনিক, সায়ামী, বোর্ণিওবাসী, আনামী, ইয়ারকন্দী বণিকেরা বিচরণ করিতেছে। সমস্ত শহর সওদাগরে পরিপূর্ণ। বোগদাদ, বসোরা, রুশিয়া, তুর্কী, মধ্য-আসিয়া, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থান হইতে ব্যবসায়ীরা এখানে যাতায়াত করে। ···সমস্ত বৌদ্ধ রাজ্যের ইহা অন্যতম প্রধান বণিক-আড্ডা। বাজার, দোকান, হাট ইত্যাদি খুব বড়, জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। দুগ্ধ, ঘৃত, মাংস খুব সস্তা কিন্তু "আটা" ও চাউলের দাম অধিক। চাউল সস্তা নয়। আটা ও চাউল প্রধান খাদ্য।

"অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৮৫জন বৌদ্ধ, ৯ জন হিন্দু এবং বাকী বিদেশীয়। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীগণের আচার-ব্যবহার অনেক প্রকারে হিন্দুর মত। এক সময় সমুদয় দেশ হিন্দু ছিল, কালপ্রভাবে অনেকে বৌদ্ধমতাবলম্বী হইয়াছে।

"লাদকের পুরুষ যেমন সুন্দর, রমণী তেমনি সুন্দরী। কাশ্মীরে সুন্দর পুরুষ আছে···আবার কদাকার হইতে কদাকার পুরুষও আছে। লাদকে তাহা নাই। এখানে সকলেই সুন্দর।

"লাদক প্রদেশে বৌদ্ধধনপতি ও সন্ন্যাসীদিগের এত অন্নছত্র আছে যে, অন্নের জন্য সে দেশে কাহাকেও চিন্তা করিতে হয় না। কিন্তু নিরামিষাশীর তত সুবিধা নাই; এদেশের সকলেই মাংসভোজী, সুতরাং পশু ও পক্ষী মাংস ভিন্ন পাকশালাই নাই। এখানে বৌদ্ধ যেমন, হিন্দুও তেমন।

"এদেশে তিন জন রাজা রাজত্ব করিয়া থাকেন। রাজনৈতিক রাজা—কাশ্মীরাধিপতি; ধর্ম্মনৈতিক রাজা তিব্বতের প্রধান লামামহাশয়; আর সমাজ ও গার্হস্থ্যাচারাদির রাজা—'ভোৎরংপু'।"

[নোট।—উপরে উদ্ধৃত অংশের লেখক "ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী"। নব্যভারত সম্পাদক এই প্রবন্ধের ফুটনোটে বলিতেছেন—"মহাভারতীর এই প্রবন্ধই তদীয় জীবনের শেষ প্রবন্ধ। মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াও তিনি বঙ্গভাষার সেবার কথা ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার জীবন রহস্যময় হইলেও একথা সর্ব্ববাদীসম্মত যে, তিনি বাঙ্গলাভাষার যেরূপ পরিচর্য্যা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার নাম সুদীর্ঘকাল স্মৃতিতে থাকিবে। ২৮শে অগ্রহায়ণ ১৩১৬ সালে তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ন. স।"

নব্যভারত সম্পাদক স্বর্গীয় দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয়ের উক্ত ফুটনোট প্রণিধানযোগ্য। সুদীর্ঘকাল কেন সু-অল্পকালও বাংলাদেশের লোক "ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী"কে মনে রাখে নাই। অথচ এই লোকটির বহু প্রবন্ধ পুরাতন মাসিক পত্রিকায় দেখিয়াছি। "তাঁহার জীবন রহস্যময়"—দেবীবাবুর এ কথারও বিশিষ্টতা আছে। ইঁহার গৃহী নাম কি ছিল জানি না। ইনি যে বহুদেশ, ভারতের সর্ব্বত্র ও এশিয়ার অনেক স্থানে গিয়াছিলেন ইহা তাঁহার লেখা হইতে বুঝা যায়। আজকার মহানগরী জামসেদপুরের পাশে যে "দলমা" পাহাড় আছে তার বিচিত্র বর্ণনা এঁর লেখায় পড়িয়াছি। আজ বিলাতি পাদরী এলউইন সাহেবকে লইয়া আমরা নৃত্য করি—কিন্তু ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী ষাট বছর পূর্ব্বে ভারতের অনেক আদিম অধিবাসীদের মধ্যে গিয়া তাহাদের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। ইনি অত্যন্ত স্বদেশ-প্রেমিক ছিলেন। ইংরেজ অত্যাচারের অনেক কাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন। "জুতা" নামক এক প্রবন্ধ সম্বন্ধে অন্য এক বিশিষ্ট বাঙ্গালী লেখক নব্যভারতে মহাভারতীর জুতা ও গুঁতা" লিখিয়াছিলেন। ইংরেজের জুতা আমরা কেমন পরিপাক করিতাম মহাভারতীর প্রবন্ধ সেই সম্বন্ধে ছিল। ইঁহার "হেরডসাহেবের হাকিমী" ইংরেজ শাসনের হাস্য-রসময় বর্ণনা।

[৺ব্রজেনবাবু ও শ্রীযোগেশ বাগল মহাশয় এবং শ্রীসজনীকান্ত "সাহিত্যসেবক চরিতমালা" লিখিয়া বাংলা ভাষার উপকার করিয়াছেন। কিন্তু অনেক যোগ্য-ব্যক্তির স্মৃতিতর্পণ বাকী আছে। কোথায় দেখিয়াছিলাম মনে নাই যে, সাহিত্যপরিষদ প্রতিষ্ঠার জন্য মহাভারতী খুব চেষ্টা করিয়াছিলেন—সুধীরলাল রায়।]

জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ

ডঃ শ্রীরমা চৌধুরী

(৪)

জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদের বিরুদ্ধে শঙ্কর যে সব প্রধান আপত্তি উত্থাপিত করেছেন তাঁর সুবিখ্যাত গীতা-ভাষ্যে, তার কিছু আভাস পূর্ব সংখ্যায় দেওয়া হয়েছে। তিনি এ বিষয়ে আরো কয়েকটী যে যুক্তি দিয়েছেন তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণী এই সংখ্যায় দেওয়া হচ্ছে।

অষ্টমতঃ, নিত্যকর্ম করলে যে আয়াস হয়, সেই আয়াস থেকে যে দুঃখের সৃষ্টি হয়, সেই দুঃখ সেই আয়াসেরই ফল, তাকে অকারণে পূর্বকৃত পাপের ফল বলা হবে কেন?

"তদ্দৃশ্যতে ব্যায়ামাদিবৎ। তদন্যস্যেতি কল্পনানুপপত্তিঃ।"

যেমন, ব্যায়াম করলে যে আয়াস হয়, এবং সেই আয়াস থেকে যে ক্লেশ বা দুঃখ হয়, সেই ক্লেশ বা দুঃখ সেই আয়াসেরই ফল—পূর্বকৃত পাপের ফল ত তা নয় কোনো ক্রমেই।

নবমতঃ, যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্মের বিধান দেওয়া হয়েছে। এর থেকেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, যত দিনই জীবন, ততদিনই নিত্য কর্মানুষ্ঠান বলে জীবন হ'ল নিত্যকর্মের নিমিত্ত, পূর্বজন্মকৃত, সঞ্চিত পাপ-কর্ম নয়। বস্তুতঃ, প্রায়শ্চিত্তের যে দৃষ্টান্ত এক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে, তা ন্যায্য দৃষ্টান্ত নয়।

"যস্মিন্ পাপ-কর্ম-নিমিত্তে যদ্ বিহিতং প্রায়শ্চিত্তং, নতু তস্য পাপস্য তৎ ফলম্।" (গীতা-ভাষ্য, ১৮-৬৬)

শাস্ত্রে পূর্বকৃত পাপ-ক্ষয়ের জন্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে, সত্য। কিন্তু স্বয়ং প্রায়শ্চিত্তই ত সেই পাপের ফল নয়। পূর্বকৃত পাপরূপ কর্মের ফল এক, অধুনাকৃত প্রায়শ্চিত্তরূপ কর্মের ফল অন্য। পাপকর্ম ও প্রায়শ্চিত্ত উভয়ই কর্ম, একে অপরের ফল নয়, প্রত্যেকের স্ব স্ব ফল আছে। কেবল বর্তমানের প্রবলতর পুণ্য কর্ম-ফলটী পূর্বের দুর্বলতর পাপকর্ম ফলটীকে ব্যাহত করতে পারে বলেই প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব পাপ বিনষ্ট করতে পারে। এতে অবশ্য কর্মবাদ ব্যাহত হয় না, যা পূর্বেই বলা হয়েছে।

সে যাই হোক্, যদি একথাও পুনরায় বলা হয় যে, প্রায়শ্চিত্ত কালে যে দুঃখক্লেশ অবশ্যম্ভাবী, সেই দুঃখ-ক্লেশই হ'ল পূর্ব পাপের ফল, যে পাপের বিনাশের জন্যই সেই প্রায়শ্চিত্তটী করা হচ্ছে—তা হলে এক্ষেত্রেও নিত্য-কর্মের অনুষ্ঠানের জন্য যে আয়াস হয়, এবং সেই আয়াস থেকে যে দুঃখ হয়, সেই দুঃখের কারণ হ'ল পূর্বকৃত পাপ নয়, বর্তমান জীবন, যেহেতু জীবন আছে বলেই নিত্য কর্মানুষ্ঠান, নিত্য কর্মানুষ্ঠান আছে বলেই আয়াস, আয়াস আছে বলেই পরিশেষে দুঃখ।

দশমতঃ, নিত্য অগ্নিহোত্রাদি অনুষ্ঠানে যে দুঃখ, কাম্য অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠানেও সেই একই দুঃখ। সেজন্য নিত্য অগ্নিহোত্রাদির দুঃখ যদি পূর্বজন্মের পাপের ফল হয়, তা হলে কাম্য অগ্নিহোত্রাদির দুঃখও ঠিক তাই হওয়া উচিত। সেক্ষেত্রে, বেদে নিত্যকর্মের কোনোরূপ ফলের উল্লেখ নেই বলে এবং এরূপ ফলবিহীন নিত্য কর্মের অকারণ বিধান অনুপপন্ন বলে, নিত্যকর্মের আয়াস থেকে সৃষ্ট দুঃখকে পূর্বজন্মকৃত পাপের ফল বলে গ্রহণ করা অযৌক্তিক। "অর্থাপত্তি" প্রমাণও এক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়। "অর্থাপত্তির" অর্থ হ'ল যে, একটী উপস্থিত ঘটনার অন্য কোনো দৃষ্ট বা জ্ঞাত কারণ খুঁজে না পেলে, একটী অদৃষ্ট বা অজ্ঞাত কারণ ধরে নেওয়া। যেমন, দেবদত্ত দিবসে ভোজন করেন না, অথচ স্থূলতর হচ্ছেন। এই স্থূলত্বের কারণ দিবসে প্রত্যক্ষদৃষ্ট, জ্ঞাত ভোজন যখন নয়, তখন রাত্রিতে, অপ্রত্যক্ষ, অজ্ঞাত ভোজন নিশ্চয়ই। (বেদান্ত-পরিভাষা)। একই ভাবে, নিত্যকর্মের বিধান যখন শাস্ত্রে আছে, অথচ কোনো বিশেষ ফলের উল্লেখ সেই সঙ্গে নেই, তখন নিত্যকর্মের বিধান যাতে একেবারে অযৌক্তিক না হয়ে পড়ে, সেজন্য তা পূর্ব পাপের ফলরূপেই অনিবার্য এবং সেইজন্যই অনুষ্ঠেয়—এই হ'ল জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদীদের মতানুসারী, নিত্য-কর্মের ক্ষেত্রে "অর্থাপত্তি" প্রমাণ। কিন্তু "অর্থাপত্তি"র অর্থ নিশ্চয়ই এই নয় যে, যে কোনো অজ্ঞাত কারণই স্বীকার করে নেওয়া। কারণটীও যুক্তিযুক্ত ও সম্ভাব্য কারণ হওয়া প্রয়োজন। নিত্যকর্মের ক্ষেত্রে তা হয় নি সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

একাদশতঃ, কেবল দুঃখরূপ ফলের জন্যই শাস্ত্রে কোনো কর্ম বিহিত হতে পারে না। সেজন্য, বেদে যখন

নিত্যকর্ম বিহিত হয়েছে, তখন স্বীকার করে নিতেই হয় যে, আয়াসজনিত দুঃখভোগ ব্যতীতও নিত্যকর্মের অন্য ফল আছে।

দ্বাদশতঃ, নিত্যকর্ম সম্বন্ধে উক্ত মতবাদ স্ববিরোধ-দোষদুষ্ট। কারণ, এক্ষেত্রে একবার বলা হচ্ছে যে, নিত্য-কর্মের কোনোরূপ ফল নেই; আরেকবার বলা হচ্ছে যে, নিত্যকর্মের ফল দুঃখ, যেহেতু পূর্বকৃত পাপের ফলই হ'ল দুঃখরূপ নিত্য কর্ম।

ত্রয়োদশতঃ, কাম্য অগ্নিহোত্রাদি অনুষ্ঠিত হলে, নিত্য অগ্নিহোত্রাদিও সেই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়ে যায়—যেহেতু অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠানপ্রণালী উভয়ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ একই, কামনা ও কামনাভাব—এই মনোগত দিক্ থেকে তাদের মধ্যে যতই ভেদ থাকুক না কেন। সেক্ষেত্রে, নিত্য অগ্নিহোত্রাদির ফল দুঃখভোগের সঙ্গে সঙ্গেই কাম্য অগ্নিহোত্রাদির ফলভোগও হয়ে যায় এবং তার আর স্বর্গাদিরূপ অন্য কোনো ফল অবশিষ্ট থাকে না।

চতুর্দশতঃ, যদি বলা হয় যে, কাম্য অগ্নিহোত্রাদি ও নিত্য অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠানপ্রণালী এক হলেও, ফলতঃ এক নয়; যেহেতু কাম্য অগ্নিহোত্রাদির ফল স্বর্গ, যা নিত্য অগ্নিহোত্রাদির ফল কোনোক্রমেই নয়—তার উত্তর হ'ল এই যে,সেক্ষেত্রে কাম্য অগ্নিহোত্রাদির ফল দুঃখ এবং নিত্য অগ্নিহোত্রাদির ফল দুঃখ থেকেও ভিন্ন। কিন্তু—"ন তদস্তি দৃষ্ট-বিরোধাৎ।" (গীতা-ভাষ্য ১৮-৬৬) তা নয়, প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট সত্য হচ্ছে এই যে, কাম্যই হোক্, বা নিত্যই হোক্, অনুষ্ঠানপ্রণালী, ও আয়াস, প্রচেষ্টা, শ্রম প্রভৃতি উভয় ক্ষেত্রে সেই একই বলে, তজ্জনিত দুঃখও নিশ্চয়ই এক ও সমান।

পঞ্চদশতঃ, "অজ্ঞাত-জ্ঞাপকং শাস্ত্রম্" বলে, শাস্ত্রে জ্ঞাত বা দৃষ্ট ফলের বিধান নেই, অজ্ঞাত বা অদৃষ্ট ফলেরই বিধান আছে। সেজন্য, যে কর্ম শাস্ত্রে বিহিত বা নিষিদ্ধ নয়, সেই সাধারণ কর্মেরই ফল অবিলম্বে উৎপন্ন হতে পারে।

"যৎকর্ম মর্দন ভোজনাদি তন্ন শাস্ত্রেন বিহিতং নিষিদ্ধং বা তদনন্তরফলং তথানুভবাৎ ইত্যর্থঃ।" (আনন্দগিরি-টীকা)

গাত্রমর্দন, ভোজন প্রভৃতি কর্ম সম্বন্ধে শাস্ত্রে বিধি-নিষেধ কিছুই নেই। তাদের ফল তৎক্ষণাৎই হয়—যেমন দেহের আরাম, ক্ষুন্নিবৃত্তি প্রভৃতি। কিন্তু শাস্ত্রীয় কর্মের ফল, যেমন, স্বর্গলাভাদি, তৎক্ষণাৎ অবিলম্বে হতে পারে না, নতুবা শাস্ত্রীয় কর্মে, লোকের প্রবৃত্তি অযৌক্তিক হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে কাম্য অগ্নিহোত্রাদি ও নিত্য অগ্নি-হোত্রাদি স্বরূপের দিক্ থেকে এক ও অভিন্ন। তা সত্ত্বেও এই মতানুসারে কাম্য অগ্নিহোত্রাদির ফল তজ্জনিত আয়াস থেকে উদ্ভূত দুঃখের ভোগের দ্বারাই সঙ্গে সঙ্গে হবে না, হবে বহু পরে, মৃত্যুর পরে স্বর্গভোগের দ্বারাই কেবল। অথচ, নিত্য অগ্নিহোত্রাদির ফল তজ্জনিত আয়াস থেকে উদ্ভূত দুঃখের ভোগ দ্বারাই সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যাবে। কাম্য ও নিত্য অগ্নিহোত্রাদির মধ্যে এরূপ প্রভেদ কল্পনা ত সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

সুতরাং, নিত্যকর্মের যে একেবারে কোনো ফল নেই, যে জন্য বলা চলে যে, নিত্যকর্ম জ্ঞানেরই ন্যায় কেবল মোক্ষের প্রকাশ করে, আর অন্য কিছু ফল উৎপাদন করে না—তা কোনোক্রমেই প্রমাণিত করা যায় না।

"তস্মান্ন নিত্যানাং কর্মণামদৃষ্ট-ফলাভাবঃ কদাচিদ-প্যুপপদ্যতে।" (গীতা-ভাষ্য, ১৮-৬৬)

বস্তুতঃ;—

"অবিদ্যা-কাম-বীজং হি সর্বমেব কর্ম।"

(গীতা-ভাষ্য, ১৮-৬৬)

অবিদ্যা এবং তজ্জনিত কামনাই হ'ল সকল কর্মেরই বীজস্বরূপ বা মূলীভূত কারণ।

সেজন্য :—

"অতশ্চাবিদ্যা-পূর্বকস্য কর্মণো বিদ্যা এব শুভাশুভস্য ফল-কারণমশেষতো, ন নিত্যকর্মানুষ্ঠান"

(গীতা-ভাষ্য, ১৮-৬৬)।

অবিদ্যাজনিত কর্ম, শুভই হোক্ বা অশুভই হোক, বিদ্যার উদয় হলেই নিঃশেষে ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু নিত্য কর্মানুষ্ঠান দ্বারা অবিদ্যা ও তজ্জনিত কর্মের ধ্বংস হতে কোনোক্রমেই পারে না।

এই কারণেই, জ্ঞানহীন ব্যক্তির পক্ষেই কেবল কর্ম সম্ভবপর। কিন্তু জ্ঞানীদের ক্ষেত্রে সর্ব-কর্ম-ত্যাগই এক-মাত্র পন্থা।

অবশ্য, কর্ম নানাপ্রকারের হতে পারে। যেমন শাস্ত্রে বিহিত যাগ-যজ্ঞাদি প্রমুখ সকাম পুণ্যকর্ম, মর্দন-ভোজনাদি প্রমুখ সাধারণ সকাম কর্ম যা শাস্ত্রে বিহিত বা নিষিদ্ধ হয় নি, পর-পীড়নাদি প্রমুখ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ সকাম পাপকর্ম, শাস্ত্রে বিহিত নিষ্কাম নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম, পরসেবা প্রমুখ সাধারণ নিষ্কাম কর্ম যা শাস্ত্রে বিহিত বা নিষিদ্ধ হয় নি ইত্যাদি। কিন্তু শাস্ত্রে বিহিতই হোক বা অবিহিতই হোক, নিষ্কাম কর্মই হোক বা সকাম কর্মই হোক, নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মই হোক বা কাম্য কর্মই হোক

—সকল প্রকারের সকল কর্মই অবিদ্যা ও কামমূলক বলে মোক্ষবিরোধী। সেজন্য, এমন কি—

"ভগবৎ-কর্ম কারিণো যে যুক্ততমা অপি কর্মণোঽজ্ঞাস্তে উত্তরোত্তর-হীন-ফল-ত্যাগাবসান-সাধনাঃ।"

(গীতা-ভাষ্য, ১৮-৬৬)

যাঁরা শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যেই সম্পূর্ণ নিষ্কাম ভাবে শাস্ত্রোপদিষ্ট নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম সম্পাদন করেন, তাঁরা শ্রেষ্ঠ কর্মকারী হলেও, অজ্ঞ, অনাত্মজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞানবিহীন। সেজন্য তাঁরাও সাক্ষাৎ ভাবে মোক্ষলাভ করতে পারেন না; কিন্তু উত্তরোত্তর হীন ফল পরিত্যাগ করে, অবশেষে মোক্ষের প্রকৃত সাধন অবলম্বন করে, তবেই মোক্ষলাভ করেন পরম্পরাগত ভাবে। কর্মের পাঁচটি কারণের কথা গীতার ১৮-১৪ শ্লোকে বলা হয়েছে। যথা: শরীর, কর্তা, করণ বা ইন্দ্রিয়, প্রাণ, অপান প্রমুখ বায়বীয় ব্যাপার এবং দৈব। এই পাঁচটি কারণ থেকে স্বভাবতঃই অসংখ্য এবং বহুবিধ কর্মের সৃষ্টি হয়। যাঁরা এই পঞ্চবিধ কারণ থেকে উদ্ভূত, নিত্য-নৈমিত্তিককাম্য ভেদে ও সাত্ত্বিক-রাজসিক-তামসিক ভেদে ত্রিবিধ কর্ম (গীতা, ১৮-২৩) সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেছেন, যাঁদের আত্মা এক ও অকর্তা এই জ্ঞান আছে, যাঁরা পরম-জ্ঞান-নিষ্ঠাকে আশ্রয় করে রয়েছেন, যাঁরা ভগবানের তত্ত্ব জ্ঞাত হয়েছেন, যাঁরা ভগবানের স্বরূপ এবং ভগবান ও আত্মার একত্ব উপলব্ধি করেছেন, সেই পরমহংস পরিব্রাজকগণ কোনো কর্মেরই ফলভোগ করেন না।

"এষ গীতা-শাস্ত্রোক্তস্য কর্তব্যাকর্তব্যার্থস্য বিভাগঃ।"

(গীতা-ভাষ্য, ১৮-৬৬)।

এই হ'ল গীতা-শাস্ত্রের কর্তব্য ও অকর্তব্যের বিভাগ।

অবশ্য এক্ষেত্রে স্বভাবতঃই আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে যে, সকল কর্মই অবিদ্যামূলক হতে পারে না, যেহেতু পুণ্য ও পাপ, শুভকর্ম ও অশুভকর্মের মধ্যে প্রভেদ নিশ্চয়ই আছে। এর উত্তরে শঙ্কর দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছেন:

"ন, ব্রহ্মহত্যাদিবৎ।" (গীতা-ভাষ্য, ১৮-৬৬)

পাপপুণ্য সকল কর্মই নির্বিশেষে অবিদ্যামূলক। যেমন, ব্রহ্মহত্যা রাগদ্বেষাদিসম্ভূত বলে অবিদ্যামূলক, ঠিক তেমনি অন্যান্য সকল কর্মই একইভাবে রাগদ্বেষাদিসম্ভূত বলে একইভাবে অবিদ্যামূলক। অতএব অবিদ্যা ও কামনা কর্মের সাধারণ কারণ বলে নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্মও সেই একই কারণ অবিদ্যা ও কামনা থেকে উৎপন্ন।

"যথা প্রতিষেধ-শাস্ত্রাবগতমপি ব্রহ্মহত্যাদি-লক্ষণং কর্ম অনর্থ-কারণমবিদ্যা কামাদি-দোষবতো ভবতি অন্যথা প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ, তথা নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্যাত্মকমপীতি।"

(গীতা-ভাষ্য, ১৮-৬৬)

এই দিক থেকে, পাপকর্ম ও পুণ্যকর্ম, নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম ও কাম্য কর্মের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই।

এমন কি, কর্ম যদি সম্পূর্ণরূপে নিষ্কামও হয়, তা হলেও কর্মের যে প্রবৃত্তি তা কর্তা, করণ, ক্রিয়া, ফলপ্রমুখ বিবিধ ভেদমূলক, অর্থাৎ অবিদ্যামূলক। নিষ্কাম কর্ম অবশ্য কামনাবিহীন বলে, সেই দিক থেকে সকাম কর্ম থেকে উচ্চতর, নিঃসন্দেহ, কিন্তু তা সত্ত্বেও অবিদ্যামূলক ভেদভিন্ন-জ্ঞানের দিক্ থেকে নিষ্কাম ও সকাম কর্ম একই দোষদুষ্ট।

এক্ষেত্রে পুনরায় বলা যেতে পারে যে, দেহ ও আত্মার মধ্যে প্রভেদজ্ঞান না থাকলে, শাস্ত্রবিহিত যাগযজ্ঞাদিকর্ম কেহ স্বর্গাদিলাভের আশায় করতে পারে না।

তার উত্তর শঙ্কর বলছেন যে, আত্মা যে দেহ থেকে ভিন্ন এবং দেহের পতনেও যে আত্মা বর্তমান থাকে—মাত্র এইটুকু জ্ঞান স্বর্গলাভের পক্ষে যথেষ্ট হলেও, মোক্ষলাভের পক্ষে একেবারেই যথেষ্ট নয়। মোক্ষলাভের সাধন যে জ্ঞান, তা হ'ল ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞান, অর্থাৎ, আত্মাই যে ব্রহ্ম এবং সেরূপে নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার, নির্গুণ, নির্বিশেষ, এই জ্ঞান। সেজন্য "চলনাত্মককর্ম", চলনস্বভাব কর্ম অচঞ্চল আত্মার সম্ভবপর নয়। এই কারণে, নিত্যকর্মের সঙ্গেও জ্ঞানের সমুচ্চয় অসম্ভব:

"যদ্যপি শাস্ত্রাবগতং নিত্যং কর্ম, তথাপি অবিদ্যাবত এব ভবতি।" (গীতা-ভাষ্য, ১৮-৬৬)

নিত্যকর্ম শাস্ত্রবিহিত হলেও, তা কেবল অবিদ্বানের ক্ষেত্রেই সম্ভবপর।

এই ভাবে, নানাবিধ যুক্তিতর্কের সাহায্যে, শঙ্কর সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন:

"আত্মজ্ঞানস্য তু কেবলস্য নিঃশ্রেয়স-হেতুত্বং ভেদ-প্রত্যয়নিবর্তকত্বেন কৈবল্য ফলাবসানত্বাৎ।

"তু শব্দঃ পক্ষদ্বয় ব্যাবৃত্ত্যর্থো, ন কেবলেভ্য কর্মভ্যঃ, ন চ জ্ঞান-কর্মভ্যাং সমুচ্চিতাভ্যাং নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তিরিতি পক্ষদ্বয়ং নিবর্তয়তি।" (গীতা-ভাষ্য, ১৮-৬৬)

একমাত্র আত্মজ্ঞানই ভেদজ্ঞান বিদূরিত করে মোক্ষ-লাভের উপায় হয় বলে, একমাত্র আত্মজ্ঞানই মোক্ষের সাধন।

অর্থাৎ কেবল কর্ম অথবা কর্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয় থেকে মোক্ষলাভ হতে পারে না।

এরূপে, শঙ্কর গীতা-ভাষ্যে বিশেষ ভাবে, জোরের সঙ্গে, বারংবার জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ খণ্ডনের প্রচেষ্টা করেছেন।

বাংলা বিশেষণ

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মাইতি

শেষো বহুব্রীহিঃ (২।২।২৩) ও অনেকমন্য পদার্থে (২।২।২৪) সূত্রদ্বয় দ্বারা মহামুনি পাণিনি সংস্কৃত এবং বর্তমান ভারতীয় আর্যগোষ্ঠীর ভাষাগুলির জন্ত শুধু যে বহুব্রীহি সমাসের অপূর্ব বিধান করিয়াছেন তাহা নহে, বাংলা ভাষার বিশেষণের বিভাগ প্রভৃতি বিবেচনার সুসঙ্গত পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। "অনেকমন্য পদার্থে" সূত্রটির বিভিন্ন ব্যাখ্যাকলে উক্ত সমাসের বিভিন্ন বিভাগ নির্দেশ সুসম্পন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গে "অনেক" পদটির নঞ তৎপুরুষ সমাস বিধিমতে পরপদ "এক" সর্বনামের অর্থ প্রধান থাকিয়া যেমন সমস্ত "অনেক" পদের সর্বনামত্ব অটুট রাখিয়াছে তেমনই উক্ত মতবিরোধী বহুব্রীহি সমাস বিধিমতে অন্য পদার্থ প্রধান রাখিয়া উক্ত "অনেক" পদের বিশেষণত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কাজেই বাংলার তৎসম সর্বনামের বিশেষণ প্রবৃত্তি বুঝিতে গেলে উক্ত সূত্রটিকে বিশেষ ভাবে পর্যালোচনার আবশ্যকতা তো আছেই, অধিকন্তু বাংলার বচনরীতি (Rules of number) জানিতে গেলেও সূত্রটির তাৎপর্য জ্ঞান অপরিহার্য।

উল্লিখিত পাঃ ২।২।২৪ সূত্রটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পতঞ্জলি মহাভাষ্যে এক স্থানে বলিয়াছেন—"সংখ্যা সমানাধিকরণ নঞ সমাসেষু বহুব্রীহি প্রতিষেধ" অর্থাৎ যেখানে সংখ্যা-সূচক শব্দ নঞ তৎপুরুষ সমাসে সমানাধিকরণ্য প্রতিষ্ঠা করে সেখানে বহুব্রীহি সমাসের স্থান নাই। কাজেই "অনেক" পদটিকে নঞ তৎপুরুষ সমাস ছাড়া বহুব্রীহি সমাস নিষ্পন্ন ধরিতে গেলে "সমানাধিকরণ্য" তত্ত্ব জানিবার আবশ্যকতা আসে। যাহা এক নহে তাহা শূন্যও হইতে পারে, অতএব "অনেক" পদে "এক" সংখ্যা-সূচকের সমানাধিকরণ্য অস্বীকার করা যাইতে পারে, কেন না "সপ্তপদার্থী" মতে—"সমানাধিকরণং ব্যাবর্তকং বিশেষণম্ (সূত্র-১৫৯)" এবং সে স্থলে "শেষো বহুব্রীহিঃ (২।২।২৩)" সূত্রমতে উক্ত পদের বহুব্রীহি ব্যুৎপত্তি ধরা যাইতে পারে। বিশেষতঃ, উক্ত সূত্র ব্যাখ্যায় মহাভাষ্য-কারের উক্তি—"বেষাং পদানামনুক্তঃ সমাসঃ সশেষঃ" আমাদের সহায়ক। এতদ্ব্যতীত বর্তমান সমস্তপদ "বহু" অর্থ-প্রধান দ্বারা "অন" ও "এক" পদদ্বয়ের সমানাধিকরণ্য নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠা করিয়া (লঘু শব্দেন্দু) শেখর-কারের "দ্বয়োঃ পদয়োঃ সমানাধিকরণত্বে স্বপদার্থে বৃত্তৌ তৎপুরুষেণাবাধাৎ (২য় ভাগ, পৃঃ ৮৮)" সূত্র সাহায্য প্রাপ্ত হয়।

সংস্কৃত ব্যাকরণোপযোগী উল্লিখিত আলোচনা ছাড়িয়া এবার বাংলা ব্যাকরণের নিজস্ব আলোচনায় আসা যাক। নঞ তৎপুরুষ সমাস নিষ্পন্ন পদের উত্তর এ-প্রত্যয়ান্ত (অনেকে) পদ ছাড়া বহুব্রীহি সমাস নিষ্পন্ন বিশেষণটির উত্তর বিভক্তি এবং নির্দেশকযুক্ত দুই প্রকার রূপ আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। একটি হইতেছে "গুলি" এই বহুবচন বিভক্ত্যন্তরূপ এবং "অনেকগুলি" পদটি নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে সংখ্যাবাচক বিশেষণ (Adjective of Number) অর্থপ্রদান করে। অপরটি হইতেছে "টা" ও "খানি" এই দুই নির্দেশক সংযুক্তরূপ। "খানি" নির্দেশকের অর্থ যাহা হউক না কেন "অনেকখানি" পদ "অনেকটা" পদের ন্যায় পরিমাণ বাচক বিশেষণ (Adjective of quantity)। "অনেক" শব্দ উদ্ভূত এই তিনটি, উভয় প্রকার বিশেষণের বৈশিষ্ট্য এই যে উল্লিখিত বহুব্রীহি সমাস নিষ্পন্ন "সকল" পদের উত্তর "গুলি" যোগে উৎপন্ন সংখ্যাবাচক বিশেষণ "সকলগুলি" পদ ব্যবহার হইতে পৃথক। "সকলগুলি" পদের পরে সরাসরি কোনও বিশেষ্য বসে না; কেননা "গুলি" যোগে ইহা নিজেই বিশেষ্যে পরিণত হইয়া গিয়াছে এবং ইহার বিশেষণ অবস্থা বজায় রাখিতে গেলে "গুলি" বিভক্তি সরাইয়া লইয়া বিশেষ্যে যুক্ত করা আবশ্যক অর্থাৎ "সকলগুলি লোক" প্রভৃতি অশুদ্ধ এবং শুদ্ধ রূপ হইতেছে "সকল লোক গুলি"। কিন্তু "অনেকগুলি" বা "অনেকটা" বা "অনেকখানি" পদ সরাসরি বিশেষ্য গ্রহণ করিতে পারে অর্থাৎ বিভক্তি বা নির্দেশক যোগ সত্ত্বেও ইহার বিশেষণত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে।

কিন্তু একটি লক্ষ্য করিবার এই যে, "অনেক" শব্দোৎপন্ন বিষয়। তিনটি পদের মধ্যে নির্দেশকযুক্ত "অনেকটা" ও "অনেকখানি" পদের বিশেষণের বিশেষণ (অব্যয়-বিশেষণ—Adverb) রূপেও ব্যবহার হয়। "তাঁহাকে আজ অনেকখানি সুস্থ মনে হইতেছে", "তোমাকে অনেকটা

বিরূপ দেখিতেছি" প্রভৃতি বাক্যে পদদ্বয়ের উক্ত ব্যবহার সুস্পষ্ট। এতদ্ব্যতীত সম্বন্ধ পদের অন্বয় পাইলে পদ দুইটি "সকলগুলি, সবটা, সবটুকু" পদের ন্যায় বিশেষ্যরূপেও ব্যবহার পায়, যথা: "জামার অনেকটা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। শরীরের অনেকখানি ঝলসিয়া গেল।"

"অনেক" পদের বিভিন্ন আচরণ বিষয় বাদ দিয়া এখন বিশেষণ পদের বিভাগ আলোচনায় আসা যাক। পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে আমরা পাইতেছি যে, বাংলায় বিশেষ বিশেষণ (Proper adjective; যথা: ভারতীয় বঙ্গীয়, বৈদিক, বিদ্যাসাগরীয় ইত্যাদি), গুণবাচক বিশেষণ (Adjective of Quality) যথা: ঠাণ্ডা, বীর, ছেঁড়া, ইতর, অবর ইত্যাদি) ছাড়া পরিমাণবাচক বিশেষণ, (যথা: বিস্তর, নানা, সারা, সামান্য, অল্প, দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, যথেষ্ট, বেশি, কতক, সমস্ত, বহু, বহুল, অর্ধেক, সিকি, কিছু, অধিক, প্রভূত, সমূহ, সমুদয় বা সমুদায়, প্রচুর, পর্যাপ্ত, আড়াই, দেড়, যাবতীয়, মুষ্টিমেয়, খানিক, ছোট, বড়, খাট, একক, দশক, শতক, কিঞ্চিৎ) ও সংখ্যাবাচক বিশেষণ (যথা: কতিপয়, প্রভৃতি, ইত্যাদি) বিভাগ পাইতেছি। শেষোক্ত সংখ্যাবাচক বিশেষণকে আবার নির্দিষ্ট (Definite; যথা: সকল) ও অনির্দিষ্ট (Indefinite) এই দুই ভাগে লক্ষ্য করা যায়। প্রথম ভাগে আবার সংখ্যাবাচক, পূরণবাচক, গুণিত সংখ্যাবাচক ও ভগ্ন সংখ্যাবাচক এই চারি উপবিভাগ পাই। "যমজ" শব্দের ন্যায়, সর্বনাম হইতে আগত "উভয়" শব্দ এই গুণিত সংখ্যাবাচক উপবিভাগের অন্যতম। পদটি কারক অনুসারে রূপ পাইলেও প্রথমার এক বচনে এ-প্রত্যয়ান্ত না হইলে পুনরায় সর্বনাম রূপ পায় না অর্থাৎ সর্বনামটির বিশেষণ প্রবৃত্তি সুস্পষ্ট। পরিমাণবাচক বিশেষণ বিভাগের "অধিক" পদটির ব্যুৎপত্তির জন্য মহামুণি পাণিনি ৫।২।৭৩ সূত্রে স্বতন্ত্র নিয়ম নির্ধারণ করিয়াছেন। এখানে "অধ্যারূঢ় শব্দাৎকন্, উত্তর পদ লোপশ্চ" ব্যাখ্যানুসারে "অধিক" পদসিদ্ধ।

পাণিনির আর একটি সূত্র "ইদমোহঃ—৫।৩।১১" সূত্রসিদ্ধ আর একটি বিশেষণ এবং তৎ নির্দেশে আর এক শ্রেণীর বিশেষণের আলোচনা করা যাইতেছে। উক্ত সূত্র মতে ব্যুৎপন্ন "ইহ" পদ সংস্কৃত মতে বিশেষণ (যথা: ইহকাল, ইহলোক, ইহজগৎ ইত্যাদি) বা ক্রিয়াবিশেষণ (যথা: ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইত্যাদি) হইলেও বাংলায় নির্দেশক বিশেষণ (Demonstrative Adjective) মাত্র। পদটি আপ্রত্যয় যোগে নির্দেশক সর্বনাম Demonstrative Pronoun) হয় বলিয়া এখানে সর্বনামের বিশেষণ প্রবৃত্তি অপেক্ষা বিশেষণ বা ক্রিয়া বিশেষণের (Adverb) সর্বনাম প্রবৃত্তি সুস্পষ্ট। এই নির্দেশক বিশেষণের উপবিভাগরূপে সংখ্যাবাচক বিশেষণের বিভাগের ন্যায় (ক) নির্দিষ্ট ও (খ) অনির্দিষ্ট দুইপ্রকার পাই। নির্দিষ্ট বিভাগের মধ্যেও যেগুলি "ইত্যাদি, প্রভৃতি" এই দুই অনির্দিষ্ট সংখ্যাবাচক বিশেষণের ন্যায় শব্দের পরে বসে অর্থাৎ "টি, টা, খানা, খানি, গাছা, গাছি, টুকু" কয়টিকে "নির্দেশক (Article)" এই স্বতন্ত্র সংজ্ঞায় অভিহিত করা প্রয়োজন। এই বিশিষ্ট সংজ্ঞা ও বিশেষণ শ্রেণীভুক্ত করিবার যুক্তি এই যে, ইহারা বিশেষণের ন্যায় বিশেষ্যের পূর্বে না বসিলেও কখনও কখনও বিশেষণের উত্তর প্রযুক্ত হইয়া বিশেষণের কতকটা অর্থ ঠিক রাখিয়া পদটিকে বিশেষ্যে পরিণত করিতে পারে। ছাপাটা, ছাপাখানা, ছাপাখানাটা বা ডাক্তারটি, ডাক্তারখানা, ডাক্তারখানাটি প্রভৃতি শব্দশৃঙ্খলে 'খানা' শব্দের তদ্ধিত প্রত্যয়ত্ব কিন্তু 'চাদরখানা' প্রভৃতি স্থলে নির্দেশক অর্থ সুস্পষ্ট। "প্রতিটি লোক তাঁহাকে মহৎ বলে" বাক্যে "টি" এই নির্দেশক যুক্ত হইয়া "প্রতি" এই উপসর্গ বা বিভাগকারী বিশেষণ (Distributive Adjective) নির্দেশক শক্তি পাইয়াছে কিন্তু পদের পরিবর্তন পায় নাই। অন্য পুরুষবাচক সর্বনামে প্রযুক্ত না হইলেও "যে" ও "সে" এই দুইটি প্রথম পুরুষে ইহারা প্রযুক্ত হয় এবং তাহাদের ব্যক্তিবাচক অর্থ বদলাইয়া বস্তু বা প্রাণীসূচক অর্থ সূচনা করে। "যে" পদটির অনির্দিষ্ট অর্থ বদলাইয়া নির্দিষ্ট অর্থও আনিয়া দেয়। এতদ্ব্যতীত আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, "অনেক" পদ "টা বা খানি" যুক্ত হইলে বিশেষণ অর্থ ছাড়া অব্যয় বিশেষণ (বিশেষণের বিশেষণ) অর্থও দিতে পারে। অতএব উক্ত সংজ্ঞা ও বিভাগ স্বীকৃতি সঙ্গত।

"ইহ" পদের ন্যায় "অমুক" ও "কোন" পদ নির্দিষ্ট নির্দেশক বিশেষণ। "কোন" পদ ব্যক্তিবাচক শব্দের পূর্বে বসিলে উক্ত ব্যক্তিবাচক শব্দ সহ সংক্ষিপ্তরূপে "কেউ বা কেহ" রূপে বিকাশলাভ করে; যথা—কোন লোক বা ব্যক্তি বা স্ত্রীলোক বা মেয়ে—কেহ বা কেউ। "কোন" পদের দ্বিত্বরূপ বিভাগকারী বিশেষণ (Distributive Adjective) হয়। অনির্দিষ্ট নির্দেশক বিশেষণ বিভাগে "এ, ঐ, যে, এই, সে ও সেই" ছয়টিকে পাইতেছি। বহু বিশিষ্ট প্রয়োগে ইহাদের এরূপ বিশেষণ আচরণ সুস্পষ্ট। বাহুল্য ভয়ে তাহাদের উল্লেখ না করিয়া ব্যাকরণ সঙ্গত নিয়ম লক্ষ্য করিলে ধরা পড়ে যে, "যে" ও "সে" মূলতঃ তৎসম সর্বনাম হইলেও তাহাদের বিশেষণ প্রবৃত্তি

সন্দেহাতীত। "গুলি" বিভক্তি বা নির্দেশক যোগে ইহাদের বিশেষণ অবস্থার পরিবর্তন হইতে পারে বটে কিন্তু সে পরিবর্তনে মূল প্রাণী বা ব্যক্তিবাচক অর্থ ফিরিয়া আসে না। এখানেও নির্দেশকগুলির adjunct লক্ষণ সুনির্দিষ্ট, কেন না Otto Jespersen তাঁহার The Philosophy of Grammar গ্রন্থে—"The most important of these undoubtedly is the one composed of what may be called restrictive or qualifying adjuncts (Page 108)" যাহা বলিয়াছেন তাহা সুপ্রকট। "স্ব, পূর্ব, উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম" শব্দও নিজস্ব নির্দেশক বিশেষণ। ইহাদের প্রথম চারিটি তৎসম সর্বনাম হইতে উৎপন্ন এবং "পশ্চিম" শব্দের ন্যায় "স্ব"-ভিন্ন তিনটি, বায়ু, দিক, দেশ ও কালবাচক শব্দেরই বিশেষণ হয়। "দক্ষিণ" শব্দের স্বতন্ত্র বিশেষণ রূপেও ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়, তখন ইহা গুণবাচক বিশেষণ (adjective of quality) মাত্র। "বিত্ত" অর্থে "স্ব" শব্দ বিশেষ্য কিন্তু দ্বিত্ব হইলে ইহা বিভাগকারী বিশেষণ (Distributive adjective) হইয়া যায়। "ইতর" ও "অবর" তৎসম সর্বনামদ্বয় নিত্য গুণবাচক বিশেষণ এবং তাহাদের বিশেষণ প্রবৃত্তি দুর্নিবার; যথা—অবর জেলা-পরিদর্শক, ইতর প্রাণী ইত্যাদি। তৎসম সর্বনামের এইরূপ বিভিন্ন শ্রেণী আশ্রয় লক্ষ্য করিয়া বাংলায় "সর্বনামীয় বিশেষণ" বিভাগ স্বীকারের কোনও যৌক্তিকতা নাই।

নঞ তৎপুরুষ সমাস নিষ্পন্ন "অপর" শব্দ সংস্কৃত মতে সর্বনাম হইলেও বাংলায় বিভাগকারী বিশেষণ। এ-প্রত্যয়ান্ত হইয়া ইহা সর্বনাম অবস্থা ফিরিয়া পাইতে পারে বটে নচেৎ "স্ব, পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ" পদের ন্যায় ইহাতে বিশেষণ প্রবৃত্তি অটুট থাকে। "প্রতি" এই উপসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয়ের বাংলা ব্যবহার "প্রত্যেকে"ও "অন্যান্য" পদের ন্যায় এই শ্রেণীর বিশেষণরূপে ব্যবহারে লক্ষণীয়। "টা" প্রভৃতি নির্দেশক যোগে বা "এক" শব্দের সহিত সমাসবদ্ধ অবস্থায় "প্রতি" পদ যে বিশেষণের অর্থ দেয় তাহা পাণিনি সূত্র—লক্ষণেত্থং ভূতাখ্যানভাগ বীপ্সাসু প্রতিপর্যনবঃ (১।৪।৯০)"—সিদ্ধান্তাগার্থ দ্বারা সূচিত হয় এবং "টা" নির্দেশকের এই "এক"-পদ সমমর্যাদা দ্বারা পূর্ব সিদ্ধান্তদ্বয় বিরোধশূন্য ও অভ্রান্ত।

সমগ্র বিশেষণের ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে বাংলা ভাষার কয়েকটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। আরোপ্য (attributive) ও বিধেয় (predicative) এই দুই ব্যবহারে আমরা দেখিতে পাই যে, "ঠাণ্ডা, ভাল, সুস্থ" প্রভৃতি পদ কখনও কখনও ক্রিয়ার পরিপূরক (Complement) রূপে কাজ করে; যথা—জবাকুসুম তেল মাথা ঠাণ্ডা রাখে, সে দিনের তিথিটা ভাল ছিল, আজ আমার শরীর সুস্থ নাই। কিন্তু উল্লিখিত বৈচিত্র্য ছাড়া অন্য যাহা বাংলার নিজস্ব তাহা এই যে—"আমার ছেঁড়া কাপড় আছে" এবং "আমার কাপড় ছেঁড়া আছে" বাক্যদ্বয়ের অর্থ পার্থক্য বিশেষ লক্ষণীয়।

আমরা নির্দেশকযুক্ত "অনেক" পদের বিশেষণের বিশেষণ রূপে ব্যবহার লক্ষ্য করিয়াছি। উল্লিখিত "ভাল" প্রভৃতি গুণবাচক বিশেষণেরও ক্রিয়া বিশেষণ প্রয়োগ হয়। "ভাল, খারাপ" প্রভৃতি বিশেষণ পদ "গেল" ক্রিয়া সংযুক্ত বাক্যে এবং "মিষ্ট, সুন্দর" প্রভৃতি বিশেষণ "লাগে" ক্রিয়ারূপযুক্ত বাক্যে এই বিশেষণ স্বতন্ত্র প্রয়োগ পাইয়া পূর্বোক্ত পরিপূরক শক্তি অটুট রাখে; যথা—আজ দিনটা ভাল গেল না; এ সপ্তাহটা এ বাড়ীতে খুব খারাপ গেল; অতুলপ্রসাদের গান আমাকে সুন্দর লাগে; কাঁচা আম টক লাগে ইত্যাদি।

ব্যুৎপত্তি লক্ষণ হইতে দেখা যাইবে যে—"অদূর, ধীর, ঊর্দ্ধ, সরল, অবশেষ, বিজন, চরম, অবাধ, উচ্চ, অগ্র, পশ্চিম, সহজ, অচির, দূর, চকিত, পরোক্ষ, প্রকাশ্য, কঠোর, প্রথম, আসল, বিরল, নিঃশঙ্ক প্রভৃতি গুণবাচক বিশেষণও "সব" এই পরিমাণবাচক বিশেষণ এ-প্রত্যয়ান্ত হইয়া ক্রিয়া বিশেষণ হয় এবং বিধেয় ব্যবহার প্রাপ্ত হয় কিন্তু "খুব, সত্ত, অত্যন্ত, নিতান্ত, খালি (সর্বদা বা কেবল অর্থে)" প্রভৃতি পদ আরোপ্য ও বিধেয় উভয় ব্যবহারই পায় অর্থাৎ বিশেষণের বিশেষণ এবং ক্রিয়া বিশেষণ উভয় কাজ করিতে পারে। কাজেই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, বাংলায় ক্রিয়া বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ বা বিশেষণের বিশেষণ প্রভৃতির একশ্রেণীভুক্ত হইবার বিশেষ আবশ্যকতা আছে এবং তাহাদের আলোচনাও বিশেষণ পদ স্বতন্ত্র হওয়া প্রয়োজন। "তুমি ঠিক কথা বলিয়াছ" এবং "তুমি ঠিক বলিয়াছ" বাক্যদ্বয়ে "ঠিক" পদের আরোপ্য ও বিধেয় ব্যবহারে যথাক্রমে বিশেষণত্ব ও ক্রিয়া বিশেষণত্ব পার্থক্য বেশ সুস্পষ্ট। কাজেই আমাদের সিদ্ধান্ত নির্ভুল। "অনেকটা"ও "অনেকখানি" পদদ্বয়কে এইভাবে বিবেচনা করাও প্রয়োজন।

বিপ্লবীর জীবন-দর্শন

প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী

৪

যদিও চুড়াইন গ্রামের বাড়ীতে আমাদের পাকাবাড়ী ছিল এবং দোতলা করবার জন্য সমস্ত মালমসলা কেনা হয়েছিল; কিন্তু তবুও বাবা এবং কাকাদের ও গ্রাম তেমন পছন্দসই ছিল না। সেজন্য, প্রায়ই তাঁরা সে গ্রাম পরিত্যাগ করে অন্য কোন গ্রামে চলে যাওয়ার পরামর্শ করতেন। এমনকি মাদারীপুরের অন্তর্গত শেওলাপট্টি গ্রামে জায়গাজমি ও একটা তালুকও কেনা হয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত আর কোথাও যাওয়া হয় নি। অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তনের ফলে গ্রাম ছেড়ে শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা শহরে গিয়ে বাস করতে লাগল। প্রধানতঃ এ কারণেই আর আমাদের গ্রাম পরিবর্ত্তন করা হয় নি।

আমি যে সময়ের কথা বলছি তার আগে থেকেই পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সংঘাতে এসে এবং অন্যান্য কারণে আমাদের দেশেও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা আস্তে আস্তে কায়েম হতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে আমাদের সামন্ততান্ত্রিক গ্রাম্য-সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি তখন টলমলায়মান। কেবল-মাত্র চাষবাসের উপর নির্ভর করে আর গ্রাসাচ্ছাদন হয় না। জীবিকার জন্য লোক শহরমুখী হ'ল। এ বিষয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ই হ'ল অগ্রণী।

পিতামহের আমলে গ্রাম ছাড়ার কথা আমাদের পরিবারে কেহ কল্পনাও করে নি। কোন প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু আমার পিতা মাত্র ষোল বছর বয়সে পিতৃহারা হয়ে শহরে গেলেন ইংরেজী লেখাপড়া শিখে পরিবার প্রতি-পালনের জন্য অর্থোপার্জনক্ষম হতে। লেখাপড়া শিখে আমার কাকা গেলেন শহরে পাটের অফিসে চাকুরী করতে। পিসতুত ভাইরাও শহরে গেলেন লেখাপড়া শিখতে।

গ্রামে আমাদের যে জমিজমা এবং আম-কাঁঠালের বাগান ছিল তাতে গ্রাম্যজীবনের মোটাভাত মোটাকাপড় হয়ত জুটে যেত। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে জীবনযাত্রার প্রণালী তখন বদলাতে শুরু করেছে। এর ফলেই গ্রাম্যজীবন ভেঙে পড়তে আরম্ভ করলো। সুতরাং আমার পিতৃদেব ও পরিবারের অনেকের প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও গ্রামে থাকা ত হলই না, ক্রমে আকাঙ্ক্ষাও নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

লোক শহরমুখী হলেও তখন পর্য্যন্ত চাকরির মোহ সকলের মধ্যে তীব্র হয় নি। বরং অনিচ্ছাই ছিল। এখনকার দিনের অনেক আকাঙ্ক্ষিত চাকরিও তখন লোকে চাইত না। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল।

আমাদের গ্রামে শ্যামাচরণ ও চিরঞ্জীব দু' মামাত পিসতুত ভাই ছিলেন। তাঁরা সম্ভবতঃ আমার পিতৃদেবের চেয়ে বয়সে কিছু বড়। তখন তাঁদের পূর্ণ যৌবন। সুগঠিত দেহে স্বাস্থ্য টলটল করছে। একবার তাঁরা ঢাকা শহরে গিয়ে পাঁচ আইন ভঙ্গের দায়ে গ্রেপ্তার হন। পুলিস এঁদের নিয়ে গেল থানায়। কর্তৃপক্ষ যুবকদ্বয়ের সুগঠিত দেহের দিকে তাকিয়ে শাস্তি দেবার কথা ভুলে গিয়ে আদেশ করলেন—"এদের দারোগা বানিয়ে দাও।" ওঁদের ত এদিকে মুখ ম্লান হয়ে গেল। ভয়ে কাঁপতে লাগল। প্রথমেই চিরঞ্জীবকে দারোগা বেশে বিভূষিত করা হলো। সবাই যখন তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত তখন সুযোগ বুঝে শ্যামাচরণ প্রহরীর চোখে ধুলো দিয়ে সেই যে ছুটতে শুরু করলেন, ষোল মাইল দূরে বাড়ী পৌঁছবার আগে আর কোথাও থামেন নি। রাস্তায় বুড়ীগঙ্গা, ধলেশ্বরী, ইছামতি এই তিনটি নদীতে খেয়া পার হয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে বাড়ী পৌঁছেই চিরঞ্জীবের মাকে বললেন— "পিসীমা, সর্বনাশ হয়েছে, চিরঞ্জীবকে দারোগা বানিয়ে দিয়েছে। আমি কোনমতে পালিয়ে এসেছি।" বৃদ্ধ বয়সে শ্যামাচরণবাবুকে একজন্য আপশোষ করতে শুনেছি।

কি কথায় কি কথা এসে গেল। নিজের গ্রাম চুড়াইনে আজ বহু বছর যাইনে। কিন্তু মনে আছে আমার সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত প্রায় প্রতি বছরই একবার করে বাড়ী যেতাম। দেশ বিভাগের ফলে আজ তা বিদেশ হয়েছে। যেতে চাইলেও প্রয়োজন পাসপোর্ট-ভিসা ইত্যাদি নানা পরিচয় ও অনুমতিপত্র। 'দুই বিঘা' জমির আজ আমরা দরিদ্র প্রজা!

বাধা যতই থাক না কেন, অন্তরের ছবি কোনদিনই

ম্লান হবে না। মনে পড়ে আমাদের গ্রামের সেই ছোট্ট নদী ইছামতিকে। নৌকো করে ভেসে গ্রামের প্রান্তে এসে পৌঁছেছি। দূরে ঐ দেখা যায় পঞ্চবটি—বট ও অশথ আর সবার উপর মাথা তুলে যেন চারদিকে নজর দিয়ে পাহারা দিচ্ছে। নদীর কোলঘেঁষা ক্ষেতগুলি ধান পাট ও নানান শস্তে ভরপুর। গৃহস্থের মুখে ফুটে উঠেছে সম্পদের আনন্দ-আভা।

পঞ্চবটীর ঘাট বউঝিদের কলকোলাহলে মুখরিত। কারুর কাঁখে কলসী, কেউবা করছে অবগাহন স্নান। অপরিচিত পুরুষ দেখে ঈষৎ ঘোমটা টেনে অন্তদিকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। ঐ যে নৌকোখানা ঘাটে এসে ভিড়ল তা থেকে হাসিমুখে নেমে গেল মেয়ে—বাপের বাড়ী এলো। আবার তার পাশেই বাঁধা নৌকোতে উঠছে কোন মেয়ে—চোখের জল ফেলতে ফেলতে, শ্বশুরালয়ে যাওয়ার জন্ত। চাষী ছাতিফাটা রোদে কাজ করতে করতে কপালের ঘাম মুছছে। পঞ্চবটির শ্মশান ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। বটমূলে জলছে ধুনি। সন্ন্যাসী পাশে বসে গাঁজায় দম দিচ্ছে। সামনেই উপবিষ্ট সতৃষ্ণ নয়নে গ্রাম্যভক্তের দল। মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির সন্ন্যাসীও দেখেছি। চারিদিকে কত খাবার, কিন্তু সন্ন্যাসী তা থেকে কণিকামাত্র গ্রহণ করে আর সব বিলিয়ে দিচ্ছেন ভক্তদের।

আমবাগানের মধ্যদিয়ে এগিয়ে চলছি গ্রামের দিকে। সবাই জিজ্ঞেস করছে কুশল প্রশ্ন। বাড়ী পৌঁছে সর্ব-প্রথম ঠাকুরমাকে প্রণাম করে মাথায় ছোঁয়ালাম তাঁর পদধূলি।

গ্রামের অপরদিকে বিপুল মাঠ। সে মাঠেরই প্রায় শেষ প্রান্ত হতে আরম্ভ হয়েছে প্রসিদ্ধ আড়িয়ল বিল। পাশঘেঁষে চলেছে আঁকা-বাঁকা রাস্তা। গাছে গাছে পাখীর ডাক আজও যেন কর্ণে মধু বর্ষণ করছে।

ছেলেবেলায় দেখেছি আমাদের গ্রামে দরিদ্র বলতে বড় একটা কেউ ছিল না। অধিকাংশই ছিল সম্পন্ন গৃহস্থ। কেউ কেউ বা কলকাতায় গিয়ে ব্যবসা করে, উকিল-মোক্তার বা ডাক্তার হয়ে পয়সাকড়ি উপায় করছিল। এদের পরিবারের লোকেরা আস্তে আস্তে কৃষির উপর কম নির্ভরশীল হতে লাগল। অবশ্য সবই এক পুরুষের কথা। কোন কোন ভদ্র গৃহস্থ-ঘরের বিধবাদের দেখেছি টাকা সুদে খাটিয়ে দু'পয়সা উপায় করতে।

ভাত-কাপড়ের অভাব তেমন না থাকায় গ্রামখানা যেন আনন্দ কোলাহলে মুখরিত থাকত। আমাদের বাগানেই যে কত আম-কাঁঠাল হত তার অন্ত নেই। কোন বাড়ীতেই এ সব ফল, দুধ, দই, ক্ষীর, চিড়া, মুড়ির, অভাব ছিল না। কারুর খাওয়ার কোন নির্দিষ্ট বরাদ্দ থাকত না। যে যত পারত খেত। আজকালকার মত দু'চারটা আম কেটে বাড়ীর সবাই মিলে ভাগ করে খাওয়ার প্রশ্ন উঠত না। সব বিষয়েই যেন একটা সচ্ছলতার ভাব ছিল। গ্রামে গিয়ে দরিদ্র নিরন্ন মানুষের মুখ দেখেছি বলে আজ মনে করতে পারছি না।

আমাদের পিতৃদেব ওকালতি করে তখন বহু সহস্র টাকার মালিক হয়েছিলেন। আমার কাকাও পাটের অফিসে চাকরি করে বছরে বিশ সহস্রাধিক টাকা উপায় করতেন। কাজেই তখন আমাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালই ছিল। আমরা বাড়ী গেলে শুধু আমাদের বাড়ী নয় সমস্ত গ্রামেই যেন উৎসব সুরু হত। দেখেছি পৈতে, অন্নপ্রাশন এবং বিবাহাদি উৎসবের পর মাটিতে দুধ ও দই ঢেলে কাদা খেলা হত।

আমার কাকা এবং আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে অনেকে মন্ত পান করতেন। পয়সাওলা লোকের মধ্যে এ দোষ ছিল না এমন লোক তখন খুবই কম ছিল। গ্রামে অপেক্ষাকৃত দরিদ্রের মধ্যে গাঁজার প্রচলন ছিল।

গ্রীষ্ম কিংবা পুজোর ছুটিতে বাড়ী গেলে দেখেছি বাহিরের প্রাঙ্গণে চলত মদ খাওয়া, তাস, পাশা বা দাবা খেলা অথবা থিয়েটার। অবশ্য ঠাকুরমাদের জন্ত মাঝে মাঝে ব্যবস্থা করতে হত রামায়ণ, মহাভারত, কথকতা বা চণ্ডীপাঠ।

বাহির প্রাঙ্গণে যতই মদ চলুক না কেন ভেতর-বাড়ীতে তা প্রবেশের সাধ্য থাকত না, কিংবা মত্ত অবস্থায় কেহ ভেতরে আসতে পারত না। মেয়েদের শালীনতা, শুচিতা এবং সম্মান রক্ষার দিকে বাড়ীর কর্তাদের প্রখর দৃষ্টি থাকত। ছোট বড় এক সঙ্গে বসে মদ খেলেও ছোটরা বড়র সামনে খানিকটা নলচে আড়াল করে তামাক খাওয়ার মত একটা সম্ভ্রম রক্ষা করে চলত।

আমার পিতৃদেব ৺মহিমচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, কিন্তু ছিলেন একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। তিনি যে শুধু কখনই মন্ত পান করেন নি তা নয়, কখনও কোনরূপ নেশার বশীভূত হন নি। এক কথায় বলতে গেলে তিনি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সাধু প্রকৃতির মানুষ। এজন্ত তিনি ছিলেন সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি বাড়ী থাকলে মন্ত-পানাদি কিছুই হতে পারত না।

তখন পর্যন্ত আমাদের গ্রামে কোন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল না। একটি পাঠশালা ছিল মাত্র। সরকারী ডাক্তারখানা তখনও স্থাপিত হয় নি। শুধু কবিরাজী

চিকিৎসা চলত। পোষ্ট-অফিস তখন সবে মাত্র স্থাপিত হয়েছে।

আমার কাকিমা, পিসিমারা কেউ লিখতে বা পড়তে পারতেন না। আমার মা বিয়ের পর বাংলা লেখাপড়া শিখেছিলেন। গ্রামে তখন মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা তেমন ছিলই না। আমার আপন বোনেরা শহরে থাকত বলে লেখাপড়া শিখেছিল। অবশ্য পরে আমার খুড়তুত পিসতুত বোনেরাও নিজেদের চেষ্টায় বাংলা লেখা-পড়া ভাল করেই শিখেছিলেন। মেয়েরা বেশী লেখাপড়া শেখে এটা আমার ঠাকুরমা পছন্দ করতেন না। খুড়তুত বোনেরা নাটক নভেল নিয়ে পড়তে বসলে ঠাকুরমা খুব রাগ করতেন। রেগে বলতেন, "হ্যাঁ, যেন এরা এখন লেখাপড়া শিখে জজ ম্যাজিষ্ট্রেট হবেন, বিদেশে চাকরি করতে যাবেন! রামায়ণ মহাভারত পড়, হিসাবপত্র রাখ, দলিল-দস্তাবেদ পড়তে শেখ; তা নয়, ঘরের কাজ-কর্ম ফেলে নভেল নাটক মুখে গুঁজে বসে আছেন!"

কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত তিনি শুনতেন খুব খুশী ও পবিত্র মনে। তখনকার দিনে, বোধ হয় আজকালও, শাস্ত্রগ্রন্থ লোকে শুধু জ্ঞানার্জনের জন্যই পড়ত না; পড়লে, শ্রবণ করলে, এমন কি ঘরে রাখলেও পুণ্য হয়, এই ছিল তাদের বিশ্বাস।

অর্থোপার্জন ক্ষমতা লাভ করা লেখাপড়া শেখবার একটা মুখ্য কারণ। সেকালে লোকের আর্থিক অবস্থা এতটা খারাপ হয় নি যাতে করে মেয়েদের টাকা রোজগার করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিত। একান্নবর্তী পরিবার থাকার ফলে পুরুষদের মধ্যেই অনেকের অর্থোপার্জন প্রয়োজন হত না। অর্থনৈতিক কারণেই সেদিন স্ত্রী-শিক্ষার তেমন প্রচলন হয় নি। কিন্তু আজকাল অবস্থা একেবারে পাল্টে গিয়েছে। যে কারণে সেদিন মেয়েদের বাইরে আসার সামাজিক সমর্থন থাকত না, সেই আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য দূর হয়ে যাওয়ার ফলে, জীবনযাত্রার ব্যয় বহুগুণে বর্দ্ধিত হওয়ার ফলে এখন আর পুরুষদের রোজগারে সকল অভাব মেটে না। মেয়েদের সহ-যোগিতা চাই পুরোপুরি। এ অবস্থায় পর্দা প্রথা যে বিদূরিত হবে তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার কি আছে!

৫

আগেই বলেছি আমার পিতৃকুল ছিল নৈকষ্য কুলীন এবং মাতৃকুল ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত মেহারের সিদ্ধপুরুষ সর্বানন্দ ঠাকুরের বংশ। এঁরা ছিলেন শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ এবং গুরুবংশ। বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের এঁরা ছিলেন কুলগুরু। মত ও পথে তারা তান্ত্রিক শাক্ত ব্রাহ্মণ। এদের কথা পরে বিস্তারিত আলোচনা করব।

আমার পিতৃদেব ছিলেন মত, পথ, বিশ্বাস ও আচরণে ব্রাহ্ম, একেশ্বরবাদী, অস্পৃশ্যতাবিরোধী। এক কথায় সর্বপ্রকার সামাজিক কুসংস্কার বর্জিত। খুব ছোটবেলা থেকেই পিতৃদেব আমাকে ব্রাহ্ম-সমাজে নিয়মিত নিয়ে যেতেন। ব্যক্তিগত চরিত্রে, আচার-ব্যবহারে যাতে আমার মন শুদ্ধাচারী এবং সর্বপ্রকার কুসংস্কারবিরোধী হয়ে গড়ে ওঠে সেই চেষ্টাই সব সময় করতেন।

পিতৃদেব ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার উকিল। সেখানে তিনি ছিলেন সর্বজনমান্য। শুধু বড় উকিল বলে নয়, কিংবা কেবল জ্ঞান ও বিদ্যা-বুদ্ধির জন্যও নয়। সাধুতায়, সততায় তিনি ছিলেন সে যুগের ব্যতিক্রম। হাজার হাজার টাকা উপায় করেও যে লোক সে যুগে মদ খায় না, বা পতিতালয় যায় না, তার প্রতি স্বতই মাথা শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে আসে। যে অর্থ তিনি উপায় করতেন তা শুধু আমাদের জন্যই ব্যয় বা সঞ্চয় করেন নি। অনেক আত্মীয়স্বজনও প্রতিপালন করেছেন। তথাপি মৃত্যুকালে তিনি তার পুত্রদের অঋণী এবং লক্ষ টাকার মালিক রেখে গিয়েছেন।

আমাদের একান্নবর্তী পরিবারে পিতাই ছিলেন শীর্ষ-স্থানীয়। তাঁর চার বোন এবং তাঁদের পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনীদের সহ সকলের প্রতিপালনই তাকে করতে হ'ত। এমনকি পিসীমাদের সতীন কন্যাদের ভরণপোষণ এবং বিয়ে দেওয়ার দায়ও পিতৃদেবের উপরেই ছিল। আমার দু'কাকা মেলাই রোজগার করতেন; কিন্তু, তথাপি পিতাই তাঁদের পরিবার প্রতিপালন করতেন। এঁরা ছাড়াও বহুলোক···আমার পিতৃদেবের রীতিমত সাহায্য পেত। আর একটা বিশেষ গুণ দেখেছি যে, তিনি তাঁর পুত্র-কন্যা এবং অন্যান্য আশ্রিত-প্রতিপালিতের মধ্যে কোন তারতম্যই করতেন না। খাওয়া-দাওয়া, কাপড়-জুতো সকলের জন্যই সমান মূল্যের বরাদ্দ ছিল।

আমি ছিলাম পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। সুতরাং সকলের মতে আমিই এই বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের ভবিষ্যৎ ভরসাস্থল। লেখাপড়া শিখে বড় হয়ে আমিই হব এই বৃহৎ পরিবারের কাণ্ডারী। এমনকি বাড়ীর পুরণো চাকর-বাকররা ভাবত, তারা যখন বুড়ো হয়ে অক্ষম হয়ে পড়বে তখন তাদের ভারও আমিই বহন করব। কিন্তু বিধাতা তাদের সে ইচ্ছা পূর্ণ করেন নি! আমি যে অল্প বয়সেই দেশের জন্য সর্বত্যাগী হওয়ার সঙ্কল্প গ্রহণ করে অনুশীলন সমিতির হয়ে সর্বহারাদের দলে যোগ দিয়েছি

এবং সমস্ত পরিবারকে নিঃস্ব অবস্থার দিকে টেনে নিয়ে আসছি এ কথা কেউ ভাবতেও পারে নি। আমার চোখে ভারতের অগণিত বুভুক্ষু, নির্যাতিত এবং শোষিত পরিবারের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিবার এক হয়ে গিয়েছিল। শুধু আমার নিজের কেন আরও শত সহস্র পরিবারের ধ্বংস হয়েও যদি ভারতমাতার শৃঙ্খল মুক্ত হয় তাকেও কাম্য বলে মেনে নিয়েছিলাম। সকলের মুক্তির মধ্যেই যে অংশের মঙ্গল এ যুক্তিই জেনেছিলাম অকাট্য বলে। এত সব কথা আত্মীয়-পরিজনরা বুঝতেন না বা কোনই সান্ত্বনা দিতে পারতেন না।

তা হলেও এইসব আত্মীয়-পরিজন ও আশ্রিতদের কথা মনে হলে বুকটা ব্যথায় টনটন করে উঠত—এঁদের দৈন্যদশা দেখে। কখনও মনে হয়েছে কর্তব্যের বুঝি ত্রুটি হ'ল। পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁদের আশা পূর্ণ করার অক্ষমতায় এঁদের কাছে এবং নিজের কাছেও অপরাধী বলে মনে করেছি। এ হয়ত আমার ভাবরসের কথা। অথবা যে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক পিতৃ-প্রধান সমাজ আমার অন্তরের অন্তস্থলে অতি গোপনে লুকিয়ে আছে এই ভাবরস তারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। বিশদ বিশ্লেষণ করলে এই দাঁড়ায়—

আমি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। সুতরাং তাঁর অবর্তমানে আমিই পরিবারের কর্তা। আমিই করব সমগ্র পরিবার ও গোষ্ঠি প্রতিপালন ও রক্ষা। আমার কথা সকলের ওপরে; এবং সকলেই কৃতজ্ঞ থাকবে আমার কাছে। ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃকপাত না করে আত্মীয়-স্বজন ও পরিবার রক্ষণাবেক্ষণ করে কর্তব্য পালন করব। গ্রামের পুরোহিত, ধোপা, নাপিত, ভুঁইমালি, গ্রাম্য-দরিদ্র সকলেই আসবে আমার কাছে প্রার্থী হিসেবে, আর আমি সবাইকে করব মুক্তহস্তে দান। সবাই ধন্য ধন্য করবে। এই হচ্ছে গিয়ে পিতৃপ্রধান সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মূল কথা। এই ভাবাবেগই হয়ত আমার অবচেতন মনে সুপ্ত হয়েছিল এবং আত্মীয়-পরিজনের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করতো।

দীক্ষিত না হলেও পিতৃদেব মতে ছিলেন ব্রাহ্ম। কিন্তু কুলগুরুর মর্যাদা রক্ষা এবং বার্ষিক প্রণামীদানে কখনও ত্রুটি করেন নি। বহু ঘটক এবং সংস্কৃত টোলের পণ্ডিতও এসে বাৎসরিক বৃত্তি নিয়ে যেতেন। আমি কিন্তু আর কুল-গুরুর খবরও রাখি নি কিংবা ঘটকরাও আর পদার্পণ করেন নি।

যদিও আমার মাতাঠাকুরাণী নিজে আমার সর্বপ্রকারে বিপ্লববাদী কার্যে উৎসাহ দিতেন এবং তিনি নিজে বিপ্লবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, তবুও দু'এক সময় আমার কথা উল্লেখ করে দুঃখ করতেন এই বলে যে, আমি এমন একটা জীবনযাপন করছি যার ফলে বংশের গৌরব ও মর্যাদা রক্ষার কর্তব্য আমার দ্বারা সম্ভব হ'ল না। আমারও অবচেতন মনে এই পিতৃপ্রধান সমাজের খেদ লুকিয়ে আছে বলেই মাঝে মাঝে ব্যথিত হই।

৬

আগেই বলেছি যে, আমি জন্মেছি মামাবাড়ীতে। চালিতাতলী গ্রাম চাঁদপুর শহর থেকে বোধ হয় পাঁচ কি ছ'মাইল দূরে। আমরা চাঁদপুর থেকে ষ্টীমারে চেপে তার পরের ষ্টেশন নরসিংহপুরে নেমে হেঁটে কিংবা নৌকোয় মামাবাড়ী যেতাম। নরসিংহপুর অবশ্য নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। পরে ষ্টেশন হলো ইব্রাহিমপুরে। তাও হয়ত আজ পদ্মার স্রোতের ধারে লুপ্ত হয়ে গেছে!

চাঁদপুর থেকে অবশ্য নৌকোতেও যাওয়া যেত। তবে প্রকাণ্ড নদীতে নৌকো সবসময় নিরাপদ নয় বলে আমরা ষ্টীমারেই যেতাম। চাঁদপুর ও ইব্রাহিমপুরের মধ্যে পদ্মা মেঘনার মিলিত স্রোতে সীমারেখাহীন বিস্তীর্ণ জলরাশি ভীষণ কায়া ধারণ করেছে। এই বিশালতা আমার মনকে চিরকাল আনন্দে ভরপুর করে রাখত। সেই ছবি আমি জীবনেও ভুলতে পারব না।

এ পথে অনেকবারই গিয়েছি, কিন্তু শেষ যেবার যাই সেবার একটা ছোট একমাল্লা নৌকোয় চাঁদপুর থেকে ইব্রাহিমপুর পর্যন্ত গিয়েছিলাম। ডিঙি যখন বেশ খানিকটা পথ অতিক্রম করে এসেছে সূর্য তখন পশ্চিমে জলরাশির মধ্যে ডুব দেবার আয়োজন করছেন। তাঁরই অস্তরাগে পারকূলহীন বিরাট নদীর চারদিক রঞ্জিত। নদীর জলে কে যেন খুনখারাপি রং গুলে দিয়েছে। ডিঙিটি ক্ষুদ্র। কাণ্ডারী এক কিশোর। আকাশে সোনালী মেঘ, পারে সুপারির সারি, নৌকোর পাটাতনের এক ইঞ্চি নীচেই অতল জল। সব মিলে এমন একটা রোমাঞ্চকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল যে, সেদিন সে মুহূর্তে যদি নৌকোর কাঠ কেটে গিয়ে অতল তলে ডুবে যেতাম তবুও বুঝি স্বর্গ-লাভের আনন্দেই নদীর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তাম।

শুধু সেদিন কেন, চিরকালই পদ্মা-মেঘনার বিস্তৃত কায়া আমার মনকে মোহিত করে। বিরাট ও বিস্তারের রূপ আমাকে চিরকাল অভিভূত করে তোলে। পূর্ববঙ্গ নদীমাতৃক। সেই পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে আমি আশৈশব প্রকাণ্ড নদীর স্বপ্ন দেখেছি। আনন্দে বিহ্বল হয়ে যেন ভেসে চলেছি সেই অকূল-অতল তরঙ্গায়িত বানের উপর দিয়ে। আজও রোমাঞ্চ জাগায় পদ্মা-

মেঘনার ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রূপ! চারদিকে ঝড়-ঝঞ্ঝার তাণ্ডব-লীলা। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে নদীর বুকে। চাঁদপুর-গোয়ালন্দ যাতায়াতে কয়েক-বারই এমনি পরিবেশের মধ্যে সীমাহীন আনন্দে সময়টুকু কাটিয়েছি। পথে যদি ঝড়ই না বইত, রাত্রির সূচীভেদ্য অন্ধকারে প্রবল বাতাস ও সুউচ্চ ঢেউ-এর আঘাতে ষ্টীমার টলমল্ করে না উঠত, তবে যেন নিষ্ফল যাত্রার নৈরাশ্য মনকে সঙ্কুচিত করত!

যে নদী মরে-হেজে যাচ্ছে তা দেখলে আমার মন ব্যথিত হয়ে ওঠে। কিন্তু যে নদী ক্ষুরধার স্রোতে গ্রামের পর গ্রাম গ্রাস করে এগিয়ে চলেছে সে অগ্রগতি দেখলে মন পুলকে রোমাঞ্চিত হয়। তাইত আমাদের গ্রামের পাশ দিয়ে বিশীর্ণ ইছামতির উপর দিয়ে ভেসে যেতে যেতে মন বিষাদে ভরে যেত। মনে হ'ত ইছামতি কেন তার দু'পার ভেঙ্গেচুরে নিজের কলেবর বাড়িয়ে তোলে না। আর যখন আমার পিসীমার বাড়ীর কাছে অর্থাৎ রাজাবাড়ী-বাহেরকের পাশে পদ্মার ধ্বংসলীলা দেখতাম তখন মন বিভোর হয়ে উঠত।

মামাবাড়ী গেলে প্রায়ই নরসিংহপুর ষ্টেশনে এসে নদীর ভাঙ্গনকূলে বসে মেঘনার সীমারেখাহীন রূপ দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যেতাম। আমার মনে আছে, নোয়াখালী গেলে মেঘনার চেয়েও বড় নদীর দিকে তাকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতাম।

ভাঙ্গনকূলে নদী খরস্রোতা। মিনিটে মিনিটে পাড় নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে লুপ্ত হয়ে যায়। প্রথমে অনেকটা জায়গা জুড়ে চির খেত। আমরা তক্ষুণি সে জায়গা ছেড়ে দূরে গিয়ে বসতাম। একটু পরেই সেই ভূখণ্ডটুকু পাক-খাওয়া জলে ডুব দিত। বিশাল বিশাল বট অশথ যখন ভীষণ শব্দ করে পাক খেতে খেতে নদী-গর্ভে বিলীন হয়ে যেত তখন বিস্ময়ে পুলকে দেহমন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত।

এমনি মনোভাব ও স্বপ্নাকুল মানুষের মনোবিশ্লেষণ ফ্রয়েডপন্থীরা কি করবেন জানি না। কিন্তু আমি যে আজও এমনি স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়ি তা অকপটে স্বীকার করছি।

৭

শৈশবে প্রতিবছরই মামাবাড়ী যেতাম পূজোর ছুটিতে। অবশ্য বড় হয়ে আর প্রতিবছর যেতে পারি নি। তবে জেলের বাইরে থাকলে সময়-সুযোগ হলে ঐ পূজোর সময় মামাবাড়ী না গিয়ে থাকতে পারতাম না। কুলীনদের মামাবাড়ীর প্রতি যে স্বাভাবিক-আকর্ষণ আছে সে টানেই বোধ হয় ছুটে যেতাম। এ ব্যাপারে আমি আমার পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছি মাত্র। তিনিও যেতেন তার মামাবাড়ী মাদারীপুর অন্তর্গত সেণ্ডলাপট্টি গ্রামে। এবং এ কারণেই মামাদের একটু বিস্তৃত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক মনে করছি না।

আমার মামারা গুরুবংশ বলে খ্যাত এবং বহু উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুর তাঁরা কুলগুরু। কুলীনে কন্যাদান খুব সম্মানের কাজ বলেই তাঁরা স্মরণাতীত কাল থেকে কুলীন জামাই ঘরে আনতেন। ঐ এলাকায় মামারা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরূপে সম্মানিত হ'ত। সামাজিক নিমন্ত্রণে অন্যান্য ব্রাহ্মণ অপেক্ষা তাঁরা পৃথক ও শ্রেষ্ঠ আসন পেতেন। এ আমার ছোটবেলায় দেখা। কেন তা বলছি:

সর্বানন্দ ঠাকুর ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত মেহারের প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। আমার মামারা তাঁরই বংশোদ্ভব। সর্বানন্দ ঠাকুর মহাবিদ্যা মা কালির দশরূপ সাধনাতেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলে তাঁর বংশ সর্ববিদ্যা বংশ নামে খ্যাত। এবং এই কারণেই তারা সমস্ত পূর্ববঙ্গে সম্মানিত।

যতদূর জানা যায়, তেইশ কি চব্বিশ পুরুষ পূর্বে মেহারের জঙ্গলে সর্বানন্দ ঠাকুর তার পরিচারক পূর্ণর মৃতদেহের উপর বসে ঘোর অমাবস্যা রজনীতে শব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তিনি নাকি তখন এমন অলৌকিক শক্তির অধিকার লাভ করেছিলেন যে, অমাবস্যা তিথিতেও আকাশে পূর্ণ চন্দ্রোদয় হয়েছিল। কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলাম্বিকা—এই দশ রূপেই নাকি মহাকালী সর্বানন্দ ঠাকুরের নিকট আবির্ভূত হয়েছিলেন। এ সবই তন্ত্রোক্ত দেবতা এবং সকল প্রকাশই ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যমণ্ডিত। কারুর গলায় মুণ্ডমালা রক্তাক্ত তরবারি হস্তে অসুর নিধন করছেন; কেহবা ষড়ৈশ্বর্যশালিনী মূর্তিতে এক হস্তে তরবারি ধারণ করে অপর হস্তে অসুরের জিহ্বা আকর্ষণরতা; আবার ভীষণ-দর্শনা ধূমাবতী কুলার বাতাসে প্রলয় ঝঞ্ঝার সৃষ্টি করছেন; স্বহস্তে নিজমুণ্ড ধারণ করে ছিন্নমস্তা রুধির পানে রতা। ছেলেবেলায় মাতুলালয়ে এই সব ভীষণ-দর্শন দেবতাদের অসুর ধ্বংসের কাহিনী শুনতে শুনতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত। আর সেই সঙ্গে সর্ববিদ্যা-বংশের শ্রেষ্ঠত্ব ও অলৌকিক শক্তির গৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতাম।

ছেলেবেলায় একবার মামাবাড়ী থেকে নৌকোযোগে মেহারের কালীবাড়ী গিয়েছিলাম। সেই দেবস্থানে কোন

মন্দির দেখি নি কিংবা কোন মূর্তিও ছিল না। কেবল কয়েকটা বহু প্রাচীন বট গাছ আজও দাঁড়িয়ে আছে যেন সর্বানন্দ ঠাকুরের আমলের সাক্ষ্য দান করতে। সেই সব বটগাছের চারদিকে ঘট বসিয়ে লোক পুজো করছে। শুনলাম, দেখলামও বটে, সেখানে অস্পৃশ্যতাও নেই কিংবা কোন কিছু ঘৃণ্যও নহে। স্পৃশ্য অস্পৃশ্য সকলেই অবাধ চলাফেরা করছে। অচ্ছুতরা পুজোর ঘট ছুঁলেও কেউ আপত্তি করছে না। এমনকি বটগাছের উপর থেকে অসংখ্য চিল-শকুনির বিষ্ঠা নৈবেদ্যতে পড়লেও কেহ অশুচি কিংবা দোষের মনে করত না।

পাঁঠাবলি হ'ত সেখানে প্রতিদিনই; কিন্তু কালি-পুজো কিংবা কোন পর্ব উপলক্ষে বলি হতো হাজার হাজার। সর্বানন্দ ঠাকুর যখন সাধনা করেছিলেন তখন এই জায়গাটা ছিল ঘোর জঙ্গলাকীর্ণ মহা-শ্মশান। তৎকালে নাকি এখানে নরবলিও হ'ত।

আমি যেদিন সেখানে গিয়েছিলাম সেদিন ছিল অমাবস্যা। দেখলাম সর্ববিদ্যাবংশের ব্রাহ্মণরা ঘুরে বেড়াচ্ছে—পরিধানে রক্তবস্ত্র, গলায় রুদ্রাক্ষমালা, কপাল রক্ত-তিলকে রঞ্জিত। কারুর কারুর গলায় নর-অস্থির মাল্য শোভা পাচ্ছে। কারণ বারি (সুরা) পানের জন্য দেখলাম মাথার খুলি। বটাচ্ছাদিত অমাবস্যা রজনীর সেই নিরন্ধ্র অন্ধকারে তীর্থযাত্রীরা ভয়, ভক্তি ও বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়ত। স্তিমিত মাটির প্রদীপগুলি অন্ধকারকে যেন আরও রহস্যাবৃত করে তুলত। সাধারণ তীর্থস্থানের মত সেখানে কোন কলকোলাহল ছিল না। সবাই নীরবে অবস্থান করত। প্রয়োজন হলে মৃদুস্বরে আলাপ করত। কেবল মাঝে মাঝে তান্ত্রিকদের উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ, সুরাপানোন্মত্ত সর্ববিদ্যাসন্তানদের হুঙ্কার ও অট্টহাস্য রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করত। দিনের বেলাতেও দেখেছি এমনি পরিবেশের মধ্যে তীর্থযাত্রীদের গা ছম্ ছম্ করত।

আমাদের সঙ্গে ছিলেন বড়মামা ৺অপর্ণানাথ ঠাকুর। তিনিই আমাদের পুজোর তত্ত্বাবধান করছিলেন। আমি যে বিপ্লবী অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করেছিলাম তা তিনি জানতেন। একটু অবসর পেয়ে একান্তে ডেকে তিনি আমায় বলেছিলেন, "এখানেই আমাদের পূর্বপুরুষ, তোরও মাতামহ বংশের প্রতিষ্ঠাতা সর্বানন্দ ঠাকুর সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। দশ-মহাবিদ্যার সাক্ষাৎলাভ করেছিলেন তিনি। জেনে রাখ, এই স্থানই বিশ্বের সমস্ত শক্তির উৎসস্থল। শুম্ভ-নিশুম্ভ, মহিষাসুর প্রভৃতি কত দৈত্যদানব ধ্বংস করেছিলেন এই মহাকালী। তোদের ইংরেজদের যতই গোলাগুলি থাকুক না কেন তা সবই এ শক্তির নিকট অতি তুচ্ছ তৃণসমান। ম্লেচ্ছ ইংরেজ শক্তির বিনাশ করতে হলে চাই এই মহাশক্তির বর।" বড়মামার কথা শুনতে শুনতে আমার মন বিস্ময়ে ও আনন্দে পরিপ্লুত হয়ে গেল। মনে মনে দশমহাবিদ্যার নাম জপ করে তন্ময় হয়ে প্রণাম জানালাম—

"ওঁ সর্বমঙ্গল মাঙ্গল্যে শিবে-সর্বার্থ-সাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে"

সেই দিন সেই তিথির রাত্রির রোমাঞ্চকর অবস্থায় দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করেছিলাম—"ম্লেচ্ছের কবল থেকে মাতৃভূমি মুক্ত হোক! সেই পুণ্য কার্যে আমায় শক্তি দাও মা মহাকালী!" এই কয়টি কথায় আমাকে চিরদিন মনোবল জোগাতে সহায় হয়েছে। কোন দেবদেবীর মন্দিরে—বিশেষ করে কালিমন্দিরে গেলে দেশের মুক্তি কামনায় নিজের শক্তি-প্রার্থনা এক রকম অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

সমগ্র ভারতবর্ষেই—বিশেষ করে বাংলা দেশে হিন্দু-দের উপর তন্ত্রের প্রভাব খুব বেশী। এরা শক্তির উপাসক। তন্ত্রের অনুশাসন অনুযায়ীই তারা জীবন অতিবাহিত করে। সুতরাং এদের জীবন তন্ত্রশাসিত বলা চলে।

তান্ত্রিকরা লিঙ্গ-পূজক। লিঙ্গ-পূজা (Phallic Worship) বোধ হয় প্রবর্তিত হয় জীবসৃষ্টি রহস্য মানুষের কাছে উদ্‌ঘাটিত হওয়ার পর থেকেই। তান্ত্রিকরা পুরুষের চেয়ে প্রকৃতিকেই বেশী আমল দেয়। প্রকৃতিই সৃষ্টি, স্থিতি, পালনকর্তা বলে এদের অধিকাংশ দেবতাই স্ত্রীরূপী। তাইত দেবাদিদেব মহাদেবও মা মহামায়ার পদতলে। তাইত এরা শুধুমাত্র শিবলিঙ্গের উপাসক নয়, স্ত্রীচিহ্নও এরা উপাসনা করে। এবং স্ত্রীচিহ্ন পূজার প্রচলনও এই কারণেই।

কিংবদন্তী অনুসারে শিব যখন সতীদেহ স্কন্ধে করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আলোড়িত করে তুলেছিলেন, তখন বিষ্ণু-চক্র দ্বারা সতীদেহ বাহান্ন খণ্ডে খণ্ডিত করেন। এবং যে যে স্থানে এর এক একটি অংশ পতিত হয়েছে সেই সেই স্থানই এক একটি সিদ্ধপিঠ বলে পরিগণিত হয়েছে। এই হলো বাহান্ন পিঠের উৎপত্তির পৌরাণিক কথা। এর মধ্যে আবার কামাখ্যা শ্রেষ্ঠ, কেননা সতীর স্ত্রীচিহ্ন এখানেই পতিত হয়েছিল।

স্ত্রীচিহ্ন পূজাকেই শ্রেষ্ঠ পূজা মনে করে বলেই তান্ত্রিকরা সমস্ত পূজাতেই ত্রিকোণ-চক্র অঙ্কিত করে। এই ত্রিকোণ-চক্রের উপরই দুর্গাপূজার ঘট স্থাপিত হয়।

এমনি চক্র খ্রীচিহ্নের প্রতীক ছাড়া আর কিছুই নহে। কতকগুলি আবার নর-নারীর মিলন চিহ্নস্বরূপ। তান্ত্রিক মুদ্রাগুলিও প্রায় এইরূপই।

জীবসৃষ্টি এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি-রহস্য মানুষকে চিরকাল বিস্মিতই করে নাই, নানা কল্পনায়ও উদ্বুদ্ধ করেছে। এই যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বীজ যা অণুবিক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না তা কি ভাবে এমন মানুষে পরিণত হয় সে রহস্য আজও মানুষের জ্ঞান, বিদ্যা-বুদ্ধি, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সমস্ত প্রতিভাকে পরাজিত করে আছে।

তান্ত্রিকরা নিজেদিগকে অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন মনে করে। আপন আপন সাধন-শক্তিতে এতখানি বিশ্বাসী যে, তারা বিশ্বসৃষ্টির কার্যকারণ সম্বন্ধ ইচ্ছা করলে ওলট-পালট করে দিতে পারে এমনি তাদের ধারণা। এই কারণেই দেখতাম মাতুলবংশের লোকেদের মধ্যে কি একটা শ্রেষ্ঠত্ববোধ বিরাজমান ছিল। তাঁরা যে শুধু ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ তাই নয়, তন্ত্র-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারলে ভগবানের সমতুল্য ক্ষমতাশালী হতে পারেন। তাইত অমাবস্যা রজনীতেও পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্ভব হয়েছিল। তাই তাদের কোন কুলগুরু ছিল না। তবে মন্ত্র যখন গ্রহণ করতে হ'ত তখন তারা পরিবারের মধ্যেই কারুর কাছ থেকে গ্রহণ করত।

তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও শক্তির কথা ছোটবেলায় অবাক হয়ে শুনতাম। বিশ্বাস ছিল যে, তাঁরা এই ম্লেচ্ছ-নিপীড়িত ভূমিতে মাত্র সাময়িক ভাবে পরাভূত হয়ে আছেন। কিন্তু তবুও তাঁরা সবার চাইতে উঁচুতে—এমনকি ঐ শ্বেতকায়দের চাইতেও। ধর্মবিরোধের ধ্বংস সাধন করে আবার তারা প্রভুত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবেন—অবশ্য সাধন-শক্তিতেই। আবার আসবেন সর্বানন্দ ঠাকুর, তাঁদের বংশেই; এবং তিনিই আবার তাঁদের পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনবেন। জানি না আজও তাদের বুকে এমনি ধারণা লুকিয়ে আছে কিনা!

সেকালের স্যার ভেলেনটাইন চিরল (Sir Valentine Chirol) ভারতবর্ষের বিপ্লবান্দোলন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, মহারাষ্ট্রের চিতপাবন ব্রাহ্মণরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী বলেই বৃটিশ প্রভুত্বের বিরোধী। চিরল সাহেবের মতে ভারতের বিপ্লব শুধু বৃটিশ-বিরোধী নয়, সমস্ত পাশ্চাত্ত্য সভ্যতারও। উচ্চ শ্রেণীর লোকই আপন অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়ে অপরের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় বিক্ষুব্ধ হয়। প্রমাণস্বরূপ তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, বিপ্লবীরা ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব। চিরল সাহেব বিপ্লব আন্দোলন তলিয়ে দেখেন নি। তিনি শুধু মাত্র একটি দিকই দেখেছিলেন। তিনি দেখেন নি বা লক্ষ্য করেন নি আন্দোলনের পেছনে একটা জাতির জাগরণ। বিপ্লবীদের আন্দোলনের মধ্য দিয়েই এই জাতীয় অভ্যুত্থান আত্মপ্রকাশ লাভ করেছিল। শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা মানুষকে পুনরাধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে, এটা একটা সমগ্র বিষয়ের অংশ মাত্র। শুধুমাত্র ব্রাহ্মণরাই নয়, সকল ভারতবাসীর মধ্যে অবশ্যই পূর্ব-গৌরববোধ জাগ্রত হয়েছিল। সক্রিয়ভাবে হয়ত সকলে বিপ্লবান্দোলনে যোগদান করে না, কিন্তু এমনি সংগ্রামে তারা থাকে সহানুভূতিশীল। যদি অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অনুকূল হ'ত তবে অনেকেই বিপ্লবান্দোলনে যোগদান করতেন। ক্রমশঃ

আনারকলি

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

কাবুলের ক্রীতদাসের কন্যা ওগো সুন্দরী আনারকলি!
তোমার বেদনাঘন প্রণয়ের স্মৃতির জ্বালায় মরি যে জলি'!
ভ্রমণ করিতে আকবর যবে দিল্লী হইতে কাবুলে যান,
তথাকার এক শাসকের কাছে উপহাররূপে তোমাকে পান।
পরমারূপসী কিশোরী তোমার আসল নামটি নাদিরাবেগ,
রূপের জন্য তোমার ভাগ্য-আকাশে ঘনালো কৃষ্ণমেঘ!
মধুর নৃত্যনিপুণতা-গুণে শারুন্নেসা লভিলে নাম;
'গরবিনী নারী' হয়েছিলে বটে, বিধাতা কিন্তু হলেন বাম!

২

বাদশাহ্ আকবরের হারেমে পরম আদরে করিতে বাস ;
নৃত্য এবং রূপের জলুসে বাদশাজাদার কী উল্লাস !
সেলিম সারাটি দিবস রজনী করিত তোমার রূপের ধ্যান।
তুমিও তাহাকে হেরিয়া সকলি হারায়ে ফেলিলে অভিজ্ঞান !
রবি-তটিনীর তীরে দুর্গের বাগানে উভয়ে মিলিয়া রাতে
দু'জনে দোঁহার প্রেমসম্ভোগ করেছ গোপনে মত্ততাতে।
ঈর্ষাকাতরা আরেক রমণী এই অভিসারে ক্ষুব্ধ মনে
মুখ্যমন্ত্রী আবুল্‌ফজলে দেখালো নিশীথে সঙ্গোপনে।

৩

বাদশাজাদাকে আবুল্‌ফজল ভাখেননি কভু প্রীতির চোখে,
গোপনে শাহান্‌শাকে জানান্ একদা তীব্র রাগের ঝোঁকে।
প্রেমসম্ভোগ চলে প্রত্যহ দুর্গের মাঝে আর্শিঘরে ;
সম্রাট যান তাঁহার সঙ্গে কোনো এক রাতে ঘৃণার ভরে।
মুখ্যমন্ত্রী দেখায়ে দিলেন আয়নাতে সবি শাহানশাকে ;
সেলিম আলিঙ্গনে আবদ্ধ, পড়িলে তুমি কী দুর্বিপাকে !
হয়ে শৃঙ্খলে আবদ্ধ তুমি বন্দিনী হ'লে বিজন ঘরে !
তোমা' তরে ক্ষমা যাচেন রাজ্ঞী রাজসভা শেষ হবার পরে।

৪

সম্রাট কভু টলেন নি তা'তে, ক্ষমা চাওয়া বৃথা বারংবার !
জ্যান্ত কবর দেওয়ার হুকুম বহাল রহিল চমৎকার !
শিকলাবদ্ধ তন চৌদিকে দেওয়াল গাঁথার আদেশ হয় ;
গহন অন্ধকারের ভিতরে তিলে তিলে হোলো জীবন লয় !
পুত্রের দোষ ধরেননি পিতা, দোষ হোলো শুধু নর্তকীর !
প্রেমের মূল্য কিছুই কি নাই বিত্তবিহীনা দুর্ভাগীর ?
রবি-তটিনীর বাম তটে স্মৃতিমন্দির গড়ি' জাহাঙ্গীর
তোমারে লাহোরে স্মরণীয় করে' আজো ফেলিতেছে অশ্রুনীর !

৫

কোথা আজি সেই মোগলরাজ্য, কোথা আকবর প্রতাপশালী !
তোমাকে বধিয়া আকবর তাঁর সুযশে মাখায়ে দেছেন কালি !
মোগলের আর নাহি রাজপাট, আছে উজ্জ্বল তোমার স্মৃতি ;
শহীদ্ হয়েছ, বেহেস্তে আছ, গাহিছে নকীব কবিরা গীতি।
পৃথিবীর যত প্রেমিক-প্রেমিকা তোমাকে যখনি স্মরণ করে,
হৃদয়ে তাদের জাগে হাহাকার, আকুল আবেগে অশ্রু ঝরে !
আমি বাঙ্লার অভাজন কবি দু-ফোঁটা অশ্রু গেলাম রাখি' !
তৃষার্ত প্রাণে তৃপ্তি লভিও, আর সব কথা থাকুক বাকি !

মাদ্রাজ প্রবাসী বাঙালী শিল্পী চুণী বিশ্বাস

শ্রীরাধিকা রায়চৌধুরী

ব্যস্ত কর্মীদের মধ্য থেকে শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ সর্ব্বাগ্রে যার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, তিনি হচ্ছেন চুণী বিশ্বাস। মাদ্রাজী কর্মীদের সঙ্গে, মাথা নেড়ে অনর্গল তামিল ভাষায় কথা বলে কাজ করে যাচ্ছেন। তখন পাটনায় শহীদ স্মারকের মূর্ত্তিগুলি বসান হচ্ছে। কালো হাল্কা চেহারা বিবর্ণ পোষাক এবং সর্ব্বোপরি তামিল বয়ান শুনে মাদ্রাজী বলেই প্রথম মনে হয়েছিল। চুণীবাবুর পরিশ্রম-শক্তি ও কর্ম্মের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হলাম। এর পর আরো দু'বার মাদ্রাজ গিয়েছি শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদের নূতন কাজগুলি দেখতে। সেখানে চুণীবাবুর কর্ম্ম-নৈপুণ্যের যে পরিচয় পেয়েছি তা আরো বিস্ময়কর।

পিতৃমাতৃহীন চুণী বিশ্বাসকে নিজ গ্রাম বামনপুকুর (নবদ্বীপ) থেকে শিক্ষার জন্য কলিকাতা নিয়ে আসা হয়। এই দুরন্ত ছেলেকে নিয়ে দিদিমা বড় মুস্কিলে পড়েন। স্কুল পালিয়ে কুমারটুলির মূর্ত্তি-নির্ম্মাতাদের কাছে বসে চুণীর দিন কাটত। ঐটুকু বয়সের ছেলেটির আগ্রহ দেখে কারিগররা খুসী হতেন।

মাদ্রাজ-প্রবাসী মামা P. S. Dass ও দাদা কমল বিশ্বাস, film line-এ রাসায়নিক হিসাবে সবিশেষ পরিচিত। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারা চুণীকে মাদ্রাজ নিয়ে গেলেন। সেই পরিবেশেও চুণী পড়াশুনা অপেক্ষা মূর্ত্তি তৈরিতে বেশী মনযোগী হলেন। তাহার এইরূপ উৎসাহ দেখে দাদা তাহাকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর নিকট হাজির হন। এবং তাঁহার পরামর্শে মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজে ভর্ত্তি করেন। তিন বছর পর চুণী বিশ্বাস কৃতিত্বের সহিত modelling-এর diploma লাভ করেন! তার পর painting class-এ আরো দু' বছর কাজ শেখেন। ছাত্র হিসাবে চুণী বাবুর কাজ শেখার আন্তরিকতা দেখে দেবীপ্রসাদ তাহার প্রতি আকৃষ্ট হন।

১৯৫৪-এর নবেম্বর থেকে পাটনার শহীদ স্মারক তৈরির কাজ আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ তাঁহার সঙ্গে কাজ করার জন্য চুণীকে ডেকে নেন। এই দুর্লভ সুযোগলাভে চুণীর শিক্ষার্থী মন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই বড় বড় মূর্ত্তির প্রধান moulder-এর যোগ্যতা অর্জ্জন করে গুরুর আশীর্ব্বাদ লাভে সমর্থ হন। অক্লান্ত-কর্ম্মী দেবীপ্রসাদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য চুণীবাবুকে করে তুলল নীরব, নিরলস কর্ম্মী। এই কয় বছরে দেবীপ্রসাদ সবচেয়ে বড় দুটি Composition work করেছেন। 'শহীদ স্মারক' ও 'শ্রমের জয়যাত্রা।' এই কাজের মাধ্যমে চুণীবাবু যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তা সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, Armature তৈরি moulding এবং casting করার পুরাতন জটিল পদ্ধতিকে তিনি সহজ ভাবে পরিবর্ত্তিত করেছেন। এই কাজগুলি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ কার্য্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ ১৩ ফুট উঁচু মিঃ চেট্টিয়ারের মূর্ত্তির modelling-এর কাজ শেষ করেছেন। এবার moulding এবং casting করার নির্দ্দেশ দিলেন চুণী বিশ্বাসকে। আমি তখন ক্রোমপেটে (মাদ্রাজ) আছি। কাজ দেখার আগ্রহে দুবেলা ষ্টুডিয়োতে যাই।

কয়দিনের মধ্যেই ৪ হাজার টাকার লোহা এবং ৫ হাজার টাকার Plaster of Paris এসে গেল। রাত্রে আগুনের চুল্লী জলে উঠল—কর্ম্মকারের হাতুড়ীর শব্দ আর শ্রমিকদের ব্যস্ততা, কর্ম্মের বিপুল ঐক্যতানে ষ্টুডিয়ো মুখর হয়ে উঠলো। চুণীবাবু উচ্চ মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে ক্ষিপ্রবেগে plaster ছড়াচ্ছেন। তাহার দু'হাত যেন দশ হাতে রূপান্তরিত হয়েছে। নিজে মেতে কর্ম্মীদের মাতিয়ে সারারাত ব্যাপী কাজ করে mould তৈরি হ'ল। এর কয়দিন পরেই হ'ল casting. চুণী-বাবুর কর্ম্ম-নৈপুণ্য দেখে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হলাম।

চুণীবাবু শুধু plaster casting-এ দক্ষতা অর্জ্জন করেন নি, bronze casting সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, গুরু দেবীপ্রসাদের ইচ্ছাকে জয়যুক্ত করেছেন। একজন বাঙালী শিক্ষার্থীর পক্ষে বড় বড় মূর্ত্তির bronze casting সম্বন্ধে বিদেশে না গিয়ে দক্ষতা অর্জ্জন করা কম গৌরবের কথা নয়।

একদিন চুণীবাবুর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলাম। সেখানে কতগুলি উডুদের কাজ দেখে আনন্দিত
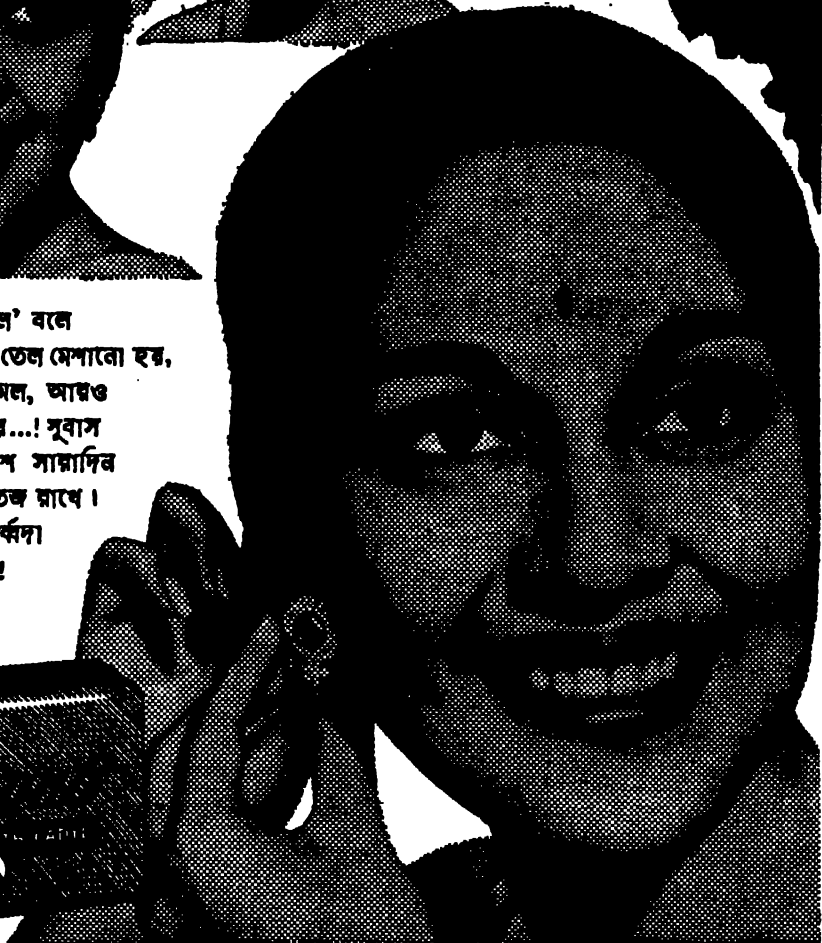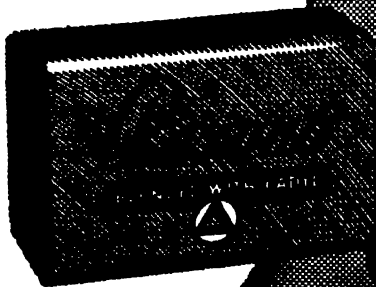
দিনে
দিনে
দিনে
দি...
রেক্সোনা সাবানে 'ক্যাডল' বলে
একটি বিশেষ ধরণের তেল মেশানো হয়,
যাতে ত্বক আরও কোমল, আরও
সুন্দর, আরও লাবণ্যময়ী হয়...! সুবাস
ভরা রেক্সোনার পরশ সারাদিন
আপনাকে সজীব আর সতেজ রাখে।
সৌন্দর্য্য সাধনায় সর্ব্বদা
রেক্সোনা ব্যবহার করুন !
রেক্সোনা সাবানে আপনার ত্বককে আরও লাবণ্যময়ী করে।
রেক্সোনা প্রোপাইটরী লিঃ অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে ভারতে হিন্দুস্থান লিভার লিঃ তৈরী

শিল্পী চুণী বিশ্বাস

চুণী বিশ্বাসের হাতের কাজ
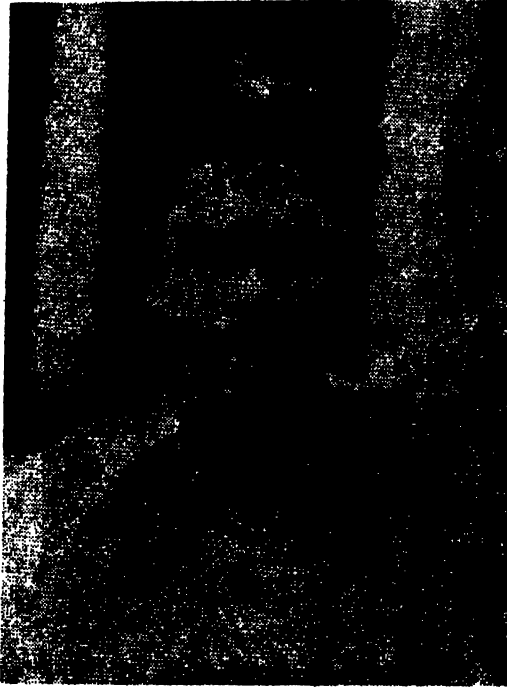
হলাম। তিনি বললেন, "আর্ট স্কুল ছাড়ার পর এইসব কাজগুলি করেছিলাম। মাদ্রাজে উপার্জন ক্ষেত্র তৈরি করার উদ্দেশ্য নিয়েই কিছু কিছু বাইরের কাজেও হাত দিয়েছিলাম। বাঙালী ক্লাবে দুর্গা প্রতিমা কয় বছর থেকে আমি তৈরি করছি। তা ছাড়া বাইরের কাজের সুযোগও আমার অনেকটা ছিল, কিছু টাকাও রোজগার করেছিলাম। ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর কাছ থেকে ডাক এলো। শিক্ষার্থীর আনন্দে কাজে যোগদান করলাম। তখন পাটনার শহীদ স্মারকের কাজ মাত্র সুরু হয়েছে। একটা একটা করে মূর্ত্তির মাটির কাজ শেষ হতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে plaster moulding এবং casting, তার পরই bronze casting-এর কাজ। স্কুলে ছোট ছোট করেছি একটা তৈরি কাজ ভেঙে, আরো ভাল করে করতে সাহস হ'ত না। আর দেবীপ্রসাদ প্রতিটি মূর্ত্তিকে নিয়ে নানা অবস্থার নানা রকম experiment করে চলেছেন। এই সব ভাঙা গড়া দেখেছি আর শিখেছি। শহীদ স্মারকের কাজ শেষ হতে না হতেই দিল্লীর কাজ 'শ্রমের জয়যাত্রা' সুরু হয়ে গেল। তখন দিনরাত ষ্টুডিয়োতে কাজ চলেছে। নূতন নূতন কাজের আনন্দ আর দেবীপ্রসাদের নিজের কর্ম্মতৎপরতা, আমাকেও অত্যধিক পরিশ্রমী করে তুলল। Plaster of Paris-এর নানা রকম পদ্ধতিতে বড় বড় moulding এবং casting-এর কাজ ভাল ভাবে আয়ত্ত হ'ল। এবার নজর দিলাম bronze casting-এর উপর। এত বড় অর্থকরী বিদ্যা অপরকে শেখাবার উদারতা কয়জনের থাকে? সুবিধে ছিল আমাদের একই Studioতে bronze casting হ'ত। দেখে দেখে নিয়ম-কানুনগুলি বুঝতে লাগলাম, সুযোগমত সাহসের সহিত কাজে লেগে গেলাম। অজানা রহস্তের দ্বারোদ্ঘাটিত হ'ল।"
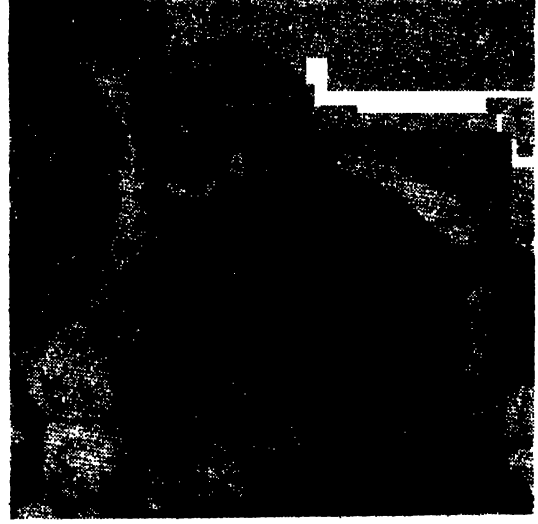
গুরু দেবীপ্রসাদ প্রসঙ্গে চুণীবাবু বললেন, "শিল্পমান রক্ষার্থ ষ্টুডিয়ো কাজে তাঁহার নিয়মানুবর্ত্তিতা অত্যন্ত কঠোর। কিন্তু এই বহিরাবরণে আসল যে মানুষটি লুক্কাইত, তাহার পরিচয় অধিকাংশের নিকট অজ্ঞাত। প্রথমটাতে আমিও ভয় পেতাম। কাজের পরিবেশ ও তাঁহার উদারতায় ধীরে ধীরে সম্পর্ক সহজ হয়ে এলো। মানুষ দেবীপ্রসাদকে পেলাম খুঁজে। অপরের প্রতি মমত্ববোধে যাঁকে কাতর দেখে নিজেও ব্যথিত হয়েছি। ষ্টুডিয়োর প্রতিটি কর্মীর শ্রমের মর্য্যাদাদানে তিনি সর্ব্বদা মুক্তহস্ত। বহু ছাত্রের কর্ম্মজীবনের সূচনায় রয়েছে তাঁহার নীরব প্রভাব। এইরূপ নির্ভরশীল আশ্রয় পেয়েছি বলেই এত শিখেছি—শিখছি আরও শিখব।"

এই সব আলোচনার পর বুঝলাম চুণীবাবু কর্ম্মে ও মর্ম্মের একাত্মবোধে দেবীপ্রসাদের ষ্টুডিয়োতে আরও দায়িত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে আছেন।

শ্রীকৃষ্ণ কি কৈবর্ত ছিলেন ?

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সূচনায় অভ্যুত্থান শ্লোকাবলীতে, দ্বাপরযুগপাবন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে 'কৈবর্ত' বলিয়া সগৌরবে ঘোষণা করা হইয়াছে, চিরস্মরণীয় কুরুক্ষেত্রের ঘোরতর রণনদী হইতে তৎকর্তৃক প্রিয় পাণ্ডবদের পরিত্রাণ করার জন্য১। যিনি নদনদী, খাল-বিল-হ্রদ এমনকি অসীম পারাবারাদি পারাপার করিয়া থাকেন, তিনি কৈবর্ত, কর্ণধার বা কাণ্ডারী। এমন গৌরবসূচক বাক্য জগতে আর আছে কি ?

শব্দ উৎপত্তিতে দেখা যায়, কে (জলে) + বর্ততে (থাকে) যে, সে—কেবর্ত ; এর সহিত ষ্ণ্য-প্রত্যয় যোগে কৈবর্ত—অর্থাৎ জলই যার উপজীব্য, জল লইয়াই যার কাজ-কারবার, সেই জলজীবী, মৎস্যশিকারী জালজীবী ও নৌকর্মজীবী ব্যক্তিই এই কৈবর্ত নামের গৌরবলাভে ধন্য। জলের সঙ্গে যার সম্পর্ক নাই বা জলসম্পর্কিত কাজকর্মকে যে ঘৃণা করে, তার পক্ষে কৈবর্তনামের গৌরব কিছুতেই যুক্তিসহ নহে।

সনাতন আর্যবিজ্ঞানভাস্কর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কুরুক্ষেত্র সমরমহার্ণবের উত্তাল তাণ্ডব তরঙ্গায়িত জলোচ্ছ্বাসের ঘুরপাকে বহুধা বিঘূর্ণিত নিমজ্জিতপ্রায় অভয়তরণীর বিচক্ষণ কর্ণধারণক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়া তবে এই গৌরবোজ্জ্বল আখ্যায় বিভূষিত করিয়াছিলেন। কাজেই নাবিক, মৎস্যশিকারী, জালজীবী, ধীবর, কেবট, দাস (দাশ), ইত্যাদিই কৈবর্ত নামের অবিসম্বাদিত অধিকারী। ইঁহাদিগকেই স্মৃতিকার হলায়ুধ২ এই আখ্যা দিয়াছেন। যথার্থ কৈবর্ত জাতি কৈবর্ত উপাধিতেই গর্বিত এবং ধন্য, অন্য উপাধির বা অন্য মানবগোষ্ঠীর আখ্যায় বিভূষিত বা তদন্তর্ভুক্ত হইবার লালসা তার কিছুতেই হইতে পারে না। এই অভ্রান্ত সত্য কারণেই বিগত একাদশ শতাব্দীতে উত্তরবঙ্গে বরেন্দ্রভূমে স্বাধীন রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া 'কৈবর্তরাজ' রূপে পরিচিত হওয়াই দিব্বোক, রুদক, ভীমাদি রাজগণ পরম শ্লাঘার বিষয় মনে করিয়াছেন। এমনকি তাঁহাদের চরম গৌরবের অক্ষয় স্মৃতিরক্ষার্থে 'কৈবর্তরাজস্তম্ভ' প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। সুমহৎ তাৎপর্যপূর্ণ কৈবর্ত আখ্যায় সন্তুষ্ট থাকাই যথার্থ কৈবর্ত সন্তানের পক্ষে পরম গৌরবের! তাহাকে অন্য আখ্যার বা অন্য বর্ণমর্যাদার লেজুর ধরিতে যাওয়া দুর্দৈব অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নহে।

কৃষিকর্ম বৈশ্যদের জাতীয় বৃত্তি বা ব্যবসায়, ইহা চির সুবিদিত। কিন্তু পেটের দায়ে জীবনরক্ষার পরম সম্বল শস্য উৎপাদনের জন্য হালচাষাদি শ্রমের কাজ অন্য বর্ণের কা' কথা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদিও দেশের নানা স্থানে বহু করিয়া থাকেন। তাহাতে কেহ বৈশ্য হইয়া যান না। অতি প্রাচীন কালে যখন বর্ণস্বাতন্ত্র্য ও বৃত্তি-স্বাতন্ত্র্যের দৃঢ়তা ছিল, তখনও পরবৃত্তি আচরণ করিয়া কেহ পরবর্ণের কৌলিন্য গৌরব গ্রহণ করেন নাই। একক বিশ্বামিত্র ছাড়া ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদির অনেকে পরম ধর্মজ্ঞরূপে—ধর্মোপদেষ্টার কাজ কার্যত করিয়াও ব্রাহ্মণের গৌরব গ্রহণের চেষ্টা করেন নাই। আবার অনেক ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাদির বৃত্তি কার্যতঃ আচরণের দ্বারা অব্রাহ্মণ বিবেচিত হন নাই। আর্যসভ্যতার গৌরবময় সুপ্রসিদ্ধ জাতীয় ইতিহাস রামায়ণ-মহাভারতাদিতে এ বিষয়ে যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়।

কৈবর্ত জাতি জালিক হালিক বলিয়া সুবিখ্যাত। এই দুইটি প্রসিদ্ধ ব্যবসাতেই এ জাতির পারদর্শিতা সুবিদিত। এখন কোনক্রমে জালের ও নৌকা চালনার অর্থাৎ জলসম্পর্কিত ব্যবসায় সুযোগ-সুবিধায় বঞ্চিত হইয়া বা অসামর্থ্যবশতঃ সেসব ছাড়িয়া কেবল হালচাষী বা জীবিকার্জনে অন্য পন্থাবলম্বীগণ তাঁহাদের জাল-হাল উভয় কর্মে নিপুণ ভ্রাতাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কৌলিন্য মর্যাদার অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইবেন কি, না তাঁহাদের জাতীয় নামের ব্যুৎপত্তিগত স্বকীয় প্রধান ব্যবসাত্যাগের জন্য এবং পরকীয় গৌরব-লুব্ধতার জন্য হীন আত্মবিস্মৃত কলঙ্কের অধিকারী বিবেচিত হইবেন ?

কৈবর্ত জাতির এক বিরাট অংশ নিজেদের হালিক অর্থাৎ কেবল চাষীরূপে পরিচয় দিয়া স্বতন্ত্র মাহিষ্য

---

১ "সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী 'কৈবর্তকঃ' কেশবঃ।"

২ হলায়ুধ—"কৈবর্ত্তো ধীবরো দাসো মৎস্যজীবী চ জালিকঃ।"

শাশুড়ীর শিক্ষা

ভাই বকুলফুল,

বউ কেমন হয়েছে জিজ্ঞেস করেছ। কথাটার সোজা-সুজি উত্তর আমি দেবো না। একটা ঘটনা লিখছি তার থেকেই বিচার করো বউ ভাল না মন্দ।

তপুতো কি কাণ্ড করে বিয়ে করলো তা শুনেইছো। কাউকে জানানো নেই কিছু না, হঠাৎ সাদাসিধে বিয়ে করে বসলো আমার উপর রাগ করে। আমার কত সাধ ছিল ব্যাকপাইপ বাজিয়ে তপু ঘোড়ায় চড়ে বৌ আনবে। উনিতো আমায় জুড়িগাড়ী চেপে, ব্যাণ্ড বাজিয়ে বিয়ে করেছিলেন। তাতে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছিল শুনি? ছেলে বেঁকে বসলো ও ভাবে বিয়ে সে করবে না—আমরা নাকি সেকেলে। সেকেলে বৈকি! আটাশ বছর বয়সে কি একেলে থাকবো নাকি?

যাই হোক, বউ দেখে আমি সেকেলে মানুষ, কি রকম ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলুম। দেখলুম বউ আমার ওপর এক বিঘৎ ঢ্যাঙা (আজকাল ট্যাঙা হওয়া নাকি সুন্দরের লক্ষণ), ময়লা রঙ (এটাও আজকাল চলে), একটু রোগাটে—যাকে আধুনিকারা 'সিলিন' না কি বলে ইংরিজিতে—তাই। গলার স্বর অবশ্যি বলতে বাধ্য হচ্ছি, বেশ মিষ্টি। গানটানগুলো বাপমা খুব চর্চ্চা করিয়েছে নিশ্চয়ই।

উনি অসুখ থেকে তখন সবে সেরে উঠছিলেন। খাওয়া নিয়ে সারাক্ষণ খিটমিট করেন। সব খাবার-দাবারই ওঁর পানসে লাগে! আমি একেবারে তিতো-বিরক্ত হয়ে ঝালের ঝোল রেঁধেছিলুম—আজ খান খাবেন নয়তো এবার থেকে রান্না করাই ছেড়ে দেবো।

বউমারা প্রণাম করে দাঁড়িয়ে রইল আর আমি ওঁর খাবার থালাটা ধরে দিলুম বিছানার পাশের টেবিলে। উনি ঝোল মুখে দিয়েই ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। ছি, ছি, কি লজ্জা বলতো ভাই বকুলফুল নতুন বউমার সামনে। উনি আরও কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—'পঁয়ত্রিশ বছর বিয়ে হয়েছে, এখনও রুগীর পথ্য রাঁধতে শিখলে না?

আমি চোখের জল ফেললুম। পাশের ঘরে গিয়ে বউমাকে বললুম—'কি রকম খিটখিটে মানুষটি দেখছো তো? পারবে তো ঘর করতে মা?'

বউমা হাসল। তারপর কাচুমাচু মুখ করে বললো—'একটা কথা বলবো?'

'বলো'

'কাল আমি রাঁধবো বাবার তরকারী?'

আমি একেবারে আকাশ থেকে পড়লুম—'বলো কি বউমা, রান্নাবান্না জানো কিছু?'

'হুঁ, আমার মাতো অনেক রকম রান্না আমায় শিখিয়েছেন।'

পরদিন আমি গেলুম কালীঘাটে পুজো দিতে আর বউমা কোমর বেঁধে রাঁধতে বসলো। তপুকে লিষ্টি করে দিল বাজার থেকে কি সব আনতে। বাড়ি ফিরে দেখি এলাহি কাণ্ড, রান্নাঘরের ভোলই পালটে গেছে—সব সাজানো-গুছানো। উনুনের পাশে একটা নতুন কেরো-সিন ষ্টোভ। এর মধ্যেই পাঁচখানা তরকারী সারা, উনুনে ভাত ফুটছে। তরকারীর রং দেখে জিজ্ঞেস করলুম—'বাঃ এমন রং বার করলে কি করে বউমা?' বউমা কিছুটি না বলে মিটিমিটি হাসতে লাগলো। বুঝলুম মার কাছে শেখা গুপ্ত মন্তর আছে, বলবে না।

ওঁকে প্রথমে ঝোল ভাত দেওয়া হ'ল কি বলেন দেখার জন্য। প্রথম গ্রাসেই মুখে হাসি ফুটলো—'বাঃ, আজ রান্নাটা যেন অন্য রকম লাগছে।' বউমা একে একে পাঁচটা তরকারী ধরে দিল। উনি চেঁছে-পুঁছে সব খেয়ে আরামের ঢেঁকুর তুলে বললেন—'এত খেয়ে ফেললাম—একটু জোয়ানের আরক দাওতো গো'।

বউমা বাধা দিল—'না না, ও সব খাওয়ার দরকার নেই। আমার বাবাতো আপনার চাইতেও বড়, কিন্ত বাবাকে ও সব খেতে হয় না। আমার মা বাবার সব রান্নাই একটু হাল্‌কা করে 'ডাল্‌ডা' বনস্পতিতে রাঁধেন। আমাদের বাড়ীর সব রান্নাই 'ডাল্‌ডা'র হয়।

'কি বললে বাছা?' আমি উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম—'ডাল্‌ডা' বনস্পতি? তা' আমাদের লুচিটুচিতো বনস্পতিতে ভাজি আজকাল। ডিমের আমলেটও ওতেই হয়। আর কি বলে—সুজির হালুয়াও।'

'শুধু জলখাবার কেন মা, আজকালতো অনেক বাড়িতেই সব কিছু 'ডাল্‌ডা'র রান্না হয়। আজ যে পাঁচটা তরকারীই 'ডাল্‌ডা'য় রেঁধেছি, তাতে কি স্বাদ খারাপ হয়েছে?'

উনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—'না, না, বরং খুব ভাল হয়েছে। বউমার কাছে থেকে 'ডাল্‌ডা'র তাক্‌বাগ্‌গুলো জেনে নাওতো গো।'

বউমার গুপ্ত মন্তরটি জেনে নিয়ে খাসা রান্না করছি আজকাল। উনি সেরে উঠেছেন। খেতেও পারছেন প্রচুর। বউমা যে শুধু শ্বশুরকে বশ করছে তা-ই নয়, চিরকেলে খুঁৎ কাড়া শাশুড়ীও বশ মেনেছে! কি বল ভাই, বউ মন্দ না ভাল?

হ্যাঁ, আর মাথা খাও ভাই বকুলফুল, তোমার ঐ খিটখিটে বুড়োকে আমার বউমার 'ডাল্‌ডা' বনস্পতিতে রাঁধা রান্না খাইয়ে দেখ একবার—হাতে-নাতে ফল পাবে।

তোমার বকুলফুল সই

সম্প্রদায়ে পরিণত। তাঁহারা জালিক ও নৌকর্মজীবিদের চাইতে উচ্চতর সামাজিক মর্যাদাবিশিষ্ট বলিয়া মনে করেন এবং উঁহাদের সহিত পান-ভোজন বা বৈবাহিক সম্পর্ক বর্জিত। কিন্তু প্রাচীন কৈবর্তকীর্তির ধ্বজা ও ইংরেজ-শাসনাধীনে বৈদেশিক লোকগণনাকারী কর্মকর্তাদের সাহুগ্রহ মন্তব্য জালিক-হালিক এবং কেবল হালিক উভয় সম্প্রদায়েরই গৌরবস্মৃতির অপরিহার্য অবলম্বন! হালিক অর্থাৎ চাষী কৈবর্তরা মাহিষ্য নামের গৌরবকেই সমধিক প্রাধান্য দিয়া থাকেন এবং উত্তরবঙ্গের প্রাচীন কৈবর্ত কীর্তিকে মাহিষ্যকীর্তি বলিয়াই নানা ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। নিখুঁৎ ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক বিচারে এই চেষ্টা কতটা সার্থকতাসম্পন্ন তাহা বিবেচ্য! তবে একটা প্রশ্ন অতি সহজেই অনুসন্ধিৎসু হৃদয়ে জাগে যে, অতীতের নিষ্কণ্টক স্বাধীনতার গৌরবময় দিনে যখন 'বিজয়স্তম্ভ' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন সেই রাজস্তম্ভকে 'কৈবর্ত রাজস্তম্ভ' নামকরণ প্রতিষ্ঠাতৃগণ কেন করিয়াছিলেন? সমধিক গরিমাময় মাহিষ্য নাম সংযোজনে কি বাধা ছিল? বা উৎসাহ জাগে নাই কেন? যদি সত্যই উহা মাহিষ্য সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ নিজস্ব কীর্তি!

খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর ভারতেতিহাস সম্পর্কিত 'মঞ্জুশ্রীমূলকল্পম্' নামে একটি প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ অন্যতম বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর কে. পি. জয়শোয়াল কর্তৃক সম্পাদনের কথা 'রামচরিতম্' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক পণ্ডিত অযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ উল্লেখ করিয়াছেন এবং একটি শ্লোক (১) উদ্ধৃত করিয়া বাংলার পাল-রাজাদের দাস জাতীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা মূলের তাৎপর্যের সহিত কতটা সঙ্গতিসম্পন্ন, সে বিষয় স্বতঃই সন্দেহ জাগে! ডক্টর জয়শোয়াল তাঁর ইংরাজী অনুবাদে ভূপালসমূহের বিশেষণ বহুবচনযুক্ত গোপাল ও শ্রমজীবী করিয়াছেন (২)। সংস্কৃত মূলশ্লোকে যদি গৌরবে বহুবচন হইত, তবে সুপণ্ডিত ডক্টর জয়শোয়াল ইংরাজী অনুবাদে বহুবচন না করিয়া নিশ্চিত একবচন করিতেন। এ ছাড়া তাঁহার অনুবাদ ও নিঃসন্দিগ্ধ তাৎপর্য প্রকাশক নহে। শ্লোকে 'ভবিষ্যন্তি' এই বহুবচন ক্রিয়ার কর্তা বহুবচন 'ভূপালাঃ', বিশেষণও সঙ্গে সঙ্গে 'গোপালাঃ' ও 'দাসজীবিনঃ'—অর্থাৎ যাঁহারা রাজা হইবেন, তাঁহারা জাতীয় বৃত্তিতে গোপালক এবং শ্রমকর্মকুশল। প্রাচীনকালে গোধন ও শস্যধনই রাজা-রাজন্যদের ঐশ্বর্যের মাপকাঠি ছিল এবং উত্তরবঙ্গের বহু স্থানে উত্তর গোগৃহ বলিয়া ও দক্ষিণবঙ্গের অনেক স্থানে দক্ষিণ গোগৃহ বলিয়া প্রাচীন নিদর্শন বিস্তর বর্তমান। কাজেই রাজারা গোধনাঢ্য ছিলেন ভাবিতে কোনই বাধা নাই। আবার 'গোপালাঃ' বলিতে 'পালবংশীয়-গোপাল-প্রভৃতয়ঃ' যদি ধরা যায়, তাহাতে অর্থ হয় পালবংশীয় গোপালাদি। দাশ বা দাস শব্দের অর্থ সংস্কৃত-বাংলা সব অভিধানে দেখা যায়— ধীবর, শ্রমজীবী, সেবাপরায়ণ জাতি ইত্যাদি। তাহা হইলে শ্লোকের সহজ স্পষ্টার্থ দাঁড়ায়—গোধনাঢ্যরা বা পালবংশীয় গোপালাদি, দাস-পরনামা অর্থাৎ ধীবর-কৈবর্তাদি যখন নৃপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন, তখন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদি দ্বিজাতির স্বধর্মহীনতা ঘটিয়া কার্পণ্য দোষের বিস্তার হইবে। এই কৃপণ শব্দের মর্মানুসন্ধান পাওয়া যায় উপনিষদে (৩)—যাজ্ঞবল্ক্য গার্গিকে বলিতেছেন, জন্মিয়া যে ঈশ্বর দর্শন বা পরমার্থতত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি না করিয়া মরে সেই যথার্থ কৃপণ, সেই স্বধর্মহীন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও বিষণ্ণ অর্জুন স্বধর্মবিরোধী ভাবে আবিষ্ট হইয়া নিজেকে 'কার্পণ্য দোষোপহতঃ স্বভাবঃ' বলিয়াছিলেন, এই অবিসম্বাদিত সত্যমর্মানুভূতিতে। জাতির স্বধর্ম ও স্ববৃত্তির প্রতি নিষ্ঠাহীনতা,ঘৃণা,অবজ্ঞাই জাতীয় অধঃপতনের মূল কারণ।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রচিত কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতম্' কাব্যের মূল শ্লোকে কোথাও কৈবর্ত বা মাহিষ্যের নামগন্ধ নাই। প্রথম পরিচ্ছেদে ২৯ শ্লোকের কবিকৃত নিজস্ব টীকায় 'কৈবর্তস্য নৃপস্য' কথা একবার-মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে রাজা দিব্বোকের বিশেষণরূপে। এই কৈবর্ত নৃপতি সম্বন্ধে হালিক বা মাহিষ্য বলিয়া কোন স্বাতন্ত্র্যের আভাস মোটেই নাই।

প্রাচীন ও দুর্লভ সংস্কৃত 'বাচস্পত্যাভিধানম্' অনুসন্ধানে দেখা যায় নিষাদ, ধীবর, দাস, কৈবর্ত জাতির আদি উৎপত্তি বিষয়ে মনুস্মৃতির সিদ্ধান্ত এবং মাহিষ্য জাতির আদি উৎপত্তি বিষয়ে অমরকোষের সিদ্ধান্ত উল্লিখিত। এই প্রাচীন প্রামাণ্য সংস্কৃত অভিধানে কৈবর্তের জল সম্পর্কিত ব্যবসা ছাড়া অন্য ব্যবসায় যেমন উল্লেখ নাই, তেমনই মাহিষ্যের সহিত চাষী কৈবর্তের কোন সম্পর্কেরও উল্লেখ নাই।

---

(১) মঞ্জুশ্রীমূলকল্পম্—৮৮০ শ্লোঃ "ততঃপরেণ ভূপালা গোপালা দাসজীবিনঃ।
ভবিষ্যন্তি ন সন্দেহো দ্বিজাতি কৃপণা জনাঃ।"—
(শ্লোকে পাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা গোপালকে দাস জাতীয় বলা হইয়াছে। যাই হউক ইহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, পালরাজগণ ক্ষত্রিয় নহেন।)

(2) "Then the Gopalas will be King, who will be of menial caste and the people will be miserable with Brahmins."

(৩) "গার্গি! য এতদবিদিত্বা প্রাণান্ জহাতি স এব কৃপণঃ।"

একটু সানলাইটেই
অনেক জামাকাপড় কাচা যায়
এর কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা
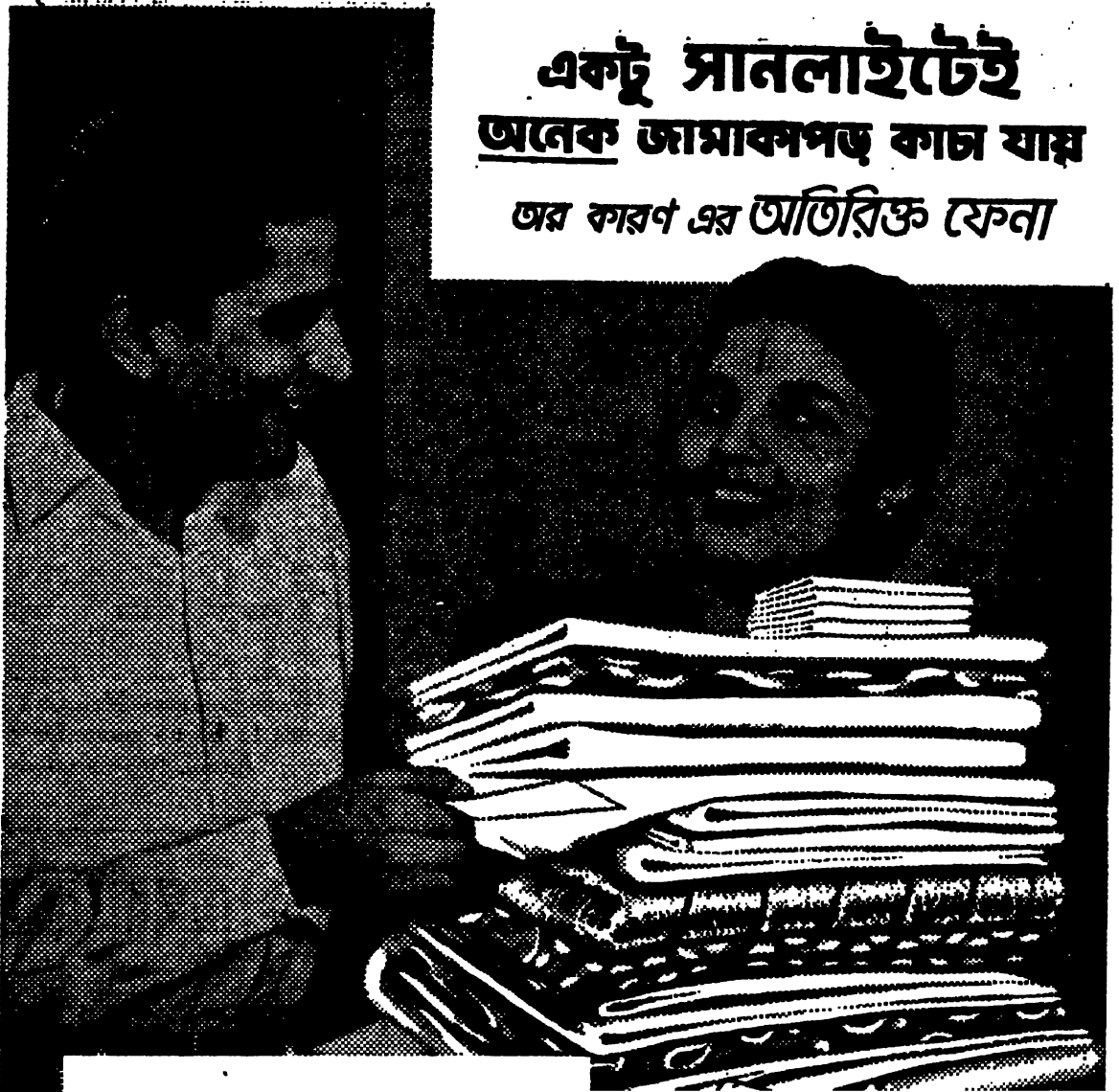
না দেখলে বিশ্বাসই হতনা: শঙ্কর সীতার পরিষ্কার করা ধবধবে সাদা সার্টটা দেখে দারুণ খুসী। আর শুধু কি একটা সার্ট দেখুন না জামাকাপড়, বিছানার, চাদর আর তোয়ালের স্তূপ—সবই কিরকম সাদা ও উজ্জ্বল এসবই কাচা হয়েছে অল্প একটু সানলাইটে! সানলাইটের কার্য্যকরী ও অফুরন্ত ফেণা কাপড়কে পরিপাটি করে পরিষ্কার এবং কোথাও এক ফুটিও ময়লা থাকতে পারেনা! আপনি নিজেই পরীক্ষা করে দেখুননা না কেন...আজই!

সানলাইটে জামাকাপড়কে সাদা ও

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড

বিদেশীয় ঐতিহাসিক ফ্রেডারিক(১), ভিন্সেন্ট স্মিথ(২) প্রভৃতি কি প্রমাণের সাহায্যে চাষী কৈবর্তকে 'মাহিষ্য' এবং স্বাধীন বরেন্দ্রী কৈবর্ত রাজাদের মাহিষ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট বুঝিবার উপায় নাই। বালী, জাভা প্রভৃতির উপনিবেশী পূর্বভারতীয়েরা নৌচালক ও নৌযুদ্ধবিশারদ কৈবর্ত জাতি নিঃসন্দেহ। মাহিষ্যেরা অমরকোষ নির্দেশে এবং কৈবর্তেরা ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ নির্দেশে ক্ষত্রিয়। কাজেই বিদেশী ঐতিহাসিকদের 'মহিষ-ক'বো-ক্ষত্রিয়'—এই অপভ্রংশ উক্তি দোষাবহ নহে। তবে কৈবর্ত ক্ষত্রিয়েরা যে নৌযুদ্ধবিশারদ নৌকর্মজীবী জলের কীট তাহা সুস্পষ্ট।

আরও বিশেষভাবে দেখা যায় যে, এ পর্যন্ত কৈবর্ত প্রতিভার যে সব স্মৃতিস্তম্ভ, শিলালিপি, তাম্রশাসনাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে কৈবর্তকে চাষী বা মাহিষ্য বলিয়া বিশেষিত হইবার উল্লেখ কোথাও নাই। ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ অক্ষয়কুমার মৈত্র, রমাপ্রসাদ চন্দ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির মন্তব্যেও এরূপ আভাস দৃষ্ট হয় না। বহুমানিত সুপ্রাচীন মনুস্মৃতি-সংহিতাতেও মাহিষ্য জাতির উৎপত্তি কথা দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন ঐতিহ্য বেদ-রামায়ণ-মহাভারতে কৈবর্ত, ধীবর, দাস, নিষাদ, পারশব, কেবট প্রভৃতির বর্ণনা পাওয়া যায় আর্যমানব সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে, কিন্তু মাহিষ্যের কোন বর্ণনা আছে কি? কাজেই যে কৈবর্ত জাতি নিজস্ব স্বাভাবিক কর্মকুশলতায় কি প্রাচীন যুগে, কি মধ্য যুগে, কি আধুনিক যুগে যথোচিত মহিমান্বিত-রূপেই প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাকে পরবৃত্তি আচরণে মিথ্যা কৌলিন্যবোধের মোহে আত্মবিস্মৃতিজাত কলঙ্কের ডালি বহিবার কোনই কারণ নাই। 'কৈবর্ত' যথার্থ কৈবর্তরূপেই গর্বিত ও সম্মানিত।

জেলে ও চাষী এবং কেবল চাষী এই উভয় দলীয় কৈবর্তই যে মূলতঃ অভিন্ন তাহা কিঞ্চিদধিক অর্ধশতাব্দী পূর্বে তদানীন্তন লোকগণনার প্রধান কর্মকর্তা মিঃ গেইট (৩) সুস্পষ্ট ভাবে মন্তব্য করিয়াছেন। অবশ্য অল্প সময়ের লোকগণনার প্রধানদের কেহ কেহ চাষী কৈবর্তকে স্বতন্ত্র মাহিষ্য বলিয়াও মন্তব্য করিয়াছেন। বিদেশী কর্মকর্তাগণ যখন যেরূপ বুঝিবার জন্য প্রভাবিত হইয়াছেন সেরূপ মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সুবিধা-বাদীরা ঐ সব মন্তব্য নিজ নিজ রুচির খোরাকরূপে গ্রহণ ও ব্যবহার করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন; কিন্তু উহাতে সত্য চাপা পড়ে না বা বিলুপ্তও হয় না। 'কৈবর্ত' শব্দটাই এমন তাৎপর্যপূর্ণ যে, তার গৌরব লইতে হইলে জলসম্পর্কিত ব্যবসাকে কিছুতেই অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করা যায় না।

(1) Mr. Frederic in J. R. A. S. Great Britain and Ireland—"To the Xatriyas belong all those, who bear the title of Arya, *K'bo* or Mahisa and Rangga . . . . . . They are called Mahisa or *K'bo* (buffalo to indicate strength) and Rangga (meaning Minister) . . . . These are all Xatriyas who existed in the largest Kingdom of Java."

(2) Early History of India by Vincent Smith—"When Mahipala succeeded to the throne, he imprisoned his brothers and mis-governed the realm. His evil deeds provoked—a rebellion, headed by *Divya or Divyoka*, chief of the Chasi Kaibarta tribe or Mahishya caste, which, at the time, was powerful in North Bengal."

(3) Census Commissioners Mr. Gait remarked—"There seems to be no room for doubt as to the common origin of two sections of Kaibarta".

মধ্য-শিক্ষা পর্য্যায়ে সংস্কৃতের স্থান

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দাশগুপ্ত

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ যে পাঠ্যসূচী প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাতে সংস্কৃতকে শুধু যে তৃতীয় ভাষা রূপে গণ্য করিয়া হিন্দির বিকল্পে সংস্কৃত পড়িবার ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা নহে, পরন্তু এই তৃতীয় ভাষারও কোন পরীক্ষা দিতে হইবে না ইহাই ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাকে মানবতা বিষয়ক বিভাগে (Humanities Group) ১০টি বিষয়ের একটি বৈকল্পিক পাঠ্য বিষয় রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রবেশিকা পরীক্ষায় এবং পরে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় এতাবৎকাল সংস্কৃত অবশ্য-পাঠ্য বিষয়ভুক্ত ছিল। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ স্থাপিত হওয়ার পরও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের পর সংস্কৃতকে বৈকল্পিক পাঠ্য বিষয় করা হইয়াছে। যে ভাবে পাঠ্যসূচী প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে শতকরা ৫টির বেশী ছাত্র সংস্কৃত পড়িবে না এবং যাহারা অপেক্ষাকৃত মেধাবী তাহারা মোটেই পড়িবে না। এই অবস্থা সঙ্গত কিনা এবং ইহা শিক্ষার সহায়ক হইবে কিনা এ বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বিচার করিতেছেন। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাধ্যমিক শিক্ষা পর্য্যায়ে সমস্ত ভাষাগুলির (ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত. হিন্দি) স্থান কিরূপ হওয়া উচিত ও অন্যান্য বিষয় নির্দ্ধারণের জন্য ১৩ জন সদস্য লইয়া একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। কমিটি এই সম্পর্কীয় তথ্যাদি গ্রহণ করিয়া মতামত প্রকাশ করিবেন।

এক শ্রেণীর লোকের মতে সংস্কৃতকে অবিলম্বে অবশ্য-পাঠ্য রূপে নির্দ্দেশ করা একান্ত কর্ত্তব্য। তাঁহাদের মত এই ভারতের সমস্ত প্রান্তীয় ভাষার জননী, ভারতীয় সভ্যতার অন্তরাত্মা, ভারতীয় কৃষ্টির প্রাণ, ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার, রাষ্ট্রীয় ঐক্যের প্রধান উপাদান ও শিক্ষার মেরুদণ্ড, বিশ্ব-বরেণ্য সংস্কৃত ভাষাকে বৈকল্পিক পাঠ্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রকৃত শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। এই শ্রেণীর লোকদের মত এই যে, অবিলম্বে সংস্কৃতকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে অবশ্য পাঠ্য রূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া শিক্ষাক্ষেত্রের আশু বিপর্য্যয় রোধ করা কর্ত্তব্য।

অপর এক শ্রেণীর লোকের মতে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক এবং যন্ত্রপাতির যুগে ছাত্রদের মধ্যে বিস্তৃতভাবে বৈজ্ঞানিক বিষয়াদি শিক্ষা দিয়া যাহাতে বর্ত্তমান অর্থনৈতিক বিপর্য্যয় দূর করা যায় তৎপ্রতি সম্যক্ দৃষ্টি দেওয়াই শিক্ষা বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের একান্ত কর্ত্তব্য। এই শ্রেণীর লোকেরা মনে করেন যে, সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া এই উদ্দেশ্য সফল হইবে না। তাঁহাদের মতে সংস্কৃত অবশ্য পাঠ্য করিলে ছাত্রদের মস্তকে অনর্থক বোঝা চাপান হইবে এবং তাহাদের সময় অকারণ নষ্ট করা হইবে।

এক্ষণে সংস্কৃত পড়ানর বিরুদ্ধে যে সমস্ত যুক্তি সাধারণতঃ উত্থাপন করা হয় সেগুলি কিছু বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক। প্রথমতঃ, সংস্কৃত ব্যাকরণ আশ্রিত ভাষা, ব্যাকরণের জটিল সূত্রাদিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করা দুঃসাধ্য এবং অতিশয় সময় সাপেক্ষ। বলা বাহুল্য, যাঁহাদের সংস্কৃত ভাষায় সামান্য জ্ঞান আছে, তাঁহারা এই আপত্তি সমর্থন করেন না। পরন্তু যাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্য অথবা ব্যাকরণ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ তাঁহারাই জোর গলায় এই আপত্তি করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় এই যে, এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যাই অধিক এবং ইহারাই গলাবাজিতে অগ্রণী ও সিদ্ধহস্ত। ইহাদের চীৎকারে সাধারণ শিক্ষিত লোকেরা এবং ছাত্রেরা উদ্‌ভ্রান্ত হইতেছে। শুধু সংস্কৃত কেন, যে কোন বিষয়ে সম্যক্, ব্যুৎপত্তি লাভ করা বিশেষ কষ্ট সাধ্য। তবে সাধারণ ভাবে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে কাহারও কোন কষ্ট হয় না। বস্তুতঃ, যে প্রকার পরিশ্রম করিয়া দশ বৎসর আবশ্যিক ভাবে ইংরেজী ভাষা অধ্যয়ন করিয়া ছাত্রদের ইংরেজী ভাষায় যেটুকু জ্ঞান জন্মে তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। ইংরেজী পরীক্ষাতেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছাত্র অকৃতকার্য্য হইয়া থাকে। ইংরেজী শিক্ষা করিবার জন্য ছাত্রদের যে পরিশ্রম করিতে হয় তাহার সিকি ভাগ পরিশ্রম করিলে সংস্কৃত ভাষায় বহু বেশী জ্ঞানলাভ করা যায়।

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে বর্ত্তমানে ছাত্রদিগকে বহু ভাষা শিক্ষা করিতে হইতেছে—ইহা বিশেষ কষ্ট

সাধ্য। সংস্কৃতকে অবশ্য পাঠ্য করিয়া এই ভার বৃদ্ধি করা নিষ্ঠুরতা মাত্র। বর্ত্তমানে সুকুমার মতি শিশুদের উপরও যে বিশাল বোঝা চাপান হইতেছে—সাধারণ জ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, পৌর বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত ইত্যাদি নানা বিষয় পাঠ্য করিয়া ছেলেদের জ্ঞান বৃদ্ধি করিবার প্রচেষ্টা হইতেছে। কিন্তু দেখা যায় যে, কোন বিষয়েই ছেলেদের জ্ঞানলাভ হইতেছে না। পল্লবগ্রাহীতা শিক্ষার সহায়ক নহে। অসংখ্য বিষয় পড়িতে গিয়া ছেলেরা হাবুডুবু খাইতেছে। গৃহশিক্ষকের সহায়তায় কতকগুলি প্রশ্নোত্তর মুখস্থ করিয়া পরীক্ষার খাতায় উদ্গীরণ করিবার প্রয়াস পাইতেছে। এই পদ্ধতি, এই অসংখ্য বিষয় শিক্ষা দেওয়ার বিষয়ে এই সব আপত্তিকারিগণ কিছু বলেন না—এগুলিকে ভার বলিয়া মনে করেন না; শুধু সংস্কৃতের নাম করিলেই তাঁহাদের মন ভারাক্রান্ত হয়।

শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য চরিত্রগঠন এবং গৌণ উদ্দেশ্য সাধারণ জ্ঞান অর্জ্জন। এজন্য পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবিদ্‌গণ পাঠ্য বিষয়গুলিকে Formative এবং Imformative এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। Formative (গঠনমূলক) বিষয়গুলির মধ্যে যে সংস্কৃতের স্থান সর্ব্বপ্রথম ইহা যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন।

তৃতীয় আপত্তি এই যে, যেহেতু ছাত্রেরা সংস্কৃত পড়িতে চায় না, সেজন্য জোর করিয়া তাহাদিগকে ইহা পড়ান সঙ্গত নহে—তাহাতে কুফলই হইবে। এই আপত্তির সারবত্তা খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত। ছাত্রদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া যদি পাঠ্যবিষয় স্থির করিতে হয় তবে কোন বিষয়ই পড়ান সম্ভব নহে। সাধারণতঃ ছাত্রেরা কোন বিষয়ই পড়িতে চায় না—ইংরেজী ও বাংলা পরীক্ষায় ফেলের হার দেখিলে ইহা সহজেই বুঝা যায়। তাহা ছাড়া বহু ছাত্র গণিত পড়িতে চায় না; ইতিহাস পড়িতে চায় না, বহু ছাত্র ভূগোল পড়িতে চায় না। তবে কি এসব বিষয় পড়ান বন্ধ করিতে হইবে? ছাত্রদের এরূপ অনিচ্ছা সত্ত্বেও সমাজের কল্যাণের জন্য, দেশের কল্যাণের জন্য আমরা বাধ্যতামূলক ভাবে ছাত্রদিগকে বহু বিষয় শিক্ষা দিয়া থাকি। রোগীর কল্যাণের জন্য উত্তম বৈদ্য তাহাকে তিক্ত ঔষধ খাওয়াইতে পশ্চাৎপদ হন না; দূষিত রক্ত দূর করিবার জন্য অস্ত্রোপচারক নির্ম্মমভাবে রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করিয়া থাকেন। আমাদের আইন, আদালত, সামাজিক ব্যবস্থা সবই বাধ্যতামূলক। সংসারের এক শ্রেণীর লোকের উপর বাধ্যতামূলক ভাবে কতকগুলি বিষয়ে নিষেধ,প্রতিনিষেধ, আদেশ, প্রত্যাদেশ ইত্যাদি না করিলে কখনও সুষ্ঠু সমাজ গঠন করা সম্ভব নহে। সমাজের এবং দেশের কল্যাণের জন্য যাহা করা প্রয়োজন তাহা অবশ্যই করিতে হইবে—বাধ্যতার আপত্তিকে বাধা বলিয়া বোধ করিলে চলিবে না।

বর্ত্তমান জড়বাদী যুগে বিজ্ঞান, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির প্রতি লোকের সহজ আকর্ষণ। কিন্তু ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, এই প্রতিষ্ঠানগুলি কার্য্যকরী ও উন্নতিশীল করিতে হইলে পরিশ্রম, একাগ্রতা, সত্যনিষ্ঠা, সন্তোষ, স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, সরলতা ইত্যাদির প্রয়োজন। বিজ্ঞানযুগ, যান্ত্রিকযুগ, আণবিকযুগ—যাহাই আসুক না কেন, জাতীয় উন্নতিসাধন করিতে হইলে এই সমস্ত গুণ-রাজির অনুশীলন করিতে হইবে। এগুলি না থাকিলে কোন উন্নতি স্থায়ী হইতে পারে না। এগুলি অনুশীলন করিবার পক্ষে সংস্কৃতের মত আর কি আছে? শুধু পরকাল নহে, ইহকালের জন্যও সংস্কৃতের প্রয়োজন স্বীকার করিতে হইবে।

বর্ত্তমান কালে সংস্কৃত শিক্ষা অর্থোপার্জ্জনের সহায়ক নহে, শুধু এই কারণেই ছেলেরা সংস্কৃত পড়িতে চায় না। ছাত্রেরা যখন দেখে যে, সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনেরও উপায় করা যায় না, তখন ইহা পড়িতে তাহাদের ইচ্ছা না হওয়াই স্বাভাবিক। এই প্রবৃত্তির জন্য তাহাদিগকে দাবী করা যায় না। আজ যদি জাতীয় সরকার সংস্কৃত শিক্ষাকে অর্থকরী করিতে পারেন তবে ছাত্ররাও পরম উৎসাহে সংস্কৃত পড়িবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দু মাত্রেরই সংস্কৃতের প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা আছে। ইহা অর্থোপার্জ্জনের সহায়ক হইলে ইহা পড়িতে ছেলেরা অবশ্যই আগ্রহান্বিত হইবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে এদিকে দৃষ্টি দেওয়া দূরে থাকুক, সংস্কৃত শিক্ষাকে আঘাত করা এবং হিন্দি শিক্ষাকে উৎকোচ দিবার প্রচেষ্টাই দেখিতে পাই। এত ঘাত, প্রতিঘাত সত্ত্বেও যে আজও সংস্কৃত চর্চ্চা অব্যাহত রহিয়াছে, ইহাতে তাহার অমর জীবনীশক্তির প্রভাবই দেখা যায়। কিন্তু এরূপ জীবন্মৃত অবস্থায় না বাঁচিয়া যাহাতে বাঁচিবার মত বাঁচিতে পারে তাহারই ব্যবস্থা করিবার জন্য আমরা জাতীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। কি উপায়ে সংস্কৃত শিক্ষাকে অর্থকরী করা যায় এবিষয়ে বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প—গ্রন্থম্। ২২।১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। কলিকাতা—৬। দাম পাঁচ টাকা।

চারুচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমসাময়িক। এত বড় বহুমুখী প্রতিভার প্রভাবমুক্ত না হইয়াও চারুচন্দ্র সাহিত্য ক্ষেত্রে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁর লেখা রোমান্সধর্মী হইলেও আদর্শনিষ্ঠ ও সংযমশীল। হয়তো সেইজন্যই বর্তমান কাল তাঁহাকে ভুলিতে বসিয়াছে। এ ছাড়া চারুচন্দ্রের কোন পুস্তকই আজ আর সহজলভ্য নয়। বহু পূর্বেই সংস্করণ শেষ হইয়া আর নতুন করিয়া প্রকাশিত হয় নাই।

আলোচ্য পুস্তকখানি গল্পগ্রন্থ। সঙ্কলনটিতে কুড়িটি গল্প স্থানলাভ করিয়াছে। বেশীর ভাগ গল্পের মধ্যেই লেখকের কবিত্বপূর্ণ সূক্ষ্ম ভাবানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। জীবনের সহজ সুন্দর দিকটাকেই তিনি রূপ, রস ও মাধুর্যে ভরিয়া দিয়াছেন। সমস্যা কণ্টকিত জটিলতাকে পাশ কাটাইয়া গিয়া মধুর রস স্মৃষ্টির দিকেই তিনি বিশেষ করিয়া দৃষ্টি দিয়াছেন।

"একটি মেহেদী পাতায়" পাতার বাহিরের সবুজ আর ভিতরের লাল রঙের সঙ্গে বাদশাদীর বাহির ও অন্তরের দুটি রূপ অপরূপ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী"তে একটি তরুণ ব্রহ্মচারীর বৈরাগ্য বনাম রূপতৃষ্ণার বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে কাহিনী দানা বাঁধিয়াছে, যদিও কাহিনী এখানে গৌণ কিন্তু সরল ভাষ্যময় বর্ণনায় সে কথা একবারও মনে হয় না।

"চুড়িওয়ালা" গল্পটি বাৎসল্য রসে মধুর ও করুণ। 'ফুলওয়ালী' গল্পে প্রকৃত প্রেমই যে প্রকৃত ত্যাগ করিতে শিক্ষা দেয় এ কথাটিই বড় হইয়া উঠিয়াছে।

"বায়ু বহে পূরবৈয়াঁ" গল্পটিতে মুচির ছেলে কানুর মেয়ে স্কুলের গাড়ীর সহিসের কাজ লইবার পর বিভা নামে একটি মেয়ের প্রতি তার আসক্তি ও তাহাকে কেন্দ্র করিয়া তাহার মনের রং বে-রঙের খেলা পাত্রগত অসমতা থাকা সত্ত্বেও যে বিচিত্র পথ ধরিয়া আনাগোনা করিয়া শেষ অধ্যায়ে উপনীত হইয়াছে তাহাতে কিছুটা অসঙ্গতি থাকিলেও ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে কানুর চরিত্রের বিভিন্ন দিকগুলি যে ভাবে দেখান হইয়াছে তাহা মনকে দোলা দেয়।

ইহা ছাড়া সতীন, মা, মেয়ো, মমতার মূল্য ও অন্যান্য গল্পগুলির মধ্যেও লেখকের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

ভূমিকায় ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিকই বলিয়াছেন যে, "রবীন্দ্র পরবর্তী গল্প লেখকদের মধ্যে একমাত্র চারুচন্দ্রই রবীন্দ্র-রীতির প্রত্যক্ষ অনুসরণে সাহসী হইয়াছিলেন। আর সকলে রবীন্দ্রনাথ হইতে নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করিয়া তাঁহার প্রতিভা-বিচ্ছুরিত জ্যোতির্মণ্ডলকে সভয়ে পরিহার করিয়াছিলেন। বাংলা দেশে রবীন্দ্রনাথের কাব্যানুকৃতি যতটা ব্যাপক ভাবে হইয়াছিল তাঁহার ছোটগল্পের অনুসরণ সে তুলনায় অতি সামান্যই হইয়াছে। সেই দিক দিয়া আপেক্ষিক অসাফল্য সত্ত্বেও চারুচন্দ্র বিরল ব্যতিক্রমের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হইবার দাবী রাখেন।"

জানি না বর্তমান যুগের পাঠক সমাজ চারুচন্দ্রের এই সঙ্কলনটিকে কি ভাবে গ্রহণ করিবে। সৌন্দর্যবোধ, রুচিবোধ আজ পাল্টাইয়াছে বলিয়াই ভয়ে ভয়ে অত্যন্ত সংকোচের সহিত কথাকটি বলিতেছি—যদিও মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে, সত্যিকার সাহিত্য সৃষ্টি ব্যর্থ হইবার নয়—বিনাশ হইবার নয়।

ভালবাসার ইতিকথা—শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী। গ্রন্থম্। কলিকাতা—৬। দাম দু' টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বাংলা দেশে যে কজন মুষ্টিমেয় হাস্যরসাত্মক লেখক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন শিবরামবাবু তাঁহাদের মধ্যে একজন। আলোচ্য পুস্তকখানি গল্প গ্রন্থ। এতে তেরটি গল্প আছে। শিবরাম বাবুর নিজস্ব বিশিষ্ট ভঙ্গীতে লেখা গল্পগুলির মধ্যে প্রচুর হাস্যরসের খোরাক পাওয়া যায়। হাসি ঠাট্টার মধ্যেও ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কশাঘাতগুলি সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গুটিকয়েক গল্প খুবই উপভোগ্য হইয়াছে। কিন্তু "মধুরেণ সমাপয়েৎ" গল্পটিতে লেখক মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছেন। আর একটু সংযমের পরিচয় দিলে তিনি ভাল করিতেন।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

ট্রেড ইউনিয়নিজম্—সম্পাদক প্রতাপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ওয়ার্কার্স পাবলিকেশন হাউস প্রাইভেট লিঃ, ২০, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১। মূল্য ৩৲ পৃষ্ঠা ৮৪।

শ্রমিক-সঙ্ঘ সম্পর্কিত পুস্তক। লেখক বলেন যে, শ্রমিক আন্দোলনের মূলগত প্রশ্ন ও আদর্শ নিয়ে মৌলিক গবেষণা, তথ্যপূর্ণ

LIFEBUOY
SOAP
ইফ বয় যেখানে
স্বাস্থ্যও সেখানে!
আঃ! লাইফবয়ে স্নান করে কি আরাম! আর স্নানের পর শরীরটা কত ঝরঝরে লাগে!
ঘরে বাইরে ধুলো ময়লা কার না লাগে—লাইফবয়ের কার্য্যকারী ফেনা সব ধুলো
ময়লা রোগ বীজাণু ধুয়ে দেয় ও স্বাস্থ্য রক্ষা করে। আজ থেকে আপনার
পরিবারের সকলেই লাইফবয়ে স্নান করুন।
L. 16-X52 BG

আলোচনা বা বাংলা ভাষায় পুস্তক প্রকাশের ধারাবাহিক কোন প্রচেষ্টা আজও সম্ভবপর হয় নি। এই উক্তির মধ্যে কিছুটা সত্য অবশ্য আছে। কারণ এরূপ তথ্যপূর্ণ আলোচনা সংবাদ ও সাময়িক পত্রে বহু হইয়াছে এবং হইতেছে কিন্তু পুস্তকাকারে অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা ভাষায় এই দৈন্য যাহারা দূর করিতে চান তাহাদের প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসার্হ।

বর্তমান গ্রন্থে লেখক তিনটি অধ্যায়ে শ্রমিক আন্দোলনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়াছেন। যে সকল দেশে ব্যক্তি-স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় এবং যে সকল দেশে একনায়কত্বের প্রভাব এই উভয় দেশের শ্রমিক আন্দোলনের বিভিন্ন রূপ ও ইহার তাৎপর্য্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু পুস্তক রচনার সাধারণ নিয়মগুলির প্রতি লক্ষ্য না রাখার দরুণ বহু পুনরুক্তি দোষ ঘটিয়াছে। ইহাতে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার সম্ভাবনা। ইহা ব্যতীত বহু ইংরেজী শব্দের অপ্রচলিত ও স্বল্প প্রচলিত বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় আলোচ্য বিষয় বুঝিতে অসুবিধা হয়। পাশ্চাত্ত্যের এবং ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের বিষয় সংক্ষিপ্ত আকারে দিলেও পুস্তক তথ্যপূর্ণ সুখপাঠ্য হইত। কোন তথ্য না দিয়া কেবল তত্ত্ব বা থিয়োরীর উল্লেখ করিলে যে অস্পষ্টতা হয় এই পুস্তকে তাহা হইয়াছে। এরূপ পুস্তকে পরিভাষা, বিষয়সূচী ও গ্রন্থপঞ্জী দিলে এবং শ্রমিক আন্দোলনের মত সুন্দর আলোচ্য বিষয়টি যথাযথভাবে লিখিত হইলে বাংলা ভাষার একটা অভাব দূর হইত সন্দেহ নাই। ছাপা বাঁধাই ভাল। মূল্য বেশী বলিয়া মনে হয়।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

দুই কবি—শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীভার্গব, ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন। কলিকাতা ৬। মূল্য ৪·৭৫ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি দুই কবি-মনীষী রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দের কাব্য-ধর্মের প্রতি গ্রন্থকারের মূল্যবান বিচার বিশ্লেষণ। কবি শুধু স্রষ্টাই ন'ন, কবি দ্রষ্টা। তিনি জীবনকে প্রত্যক্ষ করেন, ধ্যান-নিমীলিত নয়নে জগৎ নিরীক্ষণ করেন। সাধক হইয়াও তিনি যোগী। একই যুগের দুই শ্রেষ্ঠ কবি, বোধি-চেতনায় দীপ্ত। গ্রন্থকার বলিয়াছেন, ইহা তুলনামূলক সমালোচনা নয় অথবা রবীন্দ্র-অরবিন্দের ভাবধারার সমন্বয় চেষ্টাও নয়।

তবে কি? তিনি দেখাইয়াছেন, দুইজনের সাধনা কত উচ্চ-স্তরে উঠিয়াছে। সেই ঊর্দ্ধলোক হইতে কবি নিরীক্ষণ করিতেছেন, ঈশ্বরের সৃষ্টি-বৈচিত্র্য। এই প্রত্যক্ষ করাই কবির জীবন-ধর্ম। গ্রন্থকার এখানে একটি প্রাচীন কবির উক্তি দিয়া বলিয়াছেন—

"প্রাণের দেবতা আমাকে চোখ দিয়ো, আবার দিয়ো প্রাণ, দিয়ো তেজ, উদয়ন্ত সূর্যকে আমি দেখবো, আমাকে শক্তি দিয়ো। মায়ের কোলে জন্মগ্রহণ করেই আমরা চোখ মেলি আলোর রাজ্যে, ধ্বনির জগৎ শুনি। আমরা শুধু বাঁচতেই চাই না, জানতেও চাই, প্রকাশ করতেও চাই—I exist, I know, I express—যা আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বোধের সীমার মধ্যে তা নয়—যা আমার কাছে অস্পষ্ট, যা আমার শুধু অবচেতনে নেই, অধিচেতনেও আছে।"

রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি ন'ন—অসাধারণ কবি। এরূপ প্রতিভা জগতে আজও আসে নাই। যশোত্তীর্ণ হওয়াটাই কাব্যের বড় কথা নয়, বড় কথা হইল, আত্ম-আবিষ্কার এবং সেই আনন্দ উপভোগ অথচ আস্বাদেরই সহোদর।

শ্রীঅরবিন্দকে আমরা বুঝিবার স্পর্দ্ধা করি না। গ্রন্থকারও সে কথা বার বার বলিয়াছেন। তথাপি তিনি রবীন্দ্রনাথকে এক জায়গায় আনিয়া মিলাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। যেমন তিনি বলিয়াছেন, "পৃথিবীকে ভুলে গিয়ে কেউ শুধু সূর্যকে দেখল, তার সূর্যদর্শন নিশ্চয় সত্য। কেউ সূর্যের আলোকে পৃথিবীকেও দেখল, তার সূর্যদর্শন কিন্তু সত্যতর। আর যে পৃথিবীর অণু-পরমাণুতে সূর্যের তেজক্রিয়াকে অনুভব করল, তার সূর্যদর্শন সত্যতম। মহাসাধক মহাকবি শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আত্মিক পরিচয় তাই ক্ষীণ নয়। কাব্যজগতে তাঁরা অবিভক্ত এক পথের পথিক—"

কাব্য তো শুধু "কতকগুলি কথার সমষ্টি নয় বা ছন্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ নয়, বা রচনাশিল্পীর বৈচিত্র্যই নয়, ভাবে ভাষায় ঝংকারে ধ্বনিতে বর্ণবৈচিত্র্যে উপমায় গভীরতম রহস্যে তথ্য ও তত্ত্বের সমবায়ে একটি আন্তর অনুভূতির চিত্র।"

এই আন্তর অনুভূতির পরিচয় পাই আমরা এই দুই কবির মধ্যে। দুজনেই একই পথের পথিক। দুজনেই চলিয়াছেন অমৃতের সন্ধানে। "কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের কাছে—মাটির ভাণ্ডে শুধু অমৃতবারিই শুধু নেই—মাটিই মূলে অমৃত—তাকে শুধু রূপান্তর

করে নিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু অমৃতের সে পরিচয়কে সম্পূর্ণ করতে চান নি—তিনি পথিক কবি, হিতির মন—চলার পথের পথিক—সে পথও অনন্ত ঊর্ধ্বের পথ, কিন্তু তাঁর নৈবেদ্য পূর্ণের কাছে অসম্পূর্ণ রাখছেন। তবে মানবীর আবেদনের কাছে সে অতীপ্সা অপূর্ব—চাইতে চাইতেই যাব এই হলো তাঁর কামনা। চৈতন্যে তাঁর মন্ত্র—'

এক দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে, এই চলাই তো সাধনা।

"যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে, রূপ হতে রূপে

ক্রমশঃ এই সৃষ্টিই রূপলোকের সীমা ছাড়িয়ে অপরূপ রসলোকে পৌঁছয় এবং শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় সেই প্রত্যন্ত দেশ অতিক্রমণেরই অনুরূপ সংগীত মন্ত্রমুগ্ধ ভাবে অন্তরাত্মার সত্যরূপের জ্যোতি ও ধ্বনি মানবজীবনের সূক্ষ্মতর প্রকাশের মধ্যে নব নব নিগূঢ় অর্থ আনিয়া পৌঁছাইয়া দেয়।...কবি শ্রীঅরবিন্দের বা রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্যক বিচার করবার আগ্রহ যাঁদের হবে তাঁদের এই মূল সূত্রটি পূর্বেই হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। তাঁদের জীবনের, তাঁদের সাধনার, তাঁদের কাব্যের ভিত্তি এই পার্থিব রসে এই মাটির পৃথিবীতে—ইহৈব—এইখানে এই কাম-কামনা-ক্লেদের মধ্যেই লুকিয়ে আছেন যিনি বীজে, প্রকাশে, সীমায়, রূপে—

কিন্তু মাটিতে যে জীবনের আরম্ভ, আকাশে তার সমাপ্তি। বৈরাগ্য সাধনেই মুক্তি এই শেষ কথা নয়। তাঁদের কবি-জীবনের প্রথমে তাই এই মাটি, আলো, বাতাস, মানুষের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় পাই এবং পরের জীবনের সাধনাতেও এই মূর্ত রূপটিও বোধ।"

দুজনকে জানিবার এই সংক্ষিপ্ত পরিচিতি—গ্রন্থকার এক কথায় সুন্দর ভাবে ফুটাইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ যেখানে তৃষার জন্য কাঁদিতেছেন—'কোথায় আলো, কোথায় আলো, ভিতর বাহির কালোর কালো—" গ্রন্থকার বলিতেছেন, "শ্রীঅরবিন্দ এর মূল রহস্যে গেলেন—কেন এই কান্না —because a subtler and vaster life is in birth".

কিন্তু এই অনুসন্ধিৎসায় কাব্য-ধর্ম কি ব্যাহত হইতেছে না?

'সাবিত্রী' কবি শ্রীঅরবিন্দের কাব্যের শেষ পরিণতিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহাকে বুঝিতে হইলে, সেই ভাবে ভাবিত হইতে হইবে। সাবিত্রীর মর্মকথা গ্রন্থকার অতি সহজ কথায় বুঝাইয়াছেন। ভাষার জটিলতা বা তত্ত্বের গভীরতা গ্রন্থকারের হাতে পড়িয়া অন্য রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। কবি সেখানে শুধু শিল্পী নন, ঋষি। দুজনেরই প্রত্যক্ষানুভূতি আপন আপন ভাবধারায় ব্যক্ত হইয়াছে। দুই কবি আমাদের কাছে যে পরিচিতি লইয়া আসিলেন তাহা অমৃতের সাধনা। গ্রন্থকারের কথায় বলি, "অগ্নির সাধনাই আলোর সাধনা, আলোর সাধনাই অমৃতের সাধনা। শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ সেই প্রাচীন কবিদের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী।"

শ্রীগৌতম সেন
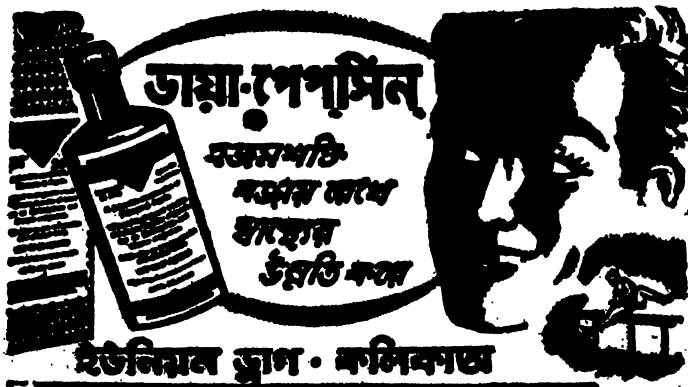
দেশ-বিদেশের কথা

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিষ্ণুপুর শাখা ও তদীয় সংগ্রহশালা "আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে"র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান

গত ২১শে বৈশাখ সকালে একটি ভাবগম্ভীর পরিবেশে মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনির মধ্যে ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবীর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিষ্ণুপুর শাখা ও তদীয় সংগ্রহশালা "আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে"র ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। সঙ্গীতাচার্য শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার পত্নীর সুমধুর দ্বৈত সঙ্গীতের দ্বারা সভার উদ্বোধন হয়। বয়োবৃদ্ধ এই গায়কের কণ্ঠনিঃসৃত উদাত্ত সঙ্গীতে সভায় একটি অপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

প্রাচীন সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র বিষ্ণুপুরে স্বাগত জানাইয়া শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবীরকে পরিষৎ শাখার পক্ষ হইতে একটি অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হয়। পরিষৎ শাখার অভিনন্দনের উত্তরে শ্রীযুক্ত কবীর বলেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিষ্ণুপুর শাখার এই সভায় উপস্থিত হইয়া সাহিত্যের মধ্য দিয়া সকলের সঙ্গে একটি প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপন করিতে পারিয়া তিনি আনন্দিত। তিনি বলেন সাহিত্যের অর্থ সংযোগ বা মিলন। দেশে দেশে, কালে কালে, যুগে যুগে মিলন। সাহিত্য সর্বজনের মিলন ক্ষেত্র। শুধু ভাষার প্রকাশই সাহিত্য নহে, ব্যাপক অর্থে সঙ্গীত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। পূর্বে লোকে সাহিত্য বলিতে সঙ্গীতকেও বুঝিত। প্রায় আড়াই শত বৎসর হইল সাহিত্য ও সঙ্গীতের মধ্যে প্রভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। সাহিত্য ও সঙ্গীতের মধ্যে সৃষ্ট এই প্রভেদের পক্ষে এবং বিপক্ষে নানা মত বর্তমান। সঙ্গীতের সহিত মিলনে ব্যাপক সাহিত্যই সর্ব মানবের মিলন ক্ষেত্র। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার প্রকৃতিগত দুইটি বিশিষ্ট-ধারা আমাদের সাহিত্যে মিলিত হইয়াছে। একটি অন্তর্মুখী—অপরটি বহির্মুখী। তাঁহার রচিত "বাঙলার কাব্য" গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন উক্ত পুস্তকে তিনি এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিদের প্রসঙ্গে, তিনি, তাঁহাদের গভীর কথা সহজ করিয়া বলিবার আশ্চর্য ক্ষমতার উল্লেখ করেন। সঙ্গীত এবং সাহিত্যের মিলনে বিষ্ণুপুর ঐতিহ্যময়। এখানের সাহিত্য পরিষদ সেই মিলনের কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠুক, তিনি ইহাই কামনা করেন। পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত আকাদামীর অধ্যক্ষ মাননীয় শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একখানি সুন্দর রবীন্দ্র সঙ্গীতের পর অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। অনুষ্ঠানের পর শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবীর পরিষৎ শাখায় রক্ষিত পুরাবস্তুগুলি পরিদর্শন করেন। পরিষৎ শাখার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত কবীরকে মল্লভূমের বিভিন্ন প্রাচীন কীর্তির আলোকচিত্র সম্বলিত একখানি এ্যালবাম উপহার দেওয়া হয়।

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য

(বটবৃক্ষমূলে ভাবাবিষ্ট শ্রীনিবাসের সহিত নরহরি ও রঘুনন্দন দাসের সাক্ষাৎ)

শ্রীনৃপেন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

দুটি পাতা একটি কুঁড়ি
ফটো শ্রীরমেন বাগচী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬০শ ভাগ
১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৬৭

৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

দায়িত্বজ্ঞান আছে কাহার ?

লেখা শেষ করিবার মুখে পরে পরে দুইটি ঘোষণার সংবাদ দুই দিনে আসিল। উহার মধ্যে প্রথম ঘোষণা ছিল শ্রী নেহরুর বেতার ভাষণের মধ্যে এবং দ্বিতীয়টি একটি সরকারী অর্ডিনান্সের রূপে।

শ্রী নেহরুর ঘোষণায় আমরা পাইতেছি এই কথা যে, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ম্মচারীদিগের প্রস্তাবিত সাধারণ ধর্ম্মঘট "দায়িত্বজ্ঞান শূন্যতার পরিচায়ক ও অযৌক্তিক" হইবে। কেন হইবে সে কথা তিনি তাঁহার ভাষণে আরও বিস্তারিত ভাবে বলেন :

শ্রী নেহরু বলেন, ভারত যখন গুরুতর সীমান্ত সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে, তখন সাধারণ ধর্ম্মঘটের অর্থ হইতেছে জাতীয় প্রচেষ্টাকে বানচাল করা। যে কোন সাধারণ ধর্ম্মঘটই দেশের মধ্যে ধ্বংসাত্মক শক্তিকে সক্রিয় করিয়া তুলিবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্য্যকরী করা সম্পর্কে সরকার এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রতিনিধিদের যুক্ত আলোচনার ব্যবস্থা করার জন্য সরকার প্রস্তুত রহিয়াছেন।

প্রস্তাবিত ধর্ম্মঘট পরিহার করার জন্য সনির্বন্ধ আবেদন জানাইয়া প্রধানমন্ত্রী বলেন, সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের শান্তিপূর্ণ আলোচনার অন্য পথ অবলম্বন করা উচিত। আমাদের যে সব দেশবাসী ভারতের সীমান্তে পাহারা দিতেছেন, তাঁহাদের কথা উল্লেখ করিয়া শ্রী নেহরু বলেন, আমাদের সমর্থন ও সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া আমাদের যে সব দেশবাসী উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর অবস্থান করিয়া প্রহরীর কাজ করিতেছেন, তাঁহাদের কথা আমাদের মনে রাখা উচিত।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, কর্ম্মচারীদের দাবি মানিয়া লওয়া হইলে মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতাকে উৎসাহ দেওয়া হইবে। কর্ম্মচারীরা আপাতদৃষ্টিতে লাভবান হইবেন বলিয়া যে কথা মনে করা হইতেছে, মূল্যবৃদ্ধির ফলে তাহা বিলুপ্ত হইবে এবং দেশের তৃতীয় যোজনার রূপায়ণের ক্ষমতাও হ্রাস পাইবে।

শ্রী নেহরু দেশবাসীকে একথা স্মরণ রাখিতে বলেন যে, প্রস্তাবিত ধর্ম্মঘটের ফলে দেশের প্রতিরক্ষা ও অর্থনীতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে এবং দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের ভবিষ্যৎ এবং উহার অস্তিত্ব যখন বিপন্ন তখন লাভ-লোকসানের কোন প্রশ্ন উঠে না। প্রস্তাবিত সাধারণ ধর্ম্মঘট সাধারণ শ্রমিক-মালিক বিরোধ নহে। উহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের। উহাতে কাহারও কল্যাণ হইবে না, উহার ফলে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হইবে।

শ্রী নেহরু তাঁহার লাদক সীমান্ত পরিদর্শনের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, একদিকে দেশরক্ষার জন্য সৈন্যদের মৃত্যুবরণের সঙ্কল্প আর অন্যদিকে এই সাধারণ ধর্ম্মঘটের প্রস্তাব, এই দুইয়ের মধ্যে কোনরূপ সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ধর্ম্মঘটের ফলাফল সম্বন্ধে সকলকে বিবেচনা করিতে বলিয়া শ্রী নেহরু স্পষ্টই এ কথাও বলেন।

"আমরা জানি যে, আমাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক এমন

লোক আছেন যাহাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ বা দেশ-প্রেম বলিয়া কিছু নাই এবং আমাদের দেশ দুর্বল হইয়া পড়িলে তাহারা আনন্দিতই হইবেন।"

ঐ ভাষণের পরের দিনই আসিল অর্ডিনান্স জারীর ঘোষণা। অর্ডিনান্সে ডাক, তার, রেল, বিমান, প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা ইত্যাদির কাজকে অত্যাবশ্যকীয় বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে এবং উক্ত সকল কার্যে নিযুক্ত কর্মচারী-দিগের ধর্মঘট নিষেধ করা হইয়াছে এবং ধর্মঘটের প্রচার, সাহায্যদান বা উস্কানি দেওয়াও নিষেধ করা হইয়াছে। দণ্ডের ব্যবস্থা ইত্যাদিও জানানো হইয়াছে।

অবস্থা এখন অতিশয় উদ্বেগজনক সুতরাং এ বিষয়ে আলোচনা ও বিচার অত্যন্ত স্থিরভাবে করা প্রয়োজন, কিন্তু প্রশ্ন এই যে, বিচার কার হাতে? শ্রী নেহরু দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কথা যাহা বলিয়াছেন সে বিষয়েও প্রশ্নের অবকাশ রহিয়াছে যে, দায়িত্বজ্ঞান আছে কোথায় এবং কি ভাবে তাহার প্রকাশ, আমাদের মত সাধারণ লোকের কাছে।

এই ধর্মঘটের ব্যাপারে আমরা দায়িত্বজ্ঞানের কথা বা কর্তব্যজ্ঞানের কথা এই প্রথম শুনিতেছি। কেননা দেশ এখন যে ভাবে চলিতেছে তাহাতে জনসাধারণের অবস্থা উলুখড়ের মত অসহায় ও প্রাণহীন।

রেলমন্ত্রী ত বিদেশে "শুধু অকারণ পুলকে" ঘুরিয়া আসিলেন, তিনি কি বিদেশযাত্রার পূর্বে ধর্মঘটের কাণাঘুষাও শুনেন নাই? যদি তিনি জানিতেন তবে এ ভাবে যাওয়া কি দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয়? ধর্মঘট যাহারা ঘোষণা করিয়াছেন তাঁহাদের দায়িত্ব-জ্ঞানের অভাবের কথা তো শ্রী নেহরু সবিশেষ বলিয়াছেন কিন্তু একথা কি ঠিক নহে যে, সারা দেশে যে অভাব ও অসন্তোষের বন্যা চলিতেছে তাহার মূলে রহিয়াছে চোরাকারবার ও কালোবাজারজনিত দুর্মূল্যতার প্রবাহ? আজ এতদিন ধরিয়া দেশের রক্ত শুষিয়া খাইতেছে যাহারা এবং সমস্ত নিত্য-প্রয়োজনীয় বস্তুতে ভেজাল দিয়া আবালবৃদ্ধবনিতার দেহমন বিষাক্ত করিতেছে যাহারা তাহাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা করিয়া-ছেন নেহরু সরকার? কি দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন সরকার বাহাদুর দুর্নীতি দমনে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায়?

দেশ ত দাঁড়াইয়াছে কতকগুলি দায়িত্বজ্ঞানশূন্য স্বার্থ-সর্বস্ব রাষ্ট্রনৈতিক দলের ক্ষমতা পরীক্ষার প্রাঙ্গণ হইয়া। জনসাধারণ অর্থাৎ দেশের শতকরা ৯৯ জন আছে যেন গড্ডলিকাসমষ্টির ন্যায় শুধু তাহাদের স্বার্থপূর্তির জন্য। সুতরাং সেদিকে কে কাহাকে দোষ দিবার অধিকারী?

অবশ্য এখানে আর একটা প্রশ্ন আসিয়াছে সেটা দেশদ্রোহিতার। শ্রী নেহরু যাহাদের কথা বলিয়া-ছেন সে বিষয়ে অন্য ক্ষেত্রেও একটা আভাস পাওয়া গিয়াছে ধ্বংসাত্মক প্রচেষ্টার। আসামের অমানুষিক বর্বরতার পিছনে ভাষা আন্দোলন ছাড়াও আর কিছু আছে এই সংবাদ কলিকাতার এক ইংরেজী সংবাদপত্রের দিল্লী প্রতিনিধি পাঠাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ঐ ভাষা আন্দোলন সংক্রান্ত ব্যাপারে কম্যুনিষ্ট পার্টি ও আর-এস-পির কার্যকলাপ সন্দেহজনক বলিয়া মনে হয়। এই অভিযোগ যদি সত্য হয় তবে তাহার ক্ষমা নাই।

কিন্তু সেদিকেও বলিতে হইবে যে, আসামে কংগ্রেসী সরকারের দায়িত্বজ্ঞানেরও পরিচয় আমরা পাই নাই এবং তাঁহাদের দলের লোক যে এই বিষ ছড়ানোর ব্যাপারে দোষমুক্ত একথা কোন মতেই গ্রাহ্য নয়।

সরকার যদি জনসাধারণের জীবনযাত্রার পথ সরল ও সহজ করিতে চেষ্টিত হইতেন, যদি এই বড় বড় পরি-কল্পনার পিছনে জনকল্যাণের আন্তরিক উদ্দেশ্য ও চেষ্টা প্রকট হইত তবে শ্রী নেহরুর আবেদনের কোন যুক্তি থাকিত। তাঁহার এই আবেদন কাহার কাছে, অসহায়, অসমর্থ, বিভ্রান্ত ও ক্লিষ্ট জনসাধারণের কাছে, না তাঁহাদের রাষ্ট্রচালনার অধিকারে প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য দল-গুলির কাছে?

জনসাধারণ কোনও দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় পায় নাই কাহারও কাছে। দুই পক্ষই ক্ষমতালোলুপ ও দলগত স্বার্থের চিন্তায় জনকল্যাণের বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। এ বিষয়ে কর্মীসঙ্ঘগুলির ভূমিকাও ঠিক একই প্রকার। তাঁহারাও জনসাধারণের প্রতি একই প্রকার অবহেলা দেখাইতেছেন। এটার ফলাফল কি হয় তাহা বুঝিতেছে ইংলণ্ডের লেবার পার্টি। তাহারাও এইভাবে জন-সাধারণের সহিত যোগসূত্র কাটাইয়াছে।

আমাদের বক্তব্য এই যে, ধর্মঘটকারিগণ কেন ৪০ কোটি ক্লিষ্ট জনসাধারণ হইতে পৃথক অধিকার লাভের যোগ্য, সেকথা তাঁহাদের নেতৃবর্গের আরও বিশদ ভাবে সাধারণকে জানান উচিত। সরকারের ত্রুটি বলিয়া যে অভিযোগ আমরা অহোরাত্র করিয়া থাকি, সেই ত্রুটিগুলির অনেকাংশ কি ঐ সতেরো লক্ষের অবহেলা-জনিত নহে? তাহা না হইলে এবং যদি তাঁহাদের দাবীর সহিত সাধারণজনের কল্যাণপ্রসূ কিছু সর্ত থাকিত তবে আমরা সর্বান্তকরণে তাঁহাদের সমর্থন করিতে পারিতাম।

আসাম

আসাম বঙ্গের উত্তর-পূর্ব্বে ভারতের প্রদেশগুলির অন্তর্গত একটি প্রদেশ। এই প্রদেশের মধ্যে যে সকল জেলা বৃটিশ আমল হইতে অঙ্গীভূত আছে সেই সকল জেলা প্রাচীনকাল হইতে বিভিন্ন ভাষাভাষী অধিবাসীদের দ্বারা অধিকৃত। প্রদেশের নাম আসাম হইলেও আসামী ভাষা এই প্রদেশের সর্ব্বত্র কথিত নহে এবং আসামী জাতির অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অবস্থাহেতু তাহাদের ভাষা অপরাপর আসামবাসীরা নিজেদের মানসিক উৎকর্ষের জন্য শিখিবার চেষ্টা করে নাই। আসামী ভাষা অনেকটা বাংলাভাষার অনুরূপ, আবার তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও আছে। আসামের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় এক কোটি। ইহার মধ্যে অর্দ্ধেকের কিছু অধিক লোক আসামী ভাষা ও তাহার অপভ্রংশ সকল ব্যবহার করিয়া থাকেন। আসামের সহিত বাংলা ভাষাভাষী জেলা সংযুক্ত করাতে প্রায় কুড়ি লক্ষ আসামীর বাংলা মাতৃভাষা। আরও কুড়ি লক্ষের অধিক আসামী আদিম পার্ব্বত্য জাতির ও তাঁহাদের কথিত মাতৃভাষা খাসিয়া, আবর, মিসমি, মিকির, গারো প্রভৃতি জাতির। এই সকল জাতির শিক্ষিত জনসমাজে অনেকে বাংলা ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন। আসামী ভাষা শিক্ষা ইঁহাদের মধ্যে প্রচলিত নহে। সাধারণভাবে দেখিলে বলা যায় যে, আসামের অর্দ্ধেক লোক আসামী ভাষাভাষী ও অপর অর্দ্ধেক বাংলা ও পার্ব্বত্য জাতিদের ভাষাভাষী। আসামী ভাষাতে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতির শিক্ষা ও আলোচনা উৎকৃষ্টভাবে এখনও চলে না। অর্থাৎ এই ভাষা সুসংস্কৃত ও সুগঠিত নহে। ১৯৫৪ খ্রীঃঅব্দে প্রেস কমিশন যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন তাহাতে মাত্র ১১টি আসামী ভাষার দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক সংবাদপত্র ও পত্রিকার নাম ছিল। অন্যান্য ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষায় ৫৭৯টি ছিল ও তামিলে ৩২৩টি এবং পাঞ্জাবী ভাষায় ১২৫টি। আসামীর স্থান সর্ব্বনিম্নে ছিল। বর্ত্তমানেও আসামী ভাষা সেই অবস্থাতেই আছে। দেশ হিসাবে আসামে ১৮টি সংবাদপত্র ইত্যাদি প্রকাশিত হইত এবং পঃ বাংলাতে হইত ১০০৯টি। আসামে তাহা হইলে আসামী ভাষাতে ১১টি ও অপরাপর ভাষাতে ৭টি সংবাদপত্র বাহির হইত। বাংলা দেশের ইংরেজী পত্রিকার সংখ্যা বাংলার প্রায় সমান সমান ছিল। আসামী ভাষাভাষীরা নিজ ভাষার উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা কখনও করেন নাই এবং সেই কারণে তাঁহাদের মাতৃভাষার এই অনুন্নত অবস্থা।

বর্ত্তমান ভারতে অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষায় ও কৃষ্টিতে অনুন্নত জাতিদের মধ্যে একটা বিশেষ অন্যায় অহঙ্কার লক্ষ্য করা যায়—ইহা ভাষা লইয়া। বিহারে যেমন কেহই সত্যকার হিন্দী ভাষাভাষী নহেন। কেহ মৈথিলী, কেহ মাগধি ও কেহ ভোজপুরী ভাষা বলেন। ইহা ব্যতীত বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া যে সকল জেলা বিহারে যুক্ত করা হইয়াছে সেইগুলিতে বাংলা ভাষা ও ঝাড়খণ্ডের বহু আদিম ভাষাও ছোটনাগপুরে প্রচলিত আছে। বিহারের কর্তারা কিন্তু হিন্দীভাষা লইয়া জোর-জুলুম করিয়া বিহারবাসী বহু বাঙালী ও আদিম জাতির লোকেদের সহিত দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদের সুনাম হয় নাই এবং হিন্দীভাষারও প্রচার জুলুমের অখ্যাতিতে কলুসিত হইয়াছে। যাঁহাদের মাতৃভাষা হিন্দী, সেই উত্তর প্রদেশের লোকেরা কিন্তু হিন্দী গিলাইবার জন্য কাহারও গলা চাপিয়া ধরেন নাই। বিহারের নেতারা নিজ মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া হিন্দী অবলম্বন করিয়া এখন লাঙ্গুলহীন শৃগালের ন্যায় অপর জাতীয় বিহারবাসীর উপর হিন্দী লইয়া জুলুম আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদের ও হিন্দীভাষার সম্মান বৃদ্ধি হয় নাই।

আসামীরা এখন আসামী ভাষা লইয়া খুব খুনাখুনি সুরু করিয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা, বাঙালীদের মারিয়া ফেলিলেই আসামী ভাষা উন্নত হইয়া জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। নিজেরা নিজেদের মাতৃভাষার প্রতি কর্ত্তব্য না করিয়া অপরকে মারিয়া সে কর্ত্তব্য সিদ্ধ হইবে বলিয়া তাঁহারা আশা করিতেছেন। এই মনোবৃত্তি যে স্তরের সেখানে সাহিত্য বা সংস্কৃতির স্থান কোথায়? ভারত সরকার এ ক্ষেত্রে একমাত্র আসামকে দুই অথবা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া সমস্যার সমাধান করিতে পারেন। আসামী-প্রধান অংশ ও বাংলা-প্রধান অংশ ভাগ হইয়া যাওয়া প্রয়োজন। আদিম পার্ব্বত্যজাতিদের শাসনকার্য্য ভারত সরকার সাক্ষাৎ ভাবে করিতে পারিবেন। বাংলা-প্রধান অংশ পশ্চিম বঙ্গের সহিত যুক্ত হইবে। বিহারেও ঠিক এইভাবে সিংভূমের পূর্ব্বাংশ (ধলভূম প্রভৃতি), মানভূম ও পূর্ণিয়া পশ্চিম বাংলার সহিত যুক্ত হওয়া প্রয়োজন; এবং কোল, ওরাঁও, মুণ্ডা, হো প্রভৃতির শাসনকার্য্য ভারত সরকারের সাক্ষাৎ ভাবে করা আবশ্যক। অ-শিক্ষিত ও অর্দ্ধ-শিক্ষিত প্রাদেশিক নেতাদিগের বর্ব্বর অহমিকার আক্রমণে ভারতের জাতীয়তা বিনষ্ট হইতে দেওয়া চলিতে পারে না। যাঁহারা ক্ষুদ্র গণ্ডির স্বার্থসিদ্ধির জন্য মিথ্যা, অন্যায় ও নির্দ্দোষের

উপর অত্যাচারে নিযুক্ত হইতে দ্বিধাবোধ করেন না, সে সকল লোকের শাসনে তাঁহাদের গণ্ডির বাহিরের কাহাকেও রাখা উচিত নহে। ভারত সরকারের এখন কর্ত্তব্য নিজ শক্তি বিস্তার করিয়া ক্রমশঃ এই সকল গণ্ডিগুলিকে দমন করিয়া ন্যায়ের ও জাতীয়তার পথে ফিরাইয়া আনা। যে সকল প্রদেশবাসী প্রদেশবিশেষের সংখ্যাগুরু লোকেদের [illegible] নহেন অর্থাৎ অপর জাতীয়, তাঁহাদিগকে প্রদেশগুলির ষড়যন্ত্রকারী ফন্দি ও জুলুমবাজ নেতাদের দাসত্বে নিযুক্ত হইতে দেওয়া ভারত সরকারের কখনও উচিত হইবে না। বর্ত্তমানে আসাম, বিহার প্রভৃতি প্রদেশে ইহাই হইতেছে।

খ

আসন্ন ধর্ম্মঘটের স্বরূপ

আসন্ন ধর্ম্মঘট বন্ধ করিবার চেষ্টা অবশেষে ব্যর্থ হইল। কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ ও কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম্মচারীদের নেতৃবৃন্দের মধ্যে তিন দিন ধরিয়া মীমাংসার যে আলোচনা চলিতেছিল তাহা বন্ধ হইয়াছে। সুতরাং ১১ই জুলাই হইতে এ দেশের ইতিহাসে এক বৃহত্তম ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। ইহার অর্থ হইল, রেলপথ, ডাক, তার অচল হইবে, কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসগুলির সাধারণ দৈনন্দিন কাজ বন্ধ হইবে, সরকারী কল-কারখানা বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির কাজও বন্ধ হইয়া যাইবে এবং ডক, বন্দর ইত্যাদির কর্ম্ম-চাঞ্চল্য স্তব্ধ হইবে। এক কথায়, এই উপলক্ষ্যে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে, তাহাতে জনসাধারণই সকলের চাইতে বিপন্ন হইবার কথা। প্রায় ১৭ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম্মচারী তাঁহাদের বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে যদি কাজ বন্ধ করিয়া দেয়, তাহা হইলে সমগ্র ভারতেই অচল অবস্থার সৃষ্টি হইবে। সুতরাং ইহার গুরুত্ব যেমন অত্যধিক, ইহার পরিণামও তেমনি সুদূরপ্রসারী। এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব একদিনে বা এক বৎসরে হয় নাই। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ম্মচারীগণ—বিশেষ ভাবে নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীগণ সুদীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহাদের অভাব-অভিযোগের কথা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট জানাইয়া আসিতেছেন। সরকার এ সম্পর্কে তদন্তের জন্য দুই বার পে-কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন নাই। বিশেষ করিয়া দুইটি প্রশ্নে উভয় পক্ষ অনমনীয় হইয়া রহিয়াছেন। কর্ম্মচারীদের সর্ব্বনিম্ন মূল বেতনের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মানের সহিত দুর্ম্মূল্য ভাতার সংযুক্তি সম্বন্ধে কোন মীমাংসাতেই আসা সম্ভব হয় নাই। এইগুলি তাঁহাদের মূল দাবি।

শ্রমমন্ত্রী বলিয়াছেন, ইহা মেহনতী মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী। ইহার ফলে শ্রমিক সাধারণ যে দুর্দ্দশায় পতিত হইবেন, তাহা চিন্তা করিয়া তিনি শঙ্কিত হইয়াছেন। এই সময়ে এই ভাবে এরূপ ব্যবস্থার আশ্রয় লওয়া, কোন শ্রমিক নেতারই উচিত নয়।

অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম্মচারীগণ যে দাবি করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষেও যেমন যুক্তি আছে, তেমনি সরকারী পক্ষেরও যুক্তি আছে। সুতরাং সম্ভবমত উভয় পক্ষের কথা বিবেচনা করিয়া আপোষ-মীমাংসা দ্বারা এই বিরোধ মিটানো সম্ভব হইলেই সকলে খুসী হইত।

ধর্ম্মঘটের সমর্থন কেহই করে না। কারণ ইহাতে যে ক্ষতি হয়, তাহার ক্ষত শুকাইতে অনেকদিন লাগে।

গ

আইনের ফাঁকে ভেজাল খাদ্য

গত [illegible] জুন [illegible] তিনটি চাউলের গুদামে পুলিস হানা দিয়াছে। ঐ গুদামগুলিতে নাকি [illegible] চাউলের সঙ্গে অনেক পরিমাণ ভাঙ্গা ও পচা চাউল, ধান [illegible] কাঁকর মিশাইবার চেষ্টা চলিতেছিল। [illegible] এইরূপ পচা চাউল, ধলা কাঁকর [illegible] বস্তা-সংখ্যা ছিল [illegible]। [illegible] ভাল চাউল [illegible]। [illegible] মিশাইতেছিল, তাহাদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক।

এই ব্যাপার লইয়া গত ১০ই জুলাই কর্পোরেশনে একটি সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় খাদ্যে ভেজাল এবং অখাদ্য বস্তু মিশাইবার ব্যাপারে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কেহ কেহ এইরূপ অসামাজিক পাপের প্রতিষেধক ব্যবস্থারূপে অবিলম্বে বেত্রদণ্ড প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করেন। আবার কেহ কেহ বলেন, অবিলম্বে খাদ্যে ভেজাল বন্ধের জন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করা হইলে আগুন জ্বলিয়া উঠিবে এবং বিপ্লব সুরু হইবে।

সভা-কক্ষেই একটি টেবিলের উপর সেই অপরূপ খাদ্যের নমুনা রক্ষিত ছিল। সেই দিকে ডেপুটি মেয়রের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে তিনি বলেন, এ সব এখানে দেখাইয়া কি হইবে। এগুলি যথাস্থানে, অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের নিকট পাঠান হউক। একজন সদস্য ইহাতে উত্তেজিত হইয়া বলেন, পুলিস বলিতেছে এ ব্যাপারে তাহারা কিছুই

হইবে বলা যায় না। শুধু এই কথাটিই পরিষ্কার হইয়াছে যে, চীন কোন সত্য, শান্তি, ভদ্রতা, বন্ধুত্ব, প্রেম, সন্ধি, সর্ত্ত প্রভৃতির দ্বারা আবদ্ধ থাকিতে নারাজ। চীনেরা ছলে-বলে-কৌশলে নিজ মতলব হাসিল করিবেই করিবে, ইহাই তাহাদিগের ধর্ম্ম। এই শঠতার উত্তরে প্রেম ও ধর্ম্মের অভিনয় করিয়া যাওয়া সম্ভব নহে। চীনকে কঠোর ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যে, নেপাল ও ভারত চীনের তিব্বত ধর্ষণের সমর্থন করেন না। তাঁহারা তিব্বতকে তাহার হারান স্বাধীনতা ফিরাইয়া দিবার জন্য চীনকে উপযুক্ত ভাষায় উদ্বুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেই চীনের সহিত ইঁহাদের সত্যকার বোঝাপড়া আরম্ভ হইবে। তিব্বত স্বাধীন না হইলে নেপাল ও ভারতের নিরাপত্তা অসম্ভব।

অ

ভুটানের সীমানা ও তাহার গলদ

গত ১১ই জুন যুগান্তরে 'নেপথ্য দর্শনে' যে সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আমরা বিচলিত না হইয়া পারি না। ভুটানের বর্ত্তমান পশ্চিম সীমানা নাকি যে-ভাবে আমাদের মানচিত্রে অঙ্কিত, তাহাতে আমরা প্রায় ৪০০ বর্গমাইল এলাকা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। গত কয়েক মাস ধরিয়া বহু পরিশ্রম ও তথ্যানুসন্ধান এবং ভারতীয় মহাফেজখানা ও অন্যত্র প্রায় একশত বৎসরের নানা দলিল, সনদ, সন্ধিপত্র ও মানচিত্র ইত্যাদি খোঁজা-খুঁজির পর আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে বাধ্য হইয়াছি যে, বর্ত্তমানে ভারতীয় মানচিত্রে ভুটানের পশ্চিম সীমা-রেখারূপে যে রেখাটি দেখান হয়, সেটি কাল্পনিক এবং তার কোন তথ্যগত, আইনগত কিংবা জরিপ চিহ্নযুক্ত কোন অস্তিত্ব নাই। কাজেই ভারত ও ভুটানের মধ্যে ভুটানের পশ্চিম সীমারেখাটি কৃত্রিম এবং ভুল। দলিল-দস্তাবেজ, সন্ধিপত্র ও পুরানো মানচিত্র সহযোগে এই সিদ্ধান্ত যে কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তির নিকট সপ্রমাণিত হইবে। 'নেপথ্য দর্শনে' দুইটি মানচিত্র এবং সন্ধিপত্র ও অন্যান্য দলিলের বিবরণ সহ যে বিস্তৃত তথ্য পরিবেশন করা হইয়াছে, তাহা এত প্রামাণিক ও গুরুত্বপূর্ণ যে, আমরা জনসাধারণ ও গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করিতেছি।

১৮৬৫ সনের ১১ই নবেম্বর ভুটান ও ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত সিনচুলা সন্ধিপত্রের দ্বারা ভারতবর্ষের সঙ্গে ভুটানের সীমারেখা চূড়ান্তরূপে নির্ণীত হইয়াছিল। তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল ও রাণীর নামাঙ্কিত ঘোষণা-পত্রের মধ্যেও যে বর্ণনা ও অন্যান্য দলিলপত্র রহিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, ভুটানের পশ্চিম সীমানায় ভারতবর্ষের আরও ৪ শত বর্গমাইল এলাকা প্রাপ্য। ১৮৬৫ সনের সন্ধিপত্র এবং ১৮৭৩ সনের সামরিক মান-চিত্রের দ্বারা ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হইবে যে, ভুটানের পশ্চিম সীমানা জলঢাকা নদী পর্য্যন্ত হওয়া উচিত। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, ভুটানের পশ্চিম সীমানা আগাগোড়া জলঢাকা নদীকে অবলম্বন করিয়া থাকে নাই। মধ্যপথে পশ্চিমদিকে পর্ব্বতের ভিতর পর্য্যন্ত সীমানা অপসারিত হইয়াছে এবং জলঢাকা নদী ভুটানের অভ্যন্তরে কবলিত হইয়াছে। কিন্তু আসলে এই এলাকা সম্পূর্ণরূপেই ভারতবর্ষের প্রাপ্য এবং যদি আমরা উহা না হারাই, তবে উহা উত্তর-পশ্চিম কোণার দিকে সরিয়া গিয়া তিব্বত, ভুটান ও ভারতের মধ্যে যে ত্রিকোণাকৃতি সন্ধিস্থল সৃষ্টি করিবে, সেই পর্য্যন্ত আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান সীমানাও প্রসারিত হইবে। অর্থাৎ ১৮৬৫ সনের সিনচুলা সন্ধিপত্র ও ১৮৭০ সনের সামরিক মানচিত্র অনুযায়ী ঐ চারিশত বর্গমাইল এলাকার ত্রিসন্ধিস্থলে জেলাপলা গিরিপথ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং পশ্চিমবঙ্গের সীমানা তিব্বত পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া বিখ্যাত নাথুলা গিরিপথকে আমাদের নাগালের মধ্যে আনিয়া দিবে, যাহা রণনৈতিক কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে জেলাপলা গিরিপথের অধিকার এবং অন্যদিকে নাথুলা গিরিপথের উপর রণনৈতিক কর্ত্তৃত্ব—এই দুইটি প্রশ্নই ভারত, ভুটান ও তিব্বতের অবস্থানের বিবেচনায় সীমান্তের আত্মরক্ষা ও যোগাযোগের পক্ষে অপরিহার্য্য। অথচ ভারতের বর্ত্তমান মানচিত্রে এই অঞ্চলের কিংবা যে সীমানা সন্ধিসূত্রে আমাদের প্রাপ্য, তাহার কোন পাত্তাই নাই। ১৮৭২ হইতে ১৮৯২ সনের মধ্যে এই সীমানায় যথারীতি 'বর্ডার পিলার' স্থাপন করা হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিম সীমানায় কোন চিহ্নিতকরণ কার্য্য হয় নাই। জরিপগত বা গাণিতিক ভিত্তিতে এই সীমানা কখনও দখল করা হইয়াছে, এমন প্রমাণ কোন দলিল দস্তাবেজে পাওয়া যাইবে না। অথচ ভারত সরকারের 'গোপনীয়' মানচিত্রে ও অন্যত্র ভুটান সীমানার 'বর্ডার পিলারের' উল্লেখ আছে। কিন্তু পশ্চিম সীমানায় উহা নাই। ইহার রহস্য কি, এবং কি অজ্ঞাত কারণে ভুটানের পশ্চিম সীমানায় এই বিভ্রাট ঘটানো হইয়াছে? এ দিকে কিছুদিন পূর্ব্বে ভুটানের রাজদরবার হইতে ভারত-ভুটান সীমানাকে আন্তর্জাতিক সীমারেখারূপে চিহ্নিত করিবার দাবি চীন-ভারত সীমান্ত-বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ভুটানের এই সীমান্ত অবস্থা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ।

যদিও সীমানার এই অব্যবস্থিতচিত্ততা ঘটিয়াছে ব্রিটিশ আমলে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হইবার পর, তখন তার সার্ব্বভৌম অধিকার ও সীমানা ব্রিটিশ-আমলের চুক্তিপত্রে সনদ ও সন্ধিপত্র ইত্যাদি অনুযায়ীই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক আইন অনুসারেই আমরা এই সমস্ত সীমানার অধিকারী। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের যাঁরা বর্ত্তমান শাসক, তাঁরা সার্ব্বভৌম ভারত-রাষ্ট্রের আইনসঙ্গত অধিকার লাভ করিয়াও তাঁরা সীমানার প্রশ্নটিকে অমার্জ্জনীয় ঔদাসীন্যে উপেক্ষা করিয়াছেন। পররাষ্ট্র দপ্তরই হউক, আর সামরিক বা অপর কোন দপ্তরই হউক, তাঁরা গত দশ-বারো বৎসরের মধ্যে হিমালয়ের সুদীর্ঘ ও জটিল আড়াই হাজার মাইল সীমানা কখনও গভীর ভাবে ও বিজ্ঞান-বুদ্ধি সহকারে যাচাই করিয়া দেখেন নাই। ঐতিহাসিক দলিল, পুরাতন মানচিত্র ইত্যাদিও অনুসন্ধান করেন নাই। ইহার বিষময় ফল ফলিতে সুরু করিল ১৯৫৯ সনে তিব্বত এবং চীন-ভারত সীমানার বিরোধ উপলক্ষে। লাডাক অঞ্চলে তিন-চার বৎসর আগেই চীনা গবর্ণমেন্ট সড়ক, ঘাঁটি ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমাদের গবর্ণমেন্ট কোনো খবর পর্য্যন্ত রাখিতেন না।

বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে ভারতীয় লোকসভা বা পার্লামেন্টের অপরিসীম দায়িত্ব রহিয়াছে। কারণ ইহা সার্ব্বভৌম ভারতরাষ্ট্রের সীমানা ও ভূমির প্রশ্ন। কিন্তু দায়িত্ব যদি এই ভাবে তাঁহারা পালন করেন, তবে ইহার পরেও ভারতকে অনেক কিছু হারাইতে হইবে। গ

তৃতীয় পরিকল্পনা

প্ল্যানিং কমিশন যে তৃতীয় পরিকল্পনার বিবরণ প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, এই পরিকল্পনা বাস্তবরূপ ধারণের পরে ভারতের আরও প্রায় ৭,০০০ হাজার কোটি টাকা সরকারী হিসাবে ব্যয় হইয়া সম্পত্তি-গত হইবে এবং ব্যক্তিগত হিসাবে মূলধনে নিহিত হইবে ৪,০০০ হাজার কোটি টাকা। বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন দ্বিগুণ হইবে। ইস্পাত উৎপাদন এক কোটি টন পর্য্যন্ত হইবার মত ব্যবস্থা হইবে। খাদ্যবস্তু ১,০০০ হাজার লক্ষ টন উৎপাদিত হইবে। ৬-১১ বয়সের সকল বালক-বালিকার বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা, সকল গ্রামের সহিত বড় রাস্তা অথবা রেলপথের সংযোগ স্থাপন, সকল গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, প্রতি গ্রামে একটি স্কুলগৃহ নির্ম্মাণ, আরও ১৩৫ লক্ষ লোকের চাকুরির ব্যবস্থা ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু ঘটিবে।

পরে বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া দেখান হইয়াছে যে, ২০,০০০ মাইল নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ করা হইবে। ভারতে প্রায় ৫ লক্ষ গ্রাম বড় বড় রাজপথ ও রেল লাইন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে পড়িয়া আছে। এই সকল গ্রাম মাত্র ২০,০০০ মাইল রাস্তা দিয়া অপরাপর শহর ও গ্রামের সহিত সংযুক্ত হইয়া যাইবে কেমন করিয়া? এইক্ষেত্রে হিসাবে কিছু গোলযোগ আছে বলিয়া মনে হয়। ভারতে উপস্থিত ১ লক্ষ ৫০ হাজার মাইল রাস্তা আছে। গ্রাম আছে সাড়ে ছয় লক্ষ। সাড়ে ছয় লক্ষ গ্রাম বড় রাস্তা ও রেল লাইনের সহিত সংযুক্ত করিতে অন্ততঃ ৭।৮ লক্ষ মাইল রাস্তা প্রয়োজন হয়। দুই লক্ষের ও অনধিক মাইল রাস্তা দিয়া সাড়ে ছয় লক্ষ গ্রামের অপরাপর গ্রাম প্রভৃতির সহিত সংযোগ স্থাপন সম্ভব নহে। কারণ ভারতে ১০ লক্ষ বর্গ মাইলের অধিক জমি আছে এবং গ্রামপ্রতি প্রায় ২ বর্গ মাইল স্থান ধরিলে অবশ্য-প্রয়োজনীয় রাস্তার দৈর্ঘ্য অন্ততঃ সাড়ে ছয় লক্ষ মাইলের অধিক হয়।

১৩৫ লক্ষ নূতন চাকুরির মধ্যে যদি অধিকাংশ স্কুল-মাষ্টারী ও সরকারী দপ্তরে চাকুরি হয় তাহা হইলে আমাদের কিছু বলিবার নাই। শুধু অতগুলি মাষ্টার হইবার উপযুক্ত লোক আছে বলিয়া সন্দেহ হয়। তাহা ছাড়া স্কুল-মাষ্টারদিগের বেতন পূর্ণতঃ সরকারী তহবিল হইতে আসিবে। কেননা ছাত্ররা বেতন দিবে না। এক লক্ষ শিক্ষকের বেতন যদি বৎসরে ১০ কোটি টাকা হয় তাহা হইলে ১০ লক্ষ শিক্ষকের বেতন শত কোটি টাকা হইবে। ৫ লক্ষ নূতন স্কুলের জন্য ২০ লক্ষাধিক শিক্ষকের আবশ্যক হইবে এবং বাৎসরিক দুই শত কোটি টাকা বেতনেই ব্যয় হইবে। অপরাপর খরচও কিছু হইবে। ভারত সরকার পাঁচ বৎসরে ১৬৫০ কোটি টাকা নূতন রাজকর হিসাবে সাধারণের নিকট আদায় করিবেন মনস্থ করিয়াছেন এবং ইহার অর্থ বাৎসরিক ৩৩০ কোটি টাকা নূতন করিয়া আদায় হইবে। ইহার দ্বারা গঠনের মূলধনের কাজ হইবে। নূতন স্কুলে যদি এই টাকার অধিকাংশ ব্যয় হয় তাহা হইলে মূলধন আসিবে কোথা হইতে? প্রাদেশিক হিসাবে যদি আবার সাধারণকে আরও ২০০ শত কোটি টাকা রাজকর দিতে হয় তাহা হইলে শতকরা ৫ টাকা অধিক আয় যে হইবে সকলের তাহা হইতে অধিক কিছু, অর্থাৎ ৩৩০ + ২০০ = ৫৩০ কোটি টাকা সরকারকে দিতে হইবে। ১৩৫ লক্ষের মধ্যে মাষ্টার ২০ লক্ষ বাদ দিলে ১১৫ লক্ষ লোকের চাকুরি বিভিন্ন কারখানায় ও দপ্তরে হইবে বোধ হয়। একজন লোককে কাজে লাগাইতে ভারত সরকারের হাল

কারখানায় মূলধন লাগে দুই-চার লক্ষ টাকা। থার্মাল বা হাইডেল প্লাণ্টে লাগে প্রায় ঐরূপ। ভারত সরকারের বা প্রাদেশিক সরকারদের মূলধন ব্যয়ের হিসাব জোরাল রকম। ৫০,০০০ হাজার টাকার কম শ্রমিকদের মাথা-পিছু মূলধন লাগিতেই পারে না। প্রাইভেট সেক্টর মিতব্যয়ী ও তাহার নজর বড় নহে। তাহারা হয়ত ১০।২০ হাজার মাথাপিছু খরচ করিয়া এক-একটি শ্রমিককে কাজে লাগাইতে পারে। মোটামুটি ভাবতের শ্রমিকদের পিছনে মাথাপিছু ৩০।৩৫ হাজার টাকা মূলধন লাগা সম্ভব। ১১৫ লক্ষ লোকের তাহা হইলে ৩৪৫০০ কোটি টাকা মূলধন লাগা সম্ভব। এই মূলধন কোথায়?

অ

'অধিক ফসল ফলাও'

জমির ফসল বাড়ানো লইয়া সরকারী কর্তাদের কত জল্পনা-কল্পনা! তাঁহাদের জ্ঞানও সুদূর-প্রসারী! এমনকি দূর-দূরান্তে বিদেশে জমির ফসল কিরূপে বৃদ্ধি হইতেছে তাহা লইয়াও তাঁহাদের গবেষণার অন্ত নাই। কিন্তু ঘরের কাছে ফসলী জমি কি ভাবে নষ্ট হইতেছে, সেদিকে কর্তাদের নজর নাই। সে সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান আছে বলিয়াও মনে হয় না। বাঁধ ভাঙ্গিয়া লোনা জল ঢুকিয়া বহু ফসলী জমি, চাষের জমি নষ্ট হইবার সংবাদ বৎসর বৎসরই শোনা যায়। জমির ফসল বাড়াইবার জন্য যাঁহাদের নাকি ভাবনার অন্ত নাই, তাঁহারা চাষীর নিজের জমিতে উৎপন্ন সামান্য ফসলের কথা ভাবিবেন কেন? তাঁহাদের কল্পনা যে বৃহৎ!

ডায়মণ্ড হারবারের ত্যাংরা-চর-বাঁধ ভাঙিবার ফলে লোনা জল ঢুকিয়া প্রায় পনর শত বিঘা ধানের জমি চাষের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের দায়িত্ব সরকারের। কিন্তু এই দায়িত্ব পালনে সেই চিরপুরাতন দপ্তর লইয়া টানাটানি। যে বাঁধ ভূমি-সংস্কার বিভাগ মেরামত করিয়াছেন তাহা ভাঙ্গিয়া ধসিয়া পড়িলেও, সেচ-বিভাগ সেদিকে নজর দিবেন না। আবার মেরামতও সেইরূপ। আমলাতন্ত্র এবং ঠিকাদারতন্ত্রের মণিকাঞ্চনযোগে বাঁধ মেরামতের বিল শোধ করিতে না করিতেই বাঁধের বাঁধন খসিয়া যায়। 'অধিক ফসল ফলাও' ধুয়াটা কাগজে-পত্রে, আসলে যাহা দাঁড়ায় তাহা হইল অধিক লোনা জমি বাড়াও। বলা বাহুল্য, ইহাতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ক্ষমতাশালী লোকদেরও সুবিধা—বাঁধ কাটিয়া লোনা জল ঢুকাইলে মাছ-চাষের নগদ মুনাফা বাড়ানো যায়। ঠিক যে ভাবে ভাঙা ব্রিজ মেরামতে গড়িমসি করিয়া খেয়াঘাটের ইজারাদারের পকেট ভারী করা যায়, প্রায় সেই ভাবেই বাঁধভাঙা লোনা জলের কারবারে ঠিকাদার ও মাছের ভেড়িওয়ালাদের সুবিধাই ইহাতে করা হইতেছে। সরকারী কর্তারা যে কৈফিয়ৎই দিন, আমরা দেখিতেছি পশ্চিমবঙ্গে এই বাঁধ ও ব্রিজ লইয়া খেলা চিরকালই চলিতেছে।

অন্যদিকে বলিহারি দিতে হয় সেই সব চাষী ও কৃষাণদের যাঁহাদের ঐ অঞ্চলের ক্ষেত-খামারের উপর নির্ভর। কাঁকড়ার বাঁধ ফুটা করিল ত ফুটা বুজাইবে সরকার, আমি ত ততদিন কাঁকড়া ধরি! বাঁধ যায় যার হইয়াছে, সমসমত সকলে মিলিয়া কাজ করিলে ক্ষেত বাঁচে, ফসল বাঁচে, কিন্তু তা হইলে ফাঁকি দিয়া চড়া মজুরি আদায় করার সুবিধা হয় না। অতএব বাঁধ যায় যাউক, যদি আমার কাজ সরকারে না করে তবে সরকারকে গালি দেওয়ার সুবিধা ত হবেই!

বাংলা দেশের বাহিরে এরূপ অবস্থা ও ব্যবস্থা আর কোথায়ও সম্ভব নহে আমাদের বিশ্বাস।

গ

এত খাদ্য যায় কোথায়?

উড়িষ্যার সংহত খাদ্যাঞ্চল গঠিত হইবার পর আমেরিকার সঙ্গে ভারতবর্ষের খাদ্যশস্য লইয়া যে চুক্তি হইয়াছে, তাহাতে আগামী চার বৎসর ভারতে খাদ্যাভাব হইবার কথা না। অবশ্য তাহাদের খাদ্যশস্যের মধ্যে গমের আধিক্যই বেশী। যদিও পশ্চিমবঙ্গ ইহাতে উল্লসিত হইতে পারে নাই, কারণ তাহারা ভাতের কাঙাল। তবু উড়িষ্যা হইতে এ পর্যন্ত যে-পরিমাণ চাউল আমদানী হইয়াছে, তাহাতে এতটা হাহাকার উঠিবার কথা নয়। প্রশ্ন এই, এত চাউল যাইতেছে কোথায়?

গত কয়েক মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ উড়িষ্যা হইতে . লক্ষ ৬৬ হাজার টন চাউল উৎপাদনের উপযোগী ধান এবং ১ লক্ষ ১১ হাজার টন চাউল পাইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ আশা করিয়াছিল যে, বর্ত্তমান মরশুমের শেষ পর্য্যন্ত এই ভাবে উড়িষ্যা হইতে ধান ও চাউল পাওয়া যাইবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ধান-চাউল রপ্তানির জন্য উড়িষ্যার ধান-চাউলের দর চড়িয়া যাইতেছে বলিয়া ইতিমধ্যে উড়িষ্যার নেতৃস্থানীয় অনেক ব্যক্তি পশ্চিমবঙ্গে ধান-চাউল রপ্তানি বন্ধ করিয়া দিবার জন্য দাবি উত্থাপন করিয়াছেন। যদি সত্যই এই রপ্তানি বন্ধ হয়, তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গের ইহাতে সমূহ বিপদেরই আশঙ্কা। আবার খাদ্যমন্ত্রী শ্রী সেন জানাইয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গে বর্ত্তমান বৎসরে

চাউলের ঘাটতি ৮ হইতে ১০ লক্ষ টন। সরকারের এই বিভিন্ন ঘোষণায় জনসাধারণের মনে সংশয় দেখা দিয়াছে। কারণ আমেরিকা যে পরিমাণে খাদ্যশস্য দিয়া সাহায্য করিয়াছে তাহাতে অভাব হইবার কথা নহে।

আবার শুনিতেছি, কেন্দ্রীয় সরকার এইরূপ খাদ্যাঞ্চলগুলি ভাঙিয়া দিয়া সমগ্র ভারতকে একটিমাত্র খাদ্যাঞ্চলে পরিণত করিতে চাহিতেছেন। এই প্রস্তাব করিয়াছেন ভারতের নূতন খাদ্যমন্ত্রী শ্রী পাতিল।

এ বিষয়ে আমাদের কিছু বক্তব্য রহিয়াছে। কারণ, আজ পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ উড়িষ্যা হইতে কম করিয়াও আড়াই লক্ষ টন চাউল পাইয়াছে। উড়িষ্যার উদ্বৃত্ত ধান-চাউল পশ্চিমবঙ্গের একচেটিয়া ভাবে পাওয়ার অধিকার জন্মাইবার ফলেই উহা সম্ভব হইয়াছে। এখন যদি খাদ্যাঞ্চলগুলি ভাঙিয়া দিয়া সমগ্র ভারতে অবাধে ধান-চাউল আমদানী-রপ্তানির ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গ উড়িষ্যা হইতে এত চাউল পাইবে কিনা সন্দেহ। তা ছাড়া খাদ্যাঞ্চলগুলি উঠিয়া গেলে ভারতের উদ্বৃত্ত রাজ্যগুলিতে ধান-চাউল ক্রয় করিবার জন্য সমস্ত ঘাটতি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ভিড় করিবেন। তাহার ফলে এই শ্রেণীর রাজ্যে ধান-চাউলের মূল্য অত্যধিক চড়িয়া যাইতে পারে। এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে উদ্বৃত্ত রাজ্যগুলি হইতে ধান-চাউল সংগ্রহ করার পথে অন্তরায় সৃষ্টি হইতেও পারে। তার পর ভারতে যদি অবাধ খাদ্যশস্যের ব্যবসায় প্রবর্ত্তিত হয় তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গ হইতে অনেক ধান-চাউল বিহার, আসাম ইত্যাদি সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলে গোপনে রপ্তানি হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং ভারতে অবাধ খাদ্যশস্যের ব্যবসায় প্রবর্ত্তন হওয়া পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে ক্ষতিকর।

আসল কথা, বিভিন্ন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনের ফলে ইহাই প্রমাণ হইতেছে, খাদ্য ঠিকমত সরবরাহ করিতে সরকার অপারগ। আবার শুনিতেছি, সরকার রেশন-মাধ্যমে চাউল বণ্টন করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। অফিসের কেরাণী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে সে চাউল সংগ্রহ করা একরূপ অসম্ভব। এই সমস্যার কথাও বহুবার আলোচিত হইয়াছে। তথাপি সরকার ঐ রীতিই বহাল রাখিতেছেন, ইহাও তাঁহাদের অক্ষমতার আর এক রূপ। এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য, এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের কি উপায় হইবে? খাদ্য সম্পর্কে এইরূপ একটা অনিশ্চিত ও উদ্বেগজনক পরিস্থিতির মধ্যে মানুষ কতদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে? এইরূপ একটা অস্বস্তিকর অবস্থার কি কোনদিনই অবসান হইবে না? গ

দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে নববিধান

দণ্ডকারণ্যের জট বোধ হয় এতদিনে খুলিল। এই জট খুলিবার জন্যই স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় তাঁহার দলবল সহ দণ্ডকারণ্যে ছুটিয়া গিয়াছিলেন। সেখানকার অব্যবস্থা, দুর্নীতি চাক্ষুষ দেখিয়া আসিয়া, প্রতিকারের জন্য তাঁহাকে দিল্লী পর্য্যন্তও যাইতে হইয়াছিল। এখন কথা হইতেছে, এ কাজটা তিনি পূর্ব্বে করেন নাই কেন? গোলযোগের কথা তো বহু পূর্ব্ব হইতেই শুনা গিয়াছিল।

যাহা হউক, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অভিযোগ অনুসারে এবং রাজ্যের জনমত যেমন চাহিয়াছিল, প্রায় সেইরূপই দণ্ডক প্রশাসনিক সংস্থার পুনর্গঠনের ব্যবস্থা একটা হইয়াছে। কিন্তু তবুও ইহাতে আশ্বস্ত হইতে পারিতেছি না। কারণ, যে-খান্নাকে লইয়া এতটা তিক্ততার সৃষ্টি, উপস্থিত বিধানে তিনি পূর্ব্ব পদেই বহাল রহিলেন। তবে তাঁর ক্ষমতা হ্রাস করা হইয়াছে। অর্থাৎ দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন সংস্থাকে প্রভূত পরিমাণ স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। এই সংস্থায় সর্ব্ব সময়ের জন্য একজন চেয়ারম্যান থাকিবেন। এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চীফ সেক্রেটারী এই সংস্থার সদস্য হইয়া কাজ করিবেন। একজন প্রধান প্রশাসক নিযুক্ত হইবেন। এবং মুখ্যতঃ পশ্চিমবঙ্গের ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তুদিগকে পুনর্ব্বাসনের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে ও পরবর্ত্তীকালে ক্যাম্প-বহির্ভূত অন্যান্য সাধারণ উদ্বাস্তু পরিবারকেও এই সুযোগ দেওয়া হইবে। কেবল কৃষিজীবীদিগকেই নয়, অন্যান্য কারিগর, মজুর, ছোট ছোট দোকানদার প্রভৃতিকেও 'সংহত সমাজ-জীবন' গড়িবার উদ্দেশ্যে দণ্ডকারণ্যে সুযোগ দেওয়া হইবে।

অনেকেই বলিতেছেন, 'শ্রীখান্না ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত থাকিলে, ইঁহাদের—অর্থাৎ যাঁহারা আসিলেন, তাঁহাদের ভাল করিবার ইচ্ছা থাকিলেও বাধাপ্রাপ্ত হইবেন। অতএব দণ্ডকারণ্য-পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করিবার ভার আর যাঁহার উপরই দেওয়া হউক, শ্রী খান্নার উপরে রাখা কোনক্রমেই উচিত হইল না।' তাঁহারা আরও বলিতেছেন, 'দিল্লীর বৈঠকে যে সকল সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে, তাহার কোনটা নূতন? দণ্ডকারণ্য-পরিকল্পনা ব্যাপক ও বৃহৎ বটে, কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা প্রধানতঃ উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের জন্যই রূপায়িত হইবে—এ কথা ত বহুদিন পূর্ব্বেই স্থির হইয়া গিয়াছে, তবুও তাহা হয় নাই কেন? দণ্ডকারণ্য-পরিকল্পনার যে একটা ব্যাপক লক্ষ্য আছে তাহাও কাহারও অজানা নাই। তবুও শ্রী খান্না বার বার সে কথা সকলকে স্মরণ করাইয়া

দিয়াছেন কেন? উদ্দেশ্য কি দণ্ডকারণ্যে পুনর্ব্বাসন ব্যবস্থা পণ্ড করিবার জন্য নয়? নূতন নিয়মে শ্রীখান্নার হাতে সকল অস্ত্রই অটুট রহিয়া গিয়াছে। সুযোগমত সেগুলিকে ব্যবহার করিতে পারিলে, দণ্ডকারণ্য-পরিকল্পনাকে বিপর্য্যস্ত করা তাঁহার পক্ষে খুব কঠিন হইবে না। তাই মনে হয়, কাগজে-পত্রে দণ্ডকের নববিধির বাহিরের রূপটাকে যতই রমণীয় ও উজ্জ্বল বলিয়া মনে হউক না কেন, তাহার ব্যর্থতার বীজ লুকানো রহিয়াছে তাহারই ভিতরে। শ্রীখান্না ইচ্ছা করিলে, তাহাকে অক্লেশে অসার্থক করিয়া তুলিতে পারেন—প্রধানমন্ত্রীর বিজ্ঞপ্তির কোনও নীতি বা নির্দ্দেশ সাক্ষাৎ ভাবে লঙ্ঘন না করিয়া।'

কিন্তু আমরা বলিব, অপরাধ যদি কেহ করিয়া থাকেন, তবে শ্রীপ্রফুল্ল সেন প্রমুখ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ধুরন্ধরগণই করিয়াছেন। কারণ, শ্রীখান্নার যোগ্যতা অন্যত্র প্রমাণিত হইয়াছে।

দণ্ডকারণ্য-পরিকল্পনার মূলনীতিগুলি যে প্রামাণিক দলিলে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা ভালই হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহিত দণ্ডকারণ্য সংস্থার যে ঘনিষ্ঠ যোগ-সূত্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে, তাহাও অত্যন্ত সমীচীন এবং এ রাজ্যের উদ্বাস্তু-শিবিরগুলি তুলিয়া দিবার একটা তারিখ ঠিক না-করাটাও অত্যন্ত সঙ্গত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত শরণার্থীর দল ইহাতে অনেকটা আশ্বস্ত হইবে সন্দেহ নাই।

কিন্তু শুধু আশ্বস্ত হইলেই ত চলিবে না। তাহাদের পুনর্ব্বাসনের সকল ব্যবস্থা সুষ্ঠু হওয়া কর্ত্তব্য। দায়িত্ব যাহাদের উপর পূর্ব্বেও ন্যস্ত ছিল, এবারেও দায়িত্ব তাঁহাদেরই। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ক্ষেত্রে আগাইয়া আসিতে হইবে—যে-কাজটা তাঁহারা পূর্ব্বে করেন নাই। কেবল দপ্তরের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। মনে রাখিতে হইবে, দায়িত্ব শুধু নৈতিক নয়, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক। শুধু শ্রীখান্নার উপর দোষ চাপাইয়া দিলেই, নিজেদের অপরাধ চাপা যাইবে না। যে কারণে দণ্ডকারণ্যকে কেন্দ্র করিয়া এতটা কাণ্ড হইয়া গেল, তাহারই পুনরাবৃত্তি যেন আর না ঘটে, ইহাই আমাদের বলিবার কথা।

গ

বর্দ্ধমানে নূতন বিশ্ববিদ্যালয়

গত ১৫ই জুন পশ্চিমবঙ্গে আর একটি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শিক্ষার ইতিহাসে ইহা এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিল। বর্দ্ধমানের মহারাজা তাঁহার সুবিখ্যাত গোলাপ-বাগ ভবনটি এই নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন। ভারতের ভূতপূর্ব্ব নির্ব্বাচন কমিশনার শ্রীসুকুমার সেন বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিস্তীর্ণ ও বহু উচ্চশ্রেণীর শিক্ষায়তন-পূর্ণ অঞ্চল নিজের এলাকারূপে পাইতেছে। হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলা বাদে বর্দ্ধমান বিভাগের সমস্ত জেলার কলা ও বিজ্ঞান কলেজগুলি এই নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন হইবে। রাজপ্রাসাদকে বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের উপযোগী করিবার জন্য ইহার সংস্কার ও আংশিক পুনর্গঠন দরকার এবং সে কাজও কিছু পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছিল। আশা করা যায়, এই বৎসরই বিজ্ঞান ব্যতীত কলা-সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি পড়াইবার ব্যবস্থা হইবে। বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে একটু দেরি লাগিবে।

এই বিশ্ববিদ্যালয় কেবল যে বর্দ্ধমান বিভাগের কলা ও বিজ্ঞান কলেজগুলিকেই পাইতেছে তাহা নহে। দুর্গাপুরের ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ এবং শ্রীরামপুরের টেক্সটাইল টেকনলজি কলেজটিও ইহার অধীন হইতেছে। অর্থাৎ একশ' বছর আগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে যেমন প্রায় ফাঁকা মাঠে কাজ আরম্ভ করিতে হইয়াছিল, বর্দ্ধমানকে সেরূপ পথপ্রদর্শকের কাজের অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না। আশা করা যায়, নূতন বিশ্ববিদ্যালয় ভবিষ্যতেও সরকারী আর্থিক সাহায্য যথেষ্ট পরিমাণে লাভ করার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইবে না। পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট নাকি ইতিমধ্যেই প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

এই নূতন বিশ্ববিদ্যালয় ভবনটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিড় অবশ্যই কমিবে। ইহাও একটা বড় সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বর্দ্ধমান এবং কল্যাণী লইয়া পশ্চিমবঙ্গে পাঁচটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলেও এ রাজ্যের জনসংখ্যা অনুপাতে উহা বেশী নয়।

গ

তিন বৎসরের ডিগ্রী-কোর্স প্রবর্ত্তনে নূতন বিপত্তি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন, আগামী জুলাই মাস হইতে তিন বৎসরের ডিগ্রী-কোর্স চালু হইবে। অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল নূতন কোর্সের নিয়মাবলী রচনা করিয়াছেন। কিন্তু রচনা করেন নাই, নূতন শিক্ষাবর্ষ অনুযায়ী নূতন পাঠ্য-পুস্তক। কলেজী

শিক্ষায় নূতন ব্যবস্থার প্যাঁচ এমন যে, কলেজগুলিকে শুধু তিন বৎসরের ডিগ্রী-কোর্স নয়, প্রাগ-বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স পড়াইবার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। অবশ্য তিন বৎসরের ডিগ্রী-কোর্সে এ বৎসর খুব বেশী ছাত্র-ছাত্রী ভর্ত্তি হইতে আসিবে না, কিন্তু যে দশ হাজার ছাত্র-ছাত্রী উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়াছে তাহাদের মধ্যে পরীক্ষোত্তীর্ণরা তিন বৎসরের ডিগ্রী-কোর্সে ভর্তি হইবে। আবার স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষা যাহারা পাস করিবে, তাহাদের একটি বিপুল সংখ্যার জন্ম কলেজগুলিতে প্রাগ-বিশ্ববিদ্যালয়-কোর্স পড়াইবার ব্যবস্থা করিতেই হইবে।

আমাদের দেশে কলেজের সংখ্যা কম। স্থানাভাবে অনেক ছাত্রকেই বিমুখ হইয়া ফিরিতে হয়। ইহার পর এক সঙ্গে দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের কোর্স পড়াইবার ব্যবস্থা অধিকাংশ কলেজই করিয়া উঠিতে পারিবে না। মফঃস্বলের অনেক কলেজ যতদূর সম্ভব তিন বৎসরের ডিগ্রী-কোর্স চালু করিবে না। কিংবা করিলেও শুধুমাত্র কলা-বিভাগে তিন বৎসরের পাঠক্রম প্রবর্ত্তন করিবে। তাহা হইলে এত ঘটা করিয়া উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষায় বিজ্ঞান, বাণিজ্যিক ও কারিগরি বিদ্যার কোর্স যে প্রবর্ত্তন করা হইল তাহার ফলটা কি দাঁড়াইবে? যাহারা বিজ্ঞান, বাণিজ্যিক ও কারিগরি বিদ্যায় শিক্ষা লইয়া উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করিল, তাহারা অনেকে যোগ্যতা সত্ত্বেও তিন বৎসরের ডিগ্রী-কোর্সের দরজায় মুখ থুবড়াইয়া পড়িবে। ইহাই কি শিক্ষা-সংস্কার? না, শিক্ষা-সঙ্কোচের কৌশল? যদি তাহাই হয়, তবে তাঁহারা বহু কৃতী ছাত্রকেই উচ্চশিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিবেন।

১৯৫৭ সনে যখন মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এগার শ্রেণীর ক্লাস এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্যসাধক উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়, তখনই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত ছিল, তিন বৎসরের ডিগ্রী-কোর্স চালু করিবার জন্ম সর্ব্বাঙ্গীণ আয়োজনে উদ্যোগী হওয়া। বিশ্ববিদ্যালয়-কর্ত্তৃপক্ষ গত তিন বৎসর টালবাহানা করিয়া কাটাইয়াছেন, ফলে এখন এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, জুলাই মাসে নূতন কোর্স অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের পড়িবার ও পড়াইবার উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক পর্য্যন্ত নাই। এই অবস্থা যেখানে সেখানে তাঁহারা উচুদরের উচ্চশিক্ষার নামে অনর্থ সৃষ্টি করিলেন কেন? এখন তাহার ধাক্কা সামলাইতে হইবে, বেচারা ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকগণকে।

পুরানো ব্যবস্থায় যে ভাবে পড়াশুনা চলিতেছিল, তাহার দোষত্রুটি অনেক থাকিলেও বর্ত্তমানে যে ব্যবস্থা চালু হইতেছে উহার মত কিম্ভূতকিমাকার ছিল না। অথচ এমনটি হইতে পারিত না যদি মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলির মধ্যে গোড়া হইতেই ধারাবাহিক সহযোগিতার ব্যবস্থা থাকিত। তিন বৎসর পূর্ব্বে মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার বিবিধ বিভাগের জন্ম যে পাঠক্রম রচনা করেন, তাহার সহিত মিল রাখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন বৎসরের ডিগ্রী-কোর্সের পাঠক্রম ধারাবাহিক ভাবে অনায়াসে রচনা করা যাইত এবং সেই অনুযায়ী পাঠ্য-পুস্তক প্রস্তুত করিতেও বিশ্ববিদ্যালয় সময়মত উদ্যোগী হইতে পারিতেন। সরকারী কাজকর্ম্মে আমলাতান্ত্রিক দপ্তর-সর্ব্বস্বতার অনাচার নিত্যই দেখিয়া থাকি। শিক্ষাক্ষেত্রেও যে তাহারই পুনরাবৃত্তি ঘটিবে, ইহা আমরা আশা করিতে পারি নাই।

যাহা হউক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজী শিক্ষাক্ষেত্রে যে নূতন বিপত্তি ডাকিয়া আনিতেছেন, অবিলম্বে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা না হইলে এ বৎসর হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ মাটি হইবে।

গ

ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য লইয়া উদ্বেগ

দিল্লীতে জাতীয় পুষ্টি-পরিষদের অধিবেশনে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীকারমারকার বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের কতকগুলি অঞ্চলে গরীব-পরিবারের সন্তানদের মধ্যে অন্ধত্ব রোগের প্রাদুর্ভাবের একটি প্রধান কারণ তাহারা পুষ্টিকর খাদ্য পায় না। যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ বাড়িবারও একটি কারণ পুষ্টির অভাব। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিম বাংলার ছাত্র-ছাত্রীরা সম্ভবতঃ অনেক বেশী স্বাস্থ্যহীন।

এ বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বোর্ড অব হেল্‌থ' সম্প্রতি একটি বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত বোর্ড কলিকাতা এবং শহরতলির প্রায় এক হাজার ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, শতকরা ৫৭·৫৭ জন ছাত্র কোন-না-কোন রোগে ভুগিতেছে। শতকরা ৩৪ জন ভুগিতেছে অপুষ্টিতে, দাঁতের পীড়ায় ভুগিতেছে শতকরা ২৪·৩৪ জন। ১৯৫৩ হইতে ৫৪ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে বোর্ড প্রায় চার হাজার ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়াছেন। উহার ফলাফলও অত্যন্ত শঙ্কাজনক। ছাত্রীদের স্বাস্থ্যহীনতা আরও বেশী। শতকরা ৪০·৪ জনের দাঁতের এবং ৪০·০৫ জনের গলার অসুখ। তা ছাড়া, কয়েক বৎসরের স্বাস্থ্য-পরীক্ষার হিসাব তুলনা

করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ছাত্রদের গড়পড়তা ওজন এবং ছাতির মাপ কমিয়া যাইতেছে।

জাতির ভবিষ্যৎ আশাস্থল তরুণ-ছাত্র-সম্প্রদায়ের এই ক্রম-বর্দ্ধমান স্বাস্থ্যহীনতার পরিণাম কি তাহা ভাবিতেও ভয় লাগে। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিম বাংলায়—বিশেষ করিয়া, কলিকাতা এবং শহরতলী অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি কেন ঘটিতেছে তাহা চিন্তা করা প্রয়োজন। সাধারণ ভাবে পশ্চিম বাংলার অনেক জায়গায় জলবায়ু স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব অনুকূল নয়। তার পর কলিকাতা ও শহরতলী অঞ্চলে গত দশ-পনের বৎসরে জন-স্বাস্থ্যের ঘোর অবনতি ঘটিয়াছে নানা কারণে। অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই নিম্ন এবং মধ্যবিত্ত-পরিবারের সন্তান। পুষ্টিকর আহার, পরিচ্ছন্ন আলো-বাতাসপূর্ণ বাসস্থান, বিশুদ্ধ পানীয় জল কোনো কিছুই আজ শহরের মধ্যবিত্ত পরিবারের সহজলভ্য নয়। যে পরিবেশে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীকে থাকিতে হয় এবং যে ধরনের আহার তাহাদের সাধারণতঃ জোটে, তাহাতে স্বাস্থ্যের উন্নতি দূরের কথা, কোনো মতে টিকিয়া থাকাই প্রাণান্ত সমস্যা। স্কুল-কলেজের পরিবেশও অস্বাস্থ্যকর। সস্তায় পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা খুব বেশী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে নাই, খেলাধুলা এবং ব্যায়ামের সুযোগ নামমাত্র।

নিম্ন এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান আরও উন্নত না হইলে, এই সমস্যার কোনোও স্থায়ী প্রতিকার সম্ভব নয়, ইহা ঠিক। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, কলা ইত্যাদি বেশী করিয়া খাইবার পরামর্শ দিয়া লাভ নাই, অভাবের সংসারে এগুলি অনেকের পক্ষেই জুটাইতে পারা অসম্ভব। কিন্তু খোসাসমেত ভিজা ছোলা, ডালবাটা এবং সস্তাদরের নানা প্রকার উদ্ভিজ্জজাতীয় প্রোটিন খাদ্য জোটানো খুব কঠিন নয়। ভাতের ফেন, যাহা আমরা ফেলিয়া দিই, তাহা একটি পুষ্টিকর খাদ্য। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ভাতের ফেন না ফেলিবার পরামর্শ দিয়াছেন—তাঁহার সে কথাও আমরা কেহ শুনি নাই। শুনি নাই আমরা অনেক কথা। চিড়া, মুড়ি, নারিকেল—শুধু পুরানো বলিয়াই তাহাদের বর্জ্জন করিয়াছি, পরিবর্ত্তে চা, রুটি, টোষ্টকে ঘরে স্থান দিয়াছি। এই আবহাওয়া বদলাইতে হইবে। ছাত্ররা এবং শিক্ষক-অধ্যাপকগণ কেবল মনের খোরাক নয়, শারীরিক পুষ্টির দিকে দৃষ্টি দিলে খাদ্য-সংস্কারের কাজ সহজে অগ্রসর হইতে পারে। সরকারকেও এ বিষয়ে সজাগ থাকিতে হইবে। কেবল হেল্‌থ-সেণ্টার এবং ঔষধ গিলাইলেই, তাহাদের বাঁচানো যাইবে না, তাহাদের পুষ্টিকর খাদ্য দিতে হইবে। গ

জমিদারী স্বত্ব গ্রহণ ও তাহার পরবর্ত্তী অবস্থা

সকলের স্মরণ থাকিতে পারে ১৯৫৫ সনের ১৫ই এপ্রিল তারিখ হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই রাজ্যের জমিদার, তালুকদার, ইজারাদার ইত্যাদি সকল শ্রেণীর খাজনা-আদায়কারীদের খাজনা আদায়ের অধিকার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ঐ সময়ে খাজনা-আদায়কারীদের সম্পত্তির বাজার-মূল্য অনুযায়ী তাঁহাদিগকে ক্ষতিপূরণ দিবার কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। তবে ঐ সময়ে গবর্ণমেণ্ট খাজনা-আদায়কারীদের একটা ক্ষতিপূরণ দিবেন স্থির হয় এবং পশ্চিমবঙ্গের জমিদার, তালুকদার ইত্যাদি সমস্ত খাজনা-আদায়কারীর মোট প্রাপ্যের পরিমাণ ৭৮ কোটি টাকা বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। উহার মধ্যে ক্ষতি-পূরণ হিসাবে যাঁহাদের প্রাপ্য টাকার পরিমাণ বেশী, তাঁহাদের প্রাপ্য টাকার একাংশ সরকারী ঋণপত্র হিসাবে প্রদান করা হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জমিদারী ইত্যাদি খাস হইবার পর পাঁচ বৎসর অতীত হইলেও গবর্ণমেণ্ট আজ পর্য্যন্ত ক্ষতিপূরণ হিসাবে ছয় কোটি টাকার বেশী প্রদান করেন নাই। জমিদার, তালুকদারদের মধ্যে সকলেই সমৃদ্ধ ছিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে এরূপ লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি ছিলেন, যাঁহারা নিজেদের প্রাপ্য সামান্য খাজনা দ্বারাই কোন প্রকারে গ্রাসাচ্ছাদন-সংগ্রহ করিতেন। ক্ষতিপূরণ পাইতে এরূপ দেরি হওয়ার জন্য, এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ চূড়ান্ত দুর্দ্দশায় পতিত হইয়াছেন। আশা করা গিয়াছিল যে, এই ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ত্বরান্বিত হইবেন। কিন্তু বর্ত্তমানে শুনা যাইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলাতে ক্ষতিপূরণ বাবদ কাহার কত টাকা প্রাপ্য হইবে, তাহার তালিকা প্রস্তুতের জন্য একটি অর্ডিনান্স জারি করিবেন। যদি এই অর্ডিনান্স জারি হয়, তাহা হইলে বিভিন্ন জেলার ১৫ লক্ষ মধ্যস্বত্বাধিকারীর তালিকা প্রস্তুত করিতে কয়েক বৎসর সময় অতিবাহিত হইবে এবং ততদিন পর্য্যন্ত মধ্যস্বত্বাধিকারীরা কোনও ক্ষতিপূরণ পাইবেন না।

এরূপ ব্যবস্থা কাহার মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত হইয়াছে জানি না, তবে এ ব্যবস্থায় তাঁহাদের প্রতি যে অবিচারই করা হইয়াছে একথা বলিতে আমরা বাধ্য। এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, গত পাঁচ বৎসর গবর্ণমেণ্ট কোথায় ছিলেন? তাঁহারা সময়মত এই ব্যাপারে অবহিত হইলেন না কেন? তাঁহারা কি জানিতেন না, একমাত্র তাঁহাদেরই অবহেলায় এ রাজ্যের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর দুঃখ-দুর্দ্দশা চরমে উঠিবে? এই ঔদাসীন্যের ফলেই তাঁহারা জনসাধারণের আস্থা হারাইতেছেন। গ

ভারতের বহির্জগতে শান্তি-প্রচেষ্টা

ভগবান প্রেমময় বলিয়া মনুষ্য-জগতে পরিচিত। তিনি কিন্তু কখনও আত্মপ্রকাশ করেন না অথবা নিজ প্রেম ফেরি করিয়া বেড়ান না। যাঁহারা নিজেদের ভগবানের সাক্ষাৎ সাকরেদ, সভাসদ বা অনুচর বলিয়া প্রচার করিতে চাহেন, কিম্বা অন্তর্নিহিত কোন গভীর মনোবৃত্তির তাড়নায় মনের উর্দ্ধতম স্তরে নকল অনুভূতির ফেনা সৃষ্টি করিয়া জগতকে বঞ্চনা করিয়া নিজেদের প্রকৃত স্বভাব সম্বন্ধে ভুল বুঝাইতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা অনেক ক্ষেত্রে "প্রেম প্রেম" বলিয়া হাতে ঢোল ও গলায় মালা ধারণ করিয়া নৃত্যে রত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রেম শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেম নহে। তাঁহাদের কলসীর কানা দিয়া আঘাত করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, প্রাণ তাঁহাদের প্রতিহিংসা-বৃত্তিতে পরিপূর্ণ। প্রেম শুধু অভিনয়ের প্রেরণা। যিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া জনগণের কল্যাণার্থে নিজেকে বিলাইয়া দিতে পারেন, তিনিই শুধু সেই প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিতে অধিকারী। স্বার্থপর, ভোগী, বিলাসী, ঐশ্বর্য্য-তৃষ্ণাক্রান্ত যাহারা; ধন, মান, রাষ্ট্রশক্তি ও যশের কাঙাল যাহারা; তাঁহাদের এই প্রেম-ধর্ম্মের অভিনয় অত্যন্তই হাস্যকর। লোক দেখাইয়া প্রেমের অভিনয় করা লোক ঠকাইবার উপায় মাত্র। তাহার মধ্যে সত্যকার কোনও অনুভূতি নাই। এই সকল কারণে বুদ্ধদেব অথবা শ্রীচৈতন্যের পরবর্ত্তী যুগের অহিংসা ও বিশ্ব-প্রেমের অভিনেতা ও খেলোয়াড় মহলে মন্দিরনির্ম্মাণ ও মিছিল, মেলা, মহোৎসব ইত্যাদি করিয়া নিজেদের স্থান উচ্চে রাখিবার চেষ্টা ক্রমাগতই হইয়াছে, কিন্তু বিশ্বপ্রেম ও অহিংসা ক্রমশঃ নিঃসীম শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে এই অহিংসা ও প্রেমের পরিচয় ভগবানকে কচু-সিদ্ধ "খাওয়াইয়া" ও জনসাধারণের পায়ের জুতা খুলাইয়া কোন প্রকারে কিছু কিছু দেওয়া হইয়া থাকে। মনোভাব নাই। যাহা ছিল তাহা পদ্ধতিগত ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং অহিংসা ও প্রেমের সেবাইত সকলে "প্রসাদ" ভোজন করিয়া নিজ নিজ প্রাসাদে পূর্ণ ভোগের আসরে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকেন। ধর্ম্মের ক্ষেত্রে এই প্রেমের প্রচার যেমন একটা পেশামাত্র এবং তার অভিব্যক্তি শুধু রূপ ও মুদ্রার খেলা অন্তরে তার কোনও স্থান নেই; রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও তেমনি প্রেম ও শান্তির ভণিতা একটা অতি-বড় মিথ্যার অভিনয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জলুস করিয়া প্রকাশ্যে কোলাকুলি করিয়া পিছন হইতে পরস্পরকে ছুরি-মারা এখনকার রাষ্ট্রীয় নীতি। এই মিথ্যার শিকড় আমাদের নিজেদের রাষ্ট্রীয় দলগুলির লোক-ঠকান ও জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকের প্রবৃত্তির মধ্যে নিহিত আছে। সর্ব্বদেশেই আজকাল ষড়যন্ত্রকারী রাষ্ট্রীয় দল বা "পার্টির" রাজত্ব। জনসাধারণকে প্রচারের সাহায্যে প্রবঞ্চনা করা আজকাল একটা "উচ্চাঙ্গের" বিজ্ঞান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই মিথ্যা প্রচারের নাম "প্রপাগ্যাণ্ডা।" এই ঘৃণ্য মিথ্যা প্রচার-পদ্ধতি দ্বারা বর্ত্তমান জগতের মানব-সমাজে সাধারণ লোকের মনের ধারা সততই ভুল পথে চালিত হইয়া থাকে। রেডিও, সংবাদপত্র, বক্তৃতা প্রভৃতি বিশেষ কৌশলের সহিত ব্যবহৃত হয় এই "প্রপাগ্যাণ্ডার" জন্য। ফলে মহাপুরুষ, উচ্চ আদর্শ, সুনীতি, সুযুক্তি ও সত্য বলিয়া পৃথিবীতে আর কিছু নাই। "প্রপাগ্যাণ্ডা" স্বার্থপর ও নীচ ব্যক্তিদের অতিমানব বলিয়া প্রমাণ করিয়া দেয়, মিথ্যাকে সত্য, পাপকে পুণ্য এবং নিকৃষ্টকে উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রচার করে এবং সত্য ঘটনা ইত্যাদি চাপা দিয়া বিপরীত কাল্পনিক সংবাদ ও অবস্থা সত্য বলিয়া রাষ্ট্র করে। একটা বিরাট, বহুমুখী ও সর্ব্বগ্রাসী মিথ্যা মানব-চিত্তকে সম্মোহিত করিয়া দাসত্ব-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া ফেলিতেছে। এই মিথ্যা প্রচারের মূল উদ্দেশ্য হইল রাষ্ট্রীয় দলতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা। দেশ অতলে ডুবিয়া যাউক, জনসাধারণ নিষ্পেষিত নির্জ্জীবতায় নষ্ট হইয়া যাউক, মানুষ "পার্টি" দাসত্বের অবয়বরূপে খেলনার পুতুলের মত সূতার টানে উঠা-বসা, নাচা-হাসা, কাঁদা ইত্যাদি করিতে থাকুক, কিন্তু দলতন্ত্র দেশের গৌরবের ও মানব-সভ্যতা ও স্বাধীনতার মিথ্যা প্রতীক হইয়া সকলের মাথার উপরে থাকিবে, ইহাই বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় প্রগতির আদর্শ। মানুষ যেখানে বড় বড় মিথ্যাকে প্রচার করিতে থাকে এবং নির্ব্বোধের ন্যায় নিজের মিথ্যাকে নিজেই সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে শিখে, মানুষের সে ক্ষেত্রে অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত সম্বন্ধও সেইরূপ মিথ্যা অবলম্বন করিয়া চলিতে চাহে। প্রেম ও শান্তির অভিনয় আজ এই আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে নির্লজ্জ ভাবে প্রচলিত।

ভারত-রাষ্ট্র কংগ্রেস দলের দ্বারা চালিত। তাঁহাদের বিপরীত দল হইল কম্যুনিষ্ট পার্টি অফ ইণ্ডিয়া ও অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র "বামপন্থী" দলগুলি। কম্যুনিষ্ট ইত্যাদির সহিত কংগ্রেসের ভিতরে ভিতরে কতটা মিল আছে এবং গোপনে পরস্পরের দলের মধ্যে কতকগুলি ছদ্মবেশী সভ্য ঢুকিয়া বসিয়া আছে, অপর পার্টিকে ভিতর হইতে আক্রমণ করিবার জন্য, এই সকল কথার উত্তর আমরা জানি না। এইটুকু বুঝা যায় যে, কংগ্রেস এবং বামপন্থী, উভয়জাতীয় দলতন্ত্রীদের মনোভাব একই।

কোনরূপে নির্বাচন-পন্থার নিয়ম উপর উপর বজায় রাখিয়া "গদি" দখল করিতে পারিলেই, তৎপরে পূর্ণ-উদ্যমে রাজত্ব চালনা। তখন আর জনসাধারণের সাহায্য বা পরামর্শ লইবার কোন প্রয়োজন থাকিবে না। দেশ ও দেশবাসী তখন "পার্টির" দাসত্বে নিযুক্ত ও সকল শক্তির একমাত্র অধিকারী "পার্টি"।

বিশ্বপ্রেম, শান্তি ও সাধারণতন্ত্রের বা গণতন্ত্রের সত্যকার অবস্থা যাহা দেখা যায় তাহাতে মনে হয় যে, দেশবাসীর এই সকল মিথ্যার উপর নির্ভর করা আর কোনও মতে উচিত ও নিরাপদ নহে। আদিমযুগের হিংস্র, পরস্পর বিরুদ্ধতা ও দুর্বলকে মারিয়া খাইয়া ফেলাই আজ বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার ভিত্তরের সত্য। যে সকল জাতি পূর্ণরূপে শক্তিমান ও যুদ্ধের জন্য সতত প্রস্তুত, তাহারাই আজ অসংখ্য অস্ত্র-শস্ত্র তৈয়ার করিয়া যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইয়া পরস্পরকে নিদ্রাহীন দৃষ্টিতে শত-সহস্র চক্ষুতে প্রকাশ্যে ও গোপনে পর্য্যবেক্ষণ করিতে নিরত। কাহার গতিবিধি কি প্রকার, কে আরও সর্বনাশী কোন অস্ত্র আবিষ্কার করিল, এই সকল কথাই রাষ্ট্রীয় জগতের বড় কথা। অথচ সকল সমর-প্রয়াসী জাতিরই বিশ্বপ্রেম ও শান্তির অভিনয় পূর্ণ উদ্যমে চলিয়াছে। মুখে শান্তি ও বন্ধুত্বের স্বস্তিবাচন এবং হাতে লুকান পিস্তল ও ছোরাছুরি, এই ভাবে আন্তর্জাতিক অভিনন্দন বিনিময় ও সম্বন্ধ রক্ষা হইতেছে। যে সকল জাতি দুর্বল তাহাদের দলে টানিবার বা গিলিয়া খাইবার জন্য শক্তিশালী জাতিরা আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। দুর্বল জাতির পক্ষে সবলের বন্ধুত্ব সতত্ই আগ্রহের বস্তু। সবলের সহিত কোলাকুলি ও ঘনিষ্ঠতা আত্মমর্য্যাদা বৃদ্ধি করে বলিয়া দুর্বলের ধারণা। তাই দুর্বল প্রায় এক-প্রকার গায়ে পড়িয়া সবলের সান্নিধ্য অনুসরণ করিয়া ও নিজ মর্য্যাদা নষ্ট করিয়া চাটুকারের ন্যায় জগত-সভায় সকলের কৃপা ও অবজ্ঞার পাত্র হইয়া অবস্থিত হইয়া থাকেন।

ভারতের অবস্থা আজ অনেকটা উপরোক্ত দুর্বল ও পররূপাপুষ্ট চাটুকারের মত। অকারণে অপর জাতিদের সহিত অত্যধিক মাখামাখি করিয়া ও উৎকট বিজ্ঞপ্তির সহিত "ভাই ভাই" করিয়া ভারতের আভিজাত্য নষ্ট করা কংগ্রেস দলের বিশ্বপ্রেমের নিদর্শন। চীনদিগের সহিত ভারতের ২০০০ বৎসরের বন্ধুত্ব ইত্যাদি ইতিহাস-বিরুদ্ধ মিথ্যা প্রচার করার ফলে শুধু এইমাত্র লাভ হইল যে, চীনারা ভাবিল, ভারত তাহাদের মহা-শক্তিমান বুঝিয়া তাহাদের বন্ধুতা লাভ করিবার জন্য অতি-ব্যগ্র। বস্তুতঃ চীনাদের সহিত ভারতের যে বৌদ্ধধর্মের বন্ধন, সে বৌদ্ধধর্ম ও বুদ্ধদেবকে চীনারা আজ উচ্ছেদ করিয়া চীন দেশ ও চীন-সভ্যতা হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছে। চীনাদের সহিত আমাদের কখনও যুদ্ধ হয় নাই বলিয়া আমরা তাহাদের পরম বন্ধু একথা ভাবা ভুল। আমাদের সহিত সুইডেন, নরওয়ে আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি বহু দেশেরই কখনও যুদ্ধ হয় নাই। তাহারা সেই জন্য আমাদের পরম বন্ধু এ কথা ভাবিবার কোনও প্রয়োজন নাই। ভারতের বিভিন্ন জাতিসকল চিরকাল পরস্পরের সহিত কলহ, বিবাদ ও যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে। ইহার অর্থ এই নহে যে, এই সকল জাতি পরস্পরের বন্ধু নহে। এই সকল জাতি একই কৃষ্টি ও একই সভ্যতার দ্বারা একতায় বাধা। চীনারা বহুপ্রকার অখাদ্য ভোজন করিয়া থাকে। তাহাদের ভাষা, চাল-চলন প্রভৃতির সহিত আমাদের কোনই সহানুভূতি নাই। বর্ত্তমানে চীনারা নকল বাণিজ্যধান সাজিতে ব্যস্ত। এই জন্য তাহারা নিজেদের প্রাচীন কৃষ্টি ও সভ্যতা ত্যাগ করিয়া জগতের সকল জাতির সহিত শত্রুতায় লিপ্ত। আমাদের সহিত চীনের কোন বন্ধুতা বর্ত্তমানে নাই। চীন আমাদের ও জগতের শত্রু। এই অবস্থায় যাহারা চীনের সহিত সখ্য স্থাপন করিতে চাহেন তাহাদের স্থান ভারতের ভিতরে থাকা উচিত নহে।

রাশিয়া চীনের গুরু ও প্রতিপালক। রাশিয়ার সহিতও আমাদের কোন অতীতের বন্ধন নাই। কোন কোন স্তরের মস্তিষ্কে রুশের সহিত ভারতের বন্ধু-সম্বন্ধ লইয়া কল্পনার ধারা জাগ্রত হইয়া স্রোতস্বিনী হইয়াছে দেখা যায়, কিন্তু সে সকল মস্তিষ্কে সত্যকার জ্ঞান নাই, আছে শুধু মতলব এবং দেশদ্রোহের প্রেরণা। রুশ আমাদের কখনও কোন সাহায্য করে নাই। ব্রিটিশের সহিত আমাদের দ্বন্দ্বে রুশ নিরপেক্ষ ভাবে আমাদের উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। সুভাষচন্দ্রকে রুশ আশ্রয় ও সাহায্য দান করে নাই এবং বর্ত্তমানে রাশিয়ার ভারত-প্রীতি তাহার আমেরিকার প্রতি শত্রুতাপ্রসূত মাত্র। সত্যকার বন্ধুত্ব তাহাতে নাই। এবং শ্রীনেহরু শ্রীমতী গান্ধী, শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ ও শ্রীজগজীবনরামের রাশিয়া ভ্রমণের ফলে রুশ জাতি আমাদের ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে এই কষ্টকল্পিত কথা বিশ্বাস করিবার কোন কারণ আমরা দেখিতে পাই না। তাঁহাদের ভ্রমণে তাঁহাদের নিজেদের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে হয়ত—ভারতের গৌরব যেমন ছিল তেমনই আছে। আমেরিকা, ইংলণ্ড ও অপরাপর অ-কম্যুনিষ্ট জাতির সহিত ভারতের

প্রেম আরও ক্ষতিকর হইয়াছে। প্রথমতঃ, ইংলণ্ডের সহিত মিলিত হইয়া কংগ্রেসদল ভারত বণ্টন করিয়া পাকিস্থানের সৃষ্টি করিলেন ও তাহার ফলে বহু লক্ষ নরনারী ও শিশুহত্যা ঘটাইয়া ভারতের ইতিহাসে এক মহা কলঙ্কের প্রলেপ লাগাইয়া দিলেন। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের সহিত মিলিত হইয়াও কিছু কিছু রুশীয় সাহায্য আহরণ করিয়া কংগ্রেসদল যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় প্রচলন করিলেন তাহার ফলে ভারতের কি কি ক্ষতি হইয়াছে সে হিসাব এই স্থলে করা সম্ভব নহে। একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, এই সকল পরিকল্পনা-বহুল অংশে সফলতাবর্জ্জিত এবং ইহার ফলে ভারতীয় অর্থনীতির ধারা যতটা কাট ধরিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে, জোড় ও গঠন সেই তুলনায় যথেষ্ট হইতেছে না। ফলে দেশব্যাপি অশান্তির সৃষ্টি হইবে। এখনই তাহার চিহ্ন দেখা যাইতেছে।

ভারতের বিশ্বপ্রেম ও শান্তির "সংগ্রামে"র পূর্ণ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, নেপোলিয়নের অমর যুক্তি অনুসারে "দেশে শান্তিরক্ষা করার বড় উপায় বিদেশে যুদ্ধ করা" হইলে "দেশে যুদ্ধ ঘটাইবার কারণ বিদেশ গমন করিয়া বাহিরে শান্তি স্থাপন চেষ্টা করা।" কংগ্রেসী দলের "ফরেন পলিসি"র ফলে দেশে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া অসম্ভব নহে। অ

আবার দপ্তর স্থানান্তরের চেষ্টা

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন কর্ম্ম-বিভাগের যে সকল সদর দপ্তর কলিকাতায় অবস্থিত, সেগুলি একের পর এক অন্য রাজ্যে স্থানান্তরিত করিবার একটি সঙ্কল্প যেন গোপনে ও প্রকাশ্যে বেশ নিয়মিতভাবে কাজ করিয়া চলিয়াছে। যে সময়ে উদ্বাস্তুদের আগমনের ফলে নূতন কর্ম্মপ্রার্থীদের চাপে পশ্চিমবঙ্গ বিপর্য্যস্ত এবং স্থায়ী বেকার-সমস্যায় জর্জ্জরিত সেই সময় পশ্চিমবঙ্গ হইতে পর পর কয়েকটি দপ্তর যেমন, আর. এম. এস., রেল, কোল কমিশনার্স অফিস, পি.এল.আই, ইণ্ডিয়ান মাইনস অফিস ইত্যাদি স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ইহাতে প্রায় ৭৫০টি পদে কর্মী নিয়োগের সুযোগ হইতে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ বঞ্চিত হইয়াছেন। সম্প্রতি কলিকাতাস্থ আর. এম. এস. বিভাগের আর একটি ইউনিটের সদর দপ্তর কলিকাতা হইতে গয়ায় স্থানান্তরের চেষ্টা চলিতেছে।

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে এই দপ্তরগুলি স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। দপ্তর স্থানান্তরিত করিবার এই পর্ব্ব বহু ব্যয়-বাহুল্য এবং আর্থিক অপচয় স্বীকার করিয়াও চালাইয়া যাওয়া হইতেছে। কিন্তু কিসের স্বার্থে? প্রশ্নটির সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের মুখপাত্রেরা আজ পর্য্যন্ত যুক্তি-সঙ্গত কোন উত্তর দিতে পারেন নাই। এবং এই সম্পর্কে কোন কৈফিয়ৎ প্রদান করিবার প্রয়োজনও কেন্দ্রীয় সরকার অনুভব করেন না। ব্যাপারটা বস্তুতঃ গায়ের জোরের ব্যাপারের মত, কৈফিয়তবিহীন যথেচ্ছাতন্ত্রের মত চলিতেছে। বেকার-সমস্যার তীব্রতায় অভিভূত পশ্চিমবঙ্গের প্রধান জনপদ হইতে দপ্তর অপসারণ করা সাংবিধানিক আদর্শেরও অন্যথাচরণ বলিয়া মনে করিতে পারা যায়। কোন রাজ্যের জনসাধারণের কর্ম্মসংস্থান সুযোগ অপসারিত করাই নীতিবিগর্হিত। তাহা দিয়া অন্য রাজ্যের অদৃষ্ট প্রসন্ন করিবার ব্যাপার আরও নীতি-বিগর্হিত। কিছুকাল আগে রাঁচিতে বৃহৎ-যন্ত্র কারখানায় একটি বিভাগীয় উদ্যোগের উদ্বোধনী-অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমহুভাই শা ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, এই বৃহৎ যন্ত্র-কারখানাকে স্থানীয় জনসমাজেরই কর্ম্মসংস্থানে পরিণত করা হইবে। বিহার সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাবে যে নীতি লক্ষ্য করিতেছি, পশ্চিমবঙ্গের সম্পর্কে যেন ঠিক তাহার বিপরীত নীতিই কেন্দ্রীয় সরকারের আচরণে প্রকট হইতেছে। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারকেই তাঁহাদের দায়িত্ব স্মরণ করাইয়া দিতে চাহি। কলিকাতা হইতে কেন্দ্রীয় কর্ম্মবিভাগের সদর দপ্তর স্থানান্তরিত করিবার এই শোচনীয় প্রচেষ্টা রোধ করিবার জন্য উপযুক্ত প্রতিবাদ প্রয়োজন। গ

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনের পাঠাগার

খ্যাতনামা বাঙালী ঐতিহাসিক ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন তাঁহার ব্যক্তিগত পাঠাগারটি কলিকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরীকে দান করিয়াছেন।

দীর্ঘকাল একাগ্রচিত্তে ইতিহাস ও সংস্কৃতির সাধনা করিয়া ডাঃ সেন আজ পরিণত বয়সে উপনীত হইয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি যে সমস্ত মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার তিন সহস্রাধিক নিদর্শন এখন জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত হইল। দেশের সকলেই ইহাতে বিশেষ উপকৃত হইবেন, বিশেষ করিয়া গবেষক ও চিন্তাশীল পাঠকেরা ইহার যথাযথ সদ্ব্যবহার করিতে পারিবেন। আমাদের দেশের গুণী ও কৃতবিদ্য বহু লোকেরই এরূপ ঘরোয়া-গ্রন্থাগার থাকে। কিন্তু কোনো দায়িত্বশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠানের হাতে এইগুলি ন্যস্ত করিয়া না-যাওয়ায় তাহা অযত্নেই নষ্ট হইয়া যায়, কিংবা অনধিকারীদের হাতে পড়িয়া তাহা ওজনদরে বিক্রয় হয়। এই জন্যই প্রয়োজন, সেই সব দুষ্প্রাপ্য বই, পুঁথি, পাণ্ডু-লিপি, চিঠিপত্র, ছবি, দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি সমস্ত

থাকিতে উপযুক্ত স্থানে গচ্ছিত করিয়া যাওয়া। ইহাতে দেশবাসীও উপকৃত হয়, তাঁহার সারাজীবনের সাধনার সামগ্রীগুলি রক্ষা পায়। স্বর্গীয় যদুনাথ সরকারের পর ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনের পাঠাগার জাতীয় গ্রন্থাগারে অর্পিত হওয়ায়, দেশবাসী ইহাতে অনুপ্রাণিত হইবে। গ

সাহারা অভিযানে মৃত্যুপথযাত্রী

২৯শে জুনের আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি সংবাদ বাহির হইয়াছে—সংবাদ হিসাবে ইহার মূল্য অনেকখানি। সংবাদটি এই—তৃষ্ণায় মানুষের মৃত্যু ঠিক কি ভাবে আসে, কি ভাবেই বা মানুষের দেহ-যন্ত্র ক্রমশঃ বিকল হইয়া যায়, সে সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য দশ জন ফরাসী নাগরিক সাহারা মরুভূমিতে গিয়া স্বেচ্ছায় প্রায় মৃত্যুবরণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এই অভিযাত্রী দলের নেতৃত্ব করিবেন, বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক ডাঃ ফ্রান্সিস বোরে।

তিনি বলিয়াছেন, ১৫ই আগষ্ট হইতে ২০শে আগষ্ট পর্য্যন্ত সাহারায় এই অভিযান চালানো হইবে। সে সময় সেখানকার তাপ হইবে ১৪৪ ডিগ্রী (ফারেনহাইট)—বাতাসে এক কণাও জলীয় বাষ্প থাকিবে না।

ডাঃ বোরে আরও বলিয়াছেন, এই তাপমাত্রায় মানুষের দেহযন্ত্র এমন ভাবে শুকাইয়া যাইবে যে, চিন্তা করিতেও ভয় হয়। প্রতিদিন দেহ হইতে প্রায় ২৫ পাঁইট জল বাষ্প হইয়া বাহির হইয়া যাইবে। তিনি বলেন, বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের জন্য এ কৃচ্ছ্রতার প্রয়োজন রহিয়াছে। ধন্য সাধনা! এই অভিযানকালে, দূরে বালুকা-পাহাড়ের পিছন হইতে প্রায় চল্লিশজন বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক টেলিস্কোপ লইয়া ইহাদের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিবেন। জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে পৌঁছাইলে পরে সেই অভিযানকারীকে তাঁহারা বাঁচাইতে চেষ্টিত হইবেন।

জীবন ও মৃত্যুর ব্যবধানটি কোথায় এই তথ্য সংগ্রহ করাই এ অভিযানের উদ্দেশ্য। মৃত্যুর সহিত এই ভাবে খেলিতে ৫০ জন প্রার্থী আগাইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে ডাঃ বোরে মাত্র দশ জনকে বাছিয়া লইয়াছেন। এইরূপে সাক্ষাৎ মৃত্যু লইয়া যাঁহারা খেলিতেছেন তাঁহাদের অভিনন্দিত করিবার ভাষা নাই! গ

কবি সুধীন্দ্রনাথ

গত ২৪শে জুন কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত পরলোকগমন করিয়াছেন। আধুনিক বাংলা কাব্য-সাহিত্যে কবি সুধীন্দ্রনাথ একটি নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রোত্তর যুগ বলিয়া পরিচিত আধুনিক সাহিত্যের যুগে সুধীন্দ্রনাথ তাঁহার উৎকৃষ্ট ক্লাসিক্যাল রীতি, সংস্কৃত সাহিত্য হইতে ওজস্বী শব্দচয়ন, ভাষা ও প্রকাশ ভঙ্গিমার শুচিতা ও সংযমের দ্বারা তিনি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

সুধীন্দ্রনাথ ১৯০১ সনের অক্টোবর মাসে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে শ্রীমতী এনি বেসান্তের তত্ত্বাবধানে তিনি কাশীতে ১০।১১ বৎসর সংস্কৃত শিক্ষা করেন। তিনি প্রখ্যাত বৈদান্তিক পণ্ডিত স্বর্গত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের জ্যেষ্ঠ সন্তান। কাশীতে সংস্কৃত শিক্ষা সম্পন্ন করিবার পর সুধীন্দ্রনাথ ওরিয়েন্টাল সেমিনারী হইতে ১৯১৮ সনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২২ সনে তিনি স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ হইতে গ্রাজুয়েট হন এবং আর্টিকৃলড ক্লার্করূপে তাঁহার পিতার সলিসিটার ফার্ম্মে প্রবেশ করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায়, বিশেষতঃ, ফরাসী এবং জার্ম্মান ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। তিনি 'পরিচয়' নামে একটি বিশিষ্ট ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র পরিচালনা করেন। তিনি কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে 'তন্বী', 'অর্কেষ্ট্রা', 'ক্রন্দসী', 'উত্তর ফাল্গুনী', 'সংবর্ত্ত', 'দশমী' প্রধান। তাঁহার রচিত প্রবন্ধ-পুস্তক 'স্বগত', 'কুলায় ও কালপুরুষ' পাণ্ডিত্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন। একালের যাঁহারা অগ্রণী কবি, সুধীন্দ্রনাথ তাঁহাদের অন্যতম। অন্যতম তবু অনন্য। গ

ডঃ প্রকৃতিকুমার ঘোষ

ডক্টর প্রকৃতিকুমার ঘোষ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী অপর্ণা ঘোষ গত ১৯শে জুন দেরাদুনের নিকট বিমানবিধ্বস্ত হইয়া মারা যান। ডঃ ঘোষ ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক বিভাগ হইতে অবসর গ্রহণের পর ভারত সরকারের আণবিক শক্তি বিভাগে ডিরেক্টরের পদে কাজ করিতেছিলেন।

ডঃ ঘোষ ১৮৯৯ সনের ২৬শে অক্টোবর চেতলায় জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিষয়ক বি-এস-সি এবং এম-এস-সি উভয় পরীক্ষাতেই প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করেন। তার পর তিনি সরকারী বৃত্তিলাভ করিয়া উচ্চশিক্ষার্থে বিলাত যান। পরে গবেষণামূলক কার্য্যের জন্য তাঁহাকে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ-ডি এবং ডি-এস-সি উপাধি প্রদান করা হয়। তিনি শিলাবিজ্ঞান, অর্থনীতিক, খনিজবিজ্ঞান এবং চারনোকাইটস শিলা প্রভৃতির তত্ত্ব সম্বন্ধে অতি মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিয়াছেন। গ

তারে যেন দণ্ড দিই দেবদ্রোহী বলে

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

মার্কিন কবি ওয়াল্‌ট্‌ হুইটম্যান সেরা শহরের অনেকগুলি লক্ষণের কথা বলেছেন যেমন সেখানকার লোকেরা মিতব্যয়ী হবে, বাস্তব বুদ্ধির হাত ধরে চলবে, আচরণে নির্ভীকতার পরিচয় দেবে, নারীরা পুরুষের মতোই মর্য্যাদা পাবে, নিজেদের উপরে তারা নির্ভর করতে শিখবে। কিন্তু সেরা শহরের যেটা হবে প্রথম বৈশিষ্ট্য—সেটা হচ্ছে সেখানকার নাগরিকেরা শক্তিমান বাগ্মী আর কবিদের বুঝতে ও সমাদর করতে পারবে।

বাগ্মী আর কবিদের সমাদর করতে পারার মধ্যে একজন নাগরিকের গৌরবের কি পরিচয় থাকতে পারে—মনের মধ্যে এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। দেশের জন্যে অকুতোভয়ে মৃত্যুবরণ করেছে, ভগবানকে পাওয়ার জন্যে সর্বত্যাগী হয়েছে—এরকম মানুষ যে কোন শহরের পক্ষে অবশ্যই গৌরবের। কিন্তু একজন সেরা বাগ্মী অথবা কবিকে বুঝতে পারার মধ্যে কি আছে যা আমাদের ঔৎকর্ষ্যের পরিচায়ক?

একজন ইঞ্জিনীয়ারের কীর্ত্তিকে ব্যবহার করতে পারে যে-কেউ। রেলগাড়ীর যাত্রীর ইঞ্জিন তৈরীর কলা-কৌশল শিখবার দরকার হয় না। কিন্তু একজন কবির সৃষ্টিকে ব্যবহার করা তো যে সে লোকের কাজ নয়। শিক্ষার এবং সংস্কৃতির একটা বিশেষ স্তরে উঠতে না পারলে হুইটম্যানের অথবা রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মধ্যে তো প্রবেশ করা যাবে না। যার মনের জীবন বলে কিছু নেই, শিক্ষা-দীক্ষার দিক দিয়ে যে অনগ্রসর তার কাছে একজন উঁচুদরের কবির সৃষ্টি দুর্বোধ্যই থেকে যাবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—কবিকে অথবা বাগ্মীকে বুঝবার জন্যে শিক্ষার এবং সংস্কৃতির একটা বিশেষ স্তরে উঠবার প্রয়োজন আছে কেন? কারণ কবিদের এবং বাগ্মীদের কাজ হচ্ছে জাতির আত্মার মধ্যে ভাবের জ্যোতির্ময় জগতকে গড়ে তোলা। নাগরিকদের মনের জীবনকে ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ করার ব্যাপারে যেখানে ঔদাসীন্য সেখানে জাতির বাহিরের জীবন কখনোই মহৎ হোতে পারে না। মানুষ চলে তার জীবনদর্শনের আলোয়। আমাদের ভাবনা যেরকম আমাদের জীবনও তদ্রূপই হয়ে থাকে। একটা জাতি জগৎসভায় বরেণ্য হবে না হীন হয়ে থাকবে—তা একান্ত ভাবে নির্ভর করে সেই জাতির আত্মা ভাব-সম্পদে কি পরিমাণে ধনী। আমাদের অন্তরের জীবনের সঙ্গে বাহিরের জীবনের কী অদ্ভুত মিল! যার মনে সৌন্দর্য্যানুরাগ অকৃত্রিম সে কখনো খুসী মনে এমন জায়গায় বাস করতে পারে যেখানে সব-কিছুর মধ্যেই রুচিবোধের একান্ত অভাব?

তাই তো একটা জাতিকে সব দিক দিয়ে মহিমাময় করবার জন্যে কবিদের এবং বাগ্মীদের এত প্রয়োজন! ভাব নিয়েই যে তাদের কারবার। সর্বাগ্রে তারা যে ভাবুক। সতেজ চিন্তার অগ্নি-স্ফুলিঙ্গকে দিগ্বিদিকে বিকীর্ণ করে দেওয়াই হচ্ছে তাদের জীবনব্রত। আর আমাদের চিন্তাশক্তির উন্মেষের, আমাদের মনের জীবনের বিকাশের উপরে নির্ভর করে আমাদের পরিবেশ সুষমাময় হবে, না অসুন্দর হয়ে থাকবে। কেন আমাদের মফঃস্বলের শহরগুলিতে মদের দোকানগুলি আজও বিষ ছড়াচ্ছে? রাস্তার পাশে পাশে আবর্জ্জনার কুণ্ড? নর্দ্দমার দুর্গন্ধে বাতাস কলুষিত? এক কথায় এর উত্তর হচ্ছে, নাগরিক-দের জীবনে চিন্তার দৈন্য, রুচিবোধের অভাব। নাগরিক-দের মনের জীবনে পরিবর্ত্তন ঘটাতে পারলে তবেই না তাদের চারিত্রিক পরিবর্ত্তন সম্ভব আর নাগরিকদের চারিত্রিক পরিবর্ত্তন ঘটলে তবেই না আমাদের গৃহে গৃহে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে আসবে নব-বসন্তের হিল্লোল!

এইবার আমরা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারবো, কেন হুইটম্যান কবিকে এবং বাগ্মীকে এতটা গৌরব দান করেছেন। কর্ম্মকে নিয়ে এতটা মাতামাতি করা কি আমাদের পক্ষে শুভ হবে? কর্ম্মকে তো তার প্রাপ্য মর্য্যাদা দিতেই হবে! খালি পেটে ধর্ম্ম কেন, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প কিছুই হবার নয়। আর পেট ভরাতে হলে, দারিদ্র্যকে তাড়াতে গেলে দরকার প্রচুর অন্নের। এই জন্যেই তো তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে: অন্নং বহু কুর্বীত। তদ্‌ ব্রতম্‌। বহু অন্ন অর্জ্জন করবে। তা ব্রত। কিন্তু অন্ন উৎপাদন শ্রমসাপেক্ষ। এই জন্যেই সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, কবি রবীন্দ্রনাথ, সত্যাগ্রহী গান্ধী—কেউ কর্ম্মের আহ্বানকে উপেক্ষা করতে পারেন নি। সুতরাং কর্ম্মের প্রয়োজনকে অস্বীকার করবে কে? 'টেক্‌নলজি'কে

হুতআসন করতে যাওয়া বর্তমান যুগে নিশ্চয়ই মূঢ়তার চূড়ান্ত।

কিন্তু কর্মের এই গুরুত্বকে স্বীকার করে নিয়েও আইরিশ মনীষী A. E.-র ভাষায় আমরা বলবো :

What we require more than men of action at present are scholars, economists, scientists, thinkers, educationalists and litterateurs, who will populate the desert depths of national consciousness with real thought and turn the void into a fulness

এর মর্মার্থ হচ্ছে, আজকের দিনে কর্মীর চেয়ে দরকার কবিরে, চিন্তাশীলকে যিনি গণমানসের শূন্য সাহারাকে ভরিয়ে তুলবেন নব নব ভাবের শ্যামল ঐশ্বর্য্যে। একজন অতিসাধারণ মানুষেরও মগজের মধ্যে যদি একটা মহান আদর্শের হোমশিখা প্রজ্বলিত করা যায় দেখা যাবে সেই অতিসাধারণও মরিয়া হয়ে উঠেছে ঐ আদর্শের জন্যে এবং জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য জ্ঞান করে অবহেলায় প্রাণ দিয়েছে। সে দিনও আমরা দেখেছি, গান্ধীর উদাত্ত আহ্বানে কী করে গাঁয়ের অখ্যাতনামা চাষীরা দিগ্‌দিগন্ত থেকে ছুটে এসেছে, শ্বেত-শাসকদের মাথাকে হেঁট করে, বুকের তাজা রক্তে ভিজিয়ে দিয়েছে দেশের মাটি। দেশাত্মবোধের এবং সত্যাগ্রহের আদর্শের প্রেরণাতেই নিরস্ত্র জনসাধারণ বিপুল দুঃখের অগ্নিকুণ্ডে অমন করে ঝাঁপিয়ে পড়তে সমর্থ হয়েছিল।

ভারতবর্ষের জনসাধারণ ছিল মহাতামসিকতার 'নিদ্রা-জালে জড়িয়ে। সেই ঘুমের পাতালপুরীতে প্রথম মহা-জাগরণ নিয়ে এল বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দের কণ্ঠনিঃসৃত বেদান্তের অগ্নিবাণী। স্বামীজী কবি ছিলেন, বাগ্মীও ছিলেন। জাতিধর্মনির্বিশেষে আবালবৃদ্ধবণিতার মধ্যে রয়েছে অনন্ত আত্মা আর অপরাজেয় হচ্ছে এই আত্মার শক্তি—এই না বেদান্তের মর্মকথা! আর স্বামীজী যে আজীবন বেদান্তের কথা এমন করে দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে গেলেন—সে কী একটা ঝিমিয়ে-পড়া হীনবীর্য্য জাতিকে জাগ্রত এবং উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে নয়? সিলোনের রাস্তায় সমুদ্র-পথে জাহাজ যখন এডেনের কাছাকাছি তখন একটি শান্ত সন্ধ্যায় নিবেদিতার প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেন :

"আত্মশক্তিকে আশ্রয় করে ভারতবর্ষ যাতে নিজেকে বিকশিত করে তুলতে পারে সেজন্যে আমি শুধু উপনিষদ প্রচার করে থাকি। অনুসন্ধান করলে দেখতে পাবে, উপনিষদের বাণী ছাড়া আর কোন বাণী কখনো আমি উদ্ধৃত করি নি। আর উপনিষদগুলি থেকে আমি শুধু বীর্য্যের বাণীই উদ্ধৃত করেছি। সমস্ত বেদ-বেদান্তের বাণী শুধু ঐ একটি কথার মধ্যে।" ("The Master As I Saw Him"—Nivedita)

আমরা জানি স্বামীজী প্রচারিত বেদান্তের বীর্য্যের মন্ত্র নিষ্ফল হয় নি। সেই অগ্নিমন্ত্রের কশাঘাতে নিদ্রিত ভারতবর্ষ প্রথম ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরলো। মাদ্রাজের সেই ঐতিহাসিক বক্তৃতা যার মধ্যে ছিলো আত্মার অপরিমেয় শক্তির কাছে স্বামীজীর আবেগপূর্ণ আবেদন! সেই স্মরণীয় দিনটির কথা উল্লেখ করে মনীষী বর্ণ, স্বামীজীর জীবনীতে লিখেছেন :

From that day the awakening of the torpid Colossus began

সেই দিন থেকে তন্দ্রাচ্ছন্ন মহাভারতের জাগরণ হলো সুরু। কৃষ্ণ-চরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র একটা মূল্যবান কথা বলেছেন। বলেছেন, কৃষ্ণ-চরিত্রকে যদিন আমরা নিজেদের মনের মত করে গড়িয়া আনলাম বৃন্দাবনের কৃষ্ণের আড়াল করে ভারতের কৃষ্ণের প্রেরণা দিলাম সেই দিন থেকে সুরু হলো ভারতবর্ষের অবনতি। তাই না বঙ্কিম কৃষ্ণ-চরিত্রে লিখে নব্য-ভারতের মনের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন গীতাসিংহনাদকারী কৃষ্ণকে যার কণ্ঠে বীর্য্যের মন্ত্র, যিনি অর্জ্জুনকে গাণ্ডীব ধরিয়ে যুদ্ধ করালেন অন্যায়ের এবং অবিচারের বিরুদ্ধে। আগে আদর্শচ্যুতি, ফলে নৈতিক অধঃপতন। তাই বঙ্কিম হচ্ছে ভারতের রাষ্ট্রগুরু শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়। তিনি নূতন ভারতকে আদর্শ দিয়ে গড়েন।

এই জন্যেই বার্ট্রাণ্ড রাসেল (Bertrand Russel) লিখেছেন :

Thought is great and swift and free, the light of the world, and the chief glory of man.

"চিন্তা হচ্ছে মহৎ, বেগবতী এবং মুক্ত, চিন্তা হচ্ছে জগতের জ্যোতি এবং মানুষের প্রধান গৌরব।"

রাসেল আরও বলছেন :

"মানুষ চিন্তাকে যত ভয় করে পৃথিবীর আর কিছুকেই তত ভয় করে না। চিন্তা মানুষের কাছে সর্ব্বনাশের চেয়েও, মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর। চিন্তা হচ্ছে সর্ব্বধ্বংসী এবং ভয়ানক। চিন্তা কারও বিশেষ সুখ-সুবিধার পরোয়া করে না, প্রচলিত সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার উপরে খড়্গ হানতে কুণ্ঠিত হয় না, অভ্যস্ত জীবন-যাত্রার আরাম থেকে ছিন্ন করে আনতে পিছিয়ে যায় না। চিন্তা বিধি-

নিষেধের কোন ভ্রূক্ষেপ করে না, নিয়ম-শৃঙ্খলাকে গণনার মধ্যে আনে না, অন্ধ কারও কর্তৃত্বের ধার ধারে না, যুগযুগান্তের বহু পরীক্ষিত ঋষিবাক্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে সঙ্কুচিত হয় না। চিন্তা নরকের গুহার মধ্যে দৃষ্টিপাত করে, কিন্তু ভয়ে কাঁপে না।"

এ হেন চিন্তার ধারক এবং বাহক হচ্ছেন কবিরা। তাঁহাদের লেখনীর মুখে স্বর্গের আগুন। এই জন্যেই হুইট-ম্যান কবিকে বলেছেন, leader of leaders. বাস্তব নিয়ে কারবার করেন যাঁরা তাঁরা যাই বলুন না কেন, মনীষী T. H. Huxley-র অভিমতই ঠিক অর্থাৎ this world is, after all, absolutely governed by ideas, এই পৃথিবীতে চিন্তার প্রভাবই সর্ব্বেসর্ব্বা। এই জন্যেই না আচার্য্য বিনোবা বিচার-বিপ্লবের উপরে এতটা জোর দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ কবি—শুধু কবি নন, কালজয়ী মহাকবি যিনি তাঁর পরিণত সাহিত্য-প্রতিভাকে এবং সারা জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে নিয়োজিত করেছিলেন বিরাট বিরাট আদর্শের সেবায়। একটা প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশের নিষ্করুণ চাপে কবির সংবেদনশীল উদার আত্মা থেকে প্রতিবাদের আগুন-ভরা যে সুর বেরিয়ে এসেছে সেই সুর তাঁকে করেছে বিপ্লবীদের অগ্রদূত, ইবসেনের আর হুইটম্যানের সগোত্র। শান্তির ললিতবাণী শুনবার জন্যে যাঁরা উৎকর্ণ হয়ে আছেন তাঁরা রবীন্দ্র-সাহিত্য পড়ে হতাশ হবেন। তাঁর কণ্ঠে সংগ্রামের দুর্জ্জয় আহ্বান। তাঁর কাছ থেকে আমরা যা পেয়েছি তা মালা নয়, ভীষণ তরবারি। সেই তরবারি দিয়ে আমরা লড়াই করবো স্বাধীনতার এবং সত্যের জন্যে—এই ছিলো আমাদের কাছে তাঁর আবেগভরা আবেদন। 'প্রান্তিক'-এর সর্ব্বশেষ কবিতায় এই আবেদন মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে :

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস,
শান্তির ললিতবাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

সত্যের এবং স্বাধীনতার জন্যে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করবার মধ্যে যে একটি বিপুল প্রাণোদ্যমের প্রকাশ আছে—এই উদ্যমের উৎস ছিল কবির সুবিশাল মানবপ্রেম। 'আত্ম-পরিচয়' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন,

"আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে—এখানে সর্ব্বদেশ সর্ব্বজাতি ও সর্ব্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা—তারি বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহঙ্কার আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।"

সর্ব্বদেশের এবং সর্ব্বকালের মানুষকে কবি যে এমন গভীর করে ভালোবাসতে পেরেছিলেন—এর মূলে ছিল মানুষের মধ্যে দেবতাকে দেখবার সুদুর্লভ দৃষ্টি। মানুষকে ভালোবাসতে পারা যদি এতই সহজ হোতো তবে তো সবাই রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, গান্ধী হতে পারতেন। কারণ মানবপ্রেম তো শুধু পরোপকার নয়; চরম আত্মোৎসর্গের মধ্যেও আমরা শেষ পর্য্যন্ত মহৎ এবং সুন্দর নাও হতে পারি। জীবের মধ্যে যখন আমরা শিবকে ভালোবাসি তখনই আমাদের ভালোবাসা সত্য হয়ে ওঠে। শ্রীরাম-কৃষ্ণের জীবনীর মধ্যে মনীষী রোমা রলাঁ এক জায়গায় তাই লিখেছেন :

For Ramkrishna charity meant nothing less than the love of God in all men; for God is incarnate in man. Nobody can truly love man, and hence nobody can help him unless he loves the God in him.

রামকৃষ্ণের কাছে ভালোবাসার অর্থ ছিল সমস্ত মানুষের মধ্যে ভগবানকে ভালোবাসা। কারণ মানুষের মধ্যে ভগবানই তো মূর্ত্ত। মানুষের মধ্যে ভগবান বিরাজ করছেন। তাঁকে ভালোবাসতে না পারলে কখনও মানুষকে ভালোবাসা এবং সাহায্য করা যায়?

এই জন্যেই মনস্বী মরিস্ মেটারলিঙ্ক (Maurice Maeterlink) "The Treasure of the Humble বইখানির এক জায়গায় লিখেছেন, To learn to love, one must first learn to see. কেমন করে ভালো-বাসতে হয় তা শিখতে হলে আগে দরকার দেখতে শেখা, জীবের মধ্যে শিবকে, নরের মধ্যে নারায়ণকে দেখতে শেখা। দরকার হচ্ছে, জাগ্রত থাকা। মেটার-লিঙ্ক যেমন বলেছেন, and better had you watch in the marketplace than slumber in the temple. মন্দিরে ঘুমানোর চেয়ে বাজারে জেগে থাকা কি অনেক ভালো নয়?

এই দৃষ্টিই হচ্ছে বড়ো কথা, ভালোবাসার একদম গোড়ার কথা। কবির বয়স যখন আঠারো কি উনিশ হবে বা বিশও হতে পারে তখন চৌরঙ্গীতে দাদার বাড়ীতে অবস্থানকালে একদিন ভোরে হঠাৎ তিনি আবিষ্কার করেছিলেন তাঁকে "যিনি মানুষের ভূত-

ভবিষ্যতের মধ্যে পরিব্যাপ্ত, যিনি অরূপ, কিন্তু সকল মানুষের রূপের মধ্যে যাঁর অন্তরতম আবির্ভাব।" এই অদ্ভুত আবিষ্কারের কথা লিখতে গিয়ে 'মানুষের ধর্ম্ম' বইখানির পরিশিষ্টে তিনি লিখেছেন :

"সেই ভোরে উঠে একদিন চৌরঙ্গীর বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলুম। তখন ওখানে ফ্রি ইস্কুল বলে একটা ইস্কুল ছিল। রাস্তাটা পেরিয়েই ইস্কুলের হাতাটা দেখা যেত। সেদিকে চেয়ে দেখলুম গাছের আড়ালে সূর্য্য উঠছে। যেমনি সূর্য্যের আবির্ভাব হোলো গাছের অন্তরালের থেকে, অমনি মনের পর্দ্দা খুলে গেল। মনে হ'ল মানুষ আজন্ম একটা আবরণ নিয়ে থাকে। সেইটাতেই তার স্বাতন্ত্র্য। স্বাতন্ত্র্যের বেড়া লুপ্ত হলে সাংসারিক প্রয়োজনের অনেক অসুবিধা। কিন্তু সেদিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার আবরণ খসে পড়ল। মনে হ'ল সত্যকে মুক্ত দৃষ্টিতে দেখলুম। মানুষের অন্তরাত্মাকে দেখলুম। দু'জন মুটে কাঁধে হাত দিয়ে হাসতে হাসতে চলেছে। তাদের দেখে মনে হ'ল কি অনির্ব্বচনীয় সুন্দর। মনে হ'ল না তারা মুটে। সেদিন তাদের অন্তরাত্মাকে দেখলুম, সেখানে আছে চিরকালের মানুষ।"

মেটারলিঙ্ক বলেছেন এই দেখার কথাই যে-দেখা থেকে আসে সত্যিকারের প্রেম। আর মানুষকে এমনি গভীর করে ভালোবাসতে পারলে "মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান"-এর সামনে কি উদাসীন থাকা যায়? কবি তাই নরদেবতার অসম্মানের সম্মুখে কখনও চুপ করে থাকতে পারেন নি। পঞ্জাবে জাঁদরেল জেনারেল ডায়ারের অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিবাদে বৃটিশের প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি প্রথম যিনি বর্জ্জন করেছিলেন তিনি কি কবি রবীন্দ্রনাথ নন? দেবতা প্রতিটি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সেই মানুষের ভিতর দিয়ে তাঁর একটা বিশেষ উদ্দেশ্যকে সফল করবার জন্যে। বিধাতার সৃষ্ট এই মানুষকে যে-মানুষ দাবিয়ে রেখে ব্যবহার করতে চায় নিজের প্রয়োজনসিদ্ধির উদ্দেশ্যে—সেই আত্মকেন্দ্রিক অত্যাচারীকে রবীন্দ্রনাথ কখনও ক্ষমা করেন নি। তাঁর মানসপুত্রেরা এবং মানসকন্যারা সত্যের এবং স্বাধীনতার পূজারী এবং পূজারিণী। তাদের মর্য্যাদার উপরে যেখানে কেউ পদক্ষেপ করেছে—সে রাজাই হোক আর পুরোহিত হোক, স্বামী হোক অথবা পিতাই হোক—তাকে তারা কখনও সহ্য করে নি ; সর্ব্বশক্তি নিয়ে তাকে দণ্ড দিয়েছে দেবদ্রোহী বলে। সত্যি সত্যি পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ আছে যাকে অবজ্ঞা করা যায়? বার্ট্রাণ্ড রাসেলের সেই অপূর্ব্ব মন্তব্য!

He sees, in his moments of insight, that in all human beings there is something deserving of love, something mysterious, something appealing a pry out of the night, a groping journey, and a possible victory.

"যার মধ্যে আধ্যাত্মিক জীবন জেগেছে সে বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত্তগুলিতে দেখতে পায়, সকল মানুষের মধ্যেই এমন-কিছু রয়েছে যা ভালোবাসার যোগ্য, এমন-কিছু আছে যা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, এমন-কিছু যার আবেদনকে স্বীকার না করে উপায় নেই, রাতের আঁধারে মুক্তির জন্যে যা কান্না, যা চলা—আলোর পানে প্রাণের চলা—যে চলায় পদে পদে ভুল, এবং হয়তো যার পরিণতি জয়ে।"

বুদ্ধি এবং নীতির দিক দিয়ে আত্মকেন্দ্রিকতা একটা বিরাট মূঢ়তা। একজন আত্মকেন্দ্রিক মানুষের স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বলি হবার জন্যে আর আর মানুষগুলো তৈরী হয়েছে—এই দৃষ্টি নিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার কখনোই চলতে পারে না। এ যুগের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক টয়েনবী ঠিকই বলেছেন :

Each personality has something in it that is unique, and each walk of life has its peculiar experience, outlook and approach.

প্রত্যেক ব্যক্তিত্বের মধ্যেই এমন-কিছু আছে যা অনুপম, জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই এমন অভিজ্ঞতা, এমন দৃষ্টিভঙ্গিমা, এমন একটা 'এ্যাপ্রোচ' আছে যা আপন বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র।

রাসেলের এবং টয়েনবীর এই জীবনদর্শনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের একটা অদ্ভুত মিল আছে। মানুষের উপরে রবীন্দ্রনাথের এই পরম শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে 'যোগাযোগ' উপন্যাসে বিপ্রদাসের কণ্ঠে যেখানে বিপ্রদাস মোতির মাকে বলছে : "আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি কুমুকে যিনি গড়েছেন তিনি আগাগোড়া পরম শ্রদ্ধা করে গড়েছেন। কুমুকে অবজ্ঞা করে এমন যোগ্যতা কারো নেই, চক্রবর্ত্তী সম্রাটেরও না।" নৈবেদ্যের কবিতায় এই একই জীবনদর্শনেরই ছন্দোময় অপূর্ব্ব প্রকাশ :

মোর মনুষ্যত্ব সে যে তোমারি প্রতিমা,
আত্মার মহত্বে মম তোমারি মহিমা,
মহেশ্বর।
সেথায় যে পদক্ষেপ করে,
অবমান বহি আনে অবজ্ঞার ভরে,

হোক-না সে মহারাজ বিশ্বমহীতলে,
তারে যেন দণ্ড দিই দেবদ্রোহী বলে
সর্বশক্তি লয়ে মোর। যাক আর সব,
আপন গৌরবে রাখি তোমার গৌরব।

মুক্তধারা নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগী রাজা রণজিতের কর্তৃত্বকে নির্ভয়ে অস্বীকার করে দৃঢ়কণ্ঠে বলেছে: "আমার উদ্বৃত্ত অন্ন তোমার, ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়।" রাজা জিজ্ঞাসা করেছে, রাজাকে দেবে কিনা, বল। রাজার মুখের উপর ধনঞ্জয় জবাব দিয়েছে, 'না, মহারাজ, দেবো না।' গল্পগুচ্ছের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি তথাকথিত পতির অন্যায় কর্তৃত্বকে নতশিরে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। ঐ ঐতিহাসিক গল্পটিতে স্ত্রী তার স্বামীকে পত্রে লিখেছে, "কিন্তু আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরবো না। আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয়টা যে কি তা আমি পেয়েছি। আর আমার দরকার নেই।" 'যোগাযোগ' উপন্যাসের কুমুও কি মধুসূদনের মতো স্বামী প্রবরের উদ্ধত রুক্ষতাকে মাথা নোয়ায়ে দাসীর মত স্বীকার করে নিয়েছে? তার 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ' গল্পটিতে তো অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে পুত্রের সেই প্রতিবাদে পাঠক-পাঠিকার মনে কি আনন্দের ঢেউ খেলে যায় না? বুড়োশিবতলা গ্রামে হঠাৎ বৃষ্টি নেমে কন্যার পিতা যজ্ঞেশ্বরের সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ করে দিয়েছে। পল্লীগ্রামে হঠাৎ কিছু সংগ্রহ করাও কঠিন। এই বিপদে বাগানপাড়ার হৃদয়বান গোয়ালারা ছানা যুগিয়ে যজ্ঞেশ্বরকে সাহায্য করলো। কিন্তু নিষ্ঠুর বরযাত্রীরা পুত্রের জমিদার পিতা গৌরসুন্দরের নীরব ইঙ্গিতে কন্যাপক্ষকে বিপন্ন করবার জন্যে কাদা মিশিয়ে ছানা ফেলে দিতে লাগল। কন্যার পিতার সম্ভ্রম যখন যায় যায় এমনি একটা ঘোরালো পরিস্থিতিতে লেখক বাসরঘরের বরকে অসময়ে ভোজনশালায় এনে উপস্থিত করিয়েছেন। বর বিভূতি রুদ্ধকণ্ঠে পিতাকে বললে, 'বাবা, আমাদের একী ব্যবহার!' ব্যস, ঐ এক কথাতেই সমস্ত বর্বরতার অবসান। ছানাও যথাস্থানে যেতে লাগলো, বিবাহও নির্বিঘ্নে মিটে গেল।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে লাঞ্ছিত নরদেবতার অসম্মানের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের লেখনীমুখে এই যে বলিষ্ঠ প্রতিবাদের সুর—এই সুর তাঁর সাহিত্যে এনেছে যুগদেবতার পদধ্বনি। আর এই যুগদেবতা হচ্ছে গণতন্ত্র। গণতন্ত্রে জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের—জাতির অধমতম মানুষেরও—কল্যাণের আদর্শের স্বীকৃতি। গণতন্ত্র বলে, কাউকে বাদ দিয়ে যে স্বাধীনতা—সে স্বাধীনতাই নয়। লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থের ৯৩ পৃষ্ঠায়:

সমস্ত মানবসংসারে যতক্ষণ দুঃখ আছে, অভাব আছে, অপমান আছে ততক্ষণ কোন একটি মাত্র মানুষ নিষ্কৃতি পেতে পারে না। একটিমাত্র প্রদীপ অন্ধকারে একটুমাত্র ছিদ্র করলে তাতে রাত্রির ক্ষয় হয় না, সমস্ত অন্ধকারের অপসারণে রাত্রির অবসান। সেইজন্যে মানুষের মুক্তি যে মহাপুরুষেরা কামনা করেছেন তাঁদেরই বাণী সম্ভবামি যুগে যুগে।"

রবীন্দ্রনাথও যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে সমস্ত মানুষেরই মুক্তির জন্যে। অপরিমাণ পথেই মানুষ আপনার অন্তরের অপরিমেয় সত্যকে প্রকাশ করে। 'মানুষের ধর্ম' বইতে এক জায়গায় লেখা আছে: যখন অহং তার আপন ঐকান্তিকতা ভোলে তখন দেখে সত্যকে।' আর এক জায়গায় লেখা আছে: 'অহং-এর মধ্যে সমাবদ্ধ যে জীবন সেটা মিথ্যা।' সমস্ত রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্যে যে সুরটি কবির বীণায় বারংবার বেজে উঠেছে সেটি হচ্ছে, 'অহংকারের মিথ্যা হতে বাঁচাও দয়া করে।' বিশ্বজীবনের কল্লোলধ্বনি তাঁর প্রাণকে করেছে আকুল আর সেইজন্যেই কর্ম থেকে তিনি ছুটি নিতে পারেন নি। চরাচরব্যাপী কাকলিকল্লোলে মুখরিত পদ্মাচরকে পিছনে রেখে বোলপুরের প্রান্তরে কর্মজীবন সুরু করলেন— কারণ রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই 'যিনি মহাত্মা তাঁর বিশ্বকর্ম।' শুধু কবিহিসাবে নয়, মানুষহিসাবেও রবীন্দ্রনাথ মহামানবই ছিলেন। আর মহামানব ছিলেন বলেই দুর্বলকে রক্ষা করবার জন্যে আগিয়ে গেছেন জননীর করুণ হৃদয় নিয়ে, দুর্জনকে হেনেছেন নির্মম আঘাত। তাঁর 'আফ্রিকা' কবিতায় 'মানহারা মানবীর দ্বারে' দাঁড়াবার জন্যে যুগের কাছে কবির কি মর্মান্তিক আবেদন! গর্বান্ধ এবং হিংস্র সাম্রাজ্যবাদের উপরে কবির লেখনী করেছে নির্মম খড়্গাঘাত। জাপান যখন চীন আক্রমণ করেছে আর জাপানের কবি নোগুচি সেই আক্রমণকে সমর্থন করছেন তখনও কবি যে চিঠি লিখেছিলেন নোগুচিকে তার মধ্যে দেখেছি কবির বিশাল হৃদয়ের ভাস্বর প্রকাশকে। আন্তর্জাতিক যুদ্ধের সময়ে রোমাঁ রলাঁ নির্বাসন থেকে যে সব প্রবন্ধ লিখেছিলেন সেগুলিকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হয়েছে 'Above the Battle' নাম দিয়ে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের উগ্র অভিব্যক্তিকে রবীন্দ্রনাথ রলাঁর মতোই ক্ষমা করতে পারেন নি। রলাঁ, রাসেল, রবীন্দ্রনাথ—মানবতার দিক দিয়ে এঁরা তিনজনেই সগোত্র।

কিন্তু এর থেকে এমন সিদ্ধান্ত আমরা যেন করে না বসি যে, রবীন্দ্রনাথ স্বাদেশিকতাকে বক্রদৃষ্টিতে দেখতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রত্যেক জাতিরই মানবসভ্যতার ভাণ্ডারে কিছু-না-কিছু দেবার আছে। আর সাম্রাজ্যবাদের বেড়াজালের মধ্যে কোন জাতির জীবন যদি পঙ্গু হয়ে থাকে সেই পঙ্গুত্ব জাতির উপরে আনে ইতিহাসের ধিক্কার। তাই পাশ্চাত্ত্যের নিষ্ঠুর সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলিত এসিয়ার ক্ষুব্ধ আত্মার গরিমাময় অভ্যুত্থানকে কবি দুবাহু বাড়িয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে এই অভ্যর্থনার প্রকাশ কি আনন্দের ভাষায় :

"ইতিহাসের সেই ধিক্কার বহুকালের সুপ্তিমগ্ন এসিয়া মহাদেশের বক্ষে দিয়েছে আজ আঘাত ; সকল দিকেই শুনছি জনগণের অন্তর্য্যামী মহান পুরুষ তামসিকতার বন্দীশালায় শৃঙ্খলে দিয়েছেন ঝঙ্কার, তাঁর প্রকাশের তপোদীপ্তি জ্বলে উঠেছে তমসঃ পরস্তাৎ। রব উঠেছে, শৃণ্বন্তু বিশ্বে শোনো বিশ্বজন তাঁর আহ্বান শোনো, সে-আহ্বানে ভয় যায় ছুটে। স্বার্থ হয় লজ্জিত, মৃত্যুঞ্জয় শঙ্খধ্বনি করে ওঠেন মৃত্যুদুঃখবন্ধুর অমৃতের পথে।"

হাঁ, রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্য্যন্ত নরদেবতার পূজারী। ভারতবর্ষকে সেই স্বর্গে তিনি জাগ্রত দেখতে চেয়েছেন যেখানে মানুষ ভয়কে করেছে জয়, মাথা করেনি কারও কাছে অবনত। 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির'—এই হচ্ছে সেই স্বর্গের প্রথম বৈশিষ্ট্য। সর্ব্বপ্রকার তামসিকতার বিরুদ্ধে তূর্য্যধ্বনি করে যিনি জাতিকে জাগ্রত এবং উন্নত রাখতে চেয়েছিলেন গান্ধীজীর ভাষায় সেই Great Sentinel-কে শতসহস্র প্রণাম।

নম্রনীলনভোতলে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

যতবার হেরিতেছি মনে হয় যেন বাতিঘর
দুরন্ত ঝটিকাহত জাহাজের চোখে।
সিন্ধু-ঘেরা দ্বীপসম সবুজ-শোভায় নিরন্তর
জেগে আছ দোলা দিয়ে মোর মর্ম্মলোকে।
প্রান্তরের কোলে কোলে দিনান্তের শেষ বর্ণরেখা
পান্থহারা পথ গেছে এঁকেবেঁকে, সেথা তব দেখা।

জ্যামিতিক উপপাদ্য সম মোর সহস্র ভাবনা,
নাহি অবকাশ নদীতরঙ্গের মত।
অনুকূল আবহাওয়া কোথা ?—কেন দু'দণ্ড কামনা
আলাপন তরে করি, সে যে অনাগত।
নম্রনীলনভোতলে তৃণপত্রে ঢাকা অন্তরালে
বকের পালক ঝরে বীথিকার ছায়াঘন জালে।

জীবনের বহু কথা উড়ে গেছে, ফেলে-আসা দিন
স্মৃতির সমীরে কাঁদে : ব্যর্থ বিলাপন।
একটি মিনতি আর প্রতিশ্রুতি হবে কি বিলীন
বিরহ ধূসর চিন্তা ফেলে সারাক্ষণ ?
অলস পাখীর ডাক, ঝিঁঝিঁদের স্বর আসে কানে
বিস্তীর্ণ আকাশে তারা চেয়ে রবে আমাদের পানে।

তুমি চেয়ে আছ যেন রাত্রে-ঝরা কুসুমের সম
হয়তো অনেক কিছু কহিবার আছে।
যৌবন-দুপুর লয়ে এলে সান্ধ্য অবসরে মম
দূরের দেউল হোতে শোনো ঘণ্টা বাজে।
আশার সোনালি ভোরে স্বপনের সমুদ্রের স্বর
হয়তো তোমার মনে এনে দেবে দিগন্তের ঝড় !

আদিম

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারে মামাদের ওই যে একশ' বিঘের প্রকাণ্ড বাগানটি, ওখানে আমরা ছেলেবেলা মাঝে মাঝে পিক্‌নিক্ করতে যেতাম। ওটা মামাদের সাতপুরুষের বাগানবাড়ী, কিন্তু সরিকী বিবাদের ফলে অনেকদিন হ'ল ওখানে যাওয়া-আসা বন্ধ হয়ে গেছে। ছেলেবেলাই আমরা দেখেছি বাগানবাড়ীর বাড়ীটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্তূপ, আর বাগানটি অরণ্যে পরিণত। দিদিমার কাছে শুনেছি, যখন তিনি এগারো বছর বয়সে বধূ হিসাবে এই সংসারে প্রবেশ করেন তখন ওঁদের পরিবারের আভিজাত্যে ভাঁটা পড়লেও একেবারে শুকিয়ে যায় নি। বছরে এক-আধবার তখন মরাগাঙে কিছুটা জোয়ার খেলত, দাদামশাইয়ের বাবা-কাকা-জ্যেঠারা তাকিয়া, আলবোলা, ঝাড়লণ্ঠন সহযোগে দোল-দুর্গোৎসব, যাত্রাগান, খেম্‌টা-নাচ করাতেন। "ওই বাড়ীতে কত মেম নেচেছে গো!" মামাদের প্রাচীনা ঝি ক্ষেমঙ্করীকে আমরাও বলতে শুনেছি।

কিন্তু আমরা এসব কিছুই দেখি নি। আমরা শুধু দেখেছি জঙ্গল আর জঙ্গল। লোলচর্ম সুপ্রাচীন আমগাছগুলির সর্বাঙ্গে শ্যাওলা আর পরগাছার প্রগলভ আত্মবিস্তার। পরন্তু জমিদারের মোসাহেবদের মত রক্তশোষা স্তাবকের দল—যার অনুগ্রহে বেঁচে আছে তারই রক্তস্ফীতোদর। আর দেখেছি জটাজুটধারী ত্রিকালজ্ঞ সন্ন্যাসীর মত বটগাছগুলি। এদের এলাকা পার হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের দিকে দশ বিঘা জমির উপর যে দীঘিটা দেখা যায় তার শ্যাওলাপড়া নিথর জলের উপর হিংস্র আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বাঁশঝোপগুলি—বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেনের স্তিমিত রাজশক্তির উপর বক্তিয়ার খিলজির তুর্কী সেনাদলের মতন। ওখান থেকেই বাঁশবন চলেছে ত চলেছেই। ওদিকে যাবার দুঃসাহস আমাদের কারোরই ছিল না। রাস্তার ধারে বাগানের মুখে মামারা ছোট্ট একখানা ঘর তৈরি করেছিলেন মাঝে মাঝে এসে থাকবার জন্য। তারই আশেপাশে আমরা আড্ডা জমাতাম, সারাদিন হৈ-চৈ করে, খিচুড়ি-মাংস খেয়ে সন্ধ্যার যথেষ্ট আগেই সরে পড়তাম।

দীঘির দিকটাতে না যাওয়ার বিশেষ একটা কারণ ছিল। শুনেছি ও থাকত ওই দিকেই। ও-কে আমরা ভাল করে কেউ জানতাম না, চিনতাম ত না-ই। শুধু ওর নামেই একটা আতঙ্ক আমাদের শিরা-উপশিরা দিয়ে বরফের স্রোতের মতন বয়ে যেত। ও ছিল আমাদের কাছে একটা কিংবদন্তী। বাঁশবনের গভীর গহনে কোথায় ওর আস্তানা কেউ জানত না। অথচ হিমালয়ের তুষার মানবের মত ওর অস্তিত্বে একটা স্থির প্রত্যয় সকলেরই ছিল। ও যেন বাগানের একটা সম্পদ, যা অন্য কোথাও নেই। লোকে বলত, "সিংগীদের বাগান ত? যেখানে—।" তার পরই ভয়ার্ত্ত চোখ মেলে তাকাত। হয়ত বলত, "আমার বাবা একবার দেখেছিলেন, ভোরবেলা অন্ধকারে,—সে কি চেহারা—!" আমরা হাঁ করে গল্প শুনতাম, আর আমাদের চারপাশে ওর অশরীরী অস্তিত্ব অনুভব করতাম। শঙ্কিত দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক একবার চোখ বুলিয়ে নিতাম আর মনে হ'ত, জঙ্গল ভেদ করে অতর্কিতে কখন বুঝি আমাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে, পালাবার অবসর পাব না।

কিন্তু ও কি সত্যিই হিংস্র? জানি না। আশপাশের সাতটা গাঁয়ের লোকেরা সাক্ষ্য দেবে, ওকে তারা সাক্ষাৎ যমের মত ভয় করে, কিন্তু কোন লোককে ও আক্রমণ করেছে এমন কথা তারা জানে না। দিনের বেলা সভ্য মানুষের জগতে ও বেরোয় না, হয়ত নিতান্ত অসভ্য। কিন্তু জীবহিসাবে ও দেহের প্রয়োজন আছে। তাই রাতের গহনে বেরোয় আহারের সন্ধানে। ঘুরতে ঘুরতে অনেক সময় লোকালয়েও এসে পড়ে। কিন্তু গাড়ী-ঘোড়া দেখলে ভয় পায়, পালাবার চেষ্টা করে। মামাদের বাগানের কাছে একবার এক চাষী দেখেছিল, রাস্তায় গাড়ীর সাড়া পেয়ে অবলীলাক্রমে লাফিয়ে পাঁচ হাত উঁচু প্রাচীর টপকে জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল। সে কি তার চেহারা, শ্যাম চিক্কণ দেহকান্তি, অপরূপ বন্য-সুষমায় মণ্ডিত সমস্ত দেহে ইস্পাতের মত ঝক্‌ঝকে পেশীর সুঠাম ছন্দ।

কোন প্রকৃতি-প্রেমিক মধ্যযুগীয় কবি ওকে দেখলে প্রকৃতির কোলে লালিত রুসীর মতই ওর মধ্যে এক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সাক্ষাৎ পেতেন। আর আধুনিক

কবি শ্রেণী-সংগ্রামে দলিত মানবাত্মার প্রতীকরূপে ওর মধ্যে বিপ্লবের আগুন প্রত্যক্ষ করতেন। এতদিন পর প্রৌঢ়ত্বের সীমায় উপনীত হয়ে আমার মনে হচ্ছে, ও ছিল প্রকৃতপক্ষে বিস্মৃত সুদূর অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানের এক অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র। সেই অতীত, যে সময় পাথরের হাতিয়ার নিয়ে অসভ্য গুহামানব হিংস্র শ্বাপদের সঙ্গে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকত, বন্য হরিণ আর শূকরের কাঁচা মাংস খেয়ে জীবন ধারণ করত, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষার দারুণ প্রকোপ থেকে আত্মরক্ষা করত গাছের পাতা আর বাকল দিয়ে, আর সেই সঙ্গে সৌন্দর্য্য আর সংস্কৃতির চর্চ্চা করত গুহার মধ্যে দেয়ালে ছবি এঁকে। বেঁচে থাকবার সংগ্রামে মানুষের এগিয়ে চলার তাগিদ আজ আকাশে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে গিয়ে পৌঁছেছে, আরও যাবে। কিন্তু এই সংগ্রামে মরে নিঃশেষ হয়ে গেছে অতীতের মেসো-জোয়িক যুগের অতিকায় দানব ডিপ্লোডকাস্, টিবানো-সোরাস্ প্রভৃতি। ও বুঝি সেই অতীতের মানব, অকস্মাৎ কয়েক লক্ষ বছর অতিক্রম করে এসে পড়েছে বর্ত্তমানে, তাই নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছে না। বিবর্ত্তনের গতির সঙ্গে পা ফেলতে পারে নি যারা তাদের অনেকেই ত মুছে গেছে পৃথিবীর বুক থেকে।

ওকেও দেখলাম এমনি ভাবে একদিন মুছে যেতে। একদিন ভোরবেলা, ও বোধ হয় সেদিন ওর নৈশ-পরিক্রমা শেষ করে ফিরতে একটু দেরী করেছিল—সামান্য ভুলের মাশুল দিতে হ'ল জীবন দিয়ে।

তখন বালীখাল-বর্দ্ধমানের বাস কিছুদিন হ'ল চলতে শুরু করেছে। খোলা রাস্তা পেয়ে প্রকাণ্ড একখানা বাস বিপুল গতিতে আসছিল। ও ঠিক সেই সময় রাস্তা পার হচ্ছিল। বাসের চালক বোধ হয় তার যন্ত্রদানবের গতিরোধ করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে থামল ওর গায়ের উপর দিয়ে গিয়ে কিছুদূরে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা কয়েকজন সেই বাসেই ছিলাম। যাত্রী সকলেই হৈ হৈ করে উঠল।

বাব্বাঃ, কতবড় সাপ! কি সাংঘাতিক—কাছে যাবেন না মশাই, কি সাপ কে জানে। উঃ কত বড়!

একেবারে গায়ের উপর দিয়ে চাকা গেছে।

মরেছে কি? সাপের জান,—কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে, এক্ষুণি হয়ত তেড়ে আসবে।

পথচারী স্থানীয় লোকও জুটে গেছে কয়েকজন! আরে, সিংগীদের বাগানের সে-ই না? শঙ্খচূড়। হ্যাঁ, কুণ্ডলী খুলছে, পালা পালা।

আমরা ততক্ষণ নেমে পড়েছি। ওর পিষ্ট দলিত দেহটা থর থর করে কাঁপছে, নিজেকে আর টেনে নিতে পারছে না। রাস্তার পাশে খানায় গড়িয়ে পড়ে আরও কয়েকবার মোচড় দিয়ে ধীরে ধীরে থেমে গেল। বিবর্ত্তনের পথে অতীতের আর একটি সাক্ষী চিরতরে ধূলায় মিশে গেল।

না না, শঙ্খচূড় নয়, নিতান্তই নির্ব্বিষ একটা ঢেমনা, তবে প্রকাণ্ড, সাড়ে আট হাত লম্বা। ওর বিক্রম দেখে লোকে ভুল করত।

শঙ্খচূড় হ'লে হয়ত আরও কিছুকাল বাঁচত।

জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

৫

পূর্ব কয়েকটি সংখ্যায় শঙ্কর তাঁর গীতা-ভাষ্যে কি ভাবে জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ খণ্ডন করেছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এই সংখ্যায় তিনি তাঁর উপনিষদ্ ভাষ্যে এই বিষয়ে কি বলেছেন, তারই সামান্য আভাস দেওয়া হচ্ছে।

যেমন, কেনোপনিষদের ভাষ্য ভূমিকাতেও শঙ্কর একই যুক্তির মাধ্যমে জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়-বাদ খণ্ডনে ব্রতী হয়েছেন।

এক্ষেত্রে তিনি বলছেন যে, হয়ত কেহ কেহ বলতে পারেন যে, কর্মসহিত জ্ঞান থেকে মোক্ষলাভ সম্ভবপর। কিন্তু প্রকৃতকল্পে, তা কোনো ক্রমেই সম্ভবপর নয়, কারণ কর্ম সহিত জ্ঞানের ফল মোক্ষ নয়, বস্তুতঃ, শাস্ত্রে প্রজ্ঞা বা পুত্রের, সকাম কর্মের এবং সকাম উপাসনার ফলরূপে যথাক্রমে নির্দিষ্ট হয়েছে মনুষ্য-লোক, পিতৃলোক ও দেবলোক। অপরপক্ষে, দেবতা জ্ঞান-সমন্বিত, নিষ্কাম কর্ম ও উপাসনার ফল হ'ল ক্রমমুক্তি সেজন্য, যা পূর্বেই বলা হয়েছে, জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়ের কথা যদি বলতেই হয়, তবে সেইজ্ঞানকে গ্রহণ করতে হবে দেবতা-জ্ঞান এবং নিষ্কাম দেবতোপাসনা রূপে। কারণ :—

"কর্ম-সহ ভাবিত্ব-বিরোধাচ্চ প্রত্যগাত্ম-ব্রহ্ম-বিজ্ঞানস্ত।" (কেনোপনিষদ্-ভাষ্য-ভূমিকা)

জীবই যে ব্রহ্ম এই জ্ঞান কর্মের বিরোধী। সেজন্য এরূপ জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়, সহাবস্থিতি, সহানুষ্ঠান অসম্ভব।

পূর্বেই যা বারংবার বলা হয়েছে, কর্মে কর্তা, কারক, ক্রিয়া, ফল প্রভৃতির অসংখ্য ভেদ আছে; জ্ঞানে সমস্ত ভেদ বিলুপ্ত হয়ে অভেদের আবির্ভাব হয়। পুনরায়, জ্ঞান জ্ঞাতার ইচ্ছাধীন নয়, বস্তুর অধীন: কর্ম কর্তার সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। এই সকল মূলীভূত পরস্পর-বিরোধের জন্য জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় অযৌক্তিক।

তৈত্তিরীয়োপনিষদ-ভাষ্যেও, শঙ্কর জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়-বাদ খণ্ডনের প্রচেষ্টা করেছেন তাঁর স্বভাব-সুলভ সরল অথচ নিগূঢ় যুক্তিবিচারের মাধ্যমে (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্-ভাষ্য ১-১১)।

এক্ষেত্রে তিনি পাঁচটি বিকল্প উত্থাপিত করে আরম্ভ করেছেন :—

"অত্রৈতচ্চিন্ত্যতে বিদ্যা-কর্মণোর্বিবেকার্থম্—কিং কর্মভ্য এব কেবলেভ্যঃ পরং শ্রেয়ঃ, উত বিদ্যা সংব্যপেক্ষেভ্যঃ, আহোস্বিদ্-বিদ্যা কর্মভ্যাং সংহতাভ্যাম্, বিদ্যায়া বা কর্মাপেক্ষায়াঃ, উত কেবলায়া এব বিদ্যায়াঃ? ইতি।"

(তৈত্তিরীয়োপনিষদ্-ভাষ্য, ১-১১)

বিদ্যা ও কর্মের মধ্যে প্রভেদ বিশ্লেষণের জন্য এস্থলে চিন্তা করা হচ্ছে—

মোক্ষলাভ হয় কি কেবল কর্ম থেকে? অথবা বিদ্যা-সাপেক্ষ কর্ম থেকে? অথবা, বিদ্যা ও কর্মের সমুচ্চয় থেকে? অথবা, কর্ম-সাপেক্ষ বিদ্যা থেকে? অথবা, কেবল বিদ্যা থেকে?

প্রথমতঃ, বলা যেতে পারে যে, কেবল কর্ম থেকেই মোক্ষলাভ হয়। তার কারণ হ'ল এই যে, শ্রুতি-স্মৃতি অনুসারে, সমস্ত বেদার্থজ্ঞ পুরুষেরই শাস্ত্রীয় কর্মে অধিকার আছে। "বিদ্বান্ যজ্ঞ করেন," "বিদ্বান যজ্ঞ করান" প্রমুখ বাক্যানুসারে, সর্বত্রই এই বিহিত হয়েছে যে জ্ঞানলাভ করে, তবেই কর্মানুষ্ঠান করবে। সেজন্যই কারো কারো মতে, সমগ্র বেদই কর্মার্থ, অথবা সমগ্র বেদেরই বিষয় বস্তু হ'ল কর্ম। এই কারণে, কর্ম থেকে মোক্ষলাভ না হলে, সমগ্র বেদই নিরর্থক হয়ে পড়বে।

এর উত্তরে শঙ্কর বলছেন যে, এই মতবাদ বা "কর্ম-যোগ" গ্রহণযোগ্য নয়।

"নিত্যত্বাৎ মোক্ষস্য।
"কর্মকার্যস্যানিত্যত্বং প্রসিদ্ধম্ লোকে।
"কর্মভ্যশ্চেৎ শ্রেয়ঃ, অনিত্যং স্যাৎ।"

(তৈত্তিরীয়োপনিষদ্-ভাষ্য, ১-১১)

সর্ববাদিসম্মতক্রমে, মোক্ষ নিত্য। একই ভাবে, সর্ব-বাদিসম্মতক্রমে, কর্মের কার্য বা ফল অনিত্য। সেজন্য মোক্ষকে কর্মের কার্য বা ফল বলে। গ্রহণ করলে, মোক্ষ অনিত্য হয়ে পড়ে।

পুনরায় বলা যেতে পারে যে, কর্মের দ্বারা এইভাবে মোক্ষের উৎপত্তি না হয় নাই হ'ল। কিন্তু তা সত্ত্বেও, কেবল কর্মের দ্বারা মোক্ষলাভ হতে পারে এই ভাবে:— সেই সময়ে, কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম পরিত্যাগ এবং কেবল নিত্য কর্মেরই অনুষ্ঠান করতে হবে। তার সাহায্যে, সমস্ত পাপের বিনাশ এবং সেই সঙ্গে, প্রারব্ধ কর্মেরও ভোগ দ্বারা ক্ষয় হয়ে যাবে। এরূপে, নিত্য মোক্ষেরও আবির্ভাবের পথে আর কোনরূপ বাধা থাকবে না।

এর উত্তরে শঙ্কর বলছেন যে, এরূপ সম্ভবপর হতে পারে না, যেহেতু পূর্ব পূর্ব জন্মে যে সকল অসংখ্য কর্ম স্ব স্ব ফল উৎপাদন করেনি, তাদের উপভোগ দ্বারা ক্ষয় যাতে হতে পারে, সেজন্য জন্মান্তরের প্রয়োজন নিশ্চয়ই। অপরপক্ষে, সেই সকল প্রাক্তন সকাম কর্ম এবং নিষ্কাম নিত্যকর্ম পরস্পরবিরোধী নয় বলে, নিত্যকর্ম দ্বারাও প্রাক্তন কর্মের বিনাশ অসম্ভব। প্রাক্তন সকাম কর্ম এবং নিষ্কাম নিত্যকর্ম পরস্পরবিরোধী নয় এইজন্য যে, কামনা ও কামনাভাব—এই দিক্ থেকে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ থাকলেও, অবিদ্যামূলক ভেদজ্ঞান ত উভয় ক্ষেত্রে সেই একই।

পূর্বে যে বলা হয়েছিল যে, বেদার্থতত্ত্ববিদই কেবল কর্মের অধিকারী—সে কথাও অযৌক্তিক।

"শ্রুতজ্ঞান-ব্যতিরেকাদুপাসনস্থ।"

(তৈত্তিরীয়োপনিষদ-ভাষ্য, ১-১১)

শ্রুতজ্ঞান, বা কেবলমাত্র শাব্দজ্ঞান, বা বেদোল্লিখিত বিধি-নিষেধ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলেই বৈদিককর্মে অধিকার হয়, সত্য। কিন্তু যে নিদিধ্যাসন বা ধ্যানের মাধ্যমে পরিশেষে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, তা এরূপ শ্রুতজ্ঞান থেকে পৃথক্। সেজন্যই, "শ্রবণ", "মনন" ও "নিদিধ্যাসনের" পৃথক্ পৃথক্ বিধান দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, বলা যেতে পারে যে, বিদ্যা-সাপেক্ষ কর্ম থেকেই মোক্ষলাভ হয়। কেবল কর্ম মোক্ষফল উৎপাদনে সমর্থ না হয় নাই হোক। কিন্তু বিদ্যার সঙ্গে মিলিত হলে, কর্মের মোক্ষফল উৎপাদনে সামর্থ্য হয়। যেমন, বিষ স্বতন্ত্রভাবে মরণের কারণ হলেও, মন্ত্রের সঙ্গে মিলিত হলে বিপরীত ফল জীবনেরই কারণ হয়; দধি স্বতন্ত্রভাবে জ্বরের কারণ হলেও, শর্করার সঙ্গে মিলিত হলে বিপরীত ফল দেহের পুষ্টিরই কারণ হয়; ঠিক তেমনি কর্ম স্বতন্ত্র-ভাবে বন্ধের কারণ হলেও বিদ্যার সঙ্গে মিলিত হলে, বিপরীত ফল মোক্ষেরই কারণ হয়।

এর উত্তরে শঙ্কর বলছেন যে, কেবল কর্ম থেকে মোক্ষের উৎপাদন হলে মোক্ষ যেরূপ অনিত্য হয়ে পড়ে, বিদ্যা-সাপেক্ষ কর্ম থেকে মোক্ষের উৎপাদন হলে, মোক্ষ ত সেই একইভাবে অনিত্য হয়ে পড়ে সুনিশ্চিত।

যদি বলা হয় যে, এইভাবে মোক্ষ না হয় অনিত্যই হোক; কিন্তু শাস্ত্র বাক্যানুসারে, তাকে ত নিত্য বলেই গ্রহণ করা উচিত—তার উত্তর এই যে, বাক্য কেবল বস্তুর স্বরূপই ব্যক্ত করে; স্বরূপ উৎপাদন বা পরিবর্তন করতে পারে না।

"প্রাপকস্থাদ্বচনস্থ। বচনং নাম যথা ভূতস্থার্থস্থ-জ্ঞাপকম্, নাবিদ্যমানস্থ কর্তৃ। ন হি বচনশতেনাপি নিত্যমারভ্যতে, আরব্ধং বা অবিনাশি ভবেৎ।"

(তৈত্তিরীয়োপনিষদ্-ভাষ্য ১-১১)

বচন বা বাক্য কেবল বিদ্যমান বস্তুরই স্বরূপ জ্ঞাপন করে, অবিদ্যমান কোনো বস্তু সৃষ্টি করতে পারে না। সেজন্য, যা নিত্য তা শত শত বচনের দ্বারাও অনিত্য হয়ে পড়ে না; যা অনিত্য, তা শত শত বচনের দ্বারাও নিত্য হয়ে পড়ে না।

যদি বলা হয় যে, বিদ্যা ও কর্ম সাক্ষাৎ ভাবে মোক্ষ-সাধক না হলেও, মোক্ষের প্রতিবন্ধক দূর করে—তার উত্তর এই

"ন, কর্মণঃ ফলান্তর-দর্শনাৎ।"

(তৈত্তি-ভাষ্য, ১-১১)

কর্মের ফল চতুর্বিধ—উৎপত্তি, বিকার, সংস্কার, প্রাপ্তি; এবং মোক্ষ এই চারটিরই সম্পূর্ণ বিপরীত।

যদি বলা হয় যে, মোক্ষ অন্ততঃ "প্রাপ্তি" রূপ কর্মের ফল, যেহেতু শ্রুতিতে ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য আত্মার গমনের উল্লেখ আছে—তার উত্তর এই যে, এই গমন দেবযান পথাধিকারী, ক্রমমুক্তিলাভকারী আত্মারই গমন, ব্রহ্মজ্ঞ আত্মার নয়।

পুনরায়, বিদ্যা ও কর্ম পরস্পরবিরোধী বলেও তাদের মধ্যে সমুচ্চয় অসম্ভব। এ কথা পূর্বে বহুবার বলা হয়েছে।

"অতো বিরোধো বিদ্যা-কর্মণোঃ। অতশ্চ সমুচ্চয়ানুপ-পত্তিঃ।" (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্-ভাষ্য, ১-১১)

জ্ঞান ও কর্ম যদি পরস্পরবিরোধী হয় এবং জ্ঞানের দ্বারা যদি অবিদ্যামূলক কর্মের ক্ষয় হয়, তাহলে শাস্ত্রোক্ত কর্মবিধিসমূহ সবই নিরর্থক হয়ে পড়বে—এ আশঙ্কাও করা চলে না। কারণ, কর্মের মূল্য কেবলমাত্র ব্যবহারিক দিক্ থেকে হলেও, কর্মবাদানুসারে, চিত্তশুদ্ধির জনকরূপে, নিষ্কাম কর্ম মোক্ষের সহায়ক। অপরপক্ষে, সকাম কর্ম সংসারেরই হেতু। এরূপে, নিষ্কাম ও সকাম কর্মবিধি

স্ব স্ব ক্ষেত্রে, স্ব স্ব ফল দান করে সার্থকতা লাভ করছে, কোনো বিধিই সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়ে যাচ্ছে না। নিত্য কর্মও একইভাবে পূর্বসঞ্চিত পাপরাশিরূপ প্রতিবন্ধক দূর করে জ্ঞানোৎপাদনের সহায়কই হয়।

"পূর্বোপচিত-প্রতিবন্ধাপনয়ন-দ্বারেণ বিদ্যাহেতুত্বং প্রতিপদ্যন্তে কর্মাণি নিত্যানীতি।" (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্-ভাষ্য, ১-১১)

এরূপে, জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় অসম্ভব হলে, পূর্বোক্ত তৃতীয় ও চতুর্থ বিকল্প: বিদ্যা ও কর্মের সমুচ্চয় ও কর্ম-সাপেক্ষ বিদ্যা মোক্ষের সাধক—সমানভাবে অযৌক্তিক হয়ে পড়ে। সেজন্য পরিশেষে, পঞ্চম বিকল্প—কেবল জ্ঞান থেকেই মোক্ষলাভ হয়—

"অতঃ কেবলায়া এব বিদ্যায়াঃ পরং শ্রেয়ঃ ইতি সিদ্ধম্।" (তৈত্তিরীয়োপনিষদ-ভাষ্য, ১-১১)

জ্ঞান ও কর্মের প্রকৃত সম্বন্ধ কি—তা হ'ল দর্শন-শাস্ত্রের একটি মূল সমস্যা। সাধারণ ব্যবহারিক দিক থেকে ধরতে গেলে বলা যায় যে, জ্ঞান আগে, কর্ম পরে, যেহেতু জ্ঞান থেকেই হয় কর্মের উৎপত্তি। এরূপে, কোনো বিষয়ে প্রথমে জেনে, পরে সেই বিষয়ে কিছু করা হয়। সেজন্য, জ্ঞানকে কর্মের কারণ, কর্মকে জ্ঞানের কার্য; জ্ঞানকে কর্মের তত্ত্ব, কর্মকে জ্ঞানের প্রকাশ; জ্ঞানকে মূল, কর্মকে ফল বলে গ্রহণ করা হয়। এরূপে, সাধারণ বিজ্ঞানের দিক থেকে জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় অত্যাবশ্যক; এবং 'থিওরি' 'প্র্যাকটিসে', 'সায়েন্স' 'আর্টে' প্রকাশ না পেলে সেই তত্ত্বকে নিষ্ফল বলে মনে করা হয়। এই কারণে, সাংসারিক জীবনে, জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদের মাধ্যমেই কেবল হয় সাংসারিক লক্ষ্যলাভ। কিন্তু পারমার্থিক দিক্ থেকে, পারমার্থিক লক্ষ্য বা মোক্ষ লাভ হয় কেবল অজ্ঞানাবরণ উন্মোচিত হলে। সেজন্য, ভারতীয় সাধন-শাস্ত্রের প্রধান প্রশ্ন হ'ল: কিরূপে এই অজ্ঞানাবরণ উন্মোচিত করা যায়? কেবল জ্ঞানের দ্বারা, কেবল ভক্তির দ্বারা, কেবল কর্মের দ্বারা অথবা, দুই বা ততো-ধিকের সমুচ্চয় দ্বারা? অর্থাৎ, মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধন কি? একতত্ত্ববাদী ও একেশ্বরবাদী উভয় সম্প্রদায়ের বৈদান্তিকদের মতেই, সকাম কর্ম সম্পূর্ণরূপে মোক্ষ-বিরোধী। কেবল নিষ্কাম কর্ম মোক্ষের পরোক্ষ সাধন। নিষ্কাম কর্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হলে, তবেই সেই বিশুদ্ধচিত্তে জ্ঞান ও ভক্তির উদয় হতে পারে; এবং পরিশেষে জ্ঞান বা ভক্তির মাধ্যমেই অজ্ঞানাবরণ বিদূরিত হয়ে আত্মার প্রকৃতস্বরূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠে—এই ত হ'ল জীবের জন্মজন্মান্তরের সাধনার ধন "মোক্ষ"। কিন্তু এরূপ নিষ্কাম-কর্মের পূর্বেও প্রয়োজন জ্ঞান, "নিত্যানিত্য বস্তু-বিবেকঃ, ইহামুত্রার্থভোগবিরাগঃ, শমদমাদি সাধনসম্পৎ, মুমুক্ষুত্বঞ্চ।" কারণ, নিত্য ও অনিত্য বস্তুর মধ্যে প্রভেদজ্ঞান, অথবা স্বর্গ-মর্ত্যের সকল বস্তুই যে অনিত্য এই উপলব্ধি, ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগসুখে বৈরাগ্য, ইন্দ্রিয় ও মন-সংযম-শক্তি এবং মোক্ষের জন্য ঐকান্তিকী আকূতি না থাকলে, সাংসারিক জীব হঠাৎ সাধারণ-সকাম-কর্ম ত্যাগ করে নিষ্কাম কর্মে রতই বা হবে কেন। এইভাবে, নিষ্কাম কর্মের প্রারম্ভেও জ্ঞান, পরিশেষেও জ্ঞান। ওতপ্রোতভাবে জ্ঞাননিষ্ণাত এরূপ নিষ্কাম কর্ম মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধন হোক্ বা না হোক্, মোক্ষক্ষেত্রে তার মহিমাও অল্প নয়—এ সত্যটি ভারতীয় দর্শনে সর্বত্রই সানন্দে স্বীকৃত হয়েছে।

বাতিদার বিলাস

শ্রীরামশঙ্কর চৌধুরী

—ওরে বিলাস, আলো দিয়ে আয়।

হাঁক্ দিয়ে বললেন, বড়বাবু অর্থাৎ ষ্টেশনের ষ্টেশন-মাষ্টার। তিনজন ষ্টেশন-মাষ্টারের মধ্যে বড়বাবুই প্রধান। অন্যদের ডিউটি রাত্রে, কিন্তু বড়বাবুর ডিউটি সকাল আটটা থেকে বৈকাল চারটা পর্যন্ত। তা হোক, ষ্টেশনের পুরো দায়িত্বটা তাঁরই। ছোট্ট রোড সাইড ষ্টেশনের ছোট-খাটো একটি জমিদার বললেই হয়। সকাল ছয়টার প্যাসেঞ্জার-ট্রেনটা আসবার আগেই, মেলা বসে যায় ছোট্ট ষ্টেশনটার পিছন দিকের চা-পানের দোকানটার সামনের ফাঁকা জায়গাটায়। গ্রাম থেকে জেলেনীরা নিয়ে আসে মাছ, চাষী নিয়ে আসে বাড়ীর ফসল—কেউ কেউ আবার পুলিশের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে আনে চাল। সকালের ট্রেনটায় শহরে গিয়ে বিকে আসবে সব। বড়বাবু আসেন কোম্পানীর দেওয়া সাদা কোটটা গায়ে দিয়ে দাঁতন করতে করতে।

—কই দেখি, কে কি এনেছিস? দাঁতনটা হাতে নিয়ে মুখের জলটা ফেলে দিয়ে বলেন বড়বাবু। তারপর জেলেনীদের মাছের ঝুড়ির ভিজে-কাপড়ের ঢাকাটা তুলে দিয়ে টিপে টিপে মাছগুলি পরীক্ষা করেন। তারপর খুশীমত একটা তুলে নিয়ে বলে, মাছটা কখন ধরেছিস রে? ভালো হবে ত?

উত্তরের জন্য ক্ষণকাল অপেক্ষা না-করে চাষীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হন। সবাইকেই খাজনা দিতে হয়; না দিলে এই প্লাটফরমেই এদের স্বল্প সম্পত্তি নিলাম করে নেবার সরকারী ক্ষমতা আছে তাঁর।

এ হেন বড়বাবুকে ষ্টেশনের সবাই ভয় করে।

দিনের শেষ প্যাসেঞ্জার-গাড়ীটা চলে গেছে বৈকাল চারটায়, তারপরে গেছে কোলিয়ারী পাইলট। প্রত্যহই যায়। সিগন্যাল হয়েছে একটা মালগাড়ীর। থ্রু যাবে ট্রেনটা। লোহা লক্কড় নিয়ে যাচ্ছে। কোথায় নাকি পুল বাঁধাই হবে। এই লাইনটাও ডাবলিং হবে শুনেছে বিলাস। ইতিমধ্যে প্রাথমিক কাজও সুরু হয়ে গিয়েছে। বিলাস নিজে দেখে এসেছে—ডিসট্যান্ট সিগন্যালের ওদিকে লাইনের দু'পাশের পাহাড় কেটে সমান করে দিয়েছে জমিটা। ইলেক্‌ট্রিক ইঞ্জিন যাবে নাকি।

—কইরে বিলাস? সন্ধ্যা হয়ে গেল যে! আবার হাঁক দিয়ে সতর্ক করে দিলেন বিলাসকে।

সত্যই, বেলা শেষ হয়ে যাবার লক্ষণ দেখা দিয়েছে সর্বত্র। এই সময় থেকেই কাজ বিলাসের। দিনের আলোয় বিলাসের ডাক পড়ে না—রাত্রির অন্ধকারই তার সঙ্গী। কিন্তু ঠিক এই আলো-আঁধারের সন্ধিক্ষণেই কেমন বিমনা হয়ে পড়ে বিলাস।

ষ্টেশনঘরের অনতিদূরের কাঠের ঝাঁঝরি দেওয়া এক কুঠরী ঘরের দরজায় বসে তাকিয়ে থাকে সামনের দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে। সামনের পোড়ো বাড়ীটাও তাকিয়ে থাকে বিলাসের দিকে। পরস্পর পরস্পরকে দেখে। কোন এক সময়, কোন এক ব্যবসায়ী চুণের ব্যবসা করবার জন্য বাড়ীটা তুলেছিলেন। অফিস ঘর ছিল ওটা—ওর ভিতরে থাকত ম্যানেজার, খাজাঞ্চি; কেরাণী, মুন্সী আশে পাশে এখনো পড়ে আছে কয়েকটা উনোন্—সাঁওতাল-বাউরী মেয়ে-বৌয়েরা চিটেল মাটির মাঠ থেকে ঝুড়িভর্তি ঘুটিং এনে ঢালত উনোনে, আগুনের সংস্পর্শে ঘুটিং পুড়ে যেত ছাই হয়ে।

এ সব দেখে নি বিলাস—শুনেছে। তার জ্ঞান হওয়া অবধি এমনই পড়ে থাকতে দেখছে বিলাস।

সম্প্রতি ছন্নছাড়া, ঘর-হারানো একটি মানুষ ছেলে-মেয়ে নিয়ে সংসার পেতেছে বাড়ীটায়। সারাদিন কোথায় ঘুরে বেড়ায়, সন্ধ্যা হলেই ফিরে আসে। অনুমান—তিরিশ-বত্রিশ বছরের চিবুকে উল্কি পরা মেয়েটি রান্না করতে বসে—পুরুষটি গোটা কয়েক ছেলে-মেয়েকে আগলে থাকে। মাঝে মাঝে মেয়েটির সঙ্গে একটু হাসি-তামাসা করে। দেখতে ভালোই লাগে বিলাসের, মনে হয়, এত অভাব থাকলেও তারা সুখী। ওদের ঘর নেই, সংসার আছে। দিনান্তে একবার ছেলেমেয়েদের কোলের কাছে টেনে নিয়ে সারাদিনের বেদনাকে ভুলতে পারে। ওদের ঐ জীবনধারার মধ্যে ক্ষণ-বাসন্তীলীলা বিলাসের অন্তরকেও স্পর্শ করে। কিন্তু এই পরশ জাগিয়ে দেয় বেদনা। মনটা কেমন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে।

সেদিনও এমনিই বসেছিল বিলাস। রতন পয়েণ্টস্-ম্যানের স্ত্রী এসে বলেছিল, কেমন আছ দেওর?

পাশাপাশি কোয়ার্টার—তাই একটা আত্মীয়তা জন্মে গেছে। পাঁচটা ছেলেমেয়ের মা রতনের স্ত্রী তবু এখনো বেশ বাঁধন আছে শরীরের। দেখে, কার সাধ্য বলে দেয়, পাঁচটা সন্তানের জননী রতনের স্ত্রী! বিলাসের অসুখ-বিসুখ হলে সাবু করে পাঠিয়ে দেয়, নিজে এসেও খোঁজ নিয়ে যায়।

—ভালোই। উত্তর দিয়েছিল বিলাস।

—তাই কি হয় দেওর, আমি চোখ দেখে বুঝতে পারছি—ভালো নাই। তুমি ছুটি লাও দেওর।

রতনের স্ত্রী বিলাসের কপালে হাত দিয়ে গায়ের উত্তাপ পরীক্ষা করে বলেছিল, এই ত গা গরম।

জ্বর ছিল সেদিন। আজো তার শেষ হয় নি। এমনি সময় হলেই চোখ দুটি জ্বালা করে, মাথাটা ধরে। দেহটা কেমন যেন অচল হয়ে আসছে বিলাসের। উঠতে, বসতে, কথা বলতে, কাজ করতে আলস্য আসে। একবার বড়-বাবুকে বলেওছিল ছুটির কথা। মাষ্টারবাবু বলেছিলেন, অসুখ যদি তবে সিক্ দে, ছুটি দিতে পারবো না। তুই ছুটি নিলে কাজ করবে কে?

সিক্ সে একটা দিনের জন্যও হয় নি। ছুটি নিলে চলে না তার, গুরু দায়িত্ব রয়েছে তার উপর। যখন কাজে ভর্তি হয়েছিল, তখন সাহেব বলেছিলেন, শুন বিলাস, তোর দায়িত্ব খুব বেশী। তুই সিগন্যালে আলো দিবি, সেই আলো দেখে চলবে গাড়ী। সেই সব গাড়ীতে যাবে খাবার, কয়লা, লোহা। অন্ধকার দূর করবি তুই।

সত্যই ত, হাজার হাজার মানুষের খাদ্য, হাজার হাজার মানুষের সম্পদ—তারই দেখানো আলো দেখে যাবে গন্তব্য স্থানে। গুরুদায়িত্ব বৈকি!

—পারবি ত বিলাস? জিজ্ঞেস করছিলেন সাহেব।

—পারব বৈকি। ষোলো বছরের ছেলে বিলাস বুক চিতিয়ে উত্তর দিয়েছিল সেদিন।

কথার খেলাপ করে নি বিলাস।

সে বছর ছেলে হবার সময় মরো মরো হয়ে উঠেছিল বিলাসের স্ত্রী। গাঁ থেকে হরিশ এসেছিল খবর নিয়ে। বড়বাবুর কাছে কথাটা পাড়তেই বড়বাবু বলেছিলেন, তোর কাজ করার লোক কই বিলাস? আলো কে দেবে?

তা ঠিক। প্রতিশ্রুতি দিয়ে কাজ নিয়েছে বিলাস। দায়িত্ব তার কঠিন। হাজার হাজার লোকের জীবন-মরণ কাঠি তার হাতে। হরিশকে বলেছিল, তুই ফিরে যা হরিশ।

শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল হরিশ।

—তুই কি মানুষরে বিলাস, বৌটা মরতে বস্যেছে, দেখতে চাইছে একবার, বাঁচে না মরে তার ঠিক নাই, আর তুর কাজটাই বেশী হৈলো বিলাস?

—কি করি বল, আমার হাতে যে হাজার হাজার মানুষের জীবন। রাতের বেলায় সিগ্‌নেলে আলা না দিলে গাড়ী চলবেক নাই।

বিলাসের কথা শুনে রেগে উঠেছিল হরিশ। এই কি মরদের কাজ? কি ভাববে বৌটা? আসবার সময় অনেক আশা দিয়ে এসেছিল সে।

—তবে কি বিনা চিকিচ্ছায় মরে যাবেক বৌট?

রেলের ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল হরিশের হাতে। কিন্তু সে ওষুধ আর খেতে হয় নি বিলাসের স্ত্রীকে। এর পর একদিন গ্রামে গিয়ে আট-নয় বছরের ছেলে নটবরকে নিয়ে ইষ্টিশনে ফিরে এসেছিল বিলাস।

বড়বাবু বলেছিলেন, এই বুঝি তোর ছেলে বিলাস?

—হাঁ বড়বাবু। ছিল দুটা, একটা মায়ের সতেই (সঙ্গেই) গেইছে। দণ্ডবৎ কর লটবর।

আট-নয় বছরের নটবর বড়বাবুর পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছিল।

—থাক্ থাক্! বলেছিলেন বড়বাবু।

—ই যেন বাঁচ্যা থাকে বড়বাবু। ইয়াকেই আমি বাতিদার কৈরে দিয়ে যাব।

—তা করবি বৈকি। কাছে রেখে লেখাপড়া শেখা।

ঠিক তাই করবে বিলাস। কিছুটা লেখাপড়া শিখে যদি ছোটবাবুর হাতে-পায়ে ধরে 'টরে টক্কা' শিখে নেয় তবে ইষ্টিশন মাষ্টারও হতে পারবে নটবর।

ছেলের ষ্টেশন-মাষ্টার করবার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করবার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে একদিন নটবরকে কাঁধে নিয়ে গিয়েছিল ষ্টেশন সংলগ্ন একটি গ্রামের পাঠশালায়।

—কুথা যাইছ বাপ? জিগ্যেস করেছিল নটবর।

—পাঠশাল রে, তোকে ভত্তি কৈরে দিব পাঠশালে, তুই লেখাপড়া শিখবি—ইষ্টিশন মাষ্টার হবি রে, এ্যাঃ—কেমন টরে-টক্কায় কথা বলবি। সবাই বলবেক মেষ্টরবাবু!

নটবরকে একবার বুকের উপর নিয়ে তার নরম গালে সোহাগের চিমটি কেটে বলেছিল বিলাস।

—আর তুই? জিগ্যেস করেছিল নটবর।

—আমি? আমি হবো মেষ্টরের বাপ। কেমন? হাঃ, হাঃ, হাঃ—

সারাটা রাস্তা ছেলেকে সোহাগ করতে করতেই এসেছিল বিলাস—উপেন পণ্ডিতের পাঠশালায়।

ছোট গ্রামের ছোট পাঠশাল উপেন পণ্ডিতের। একটা চালাঘরে এক পাল ছেলে চটে বসে পাঠ পড়ছিল। উপেন পণ্ডিত কল্কের আগুন দিয়ে বুদ্ধির ঘরে ধোঁয়া দেবার ব্যবস্থা করছিল। বিলাস ছেলেকে নামিয়ে বলেছিল এলুম পণ্ডিত, তুমার কাছে।

নটবরের সঙ্গে পরিচয় ছিল উপেন পণ্ডিতের। নানা কাজে উপেন পণ্ডিতকে ইষ্টিশনে যেতে হত—পরিচয় হয়ে গেছে।

—ভালোই করলি, লে তামুক খা। বলেছিল উপেন পণ্ডিত।

—না পণ্ডিত, তামুক খাইতে আসি নাই, লটবরকে দিতে আস্তাছি তুমার জিম্মায়। বলেছিল বিলাস।

—তা দিয়ে ত যাচ্ছ বাপু, কিন্তু রেলে যাদের বাপেরা চাকরি করে তাদের ছেলের লেখাপড়া হয় কৈ? চশমার ফাঁক দিয়ে বিলাসের দিকে তাকিয়ে বলেছিল উপেন পণ্ডিত।

—আমি বলছি লটবরের হবেক। তুমি দেখে লিও পণ্ডিত, লিশ্চয় হবেক। লটবর আমার সে ছেলে লয়।

ছেলেকে রেখে দিয়ে এসেছিল বিলাস।

মাসখানেক যাবার পর একদিন উপেন পণ্ডিত বিলাসকে ডেকে বলেছিল, তোমার ছেলে লেখাপড়া করে কই বিলাস? যতক্ষণ বিদ্যালয়ে থাকবে, ততক্ষণ শুধু মুখ দিয়ে ইঞ্জিনের বাঁশী বাজিয়ে নিজে ইঞ্জিন হয়ে হস্ হস্ করে চলবে।

—হা হা হা। আনন্দের উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছিল বিলাস। ব্যাটা রসিক আছে, কি বল পণ্ডিত? হা হা হা—। ত্যাখ লটবর, পড়াশুনা করবি, বুঝলি? ঐ যে কি বলে—লেখাপড়া করে যেই—কি হে পণ্ডিত বলে না?

রাত্রে নটবরকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে গম্ভীর স্নেহে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বিলাস বলত, মন দিয়ে লেখাপড়া করবি নটবর। রেলের চাকরি করবি, মেষ্টর বাবু হবি।

নটবর শান্ত ছেলেটির মত চুপ করেই থাকত। বাপের বুকের উপর মাথাটি রেখে শুয়ে থাকতে বড়ো আরাম লাগত তার।

—কি রে কথা বলছিস্ নাই যে? পড়াশুনা করবি ত?

—আমার ঘুম লাগছে।

—বেশ ঘুমা।

নটবরকে প্রত্যহ নিজেই দিয়ে যেত বিলাস। নিয়েও যেত।

সে দিন বিলাস উপেন পণ্ডিতকে গিয়ে দণ্ডবৎ করে দাঁড়াতেই, উপেন পণ্ডিত বলেছিল, তোমার ছেলেকে এই পাঠশাল থেকে নিয়ে যাও বিলাস।

—কেনে পণ্ডিত? বেদনাহত বিলাস জিজ্ঞেস্ করেছিল।

—এখানে থাকলে ওরও পড়া হবে না, অন্য ছেলেরাও খারাপ হয়ে যাবে। বাপরে বাপ, কি ছেলে—বললাম, পড়াশুনা না করলে কি গোরু চরাবি? তা আমাকে বলে কিনা ড্যাম্ ফুল।

—হা হা হা—। তাই বললে? দেখেছ পণ্ডিত, ব্যাটার আমার বুদ্ধি আছে। আমি এত দিন ইষ্টিশনে থাক্যাও কথা-ট শিখতে লারলুম, আর উ এই ক'দিনেই সাহেবদের মুখের কথা কাড়্যা লিয়েছে। বুদ্ধি আছে ব্যাটার, কি বল পণ্ডিত? হা হা—

উপেন পণ্ডিত ধমক দিয়ে বলেছিল, থাম? কথাটার মানে জানিস?

—না, পণ্ডিত তা ত জানি না। তবে সাহেবরা বলে।

—সাহেবরা বললেই বেদবাক্য হবে নাকি? তোর ছেলে আমাকে কিনা মূর্খ বলে গালাগালি দেয়? আমি যদি মূর্খই হই—তা আমার পাঠশালে কেন বাপু। তুই নিয়ে যা আপনার ছেলেকে।

কোনো জবাব দিতে পারে নি। লিয়েই এসেছিল বিলাস। শাসন করেছিল। কঠিন শাসন করেছিল। রাগে অপমানে হতাশায় জর্জরিত বিলাস হিতাহিত ভুলে গিয়ে সেদিন প্রহার করেছিল নটবরকে।

নটবর কাঁদেনি। অবাক হয়ে শুধু তাকিয়ে ছিল বাবার মুখের দিকে। ওর সজল চোখ দুটি দেখেও মায়া হয় নি বিলাসের। ছেলেটিকে নিয়ে সে যে কল্পনায় স্বর্গ রচনা করেছিল। কতো আশায়—কতো ভরসায় স্ত্রীকে হারিয়েও ছেলেকে বুকে নিয়ে দিন কটাচ্ছিল বিলাস। ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করেছিল তার। সারাটা দিন আর কোনো কথা বলে নি নটবরের সঙ্গে।

নটবরও তাই। সারাটা দিন সেও খাবার চায় নি। খালি মেঝেয় পড়েছিল।

সন্ধ্যার কাজ শেষ করে আসতেই রতনের স্ত্রী বলেছিল—একটা কথা বলি দেওর। বলি মা-মরা ছিলাকে কি এমনি করেই মারতে আছে? কতোবার বললাম তা কিছুতেই খেল নাই। ছিঃ ছিঃ—

বিলাসও মনে মনে ঐ কথাই বলেছিল। অসহায় ছেলেটিকে খালি মেঝেয় ঘুমিয়ে থাকতে দেখে বিলাসের প্রাণটাও হু হু করে উঠেছিল। নটবরের মুখের পানে

তাকিয়ে দেখেছিল—চোখে জলের দাগ। তবে কেঁদে-ছিল নটবর, হয় ত তার মার নাম করেই কেঁদেছিল।

আর থাকতে পারে নি বিলাস। ছেলেকে সাবধানে তুলে নিয়ে শুইয়ে দিয়েছিল খাটিয়ার উপর। মনে মনে বলেছিল, না পড়াশুনা করুক। নটবর বেঁচে থাক্।

বিলাস কসুর করে নি। তার স্বল্প আয় দিয়ে নটবরের সখ সাধ মিটিয়ে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টাই করেছিল। কেউ না জানুক একমাত্র ভগবান জানেন, বিলাসের কোনো দোষই ছিল না। তবু যেন কেমন একটা অন্য মানুষ হয়ে যাচ্ছিল নটবর। সকাল হলেই ঘর হতে বেরিয়ে যেত ফিরত খাবার সময়, আবার খেয়ে যেত বেরিয়ে।

একদিন রতনের স্ত্রী বলেছিল, ছেলেটার উপর নজর দিও দেওর। বয়স হঁয়্যাছে—চোখে চোখে রাখতে হয়।

—ক্যানে কি কৈরেছে লটবর ?

—ই বয়সে যা সবাই করে। সুখুড়ির সেই লাচনী মিয়াটা গুণ কৈরেছে।

মেয়েটাকে জানত বিলাস। চপলা, না কি নাম। অল্প বয়সে মরদকে ছেড়ে দিয়ে এসে ভাইয়ের কাছে থাকে। গান গায় ভালো মেয়েটা। নাচতেও পারে—মাঝে মাঝে ইষ্টিশনের বস্তিটায় এসে গান বাজনা করে। চোখে চোখে কথা কয় মেয়েটা, ঠোঁটের উপর তীক্ষ্ণ হাসি দিয়ে পুরুষের হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়।

অপরাধ এমন কিছু গুরুতর নয়। ছেলেদের বয়স হলেই, ছেলেরা একটু ফষ্টিনষ্টি করে। আবার বয়সের আগুনটা নিবে গেলেই সব ঠিক হয়ে যায়। রতনের স্ত্রীর কথার কোনো জবাবই দেয় নি বিলাস। মনে মনে স্থির করেছিল, নটবরকে সাবধান করে দিবে—মানা করে দিবে, এই মেয়েটার সঙ্গে মেলামেশা করতে।

একদিন বলেছিল বিলাস, দিন দিন তুই বড়ো বাবু হঁয়্যা যাচ্ছিস লটবর। ইবারে একট কিছু কাজ কম্মর সন্ধান কর। বাপের কথা শুনে নটবর বলেছিল, বাবু আর কুথায় দেখলে ?

—তুর বাবা কখনো যা করে নাই, তুই তাই কচ্ছিস্ লটবর। লম্বা টেড়ী, পা ভর্ত্তি পাৎলুন ই সোব আবার কি রে ? যেমন মানুষ তেমনি থাকবার চেষ্টা কর।

এইটুকুই—আর বেশী কিছু বলেনি বিলাস। কিন্তু যেদিন বিলাস আবিষ্কার করেছিল যে, তার বাক্সের মাইনা থেকে জমিয়ে রাখা কয়েকটা টাকা স্থানান্তরিত হয়ে গিয়েছে, সেদিন আর এই ক্ষতিকে স্বীকার করে নিতে পারেনি বিলাস।

বলেছিল, আমার রক্ত জল করা পয়সা লটবর, তা তুই এমনি ভাবে উড়াবি ?

—উড়ালাম আবার কুথায় ?

—কি করলি তবে ?

—শম্বরাজের মেলা দেখতে গেইছিলাম।

—উ মেলায় আবার যায় নাকি কেউ ? মদ চলে, মিয়া লিয়ে কারবার চলে—আর জুয়া চলে। তাই তুই করেছিলি ?

হঁ।

—মদ খায়্যাছিলি ?

—খায়্যাছিলম।

—জুয়াও খেলেছিলি।

—হঁ।

জবাব শুনে মাথায় রক্ত উঠে গিয়েছিল বিলাসের। চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল হয়ে উঠেছিল, রগের শিরাগুলো দপ্ দপ্ করে উঠেছিল—মাথাটা কেমন ঘুরে গিয়েছিল তার। ক্ষণকালের জন্য সমস্ত জগৎ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল তার সামনে থেকে। তার ছেলে চোর, মাতাল, জুয়াড়ী।

—তুই আমার চোখের ছামু (সম্মুখ) হৈতে পালাএ যা লটবর, তুই চলে যা।

কোন প্রতিবাদ না করে চলে গিয়েছে নটবর। কোথায় গেছে জানে না। অনেককে বলেছিল বিলাস, দেখা হলে তারা যদি বলে দেয় ফিরে আসতে। নিজেও যতটা সম্ভব খোঁজ-খবর করেছিল বিলাস। কিন্তু সন্ধান করতে পারে নি।

—কইরে বিলাস স্প্যাশেল ট্রেনের সময় হ'ল যে। লাইন ক্লীয়ার হয়ে গেছে—সিগ্ন্যালের আলো জ্বলে না কেন ?

আবার বললেন বড়ো বাবু।

চমকে উঠল বিলাস। তাই ত অন্ধকার নেমে আসছে আকাশ থেকে। ষ্টেশন থেকে শহরে যাবার পাকা রাস্তাটা আর নজরে পড়ে না। আকাশের অন্ধকারের অভ্যন্তরে আত্মগোপন করেছে পূর্ব দিকের বড় পাহাড়টা। ওপাশের কারখানার আলোটাও জ্বলছে না। উঃ কি নিঃসীম অন্ধকার।

উঠে পড়ল বিলাস। বাঁ হাতে এক-চোখো বাতিটা আর ডান হাতে মশালের শিকটা নিয়ে এগিয়ে গেল ডিস্‌ট্যাণ্ট সিগন্যালটার আলো জ্বালিয়ে দিতে। পায়ে পায়ে এগিয়ে এল বিলাস। সিঁড়ি দিয়ে সিগন্যালের উপরে উঠল। মশালটা জ্বলন্ত বাতির আগুনে জ্বালিয়ে

নিয়ে জেলে দিল সিগন্যালের আলোটা। আলোটা জলে উঠতেই তীরের মত একটা তীব্র রশ্মি এসে পড়ল লাইনটার উপর। চিক্ চিক্ করে উঠল লাইনটা।

—বাবা!

—চমকে উঠল বিলাস। অনেক দিন আগে যেন এই স্বর শুনেছে সে। এমনিই কণ্ঠস্বর ছিল তারও —

—কে? কে?

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল একটি জোয়ান ছেলে—সঙ্গে আরো কয়েকটি মানুষ। পরনে কালো কালো প্যাণ্ট, মাথার চুলগুলো কালো কাপড় দিয়ে আবৃত। চিনতে পারা যায় না কাউকে। তবু বিলাস এগিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াল।

-সিগ্নেলের বাতি নিভাই দাও বাবা। বলল একজন।

—কে রে? লটবর?

—হাঁ। বাতি নিভাই দাও।

অবাক হলো বিলাস। এ বলে কি? আলো না জ্বললে গাড়ী পাস হবে না যে। এইখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে গাড়ীটা। না, তেমনি বোকাই আছে লটবর।

—না রে না, তা হয় না। বলল বিলাস।

—বেশ, তবে আমিই নিভাই দিব। এই গাড়ী বোঝাই লোক যায়্যা কারখানায় চাকরি করবেক। আর আমার?

সিগন্যালে উঠতে গেল নটবর।

মানা করল বিলাস। অমন কাজ করিস না নটবর। সবাই দুর্নাম করবেক আমার। হাঁই ভাল্ (ঐ দেখ) গাড়ী আইসে গেল। নটবর, নটবর নামে আয়, নামে আয় বলছি।

গাড়ীটা ততক্ষণে এসে গেছে প্লাটফরমে। তীব্র বেগে আসছে গাড়ীটা। থ্ু সিগন্যাল—এগিয়ে যাবে। আর দেরী করা চলে না ত!

—আয় লটবর।

—না। ই গাড়ী আমরা যাত্যা দিব নাই।

—তোকে নামতেই হবেক, অন্ধকার হলে গাড়ী আর যাবেক নাই—আয় আয়

এবার নটবরের হাতটা ধরে টান দিল বিলাস নটবর সামলাতে না পেরে একেবারেই পড়ে গেল লাইনের উপরে—

আর্তনাদ করে উঠল বিলাস, লটবর, লটবর।

পেরিয়ে গেল স্প্যাশেল ট্রেনটা। সিগন্যালের আলোয় দেখতে পেল নটবরের ক্ষত-বিক্ষত দেহটা পড়ে আছে লাইনের উপরেই। বিলাস কাঁদতে চাইল—পারল না। একবার উপরের দিকে তাকিয়ে দেখল—আলোটা এখনো জ্বলছে ত!

উত্তর যৌবন

শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত

কি সুন্দর পৃথিবী! তারই প্রতিবিম্ব তুমি! সুন্দরতম তুমি তাই!
এ কথা বলার রাত অকস্মাৎ মুছে গেছে। গোধূলির বিধুর সানাই
বেজেছে করুণ সুরে। স্রোতস্বতী ক্ষীণতনু। মন্দানীল বন্দনাস কার—
আত্মার গহন বনে ফুলফুল-খেলা ফেলে কণ্টকের তীব্র অঙ্গীকার
নিয়েছে নেপথ্যবুকে। তাই আজ এ পৃথিবী প্রিয়ার ক্রন্দন ঝরা ফুলে
অমাবস্যার বুকে নিজেরে বিলীনা করে অন্তরের রুদ্ধদ্বার খুলে
বলেছে নিরুক্ত কথা, দেখায়েছে অন্য তীর, জানায়েছে অন্য পরিচয়—
যৌবনী ঋতুর মাস শেষ হয়ে গেছে বলে অতনুর এ কি পরাজয়!
কি ববাহ হবে তবু উত্তরযৌবন মাসে? বসন্তের কোন অভিজ্ঞানে
এ হৃদয়-সাধ দিয়ে বিচিত্র তপস্যা নিয়ে কে ডেকেছে কেই বা তা জানে?
এতদিন যে ভাবনা ঊর্ণার রূপোলী ধ্যানে উড়ে যেত লঘু মেঘ হয়ে
একদিন যে কথাটি পাখার পরশ পেয়ে কানে কানে গেছে কি যে কয়ে,
সে সব হঠাৎ যেন তামসী-শাসনে আহা মুছে দিল সকল আলোক—
সূর্যস্নান শেষ হোলো; পশ্চাতের ঢেউ তবু বসে বসে গণে দুই চোখ।

রবীন্দ্র কাব্যে যৌবন-সূচনা

অধ্যাপক শ্রীশ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের নিজের অভিমত অনুসারে "যৌবন হচ্ছে জীবনে সেই ঋতু-পরিবর্তনের সময়, যখন ফুল ও ফসলের প্রচ্ছন্ন প্রেরণা নানা বর্ণে ও রূপে অকস্মাৎ বাহিরে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। 'কড়ি ও কোমল' আমার সেই নব যৌবনের রচনা।"

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের দীর্ঘ প্রবাহিতা স্রোতস্বিনীর বিশাল ধারার সঙ্গে যাঁরা সামান্য পরিমাণেও পরিচিত, তাঁরা জানেন যে, কবির জীবনের যৌবন-উন্মালগ্নে "কড়ি ও কোমল" কাব্যের অভ্যুদয়। যৌবনে নানা দিক থেকে মানুষের সৃষ্টিশক্তি নানা ভাবে সক্রিয় হয়। দেহের ক্ষেত্রে যেমন, মনের ক্ষেত্রেও তেমনি সৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন মানুষ যৌবনোন্মেষে বিভিন্ন উপায়ে স্বকীয় নির্মাণ-প্রতিভার বিকাশ সম্ভব করে। ভাবী মহত্ত্বের প্রায় সকল বীজই এই যৌবনোদ্‌গমে অঙ্কুরিত হয়। যার যে-বিষয়ে আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা, সে এই সময়ে সে-বিষয়ে সাধ্যানুযায়ী দক্ষতা প্রদর্শনের চেষ্টা করে। তার ফলে, তার মধ্যে সংগুপ্ত বহুমুখী প্রেরণাসমূহ হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে। যৌবনের প্রথম আবির্ভাবে কর্মজীবনেও যেমন, ভাবজীবনেও তেমনি মানুষমাত্রের কর্মচেষ্টা ও ভাবপ্লাবন যেন শতমুখে উৎসারিত দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে মাত্র চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সে "কড়ি ও কোমল" কাব্যগ্রন্থখানি রচনা করেন। এই বইটিতে তাঁর অন্তর্নিহিত ইতিমধ্যে সামান্য মাত্রায় অভিব্যক্ত কবি-প্রতিভা পূর্ববর্তী রচনাগুলির তুলনায় যেন সহসা বহু ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। এর আগে তিনি :

(১) পৃথ্বীরাজের পরাজয়, ১৮৭৩; (২) হিন্দু মেলার উপহার, ১৮৭৪; (৩) বনফুল, ১৮৭৬; (৪) কবি-কাহিনী, ১৮৭৭; (৫) ভগ্নহৃদয়, ১৮৮০; (৬) রুদ্রচণ্ড, ১৮৮১; (৭) শৈশবসঙ্গীত, ১৮৮৪—প্রকাশ কাল; (৮) সন্ধ্যা-সঙ্গীত, ১৮৮২; (৯) প্রভাতসঙ্গীত, ১৮৮৩; (১০) ভানু-সিংহের পদাবলী, ১৮৮৪—প্রকাশ কাল; (১১) ছবি ও গান, ১৮৮৪।

এই এগারোখানি কাব্য-পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এদের মধ্যে তাঁর কবি-প্রতিভার যে বিকাশ হয়েছিল, তার সঙ্গে ১৮৮৬ সনের "কড়ি ও কোমল" কাব্যের প্রতিভাদীপ্তির শ্রেণীগত পার্থক্য দেখা যায়। পূর্বতন কাব্যগুলি অনেকটা মেলডি বা সরল একটানা সুর ধরনের রচনা। তাদের মধ্যে পরস্পর-বিরুদ্ধ, বিচিত্র ভাবের বহু রকমের সংঘাত নেই। প্রত্যেক কবিতায় একটি ভাব সরল মাধুর্যে পরিস্ফুট হয়ে স্নিগ্ধ সুরজ্যোতি বিকিরণ করেছে একই লক্ষ্যের অভিমুখে। সুতরাং ঐ এগারোটি কবিতাগ্রন্থে ভাবের বৈচিত্র্য নেই বললেই চলে। সন্ধ্যাসঙ্গীত-এ বিষাদভরা কোমল সুরের প্রাধান্য; প্রভাতসঙ্গীত-এ উৎফুল্ল আশার উদাত্ত স্বর প্রতিধ্বনিত। "কড়ি ও কোমল" কাব্যে ঐ দুই ভাব এবং আরো অনেক ভাবের একত্র সমাবেশ, সম্মিলন, মতৈক্য আর অনৈক্যের ভিতর দিয়ে আগত একটা স্বরসঙ্গতি বা হার্মনি দেখা যায়। কবি তাঁর অভিনব সৃষ্টি-সামর্থ্যের অফুরন্ত উৎসটি সহসা উন্মুক্ত করেছেন। এখন আর অল্পে অল্পে একটি ধারার ক্ষীণ আত্মনিবেদন নয়, একেবারে তীব্র বেগে আত্মশক্তির যৌবনোচ্ছল উৎসারণ। তাঁর জীবনে ও কাব্যে এই সময় একসঙ্গে যৌবনের সূচনা অরুণোদয়ের রক্তিম আভা বিস্তার করেছে। তাই এই কবিতাচয়নে একই সঙ্গে বিষণ্ন খিন্ন করুণ আকুতি, উদ্দীপ্ত আশ্বাসের বাণী, পলায়নী মনোভাবের অস্থির চাঞ্চল্য, বিশ্ববোধে জাগরণের ঘুম-ভাঙা আকুলতা এবং বৈদেশিক কাব্য-সাহিত্যের রসগ্রহণের উৎসুক প্রয়াস সমবেত হয়েছে। কবি তাঁর জাগ্রত যৌবনকে নির্দ্বিধায় ব্যক্ত হতে দিয়েছেন। তাঁর মানসকাননের কুসুমরাশির বর্ণবৈচিত্র্য কয়েকটি কবিতার আলোচনায় প্রতিভাত হবে।

"উপকথা" কবিতার শেষ চারটি পংক্তিতে বিফলতা-বোধের আক্ষিপ্ত সুর অনুরণিত :

মধ্যাহ্নে রবির দাপে বাহিরে কে রবে তাপে
আলয় গড়িতে সবে চায়
যবে হায় প্রাণপণ করে তাহা সমাপন
খেলারি মতন ভেঙে যায়!

আবার "নূতন" কবিতার প্রথমেই পরম আশার আলো বিগত জীবন-ভরা অন্ধকার নাশ করে সবিস্ময় পুলকে আশ্বাভরা আনন্দ পরিব্যক্ত করেছে :

ঘোর ঝটিকার রাতে দারুণ অশনি-পাতে
বিদীরিল যে গিরিশিখর—
বিশাল পর্বত কেটে পাষাণ-হৃদয় ফেটে
প্রকাশিল যে ঘোর গহ্বর—
প্রভাতে পুলকে ভাসি' বহিয়া নবীন হাসি
কোথাও তো পশে সূর্যকর।

এ যেন "প্রভাতসঙ্গীত"-এর পুনরাবির্ভাব।

"বিজনে" কবিতায় কবি ছাড়া পেতে চান—"আমারে আজিকে তোরা ডাকিস্ নে কেহ"—তথাকথিত এস্কেপিজম্ বা পলায়নী মনোবৃত্তির সুস্পষ্ট চিহ্ন, আবার, বিপরীত পক্ষে, "স্বপ্নরুদ্ধ" কবিতায় কবি আপনারে দিয়ে আপনার কারাগার রচনার জন্তে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। বিশ্বজীবনের সঙ্গে যোগ-সাধনের অভাব-বোধ এই কবিতায় প্রকাশিত :

আমি গাঁথি আপনার চারি দিক ঘিরে
সূক্ষ্ম রেশমের জাল কীটের মতন।
মগ্ন থাকি আপনার মধুর তিমিরে,
দেখি না এ জগতের প্রকাণ্ড জীবন।

পরবর্তী কালের কোন কোন বৃহৎ কাব্যমহীরুহের অঙ্কুরোদ্গম কড়ি ও কোমল কাব্যেই লক্ষ্য করা যায়। ভাবী কাব্যের সোনার ফসল এই সময়ে ফলতে সুরু করেছে। মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, নৈবেদ্য ও মহুয়ার পূর্বাভাস এই কাব্যে পাওয়া যায়। "স্মৃতি" কবিতার এই চরণগুলি "মানসী" গ্রন্থের "অনন্ত প্রেম" কবিতাটি মনে করিয়ে দেয় :

ঐ দেহ-পানে চেয়ে পড়ে মোর মনে
যেন কত শত পূর্ব জনমের স্মৃতি।
* * *
যেন গো আমারি তুমি আত্ম-বিস্মরণ
অনন্ত কালের মোর সুখ-দুঃখ শোক।

কবিতা দুটির ভাবসাদৃশ্য বিস্ময়কর।

"মরীচিকা", "স্বপ্নরুদ্ধ" প্রভৃতি কবিতার বাস্তববোধ, "কবির অহংকার" কবিতার বিশ্বযোগ আমাদের "চিত্রা" কাব্যের "এবার ফিরাও মোরে" কবিতার কথা মনে করিয়ে দেয়। এমনকি "জীবন-দেবতা" বা "অন্তর্যামী"-র আভাসও পাওয়া যায় :

আলায়ে আঁধার শূন্যে কোটি রবি শশী
দাঁড়ায়ে রয়েছ একা অসীম সুন্দর!
সুগভীর শান্ত নেত্র রয়েছে বিকশি'
চিরস্থির শুভ্র হাসি, প্রসন্ন অধর।

"প্রাণ" কবিতাটির বৈরাগ্য-বিতৃষ্ণা পরম যুগে কবিতাটির জীবনরসলিপ্সা পরবর্তী কালের কাব্যগুলির একটি প্রধান সুর। এমনকি "মহুয়া"-র যে বলিষ্ঠ প্রেমাদর্শকে অভিনবত্বে প্রায় অভূতপূর্ব বলে বোধ হয়, তারও সূচনা "শ্রান্তি" ও "বন্দী" কবিতায়। "মরীচিকা" কবিতায় ঐ ভাব এত স্পষ্ট যে, অস্বীকার করা অসম্ভব :

চলো গিয়ে থাকি দোঁহে মানবের সাথে—
সুখ-দুঃখ লয়ে সবে গাঁথিছে আলয়—
হাসি-কান্না ভাগ করি' ধরি হাতে হাতে
সংসার সংশয় রাত্রি রহিব নির্ভয়।

এ তো স্পষ্টই "উড়াবো ঊর্ধ্বে প্রেমের নিশান দুর্গম পথ-মাঝে"-র পূর্বশ্রুতি। মহুয়ার এরই প্রবল প্রতিধ্বনি। "কড়ি ও কোমল" সব দিক থেকেই রবীন্দ্র-কাব্যবীথির একটি উল্লেখযোগ্য দিগ্‌দর্শন। জীবনের জয়গান আর মরণের সম্ভাষণ এখানে এক বীণাতেই ঝঙ্কৃত।

রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায় এই কাব্যে "প্রথম আমি সই কথা বলেছি যা পরবর্তী আমার কাব্যের অন্তরে অন্তরে বরাবর প্রবাহিত হয়েছে।

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

যা নৈবেদ্যে আর এক ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।"

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের একটি সাধারণ লক্ষণ এই য়ে, তিনি জীবনে বৈরাগ্য-পন্থার সমর্থন না করে সব সময়েই জীবনোপভোগপ্রসন্নতা বরণ করেছেন। সন্ধ্যাসঙ্গীতে ঈষৎ ব্যথাতুর বিষণ্ণতার ছায়া পড়লেও কড়ি ও কোমলে কবি নিঃসঙ্কোচে জীবনের জয় গেয়েছেন। "জীবন-স্মৃতি"তে তিনি লিখেছেন, আশুতোষ চৌধুরি মহাশয় তাঁর এই কাব্যের সেই বিশেষত্ব লক্ষ্য করে কড়ি ও কোমলের প্রথমেই "প্রাণ" শীর্ষক কবিতাটি স্থাপন করেছেন।

প্রাণ কবিতাটিতে রবীন্দ্র-কাব্যের মর্মবাণীকে সংক্ষেপে রূপায়িত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরবর্তী কাব্য-গ্রন্থগুলিতে জগৎ ও জীবনকে পরিহার করতে বলে যে নেতিবাদ, তাকে একেবারে পরিহার করতে বলেছেন। সোনার তরীর মায়াবাদ-বিষয়ক কবিতাগুলিতে তাঁর এই মনোভাবের প্রবল বিকাশ দেখা গেছে। নৈবেদ্যে এই মনোভাবের চরম পরিণতি দেখা যায়। সেখানে কবি তাঁর জীবনদর্শন মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।...[illegible]

রসপ্রবাহের এই তীব্র ভোগবাসনারিবেগ প্রকৃতপক্ষে জীবনরসলিপ্সার পরিচায়ক। জীবনের সৌন্দর্য আর আনন্দ উপভোগের বলবতী স্পৃহা তাঁর সব কাব্যেরই বৈশিষ্ট্য, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি তান্ত্রিকের অনুরূপ ; দিলীপকুমার রায় মহাশয়ের ভাষায় রবীন্দ্রনাথের মনের কথা এই ভাবে বর্ণনা করা যায়।

জীবন আমার কাম্য লক্ষ গতিভরা

শব্দোচ্ছল সুরধুনী—প্রাণোৎসবী আমি।

প্রাণের উৎসবে কবি জীবনের যে জয়গান গেয়েছেন, তার প্রথম সুর "কড়ি ও কোমল" এ আরম্ভ হয়ে পরে আর কখনও থেমে যায় নি। তাঁর নিজের ভাষায় "প্রাণ" কবিতায় তিনি বলেছেন :

ধরায় প্রাণের খেলা চির-তরঙ্গিত

বিরহ-মিলন কত হাসি-অশ্রুময়—

এই হাসিকান্নার আলোছায়ামাখা প্রাণলীলাই কবির মর্মে চিরদিন নব নব ভাব ও রসের উদ্দীপনা সঞ্চার করে নব নব কাব্যের রামধনু-রং ফলিয়েছে। কড়ি ও কোমলের কোথাও দেখা যায়, কবি মিলনানন্দবিহ্বল কণ্ঠে পুলকিত স্বরে বলছেন :

ওগো শোনো কে বাজায়

বনফুলের মালার গন্ধ

বাঁশির তানে মিশে যায়।

আবার, কখনও বিরহ-বেদনার বিফলতা :—

আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন

আকুল নয়ন রে !

কিম্বা, প্রণয়াকৃষ্ট চিত্তের নিষ্ফল অকিঞ্চনতাবোধ :

বাঁশরি বাজাতে চাহি, বাঁশরি বাজিল কই !

আর নয় তো শুভ-লগ্ন বয়ে যাওয়ার হতাশায় সুগভীর দীর্ঘশ্বাস তাঁর গীতিকায় মন্দ্রিত :

কখন্ বসন্ত গেল, এবার হ'ল না গান।

এই আনন্দ-বেদনা জীবন-দেবতার প্রাণ-বেদিকায় প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্র-কাব্যের যুগপ্রবাহ অনুসরণ করে পরবর্তী সব কাব্যেই আমরা প্রাণের লীলাবিলাসে আত্মহারা কবির রসান্বিত চিত্তের মুগ্ধ ভাবোচ্ছ্বাস দেখতে পাই—এই প্রবণতা কবি কখনও একেবারে হারিয়ে ফেলেন নি। ভুবনের যে শোভামাধুর্য দেখে তিনি এই কাব্যে সুন্দর ভুবনে মরতে চান না বলে জানিয়েছেন, সেই রূপের মেলায় তন্ময় তিনি "মানসী"তে বলেছেন :

ইহারা আমারে ভুলায়ে সতত কোথা নিয়ে যায় টেনে।

মাধুরী মদিরা পান করে শেষে প্রাণ পথ নাহি চেনে।

নিখিল ভুবন কবির চিত্তবীণায় যে সম্মোহনী ঝঙ্কার তোলে, তারই অনিমুখমায় তিনি আবেশ-বিভোর জগৎকে অবহেলা করা তাঁর কাছে প্রশ্নাতীত ব্যাপার। পরবর্তী কাব্যে তাই দেখা গেল :

বিনয়ে বিশ্বাসে প্রেমে হাতে লহো তুলি'

বর্ণ গন্ধ গীতময় যে মহা খেলনা

তোমারে দিয়াছে মাতা ;

এবং বৈরাগ্যের বিরুদ্ধে এই তীব্র প্রতিবাদ :

চক্ষু কর্ণ বুদ্ধি মন সব রুদ্ধ করি'

বিমুখ হইয়া সর্ব জগতের পানে

শুদ্ধ আপনার ক্ষুদ্র আত্মাটিরে ধরি'

মুক্তি আশে সন্তরিব কোথায় কে জানে !

এই মনোভাবই তাঁর মর্ত্যপ্রীতির উদ্ভব সাধন করে। তার ফলে তিনি স্বর্গও চান নি। সোনার তরীতে তাঁর তিরস্কার "বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে, আমি একা বসে রবো মুক্তি-সমাধিতে ?" চিত্রার রূপান্তরিত হ'ল এই দৃঢ়তায়, "স্বর্গে তব বহুক অমৃত, মর্ত্যে থাক সুখে-দুঃখে অনন্তমিশ্রিত প্রেমধারা—অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি', ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি।" এই মনোভাব পেগানিজ্ম্ বা পরলোক বিমুখতার প্রভাব নির্দেশ করে। জীবনপিপাসা ও মর্ত্যপ্রীতি নৈবেদ্য কাব্যে বৈরাগ্যকে সবলে প্রত্যাখ্যান করেছে। প্রাণময়তা কবির চিত্তে বিপুল বিশ্বকে জানার এবং তার রস আস্বাদন করার অসীম আগ্রহ জাগিয়ে দিয়েছে। তাঁর ইচ্ছা প্রতি বিন্দুর ভোগে মহাসিন্ধুর যোগে তিনি রূপের মারফতেই অরূপ অনন্তকে বরণ করবেন। তাঁর একটি গানের অতুলনীয় ভাষায় :

বিশ্বযোগে সবার সাথে যেথায় বিহারো

সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।

নয় কো বনে, নয় বিজনে

নয় কো আমার আপন মনে···

তিনি প্রত্যক্ষভাবে রামকৃষ্ণের "মনে, বনে, কোণে" ভগবানকে ডাকার নির্দেশের প্রতিবাদ করেছেন। এই কথাটিই নৈবেদ্য কাব্যে "যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে, তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে," এই রূপ নিয়েছে। "উৎসর্গ" কাব্যে এই মনোভাব প্রশান্ত রূপে অভিব্যক্ত—"স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে।" তিনি বলেছেন, "ধন্য রে আমি অনন্ত কাল, ধন্য আমার ধরণী। ধন্য এ মাটি, ধন্য সুদূর তারকা হিরণ-বরণী।" অনেক পরেও তিনি মায়াবাদ বা বৈরাগ্যবাদকে তেমন ভাবে আক্রমণ না করলেও বলেছেন, "শুধায়ো না মুক্তি কোথা, মুক্তি কারে কই," বলেছ

ছেন, "আমি কবি, আছি—ধরণীর অতি কাছাকাছি।" কবি বরাবর এই ধরণীর কবিই ছিলেন।

কড়ি ও কোমল কাব্যেই যৌবনের প্রথম রক্তরাগে এই প্রাণময়তার প্রথম প্রতিষ্ঠা।

যৌবনের একটি প্রধান ধর্ম নির্ভীকতা: যৌবন মৃত্যু সম্বন্ধে কৌতূহলী, মৃত্যুকে সে ভয় করে না। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও তারুণ্যের প্রথম উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু সম্পর্কে একটা কৌতূহলের ভাব দেখা গেছে, যা তাঁর কাব্যরচনায় বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট। তিনি নিজে এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন:

"যাঁরা আমার কাব্য মন দিয়ে পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন, এই মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি আমার কাব্যের এমন একটি বিশেষ ধারা নানা বাণীতে যার প্রকাশ। কড়ি ও কোমলেই তার প্রথম উদ্ভব।"

রবীন্দ্রনাথ জীবনের কবি; কড়ি ও কোমলে আবার বিশেষ করে যৌবনের কবি: তাঁর সকল কাব্যেই জীবনের জয়গান মন্দ্ররবে ঝঙ্কৃত। কিন্তু জীবনের প্রতি পর্যাপ্ত আসক্তি আর অনুরাগ যাঁর আছে, মরণকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেন না। জীবনের মধুরতায় মুগ্ধ কবির স্নেহ-পাশ যখনই ছিন্ন হয়েছে, প্রিয়জনবিয়োগের পর তখনই তাঁকে ভাবতে হয়েছে মরণের রহস্যের অর্থ কি। এ ভাবনা স্বাভাবিক। জীবনবাদী কবির রচনায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মরণের উপলব্ধি আত্মপ্রকাশ করেছে। জীবন-বেদীর উপর অবস্থিত কবি মরণের দেবতাকে বার বার নানা ভঙ্গিতে সম্ভাষণ করেছেন। তাঁর প্রায় সব কাব্যেই এর প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথের নিজের মতে, কড়ি ও কোমল কাব্যেই মরণের উপলব্ধির প্রথম উদ্ভব। কিন্তু আমরা তার আগে মৃত্যুর সম্বন্ধে কবির বিচিত্র রোমান্টিক উপলব্ধির প্রকাশ দেখতে পাই যখন ভানুসিংহ বলছেন:

মেঘবরণ তুঝ, মেঘ জটাজুট,
রক্তকমলকর রক্ত অধরপুট;
তাপবিমোচন করুণ কোর তব
মৃত্যু-অমৃত করে দান।

ভানুসিংহের পদাবলী কাব্যেই কবি মরণবিষয়ক অনুভূতির আভাস দিয়ে রেখেছেন। "প্রভাতসঙ্গীত" কাব্যেও বলা হয়েছে যে, "জীবন যাহারে বলে মরণ তাহারি নাম, মরণ তো নহে তোর পর।"

কিন্তু এ সব হ'ল মৃত্যু সম্বন্ধে কবিকল্পনার নিদর্শন; প্রথম যৌবনে মৃত্যুর বাস্তব রূপটি স্বচক্ষে দেখার পর কবি নিজ অন্তরে তাকে তীব্র ভাবে উপলব্ধি করলেন; যৌবনের সেই উগ্র, প্রখর মৃত্যুবিষয়ক অনুভূতি নিয়ে তিনি যে সব কবিতা লেখেন, কড়ি ও কোমল তাদের প্রথম সঞ্চয়ন। এই বইটিতে বহু বিচিত্র একত্র সমাবিষ্ট হয়েছে বলেই জীবনের কলগীতির পাশেই মরণের মহা-সঙ্গীত স্থান লাভ করেছে। জগতের নশ্বরতার উপলব্ধি সহসা দেখা দিয়েছে:

আলয় গড়িতে সবে চায়
যবে হায় প্রাণপণ করে তাহা সমাপন
খেলারি মতন ভেঙে যায়!

"কোথায়" কবিতাটিতে মৃত্যুর অজানা অচেনা হাহাকারময় সঙ্গীবিহীন রূপ প্রদর্শিত হয়েছে। "শান্তি" কবিতাটিতে মৃত্যুর পরে রোদনবিগলিত ব্যথা ঝরে পড়েছে। যে ধরণীকে কবি প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছেন, জীবমৃত্যুতে ব্যথিত হয়ে তাকেই তিনি প্রশ্ন করেছেন: "কেন সবে তোর কোলে কেঁদে আসে, কেঁদে যায় চলে?" কবির স্নেহকাতর চিত্তের প্রকাশ "আকুল আহ্বান" কবিতায় মর্মস্পর্শীরূপে ধরা দিয়েছে। আরো অনেক কবিতায় এই ধরনের বিয়োগবিধুর ভাব দেখা যায়। মৃত্যু সম্বন্ধে কবির ধারণা:

অনন্তের মাঝখানে দু' দণ্ডের দেখা,
তা-ও কেন রাহু এসে ঘিরে।
মৃত্যু যেন মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যায়,
পাঠায় সে বিরহের চর।
সকলেই চলে যাবে, পড়ে রবে হায়
ধরণীর শূন্য খেলাঘর!

এই ভাবে "কড়ি ও কোমল" কাব্যে মৃত্যু সম্পর্কে কবির বাস্তব উপলব্ধিটি নিবিড় ভাবে গড়ে ওঠার পর প্রকাশিত হয়েছিল। এই ভাবধারার ক্রমবিবর্তন আমৃত্যু কবির সব পরবর্তী কাব্যেই লক্ষ্য করা যায়। সোনার তরীতে কবি বলেছেন, জীবন ও কবি যেন প্রিয়-প্রিয়া-সম্পর্কে আবদ্ধ আর মরণ এই সম্পর্ককে তার ভয়াল ঝটিকার চাঞ্চল্যে বৈচিত্র্যময় করে তোলে। দুটি কবিতায় একই ভাব দেখা যায়:

জীবনের ধারা ছুটিছে
কি মহাখেলায় মরণবেলায়
তরঙ্গ তার টুটিছে।

এবং

সঘন বরষা, গগন আঁধার
হের, বারিধারে কাঁদে চারিধার,
ভীষণ-রঙ্গে ভব-তরঙ্গে ভাসাই ভেলা;
পরাণের সাথে খেলিব আজিকে মরণখেলা।

"প্রতীক্ষা" কবিতায় জীবন ও মরণকে বধূ ও বররূপে কল্পনা করা হয়েছে :

ওগো মৃত্যু, সেই লগ্নে নির্জন শয়নপ্রান্তে
এসো বরবেশে ;
আমার পরাণবধূ ক্লান্ত হস্ত প্রসারিয়া
বহু ভালোবেসে
ধরিবে তোমার বাহু ;

চিত্রা কাব্যে "মৃত্যুর পরে" কবিতাটিতে রসের পরিমাণ অল্প হলেও মৃত্যুর উপলব্ধি কবির অন্তঃকরণে এই প্রথম কতকটা শান্তির সঙ্গে স্বীকৃত হয়েছে। কবি যেন একে অগত্যা মেনে নিয়েছেন। কণিকা কাব্যে এক জায়গায় তিনি আরো খানিকটা এগিয়ে বললেন : আমি মৃত্যু, তোর মাতা, নাহি মোরে ভয়।" গীতপঞ্চাশিকার একটি গানে তিনি মৃত্যুর সম্বন্ধে পরম আশ্বাসের বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ জীবনে যদি আনন্দের এত ঐশ্বর্য থাকে, তবে মরণের পরপারের বিশাল অসীম কি কেবল শূন্যতায় পর্যবসিত হতে পারে? তিনি নির্ভীক ভাবে বলেছেন :

মরণকে তুই পর করেছিস্ ভাই
জীবন যে তোর তুচ্ছ হ'ল তাই।

উৎসর্গ কাব্যে তাঁর মরণের সম্ভাষণ ভাব ও রসে অতুলনীয় : এর রোমান্টিকতা ভানুসিংহের মরণকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কড়ি ও কোমল কাব্যে যে-মৃত্যুরূপ দেখি, পরে তার যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। কড়ি ও কোমল কাব্যে মৃত্যুর সঙ্গে প্রথম পরিচয়, যা বাস্তবতার রূঢ় অভিঘাতে শোকাচ্ছন্ন। কিন্তু উৎসর্গ কাব্যে তার রূপ সঙ্গীতময়, শিহরণ ও রোমাঞ্চের নীপবীথিসন্নিহিত, রক্তসন্ধ্যার জ্বালাময় প্রসাধনবিলাসে ভীষণ সুন্দর। রবীন্দ্রনাথ ক্রমে ক্রমে মরণের ভয়াল মাধুর্য আবিষ্কার করেছেন। তার পূর্ব-পরিচয় বরং ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে পাওয়া যায়, "কড়ি ও কোমল"-এ নয়।

যৌবন স্বভাবে মরণবিরাগী, জীবনই তার প্রকৃত বল্লভ। তাই কড়ি ও কোমল কাব্যের মরণ-বিরাগই রবীন্দ্রকাব্যের প্রধান কথা মরণের সম্বন্ধে। পরে বহু কবিতায় ও গানে কবি মরণের মাধুরী বর্ণনা করেছেন, নিরুপায় দার্শনিকতায় এর সার্থকতা খুঁজে বার করেছেন, কিন্তু সে-সব তাঁর অন্তরের কথা নয়। যে বিচিত্র অথচ অমোঘ, করুণ অথচ নিষ্ঠুর শক্তি তাঁকে তাঁর অতিপ্রিয় এই শ্যামা জননী ধরিত্রীর কোল থেকে বিচ্ছিন্ন করবার চেষ্টা করেছে, তাঁর আপনার জনদের অনির্দিষ্টকালের জন্যে, হয়তো চিরকালের মতো তাঁর কাছ থেকে দূরে নিয়ে গেছে, তাকে অপরিসীম শক্তিমত্তার জন্যে সম্ভ্রম জ্ঞাপন করলেও কবি তাকে কখনও ভালোবাসেন নি। জীবনবল্লভ আনন্দস্বরূপকে তিনি বরাবর মরণের চেয়ে বড় বলে মনে করেছেন। পূরবী কাব্যে মৃত্যুর পদধ্বনিতে তাঁর বক্ষের যে কম্পন, তাই তাঁর মৃত্যুবিষয়ে যথার্থ প্রতিক্রিয়া এবং এর প্রথম ও প্রকৃত পূর্বাভাস কড়ি ও কোমল কাব্যেই আছে ; সেখানে মৃত্যু সম্বন্ধে প্রশ্ন অস্ফুট এবং উত্তরবিহীন ; পরবর্তী কাব্যসমূহে সেই প্রশ্ন প্রবলতর এবং উত্তরলাভপ্রয়াসী।

অনন্যা

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

প্রেমের স্বাক্ষর তব চারিদিকে এ গৃহে আমার।
নৈকট্যের মিতালিতে ছেদ টানি রচিয়াছ দূর।
স্মরণের অবসরে খুঁজে ফিরি আলেখ্য তোমার
দু'দিনেই মনে হয় নিরিবিলি জীবন বন্ধুর।

কল্পনার ঊর্ণনাভে জাগর আঁখিরে দিই ভরি।
জীবনের রিক্তকুঞ্জে জেগে আছি লুব্ধ প্রতীক্ষায়।
অতীতের ইতিহাসে প্রথম প্রেমের পড়া পড়ি।
তাকাই ভবিষ্যপানে বর্তমান ভরে ব্যর্থতায়।

অনেক দিয়েছো জানি, পাইয়াছি মনের নাগাল।
তবু চাওয়া-পাওয়া-দ্বন্দ্ব আজো যে গো চলে চিরন্তন
অঙ্কুরিত বাসনারে তৃপ্ত করি দিবে ভাবীকাল,
বাঞ্ছিত জবাব বহি আনিবে কি জরিষ্ণু যৌবন?

প্রেম-স্বীকৃতিতে তব আছে জানি প্রত্যয়ের সুর।
হে অনন্যা, তাই কি নিকট ছাড়ি ভালবাস দূর?

বিলেতের লেখক

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

আলডুস হাক্স্‌লির ঠিকানা চেয়ে চিঠি দিয়েছিলাম তাঁর প্রকাশককে। প্রকাশক: মেসার্স ছাট্টো অ্যাণ্ড উইণ্ডুস, ৪০ উইলিয়ম কোর্থ স্ট্রীট, লণ্ডন, ডব্লু সি-২।

চিঠিটা পোষ্ট করেছিলাম গতকাল সকালে।

অফিস থেকে ফিরে দেখি, উত্তর এসে গেছে তার আজ বিকেলেই। প্রকাশক জানিয়েছেন, মিঃ হাক্স্‌লি বর্তমানে আমেরিকার বাসিন্দা। তাঁর সঠিক ঠিকানা আমাদের পক্ষে জানানো সম্ভব নয়। তবে তাঁর উদ্দেশ্যে কোনো চিঠি আমাদের কাছে পাঠালে তাঁর কাছে পৌঁছবে।

চিঠিটা হাতে নিয়ে বসেছিলাম ডিনার-টেবিলে। আরো অন্যান্য কয়েকজন বাঙালী ছাত্রও আমার মতো এ বাড়ীর পেয়িংগেষ্ট। তাঁরাও বসেছিলেন। মানে ডান হাতের সদ্ব্যবহারে লিপ্ত হয়েছিলেন ডিনার-টেবিলে।

আমাদের বৃদ্ধা ল্যাণ্ডলেডি বেরুলেন সুপ পরিবেশন করতে। আমার পাতে সুপ দিতে এসে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন, কোনো বন্ধুর চিঠি নাকি?

রহস্য করে বললাম, বন্ধুরই বটে! তোমার হাতের রান্না খেতে চায়!

তাই নাকি? কে তিনি?

আলডুস হাক্স্‌লি।

আলডুস হাক্স্‌লির নাম আমার ল্যাণ্ডলেডি কোনো-দিন শুনেছেন—মনে হ'ল না। সাহিত্যজগতের খোঁজ-খবরের চেয়ে কিসে দু' পয়সা আয় হয় এমন এক জগতের খোঁজেই তিনি বেশি আগ্রহশীল। ভেবেছিলেন, হয়তো হাক্স্‌লি সত্যই আমার কোনো বন্ধুস্থানীয়। একবার যদি বন্ধুকে বাড়ীতে ঢোকাতে পারেন আর যত্ন-আত্মীয়তা করে তাঁকে তাঁর হাতের রান্না খাওয়াতে পারেন, চাই কি, এক কায়েমী পেয়িংগেষ্ট পেয়ে যাওয়াও তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়।

তাই, বলে বসলেন, বেশ তো, দিন স্থির করে এক দিন নিমন্ত্রণ করো তাঁকে। আমি খাওয়ার ভার নিচ্ছি।

সলিল সান্যাল থাকতেন এ বাসায়। তিনিও ছাত্র। ইকনমিক্সে এম. এস-সি দেবার আশায় বিলেতে পড়ে আছেন। শ্বশুরের অগাধ পয়সা। তিনিও এ টেবিলে হাজির। পরের ভালো দেখা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। যে কোনো ব্যাপারেই তাঁকে নাক গলাতে হবে। নিজেকে অনবরত ভারতবর্ষের এক দুর্ধর্ষ প্রতিনিধি বলে ভাবেন। তিনি এক মন্তব্য ছুড়ে দিলেন, আপনার জন্য মশাই আমাদের মুখ দেখানো দায় হয়ে উঠল?

কেন?

যত সব অবান্তর ব্যাপার নিয়ে দেশের নামে এমন কলঙ্ক ছড়ান যে কী বলব!

কি কলঙ্ক ছড়ানো হ'ল মশাই?

কলঙ্ক নয়? হাক্স্‌লিকে নিয়ে ঠাট্টা আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না।

আপনাকে যে দেখতেই হবে—এমন কি মাথার দিব্যি দেওয়া হয়েছে? কড়া কথা আরো মুখে আসছিল। সামলে নিলাম।

এই সব বাঙালী ছাত্ররা বিদেশে এসেছে যে যার কাজ নিয়ে। এরা বিদেশীর কাছে সাহায্য চাইলে কত সহজে পায়। সাহায্য চাইতেও কার্পণ্য করে না। তবু এদের জ্ঞানচক্ষু খোলে না। নিজের দেশের লোকের ব্যাপারে এরা এত স্বার্থপর, এত উদাসীন যে, দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। ক'দিন আগে টি. এস. এলিয়টের ঠিকানা চেয়েছিলাম সলিল সান্যালের কাছে। ঠিকানা অবশ্য অনেক কষ্টে পেয়েও ছিলাম; কিন্তু সেই থেকে তাঁর যে কি রাগ এই অধমের উপর, জানি না।

ঠিকানা যে চেয়েছিলাম, এও তাঁর এক প্রবল আপত্তির কারণ। খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল হ'ল এঁড়ে গরু কিনে। এই যেন তাঁর মনোভাব আমার প্রতি।

আপনার আশা যেন, নোবেল প্রাইজটা আদায় না করে ছাড়বেন না! মিঃ সান্যাল বলেছিলেন, কিন্তু জেনে রেখে দিন, ঐ একখানা চটি ইংরেজী কবিতার বই নিয়ে আপনি এখানে একটা ঘুঁটের মেডেলও কুড়ুতে পারবেন না। কি যে আপনার দুর্মতি···

দুর্মতিটা কোথায়—আজো ঠিক ভেবে পাই না। যদিও কাজ শিখি কোনো অফিসে তবু বাংলা সাহিত্যিক

হিসাবে বিলেতে এসেছি। দু'পাঁচ জন ইংরেজী সাহিত্যিকের সঙ্গে যদি আলাপ করতে চাই, সেটা কি অপরাধ? আলাপ করবার একটা অস্ত্রও অবশ্য হাতে আছে। একটি মাত্র ইংরেজী কবিতার বই। 'রিপল্‌স্' (Ripples)। কতকগুলি বাংলা চতুষ্পদী কবিতার অনুবাদ। বইখানি কয়েক বছর আগে কলকাতার থ্যাকার স্পীংক অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রকাশ করেন।

সেই রাত্রেই হাক্‌স্‌লি আর টি. এস. এলিয়ট—উভয় সাহিত্যিকের প্রকাশকের ঠিকানা দিয়ে দুখানা 'রিপল্‌স্' প্যাক করলাম। পরদিন সকালবেলা পোষ্ট অফিসে গিয়ে সে দুটোকে ছেড়ে দিলাম। বুক পোষ্ট চার্জ পড়ল প্রতিটি প্যাকেটের দেড় পেনি করে।

বাসার ঠিক বিপরীত ফুটপাথের গায়েই একখানা বাড়ী।

সে বাড়ীর দিকে যখনই নজর পড়ে, দেখেছি এক ইংরেজ ভদ্রলোক লিখে চলেছেন। সকালবেলা তাঁর গায়ে থাকে এক নীল পুলোভার। বিকেলে রীতিমত স্যুট, এমনকি গলায় টাইটি পর্যন্ত।

লোকটি কী এত লেখেন?

আমার রুমমেট শচীনদাকে একদিন জিগ্যেস করেছিলাম। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, উনি একজন লেখক।

অফিসের কাজ আর অন্যান্য ব্যাপারে এত বেশি মগ্ন ছিলাম যে, ইচ্ছে থাকলেও ভদ্রলোকের সঙ্গে যেচে আলাপ করতে পারি নি।

সেদিন সন্ধ্যায় কোথা থেকে যেন আসছিলাম, হঠাৎ মনে হ'ল, রাস্তা দিয়ে যেন সেই প্রৌঢ় লেখক-ভদ্রলোকটিই চলেছেন।

গুড ইভ্‌নিং বলে তাঁর পথরোধ করে দাঁড়ালাম।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে আমার দিকে চাইলেন।

বললাম, মাপ করবেন, আপনি কি একজন লেখক?

কেন বলো দেখি?

বাড়ীটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম, যখনই লক্ষ্য করি, দেখি, জানালার সামনে বসে এক ভদ্রলোক লিখে চলেছেন। মনে হচ্ছে, আপনিই সেই লেখক।

না, না। আমি হতে যাব কি জন্যে? তুমি ভুল করছ। অবশ্য আমিও এককালে সাংবাদিক ছিলাম। লিখতাম কিছু কিছু। এ বয়সে আর লিখি না। এ পাড়াতেই অবশ্য থাকি। তুমি যাঁকে 'মিন' করছ, আমি তাঁকে জানি। তাঁর বারখানা বই আছে। দুখানার বিক্রি হয়েছে। কিন্তু তিনি তো এখানে নেই।

কোথায় গেছেন?

এত কথা তুমি জিগ্যেস করছ কেন—জানতে পারি কি?

আমি একজন বাঙালী লেখক। এসেছি কলকাতা থেকে। তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চাই।

ক'দিন তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে মনে হয়। যতটুকু শুনেছি, তিনি সপরিবারে কোথাও বেড়াতে গেছেন। হয়তো কোনো সমুদ্রতীরে। ফিরতে তাঁর দিন পনেরো লাগতে পারে।

একটু থামলেন।

একটা জরাজীর্ণ মোটর পড়েছিল লেখকের বাড়ীর সামনে। সেটাকে দেখিয়ে বললেন, এ গাড়ীটা তাঁর। এটা দেখে ভেবো না যে, লেখক বাড়ীতে আছেন। গাড়ীটা অচল হয়ে গেছে বলেই এখানে পড়ে আছে। এরকম অচল গাড়ী বিলেতের রাস্তায় অনেক পড়ে থাকে।

বললাম, ধন্যবাদ আপনাকে।

ভদ্রলোক চলে যাচ্ছিলেন। ফের দাঁড়ালেন। প্রশ্ন করলেন, তুমি যে তাঁর সঙ্গে দেখা করবে—

তোমার পরিচয়পত্র আছে?

আছে। ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘ থেকে পাওয়া।

আচ্ছা।

তাঁকে শুভরাত্রি জানিয়ে ঘরে চলে এলাম।

সকালে উঠে দেখি, আমার লেখক একই জায়গায় বসে বসে লিখছেন।

এ কি হ'ল? যিনি দিন পনেরো বাদে ফিরবেন—তিনি এখন কোথা থেকে? তবে কি বাড়ীতে নেই—কথাটা মিথ্যা? লেখবার সুবিধার জন্য তৈরী করা? লোকজন এড়াবার ফন্দি?

দেরি না করেই ব্রেকফাষ্ট সেরে নিলাম। যা থাকে বরাতে—কপাল ঠুকে বেরিয়ে পড়লাম। হাতে সেই আমার ইংরেজী বই।...লেখকের ছাড়পত্র।

ভদ্রলোকের নামও জানি না, যে তাঁকে সম্বোধন করতে পারব। একেবারে ঢুকে গেলাম ছোট দরজা ঠেলে তাঁর বাড়ীর চত্বরে। সামনেই একটু ছোট বাগানের মতো জায়গা। ফুল গাছ, গাছে নানা রঙের অনেক ফুল। প্রধান হচ্ছে, গোলাপ। ফুটপাথের ধার ঘেঁসে দেওয়াল!

সেই বাগানে ঢুকে যেই দাঁড়িয়েছি, লেখক নিজেই এলেন।—কে তুমি?

আমি লেখককে খুঁজছি।

যতখানি প্রৌঢ় বলে তাঁকে মনে হয়েছিল, দেখি, ঠিক ততখানি তিনি নন। বয়েস পঞ্চাশ-বাহান্ন হবে। আমাদের দেশের ফিল্ম-জগতে অমন অনেক প্রৌঢ়ই যুবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। দীর্ঘ সুগঠিত তাঁর লাল চেহারা। দেখলে তাঁকে রসিকই মনে হয়।

লেখক বললেন, যদি আমাকে দেখে হতাশ না হয়ে থাকো, বলব আমিই সেই লেখক। ভিতরে এসো।

ভিতরে যেতেই তিনি বললেন, আমি ভয়ানক ব্যস্ত। টেলিভিশনের জন্যে একটা নাটক লিখছি। বাড়ীতে উপস্থিত কেউ নেই। সী-সাইডে বেড়াতে গেছে। আমিও গিয়েছিলাম। বিশেষ দরকার বলে কয়েক ঘণ্টার জন্য ফিরে এসেছি। আবার যেতে হবে। তুমি পরের সপ্তাহে একদিন এসো। ভালো করে কথা বলব।

আমি কে—কি বৃত্তান্ত না বলে কেমন করে পালিয়ে আসি? ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের চিঠিখানা তাঁর মুখের সামনে মেলে ধরলাম। বললাম, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই চলে যাচ্ছি। আমার একখানা ইংরেজী বই আপনাকে উপহার দিতে এসেছিলাম। আপনার নামটা সঠিক জানতে পারলে লিখে উৎসর্গ করতে পারতাম।

খুব আনন্দের কথা—চট্ করে লেখক একখানা ইংরেজী বই আমার সামনে এগিয়ে দিলেন। বললেন, এটা আমার লেখা বই। এ থেকে আমার নামটা দেখে লিখে দাও।

তাই করলাম।

তাঁর লেখা বইখানা দেখে হিংসে হতে লাগল। এত সুন্দর গেটআপ ও কাপড়ের বাঁধাই যে, কলকাতার বাজারে এমন বই বহু দিন দেখি নি। এক-একটা সংস্করণই তো ছাপা হয় বিলেতে পাঁচ-ছয় হাজার, কি তারো বেশী। ক্রেতার সংখ্যাও তেমনি। বিলেতের বইয়ের বাজারের সঙ্গে আমাদের তুলনা?

লেখকের নাম দেখলাম, জেরার্ড টিকেল (Jerrard Tickell)।

বললাম, আপনার একটা মতামত আমাকে দেবেন না?

বইটা পড়ি আগে। পরের সপ্তায় এসো।

তিনি যেন আমাকে সরাতে পারলে বাঁচেন—এত ব্যস্ত।

পরের সপ্তার সুযোগ গ্রহণ করলাম।

গেলাম এক সকালে।

লেখক তখন ব্রেকফাষ্ট-টেবিলে বসে আছেন। সামনে কফির কাপ।

আমাকে অভ্যর্থনা করে বসালেন। একটা সিগারেট দিলেন এগিয়ে।

কুশল সংবাদ আদান-প্রদানের পর বললাম, এখনো ব্যস্ত আছেন বোধ হয়?

মরবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত থাকব।—

রসিক লেখকের রসঘন উক্তি!

বললাম, আমার বইখানা…

দেখেছি, পড়েছি, খুশী হয়েছি।

সেকথা মুখে না বলে একটু লিখে দিন।

দেব। নিশ্চয় দেব। তুমি কবে লণ্ডন ত্যাগ করছ?

দিন তো হয়ে এল। এই মুহূর্তে লিখে দিতে পারেন না?

এখন একশো পঞ্চাশ লাইন আমাকে লিখতে হবে। নাটক শেষ হয় নি। তোমাকে একদিন জানালা থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকব। ডেকে লিখে দেব।

সেদিন কবে আসবে? একটু তাড়াতাড়ির ভরসা পেলে আনন্দে থাকতে পারি।

আনন্দে তুমি এখন থেকেই থাকতে পারবে। যেহেতু, ভরসা তোমাকে দেওয়াই হয়েছে ধরে নাও।

আপনার সম্বন্ধে আমার কিছুই জানবার সৌভাগ্য হয় নি। একটু জানতে পারি কি?

আচ্ছা জানাচ্ছি।

মিঃ টিকেল আমাকে একটা পত্রিকার চারখানা আলগা পৃষ্ঠা দিলেন।

বললেন, এতে আমার একটা গল্প আছে। 'দি লেমন পাজামা' (The Lemom Pyjama)। দেখলেই সব জানতে পারবে। কাগজটা কিন্তু আমাকে ফেরৎ দিও—পড়া হয়ে গেলে।

ঘরে এসে কাগজটার নাম ও তারিখ দেখলাম।—Evening Standard. Page 9. Saturday, Dec 4, 1954.

গল্পের নামের নিচে লেখকের নাম, ছবি ও পরিচয়: By Jerrard Tickell—49, best known for two books, 'ODETTE' and 'APPOINTMENT WITH VENUS', both have been filmed. He is married, has three sons, lives in Hamstead.

গল্পটা পড়লাম।

বাংলা সাহিত্যের কথা ভেবে সত্যিই গর্বিত হলাম। বাংলায় আজকের দিনে এত ভালো গল্প বেরিয়েছে যে

'কমনওয়েলথ' সম্মেলনে বিটিশের প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড ম্যাকমিলান
প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল ও অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ
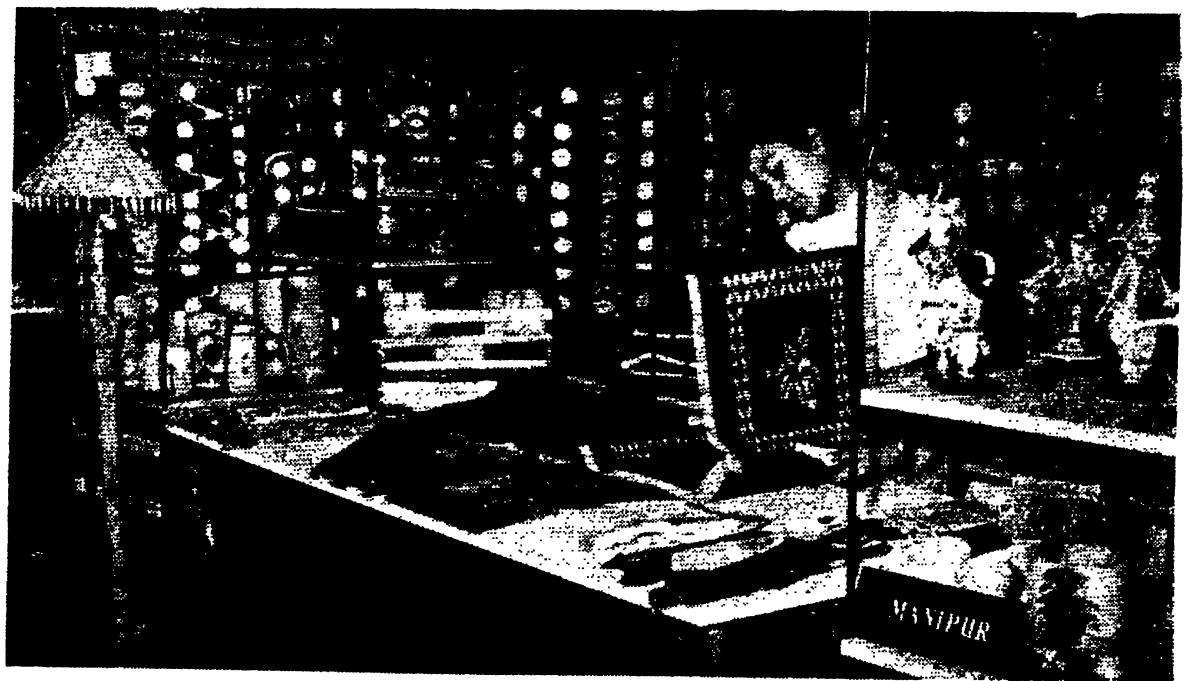
নিউ দিল্লীতে 'সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার' প্রদর্শনীতে মণিপুরের ষ্টল

ওরা কাজ করে
ফটো : শ্রীরমেন বাগচী

মধ্যাহ্নে
ফটো : শ্রীরমেন বাগচী

ইংরেজরা যদি বাংলা পড়তে পারত, তারিফ করত। শুধু তারিফ নয়, বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যেত।

মিঃ টিকেলের গল্পের প্রথম লাইন হচ্ছে: "When the day came for me to leave the Goldcoast, Clarkson was missing."

তার পর গল্পাংশ:

"ক্লার্কসন একজন নিগ্রো। অসম্ভব কালো। আমার সঙ্গে তার জানাশোনা অনেক দিনের। আমার পুরাণো ভৃত্য। অথচ আজ প্লেনে চড়ে লণ্ডন যাবার মুখে তার সঙ্গে দেখা হবে না? খোঁজাখুঁজি করলাম তাকে। একজন বললে, বাজারে গেছে, মাংস আনবে, তোমার জন্তে চপ বানাবে রাত্রে।

রাত্রে আমি কোথায়? আমি তো উড়ে যাচ্ছি এখনি।

ক্লার্কসনকে না পেয়ে—বিদায়-সম্ভাষণ না জানিয়েই—লেবু-রঙের পায়জামা হারিয়ে শেষকালে প্লেনে চড়তে হ'ল।

প্লেন উঠল আকাশে। আমরা ফ্রি-টাউনের দিকে এগিয়ে চললাম। নীচে সমুদ্র জলে যেন মণি জলছে। অবারিত সূর্য-আলোয় সে মণি যেন মণি নয়, তরল অনল। আফ্রিকার বন-জঙ্গল অনেক দূরে দূরে পিছিয়ে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে অদৃশ্যলোকে। সহসা দেখা গেল, প্লেনের দুটো এঞ্জিনের একটা থেকে কালো তেল ঝরছে। এ অবস্থায় যতখানি এগিয়ে যাওয়া যায়, তার বেশি পেছিয়ে যাওয়াই ভালো। মাটিতে অবতরণ করাই শ্রেয়।

প্লেন আবার ফিরে এল সন্ধ্যায় স্বস্থানে—যেখান থেকে যাত্রা সুরু করেছিল। মাটিতে নেমে দেখি—ক্লার্কসন!

ক্লার্কসন বললে, রাত্রের খাবার তৈরী। একটু বসলেই গরম করে দিতে পারি।

খাবার যে আমি খাব—একথা তোমাকে কে বলেছিল?

আমি জানতাম। তাই সকালে বাজার করতে বেরিয়েছিলাম।

কেমন করে তুমি জানতে, শুনি?

সমস্ত ব্যাপারটা রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম।

স্বপ্ন তোমার এত সত্যি? তাই যদি হবে, বলো নি কেন?

বলে কোনো লাভ ছিল না।

খাওয়ার চেয়ে বিছানাটা পেলে আরও ভালো হয়।

তাও পাবে। তা-ও তৈরী।

দেরি না করে বিছানায় গেলাম। দেখি, লেবু-রঙের পায়জামাটি পরিপাটিরূপে সাজানো আছে একপাশে।

সেইটে পরে একেবারে শয্যায় লুটিয়ে পড়লাম।"

মিঃ টিকেলের বাড়ী যাতায়াত করছি, বৃদ্ধা ল্যাণ্ড-লেডি সেটি কবে লক্ষ্য করেছিলেন।

হঠাৎ একদিন জিগ্যেস করে বসলেন, তুমি ও বাড়ীতে কেন যাও?

ওখানে একজন লেখক আছেন। তাই লেখক যদি লেখকের বাড়ী না যায় তো কোথায় যাবে?

লেখক? কে লেখক? ওই ভুতটা আবার লেখক নাকি?

ভূত কাকে বলছ, বুঝতে পারছি না।

শুধু ভূত? ওকে গুণ্ডা, খুনী—যা কিছু আমি ভাবতে পারি।

ভাবার হেতু?

জানো, ও আমাকে একবার মোটর চাপা দিতে এসেছিল? মেয়েছেলের প্রতি সম্মানবোধকে ও দু'পায়ে মাড়িয়ে যেতে পারলে আর কিছু চায় না।

কিন্তু তোমার সম্বন্ধে তো উনি কিছু বলেন নি আমাকে?

বলবে? ওর সে সাহস আছে? তা হলে ওকে আমি জেল খাটিয়ে ছাড়ব না?

তুমি অনর্থক রাগারাগি করছ। তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার আমাকে না শোনানোই উচিত ছিল। সকলের সব গুণ তো থাকে না।

তুমি একেবারে ওখানে না গেলেই আমি খুশি হতাম। তা ছাড়া, তুমি তো অফিসে কাজ করতে এসেছ এখানে। যারা চাকরি করে, তারা আবার লেখক হয় নাকি?

বিলেতে না হতে পারে। আমাদের দেশে হয়।

মনে মনে বললাম, দুধ ও তামাক—আমরা এক সঙ্গেই খাই।

বৃদ্ধা ল্যাণ্ডলেডির সঙ্গে তাল দেবার জন্য আমি বিদেশে আসি নি। তাঁর কথামতো চলা আমার পক্ষে সম্ভবও ছিল না।

একদিন উপরের জানালা থেকে দেখলাম, মিঃ টিকেল লিখছেন। টিকেল আমার দিকে একবার চাইলেন। মনে হ'ল, তিনি আমাকে ডাকছেন।

তখনই সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেলাম।

যেই তাঁর বাড়ীতে ঢুকতে যাচ্ছি, টিকেল যেন চঞ্চল

হয়ে উঠলেন। তাঁর স্ত্রীকে ডেকে কি বললেন। আর দৌড়ে এলেন তাঁর স্ত্রী।

বললেন, দুঃখিত, উনি লেখায় বিশেষ ব্যস্ত আছেন। অন্য দিন এসো।

এ রকম ব্যবহার প্রত্যাশা করি নি। ইতিপূর্বে পাইও নি। তাঁরই পড়তে দেওয়া গল্পের পৃষ্ঠাগুলি প্রত্যর্পণ করতে গিয়েছিলাম। একটু আগে তিনিই তো ডাকলেন—মনে হয়েছিল। আর একি ব্যবহার?

গল্পের পৃষ্ঠাসহ পিছন ফিরেছি কি—ব্যাপারটা বোধগম্য হয়ে গেল।

আমার বৃদ্ধা ল্যাণ্ডলেডি মিঃ টিকেলের দিকে দুর্বাসার মতো চেয়ে আছেন তাঁর দরজা থেকে।

মিঃ টিকেলও সেটা লক্ষ্য করেছিলেন নিশ্চয়ই।

ল্যাণ্ডলেডি যেন বলতে চাইছেন, কি, এত বড় স্পর্দ্ধা, আমারই বাড়ীর লোকের সঙ্গে আলাপ আলোচনা? আমাকে অপমানিত করা? ভূত কোথাকার···

'রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাধে, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।' আমি সেই উলুখাগড়ার ভূমিকাতেই হয়তো উত্তীর্ণ হয়ে পড়েছি!

আমার ল্যাণ্ডলেডির মন কি খুঁৎখুতে! তাঁর দুঃসাহসী চাওনিকে লেখক হয়েও মিঃ টিকেল এড়াতে পারেন নি, এটা ভারি মজার ব্যাপার।

লণ্ডন ত্যাগের দিন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল।

ইতিমধ্যে বহু কাগজের সম্পাদকের সঙ্গে আলাপ করেছি। তাঁদের সুমধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছি। কেউ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। কেউ বই উপহার দিয়েছেন। কেউ আমার দেশের খ্যাতনামা সাহিত্যিকবৃন্দের নাম টুকে রেখেছেন। বাংলা সাহিত্য, যদিও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম স্নাতকোত্তর পাঠ্যতালিকাভুক্ত, দুঃখের কথা, ইংরেজ সাহিত্যিকদের ভিতর তার সম্বন্ধে কোনোরূপ আগ্রহ প্রকাশের তীব্রতা লক্ষ্য করি নি। অথচ বাংলা দেশে বাস করে—বাংলা সাহিত্যের চর্চা করে আমরা কাউকে গ্যারিক বানাচ্ছি, কাউকে ডিকেন্স্ গলস্ওয়ার্দির সঙ্গে তুলনা করে আত্মপ্রসাদ লাভ করছি, কারো সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যকে টক্কর দিয়েছে বলে গর্বিত হচ্ছি। বাংলায় একটা প্রবন্ধ লেখবার সময় যত বেশি ইংরেজ সাহিত্যিকের বুকনি আমরা উদ্ধৃত করি, ইংরেজ সাহিত্যিক যদি তার কিছুও করত! টি. এস. এলিয়টকে বই পাঠানো হয়েছিল, স্মারকপত্রও দিয়েছিলাম কিন্তু তার উত্তর আজো আসে নি। শুনেছিলাম, তিনি অসুস্থ। ইংরেজ অসুস্থ হলেও শোনা যায়, প্রাপ্তিসংবাদ নাকি একটা আসে। তিনি নিজে না লিখুন, সেক্রেটারি তাঁর লিখবেনই। এ ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম কেন—সে খবর আজো অজ্ঞাত।

একদিন সকালে এক অভাবিত ব্যাপারের সম্মুখীন হলাম।

হাক্সলিকে একখানা চিঠি দিয়েছিলাম তাঁর প্রকাশকের ঠিকানায় লণ্ডনে। চিঠিখানা আমেরিকা থেকে ফেরৎ এসেছে। অর্থাৎ লণ্ডনের প্রকাশক খামের উপর নিজেদের ঠিকানা কেটে হাক্সলির আমেরিকার ঠিকানা দিয়ে চিঠিখানা ডাকে ফেলেছিলেন। আমেরিকার ডাকবিভাগ দেখেছেন, ঠিকানাটা ভুল। চিঠিখানা ফেরৎ পাঠিয়েছেন লণ্ডনের জি. পি. ও-তে। স্থানীয় জি. পি. ও. প্রেরকের ঠিকানা খামের উপর না দেখে সেটা খুলেছেন। তার মধ্যে চিঠিতে আমার নাম-ঠিকানা ছিল। তাই দেখে তাঁরা আর একটা বড় খামে ভরে আমার কাছে সবশুদ্ধ পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কি আর করি? আমিও সবশুদ্ধ খামে ভরে হাক্সলির প্রকাশকের ঠিকানায় ফের পাঠিয়ে দিলাম। সঙ্গে একটা চিঠি দিলাম প্রকাশকের উদ্দেশ্যে: আমার কলকাতার ঠিকানা হচ্ছে অমুক, আমি ইংলণ্ড ত্যাগ করছি অমুক দিনে, অতএব এসব কথা যেন মিঃ হাক্সলিকে জানানো হয় দয়া করে। আর এবার যেন সঠিক ঠিকানায় চিঠি পাঠাতে ভুল না হয়।

সকাল বেলা কুয়াশা নেমেছিল প্রচণ্ড। তিন হাত দূরের মানুষও ছিল সেই কুয়াশায় অস্পষ্ট। একটু বেলা হতেই হঠাৎ পৃথিবী ভেসে উঠল। সুন্দর সূর্য-আলোয় গাছপালাগুলিকে যেন আরো বেশি সবুজ, সতেজ দেখাতে লাগল।

মিঃ টিকেল তখনো বসে লিখছেন কাঁচ দিয়ে ঢাকা তার জানালার সামনে।

দেরি না করে একেবারে মরিয়ার মতো ঢুকে গেলাম তাঁর বাড়ীর এলাকায়। হাতে সেই লেমন পায়জামার ফাইল কপি।

মিঃ টিকেল খুব খাতির করলেন। করমর্দন করে বসালেন। কুশল সংবাদ নিলেন। জিগ্যেস করলেন, গল্পটা কেমন লাগল?

বললাম, এর চেয়েও ভালো গল্প বাংলা সাহিত্যে পড়েছি।

তা হতে পারে। এটা কি রকম লাগল বলো?

মন্দ নয়।

শুনেছি, বাংলা সাহিত্যিকরা তো ইংরেজী গল্পই বেশি চুরি করে।

সকলে নয়। এমন অনেক প্রতিভাবান সাহিত্যিক আছেন যাঁদের গল্প পড়লে আপনারই হয়তো চুরি করতে ইচ্ছে করবে।

অস্বীকার করি না। কিন্তু এজন্মে তা সম্ভব কি?

নিউজ ক্রনিক্যাল সম্পাদকের একখানা সুন্দর চিঠি পেয়েছিলাম।

সেখানা তাঁকে দেখতে দিলাম।

পড়ে তিনি খুশি হলেন।

জিগ্যেস করলাম, আপনার লেখা গল্পের বই নেই?

এখনো বার হয় নি। তবে নানা কাগজে গল্প বেরুচ্ছে। সবগুলো এক সঙ্গে করে বই আকারে একদিন বার করবার ইচ্ছে আছে।

তিনি একটা পত্রিকা দিলেন। পত্রিকার নাম, এভরি-বডিস উইকলি, সেপ্টেম্বর ১০, ১৯৫৫।

বললেন, এতে একটা গল্প আছে…'স্যাম্পেন ফর দি ব্রিগেডিয়ার', আমার লেখা। পড়ে ফেরৎ দিয়ে যেও।

পত্রিকাটা গ্রহণ করলাম। বললাম, দেব। কিন্তু তোমার কাছে আমার দুটো জিনিস পাওনা আছে। একটা তোমার অভিমত, অপরটি তোমার একখানা ছবি।

তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন—

পর মুহূর্তেই ফিরে এলেন একখানা বই হাতে করে। —The Hero of Saint Roger. By Jerrard Tickell.

এটারও চমৎকার গেটআপ। কাপড়ের বাঁধাই। দাম, দশ শিলিং ছ' পেন্স। বইয়ের উপর জ্যাকেট আছে।

পিছনের পাতা খুলে মিঃ টিকেল জ্যাকেট দেখালেন। সেখানে তাঁর সুন্দর একখানা ছবি।

বইটি আমাকে উপহার দিলেন। আর অভিমতও লিখে দিলেন আমার বই সম্বন্ধে।

পত্রিকা, বই ও অভিমত হাতে নিয়ে উদ্ভ্রান্তের মতো বেরিয়ে আসছি তাঁর বাড়ি থেকে, তিনি চেঁচিয়ে ডাকলেন: তোমার চিঠি ফেলে গেছ।

নিউজ ক্রনিক্যাল সম্পাদকের চিঠিটা ফেলে এসে-ছিলাম বটে!

পরের পর্ব কলকাতা।

লণ্ডন ত্যাগের প্রাক্কালে মিঃ টিকেলের সঙ্গে আর দেখা হয় নি।

এভরিবডিস্ উইকলিটা ফেরৎ দিতে গিয়েছিলাম যখন, তিনি বাড়ি ছিলেন না। তাঁর হয়ে তাঁর স্ত্রী কাগজটা ফেরৎ নিয়েছিলেন। ধন্যবাদ দিয়েছিলেন আমাকে। বলেছিলেন, মিঃ টিকেল আফ্রিকায় গেছেন। আফ্রিকা যেন আমার স্বামীর প্রাণ! ও-দেশের লোক অত কালো, অত কুৎসিত, তবু ওদেরই তিনি ভালোবাসেন অন্তর দিয়ে। ওদের চোখের তারায় তিনি আলো দেখেন। একবার করে ওখানে না বেড়িয়ে এলে উনি লেখার খোরাক পান না।

'দি হিরো অব সেণ্ট রজার' বইয়ে তারই প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়েছিলাম—

সেকথা জানিয়েছিলাম সাহিত্যিক-পত্নীকে। আর জানিয়েছিলাম, আমি অমুক দিনে জাহাজে চড়ছি—সে কথা যেন মিঃ টিকেলকে জানানো হয়। তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল না। তবু আমার আন্তরিক নমস্কার তাঁর উদ্দেশ্যে রেখে গেলাম। এ জীবনে বিলেতে আসা আবার সম্ভব হবে কিনা জানি না, তবু তিনি আমাকে যেন মনে রাখেন।

টিকেল-গৃহিণী সর্বান্তঃকরণে তাঁর স্বামীর হয়ে আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। আমার যাত্রাপথ যেন শুভ হয়, এ কামনাও তিনি বারে বারে করেছিলেন।

যাত্রাপথ শুভ হয়েছিল বৈকি!

নইলে নির্বিঘ্নে কলকাতায় ফিরলাম কেমন করে?

দুপুরে কলকাতার বাসায় এসে উঠেছি, বিকেলে একখানা চিঠি এসে হাজির। ইউ.এস.এ. এয়ার মেল লেটার…আসছে লস্ এঞ্জেলস, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে। যিনি স্বহস্তে চিঠিখানা লিখেছেন, তলায় তাঁরই সুপ্রতিষ্ঠিত স্বাক্ষর।

Dear Mr. Chatterjee

Your letter has just reached me, but not the poems. Owing to a long outstanding visual handicap, I am compelled to ration my reading, confining myself to my work. For this reason I cannot undertake the criticism of books or proof or type scripts. It is a matter of simple self-preservation. The flesh is weak even tho' the spirit may be willing.

Yours truly,
ALDOUS HUXLEY

সাহিত্য শিক্ষা

শ্রীদিলীপ চট্টোপাধ্যায়

১

সাহিত্যের সংজ্ঞা কি? সাহিত্য কাকে বলে?

কুন্তক বলেছেন, সহিতয়োর্ভাবঃ সাহিত্যম্।

কিন্তু কিসের সহিতত্ব?

ভামহ বলেছেন, শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্। শব্দ ও অর্থের সহিতত্ব। শব্দ ও অর্থের মিলন তো স্বতঃসিদ্ধ। কালিদাসের বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ কথাটি তো সুপরিচিত। ভর্তৃহরি বলেছেন, 'জগতে এমন কোনো বিজ্ঞান সম্ভবপর নয় যার সঙ্গে শব্দ অনুস্যূত হয়ে নেই। সমস্ত জ্ঞানই শব্দের দ্বারা অনুবিদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়ে থাকে।' পাশ্চাত্য দার্শনিক ক্রোচেও অনুরূপ কথাই বলেছেন, ("A thought is not thought for us, unless it be possible to formulate it in words")। গোড়ায় মানুষ কথা বলতে পারত না, প্রথমে হাত পা নেড়ে আকারে ইঙ্গিতে বুঝাবার চেষ্টা করত, তাই এখনো তো আমরা মনোভাব ব্যক্ত করবার জন্যে হাত নাড়ি কথা বলার সময়। মুখ দিয়ে গোড়ায় অর্থহীন একটা আওয়াজ বা শব্দ বেরোত কেবল। ক্রমে মানুষ অনেক কিছু জিনিসকে নির্দিষ্ট ও বিশিষ্ট ভাবে চিনে তাকে বিশেষ এক বস্তু হিসেবে সনাক্ত করবার জন্য মনে যে বিশেষ রকম স্পন্দন জাগায় তার থেকে বিশেষ এক রকম শব্দ নির্গত হয় মুখ থেকে। আমাদের দেশের প্রাচীন বৈয়াকরণ রাজশেখর ঠিকই বলেছেন, বিবক্ষাপূর্বাঃ হি শব্দাঃ—বক্তার মনোভাব প্রকাশের বাসনা দ্বারা শব্দের অর্থ নিয়ন্ত্রিত। "অর্থ" কথাটির ব্যুৎপত্তিগত তাৎপর্যই হোলো —লেখকের মনোগত অভিপ্রায়। লেখকের মনোগত অভিপ্রায় যেখানে শব্দের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে সেখানেই সাহিত্য। অর্থাৎ, শব্দ ও অর্থের সুষ্ঠু ও সার্থক মিলনে সাহিত্য।

শব্দ ও অর্থের সুষ্ঠু ও সার্থক মিলন ঘটেছে কিভাবে বুঝা যাবে? নায়কস্ত কবেঃ শ্রোতুঃ সমানোঽনুভবস্ততঃ। লেখক ও পাঠকের লেখার মাধ্যমে চিত্তসাম্য ঘটলেই তা সম্ভব হবে।

বিজ্ঞান দর্শন সবই তো তা হলে সাহিত্য। কেননা এগুলিও তো ভাষার সাহায্যে লেখা হয়। হ্যাঁ, এগুলিও সাহিত্য। তাই Scientific Literature-এর কথাও তো শোনা যায়। কিন্তু সাহিত্য বলতে আমরা তো এ সবকে বুঝি না। ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত রচনামাত্রকেই আজ আর আমরা সাহিত্য বলি না, ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত রচনাসমূহের একটি শাখাকে বলি সাহিত্য। ডি কুইন্সী তাঁর Essays on Poets: Pope-এ লিখেছেন, "There is first the literature of knowledge, and secondly, the literature of power. The function of the first—to teach, the function of the second—to move." অর্থাৎ সমস্ত সাহিত্যকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়:

(১) জ্ঞানবান সাহিত্য। এর মধ্যে পড়ে দর্শন বিজ্ঞান। এখানে লেখক যেন শিক্ষক, তিনি আমাদের শিক্ষা দিতে চান, জ্ঞান প্রচার করতে চান। তাই আমাদের বুদ্ধির কাছে এঁর আবেদন। এখানে সুনির্দিষ্ট ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যাদি নিবেদিত হয়।

(২) সৃষ্টিশীল সাহিত্য। এখানে লেখক দেখা দেন একান্ত আত্মীয় বেশে, সহৃদয় বন্ধুরূপে। আত্ম-নিবেদন করেন লেখক এতে। এরা লেখকের হৃদয়োদ্ভূত। এখানে আমেরিকার কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের কথায়,—

"Comrado, this is no book,
Who touches this, touches a man,..."

এ ভাবে আমরা মানুষের 'সহিত' সরাসরি মুখোমুখি মিলি বলেই এই বিশেষ ধারাটিকে সাহিত্য নামে চিহ্নিত করা সার্থক হয়েছে।

শুধু তাই নয়, এই ধারাতেই শব্দ ও অর্থের হরগৌরী মিলন ঘটেছে। কেননা, এখানে লেখক তাঁর মনোভাবকে ভাষার মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশের সাধনা করেন—মনের সূক্ষ্ম চেতনা, আবেগ, গভীর উপলব্ধি, আনন্দ, খুশি, দুঃখ, একটা মেজাজ এ সবকে ভাষায় কি ভাবে সুষ্ঠু ভাবে প্রকাশ করা যায়—অন্য লোককে জানানো যায়—সাহিত্য তারই সাধনা করে চলেছে। তাই বিজ্ঞান দর্শনের আলোচনাকারীকেও সাহিত্যের পাঠ নিতে হয়। কেননা জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্যাবলীকে ভালো ভাবে প্রকাশের জন্য

সাহিত্যের কাছে ভাব উপলব্ধি মনন চিন্তা ব্যক্ত করবার উপযুক্ত ভাষা-অনুশীলন লাভ করা যায়। তাই মাধ্যমিক স্তরে (Intermediate) Arts বা Science উভয়কেই ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ নিতে হয়। এরপর Scienceকে আর ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ নিতে হয় না শিক্ষকের কাছ থেকে।

২

প্লেটো বলেছিলেন, সাহিত্য 'অকাজের কাজ যত আলস্যের সহস্র সঞ্চয়'। আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে সাহিত্যের কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু কোনো চিন্তাশীল মানুষ একথা মেনে নিতে পারেন না। সাহিত্যের মাঝে মানুষ এক দিকে যেমন তার মুক্তি খুঁজেছে, তার অন্তরের আকুতিকে রূপ দিতে চেয়েছে, সমস্ত মানুষকে একই হৃদয়রাজ্যে আহ্বান করতে চেয়েছে, তেমনি অন্য দিকে সাহিত্য মানুষকে শিক্ষা দিয়েছে, মানুষকে পথ দেখিয়েছে, মানুষকে মানুষের সাথে মিলিয়েছে, মানুষের ইতিহাস রচনা করেছে।

অনেকে বলেন, সাহিত্যের উদ্দেশ্য শিক্ষা দেওয়া। আগেই বলেছি সাহিত্যিক দেখা দেন একান্ত সুহৃদরূপে, শিক্ষকরূপে নয়। সাহিত্যের আসল কাজ আনন্দদান। সাহিত্য জগতের বুকে জীবনের চিত্রকে আঁকতে চায় নিরপেক্ষ ভাবে, নৈর্ব্যক্তিক ভাবে, তন্ময় ভাবে, মন্ময় ভাবে আঁকতে চাইলেও সেই চিত্র তন্ময়রূপকেই অনুধাবন করে শেষ পর্যন্ত। এই চিত্র দেখে জগতের বুকে কি ভালো আর কি মন্দ আপনাআপনিই পাঠক বুঝতে পারে। যেমন ধরা যাক, একটি বইয়ে লেখানো হচ্ছে, একটি লোক সারা জীবন পাপ করে এসেছে, কিন্তু শেষে দেখা গেল, লোকটি কি কষ্টেই না মারা গেল, কিংবা ধরা গেল, ভালো ভাবেই, কোনো কষ্ট না পেয়েই, মারা গেল। পাঠক এই চিত্র দেখে বুঝবে যে-ক'টা দিনের জন্য জগতে লোকটা এসেছিল সে-ক'টা দিন ভালো ভাবেই তার কাটানো উচিত ছিল—মিছিমিছি লোককে ঠকালো, অত্যাচার করলো, এতে তার জীবনে কি লাভ হোল? এভাবে মানুষ সাহিত্যের মাঝে শিক্ষা পেতে পারে। এমনি ভাবে মানুষ যা শিব, অর্থাৎ যা মঙ্গলময়, যা কল্যাণকর তার দীক্ষা লাভ করে। তাই সাহিত্য পরোক্ষে মানুষকে নীতিশিক্ষাও দেয়। জগতে যা মঙ্গলময় তাই সুন্দর, তাতে মালিন্য থাকে না, তা কলুষমুক্ত। এ ভাবে মানুষ জগতের বুকে যা সুন্দর, জীবনের মাঝে যা সুন্দর তার পরিচয় লাভ করে সুন্দর জীবনযাপন করবে।

সাহিত্যে জীবনের চিত্র ফুটে ওঠে বলেই তাতে একটা বিশেষ স্থানের বা বিশেষ কালের চিত্রই ফুটে ওঠে। এ জন্যে তা ইতিহাসের একটা উপাদান রূপে পরিগণিত হয়। সাহিত্যের মাঝ দিয়ে আমরা ইতিহাসকে সজীব-রূপে প্রত্যক্ষ করি।

সাহিত্য একটা জাতির জীবনের উপরও অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করে। সমাজ-সংস্কারে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনে, মানবিক প্রেরণারূপে সাহিত্য দেখা দিয়েছে। আমাদের দেশে 'আনন্দমঠ' স্বাধীনতা আন্দোলনে যে কত বড় প্রেরণা জুগিয়েছে তা সকলের সুবিদিত, 'নীলদর্পণ' দেশ থেকে নীল সাহেবদের অত্যাচারকে চিরদিনের মত দূর করেছে। রাশিয়াতে গোর্কী-টলষ্টয় প্রমুখের সাহিত্য তাদের নতুন জীবনকে বরণ করে নেবার সাধনাতে শক্তি জুগিয়েছে, আমেরিকায় স্টো'র 'আঙ্কল্ টম্‌স্ কেবিন' দাসত্ব প্রথাকে চিরদিনের মত দূর করেছে। কিন্তু একথা ভাবলে বড়ই ভুল করা হবে যে, সাহিত্য উদ্দেশ্যসাধনের অস্ত্র, প্রচার করবার যন্ত্র। আগেই বলেছি, সাহিত্য হবে নৈর্ব্যক্তিক ও নিরপেক্ষ, তার মাঝে ফুটে উঠবে জীবনের চিত্র, তার মাঝেই একটা জাতির স্বাধীনতা পাবার আকাঙ্ক্ষা বা একটা সামাজিক কুপ্রথা বিতাড়নের বাসনা, বা ভালো-মন্দ সুনীতিদুর্নীতির চিত্র এসব দেখা দিতে পারে।

সাহিত্যের মাঝে জীবনচিত্র ফুটে ওঠে সাহিত্যিকের জীবনদর্শন অনুযায়ী। সাহিত্যিক জীবনকে দেখে একটা জীবনদর্শন লাভ করেন, সে অনুযায়ী গড়ে ওঠে তাঁর সাহিত্য-জগৎ। তাই সাহিত্যের সঙ্গে দর্শনের নিগূঢ় যোগ আছে।

সাহিত্যের উপজীব্য যেমন জীবন-অভিজ্ঞতা, তেমনি সাহিত্য পাঠ করে আমরা লাভও করি জীবন সম্বন্ধে একটা নিটোল অভিজ্ঞতা। এক কথায় বলা যেতে পারে, অভিজ্ঞতাই জীবনের মূল্য। জন্ম থেকে মৃত্যুর প্রান্তসীমা পর্যন্ত জীবনযাপন করে যখন ভাবা যাবে, এই এত বছরের জীবনে কি পেলাম? আমার চারধারে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আত্মীয়স্বজন জড়ো হয়েছে, চাকর-বাকররা আমার আদেশ পালন করতে ব্যস্ত, বন্ধুবান্ধব পরিবৃত হয়ে বেশ আড্ডা জমাই, আমার ব্যক্তিগত পাঠাগারে বইয়ের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়, ব্যাঙ্কব্যালান্স ভবিষ্যতের ভাবনাকে দূর করেছে, কিন্তু এ সব যেন আমার সত্তা থেকে বাইরে, 'আমি' নামে যে মানুষ তার কোনো লাভ নয়, "আমা"র কোনো অবিচ্ছেদ্য অংশ নয় সে সব, "আমা"র সত্তাকে তারা পুষ্ট ও ঋদ্ধ করেনি, আমার লাভ হয়েছে কেবল বাল্যজীবন

ও কৈশোর জীবনের স্মৃতি, ছাত্রজীবন ও কর্মজীবনের স্মৃতি, প্রেমের স্মৃতি, ধ্যানের স্মৃতি—এ সব স্মৃতি দিয়েছে আমার জীবনের মূল্য বাড়িয়ে—যতই ভাবি, ততই বুঝি, আমার জীবনটা কত মূল্যবান। এই অভিজ্ঞতাই তাই জীবনের একান্ত সম্পদ, মানুষের এই একান্ত সম্পদ সাহিত্যে পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে। তাই সাহিত্য পাঠ করে আমাদের জীবনের মূল্য উপলব্ধি করি।

সাহিত্য ও বিজ্ঞান মূলতঃ এক। এক আমাদের মনে। আমরা সভ্যতার প্রত্যুষ লগ্ন থেকে বহির্জগতকে জানতে চেষ্টা করেছি, বহির্জগতের কলা ও কৌশল দুইকেই; বহির্জগতের সৌন্দর্য্য ও কলাকে মনের কল্পনা দিয়ে অধিগত করে বহির্জগতের রূপকে মনে মনে ভাষার সাহায্যে নিজেদের মত গড়ে নিতে চেয়েছি—এখানেই সাহিত্য; আর বহির্জগতের কল ও কৌশলকে মন দিয়ে বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে অধিগত করে বহির্জগতের নানান্ শক্তিকে ও বস্তুকে নিজেদের মত করে হাতে করে বাইরের বস্তুনিচয়ের সাহায্যেই গড়ে নিতে চেয়েছি—এখানেই বিজ্ঞান। সাহিত্য ও বিজ্ঞানে কোনো দ্বন্দ্ব নেই; তারা পরস্পরের পরিপূরক। এক মনে এদের ঠাঁই, এক মনের অখণ্ড ক্ষমতারই দ্বিধা গতি।

৩

এবার সাহিত্য পাঠ কি ভাবে করব সে কথা বলব। কতকগুলো বিভিন্নকালের বিভিন্ন লেখকের গল্প, কবিতা দেওয়া আছে, এগুলো এমনি বিশৃঙ্খলভাবে পড়লে সাহিত্য পাঠের কোনো তাৎপর্য্যই থাকে না। তাই সাহিত্য পাঠ করতে হবে:

সাহিত্য ইতিহাসের পরম্পরায় পাঠ করতে হবে। এবং চারটি ধারায় সেই পাঠ-ধারা প্রবর্তিত হবে—

(এক) ভাষাগত পাঠ—বহিরঙ্গ পাঠ—শব্দ, বানান, টীকা, ভাষ্য।

(দুই) সাহিত্যিক পাঠ—অন্তরঙ্গ পাঠ—কবিমানসের অনুধ্যান।

(তিন) সাহিত্যিক ইতিহাস—বহিরঙ্গ পাঠ—একক ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ সাহিত্যিকের প্রকাশ, জাতি-ইতিহাসের অভিব্যক্তি, বিভিন্ন সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা।

(চার) সাহিত্যিক বিকাশ—অন্তরঙ্গ পাঠ—সাহিত্যিক রূপ সংগঠনের গোপনতত্ত্ব; সাহিত্যিক উদ্দেশ্য ও ভাবের অধিবসানের সার্থকতা।

৪

সাহিত্য পাঠের আসল উদ্দেশ্য ও লাভ হোলো রসোপলব্ধি। 'রস' কথাটি লোকমুখে লঘু হয়ে গেছে, কিন্তু এই সংজ্ঞাটি সুগভীর অর্থবহ। যেমন বিখ্যাত ইংরেজ সমালোচক ব্রাডলী বলেছেন "emotion" কথাটি ইংরেজীতে লঘু হয়ে গেছে। রসের ইংরেজী "emotion" করা হয়েছে। রস কি, তার কার্যকারিতা কেমন—এসব আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক এবং তা দুরূহ। আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যতত্ত্ববিদ্‌রা যাকে বলেছেন রসোপলব্ধি, পাশ্চাত্যের সাহিত্যতত্ত্ববিদ্‌রা তাকেই বলেছেন Aesthetic pleasure, অর্থাৎ শৈল্পিক আনন্দ। আনন্দ লাভই হোলো জীবনের পরম লাভ, এর নেই কোনো ভার, নেই কোনো ধার।

সাহিত্যিক আনন্দ দান করেন ভাষার মাধ্যমে লিখে। ভাষা হোলো সাহিত্যের মাধ্যম। ভাস্কর্যের যেমন পাথর বা ব্রোঞ্জ বা অন্য কোন ধাতু বা শিলা, চিত্রের যেমন ক্যানভাস। সাহিত্যিকের কাজ হোলো "বোধে যার চিহ্ন পড়ে ভাষায় কুড়ায়ে তারে রাখা।" সাহিত্যিক কেমন ভাবে বোধকে ভাষায় জড়িয়ে রাখেন?

বহির্জগত লেখকের মনোজগতে অনুক্রমিত হচ্ছে। লেখকের মনোজগতে বার্কের কথিত imagination বা কল্পনাবৃত্তির প্রক্রিয়ায় কিংবা কান্টের জাজমেণ্ট বৃত্তির প্রক্রিয়ায় বা ক্রোচের intuitive knowledge-এর প্রক্রিয়ায় বহির্জগতের উপলব্ধ ইন্দ্রিয় প্রত্যয়গুলি আত্মানুরঞ্জিত হয়ে মিলে-মিশে সাহিত্যিকের আনন্দবেদনামূলক অনুভবের পর্দায় এক রূপসাক্ষাৎকার ঘটায়। এই রূপ সাক্ষাৎকার—"Seeing everything with utmost vividness"—অ্যারিষ্টটলের মতে সৃষ্টির আসল ক্ষমতা। ক্রোচে এই রূপসাক্ষাৎকারকে প্রতিভান বলেছেন, আর বলেছেন—"In every true intuition there is an expression." মনোজগতের এই রূপসাক্ষাৎকারকে, এই প্রতিভানকে কবি তাঁর সৃষ্টিক্ষমতা বলে ভাষায় অনুকরণ করতে পারেন। ভাষায় এই অনুকরণ ব্যাপারটি কি ভাবে ঘটে থাকে আধুনিক সমালোচক হার্বার্ট রীড তা খুব সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন: "The process of poetry consists firstly in maintaining this vision (রূপসাক্ষাৎকার) in its integrity, and secondly in expressing this vision in words. Words are generally the analysis of a mental state. But in the process of poetic composi-

tion words rise into the conscious mind as isolated objective 'things' with a definite equivalence in the poet's state of mental intensity." এমনি ভাবে সাহিত্যিক সৃষ্টিটি "হয়ে উঠে।"

এই যে সাহিত্য সৃষ্টি হোলো তাকে বলে রূপ। রূপের মাঝে রস আছে, কিন্তু কোথায় আছে তা কেউ বলতে পারবে না, যেমন কেউ বলতে পারবে না দেহের মাঝে কোথায় আত্মা আছে, আছে কোথায় চেতনার বীজটি, তবু দেহকে সুন্দর ভাবে গড়ে তুলবার জন্যে যেমন দরকার ব্যায়ামের, তেমনি ভাষাকে ভাবপ্রকাশের সুন্দর বাহন করে তুলবার জন্যে চাই ভাষাচর্চা। ভাষার দেউড়ি পেরিয়েই রসের মহলে গিয়ে পৌঁছতে হবে। দেহের মাঝে আত্মা আছে তার প্রমাণ কি? তার প্রমাণ হোলো একটা ঐক্য ও সুষমা। মৃত্যুর পর দেহের সে ঐক্যশক্তি থাকে না, তাই দেখা দেয় বিকৃতি; থাকে না সুষমা, তাই দূর হয় শরীরের লাবণ্য। তেমনি সাহিত্যের মাঝে যে রস আছে তার প্রমাণ একটা ঐক্য, একটা সুষমা আছে তাতে; এবং সেই ঐক্যময় সুষমামণ্ডিত ভাষা-দেহের অনুধ্যান করেই রসোপলব্ধি করি আমরা। তাই বল ছিলাম রূপের মাঝেই রস লুকিয়ে আছে। সেই রসের সন্ধান পেতে হলে রূপকে পেরিয়ে যেতে হবে। কেমন ভাবে রূপকে অতিক্রম করব? শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "রূপের মধ্যে তিনটে জিনিস। একটি তার আকার-প্রকার। একটি তার অন্তর্নিহিত ভাব। আর এই দুই জড়িয়ে যে মাধুর্য্য ফুটল সেটি।" তাই সাহিত্য-শিক্ষক সাহিত্য রসের সন্ধান দেবেন সাহিত্য-রূপ চর্চার মাধ্যমে—এবং তিন ভাবে—(এক) সাহিত্য রূপের আকার-প্রকার বিশ্লেষণ করে। (দুই) তার অন্তর্নিহিত ভাবটি বুঝিয়ে। (তিন) তার মাধুরীর আস্বাদের বিবরণ দিয়ে বা ইঙ্গিত দিয়ে। এই যে মাধুরী, এই যে লাবণ্য, এই হোলো রসের বাহ্য ইঙ্গিত। এই ইঙ্গিতটি সাহিত্য রূপটির মাঝ দিয়ে উঁকি মারছে, একে ধরেই রসলোকে অনুপ্রবেশ করতে হবে। এই ইঙ্গিতটি সাহিত্যিক যেমন সাহিত্য রূপে ভাষার দেহলীতে ফুটিয়ে তুলবেন, তেমনি এই ইঙ্গিতটি ধরাই সাহিত্য পাঠকের কাজ। এই ইঙ্গিত ধরতে পারার ক্ষমতা পাঠকের মাঝে জোগানোর জন্যে সাহিত্য শিক্ষণ॥

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

যখনি করেছ গান—
'সুন্দর দিয়েছে মোর জীবনের শান্ত সমাধান;
দ্বন্দ্ব ছিল ক্ষণে ও শাশ্বতে—
মহিমায় প্রতিস্পর্ধী অণুতে বৃহতে,
শ্যামশাখে ছোট নীড়ে—আকাশের যদৃচ্ছ বিস্তারে,
ঝিকিমিকি হাসি-কান্না—দিগন্তের কম্পিত ঝঙ্কারে;
সুন্দর দিয়েছে ছোঁওয়া—অনন্তের নামিল আভাস—
ক্ষণে এল নিত্যকাল, নীড়ে এল নিঃসীম আকাশ।'
মুক্ত হ'ল ভ্রূণ হতে বিষলিপ্ত শাণিত সংশয়—
বীভৎসের প্রেতলীলা—জীবনের সে কি সত্য নয়?

যখনি করেছ গান—
'প্রেম দিল জীবনের মান;
যত পাওয়া—যত বা না পাওয়া—
পশ্চাতের ব্যর্থ স্মৃতি—সম্মুখের উৎকণ্ঠিত চাওয়া—
ঘর্মক্লিন্ন জীবন-জঞ্জাল—
ঈর্ষ্যাদীন শ্রান্ত আঁখি—মদোদ্ধত অভ্রভেদী ভাল—
পূর্ণ হ'ল পূত হ'ল—দীপ্ত হ'ল প্রেমস্পর্শ লেগে,
ইতিহাস-গুহা-সুপ্ত ভাস্বর মানুষ ওঠে জেগে।'
দিকে দিকে ক্ষুব্ধ হ'ল যজ্ঞভাগ-বঞ্চিত ধূর্জটি,
লাঞ্ছনা-লাঞ্ছিত-শির—গলে সর্প—ক্ষুধাশীর্ণ কটি—
রুধিরাক্ত কর হতে বর্ষে তারা শাণিত সংশয়—
এত হিংসা—অত্যাচার—হানাহানি—একি সত্য নয়

সায়াহ্ন আকাশ তাই ক্ষণে ক্ষণে ভাবনাবিধুর,
অগ্নিগর্ভ মেঘে মেঘে বিপ্রতীপ ফুঁসিছে বেসুর;
তারি মাঝে ডাক দিয়ে শুনায়েছ বাণী—
'জানি এর সবি জানি—মানি এর সবি সত্য মানি;
তবু জানি, অতিক্রমি' আবর্তন-পুঞ্জিত কলুষ
দেশে দেশে কালে কালে জাগে ঐ শাশ্বত মানুষ!
যত ভয় শঙ্কা হোক জড়—
মানুষ যে আরও সত্য—মানুষ যে আরও আরও বড়।'

সবার উপরে

শ্রীসীতা দেবী

৭

ছ'-সাতটা দিন কেটে গেছে। বাড়ীটার এখনও যেন সম্পূর্ণ মূর্চ্ছাভঙ্গ হয় নি, তবে অল্পস্বল্প প্রাণের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। বেঁচে যে আছে তাকে খেতে হয়, শুতে হয়। যার যা কাজ তা কিছু কিছু করতেই হয়, হৃদয়ে যত বড় আঘাতই লাগুক না কেন। শোক যাঁর হাত থেকে আসে, অদৃশ্য হাতে তিনি সান্ত্বনার প্রলেপও ধীরে ধীরে দিতে থাকেন। জীবন ও মৃত্যুর তফাৎ তাঁর কাছে ত খুব নেই, কাজেই পৃথিবীর মূর্ত্তি কিছু বদলায় না। আকাশ তেমনি সুনীল থাকে, মধুর বাতাস বয়, ফুল ফোটে, পাখী গান গায়। শোকার্ত্ত মানুষ প্রথমে চোখ-কানকে এই রূপরসগন্ধময়ী ধরিত্রীর দিক্ থেকে ফিরিয়ে নিতে চায়, কিন্তু খুব বেশীদিন পারে না।

নির্ম্মলের নাম আহতদের মধ্যে পাওয়া যায় নি। জিতেন ও নির্ম্মলের এক ভাই ঘটনাস্থলে পরদিনই গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। হতদের মধ্যেও তাকে পাওয়া যায় নি। সত্তর-আশী জন নিখোঁজ হয়ে গেছে, নদীগর্ভ থেকে তাদের উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি রাতের অন্ধকারে। দুদিন সেখানে থেকে জিতেনরা ফিরে এসেছে।

গৌরাঙ্গিনী সেই যে শয্যা নিয়েছেন, আর উঠতেই চান না। এত যে সাধের সাজান সংসার, সে দিকেও চোখ দিতে চান না। হঠাৎ যেন আগুনের ঝড় বয়ে গেছে তার সাধের বাগানের উপর দিয়ে। বাড়ী থেকে এখনও সুমনার বিয়ের চিহ্ন মিলিয়ে যায় নি, এরি মধ্যে এই অবস্থা। রাসবিহারী পুরুষমানুষ, কাজের মানুষ, আরো বেশী করে তিনি কাজের মধ্যেই ডুব দিয়েছেন। অন্য ছেলেমেয়েরা সকলেই সুমনার দুঃখে আন্তরিক দুঃখিত, কিন্তু আঘাতটা তাদের নিজেদের অন্তরতম স্থানে খুব বেশী করে বাজে নি, কাজেই প্রতিদিনই একটু একটু করে তারা তাদের চিরাভ্যস্ত স্বাভাবিক জীবনের মধ্যে ফিরে যাচ্ছে। এক হপ্তা পরেই ছোটরা নিজের নিজের স্কুলে-কলেজে যেতে সুরু করল। চাকরী যারা করত তারা এরও আগেই ফিরে গিয়েছে।

সুমনা এখনও কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে আছে। মা, মাসী, কাকীর কান্না ও আক্ষেপের মধ্যে সে সারা দিন-রাত শুনছে যে, তার চিরকালের মত সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে, তার বেঁচে থাকা এখন শুধু যন্ত্রণাভোগ করার জন্যে। বিধবার জীবন মানুষের জীবনই নয়। বাপ-মা মরে গেলে হতভাগী কোথায় ভেসে যাবে, কার ঘরে দাসী হয়ে থাকবে। টাকাকড়িও যদি তাকে দিয়ে যাওয়া যায়, তাহলেও কি সে তা রাখতে পারবে? অথচ সুমনা নিজের মনের মধ্যে এমন কোনো সর্ব্বনাশকে অনুভব করছে না। সে যা ছিল তাইই যেন সে আছে বলে তার মনে হয়। নির্ম্মল ক'দিনের জন্যই বা তার জীবনে এসেছিল? কি সম্পদই বা সে সুমনাকে দিয়েছিল? বিয়ের আগে সুমনা যা ছিল, দেহে মনে তাইই আছে। অবশ্য সাংসারিক দিক দিয়ে তার কপাল যে খুবই মন্দ হয়ে গেল, সেটা সে বুঝতে পারে। দুর্ভাগ্য তাকে চিহ্নিত করে গেল নিজের প্রজা বলে। সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যে আর তার হওয়ার সম্ভাবনা নেই, এটা সে খুবই বোঝে। কিন্তু মানুষ হিসাবে তার দাম এত কমে যাবে কেন? সে ত পাপ করেনি বা অপরাধ করেনি? কেন লোকে তাকে অপয়া ভাববে? মানুষ হয়ে জন্মানর যা দায়িত্ব সে তা কেন নিতে পারবে না?

একটা পরিবর্ত্তন সুমনার হয়েছিল, যদিও সেটা সে খুব সচেতনভাবে বুঝছিল না। তার বালিকা-জীবন খসে পড়ছিল, সুরু হচ্ছিল তার নারীজীবন।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। দু'একটা ঘরে আলোও জ্বলেছে। এমন সময় কে একজন আত্মীয়া দেখা করতে এলেন গৌরাঙ্গিনীর সঙ্গে। আবার বাড়ীতে কান্নাকাটি বেধে গেল। সুমনা বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল, সে ছুটে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ঢুকে গেল।

রাসবিহারী এই সময় বৈঠকখানা থেকে ভিতরের বাড়ীতে আসছিলেন। ইতিপূর্ব্বে মহিলাদের কান্নাকাটির শব্দ কানে এলে তাঁরও চোখ সজল হয়ে উঠত, কিন্তু আজ কেমন যেন একটু বিরক্ত হয়ে গেলেন। খাবার-ঘরের ভিতর ঢুকে স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন, "ক্রমাগত কান্নাকাটি করে তুমি এর পর নিজেও মরবে, মেয়েটাকেও মারবে। এরপর ত চুপ করলে হয়।"

গৌরাঙ্গিনী বললেন, "কি করে চুপ করব? ঐ মেয়ের

মুখ দেখলে যে আমার গলায় দড়ি দিয়ে মরতে ইচ্ছে করে।"

রাসবিহারী বললেন, "তাকেও কি গলায় দড়ি দিতে বল? এইরকম করলে সে টিঁকবে কি করে? ছেলে-মানুষের প্রাণ ত?"

যে বুদ্ধিমতী আত্মীয়াটি বেড়াতে এসেছিলেন, তিনি চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললেন, "ওর আর বেঁচে থেকে কোন্ সুখ হবে?"

রাসবিহারী বললেন, "সুখ হওয়া না হওয়া বড় কথা নয়। ওকে মানুষের মত হয়ে বাঁচতে হবে, মানুষের কাজ করতে হবে। পৃথিবীর আর কোনো দেশে কি মেয়ে বিধবা হয় না? তাদের কি তখনই মেরে ফেলা হয়? তাদের সঙ্গে কি এইরকম ব্যবহার করা হয়?"

স্বামীর রাগ দেখে গৌরাঙ্গিণী তখনকার মত থেমে গেলেন। আগন্তুক মহিলাটি ভাবলেন, "কি মেলেচ্ছ মানুষ, মা গো মা! মুসলমান কি খিষ্টান হলেই পারত, হিন্দুর ঘরে জন্মাল কেন? মেয়েটা যে জন্মের মত গেল, তা যেন বুঝতেই পারে না।"

পরদিনই রাসবিহারী চা-খাবার পর সুমনার ঘরে গিয়ে বললেন, "শোন ত মা মনু, তোমার শরীর কি এখনও বেশী দুর্ব্বল আছে?"

সুমনা বলল, "না বাবা, খুব দুর্ব্বল ত বোধ হয় না?"

"তা হলে তুমি পড়াশুনোটা আবার সুরু কর, গ্রীষ্মের ছুটির পর আমি আবার তোমাকে স্কুলে ভর্ত্তি করে দেব। একটা বছর পিছিয়ে গেলো, তার আর কি হবে, অমন কত লোকের হয়।"

সুমনার মুখে এই প্রথম একটা খুসির আভাস দেখা দিল। সে বলল, "হ্যাঁ বাবা তাই করব। তুমি আমাকে কিছুদিনের জন্যে বোর্ডিং-এ দিয়ে দাও না? বাড়ীতে এত গণ্ডগোল যে, পড়াশুনো মোটে ভাল করে করা যায় না।

রাসবিহারী বললেন, "তার দরকার নেই ক্রমে গোলমাল কমে যাবে। এখনই কমতে আরম্ভ করেছে। আমার ত অনেক ছুটি পাওনা হয়েছে, ভাবছি মাস-খানেকের ছুটি নিয়ে তোমাকে আর তোমার মাকে নিয়ে একটু ঘুরতে বেরব। তাঁর অনেক দিনের ইচ্ছে তীর্থে যাবার, তা তীর্থ করাও হবে তাঁর, আর আমাদের বেড়ানও হবে।"

সুমনা সম্পূর্ণ সম্মতি দিয়ে বলল, "হ্যাঁ বাবা, তাই কর।"

গৌরাঙ্গিণীর কাছে প্রস্তাবটা মন্দ লাগল না। এখন ধর্ম্মকর্ম্মের দিকে মেয়ের মন ঘুরে যায় ত ভাল। স্বামী অবশ্য যেভাবে তার দুর্গতিটাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছেন সেটার তিনি অনুমোদন করলেন না। তাকে যেন আবার কুমারী মেয়ের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান, সেইভাবে মানুষ করতে চান। সে কি কখনও সম্ভব? মেয়েমানুষের বিবাহিত জীবন, স্ত্রী ও মায়ের জীবন ছাড়া আর কি কিছু হতে পারে? এ ছাড়া তার সুখ আর সার্থকতা কোথায়?

গৌরাঙ্গিনী সাধারণ বাঙালী হিন্দু গৃহস্থের সংসার ছাড়া আর কিছু জানতেন না। পড়াশুনাও তাঁর ছিল নামমাত্র, বিশাল বিশ্বজগতের কিছু বুঝতেনও না। মেয়ে যে নিদারুণ কান্নাকাটি করল না, একেবারে ভেঙে পড়ল না, এটা কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগছিল তাঁর কাছে। সে যে আবার স্কুলে কলেজে পড়তে যাবে, এটাও তিনি মনে মনে অনুমোদন করছিলেন না। কিন্তু এ বিষয়ে রাসবিহারী যে আর তাঁর কোনো কথা শুনবেন না তা তিনি জানতেন। অত সাত তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ে রাসবিহারী দিতে চান নি, গৌরাঙ্গিনীর জেদেই হয়েছিল। বিয়ের এই পরিণাম অবশ্য গৌরাঙ্গিনীর কোনো দোষে হয় নি, তবু তিনি একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। সম্প্রতির মত সুমনার সব ব্যবস্থা করা তিনি স্বামীর হাতেই ছেড়ে দিয়েছিলেন।

যা হোক্, এখন কিছুদিন কলকাতার থেকে বেরিয়ে গেলে ভালই হবে। ধর্ম্মকর্ম্ম করাও হবে প্রাণটাও একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। নিরন্তর শোকের আবহাওয়া তাঁরও যেন গলা টিপে মারছিল, যদিও তিনি সেটা নিজের কাছেও স্বীকার করতেন না। শোক করাই ত স্বাভাবিক, না করলে প্রমাণ হয় যে মানুষের প্রাণ নেই এই সব লোকদের মধ্যে।

দেশ ভ্রমণ সেরে এসে তবে সুমনা আবার স্কুলে ভর্ত্তি হবে, এই স্থির হ'ল। বাইরে বেরবার জোগাড়-জাগাড় হ'তে লাগল। এ যাত্রা প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন আর কাশীই দেখা হবে। গয়া যেতে রাসবিহারী রাজী হলেন না। সেখানে মহামারী চলেছে। তার বদলে আগ্রা দেখে আসা যাবে।

সুমনা এতদিন বাড়ীর ভিতরেই ছিল কোথাও যেত না। এখন বাইরে যেতে হলে তার সাজ-পোশাক কি রকম হবে সে প্রশ্ন উঠল। স্বামীর দেহ পাওয়া যায় নি, সৎকার শ্রাদ্ধও হয় নি, কাজেই তাকে বিধবার বেশ

পরান যায় না। অথচ মনে মনে কারো সন্দেহ ছিল না যে সে বিধবা হয়েছে। যা হোক লোকাচার যা এক্ষেত্রে তাই করা হ'ল। সুমনার হাতে বালা রইল, গলায় এক ছড়া সরু হারও রইল। পাড় দেওয়া শাড়ীই সে পরল। তবে রঙীন শাড়ীগুলো আর পরল না। আগের মতই সে বিনুনী করে খোঁপা বাঁধল।

গৌরাঙ্গিনী বড় মানুষের স্ত্রী বলে খুব গর্ব্ব অনুভব করতেন। নিজের বয়স আর পদমর্য্যাদার সঙ্গে মানিয়ে সাজসজ্জায় তাঁর কোনো অরুচি ছিল না। খুব চওড়া পাড়ের শাড়ী পরতেন, চওড়া করে সিঁদুর পরতেন, গায়ে ভারি ভারি গহনা ছিল। কিন্তু মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে এ সবে আর কোনো রুচি রইল না তাঁর। সধবা মানুষ, সব ছাড়তে পারলেন না, যতটা পারলেন ছেড়েই দিলেন।

বেশীর ভাগ জায়গায় তাঁরা ধর্ম্মশালায় উঠবেন ঠিক হ'ল। পাণ্ডাকে লিখে দেওয়া হ'ল, যতটা সম্ভব ভাল ব্যবস্থা করতে। একটা ঝি নেওয়া হ'ল সঙ্গে, সে কায়েতের মেয়ে, দরকার হলে রান্নাবান্না সবই করবে। প্রথম ঠিক ছিল সুমনা আর তার মা বাবা এই তিনজন যাবে। কিন্তু শেষের দিকে গৌরাঙ্গিনীর সব ছোট মেয়ে চামেলী মহা কান্নাকাটি জুড়ে দিল, সেও মায়ের সঙ্গে যাবে। তার মাত্র আট বছর বয়স, এখনও মাকে তার একান্ত প্রয়োজন, তাঁকে ছেড়ে সে থাকতে পারে না। গৌরাঙ্গিনীও মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন, মা ছেড়ে কি করে চামেলীর চলবে তাই ভেবে। এখন তার কান্না দেখে আর দ্বিধা না করে তাকে সঙ্গেই নিয়ে চললেন।

যাওয়ার দিনক্ষণ স্থির হয়ে গেল। চেষ্টা-চরিত্র করে হাট একটা কম্পার্টমেণ্ট রিজার্ভ পাওয়া গেল। বাড়ী থেকে বেরিয়ে গৌরাঙ্গিনীর মনে হ'ল যেন একটা পাষাণ-ভার তাঁর বুক থেকে নেমে গেল। সুমনার যদি ভয় না থাকত যে মা তাকে বকবেন, তা হলে সে খানিকটা বক্ বক্ করত, বাবাকে অনেক কথা জিগগেস করত। যা হোক, চামেলী এবং রাধা ঝিয়ের সঙ্গে গল্প করতে করতে তারা চলল।

হাওড়া ষ্টেশনে সর্ব্বদাই দারুণ ভিড়। কোনো মতে দাদার হাত ধরে চামেলী আর সুমনা ট্রেনে উঠে পড়ল। জিতেন এসেছিল তাদের তুলে দিতে। গৌরাঙ্গিনী গাড়ীতে উঠেই জিনিসপত্র উঠল কিনা তার খোঁজ নিতে লাগলেন এবং ঠিকমত সাজিয়ে রাখতে লাগলেন। পরলোকের পাথেয় সঞ্চয়ের দিকে তাঁর যতই মন থাক, ইহকালের সম্বল এই পোঁটলা-পুঁটলীগুলির একটিও খোয়াতে তিনি রাজী নন।

গাড়ী ছেড়ে দিল। যতক্ষণ পারলেন গৌরাঙ্গিনী মুখ বার করে জিতেনকে উপদেশ দিলেন, তাঁর অনুপস্থিতির সময় সবাই কি ভাবে চলবে সেই বিষয়ে। তিনি হাজির না থাকলে ঘরকন্নার কাজ যে ভালভাবে চলতে পারে এ তিনি বিশ্বাসই করতেন না। ছোট বৌয়ের বুদ্ধিশুদ্ধি কম, গিন্নী হবার মত ভারিক্কি স্বভাবও নয়, হাসি মস্করা করতেই ব্যস্ত। আর গীতা ত একেবারে ছেলেমানুষ, সংসার কি কোনো দিন করেছে যে সংসার চালাতে জানবে?

ট্রেন ত চলল। যতক্ষণ চারিদিক্ দেখা গেল, সুমনা বসে বসে দেখল। চামেলী একটা সুবিধামত বিছানা আবিষ্কার করে শুয়ে পড়ল এবং গাড়ীর দোলানীতে ঘুমিয়ে পড়ল অবিলম্বে। গৌরাঙ্গিনী রাধার সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন এবং রাসবিহারী বই পড়ায় মন দিলেন। যখন বাইরের সব কিছু আঁধারের স্রোতে ডুবে গেল, তখন সুমনারও আর না ঘুমিয়ে উপায় রইল না।

সকালে তারা এসে পড়ল উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের মধ্যে। বিস্ময়ে আর আনন্দে চামেলীর চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল। সে তার ক্ষুদ্র জীবনে বাংলা দেশের বাইরে যায় নি কখনও, তার কাছে সবই নূতন। সুমনা দু'চারবার বেরিয়েছে, পাহাড়ে গিয়েছে দু'একবার, কিন্তু এদিকে কখনও আসেনি। সবাই মুগ্ধ বিস্ময়ে চারিদিক্ দেখতে লাগল।

ট্রেন মোগলসরাই ছাড়িয়ে চলতে লাগল। ষ্টেশনে কত রকম যে জিনিস বিক্রী হচ্ছিল তার ঠিক নেই। মাটির জিনিস, পিতলের জিনিস। গৌরাঙ্গিনীর একবার ইচ্ছা হ'ল কিছু কেনাকাটা করেন। কিন্তু তাঁদের ত এখন আনন্দ করবার দিন নয়, কাজেই কিছু আর কিনলেন না। ট্রেন গঙ্গার সেতুর উপর দিয়ে চলল, দেখা গেল কাশীর ঘাটগুলির দৃশ্য, বিশ্বনাথের মন্দিরের, অন্নপূর্ণার মন্দিরের চূড়া, বেণীমাধবের ধ্বজা। গৌরাঙ্গিনী আর রাধা উদ্দেশে প্রণাম জানালেন।

এঁরা প্রথম এলাহাবাদেই নামবেন। সেখানে তাঁদের বহু পুরানো পাণ্ডার আড্ডা। সে থাকার খুব ভাল ঘর দেবে। তারই সাহায্যে তারা উত্তর প্রদেশের অন্য জায়গাগুলি দেখবেন, আবার এলাহাবাদে ফিরে আসবেন। এখানটাই হবে তাদের কেন্দ্রীয় আস্তানা।

বেলা দুপুর হবার আগেই তাঁরা গন্তব্যস্থানে এসে পৌঁছলেন। তাঁদের আর কাউকে খুঁজতে হ'ল না

"সাড়ে আট ভাই" পাণ্ডার দল গাড়ী খুঁজে ঠিক এসে হাজির হ'ল। তার পর নিজেরা নামা, জিনিসপত্র নামান, গাড়ী ডাকা, মুটে ডাকা চলল কিছুক্ষণ। দুখানা ঘোড়ার গাড়ীর উপরে জিনিস চাপিয়ে তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন।

মিনিট কুড়ি-পঁচিশ লাগল তাদের ধর্মশালায় পৌঁছতে। বেশ ভাল ঘর পাওয়া গেল ছাদের উপর। ব্যবস্থা ভালই, রান্নাঘর স্নানের ঘর উপরেই। একটু-আধটু সাবেকিয়ানা সহ্য করতে হ'ল, সব ব্যবস্থা একেবারে আধুনিক নয়। তা নূতন জায়গায় আসার আনন্দে সেটা তারা গ্রাহ্যই করল না। সকলেই খানিকটা ক্লান্ত ছিল, কাজেই সংক্ষেপে নাওয়া খাওয়া সেরে খুব খানিকটা ঘুমিয়ে নিল।

গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে স্নান করতে যেতে হবে সকালে। কাজেই দিনের আলোর যেটুকু বাকি ছিল, সেটা তারা এক্কা চড়ে শহর দেখে বেড়াল। এক্কা চড়া এক মহা মজার ব্যাপার, গৌরাঙ্গিনী ত পড়ে যাবার ভয়ে অস্থির কোন রকমে দুতিন জনে ধরে তাঁকে তুলে দেওয়া হ'ল। শহরের ভিতর দেখবার তেমন কিছু নেই, বরং প্রথম দৃষ্টিতে বড়ই নোংরা লাগে। কিন্তু এই অতি পুরাতন শহরটি সুমনার চোখে ভালই লাগল। সে যেন ইতিহাসের কোন পুরনো যুগে চলে গেছে। এখানে পুরাণের গল্প, প্রাচীন ইতিহাসের গল্প যেন ইচ্ছা করলেই হঠাৎ মূর্ত্তি ধরে দাঁড়াতে পারে। রাস্তাঘাটে আলো আছে বটে কিন্তু বেশী উজ্জ্বল নয়, শোনা গেল যে, শুক্লপক্ষে কয়েকটা দিন এখানে রাস্তায় আলোই দেওয়া হয় না।

ফিরে এসে আবার খেয়েদেয়ে ঘুম। আর কিইই বা করবার আছে? রাধা আর সুমনার মায়ের তবু খানিকটা গৃহকর্ম্ম ছিল অন্যদের কিছুই নেই।

ভোর বেলা সকলে উঠে পড়লেন। আজ সর্ব্বাগ্রে সঙ্গমে স্নান করে আসতে হবে, তার পর বাড়ী এসে খাওয়া দাওয়া। একমাত্র চামেলী খেয়ে দেয়ে বেরল, কারণ সে ছেলে মানুষ।

যমুনার নীল জলের ধারা আর গঙ্গার শ্বেতাভ জল-রাশি এক জায়গায় এসে মিশেছে। সুমনার দেখতে বড় ভাল লাগল। তবে স্নানের ঘাটে বড় ভিড়, জায়গাটা মোটে পরিষ্কারও নয়। পাণ্ডার উৎপাতও বড় বেশী। তবে তাদের সঙ্গে পাণ্ডার লোক ছিল, বেশী ভুগতে হ'ল না। কত অল্প খরচে পুণ্যলাভ করা যায়, গৌরাঙ্গিনী সেটা দর দাম করে ঠিক করে ফেললেন। কর্ত্তা, গিন্নী আর রাধা পাণ্ডার সাহায্যে ঘাটের গোড়াতেই এক একটা ডুব দিয়ে নিলেন। বড় বড় শুশুক জলে ডুব দিচ্ছে আর উঠছে দেখে মেয়ে দুজনও কিছুতেই জলে নামবে না। শেষে একটা নৌকা ভাড়া করে তাঁরা এগিয়ে চললেন, এবং নৌকার পাটাতনের উপর বসে ঘটি ঘটি জল ঢেলে দুই মেয়ের তীর্থ করার ব্যবস্থা হয়ে গেল। দু ধারে শাড়ী টান করে ধরে একটা জায়গা করা হ'ল, তার ভিতর মহিলারা কাপড় বদলে নিলেন। তার পর নৌকা যমুনা নদী ধরে চলতে লাগল। কি সুন্দর দৃশ্য চারদিকের। যমুনার উদার নীল প্রসার, পরপারে ছায়াছবির মত তরুশ্রেণী, পল্লীগ্রাম, ঝুঁশীর দেবালয়। সারে সারে নৌকা চলেছে, কত দেশের কত যাত্রী চলেছে। তাদের কত রকম পোশাক, কত ভাষায় তারা কথা বলছে। রঙীন চুনারী শাড়ী পরা, টিপ, কাজল, সিঁদুরে সুশোভিতা হিন্দুস্থানী মেয়েগুলিকে বড় ভাল লাগল সুমনার। নদীর ধারেই আকবরের লাল পাথরের বিরাট দুর্গ, এর কত কথা তারা ইতিহাসের বইয়ে পড়েছে। তিনি আজ নেই, তাঁর কীর্ত্তিই পড়ে রয়েছে।

নৌকা করে ফিরে যাবার পথে ছোট একটি আধভাঙা মন্দির দেখা গেল। নদীর উঁচু পাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এখানে ইচ্ছে করলে নামা যায়, কত লোক নামছে। সিঁড়ি নেই, কিন্তু পায়ে হাঁটা ঢালু পথ রয়েছে, নদীর ধার থেকে মন্দিরের উপরের বড় রাস্তা অবধি। বিপুল একটি অশ্বত্থ গাছ যেন মন্দিরটির উপর ছাতা ধরে দাঁড়িয়েছে, তার বিশাল ডালপালা মেলে।

মাঝি ও পাণ্ডা মন্দির দেখিয়ে বলল, "মা প্রণাম করে আসুন, মনস্কামনেশ্বরের মন্দির।"

সকলে নামলেন। ছোটরা তড়তড় করে উঠে গেল। কর্ত্তা আর গৃহিণী হাঁফাতে হাঁফাতে উঠলেন। প্রণাম করা হল পয়সাও দেওয়া হল। গৌরাঙ্গিনী অনেকক্ষণ ধরে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করলেন, কি প্রার্থনা করলেন, তিনিই জানেন। সুমনা প্রণাম করে মনে মনে বলল, "ঠাকুর আমি যেন মানুষ হতে পারি, যেন হেরে না যাই।"

পাণ্ডারা "অক্ষয় বট" দেখাবার জন্যে আবার ত্রিবেণী সঙ্গমের দিকে যেতে চাইল। কিন্তু বেলা অনেক হয়ে গেছে, রোদে গরমে কষ্ট হচ্ছে। রাসবিহারী বললেন, "আজ থাক। আমরা ত এখানে ঘুরে ফিরে আসব, সব জড়িয়ে অনেক দিনই থাকব। আর একদিন এসে দেখা যাবে।" গাড়ী জোগাড করে তাঁরা বাড়ী ফিরে চললেন।

বিকেলে "খসরু বাগ" দেখতে যাওয়া হ'ল। জাহাঙ্গীরের হিন্দু মহিষীর পুত্র, খসরুর সমাধি এটা।

তাঁর পরিবারের অনেকেই এখানে সমাহিত। সুমনার ভারি ভাল লাগল এই শান্ত স্তব্ধ জায়গাটি। কেমন যেন করুণ উদাস গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ। কত শতাব্দী চলে গেছে এদের তিরোধানের পর, কিন্তু এখনও যেন তাঁদের ছায়া এখানে ঘুরছে। অনেকটা অংশ সরকারী কাজে লাগিয়ে অপরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে বলে সুমনার মনটা বিরূপ হয়ে গেল। সমস্ত জায়গাটা যদি সুন্দর বাগান করে রাখা হ'ত, তা হলে কত ভাল হত।

যেটুকু সময় বাকি ছিল, তারা ঘুরে ঘুরে "কোম্পানীর বাগান, "মেয়ো হল," "মহুইর সেণ্ট্রাল কলেজ" প্রভৃতি দেখতে লাগল। গৌরাঙ্গিনীর এ সব ভাল লাগে না, কিন্তু একলা একলা ঘরে বসে কিই বা করবেন? রাধাকে রেখে আসা হয়েছে রাত্রির রান্না করবার জন্যে, সেই বা একলা কি করছে, কে জানে?

চামেলীর পা আর চলছে না, কাজেই অতঃপর ফিরে যেতে হ'ল। দেখা গেল রাধা ঠিকই আছে, কিছু অঘটন ঘটে নি। খিল দিয়ে ঘরে বসেও নেই, দিব্যি গল্প করছে একটি বুড়ো পাণ্ডার সঙ্গে। রান্নাবান্না তার অনেকক্ষণই হয়ে গেছে। ধর্ম্মশালায় ত আর মাছ মাংস খাওয়া চলে না কাজেই ডাল তরকারি চাটনীর উপরেই নির্ভর করতে হচ্ছে। চামেলী আর সুমনা খেয়ে দেয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুরে ঘুরে তারা বড় ক্লান্ত হয়েছে।

পরদিন তাঁরা দু'দিনের জন্য কাশী চললেন। জিনিস-পত্র বেশীর ভাগ এখানেই রেখে যাওয়া হ'ল। সামান্য কাপড়-চোপড় নিয়ে তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন। অল্পক্ষণের পথ, বেশী ক্লান্ত হতে হ'ল না।

কাশী এসে রাসবিহারী বললেন, "বাবা, এখানে এক মাস থাকলেও ত সব দেখা হবে না, দু'দিনে আমরা কিই বা দেখতে পারব?"

গৌরাঙ্গিনী, "বাবা বিশ্বেশ্বরকে ত প্রণাম করি আগে, তার পর আর কি দেখি না দেখি সে পরে বোঝা যাবে।"

এত মানুষের ভিড়, এত অপরিচ্ছন্নতা চারিদিকে, সুমনার বেশী ভাল লাগছিল না। তবে গঙ্গার ধারটা মন্দ নয়, যদিও ভিড়ের অভাব নেই সেখানেও। ভয় পাবার মত দৃশ্যও আছে। জোর করে সেদিক্ থেকে সুমনা চোখ ফিরিয়ে নিল। অন্নপূর্ণার মন্দিরটি দেখতে বেশ লাগল।

সব চেয়ে ভাল লাগল তার সারনাথ বেড়াতে গিয়ে। কি শান্ত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ পরিবেশ। ধর্ম্মাচরণ করবার মত জায়গা বটে! হিন্দু তীর্থস্থানগুলি ত মেলার জায়গা বলে মনে হয়। ভগবান্ কি এই উৎকট গোলমাল আর নোংরামি পছন্দ করেন? সুমনা মনে মনে ভাবত এই সব কিন্তু কাউকে ত বলবার জো ছিল না? এক চামেলীকে বলা যেত, কিন্তু সে কিই বা বুঝবে?

কাশী থেকে ফিরে এসে আবার তাঁরা দিন দুই-তিন এলাহাবাদে থেকে গেলেন। জিনিসপত্র সব ঠিকই আছে, কিছুই খোওয়া যায় নি। পাণ্ডাদের উপর খুব শ্রদ্ধা এসে গেল গৌরাঙ্গিনীর মনে। সব মানুষই সুবিধা পেলে চুরি করে তাঁর ধারণা ছিল, কেউ সুবিধা পেয়েও চুরি করছে না দেখে তিনি একটু অবাক্ই হয়ে গেলেন।

এর পর মথুরা, বৃন্দাবন আর আগ্রা, সেখান থেকে এসে তের-চৌদ্দ দিন এলাহাবাদে বাস, তার পর কলকাতায় ফিরে যাওয়া। আগ্রাটাই আগে দেখতে চললেন তাঁরা। সুমনারই সব চেয়ে আগ্রহ বেশী। এখানেও জানাশোনা এক হোটেলওয়ালার সঙ্গে ব্যবস্থা করে দিয়েছিল এলাহাবাদের পাণ্ডা। হোটেলটা খুব বেশী পছন্দ তাঁদের হ'ল না, তবে খেতে দেয় প্রচুর, এইটাই গৌরাঙ্গিনীর ভাল লাগল। রান্নাবান্না ভাল নয়। অসুবিধা ঢের! যাই হোক স্নানাহার সেরে তাঁরা তাজমহল দেখতে চললেন।

এই সেই, "এক বিন্দু নয়নের জল, কালের কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল।" সুমনা মন্ত্র মুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে রইল। নিশ্বাস ফেলতে শুদ্ধ তার যেন ইচ্ছা করছিল না। এ শুধু চোখ দিয়ে দেখলে হয় না, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে, নিজের সম্পূর্ণ সত্তা দিয়ে যেন দেখতে হয়। ভগবানের আরাধনার জন্যে যে সব মন্দির তৈরী হয়, তা কেন এমন সুন্দর হয় না? সুমনার মনে হ'ল এ যেন সম্রাট শাজাহানের প্রার্থনা তাঁর প্রেয়সীর আত্মার কল্যাণের জন্য, শুভ্র পাথরের রূপ নিয়ে আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তার পরলোকগত, ক্ষণেক-দেখা স্বামীর কথা মনে পড়ে গেল। তার আত্মার সদগতি হোক, এই প্রার্থনা উঠল তার মনে।

গৌরাঙ্গিনী চোখ চেয়ে দেখলেন বটে, তবে তাঁর ভাল মন্দ কি লাগল, তা কিছু বোঝা গেল না। রাধা যে খুবই সঙ্কুচিত হয়ে আছে তা বোঝা গেল। চারদিকে মুসলমান, মাগো কি ঘেন্না!

আগ্রায় দেখবার জিনিসের অভাব নেই। কিন্তু থাকবার বড় অসুবিধা। সে দিনই আর দু'চারটে দ্রষ্টব্য দেখে নিয়ে তাঁরা মথুরা বৃন্দাবনের পথ ধরলেন।

মানুষের ভক্তিতে সমুজ্জ্বল এ জায়গাগুলি। যারা একেবারে সাদা চোখে দেখে তাদের কাছে খুব সুন্দর কিছু লাগে না। ভাঙা-চোরা মাটির ঢিপি, মন্দির। পঙ্কিল জলে পূর্ণ জলাশয়। পথে ঘাটে নিদারুণ। ধুলো।

পাণ্ডার উৎপাত, ভিড়ের ও ভিখারীর উৎপাত। বাঁদর পালে পালে ঘুরছে, যাত্রীদের আক্রমণ করে খাবারদাবার কেড়ে নেবার চেষ্টাও করছে।

সুমনা নাকে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে বলল, "বাবাঃ কি ভীষণ ধুলো!"

পথের উপর কতগুলো অর্দ্ধ-উলঙ্গ ছেলে ডিগবাজী খাচ্ছিল, তারা দাঁড়িয়ে পড়ে ছড়া কাটতে আরম্ভ করে দিল, "ধূলা নয় ধূলি নয়, গোপীপদরেণু, এই ধূলাতে খেলেছিলেন, নন্দের বেটা কানু?"

রাসবিহারী বললেন, "বেশ বলেছ বাবা, এই নাও দুটো পয়সা।"

চামেলী নাকে কান্না সুরু করল, তার মাথা ব্যথা করছে গরমে, সে বাড়ী যাবে। যা হোক বৃন্দাবনে কয়েকটি ভাল মন্দির দেখে তাদের একটু প্রাণ ঠাণ্ডা হ'ল। বড়রা কেন যে কি দেখতে চায়, চামেলী বেচারী ভেবেই পেল না। কতক্ষণে সে আবার এলাহাবাদে ফিরে যেতে পারবে, সে তাই দিন গুণতে লাগল।

যা হোক এবারকার মত পর্য্যটন শেষ করে তাঁরা এলাহাবাদে ফিরে এলেন। ক্রমাগত ঘোরাঘুরি করে কর্ত্তা গিন্নী ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। চামেলীরও নানা জায়গার বিচিত্র খাবার খেয়ে শরীর ভাল যাচ্ছিল না। একমাত্র সুমনা আর রাধা বিশেষ কিছুই কাতর হয় নি। তবু এলাহাবাদে ফিরে এসে তারাও খানিকটা আরাম অনুভব করল।

এর পর দিন কয়েক এখানেই বাস। খোঁজাখুঁজি করলে এখানে পরিচিত লোক নিশ্চয়ই পাওয়া যেত, কিন্তু গৌরাঙ্গিনী রাজী হলেন না, কারো সঙ্গে দেখা করতে। এই মেয়ে নিয়ে কোথায় যাওয়া যায় নাকি? কত রকম কথা শুনতে হবে।

রোজই তারা বিকেলে বেড়াতে যায়। গৌরাঙ্গিনী পাণ্ডার লোকের সঙ্গে গঙ্গাস্নান করতেও প্রায়ই যান। সুমনা একদিন অক্ষয়বট দেখতে গেল। ঘোর অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে শুধু একটা প্রদীপ সম্বল করে যেতে তার বড় ভয় করতে লাগল। কিন্তু নেমে যখন পড়েছে তখন যেতেই হবে উপায় কি? ভাগ্যে চামেলীকে আনা হয় নি, না হলে সেও ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠত।

এত কষ্ট স্বীকার করে কি যে সে দেখল তাই বুঝল না। মহাবীরের মন্দির সুন্দর না হোক, কিসের যে মন্দির তা বেশ ভালই বোঝা যায়। সঙ্গমের ঘাটে সমাগত নানা বেশধারিণী মেয়েদের দেখতে কিন্তু মন্দ লাগে না। ভারতবর্ষের সব প্রদেশের মেয়েই এখানে আসে। আর সবাই কেমন উজ্জ্বল রঙের শাড়ী পরে, বাঙালী মেয়েরাই শাদা শাড়ীর পক্ষপাতী।

বিকেলে তারা যমুনার ধারে বেড়াতে যেত বেশীর ভাগ দিনই। এই জায়গাটি আর যমুনা নদীর উপরের বড় পুলটি সুমনার বড় ভাল লাগত। যমুনা সম্বন্ধে কত কবি কত না গান বেঁধেছেন, কবিতা লিখেছেন। সত্যি এত সুন্দর নদী আর কি কোথাও আছে? ওপারের ঝুশী গ্রামটি দেখতে যেতে তার খুব ইচ্ছা করত কিন্তু একটানা অতক্ষণ বাইরে থাকতে তার মা রাজী হতেন না।

দিনগুলো তাড়াতাড়িই কেটে গেল, কলকাতায় ফিরবার দিন এল এগিয়ে। গৌরাঙ্গিনী ঘরে ফিরবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। রাসবিহারীরও এতদিন একটানা বাইরে ভাল লাগছিল না। চামেলী সঙ্গিনীর অভাবে কিছু কাতর। শুধু সুমনার ভাল লাগছিল না ফিরে যেতে। এখানে সে বেশ শান্তিতে ছিল। কলকাতার বাড়ীর সেই গোলমাল, কান্নাকাটি আর হাজার রকম কথা ভাবলেই তার মনটা বিরূপ হয়ে যাচ্ছিল। তবে কান্নাকাটিটা বেশীর ভাগ সুমনার মাই করতেন, তিনি এখন অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছেন ব'লে মনে হয়। আর তার পড়াশুনো রয়েছে ত? খুব ভাল ক'রে এর পর পড়তে হবে, যাতে পরীক্ষার ফল একটুও খারাপ না হয়। সে এম, এ, পাশ নিশ্চয়ই করবে, এ দেশে যতখানি পড়া যায় সব পড়বে। স্কলারশিপ্ নিয়ে বিলেত যাবার চেষ্টা করবে। বাবা ছাড়া কারো কথা সে শুনবে না। কারো গলগ্রহ সে কখনো হবে না।

জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হতে লাগল। কিন্‌বনা কিন্‌বনা করেও খানিক খানিক জিনিস কেনা হল। রাধাও কিছু সওদা করল। পাণ্ডাদের বেশ ভাল মনে পয়সাকড়ি দিয়ে, এবং আগামী বৎসর আবার আসবার কথা দিয়ে তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন।

ট্রেনে উঠেই গৌরাঙ্গিনী বল্‌লেন, "কি যে দেখব বাড়ীঘরের অবস্থা, তাই ভাবছি।"

রাসবিহারী বল্‌লেন, "এত তীর্থ ঘুরলে, কিন্তু মন প'ড়ে আছে সেই বাটিঘটির দিকে।"

তাঁর স্ত্রী বল্‌লেন, "বাটিঘটির ভাবনা চিরদিনের মত ঘুচিয়ে দিয়ে ত যাইনি? আবার যখন সংসার করতে হবে, তখন ওসব না ভেবে উপায় কি? অসুবিধা যখন হবে তখন সব চেয়ে জোরে চেঁচাবে ত তুমিই।"

চামেলীর খুব ভাল লাগছিল আবার সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে ফিরে যাবে বলে। রাধাও কতক্ষণে অন্য সহ-

কর্ম্মিণীদের সঙ্গে প্রাণ খুলে গল্প করতে পারবে, তাই ভাবছিল। জিনিসপত্র যা কিনেছে তা যতক্ষণ তাদের না দেখাচ্ছে, এবং তাদের ঈর্ষ্যার উদ্রেক করাতে না পারছে, ততক্ষণ তার সান্ত্বনা নেই। সুমনা ভাবছিল সামনের দিনগুলোর কথা। কলকাতায় গিয়েই সে স্কুলে ভর্ত্তি হবে। সঙ্গিনীরা তার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করবে কে জানে? বেশী সমবেদনা জানাতে এলে ত বিপদ, সুমনার সে সব একেবারেই ভাল লাগবে না। শিক্ষয়িত্রীরা যেমন ব্যবহার করতেন, তাই করবেন, সুমনা সেটা জানে। সে একেবারে আগের জীবনেই ফিরে যেতে চায়। মাঝের কয়েকটা দিনের ছাপ তার জীবন থেকে মুছেই যাক্। সেগুলোর মধ্যে ভাল যা হবার সম্ভাবনা ছিল, তা যখন ভগবান্ কেড়েই নিলেন, তখন আঘাতের চিহ্নগুলোকে চিরস্থায়ী ক'রে রেখে লাভ হবে কি?

কলকাতা এসে পড়ল। ট্রেন থামতে না থামতে চামেলী হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠল, "ঐ যে দাদা এসেছে। রঘুও এসেছে।"

গাড়ী থেকে ত নামা হল। পোঁটলা-পুঁটলি যাবার সময় যত না ছিল, ফিরবার সময় তার চেয়েও বেশী হয়েছে। যাহোক রঘু ও রাধা থাকাতে সে সব নিয়ে বেশী ভুগতে হল না গৌরাঙ্গিনীকে। তারাই বেঁধেছেঁদে নামিয়ে নিল, তিনি খালি গুণে নিলেন যে, সব ক'টা আছে কিনা!"

জিতেন মা বাবাকে প্রণাম ক'রে বলল, "বেশ সব কালো হয়ে এসেছ। শরীর ভাল ছিল ত? মনু আর চামেলী একটু যেন রোগা হয়ে গিয়েছে।"

তার মা বল্লেন, "কালো না হয়ে উপায় আছে? যা রোদ আর যা গরম! মেয়েরা খাওয়া-দাওয়া ঠিক-মত পায়নি ত? চিরজন্ম মাছভাত খাওয়া অভ্যেস, তা ও খোট্টার দেশে মাছ কি চোখে দেখবার জো আছে? দুধও ভাল পাওয়া যায় না।"

রাধা বলল, "দু গরাসের বেশী ভাত মুখে তুলতে পারতুম না গো দাদাবাবু। খালি ঘাসপাতা কত খাওয়া যায়? ভালো মুগের ডাল কতদিন দেখিনি। খালি অড়রের ডাল নিয়ে আসছে।"

জিতেন বল্ল, "ভালই হয়েছে। বেশী ভাল খাবার পেলে মানুষের ধর্ম্মকর্ম্মের দিকে মন যায় না।"

গৌরাঙ্গিনী বললেন, "আগ্রার হোটেলটার আর কিছু ভাল ছিল না, কিন্তু মাছ ক'দিন খুব দিয়েছিল। এলাহাবাদের পাণ্ডা লিখেছিল কিনা যে আমরা মাছ খাই, তা এক এক জনকে আধসের করে মাছই দিয়ে দিত। তা যা রান্নার ছিরি কতটুকুই বা খাওয়া গেল?"

বাড়ী এসে পৌঁছলেন সকলে। বাড়ীটা যে একেবারে ভেঙেচুরে শতখান হয়ে যায়নি, বাইরে থেকে সেইটুকু দেখেই গৌরাঙ্গিনী খানিকটা আশ্বস্ত হলেন। বাড়ীর সকলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল তাঁদের অভ্যর্থনা করতে। সকলের মুখে ঐ এক কথা, "কালো হয়ে গেছ, রোগা হয়ে গেছ।"

একটু জিরিয়ে নিয়ে যে যার নিজের কাজে মন দিল। রাধা গেল ঠাকুর, কাতী ও রঘুর সঙ্গে গল্প করতে। হাত পা ছড়িয়ে গল্প করবার অবকাশ তখন কারো নেই, কাজ-কর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকেই গল্প চলতে লাগল। গৌরাঙ্গিনী ঘর-সংসার তদারক করতে লাগলেন। চামেলী খেলায় মেতে উঠল। সুমনা সুচিত্রার সাহায্যে কাপড়-চোপড় বাক্স থেকে বার ক'রে আলমারী আর আলনায় সাজিয়ে রাখতে লাগল।

নিচের ঘরে ছোটগিন্নী বড়গিন্নীকে জিগ্যেস করলেন, "মনু ছিল কেমন? খুব মনমরা হয়ে আছে নাকি এখনও?

গৌরাঙ্গিনী বললেন, "কোথায়? নিজের পেটের মেয়ে বলতে নেই, তবু বলছি, মেয়ে ঠিক ঐ বাপের স্বভাব পেয়েছে। ঠাকুর দেবতায় ভক্তি নেই, কোথায় কোন বাদশাহের কবর আর বেগমের কবর, তাই নিয়েই অস্থির। যেখানে সেখানে ওদের সঙ্গে দৌড় ঝাঁপ ক'রে আমার যেন গতর চূর্ণ হয়ে গেছে।"

ছোটগিন্নী মুখটা একটু ম্লান ক'রে বললেন, "ছেলে-মানুষ, বোঝে না ত কপালে কি ঘটে গেল। এখন যা নিয়ে ভুলে থাকে তাই ভাল।"

গৌরাঙ্গিনী বল্লেন, "এখনি না হয় ছেলেমানুষ আছে, চিরকাল. ছেলেমানুষ থাকবে না ত? ঠিকমত চালচলন শেখা দরকার, নইলে সমাজে নিন্দে হবে যে? তা কি করব বল বোন, জেদ ক'রে বিয়ে দিয়েছিলাম ব'লে আমি যেন নিজের ঘরে চোর হয়ে আছি। কিছু কি আমার আর বলবার জো আছে? এখন ঐ মেয়ে আর বাবা মিলে যা ঠিক করবেন তাই হবে।

সুচিত্রার মা বললেন, "বিয়ে ত তোমরা খুব ভাল দেখেই দিয়েছিলে। কোনো খুঁৎ ছিল না। তা কপালে সইল না তা আর তুমি কি করবে?"

গৌরাঙ্গিনী বল্লেন, "বল ত ভাই আমি কি অন্যায় করেছি? ষোল বছর কি কম বয়স হল বাঙালীর মেয়ের পক্ষে? ওঁর সখ ছিল মেয়ে বি, এ, ; এম, এ, পাশ ক'রে

একেবারে ঝাড়ু হয়ে বিয়ে করবে। আমাদের পরিবারে কখনও ত তা হয়নি, তাই আমি আগে দেবার চেষ্টা করলাম। কপালে সইল না। তা উনি তখন থেকে আমার উপরে চ'টে আছেন, ভাল ক'রে কথা বলেন না। আমি মা হয়ে কি নিজের মেয়ের মন্দ করতে চেয়েছি ?"

এইবার তার কণ্ঠস্বর অশ্রুসজল হয়ে উঠল। কান্নাকাটি শুনলে বাড়ীর পুরুষমানুষরা এখনি এসে ধমক লাগাবে, তাই বড় জাকে ছোটগিন্নী তখনই থামিয়ে দিলেন। বললেন, "যাক্ গে ভাই, ওসব আলোচনা ক'রে আর কি হবে? ছোটরা শুনলে ভয় পাবে। ভাঁড়ার-টাড়ার দেখ তোমার, খরচপত্র সব ঠিকমত হয়েছে কি ফেলাছড়া হয়েছে।"

বড়গিন্নী এইবার তাঁর এই অতিপ্রিয় কাজে মনোনিবেশ করলেন। কয়েকটা বড় বড় ফাঁকিও ধ'রে ফেললেন। এই নিয়ে খোঁজখবর করতে করতে নাওয়াখাওয়ার সময় উৎরে গেল।

পরদিন রাসবিহারী সুমনাকে ডেকে বললেন, "যে ক্লাশে ছিলে সেইখানেই দিয়ে দিই তা হলে? অবশ্য তোমার বেশ কিছুদিন পড়াশুনো হয় নি, টেঁষ্টে পারবে ত? না কি পরের বছর পরীক্ষা দেবে?"

সুমনা বলল, "না বাবা, আমি পেছতে চাই না, এমনিতেই আমার বয়স বেশী হয়ে গেছে। আমি ঠিক সব তৈরি করে নেব, সামনে গরমের ছুটি আসছে ত? হরিবাবুকে তুমি ছুটির সময় আসতে বলে দিও তা'হলেই হবে।"

রাসবিহারী বললেন, "সে ত দেবই। শরীরটা ভাল থাকে তা'হলেই হয়।'

খাওয়া-দাওয়ার পর বাবার সঙ্গে গাড়ী চড়ে সুমনা স্কুলে চলল। সুচিত্রা খবরটা আগেই রটিয়ে দিয়েছে কাজেই তাকে দেখে অবাক আর কেউ হ'ল না। রাসবিহারী অফিসে বসে হেডমিষ্ট্রেসের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন, সুমনা সোজা নিজের ক্লাশে চলে গেল। সঙ্গিনীরা প্রথম একটু সচকিত এবং অপ্রতিভ ভাবে তার দিকে তাকাল। কি রকম করে তার সঙ্গে কথা বলবে? কি ভীষণ বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেল বেচারীর জীবনে। কিন্তু সুমনাকে ত ঠিক আগেরই মত লাগছে। চেহারাও বদলায় নি, ধরন-ধারণও বদলায় নি, বেশভূষাও বদলায় নি। তারা অল্পে অল্পে কথাবার্ত্তা সুরু করল, এবং আধঘণ্টার মধ্যেই সকলে বেশ স্বাভাবিক ভাবেই গল্প জুড়ে দিল। টিফিনের ছুটির সময় সুমনা সব জেনে নিল কি কি পড়া হয়ে গিয়েছে তার অনুপস্থিতিতে। তার ক্লাশের মেয়েরা তাকে সোজাসুজি ভাবে গ্রহণ করাতে সে খুব আরাম বোধ করল। তবে অন্য ক্লাশের মেয়েরা যে তাকে নিয়ে খুব আলোচনা করছে, সেটা সে বুঝতেই পারল।

বাড়ী ফিরে নিজের বই খাতাপত্র গুছিয়ে নিয়ে সে একেবারে পড়াশুনোর মধ্যে ডুবে গেল। রাসবিহারীবাবু এতে বেশ স্বস্তি অনুভব করছেন দেখে গৌরাঙ্গিনী খানিকটা বিরক্তই হয়ে গেলেন। রাত্রে স্বামীকে বললেন, "আচ্ছা, ওর শ্বশুরবাড়ী একবার যাবে না? ভগবান যদি মুখ তুলে চান, যদি বাছার আমার কোনো খবর পাওয়া যায়? বাইরে থেকে এলাম, একবার দেখা ত করতে হয়?"

রাসবিহারী বললেন, "যাব কাল। আশা ভরসা আমার মনে কিছুই নেই, তবু খোঁজ করব ওদের কাছে।"

সুমনার শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা আর ইদানীং কোনো খোঁজ-খবর নিত না। এই ব্যাপারের পর সুমনা সম্বন্ধে তাদের মনে কোনো মায়াদয়া ছিল না। ক'টা দিনের মধ্যে যে স্বামীকে খেয়ে শেষ করল, সে যে কি নিদারুণ অপয়া তা-ও আর বলে বোঝাতে হবে না?

তবু সামাজিক শিষ্টাচার কতগুলো আছে। রাসবিহারী যখন গিয়ে পৌঁছলেন, তখন বিকেল হয়ে এসেছে, চা খাবার সময়। তাঁকে বসান হ'ল ভদ্র ভাবে অভ্যর্থনা করেই, চা খেতেও বলা হ'ল, যদিও তিনি রাজী হলেন না। নির্ম্মলের বাবা বললেন, "খোঁজ-খবর মানুষের পক্ষে যতটা করা সম্ভব সবই ত করালাম, কোনো ফল হ'ল না। নিতান্ত তাকে নিয়তিতে টেনেছিল।"

রাসবিহারী জানতে চাইলেন, কি কি করা হয়েছে। শুনলেন একজন লোক আবার পাঠান হয়েছিল, খোঁজখবর করতে, সে প্রায় মাসখানেক সেখানে থেকে ঘোরাঘুরি করেছে। লোকটি ডিটেক্‌টিভের কাজ জানে, কাজেই ভাল করেই অনুসন্ধান করেছে ধরতে হবে। ও দিক্‌কার প্রধান দুটো খবরের কাগজে নির্ম্মলের ছবিসহ বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। কেউ কোনো খবর দিতে পারলে তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে বলেও ঘোষণা করা হয়েছে।

রাসবিহারী অতঃপর চুপ করেই রইলেন। আর কিই বা বলা যায়? আর কোন বিষয়ে বা এদের সঙ্গে আলাপ চলতে পারে?

খানিকক্ষণ নীরবে তামাক টেনে নির্ম্মলের বাবা হঠাৎ বললেন, "একটা কথা আপনাকে বলি, কিছু মনে করবেন

না। আপনার মেয়ের সঙ্গে যে সব আসবাব-পত্র এসেছিল, সেগুলো যদি ফিরিয়ে নিয়ে যান ত ভাল হয়। ওগুলো দেখলে গিন্নী বড় কান্নাকাটি করেন।"

রাসবিহারী চটে গেলেন। তাই ত, কান্নাকাটি করেন যখন তখন নিয়ে যাওয়াই ভাল। বাড়ীতে হলে গর্জ্জে উঠতেন, এখানেও ত তা চলে না, সুতরাং গলার স্বর না চড়িয়েই বললেন, "ঠিক আছে, নিয়েই যাওয়া যাবে। আমাদের ওখানেও আপনাদের জিনিস কিছু কিছু আছে সেগুলো ফেরত দেব। আসি তবে।" বলেই উঠে গট্ গট্ করে বেরিয়ে গেলেন।

বাড়ীতে এসেই স্ত্রীকে বললেন, "মনু ওবাড়ী থেকে গহনা কাপড় যা কিছু পেয়েছে, সব গুছিয়ে দাও, ফেরৎ পাঠাব।"

গৌরাঙ্গিনী অবাক হয়ে গেলেন। "কেন গা? ফেরত কেন? ওসব ত ওর স্ত্রী-ধন।"

রাসবিহারী বললেন, "স্ত্রী-ধন কি পুরুষ-ধন জানি না, ওসব আমি রাখব না। ওরা অসভ্যতা করলে আমিও করব। ওসব আসবাব-পত্র আমি বেচে দেব, দিয়ে টাকা মনুর নামে জমা করে দেব ব্যাঙ্কে। সব তাড়াতাড়ি গুছিয়ে দাও।"

অগত্যা গুছিয়েই দেওয়া হ'ল। সুমনা এতে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। যাক্ এগুলো আর কোনোদিন তার চোখে পড়বে না। বাড়ীর একজন ছেলে সেগুলি পৌঁছে দিয়ে এল, এবং ঠেলাগাড়ী করে আসবাব-পত্র নিয়ে এল। কুটুমবাড়ীর লোকেরা তার সঙ্গে প্রায় কেউ কথাই বলে নি। সুমনার বিবাহ ব্যাপারটা এইবারে পাকাপাকি বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে যাবার সুযোগ পেল।

দিন কাটতে লাগল একটা একটা করে। সুমনা আবার যেন তার কুমারী জীবনে ফিরে গেল। পড়াশুনো করে গল্পগাছা করে। তবে নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে তাকে গৌরাঙ্গিনী নিয়ে যান না। কেউ মেয়েকে দেখে কোনো কথা বলে এটা তিনি চান না। তবে দু'তিন মাস পরে, ভাই-বোনদের সঙ্গে বাইরে বেড়াতে যাবার অনুমতি সে পেয়ে গেল। সিনেমায় আগে আগে সে যেত, এখন পাঠাবার ইচ্ছা তার মায়ের ছিল না, কিন্তু মেয়ে কোনো দিক দিয়ে বঞ্চিত হচ্ছে এটা তাকে ভাবতে দিতে রাসবিহারী রাজী ছিলেন না। সেখানেও তিনি তাকে পাঠিয়েই দিলেন।

ইতিমধ্যে শোনা গেল গীতা মা হতে চলেছে। গৌরাঙ্গিনী ক'মাস আগের নিষ্ঠুর আঘাতে কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলেন। স্বামীর কাছে নিজের এ দুঃখ তিনি বলতে পারতেন না, এতে তাঁর মন ক্রমেই ভেঙে যাচ্ছিল। এই শুভ সংবাদে খানিকটা তিনি চাঙা হয়ে উঠলেন। সবাইকার সঙ্গে হাসি গল্প আবার আরম্ভ করলেন। পুরণো কাপড় সব খুঁজে বার করে, ছোট ছোট কাঁথা তৈয়ারি করতে লাগলেন, নানা রকম নক্সা করে। এগুলি তিনি সাবধানে সুমনার চোখের আড়াল করে রাখতেন, পাছে সে মনে দুঃখ পায়। সে যখন স্কুলে থাকত, সেই সময় সেলাই করতেন।

বাড়ীর বড় বৌ, তার প্রথম সন্তান হবে। ঘটা করে সাধ দিতে হবে। কর্ত্তাও তাতে কিছু অমত করলেন না। গীতা কিছুদিনের জন্যে বাপের বাড়ী গিয়েছিল। এই উপলক্ষ্যে তাকে আবার নিয়ে আসা হ'ল। আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে সব মেয়েদের নিমন্ত্রণ হ'ল। সুমনা পড়ার ফাঁকে ফাঁকে এই সব আনন্দ কোলাহলের ব্যাপারে যোগ দিয়ে যেত, তবে খুব বেশীক্ষণ থাকত না।

সাধের দিন আর কেউ স্কুলে গেল না, সকাল সকাল যা রান্না হয়েছে খেয়ে নিয়ে সুমনা চলেই গেল। কিছুই তার হয় নি, এবং সে নিজে কোনো অপরাধে অপরাধিনী নয় এটা সে অনুভব করে বটে, কিন্তু অন্যরা যে এখনও তাকে ঠিক ভাবে নিতে পারে না এটাও সে বুঝতে পারে। তাই জনকোলাহলের মধ্যে সে যেতে চায় না। বাড়ীতে থাকলে, কার কোন কথা শুনে হঠাৎ তার মা চেঁচিয়ে কাঁদতে সুরু করে দেবেন তারও ঠিক নেই। কাজেই এ ব্যাপারটাকে যথাসম্ভব সে এড়িয়েই গেল।

যখন ফিরে এল, তখনও কিছু কিছু নিমন্ত্রিতাকে দেখতে পেল। তবে তাকে নিয়ে সৌভাগ্যক্রমে কোনো মন্তব্য হ'ল না। মা তাকে নেমন্তন্নের রান্না খানিকটা খাওয়াবার চেষ্টা করলেন, খুব বেশী অবশ্য সে খেতে পারল না। চামেলী এত খেয়েছে যে তার অসুখ করে গেছে। সুচিত্রারা সবাই জোট বেঁধে বৌদির ঘরে ঢুকেছে গল্প করতে, আর সে কি কি উপহার পেয়েছে তাই দেখতে।

ক্রমশঃ

বলাকা কাব্যে তত্ত্বানুসন্ধান

ডক্টর শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

বলাকা কাব্যের কথা বললেই আমরা গতির কথা ভাবি, প্রসঙ্গত ফরাসী দার্শনিক বের্গ্‌সর কথাও ভাবি। এমন একটা ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে যেন রবীন্দ্রনাথ বলাকা কাব্যগ্রন্থে শুধু গতির কথাটুকু বলেছেন, অন্য সব দামী কথা যেন বলাকা কাব্যগ্রন্থে অনুক্ত রয়ে গেছে। এমন ইঙ্গিতও পাওয়া যায় যেন রবীন্দ্রনাথ অন্য কোথাও গতির কথা বলেন নি। মনস্বী সমালোচকেরা রবীন্দ্রনাথের গতির ধারণাকে বের্গ্‌সর গতি-ধারণার সঙ্গে তুলনা করে এমন মতও প্রকাশ করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথের গতি-ধারণার মধ্যে স্থিতির অবকাশ আছে এবং বের্গ্‌সর গতি-ধারণার মধ্যে এর অসদ্ভাব; বলাকা কাব্যগ্রন্থ পাঠ করতে বসে কেমন করে বের্গ্‌সর এবং রবীন্দ্রনাথের গতি-স্থিতির ধারণার তুলনামূলক আলোচনা আসতে পারে তার সঠিক নিশানা আমাদের জানা নেই। উপনিষদের গতিবাদ মহাকবিকে প্রভাবিত করেছিল এবং উপনিষদে দীক্ষা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে, এমন কথা তাঁর জীবনীকার আমাদের বলেছেন। উপনিষদের রসধারায় পুষ্ট কবি-মানস 'চরৈবেতি' মন্ত্রের ভাবের দ্বারা ভাবিত; তাই গতি, তাই পলায়ন, তাই পেরিয়ে যাওয়ার ধারণা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির মধ্যে অনুস্যূত হয়ে রয়েছে। সুদূরের পিয়াসী কবি সুদূরকে পেতে চান। সে চাওয়া কবি-জীবনের অনাদি চাওয়া, কবি-মানসের অনন্ত প্রত্যাশা। নির্ঝরের যখন স্বপ্নভঙ্গ ঘটল তখন তো তার প্রাণে এই গতির তাগিদই ছিল। ডাকঘরের অমল যখন দূরে সর্ষে ক্ষেতের সীমানায় ডাকহরকরাকে চলে যেতে দেখত তখন তার প্রাণেও তো এই গতির সুরই বেজে উঠত। কবির ধনঞ্জয় বৈরাগী আর ঠাকুর্দা তো বার বার সকলকে ঘর ছাড়তে বললেন। পথ যার নেই তার যে কিছুই নেই; যে পথে নামতে পারল না সে যে অভাগা। কবির তো এই পথ চলাতেই আনন্দ ছিল। কবির বিশ্ববোধের ধারণাটুকু বিশ্লেষণ করলে আমরা এক সর্বপ্লাবী গতিকে আবিষ্কার করি। সে গতি কবির ছোট আমিটাকে, যে আমিটা স্বার্থবুদ্ধি, ভেদবুদ্ধির দ্বারা আচ্ছন্ন, সে আমিটাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে তার বড় আমিটাকে বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত করে দেয়। এই বড় আমিটার প্রসার ঘটে ধীরে ধীরে—আমার প্রতিবেশী মানুষের মধ্যে, জীবজন্তুর মধ্যে এবং গাছপালার মধ্যে; স্থাবর এবং জঙ্গম প্রকৃতি কবির এই আমি দ্বারা 'আমি'ময় হয়ে ওঠে, তাই তো কবি ঘোষণা করলেন যে, ময়ূর যখন তাঁকে ভয় করেনি তখন তার মধ্যেই তাঁর জয় এবং আনন্দ ঘোষিত হচ্ছে। শিমুল, সজিনা কবিকে অনাদিকালের মাথায় আবদ্ধ করেছে। কবি অনাদি কালের প্রত্যূষে গাছ হয়ে ধরিত্রীর বুকে জন্মেছেন। এ সবই তো গতির কথা। কবি-মানস যদি স্থিতিশীল হোত তা হলে আর আমির বেড়াটাকে শক্ত করে গেঁথে তার মধ্যে বন্দী হয়ে থাকত। কিন্তু কবি নিজেই ঘোষণা করলেন তাঁর এই বড় আমিটা তাঁর ব্যক্তিসীমায় আবদ্ধ নয়:—

'সে আমি তো বন্দী নহে আমার সীমায়।'

এই যে সকল সীমাভাঙা মহৎ অসীমের দিকে কবির আত্মবিস্তার একে কি গতি বলব না? হংস বলাকার পক্ষ বিধূননে গতির সৃষ্টি হয় আর মহৎ প্রাণের দিক-বিদারী আত্মসম্প্রসারণ কি গতির সূচনা করে না? তবে বিশেষ করে চলার তত্ত্বটুকু বলাকাকাব্যের উপর আরোপ করে বলাকাকাব্যগ্রন্থের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করার বিশেষ তো কোন হেতু নেই। সেই গতি, সেই প্রাণ, সেই যৌবন, সেই প্রেম, সেই পেরিয়ে যাওয়া, সেই ভক্ত-ভগবান তত্ত্ব, সেই সুন্দরের কথা সবই পেলাম বলাকা-কাব্যের মধ্যে, যেমনটি পেয়েছি অন্যান্য কাব্যেও।

কবি ক্রান্ত-দর্শী। কবি-দৃষ্টি প্রতিভাস রূপের অন্তরে যে সত্য বিরাজ করে তাকে দেখে নেয় স্বজ্ঞার সহায়তায়। প্রথম মহাযুদ্ধের ঘোর ঘনঘটা তখনও বিশ্বের আকাশকে আচ্ছন্ন করে নি; কবির মানস-কর্ণে আসন্ন দুর্যোগের দুন্দুভিনিনাদ অগ্রচারী হয়ে এসে সাড়া তুলল। কবি দেখলেন ঐ সর্বনেশে আসছে:

'এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো,
বেদনায় যে বান ডেকেছে,
রোদনে যায় ভেসে গো।

রক্তমেঘে ঝিলিক মারে,
বজ্র বাজে গগন পারে,
কোন্ পাগল ঐ বারে বারে
উঠছে অট্ট হেসে গো।
এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো।'

কবি-দৃষ্টি এই কবিতাটিতে ঋষি-দৃষ্টির স্বচ্ছতা নিয়ে অনাগত ভবিষ্যতকে দেখেছে। অনাগত যুগের অকথিত কথা কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। এণ্ড্রুজ সাহেব বলেছিলেন যে এই মহাসমরের বার্তা যেন তারহীন টেলিগ্রাফে কবির মনে পৌঁছে গিয়েছিল। কবি অনাগত এই মহাসমরে এক যুগসন্ধি দেখেছেন; এই মহাযুদ্ধে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে। তাই তিনি যুদ্ধের ঘোর শঙ্খধ্বনিকে বিধাতার মঙ্গলশঙ্খের আহ্বান বলে বর্ণনা করেছেন। যুগান্তরের সূচনা এই মহা বিপর্যয়ের অন্তরে অঙ্কুরিত হয়েছে; কবি তাকে মানস-নেত্রে প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি দেখেছেন অতীতের বিষাদ রজনী অবসান প্রায়। মৃত্যু, দুঃখ ও বেদনার মধ্য দিয়ে বৃহৎ নবযুগের রক্তাভ অরুণোদয় আসন্ন। যুগ পরিবর্তনের প্রত্যাশায় কবির মনের এই অকারণ উদ্বেগ তাঁর কতকগুলি কবিতায় ধ্বনিত হয়ে উঠল।[১] বলাকার চার সংখ্যক কবিতাটি বহুশ্রুত। এই কবিতাটি সম্পর্কে কবি নিজে যা বলেছেন তা উদ্ধৃত করে দিই:[২]

"যে যুদ্ধ হয়ে গেল তা নূতন যুগে পৌঁছিবার সিংহদ্বার স্বরূপ; এই লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে একটি সার্বজাতিক যজ্ঞে নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার হুকুম এসেছে। তা শেষ হয়ে এখন স্বর্গারোহণ পর্ব আরম্ভ হয় নি। আরও ভাঙবে, সংকীর্ণ বেড়া ভেঙে যাবে, ঘরছাড়ার দলকে এখনও পথে পথে ঘুরতে হবে।"

কবি যুদ্ধের দুর্যোগের মধ্যে অশেষের আহ্বানকে প্রত্যক্ষ করলেন। সে আহ্বান মানুষকে গৃহের শান্তি দেয় না; নিরঙ্কুশ আরামের অবসন্নতায় মানুষকে জড় হয়ে যেতে দেয় না এই ঘরছাড়ার ডাক। জীবনের লগ্নে লগ্নে প্রহরে প্রহরে এই ঘরছাড়ার ডাক আসে; বিধাতার মঙ্গলশঙ্খে সেই ডাক ধ্বনিত হয়। যারা সেই ডাকে সাড়া দিল, তারাই দুঃখরাত্রি অতিক্রম করে প্রভাতের স্বর্ণসিংহদ্বারে উপস্থিত হতে পারল। কবি বললেন, পাশ্চাত্ত্য দেশে দেশে এসেছি সেই ঘরছাড়ার দল আজ বেরিয়ে পড়েছে। তারা এক ভাবী কালকে মানসলোকে দেখতে পাচ্ছে, যে কাল সর্বজাতির লোকের। চাক ভাঙা মৌমাছির দল বেরিয়ে পড়েছে আবার নতুন করে চাক বাঁধতে। শঙ্খের আহ্বান তাদের কানে পৌঁছেছে। বিশ্বদেবতার মঙ্গলশঙ্খের আহ্বান যাদের কানে গিয়ে পৌঁছল তারা ঘর ছাড়ল, সর্ব জাতির কল্যাণকে কামনা করে তারা পথে বেরিয়ে পড়ল। ইতিহাসের দুর্যোগ রাত্রিতে বিধাতার মঙ্গলশঙ্খে নির্ঘোষ থাকে না, ধুলায় অবনত সেই মহাশঙ্খের মূক আহ্বান ঘরছাড়া করে বৈরাগী মানুষগুলোকে: তারা অন্যায়ের প্রতিকার চায়। তাই অত্যাচারিত হয়। তবু তাদের দুরন্ত প্রাণের তৃষ্ণা মেটে না। রোঁমা রোঁলা, বারট্রাণ্ড রাসেল প্রমুখ মনীষীরা এই দলের; কবিও এই দলেরই দলী। তাই তিনি তাঁর যৌবনের দেবতার কাছে প্রার্থনা করলেন:

"যৌবনেরই পরশ মণি
করাও তবে স্পর্শ।
দীপক তানে উঠুক্ ধ্বনি
দীপ্ত প্রাণের হর্ষ।
নিশার বক্ষ বিদার করে
উদ্‌বোধনে গগন ভরে
অন্ধ দিকে দিগন্তরে
জাগাও না আতঙ্ক।
দুই হাতে আজ তুলব ধরে
তোমার জয়শঙ্খ।"

(৪ সংখ্যক কবিতা)

এই যে পথ চলার তত্ত্ব, এই যে চলার মধ্য দিয়ে সর্বমানবের কল্যাণ সাধনের ইঙ্গিত এটি কবির বিশ্ববোধের ধারণার মধ্যে নিহিত রয়েছে—এমন কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে না বলেই মনে হয়। কবির বিশ্ববোধের ধারণা সমগ্র কবি-মানসকে আচ্ছন্ন করে আছে। কবি আপনার চিন্তায়, কর্মে, ধ্যানে এবং প্রেরণায় এই বিশ্ববোধকে সত্য করে তুলতে চাইলেন। 'কড়ি ও কোমল' থেকে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত যত লেখা লিখলেন তার সবই এই বিশ্ববোধ আশ্রয়ী। কবির সাধনা হ'ল ছোট আমিটাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে বড় আমিটার প্রতিষ্ঠা করা। ছোট আমিটা স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা খণ্ডিত; সে বিভেদের বেড়াটা পাকা করে গাঁথে। এটা আমার, ওটা তোমার এই ধরনের কথা বলা লঘুচিত্ত মানুষদেরই সাজে—এমন কথা একটি উদ্ভট সংস্কৃত শ্লোকে বলা হয়েছে। এই লঘুচিত্ত মানুষেরা ছোট আমির কারবারী। ছোট আমিটাকে যখন নির্বীর্য করে দিয়ে ঐ বড় আমি, ঐ

১। দুই সংখ্যক ও চার সংখ্যক প্রমুখ কবিতা দ্রষ্টব্য।

২। শান্তিনিকেতন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯।

চিন্ময় আমিটাকে যখন আমার মনের রাজত্বে অধীশ্বর করে বসাই তখনই বিশ্ববোধের ধারণাটি আসে। তখন আমি আমার দূরের এবং নিকটের প্রতিবেশীকে ভাল বাসতে পারি, তখনই ভারতের মহামানবের সাগরতীর্থে আমি বিশ্ববাসীর সঙ্গে মিলিত হতে পারি।

কবি একসংখ্যক কবিতাটিতে প্রবীণ স্থবির মানুষদের ব্যঙ্গ করে বললেন যে, ওরা জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগটুকু হারিয়ে ফেলেছে, বাইরের পৃথিবীটার দিকে তাকাতে ভুলে গেছে। ওরা চলতে চায় না, ওরা মাটির ছেলে হয়েও মাটির পরে চরণ ফেলে চলতে অপারগ। শিকলদেবীর পূজা-বেদীটাকে ওরা চিরকাল খাড়া করে রাখতে চায়। তিনি যৌবনের দূতদের আহ্বান করে বললেন যে, শিকলদেবীর পূজা-বেদীটাকে উপড়ে ফেলতে হবে। স্থাবর পৃথিবীটাকে ঘা দিয়ে দিয়ে গতিময় প্রাণময় করে তুলতে হবে আর এই মহৎ কাজটুকু দেশের যুবক সম্প্রদায়ের। তাই তিনি সেই চিরজীবী চিরযুবাদের ডাক দিয়ে বলেছেন :

আন্‌রে টেনে বাঁধা পথের শেষে।
বিবাগী কর্ অবাধ পানে,
পথ কেটে যাই অজানাদের দেশে।
আপদ আছে, জানি আঘাত আছে,
তাই জেনে তো বক্ষে পরাণ নাচে—
ঘুচিয়ে দে ভাই, পুঁথি পোড়োর কাছে
পথে চলার বিধি বিধান যাচা,
আয় প্রমুক্ত, আয় রে আমার কাঁচা।'

শাস্ত্র কথিত, সংস্কার নির্দিষ্ট বাঁধা পথে কলুর চোখ-বাঁধা বলদের মত চলার কথা কবি বলছেন না। সর্ব রকম ঐতিহাসিকতা মুক্ত অজানা বাধাহীন যে পথ কবি সেই পথে ভ্রমণচারী। দেশের যৌবনকে কবি সেই পথেই আহ্বান জানিয়েছেন। ঐ পথ চলার সময় কবিকণ্ঠে গান ফুটে উঠে যে গানে পথ চলার আনন্দের সুর ধ্বনিত। চলার খুশি এবং গানের খুশি কবির চিত্তে এক সঙ্গে উপচিয়ে পড়ে; চলা এবং গান গাওয়া এরা নিত্য সঙ্গী; কবি যেখানে চলার কথা বলেছেন সেখানে তাঁর অবচেতন মন গানের ধুয়ো ধরেছে। চার সংখ্যক কবিতায় তিনি বললেন :

'লড়বি কে আয় ধ্বজা বেয়ে,
গান আছে যার ওঠ-না গেয়ে,
চল্‌বি যারা চল রে ধেয়ে,
আয় না রে নিঃশঙ্ক।
ধূলায় পড়ে রইল চেয়ে
ওই যে অভয় শঙ্খ।'

আবার কবি ৪৩ সংখ্যক কবিতায় বলেছেন :

'ওরে পথিক, ধর না চলার গান,
বাজারে একতারা?
এই খুশিতেই মেতে উঠুক প্রাণ—
নাই কো কূলকিনারা।
পায়ে পায়ে পথের ধারে ধারে
কান্না হাসির ফুল ফুটিয়ে যারে,
প্রাণ বসন্তে তুই যে দখিন হাওয়া
গৃহ বাঁধন হারা।'

কবির কাছে চলা যেমন বন্ধন-মুক্তি ঘোষণা করে। সঙ্গীতও ঠিক তেমনি সর্ব বন্ধন মুক্তির দ্যোতক। পায়ে চলায় আমরা যেমন দেশ কালের সীমা লঙ্ঘন করি ঠিক তেমনি করে গান গেয়ে আমরা ভাবগত, আদর্শগত, সংস্কারগত এবং জন্মগত সকল বন্ধন অতিক্রম করি। মহর্ষি দয়াল স্বামীর জীবনচরিতে আমরা এমন একটি বাইজীর দেখা পাই যার সকল বন্ধন ক্ষয় হয়ে গিয়েছিল সঙ্গীতের অমৃতময় স্পর্শে। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতের এই বন্ধনহীন উদাত্ত সঞ্চরণকে মুক্তিস্বরূপ বলে সবিনয়ে এবং শ্রদ্ধায় স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

কবি বললেন যে যাঁরা গতিশীল তাঁরা অক্ষয় জীবনের অধিকারী। তাঁরা সকল বাধা বিপদ অতিক্রম করে লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছবে। তাঁদের এই পথ চলার সঙ্গী হলেন স্বয়ং ভগবান।[১] এই ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সামীপ্যটুকু কবি সবচেয়ে বেশী অনুভব করেছেন যখন তিনি পথে বেরিয়েছেন। ভক্তের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্কটি হোল প্রেমের সম্পর্ক। এই ভগবৎ প্রেমই অক্ষয় মানব প্রেমরূপে ভাস্বর মূর্তি পরিগ্রহ করেছে বলাকার দুই একটি কবিতায়। এই ভাগবত প্রেমই বিশ্বপ্রেমরূপে কবির বিশ্ববোধকে উজ্জীবিত করেছে; তাই তো কবি নিখিল ভুবনকে ভালবাসলেন। পথে চলার সময় যেমন কবির কণ্ঠে গান ফুটে উঠেছিল, তেমনি তিনি যখন বিশ্বভুবনকে ভালবাসলেন তখন তাঁর কণ্ঠে আবার সেই গানের সমারোহ। কবির বিশ্বপ্রেম গান হয়ে ঝরে পড়ল।[২] সাতসংখ্যক কবিতায় কবি বললেন যে, তাজমহলের হীরা-মণি-মুক্তা-মাণিক্যের ঘটা যদি লুপ্ত হয়ে যায় তবুও অক্ষয় হয়ে থাকবে সম্রাটের প্রেমের অশ্রুজল। এই কবিতাটিতেও কবি সেই অনন্তকালের গতির কথা বললেন; কাল নিত্যচলমান, বস্তুর আবর্জনার ভারকে

১। তিন সংখ্যক কবিতা দ্রষ্টব্য।
২। ১৭ সংখ্যক কবিতা দ্রষ্টব্য।

সে ধুয়ে-মুছে নিয়ে যায়। সুন্দর যেখানে অসীম বিত্তের বিনিময়ে প্রেমের অর্ঘ্য রচনা করে সেখানে মহাকাল কি পরাস্ত হয়? তাজমহলের হীরা-মুক্তা-মাণিক্যের ঘটা কি কালকে মুগ্ধ করল? কাল ত' সুন্দরের এই স্থাবর বিত্তের আস্ফালনে সাড়া দিল না। যে প্রেম চলতি পথে চলতে চলতে থেমে গেল, মানুষকে ছেড়ে রূপৈশ্বর্যময় সমাধি-মন্দিরকে আশ্রয় করল তার ত' বিনাশ ঘটল তখুনি। সম্রাটের প্রেম যখন স্থাণু হয়ে পড়ল সমাধি-মন্দিরের অচলায়তনকে আশ্রয় করে তখন সে চলতেও ভুলে গেল আর মানুষকে চালাতেও ভুলে গেল। তাই সে-প্রেম নিত্য চলমান সম্রাটের বৃহৎ আমিটাকে ধরে রাখতে পারল না। প্রেম তার কক্ষ্যচ্যুত হ'ল গতিটুকু হারিয়ে। তাই সে মাটির গোরস্থানকে আশ্রয় করল, জীবন থেকে বিচ্যুত হ'ল। সেই বৃহৎ আমিটার সংলগ্ন ক্ষুদ্র আমিটা পিছনে পড়ে রইল ঐ সমাধিমন্দিরটাকে আশ্রয় করে। সে-ই ঘোষণা করেছে শাহাজানের স্থাবর প্রেমটুকুকে: সে-ই ত' ঐ বৃহৎ আমিটার আত্যন্তিক বিচ্ছেদটুকুও ঘোষণা করছে:[১]

> "যতদূর চাই
> নাই, নাই, সে পথিক নাই।
> প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ,
> রুধিল না সমুদ্র পর্বত।"

কবির কথায় বলি:[২] "শাহাজানকে যদি মানবাত্মার বৃহৎ ভূমিকার মধ্যে দেখা যায় তা হলে দেখতে পাই, সম্রাটের সিংহাসনটুকুতে তাঁর আত্মপ্রকাশের পরিধি নিঃশেষ হয় না ওর মধ্যে তাকে কুলোয় না বলেই এতো বড়ো সীমাকেও ভেঙ্গে তাঁর চলে যেতে হয়—পৃথিবীটাতে এমন বিরাট কিছুই নেই যার মধ্যে চিরকালের মতো তাঁকে ধরে রাখলে তাঁকে খর্ব করা হয় না। আত্মাকে নিয়ে চলে কেবলই সীমা ভেঙ্গে ভেঙ্গে। তাই ত সম্রাটের সঙ্গে সঙ্গে এতো সাধের তাজমহলের, তাঁর সাম্রাজ্যের কোন আত্যন্তিক যোগ রইল না। সমস্ত বাহ্য সম্পর্কই জীর্ণ পত্রের মত একে একে খসে পড়ল। সম্রাটের চিন্ময় সত্তাটুকু, ঐ বৃহৎ আমিটা চলে গেল অনন্তের পথে। দার্শনিকের ভাষায় বলতে হলে বলতে হয় ঐ বড় আমিটা পারমার্থিক জগতের আর ঐ ছোট আমিটা হ'ল ব্যবহারিক জগতের অধিবাসী। ছোট আমিটা ব্যবহারিক জগতে, আমাদের চারপাশের অতি পরিচিত জগতে আধিপত্য করে। সে-ই ত' সম্রাটের সমাধিমন্দিরটার রচয়িতা। তাই সে পরম-যত্নে খণ্ডকালের কিছুটা পার হয়ে আজও তাজমহলকে পাহারা দিচ্ছে। সেখানে তার প্রিয়তমা মমতাজ যে মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন। সে-ই ত' চিরযাত্রী মানুষদের ডাক দিয়ে বলছে:

> "তাই
> স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি,
> ভারমুক্ত সে এখানে নাই।"

বড় আমিটার চিন্ময় সত্তা লোক থেকে লোকান্তরে প্রতি-নিয়ত ভ্রাম্যমান।

কবি ৭ সংখ্যক কবিতায় বললেন যে, গতিহীন প্রেম সেও নশ্বর। যে প্রেম থেমে গেল চলতে চলতে, যে পথের ধুলোর ওপরই তার সিংহাসন পাতলো তার নশ্বরতা অনস্বীকার্য। সে প্রেমের সঙ্গে চিন্ময় মানবাত্মার আত্যন্তিক বিচ্ছেদ ঘটে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চির-চঞ্চল; যা কিছু থেমে গেল, শান্ত হয়ে গেল তারা ত' জীবনের যোগটুকু হারিয়ে ফেলল। তাই কবি ৬ সংখ্যক কবিতায়, ছবিকে উদ্দেশ করে বললেন:

> "চির-চঞ্চলের মাঝে তুমি কেন শান্ত হয়ে রও?
> পথিকের সঙ্গ লও
> ওগো পথহীন।
> কেন রাত্রিদিন
> সকলের মাঝে থেকে সবা হ'তে আছ এত দূরে
> স্থিরতার চির অন্তঃপুরে?"

যে থেমে গেছে সে সকলের মধ্যে থেকেও সবার থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সে মৃত, তাই সে বিস্মৃত। গতিহারা এই পঙ্গু মুমূর্ষুকে নবজীবন দানের মন্ত্রটি কবি আমাদের দিলেন। বিশেষকে নির্বিশেষ করে দেখা, বিশেষের সামান্যীকরণ হ'ল মৃত্যু থেকে অমৃতে যাওয়ার পথ:

> "শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।
> আমার নিখিল
> তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।"

যে মৃত, যে পরিত্যক্ত, যে থেমে গেছে তাকে যখন চলমান শ্যামল বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে এক করে দেখি, অসংখ্য নক্ষত্র গ্রহ তারকা খচিত নীল আকাশের সঙ্গে একাত্ম করে দেখি, তখন তো বিশ্ব-প্রকৃতির গতি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের চলমানতা তার উপর আরোপ করি। তাই তো পঙ্গু স্থবির স্থাবর আবার জীবন ফিরে পায়। নিশ্চলের মধ্যে গতি সঞ্চারিত হয়, পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে

১। ৭ সংখ্যক কবিতা দ্রষ্টব্য।
২। প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩৪৮, পৃঃ ১২৩

আবার গতির আবেগ জাগে। কবি প্রত্যক্ষ করেন পর্বতের অন্তরে গতির দারুণ তিয়াসা। বৈশাখের মেঘের মতই পর্বতের স্তূপ এ আকাশ থেকে অন্য এক আকাশে উড়ে যেতে চায়। অসংখ্য তৃণের দল মাটির আকাশে পাখা নাড়ছে। কবি তাদের পক্ষ বিধুননের শব্দ শোনেন। মাটির গভীরে সংখ্যাতীত বীজ যারা আজও অঙ্কুরিত হয় নি, তারাও বুঝি পাখা মেলছে উড়ে যাবার জন্য। অনাদি, অতীত কাল থেকে উড়ে আসা লক্ষ কোটি চলমান মানবাত্মার বাণী কবির অন্তরে প্রবেশ করে। কবি মানস-কর্ণে শোনেন তাদের নিরন্তর আহ্বান; অতি পরিচিত জগৎটুকু পেরিয়ে যাবার জন্য কবির অন্তরে ডাক এসে পৌঁছেছে :

"হেথা নয় অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে।' এই যে অকারণ, অবারণ চলা যার জন্য মানুষের নিত্য তপস্যা, এর মধ্য দিয়েই তো আমরা অমৃতের সন্ধান পাই। এই চলার মধ্য দিয়েই তো পাপ মরে যায়, অহঙ্কার ভেঙে পড়ে, সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র যেমন তমিস্র অন্ধকার বিদীর্ণ করে প্রতিনিয়ত আলোর সিংহদ্বারের পানে ছুটে চলেছে তেমনি মানুষের অনন্ত যাত্রা মর্ত্য সীমা চূর্ণ করে দেবতার অমর মহিমার দিকে প্রধাবিত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ ৩৭ সংখ্যক কবিতায় চলার উদ্দেশ্যটুকু ব্যাখ্যা করলেন :

'মৃত্যুর অন্তরে পশি' অমৃত না পাই যদি খুঁজে,
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ—সাথে যুঝে,
পাপ যদি নাহি মরে যায়
আপনার প্রকাশ লজ্জায়
অহংকার ভেঙে নাহি পড়ে আপনার অসহ্য সজ্জায়,
তবে ঘরছাড়া সবে
অন্তরের কি আশ্বাস রবে
মরিতে ছুটিছে শত শত
প্রভাত আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মতো ?"

* * *

মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখন দিবে কি দেখা দেবতার অমর মহিমা ?"

মানুষ যখন আপনার চার পাশের বাঁধনটুকু ছিন্ন করে চলার পথে নেমে পড়ে তখন সে দেবতার অমর্ত্য মহিমার সান্নিধ্যটুকু লাভ করে। এই যে কবি দেবতার কথা বললেন,এই দেবতাই তাঁর জীবনদেবতা এবং জগৎ-দেবতা। এঁর পানে কবির যেমন নিত্য অভিসার, তেমনি কবির পানেও এঁর নিত্য আগমন। এই ভগবানের সঙ্গে কবির সম্পর্কটি হোল প্রেমের সম্পর্ক। ভগবান ভক্তকে তার অনন্ত ঐশ্বর্যটুকু দেখান। ভক্তের দেখার মাধ্যমে ভগবান তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্যের রূপাস্বাদন করেন। এই ভগবানের আনন্দোপলব্ধি ভক্ত ছাড়া সম্ভবপর হয় না; তাই তো ভগবান ভক্তকে এই অনন্ত ঐশ্বর্য দর্শনের শক্তিটুকু দেন। ভক্ত সেই ঐশ্বর্য দর্শনের মধ্যে যে আনন্দ পায় সে আনন্দটুকু ভগবানের আনন্দ। প্রেমের পথে ভগবান এবং ভক্তের সামীপ্য ও সাযুজ্য ঘটে। তাই কবি বললেন :

"এমনি করেই দিনে দিনে
আপন প্রেমের পরশমণি আপনি যে লও চিনে
আমার পরাণ করি হিরণ্ময়।"

এই ভক্ত-ভগবানের সম্পর্কটুকু পরস্পর নির্ভর। আমাদের ধর্মের ভগবান ভক্তের পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করেছেন, এমনি তাঁর ভক্তের প্রতি ভালবাসা। ভৃগু-পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করে ভগবান ভক্তকে ধন্য করেছেন এবং নিজেও ধন্য হয়েছেন। এ যুগের পরম ভক্ত মহাকবি রবীন্দ্রনাথ পরম বিশ্বাসের সঙ্গে আর একবার ভক্ত-ভগবানের এই নিবিড় মধুর যোগটির কথা ব্যক্ত করলেন। তিনি তাঁর ভগবানকে বললেন :

"যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা
আপনাকে তো হয় নি তোমার দেখা।
সেদিন কোথাও কারো লাগি ছিল না পথ-চাওয়া;
এ পার হ'তে ও পার বেয়ে
বয়নি ধেয়ে
কাঁদন-ভরা বাঁধন-ছেঁড়া হাওয়া।"

ভগবান যখন একলা থাকেন, তখন তো কাঁদন-ভরা বাঁধন-ছেঁড়া হাওয়া বয় না। সেই মহা নিঃসঙ্গের স্থাবর পৃথিবীটা পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকে, ফুল ফোটে না, গান ঝরে না, কোথাও কেউ আনন্দের বার্তা বহন করে আনে না, কেন না সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তো গতি নেই। তাই তো ভগবানের ভক্তকে দরকার। পুরাণ-কথিত মহানিদ্রায় শয়ান বিষ্ণুর ঘুম তো তখন ভাঙে নি, ভক্ত আসে ভগবানের কাছে, ভগবানের ঘুম ভাঙে, লীলা সুরু হয়। ভগবানের নিশ্চল ব্রহ্মাণ্ডে গতি সুরু হয়, ভগবান লীলায় মেতে ওঠেন। ভক্তকে নিয়ে তাঁর নিত্য লীলা :

আমায় তুমি ফুলে ফুলে
ফুটিয়ে তুলে
দুলিয়ে দিলে নানারূপের দোলে।

আমায় তুমি তারায় তারায় ছড়িয়ে দিয়ে
কুড়িয়ে নিলে কোলে,
আমায় তুমি মরণ মাঝে লুকিয়ে ফেলে
ফিরে ফিরে নূতন করে পেলে।"

ভক্ত এবং ভগবানের সম্বন্ধটি চিরপুরাতন ও চির-নূতন। সে সম্বন্ধটিও গতির দোলায় দোলায়িত; ভক্তকে মৃত্যুর যবনিকা কখন এসে ভগবানের থেকে আড়াল করে দাঁড়ায়, বিচ্ছেদ অসহ হয়, আবার ভক্ত ভগবানের মিলন ঘটে। ভগবান ভক্তকে নূতন করে পান, ভগবানের আত্মোপলব্ধি ভক্তের মাধ্যমেই ঘটে। ভক্ত না থাকলে ভগবানের আত্মজ্ঞান ও আত্মোপলব্ধি পরিপূর্ণ হয় না। কবিগুরুর ভক্ত ভগবানের এই চলমান সম্বন্ধের ধারণাটি হেগেলীয় ধারণার অনুরূপ। কবি বললেন :

"আমি এলেম তাই তো তুমি এলে—
আমার মুখে চেয়ে
আমার পরশ পেয়ে
আপন পরশ পেলে।"

ভগবৎ জীবনের পরিপূর্ণতা যে ভক্তকে কেন্দ্র করে এবং ভক্ত-জীবনের চরম সার্থকতা যে ভগবৎ সান্নিধ্য লাভ করে, এই পরম তত্ত্বটুকু বলাকা কাব্যগ্রন্থে ঘোষিত হ'ল। তাই বলেছি, বলাকা কাব্যগ্রন্থ শুধু গতির কথা বলে নি; গতির সঙ্গে স্থিতির কথা বলাও বলাকা কাব্য-গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড গতি সাধনা করতে করতে আপনার অজান্তে পরমাগতি ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করে, ভগবানও এই গতির রথে চড়ে অনাদি কাল থেকে ভক্তের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য আসছেন। তাঁর চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারার আবরণ তাঁকে ঢেকে রাখতে পারল না; মানুষের জন্য ভগবানের অসীম কৌতূহল রয়েছে, সেই কৌতূহলটুকু চরিতার্থ করবার জন্য ভগবান তাঁর সপ্ত স্বর্গ ছেড়ে নেমে আসছেন। ভক্ত মানুষ জীবন এবং মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সেই অমৃতময় ভগবানের লক্ষ্যাভি-মুখে নিত্যকাল চলেছে। এটা হ'ল মানুষের ধর্ম। ২২ সংখ্যক কবিতায় কথিত এই ধর্মের ব্যাখ্যা কবি করেছেন[১]: ধর্ম-বোধের এই যে যাত্রা এর প্রথমে জীবন, তার পরে মৃত্যু, তার পরে অমৃত। মানুষ সেই অমৃতের অধিকার লাভ করেছে। কেন না, জীবের মধ্যে মানুষই শ্রেয়ের ক্ষুরধার-নিশিত দুর্গম পথে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করেছে। সে সাবিত্রীর মতো যমের হাত থেকে আপন সত্যকে ফিরিয়ে এনেছে, সে স্বর্গ থেকে মর্ত্যলোকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। তবেই অমৃতলোককে আপনার করতে পেরেছে। ধর্মই মানুষকে এই দ্বন্দ্বের তুফান পার করে দিয়ে এই অদ্বৈতে, অমৃতে, আনন্দে, প্রেমে উত্তীর্ণ করিয়ে দেয়। যারা মনে করে তুফানকে এড়িয়ে পালানোই মুক্তি, তারা পারে যাবে কী করে? সেই জন্যই তো মানুষ প্রার্থনা করে :—

"অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।"

গময় এই কথার মানে এই যে, পথ পেরিয়ে যেতে হবে, পথ এড়িয়ে যাবার জো নেই। এই মহৎ জীবন-সাধন-তত্ত্বও বলাকা কাব্যের উপজীব্য।

১। সবুজপত্র : আশ্বিন কার্তিক—.৩২৪
(১২শ খণ্ড রবীন্দ্ররচনাবলী, পৃঃ ৫৯৬)

আফ্রিকাকে যেমন দেখেছি

যাদুসম্রাট পি. সি. সরকার

আফ্রিকা বন-জঙ্গলের দেশ। এর অরণ্য-সম্পদই একে আজ জগৎসমক্ষে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। এদেশে যে সবুজ সোনার ক্ষেত দেখা যায় তাতে রয়েছে তৃণভূমি—যেখানে হরিণ, মহিষ, জেব্রা, জিরাফ প্রভৃতি তৃণভোজী প্রাণীরা আনন্দে বসবাস করতে পারে। আবার সেই অসংখ্য হরিণ, মহিষ, জেব্রা, জিরাফ প্রভৃতিকে আহার্য্য করে নিয়ে ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি হিংস্র মাংসভোজী প্রাণীরা বেঁচে আছে। ফলে এটা সিংহেরই রাজত্ব হয়েছে।

কেনিয়া, উগাণ্ডা এবং টাঙ্গানাইকা এই তিন দেশ মিলে বৃটিশ-ইষ্ট-আফ্রিকার সৃষ্টি হয়েছে। জঙ্গলে ঢুকলে দেখা যাবে সিংহরা সব কেনিয়া কলোনীতে আশ্রয় নিয়েছে। কেনিয়া কলোনীতে সিংহই সব চাইতে প্রসিদ্ধ, তাই ঐ দেশের প্রতীক-চিহ্ন পিঙ্গল জটাধারী সিংহ। উগাণ্ডাতে হাতীর পাল বেশী দেখা যায় তাই হাতী হচ্ছে ওদেশের প্রতীক, আর টাঙ্গানাইকা দেশে জেব্রা-জিরাফ খুব বেশী দেখা যায়, তাই ঐ লম্বগ্রীব জিরাফ হচ্ছে সরকারী প্রতীক। বৃটিশ-ইষ্ট-আফ্রিকাতে এক প্রকার চিত্রসম্বলিত "এয়ার লেটার" চিঠির ফর্ম্ম সম্প্রতি চালু হয়েছে—তার মধ্যেও ঐ সিংহ, জেব্রা ও হাতীর ছবি প্রতীক হিসাবে ছাপান হয়েছে।

অনেকেই জীবনে লক্ষ্য করে থাকবেন পাড়াগাঁয়ের রাস্তা দিয়ে যখন মোটর গাড়ী সশব্দে এগিয়ে চলে, ওতে হকচকিয়ে গিয়ে পথের অনেক গরু-বাছুর লেজ উঁচু করে ঐ মোটরের পেছনে পেছনে বহু দূর পর্য্যন্ত ছুটে চলে যায়। মোমবাসা রোডে গাড়ী চলবার সময় কয়েকটা সিংহকেও ঐ চলন্ত মোটরের পেছনে দৌড়ে দৌড়ে চলতে দেখা গিয়েছে। শুনা যায়, ওদের রাজধানী শহর নাইরোবীতে নাকি বছর দশেক আগেও রাস্তার মধ্যে সিংহ চলাফেরা করতো। নাইরোবী শহরটা খুবই আধুনিক, আমাদের বোম্বাই-কলিকাতার চাইতে বহু গুণে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। আজকাল কলিকাতার রাজপথে যেমন বড় বড় গরু চলতে দেখা যায়, মাত্র ২০ বছর আগে ওখানেও নাকি যখন তখন নানা জানোয়ার যাতায়াত করতো—এদের বড় ডাকঘর জি-পি-ও'র কাছে প্রায়ই সিংহের দল এসে বসে থাকতো। দশ-বিশ বছরের খবর জানি না, আমরা ওখানে থাকাকালেই নাইরোবী শহরের উপকণ্ঠে (যেমন কলিকাতা থেকে ঢাকুরিয়া) বড় পিচ বাঁধানো রাস্তার ধারে একটা ছোট্ট খালি পতিত জমির উপর পাঁচটি বড় বড় সিংহ বসে থাকতে দেখা গিয়াছে। তামাসা দেখার জন্য লোকেরা সব মোটর-গাড়ী নিয়ে হাজির হলো—বিকালের দিকে গুণে দেখা গেল দুইশতটি আরোহীসহ মোটর-গাড়ী তামাসা দেখার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাধ্য হয়ে পুলিশ ঐ বড় রাস্তার কয়েক মাইল অংশে "রাস্তা বন্ধ" নোটিশ দিয়ে গাড়ী চলাচল বন্ধ করে দেন। নাইরোবীর গবর্ণমেণ্ট ন্যাশনাল পার্কের কর্ম্মকর্তা সিংহগুলিকে জঙ্গলের দিকে সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য নানা ভাবে বৃথা চেষ্টা করছিলেন। ফলে একটি সিংহী তাঁর মোটর-গাড়ীতে ঝাঁপ দেয়। সামনের কাঁচে বাধা পেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর "মাডগার্ডে" কামড় দিয়ে তাতে ফুটো করে দেয়।

আফ্রিকাতে পথ চলতে বারে বারে কলিকাতার কথা মনে হয়। কলিকাতা মিছিলের শহর, গাড়ীতে চলতে চলতে যখন-তখন একটা বড় বা মাঝারী মিছিলের সামনে পড়লে ধর্ম্মতলার মোড়ে এক-আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা বিচিত্র নয়। মোটরচারীরা তখন মোড় ঘুরিয়ে কয়েক মাইল অন্যদিকে অন্য পথে গিয়ে মোড় ঘুরিয়ে গন্তব্যস্থলে যেতে পারেন, বড় বড় বাসগুলিও অলি-গলি ঘুরে পথ বেছে নেয়, নতুবা ট্রাম গাড়ীর মত মিছিল শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে। আফ্রিকাতেও আমাদিগকে মাঝে মাঝে কলিকাতার ট্রাম-যাত্রীর মত মাঝপথে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছে। যখন-তখন রাস্তার মাঝখানে হয়ত গোটা দশেক হাতী দাঁড়িয়ে রয়েছে, নতুবা হয়ত গণ্ডার কিম্বা সিংহই শুয়ে রয়েছে। গাড়ীতে হর্ণ দেওয়া নিষিদ্ধ, গাড়ীর 'ষ্টার্ট' বন্ধ, দরজা জানালা বন্ধ করে অধীর প্রতীক্ষায় বসে থাকতে হবে যতক্ষণ না পথ পরিষ্কার হয়। গবর্ণমেণ্টের দেওয়া নোটিশ সাইনবোর্ড যখন-তখন নজরে আসে, 'আগে হাতীকে পথ ছেড়ে দিন' 'Elephants have the right of way.' গাড়ীর মোড় ফিরিয়েও লাভ নেই, হয়ত দেখা যাবে পেছনে আরও ১০।২০টা বুনো

হাতী দাঁড়িয়ে আমাদের গাড়ীটাকেই লক্ষ্য করছে। কলিকাতার যখন আংশিক হরতাল হয় তখন শহরটা যেমন থম্‌থমে ভাব মনে হয়—কোথায়ও লোকের জটলা নেই—রাস্তা-ঘাট জনবিরল—আফ্রিকার (বড় শহর কয়টি বাদে) সব অঞ্চলই ঠিক অনুরূপ। বড় বড় প্রশস্ত রাস্তা রয়েছে, কিন্তু লোকজন নেই। এবার যখন কলিকাতায় আন্দোলনের সময় পথ চলতে সব সময় ভয় হচ্ছিল, কোথা থেকে পুলিশের গুলী অথবা কাঁদুনে বোমা ফাটবে, কোথা থেকে কোন্ বিপদ মুহূর্ত্তে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, তেমনি আফ্রিকাতে পথ চলতেও ঠিক সেই রকম ভয়—জঙ্গলের বুনো হাতী, সিংহ, গণ্ডার যে কোন দিক থেকে যে কোন মুহূর্ত্তে বিনা নোটিশে হাজির হতে পারে, নতুবা রাস্তার ধার থেকে একটা বিষাক্ত তীর বা বর্শা এসে আক্রমণ করতে পারে। পাঙ্গাওয়ালার ধারালো পাঙ্গাও যে কোন মুহূর্ত্তে জীবন-লীলা শেষ করে দিতে পারে। পাঙ্গাওয়ালারাও মাউ মাউদের মত গোঁড়া দেশভক্তের দল, তারা সন্ত্রাসবাদী, আফ্রিকার ভূ-খণ্ড থেকে শ্বেতাঙ্গ এবং এশিয়াবাসীদের সকলকে উচ্ছেদ করে তারা প্রকৃত স্বরাজ আনতে চায়। শ্বেতকায় লোকেরা সর্ব্বদাই বিশেষ সতর্ক হয়েই রাস্তায় বের হন, ভারতীয়দের মধ্যে এখনও ততটা ভয় প্রবেশ করে নি। আফ্রিকার লোকেরা পণ্ডিত নেহরুর পররাষ্ট্র নীতিতে সন্তুষ্ট, ভারতের পঞ্চশীল নীতিতে তারা বিশ্বাসী, কাজেই ভারতকে বন্ধু-রাষ্ট্র বলেই তারা গ্রহণ করেছে। তবে মুখে এরা ভারতকে যতই ভাল বলুক, বিশ্বাস করুক, ওরা এ কথা ভাল ভাবেই বুঝে নিয়েছে যে, আফ্রিকার বড় বড় ব্যবসায়, শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতিতে ভারতীয়রাই সর্ব্বময় কর্তৃত্ব নিয়ে আছে। তারা স্বদেশে পরদেশীদের অধীন হয়ে আছে। শ্বেতাঙ্গদের একবার উচ্ছেদ করতে পারলে তাদের পরবর্ত্তী লক্ষ্যই হবে এশিয়াবাসীগণ। ওদের বর্ত্তমান শ্লোগান হচ্ছে, "Africa for the Africans" "আফ্রিকা শুধু মাত্র আফ্রিকাবাসীদের জন্যই"। কাজেই তিনটি পুরা দল হয়েছে—একটা আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের, দ্বিতীয়টি তাদের বিরোধী দল শ্বেতাঙ্গ সমাজ আর তৃতীয়টি হচ্ছে কথামালার বাদুড় একবার এদলে আবার ওদলে অর্থাৎ এশিয় (অর্থাৎ ভারতীয়) সমাজ। ওরা আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতীয়দিগকে ঠিকমত বিশ্বাস করতে পারছে না, সর্ব্বদাই সন্দেহের চোখে দেখছে। সামান্য বিশ্বাস-ভঙ্গের প্রমাণ পেলেই ওরা সঙ্গে সঙ্গে বিচার করে দেয়।

আফ্রিকাতে কালো আদমীদের মধ্যে অনেক রকম ভাষা প্রচলিত আছে,তবে অধিকাংশ লোকেই সোয়াহিলী (Swahili) ভাষা জানে এবং বুঝতে পারে। সোয়াহিলী ভাষার মাধ্যমে এদের সঙ্গে কথা বললে সহজেই বন্ধুত্ব করা যায়। এরা দুর্দ্ধর্ষ হলেও খুব বন্ধু-বৎসল। ভাল ব্যবহার করলে, বন্ধুর মত চললে এদের কাছে খুবই সাদর ও সদয় ব্যবহার পাওয়া যায়। কিন্তু এদের বিরুদ্ধে চললে কোন অজানা সংকেতে সারা বন-ভূমিতে এদের সাঙ্কেতিক বার্ত্তা অদৃশ্য ভাবেই ছড়িয়ে পড়ে, এদের চক্ষু, এদের হাত এড়ানো অসম্ভব। গাছের ডালে এরা মাদল ঝুলিয়ে রাখে, সেই মাদল বাজিয়ে এরা সমস্ত জঙ্গলে সাঙ্কেতিক বার্ত্তা জানিয়ে দেয়। যে অঞ্চলে কোথাও কিছু নাই—মুহূর্ত্তের মধ্যে শত শত বন্ধু এসে জুটতে পারে, আবার পরক্ষণে তারা সবাই অদৃশ্য হতে পারে—এ যেন সত্যিকারের ইন্দ্রজাল—মুহূর্ত্তে আবির্ভাব আর মুহূর্ত্তে জনগণের অদৃশ্য হওয়া এটা ওদের জঙ্গলের ম্যাজিক—ওখানে আমার ম্যাজিক অক্ষম।

ইংরেজেরা ওদেশে রাজত্ব করতে গিয়ে বহু নূতন নূতন পিচ ঢালা প্রথম শ্রেণীর রাস্তাঘাট, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিও, এরোপ্লেনের সুন্দর বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। ওখানে মোটরে রাস্তা চলতে অসুবিধা নেই। আমরা নাইরোবী শহরে খেলা শেষ করে পর দিন ৪০০ মাইল দূরে জিন্‌জা চলে গিয়েছি, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মোটরে। উগাণ্ডার রাজধানী কাম্পালা শহরে নরম্যান টকিজে আমাদের খেলা হ'ল কিন্তু আমরা তখন ঠিক ৫৫ মাইল দূরে জিন্‌জা শহরের রিপন ফলস্ হোটেলে থাকতুম। আমরা পুরা এক সপ্তাহ প্রত্যেক দিন এই ৫৫ মাইল রাস্তা মোটরে গিয়ে সেখানে খেলা করে রাত্রিতে আবার এই ৫৫ মাইল দূরে চলে আসতাম। যেতে মাত্র এক ঘণ্টা সময় লাগে, যেন বাগবাজার থেকে বালীগঞ্জ। আমাদের ঐ রিপন ফলস্ হোটেলটা ছিল ভিক্টোরিয়া হ্রদের একদম উপরে—রিপন ফলসের ধারে অর্থাৎ নীল-নদের উৎসমুখে। এই হ্রদে কেউ স্নান করে না, কারণ হাঙ্গর, কুমীর ও জলহস্তীতে এর জল ভর্ত্তি। ছিপ দেখলে তখনই সুতা কেটে নিয়ে যায়। লেকের জলে একটু লক্ষ্য করলেই অসংখ্য জলহস্তী দেখতে পাওয়া যায়। আমরা খেলা শেষে রাত্রিতে হোটেলে ফিরতে এসে আমাদের হোটেলের গেটের কাছে দেখি দুইটি বড় বড় জলহস্তী দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাদের মোটরের তীব্র আলোক দেখে ওরা পিচ-ঢালা রাস্তা অতিক্রম করে নীচে জলে নেমে গেল। একটু সামনে এগিয়ে দেখি আরও চারিটা অনুরূপ জলহস্তী রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে—

সেগুলোও জলে নেমে গেল। প্রথম প্রথম খুবই ভয় পেয়েছিলাম, পরে ওটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। আফ্রিকার জঙ্গলে 'সিম্বা', (সিংহ), জলে কুমীর, গাছে সাপ, ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে আছে হাতী, বাঘ, গণ্ডার নইলে জংলীদের দল। জলহস্তী রয়েছে জলে ও ডাঙ্গাতেও। কাজেই 'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা'? তাই ত শ্বেতাঙ্গেরা সকলে একজোট হয়ে থাকে এবং একজোট হয়ে চলে। শ্বেতাঙ্গেরা কৃষ্ণাঙ্গদের সব রকম ছোঁয়াচ থেকেই দূরে দূরে থাকতে চায়।

ওদের লাইব্রেরীতে গিয়ে উগাণ্ডার ইতিহাস পড়ছিলাম। খুব বেশী দিনের কথা নয় ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা নীলনদের উৎস সন্ধান করতে করতে ওরা রিপণ জলপ্রপাতের খোঁজ পায়। তার পর তাদের ওখানে যাওয়া আসা সুরু হয়। ১৮৭৫ সনে ষ্টানলি সাহেব বিলাতের 'ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকাতে তাঁর বিখ্যাত আবেদন করলেন ওদেশে মিশনারী পাঠাবার জন্য। মিশনারীরা ধর্মপুস্তক হাতে নিয়ে এলো, তার পর মিরজাফর, মিরকাশিম, জগৎশেঠ প্রভৃতির ঘটনার পুনরাবৃত্তি। বণিকের মানদণ্ড সেখানে রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হয় নি। ওদেশের ইতিহাস পাওয়া যায় জুলু সর্দারের ভাঙ্গা ইংরাজীর মধ্যে One come, Bookman come! Two come, Wine bottle come! Three come, Gunboat come.

অর্থাৎ "একজন এলো, বই হাতে এলো! দুইজন এলো কী মদের বোতল এলো!" তিনজন এলো অর্থাৎ যুদ্ধজাহাজ এলো।" ঐ আধ-ভাঙ্গা ইংরাজীতে লুকানো রয়েছে ওদেশে শ্বেতাঙ্গদের কলঙ্কিত ইতিহাস।

আফ্রিকাবাসীরা 'আদিম' 'অসভ্য' তারা **dark continent**-এর লোক, সেখানে সভ্যতার আলোক-বর্ত্তিকা প্রবেশ করে নি—এই অছিলায় ওদেশের শাসক-সম্প্রদায় ওদের সংস্কৃতির ঐশ্বর্য্যের প্রতি, তাদের জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি কোনরূপ দৃষ্টি দেন নাই। আমরা লর্ড ক্লাইভকে ভারতীয় সংস্কৃতি আর ঐতিহ্য কত্তা উপলব্ধি করতে দেখেছি!

আজ আফ্রিকাবাসী জেগে উঠেছে। মন্বন্তর মহামারীতে তারাও মরে নি। ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়া, বিষাক্ত টেৎসী মাছির কামড়, পাহাড়ী ভয়ঙ্কর বিষধর সাপ প্রভৃতি নানা প্রকার বাধা বিপত্তি বিপর্য্যয়ের সঙ্গে লড়াই করে যে জাতি বেঁচে আছে। তাদের প্রাণশক্তির প্রশংসা করতে হয়। বিচিত্র ওদের দেশ। কোথায়ও বৃষ্টি-শূন্য মরুময় দেশ, কোথাও অতিবর্ষণের ফলে পথঘাট একাকার হয়ে জলাভূমিতে পূর্ণ। কোথায়ও হিংস্র জন্তু-জানোয়ার পূর্ণ শ্বাপদসঙ্কুল অধ্যুষিত নিবিড় বনভূমি, কোথায়ও বিরাট জলপ্রপাত, বিশাল খরস্রোতা নদ-নদী। ওদেশে বাস করতে হলে সাহস, স্বাস্থ্য—শারীরিক ও মানসিক বলের প্রয়োজন। কৃষ্ণ মহাদেশের কৃষ্ণকায়দের প্রাকৃতিক সম্পদ যে দেহ, তার শক্তির অপব্যবহার যাঁরা করিয়েছেন, এবার তাঁরা তার জবাব দেবার জন্য দাঁড়িয়েছে। ওরাও প্রাচীনতম মহাদেশসমূহের অন্যতম একটি মহাদেশের অধিবাসী—একথা যেন আমরা ভুলে না যাই।

সূর্য্যধন্যা

শ্রীতপতী চট্টোপাধ্যায়

পদ্মপাতায় শিশির বিন্দু
আমার লেখা
তারি মাঝে জাগে সূর্য্য তোমার
আলোর রেখা।
তারি মাঝে তব বিশ্বলীলার
ক্ষুদ্র লিপি।
সূর্য্য, আমার শিশির বৃন্তে
উঠিছে কাঁপি।

আমি শুধু মোর
কম্পিত হাতে অঞ্জলিয়া
তোমারই দৃষ্টি লভিতে দিলাম
সমর্পিয়া।
তোমারই স্পর্শে হীরক-দ্যুতিতে
উঠুক জাগি।
চির সুন্দর সাথে মানবের
মিলন রাখি।

ভূমির নূতন স্বত্ব স্বামিত্ব

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

বাংলা প্রবাদ আছে, "গাছে না উঠতে এক কাঁদি"—কিছু আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ফলে লোভ জন্মিয়া গেল এবং তাহার প্রাপ্তি সম্বন্ধে মনে ধারণা স্থির করিয়া লাফালাফি করায় কেবল যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, তাহা নহে, লোকসমাজে হাস্যাস্পদ হইবার সম্ভাবনা দাঁড়াইয়া যায়। যেখানে ব্যাপারটা কেবল হাস্যরসের সেখানে কোনও বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ না করিলেও চলিয়া যায়, কিন্তু একজনের যাহা খেয়াল তাহা যদি অপরের মারাত্মক অবস্থা টানিয়া হাজির করে, তখন তাহা করুণ রসে পর্য্যবসিত হইয়া যায়।

ভারত স্বাধীন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের রাম রাজ্যের দশরথ জনক বশিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক রাম সীতা রাম-ভক্তের দল যে সকল দেশ শত শত বৎসর স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছে, অনুশীলন, ভূয়োদর্শন, প্রয়োগ পরীক্ষা দ্বারা আজও যে সকল মীমাংসায় উপনীত হইতে শঙ্কা সঙ্কোচ বোধ করে, সে সকল কাজের ভার লইবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে। ক্ষতি ছিল না, যদি নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি লইয়া এই পরীক্ষা করিতে পারিতেন। যাঁহারা পদাধিকারে আত্মরক্ষায় সমর্থ, তাঁহারাই আজ অপরের সর্ব্বস্ব লইয়া ছিনিমিনি খেলার নেশায় মাতিয়া উঠিয়াছেন।

আজ যাঁহারা শ্রেষ্ঠস্থানে গদি আঁকড়াইয়া বসিয়া আছেন, তাঁহাদের সেখানে প্রায় মৌরসীস্বত্ব জন্মিয়াছে। দান-খয়রাত হিসাবে যাহাকে যাহা বণ্টন করিয়া দিতেছেন তাঁহারা নিতান্ত বশংবদ না হইলে ঐ কৃপার ছিটেফোঁটাও পাইতেন না এ কথা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে। কাজে কাজেই উচ্চগ্রামের কয়টি মহাপুরুষ যাহা ভাবিতেছেন, তাহাই গড্ডলিকার মত অপরে অনুসরণ করিতেছে, জম্বুকদলের ন্যায় একই সময় ঐক্যতান বাদন দ্বারা সমর্থন জানাইতেছেন। ইঁহারা মনে করেন "after us the deluge", আমাদের পর আর রাষ্ট্রের কল্যাণকামী বা কল্যাণকারী আদমি কেহ থাকিবে না, সুতরাং আমরা ভারতের মঙ্গলের আর বাকী-বকেয়া রাখিয়া যাইব না। তাহাতে দু'চার পুরুষ, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, যদি নিঃস্ব, সর্ব্বস্বান্ত, ক্লিষ্ট, খিন্ন হয়, তাহাতে দৃক্পাত করিবার প্রয়োজন নাই। জগন্নাথের রথ ঘর্ঘর শব্দে চলিবে পাশে যদি দু'চারটা সারমেয় পিষ্ট হইয়া মরে, বা রুষ্ট বিরক্ত হইয়া চীৎকার করে তাহাতে কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। যাহাদের কিছু নাই, তাহাদের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান, জমি, আয়ের পথ যদি দেওয়া নাইই হইয়া থাকে, তাহাদের ভোটদানের শক্তি দেওয়া হইয়াছে, প্রতিনিয়ত অজস্র স্তোক দেওয়া হইতেছে। অনশনক্লিষ্ট লোককে তণ্ডুল কণা দিয়া জীবন রক্ষা করা যায়, তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি করা সম্ভব নয়, বরং বাঁচিয়া থাকিবার আশায়, স্বভাবের নীতিতে সে ক্ষুধার তীব্রতা বৃদ্ধি অনুভব করে। তাহাকে রক্ষা করিবার আশা-ভরসা দিয়া মুখ ফিরাইয়া তামাসা 'মস্করা' করিলে তাহার পূর্ব্ব কৃতজ্ঞতা পরিবর্ত্তিত হইয়া দাবির তীব্রতা বাড়ে, না পাইলে তিক্ততা আসিয়া সেই স্থান অধিকার করিয়া বসে।

দেশের মধ্যে দুঃখ দারিদ্র্য অনশন অনাহার স্বাস্থ্য-হীনতা প্রভৃতি দূর করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া স্বাধীনতার জয়যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। মুদ্রিত পৃষ্ঠায় প্রচার মারফত লোককে বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে, তাহাদের দুঃখ হ্রাস পাইতেছে, প্রচুর আর্থিক উন্নতি হইতেছে। এবং দেশ-বিদেশে ভারতের সম্ভ্রম বাড়িতেছে। কি হইতেছে তাহা লইয়া বিচারের প্রয়োজন বর্ত্তমানে নাই। যে উপায় অবলম্বন করা হইতেছে তাহাতে লোক কতটা আনন্দ পাইতেছে, কতটা লাভবান হইতেছে, তাহার বিষয় আলোচনা করা যাইতে পারে।

দেশে নূতন সম্পদ উৎপাদন ও বৃদ্ধির নানা চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু যাহাদের নাই তাহাদের হঠাৎ সম্পদ বৃদ্ধি করিতে গেলে যাহার ইচ্ছা আছে তাহা আত্মসাৎ করিয়া ছিটেফোঁটা বণ্টন করিয়া দিলে উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে সিদ্ধ হইতে পারে। সমস্ত কল-কারখানা, অপরাপর উৎপাদনের ক্ষেত্র সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় নাই, কিন্তু সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য পড়িল ভূমির মালিকানা বা অপর স্বত্বের উপর।

যাহার বেশী (কতটা হইলে "বেশী" হইবে তাহার বিচার শেষ হয় নাই) জমি আছে, তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট

পরিমাণ জমি রাখিয়া বাকীটা কাড়িয়া লও। যত মধ্যস্বত্বভোগী আছে, তাহাদের নির্ব্বিচারে তাড়াইয়া দাও। খেসারত যাহা দেওয়া হইবে, যে ভাবে এবং যত দিনে দেওয়া হইবে তাহাই মানিয়া লইতে হইবে। ভোট আছে, তাহার জোরে যাহা ইচ্ছা পাশ করাইয়া লওয়া হইবে। যদি দেশের বর্ত্তমান আইনের অমর্য্যাদা হইয়া থাকে, তাহা জরুরী আইন (ordinance) দ্বারা সরাসরি সিদ্ধ করাইয়া লইতে হইবে, পরে তাহা বিধিবদ্ধ আইন বলিয়া পাস করিয়া লইলে সকল হাঙ্গামা চুকিয়া যাইবে। ইহাতে যদি বারে বারে ভারতের সংবিধান (Constitution) রদবদল করিতে হয় এবং তাহার জন্য যদি জগতের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে হয়, তাহাতেও কোনও আপত্তি দেখা যায় না।

সারা ভারতের জমির মালিক হইল ভারত সরকার। প্রধান উদ্দেশ্য, দেশের শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং তাহার সুষ্ঠু পন্থাস্বরূপে যাহাদের জমি নাই, অথচ কৃষিকার্য্যে অগ্রসর স্থান করে, তাহাদের জমির মালিক করিয়া দেওয়া। তাহা ছাড়া মালিক-প্রজা সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ, ক্ষুদ্রাংশে বিভক্ত জমির একত্রীকরণ, সমবায় কৃষি প্রবর্ত্তন প্রভৃতি নানা উপায় অধিকার ও অবলম্বন করা হইয়াছে বা হইতেছে।

কার্য্যক্ষেত্রে যাহা ফল হইয়াছে, তাহা মোটেই সন্তোষজনক নয়। যখন সমস্ত মালিকানা লোপ করার কথা উত্থাপিত হয়, তখন যাঁহারা ইহার ত্রুটি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্বার্থদুষ্ট ও দেশদ্রোহী বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। যাহাদের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া পথের ভিখারী করা হইয়াছে, তাহাদের আপত্তি দেশের জন্য স্বার্থত্যাগের দোহাই দিয়া চাপা দেওয়া হইয়াছে। কত লোক কত ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ভিন্ন পথে কিছু উপার্জ্জন আর কিছু খাজনা এবং জমির নিজ চাষ দ্বারা যাঁহারা পল্লীর মধ্যে সম্ভ্রান্ত বলিয়া বিবেচিত হইতেন, তাঁহারা আজ আর সংসার প্রতিপালনের পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। যাঁহারা 'জমিদার', 'রাজা' প্রভৃতি খ্যাতি লইয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা না হয় ছাড়িয়া দেওয়া গেল, কিন্তু ইঁহাদের অনেকেই যে রাজা প্রজার কাছে নাম যশ কিনিবার জন্য অনেক সৎকাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহা আজ আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এখন প্রত্যেককে অতি নগণ্য ব্যাপার, যাত্রা, কথকতা, পুতুলনাচ প্রভৃতির জন্য গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইতে হয়। মনে হয় গবর্ণমেণ্ট এইরূপ অবস্থা মনে মনে গড়িয়া লইয়া আপন পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছে। যখন কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের হাত হইতে অন্য দলের হাতে শক্তি চলিয়া যাইবে তখন আবার কেরলের মত বে-আইনী আন্দোলন দ্বারা শক্তিলাভের চেষ্টা করিতে হইবে।

আর কোনও সম্পত্তি এভাবে "জবরদখল" হয় নাই। শহরের দিকে এমন এক-একখানা ইমারত আছে যাহার বাৎসরিক আয় একটা বড় জমিদারীর আয় অপেক্ষা বেশী এবং এইরূপ বাড়ী। একক বা একটি পরিবারের কতগুলি আছে, তাহা গবর্ণমেণ্ট জানিয়াও জানিতে চাহে না। ব্যাঙ্কে জমা টাকার হিসাব নাই—এত টাকার মালিকও ট্যাক্স দিয়া মুক্তি পাইয়াছে, রুজি-রোজগারের পথ তাহার বন্ধ হয় নাই। পল্লীর লোক দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর হইয়াছে; তাহাদের সন্তান-সন্ততির শিক্ষা, নূতন ব্যবসা-বাণিজ্যের সামান্য মূলধনের পথও বন্ধ হইয়াছে। কৃষির উপরও ইনকাম ট্যাক্স বা আয়কর আছে। সে টাকা দিয়াও জমির মালিক মুক্তি পায় নাই। ভোট-শক্তি দিবার পর কৃষি সম্পর্কিত লোকে জমি পাইয়া যাহাতে দাতাকে দু'হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করে এবং অন্য কোনও পক্ষে ভোট দিতে না যায়, ভূমি ব্যবস্থা তাহার অন্যতম কারণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

কয়েকটি রাজ্যে জমির উপর আক্রমণ সম্পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এইরূপ সরকারী দখলীকৃত জমির বণ্টন সম্পূর্ণ হয় নাই। যখন সকল জমিতে চাষ হওয়া প্রয়োজন ছিল, তখন গবর্ণমেণ্ট মালিক জমি পাইয়া "কালনেমির লঙ্কা ভাগ" পর্ব্ব আলোচনা করিয়া সন্তুষ্ট আছেন। বহু দরিদ্র চাষী জমির সাময়িক বা স্বল্প-মেয়াদী পাট্টা, জমিদারের নিকট বীজ ও হালের জন্য ঋণ লইয়া চাষ করিত। অনেক ক্ষেত্রে ব্যবস্থাটা হয়ত তাহার পক্ষে সুবিধাজনক হইত না; কিন্তু সে যাহা হউক পাইত এবং জমি বিনা চাষে পড়িয়া থাকিত না। বর্ত্তমানে নানাভাবে কৃষিঋণ দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট উত্তমর্ণ, তাহার টাকা আদায় করিতে সময় লাগে না। সার্টিফিকেট ঝাড়িয়া দিলে টাকা আদায় হইবার কথা। সময় সময় সে কারণে বাধ্য হইয়া তাহাকে টাকার কিস্তি পরিশোধের সময় বৃদ্ধি করিয়া লইতে হয় এবং তাহার জন্য যে "ত" খরচ পড়ে তাহা জমিদারকে দেয়-খাজনা অপেক্ষা অনেকক্ষেত্রেই বেশী।

প্রজা লইয়া বা জমির বিলি লইয়া কারবার অপেক্ষাকৃত সহজ। যাহারা জমিতে হাল দিয়াছে, ভাগে চাষ করিয়াছে, জমি নূতন বন্দোবস্ত করিয়া লইতে প্রস্তুত

আছে, এইরূপ চাষীকে জমি দিয়া বসাইয়া দেওয়া সহজ। কিন্তু তাহাদের খাজনা নির্দ্ধারণ করা বা নিরিখ বাঁধিয়া দেওয়া তত সহজ ব্যাপার নয়। অনেক সময় জমিদারকে যাহা দিতে হইত, তাহা গবর্ণমেন্টকে দেয়-খাজনা অপেক্ষা বেশী ছিল। তখন ভিন্ন ভিন্ন জমিদার ছিল, ভিন্ন ভিন্ন স্বত্বে জমি বিলি হইত, সুতরাং খাজনার তারতম্য তত বড় করিয়া মনে হইত না। এখন এক মালিক, পাশাপাশি একই গুণের জমিতে ভিন্ন খাজনা হইতে পারে না। সুতরাং নূতন করিয়া খাজনার পরিমাণ ঠিক করা দরকার। ইহা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আনকোরা' ফেরত কতগুলি যুবক (ছোকরা)কে ধরিয়া এই সকল কূট সমস্যার সমাধান করিবার ব্যবস্থা করিলে যাহা হইবার তাহার কোনও ত্রুটি হয় নাই। প্রজারা "ত্রাহি! ত্রাহি!" ডাক ছাড়িতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

যাহাদের জমি কাড়িয়া লওয়া হইল, তাহাদের দশা সকল দুর্দ্দশাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। কাহার জমি, কি স্বত্ব, কত অংশ প্রভৃতি সংবাদ সংগ্রহ করিতে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। খেসারত হিসাবে যাহার সামান্য পাওনা তাহাকে দিবার একটা চেষ্টা হইয়াছে। এ টাকা আদায় করিতে প্রাপ্য টাকার প্রায় সবটাই শেষ হইয়া যায়। সরকারী চিঠি যায়, মণিঅর্ডার খরচ দিয়া টাকা লইতে ইচ্ছুক কি না। যাহারা সম্মতি দেন এবং প্রায় প্রত্যেকেই, তাঁহারা কিন্তু টাকা পান না। আপিসে খোঁজ করিলে শোনা যায় যে, পোষ্ট-আপিসকে টাকা দিবে অথচ যাহারা এত খাটিয়া বিল তৈরীর পর টাকা দিবার ব্যবস্থা করিল, তাহারা মাঠে মারা যাইতে পারে না। সুতরাং টাকা আর যায় না। বেশী টাকা যাহাদের পাওনা, তাহাদের আপদ বেশী। একটা বিষয় বলিয়া রাখা ভাল। জমি দখল করিবার গুজব যখন চলিতেছিল, তখন বেশী জমির মালিক নিজেদের মধ্যে পুরা কোর্ট ফি অর্থাৎ সরকারের প্রাপ্য টাকা দিয়া কিছু কিছু জমি হস্তান্তর করে। ইহা সম্পূর্ণ আইনানুগত ভাবে করা হইয়াছে। পরে সরকারী আইন করিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট বিগত বৎসর হইতে সমস্ত ট্রান্সফার (হস্তান্তর) অসিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করা হয়। মালিক ভিন্ন হইয়া গেল, জমির বণ্টন হইল, সরকারী প্রাপ্য অর্থ মিলিল, তথাপি প্রগতিবাদীদের চাপে গবর্ণমেণ্ট এই আইন পাশ করিতে বিরত হয় নাই। যাহা হউক, লোকের আপত্তিতে প্রধান সরকারী আইন পরামর্শদাতার নিকট মতামত জানিতে চাহিলে, গবর্ণমেণ্টের আইন যে সম্পূর্ণ বে-আইনী হইয়াছে, তাহা জানিতে পারা যায় এবং অন্ততঃ পশ্চিম বাংলায় তাহা প্রত্যাহৃত হয়।

ইহার পর নিজেদের মধ্যে প্রচণ্ড কোন্দল আছে। প্রতি রাজ্যে এক মালিকের উচ্চতম অধিকারের জমির পরিমাণ লইয়া ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। এখানে মনে হয় না, ভারত (পাকিস্থান বাদে) এক অখণ্ড রাষ্ট্র এবং তাহা এক সংবিধান মতে শাসিত এবং এক আর্থিক-নীতি মতে চালিত হয়। প্রতি রাজ্যকে কতগুলি নিজস্ব ক্ষমতা দেওয়া আছে এবং তাহাতে রাজ্যে রাজ্যে বহু বিভেদ দেখা দিতেছে। জমিদারী বিলোপ ব্যাপারে তাহার কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই। জমির পরিমাণ ছাড়াও খেসারতের হার লইয়া আরও গুরুতর গোলযোগ দেখা যাইতেছে। এখানে অবশ্য জমির গুণের উপর খেসারতের তারতম্য নির্ভর করিতেছে। একই জেলায় এবং জেলায় জেলায় জমি গুণান্তর আছে আর সেই চুলচেরা ব্যতিক্রম লইয়া বিতণ্ডা পাকিয়া উঠিতেছে। যাহাদের উপর গুণের তারতম্য বিচার করিয়া খেসারতের পরিমাণ স্থির করিবার ভার দেওয়া হইতেছে, ইহাদের অধিকাংশই এই কাজে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; তাহার উপর নিক্তির তৌল করিতে যেখানে অভিজ্ঞ লোক হিমসিম্ খায়, সেখানে এই নবাগতদের যন্ত্রণার অবধি থাকে না। তাহার উপর প্রলোভন চারিদিকে ছড়াইয়া আছে। তাহা চৌকি দিবার জন্য আবার এন্‌ফোর্সমেণ্ট ব্র্যাঞ্চ (Enforcement Branch) পুলিস লাগাইতে হয়।

মধ্যস্বত্বভোগী বিতাড়নপর্ব্ব প্রায় সকল রাজ্যে সমাপ্ত হইয়াছে। এখন জমির পূর্ব্বতন মালিকদের কতটা প্রত্যর্পণ করা যায়, তাহা লইয়া বিচার-বিতর্ক চলিতেছে। কয়েকটি রাজ্যে আইন দ্বারা জমির উচ্চতম সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে।

আসাম রাজ্যে ৫০ একর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

পূর্ব্বতন হায়দরাবাদ রাজ্যে ১৮ হইতে ২৭০ একর জমি মালিকের অধিকারে থাকিতে পারিবে।

জম্মু ও কাশ্মীর একেবারে চুল চিরিয়া হিসাব করিয়াছে—অর্থাৎ ২২'৭ একর। (এই মাপ লইয়া কত গণ্ডগোলের সম্ভাবনা রহিয়া গেল, তাহার হিসাব করা কঠিন ব্যাপার)।

পেপ্‌সু (বর্ত্তমানে পঞ্জাবের অন্তর্ভুক্ত) দিয়াছে ৩০ ষ্ট্যাণ্ডার্ড (সর্ব্বক্ষেত্রে গৃহীত) একর। তাহাতে শেষ হয় নাই; উৎখাত লোকের পক্ষে ৪০ ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর।

পশ্চিম বাংলায় ঢালা আইনে ২৫ একর রাখিতে পারা যাইবে।

হিমাচল প্রদেশে আবার নূতন ব্যবস্থা আছে। চম্বা জেলায় ৩০ একর আর যেখানে জমি একর পিছু ১২৫ টাকা দাম, সেই সকল অঞ্চলেও ৩০ একর। অন্যত্র ভিন্ন ব্যবস্থা পালিত হইবে।

আবার কতগুলি রাজ্য এতদূর অগ্রসর না হইলেও, সেখানে আইনকল্প নীতি আরোপ করিয়া জমির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এইখানেই তারতম্য আরও বেশী করিয়া নজরে পড়ে।

পরিকল্পনা বিশারদগণ কতগুলি রাজ্য সম্বন্ধে তাঁহাদের নির্দ্দেশ দিলেন। কার্য্যক্ষেত্রে তাহা প্রয়োগ করিতে গিয়া নানা গণ্ডগোলের পরিচয় পাওয়া গেল। সুতরাং এখনও শেষ মীমাংসা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

বোম্বাই—(অবিভক্ত) রাজ্যে ১২ হইতে ৪৮ একর জমি মালিকদের অধিকারে রাখিবার শুভ ইচ্ছা ছিল। এখন মনে হইতেছে একর হিসাবে না ধরিয়া আয়ের পরিমাণ হিসাবে জমির পরিমাণ বাঁধিয়া দিলে ভাল হয়। সুতরাং যে জমি হইতে বৎসরে ৩,০০০ (বা ৩,৬০০) টাকা আয় হয় এমন জমি দেওয়া যাইতে পারে।

উত্তর-প্রদেশে ১০ একর সীমা ছিল; বর্ত্তমান আলোচনায় পড়ে মোটামুটি ভাল জমি (of fair average quality) ৪০ একর লইয়া কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

অন্ধ্রে হিসাব আরও একটু চড়া। তাহারা বলিতেছে, বাৎসরিক ৪,৫০০ (বিকল্পে ৫,৬০০) টাকা আয়ের মত জমি চাই। (বোধ হয় সেখানের জমিদাররা বেশী জমি হস্তান্তর করিতে পারেন নাই ! তাহাতে জমির দাবি একটু উচ্চগ্রামে ধরা আছে)।

কেরল ক্ষুদ্র রাজ্য, সুতরাং তাহারা বেশী জমি ছাড়িতে নারাজ। তথাপি যে মান নির্দ্ধারিত হইবার আলোচনা চলিতেছে, তাহার ফাঁকে কিছু জমি বাহির হইয়া যাইতে পারিবে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জমি ("Class I land") ১৫ একর দেওয়া স্থির হইতেছে। সুতরাং অন্যান্য জমির গুণাগুণ বিচারে ১৫ একরের বেশী জমি পড়িয়া যাইবার কথা। অবিবাহিত লোকের উপর তাহাদের আক্রোশ আছে। ঐ শ্রেণীর হতভাগারা অর্দ্ধেক জমি পাইবে। প্রকারান্তরে ইহাদের বিবাহে উৎসাহ দেওয়া হইতেছে, যেন দেশে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন। এখানে কেরলের খুব দোষ নাই, কারণ কেন্দ্রীয় সরকার অবিবাহিত লোকদের উপর উচ্চহারে আয়কর আদায় করিয়া থাকে।

বিহার রাজ্যে ৩০ হইতে ৯০ একর পর্য্যন্ত জমি রাখিতে পারা যাইবে। সরকারী খাল হইতে সেচপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ ৩০ আর পঞ্চম শ্রেণী জমি হইলে ৯০ একর। এখন এক হইতে পাঁচ, আরও আছে কি না জানি না, শ্রেণীর জমি ভাগ করা ক্লেশকর ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কতদিনে ইহার মীমাংসা হইবে, তাহা কেবল বিহার রাজ্য তথা ভারত সরকার জানেন ! এই গুণের বিচার করিয়া খেসারত নির্দ্দিষ্ট হইবার কথা। এমত অবস্থায় বলা যায়, অনেককে জীবিতকালে কিছু দিতে ত হইবেই না; দ্বিতীয়-তৃতীয় পুরুষ পর্য্যন্ত নিশ্চয়ই গড়াইয়া যাইবে। আর সেই সময় বংশধর অ শীদারের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পাইবে, নূতন আইনে কন্যাও উত্তরাধিকারি(ণী)—তখন সকলের এক মত হইবার জন্য গবর্ণমেন্ট নির্দ্দেশ দিবে। উত্তরাধিকার সার্টিফিকেট, উইল, প্রবেট, মৃত্যুকর, আয়কর (বাকী-বকেয়া) প্রভৃতি সব চুকাইয়া খেসারতের টাকা লইতে গেলে হয়ত ঘর হইতে রাজপুরুষদিগকে বারে বারে এবং বৎসর পর বৎসর বিরক্ত করার জন্য ঘর হইতে টাকা লইয়া গিয়া খেসারত দিয়া আসিতে হইবে।

পুরাতন প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসা যাক্। মধ্যপ্রদেশে রাজপুরুষদের দয়া আছে। বিহারে যেখানে "ইরিগেটেড" জমি হইলে ৩০ একর রাখা সম্ভব, মধ্যপ্রদেশে বারোমাস সেচপ্রাপ্ত (perennially irrigated) জমি ৩৫ একর আর শুকনাখরা জমি হইলে ৯০ একর রাখা চলিবে।

মহীশূরে ৪,২০০ টাকা আয়ের জমি দিবার প্রস্তাব আছে।

রাজস্থানে একটু অনুর্ব্বর মরুজাতীয় জমির প্রাধান্য, সেখানে সাধারণত: ৩০ একর হইলেও বিশেষ ক্ষেত্রে ২৫০ একর পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।

উড়িষ্যা ৩৩ হইতে ৯৯ একর জমি গুণানুসারে ছাড়িবার কথা।

এ সকল রাজ্যে প্রত্যেকের মধ্যে খুঁটিনাটি লইয়া বহু বিতণ্ডা, গোপন কলহ, সরকারী মতদ্বৈধ, "ত্রৈধ" "চতুর্থ" প্রভৃতি আছে। সম্প্রতি মাদ্রাজের ব্যাপার লইয়া একটু জরুরী আলোচনা হইতেছে, তাহারই ভিতরের খবর বাহিরে কিছু প্রকাশ পাইয়াছে।

পরিবারের জনসংখ্যা ৫ জনের বেশী না হইলে ৩০ একর জমি পাইবার কথা উপরন্তু স্ত্রীধন হিসাবে মহিলারা ৩০ একর পর্য্যন্ত পাইবার যোগ্যতা ধারণ করে। পরিবারে ৫ জনের উপর প্রতি জন পিছু আরও ৫ একর জমি পাওয়ার সম্ভাবনা। গবর্ণমেন্টের শেষ মীমাংসার পূর্ব্বে আর দু'তিনটি সন্তান হইলে লাভ বেশী হইবে। ফলের

বাগান আবাদ (চা কফি প্রভৃতি) এর কোনও বিপদ নাই, যত ইচ্ছা জমি রাখা সম্ভব। দেব দেউল প্রভৃতির সীমা ২০০ একর পর্য্যন্ত। খুঁটিনাটি আরও আছে, এস্থানে আলোচনার প্রয়োজন নাই।

প্রসঙ্গক্রমে পেসারতের হার সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে। জমির পরিমাণ নির্দ্ধারণে যত বৈচিত্র্য আছে, এখানে তাহা অপেক্ষা আরও অনেক বেশী। সবিস্তারে আলোচনা পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করিবে মাত্র।

প্রতিবাদ করিবার মত সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি নাই, ইহা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে একটা বড় সুযোগ। তাহা না হইলে আরও কত কবার সংবিধান অদল-বদল করার প্রয়োজন হইয়া পড়িত। আজও সুপ্রীম কোর্টের মতামত গ্রহণ করা হয় নাই। এতদূর অগ্রসর হইবার পর, যদি কোনও বিরুদ্ধ মত পাওয়াই যায়, তাহাও সংবিধান সংশোধন দ্বারা সম্ভব। কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মাঝে মাঝে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। কত জমি বিলি হইয়াছে; যাহারা পাইয়াছে, তাহাদের আর্থিক অবস্থার কতটা উন্নতি হইয়াছে; সেই সেই জমির ফলন কত বৃদ্ধি পাইয়াছে; নূতন মালিক (গভর্ণমেণ্টের উপর) সন্তুষ্ট কি না, ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া বাহির করা বাঞ্ছনীয়।

গভর্ণমেণ্টের দখলে বহু জমি রহিয়া গিয়াছে। তাহার সুষ্ঠু ব্যবস্থা হইলে, সেই আদর্শে অপরে জমি ও ফলনের উন্নতি করিতে উৎসাহ পাইবে। অপর সকলের বিচার গভর্ণমেণ্ট করে; তাহারাই দণ্ডমুণ্ডের মালিক। তাহাদের ত্রুটি সম্পর্কিত অভিযোগে বাতাস ভরিয়া উঠিতেছে। খাদ্য উৎপাদন সম্বন্ধে তাহারা এখন কোনও নজির স্থাপন করিতে পারে নাই, যাহাতে খাদ্য সম্বন্ধে আশ্বস্ত হওয়া যাইতে পারে। এত লম্ফঝম্পের পর একটা কথা বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, নূতন ভূমি ব্যবস্থায়, নূতন মালিকানায় দেশে অন্ন উৎপাদনের বহুল উন্নতি হইবে। তাহা হয় নাই এবং এই জমিদারদিগের নিকট প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত জমিতে চাষ দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে বলিয়া যদি মনে করা হইয়া থাকে, তাহা প্রারম্ভেই পরাজিত হইয়াছে, ইহা বলিতে দ্বিধা সঙ্কোচ নাই। এইখানে কংগ্রেসের খোদ মুখপত্র ইকনমিক রিভিউ (১৬ই জানুয়ারী, ১৯৬০) তে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের কথা কয়টি উদ্ধৃত করিয়া দিলে কোনও দোষ স্পর্শ করিবার কথা নহে—

"What ever be it, if food production is to depend almost wholly on co-operative farming and ultimately on the attraction of "ceiling surplus lands", then it means we have already acknowledged defeat on the food production front."

একটি চিরন্তনীর কাহিনী

শ্রীপুলকেন্দু সিংহ

অষ্টাদশী জীবনের টলোমলো মদির চেহারা
আনত স্বপ্নালু চোখে কন্যা তোর কিসের ইসারা
মাটির সোঁদালী গন্ধে যৌবনের রঙলাগা অলস আবেশ
অদূর কূজন হতে ভেসে আসে পক্ষিদের সঙ্গীতের রেস।

ফুলগন্ধ মৃদুবায়ে বিচ্ছুরিত গোধূলির নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায়
ঘরে ফেরা বলাকার পিছু পিছু মন তোর কোথা উড়ে যায়
ঘরবাঁধা জীবনের পটভূমিকায় চক্রবাক দম্পতির
আশাভরা বুক
বধূরা প্রদীপ জ্বেলে দেখে বুঝি অন্তরের সন্তানের মুখ।

তোর ও ভুখারি চোখে ঝরে পড়ে কিসের বেদনা
কোন্ সে জ্বলন্ত দাহ তোর বুকে বেঁধে আছে দানা
চুপ কেন? কথা বল্? মনের মানুষ পেলে খুশী
কন্যার অনিন্দ্য মুখে উদ্বেলিত লজ্জারক্ত হাসি।

বারোয়ারী বাড়ী

শ্রীগণেশ নন্দী

কলতলায় দাঁড়িয়েই চেঁচিয়ে উঠল চপলা।

আমি জানতাম। একটু বেখেয়াল হয়েছি কি উধাও হয়ে যাবে! কিন্তু এর বিহিত আমি আজ করবো তবে ছাড়বো। এইটুকু সময়ের মধ্যে ত বাইরে থেকে চোর-ডাকাত ভাড়া করে আসে নি।

মন্টির মা রান্নাঘর থেকে উঁকি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে,

কি হ'লরে—সকালেই আবার চেঁচামেচি কেন?

এতক্ষণ নিজেই চেঁচাচ্ছিল চপলা। বাদ-প্রতিবাদ কেউ করে নি। এবারে মন্টির মা'র গলা পেয়ে যেন ক্ষোভটা চরমে উঠল। ততোধিক উচ্চকণ্ঠে বাড়ীর সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে চপলা,

এই এক মিনিট হ'ল আমি চান করে গেছি—আর এর মধ্যেই এসে দেখি চাবিটা যেমনিকার তেমনি পড়ে আছে, আর আধুলিটা নেই! এর মধ্যে কোন্ চোরটা বাইরে থেকে এসে আধুলিটা নিয়ে গেল, এ কথা বুঝিয়ে আমার মুখে তুমি ঝাঁটার বাড়িটা মারো।

তা ত ঠিক কথাই বাপু। এখুনিকার এখুনি তো উড়ে যাবে না। তা দেখ না, তোমার পর কে চান করতে নেমেছিল।

হাতে বালতী নিয়ে দাঁতন করতে করতে ঐ দিকে আসছিল সুমথ। চপলার রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি দেখে সভয়ে জিজ্ঞাসা করলে সে,

কি হ'ল চপলাদি?

হবে আবার কি! আবার জেরাদ্দ! দেখতে দেখতে টাটকা আধুলিটা চুরি করলে।

কে?

কে আবার!

মুখ ভেংচে বললে চপলা,

ভূতে! ভূতে! এ বারোয়ারী বাড়ীতে যে বার ভূতের আমদানি হয়েছে জান না?

কি হ'ল কি! অত চেঁচাচ্ছ কেন? যা মুখে আসছে তাই যে বলতে আরম্ভ করলে?

হ্যাঁ, ঐ রকমই মনে হয়। পয়সাটা যদি আপনার নিজের চুরি যেত তা হলে দেখতাম কেমন রসগোল্লা গুঁজে দিতেন সবাইয়ের মুখে।

না! রসগোল্লা না দিলেও তোমার মতন অমন অসভ্য আর অশ্লীল কথায় বাড়ী মাথায় করতুম না।

চোখ মটকে তাড়াতাড়ি চলে গেল সুমথ। ওদিকে আবার তার কারখানায় লেট হয়ে যাবে।

সুমথর ভ্রূভঙ্গি কিন্তু চোখ এড়াল না চপলার! কটাক্ষটা যেন সারা গায়ে বিষ ছড়িয়ে দিলে তার, গলার স্বরটা আরো একটু উচ্চগ্রামে বেঁধে বললে চপলা,

কি বললেন? আমি অসভ্য?

একশো বার অসভ্য। না হলে ধাইবুড়ো মেয়ে, লজ্জা করে না তোমার কলতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গলা-ফেরে চেঁচাতে? তুমি না নিজেকে শিক্ষিতা বলে জাহির কর! তার নমুনা বুঝি এই?

যেন দাউ দাউ অগ্নিশিখাটা দমকা ঝড়ের দাপটে নিভে গেল। সুমথর শেষ কথাটায় কেমন যেন খোঁচা ছিল। যে খোঁচা শুধু আঘাত করে অন্তরে যন্ত্রণা দেয়, কিন্তু রক্ত ঝরায় না বাইরে। কেমন যেন মিইয়ে গেল চপলা। এই একটি কথা। সে লেখাপড়া জানা মেয়ে। আর সে মেয়েকে, আর পাঁচ জনদের থেকে আলাদা করে দেখেন সুমথদা। তার গুণের প্রশংসা করেন। দুপুরে গা গড়াবার সময় সুমথদার বাসী খবরের কাগজটা একমাত্র সেই-ই নিয়ে এসে চোখ বুলুতে বুলুতে ঘুমিয়ে পড়ে। তাই সুমথদার অমন তীরের ফলার মতন ছুঁচলো কথাটা গায়ে বিঁধল না তার, কিন্তু পুরোদস্তুর জখম করে দিলে মনটা। কিছুতেই আর মুখ খুলতে পারলে না চপলা।

নিজেকে শিক্ষিতা বলে পাঁচ জনের কাছে নিজে জাহির করার চেয়ে অপরের মুখের বাহবা শুনতে পাওয়া যেমন লোভনীয় তেমনি গর্কের। কথাটা ইতিমধ্যে বুঝে ফেলেছে চপলা।

দোতলার সামনের দিকে পুবমুখো যে ঘরটা, সেই ঘরটা সুমথদার। ঘরের সামনে এক চিল্‌তে বারান্দায় নিজেরাই টিন আর দরমা দিয়ে ঘিরে রান্নার জায়গা করে নিয়েছে। উমা বৌদি রান্না করেন সেখানে। নিচের থেকে রান্নার জল তুলে দেয় সুমথদা, কোন কোন দিন উমা বৌদিও তোলেন।

গুম্ হয়ে বসলো চপলা। ভিজে চুলে, এলো মাথায়। আসল চোরকে সে ঠিক ধরেছে মনে মনে। কিন্তু চোখে না দেখলে ত আর নাম করে বলা যায় না। অথচ

মাছের কাঁটার মতন মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করে বিঁধছে নামটা। ইচ্ছে হ'ল—যা থাক কপালে—চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে শুনিয়ে দেয় বাড়ীশুদ্ধ সবাইকে—সে দেখেছে, দেখেছে দেখেছে !! নিজের চোখে দেখেছে। একেবারে তিন সত্যি করে কানে ধরে বলে সবাইকে—সে আসার একটু পরেই বিটুলেকে কলতলায় যেতে দেখেছে নিজের চোখে। তাছাড়া এ বাড়ীর ডাকসাইটে আন্নামাসীর বখাটে ছেলে বিটুলেকে কে না চেনে। এই বয়সেই পেকে ঝুনো হয়ে গেছে একেবারে। চুরি ডাকাতি গুণ্ডামী আরও আরও কত কি! কিছু আর বাকী নেই। আর হবে নাই-ই বা কেন--মায়ের যেমন আস্কারা!

ও দিদি, দিদি? কোথায় গেল তোমার চপলা। বলতে বলতে ওপরে উঠে এলেন আন্নামাসী।

ঘরের মেঝেয় বসেছিল চপলা, ভিজে মাথায় এলোচুলে। কতদিন ধরে পুতুপুতু করে না খেয়ে জমান আট আনা পয়সা! বলতে গেলে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও আঁচলছাড়া করে নি একদিনও। কথা দেওয়া আছে নিশীথকে, আজ বোম্বাই সার্কাস দেখতে যাবে দু'জনে। টিকিটের দাম পুরোপুরিই নিশীথ দেবে কিন্তু তা হলেও পথ চলতে মেয়েরা আঁচলশূন্য থাকবে কি করে!

চোর জোচ্চরের মা দিদি, তা মাশুলটা ত আমাকেই দিতে হবে।

রান্নাঘর থেকে ঘরের ভিতর নিজের মেয়ের দিকে চেয়ে চোখ মটকে বললেন চপলার মা,—

কেন দিদি, তোমার ছেলের নাম করে ত কেউ চোর বলে নি। তুমি কেন গায়ে পড়ে নিচ্ছ কথাটা? আর পয়সাই বা দেবে কেন?

তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল চপলা।

তা আন্নামাসী, তুমি বাপু রাগ করো না। হাতে-নাতে পয়সাটা নিতে না দেখলেও এ কাজ বিটুলে ছাড়া কেউ করতে পারে না। চান করে এসে এখনও বাসী পেটে জল দিই নি। আমি মিথ্যে বললে মুখ খসে যাবে। স্বচক্ষে বিটুলেকে কলতলা থেকে বেরোতে দেখলাম।

হাসলেন আন্নামাসী। ধন্যি মা! তুমি যখন দেখলে, স্বচক্ষে দেখেছ বিটুলেকে—কলতলা থেকে বেরোতে, তখন ও ছাড়া আর কেউ নেয় নি—একথা আমিও স্বীকার করবো। তা নাও, ধরো। চোরের মা যখন হয়েছি......। শেষের দিকের কথাটায় গলাটা কেমন ভারী শোনাল আন্নামাসীর। আঁচল থেকে আটআনা পয়সা চপলার হাতে দিয়ে তাড়াতাড়ি পিছু ফিরতেই চোখাচোখি হ'ল মোতির মার সঙ্গে। আন্নামাসীর ঘরের ঠিক ওপরেই ঘর। ওই একটা ঘর, আর ঘরের সামনে এক চিলতে বারান্দা। ভাগাভাগি করে তিন ঘর রান্না করে। টিন-দরমা দিয়ে রান্নার জায়গাটা ঘিরে নেওয়ার আর সঙ্গতি হয় নি কারুর। শুধু যা বর্ষাকালটাই অসুবিধে। ভিজে ভিজে রান্না আর ঝগড়া দুই-ই করতে হয়। হ্যাঁ, মোতির মা জানে, এ বারো জনের বাড়ীতে মরলে বরং কান্নাটা থামিয়ে রাখা যায়, কিন্তু বাস করতে গেলে ঝগড়া না করে থাকাটা কিছুতেই কল্পনা করতে পারে না মোতির মা। সেই মোতির মা।

বিরাট ময়দানের প্রায় অর্দ্ধেকটা ঘিরে তাঁবু পড়েছে সার্কাসওয়ালার। 'দি গ্রেট সার্কাস অব বোম্বে।' অনেক অভিনব আর বিস্ময়কর খেলা। জ্বলন্ত মশাল খেলা থেকে জীবন্ত মানুষের সদ্য সমাধি পর্য্যন্ত। আরও নানারকম জিম্‌নাষ্টিকের কায়দা। শুধু মানুষ নয়, মানুষের প্রপিতামহ, অতীত পুরুষের অতিকায় জীব, আধুনিক মানুষের সঙ্গে সাইকেল রেসে পাল্লা দেবে। পাল্লা কণবে যুযুৎসুর। তাছাড়া আছে 'ডবল ফায়ারিং নট্ ডেড্'। তাঁবুর গায়ে গেটের সামনে বিরাট বিরাট নানান পোজে ছবিসহ বিজ্ঞাপন তার। একেবারে তাক-লাগান ব্যাপার! নানা ঢংয়ের কসরৎ নকল করতে করতে আত্মহারা আওয়ারা দর্শকের দল গলা ছেড়ে বিদেশী পাঞ্চ-করা হিন্দী গানের কলি গাইছে। ভিড় হয়েছে। লোক জমেছে প্রচুর। বাইরে। ভেতরে।

চপলাও দাঁড়িয়ে আছে একপাশে। নিশীথটা সেই যে তাকে দাঁড় করিয়ে টিকিট কিনতে গেছে এখনও আসার নাম নেই। একলা একলা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগে না তার। তাছাড়া, চটুল চোখে একবার চাইল চপলা। সেই থেকে ঐ লোকটা ছবি দেখার ছল করে বার বার আড়চোখে চাইছে এদিকে। ছ্যা! ওই সব ছবি মানুষে টাঙায়! ঢং যত! রাজ্যের পুরুষ হ্যাংলার মতন দেখবে। ওদিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলে চপলা। বিচিত্র ঢংয়ে ছাপা বিচিত্ররকমের বিজ্ঞাপন। ছবির বিজ্ঞাপন। এদিকে সেদিকে তাঁবুর চারপাশে টাঙান। মন্দ না লাগলেও মনে মনে ভারী লজ্জা করে চপলার এত লোকজনের সামনে চোখ তুলে চেয়ে দেখতে। ছিঃ! অত বড় ধিঙ্গী মেয়েটা একটা জাঙিয়া আর বডিস্ পরে...... ভারী লজ্জা করে। ঈশ! লোকটা কি অভদ্র! সেই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঐ ছবিটাই দেখছে। যেন দেখার আর শেষ নেই। এদিকে ভিড় বাড়ছে ক্রমশঃ।

শীতের রোদটা মিষ্টি লাগলেও বেশীক্ষণ সহ্য করা যায় না; চির চির করছে গায়ের ভেতরটা। একবার ইচ্ছে করল, সামনের ওই গাছতলাটায় আইসক্রীমওয়ালার পাশে ছায়াতে দাঁড়ান যায়, কিন্তু নিশীথ কি ভাববে! একেই যে-করে বাড়ী থেকে আসা। বাব্বা! নিজের লোককে অত কৈফিয়ৎ দেবার বালাই নেই, অথচ ছত্রিশ জনকে জবাব দাও। কোথায় গিয়েছিলি? কার সঙ্গে? ওমা, তাই নাকি! কবে থেকে! নিজে টিকিট কেটে দেখালে বুঝি? এমনিতরো আরও সাড়ে-বত্রিশ রকমের প্রশ্ন। টেনে টেনে চোখ কুঁচকে যেন কি-না-কি-একটা অপকর্ম করে ফেলেছে একটা; আর তাই মজা দেখার জন্যে হাজার জোড়া চোখ ওঁৎ পেতে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। হুঁ! জানতে ত আর বাকী নেই তার কিছু।

হঠাৎ মুখ ফেরাতেই চোখ পড়ল চপলার, সেই লোকটা আর দাঁড়িয়ে নেই ওখানে। না! আরম্ভ হতে তাহলে আর বেশী দেরি নেই। অথচ নিশীথটা এখনও ফিরছে না। হবেও বা হয়ত টিকিটই পায় নি। অস্থির হয়ে উঠল চপলা।···ওমা! লোকটা···ওই ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিনেবাদাম কিনছে। বেশ লাগে কিন্তু। কুট কুট করে দাঁতে করে চিনেবাদাম ভেঙে কাঁচালঙ্কা ধনে-পাতা আর নুন গুঁড়িয়ে, ঝাল-নুনের চাকনা দিয়ে খেতে। বাঁটা মারো! নাম করতেই নিজের জিভটা ভিজে উঠল। ঠিক আছে। নিশীথ এলে আধপো বাদাম কিনে নিয়ে ভেতরে যাবে। বেশ বসে বসে আরাম করে···ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। একটা বাদাম দাঁতে কাটতে কাটতে যেন ওর দিকেই এগিয়ে আসছিল। চোরা-চোখে চপলাও দেখল, বাঁ হাতে বাদামের ঠোঙাটা ধরে ডান হাতে একটা বাদাম দাঁতে কাটতে কাটতে যেন ওর দিকেই এগিয়ে আসছে লোকটা। মতলব কি? অসভ্য কোথাকার! শঙ্কা আর বিরক্তি জাগল চপলার মনে।

সত্যিই এগিয়ে আসছিল লোকটা। পায়ে পায়ে, ধীরে ধীরে। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দূরে আইসক্রীম-ওয়ালাকে দেখতে লাগল চপলা। আড়চোখে চোরা-চাউনিটা সতর্ক করে রাখল। আহা ঢং! ছবিটার দিকে এমনভাবে দেখতে দেখতে আসছে যেন, পৃথিবীর আর কাউকে খেয়ালই নেই। বিশ্বসংসারে কিম্ভূতকিমাকার এই লোকগুলো। দু'চোক্ষের বিষ!

কি রে, এত দেরী?

চমকে ফিরে তাকালো চপলা।

আশ্চর্য্য!

আর বলিস কেন, শালার টিকিট কাটা নয়ত যেন, মার-দাঙ্গা করা। নাও, চল চল। আলাপ হয়েছে?

চপলার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলে নিশীথ।

আলাপ!

চপলা কিছু বলার আগেই হাসতে হাসতে এগিয়ে এলেন সেই ভদ্রলোকটি।

না! হ'ল আর কোথায়, এই ত সবে মাস্তোর···

সে কি! ইনি হচ্ছেন বিখ্যাত আর্টিষ্ট, আমার বিশিষ্ট বন্ধু অমিয় সোম। আর···

চপলার দিকে মুখ ফিরিয়ে ভ্রূভঙ্গি করে বললে নিশীথ,

চপলা দত্ত। একই আস্তানায় ভিন্নকক্ষে আমরা ভিন্নভাবে বাস করি।

হো-হো করে হেসে উঠলেন অমিয় সোম।

লাভ্‌লী! আজকাল সাহিত্য-টাহিত্য করছ নাকি নিশীথ? ধর।

একমুঠো চিনেবাদাম নিশীথের হাতে দিয়ে আর একমুঠো চপলার দিকে ধরে বললেন অমিয় সোম, আপনি কিন্তু অভিন্নমনেই গ্রহণ করুন।

সবাই হাসল। হাত পেতে চিনেবাদাম নিয়ে চপলাও হাসল। তবে হো-হো করে নয়। মুখ টিপে আর মুখে কাপড় চাপা দিয়ে।

* * *

পুরো তিন ঘণ্টা যেন কোথা দিয়ে চলে গেল। হাসি-হল্লোড় আর রোমাঞ্চকর রকমারি অনেক খেলায় ওরা তিনজনেই মশগুল হয়ে বসেছিল। চপলা, নিশীথ আর অমিয়। শো ভাঙতেই যখন তিনজন বাইরে এসে দাঁড়াল, শহর কলকাতায় তখন ঝিলিক্ দিয়ে ঝলমলিয়ে উঠেছে বিজলী আলো।

বেশ সহজ হয়ে গেছে চপলা। একটুও আর অপরিচিত বাধো বাধো ঠেকছে না অমিয়কে। মনেই হবে না, এ সেই ভদ্রলোক। কয়েক ঘণ্টা আগেও যাকে চোরাচোখে দেখে ভয় হয়েছিল। মনে হয়েছিল একেবারে বখাটে, রকবাজ। অথচ···মনে মনে অবাক না হয়ে পারে নি চপলা। সত্যি! তারিফ করার মতন। কত সহজে মাস্তোর ক'ঘণ্টায় যেন কতবড় আত্মীয় হয়ে গেছে। তাই-ই হয়। মনে মনে ভাবলে চপলা, গুণীলোকের নিয়মই তাই। নইলে এত তাড়াতাড়ি নিজেই বা সে সহজ হ'ল কি করে? :কথায় কথায় হাসতে, ঠাট্টা করতে, এমন কি নিরালা জায়গা হলে গুণ গুণ করে এককলি কলঘরের গানও গেয়ে ফেলতে পারে সে এখন।

বাইরে আসতে আসতে কি কথায় যেন কি কথা

হ'ল—আর সঙ্গে সঙ্গে হেসে গড়িয়ে পড়তে চাইল চপলা। যেন দমকাটা হাসি। মুখে কাপড় চাপা দিয়েও সে হাসির বেগ সামলান দায়। হাসির দমকে দুমূরে টাল খেতে খেতে বললে চপলা,

এমন কথা বলেন না আপনি—সত্যি!

খুশীর আত্মতৃপ্তিতে মাতোয়াল অমিয়। মনে মনে গর্ব্ববোধ করে। শুধু কথা বলতে নয়—বলাতেও জানে সে। অল্প একটু কাঁধ দুটো বাঁকিয়ে বললে,

হ্যাঁ। ছবি মানেই তাই। তোমার কবি-মন তাকে কাব্য বলেও নিতে পারে—অকবি-মন তাকে কুৎসিত সৃষ্টি বলে ঘৃণাও করতে পারে। তবুও যা ছবি তা ছবিই। বিভিন্নরুচি মানুষের কাছে তার আবেদন বিভিন্নভাবে। তা যাক্! তা হলে—

মুখের কথা কেরে নিয়ে বললে নিশীথ,

তা হলে এবার যে যার গন্তব্যস্থল। আমার আবার রাত-ডিউটি।

সে কিরে! এতদিনের পর আলাপ হ'ল আর আজকের দিনটা ছুটি নিতে পারলি না?

হাসল নিশীথ।

ইচ্ছে তো তাই ছিল, কিন্তু হ'ল কোথায়? পেটের জন্যে যৌবনটাকেও যে ক্ষিদের চাকায় বেঁধে ফেলেছি।

অ্যাঁ! বিস্ময়ে দু'চোখ কপালে তুলে তাকাল অমিয়।

হ্যাঁ! জীবনের গণ্ডিটা এতই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে আজকাল। ভারি চুলচেরা হিসেব; উনিশ থেকে বিশ হবার উপায় নেই।

অবাক চপলা! নিশীথও এমন করে কথা বলতে পারে নাকি! নাকি নাটক করছে আজকাল! অথবা হাওয়া লাগল অমিয়র।

বাসষ্টপে এসে দাঁড়াল তিনজন। নিশীথ বললে,

তোমাকে বিদায়-সম্বর্দ্ধনা জানিয়ে বিদায় হব আমরা।

বেশ! আমার বাস তো দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। কিন্তু একটু চা খেলেও হ'ত না?

খুব সুখের হ'ত! কিন্তু সময় নেই, আর একদিন হবে।

আগের ভঙ্গিতে কাঁধটা অল্প বাঁকিয়ে বললে অমিয়,

বেশ! চলি তাহলে।

বাসে গিয়ে উঠল অমিয়। নিশীথ আর চপলা দাঁড়িয়ে রইল বাসের গা ঘেঁসে। বাসে উঠে বললে অমিয়,

আবার কবে দেখা হচ্ছেরে?

আবার? প্রাণ আর মন যেদিন টানাটানির বাঁধন ছিঁড়বে, আবার মুখোমুখি হব দু'জনে।

হেসে উঠল তিনজন। হাসতে হাসতে বললে নিশীথ,

শুধু দু'জনে? ফাউ হিসেবে আর একজনকে নয়?

চোখ পাকিয়ে বললে চপলা,

কি আমি ফাউ?

বাস ছাড়ল।

নিশীথ আর চপলা পায়ে পায়ে হেঁটে চলল কিছুটা। কিছুটা গিয়েই নিশীথ বললে,

কি, করবে? এইভাবে হেঁটে হেঁটে গেলে আজ আর ডিউটির বুড়ি কিছুতেই ছুঁতে পারব না।

হ'ল কি নিশীথের! অবাক হয়ে নিশীথের মুখের দিকে তাকাল চপলা।

বলছি একটা রিক্সা করলে হ'ত না? শেতলাতলার গলির মোড়ে না হয় নেমে ওইটুকু হেঁটে যাওয়া যেত।

হাসল চপলা, সলজ্জ দুষ্টুমি-ভরা হাসি।

কত আছে তোমার কাছে?

আট আনা।

মাত্র!

হঠাৎ যেন সপাং করে বিদ্যুতের চাবুক পড়ল তার মুখের ওপর। ঠিক যেমন সার্কাস পার্টিতে রিং মাষ্টারের হাতের চাবুকটা হিংস্র জন্তুটার মুখের কাছে সপাং সপাং করছিল তাকে বশে রাখার জন্যে।

ঠিক আছে চল।

দু'জনে পাশাপাশি বসল রিক্সায়। গন্তব্যস্থান নির্দ্দিষ্ট করে একটু নড়েচড়ে বসতে বসতে হঠাৎ যেন চমকে উঠে বললে নিশীথ,

এই যা! ভীষণ একটা ভুল হয়ে গেছে ত!

কি আবার?

ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! আত্মগাসীকে কথা দিয়েছিলাম, সন্ধ্যের সময় বিটুলেকে—

বিটুলে! আচম্কা নামটা শুনেই ঘৃণায় আর রাগে কুঁচকে উঠল চপলার চোখমুখ। বিটুলে, বিটুলে আর বিটুলে। এখানেও বিটুলে। একদণ্ডও আর স্বস্তি নেই।

কি হ'ল, অমন করলে যে?

না, এমনিই। বাড়ির মধ্যে বিটুলেই তোমার বেশী আপনার দেখছি।

না! কথাটা ঠিক তা নয়। তবে বাড়ির অন্য সকলের মতো ও আমার চোখের বিষ নয়।

চটুল হেসে চোখ টেনে টেনে বললে চপলা,

তুমি কিছুই জান না। এই বয়সেই ও আরও একজনের চোখের মণি হয়ে বসে আছে।

কি জানি, অত খবর রাখি না। তবে যাদের চোখ আছে, তাদের অন্ততঃ চক্ষুশূল সে হবে না। এক কথায় সত্যিই ভাল লাগে আমার। শুধু দুঃখ হয় তখন, যখন দেখি অমন ডানপিটে ছেলেগুলো নালানী জলের মতন শুধু নালা দিয়ে গড়িয়ে নর্দ্দমা আর ড্রেনেতেই শেষ হচ্ছে। সত্যি বলছি, তখন আমার ভারী কষ্ট হয়। মনে মনে ভাবি, ওরা কি হতে পারত, আর কেন যে পারছে না!

চুক্ চুক্ করে মুখে একটা শব্দ করে বললে চপলা,

আহা রে! এত দুঃখ লক্ষ্মণের জন্যে বোধ হয় রামচন্দ্রেরও ছিল না।

ছিল। যতক্ষণ সীতা তার কাছে ছিল না। আচ্ছা, চপলা, একটা কথা বলব?

স্বচ্ছন্দে।

রাগ করবে না?

করলেই বা কি! আমি ত আর বিটুলে নয় যে, তোমার ভারী কষ্ট হবে, বল।

আচ্ছা, তোমাকে যে এত করে বলি, বিশ্রী ভাবে অমন চেঁচামেচি তুমি করবে না। মানুষ ইচ্ছে করলে কত সুন্দর হতে পারে, তা তুমি কিছুতেই ভাবতে পারছ না। সুন্দর করে শুধু দেহটা নয়—মনটাকেও সাজানো যায়।

অপাঙ্গে হাসল চপলা। মনে মনে ভাবলে—হায় রে! তবু যদি জানতে! দেহটাকে কি ইচ্ছে করলেই সাজান যায়! তেমনি মনটা। তাছাড়া সাধ করে চপলা কি কারুর সঙ্গে ঝগড়া করতে চায়: নাকি আজও করত। সামান্য আট আনা পয়সা। চপলাও জানে, ঢাকুরে পুরুষের কাছে ওটা কিছুই নয়। কিন্তু···কিন্তু কি করে বোঝাবে চপলা। ওই আট আনা পয়সা যোগাড় করতে কতদিন না খাওয়া, আর না ঘুম অবস্থায় রাত্তির চলে গেছে। শেষ পর্য্যন্ত ওই ক'আনা পয়সা জমিয়ে ও কি নিস্তার পেয়েছিল! অতগুলো খুচরো পয়সা একসঙ্গে রাখার জায়গাই বা কোথায় তার। ওই ত একফালি ঘর আর বারান্দার আধফালি রান্নার জায়গা। রাজ্যের ডেয়ো, ঢাকনা থেকে ছেঁড়া কাঁথা বালিশের স্তূপাকার, তাই চোদ্দবার দিনে সরানো নাড়ানো আছে। টোপকে এক জোরা চোখ পড়তে আর কতক্ষণ লাগে! তাই চুপি চুপি নিচেতলার সিঁড়ির ঘরের তেলওলা রামস্মরণের কাছ থেকে গাঁথিয়ে আধুলি করে সর্ব্বক্ষণ পুতু পুতু করে নিজের কাছেই রাখতে হয়েছে। কিন্তু কেন? কি জন্যে রেখে-ছিল! এই কেনটুকু পুরুষরা কোনদিন বুঝতে চায় না। বোঝে না। শুধু বোঝে, মেয়েরা কেন লক্ষ্মী হয় না। হায় রে!

এই রোখ্কে—রোখ্কে। কি ব্যাপার, মোতি না?

মোতি!

চমকে উঠল চপলা। সংশয় আর উত্তেজনায় জড়োসড়ো হয়ে এল। সত্যিই তো। মোতিকে ঘিরে অত লোকজন—

তাড়াতাড়ি রিক্সা থেকে নামল দু'জনে।

ডানদিকের ফুটপাথের কোণে একটা মেওয়াওয়ালার দোকানে মোতিকে ঘিরে বেশ একটা ভিড়ের জটলা চলছে। মোতির শাড়ীর আঁচলটা মুঠো করে ধরেছে মেওয়াওয়ালা। দু'হাতে ভিড় ঠেলে মোতির কাছে দাঁড়াল নিশীথ।

মোতি? কাঁধে হাত দিয়ে ডাকল নিশীথ।

কি ব্যাপার?

দু'চোখে কান্না ঝাঁপিয়ে পড়ল মোতির। চপলার দিকে চোখ তুলেই মুখ নামাল তাড়াতাড়ি।

সভয়ে আঁচল ছেড়ে দিয়ে বললে মেওয়াওয়ালা,

লেড়কি আপকা জান পইছান হায় বাবুজি? দেখিয়ে ত কেয়াবাত! ই-য়ে ইয়ে লিজিয়ে···অচল আধুলি হায়—চারঠো লেম্বু লেকর ভাগতাথা।

কৌতূহলী দর্শক, কেউ হাসল, কেউ উপভোগ করল। কেউ টিপ্পনি কেটে নিজের পথে ফিরল।

অচল? এটা তুমি কোথায় পেলে মোতি? ভারী ঠকিয়েছে তোমাকে।

হঠাৎ কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গেল চপলার। মনে হ'ল যেন এক তাল গরম রক্ত পেট মুচরে চলকে পড়ল মুখে। মেওয়াওয়ালার দু'শো-শক্তির বাতিটাও কি ঝিমিয়ে পড়ল! অচল! শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসে গলাটা। কান্নাঝরা চোখে পায়ের নোখ দিয়ে মাটি খোঁটে মোতি। মাথাটা যেন মাটিতেই ঝুঁকে পড়ে।

তোমার কাছে আট আনা পয়সা আছে না চপলা? একে দিয়ে দাও, বললে নিশীথ।

আপ লে যাইয়ে বাবু, পিছু দিজিয়ে গা।

ঠিক হ্যায়, কই পয়সা, আট আনা দাও তো।

লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইল চপলা। ছিঃ! একটা যদি ভূমিকম্প হ'ত এখুনি। কিংবা একটা চলন্ত লরী কি বাস পাগলা হাতীর মতন হুড়মুড়িয়ে যদি চাপা দিয়ে দিত এখুনি, সব ক'টা একসঙ্গে দলে পিষে শেষ হয়ে যেত। সে, মোতি, আর মেওয়াওয়ালা, বেশ হ'ত। সবকিছুর নিকেশ হয়ে যেত একেবারে। সত্যি, মিথ্যে,

ভাব, ভালবাসা, হ্যাঁ প্রাণটাও। সব মিথ্যে। সব মিথ্যে। মিথ্যে দিয়ে সাজান সব। কাঁপা কাঁপা হাতে পয়সা আট আনা নিশীথের হাতে তুলে দিলে চপলা। না নিশীথের দিকে আর কিছুতেই চাইতে পারা যায় না। কোথায় যেন, কেমন করে এক ছিটে কলঙ্কের দাগ লেগে গেল, ছিঃ।

কমলা লেবুর ঠোঙাটা মোতির হাতে দিয়ে পয়সা আট আনা মেওয়াওয়ালাকে দিয়ে বললে নিশীথ,

এসো তোমরা দু'জনে, বরং রিক্সায় উঠে চলে এসো। আমি বাড়ী গিয়ে পয়সা দিচ্ছি। আর এটা একেবারেই বাতিল করাই ভাল, চপলা। নইলে আবার পদে পদে মোহ আর বাধার সৃষ্টি করবে।

এক ঝট্‌কায় দূরের নর্দ্দমায় অচল আধুলিটা ফেলে দিয়ে পা চালাল নিশীথ।

ঠিক আছে, তা হলে এসো তোমরা।

মাটি আর পৃথিবীর বুকে মুখ লুকিয়ে মরমে আর সরমে আড়ষ্ট হয়ে কুঁকরে উঠল দু'জনেই। ঝুঁকে-পড়া এক জোড়া মুখ কিছুতেই আর উঠতে চাইল না। মোতি আর চপলা। শুধু পায়ে পায়ে আড়ষ্ট হয়ে গায়ে গায়ে জড়িয়ে রিক্সায় উঠল দু'জনে। রিক্সা চলল।

বাঁক ঘুরতেই চপলার কোলের ওপর মুখ গুঁজরে ফুঁপিয়ে উঠল মোতি। আমাকে মাপ করো ভাই চপলাদি। আধুলিটা তোমার, আমিই চুরি করেছিলাম। অসুখে পড়ে বিটলেদা আজ দু'দিন ধরে লেবু খেতে চেয়েছে, মুখ ফুটে কাউকে বলে নি। আমাকেও না। খালি যা আমি—

ধরা গলাটা আরও ধরে উঠল, ফুঁপিয়ে উঠল মোতি।

এই ওঠ! ওঠ! পাঁচজন লোকে দেখবে যে।

কান্নায় চপলার গলাটাও ভারী হয়ে এল। তোর চেয়েও আমি বেশী দোষ করেছি। আমি যে ঠকিয়েছি। সবাইকে, নিশীথকেও। ওই অচল আধুলিটার মতন আমরাও তো অচল হতে হতে বেঁচে গেলাম। ওঠ! ওঠ! বাড়ী এসে গেল যে! নে ধর লেবুটা, রাখ। আর বলিস···বলিস চপলাদি কিনে দিয়েছে তাকে।

চম্‌কে মুখ তুলে তাকাল মোতি। দু'জনের চোখেই জল। দু'জনে মুছল আঁচল দিয়ে।

পল্লী-সন্ধ্যা

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

সন্ধ্যা নামিছে পল্লীর বাটে,
নারিকেল তরু শিরে,
কাজল দীঘির তীরে।
তরল তন্দ্রা ছড়ায়ে পাখায়
ঝাঁকে ঝাঁকে বক কোথা উড়ে যায়!
ভরিয়া কলসী উল্লাসে বধূ
কাঁকন বাজায়ে ফিরে।
নামিছে সন্ধ্যা পল্লী কুটীরে,
তুলসী তরুর তলে,
তারা-হার পরি' গলে।
ললাটে পরিয়া কাঁচপোকা টীপ
শাঁখা-পরা হাতে কে জ্বালে প্রদীপ!—
আঁধার যেন রে পড়িয়াছে বাঁধা
তার কালো চুল ঘিরে!

বরষি' শান্তি নামিছে সন্ধ্যা
বিজন পল্লীপথে
সুদূর স্বর্গ হ'তে।
বাঁশবনে বাজে ঝিঁঝিঁর ঝিঝিট,
কোথায় জোনাকি করে মিট মিট;
এখনি বাহিরি' এলো শিশু-শশী
গগন-গর্ভ চিরে?
মৃদুমন্থর নামিছে সন্ধ্যা
পল্লীর প্রান্তরে
শ্যাম তৃণদল 'পরে।
নেশা খেয়ে যেন ঝিমাইছে গ্রাম,
তালীবনে করতালি অবিরাম!—
দেখিছে চন্দ্র চাঁদমুখখানি
পুকুরের নীল নীরে!
অঙ্গনে মোর সন্ধ্যা নামিছে
আধ-ফোটা ফুল হাতে,
কোমল চরণপাতে।
আম্র-পনসে, আনারস-গায়
জোছনা-পরশে সোনা উথলায়!
ঘন ঘুমঘোরে ঢুলে ঘুঘু পাখী
সুপারি-শাখায় ফিরে?

রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারা

অধ্যাপিকা শ্রীআভা কুণ্ডু

রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্যাবলীর মধ্যে বিশেষ একটি স্থান অধিকার করে আছে তাঁর মুক্তধারা। ১৩২৯ সনের বৈশাখ মাসের প্রবাসীতে এটি প্রকাশিত হয়। এর কিছুদিন পূর্বে তিনি এটিকে 'পথ' নাম দিয়ে রচনা করেছিলেন, নাটকটির প্রস্তাবনায় এ কথার উল্লেখ আছে।

নাটকটি যে রূপকধর্মী একথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন এবং এর মধ্যে যে সত্যটিকে রূপ দেওয়া হয়েছে তার আংশিক ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। আধুনিক সভ্যতায় যন্ত্রের যে প্রাধান্য এবং তা হতে যে সমস্ত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তারই একটি এই নাটকের উপজীব্য। শ্রীকালিদাস নাগকে লিখিত একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ মুক্তধারা সম্বন্ধে লিখেছেন—"আমি মুক্তধারা বলে একটি ছোটো নাটক লিখেছি, এতদিনে প্রবাসীতে সেটা পড়ে থাকবে। তোমার চিঠিতে তুমি machine সম্বন্ধে যে আলোচনার কথা লিখেছ সেই machine এই নাটকের একটা অংশ।"

মুক্তধারা নাটকে যে সমস্যার কথা আলোচিত হয়েছে তাকে সম্পূর্ণ করে বুঝতে হলে আধুনিক জগতে যন্ত্রবিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির ইতিহাসটির সঙ্গে পরিচয় থাকা একান্ত প্রয়োজন। খ্রীঃ অষ্টাদশ শতকের শেষে এবং ঊনবিংশ শতকের প্রথম অংশে ইংলণ্ডকে কেন্দ্র করে যন্ত্রশিল্প জগতে যে পরিবর্তন সুরু হয় তাই পত্রে-পুষ্পে বিকশিত হয়ে শিল্প-বিপ্লব নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এ বিপ্লব ইংলণ্ডে সুরু হলেও শুধু সেখানেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ক্রমে ক্রমে য়ুরোপের সমস্ত দেশে এটি ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। শিল্পক্ষেত্রে যন্ত্রের এই প্রাধান্য পৃথিবীতে যে নব যুগের সৃষ্টি করেছে তাকে যন্ত্রযুগ নামে অভিহিত করা যেতে পারে। আধুনিক যুগে যন্ত্রের এই প্রাধান্য মানুষকে প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এর ফলে নূতন নূতন এমন কতকগুলি সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে যার সমাধান সহজসাধ্য নয়।

যন্ত্র-সভ্যতা যে য়ুরোপ ও আমেরিকায় পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত সেখানেও সমস্যার অন্ত নেই। যন্ত্র সেখানে মানুষকে ছাড়িয়ে গেছে—তার মনুষ্যত্বকে পীড়িত করেছে প্রতি পদে। মানুষে মানুষে সহজ সম্পর্ক হারিয়ে গিয়ে সেখানে যে বিপুল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তাকেই অবলম্বন করে রক্তকরবী রচনা করেন কবি। আধুনিক সভ্যতায় যন্ত্রের প্রাধান্য আরো একটি সমস্যার সৃষ্টি করেছে, যেটিকে মুক্তধারা নাটকের রসসৃষ্টির মূল উপাদান বলা যেতে পারে। পৃথিবীর সব দেশগুলিতে একই সময়ে যন্ত্র-বিপ্লব সংঘটিত হয় নি। যে দেশগুলি যন্ত্রে অনুন্নত রয়ে গিয়েছিল সেগুলি উন্নত দেশগুলির লোভের খাদ্যে পরিণত হয়। কাঁচা মালের জোগানদার হিসাবে এবং বৃহৎ কারখানার মাধ্যমে উৎপন্ন বিপুল পরিমাণ উদ্বৃত্ত শিল্পদ্রব্যের বাজার হিসাবে অনুন্নত দেশগুলিতে উপনিবেশ ও আধিপত্য স্থাপনের একটা বিষম প্রতিযোগিতা সুরু হয়ে যায়। এই প্রতিযোগিতার ফলে আফ্রিকা ও এশিয়ার শিল্পের অনগ্রসর দেশগুলিতে য়ুরোপের এই অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে বসলো। এক দেশের উপর অন্য দেশের আধিপত্য পৃথিবীতে নূতন নয়। কিন্তু পূর্বেকার সে আধিপত্য বা সাম্রাজ্যবাদ ছিল প্রধানতঃ রাজনৈতিক—অর্থনৈতিক শোষণ সেদিন এমন প্রবল ছিল না। খ্রীঃ ঊনবিংশ শতকে সাম্রাজ্যবাদ যে উৎকট রূপ নিয়ে প্রতিভাত হ'ল তা হ'ল মূলত অর্থনৈতিক। যন্ত্রবলে যে দেশগুলি বলীয়ান তাদের মূলনীতি হ'ল নিজেদের অধিকৃত দেশগুলিকে শিল্পের দিক থেকে চিরকাল অনগ্রসর করে রাখা—সেখানকার শিল্প-বাণিজ্য সমস্ত নষ্ট করে দিয়ে তাদের শোষণ করাই হ'ল এদের একমাত্র চিন্তা। কারণ এ না হলে তাদের শিল্পে কাঁচা মালের জোগান বন্ধ হয়ে যায়, শিল্পজাত পণ্যের বাজারও বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং হীন স্বার্থের জন্য এক জাতি অপর জাতির জীবনকে পঙ্গু করে দিতে একটুও পিছপা হ'ল না। মুক্তধারায় উল্লিখিত উত্তরকূটের উগ্র সাম্রাজ্যবাদ ঊনবিংশ-বিংশ শতকের এই অর্থনৈতিক শোষণমূলক সাম্রাজ্যবাদ। নাটকের মধ্যে রাজা রণজিৎ বলছেন—"শিবতরাই-এর প্রজাদের তো কিছুতেই বশ মানাতে পারলে না। এতদিন পরে মুক্তধারার জলকে আয়ত্ত করে বিভূতি ওদের বশ মানাবার উপায় করে দিলে।" বিভূতির যন্ত্র সাম্রাজ্য-শাসনের এক নিষ্ঠুর যন্ত্র। কিন্তু এ ছাড়াও শোষণের অন্য পথ জানেন উত্তরকূটের

শাসকগণ। "শিবতরাই-এর পশম যাতে বিদেশীদের হাটে বেরিয়ে না যায়—তার জন্ম পিতামহদের আমল থেকে নন্দিসংকটের পথ আটক করা আছে।" এ সংবাদ স্বয়ং মহারাজের উক্তি থেকে পাওয়া যায়। উদারহৃদয় যুবরাজ অভিজিৎ শিবতরাই-এর প্রজাদের মুখ চেয়ে এই পথটি খুলে দিয়েছিলেন, তাই তাঁর উপর রাজা-প্রজা সকলেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। "কারণ এ কাজ উত্তরকূটের স্বার্থের বিরোধী। অভিজিৎ সেই পথটাই খুলে দিলে! উত্তরকূটে অন্নবস্ত্র দুর্মূল্য হয়ে উঠবে যে!" এক কথায় নন্দিসংকটের গড় ভেঙে দিয়ে যুবরাজ তাদের ভোজন-পাত্রের তলা খসিয়ে দিয়েছেন। এই সব উক্তির মধ্যে অর্থনৈতিক শোষণের যে চিত্র ফুটে ওঠে তার চেয়ে ভয়ঙ্কর আর কি হতে পারে?

এই অত্যাচারের জলন্ত নিদর্শন রবীন্দ্রনাথ নিজ দেশেই দেখতে পেয়েছিলেন। ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের নিষ্ঠুর শোষণে ভারতের প্রাচীন শিল্পসম্পদ প্রায় সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যে ভারত বিশ্ব-ইতিহাসে সোনার ভারতরূপে উজ্জ্বল হয়ে আছে সেই ভারতের অধিবাসী-দের অকথ্য গ্লানি ও লাঞ্ছনা রবীন্দ্রনাথ নিজ চক্ষেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সমগ্রভাবে পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে লক্ষ্য করলে অবশ্য বোঝা যায় যে, শুধু ভারতই নয়—এই নির্লজ্জ লোভ ও অত্যাচারের খাদ্যে পরিণত হয়েছিল এশিয়া ও আফ্রিকার প্রায় সমস্ত অনুন্নত দেশগুলি। শুধু সুদূর প্রাচ্যে জাপান পশ্চিমের অস্ত্র ও শিল্প অবলীলাক্রমে আয়ত্ত করে নিজের অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল।

কিন্তু এই অত্যাচার ও নির্মম শোষণ ত চিরকাল চলতে পারে না। এর থেকে মুক্তির পথ কোথায়? রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারা নাটকে নগ্ন সাম্রাজ্যবাদের নিষ্ঠুর শাসন থেকে মুক্তির "পথ" নির্ণীত হয়েছে। খুব সম্ভবত এই কারণেই কবি নাটকটির প্রথম নামকরণ করেছিলেন "পথ"। বিধাতার নির্দিষ্ট নিয়মে এ পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষেরি মানুষের মত বাঁচবার অধিকার আছে। তার অন্ন, তার বস্ত্র এবং তার সুস্থ সবল জীবনযাত্রা নির্বাহের অধিকার যখন অন্যের অন্যায় অত্যাচারে দুর্লভ হয়ে ওঠে, তখন মনে হয় যেন বিধাতার সহজ সরল কল্যাণের ধারাটিই অবরুদ্ধ হয়েছে। যন্ত্ররাজ বিভূতির চেষ্টায় আবদ্ধ-মুক্তধারা ঝর্ণা এই লুপ্তপথ সহজ,কল্যাণের প্রবাহ। কিন্তু যান্ত্রিকতার এ পীড়ন অস্বাভাবিক—বিধাতার নিয়ম-বিরুদ্ধ। তাই উৎপীড়িত মানুষের মনে তীব্র প্রতিবাদ জেগে ওঠে। প্রতিবাদ শুধু পীড়িতদের মধ্যেই জাগে না—পীড়নকারীদের মধ্য থেকেও প্রতিবাদের সুর বেজে ওঠে। নাটকের প্রস্তাবনাতে রবীন্দ্রনাথ এ সত্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন। যান্ত্রিকতার চাপে যারা নিষ্পিষ্ট তাদের মধ্যের যে বিক্ষোভ তা রূপ নিয়েছে শিবতরাই-এর ধনঞ্জয় বৈরাগীর মধ্যে। অদ্ভুত তার সংগ্রামের রীতি। সে যন্ত্রকে যন্ত্র দিয়ে আঘাত করতে চায় না। সে মার দিয়ে মার ঠেকাতে চায় না। সে বলে—"মারকে আমি না-মারা দিয়ে ঠেকাব—না-লাগা দিয়ে ঠেকাব।" সমস্ত অত্যা-চারের ঊর্দ্ধে উঠে সে দেখাতে চায় যে মানুষের পশু-বলের থেকে তার আত্মিক বল অনেক বেশী। তার অনুচরেরা অনেক সময় চঞ্চল হয়ে ওঠে—হিংসার পথে পা বাড়াতে চায়। বলে "আর তো সহ্য হয় না প্রভু—এক-বার হুকুম দাও তো দেখি।" সর্বংসহা বৈরাগী বলে—"হ্যাঁরে এখনও মারের উপরে উঠতে পারলি নে? এখনও লাগে?···দেখ মার খেয়ে যেমন বলতে পারবি লাগছে না—অমনি মারের শিকড় যাবে কাটা।" কে বলবে এই ধনঞ্জয় বৈরাগীর মধ্যে মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর অহিংস সংগ্রামের নীতি প্রতিভাত হয়েছে কি না? মহাত্মাজীর নির্দেশিত অহিংস প্রতিরোধের সঙ্গে ধনঞ্জয় বৈরাগীর প্রতিরোধের পথের সাদৃশ্য এতই সুস্পষ্ট যে লক্ষ্য না করাই কঠিন। রবীন্দ্রনাথ নিজে অবশ্য এ কথা কোথাও স্বীকার করেছেন বলে জানা নাই। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের আওতায় বাস করে একথা স্পষ্ট করে বলার উপায় ছিল না—সেকথা বলার দায়ও কবির নয়। কিন্তু একথা উল্লেখ না করে পারা যায় না যে, ১৯২১ সনে ভারতে মহাত্মাজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন সুরু হয় এবং মুক্তধারা রচিত হয়েছিল ১৯২২ সনে। দক্ষিণ আফ্রিকায় এই সত্যাগ্রহ বা অহিংস প্রতিরোধের নীতি আরও পূর্বে প্রচারিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ যে গান্ধীজীর নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁকে সমস্ত অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা করতেন এ কথা সর্বজনবিদিত। গান্ধীজীকে "মহাত্মা" আখ্যায় তিনিই প্রথম বিভূষিত করেছিলেন। সুতরাং মহাত্মাজীর নির্দেশিত পথেই সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান সম্ভব এ আভাস তিনি যদি মুক্তধারা নাটকে দিয়ে থাকেন তবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

এ তো গেল পীড়িত মানুষের ভিতরকার কথা। অন্যদিকে যারা মানুষের মনুষ্যত্বকে আঘাত করতে তাদের ভিতরকার সত্যকার মানুষটিও এতে কম আঘাত পায় নি। রবীন্দ্রনাথ মনুষ্যত্বের অপমৃত্যুতে বিশ্বাস করতেন না। মানুষের সকল স্খলন, পতন ও অধঃপতনের মধ্যে

মানুষের আত্মার মৃত্যু ঘটে না এ ছিল তাঁর বিশ্বাস। মনুষ্যত্ব কিছুকালের জন্য সুপ্ত হয়ে থাকলেও তার জাগরণ হবেই এইটিই তাঁর মতে ধ্রুব সত্য। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"যন্ত্র দিয়ে যারা মানুষকে মারে তাদের একটা বিষম শোচনীয়তা আছে; কেন না যে মনুষ্যত্বকে তারা মারে সেই মনুষ্যত্ব যে তাদের নিজের ভিতরেও আছে—তাদের যন্ত্রই তাদের নিজের ভিতরকার মানুষকে মারছে। আমার নাটকের অভিজিৎ হচ্ছে সেই মারনেওয়ালার ভিতরকার মানুষ। নিজের যন্ত্রের হাত থেকে নিজে মুক্ত হবার জন্যে সে প্রাণ দিয়েছে।"

রবীন্দ্রনাথ আশা করেছিলেন মনুষ্যত্বের অপমানকর এই যন্ত্রশাসনের একদিন অবসান ঘটবেই। যান্ত্রিক পীড়নে পীড়িত মানুষ যেদিন সকল পীড়নকে তুচ্ছ করে অত্যাচারীর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে বলতে পারবে—"তোমার পীড়নকে আমি ভয় করি না, মৃত্যুভয় আমার কাছে তুচ্ছ।" সেদিন অত্যাচারীর হাতের যন্ত্র সহসা কেঁপে উঠবে। যে জাতি অন্য জাতির মনুষ্যত্বকে অস্বীকার করে তাদের বাঁচবার অধিকারকে হরণ করে বড় হতে চায়, একদিন তারাই বুঝতে পারবে এর ভিতরকার অন্তর্নিহিত মহা অন্যায়কে। সেদিন অত্যাচারীর অন্তরে সুপ্ত তার চিরদিনের মানুষটি জেগে উঠে বলবে—"এ চলবে না—এর অবসান চাই-ই চাই।" সেদিন যন্ত্রের উপর জয়ী হবে প্রাণ। প্রাণ দিয়ে যন্ত্রকে ভেঙে সহজ মনুষ্যত্বের পথকে মুক্ত করে দিয়ে তবেই হবে মানুষের আত্মার বন্ধনমুক্তি। অভিজিতের আত্মদানে পুনর্মুক্ত ছন্দোশীলা মুক্তধারার অবাধ গতি মানবের কল্যাণপথের এই মহামুক্তিরই সূচনা করে। একের মনুষ্যত্বের হানি ঘটিয়ে অপরের সত্যকার উন্নতি কখনোই ঘটতে পারে না। পৃথিবীতে প্রত্যেক জাতির স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ উন্নতি এবং শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থিতির মধ্যেই মানব-কল্যাণের একমাত্র সহজ পথ। মুক্তধারা নাটকের এটাই প্রতিপাদ্য বিষয়।

মুক্তধারা রচিত হয়েছিল ১৯২২ সনে, রক্তকরবী প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সনে। প্রথমটিতে দেখানো হয়েছে রাজ্যগ্রাসী মনোবৃত্তিজাত তীব্র যান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের নগ্নপীড়নের হাত হতে মানুষের মুক্তির পথ। আর রক্তকরবী নাটকে দেখানো হয়েছে কেমন করে যন্ত্রে পূর্ণ অগ্রসর ঐশ্বর্যবান দেশগুলির ভিতরেও দিনে দিনে অশান্তি ও অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। দেখানো হয়েছে ভারতে মুক্তির ইঙ্গিত কোন্ দিকে। এই হিসাবে বিবেচনা করলে মুক্তধারা ও রক্তকরবী নাটক দুইটি একে অপরের পরিপূরক। যান্ত্রিকতার পীড়নে মানবতার অপমান উভয় নাটকেরই উপজীব্য। মানুষকে ছাড়িয়ে যন্ত্র যেখানে বড় হয়ে উঠেছে, মানুষে মানুষে সহজ সম্বন্ধ লুপ্ত হয়ে গিয়ে সেখানে আছে শুধু সন্দেহ, অবিশ্বাস আর হানাহানি কাড়াকাড়ির অভিসম্পাত। পুঞ্জীভূত ঐশ্বর্যের মাঝেও তাই সেখানে মানবাত্মা ক্লান্ত হয়ে উঠেছে—ব্যাকুল হয়ে উঠেছে সহজ সুন্দরের জন্য—যে সহজ একদিন তার আয়ত্তের মধ্যেই ছিল, কিন্তু আজ দূরে হারিয়ে গেছে। বিরাট এক বিপ্লবের মাধ্যমে রক্ত-করবীর মানুষ তাই আবার উত্তীর্ণ হয়েছে মানবের সহজ আনন্দলোকের মধ্যে যেখানে রয়েছে পায়ের নীচে সবুজ প্রান্তর আর মাথার উপরে উদার নীল আকাশ। যন্ত্র-প্রধান ও শিল্পপ্রধান প্রবল প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ আধুনিক সভ্যতার মুক্তির সন্ধান তিনি দেখিয়েছেন—"পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে"—এই গানের উদাস-করা সুরে।

মুক্তধারার মধ্যেও যন্ত্রনিপীড়িত আর্তমানবাত্মার করুণ ক্রন্দন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এ ক্রন্দন এক জাতির শাসনে পীড়িত অপর এক পরাধীন জাতির অসহায় মানুষের। আর তারি পাশে আর এক শ্রেণীর মানুষের ক্রন্দন মুখর হয়ে উঠেছে। যন্ত্রকে জয়যুক্ত করতে কত মার বুক থেকে সন্তান হারিয়ে গেছে—কত বৃদ্ধ পিতার স্নেহের বংশধর গেল গুঁড়িয়ে। সেই পুত্রহারা মাতা আর পিতৃপিতামহের অভিশাপও এসে লাগল প্রাণহীন যন্ত্রশাসনের জয়স্তম্ভকে। কিন্তু এ ক্রন্দনেরও শেষ আছে—এ অত্যাচারও চিরস্থায়ী নয়। অন্তর ও বাহিরের সম্মিলিত আঘাতে যান্ত্রিকতার এ পীড়নও একদিন শেষ হবে—এই আশার বাণী শুনিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মুক্তধারার যবনিকা টেনেছেন।

মুক্তধারা একাঙ্ক রূপকনাট্য

রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' রূপকনাট্যটির ঘটনা যে স্থানটিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে সেটি হচ্ছে উত্তরকূট রাজ্যের রাজধানী। উত্তরকূট যন্ত্রবলে বলীয়ান এক রাজ্য। শিবতরাই তার অধীনস্থ এক রাজ্যখণ্ড। উত্তর-কূটের শিল্পী যন্ত্ররাজ বিভূতি বিরাট এক যন্ত্র নির্ম্মাণ করেছেন—যার সাহায্যে দুই রাজ্যের মধ্যে প্রবহমান মুক্তধারা ঝর্ণাকে বাঁধা হয়েছে। এ বাঁধার উদ্দেশ্য শিবতরাইকে তার তৃষ্ণার জল থেকে বঞ্চিত করা। ক্ষুধার অন্ন আর তৃষ্ণার জলের জন্য উত্তরকূটের মুখাপেক্ষী হয়ে যাতে শিবতরাই সম্পূর্ণ ভাবে উত্তরকূটের দয়ার

ভিখারী ও পদানত হয়ে থাকে তারই জন্ম এত আয়োজন। এই যন্ত্র-প্রতিষ্ঠার দিনটিতে উত্তরকূটে মহা সমারোহ—কারণ শিবতরাইকে বশে রাখবার এমন সুন্দর উপায় এর আগে কখনো আবিষ্কৃত হয় নি। যন্ত্ররাজ বিভূতির সম্বর্দ্ধনার জন্ম তাই বিপুল আয়োজন করা হচ্ছে। রাজা মন্ত্রী হতে আরম্ভ করে উত্তরকূটের সকলের মুখেই সেদিন একটা নাম—সে নাম যন্ত্ররাজ বিভূতির। ঐ একই দিনে আবার উত্তরকূটের প্রধান দেবতা উত্তর-ভৈরবের বার্ষিক পূজা-উৎসবের দিন। দলে দলে ভৈরব-পন্থী সন্ন্যাসী উদাত্তকণ্ঠে শঙ্করস্তোত্র গাইতে গাইতে মন্দির পরিক্রমা করছে। রাজ্যের সকল স্থান হতে ভৈরবের উপাসকেরা সম্মিলিত।

বস্তুতঃ মুক্তধারা নাটকের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে যন্ত্র আর দেবতা পাশাপাশি বিরাজ করছেন। ভৈরবমন্দিরের চূড়ার ত্রিশূলের ঠিক পাশেই বিভূতির যন্ত্রের চূড়াটি অসহ্য স্পর্দ্ধায় দৃশ্যমান। দেবতা ও যন্ত্রে যেন এক প্রতিযোগিতা সুরু হয়েছে—কে জয়ী হবে দেবতা না যন্ত্র, এই হোল প্রশ্ন। উত্তরকূটের নাগরিকদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি দেবতাকেও সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে এনে ফেলেছে। তারা ভুলে গেছে যে, দেবতা কোন ব্যক্তি-বিশেষের নন—কোন সম্প্রদায়বিশেষের নন—তিনি সর্ব-দেশের সর্বকালের মানুষের। তাঁর কমণ্ডলু হতে যে জলধারা নিঃসৃত হচ্ছে তা সকল মানুষের জন্ম। তাই মুক্তধারাকে আবদ্ধ করে যন্ত্ররাজ দেবতার কল্যাণ-আদর্শকেই ক্ষুণ্ণ করেছেন। মুক্তধারার বন্ধন উত্তরকূটের কাম্য হতে পারে, কিন্তু শুধু উত্তরকূটের জয় কখনো দেবতার জয় হতে পারে না। যান্ত্রিকতার পীড়নে পীড়িত মানবের ক্রন্দন বহুদূর হতে তাঁকে বিচলিত করে তোলে, তাঁর রুদ্ররোষের বহ্নিকে জাগরিত করে। সত্য-প্রতিষ্ঠার জন্ম, ন্যায়-প্রতিষ্ঠার জন্ম তাঁর জাগৃতি তাই অবশ্যম্ভাবী। দেবতার হাতে কাল অনন্ত—তাই তাঁর জাগরণ দ্রুত অথবা বিলম্বিত হতে পারে। কিন্তু জাগতে তাঁকে হবেই। উত্তরকূটের মানুষেরা এই ধ্রুব সত্যটি ভুলে গেছে—তাই বাইবেলোক্ত ইহুদীদের মতো তাদের ধারণা যে তারাই দেবতাদের প্রিয় জাতি—"The chosen People of God"। তারা মনে করে তাদের পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে ভৈরব তাদের শত্রুদমনে সাহায্য করবেন। তাদের পূজা তাই সত্যকার পূজা না হয়ে বেতনে পরিণত হয়েছে। তাই রাজা রণজিৎ বলেছেন, "উত্তরকূটের যিনি পুরদেবতা আমাদের জয়ে তাঁরই জয়। ...তৃষ্ণার শূলে শিবতরাইকে বিদ্ধ করে তাকে তিনি উত্তরকূটের সিংহাসনের তলায় ফেলে দিয়ে যাবেন।" এই উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করেন রাজার খুড়া মহরাজ বিশ্বজিৎ, যাঁর দৃষ্টিকে যুবরাজ অভিজিৎ দিয়েছিলেন মুক্ত করে। তিনি বলেন, "তবে তোমাদের পূজা পূজাই নয়, বেতন।" এদিকে যন্ত্ররাজ বিভূতি তো স্পষ্টই ঘোষণা করেছেন যে, যন্ত্রবলে দেবতার পদ তিনি নিজেই নেবেন। মূঢ়তার এই নিষ্ফল স্পর্দ্ধা কি দেবতা চিরকালই সহ্য করবেন? সে প্রশ্ন বার বার উত্থাপিত হয়েছে। সর্বস্ব-হারা বটুকের কণ্ঠে বার বার তাঁর আহ্বান শোনা যাচ্ছে, "জাগো ভৈরব জাগো।" ভৈরবপন্থীদের কণ্ঠে উদাত্ত-স্বরে বার বার তাঁর জয়ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে। নাটকের মধ্যে ভৈরবমন্ত্রের রহস্যময় আহ্বান এক অতীন্দ্রিয় লোকের আভাস দিয়ে যায়। ভৈরব কি জাগ্রত না নিদ্রিত? তাঁর আহ্বান তো সকলে শুনতে পায় না। তাঁর জাগরণের বাণী যে দু'একজনের অন্তরে এসে পৌঁছে-ছিল তাদের মধ্যে ছিলেন ধনঞ্জয় বৈরাগী আর যুবরাজ অভিজিৎ। তাঁরা ভুল করেন নি—স্পষ্ট শুনেছিলেন ভৈরবের প্রলয়নৃত্য আরম্ভের ডমরুধ্বনি। যুবরাজ অভিজিতের অন্তরে যে প্রেরণা সেই তো দৈবী প্রেরণা। "উত্তরকূটে যে দেবতাও আছেন সে কথাও প্রমাণ করা চাই।" এই হোল অভিজিতের মর্মবাণী। তাঁর আত্মদানে মুক্তধারার বন্ধনমোচনে দৈবীশক্তির বিজয়ও হয়েছে বিঘোষিত। ক্রমশঃ

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

আরতি

শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর

(প্রবাসী, ১৩৪৪ সনের কার্ত্তিক হইতে পুনর্মুদ্রিত)

বিপ্লবীর জীবন-দর্শন

প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী

৮

আমাদের চুড়াইল গ্রাম ছিল জনবহুল ঘনবসতি এবং প্রত্যেকটা বাড়ীই ছোট ছোট। কিন্তু মামাদের দেশ হরিণা চালিতাতলী এবং আশেপাশের গ্রামগুলি জনবিরল এবং এক একটা বাড়ী যেন এক একটা গ্রাম জুড়ে।

মামাবাড়ীকে লোকে "ঠাকুরবাড়ী" অর্থাৎ গুরুবাড়ী বলত। আমার মামারা ঠাকুর উপাধিতেই বেশী পরিচিত।

মামাবাড়ী ছিল পরিখা-বেষ্টিত প্রকাণ্ড বাড়ী। সীমানার মধ্যে ছিল খুব বড় একটা দীঘি, বড়-ছোট দুটো পুকুর। পরিখাতে সব সময় জল থাকত। নদীর সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে জোয়ার ভাটায় জল কমত বাড়ত। বাড়ীর সীমানার মধ্যেই ছিল ঘন সুপারি বাগান। এ বাড়ীতে দুটো পুরনো ধরনের দোতলা ইটের দেউড়ির অংশ তখনও ছিল এবং তার মধ্য দিয়েই যাতায়াত করতে হত।

দীঘিতে ছিল প্রকাণ্ড ইটের ঘাট—তখন ভগ্নাবস্থায়। পূর্বপারে 'পঞ্চরত্ন' নামে কারুকার্য খচিত অতি সুন্দর একটা দালান ছিল। পরিখার পাশ দিয়ে বাড়ীর চার দিকে ভাঙ্গা প্রাচীর তখনও পুরনোদিনের স্মৃতি বয়ে আনত। প্রাচীরের গায়ে গায়ে প্রকোষ্ঠগুলি স্মরণ করিয়ে দিত সেই যুগের কথা যখন এতে বসে বাড়ী পাহারা দিতে হ'ত বা বাড়ীর নানা ধরনের কর্মচারীরা বসবাস করতে পারত।

দুর্গামণ্ডপ, ঠাকুরদালান, এবং আর একটা তিনতলা দালান তখন ভগ্নাবস্থায়—বট ও নানা বৃক্ষলতায় সমাকীর্ণ। দালানগুলি কড়ি-বরগাহীন এবং পুরনো ধরনের খুব ছোট ছোট ইটে তৈরী। জানালা প্রায় ছিলই না বলা যায়। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে দিনের বেলাতেও আলোর প্রয়োজন হত।

আঁধার মাণিক নামে আর একটা কোঠাবাড়ী দেখেছি তার একতলা ছিল মাটির নীচে। দোতলা উপর হলেও ছিল অন্ধকার রহস্যপূর্ণ। এ দালানে কেউ প্রবেশ করে না। পূর্বে নাকি এর ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠে ধনরত্ন লুকনো থাকতো। আলো নিয়ে গুপ্তদ্বার দিয়ে ভূগর্ভে নামতে হ'ত। সুড়ঙ্গপথের চিহ্ন তখনও আমি দেখেছি। দালানটি কেবল বৃক্ষলতা পরিবেষ্টিত নয়, বহু বিষধর সর্পের আবাসভূমিও বটে। এই বাড়ীটা সম্বন্ধে কত আশ্চর্য গল্প শুনতাম ছোটবেলায়। অনেক সোনারূপা, মণি-মাণিক্য নাকি তখন পর্যন্তও যক্ষের পাহারায় মজুত ছিল। মামাদের বংশে কোন পুণ্যবান ব্যক্তি পুনরায় জন্মগ্রহণ করে নিজের সাধনার শক্তিতে উদ্ধার করবেন।

সমস্ত বাড়ীটাই একটা পুরাতন দুর্গের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ। অরাজকতার যুগে ডাকাত ও শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই এমনি করে সুরক্ষিত ভাবে তৈরি করতে হয়েছিল। এই বাড়ীতেই আক্রমণ ও ডাকাতির কয়েকটা গল্প শুনেছি।

যে সময়ের কথা বলছি তখন মামারা দারিদ্র্য-দশাগ্রস্ত। কিন্তু তখনও বাড়ীটার পুরাতন সমৃদ্ধির স্মৃতি গর্বের সঞ্চার করত। ভবিষ্যতে পুনরায় সর্বানন্দ ঠাকুর আবির্ভূত হয়ে বংশের পূর্বের সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনবেন—এই আশাতেই তারা সব দুঃখ কষ্ট ভুলে যেতেন।

মাতামহ, আমার মায়ের জ্যেষ্ঠতাত, কালিচন্দ্র ঠাকুর, বড় মামা অপর্ণানাথ ঠাকুর, ছোট মামা উমানাথ ঠাকুর, এবং অন্যান্যদের কাছে কত গল্প শুনেছি, আর বাড়ীর ভাঙা অংশগুলির দিকে চেয়ে চেয়ে প্রাচীন ইতিহাসের মধ্যে ফিরে যেতাম। সেকালের অরাজকতার ছবি মনে ফুটে উঠত। ইংরেজ রাজত্ব চিরকাল ছিল না—তার আগেকার কথাও আছে। তখনকার সমাজ-জীবনের আভাস, সুখ দুঃখের কথা, আপন শক্তিতে আত্মরক্ষার কত কাহিনী গাছ-পালায় ঢাকা, সাপখোপে ভরা ঐ ভাঙা বাড়ীর কোঠায় কোঠায় লেখা আছে। গল্প শুনে শিউরে উঠতাম। সেকালে ফিরে যাওয়ার জন্য মনটা উৎসুক হয়ে উঠত।

সে সময় ত্রিপুরা রাজ্যের গল্পও খুব আগ্রহের সঙ্গে শুনতাম। শিশুকালে জানতাম সমগ্র ভারতব্যাপীই ইংরেজ রাজত্ব। ইংরেজের একচ্ছত্র আধিপত্য। এর বিপরীত কোথাও কিছু থাকতে পারে ভাবতেই পারতাম না। অত ছোট বয়সে দেশীয় রাজ্যগুলির কথা ভাল করে বুঝতেও পারতাম না। আমার মামাবাড়ী ত্রিপুরা-

জেলার পাশেই স্বাধীন হিন্দুরাজ্য ত্রিপুরা নামক দেশ আছে এ কথাটা আমার মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করত। লোকে বলত "স্বাধীন ত্রিপুরা"। সেখানে কারাগার, পুলিস, বিচারালয় সবই আছে। আছে সেই রাজ্যে সৈন্য আর বন্দুক। ইংরেজ পুলিসের কোন অধিকার নেই আর রাজা ইংরেজকে খাজনা দেয় না। সে সময়ই শুনেছিলাম নেপাল নামে আর একটা স্বাধীন হিন্দুরাজ্যও হিমালয়ের উপর আছে। তখন পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে গুর্খার আমদানী বেশী হয় নি। গুর্খা পুলিস ও সৈন্য ব্রিটিশ সরকার প্রথম আনে স্বদেশী আন্দোলন দমন করতে লাঠি ও বন্দুক দিয়ে। সেকথা এখন থাক। অবাক হয়ে শুনেছিলাম যে এই ত্রিপুরা রাজ্য কখনও মুসলমান কিংবা ইংরেজ রাজার অধীন হয় নি। যদিও ত্রিপুরা রাজ্যের কোনও অংশমাত্র বিদেশী রাজার অধিকারে গেছে এই রাজ্য সমগ্রভাবে বা রাজধানী কখনও বিদেশী আক্রমণকারীর পদস্পর্শে অশুচি হয় নি।

এ সমস্ত কাহিনী আমার শিশুমনকে গর্বিত করে তুলত। এই ভারত-ভূমিতেই স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্ব, মুষ্টিমেয় বুয়রদের কাছে অপরাজেয় ব্রিটিশ সৈন্যের শোচনীয় পরাজয়, আর ইংরেজদের মতই শ্বেতাঙ্গ রুশিয়ার আমাদের এশিয়াবাসী ক্ষুদ্র জাপানের হাতে চূড়ান্ত পরাজয়—এই সব কিছু মিলে শিশুমন ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠত।

আমার মাতুল বংশকে যাঁরা চালিতাতলী গ্রামে স্থাপিত করেছিলেন সেই হরিণা চৌধুরীদের বাড়ীও আমার মামাদের বাড়ীর ঢঙে তৈরী ছিল। প্রশস্ত পরিখা সাঁকো দিয়ে পার হতে হত। যদিও এখন আর পূর্বের সমৃদ্ধি নেই তথাপি অনেকেই আধুনিক লেখাপড়া শিখে অন্যদিকে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন।

ছেলেবেলায় দেখেছি কেউ জুতো পরে কিংবা ছাতা মাথায় দিয়ে মামাবাড়ীর সীমানার মধ্যে প্রবেশ করতে পারত না। একে ত ঠাকুর বাড়িটাই পবিত্র, তাছাড়া ঠাকুরমশাইরা সকলেই মাননীয়; সুতরাং ছাতা এবং জুতো ব্যবহার করে বাড়ীতে প্রবেশ করলে তাদেরকে অমর্যাদা করার সামিল ছিল। বাড়ীর সর্বত্রই এত দেবদেবী ছিল যে ভিতরে আসতে হলে প্রণাম করতে করতে ঢুকতে হ'ত। ঠাকুরবাড়ীর ছোট ছেলেরাও গ্রামের সকলের প্রণাম পেত। গ্রামের বাজারের নামই ছিল 'ঠাকুরহাট'। সেখানে যেদিন হাট বসত সে দিন দেখেছি গ্রামস্থ সবাই ঠাকুরদের পায়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করছে।

বাস্তবিক পক্ষে মামাবাড়ীতে যেন একটা ভিন্ন আবহাওয়ার মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হতাম। বার মাসই ত্রিসন্ধ্যা, বাড়ির আবালবৃদ্ধবণিতা পুকুরঘাটে কিংবা ঘরের বারান্দায় বসে সন্ধ্যা-বন্দনায় নিরত আছে। সারাদিনই বাড়ীতে পূজো-অর্চনা চলছে। শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর এবং উলুধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত। যাদের জীবনে নেমে এসেছে বৈধব্যের অভিশাপ তারা জপতপ বা শিবপূজায় সময় অতিবাহিত করতেন। দৈনিক পূজা ছাড়াও ছিল বার মাসে তেরো পার্বণ। আশ্রিত পূজারী ব্রাহ্মণরা তাহারই তদারক করতেন মন্দির মন্দির ঘুরে। ঢাকঢোল বাজিয়ে যাচ্ছে বাদ্যকরেরা। বাড়ীর মেয়েরা কেউ বা সাজি হাতে ফুল তুলতে ব্যস্ত। অপেক্ষাকৃত যারা বয়স্ক তারা বেলপাতা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে রাখছে কিংবা চন্দন ঘষছে। পুরুষদের কারুর কারুর পরিধানে রক্ত-বসন, কপালে রক্ত-চন্দনের তিলক, নগ্নগাত্রে শুভ্র যজ্ঞোপবীত লম্বিত, রক্তবর্ণের ফুলে শিখা বাঁধা আছে। কেউ কেউ রুদ্রাক্ষের মালা পরতেন যেমন বৈষ্ণবরা পরিধান করেন তুলসীর মালা। রুদ্রাক্ষের মালা শক্তি-উপাসক তান্ত্রিকদেরই পরিধেয়।

বৈঠকখানায় দেখতাম হিন্দু-মুসলমান প্রজারা কর্তাদের সঙ্গে জমাজমির ব্যাপারে আলোচনা করছে। গৃহস্থরা ঠাকুরদের কাছ থেকে জেনে যাচ্ছে শাস্ত্রসম্মত বিধি-ব্যবস্থা। বাড়ীতে যদিও একটাও ঘড়ি থাকত না তথাপি তারা আকাশের দিকে তাকিয়ে সূর্য-চন্দ্র-তারকার অবস্থিতি দেখে দণ্ড-প্রহর স্থির করছেন। ভুল করা চলবে না। কারণ সমস্ত পূজাই ঠিক ঠিক সময়ে করতে হবে।

এঁদের পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল অতীব স্বল্প। বাড়ীতে একপ্রকার ধুতি পরিধান করেই কাটিয়ে দিতেন। সার্ট পাঞ্জাবী বা গেঞ্জির প্রয়োজন হ'ত না। জুতোর ব্যবহার প্রচলন ছিল না। খড়ম পায়ে দিয়েই চলাফেরা করতেন। বাইরে কোথাও যেতে হলে খালিপায়ে যেতেন। গাত্রাবরণ হিসেবে নিতেন নামাবলি বা দেবতার নামাঙ্কিত চাদর। ইদানীং কাউকে কাউকে চটি ব্যবহার করতে দেখেছি।

মেয়েদের বেলাতেও দেখেছি যে, সেমিজ-কামিজের বড় একটা প্রয়োজন তাদের হ'ত না। একবস্ত্রেই তারা গাত্র আচ্ছাদন করতেন। বাড়ির বউ এবং বিবাহিতা মেয়েরা শাঁখা সিঁদুর ব্যবহার করতেন—যদিও আজকাল এর ব্যবহার কমে আসছে। এ প্রসঙ্গে পরবর্তী কালের একটা ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারছি না।

১৯৪০ সনে একদিন আমি ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু একই মোটরে ঢাকা শহরের শাঁখারীবাজারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। রাস্তার দু'পাশে, ছাদের উপর এবং জানালার ধারে হাজার হাজার নরনারী জোড়হাত করে দাঁড়িয়ে আছে। যেতে যেতেই শুনতে পেলাম সুভাষবাবুর কাছে তাদের আবেদন—"ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকেরা এখন শাঁখা-পরা ছেড়ে দিচ্ছে। আমাদের ব্যবসা ডুবতে বসেছে। আমরা অনাহারে মরছি।" মন ব্যথায় টন টন করে উঠল। যান্ত্রিক সভ্যতার সংঘাতে অর্থনৈতিক বিবর্তন ও কুটীর-শিল্পের উপর তার প্রভাব তাদেরকে বুঝিয়ে বলবার স্থান বা কাল তখন ছিল না। পরে অবশ্য ঢাকা কংগ্রেস অফিসে ফিরে গিয়ে সদ্য-বিবাহিতা প্রসিদ্ধ একজন মহিলা রাজনৈতিক কর্মীকে আমাদের অভিজ্ঞতার কথা বললাম এবং জিজ্ঞেস করলাম যে, তাঁরা কি উপলব্ধি করছেন যে, তাঁদের মত মহিলারা শাঁখা ব্যবহার না করায় এমনি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বেশ একটু শ্লেষের সঙ্গেই উত্তর দিলেন—"নারীদের শাঁখা ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে চান নাকি এবং না করলে তারা শাস্তিমূলক ব্যবস্থাধীনে আসবে!"

যাক্ এই পর্যন্ত। মামাবাড়িতে দেখতাম বাড়ীর বউরা খুব ভোরে উঠে গোবরজল গুলে সারা বাড়ীতে গোবর-ছড়া দিচ্ছে। পরে ঘরদোর লেপেপুঁছে বাসন মাজতে ঘাটে চলে যাচ্ছেন। রান্নাবান্না, কুটনো-বাটনা ঘরের যাবতীয় কাজ তাঁরাই করতেন। ঢেঁকি কিংবা হামানদিস্তা (কাঙাল-ছিয়া পূর্ববঙ্গের কথা) মেয়েরাই চালাতেন। আবার কাঁথা-সেলাই ছিল তাঁদের অতি প্রয়োজনীয় কাজ। এরই মধ্যে সময় করে মহাভারত, রামায়ণ, চণ্ডী ও নানা পুরাণের ব্যাখ্যান শুনতেন। এই পরিবারের বউরা স্ত্রীলোক হয়েও শিষ্য এবং নিজ-পরিবারের অপরকে মন্ত্রদান করার অধিকারী ছিলেন, আজও তাই আছেন।

গৃহ-দেবতার পূজা সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে একমাত্র শিশু ছাড়া আর কেউ আহার করত না। আমিষাশী হলেও এঁরা পিঁয়াজ, রশুন খেতেন না। সমস্ত আহার্যদ্রব্যই রান্নার পর দেবতার নিকট নিবেদন করে প্রসাদস্বরূপ আহার করতেন।

অন্নবস্ত্রের অভাববোধ খুবই কম ছিল এদের।

সমগ্র ঠাকুরবাড়ি তিন হিস্সায় বিভক্ত ছিল। প্রতি হিস্সার পরিবার প্রথমে একান্নবর্তীই ছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে তা ভেঙে গিয়ে একাধিক পৃথকান্নের ব্যবস্থা হয়েছিল।

অভাববোধ কম থাকলেও অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যই ছিল বলা যায়। গুরুদক্ষিণা, খাজনা, জমির ফসল, পুকুরের মাছ, গরুর দুধ আর কি চাই। তবুও কিছু নগদ টাকার প্রয়োজন এদের মনে উঁকি দিতে সুরু করেছে। তবে সে অভাববোধ তেমন তীব্র হয়ে ওঠে নি। কেননা বাজার থেকে কেনবার বড় বিশেষ কিছুর প্রয়োজনই হ'ত না।

ছেলেবেলায় মামাবাড়ীতে দেশলাই ব্যবহার করতে বড় একটা দেখি নি। চকমকি এবং পাটকাঠিতে গন্ধক লাগিয়ে কাজ নির্বাহ করতেন। বাংলা দেশের প্রায় সব গ্রামেই বোধ হয় কমবেশী এমনি প্রচলন ছিল।

তামাকের প্রচলন খুবই ছিল। তবে সে তামাক বাড়ীতেই তৈরী হ'ত—তামাকপাতা কেটে মাতগুড়ে মেখে। আর ঘরে থাকত আগুন মাটির পাত্রে।

কেরোসিন ও লণ্ঠন ব্যবহার খুব কম দেখেছি। ঘরে জ্বলত মাটির প্রদীপ। বাইরে চলাফেরার জন্য কেউ কেউ সাধারণ একটা লণ্ঠন ব্যবহার করতেন। সাধারণত দূর পথের জন্য ছিল পাটকাঠি কিংবা মশাল।

শীতের সময় মেয়েরা বিশেষ করে প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধারা মালসায় তুষের আগুন জ্বালিয়ে সঙ্গে রাখতেন শীত নিবারণের জন্য। পুরুষেরা ধুতির খুঁট বড় জোর একটা চাদর গায়ে জড়াতেন। প্রচণ্ড শীতেও এদের প্রাতঃস্নান কিংবা সন্ধ্যা-বন্দনা বন্ধ থাকত না।

অতিথিকে এঁরা দেবতাস্বরূপ মনে করতেন। সুতরাং এঁদের সেবা পুণ্য কার্য সামিল। অতিথি-অভ্যাগত ছাড়াও এঁদের দেখেছি রাস্তার লোক ডেকে খাওয়াতে। আজ অবশ্য আর সেদিন নেই। এঁদের কারুর কারুর আর দুবেলা অন্নসংস্থান হয় না।

বাড়ীর বউরা ঘোমটা দিয়ে চলতেন কিন্তু বিবাহিতা মেয়েরা পিত্রালয়ে এসে অবগুণ্ঠন দিতেন ফেলে। কোন স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে দিনের বেলা সাক্ষাৎ করতেন না। সামনে দিয়ে যেতে হলে মুখ ঢেকে যেতে হ'ত। অবশ্য সমস্ত বাঙালী হিন্দু-পরিবারেই কম বেশী এমনি ব্যবস্থা ছিল। আজকাল অবশ্য অন্য রকম ব্যবস্থা চলতি। গুরুজনের সামনেই স্বামী স্ত্রীকে নাম ধরে ডাকার রেওয়াজ হয়েছে। স্ত্রীও স্বামীর সঙ্গে অকপটে বা সামান্য অবগুণ্ঠন দিয়ে আলাপ করতে দ্বিধাবোধ করছে না।

সে সময়ে আমাদের বংশে পুরুষরা সকলেই বাংলা ও সংস্কৃত লেখাপড়া জানতেন। শিষ্যদের মধ্যে অবশ্য কেউ কেউ ইংরেজী স্কুলে কেবল যাতায়াত সুরু করেছে। বউ বা মেয়েরা সাধারণত কেউ লেখাপড়া জানত না।

খবরের কাগজ বাড়ীতে আসত না। কেন না বাইরের দুনিয়ার খবরাখবর জানবার আগ্রহ ছিল না। সমগ্র গ্রামের মধ্যে এক কি বড় জোর দু'খানা সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' কিংবা 'হিতবাদী' আসত।

চাকর-নফর, ধোপা-নাপিত, বাদ্যকর সবাই ঠাকুরদের জমিতেই বাস করে উপসত্ব ভোগ করত নিষ্কর ভাবে। প্রয়োজনমত ঠাকুরবাড়ীতে কাজ করে দিয়ে যেত—কিন্তু পূজো-পার্বণে এদের প্রাপ্তি ছিল। এই সমস্ত পরিবারের লোকের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ীর লোকদের একটা আত্মীয়তার বন্ধন ছিল। দাদা, মামা, কাকা ডাক অতি সহজ ভাবেই গড়ে উঠত।

আমিই ছেলেবেলায় দেখেছি মামারা নতুন লোক এলে নিষ্কর জমি দিয়ে বসতি করাচ্ছেন। পূজা-পার্বণে এসে স্ত্রী-পুরুষ ঠাকুরবাড়ীতে কাজ করে দিত। এরা বেতনভুক্ হ'ত না। এ সবই অবশ্য সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অংশবিশেষ।

গ্রামে তখন নগদ টাকায় লেনদেনের চাইতে জিনিস দিয়ে জিনিস কিনবার প্রচলনই বেশী ছিল।

আমার মাতুল বংশের সর্বজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি সমাজপতি হতেন। সাধারণত কয়েকখানা গ্রাম নিয়ে হ'ত একটা সমাজ। কয়েকজন প্রধান ব্যক্তি নিয়ে একটা কমিটির মত গঠিত হ'ত। আর তার মধ্যে প্রধান ব্যক্তিকেই সমাজপতি বলা হ'ত। বংশমর্যাদায় এবং শাস্ত্রজ্ঞ সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণই সমাজপতি হতেন। কোন নির্বাচন-প্রথা ছিল না। অধিকাংশই যাকে বা যাঁদের মান্য করত তাঁরাই কর্তৃস্থানীয় বলে গণ্য হতেন। শাস্ত্রানুগত সমাজ-ব্যবস্থা বজায় রাখাই ছিল এঁদের কর্তব্য। শাস্ত্রীয় বিধানের ব্যাখ্যা এবং লঙ্ঘনকারীর দণ্ড বিধান ছিল এঁদেরই হাতে।

মামারা প্রধান হিসেবে সকলেরই মান্য ছিলেন। এক ডাকে সকলে এসে হাজির হত। রাস্তায় চলতে গিয়ে দেখেছি যাদের সঙ্গে দেখা হত তাদের অধিকাংশই পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে রাস্তার এক পাশে সসম্ভ্রমে দাঁড়াত। কারুর বাড়ী গেলে প্রথমেই সকলে প্রণাম করত এবং বসবার যোগ্য আসন দিত। সবাইকে পা-ধোয়ার জল দেওয়ার রীতি ছিল। ঠাকুর-মশায়দের পা অবশ্য বাড়ীর কর্তারাই নিজ হাতে ধুয়ে দিতেন। আহ্নিকের সময় উপস্থিত হলে তার ব্যবস্থা করে দিতেন। শিষ্য কিংবা ব্রাহ্মণেতরের বাড়ীতে ঠাকুররা স্বপাক আহার করতেন।

মামা বাড়ীতে দেখেছি তাঁদের বাড়ী নিমন্ত্রিত অব্রাহ্মণরা নিজেরাই উচ্ছিষ্ট পাতা আহারের পর ফেলে দিতেন। তাঁরা গ্রামের জমিদার, বড়লোক এবং অন্যথা যত সম্মানিতই হোন না কেন, বাড়ীর চাকররাও সে পাতা ফেলত না। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা আজও আমার মনে স্পষ্ট হয়ে আছে—

তখন বাঙালী সমাজে অব্রাহ্মণদের মধ্যে নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের তীব্র আন্দোলন চলছিল। একদল শূদ্র ঠাকুরবাড়ীতে আহার করে পাতা না ফেলে উঠে চলে গেল। এরা ছিল হরিণার চৌধুরীদের পূর্বপুরুষ প্রদত্ত নানা রকম জমাজমি ভোগিদার নফর চাকর শ্রেণীর লোক। এরা নিজেদের শূদ্রত্বের প্রতিবাদে পাতা ফেলল না, কিন্তু চৌধুরীরা নিজেদের হাতে সব পরিষ্কার করে ঠাকুরদের মান রক্ষা করেছিলেন। এ নিয়ে দেশে কম হৈ চৈ হয় নি।

৯

আমার ছোটমামা উমানাথ ঠাকুরের বিয়েতে যে রোমাঞ্চকর পদ্ধতি দেখেছি তা কতকালের অতীত স্মৃতি কে জানে। বিয়ে যথারীতি মেয়ের বাড়ীতেই হয়েছিল। বরানুগমনের দু'একদিন আগে থেকেই দূর দূর জায়গা থেকে অনেক দুর্দান্ত লাঠিয়াল, সড়কি ও বর্শাধারী মামা-বাড়ীতে জমায়েত হলো। বরিশাল এবং পদ্মা-মেঘনার চর অঞ্চলের লাঠিয়ালদের সেকালে খুব নাম-ডাক ছিল। তারা এসে ছোট-বড় লাঠির চমকপ্রদ খেলা দেখাল। কেউ-বা দাঁতে কেউবা বাবরীচুলে ঢেঁকী বেঁধে ঘোরাল। দেখাল আরও কত কসরত।

এই সব জোয়ান সঙ্গে করে বরযাত্রীরা যখন কন্যার বাড়ীর প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হলো তখন কন্যাপক্ষেরও এক দল লোক লাঠিসোটা নিয়ে প্রবল বাধা দিল। তাদের উদ্দেশ্য হ'ল শুধুমাত্র বরকে জোর করে নিয়ে যাওয়া। এ দিকে বরপক্ষের লক্ষ্য সবাই মিলে যাওয়া। প্রচণ্ড লড়াই হ'ল। অনেক লোক হতাহত হলো। কিঞ্চিৎ রক্তপাতের কথা আজও মনে আছে। শেষ পর্যন্ত আমাদের জয় হলো। মামা সদলবলে পাল্কী চড়ে কন্যার বাড়ী প্রবেশ করলেন। বিবাহ সম্পন্ন হলো।

এই রীতি বোধ হয় আজকাল আর নেই। এই ভাবে বিবাহের ব্যবস্থা কোন্ হিন্দুমতে তার ঠিক হদিস্ পাই নি—অর্থাৎ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রজাপত্য, গান্ধর্ব, অসুর, রাক্ষস কিংবা পৈশাচ! যতদূর মনে হয় এমনি প্রথা আসুরিক কিংবা রাক্ষস বিয়ের নিয়মানুযায়ী। কোন এক হিন্দু আইন পুস্তকে দেখেছিলাম—'আত্মীয়স্বজনকে বধ কিংবা পরাভূত করে কন্যাকে জোর করে বিয়ে করাই

রাক্ষস বিবাহ। (Rakshyas or forcible capture of the girl, after her relatives have been killed or wounded in battles.) এই বইতেই আরও আছে যে, এ পদ্ধতি বর্বর যুগের এবং চলতি আছে সামাজিক সংস্কারে। কিন্তু ভীষ্ম পিতামহের অম্বাহরণ, শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণীহরণ, অর্জুনের সুভদ্রাহরণ কতকটা এই ধরনের। মহাভারতে বর্ণিত দেবতুল্য উচ্চশ্রেণীর আর্যদের এ পদ্ধতি এবং ঐতিহাসিক যুগের দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের সংযুক্তা-হরণকে একেবারে বর্বর যুগোপযোগী বলি কি করে!

সে যাই হোক। মামা বাড়ীর প্রসঙ্গে এবং আমার জীবনের ওপর প্রভাবের কথা মনে করে আমার মায়ের জ্যেষ্ঠতাত কালিচন্দ্র ঠাকুরের কথা উল্লেখ না করে পারছি না। তাঁর মত সাধু, সচ্চরিত্র, ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী এবং জিতেন্দ্রিয় গৃহস্থ আমার চোখে খুবই কম পড়েছে। তাঁদের গুরুবংশে তিনিই বোধ হয় শেষ ব্যক্তি যিনি ছিলেন সর্বজনমান্য,শ্রদ্ধাভাজন এবং পূজনীয়। তখন তাঁদের পরিবারে দারিদ্র্য প্রবেশ করেছে। সে অবস্থাতেও তিনি অবলীলাক্রমে সর্বস্ব দান করা সাধারণ কর্তব্যের মতই দেখতেন। তিনি শাস্ত্রালোচনা এবং জপতপে সময় কাটাতেন। যদিও নিজে অলৌকিক কিছু করেন নি কিংবা করতে পারেন বলে দাবিও করেন নি, তথাপি তাঁকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে এবং নির্ভরশীল হয়ে অনেকে আশ্চর্য ফল পেয়েছে। নগ্নগাত্রেই থাকতেন তিনি, কেবল নিদারুণ শীতে দেখেছি নামাবলি ব্যবহার করতে।|তিনি অপরের মতে ছিলেন শ্রদ্ধাবান। সুতরাং নিজে গোঁড়া ব্রাহ্মণ হয়েও ব্রাহ্ম এমনকি মুসলমানদের কাছ থেকেও শ্রদ্ধা-ভক্তি পেয়েছেন।

দাদামশায় আমাকে অসীম স্নেহ করতেন। কত শাস্ত্র, দেবদেবীর কথা গল্পের মত শুনেছি তার ইয়ত্তা নেই। দাদামশায়ের চরিত্র, জীবনযাত্রা, গল্প ও উপদেশ আমার জীবনে গভীর ছাপ রেখে গিয়েছে।

এই দাদামশাই আমার জন্ম-সময়ে কয়েকজন জ্যোতিষ বাড়ীতে এনেছিলেন। তাঁরা নাকি বলে-ছিলেন মাকে 'তোমার এ ছেলে গৃহবাসী কিংবা সংসারী হবে না।' এ কথা মায়ের কাছে অনেকবার শুনেছি। পরে যখন অনুশীলনের কার্যে আত্মনিয়োগ করলাম ঘর ছেড়ে তখন মা মাঝে মাঝে বলতেন, "তখন ভেবেছিলাম ছেলে আমার সন্ন্যাসী হবে। সন্ন্যাসী হলে ত আর এত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হত না বা জেল-ফাঁসীরও ভয় থাকত না।" কেন জানি না জ্যোতিষীর এই ভবিষ্যৎ-বাণী আমি জীবনে ভুলতে পারি নি।

জীবনের প্রথম ষোল বছর কাটিয়েছি নারায়ণগঞ্জ শহরে। শৈশব ও কৈশোরের মত এমন নিশ্চিন্ত সুখের কাল আর বোধ হয় নেই। যৌবনকাল অবশ্য বে-পরোয়া, বে-হিসেবী হয়ে আনন্দে কাটাবার কাল। কিন্তু আমাদের দেশের ছেলেদের সে সৌভাগ্য সেদিনও ছিল না, আজও নেই। তখন যুবক হতে না হতেই বিয়ে করতে হত, তার কয়েক বৎসরের মধ্যে পুত্র-কন্যা পরিবৃত হয়ে চিন্তা-ভারে নুয়ে পড়ত। মেয়েরা হত কুড়িতেই বুড়ী। ত্রিশ পার হলে পুরুষকে আর যুবক বলা যেত না। যৌবনের চাঞ্চল্য তখন স্তিমিত, প্রৌঢ়ত্বের ধীরস্থির বুদ্ধি-বিবেচনার আভা প্রকাশ পেত।

সামাজিক ও ধর্মনৈতিক রীতি-নীতি এবং বাধা-নিষেধের ফলে যুবক-যুবতীর মধ্যে যৌবনোচিত স্বাভাবিক প্রেম-চাঞ্চল্য আসতে পারত না। আসলেও তা চারদিকের চাপে আত্মপ্রকাশের সহজ সুযোগ পেত না। যৌন আকর্ষণের তীব্রতা অদম্য হলে অসংযমী লোক অসামাজিক পথ অবলম্বন করত। পুরুষদের কেউ কেউ বারবণিতালয়েও বা যেত।

এখন অবশ্য অল্প বয়সে বিয়ের প্রথা উঠে গিয়েছে। অর্থনৈতিক কারণেই গেছে। কিন্তু সে একই কারণে বেকার সমস্যা এবং দরিদ্রতার চাপে যুবকদের ম্লানমুখে বিষণ্ণতা আর ঘুচতে চায় না। মা-বাপ ভাই-বোন এদের দুঃখ কষ্টের কথা স্মরণ করে বিপ্লবী যুবকেরাও উৎসর্গিকৃত জীবনের আত্মভোলা আনন্দ উপভোগ করতে পারে নি। থেকে থেকে তাদের যৌবনোজ্জল মুখও ম্লান হয়ে উঠতে দেখেছি। যারা একটা সাধারণ চাকরি জুটিয়ে বিয়ে করেছে তারাও জীবিকা নির্বাহের চিন্তায় আকুল। তাই বলছিলাম এই যে, শৈশব ও কৈশোরের নিশ্চিন্ত নির্ভাবনার দিনই আমার কেটেছে নারায়ণগঞ্জে।

নারায়ণগঞ্জের স্মৃতি আমাকে উৎফুল্ল করে তোলে। পরের জীবনে যখনই যেতাম তখনই সেখানকার আকাশ-বাতাস, রাস্তা-ঘাট, নদীর তীর, গাছপালা এবং মানুষগুলি আমাকে শৈশবে ফিরিয়ে নিয়ে যেত। এই বয়সেও দেখেছি দু'একজন মাতৃসমা মহিলা যাঁরা এখনও জীবিত আছেন, তাঁদের কাছে গিয়ে বসলে নিজেকে যেন বালক বলেই অনুভব করি। রাজনৈতিক সম্পর্কশূন্য বাল্য বন্ধু-দের সঙ্গে দেখা হলে একটা হালকা আনন্দ ও আব-হাওয়ার মধ্যে পড়ে যেন সেই কৈশোরে ফিরে যাই। বিপ্লবী কর্মীর গম্ভীর প্রকৃতি ও উচ্চচিন্তা-ভারাক্রান্ত মুখোসটা খসে পড়ে নিতান্ত ছেলেমানুষ হয়ে যাই। সমস্ত কৃত্রিমতা দূরে চলে গিয়ে সহজ মানুষটির স্বস্তির নিঃশ্বাস

ছেড়ে যেন বাঁচি। মামাবাড়ী গেলেও আমার এমনি অবস্থা হয়। এ দু'জায়গায় গেলে লোকে যখন আমার সঙ্গে উঁচু বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে চাইত বা সর্বত্যাগী নিরাসক্ত মহাপুরুষের কাছে উপদেশ আকাঙ্ক্ষা করত তখন বড়ই ক্লান্ত বোধ করতাম—একেবারে যেন হাঁপিয়ে উঠতাম। সম্বর্দ্ধনা, ফুলের মালা, অভিনন্দন-পত্রাদি আমাকে পীড়িত করত। বাধ্য হয়ে নেতৃত্বের গাম্ভীর্য বজায় রাখতে গিয়ে অবসন্ন হয়ে পড়তাম। যাঁদের কাছে ছেলেবেলায় পড়েছি, তাঁরাও যখন সশ্রদ্ধ সঙ্কোচের সঙ্গে কথা বলতেন তখন অত্যন্ত লজ্জিত ও বিব্রত হয়ে পড়তাম।

ক্রমশঃ

সে দিনের সূর্য জানে

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

সে দিনের সূর্য জানে,
কত না মদিরা ছিল তোমার নয়নে।
সে দিনের সূর্য জানে,
কত না মাধুরী ছিল অঙ্গ-চম্পা বনে॥
সাত-রঙ্গা রামধনু
রঙে রঙে তোমার কটাক্ষে হতো হারা।
নয়ন-সাগর মাঝে,
থরে থরে তরঙ্গিত হতো চন্দ্রতারা॥
ভুবনে ভুবনে কত
লক্ষ লক্ষ মধু-ভৃঙ্গ করে মাতামাতি।
সহস্র কমল-দলে,
অনন্ত সে জীবনের মাল্য গাঁথি গাঁথি॥
সেদিনের সূর্য জানে,
কত না সুষমা ছিল সে রাস-বিলাসে।
সে দিনের সূর্য জানে,
কত না আকুতি ছিল সে মধু-পিয়াসে॥

*　　*　　*

অশ্রান্ত সে অমৃত মন্থন উর্বশী উঠিয়া এলে সুধাভাণ্ড হাতে
দুরন্ত কেতুর কীর্তি উল্লাসে মৃত্যুরে আনে নিত্য-অপঘাতে॥

*　　*　　*

সেই গ্রহ উপছায়া,
সঙ্গে সঙ্গে ফিরে নিতি সূর্যে করে গ্রাস।
সাগরের বুকে আজ,
ঢেউ-এ ঢেউ-এ তাই, জাগে এত ত্রাস॥
ব্যাকুল তরঙ্গ-তুলি
অঙ্গুলি পরশ করে মাটির মায়ায়।
দিগন্তের মসীমাঝে—
সাতরঙ্গা রামধনু কখন লুকায়॥
সম্মুখেতে বালিয়ারি,
বালুর পাহাড়,—প্রতি হিংস্র বালুকণা।
গণ্ডূষে করিয়া পান,
জীবন-জাহ্নবী, মরু করে সে রচনা॥
প্রভাত গগনে জাগা,
আজিকার সূর্য ডোবে বালুর প্লাবনে।
রক্তিম বালুর আঁখি
কি স্বাদে চলেছে ছুটে বিপুল গর্জনে॥
আকাশ বায়স ডাকে,
আকুল কুলায় ফেরা নিশীথ গগনে।
সে দিনের সূর্য জানে,
কত না মদিরা ছিল তোমার নয়নে॥

সাঁওতাল

শ্রীঅণিমা রায়

সাঁওতালদের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় নেই এমন বাঙালী খুব কমই আছে। শীতের প্রারম্ভে দলে দলে অসংখ্য সাঁওতাল নরনারী জীবিকার জন্য কাজের চেষ্টায় সমস্ত বাংলা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের ছোট ছোট অনুর্বর ক্ষেতে তখন চাষ শেষ হয়ে যায়—আর যা ফসল পায় তাতে তাদের বেশীদিন ভরণপোষণ চলে না। তাই কয়লার খাদে, চা-বাগানে, ক্ষেতখামারে, মাটি কাটার কাজে তারা আবার ছ'মাস মজুরী করে জীবিকার্জ্জন করে। সুতরাং বাংলার লোকের তাদের সঙ্গে পরিচয় হয়।

সাঁওতালদের রং কালো, নাক খাঁদা ও মোটা এবং চোখ কুটুরে। কিন্তু তাদের গড়ন সুন্দর, দেহ বলিষ্ঠ, আর মুখে হাসিটুকু সব সময় লেগে থাকে।

সাঁওতালদের মধ্যে তাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি মজার গল্প প্রচলিত আছে। মহাসমুদ্র থেকে একটি বুনো রাজহাঁস উড়ে এসে হিহিড়িপিপিড়ি নামক স্থানে দুটি ডিম পাড়ে। তা থেকে একটি পুরুষ ও একটি নারী জন্মে, তারাই সাঁওতালদের পূর্বপুরুষ। পুরুষটির নাম পিলচু-হাড়াম আর মেয়েটির নাম পিলচুবুড়ি। তারা বহু সন্তান-সন্ততি লাভ করে। বহু স্থানের মধ্য দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে হাজারীবাগ জেলায় চায়চম্পা নামক স্থানে এসে তারা বসতি স্থাপন করে। সেখানে বহু পুরুষ ধরে তারা বসবাস করে। চায়চম্পাতে বিরহড় উপজাতির একজন যুবক একটি সাঁওতাল বালিকার প্রেমে আবদ্ধ হয় এবং তাদের মাধুসিং নামে একটি পুত্র হয়। এই পুত্রটির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সাঁওতালেরা ছোটনাগপুরে মুণ্ডাদের দেশে রাতারাতি পালিয়ে যায়। শ্রীচৈতন্য হোমরক্ কুমার মহাশয়ের সাঁওতাল পরগণার সাঁওতাল আর পাহাড়িয়া কোক ইতিহাসে তিনি বলেছেন, মাধুসিং ছিলেন বিরহোড় বা অন্ত্যজাতের ছেলে, তাঁকে রাজ-বাড়ীর লোক জঙ্গল থেকে কুড়িয়ে এনে রাজবাড়ীতে মানুষ করে। পরে তিনি রাজবাড়ীর দেওয়ান হন। সেই সময়ে তিনি একজন সাঁওতাল মেয়েকে বিবাহ করতে চান কিন্তু তাঁর বংশ-পরিচয় ঠিক না থাকার দরুন কেউ তাঁকে সাঁওতাল-মেয়ে দিতে রাজী হ'ল না। তিনি তখন ক্রুদ্ধ হয়ে ভয় দেখালেন যে, তাঁর সঙ্গে কেউ সাঁওতাল-মেয়ের বিবাহ না দিলে তিনি সাঁওতাল জাতির মেয়েদের ভ্রষ্ট করবেন। তাঁর অত্যাচারের ভয়ে সাঁওতালেরা তখন চায়চম্পা পরিত্যাগ করে ছোটনাগ-পুরের মুণ্ডাদের দেশে পালিয়ে যান। মুণ্ডাদের দেবতা মারাংবুরু সাঁওতালদের যথেষ্ট সাহায্য করেন এবং সেই সময় থেকে মারাংবুরু সাঁওতালদের দেবতা বলে গণ্য হন। মারাংবুরু (বড় পর্বত) ও দামোদর নদ সাঁওতাল-দের কৃষ্টির একটি বড় অঙ্গ। এই থেকে ঐতিহাসিক হাণ্টার মনে করেন যে, সাঁওতালেরা প্রথমে উত্তর-পূর্ব হিমালয় থেকে এসেছে।

সাঁওতালেরা কোথাকার আদিবাসী সে বিষয়ে এখনও সঠিক কিছু জানা যায় নি—আরও গবেষণা চলছে। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, গঙ্গা উপত্যকায় এক সময়ে সাঁওতালেরা বাস করত। হিন্দুসভ্যতা যত পূর্বদিকে অগ্রসর হতে লাগলো সাঁওতালেরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও কৃষ্টি অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য ছোটনাগপুরের পাহাড় জঙ্গলে চলে যেতে লাগলো। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যখন বাংলায় ইংরাজ রাজত্ব সুরু হচ্ছে তখন ছোটনাগপুর সাঁওতালদের প্রধান বাসস্থান ছিল—এটি ঐতিহাসিক সত্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন ছোটনাগপুরের জঙ্গল কাটা সুরু হ'ল তখন সাঁওতালেরা বাংলায় প্রবেশ করে বসবাস সুরু করে।

বাংলায় থাকতে থাকতে হিন্দুমহাজন ও কর্মচারীদের নানারকম অত্যাচারে সাঁওতালেরা জর্জ্জরিত হয়ে পড়ে। বহুকাল যাবত এই অত্যাচার সহ্য করে শেষ পর্যন্ত ১৮৫৫ সালে ৭ই জুলাই সাঁওতালেরা সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহে বহু রাজকর্মচারী ও হিন্দুমহাজন নিহত হন। অবশেষে রাজসরকার ইংরাজ সৈন্য ও দেশীয় সৈন্যের সাহায্যে এই বিদ্রোহ দমন করেন। এই বিদ্রোহের ফলে সাঁওতাল পরগণার সৃষ্টি হয়। এখানে সাঁওতালেরা নিজেদের কৃষ্টি অনুসারে বাস করতে সুরু করে এবং তাদের জমি থেকে যাতে বঞ্চিত করা না হয় সেজন্য নতুন আইন অনুমোদিত হ'ল।

১৯৫১ সালের আদমসুমারি অনুসারে পশ্চিম বাংলায় মোট আদিবাসীর সংখ্যা সাড়ে পনের লক্ষের উপর। তার মধ্যে সাঁওতালের সংখ্যা ৯,৭৭,৪০১। কোন জেলায় কত সাঁওতাল বাস করে তা নীচে দেওয়া হ'ল: বর্দ্ধমান —১,২৭,৪৪১ বীরভূম—৭৮,৪০০ বাঁকুড়া—১,৩৭,৬৫৯ মেদিনীপুর—২০২,৮৮২ হুগলী—৪৮,৯৬০ হাওড়া—৪,৩৬৪

চব্বিশ-পরগণা—২৩,০০২ কলিকাতা—১৬৬ নদীয়া—৬,২৩৪ মুর্শিদাবাদ—২১,৮৫৩ মালদহ—৭২,৮০০ পশ্চিম দিনাজপুর—৯৪,৯১০ জলপাইগুড়ি—২১,৯২৮ কোচবিহার—১,৩০২ দার্জ্জিলিং—৩,৪৮১ এবং পুরুলিয়া—১৩১,৮২৯। পশ্চিম বাংলায় এবং সারা ভারতে সমস্ত উপজাতির মধ্যে সাঁওতালদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। এ থেকে মনে হয় যে, সাঁওতালেরা সবচেয়ে প্রাচীন আদিবাসী।

জাতি হিসাবে সাঁওতালেরা প্রোটো-অষ্ট্রেলয়েড্ জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাদের ভাষা সাঁওতালী ভাষা—এটি অষ্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর মুণ্ডাশাখার অন্তর্গত। আজকাল উড়িষ্যার সীমানার কাছে যে সব সাঁওতাল বাস করে তাদের ভাষার মধ্যে বহু উড়িয়া কথা প্রবেশ করেছে এবং বিহার সীমানার নিকটস্থ সাঁওতালদের ভাষার সঙ্গে অনেক হিন্দী কথা মিশ্রিত হয়েছে আর বাকী সাঁওতালেরা বহু বাংলা কথা নিজেদের ভাষার মধ্যে গ্রহণ করেছে।

সাঁওতালদের মধ্যে ১২টি পারিস বিভাগ আছে, যথা: (১) হাঁসদা: (২) মুরমু (৩) কিসকু (৪) হেমব্রম (৫) মার্ণ্ডি (৬) সরেন (৭) টুডু (৮) বাস্কে (৯) পাউরিয়া (১০) বেসরা (১১) চঁড়ে (১২) বেড়েয়া। প্রত্যেকটি পারিস আবার কয়েকটি ভাগে বিভক্ত—তাকে খুঁট বলে। একই খুঁটের মধ্যে বিবাহসম্বন্ধ বেশী অপরাধের বলে গণ্য হয়। প্রায় প্রতি গ্রামেই অন্ততঃ ছ'টি পারিসবিশিষ্ট পরিবারের বাস আছে।

সাঁওতাল-সমাজ গণতন্ত্রের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। জঙ্গলের মধ্যে তাদের ছোট গ্রাম, মাঝে একটি কাঁচা রাস্তা আর তার দু'ধারে খড় বা ঘাস-ছাওয়া ছোট ছোট মাটির ঘর। গ্রামপত্তনের সময় গ্রামবাসীরা নিজেদের মধ্য থেকে পাঁচজন বা সাতজন প্রবীণ ব্যক্তিকে নির্বাচিত করে একটি পঞ্চায়েত গঠন করে থাকে। পঞ্চায়েতে থাকে (১) মাঝি বা মোড়ল (২) পারাণিক বা সহকারী মোড়ল (৩) নায়ক বা গ্রাম-পুরোহিত (৪) কুডামনায়কে—যার কাজ পাহাড়ের এবং জঙ্গলের দেবতাদের সন্তুষ্ট করা (৫) জগমানঝি—ইনি গ্রামের যুবক-যুবতীদের নৈতিক চরিত্রের দিকে নজর রাখেন (৬) জগপারাণিক বা সহকারী পুরোহিত (৭) গডেট বা বার্তাবহ—যিনি গ্রামবাসীকে জানান কোথায় ও কবে পঞ্চায়েত সভা বসবে। পঞ্চায়েতের কাজ—গ্রামবাসীর যাবতীয় ঝগড়া-বিবাদ এবং গ্রামের যতকিছু গোলমালের মীমাংসা করে দেওয়া। পঞ্চায়েতেরা যদি নিজেরা এই সবের মীমাংসা করতে না পারেন তখন সমস্ত গ্রামবাসীকে ডেকে সভা করে একটা মীমাংসা করা হয়।

দশ-বারোটি গ্রামের মোড়লদের মধ্যে থেকে একটি বড় মোড়ল নির্বাচিত হয় তাকে 'পারগণা' বলে। পারগণাকে মন্ত্রণা দেবার জন্য একটি পঞ্চায়েত আছে। অধীন গ্রামগুলির 'মানঝিগণ' তার সভ্য। বাৎসরিক শিকার করবার সময় 'লবির' বা শিকারদলের কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়। একজন সাধারণ সাঁওতালকে এই লবিরের 'ডিহরি' বা সভাপতি করা হয়। মৃগয়াকালে এই ডিহরি-ই দলের ধর্মসংক্রান্ত বা সাংসারিক সকল বিষয়ে নেতৃত্ব করে। কিন্তু তা ছাড়া গ্রাম বা সমাজে তার অন্য কোন পদ থাকে না। সমস্ত সমর্থদেহ বয়স্ক পুরুষেরই এই বাৎসরিক শিকারে যোগ দিতে হয়। লবিরের সভ্যরা সাধারণের ও প্রত্যেক লোকের সমস্ত অভিযোগ বিচার করে এবং যা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয় সমবেত সাঁওতালমণ্ডলী তা মানতে বাধ্য।

পিতার মৃত্যুর পর পুত্রেরা সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। পূর্বে পুত্রের অবর্তমানে পিতার সবচেয়ে নিকটস্থ পুরুষআত্মীয় সম্পত্তি পেত। এতে কন্যার কোন দাবি থাকে না। কন্যাকে সম্পত্তি দিতে গেলে জামাইকে ঘর-জাওয়ায় বা ঘরজামাই করতে হয় এবং কন্যার বিবাহের সময় পঞ্চায়েতের কাছে বলতে হয় যে, এই ঘরজামাই তার মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তি পাবে। আজকাল অপুত্রক হলে বহুস্থানে মেয়েরা উত্তরাধিকারিণী হচ্ছে।

সাঁওতালেরা হিন্দুদের মত মৃতের সৎকার করে। তবে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীদের মৃত্যু ঘটলে তাকে কবর দেওয়া হয়।

বিবাহকে সাঁওতালেরা 'বাপ্লা' বলে। সাত প্রকার বিবাহ আছে, তার মধ্যে 'কিরিঞ বাহুবাপ্লা' সাঁওতাল সমাজে বেশী প্রচলিত। কনে ও বরের পিতামাতাকে 'রায়বারিচ' বা ঘটকের সাহায্যে বিবাহ ঠিক করতে হয়। বরের পিতামাতা কনের পিতামাতাকে বিবাহের জন্য পণ দেয়। এইজন্য এই বিবাহকে 'কিরিঞ্জিবাহু' বা কনেকেনা বলে। সাঁওতালের নিজের খুটে বা তার মার খুঁটের মধ্যে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। পুরুষ ও নারী উভয়েই বিবাহবিচ্ছেদ করতে পারে।

সাঁওতালদের জীবনে চারিটি খুব প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকলাপ আছে। (১) জনমছাতিয়ার বা জন্মাবার পর যে সব ক্রিয়া করা হয় এবং নামকরণ করা হয়—(২) চাচোছাতিয়ার, ছেলে হাঁটতে শিখলে তাকে সমাজের পূর্ণসভ্য বলে গ্রহণ করা হয় (৩) বাপলাছাতিয়ার—বিবাহের সময়কার ক্রিয়াকলাপ (৪) মৃত্যুর পরের ক্রিয়াকলাপ।

মাছধরা, শিকারকরা, বন্ত ফলমূল সংগ্রহ করা ও চাষ করা সাঁওতালদের বংশগত উপজীবিকা। কিন্তু জমি এত অনুর্বর যে, চাষে বছরের খোরাক হয় না। কাজেই বহু সাঁওতাল নরনারী মজুরী করবার জন্ত বেরিয়ে পড়ে।

সাঁওতালদের দেবতাকে 'ঠাকুর' বা 'চান্দো' বলা হয়। এই ঠাকুর পৃথিবী, জীবন, বৃষ্টি, শস্ত প্রভৃতি সৃষ্টি করেছেন। তিনি পরম মঙ্গলময় এবং আকাশের উপর থাকেন বলে সাঁওতালদের বিশ্বাস। তা ছাড়া, সাঁওতালদের আরও অনেক নিম্নস্তরের দেবতা আছেন যাঁদের 'বোঙ্গা' বলে। বোঙ্গাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন—'মারাংবুরু', 'মড়েঁকো', 'জাহের এরা', 'গোঁসাই এরা', 'পারগণা বোঙ্গা' ও 'মাঝিবোঙ্গা'। সাঁওতালদের যতকিছু পূজা-অর্চনা ও ধর্মানুষ্ঠান আছে এঁদের নিয়ে। প্রত্যেক সাঁওতাল গ্রামের পাশে চারিটি শালগাছ ও একটি মহুয়াগাছ ঘেঁসাঘেঁসি থাকে। এখানে 'বোঙ্গারা' বাস করে। বোঙ্গারা মানুষের অত্যন্ত অপকার করতে পারে মনে করে সাঁওতালেরা তাদের সন্তুষ্ট রাখবার দরুণ বলি দেয় ও পূজা করে। এই গাছের ঝোঁপকে সাঁওতালেরা 'জাহেরথান' বলে। এই ঠাকুর ও বোঙ্গার দল ছাড়া সাঁওতালেরা কতকগুলি অপদেবতার উপর বিশ্বাস রাখে, যথা: রাকস, একগুড়িয়া অথবা ঘোড়মুহা, চুড়িণ এবং ভূত। তাদের ভয়ে সাঁওতালেরা সব সময়ে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে। যাদুমন্ত্র ও ডাইনীর উপর সাঁওতালদের অগাধ বিশ্বাস। তাদের ধারণা স্ত্রীলোকেরা ডাইনীবৃত্তি জানে যার দ্বারা মানুষের ও গ্রামের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। তারা নিজেদের নারীসুলভ সৌন্দর্যের দ্বারা বোঙ্গাদের উপর এত প্রভাব বিস্তার করে যে, তাদের দিয়েই নানারকম অপকর্ম করিয়ে নেয়।

সাঁওতালদের বাৎসরিক পর্বের নাম (১) এরঃসিম (২) হারিয়ারসিম (৩) ইরিগুগুলি নাওয়াই (৪) জানথার (৫) সহরায় (৬) মাঘসিম (৭) বাহা (৮) ছাতাপরব (৯) যাত্রাপরব (১০) পাতাপরব। এই পরবের সময় বোঙ্গাদের পূজা করা হয়। প্রথম পাঁচটি পরব চাষের বিভিন্ন সময়ের সঙ্গে জড়িত। এরঃসিম—বীজ বপনের পরব, হারিয়াসিম—ধানের অঙ্কুর গজানর পরব, ইরিগুগুলি নওয়াইবজরা, ইরি এবং গুগুলি—শস্ত পাকাবার পরব। জানথার—আমন ধান পাকাবার পরব, আর সহরায়—ধানকাটার পরব। পৌষ মাসে ধান কাটার শেষে পাঁচ দিনব্যাপী এই পরব চলে। বাহা পরবটি ফুল ফোটার পরব বা বসন্ত উৎসব। প্রকৃতির সৌন্দর্যকে উপলক্ষ্য করেই তারা এই উৎসব পালন করে। ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমার পরবর্তী কোনদিন উৎসব হয়ে থাকে।

সাঁওতালদের নৃত্য বিখ্যাত। স্ত্রী-পুরুষ মিলে কর্মের অবসরে নৃত্য তাদের অত্যন্ত প্রিয়। সমস্ত উৎসবে নৃত্য তাদের প্রধান অঙ্গ। পুরুষেরা মাদল ও বাঁশী বাজায়। মাদলের তালে তালে সাঁওতাল ছেলেমেয়েরা নাচ-গান অভ্যাস করে। জগমাঝির কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তবে নাচ-গান শিক্ষা করতে হয়। সাঁওতালদের মধ্যে বিভিন্নরকমের নাচ আছে। সেগুলির মধ্যে প্রধান নাচ হচ্ছে—লাগড়ে, দং, ডাহার, সহরায় আর ডুঙ্গেড়। লাগড়ে নাচ অধিকাংশ উৎসবে অনুষ্ঠিত হয়। দং নাচ কেবল বিবাহ ও সমাজের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে হয়। সহরায় নাচ সহরায় পর্ব পালনের সময় হয়। মাঠের শস্ত সংগ্রহ হলে সাঁওতালেরা সেই উপলক্ষ্যে এই নাচ করে থাকে। বাহা নাচ একমাত্র বাহা পর্ব পালনের সময় হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল ছেলেমেয়েরা নাচ-গান সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়ছে। জগমাঝিও ছেলেমেয়েদের আর তেমন কড়া শাসনে রাখে না।

গরু, শুয়র, মেঠো-ইঁদুর, মহিষ, সাপ ও নানাবিধ পশুপাখী সাঁওতালেরা খায়। সচরাচর ভাত ও ডাল তাদের দৈনন্দিন আহার। হাড়িয়া, ধেনোমদ, মহুয়ার মদ তাদের প্রায় নিত্য ব্যবহার্য।

শহরতলীতে সাঁওতালদের যে সব ছোট ছোট উপনিবেশ আছে তাতে উপরিউক্ত জীবনধারা ক্ষীণ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু জঙ্গলে সাঁওতালদের গ্রামের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এখনও সাঁওতালী প্রথা দেখা যায়। আজ প্রায় তিন হাজার বছর হিন্দুদের সংস্পর্শে এসে বহু হিন্দু-প্রথা সাঁওতালেরা গ্রহণ করেছে। নিজেদের দেবতা ছাড়া বহু হিন্দু দেব-দেবীর পূজা তারা করে থাকে। বহু হিন্দু-পরবে তারা যোগ দেয়। ১৯৫১ সনের আদমসুমারি থেকে জানা যায় যে, সাঁওতালদের মধ্যে এখন শতকরা ৪৫ জন সাঁওতাল ধর্মাবলম্বী, ৫৪ জন হিন্দু ধর্মাবলম্বী ও একজন খ্রীষ্টান। বহু শতাব্দী ধরে এদেশে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও কোন সাঁওতাল মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করে নি।

সামাজিক বন্ধন এখন তাদের মধ্যে অনেকক্ষেত্রে শিথিল হয়ে গিয়েছে। সাঁওতালেরা নিজ নিজ জমির অধিকারী হয়ে পড়েছে—পঞ্চায়েৎ আর মালিক নয়। পারগণার নৈতিক ও সামাজিক কর্তৃত্ব প্রায় কমে আসছে। পারিপার্শ্বিক হিন্দুদের খাদ্য, গৃহনির্মাণ-প্রণালী ও পোশাক-পরিচ্ছদ সাঁওতালেরা গ্রহণ করেছে। তার ফলে অনেকক্ষেত্রে সাঁওতালেরা এখন তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ লোকনৃত্যে প্রকাশ্যে যোগদান করতে

যেন লজ্জিত হয়। আর্থিক অবস্থা ও শিক্ষানুসারে সাঁওতালদের মধ্যে বিভিন্ন স্তর গড়ে উঠেছে। "লোবির" শহরতলীর সাঁওতালদের সমস্যা সমাধান করবার সুযোগ পান না। অনেকক্ষেত্রে নিম্নস্তরের হিন্দুদের অনুকরণে সাঁওতালদের বিবাহাদি হচ্ছে, ফলে বহু সাঁওতালকে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর মত অচ্ছুত মনে করা হয়। এই পরিবর্তনের ফলে সাঁওতালদের অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রমেই অবনতি দেখা গিয়েছে।

২২শে শ্রাবণে

শ্রীপুষ্প দেবী

হে কবি চলিলে নাকি ?
স্বরগ হইতে দেবতা এল কি পরাতে মিলন রাখী
যেথায় তোমার ছিল আনাগোনা
যেথাকার সুধা সুরভির কণা
তোমার বচনে কবিতার গানে দিয়াছ সবায় ডাকি
আজি কি সেথা চিরদিন তরে চলিলে মোদের রাখি।

কাব্যলোকের মধুর কূজন আর কি মর্ত্ত ভরে
উঠিবে না কবি তোমার মোহন মধুর কণ্ঠস্বরে
রাখালের বাঁশী শিশুর কাঁদনা
বঙ্গ বধূর গোপন বেদনা
মা-হারা যে সেই ভিখারিণী মেয়ে তাহার ও মর্মকথা
তোমার লেখনী সবাকার প্রাণে জাগাল গভীর ব্যথা।

সে সুরের মোহে এ হিয়া বিভোর কিশোরী জীবন হতে
কল্পনা পথে তুমি চিরকাল এলে যে বিজয় রথে
মনে হত তুমি নহ তো দূরের
মনের নিভৃত গোপন সুরের
সব সাধ-আশা জানো যে গো তুমি আপন পরাণ হতে
সবাকার চেয়ে আপন ছিলে যে তাই এ জীবন পথে।

বধূ জীবনের সরম জড়িত যাত্রা পথের দিনে
তোমার সুরের মোহেতে মুগ্ধ হয়েছি কত না ক্ষণে
কুণ্ঠা বিহীন দীপ্ত হৃদয়ে
তোমার কবিতা উঠিয়াছি গেয়ে
পরিহাস ভরে হেসেছে সবাই হেরিয়া এ লাজ হীনে
বধূ জীবনের সরম জড়িত যাত্রা পথের দিনে।

কেহ তো জানে না মনের গোপন সে কোন্ অন্তঃপুরে
তুমি ছিলে ছিল তোমার কবিতা সকল মরম জুড়ে
হইয়া মুগ্ধ সে সুরের তানে
রচেছি ছন্দ কিছুই না জেনে
তোমার আশীষে সকল অভাব দূরেতে গিয়েছে সরে
তোমার অমৃত মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছ যে তুমি মোরে।

শুধু নও কবি ওগো কবিগুরু তুমি যে মর্মসাথী
তোমারি কাব্যে হইয়া বিভোর কেটেছে কত না রাতি
কত বরষার শ্রাবণ রাতেতে
কত দুঃখের গভীর আঘাতে
কবিতার সনে তুমি ছিলে মনে কনক আসন পাতি
তাই বলি শুধু কবি নও তুমি যে মম মর্ম সাথী।

ওগো কবিগুরু শেষ যাত্রার আজি এই শুভদিনে
মহামিলনের তিথিটিরে তাই সযতনে নিলে চিনে
ঝর ঝর ঝরে বরষার ধারা
আকুল পরাণ হয়ে তোমা হারা
তোমারে হেরিতে ছুটে চলে সব অশ্রু ব্যাকুল জীবে
অস্তগামী সে রবির প্রসাদ শেষ জ্যোতিকণা মাগে।

সবার রবিরে হারায়ে আকুল অভাগা মর্তজনে
পূর্ণিমা চাঁদে কে হেরিবে আজ সোহাগ সুখের মনে
হারায়েছে ওরে হৃদয় অধীর
তুমি নও আঁখি বহে শুধু নীর
উঠিল না চাঁদ পূর্ণিমা রাতে তাইত উজ্জ্বল হয়ে
আঁধার রজনী তুষানিশা নীরে আঁধারে গেল যে বয়ে॥

ওগো কবি তুমি শত আয়ু হও সকলে একথা বলি
করেছি কামনা যত জগজনে হৃদয় পরাণ ঢালি
গত বছরের এমনি দিনেতে
গুণীদল আসি দূর দেশ হতে
সাজায়ে অর্ঘ্য তোমার তরেতে শ্রদ্ধাতে দিলো তুলি
আজি সেই দিনে কার আহ্বানে কোথায় যাইলে চলি।

আরো সে সুদূরে না জানি কি দানে দেবেরা তুষিবে তোম
উজ্জ্বল রবির উদয়ে সেথায় ঘুচিবে আঁধার অমা
তবু শেষ বার যাই কবি বলে
আমাদের তুমি ভালোবেসেছিলে
তোমার যুগেতে লভেছি জনম এই ত গর্ব্ব মোর
তুমি যাইলেও তোমার সুরটি রহিল জীবন ভোর।

তিব্বতের ভৌগোলিক ও সামাজিক অবস্থার আভাস

শ্রীবিভা সরকার

আজকের দিনে ভারতবাসীর মন তিব্বত সমস্যা নিয়ে চঞ্চল। তিব্বতের পতন-অভ্যুত্থান বা শাসন সম্বন্ধে আমি কোনও আলোচনা করতে চাই না। সাম্প্রতিক ঘটনা দৈনিক পত্রিকার আশীর্ব্বাদে প্রায় প্রত্যেকেই কিছু কিছু পেয়েছেন এবং এ জটিল সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন বড় বড় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ধুরন্ধরেরা। কাজেই আমাদের এ সম্বন্ধে দর্শক হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

আমি এই প্রবন্ধে শুধু তিব্বতের ভৌগোলিক ও সামাজিক চিত্রের কিছুটা আভাস দিতে চেষ্টা করব মাত্র। তিব্বতকে বলা হত 'বোড্ উল' বোড্-পা বা বোথ— তাই থেকে ক্রমে টু-বোথ বা ট্যু-বোথ, থি-বেট বা অধুনা টিবেট। আজও এ দেশকে তিব্বতীরা পো, বোথ, বা চাং-থাং বলে থাকে, যদিও তিব্বতের মধ্যেই উত্তর অংশে চাং-থাং বলে ও দক্ষিণ অংশে 'পো' বলে স্বতন্ত্র স্থান আছে। সংস্কৃতে আমরা তিব্বতকে কিন্নরাখণ্ড বা কিংপুরুষ খণ্ড, স্বর্গভূমি বা স্বর্ণভূমি নামে উল্লিখিত দেখতে পাই। চিরন্তন তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতগুলি নিয়ে তিব্বত পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতম এবং একে একটি অতি বৃহৎ অধিত্যকা বলা যায়। সমুদ্র থেকে এর উচ্চতা কোথাও ১,২০০ ফিট কোথায় বা ১৬,০০০ হাজার। তিব্বতের আয়তন ৮০০,০০০ বর্গ মাইল ও ইহার লোকসংখ্যা ৪,০০০,০০০ থেকে ৫,০০০,০০০। সমুদ্র থেকে ১৬,০০০ ফিটের উচ্চ ভূমিতেও বহু তিব্বতীর বাস। তিব্বতের হাপির বৌদ্ধমঠ পৃথিবীর মধ্যে মানুষের বসবাসের সর্ব্বোচ্চ বাসস্থান বলা যায়। এই তিব্বতেই "ফারি" শহর ১৪,৩০০ ফিট উচ্চে এবং ইহাই পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ শহর। তিব্বতের উত্তরে কানলুং পর্ব্বতমালা তিব্বতকে পূর্ব্ব তুর্কীস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। ইহার পূর্ব্বে চীনের চিংঘাই ও সিকিয়াং প্রদেশ। দক্ষিণে হিমালয় পর্ব্বতমালা তিব্বতকে ভারত ভুটান নেপাল প্রভৃতি থেকে ও পশ্চিমে কাশ্মীর ইহার সীমানা রেখা। বহুস্থানেই তিব্বতের ভৌগোলিক সীমানা স্বচ্ছ নয়—যেমন ভুটান ও তিব্বতের মধ্যে কয়েকটি বাঁশঝাড় ইত্যাদি। এইরূপ দার্জ্জিলিং প্রভৃতিতেও কোনও নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা নেই বিশেষ করে চীন দেশের সঙ্গে তিব্বতের কোনও নির্দ্দিষ্ট সীমানা নেই। তিব্বতকে মোটামুটি চারভাগে বিভক্ত করা যায়। উত্তরাখণ্ড বা চাং-থাং প্রদেশ তিব্বতের প্রধানতম অধিত্যকা ইহার উচ্চতা ১৬,০০০ থেকে ১৭,০০০ হাজার ফিট এবং এই দিকের প্রধান পর্ব্বত-চূড়াদ্বয় (Nien-chen-tangla) নিয়েন-চেং-তাংলা ও (Hlumpo-Gangri) লুম্পো গ্যাংরি প্রায় ২৩,০০০ ফিটের মত, পূর্ব্বখণ্ড চাং-থাং-এর পূর্ব্বঢালে এশিয়ার তিনটি মহানদী (Salween) শালুইং, মেকং ও (Yangtse) ইয়াংসির উৎস এইখানেই। কিছুটা উত্তরে (Hoang-Ho) হোয়াং-হো নদীর জন্মস্থান। উত্তরাখণ্ড বেশীর ভাগই বন্ধুর। তিব্বতের দক্ষিণের অংশকেই তিব্বতীরা প্রধান বা মধ্যতিব্বত বলে থাকে এবং তিব্বতীদের কাছে 'পো' নামেই এই দক্ষিণাখণ্ড পরিচিত। এই অংশেই তিব্বতের প্রধানতম শহর—লাসা, সীগাটসে (Shigatse) ও গীয়াংসে বিরাজমান। লাসাই তিব্বতের রাজধানী এবং এই লাসার পোতালা দুর্গেই তিব্বতের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা জীবন্ত দেবতা দলাই লামার বাস। তিব্বতের পূর্ব্বাংশকেই একমাত্র সুজলা সুফলা বলা যায়। এ তিব্বত স্বর্ণভূমি—এখানে সোনা ও নানা খনিজদ্রব্যের সম্ভার আছে যাহা আজও সভ্যমানুষের লোভী দৃষ্টির মধ্যে ঠিক পড়ে নি এবং এখনও সভ্য মানুষের নির্ম্মম মুষ্টি তিব্বতের বুক চিরে তার সম্পদ ঠিকমত অপহরণের সুযোগ পায়নি, তাই তিব্বত আজও খনিজসম্পদে সমৃদ্ধ। দেশটির বেশীর ভাগই কিন্তু পর্ব্বতময়, বন্ধুর কয়েকটি উপত্যকা ছাড়া। প্রধান পর্ব্বতগুলির মধ্যে আমরা নাম করতে পারি গোরলাহ মানধাতার। তিব্বতী ভাষায় গো = মানে প্রধান, লাহ মানে ভগবান, একত্রে গোরলা মানে প্রধানতম দেবতা বা দেবস্থান বলতে পারা যায়। হিন্দুর ধ্যানের ধন সাক্ষাৎ দেবাদিদেব মহাদেবের বাসস্থান শ্রীকৈলাস এই তিব্বতেই। এ ছাড়াও সুরাং

সংখ্যাগুলি Everyman's Encyclopaedia ও Swami Pranavananda F. R. G. S মহাশয়ের Ka las Manassarovar হইতে Sir Charles Bell, Tibet Past & Present ও Seven heavens, Central Asia & Tibet ইত্যাদি পুস্তকের সহায়তা লইয়াছি।

ও কাংলুং প্রধান পর্ব্বতগুলির অন্ততম। দক্ষিণের পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে 'যশকররেঞ্জ'। তিব্বতের উচ্চতম পর্ব্বতচূড়া গোরলা ও মানধাতা ২৫,৩৫৫ ও ২২,৬৫০। শ্রীকৈলাস ২২,০২৮। পৃথিবীর উচ্চতম পর্ব্বতচূড়া মাউন্ট এভারেষ্ট ২৯,০০০ নেপাল ও তিব্বতের সীমানায়। শতদ্রু, ইনডাস, ব্রহ্মপুত্র ও কর্ণালী এই চারটিই এই প্রদেশের প্রধান নদী। এ ছাড়া বহু শাখা ও উপনদী আছে। মানসতাল ও রাক্ষসতাল এই দুটিই এ প্রদেশের প্রধানতম মিষ্টজলের হ্রদ। এ ছাড়াও বহু ছোট ছোট মিষ্ট জলের হ্রদ আছে। তিব্বতের মধ্যে হংসবলাকার বিচরণভূমি হিন্দুর পরম তীর্থ মানুষের মনোহরণকারি স্বপ্নময় মানসসরোবরই গভীরতম। তিব্বতে বহু লবণাক্ত জলের ছোট বড় হ্রদও আছে, 'সুন্ডগো জানিমা, চাকরা' প্রভৃতি নামে এগুলি পরিচিত।

তিব্বত বা মানসখণ্ডের আবহাওয়া অত্যন্ত ঠাণ্ডা, শুকনো ও বায়ুময়। সাময়িক বায়ুপ্রবাহ দেরিতে আসে এবং বৃষ্টিও হয় অপ্রচুর কিন্তু যখন বৃষ্টিপাত হয় তখন মুষলধারেই হয়। গ্রীষ্মের সময় ঝর্ণা ও নদীগুলি বেগে প্রবাহিত হয়। কখনও কখনও সাগাঙ্কের দিকে বরফ গলার দরুণ এই জলপ্রবাহগুলি পারাপারের অগম্য হয়ে পড়ে। গ্রীষ্মের সূর্য্যাতপ যথেষ্ট প্রখর কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হিমপ্রবাহ বইতে থাকে। আগষ্ট-সেপ্টেম্বর অর্থাৎ ভাদ্র-আশ্বিনে যখন যাত্রীরা শ্রীকৈলাস ও মানসদর্শনে যান তখন মানধাতা বা শ্রীকৈলাসের তুষারধবল চূড়াগুলি মেঘ-রৌদ্রের লুকোচুরি খেলায় যেন তীর্থপিয়াসী যাত্রীদের সঙ্গে দর্শনচ্ছলে খেলা করে। নভেম্বর-এর গোড়া থেকে মে মাসের শেষ পর্য্যন্ত দারুণ তুষার-ঝটিকা বইতে থাকে। এই হয়ত প্রখর সূর্য্যতাপে অস্থির হয়ে পড়ে মানুষ, আবার হয়ত মুহূর্ত্ত পরেই ঠাণ্ডা হাওয়ার কনকনানি সারা অঙ্গ অবশ করে আনে। সূর্য্যোদয় ও গোধূলি এখানে দীর্ঘতর প্রায়, সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের একঘণ্টা আগে ও একঘণ্টা পর পর্য্যন্ত আকাশ আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে থাকে। নীলকান্তমণির মনোহরণ শোভা নিয়ে তিব্বতের আকাশ মানুষকে স্বপ্নলোকে টেনে নিয়ে যায়।

তিব্বতের* ৩,০০০,০০০ থেকে ৪,০০০,০০০ অধিবাসীর মধ্যে একা মানসখণ্ডেই ১০,০০০ তিব্বতীর বাস। তিব্বতীরা সাধারণতঃ স্ত্রী-পুরুষনির্ব্বিশেষে বলবান, কষ্টসহিষ্ণু ও কঠোর পরিশ্রমী। অত্যন্ত ঠাণ্ডায় কঠোরতর জীবনযাপনে তারা বিশেষ ভাবে অভ্যস্ত। আজও তারা আদিম ভাবাপন্ন, হাসিখুশি, আমোদপ্রিয়, শান্তিকামী, ধর্ম্মভীরু, অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ, অল্পে তুষ্ট কিন্তু অভ্যাসে-আচরণে কিছুটা অপরিচ্ছন্ন জাতি। লামা বা কর্ম্মচারীবৃন্দ উচ্চশিক্ষিত ও অত্যন্ত বিনীত। শুনেছি তিব্বতে কোনও জাতিবিচার নেই—একমাত্র কর্ম্মকারই দ্বিতীয় শ্রেণীর। কেবলমাত্র এদের সঙ্গেই অন্যান্য তিব্বতীরা বিবাহ বা একত্রে ভোজন করেন না।

উপত্যকাগুলিতেই মানুষের অধিক বাস। পুরাং উপত্যকাতেই বোধ হয় সর্ব্বাধিক স্থায়ী বসতবাড়ী আছে। এই বাড়ীগুলি চ্যাপ্টা ছাদবিশিষ্ট, প্রায়ই দুই-তলা হয়ে থাকে। প্রখর রোদে শুকানো বড় বড় মাটির ইট এবং সামান্য কিছু কাঠের গুঁড়ি যেগুলি তিব্বতীরা ভারত সীমান্ত থেকে সঞ্চয় করে, তাই দিয়েই এই গৃহগুলি নির্ম্মিত। তিব্বতে গৃহের সংখ্যা অত্যন্ত কম। এক এক জায়গায় দুটি মাত্র গৃহের সমষ্টিকেই একটি গ্রাম আখ্যা দেওয়া হয়। হাল্কা কাঠের গুঁড়ি সহ ঝোপ বা ঘাসের ওপর মাটির আচ্ছাদন দিয়ে গৃহের ছাদ প্রস্তুত করা হয়।

বহু তিব্বতী য়ক, গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি পালন করেই জীবিকার উপায় করে। এরা পশুর লোমে প্রস্তুত একপ্রকার কালো তাঁবুতে বাস করে এবং এই তাঁবুগুলি তারা এক উপত্যকা থেকে অন্য উপত্যকায় সহজেই বহন করে নিয়ে যেতে পারে। গৃহপালিত পশুর ভাল চারণ-ভূমির সন্ধানে এরা ভ্রাম্যমানই হয়ে পড়েছে।

তিব্বতীরা পর্ব্বতগাত্রে খোদিত করে গুহা-গৃহও প্রস্তুত করে থাকে। এইরূপ গুহাগৃহ তিন-চারতলা পর্য্যন্ত হতে দেখা যায়। গুহাগৃহগুলি প্রায়ই লামা বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মঠ বা মনাষ্ট্রি হয়। তাকলাকোটের কাছে গুকিং-এ গারু, থোও, রিংগুং, ডুংমা, কার্ডি প্রভৃতি গ্রামে এরকম বহু গুহাগৃহ আছে। কর্ণালী নদীর দক্ষিণতীরস্থ তাকলাকোট মাণ্ডি থেকে আধ মাইলের মধ্যে গুকিং গুহা-গ্রামের একটি আদর্শ নিদর্শন বলতে পারা যায়।

মাংসই তিব্বতীদের প্রধানতম খাদ্য। টাটকা, শুকনো, ঝলসানো বা যে কোনও রকমে রান্নাই হ'ক না কেন। এ ছাড়া দুগ্ধজাত দ্রব্যই প্রধান। পশুপালন তাই প্রধানতম উপজীবিকা। সকাল-সন্ধ্যায় থুকপাই তিব্বতীদের প্রধান খাদ্য। মাংস এবং ছাতু একত্রে সিদ্ধ করে ঘন পায়সের মত তৈরী হয় এবং তারই নাম থুকপা। এই

Children's Encyclopaedia says 3,000,000.

* Encyclopaedia (Everyman's) & Swami Pranavananda, F. R. G. S., who is supposed to be an authority but according to many population is 3,000,000 to 4,000,000.

থুকপায় নুন মিশিয়ে এরা পরমানন্দে ভোজন করে। অতি অল্পে সন্তুষ্ট জাতি এরা। পুরাং উপত্যকা বা অন্যান্য জায়গায় যেখানে এরা নেপাল বা ভারত সীমান্ত থেকে চাল বা গম জোগাড় করতে পারে সেখানে ভাত রুটিও খায়। চীনেচা এরা প্রচুর পান করে থাকে। চা-কে অনেকক্ষণ সিদ্ধ করা হয় তার পর লবণ ও মাখন মিশ্রিত করে বড় বড় কাঠের ঘোলমৌনিতে এগুলি ভাল ভাবে মন্থন করা হয়। এইরূপ মন্থিত চা-এ দেশী সোডা, যাকে এরা 'ফুলডো' বা সেরুটসা (serutsa) বলে তাই মেশানো হয় মাখনটিকে চা-এর সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার জন্য যাতে এই মাখন ওপরে না ভেসে থাকে। এই চা এরা দিনে ৫০ থেকে ১৫০ বাটি পান করে। যব থেকে এরা এক প্রকার দেশী পানীয় বা মদ্য জাতীয় জিনিস প্রস্তুত করে। এই পানীয়কে চাং বলা হয়। এই চাং এদের জাতীয় পানীয়। আনন্দ উৎসবের দিনে তিব্বতের ছেলেমেয়ে, যুবা, বৃদ্ধ, সাধু, সন্ন্যাসী সকলেই পরমানন্দে চাং পান করে থাকেন। চা ও এই চাং কাঠের পিয়ালা বা চীনা-মাটির পাত্রে পান করা হয়। ধনীরা রূপার ঢাকনীসহ রূপার পিয়ালায় অথবা চীনের মূল্যবান পাথরের পিয়ালায় চা বা চাং পান করতে দেন বা করেন। এই চা বা চাং এর প্রত্যাখান এঁরা অত্যন্ত অশিষ্টতার পরিচায়ক ও অসম্মানজনক বলে মনে করেন—নবাগত অতিথিদের এই ভ্রান্তির দরুণ অঘটনও ঘটতে শোনা গেছে।

সমস্ত প্রদেশটাই অত্যন্ত শীতপ্রধান হওয়ায় তিব্বতীরা লম্বা লম্বা ডবল ব্রেষ্ট 'বাগ্‌গা' বা গাউনের মত পোষাক পরেন। কোমরে থাকে দড়ির কোমরবন্ধ। খানিকটা খ্রীষ্টান ধর্ম্ম-যাজকদের পোষাকের মত। হাঁটু পর্য্যন্ত ঢাকা একত্র বোনা গরম জুতো-মোজার মত চরণ-আচ্ছাদন এরা ব্যবহার করেন—এগুলিকে এরা খাম বলেন। এগুলি পরে এরা মঠের পবিত্রতম মন্দিরেও প্রবেশ করতে পারেন। শীতের দিনে পরেন ভেড়ার চামড়ার কোট, টুপী ও পায়জামা। স্ত্রী-পুরুষের পোশাকের প্রভেদ বিশেষ নেই —মেয়েরা কেবল কোমর থেকে পায়ের পাতা পর্য্যন্ত সোজা সোজা ডোরা টানা এক টুকরো গরম কাপড় ঝোলায় যার ভিতর দিকে ছাগচর্ম্মের লাইনিং থাকে। পুরুষেরা প্রায়ই ফেল্ট-হ্যাট ব্যবহার করেন। কাছে-পিঠের ভারতীয় শহর থেকে সঞ্চয় করে দোকানীরা এগুলি বিক্রয় করে।

ধনী, রাজকর্ম্মচারী এবং লামারা মূল্যবান পোশাক ও যথেষ্ট রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করেন।

তিব্বতে এক বিবাহই প্রথা, তবে বহুবিবাহও দেখা যায়। সাধারণতঃ এক একটি পরিবারে ভাইদের মধ্যে মাত্র একটি স্ত্রীই থাকেন। জীবনধারণের কাঠিন্য ও জীবিকার সমস্যাই এইরূপ আপাতঃ অভিনব রীতির মূলে আছে মনে হয়। পরিবারে জ্যেষ্ঠ বিবাহ করলেই সকলেই গৃহিণী পান এবং এই রীতিতে তাঁরা পারিবারিক কলহমুক্ত হয়ে শান্তিতেই দিনযাপন করেন বলেই আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়। বড় ভাই-ই হন পরিবারের কর্ত্তা, ছোট ভাইদের ধরন কিছুটা দাসেদের মত অনুগত। পঞ্চ-পাণ্ডব ও দ্রৌপদীর কথা সহজেই মনে পড়ে যায়। এই প্রথার জন্য তিব্বতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বহু পূর্ব্বে যে কয়টি গৃহ বা পরিবার ছিল আজও তাই বর্ত্তমান। গৃহ-বিবাদ ও বিচ্ছেদের অবকাশ কম।

বিবাহ বর-বধূর সম্মতি এবং তাঁদের পিতামাতার অনুমতি নিয়েই হয়। পৌরোহিত্য করেন ধর্ম্মযাজকেরা। বিপত্নীক পুরুষ ও বিধবা স্ত্রীর পুনর্বিবাহ খুবই প্রচলিত। এ সব ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী আপন আপন ঘরেই থাকেন। সাধারণ বিবাহের সন্তান-সন্ততির সমতুল্যই সামাজিক অধিকার ও সম্মান এই সব বিবাহের সন্তানেরাও পায়। সন্তানের অধিকারিণী মায়েরাই হয়ে থাকেন।

মুণ্ডিতশির সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসীনীরা লালচে-বেগুনে রংয়ের আলখাল্লা পরেন। গৃহী স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই বেণী বাঁধেন, তবে মেয়েরা চুল বাঁধায় নানা কারুকার্য্য করেন। মেয়ে-পুরুষে সমান সামাজিক স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করেন। প্রণাম বা সম্মান দেখাতে গিয়ে তিব্বতীরা সামনে একটু ঝুঁকে জিব বের করে দেন ও তারপর "খাম-যম্‌-ভো' বা 'খামযম্‌' অথবা কেবল মাত্র 'যো' উচ্চারণ করেন। সর্ব্বশ্রেণীর কাজই লামারা করে থাকেন। এদের মধ্যে গুরু আছেন, উচ্চশ্রেণীর পুরোহিত আছেন, শস্য-সংগ্রাহক শাসক আছেন, ছোট-বড় সর্ব্বপ্রকার ব্যবসায়ী আছেন, মেষপালক, দাসদাসী, রাঁধুনী, মুটেমজুরও আছেন—আছেন টাট্টুঘোড়া চালক, জুতো-প্রস্তুতকারক, কৃষক এবং কি নয়—সর্ব্ব উচ্চ শ্রেণী থেকে সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণীর। মহামান্য দলাইলামা থেকে অতি নগণ্য মালবাহক পর্য্যন্ত। এদের আশীর্ব্বাদ করার ভঙ্গিও নানাপ্রকারের। আশীর্ব্বাদ গ্রহণকারীর পদ ও সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী আশীর্ব্বাদ করেন। সম-মর্য্যাদার উচ্চপদস্থ সন্ন্যাসীর সাক্ষাতে যাজক নিজমস্তক তাঁর মস্তকের কাছে নিয়ে ধীরে স্পর্শ করেন। যাঁরা স্নেহের পাত্র বা অনুগ্রহভাজন তাদের মাথায় দুই হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে এক হাত ও

দুইটি আঙ্গুল বা শুধুমাত্র একটি আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ করেই আশীর্ব্বাদ সারেন। আশীর্ব্বাদের সর্ব্বশেষ প্রথা একটি কাঠিতে এক খণ্ড রঙ্গীন বস্ত্র বেঁধে তাই দিয়ে মাথা স্পর্শ করা। এই থেকে বোঝা যায় আশীর্ব্বাদক ও গ্রহীতার মধ্যে স্পর্শযোগ থাকা দরকার। সুতোয় বা সিল্কের ১ ফুট লম্বা তিন ইঞ্চি চওড়া পর্য্যন্ত ঢিলে তাঁতে-বোনা এক খণ্ড বস্ত্রকে এরা 'খটক' বলে থাকেন। এইরূপ বস্ত্র-খণ্ডের আদান-প্রদান সভ্যতা বা ভদ্রতাসূচক। কেহ যখন কোন একজন অফিসার যাজক বা বন্ধুর কাছে পত্র পাঠান বা দেখা করেন তখন এইরূপ বস্ত্রও পাঠান বা সঙ্গে নেন উপঢৌকনের জন্য। বিবাহ বা অন্যান্য উৎসব উপলক্ষেও এই খটক্ উপহার দেওয়া হয়। এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলে বুঝতে হবে হয়, সে ব্যক্তি অজ্ঞ নয়ত অভব্য। মঠে মন্দিরে দেবতার উদ্দেশ্যে ফুলের মালার পরিবর্ত্তে এই প্রকার বিশেষ গলবস্ত্র উপঢৌকন দেওয়া হয়।

তিব্বতীদের জীবহত্যার প্রথা বড়ই অভিনব। মাংসের জন্য এরাও মেষ ইত্যাদি বধ করে, কিন্তু বধ করার রীতি অদ্ভুত। এরা বিনা রক্তপাতে প্রাণী বধ করে, কেন না এদের ধর্ম্মে কোনও প্রাণীর রক্তপাত নিষিদ্ধ—সে কারণে হত্যার প্রাণীটির নাক-মুখ দড়ি দিয়ে বেঁধে দমবন্ধ করে মারা হয় আর এই দমবন্ধ হয়ে মারা যাওয়ার সময়টুকুতে মণিমন্ত্র উচ্চারণ করা হয়ে থাকে যাহাতে জীবটির উদ্ধারপ্রাপ্তি হয় ও তাহার আত্মা জন্মান্তরে নরদেহ লাভ করে। এ অভিনব করুণায় পরম-কারুণিক বিব্রত হতেন কিনা কে জানে!

অবস্থাপন্ন এবং প্রধান প্রধান যাজকদের মৃতদেহ পোড়ানো হয় কিন্তু সাধারণ সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসিনী ও গৃহী-দের দেহগুলি খণ্ড খণ্ড করে কেটে গৃধিনী শকুনীকে খাওয়ান হয়, কিছুটা পার্শীদের মত আর কি। অথবা যদি কাছাকাছি কোনও নদী থাকে তাইতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। কাঠের অত্যন্ত অভাবই এর কিছুটা কারণ। জন্ম-মৃত্যুর নানা জটিল ও বিবিধ প্রকারের সংস্কার ও নিয়ম চলিত দেখা যায় এই তিব্বতীদের মধ্যে এবং এ বিষয়ে হিন্দুদের সংস্কারের সঙ্গে বহু মিল আছে। ভারতে যেমন স্তূপ বা চৈত্য আছে তিব্বতে সেইরূপ 'চোর্টেণ' (chhorten) আছে। মৃতের ভস্মাবশেষ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ছোট ছোট পিরামিডের আকারে প্রস্তুত করে এই চোর্টেণগুলিতে রাখা হয়। এই চোর্টেণগুলিকে পঞ্চভূতের প্রতীক ধরা হয়। তলার চৌকো অংশটি ক্ষিতির সঙ্গে, ইহার উপরের গোল অংশটি অপ, তার ওপরের তিন-কোণা অংশটি তেজ, তারও ওপর দ্বিতীয়ার চাঁদের মত অংশটি মরুৎ এবং তারও ওপরে চন্দ্রাকৃতি অংশটি ব্যোমের সঙ্গে তুল্য হয়।

তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মই প্রধান। এ কিন্নরাখণ্ড লামা রাজত্বই বলা চলে। (Srongtsangampo) স্রংসাং-গোম্পো এর মধ্যে (Lha-Idan) লা-ইডান স্থাপনা করেন, ইহাই পরবর্ত্তী কালে তিব্বতের অধুনা প্রধানতম শহর ও রাজধানী লাসা। ৫ম শতাব্দী থেকে ১০ম শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজতন্ত্র ছিলো। এই সময়ে তিব্বতের ধর্ম্মাকাশে বহু বিশিষ্ট নক্ষত্রের আগমন হয়। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহা আচার্য্য সত্যরক্ষিৎ গুরুপদ্মনাভ ও আরও বহু গুণী-জনের সঙ্গে শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর বা অতীশ দীপঙ্করও এই তিব্বতে ১০২৬ শতাব্দীতে আসেন। ধর্ম্মপ্রচার ছাড়াও তাঁরা তিব্বতের নানা বুদ্ধপূর্ব্ব ধর্ম্ম ও শাস্ত্র গ্রন্থ সংস্কৃততে ও পালিতে অনুবাদ করেন।

১২৫৩ শতাব্দীতে সমস্ত পূর্ব্বখণ্ড চীনের অবতাররাজ কুবলাইখান জয় করেন এবং তিনিই রাজতন্ত্র থেকে লামাতন্ত্র অর্থাৎ সমস্ত ক্ষমতা লামাদের হাতে ন্যস্ত করেন। প্রথম লামা শাক্যবংশীয় ছিলেন। ১৭০০ শতাব্দীতে (Nga-Wang-Lab-Sang) ঙা-ওয়াং-লব-স্যাং শাক্যলামাদের পরাজিত করে অধুনা দলাই লামার বংশকে সিংহাসনে বসান। তিব্বতীরা মহামান্য দলাই লামাকে বুদ্ধের অবতার বলে পূজা করে। তিনিই একাধারে দেবতা ও রাজা। বুদ্ধ আত্মার ক্ষয় নাই, দলাই লামার দেহান্তরে শুধুমাত্র কায়ারই বদল হয়। দলাই লামার দেহান্তরের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পবিত্র আত্মা সেই মুহূর্ত্তেই নবজাত কোনও শিশুদেহে প্রবেশ করেন ইহাই বৌদ্ধদের বিশ্বাস। একজন দলাই লামার মৃত্যু-মুহূর্ত্তে যত পুরুষশিশু জন্মায় সকলেরই পরবর্ত্তী দলাই লামা রূপে নির্ব্বাচিত হবার সম্ভাবনা থাকে। এই বিশেষ মুহূর্ত্তে জাত শিশুদের মধ্য থেকে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ও শুভচিহ্ন মিলিয়ে নতুন দলাই লামা গ্রহণ করা হয়। আজকের যিনি দলাই লামা ইনি চতুর্দ্দশ দলাই লামা। ২৫ বৎসর বয়স্ক এই নবীন মহামান্য দলাই লামা ১৯৪০ শতাব্দীতে ৫ বৎসর বয়সে দলাই লামার সকল যোগ্যতায় ও গুণে উত্তীর্ণ হয়ে এই মহামান্য আসনে অধিষ্ঠিত হন। মন্ত্রীমণ্ডলী ও প্রধান প্রধান লামাদের ৩০/৪০ জন উচ্চ-পদপ্রাপ্তদের দ্বারা এঁর কার্য্যসভা পরিচালিত হয়। দলাই লামার আধিপত্য দ্বিমুখী—ইনি একাধারে আধ্যাত্মিক ও প্রশাসনিক কাজ যুগপৎ চালিয়ে থাকেন। কিন্তু পাঞ্চেন লামা কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক ব্যাপার নিয়ে লিপ্ত থাকেন। পাঞ্চেন লামার পদ পঞ্চম দলাই লামা তাঁর

আপন গুরুদক্ষিণা স্বরূপ এই পদ প্রিয় গুরুকে দেন। তিব্বতে পাঞ্চেন লামার স্থান দলাই লামার পরেই, কাহারও কাহারও মতে সমান সম্মানজনক। এখন যিনি পাঞ্চেন লামা, প্রথম পাঞ্চেন লামা থেকে দশম জন। এঁর বাসস্থান (Shigatse) সীগাটসীতে।

তিব্বতে মহাযানীদেরই প্রাধান্য দেখা যায় এবং এর সঙ্গে তান্ত্রিক ধর্মের প্রভাবও কিছুটা আছে—শাক্ত দেব-দেবী ছাড়া বুদ্ধপূর্ব তিব্বতীদের আদিম ধর্ম যে-ধর্মে নানা বীভৎস অসুর দৈত্য ইত্যাদি অপদেবতার পূজা হ'ত তাহার প্রভাবও কিছুটা পাওয়া যায়। মোটামুটি বৌদ্ধ-ধর্ম ও লামাদের প্রাধান্যই দেখা যায়। প্রত্যেকটি তিব্বতী পরিবারের একটি-দুটি ছেলেমেয়েকে অতি শৈশবকাল থেকেই ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী সম্প্রদায় ভুক্ত করা হয়। কাল-ক্রমে বুদ্ধ-প্রবর্তিত হীনযানি ধর্ম মহাযানীদের প্রভাব প্রাপ্ত হয় আর তারও পর নানা তান্ত্রিকতা ও অন্যান্য নানা লোক-প্রচলিত ধর্মের প্রভাবভুক্ত হয়ে পড়ে। যে বুদ্ধ নিজেকে মানব হিসাবেই প্রচার করেন এবং মূর্ত্তিপূজা বিরোধী ছিলেন সেই মহান্ ধর্মেই শেষ পর্য্যন্ত ভূত প্রেত পিশাচের পর্য্যন্ত পূজা হয়—ইহা বুদ্ধ বা বৌদ্ধধর্মের ত্রুটি নহে, ইহা কালের নির্মম চক্রান্ত বলা যেতে পারে। বুদ্ধ-প্রবর্ত্তিত বৌদ্ধধর্ম থেকে তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম আজ বহুদূর। আগেইত লেছি, তিব্বতে মহাযানী বৌদ্ধধর্মের প্রভাবই অধিক এবং এই মহাযানী ধর্মও দশ প্রকারের।

১। অষ্টম শতাব্দীতে চীনে ধর্মযাজকেরা তিব্বতে Ngingmapa সম্প্রদায় প্রচার করেন। ভুটান পশ্চিম-তিব্বত ও লাডকে এর প্রাধান্য দেখা যায়।

২। নবম শতাব্দীতে Urgyampa ধর্মের প্রভাব হয়। নেপাল সীমান্তে এর বিশেষ আধিপত্য। ভারতের হিমালয়ান বা হিমাচল প্রদেশের বৌদ্ধদের বেশীর ভাগই এই সম্প্রদায়ের। তা ছাড়া মধ্য তিব্বতের প্রধান মঠ Samye-তে Urgyon বা পদ্মসম্ভবর পূজা হয়ে থাকে।

৩। একাদশ শতাব্দীতে Kadampa সম্প্রদায়ের উত্থান হয়। শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর বা Atisha-র প্রধান শিষ্য Domten-এর এঁরা অনুগামী।

৪। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে Sakyapa সম্প্রদায় প্রাধান্য লাভ করেন। উপরিউক্ত এই চারিটি সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরাই লাল রঙের টুপী ব্যবহার করেন। সাধারণ লোকে এদের লালটুপী সম্প্রদায় বলেই উল্লেখ করে থাকে। মধ্য তিব্বতে অবস্থিত শাক্যগুহাই এঁদের প্রধান মঠ।

৫। Gelukpa (reformed sect) বা Gandenpa চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে প্রাধান্য পায়। Choukhapa এর প্রবর্ত্তক। সংখ্যায় এঁরাই বোধ হয় তিব্বতে সবার অধিক এবং এদের প্রধানতম মঠ হচ্ছে Ganden মঠ।

৬। Kargyudpa সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা Do বা Sutra Gratha বিশ্বাস করেন।

৭। Karmapa সম্প্রদায়ের লোকেরা কর্মের efficacy-তে বিশ্বাসী।

৮। Dekumpa দলভুক্ত সন্ন্যাসীদের প্রধান মঠ Dekung.

৯। Dorje বজ্র বা বজ্রপাতের উপাসকেদের Dukpa সম্প্রদায়ের বলা হয়। সেরা মঠ এদের প্রধানতম এবং এরা তাই বিশ্বাস করেন। স্বর্গ থেকে দোর্জে বা বজ্র এই মঠে পতিত হয়েছে—এদের যন্ত্র (yantra) মার্গের বলা যেতে পারে।

১০। তিব্বতের সর্ব্বশেষ সম্প্রদায় বোনপা বা পেন বো ইহাই তিব্বতের বুদ্ধপূর্ব্ব ধর্ম যদিও অধুনা এরা বৌদ্ধদের নানা উপাসনার পদ্ধতি ও দেবদেবীর পূজা করেন। এরাও বৌদ্ধমঠে দান কিন্তু পবিত্র স্থানের পরিক্রমা ঘড়ির উল্টোদিকে অর্থাৎ চলিত প্রথার বিপরীত দিকে করেন। তিব্বতে মোটামুটি এই দশ সম্প্রদায়ের লোকই দেখা যায়।

লালটুপী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের ব্রহ্মচর্য্য বা চির-কৌমার্য্য অবশ্য-পালনীয় ধর্ম নয়। তাঁহারা ইচ্ছামত মনমত সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে বিবাহ করতে পারেন। হলদে টুপী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের চিরকৌমার্য্য অবশ্য-পালনীয়। এই সম্প্রদায়ের কেহ যদি সর্ব্বসমক্ষে বিবাহ করেন তাঁহাকে মঠ থেকে বিশেষ সাজা দেওয়া হয়। মঠের বাহিরে ভিক্ষু ভিক্ষুণীরা ইচ্ছামত বসবাস করতে পারেন এবং কোনও কোনও ভিক্ষুণীর কোলে ছোট শিশুও দেখা যায়। অজ্ঞান অবস্থায় বহু ছেলেমেয়েকেই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ভুক্ত করা হয় এবং বড় হয়ে সবারই আকাঙ্ক্ষা যে সংসার ত্যাগের দিকেই যাবে ইহাও বিশ্বাস করা যায় না—কাজেই অজ্ঞান অবোধ অবস্থায় ইহাদের ওপর যে গুরুদায় ন্যস্ত করা হয় তাহা যদি ইহারা ঠিক ভাবে রাখতে না পারে, তার জন্য দোষী বা দায়ী ইহাদের করা চলে না, এই প্রথাই ইহার জন্য বিশেষ দোষী।

এতক্ষণ ধর্মসম্প্রদায় সম্বন্ধেই বলা হয়েছে এইবার ইহাদের বাসস্থান সম্বন্ধেও দুই-একটি কথা আলোচনা করা দরকার।

বেশীর ভাগ সন্ন্যাসীরাই গোম্ফা বা গুহাবাসী। মন্দির, মঠ ও ধর্মশালার একত্র সমাবেশকেই গুহা বলা হয়।

বৌদ্ধ মন্দিরগুলিতে আমাদের মন্দিরের মতই বুদ্ধ ও বৌদ্ধদের নানা দেবদেবীর মূর্তি রাখা হয় ও পূজা করা হয়। মঠগুলিতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা বা লামারা বাস করেন এবং ধর্ম্মশালায় পরিব্রাজক ও অতিথিরা আতিথ্য পান। তিব্বতে প্রথম গুহা খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৮২৩ বা ৮৩৫-এর মধ্যভাগে প্রস্তুত হয়। লাসা থেকে তিরিশ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে Samyeতে এই মনাষ্ট্রি অবস্থিত। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণেই ইহা প্রস্তুত। প্রত্যেক বড় মঠেই বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় থাকে এবং এগুলিকে এক একটি শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র বলা যায়। Depung বা ধান্যস্তূপ বিহার লাসার দুই মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। মহান ধর্ম্মপ্রচারক Chonkhapa ইহার স্থাপয়িতা, ইহা ১৪১৬ শতাব্দীতে স্থাপিত হয়। কৃষ্ণানদীতীরস্থ অমরাবতী স্তূপের নিকটবর্ত্তী শ্রীধান্যকটক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে ইহা প্রস্তুত। ইহা ৭,৭০০ হাজার ভিক্ষুর বাসের জন্য উপযুক্ত যদিও ১০,০০০ হাজার সন্ন্যাসীর উপস্থিত বাস এইখানে। ইহা পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম সন্ন্যাসীর আবাস ও বিশ্ববিদ্যালয় বলা যেতে পারে।

১৪১৯ শতাব্দীতে স্থাপিত সেরা মঠ লাসার দুই মাইল উত্তরে অবস্থিত ইহা ৫,৫০০ হাজার ভিক্ষুর বাসের যোগ্য ভাবে প্রস্তুত যদিও অধুনা ৭০০০ ভিক্ষুর সেখানে বাস। ইহাই পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তর মঠ। লাসার প্রায় তিরিশ মাইল পূর্ব্বে Ganden মঠ অবস্থিত,ইহা ১৪০১ শতাব্দীতে স্থাপিত হয়। এই তিনটি মঠকে তিব্বতের স্তম্ভস্বরূপ বলা হয়ে থাকে। এই তিনটি প্রধান মঠ ছাড়াও (Yashi Lhunpo) য়াসিলামপো, শাক্যমঠ (Derje) ডরজে মঠ, কোকোনূর হ্রদের কাছে কুমভুম মঠ, ডেকুং মঠ, শাক্য বিহার, নেথাং মঠ এ ছাড়া আরও বহু ছোট ছোট মঠ সারা তিব্বতে ছড়িয়ে আছে। প্রায় প্রতিটি মঠেই সাধারণ শিক্ষা প্রত্যেক ভিক্ষুর জন্য বাধ্যকতা সম্পন্ন কিন্তু উচ্চ শিক্ষার জন্য বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় সংযুক্ত মঠগুলিতে যেতে হয়। ধর্ম্ম শাস্ত্র ছাড়াও ব্যাকরণ, সাহিত্য, আয়ুর্ব্বেদ, ভাস্কর্য্য মিনার ও খোদাইয়ের কাজ, শিল্পবিদ্যা, ছাপার কাজ ইত্যাদি শেখানো হয়। নালান্দা বিদ্যালয়ের তাম্রমূর্ত্তি এবং অন্যান্য ব্রোঞ্জ ঢালাইয়ের কাজ আজ পর্য্যন্ত তিব্বতে অতি যত্নের সহিত অনুসরণ করা হয়। ডেরজে (Derje) লাসা ও তাসিলুম্পো তাম্রের বৃহত্তম স্থান বলা যেতে পারে। তামার বুদ্ধ মূর্ত্তি বা বৌদ্ধ দেবদেবী স্তূপ ভিক্ষুমূর্ত্তি বা অন্য নানা জিনিস তিব্বত, নেপাল, ভুটান ও রামপুর (Bushahrstate) বুসাহরষ্টেটে প্রচুর পাওয়া যায়। তিব্বতের প্রায় প্রতিটি মঠেই ছাত্রাবাস আছে। জনগণের দান কিছুটা ব্যবসায় ও টাকা ধারের কারবারে কিছুটা ব্যাঙ্কের মত এবং প্রায় সব মঠেরই প্রচুর জায়গা জমি আছে। স্থায়ী মঠ বাসিন্দাদের মধ্যে অর্দ্ধেককে ঠিক মত ছাত্র হিসাবে ধরা যায় আর সকলেই হয় দাস নয় পরিচালক, নয় ত ব্যবসায়ী ইত্যাদি কোনও না কোনও কাজে যুক্ত। দেশ দেশান্তর থেকে এসে শিক্ষার্থীরা এই সব মঠগুলিতে অধ্যয়ন করে। রামপুর বুসাহর ষ্টেট, লাডক, ভুটান, সিকিম, দক্ষিণ রাশিয়া, সাইবেরিয়া ও চীন থেকে বহু ছাত্র এখানে অধ্যয়নে আসে। এই সব শিক্ষার্থীরা প্রায় সকলেই বৌদ্ধ ভিক্ষু। লাসার কাছে দুটি প্রসিদ্ধ বিদ্যালয় আছে একটি আয়ুর্ব্বেদের ও অপরটি জ্যোতিষ বিদ্যার জন্য খ্যাত। দুই শ্রেণীর সন্ন্যাসী ও যারা উচ্চ স্তরের ভিক্ষু তাদের লামা ও সাধারণদের (dabas) বলা হয়। বহু দিন সাধন-ভজন ও অধ্যয়নের পরই সাধারণ ভিক্ষুদের লামা পদ দেওয়া হয়। লামাদের মধ্যেও আবার জ্ঞান ও শিক্ষার তারতম্য হিসাবে তিনটি শ্রেণীর পদ আছে। সমস্ত সন্ন্যাসীই উচ্চপদপ্রাপ্ত লামারা পর্য্যন্ত মদ্য মাংস গ্রহণ করেন। তিব্বতীদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে খুব গোঁড়ামী না থাকলেও বহু সংস্কার আছে—তাঁরা তাঁদের ধর্ম্ম-মন্দিরে বা মঠে কাহারও প্রবেশ নিষেধ করেন নাই। পৃথিবীর সকল জাতের মানুষই স্বচ্ছন্দে বিহারে বিহারে গমন ও পরিদর্শন করতে পারেন।

শঙ্খ, ঘণ্টা, ডমরু, দামামা, ক্ল্যারিওনেটস, সানাই, খোল-করতাল এবং মনুষ্য-অস্থির বাঁশরী ব্যবহার বিহারের মন্দিরগুলিতে দেখা যায়। Dorjes বা অশনি, মড়ার মাথার ঘৃত দীপ, ধূপ ধুনা বেশ কিছু পানীয় জল বা চাং (tsampa), সামপা, মাংস, মাখন, মেঠাই প্রভৃতি নানা প্রকার খাদ্য পানীয় দ্বারা দেবতার উপাসনা করা হয়। সময় সময় বড় বড় মন্ত্র বা মানদালাক টানা হয়। নানা রংয়ের মাখন ও সাম্পার প্রস্তুত বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্ত্তি গড়ে তান্ত্রিক মতে তিন থেকে তিরিশ দিন ধরে পূজার মহোৎসব করা হয়। পূজার শেষদিন বিরাট হবনম্ বা যজ্ঞ হয়। নানা জলরংয়া চিত্র সেগুলিকে (Thankas) থাংকাস বলা হয়। গৃহে পাঠাগারে এবং অন্যান্য ঘরে ইহা ঝোলানো দেখা যায়। এই সব ছবির বিষয়বস্তু নানাপ্রকারের। তার মধ্যে দেবদেবী আছেন, লামা বা (Yantra) যন্ত্র আছে, এমনি দৃশ্যাবলীও আছে। এগুলির চারধার সিল্কের ফিতে দিয়ে বাঁধান এবং ভেল দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে নষ্ট হওয়ার ভয়ে। তিব্বত তার ধর্ম্ম সংস্কৃতি শিক্ষা

সভ্যতা এবং শিল্পকলায় ভারতের কাছে নানা ভাবে ঋণী। এমনিতে তিব্বতীরা শিল্পপ্রিয় জাতি। প্রতি গৃহেই কিছু না কিছু সৌখীন শিল্পদ্রব্য দেখা যায়।

তিব্বতী সাহিত্যে দুইটি মহাগ্রন্থ আছে। একটির নাম Kangyur* ও অপরটির নাম Tengyur*। কাঞ্জুর কেবলমাত্র ভগবান বুদ্ধের বাণী ও উপাদেশাবলীর সংস্করণ বা বৌদ্ধ-বিধান গ্রন্থ ইহা ১০৮ ভাগে বিভক্ত, তেঞ্জোর বৌদ্ধ-শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থের সঙ্কলন ইহাও ২৩৫ খণ্ডে সমাপ্ত। তেঞ্জোরের নানা অংশ আছে ইহাতে কাব্য সাহিত্য ব্যাকরণ, জ্যোতিষ নক্ষত্র-বিদ্যা, রসায়ন, অঙ্কশাস্ত্র, তন্ত্র-মন্ত্র ইত্যাদি। ইহা ছাড়াও এই খণ্ডে নানা লুপ্ত সংস্কৃত পুস্তকের তর্জ্জমা আছে যে-গুলির মুসলমান টাটার প্রভৃতি বহিরাগত শত্রুর নানা অত্যাচারে বা অগ্নিকাণ্ডের ফলে ভারতে আর চিহ্ন মাত্র ছিল না। এই তেঞ্জোর-এ জ্যোতির্মার্ণব আর্য্যদের, দিগনগ, ধর্ম্মরক্ষিত, চন্দ্রকীর্ত্তি ও সত্যরক্ষিতের মূল লুপ্ত গ্রন্থগুলির অমূল্য অনুবাদ আছে। মহাপণ্ডিত কমলা-শীলের হারাণ গ্রন্থের অনুবাদও আছে। ব্যাকরণ বিশারদ চন্দ্রগৌমির বেদান্ত টীকা, চন্দ্রব্যাকরণ, সূত্রধাতু, অনাদিপথ-ভূষিটীকা পঞ্চকা ইত্যাদি পাওয়া যায় যা কালের করাল হস্তে অন্যত্র লুপ্ত হয়ে গেছে। লোকানন্দ নাটক অশ্বঘোষের নানা হারিয়ে যাওয়া গ্রন্থ, তা ছাড়া মতিচিত্র, হরিভদ্র, আর্য্যসুর ও অন্যান্য বহু বিখ্যাত পণ্ডিত ও সাহিত্যিকের অন্যত্র লুপ্ত বা নষ্ট গ্রন্থের অমূল্য অনুবাদ এই তেঞ্জোর-এর মধ্যে পাওয়া যায়। ক্ষেমেন্দ্র প্রভৃতি মহাকবিগণের ও কালিদাসের মেঘদূত, তা ছাড়া দণ্ডি ও হর্ষবর্দ্ধনের গ্রন্থসকলের অনুবাদও ইহাতে সুরক্ষিত আছে —এই তেঞ্জোর-এ অমূল্য সম্পদ যাহা ভারতীয় মনীষী-দের জয়ধ্বজা বলতে পারা যায়। তিব্বতীরা তিব্বতী ভাষায় কথা বলে এবং ইহা প্রতিটি অংশে কিছু কিছু ভিন্নতা প্রাপ্ত, যাহা প্রায় অন্যান্য ভাষা সম্বন্ধেও বলা চলে —একা বাংলাই ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কথিত হয় আমরা দেখতে পাই। একজন পূর্ব্ববঙ্গীয়ের কথা বোঝা একজন পশ্চিমবঙ্গের লোকের পক্ষে দস্তুর মত কষ্টসাধ্য।

639 A, D.-তে রাজা Srongisan Gompo তিব্বতে বুদ্ধধর্ম্মের প্রচার ও Lha-I'dan বা রাজধানী লাসার স্থাপনা করেন এবং তাঁরই আওতায় তাঁর মন্ত্রী Thonmi কাশ্মীরের সারদা অক্ষরের অনুকরণে সেই সময়ের কথ্য তিব্বতী ভাষাকে লিখিত অক্ষরে রূপ দেন, যাহাতে নানা সংস্কৃত বৌদ্ধ ও অন্যান্য গ্রন্থ তর্জ্জমা করা হয়। তিব্বতী ভাষায় পাঁচটি স্বরবর্ণ ও ৩০টি ব্যঞ্জনবর্ণ আছে। পণ্ডিত Thomi প্রথম তিব্বতী ভাষায় গ্রামারের রচয়িতা। Calendar কাশ্মীরের পণ্ডিত সোমনাথ ১০২৭ সনের কাছাকাছি 'কালচক্র জ্যোতিষ' তিব্বতী ভাষায় প্রবর্ত্তন করেন ও ৬০ বছরের বৃহস্পতি চক্র বা প্রবাহ প্রচলন করেন। এই ৬০ বছরের কালচক্র আবার ৪টি সমবিভক্ত চক্রে অর্থাৎ এক একটি বারো বছরের কালচক্রে বিভক্ত করা হয়। মার্গশীর্ষ শুক্লা প্রতিপদকে নববর্ষ হিসাবে গণ্য করা হয়। আমাদের ইংরেজী ক্যালেণ্ডার মতে সেই দিনটি ১৪ই ডিসেম্বর মত হয়। মানস-সরোবরে সমগ্র দক্ষিণ প্রান্তে এই দিনটিই নববর্ষ এবং উত্তর প্রান্তে পৌষশুক্লা প্রতিপদকে অর্থাৎ ১২ই বা ১৩ই January মত হয়। মাঘের শুক্লা প্রতিপদকে অর্থাৎ ১২ই February মত দিনটিকে সরকারী নববর্ষ হিসাবে গণ্য করা হয়। মঠে চৈত্যে নববর্ষ উৎসব সাড়ম্বরে নানা ধুমধামে প্রতিপালিত হয়ে থাকে।

মণিমন্ত্র বা তিব্বতী ধর্ম্মের বীজমন্ত্র—

ওঁ-মণি-পদ্মে-হুঁম্-মহামন্ত্রটি প্রধানলামা, সাধারণলামা, কর্ম্মচারী, জনসাধারণ আবালবৃদ্ধবনিতা সমান অধিকারে সমশ্রদ্ধায় জপ করে থাকেন—এই প্রধান মন্ত্রটি তারা শুতে বসতে চলতে ফিরতে সর্ব্ব সময়ে সর্ব্বকালে জপ করে থাকেন। দেবপিতা অমিতাভ বুদ্ধ তাঁহার প্রিয়-পুত্র ও প্রজারঞ্জন অবলোকিতেশ্বরকে এই মহামন্ত্রটি দান করেছিলেন ইহাই তিব্বতীদের বিশ্বাস।

মণি-অর্থে পুরুষ অথবা দেবশক্তি, পদ্ম অর্থে শক্তি বা প্রকৃতি, ওঁম সর্ব্বমন্ত্রের আদি এবং হুঁম্ হচ্ছে তান্ত্রিক প্রত্যয়। এই মণিমন্ত্রটি তিব্বতীরা—পাথরে দেয়ালে গাছের গুঁড়িতে দিকে দিকে কুঁদে বা লিখে রেখেছেন। এই মন্ত্রটি বার বার কাগজে লিখে সেটি একটি চোঙ্গার মধ্যে পুরে রাখেন এবং ধর্ম্মযাজক থেকে সুরু করে সর্ব্ব-সাধারণ সময় পেলেই ঘোরান—এই তাঁরা মহাপুণ্য অর্জ্জন করে থাকেন ইহাই তিব্বতী মনের বিশ্বাস। বিশ্বাসেই মানুষের সর্ব্ব-জিজ্ঞাসা সর্ব্ব-অনুসন্ধিৎসার শেষ ধর্ম্ম জগতে ইহাই আমরা দেখতে পাই।

* E'.ryman's E cyclop. dia.

* E'.r man's Encyclopae l.a.

বুদ্ধ ও তাঁহার শিষ্যগণের মূর্তি

শ্রীসুখময় সরকার

গ্রীষ্মের অবকাশে বাড়ী ফিরিতেছিলাম। গত ৭ই জ্যৈষ্ঠ (১৩৬৭), শনিবার, বৈকাল বেলা। আমাদের মোটর-বাসখানা দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়ার উষর-বন্ধুর প্রান্তর অতিক্রম করিয়া যেন অতিমাত্র ক্লান্ত হইয়া জুনবেদিয়া গ্রামের নিকটে ধীরে ধীরে শিলাবতীর বালুকাময় গর্ভ উত্তরণ করিতেছিল। সহসা আমার সহোদরা লীলা নদীর উত্তর তটে একটা জঙ্গলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, "দাদা, ঐখানে গত বৎসর বুদ্ধদেব উঠেছেন। কাল দেখে এসো।"

"বুদ্ধদেব উঠেছেন কি রে! কেমন করে উঠলেন?" বিস্মিত হইয়া আমি প্রশ্ন করিলাম।

"হ্যাঁ, উঠেছেনই তো," ভগিনী দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "জুন-বেদিয়া গ্রামের যোগীন্দ্র মণ্ডলকে স্বপ্ন দিয়েছিলেন, "আমি এখানে রয়েছি—এই বেলডাঙ্গায় মাটির নীচে, আমায় খুঁড়ে বের কর, আমার পূজো কর।" স্বপ্নে আদেশ পেয়ে যোগীন্দ্র মণ্ডল ওখানটা খুঁড়ে দেখল, সুন্দর একটি বুদ্ধ-দেবের মূর্তি। তার সঙ্গে আরও চারটি অন্য ঠাকুরের মূর্তি পাওয়া গেছে—কী ঠাকুর, কে জানে। একটি গণেশ আর একটি অষ্ট নাগের মূর্তিও পাওয়া গেছে। গত ফাল্গুনী পূর্ণিমায় ঠাকুরের উৎসব হয়ে গেল। মস্ত বড় মেলা বসেছিল ঐ বেলডাঙ্গার জঙ্গলটায়।"

"স্বপ্ন না হাতী:" আমি বলিলাম, "বোধ হয় মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে এমনি বেরিয়ে পড়েছে।"

"তোমার সব তাতেই অবিশ্বাস!" অনুজার কণ্ঠে তিরস্কারের সুর ঝঙ্কৃত হইল। "বেশ তো, কাল একবার দেখেই এসো না, সত্যি কি মিথ্যে!"

"আচ্ছা, তুই নিজে দেখেছিস, বুদ্ধ মূর্তি না মহাবীর জিনের মূর্তি? বুদ্ধ আর জিন, ভালো করে না দেখলে তো চেনা যায় না। মলিয়ানের শিব মন্দিরে 'ভৈরব' নামে যে মূর্তিটির পূজো হচ্ছে, আসলে ওটি মহাবীর জিনের মূর্তি। প্রতিমার সঙ্গে চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের মূর্তি পর্যন্ত খোদাই করা রয়েছে। নগ্ন মূর্তি দেখে লোকে 'ভৈরব' বলে: ব্রাহ্মণেরাও নির্বিচারে তাঁকে 'ভৈরব' বলে পূজো করছেন। তাঁর সামনে পাঁঠা বলি দিচ্ছেন! এইটেই সব চেয়ে ট্র্যাজেডি রে লিলি, অহিংসার অবতারের কাছে পাঁঠা বলি!!"

"আমি অতশত জানি নে, দাদা! তবে আমি দেখেছি, মাও দেখেছেন—বেলডাঙ্গায় যে মূর্তিটি পাওয়া গেছে, সেটি ধ্যানী বুদ্ধদেবের মূর্তি বলেই মনে হয়। ওখানে পাঁঠা বলি হয় না। যোগীন্দ্র মণ্ডল নিরামিষ খায়, শুনেছি।"

বাড়ী পৌঁছিয়া কার্যান্তরে এতই বিব্রত হইয়া পড়িলাম যে, পরবর্তী তিন দিন বুদ্ধদেব দর্শনে যাইবার সময় পাইলাম না। ১১ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, বৈকালে গ্রামের বাল্য সহচর শ্রীঅচিন্ত্য সরকারকে সঙ্গে লইয়া বেলডাঙ্গার বুদ্ধদেব দর্শনে বাহির হইলাম। পথে মলিয়ান গ্রাম পড়ে; অবশ্য অন্য পথেও যাওয়া যাইতে পারিত। মলিয়ানে আমাদের সঙ্গী হইলেন কবিরাজ শ্রীমদনমোহন কাব্যতীর্থ। কেবল সঙ্গী নহেন, ইনিই আমাদের 'গাইড' হইলেন বলা চলে। পথ চলিতে চলিতে কথা প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "কেবল বুদ্ধদেব নয়, ভায়া, শিবও উঠেছেন। এই তো আগামী পরশু, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, রোহিণী-উদয় দিনে শিবের গাজন হবে।"

"কি রকম শিব?" আমি জিজ্ঞাসিলাম, "শিবলিঙ্গ নাকি?"

"না, না। এমনি একটা পাথর," মদনমোহন বলিলেন, "দেখতে খানিকটা পিরামিডের মত। ওরা বলে অনাদি লিঙ্গ।"

মলিয়ান গ্রামের উত্তর প্রান্তে প্রায় আধ মাইল বিস্তৃত ধানের জমির উপর দিয়া সোজা হাঁটিয়া শিলাবতী নদীতে পৌঁছিলাম। জ্যৈষ্ঠ মাস, শিলাবতীর শুষ্ক বালুচর যেন শুভ্র দন্তপংক্তি বিস্তার করিয়া পিপাসার্তকে বিদ্রূপ করিতেছে। ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত অতিকায় শিলাখণ্ডগুলি নদীকে সার্থকনাম্নী করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু শিলাবতী বাহিরে রূঢ়া হইলেও অন্তরে রসবতী। বালুচরে একহাত গর্ত খুঁড়িলেই শীতল জলের ফল্গুধারা। স্থানে স্থানে 'চুয়া' খুঁড়িয়া জুনবেদিয়া গ্রামের বধূরা কলস ভরিয়া সেই শীতল জল সংগ্রহ করিয়া গৃহে লইয়া যাইতেছে। দেখিতে দেখিতে বেলডাঙ্গার দিকে অগ্রসর হইলাম। নদীর উত্তর তটে একটা পলাশের জঙ্গল, তাহার মাঝখানে একটা উঁচু ঢিপির নাম বেলডাঙ্গা। এই ঢিপির নীচে এক পুরাতন মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ। বেলডাঙ্গায় সত্যই কয়েকটা

বেলগাছ আছে, দূর হইতে দৃষ্টিগোচর হয়। শুনিলাম, এখানে পলাশ ও অন্যান্য বৃক্ষের জঙ্গল নিবিড়তর ছিল; গত কয়েক বৎসরে সরকারী বন-বিভাগের তৎপরতায় বেলডাঙ্গার চতুষ্পার্শ্বস্থ জঙ্গলের বৃক্ষরাজি বিরল হইয়া আসিয়াছে। তদুপরি গত বৎসরের (১৩৬৬) প্রবল বর্ষণে বেলডাঙ্গার উপরের মৃত্তিকাস্তর বিগলিত ও ধৌত হইয়া নদীগর্ভে নামিয়া গিয়াছে। ফলে স্তূপের ভিতরকার ইষ্টক বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইষ্টক দুই চারিটা নয়, স্তরে স্তরে সজ্জিত অসংখ্য ইষ্টক একদা কোন দেবালয়ের প্রাচীর নির্মাণ করিয়াছিল—স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। ইষ্টকের গঠন সুন্দর, মসৃণ, দৈর্ঘ্য প্রায় পাঁচ ইঞ্চি, প্রস্থ চারি ইঞ্চি, বেধ দেড় ইঞ্চির অধিক নহে। প্রাচীন কালের এই ক্ষুদ্রাকারের ইষ্টক কাষ্ঠে দগ্ধ হইত। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, একটি ইষ্টকেও নোনা লাগে নাই। মনে পড়িল, আমাদের দুলালপুর গ্রামের পার্শ্বে দেউলী গ্রামের উত্তরে যেখানে শিলাবতী নদী বাঁক লইয়াছে, সেখানে বাল্যকালে এক দেউলের এইরূপ ভগ্নাবশেষ দেখিয়াছিলাম। প্রাচীনেরা বলিতেন, ঐ দেউল হইতেই গ্রামের নাম 'দেউলী' হইয়াছিল। এই দেউলে 'কালুবীর' নামে এক ধর্মের (?) মূর্তি পাওয়া গিয়াছিল। জুনবেদিয়ার ডোমেরা সে মূর্তি লইয়া গিয়া এক বৃক্ষতলে স্থাপন করিয়া পূজা করিত। ডোমদিগের পূজিত এই 'কালুবীর' প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধমূর্তি। দেউলীর উত্তরে শিলাবতীর তীরে ছিল বুদ্ধের দেউল। কতকাল হইতে সে দেউল ছিল, কে জানে! কিন্তু সে দেউল তো এই বেলডাঙ্গা হইতে অধিক দূরে নহে, কিঞ্চিদধিক অর্ধক্রোশ হইবে। এত স্বল্প ব্যবধানের মধ্যে দুই-দুইটি বুদ্ধমন্দির ছিল!!

ভাবিতে ভাবিতে সঙ্গীদের সহিত যন্ত্রের মত পদক্ষেপ করিতে করিতে কখন যে স্তূপের উপরে আসিয়া পড়িয়াছি বুঝিতে পারি নাই। বিল্ববৃক্ষের নবোদ্গত কিশলয়ে স্তূপটি স্নিগ্ধ ছায়ায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। একটি অনতিউচ্চ প্রাচীর দ্বারা স্থানটিকে ঘিরিয়া ফেলা হইয়াছে। প্রবেশের নিমিত্ত একটি দ্বার আছে। পূজার্থিনী এক নারী বোধ হয় পূজারীর অপেক্ষায় প্রবেশদ্বারের নিকটে বসিয়াছিল; বেষ্টনীর আশেপাশে রাখাল বালকেরা বসিয়াছিল; অল্প দূরে তাহাদের গোরু-মহিষ চরিতেছিল। আবেষ্টিত স্থানটিতে প্রবেশ করিয়াই দেখিলাম একটি দুই হাত গভীর গর্ত; তাহার মধ্যে একখণ্ড শিলা মাথা জাগাইয়া আছে। এই শিলাই শিব নামে পূজিত হইতেছে। অদ্য সকালেও পূজা হইয়া গিয়াছে; শিলার উপর সচন্দন বিল্বপত্র ও আতপ তণ্ডুল বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। শিবের এই 'গম্ভীরা'র ওপারে সিমেন্ট দিয়া একটি বেদী বাঁধাইয়া এখানে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তি ও অন্যান্য মূর্তিগুলি তাহাতে রক্ষিত হইয়াছে। মূর্তিগুলি বেদীর সহিত সিমেন্ট দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। বেদীর ঠিক মধ্যস্থলে বুদ্ধমূর্তিটি। বুদ্ধমূর্তিই বটে, জিন মূর্তি নয়, কান দেখিলেই চিনিতে পারা যায়। মূর্তিটি ক্ষুদ্র, ছয় ইঞ্চির অধিক উচ্চ নহে; কিন্তু অভগ্ন ও অতি সুন্দর। দক্ষিণ করতল বাম করতলের উপর স্থাপন করিয়া সৌম্যমূর্তি ভগবান্ তথাগত পদ্মাসনে ধ্যানস্থ রহিয়াছেন। কৃষ্ণ-প্রস্তরে নির্মিত মূর্তিটি পূজারীর তৈল-নিষেকে চিক্কণ হইয়াছে।

আমি নির্নিমেষ-নেত্রে মূর্তিটি নিরীক্ষণ করিতেছি; সহসা পূজার্থিনী সেই নারী বলিয়া উঠিল, "রাজা-গাঁয়ের এক মুসলমান ঠাকুরটি লিয়ে পালাঞছিল, বাবা। তার পর যোগীনকে স্বপন হ'ল। যোগীন যাঞে বললেক, স্বপন হঞেছে, ঠাকুর ঘুরাঞ দে। নাইলে মরবি ব্যাটা রক্ত উঠে। মুসলমান ব্যাটা তখন ঠাকুর ঘুরাঞ দিলেক।"

"মুসলমানের এ ঠাকুর নিয়ে যাবার কি দরকার, মা?"

"বিচে দিঞে পয়সা করবার মৎলব গো, বাবা।"

তাহা অবশ্য অসম্ভব নহে। মূর্তিটি সত্যই লোভনীয়। আমাকে কেহ উহা বিক্রয় করিলে আমিও কিনিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলাম।

বুদ্ধমূর্তির পার্শ্বেই একটি গণেশ-মূর্তি। ইহা উচ্চতায় প্রায় বুদ্ধমূর্তিটির সমান। মূর্তিটি স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহা কিন্তু বেদীর সহিত সিমেন্ট দিয়া আঁটা হয় নাই। আমি মদনবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই গণেশ মূর্তিও কি এখানেই পাওয়া গিয়েছিল?"

এ প্রশ্নেরও উত্তর দিল সেই নারী, না, বাবা। এক সাধু উটি রাখ্যে দিঞে গেছেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঠাকুরের পূজো কে করেন, মা?"

নারী বলিল, "দেউলী-গাঁয়ের ক্ষুদিরাম গোসাঁই।"

ক্ষুদিরাম গোস্বামীকে আমি চিনি। তিনি যুবা। বৃদ্ধ হইলে বুদ্ধদেবের পূজা করিতেন কিনা সন্দেহ। তবে কি মন্ত্রে তিনি বুদ্ধের পূজা করেন, কে জানে। কোনও বৈদিক-সংস্কার-সম্পন্ন ব্রাহ্মণকে তো কখনও বুদ্ধের পূজা করিতে দেখি নাই। প্রাচীনদের মুখে শুনিয়াছি, কদাচিৎ কেহ বুদ্ধ-পূজা করিলে লোকে বলিত, "ও ব্যাটা গোল্লায় গেছে।" 'গোল্লা' মানে শূন্য। বৌদ্ধদর্শন শূন্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই কারণে 'গোল্লায় গেছে' বলিলে

বুঝিতে হইত, 'বৌদ্ধ হইয়াছে।' সেন রাজগণের কালেই বুদ্ধ বিষ্ণুর অবতাররূপে গণ্য হইয়াছিলেন; কিন্তু বেদ-মার্গী ব্রাহ্মণেরা কখনও বুদ্ধ-পূজা করিতেন না। ব্রাহ্মণেরা না করিলে কি হইবে, ব্রাহ্মণেতর জাতিদের মধ্যে যে বুদ্ধ-পূজার প্রচলন অতি ব্যাপক হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে বুদ্ধ-মূর্তিকে অন্য কোন হিন্দু-দেবতার মূর্তি কল্পনা করিয়া ব্রাহ্মণেরাও পূজা করিতেছেন, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ধ্যানী বুদ্ধ আকার-সাদৃশ্যে সাধারণতঃ শিবে রূপান্তরিত হইয়া থাকেন। বাঁকুড়া ও মানভূম জেলার প্রত্যন্ত দেশে বুধপুর (বুদ্ধপুর ?) গ্রামে 'বুদ্ধেশ্বর' নামক শিব আছেন। শিবের 'বুদ্ধেশ্বর' নাম বিশেষ ভাবে অর্থবহ। এখানে বেলডাঙ্গায় দেখিতেছি, কেবল বুদ্ধদেব একা হিন্দু-জনসাধারণের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও পূজা আদায় করিতে পারিতেছেন না; সঙ্গে সঙ্গে একটি শিব ঠাকুরকেও 'উঠিতে' হইয়াছে। তবে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে নেতৃবৃন্দের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্মের কিঞ্চিৎ অভ্যুদয় দেখিতেছি। নেতৃবৃন্দের মতে বৌদ্ধধর্ম না কি 'সেকুলার'। বোধ হয় সেই অভ্যুদয়ের প্রভাব এই সুদূর পল্লী-অঞ্চলেও কিঞ্চিৎ 'উদারতার' ইঙ্গিত বহন করিয়া আনিয়াছে।

এ সব কথা থাক। এখন বেলডাঙ্গায় প্রাপ্ত অপরাপর পুরাকৃতিগুলির কথা বলি। বুদ্ধদেবের দুই পার্শ্বে চারিটি মূর্তি বেদীর সঙ্গে সিমেণ্ট দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। মূর্তিগুলি আবক্ষ; মাত্র তিন-চারি ইঞ্চি উচ্চ। পূর্বেও এগুলি আবক্ষ ছিল, অথবা নিম্নাঙ্গ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ঠিক বুঝিতে পারা যাইতেছে না। অধুনা রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীগণ যেরূপ শিরস্ক (cap) ব্যবহার করেন, এই মূর্তিগুলির মস্তকে সেইরূপ শিরস্ক রহিয়াছে। মূর্তিগুলি তেমন স্পষ্ট নহে; দীর্ঘকাল মৃত্তিকাগর্ভে থাকিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু দেখিলেই মনে হয়, বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের মূর্তি। সারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন, আনন্দ, অনাথপিণ্ডদ প্রমুখ দ্বাদশ বুদ্ধ-শিষ্যের নাম প্রসিদ্ধ। এগুলি কি সেই সকল ভিক্ষুর প্রতিমা? আমার নিকটে ক্যামেরা ছিল না; সেই সুদূর পল্লীগ্রামে ক্যামেরা সংগ্রহ করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর হইল না; হইলে এই প্রতিমাগুলির চিত্র দিতে পারিতাম। কি জানি কেন, বারংবার মনে হইতে-ছিল, সমস্ত স্তূপটা খনন করিলে নিশ্চয় দ্বাদশ বুদ্ধ-শিষ্যের মূর্তিই পাওয়া যাইবে।

এলোপাতাড়ি গাঁতি চালাইয়া যাহারা এই সকল মূর্তি বাহির করিয়াছে, তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ অন্যরূপ। মূর্তিগুলি উদ্ধার করার উদ্দেশ্য তাহাদের ছিল না, সুন্দর ইষ্টকগুলির প্রতি তাহাদের লোলুপ দৃষ্টি ছিল বলিয়া মনে হয়। অসতর্ক ভাবে গাঁতি চালাইয়া তাহারা বৃহৎ একটি বুদ্ধমূর্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। পদ্মাসনে উপবিষ্ট ধ্যানী-বুদ্ধের দক্ষিণ পদতল ও বামপদের নিম্নাংশ সমেত একটি শিলাখণ্ড বেদীতে রক্ষিত দেখিলাম। মূর্তিটি পীতাভ শ্বেত-প্রস্তরে নির্মিত হইয়াছিল। চরণে সিন্দুর লেপিয়া পূজারী পূজা করিয়াছেন। ভগ্ন বুদ্ধ-মূর্তিটির মস্তকের ঊর্ধ্বাংশও পাওয়া গিয়াছে। খণ্ডিত অংশগুলি মিলাইয়া বুঝিতে পারিলাম, উহা ঐ ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্তিটিরই বৃহত্তর সংস্করণ। বস্তুতঃ, অভগ্ন ক্ষুদ্রাকার মূর্তিটি সেই বৃহত্তর মূর্তির প্রোটোটাইপ। বৃহত্তর মূর্তিটি অন্ততঃ দুই ফুট উচ্চ ছিল; এবং মনে হয়, ঐ মূর্তিটিই এককালে এখানকার মন্দিরে প্রধান মূর্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূজিত হইত। কিন্তু সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, এখানকার মন্দিরে বুদ্ধের শিষ্যগণের মূর্তিও পূজিত হইত। বুদ্ধের শিষ্যগণের মূর্তি আর কোথাও আবিষ্কৃত হইয়াছে কিনা, আমার জানা নাই। যদি না হইয়া থাকে, তবে বেলডাঙ্গার এই আবিষ্কার বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে একটা নূতন দিকের উপর আলোকপাত করিল, একথা জোর করিয়া বলিতে পারিব। সরকারী প্রত্ন-বিভাগ এ বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করিবেন কিনা জানি না, কিন্তু যথার্থ জ্ঞানানুসন্ধানীর নিকট ইহার মূল্য অনস্বীকার্য। মনে হইতেছে, সমগ্র স্তূপটা খনন করিতে পারিলে অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইত।

বেদীর উপর পোড়ামাটির দুইটি বাসন দেখিলাম; এগুলিও স্তূপের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। বাসনগুলি বৃত্তাকার, একটিতে প্রদীপের মত 'মুখ' আছে। কিন্তু প্রদীপ বলিয়া মনে হয় না, কারণ তৈলধারণোপযোগী গভীরতা নাই। বাসনগুলির আয়তন বৃহৎ নহে; ব্যাস প্রায় পাঁচ ইঞ্চি। কানার কাছে সামান্য কারুকার্য আছে। মনে হয়, এগুলি ভোগের পাত্র ছিল। স্তূপের নীচে হয় তো আরও এরূপ পোড়ামাটির বাসন আছে। বাসনগুলি অতি মসৃণ; একেবারে লোনা লাগে নাই। সেকালের মৃৎ-শিল্পের প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না।

কিন্তু একটি জিনিস বড় ভাবাইয়া তুলিয়াছে; ঐ 'অষ্টনাগের' মূর্তিটি। প্রকৃতপক্ষে অষ্টনাগ নহে; চার-পাঁচটি ফণা-বিশিষ্ট একটি নাগমূর্তি। বৌদ্ধ-মন্দিরে এ মূর্তি কোথা হইতে আসিল? এই নাগ-মূর্তির পূজা হইত না, এ কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। সম্ভবতঃ মন্দিরের স্তম্ভ কিংবা অন্য কোন অংশকে ইহা অলঙ্কৃত করিত।

ইহা প্রায় রক্তবর্ণ গৈরিক প্রস্তরে নির্মিত। সম্প্রতি ইহারও পূজা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

আমি নির্বিকার ভাবে পুরাকৃতিগুলি নাড়াচাড়া করিতেছি দেখিয়া এক রাখাল-যুবক কি ভাবিল, কে জানে। সহসা বলিয়া উঠিল, "দু-পহর রেতে তফাৎ থাক্যে দেখা যায়, ইখেনে একটা আলা জলছে। ডরে কেউ আসতে লারে।" আমি সঙ্গিগণকে উদ্দেশ করিয়া বলিলাম, "শুনলাম, ফাল্গুনী পূর্ণিমায় এখানে উৎসব হয়ে গেছে। মূর্তি যখন বুদ্ধের, তখন বৈশাখী পূর্ণিমায় উৎসব করাই বিধেয়।" মদনমোহন বলিলেন, "আচ্ছা, যোগীন্দ্রর সঙ্গে দেখা হলে বলব একথা।" দর্শনার্থীরা বেদীর নিকটে দুই-চারিটা পয়সা রাখিয়া যায়; আমিও কয়েকটা পয়সা দিয়া প্রণাম করিলাম। ফিরিবার সময় অনেক কথাই মনের মধ্যে ভিড় করিতে লাগিল। বাঁকুড়া-মানভূমের সীমায় পাইক-বিড়রা গ্রাম এখান হইতে অধিক দূরে নহে। একদা পুরাতত্ত্ববিৎ ম্যাজিষ্ট্রেট ডক্টর ফ্রেঞ্চ সেখান হইতে গাড়ী বোঝাই করিয়া বুদ্ধমূর্তি লইয়া গিয়াছিলেন। এখনও সেখানে বহু বুদ্ধমূর্তির ভগ্নাংশ পড়িয়া রহিয়াছে। একটি নয়নাভিরাম বিশাল-কায় বুদ্ধমূর্তির বক্ষোদেশ কাটিয়া গিয়াছে। এক অতীত যুগে এ সকল অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের কি বিপুল প্রভাব ছিল, তাহাই ভাবিতেছিলাম। সে কোন্ যুগ? সম্ভবতঃ, বাংলার পালরাজগণের যুগ। প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বের কথা। আরও একটা কথা চিন্তনীয়। এত এত বুদ্ধমূর্তি যে সকল ভাস্করের অমর শিল্প-প্রতিভায় নির্মিত হইয়াছিল, তাহারা নিশ্চয় স্থানীয় লোক ছিল। সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে এই সকল স্থানের শিল্প-চর্চা ও ধর্মানুশীলন কি ইহাই প্রমাণ করে না যে, সে যুগেও এই সকল অঞ্চল সর্বতোভাবেই সুসভ্য ছিল? অথচ আশ্চর্যের কথা, পশ্চিম-রাঢ় অসভ্যের দেশ বলিয়া একটা দুর্নাম রটিয়াছে!

এখানে যাহা লিখিলাম তাহাতে বিন্দুমাত্র কল্পনার অবকাশ নাই; পাঠক ইহাকে একটি 'সংবাদ' বলিতে পারেন। কাহারও কৌতূহল হইলে বেলডাঙ্গায় আসিয়া দেখিয়া যাইতে পারেন এবং ইহা লইয়া গবেষণা করিতে পারেন। স্থানটি বাঁকুড়া-মানবাজার রাস্তার উপরে; বাঁকুড়া হইতে ১৮ মাইল দূরে জুনবেদিয়া গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে: শিলাবতী নদীর উত্তর তটে॥

পরলোক চর্চা

শ্রীঅবনীনাথ রায়

মৃত্যুর পর কি হয় এ বিষয় জানবার ইচ্ছা মানুষের চিরন্তন। কারণ জীবিতকালে মানুষ নিজেকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসে। নিজেকে মানে নিজের দেহকে। দেহের অতিরিক্ত আর যে কিছু আছে সে সংবাদ শতকরা পঁচানব্বই জনের কাছেই অজ্ঞাত। দেহ যে নশ্বর, সেটা যে নষ্ট হয়ে যায়, সে ত মানুষ নিজের চোখেই দেখে। দেহের বিনাশের পর আর কিছু থাকে কিনা এবং যদি থাকে তবে তার কি গতি হয়, এই জিজ্ঞাসা মানুষের মনে অনন্তকাল থেকে আছে।

কিন্তু জিজ্ঞাসা থাকা সত্ত্বেও এই নিয়ে যে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত মতবাদ গড়ে উঠেছে তা নয়। তার কারণ মৃত্যুর পর যা হয় সেটার স্বীকৃতি আমাদের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। বিশ্বাস করলেই সেটা আছে, বিশ্বাস না করলেই নেই। মৃত্যুর পরের রাজ্য থেকে ফিরে এসে সে রাজ্যের যাবতীয় সংবাদ আমাদের গোচর করবে, এমন ঘটনা আজো ঘটে নি। সুতরাং যতটুকু গবেষণা এ বিষয়ে হয়েছে সেটুকু মেনে না নিলে এগোবার আর কোন পথ নেই।

স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকায় থাকতে এ বিষয়ে কিছু গবেষণা করেছিলেন। এ বিষয়ে ইংরাজীতে এবং বাংলায় তাঁর বইও আছে। মৃত্যুর পর প্রেতযোনির সঙ্গে কথা বলা, হাতের লেখা পাওয়া, এমনকি প্রেতের শরীর-ধারণ পর্য্যন্ত করতে পারার বিবরণ তাঁর বইতে আছে। শরীরধারণের ছবিও তিনি দিয়েছেন। ভারতবর্ষে কিছু

কিছু গবেষণা হলেও প্রেতের শরীর ধারণ করতে পারার ঘটনা ঘটেছে এমন উদাহরণ আমার জানা নেই।

স্বামীজীর মতের মধ্যে কেবল প্রেতলোকের কথাই আছে—তার উর্ধে অপর কোন লোকের কথা নেই। কিন্তু প্রেতলোকই ত শেষ নয় এবং একান্তও নয় অর্থাৎ মৃত্যুর পর প্রত্যেক আত্মাকে প্রেতলোক অর্থাৎ ভুবর্লোকের নীচের স্তরে যেতেই হবে এমন কোন কথা নেই। সে বিষয় পরে বল্‌ছি। কলকাতায় অনেকগুলি প্রেতচক্রের (Seance) অধিবেশনে আমি যোগ দিয়েছি। সে সবগুলিতেও প্রেতযোনি সম্বন্ধে বুদ্ধিগ্রাহ্য কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। যদিও ঘোষণা করা হয় যে, মৃত্যুর পরে কি হয় তাই জানবার জন্যই এ প্রেতচক্রের অধিবেশন, কিন্তু রোগের ঔষধ চাওয়া এবং কোন ব্যক্তির মৃত আত্মাকে দেখতে পাওয়ার (অবশ্য মিডিয়মের মধ্যস্থতায়) চেষ্টা করাই এইগুলির উদ্দেশ্য। সুতরাং তার চেয়ে উচ্চতর কোন সত্য সেখানে ধরা পড়ে না।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "দেবযান" বইখানিতে এ বিষয়ে পরিপূর্ণ আলোচনা আছে। এখানেও বিশ্বাসের প্রশ্ন। যদি কেউ মনে করেন যে, বইখানি বিভূতিবাবুর স্বকপোলকল্পিত একখানি উপন্যাস, তা হলে আমার বলার কিছু নেই। কারণ এর উল্টোটা প্রমাণ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। তবে আমার বক্তব্য এই যে, এই বইখানির পিছনে আমাদের হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদন আছে। আমাদের শাস্ত্রে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্যং—এই সপ্তলোকের উল্লেখ আছে। এইটিই আমাদের পৃথিবী থেকে (ভূর্লোক থেকে) নিক্রান্ত আত্মার উৎক্রমণের পথ। বিদেহ আত্মা নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী যে লোকে যাওয়ার সে অধিকারী সেই লোকে যায়। সেখান থেকে জ্ঞানের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে সে ক্রমশ উচ্চতর লোকে যায় কিংবা জন্মগ্রহণ করে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে। এই সপ্তলোকের মধ্য থেকেও আত্মার পুনরায় জন্মগ্রহণ সম্ভব, যদিও জন্মের চৌম্বক ঢেউ (magnetic wave) দ্বিতীয় স্তরের উপরে সাধারণতঃ যায় না। এই সপ্তলোকের উপরে ব্রহ্মলোক—তার পর গোলক যেখানে বিশ্বস্রষ্টা ভগবান স্বয়ং বিরাজ করেন। ব্রহ্মলোকের অধিবাসীরা জন্মমৃত্যুর অধীন নন।

আত্মা ঐ সপ্তলোকের যে কোন লোক থেকে (ভুবর্লোক ব্যতীত) যদি পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করে তবে সেখান থেকে পৃথিবী পর্য্যন্ত একটি আলোকের পথ সৃষ্টি হয়ে যায়। বিভূতিবাবু এই পথের নাম দিয়েছেন 'দেবযান'। আমাদের শাস্ত্রে অবশ্য আত্মার উৎক্রমণের দুটি পথ নির্দ্দিষ্ট হয়েছে, একটির নাম দেবযানমার্গ, অপরটির নাম পিতৃযানমার্গ*। এই দুই পথের একটি দিয়ে আত্মাকে যেতেই হবে। একটি প্রকাশময় দেবযান মার্গ। দ্বিতীয়টি ধূমাবৃত পিতৃযানমার্গ। বিভূতিবাবু দেবযান শব্দটি সে অর্থে ব্যবহার করেন নি।

বিভূতিবাবু তাঁর বইতে একটি সুন্দর গল্প দিয়েছেন। যতীন আর পুষ্প দু'জনে ছোটবেলা থেকে পরস্পরের বন্ধু ছিল। কেওটা সাগঞ্জের বুড়োশিবতলার ঘাটে গঙ্গার রাণার উপর বসে দু'জনে বহু গল্প করেছে। তেরো বছর বয়সে পুষ্প বসন্ত রোগে মারা যায়। তার পর চাব্বিশ বছর বয়সে যতীন আশালতাকে বিয়ে করে। যতীন যখন তার নিজের গ্রামে অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় বিনা সেবা-শুশ্রূষায় মারা গেল তখন আশালতা তার বাপের বাড়ীতে ছিল। যতীন মারা যাওয়ার পরই দেখলে পুষ্প তাকে নিতে এসেছে। যতীন বা যতীনের আত্মা নিজের মৃতদেহ দেখতে পেলে. পুষ্প আগের চেয়ে অনেক সুন্দর হয়েছে। তার পর পুষ্প যতীনকে স্বর্লোকে নিয়ে গেল—যতীন দেখলে সেখানে পুষ্প কেওটা সাগঞ্জের মত গঙ্গার ঘাট এবং বাড়ী সব বানিয়ে রেখেছে—সেই সব নিয়ে সে যতীনের প্রতীক্ষায় বসেছিল। মৃত্যুর পরের লোকে প্রেমেরই জয়—বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীও যদি পরস্পরকে ভাল না বেসে থাকে তবে ওখানে গিয়ে কেউ কাউকে খুঁজে পায় না। ভালবাসা প্রেমই ওখানে একমাত্র আকর্ষণ যার টানে একজন আর একজনের সন্নিহিত হয়। যতীন ও পুষ্পর বিদেহ আত্মা স্বর্লোক থেকে পৃথিবীর সমস্তই দেখতে পায়—আশালতাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে কিন্তু পৃথিবীর কেউ ওদের দেখতে পায় না। আশালতার জীবন অত্যন্ত বাঁকা পথে গেল—সে নেত্য নামক ওদের গ্রামের একজন যুবকের হাত ধরে গৃহত্যাগ করলে এবং একদিন তার অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আফিং খেয়ে আত্মহত্যা করলে। আশালতার আত্মা অত্যন্ত নিম্নস্তরের প্রাণী—তাকে উঁচুতে তুলতে হলে একজন ভাল আত্মার সহায়তা দরকার। যতীন এই সহায়তা করতে রাজী হ'ল—কারণ সে আশালতার অধঃপতনের জন্য নিজেকে খানিকটা দায়ী মনে করতো। পুষ্প এর জন্য প্রস্তুত ছিল না—সে বড় সাধ করে নিজের মহর্লোক ছেড়ে নেমে এসে স্বর্লোকে যতীনের জন্য কেওটা সাগঞ্জের মত বাড়ী-ঘর-দোর তৈরি করে রেখেছিল। পুষ্পর প্রেম অবশেষে যতীনকে মুগ্ধ করেছিল—সে পুষ্পর কাছেই

থাকতে সম্মত হ'ল। কিন্তু তখন পুষ্প বললে, তোমাকে মুক্তি দিলাম, যতু দা। যত দূর ইচ্ছা চলে যাও কিন্তু ভালোবেসো—ভুলো না। এইটিই মৃত্যুর পরের লোকের একমাত্র কথা। সেখানে দেহ বলে কিছু নেই, স্থানের বাধা নেই, কালের আধিপত্য নেই। সেখানে অনন্ত কালের অনন্ত জীবন। প্রেম ভালবাসাই একমাত্র বন্ধন—এই ঐশ্বর্য দিয়েই ভগবানকেও বাঁধতে হয়। বিভূতিভূষণ প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন এই গ্রন্থে। পুষ্পকে মহর্লোক থেকে উচ্চতর লোকে গিয়ে ক্রমশঃ ভগবানে লীন হয়ে যাওয়ার প্রলোভন দেখানো হয়েছিল। পুষ্প রাজী হয় নি—সে প্রেমকে আঁকড়ে ধরে স্বর্লোকের বাড়ী-ঘর, গঙ্গার ঘাট নিয়ে পড়ে রইল। এটা আধ্যাত্মিক সত্য যদি না-ও হয়, সাহিত্যের সত্য হতে বাধা নেই।

বিভূতিভূষণ এই গ্রন্থে একজন পথিক দেবতার কথা বলেছেন। তিনি বহু কোটি বছর আগে বিশ্বের প্রত্যন্ত সীমা আবিষ্কার করবেন বলে বেগবান বিদ্যুতের অপেক্ষাও দ্রুততর গতিতে শূন্যে পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু তিনি এই বিশ্বের শেষ দেখতে পান নি। "অস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য সমন্ততঃ স্থিতান্যেতাদৃশান্যনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডানি সাবরণানি জ্বলন্তি"—এই ব্রহ্মাণ্ডের আশে পাশে এই রকম অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড আবরণের সহিত প্রজ্জ্বলন্ত অবস্থায় অবস্থিত। এই বাক্যের প্রতিধ্বনি শ্রীশ্রীগীতার মধ্যেও রয়েছে। শ্রীভগবান নিজে বলেছেন, "অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন, বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।" শ্রীভগবান নিজের বিভূতির বিবরণ দিয়ে শেষে বলছেন যে, হে অর্জ্জুন, এই রকম পৃথগ্বিধ বহুজ্ঞানে তোমার প্রয়োজন কি? আমি এই সমুদয় জগৎ একাংশে ধরে অবস্থিত আছি অর্থাৎ আমার এক আনা অংশ জগৎরূপে তোমাদের সামনে প্রতিভাত, বাকি পনের আনা তোমাদের কাছে অব্যক্ত। সুতরাং পথিক দেবতা কোন দিনই এই জগতের সীমান্ত আবিষ্কার করতে পারবেন না এ কথা বোধ হয় সহজেই বলা যায়।

বিভূতিবাবু আর একটা কথা বার বার উল্লেখ করেছেন। সেটা হ'ল এই যে, এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের যিনি স্রষ্টা, যাঁর শক্তিরও শেষ নেই, জ্ঞানেরও শেষ নেই, আবার কৃপারও শেষ নেই, তাঁকে ক'জন লোকে চায়? গ্রহাধিপতি বৈশ্রবণ, অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী, দ্বৈতবাদী বৈষ্ণব সাধু, সকলের মুখেই এই কথা। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, ভগবান শুধু পৃথিবীতেই অনাকাঙ্ক্ষিত তাই নয়, মৃত্যুর পরের জীবনেও তাঁর চাহিদা কম। অথচ ইচ্ছে করলেই তিনি এক মুহূর্ত্তে সমস্ত সৃষ্টিকে ভগবদভিমুখী করে দিতে পারেন। কিন্তু সেটা তিনি করেন না। সমস্ত সৃষ্টি স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁকে চাইবে এই হ'ল তাঁর নির্দেশ—তা সে যত কাল লাগুক, তিনি প্রতীক্ষা করবেন।

আগেই বলেছি মৃত্যুর পরপারের জীবন বিশ্বাসের বস্তু—যুক্তি দ্বারা এর হদিস মিলবে না। আর বিশ্বাসকে এত ছোট ভাববারই বা কি আছে? গ্রন্থকার বিভূতিভূষণ অন্তত বিশ্বাস করতেন তার প্রমাণ আছে। তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত (শেষ পর্য্যন্ত জ্ঞান ছিল), তাঁর স্ত্রী কল্যাণী কান্নায় ভেঙে পড়েছে, তখন বিভূতিবাবু বললেন, "এত কাঁদছ? তবে 'দেবযান' লিখলাম কেন?" বিভূতিভূষণ নিঃসন্দেহে এই সান্ত্বনাই দিতে চেয়েছেন যে, এই জীবনই ত শেষ নয়—অনন্ত জীবন পড়ে রয়েছে—স্ত্রী যদি স্বামীকে ভালবাসে এবং স্বামী স্ত্রীকে, তবে মৃত্যুর পরে তারা অনন্ত কাল ধরে একত্র থাকতে পারবে।

* "যে চেমেহরণ্যে শ্রদ্ধাতপ ইত্যুপাসতে তেঽর্চিষমভিসম্ভবন্ত্যর্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষডুদঙ্ঙেতি মাসাংস্তান্। মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাদাদিত্যমাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎ পুরুষোঽমানবঃ স এনং ব্রহ্মগময়তি। এষ দেবযান পন্থাঃ।"

মনোর্মি

শ্রীক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

প্রচণ্ড আবর্তে বয়ে চলেছে জীবন,
বয়ে চলেছে অখণ্ড সময়ের প্রবাহ
দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে,
জন্ম-মৃত্যু সুখ-দুঃখ আনন্দ-বিরহ।
ঘোর কৃষ্ণ অমা রাত্রি
নেমে আসে জীবনের মধ্যাহ্নে যখন।
সেই কৃষ্ণালি তমসা সঘন,
কিসে হয় অপসৃত
কোন্ পথে আলোকের নব উদ্ভাবন?

অন্ধকারে পথভ্রষ্ট অনিরুদ্ধ উষা
দুর্লভ জীবনায়নে বিভ্রান্ত বিবশা।
অশ্রু ঝরে অতন্দ্র প্রহর
লবণাক্ত তপ্তজলে নিষিক্ত ধরিত্রী
বেদনা বিক্ষুব্ধ বারিধি
চতুর্দিকে তরঙ্গ মুখর।
কোথায় সমাপ্তি এর
পূর্ণতার অচ্ছেদ্য পরিব্যাপ্তি?
তবু আবিষ্কৃত হয় পথ
সূর্য ওঠে মেঘান্ত আকাশে।
কোথায় বিলুপ্ত সেই অপহৃত
মধ্যাহ্ন আমার?
যৌবনের আনন্দের পূর্ণ অবশেষ?
এই প্রশ্নোত্তর উদ্বেলিছে অকূল সমুদ্রে
জীবনের ছত্রে ছত্রে বেদনা বাষ্পার্দ্রে।
তবু অঙ্কুরিত দেখি শৈবাল সবুজে,
মৃন্ময়ী বসুধার তৃণাঙ্ক ত্রিভুজে
খণ্ড খণ্ড অণু অণু প্রাণ
বিন্দু বিন্দু রূপ-রসে সৌন্দর্য অম্লান।

গভীর হৃদয়ানুভূতি মুখর বাঙ্ময়
কথা কয় প্রাণ থেকে প্রাণান্তরে
স্পর্শ মনোময়।
চেতনা উন্মনা করে রাজহংসী পাখা,
কি যে স্বপ্ন দেখায় নিয়ত
কি যে তৃষ্ণা অবিরত,
নভোচারী চাতকের মত,
চেয়ে থাকে মেঘার্দ্র আকাশে
ভিখারীর মত ভালোবাসে
মুকুতা স্ফটিক স্নিগ্ধ
প্রাবৃটের ধারা।
হিমস্নাত স্পর্শাতুরা
উন্মুখ বাসনায় উদগ্র অধীর।
মরুভূ চাতকী মন
ইথারে ইথারে কাঁপে
আবেগ অস্থির।
সুবর্ণ মেখলা দিন ভালে সূর্য আঁকা,
রাজহংসী মন কাঁদে শূন্য পরিভ্রমি।
দিন সাঙ্গ হয়ে এল কোথায় তুমি,
কতদূরে আরও কতদূরে?
এই তৃষ্ণার এই স্বপ্নের সমাপ্তির সুরে
তোমার তমিস্র মন হবে তরঙ্গিত
কত দেরী, আরও কত দেরী?
সায়াহ্নের অপস্রয় ছায়ায় ছন্দিত,
সে কি তুমি অধিষ্ঠিত অতনু অপ্সরী?
সমস্ত তৃষ্ণা আর স্বপ্ন আর
দুঃখ শেষে তুমি;
জীবনের পাদপদ্মে বিচ্ছেদের
দুর্লভ প্রণামী॥

তিন সাগর

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য

৮

"সময় নাই, সময় নাই"। ইতালির গন্‌গনে রোদ চড়া হয়ে উঠেছে। পথে একটু একটু ধুলোও উড়ছে। আমি আর বসতে পারিনি, জিরুতে পারিনি। সঙ্গে সঙ্গে একটা গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি।

ম্যাক্ আর কে বিশ্রাম সারতে গেছে। ওরা চারটের পর বেরুবে। যাবে ফোর‍্যাম, কলসিয়াম আর সেন্ট পলের গির্জা।

আমি ছোটো একটা চিঠি রেখে এলাম রিয়েতার কাছে। ম্যাক যখন বেরুবে তখন যেন দেয়।

যে জায়গায় আমি এসেছি বেশীর ভাগ রোম্যান সম্রাটদের প্রাসাদ ছিলো এখানে। টাইবরের কাছাকাছি এই পাহাড়টায় প্রাচীনতম রোমের চিহ্ন আছে। নদী কাছে; সুন্দর পাহাড়; চট করে শত্রু আসতে পায় না; জায়গাটি ভালো। মোটামুটি তিনটে পাহাড় যেন গায়ে গা ঠেকিয়ে আছে। প্যালাটিয়াম, জারমালাস্ আর ভিলিয়া। এককালে তিনটের চুড়াতেই মন্দির ছিলো। পরে মন্দির ভেঙ্গে যায়। রাজাদের প্রাসাদ তৈরি হয়। সে প্রাসাদও আজ নেই। সেদিনের বিখ্যাত গষ্টেরিয়ানার বিখ্যাত বাগানও নেই। ডুমুরগাছ আছে; তার তলার গ্রোত্তোর গায়ে ঠেকেছিলো রমুলাস ও রিমাসের ভাসা-ঝুড়ি। আগষ্টসের প্রাসাদের সামান্য যা আছে দেখে বোঝা যায় অগষ্টস্ কতো সরল সহজ জীবন-যাপন করতেন। বিরাট ব্যাসিলিকা জোভিসে এককালে রোম্যান কাউন্সিল ও মন্ত্রীসভা বসতো। সারি সারি তাকে বাসাল্টের মূর্তি থাকতো। অনেক ব্যাসাল্ট মূর্তি দেখেছি, বার্গিজ ম্যুজিয়মে দেখেছি। প্যালাটাইনের আবিষ্কারে পুরাতত্ত্ববিভাগ গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ খুব নিপুণতার সঙ্গে যতো কাজ করেছে সবই জমা আছে এন্টিকোয়েরিয়ামে। এককালে এই এন্টিকোয়েরিয়াম ছিলো নীরোর প্রাসাদ; পরে কনভেন্ট। এই প্যালা-টাইনের ওপরে বিশাল ষ্টাডিয়াম ছিলো। আর্চ অব কনষ্টান্টাইনের ধারে যেতে গেলে ভিয়া ডল্ ক্লিভো ধরে যেতে হয়। কয়েকটি সুন্দর সুন্দর শ্যাপেল আছে এধারটায়। রোমের ইতিহাসের আনাচে-কানাচে নীরো, সেভেরাস্ মিটে গেলেও যেখানে যেখানেই একটুও সন্ত-সাধুদের ছোঁয়াচ আছে সেখানে সেখানেই যেন তীর্থরেণু, পুরাতত্ত্ববিদেরা সে সব জায়গায় ঢের বেশী কদরদানী দেখিয়েছেন। সেন্ট গ্রেগরি, সেন্ট রোমুয়াল্‌ডো থাকবার জায়গা, যেখানে তাঁরা বন্দী ছিলেন, এই প্যালাটাইনেই আছে। সেন্ট জন আর সেন্ট পল্ বলে যে গির্জা ছুটো দেখা যায় সে ছুটো যে একদিন কোনো রোম্যান নাগরিকের বিখ্যাত প্রাসাদ ছিলো দিব্য বোঝা যায়। কিন্তু লোকে বলে চার্চ ছুটো তৈরি হয়েছে যেখানে ঐ ক্রীশ্চান তাপস ছুটি থাকতেন। কতদূর সত্যি জানা যায় না। একটা কফিন দেখায়। বলে তপস্বী ছুজন সাধুর দেহাবশেষ আছে। আমার মনে হোলো একটা রোম্যান বাথ টাব। বলিনি কথাটা। দেখবার অনেক জিনিসই আছে। মোজাইক আর টেরাকোট্টার কাজই ভালো। ক্লদিওর প্রাসাদ, নীরোর বাগান—সবই এইখানে। অনেক প্রাসাদ আর ঝর্ণা বদলে এখন বড়ো বড়ো সাজানো বাগান। সর্বত্র নানা প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ। প্যালাটাইনে দাঁড়ালে রোম্যান সম্রাটদের অনেকের নামের তরঙ্গ কানের ভেতর দিয়ে মরমে এসে যন্ত্রণা দিতে থাকে। রোম্যান ইতিহাসে অগষ্টস্ ছাড়া নাম দেখা যায় না যার গায়ে কালো কালো দাগ না লেগেছে। কারকালার বাথস দেখে বেশ ভালো লাগলো। প্রায় সম্পূর্ণ ও সুরক্ষিত অবস্থায় দেখলাম সেন্ট সিবাষ্টিয়ানের গেট। সেন্ট সিবাষ্টিয়ানকে তীর মেরে মেরে হত্যা করা হয়েছিলো। বিরাট আর স্পষ্ট আপিয়া আন্টিকার পথ আজ ফাঁকা পড়ে আছে; এককালে এটাই ছিলো চৌরঙ্গীর পথ; ছু'ধারে ছিলো রুই কাৎলাদের বড়ো বড়ো বাড়ী। সেন্ট সিবাষ্টিয়ানের ক্যাটাকুম্বের মধ্যে মৃত খ্রীষ্টান বন্দীদের হাড় পাঁজরা করোটী রেখে দিয়ে বোধ করি দর্শকদের সহানুভূতি আর ভক্তিরস আদায় করার বোবা চেষ্টা করা হয়েছে। চমৎকার গোল একটা সুস্থ সবল গড়ন দেখলাম। সিসিলিয়া মেটালার স্মৃতি-সৌধ। এই একটাই অক্ষত ইমারত আছে প্যালাটাইনে। রোম্যান পথ যে কি জিনিস ছিলো, তার চমৎকারিত্ব প্যালাটাইনের কয়েকটা পথেই পাওয়া যায়। ...

এটা বেশ বোঝা যায় ইতিহাস বা প্রত্নতত্ত্বে যাদের রুচি নেই তাদের পক্ষে প্যালাটাইনে ঠা-ঠা রোদে ঘোরা বেশ একটু কড়া ধরনের সাজা। পাণ্ডিত্য ও রুচির ভাণ নিয়ে যদিও কেউ এখানকার রোদ খেতে আসেন, নিশ্চিত বলতে পারি সে ভাণ রাখা দায় হবে। ধুলো, ভাঙ্গা স্থান্, চার্চের পর চার্চের মধ্যে বেঁধে রাখা মৃত সন্তদের মহিমার পাখা, ভাড়া পথ আর খাড়া চড়াই—কোনোটাই পর্যটকদের পক্ষে শান্তির ব্যাপার নয়। আত্মারাম নামক পক্ষীটি দেহের পাঁজরায় যেন থাকতে রাজি হয় না। আমার আবার অন্য তাড়া। ওরা সব গাড়ী করে আসবে ক্যাপিটলে।

ক্যাপিটল জায়গাটা মোটামুটি এখনও ভদ্রই রেখেছে ইতালীয় সরকার। যদিও এখানে ওদের সিটি কাউন্সিল আর একটা বড়ো ম্যুজিয়ম, তবুও প্রাচীন রোমক স্থাপত্যের সুসম্পূর্ণ একটা চাকলা এখানে শুধু দেখা যায় তাই নয়; ঘুরে ঘুরে দেখতে হয়। মাঝখানে ঘোড়ায় চড়া মূর্তি মার্কাস্ অরেলিয়াসের। কোনোকালে সোনার জলে ঢাকা ছিলো পুরো মূর্তি। এখন সে সোনার দাগ মিটে গেছে। খানিক খানিক জায়গায় এখনও সোনার দাগ আটকে আছে। গাইডরা দেখিয়ে বলে ঐ দাগও মিটবে, দুনিয়াও খতম্। ঝামা থাকলে, আর পিটুনী না দিলে রোমের পথের অনেক ভিখিরী এখুনিই খুশী মনে ঐ বাকী দাগটুকু মিটিয়ে দেবার জন্য পরিশ্রম করতে লেগে যেতো।

একটা চমৎকার আর্ট ক্যাপিটলের পৌরসভার সঙ্গে যোগ করেছে ম্যুজিয়াম। এই ম্যুজিয়ামটায় অনেক ভালো ভালো জিনিস আছে দেখার। প্রত্নতত্ত্ববিভাগীয় যতো আবিষ্কার সবই প্রায় এই ম্যুজিয়মে; আর ঐতিহাসিক নিদর্শনের অনেক কিছু এখানে। রোম্যুলাস আর রীমাসের নেকড়ের স্তন পান করার মূর্তি এখানেই। ভার্জাইলের আদ্রিয়াপ্পর আবক্ষ মূর্তি ছাড়াও এখানকার বিশেষ দর্শনীয় এরস ও সাইকী, কাঁটাতোলা তরুণের অপূর্ব মূর্তি যেন বিস্ময় জাগায়। কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হয় ভীনাসের মূর্তির সামনে। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে তৈরী মূর্তি সপ্তদশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হয়। হল্ অব এম্পারার্স-এ প্রায় আশীটি আবক্ষ মূর্তি রাখা আছে। মর্মর মূর্তি ছাড়া ভালো ভালো ছবি আছে—গুয়েটিনো, তিস্তোরেত্তো, ভিয়েনিসের।

বার হচ্ছি এখান থেকে। ঢালু পথ দিয়ে সামনে রোম্যান ফোরামের দিকে চলেছি। দেখি একটা বড়ো দলের মধ্যে দাঁড়িয়ে কে আর ম্যাক্। চার-পাঁচটা দল ঘুরে ঘুরে ফোর‍্যাম দেখছে।

বেঁটে মতো গাইডটি বুঝিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে। আমি আড়াল থেকে শুনছি। একটি ভদ্রলোক ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, চোখে সুন্দর দামী অথচ প্রফেসর সুলভ বেশী নম্বরের কনকেভ্ চশমা,—দুবার তিনবার প্রশ্ন করা সত্ত্বেও গাইড শুনতে না পেয়ে জবাব না দেওয়ায় থেমে গেলেন। সাহস করে আমি জবাবটা দিতেই আলাপ জমে উঠলো,—"ভারতবর্ষ? টাগোরের দেশ? আমি তো 'লাইফ ডিভাইন' পড়ে শ্রীঅরবিন্দের মহাভক্ত হয়ে পড়েছি। বুড়ী যদি আমায় না যেতে দেয় পণ্ডিচেরিতে, ঠিক করে রেখেছি ডিভোর্স করবো।"

অন্য লোভ সামলানো যায়। কিন্তু বিদেশে এসে বাঙ্গালীর পক্ষে টাগোর আর শ্রীঅরবিন্দের নাম শোনার পরেও নির্বিকল্প থাকা বলির পাঁঠার ব্যা না করে থাকার মতো অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু লোকটির কাহিনী রীতিমতো জমকালো।

আলবার্তো গিওভানি। বাপ ইতালিয়ান, মা পর্তুগীজ। জন্ম নেপলসের কাছে। মুসোলিনীর হাতে নানা ভাবে নিগৃহীত হবার ফলে বেশীর ভাগ জীবনই কাটিয়েছে বোম্বেটে সেজে আর পুলিসের চোখ এড়িয়ে। ফলে সারা ইউরোপে ঘোরার ফলে এগারোটা ভাষা জানে।

"টাগোর যখন প্যারি-তে আমি তখন কার্পালেসদের বাড়ীর রুটি সরবরাহক। আমি কবিকে দেখার পর ঠিক করে নিই যে, যীশাস্ ছিলেন কি-না, এ প্রশ্ন অবান্তর। টাগোর যদি থাকতে পারেন, যীশাস্-ও ছিলেন। কার্পালেস্ টাগোরের কবিতা অনুবাদ করেছিলেন। ভালোই; তবে ইংরেজীটা আরো ভালো।"

"অরবিন্দকে কি করে জানলেন?"

"আমার তো এক জায়গায় থাকা কপালে ছিলো না। নর্মাণ্ডিতে তখন জেলে সেজে আছি। সাদী করেছি একটা বুড়ীকে। বড়ো ভালোবাসতো আমায়। মাঝে মাঝে টাগোর পড়ি, তা থেকে একটু একটু বেদান্ত পড়ি, এবং শেষে গীতা। প্যারীতেই একবার রাধাকৃষ্ণণের বক্তৃতায় শ্রীঅরবিন্দের কথা শুনি। তারপর যখন শ্রীঅরবিন্দের লেখা পড়ি—তখন গীতা, বেদান্ত কিছুই মনে লাগতো না।

"বুড়ী ভাবলে হিন্দু বনে যাচ্ছি। পোপের দরবারে পালিয়ে এলো। আমিও রোমে পড়ে আছি। খুড়ি খুড়ি পড়াশুনা করেছি অথচ কলেজের ছাপ নেই। এই টুরিষ্ট কোম্পানীর কাজে লেগে আছি প্রায় কুড়ি বছর, শেষ দশটি বছর এক নাগাড়ে কাজ করছি।"

জর্মন, ইংরেজী, ডাচ, স্পানিশ, ইতালিয়ন, পর্তুগীজ, ফরাসী, মুরীশ, ইজিপ্সিয়ান, ডানিশ আর সুইশ ভাষা বলতে পারে অতি সহজে। দরকার পড়লে রাশ্যানে কাজ চালিয়ে নিতে পারে। রোমের পাথরের ইতিহাস যেন কণা কণা জানা আছে।

"কিন্তু আপনার পক্ষে রোম্যান ইতিহাস জানা! নিশ্চয় কেতাবকীট!"

হাসি; বলি, "তা বই কি! একটুও জানি না রোমের ইতিহাস। নেহাৎ বেড়াবো বলে এসেছি। ফোর‍্যামের ব্যাপারগুলো জেনে রেখেছি। ওকে পাণ্ডিত্য বললে লজ্জিত হবো।"

ম্যাক্ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিলো।

"কে গাইড? বলবে কে?"

"যাকে নগদ দেবেন"—আমি বলি।

পুরো ব্যাগটা উঁচিয়ে ধরে বলে, "ধরো, নাও। কিন্তু অমন পালিয়ে পালিয়ে যেও না। কোথায় কোথায় টুঁ মেরে এলে?"

আঙুল দেখিয়ে বলি, "ঐ পাহাড়ের চূড়ায়।"

গাইড চলে গেলো তার দল নিয়ে।

সামনে প্রকাণ্ড ক্ষেত্র জুড়ে একদার জন সমাকুল ফোর‍্যামের পাঁজরার মধ্যে ঢুকে গেলো, যেন একমুঠো হাড়কাটা-পোকা; যেন জিজ্ঞাসার ব্যাসিলি।

ভাবতে পারা যায় না পাহাড়ের তলায় এই জায়গাটা এককালে জলে-কাদায় স্যাঁৎ স্যাঁৎ করতো, মশা-পোকার আড়ৎ। রোমের বোলবোলা বেড়ে উঠলো পম্পির সময় থেকে। এখানে হাট বসতো। সেই হাটের বুকে পশ্চিমী নগর-সভ্যতার কিরীটের মতো জল্ জল্ করতো ফোর‍্যাম। নগর-জীবনের কেন্দ্র, ফ্যাশন আর প্যাশনের ধুকধুকি; কর্মযোগের কুলকুণ্ডলিনী। রোম গেলো। ফোর‍্যাম গেলো। মধ্যযুগের অন্ধকার, রেঁনেশাঁসের বৈদগ্ধ্য সমাকুল অন্তর্মুখিতা, একের পর এক এসে মুছে দিলো রোমের বিলাস। চাপা পড়ে গেলো ফোর‍্যাম। বড় বড় মন্দির, ইমারত, তোরণ, গেলো সব মাটির তলায়। আবার ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে গরু-ছাগল-ভেড়ার পাল চরতো রোম্যান ফোর‍্যামের বুকে। তলায় কাঁপছে শনির মন্দির, রোমুলাস্, সীজার, ভীনাসের মন্দির, সেভেরাস, টাইটাসের তোরণ অল্পদিন হলো প্রত্নতত্ত্বের মহিমায় যাদের পঙ্কোদ্ধার হয়েছে।

একদিকে কলসিয়াম, অন্যদিকে কাপিটল, মাঝখানে বিস্তীর্ণ রোম্যান ফোর‍্যাম। কলসিয়াম থেকে রোম্যান ফোর‍্যামের দিকে আসার পথে মাঝখানে কনষ্টাণ্টাইনের তোরণ। কাছেই ছিলো ঝর্ণা; মস্ত জলাশয়। গ্লাডিওটারদের হাত পা ধোবার ব্যবস্থা। তার পর হাড্রিয়ানের তৈরী ভীনাসের মন্দির আর রোমের মন্দির। রোমই যেন জীবন্ত দেবতা! আজ সেখানে চার্চ। মন্দিরের মধ্যে বিস্ময়কর মর্মর মূর্তি ছিলো ভিনাসের আর রোমার। টাইটাস জয় করে ফিরেছে, সেনেট তোরণ গড়েছে—আজও অক্ষত টাইটাসের বিজয় তোরণ। এর গায়ে যে সব কাজ তার মধ্যে ত্রায়াম্ফ আর কোয়াড্রিগা বলে খ্যাত টাইটাসের সৈনিক-জীবনের দুটি বিচিত্র আলেখ্য দর্শনীয়। মাসেন্টিয়াসের বাসিলিকা দেখে কুতবমীনার সংলগ্ন খিলানের কথা মনে পড়ে যায়। রোম্যানরা আর কি গড়েছে জানি না; ইমারত গড়তে ওস্তাদী দেখিয়েছে পায়ে পায়ে। কাসা দেলে ভেস্তালির গড়নটি গোল; দু'সার থাম, চমৎকার জিনিসটি। ভেষ্টাল ভার্জিনরা, অর্থাৎ মন্দিরে উৎসর্গ করা কুমারীরা থাকতেন এখানে? কে জানে? এইটুকু জায়গায় অতো কৌমার্য্য থাকতো কি করে? তবে তারই মধ্যে খাসা খাসা কুমারী দেবদাসীদের মূর্তির নিশানা এবং কিছু কিছু প্রশস্তি আজও মন্দিরের গায়ে পাওয়া যায়। অবশ্য বেশী খুঁটিয়ে দেখার দায়ও অনেক। না দেখাই ভালো। একজন কেউ, যাঁর নামের আদ্যক্ষর C। বোধ করি গর্হিত কিছু করেছিলেন। তাঁর খোদাই নাম কুঁদেই কেটে দেওয়া আছে। C দেওয়া নাম ক্লাসিয়াকেই মনে পড়ে যায়। রাজবংশের বহু সম্মানিতা এই নারীকে রোম একদিন কতো সম্মান দেখিয়েছে। কিন্তু পরে তিনি খ্রীষ্টান হয়ে গিয়েছিলেন। তার সেই পাপের সাজা তো কঠিন হয়েছিলো। একি তাঁরই নাম কাটা হয়েছিলো? সব কেটেও ঐ 'C'টুকু রাখা কেন?

আরও এগিয়ে এলে রোমুলাসের চমৎকার গোল মন্দির; খোদাই করা থামের বাহার। অনেকক্ষণ চেয়ে দেখতে লাগলাম। ব্রোঞ্জের একটি দরজায় তালা ঝুলছে, বলে দরজাও, তালাও—আদি ও অকৃত্রিম। কিন্তু যে জুলিয়াস সীজারের মন্দির জুলিয়ান বাসিলিকা অগষ্টস গর্বভরে তৈরি করিয়েছিলেন তার কেবল বেদীটিই রয়ে গেছে, আর কিছু নেই। অথচ এই মন্দিরের মাথায় টিম্পে নামে ছিল জুলিয়াস সীজারের চমৎকার মূর্তি। এর দেওয়ালে গাঁথা ছিলো একটি প্রসিদ্ধ জাহাজের গলুই; ক্লিওপাত্রার জাহাজের গলুই। যে সে জাহাজ নয়; একটিয়ামের যুদ্ধে যে জাহাজে ক্লিওপাত্রা এণ্টনিকে দেখা দিল তার মাথাটি ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন, সেই স্বর্ণখচিত বিবাক্ত জাহাজের গলুই—সে মন্দিরের ভেতরে

ছিলো সিজারের বিরাট মূর্তি। কিছু নেই ; আজ তার কিছু নেই।—

এক জায়গায় সুদৃশ্য তিনটি করিন্থিয়ান থাম, চ্যানেল করে কাটা, দেখেই মনে জাগে সুদৃশ্য এক মন্দিরের। ক্যাষ্টর আর পল্যাক্সের মন্দির। কে না জানে গ্রীক-পুরাণের এই অশ্বিনীকুমারদের কাহিনী। স্পার্টার রাণী লীডার প্রেমে মুগ্ধ হলেন দেবরাজ জিউস। হাঁসের রূপ ধরে প্রণয় চলেছিলো। ফলে দু'টি 'ডিম' দুনিয়ার মাটি ছুঁলো। একটি থেকে গ্রীক-দ্রৌপদী হলেন। বার চার স্বামী বদলান, ট্রয় ধ্বংস করান, ইলিয়াড লেখান। অন্য ডিম থেকে ক্যাষ্টর, ঘোড়া চালাবার ওস্তাদ ; আর পল্যাক্স, দারুণ মুষ্টিযোদ্ধা। হেলেনকে থিসয়ুসের হাত থেকে এঁরা বাঁচান। কিন্তু এসব কারণে ক্যাষ্টর পল্যাক্সরোমে প্রসিদ্ধ নন। তার কারণ অন্য। আর সেই কারণে যশের আকাশে এঁরা আজ নক্ষত্র। ক্যাষ্টর পল্যাক্সের সুদৃশ্য ছবি দেখেছি। কিন্তু রোমে তাঁদের মন্দির গড়ার ইতিহাস সুপ্রসিদ্ধ। তার্কুইনিয়ানদের সঙ্গে রোমানদের মরণপণ যুদ্ধ লেগেছে। গিউতুর্ণা হ্রদের তীরে তীব্র সংগ্রাম। নীল জল রাঙা হয়ে উঠেছে। রোম্যান ঈগলের পাখা বুঝি কাটা যায়। তখন এই দেবতাদের নামে জপ-যজ্ঞ-স্তব সুরু হোলো। হঠাৎ হ্রদের জলে দেখা গেলো, এক অশ্বারোহীকে ; হ্রদ পার হয়ে যাচ্ছেন ঘোড়ার পিঠে। ঐ পথে রোম্যান সৈন্যদল পার হয়ে শত্রুদমন করেছিলো। তারই কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ ছিলো এই অদ্ভুত মন্দির, যার কিছু না থাকলেও এই তিনটি থামের কমনীয় সরলতা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, আজও।

সান্তামারিয়া আন্তিকার চার্চ ছিলো রাজপ্রাসাদ। এখনও দেয়ালের গায়ের ফ্রেস্কো দেখে লোকে। তবে সেদিনের সেই প্রাসাদের সৌন্দর্য্যের যা খ্যাতি ছিলো আজ তার ক্ষীণ আভাসও নেই।

ওরা বলে একটি গেট দেখিয়ে যে, সেটি অগষ্টসের মন্দির ছিলো : প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বলে ওটি পুরাকালে পালাটাইনের যাবার দরজা ছিলো। পাশ দিয়ে ঢালু পথ গেছে পালাটাইনের পাহাড়ে চড়ার। জুলিয়া বাসিলিকা দেখবার মতো হলেও ভালো লাগলো পিছনের খোলা জায়গা। রোমের জনতা এখানেই মিলিত হোতো সীজার, কেটো, সীসেরো আর অরেলিয়াসের বক্তৃতা শোনার জন্য। সাধারণের স্থান। যেন ধুলোয় ধুলোয় প্রাচীনকালের নিঃশ্বাস। একটি থাম—বিজয় স্তম্ভ—ফোকা—পূর্ব দিগন্তে রোম রাজ্যের প্রতিনিধি। শুভবুদ্ধি শাসক ছিলেন। তারই স্মৃতিস্তম্ভ।

এই স্মৃতিস্তম্ভের পাশেই একটা উঁচু বেদী—মঞ্চ। এই মঞ্চই প্রসিদ্ধ রোম্যান রষ্ট্রাম্. যেখান থেকে দাঁড়িয়ে বক্তারা বক্তৃতা দিতেন। আর তার পরেই সেভেরাসের স্মৃতি-তোরণ। ছোটোখাটো আরও সব নানা তথ্য ও তত্ত্বে ভরা এই বিরাট রোম্যান ফোরাম। কিন্তু স্যাটার্ণের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখে সতেরো ডিসেম্বর থেকে সপ্তাহব্যাপী অগ্নিক্রিয়া স্যাটারনালিয়া উৎসবের কথা মনে পড়ে যায়। দেবতার নামে উলঙ্গ ব্যভিচার আর পশুতা এই রোমকে গল্, গথ্, ভাণ্ডালদের হাতের পুতুল করে ছেড়েছিলো। While Rome lives, all lives ; if Rome dies, all dies— ; তাই হোলো। রোমও ধ্বংস হোলো ; য়োরোপে Dark Ages নেমে এলো। সেই রেনেসাঁর আলো না আসা পর্যন্ত সেই নিদারুণ অন্ধকার আর সরে নি। লাটেরানোর মুজিয়মে একটা ব্রোঞ্জের দরজা দেখেছিলাম। রোম্যান সেনেটের দরজা। এখানে সেই সেনেটের শেষ হাড় ক'খানা পাথর হয়ে আছে। হলে তিনশো সেনেটরের বসার ব্যবস্থা ছিলো। ট্রাজানের সময়ের পাথরের ফলায় খোদাই করা শিলালেখ আছে, তাতে রোম্যান জনতার অধিকারের একটা ফিরিস্তি আজও পাওয়া যায়।

বিকেল হয়ে আসে ক্যাপিটল থেকে অনেক দূরে সরে গেছি। পাথর আর পাথর ; জিজ্ঞাসা আর জিজ্ঞাসা। মন ক্লান্ত হয়ে আসে। পাথর, তার আবার ভাঙ্গা পাথর, কে-ই বা দেখে ; দেখার আছেই বা কি? জানে না যারা তাদের কাছে সাপও মালা ; জানাই যতো পাপ। গাইড বলে যায়, মনও গড়িয়ে চলে যায় সুপারসেনিক স্পীডে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল,—একাল আর ওকালে। দেখতে পাই সেনেটের বাগ্মীদের, মন্দিরের পুরোহিতদের, ভেষ্টাল ভার্জিনদের, গ্লাডিয়েটর্সের মত্ততা, সুন্দরীদের আনাগোনা, মহামান্য ত্রিয়াম্ভির, কন্‌সাল আর সেনাধ্যক্ষদের ত্বরিত, দৃপ্ত, গতি। রোমের জীবন যেন জল্ জল্ করে ওঠে।

ম্যাক আমার সঙ্গে দেখে দেখে একেবারে হায়রাণ। কে বলছে, "দেশ বেড়াতে এসে পুরাতত্ত্ব ঘাঁটা আর ওয়েডিং গাউন পরে ঘর-ঝাঁট দেওয়া সমান উত্তেজক।"

"কিন্তু আপনারা তো অন্য দলে গেলেই পারেন।"

অভিমান করিনি। সত্যিই ভাবছি আমার নৃত্যের তালে তালে ওদের সকল বন্ধ ঘুচানোর আদর্শটা হয়তো বড়ো বেশী আধ্যাত্মিক হয়ে পড়ছে। ভাবছি ওরা
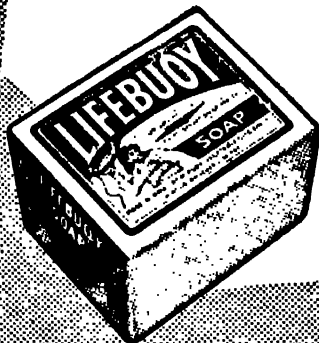
লাইফবয় যেখানে
স্বাস্থ্যও সেখানে !

আলাদাই যাক। Let them do Rome & let me drink it.

কলসিয়াম দেখেই মনে পড়ে গ্লাডিয়েটরদের স্থূল উত্তেজনার বস্তু। সাজগোজ করে গৃহলক্ষ্মীরা আসতেন সিংহের মুখে মানুষ ফেলে মজা দেখতে। বিকৃত মনের, বিকৃত রুচির স্মৃতিস্তম্ভ হয়ে এই বিরাট বিস্ময়, স্থাপত্যের গৌরব কলসিয়ম দাঁড়িয়ে। ঘুরে ঘুরে ওরা দেখছে। আমার ইচ্ছে ওপরে যাই। বিশাল বিশাল সিঁড়ি বেয়ে যতই যাবার চেষ্টা করি, দেখি কারুর ইচ্ছে নেই। গাইডও বলে, "যেতে পারবেন না।" অগত্যা কেটে পড়লাম।

পর পর কয়েকটা খিলান অন্তর অন্তরই সিঁড়ি। কিছু ঘুরে উঠে যাই: ওমা, বন্ধ! অবশেষে একটা ধরে উঠে যেতে যেতে ভাবছি রোম্যান মানুষগুলোর পা ছিলো বনমানুষের মতো ঢেঙ্গা, রোম্যান অবলারা লাথি মারলে আমি চিড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে যেতাম। পেল্লায় পেল্লায় "সোপান শ্রেণী"—শ্রোণীভারাদলসগমনাদের যে কি বিপর্যয় ঘটতো জানি না।

মাঝামাঝি উঠেছি। ব্যস্—সেই পুরাতত্ত্ববিভাগ। সিঁড়ি ওঠার টিকিট চাই। কিন্তু ওপরে উঠে যেন মন ভরে যায়—সবটা এক থাবলা দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পাই। এই ইমারতের গাম্ভীর্য এবং ভয়ঙ্করতা আপনি যেন ফুটে উঠলো।

Rome and her Ruin past Redemption's skill,
The world, the same wide den,—of the eves,
or what you will.

চেয়ে দেখি পালাটাইনের ধার দিয়ে সূর্য নেমে যাচ্ছে পশ্চিম সাগরে। দুস্তর আকাশের এক কোণে ছিটের মতো আমার একটুখানি অস্তিত্ব। বহুদূরে যেতে হবে; বহুদূর থেকে এসেছি। কলসিয়ামের একটা পাঁচিলের ওপর দাঁড়িয়ে হঠাৎ মনে হোলো রোমও আছে কলসিয়ামও আছে, পৃথিবীও আছে। কোনোটাই ভেঙ্গে পড়েনি, রসাতলে যায়নি। তবু মানুষ রসাতল পেলো কোথা থেকে? এতো পিপাসা, এতো দাহ, শতাব্দীর কঙ্কাল পার করে আমাদের বুকে জমা হোলো কি করে?

দিন ডুবছে, তাই একা একা নির্বেদও চাড়া দিয়ে উঠেছে। ঐ কে আর ম্যাকের কলকলানির মধ্যে গিয়ে পড়তে পারলেই এ সব 'কুসুম-কুসুম' চিন্তা ঝরে পড়বে।

নিচে নেমে দেখি হরি হরি। বাস ছেড়ে গেছে। আমার কোট আর কোটের পকেটে টাকা এবং পাসপোর্ট সবশুদ্ধ বাস গায়েব; কে, ম্যাক, কেউ নেই। কলসিয়াম ফাঁকা।

প্রথমটায় একটু যেন চনমন করে ওঠে মন। বিদেশ বিভুঁই। তার পরেই মনে হোলো বিপদে পড়লে হরলিক্স খেতে হয়। এখানে পাবো আইস্ক্রীম্,—ইতালিয়ান আইস্ক্রীম। খেতে খেতে আধা সাফ করে এনেছি, তখন মনে পড়লো সর্বনাশ, পয়সা তো নেই।

বলি, বোঝে না। হাসে। সুন্দরী তরুণীর হাসির মতো কুৎসিৎ কিছু নেই যদি তা স্রেফ অপরিচিত ও অনিবিড় অনুকম্পার হাসি হয়। পয়সা যে ও নেবে না ছেড়ে দেবে তা বুঝতে পারছি হাড়ে হাড়ে; কিন্তু পা যেন কেউ জিকুলের আঠা দিয়ে সেঁটে দিয়েছে রোমের পথে। নট্ নড়ন চড়ন, নট্ কিচ্ছু হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাম, দুই, তিন—বহুর হাসির মার নীরবে সইছি। যদি কেউ ইংরিজি জানা বেকুব আসে এই ইতালিয়ান পণ্ডিত-সভায় বলবো যে "ওদের ঠিকানাটা জেনে আমায় বলে দিন; আমি পয়সা দেবো, মেরে দেবো না!"

যাক্, পথ টানে। চলে যেতেই হয়। রাতের "পোগ্‌গাম্" বাকী। চলতে চলতে সহসা মনে হয় কলসিয়ামের সিঁড়িতে পয়সা দিয়ে তারা কিছু ফেরৎ দিয়েছিলো। সে একটা বড়োগোছের শও—সওয়া শ-ওয়ের মুদ্রা তো আছে। তাড়াতাড়ি, পাইও পরক্ষণে, ছুটতে ছুটতে এসে সুন্দরীর হাতে গুঁজে দিয়ে এক দারুণ রড় দিই। পেছনে তখনও হাসি; কিন্তু এবার যেন তা ততো শানালো নয়।

কোট আর টাকা আর পাসপোর্ট! ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে আসি। ম্যানেজার ট্যাক্সি মিটিয়ে দেয়। তার পর আরম্ভ হলো টেলিফোনে ধস্তাধস্তি।

হঠাৎ ম্যানেজার বলেন, "আলবার্তোকে চেনেন?"

মাথা নাড়ি।

"করিৎকর্মা বলতে হবে। কাজ তো গুছিয়ে ফেলেছেন তা হলে। পিয়াৎসা এসেদ্রায় চলে যান ট্যুরিষ্ট ব্যুরোতে। আলবার্তো আপনার অপেক্ষা করছে।"

* * * *

"কোট খুলে রেখেছিলে কেনো?" কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে আলবার্তো শুধায়।

"আর বলো কেন! জামা-কাপড় ধোয়ার যা হাঙ্গাম। দেশে সবাই বার বার বলে দিয়েছে ইউরোপে সেন্ট বেশী চলে কারণই জামা কাপড় ধোয় কম!"

"তাই নাকি!" আলবার্তো হাসিতে দুলতে থাকে। "তার পর? তার পর? আর কি বলেছে শুনি? অবশ্য মন্দ বলে নি। দক্ষিণ-ইতালীর কাব্যিক বাতাসের গন্ধে ভূত না পালালেও ভারতীয় পালাতো।"

"তাই, পাছে বেশী ধুয়াধুয়ির হাঙ্গামায় পড়তে হয়,

সেজন্য লম্বা কালো সার্জের আচকান চাপিয়েছিলাম কালো সার্জের প্যান্টের উপর।"

"ভুল করছো, একটা পাগড়ী বাঁধো নি। তা হলে আমি নিজে একটা ভেল্কী-দাড়ি পরিয়ে তোমায় খাসা প্রতীচ্য এক মেসেয়া করে ফেলতাম। দু' পয়সা তোমারও হতো, দু' পয়সা আমারও। তা সে কোট খসলো কেন?"

"আর কেন, পালাটাইনে তো বরাবর হেঁটে হেঁটে দেখেছি। চড়া রোদ তখন। নেমে এসে ম্যাকের বাস্ দেখতে পেয়ে বেঁচে গেলাম যেন। জামাটা খুলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। বাপ্‌স্ কি গরম!...আর সত্যিই মনে হয় আমায় চোর ছোঁবে না। আঠারো বছরেও কি মাষ্টারের গা দিয়ে গোবরের গন্ধ বেরুবে না? তাই সবই বাসে রেখেছিলাম।"

"বোধ হয় সেই গুবরে-গন্ধই বলে দিয়েছে কোটটি তোমার। তবে পকেটে পাসপোর্টটা দেখে ম্যাকের গালের রং আর সাদা বা গোলাপী ছিলো না। দেখা হয় নি বুঝি?"

"না।"

"হ'লে টের পাবে। এ ভুল কখ্‌খনো করো না। নিজেকে ভুললেও পাসপোর্টের দৌলতে ফিরে পাবে; কিন্তু পাসপোর্ট খোয়া গেলে নিজেকেও ফিরে পাবে না!"

রাতটায় অপেরা দেখতে গেলাম আলবার্তোর সঙ্গে। ন্যাশনাল অপেরাই তখন অন্য একটা হলে সাময়িক ভাবে অভিনয় করছিলো। হোটেলে ফোন করে বলে দিলাম ম্যাক আর কের জন্য টিকিট করেছি। যদি ওরা অন্য ভাবে বিশেষ ব্যস্ত না থাকে চলে আসতে পারে।

বিশেষ সুবিধা, এখানে হঠাৎ সীট কিছুক্ষণের জন্য আটকে রাখা যায়। ম্যাক একাই এলো। কে—যথারীতি সুস্থ হতে পারছে না। কাজেই মেদের পসরাকে খাটে ছড়িয়ে জমিয়ে নিচ্ছে। ইতালীর গরমে বড়ো বেশী গলছে।

সেই সূত্রে কথা হলো কাপ্রির!

কাপ্রি! নেপ্‌লসের নীল সাগর। তার বুকে কাপ্রি। একদিকে কাপ্রি, অন্যদিকে বিসুবিয়াস, পম্পিয়াই। উত্তরে ছোটো ছোটো দুটো দ্বীপ! ইস্কিয়া, আর ফারাগ্‌লিওনী। কাপ্রি, যেখানে বিলাস আর ব্যসনের জন্য তাবৎ পৃথিবীর মিথুনের জড়ো হয়। মেডিটারেনিয়ানের তীরে কাপ্রি আর মোনাকোর মতো রিভিয়েরা আর কোথায় আছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে কাপ্রি অনুপম।

কিন্তু আমার পকেটে কুল্যে যে শ' পাঁচেক টাকা। কি দিয়ে কি করি।

"খরচ কতো পড়বে ম্যাক?"

আলবার্তো হেসে উঠে!

ম্যাক এমন একটা শব্দ করে হঠাৎ সন্দেহ হয় গরু হয়ে গেলাম নাকি?

মিনি পয়সায়? ঘাড় কার?—চড়িই বা ঘাড়ে কোন্ খাতিরে? সঙ্কোচ হয়।

অবশ্য পরাণ পাখীও পুচ্ছটি উচ্চে তুলে নাচায়।

কে অসুস্থ। তার জায়গাটা।

রাতে ঘুম নেই। অসম্ভব রকম খাটুনী গেছে সারা-দিন। সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা। ঘুমের সাড়ে-চুয়াত্তোর হয়ে গেছে। বুড়ী এসেছে—"কম্ফর্ট চাই, কম্ফর্ট? যা বলো এনে দিই, গরম জল, চা, কফি—যা বলো!"

জামা কাপড় পরছি দেখে বুড়ী বলে, "কোথায় চললে এই রাতে?"

চোখ বাঁকিয়ে বলি, "নাইট ক্লাব।"

"কিন্তু কেন? সেখানে যাবার দরকার কি? কিন্তু পরক্ষণেই চোখে চোখ পরতেই ও হেসে ফেললো। লজ্জিতও হলো।

ম্যানেজারের প্রতিভূ বসে; রাত শেষ হয়ে এসেছে। ট্যাক্সি নিয়ে বার্গিজ খালের ধারে একটা গাছের তলায় বসে বসে কালপুরুষের ঢলে পড়া রূপ দেখছি আর ভাবছি রাত সব জায়গাতেই এক। যা নিশা সর্ব ভূতানাং। জেগে আছি। চোখ বুজতে পারছি না। আরও খানিক গিয়ে নোমেণ্ডানোর সেতুর উপর বসে রইলাম।

ধীরে ধীরে ভোর হচ্ছে। হোটেলে ফিরে শুয়ে পড়লাম।

মনে আছে সকালের খাওয়াটি সেদিন বিছানাতেই সেরেছিলাম। ম্যাক খোঁজ নিয়েছে টেলিফোনে। অসুস্থ নই শুনে খুশী হয়ে বলেছে, "আমি আসছি এগারোটায়। তখনই কাপ্রি যাবো। সারা বাস যাবে। দেখো শেষ অবধি কোনো গোল করো না কিন্তু।"

৯

এগারটায় বাস ছাড়বে। তাড়াতাড়ি উঠেই চার্চ অব সেণ্ট পিয়েত্রো—যেখানে আছে লোহার শেকল, যে শেকলে বেঁধে রাখা হয়েছিলো সেণ্ট পীটরকে। খুব যাত্রীর ভিড়। কিন্তু ভেতরটি গাম্ভীর্য্য পূর্ণ। কারুকার্য বিশেষ নেই। ছবি আছে ভালো ভালো। দ্বিতীয় জুলিয়াসের সমাধির কাজ মিকেলেঞ্জেলোর। খুব প্রখ্যাত এর কাজ। মিকেলেঞ্জেলো এই সমাধির কাজের জন্য

দিনে
দিনে
দিনে
দি...
রেক্সোনা সাবানে 'ক্যাডল' বলে
একটি বিশেষ ধরণের তেল মেশানো হয়,
যাতে ত্বক আরও কোমল, আরও
সুন্দর, আরও লাবণ্যময়ী হয়...! সুবাস
ভরা রেক্সোনার পরশ সারাদিন
আপনাকে সজীব আর সতেজ রাখে।
সৌন্দর্য্য সাধনায় সর্ব্বদা
রেক্সোনা ব্যবহার করুন!
Rexona
BLENDED WITH CADYL
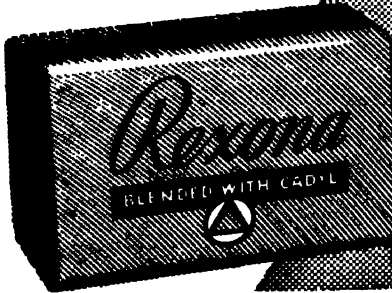
এক বিশাল আয়োজন করেন ; সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। তাঁর বিখ্যাত মোজেজ-এর মর্মরমূর্তি এই সমাধির একটি অংশ। এই মূর্তির মতো জীবন্ত মূর্তি মিকেলেঞ্জেলো আর করেছেন কিনা সন্দেহ। হাঁটুর ওপর একটি কাটার দাগ সম্বন্ধে কাহিনী বলা হয় যে, মিকেলেঞ্জেলো নিজে তাঁর হাতুড়ি এইখানে মেরে বলেছিলেন—"কথা কওনা কেন তুমি, কথা কেন কওনা ?" সত্যিই, বোধ হয় কথা বলা হলেই মূর্তিটি সম্পূর্ণতা পেতো।

এইটি দেখতেই এসেছিলাম। দেখা হোলো।

এর পরে ভিয়া দল মারে ধরে ক্যাপিটলের পাহাড়ে এলাম। পাহাড়ের ধারে বিরাট একটা শিক দেওয়া খাঁচা। তার মধ্যে একজোড়া সোনালী ঈগল রাখা আছে, রোমান সভ্যতার প্রতীক। আর একটা খাঁচায় একটা স্ত্রী-নেকড়ে। নেকড়ের দুধ খেয়েই তো রমুলাস বেঁচেছিলো ; আর রমুলাস থেকেই তো রোম! কলসিয়ামের গড়নে তৈরি মার্সেলাসের থিয়েটারের মধ্যে গেলাম না। অগষ্টাসের ২৩ বৎসর বয়সের ভাগ্নে মার্সেলাস মারা যাওয়ায় এ থিয়েটার তার নামে উৎসর্গ করা হয়েছিলো। ভার্জিল মার্সেলাসকে কবিতায় অমর করে রেখেছেন। এর পাশে অনেকটা জায়গা জুড়ে অনেক ধ্বংস স্তূপ। মনে আছে দুটি কারণে। এইখানে এপোলো সোসিয়ানোর বিরাট মন্দির ছিলো ; আর বিশ্ব-বিখ্যাত ভীনাস্ ডি মেডিসির মূর্তি এই ধ্বংসস্তূপ থেকেই বার করা হয়। আমার মনে কি জানি কেন এপোলোর মন্দিরে ভীনাসের এতোকাল ধরে চাপা পড়ে থাকা খানিকটা কৌতুকের হাওয়া বইয়ে দিয়ে গেলো। পাশা-পাশি সেকালের রোমের সব্জীবাজার, মাছের বাজার ছিলো। একটা পাথরের গায়ে লেখা, মাছের মুড়ো (একটা বিশিষ্ট মাপের) বাজারের মালিকদের টেবিল ছাড়া অন্য টেবিলে খেতে পাবে না।

এখানে একটা চার্চ দেখলাম। যে সব চার্চ দেখেছি তার তুলনায় কিছুই নয়। দুটো কারণে চার্চটা মনে আছে। প্রথম কারণ যে, চার্চটা তিনটি প্রসিদ্ধ মন্দিরের সমন্বয়ে গড়া—জুনো, জেনাস ও দিয়া হোপ্‌স্ এই তিন দেবতার মন্দির। এই মন্দিরের পাশে ছিলো একটি কারাগার। সেই কারাগারে খ্রীষ্টান পীড়নের দিনে অপূর্ব এক কাব্য রচিত হয়। তারই স্মৃতিতে আজ চার্চটির নাম চার্চ অব সেণ্ট নিকোলাস ইন্ প্রিজন্‌স্। সেই গল্পটিই এই চার্চকে মনে রাখার দ্বিতীয় কারণ।

একটি খ্রীষ্টান পরিবার আরও অনেক বন্দীর সঙ্গে বন্দী হয়ে আছে বন্দীশালায়। অনাহারে বিনা যত্নে বন্দীরা মারা যাচ্ছে। নব-বিবাহিতা এক অন্তঃসত্ত্বা কন্যাকে নিয়ে বৃদ্ধ পিতা, তার জামাতা ও পুত্র সহ বন্দী। গ্লাডিটরিয়াল উৎসবে পশুর সঙ্গে লড়ায়ের জন্য সুস্থ সবল জামাতা গেলো। আর ফিরলো না। পরে পুত্র গেল সেও ফিরলো না। শোকে দুঃখে অপমানে বৃদ্ধ মৃত-প্রায়। সেই সময়ে কন্যা প্রসব করে এক মৃত-শিশু। বৃদ্ধ অনাহারে মৃতপ্রায়। খাদ্য নেই। তখন সদ্য-মাতা সেই কন্যা স্তন্যদান করে মুমূর্ষু পিতাকে। যদিও শেষ অবধি সে বৃদ্ধও বাঁচে নি, সেই অপরূপ স্নেহময়ী কন্যাও বাঁচে নি, সকলেই সিংহের মুখে গিয়েছিলো, তবুও কারাগারের মধ্যে কন্যার এই অদ্ভুত স্নেহশীলতার স্মৃতি বুকে ধরে আছে এই চার্চ। তাই তাকে মনে আছে।

খানিকটা গিয়ে একটা গলির মধ্যে প্রাচীন রোমের টাঁকশাল আর রাজকোষ দেখতে পাওয়া যায়। তখন বলা হতো টেম্পল্ অব জুনো মনিতা।

টাইবরের মাঝে চমৎকার একটা দ্বীপ। রোম্যানরা এক নৃশংস রাজার উপর রাগ করে তার জমা করে রাখা গমের বস্তা নদীর জলে ফেলে দেয়। এতো বস্তা ফেলা হয় যে, তা থেকেই এই দ্বীপের সৃষ্টি। দ্বীপটি দেখতে বেশ। একটি গির্জা আছে যথারীতি। জেনাসের আর্চ খুব জরাজীর্ণ। কাছাকাছি একটা জায়গা দেখিয়ে বলা হয় যে, রোমুলাস আর রোমাসকে নিয়ে গ্রীকেরা প্রথমে এখানেই নামে। তখন ছিলো রোম জলা জায়গা। এখন জাঁকালো চার্চের মাথায় ঘণ্টা বাজছে। একটা সূর্য মন্দির দেখলাম। বহু প্রাচীন। এখন আর বিশেষ কিছু বাকী নেই। একটা পুল পার হয়ে প্রসিদ্ধ বাগান—সীজারের বাগান—যা সীজারের উইলে সীজার রোমের জনসাধারণকে দান করে গিয়েছিলেন। চার্চ অব সেণ্ট সিসিলিয়াতে সিসিলিয়ার একটা অদ্ভুত শোয়া মূর্তি দেখলাম। হাত দুটা বন্দী অবস্থায় ঝুলে আছে, আর মাথাটা বেঁকে আছে ; দেখা যাচ্ছে না। বলে, সিসিলিয়াকে যখন রোম্যানরা সাজা দিয়ে মেরে ফেলে তার পর তার দেহ কোনো রকমে একটি কফিনে ভরে মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। বহুকাল পরে কফিনটা খুঁজে পাওয়া যায়। কফিন খুলে দেখা যায় দেহ নষ্ট হয় নি ; অবিকৃত অবস্থায় যেমন ওরা ফেলে রেখেছিলো তেমনি ভাবেই পড়ে আছে। সেই অবিকৃত শরীর চোখে দেখে শিল্পী এই মূর্তি তৈরি করেন।

কিন্তু সকালে যা দেখেছিলাম তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ জিনিস দেখলাম সেণ্টপলের গির্জা। যীশুর ভক্তদের মধ্যে সেণ্ট-পলের প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা হয়। এই মহাত্মার

সমাধি দেখার জন্য আমি উদ্‌গ্রীব। তাই সময় অল্প থাকা সত্ত্বেও পালিয়ে এসেছিলাম। অবশ্য সেন্টপলের গির্জায় পৌঁছাবার আগে প্রটেষ্টাণ্ট সেমেট্রিতে গিয়ে কীটশ্ আর শেলীর সমাধির ওপর গোলাপ রাখলাম। জানি আজকের দিনে বস্তুমূল্যে আমার কৈশোরোচিত এই আবেগের গৌরব নেই, তবু মনে হোলো, রোমে কখনও আর হয়তো আসবো না; শেলী কীটসের দৈহিক সান্নিধ্যেও এমন আসা হবে না। মনে যা আসছে করি। লোকের হাসি, সে তো আছেই। পাশেই কায়ুস্ সেষ্টিয়াসের সমাধি; দেখতে পিরামীডের মতো।

সেন্টপলের গির্জায় অনেকবার চুরি হয়ে গেছে। তাই এই আশ্চর্য সুন্দর গির্জাটির চার পাশে অধুনাতন কালে শক্ত পাথরের দেয়াল তুলে দেওয়া হয়েছে। শহর থেকে দূরে আপেক্ষিক নির্জনতার মধ্যে এই দেওয়ালটি যেন এই ধনাঢ্য গির্জায় আশ্রমসুলভ পবিত্রতার আমেজ এনে দিয়েছে। ঢুকতেই মস্ত খোলা জায়গায় চার ধারে বিরাট বিরাট থামের সারি। মাঝ দিয়ে বাঁধানো পথ। মাঝের খোলা জায়গায় ঘাস-ঢাকা; আর সেন্টপলের চমৎকার একটি পূর্ণাবয়ব প্রতিমূর্তি। ছবি না তুলে থাকা যায় না। গির্জার মধ্যে যা কারু-শিল্প তার মধ্যে বিশেষ করে মনে পড়ে মোজাইকের কাজ। বিশ্বাস হয় নি মোজাইক। হাত বুলিয়ে পরখ করতে হয়েছিলো। ছাদের ধারে সিলিংয়ে দুশো একষট্টি জন পোপের ছবি আছে। বর্তমান পোপ পর্যন্ত। এবং এই গির্জাতে পোপদের চিত্রলিপি সংরক্ষিত হয়ে এসেছে। অলটারের দু'ধারে দুটি মর্মর মূর্তি—একটি সেন্টপল, একটি সেন্ট পীটর।

মজা লাগলো পেছনে ক্লয়ষ্টারের বাগানে গিয়ে। সুরম্য বাগান। তার ধারে সারি সারি শো-কেসে নানান তাবিজ,মাদুলী, ছবি, পাদোদক, শিশিতে লেবেল-সাঁটা পবিত্র বারি—দেখতে দেখতে মনে পড়ে গেলো পুরীর মন্দিরের চাতাল, মথুরার গলি, কাশীর বিশ্বনাথের গলি, কালীঘাটে মায়ের প্রসাদীর দোকান! ধর্মের মত অধর্ম আর নেই!!

বেলা বয়ে যায়। চড়া রোদ। ন-টা বেজে গেছে। লাটেরানোর গির্জায় যাবার সাধ ছিলো। ম্যুজিয়মটি ভালো। রোমের মধ্যে সবার উঁচু মিশরীয় স্তম্ভ এখানেই আছে। কনষ্টানটাইনের নানা কীর্তি এখানে আছে। সেভেরাসের দেহরক্ষীদের আস্তাবলের ওপর এই চমৎকার গির্জাটি তৈরি করা হয়। সেণ্ট পীটর যে টেবিলে দাঁড়িয়ে মাস্ পড়তেন সেই টেবিলটি এই গির্জার সম্পদ। তা ছাড়া প্রফেন ম্যুজিয়াম আর ক্রীশ্চান ম্যুজিয়াম বলে দুটি ম্যুজিয়ামে দেখার মতো শত শত বস্তু আছে। আমার সময় নেই। তবু ভুলবার নয় এ্যথলেটস-দের নগ্ন মূর্তি, মীডিয়াস্, প্রায়াডি সফোক্লীসের বিশাল ও বিশিষ্ট মূর্তি আর ছবির মধ্যে স্যাটার্ণের নিজের সন্তান খাবার ছবি। একটি নগ্ন ভীনাস মূর্তি দেখে বেশ বোঝা গেলো, যে মূর্তির নগ্নতাকে ঢেকে দেয় সৌন্দর্য সেই মূর্তি আর নগ্ন মূর্তির মধ্যে প্রভেদ কোথায়। ভীনাস ডি মেলো বা থার্মি ম্যুজিয়মের সাইরীন-ভীনাস দেখে মনে হয়নি তারাও নগ্ন। আর্টে নগ্নতা নেই, কেবল আর্টই আছে। তবু যেখানে নগ্নতা প্রকাশ পায়, সেখানে আর্ট ব্যর্থ। একটা সিঁড়ি পরম সম্মানে রক্ষা করা হয়েছে। পন্টিয়াস পাইলটের দরবারে যীশাস্‌কে যখন বিচারের জন্য হাজির করা হয়েছিলো, তখন তাঁকে নাকি এই সিঁড়ি পার হয়ে যেতে হয়েছিলো। সেই পবিত্র পদরেণু স্পর্শে এ সিঁড়ি মহিমান্বিত বলে সযত্নে ও সশ্রদ্ধায় সেটা এখানে পূজিত। মোজেকের কাজে তৃতীয় লীও, শার্ল মেন, পোপ সিলভেষ্ট্রাস, কনষ্টানন্টাইন প্রভৃতি হোলি রোমান এম্পায়ারের হর্তা-কর্তাদের চেহারা। মিনার্ভার ভাঙা মন্দিরের পাশ দিয়ে এলাম রোমের য়ুনিভার্সিটি। ভেতরে যাওয়া হোলো না। ট্যাক্সি নিয়ে চলে এলাম হোটেলে।

ক্ষেপে গেছে ম্যাক্! "যদি বাস ছেড়ে দিতো?"

আমি হাসি।

কে একটা প্যাকেট হাতে গছিয়ে দিলো।

"সময় তো নেই যাবে। গাড়ী ছাড়ছে। এতে স্যাণ্ডউইচ আছে আর দু'চার টুকরো ফল, খেয়ে নিও।"

ঘরে গিয়ে সামান্য দু'একটা জিনিস নিয়ে লাফুলারি বাসে চেপে বসলাম। কাপ্রি যাবো, কাপ্রি মিলান—১২০ মাইল পথ। বড় জোর তিন চার ঘণ্টা। বিকেলের চা খাবো নেপলসে। তার পর ষ্টীমার। কেন? চা কাপ্রিতেই খাবো। বাস ছাড়লো।

ক্রমশঃ

অলৌকিক

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম—একটি গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। বর্ধমান জেলার একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। নাম দেবীপুর। গ্রামে বড় বড় অট্টালিকা রহিয়াছে। ঐরূপ এক অট্টালিকার কাঠের খড়খড়ি দিয়া ঘেরা একটি বারান্দা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমি তাহা দেখিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরেই জাগিয়া উঠিলাম। স্বপ্ন বাতাসে মিলাইয়া গেল।

গ্রামে জন্ম : গ্রামেই বাল্যকাল কাটিয়াছে। সুতরাং গ্রামের স্বপ্ন দেখিব—ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। অবশ্য বর্ধমান জেলার দেবীপুর গ্রামে কখনও যাই নাই।

সকাল সাড়ে ছয়টায় আপিসে উপস্থিত হইয়া কিছুক্ষণের মধ্যে কাজে নিমগ্ন হইয়া পড়িলাম। রাতের স্বপ্ন বাস্তব দিবালোকে অস্তিত্ব হারাইয়াছে।

সহসা এক ভদ্রলোকের প্রবেশ। তাঁহাকে পূর্বেও দুই একবার দেখিয়াছি। বাঁকুড়া জেলায় বাড়ী। ইস্কুলে কাজ করেন।

তিনি আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন—"সম্প্রতি দেবীপুর হইতে আসিতেছি। সেখানে এক বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী সভায় আপনাকে সভাপতি হইতে হইবে।"

আমি চমকিয়া উঠিলাম। রাতের হারানো স্বপ্ন আবার চক্ষের সম্মুখে মূর্তিগ্রহণ করিল।

"দেবীপুর! বল কি! দেবীপুর গ্রামে অট্টালিকা আছে?"

ভদ্রলোকও চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন :

"হাঁ। দেবীপুর বনেদি জমিদারের গ্রাম। অট্টালিকা আছে বৈকি!"

আমি তখন তাঁহাকে আমার স্বপ্নের কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি অবাক হইলেন। শেষে বলিলেন—"তাহা হইলে তো আপনাকে যাইতেই হইবে। স্বপ্নই তাহার সূচনা দিয়াছে। সত্যই এ বড় আশ্চর্য ব্যাপার। তবে কয়েক দিন যাবৎ আমরা আপনার কথা বহুবার আলোচনা করিয়াছি।"

তাহারই জন্য আমি এইরূপ স্বপ্ন দেখিলাম—ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না। হয়তো উহা কাকতালীয়।

অতঃপর দেবীপুর যাইব বলিয়া কথা দিলাম। তখনও কয়েক দিন হাতে ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে সেখানে যাবার বাধা পড়িল। দুরতিক্রম্য বাধা। কিন্তু যথাসময়ে সেইরূপ বাধাও কাটিয়া গেল। আমাকে যাইতে হইল।

বর্ধমান ছাড়াইয়া দেবীপুর ষ্টেশনে নামিয়া, মোটরে করিয়া যথাস্থানে উপস্থিত হইলাম। সেখানে এক ধনী ব্যক্তির অতিথি হইলাম। জমিদার এবং ব্যবসায়ী; কলিকাতার নামকরা কোম্পানীর মালিক। তিনি তাঁহার নিজের বাড়ীর দোতলায় আমার থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন।

বাড়ীর প্রবেশমুখে এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিল। দোতলায় উঠিবার পূর্বে কাঠের সুদৃশ্য খড়খড়ি দিয়া ঘেরা বারান্দা দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। হুবহু আমার স্বপ্নে দেখা বারান্দা। স্বপ্নে আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উহা দেখিয়াছিলাম। মনের মধ্যে উহা অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। সেই স্বপ্নে দেখা বারান্দাই আমাদের চক্ষের সম্মুখে। আমি উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলাম :

"এই! এই বারান্দাই আমি স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম। অবিকল এই খড়খড়ি দেওয়া বিশিষ্ট বারান্দা!"

এবার অন্য সকলের চমকিত হইবার পালা। তাঁহারা সকলেই অবশ্য আমার স্বপ্নের কথা শুনিয়াছিলেন এবং শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া এতদূর আশা করেন নাই।

সেই বারান্দায় বসিয়া গৃহকর্তা, প্রধান শিক্ষক এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণ বহুক্ষণ এ বিষয়ে আলোচনা করিলেন। নানাজনে ইহার নানারূপ ব্যাখ্যা করিলেন। অবশ্য নিজস্ব ব্যাখ্যা নয়। পণ্ডিতদের গ্রন্থে পড়া স্বপ্ন বা মানসিক বিষয়ে "বৈজ্ঞানিক" ব্যাখ্যা।

সুপ্তাবস্থায় দেহ হইতে আত্মার বহির্নিক্রমণ ও নানা দেশ পর্যটনের "থিওরিও" আলোচিত হইল।

আমি নিজে ইহার কোনো ব্যাখ্যাকেই পুরোপুরি অন্তরে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কিন্তু স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তুই যে বাস্তবে দেখিয়াছিলাম এবং হুবহু দেখিয়াছিলাম—তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইতিহাসের দৃষ্টিকোণে কারবালা

অধ্যাপক শ্রীশঙ্কর দত্ত

ইসলামের ইতিহাসে ইয়াজিদের শাসনকাল (৬৮০-৮৩ খ্রীঃ) এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। স্বল্প পরিধির হলেও এ শাসনকালে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সমাবেশ দৃষ্ট হয়। কারবালার "বিয়োগান্তক" ঘটনা এ শাসনকালের অন্যতম বিতর্কবহুল অঙ্গ; এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে সে বিতর্কের বিচার এ আলোচনার উপজীব্য।

অতি পরিচিত হলেও, আলোচনার ভূমিকা হিসাবে কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থাপনের প্রয়োজন আছে। ইসলামের ইতিহাসে প্রকাশ্য-ভাবে দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের সূচনা ৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ওসমানের মৃত্যু থেকেই লক্ষ্য করা যায়। ওসমানের মৃত্যুর পর আলি খলিফার আসন পেলেও সে আসন-প্রাপ্তি বিরোধিতা-বিহীন ছিল না। সিরিয়ার সুযোগ্য শাসক মহাবিয়া (Muawiya) প্রকাশ্যে আলির বিরোধিতা করেন এবং ইসলামের ইতিহাসে প্রথম গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। ৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে আলি নিহত হন; মহাবিয়া এই অন্তর্ঘাতী সংঘাতে শেষ পর্যন্ত জয়ী হন এবং উম্মায়াদ্ (Umayyad) বংশের শাসনের সূচনা করেন। মহাবিয়ার এই জয়লাভ এবং উম্মায়াদ্ বংশের শাসনের সূচনা কিন্তু ইসলামের দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান করতে সমর্থ হয় নি। পরন্তু, আলির মৃত্যু আলিকে শহীদের পর্যায়ে উন্নীত করে আলি-সমর্থকদের একটি বিশিষ্ট দলের উত্থানকে স্পষ্টতর করে তোলে।

আলির মৃত্যুর পর আলি-সমর্থকদের এই দল ত্রিবিধ তথ্য ও দাবী উত্থাপন করে। প্রথমতঃ, আলি এবং আলির বংশধরেরা ইসলামের, আরও স্পষ্টভাবে মহম্মদের, ন্যায়-সঙ্গত উত্তরাধিকারী এবং আলি-সমর্থকেরা এক ন্যায়সঙ্গত দাবীর পৃষ্ঠপোষক (Legitimists)। দ্বিতীয়তঃ, প্রথম তিন খলিফা—যথা আবু-বকর, ওমর এবং ওসমান যথাক্রমে আলিকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগে অভিযোগী। তৃতীয়তঃ, আলির মৃত্যুর পর

খলিফার আসন আলি-বংশোদ্ভূত সন্তানদের—অর্থাৎ হাসান এবং হোসেনের প্রাপ্য।

মহাবিয়া বিচক্ষণ শাসক ছিলেন। তাঁর শাসনকালে (৬৬১-৮০ খ্রীঃ) আলি-সমর্থকদের এই দল অন্তর্ঘাতী ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত থাকলেও প্রকাশ্য বিরোধিতার বিশেষ সাহস পায় নি। তা ছাড়া মহাবিয়া প্রচুর অর্থ এবং মদিনায় নিরাপদ সুখী জীবনের বিনিময়ে হাসানকে স্বেচ্ছায় খলিফা-আসনের দাবী পরিত্যাগ করাতে সমর্থ হয়েছিলেন। এ সত্ত্বেও ৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্ভবতঃ হারেম ষড়যন্ত্রের ফলে হাসানের মৃত্যু হলে সে মৃত্যুর দায়িত্ব মহাবিয়ার স্বার্থ-সংকীর্ণ নিরঙ্কুশ শাসনের লক্ষ্যের ওপর অর্পণ করা হয়। অর্থাৎ মহাবিয়ার চক্রান্তেই হাসানের মৃত্যু—এই তথ্যের ব্যাপক প্রচার চালান হয় এবং হাসানকে আলির মত শহীদের পর্য্যায়ে উন্নীত করা হয়।

মহাবিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইয়াজিদ খলিফার আসনে উপবিষ্ট হন (৬৮০ খ্রীঃ)। ইয়াজিদের খলিফাসন গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই হোসেন আলি-সমর্থকদের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে ইয়াজিদের খলিফাসন গ্রহণের দাবীর বিরোধিতা শুরু করেন। কুফার জনসাধারণ কর্তৃক হোসেনকে ইয়াজিদ-বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণের আমন্ত্রণের কথাও জানা যায়। হোসেন ও তাঁর দল কুফা অভিমুখে রওনা হয়েছেন—এই সংবাদ পেয়ে কুফার সম্ভাবিত বিদ্রোহকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করার জন্যে পুত্র ওবাইদুল্লাকে (Obaidullah) পাঠান। ওবাইদুল্লা কুফার এই সম্ভাবিত বিদ্রোহের অঙ্কুর বিনষ্ট করে হোসেনের সঙ্গে বিনাযুদ্ধে মীমাংসার চেষ্টা করেন। দীর্ঘ পথযাত্রায় হোসেন ও তাঁর দল তখন ক্লান্ত এবং নিঃসঙ্গ। এই পরিস্থিতিতেও বিনাযুদ্ধে মীমাংসার চেষ্টা বিবিধ কারণে ফলপ্রসূ হয় নি। ওবাইদুল্লার নীতি-বহির্ভূত আচরণ ও রূঢ়তার কথা এই প্রসঙ্গে বহু ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন। যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত কুফার পঁচিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে কারবালার যুদ্ধের "প্রহসনের" মধ্য দিয়ে এ দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। হোসেন পরাজিত হন ও তাঁর বংশধর ও উপস্থিত দলীয় সমর্থকদের প্রায় সকলকেই নির্ম্মমভাবে হত্যা করা হয়। ইয়াজিদের কাছে হোসেনের ছিন্ন-মস্তক পাঠানোর কথাও বহু ঐতিহাসিক

স্বীকার করেন। বেদনা-বিজড়িত কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনার এই সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।

এবারে এই বিয়োগান্তক ঘটনার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যায় আসা যাক্। আল্-ফক্‌রি প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা কারবালার এই ঘটনাকে "Saddest event in the annals of Islam" বলে অভিহিত করেছেন। আবু মিকানফ্ এই ঘটনাকে প্রকাশ্যভাবে "Tragedy" আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু আধুনিক ইতিহাসবিদেরা এই গতানুগতিক মতবাদের বিরোধিতা করে একাধিক যুক্তির মাধ্যমে বলেছেন যে, কারবালার ঘটনাকে যতখানি "বিয়োগান্তক" ও "দুঃখজনক" বলে অভিহিত করা হয়েছে, রাষ্ট্রনীতি ও ইতিহাসের যথার্থ বিচারে তা ততখানি দুঃখজনক নয়। এঁদের যুক্তিগুলি এক এক করে অনুধাবন করা যাক্।

প্রথমতঃ, এঁরা বলেন যে, যে সমস্ত ঐতিহাসিকেরা কারবালার ঘটনাকে অতীব "বিয়োগান্তক" ও "দুঃখজনক" বলে অভিহিত করেছেন তাঁরা অধিকাংশই আব্বাসাইদ (Abbaside) যুগের লেখক। আব্বাসাইদ যুগ সাধারণ ভাবে আলি-সমর্থকদের অনুকূল যুগ এবং সে যুগের লেখকদের পক্ষে অতিরঞ্জনের মাধ্যমে শত্রুপক্ষ উম্মায়াদ বংশীয় ইয়াজিদ পরিকল্পিত যে কোন ঘটনাকে "হীন ও নৃশংস" হিসাবে উপস্থাপিত করা আশ্চর্য্যের নয়।

দ্বিতীয়তঃ, এরা বলেন যে, কারবালার ঘটনার গতানুগতিক স্বরূপ গোঁড়া মুসলমান ঐতিহাসিকদের হাতে তৈরী হয়েছে। ধর্ম্মের নিখুঁত বিচারে ইয়াজিদ খুব ধার্ম্মিক মুসলমান ছিলেন বলা চলে না। ব্যক্তিগত জীবনে ইয়াজিদের ব্যভিচার গোঁড়া মুসলমানদের আক্রমণ সাপেক্ষ। সেই আক্রমণের উত্তেজনায় ইয়াজিদের সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপের পিছনে অকারণ "অশুভ অভিসন্ধি", "হীন চক্রান্ত" ও নৃশংসতার সন্ধানের চেষ্টা হয়েছে।

তৃতীয়তঃ এঁরা বলেন যে, আবু মিকানফ্, যিনি কারবালার এই ঘটনাকে প্রকাশ্যভাবে "tragedy" বা "বিয়োগান্তক" বলে অভিহিত করেছেন, তাঁকে ঠিক ঐতিহাসিক পর্য্যায়ভুক্ত করা যায় না। ডাঃ ওয়াসটেনফেল্ডের ভাষায় :

"Abu Mikanof was the first to speak of the tragedy of Karbala and Abu Mikanof connot be set down in the rank of sober historians. His fanciful legends were later on magnified and multiplied with true eastern luxuriance and popular fancy lovingly accepted what legend lavishly invented".

এঁদের চতুর্থ যুক্তি বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে অনুধাবনযোগ্য। এঁরা বলেন যে, গতানুগতিক মতবাদের সমর্থক ইতিহাসবিদেরা রাষ্ট্রনীতি, ধর্ম্মনীতি, ও নীতির মধ্যে নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা টানতে পারেন নি। রাষ্ট্রনীতির দিক থেকে বিচার করলে ইয়াজিদের আচরণকে অন্যায় বলা চলে না। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে রাষ্ট্রবিরোধী ক্রিয়াকলাপ দমন করা যে কোন শাসকেরই কর্ত্তব্য। এ কর্ত্তব্যে অবহেলা করলে রাষ্ট্রের সংহতি ও শাসকের সুনাম— উভয়ের বিপর্য্যয় অনিবার্য্য। কারবালায় হোসেনকে দমন করে ইয়াজিদ রাষ্ট্রশাসকের প্রকৃত কর্ত্তব্য পালন
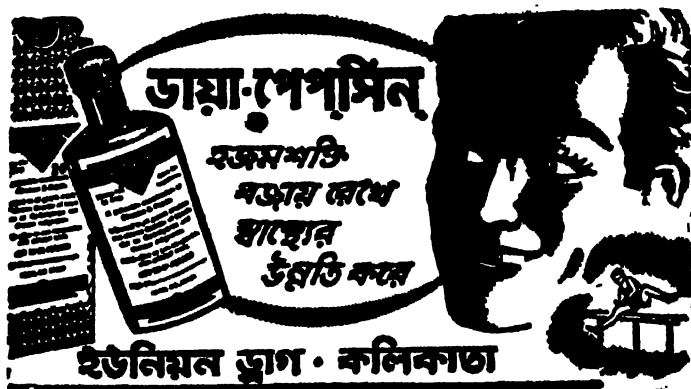
করেছিলেন। ধর্মীয় উত্তেজনার মাঝে ইয়াজিদের এই কর্তব্য পালনের বিকৃত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ঐতিহাসিক Khuda Baksh-এর ভাষায় :

"The question of Government, defacto and dejure was too subtle and refined a question to be understood by 'Profanum Vulgus', The grandson of the prophet had been slain and that was enough. No justification was conceivable, no plea admissible or organable…".

পঞ্চমতঃ, এঁরা বলেন, ওবাইদুল্লার নৃশংস ব্যবহারের পিছনে ইয়াজিদের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইতিহাসবিদের ভাষায় :

"In slaying Husain they not only acted without authority, but also in contravention of the order issued to them".

ইয়াজিদ কর্ত্তৃক কারবালায় হোসেনকে সমাধিস্থ করার নির্দ্দেশ দান এবং হোসেনের জীবিত আত্মীয় স্বানীয়দের আর্থিক সঙ্গতি বিধানের চেষ্টা, এঁদের মতে, উপরোক্ত সত্যকে সন্দেহাতীত করে তুলেছে।

ইতিহাসবিদ্ Browne উপরোক্ত পরস্পর বিরোধী দুই মতবাদের মধ্যে একটা সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন যা উপসংহারে প্রণিধানযোগ্য। Browne-এর ভাষায় :

"We should not look at the incident of Karbala from the modern 20th century point of view, but from the point of view of contemporary people. It is not so much important as how people should look at it…It cannot be denied that to the contemporaries the event was undoubtedly a sad affair ; an act of sacrelege on the part of Yezid, and the Muharram is celebrated to-day both by the shites and the sunnis".

কারবালার ঘটনার যে ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা হোক না কেন, ইসলামের ইতিহাসে এ ঘটনা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কারবালার এই ঘটনা শিয়া আন্দোলনে এক নতুন উদ্দীপনা ও নতুন অধ্যায় সূচনা করে। ঐতিহাসিক Hitti বলেছেন :

"Shiaism was born on the tenth of Muharram…Karbala gave the shia a battle-cry, summed up in the formula—vengeance for Al Husain".

উত্তরকালে আব্‌বাসাইদ্‌দের সঙ্গে এই নবোদ্দীপনায় উজ্জীবিত শিয়া সম্প্রদায়ের মিতালী উম্মায়াদ্ শাসনের অবসানকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলে ইসলামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল।

স্বর্ণলতা বসু

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন স্বর্ণলতা বসু এক প্রসিদ্ধ, সম্ভ্রান্ত এবং সংস্কৃতি-সম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; ইঁহার পিতা ডাঃ পি. কে. রায় এবং মাতা শ্রীমতী সরলা রায়; তখনকার দিনে ডাঃ পি. কে. রায় ভারতীয়দিগের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ্ এবং শিক্ষাব্রতী ছিলেন; ভারতীয়দিগের মধ্যে তিনিই কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের সর্ব্বপ্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন; সমাজে বিশেষতঃ শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি তাঁহার পাণ্ডিত্যের এবং নির্ভিকতার জন্য সকলের সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন; অদ্যাবধি ডাঃ পি. কে. রায় জনসমাজে স্মরণীয় ও বরণীয় হইয়া আছেন। শ্রীমতী সরলা রায় উপযুক্ত স্বামীর উপযুক্ত পত্নী ছিলেন; সর্ব্ব বিষয়ে নারীসমাজের উন্নয়ন এবং স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন; বালিকাদিগের শিক্ষা সম্পর্কে তাঁহার অবদান প্রচুর; তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত গোখলে মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল ইহার সাক্ষ্য দিতেছে।

ডাঃ পি. কে. রায়ের পাঁচ কন্যা এবং এক পুত্র ছিলেন; স্বর্ণলতা দ্বিতীয়া কন্যা; ইঁহাদের মধ্যে বর্ত্তমানে কেবল প্রথমা কন্যা শ্রীমতী চারুলতা মুখার্জ্জি এবং তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী কণকলতা রায় জীবিতা আছেন। শ্রীমতী চারুলতা মুখার্জ্জি শ্রী এস. সি. মুখার্জ্জি, আই-সি-এস মহোদয়ের পত্নী; শ্রীমতী কণকলতা রায় স্বর্গতঃ জে. এন. রায় মহোদয়ের পত্নী। মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে স্বর্ণলতা শ্রীপ্রাণকিশোর বসু মহোদয়ের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন; প্রাণকিশোর বসু মহাশয় তখন দার্জ্জিলিঙে ওকালতি করিতেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা তখন সচ্ছল ছিল না; শৈশবে এবং কৈশোরে প্রাচুর্য্যের মধ্যে লালিত পালিত স্বর্ণলতাকে সেই সময়ে বহু বিষয়েই কৃচ্ছ্রসাধন করিতে হইয়াছিল। বিবাহের কয়েক বৎসর পর প্রাণকিশোর বসু ইংল্যাণ্ডে যান এবং সেখান হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়া আসেন; ১৯১১ সাল হইতে তিনি ঢাকায় ব্যারিষ্টারের বৃত্তি অবলম্বন করেন; ১৯৩৮ সালের ১৮ই অক্টোবর ঢাকাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ব্যারিষ্টার ও মানুষ হিসাবে ঢাকায় তিনি সর্ব্বশ্রেণীর শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জ্জন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর স্বর্ণলতা সন্তানসন্ততিসহ কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং গত ১৩ই জুন ৭৮ বৎসর ৮ মাস বয়সে কলিকাতাতেই ইহলোক ত্যাগ করেন।

স্বর্ণলতা বসু

পিতামাতার অনেক গুণ স্বর্ণলতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন; প্রকৃতিতে তিনি শান্ত ও সৌম্য ছিলেন; তাঁহার চরিত্রে মাধুর্য্য যেমন ছিল দৃঢ়তাও তেমন ছিল; সুখ ও দুঃখকে তিনি ঈশ্বরের দান মনে করিয়া হাসিমুখে সমান ভাবে গ্রহণ করিতেন; কখনও কোন রকম অভাবের জন্য তাঁহার কিছুমাত্র অভিযোগ বা অনুযোগ ছিল না। অল্পেই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন; এবং কাহারও কোন উপকার ও সাহায্য তিনি কৃতজ্ঞতাচিত্তে স্মরণে রাখিতেন; পরের উপকারের জন্য তাঁহার হাত

থাকিত। ঢাকায় তাঁহার বন্ধু-বান্ধবের পরিধি খুবই বিস্তৃত ছিল ; সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সকল রকম লোকজনের সঙ্গে তাঁহার মেলামেশা ছিল ; সকলকেই তিনি "আপন জন" মনে করিতেন ; প্রীতিজ্ঞাপনে উচ্চ-নীচের কোন ভেদাভেদ তিনি রাখেন নি।

স্বর্ণলতার মধ্যে নারীত্বের ও মাতৃত্বের চরম বিকাশ ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর জন্য বিশেষ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন ; তাহাদের সহায়তা কল্পে তিনি ঢাকায় নারী সমিতি গঠন করেন ; সমিতির সদস্যাবৃন্দ কর্ত্তৃক নির্মিত এবং সংগৃহীত বহু প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি রণাঙ্গনে নিয়মিত প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ; এই কাজ সুষ্ঠুভাবে চালাইবার জন্য তাঁহাকে অপরিসীম পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল ; এই সময়েই তাঁহার গঠনশক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল ; তিনি স্বল্পভাষিণী ছিলেন, নীরবে কাজ করিয়া যাইতেন ; কিন্তু তাঁহার এই নীরব কাজও সর্ব্বশ্রেণীর লোকের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় আকর্ষণ করিয়াছিল ; এমনকি তখনকার দিনের ইংরাজ প্রদেশপালগণের পত্নীগণ তাঁহার গৃহে গমন করিয়া তাঁহাকে এই কাজে সাহায্য করিতেন। তাঁহার এই কর্ম্মনিষ্ঠার স্বীকৃতি স্বরূপ তৎকালীন ইংরাজ সরকার তাঁহাকে "কাইজার-ই-হিন্দ" পদক এবং "এম-বি-ই" উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন।

স্বর্ণলতার গঠনশক্তি বহুমুখী ছিল ; ইহার অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় ; এখানে কেবল একটিমাত্র উদাহরণ দিব ; বিধবাদিগের অবস্থা তাঁহার মনকে সর্ব্বদাই বেদনা মথিত করিত ; তাহাদিগের মধ্যে শিক্ষা, বিশেষতঃ বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিস্তার হইলে তাহাদিগের দুঃখ-দুর্দ্দশার কতকটা দূরীকরণ হইতে পারে ; এই উদ্দেশে তিনি ঢাকায় এক ভাড়াটে বাড়ীতে একটি "বিধবা আশ্রম" স্থাপন করেন ; প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইহার উন্নয়নকল্পে তিনি তাঁহার সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করেন ; এবং তাঁহারই চেষ্টা এবং প্রভাবের ফলে উক্ত আশ্রম উয়ারীর ভাড়াটে বাড়ী হইতে রমনার এক প্রশস্ত দ্বিতল বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয় ; অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের দ্বারা তিনি রমনায় এক খণ্ড প্রশস্ত জমি সংগ্রহ করেন, এবং উহার উপরেই 'বিধবা আশ্রমে'র দ্বিতল বাড়ী নির্মিত হয় ; এবং তাঁহারই উৎসাহ, উদ্যোগ ও কর্ম্মনিষ্ঠার ফলে ইহার আর্থিক অবস্থাও সচ্ছল হয়। 'বিধবা আশ্রমের' উন্নত এবং সমৃদ্ধ অবস্থায় তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু কখনও তাহা প্রকাশ করেন নাই। প্রসূতি-পরিচর্য্যা এবং শিশু-কল্যাণ ব্যাপারেও তিনি উৎসাহী ছিলেন এবং এইরূপ বহু সমিতির সহিত তাঁহার সক্রিয় যোগাযোগ ছিল এবং ইহাদের উৎকর্ষসাধনের জন্য তিনি যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিতেন।

স্বর্ণলতা বসুর তথাকথিত কলেজী বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ছিল না ; গৃহে পিতামাতার নিকটেই তিনি শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, শিক্ষায় পরিবেশেই তিনি বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন ; নিজের প্রতিভার বলে তিনি শিক্ষায় নিজেকে উন্নীত করিয়াছিলেন। ভোটাধিকার বিস্তৃতির জন্য "লোথিয়ান কমিটি" নামে যে রাজকীয় কমিশন গঠিত হয় তিনি সরকার কর্ত্তৃক তাহার একজন সদস্যা হিসাবে মনোনীত হন ; এই কমিশনের জন্য তাঁহাকে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল, ইহার জন্য তাঁহাকে দিনের পর দিন যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইত। তিনি ছোট-বড় যে কাজেই নিজেকে নিযুক্ত করিতেন তাহা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য কোন আয়াস ও ক্লান্তি গ্রাহ্য করিতেন না।

পারিবারিক জীবনেও স্বর্ণলতা আদর্শ স্ত্রী এবং আদর্শ মাতা ছিলেন। স্বামীর মহাপ্রয়াণের পর তিনি যেন হৃত-সর্ব্বস্বা হইয়া পড়িয়াছিলেন ; তিনি বিধবার জীবনে নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারেন নাই, কিন্তু কোনদিন তাহা প্রকাশ করেন নাই। সন্তানসন্ততিদের কল্যাণই তাঁহার প্রথম ও প্রধান কাম্য বস্তু ছিল ; সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল সন্তানটি তাঁহার প্রিয় এবং প্রধান আকর্ষণ ছিল। যখন তাঁহাকে তাঁহার পৌত্রী রমলার ভার গ্রহণ করিতে হইল, তখন হইতেই তাঁহার বিধবা জীবনের উদ্দেশ্যের পরিবর্ত্তন হইল ; রমলাই তাঁহার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিল এবং রমলার যখন বিবাহ হইল এবং সে উপযুক্ত স্বামী ও উপযুক্ত গৃহ লাভ করিল তখন তিনি আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া পড়িলেন। তিনি যখন ঢাকায় ছিলেন স্যার কে জি. গুপ্তর ভগ্নী তাঁহার একজন অন্তরঙ্গ বান্ধবী ছিলেন—তাঁহারই নাতি বাবলুর সহিত রমলার বিবাহ হয়। পরে রমলার সন্তান রাজীবও স্বর্ণলতার জীবনে পরিবর্ত্তন ঘটাইল। রমলা, বাবলু, রাজীব তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। শিশুদের প্রতি তাঁহার প্রবল আকর্ষণ ছিল ; তাঁহার কলিকাতার বাড়ীর নীচের তলায় এক পরিবার বাস করিত, তাঁহাদের দুই কন্যা—আট বৎসরের ইন্দিরা এবং আড়াই বৎসরের মুন্না স্বর্ণলতার অতি প্রিয় ছিল ; তাহারা প্রায় সকল সময়েই স্বর্ণলতার নিকট থাকিত ; তাহারা যেন রমলার স্থান অধিকার করিয়াছিল। তিনি নিজের রোগ, শোক,

দুঃখের কথা কাহাকেও বলিতেন না, কিন্তু অন্যের রোগ, শোকে ও দুঃখে বিচলিত হইয়া পড়িতেন। অন্তিম শয্যাতেও তাঁহার কষ্টের কথা মুখে প্রকাশ করিতেন না, বরং তাঁহার সেবা-শুশ্রূষার জন্য অন্যের কষ্ট হইতেছে, যথেষ্ট অর্থব্যয় হইতেছে মনে করিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। অন্তিম শয্যায় তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী এবং তৃতীয়া ভগ্নী তাঁহাকে দেখিতে আসিলে তিনি তাঁহাদের সকল প্রকার সুবিধা ও স্বচ্ছন্দের জন্য দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহার স্মরণ-শক্তি ছিল প্রচুর; ঢাকার পুরাতন বন্ধুদের মধ্যে কেহ তাঁহার নিকট আসিলে তিনি প্রত্যেক পরিচিত ব্যক্তির খোঁজখবর লইতেন। সকলের প্রতিই তাঁহার প্রীতি ও ভালবাসা অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর পুত্র শ্রীপি. সি. মুখার্জির মৃত্যুতে তিনি অতিশয় বিচলিত হইয়া পড়েন—মৃত্যুশয্যাতেও তিনি তাঁহার কথা বলিতেন।

স্বর্ণলতার মৃত্যু খুবই শান্তিপূর্ণ ছিল: নিদ্রার মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। পরিণত বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে দেশ একজন বিশিষ্টা সমাজসেবিকা হারাইল। তাঁহার মত আদর্শ রমণীর জীবন বর্তমানে নারীদিগের অনুকরণীয়। সমাজসেবায় উৎসর্গীকৃত তাঁহার জীবনে অবসরের কোন প্রশ্রয় ছিল না। কর্মই ছিল তাঁহার ব্রত। বাহিরের কর্ম হইতে অবসরের পর তিনি গৃহস্থালীর বিভিন্ন কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। সীবন এবং বুনন তাঁহার সময় অতিক্রম করিবার উপকরণ হইলেও প্রয়োজনীয় নিষ্ঠার সহিত তাহা সম্পাদন করিতেন।

তিনি দুই পুত্র এবং তিন কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহারা আপন আপন কর্মক্ষেত্রে যশ লাভ করিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্ত্রীশিক্ষা বিভাগের প্রধানা পরিদর্শিকা শ্রীমতী মনোরমা বসু এম. এ. (লণ্ডন) তাঁহার অন্যতমা কন্যা।

মরা চিঠি

শ্রীকৃতান্তনাথ বাগচী

ওগো !

কদিন ধরেই থরথরিয়ে নাচছে আমার চোখ,
তাইতো এমন চিঠি লেখার ছন্নছাড়া ঝোঁক।
সবার মুখেই শুনছি যেন কোথায় কি হাঙ্গাম।
পালিয়ে এলেন ছুটি নিয়ে সবিতাদের মামা :
সেদিন নাকি ইষ্টিসেনের যত রেলের গাড়ী
অভিমানী মেয়ের মতন করেছিল আড়ি,
বন্ধ ছিল দোকানপাট আর উনুন জ্বলেনিকো,
সত্যি কিনা, মাথার দিব্যি, খুলে আমায় লিখো।
বিষ্টু খুড়োর বড় ছেলে হয়েছে হালসানা।
ডানাকাটা পরীর খোঁজে দিচ্ছে খুড়ী হানা।
করিমপুর আর কামারহাটি, পলাশডাঙ্গা গাঁয়ে ;
একজিমাটা বেড়ে গেছে হরিশদাদার পায়ে।
চালের উপর কুমড়োলতায় ফুটছে হলুদ ফুল,
হাঁড়ি ভরেই রেখেছি গো বড়ি, শুকনো কুল।
আলুর পাঁপর সঙ্গে এনো, কপি, কড়াইশুটী,
সেবার যে সেই এনেছিলে "ঠাকুরপো" পাঁউরুটী,
পেস্তা, বাদাম, কিসমিস আর সেজায় যার দাম
চাটনি করে, পারিনে ছাই মনে করতে নাম।
শুনছি সবাই চুপি চুপি করছে বলাবলি
এবার নাকি বাসুকী নাগ উঠবে হঠাৎ টলি,
রাক্ষুসীরা জাগবে সবাই হাইতুলে ঘুম থেকে
আঁচল দিয়ে তাই রেখেছে মায়েরা বুক ঢেকে,
ভাঁটার মতন চোখে ওদের চাউনি রাঙ্গা শনির
এক পলকেই ছাই করে দেয় সাতরাজার এক মণির।
শুনে আমার সকল গায়ে দিচ্ছে কেবল কাঁটা।
ঘনিয়ে উঠে কিসের ছায়া, কাঁদছে বিড়ালছা-টা !
তোমার কাছে খাঁটি খবর আমায় কিন্তু দিয়ো,
পাড়াগাঁয়ের বৌয়ের শুধু একটি প্রণাম নিয়ো।
ক্ষমা করো জানিনে তো আধুনিকার রীতি,
পড়লো বেলা। সাজাই পিদিম। তোমার আমি, ইতি।

পুনশ্চ :—

ছেঁড়া শাড়ী বদল করে নিলেম কাঁসার বাসন,
পাড়ের সুতোয় বুনছি আসন, খোকার অন্নপ্রাশন।

বাইশে শ্রাবণ

শ্রীকরুণাময় বসু

হে রবীন্দ্র, তুমি নাই, তাই এলো বাইশে শ্রাবণ,
সজল মেদুর স্নিগ্ধ গগনের ধারাবরিষণ
আকুল প্রাণের প্রান্তে ; তুমি ছিলে বরষার কবি,
তোমার বিদায় ক্ষণে তাই আসে কেতকী সুরভি,
মালতীর গন্ধশ্বাস মালঞ্চের ক্লান্ত শাখা হ'তে ;
একটি স্বর্গের আভা মেঘমগ্ন সূর্যাস্ত আলোতে
ঝিলিমিলি করে ওঠে ঝিকিমিকি সায়াহ্ন বেলায়
কম্পিত বকুল কুঞ্জে, কপোতের শঙ্কিত কুলায়,
সবুজ শস্যের শীর্ষে। নারিকেল পল্লব মর্মরে
তোমার সঙ্গীত-ছন্দ ভেসে যায় দূর দিগন্তরে,
সমুদ্রের পরপ্রান্তে, ভেসে যায় দেশ হ'তে দেশে,
কাল হ'তে কালান্তরে শতাব্দীর শূন্য নিরুদ্দেশে
নির্জ্জন আত্মার তটে।

কতোদিন শূন্য বালুচরে
তোমার কবিতাগ্রন্থ হাতে করি ব্যাকুল অন্তরে
ঘুরেছি নিঃসঙ্গ একা, সেই স্মৃতি কভু ভুলিব না,—
অবোধ আনন্দভরা অশ্রুপূর্ণ বিশাল বেদনা
অপূর্ব সৌন্দর্য মায়া, ফুটেছিল বসন্তের ফুল,
পথের কি শেষ আছে, তুমি মোরে করেছ বাউল,
তাই আমি উদাসীন চলে যাই দূর হ'তে দূরে,
যেখানে প্রাণের কথা বলা যায় উচ্ছ্বসিত সুরে
গভীর আবেগপূর্ণ ; কোন ক্ষণে বাজায়েছ বাঁশী,
সেই কথা সেই সুর চিরকাল উঠেছে উদ্ভাসি'
মানবের-চিত্তপটে ; জীবনের গোধুলি বেলায়
রাখালিয়া সুর যেন বেজে ওঠে শেষের খেলায়।
হে রবীন্দ্র ভাষা দেছ, মানুষেরে শিখায়েছ গান,
শিখায়েছ ভালোবাসা, দিয়েছ যে আত্মার সন্ধান
একটি চরম লক্ষ্য। যতোদূর চলে যাও তুমি,
রহিল পশ্চাতে তব প্রসারিত দূর পটভূমি,
অবারিত নীলাকাশ, উদ্বেলিত সাগরসঙ্গম,
যেখানে মেলিবে পাখা শতাব্দীর স্বপ্নবিহঙ্গম।

মর্ম্মবাণী—তপতী চট্টোপাধ্যায়, ১, ডাঃ শ্যামাদাস রো, কলিকাতা-১৯। মূল্য—তিন টাকা।

কয়েকটি কবিতার সমষ্টি এই মর্ম্মবাণী। অধিকাংশই অনুবাদ কবিতা, তবে মৌলিক রচনাও ইহার মধ্যে কিছু আছে। শ্রীমতী তপতীর ইতিপূর্ব্বে বহু কবিতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। মর্ম্মবাণী তাঁহার প্রথম পুস্তক। প্রথম হইলেও ইহার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার মতো। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, আধুনিক কবিদের মতো তাঁহার কবিতায় উগ্র ঝাঁজ নাই। ছন্দ এবং ভাব সমন্বয় সাধন করিয়াছে। তাঁহার জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করিয়া আছে।

গ্রন্থের মুদ্রণ-পারিপাট্য এবং প্রচ্ছদ-প্রসাধন সুরুচির পরিচায়ক। আগাগোড়া আর্টপেপারে ছাপা—উপহার দিবার মতো বই।

ছোটদের ছড়া সঞ্চয়ন—সম্পাদনা, শ্রীপ্রভাত বসু ও মহেন্দ্রনাথ দত্ত। মূল্য আড়াই টাকা।

ছবিতে মহাভারত অঙ্কন ও লেখা—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। মূল্য—১·৭৫ নঃ পঃ।

শ্যামলা-দীঘির ঈশান-কোণে—শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত। মূল্য—আড়াই টাকা। শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ, ৩২ এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা—৯।

আমাদের দেশে ছেলেমেয়েদের হাতে দিবার মতো ভাল বই খুব কমই আছে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে, লেখা ভাল কিন্তু তাহাতে শিশুদের মন ভরে নাই। ইহার কারণ, তাহাদের মনের খবরটি আমরা প্রায় সকলে জানি না। সাহিত্য সংসদ সেই দুরূহ কাজের ভার লওয়ায়, একটি বড় অভাব আমাদের মিটাইলেন।

আমাদের দেশে কত ছড়া মুখে মুখে সর্বত্র ছড়াইয়া আছে। সেইগুলিকে একত্র সংকলন করা বড় সহজসাধ্য নয়। সাহিত্য সংসদের এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। কারণ এগুলি একত্রে গ্রথিত হওয়ায়, হারাইবার আর ভয় রহিল না। ছড়ার সঙ্গে ছবি শিশু-মনকে আকৃষ্ট করিবে। এরূপ ছড়ার সঙ্গে ছবির মিল বজায় রাখিয়া চমৎকার বই ছোটদের পরিবেশন করা খুব সহজ-সাধ্য নয়। সহজ করিয়া লেখাও যেমন সহজ নয়, তাদের মন ভুলানোও বড় সহজ কাজ নয়। সাহিত্য সংসদ এই কাজের ভার লইয়া একটা কাজের মত কাজ করিলেন।

'ছবিতে মহাভারত' সম্বন্ধেও সেই একই কথা। রামায়ণ মহাভারতের সঙ্গে শিশু বয়স হইতেই আমাদের পরিচয় থাকা আবশ্যক। উনিশ শতকের শেষের দিকে শুধু ছেলেরা কেন, যুবকদের মন হইতেও রামায়ণ মহাভারত প্রায় মুছিয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমানে ইহার চর্চ্চা নূতন করিয়া দেখা দিয়াছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ইস্কুল-পাঠ্যের মধ্যেও রামায়ণ মহাভারত দেখা যাইতেছে। ইহা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। সাহিত্য সংসদ ছবির সাহায্যে সংক্ষেপে মহাভারত কাহিনী প্রকাশ করিয়া আর একটি বড় কাজ করিলেন। ছবির সহিত কাহিনী শিশু-মনে অতি সহজেই দাগ কাটিবে।

'শ্যামলা-দীঘির ঈশান-কোণে' একটি সুন্দর গল্প-ছড়া। গল্প অনেকেই বলেন, কিন্তু ঠিক ছেলেদের মত করিয়া বলা বড় সহজ কথা নয়। শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত ছড়ার মতো করিয়া সেই গল্প পরিবেশন করিয়াছেন। সুদক্ষ হাতে পড়িয়া ছড়া প্রাণবন্ত হইয়াছে। তাহার উপর সংসদ প্রচুর ব্যয়ে ছেলেদের মন ভুলাইয়াছেন। যে উদ্দেশ্য লইয়া সাহিত্য সংসদ এই কাজে নামিয়াছেন তাহা সার্থক হইয়াছে।

গল্পে গীতা—শ্রীক্ষেত্রমোহন ভাদুড়ী, ৯ পশুপতি বোস লেন, কলিকাতা—৩। মূল্য ১·৩৭ নয়া পয়সা।

গীতা সম্বন্ধে ছেলেদের মনে কোনো ধারণাই নাই। দুরূহ ধর্ম-গ্রন্থ বলিয়াই জানে, তাই গীতাকে তাহারা সযত্নে দূরে দূরেই রাখে। কিন্তু গীতার আচরণ প্রত্যেক মানুষেরই অবশ্য পালনীয়। জীবনকে ভালভাবে গঠন করা, আচরণকে সুন্দর করিয়া তোলার জন্যই গীতার উপদেশ। ধর্ম কি? যাহা আচরণ করা যায় তাহাই ধর্ম। সেই ধর্মের কথাই গীতায় আছে। তাহার উপর যাহা আছে তাহা আদর্শের কথা। একটি আদর্শকে অনুসরণ করো—সে আদর্শ মানুষও হইতে পারে, ভগবানও হইতে পারে। সেই আদর্শ বা ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া কাজ করিয়া যাও—ইহাই গীতার মর্মকথা।

ছেলেদের বুঝাইবার জন্য, গ্রন্থকার ইহার তত্ত্বকথা গল্পের মত করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। ইহাতে ছেলেদের মনে গীতা সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা জন্মিবে। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীগৌতম সেন

দেশ-বিদেশের কথা

ডাক্তার সি. আর. দত্ত

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, ডাক্তার সি. আর. দত্ত এম-বি-এস—যিনি উচ্চ শিক্ষার্থে কয়েক বৎসর পূর্বে বিলাত গিয়াছিলেন, তিনি বর্তমানে কিংসটনের 'কুইনস্ ইউনিভার্সিটি' হইতে মেডিসিনে এম-এস-সি ডিগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই পরীক্ষায় ভারতীয়ের মধ্যে আজ পর্যন্ত কেহই উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। তিনিই প্রথম ভারতীয়, যিনি এই সর্বোচ্চ পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

বর্তমানে তিনি নিউরো মাসকিউলার বিষয়ে গবেষণা করিতেছেন। ডাঃ দত্ত খুলনার অধিবাসী। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের তিনি কৃতী ছাত্র ছিলেন। ইনি কলিকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে দীর্ঘ চার বৎসর ডিমনেষ্ট্রেটরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিদেশে গিয়াও, ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল, মনট্রিল, এবং কানাডায় ই. এন. টি.-বিভাগে রেসিডেণ্ট সার্জেন রূপে দীর্ঘকাল কাজ করিয়াছেন। ইহার পর তিনি কুইনস্ ইউনিভার্সিটিতে গবেষণার কাজে মনোনিবেশ করেন। বহু ছাত্রও তাঁহার অধীনে থাকিয়া গবেষণা কার্যে লিপ্ত আছেন। একজন ভারতীয়ের পক্ষে এ সম্মান লাভ করা কম কৃতিত্বের কথা নয়। তিনি ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়া ফিরিয়া আসুন ইহাই কামনা।

ডাঃ সি. আর. দত্ত

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

প্রবাসী গল্প-প্রতিযোগিতার ফলাফল জানিবার জন্য প্রত্যেকেই উৎসুক হইয়া আছেন। বিলম্বের জন্য আমরা নিজেই লজ্জিত। আগামী ভাদ্র-সংখ্যার প্রবাসীতে ইহার ফলাফল বাহির হইবে। কর্ম-কর্তা, প্রবাসী—

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

নীড়ের বন্ধন

হাসি
ফটো : শ্রীতপনকুমার বর্মণ

হাসি
ফটো : শ্রীঅমল সেনগুপ্ত

:: ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬০শ ভাগ
১ম খণ্ড } ভাদ্র, ১৩৬[illegible] { ৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাঙালীর বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ

আসামে যাহা ঘটিয়াছে তাহার জের এখনও আমাদের মন ও বিচার-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। নহিলে এতদিনে আমাদের মধ্যে যাঁহারা চিন্তাশীল এবং যাঁহারা ভাবের উচ্ছ্বাসে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন নাই, তাঁহাদের মনের কথা সাধারণের নিকট প্রকাশ পাইবার সুযোগ পাইত। এই যে আসামের মুষ্টিমেয় নীচমনা আক্রান্তকারী দল এই ভাবে বাঙালীর সকল রাষ্ট্রগত অধিকারকে অনায়াসে ধূলিসাৎ করিতে সাহস পাইল, তাহার পিছনে কি প্রভাব, কি শক্তি ছিল তাহা নিমেষের মধ্যে বাঙালীর সকল সাহস সকল প্রতিরোধ-ক্ষমতা উড়াইয়া দিয়া তাহাকে অসহায় বলির পশুর অবস্থায় আনিল?

দ্বিতীয় কথা যেটা আমাদের বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত সেটা এই যে, আসামের এই নিদারুণ পাশবিক অত্যাচারের বিবরণে ভিন্ন প্রদেশীয় ভারতীয়দের মনে এত অল্প প্রতিক্রিয়া হইল কেন? আমরা যেটুকু ভিন্ন প্রদেশের সংবাদপত্রে পাইতেছি তাহাতে ত মনে বরং এই প্রশ্নই জাগে যে, আমাদের বাংলা সংবাদপত্রে যাহা ব্যাপকভাবে ও তীব্র জ্বালাময়ী ভাষায় প্রকাশিত হইতেছে তাহাই অবাস্তব না এই প্রতিক্রিয়ার অভাবই কৃত্রিম? হয় বাঙালী জাতি এখন সমগ্র ভারতে বন্ধুহীন সহায়হীন এবং সেই কারণে তাহার ব্যথার ব্যথী কেহই নাই, তাহার দুঃখে-যন্ত্রণায় কেহই তাহার পাশে দাঁড়াইতে ইচ্ছুক নয়, নয়ত বাঙালী স্বভাব-চরিত্রের মধ্যে, তাহার কার্য্যকলাপের মধ্যে এমন-কিছু দেখা দিয়াছে যাহাতে সে তাহারই স্বদেশবাসীর নিকট শুধু অপ্রিয়ই নয়, বর্জ্জনীয়ই হইয়া দাঁড়াইতেছে।

আমাদের এখন বুঝিবার সময় আসিয়াছে যে, এই ভাবে তারস্বরে গগনভেদী আর্ত্তনাদ করিয়া কোনও স্থায়ী লাভের সম্ভাবনা নাই। গরম গালিগালাজ, প্রখর কটুবাক্যের প্লাবন এই সকলে কাগজ বিক্রীর সহায়তা হইতে পারে কিন্তু তাহার স্থায়ী ফল কি? বাঙালী জাতি এইরূপ আন্দোলনের ফলে কতটা অগ্রসর কতটা স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিবে?

আমরা জানি যে, এই চূড়ান্ত বর্ব্বরতার প্রতিকার দাবি করা, এবং যাহারা ঐ অত্যাচারের ফলে চরম দুর্দ্দশাগ্রস্ত তাহাদের জন্য পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দাবি করা আমাদের রাষ্ট্রগত ও জন্মগত অধিকার এবং আমরা ইহাও জানি যে, যে নীচ মনুষ্যরূপী পিশাচের দল এই ভাবে নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য অসহায় নরনারীর উপর এই ভাবে অত্যাচারের স্রোত বহাইয়াছে তাহারা সকল প্রকারে নিন্দনীয় ও দণ্ডনীয়। সে কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে সবিস্তারে বলিয়াছি এবং এইবারেও বলিতেছি। কিন্তু যাহা আমরা বুঝিতেছি না এবং শুনিতেছি না, সেকথা হইল স্থায়ী প্রতিকারের কথা এবং এইরূপে বাঙালীর দ্রুত অধঃপতন রোধের কথা। বোধ হয় সেকথা লিখিলে "সারকুলেশান" নামক দেবতার অপমান হয়, হয়তো বা সেকথা ভাবিলে বাঙালীর ঐতিহ্যে আঘাত লাগে।

কিন্তু ভাবিতে তো হইবেই, নহিলে উত্তর যে আসে না। এক সহযোগী মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ("পত্র-

পত্রিকা" নামক অপরূপ ও অর্থহীন শব্দ আমরা গ্রাহ্য মনে করি না) ঐ ভাবে ভাবিতে গিয়া নিদারুণ ক্ষোভের ও অন্তর্গ্লানির বশে বাঙালী জাতির আত্ম-বিশ্লেষণ অতি বাস্তব ভাবে করিয়াছেন। অতি বাস্তব ভাবে বলিলাম, এই কারণে, কেননা ঐ বিশ্লেষণ যাহা আপাতদৃষ্টিতেও সাধারণ ভাবে আমাদের চক্ষুগোচর, শ্রুতিগোচর ও বোধগম্য হয়, বাঙালী চরিত্রের সেই বাহ্যরূপ লইয়া করা হইয়াছে। বাঙালীর অন্তরে গভীর নিহিত ভাবে কি আছে সেটারও কিছু পরিচয় পরে আছে ঐ সম্পাদকীয়ে। এই বিশ্লেষণের মূল্য আছে কেননা ইহাতে যে জাতি চরিত্রগত দোষের তালিকা দেওয়া হইয়াছে—উদাহরণ সহ—তাহাতে বুঝা যায় বাঙালী কেন ভিন্নপ্রদেশীয়ের সহিত সখ্যতা বা আত্মীয়তা স্থাপনে অসমর্থ হইয়াছে। জাতিচরিত্রের কথায় তিনি বলিতেছেন :

"...বাঙালীর জাতি-চরিত্র কি? তাহার জাতীয় বৈশিষ্ট্য কি? আলস্য, শ্রম-বিমুখতা, পরশ্রীকাতরতা, কলহ-পরায়ণতা, বাক্-সর্বস্বতা, ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি—সর্বোপরি আত্মম্ভরিতা। অকারণ অযৌক্তিক সুবিপুল উত্তুঙ্গ দম্ভ —অভ্রভেদী অহঙ্কার। অহঙ্কার কেন? না, আমরা বড়—" ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এই ধারায় চিন্তা করিলে আত্মগ্লানি ও ধিক্কার ভিন্ন আর কি পাওয়া যাইবে, যদিও যে ভাবে আমাদের অধোগতি চলিতেছে তাহাতে এই ধিক্কারের কারণ যথেষ্টই রহিয়াছে। এবং সহযোগীর সম্পাদক মহাশয় যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা অপ্রিয় হইলেও বেশীর ভাগেই সত্য। উহা কেন নিরবচ্ছিন্ন ও সম্পূর্ণ সত্য নয় সে কথা বলিতেছি।

বাঙালী চরিত্রের এই বিশ্লেষণ কিছু নূতন নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে হুতোম পেঁচার নক্সায় ও আলালের ঘরের দুলালে আমরা তাহার বেশ পরিচয় পাই। বঙ্কিমের শ্লেষাত্মক লেখায় তো আরও পরিষ্কার চিত্র পাই। রবীন্দ্রনাথের খেদোক্তিতে অভাগা বঙ্গমাতার সাত কোটি সন্তান যে মানুষ নয়, বাঙালী, তাহা স্পষ্ট ভাষায় আছে।

কিন্তু এই বাঙালীই যথার্থ নির্দ্দেশ ও নেতৃত্ব পাইলে অনেক ক্ষেত্রেই তাহার চরিত্রগত দোষ অতিক্রম করিয়া কত উপরে উঠিতে পারে তাহার বহু ছোট-বড় দৃষ্টান্ত ত আমাদের চোখের উপর দিয়াই গিয়াছে। লবণ সত্যাগ্রহে সারা ভারত দমননীতিতে আন্দোলন ছাড়িয়া দিবার পরও মেদিনীপুরের কয়েক অঞ্চলে ও আরামবাগে উহা চলিতে থাকে। বিয়াল্লিশের স্বাধীনতা-সংগ্রামেও তমলুক ও কাঁথিতে সশস্ত্র সৈন্যদল ও পাঞ্জাবী মুসলমান গুণ্ডাদলের অমানুষিক অত্যাচার সত্ত্বেও বাঙালী মাথা নত করে নাই। আমরা সামান্য অংশ লইলেও এই সব ক'টারই সাক্ষ্য দিতে পারি। এখানে—এই কলিকাতায় যখন লীগদল সুহরাবর্দ্দির নেতৃত্বে কলিকাতা দখলের অভিযান চালাইয়াছিল সে সময়েও বাঙালী ছেলে হটিয়া যায় নাই—যদিচ সেই হত্যাকাণ্ডের সম্পূর্ণ সমর্থন বা ঐ "মুসাবাদ্দি" স্তায়ের প্রচার আমরা আজিকার দিনে করিতেছি না।

আসলে বাঙালীর সব চাইতে বড় দৌর্ব্বল্য তাহার ভাবালুগ, গড্ডলিকা মনোবৃত্তি হইতে জাত। যে ব্যক্তি সকলের চাইতে বড় বড় কথা বা অসম্ভব প্রতিশ্রুতি দিবে, পরনিন্দায় যে সর্ব্বাপেক্ষা মুখর, আমরা বিনা বিচারেই তাহার মতামত গ্রহণ করি (সত্যাসত্য বা শুভাশুভের বিচার কোনদিনই আমাদের মুখরোচক ছিল না), আজ যেকালে সকলেই নেতা, সিংহনাদ চতুর্দ্দিকেই শুনা যায়, আজ ত আমরা বিভ্রান্ত, আমাদের বিচারবুদ্ধি বিকারগ্রস্ত। সুতরাং বিনা শ্রমে বিনা আয়াসে বা বিনা ক্ষতি স্বীকারে যদি নিছক পেঁউড় গাহিয়াই বা কটু ভাষার প্লাবন বহাইয়াই দেশোদ্ধারের বা দলিতোদ্ধারের বাহবা পাওয়া যায় তবে মন্দ কি? যুক্তিতর্ক বা গঠন-মূলক প্রস্তাব এ সব করায় অনেক ঝঞ্ঝাট।

কাগজে দেখি এবং অনেক বক্তাও বলিয়াছেন যে, আসামে যাহা ঘটিয়াছে তাহা অপেক্ষা অনেক কম অত্যাচারের ফলে কেরলে রাষ্ট্রশাসন প্রেসিডেন্ট নিজ হস্তে (গবর্ণর মারফৎ) গ্রহণ করেন। ইহা পূর্ণ সত্য ত নহেই অর্দ্ধ সত্যও নহে। সেখানে বিরাট "বিমোচন আন্দোলন" সমস্ত রাষ্ট্রকে অচল করার পর তাহা হয় এবং সেই আন্দোলনের ফলেই পরের নির্ব্বাচনে কেরলের শাসনতন্ত্রের হাত-বদল হয়।

আসামে প্রেসিডেন্টের শাসন যদিই বা প্রবর্ত্তিত হয় তাহার পরে সংবিধান অনুযায়ী নির্ব্বাচন অবশ্যম্ভাবী। তারপর ?

আসামে অশোক সেন

ভারতের রাষ্ট্রীয় আইনসচিব শ্রীঅশোক সেন আসামে শান্তি স্থাপনের জন্য আসামমন্ত্রী ফকরুদ্দিন আহমদের সহিত বর্ত্তমানে আসাম অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি ভারত সরকারের দ্বারা নিযুক্ত ও আসামে পারস্পরিক প্রেম ও মৈত্রী প্রচার করিয়া ভারতের, বাংলার ও নিজের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন। শুনা যায় যে, তিনি যে সময় এই প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন ঠিক সেই সময়েই আসামে কোথাও কোথাও বাঙালীর ঘরে

আগুন লাগান হয়। অর্থাৎ আসামীদের মধ্যে যে সকল লোক খুন, গৃহদাহ, লুঠ ও গুণ্ডামি করিয়া আসামী ভাষার উন্নতিসাধনে লিপ্ত সেই সকল দুর্বৃত্তদের বাঁচাই-বার যে ব্যবস্থা আসাম ও ভারত সরকার করিয়া চলিয়াছেন, ভারতের আইনসচিব বাংলার সুসন্তান শ্রীঅশোক সেন সেই কার্য্যের সহায়ক। আইন অর্থে কেহ অপরাধের সমর্থন, অথবা অপরাধীরক্ষণ বোঝে না। বরং অপরাধের ও অপরাধীর দমনই আইনের উদ্দেশ্য। শ্রীঅশোক সেন যদি আসামের জনসাধারণের সহিত আসামবাসী বাঙালী-দের সখ্য স্থাপন চেষ্টামাত্র করিতেন তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকিত না। কিন্তু অপরাধীদের শাসন বা শাস্তির কোন চেষ্টা না করিয়া, নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা খুন, লুঠ ও অপরাপর অপরাধের মূক সমর্থন করিয়া ভারত সরকার যে শাসনকার্য্যে অক্ষমতা দেখাইয়াছেন, অশোক সেনের উচিত হয় নাই সেই কার্য্যে লিপ্ত হইয়া পড়া। পণ্ডিত নেহরু বাঙালীর প্রতি ভালবাসার জন্য প্রসিদ্ধ নহেন। এমনকি বাঙালী কেহ কোনও বিষয়ে জড়িত থাকিলে পণ্ডিতের সে বিষয় সম্বন্ধে ন্যায়, সত্য ও ধর্ম্মজ্ঞান কাণ্ডা-কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া ইতঃস্তত ধাবমান হয় ও অচিরাৎ অন্যায়, মিথ্যা ও অধর্ম্মে পরিণত হইয়া পণ্ডিতের বিশ্ব-মানব-প্রীতির মিথ্যা প্রতীকরূপে শোভমান হয়। অশোক সেনের উচিত হয় নাই নেহরুর সহায়তা করা।

অ

চালিহার অশ্রুমোচন

শ্রীঅশোক সেন যখন আসামে শান্তিস্থাপনার্থে ঘোরা-ফেরা করিতেছিলেন তখন তিনি দুইটি ঘটনা দ্বারা বিশেষ ভাবে মর্ম্মবেদনা আহরণ করেন। প্রথমতঃ কাছারের কোনও বাংলা সাপ্তাহিকে আসামীদের চরিত্র সম্বন্ধে অপবাদ দিয়া কি যেন লেখা হয়। ইহা পাঠ করিয়া শ্রীঅশোক সেন বুঝিতে পারিলেন যে, আসামীরা যে উক্ত সাপ্তাহিক প্রকাশিত হইবার দুই মাস পূর্ব্ব হইতে বাঙালীদের মারপিট, খুনজখম, লুঠ ও ঘরজ্বালান ইত্যাদি করিতেছিল তাহাতে বাঙালীদেরও কিছু দোষ ছিল। আইনজ্ঞের পক্ষে ঈসপের গল্প পড়া প্রয়োজন হয় না। নতুবা শ্রীঅশোক সেন বলিতে পারিতেন যে, বাংলার আসামের নদীগুলির জল ময়লা করা হয় সেই কারণে আসামীদের বাঙালী-বিদ্বেষ স্বাভাবিক। অপর ঘটনাটি হইল শ্রীঅশোক সেনকে দেখিয়া শ্রীচালিহার অশ্রুমোচন। ইহা বড়ই হৃদয়বিদারক হইয়াছিল। শ্রী চালিহা ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া শ্রীঅশোক সেনকে বলিলেন, "আমাদের নামে যাহা কিছু দোষ দেওয়া হইতেছে তাহা সবই আমি মানিয়া লইতেছি···।" শ্রীঅশোক সেন এই দৃশ্য দেখিয়া অশ্রুসম্বরণ করিতে বিশেষ পরিশ্রম করিতে বাধ্য হইলেন এবং ভাবিলেন (হয়ত) যে অতঃপর আসামে সকল খুনেদের স্বর্ণপদক দিয়া পারিজাতবিভূষণ উপাধি দেওয়াই উপযুক্ত হইবে। আসামে এই যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে ইহার মূলে বাঙালীদের যে সকল দোষ আছে তাহার মধ্যে কোন কোন বা অধিকসংখ্যক বাঙালীর কাপুরুষতা, পরদাসত্বপ্রীতি, বিবেকহীনভাবে চাকুরিরক্ষা ও দরবারে উচ্চপদ উপার্জ্জনহেতু স্বজাতিবিরুদ্ধতা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। শ্রীঅশোক সেন এই সকল দোষের চর্চ্চা ও আলোচনা করিয়া দেখিতে পারেন সত্য কোথায় তাহা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে কিনা।

অ

ঐক্য কোথায় ?

মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু তাঁহার এক বক্তৃতায় অতি সত্য কথা বলিয়াছেন, যাহার প্রতি আমরা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তিনি বলিয়া-ছেন—ভারতবর্ষ যে এক অবিভাজ্য দেশ এবং ভারতবাসী যে একজাতি এ সত্য যেন আমরা কোনোদিন না ভুলি। ভাষার প্রশ্ন, সীমানার প্রশ্ন বা অন্য যে কোন প্রশ্নই হউক, সব কিছুরই পারস্পরিক সম্প্রীতি ও বোঝা-পড়ার মধ্যে মীমাংসা হওয়া উচিত। মারপিট, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, লুঠতরাজ, ঘরে আগুন দেওয়া, এ সবের পথে কোনও সমস্যার সমাধান করিতে যাওয়া শোভনও নয়, মনুষ্যত্ব-সম্মতও নয়, অথচ বাস্তবে যদি তাহাই পাইকারীহারে অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে না যে, যে ঐক্য আমাদের এত বেশী প্রয়োজন এবং যাহার আদর্শ আমাদের বরেণ্য নেতারা গত এক শতাব্দী ধরিয়া ক্রমাগত প্রচারও করিয়া আসিতেছেন, তাহা আমাদের চেতনায় সত্য হইয়া উঠে নাই ?

বলা বাহুল্য, ডাঃ কাটজু আসামের সাম্প্রতিক বাঙালী-মেধ যজ্ঞের কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু এই সূত্রে তিনি ভারত-ইতিহাসের একটি জটিল ও অনুত্তরিত প্রশ্নের প্রতিও অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যা এড়াইয়া যাওয়া লাভজনক বা বাস্তববুদ্ধিসম্মত হইবে না। রবীন্দ্র-নাথ, গান্ধীজী ও অন্যান্য মহান নেতা যে ভারতীয় ঐক্যের বাণী প্রচার করিয়াছেন, তাহা কি সত্য সত্যই বাস্তবে কোন দিন ছিল ? আজও কি তাহা আছে ? আজিকার

ভারতবর্ষের দিকে তাকাইলে দেখা যাইবে, উত্তরে পঞ্জাবের হিন্দু ও শিখরা একই জাতিগোষ্ঠীভুক্ত এবং প্রায় একই শিক্ষা-সংস্কৃতি ও আচার-আচরণে অভ্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও, এক রাজ্য-ব্যবস্থাপনার মধ্যে থাকিতে প্রস্তুত নন। শিখদের স্বতন্ত্র পঞ্জাবী ভাষাভাষী রাজ্যের জন্য জেহাদ চলিতেছে। দক্ষিণে দ্রাবিড়রা স্বতন্ত্র দ্রাবিড়ী স্থান গঠন করিয়া আর্য্য-ভারতের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইবার জন্য তুমুল আন্দোলন চালাইতেছে। পূর্ব্বে আসামের ও বিহারের পেটে বাংলার যে যে অংশগুলি ইংরেজরা মতলব করিয়া ঢুকাইয়া গিয়াছিল, কংগ্রেসীরা তাহা বাংলাকে ত ফিরাইয়া দিলেনই না, উপরন্তু আসামের লক্ষাধিক বাঙালীকে হতাহত, উপদ্রুত ও লুণ্ঠিতসর্ব্বস্ব করা হইল! বৃহৎ ভারতবর্ষের কোথাও সেজন্য উষ্মা, লজ্জা বা বেদনার আভাসটুকুও মিলিল না! পশ্চিমে অনেক ঠেঙা-ঠেঙি ও ধ্বস্তাধ্বস্তির পর মাত্র সেদিন গুজরাটি এবং মারাঠী দুটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ রাজ্য গঠিত হইয়াছে। কিন্তু মহারাষ্ট্রের পিছনে বিদর্ভের গোঁজ পোঁতাই আছে। স্বতন্ত্র নাগারাজ্যের স্বীকৃতিও মিলিয়াছে।

সুতরাং অখণ্ড ও অবিমিশ্র ভারতীয় ঐক্য কোথায়? বিচিত্র ভাষা, বিচিত্র সামাজিক ও ধর্ম্মসম্পর্কীয় আচার-অনুষ্ঠান, বিচিত্র খাদ্য, পানীয় এবং পরিচ্ছদের অভ্যাস, পরস্পর-বিরোধী বিচিত্র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক স্বার্থের সংঘাত ত অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই ভারতবর্ষে চলিয়া আসিতেছে। অশোক, সমুদ্রগুপ্ত ও হর্ষবর্দ্ধনের আমলেও দেখিয়াছি, আকবর, আওরঙ্গজেবের যুগেও দেখা গিয়াছে—খণ্ড ভারতকে তাঁহারা এক করিতে পারেন নাই। ইংরেজ কতকটা পারিয়াছিলেন লাঠির জোরে। কিন্তু মনন-চিন্তনে, আশায়-আদর্শে কোনদিন একত্ব আসে নাই। বরং বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় সুযোগ পাইলেই পরস্পর যুদ্ধে মাতেন। এ যুদ্ধের আর বিরাম আসিল না!

এই যে আঞ্চলিক ভেদবুদ্ধি, ইহা এত প্রবল ও সর্ব্বব্যাপী যে, কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃত্বে যাঁহারা সংখ্যাধিক, তাঁহারাও ইহার দ্বারা সমভাবেই চালিত। তাই চারিটি রাজ্যের মোট সাড়ে সাত বা আট কোটি লোক যা বোঝেন ও বলেন, সেই হিন্দীকে চল্লিশ কোটি লোকের মাথার উপর জোর করিয়া সরকারী ভাষারূপে চাপানোর আয়োজন চলিতেছে। অন্যান্য সমৃদ্ধতর ভাষার অধিকার সঙ্কুচনের জন্য হীন কৌশলের আশ্রয় লইতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত নহেন। একদিকে এইভাবে ভাষার ফাঁদ পাতিয়া কেন্দ্রীয় বড় চাকুরিগুলি হইতে ভিন্ন ভাষাভাষীদের খেদানোর, অন্যদিকে শিল্প-বাণিজ্যে নিজেদের অভিপ্রেত গোষ্ঠীকে নানাভাবে অগ্রাধিকার দিয়া অবশিষ্ট ভারতকে অর্থনৈতিক তাঁবেদার করার চতুর চেষ্টা চলিতেছে। অর্থাৎ যে নিরপেক্ষ সমদর্শিতা উদারবুদ্ধি ও সর্ব্বভারতীয় মানসিকতা তাঁহাদের কাছে প্রত্যাশিত ছিল তাহা তাঁহাদের নাই—যেমন নাই কোন রাজ্যেরই।

বিভেদের মধ্যে ঐক্য, বৈচিত্র্যের মধ্যে সমন্বয়, বৈষম্যের ভিতর সাম্য প্রভৃতি গালভরা কথা শুনিতেও ভাল, বলিতেও ভাল। গ

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের ঘোষণা

সংবাদে দেখিতেছি, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি একটি কঠোর প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। এই কমিটি স্থির করিয়াছেন—আসামে দলবদ্ধ ভাবে গুণ্ডামি, লুঠ-তরাজ ও অন্যান্য হিংসাত্মক কার্য্যের ফলে সেখানকার বাঙালী অধিবাসীরা যে দুর্ভাগ্যের মধ্যে পড়িয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ এবং দুর্গতদের উদ্দেশ্যে সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য, এবারে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস আসন্ন স্বাধীনতা দিবসের উৎসব বর্জ্জন করিবেন। অন্যান্যবার পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ১৫ই আগষ্টের স্বাধীনতা-দিবস উপলক্ষ্যে সপ্তাহব্যাপী যে-উৎসব পালন করা হইয়া থাকে, এ বৎসর তাহা করা হইবে না। শুধু পতাকা উত্তোলন এবং অনাড়ম্বর সভা অনুষ্ঠান দ্বারা নিয়ম-রক্ষা করা হইবে মাত্র। এই প্রতিবাদ-জ্ঞাপন ছাড়াও, তাঁহারা আসাম সম্পর্কে ছয় দফা কর্ম্মসূচীর উপর জোর দিয়াছেন। এই কর্ম্মসূচীর মধ্যে আছে, আসামে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা এবং কেন্দ্র কর্ত্তৃক আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার গ্রহণ। আর আছে সমগ্র পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তৃত তদন্তের জন্য সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারপতিকে লইয়া একটি উচ্চপর্য্যায়ের ট্রাই-ব্যুনাল গঠন এবং উপদ্রুত অঞ্চলে পিটুনী কর প্রবর্ত্তন ও শরণার্থীদের পুনর্ব্বাসন।

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস এই ঘোষণার দ্বারা বাঙালীর গভীর মনোবেদনাকে আত্মীয়রূপে গ্রহণ করিলেন, ইহা নিঃসন্দেহ। কারণ, এই স্বাধীনতা যাহারা আনিয়াছে, জাতি হিসাবে তাহারাই বঞ্চিত। কেবল বঞ্চিত নহে, বাঙালী যেন স্বাধীনতার শাস্তি বা দণ্ডটাই বেশী পাইয়াছে। বাঙালীকেই শাস্তি দিবার জন্য লর্ড কার্জ্জন বাংলাকে খণ্ডিত করিয়াছিলেন, আবার ১৯৪৭ সনে স্বাধীনতার নামে কংগ্রেসী নেতৃত্বে বাংলাকে ভাগ করা

হইল। যাহার ফলে আমরা বাস্তু হারাইলাম। আজও যাহারা উদ্বাস্তুরূপে ভিখারীর মতো ভারত-রাষ্ট্রের দুয়ারে করুণাপ্রার্থী। আবার সুরু হইল বাঙালী খেদাইবার ষড়যন্ত্র! নিজেদের দেশের গবর্ণমেণ্ট, নিজেদের রাষ্ট্র আজ বাঙালীকে অত্যাচারে নিপীড়নে জর্জ্জরিত করিতেছে।

সুতরাং প্রশ্ন উঠে, ১৫ই আগষ্টের স্বাধীনতার উৎসব কাহাদের জন্য? উহা কি তাহাদেরই জন্য, যাহারা বাঙালী জাতির রক্তে ও অশ্রুতে দিল্লীর দরবারী-আরাম ভোগ করিতেছেন? কিন্তু কেন আমরা এইভাবে মরিব? কেন কুকুরের মতো এক দুয়ার হইতে আর এক দুয়ারে ঘুরিব?

জানি, এ প্রশ্নের জবাব মিলিবে না। গ

হিন্দী সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতির উক্তি

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ হাইদরাবাদে হিন্দী-প্রচার সভার উপাধিদান আসরে বক্তৃতা প্রসঙ্গে যে সকল কথা বলিয়াছেন, সেগুলির সত্যতা সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতির নিজের পূর্ণ বিশ্বাস থাকিলেও, ভারতের জনসাধারণ ঐ সকল উক্তি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না। তিনি বলিয়াছেন, "ভারতের অনেক বিশেষ বিশেষ স্থলের ভারতবাসীরা হিন্দী শিখিতে অসুবিধা বোধ করেন। কারণ হিন্দী সেই সকল ভারতবাসীর মাতৃভাষা নহে। এই কথাটি হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে সর্ব্বদা মনে রাখা হইয়া থাকে।" তিনি আরও বলেন, "ভবিষ্যতেও ভাষা বিষয়ে রাষ্ট্রীয় পন্থা নির্দ্ধারণ করিবার সময় আমাদের অহিন্দীভাষী ভাইদের কথা আমরা কখনও উপেক্ষা করিতে পারিব না। অন্ততঃ একথা আমি বলিতে পারি যাহা আমাদের প্রধানমন্ত্রী লোকসভায় ও অপরাপর ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে বহুবার বলিয়াছেন যে, হিন্দী কখনও জোর করিয়া কাহারও উপর চাপানো হইবে না।

রাষ্ট্রপতি তৎপরে বলিলেন যে, মাতৃভাষার স্থান ব্যক্তির জীবনে খুবই উচ্চে এবং ভারতের রাষ্ট্রনীতি ও পদ্ধতির মধ্যে সকল স্থানীয় ভাষার অধিকার পূর্ণরূপে সংরক্ষিত করা হইয়াছে এবং প্রাদেশিক উপরাষ্ট্রগুলিকে স্থানীয় ভাষার উন্নতির জন্য পূর্ণ ব্যবস্থা করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। অহিন্দীভাষী ভারতীয়দিগকে রাষ্ট্রপতি বলেন যে, রাষ্ট্রভাষার ব্যবস্থা সমগ্র ভারতের একতা ও উন্নতির জন্যই করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা প্রচলন করা যদি কোন কোন ভারতবাসীর পক্ষে সহজ হয় তাহাতে অপর ভারতবাসীদের এই ব্যবস্থাকে অন্যায় বলিয়া চিন্তা করা উচিত হইবে না। অবশ্য যদি এই ব্যবস্থার ফলে কোন কোন শ্রেণীর লোকের অন্যায়ভাবে নানাপ্রকার সুবিধালাভের পথ খুলিয়া যায় তাহা হইলে সে সকল লাভের পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া যাইবে। অতঃপর রাষ্ট্রপতি হিন্দীর উদ্ভব কি করিয়া হইয়াছে তাহার আলোচনা করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করেন যে, দক্ষিণ ভারতের সাধুরা হিন্দীর গঠনে অনেক সাহায্য করিয়াছেন। এই সকল সাধুরা হিন্দীভাষার উন্নতি করিবার চেষ্টা যে, কোনও রাজনৈতিক কারণে করেন নাই তাহা রাষ্ট্রপতি পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই। দক্ষিণের সাধুদের এই প্রচেষ্টার অনুকরণ বর্ত্তমানকালের অসাধুরা যাহাতে করিতে পারেন সেই আকাঙ্ক্ষা হইতেই এই আলোচনার উদ্ভব।

রাষ্ট্রপতির বক্তৃতা হইতে যে সকল তথাকথিত সত্য আমরা আহরণ করিতে পারি তাহা হইল :—

১। হিন্দীভাষার প্রচার জাতীয় একতার জন্যই করা হইতেছে।

২। এই রাষ্ট্রভাষা প্রচারের ফলে কোন অহিন্দী-ভাষীর উপর কোনপ্রকার অবিচার করিয়া তাহার অসুবিধা বা কোনপ্রকার অধিকার হানি করা হইবে না।

৩। হিন্দীভাষা কাহারও উপর জোর-জুলুম করিয়া চালান হইবে না।

৪। হিন্দী প্রচারের ফলে যদি হিন্দীভাষাভাষী-দিগের কোন অন্যায় সুবিধালাভ ঘটে, তাহা বন্ধ করা হইবে।

৫। প্রাদেশিক উপরাষ্ট্রগুলিকে স্থানীয় ভাষা প্রচার ও গঠনের পূর্ণ অধিকার দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার ফলে সকল ভাষাভাষী ভারতবাসীদের স্বাধীনভাবে নিজ ভাষা ব্যবহার করিবার সুবিধা হইয়াছে।

প্রথম তথ্যটি, অর্থাৎ হিন্দীভাষা জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির জন্যই প্রচার করা হইতেছে ও ভবিষ্যতে হিন্দীকে সেই কারণে রাষ্ট্রভাষা বলিয়া চালান হইবে, সত্য কিনা বিচার করিলে দেখা যায় যে, হিন্দী প্রচারের ফলে জাতীয় অনৈক্যেরই সৃষ্টি হইয়াছে এবং প্রাদেশিক ভাষা-গুলির অপকার ঘটিয়াছে। যদি হিন্দী প্রচারের ফলে অনৈক্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে তাহা হইলে যেখানে একতাই আমাদের রাষ্ট্রের মূলমন্ত্র সেক্ষেত্রে হিন্দী প্রচার অবিলম্বে স্থগিত রাখা উচিত। কিন্তু হিন্দী প্রচার যে সকল প্রদেশে হিন্দী প্রধান ভাষা সে সকল প্রদেশে অপর সংখ্যালঘু জনসাধারণের ভাষার দাবি অগ্রাহ্য করিয়াই চালান হইয়াছে। যথা বিহার প্রদেশ বহু বাঙালী ও আদিবাসীর পুরুষানুক্রমিক বাসস্থান হইলেও সেই প্রদেশের যে সকল জেলায় প্রায় সকল ব্যক্তিই অহিন্দী-

ভাষী সে সকল জেলাতেও হিন্দী প্রবল বিক্রমে প্রচলিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কাল বিহারের মানভূম ও সিংভূম জেলায় এই প্রচেষ্টা ইংরেজ ও হিন্দীভাষী বিহারীদের দ্বারা চালিত হইয়া আসিয়াছে এবং তৎসত্ত্বেও সে সকল জেলায় এখনও বাংলা, মুণ্ডারী, কোল, সাঁওতালী প্রভৃতি ভাষা ব্যক্তিগতভাবে পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। বিহারের উত্তর প্রান্তের জেলা-গুলিতে ভোজপুরী, মৈথিলী ও মাগধীদিগের বাস। ইঁহারা হিন্দীভাষী বলিয়া নিজেদের প্রচার করেন; যদিও ইঁহাদের মাতৃভাষা ভোজপুরী, মৈথিলী ও মাগধী। রাষ্ট্রপতির নিজের মাতৃভাষা সম্ভবতঃ ভোজপুরী। যে সকল জাতি বর্ত্তমানে নিজেদের মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া হিন্দীকেই নিজেদের মাতৃভাষা বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন তাঁহাদের বাস অধিকাংশ বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ। কিছু কিছু পঞ্জাবী ও রাজস্থানী লোকেও হিন্দীকে মাতৃভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই যে হিন্দীকে মাতৃভাষা বলিয়া মানিয়া লওয়া ইহা কোন জাতীয়তাবোধের জন্য ঘটিতেছে না। ইহার কারণ লোভ ও লাভ। অর্থাৎ হিন্দী মাতৃভাষা বলিয়া মানিয়া লইলে চাকুরি, ব্যবসা, সরকারী অর্ডার ও কণ্ট্রাক্ট প্রভৃতি পাওয়া যাইবে এবং পাওয়া যায় এই কারণেই বহু জাতি হিন্দীকে মানিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের যে সুবিধা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে অপর ভাষাভাষীর উপর অন্যায় করা হইয়াছে। ব্রিটিশ আমলেও কিছু কিছু হইয়াছে এবং বিহারে বাঙালী চাকুরেদিগকে নানা ভাবে অপমান ও অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে, হইতেছে ও হইতে থাকিবে। রাষ্ট্রপতি যখন বিহারের নেতা ছিলেন তখন তিনি নিজ উদ্যোগে ও চেষ্টায় কোন বাঙালীর অপকার ঘটাইয়াছেন কি না এ কথার উত্তর তিনি হয়ত এখন দিতে পারিবেন না। কারণ এখন তিনি বিহারী নহেন ভারতের রাষ্ট্রপতি ও সর্ব্ব জাতির একতা-প্রয়াসী। কিন্তু তাঁহার সহকর্মী বিহারী নেতারা এই কার্য্য পূর্ণ উদ্যমে বহুকাল চালাইয়া আসিয়াছেন ও তাহার ফলে আজ জামসেদপুর, ধানবাদ, রাঁচি বা চাঁইবাসায় যাইলে আদালত ও অপর রাষ্ট্রীয় দপ্তরে উচ্চপদে শুধু ভোজপুর, মিথিলা ও মগধবাসীদেরই অধিষ্ঠিত দেখা যাইবে এবং তাঁহারা হিন্দী লিখিয়া অপর অহিন্দীভাষী-দের বিপর্য্যস্ত করিয়া দিন গুজরান করিতেছেন। এই সব হিন্দীভাষী চাকুরের দল শুধু হিন্দীভাষী নহেন, ইঁহা-দের অধিকাংশই জাতিতে ভূমিহার ও কায়স্থ। অল্প কয়েকজন মাত্র অপর জাতীয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বিহারের সকল সুখ-সুবিধার প্রধান অধিকারী হিন্দী-ভাষী কায়স্থ ও ভূমিহার জাতির লোকেরা। তাঁহাদের পরে অধিকার হিন্দীভাষী অপর জাতির বিহারী ও মুসলমানের। সর্ব্বশেষে আসেন স্থানীয় আদিবাসী ও বাঙালী। রাষ্ট্রপতির কথাগুলির প্রথম ও দ্বিতীয় তথ্য তাহা হইলে সত্য নহে।

হিন্দীভাষা কাহারও উপর জোর-জুলুম করিয়া চালান হইবে না একথাও সত্য নহে। কারণ বিহার প্রদেশে রাস্তা চলিতে হইলেও হিন্দী না জানিলে দূরত্ব ও দিক নির্ণয় করা অসম্ভব। সর্ব্বত্র সবকিছু হিন্দীতে লিখিত; এমনকি ইংরেজী লেখাও মুছিয়া তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। লেখাপড়া আদালতের কাজ, দলিলদস্তাবেজ প্রভৃতি সবকিছুই বাঙালী-প্রধান স্থানগুলিতে হিন্দী-ভাষায় লিখিত হইয়া থাকে। এবং আদমসুমারী হিসাবে হিন্দীভাষাভাষীর সংখ্যা মিথ্যা করিয়া বাড়াইয়া দেখান হইয়া থাকে। আসামে যেমন আসামীরা দশ বৎসরে শতকরা ৮৫ জন সংখ্যায় বাড়িয়া গিয়াছে, যাহা বৈজ্ঞানিক ভাবে দেখিলে অসম্ভব; বিহারেরও হিন্দী-ভাষীরা সেই উপায়ে সর্ব্বত্র সংখ্যাগুরু হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দীভাষা সকলকে অন্তরটিপুনি দিয়া শিখান হইতেছে এবং সকলে হিন্দীতে কাজকর্ম্ম করিতে বাধ্য হইতেছেন। অতঃপর সকলেই হিন্দীভাষাভাষী একথা প্রমাণ হইতে বেশী সময় লাগিবে না। শুধু গোলমাল এক বিষয়ে থাকিয়া যাইতেছে। ভূমিহার ও কায়স্থ ব্যতীত বিহারে বুদ্ধি ও কর্ম্মশক্তি কাহারও প্রায় নাই, এই স্বতঃসিদ্ধ মিথ্যার উপর বিহারের শাসনপ্রণালী ও কর্ম্মচারী নিয়োগ-পদ্ধতি নির্ভর করে। ইহার ফলে ভবিষ্যতে বিহারের অপরাপর জাতিদের আত্মরক্ষার জন্যই ঐ দুই জাতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে। ভারতের ঐক্য ও স্বাধীনতার অর্থ যদি এই হয় যে, ভোজপুরী, মৈথিলী ও মাগধী কায়স্থ ও ভূমিহারের হস্তে সকলকে আত্মসমর্পণ করিয়া ঐ সকল ব্যক্তির আর্থিক উন্নতি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য দাসত্বে আবদ্ধ হইতে হইবে তাহা হইলে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম বিফলেই হইয়াছিল বলিয়া জানিতে হইবে। হিন্দী ও অপরাপর প্রাদেশিক ভাষার প্রচার অর্থে যদি ভারতের অপেক্ষাকৃত অল্পশিক্ষিত ও অধিক স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের হস্তে রাজশক্তি তুলিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে সকল ভারতীয় ভাষা বর্জ্জন করিয়া ইংরেজী ভাষাই সর্ব্বত্র প্রচলিত থাকা প্রয়োজন। স্বজাতির (ভূমিহার, কায়স্থ ইত্যাদি) স্বার্থের মধ্যেই যদি কেহ ভারতের প্রগতি বিনষ্ট দেখিতে পান,

তাঁহার উচিত রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অবসর গ্রহণ করিয়া নিজ এলাকায় বসিয়া স্বজাতীয় লোকেদের সেবা করা। যাঁহাদের মনে বৃহত্তর আদর্শের কোন স্থান নাই, যাঁহারা শুধু ক্ষুদ্র স্বার্থমাত্র উপলব্ধি করিতে সক্ষম, তাঁহাদিগের উচিত রাষ্ট্রীয় কার্য্য হইতে সরিয়া যাওয়া। নিজ হইতে না যাইলে, দেশবাসীর উচিত দেশের মঙ্গলের জন্য এই সকল ক্ষুদ্রচেতা মানুষকে উচ্চস্থান হইতে সরাইয়া দেওয়া। ভারতের আজ অশেষ দুরবস্থা, যে সকল পাপাত্মাদের হস্তে পড়িয়া ভারতীয় জাতীয় আদর্শ ক্ষত-বিক্ষত। ভাষা, প্রদেশ, ধর্ম্ম, জাতি, খাদ্য, বস্ত্র অথবা যে কোন ক্ষুদ্র ও অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় বিষয় উত্থাপন করিয়া ইহারা তর্কের সৃষ্টি করিয়া ভারতের উচ্চতর আদর্শগুলিকে নষ্ট করিতে লাগিয়া যান। আজ তাই ভারতবাসীর মধ্যে কোন ভ্রাতৃভাব ও একতা নাই। সকলে সকলকে সন্দেহ করিয়া ও পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া ক্রমশঃ এই মহা-জাতির সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে। একদিকে তথাকথিত কংগ্রেসী ক্ষুদ্র স্বার্থের অনুসরণ ও অপর দিকে কম্যুনিষ্টের রুশী-চীনি দাসত্বের টান; এই দুয়ের মধ্যে পড়িয়া ভারতের জাতীয় শক্তি ও স্বাধীনতার শেষাবস্থা হইয়াছে বলিলে ভুল হয় না।

প্রাদেশিক উপরাষ্ট্রগুলির নিজ ভাষা প্রচারের অধিকার অর্থে ইহাই দাঁড়াইয়াছে যে, প্রত্যেক প্রদেশের সংখ্যাগুরুদিগের ভাষা জোর-জুলুম করিয়া সংখ্যালঘিষ্ঠ-দিগের উপর চালান হইতেছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি সংখ্যা-লঘিষ্ঠদিগের ভাষা রক্ষার যে প্রাদেশিক ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন সে ব্যবস্থা তিনি যাহা বলিয়াছেন ঠিক তাহার বিপরীত। উপরাষ্ট্রীয় ভাষাগুলি প্রদেশের সংখ্যাগুরু-দেরই ভাষা এবং প্রদেশের সংখ্যালঘিষ্ঠদের ভাষাগুলিকে দাবাইয়া দিবার ব্যবস্থা পূর্ণরূপে বহু প্রদেশেই বর্ত্তমান। যথা, বিহার ও আসাম। এই অবস্থায় রাষ্ট্রপতির কথার মূল্য কি ধরা যাইবে? অ

ধর্ম্মঘটের জের

কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘট প্রত্যাহৃত হইয়াছে এক পক্ষ-কালের উপর। কিন্তু তাহার জের আজও মিটে নাই। দেখা যাইতেছে উচ্চপদস্থ কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম্মচারীদের কেহ কেহ এ রাজ্যের অধিবাসী নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীদের প্রতি বিরূপভাবাপন্ন। এই সম্পর্কে ডাঃ রায় যে দুই-চারিটি কথা বলিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর আচরণকে অশোভন হস্তক্ষেপ বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ম্মচারীরা যে ভুল করিয়াছিলেন, তাহা কেহ অস্বীকার করে না, কিন্তু সে ভুলের মাশুল কি শুধু পশ্চিম-বঙ্গের অধিবাসীদেরই দিতে হইবে? অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দ্দেশে এমন কোনও ইঙ্গিত নাই, যাহাতে এই ধরনের পক্ষপাতিত্বমূলক নীতির কোনও সমর্থন পাওয়া যায়। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সরকারকে যে পরামর্শ দিয়াছেন তাহার মূল কথাই হইল, ব্যাপকভাবে শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা সম্বন্ধে। যাহারা নাশকতা-মূলক কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিল তাহাদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা কখনই বেশী হইতে পারে না। যে অনুজ্ঞা নয়াদিল্লীর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার তরফ হইতে পাঠান হইয়াছে বিভিন্ন রাজ্যে, তাহার মর্ম্মকথাও বিশেষ ভিন্ন নয়। তথাপি এইরূপ হইল কেন?

তবে যে-নীতি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি স্থির করিলেন এবং যাহা কেন্দ্রীয় সরকারের অকুণ্ঠ সমর্থন পাইল তাহাও ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইতে পারে যদি তাহা বাস্তবে প্রয়োগ করিবার দায়িত্ব তাঁহারা আন্তরিকতার সহিত পালন না করেন। কোন চতুর ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে সরকারী নীতি সরাসরি উল্লঙ্ঘন না করিয়াও আপন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন।

ইহার প্রতিকার সহজ নয়, কিন্তু অসম্ভবও নয়। কংগ্রেস পার্টি তথা কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চয়ই চান না যে, তাঁহাদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ কেহ আনে। অতএব যদি কোনও অঞ্চল হইতে এই ধরনের প্রতিবাদ উঠিয়া থাকে, তাহার প্রতিকার অবিলম্বেই করা উচিত। পশ্চিমবঙ্গের কর্ম্মীদের পক্ষ হইতে অভিযোগ আনা হইয়াছে যে, সরকারী মর্য্যাদা রক্ষা করিতে বদ্ধ-পরিকর অত্যুৎসাহী কোন কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে। তাচ্ছিল্যের সহিত সেগুলি উড়াইয়া না দিয়া নয়া দিল্লীর রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের উচিত এ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া। ধর্ম্মঘটের ফলে বিপন্ন হইয়াছে বিশেষ করিয়া জনগণের স্বার্থ, সেই জনস্বার্থই ক্ষুণ্ণ হইবে যদি মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তির অবিমৃষ্যকারিতা অসন্তোষের আগুন জ্বালাইয়া তোলে দপ্তরে দপ্তরে। পশ্চিমবঙ্গে এই উপলক্ষ্যে একটা বাঙালী বিতাড়ন-যজ্ঞের অনুষ্ঠানের সূচনা দেখা যাইতেছে বলিয়াই উদ্বেগবোধ করিতেছি। দোষীকে শাস্তি নিশ্চয়ই দিতে হইবে—সে বাঙালীই হউক আর নাই হউক, কিন্তু বিচারের মাপ-কাঠিটা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ না হইয়া শুধু বাঙালীর উপরই পড়িতেছে—ইহাই দুঃখ। গ

আন্দোলন বন্ধ করিতে প্রাচীর ও লৌহ-কপাট

দেশে আন্দোলন, বিক্ষোভ-প্রদর্শন ও শোভাযাত্রার

পথ রুদ্ধ করিতে সরকার এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। দেশে অভাব-অভিযোগ, অনটন যত তীব্র হইয়া উঠিতেছে, ততই আন্দোলন, বিক্ষোভ-প্রদর্শন ও শোভাযাত্রার সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। জনসাধারণের প্রতিকার ও দাবি জানাইবার উহাই অবশ্য প্রকাশ্য পন্থা। কিন্তু উহা প্রতিরোধ করা কি কেবল উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া কিংবা লৌহ-কপাটের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াই নিশ্চিন্ত হওয়া যাইবে?

নয়া দিল্লীর পার্লামেণ্ট ভবনের নিরাপত্তা ও সুশৃঙ্খল কর্ম্ম-পরিচালনা কি উহাতেই সম্ভব হইবে? শুধু পার্লামেণ্ট ভবনে নহে, রাজ্য সরকারের দপ্তরগুলিতেও বিক্ষোভ-প্রদর্শনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। রাজনৈতিক সমস্যা তো আছেই, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সমস্যাও মানুষকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। কল্যাণ-রাষ্ট্রের কল্যাণের স্পর্শ পাইলে মানুষ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে না। অশান্তির অসন্তোষ চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ধরিলেই অসহায় মানুষের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, পারিবারিক, সকল সমস্যাতেই যদি কেবল জটিলতা দেখা দিতে থাকে, এবং জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিতে থাকে, তাহা হইলে মানুষ শান্ত থাকিবে কিরূপে? বিক্ষোভের কারণগুলি কি দূর করা হইতেছে? লৌহ-কপাট বা উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া সাময়িক ভাবে বিক্ষোভকারীদের দূরে রাখা যায় বটে, কিন্তু উহা দ্বারা দেশ রক্ষা পায় না। মানুষের অবাধ অধিকারে ক্রমাগত বাধার সৃষ্টি করা হইতেছে। খাদ্যশস্য ক্রয়ের ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণের বেষ্টনী, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে লাইসেন্স পারমিটের বেষ্টনী, শিক্ষার ব্যাপারে বাধা-নিষেধের নিত্য নূতন প্রাচীর, কর্ম্মসংস্থানের সুযোগে বেষ্টনী! কোথাও কোনো সহজ সরল ব্যবস্থা নাই। রাজ্যের দাবি, ভাষার দাবি; আত্মরক্ষার দাবি, দেশরক্ষার দাবি কোনোটিরই সুমীমাংসা হইতেছে না। সমস্যার পর সমস্যা ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। উহাদের সমাধানের চেষ্টা যত ব্যর্থ হইতেছে, ততই প্রাচীর ও বেষ্টনী দ্বারা আত্মরক্ষার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে। নয়া দিল্লীর পার্লামেণ্ট ভবনের প্রাচীর উঁচু করা বা ছয়টি লৌহ-কপাট দ্বারা বিক্ষোভ-প্রদর্শনকারীদের প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা কি বিক্ষোভ-ভীতির পরিচয় নহে? বিক্ষোভ দমনের চেষ্টা অপেক্ষা বিক্ষোভের কারণ দূর করা বা শান্ত করার চেষ্টা করিলেই বিক্ষোভের সত্যকার প্রতিকার সহজ হইবে। না হইলে সহস্র প্রাচীর দিয়াও ইহা ঠেকানো যাইবে না। গ

স্বতন্ত্র নাগারাজ্য গঠন

অবশেষে এতদিন পরে ভারত সরকার পৃথক নাগা-রাজ্য গঠনের নীতি স্বীকার করিয়া লইলেন। শ্রী নেহরুর সহিত উনিশজন সদস্যের এক প্রতিনিধি দলের বৈঠকে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়। স্থির হইয়াছে, অস্থায়ী সরকারের কাজ চালাইবার জন্য একটি অন্তর্ব্বর্তীকালীন সংস্থা গঠন করা হইবে। এবং ইহার সদর স্থাপিত হইবে কোহিমায়। তবে নূতন রাজ্যের জন্য একজন পৃথক রাজ্যপাল নিযুক্ত হইবেন না।

প্রস্তাবিত নাগারাজ্যের আয়তন হইবে ছয় হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা হইবে প্রায় চার লক্ষ। ঐ রাজ্যের নাম হইবে নাগাল্যাণ্ড। উহার নিজস্ব আইন-সভা ও মন্ত্রিসভা থাকিবে। নাগারা নিজেদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও রীতি-নীতি অনুযায়ী নিজেদের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করিবেন। এই নাগারাজ্যের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রতি বৎসর প্রায় চার কোটি টাকা সাহায্য করিতে হইবে। নাগা নেতৃবৃন্দের সহিত চুক্তির ফলে, নাগাভূমি ভারতের অন্যতম অঙ্গরাজ্যে পরিণত হইবে।

সেই স্বীকৃতিই দিতে হইল, কিন্তু বড় বিলম্বে। বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা বুঝিয়া কেন্দ্রীয় সরকার যদি অঙ্গরাজ্যগুলির পুনর্গঠন ও বিন্যাসে দৃঢ়ভাবে পরিচ্ছন্ন নীতি অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে ভাষা ও জাতিদ্বন্দ্বে ভারতের রাষ্ট্রিক সত্তা বৎসরের পর বৎসর দীর্ণ-বিদীর্ণ হইতে পারিত না। ভারত সরকারের নীতি-নির্দ্ধারণের গোড়াতেই একটি প্রকাণ্ড ভুল ধারণা এই বিপত্তির কারণ হইয়াছে। নূতন রাজ্য গঠনের দাবিমাত্রই বিভেদমূলক, অতএব গ্রহণযোগ্য নয়, এই কথাই তাঁহারা বার বার ঘোষণা করিয়াছেন। আবার অবস্থাগতিকে বার বার তাঁহাদের সিদ্ধান্ত পাল্টাইতেও বাধ্য হইয়াছেন। অন্ধ্ররাজ্য গঠনের দাবি লইয়াও এই বিপত্তি হইয়াছিল, পরে মানিয়া লইয়াছিলেন। গুজরাট-মহারাষ্ট্রের বেলাতেও তাই। অর্থাৎ বিক্ষোভ চরমে না উঠা পর্য্যন্ত তাঁহারা ভুল স্বীকার করেন নাই। এখনও সেই অবস্থা। কোথাও জোড়াতালি দিতেছেন, কোথাও দায়ে পড়িয়া সমস্যা-সমাধানের নূতন পথ ধরিতেছেন।

কিন্তু সমস্যা প্রকৃতপক্ষে শুধু নাগা-অঞ্চল লইয়াই নয়। সমগ্র উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তের পরিস্থিতি লইয়া। শ্রী নেহরু নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, সমস্ত হিমালয় সীমান্ত এখন চঞ্চল, অগ্নিগর্ভ হইয়া উঠিয়াছে। বাহির হইতে যে বিপদ উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত ধরিয়া ভারতের নিরাপত্তা এবং

সংহতি নষ্ট করিতে উদ্যত তাহাকে ঠেকাইতে হইলে, সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলগুলির রাজনৈতিক বিন্যাস স্থানীয় জনসাধারণের মনোমত এবং মজবুত করা প্রয়োজন।

গত দশ বৎসরে নাগাদের লইয়া যে সমস্যা জটিল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার অনেকগুলি আসাম রাজ্যের ভিতরেই সৃষ্ট। অবশ্য ইহাদের দাবির পিছনে কিছু কিছু বৈদেশিক প্ররোচনা আছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু নাগা-অঞ্চলে অশান্তি এবং বিদ্রোহের মূল কারণ হইল, নাগাদের প্রতি অসমীয়াদের জবরদস্ত উপরওয়ালা-সুলভ মনোভাব ও আচরণ। ভারত সরকারও প্রকারান্তরে ইহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। যাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, নাগাদের স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার দিলে, খাল কাটিয়া কুমীর আনা হইবে এবং ভারতের রাষ্ট্রীক নিরাপত্তা ও সংহতি ধ্বংস হইবে, তাঁহাদের এ যুক্তির মূলে কোনো সত্য নাই। আসল প্রশ্ন দুইটি—ভারতবর্ষের মতো বহু-জাতিক ও বহু-ভাষী দেশে বিভিন্ন জাতি ও ভাষা-গোষ্ঠী যাহাতে অন্য কোনো জাতি ও ভাষা-গোষ্ঠীর দ্বারা নিগৃহীত না হয়, সেজন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্ত-শাসনের ভিত্তিতে অঙ্গরাজ্যগুলির পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, দেশের বৈষয়িক ও সামরিক নিরাপত্তার জন্য সমস্ত অঙ্গরাজ্যের ও স্বায়ত্ত-শাসিত অঞ্চলের উপর কতকগুলি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয়-শক্তির কঠোর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা থাকা চাই।

অসমীয়াদের উগ্র প্রাদেশিক সংকীর্ণতাদুষ্ট জবরদস্তিতে নাগারা বিগড়াইতে বসিয়াছিল, আসামের অন্যান্য পার্ব্বত্য উপজাতীয় অধিবাসীরাও বিক্ষুব্ধ। বাংলাভাষীদের উপর যে অত্যাচার চলিয়াছে, তাহাও নিশ্চয়ই ভারত রাষ্ট্রের ঐক্য এবং নিরাপত্তার পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। অতএব দেখা যাইতেছে, নাগাই হউক কিংবা আসামের অন্যান্য পার্ব্বত্য অধিবাসীরাই হউক, কাহাকেও জোর করিয়া অন্য ভাষা-গোষ্ঠীর তাঁবেদার করিয়া রাখিলেই, উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে অরাজকতা বাড়িয়াই চলিবে এবং শত্রুভাবাপন্ন প্রতিবেশী বিদেশী-রাষ্ট্রগুলির সুবিধা বেশী হইবে।

যে কারণে ভারত রাষ্ট্রের আওতায় নাগাদের স্বাতন্ত্র্যের অধিকার আজ মানিয়া লওয়া হইল, ঠিক সেই কারণেই আসামের অন্যান্য অনসমীয়াভাষী অঞ্চলগুলি ঐ রাজ্য হইতে পৃথক করা জরুরী প্রয়োজন। পূর্ব্বাচল রাজ্য গঠনের প্রস্তাব বহুকাল পূর্ব্বে সর্দ্দার প্যাটেল সমর্থন করিয়াছিলেন। সেই সময় ঐ প্রস্তাব কার্য্যকর করা হইলে, সমগ্র উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত জুড়িয়া আজ যে বিভীষিকা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে তাহা কখনই সম্ভব হইত না। আজ কেবল আসামের বাঙালী অধিবাসীরাই উপদ্রুত হয় নাই, প্রজাতন্ত্রী ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন-শক্তিও উপহাসাস্পদ ও পরাজিত হইয়াছে।

গ

তৃতীয় পরিকল্পনায় আমাদের ভবিষ্যৎ

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুতির পথে। এই পরিকল্পনাগুলির উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের অন্ন, বস্ত্র, বাসগৃহ ইত্যাদি মৌলিক প্রয়োজন মিটানো। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। তৃতীয় পরিকল্পনাতেও হইবে বলিয়া মনে হয় না। দ্বিতীয় পরিকল্পনার আগে বিদেশ হইতে জনসাধারণের ভোগ্যপণ্য আমদানি ব্যাপকভাবে সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। অথচ তাহার জন্য প্রয়োজনানুরূপ ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করিতে পারা যায় নাই। এদিকে পরিকল্পনার ফলে দেশের একশ্রেণীর ব্যক্তির হাতে প্রভূত অর্থ আসিয়াছে। এইসব কারণে পরিকল্পনার প্রথম চার বৎসরে দেশে সমস্ত শ্রেণীর পণ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্য শতকরা ৩৩·৭ ভাগ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় শতকরা ৪৪ ভাগ এবং চাউল গম ইত্যাদি তণ্ডুল-জাতীয় খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় শতকরা ৫২ ভাগ। খাদ্যশস্যের এইরূপ মূল্যবৃদ্ধির ফলে দেশবাসীর নিত্য-ব্যবহার্য্য ও অত্যাবশ্যক অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের মূল্যও অল্প-বিস্তর এইভাবে বৃদ্ধি পায়। তাহার ফলে দ্বিতীয় পরি-কল্পনার আমলে দেশের অধিকাংশ ব্যক্তি—যাহাদিগকে খাদ্যদ্রব্য, পরিচ্ছদ ইত্যাদি বাজার হইতে ক্রয় করিতে হয় তাহাদের জীবনযাত্রার মান বিশেষভাবে খর্ব্ব হইয়াছে।

সুতরাং আশঙ্কা হইতেছে, তৃতীয় পরিকল্পনাও দ্বিতীয়ের মত বুঝি ব্যর্থ হইবে। ইহা সকলেই জানেন, কোনও দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং দেশবাসীর অধিকতর পরিমাণে ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দেশে অন্ন, বস্ত্র, বাসগৃহ ইত্যাদির চাহিদা যে হারে বৃদ্ধি পায়, সেই দেশে যদি এইসব জিনিসের সেই হারে যোগান না বাড়ে তাহা হইলেই পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া মনে হইতেছে যে, তৃতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরের মধ্যে ভারতে জনসংখ্যা যেভাবে বাড়িবে এবং এই সময়ে দেশ-বাসীর ক্রয়ক্ষমতা যে হারে বৃদ্ধি পাইবে, সেই তুলনায় দেশে অন্ন, বস্ত্র, বাসগৃহ ইত্যাদির যোগান অনেক কম হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়ায় জানানো হইয়াছে যে, পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরের মধ্যে দেশে জনসংখ্যা ৪৩ কোটি ১০ লক্ষ হইতে ৪৮ কোটিতে বৃদ্ধি পাইবে।

এদিকে এই পাঁচ বৎসরে সরকারী ও বেসরকারী হাত দিয়া যে ১১ হাজার ২৫০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে, তাহারও বহুলাংশ দেশবাসীর হাতে আসিবে। তাহার মধ্যে অবশ্য বহুল পরিমাণ টাকা গবর্ণমেণ্ট রাজস্বের উদ্বৃত্ত, সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির লাভ, দীর্ঘমেয়াদী ঋণ, ক্ষুদ্র সঞ্চয়, প্রভিডেণ্ট ফণ্ড, অতিরিক্ত ট্যাক্স ইত্যাদির মারফতে টানিয়া লইবেন। বেসরকারী শাখাও শেয়ার, ডিবেঞ্চার প্রভৃতির মাধ্যমে দেশ হইতে অনেক টাকা তুলিবেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পরিকল্পনার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর হাতে সঞ্চিত মোট অর্থের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে। গত ১৯৫১-৫২ সনে প্রথম পরিকল্পনা আরম্ভ হওয়ার সময়ে দেশবাসীর হস্তস্থিত অর্থের পরিমাণ ছিল ১৮০৪ কোটি টাকা। এই পরিকল্পনার শেষ বৎসরে উহার পরিমাণ দাঁড়ায় ২১৮৪ কোটি টাকা। গত এপ্রিল মাসের শেষে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২৭৪৪ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ পর্য্যন্ত উহা সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি দাঁড়াইলে বিস্ময়ের বিষয় হইবে না। তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ ৫৫০ কোটি টাকা ধরা হইলেও কার্য্যতঃ উহার পরিমাণ অনেক বেশী হইবে বলিয়াই মনে হয়।

একথা নিশ্চয় করিয়াই বলা যাইতে পারে যে, তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রার ঘাটতি দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলের তুলনায়ও বেশী হইবে। এজন্য এই আমলে বিদেশ হইতে ভোগ্য-পণ্য আমদানির কড়াকড়ি কিছুমাত্রও হ্রাস পাইবে না। বরং এই ধরনের আমদানি অধিকতর সঙ্কুচিত হইতে পারে। আর দেশবাসীর প্রয়োজনীয় দুধ, মাছ, মাংস ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য এবং দেশবাসীর প্রয়োজনীয় বাসগৃহ নির্ম্মাণের জন্য যে নামমাত্র অর্থব্যয়ের বরাদ্দ হইয়াছে, তাহার দ্বারা দেশের ক্রমবর্দ্ধমান জনসমষ্টির অভাব কিছুই মিটিবে না। অবশ্য এই আমলে দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ব্যাপকভাবে চেষ্টা হইবে এবং এই বিষয়টির উপর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অগ্রাধিকারও দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পরিকল্পনায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের যে কর্ম্মপন্থা দেওয়া হইয়াছে, তাহা গতানুগতিক। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এই গতানুগতিক পথে দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু উহাতে আজ পর্য্যন্ত দেশ খাদ্যশস্যের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হয় নাই। এই অবস্থায় আগামী তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে অধিকতর সুফল পাওয়া যাইবে তাহা কি করিয়া মনে করা যাইতে পারে?

তাহা ছাড়া এই পরিকল্পনার আমলে দেশবাসীর ক্রয়-ক্ষমতা বাড়িয়া যাওয়ার জন্য দেশে মুদ্রাস্ফীতির কুফল অধিকতর প্রকট হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট অবশ্য এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত নহেন। তাঁহারা আগামী পরিকল্পনার আমলে দেশে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রিত রাখার জন্য একটি কার্য্যক্রমের বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন। কিন্তু এই ব্যাপারে তাঁহারা কতটা সফল হইবেন তাহা চিন্তার বিষয়। অন্যান্য উন্নত দেশগুলিতে এইরূপ পরিস্থিতিতে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় সমস্ত পণ্যের ব্যবহার, বণ্টন ও মূল্য নিয়ন্ত্রিত করিয়া সমস্যার সমাধান করা হয়। বিগত যুদ্ধের সময় ইংলণ্ড ও অন্য অনেক দেশ এই ব্যবস্থার দ্বারাই মুদ্রাস্ফীতির চূড়ান্ত কুফল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ভারতের মত অনগ্রসর দেশে—যে দেশের গবর্ণমেণ্ট কার্য্যদক্ষ নহেন, যে দেশের সরকারী কর্ম্মচারী দুর্নীতিপরায়ণ এবং যে দেশের জনসাধারণের একাংশ এইরূপ দুর্নীতির সহায়ক, সেই দেশে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা কিছুতেই কার্য্যকরী হয় না। এই ব্যবস্থার আওতায় দেশে ব্যাপক কালোবাজারই গড়িয়া উঠে এবং দেশবাসী চূড়ান্ত দুর্ভোগের মধ্যে পতিত হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্বন্ধেও এই আশঙ্কার সম্ভাবনা প্রচুর রহিয়াছে। গ

সিংহলের প্রধানমন্ত্রীপদে শ্রীমতী বন্দরনায়ক

আততায়ীর হস্তে নিহত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সলোমন বন্দরনায়কের বিধবা পত্নী শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়ক সিংহলের প্রধানমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীলঙ্কা ফ্রীডম পার্টি যে নির্ব্বাচনে জয়লাভ করিবে তাহা অনেকেই অনুমান করিয়াছিলেন। সিংহলীয় পার্লামেণ্টের যে ১৫১টি আসনের জন্য নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ৭৫টি আসন দখল করিয়া শ্রীমতী বন্দরনায়ক পরিচালিত শ্রীলঙ্কা ফ্রীডম পার্টি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু যদি প্রাক্-নির্ব্বাচন চুক্তি বজায় থাকে তবে শ্রীলঙ্কা ফ্রীডম পার্টি পার্লামেণ্টে অন্যান্য দলেরও যথেষ্ট সাহায্য পাইবে। উপরন্তু মন্ত্রীসভারই নির্দ্দেশে গভর্ণর ছয়জন সদস্য প্রেরণ করিবেন।

সিংহলের এই নির্ব্বাচন জনসাধারণের মধ্যে প্রচুর উৎসাহের সৃষ্টি করিয়াছিল। শ্রীমতী বন্দরনায়ক সিংহলের প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হইয়া পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে রেকর্ড স্থাপন করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে কোনো দেশে কোনো নারীকে প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভের সৌভাগ্য অর্জ্জন করিতে দেখা যায় নাই। সামাজিক

ক্ষেত্রে তিনি ইহার পূর্ব্বেই অনেক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। বিপক্ষ দলের অনেকেই প্রচার করিয়াছিল, সিংহলে স্ত্রী-নায়ক হইলে সর্ব্বনাশ হইবে, এবং এই দলটি আবার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হইলে, সিংহলে সামন্ততন্ত্রের জয় হইবে। অন্য কথায়, বড় বড় চা ও রবার বাগিচার ধনী-মালিকেরা, জমিদারেরা এবং বিরাট বিরাট সম্পত্তিশালী পুরোহিত মোহান্তেরা দেশের শাসনযন্ত্রকে প্রভাবিত, এমনকি কৌশলে নিজেদের ইচ্ছামত পরিচালিতও করিতে পারিবে। পরলোকগত বন্দরনায়কের সময়েও রাজনীতিতে ধনী ও সম্পত্তিশালীদের অবাঞ্ছিত প্রভাবের অভিযোগ উঠিয়াছিল এবং তিনি উহার অবসান ঘটাইতে গিয়া বহু শক্তিশালী লোকের বিদ্বেষভাজন হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, শ্রীলঙ্কা ফ্রীডম পার্টি নূতন ক্ষমতা লাভ করিয়া শাসনযন্ত্রকে সঙ্কীর্ণ স্বার্থান্বেষী ধনিক ও বিত্তশালীদের কুপ্রভাব হইতে রক্ষা করিতে পারিবে এরূপ আশা করা যাইতে পারে। সিংহলের আর এক সমস্যা হইতেছে, সেখানকার তামিল ভাষাভাষীদিগকে লইয়া। ইহারা সিংহলীয় ভাষাকে দেশের একক রাষ্ট্রীয় ভাষারূপে প্রচলন করার বিরোধী। তামিল ভাষাকে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করার জন্য ইহারা দাবি করিয়া আসিতেছেন। অথচ সিংহলের জনসাধারণের মধ্যে তামিল ভাষার প্রতি বিরোধিতার মনোভাব বর্ত্তমান। এই ভাষার প্রশ্নেই কিছুকাল পূর্ব্বে সিংহলে ভয়াবহ দাঙ্গা হইয়াছিল। তামিলদের ফেডারেল পার্টি শ্রীলঙ্কা ফ্রীডম পার্টিকে সাহায্য করিতে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে শুনা গেলেও, তাহাদের দাবি কতখানি গৃহীত হইবে বলা কঠিন।

সমস্যার শেষ এইখানেই নয়। সিংহলপ্রবাসী প্রায় দশ লক্ষ ভারতবাসীর সমস্যাও অপর একটি পুরাতন সমস্যা। বহু চেষ্টা করার পরেও, উহা আজও পর্য্যন্ত অমীমাংসিত রহিয়াছে। শ্রীমতী বন্দরনায়কের প্রধান-মন্ত্রিত্বের দ্বারাও সিংহলবাসী হতভাগ্য ভারতীয়গণের দুর্দ্দশা দূরীভূত হইবে কিনা সন্দেহ। তথাপি আমরা আশা করিব, শ্রীমতী বন্দরনায়কের শ্রীলঙ্কা ফ্রীডম পার্টি শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে সিংহল শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হউক, এবং যে সমস্ত গুরুতর সমস্যা সিংহলের জাতীয় জীবনকে পীড়িত করিতেছে, সেগুলির মীমাংসা হউক। সর্ব্বোপরি সিংহল-ভারত সৌহার্দ্দ্য-বন্ধন দৃঢ়তর হউক। গ

স্বাধীনতায় আফ্রিকার কয়েকটি ভূখণ্ড

অতি অল্পদিনের মধ্যেই আফ্রিকার কয়েকটি ভূখণ্ড পর পর স্বাধীন হইয়া গেল। সকলের শেষে স্বাধীনতা পাইয়াছে, তিনটি দেশ—কঙ্গো, মধ্য-আফ্রিকা রিপাবলিক আর চ্যাড। ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের হস্তে সার্ব্বভৌম ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন। ঘোষণা করা হইয়াছে, রাষ্ট্রগুলি পৃথক থাকিবে না। স্বাধীনতা লাভের পর পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইয়া তাহারা একটি সম্মিলিত রাষ্ট্র গঠন করিবে। খুব আনন্দের কথা সন্দেহ নাই। কারণ, পরাধীনতার বেদনা যে কতখানি আমরা তাহা জানি। সেই সঙ্গে একথাও জানি, শুধু স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য নয়, স্বাধীনতাকে রক্ষা করিবার জন্যও ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করিবার প্রয়োজন ঘটে। স্বাধীনতা পরেই আফ্রিকার অন্য একটি রাষ্ট্রে—বেলজিয়ান-কঙ্গোয় যে অশান্তির সৃষ্টি হয়, তাহাতে সত্যই আমরা বেদনাবোধ করিয়াছি। অশান্তির দায়িত্ব যে শুধু আফ্রিকাবাসীদের এমন কথা অবশ্য বলা চলে না। দায়িত্ব আছে শ্বেতাঙ্গ শাসকদেরও। ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনে আজ তাঁহারা আফ্রিকা হইতে বিদায় লইতেছেন বটে, কিন্তু আফ্রিকার দেশগুলি যাহাতে সুশৃঙ্খলভাবে স্বয়ং-শাসিত হইতে পারে, সময় থাকিতে এই শ্বেতাঙ্গ শাসকরা তাহার কোনো ব্যবস্থাই করেন নাই।

সে যাহাই হউক, পরিণামে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে, আপন উদ্যমে আফ্রিকাবাসীদেরই তাহার অবসান ঘটাইতে হইবে। এইজন্যই ক্ষুদ্র স্বার্থের বিসর্জ্জন দিবার প্রয়োজন হয়। অনুমান করি, সদ্য-স্বাধীনতা-প্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলি সেই ত্যাগের পথেই অগ্রসর হইতেছে।

গ

সরকারী সেচ-বিভাগ

সরকারী সেচ-বিভাগ কমিটি মন্তব্য করিয়াছেন, নদী-নালাগুলি—বিশেষ করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার ভাগীরথী ও রূপনারায়ণ এবং এই দুইটি নদ-নদীর সেচ খালগুলি হাজিয়া-মজিয়া যাওয়ার জন্যই বন্যার বিভীষিকা ক্রমশঃ ভয়াল হইয়া উঠিতেছে। এই সব নদী-নালা, খালের সংস্কার ও উন্নতি ব্যতীত সমস্যার প্রতিকার হইবে না। রিপোর্টের এই উপক্রমণিকাটুকু প্রত্যেকেরই জানা। হাজা-মজা নদী-নালা খালগুলি সংস্কারের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, তাহা নির্ণয় করাই কমিটির মুখ্য দায়িত্ব। কিন্তু সরকারী সেচ-বিভাগে গড়িমসির জন্য কমিটি সে সম্পর্কে কোন সুনির্দ্দিষ্ট কার্য্যসূচী রচনা করিতে পারেন নাই। এই কাজের জন্য নদীতে ঋতু ও তিথি-ভেদে জল-প্রবাহের পরিমাণ এবং গভীরতা হ্রাস-বৃদ্ধির

হিসাব, স্রোতের বেগ, নদীর জলে পলিমাটির পরিমাণ, গতিপথ পরিবর্ত্তনের ধারাবাহিক ইতিহাস ও আনুষঙ্গিক তথ্যগুলি প্রয়োজন।

কমিটির রিপোর্টে জানা গিয়াছে যে, রাজ্যসরকার এ পর্য্যন্ত এই সব তথ্য সঙ্কলন করেন নাই, এমনকি তথ্যাদি সংগ্রহ ও সঙ্কলন করার যোগ্যতা কোন কর্ম্মচারীরই নাই। তাঁহারা ভরসা দিয়াছেন আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে রাজ্যে নদী-নালা, খাল-বিল সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ব্যাপক আয়োজন করিবেন। এই কাজের নদীবিজ্ঞান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল একদল তদন্তকারী প্রয়োজন, কিন্তু রাজ্যের সেচ-দপ্তরে কিছুদিন যাবত ইঞ্জিনীয়ারের অভাব ঘটিয়াছে। ইহাই নদীপথ সম্পর্কে ব্যাপক ভাবে জরিপের কাজ ও নদী-শাসনের মডেল তৈয়ারি করিয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ করিতে বিলম্বের হেতু! সুতরাং নিকট ভবিষ্যতে বন্যা-নিয়ন্ত্রণের উপযোগী কোন ব্যাপক কার্য্যসূচী প্রবর্ত্তনের সম্ভাবনা নাই।

প্রতি বৎসরে বন্যার উপদ্রব সরকারের অজ্ঞাত নয়, অথচ গত এক যুগের মধ্যে প্রাথমিক তথ্যাদি পর্য্যন্ত সঙ্কলন করিবার ফুরসুৎ পান নাই। সুতরাং তাঁহারা যে আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে কাজ শেষ ও সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসূচী রচনা করিতে পারিবেন—এ আশা করার কোন কারণ দেখিতেছি না। সরকারী দপ্তরে এ রকম দীর্ঘ-সূত্রতার জন্যই সর্ব্ব-সাধারণের মনে ক্রমশঃ অসন্তোষ দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে।

রূপনারায়ণ নদের অধোগতি সম্পর্কে কমিটির অভিমত সমধিক তাৎপর্য্যব্যঞ্জক। কমিটি মন্তব্য করিয়াছেন, "ভাগীরথীর খাত-বাহিয়া প্রচুর পরিমাণে বানের জল রূপনারায়ণে প্রবেশ করে এবং ইহার খাত ধরিয়া মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান জেলায় শিলাবতী, কংসাবতী, দামোদর প্রভৃতি বিভিন্ন নদীতে প্রবেশ করে। কিন্তু গত কয়েক বৎসরের মধ্যে রূপনারায়ণ নদের গুরুতর অবনতি ঘটিয়াছে। ফলে, ইহার সহিত সংযুক্ত নদী-নালা, খালগুলিরও গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে।

পূর্ব্বে দামোদর নদের খাত ধরিয়া বর্ষার সময় প্রবাহিত প্রবল জলস্রোত তুমুল বেগে রূপনারায়ণের মধ্য দিয়া ভাগীরথীতে প্রবেশ করিত। তাহাতে ভাগীরথীর গর্ভে চরাগুলি এবং উপর দিকে দামোদর ও রূপনারায়ণের গর্ভে মজুত পলি, বালি, প্রভৃতি ভাসিয়া যাইত। দামোদর পরিকল্পনা অনুসারে বাঁধগুলি নির্ম্মাণের পরে ছোট-নাগপুর পাহাড় অঞ্চলে এবং দক্ষিণে দুর্গাপুর পর্য্যন্ত বৃষ্টির জল যতটা সম্ভব আটক করিয়া রাখার নিচের দিকে ঐ দুইটি নদীর খাত ক্রমশঃ ভরাট হইয়া আসিতেছে, ভাগীরথীতে চরাগুলি ভাসাইয়া দেওয়ার জন্য প্রবল বর্ষার জল-নিকাশও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সেজন্য প্রতি বৎসর সঞ্চিত মাটি, বালি ও পলি নিকাশের পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ বেশী করিয়া ভরাট হইতেছে। ইহাই গত কয়েক বৎসরের ভয়াবহ অধোগতির মূল রহস্য।"

প্রতি বৎসর প্রবল বর্ষার সময় কয়েক দফায় দামোদর বাঁধের জল ছাড়িয়া নিচের দিকে নদীগুলির গর্ভ-সংস্কার ব্যতীত ইহার প্রতিকার দুঃসাধ্য। সে ক্ষেত্রে সেচের জন্য দামোদরের ও ইহার উপনদীগুলির জল মজুত করার ব্যয়বহুল ব্যবস্থাদি আংশিক নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু সরকার তাহাতে সম্মত নহেন। সমস্যাটি অত্যন্ত জটিল। অথচ সরকার আজ পর্য্যন্ত এ সম্পর্কে প্রাথমিক প্রস্তুতি পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই।

গ

পাস করিয়াও ফেল

এই বৎসরে মধ্যশিক্ষার পরীক্ষায় সব বিষয়ে পাস করিয়া এবং মোট নম্বরে তৃতীয় বিভাগের পাস-মার্ক অপেক্ষাও বেশী নম্বর পাইয়া জনৈক ছাত্র ফেল করিয়াছে। ইহা কি করিয়া সম্ভব হইল, ভাবিবার কথা! পরীক্ষক, স্ক্রুটিনাইজার, টেব্যুলেটার ইত্যাদি বিভিন্ন সতর্কতার সত্তাগুলি যদি চোখ মেলিয়া কাজ করিয়া থাকেন, তবে এমন ত হইবার কথা নয়! এখন সন্দেহ করা অন্যায় হইবে না যে, এইভাবে অনেক ছাত্রই হয়ত ফেল করিয়াছে। তাহারা ধরা পড়ে নাই—এইটিই পড়িল! শুনিতেছি, এখনও বহু স্কুলে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার ছাত্রদিগের মার্কশীট পৌঁছায় নাই। অথচ মার্কশীট ছাড়া ছাত্রের পক্ষে কলেজে ভর্ত্তি হওয়া অসম্ভব। যে সকল ছাত্রের পরীক্ষার ফল শুধু 'ইনকমপ্লিট' বলিয়া জানাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহাদেরও উদ্বেগ দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। কারণ তাহারা আজও জানিতে পারিতেছে না যে, কোন্ বিষয়ে তাহাদের পরীক্ষার ফল অসম্পূর্ণ। খাতা পরীক্ষা সম্বন্ধে পরীক্ষকের সতর্কতার অভাব বস্তুতঃ আন্তরিকতারই অভাব। ছাত্রের মন, মনোভাব এবং কল্যাণ সম্বন্ধে যথোচিত দায়িত্বসচেতন মন লইয়া নিষ্ঠার সহিত খাতা দেখিবার মত কর্ত্তব্যবুদ্ধিরও অভাব দেখা দিয়াছে। মধ্য-শিক্ষা পর্ষদের পক্ষে এই ধরনের অযোগ্যতার চেয়ে অমর্য্যাদাকর ব্যাপার আর কি-ই বা হইতে পারে?

গ

আমাদের বাসগৃহ

বাসগৃহের সমস্যা আমাদের দেশে ক্রমশঃই জটিল হইয়া উঠিতেছে। খাদ্য-সমস্যার মতই ইহাও একটি মারাত্মক সমস্যা। এ দেশে বাসগৃহের অভাব কি নিদারুণ তাহা নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে: গত ১৯৫১ সনের মাথাগুণতির রিপোর্টে প্রকাশ পাইয়াছে, দেশের প্রত্যেক পরিবারের একটি করিয়া পৃথক বাসগৃহ থাকিবে—এই হিসাবের ভিত্তিতে ঐ সনে দেশে বাসগৃহের ঘাটতি ছিল ২৫ লক্ষ। তাহার পর ১৯৬১ সন পর্য্যন্ত দেশের শহরাঞ্চলে জনসংখ্যা শতকরা ৩৩ জন বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে হইতেছে। এজন্য শহরাঞ্চলে ৪৪ লক্ষ নূতন বাসগৃহ নির্ম্মাণের প্রয়োজন। এ ছাড়া, এই সময়ে শহরাঞ্চলে ২০ লক্ষ পুরাতন বাড়ী ও বস্তির বাড়ী ভাঙিয়া নূতন বাড়ী নির্ম্মাণের প্রয়োজন হইবে। কাজেই ১৯৫১ সনে ২৫ লক্ষ বাড়ীর ঘাটতি লইয়া ১৯৬১ সন পর্য্যন্ত বাড়ীর ঘাটতির সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৯ লক্ষ। তাহার মধ্যে ১৯৫১ হইতে ১৯৬১ সন পর্য্যন্ত দেশের শহরাঞ্চলে ৩০ লক্ষ নূতন বাড়ী নির্ম্মিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। এই হিসাবের ভিত্তিতে তৃতীয় পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হওয়ার সময়ে দেশে ৫৯ লক্ষ বাসগৃহের ঘাটতি থাকিবে বলিয়া মনে হইতেছে। ঐ হিসাবে পল্লী-অঞ্চলে বাসগৃহের ঘাটতির বিষয় বিবেচনা করা হয় নাই। কারণ পল্লী-অঞ্চল হইতে শহরাঞ্চলে ব্যাপকভাবে জনসমাগমের জন্য সেখানে বাসগৃহের অভাব শহরের মত এত জটিল নহে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পল্লী-অঞ্চলে বাসগৃহের সমস্যা রহিয়াছে। অনুমান করা গিয়াছে যে, ১৯৫১ সনে দেশের পল্লী অঞ্চলে যে ৫ কোটি ৪০ লক্ষ বাসগৃহ ছিল তাহার মধ্যে ৫ কোটি বাসগৃহই বাসের অযোগ্য। ন্যাশনাল সেন্সাস সার্ভে অনুযায়ী পল্লী-অঞ্চলের শতকরা ৮৫টি বাড়ীর ভিত কাঁচা, শতকরা ৮৩টি বাড়ীর দেওয়াল কাদা, বাঁশ, কঞ্চি ইত্যাদি দ্বারা নির্ম্মিত এবং শতকরা ৭০টি বাড়ীতে কঞ্চি, কাদা, খড় ইত্যাদির ছাদ রহিয়াছে। পল্লী-অঞ্চলের ৭টি মাত্র বাড়ী পাকা ভিত, পাকা দেওয়াল ও টিনের ছাদের গৌরব করিতে পারে। এই সব বাসগৃহের সংস্কার আবশ্যক। তাছাড়া শহরাঞ্চলে যে ৫৯ লক্ষ বাসগৃহের ঘাটতি রহিয়াছে তাহা ত পূরণ করিতেই হইবে। তাহার উপর আগামী পরিকল্পনার আমলে শহরাঞ্চলে প্রত্যেক বৎসরে শতকরা ৪ জন করিয়া যে লোক বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন বরাদ্দ করিয়াছেন, তাহাদের জন্যও বাসগৃহের সংস্থান করিতে হইবে।

তাই ত বলিতেছিলাম, বাসগৃহের সমস্যা, অতি-গুরুতর সমস্যা। যতই দিন যাইবে, ততই সমস্যা জটিলতর হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয়, তৃতীয় পরিকল্পনার এই সমস্যাদি এক প্রকার উপেক্ষিত হইয়াছে। কারণ পরিকল্পনামূলে সরকারী হাত দিয়া মোট ৭২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ের মধ্যে দেশে গৃহনির্ম্মাণে মাত্র ১২০ কোটি টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ হইয়াছে। চলতি পরিকল্পনার আমলে গবর্ণমেণ্ট নিম্ন-মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত, কলকারখানার শ্রমিক, বস্তিবাসী, আশ্রয়প্রার্থী ইত্যাদি শ্রেণীর বাসগৃহের সংস্থান এবং জমির উন্নতিবিধান করিয়া, উহাকে বাসোপযোগী করিবার যেসব কার্য্যক্রম চালু করিয়াছেন তাহার জন্যই এই টাকা ব্যয়িত হইবে।

অবশ্য একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, দেশের অধিবাসীদের প্রয়োজনীয় সমস্ত বাসগৃহের জন্য টাকা দেওয়া কোনো দেশের গবর্ণমেণ্টেরই সাধ্যায়ত্ত নয়। প্রত্যেক দেশে বে-সরকারী অর্থেই প্রয়োজনীয় বাসগৃহের অধিকাংশ নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

পরিকল্পনার খসড়ায় জানান হইয়াছে, দেশের নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিগণ যাহাতে তাহাদের নিজস্ব বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারে, তাহার জন্য আগামী পরিকল্পনার আমলে বিভিন্ন রাজ্যে কতকগুলি হাউসিং ফিনান্স কর্পোরেশন স্থাপনের জন্য গবর্ণমেণ্ট সঙ্কল্প করিয়াছেন। কিন্তু এইসব কর্পোরেশনের অর্থসঙ্গতি কিরূপ হইবে, এই অর্থ কি ভাবে সংগৃহীত হইবে এবং এই অর্থ হইতে দেশবাসীকে গৃহনির্ম্মাণের জন্য কি সর্ত্তে টাকা ধার দেওয়া হইবে, সে সম্বন্ধে পরিকল্পনার খসড়ায় কিছু জানানো হয় নাই। বলা হইয়াছে, পরিকল্পনার চূড়ান্ত রিপোর্টে এই বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইবে।

অন্যান্য দেশে দেশবাসীর গৃহ-সমস্যার সমাধানে এই ধরনের কর্পোরেশন ও বিল্ডিং সোসাইটি বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়াছে। ভারতেও তাহা সম্ভবপর। কিন্তু ভারতে পরিকল্পিত হাউসিং ফিনান্স কর্পোরেশনগুলিকে যদি এই দায়িত্ব পালন করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদের হাতে যাহাতে প্রচুর অর্থ আসে, সে ব্যবস্থা করিতে হইবে। উহার কতটা সম্ভাবনা আছে তাহা বুঝিতেছি না। গ

বিনোবাজীর নূতন ব্রত

সংবাদপত্রে দেখিতেছি, ভূদানযজ্ঞের নেতা আচার্য্য বিনোবা ভাবে আবার এক নূতন ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। এবারে তাঁহার লক্ষ্য হইল, শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদিগকে সস্তাদরে খাদ্যশস্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্যে

তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন, সরকার মিউনিসিপ্যালিটি, পঞ্চায়েৎ ও কল-কারখানার অধীনে প্রত্যেক শ্রমিক ও কর্মচারীকে মণ প্রতি ১৬৲ টাকা দরে প্রতি মাসে দুই মণ খাদ্যশস্য সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার ফলে খাদ্যশস্যের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধিজনিত ক্লেশহ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ্য বাজারের উপর চাপও হ্রাস পাইবে।

প্রস্তাবটির মধ্যে অবশ্য কোন নূতনত্ব নাই। গত মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সহিত সংশ্লিষ্ট কর্মীদিগকে বাঁধা দরে খাদ্যশস্য এবং আরও কয়েক প্রকার অত্যাবশ্যক খাদ্য-সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। যুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগের জন্য ইহার যৌক্তিকতা থাকিতে পারে। কিন্তু শান্তির সময় দেশে বিশেষ কোন শ্রেণীর জন্য এই প্রকার পক্ষপাতিত্বমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনের কোনো সার্থকতা নাই। খাদ্যশস্যের দর চড়িবার জন্য ভারতে প্রত্যেক নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র ব্যক্তি বিপন্ন হইয়াছে, মোট লোক-সংখ্যার মধ্যে ইহাদের হার শতকরা ৮৫ জনের কম নয়। বিনোবাজীর প্রস্তাবটি গ্রহণ করিলে, তাহার মধ্যে বড় জোর ২০ শতাংশ লোক সস্তাদরে খাদ্যশস্য পাইবে। আর ইহাদিগকে সস্তায় খাদ্যশস্য সরবরাহের জন্য অতিরিক্ত খরচটা করভার বাড়াইয়া কিংবা দর চড়াইয়া সর্বসাধারণের নিকট হইতে উশুল করা হইবে। ফলে শ্রমিক ও কর্মচারী ব্যতীত অন্যান্য দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত-দিগের সংসার খরচ আরও বাড়িয়া যাইবে। নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র শ্রমিক এবং কর্মচারীরাও সম্ভবতঃ এইরূপ পক্ষপাতিত্ব ভোগ করিতে সম্মত হইবে না। ভারতীয় সংবিধানের মূলনীতির দিক হইতেও প্রস্তাবটি আপত্তি-কর। শ্রেণীভেদশূন্য সমাজ গড়িয়া তোলাই সংবিধানের লক্ষ্য। বিনোবাজী ইহা চিন্তা করিয়া দেখিবেন আশা করি। গ

বারাসাত সরকারী কলেজ

'বারাসাত' পত্রিকায় নিম্নের এই সংবাদটি বাহির হইয়াছে :

"বারাসাত সরকারী কলেজের ছাত্র এবং অভিভাবক মহলে ক্ষোভ দেখা যাইতেছে। বারাসাতের সরকারী কলেজ ইণ্টারমিডিয়েট হইতে ডিগ্রী কলেজে উন্নত হইলেও এখন পর্য্যন্ত বি. এস-সি-বিভাগ এবং কলা ও বিজ্ঞান উভয় ক্ষেত্রেই অনার্স লইয়া ছাত্রদের পড়িবার সুযোগ দেওয়া হয় নাই। ইহার ফলে স্থানীয় মেধাবী ছাত্রগণ অনার্স লইয়া স্থানীয় কলেজে পড়িতে পারিতেছে না, এই সমস্ত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীগণ বাধ্য হইয়া কলিকাতার কলেজে ভর্তির জন্য ছুটিতেছে। বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রগণ আই. এস. সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্থানীয় কলেজে ডিগ্রী কোর্স পড়িতে পারিতেছে না। বি. এস. সি. পড়ার জন্য তাহাদিগকেও কলিকাতার পথে ছুটিতে হইতেছে। কলিকাতা যাতায়াত অথবা হোষ্টেলে থাকিবার আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য স্থানীয় কলেজ হইতে বিজ্ঞান বিভাগে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদিগকে কলা-বিভাগের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে হইতেছে। বারাসাতের সরকারী কলেজের বৃহৎ দ্বিতল ভবন নির্মাণের পর স্থানের সমস্যা একরূপ মিটিয়াছে কিন্তু সরকার যে কেন এই কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদিগকে পূর্ণ শিক্ষার সুযোগ দিতেছেন না ইহার কারণ জানা যায় নাই।" গ

প্রাচীন ভেষজের গুণাগুণ

পেনিসিলিনের আবিষ্কারক আর ইহজগতে নাই। কিন্তু আজ তিনি জীবিত থাকিলে শুনিয়া বিস্মিত হইতেন, যে-উপাদান হইতে এই পেনিসিলিনের উদ্ভব সেই ছত্রাক জাপানীরা অতি প্রাচীনকাল হইতে ক্ষতস্থানে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। অবশ্য ইহাতে প্রমাণিত হয় না, তাঁহারা অ্যাণ্টি-বাইওটিক বিশেষজ্ঞের মতো প্রতিভাধর চিকিৎসক ছিলেন। ইহা অবৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানমতো বহু ভেষজ আমাদের দেশেও বহুদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে—যাহা পরে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এই প্রাচীনের বিজ্ঞান শুধু পাইয়াই সন্তুষ্ট ছিল, জানিয়া সন্তুষ্ট হইবার প্রয়োজনবোধ করে নাই। আধুনিক বিজ্ঞান না জানিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই।

এখন প্রশ্ন করিতে পারা যায়, আধুনিক ভেষজ-বিজ্ঞানী যদি আরও আগে প্রাচীন ছত্রাকের খবরটা পাইতেন, তবে কি অ্যাণ্টি-বাইওটিকের আবিষ্কার ত্বরান্বিত হইত না? আধুনিক ভেষজ-বিজ্ঞানের গবেষক বস্তুতঃ আক্ষেপের স্বরে এই কথা বলিতেছেন। কিন্তু মনে হয়, প্রাচীনের সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানীর যে-মনোভাব ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা তুচ্ছতা ও উপেক্ষার মনোভাব। একশত বৎসর আগে যদি কোনো আধুনিক ভেষজ-বিজ্ঞানী এই ছত্রাকের ব্যবহার দেখিতেন, তবু তাঁহার কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইত কিনা সন্দেহ। আলবেরুনি লিখিয়াছেন, ভারতীয় হিন্দুরা মানবদেহে অঙ্গ-যোজনা করিবার কৌশল জানে। তিনি ভারতে তিনহস্তবিশিষ্ট মানুষ দেখিয়াছিলেন, যাহার দুইটি হস্ত অকৃত্রিম, তৃতীয়টি কৃত্রিম। অর্থাৎ

অন্তের দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন একটি হাত তাহার অঙ্গে যোজিত হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানী আলবেরুনির বিবরণ নিতান্ত কল্পনা বলিয়া ধারণা করিতেন। কিন্তু লর্ড রোনাল্ডসে যখন লিখিলেন, তিনি কুম্ভমেলায় এইরূপ সাধু দেখিয়াছেন, যাহাদের দেহে অপরের দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন অঙ্গ সংযোজিত হইয়া স্বাভাবিক অঙ্গে পরিণত হইয়াছে। তখন তাঁহারা বিস্মিত হইয়াছিলেন। পরে অবশ্য বহু শরীর-বিজ্ঞানী গবেষক ভারতে আসিয়া অনুসন্ধান করিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাইয়াছিলেন।

আধুনিক ভেষজ-বিজ্ঞানে রেড-ইণ্ডিয়ানদিগের অন্ততঃ পঞ্চাশটি ওষধির দান আছে। ভারতের সর্পগন্ধাও আধুনিক ভেষজ-বিজ্ঞানে একটি বিস্ময়কর ওষধি হিসাবে মর্য্যাদালাভ করিয়াছে। গান্ধীজী লিখিয়াছিলেন, জনৈক শিখ সাধু দুগ্ধের দ্বারা কুষ্ঠ চিকিৎসা করিয়া বহু রোগীকে নিরাময় করিয়াছিলেন।

যদিও আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর কাছে এখন প্রাচীন কৃতিত্বের এই সব তথ্য আর অজ্ঞানতার আবর্জ্জনা বলিয়া বিবেচিত হইতেছে না। বরং তথ্যগুলি তাঁহাদের আধুনিক গবেষণাকেই সাহায্য করিতেছে। গ

আবার মিলবস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি

মিলের কাপড়গুলির মূল্য যে-হারে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে চিন্তিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। এবারের মূল্যবৃদ্ধির আরও একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যাইতেছে। পূর্ব্বে ছিল মিহি কাপড়গুলি দামে চড়া, এবারে দেখিতেছি মোটা ও মাঝারি ধরনের কাপড়গুলির দাম বাড়িয়াছে। এই ব্যবস্থায় দেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিগণই বেশী বিব্রত হইবেন ইহা বলাই বাহুল্য।

এই বর্ত্তমান উচ্চমূল্যের জন্য সম্পূর্ণ কলওয়ালাদের স্বজাতীয় পাইকারী ব্যবসায়ীরাই নিঃসন্দেহে দায়ী। দিল্লীতে ভারত সরকারের ইণ্ডিয়ান কটন টেক্সটাইল কন্‌সালটেটিভ বোর্ডের সভা প্রকারান্তরে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। কিছুদিন হইতে দেশে মিলজাত সূতীবস্ত্রের চাহিদা পূর্ব্বের তুলনায় বেশী দেখা যাইতেছে। এদিকে চলতি বৎসরের জুন পর্য্যন্ত এই ছয় মাসে মিলগুলিতে ২৪৬ কোটি ৬০ লক্ষ গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে। গত বৎসরের ছয় মাসের তুলনায় উহা মাত্র ২ কোটি ১০ লক্ষ গজ বেশী। এইভাবে একদিকে চাহিদা বৃদ্ধি আর অন্যদিকে উৎপাদনের স্বল্পতাহেতু গত জুন মাসের শেষে মিলগুলির হাতে অবিক্রীত বস্ত্রের পরিমাণ ছিল মাত্র ১ লক্ষ ৬২ হাজার বেল। উহা মাত্র দুই সপ্তাহের উৎপাদনের সমপরিমাণ। উৎপাদন চাহিদা ও মজুত মালের এই অবস্থা দেখিয়া এবং শারদীয়া পূজা ও দেওয়ালী আগত ভাবিয়া মিলগুলি ইচ্ছা করিয়াই বস্ত্রের মূল্য চড়াইয়া দিয়াছে ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

অথচ ইহা জানিয়া-শুনিয়াও সরকার এই ব্যাপারে এখনও কলওয়ালাদের মাত্র অনুরোধ-উপরোধ করিয়াই নিজেদের কর্ত্তব্য শেষ করিতেছেন। গত ৩০শে জুলাই দিল্লীতে সূতীবস্ত্র উপদেষ্টা পর্ষতের এক বৈঠকে ভারতের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী কলওয়ালাদের বস্ত্রের মূল্য হ্রাস করিতে অনুরোধ জানান। এই সম্পর্কে তিনি কলওয়ালাদের সমক্ষে বস্ত্র ও সূতার বাণ্ডিলের উপর মূল্যের ছাপ দেওয়া, মূল্যের হার প্রচার করা, নিজ নিজ দোকানের মাধ্যমে বস্ত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা, অধিকতর পরিমাণে মোটা ও মাঝারি ধরনের বস্ত্র উৎপাদন করা, তাঁতীদের ন্যায্যমূল্যে সূতা দেওয়া ইত্যাদি কতকগুলি প্রস্তাবও উত্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার এইসব উপদেশ হইতে মনে হয় যে, কলওয়ালারাই এই মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী, তাহা তিনি অবগত নহেন। কলওয়ালারা অবশ্য বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রীকে মুখে আশ্বাস দিলেও কার্য্যতঃ তাঁহারা এই লাভ ছাড়িতে পারিবেন না।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়ায় আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে যে, সরকার পণ্যদ্রব্যের—বিশেষ করিয়া জনসাধারণের ভোগ্য পণ্যদ্রব্যের—মূল্য স্থির রাখার ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু আমরা একাধিকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, শারদীয়া পূজা ও দেওয়ালীর পূর্ব্বে কলওয়ালা ও ব্যবসায়ীরা নানা কারসাজিতে চিনি, বস্ত্র ইত্যাদির মূল্য চড়াইয়া দিয়াছেন এবং এইভাবে কলওয়ালা ও ব্যবসায়ীরা কোটি কোটি টাকা মুনাফা লুটিবার পূর্ব্বে সরকার উক্ত ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজনবোধ করেন নাই। বর্ত্তমানে বস্ত্রের ব্যাপারেও ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। বরং পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রিত রাখা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের কোন আন্তরিকতার পরিচয় পাইতেছি না। কারণ এই ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের একটা বড়রকম স্বার্থ রহিয়াছে। কলওয়ালা ও ব্যবসায়ীরা যদি অত্যধিক লাভ করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে সরকার এই লাভের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ আয়কর হিসাবে পাইবেন, সরকারের এই নিশ্চেষ্টতার মূলে উহাই কারণ নহে কি?

কারণ যাহাই থাকুক, দরিদ্র জনসাধারণ যে মরিতে বসিল!

গ

কবি শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

গত ১১ই জুলাই কবি শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা পরলোক-গমন করিয়াছেন। তিনি 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ'-এর সহ-সম্পাদকরূপে দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর যুক্ত ছিলেন। কর্মের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠা না থাকিলে, এই ভাবে কাজ করা কাহারও পক্ষে সম্ভব হইত না।

১৮৯২ সনের জানুয়ারী মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ, বি-এল পাস করিয়া তিনি ব্যাঙ্কশাল কোর্টে ওকালতি করিতে সুরু করেন। কিন্তু এ-জীবন তাঁহার ভাল লাগে না। অতঃপর তিনি একান্ত ভাবে সাহিত্য-সাধনায় মনোনিবেশ করেন। পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সাহিত্যানুরাগ রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় ও প্রভাবে ছাত্র-জীবনেই তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করে। তখনকার দিনের মানসী ও মর্ম্মবাণীতে তাঁহার প্রথম কবিতা প্রকাশিত হইয়া আদৃত হয়। পরে অবশ্য প্রবাসী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁহার বহু রচনা বাহির হইয়াছে। প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সাহিত্যিক-চক্রের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তাঁহার সম্পাদিত 'সবুজ-পত্রে' শৈলেন্দ্রকৃষ্ণের অনেক কবিতাই বাহির হইয়াছে। 'ছোট গল্প' নামক সাপ্তাহিক-পত্রের সম্পাদকও ছিলেন কিছুকাল। তাঁহার প্রবন্ধগুলির মধ্যেও উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়াছে। লিখিয়াছেন তিনি অনেক। লিখিবার মতো পাণ্ডিত্যও ছিল অসাধারণ। ইংরেজী ও বাংলায় সমান ব্যুৎপত্তি ছিল তাঁর। কিন্তু এত লিখিয়াও, সাহিত্যিক-মহলে তাঁহার কোনো স্বীকৃতি নাই ইহাই আশ্চর্য্যের কথা! ইহার একমাত্র কারণ বোধ হয় গ্রন্থাভাব। তিনি একখানি বইও প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। আমাদের দেশে প্রতিভার সমাদর আজিকার দিনে এইরূপই। নিজের ঢাক নিজে না পিটাইতে পারিলে বড় হওয়া যায় না। অবশ্য এজন্য তাঁহার কোনো ক্ষোভ ছিল না। নীরবে কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন, ফলের প্রত্যাশা করেন নাই।

মানুষ হিসাবেও তাঁহার তুলনা হয় না। এমন নির্ব্বিরোধী সরল মানুষ আজকের দিনে বিরল।

গ

গল্প-প্রতিযোগিতার ফলাফল

পুরস্কার	গল্পের নাম	লেখকের নাম
প্রথম পুরস্কার ১০০৲	মরুতৃষা	শ্রীধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায়
দ্বিতীয় পুরস্কার (দুইটি প্রত্যেকটির জন্য) ৭৫৲	ঈশ্বরের জন্ম	শ্রীদীপক মজুমদার
	খাতা	শ্রীমতী সাধনা কর
তৃতীয় পুরস্কার (পাঁচটি প্রত্যেকটির জন্য) ৫০	সম্মোহন	শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়
	সমাবর্ত্তন	শ্রীঅমলেন্দু বন্দোপাধ্যায়
	রজনীগন্ধা	শ্রীমতী স্নিগ্ধা সান্যাল
	রূপজ	শ্রীমতী হেনা হালদার
	শিল্পসম্ভবা	শ্রীসুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শঙ্করের শুদ্ধ জ্ঞানবাদ

ডক্টর রমা চৌধুরী

মোক্ষ-সাধনরূপে যে দুটি প্রধান মতবাদ বেদান্ত-দর্শনে প্রচলিত আছে, তা হ'ল "জ্ঞানবাদ" ও "ভক্তিবাদ"। নাম থেকেই অনায়াসে বোঝা যাবে যে, প্রথম মতবাদের মতে, জ্ঞান এবং দ্বিতীয় মতবাদের মতে, ভক্তিই হ'ল মোক্ষের সাক্ষাৎ-সাধন। অবশ্য, এই দুটি মতবাদানুসারেই মোক্ষের ক্ষেত্রে জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ই প্রয়োজন। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল এই নিয়েই যে, এ দুটির মধ্যে কোনটি অপরোক্ষ এবং কোনটিই বা পরোক্ষ-সাধন।

দার্শনিকশ্রেষ্ঠ শঙ্করের মতে একমাত্র জ্ঞানই হ'ল মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধক, ভক্তি নয়। শঙ্কর ছিলেন কেবলাদ্বৈতবাদী, এবং সেজন্য যে ভক্তির প্রকৃতিতেই দ্বৈতবাদ নিহিত হয়ে রয়েছে, সেই ভক্তিকেই তিনি স্বভাবতঃই স্থান দিতে পেরেছেন কেবল ব্যবহারিক স্তরেই মাত্র। এই কারণে, শঙ্করপ্রমুখ সমস্ত অদ্বৈতবাদীগণই শুদ্ধ-জ্ঞানবাদী।

'শুদ্ধজ্ঞানের' অর্থ কি? অর্থ হ'ল 'আত্মজ্ঞান' বা ব্রহ্মজ্ঞান, অর্থাৎ, আত্মা ও ব্রহ্মের একত্ব ও অভিন্নত্ব জ্ঞান। একমাত্র এই জ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞান নিবারিত হয়—অন্ধকার দূর করবার জন্য আলোক ব্যতীত আর অন্য কি যোগ্য হতে পারে? এই ভাবে, অদ্বৈতমতে, ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা জীবের অজ্ঞানান্ধকার দূর হলে, তার নিত্যমুক্ত, নিত্য-বিরাজমান ব্রহ্ম-স্বরূপটি উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠে; এবং এই ত হ'ল জীবের পরমধন "মোক্ষ" বা "মুক্তি"।

এ স্থলে একটি আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে। সেটি হ'ল এই :

একমাত্র ব্রহ্মই যদি সত্য হ'ন, ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত আর সবই যদি মিথ্যা হয়, অর্থাৎ, সর্বপ্রকার ভেদেরই যদি অস্তিত্বই না থাকে, তা হলে প্রমাণ-শাস্ত্র, বিধিনিষেধ-শাস্ত্র এবং মোক্ষ-শাস্ত্র একই সঙ্গে ও একই ভাবে বাধিত হয়ে যায়। কারণ, এই সকল শাস্ত্রই সমভাবে ভেদমূলক। এমনকি মোক্ষ-হেতু-ভূত মোক্ষ-শাস্ত্রেও গুরু-শিষ্যের ভেদ অনিবার্য। সেক্ষেত্রে, মোক্ষ-শাস্ত্রও জাগতিক অন্যান্য বস্তুর ন্যায় মিথ্যা হয়ে পড়ে। সুতরাং—

"কথং চানৃতেন মোক্ষ-শাস্ত্রেণ প্রতিপাদিতস্যাত্মৈকত্বস্য সত্যত্বমুপপদ্যেত ইতি।" (ব্রহ্মসূত্র শঙ্কর ভাষ্য, ২।১।১৪)

মিথ্যা মোক্ষ-শাস্ত্রে প্রতিপাদিত অদ্বৈতবাদ কিরূপে সত্য হতে পারে।

এর উত্তরে শঙ্কর বলছেন যে, ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত, ব্যবহারিক দিক থেকে, জগৎ সত্য, যেমন জাগরণের পূর্ব পর্যন্ত স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থও সত্য। এই কারণে যতদিন পর্যন্ত মুমুক্ষু মুক্ত না হন, ততদিন পর্যন্ত নিশ্চয়ই তাঁর গুরুর নিকট থেকে প্রাপ্ত-জ্ঞানও সত্য বলেই পরিগণিত হয়।

কিন্তু পুনরায় প্রশ্ন হতে পারে যে, ব্যবহারিক দিক থেকে সত্য হলেও ভেদমূলক জ্ঞান ত প্রকৃতপক্ষে বা পারমার্থিক দিক থেকে 'সত্য' নয়; সেক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে বা পারমার্থিক দিক থেকে 'মিথ্যা' জ্ঞান কিরূপে প্রকৃতপক্ষে বা পারমার্থিক দিক থেকে 'সত্য' মোক্ষের সাধক হতে পারে? যেমন, রজ্জুতে দৃষ্ট 'মিথ্যা' সর্পের দংশনে মরণ হতে পারে না, 'মিথ্যা' মৃগতৃষ্ণিকার পানাবগাহনাদিও সম্পন্ন হতে পারে না—তেমনি 'মিথ্যা' মোক্ষ-শাস্ত্রেও মোক্ষ হতে পারে না।

এর উত্তরে শঙ্কর বলছেন যে, মিথ্যা হলেও, সর্প-দর্শনে যে শঙ্কার উদয় হয়, তাতে মরণও হতে পারে; স্বপ্নকালে, স্বপ্নদৃষ্ট জলে পানাবগাহনাদিও হয়।

কিন্তু পুনরায় আপত্তি হতে পারে যে, এই সকল কার্যাদিও মিথ্যা।

তার উত্তরে শঙ্কর বলছেন যে,—

"যদ্যপি স্বপ্নদর্শনাবস্থস্য সর্প-দংশনোদক-স্নানাদি কার্যমনৃতং তথাপি তদবগতিঃ সত্যমেব ফলং, প্রতিবুদ্ধস্যাপ্যবাধ্যমানত্বাৎ।" (ব্রহ্মসূত্র-শঙ্কর ভাষ্য, ২।১।১৪)

অর্থাৎ যদিও স্বপ্নের সর্প-দংশন, স্নানপানাদি কার্য মিথ্যা, তথাপি তাদের যে জ্ঞান, তা ত মিথ্যা নয়, যেহেতু স্বপ্নভঙ্গের পরে ঐ সকল কার্য মিথ্যা বলে জানতে পারলেও, তাদের জ্ঞানও যে মিথ্যা, এরূপ কেহই মনে করেন না। এরূপে স্বপ্ন-জ্ঞান জাগ্রৎকালেও অনুবর্তন করে বলে, এই প্রমাণিত হয় যে, চার্বাকদের দেহাত্মবাদ অসিদ্ধ। যদি এই মতানুসারে, দেহ ও আত্মা অভিন্ন হ'ত, তাহলে যিনি স্বপ্ন দেখেছেন যে, তিনি এক ভীষণ শ্বাপদ হয়েছেন, সেই জ্ঞান জাগ্রৎকালে থাকত না (ভামতী)।

পুনরায়, যদি এই স্বপ্ন-জ্ঞানকে মিথ্যা বলেও গ্রহণ করা যায়, তা হলেও মিথ্যা-জ্ঞানও যে সত্য ফলের কারণ হয়, তারও দৃষ্টান্তের অভাব নেই। যেমন, স্বপ্নে মিথ্যা স্ত্রী-দর্শন করলে, সত্য সমৃদ্ধিলাভ হয়, মিথ্যা সঙ্কেতের দ্বারা 'অ'কার প্রমুখ সত্য রেখাজ্ঞান হয়, ইত্যাদি।

একই ভাবে, গুরু-শিষ্য-ভেদমূলক মিথ্যা মোক্ষ-শাস্ত্রও সত্য মোক্ষ বা ব্রহ্মোপলব্ধির সাধক হতে পারে।

এস্থলে শঙ্কর একটি মূলীভূত বিষয়ের আলোচনা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সংক্ষিপ্ত ভাবে করেছেন। অদ্বৈত-বেদান্তের একটি প্রধান সমস্যা হ'ল এই :

যদি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডই মিথ্যা মায়ামাত্রই হয়, তাহলে শাস্ত্রও মিথ্যা, গুরুও মিথ্যা, অন্তঃকরণও মিথ্যা; অন্তঃকরণের সাহায্যে যে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", "অহং ব্রহ্মাস্মি" রূপ জ্ঞান হয় তাও মিথ্যা। অর্থাৎ, "শ্রবণ", "মনন" ও "নিদিধ্যাসন" রূপ যে সাধনত্রয়ই হ'ল মোক্ষের সাধক—তা সবই অন্তঃকরণের দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়। সেজন্য স্বয়ং অন্তঃকরণই যদি 'অজ্ঞানের' ফলরূপে 'মিথ্যা' হয়, তাহলে সেই 'অজ্ঞান-কার্য', 'মিথ্যা-স্বরূপ' অন্তঃকরণে ভেদমূলক ও সেজন্য অজ্ঞান-প্রসূত মিথ্যা-শাস্ত্রের সাহায্যে যে জ্ঞানের উদয় হয়, তা প্রকৃতকল্পে 'জ্ঞান' নয়, 'অজ্ঞান'। সেজন্য, এরূপ 'অজ্ঞান' ব্রহ্মে জগদ্‌জ্ঞানরূপ যে 'অজ্ঞান' সকল অনর্থের মূল, তা দূর করতে পারে না, যেহেতু এক 'অজ্ঞান' অন্য 'অজ্ঞান' ধ্বংস করবে কি করে? একমাত্র 'জ্ঞানই' ত 'অজ্ঞান' বিনাশ করতে পারে।

শঙ্কর সাধারণ দিক থেকে, এই সমস্যার তিন ভাবে সমাধান করবার প্রচেষ্টা করেছেন। প্রথমতঃ, তিনি অদ্বৈত-বেদান্তের সুবিখ্যাত "সত্তা-ত্রৈবিধ্যবাদ" অবলম্বনে বলেছেন যে, শাস্ত্রবাক্য ও গুরুবাক্য থেকে যে জ্ঞানলাভ করা যায়, তার ব্যবহারিক সত্যতা নিশ্চয়ই আছে। দ্বিতীয়তঃ, তিনি বলেছেন যে, ভ্রমের অবসানে ভ্রমদৃষ্ট বস্তুর অবসান হলেও, তার "অবগতির" অবসান হয় না। তৃতীয়তঃ, তিনি বলেছেন যে, মিথ্যাজ্ঞানও সত্য-ফলের জনক হতে পারে অনায়াসে।

শঙ্করের এই প্রচেষ্টা সকলের যুক্তিসঙ্গত বলে' মনে নাও হতে পারে—বিশেষ করে, তাঁর দ্বিতীয় সমাধান। স্বপ্নদৃষ্ট স্নানাদি কার্য জাগ্রৎকালে মিথ্যা বলে বোধ হয় অথচ, তার "অবগতি" সত্যই থেকে যায়—এ' যেন স্বনিরুদ্ধ বলেই মনে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রকৃত কথা হ'ল এই :

শঙ্করের মতে, ব্যবহারিক জগতের প্রয়োজনীয়তা অল্প নয়। যেহেতু ব্যবহারিক স্তরে নিষ্কাম কর্ম, ভক্তি ও উপাসনার মাধ্যমেই ক্রমশঃ শুদ্ধজ্ঞানের স্তরে উপনীত হওয়া যায়। তর্ক ও নিয়মের খাতিরে যদিও বলা হয় যে, সকল ব্যবহারিক জ্ঞানই সমান ভেদমূলক বলে সমান মিথ্যা, তা হলেও প্রকৃতপক্ষে তা নয়। যেমন "আমি চৈত্র এবং তিনি মৈত্র" এই জ্ঞান জাগতিক দিক থেকে সত্য হলেও, অদ্বৈত-বেদান্তের দিক থেকে মিথ্যা। অপরপক্ষে, "আমিই ব্রহ্ম—চৈত্র ও মৈত্র এক ও অভিন্ন" এই জ্ঞান জাগতিক দিক থেকে মিথ্যা হলেও অদ্বৈত-বেদান্তের দিক থেকে সত্য। সেজন্য অন্য কোন উপায় না থাকায়, এই জ্ঞান আপাতঃদৃষ্টিতে ভিন্নসত্তা শাস্ত্র ও গুরুর নিকট থেকে প্রাপ্ত, এবং মিথ্যা অন্তঃকরণে উদ্‌ভাসিত হলেও 'মিথ্যা' নয়, সত্য। বস্তুতঃ, এক্ষেত্রে যে মুহূর্তেই এই মহাসত্য, শাশ্বতসত্য অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হয়, সেই মুহূর্তেই গুরুর সঙ্গে ভিন্নতা-বোধ এবং অন্তঃকরণের প্রতি "অহং-মমত্ব"-বোধ নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে যায়। সেজন্য অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের ন্যায়, এক্ষেত্রেও, নিম্নতর স্তরের সত্য নিজেই নিজেকে নঞর্থক দিক থেকে (Negatively), ধ্বংস করে সদর্থক দিক থেকে (Positively) উচ্চতর সত্তায় পরিপূর্ণতা লাভ করে। যাকে পাশ্চাত্য নীতি-শাস্ত্রে বলে, "Dying to Live" "মরণের মাধ্যমেই জীবন"—তারই উচ্চতম আধ্যাত্মিক প্রকাশই হ'ল এই অনুপম অদ্বৈতবাদ। ব্যবহারিক স্তরেও, সাধারণ সাংসারিক জীবনেও যে স্তরভেদ আছে, তা অদ্বৈতবাদিগণই "সত্তা-ত্রৈবিধ্যবাদে" বিনা দ্বিধায় স্বীকার করে' নিয়েছেন। যেমন পারমার্থিক দিক্ থেকে, রজ্জু-সর্প যেমন মিথ্যা, ঘট-পটও ঠিক তাই। কিন্তু ব্যবহারিক দিক থেকে, সাধারণ জীবন-যাত্রা প্রণালীর দিক থেকে, ঘট-পট সত্য, রজ্জু-সর্প মিথ্যা। একই ভাবে অবগতি, জ্ঞান বা উপলব্ধির দিক থেকেও এরূপ স্তরভেদ আছে। সেজন্যই "আমিই ব্রহ্ম" এই মোক্ষশাস্ত্রজ জ্ঞান এবং "আমিই চৈত্র" এই সাধারণ প্রত্যক্ষজ জ্ঞান এবং "আমিই সার্বভৌম মহারাজ" এই স্বপ্নজ জ্ঞান সমান স্তরের নয়। তৃতীয়টি জাগ্রৎ দশায় বাধিত হয়ে যায়, দ্বিতীয়টি বহু জন্মজন্মান্তরব্যাপী হয়ে, মোক্ষ পর্যন্ত অনুবর্তন করে। কিন্তু প্রথমটি ভেদমূলক ও সেইদিক থেকে 'মিথ্যা' বলে, পরিগণিত হলেও, বাস্তবপক্ষে, মিথ্যা ভেদজ্ঞানেরই নিরাসক। 'মিথ্যা' 'মিথ্যার' বিনাশক হবে কিরূপে—এই প্রশ্ন এস্থলে উত্থাপিত করা চলে না। কারণ, পূর্বেই যা' বলা হয়েছে, "শ্রবণ" ও "মননের" স্তরে তা 'মিথ্যা' হলেও "নিদিধ্যাসনের" স্তরে, "বন্ধ" ও "মোক্ষের" প্রথম

সীমারেখা অতিক্রমের মুহূর্তেই, তা' সমস্ত ভেদ বিনাশ করে সত্যরূপেই প্রতিফলিত হয়।

বস্তুতঃ, "অহং ব্রহ্মাস্মি, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" রূপ অদ্বৈত-জ্ঞান মিথ্যা অন্তঃকরণের দ্বারা সৃষ্ট হয় না. "মুক্তি" নামক নূতন কোনও বস্তু সৃষ্টিও করে না—যে জন্ম মিথ্যা কারণ 'জ্ঞান' কিরূপে সত্য কার্য 'মোক্ষের' সৃষ্টি করতে পারে—এরূপ প্রশ্ন উঠতে পারে। বেদান্তমতে মোক্ষ কোনও নূতন সৃষ্টবস্তু নয়, যেহেতু আত্মা চিরমুক্ত। আত্মার এই নিত্যস্বরূপের আবরণস্বরূপ যে ভেদজ্ঞান, অদ্বৈত-ব্রহ্মজ্ঞান তাই কেবল ধ্বংস করে, সেই আবরণ দূর করে সেই নিত্যস্বরূপকেই পুনরায় উদ্ভাসিত করে তোলে। সেজন্য আপাতদৃষ্টিতে অন্তঃকরণের আধারে যে অদ্বৈত বা ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের উদয় হচ্ছে, তা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অন্তঃকরণের সৃষ্ট বা অন্তঃকরণের সাহায্যে প্রাপ্ত জ্ঞান নয়, তা আত্মারই শাশ্বত স্বরূপ। এরূপে জীবন্মুক্ত গুরু ভেদমূলক দেহাদিরও মাধ্যমে যে অদ্বৈত-ব্রহ্মজ্ঞান শিষ্যকে দান করছেন, এবং মুমুক্ষু শিষ্যও ভেদমূলক অন্তঃকরণাদির মাধ্যমে যে অদ্বৈতজ্ঞান গ্রহণ করছেন—তা মিথ্যা হবে কি করে? অপৌরুষের শাস্ত্র ও জীবন্মুক্ত গুরু মিথ্যা উপদেশ দান কেন করবেন? ব্যবহারিক দিক্ থেকে গুরু শিষ্য থেকে ভিন্ন হলেও,পারমার্থিক দিক্ থেকে যে তা নয়, তা' গুরু নিজেই সুস্পষ্টরূপে জানেন। তা হলেও ব্যবহারিক দিক্ থেকে ভেদমূলক দেহাদির মাধ্যমেই গুরুকে সেই শাশ্বত সত্য অদ্বৈতজ্ঞান বিতরণ করতে হয়—সেজন্য কি সেই জ্ঞান মিথ্যা হয়ে যাবে? একই ভাবে ব্যবহারিক দিক্ থেকে ভেদমূলক দেহাদির মাধ্যমেই শিষ্যকেও সেই জ্ঞান গ্রহণ করতে হয়—সেজন্যও সেই জ্ঞান মিথ্যা হয়ে যেতে পারে না।

বস্তুতঃ, কেবল জগন্মিথ্যাত্ব প্রচারক অদ্বৈত-বেদান্তের ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই এই একই সমস্যার উদ্ভব হয়। যেমন যোগ-শাস্ত্রের মতে. চিত্তবৃত্তি-নিরোধই মোক্ষ। কিন্তু এরূপ চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধ করা হয় চিত্তেরই দ্বারা। কারণ সম্প্রজ্ঞাত যোগের স্তরে বহু বস্তুর স্থলে একটিমাত্র বস্তুতে চিত্ত বা মন সংযোগের ফলে একটিমাত্র চিত্তবৃত্তিই চিত্তে অবশিষ্ট থাকে। পরিশেষে, অসম্প্রজ্ঞাত যোগের উচ্চতম ও সর্বশেষ স্তরে চিত্ত সেই একটিমাত্র বস্তুতেও আর মনঃসংযোগ করে না, তার থেকেও মনোযোগ অপসারিত করে নেয়, ফলে সেই একটিমাত্র অবশিষ্ট চিত্তবৃত্তিও চিত্ত থেকে তিরোহিত হয়ে যায়। এই অবস্থাই হ'ল চিত্তবৃত্তি-নিরোধের অবস্থা, এবং এও হ'ল চিত্তেরই কার্যের ফল। এই ভাবে এ স্থলেও চিত্ত নিজেই নিজের নিরোধের কারণ স্বরূপ হয়। এই ছাড়া অন্য উপায় এক্ষেত্রে কিছুই নেই। একই ভাবে, অদ্বৈত-বেদান্তের ক্ষেত্রেও, অন্তঃকরণের মাধ্যমে উদ্ভাসিত অদ্বৈতজ্ঞান অন্তঃকরণেরই বিলয় সাধন করে। যখন নিম্নতর আধারের মাধ্যমের উচ্চতর লক্ষ্যে উপনীত হতে হয়, তখন সেই নিম্নতর আধার একই সঙ্গে নিজের ধ্বংস-সাধন ও উচ্চতর লক্ষ্যের প্রাপ্তি-সাধন করে; যেমন 'গুটিপোকা' নিজের 'পোকা' রূপের ধ্বংস হলেই 'প্রজাপতি' রূপ ধারণ করতে পারে।

এই ভাবে, 'মিথ্যা' মোক্ষশাস্ত্রোপদিষ্ট এবং 'মিথ্যা' অন্তঃকরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত অদ্বৈত-জ্ঞান কি ভাবে সত্য মোক্ষের সাধক হতে পারে—সেই সমস্যার সমাধান করা যায়।

এই সমাধান সংক্ষেপে, পুনরায়, হ'ল এই:

১। মিথ্যা-শাস্ত্রবাক্য, মিথ্যা-সাধনাদি এবং পরিশেষে মিথ্যা-অন্তঃকরণজাত "অহং ব্রহ্মাস্মি" রূপ ব্রহ্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্ম ও আত্মার অভিন্নত্বজ্ঞান, মিথ্যা অজ্ঞান বা দেহমন প্রভৃতিও আত্মার অভিন্নত্ব জ্ঞান ধ্বংস করে। এরূপে, অজ্ঞানের আবরণ ধ্বংস হলেই আত্মার নিত্যস্থিত, নিত্যমুক্ত, নিত্যব্রহ্ম স্বরূপটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠে পূর্ণতম বিভায় নির্বাধ ভাবে—এবং এই হ'ল "মুক্তি বা মোক্ষ।" এরূপে, ব্রহ্মাত্মজ্ঞান মোক্ষের স্রষ্টা নয়, কেবলমাত্র দেহাত্মজ্ঞানের ধ্বংসকারকই মাত্র। অদ্বৈত, তথা সমগ্র বেদান্ত-দর্শনেই; সাধন-তত্ত্বের এই নঞর্থক (Negative) ব্যাখ্যাই সর্বপ্রথম গ্রহণীয়, যেহেতু সকল সম্প্রদায়ের মতেই, মোক্ষ নিত্য, জীবও নিত্যমুক্ত, এবং মুক্তিকালে জীবের কোনোরূপ নূতন স্বরূপ, গুণ বা শক্তি লাভ হয় না, কেবল নিত্যস্থিত স্বরূপাদির প্রকাশই মাত্র হয়।

২। সদর্থক (Positive) দিক্ থেকে যদি সাধন-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতেই হয়, তা হলেও বলা চলে যে:

(ক) মিথ্যা অন্তঃকরণজ ব্রহ্মজ্ঞান মিথ্যা হলেও, জ্ঞানের বিষয় বা ব্রহ্ম মিথ্যা নন।

(খ) মিথ্যাজ্ঞানও সত্যফলপ্রসূ হতে পারে।

আরেকটি সমস্যারও এস্থলে উদয় হতে পারে। সেটি হ'ল এই:

"তৎ পুনর্ব্রহ্ম প্রসিদ্ধমপ্রসিদ্ধং বা স্যাৎ। যদি প্রসিদ্ধং, ন জিজ্ঞাসিতব্যং; অথাপ্রসিদ্ধং, নৈব শক্যং জিজ্ঞাসিতুমিতি। (ব্রহ্মসূত্র—শঙ্কর-ভাষ্য, ১।১।১)

অর্থাৎ, "জিজ্ঞাসা" বা "জ্ঞাতুমিচ্ছা", বা জানবার ইচ্ছাই জ্ঞানের প্রারম্ভ কারণ জানবার ইচ্ছা না হলে

কেহ কোনোদিন জ্ঞানলাভের জন্য চেষ্টা করে না। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রশ্ন এই :

একপক্ষে, যদি ব্রহ্ম 'প্রসিদ্ধ' বা সাধারণে জ্ঞাত হন, তা হলে তাঁকে পুনরায় জানবার জন্য ইচ্ছা হবে কেন? অপরপক্ষে, যদি ব্রহ্ম 'অপ্রসিদ্ধ' বা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত হন, তা হলেও তাঁকে জানবার ইচ্ছা হতে পারে না, যেহেতু যে বস্তুর অস্তিত্বই আমরা জানি না, সেই বস্তুর সম্বন্ধে কোনোরূপ ইচ্ছাও আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়, নিশ্চয়ই।

এর উত্তরে শঙ্কর বলেছেন যে, এ কথা ঠিকই যে, যদি কোনো বস্তু পূর্ণ, স্পষ্ট ও সন্দেহাতীত ভাবে জানা থাকে, তাহলে তা' পুনরায় জানতে ইচ্ছা করার কোনোরূপ প্রশ্নই নেই। একই ভাবে, যদি কোনো বস্তু সম্পূর্ণরূপেই অজ্ঞাত হয়, তা হলেও তা' জানবার ইচ্ছা সম্ভবপর হয় না। কিন্তু আরেকটি তৃতীয়পক্ষও এস্থলে আছে। সেটি হ'ল এই যে, একটি বস্তু সম্বন্ধে সামান্য, অস্পষ্ট বা সাধারণ ধারণা থাকতে পারে। সেজন্য, সেই বস্তু সম্বন্ধে পরিপূর্ণ, স্পষ্ট, বিশদ, সন্দেহাতীত ও যথার্থ জ্ঞানলাভের জন্য স্বভাবতঃই হৃদয়ে ইচ্ছার উদয় হয়। ব্রহ্মের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছে। ব্রহ্মই সকলের আত্মা এবং আত্মা সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা সকলেরই আছে, যেহেতু 'আমি নেই' এরূপ প্রতীতি কারো হয় না। কিন্তু এই ভাবে, স্বীয় আত্মাকে জানলেও, এই জ্ঞান পূর্ণ, স্পষ্ট, বিশদ, সন্দেহাতীত ও যথার্থ জ্ঞান নয়। কারণ, আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে। যেমন, কেহ কেহ বলেন : আত্মা দেহই মাত্র, (চার্বাক); কেহ কেহ বলেন, আত্মা বিজ্ঞান প্রবাহই মাত্র (যোগাচার বৌদ্ধ); কেহ কেহ বলেন, আত্মা শূন্যই মাত্র (মাধ্যমিক বৌদ্ধ); কেহ কেহ বলেন, আত্মা দেহভিন্ন হলেও দেহাশ্রয়ী, সংসারী, কর্তা ও ভোক্তা (মীমাংসা); কেহ কেহ বলেন, আত্মা অকর্তা (সাংখ্যযোগ); কেহ কেহ বলেন যে, জীবাত্মা ব্যতীত পরমাত্মা বা সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরও আছেন (ন্যায়)। এই ভাবে, আত্মার প্রকৃত স্বরূপ বিষয়ে নানাপ্রকার মতভেদ থাকায়, হৃদয়ে স্বতঃই আত্মজিজ্ঞাসা বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হয়। (ব্রহ্মসূত্র—শঙ্কর-ভাষ্য, ১।১।১)।

একটি কান্নার ইতিকথা

শ্রীসত্যেন সিংহ

একটা করুণ কান্নার শব্দে মাঝরাতে গড়জঙ্গলের গভীর জঙ্গলে তন্দ্রাটা ভেঙ্গে গেলো।

পিক্‌নিক্ করতে এসে এমন বিপদে পড়বো কে জানতো?

আর উদ্ভট খেয়াল বিপিনদার, বললেন, যেতে যখন পারলুম না বনের মধ্যেই রাত কাটাতে হবে।

তখনো মোটা ওভারকোট গায়ে জড়িয়ে রাইফেলটা বাগিয়ে তিনি গাছের গুঁড়ি ঠেস্ দিয়ে বসে আছেন। তাঁর মুখের বর্মা-চুরুট আর আমাদের মাঝখানের আগুনটা সমানে জ্বলছে। আগুনের চারপাশে প্রায় ত্রিশজন গায়ের আলোয়ান, সতরঞ্চি, ত্রিপল যা পেয়েছে তাই গায়ে দিয়ে প্রচণ্ড শীতে কুঁকড়ে গাদাগাদি করে পড়ে আছে। সবাই হয়তো ঘুমিয়ে নেই, সারাদিনের শ্রান্তি আর রাত এগারোটা পর্য্যন্ত তাস খেলা, গান গাওয়া, অংহ্তুক চীৎকার—সবে মিলে সবাইকে অবসন্ন করে তুলেছে।

দেখলাম, বিপিনদাও কান খাড়া করে শুনছেন। আমরা কেউ জেগে আছি তিনি বোধ হয় বুঝতে পারেন নি।

সুমিষ্ট কণ্ঠের ক্রন্দন। তার রেশ সেই চাঁদের আলোয়, গাছের পাতায় পাতায়, মাটির স্নিগ্ধ ছায়ায় ছায়ায় শুধু গুমরে গুমরে বনের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে।

ভূত, প্রেত, দেবতা, পিশাচ—কোনদিন কিছু বিশ্বাস করি নি। গল্প পড়ে আর লোকের মুখে শুনে রহস্যের আস্বাদ গ্রহণ করেছি, মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি নি। আজ এমন করে এই গভীর অরণ্যে আমি যেন আদিম মানুষে পরিণত হলুম। সব কিছু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হোল।

স্থানটার দৈব এবং ঐতিহাসিক দুই মহিমাই অবশ্য আছে, কিন্তু তবুও সেই অতীত বা পৌরাণিক যুগের কোন ব্যথা আজ বিংশ শতাব্দীতে আমার কাণে ভেসে আসবে তাই বা বিশ্বাস করবো কেমন করে! যেখানে বসে আছি সেখান থেকে—এই জঙ্গলের মধ্যেই বহুকালের পুরনো কালো খস্‌খসে ঘাট-সত্তরটা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলেই দেবী শ্যামারূপার মন্দির, তারও পেছনে বল্লাল-সেনের আমলের পরিখা ও গড়ের ধ্বংসাবশেষ। সারাদিন ঘুরে ঘুরে সবই দেখেছি। সিংহদ্বার, গড়ের অন্দরমহল, কাপালিক রাখাল ক্ষ্যাপার কালী-মন্দির, ব্রহ্মকুণ্ড। যতখানি দেখেছি তার অনেকখানিই স্থানীয় মন্দিরের পুরোহিতের কাছে শুনে শুনে কল্পনায় পূর্ণ করে নিয়েছি, কারণ গড়জঙ্গলের সমস্ত কীর্ত্তি, সমস্ত ধ্বংসাবশেষ মাটির তলায় চলে গেছে। বাইরে মাটির রূপ আর সত্যিই কিছু কিছু চিহ্ন তার একদিনের সগৌরব অবস্থানের ক্ষীণ পরিচয় নিয়ে এখনো একটা রহস্যের মত দাঁড়িয়ে আছে।

অঞ্চলটার পুরাতন নাম সেন-পাহাড়ি। আর জঙ্গলের নাম গড়জঙ্গল। দুর্গাপুর ছাড়িয়ে কুড়ি-পঁচিশ মাইল উত্তরে অজয়ের দিকে যেতে যেতে আবার পুবে কাঁচা রাস্তায় মাইল চারেক পর বিষ্ণুপুর গ্রাম। বিষ্ণুপুর গ্রাম পার হয়ে মাইলখানেক বিস্তৃত ধানক্ষেত—তার পরই একেবারে গভীর জঙ্গলের সুরু। পাহাড়ের মত জঙ্গলটা যেন ধাপে ধাপে ওপরে উঠেছে।

ধীরে ধীরে ডাকলুম, বিপিনদা!

ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে বিপিনদা ফিস্‌ফিসিয়ে ধমক দিলেন,—চুপ!

ধমক খেয়ে কিন্তু আরও কৌতূহলী হয়ে উঠলুম। হামাগুড়ি দিয়ে এর-ওর গা পা ডিঙ্গিয়ে বিপিনদার পাশে গিয়ে বসলুম। বিপিনদা তবে কান্নার কারণটা আবিষ্কার করে ফেলেছেন, নইলে চুপ করতে বলবেন কেন।

তাই চুপ করে থাকতে পারলুম না। নীচু গলায় বললুম, বিপিনদা তুমি শুনতে পাচ্ছো?

বিপিনদা রাইফেল ও জ্বলন্ত চুরুট দুটোই নাবিয়ে রেখে বললেন, হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু তুই কথা বলছিস্ কেন?

আমাকে আবার কথা বলতে বারণ করে বিপিনদা যেন ধ্যানমগ্ন হয়ে গেলেন। দুটি হাত একত্র করে মাথায় ঠেকিয়ে বিড়্ বিড়্ করে কি যেন মন্ত্র পড়তে লাগলেন।

তাঁর এই অভিভূত ভাব দেখে আমি রীতিমত বিস্মিত হলুম। আমাদের আসানসোলের বিখ্যাত শিকারী বিপিন দা, যিনি কোন দেবদেবী, ভূতপ্রেত কিছুরই

তোয়াক্কা রাখেন না, তিনি কি এই গভীর রাত্রে, এই ভয়াবহ পরিবেশে সত্যিই ভয় পেয়ে গেলেন ?

কিন্তু কথা কয়ে আমি যেন সত্যই অপরাধ করলুম। কান্নার সেই সুমিষ্ট স্বরটা ক্রমেই যেন দূরে মিলিয়ে যেতে লাগলো এবং একটু পরেই সমস্ত বনটাকে আরও নীরব করে দিয়ে একেবারেই মিলিয়ে গেল।

বিপিনদা ধীরে ধীরে চোখ মেলে চাইলেন আমার দিকে। হয়তো আমার মুখ ভয়ে, কৌতূহলে, কথা কইতে না পাওয়ার বিড়ম্বনায় ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল—তাই দেখে বিপিনদা বললেন, ভয় পেয়েছিস ?

তাঁকে সন্তুষ্ট করবার জন্যই তাড়াতাড়ি বললাম, তুমি থাকতে আবার ভয় ? কিন্তু কান্নার শব্দটা কিসের ?

এত পরিতৃপ্তির সঙ্গে নীরব হাসি কোনদিন হাসতে দেখি নি বিপিনদাকে।

বললেন, মা কাঁদছিলেন। চল্, মন্দিরে গিয়ে মাকে প্রণাম করে আসি।

আমার সারা দেহে যেন একটা বিদ্যুৎ-শিহরণ খেলে গেল।

"মা কাঁদছিলেন"—এই দুটি কথা যেন মুহূর্তে আমার সারা অঙ্গে বীণার মত বেজে উঠলো। অভিভূতের মত আমিও বিপিনদার পিছু পিছু সেই দিনে দেখা অনেকখানি মাটিতে ঢাকা-পড়া এক হাজার বছর আগেকার সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরের দিকে উঠতে লাগলুম। বিপিনদার হঠাৎ ভক্তির উদ্রেক তখন আমায় বিস্মিত করে নি; আমার চোখের সামনে সারাদিনের দেখা আর শোনা কাহিনী যেন রূপ পরিগ্রহ করে আমার সমস্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে দিল।

পায়ের তলার সিঁড়ি হয়ে উঠলো মসৃণ, ঝকঝকে তকতকে—দু'পাশের ঘন বন সরে গিয়ে স্ফটিকের মত শুভ্র-ধবল হর্ম্ম্য উঠলো ভেসে—আর দেখলুম, সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে এক বিরাট পুরুষ।

কালো পাথরের মত সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, পরণে রক্তবর্ণ বসন ও উত্তরীয়, হাতে সোনার মোটা বলয়, বাহুতে স্বর্ণ-বন্ধনী, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা।

দুটি হাত একত্র করে যেন ধ্যানমগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

কণ্ঠ দিয়ে অস্ফুটে বেরিয়ে এলো—ইছাই ঘোষ !

প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের, ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের সেই ইছাই ঘোষ।

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে চেয়ে আছি। কখন সেই বিরাট পুরুষ চোখ মেলে চাইলেন, ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলেন নীচে।

চোখের পাতা ফেলতেও আমরা ভুলে গেছি।

কাছে এসে দাঁড়ালে আমরা দু'জনে মাথা নত করে প্রণাম করেছি, কিন্তু মুখ তুলে আর তাঁকে দেখতে পাই নি।

বিপিনদা বললেন, দেখলি ?

উত্তর না দিয়ে মনে মনে নিজেকেই বললাম, দেখলাম।

ইছাই ঘোষের মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গড়জঙ্গল আবার জঙ্গলে পরিণত হোল।

কিন্তু গড়জঙ্গল নয়। অন্য এক জঙ্গল।

গড়জঙ্গল সেদিন জঙ্গলে ঢাকা পড়ে নি। একটু আগেই আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠা স্ফটিকের মত শুভ্র-ধবল কারুকার্য্য খচিত অট্টালিকায় সাজানো তখনো সেই গড়। পাষাণ প্রাকার আর গভীর পরিখায় ঘেরা রাজপ্রাসাদ। আজকের মত বাঘের ডাক আর পতঙ্গের মুখরতার বদলে সেদিন হাতীর গলার ঘণ্টা, ঘোড়ার খুরের দ্রুত শব্দ, মন্দিরের শঙ্খ আর সুন্দরীর নূপুর নিক্কণের সঙ্গে তরবারির ঝন্‌ঝনায় জীবন্ত সেদিনের সেই গড়।

তাই গড়জঙ্গল তখন শুধু গড়, জঙ্গল নয়। কিন্তু গড় থেকে কুড়ি-পঁচিশ মাইল দূরে অন্য এক জঙ্গল। রাঢ়-দেশে তখন জঙ্গলেরই প্রাধান্য। বল্লালসেন এ দেশকে কৌলিন্য-প্রদান করলেও এদিকের এ অঞ্চলে তখনো চুহাড় ও ডোমের প্রতিপত্তি কম নয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে তারাই তখন এক একটি রাজা—আর জঙ্গলে রাজত্ব করতেই তারা ভালবাসতো, শুধু রাজা নয়, তারাই আবার পুরোহিত। বৌদ্ধধর্মের শেষ অস্তিত্ব ধর্ম্মপূজায় পর্য্যবসিত হয়েছে। ধর্মের পুরোহিত তখনও ব্রাহ্মণ হয় নি, ডোমেরাই পুরোহিত। একাধারে রাজা, বীর ও পুরোহিত। আর এক জাতি সে সময় ছিল—সে সদ্‌গোপ বা গোয়ালা।

ঐ গোয়ালাদেরই একটি ছয়-সাত বৎসরের অনাথ ছেলে গড়ের নিকটস্থ জঙ্গলে গ্রামের লোকের গরু চরাত। অল্প বয়সে মা-বাবা মারা যাওয়ায় ছেলেটিকে দেখবার কেও ছিল না। দুটি অন্নের জন্য তাকে গ্রামবাসীদের গরু নিয়ে সারাদিন ঘুরতে হোতো। ঘুরতে ঘুরতে তার ক্ষিদে পেতো, কাউকে সে কথা বললে সইতে হোতো কঠোর নির্য্যাতন। তাই বনের মাঝে বসে সে কাঁদতো।

একদিন গ্রীষ্মকালে দুপুরে একটি আমগাছের ছায়ায় তার ছোট্ট লাল গামছাটি পেতে উবু হয়ে শুয়ে মাটিতে মুখ গুঁজে সে কাঁদছে, এমন সময় একটি সুমিষ্ট নারীকণ্ঠের ডাক শুনে সে চম্‌কে উঠলো।

—হ্যাঁ রে কাঁদছিস কেন?

অপূর্ব্ব রূপসী একটি মেয়ে। ছেলেটি অবাক হয়ে মেয়েটির ঠোঁটে স্নিগ্ধমমতায় ভরা হাসিটুকুর পানে চেয়ে রইলো।

—এমন করে একা শুয়ে শুয়ে তুই কাঁদছিস্ কেন বল?

ছেলেটি কি যেন বলতে গিয়ে একবার ঠোঁট নাড়লো, পরক্ষণেই আবার থেমে গিয়ে তেমনি অপলক চোখে চেয়ে রইলো।

—কি রে, ভয় পেয়েছিস? ভয় কি? আমি তো তোর কান্না শুনেই দেখতে এলুম।

যত দেখছে ছেলেটি ততই মুগ্ধ হয়ে উঠছে। ওর সারা সত্তা যেন বলে উঠছে, ইনি তোর অতি আপনজন।

তাই ভয় সে পায় নি, তবু সঙ্কোচে বাধছিল। মৃদুস্বরে প্রশ্ন করলো—তুমি কে?

হাসলো মেয়েটি। কি সুন্দর হাসি!

হাসতে হাসতেই বলল—আমি তোর মা।

—মা!

বিস্ময়ে দুটি চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠলো ছেলেটির। কথা কইতে পারলো না।

—অমন করে চেয়ে আছিস্ যে, বিশ্বাস করতে পারছিস না?

মনে হলো, ছেলেটি বিশ্বাস করতে পারছে না। মা কেমন ছিল সে কথা আজ তার মনে নেই, কিন্তু একে যেন বার বার তার মা বলতে ইচ্ছে হোলো।

—তবে যে সবাই বলে আমার মা মারা গেছে?

—মারা গেলে তোর কাছে আসতুম কেমন করে?

—এতদিন তবে আস নি কেন?

ধীরে ধীরে মেয়েটি কাছে এসে বসলো।

—আমার যে অনেক কাজ বাবা, তাই আসতে পারি নি। এবার থেকে তুই যখুনি ডাকবি তখুনি আসবো—আর যা চাইবি তাই দেবো।

তার পর থেকে ছেলেটি যখুনি ডেকেছে তখুনি মা এসেছেন। ছেলেটি যা চেয়েছে তিনি তাই দিয়েছেন। ক্ষুধার জ্বালায় আর সে কাঁদে না। গরু নিয়ে সকাল-বেলাই জঙ্গলে চলে আসে, নির্জ্জন গাছের ছায়ায় বসে, শিশুর বিশ্বাস নিয়ে মাকে ডাকে, মা এসে খাবার দিয়ে যান। অন্ত ছেলেদের ভাল জামাকাপড় দেখলে মায়ের কাছে বায়না ধরে—আমায় অমনি কাপড় এনে দাও, বাঁশী এনে দাও, খেলনা এনে দাও। গাঁয়ের থেকে কাছেই মেলা বসেছে—মা পয়সা দাও, মেলা দেখতে যাব।

ছেলেটির আকাঙ্ক্ষা মত সবই মা জুগিয়ে যান। ছেলেটিও ক্রমেই বুঝতে পারে মায়ের কাছে চাইলেই পাওয়া যায়। চাওয়ার মাত্রাও তাই দিন দিন বাড়তে থাকে। গ্রামের লোকে বিস্মিত হয়, হতভাগ্য অনাথ ছেলেটি কোথায় পেলো এত সুন্দর কাপড়, কি খেয়ে ওর দেহ দিন দিন নধর আর সুপুষ্ট হয়ে উঠছে! ছেলেটি বলে, আমার মা আমাকে দিয়েছে।

—মা? তোর মা তো মরে গেছে!

প্রতিবাদ করে বালক—মিথ্যা কথা, আমার মায়ের অনেক কাজ তাই সব সময় আসে না, যদি মরেই যাবে তবে রোজ রোজ ডাকলে আসে কি করে? কি করে দেয় আমায় এত খাবার আর জামাকাপড়?

একদিন কৌতূহলী কয়েকটি গ্রামের লোক ছেলেটির সঙ্গে জঙ্গলে এসে বলে—কই ডাক তো দেখি—কেমন তোর মা আসে। তাদের ধারণা, ছেলেটির মা বোধ হয় ভূত হয়ে জঙ্গলে ঘোরে আর ছেলে যা চায় তাই এনে দেয়।

অমন সুন্দর মাকে দেখাবার লোভ কে সংবরণ করতে পারে? ডাকলো ছেলেটি 'মা' 'মা' বলে কিন্তু মা এলেন না, এলো ঝড়, জল—সবাই সেদিন জঙ্গল থেকে বহুকষ্টে পালিয়ে এলো। গ্রামে সত্যই রব উঠলো ছেলেটিকে ভূতে পেয়েছে।

কিন্তু ছেলেটি জানে ভূত নয়, প্রেত নয়, :মা তার সত্যিকার মা। অথচ তিনি এলেন না। সারারাত শুয়ে শুয়ে কাঁদলো। ভোরবেলায় কার স্পর্শে জেগে উঠে দেখলো মা তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

—কাল তোমায় কত ডাকলুম, তুমি এলে না কেন মা?

স্নিগ্ধকণ্ঠে মা বললেন—যারা অবিশ্বাস করে, আমি তোর মা, তাদের কাছে আমায় কেন ডাকিস বাবা?

সত্যিই মা আছেন। মা তার একার—অবিশ্বাসীদের কাছে মা আসেন না।

কিশোর বয়সে একথা বিশ্বাস করলেও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মনে প্রশ্ন জাগে—এমন মা তো আর কারুর নেই। সব কিছু অলৌকিক, সব কিছু আশ্চর্য্য। কে এই স্নেহ-ময়ী, মায়াবিনী যিনি ডাকামাত্র সর্ব্বত্র আবির্ভূত হয়ে তার সব মনস্কামনা পূরণ করেন?

মাকে জিজ্ঞাসা করতে বাধে; দ্বিধা, সঙ্কোচ জড়িয়ে ধরে, ভয় হয় কিছু বললে মা যদি আর না আসেন! কিন্তু কতদিন মনের এই দ্বন্দ্ব চেপে রাখবে? পরিষ্কার বাস্তব-জ্ঞানের অধিকারী তখন সে, বেশ বুঝতে পারে তার জীবনে অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটেছে।

মাকে ডাকতেও কেমন একটা শঙ্কা জড়িয়ে আসে, না ডেকেও পারে না। যেন বুঝতে পারছে সকলের মত সাধারণ মা তার নয়, অনুভব করছে একটা বিরাট রহস্য লুকিয়ে আছে তার এই মায়ের পেছনে—তবু তো মায়ের জন্য তার প্রাণ কাঁদে। একদিন তাঁকে না ডাকলে, তাঁকে না দেখলে তার শান্তি নেই। দিবারাত্রির সকল সময়েই মা'র সেই অপরূপ মূর্ত্তিখানিই তো তার চিত্ত ভরে থাকে। আমোদ, আহ্লাদ, সঙ্গী, সাথী কিছুই যে তাকে আনন্দ দিতে পারে না। মা এসে সামনে দাঁড়ালেই সমস্ত মন তার পুলকের উচ্ছ্বাসে ফুলের মত হালকা হয়ে বাতাসে উড়তে চায়।

তবু একদিন মাকে মনের সব কথা না জানিয়ে পারল না।

সেদিন মা আসতেই চুপ করে মাথা নীচু করে বসে রইল অভিমানী বালকের মত।

মা হাসলেন, বললেন—কি রে, কি হয়েছে? এত-দিন পর আবার মন ভার কেন?

উত্তর দেয় না, নড়ে না। সাংসারিক জ্ঞানের ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণতায় সমস্ত দেহ-মন জড়ের মত অনড়, আড়ষ্ট।

মা ধীরে ধীরে পিঠে হাত রাখলেন। বল্ কি হয়েছে?

সেই স্নেহস্পর্শে আবার যেন সমস্ত জড়তা কেটে গেল। হৃদয়ে আনন্দের স্রোত বইল।

মুখ তুলে বলে বসলো—তুমি কে?

অবোধ শিশুর মত এই প্রশ্নে মা হাসলেন আবার। বুঝি যুগ যুগ ধরে জগতের প্রতিটি হৃদয়ে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত্তে, জ্ঞানে অজ্ঞানে এই প্রশ্ন জাগছে—তুমি কে?

যিনি এতদিন ধরে এত কাছে, এত সরল হয়ে, সহজ হয়ে রয়েছেন, মিথ্যা সাংসারিক জ্ঞানের অহমিকায় তাঁকেই প্রশ্ন করছে—তুমি কে?

তবু মা বিব্রত হলেন না, সহজভাবেই বললেন—আমি তোর মা।

সর্ব্বান্তঃকরণে এই সহজ কথা কি মানুষ মেনে নিতে পারে? তাই বললো—এমন মা তো আর কারুর নেই, এমন মা হয় না, বলো, তুমি কে?

মা নিজের স্বরূপ উদ্ঘাটন করলেন। সেই মুহূর্ত্তে করুণায় বিগলিত হয়ে একটি সন্তানের অজ্ঞান অন্ধকার দূরীভূত করে তার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করে দিলেন।

মায়ের সেই পরম রূপ প্রত্যক্ষ করে, তাঁর স্নেহের অসীমতা অনুভব করে দুই চক্ষু দিয়ে দরদর ধারায় অশ্রু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো, রোমে রোমে, কোষে কোষে সেই মাতৃস্নেহ আস্বাদন করে মায়ের চরণে সমস্ত দেহ লুটিয়ে দিল পরম ভাগ্যবান ইছাই ঘোষ।

কালো কালো খসখসে সিঁড়ির ওপর বসে আমি আর বিপিনদা যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলুম। সহসা অদূরে ঘোড়ার খুরের টগ্‌বগ্‌ শব্দে চোখ মেলে চম্‌কে উঠলুম। কখন চাঁদ উঠেছে আর আকাশ থেকে জ্যোৎস্নার ধারায় ভরে উঠেছে গড়জঙ্গলের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ। সেই চাঁদের আলোয় যেন স্পষ্ট দেখলুম দুটি দুধের মত সাদা ঘোড়ায় চড়ে দু'জন অপরূপ রূপবান রাজপুত্র দ্রুতবেগে গড়জঙ্গল ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন।

দুই রাজপুত্র কর্ণসেন ও কর্পূরসেন। যথাক্রমে লাউসেন ও ধর্ম্মসেন নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন এই দুই ধর্ম্মের পূজারী। সেদিনকার গড় রাজধানীর একচ্ছত্র অধিপতি।

কিন্তু ধর্ম্ম সেদিন রক্ষা করতে সক্ষম হন নি এই দুই রাজপুত্রকে। মাতৃশক্তিতে বলীয়ান মহাবীর ইছাই ঘোষের কাছে পরাজয় স্বীকার করে নীরবে এঁদের রাজধানী ত্যাগ করে পালাতে হয়েছিল। ইছাই ঘোষ দখল করেছিলেন সেনপাহাড়ীর এই গড়। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর ইষ্ট দেবী, তাঁর মা শ্যামারূপার মন্দির।

কৃষ্ণানদী পার হয়ে দুই রাজপুত্র কালুডোমের রাজত্বে এসে আশ্রয় নিলেন। ধর্ম্মের তপস্যায় নিমগ্ন হলেন।

ইছাই ঘোষ রাজ্য বিস্তার করে চললেন। কৃষ্ণার তীরে দাঁড়িয়ে তিনি সকল রাজার সকল দিগ্বিজয়কে প্রতিহত করে কৃষ্ণানদীর নাম দিলেন অজয়। অজয়কে জয় করে এপারে আসা তখন কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়।

ইছাই ঘোষের দর্প বেড়ে চললো। মাতৃশক্তিতে শক্তিমান, মাতৃগর্ব্বে গর্ব্বিত, অজয়, অমর, ইছাই ঘোষ।

মা শ্যামারূপা শঙ্কিত হলেন। বড় বেশী ভাল-বেসেছেন তিনি ইছাইকে। কিন্তু এবার যে ইছাই শক্তির মত্ততায় ধর্ম্মকে পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে বসেছে। ওদিকে কালুডোমের পৌরোহিত্যে ধর্ম্মের পূজায় বসেছেন লাউসেন ও ধর্ম্মসেন। ধর্ম্মের কাছে নিবেদন কচ্ছেন ইছাই ঘোষের অত্যাচার। ধর্ম্ম তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের আশ্বাস দিলেন। রাঢ়ের ডোম ও চুহাড়ের বিশাল বাহিনী নিয়ে ধর্ম্মের কৃপায় লাউসেন ও ধর্ম্মসেন

অজয়কে জয় করে ইছাই ঘোষের হাত থেকে নিজেদের গড় ছিনিয়ে নিতে এগিয়ে এলেন। হোলো প্রবল যুদ্ধ। ধর্ম্মের শক্তিতে বলীয়ান রাজপুত্রদ্বয় কিন্তু ইছাইকে পরাজিত করেও গড় থেকে বিতাড়িত করতে পারলেন না।

ইছাই ঘোষ শেষ পর্য্যন্ত একা দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেন; রাজপুত্রেরা বার বার তাঁর মুণ্ড ছেদন করেন তীক্ষ্ণ তরবারীর আঘাতে—অপার করুণাময়ী মা প্রতিবার সন্তানের মুণ্ড যথাস্থানে স্থাপন করে তাকে না বাঁচিয়ে পারেন না। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, ভগ্নমনোরথ রাজপুত্রেরা পুনরায় ফিরে এসে ধর্ম্মের কাছে ইছাই ঘোষের এই অমানুষিক শক্তির কথা বর্ণনা করলেন।

ধর্ম্ম জানালেন—বৎস, জগদ্ধাত্রী মহামায়ার মাতৃ-শক্তিতে বলীয়ান ইছাই ঘোষ। তোমরাও মায়ের আশ্রয় গ্রহণ কর।

ধর্ম্মের পূজারী লাউসেন ও ধর্ম্মসেন ধর্ম্মেরই আদেশে নিমগ্ন হলেন মাতৃপূজায়—শক্তি-আরাধনার অক্লান্ত তপস্যায়।

কোন তপস্যাই বুঝি বিফলে যায় না, মা বুঝি বিচলিত হলেন—সাড়া দিলেন দুই রাজপুত্রের ব্যাকুল আহ্বানে।

মায়ের চরণে হৃতরাজ্য ফিরে পাওয়ার একমাত্র কামনা নিবেদন করলেন দুই রাজপুত্র।

মা যেন কেমন চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

—ধর্ম্মসেন! লাউসেন! অন্য কিছু চাও, চাও এর চেয়েও বিরাট রাজত্ব,আরও কিছু দুর্লভ ঐশ্বর্য্য।

—আমাদের আর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই মা, শুধু ইছাইকে সরিয়ে আমাদের রাজ্য তুমি আমাদের হাতে ফিরিয়ে দাও।

—কিন্তু ইছাই যে আমায় 'মা' বলে ডাকে।

—আমরাও তো 'মা' বলে ডেকেছি।

মা মাথা নত করলেন। বললেন—তবে তাই হোক। রাজ্যের মোহে ইছাই যদি আমায় ভুলে যায় তবে তাকে আমি নিজের কাছেই টেনে নেবো।

জয়ের আনন্দে রাজপুত্রেরা মায়ের চরণে লুটিয়ে পড়লেন।

ইছাইকে মা সরিয়ে নেবেন কিন্তু সর্ত্ত বড় কঠিন। দেবীপক্ষের সপ্তমীর দিন যুদ্ধ করতে হবে—ইছাইয়ের মুণ্ড ছিন্ন করে ব্রহ্মকুণ্ডে নিক্ষেপ করতে হবে নতুবা ইছাইয়ের মৃত্যু নেই।

যেমন করুণাময়ী, যেমন স্নেহময়ী তেমনি ছলনাময়ী এই মা।

চমকে উঠলুম হাঃ হাঃ হাঃ একটানা একটা অট্ট-হাসির শব্দে। সভয়ে জড়িয়ে ধরলুম বিপিনদাকে। বিপিনদার দৃষ্টি কিন্তু অদূরে লাল ইট দিয়ে বাঁধানো একটা বিরাট গহ্বরের দিকে আবদ্ধ। দিনের বেলা ঐ গহ্বর পুরোহিত আমাদের দেখিয়েছিলেন, বলেছিলেন ঐটিই ব্রহ্মকুণ্ড। তবু বিপিনদার কানে মুখ নিয়ে জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না—বিপিনদা শুনলে? কে যেন হাসলো?

বিপিনদা হাত দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরলেন। পরে অস্পষ্ট কণ্ঠে বললেন—হাসলো ইছাই ঘোষ।

হ্যাঁ, মায়ের কথা শুনে ইছাই ঘোষ অট্টহাস হেসে উঠলো।

—শত্রু আক্রমণ করলেও যুদ্ধ করবো না? তুমি কি বলছো মা?

—না বাবা, সপ্তমীর দিন শত্রু আক্রমণ করলেও তুমি যুদ্ধ করবে না। সপ্তমীর দিন আমি থাকব না। শুধু একটি দিন বাবা, একটি দিন তুমি যুদ্ধ নাই বা করলে?

—তুমি নাই বা থাকলে, শত্রুকে কি আমি ভয় করি নাকি?

—"তুমি নাই বা থাকলে"—মুহূর্তের জন্য মা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

ইছাই ঘোষ আবার হেসে উঠলো—তুমি যে আমায় শিশুর মত আগলে রাখতে চাও মা।

পরম করুণাময়ী মা স্নেহের সুরে বললেন—সেদিন তোমার কোন অনিষ্ট হলে আমি যে তোমায় রক্ষা করতে পারবো না বাবা। বিনা যুদ্ধে শত্রু তোমায় রাজ্য থেকে বিতাড়িত করে দিলেও পরদিন সে রাজ্য আবার আমি তোমায় ফিরিয়ে দেবো।

—তোমার কোন ভয় নেই মা, কোন আশঙ্কা তুমি মনে রেখো না। বার বার শত্রু আমার হাতে পরাজিত হয়ে ফিরে গেছে, তাদের লাঞ্ছনার চরম হয়েছে। তারা আর কোনো দিন এ মুখো হবে না। এক দিন কেন অনেক দিনের জন্য তুমি যেখানে খুশী চলে যেতে পার।

ইছাই ঘোষ মাকে চলে যেতে বলছে। নির্ব্বোধ বালকের মত এখনো হাসছে। মায়ের সমস্ত শ্রীঅঙ্গে যেন একটা শিহরণ বয়ে গেল। তবু মা আবার সাবধান করে দিলেন।

—ইছাই আমার কথা রেখো, ছেলেকে মায়ের কথা শুনতে হয়। শত্রু আক্রমণ করুক বা নাই করুক সপ্তমীর দিন তুমি কিছুতেই যুদ্ধ করবে না।

কিন্তু মায়ের সব কথা ইছাইয়ের অট্টহাসিতে মিলিয়ে গেল।

চারিদিক থেকে শেষ রাত্রের বাতাসে গাছে গাছে পত্রের মর্মর ভেসে এলো। মনে হোল এ যেন সপ্তমীর দিনে লাউসেনের বিশালবাহিনীর সেই পদসঞ্চার।

বার বার যুদ্ধে অপরাজেয় ইছাই ঘোষ মায়ের সতর্ক-বাণী সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে সপ্তমীর মাতৃহারা প্রভাতে সেই বিশাল বাহিনীর সম্মুখীন হলো। সমস্তদিন বীর বিক্রমে চললো ভীষণ যুদ্ধ। ক্রমে দিনের পরমায়ু শেষ হয়ে এলো কিন্তু শত্রুর পরাক্রম এক তিল কমলো না। সুদর্শন, তরুণ রাজপুত্রদ্বয় গোধূলীর আলো মিলিয়ে যাওয়ার পূর্বক্ষণেই বিদ্যুৎ বেগে ইছাইয়ের সৈন্যব্যূহ ভেদ করে বার বার পরাজয়ের সমস্ত অপমানের জ্বালা আর মায়ের আশ্বাস-বাণী বুকে নিয়ে ইছাইয়ের সম্মুখীন হলো। ইছাই ঘোষের শির লক্ষ্য করে দুটি তরবারী এগিয়ে এলো আর ইছাই ঘোষ অট্টহাসির সঙ্গে যেমনি সেই আক্রমণকে প্রতিহত করতে যাবে অমনি মায়ের মন্দির থেকে আরতির শঙ্খ-ঘণ্টা বেজে উঠলো। ইছাই ঘোষের মনে পড়ে গেলো —মা যেন বারণ করেছিলেন।

ঐ এক মুহূর্তের অন্যমনস্কতা! কিন্তু ঐ এক মুহূর্তেই ইছাই ঘোষের শির যুগ্ম তরবারীর আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। মা নেই, কে সে শির আবার জুড়ে দেবে? আবার বাঁচিয়ে দেবে ইছাই ঘোষকে?

বিপিনদা উঠে গিয়ে ব্রহ্মকুণ্ডের সামনে দাঁড়ালেন, আমিও আছি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। এই ব্রহ্মকুণ্ডেই নিক্ষিপ্ত হয়েছিল—ইছাই ঘোষের খণ্ডিত মস্তক। মা কথা রেখে-ছিলেন—রাজপুত্রেরা ফিরে পেয়েছিলেন গড়ের অধিকার।

কিন্তু মা?

বিপিনদা কান খাড়া করলেন, আমিও।

অল্প পরে বিপিনদা বললেন—না, ও পাখীর কাকলি, ভোর হয়ে এলো। আর শোনা যাবে না।

আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলে দিলুম বিপিনদার মুখে।

দুই হাত জোড় করে বিপিনদা বললেন—সন্তান অবাধ্য হয়, মা তাকে শাস্তি দেন—কিন্তু তবুও স্নেহময়ী মা ভুলতে তো পারেন না সন্তানকে, তাই প্রতি সপ্তমীর রাতে এই গড়জঙ্গলে এখনো যে লোকে মাঝে মাঝে মায়ের কান্না শুনতে পায় সে কথা মিথ্যা নয়। আজকের তিথিটাও নিশ্চয়ই সপ্তমী ছিল।

সত্যিই কি-করুণ সেই সুমিষ্ট কণ্ঠের ক্রন্দন! তার রেশ যেন গাছের পাতায় পাতায়, মাটির স্নিগ্ধ ছায়ায় ছায়ায় বনের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সঞ্চারিত হয়ে এখনো আমার কানে লেগে আছে।

আমিও দুই হাত একত্র করে সেই পরম স্নেহময়ী মায়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালুম।

কুহুধ্বনি

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

রক্তাভ রৌদ্রের গন্ধে সমাবৃত পৃথিবী আকাশ
স্তম্ভিত অরণ্য, পাতা, কুলাশ্রয়ী মানুষ যখন
দুর্দম দোর্দণ্ড তাপে তন্দ্রালস অবসন্ন মন,
তখন অতর্কে যেন সঞ্চারিত দক্ষিণ বাতাস
—সে স্পন্দনস্পর্শে দ্রুত সঞ্জীবিত মৃত্তিকার ঘাস,
মধুস্রাবী কুহুধ্বনি পরিপ্লুত মরুৎ কম্পন
তাই কি হৃদয় করে এতই বিমুগ্ধ আকর্ষণ?—
যদিও পাখায় নেই অলৌকিক অনন্ত আভাস।

দক্ষিণ বায়ুর স্পর্শ—কুহুধ্বনিমিশ্রিত মধুর
একটি প্রস্ফুট সাড়া এনেছিলে, তোমার স্বভাবে
ছিল না দার্ঢ্যতা, দ্বেষ, নির্বিকল্প নিঃসংশয় ভাবে
ছিলে শুধু ধ্যানমগ্ন—সঙ্গীতের সে মূর্ছনা—সুর
নিঃশব্দে গিয়েছে মিশে হৃদয়ের ভিতরে সুদূর,
মৃত্যুতে বিলীন নও, তুমি আছো দৃপ্ত আবির্ভাবে।

* কবি শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা স্মরণে।

প্রেমের স্বরূপ ও রূপ

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

প্রেমের 'স্বরূপ' অর্থে তার স্বকীয় রূপ বা সত্তা অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্তা। আর রূপ অর্থে তার বহিঃপ্রকাশ বা ব্যবহারিক প্রকাশ, যেরূপে তাকে আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করি জীবনের বিবিধ সম্পর্কে ও সম্বন্ধে, আদানে এবং প্রদানে।

আত্মার সহিত আত্মার—আত্মীয়তার সর্ববিধ সংস্পর্শ এবং সম্পর্কই প্রেমাত্মক।

এই প্রেমের গতি হয় তিন পথে। জীবের প্রতি, "আত্মৌপম্যেন ভূতেষু দয়াং কুর্বন্তি সাধবঃ"—অথবা "সমঃ সর্বেষু ভূতেসু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্"। শ্রীমন্মহাপ্রভু তুলসীদাস নানক সকলেই জীবে দয়াকে বিশেষ স্থান দিয়েছেন—"জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণবসেবন" ইহা বই ধর্ম নাই শুন সনাতন"। ইহাই প্রেমের প্রথম সম্পর্ক।

প্রেমের দ্বিতীয় সম্পর্কে মানুষ পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় এবং গভীর প্রীতিতে আবদ্ধ হয়। তৃতীয় সম্পর্কে মানুষ সেই প্রেমকেই সগুণ ব্রহ্মে বা শ্রীভগবানের নরোত্তম বা পুরুষোত্তম রূপে অর্পণ করে। তাকেই লক্ষ্য করে মহাকবি বলেছেন :

> "সেই সুধা স্রোতে
> সমুদ্রবাহিনী সেই প্রেমধারা হতে
> কলস ভরিয়া তারা লয়ে যায় তীরে
> বিচার না করি কিছু আপন কুটীরে
> আপনার তরে।" (রবীন্দ্রনাথ)

কারণ

> "আমাদেরি কুটীর কাননে—
> ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা চরণে
> কেহ রাখে প্রিয়জন তরে"
> * * * "এই প্রেমগীতি হার
> গাঁথা হয় নর-নারী মিলন মেলায়
> কেহ দেয় তাঁরে,—কেহ বঁধুর গলায়।
> দেবতারে যাহা দিতে পারি,—দিই তাই
> প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
> তাই দিই দেবতারে,—আর পাবো কোথা
> দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা।"
> (রবীন্দ্রনাথ)

এই প্রেম যাঁর ধন তিনি অসীম ঔদার্যে এবং অপার সন্তোষে বসে নর-নারীর এই প্রেমের আদান-প্রদান দেখেন, কবি বলেছেন—"যাঁর ধন তিনি ওই অপার সন্তোষে, অসীম স্নেহের হাসি হাসিছেন বসে।" তাই পাই ব্রহ্মসূত্রে এরই প্রতিধ্বনি "লোকবত্তু লীলা কৈবল্যম্।" এই প্রেমই সেই প্রেম এবং সেই প্রেমই এই প্রেম—মধ্যে কেবল একটু অগ্নিসংস্কারের প্রয়োজন হয়—যাকে বলা যায় baptism of fire। সেই অগ্নি সংস্কারের ফলে অসম্ভব সম্ভব হয়। 'প্রথম রমণী দরশ মুগ্ধ' তাপসকুমার ঋষ্যশৃঙ্গ—যখন 'ধরার নরক সিংহ দুয়ারে' যারা নিত্য সন্ধ্যা-বাতি জ্বালায়—এমনই এক বারাঙ্গনার মুখের পানে চেয়ে বলে উঠেন—

> "আনন্দময়ী মুরতি তুমি
> ফুটে আনন্দ বাহুতে তোমার
> ছুটে আনন্দ চরণ চুমি।"

তখন তার অন্তরের সুপ্ত দেবতা জেগে ওঠেন—কারণ সুন্দরের স্মরণে ধ্যানে এবং দর্শনে এমন কলুষিত বা কলঙ্কিত কেউ নেই যে অন্তরে বাহিরে শুচি সুন্দর হয়ে না ওঠে তাই আমাদের শুচিতার মন্ত্রে পাই—

> "সর্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
> যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচি।"

তাই সেই পতিতা নারীর শুচি সুন্দর মুখে শুনি—

> "আনন্দে মোর দেবতা জাগিল
> জাগে আনন্দ ভকত প্রাণে
> এ-বারতা মোর দেবতা তাপস
> দোঁহে ছাড়া আর কেহ না জানে।
> * * *
> শুনি সে-বচন হেরি সে-নয়ন
> দুই চোখে মোর ঝরিল বারি
> নিমেষে ধৌত নির্মলরূপে—
> বাহিরিয়া এল কুমারী নারী।"
> (রবীন্দ্রনাথ)

আত্মার এই ঐকান্তিক নির্মলতার ফলে, পতিতা 'চিন্তামণি'কে বিল্বমঙ্গল গুরু সোমগিরিরও পূর্বে প্রণতি জানিয়ে বলেন—

> "চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরিগুরুর্মে
> শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান শিখিপিচ্ছমৌলিঃ।

যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু
লীলা স্বয়ং বররসং লভতে জয়শ্রীঃ।"
(কৃষ্ণ কর্ণামৃত)

মহাকবি এই অগ্নি দীক্ষার প্রার্থনা করেই বলেছেন—

"আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে, এ জীবন ধন্য কর—এ জীবন পুণ্য কর দহন দানে।"

এই অগ্নি সংস্কারের মূল মন্ত্রটি হ'ল—কস্মৈচিৎ প্রিয়ায় বা দয়িতায় বা স্বাহা,—এই সমর্পণের মন্ত্র—প্রেমযজ্ঞে আহুতির মন্ত্র। যিনি হোতা বা হোত্রী তাঁকে আত্মসুখ সহ আপনার বলতে যথাসর্বস্ব অর্পণ করতে হবে সেই প্রেমস্বরূপের উদ্দেশে।

প্রথমে সে প্রেম থাকে 'পরশমণি'—তাকে লক্ষ্য করে পদকর্তা বলেন—

"সখি বঁধুয়া পরশমণি—সে অঙ্গ পরশে এ অঙ্গ আমার সোনার বরণ খানি,"—বলেন, "তোমারি গরবে গরবিণী আমি রূপসী তোমারি রূপে"—সেই মিলনের প্রেম বিরহের আগুনে দগ্ধ হয়ে চিন্তামণি হয়ে ওঠে। তখন পরশেরও প্রয়োজন থাকে না—

যখন "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।"

যখন বিরহিণী পথিকবধূর কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়ি-জন—আশার অতীত দূরদেশে অবস্থিত! প্রশ্ন ওঠে যে, এই অগ্নি সংস্কারে কি দগ্ধ হয়—কি হয় পবিত্র? কি হয় পরিবর্তিত? —উত্তর, —'আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা'-রূপ—'মহাশনো-মহাপাপ্মা'—মহাবৈরিরূপ যে কাম তাই দয়িতের প্রীতি ইচ্ছায় বা বৈষ্ণব কবির ভাষায় 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা' রূপ প্রেমে পরিণত হয়। ফলে অন্ধতম যে কাম তাই প্রেমরূপ উজ্জ্বল ভাস্করে পরিণত হয়। তখন প্রেমই fire (অগ্নি), প্রেমই light (আলোক) এবং প্রেমই delight (আনন্দ), প্রেমই যুগপৎ সংস্কারের অনল, নয়নের আলো এবং হৃদয়ের আনন্দ।

ছেলেবেলায় যখন বড়দের বৈঠকী গানের আড্ডায় আড়ি পেতে লুকিয়ে গান শুনতাম তখন একদিন শুনলাম—

"প্রেম অভিধানে মানে ভালোবাসা
যদি বল বুঝি না যদি বল সুঝি না
ন্যায়ের প্রমাণে তুমি চাপা।"

ন্যায়ের প্রমাণে তখন তাই প্রমাণিত হলাম, কিন্তু কৌতূহল সেদিন থেকেই বেড়ে চলল প্রেম কি তা জানবার জন্য। বয়সের বশে আরো বড় হতে লাগলাম —কবির মুখে শুনলাম "ভালো যারা বাসে শুধু তারা ভাল থাকে, প্রেমহীন সারা হয় বহি আপনাকে!" তখন মনে হয়েছিল বুঝি ভালোবাসতে পারলে আর অসুখ-বিসুখ জ্বর-জারি হয় না, স্বাস্থ্যটা ভালো থাকে—তখনো নিধুবাবুর গান শুনি নি যে—

"বিচ্ছেদ যন্ত্রণা হতে মরণ যন্ত্রণা ভালো
সে যে অনন্ত যাতনা—এ যাতনা অল্পকাল"

তখনো কবিরাজ কবির মুখে শুনি নি—"এই প্রেমার আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্বণ মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন। এই প্রেমা যার মনে তার বিক্রম—সেই জানে বিষামৃতে একত্র মিলন।" রূপ গোস্বামী তাই বলেছেন—"উত্তাপী পুট পাকতোঽপি গরলগ্রামাদপি ক্ষোভনঃ।"

তার পর কবি সত্যেন্দ্রনাথের Victor Hugoর এই অনুবাদটি পড়ি—

"ভালবাসি নারী, পূজা করি দেবী—মূরতি তোর
বিধি তোরে দিয়ে পূর্ণ করেছে আমারে—
প্রেম দেছে শুধু তোরি তরে বিধি হৃদয়ে মোর
নয়ন দিয়েছে, দেখিতে কেবল তোমারে।"

অনন্তমুখী অনবদ্য এই প্রেম—একেই হয় পূর্ণ—এবং এক না হলে বিশ্ব জগৎ হয় শূন্য।

কিন্তু কি এই প্রেম—কেন এই প্রেম না হলে চলে না? একজন ইংরাজ কবি লিখেছেন :—

"What is love, that all the world should
think so much about it ?
What is love,—that neither you nor
I can live without it ?
Love is a tyrant and a slave, a torment
and a treasure
Having it,—we know no peace. and
wanting it no pleasure.
Should we lose it, if we could ? Sooth, I
almost doubt it
Faith—I w'd rather bear its sting than
live my life without it."

সুতরাং এই প্রেম না হলে কাহারও চলে না। সৃষ্টির প্রাক্কালে নির্বিশেষ—একমেবাদ্বিতমেরও চলে নি—"স একাকী ন রেমে, সঃ অকাময়ত জায়া মে স্যাৎ" কিন্তু সে কথা এখন থাক, পরে বলা হবে। এই প্রেম সম্পর্কে শিশুকালে গ্রামে দুর্গাপূজার সময় জমিদার বাড়ীতে একটি গান শুনেছিলাম তা আজও মর্মে গাঁথা হয়ে আছে—

"লুকিয়ে ভালবাসব তারে জানতে দেবো নারে—
জানতে পারলে প্রাণ সে নেবে প্রাণ তো দেবে নারে—
বসিয়ে হৃদিসিংহাসনে ; হাসবো কাঁদবো আপন মনে,
মজেছি আপনি মজি তায় মজাবো না রে—॥

এই প্রেমে প্রেমতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন যে—নিজের সুখের প্রসঙ্গই থাকে না, কারণ প্রহ্লাদ বলেছেন : যস্তু আশিস আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক !" একই অর্থে বাংলা গানে পাই :—

"যে দেয় প্রেম করে ওজন, সে জন প্রেমিক নয়কো কখন
সংসারের বণিক সেজন থাকে সংসারে ।"

তাই শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলেন—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্
অদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা—
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ"

তখন কেবল—"যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুসা প্রাবৃষায়িতং শূন্যং মন্যে জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে।"

এ রাজ্যে যে দয়িত সেই দেব—যে শ্রেষ্ঠ সেই বরিষ্ঠ —যে বন্ধু সেই জগদেকবন্ধু এবং করুণৈকসিন্ধু—তাই কর্ণামৃতে লীলাশুক বলেছেন—"হে দেব হে দয়িত হে জগদেকবন্ধো * * * হা হা কদানুভবিতাসি পদং দৃশোর্মে।"

লৌকিক গানেও পাই—

ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে—
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।

এই প্রেম তখন—প্রকৃতিগত—Constitutional বা অস্থিমজ্জাগত হয়ে পড়ে।

"আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই তুমি তাই গো
তোমা ছাড়া আর এ জগতে মোর কেহ নাই কিছু
নাই গো।
তুমি সুখ যদি নাহি পাও—যাও সুখের সন্ধানে যাও
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয়মাঝে আর কিছু নাহি
চাই গো।
যদি আর কারে ভালবাসো, যদি আর ফিরে নাহি এসো.
তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও আমি যত দুখ
পাই গো ॥

অন্যত্র ফরাসী mystic কবি Madame Guyaon প্রেমের মুখে কানে কানে এই কথা শুনেছেন এবং বলেছেন—

"Love, this gentle admonition
Whispers soft within my breast
Choice befits not thy condition
Acquiescence suits thee best.

অর্থাৎ তাই ভালো, যা তোমার ভালো—Thy will be done. "তাই আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা নাহি গোপিকার" —এবং—"রজকিনী প্রেম নিকসিত হেম কাম গন্ধ নাহি তায়"। এই 'রজকিনী প্রেম' অন্য অর্থেও সার্থকনামা— কারণ ইহাতে Dyeing এবং cleaning দুই-ই আছে। প্রথমে হয় 'Cleaning'—যখন তার ফলে 'নিমেষে ধৌত নির্মল রূপে' বারাঙ্গনার অন্তর থেকে তার কুমারী সত্তা তার 'জাম্বুনদ হেম'-সদৃশ পবিত্র অন্তরাত্মা আবির্ভূত হয়—বাহিরিয়া আসে—এবং তখন তার গায়ে অনুরাগের রঙের ছোপ লাগে—সেই অনুরাগে রঞ্জিত হয়ে তখন সে গায় :

"যদি পরাণে না জাগে আকুল পিয়াসা
চোখের দেখা দিতে এসো না—
ভালবেসে যদি দুখ পাও সখা
পায়ে ধরি ভালবেসো না।"

সে ভালবাসা সর্বত্যাগী বৈরাগী, সে কিছু চায় না, কিছু রাখতে চায় না তাই :

"যাহা চাও সখা দিব ফিরাইয়ে
স্মৃতিটুকু ফিরে চেও না।"

জ্ঞানের সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধ কি ? এ বিষয়ে লৌকিক প্রেমের কবি Lord Byron যা বলেছেন, অলৌকিক এবং আধ্যাত্মিক প্রেম প্রসঙ্গে গীতাও তাই বলেছেন। Byron তাঁর প্রিয়ার সম্বন্ধে বলেন :

To know her is to love her
Love but her for ever
for Nature made her what she is
And never made another !

গীতাতেও ঠিক তাই আমাদের সেই 'তাঁহার' বর্ণনায় বারংবার পাই 'পরমং পুরুষং দিব্যং'—'উত্তমঃ পুরুষস্তন্যঃ' যিনি ক্ষরাত্মক সর্বভূতের অতীত,'অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং' এরও উত্তম। ভগবত্তার কথা না তোলাই ভালো কারণ ঐশ্বর্য্য নিয়ে প্রেম হয় না—মাধুর্য্য ব্যতিরেকে।

গীতায় তাই 'এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা' বলবার পূর্বেই শ্রীমান পুরুষোত্তম বলে নিয়েছেন— জ্ঞানের লক্ষণের মধ্যে "ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।"

তিনি যুগপৎ বিশ্বানুগ (immanent) এবং

বিশ্বাতিগ (transcendent) 'তৎসৃষ্ট্বা তদেবানু প্রাবিশৎ' তাই ভাগবত বলেন 'আকাশবৎ অন্তরং বহিঃ' (১০।৩০।৪)।

তিনি অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব হলেও (১।২।১১) তিনি পুরুষোত্তম—(Infinite Individuality) মহান প্রভুর্বৈ পুরুষঃ (উপনিষদ্) এবং 'গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী' (গীতা) Infinite কেন, যেহেতু "তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং, তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবং" রমণীয় কেন না "ক্ষণে ক্ষণে যন্নবতামুপৈতি তদেব রূপং রমণীয়তায়াঃ"

প্রেমের রাজ্যে আকাশের মত অসীম অর্থে infinite বলা উদ্দেশ্য নহে।

> কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন
> অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন
> সর্ব্ব আদি সর্ব্ব অংশী কিশোর শেখর
> চিদানন্দ দেহ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর। (চরিতামৃত)

অর্থাৎ

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥
(ব্রহ্মসংহিতা)

তাঁহার দ্বিবিধ লক্ষণ নির্দেশ করেছেন—স্বরূপ লক্ষণ এবং তটস্থ লক্ষণ।

> আকৃতে প্রকৃতে জানি স্বরূপ লক্ষণ
> কার্য্যদ্বারা জ্ঞান এই তটস্থ লক্ষণ ॥

আমিও এই অর্থেই প্রেমের 'স্বরূপ' ও 'রূপ' ব্যবহার করেছি। বেদের ব্রহ্মোপাসনা কেমন করে ভাগবতের রাগাত্মিক প্রেমে পরিণত হয়—এবং কেমন করে সেই প্রেমই নরনারীর মিলন মেলায় বিকৃত কামে পর্য্যুষিত হয় তার হেতুভূত এই নবসঙ্গরসায়ন অপূর্ব অনির্বচনীয় বস্তু।

বেদান্ত সৃষ্টিতত্ত্ব নির্ধারণ করতে গিয়ে বললেন:

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ ব্রহ্ম তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব ইতি।"

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।"

তার পরের উপলব্ধি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", তার পরের কথা "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ"—বেদান্তসূত্র।

ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ এবং আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভি সংবিশন্তি—যেহেতু সৃষ্টি করে ব্রহ্ম সৃষ্টির মধ্যেই অনুপ্রবিষ্ট (immanent) হয়েছিলেন সেহেতু ব্রহ্মকে শুধু আনন্দস্বরূপ বলেই শ্রুতি প্রতিনিবৃত্ত হলেন না, বললেন আরও আগের কথা, সব কথার শেষের কথা মৌন নীরবতা কারণ 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে' এবং যেখানে আস্বাদন হয় 'মূকবৎ।' বললেন, 'রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধা নন্দী ভবতি স্বর্দ্ধী ভবত্যমৃতীভবতি'। অর্থাৎ এইবার বেদান্ত করলেন কাব্যের সঙ্গে করমর্দ্দন। যে বেদান্ত বলেন'আসুপ্তেরামৃতেঃ কালং নয়েদ্ বেদান্তচিন্তয়া' সেই বেদান্ত স্বীকার করলেন যে উচ্চতর বেদান্ত এবং উচ্চতর কাব্যের বিষয়বস্তু একই! বলা যায় না বলেই বিল্বমঙ্গল তাঁর মধুরাষ্টকে "মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো—র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরং ॥ মধুগন্ধি মৃদু স্মিতমেতদহো—মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥ বলেই শেষ করলেন। উপনিষদের 'মধুবাতা ঋতায়তে' ইত্যাদি মধুমতী সূক্তিও তাই।

কারণ কাব্যের লক্ষণ নির্ধারণ করতে গিয়ে আলঙ্কারিকরা স্বীকার করেছেন, বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং। কাব্যের মধ্যে পাণ্ডিত্য, বৈয়াকরণিক শুদ্ধি এমনকি নৈতিক শ্লীলতাও যে অবশ্য রাখতে হবে এমন কোনও আবশ্যিক বাধ্য-বাধকতা তাঁরা সেকালেও রাখেন নি, কিন্তু রেখেছেন তার জন্য শুধু রসের কষ্টিপাথর, রেখেছেন তার জন্য রসিকদের চিত্তবিনোদনের এবং অনুমোদনের মানদণ্ড যার জন্য স্বয়ং কালিদাসও বলেছেন—"আপরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্"।

এই রসবন্ধের পরিচিতির পর, 'বেদান্ত' আর শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায়—অর্থাৎ উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র এবং ভগবদ্গীতার মধ্যেই সীমিত হয়ে থাকতে পারল না। তখন স্বয়ং বেদ-ব্যাসকেই বেদান্তসূত্রের বেদান্তের সঙ্গে কাব্যের পরিণয়ে ঘটকালি করবার জন্য এবং সেই প্রয়োজনে অভিনব ভাষ্য প্রণয়ন করবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন করতে হ'ল। তাই দেখি, ব্রহ্মসূত্রের মঙ্গলাচরণের পর প্রথম সূত্র "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এবং ভাগবতেরও প্রথম শ্লোক—

> "জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্—
> তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
> তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গো মৃষা
> ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥

এই এক শ্লোকেই সমগ্র বেদান্তের মূলকথা আবৃত্তি করে রসশাস্ত্রের মঙ্গলাচরণ এবং রাসস্থলীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হ'ল। বৈদান্তিকরা যেমন বলেন, অবিদ্যাবশতঃ দড়িই হয় সাপ, রজ্জুতে সর্পভ্রম অধ্যস্ত হয় বলে। রসিকরাও বলেন, প্রেমই হয় কাম, দেহে আত্মবুদ্ধি অধ্যস্ত হয় বলে এবং সেই ভ্রমবুদ্ধিতে দেহের সুখে আত্মসুখ-কামনা হানা দেয় বলে। এই আত্মসুখাকাঙ্ক্ষা অধ্যস্ত যে-দেহের দেউলে 'আত্মা' বাস করেন—সে বাড়ীটাই

কামরূপের হানাবাড়ী। তাই গীতা বলেন, "জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্"। "দেহে আত্মবুদ্ধি এই বিবর্তের স্থান"—চরিতামৃত। প্রেমভক্তির সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে শাণ্ডিল্য বলেছেন, "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"—অর্থাৎ ঈশ্বরে পরমানুরক্তিই প্রেম। কিন্তু নারদ আরও সার্বজনীন এবং উদারভাবে বলেছেন—"সা কস্মৈচিৎ পরমপ্রেমরূপা" অর্থাৎ তা কাহারও প্রতি পরমপ্রেমরূপ। মনে হয় তাই এই প্রেমযোগকেই স্বীকৃতি দান করে—"অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ" বলে—মনঃসংযমের উপায় নির্ধারণ প্রসঙ্গে ঋষি পতঞ্জলিও উদারভাবে সূত্র প্রণয়নক রেছেন—"যথাভিমতধ্যানাদ্বা"। দুর্বাসা যখন দুষ্মন্ত-ধ্যানমগ্না শকুন্তলাকে অভিশাপ দান করেন তখন কি শকুন্তলা ঠিক এই সূত্রেরই প্রমাণস্বরূপে ধ্যানসমাধিস্থা ছিলেন না?

> "অয়ি অতিথি পরিভাবিণি!—
> বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা
> তপোধনং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্।
> স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্
> কথাং প্রমত্তাং প্রথমং কৃতামিব॥"

বিপ্রপত্নী যাঁরা রাসস্থলীতে যেতে পাননি তাঁরা ধ্যানযোগে দেহের শৃঙ্খল কেটে পিঞ্জরমুক্ত বিদেহ আত্মা নিয়ে তার সঙ্গে মিলিত হলেন—"ধ্যানেন যামঃ পদয়োঃ পদবীং সখে তে" "তদনুস্মরণধ্বস্ত জীবকোশাস্তমধ্যগন্" ভাগবত (১০।৮২।৪৭)

"যংলব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ" তাই তাঁরা বলতে পারেন—

> "সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও
> জীয়ন্তে মরিয়া যে আপনারে খাইয়াছে
> তারে তুমি কি আর বুঝাও?"

কারণ তখন—

> "আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি তবে সে পরাণে মরি
> চণ্ডিদাস কয় পরশরতন গলায় গাঁথিয়া পরি।"

ভাগবতেও দেখি এই ধ্যানযোগে বিদেহমুক্তি অথবা মুক্তি কেন বলি, বলি প্রিয়সংযুক্তিলাভ যথা:

> অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্ গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ।
> কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ॥

এবং তার পর দুঃসহ-প্রেষ্ঠ-বিরহ-তীব্র-তাপধুতাশুভাঃ।

> ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষনির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ॥

কামে হয় বিষয়-তৃষ্ণা এবং প্রেমে হয় বিষয়-বিস্মরণ। কাম আপনার সুখে সুখী, প্রেম প্রিয়ের দয়িতের বা দয়িতার সুখেই সুখী। কামে আত্মচিন্তা, প্রেমে আত্মসমর্পণ। আত্মহারা প্রেমের পরিণামে হয় একেবারে আত্মজ্ঞানশূন্যতা। কাম চায় ভোগ, প্রেম চায় ত্যাগ। কামের উদাহরণ ভ্রমর, প্রেমের উদাহরণ পতঙ্গ। তাই তাদের বর্ণনার পার্থক্য দ্রষ্টব্য।

> "ভ্রমর গোলাপে কহে—'আমি তোরে কত ভালবাসি
> রজনী প্রভাত হলে নানা ছলে তাই নিতি আসি'।
> পতঙ্গ শুনিয়া কানে হাসিয়া বিদ্রূপ করি কহে—
> 'লম্পট কি জানে প্রেম মন তার মধুপানে রহে॥
> প্রিয়া মোর দীপশিখা আমি তার রূপে পুড়ে মরি
> ভস্মীভূত প্রাণ মোর প্রেম তবু ফিরে হা-হা করি'॥"

এই কাম ও প্রেমের প্রভেদ প্রদর্শনে চরিতামৃতকার চিরস্মরণীয়।

> কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ
> লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ।
> আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম
> কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।
> কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল
> কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত প্রবল।
> ** সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন
> কৃষ্ণ সুখ হেতু করে প্রেমের সেবন।
> ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ—
> স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি অন্য দাগ।
> অতএব কামে প্রেমে বহু ত অন্তর
> কাম অন্ধতমঃ প্রেম উজ্জ্বল ভাস্কর।
> অতএব গোপীগণের নাহি কাম গন্ধ
> কৃষ্ণ সুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ॥

এ জন্যেই "প্রেমৈব গোপরামানাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।" চণ্ডিদাসও মধুর ভাবে এই প্রেম বা পিরীতির বিশ্লেষণ করেছেন।

> "বিহি এক চিতে ভাবিতে ভাবিতে নিরমাণ কৈল 'পি'
> সুখের সাগর মথান করিয়া তাহে উপজিল 'রি'
> অমিয় ছানিয়া যে রস রহিল তাহে বিনাইল 'তি'
> এ হেন পিরিতি লভিল যে জন তার অবশেষ কি?"

> **"কেবা নিরমিল প্রেম সরোবর নিরমল তার জল
> দুখের মকর ফিরে নিরন্তর প্রাণ করে টলমল।
> গুরুজন জ্বালা জলের শিহলা পড়শী জিয়ল মাছে
> কুল পানিফল কাঁটায় সকল সলিল বেড়িয়া আছে।
> কলঙ্ক পানায়, সদা লাগে গায়, ছানিয়া খাইল যদি
> অন্তরে বাহিরে কটু কটু করে সুখে দুখ দিল বিধি।
> কহে চণ্ডিদাস শুন বিনোদিনী সুখ দুখ দুটি ভাই
> সুখের লাগিয়া যে করে পিরিতি দুখ যায় তার ঠাঁই।"

অন্ত পদে বলেছেন—

চণ্ডিদাস বাণী, শুন বিনোদিনী পিরিতি না কহে কথা
পিরিতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে পিরিতি মিলয়ে তথা।

আর একটি সমস্যার সমাধানও কবিরাজ গোস্বামী করিয়াছেন—

সেটি এই—"গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণ দরশন
সুখবাঞ্ছা নাহি সুখ হয় কোটিগুণ।
গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়
তাহা হৈতে বহু গুণ গোপী আস্বাদয়।
তা সবার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ।
তথাপি বাড়য়ে সুখ পড়িল বিরোধ।
এ বিরোধের এই এক দেখি সমাধান
গোপীর সুখ কৃষ্ণসুখে পর্যবসান।
গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা
সে মাধুর্য বাড়ে যার নাহিক সমতা।
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গমুখ।
অতএব সেই সুখে কৃষ্ণ সুখ পোষে
এই হেতু গোপী প্রেমে নাহি কাম দোষে॥

তাই পাই আদিপুরাণে—

মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্যাং মৎশ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ॥

প্রেম তত্ত্ববিদ্‌রা যৌন প্রেমকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। বলেছেন, প্রেম বা রতি তিন প্রকার—সাধারণী, সমঞ্জসা এবং সমর্থা। ইহার উদাহরণ স্থলে 'সাধারণ' প্রেমকেই প্রথম ধরা যাক্।

প্রথম—

শুধু প্রেম শুধু মনের মিলন মিলনের ভালবাসা
বেগবান প্রেম প্রেমের আবেগে বিনিময় প্রত্যাশা।
প্রেমের মিতালি তালীয় রসের নিঃসৃত নির্যাস
জোয়ারের টান প্রবল তুফান ফেনিলোচ্ছল ভাস।
'সাধারণ'-প্রেম সুখের প্রবাহ, আমার সুখের লাগি
আমি করি প্রেম তুমি কর প্রেম দেহের মিলন মাগি।

দ্বিতীয়—

দ্বিতীয় যে প্রেম সমন্বয়ের উভয়-'সমঞ্জসা'
অর্ধেক দিয়া অর্ধেক নিয়া আপোষে হিসাব কষা।

তৃতীয়—

প্রেমের তৃতীয় সমধিক প্রিয় উজ্জলে মধুরে খাঁটি
উজাড় করিয়া দেয় যেই প্রেম 'সমর্থ' পরিপাটি।
তুমি সুখী হবে আমারে বাসিয়া—তোমারে বাসিয়া আমি,
দেহের গেহের গণ্ডী ভাঙিয়া অলকানন্দাগামী।

অবধির সীমা প্রেমের মহিমা পরিধি মানে কি কভু?
আরো আছে আরো দাও তবু আরো নাহি সে ফুরায় তবু

বৈষ্ণব কবিতা পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে এই শেষোক্ত প্রেমে পরিপূর্ণ—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।

বিল্বমঙ্গলের পাগলিনী এই মধুর রসের একখানি অপরূপ ছবি—

যাই গো ঐ বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে
সে যে একলা কালা কদমতলায় দাঁড়িয়ে আছে
আমার তরে।
যত বাঁশরী বাজায়, তত পথপানে চায়,
পাগল বাঁশী ডাকে উভরায়—
(আমি) না গেলে সে কেঁদে কেঁদে চলে যাবে
মানভরে।

মীরার প্রেমও এই প্রেম—

"মেরে তো গিরিধারী গোপাল দুসরা না কোই—"

গীতায় শ্রীভগবান "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" স্বীকার করেছেন—শ্রীমদ্ভাগবতে বলেছেন—

"অহং ভক্ত পরাধীনোহস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ।"
"নাহমাত্মানমাশংসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।"
"ময়ি নিবদ্ধ হৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ
বশে কুর্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা।"
"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহম্
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি।"

ঠিক অনুরূপ ভজনাত্মক মধুর রসের অভিব্যক্তি পাই Christian mystic ভক্তদের মুখে—

It is a passive & joyous yielding up of the virgin soul to its Bridegroom, a silent marriage vow. It is ready for all that may happen to it, all that may be asked of it, to give itself and lose itself, to wait upon the pleasure of its Love (Underhill, p. 391)

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার 'Theosophical Gleanings'-এ God as Love শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন শ্রীরাধাই মহাভাবের অভিব্যক্তি বা acme তিনি 'মহাভাবময়ী'।

"Radha is the prototype of all lovers of God, male or female. Only her love is human love raised to the n th power."

প্রেমিক ভক্তের দৃষ্টিতে ভগবান ষড়ৈশ্বর্যময় নহেন—তিনি প্রেমময়—Dulce Amori বা Sweetest Love—ভক্ত যখন রাগমার্গে প্রবেশ করেন—ব্রজভূমিতে প্রবেশ করেন তখন তাঁর ভক্তি (devotion) প্রেমে (love) পরিণত হয়।

F. W. Newman বলেন—If thy soul is to go on to higher spiritual blessedness it must become woman—yes, however manly you may be among men. রাগমার্গকে তাঁরা বলেন, Kings highway that leads man back to the country of his soul.

পূর্বরাগকে তাঁরা বলেন, The first flame of love.

প্রেমিক ভক্ত বলেন—"Oh Love! I give myself to thee, Thine ever only thine to be." প্রার্থনা করেন—Please Thee to unite me to thyself, making my soul thy bride, I will rejoice in nothing—till I am in thine arms St. Catharine-এর মুখে তাই শুনি—"Companionship with Love Divine-এর কথা।

প্রেমিক ভক্ত যখন নারী হয়ে পুরুষোত্তমে 'কাম' নিবেদন করেন তখন—মহাশনো মহাপাপ্মা এই কাম বর্জ্জিত হয় না, নিগৃহীত হয় না—তার suppression হয় না,—যার প্রতি লক্ষ্য করে গীতা বলেছেন—"প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি" শাস্ত্রের শাসনবাক্যে তার কি করতে পারে? তবে কি হয়? হয় psychological sublimation বা পারদের ন্যায় ঊর্ধ্বপাতন। Mystic (Osespeusky) বলেন—'Of all we know in life, only in love is there a taste of the mystical ecstasy. Consequently in true mysticism,—there is no sacrifice of feeling. Mystical sensations are sensations of the same category as the sensations of love,—only infinitely higher and more complex."

তাই দেবর্ষি নারদ তাঁর ভক্তিসূত্রে বলেছেন—"তদর্পিতাখিলাচারঃ সন্ কামক্রোধলোভাভিমানাদিকং তস্মিন্নেব করণীয়ং তস্মিন্নেব করণীয়ম্।" তাহা পরিপূর্ণ sublimation ব্যতীত আর কিছুই নয়।

Christian mystic-রাও ঈশ্বর এবং জীবের প্রেমের পারস্পরিকতায় বা অন্যোন্যাশ্রয়িত্বে বিশ্বাসবান। অর্থাৎ এই প্রেম reciprocal অর্থাৎ when the love of God arises in the heart, without doubt, God also feels love for thee.

ভক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষের অপূর্ব গান এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়:

"কে বলে হরি রাঙ্গা হরি প্রেমের ভিখারী।
প্রেমের ভিক্ষা পায় না বলে চক্ষে বহে প্রেমের বারি।
ভিক্ষার ঝুলি ঝুলিয়ে কাঁধে দাঁড়িয়ে দ্বারে হরি কাঁদে,
হাসিমাখা বদনচাঁদে বিষাদ রেখা সারি সারি।
প্রেম না পেলেও কাঁদে পেলেও কাঁদে
প্রেমেই পাগল প্রেমের হরি।"

আধ্যাত্মিক প্রেম রাজ্যের এই পরস্পরের প্রতি টান বা আকর্ষণ বা মিথঃ আকর্ষণ। তাই শ্রীকৃষ্ণের হাতে বাঁশী—যার সুরে "ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ"—অর্থাৎ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কটাহের ভিত্তি পর্যন্ত কেঁপে ওঠে এবং ব্রহ্মাণ্ডও আবার কোটি কোটি—"কোটি কোটি সূতানীশে চাণ্ডানি কথিতানি বৈ"। বিজ্ঞান বলেন, each star is a sun,—and as such the centre of a solar system. "লোকান্নুন্মদয়ন্ শ্রুতিং মুখরয়ন্ ক্ষৌণীরুহান্ হর্ষয়ন্"—বেজে উঠে বিশ্বজয়ী বংশীনাদ।

প্রেমের আদিম রসের আদিম কথাটি আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদেই পাই। ব্রহ্ম অবিভিন্ন নির্বিশিষ্ট ভাবে একান্ত একাকী ছিলেন। একমেবাদ্বিতীয়ম্। কিন্তু একাকী কোনও খেলা বা লীলা বা আনন্দ উপভোগ হয় না অতএব স বৈ (একাকী) নৈব রেমে—তস্মাৎ একাকী ন রমতে। স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ সঃ অকাময়ত জায়া মে স্যাৎ। বৃহঃ ১।৪।৩

স হ এতাবান আস—যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সংপরিষ্বক্তৌ। স ইমমেব আত্মানং দ্বেধা অপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চ অভবতাম্। (বৃহঃ ১।৪।৩)।

বৈষ্ণব পরিভাষায় এই পরম পতি পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ এবং এই পত্নী পরা প্রকৃতি শ্রীরাধা।

যোগেনাত্মা সৃষ্টিবিধৌ দ্বিধারূপো বভূব হ
পুমাংশ্চ দক্ষিণার্দ্ধাঙ্গং বামার্দ্ধং প্রকৃতিঃ স্মৃতা॥

অদ্বৈতের পর এই দ্বৈত ভাব বা দ্বৈতাদ্বৈত ভাব—অথবা অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদ কারণ এই ভেদ ও অভেদ অচিন্তনীয় এবং অনির্বচনীয়।

আত্মা তু রাধিকা তস্য তয়ৈব রমণাদসৌ
আত্মারামতয়া প্রাজ্ঞৈঃ প্রোচ্যতে গূঢ়বাদিভিঃ।
(স্কন্দ পুরাণ)।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও পাই—"মমার্দ্ধাংশস্বরূপা ত্বং মূল

প্রকৃতিরীশ্বরী" এই যে খেলা সুরু হ'ল এই খেলা এবং লীলা সম্পূর্ণ লৌকিক জগতের অনুরূপ,তাই ব্রহ্মসূত্রে পাই "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্"। এবং এই খেলাও জমে না ঈশ্বরের ঐশ্বর্য জ্ঞান নিয়ে তৃণাদপি তুচ্ছ জীবভাবাশ্রিত প্রেমিকার সঙ্গে। তাই কবিরাজ গোস্বামীর লেখায় পাই—

"ঐশ্বর্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত
ঐশ্বর্য মিশ্রিত প্রেমে নাহি মোর প্রীত।
আমারে ঈশ্বর মানে আপনারে হীন
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন।

** মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি
এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধ রতি—
আপনাকে বড় মানে আমারে সম হীন
সর্বভাবে হই আমি তাহার অধীন।

** মাতা মোরে পুত্রভাবে করয়ে বন্ধন
অতিহীন জ্ঞানে করে লালন-পালন।
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ
'তুমি কোন বড় লোক তুমি আমি সম।'

প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন
বেদস্তুতি হৈতে সেই হরে মোর মন॥

চৈতন্য চরিতামৃত (আদি ৪র্থ)।

তাই পদকর্তার মুখে শ্রীকৃষ্ণ বলেন—

প্রিয়ে তুমি মহাজন কি কর ভৎর্সন
সুধাসম মোর লাগে।

এবং সে জন্যই,—কেবল যে রাগ মার্গে—

ভজে কৃষ্ণে অনুরাগে
তার কৃষ্ণমাধুর্য সুলভ॥

তাই Christion mystic-রাও বলেন—

Love raises the spirit above reverence into one of laughter and dalliance * * Lovers of God have a horror of solemnity * * They are not frightened with any amazement,—they are at home (Underhill's Mysticism).

তাই অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন এবং যশোদার বিশ্বরূপ দর্শন সম্পূর্ণ পৃথক। অর্জ্জুন স্তব করেন, "সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য"—মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে কেউ কোনও অভিচার করেছে ভেবে বুকে হয়তো মুখামৃত দিয়ে দুর্গানাম জপ করে আপন বক্ষে জড়িয়ে ধরেন!

ভারতে অনার্য্য জাতির সভ্যতা ও আর্য্য জাতির আগমনকাল

শ্রীসতী শচন্দ্র সেন

অবলুপ্ত কোনও প্রাচীন সভ্যতার অনুসন্ধানকালে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা তথাকার সঞ্চিত মাটির স্তূপ স্তরের পর স্তর খনন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মাটির বাসন ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা কোন্ কোন্ সভ্যতার লোক কোন্ কোন্ সময় সেখানে বাস করিয়াছিল তাহা নিরূপিত হয়। পূর্ব্বকালে প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প, বন্যা, গৃহদাহ, মহামারী বা যুদ্ধের ফলে কোন স্থানে এক সভ্যতার লোকের অভাব হইত, বহুকাল পরে মাটি ঢাকা পড়িয়া সে স্থান বাসের যোগ্য হইলে, তাহাদের বংশধর বা অন্য সভ্যতার লোক সেখানে বা তাহার খুব নিকটবর্ত্তী স্থানে আসিয়া বাস করিত।

সিন্ধুদেশের মহেঞ্জোদারো ও পঞ্জাবের হরপ্পার অনুরূপ স্তরের পর স্তর খননকার্য্য প্রথমতঃ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্যার জন মার্শালের তত্ত্বাবধানে ১৯২০ সনে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ দয়ারাম সাহানী দ্বারা আরম্ভ হয়। তৎপর আর ডি ব্যানার্জ্জী, এন জি মজুমদার ও আরনেষ্ট ম্যাকে ঐ অঞ্চলের খননকার্য্য সমাপ্ত করেন। তাঁহাদের অনুসন্ধান দ্বারা এই প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার এক বিশাল অধ্যায়ের উপর আলোকপাত হইয়াছে।

হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোর তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা প্রায় ৫৫০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই ভারতীয় অনার্য্য সভ্যতার প্রথম প্রামাণ্য নিদর্শন। ইতিপূর্ব্বে ভারতীয় অনার্য্য জাতীয় বণিকেরা স্থলপথে দক্ষিণ বেলুচিস্থানের মধ্য দিয়া মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করিলেও তাহাদের ইতিহাস পাওয়া যায় না। হরপ্পা সিন্ধুর উপনদী ইরাবতীর পূর্ব্বতীর এবং মহেঞ্জোদারো তাহার দক্ষিণে সিন্ধুনদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। উভয় শহর একটি বিরাট সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল যাহার সীমা সঠিক নির্দ্দেশ করা যায় না। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ষ্টিউয়ার্ট পিগট্ বলেন, "এই সমৃদ্ধিশালী নগরের সহিত পশ্চিম এশিয়ার সমসাময়িক কোনো স্থানের তুলনা হইতে পারে না। সর্ব্বত্র আমরা কৃষিপ্রধান ক্ষুদ্র বাজার সমন্বিত পল্লীর সন্ধান পাইয়াছি। কিন্তু এই দুইটি সুকৌশলে রচিত ও সুব্যবস্থিত শহরের সহিত উহাদের কোনো তুলনা সমীচীন নয়।"

অন্য সর্ব্বত্রই কাঁচা ইটের বাড়ী-ঘর দেখা গিয়াছে। কিন্তু এখানে সমস্ত বাড়ী-ঘর উত্তমরূপে পোড়ান ইট দ্বারা নির্ম্মিত। সে ইটের আকারও বর্ত্তমানে প্রচলিত ইটের অনুরূপ। ১১ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য, সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি প্রস্থ ও আড়াই ইঞ্চি বেদ বিশিষ্ট। রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে অজস্র ইট প্রস্তুত করা হইত। তাহা রক্ষা ও ব্যয়ের ভারও ছিল শহর-রাষ্ট্রের উপর। নির্ম্মাণকার্য্যে তাহাদের কৃতিত্ব ছিল বিস্ময়কর। দ্বিতল গৃহনির্ম্মাণের কৌশল প্রথম তাহারাই আয়ত্ত করে। উত্তম কাঠের তৈরী কড়ি-বরগা দালান প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার সুরু করে। স্থানীয় চরম আবহাওয়ার জন্য ঘরে জানালা খুব কম থাকিত এবং সেগুলি আকারে ক্ষুদ্র ও অত্যন্ত উঁচুতে অবস্থিত ছিল। তাহারা বসত বাড়ীতে এবং সাধারণের জন্য স্নানাগার নির্ম্মাণ করিত। প্রতি স্নানাগার হইতে যত্নপূর্ব্বক নির্ম্মিত পয়ঃপ্রণালী রাস্তা অবধি পৌঁছিত যাহাতে সমস্ত ময়লা জল বাহির হইয়া যাইতে পারে। রাস্তা বরাবর মাটির তলা দিয়া সুনির্ম্মিত 'সিউয়ার' ছিল যাহা দ্বারা শহরের ময়লা জল দূরে নিষ্কাশনের সুবিধা হইত। ম্যানহোলের ঢাকনী তুলিয়া উহা নিয়মিত সাফ করিবার ব্যবস্থাও ছিল। বাড়ীর সমস্ত আবর্জ্জনা বাড়ীর দেওয়ালের ফুকর দিয়া রাস্তার উপর ইট দ্বারা প্রস্তুত ডাষ্টবিনের ভিতর ফেলা হইত। এই ডাষ্টবিন এবং যাবতীয় ড্রেন নিয়মিত পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থাও ছিল। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে জনস্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে তাহারা যেরূপ দৃষ্টি রাখিত তাহা সত্যই বিস্ময়কর। ইট দ্বারা বাঁধাই-করা বড় বড় ইঁদারা হইতে শহরের জল সরবরাহ করা হইত। শহরের রাস্তার দু'পাশে শ্রেণীবদ্ধ বাসগৃহ ও দোকানপাট ছিল। এখানে বিস্তর চওড়া রাস্তা, মাঝারি ধরনের রাস্তা ও সঙ্কীর্ণ গলির নিদর্শন পাওয়া যায়। বড় রাস্তাগুলি প্রায় ১০ গজ চওড়া ছিল। রাস্তাগুলি জালের আকারে বিন্যস্ত হইয়া সমগ্র সহরকে অনেকগুলি প্রায় সমান আকারের ছোট ছোট চতুষ্কোণখণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিল। শহরের পশ্চিমাংশে একটি চিত্তাকর্ষক নগররক্ষার্থ দুর্গ ছিল। দুর্গের আকার ছিল চতুষ্কোণ; দৈর্ঘ্যে ৪০০ গজ, প্রস্থে ২০০ গজ, ১০ গজ উঁচু

ভিত্তির উপর অবস্থিত এবং চারিদিকে সু-উচ্চ, প্রশস্ত ও দুর্ভেদ্য প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, ভিতরে শ্রেণীবদ্ধ বাসগৃহ এবং প্রাচীরের বাহিরে রক্ষীদের আবাসস্থল। প্রাচীনকালে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো শহর সিন্ধুনদের বন্যায় মাঝে মাঝে প্লাবিত হইত। তজ্জন্য প্রত্যেক বাড়ীর ভিত্তি অনেকটা উঁচু করিয়া প্রস্তুত করা হইত। এই নিয়মিত প্লাবন হইতে নগর রক্ষার জন্য নদীর তীর বরাবর ও সমগ্র নগর বেষ্টন করিয়া সুদৃঢ় বাঁধ নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। ৪০ ফুট চওড়া ও ৩৫ ফুট উঁচু এই বাঁধের কোণে কোণে অত্যুচ্চ গৃহাদি অবস্থিত ছিল।

শহরের সমস্ত কাজ কঠিন আইন অনুযায়ী চলিত। সমস্ত উৎপন্ন খাদ্যশস্যের মালিক ছিল রাষ্ট্র, উহা সঞ্চয় এবং প্রয়োজনমত ব্যয় করিবার অধিকার রাষ্ট্রেরই ছিল। সমগ্র জ্বালানী কাষ্ঠের সঞ্চয় ও ব্যয় সম্পর্কেও শহর-রাষ্ট্রের অনুরূপ কর্তৃত্ব ছিল। রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে ইহা দ্বারা প্রচুর ময়দা প্রস্তুত হইত। এবং উহা বণ্টনের ভারও ছিল রাষ্ট্রের উপর।

মাটির রঙীন, উজ্জ্বল, উৎকৃষ্ট বাসনাদি পৃথিবীর মধ্যে তাহারাই প্রথম প্রস্তুত করিয়াছিল। এখানে কতগুলি নির্ভুল ওজন পাওয়া গিয়াছে। এখানে উত্তম প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত হইত। উৎকৃষ্ট চুল্লীতে ধাতু গলাইয়া উত্তমরূপে ঢালাই করিয়া ব্রোঞ্জের প্রতিমূর্ত্তি, বাসন, বাটালি, কুঠার, ছুরি, ক্ষুর প্রভৃতি এবং ধারালো অস্ত্রাদি নির্ম্মিত হইত। সুন্দর বাঁটযুক্ত তাম্রনির্ম্মিত আর্শীর নিদর্শনও পাওয়া গিয়াছে। তাহারা রৌপ্যের বাসন এবং স্বর্ণের ও নানাবিধ মূল্যবান প্রস্তরের অলঙ্কার প্রস্তুত করিত। উৎকৃষ্ট কার্পাস তুলা হইতে প্রস্তুত সূতায় তাহারা কাপড় বানাইত। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সে যুগে মিশর ব্যতীত অন্য কোথাও কার্পাস সূতার কাপড় প্রস্তুত হইত না। তাহারা উৎকৃষ্ট লোমওয়ালা কাশ্মীরী ছাগল পালিত এবং তাহার লোমদ্বারা পশমী কাপড় প্রস্তুত করিত। লিখিবার জন্য তাম্র অথবা মৃত্তিকা-ফলকের প্রচলন ছিল। এখানে কতকগুলি চারকোণা সিল পাওয়া গিয়াছে। বহুসংখ্যক ভ্রমশূন্য ওজন পাওয়া গিয়াছে যাহা অতি উন্নত ধরনের পরিচালন-ব্যবস্থার ইঙ্গিত দেয়। এখানে জিনিসপত্র বহন করিবার জন্য গো-যানের এবং জলপথে নৌকার ব্যবস্থা ছিল। প্রায় ৪৫০০ বৎসর পূর্ব্বে হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোর বণিকেরা সমুদ্রপথে মেসোপটেমিয়ার সহিত বাণিজ্য করিত। সে দেশে কার্পাস বস্ত্র সরবরাহ করিত। এবং সময়ে সময়ে তথায় স্থায়ী ভাবে বসবাস করিত এইরূপ নিদর্শন পাওয়া যায়। মহেঞ্জোদারোতে ব্যবহৃত বর্ণমালা সুদূর মেক্সিকোর নিকটবর্ত্তী প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়ালী দ্বীপের পর্ব্বতগাত্রে ক্ষোদিত আছে। ইহাতে তাহারা প্রশান্ত মহাসাগরের পরপারে বৃহৎ নৌকায় আমেরিকা ভূখণ্ড অবধি বাণিজ্য করিতে যাইত তাহাই প্রমাণিত হয়।

প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে জানা যায় যে, হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারের শক্তি কমিয়া আসিলে এই দুইটি এবং সন্নিহিত শহরগুলি দখল করিবার জন্য প্রায় ৩৫০০ বৎসর পূর্ব্বে পশ্চিম এশিয়া হইতে নানা জাতি আসিতে থাকে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতে আগন্তুক আর্য্য জাতিই ইহাদের ধ্বংসের মূল কারণ। কিরূপে এই উন্নত সভ্যতাসম্পন্ন জনপদগুলি বিনষ্ট হইল তাহার কিছুটা বিবরণ ঋগ্বেদে আছে। প্রত্নতাত্ত্বিক পিগট্ বলেন, ঋগ্বেদ এই বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য প্রামাণ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ইহাদিগকে দস্যু ও অনার্য্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহাদের নাসিকা আর্য্য জাতির ন্যায় উন্নত ছিল না বলিয়া উক্ত বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। ঋগ্বেদের যে অংশে অনার্য্য সভ্যতার সহিত আর্য্যদের সংঘর্ষের বিবরণ আছে তাহা অবশ্যই আর্য্য জাতির ভারত আগমনের কিছুকাল পরে সংযোজিত হইয়াছে। সুতরাং ভারতে আর্য্য জাতির আগমনকাল নির্দ্ধারণ করিতে গেলে উক্ত রচনাকাল সম্পর্কে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

ঋগ্বেদ আনুমানিক কোন্ সময়ে রচনা সে বিষয়ে লোকমান্য তিলক ও অধ্যাপক জ্যাকোবি আলোচনা করিয়াছেন। তিলক এ বিষয়ে জ্যোতিষশাস্ত্রের বিচার দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, অনায়াসে প্রায় ৬০০০ বৎসর পূর্ব্ব অবধি উক্ত রচনাকাল নির্দ্ধারণ করা যায়। জ্যাকোবি উক্তকাল প্রায় ৫৫০০ বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে এখানে বিশদ আলোচনা করা সম্ভব নহে, তবে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত পাশ্চাত্ত্য বিদ্বান সমাজেও যথেষ্ট আদৃত হইয়াছে। আর্য্যদের ভারতে আগমনের কাল সম্বন্ধে প্রত্নতাত্ত্বিক পিগটের মতে আর্য্যরা ইউরোপের ড্যানিয়ুব ও অক্সাস নদীর মধ্যবর্ত্তী দেশ হইতে পূর্ব্বমুখী হইয়া প্রায় ৩৫০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতে প্রবেশ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক এইচ জি ওয়েলস্ বলেন যে, আর্য্যরা আদিতে মধ্য ইউরোপে যেমন ছিলেন তেমনি মধ্য এশিয়াতেও ছিলেন। মধ্য ইউরোপের আর্য্যরা পশ্চিম ও দক্ষিণ ইউরোপে আসিয়াছিলেন এবং মধ্য এশিয়ার সংস্কৃত ভাষাভাষী আর্য্যগণ

দক্ষিণ দিকে আসিয়া ভারতে ও তাহাদের আর একটি শাখা পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইয়া চীনদেশে গিয়াছিলেন। কিন্তু পিগটের নিরূপিত কালের বিপক্ষে একটি ছোট বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন যে, আর্য্যদের মধ্য এশিয়ার একটি শাখা সিরিয়া প্রদেশে গিয়া তথায় মিটানী রাজ্য স্থাপন করে। পারগিটার বলেন যে, ভারত হইতে এক-দল যোদ্ধা সিরিয়ায় গিয়া মিটানী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে। মিটানী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা প্রায় ৩৫০০ বৎসর পূর্ব্বে সম্পন্ন হইয়াছে। অনুরূপে গ্রীস সভ্যতার বিকাশও প্রায় ৩৫০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে সুরু হয় এবং তাহার বনিয়াদ কিছুটা ভারতীয় আর্য্য জাতির সংস্কৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। একটি অর্ব্বাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির পক্ষে এইরূপ প্রচার, প্রসার ও অন্য একটি সভ্যতার পুষ্টিসাধন সম্ভব নহে। সুতরাং সাধারণ বিচারেও পিগটের নিরূপিত কাল ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে হয়। তাহার বহু পূর্ব্বেই আর্য্যরা ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

আর্য্যদের ক্রিয়াকলাপের ইতিহাস কিছুটা বেদে স্থান পাইয়াছে, কিছুটা পুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে বিবৃত আছে। মৎস্য পুরাণ ও শতপথ ব্রাহ্মণে বৈবস্বত মনুর কাহিনী আছে। ঐতিহাসিক পুসলকার বলেন যে, অতি প্রাচীনকালে এক প্রলয়ঙ্কর বন্যায় পঞ্জাব ও রাজপুতনা হইতে মেসোপটেমিয়া অবধি প্লাবিত হইয়াছিল। এই বন্যা প্রাচীন পৃথিবীর কাল নির্ণয় একটি বিশেষ নিদর্শন। এইরূপ প্রলয়ঙ্কর বন্যা সম্বন্ধে ভারতবর্ষ, হিব্রু, ব্যাবিলন প্রভৃতি প্রত্যেক দেশের প্রাচীন কাহিনীতে উল্লেখ আছে, কাজেই এই প্রলয়ঙ্কর বন্যাই ভারতবর্ষে ও এই সমস্ত দেশে একই সময়ে হইয়াছিল, ইহাতে তাহারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই বন্যার বর্ণনা ব্যাবিলনের এক পুস্তকে পাওয়া গিয়াছে। উহাতে উহার কাল নিরূপিত হইয়াছে। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩১০০ সন অবধি। মনু এই বন্যার সমসাময়িক। মনু এই বন্যা হইতে বেদকে রক্ষা করিয়াছিলেন। মৎস্যপুরাণে ও শতপথ ব্রাহ্মণে এই প্রলয়ঙ্কর বন্যা ও মনুর কথা আছে। এই সব বিচার করিয়া মনুর আবির্ভাব প্রায় ৫০৬০ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায়। মনু সূর্য্যবংশের আদি-পুরুষ। ঋগ্বেদ অনুযায়ী যযাতি তাহার অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। ঐতিহাসিক পারগিটার পুরাণাদি হইতে সূর্য্য-বংশের বিস্তৃত তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাঁহার নিজস্ব গণনা পদ্ধতি অবলম্বনে কাল নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছেন। প্রতি রাজা এবং তাঁহার বংশধর পরবর্ত্তী রাজার সময়ের অন্তর তিনি গড়পড়তা ১৮ বৎসর হিসাবে ধরিয়াছেন। পুসলকার তদনুযায়ী যযাতির আবির্ভাব (৫০৬০ – ৫ × ১৮) বৎসর অর্থাৎ প্রায় ৪৯৭০ বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। মান্ধাতা মনু হইতে ২০শ পুরুষ; সুতরাং মান্ধাতার আবির্ভাব (৫০৬০ – ২০ × ১৮) বা আনুমানিক ৪৭০০ বৎসর পূর্ব্বে। হরিশ্চন্দ্র মনু হইতে ৩২শ পুরুষ: অতএব হরিশ্চন্দ্রের আবির্ভাব (৫০৬০ – ৩২ × ১৮) বা প্রায় ৪৪৮৪ বৎসর পূর্ব্বে। সূর্য্যবংশের সগর ও চন্দ্রবংশের দুষ্মন্ত প্রায় সমসাময়িক: মনুর ৪৩শ পুরুষ পরে অর্থাৎ বর্ত্তমানকাল হইতে প্রায় (৫০৬০ – ৪৩ × ১৮) বা ৪২৮৬ বৎসর পূর্ব্বে সগর ও দুষ্মন্তের আবির্ভাব। মনুর ৬৫ পুরুষ পরে রামচন্দ্র, সুতরাং রাম-চন্দ্রের আবির্ভাব (৫০৬০ – ৬৫ × ১৮) বা প্রায় ৩৮৯০ পূর্ব্বে। সূর্য্যবংশের পতনের পরে চন্দ্রবংশ বহুশত বৎসর অবধি রাজত্ব করে।

পুরাণ ও অন্যান্য পরম্পরাগত গণনা হইতে উদ্ধার করিয়া পারগিটার অনুরূপ ভাবে চন্দ্রবংশের একটি বিস্তৃত তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত বংশতালিকা হইতে জানা যায় যে, মনুর কন্যা ইলার পুত্র পৌরব বা পুরূরবা চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ, চন্দ্রবংশের দুষ্মন্তের রাজধানী প্রয়াগে ছিল। দুষ্মন্তের পুত্রের নাম ভরত ও তাঁহার অধস্তন সপ্তম পুরুষ হস্তিন, যিনি হস্তিনাপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। এই হস্তিনের ৪৩ পুরুষ পরে অর্জ্জুন, অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু ও তাঁহার পুত্র পরীক্ষিৎ। পরীক্ষিতের পাঁচ পুরুষ পরে নিশ্চক্ষু। ঐতিহাসিক পুসলকার রাজাদের শিক্ষকদের বংশাবলীর তালিকা ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১৪০০ সালে অর্থাৎ প্রায় ৩৩৬০ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল। মনুর ৯৫ পুরুষ পরে এই যুদ্ধে অভিমন্যু যুদ্ধ করিয়া-ছিলেন। ইহা নির্ভুলভাবে এই সিদ্ধান্তের অনুরূপ। চন্দ্রবংশের যুধিষ্ঠির ও রাজগৃহের জরাসন্ধ সমসাময়িক। জরাসন্ধের পর তাঁহার বৃহদ্রথ বংশের ২৯জন রাজা রাজ-গৃহে রাজত্ব করেন। তাহার পর বিম্বিসারের বংশের ১৮জন রাজা রাজত্ব করেন। বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। তৎপর পাটলিপুত্রে নন্দবংশের ৯জন নৃপতি রাজত্ব করেন। তাহার পর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য পাটলিপুত্রে সার্ব্বভৌম রাজ্য স্থাপন করেন। ইহা ঐতিহাসিককাল। উপরোক্ত বিবৃতিসমূহ পরীক্ষা করিয়া নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আর্য্যগণ প্রায় ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আসিয়াছে। তখন ভারতে তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগ চলিতেছে। ভারতে

প্রবেশ করিয়া নিজেদের ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে তাঁহাদের বেশ কিছু সময় লাগিয়াছে। সেই সময়ের মধ্যে তাঁহারা উপনিষদ ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, যুদ্ধের জন্য রথাদি নির্ম্মাণ ও ছোট ছোট অনার্য্য রাজ্য জয় করিয়া তাহা শাসনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। উত্তর সীমান্ত ও পশ্চিম পঞ্জাব হইতে সমগ্র উত্তর ভারতে তাঁহাদের এলাকা বিস্তৃত হইয়াছিল। আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও বহুবিধ শাস্ত্রের মাধ্যমে তাঁহাদের চিন্তাধারার বিকাশ ঘটিয়াছে। সমাজ-জীবন ক্রমশঃ উন্নত হইয়াছে, ইহা সবই সময়সাপেক্ষ। সুতরাং প্রত্নতাত্ত্বিক পিগট্-নির্দ্ধারিত ৩৫০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তীকাল ভারতে আর্য্য অনার্য্য সংঘর্ষের কাল মাত্র। আর্য্য জাতি উহার বহু পূর্ব্বেই ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন।

যুদ্ধের জন্য উন্নত অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিয়া প্রবল শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে হইবে এই বিষয়ে মহেঞ্জো-দারো ও হরপ্পা রাজ্য কোনদিন চিন্তা করে নাই। জন-সাধারণ আরামে জীবনযাপন করিতেছিল। তাহারা নিজেদের সভ্যতার ক্রমোন্নতির দিকেই মনোনিবেশ করিয়াছিল। তাহারা যুদ্ধকার্য্যে রথের ব্যবহার জানিত না। এদিকে ভারতীয় আর্য্যগণ এই সময়ে লৌহের ব্যবহার শিখিয়া (লৌহযুগ প্রায় ৩৫০০ বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছিল) নানারূপ দৃঢ় শক্তিশালী অস্ত্রশস্ত্র এবং রথ প্রস্তুত করিলেন।

বেদে লিখিত আছে যে, দস্যু অনার্য্যদের নগররক্ষণ দুর্গগুলি ধ্বংস করিতে ইচ্ছুক হইয়া ইন্দ্র অর্থাৎ আর্য্য সেনাপতি সৈন্যবাহিনী লইয়া বহির্গত হইলেন। প্রত্ন-তাত্ত্বিকেরা বলেন যে, তৎকালে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো ব্যতীত এ অঞ্চলে অন্য কোথায়ও নগররক্ষণ দুর্গ ছিল না। সুতরাং আর্য্যসেনাপতি এ যাত্রায় হরপ্পা ও মহেঞ্জো-দারোর জনপদ ধ্বংসের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি প্রথমতঃ বিশেষ কৌশলে সিন্ধুনদ অতিক্রম করিলেন। বন্যার প্রকোপ হইতে নগররক্ষার্থ নির্ম্মিত সুদৃঢ় বাঁধ তিনি দুর্ব্বার আঘাতে ভগ্ন করিলেন। তাহার পর তিনি বিশাল দুর্জ্জয় দুর্গ অমিতবিক্রমে ধ্বংস করিলেন। তিনি দুর্গ চূর্ণ করিতে বিখ্যাত ও সিদ্ধহস্ত। তিনি দুর্গের পর দুর্গ শক্তিপ্রয়োগে ভগ্ন করিতে লাগিলেন, নির্ভীকভাবে যুদ্ধের পর যুদ্ধে বিজয়লাভ করিতে লাগিলেন। তিনি শত্রুর পর শত্রুকে পরাভূত করিলেন। যে তাঁহার প্রভুত্ব মানিতে চায় না, তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে চায় না তাহাকে হত্যা করিতে লাগিলেন। শত্রুর গৃহ ও অস্ত্রাদি অগ্নিতে ভস্মীভূত হইল। তাহাদের গাভী, গো-যান, সঞ্চিত ধন ও বহুমূল্য সামগ্রী লইয়া সেনাপতি সমৃদ্ধিশালী হইলেন। বেদে এই যুদ্ধের এইরূপ বর্ণনা আছে।

গ্রন্থসূচী

(1) Prehistoric India—Stuart Piggott.

(2) A short history of the world—H. G. Wells.

(3) Vedic Age. Edited by R. C. Majumder and Pusalkar.

(4) Ancient Indian Historical Tradition. —F. E, Pargiter.

(5) The Orion. B. G. Tilak.

সবার উপরে

শ্রীসীতা দেবী

১

অনেকগুলো দিন কেটে গেছে। যে বছরে সুমনার বিয়ে হয়েছিল, সে বছর ঘুরে আর এক বছর এসেছে। এক বছরের ভিতর সংসারে একটু-আধটু পরিবর্ত্তন এসেছে। রাসবিহারীবাবু কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করে বাড়ী বসে আছেন। তাঁর শরীরটা এই অলস জীবনযাপনে খুব ভাল থাকছে না। বাড়ীতে নবাগত যে শিশু-মহারাণীর আবির্ভাব ঘটেছে, তিনি দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করছেন। তিনি হয়েছেন নামেও রাণী, কাজেও রাণী। রাসবিহারীর প্রতাপ আজকাল অনেকখানি কমে গেছে। রাণুর কোনো হুকুম অমান্য করতে তিনিও সাহস করেন না।

গৌরাঙ্গিনী এই নাত্নীটিকে পেয়ে আবার যেন পুনর্জ্জন্ম লাভ করেছেন। গীতাকে প্রায় মেয়ের জন্যে কিছুই করতে হয় না। বাচ্চা স্নান করে ঠাকুরমার কাছে, খায় তাঁর হাতে এবং দুপুরে সর্ব্বদাই তাঁর কাছে ঘুমোয়। রাত্তিরে যখনই তার ঘুম ভাঙে তখনই সক্রোধগর্জ্জনে নিজের ঠাকুরদাদা-ঠাকুরমার ঘরে যাবার আবদার জানায়। যতক্ষণ না তাকে নিয়ে যাওয়া হয়, ততক্ষণ সে ছোট্ট কচি আঙ্গুলটি তুলে ঠাকুরমার ঘর দেখাতে থাকে। গৌরাঙ্গিনী অবশ্য তার কান্না শুনলেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে নাত্নীকে নিয়ে যান।

সুচিত্রা টেষ্টে ফেল করেছে। ফেলটা এতই ভাল করে করেছে যে তাকে আর পড়াবার ইচ্ছা তার মা-বাবার বিশেষ নেই। তার বিয়ের চেষ্টা হচ্ছে, বর খোঁজা হচ্ছে সমান সমান ঘরে। এর আগে যে সব ছেলেমেয়ের বিয়ে হয়েছে, তাতে ঘর যেন বড় এবং ধনী হয় এই ইচ্ছাটা ছিল। এবারে ছেলের স্বাস্থ্য এবং কি শ্রেণীর কাজ করে সেইটা বেশী করে দেখা হচ্ছে। এদেশ সেদেশ করে ঘুরতে হবে যাকে, তেমন পাত্রে এঁরা আর মেয়ে দিতে রাজী নয়, এতে খুব ধনী বা বড় বংশের ছেলে নাও যদি হয় ত এঁদের আপত্তি নেই।

সুমনা বেশ ভালভাবে টেষ্টে পাস করেছে। খুব খেটে সে ভাল করে তৈরি হচ্ছে, যেন পরীক্ষায় ভাল করে পাস করে স্কলারশিপ পায়। নিজের পড়ার খরচ নিজে চালাতে পারলে কি চমৎকার হবে। বাবার উপর যত কম চাপ দেওয়া যায় ততই ভাল। তিনি ত এখন আর চাকুরি করছেন না!

হরিবাবু তাকে পড়াতে আসেন সন্ধ্যার পরে। ছাত্রীর উপর তাঁর টান খুব, সে যেন খুব ভাল ফল করে পরীক্ষায় এই তাঁর ইচ্ছে। পড়াবার কথা তাঁর দেড় ঘণ্টা, তা তিনি রোজই দু' ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা পড়িয়ে যান।

আজ সময় হয়ে গেছে তবু তিনি আসছেন না। সুমনা ক্রমাগত ঘরে আর বাইরে করছে। তার পরীক্ষা ত প্রায় এসে পড়ল, এখন মাষ্টার না এলে ত মুস্কিল। উনি কামাই ত বড় একটা করেন না? হ'ল কি?

বাবার কাছে গিয়ে সুমনা ব্যস্তভাবে বলল, "বাবা, মাষ্টারমশায় ত এখনও এলেন না?"

রাসবিহারী শুয়েছিলেন, উঠে বসে বললেন, "একবার ফোন করে খবর নাও। উনি যে স্কুলে কাজ করেন, তার পাশেই থাকেন, স্কুলের দারোয়ানটা ভাল, বললেই ডেকে দেয়।"

জিতেন টেলিফোন করাতে দারোয়ান বলল যে, মাষ্টারবাবু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে শুয়ে পড়েছেন। খুবই শরীর খারাপ, তিনি আজ যেতে পারবেন না। তাঁর ছেলে একটু পরে গিয়ে দেখা করবে জিতেনদের সঙ্গে।

সুমনা প্রায় কেঁদে ফেলবার জোগাড় করল। "কি হবে? ঠিক এই সময় শেষে ওঁর অসুখ করল? আমার কপালে ভাল করে পাস করা নেই দেখছি। উনি বলেছিলেন আমাকে এমন ভাল করে 'কোচ' করে দেবেন যে, প্রথম দশ জনের মধ্যে হব।"

জিতেন বলল, "একদিন না এলেই অমনি মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল? আচ্ছা মেয়ে! চল্, আমি দেখছি তোর পড়া।"

দাদার পড়ানোর উপর সুমনার বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না। তবে পড়তে না চাইলে দাদা অপমানিত বোধ করবে বলে অগত্যা সে গিয়ে পড়তে বসল। তবে বেশীক্ষণ তাকে পড়তে হ'ল না, রঘু এসে খবর দিল যে, হরিবাবুর ছোট ছেলে দেখা করতে এসেছে। রাসবিহারী

নেমে গেলেন এবং জিতেন ও সুমনাও তাঁর অনুগমন করল।

ছেলেটি বছর আঠার-উনিশের। হরিবাবুর মতই বেঁটে-খাটো মানুষ। রাসবিহারী জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হ'ল তোমার বাবার?"

ছেলেটি খানিকটা কাঁদ কাঁদ মুখে বলল, "ডাক্তার বলছেন যে, একটা মাইল্ড স্ট্রোকের মত হয়েছে। এখন বেশ কিছুদিন শুয়ে থাকতে হবে। এক মাস ত বটেই।"

সুমনার চোখ প্রায় ঠিকরে বেরিয়ে আসবার জোগাড়। এক মাস! সে পড়বে কার কাছে?

রাসবিহারী বললেন, "তাইত। বিপদ হ'ল দেখছি। মেয়েটার পরীক্ষা সামনে। উনি এত ভাল করে পড়াচ্ছিলেন যে, সে বলবার নয়। সুমনা ত আশা করছিল যে, সে 'ষ্ট্যাণ্ড' করবে। এখন চট্ করে লোক পাই কোথায়?"

জিতেন বলল, "তা পাওয়া যেতে পারে। কলকাতার শহর, এখানে প্রাইভেট ট্যুটরের অভাব কি? স্কুল-গুলোয় খোঁজ করলেই পাওয়া যাবে।"

রাসবিহারী কিঞ্চিৎ বিরক্ত হযে বললেন, "লোক একটা যেমন-তেমন হলেই ত হ'ল না? পেটে বিদ্যে থাকা চাই, ধরন-ধারনে নিখুঁৎ ভদ্র হওয়া চাই। মেয়েকে পড়াবে। আমাদের সমাজের গতিক ত জান? বাজে কথা বলতে পেলে কেউ কসুর করে না।"

হরিবাবুর ছেলে বলল, "বাবা বলছিলেন তিনি ব্যবস্থা একটা ঠিক করেছেন। আপনি যদি কাল সকালে দয়া করে একটু আমাদের ওখানে যান ত আপনাকে বলবেন। নিজে ত আসতে পারছেন না?"

রাসবিহারী বললেন, "তাই যাব। তোমার বাবা দিলে বেশ ভাল লোকই দেবেন।"

ছেলেটি নমস্কার করে প্রস্থান করল। সুমনা কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে গেল নিজের পড়ার ঘরে। জিতেনের কে এক বন্ধু এসে জোটাতে সে আর পড়াবার চেষ্টা করল না।

পরদিন সকালে চা-টা খেয়ে রাসবিহারী তৈরি হলেন হরিবাবুর বাড়ী যেতে। সুমনা বলল, "আমি যাই বাবা তোমার সঙ্গে, মাষ্টারমশায়কে দেখে আসি?"

রাসবিহারী বললেন, "চল।" হরিবাবুর বাড়ীর সকলেই এদের চেনা, কাজেই গৌরাঙ্গিনীও আপত্তি করলেন না।

বেশী দূর যেতে হ'ল না। গাড়ী এসে দাঁড়াল ছোট একটা তিনতলা বাড়ীর সামনে। পাশেই একটা মস্ত স্কুল-বাড়ী। একতলায়ই হরিবাবু থাকেন বোধ হয়। সুমনাদের গাড়ীর শব্দ পেয়েই দরজা খুলে কালকের সেই ছেলেটি বেরিয়ে এসে তাঁদের অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে গেল। ছোট ঘর, মোটামুটি গোছানো, তবে বোধ হয় শোবার ঘর ও বসবার ঘর এই দুই ভাবেই ব্যবহার হয় বলে একটু বেশী জিনিসে ঠাসা। হরিবাবু শুয়ে আছেন, তাঁর স্ত্রী ঘরের মধ্যেই বসে কি একটা সেলাই করছেন, প্রায় সুমনারই বয়সী একটি মেয়ে হরিবাবুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, শিয়রে বসে।

আগন্তুকদের দেখে হরিবাবু বললেন, "আসুন, আসুন, কষ্ট দিলাম উপায় ছিল না বলে। সুমনাও এসেছ দেখছি। দেখ ত, এই সময়টায় অসুখ করল। তা পড়াশুনোর তোমার ক্ষতি হবে না, আমি তার ব্যবস্থা করছি। আমার জানা-শোনা একটি ছেলে আছে, আত্মীয়-গোষ্ঠীর মধ্যে বললেই হয়। অতি 'ব্রিলিয়াণ্ট' ছেলে, দু'বার পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হয়েছে। ভাল কাজেই ঢুকেছে, তবে 'জয়েন' করবে জুলাই মাসে। এখন কলকাতাতেই রয়েছে, কাল আমার অসুখ শুনে দেখতে এসেছিল। আমার ত রোগের ভাবনা না যত, সুমনার পড়ার ভাবনা তার চেয়ে বেশী। বলাতে সে রাজী হ'ল তখনই, এক মাস বা যে ক'দিন দরকার সে পড়াতে পারে। তা আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে ত তাকে ডেকে পাঠাই।"

রাসবিহারী মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন, "মনু মা, তুমি যাও ত একটু, সুকুর সঙ্গে গল্প করে এস।"

সুকু আর সুমনা তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে চলে গেল। তখন রাসবিহারী বললেন, "তা দেখুন, আপনি যখন বলছেন তখন পড়ানো-শোনানোর দিক থেকে খুবই ভাল হবে জানি। কিন্তু খুবই অল্প-বয়সী বোধ হয়? আমাদের সমাজের মানুষ যে কি চরিত্রের জানেনই ত। পাছে কোনো কথা ওঠে তাই ভয় পাই। ছেলেটি বিবাহিত কি?"

হরিবাবু বললেন, "বিবাহিত নয়, তবে বিয়ে ঠিক হয়ে আছে শুনেছি, কয়েক মাস পরে বিয়ে হবে। বুড়ো মাষ্টার ত চেষ্টা করলে ঢের জোটে, কিন্তু শুধু বুড়ো হলেই ত কাজ চলবে না? পড়াতে জানা চাই, পেটে বিদ্যে থাকা চাই। সেটা ক'জনের আছে আজকাল? বেশীর ভাগই ত ফাঁকিবাজ। সুমনার পড়ার ক্ষতি হবে এটা আমার একেবারেই সহ্য হবে না। বিজয়ের কাছে সে আমার চেয়েও ভাল পড়বে। ছেলে অতি সাধু চরিত্রের

লণ্ডনে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের বাসভবনে শ্রী নেহরু মিঃ জে. বি প্রিষ্টলি ও তাঁহার স্ত্রী আলাপরত

কর্নালে ন্যাশনাল ডেয়ারি রিসার্চ ইনষ্টিটিউসন

প্রখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক মিঃ ই. এম ফষ্টার লণ্ডন প্রদর্শনীতে মুকুল দে'র শিল্প-চাতুর্য লক্ষ্য করিতেছে

আরব সীমান্তে সীরিয়ার কনসাল জেনারেল কর্তৃক ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু অভিনন্দিত

এ আমি আপনার কাছে লিখে দিতে পারি। একে দিয়ে কারো কোনো অনিষ্টের কথা কল্পনাই করা যায় না।"

রাসবিহারী বললেন, "আচ্ছা, তবে ডাকুন তাকে, একটু কথাবার্ত্তা কয়ে দেখি। আপনাকে যা দিতাম তাই দিলেই হবে ত?"

হরিবাবু বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়। টাকা সে চায়ই না। আমার সাহায্যের জন্তেই কাজটা নিতে চাইছে, টাকাকড়ির অভাব বিশেষ তার নেই।" স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, "একটু কাউকে পাঠিয়ে দাও ত গো, বিজয়কে ডেকে নিয়ে আসুক।"

সুমনা আর খুকু আবার ঘরে ফিরে এল এবং একটুক্ষণ পরে একটি অপরিচিত যুবক এসে ঘরের ভিতর ঢুকল। হরিবাবু বললেন, "এই যে বিজয়, ইনিই রাসবিহারীবাবু, যাঁর কথা তোমায় কাল বলছিলাম। ঐ যে তোমার হবু ছাত্রী সুমনাও উপস্থিত আছে।"

বিজয় সকলকে নমস্কার ক'রে একটা মোড়া টেনে নিয়ে ব'সে পড়ল। বেশ লম্বা-চওড়া, বলিষ্ঠ চেহারা। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। চোখ দুটোর প্রতিই মানুষের দৃষ্টি সঙ্গে যায়, বুদ্ধিতে যেন ঝক্‌ঝক্ ক'রে জ্বলছে। মুখের ভাব বেশ সপ্রতিভ।

রাসবিহারী বললেন, "হরিবাবু আপনাকে যেরকম সার্টিফিকেট দিচ্ছেন, তার উপর ত কথা নেই। সুমনা পড়াশুনোয় ভালই সকলেই বলে, কাজেই ওকে পড়াতে আশা করি আপনার কোনো অসুবিধা হবে না।"

বিজয় সহাস্যমুখে বলল, ওঁর যদি নূতন মানুষের কাছে পড়তে কোনো অসুবিধা না হয় ত আমার কোনো অসুবিধা হবে না।"

কথাটা সে সুমনার মুখের দিকে তাকিয়েই বলল, কাজেই সুমনার মুখেও একটু হাসি দেখা দিল। তার বাবা বললেন, "না, না, ওর আবার কি অসুবিধে? পাছে ভাল মাষ্টার না পায়, এই ভয়েই ত সে কাঁটা হয়েছিল। তা আজ থেকে কি যেতে পারবেন?"

বিজয় বলল, "আমি যেতে পারি। সারাদিন ত ব'সেই থাকি, কাজকর্ম্ম কিছুই নেই।"

অতঃপর আর দু-চারটে কথা ব'লে রাসবিহারী মেয়েকে নিয়ে বাড়ী ফিরে চললেন। গাড়ীতে শুধু একবার মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি মনু মা, মাষ্টার কেমন হবে মনে হচ্ছে?"

সুমনা বলল, "একদিনও না প'ড়ে কি ক'রে বলব বাবা? অত ভাল ছাত্র ছিলেন যখন, তখন ভালই পড়াবেন ব'লে বোধ হয়।"

রাসবিহারী বাড়ী এসে ত খবরটা দিলেন, তাতে প্রতিক্রিয়া হ'ল নানা রকম। জিতেন বলল, "বাঁচা গেল, যে কোনো একটা বোকা বুড়ো ধ'রে পাঠিয়ে দেয় নি তাই রক্ষে।"

গৌরাঙ্গিনী শুনে বললেন, "ওমা, এতে রাজী হয়ে এলে? এরপর পাঁচজন যদি পাঁচ কথা বলে?"

রাসবিহারী বললেন, "আমরা তাহলে দশ কথা বলব।"

গৌরাঙ্গিনী বললেন, "ঠাট্টা করলেই ত হ'ল না? ঐ ত পোড়াকপালী মেয়ে, একটা যদি ফের বদ্‌নাম ওঠে তাহলে রক্ষে থাকবে?"

রাসবিহারী বললেন, "কি আমরা চুরি-ডাকাতি করছি যে বদ্‌নাম উঠবে? কারো মেয়ে কি প্রাইভেট ট্যুটরের কাছে পড়ে না? সব মাষ্টারদের বয়স কি আশীর উপরে?"

গৌরাঙ্গিনী বললেন, "যা খুসি কর বাপু, আমার কোনো কথা ত তুমি শুনবে না! শেষে পস্তাতে না হয় তবেই।"

সন্ধ্যাবেলা সুমনা পড়বার ঘর খুব ভাল ক'রে পরিষ্কার ক'রে রাখল। নূতন মাষ্টার যেন তাকে একটুও অগোছাল মনে না করেন। তার বোনরা এবং বৌদিদিও বিজয়কে দেখবার জন্তে মহা ব্যগ্র হয়ে রইল। বিজয় ঠিক সময় মতই এসে হাজির হ'ল। হরিবাবুর ছেলে পৌঁছে দিয়ে গেল তাকে। জিতেন তাকে ভিতরে নিয়ে এল। মেয়েরা এধার-ওধার থেকে খানিক উঁকি-ঝুঁকি মেরে স'রে গেল।

টেবিলের দু'ধারে দু'জন চেয়ার নিয়ে বসল। বিজয় সব বিষয়ের সব বইগুলি উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল। বলল, "অনেক কাল এ সবের সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গিয়েছে, একবার দে'খে নিতে হবে। ও বাড়ীর খুকুর কাছে সব বই-ই আছে। আজ ইংরিজী আর বাংলাটাই পড়ান যাক্। কাল থেকে সবই নিয়মমত পড়াব।"

সেদিন তাই হ'ল। এমন সুন্দর ইংরিজী পড়ান সুমনা কোনোদিন শোনে নি। ভাবল, নিশ্চয় ইনি ইংরেজের কাছে পড়েছেন। আমার ত এঁর সামনে ইংরিজী পড়তে লজ্জাই করবে। যা বাঙালের মত উচ্চারণ।"

গৌরাঙ্গিনী স্বামীকে কিছু বলতে সাহস পেলেন না, ধমক খাবার ভয়ে। জিতেনকে গিয়ে বললেন, "একটু ঐ ঘরে গিয়ে বোস্ না?"

জিতেন বলল, "আমাকে কি তুমি সার্কাসের 'ক্লাউন' পেলে নাকি? হঠাৎ ওখানে গিয়ে বসব মানে?"

গৌরাঙ্গিনী বললেন, "চেনাশোনা ত নেই। কেমন ছেলে তা কে জানে?"

জিতেন বলল, "তুমি নিজে গিয়ে বোসো, এত যদি তোমার দুর্ভাবনা।"

গৌরাঙ্গিনী সেটা অবশ্য করতে পারলেন না, তবে একেবারে হালও ছাড়লেন না। তাঁর নির্দ্দেশমত চামেলী রাণুকে নিয়ে ঘরের সামনের বারান্দায় ঘুরতে লাগল। নিতান্তই বাচ্চা ব্রব, কাজেই এ নিয়ে আর কেউ কোনো কথা বলল না। সুমনা মায়ের সন্দেহটা মনে মনে অনুভব করল, এবং বেশ বিরক্ত হয়ে উঠল।

পড়া শেষ হতেই সুচিত্রা ছুটে এসে বলল, "ভাই মহুদি, আমিও তোর সঙ্গে পড়ব।"

সুমনা কিছু জবাব দেবার আগেই গীতা বলল, "তোমার পড়ার রকম আলাদা। সে পড়াবার মাষ্টার ত খোঁজা হচ্ছে, প্রায় ঠিক হয়ে এসেছে।"

অমনি কথার মোড় ফিরে গেল।

সুচিত্রা ছেঁকে ধরল বৌদিকে, "বলনা ভাই, কোথায় সে মাষ্টার?"

গীতা বলল, "আসছে আসছে, ধৈর্য্য ধরে থাক।"

কোথায় কোথায় পাত্র দেখা হচ্ছে সব কথা আদায় করে তবে সুচিত্রা ক্ষান্ত হ'ল। সুমনা বলল, "শুধু গুণ শুনে ত আর স্বয়ম্বরা হওয়া যায় না? চোখে দেখা চাই ত?"

গীতা বলল, "আসচে রবিবার একজনকে চাক্ষুষ করতে পারবে বলে যেন শুনছি।"

জিতেন রাত্রে স্ত্রীকে বলল, "নূতন মাষ্টার ছেলেটি চমৎকার। কাকা এতদিকে খুঁজছেন, এদিকে একটু চোখ দিন না?"

গীতা বলল, "কে যে বলল ওর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে?"

জিতেন বলল, "আরে ও আমাদের বাঙালীর ঘরের পাত্তান বিয়ে কত ঠিক হয়, আবার বেঠিক হয়। সুচিত্রাটা দেখতে ভাল আছে, ওকেও পড়তে লাগিয়ে দিলে হ'ত, ঐ বিজয়কুমারের কাছে।"

গীতা বলল, "আরে বাস্‌রে, তোমার বোন তা হলে রেগে টং হয়ে যাবে। পড়াশুনায় চিত্রা ত একেবারে অষ্টরম্ভা, ও গিয়ে জুটলে ত মহুর পড়াশুনো সব জলে যাবে। মাঝ থেকে দুই রূপসীর মাঝে পড়ে মাষ্টারমশাই হাবুডুবু খাবেন।"

জিতেন বলল, "তোমাদের যা ধারণা! একটু রং ফরশা বা একটু বড় চোখ দেখলেই বুঝি মানুষ হাবুডুবু খায়?"

গীতা বলল, "খায়ই ত? যে বয়সের যে রোগ।"

দ্বিতীয় দিন থেকে সুমনার পড়া রীতিমত চলতে লাগল। এবার গৌরাঙ্গিনী একবার যেন নিতান্তই কার্য্যগতিকে ঘরের সামনের বারান্দা দিয়ে ঘুরে গেলেন। লোকটাকে চোখে দেখে তাঁর মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল। এত ভাল দেখতে হবার কি প্রয়োজন ছিল? পোড়াকপালী মেয়েটাও যে দেখতে সুন্দর!

পড়ার শেষে আজ সুমনা জিজ্ঞাসা করল, "আপনি বুঝি ইংরেজ প্রফেসারের কাছে পড়েছেন?"

বিজয় বলল, "পড়েছি দু'চার বার। কেন?"

সুমনা বলল, "আপনি ত ঠিক বাঙালীদের মতন করে ইংরিজী বলেন না।"

বিজয় বলল, "ওঃ, তাই! তা বাঙালীরাও নানারকম করে বলে। আমাকে নানা জায়গায় ঘুরতে হয়েছে, তাই হয়ত উচ্চারণটা খুব বেশী বাঙালী হতে পারেনি।"

রাসবিহারী সুমনাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি মহু মা, নূতন মাষ্টার কেমন পড়াচ্ছে?"

সুমনা বলল, "খুব ভাল বাবা। হরিবাবুর চেয়েও ভাল। খুব চমৎকার ইংরিজী জানেন।"

বাড়ীর বড় ছেলেরাও এবং একেবারে বাচ্চারাও শীঘ্রই বিজয়ের সঙ্গে ভাব করে ফেলল। সে যে খুবই ভাল ছেলে এ বিষয়ে দ্বিমত দেখা গেল না। এমনকি ছোট মহারাণী রাণুও তার কোলে যেতে আপত্তি করলেন না।

একদিন একদিন করে মাসটা প্রায় শেষ হবার দিকে এগোতে লাগল। হরিবাবুর স্বাস্থ্যের কিন্তু আশানুরূপ উন্নতি হ'ল না। কাজেই তাড়াতাড়ি কাজকর্ম্মে যোগ দিতে তিনি পারলেন না, বিজয়ই সুমনাকে পড়াতে লাগল। পরীক্ষার দিনও এসে পড়ল প্রায়।

সুমনা একদিন বিজয়কে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, আমি ভাল 'রেজাল্ট' করতে পারব আপনার মনে হয়?"

বিজয় বলল, "নিশ্চয়। আমার ত মনে হয়, প্রথম দশ জনের মধ্যে নিশ্চয় জায়গা পাবেন। আপনাদের স্কুলে টেষ্টের ফলও ত আপনার খুব ভাল হয়েছিল।"

সুমনা বলল, "স্কুলে ক'টা মেয়েই বা? আর ইউনিভার্সিটিতে হাজারে হাজারে ছেলেমেয়ে।"

বিজয় বলল, "হাজারে হাজারে হলেই বা কি! যা সব বিদ্যা দিগ্‌গজ। পাসই বা তার মধ্যে কটা হবে?"

সুমনা বলল, "আমার যখন ফল বেরবে, তখন ত আপনি কলকাতা থেকে চলে যাবেন, না?"

বিজয় বলল, "চলেই যাব সম্ভবতঃ, তবে হরিবাবুর

কাছ থেকে নিশ্চয় খবর নেব। কি রকম 'রেজাল্ট' হয় জানবার জন্তে আমি ব্যস্তই থাকব, এতদিন পড়ালাম।"

পরীক্ষার সময় এসে গেল। সুমনা প্রথম দিন যখন নিজের নির্দিষ্ট আসন খুঁজতে গেল, তখন তার বাবা, জিতেন, আর সুচিত্রা চললেন তার সঙ্গে। তাঁরা গাড়ীতে উঠতে যাবেন এমন সময় বিজয় এসে উপস্থিত। বলল, চলুন, দেখে আসি, আপনার কেমন জায়গায় 'সীট' পড়েছে। আমার জানা-শোনা আরো দু'চার জন মেয়েরও এই স্কুলেই জায়গা হয়েছে।"

সকলে একসঙ্গে ঘুরে সুমনার নির্দিষ্ট আসন খুঁজে বার করল। বিজয় বলল, "জায়গাটা ভালই পেলেন। তবে আশেপাশের মেয়েগুলো না জ্বালায়। কারও দিকে তাকাবেন না, কারও কোন কথা কানে নেবেন না। মেয়েরাও আজকাল নানারকম কীর্ত্তি করেন ত? স্ত্রী-পুরুষ সকলের জন্মগত অধিকার যখন এক, তখন জাল জুয়াচুরী সবেরই অধিকার সমান।"

ঘণ্টা পড়াতে সকলে সুমনাকে রেখে বেরিয়ে পড়লেন। রাসবিহারী মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করে গেলেন, "ভগবানের কৃপায় তুমি ভালই করবে মা, কোনো ভয় কোরো না।"

জিতেন বলল, "ভয়ের আর আছে কি? কত চেনা মেয়ে রয়েছে আশেপাশে। দুপুরে আবার ওরা সব আসবে খাবার নিয়ে।"

সুচিত্রা বলল, "বাব্বাঃ, ভাগ্যে আমি পরীক্ষা দিচ্ছি না। আমার হলে এতক্ষণে চোখ উলটে যেত।"

বিজয় বলল, "আপনি সত্যিই বিন্দুমাত্র ভয় পাবেন না। যেমনই 'পেপার' হোক্ আপনি বেশ ভাল করে পারবেন আমি বলে দিচ্ছি। অনেক পরীক্ষা ত দিয়েছি, কত ধানে কত চাল হয় তা জানি।"

১০

সুমনার পরীক্ষা হয়ে গেল, বেশ ভাল দিয়েছে। তবু তার ভয় যায় না। পরীক্ষার ক' দিনই বিজয় সন্ধ্যাবেলা এসে দেখে গেছে, কি রকম প্রশ্ন, কি রকম উত্তর। কোনো মন্তব্য করে নি, সুমনাও ভয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করে নি। তবে বিজয়ের মুখ দেখে তার মনে হয়েছে যে সে খুসীই হয়েছে।

পড়াশুনো ত এখন কয়েক মাসের মত শেষ। সময়টা কাটে কেমন করে? কেমন যেন তার মন-মরা লাগে। বেশ অনেকক্ষণ সময় কাটানো যায়, এমন একটা কাজ সে চায়। সে রকম কি-ই বা কাজ আছে? এই সেদিন সকলে দেশ বেড়িয়ে এল, আবার এখনি ত বেড়াতে যাওয়া যায় না? তা ছাড়া সুচিত্রার বিয়ে প্রায় ঠিক হয়ে এসেছে, এখন কেউই কলকতা ছাড়তে পারে না।

অনেক ভেবে সে কাকীমার কাছ থেকে সুচিত্রার কতগুলি জামা, সেমিজ সেলাইয়ের কাজ নিয়ে নিল। সেলাই খানিক খানিক জানে, কাকীমার কাছে দেখিয়েও নিতে লাগল, তিনি বেশ ভাল সেলাই জানেন। কিন্তু সেলাই করে বা কতটা সময় কাটে? রাণু তার কাছে বেশীক্ষণ থাকতে চায় না, না হলে তাকে নিয়েও বেশ কিছুক্ষণ থাকা যেত।

আচ্ছা, বিজয়বাবু আর একদিনও খবর নিতে এলেন না কেন? দাদাদের সঙ্গে ত আলাপ আছে, আসতে একদিন নিশ্চয় পারতেন? তাতেও কি কেউ কিছু বলত? এরই মধ্যে তিনি নিশ্চয়ই কলকাতা ছেড়ে চলে যান নি? সামান্য কিছু দিন পড়িয়ে ছিলেন বলে তাঁর বোধ হয় তত চাড় নেই, বরাবরের মাষ্টার হলে নিশ্চয়ই আর একটু খোঁজ-খবর করতেন।

সুচিত্রাকে দেখতে এল এর মধ্যে একদিন। আবার সেই লোকজনের কোলাহল, হৈ-হল্লা। গত বৎসরে তাকে নিয়ে ঠিক এই খেলা খেলেছিলেন নিয়তি দেবী। কোথায় সব ভেসে গেছে জলস্রোতে পাতার ভেলার মত। কোনো চিহ্নই প্রায় রেখে যায় নি। মাঝে মাঝে কখনও যে তার নির্ম্মলের মুখ মনে পড়ে না তা নয়, তবে সে যেন স্বপ্নে-দেখা ছবির মত।

সুচিত্রাকে সাজান হচ্ছে। তারও বেশী ভাল জামা-কাপড় বা গহনা নেই। সেও দিদি আর বৌদির জিনিষেই সাজছে। সুমনার ত আলমারী ভর্ত্তি শাড়ী-গহনা, কিন্তু সেগুলো পরাবার কথা কেউ ভাবতে পারে না। সেগুলোতেও যেন অমঙ্গলের ছোঁওয়া লেগে আছে।

সুমিত্রার চুল বাঁধা শেষ হ'ল। গীতা তার মুখখানা তুলে ধরে বলল, "দেখ দেখি, কেমন হয়েছে?"

জ্যোৎস্না বলল, "বেশ, বেশ, বেশ গো বেশ। যদি দেখন্তীদের চোখ থাকে ত একে কোনো মতেই অপছন্দ করবে না।"

কাকীমা দাঁড়িয়ে মেয়ের সাজ দেখছিলেন। তিনি বললেন, "বর ত দেখছে না, তা হলে দেখতে ভাল হলেই উৎরে যেত। বুড়োরা ত রূপ দেখতে আসে না, টাকা দেখতে আসে। আমরা যা দিতে পারব, তাতে তাঁদের আশ মেটে তবে ত?"

গীতা বলল, "খুব ভাল করে খাইয়ে দেবেন।"

সুচিত্রার মা বললেন, "তা ত দেবই, কিন্তু পেট ভরলেই যে মন ভরে, তা ত আর নয়?"

ইতিমধ্যে তাড়া এলো নীচ থেকে। লোকজন এসে পড়েছে, দেরী না করা হয় সাজাতে গিয়ে। মেয়েরা তাড়াতাড়ি কাজ করতে লাগল।

কার্য্যতঃ দেখা গেল বরপক্ষের লোকেরা সময় সংক্ষেপের পক্ষপাতী। আবার ত্ব'বার করে কেন আসবে, বরও এদের সঙ্গে চলে এসেছে। ত্ব'জন প্রৌঢ় ভদ্রলোক, আর তিনজন যুবক। শুনবামাত্র মেয়েদের মধ্যে ঠেলাঠেলি পড়ে গেল, কোনজন বর তা জানতে হবে। চামেলীকে চর নিযুক্ত করে চট করে ফল পাওয়া গেল। জ্যোৎস্নার স্বামী ছেলেটিকে অল্প-স্বল্প চিনত, সে চামেলীকে চিনিয়ে দিল।

মেয়ের ডাক পড়ল। এক হাতে পানের ডিবে নিয়ে সর্ব্বাঙ্গে হীরামোতির ঢেউ তুলে নীচে চলল সুচিত্রা। পিছন পিছন চলল বাড়ীর আর যে ক'টি মেয়ে ছিল।

সুচিত্রাকে দেখানো হ'ল, সেও দেখল বরের বাড়ীর লোকদের এবং বরকেও বোধ হয়। ত্ব'চারটা প্রশ্নের উত্তর দিল, মৃত্বকণ্ঠে একটা গানও গাইল। সুমনার মত তার গলা অত ভাল নয়। নিয়মমত সবই করা হ'ল, যা যা সাধারণতঃ করা হয়ে থাকে। তার পর মেয়ে ফিরে যাবার অনুমতি পেল। তার সঙ্গে সঙ্গে তরুণী আর বালিকার দল আবার উপরে উঠে এল।

গীতা বলল, "কেমন দেখলি লো বর? পছন্দ হ'ল?"

সুচিত্রা ন্যাকা সেজে বলল, "কোন্‌টা বর তা আমি জানবো কি করে? তার গায়ে ত আর লেখা ছিল না?"

জ্যোৎস্না বলল, "আহা, খুকু আমার, কিচ্ছু জানেন না। চামেলী বলল না যে, জানলার ধারে যে বসে আছে সেই ছেলেটিই বর?"

সুচিত্রা বলল, "ওঃ, ঐ বুঝি? কি আর দেখতে ভাল? নাকটা থ্যাদা, চোখ ত্বটোও কিছু ভাল নয়।"

জ্যোৎস্না বলল, "বাবাঃ, রূপসীর আর কাউকে মনেই ধরে না। বাঙালীর ঘরে আর কার্ত্তিকের মত দেখতে ক'টা ছেলে জন্মায়?"

চামেলী বলল, "বা-রে! সুন্দর হয় না বুঝি? ঐ ত মেজদির মাষ্টার বিজয়বাবু কেমন সুন্দর।"

ঘরশুদ্ধ মেয়ে হেসে উঠল। সুমনা মনে মনে বলল, "চামেলী ছেলেমানুষ, তাই কথাটা বলে ফেলল। সত্যিই ভদ্রলোক বেশ ভাল দেখতে।"

গীতা বলল, "মেয়ের পছন্দ আছে। আচ্ছা, তোর যখন বিয়ে হবে তখন ঠিক ঐ রকম দেখতে বর এনে দেব। বিজয়বাবু ত ততদিনে বুড়ো হয়ে যাবেন, না হলে তাঁকেই ধরে আনতাম।"

জ্যোৎস্না বলল, "ভাই-টাই আছে নাকি ছোট কে জানে? এখন থেকে দেখে রাখলে হ'ত।"

সুমনা বলল, "তাহলে খুব ভাল করে পড়। ওদের বাড়ীতে বোকা মেয়ে কেউ পছন্দ করবে না, সবাই খুব পড়ায় ভাল।"

যা হোক, এখন আবার সাজসজ্জা খুলে সে-সব গুছিয়ে রাখার কাজ বাকি, কাজেই সেই দিকে মন দিতে হ'ল।

সুমনার পরীক্ষার ফল বেরবার দিন এগিয়ে আসছে, সে মনে মনে একটু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। যদিও জানে যে, সে ফেল করতে পারে না, তবু মন যেন বুঝেও বোঝে না। দাদাদের মাঝে মাঝে অনুরোধ করে খোঁজ-খবর নিতে, তারা হেসেই উড়িয়ে দেয়। সুমনাও যে পাস না করতে পারে, একথা কেউ ভাবতেই রাজী নয়। বাড়ীতে এখন সুচিত্রার বিয়ে নিয়েই সকলের ভাবনা। পাত্রপক্ষের মেয়ে পছন্দই হয়েছে, তবে তারা দরদস্তুর করছে, কতটা চড়াতে পারে। সুচিত্রার বর বিশেষ পছন্দ হয় নি, অন্ততঃ মুখে সে তাই বলে।

হরিবাবু একদিন বেড়াতে এলেন, তিনি এখন অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছেন, কাজকর্ম্ম করতে আরম্ভ করেছেন। সুমনার সঙ্গে দেখা করে বললেন, "বিজয়ের কাছে শুনলাম তুমি খুব ভাল পরীক্ষা দিয়েছ। সে ত আশা করছে তুমি 'ষ্ট্যাণ্ড' করবে। ইংরিজীতে নাকি খুবই ভাল দিয়েছ?"

সুমনা খুশী হয়ে বলল, "তিনি তাই বলেছেন বুঝি? কই, আমাকে ত কিছু বলেন নি?"

হরিবাবু বললেন, "হ্যাঁ, সে ত তাই বলত। এই ক'দিন আগে সে গেল, এতদিন কলকাতাতেই ছিল ত। আমায় বলে গেছে ফল বেরলেই তাকে জানাতে। খুকুটা ভাল করে নি, পাস করতে পারবে কি না কে জানে? খুব ভাল করে তৈরি হবার সুযোগ পায় নি, আমার অসুখে বাড়ীতে সব উলোট-পালোট হয়ে গেল কিনা?"

বিজয়বাবু যে তার কথা একেবারে ভুলে যায় নি, এটা জেনে সুমনা খুশী হ'ল। যদি সে ভাল করে পাস করে তবে আই-এ পরীক্ষা দেবার সময়ও তার মাষ্টার লাগবে। তখন যদি ওঁকে আবার পাওয়া যায়? কিন্তু সে জানে তা সে পাবে না। উনি ত আর মাষ্টারি করবার জন্যে চিরকাল কলকাতায় বসে থাকবেন না? তাঁর কত ভাল কাজ হয়েছে।

হরিবাবু আর কিছুক্ষণ গল্প-স্বল্প করে চলে গেলেন।

সুমনাও আবার বোনদের আড্ডায় ফিরে গেল। সেখানে ত এখন ঐ এক বিয়ের গল্প। সুমনার সেগুলি শুনতে যে খুব কিছু খারাপ লাগে তা নয়, কিন্তু মনে একটা বিষাদের ভাবও আসে। সে চিরদিনই এ সবের মধ্যে থাকবে, অথচ এসব থেকে খানিকটা আলাদা হয়ে থাকবে। তার বিয়ে একটা হ'ল কিন্তু সেটা নামেমাত্র বিবাহ। দেহে মনে আত্মায় সে কুমারীই থেকে গেছে। এই ভাবেই সে চিরদিন কাটাবে। ভাল লাগবে কিনা কে জানে? এখন বাবা-মা বেঁচে আছেন, খুবই আদর-যত্নে সে আছে, কিন্তু তাঁরা যখন থাকবেন না, তখন কি আর এত আদর থাকবে? থাকা সম্ভব নয়। গীতা অবশ্য এখন খুবই ভাল ব্যবহার করে, কিন্তু পূর্ণ কর্ত্রীত্ব হাতে পেলে এতটা করবে কি? তা ছাড়া ছোড়দার বৌ'ও ত আসবে, সে কেমন হবে কে জানে? অবশ্য কারও গলগ্রহ সে হবে না, কিন্তু একেবারে ঘর-সংসার থেকে বেরিয়ে গিয়ে আলাদা একলা জীবন কাটাবে, এটা ভাবতেও ভাল লাগে না।

সে ছেলেমানুষ, ছেলেমানুষের দৃষ্টিতেই এখনও জগৎটাকে দেখছে। এর ভয়াবহ দিকটা এখনও তার চোখে পড়ে না, সেটা সম্বন্ধে সে কিছু এখনও ভাবে না।

সে দিকটা কিন্তু গৌরাঙ্গিনী এখন থেকেই খুব ভাবছেন। মাঝে মাঝে বলতেন স্বামীকে, "হ্যাগা, মনুর শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধটা একেবারে তুলে দিলে? আমরা যখন থাকব না তখন ত তবু একটা আশ্রয় ওর থাকত? গিয়ে দাঁড়াতে পারত দরকার হলে?"

রাসবিহারী বলতেন, "ওদের আশ্রয়ে যাবে? কোন্ দুঃখে? কি চামারের মত ব্যবহার করেছে তা এরই মধ্যে ভুলে বসে আছ? এ বাড়ীর একটুকরো কাঠ তাদের বাড়ীতে রাখতে কত অসুবিধা হচ্ছিল তাদের, আর মেয়েকে তোমার থাকতে দেবে? কেন, মনু ওখানে যাবে কেন? আমি কি হাঘরে না হাবাতে? ঘর-বাড়ী কিছু রেখে যাব না, টাকা পয়সাও কিছু রেখে যাব না? মনুর সব ব্যবস্থা আমি করে যাব, তোমার ভাবনা নেই, কালই যাব আমার সলিসিটারের বাড়ী।"

সুমনার মা বললেন, "তবু অল্প বয়সী মেয়ে, কত রকম বিপদ এ সংসারে। কে দেখবে, কে আগলাবে?"

রাসবিহারী বললেন, "দুটো দুটো ভাই রয়েছে কি করতে? গায়ে তাদের মানুষের রক্ত নেই? ছোট বোনকে তারা দেখবে না? আর আমি কি মনুকে এমনি গেঁয়ো আর মুখ্যু করে রেখে যাব যে, একদিন কেউ না দেখলেই সে তলিয়ে যাবে?"

রাসবিহারীর কথায় কিন্তু গৌরাঙ্গিনী কিছুই আশ্বাস পেলে না। নিজেরা যে ভাবে জীবন যাপন করছেন, তা ছাড়া অন্য কোন রকম জীবনযাত্রা তিনি বোঝেন না। মাথার উপর একজন কেউ নেই, এ রকম করে মেয়ে-মানুষে বাঁচতে পারে নাকি? হাজারই বই পড়ুক, মেয়ে ত বটে? তাঁদের সমাজে অদৃষ্টদোষে বিধবা যারা হয়, তারা স্বামী না হোক, অন্য কারও আশ্রয়ে থাকে। আদর পায় না, সম্মানও পায় না অধিকাংশ ক্ষেত্রে, তবু বিপদ-আপদ থেকে খানিকটা আড়াল হয়ে থাকে। আর এ হতভাগা মেয়ের অঙ্গে ত রূপ-যৌবনের জোয়ার এসে গেছে। একে সংসারের হাঙ্গর-কুমীরের গ্রাস থেকে কে বাঁচাবে? ভাইরা কি কিছু করবে? সে ভরসা তিনি পান না। তাঁরও ত ভাই আছে, কিন্তু বছরে কবার চিঠি লেখে? কর্ত্তা পুরুষ মানুষ, এ সব কথা একেবারে তলিয়ে বোঝেন না।

গৌরাঙ্গিনী স্বামীকে না জানিয়ে তলে তলে মাঝে মাঝে সুমনার শ্বশুরবাড়ীর খবর নিতেন। এত সাবধানে নিতেন যে, এ বাড়ীর লোকেরা ত জানতই না, যাদের খবর নেওয়া হচ্ছে তারাও জানত না। এ কাজে তাঁর সহায়তা করত রাধা এবং কাত্তী ঝি। ঝিদের এক বিরাট বাহিনী কলকাতার শহরে বাস করে। কোন্ সূত্রে তাদের পরিচয় হয়, কোথায় তাদের সভা বসে কেউ জানে না, কিন্তু তারা সবাই প্রায় সবাইকে চেনে; যে যেখানে কাজ করে, তাদের সব হাঁড়ীর খবর রাখে এবং প্রয়োজন মত অন্য বাড়ীতে সরবরাহ করে, দু'চার আনা বকশিসের লোভে। ডিটেক্‌টিভের চেয়ে এরা অনেক সুবিধা পায়, কারণ একেবারে গৃহস্থের সংসারের কেন্দ্রস্থলে তাদের গতিবিধি অব্যাহত। রান্নাঘর, শোবার ঘর, ভাঁড়ারঘর, কোথাও এদের যাওয়া নিষিদ্ধ নয়। গিন্নিরা এবং বৌ-ঝিরা দরকার মত এদের বকে ঝকে, আবার সখীর মত ব্যবহারও করে।

কাত্তী ঝি এসে খবর দিল, "মেজদির শাশুড়ীর বড় ব্যারাম মা, বাঁচে কি না বাঁচে।"

গৌরাঙ্গিনী বললেন, "ওমা, তাই নাকি?" কি হয়েছে?"

কাত্তী বলল, "সেই যে ছেলের খবর শুনে শয্যা নিয়েছিল মা, আর উঠে বসল নি। আগে 'হাঁফানি' ছিল, এখন নাকি 'নিমুনি' হয়েছে। ডাক্তার ত আশা দিচ্ছে না।"

গৌরাঙ্গিনী বললেন, "আহা, ছেলের শোকেই মানুষটা গেল। হবে না, এর বাড়া শোক আছে? প্রথম ছেলে, অমন কৃতী ছেলে।"

ছোট গিন্নী বললেন, "এঁরা যে মত করেন না, না হলে একবার গিয়ে দে'খে আসতাম। কুটুম্বজনের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি ত সর্ব্বদাই হয়, তবু আপদে-বিপদে যাওয়া-আসা ত করে?"

গৌরাঙ্গিনী বললেন, "দেখি কর্ত্তাকে ব'লে। বেশী বকাবকি করলে ত আর যেতে পারব না?"

রাসবিহারী শুনে বললেন, "ওরা যদি মনুকে যেতে বলে তাহলে না হয় পাঠাতে পারি, যদি অবশ্য সে নিজে অমত না করে। সম্পর্ক যা-কিছু তা একদিন ওর সঙ্গেই হয়েছিল। আমাদের সঙ্গে যারা বিন্দুমাত্র ভদ্রতার সম্পর্কও রাখে নি, তাদের বাড়ী আমরা কি করতে যাব?"

কথাটা উঠল সুমনার কানে। সে একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল, "আমি আর কি করতে যাব? ওদের সঙ্গে আমার যে কোনোদিন কিছু যোগ ছিল, তা আমার ভাবতেও ভাল লাগে না।"

শীতা বলল, "তা তারা যদি যেতে বলে তবু যাবে না?"

সুমনা বলল, "যেতে বলবেও না, যাবও না।"

সুমনার কথাটাই ঠিক হ'ল। এঁদের বাড়ীতে কেউ কোনো খবর পাঠাল না। কিছুদিন পরে ঝিদের মারফতেই জানা গেল যে, সুমনার শাশুড়ী মারা গেছেন।

এখন এক প্রশ্ন উঠল, সুমনা অশৌচ গ্রহণ করবে কি না। এ বিষয়ে গৌরাঙ্গিনী জেদ ধরলেন যে, অশৌচ নিতেই হবে সুমনাকে, না হলে সে ধর্ম্মে পতিত হবে। অশৌচ নেওয়া না নেওয়ার অবশ্য মান-অপমানের কোনো প্রশ্ন ছিল না, তাই রাসবিহারী কোন্ দিকে মত দেবেন ভেবে পেলেন না। সুমনা নিজেই সমস্যার সমাধান করল। বলল, "তুমি যখন বলছ করতে, তখন খানিকটা আমি করছি। একটা মাস বৈ ত নয়? আমি নিরামিষ খাব এখন, পায়ে জুতো দেব না। তবে চুলে তেল দেব, চুল বাঁধব, এবং ফরশা শাড়ী-জামা পরব। মাটিতে বিছানা ক'রে শুতে পারি, এখন ত আর শীতকাল নয়?"

মন্দের ভাল ব'লে গৌরাঙ্গিনীকে তাইতেই রাজী হতে হ'ল। মেয়ের ধর্ম্মজ্ঞানহীনতা তাঁকে আবার বড় পীড়া দিল। বাপের যেমন মতিগতি, মেয়েরও হয়েছে তাই। দু'জনই ওবাড়ীর উপর জাতক্রোধ। কিন্তু নির্ম্মল ত আর ইচ্ছা ক'রে মরে নি? তার বাবা অবশ্য এঁদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন নি, কিন্তু ওর চেয়েও খারাপ ব্যবহার কত লোকে করে, তবুও সম্পর্ক থাকে।

যা হোক, দিন চলতে লাগল। সুচিত্রার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল ঐখানেই। মাঝারিরকম ঘটা ক'রে পাকা দেখাও হয়ে গেল। এক বছর আগের ঐ দারুণ শোকাবহ ঘটনাটার ছায়া বাড়ীর উপর থেকে খানিকটা যেন অপসারিত হয়ে গেল। সুচিত্রার গহনা গড়ানো, কাপড়-চোপড় করানোর দিকে এখন মনটা চ'লে গেল সকলের। কে কি তাকে উপহার দেবে তাই নিয়ে লেগে গেল জল্পনা-কল্পনা।

ইতিমধ্যে যা হোক ক'রে সুমনার অশৌচের পর্ব্ব শেষ হয়ে গেল। নির্ম্মলদের বাড়ী থেকে তাকে একটা শ্রাদ্ধের চিঠি আসা ছাড়া, আর কিছু তাঁরা করলেন না। সুমনাদের বাড়ী থেকে সবাই নীরব থেকে গেলেন।

সুমনার ইচ্ছে সুচিত্রাকে সে কিছু উপহার দেয়। জিনিসে ত তার ঘর ভর্ত্তি। শাড়ী-গহনায় আলমারী বোঝাই, তার বেশীর ভাগই সে পরে নি। সে তার থেকে ভাল জিনিসই দিতে পারে। সুচিত্রা নিতে কিছুই আপত্তি করবে না,তবে মা বা কাকীমা যদি কিছু ভাবেন।

ভেবেচিন্তে মাকে কথাটা সে ব'লেই ফেলল। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তিনি কোনো আপত্তিই করলেন না। সবরকম অনাচার তাঁর এখন একটু একটু ক'রে সয়ে আসছিল। বললেন, "তা দে, কি দিতে চাস্। তবে খুব বেশী দামীগুলো রেখে দিস্।"

সুমনা ছোট একটা সোনার কণ্ঠি সুচিত্রাকে দিয়ে দিল। একখানা ভাল শাড়ীও দিল সেই সঙ্গে। সুচিত্রা মহা খুশী। সত্যি, মনুদিটা বড্ড ভাল।

বিয়ের দিন ঠিক হ'ল শ্রাবণ মাসে। বর্ষার ভয়ানক অসুবিধা হবে, কিন্তু কাছাকাছি আর ভাল সময় নেই। বাড়ীর ভিতর যেমন ক'রে হোক ক'রে নিতে হবে।

হঠাৎ সুমনার পাশের খবর পাওয়া গেল। খুব ভাল করে পাশ করেছে সে। পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে। যাক্, এতকাল তাকে নিয়ে দুঃখই করেছে সবাই, এখন তাকে নিয়ে আনন্দ করবারও একটা ব্যাপার ঘটল। বাড়ীর সবাই বেজায় খুশী; বাবা, দাদা, জামাইবাবু সবাইকার কাছ থেকে সে অনেক ভাল ভাল উপহার পেয়ে গেল।

বিজয়ের কাছ থেকে একটা টেলিগ্রাম এসে হাজির হল। "Congratulations & Blessings. Bijoy.

জিতেন টেলিগ্রাম প'ড়ে বলল "ডেঁপো কার্ত্তিক! আবার blessings!"

ক্রমশঃ

রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারা

অধ্যাপিকা শ্রীআভা কুণ্ডু

নাটকের সূচনায় দেখা যায়, ভৈরবমন্দিরে যাবার পথে শিবিরে রাজা বিশ্রাম করছেন। তিনিও সেদিন ভৈরবের অর্চনা করবেন বলে প্রস্তুত। নাটকের ঘটনা সমস্তই শিবিরের সন্নিকটে ভৈরবমন্দিরে যাওয়ার পথে সংঘটিত হচ্ছে। ভৈরবের বার্ষিক পূজা উৎসবের দিনটিতেই সমস্ত ঘটনা সন্নিবেশিত হয়েছে। দিনটি সম্ভবত বর্ষশেষের অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির।

নাটকটিতে অঙ্ক গর্ভাঙ্কমত কোন ভাগ না থাকলেও কতকগুলি দৃশ্য পরিবর্ত্তন চোখে পড়ে। এ পরিবর্ত্তনে অবশ্য পটপরিবর্ত্তন নেই—পরিবর্ত্তন শুধু পাত্রপাত্রীর। এই পাত্রগত পরিবর্ত্তনকে ভিত্তি করে মুক্তধারায় মোট নয়টি দৃশ্য পাওয়া যায়। দৃশ্যগুলি নূতন নূতন ঘটনা সন্নিবেশের মধ্য দিয়ে নাটকটিকে অনিবার্য্য পরিণামের দিকে অগ্রসর করেছে।

নাটকের প্রথম দৃশ্যে একজন বিদেশী পথিক ভৈরবের পূজা উৎসবে যোগদানের জন্য উপস্থিত। তাঁর সঙ্গে দেখা এক উত্তরকূটের নাগরিকের। বিদেশী নাগরিক প্রতি বৎসর ভৈরবের উৎসবে পূজা দিতে আসে। এবার আকাশে ভৈরবমন্দিরের চূড়ার পাশে উদ্ধত যন্ত্রটি তার মনকে কেমন যেন সংশয়িত করে তুললে। এক নাগরিককে সে জিজ্ঞাসা করছে—ওই বস্তুটি কি? নাগরিক জানালো ঐটি যন্ত্ররাজ বিভূতির অক্লান্ত চেষ্টায় নির্ম্মিত মুক্তধারার বাঁধ—তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। সেজন্যই উৎসবের আয়োজন হয়েছে। বিদেশী নাগরিকের মন কেমন যেন অপ্রসন্ন হয়ে উঠলো—সংশয়ে দ্বিধায় আন্দোলিত হ'ল তার মন। যে কীর্ত্তির উদ্দেশ্য জনকল্যাণ নয়, বিধাতার বিধানকে ছাড়িয়ে যাওয়াই যার লক্ষ্য, তা দৈবরোষের কারণ হয়ে উঠতে পারে। "দিয়ে আসি নৈবেদ্য, কিন্তু মন প্রসন্ন হচ্ছে না।" এই বলে বিদেশী প্রস্থান করল। এমন সময় কোথা হতে এসে পড়ল অম্বাপাগলী—তার মুখে শুধু একটি কথা—"আমার সুমন! আমার সুমন!" তার একমাত্র পুত্র তার চোখের আলো সুমন বিভূতির বাঁধ-বাঁধা কাজে কোথায় হারিয়ে গেছে। পুত্রহীনা জননীর উন্মত্ত প্রলাপ আর দীর্ঘশ্বাসে হঠাৎ বাতাস ভারী হয়ে উঠল। বিভূতির জয়গানের সুরে কোথায় বেজে উঠল বেসুর। যে যন্ত্র বিভূতির যন্ত্রবিজ্ঞানের জয় সূচিত করছে তার পদতলে কত নিরপরাধ মানুষের প্রাণ বলি হয়েছে সে কথা সহসা আত্মপ্রকাশ করে চমক ভাঙিয়ে দিয়ে গেল।

দ্বিতীয় দৃশ্যে কুমার অভিজিতের দূত এসে উপস্থিত হয়েছেন যন্ত্ররাজ বিভূতির কাছে। যুবরাজ অভিজিৎ বলে পাঠিয়েছেন যে, মুক্তধারাকে যন্ত্রে আবদ্ধ করে যন্ত্ররাজ তাঁর বুদ্ধিকৌশলের চরম নিদর্শন দেখিয়েছেন। তার অভিনন্দন পাওয়া উচিত এবং তা তিনি লাভও করেছেন। কিন্তু তাঁর যন্ত্র মানবকল্যাণে নিয়োজিত হয় নি। শিবতরাই রাজ্যের প্রজার ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল এ যন্ত্রের কবলে পড়ে দুর্লভ হয়ে উঠবে। সুতরাং এ কীর্ত্তি ভেঙে দিয়ে মানবের কল্যাণের পথ মুক্ত করাই হবে তাঁর আরও বৃহত্তর কীর্ত্তি। বিভূতি চমকে উঠলেন এ প্রস্তাবে। বললেন, তা কখনোই হইতে পারে না। যুবরাজের দূত সবিনয়ে জানালেন যে, তাই যদি হয় তবে মুক্তধারাকে মুক্তি দেবার ভার স্বয়ং যুবরাজই গ্রহণ করবেন। বিভূতি বলে উঠলেন—"স্বয়ং উত্তরকূটের যুবরাজ এমন কথা বলেন? তিনি কি উত্তরকূটের নন? তিনি কি শিবতরাইয়ের?" দূত জানালেন—যুবরাজ বললেন, "উত্তরকূটে কেবল যন্ত্রের রাজত্ব নয়, সেখানে দেবতাও আছেন, এই কথা প্রমাণ করা চাই।" বিভূতি সদম্ভে জানালেন—তাঁর যন্ত্রের বাঁধন আলগা করতে পারে এমন শক্তি কারো নেই। দূত জানালেন—"ভাঙনের যিনি দেবতা তিনি সব সময় বড় পথ দিয়ে চলাচল করেন না। কোন ছিদ্রপথ দিয়ে ভাঙন আসে তা কারও চোখে পড়ে না।" বিভূতি চমকে উঠলেন। দূত দ্রুত প্রস্থান করলেন।

এমন সময় ভৈরবমন্দিরের যাত্রী-নাগরিকের দল বিভূতিকে ঘিরে দাঁড়াল। যন্ত্ররাজকে সম্মান জানাবার উৎসাহের তাদের সীমা নেই। মালায় বিভূতির কণ্ঠ ঢাকা পড়ল। কি ভাবে তাঁকে সম্বর্দ্ধনা করা যায় সে সম্বন্ধে নানা বিতর্কের পর শেষে তাঁকে কাঁধে তুলে নিয়ে তারা নগর-পরিক্রমায় রত হ'ল। "জয় যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়" এই ধ্বনিতে নগর মুখরিত হ'ল। সকলে সমবেত-

স্বরে গাইতে লাগল—"নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র।"

তৃতীয় দৃশ্যে রাজা রণজিৎ ও তাঁর মন্ত্রী শিবিরের দিক হতে এসে কথোপকথনে রত হলেন।

বিভূতির যন্ত্রের সাহায্যে শিবতরাইয়ের প্রজাদের বশে রাখবার একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত হয়েছে জেনে রাজা অত্যন্ত আনন্দিত। কিন্তু মন্ত্রীকে কেমন যেন নিরুৎসাহ মনে হচ্ছে। এভাবে প্রজাকে বশে রাখার ব্যাপারে তাঁর তেমন উৎসাহ নেই। কুমার অভিজিৎকে দিয়ে যে ভাবে প্রজাদের অন্তরের যে প্রীতি লাভ হচ্ছিল তার চেয়ে বেশী কোন যন্ত্রের সাহায্যে পাওয়া সম্ভব নয়—এই তাঁর অভিমত। কুমার অভিজিৎ কিছুদিন হতে বিমনা হয়ে আছেন একথা এদের কথাবার্তার মধ্যে বোঝা যায়। রাজচক্রবর্ত্তীর লক্ষণ দেখে রাজা তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর আচরণে রাজার বিশ্বাস ক্রমেই দূরে যাচ্ছে। অভিজিৎ শিবতরাইয়ের কল্যাণের জন্য বহুকালের অবরুদ্ধ বাণিজ্যপথ নন্দিসঙ্কট খুলে দিয়েছেন। উত্তরকূটের রাজাহিসাবে এ কাজ তিনি সমর্থন করতে পারছেন না। এমন সময় রাজার পিতৃব্য বিশ্বজিৎ এসে উপস্থিত। রাজার এই পিতৃব্যের সঙ্গে অভিজিতের খুব মিল আছে, আর সেজন্যই রাজা এঁর সম্বন্ধে সন্দিহান। শুভ্র কেশ, শুভ্র বস্ত্র, আর শুভ্র উষ্ণীষধারী বৃদ্ধ বিশ্বজিৎকে অভ্যর্থনা করে রাজা বললেন—'তুমি আজ উত্তর ভৈরবের মন্দিরে পূজায় যোগ দিতে আসবে এ সৌভাগ্য প্রত্যাশা করি নি।' বিশ্বজিৎ বললেন—"উত্তর ভৈরব এ পূজা গ্রহণ করবেন না এ কথা জানাতে এসেছি।" সমস্ত তৃষিত মানুষের জন্য মহাদেব যে জলধারা ঢেলে দিচ্ছেন তাকে যে বন্ধ করেছে তার প্রতি তাঁর কোন শ্রদ্ধা নেই। স্বয়ং উত্তর ভৈরব এতে রুষ্ট হবেন। তিনি বলেন যে, তিনি এতদিন অন্ধ ছিলেন, বালক অভিজিৎ তাঁর দৃষ্টি খুলে দিয়েছে। মানবতার কল্যাণের পথকে তিনি দেখতে পেয়েছেন তাঁরই প্রভাবে। রাজা বলেন যে, বিশ্বজিৎই অভিজিৎকে উত্তরকূটের উপর বিদ্বিষ্ট করে তুলেছেন। বিশ্বজিৎ একথা স্বীকার করেন না। বিরক্ত রাজা বিশ্বজিৎকে উত্তরকূট ত্যাগ করতে বললেন। কিন্তু "আমি ত্যাগ করতে পারব না। তোমরা আমাকে ত্যাগ যদি কর তবে সহ্য করব।" এই বলে তিনি প্রস্থান করলেন।

এর পরেই সন্তানহারা অম্বার প্রবেশে আবহাওয়া করুণ হয়ে উঠল। রাজাকে সে প্রশ্ন করে—'ওগো, তোমরা কে? সূর্য্য ত অস্ত যায়—আমার সুমন ত এখনও ফিরল না!' তার করুণ আবেদন রাজার মনেও চমক লাগায়। জিজ্ঞাসা করেন—"মন্ত্রী, এ কে?" বিভূতির যন্ত্রের জয়স্তম্ভ গেঁথে তুলতে কত প্রাণ যে আহুতি দিয়েছে তা তাঁরও সঠিক জানা ছিল না। অম্বাকে একটা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বিদায় করে তিনি যেন স্বস্তি অনুভব করেন।

অম্বার প্রস্থানের পর এই দৃশ্যে দেখা যায় একদল ছাত্র ও গুরুমশায়কে। এঁদের উপস্থিতি সময়োচিত। এঁরা রাজার মনের ভাবটা কিছুটা লাঘব করে যন্ত্ররাজ বিভূতি যে উত্তরকূটের গৌরব কতখানি বাড়িয়েছে সেই কথাই প্রকাশ করেন। গুরুমশায় ছাত্রদের নিয়ে চলেছেন ভৈরবের পূজা উৎসবে। তাঁর কথাবার্ত্তায় বোঝা যায় ছাত্রদের তিনি যে শিক্ষা দিচ্ছেন তা সাম্রাজ্যবাদের উগ্রতায় ভরা। তিনি শিখিয়েছেন উত্তরকূটের মানুষেরা জাতিগৌরবে উচ্চ, তাদের সভ্যতা উঁচুদরের। শিবতরাই, চণ্ডপত্তন প্রভৃতি অন্য রাজ্যের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ গুরুমশায় শিশুকাল থেকে শিষ্যদের মনে দৃঢ়ভাবে গেঁথে দিচ্ছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস এরা উত্তরকূটের নাম রাখতে পারবে। যাই হোক প্রস্থানের পূর্ব্বে রাজদরবারে বেতনবৃদ্ধির আবেদনটা করে যেতে তিনি ভোলেন না।

এদিকে অম্বার আকুল ক্রন্দনে রাজার মনেও সংশয় দেখা দিয়েছে। গুরুমশায়ের শিক্ষাদানপদ্ধতির পরিচয় পেয়েও তিনি কিঞ্চিৎ বিচলিত। গুরুমশায় ও শিষ্যদলের প্রস্থানের পর রাজা যখন বিভূতিনির্ম্মিত যন্ত্রের দিকে তাকালেন তখন সে কীর্ত্তির মহিমা তাঁর কাছে ম্লান হয়ে গেছে। তিনি বলে উঠলেন—"ওটাকে দানবের উদ্যত মুষ্টির মত দেখাচ্ছে। অতটা বেশি উঁচু করে তোলা ভালো হয় নি।" এখন মন্দিরে যাবার সময় হ'ল—বলে রাজা ও মন্ত্রী উভয়ে প্রস্থান করলেন।

চতুর্থ দৃশ্যে দ্বিতীয়দল নাগরিকের প্রবেশ। এরা বিভূতির গাঁয়ের লোক। এদের মনে বিভূতির গৌরবে প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা থাকলেও বিভূতির ডাইনে বসার লোভ এরা সামলাতে পারে না। বিভূতিকে এরা বেশী করে জানে বলেই যন্ত্ররাজ বিভূতি সম্বন্ধে এদের তেমন উৎসাহ নেই। শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তির অধিকারী হয়ে বিভূতি আর সকলকে অগ্রাহ্য করে—এ তাদের ভালো লাগে না। "তা যা বলিস, বিভূতি উত্তরকূটের নাম রেখেছে বটে।" একজন একথা বলতেই অপরেরা তীব্রভাবে প্রতিবাদ করে। বাঁধের কোথায় যেন একটা ক্রটী আছে, যার ফলে যে কোন মুহূর্ত্তে ওটা ভেসে যেতে পারে—এমন

আভাস দিলে একজন। বিভূতির সমস্ত বিদ্যা যন্ত্র-বর্ম্মার কাছে লাভ করা—এমন কথাও বলে কেউ কেউ। তবু হাজার হোক বিভূতি তাদের গাঁয়ের লোক। তাই তারা শেষে বিভূতিকে সম্বর্দ্ধনা করতে যাওয়াই স্থির করে। "আমরা হলাম বিভূতির এক গাঁয়ের লোক; আমাদের হাতের মালা নিয়ে তবে অন্য কথা—" এই কথা বলে তারা অগ্রসর হবে এমন সময় নেপথ্যে শোনা গেল—"যেয়ো না ভাই, যেয়ো না, ফিরে যাও।" গায়ে ছেঁড়া কম্বল, হাতে বাঁকা ডালের লাঠি, রুক্ষ চুল নিয়ে বৃদ্ধ বটুক প্রবেশ করলো। সন্তানহারা বৃদ্ধ—তার দুই নাতি প্রাণ হারিয়েছে বাঁধ-বাঁধার কাজে। সে সকলকে সাবধান করে দিয়ে বলে, মন্দিরে যেও না কেউ। ভৈরবকে বিদায় দিয়ে তৃষ্ণাদানবীর আজ সেখানে প্রতিষ্ঠা করা হবে। সে রাক্ষসী শুধু নরবলি চায়। "বলি দেবে, নরবলি! আমার দুই জোয়ান নাতিকে জোর করে নিয়ে গেল, আর তারা ফিরল না।"—বটুকের এই সাবধানবাণীতে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে আগামী সঙ্কটের আশু সঙ্কেতে। সবাই বলে—তুমি চুপ করো, চুপ করো—এ সব কথা শুনলে উত্তরকূটের মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। বটুক বলে উত্তরকূটের মানুষকে সে আর ভয় করে না। তারা তো তার গায়ে ধুলো দেয়, ঢেলা মারে। আর বলে—তোর নাতি দুটো প্রাণ দিয়েছে সে তাদের সৌভাগ্য। "তারা তো মিথ্যে বলে না"—একজন নাগরিক এ কথা বলতেই বটুক প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো। "বলে না মিথ্যে? প্রাণের বদলে প্রাণ যদি না মেলে, মৃত্যু দিয়ে যদি মৃত্যুকেই ডাকা হয়, তবে ভৈরব এত বড়ো ক্ষতি সইবেন কেন? সাবধান, বাবা, সাবধান, যেও না ও পথে"—এ কথা বলতে বলতে বটুক প্রস্থান করলো। তার কথায় গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে কারো কারো। তার পর "চল্ চল্" বলতে বলতে নাগরিকেরা প্রস্থান করে।

পঞ্চম দৃশ্যে যুবরাজ অভিজিৎ ও রাজকুমার সঞ্জয়ের প্রবেশ। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। এ দৃশ্যে দেখা যায় যুবরাজ অভিজিৎ রাজবাড়ী ছেড়ে যেতে কৃতসঙ্কল্প। মুক্তধারাকে তিনি বন্ধনমুক্ত করবেনই—এই তাঁর পণ। সঙ্গে রয়েছে তাঁর একান্ত অনুগত সঞ্জয়। এঁদের দুই ভাইয়ের কথোপকথনের মধ্যে রাজকুমার অভিজিতের চরিত্রটি অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে প্রকাশিত হয়েছে। এক দিকে তাঁর দুর্জ্জয় সাহস আর অনমনীয় সঙ্কল্প। প্রাণ দিয়েও তিনি দুর্গত মানুষের কল্যাণসাধনের জন্য মুক্তধারার বন্ধন মোচন করতে প্রস্তুত। শুধু এই দিকটি দিয়ে বিবেচনা করলে মনে হয় তাঁর চরিত্র বজ্রসম কঠোর। কিন্তু তাঁর অন্তর যে কুসুমাপেক্ষাও মৃদু—তার পরিচয়ও এখানেই রয়েছে। সঞ্জয় তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছে—যা কঠিন তার গৌরব থাকতে পারে, কিন্তু যা মধুর তার কি মূল্য নেই? উত্তরে অভিজিৎ বলেছেন—তারই মূল্য দেবার জন্যই কঠিনের সাধনা।…স্বর্গকে ভালো লেগেছে বলেই দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করতে যেতে দ্বিধা করি নে।

এঁদের কথাবার্ত্তার মাঝে রক্তাক্তকপালে বটুক এসে প্রবেশ করে। সকলকে ভৈরবমন্দিরে যেতে নিষেধ করতে গিয়ে তার এই দশা। কাতরকণ্ঠে সে বলে—"ওরা যে আজ যন্ত্রবেদীর উপর তৃষ্ণারাক্ষসীর প্রতিষ্ঠা করবে…মনে করেছিলুম পাপের বেদী আপনি ভেঙে পড়ে যাবে। কিন্তু এখনও তো ভাঙল না, ভৈরব তো জাগলেন না। অভিজিৎ তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেন—"জাগবে। সময় এসেছে।" বটুক তাঁকে জিজ্ঞাসা করে—"তবে শুনেছ বুঝি? ভৈরবের আহ্বান শুনেছ?" অভিজিৎ বলেন—শুনেছি। বটুক তাঁকে জানায় সে পথের দুঃখের কথা। যখন আপনজন সবাই শত্রু হবে—সবাই ধিক্কার দেবে—"সে ব্যথা কি যুবরাজ সইতে পারবেন?" যুবরাজ বলেন—"সইতেই হবে।" ভয় তাঁর নেই। তা হলে বটুকে মনে রেখো। আমিও ঐ পথে…বলতে বলতে বটুক প্রস্থান করে।

রাজপ্রহরী উদ্ধব এসে প্রবেশ করলো এর পর। সে জানালো যুবরাজ শিবতরাইয়ের মঙ্গলের জন্য নন্দিসঙ্কটের পথ খুলে দিয়েছেন জেনে রাজা খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন। যদি পার তো এখনই চলে যাও…পথে দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে কথা কওয়াও নিরাপদ নয়…এ কথা বলে উদ্ধব প্রস্থান করতেই অম্বা প্রবেশ করে। তার মুখে সেই পুরানো সুর…"সুমন! বাবা—সুমন!" তার আকুলতায় যুবরাজের মন করুণায় ভরে ওঠে। জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার ছেলেকে নিয়ে গেছে? অম্বা বলে উঠলো—হাঁ, ঐ পশ্চিমে, যেখানে সূর্য্য ডোবে, সেখানে দিন ফুরোয়। অভিজিৎ বললেন যে, ঐ পথেই তিনি যাবেন। অম্বা আবেদন জানালো যখন তার দেখা পাবে বোলো, মা তার জন্য পথ চেয়ে আছে। অভিজিৎ প্রতিশ্রুতি দেন—বলব। বাবা, তুমি চিরজীবী হও—বলতে বলতে অম্বা প্রস্থান করলো।

জয় ভৈরব! জয় শঙ্কর!—গান করতে করতে ভৈরবপন্থীর দলকে আবার মন্দির পরিক্রমারত দেখা গেল।

এর পর সেনাপতি বিজয় পালের আবির্ভাব। তিনি জানালেন যে, মহারাজ যুবরাজকে রাজশিবিরে আহ্বান

করেছেন। সঞ্জয় সঙ্গে যেতে চাইলে সেনাপতি নিষেধ করলেন এবং একা অভিজিৎকে নিয়ে প্রস্থান করলেন। একা সঞ্জয় অভিজিতের প্রত্যাবর্ত্তনের আশায় অপেক্ষায় রইলেন।

দৃশ্যপটে আসে একজন বাউল, মুখে তার গান···
ওতো আর ফিরবে নারে, ফিরবে না আর, ফিরবে নারে।
ঝড়ের মুখে ভাসল তরী, কূলে আর ভিড়বে নারে।

এ গান যুবরাজ অভিজিতের সঙ্গে কুমার সঞ্জয়ের চিরবিচ্ছেদের সূচক বলে মনে হয়।

বাউলের পর একজন ফুলওয়ালীর প্রবেশ। সে বিদেশী—দেওতলি হতে এসেছে। উত্তরকূটের বিভূতির গুণগান শুনে সে এসেছে তাঁকে অভিনন্দিত করতে। নিজের মালঞ্চ হতে সে এনেছে ফুল। সঞ্জয়কে সে জিজ্ঞাসা করে—বাবা,উত্তরকূটের বিভূতি মানুষটি কে?··· কি কাজ করেছেন তিনি? সঞ্জয় উত্তর দেন—আমাদের ঝর্ণাটাকে বেঁধেছেন। তাই পুষ্পবৃষ্টি! বুঝলাম না—বলে ফুলওয়ালী হতাশায় ব্যথিত হয়ে ওঠে। সঞ্জয় তার কাছে ফুলটি চেয়ে নেন—বলেন—দেবতার ফুল অপাত্রে নষ্ট কোরো না, ফিরে যাও। সঞ্জয় যখন বলেন —আমি যে সাধুকে সবচেয়ে ভক্তি করি তাঁকেই দেব, তখন ফুলওয়ালী আনন্দিত মনে ফুলটি তাঁকে দিয়ে প্রস্থান করে।

এর পর সেনাপতি বিজয় পাল একা প্রবেশ করলেন। সঞ্জয় বললেন—দাদা কোথায়? বিজয় পাল জানালেন যুবরাজ শিবিরে বন্দী। আমাকেও বন্দী করো, আমি বিদ্রোহী—সঞ্জয় ব্যাকুল হয়ে আবেদন জানান। আদেশ নেই জানিয়ে সেনাপতি চলে যাবার উপক্রম করতে সঞ্জয় অনুরোধ জানালেন দাদার সঙ্গে দেখা হলে এই শ্বেত-পদ্মটি তাঁকে দিও। তাই হবে বলে সেনাপতি প্রস্থান করলেন—তার পশ্চাতে গেলেন সঞ্জয়।

ষষ্ঠ দৃশ্যে ধনঞ্জয় বৈরাগী প্রবেশ করেন। মুখে তার গান—আমি মারের সাগর পাড়ি দেব···। অধীন রাজ্য শিবতরাইয়ের জনতা ধনঞ্জয় বৈরাগী ও তাঁর কয়েকজন অনুচরের কথাবার্ত্তার মধ্যে উত্তরকূটের সাম্রাজ্যবাদী নীতির নিষ্ঠুরতা ও বর্ব্বরতার পরিচয় মেলে। সেই সঙ্গে দেখা যায় এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভও হয়ে উঠেছে প্রচণ্ড। প্রজারা এ অত্যাচারের প্রতিরোধ করতে কৃতসঙ্কল্প। কিন্তু ধনঞ্জয়ের নেতৃত্বে এ প্রতিরোধের ধরন বড় বিচিত্র। একজন বলে—প্রভু, রাজশ্যালক চণ্ডপালের মার তো সহ্য হয় না।

আরেকজন বলে ওঠে—ঠাকুর, একবার হুকুম করো, ঐ ষণ্ডামার্ক চণ্ডপালের দণ্ডটা খসিয়ে নিয়ে মার কাকে বলে একবার দেখিয়ে দিই। কিন্তু মারকে মার দিয়ে ঠেকাবার শিক্ষা ধনঞ্জয়ের নয়। তাঁর সংগ্রাম অহিংস। তিনি বলেন—মার জিনিসটাকেই একেবারে গোড়া গোড়া ঘেঁষে কোপ লাগাও।···মাথা তুলে যেমনি বলতে পারবি লাগছে না অমনি মারের শিকড় যাবে কাটা। তিনি রাজার কাছে দরবার করতে এসেছেন, রাজ্য শাসনে প্রজার যে ন্যায্য অংশ তাই তিনি দাবী করবেন। পথঘাটের সন্ধান নিতে তিনি প্রস্থান করতেই উত্তরকূটের একদল নাগরিক প্রবেশ করে। শিবতরাইয়ের লোক দেখে তাদের আর কৌতুকের সীমা নেই। দুই দলের নাগরিকদের কথাবার্ত্তায় বোঝা যায় উত্তরকূটের নাগরিক দের চোখে শিবতরাইয়ের মানুষ কত হীন। পরাধীন জাতির মানুষকে তারা মানুষের মর্য্যাদা দিতে চায় না। উদ্ধত তাদের আচরণ, দম্ভে ভরা তাদের কথাবার্ত্তা। যন্ত্রবলে বলীয়ান হয়ে দেবতাকেও তারা অস্বীকার করতে চায়। বিভূতিই তাদের দেবতা—যন্ত্র তাদের উপাস্য। বিভূতিপ্রসঙ্গে তারা বলে যে, 'সে দেবতাকে ছুটি দিয়ে দেবতার কাজ নিজেই চালিয়ে নেবে।' তাদের অকাট্য প্রমাণ মুক্তধারার বাঁধ। শিবতরাইয়ের মানুষ একথা বিশ্বাস করতে চায় না। "ওরা শুনেও শুনবে না, তাই তো মরে।"—এই কথা বলে উত্তরকূটের দল প্রস্থান করে।

ইতিমধ্যে ধনঞ্জয় ফিরে এসেছেন। কুমার অভিজিতের অপসারণে প্রজারা বড় উত্তেজিত। তারা জোর করে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে—রাজাকে মানবে না···এই কথাবার্ত্তার মধ্যে রাজা ও মন্ত্রী এসে প্রবেশ করেন। রাজার সম্মুখেও ধনঞ্জয়ের কোন ভয় নেই। শিবতরাইয়ের প্রজাদের বাঁচবার অধিকার মেনে না নিলে তাঁর অহিংস প্রতিরোধের সংকল্প তিনি নির্ভয়ে প্রকাশ করেন। রাজার প্রাপ্য দিতে তিনি কুণ্ঠিত নন, কিন্তু অন্যায় দাবি তিনি মানতে নারাজ। "আমার উদ্বৃত্ত অন্ন তোমার—ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়।" রাজার আদেশে ধনঞ্জয় বন্দী হলেন, তাঁর অনুচরেরা শিবতরাইয়ে ফিরে গেলেন।

তোর শিকল আমায় বিকল করবে না।
তোর মারে মরম মরবে না।

এই গান গাইতে গাইতে ধনঞ্জয় হাসিমুখে বন্দীশালায় গেলেন। মন্ত্রীকে বন্দীশালায় অভিজিৎকে দেখে আসার আদেশ করে, রাজা রণজিৎ জানালেন তিনি রাজধানীতে যাচ্ছেন। ভৈরবমন্ত্রেদীক্ষিত সন্ন্যাসীদলকে আবার মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে মন্দির পরিক্রমা করতে দেখা

গেল। যুবরাজকে দেখে আসিগে বলে মন্ত্রীও প্রস্থান করলেন।

সপ্তমদৃশ্যে—প্রথমে দুইজন মহিলা প্রবেশ করলেন। এদের একজন প্রবীণা, অপরজন নবীনা। উভয়ের বাক্য-বিনিময়ের মাধ্যমে জানা যায় যে, কুমার অভিজিৎ নন্দি-সঙ্কটের পথ খুলে দেওয়ায় উগ্রসাম্রাজ্যবাদে বিশ্বাসী উত্তরকূটের প্রজাকুল তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ। শিবতরাইয়ের প্রজাদের প্রতি তাঁর দরদ তাঁর স্বজন প্রসন্নমনে গ্রহণ করতে পারেন নি। প্রবীণার সহানুভূতি প্রজাদের দিকে, নবীনার মন যুবরাজের প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত। এদের চলে যাবার পরেই একদল নাগরিক প্রবেশ করে। যুবরাজের উপর তাদের অসীম ক্রোধ—তাঁকে যে করে হোক হাতে পেলে তারা গুঁড়িয়ে দিতে চায়। উদ্ধব ও মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হতে তাদের এই অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পায়। মহারাজ নিজেই তাঁর শাস্তির ব্যবস্থা করবার জন্য তাকে বন্দীশালায় রেখেছেন জেনে তারা কথঞ্চিৎ ক্ষান্ত হ'ল। ততক্ষণে সূর্য্য অস্ত গেছে—অস্তমান সূর্য্যের আলোয় ভৈরব মন্দিরের চূড়া হয়ে উঠলো লাল, আর তার পাশে বিভূতির যন্ত্রের চূড়াটাকে কেমন অদ্ভুত দেখাতে লাগলো। বিভূতির যন্ত্রের জন্য যাদের উৎসাহের সীমা নেই সেই প্রজাকুলের মনও যেন একটা আসন্ন বিপদের সম্ভাবনায় উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলো।

নাগরিক দলের প্রস্থানের পর প্রবেশ করলেন যুবরাজ সঞ্জয়। যুবরাজ অভিজিতের সঙ্গে মিলিত হবার আকুল আগ্রহে তিনি বন্দীত্ব বরণ করতেও প্রস্তুত। কিন্তু মন্ত্রী তাঁকে বিচক্ষণ পরামর্শ দিয়ে বললেন, "রাজকুমার,···সেই সত্য মিল যেখানে সেখানে কাছে কাছে থাকবার দরকার হয় না। আকাশের মেঘ আর সমুদ্রের জল অন্তরে একই, তাই বাইরে তারা পৃথক হয়ে ঐক্যটিকে সার্থক করে। যুবরাজ আজ যেখানে নেই সেইখানেই তিনি তোমার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পান।"···সঞ্জয়ের চোখ খুলে গেল, কে যেন তাঁকে নূতন কথা শোনাল, তিনি যেন অন্ধকারে আলোর সন্ধান পেলেন—খুঁজে পেলেন তাঁর কর্ত্তব্য। তিনি বললেন, "মন্ত্রী, এ তো তোমার নিজের কথা বলে শোনাচ্ছে না; এ যেন যুবরাজের মুখের কথা!" যুবরাজ অভিজিৎ ইতিমধ্যে কখন মন্ত্রীর মনটিকেও জয় করে নিয়েছেন। অভিজিতের আদর্শ ও ত্যাগ যেন এক নূতন আন্দোলনের সৃষ্টি করেছে, তার ছোঁয়াচ যেন মন্ত্রীর মনে সংক্রামিত হয়েছে। মন্ত্রী তাই সঞ্জয়কে জানান—"তাঁর কথা এখানকার হাওয়ায় ছড়িয়ে আছে; ব্যবহার করি, অথচ ভুলে যাই তাঁর কি আমার।" দূর থেকে তাঁরই কাজ করব—এই ব্রত গ্রহণ করে সঞ্জয় চলে যান।

এবার দৃশ্যপথে আসেন উদ্ধব এবং খুড়-মহারাজ বিশ্বজিৎ। শিবিরে আগুন লাগিয়ে বন্দী অভিজিৎকে মুক্ত করার পরিকল্পনায় তাঁরা রত। অল্পক্ষণ পরেই চারি-দিকে ভয়ার্ত্ত রব উঠলো—"আগুন! আগুন!" এই সুযোগে বিশ্বজিতের অনুচরবর্গ অভিজিৎকে মুক্ত করে আনলো। বৃদ্ধ বিশ্বজিৎ অভিজিৎকে মোহনগড়ে যাবার সাদর আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু অভিজিতের সে স্নেহের ডাকে সাড়া দেবার অবসর নেই। তাই তিনি নিবেদন করেন—আজ আমার বন্দী থাকবার অবকাশ নেই।··· জন্মকালের ঋণ শোধ করতে হবে। স্রোতের পথ আমার ধাত্রী, তার বন্ধন মোচন করব। বৃদ্ধের অনুনয় ব্যর্থ হ'ল। "তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হবার নয়"···এই অমোঘ প্রীতি-বন্ধনের কথা ঘোষণা করে অভিজিৎ তাঁর অনুধ্যান উদ্দেশ্যের পথে পা বাড়ালেন।

অষ্টম দৃশ্যে দেখা গেল ওধারে বাইরে আগুন, এধারে ধনঞ্জয়ের মনের আগুন জ্বলছে। তাঁর কণ্ঠে অনুরণিত:

আগুন, আমার ভাই
আমি তোমারি জয় গাই।

বটুক সকাতরে ভৈরবকে আহ্বান জানায়—"জাগো, ভৈরব, জাগো।" তার প্রস্থানের পর উত্তরকূটের ক্ষিপ্ত নাগরিকদের দেখতে পাই। আগুন লাগার পর যুবরাজ নিখোঁজ, কিন্তু তাঁকেই যে এদের চাই। ধনঞ্জয়কে সামনে পেয়ে তারা বলে, এই বৈরাগীটাকেই ধর। ওকে বাঁধ। তারা সন্দেহ করে ধনঞ্জয় যুবরাজের সংবাদ জানেন। তিনি বার বার জানি না বলেও নিষ্কৃতি পেলেন না—উত্তরকূটের মানুষদের নির্ম্মম দড়িতে বাঁধা পড়লেন। কিছুটা কাজ অন্তত: হোল নাগরিকরা ভাবলেন। এই অবস্থায় বজ্রঘোষবাণী, রুদ্র শূলপাণি, মৃত্যুসিন্ধুসন্তর শঙ্করের জয়গান ঘোষিত হয় ভৈরবপন্থীর কণ্ঠে। বন্ধনেও ধনঞ্জয় নির্ব্বিঘ্ন ও নির্ব্বিশঙ্ক। তাঁর স্বতস্ফূর্ত্ত স্বগত সঙ্গীতে শুধু তাঁর অন্তর্ব্বেদনার আভাস··· তার বাঁধার পর শুধু সুরের জাগরণের প্রতীক্ষা।

আবার নাগরিকরা এসে উপস্থিত হ'ল। যুবরাজ সম্বন্ধে তারা সংবাদ পেয়েছে যে তাঁকে মোহনগড়ে নিয়ে গেছে—মোহনগড়ের রাজার উপরও তাদের রাগ ক্রমাগত বেড়ে উঠছে। যাবার সময় ধনঞ্জয়ের দিকে তাদের চোখ পড়লো। সকলেই তাঁকে ফেলে চলে যাচ্ছিল। কুঞ্জন নামে ওদেরই একজন তাঁর বাঁধন খুলে

দিল। নেপথ্যে ধ্বনিত হোল—"জাগো, ভৈরব, জাগো!" সশব্দ কুন্দন চলে গেল।

নবম দৃশ্যে নাগরিকদের প্রস্থানের পর উত্তরকূটের দুইজন রাজদূতের প্রবেশ। এরা যুবরাজকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। মহারাজের হুকুম, যুবরাজকে রাত্রির মধ্যে খুঁজে বের করতেই হবে। ওদারে বিভূতির নির্দ্দেশে নরসিংহ দল জুটিয়ে এনেছে। নন্দিসঙ্কটের ভাঙা গড়কে রাতারাতি গড়ে তুলতে হবে। উত্তরকূটের সেবায় যারা অনিচ্ছুক তাদের দমন করতে হবে। কাজ অনেকটা এগিয়েছে, লোকও অনেক জুটেছে; কিন্তু যাঁকে নিয়ে উৎসব তাঁর উৎসবে মন নেই। তাঁর কীর্ত্তি খর্ব্ব করবার জন্যই নন্দিসঙ্কটের গড় ভাঙার সংবাদ ঠিক সময়ে এসে পৌঁছল। তাঁর জয়যাত্রার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক যুবরাজ অভিজিৎ। গড়কে গড়ে তুলতে না পারলে প্রতিযোগিতায় তাঁর পরাজয়। সেই রাত্রে মুক্তধারার বাঁধ ভাঙতে পারে এমন আভাসও তিনি পেয়েছেন। কিন্তু সে বাঁধ যে ভাঙতে যাবে তার নিষ্কৃতি নেই, তা তিনি জানেন। বিভূতির ভক্তবৃন্দ তাই পণ করে—মরতে মরতে গেঁথে তুলবো।

নেপথ্যে আবার সেই সন্দীপন বাণী—জাগো, ভৈরব, জাগো। যন্ত্রপ্রখ্যাত বিভূতি হেসে ওঠেন সে কথা শুনে। তিনি বলেন, বৈরাগী, তোমাদের মতো সাধুরা ভৈরবকে এ পর্য্যন্ত জাগাতে পারলে না, আর যাকে পাষণ্ড বল সেই আমিই ভৈরবকে জাগাতে চলেছি। ধনঞ্জয় জানেন বিভূতির দল তাঁকে শিকল দিয়ে বাঁধবার ব্যর্থ চেষ্টা করলে, শিকল ছেঁড়বার জন্য তিনি অবশ্যই জাগবেন, কিন্তু সবচেয়ে দুঃসাধ্য না হলে তাঁর সময় হয় না। আবার শোনা যায় বন্ধনচ্ছেদন সঙ্কট সংহর জয় শঙ্করের জয় ভৈরবপন্থীর পাবক সঙ্গীত।

এর পর মন্ত্রীসহ রাজা রণজিতের প্রবেশ। রাজধানীর পথ থেকে তিনি কখন ফিরে এসেছেন। কঙ্কর যুবরাজের শাস্তি দাবি করে। বিভূতি জানায় যে, মহারাজের আদেশের অপেক্ষা না করেই নন্দিসঙ্কটের ভাঙা দুর্গ গড়ে তোলবার ভার তাঁরা নিজেদের হাতে নিয়েছেন। এই উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে রাজা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়—মন্ত্রী তাঁকে ধৈর্য্য ধরতে বলেন। ধনঞ্জয় বৈরাগীকে সামনে দেখে রাজা যুবরাজের সন্ধান চান। বৈরাগী জানান যে, তিনি নিশ্চিত জানেন না বলেই যুবরাজের জন্য অপেক্ষা করছেন। অন্ধকারের বক্ষ বিদীর্ণ করে নেপথ্যে শোনা যায় আবার সেই সঞ্চিত বেদনার সকরুণ প্রকাশ। এ ডাক সেই অম্বাপাগলির। "কই, সে তো ফিরল না!"

এই আন্দোলিত মুহূর্ত্তে চরের মুখে শোনা যায় শিবতরাই থেকে দলে দলে লোক আসছে। তারা খবর পেলো কি করে এ আলোচনার—কেউ কি তবে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? শিবতরাইয়ের মুখপাত্র হয়ে গণেশ সর্দ্দার রাজার সামনে উপস্থিত।

তাদের আবেদন—যুবরাজকে ছেড়ে দিতে হবে।··· অকপট ভাবে গণেশ রাজাকে বলে, "তোমরা তাকে চাও না, আমরা তাকে চাই। আমাদের সবই তোমরা আটক করে রাখবে? ওকে-ও?···ওকে আমাদের রাজা করে রাখব।"

রাজা নির্ব্বাক। অন্তরে অভিনিবিষ্ট। অবশ্যম্ভাবী পরিণতির ইঙ্গিত দেন শুধু প্রশান্ত ধনঞ্জয়। অভিজিৎ রাজবেশ পরে আসবে।

'তিমিরহৃদবিদারণ জলদাগ্নিনিদারুণ' শঙ্করের জয়গান ভৈরবপন্থীর কণ্ঠে শোনা গেল। গান থেমে যাবার পরই আবার সেই ক্রন্দন ক্রন্দসীকে কাঁপিয়ে তোলে···"ফিরে আয়, সুমন, ফিরে আয়!" এক দিকে মৃত্যুসিন্ধুসন্তর শঙ্করের শাশ্বত প্রাকার, অপর দিকে অসহায় অম্বার আকুল বিহ্বলতা। এই দ্বৈত প্রতিঘাতে বিভূতি উৎকণ্ঠ—"ও কি শুনি? ও কিসের শব্দ?" সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে শোনা যায় প্রমত্ত জলোচ্ছ্বাসের দুর্জ্জয় অভিযান। প্রথম ডমরুধ্বনির সঙ্কেতে ভৈরব চঞ্চল। মুক্তধারা নির্মুক্ত। স্বাধীনতার আস্বাদে প্রমত্ত মুক্তধারা আবার বইছে। তার সুপ্তির শেষ হয়েছে। তারায় তারায় কাঁপন লাগায় ধনঞ্জয়, সে প্রহর জাগায়। মর্ম্মবিদ্ধ রণজিৎ যেন অভিজিতের পদসঞ্চারণ শুনতে পান, ডেকে উঠেন—অভিজিৎ! অভিজিৎ! মুক্তধারার স্রোতে ভেসে গেল নির্ভীক নিষ্পাপ অভিজিৎ। সাক্ষ্য দেয় সঞ্জয়। রণজিৎ বুঝতে পারেন মুক্তধারার মুক্তিতে অভিজিৎও মুক্ত।

শোকার্ত্ত শিবতরাইয়ের প্রতিনিধি গণেশ বলে ওঠে, "তাহলে তাঁকে কি আর পাব না!" ধনঞ্জয় শুধু উত্তর দেন···"চিরকালের মতো পেয়ে গেলি!" ভৈরবপন্থীর জয়পরিক্রমা সমাপ্ত হোল।

মুক্তধারার চরিত্রসমূহের বিশ্লেষণ

১। যুবরাজ অভিজিৎ:

চরিত্রাঙ্কণ মুক্তধারার মুখ্য উদ্দেশ্য না হলেও, এ কথা সর্ব্বস্বীকার্য্য যে, চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে যুবরাজ

অভিজিতের কথাই সর্ব্বপ্রথম মনে পড়ে। মুক্তধারা নাটকে ভৈরবমন্দিরে উৎসবের শুভরাত্রিতে মুক্তধারা ঝর্ণার বন্ধনমোচনে যিনি নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন —তিনিই যুবরাজ অভিজিৎ। সেদিন উত্তরকূট নগরে উৎসবের সারা পড়ে গেছে। ভৈরবের বার্ষিক পূজা ও উৎসবের সঙ্গে মিলেছে সেদিন যন্ত্ররাজ বিভূতির সম্বর্দ্ধনা-উৎসব।

সেই আনন্দ-উৎসবের মাঝখানে নিরানন্দ হয়ে বসে আছেন উত্তরকূটের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী যুবরাজ অভিজিৎ। যুবরাজ হলেও রাজকুলে তাঁর জন্ম নয়। শোনা যায় মুক্তধারার ঝর্ণাতলায় কোন এক ঘর-ছাড়া মা তাঁকে ফেলে গিয়েছিলেন। রাজচক্রবর্ত্তীর লক্ষণ দেখে রাজা তাঁকে পুত্ররূপে পালন করেন এবং যৌবরাজ্যে অভিষেক করেন। কিন্তু যুবরাজ সাম্রাজ্য-শাসনের সমস্ত গতানুগতিক নিয়মকে কেবলি এড়িয়ে যেতে লাগলেন। শিবতরাইয়ের শাসনভার তাঁর হাতে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে শিবতরাইয়ের জনগণের হৃদয় তিনি জয় করে বসলেন। কারণ তাঁর হৃদয়ে হীনতার ঠাঁই ছিল না। সেখানে উত্তরকূট আর শিবতরাই সবই সমান। ফলে শিবতরাইয়ে যুবরাজের সিংহাসন জনগণের হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠল বটে, কিন্তু উত্তরকূটের রাজকোষ সেভাবে পূর্ণ হোলো না। তাঁকে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনা হলে যন্ত্ররাজ বিভূতির চেষ্টায় মুক্তধারাকে বেঁধে শিবতরাইয়ের উপর উত্তরকূটের শাসনকে চিরস্থায়ী করার বন্দোবস্ত পাকা করা হ'ল। এ সংবাদ শুনে অবধি যুবরাজের মনে শান্তি নেই। তিনি যে যন্ত্ররাজ বিভূতির সাফল্যে ঈর্ষ্যান্বিত তা নয়—কিন্তু যে যন্ত্র কোন মঙ্গল বয়ে আনলো না, শুধু অমঙ্গলকেই জন্ম দিল তাকে তিনি মনের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন না। শিবতরাইয়ের প্রজাদের অগণিত মুখ তাঁকে পীড়া দেয়। "এ কেমন রাজধর্ম—যা প্রজা-পালন করে না, প্রজাদের পীড়ন করে?"—এই প্রশ্ন তাঁকে ব্যথিত করে। তিনি ভুলে গেলেন যে, রাজা তাঁকে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করেছেন—ভুলে গেলেন যে, এই উত্তরকূটের সিংহাসন তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। তাঁর মনে হ'ল এমন সাম্রাজ্যে তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। একের ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল হরণ করে যদি অন্যে অস্বাভাবিক ভাবে পুষ্ট হয়ে ওঠে তবে সেই পুষ্টির মত অমানুষিক আর কি হতে পারে? বিধাতার নিয়মে এ পৃথিবীতে বাঁচবার অধিকার সকল মানুষের সমান—যে যন্ত্র প্রাণের এ নিয়মকে ক্ষুণ্ণ করে—সে যন্ত্রকে তিনি নিজ প্রাণের বিনিময়ে ভাংতে কৃতসঙ্কল্প। ভৈরব পূজার রাত্রে নিশীথ নির্জ্জনে মুক্তধারার শৃঙ্খলমোচনের জন্য যুবরাজ অভিজিৎ তাঁর কোমল নিষ্পাপ প্রাণ বলি দেবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে উঠলেন।

তাঁর এ সঙ্কল্পের কথা তিনি সম্পূর্ণ গোপন করেন নি। যন্ত্ররাজ বিভূতিকে তাঁর দূত একথা পূর্ব্বাহ্নে জানিয়ে-ছিলেন। বলেছিলেন, বিভূতি যদি তাঁর এই মানবিকতার শত্রু যন্ত্রকে চূর্ণ না করেন তবে যুবরাজই সে ভার গ্রহণ করবেন। বিভূতি সে সাবধানবাক্যে কর্ণপাত করেন নি। কারণ তাঁর মনে হয়েছিল মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে কেউ সে কাজে হাত দিতে পারবে না। সে ছিদ্রের কাছে স্বয়ং যম পাহারা দিচ্ছেন—এই ভেবে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। অভিজিৎ কিন্তু তুচ্ছ প্রাণের ভয়ে ভীত নন। মানবকল্যাণের স্রোতের পথ মুক্ত করতে তিনি হাসিমুখে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। কুমার সঞ্জয় ছিলেন তাঁর চিরসাথী; যুবরাজকে তিনি সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন। অভিজিতের কাছে যে তার কোন মূল্য ছিল তা নয়। জগতে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু পবিত্র সকল কিছুর প্রতি অসীম শ্রদ্ধা। সঞ্জয় তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন—বুঝতে পারি না, রাজবাড়ী ছেড়ে কেন যেতে চাও? যুবরাজ বলেছেন—যেখানে বাধা সেখানে কি বিশ্রাম আছে? স্বর্গকে ভালবাসি বলেই সহ্য করতে পারি না এই অসুন্দরটাকে—যা তাকে গ্রাস করতে চায়। মুক্তধারার মুক্তিসাধনে তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্প হতে কিছুই তাঁকে বিচলিত করতে পারল না। রাজা তাঁকে বন্দীশালায় বন্দী করে-ছিলেন উন্মত্ত প্রজাদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য। সে বন্দীশালায় লাগলো আগুন—ছিঁড়লো বন্ধন। পিতামহ বিশ্বজিৎ তাঁকে স্বদেশে নিয়ে যাবার সব আয়োজন সম্পূর্ণ করেছিলেন—কিন্তু যুবরাজ কোন বন্ধনই মানতে চাইলেন না। না ক্রোধের, না স্নেহের। পিতামহ বিশ্বজিৎ নিরুপায় হয়ে তাঁকে বিদায় দিলেন। কুমার সঞ্জয় মুক্ত-ধারার তীর পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন কিন্তু যুবরাজ তাঁকেও ফিরিয়ে দিলেন। তাঁর সেদিনকার ব্রত একলা চলার। সে পথে তিনি সঙ্গী নিলেন না। মধ্যরাত্রে নিরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে তিনি মুক্তধারার স্রোতকে দিলেন মুক্ত করে—যন্ত্রকে সে মুক্ত স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে গেল। কিন্তু ভেঙে পড়বার আগে যন্ত্র তার শেষ আঘাত হেনেছিল অভিজিৎকে। মুক্তধারার স্রোত মাতৃক্রোড়ের মত তাঁর আহত দেহকে গ্রহণ করে আপন করে নিল।

যুবরাজ অভিজিৎ কে—সে প্রশ্নের উত্তর রবীন্দ্রনাথ নিজেই দিয়েছেন। তিনি হলেন চিরন্তন মানবাত্মার

প্রতীক্‌। যারা যন্ত্রবলে বলী, অত্যাচারী, উৎপীড়ক তাদের মধ্যেও সেই শাশ্বত মানবাত্মা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না। অত্যাচারীদের মধ্যেই কারো-না-কারোর কণ্ঠে তাঁর জয়ধ্বনি শোনা যায়। অভিজিৎ সেই চির-দিনের মানুষ—সে হল "মারনেওয়ালার ভিতরকার পীড়িত মানুষ।" চিরকালের মানবসম্বন্ধের বিকারে সে পীড়িত। "নিজের যন্ত্রের হাত থেকে নিজে মুক্ত হবার জন্যে সে প্রাণ দিয়েছে।"

২। ধনঞ্জয় বৈরাগী :

উত্তরকূটের সাম্রাজ্যবাদী শাসনে অধীনরাজ্য শিব-তরাই-এর প্রজাকুল যখন জর্জরিত তখন যে মহাত্মা তাঁদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তিনি ধনঞ্জয় বৈরাগী। "ধনঞ্জয় হচ্ছে যন্ত্রের হাতে মারখানেওয়ালার ভিতরকার মানুষ। সে বলছে, আমি মারের উপরে; মার আমাতে এসে পৌঁছয় না—আমি মারকে না-লাগা দিয়ে জিতব, আমি মারকে না-মার দিয়ে ঠেকাব।"—রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষায় এই হচ্ছে ধনঞ্জয়ের পূর্ণ পরিচয়। এই যে অন্যায় প্রতিরোধের সম্পূর্ণ অভিনব পন্থা—এ শুধু কবি-কল্পনা নয়। এই অহিংস প্রতিরোধ বা অহিংস সত্যাগ্রহের মূর্তিমন্ত প্রতীক্‌ মহাত্মা গান্ধীকে আমরা অনেকেই প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। মুক্তধারা প্রকাশিত হবার পূর্ব্বেই ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছিল। তারও বহুপূর্ব্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজী প্রথম এই অহিংস সংগ্রামের নীতি অদ্ভুতভাবে কার্য্যকরী করে-ছিলেন। কে বলবে বৈরাগী ধনঞ্জয়ের চরিত্রে মহাত্মাজীর ছায়া এসে পড়েছে কিনা? যদি এ কথাও ধরা যায় যে, ধনঞ্জয় বাস্তবনিরপেক্ষভাবে কবিমানসের সম্পূর্ণ নিজস্ব সৃষ্টি, তবু ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ঋত্বিক্‌ মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর তুলনা না করে পারা যায় না।

ধনঞ্জয়ের সাক্ষাৎ আমরা উত্তরকূটের ভৈরবমন্দির-প্রাঙ্গণেই পাই। কিছু অনুচর সঙ্গে তিনি উত্তরকূটে এসেছেন সেখানকার রাজার কাছে শিবতরাইয়ের বাঁচবার দাবিকে পেশ করতে। রাজাকে তাঁর ভয় নেই, কোন বন্ধন তাঁকে বাঁধতে পারে না—আঘাত তাঁকে আঘাত করতে না পেরে ফিরে আসে। রাজার কাছে তাঁর দাবি রাজশক্তির অপব্যবহারের অবসান। তিনি বলতে চান প্রজাকে তার আপন দাবিতে প্রতিষ্ঠিত রেখেই রাজার সত্যকারের রাজত্ব। প্রজার বাঁচবার দাবির পরে রাজার খাজনার দাবির স্থান। তাই অকুতোভয়ে তিনি রাজাকে বলেন—"আমার উদ্বৃত্ত অন্ন তোমার—ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়।" রাজা যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন—"তুমিই বুঝি প্রজাদের খাজনা দিতে নিষেধ কর, তখন তিনি বলে ওঠেন—হ্যাঁ রাজা, তোমার যা না তাতো তোমাকে দিতে বলতে পারি নে।" ক্রুদ্ধ রাজা তাঁকে বন্দী করবার আদেশ দিলে প্রসন্নমনে তিনি বন্ধন বরণ করেন। তোমার শিকল আমায় বিকল করবে না—এই গান তাঁর কণ্ঠে বেজে ওঠে। এই সর্ব্বত্যাগী সদানন্দ পুরুষ শিবতরাইয়ের সকলের হৃদয় জয় করেছেন। তারা তাঁকে দেবতা বলে জানে। তিনি তাদের বল বুদ্ধি সব কিছু। তাঁকে বন্দী হতে দেখে তাঁর অনুচরেরা ব্যাকুল হয়ে উঠলো। ধনঞ্জয়ের আদেশে অবশ্য তারা ফিরে গেল। কিন্তু যাবার সময় জানিয়ে গেল—"চললুম। কিন্তু আমাদের বল বুদ্ধি এখানে রইলো পড়ে।" তাদের এই একান্ত নির্ভরতায় কিন্তু বৈরাগী সুখী হতে পারলেন না। তিনি চান তাঁর অনুচরেরা হবে পূর্ণাঙ্গ মানুষ—আত্মপ্রতিষ্ঠ, স্বচ্ছন্দগতি। তারা যে তাঁকে একান্ত নির্ভর করবে এ তিনি সহ্য করতে পারেন না কিছুতেই। তিনি বলেন—তোরা আমাকে যত জড়িয়ে ধরছিস্‌ তোদের সাঁতার শিখা ততই পিছিয়ে যাচ্ছে। ওদের বল বুদ্ধি বাড়াতে গিয়ে ওদের বল বুদ্ধি হরণ করেছেন—এই ভেবে তিনি অন্তরে ব্যথিত। তিনি পালাতে পারলে বাঁচেন, তাই তিনি বলেন রাজাকে—"আমাকে পূজো দিয়ে ওরা অন্তরে অন্তরে দেউলে হতে চলল, সে দেনার দায় যে আমারও ঘাড়ে পড়বে; দেবতা ছাড়বেন না।"

আকস্মিক অগ্নিদুর্ঘটনায় বন্দী ধনঞ্জয় সে রাত্রেই মুক্তি পান। সে রাত্রে মুক্তধারার বন্ধনমোচনের পূর্ব্বাভাস তিনি যেন ধ্যানযোগে লাভ করেছিলেন। যুবরাজ অভিজিৎকে তিনি ভালভাবেই জানতেন—সে রাত্রে অন্ধকার দুর্য্যোগের মধ্যে তিনি রাজকুমারের এই গৌরব-ময় আহুতির জন্যই প্রতীক্ষা করেছিলেন। তাঁকে দেখতে পেয়ে উত্তরকূটের একজন নাগরিক তাঁকে পথের ধারে বেঁধে রেখে যায়; অথচ কিছু পরে তাদেরই একজন এসে তাঁর বন্ধনমোচন করে দিয়ে গেল। সর্ব্বশেষ দৃশ্যে মুক্তধারার স্রোত যখন বন্ধনমুক্ত হয়ে ছুটে চলেছে তখন তাঁর কণ্ঠে বেজে উঠলো ভৈরবের নাচ-আরম্ভের আবাহন সঙ্গীত :

বাজে রে বাজে ডমরু বাজে
হৃদয় মাঝে, হৃদয় মাঝে।

*　*　*

মরমে মরমে বেদনা ফুটে—
বাঁধন টুটে, বাঁধন টুটে।

৩। বিভূতি :

যন্ত্ররাজ বিভূতি মুক্তধারা ঝর্ণাকে বেঁধেছেন তাঁর যন্ত্রের সাহায্যে। অদ্ভুত তাঁর ক্ষমতা, তাঁর প্রতিভা লোকোত্তর—তাঁর কীর্ত্তি গগনস্পর্শী। আধুনিক জগতে যন্ত্রবিজ্ঞানের আধিপত্য যে বৈজ্ঞানিককুলের অক্লান্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—তিনি তাঁদেরই মুখপাত্র। বিভূতি জড়বিজ্ঞানের সাধক। "যন্ত্রবলে প্রকৃতিকে জয় করব—এই ছিল তাঁর সাধনা।" সে বাঁধ বাঁধতে বাঁধতে কতবার ভেঙেছে, কত লোক ধুলোবালি চাপা পড়েছে, কত লোক বন্যায় ভেসে গেছে। কিন্তু সে কথা তিনি গ্রাহ্যের মধ্যেও আনেন না। যন্ত্র গড়ে তুলতে তুলতে বিভূতি যেন নিজেও যন্ত্রে পরিণত হয়েছেন—তাঁর মায়া নেই, দয়া নেই, প্রাণ নেই। আছে শুধু দম্ভ—আকাশস্পর্শী উচ্চাকাঙ্ক্ষা। যন্ত্রের বলে তিনি দেবতাকেও ছাড়িয়ে যেতে চান। দম্ভ করে তিনি বলেছেন—"দেবতা কেবল জলই দিয়েছেন—আমাকে দিয়েছেন জলকে বাঁধবার শক্তি।" সেই শক্তির দম্ভেই তিনি মত্ত। তাঁর প্রতিষ্ঠিত যন্ত্র মানবকল্যাণে নিয়োজিত হয়েছে না অকল্যাণসাধন করছে সে সম্বন্ধেও তিনি নির্ব্বিকার। শিবতরাইয়ের প্রজাদের চাষের ক্ষেত জলের অভাবে শুকিয়ে উঠতে পারে একথা জেনেও তিনি অবিচলিত। তিনি কেবল যন্ত্রশক্তির মহিমার কথা ভেবেছেন আর ভেবেছেন যন্ত্রবলে একদিন নিজেই দেবতার পদ গ্রহণ করবেন। তিনি বোঝেন নি যে, এমনতরো স্পর্দ্ধা পৃথিবীতে কোনদিন স্থায়ী হয় নি। তিনি বোঝেন নি যে, দেবতার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দেবতাকে তিনি কখনো অতিক্রম করতে পারবেন না। বিজ্ঞানের অবদান যদি মানবকল্যাণের পথকে অবরুদ্ধ করে তবে মানবের আত্মা একদিন তার বিরুদ্ধে জেগে উঠবেই—এ সত্য তিনি উপলব্ধি করেন নাই। মানবের অকল্যাণে নিয়োজিত তাঁর বাঁধ নিশ্চিত ভেঙে পড়বে অন্তর ও বাহিরের সম্মিলিত আঘাতে—এ সত্যটিকেও তিনি উপলব্ধি করেন নাই। এইখানেই তাঁর চরম ব্যর্থতা—এইখানেই তাঁর কীর্ত্তিরই মধ্যে ধ্বংসের বীজ লুকানো ছিল।

৪। রণজিৎ :

রাজা রণজিৎ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র উত্তরকূটের রাজপদে অধিষ্ঠিত। তাঁর চরিত্রচিত্রণে রবীন্দ্রনাথ গতানুগতিক সাম্রাজ্যবাদী স্বৈরাচারী শাসকের ভূমিকাটুকু অনাবৃত ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। রণজিৎ উত্তরকূটের শাসক। তাঁর রাজ্যলিপ্সা প্রবল, প্রভুত্বপ্রিয়তা অসীম এবং রাজগৌরব সম্বন্ধে ধারণা স্ফীত ও উচ্চ। এঁর চরিত্রের ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের ইতিহাসে ছড়িয়ে আছে। পদানত রাজ্যের প্রজাদের প্রতি তাঁর স্নেহ নেই—তাদের হৃদয় জয় করবার স্পৃহাও তাঁর নেই। যে রাজ্য বাহুবলে বিজিত হয়েছে তার অর্থনৈতিক শোষণ সম্পূর্ণ করতে তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প। শিবতরাইয়ের স্বাধীন ব্যবসায় তাঁর আদেশে বন্ধ হয়েছে। তাদের বশে রাখবার বিরাট শাসনযন্ত্র যে বিভূতির চেষ্টায় নির্ম্মিত হয়েছে তাঁকে তিনি মুক্তহস্তে পুরস্কৃত করতে চলেছেন। তবু এই দাম্ভিক উগ্র সাম্রাজ্যবাদী শাসকটিকে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ মমত্ববর্জ্জিত, মানবিকতাবর্জ্জিত করে দেখান নি। পালিতপুত্র অভিজিতের প্রতি তাঁর স্নেহ আমাদের মনকে মুগ্ধ করে। রাজচক্রবর্ত্তীর লক্ষণ দেখে যাকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন সে যখন তাঁর রাজচক্রবর্ত্তীর সংজ্ঞাকে অগ্রাহ্য করে বিশ্বমানবিকতাকে বড় করে দেখতে সুরু করল তখন তিনি বাহ্যত ক্রুদ্ধ বলে মনে হলেও তাঁরও অন্তরের গভীরে সত্যের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন। তাই নাটকের শেষের দৃশ্যগুলিতে তাঁর শাসনের সুর হয়েছে নরম, অম্বা ও বটুকের ক্রন্দন তাঁকে স্পর্শ করেছে, বিভূতির যন্ত্রের মহিমা হয়ে এসেছে ম্লান। রবীন্দ্রমানসের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি মানুষের মনুষ্যত্বকে অমর বলে জেনেছিলেন। অত্যাচারীর অন্তরের গভীরে যে মানবতা সুপ্ত হয়ে থাকে তাকেও তিনি জাগাতে চেয়েছেন—দেখিয়েছেন মানবের অন্তরে দেবতা আছেন, এই সত্যই চিরন্তন সত্য।

৫। সঞ্জয় :

সঞ্জয় চরিত্রটি মুক্তধারা নাটকে একটি প্রস্ফুটিত সুগন্ধি পুষ্পের মতই অম্লান। যুবরাজ অভিজিতের নিয়ত সঙ্গী সে। রাজপুত্র হয়েও সে যে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নয় তার জন্য তার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই। তার চরিত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য নিজেকে সম্পূর্ণ বিলোপ করে দিয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ভালবাসার অদ্ভুত শক্তি। এমন নিষ্পাপ সুন্দর ভালবাসার নিদর্শন বড় দুর্লভ। প্রতিদিন সকালে অভিজিৎ পূজায় বসবার আগে আসনের সামনে শ্বেতপদ্মটি যে রেখে আসত সে সঞ্জয়। কিন্তু কোনদিন জানায় নি সে কথা। অভিজিৎকে সে শ্রদ্ধা করেছে, ভক্তি করেছে, পাশে থেকেছে ছায়ার মত—নিজের কথা বুঝি কখনও ভাবে নি। যেদিন ভৈরব পূজার রাত্রে যুবরাজ চিরদিনের জন্য রাজবাড়ী ছেড়ে যেতে উদ্যত—সেদিন সে পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল

অভিজিৎকে—তোমার কাছে কি যা কোমল, যা সুন্দর তার কোন মূল্য নেই—কেন চলে যেতে চাও দুস্তর কঠিনের সাধনায়? অভিজিৎ বলেছিলেন—তারই মূল্য দেবার জন্য কঠিনের সাধনা। স্বর্গকে ভালবাসি বলেই দৈত্যের সঙ্গে লড়াই। রক্তকরবী নাটকে নন্দিনীর পাশে কিশোরের ছবিটি যেমন মধুর, মুক্তধারায় অভিজিতের পাশে তেমনি সঞ্জয়। সত্যের সাধনায় দুর্গম দুঃখপথের অভিযানে একা যাত্রা করার দুঃসাহসের অভাব ছিল না অভিজিতের। কিন্তু সঞ্জয়ের সর্বস্বঢালা ভালবাসা তাঁর সে যাত্রার পথকে কি একটুও সুখাবহ করে তোলে নি? জানি না এ প্রশ্নের উত্তর আছে কি না।

৬। মন্ত্রী :

উত্তরকূটের রাজা রণজিৎ। তাঁর মন্ত্রী তাঁকে উপযুক্ত মন্ত্রণা দিয়ে থাকেন। পররাজ্য গ্রাসের সহজ পন্থা কি—তাদের সর্বপ্রকারে শোষণ করার শ্রেষ্ঠ উপায় কি কি—সে সবেরই তিনি এতকাল পথনির্দেশ করেছেন। তাঁরি মন্ত্রণায় চণ্ডপতনের (আর একটি পদানত রাজ্য) ঘরে ঘরে আগুন লাগানো হয়েছে, শিবতরাইয়ের শাসন-যন্ত্রকে কঠোর করা হয়েছে। ভৈরবপূজার উৎসবে যেদিন যন্ত্ররাজ বিভূতির সম্বর্দ্ধনার আয়োজন হয়েছে সেদিন তাঁর ও মন্ত্রণার সুরের কিছু বদল হয়েছে দেখা গেল। কুমার অভিজিৎ বৃদ্ধ মন্ত্রীর মনকেও আকর্ষণ করেছেন। তাই দেখি শিবতরাইয়ের প্রজাদের বশে রাখবার জন্য যে যান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে তার প্রতি তাঁর তেমন সমর্থন নেই। অভিজিৎ তাঁর উদার বিশ্বভ্রাতৃত্বের দৃষ্টিতে যেভাবে সকলের প্রতি সমদর্শিতা অর্জ্জন করেছিলেন তা তাঁর মনকে আকৃষ্ট করেছে। প্রাচীনপন্থী শান্তি আর দমনমূলক নীতির উপর তাঁর আস্থা কেমন শিথিল মনে হয়। রক্তকরবী নাটকে নন্দিনীর আবির্ভাব যেমন রাজা মন্ত্রী অধ্যাপক খোদাই-কর সবার মনেই নূতন এক ভাবের অনুপ্রেরণা জাগিয়েছিল, মুক্তধারায় অভিজিতের আবির্ভাবে অনুরূপ পরিবর্ত্তনের আভাস পাওয়া যায়। কোন বিপ্লবই যে আকস্মিক নয়—তার আকস্মিক আত্মপ্রকাশের পূর্ব্বে যে ভাবজগতের বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট করে রবীন্দ্রনাথ উভয় নাটকেই দেখিয়েছেন। মন্ত্রীর পরিবর্ত্তনের কারণ রাজা হঠাৎ বুঝতে পারেন না। বিভূতির অভ্যর্থনায় মন্ত্রীর আন্তরিকতার অভাবে তিনি সংশয় প্রকাশ করেছেন। "কিন্তু তোমার তো তেমন উৎসাহ দেখছি না—ঈর্ষা?"

"না—মহারাজ"—মন্ত্রী উত্তর দেন।

৭। অম্বা ও বটুক :

উত্তরকূটের সকল প্রজাই কি সাম্রাজ্যবাদের বিজয়-গৌরবে সুখী হয়েছিল? এ প্রশ্নের উত্তর মূর্ত্তি নিয়েছে পুত্রহারা মাতা অম্বার করুণ ক্রন্দনে আর অন্ধ উন্মাদ বটুকের করুণ বিলাপে। অম্বার একমাত্র পুত্র সুমন—বটুকের একমাত্র অবলম্বন ছিল তার 'জোয়ান দুই নাতি।' বটুকের জোয়ান দুই নাতি বাঁধ-বাঁধার কাজে প্রাণ হারিয়েছে। পাগল বটুক উত্তরকূটের পথে পথে ভৈরবের জাগৃতির প্রতীক্ষায় নিরত।

পুত্রহীনা অম্বা পাগলিনীর মত উত্তরকূটের পথে পথে ঘুরে বেড়ায় অম্বার সকরুণ ক্রন্দন রাজাকেও ব্যথিত করেছে। বটুকের ব্যথা আর অম্বার করুণ ক্রন্দনে একটি কথাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—সেটি হচ্ছে এই যে, উত্তরকূটে যন্ত্রের মহিমা স্থাপন করতে গিয়ে মূল্য দিতে হয়েছে প্রচুর। সকলেই সেখানে সুখী হতে পারেনি। যে সব কোমল প্রাণ সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিপ্রস্তরের তলায় পিষ্ট হয়ে গেল—কে তাদের মূল্য দেবে? এ প্রশ্ন মূর্ত্ত হয়েছে অম্বা ও বটুকের কাতর আবেদনের মধ্যে।

৮। নাগরিকগণ :

মুক্তধারা নাটকের আর দুইটি ভূমিকা উল্লেখ না করলে চরিত্র পরিচয় অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। উত্তরকূট আর শিবতরাই—এ দুটি রাজ্যের নাগরিকগণ এ দুটি ভূমিকায় অবতীর্ণ। উত্তরকূটের নাগরিকগণ বিভূতির জয়গানে মুখর—তাঁর কীর্ত্তির জন্য তাদের উৎসাহের সীমা নেই। শিবতরাইয়ের প্রজাদের স্পর্দ্ধা এবার চিরকালের জন্য ভেঙে যাবে—এ কথা বুঝতে তাদের বিলম্ব হ'ল না। উত্তরকূটের মানুষদের চোখে শিবতরাই-য়ের মানুষেরা অত্যন্ত হীন। তাদের নাকি নাক চ্যাপ্টা, তারা পড়ে কাণ-ঢাকা টুপি। পরপদানত হয়ে থাকবার জন্যই তাদের জন্ম।

গুরু। নাক উঁচু থাকলে কি হয়?

ছেলেরা। খুব বড় জাত হয়।

গুরু। তারা কি করে?...তারাই সকলের উপর জয়ী হয় না?

ছেলেরা। হ্যাঁ, জয়ী হয়।

বুঝতে বিলম্ব হয় না যে, উনবিংশ, বিংশ শতকের ইউরোপীয় জাতিসমূহ যে **race-superiority**-র দাবি

করে থাকেন উত্তরকূটের মানুষদের দাবি তার চেয়ে কম ছিল না। কালা আদমীদের উপর শাসন চালাবার যে গুরুদায়িত্ব শ্বেতকায়দের উপর ভগবান চাপিয়েছেন—উত্তরকূটবাসীরাও তাও দাবি করেন।

শিবতরাই অধীন রাজ্য। অত্যাচার সহ্য করতে করতে তাদের সহ্যের সীমা যখন সীমা ছাড়ালো, তখন ধনঞ্জয় বৈরাগীর নেতৃত্বে তারা সঙ্ঘবদ্ধ হ'ল। ধনঞ্জয়ের উপর তাদের অগাধ বিশ্বাস—তার আদেশ পালনে তাদের অক্লান্ত উৎসাহ। তাদের দুর্দ্দিনের নিশ্চিৎ অবসান ঘটবে, এ বিশ্বাস তাদের অবিচল। নাটকের শেষ দৃশ্যে যুবরাজ অভিজিৎকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতে তারা সদলে এসে উপস্থিত হয়েছিল। যুবরাজ তখন মুক্তধারার মুক্তস্রোতে ভেসে গেছেন। আমরা যে তাকে নিতে এসেছিলাম—বলে উঠলেন তাদের দলপতি। "চিরকালের মত পেয়ে গেলি।" বললেন ধনঞ্জয়। মুক্তধারার মুক্তিতে যুবরাজের প্রাণদানে শিবতরাইয়ের মুক্তি ঘোষিত হ'ল।

একাঙ্ক নাট্য মুক্তধারায় নাগরিকদলের এই ভূমিকা গ্রীক নাটকের কোরাসের সঙ্গে তুলনীয়। এরা আদর্শ দর্শকের ভূমিকায় চলমান ঘটনাস্রোতের উপর আলোকপাত করেছে। অধ্যাপক টমসনের মতে এরা জীবন-স্রোতের সঙ্গে তুলনীয়। নাটকের মধ্যে এদের একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে এ কথা অবশ্যস্বীকার্য্য।

সমাপ্ত

আপনার ঘড়িতে ক'টা বাজল ?

শ্রীতুষার গঙ্গোপাধ্যায়

বাজার করে ফিরছিলাম।

মুখে কথা নেই, মনে সদ্য কেনা মাছ-তরকারীর হিসাব। হঠাৎ আমার পথ আটকেই এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়েছেন—"আপনার ঘড়িতে ক'টা বাজল?" অপরিচিত ভদ্রলোক। অতি সাধারণ সাজ-পোশাক, তবে দুই হাতই ব্যস্ত; একটিতে ছাতা, অপরটিতে লাঠি।···আমি ঘড়ি দেখে বললাম, ন'টা পঁয়ত্রিশ। আর কোন প্রশ্ন না করে বৃদ্ধ এগিয়ে গেলেন। আমিও বাড়ীর দিকে পা বাড়ালাম। গিন্নীকে হিসেব দিতে হবে। আবার সেই দিকে মন দিলাম। ফিরে দেখি, বৃদ্ধ অন্য এক পথচারীকে ঐ একই প্রশ্ন করছেন—আপনার ঘড়িতে ক'টা বাজল ?

এবার একটু আশ্চর্য্য হলাম।···প্রশ্নোত্তর পেয়ে বৃদ্ধ ততক্ষণ আরো এগিয়ে গেছেন।

এর পর প্রায় দেখা হয়ে যায় এবং একই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়।

এক দিন নিজেই আলাপ করলাম—দাদা, এদিকে কোথায় যান, রোজ সকালে দেখি ?

—বেড়াতে যাই ভাই। স্নেহ-কোমল কথা।

—আপনার নামটা···

—আমার নাম অভয়পদ রায়। আমার ছেলে এখানকার এস. ডি. ও. (ওয়াটার ওয়েজ)। আপনি ?

—আমার নাম শ্রীনাথ গাঙ্গুলী, এই স্কুলের বাংলা পণ্ডিত।

—বেশ, বেশ, আলাপ হয়ে সুখী হলাম। চলি। হ্যাঁ, আপনার ঘড়িতে ক'টা বাজল ?

রায় মশায় ক্রমে আমার সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন—আমার বাড়ীর সামনে দিয়ে রোজ সকালে-বিকেলে বেড়াতে যান। আমার কুশল সংবাদ নেন। তার পর ঐ প্রশ্ন করেন। এ প্রশ্নটা করায় তাঁর কোনও সঙ্কোচ নেই। আমার ভাই-পো এঁর সঙ্গে কি ভাবে আলাপ করেছিল। তাঁকে দেখলেই চীৎকার করতো।

—ছাতাদাদু তোতায় দাও? বলা বাহুল্য তাঁর হাতে প্রতিদিন ছাতা দেখে তাই এই নামকরণ। রায় মশাই সস্নেহে জবাব দেন—বেড়াতে যাচ্ছি ভাই। তুমি কেমন আছ ?

শহরে প্রায় সকলেই জানল, ইনি ঘড়ি পাগল।

ছেলে-ছোকরার দল একে দেখলেই, ঘড়িটা তার নজরে পড়ে, এমনি ভাবে তার কাছ দিয়ে হাঁটে। সঙ্গে সঙ্গে রায় মশাই স্বভাবগত প্রশ্ন করেন—আপনার ঘড়িতে ক'টা বাজল ?—তারাও সময়টা বলে দিয়ে এগিয়ে যায়। বেশ কৌতুক অনুভব করে। আমি কিন্তু এর মধ্যে কোনও রহস্য বা করুণ ইতিহাস অন্বেষণ করতে চাই।

কিছু দিন রায় মশাইকে পথে দেখা গেল না। আমি চিন্তিত হলাম, তাঁর জীবন-ঘড়ি কি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল ? শেষ পর্য্যন্ত এক দিন তাঁর বাসায় গিয়ে হাজির হলাম। তার ছেলে প্রিয়তোষবাবুর সঙ্গে আলাপ করে প্রশ্ন করলাম—আপনার বাবাকে দেখি না ?

তিনি বললেন—বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি একবার পড়ে গিয়ে ভীষণ আঘাত পান। সেই থেকে তাঁর বাঁ অঙ্গটি প্রায় অক্ষম হয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে যন্ত্রণা আরম্ভ হয়, তখন আর চলাফেরা করতে পারেন না। এখন ভাল আছেন। এবার বেড়াতে যেতে পারবেন মনে হয়।

যাক। নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়ে ছিলাম। কিছু আমার কৌতুহল বেড়ে গিয়েছিল।

এ অন্য একদিনের কথা।

আমার এক বন্ধুকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে রায় মশাইকে দেখলাম। তিনি রুগীদের কাছে গিয়ে কুশল প্রশ্ন করছেন। আবার বলছেন, ভয় নেই, ভাল হয়ে যাবেন, নিশ্চয় ভাল হয়ে যাবেন। কিন্তু ঘড়ি রাখবেন না, ঘড়ি দেখবেন না। খবরদার বলছি···

সেদিন একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। হাসপাতালের গেটের কাছে গিয়ে দেখি রায় মশাই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আসছেন, নিজেকে যেন আর সামলাতে পারবেন না, পড়ে যাবেন। কিন্তু কেন? আমায় দেখেই প্রশ্ন করলেন।

—গাঙ্গুলী মশাই আপনার ঘড়িতে ক'টা···। নিজের গতিবেগ সামলাতে না পেরে পড়ে গেলেন। আমি তাড়াতাড়ি তাঁকে তুলে ধরলাম। আমার চীৎকার শুনে হাসপাতাল থেকে সকলে ছুটে এলেন। অচৈতন্য রায় মশাইকে তুলে নিয়ে গেলেন। সেখানে তাঁর চিকিৎসা আরম্ভ হ'ল। সংবাদ পেয়ে প্রিয়তোষবাবু এসে পড়লেন। কয়েকজন রুগীও বেরিয়ে এসেছিল। তারা বলল—একটি মুমূর্ষু রুগীকে দেখে রায় মশাই হঠাৎ বিচলিত হয়ে পড়েন। তাকে বলেন—নিশ্চয় ঘড়ি আছে আপনার কাছে···আমি···ঘড়ি বলেই তিনি ছুটতে আরম্ভ করেন। যার পরিণাম এই।

পরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন—এটা বহু পুরাতন মানসিক ব্যাধি। কোনও রকম 'শক্' পেলেই আবার 'এ্যাটাক' হয়। এঁকে নিয়ে যান। এখন ভাল আছেন।

বাসায় পৌঁছে প্রিয়তোষবাবু তাঁকে একটি নির্জ্জন ঘরে শুইয়ে দিলেন। তার পর বললেন—বাবা, আপনি বিশ্রাম করুন। আমরা পাশের ঘরে আছি। বলা বাহুল্য, আমিও সঙ্গে ছিলাম। আমরা পাশের ঘরে এসে বসলাম।

প্রিয়তোষবাবু আমায় একটি কাহিনী শোনালেন।

"আমরা শিশুকালে মাকে হারাই, বাবা আমাদের পরম স্নেহ-যত্ন দিয়ে মানুষ করেছেন। আমি, আমার দাদা প্রেমতোষ, আর আমার বোন প্রিয়লতা। আমরা তিন ভাই বোন। দাদা ছিলেন সব দিক দিয়ে সেরা। আমার বাবা ছিলেন বড় সরকারী কর্ম্মচারী। দাদাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা বাবার জীবনে মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। দাদাও বাবার খুব অনুগত ছিলেন। তাঁরা একই ঘরে থাকতেন। বন্ধুর মত নানা বিষয়ে আলোচনা করতে ভালবাসতেন। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে দাদা বিলেত যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। সব ব্যবস্থা পাকা হ'ল। যাত্রার কিছুদিন আগে দাদা হঠাৎ ক্রিকেট-মাঠ থেকে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্ত্তি হলেন। এ সংবাদে বাবা খুব বিচলিত হলেন। দাদার বুকের মধ্যে কঠিন ব্যাধি আবিষ্কার করলেন বিশেষজ্ঞেরা। বাবা দু'বেলা হাসপাতাল যাতায়াত করতেন। একদিন ট্রামের সঙ্গে সামান্য ধাক্কা খাওয়ায় বাবা খুব আঘাত পেলেন। তিনিও শয্যাশায়ী হলেন। সারা অঙ্গ প্লাষ্টার করে রাখা হ'ল। বিছানা থেকে উঠবার শক্তি রইল না। এ সংবাদ পেয়ে দাদা কিছুতেই হাসপাতালে রইলেন না। বাড়ীতে ফিরে এলেন। পিতাপুত্র একই ঘরে পাশাপাশি শয্যা নিলেন। চিকিৎসা চলছিল। এদের মধ্যে যথারীতি কথা, গল্প চলত, বেশ সময় কাটতো।

একদিন মধ্যরাত্রির পর দাদা হঠাৎ প্রচণ্ড ব্যথায় ছটফট করতে লাগলেন। বাবার ঘুম ভাঙল। দাদা বাবাকে বললেন—বাবা জল চাই, জল। বাবা···জল। বাবা নিরুপায়। অন্যান্য দিন চাকরটা ঐ ঘরে শুতো, সে দিন কেউ ছিল না। দাদার কষ্ট বাড়তে লাগল। বাবা নির্ব্বাক বিমূঢ়ের মত শুয়ে শুয়ে নিদারুণ যন্ত্রণা দেখতে লাগলেন। আর মাঝে মাঝে টেবলের উপর টাইমপিস্‌টার দিকে দেখছিলেন। বাবা বাবা—আমি, আর বাঁচব না···। আমি চললাম। বাবাঃ···। ঘড়ির কাঁটার টিক্ শব্দের সঙ্গে দাদার কণ্ঠস্বর ক্রমে মিলিয়ে যায়। এই অসময়ে বাবা শুধু ঘড়িটার দিকে কোনও মতে এগিয়ে ছিলেন। পাশেই টেবলের উপর রাখা সেই ঘড়িটা তাঁর হাত লেগে পড়ে যায়।···

আমরা শব্দ শুনে ছুটে আসি। বাবাকে তুলে ধরি। বন্ধ ঘড়ির কাঁটায় 'একটা বেজে দশ'।

এই কঠিন শোকে বাবা বদ্ধ পাগল হয়ে যান। বহু চিকিৎসার পর কিছু দিন হ'ল প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছেন। উন্মাদ অবস্থায় ঘড়ি দেখলেই যেমন ক্ষেপে উঠতেন, ঘড়ি ভাঙতে যেতেন, এখন আর তেমন করেন না। তাঁর ধারণা হয়েছিল ঐ ঘড়ির কাঁটার মধ্যে তাঁর খোকা হারিয়ে গেছে।···"

আমি সেদিন বুঝলাম রায় মশাই সেই অশুভ সময়টিকে ঘড়ির কাঁটার মধ্যে এখনও ভয় করে চলেছেন···জীবনের শেষ দিনগুলো ওরই মধ্যে প্রশ্নময় হয়ে রয়েছে।

আধুনিক বাংলার মহিলা সমাজ

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

সালতামামির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই একথা স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, উনবিংশ শতাব্দী হইতে বিংশ শতাব্দীতে সমগ্র জগতের মনুষ্যসমাজে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের শক্তি অনেকাংশে বাড়িয়া গিয়াছে। সভ্যজগতে স্ত্রীলোকের ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে এখন সকলেই মান্য করিয়া চলে, তাহার কর্মক্ষেত্রের সীমারেখা কেহ নির্বিচারে টানিয়া দিতে চায় না। কিন্তু যে সমাজ এখন পৃথিবীতে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা পুরুষ গঠিত ও শাসিত কাজেই সে সমাজের অনুশাসনে 'স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী'র স্থান এখনও অব্যাহত আছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই সাম্রাজ্যবিদ্বিষ্টদের রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে এই প্রগতির প্রথম পাদক্ষেপ সুরু হয় সত্য কিন্তু তার পর ইহার বিশেষ পুষ্টি ও শক্তিলাভ ঘটে সামাজিক বিবর্তনে ও অর্থনৈতিক সংগ্রামে। সে বিবর্তন ও সংগ্রাম অবশ্য সর্বদেশে সমভাবে দেখা দেয় নাই কিন্তু সর্বব্যাপারে যে, নারীর শক্তি সকল দেশেই বাড়িয়া গিয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শক্তি হিসাবে নারীর পূজা বাংলাদেশে চিরকাল প্রচলিত থাকিলেও, সে শক্তির বোধন হয় উনবিংশ শতাব্দীতেই। বঙ্কিমচন্দ্রের মানসীকন্যা আনন্দমঠের শান্তি বা সীতারামের শ্রী বোধ হয় এই মানস-বোধনের ফল। নারীর কল্যাণময়ী রূপকেই বাংলা চিরদিন পূজা করিয়াছে সত্য কিন্তু তাহার পিছনে যে করাল শক্তি লুক্কায়িত আছে তাহা সে বিস্মৃত হয় নাই। তাহার পূজা করিয়াছে সে গোপনে, অমাবস্যার অন্ধকারে, কারণ সে নগ্নশক্তি যে দাবানলের মত শিব ও অশিবের সীমারেখা মুছিয়া দেয় সে সত্য তাহার কাছে নূতন নয়। সে শক্তিপূজার কাহিনী পুরাতন।

নব-বাংলার সমাজচেতনায় নারীর স্বীকৃতি প্রথম দেখা দেয় ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে। সে শিক্ষার বাহক ও ধারক একদিকে ব্রাহ্মসমাজ অন্যদিকে খ্রীষ্টান মিশনারী। কিন্তু সে শিক্ষায় বিদ্যা অপেক্ষা অবিদ্যার প্রভাব বেশি। অবশ্য তখন সে কথাটা বুঝিবার মত মানসিক শক্তি না ছিল বাংলার মহিলা সমাজের না ছিল বাংলার পুরুষ সমাজের। পুরুষ সমাজ সে সময় স্ত্রীসমাজের বর্ণজ্ঞানহীনতা ও কুসংস্কারের জন্য নিজেদের কাছেই নিজেরা লজ্জিত ও অপরাধী হইয়াছিল। আর এজন্য বিদেশীর কাছে তাহাদের সঙ্কোচও ছিল অপরিসীম। আর শুধু তাহাই বলি কেন? বোম্বাই ও এদেশের পার্শী সমাজ দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ বাংলার জন্য যে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যেই সে যুগের পুরুষ-সমাজের মানসতা প্রকাশ পাইয়াছে। স্ত্রীকে আপনার যোগ্য করিয়া না লইলে যে জীবনযাত্রা অসম্পূর্ণ ও অঙ্গহীন হইয়া পড়ে একথা ইংরেজি শিক্ষিত জনসমাজ তারস্বরে প্রচার করিতে থাকেন। অবশ্য যোগ্যতার মাপকাঠি যে ইংরেজি বর্ণজ্ঞান আর ইংরেজি সমাজের নিয়ম-কানুন এ কথা না বলিলেও চলে। ফলে, মাটির সঙ্গে সম্পর্ক কাটাইয়া দেশের মহিলা-সমাজের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ টবের ফুলের গাছে পরিণত হন। তাঁহারা টবে চড়িয়া দেশের মাটির গাছগুলিকে অযথা অনুকম্পা প্রকাশ করিতে থাকেন আর বিদেশের প্রশংসা পাইবার জন্য শুধু গন্ধহীন বর্ণাঢ্য ফুল ফুটাইবার চেষ্টা করেন। ইহাই বাংলাদেশের মহিলা প্রগতির প্রথম ইতিহাস।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপক প্রচারের কাহিনী। ইহার মূলে জ্ঞানলিপ্সা অপেক্ষা সামাজিক শুভবুদ্ধির প্রেরণা অনেক বেশি। আর সে প্রেরণার জন্য ধন্যবাদ মহিলা সমাজেরই প্রাপ্য। তাহাদের সহজ সম্মতি না পাইলে গৌরীদান সমস্যা শাস্ত্রকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিত না; শুধু পুরুষের চেষ্টায় অরক্ষণীয়াকে রক্ষা করা যাইত না। বিবাহের বাজারে স্কুল, কলেজের ছাত্রীর চাহিদা বাড়িয়া উঠিল, শিক্ষিতা ও অশিক্ষিতার বিবাহে পণেরও তারতম্য ঘটিল। ফলে, প্রধানতঃ উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজের অন্তঃপুরে নববধূর সঙ্গে সঙ্গে নবস্বাস্থ্যতত্ত্ব, সন্তানপালন, ইতিহাস, ভূগোল, নব-বিজ্ঞান প্রভৃতিও আসিয়া পৌঁছিল। ফল যে সর্বত্রই ভাল হইল একথা বলা চলে না; কোথাও নববিজ্ঞানের সঙ্গে পূর্বতন সংস্কারের মিশ খাইল আবার কোথাও বা নিরন্তর বাদ-বিসম্বাদ লাগিয়াই রহিল। কিন্তু মহিলা সমাজে মোটামুটি এই অবস্থাটাই দাঁড়াইয়া গেল যে, ছেলেপিলে মায়ের কাছে নববিজ্ঞানের পাঠ লইয়া ঠাকুমার

কাছে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ভূতপ্রেত আর ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমীর গল্পের রস আস্বাদন করিত। দুইটি মহলই বর্তমান রহিল বটে, কিন্তু একটির সহিত অন্যটির সংযোগ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিল। মহিলা-সমাজে ইংরেজি শিক্ষার দ্রুত প্রচারের ফলে যে মহিলা-উদ্যান রচিত হইল তাহাতে কেয়ারি তৈরী হইল দেশের মাটির উপরেই, টবে নহে। তাহার কারণ এই নয় যে, সে সমাজের টান দেশী মাটির উপর বেশি ছিল। সে সমাজও হয়ত টবেই থাকিতে পছন্দ করিত কিন্তু ইতিমধ্যে পুরুষ-সমাজের মানসতার পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। দেশাত্ম-বোধের কল্যাণে সে সমাজ তখন অনেকটা আত্মস্থ হইয়াছে। ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে তখন আর ইংরেজ বনিবার আকাঙ্ক্ষা নাই। কাজেই দেশের মাটিতে ভাল ফসল ফলাইবার চাহিদা অনেকাংশে বাড়িয়া গিয়াছে। তারপর প্রথম যুগের মহিলা প্রগতির সঙ্গে দেশের নাড়ীর কোন সংযোগ ছিল না। তথাকথিত আলোকপ্রাপ্তা মহিলারা দেশের সর্বসাধারণকে অবজ্ঞা করিতেন। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে তাহাদিগকে পুরাতনপন্থী আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে একত্র ঘর করিতে হইত। ফলে, তাহাদের পুরাতন-পন্থা একেবারে এড়াইবার জো ছিল না। মোটের উপর বাংলাদেশের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্য্যায়ের মহিলা প্রগতি পুরুষসমাজের ইচ্ছাকেই একান্ত ভাবে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে।

এবার আমরা বাংলাদেশের মহিলা-প্রগতির তৃতীয় পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এই পর্যায়ের সুরু হয় প্রায় বিশ-পঁচিশ বৎসর পূর্বে। কিন্তু স্বাধীনতার পূর্বে এই ধারা ছিল ক্ষীণ; স্বাধীনতার পরে ইহার স্রোতাবেগ উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে।

এই পর্যায়ে শিক্ষা সাধারণ ভাবে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার কারণ কিছুটা রাজনৈতিক কিছুটা অর্থনৈতিক। এই সময়ের মধ্যে দেশে বহুপ্রকার পরিবর্তন ঘটিয়াছে—বস্তুজগতে ও মনো-জগতে। জমিদারের স্থান শিল্পপতিরা গ্রহণ করিয়াছেন, বহু কৃষিজীবী শ্রমশিল্পীতে পরিণত হইয়াছে, বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়িয়াছে আর অন্তর্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক কমিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর ও দেশবিভাগ সমগ্র-দেশের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাইয়া গিয়াছে। ব্যক্তিতাবাদ ও মৈত্রীহীন সাম্য আধুনিক বাংলার বুকে চাপিয়া বসিয়াছে। সে গ্রাস হইতে বাংলার মহিলা সমাজও রক্ষা পায় নাই। পাইবার কথাও নয়।

বাংলায় আধুনিক শিল্পপতির সংখ্যা নগণ্য। তাহাদের পরিবারস্থ নারী-সমাজের কথা ছাড়িয়া দিলেও, বাংলায় এমন একটা নারী-সমাজ আছে যে সমাজের সকলেই প্রায় আলস্যে জীবনযাপন করেন। কলিকাতাই অবশ্য এ সমাজের কেন্দ্র আর গণনায় হয়ত তাহাদের মধ্যে অবাঙালী ও বিদেশীর সংখ্যা বেশি হইবে। পূর্বে বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দৃষ্টি এ সমাজের দিকে পড়িত না; এখন পড়ে, কারণ একদলের সঙ্গে অন্যদলের সাহচর্য বাড়িয়া গিয়াছে। আর এই সাহচর্যের ফলে ঐ আলস্যজীবীদের ঝুলি হইতে অনেক অসঙ্গত ও অশোভন রীতিনীতি ও ভাবধারা বাংলার সমাজে পৌঁছিতে সুরু করিয়াছে।

কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া লওয়া যাউক। এই অলস নারী-গোষ্ঠী, ভারতীয় হইলেও, রীতি-নীতি ও রুচিতে সম্পূর্ণ বিদেশী। আর তাহাই বা বলি কেন? ইহাদের নিজেদের কোনো বিশিষ্ট সত্তা নাই; ইহাদের মন পাঁচমিশালী, সঙ্কর। জীবনের কোনো গভীর চিন্তার ধার ইহারা ধারে না, দেহাত্মবাদ ইহাদের জীবন-দর্শন, পরিবার-বন্ধন ইহাদের শ্লথ, ঐশ্বর্য ও অর্থের ইহারা ক্রীতদাস, অসংযত ও বিকৃতরুচি ইহাদের আভরণ আর পল্লবগ্রাহীতা ইহাদের কৃষ্টির পরিমাপ।

ইহাদের অগভীর মন চিত্তচাঞ্চল্যের মধ্যেই বাঁচিতে চায়। অর্থের স্বাচ্ছন্দ্যই ইহাদের একমাত্র শক্তি এবং সে শক্তির দৌলতে ইহারা যে বিকৃত রুচি গঠন করে তাহার একমাত্র উপজীব্য নিত্য নব-চাপল্যের অভিনবত্ব।

এই স্বাচ্ছন্দ্য, এই চাপল্য, এই অভিনবত্বের আকর্ষণ প্রবল। বিশেষ করিয়া আধুনিক মধ্যবিত্ত মহিলা-সমাজে —যে সমাজ দেশের নানা বিবর্তনের পরে এখনও আত্মস্থ হইতে পারে নাই। তাই আজ সে মহিলা সমাজে নকল করিবার প্রচেষ্টা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। বিদ্যা বা বুদ্ধির সেখানে অভাব নাই; অভাব শুধু ঋজুতার ও আত্মপ্রত্যয়ের। যে শালীনতা ও কমনীয়তার জন্য বাংলার মহিলা-সমাজের যথার্থ প্রসিদ্ধি, শাড়ী, জামা ও প্রসাধনের মধ্যে আজ তাহার অভাববোধ হইতেছে কেন?

এই আত্মপ্রত্যয় ও সরলতার অভাব সারা দেশের মহিলা-সমাজে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নিম্নমধ্যবিত্ত, বাস্তু-হারা, শ্রমশিল্পী সর্ব-সমাজেই ঐ একই কথা। নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের জীবনাদর্শ মধ্যবিত্ত আবার শ্রমশিল্পী মহিলা-সমাজের কাম্য নিম্নমধ্যবিত্তের জীবন। একে অন্যের ঈর্ষায় ভরপুর। কিন্তু ঈর্ষার যে বস্তু সেটুকু অপরের শিক্ষা বা মানসিক সমৃদ্ধি নয়, সেটুকু শুধু অর্থের স্বাচ্ছন্দ্য।

ঋজুতার অভাব মহিলা-সমাজে আজ ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে। নিজ নিজ আর্থিক ও মানসিক সঙ্গতির

মধ্যে বাস করিবার ইচ্ছা প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে ; নিজে যাহা নয় তাহা দেখাইবার জন্তই সকলেই ব্যাকুল। মানসিক সমৃদ্ধির জন্ত আজ আর মহিলা-সমাজের আকাঙ্খা নাই, কেবলমাত্র বেশভূষা, আচার-ব্যবহারের পারিপাট্যে লোকের কাছে তাহাদের মূল্য যাচাই করিবার জন্তই তাহারা ব্যস্ত। যে শালীনতা ও কমনীয়তা নারীর ভূষণ, আর যাহা পুরুষের কাম্য, তাহার জন্ম হয় মানসিক সমৃদ্ধির মধ্যে। ঋজুতার অভাবে, ছলনার মধ্যে, নিরন্তর অন্তর্দ্বন্দ্বে সে মানসিক সৌন্দর্যের বিলোপ ঘটে। ঘটিতেছেও তাই। নিদারুণ চিত্তচাঞ্চল্য ও অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে বাংলার মহিলা-সমাজের শালীনতা ও সৌকুমার্য দিনে দিনে হ্রাস পাইতেছে। আচারে, ব্যবহারে বেশ-ভূষায় সেই ক্রমবর্দ্ধমান শ্রীহীনতার ছবি সমাজের প্রায় সর্বস্তরেই দেখা দিয়াছে। এই চাঞ্চল্যকে নারী সমাজের ব্যক্তিত্ববোধের পরিচয় বলিয়া ভুল করিলে চলিবে না। এ চঞ্চলতা, এ অস্থিরতা ব্যাধির লক্ষণ।

এই অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রধান কারণ, নিজের তাহা হইতে কেহ শান্তি ও স্বস্তি পাইবার চেষ্টা করে না ; অপরপক্ষে অন্যের যাহা আছে তাহা দেখিয়া অযথা নিজের বেদনাবোধকে জাগ্রত করে। নিজের অভাববোধ অপেক্ষা অপরের সমৃদ্ধি চিত্তদাহকে বেশী করিয়া সঞ্জীবিত রাখে। মহিলা-সমাজে নিজ নিজ ঐশ্বর্য প্রদর্শনের উৎকট প্রচেষ্টা ক্রমাগত বাড়িয়া যাইতেছে ; ফলে, এক স্তর হইতে অন্য স্তরে চিত্তদাহ সংক্রামিত হইতেছে। এমনকি, সন্তানকে সুসজ্জিত রাখিবার চেষ্টা যে একমাত্র বাৎসল্যেরই প্রেরণা এখন একথা মনে করিবার কারণ নাই ; ইহার মধ্যে ঐশ্বর্য প্রদর্শনের চেষ্টা উগ্র হইয়া দেখা দিয়াছে !

বাংলার সাধারণ মহিলা-সমাজের এই বিসংগত অবস্থার জন্ত মধ্যবিত্ত সংসারের মহিলারা বহুলাংশে দায়ী। তাহারাই মহিলা-সমাজের কর্ণধার। স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসার আবরণে তাঁহারাই সমগ্র জাতিকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই আদর্শে চিরদিন বাংলার মহিলা-সমাজ অনুপ্রাণিত হইয়াছে। আজ তাঁহাদের এ আত্মপ্রত্যয়ের অভাব কেন? যে অলস ও ক্ষীণমেধা নারী-গোষ্ঠীর সাচ্ছন্দ্য ও জীবন-দর্শনের কথা চিন্তা করিয়া তাঁহারা বিচলিত হইয়াছেন, তাঁহারা যে উৎকট মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত একথা কি একবারও চিন্তা করেন নাই ?

সত্য বটে, আমাদের আধুনিক রাষ্ট্রনেতার দল এই ব্যাধিগ্রস্ত সমাজকেই শ্রেষ্ঠতার আসন দান করিয়াছেন। কাজেই সমগ্র দেশই এই আদর্শকে নির্বিচারে গ্রহণ করিতে উন্মুখ। বাংলার সমাজ চিরদিনই একটু বিভিন্ন প্রকৃতির। আজ তাই সমগ্র মহিলা সমাজকে অবহিত হইতে হইবে। যে আদর্শে দেশ চলিয়াছে তাহাতে দেশের মনুষ্যত্ববোধ কোনোদিনই গড়িয়া উঠিতে পারিবে না। রাষ্ট্রনেতার দল এখনও দেশকে বিদেশীর দৃষ্টি-ভঙ্গিতেই দেখিতেছেন। যতদিন না তাঁহারা প্রকৃত ভারতীয় দৃষ্টিতে দেশের দিকে চাহিবেন, ততদিন এ ভ্রান্তি তাঁহাদের ঘুচিবে না।

বাংলার মহিলা-সমাজ চিরদিন ভারতের আদর্শ-স্থানীয়। বাঙালী জাতির চরিত্র গঠনে সে সমাজের দান অপরিসীম। জোয়ারের টানে সে সমাজের সহিত দেশের মাটির সম্পর্ক কিছু আলগা হইয়া পড়িয়াছে ; কাজেই রামায়ণ, মহাভারতের গল্প আর বাংলার মার মুখে ফোটে না। ছেলেরাও তাই দেশে থাকিয়াও দেশের সহিত কোনো সম্পর্ক না রাখিবার চেষ্টাই মকৃশ করিতেছে। বাংলার মহিলা-সমাজের যদি আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়া না আসে তবে স্বামী, পুত্র, কন্যার সঙ্গে তাহাদের সংঘাত ক্রমাগতই বাড়িতে থাকিবে। এ কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিবার সময় আসিয়াছে।

উদয় দিগন্তে রবি

অধ্যাপক শ্রীগোপাললাল দে

যে ঋষিকবি উত্তর জীবনে সমগ্র জগতের শ্রেষ্ঠ কবি, ভাবুক, দার্শনিক বলিয়া সমাদৃত হইয়াছিলেন, সর্ব্বকালের ঋষিকবিদের মধ্যে যাঁহার স্থান অবিসংবাদিতরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল—রবীন্দ্র-তত্ত্ববেত্তাদের মতে তাঁহার ভাববৈশিষ্ট্যের প্রায় সবগুলিই দেখা গিয়াছিল, তাঁহার 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুচ্ছে। 'মানসী'র কবিতাগুলি বৈশাখ, ১২৯৪ হইতে কার্ত্তিক, ১২৯৭-এর মধ্যে রচিত। রবীন্দ্র-প্রতিভা-বিকাশের এ একটা নূতন অধ্যায়। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মানসীকে রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার উন্মেষ বলিয়াছেন। কাজী আবদুল ওদুদ লিখিয়াছেন, 'মানসীতে কবি দক্ষস্রষ্টা হয়ে উঠেছেন···ভাবছন্দ প্রকাশ-ভঙ্গিমা সমস্তেরই উপর পর্য্যাপ্ত অধিকারের জন্য এই মানসীর সময় থেকে যত কবিতা তিনি লিখেছেন, তার প্রায় প্রত্যেকটিতেই কিছু না কিছু প্রশংসাযোগ্য আছে। জগতের অতি অল্প কবি সম্বন্ধেই এত বড় কথা বলা যেতে পারে।···তাঁর স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণ অনুভূতি সন্ধানপরতা আর প্রকাশ-ভঙ্গিমার গুণে সাধারণ লেখকের স্তরে তিনি প্রায় কখনো নেমে পড়েন নি।'

কবির বয়স তখন ছাব্বিশ সাতাশ।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে 'মানসীতে কবির প্রকাশসামর্থ্য সুনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাঁহার চিন্তাশক্তি সুপরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তিনি দেশের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ নিপুণতার সহিত ও মমতার সহিত আলোচনা করিয়াছেন; কবি আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়াছেন। এই সময় হইতে কবি তাঁহার রচনার তারিখ নির্দ্দেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।'

আজিকের দিক দিয়া একটা প্রকাণ্ড নূতনত্ব মানসীর ছন্দ। এত দিন পর্য্যন্ত কবি অন্যান্য বাঙালী কবিদের মত অক্ষর (বর্ণ) গণিয়া কবিতা রচনা করিতেছিলেন, এখন মানসীর কবিতায় কবি ছন্দের মাত্রা নির্ণয় করিয়া মাত্রানুসারী সিলেবল্ (ছন্দোবিজ্ঞানে Syllable অক্ষর,) গণিয়া ছন্দ রচনা আরম্ভ করিলেন। উচ্চারণের কাল পরিমাণকে বলে মাত্রা। 'একটি হ্রস্ব অক্ষর উচ্চারণ করিতে যে পরিমাণ সময় লাগে তাহাকে একমাত্রা বলে; এবং দীর্ঘ অক্ষরের উচ্চারণে দুই মাত্রা সময় লাগে ধরা হয়। কখনও কখনও তিন মাত্রার অক্ষরও পাওয়া যায়।' (শ্রীসুনীতি চট্টোপাধ্যায়)। কবি নিজেও লিখিয়াছেন, 'আমার রচনার এই পর্ব্বেই যুক্ত অক্ষরকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে ছন্দকে নূতন শক্তি দিতে পেরেছি। মানসীতেই ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল।' চারু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মানসীতে 'ইউরোপীয় ছন্দের অনুরূপ নানা ধরনের নব নব ছন্দ তিনি সৃষ্টি করিলেন।'

রবীন্দ্রনাথের সঙ্কেতিত পথে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার ফলে পরবর্ত্তীকালে বাংলা ছন্দের মূলসূত্র যে পর্ব্ব (Measure বা Bar) এবং পর্ব্বাঙ্গ (Beat) তাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ফলে এখন বাংলা ছন্দ, কেবল 'চক্ষু নহে কিন্তু কর্ণ নির্দ্ধারণ করে। সুনীতিবাবু বলেন, 'পর্ব্ব ও যতির উপরেই বাংলা ছন্দের বৈশিষ্ট্য, নির্ভর করে।' যতি (pause, breath pause, sense pause) সাধারণ বাক্যালাপে শ্বাস গ্রহণের জন্য বিরাম।

এ সকল গেল বহিরঙ্গের কথা, কিন্তু মানসীর অন্তরঙ্গ ভাব-জগতের কথা, অনুভূতি-কল্পনার কথা অনেক বেশী মূল্যবান। রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায় এই কালকে 'মানসীর যুগ' আখ্যা দিয়াছেন, এ যুগের রচনা 'রাজা ও রাণী', 'বিসর্জ্জন', 'মন্ত্রী-অভিষেক', 'মানসী।'

মানসী কাব্যে কবি যেন মানসলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। প্রভাত-সঙ্গীতে কবি অকস্মাৎ এক অপূর্ব্ব জীবনানন্দ অনুভব করিয়া যেন বহির্বিশ্বে প্রাতভ্রমণে বাহির হইলেন, জীবনের নবীন প্রভাতে যাহা দেখিলেন তাহাই 'ছবি', যাহা শুনিলেন তাহাই 'গান'। তখনকার কাব্যগ্রন্থ 'ছবি ও গান'। এতখানি আনন্দ-সংবেদনে কবির মনে গানের সুর বিশেষ ভাবে গুঞ্জরিয়া উঠিল, সুরের নানা তান ধরা পড়িয়াছে 'কড়ি ও কোমলে', গৃহে ফিরিয়া অবসরের মুহূর্ত্তে যেন মানসীতে মানসলোকে প্রয়াণ। নাম সূচী পর্য্যবেক্ষণ করিলেই ইহার সত্যতা প্রতীয়মান হয়। 'উপহার' কবিতায় কবি

বলিয়াছেন, 'আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে, তাহে ভালবাসা দিয়ে গড়ে তুলি মানসী প্রতিমা।'

চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মানস কবিতাগুলিকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করিয়াছেন—প্রেমের কবিতা, দেশ সম্বন্ধীয় কবিতা, প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা ও অমোঘ নিয়তির সম্বন্ধে কবিতা।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমে দেখা যায় বড় শঙ্কা, বড় সংশয়, একটু স্পর্শ করিয়াই ভীরু প্রেমিকের দূরে পলায়ন, তথ্য অপেক্ষা তত্ত্ব-চিন্তা অধিক, কবি চিরবিরহী; এতখানি ধরা-ছোঁয়ার জগতে কবি যেন ভুল করিয়া আসিয়াছেন, তিনি ত বলিয়াছেন, 'কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া এসেছি ভুলে'। 'চারিদিক হতে বাঁশী শোনা যায়, সুখে আছে যারা তারা গান গায়'; এমন পরিবেশে জনতার মাঝে নিঃসঙ্গ কবি ভাবেন :

'এমন করিয়া কেমনে কাটিবে
মাধবী রাতি।
দখিন বাতাসে কেহ নাই পাশে
সাথের সাথি।' (ভুলে)

পরের কবিতা 'ভুলভাঙা'; হায়, 'প্রণয় ক্ষীণবেগ হইয়া আসিয়াছে, এখন আর আগের মতন মাদকতা নাই'; তাই কবি বলেন,

বুঝেছি আমার নিশার স্বপন হয়েছে ভোর।
মালা ছিল, তার ফুলগুলি গেছে, রয়েছে ডোর।
হায়, ধরণীর প্রেম এত ভঙ্গুর!
'বাঁশি বেজেছিল, ধরা দিনু যেই থামিল বাঁশি।
এখন কেবল চরণে শিকল কঠিন ফাঁসি।'

কিন্তু তার অল্পকাল মধ্যেই কবি সুস্থ হ'ন, 'ক্ষণিক মিলনে' 'একদা এলো চুলে কোন ভুলে ভুলিয়া' যে কবির ভাঙা দ্বার খুলিয়া আসিয়াই তাঁহাকে আনমন উদাসীন বসাইয়া চলিয়া গেল, মিলনে যদি না হয় তবে তাহার বিরহেই কবি আনন্দ-সম্ভোগ করিবেন।

'বিরহে তারি নাম শুনিতাম পবনে,
তাহারি সাথে থাকা মেঘে ঢাকা ভবনে।
পাতার মরমর কলেবর হরষে,
তাহারি পদধ্বনি যেন গণি কাননে।' (বিরহানন্দ)

'বিচ্ছেদের শান্তি'তে কবি বলেন, মিলন-সৌভাগ্য যদি এতই ক্ষণিক, তবে

'সেই ভালো তবে তুমি যাও।
তবে আর কেন মিছে করুণ নয়নে
আমার মুখের পানে চাও।'

ভারতীয় আলঙ্কারিক লিখিয়াছেন,

'সঙ্গম বিরহ বিকল্পে বরমিহ বিরহো নতুসঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গমে সৈব একা, ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে।'

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ছাব্বিশ বৎসর বয়সী যুবক কবি এমনই ক্রান্তদর্শী হইলেন যে, মনেপ্রাণে অকপটে এই সত্যকে উপলব্ধি করিলেন। এই বিরহের ভাবটি মানসীর 'মরণ স্বপ্ন', 'কুহুধ্বনি', 'একাল ও সেকাল', 'বিচ্ছেদ' প্রভৃতি কবিতায় দেখা যায়।

ইহার পর হইতে চিরদিন দেখি কবির প্রেম সম্পর্কে, সম্ভোগ সম্পর্কে এই ভীরু, প্রেমী অথচ নিরাসক্ত ভাব। ভোগে কবি কোন দিনই সমস্ত কায়মনোবাক্য দিতে পারেন নাই। 'মানসী'তে ভারতীয় মহাকবির এই এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের প্রথম প্রকাশ। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিকই লিখিয়াছেন, মানসীর কতকগুলি প্রেমের কবিতায় যেমন মানবীয় চিত্ত-বৃত্তির সত্য চিত্র আছে, অন্য কোথাও তাঁহার কবিতায় এরূপ নাই। 'নারীর উক্তি', 'পুরুষের উক্তি', 'ব্যক্তপ্রেম' ও 'গুপ্তপ্রেম' এই শ্রেণীর কবিতা। ধরণীর প্রেমের ইতিহাসে সুখ অপেক্ষা দুঃখ, গড়া অপেক্ষা ভাঙা, হাসি ও উচ্ছ্বাস অপেক্ষা অশ্রু ও দীর্ঘশ্বাস কত অধিক! 'ব্যক্তপ্রেমে' প্রণয় পরিত্যক্তা হতভাগিনী প্রেমিকা বিশ্বাসহন্তা নিষ্ঠুর পুরুষের প্রেমহীন ভোগ-লিপ্সার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছে,

ভাঙিয়া দেখিলে ছি ছি নারীর হৃদয়।
লাজে ভয়ে থর থর ভালবাসা সকাতর
তার লুকাবার ঠাঁই কাড়িলে নিদয়।

প্রেমিকের শঠতার বিরুদ্ধে ইহা কবিরই প্রতিবাদ।

গুপ্তপ্রেমে রূপহীনার গোপনপ্রেমের ব্যর্থতার ব্যথাটি কী হৃদয়বিদারক ভাবেই না ধ্বনিত হইয়াছে কবির মর্ম্মবীণায়।

তবে, পরাণে ভালবাসা কেন বা দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে।
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া
পূজিব তারে গিয়া কি দিয়ে

বিধাতা ব্যতীত সংসারের কাহাকে আর এই গোপন ব্যথা জানাইবে? 'কবিরের প্রজাপতি'র কবি দ্বিতীয় বিধাতা, তাই মর্ম্মদর্শী বংশীবাদক কবির হৃদয়তন্ত্রীতে তাহাদের ব্যথা এমন করুণ অনুরণন তুলিয়াছে।

ছবি তো এখন আর কবির চক্ষে কেবল পটে লিখা ছবি নয়, তাহার অন্তরালে যে চিন্ময় সত্তার গভীর সুখ-দুঃখের তরঙ্গ-বিক্ষোভ, তাই তো গানের গভীরে কবির আনন্দ-বেদনাময় হৃৎপদ্মটি এমন আন্দোলিত হইয়া উঠে।

অন্তর্য্যামী কবিকে আবার দেখি 'বধূ' কবিতায়, অবরুদ্ধা বালিকা-বধূর ব্যথা বহনে। একান্ত সরলা কিশোরী পল্লী-বালিকা ঘটনাচক্রে মহানগরীতে বধূরূপে আসিয়াছে। এখানে সে আলো পায় না, আকাশ পায় না, পথে-প্রান্তরে সরসী তীরে বেড়াইতে পায় না; সম্বৃত বেশবাসে অবরোধে নিয়ম-নিগড়ে নিঃশ্বাস ফেলে; লোকে আসে; ঘোমটা তুলিয়া নিমীল-নয়নার মুখ দেখে, ইচ্ছামত টিপ্পনী মন্তব্য করে। হঠাৎ সৌভাগ্যের ছদ্মবেশে এ কি তাহার বিড়ম্বনা! জীবনে স্বাভাবিকতা নাই, পরিবেশে স্নেহ নাই, পাষাণ-কায়া রাজধানী 'বিরাট মুঠিতলে চাপিছে দৃঢ় বলে ব্যাকুলা বালিকাকে নাহিক মায়া'। ওরা 'দেবে না ভালবাসা দেবে না আলো,' তাই অবশেষে তাহার মনে হয়, 'আঁধার ছায়াময় দীঘির সেই জল শীতল কালো, তাহারি কোলে গিয়ে মরণ ভালো'।

একটি বিশেষ অবস্থায়, বিশেষ বয়সের বালিকা-বধূর এই সূক্ষ্ম সাময়িক বেদনাটির অনুভবে ও প্রকাশে ইতিপূর্ব্বে আর কোন বাঙ্গালী কবি এত সার্থক-প্রযত্ন দেখান নাই। 'বধূ' কবিতা পড়িতে পড়িতে সেকালে ঠাকুর-পরিবারে গ্রাম হইতে আনীত বালিকা-বধূগুলি যেন চোখের সামনে রূপ লাভ করে। ইন্দিরা দেবী তাঁহার 'পুরাতনী' পুস্তকে লিখিতেছেন যে,তাঁহার মাতাকে এমনি ভাবে অতি শৈশবে তাঁহার মাতার (অর্থাৎ লেখিকার দিদিমার) গঙ্গাস্নান উপলক্ষ্যে সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগে গ্রাম হইতে আনিয়া ঠাকুর-বাড়ীতে বধূরূপে প্রবেশ করান হইয়াছিল। মাতা-কন্যায় আর দেখা হইল না, মাতা কাঁদিয়া অন্ধ হইয়া গেলেন।

হায়, মানুষ ভ্রান্ত সংস্কারে নিজেদের কত দুঃখ-দুর্ভোগই না বৃদ্ধি করে! এই শোচনীয় সত্যটির প্রতি কবি এখন হইতে আরম্ভ করিয়া চিরজীবনই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। নারীজাতির প্রতি যে শ্রদ্ধা ও সহৃদয়তা মানসীর কবিতাগুলিতে প্রকাশ পাইয়াছে, কবি-জীবনে তাহা আরও কত উজ্জ্বল হইয়াছিল।

'কবি সুরদাসের প্রার্থনা' একটি আশ্চর্য্য ভাবময় কবিতা। জ্যৈষ্ঠ মাসে কবিতাটি লেখা। জ্যৈষ্ঠের প্রখর রৌদ্রে কবি উপলব্ধি করিয়াছেন যে, দিবালোক আমাদিগকে স্বল্প সীমায় স্পষ্ট দেখায় সত্য, কিন্তু সেই আলোক আমাদের দৃষ্টিকে বিশাল বহির্বিশ্বের অসীম ব্যাপ্তি হইতে এবং অন্তর্লোকের অতল গভীরতা হইতে প্রত্যাহৃত করে। অন্ধকারে যে মুহূর্ত্তে গৃহের প্রদীপ আমরা নিভাইয়া দিই সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত হয় অসীম আকাশের দূরতম নীহারিকাপুঞ্জে; আবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই তো মনের গহন-গভীরে প্রবেশ করিতে হয়।

ভক্তকবি সুরদাস লোলুপদৃষ্টিতে এক সুন্দরী নারীকে দেখিয়া অনুতপ্ত হইয়াছেন, ইন্দ্রিয়াতীতকে ইন্দ্রিয় সীমার বাহিরে তিনি উপলব্ধি করিতে চান তাই অদ্ভুত প্রার্থনা করিতেছেন সেই নারীরই কাছে। তিনি বলেন,

'আঁখি গেলে মোর সীমা চলে যাবে একাকী অসীম ভরা
আমারি আঁধারে মিলাবে গগন মিলাবে সকল ধরা।
আলোহীন সেই বিশাল হৃদয়ে আমার বিজন বাস,
প্রলয় আসন জুড়িয়া বসিয়া র'বো আমি বারো মাস।'

'অপেক্ষা' কবিতাতেও কবি লিখিয়াছেন,

'অন্ধকারে নিকট করে,
আলোতে করে দূর।
যেমন দুটি ব্যথিত প্রাণে
দুঃখ নিশি নিকটে টানে,
সুখের প্রাতে যাহারা রহে আপনা ভরপুর।'

আচার্য্য টমসন্ 'অপেক্ষা' কবিতার খুব প্রশংসা করিয়াছেন।

সীমাকে অতিক্রম করিয়া, অথবা সকল সীমাকে অধিগত করিয়া অসীমের সত্য স্বরূপকে উপলব্ধি করিয়া কবির বিশিষ্ট আকাঙ্ক্ষাটি এই ছাব্বিশ বৎসর বয়সেই পূর্ণরূপ লাভ করিয়াছে।

'ভৈরবী গানে' কবিতায় দেখি কবির সেই অন্তর্দ্বন্দ্বটি। কবির মনে 'অতৃপ্ত যত মহৎ বাসনা গোপন মর্ম্মদাহিনী'; তিনি বুঝিয়াছেন,

'এই সঙ্কটময় কর্ম্মজীবন
মনে হয় মরু সাহারা,
দূরে মায়াময় পুরে দিতেছে দৈত্য পাহারা।'

তাই একবার মনে হয়, 'তবে ফিরে যাওয়া ভালো
তাহাদের পাশে পথ চেয়ে আছে যাহারা।'

কিন্তু তাই কি হয়? মানবাত্মার কি পরাজয় ঘটিবে? তাই পরমুহূর্ত্তেই ক্লান্তকবি বলেন,

থামো, শুধু একবার ডাকি নাম তাঁর নবীন জীবন ভরিয়া।
যাবো, যাঁর বল পেয়ে সংসার পথ তরিয়া।
যত মানবের গুরু মহৎ জনের চরণ-চিহ্ন ধরিয়া।

আবার বলেন,

'যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ সুখ আছে সেই মরণে'।

মানবমনের একটি চিরন্তন আকুতি বিশেষ ক্ষণে, বিশেষ পাত্রকে মনের সেই শেষ কথাটি, চরম কথাটি বলিয়া ভারমুক্ত হওয়া; কবি সেই আকুতির সার্থক রূপকার; 'বর্ষার দিনে' কবিতায় কবির সেই আকুতিটি

জাগিয়েছে। ইন্দ্রিয়-অতীন্দ্রিয় অনুভব-কল্পনা, আবেগ-সংযমে মেশানো অপূর্ব্ব রসোত্তীর্ণ একটি কাব্যখণ্ড 'বর্ষার দিনে।' মানবিক সীমায় ইহা কত সত্য, কত সার্থক! কিন্তু ইহার দ্যোতনা মানবিক সীমায় শেষ হয় না, বাচ্যার্থকে অতিক্রম করিয়া ইহার রসধ্বনি অনন্তসুন্দরের অভিসারপথের সঙ্কেত দেয়।

কিন্তু এই অভিসারের হয়ত শেষ লক্ষ্য নাই; পথের প্রান্তে কি শেষ তৃপ্তি মিলিবে, না আবার আরম্ভ হইবে নূতন পথ-পরিক্রমা?

'ভালো করে' বলে যাও' কবিতায় কবি যে বলিতেছেন,

শেষে রজনীর অবসানে
অরুণ উদিলে ক্ষণেকের তরে চাবো দুঁহু দোঁহা পানে।
ধীরে ঘরে যাবো ফিরে দোঁহে দুই পথে জলভরা দু'নয়নে।

মিলনে 'মিলনানন্দ'কে পাওয়া গেল না, 'যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।'

মানব জীবনের এই চরম ট্র্যাজেডি কবি এখনই বুঝিয়াছেন, এই জ্ঞানে সুখ নাই কিন্তু আছে তত্ত্বোপলব্ধির আনন্দ। এই কবিতাটিকে আচার্য্য টমসন্ perfect love lyrics-এর মধ্যে অন্যতম বলিয়াছেন।

অনন্তকে, ভূমাকে স্পর্শ করিবার একটি আকুতি এবং তাহারই অভাবে একটি অনির্ব্বচনীয় বিরহব্যথা মানসীর কালেই কবির মনে একান্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

বৃহত্তের, অনন্তের আকাঙ্ক্ষা 'শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা',
'আবার কবে ধরণী হবে তরুণা
কাহার প্রেমে আসিবে নেমে স্বরগ হতে করুণা।'
অনন্ত প্রেমে' 'তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি শত রূপে শতবার
জনমে জনমে যুগে অনিবার।'

'আত্ম-সমর্পণ'
'ওই রূপরাশি আপনা বিকাশি
রয়েছে পূর্ণ গৌরবে ভাসি,
আমার ভিখারি প্রাণের বাসনা
হোথায় না পায় ঠাঁই।'

নিষ্ফল কামনায়' কি আছে বা তোর, কি পারিবি দিতে
আছে কি অনন্ত প্রেম।'

ইত্যাদি ভাব অসংখ্য কবিতাতে দেখিতে পাওয়া যায়; আবার সঙ্গে সঙ্গে একটি অনন্ত বিরহের ভাবও দেখা যায় এই সকল কবিতায় তথা, 'বিরহানন্দ', আকাঙ্ক্ষা', 'প্রকৃতির প্রতি', 'কুহুধ্বনি' 'শূন্যগৃহে', 'জীবন-মধ্যাহ্নে' ইত্যাদি কবিতায় দেখা যায়। 'মেঘদূত' কবিতায় কবি স্পষ্টই বলিতেছেন,

কবি, তব মন্ত্রে আজি মুক্ত হয়ে যায়
রুদ্ধ এই হৃদয়ের বন্ধনের ব্যথা।
লভিয়াছি বিরহের স্বর্গলোক যেথা
চিরনিশি যাপিতেছে বিরহিণী প্রিয়া,
অনন্ত সৌন্দর্য্য মাঝে একাকী জাগিয়া।

পুনশ্চ, ভাবিতেছি অর্দ্ধরাত্রি অনিদ্র নয়ান,
কে দিয়াছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান।
কেন ঊর্দ্ধে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ,
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ।

মানসীতে 'অহল্যার প্রতি' একটি দীর্ঘ কবিতা, একসঙ্গে রুচি ও দীপ্তি ভাবের কবিতার একটি অপূর্ব্ব নিদর্শন। মৃন্ময়ী পৃথিবীর সহিত যে একাত্মতার কথা কবি বহুবার ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাই বার বার অনুরণিত হইয়াছে, এই কবিতায়। দীর্ঘ-দিবানিশি অহল্যা পাষাণ-রূপে ধরাতলে মিশিয়া কাটাইল, বিস্মিত কবির তাই জিজ্ঞাসা,

দিবারাত্রি অহরহ
লক্ষ কোটি পরাণীর মিলন, কলহ,
আনন্দ বিষাদ ক্ষুব্ধ ক্রন্দন, গর্জ্জন,
অযুত পান্থের পদধ্বনি অনুক্ষণ
পশিত কি অভিশাপ নিদ্রা ভেদ করে
কর্ণে তোর—

কবি অস্পষ্ট অস্ফুট ভাবে এ সমস্ত অনুভূতি নিজ অন্তরে অনুভব করেন, তাই এই প্রশ্ন; তিনি এই অভিজ্ঞতাকে যেন স্পষ্ট করিয়া লইতে চান। জড় ও জীবের মধ্যে সাধারণ ভাবে বিরাজিত একটি আত্মীয় সম্পর্কময় বিশ্ব-চৈতন্য।

কবি অন্যত্র ইঙ্গিত দিয়াছেন। 'অহল্যা' রূপক; 'অহল্যা' অর্থাৎ কর্ষণের অযোগ্যা বা অকর্ষিতা, অনুর্ব্বরা ভূমি। রাম-পদস্পর্শে সঞ্জীবিতা অহল্যা রূপকের অর্থ— আর্য্যজাতির উপনিবেশ স্থাপনদ্বারা দক্ষিণাপথ মালভূমির শস্যপ্রসূ হওয়া, ততোধিক আর্য্য-সংস্কৃতির সংযোগে দ্রাবিড় জাতির চিত্তভূমির কর্ষণা (কৃষ্টি)। চিত্তের নব নব কর্ষণা; যেমন আজিকার চীনে, রাশিয়ায়.

পূর্ণস্ফুট পুষ্প যথা শ্যাম পত্রপুটে
শৈশবে যৌবনে মিশি উঠিয়াছে ফুটে
এক বৃন্তে।

তাইতো বহির্বিশ্বের সহিত ইহাদের 'চির-পরিচয় মাঝে নব পরিচয়।' মানসীর যুগে কবির জীবনে একটা অতি

স্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা সপরিবারে কবি-কল্পনা-প্রণোদিত গাজীপুর-প্রবাস। বসোরা-শিরাজের পুষ্পবন পারসীক কবিদের পীঠস্থান, ইটালীর সাগর-তীরের উদ্যান ইউরোপীয় কবিদের প্রিয়-নিকেতন, গাজীপুর তো গোলাপবাগের জন্য বিখ্যাত; আমাদের অদ্ভুত কবি তাই গাজীপুর-শিরাজে গমন করেন। কবি নিজেই বলিয়াছেন, 'বাল্যকাল থেকে পশ্চিম ভারত আমার কাছে রোম্যান্টিক কল্পনার বিষয় ছিল।......অনেকদিন ইচ্ছা করেছি এই পশ্চিম ভারতের কোন এক জায়গায় আশ্রয় নিয়ে ভারতবর্ষের বিরাট বিক্ষুব্ধ অতীত যুগের স্পর্শলাভ করব মনের মধ্যে। শুনেছিলাম গাজীপুরে আছে গোলাপের খেত। তারি মোহ আমাকে প্রবল ভাবে টেনেছিল।'

বহু কষ্টে, সুদীর্ঘ পথ বিবিধ যানবাহনে অতিক্রম করিয়া গাজীপুরে পৌঁছিয়া কিন্তু কবির স্বপ্নভঙ্গ হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় নাই। বয়স এখন সাতাশ, সেই বয়স সম্বন্ধে কবি তৎকালীন বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিয়াছেন, 'কিন্তু সাতাশ হওয়াই কি কম কথা! কুড়ির কোঠার মধ্যাহ্ন পেরিয়ে ত্রিশের অভিমুখে অগ্রসর হওয়া। ত্রিশ অর্থাৎ ঝুনো অবস্থা, অর্থাৎ যে অবস্থায় লোকে সহজেই রসের অপেক্ষা শস্যের প্রত্যাশা করে।...যাতে পাঁচজনের লভ্য হয় এমন বন্দোবস্ত করতে পারছি না।'

কবির হয়ত আশঙ্কা হইয়াছিল, তাঁহার জীবনে অধিক অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা ফুরাইয়া যাইতেছে। আমাদের সামান্য জীবনের কত 'সাতাশ' নষ্ট হইয়া যাইতেছে, ভাবিও না, দীর্ঘশ্বাসও ফেলি না। কবির জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া আজ মনে হয়, 'অহোবত মহাভাগ্যম্।'

গাজীপুরে এই বৎসর (১২৯৫) ২৩শে বৈশাখ পর্য্যন্ত কবি অনেকগুলি চমৎকার কবিতা লিখিয়াছিলেন, (১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ) 'শূন্য গৃহে', 'জীবন-মধ্যাহ্ন' 'শ্রান্তি', 'মানসিক-অভিসার', 'পত্রের-প্রত্যাশা' ইত্যাদি। ঐ-গুলিতে জীবনের গভীর বেদনা-প্রকাশের একটি ব্যাকুলতা আছে। 'মানসিক অভিসার' কবিতায় অস্ফুট ভাবে কবির জীবন-দেবতাকে দেখা যায়।

ইহার পর প্রায় পনের দিন কোন কবিতা না লিখিয়া জ্যৈষ্ঠের মধ্যভাগে কবি আবার এক অপূর্ব্ব মন্ময় (Lyric) কবিতাগুচ্ছ লিখেন, যথা 'বধূ', 'গুপ্তপ্রেম', 'ব্যক্তপ্রেম', 'অপেক্ষা', 'ভৈরবী গান' প্রভৃতি। প্রভাত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এগুলির সুর ও রূপ বৈশাখীগুচ্ছ হইতে বেশ তফাৎ।' এগুলিতে যেন কবি বর্ত্তমানের সীমাকে অতিক্রম করিয়া চিরন্তনের মধ্যে জীবনের প্রতিষ্ঠা চাহিয়াছেন। 'অপেক্ষা' কবিতাটির সম্বন্ধে আচার্য্য টম্‌সন্ লিখিয়াছেন, 'Of the quieter pictures none is more masterly' প্রভাত-মুখোপাধ্যায় বলেন, 'বাস্তব তার এমন অপরূপ কাব্য-আবরণ রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সুদক্ষ আর্টিষ্টের লেখনীরই উপযুক্ত।'

'সকাল বেলা কাটিয়া গেল, বিকাল নাহি যায়।
দিনের শেষে শ্রান্ত ছবি, কিছুতে যেতে চায় না রবি,
চাহিয়া থাকে ধরণী পানে, বিদায় নাহি চায়।
মেঘেতে দিন জড়ায়ে থাকে, মিলায়ে থাকে মাঠে
পড়িয়া থাকে তরুর শিরে, কাঁপিতে থাকে নদীর নীরে,
দাঁড়ায়ে থাকে দীর্ঘ ছায়া মেলিয়া ঘাটে বাটে।'

প্রেমিক দীর্ঘ জ্যৈষ্ঠ-দিবসের অবসান-প্রতীক্ষায় আছে, দিবাশেষে হইবে প্রণয়িণীর সহিত মিলন, 'অন্ধকারে নিকট করে, আলোতে করে দূর।' 'কিন্তু এত অপেক্ষার পর যখন দেখা হইবে তখন কি আর তাহার সহিত কথা বলিবার শক্তি থাকিবে? সুখের আকুলতায় কথা হারাইয়া যাইবে।' (র. র)

তখন, 'প্রলয় তলে দোঁহার মাঝে দোঁহার অবসান।'

'চিরন্তনের মধ্যে নিজের অনুভূতিকে প্রকাশ করাই কবির ধর্ম্ম।' রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ইহা বর্ণে বর্ণে সত্য।

দেশ ও জাতির অবস্থা, জাতির মানস সম্বন্ধে কবির বুদ্ধিদীপ্ত সচেতন লক্ষ্য মানসীর যুগে প্রথম দেখা যায় একথা অনেকেই বলিয়াছেন। 'দেশের উন্নতি', 'দুরন্ত আশা', 'গুরুগোবিন্দ' 'ধর্ম্মপ্রচার' প্রভৃতি এই শ্রেণীর কবিতা। 'দেশের উন্নতি'তে কবি বলিয়াছেন:

দূর হোক এ বিড়ম্বনা, বিদ্রূপের ভান,
সবারে চাহে বেদনা দিতে বেদনা ভরা প্রাণ।
আমার এই হৃদয় তলে, সরম তাপ সতত জ্বলে,
তাই তো চাহি হাসির ছলে, করিতে লাজ দান।

বুঝা গেল দেশের অবস্থা ও দেশের মানুষের অবনতিতে কবির গভীর মনোবেদনা হাস্যকৌতুক ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আকারে প্রকাশ পাইতেছে। দেশের উন্নতির জন্য কবি এখন তাই চাহেন:

জগতে যত মহৎ আছে, হইব নত সবার কাছে,
হৃদয় যেন প্রসাদ যাচে. তাঁদের দ্বারে দ্বারে।

মনকে বুঝান,

'ক্ষুদ্র কাজ ক্ষুদ্র নয়', একথা মনে জাগিয়া রয়,
বৃহৎ বলে না মনে হয় বৃহৎ কল্পনারে।
সবাই বড় হইলে তবে, স্বদেশ বড় হবে,
যে কাজে মোরা লাগাবো হাত সিদ্ধ হবে তবে।

জাতির কর্তব্য সম্বন্ধে,

'ঘরের কাজ রয়েছে' পড়ি, তাহাই যেন সমাধা করি,
'কী করি' বলে ভেবে না মরি সংশয়েতে দুলে।
কবির কাজ নীরব থেকে,
মরণ যবে লইবে ডেকে,
জীবনরাশি যাইব রেখে, ভবের উপকূল।

লক্ষ্য করিবার যোগ্য 'জীবন রাশি' এই শ্রেণীর মধ্যে 'দুরন্ত আশা' কবিতাটি সর্বাপেক্ষা ভাবোদ্দীপক ও উত্তেজক। জড়তা, আলস্য ও নৈষ্কর্ম্য পরিহারের, স্বার্থ-বিধি-সংকীর্ণ গণ্ডী ছেদনের, এবং বিশাল বিশ্বের স্বাধীন অধিবাসী হইবার এক দুর্বার আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হইয়াছে এই কবিতায়। মহত্তর বৃহত্তর জীবন লাভের জন্য দুঃখ বরণের আনন্দকে কবি বরণ করিয়াছেন। দুর্বার আবেগে কবির অন্তরে :

'উচ্ছ্বসিত রক্ত আসি, বক্ষতল ফেলিছে গ্রাসি'
প্রকাশহীন চিন্তারাশি করিছে হানাহানি।

তাই :

বিশ্ব মাঝে মহান যাহা, সঙ্গী পরাণের,
ঝঞ্ঝা মাঝে ধায় সে প্রাণ, সিন্ধু মাঝে লুটে'।

'গুরুগোবিন্দ' কবিতায় কবি প্রকৃত নেতৃত্বের রূপ, নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুতি নেতার জীবনাদর্শের সম্পর্কে তাঁহার ধারণা প্রকাশ করিয়াছেন। গুরুগোবিন্দ দীর্ঘদিন নিরালায় থাকিয়া দেশের জনসাধারণের সহিত অন্তরঙ্গ-ভাবে মিশিয়া নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন ; কবি এই কালে তাঁহার অন্য রচনায়ও এই ইঙ্গিত দিয়াছেন। তাঁহার 'গোরা' এমনি করিয়াছিল। গুরুগোবিন্দ সেই দিন আত্মপ্রকাশ করিবেন, কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া নেতৃত্বভার গ্রহণ করিবেন, যেদিন তিনি বলিতে পারিবেন, 'কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব—

'পেয়েছি আমার শেষ।' * * *
'আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগোরে সকল দেশ।'

ঋষিকবির এই ইঙ্গিত মহাত্মা গান্ধী, শ্রীঅরবিন্দ, নেতাজী সুভাষ প্রভৃতির জীবনে যেন রূপ লাভ করিয়াছে। গান্ধীজী তো নিজ হাতে লিখিয়া দিয়াছেন, নিজের বাণী, 'আমার জীবনই আমার বাণী।'

'গুরুগোবিন্দ' এবং 'নিষ্ফল উপহারে' কবি শিখগুরু-বর্গের উচ্চজীবনাদর্শ তথা পরম নিস্পৃহতাকে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন। 'নিষ্ফল উপহারে' গুরুর শিষ্য-প্রদত্ত স্বর্ণবলয়ের একখানি নদী-জলে পড়িয়া গেলে শিষ্য কাতর হইয়া সেটি কোন্‌খানে পড়িল জানিতে চাহিলেন, গুরুজী 'দ্বিতীয় বলয়খানি ছুঁড়ি দিয়া জলে

গুরু কহিলেন 'ওই আছে নদীতলে'।

'পরিত্যক্ত' নামে একটি কবিতা তৎকালীন দেশের ভাবুক-জগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সাক্ষ্য বহন করে।

বঙ্কিম, চন্দ্রনাথ বসু ইত্যাদি নেতা ইতিপূর্বে প্রগতি ও সংস্কারের নেতৃত্ব লইয়া নবীন-নবীনাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। এখন প্রগতির স্বরূপ দেখিয়া তাঁহারা ভীত হইয়া সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিতেছেন, তাই ক্ষুব্ধ কবি অনুযোগ করিতেছেন :

'বন্ধু, এ দীন হয়েছে বাহির, তোমাদেরি কথা শুনে',
ফলে,'একে একে সবে পর হয়ে যায়, ছিল যারা আপনার'

আর এখন বলিতেছ কিনা, 'বসে থাক বাপু,
ছিল যাহা ভালো।'

কিন্তু, হায়, 'বন্ধু, এ তব বিফল চেষ্টা,
আর কি ফিরিতেপারি।
শিখর গুহায় আর ফিরে যায়, নদীর প্রবল বারি ?

তাই কবির সঙ্কল্প, 'আপনার বলে চলিতে হইবে, আপনার পথ করে।'

'নিন্দুকের প্রতি নিবেদন' অনুরূপ একটি প্রত্যুত্তর কবিতা। কবির নূতন ধরনের কাব্য, নূতন ও সুগভীর ভাব দেশের অনেকে বুঝিতে না পারিয়া, অন্য অনেকে ঈর্ষ্যাকাতর হইয়া নিরন্তর তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়া চলিয়াছিল ; অতিশয় ভদ্র বিনীতভাবে কবি তাহাদিগকে বলিলেন :

'আমার এ লেখা কারো ভালো লাগে,
তাহা কি আমার দোষ ?'
তোমার 'ভালো নাহি লাগে ফেলে যাবে চলে,
কিসের ভাবনা তার ?'
তবে 'কেন হীন ঘৃণা, ক্ষুদ্র এ দ্বেষ,
বিদ্রূপ কেন ভাই।'

কবির বক্তব্য, 'প্রেমফুল ফোটে, ছোটো হ'ল বলে,
দিব না কি তাহা সবে ?'

'বঙ্গবীর' ও 'নবদম্পতির প্রেমালাপ' দুইটি উপভোগ্য ব্যঙ্গ-কবিতা,কিন্তু ইহাতেও আমাদের চারিত্রিক দুর্বলতা, সামাজিক অসামঞ্জস্যের প্রতি যথেষ্ট ইঙ্গিত আছে। দেশ-বাসীর মনে ইহার যথেষ্ট প্রভাব হইয়াছিল ও হইয়াছে।

'ধর্মপ্রচার' নামক একটি কবিতায় কবি দেশের লোকের পরধর্ম সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতাকে এবং ভীরুতাকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে খৃষ্টধর্ম প্রচারকের চরিত্র, মহত্ত্ব ও খ্রীষ্টাদর্শে তাঁহাদের নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন। কবির উদার গুণগ্রাহীতা প্রকাশ পাইয়াছে এইখানে ; বিরোধীর স্বার্থও যে কবির কাছে কত নিরাপদ তাহা

ভবিষ্যতে আমরা বার বার দেখিয়াছি। 'কবির প্রতি নিবেদনে' কবি জীবনোত্তাপ গ্রহণ করেন, গ্রহণ করেন পথের নির্দেশ :

'হোথা মানবের জয়, উঠিছে জগৎময়,
ওইখানে মিলিয়াছে নরনারায়ণ।
হেথা, কবি তোমারে কি সাজে,
ধূলি আর কলরোল মাঝে?'

বাঙ্গালার কবি একদা বিশ্বকবি হইবেন, তাহার ইঙ্গিত কি এখানে সুস্পষ্ট ভাবে নাই?'

মানসী পর্য্যায়ের আর এক গুচ্ছ চমৎকার মধুর (lyric) কবিতা, 'প্রকাশবেদনা' 'মায়া', 'বর্ষার দিনে', 'মেঘের খেলা', 'ধ্যান', 'পূর্ব্বকালে', 'অনন্ত প্রেম', 'আশঙ্কা', 'ভালো করে বলে যাও'। এইগুলিতেও অসীম বিরহ আর অনন্ত প্রেম পাশাপাশি বহিয়া চলিয়াছে।

'এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘনঘোর বরিষায়।'
(বর্ষার দিনে)

'ছায়ার মতন হৃদয় বেদন, ছায়ার লাগিয়া ফিরে।'
(মায়া)

'যেমন প্রাণপণ বাসনা, তেমনি বাধা তার সুকঠিন।'
(মেঘের খেলা)

সেই চিরপরিচিত অজানাকে কবি বলেন :

'তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি শতরূপে শতবার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।'

কবি স্বীকার করিয়া ধন্য, 'নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া
স্মরণ করি,
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া
বরণ করি;
তুমি আছ মোর জীবন মরণ
হরণ করি।'

কবির জীবন-দেবতাকে এবং ভূমার অধিষ্ঠাতা পরম দেবতাকে আমরা মুখোমুখি দেখিয়া ধন্য হইলাম। গূঢ়বাদী (mystic) কবির দৃষ্টি যে অবশেষে খুলিবে তাহারও প্রথম সংকেত এইখানে।

প্রধানতঃ 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি' ও 'সিন্ধুতরঙ্গ' কবিতায় কবি প্রকৃতির নিয়মানুগত্য অন্ধতা ও নিষ্ঠুরতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

'নিষ্ঠুর সৃষ্টি'তে কবি বলিয়াছেন :

মনে হয়, সৃষ্টি বুঝি বাঁধা নাই নিয়ম নিগড়ে,
আনাগোনা মেলামেশা সবি অন্ধ দৈবের ঘটনা।

অকস্মাৎ সৃজনের ভয়ানক বন্যা আসিয়াছে, আর
'মোরা শুধু খড়কুটো স্রোতমুখে চলিয়াছি ছুটি।'

'সিন্ধুতরঙ্গ' কবিতাটি একটি গুরুতর দুর্ঘটনা উপলক্ষ্যে লিখিত। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে (১২৯৪) স্যার জন লরেন্স নামক ষ্টীমার ৮০০ যাত্রী লইয়া রথযাত্রা উপলক্ষ্যে পুরী যায় এবং ফিরিবার পথে ঝড়ে পড়িয়া জলমগ্ন হয়। প্রায় সকলেই মারা যায়, মাত্র কয়েকজন বাঁচে। সংবাদ প্রকাশিত হইলে দেশবাসী স্তম্ভিত ও কবি শোকার্ত হন। তাঁহার উতলা চঞ্চল শোকার্ত হৃদয় প্রকাশিত হইয়াছে 'সিন্ধুতরঙ্গ' কবিতায়। ইহা যে ঝড়ের চমৎকার ভয়াল গম্ভীর চিত্র, সমুদ্রের ভীষণ মধুর রূপ এবং প্রকৃতির নিষ্ঠুর বলির খামখেয়ালি সার্থক রূপ পাইয়াছে। Dr. Thompson লিখিয়াছেন :

'This is the grandest sea-storm he ever did'....'There is wonderful sea music and imagery here, the very sweep and rush of the tempest. In the opening stanzas, the lines swell up and crash like waves, the black clouds and fierce winds are living things, blotting all hope and light'. (Rabindranath Tagore, Poet and Dramatist.)।

মানসীতে দুইখানি পত্র-কবিতা আছে, 'শ্রাবণেরপত্র' এবং 'পত্রের প্রত্যাশা'। অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগত আলাপের মাধ্যমে চমৎকার প্রকৃতি বর্ণনা এবং সাধারণ তত্ত্ব ইহাতে পরিবেশিত হওয়ায় সামান্য অসামান্যের মিলনে পত্র দুইটি একটি বিশেষ শ্রেণীর কাব্য হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে মানসীর অসংখ্য কবিতা পড়িতে পড়িতে মনে বিস্ময় জাগে ছাব্বিশ-সাতাশ বৎসরের কবির এত ছন্দ, এত ভাব, সে ভাবের এত বৈচিত্র্য, এত ব্যাপকতা, এত গভীরতা। মনে হয় আর কোন একখানি কাব্যগ্রন্থে কবির ভাবের এত বিভিন্নতা নাই যেমন আছে মানসী কাব্যে। 'মানসী' কাব্যগ্রন্থ যেন রবীন্দ্রমানসের 'সূত্রাকারে সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র।' তবুও পরবর্তী কালের অতি বিখ্যাত ও অতি উজ্জ্বল কাব্যগ্রন্থগুলির সহিত তুলনাতেও মানসীর কাব্য এত চমৎকার যে, বস্তুতঃ প্রথম কাব্য হইলেও পড়িতে পড়িতে মনে হয়—কবি রবির কাব্য, কাহাকে রাখিয়া কাহাকে দেখি। উদয় দিগন্তের রবিকে সেদিন যাঁহারা অভিবাদন জানাইয়াছিলেন তাঁহারা ধন্য।

তিন সাগর

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য

১০

যদি বাসে করে এই পথ পার না হতাম ইতালির সত্যিকার রূপ দেখা থেকে বঞ্চিত হতাম। তবু ভাবতে ছাড়তাম না, কি দেখাই দেখেছি! ইতালি দেখেছি! যেহেতু এই পথে অনবরত বিদেশী পর্যটক ঘোরাঘুরি করছে, পথ চমৎকার, সাজানোও তেমনি শাঁসালো। বেশীর ভাগই বিরাট বিরাট বাগান সংলগ্ন ভিলা; আর চলচলে ক্ষেত। ক্ষেতের পাশে পাশে নালা। নালায় জল। হাঁস ভাসে জলে। ছেলেরা জল ছোড়াছুড়ি করে। মাথায় রুমাল বেঁধে মেয়েরা কোমরে দু'হাত দিয়ে কাজ থামিয়ে বাস দেখে, বাসের যাত্রীদের দেখে।

এক একটা ছোটো ছোটো শহর আসে—ছবির মতো শহর, আলবানা, লাতিনা, গীয়েতা। আমাদের দেশে পথে চলতে চলতে হঠাৎ সাজানো খাবারজায়গা নেই যেখানে সাধারণ ভাবে বসে পয়সার পরিবর্তে কিছু সুস্বাদু ভোজ্য শাস্তশুদ্ধ পরিবেশে খাওয়া যায়। কন্যা-কুমারী থেকে ত্রিবাঙ্কুর যাবার মোটরপথে এমনি পান্থ-শালা দু'চারটে দেখে ও খেয়ে চরিতার্থতায় মন ভরে গিয়েছিলো। আমি তো সব ফেলে কমলা, কলা, আঙুর আর আপেল খেতে লাগলাম। দুধে মধু দিয়ে খেলাম।

নেপ্‌লসে পৌঁছতে আমাদের দেরি হয়ে গিয়েছে। আর একটুও দেরি নয়। ষ্টীমার ছাড়বে। কাপ্রিতে ঠিক সন্ধ্যার আগে পৌঁছলাম। বন্দরটি ছোটো। কিন্তু সব সাইজের ষ্টীমারে ভর্তি। বড়ো জাহাজ একখানাও নেই। সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেছে পাহাড়ের ধার। সমুদ্র থেকেই কাপ্রির সৌন্দর্য দেখে অবিশ্বাস হচ্ছিলো যে, মানুষ এখানে গেলে ফিরতে পারে। সে বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছিলো যখন নৌকায় করে ইতালিয়ান মাঝি নীল গ্রোত্তোর মধ্যে নিয়ে গেলো। পড়ন্ত রোদেও ভেতরের দেয়ালের নীল আর জলের নীলে মিশে সে যেন এক স্বপ্ন-পুরী। দলে দলে লোক আসছে। ভিড় ভালো লাগে না। মনে হয় তাইবেরিয়াস আর অগষ্টস্ এই জায়গায় কতো বিলাস করে গেছে। একটা নয়। এমনি পাহাড়ের গায়ে গায়ে কতো সব গুহা, সমুদ্রের জল গুহার মধ্যে অনেকটা জায়গা জুড়ে ঢুকে গেছে। পাহাড়ের ক্ষয়া-পাথর মাঝে মাঝে আইসিক্লিসের মতো ঝুলে আছে। বেশ লুকোচুরি খেলা যায়, যদি কাঁকড়ায় না কামড়ায়। তাইবেরিয়াসের বাথের কিছু কিছু ভাঙ্গা অংশ আছে। আর আছে চমৎকার একটা চার্চ।

হঠাৎ একটা ঝড় উঠলো।

আমরা তখন নৌকা নিয়ে পাড়ে এসে গেছি। পাহাড়ের গায়ে ধাপ কাটা। বরাবর সিঁড়ি উঠে গেছে। ওপরে সুদৃশ্য চার্চ। বিলাসিনীরা সমুদ্রের ধারে বড়ো বড়ো হোটেলের বাগানে বাইরে বসে খানা খাচ্ছিলেন। ঝড়ের বেগে সবাই ভেতরে দৌড়ুতে লাগলেন। বেশ একটা কৌতুক লেগেছে।

আমরা একটা গাড়ী করে মোটামুটি কাপ্রি শহরের মধ্যে ঘুরলাম। একটা হোটেলে খাবার কথা বলা ছিলো। 'মনিকো' হোটেল। খাওয়াটা এতোদিনের সব খাবারের মধ্যে আয়োজনে, উপাদানে ও স্বাদে শ্রেষ্ঠ। চমৎকার গান বাজনা চলছিলো। আর কিছু নয়, এখানে চিংড়ির ফ্রাই আর লেটুশের সালাদ না খেয়ে কেউ যেন না ফেরে।

খাবার পর আর ষ্টীমার ছাড়ার আগে আবার মোটরে করে পাহাড়ের ওপরে গেলাম। ভিসুবিয়সের চূড়া দেখা যায়। অস্পষ্ট একটা আভা বেরুচ্ছে, বলে আগুনের আভা।

খাওয়া ভালো হয়েছে, আর কথা কি!

ওরা আবার ট্যাক্সিতে চাপছে, আমি বলি ম্যাক্‌কে—"একটু ছেড়ে দাও না। পিয়াৎসা থেকে বন্দরে ঠিক পৌঁছে যাবো। দশটায় তো ছাড়বে ষ্টীমার। পাকা দেড় ঘণ্টা আছে। এক পাক বেড়িয়ে আসি পায়ে পায়ে।"

ম্যাক তাকায়, "ওস্তাদ ছেলে বটে। যদি আপত্তি না থাকে একজন মহিলা সঙ্গে নিয়ে চলো। জায়গাটা কাপ্রি। বিনা মহিলায় পথ চলার দায় আছে।"

ঝিরঝিরে বাতাস। পাহাড়ের পথের ধারে ধারে আলোর থাম। তবু পাইনের সিরসির শব্দ আর গুঁড়ো গুঁড়ো অন্ধকার ঝরে পড়ছে আশে পাশে। যতো ওপরে উঠি দূরে দূরে কালো সমুদ্রের বুকে দ্বীপের মালা দেখা যায়, নেপ্‌লসের আলো দেখা যায়। ঝড় নয় বটে;

হাওয়ার জোর আছে। সমুদ্রের শব্দও জোরালো। বিসুবিয়স দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। যা কিছু দেখছি, সবই আলোর সঙ্কেতে।

পথে পথে বেঞ্চি পাতা বেশ রমণীয় গোপনতার বুকে বুকে। মনে হয় রোমের সময় থেকে এই পথে কতো মন গড়াগড়ি খেয়েছে। রোম গেছে, রোম্যান গেছে। মন তো আজও আছে। তাই ওই সব বেঞ্চি পাতা। বৃন্দাবনে শ্যামের বাঁশী চিরকাল বাজছে। রাধার কাঁদা আজও থামে নি।

বৃন্দাবনে এলাম; বাঁশী কই? বাঁশী তো চিরকালের। সে বাজবেই।

খুব নীচে সামান্য একখানা বাড়ী। কোনো ধীবরের হবে। ভাবছি ধীবর; হবে হয়তো বা ফাটকা বাজারের পকেটমারের। কিন্তু চমৎকার ম্যাণ্ডোলিন; আর ম্যাক ইশারা করে বলছে, "নাচও চলছে হয়তো।"

বসেছি ম্যাকের পাশের বেঞ্চিতে। গল্প বলছি অগষ্টস আর তাইবেরিয়াসের। সেকালের কথায় ডুবে গেলে সময় যায় হু হু করে কেটে। ম্যাক বলে, "গ্রোটোগুলো বেশ। রোম্যানরা থাকতে জানতো।"

"রোম্যানরা গ্রোটোগুলোকে বেশ করে নি ম্যাক্? সে করেছেন তোমায় যিনি বেশ করেছেন। পাহাড়ী দ্বীপ। সমুদ্রের জলের দৌলতে নিখরচায় এমন সব মায়াকানন তৈরি হয়েছে। যদি দিন নিয়ে আসতাম সব ক'টা গ্রোটোতে ঘুরে তোমার সঙ্গে প্রেম প্রেম খেলা করতাম।"

"চলো না, অসময়ের প্রেমই খেলা যাক্।" ম্যাক বলে। সালফারের গ্যাসে ওই নীল গ্রোত্তোয় অসময়ের প্রেম বেশী জমবে না। গাইড না নিয়ে গ্রোত্তোয় গিয়ে অনেকে মরেছে। সেকালে অনেককে এখানে জোর করে এনে সাফ্ করে দেওয়া হতো। নীল গ্রোত্তোর খিদে অনেক।"

"গাইড নিয়ে প্রেম করতে হবে? গাইডেড প্রেম?" হাসি দু'জনে।

"হায় ম্যাক্—যদি দশ বছর আগে এসব কথা বলতে!" মেকী আর্তনাদ করি।

ম্যাকও পাল্টা জবাব দেয়। রাজী থাকলে তোমার আবার প্রেয়সীর অভাব হতো কাপ্রিতে? আমার মতো বুড়ীকে নিয়ে ঠাট্টা করা চলে, প্রেম চলে না।

সর্বনাশ! সিরিয়সলি নেয় যে। বলি, "ও বস্তু যে কখন কাকে নিয়ে হয় কে জানে?"

"বড়ো বাজে কথা বলো। তুমি কি বলতে চাও এই নির্জনে, রোম্যান্টিক পরিবেশে আমায় তোমায় মেয়ে মেয়ে বলে বোধ হচ্ছে? বাজে রোম্যান্টিসিজম্ করো কেন?"

হাসি, বলি,—"কিছুই মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে বিদিকিচ্ছি এক ঝুড়ি প্রশ্নের তলা ফাঁসা ধাষ্টামো। থামাও তো তোমার আমেরিকায়ানা। দেখো কাপ্রিতে রাত কেমন ফিসফিসিয়ে কথা বলে।"

"থামাও তো তোমার আরব্য উপন্যাস। চলো, ফেরা যাক্।"

ষ্টীমারের ডেকে বসে আছি। কাপ্রি দূরে সরে যাচ্ছে। ঝলমল্ করছে নেপল্‌স। তার গা দিয়ে সপ্তমী কি ষষ্ঠীর চাঁদ উঠছে একদিক হেলে। নেপলসে পাবো সেই বাস। গিয়েই রোমযাত্রা।

বাসে চড়তে চড়তে ম্যাক হাত চেপে বলে, "আর কিছু নয়; দেশে গিয়ে বলা চলবে কাপ্রিতে গিয়েছিলাম।"

"কাপ্রিতে শুনেছি যাওয়া সোজা, ফেরা সোজা নয়। কঠিন কাজটাই তো আমরা করেছি।"

আরও কঠিন কাজ পরদিন সকালে ন'টায় রোম ছাড়া। রোম আমার ভালো লেগেছিলো। রোমে প্রতিটি মিনিট মন যেন আবেগে বিবশ হয়েছিলো। তা ছাড়া ইতালিয়ন জাতটা যেন অনেক ব্যাপারে ভারতীয়, ওদের দৃষ্টির মধ্যে নীলের চেয়ে কালো বেশী, হৃদয়ের মধ্যে শাদার চেয়ে সবুজ বেশী; আর ব্যবহারে, কায়দা-কানুনে, কেতায়, নীলের চেয়ে লাল বেশী। ইতালিয়নরা কম্যুনিজম না চেয়েও কম্যুনিষ্ট; হিন্দু না হয়েও মূর্তি উপাসক; ব্রিটিশ শাসিত না হয়েও ভিখিরী। ওদের দেশ দেখি নি। কেবল রোম দেখেছি। কলকাতা দেখে বাংলাদেশের কথা লিখছি কিনা জানি না। একটা অস্পষ্ট ধারণা রোমে এসে স্পষ্ট হয়েছিলো। ভাবতাম ইতালিয়ান মেয়েরা বুঝি কেবলই ছবির মডেল হতে ওস্তাদনী। কিন্তু দেখলাম চোখে, ওরা কি কাজই করে। এমন কি পথে কাগজ কুড়িয়ে, ডাষ্টবিন ঘেঁটে বস্তায় মহামূল্য নোংরা ভরতে দেখেছি; সব্জী বাজারের ব্যবসায়ে একচেটিয়া প্রভুত্ব করতে দেখেছি; মাল ওঠানো নামানো করতে দেখেছি; বড় বড় কাকে চালাতে দেখেছি, মজবুতির সঙ্গে। যুদ্ধের পর ওদের জীবনও পাল্টেছে, আর রোমের প্রান্তে যখন বাস নিয়ে যাচ্ছে, এরোড্রোমে, নতুন আমেরিকান ধাঁচা রোমের গড়নও দেখতে পাচ্ছি। ভাবছি দিল্লী দু'টা, রোম পাঁচটা,—

কিন্তু মানুষের বেঁচে থাকার তৃষ্ণার কাছে ঐ পাঁচ আর ছয় কতো ক্ষণভঙ্গুর।

যেতে হবে জেনেভা।

বন্ধু আছে; ছাত্র আছে।

সেন্ট্রাল ষ্টেশনেরই একটা অংশে এয়ার অফিস-গুলোর কাউণ্টার সারি সারি। বি. ও. এ. সি.-র কাউণ্টারে আসতেই ওরা যথারীতি খাতির করলো। এখানে স্যুটকেশটা ছাড়াও সশরীরে আমাকেই ওজন করতে লেগে গেলো। ইতালিয়ন মেয়ে। মুচকী মুচকী হাসে, যেন মনে হয় এবারে কেড়ে নেবে টিকিটখানা।

"ওজন বেশী"। আবার হাসি।

"বলো, কি ফেলে যাবো? যা বলবে তাই ফেলে যেতে পারি।"

একটি যুবক এগিয়ে এলো।

মেয়েটি বলেন,—"ওজন বেশী।"

যুবক বলেন, "তা দেখছি। কোথাকার টিকিট?"

"জর্জ্জটাউনের। বিটিশ গায়ানার।"

"টুরিষ্ট?"

"ক্লাসটা তাই, তবে পেশাটা আরও স্থূল। মাষ্টারি।"

"মাষ্টারি? তবে ও তো জ্ঞানের ওজন। কমাতে গেলে বেড়ে যাবে। দরকার নেই। চলে যান্।"

সুন্দর সকালটায় ঝকঝকে হাসি ভরে গেলো।

ঘোরাফেরা করছে আমাদের পরেশ স্যাকরার ছেলে। কাশীর পরেশ স্যাকরা। কেবল দামী গ্রের স্যুটের ওপর সবুজ টাই বেঁধেছে। হাতে মনোরম একটা ব্যাগ। ঘোরাফেরা করছে। চেয়ে চেয়ে দেখছে কথা কইছে না।

পরেশ স্যাকরার ছেলে মিস্ত হলে কথা বলতো। কিন্তু মিস্ত চেহারার অনেককে পরে গায়ানায় দেখেছি।

এগিয়ে যাই। বলি—"ভারতীয়?"

বলেন—হ্যাঁ; তবে আশী বছর আগে। আপাততঃ বাড়ী কুবায়। কাজ করি ষ্টাণ্ডার্ড ওয়েলে। কাজ করতাম মালটায়। বদলি হয়ে চলেছি মিয়ামী। লণ্ডনে দুই মেয়ে পড়ে। স্ত্রীও সেখানে। যাচ্ছি লণ্ডনে।"

ইংলণ্ড স্পেন ফ্রান্সের উপনিবেশে জিইয়ে রাখা ইতিহাসের শিলালিপির প্রথম স্বাক্ষর দেখলাম মিষ্টার রামসহায় রাজারাম। পরে গায়ানায় এই সব পরেশ মাষ্টারদের ছেলে রাজারামদের অনেক দেখার সুযোগ হয়েছিলো।

টয়লেটে গিয়ে একটু ঝরঝরে হয়ে আসতে গেলাম। চমৎকার ব্যবস্থা। আর পরিচর্যা করছেন এক বৃদ্ধা মহিলা। সামনে এপ্রন্ আঁটা। মাংস, চামড়া প্রচুর এবং ঝুলে পড়েছে। হাতে ধরা ডাণ্ডার মাথায় ঝাড়ুর বুরুশ। ইতালিয়নে আমায় কি বললো যেন।

রান্নাঘর পরিষ্কার করার মতো সমস্ত জায়গাটা তক্-তকে করে রেখেছে।

পয়সা দিলাম। নিলো।

হঠাৎ অনাস্বাদিত, অসম্ভব জায়গায় মেয়েদের দেখতে পাবার বিস্ময়ই য়োরোপে আমার প্রথম বিস্ময়। বইয়ে পড়া এক, চোখে দেখার স্বাদ স্বতন্ত্র। আবার পরিস্থিতি ও পরিবেশ মানিয়ে বিস্ময় কাটিয়ে ওঠার বাস্তব দায়টাকেও তো অগ্রাহ্য করা যায় না।

ঐ বৃদ্ধার ভারতীয় সংস্করণ ঐ টয়লেটের ভারতীয় সংস্করণের মতোই দীন, নোংরা আর অবহেলিত। নোংরাকে অবহেলা করার ফলে নোংরা আর নোংরামি দুটোই যে আমাদের ঘাড়েগর্দানে ঠেসে ধরেছে। য়োরোপে বার বার মনে হয়েছে জাত-বিচারটা এদের সমাজদেহে সূক্ষ্মরূপে সেঁদিয়ে থাকলেও মানুষকে জানা-চেনা আর মানুষের ভবিতব্যকে জাঁকিয়ে তোলার অন্তরায় তা হয় না। ভারতের জাত একদিকে যেমন মিথ্যা অহঙ্কারে দর্পে শোষণ করে, অন্যদিকে তেমনি মিথ্যা দীনতায়, দুর্ভিক্ষে, মূর্খতায়, সংস্কারে পেষণ করে।

ঘণ্টা বেজে উঠলো। সময় হয়েছে যাবার। লাল টকটকে বাস এসে দাঁড়িয়েছে।

বাসে করে এয়ারোড্রোম। সুইস্ প্লেনে জেনেভা চললাম।

কিন্তু প্লেন এমন অদ্ভুত পথ নিলো কেন? দেখালো একটা দ্বীপ। বললে কর্সিকা। নেপোলিয়নের জন্মভূমি। তখন কর্সিকা ফ্রান্সের অধিকারে তাই নেপোলিয়ন ফ্রেঞ্চ। জাতীয়তা বোধটা কেমন যেন একটা অসহায় আবিষ্কার; শত শত যুদ্ধের কারণ। অথচ এই দুর্দান্ত লোকটা আন্তর্জাতীয়তাকেই চেয়েছিলো। দেব গড়তে কেমন করে যে বাঁদর হয়ে যায় কে বলবে।

কিন্তু কর্সিকা হোক আর নাই হোক নীলের মধ্যে অমন এক খাব্‌লা সবুজ দেখলে কার আর মন কেমন না করে। আমার অমন হ্যাংলা মুখো চাওয়া দেখে অনেক হুঁকোমুখো—হুঁকোমুখীদের গালে চোখে রংয়ের খেলা চলতে লাগলো।

কেতার দুরুস্তি বজায় রাখতে গিয়ে আসল সওগাতে ফাঁকী পড়ে গেলাম আর কি? কলা কেয়ার করি তোদের অমন ড্যাব ড্যাবে চাওয়ার। হতিস্ আমেরিকান বুঝতিস্ চপর চপর করে চোখের চর্বন কাকে বলে? ম্যাক্ কাঁদে নি বটে এয়ার টার্মিনাসে। কিন্তু চেয়েছিল

"ফাইন!" অমনি করে চেয়েছে হয়ত জীবনে বাহাত্তর দফা; এবং চাইবেও আরও তিন কুড়ি দফা! তা হোক গে! দু' এক মিনিটের জন্যে ও আমার যাওয়াটাকে একটা দাম ত দিয়েছিলো। "সেই ভালো সেই ভালো—না বলা বাণীর নিয়ে আকুলতা আমার বীণাটা বাজানো।"

সোজা এগিয়ে গেলাম এঞ্জিন রুমের দিকে—অর্থাৎ যে ধারে ককৃফিট। মাঝে একটা জায়গায় জাল দিয়ে ঘিরে রেখেছে কিছু মালপত্তর। তার পাশ দিয়ে দিব্যি দেখতে লাগলাম। এয়ার হষ্টেস এসে নিষেধ করার চেষ্টা করতেই এয়সা এক "শিশির-অহীন্দ্র ছবি-কোলম্যানের" প্যাঁচ ঝাড়লাম কুৎকুতে চোখে, ফরাসী পটিয়সী বুঝে গেলেন এ ছেলের পরকালে নিরেট বলে কিছু নেই। ফাঁড়া কেটে গেলো।

কর্সিকা-এলবা ছাড়াও আরও দু' চারটে দ্বীপ গেলো। নীল জল। ডান ধারে বড় একটা শহর সমুদ্রের ধারে। লেগহর্ণ। জেনোয়ার ঠিক ওপর দিয়ে প্লেন যেতে লাগলো। জেনোয়া—১৫০৬ খ্রীষ্টাব্দে এই শহরের এক সুসন্তান মাদ্রিদের পথে পথে ভিখারীর মত ঘুরেছেন লোকের উপহসনীয় পাগল, অত্যাচারী পাগল, অত্যাচারী কাপ্তেন। তারুণ্যেই বুকের ভিতর সেই জ্বালা অনুভব করেছেন যার শিখা পুড়িয়ে দেয় ঘর সংসার জীবন। সেই জ্বালায় পাগল হয়ে বার বার সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। জগতকে উপহার দিয়েছেন নতুন জগৎ। কিন্তু মৃত্যুর সময়ে নিদারুণ দারিদ্র্য ও তার চেয়েও কষ্টকর অবহেলায় মারা গেছেন। জেনোয়া শুনলেই কলম্বাসকে মনে পড়ে।

যাচ্ছি প্লেনে। বোধ হয় মাটির স্পর্শ পাচ্ছি না। শক্ত কিছুর অনুভূতি নেই বলেই এই সামান্যতেই এমন সব ভাসা ভাসা চিন্তার টুকরো মনকে আচ্ছন্ন করছে। এর পরে সেই যে আরম্ভ হ'ল পাহাড়ী দেশ, তার আর শেষ নেই।

আলপস্ এসে গেলো। চার ধারে বরফ ঢাকা পাহাড়ী মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। দেখতে দেখতে এসে গেলো বাঁ ধারে ম ভিসো—যার পাশে তুরিন, আলপস্ থেকে নেমেই সমতলের প্রথম শহর; তুরিন থেকে প্লেনের উত্তর গতি বদলে একটু পূর্বে চললো। পথে গ্রেইয়ান আলপস্, ম সেনী পড়বে; প্লেন যাত্রার পক্ষে আপেক্ষিক বিপজ্জনক পথ। ডোরা বলতিয়া ছোট নদী, পো নদীতে মিশেছে। এই ডোরা বলতিয়ার অববাহিকা ধরে প্লেন চললো উত্তর পশ্চিম দিকে। চমৎকার ছোট্টো একটা শহর তলায়; ইভরিয়া। ছোট্টো শহর। রোম্যান সময় থেকে তাঁতের কাজের জন্য বিখ্যাত। আজও এরা সিল্ক, তুলো সব রকমের কাপড় তৈরি করে। এর পরে এমনি আরও একটি শহর এলো—এওস্তা—এখনও লৌহ শিল্পের জন্য নামডাক; আলপসের মধ্যে আগাগোড়া এমনি ছোট ছোট শহর। প্রতি শহরের জীবনে বিশিষ্ট কোনও শিল্প প্রাচীন ঐতিহ্যের মত নিবিড় হয়ে আছে। তাই সারা দেশে দারিদ্র্য নেই; অসম্পূর্ণতা নেই; বেশ সঙ্গতি আছে ও সঙ্গত জীবন যাপন করে।

হঠাৎ প্লেনের কণ্ঠ ডাক ছাড়লো ম ব্লাঁ। য়োরোপের সর্বোচ্চ পর্বত শিখর। ১৫,৭৮২ ফুট। মনে পড়লো ১৫,৭৮২ ফুটের ওপর প্রায় আধাদিন কাটিয়েছি অমরনাথের পথে। অমরনাথ ১৭০০০ ফুট পার করে যেতে হয়। এমনি বরফে ঢাকা ছিলো সারা পথ। য়োরোপ, তাই বরফ পাওয়া যাচ্ছে দশ হাজারের পর থেকেই। এত আলো আর রোদ যে প্লেনের ভিতরটা চক্‌চক্ করছে বরফ থেকে রোদ ঠিকরে পড়ে। যাদের কাছে ভালো ক্যামরা ছিলো তারা ফোটো নিচ্ছে। আমার ক্যামেরা প্লেনের ভিতর থেকে ছবি নেবার মত নয়। কিন্তু এ কি! কখনও ম ব্লাঁ ডাইনে, কখনও বাঁয়ে। প্লেনের গলায় শ্লেষ্মা জড়িত বাণী—"আমরা কুড়ি মিনিট এগিয়ে আছি। জেনেভায় ঠিক সময়ে নামতে হবে। তাই ম ব্লাঁ ঘুরিয়ে দেখানো হচ্ছে।" পাহাড়ী চূড়ার অলিগলি—প্রাতর্ভ্রমণের পক্ষে বেশ শান্তশিষ্ট জায়গা নয়। ও জায়গার নাম যদিও চাণক্যের "শৃঙ্গীনাঞ্চ নদীনাঞ্চ" মধ্যে ধরা নেই; বা তাঁর "হস্তী হস্ত সহস্রেণ"র মধ্যেও নেই তবুও আলপসের এ অঞ্চলটা হাওয়া খাবার পক্ষে যে পরিত্যাজ্য এ সংবাদ জানা ছিলো। মনে ভয় যদি মুখ ব্যাজার করে বসে থাকে তখন কি আর দেখাশুনার মৌজ থাকে?

তবু এমনি মজা, চেয়ে চেয়ে দেখি ম ব্লাঁ। সমস্ত বরফ আর বরফ। মাঝে মাঝে এক একটা চাবড়া খসে পড়ছে। বাতাসে ধোঁয়ার মতো জমাট নিঃশ্বাস; পৃথিবীর নিঃশ্বাস, শীতকালে আমাদের নিঃশ্বাসের যে দশা। নানা রং বরফে; তবু যেন গাঢ় বেগুনী আর হাল্কা গোলাপীই বেশী।

এর পর থেকেই প্লেন নামতে লাগলো। আর সত্যি যেন টুকরো টুকরো সবুজ ছবি দেখতে লাগলাম। কার্পেটের মতো বিছিয়ে রাখা গাঁয়ের পর গাঁ। সুইসরা কর্মঠ জাত, সুইজারল্যাণ্ড সুন্দর দেশ। সবই সোনা

কথা। দেখার মধ্যে ছিলো কাশ্মীর। কাশ্মীর যে এতো সমৃদ্ধ, এতো সাজানো, এতো নির্মল নয় তা এই আকাশ থেকেই বলতে পারি।

বিশাল জেনেভা লেকের মাঝে থেকে একটা ফোয়ারা উঠছে। তার চক্‌চকে শিখা প্লেন থেকে দেখা যায়, যেন ফেনার একটা অদ্ভুত দর্প। প্রথমেই সেটা চোখে পড়ে।

দেখতে দেখতে প্লেন নামলো জেনেভায়।

নামতেই দেখি জ্যাকি হাত নাড়ছে।

"তার করেছিলে রোম থেকে—কাল আসবে—একদিন দেরী হোলো, কেন?"

"তুমি তার পেলে কি করে?"

"প্লেন আফিস থেকে। কিন্তু দেরী কেন?"

কাশ্মীর কথা বলি।

১১

"বলো কি! কাশ্মীর ঘুরে এলে? কি করে? কি করে হোলো?"

জ্যাকি সঙ্গে আমার ছোটো ভায়ের মতো। ভারতবর্ষে এসেই আগে আমার কাছে কিছুদিন থেকে যায়। জেনেভা কাছে ওদের মস্ত ব্যবসা এদের। বাপের এক ছেলে; একই সন্তান।

আমি য়োরোপে আসছি। ওর ভারি আনন্দ।

ওরা তুললো সুন্দর একখানা বাড়ীতে। হ্রদের ওপরেই প্রায়। ভদ্রলোকের নাম ফ্রাঁসিস রেনে। এক ছেলে সৈন্য-বিভাগে কাজ করে। এক ছেলে ব্যবসা করে। নিজে এখন রিটায়ার্ড। স্ত্রী দেখতে এককালে যে খুব সুন্দরী ছিলেন বোঝা যায়। এখনও লম্বা, শক্ত, চেহারার লাবণ্য কমে নি। যে ছেলে সৈন্য-বিভাগে, তার স্ত্রী এখন বাড়ীতেই আছে, ছেলের বদলি সবে হয়েছে। সেখানে যাবার আগে লুনা কিছুদিন মঁসিয়ে রেনের কাছে থেকে যাবে। লুনাই দরজা খুলে আমায় কেবল হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করলো। কারণ ভাষা আমরা কেউ কারুর জানি না।

মাদাম-রেনে-সীনিয়র চমৎকার মহিলা। কয়েক মিনিটের মধ্যে আমায় একেবারে ঘরোয়া করে নিলেন। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে বললেন, "জ্যাকি আমার ছেলের মতো। ওর বাবা আমার ছেলেবেলার বন্ধু। ওর মা আমার সঙ্গে এক স্কুলে পড়েছে। জ্যাকিতে আর আমার ছেলেদের মধ্যে কোনও প্রভেদই নেই। তোমাদের গল্প এতো শুনেছি, এতো সহৃদয় আতিথেয়তার কথা শুনেছি…"

বাধা দিয়ে বলি, "যদি না শুনতেন তা হলে যা করতেন তাই করুন। নিতে দিন কিছু। ধার শোধ করাতে আসি নি।"

য়োরোপে আসার আগে ভেবেছিলাম 'বিদেশে যাচ্ছি, "সায়েবের দেশে" যাচ্ছি! না জানি সে দেশ কেমন হবে। লোকগুলোই বা কেমন হবে।' পাছে কেউ আনাড়ি গাড়োল বলে সে জন্য কতো আয়োজন; কতো খিদমৎ! সুট করানোরে, টাই পছন্দরে; নানা রকম কামিজের কলারের পালিশ পরখ করা রে; খানা-টেবিলের খানাদানী খবরদারি রে। যেন সায়েবরা আমায় জেন্ৎ-সায়েব বলে না মনে করলেই গেছি।

অথচ খোদ য়োরোপে এসে দেখি সহজ হয়ে থাকার মতো আনন্দ নিজেরও কিছু নেই; ওদেরও কিছু নেই। রোমের মুজিয়াম আর প্রাচীন ইমারত ছাড়াও জীবন্ত রোমের ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, হোটেল, ষ্টেশন, খবরের কাগজের দোকানের ভিড়, চুলকাটি-সেলুনের গল্প, কাফেতে জলচুনী, অন্ধকারের ছায়ায় ফোয়ারার তীরে আড্ডা—সবই যেন কেমন চেনা, সহজ আর অত্যন্ত অমায়িক বলে বোধ হোলো। আমি তো আমার কালো চোগা পরেই ছিলাম। কুকুরও কেউ লেলিয়ে দেয় নি, ঢিলও কেউ মারে নি, চায়ের টেবিলে, মাঝে কফির আড্ডাতে গল্প জমাতেও কেউ ছাড়ে নি। বড় ভালো লাগলো দেখে যে, মানুষেরা সর্বত্রই মানুষের মতোই, আর কি ব্যবহারে এবং কি অসদ্ব্যবহারে এক মানুষেরই রুচি আর প্রকৃতি।

দেশে দেশে মানুষের মানুষিয়ানা দেখে কেবল মনে হয়েছে বিলাত-ফেরৎ দেশের "টাঁশ"গুলোর কদর বাড়িয়ে য়োরোপের কদর আমরা কতো কমিয়েছি। ইটালিয়ান, জর্মান, সুইস্‌কে সন্তুষ্ট করা যতো সহজ, আমাদের দেশীয় সায়েব-মেমদের সন্তুষ্ট করা ততো সহজ নয়। সায়েবরা যদি সায়েবী শিখতে চায় তো আমাদের দেশে এসে বিলেত-দা আর বিলেত-দি'দের কাছে শিখতে পারে। দেখলাম যা তাতে সায়েবরাই সায়েবিয়ানা জানে না!

ঐতো রেনেদের বাড়ীতে প্রথমেই লাঞ্চ খেলাম। কেমন সাদাসিধে। জ্যাকির মা এসে গেলেন। অমন মোটা লোক সহজে চোখে পড়ে না। কেউ হলেই মোটা লোক জ্যাকির মা'র কাছে কিছু নয়। কিন্তু ঐ স্তূপ স্তূপ মেদের মধ্যেও ছোট্ট একখানি মুখে চকচক করছে খুশী-জলন্ত এক জোড়া গোয়েন্দার মতো চোখ। আর কালো কুচকুচে চুলটা পাৎলা বেণী বেঁধে কুমারী মেয়ের মতো বেড়াবিনুনী করায় আরো ছোটো দেখাচ্ছিলো চেহারা। একটুও ইংরেজী জানেন না। কিন্তু হাত ধরে সেই যে

বসলেন, আর হাত ছাড়েন অনেকক্ষণ। ওঁর ছেলের প্রবাস-বাস আমার জন্ম খুশীতে ভরেছিলো, এই কৃতজ্ঞতায় ওঁর মাতৃহৃদয় ছলো ছলো।

টেবিলে অবশ্য কাঁটা, ছুরি, চামচ ছিলো। কিন্তু দফায় দফায় কাঁটা-ছুরি-চামচের যে সব ফিরিস্তি দেশী সায়েবরা দিয়ে থাকেন, সে সবের কোনো বালাই নেই। টেবিলে মোটামুটি খাবার ঢাকা আছে। সুপ দিয়ে শুরু করার আগে ওরা মা-ছেলে একটু 'ড্রিঙ্ক' করলো; আমাকে একটু ফলের রস দিলো। সুপ আর চিংড়ি দেওয়া ভাত এক ই চামচে খেলাম। জ্যাকির মা রাঁধতে জানেন ভালো। সুইজারল্যাণ্ডে দাল হয়। জ্যাকি বলেছিলো বলে দালও করেছিলেন। মাছের ফ্রাই, আলুভাজা। আর সুইজারল্যাণ্ডের মাখন। বামুনের ছেলের আর কি চাই ?

কথা তো খাওয়া নিয়ে নয়। কথা সাহেবিয়ানা নিয়ে। পারে সুইজারল্যাণ্ডে ভালো ভালো হোটেলে খেয়ে দেখেছি, আমি যে হাত দিয়ে খাচ্ছি এটাই যেন আচকান পরার মত আমার স্বকীয়তা বেশী বাড়িয়ে দিয়েছিলো। অবশ্য সুইজারল্যাণ্ডের হোটেলের লাউঞ্জে হঠাৎ যদি একটা ষ্টিগাসেরস, ট্রাইসেরাটপস বা টেরোড্যাকটাইল, বা একালীন এপম্যান এসে খেতো তাকে দেখার জন্ম যে ভিড় হোতো, সেই ভিড়ের স্বকীয়তার কথা বলছি না।

ওদের জীবনের মূলসূত্র হচ্ছে, যা করো বাবা আস্তে ধীরে, ঘা করো কেন খুঁচিয়ে ; পাৎলা একটা যবনিকা আছে, কাজ কি সেটাকে ঘুচিয়ে।" পাৎলা থেকে যবনিকাকে পাৎলাতরো করে ওরা নিজেদের কৃষ্টি ও শালীনতার পরিচয় দেয় ; কিন্তু খুঁচিয়ে ঘা করতে ওরা আদৌ নারাজ। যা করছো করো ; ভালোই, যদি না ওদের 'যা-করা'র ব্যাঘাত না ঘটে। সময় নেই তোমাকে ছোট বা বড় ভাববার, তোমার সুটের মেক দেখার, তোমার বাবুর্চি-আদব পরখ করার। তোফা গ্রুমড্, সেরা বাটলার্ড মানুষকে আজকের ইয়োরোপ শিকেয় তুলে রেখেছে কৈ মাছের মত ; সময় মত কেটে সুপ বানিয়ে খেয়ে সমাজের বদ স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার করবে।

কিন্তু তখন আমার দরকার ধোবা। শার্ট আছে কুল্যে ছুটি। একটি ক'দিন ধরে পরেছি। নেহাৎ আচকান ছিলো তাই চলেছে। এখন যে গন্ধে আত্মারাম শেষের দিনের বুলি ঝাড়ছে।

"ঐটি নেই এখানে" বললো জ্যাকি। তোমাদের দেশের কাষ্ট-সিষ্টেম যে সমাজের পক্ষে কেমন মোক্ষম পাকাপোক্ত ব্যবস্থা ছিলো তা আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝি। মুখে বলি ও সিষ্টেম খারাপ। কেন জানো, নিজেদের নেই বলে। মনে আছে তোমাদের ওখানে যতো ইচ্ছে জামাকাপড় পরেছি। স্বকৃদেও ধোবা প্রাতঃকালে কড়া পালিশী শার্টটি বাগিয়ে যখন দাঁত বার করতো, মনে হোতো গাঁধির ভারত বেঁচে থাক। এখানে সকলেই ট্রেন্ড স্পেশালাইজড লেবার ; লেবার অর্গানিজেশনের মেম্বর। একটা শার্ট ধোয়াও, দুবার ধোয়াবে, একটা নয়া শার্টের দাম। জলে ধুয়ে গলে যাবে।"

মনে পড়ে ডাক্তার মিত্র বন্ধুতাভরা কণ্ঠে বারংবার বাণী দিয়েছিলেন "নাইলন নেবেন। কটন নয়। ওদেশে ধোবার পাট নেই। ধোয়াতে গেলে বিকিয়ে যাবেন।" কিন্তু সে তো লণ্ডনে গিয়ে কিনবো। এখানে চলে কি করে ?

"রেখে দাও। এখানে জামা কাপড় ধোয়ার কথা পুরুষদের ভাবা নিষেধ। ওটা মেয়েরা সামলায়।"

জানি না শুনি না, ঐ ডালিমের মতো লীনা আর পাকা আমের মতো মাদাম—এরা হঠাৎ আমার ঘর্মগন্ধে সিক্ত কামিজটাকে নিয়ে দলাই মলাই করবে, এবম্বিধ চিন্তাতেও আমার কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। "জয় হরি" বলে নূতন কামিজ বার করে পরলাম। পুরোনোটি গুঁজে রাখলাম একধারে।

জ্যাকির গাড়ীখানা জর্মান, নানা কায়দা আছে তাতে। একটা বিড়ম্বনা, চলে যখন, বোঝা যায় না বাইরে না চাইলে ; স্পীড তো বোঝা যায়ই না। ও নিজেই চালায়। চললো নিয়ে। "মাষ্টার তো ; চলো একটা স্কুল দেখিয়ে আনি।"

সুইজারল্যাণ্ডে শিক্ষাব্যবস্থার খ্যাতি বিশ্ববিশ্রুত। আমেরিকার মতো ওদের ঢাক-ঢোল নেই, ঢাক ঢাক বইও নেই, শিক্ষকের শিক্ষা, শিক্ষার ওপরে। ওদের সব ঢাক-ঢাক গুড় গুড়। নীরব কর্মী সুইসরা। ষোলো হাজার স্কোয়ার মাইলের তো দেশ। ভারতবর্ষের কতোটুকু ? ল্যাজামুড়ো কাটা বাংলা দেশের প্রায় আধখানা। তার মধ্যে আবার শতকরা ৭৩ ভাগ পাহাড়, অর্দ্ধেকের বেশী বাসযোগ্যই নয়। এরই মধ্যে বাস করে ৪৭ লক্ষ লোক। ইয়োরোপের মধ্যে একটা সত্যিকার ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। স্কটল্যাণ্ডের অর্দ্ধেক জায়গায় প্রায় স্কটল্যাণ্ডের জনসংখ্যা ঠাসা আছে। অবশ্য

ভারতবর্ষের অনুপাতে কিই-বা। একটা ভারতবর্ষে পঞ্চাশটা অষ্ট্রেলিয়ার লোক থাকে! কিন্তু এদের দেশে চাষবাস করার মতো জায়গা খুবই অল্প। গ্রীষ্মকালে পাহাড়ের ধারে ধারে উঁচুতে উঁচুতে ঘাসে ছেয়ে যায়; তখন গরু, ভেড়া খুব চরে বেড়ায়, খুব খেতে পায়। কিন্তু শীতকালে সবাইকে নেমে আসতে হয় নীচের দিকে। শীতটা কাটিয়ে আবার ওঠে।

তা হলে কি হবে। ঐ অল্প জায়গাটুকুর সঙ্গে মিতালি করে, তার গায়ে হাত বুলিয়ে, মেজে-ঘষে, খাইয়ে-পরিয়েই সুইস চাষীকে বার করতে হয় আঙুর, আপেল, বাদাম, জলপান, গম, যব, দাল। সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে না দেখলে ধারণা করা যায় না "প্রতি ইঞ্চি" জমিকে সায়েস্তায় রেখে ফলন করিয়ে ছাড়ার মানেটা কি।

প্রথমেই জ্যাকি নিয়ে যায় লীগ অব নেশন্সের ইমারতে। এ ইমারতে উড্রো উইলসনের স্বপ্ন আর আমেরিকান ক্রোড়পতির টাকা এক সঙ্গে কবর হয়ে আছে। প্রাসাদের প্রাসাদ, মহা প্রাসাদ; আর তার চেয়েও চমৎকার এর বাগান।

বাগানে বসে বসে জ্যাকির কাছে শুনতে লাগলাম সুইজারল্যাণ্ডে ক্যাথলিকদের কতো দুর্গতি। আমরা যেমন মৌকা পেলেই ধর্মের দোহাই পেড়ে বেম্মো, মোল্লা, বামুন, আর পুতুলপুজো নিয়ে নিকে না হওয়া বিধবার গর্ভ আর নিকে করা বিধবার সাধভক্ষণ নিয়ে নৃশংস ও অমানুস আলোচনা করি, তেমনি জ্যাকি বলতে লাগলো ক্যাথলিক চার্চে ডিভোর্সের নষ্টামী আর ব্রহ্মচর্যের ভাঁড়ামির চর্চা। দেখলাম রগড়ান্ লাগলে শাদা চামড়াও যতো জ্বলে, কালোও ততো। জ্যাকির কোন্ বন্ধু ডিভোর্স করার এক বছরের মধ্যে বিয়ে করার ফলে ক্যাথলিক বাপমা-বন্ধুবান্ধবের হাতে নিগৃহীত হচ্ছে। তাঁকে নিয়েই এ প্রসঙ্গ।

প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে জেনেভা হ্রদের ওপরের পথে এলাম। ওর মোটরে করে ও আমায় নিয়ে শহর ঘোরাচ্ছে। হ্রদের ধারে ধারে রেলিং ঘেরা। পায়ে-চলা পথ। সারি সারি গাছ প্যারীকে মনে করিয়ে দেয়। জেনেভা লেক মন ভরিয়ে দেয় আনন্দে।

মোটর চলেছে শহর ছাড়িয়ে গ্রামের ভেতর দিয়ে। দু'ধারে এমনি সব ক্ষেত। পথ খুব প্রশস্ত নয়; হঠাৎ পাহাড়ের ঢল থেকে নেমে এসে পথ এসে পথে মিশ খেয়েছে। ফুটপাথ নেই-ই বললে হয়। পথের পারেই ফুলের বেড়া; পরিণত হাতে কাটা সাজানো, কেয়ারি করা। এরই মধ্য দিয়ে মোটর চলেছে নব্বই মাইল উঠছে, তবে প্রায়ই সত্তর-আশীর মধ্যে। মীটার দেখি, আর ব্লাডপ্রেসার চড়তে থাকে।

"করছো কি জ্যাকি?"

"আমি কিছুতেই ধীরে চালাতে পারি না। সেই জন্যেই বাপের এক সন্তানকে বাপ এই গাড়ী কিনে দিয়েছেন।"

"যে সব বাঁক দেখছি, আর যে পথ জ্যাকি—হেঁটে না বেড়ালে দেশ দেখা যায় না; কি বলো?"

জ্যাকি ম্যাক্ নয়। হেসে ফেলে। "সুইজারল্যাণ্ডে প্রায় সকলেই দারুণ স্পীডে গাড়ী চালায়। এখানে প্রতি চারজন লোক-পিছু একখানা গাড়ী আছে। জেনেভায় প্রায় ত্রিশ হাজার গাড়ী আছে। ভয় পেও না, সুইজার-ল্যাণ্ডে একসিডেণ্ট হয়ই না।"

ওরা হর্ণ ব্যবহার আদৌ করে না। সত্যিই জেনেভায় দেখেছি গাড়ী কিলবিল করে। একসিডেণ্ট নেই। ম্যাজিক নয়; কেবল মোটরের নিয়মগুলো মেনে চলার ফল। নিয়মকানুনগুলোকে কাজে লাগাতে পারলে ওরা ভূতের মতো খাটতে পারে।

পথে যতো দেখি যেন চোখ ফেরাতে পারি না। রোমে পাথর, ইতিহাস, মানুষের কীর্তি, অপকীর্তি, সঞ্চয়, ভঙ্গুরতা। রোমে বিলাস আর দেহ, মাংস আর জরা। আর এদেশের প্রকৃতিটা যেন সবুজ, ঝল্মল, প্রাণবেগে উচ্ছল। এখানে এফেল টাওয়ার নেই, ট্রজান্ কলাম নেই—আছে জলের ফোয়ারা ২৪০ ফিট উঁচু। সুইসারদের ভারি অহঙ্কার এ নিয়ে। এক লক্ষ উনআশী হাজার মণের এফেল টাওয়ার ওরা বানায় নিদুশো; আটত্রিশ ফুট কুতবমিনার গড়েনি; চুরাশী ফুট ক্রাজান স্তম্ভ বা একশো পঁয়তাল্লিশ ফুট নেলসন স্তম্ভ ওদের নেই। কিন্তু এই জলের ধ্বজা উড়িয়ে ওদের ভারি ফুর্তি। অন্য ধারে হ্রদে ষ্টীমার চলাচলের সুবিধার জন্য আলোকস্তম্ভ।

এমনি চারধারে প্রকৃতি। পাহাড়ের ঢলে ঢলে আঙুর ক্ষেত। দেখে দেখে চোখে যেন নেশা ধরে যায়। ডান ধারে ক্ষেত। বাঁ ধারে হ্রদের নীলজল। ওপারে ফরাসী বর্ডারের আলপস্। আলপ মানেই 'গোচারণ ভূমি'। এদের নানা সমৃদ্ধির মধ্যে গোধন একটি। এতো যে চীজ খাই আমরা, নেস্লস্ বার, চকোলেট, গুঁড়ো দুধ, জমাট দুধ, এতো যে কনডেন্সড্ মিল্কস আর টফী তার বারো আনাই তো সুইজারল্যাণ্ড। গোয়ালার জাত, কেষ্টঠাকুরের দেশ। যশোদা, রাধা, গোপকন্যারা মাঝে মাঝে আঙুর ক্ষেতে দাঁড়িয়ে উঁকি মারে এধার-ওধার কুঞ্জবনের দিকে। গল্গল্ করে টাটকা রোদের ধারায়

ভেসে যাচ্ছে চকচকে ক্ষেতের আলগুলো। দূরে দূরে শ্যাটু, কাস্‌ল্‌, সেকেলে স্থাপত্যের সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা-দুটো ক্যান্টন্‌ পার হয়ে গেছি তখন। একটা আধা-শহরে জায়গাও পেরিয়ে গেলাম। নামটা ভুলে গেছি।

ক্যান্টন্‌ এদের শাসন বিভাগীয় য়ুনিট। আমাদের যেমন জিলা। সারা সুইজারল্যাণ্ড পঁচিশটি ক্যানটনে ভাগ করা। প্রেসিডেণ্ট থাকে ওদের। দুটি লোকসভা আছে। হ্রদের ধারে চমৎকার একটি বাগানে ও গাড়ী থামালো।

খানিক দূরে বিরাট দুটি ঘোড়া চালিয়ে একজন বৃদ্ধ চাষ করে বাড়ী ফিরছে একগাদা খড় নিয়ে। জ্যাকি তাকে দেখে নমস্কার করলো।

আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো "এখানকার—এই ক্যানটনের প্রেসিডেণ্ট। এখানকার সমস্ত ব্যাপারে এর অখণ্ড স্বাধীনতা।"

"স্বাধীনতা তো কতো! এই দেখোনা স্কুলের এক দিককার ছাদ মেরামত করা হবে। খড় নিয়ে এলাম।" ভদ্রলোক হেসে বললেন। ফর্কে করে খড় তুলে এক ধারে গাদা করছেন।

খড়ের ছাদ? অবাক হলাম।

জ্যাকি বুঝতে পেরেছে।

"স্কুল কোথায়?" জিজ্ঞাসা করি আমি।

বাগানটার মাঝে সেকেলে একটি সুদৃশ্য কাস্‌ল্‌। তার টোপর-পরা টাওয়ারগুলো আর ঝুরি-কাটা ব্যাটল-মেণ্টগুলো লম্বা লম্বা পপলারের মধ্য দিয়ে দেখাচ্ছে যেন ছবি। সারা পাথরের দেয়ালে এঁটে এঁটে বসে গেছে আইভীর সবুজ। সবই নতুন লাগছে। বেশ লাগছে।

হঠাৎ চোখ পড়ে যায় জানলা দিয়ে ভেতরে।

সারি সারি বেঞ্চ আর টেবিল। ঝরঝরে পোশাক-পরা ছেলেমেয়ের দল বসে পড়াশুনা করছে। এমন নিঃশব্দ, এমন তৎপর, এমন মনঃসংযোগ যে এতো কাছে থেকেও বুঝতে পারি নি স্কুল এটি।

জ্যাকি দেখে আর হাসে।

ভারতবর্ষের স্কুল দেখেছে ও।

"আমাদের জাতীয় চরিত্রের বিশিষ্টতার মধ্যে এই নিঃশব্দতাকে আমরা বড়ো বেশী সম্মান করি।"

"না করলে চলবে কেন জ্যাকি? এতো ছোট জায়গার মধ্যে এতো বড়ো শহর। এতো লোক, এই সব পাহাড়ী সরু রাস্তার এপার ওপারে থাকবে, এতো গাড়ী চালাবে—যদি শাব্দিক হতে তোমরা কালাও হতে সঙ্গে সঙ্গে; আর আমেরিকানদের মতো নার্ভ-টনিক খেতে খেতে শেষ অবধি পাগলাগারদ ভরাতো।"

"তা ঠিক। আমাদের দেশে পাগলামো ব্যাধি হিসেবে অতি অল্প। ভারতবর্ষ, আমেরিকার ফিগার দেখে আমরা ঘাবড়ে যাই।"

"শব্দ কমের আরও দরকার তোমাদের। পাহাড়ীরা কম কথা বলে।"

স্কুলে প্রায় আড়াই শো ছাত্রছাত্রী। আট থেকে বারো অবধি বয়স। কতো ম্যাপ, ছবি, আলোকচিত্র, নানা রকম বিশ্ববিশ্রুত ভাস্কর্য আর চিত্রের প্রতিলিপি—দেখতে দেখতে কেবলই দেশের বিদ্যালয়গুলোর দাঁতবার-করা ব্ল্যাকবোর্ড আর ঢেলার মতো খড়িমাটির কথা মনে পড়ে যেতে লাগলো। হাঁড়িতে আলপোনা কেটে, মেঝেয় রঙীন গুঁড়ো ছড়িয়ে, কিছু কলাপাতা আর দেব-দারু সংযোগে আমাদের সত্যিকার দারিদ্র্য চেপে রাখার চেষ্টার কথা মনে হোলো। ম্যাপ নেই, ভালো লাইব্রেরী নেই—কোথাও ছাত্রদের নিজে যাবার পরিকল্পনা নেই। কেবল দেশাত্মবোধের নামে অনেক জঞ্জালের স্তূপ আছে। সুইজারল্যাণ্ডে যে কয়টি বিদ্যালয় দেখলাম তার মধ্যে উপকরণের স্বচ্ছলতা, হাতের কাজের ওপর জোর আর শারীরিক ব্যায়াম—এই তিনটির প্রাধান্য দেখলাম। রবীন্দ্রনাথ বরাবর এই তিনটির ওপর জোর দেবার চেষ্টা করেছিলেন।

জ্যাকি জানতো আমার ভালো লেগেছে স্কুল।

তখন লক্ষ্য করি পুরানো কাস্‌লের কোনো কোনো অংশ টালি ছাওয়া। টালির তলায় খড়ের চালা। তার ওপর টালি। "শব্দ অনেক কম হয় এতে।"

প্রেসিডেণ্ট তখনও খড় নামাচ্ছেন।

জ্যাকি হাসতে হাসতে বলল, "ভাবো তোমাদের প্রেসিডেণ্ট এই কর্মটি করছেন। আমরা ব্যবস্থা করি, তোমরা হুকুম তো চালাও (we administer; you govern)।"

ওর দেশে যে গত হাজার বছরের মধ্যে যুদ্ধ নেই, ওদের দেশের প্রত্যেকটি যুবা যে সৈন্য-বিভাগের শিক্ষায় অবশ্য শিক্ষিত এই দুটো তথ্য পাশাপাশি রেখে ওর ভারি আনন্দ।

ফেরার পথে একটা ছোটো হোটেলে বসে চমৎকার চীজ আর কফি খেলাম, ক্রীমভাসা-কফি।

জেনেভা শহরে দেখার বিশেষ কিছু নেই; শহরটাই দেখার। শহরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি ওপারের পাহাড়টার গায়ে! মাঝে একটা সেতু। হ্রদের একধারে এসে পড়ছে রোন্‌ নদী; অন্যধার দিয়ে রোন বেরিয়ে যাচ্ছে।

আলপস ছেড়ে ফ্রান্সে গিয়ে পড়বে। জেনেভা হ্রদটি ৪৫ মাইল লম্বা। জল মিষ্টি। তবে কেউ পান করে না সহজে। কলের জল খায়। একটা চমৎকার গির্জা দেখলাম ক্যাথিড্রাল অব সেন্ট পীটর। এদের ধর্মজ্ঞান খুব টনটনে। প্রটেষ্টান্ট আর ক্যাথলিক দুই আছে। তবু এই ক্যাথিড্রাল প্রাচীনতার জন্য গৌরবময়। জন কল্‌ভিন ষোড়শ শতাব্দীতে এখানে এমন সব বক্তৃতা দেন যে, তার ফলে ক্যাথলিকদের পাত্তাই এখানে ছিলো না। আজকাল ক্যাথলিক কিছু কিছু দেখা যায়।

শহর সাজানোর চমৎকারত্ব দেখেই মালুম হয় সুইসদের প্রধান গৌরব প্রকৃতির সঙ্গে বিজ্ঞানের সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তোলা। টাওয়ার বলতে ওদের জলের ফোয়ারার টাওয়ার। বাগান বলতে ওদের কেবল গোলাপের বাগান। তাতে আর অন্য কোনও ফুল নেই। জ্যাকি নিয়ে গেলো গোলাপ সপ্তাহে ফুলের বাগানে রাতে নাচ হয়। যে কোনো লোক যে কোন মহিলার সঙ্গে নাচতে পারেন। আমরা পথে আটকে গেছি বৃষ্টিতে। পৌঁছতে পৌঁছতে বাগানের গেট বন্ধ হয়ে গেছে। চৌকিদার পোশাক পরে আছে। জ্যাকিকে বারণ করার পরেই এক চোট খুব হাসাহাসি, তার পর খাতির দারি। আমার সঙ্গে পরিচয় করানো।

ব্যাপারটা এই যে, ভদ্রলোক নেহাৎই ভদ্রলোক। না চৌকিদার, না পুলিস। তবে নাগরিক ব্যবস্থাপক সংসদের আওতায় অনেকেই এমনি ছুটি-ছাটায়, বা সাধারণ নিত্যকর্মের বাইরের ফাঁকে এমনি কাজ করে থাকেন। ভদ্রলোক বেহালা মেরামত করেন। ফুল সপ্তাহে বড় বেশী ভিড়। সামলে দেবার জন্য একটু খেটে দিচ্ছেন। ওদের পোশাক স্বতন্ত্র। ওদের নাম টেরিটোরিয়াল আর্মির মত নাগরিক সংসদের খাতায় লেখানো। দরকার পড়লেই ওরা পোশাক পরে হাজিরা দেয় কাজে।

"আমাদের ক্লক টাওয়ার দেখেছেন?" অস্পষ্ট ও সকাতর ইংরেজীতে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করেন। ওরা দু'জনেই হাসে।

আসলে জেনেভার ক্লক টাওয়ার ঘাড় উঁচু করে দেখা যায় না। ঘাড় নীচু করে দেখতে হয়। ফুল আর ঘাসের বাহারেই সমস্ত ঘড়িটা তৈরি। পুরো ঘড়ি ফুলে পাতায়—মোড়া নয়—"তৈরি" জীবন্ত ফুল-পাতা, কাটা ফুল-পাতার কবর নয়। আশ্চর্য প্রতিদিন না হলেও প্রায়ই ওরা ফুল বদলায়, ঘড়ির রং বদলায়। মালীগিরির এই তৎপরতা দেখিয়ে ওরা ভারি গর্ব বোধ করে। ঘড়িটা একেবারের সেকেণ্ড অবধি সঠিক সময় দেয়।

কিন্তু জেনেভার তীর্থ রুসো আইল্যাণ্ড। প্রকাণ্ড মূর্তি রুসোর। আইল্যাণ্ডটাও চমৎকার মনোরম। রুসো জেনেভার ছেলে, জেনেভার হতভাগ্য বালক। পথে পথে ঘুরেছে একদিন। আবার তারই লেখার আগুনে ফ্রান্সে জ্বলে গেলো আগুন। ব্যক্তির স্বৈরাচার থেকে সমাজ পেলো মুক্তি সমষ্টির সাধনায়, সমষ্টির চেষ্টায়, আশায়, তৎপরতায়। দম্ভ ছিলো শক্তির জিম্মায়: তার রূপ বদলালো। কল্যাণ জন্ম নিলো চিন্তার প্রয়োগে। আর এই বিবর্তনের ঋষি রুসো। রুসো আইল্যাণ্ডে অনেক্ষণ বসে ছিলাম।

জ্যাকি মোটর নিয়ে ছুটেছে। "এখানে বায়রণ থাকতেন—এটা বায়রণ-ভিলা বলে খ্যাত।" তখন সন্ধ্যা হয় হয়। খালি বাড়ীটার মধ্যে যাবার উপায় নেই। কে একজন ইহুদী এখন এটা কিনে নিয়েছে। পাশে রথশ্চাইল্‌ডদের প্রাসাদ। বাগানের দরজা খুলে বায়রণের কাসলে ঢুকলাম। বাইরেটায় গিয়ে হ্রদের ধারে বসে বসে Prisoner of Chillon-এর কবিকে মনে করতে লাগলাম। জ্যাকি অবশ্য লুসার্ণে গিয়ে লেক্ লীমানের ধারে সে জায়গাটাও দেখিয়ে এনেছিলো। কিন্তু কবির বাসস্থানটাই আমায় বেশী আকর্ষণ করছিলো। মনে হচ্ছিলো সেদিনে এ বাড়ীর চারপাশে একটা জোরালো মাদক বাতাস বইতো। উত্তেজনায় আর প্রাচুর্যে, খ্যাতির জৌলুসে আর অখ্যাতির আকর্ষণে এ বাড়ীর বাগিচায় ভিড় জোটতো। বড় বড় কাব্য এইখানে লেখা হয়েছে।

জ্যাকি নতুন একটা ব্যবসা করছে। তার পত্তন করেছে মস্ত এক ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়ী। সে-ও জ্যাকির অংশীদার। আমেরিকান প্রি-ফ্যাব্ মোটর-লাঞ্চ কিনে জেনেভায় সৌখীন বিলাসীদের বেচবে। সে কারখানা দেখিয়ে ও ফিরলো জেনেভা শহরে ওর মাকে তুলে নেবার জন্য।

জ্যাকির মাকে নিয়ে আমরা গেলাম রাতের খাবার খেতে হ্রদের ধারের প্রসিদ্ধ একটা কাফেতে। হ্রদের ধারের কাফেতে খাওয়া জেনেভার বিলাস। কাশ্মীরে যেমন হাউস-বোটে থাকা—ডালহ্রদে।

চারধারে বাতি জ্বলে উঠেছে। বেশ লাগছে সব দেখতে। মানুষের বাসস্থান, মানুষের হাতের জোরে, মনের চেষ্টায় সমৃদ্ধিতে ভরে উঠেছে,—এ যেন মানুষের জয়গান।

আমি যে সময়ে পৌঁছেছি জেনেভায় তখন ওদের জাতীয় ফুল উৎসবের পরব চলেছে। "গোলাপ সপ্তাহ।"

বাড়ী বাড়ী ঘুরে, দোকানের সাজ-সজ্জা পরখ করে নগরবাসীরা পারিতোষিক দেবে শ্রেষ্ঠ গোলাপের বাগানের মালিককে, শ্রেষ্ঠ গৃহস্বামীকে, শ্রেষ্ঠ দোকান-মালিককে। প্রত্যেকের সম্মান নির্ভর করছে গোলাপ সপ্তাহে কেমন গোলাপ তারা ফুটিয়েছে, জুটিয়েছে, সাজিয়েছে। ফলে যখন যেদিকে গেছি কেবল গোলাপ, গোলাপ আর গোলাপ!

কাদের বাগানের আনাচে-কানাচে গোলাপ। টেবিলে টেবিলে গোলাপ। ভদ্রলোক তিনটি মেয়ে আর স্ত্রী নিয়ে পৈত্রিক বাড়ীখানায় থাকেন। বাড়ীর তলায় এক ধারে মোটর গাড়ী, অন্য ধারে মোটর-লাঞ্চ। সকাল-দুপুর গৃহস্থ। সন্ধ্যায় বাগানটায় টেবিল পেতে তিন মেয়ে, স্বামী-স্ত্রী মিলে নিজেদের রান্না পরিবেশন করেন আগন্তুকদের। হ্রদের ওপরে বাগানে বসে তারা খেয়ে যায়।

রান্নার তারিফ এদের এতো যে মোটরের গাদি লেগেছে বাগানে। ভিড় এতো, বসার জায়গা নেই। সুপ, মাছের ফ্রাই, আলুভাজা, শ্যাম্পেন, আইসক্রীম আর স্যালাদ্। মাংস এরা বেশী খায় না। চীজ সব সময়েই প্রায় খায়। গরম গরম মাছভাজা, ওদের দেশের প্রসিদ্ধ, ট্রাউট কতোগুলো খেলাম মনে নেই। রূপোর এনামেল করা বাসনে করে এনে দিলো। পেলাম চায়নায় রেখে।

হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টি এসে যেতেই যে যার খাবার নিয়ে বাড়ীর ভেতর ঢুকলো। হাসির হররা বন্ধ হোলো না; চাকর-বাকরকে ডাকতে হোলো না। হোটেলের মালিককে ব্যস্ত, লজ্জিত হতে হোলো না। এক ধরনের পারিবারিক ঘনিষ্ঠতায় পয়সা দিয়ে খাওয়াটাও যেন পারিবারিক আনন্দে ভরে উঠলো।

ফিরে এলাম মঁসিয়ে রেনের বাড়ী। রাত কাটাতে হবে এখানে। অনেকক্ষণ গল্প-সল্প চললো জ্যাকির মাধ্যমে। ভারতবর্ষের জনতা সম্বন্ধে, ভারতবর্ষের চাষ আর শিল্পের মধ্যে সামঞ্জস্যের গল্পই বেশী। আধ্যাত্মিক গল্প নয়। তার পর যেই জানলো গান জানি আর কথা কি তখন। ওরা তো গাইতে জানে না। মঁসিয়ে রেনে বাজাতে জানেন। পিয়ানো নিয়ে বসলেন। তারপর লীনা গাইলো দু'খানা গান। আমি বাজাতে জানি না। গাইলাম। মঁসিয়ে রেনে ধীরে ধীরে বাজালেন। তারিফ করা বা শোনার জন্য গানের আসর বসে নি। তবু সুরের আমেজের জন্য সন্ধ্যাটি মনে আছে।

× × ×

সারাদিনে স্নান হয় নি। পরিশ্রম আর উত্তেজনা। রাতে ঘুম হোলো না ভালো। ভোরবেলা উঠেছি। স্নান সেরে নিয়ে শরীর বেশ ঝরঝরে।

ঘরে ফিরে দেখি বিছানার ওপরে পাট করে রাখা সদ্য-পালিশ-করা আমার শার্ট।

পরে ব্যাপারটা অভ্যাস হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু সেদিন ভোরে বড়ই লজ্জিত হয়েছিলাম।

কিন্তু এমনিতে বাড়ীটা তখনও নিঃশব্দ। কেউ উঠেছে বলে বোধ হোলো না। দেয়াল-জোড়া লম্বা একটা ঘড়ি টিক টিক করছে। পুরানো কালের, শিল্পকাজ করা, ড্রেসিং টেবিলের ওপর একটি ঝুড়ি গোলাপের কুঁড়ি ফোটার জন্য ব্যাকুল।

হ্রদের দিকে আকাশটায় পাহাড়ের ওপারে একরাশ সাদা মেঘ উথলে উঠেছে। সন্তর্পণে দরজা খুলে নেমে যাচ্ছি।

সিঁড়ির মাথা থেকে ডাক এলো "মঁসিয়ে"

লীনা দাঁড়িয়ে আছে। আঙুল দিয়ে ইশারা করলো।

মিনিট দু'য়ের মধ্যেই ও নেমে এলো।

ভাষা না জানা থাকার জন্য এবার দুঃখ হতে লাগলো।

কিন্তু মনে হয় ভাষা জানা থাকলে চোখের ভাষা ধরার জন্য অমন বেহায়াপনা করতে পেতাম না।

আগা খাঁ তখন সুইজারল্যাণ্ডে সবে এসেছেন, অসুস্থ। সুস্থ হয়ে তিনি আর ফেরেন নি। তাঁর বাগান সমেত বাড়ীটা হ্রদের ওপরেই। সেই বাগানের ধারে একটা চেরিগাছ আর উইপিং উইলো। উইলোর ডাল-গুলো লাল লাল ফুল সমেত ঝুলে আছে। বসে আছি। হাঁসের দল ভেসে বেড়াচ্ছে। নানা রকমের পাখী ডাকছে। পাহাড়ের গা বেয়ে একটা সঞ্জীবক বাতাসের স্রোত ভোর-ভেজা আকাশকে কাঁপিয়ে তুলছে।

হ্রদের ধার ধরে ধরে এসে পড়েছি একটা ষ্টীমার-ঘাটে। নানা ভাষায় যাত্রীদের জন্য লেখা বিজ্ঞাপন। ওদিকে পথের ওপারে দোকান খুলছে।

লীনা নিয়ে ঢুকলো একটা ঘরে, জেটির ওপর কাঠের ঘর। খুব সাজানো।

বছর সাতচল্লিশের দীর্ঘপ্রস্থে সবল এক ভদ্রলোক ড্রেসিং গাউন পরে একটা বড়ো কাছির মুখ কেটে সেটাতে এধেসিভ টেপ লাগিয়ে মেরামত করছিলেন। মুখে টেপা জলন্ত পাইপ।

লীনাকে দেখেই একগাল হেসে অভিবাদন করলেন। ভাষার মধ্যে বুঝলাম 'বঁ'। আর কিছু নয়।

লীনা বললেন "বাতাশারিয়া।"

"আমি বেসঁ; জ্যাকি বেঁস-অ আমার ছেলে।"

জ্যাকির বাবা। ভাঙা ভাঙা ইংরিজী বলেন।

আমায় এতো সকালে উঠতে দেখে ভারি খুশী।

লীনাকে বলেন যে, যদি সম্ভব হতো ছোট মোটর বোটটা নিয়ে উনি আমাকে ঘুরিয়ে আনতেন। লীনা কেন পারবে না?

চায়ের কথা উঠলো।

না উঠলে আমিও উঠতাম।

শেষ অবধি দুটো প্যাকেট আর একটা বড়ো থার্মোফ্লাস্ক নিয়ে মঁসিয়ে বেঁস-অ আমাদের তাঁর ছোট মটর বোটে ছেড়ে দিলেন। লীনা অবলীলাভরে সেই বোট চালিয়ে ভোরের জেনেভা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলো।

সে অনুভূতি একটা নব আবিষ্কার। যদি মোটর চালাতে জানতাম অত খারাপ লাগতো না। কিন্তু চালনা ব্যাপারটায় নারীকে, বিশেষ সম্পূর্ণ অজ্ঞাতা যুবতী নারীকে ভার দিয়ে নিজে বসে বসে শ্রেফ কবিগিরি করবো যেন বড়ো বেশী নিওলিথিক ব্যাপার। আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী, বলো কোন্ পার ভিড়িয়ে তোমার 'মোটর' তরী—জিজ্ঞাসা যে করবো এ ভাষাই নেই।

কিন্তু ওরা জেনেভার মেয়ে। নিয়ে হাজির করলো 'উপলব্যথিত' একটা তীরে। দিব্যি পা ছড়িয়ে বসা যায় মোটা মোটা নুড়ির ওপর। তার পর সকালের সেই চা খাওয়া। ফিরে এসে দেখি আগেভাগেই জ্যাকি এসে বসে আছে বাপের কাছে।

তিনজনায় খানিক হাসাহাসি, রঙ্গতামাসা।

"চলো ঘুরিয়ে আনি তোমায় চমৎকার একটা বন।"

"আমি বন দেখতে চাই না। মানুষ দেখতে চাই। এতো ছোট দেশ, এতো অল্প চাষের জমি, অথচ এতো শিল্প। এই শ্রম আর শিল্পের সমন্বয় পর্বটি যেখানে—সেখানে নিয়ে চলো।"

ভোরবেলায় খাওয়া সেরে সুইস্ কর্মী বেলা আটটায় কাজের জায়গায় হাজিরা দেয়। ঘড়ি, আসবাব, মোটরের কারখানা, নৌকো তৈরির জায়গা, টিনের ক্যানে ফলভরা, বড়ো বড়ো চীজের, দুধের কারখানা, সিল্কের পশমের কারখানা—সব ঘুরে ঘুরে দেখলাম। কাগজ, ইস্পাত, কাঠের পাৎলা তক্তা, নাইলন্, প্লাষ্টিক সবই হচ্ছে সুইজারল্যাণ্ডে। কয়লা নেই ওদের। পাহাড়ী ঝর্ণা আর নদীর স্রোতকে বেঁধে প্রচুর বিজলী উৎপন্ন করছে। সারা সুইজারল্যাণ্ডের যান্ত্রিক-জীবন চলছে বিজলীতে। এমন কি ট্রেনগুলো সব চলছে বিজলীতে। পাহাড় থেকে পাহাড়ে ক্রেনের দোলায় চেপে মানুষ যাতায়াত করছে বিজলীতে। প্রায় ঘণ্টা দুই এই সব কারখানা দেখে বেলা হলে পর একটা হোটেলে গিয়ে ভাল করে খাওয়া গেলো। দোকানপাট খুলেছে। একটা দোকানে ঢুকে দুটো টাই কেনা গেলো। জ্যাকি এক বাক্স চকোলেট কিনে দিলো।

তার পরে সোজা চলে গেলাম লুসার্ণের পারে সেই প্রসিদ্ধ শিলোন্ প্রাসাদ দেখবো বলে।

লুসার্ণে মাছ শিকার করা একটা ফ্যাসান। বড়ো বড়ো হোটেলে এর ব্যবস্থা আছে। সাঁতার সেরে হ্রদের ধারেই খাওয়া সেরে নেওয়া হয়। তার পর আবার চলে নয় মাছ ধরা, নয় সাঁতার। বিদেশীরা এখানে এসে জলকেই নানা ভাবে ভোগ করে।

সুইজারল্যাণ্ডে কি দেখলে?

যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে—"কি দেখলে", বলতে হয়, "সুইজারল্যাণ্ড দেখলাম।" দেশ দেখতে গিয়ে ক'জনই বা আমরা 'দেশ' দেখি? দেখি দেশের খণ্ড খণ্ড, দেশের ইতিহাসের বরফীর টুকরো।

কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে সুইজারল্যাণ্ডকেই দেখতে হয়। অত ঘুরলাম, এক ইঞ্চি জমি দেখে মনে হয় নি নোংরা। পাহালগাম, কাম্পুর, গুলমার্গ, কোকরনাগ, কাশ্মীরের এসব জায়গা, বিশেষ করে দালের বুক আর উলারের বুক—তার নৈসর্গীক চমৎকারের কাছে সুইজারল্যাণ্ড যেন মহাভারতের কাছে এলিস ইন ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড। কিন্তু ঐ একটা তফাৎ—আর কতো বড়ো তফাৎ সেটা। আগাগোড়া কাশ্মীরের নোংরা আর নোংরামী যেন হিমালয়ের তুঙ্গতার সঙ্গে পাল্লা লাগায়। নোংরা থেকে আত্মরক্ষার উপায় ও উপকরণ জানা না থাকলে কাশ্মীর যাওয়ার চেয়ে ঘরে বসে একজিমা, কলেরা, টিবি আর সিফিলিসের বীজ চিবিয়ে খাওয়া সহজ। কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডে সবই যেন ঝেড়ে-পুঁছে, সাজিয়ে-গুজিয়ে রাখা। যেখানে বন সেও যেন সাজানো বন, যেখানে উপবন সেও যেন সাজানো উপবন। প্রতিটি বাড়ীর গায়ে যে বাগান, দেখলে মনে হয় আগামী কালই কোনো প্রতিযোগিতা আছে বলে সাজিয়ে রেখেছে। মাঠে মাঠে চাষারা ক্ষেত-খামারে কাজে ব্যস্ত; সে সব চাষাই কতো পরিচ্ছন্ন, ক্ষেতগুলোও কতো পরিচ্ছন্ন। মাঠে মাঠে গরু ভেড়া চরছে। প্রত্যেকটির গরুর গা দিয়ে চকচক করে স্বাস্থ্যের আভা বেরুচ্ছে। গো "সেবা" যাদের ধর্ম তাদের চেয়ে গোরু যারা "খায়" তারাই যেন বেশী যত্ন করে।

দুপুরের খাওয়া জ্যাকির বাড়ীতে। ওর মা রেঁধেছেন। কতো যত্ন করে যে বুড়ী খাওয়ালেন কি বলবো। কথায় কথায় চোখে জল ভরে আসে। "কতো করেছো তোমরা আমার জ্যাকির আরামের জন্ম। কতো ভালো তোমরা।

মাত্র দু'দিন রইলে। কি-ই বা করতে পারলাম," ইত্যাদি।

ভোরবেলা গাউন পরা মসিয়ে বেঁস-অ কে জেটির ঘরে দেখে একটা খটকা লেগেছিলো। দুপুরে খাবার সময়ে তাঁকে না দেখে খটকা বাড়লো। ঘরে দেখলাম জ্যাকির ঘরে জ্যাকির বিছানা। অন্য ঘরে জ্যাকির মা'র সিঙ্গল্ বিছানা। আর ঘর নেই।—

কিন্তু জ্যাকি নিজে থেকেই সেই নিদারুণ দুঃখের কাহিনী বললো—

"কি যে সুখের সংসার ছিলো কি বলবো।…গত বছরেও আমাদের সংসার দেখে লোকে তারিফ করেছে। বাবাকে তো দেখো। যেমন খাটতে পারেন তেমনি লোহার মতো স্বাস্থ্য। আমি বাবার সঙ্গেই এক জোটে ঐ কাজ করতাম। সম্প্রতি যে অন্য ব্যবসায়ে জড়িয়েছি, তাও ঐ কারণেই। মাকে দেখছো তো। এই রকম মোটা হয়ে পড়েছেন বলে বাবা মাকে আর সহ্য করতে পারেন না। অথচ ওঁদের চাব্বিশ বছরের সংসার। তার আগেও বাল্যকাল থেকেই ওঁদের ভাব। প্রতি বছরে ওঁরা নিয়মিত শীতের সময়ে ফ্রান্স বা স্পেন বা ইতালীতে বেড়াতে গেছেন। বাবা নাচ-গান খুব ভালোবাসেন। মা'র পক্ষে অবশ্য এখন ওসব কথাই ওঠে না। তা ছাড়া মাকে নিয়ে বাবা বেরুতে পর্যন্ত নারাজ। বাবা গত আট মাস থেকে বাড়ীতে আসা ছেড়ে দিয়েছেন। যে বাড়ীতে আমাদের দেখলে তুমি, তার চেয়ে ঢের বড়ো আমাদের নিজেদের বাড়ী আছে। সেই বাড়ীই আমাদের। আমাদের বাড়ী ছেড়ে দিয়ে বাবা যখন জেটির ঘরে থাকা সুরু করলেন তখন মা-ই বলেন আমায় অন্য বাড়ী দেখে আলাদা হয়ে যেতে।"

"কেন?

আমি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করি।

"ঐ তো মজা! ভারতবর্ষে তোমরা পাতিব্রত্য নিয়ে কতো অহঙ্কার করো। কিন্তু মেয়েমানুষ জাতটাকে চেনা দায়। মা বললেন—'দেখ, তোর বাবা কখনও কষ্ট করে থাকে নি, শোয় নি। তার ঐ জেটিতে কষ্ট হচ্ছে। অথচ আমাকে সে বেরিয়ে যেতে বলতেও পারছে না। তার চেয়ে, তুই তো এখন বড়ো হয়েছিস, সমর্থ হয়েছিস, আমায় নিয়ে আলাদা বাড়ী করে চলে যা না। তা হলে তোর বাবার শরীরের কষ্টটা একটু কম হয়।' আমি তো মাস তিনেক হোলো এ বাড়ীতে এসেছি মাকে নিয়ে।"

আশ্চর্য হয়ে বলি, "তোমার বাবা আপত্তি করেন নি?"

"আপত্তি করেন নি। তবে খরচার কথা তুলেছিলেন। তাতেই আমি চটে যাই। বাবার সঙ্গে আমারই মনান্তরটা বেশী হয়েছে। আমি অবশ্য ঠিক আছি। বাবার সঙ্গে ব্যবসা করি। রোজকার কাজকর্ম আগেও যেমন ছিলো এখনও তেমনি। মা-ই ভেতর থেকে ভেঙে পড়েছেন।"

অদ্ভুত একটা ব্যথায় জ্যাকির চোখ ভরে এলো।

"আর আমার মা বাবাকে ছাড়া দুনিয়ার কখনও কিছু জানতেন না। কেবল শরীরের একটা ব্যতিক্রমের দরুণ…"

আমি সান্ত্বনা দেবার ছলে বললাম, "কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখো জ্যাকি, স্বাস্থ্য ও চেহারার দিক থেকে তোমার বাবা এখনও কেমন বলিষ্ঠ। ওঁর জীবনের শক্তি বাঁধা থাকতে পারে না। জীবন বড়ো প্রচণ্ডশক্তির ধারক।"

আমার দিকে চেয়ে জ্যাকি বললো, "তা মানি। বাবার সে শক্তি কোনো দিন বাঁধা নেইও ছিলও না। কিন্তু মা ভেঙে পড়েছেন বিশেষ করে যে, সেই মেয়েটি এখন আমাদের চিরদিনের সেই বাড়ীতে এসে আছে। আত্মীয়স্বজন ছি ছি করছে। মায়ের অপমান হচ্ছে। তবু মা সবাইকে মুখে বলছেন—'কি করবে বলো? আমায় নিয়ে সত্যিই তো ঘর করা চলে না। ওর আর কি দোষ!' অথচ অন্তরে অন্তরে মা আমার শুখিয়ে যাচ্ছে, বাত্তাশারিয়া। অমাত্বসিক!"

আমি আবার বলি, "একদিন তোমার বাবা তাঁর ভুল বুঝতে পারবেন।"

"না বুঝুন। সেই ভালো। এ সব ব্যাপারে জোড়া লাগায় আমার বিশ্বাস নেই।"

এর পরে জ্যাকির মাকে দেখলেই আমার মনেও কান্না আসতো। যদিও ভদ্রমহিলা আমায় কিছু বলেন নি কিন্তু উনি বুঝতে পেরেছিলেন আমি সব জানি।

"কাল রাতে তুমি ঘুমুবার পর মা নিজে তোমার কামিজ কেচে ইস্ত্রী করে রেখে এসেছিলেন। এই হলেন আমার মা। বাঙালী মায়ের মতো সেন্টিমেন্টাল। সেন্টিমেন্ট আমার ভালো লাগে, বাত্তাশারিয়া।"

সুইজারল্যাণ্ড ছাড়ার আগে জ্যাকির মার গালে চুমো খেয়ে এসেছিলাম। জ্যাকির মা তাতে এতো খুশী হয়েছিলেন যে, আমায় জড়িয়ে কেঁদেই ফেললেন।

দুপুরটার হাঙ্গামায় পড়েছি।

প্যারিসে বন্ধু-ছাত্র ও ছাত্র-বন্ধু গোঁরাকে 'তার' করেছিলাম। 'তার' ফিরে এসেছে। কেন জানা নেই। তার পর প্যারি আর জেনেভায় ট্রাঙ্ক করেও গোঁরার পাত্তা লাগাতে পারি নি। সেটা শনিবার অপরাহ্ণ। প্যারীতে কোনো ভদ্রলোক বাড়ীতে নেই। কিন্তু প্লেনে সীট বুক করা। আমাকে যেতেই হবে।

সুযোগ

শ্রীভূদেব চট্টোপাধ্যায়

পাত্র হিসাবে অমিয় খুব একটা মহার্ঘ না হলেও একেবারে সস্তা দরেরও নয়। স্বাস্থ্য ভালই, দেখতেও মন্দ না। আর হলেই বা পল্লীগ্রামের লোক। চাল চাল করে শহরের লোকেরা যখন হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে তখন অমিয়র আঙ্গিনায় বাঁধা একশ' মণ ধানের কড়কড়ে একটা গোলা। তাছাড়া তার একখানা মুদিখানার দোকানও আছে রাস্তার ঠিক মোড়ের উপরেই। মোদ্দা কথা, দু'-বেলা আঁচাবার দুর্ভাবনায় নিঘুম চোখে নিশীথরাত্রি পর্য্যন্ত বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে হয় না তাদের। তবু যেন এ-বরে মন ওঠে নি সুলতার।

বাসরঘরে মিনিট পনের কাটিয়েই একটা মিথ্যা অছিলায় সোজা সে পালিয়ে আসে রান্নাঘরে, বড়-বৌদির কাছে। হাতে পুঁটুলির মত করে ধরা গাঁট-ছড়া বাঁধা অমিয়র চাদরটা।

বড়বৌদি দরজার দিকে পিছন করে কি সব টুকিটাকি কাজে ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ এক ঝলক সুবাস নাকে যেতেই সে চমকে মুখ ফিরিয়ে সুলতাকে দেখে বিস্মিত হয়ে যায়। কপালে একটা ছোট্ট কুঞ্চনের ঢেউ তুলে সে বললে, পালিয়ে এলে যে বড়!

—ভাল লাগছে না।

—আহা কত ইয়েই যে জান তুমি ঠাকুরঝি।

বড়বৌদির মুখে মিষ্টি হাসির আভা।

—বাপস্, ঝাঁঝাল সেন্টের সঙ্গে লোকটার গায়ের গেঁইয়া গন্ধে মাথা ধরে গেছে। দেখ না, চাদরটাতেও ঐ রকম উৎকট গন্ধ।

বলে সুলতা তার নকল বেনারসীর সঙ্গে চাদরের বাঁধনটা খুলতে আরম্ভ করল।

—কি হচ্ছে কি! ধমক দিয়ে ওঠে বৌদি: অমন অলক্ষুণে কাণ্ড করো না ঠাকুরঝি।

সুলতার হাত তখন অবশ্য থেমে গেছে, কিন্তু তার পাতলা ঠোঁট দু'খানি উঠেছে থরথরিয়ে। তার সেই আনত মুখের পানে অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বড়বৌদি কয়েক মুহূর্ত্ত কি যেন পড়তে চেষ্টা করে। তারপর নরম হাতে সুলতার মুখখানা তুলে সস্নেহে সে বললে, ছি ভাই, আপনজনকে অমন অশ্রদ্ধা করতে নেই।

ততক্ষণে পঙ্গপালের মত এসে পড়েছে বাসর-জাগানীয়ার দল। তারা ডাকাতি করে নিয়ে যায় সুলতাকে।

বর-কনে বিদায় নেবার পর কর্ত্তাকে নিভৃতে পেয়ে বড়বৌ বললে, লতাকে পল্লীগ্রামে বিয়ে দিয়ে বোধ হয় ভাল করলুম না।

শুনে একেবারে সপ্তমে চড়ে যায় এ বাড়ীর বড়কর্ত্তা অবিনাশ। তিক্ত কণ্ঠে সে গর্জ্জে ওঠে, মানে?

স্বামীর মেজাজ দেখে নিজেকে গুটিয়ে নেয় বড়বৌ।

—কি হ'ল কি? বড়কর্ত্তার স্বরে উত্তাপের হল্‌কা।

—কিছু না।

—কেবল পাড়াগাঁ আর পাড়াগাঁ। ঐ টাকায় অমন পাত্র বহু তপস্যা করে মেলে, বুঝেছ?

বড়বৌ-এর তরফ হতে এর কোনও প্রতিবাদ না হওয়ায় একটু যেন নরম হয়ে আসে অবিনাশ। অপেক্ষা-কৃত শান্ত স্বরে তাই সে বললে, কি হয়েছে শুনি?

—কিছু না।

—আহা, বলই না।

—হয় নি কিছুই, দেখলে না, শ্বশুড়বাড়ী যেতে লতা কেমন করে কাঁদল।

—ও! মৃদু হাসির আভা ফুটে ওঠে অবিনাশের মুখে: আমার সঙ্গে আসবার সময় তুমি কাঁদ নি?

এক ঝাঁক বেলোয়ারী চুড়ির আওয়াজের মত হাসি ঠিকরে পড়ে বড়বৌ-এর কণ্ঠ হতে: কাঁদতে তুমি দিয়ে-ছিলে নাকি! বাপ-মা ভাই-বোনের এতদিনের আশ্রয় ছেড়ে আসছি, দু'ফোঁটা চোখের জল না পড়লে লোকে বলবে কি? কিন্তু কান্নামুখে গলিটুকু চলে আসতেও তর সয় নি বাবুর। একেবারে যেন ইয়ে!

কৃত্রিম রাগ ফুটে ওঠে বড়বৌ-এর কটাক্ষে।

হাসি হাসি মুখে অবিনাশ বললে, কি?

—বলব না, যাও।

অবিনাশ খপ্ করে আঁচলটা ধরে ফেলে বড়বৌ-এর।

—আঃ, কি হচ্ছে কি, বাড়ীতে গিস্‌গিস্ করছে লোক।

—এখানে ত কেউ নেই, বল না লক্ষীটি, তখন আমাকে কি মনে হয়েছিল তোমার।

কথাটা বলতে গিয়েও হেসে ফেলে বড়বৌ। পাঁচ বছর পূর্ব্বের নবোঢ়া বধূর মতই লজ্জায় আরক্তিম হয়ে ওঠে তার গাল দুটি। অনেক সঙ্কোচের পর শেষে সে বললে, তখন তোমাকে মনে হয়েছিল···হাতটা আগে ছেড়ে দাও বাবু।

—কি? বল না। অধীর আগ্রহে অবিনাশ বড়বৌ-এর হাতে মৃদু ঝাঁকানি দেয়।

—তখন তোমাকে মনে হয়েছিল একটি ইয়ে।

—খুব বলেছ, ইয়ে দিয়েই সুরু করেছিলে আবার ইয়েতেই শেষ করলে। কি বুঝব?

—আচ্ছা পরে বলব, এখন খোকনকে খাওয়াতে হবে। ছেড়ে দাও।

—সে হবে না। অবিনাশ যেন বাইশ বছরের তরল যুবক হয়ে গেছে: এখনি বলতে হবে। আচ্ছা কানে কানে বল।

অগত্যা অবিনাশের কানের কাছে তার লাজুক ঠোঁট দুটিকে নিয়ে যায় বড়বৌ। কানে কানে বলে, তখন তোমাকে মনে হয়েছিল, তুমি যেন একটি···

—থামলে কেন, বল?

—মিষ্টি ডাকাত।

হাসিমুখে বড়বৌ-এর হাত ছেড়ে দেয় অবিনাশ। তারপর সে বললে, সেদিন তোমাকে যারা কাঁদতে দেখেছিল, তারা যদি তোমার মত বেঠিক ধারণা করে মিছি মিছি দুশ্চিন্তা করত, তাহলে কি ভুল করত বলত। তারা ত আর তোমার মিষ্টি-ডাকাতের খবর জানত না!

একটা উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চেপে বড়বৌ বললে, না গো না। মেয়েদের সব কান্নার যদি মানে বুঝতে তোমরা—

—আর কারও কান্নার মানে না বুঝি, অন্ততঃ কনে-বৌ-এর কান্নার মানে আমার খুব জানা আছে। কারণ একটা কনে-বৌ ত আমার জীবনেও এসেছে। দেখে নিও, তোমার সুলতাও জোড়ে খুশী ঝলমল হয়ে আসছে।

—আহা, তাই যেন হয়।

—হতেই হবে। অবিনাশের কণ্ঠে দৃঢ় প্রত্যয়ের সুর: কথায় বলে, ঘি আর আগুন, পাশাপাশি থাকলে গলবেই।

কিন্তু জোড়ে নবদম্পতি ফিরে এলে সুলতার মুখ দেখেই বোঝা গেল যে, ঘি গলে নি। খবরটা শুনে অবিনাশের ভ্রূ কুঁচকে ওঠে। বিমূঢ় মুখে স্ত্রীর মুখের পানে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর সে বললে, মানে?

—মানে আজকালকার যুগের ডালডা-ঘি কিনা। এতদিন গাছ-গাছড়া হতে ঘি বের হচ্ছিল, এ-ঘি কোন্ দক্ষ বিজ্ঞানী বোধ হয় পাথর হতে বের করেছে। আগুনের কাছে এলে এ-ঘি গলে না, ফাটে।

স্ত্রীর উত্তর শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে অবিনাশ। অস্থিরভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে বলে, আমি এখনি ওদের ডেকে একটা বোঝাপড়া করে ফেলব।

—পাগলামী করো না। ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে বড় বৌ: স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ফাঁক আনাড়ি হাতে রিপু করতে গেলে হিতে বিপরীত হবে।

— তা হলে কি করি বলত। বড় অসহায় দেখায় অবিনাশকে।

চিন্তিতমুখে বড় বৌ বললে, দেখি, কতদূর কি করতে পারি।

কিছু করতে অবশ্য পেরেছিল বড় বৌ। অসন্তোষের ধূলি আবর্জ্জনায় যে পথটা একান্ত করেই দুরধিগম্য হয়ে উঠেছিল, ঠাট্টা-মস্করার ঝড় বইয়ে সে আবর্জ্জনা কতকটা পরিষ্কার হয়েছিল বইকি। কিন্তু বিপদ কি শুধু এক তরফা! ঘি যদিও বা দ্রবণীয় হয়ে উঠল, আগুন তখন শুধু নিভেই ক্ষান্ত হয় নি, অবহেলার শৈত্যে জমে একেবারে বরফ হয়ে উঠেছে।

শ্বশুড়বাড়ীতে ঘর করতে এসে সুলতা তাই পদে পদে ঠোক্কর খায়। আর অমিয়র মেজাজের পরিবর্ত্তন দেখে বাড়ীর লোকেরা হকচকিয়ে ওঠে। সদ্য-বিবাহিত জীবন, কিন্তু মুখে তার হাসি নেই। অপরের এতটুকু বিচ্যুতিতে অধৈর্য্যে সে ফেটে পড়ে। সেদিন দোকানের চাকরটা আসতে একটু দেরি করেছিল বলে তাকে একটা চড় মেরে বসল অমিয়। অথচ এমন ত সে ছিল না।

এদিকে মেয়েমহলে অখ্যাতি রটে গেছে সুলতার। শহরের মেয়ে বলে তার নাকি দেমাকে পা পড়ে না। পল্লীগ্রামের মেয়েদের সে ঘেন্না করে। কথা বলে না কারও সঙ্গে। তবু যদি বাবুদের বাড়ীর বৌদের মত তার এক গা গয়না থাকত!

মায়ের প্রাণে কতকটা যেন বুঝতে পারেন অমিয়র মা। মুখে তিনি কিছু বলেন না বটে, কিন্তু মনে মনে মানত করে বেড়াত তেত্রিশ কোটি দেবতার চরণে। একটা মাত্র ছেলে, আর একটা বৌ—তাদের মুখের পানে তাকালে যে প্রাণ শুকিয়ে যায়। একি করলে নারায়ণ!

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের বিবর্ণতা বাইরে থেকে অবশ্য কিছু বোঝা যায় না। একই ঘরে একই বিছানায় তারা রাত্রি কাটায়, শুধু মাঝে একটা পাশবালিসের ব্যবধান। কিন্তু

কি দুস্তর! তাদের মধ্যে কোনও শ্রুতিকটু বচসাও এ পর্য্যন্ত কেউ শোনে নি। সেদিক হতে শান্তি পূর্ণমাত্রায় বজায় আছে বলতে হবে। কিন্তু এ যেন কবরের শান্তি!

সেদিন রাত্রে শুয়ে অমিয় সুলতাকে বললে, আমার একটা অনুরোধ রাখবে?

—বল।

—মা আজ আমার কাছ হতে পাঁচটা টাকা চেয়ে নিয়েছেন, আমাদের কল্যাণকামনায় শিবের পূজো করাবেন বলে। পূজো করে শিবের তাগা পরিয়ে দেওয়া এখানকার রীতি। আমার অনুরোধ, তাগা পড়তে অস্বীকার করে মায়ের মনে আঘাত দিয়ো না। মা বড় কষ্ট পাবেন তাতে।

—আচ্ছা।

—হাঁ, আমাদের জীবনের বিষ আমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাক।

এর পর অমিয় চুপ করে যায়। সুলতাও তার অস্তিত্বকে যেন অবলুপ্ত করে দেয় ঘরের নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যে।

দিনের বেলাটা দু'জনেরই বেশ কাটে। সুলতা ব্যস্ত থাকে ঘরের কাজে, অমিয় ডুবে থাকে প্রাত্যহিকের কর্ত্তব্যে, কিন্তু রাত্রিটা দুঃসহ। অনেকক্ষণ ঘুম আসে না দুজনেরই। উভয়েই মনে করে যেন মূর্ত্তিমান দুর্ভাগ্যটাকে পাশে নিয়ে রাত কাটাতে হচ্ছে।

একদিন অমিয়কে পাকড়াও করলে তার বন্ধু নরেশ। তার নিরানন্দময় মুখের পানে তাকিয়ে সে বললে, কি ব্যাপার বল দেখি ব্রাদার?

অমিয় হেসে বলে, কিসের?

—তোমাদের রসকুঞ্জের হে।

—কি আবার।

—উঁহু। ঘাড় নাড়ে নরেশ।

—ভাগ্, বেশী ফাজলামি করিস্ না।

—ত্থাখ অমে, বিয়ে-থা আমরাও করেছি, বুঝলি। মাস ছয়েক ধরে নতুন বৌ-এর সৌরভ আমার কাছে যে এসেছে সে-ই টের পেয়েছে। কিন্তু তুই যে একেবারে চুপসে গেলি রে!

আর বলতে হয় না নরেশকে। রুদ্ধ ব্যথার গুরুভারে ভিতরে ভিতরে ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল অমিয়, এখন সেটার নিষ্ক্রমণের পথ দেখতে পেয়ে নিজেকে আর সে সংযত করে রাখতে পারে না। বাল্যবন্ধুর কাছে নিঃশেষে সব কিছু উজার করে দিয়ে সে যেন স্বস্তিবোধ করে।

সব শুনে নরেশ বললে, তুই একটি মেনিমুখো।

—মানে?

—মানে, সেও মুখ ঘুরিয়ে রইল, আর তুইও বোবা মেরে গেলি। মেনিমুখো কি আর গাছে ফলে ব্রাদার!

—তবে কি করতে হবে শুনি? একটা 'আন্‌উইলিং হর্স'—

—আরে না না। এ যে হর্স নয় মেয়ার। শুধু একটু জোর খাটাতে হবে। তা হলেই দেখবি গুট্ গুট্ করে চলতে আরম্ভ করেছে।

অমিয় মাথা নেড়ে বলে, না ভাই সে আমার দ্বারা হবে না।

—হবে না মানে? তবে আর একটা বিয়ে কর।

—সেটা আরও অসম্ভব।

—অ। তাহলে সারাটা জীবন ত্রিশঙ্কুর মত কাটাবি? আচ্ছা, আবার বিয়ে করার আইডিয়াটা এখন না হয় বাদ দে। আমার থিয়োরীটা একটু পরীক্ষা করে দেখ না। শাস্ত্রকাররা পুরুষকে সিংহের সঙ্গে তুলনা করেছে রে, আর তুই তোর নিজের বৌ এর কাছে হেরে যাবি।

নরেশ চলে গেলে তার কথাগুলো মনে মনে আর একবার হিসাব করে দেখে অমিয়। অবহেলার নিষ্ঠুরতায় যার প্রতিটি হৃদয়তন্ত্রী বাঁধা, তার কাছে আবেদন-নিবেদন নিষ্ফল। তাছাড়া সে রকম কিছু একটা করতে অমিয়র পৌরুষেও বাধে। কেন, সে কি এতই ফেল্‌না! তার চেয়ে বরং নরেশের পথে চললে তাতে ইজ্জত বজায় থাকবে অনেক বেশী; অভদ্রতা? একটা নিরপরাধ পুরুষের সমগ্র জীবনটাকে মরুভূমি করে দেওয়াটাই বা কোন দেশী ভদ্র আচরণ?

কিছুক্ষণ মানসিক দ্বন্দ্বের পর অমিয়র সারা মন শেষকালে বন্ধু নরেশের পরামর্শ টাকেই আঁকড়ে ধরে। সেই ভালো। আর কিছু না হোক, অন্ততঃ একটা বোঝাপড়া ত হয়ে যাবে। এ রকম জীবন যে অসহ্য।

কিন্তু এতখানি যে গড়াবে প্রথমে ধারণা করতে পারে নি অমিয়। প্রবল ঝড়ের করাল চুম্বনে সদ্য-প্রস্ফুটিত গোলাপ যেন শতধাবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তার পাপড়ি পড়ল লুটিয়ে, পরাগ গেল ধূলায় মিশিয়ে, সুরভি হ'ল অবলুপ্ত।

সারারাত্রি ধরে সুলতা কাঁদল, আর আহত ফণিনীর মত গর্জ্জাল। শুধু তাই নয়, খাট হতে নেমে মেঝেয় একটা মাদুর বিছিয়ে মশার কামড়ে পড়ে রইল সে।

অমিয় মিনতি করে, লক্ষীটি লতা, বিছানায় শোবে চল। ক্ষমা কর আমাকে।

অশ্রুবিজড়িত কণ্ঠে গর্জ্জে ওঠে সুলতা, না না কক্ষণো না। তোমার বিছানায় আর কখনও আমি শোব না। নির্লজ্জ পশু কোথাকার? তোমার সঙ্গে আমার সব সম্পর্কের শেষ হয়ে গেছে।

তিক্ত হেসে অমিয় বললে, তাহলে এর পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে সম্পর্ক কিছু ছিল বল। অনাবশ্যক বিবেচনায় এর কোনও জবাব দেয় নি সুলতা, এবং বিড়ম্বনা মনে করে আর কোন কথাও বাড়ায় নি অমিয়।

এমনি করেই দিন কাটে। অমিয় একদিন সুলতাকে বললে, তুমি মায়ের কাছে শুতে পার লতা। তাতে অন্ততঃ মশার কামড় হতে অব্যাহতি পাবে।

সুলতা নীরব।

অমিয় বলে, মায়ের কাছে না যাও ত একটা মশারিই না হয় কিনে আনি। তুমি বরং নীচে বিছানা করেই শোও।

—কিছু দরকার নেই।

আর কোনও প্রসঙ্গ নেই কথা বলার। অতএব উভয়েই মূক হয়ে যায়। চলে যায় নীরব রাত্রির ব্যর্থ প্রহরগুলি। প্রথম প্রথম সুলতার এই বীতরাগকে তার কুমারী-জীবনের লজ্জা-জড়িমা মনে করেছিল অমিয়। ভেবেছিল ওটা একটা মনের কুয়াশা মাত্র, স্বল্প কিছু-কালের মধ্যেই সে কুয়াশা ভেদ করে ফুটে উঠবে তরুণ প্রেমের অরুণাভা। কিন্তু আজ দীর্ঘ ছ'মাসের মধ্যেও সে কুয়াশা কাটল না। আদৌ কাটবে কি না কে জানে! কি অভিশপ্ত তাদের এই বিবাহিত জীবন!

একদিন সকালে অমিয় দোকানে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে এমন সময় তার মা হাসি হাসি মুখে এসে বললেন, আমাকে দশটা টাকা দে ত অমু।

টাকার প্রয়োজনটা আন্দাজ করতে না পেরে অমিয়র ভ্রূ কুঁচকে ওঠে।

বৃদ্ধা বলে চলেন: যেমন তুই, তেমনি আমার বৌমা। ও বাড়ীর সেজবৌয়ের বয়স যখন তের, তখন ওর মহিম কোলে আসে। আর বৌমার আমার উনিশ বছর বয়স হ'ল, তবু কি লজ্জা! আমি কি করে জানব? পুকুর ঘাটে আজ দেখি, বমি করছে। বলে নি বেটি এ্যাদ্দিন। ভাল করে মুখের পানে তাকাতেই বুঝলুম, হাঁ। দে বাবা দশটা টাকা, আমার অনেক মানত আছে।

মায়ের কথা শুনে চমকে ওঠে অমিয়। বিবর্ণ মুখে মায়ের বলিরেখাঙ্কিত শীর্ণ হাতে দশ টাকার একটা নোট গুঁজে দিয়ে তাড়াতাড়ি সে পালিয়ে যায়। সারাটা দিন তার কেমন যেন আচ্ছন্নের মত কাটে। সুলতার জঠরে তার অনিচ্ছুক সন্তান। কে জানে কেমন হবে! সুখ-মিলনের কুসুমাস্তীর্ণ পথে যার আবির্ভাব নয়, সে কি আর সুস্থ সুন্দর হবে! কলকাতার পথে ভিক্ষারত বিকলাঙ্গ শিশুর মতই হয়ত এক বীভৎস সন্তান প্রসব করবে সুলতা। তার নগ্ন পশুত্বের জীবন্ত সাক্ষী হিসাবে সে বেঁচে থাকবে। অমিয়র ললাটে দুশ্চিন্তার আর একটা নতুন রেখা উৎকীর্ণ হয়ে ওঠে।

এদিকে বাড়ীতে তখন উৎসব লেগে গেছে। মা একাই যেন একশ। তাঁর উৎসাহের অন্ত নাই। পূজা-পার্ব্বণ চলছে পুরাদমে। হাজার রকম বিধিনিষেধের বাঁধনে তিনি ইতিমধ্যেই বেঁধে ফেলেছেন সুলতাকে। বহু প্রতীক্ষার পর তাঁর পরম কামনার ঈপ্সিত বস্তু যেন তিনি হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছেন।

সেদিন রাত্রে অমিয় সঙ্কোচে সুলতার পানে মুখ তুলে তাকাতে পারে না। একটা সুগুপ্ত অপরাধবোধের মালিন্য তার সমগ্র চেতনাকে যেন আড়ষ্ট করে তোলে। ছি ছি, সন্তানের জননীর কাছে যে-পিতৃত্বের গোপন সমর্থন নেই, আবেগ থরথর শিহরণ নয়, অস্ফুট আর্ত্ত চিৎকারের বিবর্ণ নিস্পৃহা যার সূচনায়, কেবলমাত্র সমাজের স্বীকৃতি আছে বলেই কি মোহান্ধ হয়ে তাকে অভিনন্দিত করা যায়! বড় লজ্জা করে অমিয়র। এ লজ্জা ব্যর্থতার লজ্জা, অক্ষমতার লজ্জা! তার মনে হয়, কিছুদিন সুলতার সান্নিধ্য হতে দূরে থাকতে পারলে সে যেন বাঁচে।

কিছু দূরে যেতে হয় নি অমিয়কে। সুলতাই চলে গেল তার বাপের বাড়ী। নিয়ে গেলেন তার বড়দা। আবাল্য যাদের কাছে থেকে সে বড় হয়ে উঠেছে, তাদেরই স্নেহে যত্নে প্রথম সন্তান প্রসবের প্রচণ্ড যন্ত্রণা সহনীয় হয়ে উঠবে বিবেচনা করে অমিয়র মাও এতে কোনও আপত্তি করেন নি।

যথা সময়ে সুলতা একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল। খবর শুনে মা আনন্দে একেবারে দিশেহারা। তার যেন একমুহূর্ত্তও দেরি সয় না। বললেন, আমাকে নিয়ে চ অমু, দেখে আসি খোকনকে।

—আমার এখন যাওয়া অসম্ভব। অমিয়র ঘোরতর আপত্তি। বকেয়া আদায়ের সময় এখন। এ সময়ে দোকানে না বসলে সারা বছরে ও টাকা আর আদায় হবে না।

অবশেষে অমিয়র বন্ধু নরেশকে সঙ্গে নিয়ে নাতি দেখতে চলে গেলেন বৃদ্ধা। কাপড়ের খুঁটে বেঁধে নিলেন ঠাকুরের পুষ্প।

সুলতাদের বাড়ীতে ঢুকেই মা ডাক দেন, কোথায় আমার সোনামনি।

হাসিমুখে বেরিয়ে আসে সুলতা। কোলে তার বাড়ন্ত গড়নের ধপধপে এক শিশু।

—ওমা, এ যে আমার ছোট অমু গো! আনন্দে মায়ের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। সকলেই সমস্বরে স্বীকার করে খোকা ঠিক তার বাবার মতই দেখতে হয়েছে। অবিকল সেই রকম; নাক মুখ চোখের গড়নে কোথাও এতটুকু পার্থক্য নেই।

বাড়ীতে ফিরে আসার পর হতেই মা অমিয়কে ছেলে দেখে আসার তাগাদা দেন। কিন্তু অমিয়র কেবল আপত্তি। তার অসংখ্য কাজ, বড় ব্যস্ত। একটা দিনও তার নাকি অপব্যয় সইবে না।

চিঠি দেয় সুলতার বৌদি। অমিয়কে তিনি বার বার করে যেতে লেখেন। কিন্তু বৌদি কে? কই সুলতা ত একবারও লেখেনি। অভিমানে ভারী হয়ে আসে অমিয়র মন।

এদিকে গজর গজর করে চলেন মা—পাঁচটা নয়, সাতটা নয়, একটামাত্র নাতি, বংশের দুলাল—আজ চার মাস হয়ে গেল এখনও পর্য্যন্ত সে পৈতৃক ভিটে দেখলে না। কি পাষাণ বাবা, ছেলেকে দেখতে পর্য্যন্ত তার মন যায় না। শিশু নারায়ণ, তাকে এত হতাদর করতে নেই—ওতে মঙ্গল হয় না।

মায়ের বিলাপ শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে ওঠে অমিয়র। অবশেষে চিঠি আসে সুলতার। আহ্বান জানিয়েছে সে অমিয়কে। আহ্বানের চেয়ে অনুযোগই বরং বেশি তার চিঠিতে। অমিয় নাকি পাষাণ, তার নাকি মায়া নেই দয়া নেই ইত্যাদি ইত্যাদি।

মনে মনে নিজের প্রথম সন্তান দর্শনের ব্যাকুলতা অমিয়র যে ছিল না এমন নয়। যে বড় কিন্তুটা এতদিন তার পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল এবার সেটাও অপসারিত হয়ে গেছে, অতএব আর বাধা নেই। অমিয় এসে পৌঁছয় তার শ্বশুরবাড়ীতে।

মধ্যাহ্নের বিজন নিভৃতে খোকাকে কোলে নিয়ে অমিয়র কাছে এসে দাঁড়ায় সুলতা। ঠোঁটে তার শীর্ণ হাসি। মাতৃত্বের নমনীয়তায় সারা মুখখানি টলটলে।

সুলতা বললে, নাও তোমার খোকাকে।

—দাও। দু'হাত বাড়িয়ে দেয় অমিয়। খোকনকে কোলে নেবার সময় মৃদুহেসে সে বলে, খোকা শুধু আমারই। তুমি ত একে চাওনি?

—ইস্! লজ্জারাঙা মধুর হাসি ঠিকরে পড়ে সুলতার অধরোষ্ঠে।

—জানিস খোকা, খোকনকে বুকের কাছে নিয়ে অমিয় বললে, তুই আসবি বলে তোর মায়ের সে কি রাগ। কত আমাকে গালাগালি দিয়েছে জানিস্? তুই বড় হ', তোকে আমি সব বলব, শুধু তোকেই বলব। আমি পশু, আমি···

অশ্রুধোয়া ম্লান হাসি ঠোঁটে টেনে এনে অমিয়র মুখটা হাত দিয়ে চেপে ধরে সুলতা। তার পর একবার কি যেন সে বলতে চেষ্টা করে, কিন্তু কিছু বলতে পারে না। শুধু থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে তার বিবর্ণ অধরোষ্ঠ দুটি। তার পর সে ভেঙ্গে পড়ে অঝোর কান্নায়। ফুলে ফুলে কেঁপে কেঁপে সুলতা যেন তার এতদিনের সমস্ত সঞ্চিত অশ্রু নিঃশেষে বের করে দেয়।

অমিয়র চোখও শুকনো থাকে না। বড় বড় ফোঁটায় নীরব অশ্রু তার প্রশস্ত বুক বেয়ে ঝরে পড়তে থাকে। একটি নধর কোমল শিশু বিচারকের অপলক দৃষ্টির সামনে উদ্বেলমুখর দুটি অশান্ত হৃদয় ক্ষণেক অস্থির ডানা ঝাপটিয়ে যেন ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে যায়।

খোকন তখন তার কচি হাতে অমিয়র কানটা ধরে ফেলেছে। হেসে ফেলে অমিয়। বলে, ওরে দুষ্টু, তুমি তবে তোমার মায়ের পক্ষে। দেখ লতা, খোকনের বিচারে আমিই অপরাধী হয়ে গেছি, কি রকম আমার কান মলে দিচ্ছে দেখ।

বৃষ্টি-ধোয়া যুঁই ফুলের মত স্নিগ্ধ হেসে সুলতা খোকনকে আদর-মাখা ধমক দেয়। অমিয় বলে, ব'কো না আমার বাপাকে।

—খোকন কেমন হাসতে শিখেছে দেখবে।

বলে সুলতা খোকনের পেটে আলতো ভাবে আঙুলের টোকা দিতেই সে খক্ খক্ করে হেসে ওঠে। তার হাসি দেখে সুলতা অমিয় দু'জনেই হেসে গড়িয়ে পড়ে। মোটা-মিহি-কচি কণ্ঠের বিচিত্র ঐকতানে সারা ঘরখানা ভরে যায়।

খোকনকে নিয়ে কিছুক্ষণ হৈ হৈ করার পর সুলতা বললে, আমি এর নাম রাখব 'স্বপন'।

মৃদু হেসে অমিয় বললে, আমি রাখব, 'সুয়েজ'।

—সে আবার কি?

—প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যের গাটছড়া বেঁধেছে সুয়েজ খাল। কালোর সঙ্গে গোরার, পল্লীগ্রামের সঙ্গে শহরের মিতালী ঘটাল খোকন্।. ও আমার সুয়েজ নয় ত কি?

লজ্জা-রাঙ্গা মিষ্টিমুখে সুলতা বলে, আহা!

বিশ্বকর্মা পুজা

শ্রীসুখময় সরকার

ভাদ্রমাসের শেষ দিবসে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা নানাস্থানে মহাসমারোহে পূজিত হ'ন। বিশ্বকর্মা পূজা 'সর্বজনীন' নহে; কর্মকার সম্প্রদায়ের মধ্যেই ইঁহার পূজা সীমাবদ্ধ ছিল। তবে ইদানীং যন্ত্রযুগে কর্মকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে—বিশ্বকর্মার পূজাতেও আড়ম্বর হইতেছে। বৃহৎ বৃহৎ কল-কারখানায় শ্রমিকেরা বিশ্বকর্মার পূজা করে; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্র-বিপণিতেও তাঁহার অর্চনা হয়। কল-কারখানা ও যন্ত্র-বিপণিগুলিতে দৈনন্দিন কর্ম বন্ধ রাখিয়া দেবশিল্পীর অর্চনায় ভাদ্রমাসের শেষ দিনটি আনন্দোৎসবে অতিবাহিত করা হয়। পূর্বে বিশ্বকর্মার প্রতিমা কচিৎ নির্মিত হইত; তৎকালে কর্মকারগণের ব্যবহৃত লৌহ-যন্ত্রেই বিশ্বকর্মার পূজা হইত। ইদানীং প্রায় সর্বত্র মৃন্ময় প্রতিমায় বিশ্বকর্মার পূজা হইতেছে। নবনীরদকান্তি, গজারূঢ়, চতুর্ভুজ মূর্তি; হস্তে মুদ্গর, ছেদনী, অঙ্কুশ ও অভয় মুদ্রা। শাস্ত্রীয় 'ধ্যান' অমান্য করিয়া কোন কোন শিল্পী স্বীয় ধ্যানানুসারে বিশ্বকর্মার হস্তে তুলাদণ্ড দিয়া থাকেন; তাহাতে অবশ্য ভাবের ব্যাঘাত জন্মে না।

লালবাজার গ্রামে বহু কর্মকারের বাস। পথের দুই ধারে অগণিত কর্মশালা। পথ অতিবাহন করিবার সময় হাতুড়ি ও হাপরের শব্দে পথিকের কর্ণপীড়া জন্মে। পথিক যদি তথাকথিত মার্জিত-রুচি সম্পন্ন হ'ন, তবে তাঁহার চক্ষুপীড়ার কারণও যথেষ্টই ঘটে। এক দিকে অঙ্গারের স্তূপ, অন্যদিকে ভস্মস্তূপ; মধ্যস্থলে একটা অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখস্থ গহ্বরে একটা নেহাইকে কেন্দ্র করিয়া ছিন্ন-বসন, মসীলিপ্ত-বদন, ঘর্মাক্ত-কলেবর একদল দৃঢ়পেশী শ্রমিক ক্রমাগত হাতুড়ির ঘা মারিতেছে। কিন্তু পথিক যদি কৌতূহলী হ'ন, তবে দেখিতে পাইবেন, কি বিচিত্র পদ্ধতিতে সেই সকল কর্মশালা হইতে বিভিন্ন আকার ও প্রকারের উজ্জ্বল, সুদৃশ্য কাংস্যপাত্র জন্মলাভ করিতেছে। এই সকল কর্মশালার অধিষ্ঠাতৃ-দেব বিশ্বকর্মা, আর ঐ সকল শ্রমিকই সেই দেবতার সন্ততি। তবে যে শিল্পীর প্রতিভাবলে গলিত ধাতু নয়ন-বিমোহন শিল্পজাত দ্রব্যে রূপান্তরিত হইতেছে, তিনিই বিশ্বকর্মার বরপুত্র।

হাতুড়ির শব্দমুখর লালবাজারের পথ ভাদ্রমাসের শেষ দিনে নিস্তব্ধ হইয়া যায়। একেবারে শব্দহীন নয়; প্রতিটি কর্মকার-পরিবারে সেদিন উৎসবের কলগুঞ্জন; পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ হইতে বিচিত্র মানুষের নিরন্তর গমনাগমন। পথের উপরে মধ্যে মধ্যে দেবদারু-শাখায় আবৃত তোরণ, কদলীতরুর পার্শ্বে মঙ্গল কলস এবং আম্র-পল্লবের বনমালা। প্রত্যেক কর্মশালায় সেদিন কর্মবিরতি এবং ভগবান বিশ্বকর্মার অর্চনা। দীর্ঘদিনের স্তূপীকৃত অঙ্গার ও ভস্ম কর্মশালা হইতে অপসারিত হইয়াছে; কর্মশালা পুষ্প-পল্লবে সজ্জিত হইয়াছে; ধূপ-দীপ-গন্ধ-পুষ্প-নৈবেদ্যাদি উপচারে কর্মশালাগুলি অন্যকার মত দেবালয়ে রূপান্তরিত হইয়াছে। কোন কর্মশালা হইতে পুরোহিতের কণ্ঠ-নিঃসৃত মন্ত্র শ্রুত হইতেছে; কোথাও শঙ্খ-ঘণ্টা ধ্বনিত হইতেছে; কোথাও বা হোমাগ্নি-শিখা ঘৃতের সুবাস বিকীর্ণ করিতেছে। পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ হইতে বন্ধু-বান্ধবেরা মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। দুলালপুর গ্রামের কায়স্থদের সহিত ইঁহাদের বড় মিত্রতা। দুলালপুরের কোন-না-কোন কায়স্থ-পরিবারে ইঁহাদের 'ফুল-পরাণ' আছে। বিশ্বকর্মা পূজার দিন 'ফুল'কে সপরিবারে নিমন্ত্রণ করিতেই হইবে। অবস্থানুসারে 'ফুল'কে কেহ লুচি-মোণ্ডা, কেহ-বা চিঁড়া-দই-গুড় খাওয়াইয়া আপ্যায়িত করেন। কিন্তু প্রত্যেক পরিবারে সেদিন একটি খাদ্য সাধারণ ভাবে পরিবেশিত হয়, সেটি 'আরসে পিঠা'। 'আউশে পিঠা' নামই বোধ হয় সুসঙ্গত হইত। কারণ, ভাদ্রের শেষ দিকে আউশ ধান্য পাকিয়া থাকে; আউশের তণ্ডুলচূর্ণে গুড় মিশ্রিত করিয়া ঘৃতপক্ক আরসে-পিঠা প্রস্তুত হয়। 'ফুল'-বাড়ীতে মধ্যাহ্নে ভূরিভোজন করিয়া কেহ গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন, কেহ-বা বৈকাল পর্যন্ত, এমন কি রাত্রি পর্যন্ত অবস্থিতি করিয়া কীর্তনগান, যাত্রাগান ইত্যাদি শ্রবণ করেন বৃহৎ লালবাজার গ্রামের দুইটি পল্লীতে সেদিন চণ্ডী-মণ্ডপের সম্মুখস্থ আটচালায় বৈকালে রাধাকৃষ্ণ-লীলা-কীর্তন গীত হয় এবং রাত্রিতে বিপুল জন-সমাবেশে যাত্রাগান অভিনীত হয়।

এ অঞ্চলের সাধারণ লোকে ভাদ্র-সংক্রান্তির দিন 'বিশ্বকর্মা পূজা' না বলিয়া 'ছাতা-পরব' বলে। ছাতা-পরব সকল গ্রামে হয় না, লালবাজারেও হয় না; তথাপি 'ছাতা-পরব' নামটা সমধিক। বাঁকুড়া-পুরুলিয়ায়

সীমান্তে ভীমপুর গ্রামের ছাতা-পরব এতদঞ্চলে বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। বর্ধমানের পশ্চিমাংশে নিয়ামৎপুর গ্রামেও ছাতা-পরব আছে। ইন্দ-পরবের সহিত এই পরবের সাদৃশ্য আছে। এক সাহেব লিখিয়াছেন, ছাতা-পরব মূলতঃ অনার্য-উৎসব এবং ইহাই ইন্দ-পরবে রূপান্তরিত হইয়াছে। শ্রীবিনয় ঘোষ তাঁহার 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি'তে সাহেবের উক্তি উদ্ধার করিয়াছেন এবং তাহা সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু বিনয়বাবু স্বচক্ষে এই দুই পরব দেখিয়াছেন কি না এবং এই দুই পরবের উৎপত্তি গভীর ভাবে চিন্তা করিয়াছেন কি না সন্দেহ; করিলে তাঁহার মন্তব্য নিশ্চয় অন্যরূপ হইত।

বিশ্বকর্মা কে? ভাদ্র-সংক্রান্তিতে তাঁহার পূজার বিধান কেন? এখন আমরা এই সকল প্রশ্ন লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। বিশ্বকর্মা দেবশিল্পী, স্বর্গের স্থপতি—ইহা প্রসিদ্ধ। কোন পুরাতন দেব-মন্দিরে অসাধারণ শিল্প-প্রতিভার নিদর্শন থাকিলে প্রাকৃতজনে আজিও বলে, উহা স্বয়ং বিশ্বকর্মা নির্মাণ করিয়াছিলেন। তবে বিশ্বকর্মা রাত্রির অন্ধকারে লোক-লোচনের অগোচরে তাঁহার শিল্পকর্ম সমাপ্ত করেন; মর্ত্যের মানুষ চর্মচক্ষুতে তাঁর শিল্প-প্রয়াস দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে না। বাঁকুড়া নগরের উপকণ্ঠে একতেশ্বরের মন্দির-সংলগ্ন একটি অসমাপ্ত দেউলে ঐ শিলাময় কোকিল কেন? তাহা আর জান না? দেব-স্থপতি বিশ্বকর্মা দেবাদিদেব একতেশ্বরের মন্দির নির্মাণ করিতেছেলেন; নির্মাণকার্য সমাপ্ত হইবার পূর্বে একটা কোকিল ডাকিয়া উষার আগমন ঘোষণা করিল; বিশ্বকর্মার কর্মা অসমাপ্ত রহিয়া গেল, কোকিলকে অভিশাপ দিয়া তিনি পাষাণ করিয়া রাখিলেন। জগন্নাথদেব হস্তপদহীন কেন? পাণ্ডা ও প্রাকৃতজনের উত্তর: বিশ্বকর্মা শ্রীমূর্তি নির্মাণ করিতেছিলেন; হস্তপদ নির্মাণের পূর্বেই উষা প্রকাশ হইল; জগন্নাথদেব হস্তপদবিহীন হইয়া রহিলেন।

এই সকল লৌকিক কাহিনীর উদ্ভব কিরূপে হইল, বিচারশক্তি-সম্পন্ন পাঠকের নিকট তাহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু বিশ্বকর্মা যে দেবশিল্পী, এই ভাবনা (conception) বৈদিক যুগেই মানুষের চিত্তে জন্মলাভ করিয়াছিল এবং পৌরাণিক যুগের মধ্য দিয়া অদ্যাপি প্রায় সমভাবে সেই ভাবনা চলিয়া আসিয়াছে। পুরাণে প্রসিদ্ধি আছে, বিশ্বকর্মা দধীচি মুনির অস্থি দিয়া বজ্র নির্মাণ করিয়াছিলেন, ইন্দ্র সেই বজ্রদ্বারা বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়া দেবলোকে স্বস্তি আনয়ন করিয়াছিলেন। ঋগবেদে এই উপাখ্যানের বীজ আছে। ঋগবেদে আছে, দেবশিল্পী ত্বষ্টা দধ্যঞ্চ নামক ঋষির অস্থিদ্বারা শতধার ও সহস্র-শঙ্কু স্বর্ণবর্ণ বজ্র নির্মাণ করিয়াছিলেন; ইন্দ্র সেই বজ্রদ্বারা বৃত্র নামক অহিকে (সর্পাকার অবগ্রহকারী অসুরকে) বধ করিয়া যজমানের জন্য বর্ষাধারাকে মুক্ত করিয়া আনিয়াছিলেন। পুরাণে যিনি দধীচি, বেদে তিনি দধ্যঞ্চ, পুরাণের বিশ্বকর্মাই বেদের ত্বষ্টা। দেবরাজ ইন্দ্রের নাম পরিবর্তিত হয় নাই। বেদের সর্পাকৃতি দানব পুরাণে মানবাকার প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব দেখিতেছি, পুরাণের বৃত্র-সংহার উপাখ্যানের মূল বেদে কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত অবস্থায় রহিয়াছে। আর বৃত্র-সংহারের নিমিত্ত বজ্রনির্মাণ ত্বষ্টা বা বিশ্বকর্মার প্রধানতম কীর্তিরূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে।

পুরাণে বিশ্বকর্মা কেবল দেবশিল্পী অর্থাৎ দেবলোকের শিল্পী। কিন্তু বেদে ত্বষ্টা নিখিল-রূপ-স্রষ্টা; স্বয়ং বিশ্বরূপ; দ্যাবা পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুকে তিনিই রূপ দান করিয়াছেন; এমন কি, মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণও তিনিই নির্মাণ করেন। তাঁহার হস্তে একটি 'বাশি' (ছুতারের বাইশ) আছে। তিনি ব্রহ্মণস্পতি নামক বৈদিক দেবতার কুঠার শাণিত করিয়া দিয়াছিলেন। ইন্দ্রের সোমপানের নিমিত্ত ত্বষ্টা একটি 'চমস' (পানপাত্র) নির্মাণ করিয়া-ত্বষ্টা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—তক্ষণ-কর্মে নিপুণ। দেবশিল্পী ত্বষ্টা তক্ষণ-কর্মে পটু ছিলেন। ঋগবেদের দুইটি ঋক হইতে বুঝিতে পারা যায়, তষ্টা ছিলেন ইন্দ্রের পিতা। যথা—

(১) সংগ্রামে প্রয়োগের নিমিত্ত ত্বষ্টা ইন্দ্রের জন্য বজ্র নির্মাণ করিয়াছিলেন (ঋ ১।৬১।৬);

(২) কিয়ৎকাল পূর্বে ইন্দ্রের পিতা তাঁহার জন্য যে বজ্র নির্মাণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা তাঁহার উপযুক্ত অস্ত্রে পরিণত হইল (ঋ ২।১৭।৬)।

ন্যায়ানুগ যুক্তিতে (Syllogistic argument) সিদ্ধ হইতেছে, ত্বষ্টাই ইন্দ্রের পিতা। কিন্তু সোমব্যসনী ইন্দ্র পিতার প্রতি ভক্তিমান ছিলেন না। ত্বষ্টা ছিলেন দিব্য-সোমের রক্ষক; একান্ত যত্নসহকারে তিনি স্বর্গীয় সোম রক্ষা করিতেন। ইন্দ্র জন্মিবামাত্র সোমপানের নিমিত্ত ব্যাকুল হইলেন। তিনি ত্বষ্টার এক পদে ধরিয়া তাঁহাকে সজোরে নিক্ষেপ করিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে সোম কাড়িয়া লইয়া সর্বোচ্চ স্বর্গে উহা পান করিলেন (ঋ ৩।৩২।১০)। অন্য একটি ঋকে পাইতেছি, অমিত-বিক্রম, বিজয়ী ইন্দ্র জন্মিবামাত্র নিজদেহ ইচ্ছামত গঠন-পূর্বক ত্বষ্টাকে পরাজিত করিয়া সোম হরণ করিলেন এবং

চমস হইতে উহা পান করিলেন (ঋ ৩।৪৮।৪)। দেখা যাইতেছে, বৃত্রসংহারের নিমিত্ত বজ্র নির্মাণ যেমন ত্বষ্টার অবিস্মরণীয় কীর্তি, ত্বষ্টাকে পরাস্ত করিয়া ইন্দ্রের সোম-হরণ বেদে সেইরূপ একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এসকল উপাখ্যানের অর্থ বুঝিলে ত্বষ্টা বা বিশ্বকর্মাকে নিশ্চয় চিনিতে পারিব এবং তিনি কেন ইন্দ্রের পিতা, তাহাও জানিতে পারিব।

ইতঃপূর্বে 'প্রবাসীতে' প্রকাশিত বহু প্রবন্ধে আমরা ইন্দ্রের পরিচয় পাইয়াছি। দক্ষিণায়ন দিনে সূর্যের যে শক্তি বৃষ্টি আনয়ন করেন, তিনিই ইন্দ্র। সূর্যরূপ ইন্দ্র স্বর্গে (আকাশে) আছেন, তাঁহার পিতা ত্বষ্টাও নিশ্চয়ই স্বর্গে আছেন। ত্বষ্টা দেবতা, অতএব দীপ্তিমান এবং অমর। সুতরাং নিশ্চয় কোন নক্ষত্রে তাঁহার অধিষ্ঠান। যাঁহারা জ্যোতিস চর্চা করেন, তাঁহারা জানেন, চিত্রা নক্ষত্রের অধিপতি ত্বষ্টা বা বিশ্বকর্মা। বস্তুতঃ এই চিত্রা নক্ষত্রই (Virgo) ত্বষ্টার প্রতিমা। চিত্রা নক্ষত্রের তারাগুলি যোগ করিয়া পরবর্তীকালে একটি 'কন্যা' কল্পিত হইয়াছিল, কিন্তু বেদের কালে ঐ সকল তারাসংযোগে একটি 'বাশি'-ধর, তক্ষণপটু ত্বষ্টাদেবের মূর্তি কল্পিত হইত। ইন্দ্র দক্ষিণায়ন দিনের সূর্য। ইন্দ্র ও ত্বষ্টার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। দক্ষিণায়ন দিনে ইন্দ্র বজ্রদ্বারা বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়া স্বর্গ হইতে বর্ষাধারাকে মুক্ত করিয়াছিলেন; সে বজ্র ত্বষ্টাই নির্মাণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ত্বষ্টা ও দক্ষিণায়ন দিনের সহিত জড়িত। ভারতের আদি আর্য উপনিবেশ পঞ্জাবে প্রচণ্ড গ্রীষ্ম; সেই গ্রীষ্মের প্রকোপে জীবজগৎ ম্রিয়মান হইত; তরুলতা শুষ্ক হইয়া যাইত; প্রান্তর তৃণহীন হইয়া পড়িত। রবির দক্ষিণায়নের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি নামিয়া আসিলে বিশ্বজগৎ যেন নূতন করিয়া গঠিত হইত; প্রান্তরে নবতৃণ অঙ্কুরিত হইত; বনস্পতির শাখা মঞ্জরিত হইয়া পুষ্প-পল্লবে সজ্জিত হইত। তখন প্রত্যুষে পূর্বগগনে ত্বষ্টাদেবের (চিত্রা নক্ষত্রের) উদয় দেখিয়া লোকে ভাবিত, ঐ ত্বষ্টাদেবই বিশ্বকর্মা, নূতন করিয়া বিশ্ব সৃষ্টি করিতেছেন। ভাদ্রমাসের শেষদিকে প্রত্যুষে সত্যসত্যই চিত্রা নক্ষত্রের উদয় দেখা যাইত, এখনও দেখা যায়; কারণ নক্ষত্রের উদয়াস্তকাল নির্দিষ্ট আছে।

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার 'বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল' গ্রন্থে বৃত্র-সংহার উপাখ্যান সবিস্তারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, সর্পাকার বৃত্রাসুরের দীর্ঘ দেহ কয়েকটি নক্ষত্রমণ্ডল দ্বারা গঠিত; তাহার মুখ হস্তা-নক্ষত্রে; পুচ্ছ অশ্লেষা-নক্ষত্রে। এক অতি প্রাচীনকালে হস্তা-নক্ষত্রে রবির দক্ষিণায়ন হইত; বৃত্র-সংহার উপাখ্যানে তাহাই রূপকের সাহায্যে বর্ণিত হইয়াছে। হস্তার পরবর্তী নক্ষত্র চিত্রা। এই প্রবন্ধে আমরা দেখিতেছি, ত্বষ্টার নিকট হইতে ইন্দ্রের সোমহরণের কাহিনী চিত্রানক্ষত্রে রবির দক্ষিণায়ন সূচিত করিতেছে। দিব্য-সোম, চন্দ্র। ত্বষ্টা এই সোমের রক্ষক ছিলেন। ইন্দ্র সেই সোম হরণ করিয়া সর্বোচ্চ স্বর্গে উহা পান করিয়াছিলেন। সর্বোচ্চ স্বর্গ, আকাশে সূর্যের সর্বোত্তর বিন্দু, অর্থাৎ দক্ষিণায়ন বিন্দু। ত্বষ্টা তখন অবশ্যই দক্ষিণায়ন বিন্দুতে অথবা তাহার নিকটে দৃশ্যমান হইয়াছিলেন।

ত্বষ্টার নিকট হইতে ইন্দ্রের সোমহরণ ব্যাপারটা কি? এক্ষণে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে। ভাদ্রমাস শেষ হইয়াছে। রাত্রি প্রভাত হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। তখনও ঊষা প্রকাশ হয় নাই; সূর্য পূর্বদিগন্তের নিম্নে। পূর্বদিগন্তের কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে চন্দ্র দেখা যাইতেছে। সূর্য নিকটে, অতএব এই চন্দ্র কৃষ্ণা-চতুর্দশীর কলা-চন্দ্র। এই কলাচন্দ্রই ত্বষ্টার নির্মিত চমস, সোমপানের দিব্যপাত্র। পার্শ্বে চিত্রা নক্ষত্র-রূপ ত্বষ্টা দীপ্তি পাইতেছেন, যেন তিনিই চমস নির্মাণ করিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে সূর্য উদিত হইলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সূর্যালোকের তীব্রতায় চিত্রা নক্ষত্র ও কলাচন্দ্র অদৃশ্য হইল। ঋষি-কবি এই ঘটনাকেই রূপকের সাহায্যে বলিতেছেন —ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করিবা মাত্র ত্বষ্টাকে পরাজিত ও দূরে বিক্ষিপ্ত করিয়া চমস হইতে স্বর্গীয় সোম পান করিলেন (চিত্র পশ্য)। ত্বষ্টা ইন্দ্রের পিতা। কেন? নক্ষত্রের উদয়ের নাম 'জন্ম'। পূর্ব-দিগন্তে প্রথমে চিত্রারূপ ত্বষ্টাকে দেখা গেল, পরে সূর্যরূপ ইন্দ্রের উদয় বা জন্ম হইল। অতএব ত্বষ্টা হইলেন পিতা, ইন্দ্র তাঁহার পুত্র।

এই ব্যাখ্যার পোষক প্রমাণ ঋগ্বেদের মধ্যেই পাওয়া যাইবে। ঋগ্বেদে আছে, ত্বষ্টার সহিত ঋভু-গণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। ঋভুগণ প্রথমে ত্বষ্টার শিষ্য ছিলেন, পরে তক্ষণ-কর্মে তাঁহারা এতদূর দক্ষতা অর্জন করিলেন যে, দেবলোকে তাঁহারা ত্বষ্টার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে লাগিলেন। ঋভুগণ সংখ্যায় তিনজন ছিলেন, তাঁহারা তিন ভ্রাতা। তাঁহাদের শিল্প-প্রতিভা যে কত-দূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তাহা প্রমাণ করিবার উদ্দেশে তাঁহারা অশ্বিদ্বয়ের নিমিত্ত একটি ত্রিচক্র রথ নির্মাণ করিয়া দিলেন। ত্বষ্টা ইহাতে ঋভুগণের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহাদিগকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। ত্বষ্টার ক্রোধ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ঋভুগণ দ্বাদশ দিন সূর্যের আশ্রয়ে লুকাইয়া রহিলেন।

এই উপাখ্যানের অর্থ বুঝিলে আমাদের পূর্বসিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইবে, তদুপরি বৈদিক ঋষিগণের জ্যোতিষিক জ্ঞান যে কত গভীর ছিল, তৎসম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মিবে। উপাখ্যানে আছে—ঋভুগণ অশ্বিদ্বয়ের নিমিত্ত ত্রিচক্র রথ নির্মাণ করিয়াছিলেন। অশ্বিদ্বয় অশ্বিনী নক্ষত্রের অধিপতি। অশ্বিনী নক্ষত্রে তিনটি তারা, এই হেতু ত্রিচক্র রথের কল্পনা। কেবল তাহাই নহে, অশ্বিনী নক্ষত্রের তিন তারাই তিন ঋভু। নক্ষত্র-চক্রে অশ্বিনীর স্থান প্রথম, চিত্রার স্থান চতুর্দশ। অতএব উভয় নক্ষত্রের মধ্যে ব্যবধান ১৮০° অংশ। আকাশের এক দিগন্তে চিত্রা থাকিলে অপর দিগন্তে অশ্বিনী থাকিবে। ভাদ্র-মাসের শেষে উষা প্রকাশের পূর্বে পূর্বদিগন্তে চিত্রা দৃশ্য হইলে পশ্চিমদিগন্তে অশ্বিনী দৃশ্য হয়। বৈদিক ঋষি-কবি এই ব্যাপারকেই ত্বষ্টার সহিত ঋভুগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (চিত্র পশ্য)।
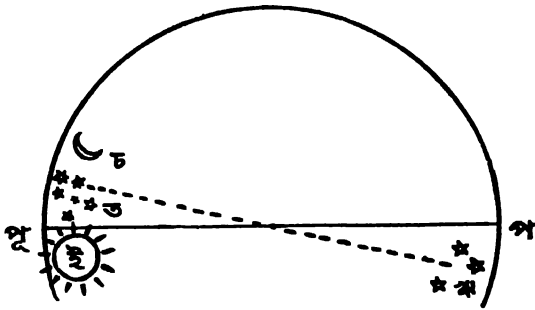
ত্বষ্টার নিকট ইন্দ্রের সোমহরণ এবং
ঋভুগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা
ত—ত্বষ্টা বা বিশ্বকর্মা (চিত্রা)
চ—চমস বা সোমপাত্র (কৃষ্ণা চতুর্দশীর কলা চন্দ্র)
ই—ইন্দ্র (দক্ষিণায়ন দিনের সূর্য)
ঋ—ঋভুগণ (অশ্বিনী)
পূ—পূর্ব দিগন্ত ; প—পশ্চিম দিগন্ত
[দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া চিত্র দেখিতে হইবে]

উপাখ্যানে আছে, ত্বষ্টার ভয়ে ঋভুগণ দ্বাদশদিন সূর্যের নিকট লুকাইয়া ছিলেন। এই ব্যাপারটি বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ। ৩৫৪ দিনে চান্দ্র বৎসর সমাপ্ত হয়, আর সৌর বৎসর শেষ হয় ৩৬৬ দিনে। উভয়বিধ গণনার মধ্যে ১২ দিনের ব্যবধান। ঋষিগণ নিশ্চয় চান্দ্র ও সৌর, উভয়বিধ গণনাতেই অভ্যস্ত ছিলেন। ইহাও বুঝা যাইতেছে, লোক-ব্যবহারে তাঁহারা সৌর গণনাই গ্রহণ করিতেন। পূর্বে দেখিয়াছি, চিত্রার নিকট কৃষ্ণাচতুর্দশীর কলা চন্দ্র ছিল। ঋভুগণ সূর্যের নিকট দ্বাদশ দিন লুকাইয়া ছিলেন—ইহার অর্থ, ভাদ্র অমবস্যায় চান্দ্র বৎসর গণনা সমাপ্ত হইবার ১২ দিন পরে অশ্বিনী নক্ষত্রে নূতন সৌর বৎসর গণনা আরম্ভ হইত। অধুনা তিন বৎসর অন্তর একটি করিয়া মলমাস বাদ দিয়া চান্দ্র ও সৌর বৎসর গণনার সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। দেখা যাইতেছে, বেদের কালে এই রীতিটি ছিল না ; ঋষিগণ প্রতি চান্দ্র বৎসরের অন্তে ১২ দিন পরিত্যাগ করিতেন। কিন্তু চান্দ্র ও সৌর বৎসরের দিন সংখ্যার সম্বন্ধে তাঁহাদের স্পষ্ট জ্ঞান ছিল। আরও মনে হয়, অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র গণনা যে সময়েই বিধিবদ্ধ হউক, ঋগ্বেদের মধ্যেই তাহার বীজ নিহিত ছিল। আর, পশ্চিম দেশের যে সকল বেদ-বিদ্বান্ বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণেরা গ্রীকগণের নিকট হইতে 'নক্ষত্রচক্র' পাইয়াছিলেন, এতদ্দ্বারা তাঁহা-দের সিদ্ধান্তের অসারতা প্রতিপন্ন হইল। গ্রীক সভ্যতার অভ্যুদয়ের বহুকাল পূর্বে ভারতীয় আর্যগণ জ্যোতির্বিদ্যার সার্থক অনুশীলন করিয়াছিলেন। সে কাল তিন-চারি সহস্র বৎসর নহে ; আরও বহু প্রাচীন কাল। এক্ষণে আমরা সেই কাল নির্ণয় করিব।

ত্বষ্টার নিকট হইতে ইন্দ্রের সোম-হরণের উপাখ্যান ব্যাখ্যা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে এককালে চিত্রা নক্ষত্রে রবির দক্ষিণায়ন হইয়াছিল, বেদের ঋষি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। বর্তমান কালে আর্দ্রা নক্ষত্রে রবির দক্ষিণায়ন হয়। নক্ষত্র চক্রে আর্দ্রার স্থান ষষ্ঠ, চিত্রার স্থান চতুর্দশ। উভয়ের মধ্যে নক্ষত্র ভাগের ব্যবধান। অয়ন-চলন (Precession of the Equinoxes)—হেতু অয়ন-দিন এক নক্ষত্র ভাগ পশ্চাদ্গত হইতে প্রায় ৯৫০ বৎসর লাগে। অতএব অদ্যাবধি প্রায় ৯৫০ × ৮ = ৭৬০০ বৎসর পূর্বে চিত্রা নক্ষত্রে রবির দক্ষিণায়ন হইয়াছিল ; ত্বষ্টার কাহিনীতে সেই স্মৃতি রক্ষিত হইয়াছে। আনুমানিক খ্রীঃ-পূ ৫৬০০ অব্দের কথা। ঋগ্বেদে কত প্রাচীনকালে ভারতীয় আর্যগণ বর্ষশেষে বিশ্বরূপ বিশ্বকর্মা ত্বষ্টাদেবের অর্চনা করিতেন। সেই পুরাতন স্মৃতি অনুসরণ করিয়া অদ্যাপি আমরা ভাদ্র সংক্রান্তিতে বিশ্বকর্মার পূজা করিতেছি ; কর্মকারগণ আনন্দোৎসব করিয়া বন্ধুবান্ধবগণকে ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করিতেছেন ; বালক-যুবকেরা ঘুড়ি উড়াইয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছে। এক্ষণে 'ছাতা-পরব' সম্বন্ধে দুই-এক কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

পূর্বে বলিয়াছি, 'ইন্দ-পরবে'র সহিত 'ছাতা-পরবে'র সাদৃশ্য আছে। ইন্দ-পরব, ইন্দ্রধ্বজোৎসব। স্মৃতিতে ইহাই 'শক্রোত্থান' নামে প্রসিদ্ধ। প্রবাসীতে (পৌষ-১৩৬১) 'ইন্দ পরব' বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছি। 'ছাতা পরব'ও ইন্দ্রোৎসব। সেদিন ছত্র অর্ঘ্য দিয়া ইন্দ্র-দেবেরই পূজা হয়, তাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞ হয়। ভাদ্র-সংক্রান্তিতে বিশ্বকর্মা ও ইন্দ্র, পিতা ও পুত্র, উভয় দেবের অর্চনা হয়, কারণ উভয় দেবতাই দক্ষিণায়ন-দিনের সহিত জড়িত। বিহারে শক্রোত্থান-দিবসে (ভাদ্র শুক্লা একাদশী) 'করমা-পরব' নামে একটি পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। তাহাতে 'করম-রাজা'র পূজা হয়। 'করম-রাজা' বিহারে বহু-পূজিত দেবতা। তাঁহারই নামানুসারে একটি স্থানের নাম 'করমাটাঁড়' হইয়াছে। করমা বিশ্বকর্মা, টাঁড় বিস্তৃত প্রান্তর। সাঁওতাল ও কোলদের মধ্যে 'করম' নাম বহু-প্রচলিত। 'করম রাজা' যে বিশ্বকর্মা, তাহাতে সন্দেহ নাই। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় আছে, "রাজা কারিগর বিশ্বকর্মা স্বর্গে মর্ত্ত্যে মিস্তিরি।" দেখা যাইতেছে, ভাদ্র-সংক্রান্তিতে বিশ্বকর্মা পূজার দিন যেমন 'ছাতা পরবে' ইন্দ্রদেব পূজিত হ'ন; সেইরূপ ইন্দপরবের দিন ইন্দ্রের পিতা বিশ্বকর্মাও পূজা পাইয়া থাকেন। এক-কালে ভাদ্র সংক্রান্তিতে উভয়েই পূজিত হইতেন; আবার এককালে ভাদ্র শুক্লা একাদশীতে পিতাপুত্রের পূজা হইত। সে কাল খ্রী-পূ ৩২৫৬ অব্দ ('ইন্দ পরব' পশ্য)। 'ছাতা পরব' কোনক্রমেই অনার্যোৎসব নহে; এই পরবে ইন্দ্র-যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তবে ইন্দ-পরব ও ছাতা পরবে অনার্যেরা বিশেষ ভাবে যোগদান করে, আমোদ-আহ্লাদ করে। বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতভূমিতে আর্য ও অনার্যের একত্র বসবাসের ফলে ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। যে উৎসব যত অধিক পুরাতন, সেই উৎসব তত অধিক অনার্যরাও গ্রহণ করিয়াছে।

ত্রিশিরা-মনসা

শ্রীতারকপ্রসাদ ঘোষ

প্রজ্বলিত নিদাঘের নগ্ন নভস্তল
দু'হাতে ছড়ায়ে' মরে পুঞ্জ পুঞ্জ লেলিহান উলঙ্গ অনল
দিক-দিগন্তরে—
দহনান্তে পৃথ্বী-দেহে কাঁপে ব্যথা, কোথা যেন অসহ্য সঙ্কেত
পাংশু তনু শীর্ণ স্তন জরাজীর্ণ প্রসূতির প্রজননিষ্ণু স্বেদ
অনর্গল ঝরে,
ওষ্ঠাগত শুষ্ক তালু খুঁজে-ফিরে একবিন্দু সুশীতল জল,
তুমি এলে বুকে তার নবজাত গুল্ম-শিশু ত্রিশিরা-মনসা!

নিরুদ্ধ যৌবনে জ্বলে কালাগ্নির জ্বালা
যেন ক্রুদ্ধ পন্নগের উদ্গারিত কালকূটে মহামৃত্যুমালা
কণ্ঠে দোলে তব!—
যুগান্তের যত বিষ, বিষভরা নির্ব্বেশের সার্ব্বিক ব্যঞ্জনা
অনুলিপ্ত চিত্তমাঝে—কবেকার দিন হ'তে নাহি জানাশোনা
নিত্য নব সব
উগ্রতার,—অপরূপ রূপ-ভ্রংশী তিক্ততার অমূর্ত্তির ডালা
দেয় ভরি' থরে থরে অন্তর্দ্দাহ-মদিরার অনন্ত তিয়াসা!

দুরন্ত আয়ুর বেগ দুর্ম্মদ দুর্ব্বার,
নৃত্য তার অফুরান, শিরায়-শিরায় ব্যাপ্ত শ্যামল-সঞ্চার
আকীর্ণ কণ্টক!—
অজস্র হরিৎ-স্নান সোম-সূর্য্য-রশ্মিতলে নিত্য-নৈমিত্তিক,
দুঃসহ কৈশোরের আশ্চর্য্য আবেগ-দৃপ্ত উচ্ছ্বাস নির্ভীক
চাপল্য-ব্যঞ্জক,—
সময়ের ঊর্ম্মিভঙ্গে ফেনায়িত কূলে কূলে নির্ব্যূঢ় নির্ঝর
আদিগন্ত দৌরাত্ম্যের বন্যামুখী নেশা-ঘোর নিরন্ধ্র তমসা!

অনমিত দৃপ্তদম্ভ অনন্ত-পুঞ্জিত,
সূক্ষ্ম তব সূচ্যগ্রের অন্তরালে স্তব্ধ যেথা বিদ্যুৎ-স্ফুরিত
বহ্নি-নীলাঞ্জন,—
চিরোন্মাদ চলে মৃত্যু-আহরণ অহর্নিশ, সকালে সন্ধ্যায়,
আগ্নেয় নির্ম্মোক খসে অনির্ব্বাণ, ভাব-রুদ্ধ কোন্ প্রতীক্ষায়,
ওগো অকিঞ্চন,
সে-কী তব নিঃস্বতার তেজঃতীক্ষ্ণ প্রতিবাদ বিদ্রোহ-পূরিত,
রুদ্র কালবৈশাখীর বজ্র-গর্ভ বেদনার জামদগ্ন্য-ভাষা?

মর্য্যাদা

শ্রীদেব শর্মা

১

বিশ্বেশ্বরের বয়স হয়েছিল। প্রথম পক্ষ গত। বড় ছেলে আছে। বিলেতে পড়ে। বয়সকালে শুধু কাজ নিয়ে আর দিন কাটে না। সঙ্গী চাই। তাছাড়া সারাদিন হাতুড়ি আর যন্ত্রপাতির আওয়াজ শুনে শুনে মনটা রস-পিয়াসু হয়ে ওঠে।

বিশ্বেশ্বর ভাবে, তার আর-একবার যদি…।

তবে এর মধ্যে আর একটু কথাও নাকি ছিল। ছেলে বিলেতে নাকি বিয়ে করে ফেলেছে কাকে। বিশ্বেশ্বর বেশ অসন্তুষ্ট তাতে। সম্পত্তির কিছু অন্য কাউকে দিয়েও যেতে পারে। হরিহর অবশ্য সে সুযোগ নেয় নি। কেবল মেয়েটার আজন্ম খাওয়াপরার কোন কষ্ট হবে না এ ব্যবস্থা সে কায়েমি করে যেতে চেয়েছিল। ওর সংসারে কেউ নেই। ওরা মাত্র দুটি প্রাণী—বাবা আর মেয়ে।

বিশ্বেশ্বরই এলেন এগিয়ে। কারণ মেয়েটি সুন্দরী। হরিহর হাতে স্বর্গ পেলেন।

জমিদার বিশ্বেশ্বরবাবু কলিকাতা গেছেন। ফিরবেন শীঘ্র। তিনি নাকি বিয়ের ব্যাপারটা গ্রামের বাড়ীতেই করতে চান। পুরণো জীর্ণ নায়েব তার ফোগলা গালে বড় কঠিন হাসি হেসে কথাগুলি জানিয়েছিল।

শুভকাজ শান্তিতে ও ভালভাবেই ঘটেছিল। কোন বাধা পড়ে নি। কোন বিপত্তি হয় নি। সন্ধ্যার আগে থেকেই গ্রামের মাথারা কেবল কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য মাথা ঘামিয়েছে। সাহায্য না চাইতে সাহায্য এসে পড়েছে ঘরের ভেতর।

হরিহরের চোখে জল এসে গেল। সে আর সামলাতে পারলে না।

গলার চাদরটার ওপর দু'হাতের ভর রেখে হরিহর বলল, "ভাই, তোমরা আমার প্রণাম নাও। এ তোমাদেরই মেয়ে। তোমরাই দেখো। তোমাদের আশীর্বাদেই রমা আজ রাজরাণী হতে চলেছে।"

যতই বলে ততই হরিহরের চোখের জল বেয়ে চলে। চট্ করে কারো মুখে কথা সোরলো না। একটু পরে ভীম মোড়ল বলল, "আরে! আপন লোকদের কি অমন করে বলতে হয়?"

"আমি ত কখনও কাউকে পর ভাবি নি ভাই।"

"কে বলেছে তা। তুমি ওদিক দেখগে যাও। এক্ষুণি সম্প্রদান করতে হবে যে গো। আমরা সবাই এদিক সামলাচ্ছি।"

সামলাবার আর কি আছে। এদিক ওদিক সবদিকই ত সামলানো হয়ে গেছে। যার কাজ সেই সামলেছে।

পাল্কি ছাড়তেই হরিহর এসে ভীম মোড়লের হাত ধরলো। গ্রামের লোক যে তাকে এত ভালবাসে, এত করে তার জন্য—এ ত হরিহর আগে বোঝে নি। শুধু অবুঝের মত কত কিছুই না করে গেছে। তাকে এবার ক্ষমা করতে হবে। হরিহর সবার দাসানুদাস হয়ে থাকতে চায়।

ভীম মোড়ল বলল, "সে কি! কি যে বলছ তুমি। তুমি এত লোকের কত কি কর ও করছ। আমরা কি-এমন করলুম। নিজেদের কাজ নিজেরা করেছি মাত্র।"

"না না, তুমি বুঝবে না যে কত অনুগ্রহ করেছ আমাকে তোমরা সবাই মিলে।"

হরিহর চিরকাল সাদা মানুষ। চিরকাল সকলের ভাল করে এসেছেন। কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই ছিল তাঁর অনুগত। গাঁয়ের লোকে বলতো, এমন লোক আর হয় না।

আনন্দের আতিশয্যেই হোক বা যে কারণেই হোক, মেয়ে-বিদায়ের পর তাঁর শরীরটা কেমন করে উঠলো। হঠাৎ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তিনি পড়ে গেলেন।

সকলে হৈ হৈ করে উঠলো। মাথায় জল ঢালা হোলো, পাখার বাতাস করা হোলো, কবিরাজ এলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হোলো না। হরিহর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

শুভকাজের পরেই এমন খবর মেয়ের কাছে সদ্য সদ্য পাঠাতে কারুর সাহস হোলো না। ভীম মোড়ল নিজেই সব ভার নিলে।

২

তার পর অনেকদিন গত হয়েছে। জমিদার বিশ্বেশ্বরও

আর নেই। কাজেই রাজরাণী আবার ভিখারিণী। রাজ-প্রাসাদে তার আর স্থান হোলো না। তাকে ফিরে আসতে হোলো পিতৃগৃহে।

এ কথা বুঝতে কারো দেরি হয় নি যে, জমিদারের প্রাসাদে বাড়ীর বৌ হিসাবে রমার ঠাঁই হয় নি। বিশ্বেশ্বর গত হয়েছেন। আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অধিকার থেকে রমা চির-বঞ্চিতা। আর অধিকার প্রতিষ্ঠাই বা করবে কে? যাকে নিয়ে দাবি করা চলে সে এতই ছোট ও অসহায় যে তার পিছনে পিছনওয়ালা চাই। রমা তার এই ছোট্ট ছেলেটিকে নিয়েই বেশী বিব্রত হোলো।

এ সব কথা ভীম মোড়ল বেশ ভালভাবেই বুঝেছিল। গ্রামের ঘরে ঘরে, দোরে দোরে, ঘাটে ঘাটে, পথে পথে, মুখে মুখে এ কথা আলোচনা হয়েছে। রমার অসহায় অবস্থার কথা একে একে সবাই জেনেছে।

রমার যে ক'টা টাকা নিজস্ব ছিল তা দিয়ে কিছুদিন চলল। মাঝে মাঝে দু'চার জন হিতাকাঙ্ক্ষীও আসে। ক্রমে সবই বন্ধ হয়ে যায়।

সেদিন পাশের গ্রামের করিম এসেছিল। কোন এক সময় হরিহর তাকে নাকি বাঁচিয়েছিল কি একটা বিপদের গ্রাস থেকে। তাই বুড়ো হয়েও সে সে-কথা ভুলতে পারে নি। রমাকে মা বলেই ডাকত বরাবর। মা'র দুঃখের কথা শুনে সে দেখা করতে এসেছিল। সঙ্গে করে করিম অনেক কিছু জিনিসপত্তর এনেছিল মার জন্য।

"মা। মা আছিস্। রমা মা আছিস্।"

জ্বরে ভুগে ভুগে রমা বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে বলল, "কে? করিম জ্যাঠা?"

"হ্যাঁ রে।" করিম হাঁপ ছাড়ল। একটু জিরিয়ে নিয়ে রমার দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল। বললে, "সোনার প্রতিমা কি হয়েছে? এত শরীর খারাপ?"

ম্লান হাসির রেখা রমার মুখে ফুটে উঠলো।

আচ্ছা মা। মুসলমানের ভাত খেলে কি তোর জাত যাবে? তোর বাপ ত অনেকবার খেয়েছে। আর যদি তাই হয় ত শুধু থাকবি চ না মা আমার কাছে? দুটো ভাত নিজেই নয় ফুটিয়ে নিবি।

আরক্ত মুখে রমা উত্তর দিল, "কি বলছ করিম জ্যাঠা? নিজের বাড়ী ছেড়ে কোথায় যাব বল?"

"তুই বড় বুদ্ধিমান মেয়ে মা। নিজের বলে আর তোর কি আছে বল? তার ওপর রোগে ভুগছিস্। চিকিৎসা নেই। পথ্য নেই। ছেলেটাকেও কষ্ট দিচ্ছিস্।"

"ও এসেছে নিজের ভাগ্য নিয়ে। আমি কি করবো?"

"ভাগ্য মা ভালই। তোর কষ্ট থাকবে না। দেখিস্, আমি বলছি।"

"তুমি মুখ-হাত-পা ধোও।"

"তা ধুচ্ছি। এই জিনিসগুলো ঘরে তুলে রাখ।"

"এত কিছু আনলে কেন?"

"কিছুই নয় রে; তোর দিন কি করে কাটছে ভাবলে এ সব তার কাছে কিছুই নয়। কিছুই নয়।"

রমা চুপ করে রইল। করিম আবার শুরু করলে, "তুই বোধ হয় ভাবছিস যে, আমি মরে গেলে তোর কি হবে। তোর সে ব্যবস্থাও আমি করে দিয়ে তবে যাব। কোন ভাবনাই থাকবে না রে। তোর বাপ আমার যা করেছে তা মানুষে পারে না। আল্লায় পারে।"

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে রমা বলল, "গ্রামের লোকেরা আমায় দেখে ত। আমার কোন কষ্ট নেই। এই ত সেদিন কবিরাজ মশাই নিজে এসে ওষুধ দিয়ে গেছেন।"

"যা দেখছি তাতে করে আর কিছুদিন বাদে তোকেই হয়ত দেখতে পাওয়া যাবে না।"

একটু থেমে চৌকিটা অল্প এগিয়ে নিয়ে করিম আবার বলল, "হাঁরে, তোর শ্বশুর বাড়ীর কোন সম্পত্তি তুই পাবি না? তুই একবার মত কর, তোর হয়ে আমি লড়ে দেখি।"

"না। করিম জ্যাঠা। তা হয় না।"

"কিছুই তোর হয় না। তুই তবে নিজের বাড়ী ছেড়ে চলে এলি কেন?"

"উপায় ছিল না।"

"কি হয়েছিল তোর?"

"এমন কিছু নয়।"

"না। তোকে সব বলতে হবে আমায়। তোর কষ্ট আমার সহ্য হয় না। এ ত কতবার বলেছি। হরিহরের মত মানুষ এ তল্লাটে নেই। আর তুই তার মেয়ে হয়ে এত কষ্ট পাবি? সকলের চোখে এত হেয় হবি। এ কি আমার সহ্য হয় রে মা!"

করিমের চোখে জল টল্‌টল্ করে উঠলো; রমা চুপ করে আছে। করিমের বার বার পীড়াপীড়িতে রমাকে কিছু প্রকাশ করতেই হ'ল।

সে বলল, "আপনার জামাই অনেক ভুগলেন। কোন ডাক্তারই কিছু করতে পারল না। মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাকে অনেক কিছু বুঝিয়ে গেলেন। টাকা-পয়সা, জমাজমি, হিসাব-নিকাশ। আমার মাথায় কিছুই গেল

না। কতটা আমার, কতটা তার বড় ছেলের, কতটা তার ছোট ছেলের—এই সব বোঝাতে লাগলেন। নায়েবকে ডেকে সব বলেও দিলেন। সব কাগজপত্তর ঠিক করে নায়েবের কাছেই রেখে দিলেন। আসল লোক চলে যাচ্ছে। আমার ওসবে কি হবে? আমি ওসব মাথায় নিতে পাচ্ছি না। শুধু ভগবানকে একমনে ডেকে চলেছি।"

"তার পর?"

"কিন্তু কিছুই হোলো না। যিনি যাবার তিনি চলে গেলেন। সবই উল্টে পাল্টে গেল। হঠাৎ সেই নায়েব এসেই একদিন জানালো যে, বড় ছেলে আসছে বিলেত থেকে। সে মেম বিয়ে করেছে। বাপের এ বিয়ে সে মানতে চায় না। সম্পত্তির কোন কিছুই সে ছাড়বে না। ভালয় ভালয় ঘর না ছাড়লে সে এসে নিজেই সব ব্যবস্থা করবে।"

বৃদ্ধ করিম হঠাৎ ক্ষেপে উঠে বলে উঠলো, "যত বড় মুখ নয় ব্যাটার তত বড় কথা?" পরক্ষণে শান্ত হয়ে বললে, "তা, তুই চলে এলি কেন?"

"ভালয় ভালয় সব কিছু করাই ত ভাল। নায়েব আমাকে বুঝিয়েছিল! বলেছিল আইনের পথে আমি চিরজয়ী। ঘর ছাড়ি সে একবারও তাতে রাজী হয় নি। ছেলে নতুন বৌ নিয়ে ঘরে আসছে। তার যেমন করে থাকতে ইচ্ছা তাতে আমি কেন বাধা দেব? মেম সাহেবের কথাও আমি বুঝব না। তাকে আমার কথাও বোঝাতে পারব না। শুধু শুধু কষ্ট আর অশান্তির সৃষ্টি করা হবে।"

করিমের দু'চোখ দিয়ে দর দর করে জল গড়িয়ে পড়ল।

মাথা নাড়তে নাড়তে বারবার সে বলল, "লক্ষ্মীকে তাড়িয়ে কি করে থাকবে তারা। এ সইবে না মা। এ কখনও সইবে না!"

এ রকম করে আর ক'দিন চলে। এখন অচল। নিজের হাতেও কিছু নেই। শুভ কামনা নিয়ে যারা আসত তারাও আর আসে না। কেন আসে না বোঝা ভার। তারা এলে আর কিছু হোক বা না হোক, কথা বলা চলে। মনটা কিছুটা শান্ত হয়। ভার কমে। কিন্তু তারও উপায় নেই।

রমাকে বাড়ী বাড়ী বেরুতে হয়েছে। দু'বেলা দু'বাড়ী কাজ করে। তাতে সামান্য কিছু পায়। ছেলেটার দুধ জোটাতে পারে তাই গয়লা পাড়ার এক-জনদের গরুর কাজ করে। আর শাক ভাত কোন রকমে হয়। তবে তারাও মাঝে মাঝে ক্ষেপে যায়। ছাড়িয়ে দিতে চায়। কখনও আবার মাইনে ঠিক ঠিক দেয় না। তবে মাঠাকুরুণদের কৃপায় কখন কখন কিছু জুটে যায়।

এখন ত আর উপায় নেই। ক'দিন ধরে জ্বর হয়েছে। খাটতে যেতে পারছে না রমা। হাঁড়িও চাড়তে পারছে না সে। আর কি দিয়েই বা কি করবে। ঘরেতে ত এমন কিছু নেই যে ছেলেটাকে দেয়। পাড়ায় বেড়িয়ে বেড়িয়ে সে যা পায় তাই মুখে দেয়। আর মা'র কাছে এসে কাঁদে। রমা মুখ বুঁজে পড়ে আছে।

সেদিন বড় দুর্যোগ। বৃষ্টি আর ঝড়ের শেষ নেই। অবিরাম গোঁ গোঁ শব্দ আর বৃষ্টি পড়ে চলেছে। আশ্বিনের গোড়ায় এমন একটা দেখা যায় না। কখন কখন অল্প অল্প ঝড়-জল হয় মাত্র। এবার যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে। মনে হচ্ছে, এ যেন থামবে না।

রমার জ্বর ছেড়ে গেছে। বড় দুর্বল। ক্ষীণ শরীর। এ দুর্যোগে সে আর বেরুতে পারলো না। ঘরে সামান্য মুড়ি ছিল। তাই ছেলেটাকে দিয়েছে কোন্ সকালে। আর কিছুই নেই যে দেবে। নিজেও কিছুই মুখে দিতে পায় নি।

রমা ঘরে শুয়ে আছে। উঠতে পারছে না। বড় কষ্ট হচ্ছে। বাইরে দালানে ছেলেটা কাঁদছে।

ঘর থেকে রমা ডাকছে। সে শুনছে না। সাড়া দিচ্ছে না। শুধু কেঁদেই চলেছে।

হঠাৎ কান্না থেমে গেল। অন্য কার গলাও পাওয়া যাচ্ছে। রমা ভাবছে উঠে গিয়ে দেখে কি হোলো।

এমন সময় ছেলেটা ঘরে ঢুকে বলল, "মা, নায়েব কাকা।"

রমা ধড়মড়িয়ে উঠে এসে দেখলো, নায়েব মশাই ছাতি ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তখনও বৃষ্টি পড়ছে। তবে তত জোরে নয়। ছাতির তলায় একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। অত অস্পষ্ট আলোতে তেমন দেখা যাচ্ছে না।

যা দেখা গেল, তাতে রমা বুঝতে পারল যে, এ আমাদের মত সাধারণ ঘরের মেয়ে নয়। ছোট চুল, কটা কটা ভাব। চোখের মণি কাল নয়—সবুজ সবুজ ভাব আছে। গাল দুটি যেন দুটি আপেল। পাতলা লম্বা অথচ গোলালো গড়ন। গায়ের দুধের মত রংটাকে একটা দেশী তাঁতের লাল শাড়ীতে ঘিরে রয়েছে।

রমাকে দেখেই সে বলে উঠল "মা আমি, মা!"

বাংলা ভাষায় বলল, বেশ বলে। তবে একটু যেন কেমন কেমন শোনায়—কথাটায় নয়, স্বরটায়। তবু

বেশ। দূর থেকে ভেসে-আসা একটা শান্ত ক্লান্ত নম্র আওয়াজ।

"এসো মা, এসো।"

বৃষ্টিতে অনেকখানি ভিজে গেছে মেয়েটির। জুতায়, কাপড়ে কাদাও লেগেছে। ধীরে ধীরে উঠে এলো দাওয়ায়। এমন মুখ-চোখের ভাব, দেখে মায়া হয়। রমার বুকের ভেতরটা হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠলো। কি জানি, আজকালকার ছেলে:তার উপর আবার বিলেতের শিক্ষা। এই কচি মেয়েটার কিছু হয় নি ত! তবে এখানে কেনই বা এমন অসময়ে এসেছে!

নায়েব মশাই এসে দাওয়ায় মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে বলল, "মা। বৌমা এসেছেন আপনাকে নিয়ে যেতে।"

"তা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমায় নিতে কেন? এসো মা। এসো, ঘরের মধ্যে এসো।"

ঘরে প্রদীপের নিষ্প্রভ আলোতে আবার রমা মেয়েটিকে দেখলে। যা দেখেছে ঠিকই ত। এমন রূপ আর হয় না।

রমার দু'পায়ের ওপর মাথা রেখে মেয়েটি বলল, "মা আমায় ক্ষমা করবেন। আমি মাত্র কিছুদিন আগে নায়েব কাকার মুখে সব শুনেছি। আপনার ছেলেও মা লজ্জা পেয়েছে। ক্ষমা চাইতে আসতে পারে নি। আমি মা তাঁর হয়েও ক্ষমা চাইছি।"

"ওঠো। ওঠো। ক্ষমা আবার কি জন্য? আর তারই বা লজ্জা কিসের? সেত আর আমাকে কখনও দেখে নি বা জানে নি। হ্যাঁ মা, তোমার নাম কি?

"আগে অন্য নাম ছিল। যেদিন থেকে সিঁদুর পরেছি সেদিন থেকে আমার নাম সাবিত্রী।"

"এখনও ওঠ নি যে?"

"আগে বলুন, আমাদের দু'জনকে ক্ষমা করলেন।"

রমা আর থাকতে পারল না। তার চোখে জল এসে পড়েছে। সাবিত্রীও কাঁদছে। রমার পা ভিজে উঠেছে। হাত ধরে তুলে রমা বলল, "তোমাকে যে কোথায় বসাই তার ঠিক নেই। এখানেই একটু বসো মা।"

"আমি বসতে আসি নি।"

"তবে?"

"ক্ষমা ভিক্ষা নিতে এসেছি।"

"কিসের ক্ষমা? কি এমন অপরাধ করেছ তোমরা।"

"যা করেছি তার ক্ষমা হয় না। তবু তুমি মা বলেই ক্ষমা চাই।

"ছেলে-বৌয়ের অপরাধ আবার অপরাধ নাকি যে, তাকে ক্ষমা করতে হবে।"

"তবে তুমি আমার সঙ্গে চল।"

"কোথায়?"

এবারে আমরা এসেছি। প্রথম দুর্গাপূজা করবো এখানে। তুমি আমাদের সব ব্যবস্থা করে দেবে এসো।"

"সে কি হয়?"

"কেন?"

"আমার অধিকার কি?"

"তার মানে? তোমারই ত সব।"

"তা নয়। ছেলে আছে, তুমি আছ। আর না হয় তোমার ঐ দেওরটিকে নিয়ে যাও। ওকে আমি বঞ্চিত করতে চাই নে।"

"ও আগেই নায়েব কাকার সঙ্গে গিয়ে গাড়ীতে বসেছে। মা আনন্দময়ী আসছেন। আমরা তাঁর আরাধনা করবো। আর তুমি যাবে না? একি কখনও হতে পারে?"

"আমি ত বেশ আছি।"

"তোমার কথা বুঝি তুমিই নিজে কেবল বুঝবে। আর আমরা তোমার বৌ-ছেলে তোমার কথা কিছুই বুঝব না, জানব না। তোমার কথা ভাববার আমাদের কোন অধিকার নেই?"

রমার মুখে তাড়াতাড়ি জবাব এলো না। সে সময় নিলো। বিদেশী মেয়ের মুখে এরকম কথা সে আশা করে নি।

"মা বলে যখন মানছ তখন মা'র কথা শুনছ না কেন?"

সাবিত্রীর মুখটা আরক্ত হয়ে উঠল। লাল মুখ হঠাৎ আরও লাল হয়ে গেছে রাগে নয়—দুঃখে আর খেদে। সে বুঝেছে ভারতের মেয়েরা সবই মায়ের জাত। না-পাওয়ার মধ্যেই এদের সব-পাওয়া।

তবু সাবিত্রী তার জিদ্ ছাড়তে চায় না। সে এসেছে মাকে ঘরে নিয়ে যেতে, তাকে পূজা করতে। ব্যর্থ হয়ে ফিরতে পারবে না সে।

মনে পড়ে গেল তার স্বামী তাকে ভরসা দেয় নি। সে বলেছিল, "সাবি, এঁরা কি ধরনের মানুষ তুমি জান না। আমি যেতে লিখেছি বলেই সব ছেড়ে চলে গেছেন। সর্বস্বত্যাগী বাংলা দেশের মেয়েদের তুমি চেন না। যদি আনতে পার ফিরিয়ে ত আমার চেয়ে আনন্দ আর কারও বেশী হবে না। তবে আমি নিজে যেতে ভয় পাই। হয়ত আমার যাওয়াতেই ওর যে আনন্দ হবে, তার পর আর আসার মন থাকবে না।"

একটু বাদে সাবিত্রী আবার বলল, "তোমার ছেলেকেও কি দেখতে যাবে না মা?"

"তুমি যে কি বল। ওকে ত আমি তোমার মধ্যেই দেখতে পাচ্ছি। তুমি তোমার দেওরটিকে দেখো তা হলেই হবে। আমি বেশ আছি। আমার জন্য অত ভেবো না বৌমা। তোমরা সুখে থাকলেই আমার সুখ।"

সাবিত্রী রমাকে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করল। তার পর উঠে বলল, "মা, তুমি আমায় তাড়িয়ে দিলে। স্বামীর কাছে মুখ দেখাতে পারব না। তবে যাবার আগে একটা কথা জেনে যাই—মা, যেখানে মায়ের মর্যাদা নেই সেখানে মেয়ের মর্যাদা কি করে থাকবে আমাকে বলতে পার?

সাবিত্রী চোখের জল গোপন করে চলে যাচ্ছিলো। রমা তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলে। এইটুকু বিদেশী মেয়ে এত বোঝে।

রমার মুখে আর কোন উত্তর এলো না।

অনধিকারী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

রবি-মণ্ডলে বিদ্রূপ করি গড়ায়ে গড়ায়ে ভাঁটা—
দেখায় তাদের গীতিময় গতি—অন্ধপথেতে হাঁটা।
রামপ্রসাদের শুনি মা মা ডাক্—
ভক্ত গুণী ও জ্ঞানীরা অবাক,
সে অমৃত সুর বিকৃত করে অজ্ঞাতে আগ পাঁটা।

২

উষর ক্ষেত্র—জন্মায় যেথা কেবল ক্যাকটাকস্
কেমনে চিনিবে সূর্য্যলোকের মানসের তামরস?
ফুলহীন ঝাড় ফণি মনসার,
বন ঝাউ লয়ে তার কারবার
কলুষিত চিৎ নিকষে লাগে না চিন্তামণির কস।

৩

মাখি' পারিজাত পরাগ অঙ্গে নন্দন বন ছায়—
স্বরগ হইতে এই পৃথিবীতে যে বায়ু বহিয়া যায়,
হাঁপাইয়া উঠি আমরা যে তাতে,
সে সুরভি যেন সহে না এ ধাতে,
অপটু পটুয়া কানা হয়ে ফিরি রূপের অজন্তায়।

৪

সুদূর-পিয়াসী সাধক—যাঁদের ধ্রুবলোকে গতায়তি—
না বুঝি তাঁদিকে অবজ্ঞা করি আমরা মন্দমতি।
পূজ্য পূজার ব্যতিক্রমের—
কত যে বেদনা পরে পাই টের,
কোনো কর্ম্মেই লভিতে পারিনে যোগেশ্বরের প্রীতি।

৫

পরশ-পাথর চিনিতে পারিনে চিনিনে পরম ধন—
জানিতে পারিনে লৌহ পৃথিবী কারা করে কাঞ্চন,
চির রস নিস্যন্দী নির্ঝর—
কাম্য কূপের বুঝিনাক দর,
রুগ্ন পাণ্ডু চক্ষু মাগিছে অমৃতের অঞ্জন।

বিপ্লবীর জীবন-দর্শন

প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী

(১০)

ঢাকা থেকে মাত্র দশ মাইল দূরে নারায়ণগঞ্জ শহর পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর সুন্দর স্থান বলে খ্যাত ছিল। শীতলক্ষ্যার জলের নির্মলতা ও বিশুদ্ধতা ছিল দেশ-বিখ্যাত। নারায়ণগঞ্জ ঢাকারই বন্দর ছিল এবং এজন্য ঢাকা শহরের অংশ বলে গণ্য হ'ত। শুধু ঢাকা নয়, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা এবং সিলেটের কতকাংশের কলকাতার সঙ্গে আমদানি-রপ্তানি ও যাত্রী-যাতায়াতের কেন্দ্র হিসেবে নারায়ণগঞ্জ পূর্ববঙ্গে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

সমগ্র বাংলা দেশে একমাত্র কলকাতা ভিন্ন পাটের এত বড় ব্যবসা-কেন্দ্র আর কোথাও ছিল না। নদীতীর সংলগ্ন হয়ে মাইলের পর মাইল জুড়ে বিস্তৃত ছিল—বড় বড় পাটের গুদাম ও অফিস। কারখানার আকাশচুম্বী চিম্‌নিগুলি দিবারাত্রি ধূম উদ্‌গীরণ করতে থাকত।

এখানে কোটি কোটি টাকার পাট ক্রয়-বিক্রয় হতে দেখেছি। দূর দূর থেকে নৌকা বোঝাই করে কত ব্যবসায়ী এবং গৃহস্থ পাট নিয়ে আসত তার ইয়ত্তা নেই। কেন্দ্রীয় দপ্তর নারায়ণগঞ্জে স্থাপিত হলেও বিভিন্ন অফিসের শাখাসমূহ সারা পূর্ববঙ্গে ছড়িয়ে থাকত। সে সব জায়গা থেকে পাট জমায়েত হতো নারায়ণগঞ্জে। পরে আসত কলকাতায়।

কত বিচিত্র কাজে এখানে মানুষ জীবিকা নির্বাহ করত—পাটের অফিসের কুলী-মজুর, কেরাণী, খরিদ্দার-বাবু এবং সহকারী, কয়াল, যাচনদার, দারোয়ান, মাঝি-মাল্লা, ছোট বড় ব্যবসায়ী, আড়তদার, ফড়িয়া, শত শত ষ্টিমলঞ্চের সারেং খালাসী। এই ত গেল কেবল পাটের ব্যবসায় প্রত্যক্ষভাবে নিযুক্ত মানুস। এ ছাড়াও আর এক শ্রেণীর মানুষ যারা এদের অন্ন-বস্ত্র এবং অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যাদির জোগান দিয়ে দু'পয়সা কামাত। সর্বোপরি ছিল পাটের অফিসের কয়েকশত ইউরোপীয় কর্মচারী। এত সাদা-চামড়ার লোক বোধ হয় একমাত্র কলকাতা ছাড়া বাংলা দেশের আর কোথাও ছিল না।

বহু নদ-নদীর সঙ্গমস্থলে নারায়ণগঞ্জে কেবল ষ্টিমার-ষ্টেশনই ছিল না, স্থলপথের যোগাযোগ রক্ষার জন্য ছিল রেলওয়ে। সুতরাং পাট ভিন্ন আরও অনেক জিনিসের কোটি কোটি টাকার কারবার চলত এখানে। পাট ছাড়া অন্যান্য ব্যবসা ছিল দেশীয় মহাজনদের হাতে। মাড়োয়াড়ী ব্যবসায়ীরা তখনও এসে পৌঁছননি।

তখনকার দিনে নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকায় বেঙ্গল ব্যাঙ্ক (Bengal Bank) ছাড়া দেশীয় বা বিদেশীয় কোন ব্যাঙ্কই ছিল না। এ সংস্থাটি ছিল সরকার সমর্থিত ইউরোপীয় ব্যাঙ্ক। সাদা চামড়াওয়ালা লোকের লক্ষ কোটি টাকার ব্যবসার জোগান দিত এই ব্যাঙ্ক। দেশীয় লোকের বেলায় এত সব সর্ত আরোপ করা থাকত যে, প্রকৃতপক্ষে তারা বড় একটা টাকা এই ব্যাঙ্ক থেকে পেত না। এই জন্য দেশীয় কতকগুলি ব্যাঙ্কের মত ব্যবসা গড়ে উঠেছিল। বড় বড় ধনীরাই ছিলেন এইসব ব্যবসায়ের মালিক। তেজারতি, লগ্নী ও হুণ্ডির সাহায্যে এরা দেশীয় ব্যবসায়ীদের টাকা যোগাতেন। এরা টাকা গচ্ছিতও রাখতেন খানিকটা সেভিং ব্যাঙ্কের মত। কলকাতা এবং অন্যান্য বড় বড় কেন্দ্রে এদের শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত ছিল। এক কেন্দ্রে টাকা জমা দিয়ে হুণ্ডি বা হ্যাণ্ডনোট নিয়ে অন্য কেন্দ্রে টাকা ওঠানো যেত। প্রয়োজন মত ব্যবসায়ীদের আগাম টাকাও দিত। কখন কখন বিল কিংবা পাওনা টাকার দলিল উপস্থিত করতে পারলে টাকা পেত। অনেক সময় সম্পত্তি বন্ধক রেখেও টাকা দিত।

এ জাতীয় ব্যাঙ্ক বা মহাজনি কারবারের স্বত্বাধিকারী ছিল হিন্দুদের মধ্যে সাহা ও তিলি অর্থাৎ পাল ও কুণ্ডু উপাধিধারীরা। এমনকি ছোটখাট ব্যবসাগুলিরও অধিকাংশ মালিকও তাঁরাই ছিলেন। কেন না তথা-কথিত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে ব্যবসাকরাটা বড় একটা সম্মানজনক ছিল না। আমার কাকা যখন কাপড়ের দোকান দেন তখন সবাই খুব অবাক হয়ে যায়।

সাহা ও তিলিরা ধর্মভীরু নিরীহ প্রকৃতির মানুষ। এরা সাধারণতঃ বৈষ্ণব এবং অনেকে ফোঁটা-তিলক ধারণ করতেন। দেবদ্বিজে এদের অসীম ভক্তি! আমাদের নারায়ণগঞ্জ বাড়ীর নিকটস্থ বহু লক্ষপতি পালবু-ড়ীর

কর্তা পাত্রে করে জল পাঠিয়ে দিতেন। আমরা তাতে পায়ের আঙুল স্পর্শ করে দিতাম। সেই চরণামৃত পান করে তবে তিনি মধ্যাহ্ন আহার করতেন।

নারায়ণগঞ্জ শহর শিতলক্ষ্যার দুইতীর শোভা করছে! শহরের তিন দিকেই নদী। প্রায় সীমানার মধ্যেই শিতলক্ষ্যা, ধলেশ্বরী, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের পুরণো শাখা একত্র মিলেছে, কেবল জল আর জল। জলের কল্লোল প্রাণমন উতল করে তুলত। শহরের দক্ষিণ সীমানায় একেবারে জলের ধারে বসে সঙ্গমস্থলের স্ফীত জলকায়ার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে বসে থাকতাম। তম্বী শীতলক্ষ্যার বুকের উপর দিয়ে জালিবোটে (Jollyboat) বাল্যবন্ধুসহ কত সন্ধ্যায় কতদূর চলে যেতাম তার স্মৃতি আজও মনকে অপূর্ব রসে দোলা দেয়।

নিজের মনের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। পদ্মা-মেঘনার বিধ্বংসী রূপ আমায় উত্তেজিত করে এগিয়ে চলার আনন্দে, আবার এই তন্বঙ্গী স্বচ্ছতোয়া স্রোতস্বিনী দু'তীরে শ্যামল আঁচল বিছায়ে মৃদুকলতানে বয়ে যাচ্ছে, তা আমার হৃদয়ে মোহের সঞ্চার করে। একদিকে মহাকালের প্রলয়লীলায় মত্ত রুদ্ররূপের প্রচণ্ড ব্যঞ্জনা, অপর দিকে কৃশাঙ্গী কিশোরী মরালগামীর মোহিনীরূপ। এই দু'রূপই স্বাচ্ছন্দ্য আত্মপ্রকাশে ভিন্ন ভিন্ন আনন্দ রসের সৃষ্টি করে। তাই ত পদ্মা-মেঘনার চর-পড়া শুষ্ক তীর মনে দুঃখের সঞ্চার করে। আসল কথা, যার যা স্বাভাবিক বিকাশ তাই মনকে আনন্দ দেয়। জগৎ-বিখ্যাত গামার অস্থিচর্মসার শরীরে স্থূলত্ব থাকবে না বটে, কিন্তু চেহারার এই দৈন্য মনকে পীড়া দেবে। কিন্তু স্বাস্থ্যোজ্জ্বল পাতলা ছিপ্‌ছিপে চিক্কণ দেহ দেখে কত তৃপ্তি পাই।

১১

নারায়ণগঞ্জ শহরের সমৃদ্ধি ও উন্নতি নাকি আমার পিতৃদেব ৺মহিমচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের চোখের ওপর হয়েছে। তিনি যখন নারায়ণগঞ্জ আসেন তখনও সেখানে হাইস্কুল হয় নি। একটি মাইনর স্কুল স্থাপিত হয়েছে মাত্র। পিতা ছিলেন এই স্কুলের হেডমাষ্টার। আস্তে আস্তে একটা সিভিল কোর্ট স্থাপিত হয়। পিতাও স্কুলের কাজ করতে করতেই ওকালতি পাশ করে নারায়ণগঞ্জেই আইনব্যবসা সুরু করেন। তখন নারায়ণগঞ্জে উকিলের সংখ্যা ছিল মাত্র ছয়জন। তার পর মহকুমা এবং শহরের সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উকিল, মোক্তার, ডাক্তার এবং দোকান-পসার দ্রুত বাড়তে লাগল।

ছেলেবেলায় নারায়ণগঞ্জে ডাক্তারের সংখ্যা ছিল নগণ্য। তার মধ্যে আবার একজন সরকারী ডাক্তার ছাড়া আর কেউ পাস করা ডাক্তার নয়। সর্বাপেক্ষা বড় ডাক্তার বলে যিনি খ্যাত ছিলেন, তিনি কম্পাউণ্ডারের কাজ করতে করতে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, তার বলেই ডাক্তারী করতেন। সাহেবরাও তাঁর চিকিৎসা গ্রহণ করতেন। আর আজ এই নারায়ণগঞ্জেই আধ ডজনের বেশী এম. বি (M. B.) ডাক্তার ব্যবসা করছেন। আমাদের ছেলেবেলায় যেখানে সন্ধ্যার পর লোকে যেতে ভয় পেত গুণ্ডা-বদমায়েসের অত্যাচারে, সে-সব জায়গা এখন জনবহুল।

পিতৃদেব ছিলেন শহরের একজন বড় উকিল। উপায় করতেন সহস্র সহস্র টাকা। মহাজন, ব্যবসায়ী ও ইউরোপীয়দের অনেকেই এবং মফঃস্বলের কৃষকশ্রেণী ও অনেক ধনীলোকের তিনি উকিল ছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর নিজ চরিত্রবলে মৃত্যুকাল পর্যন্ত শহরের সর্বজনমান্য ব্যক্তি ছিলেন। অন্ততঃ বিশ বছর তিনি মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করেছেন। হাইস্কুল স্থাপিত হওয়ার পর থেকে বহু বৎসর সেক্রেটারীর পদ অলংকৃত করেছেন এবং শহরের সর্বপ্রকার জনহিতকর কার্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থাকতেন। ঐ যুগেও তিনি ইউরোপীয় ম্যাজিষ্ট্রেট বা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেও যথেষ্ট সম্মান পেতেন। এসব সত্ত্বেও তিনি রাজসম্মানের প্রতি যে শুধু উদাসীন ছিলেন তাই নয়, অপছন্দই করতেন। একবার বাৎসরিক উপাধি বিতরণের পূর্বে ম্যাজিষ্ট্রেট পিতৃদেবের মনোভাব জানতে চাইলে তিনি রায়বাহাদুর গ্রহণে অস্বীকৃত হন।

পিতৃদেব জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই বিলাসিতা পছন্দ করতেন না। সে সময় আমাদের বাড়ীতে বহু দেশীয় বড়লোক, ম্যাজিষ্ট্রেট এবং বড় বড় সাহেবেরা আসতেন। তা সত্ত্বেও আমাদের বৈঠকখানা ঘরটি ছিল অতি সাধারণ-ভাবে রচিত ও সজ্জিত। টিনের চালের ঘর আর বসবার আসন—দু'চারখানা চেয়ার এবং তক্তপোষ। তখনকার দিনে এক একজন ম্যাজিষ্ট্রেট ও বড় সাহেবেরা প্রায় আমীর বাদশাহের তুল্যই গণ্য হ'ত! আমার পিতৃদেবকে কখনই এজন্য লজ্জিত হতে দেখি নি।

যদিও স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে এই সব সাহেব-দের গরিমা অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হয় এবং আমাদের হীন মনোভাব কমতে সুরু করে, কিন্তু পিতৃদেবকে সেকালেও সাহেবদের অনুকরণে পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করতে দেখি নি। কোর্টে যেতেন চোগা-চাপকান পরিধান করে। তা ছাড়া সাধারণ বাঙালীর পরিচ্ছদেই তিনি

থাকতেন। সেই দিনে মাঝে মাঝে ছোটলাট, বড়লাট এরা সব আসতেন ঢাকায়। পথে নারায়ণগঞ্জ, সুতরাং এতদুপলক্ষে প্রায়ই স্কুল পরিদর্শনে, ষ্টেশনে অভ্যর্থনা, বা অন্যত্র সম্বর্দ্ধনার আয়োজন হ'ত। শহরের শ্রেষ্ঠ নাগরিক হিসেবে নিমন্ত্রিত হয়েও সেখানে ধুতি-চাদরেই যেতেন এবং প্রয়োজন হলে লাটসাহেবের সঙ্গেও দেখা করতেন। ছেলেবেলায় দেখেছি এ নিয়ে শহরে হুলুস্থূল পড়ে যেত। শুনেছি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লাটসাহেবের প্রাসাদে চটি-জুতো পায়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। এ ব্যাপার দেশের লোককে স্তম্ভিত করেছিল। তার পর আমাদের ছেলেবেলায় এমনি ধরনের দৃষ্টান্তে লোকের হীনমনোভাব (Inferiority Complex) দূর করতে সহায়ক হয়েছিল।

সাহেবদের বুটের আঘাতে দেশীয় লোকের পিলে ফাটার কাহিনী ছেলেবেলায় অনেক শুনতাম। ভারতবাসী সে উচ্চ-নীচ যে পর্য্যায়েরই হোন না কেন, ইউরোপীয়দের কাছে যত্রতত্র লাঞ্ছনার কথা প্রায়ই শুনতে পেতাম। স্বদেশী আন্দোলন প্রবর্তন হওয়ার পরেও এমনি ঘটনা একেবারে থেমে যায় নি। সেকালে হাইকোর্টের জজ হাসান ইমামের রেলগাড়ীতে লাঞ্ছনার সংবাদ লোকের মনে খুব উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। ছেলেবেলায় দেখেছি সাহেবদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করাটাও একটা বীরত্বব্যোধক কাজ ছিল। এটা অবশ্য হীনমনোভাব প্রসূত।

আমি তখন পঞ্চম শ্রেণীর (Class V) ছাত্র। দশ-এগার বছরের বালক মাত্র। আমরা কয়েকজন সমবয়সী নারায়ণগঞ্জ ষ্টেশনে বেড়াতে গিয়েছিলাম। তখন লরেঞ্চ নামে এক শ্বেতাঙ্গ সস্ত্রীক তাদের অফিসের লঞ্চে উঠতে যাচ্ছিল। হঠাৎ কি হলো জানি না। দেখলাম, সাহেব একটি অপরচিত ছেলেকে কিল, চড়, ঘুসি এবং লাথিতে জর্জরিত করছে, ছেলেটির বয়স আমাদের চেয়ে কিছু বেশী। আমরা দু'তিন জন ছুটে গিয়ে বাংলা- ইংরেজীতে প্রতিবাদ করে ওকে ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দিতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু তার বিশাল দেহের তুলনায় আমাদের হাত অতি দুর্বল। সাহেবকে একটুও নড়াতে পারলাম না। সাহেবের চাপরাসী, আরদালী ও অন্যান্য লোকেরা আমাদের সরিয়ে দিল। অদূরে একটি কলেজের ছেলের কাছে ঘটনা বলায় সে এসে প্রতিবাদ জানাল। সাহেব বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না করে লঞ্চে আরোহণ করল। আমি এতই উত্তেজিত হয়েছিলাম যে, রাগে দুঃখে আমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। ষ্টীমার কোম্পানীর বড়বাবু —আমাদের এক আত্মীয়, আমায় অফিস ঘরে নিয়ে গিয়ে সান্ত্বনা দিলেন। পরে এক বড় মোক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম লাঞ্ছিত ছেলেটিকে। মোকদ্দমা দায়ের হ'ল। কোর্টে সাক্ষ্য দিলাম। এই প্রথম কোর্টে সাক্ষ্য দেওয়া। অভিযোগের উত্তরে সাহেব বলেছিল—এই বর্বরটা আমার স্ত্রীর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। আমি ছাড়া অবশ্য আর কেউ সাক্ষ্য দেয় নি। তা হলেও সাহেবের পাঁচ টাকা জরিমানা হ'ল। তুচ্ছ হলেও সে দিনে এর মূল্য কম ছিল না। ইংরেজেরও শাস্তি হয়! শহরে হৈ-চৈ পড়ে গেল। সমস্ত শ্বেতাঙ্গদের উপরই একটা বিরূপ মনোভাব অঙ্কিত হয়ে গেল।

শহরে সাহেবদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল অসীম। তারা যে রাজার জাত—শাসনদণ্ড তাদেরই হাতে! আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে সাহেব-মেমেরা ঘোড়ায় চড়ে, সাইকেলে চেপে বা গাড়ী হাঁকিয়ে যেতেন। কারুর কারুর চার বা দু'ঘোড়ার গাড়ী ছিল। আবার সেই প্রথম এরাই আনল মোটর! শাদা চেহারায় পোশাকে-আসাকে ঝলমল্ এই সব সাহেবদের হাসি-কলরবে ভীত হয়ে দেশীয় লোকেরা এদের সসম্ভ্রমে রাস্তা ছেড়ে দিত।

আমাদের বাড়ীর সামনের রাস্তার অপর পারে সাহেবদের ক্লাব। একটা গির্জাও ছিল সেখানে, সব শ্বেতাঙ্গরাই সেখানে এসে মিলিত হ'ত। কত বিচিত্র খেলাধুলা করত তারা। বড় দিনে ক্লাবপ্রান্তর আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠত। লাটসাহেবরাও এ ক্লাবে আসত। শুধু কি তাই, নদীর দু'ধারের প্রাসাদতুল্য সুন্দর সুন্দর বাড়ীগুলি সবই ছিল এ সব সাহেবদের। এদের জাঁক-জমক, বিলাস-বহর দেখে মনে কত বিচিত্র ভাবের উদয় হ'ত। এরা যেন ভিন্ন জগতের লোক, পোশাক-পরিচ্ছদ, গায়ের রং কোন কিছুতেই এদের সঙ্গে কোন মিল নেই। এরা এ দেশে এলোই বা কেমন করে, রাজাই বা কেমন করে হ'ল? এক দিকে চোখের সামনে দেখতাম এদের ভোগৈশ্বর্যের জীবন-চাঞ্চল্য আর একদিকে আমাদের পাড়ার ছোট ছোট ভাঙ্গা খড়ের ঘরে ক্ষীণজীবি, ক্ষুধার্ত্ত, নগ্নগাত্র, নিরীহ প্রকৃতির দরিদ্র প্রতিবেশীদের!

সেকালে আমার কাকা ছিলেন একজন প্রভাবশালী পাটের আফিসের বড়বাবু। রাস্তায় বার হলে অসংখ্য উমেদার তার পিছন পিছন যেত চাকুরি প্রার্থী হয়ে! সেই কাকারও উপরওয়ালা কিনা সাহেব! আমার পিতৃদেব কত সম্মানিত ব্যক্তি। কিন্তু এই বিদেশীরা তার চাইতেও বেশী সম্মান পায়! যত বড় ধনী জমিদার বা

ব্যবসাদার দেশীয় লোক হোক না কেন তাঁরাও সাহেবদের সসম্ভ্রমে সেলাম করতেন!

সাহেব ও আমরা কত প্রভেদ, কেমন করে হলো! সবিস্তারে সব জানবার জন্য সেই বাল্যাবস্থাতেই প্রবল আগ্রহান্বিত হয়েছিলাম।

খেলা-ধুলোতে আমার সখ ছিল না ছেলেবেলায়। অনুশীলন সমিতির সভ্য হয়ে লাঠি আর ছোরা খেলা শিখেছিলাম। বেশী বয়সে জেলখানায় ষ্টেট প্রিজ্‌নার হয়ে টেনিস খেলতাম। বিকেলবেলাটা কাটত আমার রেল কিংবা ষ্টীমার ষ্টেশনে বেড়িয়ে—কোন দিন বা জলি-বোট করে নদীর বুকে ভাসতে ভাসতে। বিচিত্র ধরনের সব যাত্রী আর পরিবেশ আমার মনে যেন কিসের দোলা দিত। আবার এমন অনেক দিন গেছে যখন সন্ধ্যা পর্যন্ত বই পড়েই ঘরে বসে সময় কাটিয়েছি!

আমাদের বাড়ীতে অনেক দৈনিক এবং নানা জাতীয় সাময়িক পত্র-পত্রিকা আসত। ইংরেজী দৈনিক আসত বেঙ্গলী (Bengaly)। বঙ্গদর্শন, ভারতী, সাহিত্য, নব্যভারত, প্রবাসী প্রভৃতি সেকালের পত্রিকা আসত। ইংরেজী দৈনিক বাবা নিজে পড়লেও বাংলা কাগজ আমাকেই পড়ে শোনাতে হ'ত তাঁকে। এমনি করেই তিনি আমার জ্ঞানস্পৃহা বাড়িয়ে ছিলেন এবং পরিচিত করালেন বিশ্বের সঙ্গে। তাই বুঝে না বুঝে পড়ার একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেল। ছেলেবেলাতেই বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশ চন্দ্র, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীশ মজুমদারের নভেল পড়ে ফেলি। এমন কি রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ পড়তে আরম্ভ করি। বুঝতে পারতাম বলতে পারিনে—তবে আনন্দ পেতাম! এই আনন্দবোধের মধ্যে বোধহয় লুকিয়ে ছিল অপরূপ সৌন্দর্য-মধুর কাব্যসুধারস যা বালক বা কিশোরের মনকে উদ্বেলিত করে তোলে একান্ত অজ্ঞাতে। কেন না, পরিণত বয়সে দেখেছি ঐগুলি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্য। স্কুলে আমরা কয়েকজন সহপাঠী সকলের অগোচরে পরস্পরকে বই জোগাতাম এবং বই নিয়ে আলোচনা করতাম। ভাল বই যেমন পড়েছি আবার অতি নোংরাও পড়েছি। সব কথা বুঝতে পারতাম না কিন্তু পড়বার জন্য একটা গোপন আগ্রহ জাগত।

আমি তখন পঞ্চম কি ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। তখনই বাংলা ভাষায় লেখা একখানা বেশ বড় ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়ে ফেলি। সবটা বুঝতে পারলাম না। তবে এটুকু বুঝতে ভুল হ'ল না যে, ইংরেজ কোন যুদ্ধে হারে নি, তাদের শক্তি অপরাজেয়। এমন কি নেপোলিয়ানের মত লোককেও তারা হারিয়ে দিয়ে বন্দী করেছিল। আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তির কাছেই পরাজিত এই কথা ভেবে যেন একটু গৌরববোধ হ'ত। পরিণত বয়সে এ মনোভাবের কথা মনে করে আশ্চর্য হয়ে যেতাম। ছোটবেলা থেকেই ম্যাপ দেখার অভ্যাস হয়েছিল। লাল জায়গাগুলি দেখতে দেখতে বুঝতে পারতাম সত্যই মহারাণীর রাজত্বে সূর্যাস্ত যায় না! আবার কেন জানি না, মনকে এই ভেবে পিড়িত করত যে, এত ক্ষুদ্র ইংলণ্ড কি করে আমাদের মত এমন একটা মহাদেশকে পদানত করে রাখতে পারে। তখন মনে পড়ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান—

"ত্রিংশত কোটি মানবের বাস
এ ভারতভূমি যবনের দাস
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা।"

১২

অতি অল্প বয়স থেকেই সমাজের সর্বস্তরের লোকের সঙ্গে পরিচিত হতে আরম্ভ হই। কেন না পিতৃদেব সকলের সঙ্গেই সমানভাবে মেলামেশা করতেন। তিনি নিজে ছিলেন নির্বিরোধী। অপরকেও তাঁর সঙ্গে শত্রুতাচরণ করতে দেখি নি। বহু টাকার লগ্নী কারবার করা সত্ত্বেও তাঁকে সারা জীবনে দুই-একটা ভিন্ন কারুর কাছ থেকে টাকা আদায় করতে আদালতের সাহায্য গ্রহণ করতে হয় নি। বহু দরিদ্র মুসলমান গৃহস্থ পিতৃদেবের কাছ থেকে টাকা কর্জ নিয়ে চাষবাস করত। বৈশাখ কিংবা চৈত্রমাসে টাকা নিয়ে আবার আশ্বিন-কার্তিক মাসেই তারা পরিশোধ করে দিত। তখন কোন সমবায় ব্যাঙ্ক বা সরকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে না উঠার ফলে এরা সকলেই পিতৃদেবের নিকট বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ থাকত। কুসীদজীবিদের নানা অত্যাচার ও ছলচাতুরীর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে এরা যেন সর্বনাশের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল।

পিতৃদেবের মৃত্যুর পর একবার তাদের একান্ত অনুরোধে কৃষকদের গ্রামে গিয়েছিলাম। জমিদারকেও তারা বুঝি অত সম্মান করত না। অনেক অনুরোধ করেছিল যেন আমি পিতৃদেবের কাজটুকু পরিত্যাগ না করি। কিন্তু বিপ্লবী-সমিতির সর্বক্ষণের কর্মী হওয়াতে এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতারা নাবালক থাকাতে তত্ত্বাবধায়কের অভাবে লগ্নী কারবার উঠিয়ে দিতে বাধ্য হলাম।

পিতৃদেবকে যে সবাই শ্রদ্ধাভক্তি করত এবং তাঁর অমঙ্গল চাইত না তার প্রমাণ পেতাম অনেক ভাবে।

দেশীয় ব্যাঙ্কার মহাজনদের কেউ দেউলে হওয়ার উপক্রম হলে আমার পিতার গচ্ছিত টাকা গোপনে ফিরিয়ে দিয়ে যেত।

বাক্য, চিন্তা, এবং জীবনযাত্রায় তিনি ছিলেন অতি-নৈতিক দীক্ষিত না হয়েও মত ও বিশ্বাসে ছিলেন ব্রাহ্ম একেশ্বরবাদী। সুতরাং প্রতিমা পূজা বিশ্বাসও করতেন না এবং কখনও তাঁকে প্রতিমার নিকট প্রণাম করতে দেখি নি। ব্রাহ্মসমাজে নিয়মিত গিয়ে সেখানে নানা আলোচনা করতেন। সঙ্গে অবশ্য আমি থাকতাম।

জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, বাল্যবৈধব্য, সমুদ্র-যাত্রায় বাধা-নিষেধকে কুসংস্কার মনে করতেন। কিন্তু পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ ও ঘটক বিদায়ের কৌলিক-প্রথা রক্ষা করেছেন এবং কুলগুরুর মর্যাদা দিতে কসুর করেন নি। নিজের মতবাদ তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করতে আমি দেখেছি। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে আমার মিশ্রজীর কথা। তিনি ছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণজীর আখড়ার মোহান্ত উত্তর প্রদেশীয় ব্রাহ্মণ। মনে পড়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই শালপ্রাংশু মহাভুজ বিশালদেহী মিশ্রজীকে যার অন্তর ছিল স্নেহময় কোমল। তিনি প্রায়ই সন্ধ্যারতি সমাপন করে আমাদের বাড়ী এসে পিতৃদেবের সঙ্গে ধর্ম ও নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। আমার জন্য তাঁর স্নেহ ছিল অপরিসীম। সিপাহী বিদ্রোহের অনেক গল্প তাঁর কাছ থেকে শুনেছি। শ্বেতাঙ্গ ক্লাবের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলতেন যে, এই অনাচারী ম্লেচ্ছদের পতন অনিবার্য। স্বাধীন ভারতের কল্পনা-বিলাস তাঁর হৃদয়কে উদ্বেলিত করে তুলত। তিনি বলতেন যে, রাম, লক্ষ্মণ, ভীম, অর্জুন আবার ভারতের বুকে জন্মাবে ভারতের মুক্তি সাধন করতে। তাঁর ধারণা ছিল যে, ঝাঁসির রাণী তাঁতিয়া তোপী, কুমার সিংহ নাকি প্রায় কৃতকার্য হয়েছিলেন। তিনি গভীর ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ম্লেচ্ছ-রাজত্বে অভাবের তাড়নায় রাজসরকারে চাকুরি করেও যে হিন্দুস্থানীরা শুদ্ধাচার রক্ষা করে ধর্ম ঠিক রাখতে পারছে তার ফলেই ভবিষ্যতে সর্বদুঃখ মোচন হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ না করে পারছি না যে, এই লক্ষ্মী-নারায়ণের বিগ্রহ-নামানুসারেই শহরের নাম নারায়ণগঞ্জ। শহরে প্রায় সাত-আটটা আখড়া ছিল। তবে মিশ্রজীর আখড়াই সর্বশ্রেষ্ঠ।

সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে মিশ্রজী ছিলেন পঁচিশ বছরের যুবক। তখনকার সব রোমাঞ্চকর কাহিনী বলতে বলতে তাঁর বুক ফুলে উঠত গর্বে। ঝাঁসির রাণী শিশু পুত্রকে পিঠে বেঁধে রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কানপুর, লক্ষ্ণৌ, মিরাট ও অন্যান্য জায়গায় ম্লেচ্ছরা কি ভাবে লাঞ্ছিত হয়েছিল তা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। বিদ্রূপের হাসি হেসে বলতেন, আজ যারা দর্পভরে আমাদের দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টি হেনে চলে যাচ্ছে তারাই তখন প্রাণভয়ে দরিদ্র কৃষকের কুটিরে আশ্রয় ভিক্ষা করেছিল। পরে আশ্বাস দিয়ে বলতেন আগেও যা ঘটেছে পরেও তা ঘটতে পারে। লক্ষ্মী-নারায়ণজীর কৃপায় দুঃখ বা সুখ কিছুই চিরস্থায়ী নহে। সবই ঘুরে-ফিরে আসে।

আর একটা গল্প তাঁর কাছে শোনতাম। ঢাকা শহরেও নাকি সিপাহীরা বিগড়েছিল। কিন্তু তা অঙ্কুরেই ধ্বংস হয়। এখন যেখানে ভিক্টোরিয়া পার্ক সেখানে নাকি বিদ্রোহী সিপাহীদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। এখনও গভীর রাত্রে সিপাহীদের "হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার" ধ্বনি শোনা যায়। এ কথা ছেলেবেলায় অন্য লোকের মুখেও শুনেছি।

এই মোহান্ত ঠাকুর আমাকে আদর করে "জং বাহাদুর" বলে ডাকতেন। হাসিমুখে বলতেন আমি নাকি জাতিধর্ম রক্ষার জন্য বহুৎ লড়াই করব। বহুদিন পর্যন্ত পাড়ার বৃদ্ধরাও শেষ পর্যন্ত আমাকে এ নামেই ডাকতেন। আজও আমার কানে লেগে আছে সেই সদাহাস্যময় বৃদ্ধের স্নেহশীল ডাক "জং বাহাদুর"। উত্তর জীবনে নির্জন কারাকক্ষে বসে যাঁদের কাছে ঋণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করতাম, এই মিশ্রজী ছিলেন সেই সব শ্রদ্ধাবানদের অন্যতম।

যাঁর প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে মিশ্রজীর কথায় এলাম সেই পিতৃদেব নিজেও বিলাসী ছিলেন না এবং আমরা পাছে বিলাসী অপদার্থ দায়িত্বজ্ঞানহীন হই এই ভয়ে তিনি তাঁর গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ আমাদের কাছে গোপন রাখতেন। যথোপযুক্ত খাদ্যসামগ্রী প্রচুর পরিমাণে জোগাতে শুধু আপত্তি করতেন না, তা নয় উৎসাহই দিতেন। আমাদের জলখাবার ঘরে তৈরী হ'ত এবং হাত খরচ বাবদ কোন পয়সা তিনি দিতেন না। তবে আমার কাকা ছিলেন অত্যন্ত বিলাসী ও অমিতব্যয়ী। তিনি অবশ্য গোপনে মাঝে মাঝে কিছু নগদ পয়সা দিতেন।

কাউকেই 'তুই' বলে সম্বোধন করা একেবারে নিষেধ ছিল। চাকর-ঠাকুরকেও তুমি বা আপনি বলতে হ'ত। সে অভ্যাসের বলে আজও কাউকে তুই বলতে সঙ্কুচিত হই। অশ্লীল ভাষা ব্যবহার তিনি ভীষণ ভাবে অপছন্দ করতেন। বলতেন, এমনি ভাষা প্রয়োগের চাইতে মারামারিও শ্রেয়।

নারায়ণগঞ্জ যে পাড়ায় আমরা বাস করতাম তা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, এবং বৈদ্য প্রধান। কেবল একঘর ছিল সাহা শ্রেণীর। সাহা-রা ছিল জল অনাচরণীয়। ছোঁয়া ত দূরের কথা ঘরে জল থাকলেও সাহা-রা প্রবেশ করলে ফেলে দেওয়ার রীতি ছিল। অথচ তাঁরা বিদ্যা-বুদ্ধি বা চরিত্রগুণে কারুর চাইতেই হীন ছিলেন না। তাঁদের বাড়ীর ছেলেমেয়ে বা গৃহিণীরা কারুর বাড়ীতে গিয়ে ঘরে ঢুকতে সাহস পেতেন না। বারান্দার দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে কথাবার্তা চালিয়ে আসতেন। কিন্তু আমাদের বাড়ীর নিয়ম ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। পিতৃদেবের কড়া আদেশ এবং মাতৃদেবীর সহনশীলতার গুণে তাঁরা আমাদের ঘরে যথাযোগ্য সমাদর পেত। গৃহ-প্রবেশের ফলে আমরা কখনও জল বা অন্য খাদ্য অশুচি মনে করে ফেলে দিই নি।

সাহা-রা পাড়ার অন্যান্যদের কাছ থেকে অনাদর-নির্যাতন পেতেন বটে, কিন্তু বাবা তাঁদের আদর-অভ্যর্থনা করেই ক্ষান্ত থাকতেন না, তিনি ছিলেন তাঁদের কাছে মুরুব্বী, সহায় ও বন্ধু। ভাবলে আজও অবাক লাগে যে, এই সমস্ত সৎ, নির্বিরোধী এবং পরোপকারী মানুষগুলি কেমন করে সমাজের কাছে ঘৃণা পেত। আজও মনে আছে, প্রথমবার জেল থেকে বেরিয়ে বাড়ী এলে মা বলেছিলেন, "দেখ, এই সাহাদের সবাই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, কিন্তু মানুষের বিপদ-আপদে এরাই এসে দাঁড়ায় সর্বপ্রথম। ১৯১৯ সনে পূর্ববঙ্গে যে ভয়াবহ ঝড় হয় তাতে নারায়ণগঞ্জ আমাদের পাড়ায় একখানা ঘরও খাড়া ছিল না। এই সাহা-রাই শুধু নিজেদের জীবন বিপন্ন করে সকলের প্রাণ রক্ষা করে।"

মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য না করার এই যে শিক্ষা পেয়েছি তার জন্য আমি আমার পিতামাতার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। কানে যেন পিতার কথাই সর্বক্ষণ শুনতে পাই, "সকল মানুষই সমান। মুচি, মেথর, মুদ্দফরাশ, সকলকেই দিতে হবে মানুষের সম্মান। এর ব্যতিক্রম করার কোন অধিকারই নেই আমাদের।" আজও আমি বিশ্বাস করি যে-মানুষ বিপ্লবীর ভূমিকায় থেকেও মানুষকে তার যোগ্য সম্মান দেয় না তার বিপ্লববাদ ছলচাতুরী মাত্র। যে বিপ্লবী মানুষের প্রতি দরদহীন পরন্তু বিদ্বেষ-বিষে পরিপূর্ণ তিনি যতই বিখ্যাত হোন না কেন অন্তরের দিক থেকে তাঁর কাণাকড়িরও মূল্য নেই।

একবার একটা সিঁদেল চোর পাড়ায় ধরা পড়ল। সবার সঙ্গে যোগ দিয়ে আমিও ওটাকে কম নির্যাতন করি নি। পিতৃদেব শুনতে পেয়ে আমায় তিরস্কার করে বললেন, "চোর ধরে তাকে পুলিশে দিতে পার, কিন্তু নির্যাতন করার অধিকার তোমার নেই।"

মিথ্যাচরণ ও বাক্য তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। একবার এক মুসলমান বড় গুণ্ডা ছুরিকাহত হয়। কয়েকজন লোক গ্রেপ্তার হ'ল। আমার গ্রেপ্তার হওয়ার কথাও নাকি শোনা গেল। যদিও আমার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ ছিল না তথাপি ধরে নিয়ে গিয়ে লাঞ্ছিত করতে পারত নিশ্চয়। তবে এ ব্যাপারে তখনকার পুলিশ ইন্সপেক্টর মনমোহন ঘোষ আমার এবং পিতৃদেবের অজ্ঞাতসারে আমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু পিতৃদেব আমাকে ডেকে বললেন, "যদি সত্যই এ ব্যাপারে তোমার যোগাযোগ থেকে থাকে তবে তুমি নিজের কথা সত্যি বলে অন্যকে রেহাই দাও। আমি তোমার পক্ষ সমর্থনের কোন চেষ্টাই করব না। মিথ্যা বলে খালাস পাওয়ার চাইতে সত্য স্বীকার করে শাস্তি গ্রহণ শ্রেয়।" মনমোহনবাবু ছিলেন আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পরে এই মোকদ্দমায় আমার আসামী পক্ষ হয়ে সাক্ষী দেবার ফলে তাঁকে বিশেষ ভাবে বিব্রত হতে হয়। আরও পরে অনুশীলন সমিতির বিরুদ্ধাচণের জন্য শাস্তি পেতেও হয়েছিল।

ক্রমশঃ

জাতিভেদ ও হিন্দুসমাজের অধঃপতন

ডক্টর শ্রীবিমলানন্দ শাসমল

"শ্রীকৃষ্ণ কি কৈবর্ত ছিলেন" এই শিরোনামায় আষাঢ় মাসের 'প্রবাসী'তে একটি প্রবন্ধ লিখে শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী এক গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই ধরনের আলোচনা আমাদের দেশে যত বেশি হয় ততই মঙ্গল। কিন্তু দুঃখের বিষয় দেশের সমাজ-বিজ্ঞানীরা এই ধরনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে প্রায়ই বিমুখ থাকেন। উমেশবাবু সেই কারণে ধন্যবাদের পাত্র। কৈবর্তেরা কেন মাহিষ্য নাম ব্যবহার করে তাতে আপত্তি করে উমেশবাবু বলেছেন: কৈবর্ত নামই অধিক গৌরবের তবু কৈবর্তরা মাহিষ্য নাম ব্যবহার করেন কেন?

উমেশবাবু যে সমস্যার অবতারণা করেছেন তা শুধু কৈবর্ত জাতীয়দের নিয়েই নয় পরন্তু বাংলার এবং ভারতের প্রায় সকল অনগ্রসর বা তথাকথিত অস্পৃশ্য-জাতীয়দের নিয়েই বিদ্যমান। এবং ছোটোখাটো প্রবন্ধের মারফৎ এই নিগূঢ় বিষয়ের সম্যক আলোচনা শেষ করা যাবে না। বিশেষ করে যখন ভারতের জাতীয় দুর্ভাগ্যের প্রথম এবং প্রধান কারণ এই জাতিভেদের প্রশ্ন তখন এই প্রশ্নটিকে খুব লঘুভাবে বিচার করা অন্যায় হবে। তবু এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমি সেই সমস্যা নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করতে চাই।

উমেশবাবুর প্রবন্ধের একটি প্রধান গলদ এই যে, তিনি প্রায় তিন হাজার বছর আগেকার (মহাভারতের যুগের) ভারতের সামাজিক অবস্থার সংগে বর্তমান দু' শতাব্দীর ভারতের এবং বাংলা দেশের সামাজিক অবস্থা মিশিয়ে একাকার করে ফেলেছেন।

প্রথমেই বলা দরকার, আর্যজাতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। অর্থাৎ আর্য নামে কোনো মনুষ্যজাতির বসবাস পৃথিবীর কখনও কোথাও ছিলো বলে জানা যায় নি। ভারতবর্ষ জয় করে যাঁরা বসবাস করতে আরম্ভ করলেন তাঁদের আর্য বলা হোতো কিন্তু তাই বলে যেমন ইহুদী বা মোঙ্গোল বা আরবজাতি আছে তেমনি আর্যজাতি বলে কোনো জাতি পৃথিবীতে কখনও ছিলো বলে প্রমাণ নেই। হিটলারও আর্যজাতির মহিমা প্রচার করতে উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। কিন্তু জার্মানীর বিখ্যাত লোকেদের মধ্যে বেশির ভাগই অ-জার্মান জাতির বা ইহুদী জাতির লোক ছিলেন। "আর্য" কথাটি পারশিক শব্দ "আরিয়স্" থেকে এসেছে বলে মনে করা হয় কিন্তু পারসিক শব্দ "আরিয়স" মানে অভিজাত। ওটা কোনো জাতিগোষ্ঠীর জ্ঞাপক নয়।

তথাকথিত আর্যরা ভারতে আসবার আগে ভারতে অন্য সভ্যতার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে। অন্য প্রমাণ বাদ দিলেও দ্রাবিড় সভ্যতা আর্য সভ্যতার চেয়ে কোনো অংশে নিকৃষ্ট ছিল না বা নয়। প্রসঙ্গতঃ, হিন্দু-দর্শনের দিক্‌পাল যারা, যেমন শংকর, রামানুজ, মধ্ব প্রভৃতি সকলেই দ্রাবিড় শ্রেণীর—কেউই খাঁটি আর্য নন। এবং এই দ্রাবিড় জাতীয় দার্শনিকরাই বৌদ্ধধর্মের আধিপত্য থেকে হিন্দুধর্মকে মুক্ত করেছিলেন। কোনো বিখ্যাত আর্যসন্তান সেই দুরূহ কার্য সমাধা করতে পেরে-ছিলেন বলে জানা যায় নি।

তাছাড়া আর্য সভ্যতা বলে যা আমরা প্রচার করে থাকি তাতে বহু অনার্যের মহৎ অবদান আছে। এমন কি বহু অনার্যের এই অবদান না থাকলে আর্য সভ্যতা তার বর্তমান রূপ নিতে পারত কিনা সন্দেহ। উপনিষদের মহান ঋষি সত্যকাম জাবাল অনার্য দাসীপুত্র ছিলেন। উপনিষদ্ বলেছে জবালা "পরিচর্যাকারিণী" ছিলেন। সে যুগে কায়িকশ্রমের কাজ অমার্যাদাসূচক ছিলো না বটে, তথাপি কোনো আর্যকন্যার পক্ষে অপরের "পরিচর্যার" কাজ করা সম্ভব ছিলো না। শংকরাচার্য অবশ্য জবালাকে স্বামীগৃহবাসিনী এবং স্বামীগৃহে পরিচর্যানিরতা বলে উল্লেখ করেছেন। (ছান্দোগ্য উপনিষদের শংকর-ভাষ্য)। কিন্তু উপনিষদে আছে, জবালা স্বামী পরিচয় না দিয়ে পুত্রকে তার মাতৃপরিচয় গ্রহণ করতে বলেছিলেন। সেই হেতু তাঁর স্বামী পরিচয় অজ্ঞাত হওয়াই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ জবালাকে "ভর্তৃহীনা" বলেছেন। তাছাড়া এই যে মাতৃকেন্দ্রিক (matriarchal) বংশধারার প্রথা তা সম্পূর্ণরূপে অনার্যপ্রথা ছিলো। দক্ষিণ ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে আজ পর্যন্ত এই প্রথা বিদ্যমান থেকে এই প্রথার অনার্যত্ব ঘোষণা করছে।

ঐতরেয় উপনিষদের সংকলক বা রচয়িতা মহিদাসও অনার্য দাসীপুত্র ছিলেন। তাঁরও পিতৃপরিচয় ছিলো না। জননী "ইতরা"কে স্মরণীয় করে রাখবার জন্যেই তিনি

তাঁর উপনিষদের নাম দিয়েছিলেন ঐতরেয় উপনিষদ। এই ব্যবস্থাও মহিদাসের অনার্যত্ব প্রমাণ করে, কারণ তিনিও মাতৃকেন্দ্রিক প্রথার অনুসরণ করেছিলেন।

প্রথম দিকের আর্য সমাজ-ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি বর্ণেরই স্থান ছিলো। যে সকল অনার্য আর্য সমাজ-ব্যবস্থা গ্রহণ করত তাদের শূদ্র করে রাখা হোতো। অনার্যদের তখন দস্যু বলা হোতো। তথাকথিত আর্যরাই ভারতে দস্যু হয়ে ঢুকেছিলেন, কিন্তু তাঁরা ভারতের আদিম অধিবাসীদের নাম দিলেন দস্যু। এই দস্যুজাতীয় রত্নাকরই হলেন অমর মহাকাব্য রামায়ণের স্রষ্টা। তাঁকে দস্যু রত্নাকর বলে অনেকে ডাকাত মনে করে থাকেন বটে, কিন্তু আসলে তিনি দস্যুজাতীয় অর্থাৎ অনার্য ছিলেন বলেই তাঁর নাম ছিলো দস্যু রত্নাকর। মহাভারতেরও আদি-উৎপত্তি অনার্য সূত্র থেকে। দ্রৌপদীর বহু স্বামীত্ব, ভীম কর্তৃক দুঃশাসনের রক্তপান, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ প্রভৃতি নিঃসন্দেহে মহাভারতের অনার্য উৎপত্তি প্রমাণ করে। ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এ কথা পরিষ্কার ভাবে স্বীকার করেছেন। (Indian Philosophy, Vol. I, ৪৭৮ পৃঃ)।

এককথায় প্রথম দিকে ভারতে জাতিপ্রথা আধুনিক যুগের মত এমন নিষ্করুণ ও অনড় ছিলো না। আর্য সমাজ-ব্যবস্থায় চার বর্ণের স্থান পৃথক হলেও আদি যুগে জাত্যান্তর গ্রহণ বা জাতির পরিবর্তন অসম্ভব ছিলো না। ঠিক কবে থেকে হিন্দু সমাজ-ববস্থায় জন্মগত জাতিপ্রথার প্রচলন হোলো তার প্রমাণ দেওয়া শক্ত। গীতায় আছে, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন :

"চাতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ।"

অনেকে এই কথার ব্যাখ্যা করেন যে, স্বয়ং ভগবান গীতার এই কথায় হিন্দু-সমাজকে চারিটি বর্ণে ভাগ করে দিয়েছেন। অবশ্য গীতা সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন :

"How could there be so much discussion about Jnana, Bhakti and Yoga on the battlefield where the huge army stood in battle-array ready to fight just waiting for the last Signal? And was any shorthand writer present there to note down every word spoken between Krishna and Arjuna in the din and turmoil of the battle field...there is enough ground to doubt as regards the historicity of Arjuna and others"...(Selections from Swami Vivekananda, ৩৩০-৩১ পৃঃ) কিন্তু ভগবান যদি হিন্দুসমাজকে চারি বর্ণে ভাগ করে দিয়েই থাকেন তাহলেও ভগবানের নির্দেশে জাতিবর্ণ জন্মগত নয়, স্পষ্টতঃই গুণকর্ম বিভাগগত। তাই কবে থেকে জাতিবর্ণ হিন্দুসমাজে জন্মগত হয়ে দাঁড়ালো তা বলা শক্ত।

মনুস্মৃতিতে আছে ভগবান চতুর্বর্ণ সৃষ্টি করে জাতির গণ্ডী চিরদিনের মত বেঁধে দিয়েছেন। তাছাড়া মনুস্মৃতিতে নির্দেশ দেওয়া আছে : কোনো ব্রাহ্মণের বাড়ী শূদ্র অতিথি এলে তাকে ব্রাহ্মণের বাড়ীর চাকরদের সঙ্গে খেতে বসতে দিতে হবে। কয়েক বছর আগে আমি Vigil সাপ্তাহিক পত্রে দেখাবার চেষ্টা করেছিলাম যে, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি মনুস্মৃতির চেয়ে পুরাতন। এবং যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি কোনো জায়গাতেই হিন্দুসমাজে এই ধরনের অনুদার নিয়মাদি প্রচলনের চেষ্টা করে নি। সেই প্রবন্ধে আমার প্রধান বক্তব্য ছিলো : যাজ্ঞবল্ক্য নামে একজন মহান ঋষি ছিলেন, উপনিষদে তার উল্লেখ আছে। কিন্তু মনু বলে কোনো মানুষের অস্তিত্ব ছিলো না। ঋগ্বেদে উল্লিখিত পিতা মনুকে মনুস্মৃতির রচয়িতা বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কিন্তু তিনি কল্পনার পুরুষ, তাঁকে মানুষের পর্যায়ে ফেলা যায় না। মহাভারতে দু'জন মনুর উল্লেখ আছে। স্বায়ম্ভুব মনু (শান্তি পর্ব ২১।১২) এবং প্রাচেতঃ মনু (শান্তি পর্ব ৫৭।৪৩, ৫৮।২)। প্রথমজন ধর্মশাস্ত্রকার, দ্বিতীয়জন অর্থশাস্ত্রকার। অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র সব কিছুর সঙ্গেই তখন একজন মনুর নাম যোগ করে দেওয়া রেওয়াজ ছিলো। বুলার ও ম্যাক্সমূলার উভয়েই মনুর প্রাচীনত্ব এমন কি অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাই লিখেছিলাম পিতা মনুর নাম নিয়ে পরবর্তী যুগে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনুস্মৃতিকে প্রাচীন স্মৃতি বলে চালিয়েছিলেন। মনুস্মৃতির সুপ্রাচীনত্ব স্বীকার করে নিলেও বহুবিধ অনুদার নিয়মাবলী যে এতে পরে যোগ করে দেওয়া হয়েছিল তা বলতে আমার কোনো দ্বিধা নেই। কারণ, আগেই বলেছি হিন্দুসমাজের জাতি-ব্যবস্থায় আদি যুগে অনুদারতার স্থান ছিলো না।

তাছাড়া সকল হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশ হচ্ছে এই যে, শ্রুতি ও স্মৃতির যেখানে বিরোধ হবে সেখানে স্মৃতিকে অমান্য করে শ্রুতির নির্দেশই মান্য হবে। "স্মৃতিশ্রুতি বিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী।" অতএব মনুস্মৃতিতে বা গীতাতে যাই লেখা থাক না কেন হিন্দুদের কোনো শ্রুতি মানুষে মানুষে সমত্ব এবং সমগ্র মনুষ্যজাতির একাত্মতা ছাড়া কোথাও জাতিবিভেদের মত সংকীর্ণ ও অমর্যাদাসূচক মতবাদ প্রচার করে নি। সেই হেতু মনু-

স্মৃতির যে সকল বিধান শ্রুতির লিখনের বিরোধী সে বিধানগুলি হিন্দু ধর্মশাস্ত্র অনুসারে পরিত্যজ্য। জাতি-বিভেদের জন্মগত উচ্চ-নীচ বিভাগও সেই হেতু শ্রুতি-বিরোধী।

তবু হিন্দুসমাজের এই আদর্শগত ও মনস্তাত্ত্বিক গোঁজামিলকে অনুসরণ করেই নিষ্ঠুর অনুদার জাতি-ব্যবস্থা ধীরে ধীরে সমস্ত হিন্দুসমাজে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসলো। হিন্দুসমাজের এই আদর্শগত ও মনস্তাত্ত্বিক গোঁজামিল লক্ষ্য করেই বিখ্যাত ইংরেজ আইন শাস্ত্রবিদ্ সার হেন্‌রি সামনার মেইন হিন্দু সভ্যতাকে "Perverted Civilization" বলে উল্লেখ করেছেন। (তাঁর লেখা Ancient Law দেখুন)। আর স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "আমাদের বেদান্ত-মত আছে, কিন্তু কার্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা নাই। আমাদের পুস্তকে মহা-সাম্যবাদ আছে, আমাদের কার্যে মহাভেদবুদ্ধি। মহা নিঃস্বার্থ নিষ্কাম কর্ম ভারতেই প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু কার্যে আমরা অতি নির্দয়, অতি হৃদয়হীন, নিজের মাংস-পিণ্ড-শরীর ছাড়া অন্য কিছুই ভাবিতে পারি না।"

(পত্রাবলী, ২য় ভাগ)

"দশ বৎসর যাবৎ ভারতের নানাস্থানে বিচরণ করিয়া দেখিলাম সমাজ-সংস্কার সভায় দেশ পরিপূর্ণ। কিন্তু যাহাদের রুধিরশোষণের দ্বারা 'ভদ্রলোক' নামে প্রথিত ব্যক্তিরা 'ভদ্রলোক' হইয়াছেন ও রহিতেছেন তাঁহাদের জন্য একটি সভাও দেখিলাম না। মুসলমান কয়জন সিপাহী আনিয়াছিল। ইংরেজ কয়জন আছে? ছয় টাকার জন্য নিজের পিতা ভ্রাতার গলা কাটিতে পারে এমন লক্ষ লক্ষ লোক ভারত ছাড়া আর কোথায় পাওয়া যায়? সাত-শ' বছর মুসলমান রাজত্বে ছ' কোটি মুসলমান একশ' বছর ক্রীশ্চান রাজত্বে কুড়ি লক্ষ ক্রীশ্চান, কেন এমন হয়? Originality একেবারে দেশকে কেন ত্যাগ করিয়াছে?" (পত্রাবলী, ২য় ভাগ)

অনেকে বলেন, মুসলমান আক্রমণের হাত থেকে হিন্দুসমাজকে রক্ষার জন্যই এ ধরনের অনড় জাতি-ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিলো। স্বামী বিবেকানন্দের কথা অনুসরণ করে আমি বলবো, এই অনুদার জাতিপ্রথার জন্যই এই কয়েক সহস্র মুসলমান আক্রমণকারী ভারত জয় করতে সক্ষম হয়েছিল এবং বারে বারে ভারতবর্ষ বিদেশীর ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছিলো।

যাই হোক, শেষে অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, হিন্দু-সমাজের প্রতিটি শ্রমজীবি শ্রেণীর লোককে অস্পৃশ্য ও অ-জলচলরূপে পরিণত করা হলো। অর্থাৎ কায়িক শ্রম করে যাকে দিন যাপন করতে হয়, মেহনত করে যে নিজেকে ও সমাজকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করে হিন্দু-সমাজে সেই হলো অস্পৃশ্য ও অ-জলচল। তার জল পর্যন্ত উচ্চশ্রেণীর লোকেরা ছোঁবেন না, তাহলে জাত যাবে।

হিন্দুসমাজের এই ব্যবস্থা অনুসারে কালক্রমে হালিক কৈবর্ত ও জালিক কৈবর্ত উভয় সম্প্রদায়ই অস্পৃশ্য ও অ-জলচল শ্রেণীতে পরিণত হলেন। হিন্দুসমাজের ব্যবস্থা-পনায় অন্যান্য তথাকথিত অস্পৃশ্য শ্রেণীর মত কৈবর্তদের বাংলা দেশে কি অবস্থা ছিলো তার কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া এখানে দরকার মনে করি।

কৈবর্ত জাতীয়া রাণী রাসমণি যখন দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দির প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন তখন কোনো সদ্ ব্রাহ্মণ কৈবর্তের প্রতিষ্ঠিত ভবতারিণীর মন্দিরে পূজারীর পদ গ্রহণে সম্মত হন নি। কারণ ভবতারিণী যদি কৈবর্তের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা হন তা হলে তিনি আর ভবতারিণী থাকেন না। শেষে ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভ্রাতা এই সর্তে পূজারীর পদ গ্রহণে রাজি হন যে, কৈবর্ত রাসমণি তাঁর মন্দিরের মালিকানা কোনো ব্রাহ্মণের নামে হস্তান্তর করবেন এবং রাসমণি মন্দিরের সেবায়েৎ মাত্র হয়ে থাকবেন। কিন্তু এত করেও মন্দিরে নিয়মিত পূজা আরম্ভ হবার পর কোনো ব্রাহ্মণ সাধুসন্ত রাসমণির মন্দিরের অন্নভোগ গ্রহণ করতেন না। মা ভবতারিণীর অন্নভোগ প্রথম প্রথম কুকুর ও গরুকে খাওয়ানো হোতো (বেলুড় মঠের স্বামী সারদানন্দের লেখা ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনী দেখুন)। এমন কি ঠাকুর রামকৃষ্ণ পর্যন্ত প্রথম প্রথম মন্দিরের ভোগ না খেয়ে নিজে হাতে ভাত রেঁধে খেতেন। যেদিন প্রথম মন্দিরের পূজার ভোগ খেলেন সেদিন তিনি মা ভবতারিণীর কাছে অনুযোগ করেছিলেন, "শেষে কৈবর্তের অন্ন খাওয়ালি মা?" (স্বামী সারদানন্দের লেখা ঠাকুরের জীবনী দেখুন)। এ সব ১৮৫৬-৫৭ সনের কথা।

তার পর দেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হোলো। স্বাধীনতার আন্দোলন আরম্ভ হোলো। দেশে যেন নতুন যুগের সূচনা হোলো। অসহযোগ আন্দোলন এলো। বাংলায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে প্রবল আন্দোলন সুরু হোলো। এই সময়ে দাশ সাহেবের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ যিনি ছিলেন তিনি কৈবর্ত জাতীয় দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল।

দাশ সাহেব বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি, শাসমল মহাশয় সম্পাদক; দাশ সাহেব ভারতীয় স্বরাজ্য দলের সভাপতি, শাসমল মহাশয় সম্পাদক;

দাশ সাহেব কাউন্সিলে স্বরাজ্য দলের দলপতি, শাসমল মহাশয় চিফ হুইপ, দাশ সাহেব তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের সভাপতি, শাসমল মহাশয় সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ, দাশ সাহেব "ফরোয়ার্ড" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা, শাসমল ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। দু'জনের সৌহার্দ এত গভীর ছিলো যে ঢাকা-বিক্রমপুরের চিত্তরঞ্জন, কলিকাতার ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন, শাসমল মহাশয়ের জন্মস্থান মেদিনী-পুরের কৈবর্ত প্রধান কাঁথি থেকে স্বরাজ্য দলের প্রার্থী হয়ে ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। শাসমল মহাশয় বাংলার প্রথম অসহযোগী ব্যারিষ্টার। দাশ সাহেবেরও আগে তিনি ব্যারিষ্টারী পরিত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। পরে অবশ্য রাজনীতি পরিত্যাগ করে ইনি আবার ব্যারিষ্টারি ব্যবসা আরম্ভ করেছিলেন।

বাংলার কংগ্রেস দল যখন কর্পোরেশন অধিকার করলো তখন তিনি মাত্র পাঁচ শত টাকা পারিশ্রমিকে কর্পো-রেশনের চিফ্ একজিকিউটিভ অফিসারের কাজ করতে রাজি ছিলেন। কিন্তু তিনি জাতিতে কৈবর্ত ছিলেন সেই অপরাধে কংগ্রেসের প্রধান প্রধান নেতারা শাসমল মহাশয় কর্তৃক ঐ পদ গ্রহণের বিরোধিতা করেন। কংগ্রেস দলের সভায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সম্মুখে বাংলার বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা পরে কর্পোরেশনের মেয়র নির্মলচন্দ্র চন্দ্র শাসমল মহাশয় সম্বন্ধে বলেন: "মেদিনী-পুরের ক্যাওট কলকাতায় এসে রাজত্ব করবে?" দেশবন্ধুও নীরবে তাই সমর্থন করেছিলেন। দেশবন্ধুর একান্ত সচিব হেমন্তকুমার সরকারের লেখা 'দেশবন্ধু স্মৃতিতে' এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ আছে। বাংলার কংগ্রেস নেতাদের এই নীচতা নিয়ে বিখ্যাত "Capital" পত্রিকার Ditcher's Diary-তে সে সময়ে কঠোর মন্তব্য করা হয়েছিল। একই কারণে শাসমল মহাশয়কে কংগ্রেসের সম্পাদক, তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের সম্পাদক প্রভৃতি পদ হতে অপসারণের ব্যবস্থা করা হয়।

এর পরেও বাংলার কংগ্রেস নেতারা দলবদ্ধভাবে "মেদিনীপুরের ক্যাওট" এই শাসমল লোকটিকে বহু প্রকারে লাঞ্ছিত করবার চেষ্টা করেন। অন্যান্য ছোটো-খাটো ঘটনার উদাহরণ না দিয়ে একটিমাত্র উদাহরণ দেবো তাতে যে কোনো ভদ্র ব্যক্তির মাথা লজ্জায় নীচু হয়ে যাওয়া উচিত।

শাসমল মহাশয় জনৈক বন্ধু বীরভূমের শ্রীঅবনীশচন্দ্র রায়ের নিকট ৫০০৲ টাকা ধার নিয়েছিলেন। অবনীশ-বাবুর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শ্রীসত্যেন রায়ের আইন উপদেষ্টা হিসাবে বাংলার জনৈক বিখ্যাত কংগ্রেস নেতার (এখন মৃত) নিকট ধারশোধ বাবত শাসমল মহাশয় কিস্তিতে কিস্তিতে টাকা দিতেন। যখন মাত্র দু'শো টাকা বাকি তখন সেই বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে ১৯৩৩ সনে শাসমল মহাশয়ের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা (body warrant) বা'র করিয়ে তাঁকে সিভিল জেলে পাঠিয়েছিলেন। ১৯৩৪ সনে শাসমল মহাশয় মারা গেলে কলিকাতা হাইকোর্টের তখনকার প্রধান বিচারপতি হাই-কোর্টের শোকসভায় বলেছিলেন, "He was one of the leaders of the bar," যিনি শাসমল মহাশয়ের নামে বডি ওয়ারেণ্ট বা'র করিয়েছিলেন সেই কংগ্রেস নেতাও আইন ব্যবসায়ী ছিলেন। পেশাগত ভদ্রতাও এই কংগ্রেস নেতাকে এই নীচ কাজ থেকে বিরত করতে পারে নি। যাঁদের আইন সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান আছে তাঁরাই সামান্য আর্থিক দেনার জন্য ব্যক্তিগত গ্রেপ্তারী পরোয়ানা কেবলমাত্র পলায়নোন্মুখ বিত্তহীন দেনদারের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। কিন্তু কলিকাতার বিখ্যাত ব্যারিষ্টার হওয়া সত্ত্বেও নিজের ভূতপূর্ব কংগ্রেসী সহকর্মী এবং আইন ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হাতের এই লাঞ্ছনা থেকে শাসমল মহাশয় রেহাই পান নি। অনুমান করলে খুব ভুল হবে না যে, কৈবর্ত হিসাবেই শাসমল মহাশয় এই লাঞ্ছনার লক্ষ্যবস্তু ছিলেন। এই ঘটনার উল্লেখ করে তখনকার এক বাংলা দৈনিক সংবাদ-পত্রের প্রধান সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখা হয়েছিল: "সাধারণের প্রাণের দেবতা শাসমলের বিরুদ্ধে এই জঘন্য রাজনৈতিক চালবাজী দেশবাসী কখনও ক্ষমা করিবে না।" ভবিষ্যতে দরকার হলে আমি এই দৈনিক পত্রিকার নাম দেব।

কিন্তু যাঁরা এই জঘন্য নীচতার জন্য দায়ী কংগ্রেসের সেই চিরকর্তৃত্ব প্রয়াসী দলটির কেহই শাসমল মহাশয়ের কাছে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা বা দুঃখপ্রকাশ করেন নি।

নিজে কৈবর্ত হিসাবে সারাজীবন কংগ্রেস নেতাদের কাছে নানা প্রকারে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন বলে দেশপ্রাণ শাসমলই প্রথম ১৯৩০-৩১ সনের সেন্সাসের সময়ে তখন-কার বাংলার গভর্ণর সার জন এণ্ডারসনের কাছে ব্যক্তি-গত ভাবে দাবি জানান যে, তাঁর সম্প্রদায় অর্থাৎ হালিক কৈবর্তেরা অ-জলচল অর্থাৎ অস্পৃশ্য নয়। তাদের গৌরব-ময় অতীত ইতিহাস তাদের অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। সার জন এণ্ডারসন সে-দাবি স্বীকার করে নিয়ে ছিলেন। হালিক কৈবর্তরা তার পর থেকেই মাহিষ্য নাম গ্রহণ করে আসছেন। সেন্সাসে তাদের মাহিষ্য বা হালিক কৈবর্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছিল।

আগেই বলেছি, তাদের অতীত ও বর্ত্তমান গৌরবময় ইতিহাস সত্ত্বেও হিন্দুসমাজে কৈবর্ত্তদের (যেমন অন্যান্য কায়িক পরিশ্রমী শ্রেণীগুলিকে) অ-জলচল বলে মনে করা হোতো এবং এখনও কোনো কোনো জায়গায় হয়। কাজেই ইংরাজের সেন্সাসে হালিক কৈবর্ত্তদের জলচল বলে স্বীকার করে নেওয়া সত্ত্বেও কৈবর্ত্ত নাম থাকার দরুণ ব্যবহারিক জীবনে তাদের অ-জলচলত্ব দূর হওয়া সম্ভব হয় নি। তাই সেই কৈবর্ত্ত নামটি বাদ করে দিয়ে তাঁরা মাহিষ্য নাম নিয়ে হিন্দুসমাজে নিজেদের জলচলত্ব প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেছেন। কারণ হিন্দুসমাজে নামের বাহ্যিক মোহটাই সবচেয়ে বেশি।

হয় ত মাহিষ্যরা আর হালিক কৈবর্ত্তরা এক নয়। কিন্তু হালিক কৈবর্ত্ত ছাড়া অন্য কোনো সম্প্রদায় মাহিষ্য নামের দাবিদার হন নি। ব্যবহারিক জীবনে হালিক কৈবর্ত্তরা শুধুমাত্র সামাজিক অবজ্ঞার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যেই মাহিষ্য নাম ব্যবহার করে আসছেন। হিন্দুসমাজে জাতিবর্ণের এই ধরনের নামান্তর গ্রহণ অপ্রচলিত ছিলো না। বাংলায় যাঁদের আমরা বৈদ্য জাতি বলে জানি তাঁদের আসল নাম ছিলো অম্বষ্ঠ। অন্য কোনো সম্প্রদায় যখন মাহিষ্য নামের দাবিদার নেই তখন হালিক কৈবর্ত্ত যদি মাহিষ্য নামটা গ্রহণ করে থাকে তাতে দোষের কিছু থাকতে পারে না।

অবশ্য অনেকে বলবেন এই দুর্বলতা সমর্থনীয় নয়। কিন্তু তার জন্য শুধু হালিক কৈবর্ত্তদের দায়ী করলে চলবে কেন? জাতি সম্বন্ধে এই দুর্বলতার জন্য দায়ী সমগ্র হিন্দুসমাজ—দায়ী হিন্দুসমাজের তথাকথিত উচ্চবর্ণের ব্যক্তিরা যাঁরা হিন্দুসমাজের সর্ববৃহৎ অংশ কায়িক পরিশ্রমী শ্রেণীগুলিকে শত শত বছর ধরে অস্পৃশ্য করে রেখে দিয়ে নিজেরা কেবল অর্থহীন আচারের নিয়মকানুন নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন।

আমি নিজে যদিও হালিক কৈবর্ত্ত তবুও আমি হালিক বা জালিক কৈবর্ত্তের এমন কি তথাকথিত অস্পৃশ্য শ্রেণীদের মধ্যে কোনো তফাৎ দেখি না। কিছুদিন আগে প্যারিসে ছিলাম। সেখানে সভায়, বৈঠকে, খানাপিনায় আমি নিজেকে untouchable (অস্পৃশ্য) বলে পরিচয় দিয়েছি। পৃথিবীর যে-কোনো স্থানে যতদিন একটা লোককেও অস্পৃশ্য বলে মনে করা হবে ততদিন আমি নিজেকে অস্পৃশ্য বলেই পরিচয় দেব।

কায়িক শ্রম যে অস্পৃশ্যতার জ্ঞাপক নয় সমগ্র হিন্দু-সমাজে এই সত্যটুকু আজও সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি। পশ্চিম ভারতে ততটা নয় কিন্তু পূর্ব ভারতের প্রদেশ-গুলিতে বিশেষ করে বাংলা দেশে এই দুর্বলতা আজও সেখানকার হিন্দুদের জীবনকে ক্ষীয়মান করে চলেছে। বিভিন্ন নৈসর্গিক কারণে পশ্চিম ভারতের প্রদেশগুলিতে কায়িক শ্রমের গুরুত্ব কিছুটা স্বীকৃত হলেও জাতিগত সংকীর্ণতা যে সেখানকার হিন্দুসমাজকেও বিষাক্ত করেই রেখেছে তারও প্রমাণ আছে। হিন্দুসমাজে অগ্রগণ্য মারাঠা জাতির মধ্যে এই জাতিবিভেদের বিষ সম্বন্ধে বিখ্যাত ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকার ১৯৫২ সনের লিখেছেন :

"Even to-day caste squabbles are not dead in Maharashtra though the newspapers carefully exclude information on this unsavoury subject. Brahman Prabhu wrangles about religions claims are still boiling up; even the Brahmans are not a happy family in all their branches. Are Karhada Brahmans totally at ease about Chitpavan hostility, say in Ratnagiri! Let those who know the facts ponder on the consequences." (House of Sivaji, ৩৩৯ পৃ:)

কায়িক শ্রমের মর্যাদা দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি বলেই হালিক কৈবর্ত্তরা নিজেদের বৃত্তিগত জীবনের নামটিকে পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। বৃত্তিকে তাঁরা অস্বীকার করতে পারেন না কারণ বৃত্তিকে অস্বীকার করলে তাঁরা খাবেন কি? কিন্তু বৃত্তিগত জীবনের এই যে নামটুকু পরিবর্তন করবার প্রেরণা এ তো তাঁরা হিন্দুসমাজ থেকেই পেয়েছেন যে সমাজে কায়িক শ্রমের জীবন জন্মগত-হীনতার লক্ষণ।

কায়িক শ্রম সম্বন্ধে অবজ্ঞার ভাব যতদিন হিন্দুসমাজ থেকে সম্পূর্ণ দূর না হবে ততদিন শুধু হালিক কৈবর্ত্ত কেন অন্যান্য সকল তথাকথিত অ-জলচল শ্রেণীর লোকেরা এই ধরনের আপাতবিরোধী মনোভাবের প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হবেন। সেজন্য তাঁদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। তাঁরা এই হিন্দুসমাজেরই অঙ্গ। এ সমাজের সকল দোষ স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের মধ্যে বর্তিয়েছে। তাই তথা-কথিত উচ্চবর্ণের লোকেদের মানসিক পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন সর্বাগ্রে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"যারে তুমি নিচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নিচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে আড়ালে ঢাকিছ যারে
তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।"

নষ্টচন্দ্র

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

চন্দ্রের উৎপত্তি

(১) অত্রিনেত্র হ'তে জাত ক্ষীরোদ-সাগরে,
তারাকান্ত শশী রাজ শঙ্কর-শেখরে ;
শ্বেত-শঙ্খ-সমপ্রভ শ্বেতাশ্ববাহন,
ষোলকলাপূর্ণ(২)ইন্দু রজনীমোহন।

আর্যধর্ম-শাস্ত্রীয় পৌরাণিক গ্রন্থে চন্দ্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বর্ণনা আছে যে, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার মানসতনয় মহর্ষি অত্রির মহাতপস্যা সম্ভূত তেজোরাশি তদীয় নেত্র হইতে নির্গত হইয়া দশদিগ্‌দেবীগণের গর্ভে চন্দ্রের জন্মদান করে। নবজাত-চন্দ্র-ক্ষীরোদ সাগরে আশ্রিত থাকেন এবং দেবাসুরের সমুদ্র মন্থনকালে ভুবন-মনোহর অতুল সৌন্দর্যের খনিরূপে সমুত্থিত হইয়া ব্রহ্মার রথে আরোহণ-পূর্বক একবিংশবার বা সপ্তবিংশবার বসুধাকে প্রদক্ষিণ করেন।

এই প্রদক্ষিণকালে তাঁহার তেজ ক্ষরিত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হয়, এবং তাহা হইতেই ওষধি তৃণলতা-গুল্মের সৃষ্টি হয়। সোমদেব বহুশত বৎসর তপস্যা করেন, তৎপর ব্রহ্মাকর্তৃক বীজ, ওষধি, বিপ্র ও জলরাশির আধিপত্যে নিযুক্ত হন। এই আধিপত্য লাভ করিয়া তিনি বিরাট রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা, অত্রি, ভৃগু সেই যজ্ঞে ঋত্বিক ছিলেন এবং বহু মুনি-গণের সহিত স্বয়ং হরি সদস্তকর্মে ব্রতী ছিলেন(৩)।

দেবসমাজে চন্দ্র সৌন্দর্যে, ঐশ্বর্যে ও প্রভূত সম্মান লাভে ক্রমে মদোন্মত্ত হইয়া উঠেন এবং মতি বিভ্রমবশতঃ দেবগুরু আঙ্গিরস বৃহস্পতির পত্নী তারা-দেবীকে হরণ করেন(৪)। এই দেবস্বভাব-বিরোধী এমন কি শিষ্টজন বিগর্হিত আচরণ দ্বারাই অকলঙ্ক শশাঙ্কদেব কলঙ্কিত 'নষ্টচন্দ্র' নামে অভিহিত হন। তারাকান্ত বা নক্ষত্রপতি শশীর তারা মিলনের ফলে চতুর্থ গ্রহ বুধের জন্ম হয়।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও বিভিন্ন ধারণা

আদিত্য, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু এবং কেতু(৫) এই নবগ্রহ ;—অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্বফাল্গুনী, উত্তরফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া, (অভিজিৎ) শ্রবণা, ধনিষ্ঠা (শ্রবিষ্ঠা), শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী—এই সাতাশটি নক্ষত্র বা তারকার সহিত পর্যায়-ক্রমে মিলিত হইয়া নাক্ষত্রিকীদশাগ্রস্ত কলিযুগে পৃথিবীতে আকর্ষণ বিকর্ষণের ক্রীড়া করিতেছে। নভোমণ্ডলের কক্ষপথে (orbit) অবিরাম ভ্রমণশীল গ্রহনক্ষত্রের গতি-বিধির অতীব সূক্ষ্ম বিপর্যয়, যাহা পৃথিবী ও পৃথ্বীবাসীদের পক্ষে অশুভ-সূচক তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই পৌরাণিক আখ্যায়িকায় অকলঙ্ক চন্দ্রকে কলঙ্কিত 'নষ্টচন্দ্র' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

নষ্টচন্দ্র নক্ষত্রজগতের একটি জটিল ব্যাপার। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্রাদির সহিত পৃথিবীর এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীবাসী মনুষ্যাদির নিত্য সম্বন্ধ। চন্দ্র সর্বাপেক্ষা পৃথিবীর নিকটস্থ বলিয়া, চন্দ্রের আকর্ষণই পৃথিবী এবং পৃথিবীর অধিবাসীগণের উপর বেশী পরিমাণে সংঘটিত হইয়া থাকে। তিথি বিশেষে আকর্ষণের আধিক্য হেতু পৃথিবীস্থ রসে অর্থাৎ সাগর ও নদনদীতে যেমন জোয়ার হয়, তেমনই পৃথিবীর বক্ষস্থ মানবাদির দেহেও জোয়ার

---

(১) পুষ্পরাণা গ্রন্থে—নবগ্রহ বন্দনায় চন্দ্রের বর্ণনা।

(২) পূষা. যশা, সুমনসা, রতিঃ, প্রাপ্তি, তথাধৃতিঃ।
ঋদ্ধিঃ, সৌম্যা, মরীচিশ্চ, তথা চৈবাংশুমালিনী।
অঙ্গিরা শশিনী, চেতি ছায়া, সম্পূর্ণমণ্ডলা।
তুষ্টি, শ্চৈবামৃতা চেতি কলাঃ সোমস্য ষোড়শ।

(৩) ব্রহ্মপুরাণ—৯ অঃ ২৫ শ্লোঃ—
হিরণ্যগর্ভো ব্রহ্মাত্রির্ভৃগুশ্চ ঋত্বিজোহভবৎ।
সদস্যোহভূদ্ধরিস্তত্র মুনিভির্বহুভির্বৃতঃ।

(৪) ব্রহ্মপুরাণ—৯ অঃ ১৮।১৯ শ্লোঃ—
তস্য তৎপ্রাপ্য দুষ্প্রাপ্যমৈশ্বর্যমৃষিসংকৃতম্।
বিবভ্রাম মতিস্তাত বিনয়াদনয়া হৃতা।
বৃহস্পতেঃ স বৈ ভার্যামৈশ্বর্যমদমোহিতঃ।
জহার তরসা সোমো বিমত্যাঙ্গিরসঃ সুতম্।

(৫) পাশ্চাত্যমতে হার্শেল, নেপচুন ও প্লুটো নামে আরও তিনটি গ্রহ আবিষ্কৃত।

সঞ্চারিত হয়। এই সঞ্চরণ ও সংক্রমণের ফলে দেহের গ্রন্থিতে ব্যথা, গা-কামড়ানো, শরীর ভার ভার বোধ, জড়তা, আহারে অনিচ্ছা, বায়ুর প্রকোপ, কামাদি রিপুর উত্তেজনা এবং এমন কি ভয়াবহ ক্ষয়রোগের উৎপত্তি পর্যন্ত চন্দ্রের আকর্ষণ হইতে হইয়া থাকে বলিয়া রাসায়নিক ও আয়ুর্বিজ্ঞানিদ্গণের অভিমত।

চন্দ্রের হিমকর অভিসেক লাভ করিয়া মানবজাতির মহোপকারী ওষধি তৃণ-লতা-গুল্মাদির উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয় বলিয়া ইঁহার এক নাম ওষধিনাথ। দেবগণ যে সোমরসামৃত পান করিয়া সোমপায়ী আখ্যা লাভ করিয়াছেন, সেই লোভনীয় মাদকদ্রব্য সোমলতার (Mcon plant) রস হইতে প্রস্তুত। এই মাদকদ্রব্য দেবতাদের অতিশয় প্রিয় বলিয়াই সোমযাগাদি দ্বারা দেবতর্পণের বিশেষ ব্যবস্থা আর্য-ধর্মানুষ্ঠানে প্রচলিত। চন্দ্র হইতে উপকার যেমন আমরা যথেষ্ট পাই, তেমনই আবার অপকার আশঙ্কাও আছে বলিয়া সাবধানতা অবলম্বনের ইঙ্গিত আর্যশাস্ত্রে সুস্পষ্ট!

গ্রীক্ শব্দ লিউনা (Luna) অর্থাৎ চন্দ্রমা এবং লাটিন শব্দ লিউন (Lunc) অর্থাৎ চন্দ্র হইতেই যেমন ইংরাজী শব্দ লুনার (Lunar) অর্থাৎ চান্দ্র হইয়াছে, তেমনই লুনাটিক (Lunatic = Moon-Struck) অর্থাৎ উন্মাদ বা বাতুল শব্দও উৎপন্ন হইয়াছে। শব্দ নিষ্পত্তির ভঙ্গী হইতেই বেশ প্রকাশিত হয় যে, সেই সেই ভাষার আদি স্রষ্টাগণের দৃঢ় প্রতীতি ছিল,—'চন্দ্রের আকর্ষণ হইতেই উন্মাদ রোগের উৎপত্তি!'

প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান মতে পৃথিবীর সাতটি আবেষ্টনী স্তর বা সপ্ত লহরীযুক্ত সাগর(১) পরিকল্পিত। ইহাদের ইংরাজী ভাষায় Enveloping zones বা Atmospheric zones বলা হয়। মত বিশেষে অনন্ত আকাশকে 'অণু' এবং পৃথিবীকে 'ইয়া' বলা হয় এবং এই অণু ও ইয়ার সংযুগেই সব কিছু সৃষ্টি। এই ধারণা হইতেই অনাদি লিঙ্গ পূজার প্রচলন(২)। এই ঊর্ধ্বতন সপ্ত আবরণী স্তর বা zone হইতেই সূর্যরশ্মি, চন্দ্ররশ্মি, বায়ুপ্রবাহ, বারিধারা পাত ইত্যাদি দ্বারা পৃথিবীতে সূক্ষ্ম জীব ও বীজ পরমাণু প্রবিষ্ট হয়(৩) এবং তাহাতেই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াদি প্রাকৃতিক কার্যাবলী নির্বাহিত হয়। সূর্যরশ্মি হইতে বহু প্রকার স্বাস্থ্যকর পরমাণু লাভ হয় বলিয়াই (SUNBATH, (ULTRAVIOLET) সৌরকরস্নান, কিরণ-চিকিৎসাদি মানব হিতার্থে প্রচলিত। আবার চন্দ্ররশ্মি হইতে অস্বাস্থ্যকর পরমাণু ক্ষরিত হয় বলিয়া উহা হইতে সাবধানতা অবলম্বনের নির্দেশ সুস্পষ্ট। চন্দ্রের প্রতি বহুক্ষণ তাকাইয়া থাকিলে কামবৃদ্ধি হয়, এমন কি গর্ভিণীর গর্ভ পর্যন্ত নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে। চকোর ও তিত্তির পাখী রাত্রে চন্দ্রের দিকে তাকাইয়া উন্মাদ হয়, পিঞ্জরের ভিতর থাকিয়াই চিৎকার ও উল্লম্ফন করিতে থাকে।

সূর্যরশ্মি যেমন আরোগ্যদ, জীবদেহকে হাল্কা করে, চন্দ্ররশ্মি তেমনই রসভারাক্রান্ত, বেদনিত এবং বিবিধ দুরারোগ্য রোগ বীজাণুতে দুর্বিসহ করিয়া থাকে। চন্দ্র ভাদ্র মাসে পৃথিবীর সমধিক নিকটস্থ হইয়া থাকে। এই জন্য সমুদ্র নিকটস্থ নদীমাতৃক প্রদেশে অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় সমুদ্র জল স্ফীত হইয়া সংলগ্ন নদ-নদীতে বাণ ডাকিয়া থাকে। ঐ সময়কার প্রচণ্ড বাণকে চলিত কথায় ষাঢ়াষাঢ়ীর বাণ বলা হয়। যাহা অণু-ইয়া বা পুরুষ-প্রকৃতির বাণ ইংরাজীতে (BOREAL-TIDE) কটালের বাণ নামে প্রসিদ্ধ এবং সরস অনুকূল বাংলা দেশেই সাধারণতঃ সংঘটিত হয়, অন্যত্র পশ্চিম প্রান্তে কিছু হয় না। এই প্রসিদ্ধ বাণ প্রতিপদ-দ্বিতীয়াতে তত প্রবল হয় না, তৃতীয়া হইতে প্রবলতর হইয়া চতুর্থীতে পূর্ণতা লাভ করে, তাই চতুর্থীর চন্দ্র 'নষ্টচন্দ্র' নামে খ্যাত হইয়া পৃথিবীবাসী জীবের সতর্কতার জন্য নির্দিষ্ট।

পাশ্চাত্য জগতের অতি গ্রীষ্মকাল (DOG DAYS) জুলাই মাসের ৩রা হইতে আগষ্ট মাসের ১১ই তারিখের মধ্যে নির্দিষ্ট। কালের আবর্তনে রাশিচক্রে সূর্য সংক্রমণের পরিবর্তন হেতু এই সময়ের অনুমান কুড়ি দিন অগ্রপশ্চাৎ ঘটে। এই নির্দিষ্ট কালে (SIRIUS-DOG STAR) মৃগব্যাধ বা লুব্ধক নামে এক তারকা সূর্যোদয়ের ঈষৎ পূর্বে দৃশ্য হইয়া উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়। এই তারকা দৃশ্য হইলেই অশুভ অর্থাৎ কষ্টকর অতি গ্রীষ্মকাল সূচিত হয় বলিয়া ধারণা সুস্পষ্ট।

পাশ্চাত্যের ঐ সময়ের সমকালীন প্রাচ্যের ভাদ্র মাস বিবেচিত। ভাদ্র মাসের স্বাস্থ্যতত্ত্ব বিচার করিলেও দেখা যায়, এই মাসে বর্ষার শেষ হয় বলিয়া আকাশ ক্রমশঃ মেঘ মুক্ত হয় এবং রৌদ্রের প্রখরতা বৃদ্ধি পায়। বর্ষায় রসাধিক্য বশতঃ শরীর শৈত্যগুণ যুক্ত থাকে এবং এই সময়ে হঠাৎ রৌদ্রের প্রখরতায় বায়ু ও পিত্ত অল্প কারণেই বিকৃত হইয়া পড়ে, এ জন্যই তখন নানা প্রকার রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। এই মাসের শেষ দিক হইতেই

---

(১) লবণেক্ষুসুরাসর্পির্দধিদুগ্ধজলার্ণবাঃ। (২) আকাশঃ লিঙ্গমিত্যাহু পৃথিবী তস্য পীঠিকা। (৩) আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ।

হিমপাত আরম্ভ হয়, সুতরাং হিম ও রৌদ্র উভয় হইতেই সাবধান থাকা উচিত।

চন্দ্র কিরণে স্নিগ্ধতা অতিশয় বলিয়া চন্দ্র কিরণ উপভোগ বা চন্দ্র দর্শনাদি বিশেষ ভাবে নিয়ন্ত্রিত। এই নিয়ন্ত্রণ সারা মাসব্যাপী না হইয়া নির্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ দিনে হইবার কারণ গ্রহ নক্ষত্রের পূর্বোক্ত সূক্ষ্ম গতি বিপর্যয়। এর সম্যক তাৎপর্য দূরদর্শী জ্ঞান ও সুগভীর সাধনা মথিত ঋষি হৃদয়ে স্পষ্টতম ভাবে প্রতিভাত ছিল, এক্ষণে সর্বহারা হইয়া আমাদের আর তাহা উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য নাই! তথাপি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা সহকারে মহাজন নির্দেশিত পথ অনুসরণ এবং তাৎপর্যানুধ্যানে যত্নশীল হইলে এর সত্য সন্ধান নিশ্চয় মিলিবে।

নষ্টচন্দ্র দর্শনের কুফল

স্মার্ত রঘুনন্দন তিথিতত্ত্বের ভিতর ভোজবংশের আদি পুরুষ মহাত্মা ভোজরাজের একটি হিতবচন(১) উদ্ধৃত করিয়া বর্ণনা করেন, সৌর ভাদ্রের শুক্ল-চতুর্থীতে চন্দ্রদর্শন করিলে মিথ্যা পরিবাদগ্রস্ত হইতে হয়। আবার অনুরূপ বর্ণনাও(২) আছে যে, সকল অশুভ হরণকারী হরি জগতের কল্যাণার্থ সময় নির্দেশ করিয়া দিলেন—ভাদ্র মাসের শুক্লা ও কৃষ্ণা চতুর্থীতে উদিত চন্দ্র কখনও দেখা উচিত নয়। ব্রহ্ম পুরাণ বিশেষ ভাবে বর্ণনা করেন(৩), নারায়ণ চন্দ্ররশ্মি দর্শন করিয়া অভিশপ্ত অর্থাৎ মিথ্যাপবাদ-গ্রস্ত হইয়াছিলেন। নষ্টচন্দ্র অর্থাৎ ভাদ্র মাসের উভয়-পক্ষীয় চতুর্থী তিথিযুক্ত চন্দ্র দর্শনে অদ্যাপি সেই দোষ মনুষ্যলোকে আপতিত হয়। নারায়ণের প্রতি বিজ্ঞাপিত মিথ্যাপবাদের দোষ নরেতে সংক্রমিত হয়, তাঁহার প্রিয়-পাত্র বলিয়া; এবং নারায়ণ তাঁর প্রিয়জনদের উদ্ধারের ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গেই এইরূপে রাখিলেন যে, দৈবাৎ দর্শনকারী পূর্বমুখী বা উত্তরমুখী হইয়া ধাত্রী বাক্য(৪) উচ্চারণপূর্বক শঙ্খোদক পানে নির্দোষ হইবে।

আর্য-শাস্ত্রানুশাসনে উল্লেখ আছে, ভাদ্র মাসের শুক্লা ও কৃষ্ণা চতুর্থীর চন্দ্র পাপাবিষ্ট বলিয়া দর্শনের অযোগ্য(১)। জ্যোতিষ-শাস্ত্রও সমভাবে ঘোষণা করেন, সূর্য যে মাসে সিংহ রাশিতে গমন করেন, সেই ভাদ্র মাসের উভয় পক্ষীয় চতুর্থীতে উদিত চন্দ্রকে কখনও দেখা উচিত নয়(২)।

শুভকর্ম সাধন না করিলে যেমন শুভকর্ম-ফল কেহ দিতে পারে না, তেমনই দুষ্কর্ম করিলে তজ্জাত দুর্ভোগও কেহ ঘুচাইতে পারে না, চন্দ্রের ভাগ্যেও এই দুষ্কর্মজাত ফল চিরদিনের জন্য সন্নিবেশিত হইয়া জগতকে শিক্ষা দিতেছে যে, দুষ্কর্মজাত পাপফল হইতে কাহারও নিস্তার নাই, মানবাদির কা কথা, ইন্দ্রচন্দ্রেরও নাই। চির স্নিগ্ধ স্বভাব তারাকান্ত শশী নিজেকে কলঙ্ক কালিমায় লিপ্ত করিয়াছিলেন দেবগুরু বৃহস্পতিপত্নী তারাদেবীকে হরণ করিয়া, তাই তিনি বিশ্বমাঝারে '-ইন্দ্র' এই কলঙ্কিত আখ্যা লাভ করেন। এই নষ্টচন্দ্র দর্শনের এমনই কুফল যে, দর্শনকারী কার্যতঃ কোন দোষের কাজ না করিলেও তাহাতে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপিত হইবে। এ বিষয়ের উজ্জ্বল প্রমাণ পাওয়া যায় শ্রীমদ্ভাগবতের 'স্যমন্তকমণি'র উপাখ্যানে। যাদবজীবন বসুদেবতনয় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই নষ্টচন্দ্র দর্শনের কুফলে মিথ্যা কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়া পরে নিজ অসমোর্ধ্ব বীর্যবলে তাহা ক্ষালন করিয়াছিলেন।

স্যমন্তক উপাখ্যান তথা শ্রীকৃষ্ণের কলঙ্ক মোচন

পরম সূর্যভক্ত যদুকুলোদ্ভব অন্ধকবংশীয় মহারাজ সত্রাজিৎ শ্রীশ্রীসূর্যদেবের প্রসাদে দুর্লভ স্যমন্তক-মণি লাভ করেন। এই মণির এমনই মহদ্গুণ যে, উহা হইতে প্রত্যহ অষ্টভারপূর্ণ স্বর্ণ মুদ্রা উৎপন্ন হইত। একদা তদীয় ভ্রাতা প্রসেনজিৎ এই মণি কণ্ঠে ধারণ করিয়া ঋক্ষবান পর্বতের নিকটস্থ গভীর অরণ্যে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে এই মণির অত্যুজ্জ্বল প্রভায় তিনি দ্বিতীয় সূর্যসম প্রতিভাত হইয়া সকল পশু-পক্ষীরই মহা ত্রাস উৎপাদন করেন। মহা বিক্রমশালী এক সিংহ তাঁহাকে দর্শনমাত্র বধ করিয়া মণি কাড়িয়া নিল এবং ঋক্ষবান পর্বতের গুহায় আশ্রিত হইল। সেই গুহার সুদূর অভ্যন্তর প্রদেশে চিরজীবী ভল্লুকরাজ জাম্বুবানের নিভৃত-নিলয় ছিল। জাম্বুবানের এক শিশু তনয় দূরস্থ গাঢ় তমসাচ্ছন্ন গহ্বর প্রদেশ হইতে সুড়ঙ্গ পথে এই মণির

---

(১) শুক্ল-চতুর্থ্যাস্তু সিংহে গতে চন্দ্রস্য দর্শনম্। মিথ্যাভিশাপঃ কুরুতে ন পশ্যেত্তত্র তদ্বুধঃ।

(২) হরিণা দীয়তে তাসী ভাদ্রে মাসি সীতাসীতে। চতুর্থ্যামুদিত-শ্চন্দ্রো নেক্ষিতব্যঃ কদাচন।

(৩) নারায়ণোঽভিশপ্তস্তু নিশাকরমরীচিষু। দ্বিতশ্চতুর্থ্যামদ্যাপি মনুষ্যান্ পরেচ্ছ সঃ। অতশ্চতুর্থ্যাং চন্দ্রস্তু প্রমাদাদ্বীক্ষ্য মানবঃ। পঠেদাত্রেরিকং বাক্যং প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ।

(৪) ব্রহ্ম পুঃ ১৬ অঃ ৩৬ শ্লোঃ (বিষ্ণু পুঃ)—সিংহঃ প্রসেন-মবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ। সুকুমারক! মা রোদীস্তব হ্যেষ স্যমন্তকঃ।

(১) নষ্টচন্দ্রো ন দৃশ্যশ্চ ভাদ্রে মাসি সিতাসিতে।

(২) পঞ্চাননগতে ভানৌ পক্ষয়োরুভয়োরপি। চতুর্থ্যামুদিতশ্চন্দ্রো নেক্ষিতব্যঃ কদাচন॥

মহাজ্যোতি দর্শনে প্রলুব্ধ হইয়া তাহা পাইবার জন্য তৎপিতা জাম্বুবানের নিকট কাঁদিতে লাগিল। তাহাতে জাম্বুবান আত্মবলে সিংহকে নিহত করিয়া স্যমন্তক-মণি উদ্ধার করতঃ ধাত্রীক্রোড়ে অবস্থিত নিজ কুমারের হাতে দিলেন। ধাত্রী তখন শিশুকে আর কাঁদিও না বলিয়া প্রবোধ দিলেন।

এদিকে মহারাজ সত্রাজিৎ স্বীয় ভ্রাতা প্রসেনজিৎকে মৃগয়া হইতে আর ফিরিতে না দেখিয়া মহা উদ্বিগ্ন হইলেন এবং মণিলোভে কেহ তাঁহাকে সংহার করিয়াছে বলিয়া স্থির ধারণা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কোনও সময়ে বহু সুবর্ণপ্রদ এই মণিটি সুরক্ষিত রাখার জন্য সত্রাজিতের নিকট হইতে নিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সত্রাজিৎ তাহা কিছুতেই দেন নাই। এক্ষণে প্রসেনজিতের সংহারবার্তা সর্বত্র ঘোষিত হইলে, সত্রাজিৎ এবং অন্যান্য যাদবগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রসেন-হন্তা বলিয়া সন্দেহ পোষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এই মিথ্যা কলঙ্কের বিষয় জানিতে পারিয়া তৎপূর্বরাত্রী নষ্টচন্দ্র দর্শনের ফল বলিয়া বুঝিলেন এবং অপবাদ ঘুচাইবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। তিনি যথোচিত সুদক্ষ যাদবসৈন্য সহ প্রসেনজিতের গমনচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া সেই গভীর অরণ্যে প্রবেশ করতঃ তাঁহার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ দেখিতে পাইলেন। তৎপর রক্তচিহ্ন অনুসরণ ক্রমে সমীপস্থ পর্বত গুহার উপনীত হইয়া নিহত সিংহদেহ দেখিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর গুহার অভ্যন্তর প্রদেশে গভীর অন্ধকারের ভিতর এক সুড়ঙ্গ পথ আবিষ্কার করিলেন। সিংহনিহন্তা মণিচোরের ইহাই গন্তব্য পথ বুঝিয়া অনুচর স-বলরাম যাদবগণকে গুহামুখে প্রত্যাবর্তনকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিয়া সর্বভয়মুক্ত মধুসূদন সুড়ঙ্গপথে সুগভীর ভল্লুকবিলে ধাবমান হইলেন। তথায় ধাত্রীক্রোড়ে ভল্লুক-শিশুর হস্তে স্যমন্তক-মণি দৃষ্ট হইল এবং তাহা উদ্ধারের জন্য ভল্লুকরাজ জাম্বুবানের সহিত দীর্ঘ ২৮ আটাশ দিন(১) তুমুল যুদ্ধ হইল।

বিষ্ণু পুরাণাদিতে বর্ণনা আছে,(২) ভল্লুকধাত্রী স্যমন্তক মণি গ্রহণেচ্ছু একজন মানুষকে আসিতে দেখিয়া 'রক্ষা কর রক্ষা কর' বলিয়া চীৎকার করায় ভল্লুকরাজ জাম্বুবান সক্রোধে উপস্থিত হইয়া আগন্তুকের সঙ্গে একুশ দিন অবিশ্রাম যুদ্ধ করেন। এদিকে গুহামুখে অপেক্ষমান যাদব সৈন্যেরা ১৫ পনের দিন(৩) পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও যখন শ্রীকৃষ্ণকে বাহির হইতে দেখিল না, তখন তাঁহার বিনাশ নিশ্চিত ধারণা করিয়া হতাশ হৃদয়ে দ্বারকায় গেল এবং হৃদয়বিদারক বার্তা জানাইল। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রাদ্ধাধিকারী স্বজনেরা তাঁহার উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদিক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করিলেন। শ্রাদ্ধে জল-পিণ্ডান্নদানাদির ফলে নিদ্রাহারবিহীন অবিরাম যুদ্ধে নিরত কৃষ্ণের দেহে বলপুষ্টিসঞ্চারিত হওয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বী জাম্বুবান পরাভূত হইলেন এবং কৃষ্ণানুরক্তা স্বদুহিতা জম্ববতীকে মণিসহ শ্রীকৃষ্ণ করে সম্প্রদান করিলেন।

এদিকে কৃষ্ণহারা হইয়া বসুদেব, দেবকী, রুক্মিণী হইতে আরম্ভ করিয়া সব যাদবেরা গভীর শোকমগ্ন হইলেন। তাঁহারা দুঃখ-দুর্গতি হইতে আশু পরিত্রাণের জন্য সমবেতভাবে পুণ্যসলিলা চন্দ্রভাগা নদীর তীরে শ্রীশ্রীদুর্গার পূজা করিতে লাগিলেন। পূজান্তে আশীর্বাদ গ্রহণ কালে অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণকে নব-পরিণীতা জাম্ববতী ও স্যমন্তক সহ উপস্থিত হইতে দেখিয়া পূজার ফলেই এই পরম লাভ হইল, এইরূপ সকলে দৃঢ়বিশ্বাস করিয়া অসীম আনন্দে মহামহোৎসব করিলেন।

মহারাজ সত্রাজিৎ নিজ ভ্রান্ত ধারণার জন্য অতীব লজ্জিত হইলেন এবং অপরাধ স্খালনার্থ স্বীয় দুহিতা কৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামাকে মণিসহ শ্রীকৃষ্ণ করে সমর্পণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সানন্দে সত্যভামার পাণিগ্রহণ করিলেন, কিন্তু সূর্যদত্ত স্যমন্তকমণি সূর্যভক্ত সত্রাজিৎকেই ফিরাইয়া দিলেন। ইহার পর কিছুদিন আনন্দে যাইতে না যাইতেই হস্তিনাপুর হইতে জতুগৃহদাহে পাণ্ডবদের বিনাশবার্তা অবগত হইয়া পাণ্ডবনাথ অগ্রজসহ হস্তিনায় গেলেন। তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে অক্রূর, কৃতবর্মা ও শতধনু প্রভৃতি যাদবগণ স্যমন্তক লোভে সত্রাজিৎকে নিধন করিয়া তাহা হস্তগত করিলেন।

এই দুঃসংবাদ শ্রবণমাত্র রামকৃষ্ণ হস্তিনা হইতে দ্বারকায় ফিরিয়া সত্রাজিৎ-হন্তা পলাতক শতধনুর সন্ধান করেন এবং তাহাকে বিনাশ করেন, কিন্তু মণি তাহার নিকট পাওয়া যায় নাই। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরিলে অক্রূর ও কৃতবর্মা প্রাণভয়ে নিরুদ্দিষ্ট হন, তাহাতে দ্বারকায় অনাবৃষ্টি প্রভৃতি বিবিধ অনর্থপাতের সূত্রপাত হয়।

---

(১) হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণাদিমতে ২১ একুশ দিন।

(২) বিষ্ণু পুঃ ৪র্থ খঃ ১৩ অঃ—তঞ্চ সমন্তকাভিলাষ-চক্ষুঃসমপূর্ণং পুরুষমাগতমবেক্ষ্য ধাত্রী ত্রাহি ত্রাহীতি ব্যাজহার। তদার্ত্তনাদশ্রবণানন্তরম্ অমর্ষপূর্ণহৃদয়ঃ স জাম্ববান আজগাম, তয়োশ্চ পরস্পরং যুধ্যতোর্যুদ্ধমেকবিংশতিদিনান্যভবৎ। তে চ যদুসৈনিকাস্তত্র দ্বারকামাগত্য হতঃ কৃষ্ণ ইতি কথয়ামাসুঃ। তদ্বান্ধবাশ্চ...উপরত ক্রিয়াকলাপং চক্রুঃ। ততশ্চাস্য যুধ্যমানস্যাতিশ্রদ্ধাদত্তবিশিষ্টপাত্রোপযুক্তান্নতোয়াদিনাকৃষ্ণস্য বলপ্রাণপুষ্টিরভূৎ।

(৩) শ্রীমদ্ভাগবত মতে ১২ বার দিন।

যাদবেরা অনেকে শ্রীকৃষ্ণকেই সকল অনর্থের মূল এইরূপ সন্দেহ করিতে থাকেন। কৃষ্ণ ইহা সবিশেষ উপলব্ধি করতঃ বহু অনুসন্ধানে অক্রুরকে দ্বারকায় আনয়ন করেন এবং তদ্দ্বারা সর্বসমক্ষে মণিটি প্রদর্শন করাইয়া আত্মকলঙ্ক স্খালন করেন। যাদবদের মিথ্যা সন্দেহ দূরীভূত হইল এবং তাঁহারা অকপট উল্লাসে শ্রীকৃষ্ণের জয়গান করিয়া ধন্য হইলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বীর্যগাথাসমন্বিত এই আখ্যান অনিষ্টনিবারক ও মঙ্গলপ্রদ। যিনি ইহা পঠন, শ্রবণ ও কীর্তন করেন, তিনি দুষ্কর্মজাত পাপমুক্ত হইয়া নিরন্তর শান্তি লাভ করেন(১)। শ্রীমদ্ভাগবতে স্যমন্তকমণির উপাখ্যানের এইরূপ মাহাত্ম্য বর্ণিত বলিয়াই নষ্টচন্দ্র দর্শনকারীদের পাপস্খালনের জন্য শ্রদ্ধাসহকারে ইহা পঠন, কীর্তন ও শ্রবণের কথা আর্য মনীষিগণ কর্তৃক বিনির্দিষ্ট।

(১) শ্রীমদ্ভাগবত—যস্ত্বেতদ্ভগবত ঈশ্বরস্য বিষ্ণোঃ,
বীর্যাঢ্যং বৃজিনহরং সুমঙ্গলঞ্চ।
আখ্যানং পঠতি শৃণোত্যনুস্মরেদ্বা,
দুষ্কীর্তি-দুরিতমপোহ্য যাতি শান্তিম্। (ফলশ্রুতিঃ)

সপ্তদশ শতকের এক মহিলা শিল্পী

শ্রীনন্দা সিংহ

এক শতাব্দী আগে য়ুরোপে মহিলা চিত্র-শিল্পীদের ভাগ্যে খ্যাতি প্রতিপত্তি খুব কমই জুটতো। তাদের ছবি আঁকা ছিল সৌখিনতারই নামান্তর। মেয়েদের আঁকার গণ্ডিও ছিল তখন অত্যন্ত সীমিত। বড় জোর হাতপাখা বা ফুলদানীর গায়ে একটু চিত্র-বিচিত্র করা, তার বেশী আর বড় কেউ এগুতো না। কিন্তু এরই এক ব্যতিক্রম ছিলেন রোসা বঁ-হোয়ের (Rosa Banheur)। রোসা'র মা মারা যান তার যখন মাত্র এগার বৎসর বয়স। চার ভাইবোনের মাঝে সেই ছিল সব চাইতে বড়। তাই সংসারের অনেক দায়িত্বই এসে পড়লো রোসা'র ছোট্ট মাথাটির উপর। মা-মরা ছোট ভাইবোনদের মানুষ করতে গিয়ে সেই বয়সেই সাজতে হলো তাকে "ছোট্ট মা"। বাবা ছিলেন এক সাধারণ শিল্প-শিক্ষক। যা উপার্জ্জন সংসার তাতে চলে না। রোসা'র বাবা রোসা'কে এক দর্জ্জির কাছে সেলাই শিখতে পাঠালেন, যদি তাতে কিছু সাশ্রয় হয়। কিন্তু রোসা'র মনের ইচ্ছা ছিল অন্য, বুঝি বা তার আশা-আকাঙ্ক্ষাও ছিল অনেক উঁচু। তার স্বপ্ন ছিল, সে হবে মস্ত এক চিত্র-শিল্পী, দেশে দেশে তার নামডাক ছড়িয়ে পড়বে। রাত্রির নির্জ্জন অবসরে, সব কাজের শেষে সুরু হ'ল শিল্প-সাধনা। বাবার কাছেই হ'ল তার হাতে খড়ি।

১৮৫৩ সনের প্যারিস সালোঁতে সমবেত গুণী-জ্ঞানী ও সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো রোসা বঁ-হোয়ের নাম্নী এক অজ্ঞাত শিল্পী-অঙ্কিত The Horse Fair নামে

বিরাট একখানি ছবি। ছবিখানির বর্ণাঢ্য ঔজ্জ্বল্য, তার তুলিকার বলিষ্ঠ অথচ নিখুঁত নিপুণতা এবং সর্ব্বোপরি তার আকৃতির বিশালতা (আট ফুট বাই সাড়ে ষোল ফুট) সকলকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করলো। রোসা'র বয়স তখন একত্রিশ বৎসর। ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলীয়ন-প্রেয়সী ইউজেনী সম্রাটকে অনুরোধ জানালেন ফ্রান্সের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান "লিজিয়ন অফ অনার" দিয়ে রোসাকে সম্মানিত করতে। সম্রাটের সম্মতি থাকলেও ফরাসী মন্ত্রীসভার অনুমোদন না থাকায় এ প্রস্তাব তখন কার্য্যকরী হতে পারলো না। বারো বৎসর পর, সম্রাট কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গেলে, ইউজেনী রাজপ্রতিনিধি হিসাবে রাজ্য-শাসন করছিলেন। সেই সময় একদিন সম্রাজ্ঞী স-পরিষদ উপস্থিত হলেন রোসা'র ছোট্ট ষ্টুডিওতে। রোসা কোনো রকমে রং কালি মাখা এপ্রনখানি ছেড়ে একখানি ফর্সা পোশাক পরে এলেন। রাজ্ঞী একটি সংক্ষিপ্ত সুন্দর ভাষণের পর রোসা'র কাঁধে "লিজিয়ন অফ অনার"-এর প্রতীক চিহ্ন আটকে দিয়ে বললেন, "তুমি সমগ্র নারী-জাতির মস্তকে আরোপিত করেছ এক নূতন সম্মান।" এর পর ১৮৯৫ সনে লিজিয়ন অফ অনার-এর অন্যতম কর্ম্ম-কর্ত্তার পদে রোসা'কে নিয়োজিত করা হয়। এর আগে এই সম্মান আর কোনো মহিলা লাভ করেন নি।

শৈশব হতেই রোসা'র ঝোঁক ছিল জীবজন্তুর ছবি আঁকার প্রতি। কিন্তু শুধু বইয়ের ছবি বা মিউজিয়মে রক্ষিত মূর্ত্তি থেকে আর কতটুকু শিক্ষা লাভ করা যায়? তাদের সাবলীল গতিভঙ্গি, আরণ্যক দৃষ্টি এ সব তুলির টানে ধরা পড়ে না কেবলমাত্র কল্পনার সাহায্যে। তার জন্যে চাই প্রাণ-প্রাচুর্য্যেভরা জীবন্ত, মডেল। তাই রোসা'র দরিদ্র কুটিরে তার স্বল্প সঞ্চয় থেকেই সংগৃহীত হতে লাগল নানা রকম ছোটো-খাটো জীবজন্তু। তার মধ্যে ছিল, ছাগল, গরু, ভেড়া, কাঠবেড়ালী, হরিণ ছানা আরো কত কি। আর ছিল খাঁচায় খাঁচায় রং-বেরঙের পাখীর ঝাঁক। এর পর সুরু হ'ল রোসা'র শিল্পসাধনার ইতিহাসের কঠিনতম অধ্যায়। প্যারিসের কসাইখানায় রোসা নিয়মিত যেতে আরম্ভ করলেন, সেখানকার জন্তু-জানোয়ারের ছবি আঁকার জন্য। কসাইখানার আব-হাওয়া ছিল ভয়াবহ রূপে কুশ্রী। এবং ততোধিক ভয়াবহ ছিল এই একাকিনী তরুণীর প্রতি প্রেম নিবেদনের প্রয়াস। তাদের অমার্জ্জিত অভদ্র আচরণে রোসা এক এক সময়ে ভয় বিহ্বল হয়ে পড়তেন। শেষে রোসা এক বুদ্ধি বার করলেন, চুল ছোট ছোট করে ছেঁটে পুরুষের পোশাক পরে যেতে আরম্ভ করলেন। এর পর আর তাঁকে খুব অসুবিধাতে পড়তে হয় নি। এই হ'ল The Horse Fair গোড়ার ইতিহাস। এই ছবি-খানিতেই তাঁর নাম হয়ে যায়। এর পর রোসা'র ছবি কিছু কিছু বিক্রী হতে থাকে। রোসা'ও শহরের বাইরে গিয়ে study করতে সুরু করেন। এ সময় রোসা সারা-দিন অবিশ্রান্ত মাঠে মাঠে ঘুরে ছবি আঁকতেন। তার পর রোসা বন্য জীবজন্তুর ছবি আঁকবার জন্যে একটি সার্কাস পার্টিতে যাতায়াত করেন। রোসা'র শিল্প-খ্যাতি তখন চারিদিকে ছড়াতে আরম্ভ করেছে। য়ুরোপে আমেরিকার নানা জায়গা থেকে রোসা'র ছবি কিনবার জন্য খদ্দের আসে। রোসা'র পক্ষে সব সময় চাহিদা মেটানো সম্ভবও হয়ে ওঠে না।

রোসা'র বহু দিনের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হ'ল যখন, "ফাঁ-তেন ব্লো"র বনের ধারে নিজের বাড়ীতে রোসা বসবাস আরম্ভ করলেন। এইখানে সংগৃহীত হয়েছিল বহু বিচিত্র সব পশু আর পাখী। পশু আর পাখীর সঙ্গে রোসা'র ছিল অন্তরের যোগ। এইখানে এই নিবিড় অরণ্যানীর মাঝে, নিস্তব্ধ প্রকৃতির কোলে বন্য পশু-পাখী পরিবৃত হয়ে নিজের একাগ্র শিল্পসাধনা নিয়েই রোসা'র জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত হয়। সংসারের জালে তিনি নিজেকে কোনো দিনও জড়ান নি, যদিও প্রার্থী ছিল অনেক। সমসাময়িক অনেকে তাঁকে পার্থিব জগতের সাধারণ মানবী বলে মনে করতেন না। তাঁর এক নাম ছিল Diana of the Fontainebleu, ফাঁ-তেন ব্লো'র বনদেবী।
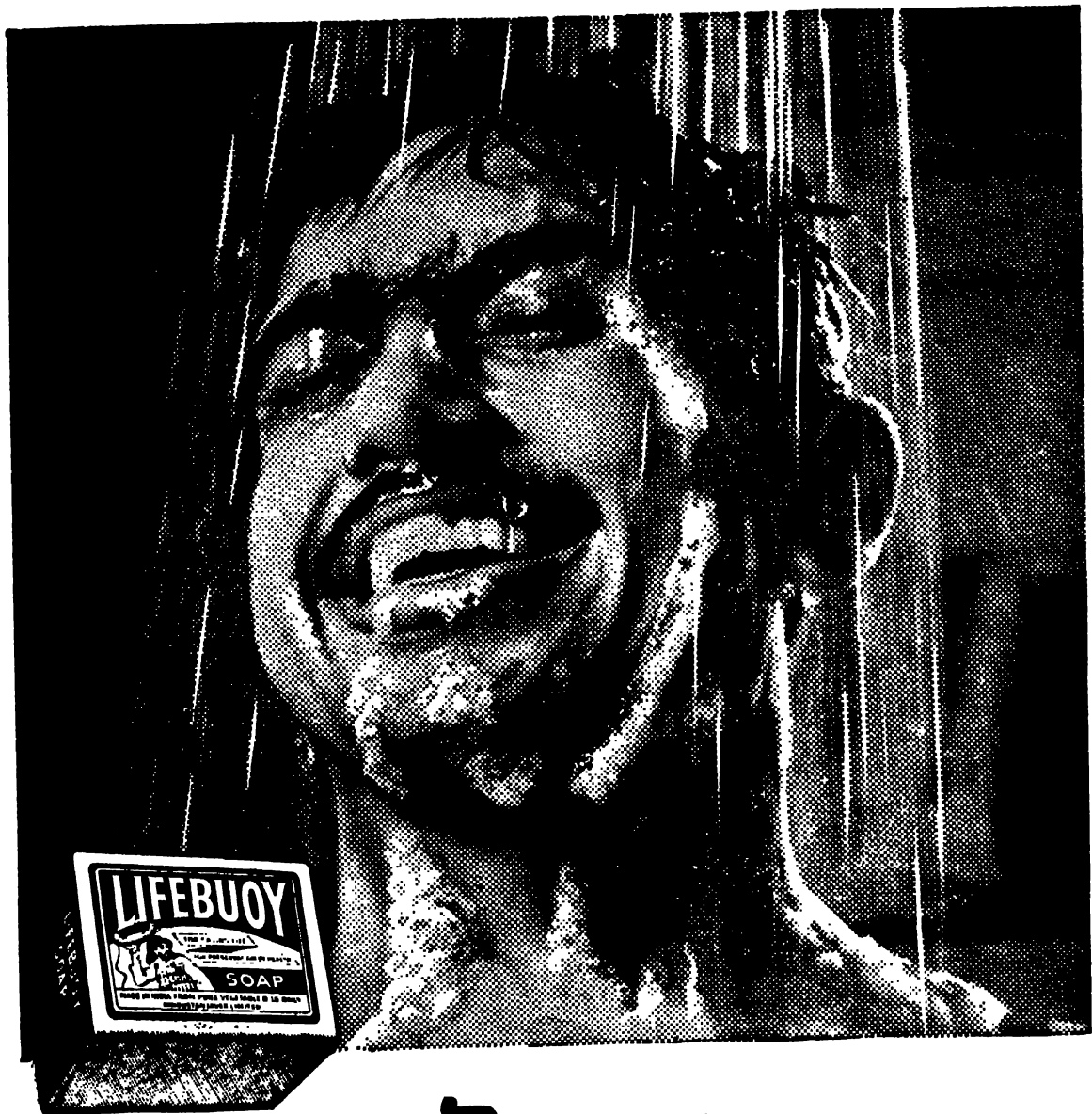
LIFEBUOY
SOAP

সন্ধ্যামণি

শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

ভাঙ্গা ভিটে—ইঁটের পাঁজা জংলা বনে ঢাকা,
একটু দাওয়া আঙ্গনটুকু গোবরমাটি মাখা,
নিমের ছায়া খড়ের চালে, শশার লতা বেড়া'য় ;

শালিক ওড়ে, চড়ুই ঘোরে, ঝিমোয় বুড়ো কুকুর,
সামনে মাঠে সবুজ ধান, খিড়কি দোরে পুকুর,
শ্যাওলাভরা জলের কোলে দু' একটা হাঁস বেড়ায়।

দাওয়ার থেকে সিঁড়ি ভেঙ্গে চিতের বেড়া ঘিরে
একটু পথ হারিয়ে গেছে লতাপাতার ভীড়ে,
গাঁদা কি জুঁই জবা ফুলের হলুদ সাদা লালে,

ধনে পাতার গন্ধ লাগা পুঁইমাচাটার তলায়—
চড়ুইটাকে সারাটা দিন কে-যে কথা বলায় ?
তুলসীমূলে পঞ্চদশী কিশোরী দীপ জ্বালে।

দাওয়ার কোলে সন্ধ্যামণির রঙেতে লাল উজ্জল—
আঙ্গন, তবু শ্যামলা মেয়ের চোখের ভরা কাজল,
হাতেতে দীপ, শঙ্খবাজার কাঁপন লাগে হাওয়ায় ;

ছায়ার শাড়ী ছড়িয়ে এলো সন্ধ্যা ; গাছে পাখী
হলদে মেঘে আঁধার দেখে থামায় ডাকাডাকি,
মাটিতে ঘুম, বাতাস এসে ঝিঁঝিঁকে গান গাওয়ায়।

মাঠের হাওয়া উপ্‌ছে আসে—আঁচলে দীপ ঢাকি'
সন্ধ্যামণি মেয়ে আকাশ আঁকে চোখের ছায়ায়॥

তৃণলতা

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস

বাণীর কুঞ্জে কুড়ায়ে এনেছি এ আমার তৃণলতা,
রাজার বাগানে ফোটে যে পারুল এ নহে সে রূপকথা।
লাবণ্যলাগা যে কচি সবুজ নব পল্লব দলে,
বিকচ নয়নে মোর পানে চেয়ে কি কথা আভাসে বলে।

নব মুকুলের আকুল আবেগ লেগেছে আমার বুকে,
চুত মঞ্জরী পরাব আজিকে তোমার কর্ণে সুখে।
মধু মালতীর লতায় পরাব বেড়িয়া কমল পাণি,
তৃণফুলদলে অঞ্জলি দিব অঞ্চল ভরি' আনি'।

কত বনফুল ঝুমকা বকুল, বুনো চামেলীর মেলা,
শ্যামল শষ্পে ছেয়েছে আমার আঙিনা সকাল বেলা।
শ্যামা শালিকের ডাহুকের ডাকে, অরুণ আলোর লাগি,
বেতের ঝোপের আড়ালে এ ঘরে মন হ'ল বৈরাগী।

হিজলের তলে নদী কুলু কুলু ঝিকিমিকি করে ঢেউ,
ওপারের ঘাটে জল নিতে দেখি আসে নাই আজ কেউ।
হেথা ভাঙ্গাঘরে মন যে মগন বাণীর চরণ পুজি,
এর চেয়ে আর রম্য-কানন আর কোথা পাব খুঁজি।

তবে লও বাণী, তৃণ ফুলদল-লতাপাতা ফলফুল।
মম প্রাঙ্গণে ধরণীর কোণে ঝরে পড়া এ বকুল।
লও বাস্তব, কল্পনা লও—লও লও আলোছায়া,
জীবন-মরণ মন্থন ধন লও ছন্দের মায়া।

যাঁদের রুচি আছে…

সেই সব মহাত্মাদের প্রতি আমার এই ছোট্ট ডাইরীটি উৎসর্গীত হলো! কে আমি প্রশ্ন নয়…তবে আজ আমি তাঁদেরই একজন যাঁরা স্বপ্নে-জাগরণে কেবলই ভাবেন আলু কপির ডালনার কথা, মটর ডালের কথা, ইলিশ মাছ, রুইয়ের মাথা, মুরগীর মাংস আর পায়েস্ রসগোল্লার কথা। ভাবছেন পেটুক আমি? মোটেই নয়।

কয়েদী মাত্র। কয়েদখানায় আটক নই। আটক আমি হাসপাতালে। জেলা-হাসপাতালের কোন এক অজানা বেড থেকে লিখছি। আমার পরিচয় দিয়ে কি প্রয়োজন? শুধু শুনে রাখুন পেটের রোগের সাজায় এখানে আমি বন্দী। ভালমন্দের আস্বাদ আমি পাই না। রুচি আছে, তবু ইচ্ছেমতো খাবার আমায় দেওয়া হয় না …এই তো আমার বড় সাজা।…না, খেতে আমাকে এরা দেয় বৈকি! ডাবের জল, ছানা আর ঘোল…মাঝে মাঝে লবণ ছাড়া মুরগী স্যুপেরও স্বাদ পাই…স্বাদ পাই দু'বেলা সেন্টিগ্রেড থার্মমিটারের! কোন এক অজানা দিনের আশায় আছি। যেদিন নিষ্ঠুর ডাক্তার বলবে তুমি সুস্থ, তুমি মুক্ত, আজ থেকে খুশীমতো, ইচ্ছেমতো তুমি খেতে পারো। সেদিনের স্বপ্নে বিভোর আমি…

১লা আগষ্ট

ঐতো পাশের বেডের ছেলেটা কি যেন গিলছে। মুরগী মাংস! আহা কতদিন খায়নি। আমাদের বাড়ীর সবাই মুরগী খায়। কেবল হেবলুটা খায় না। ছোট ভাই, ওকে কত বলেছি, ওরে, খারে খা। মুরগীর মতো মাংস হয় না, তবুও খেতো না।…

৬ই আগষ্ট

হাসপাতালে আজ তেরো দিন হলো। মা, হেবলু রোজকারমতো আজ বিকেলেও এসেছে। তবে সঙ্গে খাবার কিছু আনেনি। পাশের বেডের ছেলেটা হাঁ করে তাকিয়ে আছে আমাদেরই দিকে। কেন জানি না ছেলেটাকে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। হ্যাংলার মতো তাকানোটা অবশ্য ওর স্বভাব, আমাদের নার্সটার দিকেও ও অমন করেই তাকায়। সে যাকৃগে! ও কে দেখে আমার ঈর্ষ্যা হয়। পা ভেঙে হাসপাতালে পড়ে আছে। অথচ দু'বেলা মুরগী, মাংস ঠিক গিলছে। আমিওতো ওর মতোই রুগী। অথচ আমাকে ইচ্ছে-মতো কিছুতেই খেতে দেওয়া হয় না।…

১৬ই আগষ্ট

আজ আমাকে যারা দেখতে এসেছে, তাদের ভেতর একজন হচ্ছে নবাগতা। আমাদের হেবলুর বৌ। হাস-পাতালে পড়ে আছি, এরই মধ্যে হেবলুর বিয়ে হয়েছে। কিরণ চাকুরি নিয়ে দিল্লী গেছে। নতুন মাষ্টার মশাই এসেছেন। আরও কত কি! অনেক পরিবর্তন হয়েছে। হেবলুটা বরাবরই বিয়ের বিপক্ষে ছিল। আমি ভাব-ছিলাম শেষটায় কেলেঙ্কারী না হয়! মা'র মুখে শুনলাম, না, হেবলুটা ভালছেলের মতো সবকিছু মেনে নিয়েছে।…

২৮-ই আগষ্ট

আজও মা'র সাথে বৌ-মা এসেছে। মালতীর (আমার স্ত্রী) মুখে কিন্তু একটা মজার কথা শুনলাম। হেবলুটা মুরগী খায় না। কিন্তু কাল নাকি বৌ-মার হাতের রান্না ফেলতে পারেনি। বৌ-মা ওকে শুধু চাকৃতে দিয়েছিল। এক বাটি মাংসের সবটুকু খেয়েছে। বাহবা! বৌ-মার রান্নার তবে বাহাদুরী আছে। 'আচ্ছা বৌ-মা, কি এমন যাদু দিয়ে রাঁধলে যে হেবলুও মুরগী খেলো?'

'যাদু দিয়ে নয়, 'ডালডা' দিয়ে।'

'ডালডা দিয়ে? 'ডালডা'য় খাবারের এত ভাল স্বাদ হয়?'

'হ্যাঁ, 'ডালডা'র নিজস্ব কোন স্বাদ বা গন্ধ নেই। তবে খাবারের আসল স্বাদটি ফুটিয়ে তুলতে এর জুড়ী হয় না।'

'তাই নাকি? কিন্তু এর কি কোন উপকার আছে?'

'আছে বৈকি! প্রতি আউন্স 'ডালডা'তেই ৭০০ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট ভিটামিন 'এ', ৫৬ ইন্টার-ন্যাশনাল ইউনিট ভিটামিন 'ডি' মেশানো হয়।'

'ভাল, ভাল, খাঁটি জিনিষে রাঁধাতেও আনন্দ আছে। তা বৌ-মা আজ একটু বেশী করে 'ডালডা' আনিয়ে রেখো। আমি আবার দু'দিন পর বাড়ী ফিরছি কি না! দেখা যাক্ তোমার 'ডালডা'য় রান্না কেমন হয়।'…

'হবে গো হবে! আগে বাড়ীতে তো এসো।'—মালতী সান্ত্বনা দিল।…সবাই চলে গেল। একটা মাত্র দিন। তারপর আমিও বৌ-মার হাতের রান্না খাবো।… হাসপাতাল ডাইরীর এইখানেই শেষ। আর নয়।…

অধ্যাপক তেজেশচন্দ্র সেন

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

দেহের কারাগার ভেঙে গেল। মুক্ত আত্মা পরম আনন্দে অসীমে অবগাহন করলেন। শান্তিনিকেতনের একান্তে, নিরালায়, একটি ক্ষুদ্র কুটীরে, যিনি নীড় বেঁধেছিলেন—আজ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে তিনি মহাপ্রয়াণ করলেন।

দীর্ঘ অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক তিনি এই আশ্রমে বাস করেছেন। ৫২ বৎসর নিরবচ্ছিন্ন অধ্যাপনায় তিনি নিমগ্ন ছিলেন। আশ্রমের শিশুদের শিক্ষার ভার ছিল তাঁর উপর। ভারত এবং ভারতের বাইরেরও শত শত শিশু তাঁর কাছে শিক্ষালাভ করেছে।

প্রথম দিকে যাঁরা তাঁর ছাত্র ছিলেন, তাঁদের পুত্রকন্যা-গণও তাঁর কাছে শিক্ষালাভ করেছে। এখন আবার তাঁদের পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রীরাও তাঁর ছাত্র-ছাত্রী হয়েছিলেন। এই ভাবে তিনপুরুষকে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন। এই তিনপুরুষের সবার সঙ্গেই তাঁর স্নেহের সম্বন্ধ সমান ছিল।

তিনি ছিলেন অবিবাহিত। সুতরাং সাংসারিক পরিভাষায় তিনি নিঃসন্তান, কিন্তু সত্যই কি তিনি নিঃসন্তান? আজ কি দেখলাম? শত শত সন্তান তাঁর মৃত্যুশয্যা ঘিরে রয়েছে। দৃষ্টি তাদের সজল, মুখ তাদের ম্লান। কেউ তাঁর ললাট চন্দন-চর্চ্চিত করছে, কেউ দীপ জ্বালছে, কেউ ধূপ দিচ্ছে, কেউ মালা গেঁথে এনেছে—কেউ বা স্তূপীকৃত পুষ্পে দেহ ঢেকে দিচ্ছে।

যে অপরিসীম পিতৃস্নেহ, আপনার কয়েকটি সন্তানের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকত, সেই অফুরন্ত বাৎসল্য, শত শত সন্তানের উপর দীর্ঘ অর্দ্ধ শতাব্দী যাবৎ নিরন্তর অঝোর ধারায় বর্ষিত হয়েছে।

এই আশ্রমের দুটি রূপ। একটি বাহ্য, একটি আন্তর। বাহ্যরূপটিই সহজে চোখে পড়ে। বিচিত্র তরুলতাসমাচ্ছন্ন শ্যামল-শোভন নয়ন-বিমোহন রূপ। এর এই শ্যামল রূপ সহজে সৃষ্টি হয় নাই। বহু তপস্যার ফল এই শ্যামলিমা।
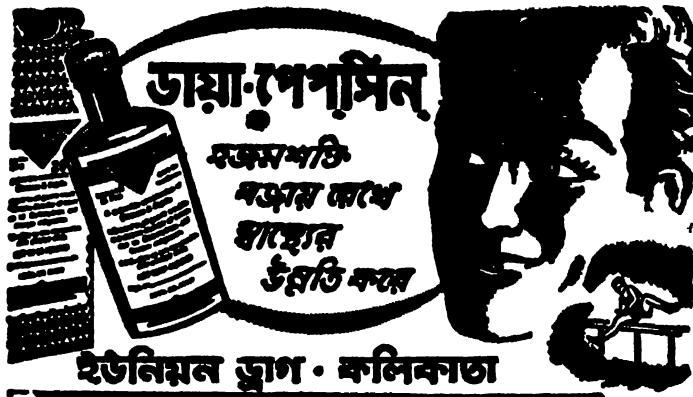
একটু সানলাইটেই
অনেক জামাকাপড় কাচা যায়
এর কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা

না দেখলে বিশ্বাসই হতনা: শঙ্কর সীতার পরিষ্কার করা ধবধবে সাদা সাটটা দেখে দারুণ খুসী। আর শুধু কি একটা সাট দেখুন না জামাকাপড়, বিছানার, চাদর আর তোয়া-লের স্তূপ—সবই কিরকম সাদা ও উজ্জ্বল এসবই কাচা হয়েছে অল্প একটু সানলাইটে! সানলাইটের কার্য্যকরী ও অফুরন্ত ফেণা কাপড়কে পরিপাটী করে পরিষ্কার এবং কোথাও এক কুচিও ময়লা থাকতে পারেনা! আপনি নিজেই পরীক্ষা করে দেখুন না কেন...আজই!

প্রথম দিকে এই আশ্রমের রূপ ছিল ঊষর, রুক্ষ। এর এই ঊষর, রুক্ষতা দূর করবার জন্য যাঁরা তপস্যা করেছেন—তেজেশচন্দ্র তাঁদের অন্যতম। কতকাল ধরে, কত না পরিশ্রমে, কত না অধ্যবসায়ে, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, তিনি ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন, বীজবপন, বৃক্ষরোপণ করেছেন। আজ যা দেখে আমরা আনন্দ পাচ্ছি, আমাদের নয়ন স্নিগ্ধ হচ্ছে, অন্তঃকরণ শান্ত হচ্ছে, সেই শ্যামলিমার সৃষ্টিতে তাঁর দীর্ঘকালের তপস্যা রয়েছে।

আশ্রমের আন্তররূপ সৃষ্টিতেও তাঁর দান কম নয়। রবীন্দ্রনাথ যে "বিশ্বের নীড়" কল্পনা করেছিলেন, তাঁর জীবনেই যে-কল্পনা মূর্তিগ্রহণ করেছিল, সেই "বিশ্বের নীড়" সৃষ্টিতে, যে-অন্তরঙ্গ সহকর্ম্মিগণ তাঁকে প্রাণপণে সাহায্য করেছিলেন, তেজেশচন্দ্র তাঁদের অন্যতম।

শিশুগণই দেশের ভবিষ্যৎ। সেই শিশুগণের জীবন-গঠনের জন্য যিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, মৃত্যুর তিন দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যিনি তাদের শেষ শিক্ষা দিয়ে গেছেন, তিনি যে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর কতখানি ছিলেন, তা মর্ম্মগ্রাহিগণ জানেন।

তাঁর অফুরন্ত প্রীতির ভাণ্ডার শিশুদের ভালবেসেই নিঃশেষিত হয় নি। বিশ্বভারতীর সকল বয়সের, সর্ব্ব-শ্রেণীর কর্ম্মীর প্রতি তাঁর স্নেহ উচ্ছ্বসিত হ'ত। সুদীর্ঘ-কাল যাবৎ "দিনেন্দ্র-চাচক্রের" তিনি মধ্যমণি ছিলেন। "চাস্পৃহ চঞ্চল চা-চাতকদলের" পিয়াস মেটাতে, চাচক্রে তাঁর উপস্থিতি ছিল নিয়মিত। তাঁকে ছাড়া শান্তি-নিকেতন চাচক্রের কথা ভাবা যায় না।

এই শান্তিনিকেতনের আশ্রমজীবনে, সকলের সঙ্গে নিবিড় স্নেহের গ্রন্থি দিয়ে অচ্ছেদ্য বন্ধনে যিনি নিজেকে বেঁধেছিলেন, আজ অর্দ্ধ শতাব্দীর সেই স্নেহের গ্রন্থি ছিন্ন করে তিনি চলে গেলেন।

আমরা তাঁকে সজলনয়নে বিদায় দিলাম। হাজার হাজার বছর পূর্ব্বে আমাদের ঋষি পিতামহগণ যে-ভাবে তাঁদের প্রিয়জনকে বিদায় দিতেন, আমরাও সেইভাবে তাঁকে বিদায় দিলাম:

"যাত্রা করো! হে পথিক। যাত্রা করো! যে-পথে আমাদের পূর্ব্ব পিতামহগণ অনন্তকাল ধরে যাত্রা করেছেন, সেইসনাতন পথে, আজ তোমার মহাযাত্রা শুরু হ'ল।

"কল্যাণকর্ম্মকে পাথেয় করে তুমি ঐ 'পরম অসীমে' অবগাহন করো। ধর্ম্ম তোমার সাথী। তারই সাহায্যে তুমি ধর্ম্মরাজের সঙ্গে মিলিত হও। যা কিছু কলুষ, যা কিছু মালিন্য, অসীমের অবগাহনে তা ধৌত হোক! জ্যোতির্ম্ময়, নবীন দেহ ধারণ করে, পুনর্ব্বার তুমি নিজ-গৃহে গমন করো।"

তোমার শত শত স্নেহভাজন আশ্রমিক আজ এই আশ্রমে তোমার তর্পণ করছেন। করপুটে বারি গ্রহণ করে আমরা তর্পণ করি। এই বারি কী? স্নেহের প্রতীক্। আমাদের স্নেহের অর্ঘ্য, শ্রদ্ধার অঞ্জলি, তাঁর উদ্দেশে প্রেরণ করছি। আমাদের পিতৃ-ঋণ, ঋষি-ঋণ, কিছু পরিমাণে শোধ হচ্ছে।

আজ তাঁর দেহের বন্ধন টুটে গেছে। সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমাণ ক্ষেত্রে যিনি আবদ্ধ ছিলেন, তিনি আজ সমস্ত বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়েছেন। আজ তাঁর তর্পণ করতে হলে সমস্ত বিশ্বের তর্পণ করতে হবে।

ত্রিভুবনের তৃপ্তি সাধনে তাঁর তৃপ্তি হবে।

"দেব, যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, অসুর, ক্রুর সর্প, সুপর্ণ, তরুলতা, সরীসৃপ, পক্ষী, বিদ্যাধর, জলচর, খেচর, নিরাহারী, পাপরত, ধর্ম্মরত প্রাণীসমূহ, ব্রহ্মলোক হতে এই পৃথিবী পর্য্যন্ত সমস্ত লোক; দেবর্ষিগণ, পিতৃগণ, মানবগণ, মাতৃগণ মাতামহগণ; যে-সব কোটি কোটি কুল লুপ্ত হয়েছে, সপ্তদ্বীপবাসী জীবগণ সকলেই তৃপ্ত হোন। ত্রিভুবন পরিতৃপ্ত হোক।"

যিনি নিজের দেহের গণ্ডি অতিক্রম করে সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছেন, তাঁর তর্পণে গণ্ডী টানবে কোথায়?

"মধু বাতা ঋতায়তে—"

"আকাশ মধু বর্ষণ করছে, বাতাস মধু বহন করছে, নির্ঝর মধু ক্ষরণ করছে। রাত্রি মধুময়, ঊষা মধুময়, সূর্য্য মধুময়, পৃথিবীর ধূলিকণা পর্য্যন্ত মধুময়—"

আমাদের প্রিয়জন যে আজ এই ধূলিকণার মধ্যেও ওতপ্রোত হয়ে রয়েছেন!*

---

* ৭ই শ্রাবণ, শনিবার, শান্তিনিকেতন মন্দিরে প্রদত্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি।

শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

কবি শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা আর ইহজগতে নাই। গত ১১ই জুলাই সোমবার রাত্রি ৯ ঘটিকায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন। উহার পূর্ব্বে কিছুকাল যাবৎ তিনি অসুস্থ ছিলেন বটে, কিন্তু কর্ম্ম হইতে তাঁহার সম্পূর্ণ বিরতি কখনও ঘটে নাই। এইবারে তাহা ঘটিল। এমন অমায়িক সাদাসিধা সরল সুকবি সাহিত্যিক মানুষটিকে এত শীঘ্র হারাইব ইহা যেন কল্পনায়ও আসে নাই।

শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

আঠারশত বিরানব্বুই খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা অবতারচন্দ্র লাহা সে যুগে সুরসিক সাহিত্যিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ পিতার নিকট হইতেই সাহিত্য-সাধনার অনুপ্রেরণা পাইয়াছিলেন। এই সাধনা পুত্রের জীবনেও শেষদিন পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল। শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ উপাধিধারী ছিলেন। বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কিছুকাল কলিকাতাস্থ ব্যাঙ্কশাল কোর্টে আইন ব্যবসায় লিপ্ত হন। অসহযোগ আন্দোলনের মরশুমে তিনি আদালতে যাওয়া বন্ধ করিয়া দেন। তবে আইন ব্যবসায় অপেক্ষা সাহিত্য-চর্চ্চাই তাঁহার মনকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিত। শৈলেন্দ্রকৃষ্ণের মুখে শুনিয়াছি, তিনি কাছারীর কাজ সারিয়াই সন্নিকটস্থ মেটকাফ হলে গিয়া গ্রন্থাদি অধ্যয়নে অভিনিবিষ্ট হইতেন। এই মেটকাফ হলের একটি সুন্দর ইতিহাস আছে। সে সম্বন্ধে কিছু বলার স্থান ইহা নহে। এই ভবনে পূর্ব্বে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী এবং পরে ইহারই আত্মজ ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর কার্য্য চলিতে থাকে। মেটকাফ হল হইতে ১৯২৩-২৪ সনে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী এসপ্লানেডের পুরোনো জঙ্গীলাটের সেক্রেটারিয়েটে স্থানান্তরিত হয়। শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দিনের পর দিন একনিষ্ঠ ছাত্রের মত এই গ্রন্থাগারে বসিয়া সাহিত্যবিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থাদি অধ্যয়নে রত থাকিতেন। সাধারণ সাহিত্য এবং কাব্যগ্রন্থ তাঁহাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিত। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন আসলে কবি। তাঁহার কবিমানস চরিতার্থ করিতে যাহা কিছু আহরণ করা আবশ্যক তাহা তিনি একাগ্রচিত্তে আহরণ করিয়াছিলেন।

এই সময় শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ সবুজপত্র সম্পাদক বিখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে মেলামেশা আরম্ভ করেন। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তখন "বীরবল" ছদ্মনামে সাধারণের নিকট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ অনতিবিলম্বে বীরবলের স্নেহপ্রীতি লাভ করিতে সমর্থ হন। 'বীরবল'-গৃহে যে সাহিত্যিক-গোষ্ঠী গড়িয়া উঠে তন্মধ্যে তরুণদের ভিতরে শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ ছিলেন অন্যতম। শৈলেন্দ্রকৃষ্ণের রচনা সবুজপত্রে স্থান পাইত। সবুজপত্র ব্যতীত অন্য বহু মাসিক পত্রিকায়ও তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইতে থাকে। এই সব পত্রিকার মধ্যে 'মানসী ও মর্ম্মবাণী', 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী' প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। তিনি ঐ সময়েই সুকবি এবং সাহিত্যরসজ্ঞ রূপে পাঠকপাঠিকার নিকট প্রতিভাত হইতে থাকেন।

ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় রবিবাসর নামে একটি সাহিত্য বৈঠক প্রতিষ্ঠিত হয়। শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ প্রায় প্রথমাবধি ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়া পড়েন। ১৯২৯ কি ৩০ সন নাগাদ ভারতবর্ষ সম্পাদক জলধর সেন (সাহিত্যিক-

আগামীর
প্রস্তুতি

দের "দাদা") ইহার সর্ব্বাধ্যক্ষ হন। তাঁহাকে কেন্দ্র করিষা একটি সাহিত্যিক এবং সাহিত্যরসিক দল পক্ষান্তে প্রতি রবিবার কলিকাতায় এবং অন্যত্র মিলিত হইতেন। তখন এটি বাস্তবিকই সাহিত্যিকদের একটি 'বাসর' হইয়া উঠিয়াছিল। শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ এই 'বাসরে' তাঁহার কতকগুলি সুচিন্তিত সারগর্ভ সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। যতদূর স্মরণ হয়, ওই প্রবন্ধাবলীর কয়েকটি প্রবাসী পত্রিকায় আমরা তখন ছাপিয়াছিলাম। ১৪নং পার্শীবাগানস্থ ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুর পৈতৃক বাসভবনে প্রায় প্রত্যহ বেশ একটি আড্ডা জমিত। পরশুরাম (রাজশেখর বসু—ডাঃ গিরীন্দ্রশেখরের মেজদাদা), শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন, জলধর দাদা, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বহু সাহিত্যিক, সাহিত্যরসিক, শিল্পী, বিজ্ঞানী, এবং ব্যবসায়ী এখানে আসিয়া মিলিত হইতেন। শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ এখানকার একজন নিয়মিত "আড্ডাধারী" ছিলেন। বহু প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনা এখানে হইত। পরশুরাম তাঁহার কোন কোন রচনার বিষয়বস্তু ও প্রেরণা এখান হইতে লাভ করিয়াছিলেন। এখানকার দলটিরও অনেকে ঐ সময়ে রবিবাসরে আসিয়া ভিড় জমাইয়াছিলেন।

শৈলেন্দ্রকৃষ্ণের কবি তথা সাহিত্যিক-মানস এইরূপ খণ্ড রচনায়ই তৃপ্ত হইতে পারে নাই। তখন ছোট গল্প নামে একটি নূতন ধরনের সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদনা কার্য্য তিনি সুরু করেন। প্রতি সপ্তাহে এক একটি উন্নত ধরনের গল্প লইয়া পত্রিকাখানি আত্মপ্রকাশ করিত। একটি মাত্র গল্প থাকায় ইহা অল্পকালের মধ্যেই সাহিত্যরসিকদের দৃষ্টিতে পড়ে এবং ইহার সুনামও হইতে থাকে। এখানে তাঁহার যে সাংবাদিক জীবনের সূচনা তাহাতে ইহার পর আর বড় বেশী ছেদ ঘটে নাই।

শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ ১৯৩৫ সনের শেষে কি, ৩৬ সনের প্রথমে প্রবাসী প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকীয় বিভাগে আসিয়া যোগ দেন। 'Modern Review'র ভারপ্রাপ্ত সহকারী সম্পাদক ছিলেন বলিয়া তিনি সাধারণের নিকট এইরূপই পরিচিত ছিলেন। তবে আমাদের সকলকেই প্রবাসী ও Modern Review উভয় পত্রিকারই কিছু কিছু কাজ করিতে হইত। এই সময় হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর তিনি প্রবাসী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, আমরা প্রায় একই সময়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেরও সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হই। প্রবাসী প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত হইবার পূর্ব্বে, রবিবাসরে, পার্শীবাগানে এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে তাঁহার সহিত বিশেষভাবে মিশিয়াছি। কিন্তু প্রবাসী প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত হইবার পর আমরা যেন এক পরিবারভুক্ত হইয়া গেলাম।

মানুষ, দোষে গুণে মানুষ। অতি নিকটে থাকিলে সাধারণতঃ দোষটাই বেশী করিয়া চোখে পড়ে। শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দোষ-ত্রুটি-বর্জ্জিত ছিলেন তাহা বলি না, কিন্তু তাঁহার গুণসমূহের নিকট এ সকল ছিল অতি তুচ্ছ। এবং গুণগুলিই আমাদের সকলকেই মুগ্ধ করিত। এক সময়ে তিনি সাহিত্য পরিষদের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। 'রমেশ ভবনে'র দ্বিতল অংশ নির্ম্মিত হইবার সময় তিনি ইহার জন্য অন্যান্যদের সঙ্গে বেশ খাটিয়াছিলেন। কিন্তু সর্ব্বত্রই শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ ছিলেন নীরব কর্ম্মী—কি পরিষদে কি অন্যত্র এমন কি সাহিত্য বিষয়েও তিনি নীরবে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। দীর্ঘকাল সাহিত্য-সাধনার ফলে তিনি বিস্তর কবিতা ও প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি যে খুব উঁচুদরের তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। আশ্চর্য্যের বিষয় তাহার রচনা কখনও পুস্তকাকারে গ্রথিত করিতে তিনি প্রয়াসী হন নাই। শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ নীরবে সাধনা করিয়া গিয়াছেন, নীরবেই চলিয়া গেলেন।

জাগৃতি ও জাতীয়তা—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। মিত্র ও ঘোষ কলকাতা। মূল্য সাড়ে চার টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানির উপজীব্য বিষয়বস্তু হ'ল বাঙালীর তথা ভারতবাসীর নবজাগরণের কথা। জাতীয়তাবোধের উন্মেষ কেমন করে ধীরে ধীরে সমগ্র জাতির চেতনায় দেখা দিল স্বাদেশিকতার ভাবনা, জাতীয় শিক্ষাপ্রবর্তনের উন্মাদনা কেমন করে আমাদের দেশের নেতৃবৃন্দকে নতুন দিগন্তের সন্ধান দিল তার সম্যক্ প্রামাণ্য আলোচনা রয়েছে এই গ্রন্থের সবটুকু বিস্তার জুড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বর্তমান শতাব্দীর প্রাক্-সাতচল্লিশ কাল অবধি ইংরেজ জাতির সঙ্গে আমাদের যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটল তা শুধু শোষণ-শাসনেই সীমাবদ্ধ থাকে নি; শিক্ষা, সংস্কৃতি, জ্ঞান, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও যে নিরন্তর আদানপ্রদান ঘটল তার প্রতিক্রিয়া আমাদের জাতীয় এবং সামাজিক জীবনে সুপ্রকট। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের বাঙালীর সামাজিক এবং ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার ধারা আজ বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত। ইংরেজ শাসন এবং ইংরেজ সভ্যতার আওতায় আমাদের ব্যষ্টি এবং সমষ্টিগত জীবন কেমন করে এবং কোন পথে ধীরে ধীরে তার দুশো বছর আগেকার রূপ পরিত্যাগ করে এ যুগের নব্য রূপটুকু পরিগ্রহ করল তার কথা গ্রন্থকার নিপুণ ভাবে আলোচনা করেছেন পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত দশটি প্রবন্ধে।

'জাগৃতি' অংশের চারটি প্রবন্ধে এবং 'জাতীয়তা' অংশের ছয়টি প্রবন্ধে কেমন করে পশ্চিমী সভ্যতার সংঘাতে এতদ্দেশীয় সংস্কারের অচলায়তনে প্রথম ফাটল ধরল তার কথা বলা হয়েছে। শাসক-গোষ্ঠীর মধ্যে অনেকেই এ দেশের মানুষদের শিক্ষাপদ্ধতি এবং শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে অনেক মূল্যবান গবেষণা করেছেন। মেকলে, গ্রান্ট, উইলবার ফোর্স, হেনরি টমাস কোলব্রুক, লর্ড মিন্টো, উইলসন হেয়ার। মার্কুয়েস হেস্টিংস প্রমুখ পণ্ডিত এবং শাসন-কর্তাদের আগ্রহে এবং চেষ্টায় দেশের শিক্ষা-সংস্কার ঘটল। ওদিকে রামমোহন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, তারিণীচরণ মিত্র, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমুখ এ দেশীয় মনীষীদের চেষ্টা এবং উৎসাহে শিক্ষা, ধর্ম ও সংস্কৃতের ক্ষেত্রে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল তার প্রতিক্রিয়াও সমাজজীবনের দর্পণে প্রতিফলিত হচ্ছিল। পশ্চিমী শিক্ষা এবং ভারতীয় শিক্ষা, বিদেশীয় মাধ্যমে শিক্ষা এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য ও তদনুসারী জ্ঞানবিজ্ঞানে পুনরুজ্জীবন এবং ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পশ্চিমী জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রবর্তন—প্রমুখ বিভিন্ন ভাবধারা ধীরে ধীরে সমগ্র জাতির মানসকে আচ্ছন্ন করল। কেমন করে এই ভিন্ন মতের এবং পথের সংঘাতকে উত্তীর্ণ হয়ে আমরা ধীরে ধীরে স্বচ্ছ এবং সুস্থ চিত্তে জাতীয় শিক্ষার ভার এবং ভাবনাকে গ্রহণ করলাম তার বিস্তৃত সঠিক ইতিহাস যোগেশ-বাবু আমাদের শুনিয়েছেন। এই জাতীয় উন্মেষের মূলে এ দেশের পত্রপত্রিকা যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল গ্রন্থকার তার সবিস্তার উল্লেখ করেছেন। বেঙ্গল গেজেট, ইণ্ডিয়া গেজেট, কলিকাতা গেজেট, বেঙ্গল হরকরা, এশিয়াটিক মিরর, মর্নিং পোষ্ট, সমাচারদর্পণ সংবাদ কৌমুদী, সমাচার চন্দ্রিকা, সংবাদ প্রভাকর, এনকোয়ারার, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, হিন্দু পেট্রিয়ট এবং অমৃতবাজার পত্রিকা দেশের মানুষের শিক্ষা, দীক্ষা, ধর্ম এবং নীতি সংরক্ষণে এবং সংবর্দ্ধনে যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তার ইতিহাসগত প্রামাণ্য বিবরণী আলোচ্য গ্রন্থটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। শতাব্দীর জড়তা থেকে সমগ্র জাতিকে মোহমুক্ত করার কাজে হিন্দুমেলা যে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন তারও উল্লেখ গ্রন্থকার করেছেন। জাতীয় সাহিত্য, জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় নাট্যশালা, জাতীয় ব্যায়ামশালা, জাতীয় সভা প্রভৃতির প্রবর্তনে এবং সংস্থাপনে হিন্দুমেলা তথা জাতীয় মেলার যে মূল্যবান অবদান রয়েছে গ্রন্থকার তা পরম নিষ্ঠার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন। সে বিশ্লেষণ তথ্যানুগ। এই তথ্যধর্মী বিশ্লেষণ পুস্তকখানির গৌরব এবং মর্যাদা বহুলাংশে বর্দ্ধিত করেছে। বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের প্রতি যাঁরা শ্রদ্ধাশীল তাঁরা এই পুস্তকখানি পাঠ করলে আনন্দিত হবেন। আমরা নিঃসংশয় যে, বাংলা সাহিত্যে পাঠকের দরবারে পুস্তকখানি সমাদৃত হবে।

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

ভগবৎ প্রসঙ্গ—শ্রীহরিশচন্দ্র সিংহ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির, ৪, ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ক রো, কলিকাতা-২৫। মূল্য সাড়ে তিন টাকা মাত্র।

জীবনটাই একটা দর্শন। অনুশীলনের দ্বারা তাহাকে উন্নত করা যায়। ইহার অপর নামই বোধ হয় সাধনা। সাধক হেম-চন্দ্রের জীবন-কথা লইয়াই মূলত এই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। শাস্ত্রে বলে সাধক বার বার আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন। কারণ সাধনার সমাপ্তি এক জন্মে হয় না। তাই মহাপুরুষদের আবির্ভাবই অলৌকিক। জন্মক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহাদের গতিবিধি, প্রতিটি আচরণের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, যাহা সাধারণ

নহে। যেমন দেখা গিয়াছিল ঠাকুর রামকৃষ্ণের মধ্যে। তাঁহারা আসেন অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করিতে। তাই হেমচন্দ্রের বাল্য-কালেই কতকগুলি অলৌকিক ঘটনা দেখিতে পাই। ইহা জন্মার্জিত শক্তির স্ফুরণ। এই শক্তিকেই সাধকরা ভিন্ন পথে চালিত করেন। ইহারই নাম অধ্যাত্ম-সাধনা।

গুরু-শিষ্যের কথোপকথনের ভিতর দিয়া তিনি অতি সহজ কথায় গভীর তত্ত্ব পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন। এই উপদেশাবলীর মধ্যেই রহিয়াছে সমগ্র বেদান্তের সার কথা। শিক্ষা তাঁহার ছিল না। কিন্তু বিশ্বাস ছিল অসীম। বিশ্বাসই তো আসল বস্তু। এই ভগবদ্‌বিশ্বাসী সাধক যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যাহা গুরুমুখে শুনিয়াছেন তাহাই তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তর্কের দ্বারা ইহাকে পাওয়া যায় না—ইহা উপলব্ধি, অনুভূতি সাপেক্ষ।

হেমচন্দ্রের কথাই গ্রন্থকার সাজাইয়া গুছাইয়া এই গ্রন্থে পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন। এমন সহজ কথায় গভীর তত্ত্বগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে, যাহা পড়িতে পড়িতে বিস্ময় বোধ করিয়াছি। সাধারণের জন্যই লেখা—তাঁহারা ইহাতে উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই।

উপনিষদ্ নির্ম্মাল্য—পুষ্পদেবী। ১, ডাঃ শ্যামাদাস রো, কলিকাতা-১১। মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

ঈশ, কেন, কঠ—এই তিনটি উপনিষদের সরল কাব্যানুবাদ। এই অনুবাদগুলির অধিকাংশই প্রবাসীতে ধারাবাহিক ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। এবং তখন হইতেই সুধীজনের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। আজ গ্রন্থাকারে বাহির হওয়ায় রসপিপাসু-দের একটা বড় অভাব দূর হইল। লেখিকার অনুবাদ সম্বন্ধে নূতন করিয়া কিছু বলিবার নাই। কারণ, তাঁহার রচিত 'শতশ্লোকী গীতা'র সহিত সকলেই পরিচিত। অনুবাদ তখনই সুন্দর হয়, যখন সে আপন বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র হইয়া উঠে। সে তখন পরের মুখে বলে না, নিজের মুখে বলে। পুষ্পদেবীর এই অনুবাদ কবিতা-গুলি তাই আর অনুবাদ হইয়া রহে নাই। লিখিয়া না দিলে মৌলিক রচনা বলিয়াই ভুল হইত।

উপনিষদের গভীর তত্ত্ব কথা এমন সহজ করিয়া বলা বড় কম কৃতিত্বের কথা নয়। সব চেয়ে বড় কথা হইল, অনুবাদের পাকে পড়িয়া তাহার কোথাও রসাভাব ঘটে নাই। ঐ ভাবে ভাবিত না হইলে ইহা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না। ব্যাখ্যার দ্বারা রসোপলব্ধি হয় না, ইহার স্বাদ স্বতন্ত্র। তবু সাধারণের উপভোগ্য হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীগৌতম সেন

(১) অমৃতের উপাখ্যান—শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়।

(২) তারাপীঠের একতারা—শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব। প্রজ্ঞা প্রকাশনী। কলিকাতা। একমাত্র পরিবেশক পত্রিকা সিণ্ডিকেট। প্রাইভেট লিমিটেড। ১২।১ লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬। মূল্য যথাক্রমে—৩।০ ও ৩৷৹।

সমালোচ্য প্রথম পুস্তকখানি মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণ হইতে আটটি রম্য উপাখ্যান সংগ্রহ করিয়া রচিত হইয়াছে। আমাদের পৌরাণিক কাহিনীগুলিও যে আধুনিক চিন্তাধারা হইতে কিছুমাত্র পিছনে পড়িয়া ছিল না তাহা এই ধরনের পুস্তক পাঠ করিলে সংশয়াতীত ভাবে বুঝিতে পারা যায়। ইহার মূল কারণ সম্ভবতঃ পাঠক সাধারণের সংস্কৃত ভীতি। এই ধরনের কাহিনীগুলি নিষ্ঠা-সহকারে ভাষান্তরিত করিলে তাহা যে কতখানি সুখপাঠ্য হইতে পারে তাহার প্রমাণ আমরা ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত সুবোধ ঘোষের "ভারত প্রেমকথায়" পাইয়াছি। অমৃতের উপাখ্যানেও পাইলাম। উপযুক্ত ভাষা, পরিবেশ সৃষ্টি, বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় বিশ্বনাথবাবু গল্পের ভিতর দিয়া সুন্দর ভাবে পরিবেশন করিয়াছেন।

পুস্তকখানি সমাদৃত হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

(২) তারাপীঠের একতারা একখানি ভ্রমণ-কাহিনী। যাহা আমরা সদাসর্ব্বদা দেখিতে পাই। তাহাকে সহজ কথায় আমাদের অন্তরে পৌঁছাইয়া দিতে পারা বড় কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়। সাধারণ ভাবে যতটুকু চোখে পড়ে সেইটুকুই সব নয়—দৃষ্টির অন্তরালে এমন বহু দুর্লভ বস্তু আত্মগোপন করিয়া থাকে যাহার সামান্যতম ভগ্নাংশ যদি দৃষ্টিপথে ধরা পড়ে, মন বিস্ময়, আনন্দে এবং শ্রদ্ধায় আপ্লুত হইয়া যায়। সমালোচ্য পুস্তকখানিতে এমনি কয়েকটি মানুষের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বিশেষ করিয়া তারাপীঠে উপস্থিত যে পাণ্ডাটির বাড়ীতে আশ্রয় নিতে হইয়াছিল তাহার চরিত্রটি নানা অবস্থার মধ্য দিয়া এমন সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, পুস্তকখানি শেষ করিবার পরেও এই মানুষটি একটি উজ্জ্বল তারকার মত চোখের সম্মুখে ফুটিয়া থাকে। তারাপীঠের একটি তারা এই বিশেষ ব্যক্তিটিই। সেবাই যাঁর ধর্ম্ম। দারিদ্র্যের জন্য অনুতাপ করেন না—পরার্থে লোভ নাই—অথচ নিজেদের মুখের গ্রাস কত সচ্ছন্দে অপরের মুখে তুলিয়া দিয়া তারা মায়ের সেবায়েতের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন।

লেখকের বক্তব্য কোথাও বাহুল্য ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে নাই। অনাড়ম্বর ভাষার সচ্ছন্দ গতি পুস্তকখানির সর্ব্বত্র অব্যাহত আছে।

আগ্রহের সহিত পড়িবার মত বই।

রঙে রেখায়—ইবনে ইমাম। প্রকাশক—নবপ্রকাশ। ২০৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম—৫।০ টাকা।

সৈয়দ মুজতবা আলীর "ঢঙে বা ধরনে লেখা। কিন্তু ধরনটি কিছু কাঁচা। অতি উচ্ছ্বাস আর বাংলা বইয়ে বেশীমাত্রায় ইংরাজির ছড়াছড়ি মনকে পীড়া দেয়। কিন্তু এরই মধ্যে গুটিকয়েক চরিত্র অল্প কথায় অপরূপ রসমাধুর্য্যে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইটালিয়ান মেয়ে দীমা—অনবদ্য সৃষ্টি। লণ্ডনের বড়দা—একটি সত্যকার বড়দা। উর্ম্মিলাও মনে দাগ কাটিতে সক্ষম হইয়াছে।

লেখকের শক্তি আছে। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সস্তায় নাম কিনিবার মোহ ত্যাগ করিতে পারিলে এই লেখকের ভবিষ্যৎ আছে বলিয়া আমরা মনে করি।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

দেশ-বিদেশের কথা

যাদুসম্রাট পি সি. সরকারের আমেরিকায় বিপুল সম্বর্দ্ধনা লাভ

আমেরিকায় বোষ্টন শহরে সম্প্রতি বিশ্ব যাদুকরদের এক মহাসম্মিলনী বা কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে মোট ১,২০০ (বারশত) যাদুকর ইহাতে যোগদান করেন। ভারতবর্ষ হইতে শ্রীযুক্ত পি. সি. সরকার আমন্ত্রিত হইয়া সমগ্র প্রাচ্যের প্রতিনিধিত্ব করেন। নিখিল বিশ্ব যাদুকর কংগ্রেসের শ্রীযুক্ত সরকার ভারতের মান ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন। সমগ্র এশিয়াবাসীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম তিনি ঐ কংগ্রেসের বিচারক নির্ব্বাচিত হন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে সমাগত যাদুকরদিগের খেলা দেখিয়া তাহাদিগকে পুরস্কার ও স্বীকৃতি দিবার জন্য তাঁহার মতামত সর্ব্বাগ্রগণ্য হয়। ৯ই জুলাই যে বিশেষ অধিবেশন হয় তাহাতে শ্রীযুক্ত সরকার প্রধান অতিথির ভাষণ দেন এবং তাঁহার ভাষণে কংগ্রেসে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। বিশ্ব যাদু কংগ্রেসে শ্রীযুক্ত সরকারকে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়াতে—বিশ্বের দরবারে ভারতের মর্য্যাদা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।
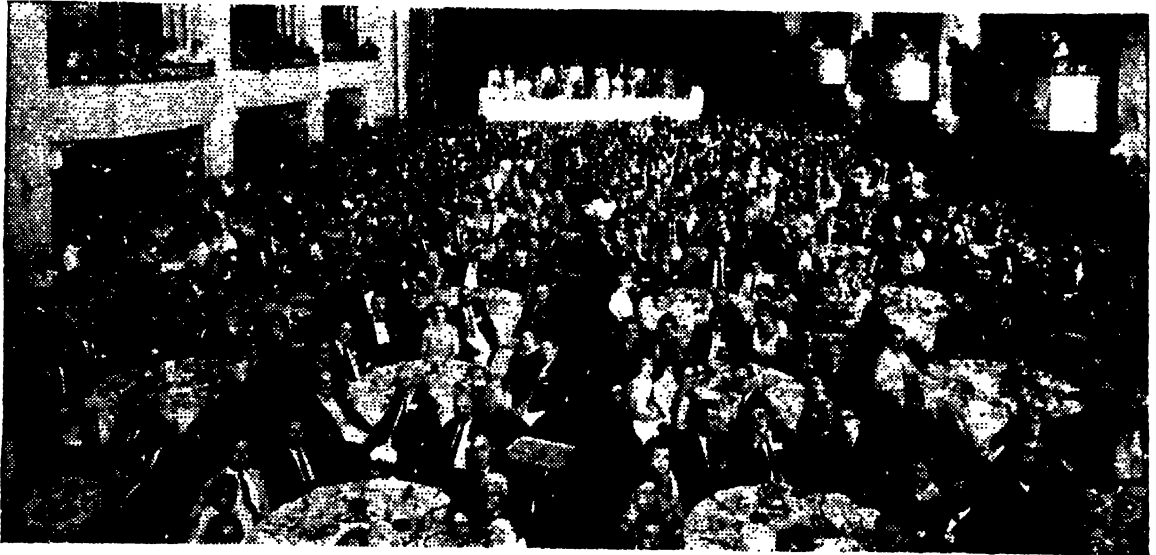
আমেরিকায় বোষ্টন শহরে বিশ্ব যাদু কংগ্রেসের প্রধান অধিবেশনে যাদুসম্রাট পি. সি. সরকার তাহার ভাষণ দিতেছেন—
প্রধান টেবিলে শ্রীযুক্ত সরকারের সঙ্গে কংগ্রেসের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বিচারকগণকে দেখা যাইতেছে।
মোট ১,২০০ যাদুকর পৃথিবীর বিভিন্ন দে হইতে এই উপলক্ষ্যে সমবেত হইয়াছিল।

সমাজসেবী যতীন্দ্রমোহন সিংহ

শ্রীহট্টের খ্যাতনামা সমাজসেবী যতীন্দ্রমোহন সিংহ গত ২৪শে জ্যৈষ্ঠ পরলোক গমন করিয়াছেন। শ্রীহট্ট জেলার ইন্দেশ্বর পরগণায় প্রসিদ্ধ সিংহ পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৪ বৎসর চলিতেছিল। কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক এবং প্রসিদ্ধ সমাজসেবীরূপে তিনি শ্রীহট্ট জেলায় সুপরিচিত ছিলেন। রাজরোষে পতিত হওয়ার ভয়ে যখন লোকে সমাজকর্মী ও কংগ্রেস-কর্মীদিগকে অতি নিকট আত্মীয় হইলেও নিজগৃহে স্থান দিতে সাহসী হইত না, তখনও নির্ভীক যতীন্দ্রমোহনের গৃহদ্বার সমাজকর্মী ও কংগ্রেসকর্মীদের নিকট অবারিত ছিল। পল্লীমঙ্গল, বিধবা-বিবাহ, অস্পৃশ্যতা বর্জন, শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি বিষয়ে যতীন্দ্রমোহন বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তাঁহার দেশাত্মবোধও অনন্যসাধারণ ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে দেশী কাপড় এবং গান্ধীযুগ হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত খদ্দর ব্যতীত অন্য কোনরূপ কাপড় তিনি ব্যবহার করেন নাই। এমনকি লাট সাহেবের দরবারে যাইতেও তিনি তাঁহার খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবী পরিয়াই যাইতেন। তাঁহার আর একটি গুণ ছিল, তিনি বালক-বৃদ্ধ সকলের সহিতই সমানভাবে মিশিতে পারিতেন। যিনিই তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তিনিই তাঁহার সৌজন্য ও অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল ইন্দেশ্বর টি এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানী'র ডিরেক্টররূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া জেলার ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

:: ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::
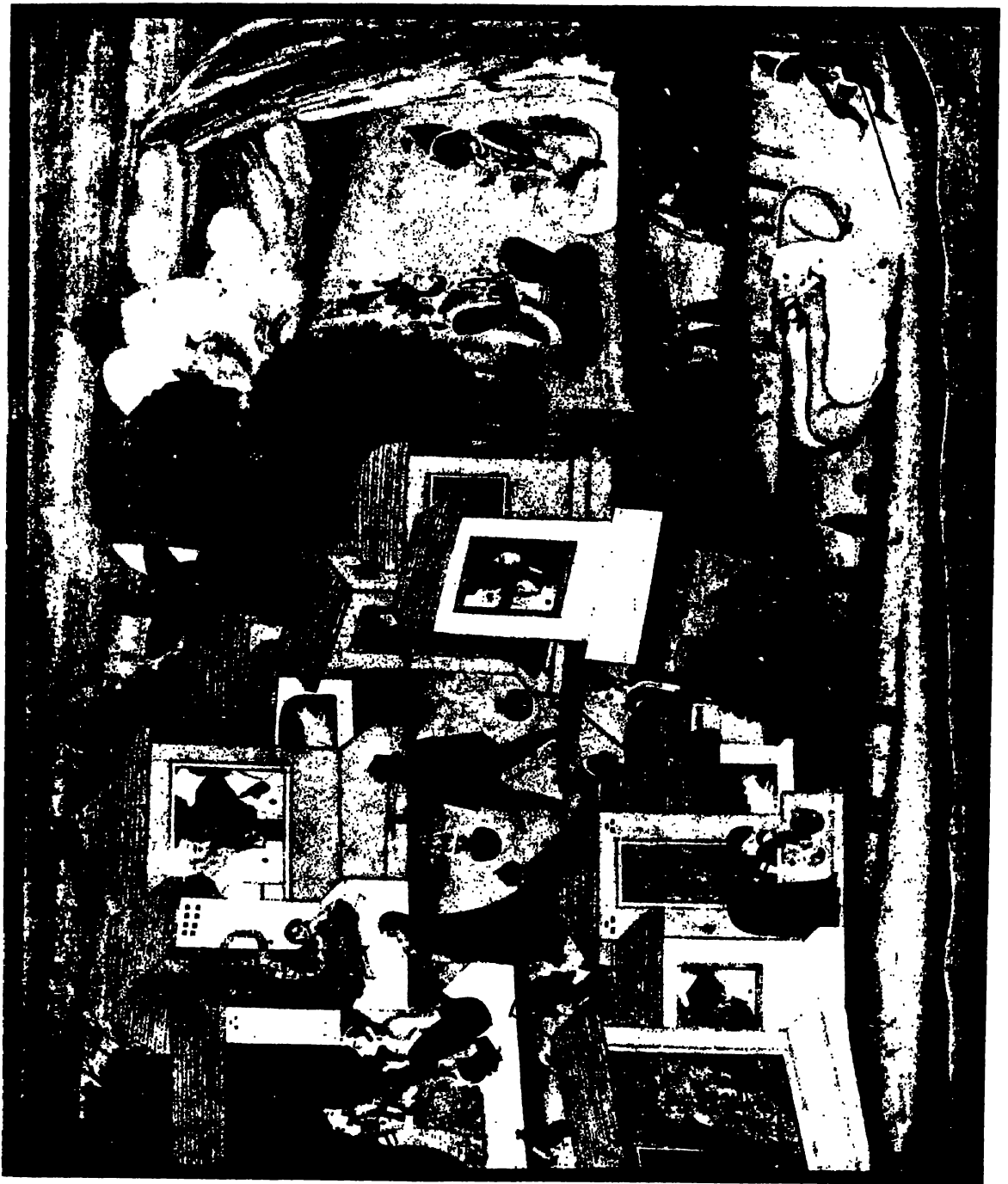
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬০শ ভাগ
১ম খণ্ড | আশ্বিন, ১৩৬৭ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও দায়িত্বজ্ঞান

আসামের "বঙ্গালখেদা" সংক্রান্ত শোচনীয় ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালাভের জন্য দিল্লীর পার্লিয়ামেণ্টের উভয় অংশ হইতে যে প্রতিনিধি দল শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈনের নেতৃত্বে আসাম সফরে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে অধিকসংখ্যক সদস্যের অনুমোদিত একটি রিপোর্ট পার্লিয়ামেণ্টের উভয় কক্ষে দেওয়া হইয়াছে। সেই সঙ্গে দুইজন সদস্য ভিন্ন-মতের রিপোর্টও দাখিল করিয়াছেন। ঐ দুইজনের মধ্যে পি-এস-পি সদস্য শ্রীমুকুটবিহারীলাল ব্যাপক তদন্তের সপক্ষে কেননা তাঁহার মতে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে ও বিচ্ছিন্নভাবে তদন্ত অনুষ্ঠানের যে সুপারিশ অধিকাংশ সদস্যের রিপোর্টে আছে তাহাতে এই শোচনীয় ঘটনাবলীর স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে না। ইহা ব্যতীত ঐ রিপোর্টের অন্য সকল রিপোর্ট ও প্রস্তাব তিনি সমর্থন করেন। কম্যুনিষ্ট সদস্য রাজবাহাদুর গৌর সাড়ে চার পৃষ্ঠার রিপোর্টে সমস্ত ঘটনার বিচার করিয়া ঐ ব্যাপক তদন্তেরই দাবি জানাইয়াছেন।

রিপোর্ট পেশ হইবার পরে লোকসভায় মন্ত্রী পণ্ডিত পন্থ এক প্রস্তাব আনেন যে, আগামী ১লা সেপ্টেম্বরে লোকসভায় আসাম সম্পর্কে যে বিতর্ক আরম্ভ হইবে তাহা উক্ত সংসদীয় প্রতিনিধি দলের রিপোর্টের আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হইবে। সদস্য শ্রীত্রিদিবকুমার চৌধুরী প্রশ্ন করেন যে, এই রিপোর্টের নির্ণয় এবং তাহার সুপারিশের ধারা লোকসভা গ্রাহ্য করিতে বাধ্য কি না। তাহার উত্তরে স্পীকার শ্রীঅনন্তশয়নম আয়েঙ্গার বলেন যে, বিতর্ক ঐ রিপোর্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে না, আসামের অবস্থার আলোচনা ব্যাপক ভাবেই করা হইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উক্ত রিপোর্টত্রয়ের মূল্য শুধু এইমাত্র যে, উহা বিভিন্ন প্রদেশীয় সদস্যের ঐ ব্যাপার সম্পর্কে সাক্ষ্য ও মতামত। সে মতামতের কোনও মূল্য নাই একথা বলা চলে না, কেননা লোকসভার সদস্যদিগের মধ্যে যাঁহারা এই প্রতিনিধি দলের বিভিন্ন সদস্যের সহিত নিকটভাবে পরিচিত, বা দলগত ও প্রদেশগত সম্পর্কযুক্ত, তাঁহারা ঐ রিপোর্টের তথ্যনির্ণয়কে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ এবং নিরপেক্ষ ব্যক্তির বিচার বলিয়া গুরুত্ব-আরোপ নিশ্চয়ই করিবেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণের মূল্য তাঁহারা কি দিবেন সেটা অবশ্য লোকসভায় ও রাজ্যসভায় আলোচনা ও বিতর্কের মধ্যে প্রকাশিত হইবে। কিন্তু সেখানেও বাংলার ও আসামের সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ, মন্তব্য ও সংবাদ অপেক্ষা তাঁহারা ভিন্ন প্রদেশীয় সংবাদপত্রে যে সামান্য মতামত ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাকেই বোধ হয় অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য মনে করিবেন। ইহা আমাদের অনুমান নহে, ভিন্ন প্রদেশের সংবাদপত্রে বাংলার খবরাখবর ও তাহার উপর মন্তব্য দীর্ঘদিন দেখিবার ফলেই আমাদের এই ধারণা জন্মিয়াছে। আসামের ঘটনাবলী সম্পর্কেও ভিন্ন প্রদেশের সংবাদপত্রের দৃষ্টিভঙ্গী একই প্রকার; উপরন্তু প্রতিনিধি দলের এই রিপোর্টের একটি অংশের মন্তব্য যে ভিন্ন-প্রদেশীয় লোকসভার সদস্যদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই মন্তব্যের সংক্ষিপ্তসার এইরূপ :

"প্রতিনিধি দলের সম্মুখে বহু দৃষ্টান্ত আসিয়াছে যেখানে সম্পূর্ণ মিথ্যা সংবাদ বা অতি নগণ্য ব্যাপারের অতিরঞ্জিত বিবরণ দিয়া অসমীয়া অথবা বাঙালী জনসাধারণকে উত্তেজিত করিবার অপচেষ্টা সংবাদপত্রে করা হইয়াছে। প্রতিনিধিবর্গ আসামের ও কলিকাতার কয়েকটি সংবাদপত্রের নাম করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, উহারা অত্যন্ত উত্তেজনা ও বিক্ষোভ সৃষ্টির চেষ্টাই করিয়াছেন, কোনও রূপ সহায়ক প্রবৃত্তি তাহাদের ছিল না। সংবাদের সত্যাসত্য নিরূপণে যথেষ্ট আগ্রহ তাহারা দেখায় নাই।

"আসাম কর্ত্তৃপক্ষের অধীনে এমন কোনও ব্যবস্থা ছিল না যাহাতে সঠিক সংবাদ পরিবেশিত হয় এবং তাহাদের সংবাদ প্রচারের ব্যবস্থায় সকল সময় সম্পূর্ণ সঠিক ও সম্যক্ বিবরণ দেওয়া হয় নাই এবং ঐ সকল সংবাদপত্রে প্রচারিত মিথ্যা বা পক্ষপাতদুষ্ট অতিরঞ্জিত বিবরণের প্রতিবাদও যথাযথভাবে করা হয় নাই। ফলে ঐ দুই প্রদেশের সংবাদপত্র এক "ঠাণ্ডাযুদ্ধের" পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে। এই সময়ে, যখন কিনা শান্তি-শৃঙ্খলার পুনঃস্থাপনের চেষ্টা এবং স্থানীয় লোকজনের মনে নিরাপত্তার বিশ্বাস ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা চলিতেছে তখনও, উভয় দিকের সংবাদপত্রের মধ্যে দায়িত্বজ্ঞানের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না।"

উপরোক্ত অবস্থা দৃষ্টে প্রতিনিধিবর্গের বিচারে যখন আভ্যন্তরীণ ব্যাপক অশান্তির ফলে ভারতের বা তাহার কোনও অংশের রক্ষণাবেক্ষণের প্রতিকূল কোনও অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন যথোচিত বিজ্ঞপ্তির দ্বারা সংবাদপত্রসকলকে মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রচারে নিবৃত্ত থাকিতে বাধ্য করা উচিত এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতার যথোচিত দণ্ডের ব্যবস্থা করা উচিত। প্রতিনিধিবর্গের অধিকাংশেরই এই মত—শুধু কম্যুনিষ্ট সদস্যের তাহা নহে। কিন্তু তিনিও একথা বলেন নাই যে, কয়েকটি সংবাদপত্রের দায়িত্বজ্ঞানের অভাব সম্পর্কে উক্ত রিপোর্টে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সঠিক নয়।

আমরা জানি যে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কত মূল্যবান বস্তু কিন্তু আমরা একথা জানি যে, সংবাদপত্র যদি সত্যাসত্যজ্ঞানশূন্য হয় বা দায়িত্বজ্ঞানশূন্য হয় তবে সেই সংবাদপত্র দেশের ও দশের কি ভয়ানক ক্ষতি করিতে পারে। সুতরাং বাংলার সংবাদপত্রের উচিত এই দায়িত্বজ্ঞানশূন্যতার অপবাদ হইতে নিজেকে মুক্ত করা নহিলে বাংলা ও বাঙালীর অধঃপতন আরও দ্রুত হইতে বাধ্য। আসাম ফেরৎ প্রতিনিধিবর্গের অভিযোগের উত্তরে "সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ" বলিয়া চীৎকার করিলেই এ ব্যাপার শেষ হইবে না। যে যে সংবাদপত্র অভিযুক্ত তাঁহাদেরও উচিত এ বিষয়ে দোষক্ষালনের চেষ্টা করা।

আসাম "বিদ্রোহের" অর্থ

কোন জাতির লোক যখন সেই জাতির অনুমোদিত আইন-কানুনে পদাঘাত করিয়া অরাজকতার সৃষ্টি করে, তখন সেই অরাজকতার প্রকৃত অর্থ বিদ্রোহ। বিদ্রোহ অর্থে সকলে বুঝেন রাজশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম। আসামে রাজশক্তিই রাজ্যের রাষ্ট্রীয় নীতিকে পদদলিত করিয়া রাজ্যের কিছু অধিবাসীর প্রাণনাশ, তাহাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার, সম্পত্তি লুণ্ঠন, গৃহদাহ ইত্যাদি চালাইয়াছেন। রাজমন্ত্রী অথবা রাজকর্ম্মচারীরা যদি আইন ভঙ্গ করেন তাহাতে সে দুষ্কর্ম আইন বা নীতিসাপেক্ষ হইয়া যায় না। আসামের শাসনকর্ত্তারা যদি নিজেরাই খুন, মারপিট, লুঠ, ঘর জ্বালান ইত্যাদি করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাদের অপরাধ বৃহত্তর রাষ্ট্রের সমর্থন লাভ করিতে পারে না। অর্থাৎ আসামের শাসনকর্ত্তাদের আইন অগ্রাহ্য করিয়া তৎপ্রদেশে বাঙালীদের উপর অত্যাচার করা, প্রধানতঃ ভারতরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কার্য্য। আইন ও রাষ্ট্রনীতি রাষ্ট্রের বুনিয়াদ। যে সেই বুনিয়াদ উচ্ছেদ চেষ্টা করে সে রাষ্ট্রের অতি বড় শত্রু ও সর্ব্বনাশকারক। রাজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম সাক্ষাৎভাবে রাজার উপর আক্রমণ করিয়া, অথবা রাজাদেশ অমান্য ও অগ্রাহ্য করিয়া হইতে পারে। আসাম কংগ্রেস, আসাম গবর্ণমেণ্ট, আসাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি বিদ্রোহের অর্থাৎ "হাই ট্রিজন"-এর অপরাধে অপরাধী। তাঁহারা এই মহাজাতির সম্মিলিত রাষ্ট্রের মূলনীতির উপর বর্ব্বর ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। তাহাতে বাঙালী আহত হইয়াছে কিংবা অপর কেহ তাহার বিচার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। রাষ্ট্রের উচ্ছেদের চেষ্টা যে ভাবেই হউক না কেন তাহা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। অর্থাৎ মহা-বিদ্রোহ। এই অপরাধের শাস্তি প্রাণদণ্ড। আসামের শাসক ও অপরাপর নেতাদের ভুলিয়া যাওয়া দরকার যে, তাঁহারা "বাঙালী, বাঙালী" বলিয়া চিৎকার করিয়া তাঁহাদের মহা অপরাধের সাফাই করিয়া লইবেন। আমরা জানিতে চাই যে, আসামের বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তা, কংগ্রেস নেতা প্রভৃতিদের বিদ্রোহের অপরাধে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ভারত সরকার করিবেন কিনা। যদি না করেন, তাহা হইলে ভারত সরকারের মন্ত্রীরাও এই বিদ্রোহের অংশীদার ও সহায়ক অর্থাৎ "এডার ও অ্যাবেটার" এবং সেই জন্য তাঁহাদেরও প্রাণদণ্ড হইতে পারে। ভারতবাসীকে এখন

দেখিতে হইবে যে, তাঁহারা নিজ রাষ্ট্রকে বাঁচাইবেন কি করিয়া। যাঁহারা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ভারতের স্বাধীনতার মূলচ্ছেদন কার্য্যে লিপ্ত আছেন, তাঁহারা যত বড়ই "ভি. আই. পি." হউন না কেন তাঁহারা ফাঁসিমঞ্চের ছায়াতেই রহিয়াছেন। বিপদ তাঁহাদেরই বেশী—বাঙালীর ততটা নহে। অ

সীমান্ত-রক্ষায় শ্রীনেহরু

শ্রীনেহরু রাজ্যসভায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, উত্তর-সীমান্ত-রক্ষার ব্যবস্থা লইয়া কাহারও চিন্তিত হইবার কারণ নাই। কেননা, ভারত-সরকার সকল ব্যবস্থাই অবলম্বন করিয়াছেন। অতএব অতর্কিতে বাহির হইতে শত্রু আসিয়া ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিবে তাহার কোনো সম্ভাবনাই নাকি নাই।

এরূপ কথা শুনিলে, সকলেরই আশ্বস্ত হইবার কথা। কিন্তু আমরা স্বস্তিবোধ করিতে পারিতেছি না এই কারণে, সরকারী-মতিগতি এবং তাঁহাদের কর্ম্মকুশলতা সম্বন্ধে আমাদের সম্যক্ পরিচয় আছে। অবশ্য একথা বলিব না, আমাদের সৈন্যবল কম এবং সেরূপ অস্ত্র-শস্ত্রের অভাব। সব থাকিতেও সরকারী-মন্থরগতি আমাদের অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখিয়াছে। সীমান্ত-রক্ষার ব্যবস্থা যে কি করা হইয়াছে, তাহার সঠিক কোনও বিবরণ প্রধান-মন্ত্রী রাজ্যসভায় দেন নাই—অবশ্য দেওয়া সঙ্গতও হইত না। তবে আভাস যেটুকু দিয়াছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে, সীমান্ত জুড়িয়া ঘাঁটি নির্ম্মাণ এবং নূতন করিয়া পথ-ঘাট প্রস্তুত করা হইতেছে। যদিও এ ব্যবস্থা পূর্ব্বেই করা উচিত ছিল। তবে প্রশ্ন এই, সত্যই তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে কি? শুনিয়া মনে হয়, কাজ এখনও শেষ হয় নাই। যে সরকার কূর্ম্ম-গতিতে অভ্যস্ত, তাহার কাছে ইহার বিপরীত গতির আশা করা যায় না।

পূর্ব্বে যাহা হইয়াছে, তাহার কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু দেখা যাইতেছে, এই সেদিনও চীনারা কামেং অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। অবশ্য তাহারা যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল, তেমনই নিঃশব্দে ফিরিয়া গিয়াছে। প্রমাণ করিয়া গিয়াছে, আমাদের রক্ষা-ব্যবস্থার ব্যর্থতা। আজও যদি এমনই ভাবে আত্ম-গোপন করিয়া চীনা-সৈন্য ভারত-সীমান্ত লঙ্ঘন করিতে পারে, তাহা হইলে কেমন করিয়া বলিব, আমাদের আত্ম-রক্ষার আয়োজন প্রয়োজনানুরূপ হইয়াছে? বরং ইহাই স্বীকার করিতে হয়, আমরা কথা যত বলিতে পারি, কাজ ততটা করিতে পারি না। সুতরাং যে আত্মতুষ্টির মনোভাব শ্রীনেহরুর ভাষণে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে উদ্বেগ দূর হইতেছে না। সীমান্ত-সমস্যা আমাদের জাতির পক্ষে জীবন-মরণ সমস্যা। সেখানেও যদি আমরা তৎপরতা ও কর্ম্মপটুতা দেখাইতে না পারি, তাহা হইলে শুধু তত্ত্বকথা সম্বল করিয়া কি আমরা আমাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিব?

অথচ এই গোপন-অভিসার যে একেবারে বন্ধ করা যায় না, এমন কথা আমরা মানিতে রাজী নই। সর্ব্বদা সজাগ থাকিলে এবং প্রস্তুতি যথাযোগ্য হইলে তাহা যে বন্ধ করা যায়, তাহার প্রমাণ সমকালীন ইতিহাসে অনেক মিলিবে। রাশিয়ার কথা তুলিব না—তাহাদের শক্তির সহিত কাহারও তুলনা হয় না। কিন্তু আফগানিস্থান? সে তো দেখাইয়া দিয়াছে, তাহার শূন্য-পথে গোপন বিচরণ নিরাপদ নয়। অথচ আমাদের স্থলপথে ও অন্তরীক্ষে যাতায়াত করিতেছে প্রতিপক্ষ ইচ্ছামত, আমরা তাহাদের ঠেকাইতেও পারিতেছি না, বন্ধ করিতেও পারিতেছি না।

বেশ দেখা যাইতেছে, সীমান্ত-রক্ষার ব্যবস্থা আমাদের এখনও প্রাথমিক পর্য্যায়ে। প্রতিপক্ষের আগমন ও নির্গমন বন্ধ করিবার শক্তি আমাদের নাই। একবার দুইবার নয়, যখন বার বার দেখিতেছি একই ধরনের ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে, তখন শ্রীনেহরুর অভয়-বাণী শুনিয়াও আশ্বস্ত হইতে পারিতেছি কই? শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার চেষ্টায় আর যাহাই করা চলুক, ভারত রক্ষা করা যাইবে না, ইহা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর স্মরণ রাখা উচিত।

গ

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামায় অরঙ্গাবাদ

পশ্চিম বাংলায় পাকিস্থানী চর-অনুচরগণের রাষ্ট্র-বিরোধী কার্য্যকলাপ এতদিনেও বন্ধ করা গেল না, ইহাই আশ্চর্য্য! কলিকাতা এবং সন্নিহিত শিল্পাঞ্চলের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে বহু পাকিস্থানী স্থায়ীভাবে আড্ডা গাড়িয়াছে, ইহাদের সন্দেহজনক আচরণ ও গতিবিধির সংবাদ প্রায়ই শুনা যায়। তাছাড়া, রাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী এলাকাগুলিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যেও কিছু কিছু লোকের আনুগত্য রহিয়াছে পাকিস্থানের উপর এবং ইহার ফলেও আইন-শৃঙ্খলা ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিপন্ন হইতেছে। গত ১১ই আগষ্ট মুর্শিদাবাদ জেলার অরঙ্গাবাদ গ্রামে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাকে নিতান্ত সাধারণ প্রকৃতির গ্রাম্য-বিরোধ মনে করা যায় না। সংবাদে প্রকাশ, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হাজার হাজার লোক নানা

রকম অস্ত্রশস্ত্র লইয়া গ্রামের হিন্দুপল্লী আক্রমণ করে এবং মারপিট ও লুঠতরাজ চালায়। ঘটনার সূত্র বিড়ি-কারিগরদের মধ্যে বিরোধ হইতে পারে, কিন্তু তাহাই যদি সত্য হয় তবে হাঙ্গামাকারীগণ 'পাকিস্থান জিন্দাবাদ' 'কাফেরগুলিকে শেষ কর' প্রভৃতি ঘোর রাষ্ট্রবিরোধী এবং সাম্প্রদায়িক ঘৃণাসূচক ধ্বনি তুলিয়া জেহাদে অবতীর্ণ হইল কেন? যাহার ফলে কিছুসংখ্যক লোক হতও হইয়াছে।

কোনই সন্দেহ নাই, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক পশ্চিম-বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলকে পাকিস্থানের সামিল করিতে চায়। ইহাদের দুরভিসন্ধির পরিচয় পূর্ব্বেও বহুবার পাওয়া গিয়াছে। ইহারা পশ্চিম বাংলায় বসবাস করিবে এবং ভারতীয় নাগরিক হিসাবে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবে, আবার সেই সঙ্গে পাকিস্থানী জিগির তুলিয়া দাঙ্গাহাঙ্গামাও বাধাইবে, ইহা কিছুতেই বরদাস্ত করা যাইতে পারে না। এই শ্রেণীর রাষ্ট্রবিরোধী বিশ্বাসঘাতক কার্য্যকলাপের মূল উচ্ছেদ করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। গ

জাতীয় উপার্জ্জন বৃদ্ধি

কিছুদিন হইল ভারত-সরকারের বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি ও প্রচারের দ্বারা আমরা জ্ঞাত হইলাম যে, আমাদের জাতীয় মোট উপার্জ্জন বস্তুতঃ এক বৎসরে শতকরা ৷৷০ আট আনা বাড়িয়াছে। এই বিজ্ঞপ্তির অর্থ কি তাহা সাধারণ মানুষ সহজে বুঝিতে পারিবেন না। কারণ, বর্ত্তমান অর্থ-নীতিতে গণিতের ব্যবহার। যে কথা সহজ ভাষায় বেশ বলা যায় তাহাই আজকাল গণিতের ভাষায় ব্যক্ত করিয়া দুর্ব্বোধ্য করিয়া তোলা হয়। জাতীয় উপার্জ্জন অর্থে জাতির সকল উপার্জ্জকের উপার্জ্জন একত্র করিয়া একটা মোট উপার্জ্জন হিসাবে দেখান। ইহার অর্থ জাতির মোট মূল্যবান দ্রব্য ও কার্য্য উৎপাদন কত হইয়াছে তাহা নহে। জাতির সকল ব্যক্তির ব্যক্তিগত আর্থিক আয়ের সমষ্টিমাত্র। অর্থাৎ একই পরিমাণ চাল, ডাল, চিনি, বস্ত্র, বাইসাইকেল, শিক্ষকতা, ওকালতি প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়া যদি অপেক্ষাকৃত অধিকসংখ্যক উপার্জ্জনকারী দিন গুজরান করেন তাহা হইলে জাতীয় উপার্জ্জন বাড়িয়াছে বলিয়া ধরা হইবে। যেমন, চাল যদি চাষীর ঘর হইতে সোজা ক্রেতার হাঁড়িতে চলিয়া যায় তাহা হইলে মোট জাতীয় উপার্জ্জনে সেই চালের মূল্য মাত্র একবারই দেখা যাইবে। চাল যদি চাষীর ঘর হইতে মারোয়াড়ীর আড়তে, তার পর পাইকারের নিকট, খুচরা বিক্রেতার দোকানে ও অবশেষে ভাতের হোটেলে ঘুরিয়া ভুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই একই চাল জাতীয় হিসাবে বহুবার দেখা যাইবে। সুতরাং আধুনিক গণিতের ভাষায় যে জাতীয় উপার্জ্জন বা সমৃদ্ধির বর্ণনা ব্যক্ত করা হয়, তাহা অনেক স্থলেই এক মূল্য পাঁচ হাত ঘুরিয়া আসার অভিব্যক্তিমাত্র। বস্তুতঃ সত্যকার জাতীয় উপার্জ্জন কমিয়া গেলেও, ক্রয়-বিক্রয়ের আধিক্যে সেই উপার্জ্জন বাড়িয়াছে বলিয়া দেখান যাইতে পারে। ইংলণ্ডে এক ব্যক্তি বলিয়াছিলেন যে, তিনি যদি তাঁহার রাঁধুনিকে বিবাহ করেন তাহা হইলে ইংলণ্ডের মোট জাতীয় উপার্জ্জন রাঁধুনির পূর্ব্ব-উপার্জ্জিত বেতন বরাবর কমিয়া যাইবে। কিন্তু যদি তিনি নিজ পত্নীকে ত্যাগ করিয়া তাঁহাকেই মাইনে করা রাঁধুনি হিসাবে কর্ম্মে নিযুক্ত করেন তাহা হইলে ইংলণ্ডের জাতীয় আয় নব-নিযুক্ত রাঁধুনির বেতন প্রমাণ বৃদ্ধি লাভ করিবে। আমাদের জাতীয় গভর্ণমেণ্ট আজকাল বহু স্থলেই পত্নীকে বরখাস্ত করিয়া রাঁধুনির কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছেন। ইহার ফলে আমাদের জাতীয় আয় বাড়িয়া চলিতেছে। অর্থাৎ যে সকল কাজ (বা অ-কাজ) পূর্ব্বে মানুষে বিনা বেতনে করিত বর্ত্তমানে সেই কাজ বা অ-কাজ করিয়া মানুষ বেতন পাইতেছে। এই সকল বেতনের মোট পরিমাণ অনায়াসেই জাতীয় উপার্জ্জনকে শতকরা আট আনা বাড়াইয়া দিতে পারে। সম্ভবতঃ নূতন নূতন চাকুরির সৃষ্টি করিয়া গভর্ণমেণ্ট জাতীয় উপার্জ্জন ক্রমশঃ অঙ্কে বাড়াইতেছেন এবং আসলে জাতীয় উৎপাদন ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। সত্য ও গণিতের হিসাব যেমন পরস্পরবিরুদ্ধ হইতে পারে এবং হইয়া থাকে, বহু মিথ্যা তেমনি গণিতের সাহায্যে সত্য বলিয়া প্রচার করা হয়। পণ্ডিত নেহরু তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দেশের বক্ষে চাপাইয়া সত্যকার জাতীয় আয়ের শতকরা কুড়ি টাকা অপব্যয় করিয়াছেন। ইহাতে আমাদের সমষ্টিগত রোজগার শতকরা আট আনা বাড়িয়াছে ইহা বড়ই আনন্দের কথা।

অ

তৃতীয় বার্ষিক পরিকল্পনায় শ্রী জে. আর. ডি. টাটা

ভারতের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়ায় জানানো হইয়াছে যে, চলতি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরি-কল্পনার শেষ পর্য্যন্ত—অর্থাৎ আগামী ১৯৬১ সনের মার্চ্চ পর্য্যন্ত দেশে ৩৫ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপন্ন হইবে এবং

আগামী তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে দেশের তিনটি সরকারী ইস্পাত-কারখানার সম্প্রসারণ করিয়া ও বোকারোতে একটি নূতন ইস্পাতের কারখানা স্থাপন করিয়া দেশে ইস্পাতের উৎপাদন ৯৫ লক্ষ টনে বর্দ্ধিত করা হইবে। ইস্পাতের উপর এই প্রকার ঝোঁকের বিরুদ্ধে টাটা কোম্পানীর শ্রী জে. আর. ডি. টাটা তীব্র আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন, "দেশের বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোন্ কোন্ শিল্পের অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন তাহা বিবেচনা করিয়াই তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে শিল্পের প্রসার হওয়া আবশ্যক।" এই সম্বন্ধে তিনি বিশেষ ভাবে দেশের খাদ্যাভাব, বেকার-সমস্যা ও বিদেশী মুদ্রার অভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন, দেশের খাদ্যাভাব দূরীকরণের জন্য আগামী তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে দেশের কৃষি-জমিতে রাসায়নিক সার দেওয়ার প্রয়োজন হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ পর্য্যন্ত দেশে তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ রাসায়নিক সার উৎপাদনের সঙ্কল্প নাকি স্থির হইয়াছে।

বেকার-সমস্যা সম্বন্ধে তিনি বলেন, ১৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশে যদি বৎসরে ১০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদনের উপযোগী একটি ইস্পাত-কারখানা স্থাপিত হয়, তাহা হইলে এই কারখানায় বৎসরে ৪৪ কোটি টাকা মূল্যের ইস্পাত উৎপন্ন হইবে এবং উহাতে বারো হাজার ব্যক্তির কর্ম্মসংস্থান হইবে। কিন্তু দেশে যদি ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে কলকব্জা ও ইস্পাতজাত পণ্য উৎপাদনের জন্য একটি কারখানা স্থাপিত হয়, তাহা হইলে উহাতে বৎসরে ৩০০ কোটি টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন হইবে এবং মোটা-মুটিভাবে উহাতে অধিকতর সংখ্যক ব্যক্তির কর্ম্মসংস্থান হইবে। এই প্রসঙ্গে তিনি টাটা লোকোমোটিভ কোম্পানীর কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, মাত্র ২০ কোটি টাকা মূলধন নিয়োজিত হইলেও উহাতে বারো হাজার ব্যক্তির কর্ম্মসংস্থান হইয়াছে। সুতরাং কি উৎপাদনক্ষমতা, কি কর্ম্মসংস্থান এবং কি বিদেশী মুদ্রার উপার্জ্জন ও সংরক্ষণ—সকল দিক হইতেই ইস্পাত-কারখানা অপেক্ষা ইস্পাতভিত্তিক কারখানার প্রয়োজন অনেক বেশী। অবশ্য দেশে বেশী পরিমাণে ইস্পাত উৎপন্ন হইলে উহা বিদেশে রপ্তানি করিয়াও বিদেশী মুদ্রা উপার্জ্জন করা যাইতে পারে। কিন্তু এ সম্বন্ধে শ্রী টাটার অভিমত এই যে, বর্ত্তমানে ইস্পাত-আমদানীকারী দেশ-গুলি ইস্পাতের ব্যাপারে ক্রমেই অধিকতর স্বাবলম্বী হইয়া উঠিতেছে। অন্যদিকে ইস্পাত-রপ্তানিকারক দেশ-গুলিতে ইস্পাতের উৎপাদন এত বেশী হইতেছে যে, ঐ সব দেশ ইস্পাতের মূল্য কমাইয়া দিয়াও ইস্পাত বিক্রয় করিতে সমর্থ হইতেছে না। ফলে ইস্পাতের রপ্তানির বাজারে একটা মন্দা দেখা দিয়াছে। এরূপ অবস্থায় ভারতে প্রয়োজনাতিরিক্ত ইস্পাত উৎপন্ন হইলেও, অতিরিক্ত ইস্পাত যে রপ্তানির বাজারে ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে তাহার সম্ভাবনা কম। আর ভারতে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ পর্য্যন্ত যদি এক কোটি টনের মত ইস্পাত উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে উহার সাকুল্য অংশ যে দেশে কাটিবে না এবং উহার মধ্যে অনেক ইস্পাত যে বিদেশে রপ্তানি করিতে হইবে তাহা সুনিশ্চিত বলিয়াই মনে হয়। এই সম্পর্কে টাটা বলেন যে, জাপান শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতের তুলনায় অনেক বেশী উন্নত। কিন্তু উক্ত দেশে গত ১৯৫৮ সনে এক কোটি টনের বেশী ইস্পাত খরচ হয় নাই। আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে ভারতে যে, বৎসরে এক কোটি টন ইস্পাত খরচ হইবে তাহা আশা করা বৃথা।

শ্রী জে. আর. ডি. টাটা এদেশের একজন বড় ইস্পাত-উৎপাদক। তাই দেশে ইস্পাত-শিল্পের অত্যধিক সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে তিনি যে সব কথা বলিয়াছেন, তাহা স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত মনে করিলে, তাঁহার উপর অত্যন্ত অবিচারই করা হইবে।

বর্ত্তমানে দেশের খাদ্য-সমস্যা ও বেকার-সমস্যা অত্যন্ত জটিল। এরূপ অবস্থায় যে-শিল্পের প্রসার দ্বারা দেশে অধিকতর পরিমাণে খাদ্য উৎপন্ন হইতে পারে এবং অধিকতর সংখ্যক দেশবাসীর কর্ম্ম-সংস্থান হইতে পারে, সেই সব শিল্পের উপরই সর্ব্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া আবশ্যক। উহার সহিত বিদেশী মুদ্রা-সংস্থানেরও একটা সম্পর্ক রহিয়াছে। ভারতের চলতি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদনের উপর সমধিক জোর না দেওয়ার ফলে এই পরিকল্পনার আমলে বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানির জন্য কয়েকশত কোটি টাকার সমপরিমাণ বিদেশী মুদ্রা ব্যয় করিতে হইয়াছে। আগামী তৃতীয় পরিকল্পনার আমলেও এজন্য আট-নয় শত কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইবে এবং শেষ পর্য্যন্ত উহাতে ভারতের কয়েক শত কোটি টাকার সমপরিমাণ বিদেশী মুদ্রার অপচয় ঘটিবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে ভারতে তিনটির বদলে যদি দুইটি কি একটি ইস্পাত-কারখানা স্থাপিত হইত এবং উহার ফলে যে টাকা বাঁচিত তাহার দ্বারা দেশে যদি কতকগুলি রাসায়নিক সারের কারখানা স্থাপন করা হইত, তাহা হইলে খাদ্য

আমদানির জন্য ব্যয়িত বিদেশী মুদ্রা বাঁচিয়া যাইত এবং উহার একাংশ দ্বারাই বিদেশ হইতে ভারতের প্রয়োজনীয় ইস্পাত আমদানির খরচ পোষাইয়া যাইত। উহার ফলে দেশে অধিকতর সংখ্যক ব্যক্তির কর্ম্মসংস্থানও হইত। দেশবাসীর ব্যবহার্য্য অন্যান্য ভোগ্যপণ্য সম্বন্ধেও এই সব কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইস্পাত, পারমাণবিক শক্তি হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন যাহা অত্যধিক ব্যয়বহুল বলিয়া ইংলণ্ডেও পরিত্যক্ত হইয়াছে, এই সব বিষয়ে নজর দেওয়ায় দ্বিতীয় পরিকল্পনায় দেশবাসীর মৌলিক প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ প্রভৃতি সংস্থানের সমস্যা উপেক্ষিত হইয়াছে।

আশা করা গিয়াছিল যে, তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের এইরূপ ভুলত্রুটি পরিহার করিয়া চলিবেন এবং ইস্পাতের মত অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক কাজে প্রভূত অর্থব্যয় না করিয়া, এই অর্থ দেশে ভোগ্য-পণ্য ও উৎপাদনে—তথা দেশবাসীর কর্ম্মসংস্থানে নিয়োজিত করিবেন। কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়া দেখিয়া আমরা সেই আশায় নিরাশ হইয়াছি। গ

উড়িষ্যায় বন্যা

আকস্মিক প্লাবনের ফলে উড়িষ্যার জনজীবনে যে সঙ্কট দেখা দিয়াছে তাহা ভয়াবহ। এই প্লাবন সম্পর্কে উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থান হইতে ক্রমে ক্রমে যে সমস্ত সংবাদ আসিয়া পৌঁছিতেছে, ব্যাপক একটা বিপর্য্যয়ের চিত্রই তাহাতে স্পষ্ট হইয়া উঠে। বুঝিতে পারি, একটি-দুইটি স্থানে নহে, উড়িষ্যার এক সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়াই বর্ত্তমানে এক সঙ্কটাবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। সেতু ভাঙিয়াছে, রেল-লাইন নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, পথ-ঘাট ভাসিয়া গিয়াছে এবং সহস্র সহস্র নরনারীর জীবনে যে এক ভয়ঙ্কর সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহার সমাধান সহজ নয়। বিশেষ করিয়া সকলপ্রকার যোগাযোগ বন্ধ হইয়া যাওয়াতে আরও অসুবিধা হইয়াছে।

১৯৫৫ সনে উড়িষ্যায় যে বন্যা হইয়াছিল তাহার ভয়াবহ বিবরণ সম্ভবতঃ সকলেরই স্মরণে আছে। তখন বলা হইয়াছিল যে, উহা অতীতের সব রেকর্ড অতিক্রম করিয়াছে। তাহার পর পাঁচ বৎসরের মাথায় এবার ইতিহাসে ভয়াবহ আর একটি বন্যার প্রকোপ ঘটিল। সেবারেও যে কারণে বন্যা হইয়াছিল, এবারেও সেই একই কারণ। জল-নিকাশের ব্যবস্থায় গুরুতর বাধা ও ব্যাঘাত ইহার মূল কারণ। অনেক স্থানে নদী-নালার গর্ভ পার্শ্ববর্ত্তী ভূখণ্ডের তুলনায় উঁচু হইয়া গিয়াছে। সেজন্য ভূখণ্ডের উপর বর্ষিত জলটা স্বাভাবিক খাতে নামিয়া যাইতে পারে না। আশেপাশের নীচু জমিতে মজুত হইতে হইতে ঘরবাড়ী ভাসাইয়া খুশীমত পথে নামিতে আরম্ভ করে। অনেক ক্ষেত্রে ক্রমাগত গাফিলতির জন্যও এরকম অবস্থা ঘটিয়াছে। অতীতে রেলপথ নির্ম্মাণের সময় পুলের স্থান নির্ব্বাচনে অদূরদর্শিতার জন্য এবং পুলের নীচে জল-নিকাশের উপযোগী বিজ্ঞানসম্মত সতর্কতার অভাবে অনেক নদী-নালা হাজিয়া-মজিয়া গিয়াছে। বাঁধ দিয়া উপর দিকে জল আটক রাখার জন্য স্বাভাবিক স্রোতের অভাবেও নদী-নালার গর্ভ উঁচু হইয়া গিয়াছে। বনজঙ্গল উজাড় করিয়া দেওয়ায় উপর দিক হইতে স্রোতের সঙ্গে বালির চাঙড়া, পাথরের টুকরা ও প্রচুর মাটি নামিয়া নদীর গর্ভ ভরাট করিয়া ফেলিতেছে। উপকূলবর্ত্তী জেলাগুলিতে সমুদ্র হইতে জোয়ারের জল প্রচুর বালি ও পলি লইয়া উপর দিকে সঞ্চিত করিতেছে। এই সকল কারণে কোন নদীতেই জল-নিকাশের স্বাভাবিক ক্ষমতা নাই। ইহা ছাড়া বসতি বিস্তারের চাপ ত আছেই।

এই জল-নিকাশের সুব্যবস্থা এবং নীচু জমি হইতে ঘরবাড়ী সরাইয়া উঁচু জমিতে বসতি বিন্যাস ব্যতীত এই নিয়মিত বন্যা রোধ করা যাইবে না। ১৯৫৫ সনে বন্যার পরে শ্রীনেহরু স্বয়ং পরামর্শ দিয়াছিলেন, উড়িষ্যার পল্লী-অঞ্চলে নদী-তীরবর্ত্তী নীচু জমি হইতে বসতি সরাইয়া উচু জায়গায় ঘরবাড়ী তৈয়ারি করাইতে হইবে। এবারের ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীনেহরুর নির্দ্দেশ পালিত হয় নাই। ১৯৫৫ সনে বন্যার সময় যে অবস্থা বিদ্যমান ছিল, আজও তাহার অবসান ঘটে নাই। প্রতি বৎসর বন্যার পর একদফা আলোচনা হয়, তাহার পরই সবকিছু ঝিমাইয়া পড়ে। জানি না, সরকারের নিদ্রা ভঙ্গ করিতে আর কয়টি এইরূপ বন্যার প্রয়োজন হইবে ?

গ

দেশভক্তি

আজকাল আমরা প্রায়ই শুনি যে, আমাদের জাতীয় চরিত্র হইতে দেশভক্তি প্রায় লোপ পাইয়াছে এবং আমরা দেশের মঙ্গলের কথা আর চিন্তা করি না, শুধু দেখি আমাদের ক্ষুদ্র গণ্ডিগত স্বার্থ কিভাবে রক্ষা করা যায়। এই কথাগুলির আলোচনা করিতে হইলে আমরা কে, দেশ-ভক্তি কাহাকে বলে ও ক্ষুদ্র গণ্ডিগত স্বার্থ কি, আমাদের এই সকল কথার উত্তর পাওয়া সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। আমরা বলিতে নিশ্চয়ই বাঙালীদের বুঝিতে হইবে।

মারোয়াড়ী ভাটিয়া অথবা হিন্দি ভাষাভাষী ভারতীয়দের বিষয়ে দেশভক্তি ঘটিত কোন সন্দেহ কাহারও মনে জাগ্রত হওয়া সম্ভব নহে। ইঁহারা যে সর্ব্বসময়ে ও সর্ব্বক্ষেত্রে দেশের জন্য সকল স্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন এ কথা সর্ব্বজনবিদিত। বাঙালী কেন দেশভক্তি ভুলিল এই কথার উত্তরই তাহা হইলে পাওয়া প্রয়োজন। নব প্রেরণাই সতত পুরাতন আগ্রহ ও অনুভূতিকে অস্পষ্ট করিয়া বর্ণহীন করিয়া দেয়। আজ বাঙালীর কোন্ নূতন প্রেরণার ফলে তাহার দেশভক্তি নষ্ট হইতে যাইতেছে? নিজ দেশবাসীর নিকট অপমান ও অন্যায় আক্রমণের ফলে লাঞ্ছিত হওয়া কি দেশভক্তি নাশের কারণ হইতে পারে? হইতে পারে হয়ত, কারণ গৃহ-বিবাদ সকল বিবাদের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ। ভাই শত্রু, সকল শত্রুর বড় শত্রু। এই নিয়ম অনুসারে বাঙালী আজ হয়ত নিজ দেশমাতার অপর সন্তানদের প্রতি বিশ্বাসহীন ও বিমুখ। কোন্ মহাপাপ আজ আমাদের জাতিকে ধ্বংসের পথে টানিয়া লইয়া চলিতেছে? ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির আবেগ নিশ্চয়ই। কাহার মধ্যে এই আবেগ সর্ব্বাপেক্ষা প্রকট? বাঙালীর মধ্যে নহে নিশ্চয়ই। যে সকল নীচ প্রবৃত্তির লোক নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভ্রাতৃ-হত্যা করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না; যাঁহারা নিজের এক পয়সা লাভের জন্য অপরের এক টাকা লোকসান করাইতে দ্বিধাবোধ করেন না, তাঁহারা কোন্ জাতির অন্তর্গত? তাঁহারা কি বাঙালী?

বাঙালী চিরকাল সকল ভারতবাসীকে নিজের বলিয়া জানিয়াছে। রাম লক্ষ্মণ সীতা; ভীমার্জ্জুন অথবা শ্রীকৃষ্ণ; বুদ্ধ শঙ্কর শ্রীচৈতন্য; শিবাজি, গুরুগোবিন্দ সিংহ, রাণা প্রতাপ কিম্বা রঞ্জিত সিংহ: ইঁহারা কেহই মনের আসরে আমাদের পর ছিলেন না। ইঁহাদের মধ্যে কেহ হিন্দি বলিতেন কি না জানি না, কিন্তু ইঁহারা ধনোপার্জ্জন লালসায় সকল নীতিকে বিসর্জ্জন দিয়া মিথ্যার অভিনয়ে আত্মনিয়োগ করিয়া বেড়াইতেন না। সেই জন্যই ইঁহারা আমাদের প্রিয়। এবং আমরা যাঁহাদের শত্রু মনে করি ও ঘৃণার চক্ষে দেখি, তাঁহাদের জাতিধর্ম্ম অথবা ভাষার জন্য আমরা তাঁহাদের প্রতি বিমুখ নহি। তাঁহাদের মধ্যে যে পাপ আছে তাহাই আমাদের ঘৃণ্য। যে নীচতা আজ ভারতীয় চরিত্রকে নষ্ট করিতে বসিয়াছে সেই নীচতাই আমাদের চক্ষে হেয়। নতুবা কোন ভাষা, ধর্ম্ম, জাতি অথবা রীতিনীতি আমরা অবজ্ঞার চক্ষে দেখি না। ধর্ম্ম ও নীতির অভাবই অবজ্ঞার বিষয়।

ভারতের বহু জাতি আজ দলবদ্ধ হইয়া অপর জাতি-দের উপর প্রভুত্ব বিস্তারে লিপ্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের নানান ছুঁতা ও নানান অজুহাত ব্যবসায়, বাণিজ্য, চাকুরি প্রভৃতি একচেটিয়া করিবার জন্য। ইঁহাদের মধ্যে বেশীর ভাগই কতকটা অশিক্ষিত ও অমার্জ্জিত রুচির লোক। তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞা না দেখান বিশেষ আত্ম-সংযমের কথা। সে পরিমাণ সংযম অনেক বাঙালীর নাই। কিন্তু অবজ্ঞাটা তাঁহাদিগের ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রতিই, তাঁহাদের ভাষা অথবা অপর কোন জাতিগত বৈশিষ্ট্যের প্রতি নহে। দুধে জল মিশানর প্রতি ঘৃণা দেখাইলে তাহা গোয়ালার জাতির উপর ঘৃণা প্রদর্শন নহে, শুধু গোয়ালা-বিশেষের চরিত্রের উপরই সে ঘৃণা যাইয়া পড়ে। যাঁহারা নানান দুষ্কর্ম্ম করিয়া ভারতের সর্ব্বনাশ করিতে-ছেন, তাঁহাদের কার্য্যের প্রতি আমাদের ঘৃণা খুবই প্রবল। ইহার জন্য তাঁহারাই দায়ী, বাঙালীর ইহাতে কোন দোষ নাই।

অ

রামরাজ্য

বড় কথা বলিয়া ছোট কাজ করা শঠ লোকের অতি-পুরাতন প্রবঞ্চনার অস্ত্র। ধর্ম্মের অভিনয় করিয়া মানুষের মন হইতে সন্দেহ অপসৃত করিয়া তৎপরে লোক ঠকান নূতন পদ্ধতি নহে। চোর, জুয়াচোর, ঠক, খুনী, পকেট-মার প্রভৃতি সকল সমাজদ্রোহীই চিরকাল মিথ্যা অভিনয়ে বিশ্বাস জাগাইয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। ধর্ম্মের অভিনয় ও বড় বড় কথা সেই জন্য সততই বুদ্ধিমানের মনে সন্দেহ জাগ্রত করে। কংগ্রেস যখন সত্যমেব জয়তে মন্ত্র সম্মুখে রাখিয়া রামরাজ্য প্রবর্ত্তনে নিযুক্ত হইলেন; এবং বিহার উত্তর প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশের উত্তর কালের ব্রিটিশ নিযুক্ত পুলিশের সন্তান-সন্ততিদিগের অনেককে খদ্দর পরিধান করাইয়া দেশভক্ত বলিয়া ভারতের সম্মুখে খাড়া করিলেন, তখনই আমাদের মনে এই সন্দেহ জাগ্রত হইয়াছিল যে, এই ব্যবস্থার ফল কখনও শুভ হইবে না। বাংলা দেশেও বহু ব্রিটিশ অর্থে পুষ্ট গোয়েন্দা ও অপর প্রকার ব্রিটিশের পদলেহনকারী ব্যক্তি পি. আই. পি. (Post Independence Patriots)-রূপে দেখা দিয়া-ছিলেন। ব্রিটিশের সহিত সংগ্রামে ভারতের শতকরা একজন লোকও নামেন নাই; কিন্তু তথাকথিত স্বাধীনতা লাভের পরে শতকরা একশত একজন মারোয়াড়ী, ভাটিয়া, চেট্টি, বিহারী প্রভৃতি জন দেশভক্তি-আপ্লুত প্রাণে ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিলেন। কেন ধাবমান হইলেন? কোন উপায়ে কিছু অর্থলাভ হইবে, তাহারই

সন্ধানে। ঘুষ দিয়া ঠকাইয়া, মিথ্যা বলিয়া, ভেজাল দিয়া, অথবা যে কোন উপায়েই হউক না কেন, অর্থসঞ্চয় দেশভক্তির প্রধান অস্ত্র। Beware of the Greeks when they come wearing gifts এই অমর বাণীর ভারতীয় তর্জ্জমা হইবে—Beware of Patriots when they come wearing khaddar and spouting Hindi. অর্থাৎ, যখন দেখিবে দেশভক্তরা খদ্দর পরিহিত হইয়া হিন্দী উদ্গার করিতে করিতে তোমার দিকে অগ্রসর হইতেছে, তখন পকেট সামলাইয়া দ্রুত সেই স্থল ত্যাগ করিবে। তাঁহাদের যে দেশভক্তি ও রাষ্ট্র ভাষার বোঝা তাহা তোমার গলায় লটকাইয়া তোমাকে ডুবাইয়া মারিবারই ইহা পন্থা; বাকি সব কিছুই মিথ্যা।

অর্থাৎ রামরাজ্য অযোধ্যাতেই শোভা পায়, অপর দেশে নহে। রামচন্দ্র সীতাহরণের প্রতিশোধ লইবার পরে লঙ্কায় কালোবাজার স্থাপনের জন্য পুনর্ব্বার গমন করেন নাই। এবং কিষ্কিন্ধ্যায় অযোধ্যার প্রাদেশিক দপ্তর খুলিয়া তত্রস্থ বানরদিগের চাকুরি অপহরণের ব্যবস্থাও করেন নাই। নৈমিষারণ্য নিকটে হইলেও সেখানে অযোধ্যাবাসী কায়স্থ ও ভূমিহার সন্তানদিগের চাকুরির জন্য কোনই প্যাঁচপোঁচ শ্রীরামচন্দ্র ধর্ম্ম অথবা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের হেতু প্রযুক্ত করেন নাই। অর্থাৎ রামরাজ্য পরস্ব অপহরণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। গো ব্রাহ্মণ নারীর রক্ষাও সে সকল সময়ে ক্ষত্রিয়গণ পূর্ণবলে করিতে তৎপর থাকিতেন। সীতাহরণের প্রতিশোধের জন্যই অতবড় লঙ্কাকাণ্ড। পরে, মহাভারতের যুগে দ্রৌপদীর অপমানের ফলে ভারতের অধিকাংশ যোদ্ধার স্বর্গলাভ ঘটিয়াছিল। আমাদের রামরাজ্যে কিন্তু শত সহস্র নারীর অপমান ও ধর্ষণ ঘটিলেও কোন রামচন্দ্রের মনে চিত্তবিক্ষোভ হয় না। পুরাকালের রামচন্দ্র একজনমাত্র ব্রাহ্মণ সন্তানের অকালমৃত্যু ঘটিয়াছিল বলিয়া তাহার কারণ অনুসন্ধানে সকল শক্তি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আজ বহু জাতির বহু লোকের অসংখ্য সন্তানের প্রাণহানি ঘটিলেও কেহ কিছু অনুসন্ধান করিতে চায় না। সন্তানহত্যারও কোন প্রতিকার নাই। জনমত নিবৃত্তির জন্য রামচন্দ্র পরমসতী সীতাদেবীর অগ্নিপরীক্ষা করাইয়াছিলেন। আজ জনমতের বিরুদ্ধে দাগী চোর ও খুনেদের রামরাজ্যের মন্ত্রীরা পূর্ণ উদ্যমে সাহায্য করিয়া চলিতেছেন। এই নব রামরাজ্য অধর্ম্মের উপর গঠিত, দুর্নীতির দ্বারা চালিত ও অন্যায়ের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার জন্য সতত উদ্গ্রীব। এই রাজ্যের প্রধান প্রধান যাঁহারা তাঁহারা সর্ব্বদা দল পাকাইতে ব্যস্ত। দল পাকাইবার উদ্দেশ্য নিজেদের দলের লোকেদের শক্তি ও প্রভুত্ব বৃদ্ধি এবং ক্রমশঃ অপর সকল ভারতবাসীকে পূর্ণ দাসত্বে আবদ্ধ করা। এই মহা ষড়যন্ত্র ভাঙ্গিয়া দেওয়া আমাদের বৃটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম অপেক্ষাও অধিক প্রয়োজনীয়। কারণ পরদাসত্ব অপেক্ষাও স্বজাতির হীনতমের দাসত্ব অধিক ক্ষতি ও অপমানকর। অ

নেহরুর সৎসাহস

পণ্ডিত নেহরু সৎসাহসের জন্য সুপ্রসিদ্ধ নহেন। তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অতিমানবরূপে যখন অবতীর্ণ হইলেন, তখন লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ভারতবর্ষ বিভাগের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। পণ্ডিত নেহরু অবাধে সংখ্যালঘু মুসলমান জাতীয় ভারতবাসীদের ব্রিটিশ প্ররোচিত অন্যায় আবদার মানিয়া লইয়া ভারত বিভাগে রাজী হইয়া গেলেন। এই যে ভারতের সর্ব্বনাশকারক ব্যবস্থা ইহা তিনি রাজত্বলাভের লোভে পড়িয়া করিলেন অথবা সৎসাহসের অভাবে ব্রিটিশের ও মুসলিম লীগের সহিত সংঘাতের ভয়ে করিলেন, ইহার উত্তর কে দিবে? এই ঘটনার পরে পণ্ডিত নেহরু কাশ্মীর লইয়া যে ঝগড়ার মধ্যে পড়িয়া গেলেন তাহার মূলে ছিল পাকিস্থানের কাশ্মীরজয়ের আগ্রহ। পণ্ডিত নেহরু এই যুদ্ধের আরম্ভে বেশ উত্তমরূপে নিজ কার্য্য সাধনে লাগিয়া যান, কিন্তু অল্পদিনের পরে পাকিস্থান ও ভারতবর্ষের সমবেত চেষ্টায় ইউনাইটেড নেশনস আসিয়া পাকিস্থানের "পাক" চেষ্টা চিরস্থায়ী করিবার ব্যবস্থায় যুক্ত হইলেন। যুদ্ধে পাকিস্থানকে পরাজিত করিবার সকল সুবিধা বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও পণ্ডিত নেহরু সম্ভবতঃ আমেরিকা ও ইংলণ্ডের পরামর্শের ভারে নিজ কর্ত্তব্যের পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। ইহার পরে আসিল পর্ত্তুগালের ভারতীয় সাম্রাজ্যের দাবি। এ ক্ষেত্রে পণ্ডিত নেহরু পর্ত্তুগালের নিকট অপমান সহ্য করিয়া নিজ দেশবাসীদের পরদাসত্বে আবদ্ধ রাখিয়া প্রেমধর্ম্ম বজায় রাখিলেন। তার পর আসিল চীন। "ভাই ভাই" রবে যখন আকাশ মুখরিত তখন পণ্ডিত নেহরু দেখিলেন ভারতের ২০,০০০ বর্গ মাইল চীন দখল করিয়া বসিয়া আছে। পণ্ডিত নেহরু ইহার জন্য কোন শক্তি প্রয়োগ করিলেন না। সর্ব্বশেষ আসামে যখন তাঁহার নিজের নিযুক্ত শাসকরা তাঁহার রাষ্ট্রের আইন ও রাষ্ট্রনীতিকে ভাঙিয়া চুরমার করিল, তখন তিনি অনন্ত সংযমের অবতার সাজিয়া ভয়ে কিছু বলিলেন না। পাছে পার্টি ভাঙিয়া যায়! অ

স্বাধীনতা দিবসে শ্রীনেহরু

এবারে ১৫ই আগষ্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সর্ব্ববিধ উৎসব বর্জ্জন করিয়াছে। রাজ্য-সরকারও ঘোষণার দ্বারা এই উৎসব বাতিল করিয়া দিয়াছেন। ইতিহাসের দিক দিয়া ইহা সম্পূর্ণ নূতন। কারণও নূতন। ভারত-রাষ্ট্রেরই আর এক অংশে আসামে যে বর্ব্বরতা অনুষ্ঠিত হইয়া গেল, ইতিহাসের দিক দিয়াও যেরূপ অভিনব, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বিলাপও তেমনি অপূর্ব্ব! তিনি ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, বাংলার এই ব্যবহারে। আর স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, আসাম বা পশ্চিমবঙ্গ হইতে ভারত অনেক বড়। শ্রীনেহরু ইহা স্মরণ না করাইয়া দিলেও, বাঙালী তাহা জানে। আর জানে বলিয়াই, একদিন সে স্বাধীনতার জন্য বাংলাকে খণ্ডিত করিয়া পাকিস্থানদের হাতে তুলিয়া দিতে পারিয়াছিল। শ্রীনেহরু আজ ঐক্যের কথা শুনাইতেছেন, কিন্তু নিখিল ভারতীয় ঐক্যের জয়গান আমরাই রচনা করিয়াছিলাম। এই বাংলার মহান নেতৃবৃন্দই গত একশত বৎসর ধরিয়া ভারতীয় ঐক্যের বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

স্বাধীনতার উদ্দেশ্য কি শুধুই স্বাধীনতা? যদি জীবন-বিকাশের অধিকারই না পাইলাম, তবে সে স্বাধীনতার মূল্য কি? বাঙালীর জন্য কোথায় ভারতীয় সংবিধান, কোথায় মৌলিক অধিকার, কোথায়ই বা গণতন্ত্রের আদর্শ?

আদর্শ তাঁহার কাছে তিনি নিজেই। তিনিই এক-মাত্র—যাঁহার অঙ্গুলি হেলনে 'হয়' নয় হইতেছে, 'নয়' হয় হইতেছে! কেন এরূপ হয়? হয়ত ব্যক্তিত্ব, কিংবা গলার জোর! কিন্তু প্রশ্নটা ব্যক্তিগত নহে, নীতিগত। দেশের বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রনীতি যে প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত, সেখানে ব্যক্তি-বিশেষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, অভিরুচি-মর্জ্জি বড় হইয়া উঠিলে আশঙ্কার কারণ ঘটে। দেশের দিকে চোখ ফিরাইলে দেখা যাইবে, থরে থরে সাজানো সমস্যার পর সমস্যা। সরকারী দপ্তরে ফাইলের উপর ফাইল জমিয়া আজ তের বৎসরে সেখানে পাহাড় উঠিয়াছে—সমস্যা সমস্যাই রহিয়া গিয়াছে। শুধু জমানো, শুধু ধামাচাপা দেওয়া—ইহাই সরকারী নীতি।

তের বৎসরে তিনি কি করিলেন, আজ কৈফিয়ৎ লইবার সময় আসিয়াছে। না পারিয়াছেন তিনি দেশকে সুগঠিত করিতে, না পারিয়াছেন মানুষের মুখে হাসি ফুটাইতে! তের বৎসরে আমরা দেখিলাম, একটি ব্যর্থতার ইতিহাস! 'ইণ্ডিয়া'কে তিনি যতই 'ডিস্‌কভার' করিতে থাকুন, ভারতের আত্মা তাঁহার কাছে চিরকালই অপরিচিত থাকিয়া যাইবে। গ

উচ্চতর শিক্ষা-সঙ্কোচে ডঃ শ্রীমালী

প্রশ্ন উঠিয়াছে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহারা ভর্ত্তি হইতে চায় তাহারা সকলেই উচ্চতর শিক্ষা পাইবার যোগ্য কিনা। প্রার্থী প্রচুর, কিন্তু সকলের স্থানসঙ্কুলান সম্ভব হয় না, স্থান দিতে গেলে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অবিশ্রান্ত বাড়াইতে হয়। অবশ্য কলেজে ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষা সকলের জন্য নয়, কিন্তু সেখানেও প্রশ্ন আছে। এই প্রশ্নের সমাধানই করিতে হইবে। ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রথম যুগ হইতে এদেশে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তকমা অসাধারণ সমাদর পাইয়া আসিতেছে। মধ্যবিত্ত বাঙালী জানে, উহাই ভদ্রতার মাপকাঠি। তাহারা জানে, উচ্চ শিক্ষার আভিজাত্য বিত্তহীনতার অনেক ক্ষোভ এবং অভাবের পরিপূরক। তা ছাড়া চাকুরিক্ষেত্রেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর প্রয়োজন আছে। কাজেই সমস্যাটা আসলে উচ্চতর শিক্ষা পাওয়া, না-পাওয়া লইয়া নয়। যে হাজার হাজার উচ্চশিক্ষাপ্রার্থী কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠাঁই পাইবে না, কিংবা পাইবার যোগ্য নয় তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন এবং জীবিকার সমস্যাই ভাবনার বিষয়।

ডঃ শ্রীমালী লোকসভায় ঘোষণা করিয়াছেন, বিশ্ব-বিদ্যালয় পর্য্যায়ে উচ্চতর শিক্ষাপ্রার্থী সকলকেই ভর্ত্তি করা সম্ভব নয়—উহা বাঞ্ছনীয়ও নহে। যাহারা উচ্চতর শিক্ষা হইতে সবচেয়ে লাভবান হইবার উপযুক্ত, কেবল তাহাদিগকেই উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হইবে। উচ্চতর শিক্ষা সম্পর্কে ইহাই নাকি গবর্ণমেণ্টের নীতিগত সিদ্ধান্ত। বিশ্ববিদ্যালয়-মঞ্জুরী-কমিশনও বলিতে গেলে এই নীতি অনুসরণ করিতেছেন। উচ্চতর শিক্ষার মান-উন্নয়নের জন্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা হইতেছে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলিতে এ বৎসর ছয় হাজার ছাত্র-ছাত্রী ভর্ত্তি হইবার সুযোগ পাইয়াছে। পশ্চিম বাংলার কলেজ-গুলিতেও ছাত্র ভর্ত্তির সমস্যা দেখা দিয়াছে। উচ্চতর শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ ও সঙ্কোচনের নীতি আরও কঠোর ভাবে প্রয়োগ করা হইলে, বৎসরে বৎসরে বহু ছাত্র-ছাত্রীর কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পথ বন্ধ হইবে। কিন্তু তার পর?

অবশ্য এই শিক্ষা-সঙ্কোচনের উদ্দেশ্য আমরা নীতিগত ভাবে আপত্তিকর মনে করি না। শিক্ষায় উন্নত প্রায় সব দেশেই উচ্চশিক্ষা প্রার্থীর যোগ্যতা পরীক্ষা করিয়া কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাতার সুযোগ দেওয়া হয়। আমাদের সে ব্যবস্থাও নাই। আমাদের সমস্যা সম্পূর্ণ

অনুরূপ। উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ অবাধে বাড়াইতে পারা এই দরিদ্র দেশের সাধ্যের বাহিরে। তা ছাড়া ডিগ্রীর ছাপ মারিয়া ছাড়িয়া দিলেই কি জীবিকার সংস্থান হইবে? সে ব্যবস্থা কোথায়?

ডঃ শ্রীমালী উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে অযোগ্যদের প্রবেশ নিষেধ করিতেছেন। কিন্তু যাহারা উচ্চতর শিক্ষালাভে অযোগ্য গণ্য হইবে, তাহারা নিশ্চয়ই এমন অপদার্থ নয় যে, একেবারে খরচের খাতায় লিখিয়া দেওয়া যাইবে। তাহাদের জীবনের নানাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ দিতে হইবে। উচ্চতর শিক্ষা-সঙ্কোচ ব্যাপারে শিক্ষা-বিধাতারা অন্যান্য দেশের নজির দিয়া থাকেন। কিন্তু যে সব দেশে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ যোগ্যতার ভিত্তিতে সীমাবদ্ধ, সে সব দেশে সাধারণ স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নানা রকম বৃত্তিকরী শিক্ষার অজস্র সুযোগ দেওয়া হইয়া থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর মোহ এবং মর্য্যাদা আমাদের দেশে প্রবল। তাহার একটি প্রধান কারণ, শিক্ষা-বিধাতারা এবং রাষ্ট্র-কর্ত্তারা অন্য পথ খুলিয়া দেন নাই। পথ খোলা থাকিলে, কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ্য অযোগ্য নির্ব্বিচারে সকলেই ভিড় করিতে যাইত না। ব্রিটেনে স্কুলের শিক্ষা শেষ করিবার পর শতকরা অন্ততঃ সত্তর জন ছাত্র-ছাত্রী শিল্প-ব্যবসায়ে ঢুকিবার উপযুক্ত বৃত্তিকরী শিক্ষার সুযোগ পায়। সাধারণ চাকুরির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমাও দরকার হয় না, সিভিল সার্ভিসের অনেক পরীক্ষা স্কুল হইতে পাস ছাত্র-ছাত্রীরাও দিতে পারে এবং দেয়। শিক্ষা ও কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ এই ভাবে স্বচ্ছন্দ-বিস্তৃত না করিলে কেবল উচ্চতর শিক্ষার কৌলীন্য বাড়াইলে কি ফল হইবে! কারণ, কেবল মেধাবী-ছাত্র লইয়াই তো কথা নয়, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জীবিকার্জ্জনের পথ মেধাবী এবং আটপৌরে বুদ্ধিসম্পন্ন সকলের জন্য খোলা রাখিতেই হইবে। অন্য দেশে তাহাই রাখা হইতেছে। গ

কল্যাণীতে নূতন শিক্ষা-কেন্দ্র

বর্ত্তমানে কলিকাতার বাহিরে যে সব উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছে, মানোন্নয়নের দিক হইতে কল্যাণী ইহার মধ্যেই জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। যে পরিকল্পনা লইয়া সরকার কাজে নামিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ না হইলেও, ইহার গঠন-পারিপাট্য ও রুচি-বিন্যাসের আভাস ইহাতেই পরিস্ফুট হইয়াছে। পূর্ব্বে একবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এখানে স্থানান্তরিত করিবার কথা হইয়াছিল, কার্যতঃ তাহা না হইলেও এখানে একটি শিক্ষা-কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। এই শিক্ষা-কেন্দ্রটি নূতনত্বের দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশে শিক্ষিতদের বেকার-সমস্যা এক চরম জাতীয় সমস্যা-রূপে আজ দেখা দিয়াছে। এই সমস্যাটি সমাধানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আজ হইতে প্রায় দুই বৎসর আগে এই শিক্ষা-কেন্দ্রটি খোলা হয়। শিক্ষিত বেকার-দের চাকরিমুখী মনোভাবকে একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গির পথে পরিবর্ত্তিত করানোর যে মূল উদ্দেশ্য এখানকার শিক্ষা ধারার মধ্যে নিহিত, বর্ত্তমানে সকল দিক দিয়াই তাহার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

দেশে নিত্য নূতন ট্রেনিং-সেণ্টার গড়িয়া উঠিতেছে। কতকগুলি ট্রেনিং-সেণ্টার ইহার মধ্যে চালু হইয়াছে। ইহার মধ্যে আছে আই. টি. আই., বিটি কলেজ ও এগ্রি-কালচারাল কলেজ, একটি ব্লক-লেভেল কো-অপারেটিভ অফিসারস ট্রেনিং সেণ্টারও আছে। কিন্তু এগুলি ছাড়াও আর একটি আছে তাহা হইল 'ওয়ার্ক-কাম-ওরিয়েণ্টেশন সেণ্টার'। দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাওয়ায় যথারীতি কর্ম্মসংস্থান অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। তাই চাকরি লওয়া নয়, চাকরি দেওয়ার সম্ভাবনাকে বাড়ানোর উদ্দেশ্যই ইহার মূল নীতি। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, বৃহদায়তন শিল্পের তুলনায় কুটির-শিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্প বেশী কাজের চাহিদা মিটাইতে পারে। তাই সরকার ইহার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। সমবায়, কৃষি-শিল্প ও ব্যবসা সব রকমেরই কিছু কিছু শিক্ষা এখানে দেওয়া হয়। তবে সমবায়ের মাধ্যমে শিল্প-সংস্থা স্থাপন ও পরিচালনা করাই এই ট্রেনিং-এর একটি প্রধান উদ্দেশ্য। দেশের প্রায় সকলেই চাকরিপ্রার্থী, অথচ প্রার্থীর পরিমাণে চাকরির অভাব, সুতরাং কর্ম্মীর মাধ্যমে চাকুরি-মুখী মনোবৃত্তিকে পরিবর্ত্তন করা এই ট্রেনিংয়ের উদ্দেশ্য। প্রয়োজনের দিক দিয়া এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য মহৎ। আমরা তাহার সাফল্য কামনা করি।

গ

স্কুল ফাইনাল পাস-করা ছাত্র-ছাত্রী

দশম শ্রেণীর হাই স্কুল হইতে স্কুল ফাইনাল পাস করিয়া, ছাত্র-ছাত্রীকে তিন বৎসরের ডিগ্রী শ্রেণীতে ঢোকার জন্য একটি বৎসর যে কোন কলেজের প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণীতে পড়িতে হইবে। কর্তৃপক্ষ এইরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

কিন্তু কথা হইতেছে, এই প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণীতে ছুটি-ছাটা ও পরীক্ষার দিনগুলি বাদে মোট ছয়-সাত মাস

মাত্র পড়ার সময় তাহাদের মিলিবে। কিন্তু যে পাঠ্য এজন্য ব্যবস্থিত হইয়াছে, তাহা পুরা দুই বৎসরের উপযুক্ত। কাজেই এই পাঠ্যগুলি পড়িয়া আয়ত্ত করা এবং পরীক্ষা দিয়া পাস করা কোন ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষেই সম্ভব হইবে না। ফলে কলেজে ঢোকার ছাড়পত্রও তাহারা পাইবে না। আসলে মুষ্টিমেয় এগারো শ্রেণীর উচ্চ মাধ্যমিক হইতে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীকেই কলেজে পড়ার সুযোগ দেওয়া এবং দশ শ্রেণীর হাই স্কুলগুলিকে নামাইয়া জুনিয়ার হাই স্কুলে পরিণত করার যে চক্রান্ত তলায় তলায় চলিতেছে, তাহাকে কার্য্যকরী করারই চতুর কৌশল এগুলি এবং এই প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণীর শেষ পরীক্ষা কে লইবেন, কলেজগুলি না বিশ্ববিদ্যালয় তাহা লইয়াও রকমারি ফ্যাকড়া উঠিয়াছে!

গ

পশ্চিমবঙ্গে সুপারির চাষ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ হইতে এই সংবাদটি প্রচারিত হইয়াছে। "তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে এই রাজ্যে সুপারির উৎপাদন দ্বিগুণেরও অধিক করার লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ৫,৫০০ একর এলাকায় সুপারির চাষ হয় এবং ৫১,০০০ মণ সুপারি জন্মে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে আরও ৬,০০০ একর জায়গায় সুপারি চাষের প্রস্তাব করা হইয়াছে এবং তার উৎপাদন ৫৯,০০০ মণ বৃদ্ধির আশা করা যাইতেছে।

"সুপারি একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল এবং ভারতে বার্ষিক প্রায় ৩০ কোটি টাকার সুপারি ব্যবহার হয়ে থাকে। সমগ্র ভারতে সুপারি চাষের এলাকার পরিমাণ ২.৬৫ লক্ষ একর এবং বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণের আনুমানিক হিসাব ২২ লক্ষ মণ।

"পশ্চিমবঙ্গে ৩.৫ কোটি টাকা মূল্যের সুপারি ব্যবহৃত হয় এবং তার মধ্যে ২.৫ কোটি টাকার সুপারি রাজ্যের বাহির থেকে আমদানি করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে প্রতিবৎসর গড়ে ১.৫ লক্ষ মণ সুপারি আমদানি করা হয়।

"অন্যান্য রাজ্যের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করিলে পশ্চিমবঙ্গে সুপারি উৎপাদনের জমির সম্প্রসারণের সুযোগ উপলব্ধি হইবে—কেরলে ১৪৯,৪০০ একর, মহীশূরে ৭৩,০০০ একর, অসামে ২৫,০০০ একর, বোম্বাইতে ৫,০০০ একর, মাদ্রাজে ৩,০০০ একর জমিতে সুপারি চাষ হয়, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে ৫,৫০০ একর জমিতে সুপারি উৎপাদিত হয়।"

ইণ্ডিয়া আপিস গ্রন্থাগার লইয়া ব্রিটেনের দাবি

ইণ্ডিয়া আপিস গ্রন্থাগার ভারতকে ফিরাইয়া দিবার কথা অনেকদিন হইতেই চলিতেছে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার যে ভাবে নীরবতার সহিত উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছেন, তাহাতে ব্রিটেনের সাংস্কৃতিক উদারতার কোনো পরিচয়ই পাওয়া যাইতেছে না। অথচ ইহা অখণ্ড ভারতেরই সম্পত্তি। ভারত ও পাকিস্থান সম্মিলিত ভাবে দাবি জানাইয়াছে, উক্ত গ্রন্থাগার ভারত ও পাকিস্থানকে প্রত্যর্পণ করা হোক।

ইহার উত্তরে ব্রিটিশ সরকার নীরব থাকিলেও, কোনো কোনো ব্রিটিশ সংবাদপত্র মন্তব্য করিয়াছেন—ইণ্ডিয়া আপিস গ্রন্থাগার আইনত অখণ্ড ভারতের সরকারী সম্পত্তি নহে, উহা ব্রিটেনের সম্পত্তি।

ইতিহাসেই ইহার প্রমাণ মিলিবে। বিনা আইনে ভারত হইতে অপসারিত গ্রন্থ ও ঐতিহাসিক সামগ্রীর সমাবেশ করিয়া লণ্ডনে দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে যে পাশ্চাত্ত্য গ্রন্থভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাই ভারত হইতে ক্রমে ক্রমে অপসারিত কয়েক লক্ষ গ্রন্থ এবং অজস্র মুদ্রা, শিলালেখ, তাম্রলেখ ও শিল্প-সামগ্রী পুঞ্জীভূত করিয়া ইণ্ডিয়া আপিস গ্রন্থাগারে পরিণত হইয়াছে। টিপু সুলতানের গ্রন্থাগারের অসংখ্য গ্রন্থ এখনও ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরীতে আছে। এ সম্বন্ধে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' যে তথ্যটি পরিবেশন করিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের বিভিন্ন নির্দ্দেশের রেকর্ডেই দেখা যায় যে, ভারত হইতে আরও পুঁথি, মুদ্রা, মূর্ত্তি ও গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া বিলেতে প্রেরণ করিবার জন্য কড়া তাগিদ দেওয়া হইত। তৎকালীন 'বেঙ্গল অফিসার'দিগকে ধমকধামকও করা হইত, যদি গ্রন্থ সংগ্রহে তাঁহাদের কোন শৈথিল্য দেখা যাইত। সংস্কৃত-সাহিত্যের যে বিখ্যাত 'কোলব্রুক সংগ্রহ' ইণ্ডিয়া আপিস গ্রন্থাগারের বিশেষ সম্পদ, তাহা কি ব্রিটিশ অর্থের দ্বারা ক্রীত কোনো সম্পদ? পুঁথিসমূহের 'ম্যাকেঞ্জি-সংগ্রহ' সম্বন্ধেও এই প্রশ্ন করা যাইতে পারে। যাঁহারা শুধু সংগ্রহকর্ত্তা ছিলেন, সেই ব্রিটিশ স্কলারদিগের নাম অনুসারে গ্রন্থ-সংগ্রহের নাম করা হইয়াছে, কিন্তু গ্রন্থ-ক্রয়ের টাকাটা ব্রিটেন হইতে আসে নাই।"

আইনের দিক দিয়াও বলা যাইতে পারে, ১৮১৭ সনের একটি ভারতীয় আইন অনুযায়ী ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরীর গ্রন্থ-সম্পদ বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া পরিপুষ্ট হইয়াছে—'ইণ্ডিয়া প্রেস অ্যাণ্ড রেজিষ্ট্রেশন অব বুক্স'

আইন। এই আইন অনুযায়ী ভারতে মুদ্রিত প্রত্যেকটি গ্রন্থের এক কপি ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরীর প্রাপ্য বলিয়া ধরা হইয়াছিল। এই গ্রন্থ সংগ্রহ ব্যাপারে কোনো ব্রিটিশ আইনের সাহায্য গ্রহণ করা হয় নাই, বরং ভারতীয় আইন অনুযায়ী সংগৃহীত গ্রন্থসমূহের দ্বারা উহা সমৃদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং আইনের দিক দিয়াও উহা ভারতীয় সম্পত্তি। বিনা আইনে যে সকল গ্রন্থ ভারত হইতে অপসারিত হইয়াছিল, তাহা অপহৃত সম্পত্তি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইতিহাস বা আইনের কোনো দিক দিয়াই, ব্রিটেন ঐ গ্রন্থাগারের দাবি করিতে পারে না।

গ

পারাপারের দুরবস্থা

জলপাইগুড়ির 'জনমত' পত্রিকা জানাইতেছেন :

"তিস্তা নদী পারাপারে যাত্রীদের যে কিরূপ দুর্ভোগ ভুগিতে হয় তাহা সকলেই কিঞ্চিৎ অবগত আছেন। এ বিষয়ে অনেকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও আছে। তিস্তা ফেরীঘাটের গুরুত্ব কম নয়। ইহার মাধ্যমেই প্রধানতঃ শহরের ও ডুয়ার্সের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষিত হয়। দৈনিক গড়ে কমপক্ষে ৩,০০০ লোক এবং বহু টাকার পণ্য এই খেয়াঘাটের মারফৎ পারাপার হয়। এই খেয়াঘাটের অবস্থা যে দিনের পর দিন অবনতির দিকে যাইতেছে তাহাও লক্ষণীয়। পূর্ব্বে ইহার দায়িত্ব রেল কোম্পানীর ছিল ; তাহার পর নীলামে ইহা ইজারাদারদের হাতে তিন বৎসরের চুক্তি দেওয়া হইতেছে। এই সময়ের মধ্যে ইজারাদারগণ সর্ব্বোচ্চ মুনাফা অর্জ্জন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু সেই তুলনায় যাত্রীর সুখ-সুবিধার প্রতি খুব অল্পই নজর দিবার অবকাশ পাইয়াছেন। খেয়াঘাটের অবস্থা যে ক্রমেই অবনতির দিকে যাইতেছে নিম্নের উদাহরণ দ্বারা তাহা কিছুটা পরিষ্কার হইবে : ঢাকা (ভাউলিয়া) নৌকার সংখ্যা ১৯৫৮-৫৯ সনে ছিল ২টি আর ১৯৬০ সনে দাঁড়ায় শূন্যতে, মাড় নৌকার সংখ্যা ১৯৫৮-৫৯ সনে ছিল ৪টি আর ১৯৬০ সনে দাঁড়ায় ২টিতে। ডিঙ্গি নৌকার সংখ্যা ১৯৫৮-৫৯ সনে ছিল ৭টি আর ১৯৬০ সনে দাঁড়ায় ৪টিতে। বর্ষার সময় মাড় নৌকা চলাচল করে না। ফলে অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, মাঝি এবং নৌকা এই উভয় ক্ষেত্রের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে।

"যাত্রীদের উন্মুক্ত নৌকায় অতিকষ্টে হাঁটু মুড়িয়া বসিয়া নদী পার হইতে হয়। রৌদ্রে ও বর্ষায় দুর্ভোগের অন্ত থাকে না। নৌকায় ভদ্রভাবে বসিবার কোন ব্যবস্থা নাই। বৃষ্টিতে যাত্রীদের মালপত্র ভিজিয়া একশেষ হয়। ঘাটে রৌদ্র ও বৃষ্টির হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কোন বিশ্রামাগার নাই। ইহার উপর মাঝে মাঝে হাঁটু ও কোমর পর্য্যন্ত জল ভাঙিয়া চর পার হইতে হয়। এই পারাপারে মহিলা ও শিশুদের যে কিরূপ দুর্দশা ভোগ করিতে হয় তাহা নিজের চোখে না দেখিলে সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।"

গ

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

গত ১২ই আগষ্ট জোড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবারের দুহিতা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে জোড়াসাঁকোর সাঁকোটিও ভাঙিয়া গেল। সেকাল আর একাল—এই দুই কূলের তিনি ছিলেন একটি সেতু। বাংলা দেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতা, সঙ্গীত ও সাহিত্য, আচার ও আচরণ—এ সকলেরই উপর ঠাকুরবাড়ীর প্রভাব স্পষ্ট। ইন্দিরা দেবী লালিত-পালিত হইয়াছেন সেই সংস্কৃতিময় পরিবেশে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলার প্রথম সিভিলিয়ান। ইন্দিরা দেবী এই সত্যেন্দ্রনাথেরই কন্যা ছিলেন। ১৮৭৩ সনের ২৯শে ডিসেম্বর বিজাপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ইন্দিরা দেবীর বাল্যকাল পিতার সহিত বাংলার বাহিরেই কাটে। বাংলা সাহিত্যের দিক্‌পাল প্রমথ চৌধুরী মহাশয় ছিলেন তাঁহার স্বামী। প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব তাঁহাকে আন্তর্জ্জাতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথে অনেকদূর অগ্রসর করাইয়া দেয়। একদিকে বিচিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা অন্যদিকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সঙ্গীতের শিক্ষা তাঁহাকে একাধারে সাহিত্য ও সঙ্গীতের একজন প্রধান বোদ্ধারূপে গড়িয়া তোলে। রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত ঠাকুর-পরিবারের যোগ্য প্রতিনিধিরূপেই তিনি বিশ্বভারতীর সেবা করিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা, রুচিবোধ ও জীবন-ধর্ম্মকে তিনি স্বীয় জীবনের সঙ্গে যে ভাবে একাত্ম করিয়াছিলেন, তাহা শান্তিনিকেতনের বর্ত্তমান আশ্রমিকদের নিকট ছিল প্রেরণার উৎসস্বরূপ।

বাংলা দেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত ইন্দিরা দেবীর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। ১৯৫৬ সনে প্রায় তিন মাসের জন্য তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্য্যা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকখানি বইও আছে। ইন্দিরা দেবী দীর্ঘ একটি সময় অতিক্রম করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে গত একটি শতাব্দী আমাদের চোখের সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল।

গ

আসামে অসমীয়া ও বাঙ্গালী

শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র পুরকায়স্থ

আসামে গত জুলাই মাসের প্রথম তিন সপ্তাহব্যাপী যে ব্যাপক বাঙ্গালী নিপীড়ন-যজ্ঞ উদ্‌যাপিত হইল, স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে, তাহা অসমীয়াদের বর্ব্বরতার নিদর্শন রূপে লিপিবদ্ধ থাকিবে। একই রাষ্ট্রের নিরপরাধ নাগরিকদের, কোন অঞ্চলের এক সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়, আঞ্চলিক রাষ্ট্রীয়-ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া উৎপীড়ন করিবে, অথচ তাহার কোন প্রতিবিধান হইবে না—ইহা এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। উৎপীড়িত সম্প্রদায়ের অপরাধ—তাহারা আঞ্চলিক সংখ্যা-গুরু সম্প্রদায়-ভুক্ত নন। প্রাদেশিক সরকার ভুল করিলে, কেন্দ্রীয় সরকার তাহার প্রতিবিধান করিবেন। কিন্তু আসামে অসমীয়াদের দ্বারা উৎপীড়িত বাঙ্গালীদের ব্যাপারে, আমাদের দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাব বড়ই দুর্ব্বোধ্য বলিয়া মনে হইতেছে। তাঁহারা উৎপীড়িতদের প্রতি প্রায়মৌলিক সহানুভূতি মাত্র দেখাইয়া পরোক্ষভাবে উৎপীড়ক অসমীয়াদের কার্য্যেই সহায়তা করিতেছেন।

প্রধানমন্ত্রীপ্রমুখ নেতাদের ভাবধারা কতকটা এইরূপ—"অসমীয়ারা দুর্ব্বল-সম্প্রদায়। বাঙ্গালীরা প্রবল ও উন্নত। বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে অসমীয়াদের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ ও অভিযোগ আছে। বর্ত্তমান দুর্ঘটনা অসমীয়াদের ক্ষোভের সামান্য প্রকাশমাত্র। বাঙ্গালীদের ক্ষতির পরিমাণ সামান্য; সুতরাং বর্ত্তমানে কোন অনুসন্ধান-কমিটি গঠনের প্রয়োজন নাই। ইহাতে বাঙ্গালী ও অসমীয়া—এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ততা বাড়িবে ছাড়া কমিবে না। তথ্যানুসন্ধানের ব্যবস্থা পরে করিলেই চলিবে। আর লোকসভায়ও সুবিধামত আলোচনা করিলেই চলিবে। কংগ্রেস-বিরোধী এক বিশিষ্ট সর্ব্ব-ভারতীয় নেতারও একই মত।" এদিকে হতভাগ্য বাঙ্গালীরা ভাবিতেছে—"স্বাধীন ভারতে কি অন্যায়ের প্রতিকার নাই? এদেশ হইতে সত্যই কি ন্যায় নীতি চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়াছে?" বর্ত্তমান দুঃসময়ে বাঙ্গালীকে প্রবল ও উন্নত বলা, ব্যঙ্গ করা ছাড়া আর কিছু নয়।

এখন প্রশ্ন হইতেছে—বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে অসমীয়াদের সত্যিকার অভিযোগ কি? বাঙ্গালীরা লেখাপড়ায় উন্নত ও তাহারা সরকারী চাকুরি করিতেছে। ইহাই মনে হয় প্রধান ক্ষোভের কারণ। অসমীয়াদের লেখাপড়া শিখিতে কেহ বাধা দিতেছে না। বর্ত্তমান বাঙ্গালীদের তুলনায় তাহাদের লেখাপড়ার সুযোগ বেশী আছে। আসামে যে সমস্ত বাঙ্গালী সরকারী চাকরি করিতেছে, তাহাদের অধিকাংশই আসামের অধিবাসী। ১৯৪৭ সনের পর হইতে আসামে, আসামবাসী বাঙ্গালীদের চাকুরি খুব কমই মিলিতেছে। প্রদেশের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা আসামীদের প্রায় একচেটিয়া। এই অবস্থায় অসমীয়াদের বাঙ্গালীর প্রতি বর্ত্তমানে বিদ্বেষ পোষণ করার কোন সঙ্গত কারণ নাই। ব্রিটিশ শাসকদের উপ্ত সাম্প্রদায়িকতা যেমন ভারতীয় মুসলমানদের মনে এই ভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল যে—"হিন্দুরা তাহাদের শত্রু এবং উন্নতির প্রতিবন্ধক, সুতরাং ইহাদের সরাইয়া ফেলিলেই তাহাদের অপ্রতিহত উন্নতি হইবে।" ঠিক সেই মনোভাব অসমীয়াদের অব্যবস্থিত মনোবৃত্তির উপর ক্রিয়া করিতেছে। আজ তের বছর হইল ভারত বিভাগ হইয়াছে। পাকিস্থানের উন্নতির কোন লক্ষণ ত দেখা যাইতেছে না; বরং নানা প্রতিবন্ধকতা ও ভারতীয় নেতৃত্বের অনেক দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও ভারতই অগ্রগতির পথে চলিয়াছে। তাই অসমীয়াদের স্মরণ করাইয়া দেওয়া দরকার—ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সমতলাংশ (গোয়ালপাড়া বাদ) লইয়া তথাকথিত স্বাধীন অসমীয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলে, তাহাদের নিজের পায়েই তাহারা কুড়াল মারিবেন। যে মানসিক শক্তি মানুষকে উন্নতির দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রেরণা দেয়—সেটা কি এবং কোথায়—প্রথমে যেন তাহারা সেই দিকে মনোযোগ দেন।

আসামে সরকারী ভাষা হিসাবে, অসমীয়া ভাষার প্রবর্ত্তন ও গ্রহণের দাবি লইয়া যে বিরাট দক্ষযজ্ঞ হইয়া গেল, তাহার মূল ও আভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য, কিন্তু অসমীয়া ভাষার প্রতিষ্ঠা ততটা নয়, যতটা বাঙ্গালী-বিতাড়ণের অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষা। বাঙ্গালী-বিদ্বেষই এই গোলযোগের কারণ। ১৯৬১ সনের লোক গণনায় অসমীয়ারা যাহাতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারেন, তাহারও একটা উদ্দেশ্য এই ব্যাপারের মধ্যে রহিয়াছে বলিয়া

মনে হয়। আমাদের দেখা দরকার—কেন্দ্রীয় সরকার প্রচারিত "বাঙ্গালীর সামান্য ক্ষতি"—সত্যই সামান্য কিনা। এই বিষয়ে যেন প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন কেন্দ্রীয় সরকার। তাঁহারা আপাততঃ কোন অনুসন্ধান কমিটি গঠন করিবেন না; কিন্তু জনসাধারণ কর্ত্তৃক সংগঠিত কোন অদলীয় কমিটি অনুসন্ধানের কাজে অগ্রসর হইলে, তাঁহাদের কিম্বা তাঁহাদের নিকট যাহারা সাক্ষ্য দিবে, তাঁহাদের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা করিতে রাজী হইবেন কি না, এই সম্পর্কে সঠিক কিছু বলা যায় না। কিন্তু যে ছাত্রটি পুলিসের গুলীতে নিহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ, তাহার সম্পর্কে আসাম সরকার যে তদন্ত কমিটি বসাইয়াছেন, সেই সম্পর্কে কোন আপত্তি করার প্রয়োজনীয়তা, আমাদের অপক্ষপাতী কেন্দ্রীয় সরকার অনুভব করেন নাই। ক্ষয়ক্ষতির যে হিসাব এখন পর্য্যন্ত আসাম সরকার কর্ত্তৃক বাহির হইয়াছে, তাহা এইরূপ—(১) মৃত—৩৫ জন, (২) গৃহদাহ—৭,০০০ এবং (৩) দাঙ্গা-উৎপীড়িত বাঙ্গালীর সংখ্যা ৪০,০০০। কিন্তু বাস্তবিকই কি উহা সত্য? আসাম উপত্যকার ১৫,০০০ বর্গমাইল জুড়িয়া অন্ততঃ তিন সপ্তাহ ব্যাপিয়া বাঙ্গালী-নিপীড়ন-যজ্ঞ চলিয়াছিল। এই সময় অন্ততঃ দশ দিন কোন শাসনব্যবস্থা চালু ছিল না। দুষ্কৃতকারীরা কি এতই শান্ত ও সভ্য ছিল যে, তাহারা মাত্র ৩৫ জন বাঙ্গালীকে হত্যা করিয়াছে। সরকারী হিসাবে নারীর প্রতি অত্যাচারের বিন্দুমাত্র উল্লেখ নাই; অথচ স্থানচ্যুত বাঙ্গালীরা, এমন কি মহিলারা পর্য্যন্ত বলিতেছেন, নানাস্থলে নারীদের উপর অত্যাচার করা হইয়াছে। অবশ্য নামধাম প্রকাশ করিয়া বলার ব্যাপারে জটিলতা আছে বলিয়া, ইঁহারা নাম-ঠিকানা প্রকাশ করেন নাই। নারীর উপর অত্যাচারের চেয়েও বিভৎস খবর সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে ও হইতেছে। ভুক্তভোগীরা সবাই বলিতেছেন, নরহত্যা, নারী-নিপীড়ন ও দাঙ্গা-প্রপীড়িতদের সংখ্যা সরকারী হিসাবে অনেক গুণ বেশী। এই জন্য সকলেই আশা করে—নিরপেক্ষ অনুসন্ধান-কমিটি গঠন করিয়া সত্য উদ্‌ঘাটিত করা হউক ও দোষীদের শাস্তিবিধান করা হউক। বার্ত্তমানে বাঙ্গালীর পুনঃপ্রতিষ্ঠার নামে বাঙ্গালী-উৎপীড়ন আরম্ভ হইয়াছে। শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তের ব্যবস্থা না করিয়া আশ্রয় শিবির হইতে জোর করিয়া বাঙ্গালীদের গ্রামাঞ্চলে পাঠান হইতেছে এবং সেখান হইতে আবার তাহারা ফিরিয়া আসিতেছে এবং যাহারা ফিরিয়া যাইতে অনিচ্ছুক তাহাদের শাসানি দেওয়া হইতেছে। আসামের বিভিন্ন রাজনৈতিকদল বাঙ্গালী-নিপীড়ন-পর্ব্বে একযোগে কাজ করিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আসামের ছাত্র সম্প্রদায়, যাহারা আসামের ভবিষ্যৎ,—তাহারা এই ব্যাপারে অগ্রণী ছিল।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশ্রয়-পুষ্ট-আসাম রাজ্যে অবিরাম বাঙ্গালী নিপীড়ন চলিতে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও, বাঙ্গালী-হিন্দু শরণার্থীদের, আসামে বসবাসে বাধা দেওয়া হইতে লাগিল, কিন্তু অপর দিকে গোপনে লক্ষ লক্ষ লীগপন্থী মুসলমানেরা, আসাম সরকারের জ্ঞাতসারে, আসামে প্রবেশ করিতে লাগিল। ১৯৫১ সনের লোকগণনায় কারসাজি করিয়া, অসমীয়ারা, আসামের সংখ্যা গরিষ্ঠ সম্প্রদায় সাজিয়া বসিলেন। ১৯৩১ সনে তাহাদের সংখ্যা ছিল ২০ লক্ষ: আর ১৯৫১ সনে, তাঁহাদের সংখ্যা হইল—৫০ লক্ষ; অর্থাৎ কুড়ি বছরে তাহাদের সংখ্যা ২৫০% বৃদ্ধি হইয়াছে। আসামে দশ বছরে জনসংখ্যা ১২% এই হিসাবে ২০ লক্ষ, বিশ বছরে বাড়িয়া ২৫ লক্ষ হইতে পারে; ৫০ লক্ষ নয়। কিন্তু সত্য হিসাবের জন্য কে মাথা ঘামায়। ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ্যে বাঙ্গালী নির্য্যাতন, দুইবার ঘটিয়াছে। ১৯৪৮ সনে, কামরূপের জিলা-শাসকের বাংলোর নিকট প্রকাশ্য দিবালোকে অসমীয়ারা, গৌহাটী সহরে বাঙ্গালীদের দোকানপাট লুট করে, ঘরবাড়ী জালাইয়া দেয় এবং কয়েকজন বাঙ্গালীকে আহত ও নিহত করে। আবার ১৯৫৫ সনে, সীমানা-কমিশনের আসাম যাত্রার প্রাক্কালে আসামের ধুবড়ী শহরে বাঙ্গালীদের উপর হামেলা করা হয়। উভয় ক্ষেত্রেই দোষীদের কোন শাস্তিদানের চেষ্টা পর্য্যন্ত করা হয় নাই।

আর্থিক ব্যাপারেও বাঙ্গালী ও পার্ব্বত্য জাতিদের উপর বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়, যাহার ফলে সমগ্র পার্ব্বত্য জাতি আজ পৃথক পার্ব্বত্য রাষ্ট্রের দাবী করিতেছে এবং নাগারা ইতিমধ্যেই পৃথক রাষ্ট্র গঠনের অধিকার লাভ করিয়াছে। আসামের এই গোলযোগের মূল কারণ কি? একমাত্র বাঙ্গালীরাই অসন্তুষ্ট ও উৎপীড়িত নয়। মণিপুর আসামের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। নাগারা পৃথক নাগারাজ্য গঠনের অধিকার পাইয়াছে। অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতিরাও পৃথক পার্ব্বত্য রাষ্ট্র গঠনের দাবী ইদানীং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পেশ করিয়াছেন। অসমীয়াদের সঙ্কীর্ণ মনোভাব ও ভারতীয় ভাবধারার প্রতি শ্রদ্ধার অভাবই মনে হয় আসামের বর্ত্তমান অশান্তির প্রধান কারণ। আর ইহার

সঙ্গে যুদ্ধ হইয়াছে আমাদের কেন্দ্রীয় নেতাদের অদূরদর্শিতা ও দৃঢ়চিত্ততার অভাব। বাঙ্গালীই একমাত্র সম্প্রদায়, যাহারা বহু জাতি ও সম্প্রদায় অধ্যুষিত আসামে ভারতীয় ভাবধারার প্রবর্ত্তক ও প্রচারক। ইহারাই আসামের সত্যিকারের উপকার করিতেছে—এই কথা আমাদের কেন্দ্রীয় নেতারা কবে অনুভব করিতে পারিবেন, কে বলিতে পারে।

অসমীয়াদের আসাম ছিল ১৫,০০০ বর্গ মাইল পরিমিত ভূমি। আর বর্ত্তমান আসামের পরিমাণ ৮৫,০০০ বর্গমাইল। এই দুই আসাম—এক বস্তু নয়। আসাম পরিস্থিতি অনিশ্চিত ও অস্পষ্ট থাকিলে ভারতের পূর্ব্ব সীমান্ত বিপন্ন হইবে। ইতিমধ্যেই ১১,০০০ বর্গমাইল বিদেশীর কুক্ষিগত হইয়াছে। এখন একান্ত প্রয়োজন, সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের উপযোগী কর্ম্মসূচী রচনা করিয়া, আসাম, মণিপুর ও ত্রিপুরা রাজ্য, অন্ততঃ ১০ বছরের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীন রাখা।

বর্ত্তমান আসাম প্রদেশ ভারতের পূর্ব্ব-সীমান্তে অবস্থিত। ইহার ভূমি পরিমাণ—৮৫,০১২ বর্গমাইল ও জন সংখ্যা—৯০,৪৩,৭০৭। এই অঞ্চলে, আকা, দফলা, এবরি, মিশমী, মিকির, কুকি, নাগা, খাসিয়া, গারো, মণিপুরী, কাচারি, আহম, চুটিয়া, কুচ, মেছ, কলিতা, নেপালী, বাঙ্গালী, সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাং, হিন্দুস্থানী ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত অসমীয়াদের বাস। ভাষাগত ভাবে বিচার করিলে, আসামকে ক্ষুদ্র ভারত বলা যেতে পারে। কিন্তু ভারতের অন্যত্র যেমন ভারতীয় ভাবধারার একটা প্রাবল্য দেখা যায়, এখানে তাহার অভাব স্পষ্ট অনুভূত হয়। ইহার কারণ কয়েকটি। মিশনারীদের প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে, পার্ব্বত্য জাতিদের ভারতীয় ভাবধারার প্রতি একটা শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ ছিল, তাহা এখন যেন একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অসমীয়ারা পূর্ব্বে ভারতীয় মতবাদের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। এখন তাঁহারা অসমীয়ত্ব আবিষ্কার করিয়া, অসমীয়া বনিয়া গিয়াছেন; ভারতীয়ত্বের সঙ্গে তাহাদের আর তেমন নাড়ীর যোগ নাই। তাঁহারা ব্রহ্মদেশের মত স্বাধীন আসামের স্বপ্ন দেখিতেছেন।

প্রাক্-স্বাধীন আসামে কলেজের সংখ্যা সামান্যই ছিল। সর্ব্বমোট ১২টির বেশী নয়। তাহার মধ্যে শ্রীহট্ট জেলায় ছিল ৫টি, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ৩টি এবং বাকি ৪টি অন্যান্য জেলায় অবস্থিত ছিল। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরে আসামে কলেজের সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে।

আসামের সর্ব্বত্রই কলিকাতার বাংলা ও ইংরেজী সংবাদপত্রের প্রচলন বেশী। স্থানীয় কোন ভাল সংবাদপত্র নাই। গৌহাটি হইতে একখানা ইংরাজী দৈনিক—"আসাম ট্রিবিউন" এবং "নূতন অসমীয়া" নামক অসমীয়া ভাষায় প্রচলিত আর একখানা দৈনিক সংবাদপত্র বাহির হয়।

"অসমীয়া" নামে যে ভাষাকে আসামে প্রচলিত করার চেষ্টা হইতেছে, তাহা বাংলা ভাষারই এক রূপান্তর। এই ভাষার নিজস্ব কোন অক্ষর নাই। উহা বাংলা অক্ষরেই লেখা হইয়া থাকে। ইহাতে অসমীয়াদের মনে বড় দুঃখ। তাই বাংলা অক্ষর বাদ দিয়া দেবনাগর অক্ষর প্রবর্ত্তনের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল। ইহার ফলে অসমীয় জনসাধারণেরই সবচেয়ে বেশী অসুবিধা হইবে, এই কথা গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য্য চন্দিকই মহাশয়, দৃঢ়ভাবে বলার ফলে এই প্রচেষ্টা পরিত্যক্ত হয়। এখন নূতন গবেষণা হইতেছে অসমীয়া ভাষা, তিব্বত হইতে প্রথমে আসামে প্রবেশ করিয়া পরে বাংলা ও বিহারে অনুপ্রবেশ করিয়া পরিপুষ্ট হইয়াছে। অসমীয়াই বাংলা-বিহারের মূলভাষা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভগবান বুদ্ধদেব তাঁহার প্রিয় শিষ্য আনন্দকে ভারতীয় বিভিন্ন লিপি সম্পর্কে যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন—তাহাতে "অঙ্গলিপি", "বঙ্গলিপি" প্রভৃতির উল্লেখ আছে, কিন্তু অসমলিপি বা কামরূপলিপি বলিয়া কোন লিপির উল্লেখ নাই। যাহাই হউক ভাষাতত্ত্বের বিচারে দেখা যায় ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান অসমীয়া ভাষার বিশেষ কোন অস্তিত্বই ছিল না। অসমীয়া নামক বস্তুটি স্থানীয় লোকদের কথোপকথনের ভাষা ছিল। জোড়হাট ও কামরূপের কথ্যভাষার মধ্যে অনেক তারতম্য ছিল। "অসমীয়া" বাংলার একটা কথ্য সংস্করণমাত্র একথা বলিলে বিশেষ ভুল হইবে না। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ১৯ লক্ষ লোক এই ভাষায় কথা বলিত। পূর্ব্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলার ৫০ লক্ষ লোক, স্থানীয় ভাষায় কথা বলে। শ্রীহট্টের ৩০ লক্ষ লোকের একটা কথ্যভাষা আছে। এই দুই জেলার লোকেরা তাহাদের দুইটি পৃথক ভাষা আছে বলিয়া সহজেই দাবী করিতে পারে। পূর্ব্বে আসামের স্কুলসমূহে বাংলাভাষায় পড়াশুনা হইত। তারপরে অসমীয়া ভাষার প্রবর্ত্তন হয় এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উহা অনুমোদন করেন। অসমীয়া ভাষা সমৃদ্ধ হউক, ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি নাই, কিন্তু তারজন্য বাঙ্গালীর মাথাভাঙ্গার দরকার কি ছিল ?

১৯৩১ সন হইতে ১৯৫১ সন পর্য্যন্ত লোকগণনার

হিসাব আলোচনা করিয়া দেখা যাক। আসামে বাঙ্গালী, অসমীয়া ও অন্যান্যদের জনসংখ্যা ও তাহার শতকরা হার কত।

১৯৩১ সনের জনসংখ্যার হিসাব :

সম্প্রদায়		জনসংখ্যা	শতকরা হার
(১) অসমীয়া :			
(ক) আসাম উপত্যকা ১৯,৭৮,৮২৩			
(খ) অন্যান্য জেলা	১৫,৭৪১	১৯,৯৪,৫৬৪	২১·৫%
(২) বাঙালী			
(ক) আসাম উপত্যকা ১১,০৬,৫৮১			
(খ) সুরমা উপত্যকা ২৮,৫২,৪৮৩			
(গ) অন্যান্য জেলা	৭,২৯৯	৩৯,৬৬,৩৬৩	৪২·৮%
(৩) অন্যান্য সম্প্রদায়		৩২,৮৭,৪৭০	৩৫·৭%
		৯,২৪,৮৮,৩৯৭	১০০%

১৯৩১ সনের লোকগণনা অনুসারে অসমীয়াদের হার ২১·৫% এবং বাঙ্গালীদের হার ৪২·৮%, অর্থাৎ ঐ সময় বাঙ্গালীদের সংখ্যা অসমীয়াদের দ্বিগুণ।

১৯৪১ :

১৯৪১ সনের লোকগণনায় ভাষার হিসাব দেওয়া হয় নাই। এই সময় আসামের মোট জনসংখ্যার পরিমাণ ছিল ১,০৯,৩০,৩৮৮। আমরা ১৯৩১ সনের সংখ্যার শতকরা হার অনুযায়ী বিভিন্ন ভাষাভাষীদের সংখ্যা নির্ণয় করিতেছি।

সম্প্রদায়	শতকরা হার	জনসংখ্যা
অসমীয়া	২১·৫%	২৩,৫০,০৩২
বাঙালী	৪২·৮%	৪৬,৭৮,২০৩
অন্যান্য সম্প্রদায়	৩৫·৭%	৩৯,০২,১৫৩
	১০০%	১,০৯,৩০,৩৮৮

এই সময় পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে বাঙ্গালীরাই আসামের একমাত্র সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়।

১৯৪৭ সনের আগষ্ট মাস :

এই সময় শ্রীহট্ট জেলার ৪,৭৬৯ বর্গমাইল জমি, ২৮,২৫,২৮৮ লোক সহ পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হয়। তার পর অসমীয়া শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায়, মণিপুর রাজ্য আসামের এক্তিয়ারের বাহির হইয়া যায়। এই দুই কারণে আসামের ভূমি পরিমাণ ও জনসংখ্যা, দুইই হ্রাস পায়। জনসংখ্যা, ১,০৯,৩০,৩৮৮ হইতে কমিয়া ৭৫,৯৩,০৩৭-এ দাঁড়ায়। কিন্তু ভূমি হস্তান্তর দ্বারা আসাম উপত্যকা বা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি হয় নাই। আমরা এখন পরিবর্ত্তিত নূতন আসামের সম্প্রদায়গত জনসংখ্যা নির্ণয় করিতেছি।

প্রথমে দেখা যাক ১৯৪১ সনে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার জনসংখ্যা কি ভাবে গঠিত ছিল। এই উপত্যকায়ই অসমীয়াদের বাস। এখানকার অসমীয়াদের সংখ্যাই প্রকৃতপক্ষে সমগ্র আসাম প্রদেশের অসমীয়াদের সংখ্যা নির্ণয় করে। এই সময় ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার জনসংখ্যার মোট পরিমাণ ছিল ৫৯,১৯,০৩৭। তৎকালীন উপত্যকার হার অনুযায়ী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় এইরূপ :

বাঙালী	১৩,৫৮,৪০১	২৩%
আসামী	২৪,২৫,৮৮১	৪১%
বিবিধ	২১,৩৪,৭৫৫	৩৬%
মোট সংখ্যা	৫৯,১৯,০৩৭	১০০%

এখন আমরা সমগ্র আসামের বাঙালীর পরিমাণ স্থির করি।

বাঙালীর সংখ্যা

(১)	ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা	১৩,৫৮,৪০১
(২)	আসামে স্থিত শ্রীহট্ট জেলার অংশ	২,৯১,৩২০
(৩)	কাছাড়—মোট জনসংখ্যার ⅘ অংশ	৪,৮০,৭৮৫
	আসামের মোট বাঙালীর সংখ্যা	২১,৩০,৫০৬

এখন ১৯৪৭ সনে আসামের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় এইরূপ :

সম্প্রদায়	জনসংখ্যা	শতকরা হার
বাঙালী	২১,৩০,৫০৬	২৮%
অসমীয়া	২৪,২৫,৮৮১	৩১·৯%
বিবিধ	৩০,৩৬,৬৫০	৪০·১%
মোট	৭৫,৯৩,০৩৭	১০০%

এই হিসাবে ১৯৪১ সন হইতে ১৯৪৭ সন পর্য্যন্ত জনসংখ্যার অন্তর্বর্ত্তীকালীন বৃদ্ধি ধরা হয় নাই।

১৯৫১ সনের হিসাব :

১৯৫১ সনে রাজনৈতিক ক্ষমতার সুযোগ লইয়া অসমীয়ারা তাহাদের সংখ্যা ২½ গুণ বাড়াইয়াছেন। এই জন্য পাঠকের অবগতির জন্য আমার ও লোকগণনার—এই দুই পক্ষীয় হিসাব নিম্নে দিলাম। ১৯৫১ সনে আসামের মোট জনসংখ্যা ৯০,৪৩,৭০৭। দেশ বিভাগের ফলে কম পক্ষে ৬,০০,০০০ (ছয় লক্ষ) বাঙালী শরণার্থী আসামে স্থান লইয়াছিল। জন্মগত বৃদ্ধির সঙ্গে এই ছয়

লক্ষ যোগ দিয়া। আমি বাঙালীর জনসংখ্যা স্থির করিয়াছি।

আমার হিসাব অনুযায়ী সম্প্রদায়গত জনসংখ্যা :

আসামের ১৯৫১ সনের জনসংখ্যা	৯০,৪৩,৭০৭
বাদ—নবাগত শরণার্থী (বাঙালী)	৬,০০,০০০
	৮৪,৪৩,৭০৭

বিভিন্ন সম্প্রদায়

(১) বাঙালী : জনসংখ্যা অনুপাত

(ক) শরণার্থী ৬,০০,০০০

(খ) ৮৪,৪৩,৭০৭ এর ২৮% ২৩,৬৪,২৩৭

২৯,৬৪,২৩৭ ২৯,৬৪,২৩৭ ২৮%

(২) অসমীয়া :

৮৪,৪৩,৭০৭ এর ৩১·৯%. ২৬,৯৩,৫৪৪ ৩১·৯%.

(৩) বিবিধ

৮৪,৪৩,৭০৭ এর ৪০·১% ৩৩,৮৫,৯২৬ ৪০·১%.

৯০,৪৩,৭০৭ ১০০%.

লোক গণনানুযায়ী সম্প্রদায়গত জন সংখ্যা

সম্প্রদায়	জনসংখ্যা	অনুপাত
বাঙালী	১৭,১৯,১৫৫	১৯%.
অসমীয়া	৪৯,৭২,৪৯৩	৫৫%.
বিবিধ	২৩,৫২,০৫৯	২৬%.
	৯০,৪৩,৭০৭	১০০%.

এখন আমার ও লোকগণনার—এই উভয় হিসাবের তুলনামূলক বিচার করিতেছি।

সম্প্রদায়	আমার হিসাব মত হার	লোকগণনানুযায়ী হার
অসমীয়া	২৯·৯%.	৫৫%.
বাঙালী	৩১·৯%.	১৯%.

অসমীয়াদের অভূতপূর্ব্ব বৃদ্ধি ও বাঙালীর তদনুযায়ী অসম্ভব রকম হ্রাসের কোন সঙ্গত কারণ নাই।

রামানুজের "বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ"

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

রামানুজের জীবনী, সময় ও রচনাবলী

আসুরি কেশবভট্ট ও কান্তিমতীর পুত্র রামানুজ ৯৩৮ শকাব্দ অথবা ১০১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মতভেদে তাঁর পিতার নাম কেশব সোমযাজী ও মাতার নাম ভূদেবী। তিনি প্রথমে যাদব প্রকাশের নিকট বেদান্ত শিক্ষা করেন। কিন্তু যাদব প্রকাশ অদ্বৈত-মতাবলম্বী ছিলেন বলে, রামানুজ তাঁর শিক্ষায় অধিক দিন সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। এই সময়ে একটি ঘটনায় রামানুজের যশঃসৌরভ চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। ছান্দোগ্যোপনিষদে একটি মন্ত্র আছে :

"তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী"। (১-৬-৭)

শঙ্কর তাঁর ছান্দোগ্য-ভাষ্যে "কপ্যাসং" শব্দটি এই ভাবে ব্যাখ্যা করেন :

"তস্য যথা কপেঃ মর্কটস্যাসঃ কপ্যাসঃ। আসেরুপবেশনার্থস্য করণে ঘঞ্, কপি পৃষ্ঠান্তঃ যেনোপবিশতি। কপ্যাস ইব পুণ্ডরীকমত্যন্ততেজস্বি এবমস্য দেবস্যাক্ষিণী উপমিতোপমত্বাৎ ন হীনোপমা।"

অর্থাৎ কপি বা মর্কটের পুচ্ছভাগের মত রক্তবর্ণ যে পুণ্ডরীক, তারই মত লোহিত তাঁর চক্ষুর্দ্বয়। এস্থলে, মর্কটের পুচ্ছাগ্রভাগের সঙ্গে পুণ্ডরীক, এবং পুণ্ডরীকের সঙ্গে চক্ষুর্দ্বয় উপমিত হয়েছে বলে, চক্ষুর্দ্বয়ের নিকৃষ্টতা উপলক্ষিত হয় নি।

কিন্তু রামানুজ এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হয়ে, বলেন যে, যে কোনো প্রকারেই হোক্, পরমপবিত্র পরমেশ্বরকে জঘন্য কপি-পুচ্ছের সঙ্গে তুলিত করা ঘোরতর অন্যায়—এবং গুরুর অনুরোধে তিনি "কপ্যাসং" কথাটির একটি সম্পূর্ণ নূতন ব্যাখ্যা দেন। সুদর্শনভট্ট বিরচিত, রামানুজ-ভাষ্যের প্রখ্যাত "শ্রুত প্রকাশিকা টীকায়" (ব্রহ্মসূত্র-রামানুজ-ভাষ্য—১-১-২৯, এবং শঙ্কর-ভাষ্য—১-১-২০-তে) এই মন্ত্রটি আছে। সেই তিনটি ব্যাখ্যা আছে :

(১) কং পিবতীতি কপিঃ আদিত্য, তেন আস্ততে ক্ষিপ্যতে বিকাশ্যতে ইতি কপ্যাসং। (২) কং পিবতীতি কপিঃ নালং, তস্মিন্‌ আস্তে ইতি কপ্যাসং। (৩) কং জলং তত্র আস্তে কপ্যাসং সলিলস্থম্‌।

অর্থাৎ "কপ্যাসং" শব্দটির অর্থ হয় "সূর্য বিকশিত" বা প্রস্ফুটিত, নয় "নালস্থ" বা অতিশোভন, নয় "জলস্থ"—এবং এই তিনটিই "পুণ্ডরীকের" বিশেষণ।

রামাহুজের অপূর্ব বিদ্যাবত্তার বিষয় শুনে, সুবিখ্যাত পণ্ডিত যামুনাচার্য তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে উদ্‌গ্রীব হলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, রামাহুজ সেস্থলে উপস্থিত হবার পূর্বেই, যামুনাচার্য দেহত্যাগ করেন। কথিত আছে যে, রামাহুজ সেস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখেন যে, আচার্যের তিনটি অঙ্গুলি আকুঞ্চিত হয়ে আছে। প্রশ্ন করে তিনি জানতে পারেন যে, তাঁর তিনটি আশা অপূর্ণ থাকাতেই এই অবস্থা হয়েছে। রামাহুজ সেই আশা পূর্ণ করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করাতে, সেই অঙ্গুলী তিনটিও স্বাভাবিক আকার ধারণ করে। এই প্রতিজ্ঞানুসারে রামাহুজ তাঁর প্রখ্যাত ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য "শ্রীভাষ্য" রচনা করেন।

রামাহুজ বিবাহিত হলেও গার্হস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস অবলম্বন করেন, এবং শীঘ্রই "যতিরাজ" এই নামে পরিচিত হন। কথিত আছে যে, তিনি দেশ-বিদেশ পরিভ্রমণ করে জ্ঞানবলে দিগ্বিজয় করেন।

রামাহুজের প্রখ্যাততম গ্রন্থ তাঁর অপূর্ব ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য "শ্রীভাষ্য"। প্রবাদ এই যে, দিগ্বিজয় ব্যপদেশে রামাহুজ কাশীধামে উপস্থিত হলে, স্বয়ং সরস্বতী দেবী তাঁর "কপ্যাসং" শ্রুতির ব্যাখ্যা শ্রবণে সন্তুষ্টা হয়ে তাঁর ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের নাম দেন "শ্রীভাষ্য"। "শ্রীভাষ্যের" প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে অদ্বৈতমতবাদের বিস্তৃত বিবরণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে খণ্ডন আছে। এই ভাষ্যটিই বৈষ্ণব-বেদান্তের সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বজনমান্য ভাষ্য, এবং এরই জন্য রামাহুজ শঙ্করের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমালোচক-রূপে যুগে যুগে বন্দিত হচ্ছেন। "বেদান্তসার" ও "বেদান্ত-দীপ" ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য। "বেদান্তসারে" অতি সংক্ষিপ্ত ও সহজসরলভাবে সূত্রসমূহের ব্যাখ্যা আছে, এবং অদ্বৈত-বাদ খণ্ডনের কোনোরূপ প্রচেষ্টা নেই। "বেদান্তদীপ" অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত। তিনি "শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা-ভাষ্য", "বেদার্থ-সংগ্রহ", "নিত্যক্রম বা নিত্যগ্রন্থ" এবং "গদ্যত্রয়" (করণাগতি-গদ্য, বৈকুণ্ঠ-গদ্য ও শ্রীরঙ্গ-গদ্য) রচনা করেন।

রামাহুজের মতবাদ

রামাহুজের মতবাদের দুটি প্রধান দিক্‌ গঠনমূলক (constructive) বা স্বমতস্থাপন, এবং ধ্বংসমূলক (destructive) বা পরমত, অর্থাৎ প্রধানতঃ, অদ্বৈত-মত খণ্ডন। প্রথম দিক্‌ থেকে, রামাহুজের মতবাদ বহুলাংশে নিম্বার্কের মতবাদের অনুরূপ। কিন্তু নিম্বার্ক-বেদান্তে রামাহুজ-বেদান্তের ন্যায় অদ্বৈতমত খণ্ডন প্রচেষ্টা একেবারেই নেই। সেজন্য রামাহুজের স্বমত সম্বন্ধে এস্থলে অতি সংক্ষিপ্ত এবং অদ্বৈতমত খণ্ডন বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণী দান করা হবে।

ব্রহ্ম

রামাহুজের মতে, ব্রহ্ম সর্বোচ্চ তত্ত্ব, সন্দেহ নেই; কিন্তু একমাত্র তত্ত্ব নন। রামাহুজ ত্রিতত্ত্ববাদী—ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, চিৎ বা জীব এবং অচিৎ বা জগৎ—এই তিনটি তত্ত্ব। ব্রহ্ম, চিৎ ও অচিৎ সমভাবে সত্য। তা হলে ব্রহ্মকে "সর্বোচ্চ" বা "সর্বশ্রেষ্ঠ" তত্ত্ব বলা যায় কিরূপে? তার উত্তর এই যে, এক্ষেত্রে "সর্বোচ্চ" বা "সর্বশ্রেষ্ঠ" কথাটি একটি বিশেষ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, সাধারণ অর্থে নয়। সাধারণতঃ "সর্বোচ্চ" শব্দ দ্বারা আমরা ক্রমবর্ধমান পরিমাণ বুঝি। যেমন আমরা বলি: উচ্চ, উচ্চতর, উচ্চতম বা সর্বোচ্চ: বৃক্ষটি উচ্চ, অট্টালিকাটি উচ্চতর, পর্বতটি উচ্চতম। এস্থলে একই গুণ "উচ্চতা" বৃক্ষে যে পরিমাণে আছে, অট্টালিকায় তার অপেক্ষা অধিক পরিমাণে, এবং পর্বতে তার অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে আছে। এরূপে, 'উচ্চতার' দিক্‌ থেকে বৃক্ষ, অট্টালিকা ও পর্বতের মধ্যে গুণগত কোনো ভেদ নেই—যেহেতু একই গুণ "উচ্চতা" তিনটির মধ্যেই আছে, কিন্তু পরিমাণ-গত ভেদ আছে, যেহেতু সেই একই গুণ "উচ্চতা" তিনটির মধ্যে বিভিন্ন পরিমাণে আছে। একই ভাবে, ব্রহ্মকে "সর্বোচ্চ" তত্ত্ব বা সত্য বললে ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, "সত্যতা" গুণটি ব্রহ্মে অধিক পরিমাণে, জীবজগতে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে নিহিত আছে। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ সমভাবে সত্য, জীবজগৎ ব্রহ্মের অপেক্ষা অল্প সত্য নয়। এরূপে বৈদান্তিকগণ সত্যের পরিণামভেদ (Degrees of Reality) স্বীকার করেন না। কিন্তু একেশ্বরবাদী বৈদান্তিকেরা সত্যের পরিণাম-ভেদ স্বীকার না করলেও প্রকারভেদ স্বীকার করেন—কারণ তাঁদের মতে, প্রকারের দিক্‌ থেকে তিনটি সত্য: ব্রহ্ম, চিৎ ও অচিৎ। একতত্ত্ববাদী বৈদান্তিকেরা অবশ্য সত্যের পরিণামভেদ বা প্রকারভেদ কোনোটাই স্বীকার

করেন না, কারণ তাঁদের মতে, প্রকারের দিক্ থেকে সত্য একটিই : ব্রহ্ম। যাহোক, রামানুজপ্রমুখ একেশ্বরবাদী বৈদান্তিকদের মতে, ব্রহ্মকে "সর্বোচ্চ" তত্ত্ব বা সত্য বলার অর্থ কেবল এই যে, জীবজগৎ ব্রহ্মের কার্য, অংশ, গুণ ও দেহরূপে ব্রহ্মের সমান সত্য হলেও সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মান্তর্গত, ব্রহ্মাশ্রিত ও ব্রহ্মাধীন।

রামানুজের মতেও ব্রহ্ম "একমেবাদ্বিতীয়ম্" কারণ, জীবজগতের সত্যতা ও নিত্যতা তাঁর একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্বের হানি ঘটাতে পারে না। জীবজগৎ ব্রহ্মান্তর্গত ও ব্রহ্মাধীনরূপেই সত্য, ব্রহ্মের বাহিরে বা ব্রহ্ম থেকে স্বতন্ত্র বস্তুরূপে নয়। বস্তুতঃ, সর্বব্যাপী ব্রহ্মের স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ না থাকলেও স্বগতভেদ আছে: জীবজগৎ তাঁর স্বগতভেদ। সেজন্য তারা ব্রহ্মের ন্যায় সত্য হলেও ব্রহ্মের "দ্বিতীয়" নয়। যেমন, পত্র-পুষ্পাদি বৃক্ষের স্বগতভেদ, কিন্তু তা হলেও, তাদের দ্বিতীয় বৃক্ষ ত বলা যায় না—সেজন্য অনায়াসে বলা চলে যে, উদ্যানে বৃক্ষটি "একমেবাদ্বিতীয়", বা সেস্থানে কেবল একটিমাত্র বৃক্ষই আছে। এরূপে, রামানুজের মতে, ব্রহ্ম নির্বিশেষ নন, সবিশেষ।

পুনরায়, ব্রহ্ম নির্গুণ নন, সগুণ। অবশ্য আমরা সগুণ-শ্রুতি ও নির্গুণ-শ্রুতি উভয় প্রকার শ্রুতিই পাই। যেমন :

"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে,
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়াচ।" (শ্বেতাশ্বতর—৬-৮)।
"এষ আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো
বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ।"
(ছান্দোগ্য—৮-১-৫)।
"সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ"
(শ্বেতাশ্বতর—৬-১১)।

এস্থলে সগুণ-শ্রুতি ও নির্গুণ-শ্রুতির যথাক্রমে এই অর্থ যে, ব্রহ্ম একপক্ষে অনন্ত কল্যাণগুণের আকর, এবং অন্যপক্ষে সমস্ত হেয়গুণবিবর্জিত। রামানুজ তাঁর "শ্রীভাষ্যে" "ব্রহ্ম" শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দিচ্ছেন—

ব্রহ্মশব্দেন স্বভাবতো নিরস্ত-নিখিল-দোষোঽনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়-কল্যাণ-গুণ-গণঃ পুরুষোত্তমোঽভিধীয়তে; সর্বত্র বৃহত্ত্ব-গুণযোগেন হি ব্রহ্মশব্দঃ, বৃহত্ত্বঞ্চ স্বরূপেন গুণৈশ্চ যত্রানবধিকাতিশয়ং সোঽস্য মুখ্যোঽর্থঃ, স চ সর্বেশ্বর এব, অতো ব্রহ্মশব্দস্তত্রৈব মুখ্যবৃত্তঃ।"
(১-১-১ ; পৃঃ ৫)

অর্থাৎ, যিনি স্বরূপতঃ ও গুণতঃ বৃহত্তম, তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্মের অসংখ্য গুণাবলীর মধ্যে সৎ, চিৎ ও আনন্দ মুখ্য, এবং সেজন্য তাঁকে সংক্ষেপে "সচ্চিদানন্দ"রূপে অভিহিত করা হয়। সৎ, চিৎ ও আনন্দ একাধারে ব্রহ্মের স্বরূপ ও গুণ—ব্রহ্ম কেবল সৎ নহেন, সত্তাবান্, কেবল জ্ঞান নহেন, জ্ঞাতা; কেবল আনন্দ নহে, আনন্দময়। সৎ ও সত্তাবান্‌রূপে তিনি স্বয়ং নিত্য ও সকল বস্তুর অস্তিত্বের কারণ, জ্ঞান ও জ্ঞাতারূপে তিনি স্বয়ং সর্বজ্ঞ ও সকল জীবের জ্ঞানদাতা, আনন্দ ও আনন্দময় রূপে তিনি স্বয়ং আনন্দাকর ও সকলের আনন্দের কারণ।

ব্রহ্মের গুণাবলী দু' প্রকারের : ভীষণ ও মধুর। তাঁর ভীষণ গুণের উল্লেখ করে রামানুজ "শ্রীভাষ্যে" বলছেন :

"যদুক্তম্ বেদান্ত-বাক্যানি নির্বিশেষ-জ্ঞানৈক রস-বস্তুমাত্র প্রতিপাদনপরাণি, 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ', ইত্যেবমাদীনীতি, তদযুক্তম্, একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞোপাদনমুখেন সচ্ছব্দবাচ্যস্য পরস্য ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বং জগন্নিমিত্তত্বং, সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিযোগঃ, সত্যসংকল্পত্বং, সর্বান্তরত্বং, সর্বাধারতা, সর্বনিয়মন-মিত্যাদ্যনেক-কল্যাণ-গুণবিশিষ্টতাং কৃৎস্নস্য জগতস্ত-দাত্মকতাঞ্চ প্রতিপাদ্য, এবম্ভূত-ব্রহ্মাত্মকঃ 'ত্বম্ অসি' ইতি শ্বেতকেতুং প্রত্যুপদেশায় প্রবৃত্তত্বাৎ প্রকরণস্য।"
(১-১-১ ; পৃঃ ২২৬)।

এরূপে, জগতের উপাদান, নিমিত্ত ও কারণ, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্, সত্য-সংকল্প, সকলের অন্তরাত্মা, সকলের আধার, সকলের নিয়ামক বা শাসকরূপে ব্রহ্ম একদিকে আমাদের নিকট শ্রদ্ধা ও ভক্তির বস্তু নিশ্চয়, কিন্তু নিতান্ত আপনার জন, বা নিকটতম সখা নন।

অন্যদিকে ব্রহ্মের মধুর গুণের কথাও রামানুজ "শ্রীভাষ্যে" বলেছেন :

"তৎসম্বন্ধিতয়া প্রকরণান্তরেষ্বপ্যপহত পাপ্মত্বা-দিনিরস্ত-নিখিল-দোষতা-সর্বজ্ঞতা-সর্বেশ্বরত্ব-সত্যকামত্ব-সত্য-সংকল্পত্ব-সর্বানন্দকরণ-নিরতিশয়ানন্দযোগাদয়ঃ সকলেতর-প্রমাণা-বিষয়াঃ সহস্রশঃ প্রতিপাদিতাঃ।"
(১-১-১৩ ; পৃঃ ৩৭৩)।

অর্থাৎ, পূর্বোক্ত গুণযুক্ত পরমেশ্বর একই সঙ্গে আনন্দময় ও সকলের আনন্দের কারণ।

"এতদুক্তং ভবতি—পরস্যৈব ব্রহ্মণো নিখিলহেয়-প্রত্যনীকানন্ত-জ্ঞানানন্দৈকস্বরূপতয়া সকলেতরবিলক্ষণস্য স্বাভাবিকানবধিকাতি শয়াসংখ্যেয়-কল্যাণ গুণগণাশ্চ সন্তি। তদ্বদেব স্বাভিমতানুরূপৈক-রূপাচিন্ত্য-দিব্যাদ্ভুত-নিত্য নিরবদ্য-নিরতিশয়ৌজ্জ্বল্য-সৌন্দর্য-সৌগন্ধ্য-সৌকুমার্য-লাবণ্য-যৌবনাদ্যনন্ত-গুণগণ-নিধি-দিব্য-রূপমপি-স্বাভাবিক-মস্তি। তদেবোপাসকানুগ্রহেণ তত্তৎপ্রতি-পত্ত্যনুরূপ-

সংস্থানং করোতি, অপার-কারুণ্য-সৌশীল্য-বাৎসল্যোদার্য জলধিঃ নিরস্ত-নিখিল-হেয়-গন্ধোপহত পাপ্‌মা পরমাত্মা পরং ব্রহ্ম পুরুষোত্তমো নারায়ণ ইতি।"

(১-১-২১ ; পৃঃ ৪১৩)।

এরূপে পরমেশ্বরের অচিন্ত্য, দিব্য, অদ্ভুত, নিত্য, নিরবদ্য, নিরতিশয়, ঔজ্জ্বল্য, সৌন্দর্য, সৌগন্ধ্য, সৌকুমার্য, লাবণ্য, তারুণ্য, কারুণ্য, সৌশীল্য, বাৎসল্য, ঔদার্য প্রভৃতি মধুর গুণগ্রামও সমভাবে স্বাভাবিক।

ব্রহ্ম জগতের অভিন্ন নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। তাঁর "বেদান্তসারে" রামানুজ বলছেন :

"আত্মভূতং ব্রহ্ম সর্বদা নিরস্ত-নিখিল-দোষ-গন্ধানবধি-কাতিশয়াসংখ্যেয়-জ্ঞানানন্দাদ্যপরিমিতোদার গুণসাগর-মবতিষ্ঠতে ইতি ব্রহ্মেব জগন্নিমিত্তমুপাদানং চেতি।"

(১-১-২ ; পৃঃ ১৯)।

ব্রহ্মের অসংখ্য গুণাবলীর মধ্যে চিৎ ও অচিৎ অন্যতম। এই শক্তির বিক্ষেপ দ্বারা তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন। এরূপে জীবজগৎ পরমেশ্বরের শক্তির প্রকাশমাত্র বলে, জীবজগৎ "সৃষ্ট" হয়েও নিত্য, যেহেতু এস্থলে "সৃষ্টি" অর্থ "অভিব্যক্তি", নূতন সৃজন নয়। অতএব রামানুজ পরিণামবাদী। কিন্তু তা সত্ত্বেও, উর্ণনাভ যেমন তন্তর কারণ হয়েও স্বয়ং তন্তুতে পরিণত হয় না, তেমনি ব্রহ্ম জীবজগতের কারণ হয়েও স্বয়ং নির্বিকার ও অপরিবর্তিতই থাকেন।

ব্রহ্ম নির্বিকার হলেও নিষ্ক্রিয় নন। জীবের দিক্ থেকে তাঁর দুটি প্রধান কার্য : সৃষ্টি ও মুক্তি। তিনি জীবের কর্মানুসারে জগৎ সৃষ্টি করে জীবকে সংসারে প্রেরণ করেন ; পুনরায় জীবের সাধনে পরিতুষ্ট হয়ে তাকে সংসারচক্র থেকে মুক্তও করেন। জীবের প্রয়োজনের জন্যই তিনি কর্মে প্রবৃত্ত হন, নিজের প্রয়োজনের জন্য নয়, কারণ তিনি স্বয়ং নিত্যতৃপ্ত ও আপ্তকাম। সেজন্য নিজের দিক্ থেকে সৃষ্টি তাঁর লীলা বা ক্রীড়াই মাত্র।

ব্রহ্ম জগল্লীন (Transcendent) হয়েও জগদতিরিক্ত (Immanent)। জগৎ ব্রহ্মের পরিণামরূপে ওতঃপ্রোত ভাবে ব্রহ্মাত্মক—পৃথিবীর ক্ষুদ্রবৃহৎ প্রত্যেক বস্তুই ব্রহ্ম-স্বরূপ। কিন্তু তা সত্ত্বেও, একটি ক্ষুদ্র জগতে ব্রহ্মের অনন্তস্বরূপ পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পেতে পারে না। সেজন্য ব্রহ্ম জগদতিরিক্ত।

রামানুজের মতে, ব্রহ্ম পুরুষোত্তম—যাকে ইংরাজীতে বলা হয় "Personal God", শঙ্করের Impersonal Absolute" নন। কারণ, তিনি যে কোনো পুরুষের মতই সগুণ ও সক্রিয়—পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষে যে সকল অপূর্ব, মহামহিমময় গুণ ও শক্তি আমরা প্রত্যক্ষ দেখতে পাই, সে সকলই অনন্ত গুণ অধিকভাবে এই পুরুষোত্তম, পুরুষশ্রেষ্ঠে আছে ; এবং উপরন্ত অন্যান্য অসংখ্য, অচিন্ত্য, অজ্ঞেয়, অনির্বচনীয় গুণ ও শক্তির একমাত্র আধারও তিনি। পুনরায়, তাঁর সঙ্গে আমাদের নিত্যই নিকটতম ব্যক্তিগত সম্পর্ক—তিনি কেবল আমাদের শুষ্ক জ্ঞানের বস্তু নন, শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র। সেদিক্ থেকেও, ব্রহ্ম "Personal God" বা পুরুষোত্তম।

রামানুজের মতে, ব্রহ্ম ও ঈশ্বরে কোনোরূপ প্রভেদ নেই। প্রকৃতপক্ষে, শঙ্করের ব্যবহারিক স্তরগত "ঈশ্বর" ও রামানুজের পারমার্থিক স্তরগত "ব্রহ্ম" একই তত্ত্ব। প্রভেদ এই যে, শঙ্করের মতে, পারমার্থিক স্তরে, "ঈশ্বর" বাধিত ও মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যান ; কিন্তু রামানুজের মতে, ঈশ্বর বা ব্রহ্ম পারমার্থিক সত্য, এবং কোনো স্তরেই বাধিত হয়ে যান না।

রামানুজ "ব্রহ্ম"কে "পুরুষোত্তম" "বিষ্ণু" বা "নারায়ণ" নামে পূজানিবেদন করেছেন।
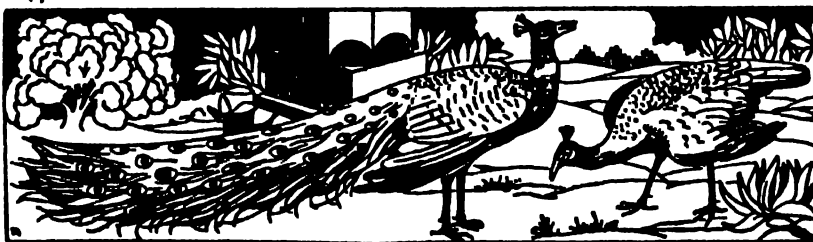
পূর্ব-পশ্চিম কথা

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী

আজ থেকে বাহান্ন বৎসর পূর্বে দক্ষিণ-আফ্রিকায় থাকাকালে মহাত্মা গান্ধী 'হিন্দ স্বরাজ্য' নামে একটি বই লেখেন। তাতে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অতি কঠোর সমালোচনা ছিল। বইটি পড়ে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের মধ্যে কেউ কেউ গান্ধীজীর উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হন, কিন্তু ইংরেজদের মধ্যে যাঁরা সদাশয় ও যুক্তিবাদী, জাত্যভিমানের উপরে মানবতাকে যাঁরা স্থান দেন, তাঁরা গান্ধীজীর যুক্তি অস্বীকার করতে পারেন নি। অন্যান্য অনেক কথার মধ্যে 'হিন্দ স্বরাজ্য' বইয়ে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে গান্ধীজীর প্রধান দুই কথা ছিল এই যে, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা মূলতঃ শোষণবাদী এবং হিংসা তার রক্তের মধ্যে। জাতিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরদেশের উপর চড়াও হয়ে সেই দেশকে শোষণ করতে পশ্চিমী দেশগুলির বাধে না; আর পারস্পরিক হানাহানি কাটাকাটি লোকাযুঝি এ সব পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য বললেও চলে।

গান্ধীজীর এই সমালোচনার সারবত্তায় সংশয় প্রকাশ করবার যো কোথায়? গান্ধীজী ছাড়াও আরও অনেক মনীষী পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার স্বভাবগত হিংস্রতা ও স্বার্থপরায়ণতার নির্মম সমালোচনা করেছেন এবং পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার এই বিসদৃশ বৈশিষ্ট্যের পিঠে প্রাচ্য সভ্যতার আপেক্ষিত শান্তিপ্রিয়তা ও অহিংস মনোভাবের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এই সকল মনীষীর মধ্যে সকলেই যে প্রাচ্যদেশীয় এমন মনে করবার হেতু নেই, একাধিক পাশ্চাত্ত্য মনীষীও রয়েছেন। তাঁরা শান্তি ও বিশ্বমানবতার আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ নিজ দেশের ও নিজ জাতির গলদগুলির সমালোচনা করতে কুণ্ঠিত হন নি। ইউরোপ সামগ্রিক ভাবে ভোগবাদী শোষক আর হিংসাপরায়ণ হলেও সে দেশে ব্যক্তিগত স্তরে অনেক মানবতাবাদী মনীষী রয়েছেন, যাঁরা প্রাচ্য আদর্শের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধাসম্পন্ন। এই শ্রেণীর ভিতর আমরা কাউণ্ট কাইজারলিঙ, স্পেঙ্গলার, রোঁলা প্রমুখ চিন্তাশীলদের নাম করতে পারি। টলষ্টয় অবশ্য প্রাচ্য আদর্শের নাম করে তাঁর অহিংসার তত্ত্ব প্রচার করেন নি, তবে তাঁর প্রসারিত মৌলিক খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের আদর্শে আর প্রাচ্য শান্তির আদর্শে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই; এবং এটিও লক্ষণীয় যে, টলষ্টয়ই প্রথম গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আর Passive Resistance-এর নীতিকে স্বাগত জানান। চীনদেশ নয়া চীন বনে যাবার আগে, অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্য আদর্শের অনুসরণে কম্যুনিষ্ট বনবার আগে, মূলতঃ শান্তিপ্রিয় ছিল। প্রাচ্য সভ্যতার স্বভাবসিদ্ধ শান্তি-প্রিয়তার একটি মূল আধার ছিল চীনদেশ। বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁর 'The Problems of China' বইতে প্রাক্-কম্যুনিষ্ট চৈনিকদের মৌলিক শান্তি-প্রিয়তার উল্লেখ করে লিখেছেন, পশ্চিমের লোকেরা চীনের দৃষ্টান্তের অনুকরণে যদি আর একটু শান্তি-প্রিয় হ'ত, তাদের ভিতর কর্মের আঁকুপাঁকু ("itch for action") যদি আর একটু কম হ'ত, তা হলে পৃথিবীর অনর্থের অনেকাংশ দূরীভূত হ'ত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমরা পাশ্চাত্ত্যদেশবাসীদের কর্মনিষ্ঠার প্রশংসা করি, কিন্তু পশ্চিমীদের এই কর্মপ্রীতি প্রায় ক্ষেত্রেই যে কাজের নামে অকাজ ছাড়া কিছু নয়, সে কথা রাসেল তাঁর পূর্বোক্ত বইতে বেশ সুন্দর ভাবে বুঝিয়েছেন। তাঁর "In Praise of Idleness" নামক বিখ্যাত প্রবন্ধেও এই খাতে পশ্চিমীদের অতিরিক্ত কর্মপ্রীতির উপর কটাক্ষ আছে।

পশ্চিমীদের কাজ মানে তো পরকে বঞ্চিত করে আত্মসুখভোগের জন্য ক্রমাগত ভোগের উপকরণ স্তূপীকৃত করে তোলা আর পরের দেশে চড়াও হয়ে সে দেশের লোকদের শতপ্রকারে শোষণ করা। তাঁদের চোখ-ধাঁধানো পনেরো আনা কাজের লক্ষ্য স্থূল সুখান্বেষণ বই আর কিছু নয়। আজ অবশ্য পশ্চিমীরা তাদের শোষণস্থল প্রাচ্যের উপনিবেশগুলি থেকে ক্রমশঃ সরে পড়তে বাধ্য হচ্ছে; কিন্তু বলাই বাহুল্য, তা ঘটনার চাপে। অবস্থার চক্রান্তে সরে পড়া অনিবার্য হয়ে না উঠলে পশ্চিমীরা যে স্বেচ্ছায় ওইসব দেশ থেকে বিদায় নিত তা মনে হয় না। প্রাচ্যদেশীয় আর আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীদের নবজাগ্রত জাতীয়তার উদ্দাম-উদ্বেল তরঙ্গসংঘাতের ধাক্কায় ইচ্ছার বিরুদ্ধে হটে যেতে বাধ্য হয়ে এখন এইসব দেশে পশ্চিমীদের মুখে 'উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ' বুলি ঘন ঘন শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। বাধ্য-

বাধকতাকেও যে ধর্মে রূপান্তরিত করা যায়, সেই বিদ্যায় পশ্চিমীদের চেয়ে পটু জাত আর কেউ নেই।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যখন ১৯১৬ সনে জাপান পরিভ্রমণে যান তখন দু' একটি বক্তৃতায় তিনি নির্ভীকভাবে জাপানের অতিরিক্ত পাশ্চাত্ত্যানুকরণ-স্পৃহা ও যুযুধানতার নিন্দা করেন। জাপানের মনীষীবৃন্দ (এঁদের ভিতর কবি ইয়োন নোগুচি অন্যতম, পরে অবশ্য তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন হয়) কবিগুরুর এ সকল কথায় আপত্তির কিছু খুঁজে না পেলেও জাপান সরকার এতে রুষ্ট হন। কিন্তু জাপান সরকারের বৈরী মনোভাব সত্বেও কবিগুরু স্পষ্ট ভাষণে কার্পণ্য করেন নি। ভোগবাদী ও হিংসাবাদী পশ্চিমীদের পথে চলে জাপান যে আত্ম-ধ্বংসের রাস্তাই ক্রমশঃ প্রশস্ত করছে—কবিকণ্ঠে এই সাবধান-বাণী সেদিন স্পষ্টভাষায় উচ্চারিত হয়েছিল। এই সাবধান-বাণী পরে কি সাংঘাতিক ভাবেই না সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জাপান-ভ্রমণকালীন বক্তৃতাবলী তাঁর 'Nationalism' (১৯১৭) নামক বইটিতে বিধৃত আছে। পাশ্চাত্ত্যের ছাঁচে গঠিত উগ্র জাতীয়তার আদর্শ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কি ভাবতেন এ বইটি পড়লে তা ভাল করে জানা যায়।

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা সম্পর্কে মোহমুক্তির ভাবটি রবীন্দ্রনাথের রচনায় এর আগেও পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে প্রথম তিনটি বিলাত-প্রবাসের (১৮৭৮, ১৮৯০, ১৯১২) অভিজ্ঞতাই ইউরোপীয় সভ্যতার চোখ-ধাঁধানো আড়ম্বর ও সমারোহের অন্তর্নিহিত দৈন্য সম্পর্কে কবিকে ক্রমশঃ সচেতন করে তোলে এবং তাঁর ওই সময়কার লিখিত বহু প্রবন্ধে ও চিঠিতে তাঁর মনের ওই ভাব ব্যক্ত হয়।

রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, ইউরোপীয় সভ্যতার বিচিত্র জাঁকজমক আর ঘটাপটা কল্যাণাত্মিকা শক্তি প্রসূত নয়; তার মূল প্রবণতাটা হ'ল বিনাশাত্মক। অপরিমিত সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা থেকে ওই সমারোহের উদ্ভব। ইউরোপ বিজ্ঞানের চর্চা আর যন্ত্রবিদ্যার ক্ষেত্রে বহুদূর এগিয়ে গেছে, অন্যান্য জ্ঞানবিদ্যার অনুশীলনেও তার অগ্রবর্তিতা কম নয়। কিন্তু এই অগ্রগতির সাকুল্য ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, ইউরোপের শক্তি ও কর্মোদ্যম গঠনমূলক খাতে প্রবাহিত না হয়ে তা ক্রমশঃ তাকে আরও বেশী করে পারস্পরিক হানাহানির পথে নিয়ে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পূর্বেই ইউরোপের ধমনীতে সুষুপ্ত এই অনিবার্য ধ্বংসাত্মিকা প্রবৃত্তির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর উপলব্ধির যথার্থতা কিছুদিন যেতে-না-যেতেই প্রমাণ হয়—ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি ১৯১৪ সনে মারাত্মক পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। গোটা পশ্চিমী জগতের একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে ধ্বংসের তাণ্ডব সুরু হয়ে যায়। সেই সময়কার তুলনায় অবস্থার আজ উন্নতি হয় নি, বরং তা আরও অনেক নিম্নাভিমুখী হয়েছে। এখন তো সারা পৃথিবী জুড়েই মারণযজ্ঞের প্রস্তুতি চলছে, আর সেই প্রস্তুতির কর্তা অবধারিত ভাবে পশ্চিমী নায়কবৃন্দ। আণবিক যুদ্ধের আয়োজনের জগঝম্প কোলাহলে পৃথিবীর আকাশ-বাতাস আজ এতই মুখরিত যে, ইউরোপ আমেরিকা থেকে বহু দূরে বাস করেও আজ আমাদের সে শব্দের আক্রমণ থেকে নিস্তার নেই। পশ্চিমী রাষ্ট্র-ধুরন্ধরগুলির কার্যকলাপের ফলে আজ শান্তিপ্রিয় পৃথিবীর মানুষের নিরুদ্বেগে বাস করাই দায় হয়ে উঠেছে।

এমন বলব না প্রাচ্য দেশগুলিতে হিংসার উপদ্রব নেই বা সে সব দেশের মানুষ যুদ্ধবিগ্রহের ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত নয়। সব দেশের ইতিহাসেই রাজ্য নিয়ে হানাহানি কাড়াকাড়ি ঘটে এসেছে, এবং প্রাচ্য দেশের ইতিহাস এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। অন্য দেশের কথা আর কি বলব, এমন যে অধ্যাত্মবাদী আর মজ্জাগতরূপে শান্তিপ্রিয় বলে কথিত আমাদের ভারতবর্ষ, সেই ভারতের ইতিহাস হিংসার দ্বারা বারেবারেই কলঙ্কিত হয়েছে। আগে রাজ্য নিয়ে রাজায় রাজায় লড়াই হ'ত, এখন লড়াই হচ্ছে সাম্প্রদায়িক স্বার্থ নিয়ে, ভাষা নিয়ে, অর্থনৈতিক আর বাণিজ্যিক স্বার্থ নিয়ে। যুগপরিবর্তনে অবস্থার বদল হওয়ায় হিংসাকারীদের শ্রেণীরূপের বদল হয়েছে, কিন্তু হিংসার চেহারা ঠিকই আছে।

কিন্তু প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য নির্বিশেষে হিংসা কম-বেশী সকল দেশে আচরিত হলেও কোথায় যেন প্রাচ্য দেশ আর পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির হিংসাচারে একটা মূলগত প্রভেদ আছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস হিংসার কলঙ্কমুক্ত নয় সে কথা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু কোনরূপ সাম্প্রদায়িক ভেদাত্মক মনোভাবকে প্রশ্রয় না দিয়েও বলা যায়, বহিরাগত আক্রমণকারীদের একে একে অভ্যাগমের পর থেকেই ভারত ইতিহাস ক্রমশঃ হিংসার দ্বারা কবলিত হয়ে উঠেছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ আমলে, সমাজের অন্যান্য স্তরে তো দূরের কথা, এমন কি রাজা-রাজড়ার মধ্যেও হিংসার সামান্যই আচরিত হয়েছে। বরং রাজ্যের লোভ ও দাবি ত্যাগ করে রাজার বনবাসী হবার ঐতিহ্যটাই প্রাচীন আমলের ভারতীয় রাজতন্ত্রে বলবৎ দেখতে পাই। চণ্ডাশোকের ধর্মাশোকে রূপান্তর কিছু বিচ্ছিন্ন বা একক ঘটনা নয়, ঐ প্রবণতা প্রাচীন ভারতের রাজকীয় সংস্কারে নিহিত ছিল বললেও অত্যুক্তি

হয় না। কিন্তু যখন থেকে ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের আকারে বহিরাগত আক্রমণকারী জাতিগুলির আবির্ভাব হতে থাকল—একে একে ভারত ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে দেখা দিতে থাকল ব্যাক্‌ট্রিয়ান, শক, হুন, পহ্লব, কুষাণ এবং আরও পরে তুর্কী ও মোগল রাজ্যলোভীর দল—ভারতের মজ্জাগত শান্তিপ্রিয়তার দুর্ভেদ্য পাষাণফলকে ফাটল ধরল এবং ঐ রন্ধ্রপথে হিংসার কলি প্রবেশ করে পুরাতন শান্তির ধারণাকে তছনছ করে দিলে। তুর্কী আর মোগলরা কখনও কখনও শাসনক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দিলেও তাদের তুল্য নিষ্ঠুর আর রক্তলোভী শাসক আর হয় না। এ নিষ্ঠুরতার ঐতিহ্য তারা মধ্য এশিয়া থেকে বহন করে এনেছিল। ইসলাম ধর্মের উগ্র আক্রমণাত্মক গোঁড়ামি তাকে আরও পুষ্ট করে তোলে। ভারত ইতিহাসের সেই মধ্যযুগে সেই যে হিংসার সংস্কার একবার ভারতীয় জীবনে শিকড় গেড়ে বসল তার পর সাধুসন্ত আর মনীষীদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাকে নির্মূল করা আর সম্ভব হয় নি। মহাপুরুষদের শুভবুদ্ধির প্রভাব বারে-বারেই এই হিংসার ধারে প্রতিহত হয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে এবং এখনও জনজীবনে হিংসাবুদ্ধিরই আধিক্য। (ভারতের আজকের জনমানস যদি প্রকৃত সনাতন ভারতীয় আদর্শের অনুগত হ'ত, তা হলে সম্প্রতি আসামে যে লজ্জাজনক কাণ্ড ঘটল, তা কখনও সংঘটিত হতে পারত না!)

ফল কথা, হিংসাচার ভারতীয় মানসে সহজাত নয়; বহিরাগত আদর্শের সংঘাতে ভারতীয় মনে ওটির জন্ম এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিয়ম অনুযায়ী তার পুষ্টি। ইংরেজ আমলে হিংসার সংস্কার খর্ব না হয়ে বরং আরও বলবত্তর হয়েছিল, তার কারণ হিংসা একেবারে ইউ-রোপীয় তথা ইংরেজী সভ্যতার মজ্জায় মজ্জায় নিহিত বলা চলে।

ইউরোপীয়রা খ্রীষ্টীয় ধর্মে বাহ্যতঃ দীক্ষিত হলেও খ্রীষ্টীয় আদর্শ ওদের ধাতে প্রবেশ করে নি। গত কিঞ্চিন্ন্যূন দু'হাজার বছরের ইতিহাসে ধর্মের নামে ইউরোপের খ্রীষ্টীয় সমাজে যত অনাচার ঘটেছে অন্যান্য দেশে তার শতাংশের একাংশও ঘটে নি। Inquisition, Stake, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর উপর নানাবিধ অত্যাচার-উৎপীড়ন, স্বাধীন চিন্তার অগ্রনায়ককে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিজ্ঞানে উৎসাদন করা, অলৌকিক ক্ষমতার ধারিণীকে ডাইনী সন্দেহে পোড়ানো—এ-সব ইউরোপীয় প্রতিভারই দান। সাম্প্রদায়িক, প্রাদেশিক আর জাতি-কলহের বীজ আজ দেশে দেশে ছড়িয়ে গেছে; এ-সবেরও মূল ইউরোপে। ফরাসী বিপ্লবের সময় ফ্রান্সে রক্তের প্লাবনের মধ্য দিয়ে যে ভয়াবহ সন্ত্রাসের রাজত্বের সৃষ্টি হয়েছিল, তা কখনও সম্ভব হতে পারত না যদি-না ইউরোপের মর্মের মধ্যেই হিংসা প্রচ্ছন্ন হয়ে বাস করত। ফরাসী বিপ্লবের সময় ব্যাপক আকারে যে হিংস্র অসহিষ্ণুতার অভিব্যক্তি দেখা গেছে, তারই রকমফের আজ দেখতে পাচ্ছি সোভিয়েট রাশিয়ায় ক্ষীণতম রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকেও অবলীলায় উৎখাত করবার ("liquidation") চেষ্টার মধ্যে। হিটলারী জার্মানীর নাৎসী জাতিবৈর, মুসোলিনীর আমলের ইতালীর নিরঙ্কুশ ফ্যাসিবাদী স্বৈরাচার, ষ্টালিনী রাশিয়ার উগ্র একনায়কবাদ ও তৎপ্রসূত বিবিধ হিংস্র ক্রিয়াকলাপ—এ-সব হিন্দু ভারতের ঐতিহ্যে অভাবনীয় বললেও চলে। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে এ-দেশেও হিংসাচার হয়েছে, কিন্তু বীভৎসতায় ইউরোপের সঙ্গে তার কোন তুলনা হয় না। কি ধর্মীয় কি, রাষ্ট্রনৈতিক, কি জাতিগত—সকল প্রকার অসহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে ইউ-রোপের স্থান সকলের পুরোভাগে।

ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার ব্যাপারে ক্রিশ্চিয়ানদের সঙ্গে মুসলমানদের মিল আছে। জোর-জবরদস্তির দ্বারা ভিন্ন-ধর্মাবলম্বীকে স্বীয় ধর্মের কুক্ষিগত করতে খ্রীষ্টান আর ইস্‌লাম—এই দুই ধর্মেরই উৎসাহ অতি প্রবল। বরং এ ক্ষেত্রে ইস্‌লামের জঙ্গী মনোভাব সমধিক প্রকট। এর কারণও আছে। ইস্‌লাম ক্রিশ্চিয়ান ধর্মের ছায়াতেই উদ্ভাবিত হয়েছিল। ক্রিশ্চিয়ান ধর্মের যা-কিছু জঙ্গী বৈশিষ্ট্য তা এই নবীন ধর্ম নিজ কাঠামোর মধ্যে আত্মসাৎ করে নেয় এবং তা বিশেষ প্রবলতার সঙ্গেই আত্মসাৎ করে। তারই ফলে দুই ধর্মের পদ্ধতি-প্রকরণের মধ্যে এত সাদৃশ্য। হিংসাচারের সাদৃশ্যটাই সবচেয়ে বেশী প্রকট। এই দুই ধর্মের অনুগামীরা বাহির থেকে অনাহূত ভাবে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে ভারতের যত না হিত করেছে, তার চেয়ে অনিষ্ট করেছে অনেক, অনেক বেশী। ভারতীয় জীবনকে হিংসাবুদ্ধির দ্বারা কলুষিত করা তাদের সবচেয়ে বড় অপকার্য গণ্য করা যেতে পারে।

আমরা মাঝে মাঝে বলে থাকি, যে কালে ইউরোপের লোকেরা কাঁচা মাংস চিবিয়ে খেত, সেই কালে ভারতবর্ষে এবং প্রাচ্যের অন্যান্য কতিপয় ভূখণ্ডে অতি উন্নত স্তরের সভ্যতা বিরাজমান ছিল। কথাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এর মূলগত তথ্যটি একটি অনতিক্রম্য সত্যরূপে সর্বদাই স্মরণযোগ্য। আজ অবশ্য এই পুরাতন প্রতি-তুলনার সাহায্যে অবস্থার বিচার করা চলে না, কেন না ইউরোপ ইতোমধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যমূলক

জড়বস্তুর স্তূপীকরণে অনেকদূর এগিয়ে গেছে; তা হলেও মনে হয় ইউরোপের শিরায় শিরায় এখনও পুরাতন বর্বরতার শোণিত বহমান রয়েছে। তা যদি না হত, তা হলে বহুলকথিত এই বিশ শতকের মধ্যভাগের পরেও স্পেনীয় ষাঁড়ের লড়াই আর বক্সিং এবং এ দুটি রক্তস্রাবী খেলাকে ঘিরে পশ্চিমী জনতার পৈশাচিক উল্লাস আমাদের প্রত্যক্ষ করতে হ'ত না। পুরাতন আমলে রোমের এ্যাম্পিথিয়েটারে যে জ্যান্ত মানুষকে সিংহের মুখে ফেলে দেওয়া হ'ত, সে কিছু আকস্মিক ঘটনা নয়, ওটি ইউরোপীয় মেজাজেরই একটা বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আমাদের দেশে সভ্যতার অনুন্নত স্তরেও এ জিনিস অভাবনীয় ছিল। ভাগ্যিস, এই বীভৎস খেলা নিরোধের জন্য সাধু টেলিমেকাস স্বীয় জীবন উৎসর্গ করে গিয়েছিলেন তাই রক্ষা, নতুবা ওই বাবদে ইউরোপের মুখে আজও চুনকালি লেগে থাকত। পশ্চিমী ছায়া-ছবিতে প্রায়ই দেখতে পাই, দুই অপরিচিত ব্যক্তির মধ্যে কোন বিষয় নিয়ে কথাকাটাকাটি হ'ল তো অমনি লেগে গেল ঘুসোঘুসি—সে এক লঙ্কাকাণ্ড! এ-সব দৃশ্য, প্রাচ্যদেশীয় আমরা, আমাদের দেখতেও লজ্জাবোধ হয়। (হিংসার অভিব্যক্তিমূলক ব্যবহারে আমরা একেবারে ধোয়া তুলসী, এ কথা নিশ্চয়ই বলব না, তবু মনে হয় কোথায় যেন এই ক্ষেত্রে প্রাচ্যদেশীয় আর পশ্চিমীদের আচরণে একটা মূলগত পার্থক্য রয়েছে)। বড় বড় ইউরোপীয় হোটেলে, ইউরোপীয়-পরিচালিত জাহাজ ও বিমানযাত্রায় খানাপিনার ঘটাপটা আর আরামের সমারোহ দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক, ওরা ব্যক্তিগত সুখভোগ ছাড়া আর কিছু বোঝে না; অগণিত অবহেলিত মানুষের কল্যাণভাবনা তাদের চিন্তায় একবারও উঁকি দেয় কিনা সন্দেহ। এই পর্বতপ্রমাণ, বহুলাংশে অনাবশ্যক স্বাচ্ছন্দ্যের স্তূপের মুখোমুখি হয়ে আমরা প্রায়শঃ এক ধরনের অস্বস্তি অনুভব করি, যাকে ঠিক ব্যাখ্যা করে বোঝানো যায় না, অথচ যা আমাদের মর্মমূলে অনবরত কাঁটার মত খচ্‌খচ্ করতে থাকে। আমরা প্রাচ্যদেশীয় বেশীরভাগ লোক গরিবানায় আর সাদাসিধা জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত, আমাদের ধাতে কি এ-সব আমীরীয়ানা পোষায়?

আসলে পশ্চিমীদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই একটা স্থূল সুখস্পৃহা আর হিংসাবুদ্ধি জড়াজড়ি করে মিশিয়ে আছে। হিংসা পশ্চিমী-স্বভাবে ওতোপ্রোত বললেও চলে। পশ্চিমী ইতিহাসের ছাত্রমাত্রে জানেন, জার্মান, ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ প্রভৃতি আধুনিক 'সভ্য' জাতি প্রাচীন জার্মানের বংশধর। প্রাচীন জার্মানদের মধ্যে স্যাক্সন, ফ্রাঙ্ক, ভ্যাণ্ডাল, লম্বার্ড প্রভৃতি নানা উপজাতির লোক ছিল। এদের জীবনযাত্রা খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষাশেষি এসেও নিতান্ত বর্বরতায় মণ্ডিত ছিল। রোমক লেখক ট্যাসিটাসের বিবরণ থেকে জানা যায়, প্রাচীন জার্মানদের যুদ্ধই ছিল একমাত্র জীবিকা। অস্ত্র ছিল তাদের নিত্য সঙ্গী, এমনকি সভাগৃহেও তারা অস্ত্র নিয়ে আসত। মেয়েরা যুদ্ধের সময় স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে থাকত। বিয়ের সময় তারা নিজ নিজ স্বামীর জন্য পিতৃগৃহ থেকে অস্ত্রের যৌতুক নিয়ে আসত। কৃষিকার্যে জার্মানদের আকর্ষণ ছিল না, লুণ্ঠনের উপার্জনে তাদের সংসার চলত।

এ-সব পুরা-বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলবার উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, এটি সপ্রমাণ করা যে, পশ্চিমীরা পরবর্তীকালের শিক্ষা ও মার্জনার দ্বারা যত সুসভ্যই বহুক, তাদের রক্তে পুরাতন হিংসা প্রচ্ছন্নভাবে আজও বহমান আছে। স্বার্থের প্রশ্ন দেখা দিতেই সেই হিংসা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। মাত্র পনেরো শো বছর আগেও যুদ্ধ যাদের প্রধান ব্যসন ছিল, তাদের পক্ষে পরবর্তী অত্যল্পকালের মধ্যে যুদ্ধের সংস্কার ত্যাগ করা সম্ভব নয়। পশ্চিমীদের পদে পদে পাঁয়তাড়া কষা আর 'রণং দেহি' হুহুঙ্কারের মূল যে এইখানেই, তা বোধ করি আর বিশদ্ ব্যাখ্যা করে বোঝাবার প্রয়োজন নেই।

আর শুধু বর্বর প্রাচীন জার্মানদেরই বা দোষ কি; যে গ্রীক সভ্যতা নিয়ে সমগ্র ইউরোপের গর্ব, তার অন্য বহুবিধ কৃতিত্বের মধ্যেও তার মজ্জাগত হিংসাচারকে কোন মতেই ভুলে থাকা যায় না। এক সময়ে (খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী) স্পার্টা সমগ্র গ্রীসের ভিতর শৌর্যে ও বলে শীর্ষস্থানীয় হয়ে উঠেছিল। স্পার্টানদের একমাত্র জীবিকা ছিল যুদ্ধ, এবং যুদ্ধবিদ্যার যা সহায়ক, স্পার্টান নাগরিকদের মধ্যে তেমন গুণাবলীরই শুধু প্রশ্রয় দেওয়া হ'ত। দুর্বল সন্তান প্রসব করলে স্পার্টান জননী ধিকৃতা হ'ত এবং সেই দুর্বল সন্তানকে মেরে ফেলা হ'ত। নিহত সন্তানের জন্য মায়ের কোনরূপ শোক-প্রকাশ বারণ ছিল। কেবলমাত্র সবল সন্তানদের বাঁচবার অধিকার ছিল। বলবান সন্তানলাভের জন্য প্রয়োজনমত স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের সহবাস রাষ্ট্রীয় আইনে নিষিদ্ধ ছিল না। স্পার্টানরা শুধু যুদ্ধই করত, তাদের খাওয়া-পরার উপকরণ যোগাত দাসেরা। সমগ্র সামরিক ব্যবস্থাটাই দাসপ্রথার উপর নির্ভরশীল ছিল।

স্পার্টানদের এই ঋজু-কঠোর সামরিক জীবনাদর্শ পরবর্তীকালীন গ্রীক লেখকদের কল্পনাকে বিশেষভাবে উচ্চকিত করেছে। এমনকি দার্শনিক প্লেটো 'Republic'

গ্রন্থে তাঁর কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রের বর্ণনা করতে গিয়ে স্পার্টানদের জীবনাদর্শকে প্রকারান্তরে সমর্থন জানিয়েছেন। কোন কোন লেখকের অনুমান, প্লেটো তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের ধারণাটি স্পার্টা থেকেই লাভ করেন। এমন অমানুষিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার যে দার্শনিক সমর্থন জোটে—আর তাও যেমন তেমন দার্শনিক নয়, প্লেটোর ন্যায় প্রসিদ্ধ দার্শনিকের দার্শনিক সমর্থন—এ শুধু পশ্চিমী-জগতের চিন্তা-রাজ্যেই সম্ভব। আর শুধু প্লেটোই বা বলি কেন, বহু পরবর্তীকালের নীট্শে, ফিক্‌টে প্রমুখ দার্শনিক তো ওই একই ভাবের ভাবুকতা থেকে তাঁদের দর্শন-সৌধ গড়ে তুলেছিলেন। বস্তুতঃ, নাৎসীবাদের জন্মই তো এই সূত্রে। এ থেকে প্রমাণ হয় এই কথাই যে, ইউরোপীয়দের বাহ্য সভ্যতা-ভব্যতার অন্তরালে একটা জান্তব প্রবৃত্তি নিয়ত-বিদ্যমান, সামান্য বিরোধের উপলক্ষে তার লুকানো দাঁত ও নখ উদ্যত ও প্রকট হয়ে ওঠে।

শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এসেও দেখি, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের বহুবিধ উৎকর্ষ সত্ত্বেও তার বিষয়বস্তুর মধ্যে জীবনের শান্তি ও সৌন্দর্যের দিক অপেক্ষা সংঘাত আর বিক্ষেপের দিকটাই প্রবল। সেক্‌স্‌পীয়রের প্রায় প্রতিটি নাটকে মারামারি খুনোখুনি লেগে আছে। অন্যান্য বহু প্রসিদ্ধ বইয়ের ভিতরও হিংসার আঁশটে গন্ধ ছড়ানো। এটি বিষয়বস্তুর আকস্মিক কোন নির্বাচন নয়, এ ইউ-রোপীয় জীবনেরই বহিরভিব্যক্তি মাত্র। অথচ আমাদের কালিদাসে, ভবভূতিতে হিংসার নামগন্ধও নেই। বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' বাদ দিলে প্রায় প্রতিটি সংস্কৃত নাটক ও কাব্য বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে প্রশান্ত সৌন্দর্যে মণ্ডিত বলা চলে। মহাভারতে যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনী আছে বটে, কিন্তু সে কাহিনী এক উচ্চ ভাবাদর্শের দ্বারা বিধৃত। গীতা সেই উচ্চ ভাবাদর্শের প্রতীক। এ তো পুরাতন সাহিত্যের কথা, আধুনিককালের শ্রেষ্ঠ প্রাচ্য কবি রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীতেও দেখতে পাই, আত্ম-সমাহিত সংযত শান্ত ভাবেরই সেখানে জয়জয়কার। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের তফাৎটুকু বুঝতে দুই ভূ-খণ্ডের সাহিত্যের প্রতিতুলনা একটি বিশেষ সহায়ক উপাদান।

আজকের দিনে অনেকে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ—এই জাতীয় আঞ্চলিক বিভাজনের পক্ষপাতী নন। তাঁরা মনে করেন এইরূপ কৃত্রিম ভৌগোলিক সীমারেখা বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের আদর্শের পরিপন্থী, সুতরাং এগুলি বিলুপ্ত হওয়াই উচিত। আমরাও বিশ্বমৈত্রীর আদর্শের পরি-পোষক, তা বলে বিভিন্ন অঞ্চলের অসমান অগ্রগতির তত্ত্বটি ভুলতে পারি না, ভুলতে চাইও না। অসূয়ামুক্ত মন নিয়ে বিভিন্ন দেশের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের যত আলোচনা হয় তত ভাল। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের আলোচনামাত্রই উগ্র জাতীয়তার পরিপোষক না হতে পারে, বরং তা থেকে বিপরীত ফল জন্মানোও অসম্ভব নয়। গলদের আলোচনা আর গলদের চেতনা গলদ দূর করবার আবশ্যিক প্রাথমিক পদক্ষেপ, আর সমস্ত দেশের জীবন থেকে গলদ দূর হলে তবেই শুধু প্রকৃত বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব।

মরুতৃষা

(প্রবাসী গল্প-প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত-গল্প)

শ্রীধর্মদাস মুখোপাধ্যায়

মামার সঙ্গেই যাচ্ছে সীতা তবু যেন ভাল লাগছে না। বড় হয়ে কোনদিন মামার বাড়ী যায় নি। ছেলেবেলায় গিয়েছিল সে কথা মনে পড়ে না। তাই কেমন যেন লাগছে সীতার বাড়ী ছেড়ে যেতে।

মাকে প্রণাম করতেই অস্ফুট স্বরে মা বলল,—এসো।

বাড়ী থেকে যাবার সময় 'যাও' বলতে নেই কাউকে। বলতে হয় 'এসো।'

দাওয়া থেকে নেমে মেয়ে দু' পা গিয়েছে, পিছু ডাকল মা,—সাবধানে থাকিস আর মামী যা বলে শুনিস।

হাসি পাচ্ছে সীতার। সে যেন কচিখুকী।

যেতে যেতে ফিরে চাইছিল সীতা। কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখের জল মুছছে মা। সত্যিই ছেলেমানুষ তার মা। তার মত অত বড় মেয়ের জন্য আবার ভাবনা!

সীতা ফিরে এল মায়ের কাছে।—তুমি কিচ্ছু ভেব না মা।

চলে গেল মেয়েটা। মনে মনে বলল ভামিনী, 'যা, দুটো পেট পুরে খেতে পাবি মা! আহা! বয়েসের মেয়ে, পেট ভরে খেতে দিতে পারি নে। দু'দিন খেয়ে আয় ভালটা মন্দটা।

ছোট বোন কল্যাণী ছুটতে ছুটতে গিয়ে পথ আটকাল দিদির—তোর সাবান!

—তুই নে! আমি আর নেব না। সীতা হাসল একটু শুধু।

অবাক হয়ে চেয়ে রইল কল্যাণী দিদির মুখের দিকে। একদিন লুকিয়ে দিদির সাবান মেখেছিল বলে কি বকুনি!

বুঝতে পারল না কল্যাণী ব্যাপারটা। দিদি তো ভুলেই গিয়েছিল। মনে করিয়ে দেওয়ায় দিদি খুসী হোলো না। উল্টে তাকে দিয়ে দিল।

দোলের সময় মেলাতলায় গিয়ে দশ পয়সা দিয়ে ছোট্ট সাবানের টুকরোটা সীতা কিনে এনেছিল। কল্যাণী ছাড়া সাবানের কথা কেউ জানত না। মায়ের বকুনিকে দু'বোনই ভয় করত।

কল্যাণী সাবানটা পেয়ে খুব খুসী হয়েছে ভেবে সীতাও খুসী হ'ল একটু। সাবানটা ফিরিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই সীতার আনন্দর কথা মনে পড়ল। সাবান মাখার সঙ্গে যেন আনন্দ জড়িয়ে আছে। আনন্দ এসেছে দেখলেই সীতা গা ধুতে যেত সাবানের টুকরোটা নিয়ে। সীতা জানে আনন্দ এখন বেশ কিছুক্ষণ বসবে। বাবার সঙ্গে নয় মায়ের সঙ্গে গল্প করবে। তার পর এক সময় সন্ধ্যা নামলে তখনও আনন্দ উঠবে না। সন্ধ্যার পর চা খেয়ে তবে বাড়ী যাবে।

এদিক ওদিক দু'বার তাকিয়ে দেখল। আনন্দকে দেখা যায় কিনা!

কোথাও নেই। চারিদিকেই আনন্দের অভাব। মনে পড়ল আনন্দ গিয়েছে মাটি কাটতে। শুধু আনন্দ নয় তার বাবাও। যাবার সময় বাবার সঙ্গে দেখা হোলো না। মাকে প্রণাম করার সময় বাবার কথা মনে এসেছিল। কিছু বলে নি। কোন কথা শুধায় নি মাকে। বাবার কথা শুধালেই মায়ের দুঃখ বাড়ে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলবে এখুনই,—কপালে এও ছিল।

বাবাকে দেখলে সীতারই কি কম কষ্ট হয়! চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছরের মানুষটা এর মধ্যেই যেন বুড়ো হয়ে গিয়েছে। লম্বা দেহটা যেন অকালবার্দ্ধক্যে কুঁজো হয়ে এসেছে। সোনা-রূপোর অমন সুন্দর কাজ করতে পারে একথা যেন ভুলে যাচ্ছে সকলেই। সীতাও ভুলে যায় সময় সময়। রাত্রি জেগে রেড়ীর তেলের প্রদীপ জেলে কাজ করতে দেখেছে সীতা তার বাবাকে। কেমন সুন্দর হাতের কাজ। মকরমুখো পাশা গড়াতে দেখেছিল বাবাকে জমিদারদের মেয়ের জন্য। আর গলায় মেট্রো প্যাট্যার্ণের হার। কেমন চমৎকার নক্সার কাজ। যে দেখেছে সেই-ই প্রশংসা করেছে। সীতা ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় তার বন্ধু অনিতা দুল গড়িয়েছিল এক জোড়া। কত সুখ্যাতি করেছিল অনিতার মা আর অনিতা। বাবার যে হাত দুটো সোনার গলানো পিণ্ডকে ছেনি দিয়ে রাতের পর রাত কুঁদে কুঁদে ময়ূর-ময়ূরীকে পরস্পরের কণ্ঠলগ্ন করে অলঙ্কারের রূপ দিয়েছে সেই হাত টেষ্ট রিলিফের কাজে মাটি কাটছে মনে করলে যে তারও কান্না পায়। তাই তো যাবার সময় মায়ের কাছে বাবার কথা বলে নি।

সীতা যায় আর ফিরে ফিরে চায়। তাদের ঘরখানা

যেন পেছু টানে সীতাকে। পিছনের দেয়াল পড়ে গিয়েছে বর্ষার জলে। জেলেপাড়া থেকে একখানা ছেঁড়া নৌকার পাল চেয়ে এনে তাই দিয়ে ঢেকে দিয়েছে বাবা ঘরের আব্রু বাঁচাতে। ভাঙা ঘরের দিকে চাইতে চাইতে যায় সীতা। জোরে বৃষ্টি নামলে জলের ছাঁট এসে ভিজিয়ে দিত তাদের সকলকে। সারা রাত্রি বসে কাটাতে হোতো।

—আয় মা! পা চালিয়ে আয়! মামা তাড়াতাড়ি হাঁটার তাগিদ দিলো।

পা চালালো মামার সঙ্গে। অনেকটা পথ। ট্রেনে পাঁচ মাইল গিয়েও দু' ক্রোশ। ভালই হয়েছে। সীতাকে আর কয়েক দিন বাবাকে মুনিষের মত মাটি কোপাতে দেখতে হবে না। কল্যাণী আর কোলের ভাইটাকে খিদের জ্বালায় কাঁদতে দেখতে হবে না।

কেউ যখন বাড়ী ছিল না, তখন মামার কাছে মাকে তাদের সংসারের কষ্টের কথা বলতে শুনেছে সে। দুটো-একটা কথা শুনেছে সে। ভাল লাগে নি। কি হবে মামাকে তাদের কষ্টের কথা বলে?

—তুমি ওকে নিয়ে যাও দাদা! অত বড় মেয়ে আমার শুকিয়ে গেল সংসারের এই হাল দেখে!

—তোরা সবাই চল্ না; কিছুদিন ঘুরে আসবি?

—তা হয় না দাদা! তুমি তো জান ওকে: এখানে মাটি কেটে খাবে তবু কোথাও যাবে না!

মায়ের এ সব কথা মামাকে বলায় ভাল লাগে নি সীতার। উপায় নেই, ভালই হোলো। মায়ের চোখে জল দেখতে হবে না। বাবার শুকনো আর চিন্তাক্লিষ্ট মুখটা তাকে পীড়া দেবে না দিনরাত।

বাবার পাশাপাশি আর একখানা মুখও ভেসে ওঠে সীতার সুমুখে। আনন্দ কেন মরতে এল গাঁয়ে! বেশ তো শহরে কাজ শিখেছিল। শহরে কি সোনা-রূপোর দোকান নেই? সেখানে কাজ করলেই পারতো। তা নয়, গাঁয়ে দোকান খুলব। গাঁয়ে ব্যবসা করব। কর্ এবার ব্যবসা। লোকে খেতে পাচ্ছে না, গহনা গড়াবে; সারাদিন মাটি কেটে আড়াই সের গম এনে যাদের সংসার চলে তারা কি স্যাকরার দোকানে যায়? ভদ্রশূদ্র, চাষী-মজুর সবারই এক দশা। কাজ নেই, ব্যবসা গুটিয়ে যাচ্ছে।-পয়সা নেই মানুষের, কি দিয়ে ব্যবসা চলবে! হাতের কাজ বন্ধ, বাজার মন্দা। সীতা বুঝতে পারে,সারা গ্রাম জুড়ে এই অবস্থা। দু'চার ঘর মানুষ কেবল বাদ।

বিকালবেলায় গিয়ে সীতা মামার বাড়ী পৌঁছাল। মামী বেজায় খুসী,—থাক্ থাক্ আর প্রণাম করতে হবে না মা! এমনিতেই আশীর্বাদ করি, সুখী হও!

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারিদিক দেখছিল সীতা। মামাদের ঘরের অবস্থা তাদের চেয়ে অনেক ভাল। মামীমা কেমন সুন্দর দেখতে!

—হারে সীতা! তুই কত বড়টা হয়েছিস, তোকে এই এতটুকু দেখেছিলাম, বোস্ মা। বোস্, চা করে দিই, পা!

মামীর আদর-যত্নে সীতার ভালই লাগছে। বাড়ীতে আর কোন ছেলেমেয়ে নেই। চলে যায় কোন রকমে দু'জনার। সোনা-রূপোর কাজকর্ম মামাও করে। কিছু কিছু কাজ এখানে পায়। সীতা ভাবে, এখানে এখনও লোকে গহনা গড়াচ্ছে। বোধ হয় অবস্থা ভালই। এই কাজ করেই তো মামার চলছে!

—তোকে বাটনা বাটতে হবে না সীতা। আমি বাটছি।

—কেন মামীমা! আমিই না হয়—

—না মা! আইবুড়ো মেয়েকে শিলনোড়া কুটতে নেই। ওতে হাতের নখ ক্ষয়ে যায়।

সীতার হাসি পায়। মামীমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। হাতের নখ ক্ষয়ে যাবার ভয়ে মামীমা বাটনা বাটতে দেবে না। সে যেন এ বাড়ীর নূতন বউ!

মায়ের কথা মনে পড়ে সীতার। কই, মা তো কোন দিন বারণ করে নি? মামী যেন কি! তাকে কনে-বৌ পেয়েছে আর কি!

বিকালবেলায় মামীমার চুল বেঁধে দেওয়া চাই। ভাল লাগে না সীতার। আজকাল কি চুল বাঁধা আছে নাকি? মামীমা সেকেলে।

শুধু এক জয়গায় মামীমাকে ভাল লাগে। বিকাল-বেলায় গা-ধোবার সময় মামীমা বলবে, সাবান মাখ্‌বি রোজ, বুঝলি সীতা! সাবান না মাখলে রং ফরসা হয় না।

অবাক্ হয়ে তাকিয়ে থাকে সীতা মামীমার মুখের দিকে।

—তাকাচ্ছিস্ কি লো? বয়েসের মেয়ে সাবান-স্নো না মাখলে বিয়ে হবে কেন?

এবারে লজ্জা পায় সীতা। বিয়ের কথা মা দু'চার বার বাবাকে বলেছিল। বাবার উৎসাহ-উদ্যোগ না দেখে মাকে বকাবকি করতে দেখেছে সীতা।

—বিয়ের কি এমন বয়স হয়েছে? বাবা সাফ্ জবাব দিয়েছে।

মা গালে হাত দিয়ে বলেছে,—বল কি! সতের বছর বয়স হলো, এখনও বিয়ের বয়স হয় নি? আমার ক'বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল মনে আছে?

—সে সব কাল চলে গিয়েছে ?

—শোন কথা ! কাল গিয়েছে বলে মেয়ের বয়সও কমে যাবে নাকি ?

—সে তোমায় ভাবতে হবে না !

—ছেলে খুঁজতে হবে তো ?

—ছেলে ! সে ঠিক আছে।

সীতা জানে বাবার এ ভরসা কোথায় ! মায়েরও ভরসা ছিল আনন্দর ওপর। আনন্দ নবাবী করে আর ভাল করে ব্যবসা না করায় এখন মুনিষ খাটছে। তাই মায়ের ভাবনা বেড়েছে। দু' বিঘে জমি যা ছিল আনন্দ তা বেচে খেয়েছে। এখন কি বেচবে। বাবার সঙ্গে মুনিষ খাটার কাজে নেমেছে।

বিয়ের কথায় আনন্দর কথাই মনে এসেছে সীতার। মুনিষ খেটে আসার পর না-খাওয়া শুকনো মুখটাও আনন্দর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাকে দেখে, একথা ভাল করেই জানে সীতা। আনন্দর চোখের ভাষা পড়ে দেখেছে সীতা। সেখানে তার কথাই লেখা আছে। প্রথম প্রথম আনন্দর তাদের বাড়ী আসার কথা মনে পড়ে। সেজেগুজে ফিট্‌ফাট্ বাবু আসত। খোপ-দেওয়া জামা-কাপড়, পায়ে জুতো। আনন্দর সাজার বহর দেখেই তো সীতাকে লুকিয়ে লুকিয়ে দশটা পয়সা জমিয়ে সাবান আনতে হয়েছিল। সাবান মেখে গা ধুয়ে এসে চা হয়ে গেলে এক কাপ চা নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালে আনন্দর চোখ দুটো খুসীতে চিক্‌চিক্ করত।

একদিন তো শুধিয়েছিল আনন্দ চুপি চুপি,—কি সাবান মাখ বলত ? ভারী সুন্দর গন্ধ !

লজ্জায় মুখ তুলে কোন কথা বলতে পারে নি সীতা।

প্রথম প্রথম মায়েরও ভাল লেগেছে। আনন্দর চেহারাও যেমন সুন্দর আর কাজ-জানা ছেলে। তাই লুকিয়ে লুকিয়ে সাবান মেখে গা ধুয়ে এসে আনন্দর সামনে হাসিমুখে দাঁড়ালে মায়েরও মুখে হাসি ফুটেছে। মনে হয়েছে দুটিতে মানাবে ভাল।

কিন্তু আনন্দর মুনিষ খাটার চেহারা ভাল লাগে নি মায়ের। জোয়ান ছেলের ও কি রূপ !

সন্ধ্যার অন্ধকারে বসে ভাবছে সীতা। দূরে আকাশের গায়ে কে যেন এক-একটি সান্ধ্যপ্রদীপ জেলে দিচ্ছে। পাখীরা অন্ধকারের মধ্যেই ডানা ঝট্‌পট করে বাসায় ফিরছে একে একে। ভারী ভাল লাগে এসময় একলা একলা বসে আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে !

—কে ? চমকে উঠেছে সীতা।

—একা একা বসে, ভয় পেয়েছ নাকি ?

কেমন গা শিরশির্ করে আনন্দর পাশে বসে থাকতে। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের কথা মনে হয়। আনন্দর গায়ে এখনও কাদা-মাটির দাগ। কেন যায় আনন্দ মাটি কাটতে ? মা আর নিজের পেটের জ্বালায় ? জ্বালা বাড়লে কি হবে ?

—চা নিয়ে যা সীতা—

মায়ের লক্ষ্য সব দিকে। আগে এতদিকে লক্ষ্য রাখতে হতো না। আনন্দ যে আর আনন্দ দিতে পারছে না। একটা মুনিষের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের কথা ভাবতেই ভামিনীর গায়ে জ্বালা ধরে।

মামার বাড়ী ভালই লাগে। প্রথম দু'চার দিন ভাত খেতে গিয়ে কেবল কল্যাণী আর কোলের ভাইটার কথা মনে পড়েছে। ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে কষ্ট হয়েছে। মনে হয়েছে, কল্যাণী এক মুঠো ভাতের জন্যে মাকে বিরক্ত করছে। দু'খানা রুটি সময়ে দিতে পারে না মা। বিরক্ত হয়ে দমাদম মারছে হয়ত। ভাইটা ক্ষিদের জ্বালায় কেঁদে কেঁদে মাটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

—কি রে হাত গুটিয়ে বসলি যে, ক্ষিদে নেই ?

কথা বলে নি সীতা। ভাইবোনের কথা ভাবলে ক্ষিদে থাকে ?

কয়েক মাস কেটেছে। আর ভাল লাগে না। ভাই-বোনকে না দেখে কেমন যেন মনটা খালি খালি লাগে। বাবা এখনও কি মাটিই কাটছে ? না বোধ হয়। দুঃস্বপ্ন কেটেছে। আবার বাবা গহনা গড়ানোর কাজ করছে। রাত জেগে টুক্‌টাক্ শব্দ করে কাজ চলছে বারান্দায়। মায়ের হাসিমুখ।

—যাবি বাড়ী ? তবে যা, ঘুরে আয়। মেয়ে নিতে গাঁয়ের লোক এসেছে যখন, ঘুরে আয়।

রাস্তায় নামবার আগেই মামীমা চুল বেঁধে সীতাকে সাজিয়ে দিয়েছিল। মুখে স্নো-পাউডার।

আসবার সময় মামীমা বলে—সাবান আর স্নোর কৌটোটা নিয়ে যা সীতা। আইবুড়ো মেয়ে, এসব মাখতে হয়।

স্নোটা নিতে চায় নি সীতা। মামীমার কথায় সাবানটা নিল সঙ্গে। নতুন সাবান, ভুর ভুর গন্ধ !

সকালবেলায় বেরিয়ে বেলা থাকতে গাঁয়ে ঢুকল। সঙ্গে দীনু কাকা। মেয়ের বাড়ী গিয়েছিল।

কেমন নতুন নতুন লাগছে গ্রামকে। রাস্তাগুলো টেষ্ট রিলিফের মাটিতে উঁচু হয়েছে। বসন্তের পাতা-ঝড়া বিকাল। রুক্ষ বিবর্ণ চারিদিক। তবু ভাল লাগে।

বাড়ী ঢুকল সীতা। ঘরের মধ্যে ভাই-এর কান্না শুনতে পেল।

—মা!

—সাড়া নেই। কেবল ভাই-এর চীৎকার একটানা।

সীতা ঘরে ঢুকে অবাক্। ভাইকে পিটোচ্ছে মা বেদম। আর তার তারস্বরে কান্না।

অবাক্ হয়ে গেল ভামিনী সীতাকে দেখে। মার বন্ধ করল। তার পর চেয়ে রইল সীতার দিকে। কে? এই তার মেয়ে সীতা! ও কার সঙ্গে এল, না জানিয়েই এল কেন? কি জন্যে এল?

মায়ের নীরব প্রশ্নগুলো সব যেন শুনতে পেল সীতা। তাই আপনমনেই জবাব দিল,—অনেকদিন তোমাদের কোন সংবাদ পাই নি, তাই চলে এলাম, ভাল লাগছিল না।

কোন কথা বলে না ভামিনী। বসতেও বলে না, যেতেও বলে না। কি বলবে নিজের পেটের মেয়েকে? ছেলেটাকে তো দমাদম মেরেছে। এত ক্ষিদে কেন? মারের ভয়ে পেটের ক্ষিদে চেপে কল্যাণী পালিয়েছে। খেলার ছলে ক্ষিদেকে ভুলে থাকতেই চেয়েছিল কল্যাণী। পারে নি, কেমন যেন পেটটা মোচড় দিয়ে ওঠে। সমস্ত দেহটা অসার হয়ে আছে। কেমন যেন একটা বোবা যন্ত্রণা। সহ্য করতে পারে না কল্যাণী। মনে হয় ভাই-এর মত হাউ হাউ কাঁদে। কাঁদলে কি ভাই-এর ক্ষিদে কম লাগে?

যেন চিনতে পারে না সীতা কাউকেই। কি চেহারা হয়েছে ভাইটার। সীতাকে দেখে একটু কান্না থামিয়েছিল। তার পর আবার সুরু করল। মায়ের দিকে তাকান যায় না। যেমন গায়ের রং কালো হয়েছে তেমনি কণ্ঠার হাড়টা বেরিয়েছে। আর চোখ দুটো! জ্বলছে রাগে আর ক্ষোভে। পোড়াতে চাইছে বিশ্ব-সংসারকে ও চোখ। ক্ষিদের জ্বালায় মায়ের চোখেও কি বোবা যন্ত্রণা?

ছেলেটাকে ফেলে মা কোথায় বেরিয়ে গেল। একটা কথাও বলল না সীতার সঙ্গে। কেমন হয়ে গিয়েছে তার মা। বাবা বোধ হয় কোথাও বেরিয়েছে। টেষ্ট রিলিফের কাজ এখনও চলছে না বন্ধ হয়ে গিয়েছে?

ভাইকে কোলে নিতে গেল, কিছুতেই আসবে না কোলে। ভুলে গিয়েছে দিদিকে। জোর করে কোলে নিয়ে দাঁড়াতেই ঠক্ করে কি যেন পড়ল। চমকে উঠল সেদিকে চেয়ে। সাবানটা। মামীমার দেওয়া গায়ে-মাখা সাবান। সাবানের কথা ভুলেই গিয়েছিল সীতা। ভাগ্যি মা নেই। দেখে নি এটা। এই সাবানটা আনার সময়ও সীতার একবারও মনে হয় নি এটা তাদের বাড়ীতে ভারী বেমানান হবে। ভুলেই গিয়েছিল, ক্ষুধার রাজ্য—এখানে খাবার ছাড়া আর কিছুরই কারও প্রয়োজন নেই।

অন্যমনস্ক হতেই ভাইটা কোল থেকে নেমে পড়েছে। আঁকড়ে ধরেছে সাবানটাকে মুখের কাছে খাবার মনে করে। দু'হাতে মুঠো করে ধরে মুখে পুরতে চাইছে। মুখে যাচ্ছে না। রাগে আর ক্ষিদেয় কাঁদছে। মুখ থেকে মাটিতে পড়ে গেলে চীৎকার করে আবার সাবানটাকে মুখে তোলার চেষ্টা করছে।

ভাই-এর কাণ্ড দেখে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠল সীতা। এ কোথায় এল সে! বেশ ছিল তো! তার দু' বছরের রুগ্ন ভাইটা ক্ষিদের জ্বালায় সাবান নিয়েই মুখে পুরছে।

—দাও ওটা! খোকন!

কেড়ে নিতেই চীৎকার। দাও খেতে দাও। ক্ষিদের রাজ্যে কোন বাচবিচার নেই। হাঁ করে খেতে চাইছে। সর্বগ্রাসী ক্ষুধা ঐটুকু ছেলের! না দিলে কেঁদে হাত কামড়ে অস্থির করছে। সীতার হাতটাকেই কামড়ে খেতে চায়। যা পাবে তাই খাবে।

সীতা কাঁদে আর অবাক্ হয়ে ক্ষুধার্ত ভাই-এর কান্না দেখে।

—কে?

সর্বাঙ্গে মাটি মেখে এসে উঠানে দাঁড়াল লোকটা। চেনা যায় না যেন।

—বাবা! ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সীতা।

অবাক্ হয়ে তাকিয়ে মাটি-কাটা মুনিষ দেবনাথ দে। কে বসে তার ভাঙা ঘরে সাজগোজ করা মেয়েটা? চিনতে পারছে না দেবনাথ। বাবা বলছে কাকে? আর কাঁদছেই বা কেন?

এগিয়ে গেল সীতা। দাওয়ায় গিয়ে দাঁড়াল।

—সীতা? তোর মা কই? এই নে, তাড়াতাড়ি রুটি কর্ দেখি?

বাবা কথা বলেছে। চুপি চুপি চোরের মত মাটি-কাটা গম-ভাঙিয়ে আনা আটাগুলো সীতাকে দিয়েছে। নে রুটি কর? কেউ খায় নি সারাদিন! নে ধর্ তাড়াতাড়ি।

সম্বিৎ ফিরে পেল সীতা। আটার থলিটা বাবার কাছ থেকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। মেঝের ওপর সাবানটা চোখে পড়ল আবার। ভাই-এর আক্রমণে ওপরের কাগজটা বিধ্বস্ত।

—ওঃ! তাড়াতাড়ি সীতা সাবানটা কুড়িয়ে নিল। কোথায় লুকোবে ওটাকে! এ সংসারে এর ঠাঁই নেই। এ যে ভয়ানক দৃষ্টিকটু। কোথায় একে সরিয়ে রাখবে? তাড়াতাড়ি একটা ছেঁড়া ন্যাকড়ায় জড়িয়ে চালের বাতায় লুকিয়ে রাখল ওটাকে। ভাগ্যি মা দেখে নি!

উদ্‌ভ্রান্তের মত সীতাকে দেখে মা কেন বেরিয়ে গিয়েছিল বুঝতে পারে নি সীতা। এবারে মা ফিরেছে কোঁচড়ে কিছু নিয়ে। দৃষ্টিতে আবিলতা নেই। বিষণ্ণ ম্রিয়মাণ মুখ। রণক্লান্ত সৈনিকের মত।

বাটিতে করে একমুঠো চালভাজা দিল ভামিনী মেয়েকে খেতে। বলল,—খা সীতা। চালভাজা ক'টা খেয়ে নে।

—খোকন খাবে না? খোকনের কই?

—ও রাক্ষসের জন্যেও রেখেছি।

ছোট্ট বাটি করে দিতেই খোকন হুমড়ি খেয়ে পড়ল। অমৃত পেয়েছে। দু'হাতে খাচ্ছে। যেন কতকাল কিছু খায় নি। সারা দুনিয়ার ক্ষুধা একত্রিত হয়ে খোকনের জঠরে এসেছে। মুঠোর পর মুঠো চালভাজা মুখে দিচ্ছে, ছড়াচ্ছে, খাচ্ছে—পৈশাচিক উল্লাস প্রকাশ করছে। অবাক্ হয়ে চেয়ে দেখছে সীতা। খাবে কি! তার ক্ষিদে নাই। মাস তিনেক গিয়েছে, এর মধ্যে কত পরিবর্তন হয়েছে। তার কত আদরের ভাই খোকনমাণিক, বেলা শেষ হতে চলেছে একমুঠো মুড়ি পর্যন্ত পায় নি।

মুড়ি খাবার ইচ্ছা ছিল না। মায়ের মুখের দিকে চেয়ে ভয়ে ভয়ে একগাল মুখে দিতেই কল্যাণী এসে সীতার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল—দিদি তুই!

অনেকদিন পরে তার ব্যথা-বেদনা বোঝবার লোক পাওয়ার আনন্দ আর সারাদিন না-খেয়ে থাকার ক্ষুধার যন্ত্রণা দুই মিশে অভিভূত কল্যাণী দিদির বুকে আশ্রয় নেয়। দুই বোনের চোখের জল এক ধারায় নামতে থাকে। এই দিদিকেই যেন খুঁজছিল সে।

—কত রোগা হয়ে গিয়েছিস কল্যাণী!

ম্লান হাসল কল্যাণী। চোখে জল। কিছু বলতে গিয়েও মায়ের মুখের দিকে চেয়ে কিছুই বলল না। কেবল কাতর চোখে দিদির মুড়ির বাটির দিকে চেয়ে রইল।

—তুই খা কল্যাণী। আমার ক্ষিদে নেই।

নিষ্প্রাণ পাথরের মত দেবনাথ দাওয়ায় বসে। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে দেখছে নাটক দেখার মত। অন্য একটা অঙ্ক হচ্ছে নাটকের। রোজ যে অঙ্ক হয় আজ সে নাটক নয়। ভামিনী কথা বলছে না, কপাল চাপড়ে কাঁদছেও নয়। কালকেও যে বলেছিল—এই সন্ধ্যের সময় গম ভাঙিয়ে নিয়ে এলে! তোমার কি আক্কেল নেই, মানুষের চামড়া নেই দেহতে!

—কি করব বল? মাটি মাপ করে বাবুরা টোকেন না দিলে তো আর গম পাব না!

—বাবুদের বলতে পার না? মেয়েমানুষ নাকি? সারাদিন না খেয়ে এই কচি বাচ্চা থাকতে পারে?

চুপ করে ছিল দেবনাথ।

—গলায় দড়ি দিতে পার না! হয় তুমি মর না হয় আমি! এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না।

সত্যিই তাই মনে হয়েছিল দেবনাথের। এ যন্ত্রণার চেয়ে এ জীবন শেষ করে দেওয়াও ভাল। পারে নি, সেটুকু উত্তেজনাও দেহে নেই। এ অঞ্চলের সেরা স্বর্ণকার মাটি কেটে কেটে যান্ত্রিক জীবন বয়ে চলেছে। এ চলার ব্যতিক্রম নেই, তাপ-উত্তাপ নেই!

কল্যাণী অবাক্ হয়েছে সবচেয়ে বেশী। দিদি এসেছে বলে মায়ের বকুনি নেই। মার খেতে হচ্ছে না অকারণে। বাবাকে গালাগালি করা নেই। মনে মনে খুসী হয় কল্যাণী, ভালই হয়েছে দিদি এসে। কিন্তু আসলে যে খারাপ। তাদের গোনা রুটি থেকে দিদি ভাগ বসাবে।

অতক্ষণ আনন্দের কথা ভাববার সময় পায় নি সীতা। আনন্দ এল। যে আনন্দকে দেখে গিয়েছিল সীতা এ যেন সে নয়। এ যেন তার কঙ্কাল। মুখে হাসি নেই। গায়ে ছেঁড়া আর ময়লা একটা গেঞ্জি, ছেঁড়া দিয়ে পাঁজরের এক-একটা হাড় যেন গুণে নিতে পারে সীতা। ভাবলেশহীন ফ্যাকাশে একখানা মুখ। এ মুখে ভাল-মন্দের কোন অভিব্যক্তি ফুটে উঠবে না। কেবল ধরা-বাঁধা দিনযাপনের ক্লান্তিকর ছাপ সারা মুখে।

—দেবুদা, সারা দিন মাটি কুপিয়েও যে সাত পোয়া দু' সেরের বেশী গম পাওয়া যাচ্ছে না, কি করা যায় বল?

দেবনাথ কথা বলবে কি আনন্দের কাছ থেকেই উত্তর শোনার জন্যই চেয়ে রইল এক ভাবে।

—শালা দালালের দলই সর্বনাশ করল! ও বেটারা না খেটে চুরি করবে। মোহরার আর পে-মাষ্টারের জন্য চা বয়ে এনে, নয়ত ডিম খুঁজে এনে দিয়ে আড়াই সের পুরো গম পাচ্ছে, আর আমরা খেটে পাব না?

কান খাড়া করে কথা শুনতে লাগল সীতা। না কঙ্কাল কথা বলেছে, এখনও মরে নি। এখনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলে আনন্দ। এখনও ভাল-মন্দ বিচার করতে পারে।

দু'দিন যেতেই হাঁপিয়ে উঠল সীতা। এখানে সন্ধ্যের

বছর যাবৎ খেয়ে-না-খেয়ে এই ভাঙা বাড়ীতে মানুষ হয়েও কেমন যেন সব নতুন নতুন মনে হয় সীতার। ভাল লাগে না। এই হাহাকারের মধ্যে থেকে কান্না পায়। তার বাবার মত কারিগরকে মাটি কেটে খেতে হয়, এই দেশ! খাটতে গেলে পুরো মজুরি মেলে না। যারা খাটে না চুরি করতে পারে আর চুরিকে প্রশ্রয় দেয় তারা আড়াই সেরের জায়গায় পাঁচ-সাত সের গম পায়। তার বাবা আর আনন্দর মত ভাল মানুষেরা পুরো মজুরির আড়াই সের গমও পায় না।

—দিদি, সাবান মাখবি? স্নান করতে যাবার সময় চুপি চুপি কল্যাণী সাবানের কথা মনে করিয়ে দেয়। তোর সেই ছোট্ট সাবানের টুকরোটা এখনও আছে।

চমকে ওঠে সীতা। সাবান মাখার দিন চলে গিয়েছে। সাবান মাখার আবহাওয়াও আর কোনদিন ফিরে আসবে না।

—আনব দিদি সাবানটা?

—না।

দিদির দিকে চেয়ে থাকে কল্যাণী। মনে হয়, দিদিও যেন কেমন হয়ে গিয়েছে।

সন্ধ্যার পর আর চা হয় না সীতাদের। আনন্দকে চা দেবার বালাইও নেই। তবু আনন্দ আসে, বসে। ছটো-একটা মাটি-কাটা আর মজুরির সম্বন্ধে কথা বলে। তার পর আর কথা নেই। সীতা নিজেই বেহায়ার মত চেয়ে থেকেছে আনন্দের দিকে। আনন্দ যেন সীতাকে দেখতেই পায় না। উদাস শূন্য দৃষ্টি! কোন্ দিকে সে চেয়ে আছে কে জানে।

—দিদি!

কল্যাণী সকাল বেলায় পুকুরে যেতে যেতে গল্প করে।

—কিরে?

—আমরা না খেয়ে মরছি, তা তুই কষ্ট পাচ্ছিস কেন?

জবাব দেবে কি, অবাক্ হোয়ে চেয়ে রইল সীতা দশ বছরের বোনের দিকে।

—তুই মামার বাড়ী চলে যা দিদি? আমাকে প্রথম দিন এসেই শুধাচ্ছিলি কেন রোগা হয়েছি। বুঝতে পারছিস্ এবার? দেখিছিস্ মায়ের চেহারা। আমরা তো তবু ছ'খানা যা হোক খাই। আর মা?

নির্বাক সীতা দাঁড়িয়ে রইল পুতুলের মত।

পুকুরঘাটে লোক নেই বেশী। যারা আছে তারা অন্য গল্প করে না, কেবল ঐ এক কথা। জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। আগুনের দর। কি হবে যে!

সন্ধ্যা নামলে ভাল লাগে সীতার। অন্ধকারে অনেক কিছুই দেখা যায় না। ভাল লাগে আকাশের পানে চেয়ে থাকতে। অনন্ত আকাশ! ওখানে কোন চিন্তা থই পায় না। ভাবনার জাল আকাশকে এতটুকুও ছুঁতে পারে না।

—তুমি আর সাবান মাখ না?

চমকে উঠল সীতা। কে কথা বলছে। কার বুক-ভাঙা দীর্ঘশ্বাস এ!

—আমি আনন্দ।

স্থির হয়ে বসেই রইল সীতা। মরা মানুষটা আবার বেঁচে উঠেছে নাকি? স্বর্ণকার হয়ে সারাদিন মাটি কোপানো মুনিষের মুখে সাবান মাখার মত বিলাসিতার কথা!

—না! এত আস্তে বলল যে নিজের কথা নিজেই শুনতে পেল না সীতা।

—আবার সাবান মেখ! ভারী সুন্দর দেখায় তোমাকে!

ছ' চোখ ভরে জল আসে। সমস্ত হৃদয়-মন জুড়িয়ে যায় সীতার। মনে হয় সমস্ত ব্যথা-বেদনা অন্তরের সমস্ত আকুতিকে ঢেলে দিয়ে ও জীবনের জয়গান শোনাচ্ছে। বলছে, সুন্দরের মৃত্যু নেই, ক্ষুধা আর অনাহারের রাজ্যেও জীবন আছে। এমন করে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আনন্দ বাঁচার কথা বলছে। মরা মানুষটা বাঁচতে চাইছে।

না, এ ভাবে নয়। তিলে তিলে ক্ষয়ে ক্ষয়ে বাঁচা নয়! বাঁচার মত বাঁচতে হবে। কি করবে। কোথায় যাবে!

আবার সেই মামার বাড়ী। ভালই হোলো। বাঁচল।

কারাগার থেকে মুক্তি পেল। এই ছুঃস্বপ্নের দেশ থেকে পালাতে পারবে সে। চোখের সামনে ছোট ভাই-বোনের আধপেটা খেয়ে থাকা আর দেখা যায় না। সীতার মনে হয় ভাইবোনটাকে অন্ততঃ সে সঙ্গে করে নিয়ে যায় মামার বাড়ীতে। ওদের ছ' মুটো ভাত খাইয়ে আনে। সেদিন বাড়ীতে ভাত হয়েছিল হঠাৎ। কি আনন্দ কল্যাণীর। দিদির গলা জড়িয়ে ধরে বলেছে, —দিদি আজ ভাত খাব আমরা। কি আনন্দ বল্ দেখি!

সীতা তার উদ্গত অশ্রু-বন্যাকে কোন রকমে চেপে রাখতে পারে না। আনন্দ, এক মুটো ভাত খেতে পাওয়ার আনন্দ! এ আনন্দও শিশুরা পাবে না? সীতার মনে হয় আকাশ-বাতাস-চন্দ্র-তারকা খুঁজে দেখে কে এ আনন্দটুকু কেড়ে নিয়ে গেল।

দীমুকাকার সঙ্গে চলেছে সীতা আবার মামার

বাড়ী। মা জোর করে পাঠিয়ে দিয়েছে। পথ চলতে চলতে ভুলতে পারে না খোকনের কথা।

থাক, ফেলে এসেছে যা তা পিছনে পড়ে থাক। ভুলে থাকতে চায় সে। দুঃস্বপ্নকে আঁকড়ে থাকবে না। মনে করতে চায় মামীর কথা। মামীর আদরের কথা। 'আইবুড়ো মেয়ে—বাঁটনা বাটতে নেই।' দুঃখের মধ্যেও হাসি পায়।—'সাবান মাখতে হয়, তবে তো ফর্সা হওয়া যায়।

না, ভুল করে নি সীতা। সাবানটা সঙ্গেই এনেছে। বাড়ীতে সাবানের কথা ভাবাই যায় না। অন্ধকারের রাজ্যে ওর প্রবেশ নিষেধ। প্রথম দিন বাড়ী ঢুকে যে ভাবে ন্যাকড়া জড়িয়ে চালের বাতায় সাবানটাকে গুঁজে রেখেছিল সেই ভাবেই নিয়ে এসেছে। মামার বাড়ী গিয়ে খুলবে একে। অনেক দিন পরে সাবান মাখবে। স্নো মাখবে, না মাখলে মামী যে রাগ করবে।

পথ চলতে চলতে রাস্তার দু' ধারে বাড়ীগুলোকে ছবির মত মনে হয় সীতার। রাস্তার পাশে ঝোপে টুনটুনী পাখী খেলা করে। মনটা খুশীতে ভরে ওঠে। পৃথিবীতে আনন্দ আছে, উল্লাস আছে! অমনি করে টুনটুনী পাখীর মত ইচ্ছা হয় সীতার লাফিয়ে লাফিয়ে মুক্ত আকাশের নীচে খেলা করে। হাঁটতে হাঁটতে সাবানটা বার করে এ-হাত থেকে নিয়ে ও-হাতে লুফা-লুফি করে। আঘ্রাণ নেয়। চমৎকার গন্ধ। মনটা ভরে ওঠে সুগন্ধে।

সীতা মামার বাড়ী ঢুকতেই দীনুকাকা চলে গেল, সীতা একা। বাড়ীতে কেউ নেই যে!

—মামীমা!

সাড়া নেই কারও।

—মামীমা!

—কে রে? ঘরের মধ্যে থেকে ক্ষীণ কণ্ঠের আওয়াজ এল।

—আমি সীতা!

ঘর থেকে বেরিয়ে এল মামীমা। চেহারাটা কেমন যেন রোগা রোগা, মুখে হাসি নেই।

সীতা গিয়ে দাওয়ায় উঠে বসল। মামীমা বসতে বলতেও ভুলে গেছে। শরীরটা খারাপ হয়েছে নিশ্চয়ই!

—কি হয়েছে মামীমা?

কথার জবাব দেবার আগেই দু'জনেই উঠোনের দিকে চাইল। সর্বাঙ্গে মাটি মেখে এসে দাঁড়িয়েছে লোকটা। মাথায় ঝুড়ি আর হাতে কোদাল।

চমকে উঠল সীতা! কে? এ সাজ এখানে কেন? বাবা! আনন্দ!

মূর্তিটা ঠায় দাঁড়িয়ে। প্রথমে চিনতে পারে নি সীতা। ভাল করে চেয়ে দেখে চাপা আর্তনাদ করে ওঠে—মামা!

সীতা যেন আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। চারিদিক অন্ধকারে ছেয়ে আসছে। লক্ষ লক্ষ অন্ধকার শিশু করতালি দিয়ে অট্টহাসি হাসছে!

—সীতা এলি? মামাই কথা বলল, কথা নয়, যেন হাহাকার করে উঠল মানুষটা।

মামীর দিকে চোখ তুলল সীতা। ভাবলেশহীন এক পাষাণ প্রতিমা বসে। নিথর দুটো চোখের নীচে কান্নার এক মহাসমুদ্র তোলপাড় করছে। মুক্তি পেলে যেন বিশ্বসংসার ভাসিয়ে দেবে।

এগিয়ে আসছে মামা। সম্বিৎ ফিরে পায় সীতা। খেয়াল নেই কখন হাত থেকে তার সাবানখানা মাটিতে পড়ে গিয়েছে। মামীমার দিকে আবার চাইল। না মামীমা দেখে নি।

তাড়াতাড়ি সাবানটা কুড়িয়ে নিল সীতা। কোথায় লুকোবে! আর যে লুকিয়ে রাখার জায়গা নেই কোথাও!

রাজরাণীর যুগ

জ্যোতির্ময়ী দেবী

অসূর্যম্পশ্যলোকে

আগে বলেছি যে, এই সব রাজ-অন্তঃপুরের উৎসবে যোগ দেবার আমন্ত্রণে খাওয়ানো প্রথা ছিল না মোটেই। কিন্তু প্রাসাদের মধ্যে একবার কি জন্য যেন একটা জলসায় আমাদের নিমন্ত্রণ বা আমন্ত্রণ এলো। সেদিন গিয়ে দেখি, সেটি একটি ভোজসভা এবং 'নজর সভা' রাজরাণীদের নয় সেটা। সেটা শোনাবার মত, তাই বলছি। এ সময়ে আর দাদা ঠাকুমা বেঁচে নেই। মা'র সঙ্গে আমি যাব।

সেদিন দুপুরের শেষ দিকে বাড়ীতে রথ এলো। নিজেদের ঘরের গাড়ী মোটর কিম্বা নিজেদেরই বাড়ীতে রথ থাক বা না থাক—রাজবাড়ীর আমন্ত্রণে তাদের প্রেরিত রথেই যেতে হবে, গাড়ীতে নয়—এই ছিল নিয়ম। কখনোই আমরা বাড়ীর কোনো গাড়ী করে যাই নি। সেই লাল পোশাক-পরা চোপদার দারোয়ান মশালচি (রাত্রি হলে) পদানুসারে ঘোড়সওয়ার আগে পিছনে নিয়ে রথ আরোহণ করে 'রথযাত্রা' হবে এই প্রথা ছিল।

এদিন রথ এলো বিকালের দিকে। আমরা দু'জন মাত্র মা আর আমি সেদিনের যাত্রী।

ঠিকমত কায়দা-কানুন নিয়ম মাফিক কানাতঘেরা অন্তঃপুর তোরণ দ্বারে নামা হ'ল এবং খুশনজরজীর (পোষ্য) পুত্র প্রধান খোজা আমাদের আগে পিছনে দাসী বা প্রতিহারিণীর সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

প্রাসাদটির নাম চন্দ্রমহল। ভিতরে যে অতবড় বাগান ফোয়ারা বাঁধানো প্রাঙ্গণ রোয়াক চত্বর (চবুতারা) আছে কখনো জানতাম না।

সেই বাগানের দিকে দিকে ফোয়ারাগুলির চারিধারের বাঁধানো রোয়াকে পড়েছে দু'সারি করে পিঁড়ি··· বেশ বড় বড়। এবং দলে দলে নানা শ্রেণী নানা জাতি নানা পদমর্যাদাশালিনী নারীরা শেঠানীর দল কর্মচারী পত্নীর দল অন্য শ্রেণীর মেয়েদের শ্রেণীবিভাগ করে দাসীরা খোজারা আনছে। এবং সেই দু'খানি পিঁড়ির একখানিতে বসানো হচ্ছে।

পিঁড়ি দু'খানি সামনা-সামনি। একখানিতে বসা হবে আর অন্য খানিতে ভোজ্য দেওয়া হবে বা হয়েছে।

ঐ ভোজ্যকে ওরা 'কাঁসা' বলে। প্রকাণ্ড একখানি পিতলের বা কাঁসার থালায় (আমাদের সেকালের বিয়ের দানের বড় বড় থালার মত) চল্লিশ-পঞ্চাশটি বাটি বা পাতার 'দোনায়' (ঠোঙ্গা) রাখা খাবার।

নানা রকমের মিষ্টি লুচি তরকারী নোন্তা খাবার সেউ (ঝুরিভাজা) নিমকী প্রচুর করে ভরা। একজন মানুষ খেতে পারবে না। সপরিবারের খাদ্য প্রায়। কেননা সব 'দোনাতে'ই ৫।৬টা করে মিষ্টি-মোণ্ডা রকমারী খাবার ভরা, লুচি তরকারী ও পাঁপড় (সবই নিরামিষ খাদ্য আদি)।

আর পাশাপাশি সারি সারি অলঙ্কার ভারাক্রান্তা শেঠানীরা, বৈশ্যানী, ব্রাহ্মণী বড় বড় ঘরণী গৃহিণীরা দীর্ঘ অবগুণ্ঠন এবং বাইবা (কন্যারা) স্বল্পগুণ্ঠনাবৃতা হয়ে বসলেন।

খোজারা এবং দাসীরা তদারক করতে লাগল। খাওয়া ও বসার কে কোন্ শ্রেণীতে বসবে।

খাওয়া সুরু হ'ল। বাইবাকন্যাদের ঘোমটা কম রাখা ক্ষমার্হ। অতএব আমার মুখটা ঢাকা ছিল না।

হ্যাঁ, খাবারে হাত দিয়েছি এবং আশ-পাশে ভোজন সভাটা দেখছি।

কি আশ্চর্য! সবাই বসেছেন হাতে করে খাবার তুলছেনও! কিন্তু কেউ-বা একটু টুকরা মিষ্টি ছোট্ট একটুখানি কোণ ভাঙলেন। অতি সন্তর্পণে ঘোমটা এবং প্রকাণ্ড নথের ফাঁক দিয়ে মুখে তুললেন! কেউ-বা একটুখানি 'সেউ' (ঝুরিভাজা) হীরামতীর আংটি শোভিত মেহেদী চিত্রিত আঙুলে করে তুলে মুখে দিলেন। বাস! তার পর হাত-গুটিয়ে নিলেন। আবার খানিক পরে কোলের দিকের কাছাকাছি দোনাটা থেকে হয়ত সামান্য কি একটু ভেঙে নিলেন আবার মুখে দিলেন! আবার হাত নিশ্চল। হাতটা দূরেও যাচ্ছে না।

আমরা প্রথমটা অত লক্ষ্য করি নি। পাশে দেখি একদল মোটা মোটা সেলাওয়ার কামিজ ওড়না পরা বিশাল বপুশালিনী পেশোয়ারী হিন্দু-মহিলা ওখানকার সৈন্য-বিভাগের কর্তা ধনপৎ রায়ের বাড়ীর মেয়েরা বসে।

তাঁরাও ঐ ভাবে একটু-আধটু কি মুখে তুললেন, খানিক পরে রুমালে হাত মুছে বসে রইলেন।

খোজারা-দাসীরা এসে পরম বিনয় সহকারে কেন খাচ্ছেন না, আর কি খাবেন জিজ্ঞাসা করে যেতে লাগল। যদিও সামনে "থালা ভরা আছে মিঠাই!" চেয়ে দেখি দূরে কাছে ঐ প্রকাণ্ড চাতাল প্রাঙ্গণের চারিধার ঘিরে-বসা নানা রঙের রঙীন বসন-ভূষণের গহনার সমারোহময় সাজ-পোশাক পরা—ঘাগরা ঘুগড়ী (ওড়না) কাঁচুলী জামা পরা, শাড়ী পরা সেলাওয়ার কামিজ পরা মহিলাবৃন্দ নিঃশব্দে একটু কিছু মুখে তুলছেন। তার পর একেবারে থেমে যাচ্ছেন।

আমরাও রকম-সকম দেখে শিখে নিলাম দস্তুর বা কায়দাটা। কিছু খুঁটে তুলে মুখে দিয়ে আবার হাত গুটিয়ে বসছি। ঘণ্টাখানেক ধরে এই খাওয়ার প্রহসনটি সমবেতভাবে বড় বড় ঘরানা ঘরের মেয়েরা অভিনয় করে সন্ধ্যা ছ'টার সময় গাত্রোত্থান করলেন। হাত-টাত কেউ ধুতে বলল না। ধুলেনও না। কেউ বা ধুলেন। পেশোয়ারীরা রুমালেই হাত মুছলেন। অনেকেই খাবার জলের মাটির গেলাসে হাত ডোবালেন। কাঁসাগুলি যেমন ভরা তেমনিই রইল।

আবার কোন্ পথ দিয়ে কেমন করে সব এসে দলে দলে রথে ওঠা ও বাড়ী আসার সময় হয়ে এলো।

নিমন্ত্রণ বাড়ীর দুটা দিক আছে, একটা মুখ্য অন্যটা গৌণ যে যেটাকে যেভাবে নেন। ছোটদের কাছে খাওয়া মুখ্য বড়দের কাছে আলাপটা মুখ্য। কিন্তু দেখলাম সে প্রথা নেই। কারুর সঙ্গেই চেনা-পরিচয় বাক্যালাপও হ'ল না—এবং খাওয়াও হ'ল না। আর যাদের প্রাসাদে জলসা হ'ল সেই রাণী-মহারাণীদেরও কোনো দিকে দেখা গেল না। এবং নিমন্ত্রিতা নারীদের এরকম নির্বাক ভোজ ও ভাণ-করা খাওয়া অজস্র খাবার সামনে নিয়ে এরকম আর কখনো কোথাও দেখি নি। এবং রাজো-য়াড়ায় আর কোনো নিমন্ত্রণেও কখনো যাওয়া হয় নি। ছোটখাটোতে কিরকম হয় বলতে পারি না।

তবে পুরুষ মানুষদের ভোজ খাওয়া হয়। ছোট ছোট নিমন্ত্রণ (উৎসব ছাড়া) সভার সম্বন্ধে দু'একটা পুরাতন চিঠিতে যা' পেলাম কৌতূহলজনক। আমরা তো ওরকম নিমন্ত্রণ দেখার সুযোগ কখনো পাই নি। চিঠিতে দেখছি :

"আজ যাঁর বাড়ী নিমন্ত্রণ ছিল তিনি একজন তাজিমী সর্দার।

রাত্রি ন'টার সময় গেলাম, রাত্রি ১২টা অবধি বাইজী-দের নাচ-গান হতে লাগল। এবং তারি মাঝে মাঝে সুরাপান। যাঁরা ও বস্তু পান করেন না তাঁদের জন্য সোডাওয়াটার এলো। নিমন্ত্রণসভার কায়দা বড়ই দুরন্ত। কেউ অভ্যাগত এলে সকলকে উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করতে হবে। মদ খাবার সময় কারুর সঙ্গে চোখোচোখি হলে সেলাম করতে হয় এই নিয়ম...।

তার পর রাত্রি ১টার সময় খাওয়া সুরু—শেষ হতে রাত্রি প্রায় আড়াইটা-তিনটা...। বাড়ী ফিরে শুতে ভোর ৪টা।...এবং এই ভোজগুলো কতকটা পলিটিক্যাল ব্যাপারের মত একজন করলে আরো অন্যজনরা করবেন।"

এই হ'ল পুরুষদের ভোজসভা। কিন্তু এ তো রাজ-প্রাসাদের নয়। ধনী জমিদার সর্দার ঠাকুর সাহেবদের বাড়ীতে ভোজ।

এই আমাদের সেদিনের মেয়েদের ভোজসভায় কিন্তু ওই মদির পানীয় বস্তু ছিল না, থাকত না। যদিও রাজা-রাণীদের অন্তঃপুরের জলসা উৎসবে সেটা অপরিহার্য তা' দেখেছি, আগেই বলেছি। কিন্তু সেটা সাধারণ ভোজ-সভা তো নয়ই মাত্র একটি জলসা।

এখন এই ভোজপর্বের ভোজ্যের নামগুলো একটু শোনাই। কেননা এও তো যুগের বদলের সঙ্গে বদলে যাচ্ছে।

ওদেশে সাধারণ মেয়েদের ভোজসভার সব ভোজ্য সাধারণতঃ নিরামিষ। কেননা ব্রাহ্মণ-বৈশ্যরা একে-বারেই মাছ-মাংস খান না, ছোঁন না, দেখেন নি বলাও চলে। অন্য জাতিরাও প্রায়ই নিরামিষ ভোজী। শেঠ-শেঠানীরা জৈন সম্প্রদায়, এঁরাও একাহারী ও আমিষাশী নন। সুতরাং এঁদের খাদ্য 'পাক্কি' নামে অভিহিত। নানাবিধ মিষ্টান্ন লুচি তরকারী দলের। ওদেশে তরকারী প্রত্যেকটি আলাদা রান্না হয় আলাদা ধরনের। যেমন আলু, ঢেঁড়স, বেগুন, কুমড়া, লাউ, এক-একটি একটি রান্না। সব পৃথক 'ডিবা'। আলুর তরকারীর নাম হ'ল আলুকা 'শাক'। লাউয়ের তরকারী সেও লাউয়ের শাক, শাক অর্থে তরকারী বা সবজী। (মহাভারতের দ্রৌপদীর দুর্বাসা শ্রীকৃষ্ণ সংবাদের 'শাকান্ন' কণিকা স্মরণ করুন)। ওদেশে এখনো যে কোনো তরকারীকে 'শাক'ই বলা হয়। আমিষাশীদের খাদ্য-তালিকাও শোনবার মত।

দশ-বারো বা আরো বেশী রকমের মাংস। তিতির-বটের পাখী থেকে বন্য কুক্কুট অর্থাৎ মুর্গী আর বন্যবরাহ বা শূকরমাংস রাজোয়াড়ার ক্ষত্রিয় সমাজ খান। তাই ওসব মাংসেরও নানাবিধ রকমেরও রান্না কোর্মাকাবাব

শিককাবাব গুলিকাবাব ঐ কাঁসায় থাকত। আস্ত আস্ত ছোট ছোট পাখী অবধি।

খাদ্যসম্ভার অনেক সব বাটিতে বা পাতার দোনায় (ঠোঙ্গায়) করে দেওয়া হ'ত। পোলাও-ও চার-পাঁচ রকমের। নিরামিষ সাদা পোলাও, মাংস দেওয়া, বিড়িয়ানী, মিষ্টি পোলাও সাদাভাত। পায়েস, ক্ষীরটা চালের গুঁড়ায় তৈরী মাটির রেকাবীতে জমানো উপরে সোনার বা রূপার তবক ঢাকা। এছাড়া এই সবের সঙ্গে থাকত ওদেশী মিষ্টান্ন দিওর (ঘেয়োর), নানখতাই (গজার মত), বালুসাই, ক্ষীরের খাবার, বহু রকমের পেঁড়া, মিশ্রী-মাওয়া, গুঁজা জাফরান দেওয়া রং করা মিষ্টি—এ ছাড়াও আরো নানা মিষ্টি থাকত। এবং নিরামিষ নানা তরকারী ও দইবড়া। 'খাটো বা 'কড়ি' রেশমের তৈরী।

এখন এই ভোজসভাতে যদি কেউ না খেতেন কিম্বা নিরামিষ-ভোজী হতেন তা হলে তাঁর গাড়ীতে ঐ 'কাঁসা' বা থালাখানি তুলে দেওয়া হ'ত। বাড়ীতে আসত। পিতামহ নিরামিষ ভোজী ছিলেন। তাঁর থালাখানি প্রায়ই বাড়ীতে আসত। কাজেই সর্দার ঠাকুর লোকদের ঐ খাদ্য সম্ভারের নাম ও রূপ দেখবার জানবার সুযোগ আমাদের হয়েছিল।

এখন সে যাক্। আমাদের 'দৃষ্টিভোগ' সেরে সেদিন আমরা মা ঠাকুমা বাড়ী ফিরলাম।

শোক

এখন বলি অন্তঃপুরে একসময়ে একটি শোকের ব্যাপারে গিয়েছিলাম। সে হচ্ছে রাজোয়াড়ার রাজ-প্রাসাদের অন্তঃপুরে শোকসভা বা শোকপ্রকাশ। কোনো একটি নির্দিষ্ট দিন ঠিক করে যাঁরা যাবেন তাঁদের জানানো হয় যেতে। যেদিন খুসী তা করার নিয়ম নেই।

সহসা কোন্ এক সময়ে তখনকার রাজার একটি লালজীসাহেব মানে বাঁদী থেকে যিনি উন্নতপদে উন্নীত হয়েছেন 'পাশোয়ানজী' খেতাবে নামে—তাঁর একটি পুত্রের সহসা মৃত্যু হ'ল। সেই পাশোয়ানজী তখন "বসন্তরায়' নামে খেতাবে ভূষিত ছিলেন। কি কারণে মা আর এই শোকজ্ঞাপন সভায় যেতে পারলেন না। আমি আর আমার এক পিসিমা গেলাম।

নিয়ম প্রথামাফিক রথ এলো। সেদিন দু'খানি। এবং দুপুর বেলা। আমরা রথ আরোহণে এবং মর্য্যাদা অনুযায়ী দুটি দাসী নিয়ে প্রাসাদ অভিমুখে গেলাম।

চন্দ্রমহলের শেষ তোরণে অন্তঃপুরের এলাকায় কানাতঘেরা প্রাঙ্গণে রথ এসে থামল। যথারীতি রথের গাড়োয়ান সঙ্গের সেপাই চোপদার মণ্ডলী সব বেরিয়ে গেল।

রথের পর্দা ঢাকা তুলে দাসীরা এবং খোজারা বললে, 'নেবে আসুন সবাই।'

নামলাম। দেখলাম আরো রথ এসে দাঁড়িয়েছে তা থেকেও দীর্ঘ অবগুণ্ঠিতা মহিলারা নাবছেন। আমরা দু'জন কন্যা মেয়ে, একটু ঘোমটা কম দিলে নিন্দা নেই। তবু দাসীরা বললে 'ঘুঁখট্ কাড়ো' (ঘোমটা টানো)। দেখবার কৌতূহলে ঘোমটায় ফাঁক রেখে দাসীদের ও অন্য সহযাত্রিণীদের সঙ্গে অন্তঃপুরের সুড়ঙ্গপথে যাত্রা করলাম। দেখলাম দিনের বেলায়ও অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে প্রতি কোণে কোণে সেই রাত্রিবেলার মত প্রকাণ্ড প্রদীপ জ্বেলে আলো জ্বালা রয়েছে।

সুরঙ্গ-ভরা যাত্রিণীরা চলছি।

সহসা যেন একটা অদ্ভুত গুঞ্জন সুর দূর থেকে ভেসে আসতে লাগল যেন একটানা ঝিঁঝিঁর ডাকের মত নিঃশব্দ নিস্তব্ধ পথ-যাত্রিণীদের কানে।

সুড়ঙ্গ পার হয়ে এবারে একটা প্রাঙ্গণে পড়লাম। এবারে আর সরু সুরের গুঞ্জন নয়। বুঝলাম একটা সমবেত উতরোল, কান্নার শব্দ দূর থেকে শুনছিলাম।

ঘোমটা তখন বাড়ানো। ঝিয়েদের নির্দেশে একটি প্রকাণ্ড ঘরে প্রবেশ করলাম। একটু ঘোমটা সরিয়ে দেখলাম। ঘরে লোকের যেন শেষ নেই—যত লোক ধরে সব বসেছে। আর তাদের মাঝে বা ঘরের মাঝ-খানে অনেকগুলি নারী মাথা চাপড়ে বুক চাপড়ে উতরোল আকুল হয়ে কাঁদছে—হায় হায় শব্দে নানা সুরে কথায় বিলাপ করে। কান্নার যেন আর শেষ নেই, সীমা নেই।

কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যেই খোজারা আর প্রাসাদের দাসীরা এসে কাছে এসে বললে, 'এবারে ওঠো, শোক-বৈঠক তোমাদের শেষ হয়েছে।'

সঙ্গে সঙ্গে আমরা ও অন্য শোক প্রকাশের সহযাত্রিণীরা দলে দলে সবাই উঠলাম। ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। দেখলাম যেমন একদল বেরিয়ে এলেন প্রাঙ্গণে আর আরো দলে দলে অনেক মহিলা এসেছেন তাঁরা ঐ ঘরে ঢুকছেন।

এবং আমরা কানাতঘেরা প্রাঙ্গণে পৌঁছবার সঙ্গেই দেখতে পেলাম আবার দলে দলে আগন্তুক যাত্রিণীদের এবং ফেরৎ যাবার দলে সুড়ঙ্গ গলি বারে বারে প্রাঙ্গণ ভরে ওঠে আর খালি হয়ে যায়।

এই হ'ল শোকবৈঠকের চিরাচরিত নরনারী

নির্বিশেষে রাজস্থানের প্রথা। যাঁরা আসবেন তাঁরা নীরবেই কয়েক মিনিটের জন্ত বসবেন। কোন বিলাপ বা ভাষণ বাচনে প্রয়োজন নেই। দু'একটি কথা অথবা শুধু নিঃশব্দ উপস্থিতিই নিয়ম। অন্যত্রও এবং বাড়ীতেও দেখেছি এই কয়েক মিনিটের উপস্থিতিই শোক জ্ঞাপনের ওখানকার প্রথা। নারী ছাড়া পুরুষ সমাজেও এই সাধারণ প্রথা।

শোকবৈঠক থেকে আমরা তো ফিরে এলাম।

পরে শুনলাম পিতার কাছে। রাজপ্রাসাদে ও বড় বড় ঘরে এই সব শোকের কান্নার জন্ত বাইরে থেকে ভাড়া করে লোক আনা হয়। শোক বৈঠকের দিন তারাই এসে ঐ খানে সমবেত হয় এবং নানা ভাবে বিলাপ করে কাঁদে। সেই সভায় অথবা রাজপ্রাসাদে অন্যত্র যাঁর শোক বা অন্ত স্বজনবন্ধু সেখানে কেউই থাকেন না। দিনও নির্দ্ধারিত করে রাখা হয় আগন্তুক-দের জন্য। যখন তখন যে সে আসবার নিয়মে নেই।

সাধারণ ক্ষেত্রেও এই শোকের বৈঠকের দিন নির্দ্ধারণ এই ধরনের প্রথা আছে।

* * *

অন্তঃপুরে প্রমোদ উৎসব

আগেই বলেছি সকলেই জানেন। রাজ-অন্তঃপুর একেবারে পুরুষহীন চিত্রাঙ্গদার দেশ।

রাণী-মহারাণীদের মহলে মহলে এবং সখী থেকে উন্নীত পর্দায়েত পাশোয়ানজী যাঁরা রাজার প্রিয় পাত্রী হয়েছেন তাঁদের 'রাওলায়' (মহল) শুধু সখি 'পাত্রী' নারীর দলই আছে। মাজী সাহেব বা রাজমাতাদেরও মহল সখি কর্মচারী জায়গীর সব আলাদা। আয়-ব্যয়ও আলাদা।

তাঁরা দিন কাটায় কেমন করে? এবং রাণীদেরই বা দিনযাপন কি ভাবে হয়। সে সময়ের রাণীদের তখন কারুরই সন্তানাদি ছিল না। ঘরে বা মহলে শাশুড়ী ননদ ও দেবরের জায়ের বালাই ছিল না, তাঁরা থাকলে সব পৃথক মহলে থাকতেন। পিত্রালয়ে যাওয়ার প্রথা একেবারেই ছিল না। সেই যে বিয়ে হয়ে প্রাসাদে প্রবেশ করেছেন আর কখনো বেরুনো হ'ত না—না তীর্থে, না বেড়াতে দেশ ভ্রমণে। বিয়েটাও অনেক সময়েই শ্বশুরগৃহে বর নিজে না গিয়ে 'তলোয়ার' মন্ত্রী পুরোহিত লোকজন পাঠিয়ে সমাধা হ'ত। আসলে তলোয়ার যেন বরের প্রতিনিধি। কনে 'তলোয়ার' বরের সঙ্গে সমারোহ করে শ্বশুরগৃহে প্রবেশ করতেন।

স্বামীসন্দর্শনও যেন বেশ নিয়মিত হ'ত তা নয়। পত্নীদের হুকুম এত্তেলা আবেদন আরজী পেলে অথবা স্বামী বা রাজার মর্জিমাফিক যে কোনো অন্তঃপুরে আসতেন—রাণী-মহারাণী বা সখিদের।

এদের সময় কাটত রাশি রাশি সখিদের নিয়ে গল্প-গুজব গান-বাজনা যাত্রা-অভিনয় করে। এক এক রাণীর সখি তো কম ছিল না—দুশো আড়াইশো তিনশো অবধি। রাণীরা লেখাপড়া জানতেন। তবে কি পড়া-শোনা করতেন বলা শক্ত, আমার জানা নেই।

অপূর্ব রূপসী, সুগায়িকা, শিক্ষিতা, অশিক্ষিতা, সব ধরনের নারীই অন্তঃপুরের ঐ নারীশালায় থাকত। কেউ বা অপূর্ব রূপসী, কেউ বা গায়িকা ভালো এমনি সব নারী।

তাদের নিয়ে এঁদের গানের নাচের জলসা হ'ত। অভিনয় হ'ত ধ্রুব চরিত্র—প্রহ্লাদ চরিত্র, রাসলীলা, শ্রীকৃষ্ণের নানা লীলা, হরধনুর্ভঙ্গ, রামের বিবাহ, বনবাস, নানা রকম পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে। ঐ সব সখি আর পাত্রীরা (কন্যা) চমৎকার অভিনয় করত। ছোট ছোট কচি কচি মেয়েও তো কিনে আনা হ'ত সখি করার জন্ত। অনেক সময়ে দীনদরিদ্র কেউ ইচ্ছা করেও দিয়ে দিত সুন্দর মেয়েকে রাজপ্রাসাদে সুখে থাকার জন্ত। সেই সব ছোট-বড় অপূর্ব রূপবতী, মাঝারি রূপসী সুগায়িকা অভিনয়কুশলা মেয়েতে সব রাণীরই অন্তপুর ভরা থাকত। তাদের নিয়েই ছোট বড় জলসা উৎসব চিত্তবিনোদন চলত।

যেদিন বড় উৎসব জলসা হ'ত সেদিন রাজা ও অন্ত সপত্নীরা নিমন্ত্রিত হতেন। কখনো কদাচ বাইরের 'ঠাকুরাণী' ও শেঠানীরা নিমন্ত্রিত হয়েছেন। (ঠাকুরাণী জমীদার গৃহিণীদের বলা হয়)।

সারারাত্রি ধরে গান আর অভিনয় তো সাধারণ ব্যাপার অন্তঃপুরে। হয়ত তাতে প্রমোদ ও চিত্তবিনোদন হ'ত।

এ ছাড়া ছিল গাছপালা ছবি আঁকা কবিতা রচনা নিজেদের মধ্যে। জলের ওপারের রং ফেলা চিত্র করার কথা আগে বলেছি। মহারাণীর প্রাসাদের ছাতে এক সময় দেখেছিলাম, ছাতের ওপর মাটি ফেলে চমৎকার একটি কমলালেবুর গাছ করা হয়েছে। তার একধারে পাথরের টুকরা জমিয়ে একটি কৃত্রিম পাহাড়। আশপাশে অনেক-গুলি ফুল গাছ টবে রয়েছে। আর নকল পাহাড়ের মাঝে ভিতর দিকে একটি কল-খোলা আছে তা থেকে, ঝির্-ঝির্ করে পাহাড় ঘিরে ঘিরে জল বয়ে আসছে। যেন নকল ঝরণা। আর কমলালেবুর গাছটি একেবারে

ফল তারে নুয়ে পড়েছে, যেন একরাশ গাঁদা ফুলের মত জায়গাটুকু আলো করে রেখেছে। তার কাছাকাছি পাশেই স্নানঘর ছিল। ছাতের ওপর সখি আর দাসীর ভিড়। দরবার। দরবার থেকে ওঠা অনুমতি ও আদব-কায়দা সাপেক্ষ। তবু নিতান্ত 'কন্যা' বলেই সাতখুন মাপ। কয়েক মুহূর্তের জন্য পিসি-ভাইঝি ঐ ছাতে এসেছিলাম। তাই ফুল আর ফলের বাগানটা দেখে নিয়েছিলাম। এবং সেই সময়ে রাণীর বিশ্রাম কক্ষও দেখি।

ফেরার পথে দেখি মহারাণী শুয়ে পড়েছেন দরবার প্রাঙ্গণের ভিতরের একটি ঘরে। ঘর ঠিক নয় খিলান-দেওয়া দালান ধরনের। তাই মহারাণীর সাময়িক শয্যাগৃহটিও এক নিমেষ নজরে পড়েছিল।

দেওয়ালের গায়ে চমৎকার ফুল পাতা লতা আঁকা ওদেশের মার্বেল পাথরের কাজ তো প্রসিদ্ধ সবাই জানেন। আগ্রা দিল্লী রাজস্থানের বহু প্রাসাদ ও কেল্লাতেও এই খচিত অঙ্কিত কাজের ও জালিকাজের নিদর্শন পাওয়া যায়।

মহারাণী সেদিন মোটেই সুস্থ ছিলেন না বারেবারেই শুয়ে পড়ছিলেন।

একখানি চমৎকার কারুকাজকরা রূপার পায়া-বাঁধানো নেওয়ারের খাটে বিছানা। পরিষ্কার সাদা চাদর পাতা ও বালিশ দেওয়া মাত্র। তখন শীতের শেষ হয় নি। দালানের মত ঘরে দুয়ার দেখিনি। বড় বড় লাল রঙের মোটা পর্দা ফেলা। চিকের মত গুটিয়ে তোলা যায়। ওই ধরনের পর্দা ওদেশে বেশী ব্যবহার হয়।

তাঁর সখি ও দাসীরা আশপাশে বসে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ বা পায়ে হাত বুলোচ্ছে।

এ যাক, এখন যা বলছিলাম ঐ ফুল বাগানের কথা ছাতের ওপর। মনে হ'ল সকলের মহলের ছাতেই ফুলের ও ফলের গাছ লাগানো হ'ত। নিচের প্রাঙ্গণে তো ফোয়ারা বাগান ফুল ফলের গাছের মেলা। ময়ূর পাখীও অজস্র। ময়ূর ওদেশে পোষবার দরকার হয় না।

তারা সব সময়েই ছাতে আঙিনায় গাছের ডালে থাকেই ওখানে। আর তাদের নৃত্যও দেখা যেমন যায়: বাগানে বাগানে পালকও ছড়ানো থাকে। তবে পোষা পাখীও থাকত। হরিণ ময়ূরও বাগানময় বিচরণ করত পোষা হলে। খাবার পেলেই ছুটে আসতো পোষা জন্তরা।

• • •

কিন্তু তারি মাঝে যেদিন কোনো একটি শিশুর জন্ম হ'ত প্রাসাদে অর্থাৎ রাজশিশু বাঁদী বা সখিদের সন্তান। সেদিন যেন আনন্দ আর উৎসবের সীমা থাকত না সখিদের পাত্রীদের মধ্যে। ছোট একটি বা দুটি শিশু তার সাজ তার খাওয়া তার পরিচর্যা কাজল গহনা জামা কাঁথা নিয়ে মেলার মত আনন্দ জমে উঠত।

বাইরে থেকে কোনো শিশু গেলেও জলসার নিমন্ত্রণের সময়ে তাকে নিয়েও তা ঐ স্নেহ-মমতা বুভুক্ষু নিঃসন্তান নারীশালায় উৎসব পড়ে যেত যেন।

একবার আমি পিতামহীর সঙ্গে আমার একটি শিশু-কন্যাকে নিয়ে গিয়েছিলাম। কন্যাটিকে দেখে মহারাণী স্মিত হেসে গিনি দিয়ে মুখ দেখলেন। আর সখি পাত্র-মণ্ডলীতে কি কাড়াকাড়ি শিশুটি নিয়ে।

সেদিন শুধু দেখেছিলাম। আজ বুঝতে পারি অত প্রমোদ উৎসব ফুল আলো সাজসজ্জা বাগান ফোয়ারা ঝরণা ফুল ফলের গাছ তারি মাঝে কি নিষ্ঠুর নিরাশাময় বন্ধ্যা-জীবনযাত্রা। এক নির্মম বন্দিনীশালা। তাদের জীবনে সুখ-দুঃখ ধর্মকর্ম প্রেম-প্রিয়জন কিছুরই কল্পনা বা আশা নেই। একটা অদ্ভুত শূন্য জগতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে চলেছে তারা। আজ ভাবি তারা কি তা জানত, বুঝতে পারত, অনুভব করত? না মূক অসহায় জীবদের মত তাদের সে কল্পনাও মনে জাগত না, ছিল না?

× × ×

অত্যাচার শাস্তিদণ্ডের অনাচার প্রসঙ্গ

এইবারে অন্তঃপুরের নানা অনাচারের কথা কিছু বলে অন্তঃপুর-প্রসঙ্গ শেষ করি।

মোগল হারেমের মত কিন্তু শুধু মোগল হারেম কেন সব দেশেই মধ্যযুগে রাজসভা, রাজা বাদশা, সম্রাট-সম্রাজ্ঞীদের ক্ষমতা বিলাস-ব্যসন-প্রেমের ক্ষেত্র অনাচারের অত্যাচারের কথা কার আর না জানা আছে। য়ুরোপের রাণী-মহারাণীদের রাজাদের জীবনের ইতিহাসেও এরকম নজীর পাওয়া যাবে। প্রাচ্য দেশে তো সেদিনো ছিল। হয়ত আছেও।

এই অন্তঃপুরের অত্যাচার যে কত নিষ্ঠুর হতে পারে কখনো কখনো, পুরাতন কাহিনী কিম্বদন্তীর মাঝ থেকে সকলের কানে এসেছে। যেমন লাহোরে আনারকলি, মুর্শিদাবাদে ফৈজীবেগমের কাহিনী। কোনো খানে পুরুষ এই অনাচার করেছে। কিন্তু নারীও নিষ্ঠুরতায় ইতিহাসে কম যায় না, কম যায় নি।

শাস্তি পাবার জন্য অপরাধ অনেক রকমের। প্রধান

অপরাধ হ'ল প্রায়ই নারীর রূপ। এই রূপ লাবণ্য ও বয়স রাজ-অন্তঃপুরে যত প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তেমনি শত্রু সৃষ্টিও করে। প্রতিদ্বন্দ্বিনী নারী নিষ্ঠুরভাবে শত্রুতা করেছে বোঝা গেছে, দেখা গেছে।

পাহাড়ের উপর অম্বর প্রাসাদে অন্তঃপুর বিভাগে—পাহাড়ের ঢালু দিকে একটি বাঁদীশালা ছিল। দেখা যায় সেখানে ভালোমন্দ সব রকমেরই ঘর আছে। এখনো ভাঙাচোরা ভাবের সেই বাঁদীগৃহ দেখা যায়। কিম্বদন্তী বলে, সুন্দরী বা লাবণ্যবতী অথবা সুগায়িকা বাঁদী বা সখিরা বিনা অপরাধেই সেখানে বন্দিনী থাকত। কত দিন? তা তাদের ভাগ্যবিধাতাই জানতেন। এবং এই সব বন্দিনীরা কখনো বাইরে আসতে পায় নি, বেঁচে আছে কিনা তাও অজানাই থাকত। শুধু শাস্তিদানকারিণীই জানতেন।

কিন্তু সব রাণীই যে বন্দিনী করে রেখেই সন্তুষ্ট হতেন, তা নয়। তাঁরা জানতেন যদি রাজার কাছে কোনো তাঁদের শত্রু বা সপত্নীপক্ষ জানিয়ে দেয় তা হলে—তাঁদের নিজের কি হয় তাও বলা কঠিন নয়। কেননা তাঁদেরও তো দণ্ডদাতা ছিলেন রাজা!

তাই সেই চমৎকার ঢালু পাহাড়ের গায়ে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বিনীদের গড়িয়ে পড়ে যেতে বাধা কি? পা পিছলে পড়া তো অস্বাভাবিক নয়! কিছু ঝুঁকে দেখতে গিয়ে পড়ে গেছে—এ তো হতেই পারে! অতএব সে রকম হয়েছে সেকালে। এখনো রক্ষীরা সে দিকে যায় না—ভরসা করে না—যেতে ভয় পায়। মনে হয় সেই অপঘাতে মৃত নারীদের অতৃপ্ত ক্ষোভ প্রতিহিংসা আত্মা সেখানে আছে শুধু নারীশালায় জন্ম না হয় হচ্ছে না। পাত্রীদের সখীদের সংখ্যা তো গোনাগাঁথা করে না কেউ প্রতিদিন। এই বিশাল মৃত্যুর আগমনে তো কোনো বাধাই কোথাও নেই! স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক মৃত্যু? তারই বা প্রশ্ন কে করবে? সেই স্বজনবন্ধুহীন অসহায় নারীদের তো ভাবনা ভাববার জন্য তো কেউ ছিল না। চোখে জগতের আলো নিবিয়ে দেবার কি উপায়ের অভাব আছে? উদয়পুরের রাজকন্যা কৃষ্ণকুমারীকেই যখন বিষ দিয়ে প্রকাশ্যেই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হয়েছিল।

এই সব কিম্বদন্তীর জগতে অনেক কাহিনী আছে অনেক উপায়ে পৃথিবী থেকে বিদায় দেবার।

সম্রাট আওরঙ্গজেব—ছেলে মহম্মদ আকবরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য তাকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করলেন। তাতেও তার তেজ মরে না, তখন মৃদু ঔষধ অর্থাৎ বিষ খাইয়ে তাকে সরালেন।

রাজস্থানের ইতিহাসেও এই রকমের প্রক্রিয়া প্রয়োগের অভাব ছিল না।

রাণী অত্যন্ত তেজস্বিনী? আচ্ছা, রোজ রাজার পাঠানো মদিরা তাঁকে পান করতে হবে। সে পানীয় খোজারা এসে স্বহস্তে পান করিয়ে যাবে। তাঁর জীবনের দিন এবারে গোনা পথে চলবে। তিনি জেনেশুনেও নিরুপায় হয়েই সেই সুরা পান করবেন।

কোনো রাণীর সখি রূপবতী? রাজা তাকে চেয়েছেন, তাকে অসুস্থ হতে হবে। প্রকাশ্যে একদিকে হত্যা করে রাজার বিরাগভাজন হওয়ার চেয়ে—মৃদু বিষ প্রয়োগ চলুক কিছুদিন। রাণীর বা কোনো ক্ষমতাশালিনী প্রিয়-পাত্রীর নির্দেশে।

অম্বর থেকে নেবে সমতলে যে রাজধানী—তাতেও বন্দিনী নারীশালা এবং মৃত্যুশালার অভাব ছিল না।

সমস্ত মহারাণী ও রাণীদের এবং রাজপ্রেয়সীদের 'সাম দান দণ্ড' দেবার অধিকার কম ছিল না। নিজস্ব কর্মচারী থাকত। অন্তঃপুরের প্রত্যেক 'রাওলা' বা মহলের প্রত্যন্ত সীমায় মাটির নীচে ঘর (তয়খানা) ছিল। নিজস্ব বন্দিনীশালাও তাঁদের সকলেরই ছিল। বন্দী করার হুকুম করলে তা 'হাসিল' হতে 'তামিল' করতে সময় লাগত না। ঐ তৃতীয়খানা বন্দিনীশালা এবং গরমের দিনে বিশ্রামাগারও রূপে দুভাবেই ব্যবহার করা হ'ত।

কে কত দিন বন্দী থাকবে, কার আয়ুর সীমা কতখানি জানাও কঠিন ছিল। জানলেও সে কথা মুখে আনা আরো কঠিন ছিল। প্রতিকারের উপায়হীন দাসিকার দল নীরবেই থাকত। চমৎকার খেলার পুতুলের মত তারা কবে এসেছিল—কে এনেছিল—কোন্ গণ্ডগ্রাম থেকে, কে তার আপন জন আছে, পুতুল ভেঙে গেছে, কেন কে রাখে হিসাব তার?

অসংখ্য সখি পাত্রী (কন্যা)-দের কে কোথায় কি অপরাধ করেছে, কখন দণ্ডিত হয়েছে, কোথায় বন্দিনী হয়ে আছে, কে রাখে তার খবর। কে জানে তার ইতিহাস। শুধু জানেন দণ্ডদাত্রী আর তাঁর প্রধানা কর্মকর্ত্রী। (এবং এতে কৌতুকের দিক এই রাজার প্রিয়পাত্রীরা অনেকেই সুন্দরী ছিলেন না—একজনকে দেখেছিলাম টেরা, অন্য একজন দেখতে সুরূপা নন। সুতরাং তাঁদের ভয় বেশী) তাই সহসা আত্মহত্যা করেছে বলতেই বা বাধা কি? আশ্চর্যই বা কি?

অতর্কিতে শীতের দিনে আগুন পোয়াতে বসে ওড়নাতে আগুন লেগে গেছে—সেও ত আশ্চর্য ব্যাপার নয়। এবং যথারীতি শবযাত্রা বেরিয়ে যেত।

এবং প্রাসাদে এই সব অকুলীন অর্থাৎ রাজপরিবার-ভুক্ত কেউ নয় নিতান্তই দাসী ও সাধারণ সখিশ্রেণীদের কারুর মৃত্যু হলে প্রাসাদের পিছনের দিকের মেথর আসবার পথের পাশের খানিকটা দেওয়াল ফেলে শবযাত্রা করানো হ'ত। প্রধান তোরণপথে যেখানে উৎসবযাত্রা হয়, প্রতিদিন প্রত্যুষে মাঙ্গলিক সঙ্গীতের সানাই বাঁশী বাজে, সে পথে সাধারণ মৃত্যুপথযাত্রীর আগম-নিগমের কোনো অধিকার নেই। সেটা অলক্ষণ মনে করা হয়।

একদিন তারা প্রাসাদের কোন্ অন্ধকার সুড়ঙ্গময় পথে প্রাসাদে প্রবেশ করেছিল, সে দিনে সমারোহ বা আবাহন তাদের জন্য ছিল না। দণ্ডিত মৃত্যু অথবা স্বাভাবিক মৃত্যুর দিনেও তাদের প্রাসাদের পিছনের বিজন-বিপথ দিয়েই মৃত্যুর সিংহদ্বার অতিক্রম করতে হ'ত। কার চরম দণ্ড হ'ল সেদিন তার হিসাব কে জানে!

লোক শুধু দেখতো প্রাসাদের পিছনের খানিকটা ভাঙা হ'ল এবং মেরামত হ'ল রাজকোষের খরচে। এবং মন্ত্রীরাও দেখতে ও শুনতে পেলেও হতবুদ্ধির মত চুপ করে থাকতেন। কাকে অভিযুক্ত করবেন? কার কাছে সে অভিযোগ করা হবে?

কিন্তু যতই গোপনে রাখা হোক এই শাস্তি বা অত্যাচার অনাচার কেমন করে লোকসমাজে কাণাঘুষোয় প্রচার হয়ে যেত।

'একবার বিদায় দে মা ফিরে আসি' গানের মত নিম্ন-শ্রেণীর লোককবিরা মুখে মুখে ছড়া আর গান রচনা করে শহরে ছড়িয়ে দিত। কোন্ রাণীর অনাচারে অত্যাচারে —কোন্ রাজপ্রেয়সী প্রতাপান্বিতা পাশোয়ানজীর অত্যাচারে কোন্ বাঁদী আত্মহত্যা (নিহত?) করেছে।

কেন শুদ্ধান্তঃপুরের পিছনের দিকের মেথরের যাবার পথের একটা দেওয়াল ভাঙা হ'ল—সেই পথে তিনটি তরুণী সখির শবদেহ নিম্ন জাতীয় কয়েকজন বহন করে নিয়ে গেল। কি হয়েছিল তাদের, শহরভরে গুঞ্জন ওঠে, গান গেয়ে বেড়ায় কতজন। জিজ্ঞাসার চিহ্নে জনমনেও সহরময় গান ভরে ওঠে—মৃত্যু না হত্যা—কে নেত্রী—কি অপরাধ?…

কিন্তু 'হাতি চলে বাজারমে কুত্তা ভুখে হাজার' দুর্বলের চিৎকারে প্রতাপান্বিতের কিছুই আসে-যায় না।

অন্তঃপুরে বসে আমরাও শুনলাম পরম রূপবতী তিনটি নবযৌবনা সখির কথা। যারা গত রাত্রে খরে আগুন লেগে মারা গেছে? যাদের প্রাসাদের পিছনের জঞ্জাল ফেলা পথের দেওয়ালের পাশের খানিকটা ভেঙে সৎকার করতে পাঠানো হয়েছে। পোস্টমর্টেম বা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো বা ডাক্তারের সার্টিফিকেট দরকার হ'ল কি? নাঃ—রাজার অন্তঃপুরে মৃত্যু-প্রেয়সী পাশোয়ানজীর প্রিয় সখি ছিল তারা—এই শোচনীয় ঘটনাতে সারা অন্তঃপুর এবং স্বয়ং পাশোয়ানজী কত কাতর হয়েছেন…। কিন্তু অপঘাত মৃত্যু—সাধারণ শ্মশানে স্থান পাবার অধিকারও তো নেই! কিন্তু কোন্ মানবী-রূপিনীর মৃত্যু কোন্ পথ দিয়ে এসে নিঃশব্দ রাত্রে তাদের চুলের মুঠি ধরে জরী রেশম জড়ানো বেণীতে তাদের রাত্রিবাসের ওড়নাতে অগ্নিসংযোগ করেছিল? এবং প্রত্যুষে 'মোরী' (নর্দমা) পরিষ্কারের পথপার্শ্ব ভেঙে তাদের কোন্ মহাশ্মশানে পাঠিয়ে দিল!!…

রাজা অন্য রাণীরা মন্ত্রীরা নিঃশব্দে শুনলেন। আমরা সাধারণ অন্তঃপুরবাসীনীরা এবং সাধারণ শহরবাসীরা অবাক বিস্ময়ে নীরবেই শুনলাম। কত রূপসী নারী পৃথিবীতে আছে—মাত্র তা থেকে তিনটি গেল! এই তো! যাদের আগেও কেউ ছিল না। তখনো নেই—যারা তখন কারুর কন্যা নয়, ভগিনী নয়। পত্নী বা মাতার স্থানও ভাগ্যে জোটে না যাদের—তারা সেই শ্রেণীর নারী। যাদের জন্য এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবার মত কেউ ত্রিভুবনে ছিল না থাকে না—তারা সেই মেয়ে?

"মুক্তিপথে আফ্রিকা"

শ্রীহেম হালদার

"অন্ধকারময় আফ্রিকা" এতদিন সভ্যজগতের কাছে আফ্রিকার এই পরিচয় ছিল। কিন্তু হঠাৎ আফ্রিকা হতে এত আলো বিকিরণ হইতেছে যে, সমস্ত সভ্যজগতের দৃষ্টি আজ ইহার দিকে নিবদ্ধ।

পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ এই আফ্রিকা। তার গর্ভে নিহিত প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যের তুলনা নাই। বনজ ও খনিজ উভয় সম্পদে সে অতুলনীয়। এখনও সমস্ত সম্পদের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তবে সর্ব্বশেষ হিসাবে জানা যায় যে, পৃথিবীর উৎপন্ন খনিজ ও অন্যান্য সম্পদের মধ্যে এই মহাদেশই পাওয়া যায়। হীরক ৯৮ ভাগ, সোনা ৬০ ভাগ, ম্যাঙ্গানীজ ৭০ ভাগ, তামা ৪৮ ভাগ, বকসাইট ৪৭ ভাগ, কোবাল্ট ৮০ ভাগ, কোকো ও চকলেট ৭০ ভাগ আর জলবিদ্যুৎ শক্তির উৎস ৪০ ভাগ। বর্ত্তমানে বেলজিয়াম কঙ্গোতে সবচেয়ে মূল্যবান ধাতু ইউরেনিয়ম ও সাহারায় প্রচুর তৈলখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

প্রকৃতি যে মহাদেশকে এত বেশী ঐশ্বর্য্যশালিনী করিয়াছে—সেই মহাদেশের জনগণ এতদিন তা' ভোগ করিতে পারে নাই। সমস্ত দেশের উপর পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা এতদিন নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে।

সাম্রাজ্যবাদের কবলে আফ্রিকা

পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পর্টুগালই প্রথমে এই মহাদেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। এবং এই আধিপত্যের সুরুতেই আফ্রিকাবাসীদের ক্রীতদাসরূপে নূতন আবিষ্কৃত মহাদেশ আমেরিকার নিকট বিক্রয় করা সুরু হয়।

এই দাসপ্রথা যেমন নিষ্ঠুর ততদূর নিষ্ঠুরতার সহিত জড়িত আফ্রিকানদের ধরিয়া বিক্রয় করার কাহিনী। "মানুষ বিক্রয়ের ব্যবসা" সভ্যমানুষের কাছে কথাটা যতই নিষ্ঠুর মনে হউক না কেন, সাম্রাজ্যবাদী মানসে তা অতি আনন্দের সংবাদ। আফ্রিকানদের কাছে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ এই পরিচয়ে প্রথমে হাজির হয়। আফ্রিকার অধিবাসীদের ধরিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিবার অভিযানে শত শত পরিবার নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়—মাতৃক্রোড় হইতে শিশুকে ছিনাইয়া লওয়া হয়। পিতা-পুত্র ও সমগ্র পরিবার বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, এক একটা অঞ্চল জনশূন্য হয়। নিদারুণ অত্যাচারে অনেকেরই প্রাণত্যাগ করিতে হয়। যাহাদের জাহাজে বোঝাই করিয়া চালান দেওয়া হয়—পথিমধ্যে অনেকেই অনাহারে, রোগে, শোকে প্রাণত্যাগ করে। এইভাবে প্রায় ৮০ লক্ষ নিগ্রোকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করা হয়—আর এই অভিযানে প্রায় ৪ কোটি লোক নির্ম্মম অত্যাচারে প্রাণত্যাগ করে।

কিন্তু ইহা তিন-চার শতাব্দীর আগের কাহিনী। কিন্তু তখনও আফ্রিকা পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীর প্রত্যক্ষ শাসনে আসে নাই।

প্রত্যক্ষ শাসনের সুরু হয় গত শতাব্দীর শেষের দিক হইতে। আফ্রিকা প্রচুর সম্পদের আধার, এই সন্ধান পাইবার পর হইতেই পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির প্রলুব্ধ দৃষ্টি ইহার দিকে ধাবিত হয়।

১৮৭৫ সনের আগে একমাত্র পর্টুগাল, স্পেন ও ফ্রান্স আফ্রিকার ব্যাপারে লিপ্ত ছিল, কিন্তু তার পরে একে একে বৃটেন, জার্ম্মানী, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও অন্যান্য রাষ্ট্র যোগদান করে।

এই সমস্ত রাষ্ট্রগুলি আফ্রিকায় প্রবেশের এক নূতন কৌশল অবলম্বন করে। দুই একটা দৃষ্টান্ত দিলে এই কৌশল পরিষ্কার হইবে। এই ব্যাপারে বৃটিশের পক্ষ হইতে সিসিল রোডস্ ও বেলজিয়ামের ষ্টানলির নাম কুখ্যাত হইয়া আছে।

রোডস্ নিতান্ত স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য সাউথ আফ্রিকার কেপটাউনে যান। সেখানে যাইয়া দেখেন, নূতন নূতন হীরক-খনি আবিষ্কারের ফলে হৈ চৈ সুরু হইয়া গিয়াছে। ভূগর্ভে এত সোনা আছে দেখিয়া রোডস্ ক্ষিপ্ত হইয়া যান। তাহার ভাইয়ের সাহায্যে তিনি তৎক্ষণাৎ এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া পড়েন ও প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। অর্থের সঙ্গে আসে আরও উচ্চাভিলাষ। তিনি আফ্রিকার ভূখণ্ডে বৃটিশ সাম্রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত হইয়া পড়েন।

আফ্রিকার ভূখণ্ড এই সময় ছোট ছোট জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা বা অধিপতি। তাহারা সরলবিশ্বাসী ও পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছিল। রোডসের
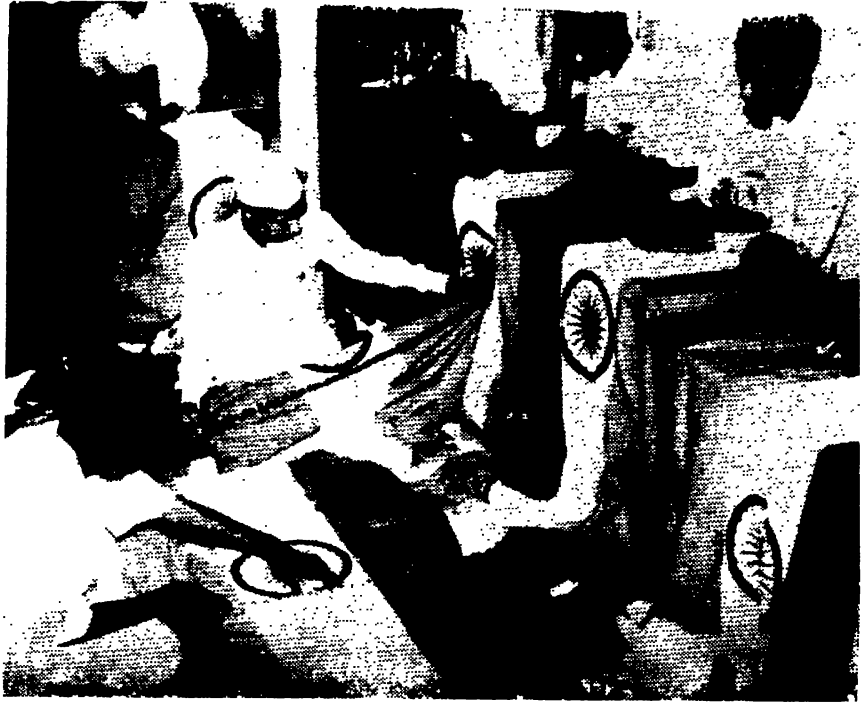
গ্রাম্য কুটীর-শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মীরা জাতীয় পতাকা নির্মাণ করিতেছে

নিউইয়র্ক প্রদর্শনীতে ভারতীয় দ্রব্য-সম্ভার
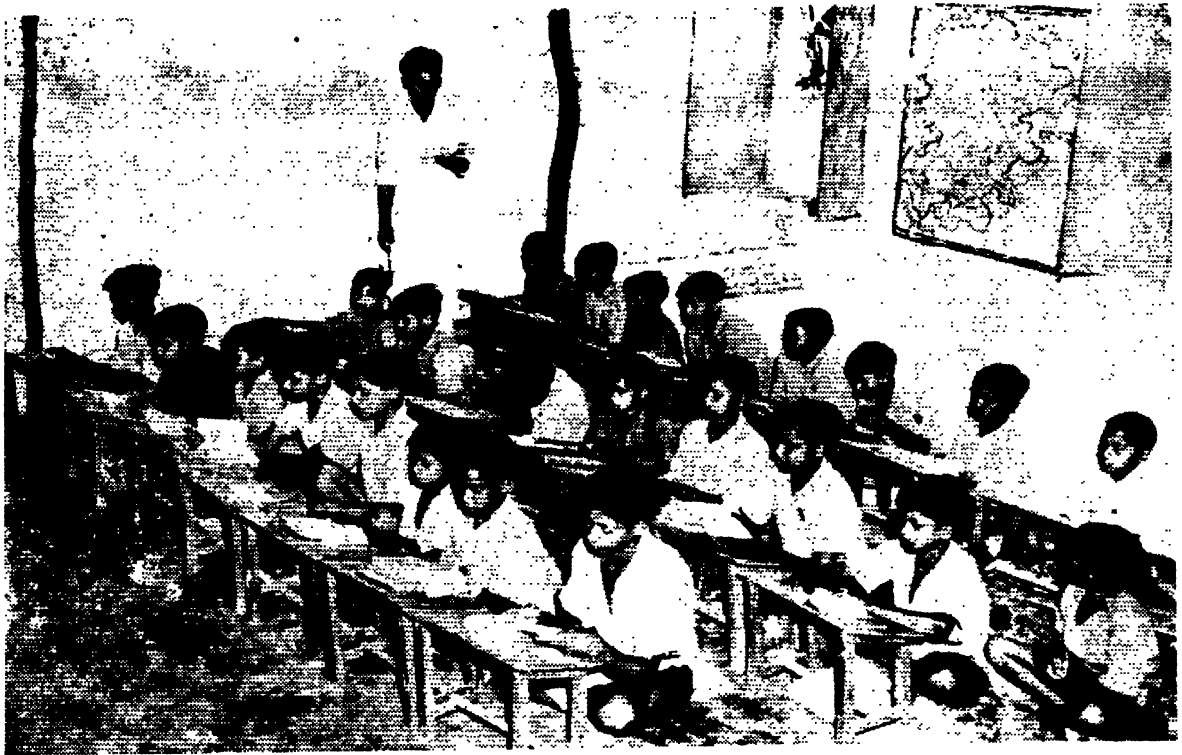
উড়িষ্যায় আদিবাসী-বালকেরা ভূগোলের পাঠ লইতেছে

ইজ্জাৎনগরে ভারতীয় পশু-গবেষণাগারের একটি বিভাগ

সাহায্যে বৃটেন বেচুয়ানাল্যাণ্ডের উপর কর্ত্তৃত্ব প্রসার করে।

তার পরের ভূখণ্ড ছিল মেটাবেলের রাজার অধীন। রোডস্ এই রাজার দরবারে হাজির হইয়া তার রাজ্যের অন্তর্গত একটু ক্ষুদ্র জমিতে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের অনুমতি প্রার্থনা করেন। বিনিময়ে রাজাকে কিছু উপ-ঢৌকন দিতে স্বীকৃত হন। রাজা সম্মত হইলে রোডস্ এক দলিল লেখেন ও রাজা তাহাতে সহি দেন।

কিন্তু এই দলিল লিখিবার সময় রোডস্ গোপনে এই রাজার অন্তর্গত সমস্ত জমির খনিজ সম্পদের উপর তাঁর অধিকার লিখিয়া লন। রাজা কিছুই জানিতে পান না।

তিন মাস পরে যখন কেপট াউনে এই সংবাদ প্রচারিত হয় তখন মেটাবেলের রাজা ক্ষিপ্ত হইয়া যান। তিনি বৃটিশ সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার নিকট এক প্রতিবাদ-পত্র লেখেন। উহাতে তিনি লেখেন: "প্রায় কয়মাস পূর্ব্বে রোডস্ ও তার কয়েকজন সঙ্গী আমার অধীন একটা জায়গায় খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের অনুমতি চায়। আমি তাহাতে সম্মত হইয়া তাহাদের দলিল লিখিতে বলি ও তাহাদের লিখিত দলিলে সহি দান করি। এখন আমি জানিতে পারিলাম, উক্ত দলিলে আমার অধীন সমস্ত খনিজ সম্পদের মালিকানা আমি রোডস্‌কে দিয়াছি।" হায়, বৃটিশ সম্রাজ্ঞীর নিকট এই ক্ষুদ্র রাজার আবেদন ব্যর্থ হইয়া যায়। ক্ষোভে রাজা লো বেঙ্গলা মন্তব্য করেন. "All white men are liars", পরে বৃটিশ অস্ত্র এই দেশ দখল করে এবং রোডসের নাম অনুসারে উহার নাম রাখা হয় রোডেসিয়া।

রোডস্ বৃটেনের পক্ষে সহি করেন, বেলজিয়ামের পক্ষে করেন ষ্টান্‌লী। তিনি কঙ্গো নদীর মোহনা দিয়ে আফ্রিকার অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করেন ও পার্শ্বস্থ রাজাদের নিকট বেলজিয়ামের অধিকার স্বীকৃতির দলিলে সহি করাইতে থাকেন। এইভাবে ষ্টানলী প্রায় ৪০০টি অঞ্চলের স্বীকৃতিনামায় সহি করাইয়া বেলজিয়ামের কর্ত্তৃত্ব দাবি করেন।

অপরদিকে ফ্রান্স ও জার্ম্মানী একই কায়দায় বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অনুমত্যানুসারে দলিল তৈয়ারি করিতে থাকেন।

এইভাবে সমস্যা যখন জটিল রূপ ধারণ করে তখন বেলজিয়ামের রাজা দ্বিতীয় লিউপোল্ড অগ্রসর হন। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি যাহাতে আফ্রিকা লইয়া যুদ্ধে জড়াইয়া না পড়ে এবং যাহাতে বিনাযুদ্ধে আফ্রিকা দখল কায়েম হয়, সুচতুর লিউপোল্ড সেই উদ্দেশ্য সাধনে লিপ্ত হন।

তিনি ১৮৮৪ সনে আফ্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট সমস্ত রাষ্ট্রের এক সম্মেলন বার্লিনে ডাকেন। ঐ সম্মেলনে বৃটেন, ফ্রান্স, স্পেন, পর্টুগাল, জার্ম্মানী, রাশিয়া, আমেরিকা ও আরও কয়েকটি রাষ্ট্র যোগদান করে। ঐ সম্মেলন আফ্রিকার অধিবাসীদের বিরুদ্ধে পশ্চিমী রাষ্ট্র-গুলির এক বিরাট চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। আফ্রিকাবাসীদের অজ্ঞাতে, তাদের অনুপস্থিতিতে এই সম্মেলন তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করে। তাদের উপর দাসত্বের এক ঘোর যবনিকা চাপাইয়া দেয়।

এই সম্মেলন নিতান্ত খামখেয়ালী ভাবে আফ্রিকা মহাদেশকে নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করিয়া নেয়। বৃটেন ও ফ্রান্সের ভাগে বড় অংশ পড়ে—তবে অন্য রাষ্ট্র-গুলিও বাদ যায় না। একমাত্র আমেরিকা কিছুই পায় নাই। ম্যাপের উপর দাগ টানিয়া অনেকস্থলে বাটোয়ারা করা হয়। তার ফলে দেশ ও জাতিগুলি বিভক্ত হইয়া পড়ে।

১৮৭০ সনের আগে যে আফ্রিকার এক-দশমাংশ অঞ্চলও পরাধীন ছিল না—শতাব্দী শেষ হইতে না হইতে ইথিওপিয়া বাদে তার সম্পূর্ণ অংশ পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী-দের কবলে যায়। একটা মহাদেশের অধিবাসীদের স্বাধীনতা হরণ করিবার এতবড় চক্রান্ত আর দেখা যায় না। ইহার ফলে সমগ্র মহাদেশের উপর নামিয়া আসে এক ঘোর অমানিশার অন্ধকার, বর্ব্বর শাসন ও লুণ্ঠন, অত্যাচার ও নির্য্যাতন যার প্রতিদিনকার ঘটনা।

বেপরোয়া লুণ্ঠন

এইভাবে আফ্রিকা মহাদেশকে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লইয়া পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির প্রত্যেকে যে পরিমাণ বেপরোয়া লুণ্ঠন সুরু করে—পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। এবং এই লুণ্ঠন কায়েম রাখিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে চলে চরম সন্ত্রাসবাদ।

এই অনগ্রসর পশ্চাদপদ মহাদেশের ঐশ্বর্য্যকে লুণ্ঠন ও জনগণকে শোষণ করিবার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। আফ্রিকাবাসীদের প্রথমে জমি হইতে বঞ্চিত করা ও শ্রেষ্ঠ জমিগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়, নতুবা ইউরোপীয়দের লইয়া গঠিত কোম্পানীর হাতে তুলিয়া দেওয়া হয়। খনিজ সম্পদগুলিও ইউরোপীয় কোম্পানীগুলির হাতে দেওয়া হয়। এই লুণ্ঠনের সঠিক পরিমাণ কোনও সময় পাওয়া সম্ভব নয়—

কিন্তু কিছু কিছু হিসাব হইতে উহার একটা ধারণা করা যাইতে পারে।

১৯২০ সনে উত্তর রোডেশিয়ার এগার হাজার ইউরোপীয়ের মোট জমির পরিমাণ ছিল ৮৭ লক্ষ একর আর উহার ১৩ গুণ অধিক আফ্রিকাবাসীর হাতে দশ ভাগের একভাগও জমি ছিল না। দক্ষিণ রোডেশিয়ার প্রত্যেক ইউরোপীয়ের জমির পরিমাণ ছিল ১০ হাজার একর। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার সমস্ত জমির এক-তৃতীয়াংশের মালিক ছিল ইউরোপীয়ানেরা। কেনিয়ার সমস্ত জমি হইতে আফ্রিকানদের উৎখাত করা হয়। ফরাসী ইউকোটেরিয়াল আফ্রিকার জমির এক-তৃতীয়াংশ ৪০টি কোম্পানীর হাতে তুলিয়া দেওয়া হয়। বাকী এক-তৃতীয়াংশ রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। এই ভাবে আফ্রিকানদের জমি হইতে চ্যুত করিয়া ঐ সমস্ত জমিতে তাহাদের দাসরূপে খাটান হয়।

১৯৩৭ সনে গোল্ড কোষ্ট (বর্ত্তমানে ঘানা) হতে খনিজ পদার্থই রপ্তানী করা হয় ৫৫ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের—উহার মধ্যে ৩০ লক্ষ পাউণ্ড মুনাফা হয়। ঐ বৎসর উত্তর রোডেশিয়া হইতে খনিজ পদার্থ রপ্তানীর দরুন ৫০ লক্ষ পাউণ্ড মুনাফা হয়। প্রতি বৎসরই এই পরিমাণ মুনাফার পাহাড় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির কুক্ষিগত হইতেছিল।

১৮৮৫ হইতে ১৯০৮ সন পর্য্যন্ত বেলজিয়াম কঙ্গোর উপর রাজা দ্বিতীয় লিউপোল্ড ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার অধীনে রবার বাগিচাগুলিতে সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে মেয়ে ও পুরুষ শ্রমিককে কাজ করিতে বাধ্য করা হইত। তাহার ফলে কোম্পানীগুলি তাদের নিয়োজিত মোট মূলধনের দশগুণ প্রতি বৎসর মুনাফা পাইতেন। রাজা লিউপোল্ড তাঁহার বাগিচাগুলি হইতে ২ কোটি ফ্র্যাঙ্ক অর্থ উপার্জ্জন করেন।

১৯০৮ সনে কঙ্গো যখন বেলজিয়াম সরকারের অধীনে আসে, তখন রাজা লিউপোল্ডকে ১০ কোটি ফ্র্যাঙ্ক ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দেওয়া হয়।

আফ্রিকার দেশগুলি হইতে যে পরিমাণ সম্পদ প্রতি বৎসর লুণ্ঠন করা হইত, উপরের দৃষ্টান্তগুলি তার দুই একটা নমুনা মাত্র। সাম্রাজ্যবাদীরা এই হিসাব কোনদিনই প্রকাশ করে নাই। সেই হিসাব কোনও দিন যদি প্রকাশিত হয় তবে পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠী কোনওদিনই সেই সেই ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না।

রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম

এই পরাধীনতার শৃঙ্খল আফ্রিকার জনগণ কোনও সময় নির্ব্বিচারে মানিয়া লয় নাই। যেদিন সাম্রাজ্যবাদ তার দেশে প্রভুত্ব কায়েম করে, সেইদিন হইতেই তার অবসানের জন্য জীবনপণ সংগ্রাম সুরু হয়; এই সংগ্রামে-কত হাজার হাজার দেশভক্ত আফ্রিকান যে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, কত নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন তার তুলনা নাই। গুলী করিয়া হত্যা, বিনা বিচারে বন্দী, বেত্রাঘাত, আঙ্গুল কাটিয়া পঙ্গু করা, দেশ হইতে বহিষ্কার—কোনও নির্য্যাতনই বাদ যায় নাই। কিন্তু এই নির্য্যাতন তার স্বাধীনতার স্পৃহাকে দমিত করিতে পারে নাই। আজিও সেই সংগ্রামের অবসান হয় নাই। তবে স্বাধীনতার জন্য কোনও মূল্য দিতেই তারা অস্বীকৃত হয় নাই।

এই নির্য্যাতনের কাহিনী অগণিত, তার হিসাব দেওয়া কঠিন। যতই এই নির্য্যাতন বাড়িয়াছে ততই স্বাধীনতা-সংগ্রাম তীব্র রূপ ধারণ করিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত উহা সমস্ত জনসাধারণের মিলিত জাতীয় বিক্ষোভের রূপ ধারণ করিয়াছে। আজিকার দিনে আলজেরিয়া, ক্যামেরুণসে উহা সশস্ত্র বিদ্রোহের রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

শ্রমিক শ্রেণীও এই সংগ্রামে পশ্চাদপদ থাকে নাই। ১৯৪২ সনে নাইজেরিয়ায় ব্যাপক রেল ধর্ম্মঘট হয়। ১৯৪৪ সনে নাইজেরিয়া ও ক্যামেরুণস মিলিত ভাবে জাতীয় পরিষদ গঠন করে। ১৯৪৫ সনে উগাণ্ডার ব্যাপক ধর্ম্মঘট ও গণজাগরণ দেখা দেয়। নাইজেরিয়ায় সাধারণ ধর্ম্মঘট দীর্ঘস্থায়ী হয়। ১৯৪৬ সনে সাউথ আফ্রিকার ৬০ হাজার খনি-শ্রমিক ধর্ম্মঘট করে। সঙ্গে সঙ্গে মরক্কো, টিউনিসিয়া ও আলজেরিয়ায় স্বাধীনতা-আন্দোলন তীব্র রূপ ধারণ করে।

১৯৫৪-৫৬ সনের তিন বৎসর একমাত্র কেনিয়ায় প্রায় ১০ হাজার আফ্রিকানকে গুলী করিয়া হত্যা করা হয়। ইহা সরকারী হিসাবে স্বীকৃত তথ্য—আর আফ্রিকানদের মতে গুলী করিয়া হত্যার সংখ্যা ৯০ হাজার। আর প্রায় ৭০ হাজার কেনিয়াবাসীকে বন্দী করিয়া রাখা হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সংগ্রাম আরও গভীর হয়। ১৯৫৯ সনে ফেব্রুয়ারী মাসে দক্ষিণ রোডেশিয়ার ৬ হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘট করে। মার্চ্চ মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে হাজার হাজার ডক-শ্রমিক ধর্ম্মঘট করে। অক্টোবরে বেলজিয়াম কঙ্গোর ২০ হাজার পরিবহন-শ্রমিক ধর্ম্মঘট করে। নভেম্বরে কেনিয়ার ২৪ হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘটে যোগ দেয়। এবং শ্রমিক শ্রেণীর পার্শ্বে সমগ্র জনসাধারণ আসিয়া সমবেত হয়।

স্বাধীন রাষ্ট্রের বিকাশ

গণসংগ্রাম যখন জাতীয় গণ-অভ্যুত্থানের রূপ নেয়, তখন সাম্রাজ্যবাদ পিছু না হটিয়া পারে না। আফ্রিকায় আজ তাহাই হইতেছে। একে একে তার দেশগুলি স্বাধীনতা লাভ করিতেছে, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান হইতেছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানী তার উপনিবেশগুলি হারায়। কিন্তু সেগুলি তখন স্বাধীন হয় নাই। লীগ অব নেশনের নামে অন্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি তার অছিগিরি লাভ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আরও কিছু রাষ্ট্র ইউনাইটেড নেশন ট্রাষ্টিশিপের অন্তর্ভুক্ত হয়। আজ একে একে এই রাষ্ট্রগুলিতে স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন হইতেছে। আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদের দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে। গত কয়েক বৎসরে এই রাষ্ট্রগুলি কি ভাবে স্বাধীন হইয়াছে—নীচের হিসাব হইতে তাহা পরিষ্কার হইবে।

	দেশ	স্বাধীনতার তারিখ
১।	লিবিয়া	১৯৫১
২।	সুদান	১৯৫৬
৩।	মরক্কো	১৯৫৭
৪।	টিউনিসিয়া	১৯৫৬
৫।	ঘানা	১৯৫৭

(ফরাসী অধিকৃত গায়না ১৯৫৮ সনে স্বাধীনতা লাভ করিয়া ঘানার সহিত যুক্ত হয়।)

১৯৬০ সনকে আফ্রিকার স্বাধীনতা বৎসর বলা হয়। এই সনে নিম্নলিখিত রাষ্ট্রগুলি স্বাধীন হইয়াছে।

৬।	মালি যুক্তরাষ্ট্র (প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশ সেনেগাল ও সুদানের সমন্বয়ে গঠিত।)	১৯শে জুন
৭।	মালাগাসী (প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশ মাদাগাস্কার)	২৬শে জুন
৮।	সোমালিল্যাণ্ড (প্রাক্তন ব্রিটিশ ও ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ডের সমন্বয়ে গঠিত)	১লা জুলাই
৯।	কঙ্গো (প্রাক্তন বেলজিয়াম উপনিবেশ)	১লা জুলাই
১০।	ঘানা (প্রজাতন্ত্র ঘোষণা)	১লা জুলাই

আর এই বৎসর শেষ না হইতে ক্যামেরুনস, টোগোল্যাণ্ড ও সর্ব্ববৃহৎ ব্রিটিশ উপনিবেশ নাইজেরিয়া স্বাধীনতা লাভ করিবে।

ব্রিটিশ অধিকৃত কেনিয়া, টাঙ্গানিকা ও উগাণ্ডার স্বাধীনতাও আর বেশী দূরে নয়।

এই ভাবে আফ্রিকার দুই-তৃতীয়াংশ আজ মুক্তিলাভ করিয়াছে—বাকি অঞ্চলগুলির স্বাধীনতা-সংগ্রাম আরও প্রবল হইয়াছে—তাদের মুক্তিও আসন্ন। ব্রিটেন ও ফ্রান্স তাদের অধিকাংশ উপনিবেশ হারাইয়াছে। ফরাসী অধিকৃত আলজেরিয়ায় আজ ৪ বৎসর ব্যাপী সশস্ত্র সংগ্রাম চলিতেছে। এই দেশের দুই-তৃতীয়াংশ আজ মুক্তিফৌজের হাতে। এই ৫০ লক্ষ অধিবাসীর দেশে ফরাসী সরকার ১০ লক্ষ সৈন্য মোতায়েন রাখিয়াছে। তাদের নির্য্যাতনের সীমা নাই। তবুও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ আর সেখানে টিকিয়া থাকিতে পারিতেছে না। বাধ্য হইয়া এই বিপ্লবী সরকারের সঙ্গে তার আলোচনায় বসিতে হইতেছে। পর্টুগাল তার অধিকৃত এ্যাঙ্গোলা ও মোজাবিক হইতে আজও সরিয়া দাঁড়াইতে রাজী হয় নাই। তবে আজ সাম্রাজ্যবাদ ক্ষয়িষ্ণু, তাকেও এই অধিকার ছাড়িতে হইবে।

এই ভাবে আজ আফ্রিকানবাসীরা তাদের দেশের কর্তৃত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। স্বাধীন বিশ্বে স্বাধীন আফ্রিকা এক নূতন যুগের সূচনা করিবে।

একটি অচল আধুলি

শ্রীসমর বসু

কথাগুলো আজও ভুলতে পারে নি মনোতোষ। কোনও দিনই হয়ত ভুলতে পারবে না। ভোলা যায় না এই ধরনের কথাগুলোকে। মনের গভীরে কোথায় যেন এরা বাসা বেঁধে থাকে। একটু অবকাশ পেলেই বেরিয়ে আসে বাইরে। সমস্ত জীবনটাকেই মুহূর্তে বিস্বাদ করে তোলে। কাজকর্ম কিছুই ভাল লাগে না। একটিমাত্র চিন্তার ছোট্ট গুহায় ঢুকে সমস্ত মনটা কেমন যেন নির্জীব হয়ে পড়ে। অথচ মনোতোষ জানে এটা তার মিথ্যে ভাবনা। তবুও একে এড়িয়ে থাকতে পারে না মনোতোষ। একটা দুশ্চিন্তার প্রেত তাকে এমন ভাবে পেয়ে বসেছে যা থেকে মুক্তি পাওয়া বোধ করি এ জীবনে আর সম্ভব নয়।

ছোট বেলা থেকে সেই একই কথা শুনে আসছে মনোতোষ—মায়ের পেটে থাকতেই বাপকে যে খায় সে ছেলে কি কম অলুক্ষণে! আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শী ঝি-চাকর—সবায়ের মুখে সেই এক কথা—মনোতোষ অলুক্ষণে! পিতৃহীন পৃথিবীতে আসার জন্যে মনোতোষ অপরাধী। জন্মাবার পরেও অনেক অপরাধ করেছে মনোতোষ। ছোটবেলায় নিজেদেরই গোয়াল ঘরে সে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। লুকিয়ে লুকিয়ে আলুপোড়া করতে গিয়ে—গোয়াল ঘরের খড়ো চালে আগুন লেগে যায়। ক্ষতি বিশেষ হয় নি বটে—কিন্তু গোয়ালে আগুন লাগাটাই সংসারের পক্ষে অমঙ্গল। আর সে অমঙ্গল ঘটল—মনোতোষের দৌরাত্ম্যেই। অতএব পেটে থাকতে যে ছেলে বাপকে খায় সে কি কম অলুক্ষণে! দেখ আরও কত অঘটন ঘটে! সত্যিই আরও অঘটন ঘটেছিল এবং তারও মূলে ছিল মনোতোষের ঔদ্ধত্য। শালগ্রাম-শিলা সমেত পুরোহিতকে অশুচি অবস্থায় ছুঁয়ে দিয়েছিল মনোতোষ। 'ছুঁসনে ছুঁসনে' না বললে হয়ত ও ছুঁত না, চুপচাপ চলে যেত, কিংবা ডুবে থাকত নিজের খেয়ালে। কেউ জানতেই পারত না যে বাড়ীতে একটা ছেলে আছে। কিন্তু তা না করে পুরোহিত ঠাকুর—আগে থেকেই চীৎকার করে উঠলেন, ওরে ছুঁসনে, সরে দাঁড়া। মনোতোষ সচেতন হ'ল। আর সঙ্গে সঙ্গেই ঘটল সেই অঘটন। শালগ্রামশিলা নষ্ট হয়ে গেল। এ কি কম অমঙ্গলের কথা! না জানি কি বিপদ আবার দেখা দেয়! প্রায়শ্চিত্ত, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, আরও কত মঙ্গল অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হ'ল।

মনোতোষের আজও মনে আছে সে সব কথা। হয়ত মনে থাকত না—যদি তাদের মনে করবার জন্যে চেষ্টা সে না করত। কিন্তু কি করবে মনোতোষ? যখনই সে একটু অবকাশ পায়, তখনই যে ঐ পাপচিন্তাটা পেয়ে বসে তাকে। সত্যই সে অপরাধী, বাবার মৃত্যুর জন্যে সত্যই সে নিজে দায়ী।

শুধু বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজনের কাছে নয়—স্কুলে এসেও সেই একই কথা শুনতে হয়েছিল মনোতোষকে। শুধু বন্ধুদের কাছ থেকে নয়—শিক্ষকদের কাছ থেকেও। মাষ্টার মশাই বলতেন—"A child born after the death of its father".—এক কথায়—Posthumous child···As for example—Monotosh—তখন ঐ কথা শুনে মনোতোষ হাসত। আর সেই সঙ্গে হাসত ক্লাসের আর সব ছেলেরা। ফুটবল মাঠে তার নামই হয়ে গেছল 'Posthumous' বেপাড়ার ছেলেরা ঐ নামটাই জেনেছিল। তারা বলত, 'Posthumous' আজকে সেণ্টার ফরোয়ার্ড খেলাবে, 'হ্যাট্রিক' না করে ছাড়বে না। হ্যাট্রিক করার আনন্দে 'Posthumous' হওয়ার বেদনা ভুলে থাকত মনোতোষ। কিন্তু এখন আর হ্যাট্রিকের আনন্দ নেই, সমস্ত মনটাকে নির্জীব করে রেখেছে ঐ 'Posthumous'-এর বেদনা।

সংসারের আর সবাই হয়ত ভুলে গেছে সে সব কথা। খেলাধুলায়—লেখাপড়ায় সর্ববিষয়েই অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়ে আর সকলকে হয়ত ভুলিয়ে রেখেছে মনোতোষ, কিন্তু নিজেকে সে ভোলাতে পারে নি। এখনও বাবার তৈলচিত্রের দিকে চেয়ে চেয়ে মনোতোষ ঐ কথাই ভাবে। মনে মনে জিগ্যেস করে বাবাকে, সত্যই সে অপরাধী কি না। অপরাধী যদি, সে অপরাধ স্খালন করবার কোনও উপায় কি নেই!···এই একটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে মনে মনে কত বৃত্ত রচনা করে মনোতোষ।

ছাত্রজীবনে সে খুঁজেছে, পায় নি—কর্মজীবনেও পেল না। এমন আর একটি লোকের সঙ্গে পরিচয় হ'ল না

যে মনোতোষের মত দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে এই পৃথিবীতে, এমন আর একটি লোককে যদি পেত, তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করত মনোতোষ। মন উজাড় করে তাকে জানাত তার মর্মবেদনা। নিভৃতে বসে দু'জনে দু'জনকে সান্ত্বনা দিত, দু'জনের দুঃখে দু'জনেই হ'ত কাতর। তার পর সব ভাবনা শেষ করে দিয়ে সমস্ত আবর্জনার গ্লানি দূরে সরিয়ে পরস্পরের মিলিত সত্তায় দুটি ক্লিষ্ট মন পেত মুক্তির আনন্দ। দু'জনেই হ'ত নিশ্চিন্ত। আমার মত ভাগ্যহীন আর একজনও আছে—এটা কি কম সান্ত্বনা! কিন্তু সে সান্ত্বনাও মিলল না। মনোতোষ সত্যই ভাগ্যহীন।

মনোতোষের ব্যবসায়ী মন পুরোপুরি বস্তুনিষ্ঠ। সেখানে সে ইস্পাতের মত কঠিন। সংসারে সে স্নেহময় পিতা, প্রিয়তম স্বামী এবং আদর্শ প্রভু। একটা অত্যন্ত জাগরূক মনের আছে সর্বদিকে সতর্ক প্রহরা। কোথাও ত্রুটি নেই। আনন্দোচ্ছল সুন্দর সুখী পরিবার! অথচ ঐ একটি বিষয়ে মনোতোষ শিশুর চেয়েও দুর্বল। মূর্খের চেয়েও অবুঝ। কিছুতেই সে নিজেকে বোঝাতে পারে না যে, সে অপরাধী নয়। তার কোনও দুঃখ নেই।

বাবার স্বর্গতঃ আত্মাকে খুসী করার জন্যেই ব্যবসায়ী হয়েছে মনোতোষ। বাবার ছোট্ট লোহার দোকানটাকে অনেক বড় করেছে সে। এখন আর সে দোকানদার নয়। রীতিমত হার্ডওয়ার মার্চেন্ট। গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়ে সে বাসা বাঁধে নি। পিতৃ-পিতামহের বাস্তুভিটার পুণ্যভূমিকে আশ্রয় করে জীবনটাকে কাটিয়ে দেওয়ার আনন্দ থেকে নিজেকে সে বঞ্চিত করে নি। শহরে এলে ব্যবসার সুবিধে হয়—হয়ত আরও দুটো টাকা বেশী উপায় হয়। কিছুটা সুখেস্বচ্ছন্দেও থাকা যায়—কিন্তু এই সমস্ত সম্ভাবনাগুলোই একটা অনুচিত কাজের উপর নির্ভরশীল। পিতৃভূমি ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাওয়া মনোতোষের পক্ষে নিতান্ত অনুচিত কাজ। আজকের দিনে এ ধরনের যুক্তির হয়ত কিছু মূল্য নেই—কিন্তু মনোতোষের কাছে এ চিন্তা পরম মূল্যবান। এবং মনোতোষের মা এতেই সন্তুষ্ট। এই মায়ের মধ্যেই বাবাকে পেয়েছে মনোতোষ। মাকে সুখে রাখতে তাই তার চেষ্টার অন্ত নেই। দানধ্যান, তীর্থভ্রমণ, পূজাপার্বণ, ব্রাহ্মণভোজন করানো, যখন মা যেমন আদেশ করেছে তাই পূরণ করেছে মনোতোষ। ছেলের সংসারে মা যদি সুখে থাকে পরলোকে বাবাও তাতে সুখী হয়। ছেলেকে আশীর্বাদ করে। এ-যুক্তিতেও মনোতোষের অবিচল বিশ্বাস। কুণ্ঠাহীন নিষ্ঠা। কিন্তু সে সান্ত্বনাটুকুও বেশীদিন রইল না—মাও চলে গেলেন।

মা মারা যাবার পর থেকেই ক্রমশঃ সংসার-বিমুখ হয়ে পড়ল মনোতোষ। রাত দিন সে গুম হয়ে বসে থাকে। সংসারের কোনও দিকেই আর নজর নেই। সবতাতেই কেমন যেন একটা নিস্পৃহ ভাব। ছেলে-মেয়ে-স্ত্রী, আরও কত আত্মীয়কুটুম—ঝি-চাকর, জনমজুর-গমগমে সংসার। কিন্তু মনোতোষ যেন একেবারে একা। অফিসের কাজেই ব্যস্ত থাকে সারাদিন। বাড়ীতে এসেও সেই অফিসের কাজ।

সব দিক থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিজের জন্যে যেন আলাদা একটা জগৎ গড়ে তুলেছে মনোতোষ। বন্ধু-বান্ধব এমনিতেই তার কম ছিল। এখন একজনও নেই। সাহায্যের প্রত্যাশী না হলে কেউ আর কথাই কয় না মনোতোষের সঙ্গে। কোনও ক্ষোভ নেই মনোতোষের। বরং ভালই হয়েছে—বিরক্ত করবার লোকসংখ্যা শূন্য থাকাই ভাল। কিন্তু সকলকার কাছ থেকে সরে এলেই সকলে যে সরে যাবে এমন কোনও কথা নেই। তাই যেদিন স্ত্রী এসে সোজাসুজি জিগ্যেস করল—তোমার কি হয়েছে বলত? তখন মনোতোষ কাঁদতে চেয়েছিল। কাঁদতে কাঁদতে বলতে চেয়েছিল—আমাকে তোমরা একটু বিশ্রাম দাও। একটু ছুটি। আমি আর পারি না। কিন্তু সেকথা বলতে পারে নি মনোতোষ। কাউকেই সে জানাতে চায় না কোথায় তার ব্যথা। যাকেই সে একথা বলেছে তার কাছ থেকে সান্ত্বনা পায় নি—পেয়েছে উপহাস। তাই নিজের বেদনাকে আঁকড়ে ধরে নিজেই সে সরে এসেছে। এ যেন তার নিজস্ব একটা গোপনীয় সম্পত্তি—কেউ যেন জানতে না পারে কোথায় তার অস্তিত্ব। এই বেদনাটাকে হয়ত ভালবেসে ফেলেছে মনোতোষ। এই বেদনাটা আছে বলেই কর্তব্যে সে প্রেরণা পায়—সৎকর্ম অনুষ্ঠানে উৎসাহ জাগে। বেদনাটাকে ভুলতে সে চায় না। অনেক দিনের পুরনো ব্যথা। তাকে ভুলতে গেলে নিজেকেই যে ভুলে থাকতে হয়। বেদনা সহ্য করতে পারে মনোতোষ—কিন্তু বেদনার অপমান সে সইতে পারে না। তাই কাঁদতে গিয়েও কাঁদতে সে পারল না। বললে, অফিসের কতকগুলো জরুরী কাজ নিয়ে বড় ব্যস্ত আছি—হিসেব মেলাতে পারছি না।

মেলাতে হবে না তোমার হিসেব। মহিমকে গদীতে বসিয়ে—চল দু'দিন কোথাও বেড়িয়ে আসি। ব্যবসা-ব্যবসা করে রাতদিন ভাবলে অসুখে পড়বে যে।

সান্ত্বনা, নয় যেন আদেশ। বিশ্রাম নিলেই বুঝি সব ঠিক হয়ে যাবে। সমস্ত মনটাকে যে-চিন্তা ঝাঁঝরা করে দিয়েছে,

কোথাও কি যাওয়া যায় তাকে এড়িয়ে? তবুও স্ত্রীর পরামর্শে রাজী হ'ল মনোতোষ,মহিম কিন্তু রাজী হ'ল না। ভালভাবেই এম-এ পাশ করেছে সে। স্তূপীকৃত লোহা-লক্কড়—নাটবল্টুর মাঝখানে, অশিক্ষিত মজুরদের অসভ্য পরিবেশে নিজের অমূল্য সময় সে নষ্ট করতে পারবে না। দরকার হলে বাবা কর্মচারী নিয়োগ করতে পারেন। মহিমের দ্বারা ব্যবসা চালানো সম্ভব নয়। সব কাজ সব মানুষ পারে না। সূক্ষ্মবুদ্ধি, স্থূল কাজের জন্যে নয়।

মনোতোষ হাসল। বললে, তোর বাবার বুদ্ধিটা বড় স্থূল, তাই লোহা থেকে সে সোনা ফলিয়েছে—তোর সূক্ষ্ম বুদ্ধি দিয়ে সেই সোনাটুকু যদি তুই বজায় রাখতে পারিস তা হলে বুঝব আমার ভাগ্য ভাল।···লোহা ত ঘাঁটবি না—তবে করবি কি শুনি!

কলেজে বেরুবো। চাকরি পেয়ে গেছি।

ছেলে প্রফেসর হবে। ভাবতে খারাপ লাগে না। কিন্তু স্থূলবুদ্ধির খোঁচাটা বুকের মধ্যে খচ্ খচ্ করে। বুদ্ধিটা স্থূল বলেই বোধ হয় অহেতুক একটা বেদনা সে বয়ে বেড়াচ্ছে। অর্থহীন অপরাধবোধ তাকে অসামাজিক করে তুলেছে। লোকে ভাবে, লোহা ঘেঁটে ঘেঁটে মানুষটাও বুঝি লোহা হয়ে গেছে। কারুর সঙ্গে মেলা-মেশা নেই। পাড়াপড়শীর খোঁজ নেয় না। নিজেকে নিয়েই মশগুল। টাকাই শুধু চিনেছে লোকটা। সত্যি, মহিম ঠিক কথাই বলেছে, বুদ্ধি স্থূল না হলে এতখানি স্বার্থপর হওয়া যায় না।

অফিসে বসে বসে এই কথাই ভাবছিল মনোতোষ। বাবার তৈলচিত্রের দু'ধারে রাখা দুটো ধূপদানে ধূপ পুড়ছে। সৌগন্ধে ভরে উঠেছে ঘরটা। ধূপের ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে উপরের দিকে। তৈলচিত্রের মুখের কাছে গিয়ে ধোঁয়াটা ছড়িয়ে পড়ল। ফিকে নীল রঙের ধোঁয়া। মনে হ'ল বাবা যেন হাসছেন। ধূপের মিষ্টি গন্ধ, বাবার মিষ্টি হাসি—খুব ভাল লাগছিল মনোতোষের।

কি যেন মনে পড়ে যেতে হঠাৎ সে উঠে পড়ল। ড্রয়ার থেকে টেনে বার করে নিল ব্যাঙ্কের পাশ বইটা। তার পর বাবার হাসির মত একটুকরো মিষ্টি হাসি ফুটিয়ে তুলল ঠোঁটের প্রান্তে। একটা সংকল্প। একটা পরি-কল্পনা। সুন্দর সহজ সমাধান। সমস্ত বেদনার পরি-সমাপ্তি। একটা গভীর আন্তর-আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল মনোতোষের মন, শরীরের স্নায়ুতে সঞ্চারিত হ'ল অমিত শক্তি। একটা অদ্ভুত অনুভূতি।···

মনোতোষ আর চুপ করে বসে থাকতে পারল না। পরিকল্পনার রূপায়ণ চাই, আর দেরি করা চলে না। এত দিন অনেক ভাবনা ভেবেছে মনোতোষ, অনেক লোকের অনেক নিন্দা সহ্য করেছে—আর নয়। আর তাকে কিছু ভাবতে হবে না। নিন্দায় পঞ্চমুখ লোকগুলো বিস্ময়ে হতবাক হবে। আর সেই সঙ্গে সমস্ত মনোবেদনার অবসান ঘটবে।···

এক সপ্তাহের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে গেল। মনতোষের গ্রাম থেকে যে রাস্তাটা সোজা চলে গেছে ষ্টেশনের দিকে সেই রাস্তাটাকে পাকা করে দেবার সব ব্যবস্থা এক সপ্তাহের মধ্যেই শেষ করে ফেলল মনোতোষ। বর্ষাকালে আর চলতে কষ্ট হবে না। বছরের সব সময়েই চলবে সাইকেল-রিক্সা। আড়াই মাইল রাস্তা আর হাঁটাহাটি করতে হবে না। রাস্তার পাশে চার-পাঁচটা টিউবওয়েল বসানো হবে।···

আশপাশের তিন-চারটে গ্রামের লোক—দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করল মনোতোষকে। বেঁচে থাকো বাবা। তোমার মত ছেলে এই গ্রামে জন্মেছিল—এটা আমাদের যে কতবড় সৌভাগ্য, তা আর মুখে কি বলব বাবা। 'বাপ-মরা' ছেলে তুমি—তোমার মনে যে কত ক্ষোভ ছিল তা এত দিনে আমরা টের পেলাম। চিরদিনের জন্যে বাপকে তুমি বাঁচিয়ে রাখলে। ধন্যি ছেলে।

গ্রামের কাঁচা রাস্তা পাকা হবে। রাস্তার নাম হবে দেবেন্দ্র সড়ক। মনোতোষের বাবার নাম। দেবেন্দ্র বেঁচে থাকবে,যতদিন এই রাস্তাটা থাকবে। ততদিন মনোতোষ থাকবে না। মনোতোষের ছেলে অধ্যাপক মহিমারঞ্জনও হয়ত থাকবে না। অথচ বাবা বেঁচে থাকবে। মায়ের পেটে থাকতেই বাপকে খাওয়ার অপবাদ সমস্তই মিথ্যা হয়ে যাবে। কি আনন্দ মনোতোষের। এত দিনের সঞ্চিত অর্থের কি সুন্দর সার্থকতা। স্থূলবুদ্ধির কি গভীর দূরদর্শিতা!···

জেলা বোর্ডের সঙ্গে সমস্ত চুক্তি শেষ করে মনোতোষ এসে ঢুকল একটা রেষ্টুরেণ্টে। পর্দায় ঢাকা ছোট্ট কেবিনে ঢুকে খাবারের আদেশ দিয়ে চুপ করে বসে রইল মনো-তোষ। কিছু খেতে হবে, ক্ষিদে পেয়েছে খুব—তার চেয়েও বেশী দরকার ছিল এমনি একটু নিরিবিলি জায়গা,যেখানে বসে মনে মনে আনন্দটাকে উপভোগ করা যায়।···

চা-খাবার দিয়ে গেল। পাশের কামরা থেকে ফিস্ ফিস্ শব্দ। প্রথমে একটি মেয়ের গলা—না, না, না,—তা হতেই পারে না। আমি তা হতে দেব না। তার পর একটি ছেলের গলা,—কিন্তু এ-ছাড়া আর উপায় নেই সুমিতা। আমাদের বিয়েটা এখনও হয় নি—এ-খবর

কলেজের সবাই জানে। সুতরাং কি দিয়ে একে চাপা দেবে! একটা দুর্নামের লজ্জা নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে—লজ্জাটাকে একেবারে না আসতে দেওয়া ভাল নয় কি? ছেলেটা থামল। মেয়েটা এবার কথা বলছে—গলাটা কান্নাভেজা—কিন্তু তুমি ত সবই জান। এই অবস্থাতেই ত তুমি আমাকে বিয়ে করতে পার।...

খাবারটা গলায় আটকে গেল। কিছুতেই সেটাকে গিলতে পারলো না মনোতোষ। মুখ থেকে ফেলে দিয়ে কোনও ক্রমে এক ঢোক জল খেয়ে সে উঠে পড়ল। কান মুখ ঝাঁ-ঝাঁ করছে। জল চাই, ঠাণ্ডা জল! কলে এসে মুখেচোখে অনেকক্ষণ জলের ঝাপ্টা দিয়ে যখন কাউণ্টারে এসে দাঁড়ালো মনোতোষ—তখন সেই পাশের কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল মহিম আর একটি মেয়ে, বোধ হয় কলেজের ছাত্রী। যা আশঙ্কা করেছিল ঠিক তাই। গলাটা চিনতে একটুও ভুল হয় নি মনোতোষের। চীৎকার করে মহিমকে একবার ডাকতে চাইল, কিন্তু পারল না। ওরা তখন ট্যাক্সিতে চেপে বসেছে।

যে-বাবা মরে গেছে, তাকেই বাঁচিয়ে রাখতে চায় মনোতোষ, আর যে-ছেলে বাঁচতে চায় তাকেই মেরে ফেলতে চায় মহিম।...এক পুরুষেই দুটি মেরুর ব্যবধান। টলতে টলতে পকেট থেকে একটা আধুলি বার করে দিল মনোতোষ। ক্যাশিয়ার চুম্বক দিয়ে পরীক্ষা করে দেখল, বললে—আধুলিটা অচল।

ভুল হয়ে গিয়েছিল মনোতোষের। মনোতোষ জানত, একটা অচল আধুলি পড়ে আছে তার পকেটে। আধুলিটায় রূপো নেই বলে অচল নয়। অচল, লোহা নেই বলে। সেই অচল আধুলিটাই এত দিন যত্ন করে রেখে দিয়েছে মনোতোষ। ওটা নাকি খুব পয়মন্ত।

শিক্ষা ও সংযম

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাট বিপ্লব চলিয়াছে। ইংরেজ শাসনকালেই ভারতের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তানায়কগণ প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতা ও ত্রুটি বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং ক্ষুদ্রভাবে হইলেও দেশের নানা স্থানে নূতন ভাবে জাতীয় শিক্ষার বীজ বপন করা হইতেছিল। বাংলা দেশে একদিকে জাতীয় শিক্ষাপরিষদ অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় (শান্তিনিকেতন) স্থাপিত হইয়াছিল। এই সম্পর্কে স্বামী দয়ানন্দ কর্ত্তৃক হরিদ্বারে গুরুকুল মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাও উল্লেখযোগ্য। সমসাময়িক রাজপুরুষেরাও যে তৎকালীন শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নির্দ্দোষ মনে করিতেন তাহাও ঠিক নহে। এই শিক্ষা-ব্যবস্থার সংশোধন ও সার্থক উদ্দেশ্যেই স্যাডলার কমিশনের নিয়োগ হইয়াছিল যাহাতে মনীষী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অন্যতম সদস্য ছিলেন।

মহাত্মা গান্ধীর ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ কেবল রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নহে শিক্ষাক্ষেত্রেও এক আলোড়নের সৃষ্টি করে। বাংলা দেশে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ও বিদ্যালয় তথা "গোলামখানা' ত্যাগের হিড়িক পড়িয়াছিল, বাগ্মী ও দেশনেতা বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তনেরও বিশেষ চেষ্টা হয়। স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত ব্যক্তিগণ যাঁহারা প্রত্যক্ষে কখনও রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলেন না তাঁহারাও জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হইয়াছিলেন। নানা ঐতিহাসিক কারণে বাংলা দেশে তখন ব্যাপকভাবে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কার্য্যকরী হয় নাই বলা চলে, কিন্তু কারিগরি শিক্ষার পথে ইহা কিছুটা সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ই উহার প্রমাণ। তবে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠার যে চেষ্টা রবীন্দ্রনাথ করিয়াছিলেন তাহা একেবারে ব্যর্থ হয় নাই বরং উহার 'বিশ্বভারতী' নাম সার্থক হইয়াছে। বিশ্বকবির জীবিতকালেই ভারতের নানা প্রান্ত হইতে এবং বিদেশ হইতে এখানে বিদ্যার্থীরা আসিত। কিছুদিন রাজরোষে পড়িয়া এই বিদ্যালয় খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিদেশী রাজশক্তির দর্প খর্ব্ব করিতে পারিয়াছিলেন। স্বাধীন ভারতের

সরকার বিশ্বভারতীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্য্যাদা দিয়া কেবল বিশ্বকবিকে সম্মান করেন নাই তাঁহার বিশ্বমৈত্রী ও শিক্ষা আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন।

এইবার মহাত্মার অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে ফিরিয়া আসা যাক্, গান্ধীজী বিদ্যালয় ত্যাগ তাঁহার তিনটা ত্যাগের বা বয়কটের (আদালত, উপাধি এবং বিদ্যালয়) অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার পর এই বিদ্যালয় বর্জ্জন আন্দোলন খুবই প্রবল হয় কিন্তু এই বিষয়ে গান্ধীজীর সহিত স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথের ঘোর মতবিরোধ প্রকট হইয়া পড়ে। কারণ ইঁহারা বিদ্যালয় বয়কটের ঘোর বিরোধী ছিলেন। অতীতের স্বদেশী দিনের তিক্ত অভিজ্ঞতা ইঁহারা স্মরণ রাখিয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়েই প্রবীণ শিক্ষাব্রতী, একজন শান্তিনিকেতনে আর একজন কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে—শিক্ষা-সংস্কারের এবং শিক্ষাপ্রচারের কার্য্য চালাইয়া যাইতেছিলেন। প্রতিকূল অবস্থার কথা এবং বিদেশী শাসনের কঠোর বন্ধনের ব্যথা ইঁহারা জানিতেন না তাহা নহে তবে তৎকালীন অবস্থায় শিক্ষা-বয়কট শিক্ষা-ক্ষেত্রে এবং তরুণ শিক্ষার্থীর জীবনে সুফল প্রসব করিবে না এ বিষয়ে ইঁহাদের সিদ্ধান্তও ছিল খুবই দ্বিধাহীন। যাহা হউক অসহযোগ আন্দোলনের কার্য্যসূচীর শিক্ষা-বয়কট সফল হয় নাই। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে স্থাপিত জাতীয় শিক্ষালয় উঠিয়া গেল। কিন্তু আর এক দিক হইতে শিক্ষা-ব্যবস্থা আহত হইল এবং আহত অংশই আজ স্থানে স্থানে প্রবল এবং দুরারোগ্য ক্ষতে পরিণত হইয়াছে।

তখন নেতাগণ রব তুলিয়াছিলেন "শিক্ষা দেরি করিতে পারে কিন্তু স্বরাজ অপেক্ষা করিতে পারে না" (Education can wait but Swaraj cannot)। প্রকৃতই স্বরাজ বা স্বরাজ আন্দোলন অগ্রসর হইয়া চলিল। ১৯২১ হইতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার তারিখ ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ পর্য্যন্ত দেশবাসী স্বরাজের জন্য বহু ভাবে সংগ্রাম করিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ও (১৯৩৯-৪৫) এই সংগ্রামের বিরাম ছিল না, যদিও কিছুকালের জন্য ইহা নেতৃগণের কারাবাস হেতু অন্ধভাবে অহিংস পথে চলিয়াছিল।

গান্ধীজীর নেতৃত্বে এই ২৫।৩০ বৎসর ভারতের ইতিহাসে বিরাট পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা বিরাট পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল ভারতবাসীর মনে বিশেষ ভাবে তরুণ এবং ছাত্রদের মনে। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনকে অভিভূত করিয়াছিল। বিদ্যালয় পরিত্যাগ না করিলেও ছাত্রগণ স্বাধীনতা আন্দোলনের স্তম্ভ-স্বরূপ ছিল। যখনই কোন সাহায্যের প্রয়োজন হইত, নেতাগণ এই ছাত্র-শক্তির সহায়তা গ্রহণ করিতেন। দেশ-বিদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, যুবশক্তিই স্বাধীনতার সৈনিক। ছাত্রগণ যেরূপ নিষ্কামভাবে কোন মহান্ আদর্শের জন্য আত্মদান করিতে পারে এরূপ আর কেহ নহে। স্বাধীনতার সৈনিকের কার্য্য আর শিক্ষার্থীর কার্য্য পরস্পর হইতে বিভিন্ন। স্বাধীনতার সংগ্রামের সময় শিক্ষার্থী তাঁহার স্কুল কলেজের নিয়মানুবর্ত্তিতা মানে নাই কিন্তু যেহেতু সে ইহা এক মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া করিতেছে, এজন্য কেহই ইহার উপর গুরুত্ব আরোপ করে নাই; এবং ভবিষ্যতে ইহার ফলও যে ছাত্রজীবনে ও সমাজ-জীবনে কুফল আনিবে তাহাও কেহ চিন্তা করে নাই। আজ ছাত্র সমাজ রাজনৈতিক নেতাগণের নির্দ্দেশে চলিলে আমরা আপত্তি করি, কিন্তু যে বিষ সমাজদেহ বহুদিন হইতে বিষাক্ত করিয়াছে, তাহা হইতে মুক্ত হওয়া যে কঠিন কাজ বাস্তব ক্ষেত্রে তাহাই দেখা যাইতেছে। আজকের ছাত্রসমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা অতীতের কার্য্যেরই প্রতিফলন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পৃথিবীর অনেক-কিছু বদ্‌লাইয়া দিয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পর রুশদেশে সাম্যবাদী শ্রমিক রাষ্ট্রের উদ্ভব। এই নূতন রাষ্ট্র সেকালের ধনিকতন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সকল জিনিসকেই অস্বীকার করিতে চাহিয়াছিল। প্রথম ইহা অস্বীকার করে ভগবানকে এবং প্রচলিত সমস্ত ধর্ম্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠানকে। ইহা প্রচলিত নৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাকেও অস্বীকার করিয়াছিল। এইরূপ একটা মহা সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং "সকল ভাঙ্গিয়া নূতন গড়িব" এই-রূপ মনোবৃত্তি লইয়া সোভিয়েট রাশিয়া কার্য্য আরম্ভ করে। আজ অবশ্য তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ৪০ বৎসরের পূর্ব্বেকার রুশের তুলনায় অদ্যকার সোভিয়েটকে "রক্ষণশীলও" বলা চলে। কিন্তু এই যে সমসাময়িক সকলের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং নূতন ও 'সংস্কৃত' করিবার চেষ্টা ও ইচ্ছা ইহা মানুষের রক্তের ভিতর সর্ব্বত্রই সকল কালে দেখা যায়। প্রথম যখন ইংরেজী শিক্ষা এদেশে আসিল তখন কি ক্ষুদ্র আকারে হইলেও এদেশে এরূপ একটা কিছু হয় নাই! নিশ্চয়ই হইয়াছে 'রাজ-নারায়ণ' বসুর 'সেকাল ও একাল', পরবর্ত্তীকালের চারুচন্দ্র দত্তের 'সেকালের বাস' ও অন্যান্য বই পড়িলে

ইহা বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। পূর্ব্বে যাহা ক্ষুদ্র আকারে ছিল এখন তাহাই দেশে দেশে বিরাট আকারে দেখা দিয়াছে। ভারত এই বিরাট কালের গতিকে কিরূপে রোধ করিবে বা কাজে লাগাইবে ইহাই প্রশ্ন। আমরা কি একেবারে নূতন করিয়া গড়িব না পুরাতনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিব। চিন্তা করিলে দেখা যাইবে একেবারে নূতন কিছু হয় না অথচ একেবারে পুরাতনও কিছু থাকে না। এইখানেই নিছক 'প্রবীণ পন্থী' এবং পুরোপুরি 'নবীন পন্থীর' পার্থক্য।

প্রত্যেক জাতির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে—ইহার মধ্যে অনেক ভাল জিনিস আছে—এগুলিকে বাদ দিলে জাতির ক্ষতি হয়। অনেক জিনিস এককালে সমসাময়িক তাগিদে জাতি গ্রহণ করিয়াছিল, পরবর্ত্তীকালে উহা সংশোধন বা বর্জ্জন প্রয়োজন হইতে পারে। আবার একেবারে কিছু নূতন বাহির হইতে—অপর জাতির নিকট হইতে গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় অথবা একেবারে নূতন উদ্ভাবনও করিতে হয়। জীবন্ত এবং চলমান জাতির এই পথ। কি ব্যক্তি, কি সমাজ, কি জাতি এক কথায় কেহই এক স্থানে বসিয়া নাই। ইচ্ছায় এবং অনিচ্ছায় সজ্ঞানে বা অজ্ঞাতে চলিতেছে। নিজেদের ভাল বুঝিয়া ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সজ্ঞানে চলিলে ভাল ফলই হওয়ার সম্ভাবনা। আর গতানুগতিক ভাবে হাল ছাড়িয়া ভাসিতে থাকিলে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ অশুভে পরিণত হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়। ভারত আজ স্বাধীন বা স্বনিয়ন্ত্রিত। তাহার জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্র সুনিয়ন্ত্রিত হইবে আশা করা যায়। অতীতের ভাল বজায় রাখিতে হইবে, ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করিতে হইবে, নূতনকে গ্রহণ করিতে হইবে। শিক্ষাক্ষেত্রেও অনেক-কিছু নূতন ভারতের তরুণগণকে শিখিতে হইতেছে। নানা কারিগরি বিদ্যা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতীয়ের জন্য প্রায় নিষিদ্ধ ছিল আজ আর তাহা নাই। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয় সাধারণ শিক্ষা—প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা। এই পথে দেশের মানুষ তৈরী হয়, ভবিষ্যতের জাতিগঠন হয়। এই ক্ষেত্রের ব্যর্থতাই জাতির ভবিষ্যৎ জীবনে অনর্থের সৃষ্টি করে। এই জন্যই অতীতে দেশের চিন্তা ও শিক্ষানায়কগণ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক এবং কলেজীয় শিক্ষা যাহাতে 'জাতীয়' হয় তজ্জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। শিক্ষা দেশের তরুণগণকে বিজাতীয় করিলে, স্বদেশ, স্বজাতি, স্বধর্ম্ম এবং নিজের অতীত ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপর শ্রদ্ধাহীন করিলে—জাতির ভবিষ্যৎ কোথায়! শৃঙ্খলা অপেক্ষা বিশৃঙ্খলাই তখন প্রবল হইবে। আজ যে সকল অনাচার প্রবল হইয়া উঠিতেছে ইহার বীজ আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি-বিচ্যুতির মধ্যেই ছিল। হঠাৎ কিছুই হয় নাই। বর্ত্তমানে এই বিষয়ে বিশদভাবে ভারতব্যাপী সকল শ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে আলোচনা হইতেছে। অনেকে এই বিপর্য্যয়ের নানা কারণ আবিষ্কার করিতেছেন এবং নানা প্রতিকারের পন্থাও বলিতেছেন। ইহাদের উপদেশের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াও ইহা বলা চলে তাঁহারা রোগের বাহিরের লক্ষণগুলি দেখিয়া বাহিরের রোগ নিরাময়ের জন্য যেরূপ প্রলেপের ব্যবস্থা করিতে চান তাহাতে সাময়িক ফল হইলেও যতদিন না রোগের মূলোৎপাটনের জন্য কিছু করিতেছেন ততদিন স্থায়ী ফল-লাভের সম্ভাবনা কম। শিক্ষাপদ্ধতি, শিক্ষক, পিতামাতা বা অভিভাবক, রাজনৈতিক দল বা নেতা, দেশের নৈতিক আবহাওয়া, বর্ত্তমানের আর্থিক ও সামাজিক সঙ্কট ও বিপ্লব এবং সর্ব্বোপরি আন্তর্জ্জাতিক পরিবেশ সকল কিছুই বর্ত্তমান ছাত্র-চাঞ্চল্য ও শিক্ষাবিভ্রাটের জন্য অল্পবিস্তর দায়ী। কিন্তু যে আদর্শে আমরা পৌঁছিতে চাই উহার পথ ইহার সকলগুলির মধ্যে খুঁজিয়া প্রতিকার উদ্ভাবন করিতে গেলে আমাদের নিরাশ হইতে হইবে। আমাদের শিক্ষার আদর্শ বড় হইলেও আমাদের সামর্থ্য অল্প, একথা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে।

এবার প্রাচীনের শিক্ষা-ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক্। তখন গুরুগৃহ ছিল, ব্রহ্মচর্য্য ছিল কিন্তু শিক্ষার বিষয়গুলি ও আদর্শ বর্ত্তমান হইতে বিভিন্ন ছিল। আজ গুরুগৃহ নাই তৎস্থানে বোর্ডিংস্কুল হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্যে যদিও এই বোর্ডিংস্কুলের সুবিধা অনেকে গ্রহণ করিয়া থাকে, এদেশের অনেক পিতামাতার পক্ষেই এরূপ ব্যবস্থার অর্থ যোগানো অসম্ভব। আমাদের মধ্যে যাহারা সম্পন্ন গৃহস্থ অবশ্য রামকৃষ্ণ মিশন বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান দ্বারা স্থাপিত শিক্ষাশ্রমে ছেলেমেয়ে রাখিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ কি করিবে তাহাই সমস্যা। কি শিক্ষা দেওয়া হইবে পিতামাতা সে বিষয়ে অনেক সময় গভীর ভাবে চিন্তা নাও করিতে পারেন, কিন্তু তাহাদের সকল সময়ই চিন্তা থাকে কিরূপে সন্তান প্রকৃত মানুষ হইবে, সমাজের দশজনের একজন হইবে, চরিত্রবান এবং স্বাবলম্বী হইবে। মানুষ হইতে হইলে কিভাবে মনুষ্যত্বের গুণগুলি অর্জ্জন করিতে হইবে ইহাই প্রথম ও প্রধান প্রশ্ন হইয়া পড়ে। যে সকল সদ্‌গুণের কথা আমরা ভাবিতেছি তাহার কতকগুলি মানুষ জন্মের সঙ্গেই লইয়া আসে, আবেষ্টন তাহা বিকশিত করে।

আবার কতগুলি শিক্ষা দ্বারা লাভ করিতে হয়। এই জন্যই সৎশিক্ষা ও অনুকূল পরিবেশ দরকার হয়।

ছোট শিশু আমাদের দৃষ্টির অগোচরেও প্রতিনিয়ত শিক্ষা করিতেছে। সুতরাং অতি শৈশবকাল হইতে সতর্ক না হইলে শিশুকালেই কুশিক্ষা আরম্ভ হইতে পারে। এ জন্য পিতামাতা আত্মীয়স্বজন যাহারা শিশুর চারিদিকে থাকেন সর্ব্বদাই তাঁহাদের সজাগ থাকা প্রয়োজন। শিশু যত বাড়ে ততই তাহার শিক্ষার আগ্রহ বাড়ে। সে প্রশ্নবাণে সকলকে জর্জ্জরিত করে। জানিতে চায়, বলে 'গল্প বল'। আমাদের পুরাতন সমাজে ও পরিবারে শিশুর এই অবস্থায় যে ব্যবস্থা থাকিত বা পরিবেশ পাওয়া যাইত আজ তাহা দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের সকল কাজের সময় হয়, কিন্তু শিশুর প্রতি কর্ত্তব্য করিবার সময় বড় অল্প, অনেকের সময় একেবারে নাই। কতকটা স্বভাবে আবার কিছুটা অভাবে বা আর্থিক কারণে বটে। কিন্তু পিতামাতাকে শৈশব হইতেই শিশুর চারিত্রিক উন্মেষের ভার লইতে হইবে। শৈশবের প্রথম শিক্ষাই সংযম শিক্ষা। সর্ব্ব বিষয়ে শিশু অবাধে অগ্রসর হইবে, কিন্তু সংযত ভাবে—প্রত্যেক কার্য্যে নিয়মানুবর্ত্তিতা থাকিবে। শৈশবের সংযম পরবর্ত্তীকালের নিয়মানুবর্ত্তিতায় পরিণত হইবে। সন্তানকে সংযমী দেখিতে চাহিলে পিতামাতাকে সংযমী হইতে হইবে। সমস্ত জীবনই এই সংযমের খেলা। প্রথম হইতেই আহারে সংযম, পোশাক-পরিচ্ছদে সংযম প্রয়োজন। যথেচ্ছ আহার, যথেচ্ছ পোশাক-পরিচ্ছদ বা এই বিষয়ে বিলাসিতা সংযমের অভাব সূচিত করে, ইহাও নিয়মানুবর্ত্তিতার অভাবের সূচক। মানুষ আমোদ-আহ্লাদ নিশ্চয়ই করিবে—সন্তানেরাও বাদ যাইবে না, কিন্তু একটা সংযমের গণ্ডি থাকিবে। ইহা ছাড়াইলেই উচ্ছৃঙ্খলতা। জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে সংযত ভাবে অগ্রসর হইলে জীবনের সফলতা আসিবে না ইহা মনে করা ভুল, বরং এই পথেই প্রকৃত সফলতা ও প্রতিষ্ঠা। আজ সংযমের অভাবেই আমাদের জীবন বিষময় হইয়া উঠিয়াছে। শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া পরিণত বয়স্ক বৃদ্ধ সকলেই যেন সংযম হারাইয়াছে, তরুণ ও যুবকগণের ত কথাই নাই। কি আনন্দ-উৎসব কি সভা-সমিতি এমন কি লোকসভা-বিধানসভায় সর্ব্বদাই অসংযম দেখা যায়। কাহাকে দেখিয়া কে শিখিবে?

আমাদের ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে বিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মশিক্ষা বারণ হইয়াছে, কিন্তু সংযম শিক্ষণীয় হিসাবে প্রবর্ত্তিত হওয়া প্রয়োজন, ইহাতে বাধা নাই। মাত্র ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে নানা সদ্‌গ্রন্থের মধ্যে অশ্বিনীকুমার দত্তের "ভক্তিযোগ" এবং চন্দ্রনাথবাবুর "সংযম শিক্ষা" শিক্ষকগণ ছাত্রের অবশ্যপাঠ্য মনে করিতেন, আজ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু অবস্থার উন্নতি হইয়াছে কি! দেশে যেরূপ শিক্ষাই চলুক, সংযম শিক্ষা হইবে সকল শিক্ষার মেরুদণ্ড বা ভিত্তি—ইহাই কাম্য।

হৃষিকেশের ঋষি

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

কর্কশ পাথর-কাঁকরের পথে-পাতা লৌহবর্ত্মে গড়িয়ে চলল বাষ্পযান। টিহরী গাড়োয়ালের এলাকা। দূরে শৈল-শিরে নরেন্দ্রনগর ছবির মত ভেসে উঠল। দু'একটা টানেল পার হয়ে ট্রেন শাল, খয়ের, আমলকী গাছ-ভরা সরকারের সংরক্ষিত বনানীর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে চলল। বৃক্ষশিরে বসে-থাকা ময়ূর দু'একটা চোখে পড়তে লাগল। শুনেছিলাম হরিণও নাকি এ অঞ্চলের বনে আছে। দেখতে পেলাম না একটাও কিন্তু। ক্রমশঃ উঁচুতে উঠছে রেলগাড়ী। পাহাড়ও নিকটে সরে সরে আসছে। জঙ্গল আর জলবিহীন ঝর্ণা অতিক্রম করছি। কারা যেন নুড়ি-পাথরের গেণ্ডুয়া খেলা খেলে এখানে। মাঝে মাঝে কচিৎ কোথাও দু'একটা পাতায়-ছাওয়া 'কুঠিয়া' ঠিক ঠাহর হবার পূর্বেই চকিতে পার হয়ে গেল। জড়াজড়ি করে থাকা কয়েকটা সেগুন আর শিশু-গাছের মাথায় ঝরে-পড়া শরতের সোনালী রৌদ্রের ঝলকটুকু বাংলা দেশের পূজার আনন্দকে স্মরণ করিয়ে দিলে। আজ সপ্তমী পূজার দিন।

এলো রাজওয়ালা। এটি একটি ছোট্ট পার্বত্য জংসন ষ্টেশন। এখান থেকে গাড়ী এক পথে দেরাদুন যায়। আবার অন্য পথে হৃষিকেশ যায়। এর পরের ষ্টেশনই হৃষিকেশ, হরিদ্বার হতে মাত্র পনের মাইল। হামেশা বাস আসে হরিদ্বার থেকে হৃষিকেশ। মহাপ্রস্থানের পথের পাশেই বাসের গতিপথ।

রাজওয়ালা থেকে গাড়ী ছাড়ল। কত গিরি-দরি নিমেষে নিমেষে অতিক্রম করে যাচ্ছি। দু' পাশের ঘন-বনে এক রকম বেগুনি ফুলের মত কাঁটা ফুল ফুটে আছে। তরাই অঞ্চল এটি।

এসে পৌঁছলাম হৃষিকেশ ষ্টেশনে। টাঙ্গায় চেপে চলেছি শহরের মধ্য দিয়ে ত্রিবেণী ঘাটে। নির্জন শহর। ঠিক পাহাড়ের কোলের কাছে। হৈ-হল্লা নেই। সংযমের কঠিন বাঁধনে বাঁধা যেন এখানের সবকিছু। মর্তলোকে নেমেছেন ভাগীরথী এখানে। হয়ত এই স্থানটিই স্বর্গ-মর্ত্যের সন্ধিস্থল। কমণ্ডলু খর্পরধারী সন্ন্যাসী একটিও চোখে পড়ল না রাস্তায়। অথচ অধ্যাত্মভূমির মানচিত্রে হৃষিকেশের স্থান পুরোভাগে। এই ত মহাপ্রস্থানের পথের সিংহদ্বার। পঞ্চপাণ্ডব জাহ্নবীর কোলে কোলে অগ্রসর হয়ে গিয়েছিলেন এই পথেই। সন্ন্যাসভূমিতে সন্ন্যাসী কই? ব্যাপার কি? বেশীক্ষণ ভাবনার অবকাশ পেলাম না। একে একে দু'য়ে দু'য়ে সাধু আসছেন দেখলাম। দেখতে দেখতে সাধুতে পথ ভর্তি হয়ে গেল। তাঁরা একে একে বিনা বাক্যব্যয়ে একটি বিশাল অট্টালিকায় ঢুকে যাচ্ছেন। অনুসন্ধিৎসা আর চেপে রাখা গেল না। অট্টালিকার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়ালাম দূরে টাঙ্গাওয়ালাকে অপেক্ষা করতে বলে।

দেখলাম আবার তাঁরা একে একে বিনা বাক্যব্যয়ে অবনত মস্তকে বেরিয়ে আসছেন এবং চক্ষের নিমেষে কে-কোথায় মিশিয়ে যাচ্ছেন। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, অট্টালিকাটি কালী কমলীওয়ালার দানসত্র। এখানে সাধু-সন্তরা দিনে একবার আহার্য গ্রহণ করে যান। আহার্য বলতে রুটি আর ডাল। নিয়ে যান যে যার পাত্রে। আহার কে যে কখন করেন তা কেউ জানে না। তাঁরা আসেন, চলে যান। বলেন না কিছুই, মুখে জপমন্ত্রের বিরাম নেই। যেন আসতে হয় আসা এবং যেতে হয় যাওয়া, এর মধ্যে প্রয়োজনের বড় বেশী তাগিদ নেই। অভ্যাসবশে তাঁরা আসেন আর চলে যান। এঁদের সম্বল বলতে একখানি কম্বল আর কমণ্ডলু। কম্বলখানি এই অন্নসত্রেই পাওয়া। অথচ দেহে লাবণ্য, চোখে ব্রাহ্মণ্য দীপ্তি। প্রাচীন ভারতবর্ষের একখানি সুন্দর ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠল। এই আমার ভারতবর্ষ। এখানে আকাঙ্ক্ষা নেই, আসক্তি নেই, আছে অধ্যাত্ম আনন্দের মহিমার উদ্ভাস, ওঙ্কারধ্বনির অনুরণন।

ব্রহ্মপুরার শ্রেষ্ঠ স্থান হৃষিকেশ। রক্ষকুলপতিকে সংহার করে রঘুকুলপতি আর্যশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র অনুশোচনার অনলে শুদ্ধিলাভের জন্য নীলকণ্ঠের আরাধনা করতে এসেছিলেন এই পুণ্যভূমিতে। আজও সেদিনের সেই পুরাণ-কাহিনীর সাক্ষ্য বহন করছে শ্রীরাম-মন্দির, ভরতজীর মন্দির, মুনি-কি-রেতির তপোবনের শত্রুঘ্নজীর মন্দির আর লছমনঝুলার লক্ষ্মণজীর মন্দির। এই ভূমিতে বসে বেদব্যাস বেদবিভাগ করেছিলেন। বালক ধ্রুবের তপস্যায় এ স্থান পবিত্র।

কালী কমলীওয়ালার ধর্মশালা ও দানসত্র হতে গঙ্গার দিকে অগ্রসর হয়ে চলি। পথে শিব ভোজনালয়ে মধ্যাহ্ন ভোজনের অর্ডার দিয়ে দিলাম। ভোজনালয়টি বাঙালীদের ডাল-ভাত বেশ পরিপাটিরূপে পরিবেশন করে এমন সুখ্যাতি কনখলের রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজী-দের কাছে শুনেছিলাম। এসে পৌঁছলাম গঙ্গার ঘাটে। আটার গুলি নিয়ে কয়েকটি কিশোর ছেঁকে ধরল। 'মছলিকে গুলি খিলাও, শেঠ', কিন্তু মাছ কোথায়! একটি কিশোর কয়েকটি গুলি গঙ্গায় ছুড়ে দিলে। অমনি কাল কাল কাষ্ঠখণ্ডের মত বিরাট বিরাট মাছ গঙ্গার বুকে ভেসে উঠল প্রবল স্রোতকে অগ্রাহ্য করে। অগত্যা কয়েক আনার আটার গুলি আমাদের নিক্ষেপ করতে হ'ল গঙ্গায়। এখানে গঙ্গায় কুলকুচো ফেলা নিষেধ। তবে কাপড়-জামা কাচার বারণ নেই। সাবান দিয়ে অনেকেই কাপড়-জামা কাচছে গঙ্গার ঘাটে দেখতে পেলাম।

ত্রিবেণী ঘাটে স্নান করে সম্মুখের রাম-মন্দিরে এলাম। মন্দিরের ভেতরে রামমূর্তি। সম্মুখে বাঁধানো একটি কুণ্ড। কেউ বলে এটিকে রামকুণ্ড, কেউ ঋষিকুণ্ড। কুণ্ডটির জল ঈষদুষ্ণ, কুণ্ড থেকে অবিরত জল ঝরে গঙ্গায় পড়ছে। অথচ জলের হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। এখানে স্নান করা আরামের, তাই ভিড়ও বেশ। পিতৃ-তর্পণ বিশেষ এখানে। অনেক পাণ্ডাই সে কথা স্মরণ করিয়ে দিলে। অনেকে তর্পণ করাতে চাইলে। বললে, যা খুশী দিও। পয়সাও দিতে পার, খাবারও দিতে পার। এক বৃদ্ধ একটি গাছতলাতে কুণ্ডপানে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমরা তাঁকেই পৌরোহিত্যে বরণ করলাম। কুণ্ডে স্নান সেরে তর্পণে বসলাম। বৃদ্ধ শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণে মন্ত্র বলছেন। আমরা সেগুলির পুনরুক্তি করছি। হঠাৎ দুটো বানর গাছ থেকে নেমে শ্রাদ্ধরত একজনের এক ছড়া কলা ভাগা-ভাগি করে নিয়ে সাঁতার দিয়ে কুণ্ডটি পার হয়ে চলে গেল। গাছতলাতে কেনেস্ত্রা পেটানোর শব্দ হচ্ছে। কোন্ বানর নাকি কোন্ মহিলার চপ্পল একপাটি নিয়ে মগ ডালে উঠেছে। অতএব ঐ কেনেস্ত্রা পিটিয়ে যাত্রীদের জিনিসপত্র সম্বন্ধে সতর্ক করা হচ্ছে, এখানে বানরের রাজত্ব। যা খুশী করে তারা। তাদের অত্যাচারে যাত্রীরা পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে, সর্বদা কলা বা ছোলা ভাজার মোড়ক সঙ্গে রাখতে হয়। কোন জিনিস নিয়ে কোন লালমুখো মেনি পালিয়ে গেলে তাকে উৎকোচের লোভ দেখাতে হয় ঐ দুটো জিনিসের যে-কোন একটা দেখিয়ে। তখন সুবোধ বালকের মত 'মেনি' গুটি গুটি এসে জিনিসটি নামিয়ে দিয়ে যায়। জানি নে কখন আমরা মন্ত্র ভুলে গিয়ে বানর দেখতে সুরু করে দিয়েছি। হঠাৎ জলদগম্ভীর স্বরে সচকিত হলাম। 'তুমলোগ লঙ্গুর দেখনে আয়ে হো, তব দেখো উনছিকো। হাম্‌কো কাহে বুলায়া, হাম ব্রাহ্মণ হ্যায়, ধরমকা ব্যবসা নেহি করতা।' কথাগুলি আমাদের পুরোহিত মশাইয়ের। তিনি সবকিছু তর্পণ-শ্রাদ্ধের উপকরণ, কোশা-কুশি-কুশ জলে ফেলে দিয়ে তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলেন। উপর থেকেও গর্জন করে যা বললেন তার ভাবার্থ, শ্রদ্ধা ছাড়া কি শ্রাদ্ধ হয়। 'নিশ্চয়ই নয়'— এ কথা স্বীকার করতে হ'ল। কত কাকুতি করে তাঁকে ফিরিয়ে এনে শ্রাদ্ধ সমাপ্ত করতে হ'ল।

দক্ষিণান্ত করতে চাইলাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু নিলেন না তিনি। বরং গঙ্গার ঘাটের এক কম্বলমোড়া সন্ন্যাসীকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'ওঁকে কিছু খাবার দাও। দেওয়া সার্থক হবে।'

কয়েকখানা পুরি আর গোটা কয়েক পেঁড়া কিনতে গেলাম নিকটের দোকানে। সে এক মজার ব্যাপার। দোকানী পুরি ভাজছে আর ভোজনরতদের পাতে দিচ্ছে। টপাটপ পুরিগুলি উদরস্থ হয়ে যাচ্ছে। ছেলে, বুড়ো, মাঝবয়সী, সধবা, অধবা, বিধবা এক সিন্ধি পরি-বারের সতের জন আহারে বসেছে। থরে থরে পুরি-পেঁড়া উদরস্থ করে চলেছে তারা। কমপক্ষে বিশ মিনিট অপেক্ষা করে খান আট পুরি ও খান ছয় পেঁড়া কিনে এনে সন্ন্যাসীকে নিবেদন করলাম।

গঙ্গার দিকে তাকিয়ে বসে আছেন সন্ন্যাসী যেন নির্বাত-নিষ্কম্প দীপ-শিখা গায়ের বর্ণ দুধে-আলতায় গোলা রঙের মত। বললাম, 'সাধুজী কুছ পুরী লে আয়া ভোজনকে লিয়ে।' সাধু তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছেন গঙ্গার দিকে।

আবার একটু কথায় জোর দিয়ে বললাম, 'সাধুজী, কসুর মাপ কি জিয়ে, ভোজনকে ওয়াস্তে কুছ লায়া।'

এবার সাধু ঈষৎ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'ভাগ যাও।

তবু অনুনয় কণ্ঠে বললাম, কুছ ভোজন করিয়ে বাবা।'

ত্বরিতে উঠে পড়লেন সাধু। সম্মুখে রক্ষিত পেঁড়া ও পুরিগুলি নিয়ে বানরদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন। কিচির-মিচির আনন্দধ্বনি করতে করতে বানরেরা পুরি-পেঁড়া খেতে আরম্ভ করে দিলে। আমাদের দেওয়া ভোজ্যগুলির ভাগ্য দেখে দুঃখিত হলাম। সাধুর সম্বন্ধে টাঙ্গাওয়ালা উক্তি করলে, ও সাধুবাবা পাগলা, কোথায় থাকে কেউ জানে না। মাঝে মাঝে ত্রিবেণী ঘাটের

পাথরে বসে থাকে। তবে লোক সাচ্চা, অন্য সাধুরা একে ভক্তি করে।

সাধু নিজের আসনে গিয়ে বসলেন আবার। এ পর্যন্ত একবারও আমাদের দিকে তাকান নি। এবার তাকালেন, আবার চোখ ফিরিয়ে নিলেন, আবার তাকালেন। আবার চোখ ফিরিয়ে নিলেন। তার পর তাকিয়ে রইলেন। আর চোখ ফিরল না। মুখের দৃঢ় ভাব ক্রমশঃ কমনীয় হয়ে উঠল, হাত নেড়ে নিকটে ডাকলেন। গেলাম, বললেন, 'চিনতে পার?' সাধুর মুখে বিশুদ্ধ বাংলা কথা শুনে স্তম্ভিত হলাম। বিস্ময়ের ভাব কাটতে কিছুটা সময় লাগল, স্মৃতি মন্থন করতে করতে হঠাৎ সাধুকে চিনে ফেললাম। সানন্দে বললাম, 'প্রিন্স—তুমি? শুনেছিলাম কোথায় কোন্ স্যানিটোরিয়মে তোমার মৃত্যু ঘটেছিল।'

'ওটা রটনা, ঘটনা নয়। আসলে আমি পালিয়ে বেঁচেছিলাম স্যানিটোরিয়ম থেকে। কর্তৃপক্ষ আমার সন্ধান না পেয়ে ঐ কথাই রটিয়েছিল। তা ছাড়া আমার মৃতদেহ সৎকার করার মত আত্মীয়স্বজন আমার আর কেউ অবশিষ্ট ছিল না এ জগতে।'

'কেন, তোমার মা, বাবা?'

'তাঁরা এ ঘটনার পূর্বেই ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন।'

'তোমার স্ত্রী?'

'আমার চরিত্রে সন্দেহ হওয়ায় তিনি পূর্বেই আমার সঙ্গ ত্যাগ করেছিলেন। টি বি হাসপাতালে থাকাকালীন সংবাদ পেয়েছিলাম বসন্ত রোগে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। এখন কোন কিছু গ্লানি নেই। শান্তি পেয়েছি ভাই...' কথা শেষ করতে পারলেন না সাধুজী। এক বৃদ্ধা এসে কান্নাকাটি সুরু করে দিলে. বৃদ্ধার একমাত্র ছেলের কলেরা হয়েছে। বৃদ্ধার বিশ্বাস সাধুবাবা তার ছেলেকে নিরাময় করে দিতে পারেন। চলে গেলেন সাধু।

আই-এস-সি পড়ার সহপাঠী প্রিন্স, বড় ঘরের ছেলে। কলিকাতায় ব্যবসা, মফঃস্বলে দু'দুটো রাইস মিল, মোটরে করে ধড়াচূড়াধারী দারোয়ান সঙ্গে কলেজে আসত, মেধাবী ছাত্র ছিল। কৃতিত্বের সঙ্গে ডাক্তারি পাশ করেছিল, এইটুকুই জানতাম, আর শুনেছিলাম মৃত্যুসংবাদ, তার পর সাতাশ বছর পরে তাকে জটাজুট-ধারী সন্ন্যাসী বেশে দেখলাম, আশ্চর্য!

বেলা প্রায় একটায় শিব ভোজনালয়ে আহার করলাম। এবার চললাম ভরতজীকে দর্শন করতে, হৃষিকেশে ভরতজীই প্রধান, প্রাচীন মন্দির, বহুবার সংস্কার করা হয়েছে। ঘৃত প্রদীপের স্তিমিত শিখা জ্বলছে। ভেতরের সবকিছু খুব ভালভাবে দেখা যায় না। ভরতজীর গায়ের রঙ নব-দূর্বাদল শ্যাম নয়, কালো, তবে চোখ দুটি সাদা, ঝলমলে। রেলিং-এর ঘেরাটোপের মধ্যে তিনি বিরাজ করছেন। জমকালো সাজ-পোশাক, সোনা-রূপায় মোড়া, রাজাধিরাজের গাম্ভীর্য ভরতজীর মুখে।

শঙ্করাচার্য-প্রতিষ্ঠিত শিব-মন্দিরটি দেখতে গেলাম, এটি এক রকম শহর ছাড়িয়ে। চন্দ্রভাগার পরপারে সাধুদের কুঠিয়া। ছোট ছোট ঝুপড়ি ঘর। কোনটিতে কোনক্রমে একজনের বসা চলে, কোনটিতে শোয়া. স্থানটিকে বলে 'তপোবন', যাত্রী-সমাগম যখন বেশী হয়, সাধুরা বিব্রত বোধ করেন, তাই তখন তাঁরা কুঠিয়া ত্যাগ করে হিমালয়ের অন্য কোন জনবিরল অঞ্চলে আত্মগোপন করেন, আবার ভিড় কমলে তাঁরা যে-যার কুঠিয়াতে ফিরে আসেন।

চলতিকালের হাওয়া লেগেছে হৃষিকেশেও, তবু বলব, পাহাড়ে পাহাড়ে আজো স্তব্ধ হৃষিকেশ, হিমালয়ের জটার জালের বন্ধনে সে আজও বাঁধা, নীলকণ্ঠ পাহাড়ের কোলের নীলধারা আর স্বর্গাশ্রমের মহিমাকে অতিক্রম করতে আধুনিককালকে এখনও দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করতে হবে।

প্রিন্সকে—মানে হৃষিকেশের ঋষিকে স্মরণ করতে করতে হরিদ্বারে ফিরে এলাম।

বাংলা ছন্দের দ্বিজাতি ও ত্রিজাতিবাদ

শ্রীআনন্দমোহন বসু

বাংলা ছন্দের রীতি বা জাতি বিভাগ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ছান্দসিকরা অনেকেই একমত হতে পারেন নি। কোনো কোনো ছান্দসিক জাতি মানতে চান নি, কেউ বলেছেন, দুই জাতির ছন্দ, আবার কেউ বলেছেন, তিন জাতির। আবার কোনো ছান্দসিক জাতি বিভাগ স্বীকার না করে বলেছেন, জাতি এক কিন্তু ঢং তিনটি। এঁদের সকলের মতের সমন্বয় সাধন করা কঠিন। শুধু জাতি বিভাগ কেন ছন্দের পরিভাষা নিয়েও বাদ-বিতণ্ডার অবসান এখনো হ'ল না। অথচ ছন্দের মূল সূত্র বিষয়ে এঁদের মধ্যে খুব যে একটা বিরোধ আছে তা মনে হয় না। বিভিন্ন ছান্দসিকের বিতর্কমূলক আলোচনার ফলে পাঠক-সমাজ ও ছন্দ-শাস্ত্রের শিক্ষার্থীদের বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা হবার পথে যথেষ্ট বাধা সৃষ্টি হয়। এই সব অসুবিধা দূর হতে পারে ছান্দসিকদের মধ্যে মোটামুটি একটি ঐক্যমত গঠিত হলে।

বাংলা ছন্দের সত্যিই কোনো জাতি বিভাগ করা চলে কি না, আর করলে ক'টি বিভাগ সঙ্গত সে সিদ্ধান্তে পৌঁছবার চেষ্টা করা যাক্। বাংলা কবিতা পড়তে গিয়ে আমরা এই তিনটি রীতির সাক্ষাৎ পাই—

(১) দিনের আলো নিবে এলো সূয্যি ডোবে ডোবে।
আকাশ ঘিরে মেঘ করেছে চাঁদের লোভে লোভে॥
[বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, কড়ি ও কোমল]

(২) নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল,
ঊর্দ্ধে পাষাণতট শ্যাম শিলাতল।
[নিষ্ফল উপহার, মানসী]

(৩) মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই।
[প্রাণ, কড়ি ও কোমল]

রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে উদ্ধৃত উপরের তিনটি দৃষ্টান্ত যে এক রীতির রচনা নয়, তা পাঠক মাত্রেই বুঝতে পারেন। বাংলা সাহিত্যে পদ্য যা-কিছু রচিত হয়েছে বা হচ্ছে তার বাক্যগঠনরীতি এই তিনের কোনোটি না কোনোটির অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম কবিতাটি যে রীতিতে রচিত, সেই রীতির কবিতা বাংলা দেশে ছেলে ভুলানো ছড়া ও লোক গাথার মধ্যে দেখা যায়। সেই জন্য রবীন্দ্রনাথ এর নাম দিয়েছেন 'ছড়ার ছন্দ'। উল্লিখিত প্রথম নমুনাটির প্রতিটি পংক্তিতে চৌদ্দটি করে সিলেবল বা দল আছে এবং প্রত্যেকটি সিলেবল (দল)—স্বরান্ত (open) কিম্বা হলন্ত (closed)—এক মাত্রার বেশী মূল্য পায় নি। এই ছন্দের এই একটি বিশেষত্ব। আর একটি বিশেষত্ব এই যে, এ ছন্দের উচ্চারণে প্রবল শ্বাসাঘাত বা ঝোঁক পড়ে। এই রীতির ছন্দে প্রতিটি পর্বে সাধারণতঃ চারটির বেশী সিলেবল স্থান পায় না, তবে কখনো কখনো চার সিলেবলের পর্বের সঙ্গে তিন বা দুই সিলেবলের পর্বও ব্যবহৃত হয়।

শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা ছন্দের মূল সূত্র' গ্রন্থে এই ছন্দকে বলেছেন, 'শ্বাসাঘাত-প্রধান বা বলপ্রধান ছন্দ'; শ্রীযুক্ত তারাপদ ভট্টাচার্য বলেছেন, 'বলবৃত্ত'; শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় বলেছেন, 'স্বরবৃত্ত'; শ্রীযুক্ত সুধীভূষণ ভট্টাচার্য নাম দিয়েছেন, 'দেশজ ছন্দ'; শ্রদ্ধেয় মোহিতলাল মজুমদার নামকরণ করেছেন, 'পর্বভূমক'; আর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন এর নাম দিয়েছেন, 'দলবৃত্ত বা দলমাত্রি (syllabic) ছন্দ'। অর্থাৎ ছন্দ এক, ভিন্ন ভিন্ন ছান্দসিকের কাছে নাম আলাদা।

এইবার দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি আলোচনা করা যাক্। এখানে প্রত্যেকটি স্বরান্ত সিলেবল (open syllable বা মুক্তদল) এক মাত্রার এবং প্রত্যেকটি হলন্ত সিলেবল (closed syllable বা রুদ্ধদল) দুই মাত্রার বলে গণ্য। এই ছন্দের ঠিক এই রূপটি রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলা কাব্যক্ষেত্রে দেখা যায় নি। তিনি যখন বাংলা ছন্দ নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন তখন যুগ্ম-ধ্বনিকে একেবারেই বর্জন করে এক শ্রেণীর কবিতা লিখেছিলেন। এইরূপ যুগ্ম-ধ্বনি বর্জিত কবিতার একটি হচ্ছে 'ভুলে' (মানসী)। পরে তিনি যুগ্ম-ধ্বনিকে বিশ্লিষ্ট করে দুই মাত্রার পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে অসংখ্য কবিতা রচনা করেছেন। এই ছন্দের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এর লয় বিলম্বিত। প্রাক্-রবীন্দ্রযুগে যে এই ছন্দ ছিল না তা নয়, তবে এত সরল ছিল না। তখন হলন্ত সিলেবল বা

রুদ্ধদল দুই মাত্রার বলে গণ্য হ'ত বটে, তবে স্বরান্ত সিলেবল বা মুক্তদল যে সব সময়েই এক মাত্রার বলে গণ্য হ'ত তা নয়, ছন্দের অনুরোধে দীর্ঘ-স্বরান্ত, কখনো কখনো হ্রস্ব-স্বরান্ত সিলেবলও দুই মাত্রার বলে গণ্য হ'ত।

এই ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মাত্রাছন্দ'; অমূল্যবাবু এর নাম দিয়েছেন, 'ধ্বনিপ্রধান ছন্দ'; দিলীপকুমার এবং তারাপদবাবু বলেছেন, 'মাত্রাবৃত্ত'; সুধীভূষণবাবু বলেন, 'শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দ'; আর মোহিতলাল একেও 'পর্বভূমক ছন্দ' বলেছেন। তবে আরও প্রস্ফুট করে বলতে গেলে মোহিতলালের পরিভাষা দাঁড়ায় 'সাধুভাষার পর্বভূমক' আর পূর্বেরটি অর্থাৎ ছড়ার ছন্দ হচ্ছে 'কথ্য-ভাষার পর্বভূমক'। প্রবোধবাবু একে বলেন, 'সরল কলামাত্রিক (simple moric) ছন্দ'।

তৃতীয় দৃষ্টান্তটি যে-রীতিতে গঠিত রবীন্দ্রনাথ তাকে 'পয়ারজাতীয়' আখ্যা দিয়েছেন। এই ছন্দে বাংলা পয়ার লেখা হয়েছে বলে বোধ করি এই নামকরণ করেছেন। কিন্তু পয়ার বললে ছন্দের রীতি বা জাতি বুঝায় না, বুঝায় ছন্দোবন্ধের কোনো একটি বিশেষ পদ্ধতি। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন,

আট-ছয় আট-ছয়
পয়ারের ভাগ কয়।

অর্থাৎ, পয়ারের প্রতি পংক্তিতে ৮।৬ ভাগের চৌদ্দ-মাত্রা থাকে, যেমন একাবলীতে থাকে ৬।৫ ভাগের এগার মাত্রা। তাই পয়ার বললে একটি বিশেষ রীতির ছন্দকেই যে বুঝাবে তা নয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে উদ্ধৃত তিনটি নমুনাই পয়ারের (অর্থাৎ ৮।৬ ভাগের চৌদ্দ-মাত্রার পংক্তি বিশিষ্ট) তবে ভিন্ন ভিন্ন রীতির। আলোচ্য ৩নং দৃষ্টান্তের ছন্দোরীতি হচ্ছে, এর প্রত্যেকটি স্বরান্ত সিলেবলকে এক-মাত্রা, আর শব্দের আদিতে বা মধ্যে কোনো হলন্ত সিলেবল থাকলে তাকেও একমাত্রা হিসাবে ধরতে হবে। শুধু শব্দের শেষের হলন্ত সিলেবল দুই-মাত্রার বলে গণ্য হবে।

আলোচ্য রীতির ছন্দেরও বিভিন্ন ছান্দসিক ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়েছেন। অমূল্যবাবু নামকরণ করেছেন, 'তান-প্রধান ছন্দ'; মোহিতলাল বলেছেন, 'পদভূম'; দিলীপ-কুমার বলেন, 'অক্ষরবৃত্ত'; সুধীভূষণবাবু নাম দিয়েছেন, 'ভঙ্গ-প্রাকৃতজ ছন্দ'; তারাপদবাবু বলেন, 'সাধারণ ভঙ্গির (অক্ষরবৃত্ত)'; আর প্রবোধবাবু সম্প্রতি এর নাম দিয়েছেন, 'জটিল কলামাত্রিক (complex moric) ছন্দ'।

অমূল্যবাবু তাঁর 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' গ্রন্থে বাংলা ছন্দের তিনটি সুস্পষ্ট রীতির বৈশিষ্ট্য ধরবার প্রয়াস পেয়েছেন এবং তাদেরকে 'তানপ্রধান', 'ধ্বনিপ্রধান' ও 'শ্বাসাঘাত-প্রধান' রূপে নামকরণ করেছেন, যদিও তিনি বাংলা ছন্দের ত্রিজাতিতত্ত্বের তথা জাতিভেদের বিরোধী। তিনি বলেছেন, "বাংলা ছন্দের তিন রীতির কথা বলিয়াছি। কিন্তু বাংলা কবিতার তিনটি স্বতন্ত্র জাতি-ভেদের কথা বলি নাই।" (বাংলা ছন্দের মূলসূত্র, পৃ-১১১, ৫ম সংস্করণ, ১৯৫৭)।

মোহিতলাল তাঁর 'বাংলা কবিতার ছন্দ' গ্রন্থে বাংলা ছন্দের জাতিভেদ স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, "বাংলা ছন্দে জাতিভেদ আছে—তথ্য হিসাবে ইহা অবিসংবাদিত। একই ভাষার ছন্দ দুই প্রকৃতির হয় কেমন করিয়া? এইরূপ প্রশ্ন সঙ্গত হইলেও, তাহাতে বিচলিত হইবার কারণ নাই। ভাষা যেমন আগে, ব্যাকরণ পরে—তেমনই ছন্দ আগে এবং ছন্দসূত্র পরে। ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া যাহাই হউক—সাধু ও কথ্যভাষার রূপভেদ যতই উপেক্ষণীয় হউক, ইহাদের উচ্চারণের ধ্বনিগুণে এমন পার্থক্য আছে যে, বাংলা পয়ার ছন্দ ও ছড়ার ছন্দ ব্রাহ্মণ শূদ্রের মতই ভিন্ন-গোত্রীয়। এই তথ্য স্বীকার করিলে বিজ্ঞানের মর্যাদা-হানি হয় না।" (বাংলা কবিতার ছন্দ, ২য় সংস্করণ, ভূমিকা পৃঃ—॥৶০)। তিনি বাংলা ছন্দকে দুই জাতিতে বিভক্ত করেছেন,—সাধুভাষার ও কথ্যভাষার ছন্দ এবং দুটি প্রধান গোত্রে ভাগ করেছেন,—পদভূমক ও পর্বভূমক।

তারাপদবাবু তাঁর 'ছন্দোবিজ্ঞান' গ্রন্থে বাংলা ছন্দের তিনটি রীতি স্বীকার করেছেন—সাধারণ ভঙ্গী, দুর্বল ভঙ্গী, প্রবল ভঙ্গী এবং এই তিন ভঙ্গীর নামকরণ করেছেন যথা-ক্রমে 'অক্ষরবৃত্ত', 'মাত্রাবৃত্ত' ও 'বলবৃত্ত'।

সুধীভূষণবাবু তাঁর 'বাংলা ছন্দ' গ্রন্থে বাংলা ছন্দকে প্রধান দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—'দেশজ' ও 'প্রাকৃতজ'। 'প্রাকৃতজ' ছন্দ তাঁর মতে দুই প্রকার—'শুদ্ধ-প্রাকৃত' ও 'ভঙ্গ-প্রাকৃত'।

প্রবোধবাবু বাংলা ছন্দের তিনটি রীতির উল্লেখ করেছেন—'দলমাত্রিক' (syllabic), 'সরল কলামাত্রিক (simple moric)' ও 'জটিল কলামাত্রিক (complex moric)'।

২

শুধু ছন্দের জাতি নির্ণয় ও নামকরণ বা পরিভাষা সৃষ্টির ক্ষেত্রেই যে ছান্দসিকরা একমত হতে পারেন নি তাই নয়, সাধারণ্যে 'স্বরবৃত্ত (ছড়ার ছন্দ)' নামে পরিচিত

ছন্দের মাত্রা হিসাব করতে গিয়েও অনেকেই একমত হতে পারেন নি। চার সিলেবলের পর্বযুক্ত স্বরবৃত্ত ছন্দের মাত্রা নির্ণয় করতে গিয়ে কেউ বলেছেন, এর প্রতিপর্বে আছে চার মাত্রা; কেউ বলেছেন, সাড়ে চার মাত্রা, আবার কেউ বলেছেন, ছয় মাত্রা।

এঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি এই স্বরবৃত্ত বা ছড়ার ছন্দকে 'তিন মাত্রার ছন্দ' বলেছেন এবং এর চার সিলেবলযুক্ত পর্বে ছয় মাত্রার হিসাব ধরেছেন। তাঁর মতে এই ছন্দে যে ঝোঁক পড়ছে তারই ফলে ফাঁক পূর্ণ হয়ে প্রতিপর্বে ছয় মাত্রা এসে যাচ্ছে। প্রবোধবাবুও রবীন্দ্রনাথের এই মত সমর্থন করেছেন তাঁর 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে। দিলীপকুমার ও সুধীভূষণবাবু ছয় মাত্রার পর্ব সমর্থন করেছেন। তারাপদবাবু স্বরবৃত্তের এই চার সিলেবলের পর্বকে সাড়ে চার মাত্রার ওজন হিসাবে গণ্য করেছেন, আর অমূল্যবাবু ধরেছেন চার মাত্রা। মোহিতলাল চার মাত্রা ও ছয় মাত্রা উভয়ই সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন—"রবীন্দ্রনাথ, এই ছড়ার ছন্দের পর্বচ্ছেদ চার না ধরিয়া, তাহাকে যে তিনের ঘরানা বলিয়াছেন, সে সম্বন্ধেও কিছু বলা আবশ্যক। ওই ঝোঁককে যদি দুই মাত্রার ওজন দেওয়া যায়, এবং প্রতি পর্বের চারকে দুই ভাগ করিয়া প্রতিভাগে একটি পৃথক ঝোঁকের ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের ঐ মত ঠিকই। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ যেমন সেই ছাঁদ রক্ষা করিয়াই কবিতা রচনা করিয়াছেন—চারের পর্বকে দুইয়ে ভাঙ্গিয়াছেন, এবং প্রত্যেকটিকে পৃথক ঝোঁকের উপায় করিয়াছেন, যেমন—

/ / / /
দুর্দ্দম ০ তোমার—শৌর্য্যের ০ বরে,
/ / / /
পর্ব্বত ০ দাঁড়ায় । গর্ব্বের ০ ভরে,

—তেমনই, এইরূপ কৌশল না করিলে ছড়ার ছন্দের পক্ষে এই চলন ও এই সুর স্বাভাবিক নয়; 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর'-কে—

/ / / /
বৃষ্টি ০ পড়ে । টাপুর ০ টুপুর

এইরূপ করিয়া পড়িলে, তাহা স্বাভাবিক হয় না—ওইরূপ সুরে পড়া নিয়মও নয়। এখানে উহা স্পষ্টই চারের চাল, এবং আদ্য অক্ষরে একটা ঝোঁকই আছে। বরং, ইহাকে এইরূপ ত্রৈমাত্রিক হিসাবে গণনা না করিয়া, অনায়াসে দ্বৈমাত্রিকের হিসাবে লওয়া যায়—ঐ চার আসলে দুইয়েরই গুণিতক, যথা—

/ / /
কৃষ্ণ-কলি ০ আমি—তারেই ০ বলি
• • •
/ / / /
(যারা) নিত্য-কেবল ০ ধেনু-চরায় ০ বংশী-বটের ০ তলে
(রবীন্দ্রনাথ)

—এ ছন্দে সর্বত্র ঐ চারকে দুইয়ের ভাগে ভাগ হইতে দেখা যায়; কেবল, ঐ আদ্য-অক্ষরের ঝোঁকের জন্য প্রতিপর্বের প্রথম খণ্ডে এমন একটা তিনের আমেজ থাকে যে, হঠাৎ পর্বগুলিকে পর্বভূমকের পাঁচ মাত্রার বলিয়া ধাঁধাঁ লাগে। কিন্তু এ ভুলও চোখের ভুল—যেখানে ধ্বনি স্থান হসন্তসমেত পাঁচটা এবং আদ্য-অক্ষরের পরে হসন্ত বা যুক্তবর্ণ থাকে সেইখানেই এইরূপ মনে হয়; কিন্তু কান ঠিক থাকিলে, ঐ ঝোঁক এবং তজ্জনিত লয়ের পার্থক্য ধরা পড়িবেই। (বাংলা কবিতার ছন্দ পৃঃ, ৬৬-৬৭, ২য় সংস্করণ)।

বাংলা ভাষায় ছন্দ রচনার সর্বাপেক্ষা সহজ এবং সরল রীতি হচ্ছে 'ছড়ার ছন্দ' বা 'দলমাত্রিক (syllabic) ছন্দ'। এই ছন্দে ঘুমপাড়ানী গান গেয়ে মা তাঁর শিশুকে ঘুম পাড়িয়েছেন, বাউল নেচে নেচে গেয়েছে তার সাধন-সঙ্গীত, ডাক ও খনার বচন মুখে মুখে ফিরেছে এই ছন্দে। এই ছন্দেই রামপ্রসাদ মা মা বলে কেঁদে আকুল হয়েছেন। তাই বলছি, বাংলার জনসাধারণের মুখের ছন্দ যে 'ছড়ার ছন্দ' তার মাত্রা-গণনা-পদ্ধতি কোন মতেই জটিল হতে পারে না। তাই আমাদের মতে এই ছন্দের চতুর্দল পর্বে মাত্র চারটি করেই মাত্রা আছে এবং এই কারণেই এর 'দলমাত্রিক (syllabic)' নামকরণ সার্থক। এই ছন্দের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এর প্রতিপর্বের আদিতে প্রবল ঝোঁক (শ্বাসাঘাত) থাকে এবং মুক্ত ও রুদ্ধদল (open ও closed syllable) প্রত্যেকটি একমাত্রার ওজনের।

৩

বাংলা ছন্দের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এর 'লয়'। 'ধীর', 'বিলম্বিত' ও 'দ্রুত' এই তিনটি লয় মুখ্য। দ্রুত ও বিলম্বিত লয়-এর আর একটি করে রূপ পাই—অতি-দ্রুত ও অতি-বিলম্বিত।

রবীন্দ্রনাথ-কথিত 'পয়ার জাতীয় ছন্দ'-কে (জটিল কলামাত্রিক, complex moric) 'ধীর লয়ের ছন্দ' বলা চলে। এই ছন্দ সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ,—তৎসম, তদ্ভব বা দেশী যে-কোন শব্দই ব্যবহৃত হোক না কেন এই ছন্দে তা সমান ভাবে মানিয়ে যাবে। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, 'দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত' যেখানে চলে

সেখানেই 'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল'-ও চলে, এবং দুটোই সমান ওজনের হয়ে দাঁড়ায়।

বিভিন্ন লয় সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে কয়েকটি ছন্দো-পংক্তি দৃষ্টান্ত হিসাবে উদ্ধার করা যাক্। এগুলি থেকে সহজেই লয় সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যাবে।*

o⌣o o : ⌣o⌣o o o o o o o o o
(ক) অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি
(ধীর লয়)

• : • o o o o o o o o o o o o :
(খ) দেখার অতীত-রূপে আপনারে করে গেসে দান
(ধীর লয়)

-o o o -• o o • o o o o - o o
(গ) পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একী সন্ন্যাসী,
-o- • o o o • o o o
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে (বিলম্বিত লয়)

o o o o ‖ ‖ ‖ ‖
(ঘ) তব শুভ নামে জাগে
o o o o ‖ o o ‖ ‖
তব শুভ আশিস মাগে
‖ ‖ o o o o |
গাহে তব জয় ।
(অতি-বিলম্বিত লয়)

o o o / /o o / / o o o o o
(ঙ) মা কেঁদে কয় মঞ্জুলী মোর ঐ তো কচি মেয়ে
(দ্রুত লয়)

ধীর লয়ের ছন্দে রুদ্ধদল শব্দের আদিতে বা মধ্যে থাকলে তাকে সঙ্কুচিত করে একমাত্রা হিসাবে গণ্য করা হয়েছে, আর শব্দের শেষে থাকলে সম্প্রসারিত করে দুই মাত্রা বলে ধরা হয়েছে। একদল শব্দে (monosyllabic word) সেই দলটি যদি রুদ্ধদল হয়, তবে সেই রুদ্ধদলটি শব্দের অন্তে আছে বলেই ধরতে হবে। কোনো সংযুক্ত ধ্বনিকে বিশ্লিষ্ট করে লিখলে সেখানকার দলগুলির আলাদা উচ্চারণের জন্য শব্দের মধ্যবর্তী হলন্ত বা ব্যঞ্জনান্ত সিলেবল দুই মাত্রার বলে গণ্য করা চলে। যেমন, 'ঝঞ্ঝন' ও 'ঝঞ্ঝনা'-কে বিশ্লিষ্ট করে 'ঝন্ ঝন্' ও 'ঝন্ ঝনা'।

বিলম্বিত লয়ের ছন্দে হলন্ত সিলেবল ও যৌগিক স্বরকে সব সময়েই সম্প্রসারিত করে দুই মাত্রার মর্যাদা দেওয়া হয়। এই সম্প্রসারণের জন্যই ছন্দের লয় হয় বিলম্বিত। অতি-বিলম্বিত লয়ের ছন্দে গুরুস্বর বা দীর্ঘ-স্বরকে দুই মাত্রার হিসাবে গণ্য করা হয়, অবশ্য কখনো কখনো যে সব গুরুস্বরকেই দুই মাত্রার বলে গণ্য করা হয় তা নয়। এই বিলম্বিত লয়ের ছন্দকে বলা হয়েছে, 'সরল কলামাত্রিক (simple moric)'।

দ্রুত লয়ের ছন্দের ক্ষেত্রে সাধারণত প্রত্যেক পর্বে অন্তত একটি হলন্ত সিলেবল ব্যবহার করে একটা দ্রুততা আনয়ন করা হয়। তবে কখনো যে হলন্ত সিলেবলহীন পর্ব ব্যবহৃত না হয়, তা নয়। এই ছন্দে স্বরান্ত বা হলন্ত প্রত্যেকটি সিলেবল এক মাত্রার বলে গণ্য হয়। এই ছন্দে সাধারণত চার সিলেবলের পর্ব ব্যবহৃত হয়, তবে কখনো কখনো ছন্দোপংক্তির মধ্যে দুই-একটি তিন বা দুই সিলেবলের পর্বও যদি ব্যবহৃত হয় তা হলেও উচ্চারণের ঝোঁকে ফাঁক পূরণ করে নেওয়া চলে। আবার কোনো পর্বে যদি পাঁচ সিলেবল থাকেও তাও দ্রুত উচ্চারণের ফলে সঙ্কুচিত হয়ে চারের চালে চলে। দৃষ্টান্ত—

(ক) মরলেম ভূতের | বেগার খেটে |
পঞ্চভূত | ছয়টা রিপু | দশেন্দ্রিয় | মহালেঠে |

(খ) মনরে আমার | যতন করে |
চুটিয়ে ফসল | কেটে নেনা | (রামপ্রসাদ)

'ক'-দৃষ্টান্তে 'পঞ্চভূত' তিন সিলেবলের পর্ব হলেও তাকে 'পঞ্চভূতো' করে পড়লে এই ছন্দে ঠিক খাপ খেয়ে যায়। 'খ'-দৃষ্টান্তে পাঁচ সিলেবলের 'চুকিয়ে ফসল'-কে 'চুট্যে ফসল' বা 'চুট্য়ে ফসল'-রূপে সঙ্কুচিত করে উচ্চারণ করলে কোনো গোল থাকে না। রবীন্দ্র-নাথও লিখেছেন—

'ভয়কে যারা | ভয় করে সব | জাগিয়ে রাখে | ভয় | ' এখানেও পাঁচ সিলেবলের 'জাগিয়ে রাখে'-কে সঙ্কুচিত করে 'জাগ্যে রাখে' বা 'জাগ্য়ে রাখে'-রূপে পড়তে হবে।

৪

এইবার বর্তমান প্রবন্ধের মূল আলোচ্য জাতিতত্ত্বে আসা যাক্। দেখা গেল, বাংলা ছন্দের মুখ্য তিনটি রীতিকে ছান্দসিকরা সকলেই স্বীকার করেছেন, কিন্তু জাতিভেদের বেলায় কেউ দ্বিজাতি, কেউ ত্রিজাতি মানছেন, আবার কেউ বা জাতিই মানেন না। রবীন্দ্র-নাথ যাকে 'ছড়ার ছন্দ' বলেছেন সেটিকে syllable অর্থাৎ 'দল' দিয়ে বিচার করা হয় এবং পর্বের মধ্যে সিলেবলের সংখ্যাই যে তার মাপকাঠি এটা সকলের আলোচনা

* ছন্দোলিপিতে ব্যবহৃত বিবিধ চিহ্ন :—

o মুক্তদল (open syllable) একমাত্রা, I মুক্তদল (গুরুস্বর) দুই মাত্রা ⌣ রুদ্ধদল (closed syllable) সঙ্কুচিত একমাত্রা, • রুদ্ধদল সম্প্রসারিত দুইমাত্রা, / রুদ্ধদল (শ্বাসাঘাতযুক্ত) একমাত্রা, : অন্ত্য-হলন্তদল দীর্ঘ।

থেকেই বোঝা যায়। তাই এটাকে অন্ত ছন্দ থেকে পৃথক করে আলাদা একটা জাতি 'syllabic' বা দলমাত্রিক (দলবৃত্ত)' বলে ধরা যেতে পারে। বাকী দুটো রীতি ঠিক সিলেবলের সংখ্যা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না—পর্বের মাত্রা সংখ্যা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়, তাই তাদেরকে 'moric বা কলামাত্রিক' বলাই ঠিক হবে। এই ভাবে আমরা বাংলা ছন্দকে দুই জাতিতে ফেলতে পারি—syllabic ও moric। এই moric ছন্দের অবশ্য দুটি রীতি দেখতে পেলাম—সরল ও জটিল (সরল কলামাত্রিক ও জটিল কলামাত্রিক)।

স্মরণে *

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিটি সভায় দেখিতাম যাঁরে, শুনিতাম যাঁর সরস বাণী
ইন্দ্রধনুর দীপ্ত ভাষায় পলাশের আশা রং জাগানী—
কণ্ঠে যার প্রণব আবেগ কবিতারে করিত পারমিতা
প্রজ্ঞায় মিলিত হে বজ্রের বজ্রনিন্দিত নবগীতা
ত্রিকালিনীর সন্ধানে যিনি একালেতেও রচিতেন গান
মুগ্ধনয়ানে সেই কবি পানে চেয়ে আছি মোরা পাতিয়া কান
নাই বা পেলাম রবীন্দ্রনাথের তূর্যবীর্য অভ্রভেদী
হয়তো নেই ম্যালার্মের স্বপ্নসৌধ সপ্তপদী—
নাই বা হলে আজকের দিনের ডায়োটিমার একটি কবি
নীলনির্জনের সাঙ্করভরা রভসাবেশের প্রতিচ্ছবি
হাওয়াই দ্বীপে নাই বা গেলে কামারের কবি না হলে যদি
প্রবালদ্বীপের সুন্দরীরা থাকুন বসে নিরবধি
অন্নেষার রাক্ষসী বেলায় কবিতারে তুমি চাওনি কাছে
জীবনরতির দায়ভাগের রক্ত দুকূল অনেক আছে
তোমার গাথা মর্মরিত কাশের বনের প্রান্তরে
তোমার গীতি অলংকৃত স্নিগ্ধ কুমুদ কহ্লারে
কুঙ্কুম ফোঁটা ভুরু সংগম সিক্ত যূথীর মালাটি
তোমার হাতে হয়েছে তারা কাব্যলেখার পালাটি
আবার কর নি ক্ষমা রাত্রি অমা নেবেছে যবে ধরাতে
শাণিত হয়েছে তোমার দৃপ্তি পূর্ণের কলস্বরাতে
পুরানো দিনের কত না গল্প শুনেছি আমরা তোমার কাছে
কলকলিতা কলিকাতার যে সব কথা স্মৃতিতে আছে
যে এলে মোদের লাগিত ভালো, মধুনিষ্যন্দী কাব্যস্রোত—
রচিত অসংখ্য আকৃতি চিত্তে, হৃদয় হইতো ওতোপ্রোত
মেধায় মনীষায় জড়িত আলাপে যাঁর কাছে কিছু
শিখিবার ছিলো
আমার কালের ব্যক্ত মানুষ কোন অব্যক্তে মিলায়ে গেলো
বাসর রবির সভাকবিরে আসরে আজ দেখি না কেন
দীপ্ত খড়্গনাসা সেই কুঞ্চিতকেশ পুরুষ যেন
নগাধিরাজের নামের সাম্যে কৃশতনু যিনি নিরভিমান
হিমালয়ের মতন যিনি মনের মানদণ্ডে সমান
ক্রান্তিকালের হিন্দোলেতে মৃত্যুর অসির পরশ এসে
সঙ্গসুধারসে বঞ্চিত করি, ফিরিয়া চাহিল একটু হেসে
বলিল—দরাজ হৃদয় যাহার, ঘরের অর্গল তাহার নাই
মরণ আমি চুপি চুপি এসে সেই পথিকেরে পথ দেখাই
আকাশপ্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে বাজিয়ে নিত্য মাঙ্গলিক্
আলোকমাতাল স্বর্গসভায় কবির করি আরত্রিক্
পুণ্য হোক প্রয়াণ তোমার, নন্দিত ঊর্দ্ধলোকের গতি—
দিব্যললনার শঙ্খে বাজুক মর্ত্যলীলার একটু স্মৃতি—
নয়নজলে বিদায় দিয়ে বলি এতো ওগো মৃত্যু নয়
মহাজীবনের আর এক প্রান্তে আর এক সভা মহালয়
অঙ্কের যদি বা সমাপ্তি হয়, নাট্যের নয় অবসান
দেহলীতে মন্ত্র পড়ি—মধুমন্ত্র-বন্দন গান।

* শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহাকে স্মরণ করিয়া রচিত।

তিন সাগর

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য

১২

যেতে আমাকে হবেই। পারীতে। শনিবার বিকেলে, রবিবার, আর সোমবার অর্ধেকটা তো বেশীর ভাগ ব্যবসায়ী দোকান খোলে না। পল্ গের্যার ছাপাখানা আছে। সে-ই মালিক। আমার জানা আছে সেই ছাপাখানার ঠিকানা। অর্থাৎ সোমবার দুপুরের আগে পারী শহরে তার পাত্তা পাবো না।

ভাবনা তা নয়। ভাবনা এই টুরের মরশুমে পারীতে হোটেল ঠিক না করে পৌঁছে শেষে কি করবো।

এয়ার বেসে পায়চারি করছি।

জ্যাকিও আমায় সঙ্গে উপস্থিত থাকতে পারে নি। বিকেলে একটা বড়ো দল ওদের স্টীমারে হ্রদে জলবিহার করবে। ওকে চলে যেতে হয়েছিলো।

সহসা চোখে পড়ে ঢেঙা সুদর্শন এক ভদ্রলোক হন্ হন্ করে কাউণ্টারগুলো পার করে চলে যান।

একবার, দু'বার, তিনবারের বার আর যেন ধৈর্য রাখতে পারি না। এ তো চেনা মুখ! এগিয়ে যাই না কেন? ফরাসীই তো, ইংরেজ তো আর নয়! অপরিচিত হয়েও কথা বলা যায়।

বিদেশে এসে চেনা মুখ দেখতে পাওয়ার আনন্দ অনেক রাতে বাড়ী ফিরে শ্রীমতীর মুখে হাসি দেখতে পাওয়ার মতো মজেদার। ভবিষ্যত ঝরঝরে হয়ে যায়।

"ডু আই নো ইউ? আমি কি চিনি আপনাকে?"

ঝাঁপিয়ে পড়লেন ডক্টর ব্রনেল, ডক্টর ফ্রাঁসিস্ ব্রনেল্।

"আরে, বাতাশারিয়া! কি অসম্ভব কথা!...কবার ঘুরলাম। কিন্তু নিউ দিল্লী, য়ুনীয়ন একাডমী, কনট্ প্লেস, তোমার সেই করোলবাগের এক ছিঁট্টে বাড়ী—আর জেনেভা—পারী—সব যেন একটা সুরে বাঁধতে পারছিলাম না।"

"বোলোনা, বোলোনা। মাষ্টারি বুদ্ধিই ওই রকম। তুমি আছো ফিলজফী, আমি আছি নেস্ফীল্ড নিয়ে। সুর ধরার চেষ্টা করতে যাওয়াই আমাদের দোষ।"

তার পর কথা হতে থাকলো একটু একটু করে।

ব্রনেল ১৯৪৩-১৯৪৪ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত ছিলো দিল্লীতে ফ্রী ফ্রেঞ্চ সরকারের প্রতিভূ হয়ে। আসলে সে ইণ্ডো-চায়েনা হাত ছাড়া হবার ফলে বহু বিদগ্ধ ফরাসী যাঁরা ইণ্ডো-চায়নায় গবেষণা প্রভৃতি কাজে ছিলেন, তাঁরা ভারতবর্ষে এসে আড্ডা গেড়েছিলেন। সে সময়ে অনেক ভদ্র, শান্ত ফরাসী পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়েছিলো দিল্লীতে।

কিন্তু ব্রনেল আর মিনে-কে ভুলতে পারি না। মিনের পদমর্যাদা শাসন বিভাগের মইতে অনেক উঁচুর ধাপে। ভারতবর্ষের আই-এস-সি-এস্ আর কি। ও ছিলো গবর্ণর, কোন্ একটা প্রদেশের। আমার কাছে "সিদ্ধিঃ সাধ্যে সতামস্ত" পড়ছে তখন। পরে পুরো কালিদাস পড়ে গেছে। আর ব্রনেলের আওরঙ্গজেব রোডের বাড়ীতে অনেক সন্ধ্যায় আমরা ব্যস্ত থাকতাম দর্শনের আকাশে কোঁৎ, বার্গসঁ, রলাঁর জ্যোতির পাশে রাধাকৃষ্ণন, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ আর ব্রজেনশীলের জ্যোতির চমক দেখতে। পরে যখন জৈমিনী, কনাদ আর কপিল এসে পড়তেন, শঙ্কর আর বুদ্ধে যখন বেশ একটা তকরার বাধিয়ে দিয়ে মাদাম লক্স্ মননের হাতের কফি আর গের্যার পকেটের সিগারেটের আমেজে মশগুল হয়ে থাকতাম, তখন মাদাম কার্পালেস স্বভাবসিদ্ধ মিতভাষিতায় প্রচণ্ড ঝাল দিয়ে বলতেন "কপিলের কিন্তু স্ত্রী ছিলো না বাতাশারিয়া। ঘড়িও থাকতো না সে কালে।" ভেঙে যেতো সভা। কতো দিনের কতো আড্ডা!

সেই ব্রনেল!

"কি ভাবনাই করছিলাম!"

"কেন?"

"যাচ্ছি পারী! অথচ ব্রহ্মচর্য বহন করার ষাঁড় নেই!"

পুরানো রসিকতা আমাদের।

গের্যা বরাবরই দুষ্টুমি আর ফিচ্লেমিতে মধুর। দিল্লীতে একদিন আমায় দেখালো দুটো ছোটো পোষ্টকার্ডের ছবি।

ব্রনেল, মিনে সকলে আমার বাড়ীতে আড্ডা দিচ্ছিলো, ওরা খুব হেসেছিলো।

বুঝেছিলাম যে ওরা আগেই ও ছবি দেখেছে।

আমিও অবাক্। "এ ছবি কোথা থেকে কিনলে?"

"কেন? বিড়লা মন্দিরের মেলায়।"

একটা ছবিতে রামেশ্বরম্ মন্দিরের নন্দী। অর্থাৎ বৃহৎ এবং সুসজ্জিত একটি ষাঁড় !!!

অন্যটায় মুকুটপরা, চমৎকার জরিদার ল্যাঙোটি আঁটা, নানা অলঙ্কার সজ্জিত লোমশ, স-লাঙ্গুল শ্রীমৎ ব্রহ্মচারী হনুমান্।

আমি হাসি।

পল গের্ঁা বলে, "জানোই তো আমি চিরকৌমার্য-ব্রতধারী। তাই ব্রহ্মচারীদের শ্রেষ্ঠ দুই দেবতার ছবি কিনেছি, যাতে অযথা নারীদের অত্যাচারে ব্রতভঙ্গ না হয়।"

"হনুমান্ তো বুঝলাম কুমারদের উপাস্য দেবতা। কিন্তু ষাঁড়?"

"কেন, ভগবান শিবের ব্রহ্মচর্যের ভার তো উনিই বয়ে বেড়ান শুনি?"

সে কি হাসি সেদিন।

ষাঁড় দেখলেই ব্রহ্মচর্যের ভার বহনের গল্পটি বাদ যেতো না।

তাই সে দিনের কথা মনে করিয়ে দেওয়াতে ক্রনেলের হাসি আর ধরে না।

"তুমি কি এই প্লেনটিতেই যাচ্ছো?"

আমি হাঁ বলায় ও মহাখুশী। "বেশ বেশ, এটি একটি ফরাসী প্লেন। দেখবে কেমন আদব-কায়দা। ফরাসী প্লেনে চড়া একটা রীতিমতো ট্রেনিং, এক্স-পীরিয়ন্স!"

আন্তর্জাতিক ও বৈদান্তিক ক্রনেলের মুখে ফরাসীর প্রশংসা ধরতো না। ফ্রান্স হেরে যাবার পরেও ক্রনেল বরাবর বলতো "ঝিমিয়ে আছে, ঝিমিয়ে আছে। থাকতো ইংলণ্ড আর আমেরিকা জার্মানীর সঙ্গে এক দেয়ালের এপার-ওপার, বুঝতে পারতো ঠেলা! ফ্রান্স বলেই মরেছে, হারে নি; হেরেছে, মরে নি।" সে সব দিনে ক্রনেলকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে অনেক রগড় দেখেছি আমরা।

এক দিন তর্কের মুখে ছোটো বোনের এনে দেওয়া গরম গরম নতুন-আলু চচ্চড়ি আর ফুলকো লুচি খেতে খেতে (ও খুব ভালোবাসতো) একটা আস্তো কাঁচা লঙ্কা মুখে ভরে দেয় আর কি! বোন চেঁচিয়ে বলে—"মঁসিয়ে ক্রনেল্, লঙ্ক, লঙ্কা, সাবধানে খাও।"

"আমি ফরাসী। সব খেতে পারি। খেয়ে প্রমাণ করি রান্না ভালো, পেশ করে জাহির করি তারিফ।"

তার পরে সে কি লাফালাফি!

মা এসে খুব বকুনি।

ফরাসী-দার্শনিক লালে লাল। চিনির সঙ্গে বরফ দিয়ে কেবল মুখ আর জিভ ডুবিয়ে রাখে।

আর বলে—"জার্মানী কখনও ভারতবর্ষের আলু-চচ্চড়ির সঙ্গে এক দেয়ালে বাস করবে না। ইংরেজ এ রান্না কেন শেখেনি বোঝো এবার। তবু বলবো—ফরাসী ঝাল খেয়ে লাফায়, খেতে ছাড়ে না।"

প্লেনে ওর সীট আর আমার সীট আলাদা ছিলো। ও বিশেষ অনুরোধ করে এক জায়গায় করিয়ে নিলো।

"তোমায় এমন পেয়ে যাবো ভাবি নি। তুমি জেনেভায় কেন?"

"কেন? আমি চিরকাল আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাস করি। জেনেভার আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃসঙ্ঘে কাজ করি (International Youth League, League of Nations, Geneva) কিন্তু তুমি হঠাৎ ব্রিটিশ গায়নায় কেন?"

বলি নিজের কথা।

"আর তোমার স্কুল? সে তো বিরাট স্কুল। তার কি?"

"পৃথিবীতে কেউই অমর নয়; কাজও আটকে থাকে না।"

"ভারতবর্ষের নিজেদের কথা! ভারতীয়দের সঙ্গে কথা বলার সময়েই আমি প্রথম বুঝতে পারি আলাদা ভাষা কাকে বলে।"

"কাকে?"

"যার কন্টেন্ট আলাদা, ইডিওলোজী আলাদা! (যার বস্তু আলাদা, তত্ত্বও আলাদা) নৈলে ভাষা তো সবই এক রকমের দুর্বল অকৃতকার্য-বাহন।"

"এখন বলো তোমার আত্মার খবর।"

"বড়ো ভালো হোলো তোমায় পেয়ে গেলাম। যোগবাশিষ্ঠ অনুবাদ করতে গিয়ে দু'চার জায়গায় জবর গোঁত্তা খেয়েছি। টালটা এবার সামলে নেয়া যাবে। পারীতে থাকছো ক'দিন, কোথায়?"

"এখন পারীতে থাকবো কিছুদিন। জানো তো পারীতে আমার মোক্ষম আকর্ষণ গের্ঁা..."

হঠাৎ দূরের সাগরে ডুব-খাওয়া তারার মতো চেয়ে ও বললো, "গের্ঁা? গের্ঁা-পল? পল গের্ঁা? ওঃ, কতো কথা মনে করিয়ে দিলে। ও যে পারীতে আছে তা-ই মনে নেই। পৃথিবী কতো ছোটো, তুমি দিল্লীর লোক এখানে। মানুষের স্মৃতি কতো সীমায়িত; পল গের্ঁা পারীর পল গের্ঁা কোথায় জানি না।"

"স্মৃতি সীমায়িত নয়; মনের দরবারে আসন না পড়লে স্মৃতির ভাঁড়ারে অপরিচয়ের জঞ্জাল বাড়ে। ওর ঠিকানা জানা নেই?"

"সে জন্ম আপশোষও নেই। ইদানীং ওর সঙ্গ অসহ্য হয়ে উঠেছিলো।"

"ইদানীং মানে?" খুব ঘাব্‌ড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি।

"ভারতবর্ষ থেকে ফেরার পর থেকে ওর যেন মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। সত্যি বলতে কি ওর সঙ্গে তোমার অতো ভাব থাকার কথা নয়। জানো কি? ও একটা জিউ। মাত্র গত যুদ্ধে নাম বদলেছে।"

ইন্টারন্যাশনালিষ্ট এবং ওয়ার্লড্ ইয়ুথ অর্গানাইজেশনের মুখের দিকে হলদে চোখে ট্যেরা হয়ে চেয়ে থাকি।

"তাই নাকি? এ তো জান্‌তাম না। দেখতে শুনতে মানুষ বলেই বোধ হোতো। ভাঁওতা দিতে লন্ ড্যানীকেও হারিয়েছে বলো।"

ফরাসী বাচ্চা: আর কিছু না বুঝলেও কথার ধার বোঝে। ওদের কথায় শানের জোর। ওরা সাহিত্যে ধার করেও যতো, ধার দেয়ও ততো।

চেয়ে চেয়ে হঠাৎ হেসে ফেলে বললো, "আমি নিশ্চয় আশা করতে পারি যে, আমার কথার অপব্যাখ্যা তুমি করবে না।"

আমি বলি, "করা যায় না। সে থাক্, ওর ঠিকানা যে আমায় পেতেই হবে। নৈলে যাবো কোথায়?"

"সে জন্ম ভাবনা কেন? আমিই তো আছি।"

"ব্যাপারটা কি জানো: প্যারীতে স্থানাভাব নেই; আমার গের্‌ঁাভাব ঘটেছে। গের্‌ঁা না পেলে কালই প্যারী ছাড়বো।"

ম্লান হয়ে ক্রনেল বললো, "ঠিকানা জানা নেই?"

বললাম সব বুঝিয়ে।

টেলিগ্রামটা দেখে বললো, "বুঝেছি 204 Mont Brun না হয়ে 20 Rue Mont Brun হবে।"

"কেন?"

"ঐ তো গের্‌ঁার পাগলামি।"

"বুঝিয়ে বলো, যদি আপত্তি না থাকে।"

এয়ার হষ্টেস বৈকালীন চা দিয়ে যান্।

আবার বলে ইন্টারন্যাশনালিষ্ট ক্রনেল—"ফরাসী প্লেনে খাবার চমৎকার, একেবারে নিষ্কলঙ্ক। মাখনও যেমন রুটিও তেমন। আর পীচ। চমৎকার পীচ দেয় এরা। চা পাবে খাঁটি দার্জ্জিলিং। ফরাসীরা চায়ের টিনিয়ে চিনির চাইয়ে নয় তা বলে।"

"সুইস্ প্লেনেও খাবার ভালো দিয়েছিলো।"

"দিয়েছিলো তো? কেন? সুইসদের মধ্যে ভালো যেটুকু পাবে, সব ফরাসী। তবে ইতালিয়ন্ আর জর্মান বিশিষ্টতাগুলো—"

বাধা দিয়ে বললাম, "লক্ষ্য করেছি তাও। সেগুলো সবই খারাপ।"

ক্রনেল আবার গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে দেখে চুমড়ে দিই—"সত্যিই ভালো চা। কিন্তু গের্‌ঁার ভুলটা কি বললে না তো?"

"20 লিখলেই হোতো। ফরাসী কায়দায় 20 r লিখতে গিয়ে 204-এর মতো হয়েছে। তুমি তো ফরাসী কায়দা জানো না। কাজেই 204 ভেবেছো।"

"ঠিকানায় আবার কায়দার হাঙ্গামা কি!"

"তোমরা যেমন Street না লিখে কেবল St. লেখো, তেমনি Rue না লিখে ফরাসী শুধু R লেখে। গের্‌ঁার হাতে R লিখতে গিয়ে দুইয়ের মতো হয়েছে। তোমার পুরো ঠিকানা লিখলেই হোতো। ফরাসী সাট্ তোমার জানার কথা নয়।"

হেসে বলি, "যাক্, অন্ততঃ একটা ব্যাপারে ফরাসী কায়দা অন্যায় করেছে।"

উজ্জ্বল হয়ে ক্রনেল বলে,—"হ্যাঁ, অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্—ওতে বিঘ্ন হবেই।" সংস্কৃতটা বলতে পেরে ও ভারি খুশী। যেন যার শিল্প যার মোড়া, তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়ার মতো।

ও যে খুশী হয়েছে কোনো কারণে, দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি।

"এখন উপায় কি!"

"হবেই উপায়। চলো তো, আগে প্যারী নামি তো!"

প্যারী এসে গেলো।

পাসপোর্ট নিয়ে নিদারুণ হাঙ্গামা।

দিল্লীতে ফ্রেঞ্চ এম্ব্যাসীতে গিয়ে পাসপোর্টের ওপর ভিসা চেয়েছিলাম। ওরা বলে চারদিন অবধি en-route যাত্রা বদলে ভিসার দরকার নেই।

এখানে পুলিশ বলে, "সবই ঠিক। ভারতের রোদে ফরাসী নন্দনরা একটু মগজে বেড়েছেন। কিছু ঢিলেও হয়েছে মগজ। ও ব্যাপারটা একদিনের; চারদিন নয়।"

তখন ক্রনেল নানা ধ্বস্তাধ্বস্তি করে ভিসার ব্যবস্থা করে নতুন অর্ডার আনিয়ে দিলো। তবে পাসপোর্ট জমা রেখে যেতে হবে।

তা হোক্। রেখে চললাম।

কিন্তু এই সব করতে করতে ঘণ্টা দেড়েক দেরি হয়ে

গেলো। ব্রনেলের নিজের গাড়ী এসেছিলো। Orly এয়ার পোর্ট থেকে শহর অবধি যেতে কোনো কষ্টই হোলো না।

প্যারী শহরের মধ্যে বেশ নীল নীল পাড়ায় সবুজ সবুজ গাছের বাহারের মধ্য দিয়ে গেছে Avenue D 'Eylaue। এই জবরদস্ত পথের ওপরেই বিশাল প্রাসাদের একটা ফ্লাট ব্রনেলের।

পথে আসতে আসতে প্যারীর পরিচ্ছন্নতা লক্ষ্য করলাম। ফরাসীরা যে ভারতবর্ষের শহর, পথ-ঘাট দেখে ক্রমাগত সেন্ট ব্যবহার করে তার আসল কারণ প্যারী না গেলে বোঝা যায় না। নিখুঁত ভাবে পরিষ্কার সমস্ত শহর। প্যারী বলতে ওদের যে গর্ব সেটা মোটেই অন্যায় বা অসঙ্গত দাবি নয়। বেশীর ভাগ পথের দু'ধারে আর মাঝখানে ঘনসন্নিবিষ্ট পুরোনো ছায়াবহুল গাছে-ঢাকা চলার পথ। মোটর গাড়ীতে হর্ণ বাজানো নেই। সবই নিস্তব্ধ। এই নিস্তব্ধতা, এতো বড়ো একটা শহরের নিস্তব্ধতা আমাকে যেন একেবারেই জয় করে নিলো।

যদিও তখন ভালো করে দেখার সময় হোলো না, পথে পড়লো ঈফেল টাওয়র, নেপোলিয়নের সমাধি আর Palais de Chaillot-এর বিশাল ইমারত।

মিসেস্ ব্রনেল বড়ো পাকা লঙ্কার মতো সুন্দরী ;—টুক্‌টুকে, ছিম্‌ছাম, চক্‌চকে, চটপটে—এবং দুরন্ত চিড়্‌বিড়ে। দিল্লীতেই আমরা পারতপক্ষে ভদ্রমহিলাকে এড়িয়ে চলতাম। ধনী কন্যা। ব্রনেলের খ্যাতিমান, রূপ এবং নেহাৎ দরকারী গুণগুলো থাকার ফলে বিবাহ করেছিলেন। ছেলে-পিলে হয় নি। তার পর যুদ্ধের সময়ে অনেকদিন একা একা বহু বিপদ মাথায় করে থাকতে হয়েছিল। যুদ্ধ যখন লাগে ব্রনেল তখন একা ইন্দো-চায়নায়। মিসেস্ ব্রনেল ফ্রান্সে আটকা পড়েছিলেন। ভিচি সরকারে উনি কাজ করেন ; অথচ ব্রনেল আছে ফ্রী ফ্রেঞ্চ ফোর্সে। ওদের মিলনের কোনো সম্ভাবনা রইলো না। যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মিসেস্ ব্রনেল ভারতে আসেন।

সেই ক' বছরের যুদ্ধ-ছেঁড়া ফ্রান্স আর দু' বছরের সদ্য ক্ষেপে-যাওয়া ভারতবর্ষের ঝাঁঝের মধ্যে পড়ে শ্রীমতী ব্রনেলের নাক আর নামেনি, চড়েই ছিলো।

আমার পরিচয় ছিলো সেই মেজাজের সঙ্গে।

পথে আসতে আসতে ব্রনেল বলছে, "এয়ার পোর্ট থেকে ফোন্ করে গাড়ী আনালাম। বলেছিলাম ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরবো। হয়ে গেছে—আড়াই ঘণ্টা! মিসেস ব্রনেল বাড়ী থাকবেন কিনা বলতে পারি না।"

আমি বলি, "কাজ থাকলে আট্‌কে থাকবেন কেন? আমায় নিশ্চয় আশা করছেন না।"

ম্লান হেসে ব্রনেল বলে, "না ; তোমার কথা বাড়ী গিয়ে বলবো বলেই ঠিক করে রেখেছি। বেশ একটা সারপ্রাইজ হবে। তাই নয় কি?"

আমার আশঙ্কা ছিলো সারপ্রাইজটা কার হবে ও কেন! বলি, "আমায় একটা হোটেল দেখে দাও না।"

"চলো না ; বাড়ী তো আগে যাই। হোটেলে থাকবেই বা কেন? কেবল রাতে শোয়া বই তো নয়। আমার যথেষ্ট খালি ঘর পড়ে আছে।"

কিন্তু আমি ব্রনেলের সঙ্গে থাকতে পারলেও মিসেস ব্রনেলের সঙ্গে একটুও থাকতে পারবো না। তবু তখনকার মতো কিছু বললাম না।

বাড়ীটা সত্যিই বড়ো। এতো নিস্তব্ধ যে মনে হতে লাগলো আর কেউ থাকে না বাড়ীতে। বিশাল সিঁড়ির ওপর কার্পেট ঢাকা। সব যেন ঘুমপুরী।

লিফ্‌টটা খারাপ হয়ে গেছে। পায়ে হেঁটেই উঠতে লাগলাম। তাড়াতাড়ি উঠে যাই। হঠাৎ ব্রনেল তার স্পীড কমিয়ে দেয়। দেখি একটি মহিলা ধীরে ধীরে উঠছেন। তাই ব্রনেল সময় নিচ্ছে।

পেছন থেকে মেয়েটির বয়স জানা যাচ্ছে না। কিন্তু গড়ন খুব চমৎকার। এক পিঠ সোনালী চুল (রং-করা —প্যারী, রোম, জেনেভা, বার্ণ, লণ্ডনে মেয়েদের চুলের স্বভাব-বর্ণ দেখাই যায় না প্রায়) ওঠার তালে তালে স্প্রীংয়ের মতো দোল খাচ্ছে। ব্লু-স্কার্টের তলায় সিল্কের মোজার মধ্য থেকে পায়ের গুলি থেকে স্বাস্থ্যের আভা উপছে পড়ছে। মহিলাটির দুই হাতই জোড়া। বাজার করে ফিরছেন।

ওমা! ব্রনেল আর সেই ভদ্রমহিলা একটা দোরের মুখেই দাঁড়ালো যে! কি ওরা বললোও। তাড়াতাড়ি, আর দরকারের চেয়ে বেশী জোর দিয়ে বলা।

চাবি খুলে মহিলা ভেতরে যান। চুপ্‌সে-যাওয়া ব্রনেল যখন বলে, "মাদামের মেজাজ বিগড়েছে। বড্ড দেরি হয়ে গেয়েছিলো। গাড়ী ছিলো না। বাজার করে ফিরছেন। এ সময়ে তোমাকে আমার সঙ্গে দেখে ওর আর মেজাজ ষ্ট্রাটোস্ফীয়রের তলায় নেই। তোমার সুটকেশটা তুমি আর ভিতরে নিয়ে যেও না। এখানেই রাখো।"

"আমি ঢুকবো কি?" সন্তর্পণে জিজ্ঞাসা করি।

"ঢুকবে বই কি। এই তো বারান্দাতেই ফেলোনা

আছে। ভেতর অবধিও যেতে হবে না। বোসো না, দেখি। ব্যাপার বড়ই বেগতিক মালুম হচ্ছে!"

কেতাবে কেতাবে কৃষ্টি, শালীনতা, আদব-কায়দা, ম্যানার্স—এ সব সম্বন্ধে পড়ে পড়ে মনে হোতো ব্রহ্ম অসত্য হতে পারে, কিন্তু সাদা চামড়ায় অসভ্যতা একেবারে দাঁতের কোষ্কা-পড়ার মতো অসম্ভব ব্যাপার। যারা জুৎ পেয়ে আমাদের মোলায়েম ভাবে জুতিয়েছে আসলে তাদের জুতো যে তাদের দেশে কতো মিষ্টি এ ব্যাপার নিয়ে আমার মনে একটা জিজ্ঞাসা ছিলো। মনে রাখতে হবে ত্রনেল একজন কৃতবিদ্য, সম্মানিত, প্রখ্যাত ভদ্রলোক; এবং মাদাম ত্রনেল ফ্রেঞ্চ এ্যারিস্টোক্রাসীর প্যয়দা। সুতরাং ফরাসী কায়দার ষট্চক্রভেদে মূলাধারেই যেন আটকে গেলাম।

অবশ্য দু-চার মিনিট পরে ত্রনেলের সঙ্গে এসে যখন মাদাম বললেন, "ও মসিয়ে বাতাসারিয়া! আমি জানতাম না আপনি এসেছেন। চা খাবেন?"

সবিনয়ে বলি, "ও কর্ম প্লেনে সারা হয়ে গেছে।"

"প্লেনে কষ্ট হয় নি তো? ফ্রেঞ্চ প্লেনে হয় না অবশ্য।"

"বিশেষতঃ মঁসিয়ে ত্রনেলের মতো সহযাত্রী পেলে।"

"বড়ই আনন্দ পেতাম আপনাকে যদি অতিথি ভাবে কিছু দিনের জন্য পেতাম। কিন্তু আমরা দু'দিনের জন্য বাইরে যাবো প্রোগ্রাম আছে। সে জন্যই কেনাকাটা।"

ভদ্রতা ও কৃষ্টির সঙ্গে মিষ্টি হাসি, আর রঙীন গালের সঙ্গে মিথ্যা কথার এনামেল আর বাজে কথার কলাই এতো কেন মাখানো থাকে? ভেতরের বাজে ধাতু ঢাকার জন্য, বিষ থেকে বাঁচানোর জন্য, না মর্যাদা আর ঠেকার বাড়াবার জন্য?

"একি, কেন খারাপ লাগছে প্যারী?"

নিজেকে সাবধান করে নিলাম।

যেখানে এসেছি সেখানে যেন ভালোই দেখি। সব বেশ ভালোই লাগে!

আমি বলি, "আমায় একটা হোটেল ঠিক করে দিলে বড়ো বাধিত হবো ভাই। বাড়ীতে এসে বাড়ীর বন্ধনে পড়ে বিদেশে আমার ফুর্তিটা মারা যাবে।"

হোটেল মার্থা ঠিক হয়ে গেলো।

একটা ট্যাক্সি ডেকে দিলো ত্রনেল।

যাবার সময়ে বললো, "কাল ন'টার সময়ে আসবে? সকালে? যোগবাশিষ্ঠটা নিয়ে বসা যেতো।"

"আমি পলকে বার না করে প্যারীতে আর কিছু করবো'না। কিন্তু তোমরা তো বাইরে কোথায় যাচ্ছো।"

ত্রনেল এক গাল হেসে বলে, "এটা প্যারী—আদব-কায়দায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নগরী। এখানকার পোশাকী ভার্যা আর আটপৌরে ভাষাটা রপ্ত করে নাও বাতাশারিয়া।"

বলেই হাত ঝাঁকিয়ে বেচারী ত্রনেল খসে পড়ে।

আমার ট্যাক্সি হোটেল মার্থা নিয়ে এলো।

১৩

এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যে মেয়েদের অবদান যথেষ্ট। সব্জী বাজার, মাছের বাজার, ফুলের বাজার মেয়েদের একচেটিয়া। মাংসের দোকানে পুরুষ। হোটেলের বেশীর ভাগটাই স্ত্রীলিঙ্গ। ওতে নাকি দোকানদারী না করেই ছোটোলোক হওয়া যায়; দোহন কর্মে ললনারাই পারদর্শিনী।

হোটেল মার্থা, ছোট্ট হোটেল। ভিক্তর হ্যুগো প্লেসের কাছাকাছি। ক্লেবার এভিন্যু আর ভিক্তর হ্যুগো রোডের মাঝামাঝি অসংখ্য গলিঘুঁজির মধ্যে একটা। প্যারিসে নামজাদা হোটেলও গাদা গাদা। বার্, ডান্সিং হল্, রেস্তরাঁ, কাফে—এর তো গোণাগুন্তি নেই। হোটেল মার্থার সে বিষয়ে কোনো পরিচয় নেই।

তবু আছে। পরিষ্কার; বিশাল বিশাল কাঁচের দরজা Sound-proof; আগাগোড়া লাল কার্পেটে মোড়া মেঝে। চমৎকার করে সাজানো, আরো চমৎকার আলোর বাহারে গোছানো ডাইনিং-কাম্-ডান্সিং হল্। মোট যাত্রী রাখার ঘরই আছে ৪৭ খানা। যাত্রী থাকতে পারে একশো আশী জনা। কিন্তু প্যারীর ছোটো হোটেল। মোটামুটি আশী থেকে একশো জন লোক থাকে। বেশীর ভাগই সাময়িক যাত্রী।

ইংরেজী যেন যম। বলে এতো বিশ্রী করে আর সিন্ট্যাক্সের ওপর এতো ট্যাক্স চাপিয়ে যে, ও না বলাই ভালো, শোনা আরও খারাপ। আমি খাড়া বাংলা বলেছি। দেখলাম কিসুস্থ যায়-আসে না।

মহিলাটি আমায় নিয়ে লিফ্‌টে উঠলেন। চাবির গোছা হাতে।

যেই লিফ্‌টে চড়েছি বার থেকে একজন মৃদু হেসে মেয়েটিকে বলে, "আঁ ব্রিভোয়া।"

মানে কি? হাল্কা পরিহাসের স্রোত বয়ে গেলো। পরিহাসের বস্তু যে আমি তা বুঝে যেন কষ্টই হোলো। এরা পেছু লাগলো কেন?

'আঁ ব্রিভোয়া' জানার মতো ফরাসী-মদের ছিটা মগজে না ছিলো তা নয়। যাচ্ছি কোথায় তবে? লিফ্‌টে তো চড়লাম।

অতঃপর লিফ্‌ট আর থামতে চায় না।

"ঈফেল টাওয়ার নয় তো?" ফরাসিনীকে জিজ্ঞাসা করলাম।

ফরাসিনী আর আমার বাংলা জানবে কোথা থেকে? তবু হাসলো। মাথা নেড়ে মঁসিয়ে ইত্যাদি বলে দুটো জিনিস বোঝালো। পয়লা নম্বর এই যে, এটা ঈফেল টাওয়ার নয়। আর দোস্‌রা নম্বর এই যে, আমার রসিকতা ওর বুকে দুলেছে।

একা আমি আর ঐ মহিলা,—প্যারীর মহিলার বয়স অনুমান করে মোপাঁসার অপমান করবো না—তবে আমাদের দেশে ওমেয়ে দেখে বলতাম বছর চব্বিশ হবে। লিফ্‌টের মধ্যে জোরালো আলো। ছোট্ট লিফ্‌ট। ঘেঁসা-ঘেষি করে দাঁড়াতে হয়। ওর হাসির হাল্কা জোয়ার আর হাল্কা মিষ্টি একটা গন্ধ মনে করিয়ে দেয়, এটা প্যারী।

চোখের মধ্যে বহু বহু শতাব্দীর ছেঁড়া ছেঁড়া নাগরিকতার স্ত্রৈণনাপনা বাস করছে; চুলের রঙে সেলুনের কারুকার্য; হাতের আঙুলগুলো আর নখই বলে দেয় হোটেলে অনেক বাসন ধুতে হয়েছে, অনেক মেঝে সাফ করতে হয়েছে। কব্জীর হাড় পায়ের গোছ আর সতেজ একটা বলিষ্ঠতা বাইশ বছর ব্যাপী নির্মম সেবার ইতিহাসের সাক্ষ্য দেয়।

সাত তলা বাড়ীটার একটা তলায় লিফ্‌টকে অবশেষে থামতে হোলো। সুটকেশ নিয়ে বেরুলাম।

মহিলাটি এবার দম্‌-মারা ইংরেজীতে বলেন, "আয়েম্‌ সরি-মঁসিয়ে; য়ু নো য়ুজ নো লিফট রেস্তব জানি" (বড় দুঃখিত ভাব্‌। বাকি পথটুকু-তে আর লিফ্‌ট ব্যবহার করারও জো নেই।)

প্যারী। ভলটেয়ার, মলেয়ার রাসিন্‌-এর দেশ। এখানে যদি লঘু পরিহাস না থাকে তো কোথায় থাকবে। গোল্ডস্মিথের বো-টীবস্‌ থাকতো "ফাষ্ট ফ্লোর—বিলো দ চিম্‌নী।" আমারও তাই। টোঙ্গে গিয়ে উঠলাম। ছোট্ট ঘর। ড্রেসিং টেবল্‌, ওয়াশ ষ্ট্যাণ্ড, একটা নরম বিছানা, আর প্যারীর সন্ধ্যাঘন আকাশ—যতো ইচ্ছে দেখো।

প্যারীতে সন্ধ্যা ঘন হয়ে নামছে।

এখানে দিন হয় সূর্যোদয়ের অনেক আগে, সূর্যাস্তের ঢের পর পর্যন্ত আকাশে আলো লেগে থাকে। পড়ন্ত বেলার এই মৃদু গতিতে চলন আপরাহ্ণিক জীবনকে যে কতো মিষ্টি করে তোলে ভুক্তভোগী ছাড়া বুঝবেন না। আমি তো যেন ভালোইবেসে ফেললাম সন্ধ্যার এমন অলস মাধুরীকে। "সূর্যি ডোবে ডোবে"র দেশে সূর্যি ডুবলেই তিমির। এ যেন কাজ সেরে আলোর সমুদ্রে গা ধুয়ে নিচ্ছে দিন। ধীরে ধীরে সব খুলে, গা মেজে, ধুয়ে, পরিষ্কার করে, আবার সব পরে নিলো। নীলাম্বরী কালো শাড়ী, তাতে সলমা চুম্‌কীর কাজ। এদেশে ডিনারের পোশাক, ঈভনিং ড্রেস—এ সব কেন আলাদা, যেন হঠাৎ সব বুঝতে পারলাম।

মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে নিয়ে পোশাক বদলে নেমে গেছি পথে। সুন্দরীকে বলে গেলাম, রাতে খাবো না। বাংলা বোঝে না। আমিও বাংলা ছাড়া বলবো না। অবশেষে ঐ আমায় বলে, "নো ডিনার?" মাথা নেড়ে বলি, "তবে নাকি বাংলা জানো না?"

এবারে সকলে হাসি।

তাড়াতাড়ি পুরুষটি বেরিয়ে আসেন। "ট্যাক্সী?"

না—না—না!!! আবার ট্যাক্সী?

ট্যাক্সীর কথাটা সেরে নেওয়া যাক্‌।

আমাদের অনেকের ধারণা যা সাহেব, যা শাদা তাই মরি মরি, আহা আহা। ছেলে যদি বিলেত-ফেরৎ হোলো তবেই দামও ফেরৎ পাওয়া যাবে। মানুষ যে সব জায়গাতেই মানুষ এই নেহাৎ বিশ্বাসযোগ্য কথাটিই বিশ্বাস করায় হিম্‌সিম্‌ খেয়ে যেতে হয়।

সত্যি কথার দশাই এই। কি যে বিপদ এই সত্যি-কথাগুলো বিশ্বাস করায়। অমন কঠিন বোধ হয় না-থেমে পাঁচবার Cricket Critic উচ্চারণ করাও নয়।

ক্রনেল তো সেই ট্যাক্সী করে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে সদ্বিবেচকের মতো বুঝিয়েও দিলো যে, মিটারে যা ভাড়া চড়বে তা ছাড়াও কিছু সেলামী দিতে হবে, রীতি পুজাটি রীতিমতোই করতে হবে। পুজো করা আমাদের ট্রাডিশন্‌; এ দেশ ট্রাডিশন্‌-পুজো করার দেশ!

শ্রীমান্‌ ট্যাক্সী তো মার্থা হোটেলে হাজির করলো। পরের দিনে ঐ পথটুকুই অন্য মোটরে এসেছি। অতি সামান্য পথ মনে হয়েছিলো কিন্তু সেদিনকার সেই প্রথম যাত্রা যেন আর থামতে চায় না। আমিও হালাকান। নাগরিক-মন তেলেভাজা হচ্ছে সন্দেহের বিষে। ঠকাচ্ছে নাকি? স্রেফ ঠকাচ্ছে, প্রান্তি পাচ্ছিও হাড়ে হাড়ে, কেবল বলবার যো নেই!

ট্যাক্সিতে উঠলো প্রায় সাড়ে তিনটাকার কাছাকাছি—দিলাম পুরো পাঁচ। কারণ ঝামেলা চাই না। আর পুরো পাঁচেরই একটা নোট দিলাম।

ও মশায়! সে আর নড়তে চায় না। হোটেলে সব টাট্‌কা ফরাসী তরুণী। আমুও টাট্‌কা আগন্তুক। যাই হই না কেন সরাসরি আত্মরূপ কেই-বা জাহির করতে চায়! বিদেশে যাওয়া মানেই যা নই, তাই সাজার বিলাস। কেবল জাঁক বজায় রাখার হুড়োর তলায়

তিনুনী খেয়ে পড়ে আছি। আর পিতৃদত্ত চোখ দু' কালা করে কাটা উচ্ছের মতো ড্যাব-ড্যাবিয়ে রেখেছি সেই কাউণ্টার-লতিকার পানে। মনে মনে ভাবখানা—"সামলে দাও ঠাকরুণ? এ যে বড় ফ্যাসাদ্!"

আমি বিশুদ্ধ বাংলায় তাবৎ কর্ম সারি। এবং দেখি চমৎকার ফল ফলে। তরুণী সেই কাউণ্টার-লতিকা বোধ করি হিসেবের খাতায় বিশেষ রকম একটা গরমিল পেয়ে গিয়েছিলেন। সে গরমিল থেকে মাথা তোলার ফুরসতই আর পান নি। ট্যাক্সিয়ান্ তাড়া-খাওয়া খ্যাঁকশিয়ালের মতো বার কতোক খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করে (অবশ্য ফরাসীতে) অবশেষে বিদায় নিলো। বাংলা ভাষা দিয়ে যে মাজিনো লাইন গড়েছিলাম মার্থা হোটেলে তা ভেদ করে ফরাসী-ট্যাঙ্ক ট্যাক্স বসাতে পারে নি সেদিন।

যেই না ট্যাক্সিয়ান্ অন্তর্ধান, তৎক্ষণাৎ কাউণ্টার-লতিকার হিসেবে মিল! আর তার পরেই আমায় লোক-মারফৎ বুঝিয়ে বলেন—"মঁসিয়ে তুমি ভারি চতুর লোক! ঠিকই দিয়েছো বলে আমি কিছু বলিনি; নৈলে কি এ হোটেলে ঝামেলা করতে দিই?"

তার পর থেকে অনেক চেষ্টা করেছি আজ পর্যন্ত সেই দন্তরুচিকৌমুদী গলগলান্বিত শব্দকটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন যৌক্তিকতার তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম করি। ঐ কথার মধ্যে যে কি লজিক ছিলো তা আজও বুঝি নি।

ফ্রান্সে সেই আমার প্রথম ব্যক্তিগত কারবার। এবং ভদ্র ও রুচি-রুচিরা ফরাসী সভ্যতার প্রথম কামড়েই আমার এমন কালশিরা পড়েছিলো যে পারীতে অভিভাবকহীন পদচারণ যেন আতঙ্ক সৃষ্টি করে দিলো মনের খুব গহনে।

তাই আর ট্যাক্সির ঝঞ্ঝাটে পড়িনি।

তা ছাড়া পায়ে হেঁটে দেখার সেরা দেখা নেই।

ভবঘুরে হতে গেলে ফ্যা-ফ্যা-মুদ্রাও চাই। যে যোগসাধনের যা বিধি!

প্যারিসে আমার প্রথম স্বচ্ছন্দ পদচারণা।

হোটেল থেকে বেরুবার সময়ে একবার মনে হয়েছিলো যদি হারিয়ে যাই। সঙ্গে মনে পড়ে গেলো রোম, ম্যাক্। ম্যাক্ এখনও ইতালির নানা শহরে ঘুরছে। ফ্লরেন্স, ভিনিস্, পিসা, নীস্।

সন্ধ্যা তো অনেকক্ষণই হয়েছে। এখন অন্ধকার হয়ে এলো। ঘড়িতে ন'টা। রাত্রিই বলতে হবে।

মনে মনে পথের ছকটা মোটামুটি ধরে রেখে এগুতে লাগলাম। পথে পথে গাছ দিয়ে ঢাকা পায়ে-চলার পথ। তার পাশে চেয়ার টেবিল পাতা, পারীর কাফে পারীর প্রাণ। আড্ডা বলো, শিল্প বলো, ফ্যাশান বলো, রাজনীতি বলো, কলকাতার ক্যাবিনের মতো পারীর পথে এই চেয়ার কুণ্ডলী-চক্রের মহাপীঠ।

আলোয় ঝল্মল্, পোশাকে উজ্জ্বল, স্তিমিত কলরবে প্রাণিল, নানা বর্ণে, পরিহাসে। দেহ উপদেহের চাঞ্চল্যে পারী যেন আর-না-দেখা একটা নূতনতা। রোমে দেখেছি দিনের পর দিন যে-দিন-ছিলো, আজ নেই; এখানে দেখছি 'যে দিন আসছে আসছে আসছে।' রোমে দেখেছি, প্রাচীনা য়ুরোপার কঙ্কাল, পারীতে দেখছি বর্তমান য়োরোপার যৌবনলীলা।

যুদ্ধের পর পারী বদলেছে। লণ্ডনের মতো ইট-পাথরের চেহারায় নয়; আদর্শে, মানসিকতায়, প্রজ্ঞায়। লণ্ডনের মার পারী খায় নি, সত্য; যে মার পারী খেয়েছে তা থেকে বাঁচবেও হয় তো, কিন্তু সে পারী আর থাকবে না, নিশ্চিত। পারীর পথে পথে ভিখারী-যৌবন কেবল দেহি দেহি করে রিরংসায়, বুভুক্ষায়, প্রেমের অকাল মৃত্যুতে সর্বহারা শঙ্করের মতো গত যামের সভ্যতার ভস্ম গায়ে মেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হয় তো অস্থির এই সতী-দেহ কোনো প্রচ্ছন্ন বিষ্ণুচক্রে কেটে যাবে, হয় তো আজকের এই আর্তনাদ ভবিষ্যতের তীর্থ-রেণু হয়ে থাকবে, হয় তো স্বয়ং বিশীর্ণ ক্রমপর্ণ বৃন্তিকা কোনো গৌরী এই তাণ্ডব নাচকে কল্যাণের মায়ায় বাঁধবে, পৃথিবী শান্ত হবে। কিন্তু এখন যা চলেছে, পারীতে কেন শুধু, সারা য়োরোপে, দেখলে অ-সভ্য ভারত, মিশর, ব্রহ্ম, সিংহলকে পরম আদরে মাথার মণি করে রাখতে ইচ্ছে করে।

তেমনি নাচ, পান আর আরও অনেক কিছু এই সব ছোটো ছোটো পানাগারেও দেখছি। হাজার পড়া থাকলেও চোখে দেখতে খুবই অপরূপ লাগছিলো।

Rue Copernic বেশী বড়ো রাস্তা নয়। পার করে খুব চওড়া একটা পথে পড়া গেলো Avenue Kleber. বাঁ দিকে চাইতেই দেখি নয়া দিল্লীর India Gate! তখুনি কেতাবে-পড়া আর্ক দ্য এ্যয়েম্পের কথা মনে পড়ে গেলো। একটু থমকে দাঁড়ালাম। আর্ক দ্য এ্যয়েম্পের মধ্য দিয়ে বিশাল পথ গেছে দুটো Avenue de la Grand Armee; আর পারীর কনট্ প্লেস, পারীর মেরিন ড্রাইভ, পারীর থিয়েটার রোড—Avenue Des Champs Eleysees। এগুলো বই-পড়া বিদ্যে। শহর থেকে শহরতর স্থানে এসে রাস্তা থেকে রাস্তাতর, ঠাট্ থেকে ঠাটতর, জাঁক থেকে জাঁকতর দেখার মতো পিত্তি ছিলো না। ও পরে হবে। ভাবলাম সাইনের তীরে

একটু বেড়ানো যাক্। ফ্লবেয়ার, বালজাক, মঁপাসাঁর অনেক বর্ণনাই পড়া গেছে। দেখা যাক চেনা জায়গাগুলো এখনও তেমনি আছে কিনা। এভিন্যু ফ্রেবারের বাঁদিকে আর্ক দ্য এ্যল্ম্প্‌ যেকালে, তখন ডান ধার ধরে গেলে সাইনে পড়া যাবে। খানিকটা এসে Galliera-র ম্যুজিয়মটা দেখলাম। ম্যুজিয়ামটা কিছু নয়, প্রদর্শনীগৃহ। হঠাৎ কোনো বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হলে কর্তৃপক্ষ এখানেই দেখাবার ব্যবস্থা করেন।

পারীতে ম্যুজিয়ামও যতো একজিবিশনও ততো। অভাব নেই। কোলকাতা আর দিল্লী ধীরে ধীরে এই সুস্থ কলা-চর্চায় অসুস্থ হয়ে পড়ছে। লক্ষণটি ভালো। অন্য রোগ ধরার চেয়ে নাগরিকের পক্ষে কলা-রোগটা বরং কাম্য বেশী। সারা পারীতে সরকারী ভাবে তেত্রিশটি কলা-শিল্পের ম্যুজিয়ম আছে। দুটি ম্যুজিয়ম বিশেষ করে আমার ভালো লেগেছিলো। রেনুয়া রোডে বালজাক ম্যুজিয়ম একটি। এটিতে যাবতীয় লেখকদের ব্যবহৃত সামগ্রীও তাঁদের জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারের টুকিটাকি রাখা। ভাবি আমাদের দেশে আমরা সাহিত্য নিয়ে কতো বড়াই করি অথচ বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন থেকে নিয়ে মাইকেল, গিরিশচন্দ্র, বঙ্কিম, রামেন্দ্রসুন্দর, এ-কালীন শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ—বহু বহু কৃতী সন্তানদের ব্যবহার করা জিনিস, হাতের লেখা চিঠিপত্র প্রভৃতি সাজিয়ে-গুছিয়ে এমন একটা চিরকালের বৈচিত্র্য নেই কেন? দ্বিতীয় ম্যুজিয়মটি নেপোলিয়নের ব্যবহৃত বহু জিনিসপত্র সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা—Rue de Belle Chasseতে Legion D' Honereur নামক ম্যুজিয়ম। এ ছাড়া আলাদা পারীর ইতিহাস, চীনা ম্যুজিয়ম, আর্মি ম্যুজিয়ম—কতোই আছে।

আমি যে পথটি পার হচ্ছি তার এক ধারে সাময়িক প্রদর্শনী দেখাবার ইমারত, অন্য ধারটায় ম্যুজি-গুর্মে—অর্থাৎ এশিয়াটিক আর্টের ম্যুজিয়ম। এশিয়াটিক আর্টের ইমারতটিই বেশী সুন্দর দেখতে। তবে প্রদর্শনী-বিল্ডিংয়ের সংলগ্ন বাগানটি খুব সুন্দর। Palais de Challiot-এর একাধারে এসে পড়েছি। মনে পড়ে গেলো ঈফেল টাওয়ারের ধার দিয়ে বিকেলে Palais de Challiot দিয়েই এসেছি। সাইনের দু'ধারে দুটো জিনিস। সুতরাং সাইনের ধারে এসে গেছি। বাঁ-ধারে এভিন্যু প্রেসিডেন্ট উইলসন্ ধরে চললাম। বিখ্যাত Place de I'Almaতে এসে পড়লাম। গোল হয়ে আছে ফুটপাত পাঁচটি পথের নাভিকেন্দ্র ঘিরে। ফুটপাতে ফুটপাতে টেবিল-চেয়ার পাতা। রাশি রাশি ছেলেমেয়ে, নর-নারী, যুবা-যুবতী প্রাণের আমোদে হৈ হৈ করছে। শনিবারের রাত, ফুর্তির আর শেষ নেই।

পারীর মেয়েদের ফ্যাসনের খ্যাতি শুনেছি। আমাদের দেশে ইংরেজ মেয়েরা যেমন ছিম্‌ছাম্ হয়ে দরকোচা মেরে থাকতেন, দেখে দেখে তাকেই ফ্যাসন বলে মনে করতাম। ফ্যাসনের সঙ্গে আড়ষ্টতার, সাজ-পোশাকের সঙ্গে নষ্টামির আর আড়ম্বরের আর চাকচিক্যের কেমন যেন একটি যোগাযোগ থেকে যেতো। পারীতে এসেও ভাবছিলাম কেতাবে-ছাপা ফ্যাসান-চিত্রের সেই সব চাকচিক্য দেখবো। হয় তো এ কথা সত্য যে, আমি পারীর পথচারী। 'শুদ্ধম্-অপাপবিদ্ধম্' সেই সব খানদানী ফ্যাসন্ মহলের মধ্যে মাছি হয়ে ঢোকবারও অধিকার পাই নি। তবু একটা গোটা দেশের অনেকখানিই তো শনিবার সন্ধ্যায় বারে, কাবারেতে, রেস্তরাঁয়, কাফেতে, পথে, ঘাটে দেখা যায়। অন্ততঃ, পারীতে তো তাই-ই। সেখানে মেয়েদের এতো সহজ এবং এতো স্বল্প সাজ দেখেছি, এতো অনাড়ম্বর এবং এতো বিচিত্রতাপূর্ণ সাজ দেখেছি, ব্যবহারে এমন নির্লজ্জ-বেহায়াপনাহীন সহজ ও মিশখাওয়া ভাব দেখেছি যে বিস্ময় লেগেছে মনে বার বার। কি বা তাদের চুলের সাজে, কি বা চুল বাঁধায়, চুল না বাঁধায়, কিবা ফুলের বোঝা গোঁজায়, ফুল না গোঁজায়, অনেক ঢাকায়, প্রায় না ঢাকায়, বিকট বিচিত্র বর্ণাঢ্যতায়, একেবারে সাদামাটায়—কেবলই মনে হয়েছে এ দেশের প্রাণবেগের মূলমন্ত্র স্বাধীনতা; এমন স্বাধীনতা যে প্রায় উচ্ছৃঙ্খলতা বলা চলে। সবই বন্ধনহীন, সবই স্বতন্ত্র, সবই গতিশীল, প্রখর, অনিবার্য। আমি পর্দানশীন ভারতবর্ষের গোঁড়া পণ্ডিতবংশের ছেলে। আমার চোখে এসব যেন "ন্যক্কারজনক" লাগা উচিত, চিৎকার করা উচিত আমার "অব্রহ্মণ্যম্-অব্রহ্মণ্যম্" বলে। "ম্লেচ্ছ নিবহ নিধনে" কল্কি হবার বাসনা জাগা উচিত; কিন্তু সেই রাতে জীবনছন্দের স্বয়ংসম্পূর্ণতার এমন এক মধুর রূপ দেখেছি যে, কোনো কিছুই অস্পষ্ট, অন্ধকার, আবছায়া, অলীক বলে মনে হয় নি। পারীর পথ-ঘাট এই সব খেয়া-নৌকা দেহ-মনের সতত সঞ্চরণশীলতা আমার কাছে যেন একটা বহু দিনের সংস্কৃতির স্বাস্থ্যকর রূপ বলে মনে হয়ে ছিলো। এক কথায় এদের ব্যবহারের স্পষ্টতা, আনন্দের উৎফুল্লতা, বেশভূষার স্বচ্ছন্দতা, জীবনধর্মের উচ্ছলতা ও সামাজিক পরিবেশের ঘনতা, আমায় যেন ক্রমশঃ আকৃষ্ট করছিলো এদের প্রাণপ্রিয়তার দিকে।

Place de I' Alma থেকে Course Albert পথ

বেরিয়ে ডান দিকে গেছে। New York Street-এর ওপর Modern Art-এর ম্যুজিয়ম আছে জানতাম। রাতে গেলে কেবল ইমারতটি দেখতে পেতাম, লাভ কি! আগাগোড়া Course Albert পথের ডান ধারে পাইন, বাঁ ধারে Grand Palais-এর বিরাট বিল্ডিং আলোয় ঝলমল্ করছে। ফরাসী স্থাপত্য একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস। মূল স্থাপত্য রীতিটা এদের প্রাচীন রোমেরই বটে, তবে নানা রকম battlements আর corridors, domes আর ছাতের বিচিত্রতা ফরাসী স্থাপত্যকে বিশিষ্টতা দান করেছে। Grand Palais-এর ভেতরে কত ইতিহাস হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। লুইদের সময়কার এই বিলাসভবন বিদ্রোহের দিনে রক্তে ভেসে গেছে। জল জল করছে নেপোলিয়নের সমাধি সাইনের ওপারে। Invalides-এর চমৎকার স্মৃতিমন্দির। ফরাসী সম্রাট, তৃতীয় নেপোলিয়নের সময়ে ফ্রান্স যখন আর একবার দপ্ দপ্ করে জলে উঠেছিল তখন নেপোলিয়নের দেহাবশেষ এনে এই স্মৃতিভবনে রেখে দেয় ফরাসীরা।

আমায় যেতে হবে আর্ক দ্য এ্যয়ম্পের কাছে। এখন ওপারে গেলে চলবে না। এপার ওপার বাঁধা চমৎকার এক সেতুবন্ধন। নাম Alexander III Bridge। সমস্ত পারীতে সাইনের বুকে তেত্রিশটি এমনি সেতু আছে। সাইন খুব চওড়া নদী নয়। কিন্তু বেশ গভীর। ষ্টীমার যাতায়াত করে। সাইনের বুকে যাত্রী-ষ্টীমার ঘোরে সারা শহর দেখাবার জন্য। সে আমার কৌতূহল নয়। আমার কৌতূহল ডিকেন্সের টেল অব টু সিটীজ, হুগোর লা মিজারেবল্, রলাঁর জাঁ ক্রিস্তফে বর্ণনা করা সাইনের তীরে তীরে ঘাটের সিঁড়ি। এখানে ঘাট মানে নৌকায় বা যে কোনো জলযানে ওঠা-নামার জেটি। স্নান কেউ করে না নদীতে। নদী খুব নোংরা। এই কারণে ভারতীয়দের নদীতে স্নান করাটা ওরা প্রায়ই নোংরামি বলে ধরে। সাইনের তীরে তীরে খানদানী সুইমিং পুল আছে। সেখানে পরিষ্কার জলে হাত-পা ছোঁড়ার ব্যবস্থা আছে। দেয়াল তুলে, লাইসেন্স আর ট্যাক্স দিয়ে, টিকিট কেটে যা করা যায় তাই সভ্য। অর্থাৎ পয়সা দিয়ে সরকার ধরে দলে টানতে পারলে সবই সভ্য। বাকী যা করো নেহাৎ বর্বরতা, গোবরগণেশী ব্যাপার। আলেকজ্যাণ্ডার ব্রীজ থেকে আর্ক দ্য এ্যয়ম্পে যাওয়া পারী-পরিক্রমার মেওয়া ভক্ষণ। নগর-সভ্যতার চমক-লাগা তাবৎ স্থানের মধ্যে বিশ্বে এমন স্থান নাকি আর নেই। ব্রীজ থেকে সোজা পথ গেছে, ডাইনে বাঁয়ে বড় প্রাসাদ, আর ছোট্টো প্রাসাদ, Grand Palais আর Pelit Palais ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে একজিবিশনের জন্য তৈরী হয় এই ইমারত নতুন করে। ডান ধারে ফরাসী ধুরন্ধর Clemencean-র প্রতিমূর্তি। প্রথম মহাযুদ্ধে এর খবরদারীতে খুশী জনতা এর নাম যখন দেন Father of Victory তখন কি আর জানতো কেউ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য কতোখানি সঞ্চয় করে রেখে গিয়েছিলেন এই মহাত্মা, ফশ, প্রেসিডেণ্ট উইলসন আর লয়েড জর্জ? তবু আজও ফরাসীরা Clemenceanকে খুব খাতির করে।

পেছনেই বিশাল বাগান, পারীর গর্ব। এটা হোলো নীলম্ পাড়া পারী নগরীর। স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট থাকেন এ পাড়ায়। Avenue des Champ Elysees-এর বিশাল পথ: ছ'সারি গাছের তলায় তিন সারি ছায়াঢাকা চলার পথ। মাঝে দু' সারি গাড়ী চড়াই-উৎরাইয়ের ফারাক ফারাক পথ। মোদ্দা ধরা যাক—দোকান, ফুটপাথ অর্থাৎ দু' সার গাছে-ঢাকা পথ। তার পর গাড়ী চলার পথ। আবার গাছ ঢাকা পায়ের পথ। ফের গাড়ী চলার পথ। পুনশ্চ পায় চলার পথ। আর কিনারে ঝলমল্ করছে বিলাসব্যসনে পরিপূর্ণ দামী দামী দোকান। উঁকি মেরে যতো দেখো দোকান, তত দেখো দোকান সাজানোর বাহার আর দুঃসাহস, ততোই দেখো যারা কিনছে তাদের এবং যাঁরা বেচছেন তাঁদেরও। পারীতে গোঁফের বাহার, জুল্ফীর বাহার আর দাড়ির বাহার আজও দেখার মতো; যেমন মেয়েদের চুল ছাঁটাইয়ের বাহার, আর তা বাঁধবার বাহার দেখার মতো।

রাত গভীর। গভীরতর, গভীরতম। চলেছি সব মিলিয়ে সাত-আট মাইল। কখনও থেমেছি, কখনও দেখেছি। এ শহরে রাতই দিন, বিশেষতঃ শনিবারের রাত। কাল, অর্থাৎ রোববার সকাল তো অর্ধরাত্রি। কেউ আর বেলা দশটার আগে উঠছে না। একটার পর আবার সবাই পথে-ঘাটে চলাচল করবে।

মাঝে মাঝে ইচ্ছে করছে কোথাও যাই; ক্ষিধে পেয়েছে, কিছু খাই। সাহস করে যাচ্ছিও দু' একটা জায়গায়। কিন্তু মেনু দেখে কিছু ফরমাস করতে পারি না। ক্ষিধে পেয়েছে। সে এক বিদিকিচ্ছি ব্যাপার! পেটে জ্বালা, খিদের, মনে জ্বালা, পল গের'র, পারীর পথ আর মনো বিকলন কতই আর আরাম দেবে। একটা বেজে গেছে। হোটেলে ফিরতে হবে। সারা পথটা পার করে আর্ক দ্য এ্যয়ম্পে এসে পড়েছি।

Chameps Elysees থেকে নিয়ে ল্যুভ্রে পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এই পথ সাজানো শুধু নয়, দিল্লীর মত 'জ্যামি-

ঠিকই নয়, সুন্দরও। পঞ্চাশ মীটর উচু আর পঁয়তাল্লিশ মীটর চওড়া আর্চটা ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে Chalgrin তৈরি করেন ফরাসীদের বিজয় গৌরবের স্মৃতি হিসেবে। ১৮৩৬এ এটা সম্পূর্ণ হয়ে সরকারী ভাবে উৎসর্গ করা হয় দেশকে। একশোটা থামে ঘেরা একটা গোল পরিক্রমা। বিদ্রোহের সময়ের "একশো-দিন" এর গৌরবের প্রতিভূ এই একশো থাম। বড় বড় শিল্পীরা এই তোরণকে শ্রীমণ্ডিত করেছে নানা কারুকলায়। ভালো লাগলো তলায় জ্বালা দিবারাত্রের জ্বলন্ত শিখা, অজ্ঞাত সৈনিকের নামে জ্বালা। যদিও বিজলীর সাহায্যে শিখা জ্বালা, তবুও আইডিয়াটা বড় ভালো লাগলো।

অনেক রাত। বেশী লোকজন নেই। একা একা বেশ লাগে। এই বিশাল শহরে কেউ আমায় চেনে না, জানে না। আমি যেন অপার সমুদ্রের মাঝে অনাবিষ্কৃত ছোট্ট একটা দ্বীপ। কচিৎ কখনও দু'একটা ভাবনা-কল্পনার পাখী এসে বসে, গান গায়, চলে যায়। বাসাও বাঁধে না। কখনও ঝড়-তুফান এলে ঝাপ্টা সে একাই ভোগ করে। আবার যখন চাঁদের আলো পায় একা একাই গা ধোয়, আরাম করে, ভাবে বিলাস!

হঠাৎ কে যেন বলে, "নমস্তে! আপ হিন্দোস্তানী?"

"জী হাঁ! নমস্তে!"

পারীতে বেড়াতে এসেছে অল-ইণ্ডিয়া রেডিও-র অন্যতম কর্ণধার। লণ্ডনে কি কনফারেন্সে এসেছেন। ফেরার পথে পারী হয়ে যাচ্ছেন। পারীতে ভতীজা দূতাবাসে চাকরি করেন। তিনিই চাচাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। নিজেদের কুলীনতার কথাগুলো এতো তাড়াতাড়ি জানিয়ে দিলেন যে, দাবা-বড়ের খেলায় প্রথমেই দুর্গ গড়ে তোলার কথা মনে পড়ে গেলো। আমার নিঃশব্দ বিলাস-রোমাঞ্চ শরাহত ক্রৌঞ্চের ব্যথায় 'মা-নিষাদ' বলে সুর তুলতে গিয়ে থেমে গেলো।

"আপনি কি পারীতেই থাকেন?"

"না। বেড়াতে এসেছি।"

"শুধুই বেড়াতে?"

"নিছক।"

"আর কোথা বেড়ালেন?"

"অনেক জায়গা। সাউথ য়োরোপ!

ওঁরা উভয়ে এতো তাড়াতাড়ি সরকারী পদে ইত্যাদি ব্যাপারে পরিচয় দিয়েছেন যে, আমি একটু রসিকতা করার লোভ আর পরিত্যাগ করতে পারলাম না।

"কোথায় কোথায় যাবেন?"

ওদের ইচ্ছে আমি কি? কে? কোথা থেকেই বা আসছি, নিজের মনে য়োরোপ বেড়াবার দুঃসাহসই বা পেলাম কোথেকে জানে। আমি কিন্তু কিছু বলছি না।

জানার জন্য ভদ্রলোক যেন ছটফট্ করছেন।

"য়োরোপ শেষ করে আটলান্টিকের ওপারে যাবো।"

"ইউএসে?"

"হ্যাঁ—ইচ্ছে আছে আরও ঘুরবো। সাউথ আমেরিকা পর্যন্ত।"

"এতো ঘুরছেন কেন? শুধু বিলাস?"

"আর্যরক্ত আমাদের। আমরা তো যাযাবরের জাত।"

"আছেন কোথায়!"

"কোথাও নয়। একটা সিঁড়ির তলায়। বন্ধুর নিমন্ত্রণ ছিলো এখানে; ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছি। জায়গা দেবেন একটু।"

গভীর রাত। কৃষ্ণা একাদশীর একফালি চাঁদ পুবের কোণটেরে পাৎলা হাসি হাসছে। তার চেয়েও হাসছে আমার মন। কি করে ভারতীয় দূতাবাসের ভদ্রলোক যে 'স্থানত্যাগেন দুর্জনঃ' করবেন সেই তখন তাঁর একমাত্র ফিকির।

"আমরা বড়ো হোটেলে আছি। আরামেই আছি। কিন্তু জায়গা দেওয়া; ওটা কি ম্যানেজার..."

মোটামুটি বিব্রত হয়ে ওরা হারিয়ে গেলো আর্ক দ ত্র্যয়ম্পের ছায়ায়।

শ্রীযুক্ত অল ইণ্ডিয়া রেডিও-র পারী ভালো লাগে নি। নিউ দিল্লীর চেয়ে এমন কিছু বেশী নয়!!!

আমার ফেরার কথা। ভুল করে ভিক্তর হ্যুগো এভিন্যুতে ঢুকে পড়েছি। ঢোকা উচিত ছিলো ক্লেবার এভিন্যুতে। চলি আর চলি, পথ পাই না। প্রায় ঘণ্টা-খানেক হালাকান্ হয়ে খিদে পেয়ে গেলো।

তখনও অবধি খাওয়া হয় নি।

হঠাৎ একটা ক্যাথারের মেঝেয় নাচ চলছে দেখতে পেলাম। সামনে কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোকে খাচ্ছেও।

ঢুকে পড়ি।

কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়াই কাউণ্টারে। আলমারি ইত্যাদি দেখি। কিছু খাদ্য আছে কিনা। ছাঁকা কালো এক আফ্রিকান যুবা একটি গৌরী তরুণীকে নিয়ে কাউণ্টারে এসে দাঁড়ালো। আমি দেখছি। কাউণ্টারের ওপারের তরুণী এগিয়ে দিলো একটা প্লেটে ভাজা ডিম আর দু' টুকরো রুটী। আর একটা কাপে চা বা কফি!

দৌড়ে চলে গেলাম। নির্বিবাদে প্লেটটা আর কাপটা

টেনে নিলাম। একবার বাও করলাম। খেতে আরম্ভ করলাম। সঙ্গে পয়সা বার করে কাউন্টারে রাখলাম।

মুহূর্তে একটা বিপ্লব বেধে গেলো যেন। যুবা ও তরুণী আধ মিনিটের বিস্ময় ভাঙার পর হাসতে লাগলো হৈ হৈ করে। আমিও যোগ দিলাম হাসিতে এবং পরে ছেলেটার নিজের অংশটা আসতে সেটাও টেনে কাছে করে নিলাম।

ওরা তো পয়সা নেবে না। আমি একেবারে পূর্ব বাংলার বাক্যজালে ওদের স্রেফ বোঝালাম ভাষা জানি না। ওরা দলে বাড়তে বাড়তে আমার মতো অদ্ভুত জীবকে ঘিরে ফেলে বড়ই আনন্দ পেতে লাগলো।

যাক্ দু' জোড়া ডিম, চার টুকরো রুটী আর দু' কাপ কফির পর মেজাজ ধাতস্থ হোলো।

'আঁ রিভোয়া' বলে বাও করে পেছু হেঁটে বিদায় নিলাম সে কাবারে থেকে। পরে পথ। পথ আর পাই না। একটি মেয়ে এগিয়ে আসে—"দেশলাই আছে ম সিয়ে?"

ইংরিজী জানে! বড় খুশী আমি। বলি, "দেখো সুন্দরী, আমি সিগারেটও পান করি না। তবু পথ হারিয়েছি। বলে দিতে পারো পথ?"

এগিয়ে দেওয়া তো দিলোই, একটা কাফেতে বসে এক পাত্র পান করলো আমার কল্যাণে। আমি কফি। কিন্তু হোটেলের দোরে এসে বলি "নমস্তে"—মেয়েটি বলে "আমিও বাড়ীই ফিরবো এখন। গুড নাইট।"

ক্রমশঃ

বিশ্ববিরহ

শ্রীকালিদাস রায়

বিশ্বনাথ, তব বিশ্বে তুমি হায় শাশ্বত বিরহী,
কত যুগ রবে তুমি এ বিরহ সহি?
ষড়ৈশ্বর্য অধিগত, এত তব প্রচণ্ড প্রতাপ!
বহিতেছ কার অভিশাপ?
বুঝি বা প্রেমের রাজ্যে বিচিত্র বিধান
সেথা তুমি অসহায় মোদেরি সমান?
ছায়াপাত করে অহরহ
গগনে গহনে মেঘে গিরি-শৃঙ্গে তোমার বিরহ।
শুষ্কপত্র মর্মরিয়া বেণু-বনে বহিছে বাতাস
সেত তব মর্মভেদী তাপিত নিশ্বাস।
তোমার বিরহ-লিপি তারার অক্ষরে
নিশি নিশি জ্বল জ্বল জ্বল-জ্বল করে।
তব অশ্রুজল
প্রপাত-ধারায় নামে গিরি-গাত্র ভেদি অবিরল।
তুমি যদি বিরহী না হবে
মানব-জীবনে কেন এত আর্তি তবে?
তোমার মাথুর
করিতেছে আজো সর্ব জীবেরে আতুর।
প্রিয়া কি তোমার অভিমানে
দূরে রহি তব মর্মে তপ্তশ্বাস হানে?
কবি তুমি, গাহিতেছ বিরহের গান,
নদীনদে তাই বুঝি সকরুণ কলকল তান?
বরষায় মেঘদূত, হংসদূত রচিছ শরতে,
নিদাঘে পবন দূত, অলিদূত বাসন্ত জগতে।
সেই গীতি অবিরত কর্ণে পশে আসি
অকারণে করে সব কবিরে উদাসী।
প্রিয়া যবে কণ্ঠলগ্না বক্ষ যবে করে দুরু দুরু,
তখনো তাদের মন করে উড়ু উড়ু।
এ বিরহ যবে হবে শেষ
রবে না তখন বিশ্বে বিষাদের লেশ।
আনন্দময়ীর সাথে কবে তব হইবে মিলন,
করিবে হ্লাদিনী হ্রদে, শূন্যে নয়, বিশ্ব সন্তরণ।

মা

শ্রীমণীন্দ্র চক্রবর্তী

হুমড়ি খেয়ে গায়ের ওপর পড়তেই দিলাম এক ধাক্কা। আচ্ছা ভদ্রলোক তো! বড্ড রাগ হলো ট্রামে উঠতে পারলাম না বলে। অথচ ভদ্রলোকটি যে আমার কাছে উঠে এসে দাঁড়াবেন ভাবতেই পারি নি। শুধু তাই নয়, ওঁর চোখের দৃষ্টিটা যেন আমাকেই শাসাচ্ছে বলে মনে হলো। বেশ গম্ভীর হয়েই বলে উঠলাম—চেয়ে চেয়ে দেখছেন কি?

কোনও কথার উত্তর দিলেন না ভদ্রলোকটি। শুধু একটু হাসলেন। ও হাসি দেখে সহ্য হলো না আমার। তাই আবার একটু গম্ভীর হয়েই বলতে হলো—ট্রামে উঠতে গেলেই কি মানুষকে অমন করে ধাক্কা দিতে হয়?

—ধাক্কা! ভদ্রলোকটি আমার কাছে আরো একটু সরে এলেন। বললেন—তা হলে আপনার গায়ের ওপর পড়েছিলাম?

আশ্চর্য! ভদ্রলোক বলছেন কি, অমন জলজ্যান্ত দু'দুটো চোখ থাকতে! কাণা নাকি? বললাম—এ কথা বলছেন কেন?

—আমি অন্ধ।

—অন্ধ! চমকে উঠলাম একটু। কই মনে হচ্ছে না তো?

—হ্যাঁ, আমি সত্যিই অন্ধ। অনেকক্ষণ এই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছি ট্রামে উঠবো বলে। বড্ড ভিড়। অনেককে বললাম উঠিয়ে দিতে। অথচ কেউ আমার কথা গ্রাহ্য করলেন না।

কথাগুলো যে কানে এল না এমন নয়। শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম ভদ্রলোকটির চোখ দুটোকে। বেশ স্বচ্ছ সহজ একটা ভাবও জেগে আছে। চোখের মণি দু'টো তখনও যেন নাচছে। অথচ অন্ধ!

আফসোস হলো একটু। বললাম—কতদিন চোখ হারিয়েছেন?

—বছরখানেক হলো।

—এখানে কি জন্যে এসেছিলেন?

—আপিসে কিছু টাকা পাওনা ছিল—তাই নিতে এসেছিলাম।

আর কিছু জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। সামনেই ট্রামটা এসে পড়েছে। ওঠবার প্রতীক্ষায় আছি, এমন সময় অন্ধ ভদ্রলোকটি বলে উঠলেন—দয়া করে আমায় ট্রামে উঠিয়ে দেবেন?

দয়া! সত্যিই মনটা আমার কেমন যেন করে উঠলো। বললাম—যাবেন কোথায়?

—বৌবাজার।

তা হলে আসুন। ভদ্রলোকটিকে ট্রামে উঠিয়ে দিলাম অনেক কষ্টে। অসম্ভব ভিড়! নিজে ওঠবার চেষ্টা করতে গিয়ে পারলাম না। উঠবার মুখেই ট্রামটা হুস করে ছেড়ে দিল। বাধ্য হয়েই আমার একটা ট্রামের প্রতীক্ষায় থাকতে হলো।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম ভদ্রলোকটির কথা। চোখ গেছে বলেই চাকরি নেই। একটা পুরো সংসার নিশ্চয় আছে। এ বাজারে চাকরি যাওয়া মানেই অসম্ভব দুঃখ ভোগ করা। সত্যি, ভদ্রলোকটির এখন কতই না কষ্ট!…ভাবনায় ছেদ পড়লো আমার গন্তব্য-স্থলের ট্রামটি এসে দাঁড়াতেই। ভীড় মেলাই; তবু যা হোক করে উঠে পড়লাম।

বাড়ী ফিরে এসে অমলাকে দেখতে পেলাম না ঘরে। হয় তো রান্নাঘরে ব্যস্ত আছে। একটু পরেই ও জানতে পারবে আপিস থেকে ফিরেছি কিনা। নির্জন ঘরটা। জমাটা খুলে পাখাটা চালিয়ে দিয়ে বিছানায় একটু শুয়ে পড়লাম। অসহ্য গরম! তবু যেন ক্লান্তির বোঝাকে এড়োনো যাচ্ছে না। শুয়ে থাকতে থাকতে একটু যেন তন্দ্রা এলো। কিন্তু সে ভাবটা কেটে গেল অমলা ঘরে ঢুকতেই। মনে হলো, ও চা-খাবার নিয়ে এসেছে। বিছানা ছেড়ে উঠতেই অমলা বললে—উঠলে কেন? একটু শুয়ে থাকো না।

আমি হেসে বললাম—ভাবলাম তুমি বুঝি চা নিয়ে এসেছো। কথাটা শেষ করে বিছানায় আবার দেহটাকে এলিয়ে দিলাম। অমলা ঠিক এমনি সময় বললে—চা নয় দিচ্ছি, কিন্তু তার আগে আমার একটা কথার জবাব দাও দেখি।

কি কথা? অমলার মুখের ওপর মুখটা তুলে ধরলাম একটু।

অমলা বললে—ওপরের খোকনের আজ কত বয়েস হ'ল বলতো?

—বছর দু'য়েক তো হলো! একটু হেসেই আবার বললাম—হঠাৎ খোকনের কথা মনে পড়লো কেন?

—এমনি। অমলার কথাটার মধ্যে কেমন যেন এক মায়া জড়িয়ে আছে বলে মনে হলো। ও চুপ করে থাকতেই আমাকেও মনে করতে হলো খোকনের কথা! তিন তলায় রতনবাবুর ছেলে ঐ খোকন। এ বাসা ছেড়ে তাঁরা এখন অনেক দূরে চলে গেছে। রতনবাবুর যদি চাকরিটা দিল্লীতে বদলী না হয়ে যেতো তাহলে খোকনকে নিয়ে অমলা অনেক আনন্দ উপভোগ করতে পারতো। ওর নিঃসন্তান মনের কোণে খোকন অনেকখানি স্থান জুড়েও ছিল। সে হিসাবে আমারও একটু স্নেহ-মোমতা জেগে ছিল। অথচ সেই খোকন আজ কত বড়ই না হয়ে উঠেছে!

অমলা কখন যে এ ঘর ছেড়ে চলে গেছে বুঝতে পারি নি। আমার চিন্তাচ্ছন্ন মনের খবর নিয়েই ও হয় তো ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। হয় তো ও তখন আমার চা আর খাবারের ব্যবস্থা করছে। এ সংসারে আমরা দু'টি মানুস। কোনো ঝামেলা নেই। অথচ মাঝে মাঝে কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা বলে মনে হয় জীবনটা। ভাবনার মুখে বাইরের সদরটায় কে যেন কড়া নাড়া দিয়ে উঠলো বলে মনে হলো। এমন তো কেউ আজ আসবার কথা নেই। কে আবার এলো? বিছানা ছেড়ে উঠতেই অমলা ঘরে ঢুকে বললে—তোমার কাছে খুচরো একটা টাকা হবে?

দেখো, জামার বুক পকেটে! কথাটা বলতেই পরক্ষণে মনে হলো হঠাৎ অমলার টাকার কি প্রয়োজন হলো। তাই বললাম—টাকা নিয়ে হবে কি?

—সাহমিয়া এসেছে, ঘুঁটের দাম নিতে। সকালে দশ টাকার নোটটা ওর হাতে দিতে সাহস করি নি। অমলা কথাটা শেষ করে হঠাৎ আমায় বলে উঠলো—এ কি! জামাটা ছিঁড়লে কি করে?

—কৈ, দেখি? আমি মহা ব্যস্ততার মধ্যে উঠে দাঁড়ালাম। জামাটা হাতে দিতেই বেশ দেখতে পেলাম, ও জামা আর কোন মতেই পরা চলবে না। অসম্ভব ছিঁড়ে গেছে, অথচ কয়েক মাস হলো আদ্দির পাঞ্জাবীটা তৈরি করিয়েছি। গায়েও খুব বেশী দিন পরছি না। মনটা তাই একটু ব্যথায় ভরে উঠলো।

অমলা বললে—ভেবে আর করবে কি? ওটা রিপু করতে দিও। তবু দু'চার দিন পরতে পারবে।

অমলা চলে যেতেই ভাবতে লাগলাম জামাটার এমন অবস্থা কি করে হলো! ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ মনে পড়লো সেই অন্ধ ভদ্রলোকটির কথা। সত্যিই তো আমার গায়ের ওপর তখন তিনি পড়েছিলেন। শুধু তাই নয়, একটা ধাক্কা দিয়ে তাঁকে ফেলেও দিয়েছিলাম।...যাক, অমলা এলেই বলা যাবে।

একটু পরেই অমলা এল চা-খাবার নিয়ে। হাসতে হাসতে বললাম, এ জামা দিয়ে তুমি বাসন কিনো।

অমলা আমার কথা শুনে বেশ একটু চমকে উঠলো। ও বললে—হঠাৎ এ কথা বলছো কেন?

—বলছি এই জন্যে, জামাটা নিজের দোষে ছেঁড়ে নি।

—আমার কাছে লুকিয়ে কি হবে।

—সত্যি বলছি অমু, সেই অন্ধ ভদ্রলোকটির জন্যেই এমন হয়েছে।

—অন্ধ!

—হ্যাঁ, অন্ধই তিনি। একটু থেমে অমলাকে আবার বললাম—বুঝতে পারি নি অমু, ভদ্রলোকটিকে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা দিয়ে ফেলেও দিয়েছিলাম।

অমলা আমার ওপর একটু অপ্রসন্ন হলো। তাই ও বললে, সত্যি, অন্যায় কাজ করেছো। কিছু বলেন নি তো?

—কোনো কিছুই বলেন নি। শুধু ওই এক কথা—আমি অন্ধ! অমলার বিষণ্ণ মুখটির ওপর দৃষ্টি মেলে থাকতে গিয়ে বেশ দেখতে পেলাম, অমলা কি যেন ভাবছে। মনে হলো, আমার এই কৃতকর্মের জন্যে আর সেই অন্ধ ভদ্রলোকটির জন্যে হয়তো অমলা অমনি এক চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়েছে। তাই ভাবি, চোখ না থাকলে সব যেন মিথ্যে হয়ে যায়। চোখ এমনি জিনিস!

* * *

কিছুদিন পরের কথা। আপিস থেকে ফিরছি। এমন সময় হঠাৎ যেন সেদিনের সেই অন্ধ ভদ্রলোকটিকে দেখতে পেলাম। দেখতে পেলাম আমারই বাসার কাছে অন্য এক পাড়া দিয়ে যেতে। চোখের ভুল হলে এমনি ভাবে দাঁড়িয়ে পড়তাম না। কারণ ভদ্রলোকটির চোখের দৃষ্টিটা আমার কাছে সেদিনের মতো চেনা-চেনা ঠেকলো। শুধু তাই নয়, হাতে একটা বেতের লাঠি দেখতে পেয়ে স্মরণ হলো, ওটা অবলম্বন করে চলবার মধ্যে আমার সেদিনের সেই ঘটনাটি নিশ্চয় জড়িয়ে আছে। পথ রোধ করে তাই বলে উঠলাম—চিনতে পারছেন?

—আমি অন্ধ!

বড় অপ্রস্তুতের মতো একটা [illegible]।

ও কথাটা ঠিক আমার বলা উচিত হয় নি। এবার একটু বুদ্ধি খরচ করে বলে উঠলাম—কিছুদিন আগে ভাল-হৌসীর মোড়ে আপনাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলাম, মনে আছে?

ভদ্রলোকটি একটু চুপ করে থেকে হেসে বলে উঠলেন —ও, এবার মনে পড়েছে। আপনিই তো আমাকে সেদিন ট্রামে উঠিয়ে দিয়েছিলেন।—কিন্তু এ পাড়ায়?

—এ পাড়ার কাছেই আমার বাসা।

—আমি এই সাত নম্বর বাড়ীতেই থাকি। ভদ্রলোকটি হেসেই বললেন।

আমি বললাম—কোথায় যাচ্ছেন এখন?

—এই বড় রাস্তার সামনের দোকানটায় একটু চা খেতে।

—বাড়ীতে কেউ নেই বুঝি?

—না, আমার নিজের বলতে এখন কেউ নেই। শুধু একটা ছেলে আছে। সবে এই তিন-এ পড়েছে।

—রান্না-বান্না কে করে দেয়?

—একটা ঝি আছে। ওই দু'মুঠো যা-হোক করে ফুটিয়ে দেয়।

—আপনার দেখছি বড্ড কষ্ট!

—তা যা বলেছেন। ভদ্রলোক ম্লান একটু হাসলেন। বললেন—আচ্ছা যাই।

—শুনুন?

—ডাকলেন বুঝি?

—হ্যাঁ। ভদ্রলোকটির কাছে এসে বললাম—চলুন না আমার বাসায় গিয়ে চা খাবেন?

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন—বেশ তো, অন্য একদিন যাওয়া যাবে। সাত নম্বর মনে আছে তো?

—তা আছে। অথচ আমার মনটা আজই যেন অন্ধ ভদ্রলোকটিকে বাসায় নিয়ে যেতে চাইলো। তাই বলে উঠলাম—আজই চলুন না।

—অন্ধ মানুষ। তাই এত মায়া হচ্ছে, না?

—তা, ঠিক নয়। হাসলাম একটু। বললাম—পরিচয় যখন হলো, তখন—।

—ছাড়বেন না দেখচি। ভদ্রলোক সুন্দর এক মিষ্টি হাসলেন। তার পর বললেন, একটু দাঁড়ান।

—দাঁড়াবো?

—হ্যাঁ, ঝি-টাকে বলে আসি ছেলেটাকে একটু যেন সামলে রাখে। ভয় হয়, নিজের চোখ হারিয়েছি। ও আবার যদি গাড়ী-ঘোড়ায় চাপা পড়ে অন্ধ হয়ে যায়!

—না-না, ও কিছু ভাববেন না। চলুন, ভদ্রলোকটিকে হাত ধরে ওঁর বাসায় নিয়ে এলাম।

দরজার কাছেই দেখতে পেলাম সুন্দর এক ফুটফুটে ছেলেকে। তার হাতে একটা রবারের বল। মনে হলো, অন্ধ ভদ্রলোকটিরই ছেলে। বললাম—আপনাকে দেখে আপনার ছেলে হাসছে।

—তাই নাকি! ভদ্রলোক ডাকলেন—বাবলু!

ছুটে এল বাবলু। ছুটে এল ঝি-টা!

ভদ্রলোকটি বাবলুকে একটু আদর করে ঝি-কে বললেন—একটু পরেই ফিরছি নেদোর মা, বাবলুকে একটু দেখিস।

—আচ্ছা দাদাবাবু। নেদোর মা বললে।

কিন্তু আমার মনটা চাইল বাবলু আমাদের সঙ্গেই চলুক। বাবলু গেলে অমলা হয়তো অনেক খুশী হবে। তাই বললাম—বাবলুকেও নিয়ে চলুন।

—না, না, ও বড় দুষ্টু! গেলেই ক্ষতি করবে আপনার। চলুন, আর দাঁড়িয়ে থাকে না।

বাসায় অন্ধ ভদ্রলোকটিকে নিয়ে আসতেই অমলা একটু যেন চমকে উঠলো। ও হয়তো কিছুই বুঝতে পারছে না। না পারাটাই স্বাভাবিক। ভদ্রলোকটিকে নিজের বড় ঘরটিতে এনে বসালাম। পাখাটাও চালিয়ে দিলাম। কলকাতার ভাড়া বাসা। ঘর বলতে তো পায়রার খোপ। কিন্তু ভদ্রলোকটিই হঠাৎ বলে উঠলেন—ঘরে বেশ হাওয়া আছে তো! দক্ষিণ-মুখো ঘর বুঝি?

—না, পাখা চলছে।

—ও, বলে ভদ্রলোক থামলেন। তার পর বললেন—আপনার নামটা?

বললাম—সত্যবাবু। ভাল নাম সত্যেন মুখার্জি। কিন্তু আপনার?

—বিলাস চৌধুরী।

—আচ্ছা, বিলাসবাবু একটু বসুন। আমি চায়ের ব্যবস্থাটা করে আসি।

ঘর ছাড়বার মুখে বিলাসবাবু আমায় বলে উঠলেন—দেখুন, শুধু চা-য়ের ব্যবস্থা করবেন।

—আচ্ছা, বলে ঘর ছাড়লাম।

রান্নাঘরে যেতেই অমলা বললে, কাকে আবার নিয়ে এলে?

—সেই অন্ধ ভদ্রলোকটিকে।

—অন্ধ ভদ্রলোক! অমলা অবুঝের মতো বলে উঠলো।

আমি হেসে বললাম—ওঁকেই তো আমি সেদিন ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলাম।

—ও, তাই বলো। দেখা হলো কোথায়?

—এ পাড়ার কাছেই।

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

পল্লীদেশে শোভাযাত্রা
শ্রীপ্রহ্লাদ কর্মকার

(প্রবাসী ১৩৪০, কার্ত্তিক সংখ্যা হইতে পুনর্মুদ্রিত)

নিড়ানী
ফটো : শ্রীরমেন বাগচা

সন্ধানে
ফটো : শ্রীরমেন বাগচী

—এ পাড়াতে!

তবু অমলা বিশ্বাস যেন করতে পারছে না। বললাম—তোমাকে মিছে কথা বলছি? চা কর।

—শুধু চা? একটু মিষ্টি এনে দাও না।

—না, উনি শুধু চা-ই খাবেন। ঘরে তো বিস্কুট আছে।

—তা আছে। অমলা বললে।

—আমি আর কোন কথা না বলেই ঘরে এসে ঢুকলাম। বিলাসবাবু আমার পদ-শব্দ শুনে বুঝতে পারলেন আমি ঘরে আছি কিনা। তাই বললেন—আচ্ছা সত্যবাবু, আপনার ছেলে-পুলেদের কাউতো দেখতে পাচ্ছি না?

বললাম—কিছুই হয় নি এখনো।

—সে কি মশাই! বিয়ে করেছেন কত বছর?

—তা প্রায় বছর সাতেক হলো।

—বেশ আছেন সত্যবাবু, বেশ আছেন। বিলাসবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন—ছেলে-পুলে না থাকাই ভাল সত্যবাবু।

—এ কথা বলছেন কেন? আমি বলে উঠলাম।

—কেন বলছি জানেন? বিলাসবাবুর মুখে একটু ম্লান হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

বললেন—আমার বাবলুর জন্যে।

—বাবলুর মা নেই বলে বুঝি?

—ওর মা! বিলাসবাবু কেমন যেন মুষড়ে পড়লেন। তাই দেখে আমি বলে উঠলাম—অমন করছেন কেন বিলাসবাবু!

আমার কথা শুনে বিলাসবাবু আবার একটু ম্লান হেসে উঠলেন। তার পর বেশ দুঃখ প্রকাশ করেই বললেন—জানেন সত্যবাবু, জীবনে মস্ত বড় এক ভুল কাজ করে ফেলেছি।

—ভুল কাজ! আমি অবাক-বিস্ময়ে বিলাসবাবুর মুখের ওপর মুখটা তুলে ধরলাম।

বিলাসবাবু করুণ এক হাসি হেসে বললেন—হ্যাঁ সত্যবাবু, ভুল করেছি আবার একটা বিয়ে করে।

—তখন যেন বললেন বাবলুর মা নেই?

—ওর মা! সেতো এখন স্বর্গে! কিন্তু বাবলু আবার যাকে মা বলে ডাকতে শিখলো, সেতো ওকে আর চাইলো না।

অমলা চা নিয়ে এমন সময় ঘরে ঢুকলো। তাই সাময়িকভাবে আমাদের নির্জন বাক্যালাপের ছেদ পড়লো। চায়ের কাপটা বিলাসবাবুর হাতে তুলে দিয়ে বললাম—আগে চা খান। তারপর সব শুনবো।

—শুনবেন! বিলাসবাবু কাপে এক আরামের চুমুক দিলেন। বললেন—বেশ মিষ্টি চা হয়েছে। নিশ্চয় আপনার স্ত্রী করেছেন সত্যবাবু?

—হ্যাঁ।

বিলাসবাবুর দৃষ্টিটা আমার দিকে না হোক তবু মুখটা তুলে বললেন—জানেন সত্যবাবু, এক এক সময় ভাবি, বাবলুটা সংসারে না এলেই ছিল ভালো। তা হলে হয়তো আমার জীবনে এমন-কিছু একটা ঘটতো না। চোখ দু'টোকেও হারাতাম না। কথাটা শেষ করে বিলাসবাবু আবার চায়ের কাপে চুমুক দিলেন।

অথচ বিলাসবাবুর দুঃখময় জীবনের কথাগুলো শুনতে আমার মনটা যেন চাইলো। তাই বললাম—আপনার কথাগুলো শুনতে বড্ড দুঃখ লাগছে বিলাসবাবু।

—দুঃখ্য! বিলাসবাবু চায়ের কাপে শেষ চুমুকটা দিয়ে অতি সন্তর্পণে টেবিলের ওপরে কাপটা রেখে বললেন—তা যা বলেছেন সত্যবাবু। যেমন কপাল করে এসেছিলাম তেমনি তো হবে!

আমি বললাম—কপাল এমন হলো কেন?

—তবে শুনুন সত্যবাবু। কোনদিন কারো কাছে মুখফুটে কিছুই বলি নি। অথচ আপনার কাছে বলতে হচ্ছে। বিলাসবাবু সোজা হয়ে একটু বসে এবার বলতে লাগলেন—বছর দুয়েক হয়ে গেল। বাবলুর মা মারা যেতে বাবলুর মুখ চেয়ে আবার আমাকে বিয়ে করতে হলো। অথচ এ বিবাহের মধ্যে আমাদের জীবনে সুখ-শান্তি কি কিছুই ছিল না? ছিল—সবই ছিল। বড় ঘরের মেয়েকেই আমি বিবাহ করেছিলাম। তখন সরকারী আপিসে মোটা মাইনের চাকরিও আমি করতাম। সুখের সংসার। ফুটফুটে সুন্দর বাবলুকে নিয়ে দিনরাত মুকুল বুকে জড়িয়ে থাকতো। আপিস থেকে ফিরলে আর কিছুই মনে হতো না। মুকুল যে বাবলুকে ভালবাসে এইটাই আমার পরম সুখ ছিল তখন। মুকুলও আমায় বলতো, আমি আর ছেলে চাই না। শুনে অনেক আনন্দও পেয়েছিলাম।...বেশ দিন চলছিল। অথচ একদিন সকাল সকাল আপিস থেকে বাসায় ফিরে দেখতে পেলাম মুকুল বাবলুকে একটা ঘরে তালাবন্ধ করে কোথায় যেন গিয়েছে। বড় অস্বস্তি লাগলো মনে। জানালা দিয়ে ঘরের ভিতর দৃষ্টিমেলে থাকতে গিয়ে মনে হলো বাবলু যেন কাঁদতে কাঁদতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। নিঃশব্দে তখনো যেন তার চোখ দুটো

দিয়ে জল ঝরে পড়ছে। মাঝে মাঝে কেমন যেন ও ফু পিয়ে ফু পিয়ে উঠছে। থাকতে পারলাম না আর। এ-ঘর ও-ঘর খুজে চাবি পেলাম না। বড্ড রাগ হলো। দরজায় তাই দুম্ দুম্ করে লাথি মেরে তালাটা ভেঙ্গে ফেলাম। ঐ শব্দে বাবলুর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। কেঁদেও উঠলো আমায় দেখে। আমার বুকের ওপর ও তখুনি এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

তার পর? আমি বলে উঠলাম।

বিলাসবাবু এবার আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন—তার পর, মুকুল সেদিন একটু রাত করেই বাড়ী ফিরলো। ওকে জিজ্ঞেস করলে ও বললে, সিনেমায় গিয়েছিলাম। ওই কথা শুনে আমি মুকুলকে অমনি বলে উঠলাম—তাই বলে বাবলুকে তালা বন্ধ করে রেখে যেতে হবে! আমার কথা শুনে মুকুল শ্লেষের হাসি হেসে বললে—তা না করে উপায় কি আছে? তোমার ছেলের জন্যে সিনেমা বা আমার বন্ধু-বান্ধবদের তো ভুলতে পারি নে। তারপর আমি কি বললাম জানেন সত্যবাবু?

—কি বললেন? আমি বিলাসবাবুর কাছে একটা চেয়ার টেনে এনে বসলাম। অমলাও ধরে দাঁড়িয়ে রইলো সংসারের কাজ ভুলে। বেশ শুনতে লাগছে বিলাসবাবুর ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ জীবনকাহিনী।

বিলাসবাবু এবার বলতে সুরু করলেন—তার পর আমি মুকুলকে অনেক বোঝালাম। ও বুঝতে চাইলো না তেমন। তাই বাবলুর জন্যে দেশ থেকে নেদোর মা'কে ডেকে আনলাম। তবু বাবলুকে ও দেখতে পারবে। ভাবলাম মুকুলও তো বাপের এক মেয়ে। সংসারের কাজ-কর্ম তো আছে! সে হিসাবে ওর মন তো চায় একটু বাইরে যেতে। সব জেনে-শুনে তবু মুকুলকে কম ভালবাসতাম না। কিন্তু ও যে ঘর ভাঙতে আসবে তা তো জানতাম না সত্যবাবু! নেদোর মা'র মুখেই একদিন সব শুনলাম।

—কি শুনলেন? আমরা দু'জনেই বিলাসবাবুর মুখের ওপর তাকিয়ে রইলাম।

বিলাসবাবু এবার বললেন—শুনলাম কি জানেন? মুকুলের বন্ধু-বান্ধবরা মাঝে মাঝে বাসায় এসে অনেক আলাপ-আলোচনা করে যেতো। ওরা এসে মুকুলকে বুঝিয়ে বলতো, বাবলু নাকি একটা কেউটে সাপ! বড় হলে ও অমন-কিছু একটা হয়ে উঠবে। পরের ছেলে পরই হয়। মুকুল সেই কথাগুলো বিশ্বাস করে রইলো। এ-ও আমি নিজের স্বচক্ষে দেখেছি, শুনেছিও তাদের কথা। সেদিন কোনও প্রতিবাদ করি নি। অপমান করে তাদের তাড়িয়েও দিই নি। শুধু মুকুলকে বোঝালাম অনেকক্ষণ ধরে, অনেক কিছু বলে। তবু ও আমার কথা বুঝলো না। শুধু ভাবলো, বাবলু ওর ছেলে নয়। বাবলু হলো কেউটে সাপ! কথাগুলো বলতে বলতে বিলাসবাবু এবার একটু থামলেন। তার পর অস্ফুটস্বরে আমায় বলে উঠলেন—তার পর কি হলো জানেন সত্যবাবু?

—কি হলো?

সেদিন ছিল বারোই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার। বাবলুরও সেদিন ছিল জন্মদিন। সকাল সকাল বাড়ী ফিরতেই অবাক হয়ে গেলাম। শুধু অবাক নয়, আমার মনটাও কেঁদে উঠলো আমার ছোট্ট বাবলুর কান্না দেখে। শুধু কান্না নয় যেন তার চোখ দুটো দিয়ে বৃষ্টিধারা নামছে। থাকতে পারলাম না। ঘরে ঢুকতেই দেখতে পেলাম মুকুলের পাগলামি। চীৎকার করে বলে উঠলাম—বাবলুকে মারছো কেন মুকুল?

মুকুল কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময় বাবলু আমার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে উঠলো—মা আমায় রোজ রোজ শুধু শুধু মারে। ওই না শুনে আমার মাথার মধ্যে ভূমিকম্প সুরু হলো। সহ্যগুণ তাই সেদিন হারিয়ে ফেলেছিলাম। অসম্ভব উত্তেজনার মধ্যে মুকুলের চুলের মুঠি ধরে পাগলের মতো বলে উঠলাম—সৎ মা হলে কি এমন শয়তানী বুদ্ধি নিয়ে থাকতে হয়? বুঝেছি, বাবলুকে তুমি মেরে ফেলতে চাও। তা না হলে আজ তার জন্মদিনে এমন করে মারতে পারো?

—তার পর? আমি ভারাক্রান্ত মনে বলে উঠলাম।

বিলাসবাবু একটু জিরিয়ে নিয়ে বলতে লাগলেন—তার পর আমার জীবনে খেলা-ভাঙার খেলা সুরু হলো! নেদোর মা'র মুখ থেকে আরো অনেক কথা জানতে পারলাম। সে-সব কথা থাক সত্যবাবু। শুধু ভাবি এইটুকু আজ, মুকুল আমার সব কিছু কেড়ে নিয়ে গেছে বলে দুঃখ করি না। দুঃখ করি শুধু এই জন্যে, বাবলু মা হারিয়ে মা পেল। কিন্তু সে তো আর তাকে মা বলে ডাকতে পারলো না।

বিলাসবাবুর চোখ দুটো যেন জলে ভরে এলো। দেখতে পেলাম, তার স্থির ওই অন্ধ চোখ দুটিতে কি যেন এক বেদনার বোঝা লুকিয়ে আছে। দেখতে পেলাম মুখের কোণে হাসি নেই, আছে এক দুঃসহ বিরক্তির ছাপ। অথচ আমার মনে হলো বিলাসবাবুর চোখ দুটো শোক-তাপেই গেছে। তা না হলে তাঁর জীবনে এমন কিছু আজ ঘটতো না।

—সত্যবাবু?

—বলুন? আমার সমস্ত চিন্তা এবার মুছে গেল।

—এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারেন?

—দিচ্ছি। অমলা ঘরেই ছিল। ওর মুখ-চোখ একটা ব্যথায় ভরে আছে বেশ দেখতে পেলাম। ও জল গড়িয়ে আনতেই আমি ওকে ইশারায় বলে উঠলাম—বিলাসবাবুকে জল দিতে।

এক নিঃশ্বাসে বিলাসবাবু জলটুকু খেয়ে অমলার হাতে গ্লাসটা দিতে গিয়ে ওর চুড়িগুলোর শব্দ হলো। বিলাসবাবু তাই শুনে আমায় বললেন—হ্যাঁ সত্যবাবু, আপনার স্ত্রী বুঝি আমায় জল দিলেন?

বললাম—অন্যায় কাজ হলো নাকি?

—না না। ও কিছু নয়। বিলাসবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমায় বললেন—আজ কত তারিখ বলতে পারেন সত্যবাবু? বাংলায় কিন্তু বলবেন।

—এগারোই জ্যৈষ্ঠ।

—তা হ'লে কাল বারোই? বিলাসবাবু এবার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তার পর বললেন—কাল যদি বাবলুর জন্মদিন পালন করি, যাবেন সত্যবাবু?

—নিশ্চয় যাবো।

—আপনার স্ত্রী যাবেন?

—যাবো। অমলা বললে।

—যাবেন? বিলাসবাবু সত্যিই যেন খুসি হলেন; তার পর আমায় বললেন—চলুন সত্যবাবু, এবার যাওয়া যাক। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম বিলাসবাবুকে নিয়ে। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো অমলার ডাকে। বিলাসবাবুর একমাত্র অবলম্বন লাঠিটা ও দিতে এলো। আর ওই ফাঁকে অমলার মুখের ওপর দৃষ্টি মেলতেই দেখতে পেলাম, তার কাজল-কালো চোখ দুটি দিয়ে নিঃশব্দে জল ঝরে পড়ছে। মনে হলো, অমলা যে চোখের জল ফেলছে হয়তো সে শুধু হতভাগ্য বিলাস-বাবুর জন্যে। কিন্তু রাস্তায় নেমে মনে হলো অন্য কথা, ঐ মাতৃহারা ছেলেটির কথা শুনে তার মাতৃত্ব হয়ত ব্যথায় টন টন করে উঠেছে।

ব্যক্তিতা বনাম ব্যক্তিত্ব

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

আধুনিক বাঙ্গালীর মনোজগতে যে কয়টি ভাবধারা তীব্র আলোড়ন আনিয়াছে তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তিতাবাদ। এই নবলব্ধ ভাবটির আকর্ষণ প্রবল আর আবেদনও জোরালো। আর জোরালো বলিয়াই এর অপরিচ্ছিন্ন প্রভাব সারা বাংলার মনে ক্রমাগত জাঁকিয়া বসিতেছে। আর তার অবশ্যম্ভাবী ফল আমরা দেখিতেছি বাঙ্গালীর আচারে, ব্যবহারে।

এই ব্যক্তিতাবাদ বস্তুটি কি? কোন দেশে এর জন্ম?

ইউরোপীয় সমাজে ও রাষ্ট্রনীতিতে 'অধিকার' বলিয়া একটি ছোট কথা আছে। কথাটি ছোট ও সহজ হইলেও তার গুরুত্ব অসাধারণ। রাষ্ট্র ও সমাজের মূলনীতি-বোধের সঙ্গে এর সম্পর্ক; আর সে সম্পর্কও নিতান্ত অঙ্গাঙ্গি। এই 'অধিকারের' দাবি না মানিলে সমাজ-ব্যবস্থা আর রাষ্ট্র-ব্যবস্থা উভয়ই অচল হইয়া যায়। সমাজের নিকট হইতে সাধারণ সামাজিক জীবের যতটুকু পাইবার কথা সেটুকুই তার অধিকার—সেটুকুই তার দাবি। সে দাবি সম্পর্কে সমগ্র ইউরোপীয় জনসাধারণ সম্পূর্ণ আত্মসচেতন; সে দাবি পূরণের ন্যূনমাত্র ব্যতিক্রম হইলে জনসাধারণের সঙ্গে সমাজের বা রাষ্ট্রের বিবাদ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণ যে শুধু পাওনার অঙ্ক কষিয়াই দেনাটাকে বেমালুম অস্বীকার করে তাহা নহে। তাহাদের নিকট হইতে সমাজের বা রাষ্ট্রের যতটুকু প্রাপ্য ততটুকু নির্ব্বিবাদে ফিরাইয়া দিতে তাহারা না করে কার্পণ্য না করে গড়িমসি। কিন্তু যথোচিত দেনা শোধের পরে পাওনার বেলায় কড়ায়গণ্ডায় সব বুঝিয়া না পাইলে জনসাধারণ হয় ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ। আর সে ক্ষোভ ও ক্রোধ সীমা ছাড়াইয়া যায়। আর তারই ফলে জনসাধারণের সঙ্গে সমাজের দারুণ বিবাদ-বিসম্বাদের সূত্রপাত হয়।

আর সে বিবাদ শুধু লাগিয়াই থাকে না, ক্রমাগত বাড়িতে থাকে। কারণ এ অধিকারের সীমাবোধ সর্ব্ব-দেশে ও সর্ব্বসমাজে একরূপ নয়; সর্ব্বত্রই ইহার মাত্রা দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইবার সম্ভাবনাই প্রবল। আর, কার্য্যক্ষেত্রে তাহাই প্রায় হইয়া দাঁড়ায়।

এই পাশ্চাত্য অধিকার-বোধের জন্ম ফরাসী বিপ্লবে। সে স্বাধীনতার, সে মুক্তির প্রধান বাহক সাম্য। মৈত্রী তার সহযোগী বটে, তবে সে দুর্ব্বল। সাম্যের কাঁধে ভর দিয়াই মুক্তির সে বিজয়নিশান লইয়া দেশ-বিদেশে সফর করিয়া

বেড়াইয়াছে। সে মুক্তির মূলকথা ব্যক্তি-স্বাধীনতা। সমগ্র দেশ হইতে, সমগ্র সমাজ হইতে নিজেকে স্বতন্ত্র বলিয়া অনুভব ও প্রচার করাই ব্যক্তি-স্বাধীনতার চরম কথা। সে ক্ষেত্রে ব্যক্তিটি একক, দোসরহীন। তার স্বপ্রধান জীবন স্বাতন্ত্র্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বাতন্ত্র্য ও প্রাধান্য রক্ষার জন্য বাদ-বিসম্বাদের একান্ত প্রয়োজন। কাজেই দ্বন্দ্বকে সাথী করিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা আপনার পথ পরিষ্কার করিয়া লয়।

পাশ্চাত্ত্য সমাজ এ স্বাতন্ত্র্য-প্রীতিকে নির্বিবাদে স্থান করিয়া দিয়াছে। শুধু ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, ইহাকে পরিপূর্ণরূপে পোষণ করিয়া চলিয়াছে। সে সমাজে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক প্রধানতঃ আইনের বিধান মানিয়া চলে—প্রেমের বিধান নহে। পুত্র-কন্যার দায়িত্বও বহুলাংশে আইনের দায়িত্ব। স্নেহের বন্ধন যে একেবারেই তিরোহিত একথা বলা চলে না, কিন্তু ব্যক্তিতা-ধর্মী মনে সে বন্ধন দৃঢ় হইতে পারে না।

শিশুকাল হইতেই পাশ্চাত্ত্য মন নিজের ও অপরের অধিকার সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। সমাজে পিতার দায়িত্ব সীমাবদ্ধ; ছেলেমেয়ে বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত পিতার দায়িত্ব তাহাদের ভরণ-পোষণের আর যথাসাধ্য শিক্ষা-দীক্ষার। ছেলেমেয়ে ইহা অপেক্ষা বেশী কিছু পিতার নিকট প্রত্যাশা করে না। তাই নিজেরা যখন আবার পিতামাতা হয় তখন তাহারাও এই অনুশাসনই মানিয়া চলে।

এই আত্ম-সচেতনতা পাশ্চাত্ত্যের জাতীয় ধর্ম্ম। বয়োপ্রাপ্তির পর প্রত্যেক মানুষের জীবন সে সমাজে একান্তভাবেই নিজস্ব। অবশ্য সামাজিক জীব হিসাবে তাহাকে সামাজিক অনুশাসন মানিয়া চলিতেই হয়, কিন্তু পারিবারিক জীবনের সঙ্কোচ প্রসারণ তাহার নিজের হাতে। নিজের জীবনকে সে কাটিয়া, ছাঁটিয়া, বাদ দিয়া যেমন করিয়া ইচ্ছা গড়িতে পারে; অন্য কোনও জীবনের সঙ্গে তাহার নিজের জীবনের কোনো সম্পর্ক সে স্বীকার করে না। অন্যের জীবনও তাহার নিকট হইতে দূরে থাকে। যেখানে একের জীবন অন্যের নিকটে আসে, সেখানে উভয়ে উভয়ের ব্যক্তিগত অধিকার মানিয়া না চলিলে দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। স্নেহের, প্রেমের বা শ্রদ্ধার প্রলেপে কোথাও কোথাও হয়ত এই দৈনন্দিন সংঘাতের রূঢ়তা কমিয়া আসে কিন্তু উগ্র ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রভাব মনকে সর্ব্বদা আত্ম-সচেতন করিয়া রাখে।

সমাজের কথা ছাড়িয়া দিলেও, পাশ্চাত্ত্যের ধর্ম্ম-বিশ্বাসও এই আত্ম-সচেতনার প্রতিকূল নয়। ধর্ম্ম সে দেশে যে গণ্ডি বাঁধিয়া দিয়াছে তাহার মধ্যে মন বা বুদ্ধি অন্তর্মুখী হইবার প্রেরণা পায় না। সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে, মন বা বুদ্ধির মুক্তি অপেক্ষা তাহাদের বন্ধনই সেখানে কাম্য। সে বন্ধনটুকু মানিয়া চলিলেই সমাজ-জীবন অক্ষুণ্ণ থাকে আর সে শৃঙ্খলাটুকু বজায় রাখিতে পারিলেই সাধারণ সামাজিক জীব সেখানে আপনাকে ধন্য মনে করে। বৃহত্তর জীবনের মুক্তির কথা, মহত্তর জীবনে আত্ম-বিলোপের কাহিনী ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের মনে যেমন করিয়া সাড়া দেয়, পাশ্চাত্ত্য সমাজে তাহার তুলনা মিলে না। যীশুকে না মানিলে খ্রীষ্টান হওয়া যায় না কিন্তু শুধু অবতার তো দূরের কথা, স্বয়ং ঈশ্বরকে না মানিলেও হিন্দু হওয়ার বাধা নাই। তাই বলিতেছিলাম, পাশ্চাত্ত্যের ধর্ম্মগণ্ডির মধ্যে আত্ম-বিলোপের স্থান নাই। বরং সে বন্ধন, সে গণ্ডি আত্ম-সচেতনতাকে জিয়াইয়া রাখে।

এই আত্ম-সচেতনতা, এই স্বাতন্ত্র, এই পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে অহরহ দ্বন্দ্ব ও সংঘাত ইহাই ব্যক্তিতা। এই ব্যক্তিতার সৃষ্টি ভারতবর্ষের মাটিতে হয় নাই। ইহাও একটি মনোরম বিদেশী ফুল—যাহার বর্ণ, দীপ্তি ও গঠন-সৌন্দর্য্যে আমরা মুগ্ধ।

এখন ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞায় ফিরিয়া আসা যাউক। ভারতবর্ষীয় মন প্রধানতঃ ব্যক্তিত্ব-ধর্ম্মী। সে সমাজের, সে ধর্ম্মের আদর্শও তাহাই। সে আদর্শ ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি। সে আদর্শ মানুষকে দেহে, মনে, বুদ্ধিতে মানবাত্মার পরিপূর্ণ সত্তারূপে সৃষ্টি করিবার আদর্শ। সে আদর্শের মধ্যে অধিকার-বোধের স্থান নাই, তাহার পদক্ষেপে দ্বিধা নাই, তাহার গতিপথে সংঘাতের কোলাহল নাই। অর্থলাভ তাহার নিতান্ত ব্যক্তিগত ক্ষুধা বিলোপের জন্য নয়, স্বাস্থ্যলাভ তাহার নিতান্তই আপনার জৈবিক প্রয়োজনের জন্য কাম্য নহে। বিদ্যা, যশঃ, আয়ু, বল, মেধা, বুদ্ধি—মানব-জীবনের যাহা কিছু কাম্য সকলই তাহার চাই কিন্তু সে সকল তাহার ক্ষুদ্র অহঙ্কারের ঝুলি পূর্ণ করিবার জন্য নহে। সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যের প্রয়োজনই তাহার মানবাত্মার পরিপূর্ণতার জন্য। ফলে তাহার প্রাপ্তিকে, তাহার ঐশ্বর্য্যকে, তাহার ব্যাপ্তিকে সমগ্র সমাজ কোনো ব্যক্তি-বিশেষের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করে না; সে সকলই পারিপার্শ্বিক মানবসমাজের বিভবরূপে পরিগণিত হয়।

ব্যক্তিতা-বাদীর দল সংসার ও সমাজকে নিছক প্রতিযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠা করে। মন তাহাদের নিতান্ত বাস্তবধর্ম্মী। কাড়াকাড়ি, মারামারি করিয়া একজন অপরজনের নিকট হইতে যাহা কিছু পারে আদায়

করিয়া লইতে চায়। যে এই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে টিকিয়া থাকে, সেই কেবল মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে ; শক্তির পরীক্ষায় পরাস্ত হইলে তাহাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অবশ্য সভ্যতার একটা মুখোস থাকে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ যুদ্ধ আদিম মানবগোষ্ঠীর লড়াইয়েরই রকমফের। বস্তুধর্মী অপরিণত মন আদিম জগতে সামান্য একটি গুহার বা ঘোড়ার মালিকত্বের দাবিতে যুদ্ধ করিত আর এখন সেই মনই তার পূর্ণ পরিণতির পথে আধুনিক যুগের ঐশ্বর্য লইয়া কাড়াকাড়ি করে। আদিম জগতের সেই নির্লজ্জ মাতামাতি আজ প্রতিযোগিতার রূপ ধরিয়া সভ্য হইয়া বসিয়াছে।

ব্যক্তিত্ব-ধর্মী মানুষের মনে এরূপ প্রতিযোগিতার কামনা নাই। তাহার কামনা মানবাত্মার পূর্ণ পরিণতি। তাই কাহাকেও বঞ্চিত করিয়া সে কিছু সঞ্চয় করিতে চায় না। কাহারও সহিত দ্বন্দ্ব বা রেষারিষি নাই। বস্তুকেই সে একান্ত ভাবে চরম পদার্থ বলিয়া মনে করিতে পারে না ; ভাবের রাজ্যেও তার গতিবিধি বহুদূরে। সর্বজীবের সঙ্গে সংযোগিতাই তাহার ধর্ম—প্রতিযোগিতা নহে।

যদি একটি বিশাল বটবৃক্ষের সঙ্গে ব্যক্তিত্ব-ধর্মী মানুষের তুলনা করা যায়, তবে ব্যক্তিতা-বাদীর দলকে কেয়ারি-করা ফুলগাছের সারি বলা যাইতে পারে। বটবৃক্ষ আপনার ঔদার্যে আপনি মহান। মুক্ত আকাশের নিচে, নির্মল আলো-বাতাসের সংস্পর্শে দ্বিধাহীন ভাবে সে আপনার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া চলে। তাহার সহিত কাহারও দ্বন্দ্ব নাই, তাহার সহিত কাহারও সংঘাত নাই। ছোট-বড় পাখীর দল তাহার শাখায় বাসা বাঁধিয়া থাকে, শ্রান্ত মানুষ ও পশু উভয়ই তাহার ছায়ায় শ্রান্তি অপনোদন করে। তাহার স্বাতন্ত্র্য এত বিশাল যে তাহা রক্ষা করিবার জন্য তাহার কোনো প্রচেষ্টার দরকার পড়ে না। তাহার সহিত সখ্য করিতেও কাহারো দ্বিধা বোধ হয় না আর বিপদে তাহার শরণ লইতেও কাহারো সঙ্কোচ উপস্থিত হয় না। কাটিয়া ছাঁটিয়া তাহাকে সুজন, সুদৃশ্য করিবার কল্পনাও কেহ করে না।

এদিকে ফুলগাছের কেয়ারি দেখিতে মনোরম। একে অন্যের রস টানিয়া সে গাছের দল নিজের নিজের জীবন রক্ষা করে, নিজেকে সুশোভিত করিতে চেষ্টা করে। প্রাণ তাহাদের ক্ষীণ ; জীবন তাহাদের নিতান্ত বস্তুধর্মী। ফুলন্ত না হইলে তাহার শাখার কোনো অর্থ থাকে না, কাজেই মালী তাহাদের অনাবশ্যক ডালপালা অবিরত কাটিতে থাকে আর যে সকল গাছ দৈনন্দিন প্রতিযোগিতায় ক্ষীণপ্রাণ, জীর্ণদেহ হইয়া পড়ে তাহাদের সমূলে উচ্ছেদ করিয়া দূরে ফেলিয়া দেয়।

পাশ্চাত্ত্য মন প্রধানতঃ বস্তুধর্মী। ব্যক্তিতা-বাদ সে ধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলে। উগ্র প্রতিযোগিতা ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। আর, প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ব্যক্তিতা-বাদ নিছক আত্মপরায়ণতায় পরিবর্তিত হইতে সময় লাগে না। তখন মানুষে মানুষে সঙ্ঘাত, কাড়াকাড়ির সামঞ্জস্য বিধান করে সমাজ ও রাষ্ট্র। কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্র যখন সে আত্মপরায়ণতার রোষ প্রশমিত করিতে অক্ষম হয়, তখন মাঝে মাঝে দাবানল জ্বলিয়া উঠে। আর, সে দাবানলে বহু নিরীহ ও নির্বিরোধী লোক আত্মাহুতি দেয়। সীমাবদ্ধ ব্যক্তিতা-বাদ পাশ্চাত্ত্যের পক্ষে অকল্যাণকর বলা যাইতে পারে না, কারণ সে-দেশের বিশেষ প্রকৃতি, বিশেষ শক্তি ইহার অনুকূল। কিন্তু ভারতবর্ষের ধর্মের ও প্রকৃতির সঙ্গে ইহার সামঞ্জস্য নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, এ দেশ ব্যক্তিত্ব-ধর্মী। এ দেশকে ব্যক্তিতা-পন্থী করিতে গেলে তার স্বধর্মচ্যুতি ঘটিবে ; সে বিচ্যুতি দেশকে মহাপঙ্কে নিমগ্ন করিবে।

ভারতবর্ষের ধর্ম ও সমাজের মূলসূত্র সহযোগিতা। এখানে একে অন্যের হাত ধরিয়া পথ চলে। আপাত-দৃষ্টিতে যে বৈষম্য দেখা যায় তাহার মধ্যে বিষ নাই, বিদ্বেষ নাই। সে বৈষম্যের ভূমি একটু খুঁড়িলেই মূলগত সাম্যের ফল্গুধারার সন্ধান পাওয়া যায়। যাত্রীর সংখ্যা অগণিত কিন্তু যাত্রাপথ প্রশস্ত নহে। কাজেই একের পিছনে অন্যকে যাইতে হইবে—এই মূলগত সত্য ভারতবর্ষ চিরদিনই মানিয়া লইয়াছে। এই অপ্রশস্ত পথে প্রতিযোগিতাকে প্রধান করিয়া তুলিলে অপেক্ষাকৃত দুর্বলকে পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইতে হইবে। তাহাতে ভারতবর্ষের ধর্ম রক্ষা পাইবে না। কারণ ভারতবর্ষের বিশেষ প্রকৃতি, বিশেষ সাধনা সুষ্ঠু সমাজ ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানকেই জীবনের পরম প্রাপ্তি বলিয়া মনে করে না ; তাহার দৃষ্টি দৃশ্যমান জীবনকে অতিক্রম করিয়া চলে।

আত্মপরায়ণতা আজ ব্যক্তিতা-বাদরূপে এদেশে আসিয়া দেখা দিয়াছে। ইহার আকর্ষণ প্রবল, বিশেষতঃ বস্তুবাদী মনের কাছে। অনেকে ব্যক্তিতা-বাদকে ব্যক্তিত্ব-বাদ বলিয়া ভুল করিতেছেন। পাশ্চাত্ত্যের নজিরে অনেকে ইহাকে সর্বাঙ্গীন উন্নতির সহজ পথ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। কেহ বা ইহাকে সমাজ-চেতনা, আত্ম-চেতনা নাম দিয়া স্বাগত করিতেছেন। ব্যক্তিতা-বাদ এদেশের সাধারণ মানুষের সহজ প্রবৃত্তির মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু ভারতবর্ষের মর্মে প্রবেশ করিবার উপায় সে কোনোমতেই খুঁজিয়া পাইবে না।

সবার উপরে

শ্রীসীতা দেবী

১১

সুমনার কলেজে ভর্ত্তি হওয়া হয়ে গেল। অত ভাল ক'রে পাস করেছে তার ভর্ত্তি হওয়া নিয়ে কিছু মুস্কিল হ'ল না। ইচ্ছা করছিল যে, প্রেসিডেন্সি কলেজে যায়, কিন্তু মা তা হ'লে একেবারেই মূর্চ্ছা যাবেন ভেবে সে-প্রশ্ন আর উত্থাপন করল না। মেয়েদের কলেজেই ভর্ত্তি হ'ল। কি কি বিষয় নেবে তাই ঠিক করতে অনেক ভাবল। নূতন মাষ্টার মশাই থাকতেন যদি এখানে, তাহলে আর তাকে ভাবতে হ'ত না, তিনিই ঠিক ক'রে দিতেন।

বিজয়ের টেলিগ্রামের সে উত্তর দিয়েছিল। জিতেন তাকে উত্তর দিতে বলায় তার কাজটা সহজ হ'ল। বাবার কাছে অনুমতি নিতে যেতে তার লজ্জা করত, এবং মায়ের কাছে ত এ-সব কথা উল্লেখ করারই জো নেই। অন্য যারা তাকে অভিনন্দন ক'রে চিঠি বা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল, তাদের চিঠি লিখে ধন্যবাদ জানিয়ে সে চিঠিগুলো জিতেনকে দিতে গিয়েছিল পোষ্ট করবার জন্য। জিতেন সব উল্টে-পাল্টে দে'খে বলল, "কই, বিজয়ের টেলিগ্রামের উত্তর দিলি না?"

সুমনা উৎফুল্ল হয়ে বলল, "দেব দাদা?"

জিতেন বলল, "দিবি না কেন? যত হেঁজি-পেঁজিকে চিঠি লিখতে পারলি, আর যে বেচারা বিনা পয়সায় ওরকম ক'রে খেটে তোকে এত ভাল ক'রে পার করিয়ে দিল, তার টেলিগ্রামটার জবাব দিবি না?"

সুমনা কিঞ্চিৎ অবাক্ হয়ে বলল, "বিনা পয়সায় পড়িয়েছিলেন নাকি?"

জিতেন বলল, "বাবা অবশ্য পয়সা দিতে ত্রুটী করেন নি, তবে শুনলাম যে, বিজয় সেটা নিজে না নিয়ে হরিবাবুকেই দিয়ে দিয়েছিল। লোকটা ভাল।"

সুমনা গিয়ে বিজয়কে চিঠি লিখতে বসল। বিজয়ের যা বয়স তাতে তাকে খুব গভীর শ্রদ্ধাভক্তি না জানালেও চলে, তবে মাষ্টারকে আর কিরকম ক'রেই বা চিঠি লেখা যায়? "শ্রীচরণেষু" সম্বোধন ক'রেই সে লিখল,—

শ্রীচরণেষু,

মাষ্টারমশায়, আপনার টেলিগ্রাম পেয়ে আমি অত্যন্ত খুসী হলাম। আমি যে ভাল ফল করতে পেরেছি তার প্রায় সমস্ত কৃতিত্বই আপনার। আমি কলেজেও ঢুকলাম, জানি না এরপর কি রকম উৎরব। সব ছেলেমেয়েরই ত খানিকটা সাহায্য দরকার হয়, আমার ত হয়ই, কারণ বাইরের জগৎটার বিষয় আমি বড় কম জানি। শুধু কয়েকটা পাঠ্য বই প'ড়ে কতটাই বা জানা যায়? আমার বাড়ীর আবহাওয়াও পড়াশুনার পক্ষে খুব অনুকূল নয়। তবু আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

আপনি কেমন আছেন? ও জায়গাটা কেমন লাগছে? বাংলা দেশের চেয়ে দেখতে ঢের ভাল নিশ্চয়ই? আপনি আবার কখন কলকাতায় আসবেন? আমার আগের মাষ্টারমশায় এখন চামেলীকে পড়াচ্ছেন। আমি পরীক্ষায় ভাল ফল করায়, বাবার খুব উৎসাহ হয়েছে মেয়েদের পড়াবার। এক সুচিত্রা বেচারীরই পড়াশুনা কিছু হ'ল না। ওর অবশ্য পড়ার দিকে মনও বেশী ছিল না।

বাড়ীর সকলেই মোটামুটি ভাল আছে। রাণু বেশ বড় হয়ে গেছে।

ইতি
সুমনা।

এ চিঠি লেখা-লিখির ব্যাপারটা জানলে গৌরাঙ্গিনী হয়ত দারুণ চটে যেতেন, তবে এ সবের খোঁজ-খবর তিনি বড় একটা রাখতেন না এমনিতেই। তার উপর এখন আবার বিয়েবাড়ীর হাঙ্গাম লেগেছে। মেয়ে যদিও তাঁর নয়, ছোট গিন্নীর, তবু তিনিই ত সংসারের মাথা, তিনি নিষ্কৃতি পাচ্ছেন কই? সব বিষয়েই তাঁর ডাক পড়ছে। অবশ্য তিনি এতে কাতর নয় কিছুমাত্র, না ডাকলেই বরং অপমানিত ও মর্ম্মাহত হতেন।

সুমনা চিঠি লিখে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে রইল। আশা করি, বিজয়বাবু তাকে প্রগল্‌ভা মনে করবেন না। আজকাল সাধারণ ভাবে চিঠিপত্র অনেকেই লেখে, এটাকে কেউ অপরাধ ভাবে না। তবে কিনা সুমনাদের বাড়ীর কথা আলাদা, তার মা অত্যন্ত বেশীরকম সনাতনপন্থী, তিলকে তাল করতে সারাক্ষণ ব্যস্ত। বিজয়বাবুর সেরকম হওয়ার কথা নয়, সেরকম হলে নিজের থেকে এগিয়ে সুমনাকে পড়াতে আসতেন না।

বিজয় যে একেবারেই গৌরাঙ্গিনীর দলের লোক নয়, তার প্রমাণ সুমনা কয়েকদিনের মধ্যেই পেল। সকালের

ডাকে তার নামে একখানা চিঠি এসে হাজির হ'ল। হাতের লেখাটা সুমনার চেনা, এ লেখা সে ত অনেক দেখেছে। খুশী হয়ে চিঠি খুলে সে পড়তে আরম্ভ করল।

বিজয়ও তাকে ভারিক্কি চালে 'কল্যাণীয়াসু' বলে সম্বোধন ক'রে চিঠি লিখেছে। সুমনা ভাবল, "ভালই করেছেন; আর কিছু লিখলেই ত দিদি-বৌদিরা ঠাট্টা আরম্ভ করত। ওদের ত কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই!"

বিজয় লিখেছে,—

কল্যাণীয়াসু,

আপনার চিঠি যে পাব সে আশা করি নি, তাই পেয়ে খুব ভাল লাগল। আপনি খেটেখুটে ভাল ক'রে পাস করলেন, আর তার কৃতিত্বটা সবটাই আমাকে দিয়ে দিচ্ছেন? যে পড়ায় সে ত নিমিত্ত মাত্র। যে পড়ে তার ভিতর যদি বস্তু না থাকে ত পড়িয়ে হবে কি? মাটি খোঁড়ে অনেকে, কারো কোদালের তলায় সোনার খনি বেরোয়, কারো বা শুধু কাদামাটি। কোদালের দোষ বা গুণ তার মধ্যে কি কিছু আছে?

পড়াশুনো খুব ভাল ক'রে করুন। একটা ভাল লাইব্রেরীর মেম্বার হয়ে নিন্, যদি কলেজে ভাল লাইব্রেরী না থাকে। প্রথম বছরটা সব সময়ই পাঠ্য-পুস্তক না প'ড়ে, খানিক খানিক বাইরের বই পড়ুন। ইতিহাস, সাহিত্য, কাব্য, সবই পড়া ভাল, অন্য বিষয়ও অভিরুচি মত পড়া যায়। বইগুলো একটু বেছে নেওয়া ভাল। প্রফেসরদের ভিতর যদি কারো সঙ্গে আলাপ হয়ে থাকে, তবে তাঁর পরামর্শ নেওয়া ভাল। অবশ্য আজকাল প্রতি ক্লাসেই যেরকম ভিড়, তাতে কোনো মেয়ে বা ছেলের সঙ্গে প্রফেসরের কোনো ব্যক্তিগত সম্বন্ধ হওয়া কঠিন। তবে আপনি ভাল ছাত্রী ব'লে একটু বিশেষ রকম ব্যবহার পেতে পারেন হয়ত। বাড়ীর আবহাওয়া যেমনই হোক, তার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে হবে।

আমি আছি ভালই, ভাল থাকাটাই আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। এ জায়গাটা ভালই, দেখতেও ভাল, স্বাস্থ্যের দিক্ দিয়েও ভাল। বাঙালী আছে কিছু কিছু, দু'চারজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। কলকাতায় সামনের বছর একবার যাবার ইচ্ছে আছে। সবে এসেছি, এ বছর আর হবে না। গেলে নিশ্চয়ই দেখা হবে।

চামেলী আশা করি তার দিদির মতই পড়ায় ভাল হবে। রাণু কি আজকাল হাঁটা-চলা সুরু করেছে? আগের মতই কি বীরাঙ্গনা আছে?

নমস্কার জানবেন। ইতি

বিজয়।

চিঠিখানা আর কারো হাতে দিতে সুমনার ইচ্ছা করল না। অন্য কেউ জানতে পারে নি যে এটা এসেছে। সেই ডাকবাক্স খুলেছিল। কিন্তু একেবারে লুকুতে গেলে ভাল দেখাবে না ভেবে সে জিতেনকে চিঠিখানা দিয়ে এল। জিতেন সুমনার সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসা বিশেষ করে না। চিঠি প'ড়ে বলল, "আজ পেলি বুঝি?"

সুমনা বলল, "হ্যাঁ।" জিতেনের কি কাজ ছিল সে অন্য দিকে চলে গেল।

সুমনার ইচ্ছা করছিল সেই দিনই চিঠির জবাব দেয়, তবে পাছে বিজয়বাবু তাকে হ্যাংলা ভাবেন এই জন্য দু'দিন দেরি করল। আর নূতন ক'রে দাদার কাছে অনুমতি নিতে গেল না, ভাবল, কোনো আপত্তি থাকলে দাদা ত তখনই বলত। জিতেনের কোনই আপত্তি ছিল না। স্বভাবে মায়ের সঙ্গে তার কোনো সাদৃশ্য ছিল না, বাপের চেয়ে অনেক প্রগতিপন্থী ছিল সে। প্রথম যৌবনে এক প্রতিবেশী কন্যাকে সাধারণ একটা চিঠি লিখে মায়ের কাছে খুব লাঞ্ছিত হওয়ায় এ সব ব্যাপারে সে বেশী রকম উদারনৈতিক হয়ে উঠেছিল। যেটা অন্যায় নয় তাকে জোর করে অন্যায় করে তোলার উপক্রম দেখলেই সে তেড়ে মারতে যেত।

সুমনা চিঠি লিখল এবং উত্তরও পেয়ে গেল কয়েক দিনের মধ্যে। চিঠিটা পড়ে ভাবল, বিজয়বাবু কি সুন্দর চিঠি লেখেন, আমি কেন পারি না অমন সহজ সুন্দর ভাবে চিঠি লিখতে? কিছু কথাই খুঁজে পাই না, কেমন যেন বোকার মত আড়ষ্ট কতগুলো যা তা লিখি। কেন পারি না?

কেন যে পারে না তা একেবারেই যে বুঝত না তা নয়। তার খালি ভয় হ'ত পাছে বেশী আগ্রহ প্রকাশ করে ফেলে। কিসের আগ্রহ? তার মনে যে বিজয়কে বন্ধু ভাবে পাবার আকাঙ্ক্ষা জেগেছে সেটা সে জানাতে চায় না। বিজয় যে তাকে মনে করে রেখেছে, আবার দেখা করবার ইচ্ছা জানাচ্ছে, এটা সুমনার কাছে মূল্যবান্। এটা সে বেশী তলিয়ে ভাবতে ভয় পায়, এটা নিয়ে বেশী নাড়াচাড়া করে না। চিঠিপত্র মাঝে মাঝে চলাচল করতেই লাগল।

সুচিত্রার বিয়ের সময় এসে পড়ল। দিনকতক খালি ছুটোছুটি করে জিনিস কেনা আর নেমন্তন্ন করা চলতে লাগল। ডাকে চিঠিও অনেক গেল। রাসবিহারী নিজে থেকেই বিজয়কে একখানা চিঠি পাঠিয়ে দিলেন। সুমনার শ্বশুর বাড়ীতেও ডাকে একখানা চিঠি গেল।

গায়ে-হলুদের দিন সারাদিন ছুটোছুটি করে কাজ

করল সুমনা, অন্য বোনদের সঙ্গে। তবে হলুদটা আর কেউ তার গায়ে দিল না। ছোট্ট রাণু অবধি নবনীত কোমল অঙ্গ তেল-হলুদে রঞ্জিত করে ঘুরতে লাগলেন এবং নিজেও বিয়ে করার আবদার ধরলেন। রাসবিহারী তাকে বিয়ে করতে চাওয়াতে রাণুর মত হ'ল না, কেন না দাদা "মোটা, বিচ্ছিরি", সে সুন্দর বর চায়।

সুচিত্রার বিয়ের দিন সব বোনেরা প্রাণভরে সাজ-গোজ করবে। সুমনা কেন সাজবে না? সে ত এখনও বিধবার বেশ গ্রহণ করে নি। সবাই জেদ ধরল তাকেও আজ বেণারসী শাড়ী-জামা পরতে হবে, গহনা পরতে হবে। সুমনার খুব যে কিছু আপত্তি ছিল তা নয়। মা বিশেষ কিছু আপত্তি করছেন না দেখে সে একটা শাদা বেণারসী আর সোনালী বুটী দেওয়া একটা কালো জামা পরে বোনেদের মন রাখল। তবে খুব বেশী গহনা পরতে রাজী হ'ল না। তাকে এমন সুন্দর মানাল এই সাজে যে একবার দেখল, সেই আর একবার ফিরে তাকাল। গৌরাঙ্গিনী আড়ালে গিয়ে চোখ মুছলেন। হায় রে, এমন সোনার প্রতিমার মত মেয়ে, তার এমন কপাল!

নহবৎ বাজতে লাগল, অতিথি অভ্যাগতরা আসতে আরম্ভ করলেন। গেটের কাছে ছোট মেয়েরা আর বাড়ীর ছেলেরা। সদর দরজার ভিতরে গীতা আর সুমনা, এরা মহিলাদের নিয়ে যাবে যথাস্থানে। কারো হাতে ফুলের মালা, কারো হাতে বিয়ের কবিতার কাগজ। দু' একটা ছেলে গোলাপ জলের পিচ্‌কারী নিয়ে ঘুরছে এবং যখন-তখন যার-তার গায়ে 'স্প্রে' দিয়ে বিরক্ত করে তুলছে।

হঠাৎ চামেলী সানাইয়ের শব্দের উপর গলা চড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "ওমা, মাষ্টার মশাই!"

সুমনার হৃৎপিণ্ডটা যেন আছাড় খেয়ে পড়ল। কে মাষ্টার মশাই? হরিবাবু না আর কেউ?

পরের মুহূর্ত্তে দুই মাষ্টার মশাই-ই সদর দরজার কাছে এসে পৌঁছলেন; বিজয় এবং হরিবাবু।

সুমনার মুখখানা একবার গোলাপী হয়ে উঠেই আবার সাদা হয়ে গেল। গীতা তখন হরিবাবুর বাড়ীর মেয়েদের অভ্যর্থনা করতে ব্যস্ত, না হলে সে সুমনার মুখ দেখে অবাক্ হয়ে যেত।

বিজয় সুমনার দিকে একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখল। তার পর নমস্কার ক'রে বলল, "বিয়ের নেমন্তন্ন খাবার লোভ সামলাতে পারলাম না। 'ফুল্‌কা' খেয়ে খেয়ে মুখের স্বাদ খারাপ হয়ে গেছে।"

সুমনা বলল, "ছুটি পেলেন কি করে?"

বিজয় বলল, "বোম্বাই বদ্‌লি হলাম। তাই দিন চার ছুটি পেয়েছি। এখান থেকে সোজা চলে যাব আর কি! আছেন কেমন আপনি? পড়াশুনো কেমন হচ্ছে?"

সুমনা বলল, "আছি ভালই। পড়াশুনো করছি ত। তবে মাঝে মাঝে ঠেকে যাই।"

লোকজন চারদিকে পাক খাচ্ছে, ঢুকছে বেরচ্ছে, এর মধ্যে বেশীক্ষণ একজনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলা যায় না। বিজয় মিনিট দুই-তিন পরেই সরে গেল। বরযাত্রীর দলও এসে পড়ল।

বিয়ের ব্যাপার চুকতে অনেক রাত হ'ল। তবে লগ্ন অনেক রাতে, বেশীর ভাগ লোকই খেয়েদেয়ে চ'লে গেল আগে আগে। বিজয় যাবার সময় আবার চেষ্টা ক'রেই সুমনার সঙ্গে দেখা ক'রে গেল, এবারেও গীতা তার সঙ্গে।

গীতা বলল, "আবার চললেন কত দূরে? একলা একলা ভাল লাগে?"

বিজয় বলল, "ভাল না লাগলেই বা কি করা যায়? আত্মীয়স্বজনের মধ্যে এমন কেউ নেই, যাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায়।"

জিতেন পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলল, "এই না শুনলাম সঙ্গে যাওয়ার লোক ঠিক হয়ে গেছে?"

বিজয় বলল, "গুজব ত আমিও শুনেছিলাম, কিন্তু তার ভিতর সার ত কিছু খুঁজে পেলাম না।"

সুমনা হাসল। তার পর মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করল, তার এতে খুসী হবার কি আছে?

লোকজন সব চলে যাবার পর তবে শুতে গেল সে অনেক রাতে। বাসরে গিয়ে হৈ-চৈ করতে তার ইচ্ছা করল না। ক্লান্তও হয়েছিল খুব বেশী। মনটাও কেমন যেন করছে। কি একটা ভাবের তরঙ্গ বুকের ভিতর দিয়ে খেলে যাচ্ছে, এটা কি ভয় না আরো কিছু?

সুমনার সবচেয়ে ভয় নিজেকে বিশ্লেষণ করতে। নিজের মনকে সে অর্দ্ধ অবগুণ্ঠিতই রেখে দিতে চায়। আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে কখন সে ঘুমিয়ে পড়ল। আর এক ঘরে তখন পূর্ণ বিক্রমে বাসর চলেছে সুচিত্রার। সে ত সুমনার মত অসুস্থ হয়ে পড়ে নি, কাজেই শালী-শালাজ ও ঠাকুরমা-দিদিমারা খুব সুবিধা পেয়ে গিয়েছেন।

সকালেও সুমনার শরীরটা ঠিক সুস্থ লাগল না। কাল খুব খাটুনি গিয়েছে, আজ একটু বিশ্রাম করলেই ভাল। বাসি-বিয়ের গোলমালের মধ্যে সে আর গেলই না। তবে সুচিত্রার কাছে দু'একবার গেল। একবার একলা পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, "খুসী হয়েছিস্ ভাই?"

সুচিত্রা বলল, "কি জানি ভাই মনুদি, এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে মানুষটিকেত ভালই মনে হ'ল, তবে একটু যেন বেশী ফাজিল।"

সুমনা বলল, "ফাজিল আর আজকালকার কোন্ ছেলে নয় বল? আমাদের দাদারাই কি কম ফাজলামি করে?"

সন্ধ্যাবেলা যখন সবাইকে কাঁদিয়ে ও নিজে কাঁদতে কাঁদতে সুচিত্রা চ'লে গেল তখন সুমনাও সকলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে চোখ মুছল। মেয়েদের জীবনের এই এক সন্ধিক্ষণ। এখন থেকে এই অপরিচিতই হবে তার সর্ব্বস্ব, চিরদিনের ঘর তার আজ দূরে স'রে গেল। যাক্ যাওয়া তার সার্থক হোক, "ঘরেও নহে, পারেও নহে" হয়ে যেন দিন কাটাতে না হয়।

বিয়ের দু'একদিন পরেই এক হাসির ব্যাপার ঘটে গেল। খাওয়া-দাওয়া সেরে, মুখে পান দিয়ে গৌরাঙ্গিনী একটু শুতে যাবেন, এমন সময় কাতী ঝি হেসে গড়াতে গড়াতে এসে হাজির। গিন্নী জিজ্ঞাসা করলেন, "কি লা, অত হাসছিস্ কেন? কি হয়েছে?"

কাতী বলল, "উঃ, কোথায় যাব মা, হেসে আর বাঁচি নি, ঐ তোমার মেজ বেয়াই-বাড়ীতে যে বেজো কাজ করতো না, সে এসে বলে গেল কি, বুড়ো নাকি আবার বিয়ে করছে। এই সেদিন মাস্তর গিন্নী মারা গেল গা, এরই মধ্যে এই কাণ্ড!"

গৌরাঙ্গিনী গালে হাত দিয়ে বললেন, "ওমা, কোথায় যাব! পুরুষ-মানুষকে বিশ্বাস নেই। ঘরভর্ত্তি ছেলেমেয়ে, নাতী-নাতনী, তাদের চোখের উপর এই সব হচ্ছে? মানুষের চামড়া গায়ে নেই!"

বাড়ীর অন্য বৌ-ঝিরা তাড়াতাড়ি এসে হাজির হ'ল খবরটা উপভোগ করতে। মহা হাসাহাসি পড়ে গেল। রাসবিহারী শুনে বললেন, "তাই নাকি? রসিক লোক বটে! ঐ ত চামচিকের মত মূর্ত্তি, এর মধ্যে অত রস আঁটে কোথায়? তা ভাল, ভাগ্যবানের বৌ মরে, অভাগার ঘোড়া মরে।"

গৌরাঙ্গিনী মুখটা একটু ভার ক'রে বললেন, "তোমরাই কেউ ভাগ্যবান হতে পারলে না।"

রাসবিহারী বললেন, "কই আর পারলাম? দেখে-শুনে হেঁপো-কেশো রুগী বিয়ে করলে তবে এ সব সুবিধা জোটে।"

সুমনাও কথাটা শুনল, এবং অন্যদের হাসিতেও একটু যোগ দিল। তবে যে-কোনো কারণেই হোক, ওবাড়ীর কোনো কথা শুনতে তার ভাল লাগে না। সে পড়ছিল, আবার গিয়ে পড়ার বইয়ের মধ্যে ডুব দিল।

সুচিত্রা দিন কয়েক পরে জোড় ভাঙতে ফিরে এল। নূতন জামাইও সঙ্গেই এল। ছেলেটি এমনি মন্দ নয়, কাজকর্ম্মও মোটামুটি ভালই করে। তবে সুমনার তার ধরনধারণ ভাল লাগে না, কেমন যেন বেশী গায়ে-পড়া। অবশ্য সাধারণ বাঙালী পরিবারে, শালী ভগ্নীপতির মধ্যে খানিকটা গায়ে-পড়া ভাব প্রশ্রয়ই পায়, তবে সুমনা একটু অন্য প্রকৃতির, তার এত রসিকতা ভাল লাগে না। জ্যোৎস্না-গীতারা কিছুই মনে করে না, তাদের মজাই লাগে। যে ক'দিন নূতন জামাই শিশির এ বাড়ীতে রইল, ততদিন সুমনা একটু চেষ্টা ক'রেই সরে সরে রইল।

সুচিত্রা ব্যাপারটা লক্ষ্য করল। বোনদের মধ্যে সুমনারই সঙ্গে তার সবচেয়ে ভাব ছিল বেশী, সে কেন এমন পরের মত ব্যবহার করছে? একলা পেয়ে একদিন সুমনাকে জিজ্ঞাসা করল, "হ্যাঁ ভাই মনুদি, তোমার বুঝি নূতন ভগ্নীপতিকে একেবারে পছন্দ হয় নি?"

সুমনা বলল, "কেন, একথা বলছিস্ কেন রে?"

সুচিত্রা বলল, "ও কাছে এলেই তুমি যেন পালাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠ। কথাও বল না ভাল ক'রে, মন খুলে মেশ না।"

সুমনা বলল, "আমার মনটাই ঐ রকম ভাই, খোলে না কিছুতেই, নিজেকে নিয়ে নিজে থাকতেই ভালবাসে।"

সুমনার কথাটা সুচিত্রার বিশেষ মনঃপূত হ'ল না, যা হোক, আর কিছু না বলে সে চ'লে গেল। শিশিরও দিন দুই পরে চলে গিয়ে সুমনাকে নিষ্কৃতি দিল।

সেই বিয়ে বাড়ীতে দেখা হবার পরে বিজয়ের সঙ্গে সুমনার আর দেখা হয় নি। পরদিনই তার চলে যাবার কথা ছিল, চ'লেই গিয়েছে বোধ হয়। যদি সেখান থেকে চিঠি লেখে তা হলে সুমনা আবার লিখবে, তবে প্রথমেই লিখতে লজ্জা করে। আগের আড়ষ্টতা এখন খানিক কমে গেছে। তবু বিজয়ের মত সহজ হতে পারে নি।

কয়েক দিনের মধ্যেই বাড়ীর অনেকের নামে বোম্বাইয়ের নানা দৃশ্য-আঁকা অনেকগুলি পোষ্ট কার্ড এল। জিতেন থেকে আরম্ভ ক'রে রাণু অবধি কেউ বঞ্চিত হয় নি। প্রত্যেকটাতে দু'চার লাইন লেখাও আছে। সুমনাকে লিখেছে, "কেমন আছেন? বিয়ে বাড়ীর হাঙ্গাম চুকেছে ত? পড়াশুনো আবার আরম্ভ করুন, এবারে প্রথম হতে হবে, বিজয়।"

সুমনা পোষ্ট কার্ডটা নাড়তে নাড়তে ভাবল, 'প্রথম

হতাম হয়ত, যদি খুব ভাল মাষ্টার পাওয়া যেত। কিন্তু 'যে-সে হলেই ত হয় না, মনে উৎসাহই আসে না।'

বড়দি ত আগেই চ'লে গিয়েছিল, এবার স্থচিত্রাও চ'লে গেল, স্থমনা বড় একলা হয়ে পড়ল। চামেলী ত একদম বাচ্চা, তার সঙ্গে এখনও খেলাধূলা ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে কথা বলাই চলে না। গীতা যদিও তার সমবয়সের গণ্ডির কাছাকাছি, কিন্তু সে কতটুকু সময়ই বা স্থমনার জন্যে দিতে পারে? তার স্বামী আছে, মেয়ে আছে; সংসারের কাজও খানিক খানিক করতে হয়। স্থমনা বেশী ক'রে পড়াশুনায়ই ডুবে থাকতে চায়, কিন্তু সব সময় যেন মন বসে না।

তার ছোড়দা হিতেনও এখন পড়াশুনা সাঙ্গ ক'রে কাজে ঢুকেছে। তারও বিয়ের কথা স্থরু হয়েছে। গৌরাঙ্গিনী মুখে বলছেন বটে, যে এ বৌ এলে তিনি যাদের সংসার তাদের পাকাপাকি বুঝিয়ে দিয়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াবেন, কিন্তু মনের ভিতর কোন্‌খানটায় তাঁর যেন একটা ব্যথা লেগে আছে। এতদিনের এত সাধের সংসার তাঁর, এ ছেড়ে কি তিনি থাকতে পারবেন? কিন্তু বৌরা হয়ত তাই চায়, তিনি জোর ক'রে সব দখল ক'রে রেখেছেন। আবার নিজেকে বোঝান, কেনই-বা তিনি না রাখবেন, তাঁর স্বামীর টাকাতেই ত এ সংসারের এত প্রতিপত্তি? শ্বশুর ত খালি একটা একতলা বাড়ী রেখে গিয়েছিলেন, বাকি সবই ত রাসবিহারীর কল্যাণে। গৌরাঙ্গিনী শক্ত হাতে হাল ধরে সংসার চালিয়েছেন এতদিন, কিন্তু অন্যায় ব্যবহার কারো সঙ্গে করেন নি।

স্থমনা কলেজের মেয়েদের সঙ্গে খুব বেশী ভাব করতে চায় না। তার অবস্থাটা একটু অদ্ভুত ত, কাউকে বলতে বিশেষ ভাল লাগে না। সবাই ভাবে সে সধবা মেয়ে, তবে কেন যে সে বরাবরের মত বাপের বাড়ীতে থেকে যাচ্ছে, সে নিয়ে হয়ত কেউ কেউ মাথা ঘামায়। এখন পর্য্যন্ত স্থমনাকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। তার সঙ্গে যারা পাস করেছিল, তাদের কেউ এ কলেজে পড়ে না, তাই হয়ত তার জীবনের ট্র্যাজেডির খবর নূতন সহপাঠিনীরা পায়নি। অধ্যাপকরাও সবাই অচেনা।

রাসবিহারীর শরীরটা মাঝে মাঝে খারাপ হয়, আবার সেরে ওঠেন। হিতেনের বিয়েটা হয়ে গেলে, এ বাড়ীতে বহুকালের মত হৈ-হল্লার ব্যাপার চুকে যাবে। চামেলী বা স্থচিত্রার ছোট ভাই বিবাহযোগ্যা বা যোগ্য হতে দশ-পনেরো বছর কেটে যাবে। মেয়েদের মধ্যে বাড়ীতে স্থমনাই হয়ত একলা থাকবে বৌরাই এসে জায়গা জুড়বে। সংসারের চেহারা অল্পে অল্পে বদলে যাচ্ছে।

স্থমনার বালিকা মনটাও ক্রমেই বদলে যাচ্ছে। এখন আর খেলতে বা নিতান্ত ছেলেমানুষী গল্প করতে ভাল লাগে না। বাবার শরীর ভাল না, তাঁর কাছে অনেক সময় চুপচাপ বসে থাকে বা বই পড়ে শোনায়। রাসবিহারী মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে ভাবেন, কিরকম ব্যবস্থা করলে মেয়ের ভবিষ্যৎ-জীবন নিরাপদ হবে।

১২

কালের চক্র ঘুরে চলেছে। বালীগঞ্জের বাড়ীর বাইরের দিক্‌টা একটু যেন রংচটা মত দেখতে হয়ে গেছে। আগের মত অত জৌলুষ নেই। গৃহকর্ত্তা কাজ থেকে অবসর নেবার পর আয় খানিকটা কমে গেছে, তাই বাড়ীর সৌষ্ঠব বজায় রাখবার জন্যে যে রকম খরচ ক'রা দরকার তা আর ঘটে ওঠে না।

সংসারের চেহারাও খানিক খানিক বদলেছে বৈ কি! রাসবিহারী এখন শুয়ে-বসেই দিন কাটান, বাইরে যাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। গৌরাঙ্গিনীও একটু বুড়ো হয়ে পড়েছেন. আগের মত আর খাটতে পারেন না। তবে এখন এক বৌয়ের জায়গায় দুই বৌ হয়েছে, ধরাবাঁধা কাজ অনেকগুলো তারাই করে। নূতন বৌ উষা একটু গরীবঘরের মেয়ে, কাজকর্ম্ম ভালই পারে। গৌরাঙ্গিনী সাংসারিক কাজ থেকে যেটুকু অবসর পান, সেটা স্বামীর কাজ এবং নাতনী ও নবাগত শিশুনাতীর কাজে কাটান।

স্থচিত্রা বৌ হয়ে খুব বেশী আর এ বাড়ীতে আসতে পায় না, তার শাশুড়ী এসব দিকে বড় কড়া। জ্যোৎস্নাও আরো ছেলেমেয়ের মা হয়ে খানিকটা আট্‌কা পড়ে গেছে। স্থমনা একলাই কাল কাটায়। পরীক্ষা আগতপ্রায়, প্রাণপণে পড়া তৈরি ক'রে। টাকাকড়ির খুব স্বচ্ছলতা না থাকা সত্ত্বেও রাসবিহারী তার জন্যে এক বুড়ো প্রফেসর রেখে দিয়েছেন। তিনি মন্দ পড়ান না, কিন্তু স্থমনার মন ভরে না।

বিজয়ের চিঠি মাঝে মাঝে পায়। দেশে তার বুড়ো বাবা থাকেন, তাঁকে একবার দেখতে এসেছিল সে অস্থখের খবর শুনে। কলকাতা দিয়ে গেল, মাত্র কয়েক ঘণ্টা ছিল। তারই মধ্যে একবার কোনোমতে স্থমনার সঙ্গে দেখা ক'রে গেল। বলল, "খেটে খেটে আরো রোগা হয়েছেন দেখছি, কিন্তু কাট্‌ হতেই হবে।"

সুমনা বলল, "কার্ট সেকেণ্ড কিছুই হ'ব না আমি, আমার পড়া ভাল হচ্ছে না।"

বিজয় বলল, "কলকাতা-ভর্ত্তি এত প্রফেসর, আর আপনাকে পড়াবার একটা ভাল লোক জুটল না?"

সুমনা বলল, "কপালে ভালভাবে পাস করা নেই তাই জুটল না বোধ হয়। ভগবান বারে বারেই দয়া করতে রাজী নন।"

বিজয় খানিক চুপ করে রইল। তার পর বলল, "শেষ মাসটা আমি পড়িয়ে দিতে পারতাম। আমার অনেক ছুটি পাওনা হয়ে আছে, কলকাতায় থাকবার জায়গারও অভাব নেই। কিন্তু সেটা হয়ত ভাল দেখাবে না। বাড়ীর লোকরাও আপনার সেটা পছন্দ করবেন না, এবং বুড়ো প্রফেসরমশাই-ই বা কি ভাববেন?

সুমনা একটু অসহিষ্ণুভাবে বলল, "কামিনী রায়ের 'পাছে লোকে কিছু বলে', কবিতাটা পড়েছেন? আমার হয়েছে সেই দশা। যা করতে চাইব, সবার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াবে এই 'পাছে লোকে কিছু বলে'।"

বিজয় বলল, "এ সমস্যা ত সকলের জীবনেই রয়েছে। আপনি মেয়ে এবং বাঙালী হিন্দু পরিবারের মেয়ে, তাই আপনার উপর জুলুম বেশী। তবে আমরাও একেবারে রেহাই পাই না। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, তাতে অনেক সুবিধা সে পায়। মূল্যস্বরূপ খানিকটা দামও তাকে দিতে হয়। নিজের ইচ্ছাকে দমন করতে হয়, যা অপ্রিয় তাকেও অনেকক্ষেত্রে স্বীকার করে নিতে হয়।"

সুমনার মনের ভিতরটা খচ্ খচ্ করে উঠল। কেন বিজয় বলছে একথা? বিশেষ কিছু কি সে সুমনাকে বোঝাতে চায়? কিন্তু রাসবিহারী এই সময় এসে পড়াতে এ আলোচনা আর বেশীদূর এগোল না। মিনিট কয়েক পরেই সে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

এ বাড়ীর অল্পবয়সীর দল সকলেই বিজয়কে পছন্দ করত। রাসবিহারীও তাকে ভালবাসতেন। আত্মীয়ের মতই খানিকটা হয়ে উঠেছিল সে। নূতন বৌ দেখাবার একটা চেষ্টা হ'ল, তবে বিজয়ের সময় ছিল না, এবং উষার তখন পর্য্যন্ত চুল বাঁধা ও গা ধোওয়া হয়নি বলে সে বেরোতে রাজীই হ'ল না।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে সুমনা খানিকক্ষণ তার বাবার কাছে বসে থাকত। কখনও গল্প করত, কখনও বই পড়ত। আজ রাসবিহারী বললেন, "তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে মা, তাই বলি। আজ বই পড়া থাক্।"

সুমনা বলল, "বল বাবা।" বই সে সরিয়ে রাখল।

রাসবিহারী বললেন, "দেখ মা, তোমার জীবনটা সাধারণ বাঙালী মেয়ের জীবনের মত হবে না, এ ত বোঝাই। ঘর-সংসার তুমি করবে না ব'লেই মনে হয়, কারণ ভাইদের সংসারে খেটে ম'রে কোনো মতে দিন কাটিয়ে দাও, এ ইচ্ছা আমার নেই। তোমারও নেই, যতদূর আমি তোমাকে বুঝি। তোমাকে স্বাধীন জীবন-যাপন করবার মত তৈরি ক'রে রেখে যেতে চাই। এখানে যতদূর পড়া যায় পড়, তার পর স্কলারশিপ জোগাড় ক'রে বিলেতে যেতে চাও ত তাও যাও। খুব ভাল কাজ পেতে তোমার আর কোনো বাধা থাকবে না। এ বাড়ীতে তোমাকে আমি একটা অংশ লিখে দিয়ে যাচ্ছি, আজীবন তুমি এখানে থাকতে পারবে। ইচ্ছা হলে একেবারে আলাদা থাকতে পার, ইচ্ছা হলে ভাইদের সঙ্গেও থাকতে পার।

সুমনা বলল, "দাদাদের সঙ্গেই থাকব বাবা, একে-বারে একলা থাকতে আমার ভাল লাগবে না।"

রাসবিহারী বললেন, "তা থেকো, তোমার ভাইরা ভালই, ব্যবহার মন্দ করবে ব'লে মনে হয় না। তবু সব রকম ব্যবস্থাই ক'রে রাখা ভাল। আর আমি যা রেখে যাব, তা নেহাৎ কম হবে না। সব ছেলেমেয়েই কিছু কিছু পাবে। তোমাকে মাসিক ২০০৲ টাকার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে গেলাম। এতে তোমার খাওয়া-পরা চ'লে যাবে। এ ছাড়া নিজের উপার্জ্জন ত তোমার থাকবেই?"

সুমনা বলল, "ঐতে ঢের হবে বাবা। একটা মানুষের আর কতই বা দরকার হয়? আমি খুব বিলাসিতা করতে ভালবাসি না।"

রাসবিহারী একটু থেমে বললেন, "আচ্ছা, এই তাহলে ঠিক রইল। উইল আমার লেখা হয়ে গেছে, এখন সই ক'রে দিলেই হয়। এ বিষয়ে কাউকে কিছু বলি নি আমি, তোমাকে একটু আশ্বস্ত ক'রে রাখতে চাই ব'লে বললাম। আর দেখ মা, আর একটা কথা বলি। বড় হয়েছ, সব কথাই তোমায় বলা চলে। নির্ম্মলের কোনো খোঁজ এ তিন বছরের ভিতর পাওয়া যায় নি। উকীলের কাছে খোঁজ নিয়ে জানলাম, সাত বছরের মধ্যে তার কোনো সন্ধান না পাওয়া গেলে ধ'রে নিতে হবে যে সে মৃত। সে ক্ষেত্রে তুমি যদি ইচ্ছা কর, আবার বিয়ে করতে পার। একটা পুতুলখেলা হয়েছিল তোমাকে নিয়ে, তার কোনো দাগ তোমার মনে পড়ে নি। তুমি যদি কাউকে কোনদিন স্বামী ব'লে আবার গ্রহণ করতে চাও ত কোরো। আমার কোনো অমত

নেই, বেঁচে থাকি বা না থাকি, আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করব।"

সুমনার শরীরটা থর্থর্ ক'রে কেঁপে উঠল। গলাটা বন্ধ হয়ে এল, কোনো কথাই সে বলতে পারল না। নীচ থেকে গৌরাঙ্গিনীর উপরে আসার শব্দ পেয়ে সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। হেঁট হয়ে বাবাকে প্রণাম করে, সে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

গৌরাঙ্গিনী উপরে উঠে এসে ব'সে একটুক্ষণ হাঁপালেন। তার পর একটা পান মুখে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁ গা, কি বলছিলে মনুকে? চোখে যেন তার জল দেখলাম?"

রাসবিহারী বললেন, "ভবিষ্যতে জীবন কি ভাবে কাটাবে, সেই সব কথা হচ্ছিল আর কি।"

গৌরাঙ্গিনী বললেন, "ভগবান জানেন কি আছে তার অদৃষ্টে।"

রাসবিহারী বললেন, "অদৃষ্ট আবার খানিকটা গ'ড়েও নিতে হয়। খালি দৈবের উপর ভর ক'রে থাকলে ত চলে না?"

গৌরাঙ্গিনী বললেন, "আমাদের দেশের মেয়েরা কি-ই বা করতে পারে নিজেদের জন্যে?"

রাসবিহারী বললেন, "সবই পারে, অন্য দেশের মেয়েরা যা পারে, তা এরাও পারে, ঠিকমত শিক্ষা পেলে।

সুমনার মা আর একটা পান ও এক চিমটে দোক্তা মুখে দিয়ে বললেন, "মনুর কথা ভাবলে আর আমার মরবারও সাহস হয় না।"

রাসবিহারী বললেন, "তা সাহসের অভাবে যদি আরো বছর ত্রিশ-চল্লিশ বেঁচে থাক ত মন্দ হয় না।"

এমন সময় গীতা নিদ্রিতা রাণুকে নিয়ে এসে ঘরে ঢোকায় তাঁদের আলোচনা বন্ধ হ'ল। রাণুর ভাই হওয়া অবধি সে পাকাপাকি ঠাকুরমাকেই আশ্রয় করেছে। ওরকম "ভাগের মা" নিয়ে তার চলে না, সে একেশ্বরী হয়ে থাকতে চায়।

সুমনা বাবার ঘর থেকে চ'লে এসেই শুয়ে পড়ল। তার তখনও শরীর কাঁপছে, বুকের ভিতর কিসের ঢেউ ফুলে ফুলে উঠছে। বাবা এ কি বললেন? তিনি কি কিছু সন্দেহ করেছেন? সুমনা যে নিজের কাছেও কিছু স্বীকার করতে চায় না, যে তার মনে কোনো ভাবান্তর হয়েছে। কিন্তু স্বীকার না করলেই বা কি হবে? সত্য যা তাকে কতদিন সে ঘোমটা দিয়ে রাখতে পারবে? তার হৃদয়কে সে ত চেষ্টা ক'রেও দমন করতে পারছে না। যেদিকেই সে তাকে ফিরাতে চাক, তার মন যে কেবলি সূর্য্যমুখী ফুলের মত একই দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। কে সে তার তরুণ জীবনাকাশের তপন? সুমনা ত তার নাম জানে না, এমন নয়।

প্রাণপণ চেষ্টায় সে পড়াশুনোয় ডুবে থাকতে চায়। কিন্তু বইয়ের পাতায় কার মুখ ভেসে ওঠে? পাঠ্য বইয়ের বিষয় থেকে ছিটকে তার মন কোন সুদূরে উধাও হয়ে যায়?

এইরকম ক'রেই পরীক্ষার দিন এগিয়ে এল। বিজয়ের একটা চিঠি সে পেল দু'একদিন আগে—

কল্যাণীয়াসু,

কিরকম তৈরী হ'ল সব? আশা করি প্রফেসরমশাই নিজের কাজ যথাযথ পালন করেছেন, এবং আপনিও তাই করেছেন। প্রথম হতেই হবে। বাড়ীর সকলে কেমন আছেন? আপনি নিজে কেমন আছেন? আপনার বোনের বিয়ের সময় থেকে যতবার আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে, ততবারই মনে হয়েছে আপনি রোগা হয়ে যাচ্ছেন। পড়ার খাতিরেও শরীরের অযত্ন করবেন না। আমি ভালই আছি। মাঝে মাঝে অসুখ-বিসুখ করা ভাল। ছুটি-ছাটা পাওয়া যায়, একটু ঘুরে-টুরে আসা যায়। পরীক্ষার পর কোথায় যাবেন এবার? তীর্থ করতে না বেরিয়ে এবার খালি বেড়াতে বেরোন না? আপনার বাবার ত আর এখন অবসরের অভাব নেই? মায়েরও দুই বৌ হয়েছে, সংসার দেখবার লোকের অভাব নেই। বোম্বাইয়ের দিকে আসতে পারেন ত? এখান থেকে পুণা, অজন্তা প্রভৃতি অনেক জায়গা দেখা যায়। আজ এই পর্য্যন্ত। নমস্কার জানবেন। ইতি

বিজয়।

সুমনা তাড়াতাড়ি ছোটখাট একটা জবাব দিল। আজকাল বিজয়কে সে বড় ক'রে চিঠি লিখতে ভয় পায়। নিজের অজান্তে সে যদি এমন কিছু লিখে বসে যাতে বিজয় কিছু সন্দেহ করে। সুমনা নিজেকে চিনতে আরম্ভ করেছে, কিন্তু বিজয় যে তার বিষয় কি ভাবে তা ত সে জানে না? শুধু ছাত্রীই ভাবে মনে হয়। কথাবার্ত্তা সেই রকম বলে, চিঠিপত্রও সেই সুরে লেখে। সুমনারও এই গণ্ডি লঙ্ঘন ক'রে যাওয়া উচিত নয়। তার সামনে এখনও দুস্তর পারাবার। সে এখনও কূল দেখতে পায় না। বাবা সাত বছরের কথা বলেছিলেন, এখন ত মাত্র তিন বছর কেটেছে। তার অদৃষ্টে কখনও ভাল কিছু কি হতে পারবে?

পরীক্ষা এসে গেল। এবারে আর তার সঙ্গে দল

নেই। জিতেন কোনোমতে একটু সময় ক'রে তাকে পৌঁছে দিয়ে গেল। আগেকার মত ভয় আর সে পায় না, আগেকার সে উৎসাহও কিন্তু আর নেই। কেমন যেন কলের পুতুলের মত চলে-ফেরে। তবু পরীক্ষার ক'টা দিন একটা উত্তেজনা তার দেহমনকে পেয়ে বসল, তারই জোরে চলতে লাগল।

একটা শুক্রবারে তার পরীক্ষা হয়ে গেল শেষ। প্রথম ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা যতটা ভাল দিতে পেরেছিল, এবার তার মনে হ'ল ততটা ভাল দিতে পারে নি। যা হোক্, শেষ ত হ'ল! এখন কিছুদিন বিশ্রাম করতে পারবে। বিজয় যে তাদের বোম্বাই যেতে নিমন্ত্রণ করেছিল সেটা বাবাকে জানাবে কিনা ভাবতে লাগল। বাবা ত যেতে পারেনই, সমুদ্রের ধারে তাঁর অসুখ ভালই থাকবে। মা যেতে রাজী হবেন কিনা, কে জানে? বৌদির পক্ষে ছানাপোনা নিয়ে নড়া শক্ত, তবে ছোট বৌদি যেতে পারে, তার ত কোনো ঝামেলা নেই?

বিজয় আর একটা চিঠি দিল। কেমন পরীক্ষা দিল সুমনা, সে জানতে চেয়েছে। বোম্বাই আসবার নিমন্ত্রণ আবার জানিয়েছে, লিখেছে, "আমার ফ্ল্যাটটা বেশ বড়ই আছে, আপনারা এসে প্রথমে এখানেই উঠতে পারেন। আমার সঙ্গে আর একজন ছেলে থাকত, সে শরীর খারাপ হওয়ায় লম্বা ছুটি নিয়ে দেশে চ'লে গেছে। এখানে কোনো কারণে যদি অসুবিধা হয়, তাহলে অন্য জায়গায় উঠে যেতে পারেন। আশে পাশে ছোট ছোট শহরতলী আছে অনেক, সেখানে বাড়ী ভাড়াও পেতে পারেন। আপনাকে ব'লে শুধু হয়ত কাজ হবে না, তাই আপনার বাবাকেও আজ চিঠি লিখলাম। নিশ্চয় আসবেন।"

সুমনা ত যেতে চায়, কিন্তু বাবা কি যাবেন? মা ত যেতে খুব সম্ভবতঃ রাজী হবেন না, সুমনাকেও হয়ত যেতে দিতে চাইবেন না। তবে বাবা জেদ করলে, মা আটকাতে পারবেন না। দাদাদের কি ব'লে দেখবে? বড়দা ছুটি খুব সম্ভব পাবে না, ছোড়দা পেতে পারে।

চা খাবার সময় রাসবিহারী সুমনাকে বললেন, "বিজয় আজ একটা চিঠি লিখেছে আমাকে, তোমার ত এখন তিন মাস ছুটি, সবাই মিলে একবার বোম্বাই যেতে বলছে, ওখান থেকে আরো অনেক বিখ্যাত জায়গায় যাওয়া যেতে পারে।"

গৌরাঙ্গিনী কোনো আগ্রহ দেখালেন না, তীর্থস্থান হলেও বা হ'ত। বললেন, "ওখানে গিয়ে কি হবে? ও কি আবার একটা হাওয়া-বদলের জায়গা? আর তোমার ত এই শরীর, এখন অনিয়ম করে টৈ টৈ করে ঘোর, আর অসুখ আরো বেড়ে যাক্। তোমায় দেখবে কে শুনি?"

রাসবিহারী বললেন, "কেন, মনু দেখবে। ওতো আমার সব কাজই জানে। একলা না পারে ছোট বৌমাকে নিয়ে যাব। সে ত এ বাড়ীতে ঢোকার পরে, আর কলকাতার বাইরে যায় নি। হিতেন, তুই দিন কতকের ছুটি নিতে পারিস না?"

হিতেন বলল, "তা পারি হয়ত। কাজে ঢুকে অবধি ছুটিত বড় একটা নিই নি।"

সেও একটু বাইরে বেরোতে পারলে বাঁচে। নূতন বিয়ে করেছে, তা এই হট্টগোলের বাড়ীতে তার বৌয়ের সঙ্গে এখন অবধি প্রায় আলাপই হয় নি। একটু বাইরে কোথাও ঘুরে এলে ভালই হয়।

সকলের উৎসাহে গৌরাঙ্গিনীর আপত্তি প্রায় ভেসেই গেল। তিনি তবু হাল ছাড়লেন না। রাত্রে স্বামীকে বললেন, "লাফাচ্ছ ত খুব যাবার জন্যে। এই হতভাগা মেয়ে নিয়ে অমন যেখান-সেখানে যাওয়া চলে?"

রাসবিহারী চটে বললেন, "কেন যাব না? ও কি হাঁটতে-চলতে জানে না, না কথা বলতে জানে না? যদি বিলেতে পড়তে যায় বা বিদেশে কাজ করতে যায়, তখন কি তুমি তার সঙ্গে যাবে?"

গৌরাঙ্গিনী বললেন, "সে কথা হচ্ছে না। ঐ অনাত্মীয় ছেলের ঘরে যাবে? ও ত বিয়েও করে নি?"

রাসবিহারী বললেন, "তাতে কি? আমি সঙ্গে থাকব না? হিতেন, বৌমা, এরা থাকবে না? একমাত্র তুমি না থাকলেই অমনি তোমার মেয়ে হারিয়ে যাবে? নিজের উপর তোমার বড় বেশী ভরসা দেখছি।"

গৌরাঙ্গিনী বুঝলেন, তিনি আটকাতে পারবেন না। মেয়ে তাঁর কথা গ্রাহ্য করে না, এবং স্বামী ক্রমাগত তাকে প্রশ্রয় দেন। যা হয় হবে। কি কুক্ষণেই তিনি সুমনার বিয়ে দিতে গিয়েছিলেন। তখন থেকে মেয়ে যেন আর তাঁর মেয়ে নয়, কোনো অধিকারই তাঁর নেই সুমনা সম্বন্ধে।

হিতেন ছুটি জোগাড় ক'রে নিলো। রাসবিহারী বিজয়কে চিঠি লিখে দিলেন যে, সাত-আট দিনের মধ্যেই তিনি যাচ্ছেন, সবাইকে নিয়ে। সুমনাও চিঠি লিখল যে, তারা চার জন যাচ্ছে।

জবাবে খুব আনন্দ জানিয়ে বিজয় চিঠি দিল। রান্নার লোক চাই কি না জানতে চেয়েছিল সুমনা, তাতে বিজয় লিখল, রান্নার লোক ভালই আছে, তবে নিজেদের কাজের জন্যে একজন ঝি বা চাকর নিয়ে আসতে পারেন।

আর সরষের তেল আনা ভাল, যদি অন্ত তেলের রান্না খেতে না পারেন।

এ বাড়ীতে গোছগাছ আরম্ভ হ'ল। রাসবিহারীর জিনিসপত্র তাঁর স্ত্রীই গুছিয়ে দিলেন, মুখ ভার ক'রে। নিজের সম্পত্তি বলে যাদের তিনি ভাবতেন, তাঁদের নিজের কাছ-ছাড়া করা মোটে পছন্দ করতেন না। সরষের তেলও বড় এক টিন সংগ্রহ করা হ'ল। গৌরাঙ্গিনী পাকা গিন্নী, তিনি ভাজা মুগের ডাল, গাওয়া ঘি, প্রভৃতি আরো কিছু কিছু জিনিস সঙ্গে দিলেন। ভাল মিষ্টিরও বায়না ক'রে রাখলেন। বললেন, "যাচ্ছ ত পরের বাড়ী, ও ছেলে ত আর তোমার কাছে খাওয়ার পয়সা নেবে না? কিছু সন্দেশ রসগোল্লা অন্ততঃ নিয়ে যাও। ওখানে ভাল মিষ্টি পাওয়া যায় না, আমি জানি। আমার এক মামাতো ভাই কাজ করত ওখানে, তা দেশে যখনই আসত, কি সব বুড়োর পাকা দাড়ির মত মিষ্টি নিয়ে আসত, দেখে ঘেন্নায় মরি!"

তাঁর বর্ণনা শুনে সবাই হাসতে লাগল। কর্ত্তা বললেন, "ওখানে আম কিন্তু খুব ভাল পাওয়া যায় শুনেছি, আল্‌ফোন্‌সো আম।"

গীতা বলল, "ও আমি খেয়েছি বাবা। ভালই, তবে আমাদের ল্যাংড়া আমের তুলনায় কিছু নয়।"

মেয়েরাও নিজেদের কাপড়-চোপড় গোছাতে বসল। গরমের সময় যাচ্ছে, মস্ত মোটা মোটা বিছানার বাণ্ডিল বাঁধতে হবে না এই এক রক্ষা। সামান্ত কিছু নিলেই হবে পাতবার জন্তে। জ্যোৎস্না এসেছিল বাপের বাড়ী এদের যাবার খবর পেয়ে। বৌকে আর বোনকে সে অনেক উপদেশ দিয়ে দিল। বলল, "দেখ বাপু, বোম্বাই ভীষণ ফ্যাশনেবল জায়গা, ওখানে সুতি সাধারণ কাপড়ের নাকি চলনই নেই। ওসব কিছু নিও না, ভাল ভাল সিল্কের শাড়ী জামা নাও। ওগুলো সব আল্‌মারীতে তুলে রেখে পোকায় কাটাচ্ছ কেন? এখানে কোথায় বা যাও যে পরবে? গহনাও দু'চারখানা নাও, তবে মোটা মোটা সোনার গহনা নিও না, জড়োয়া কিছু কিছু নাও! ওরা সোনার গহনা তত পরে না।"

ছোট বৌ উষা বলল, "তাহলে আমার রুবির সেটটাই নিই, ওটাই সবচেয়ে হাল্‌কা, দেখতেও ভাল।"

গৌরাঙ্গিনী বললেন, "তাই নাও, অন্তগুলো আমার কাছে দিয়ে যেও লোহার সিন্দুকে তুলে রাখব, তোমার ঘর ত বন্ধ পড়ে থাকবে।"

সুমনা বলল, "আমি বাপু গহনা-টহনা নিতে পারব না। এই হাতে গলায় যা আছে তাতেই হবে। কাপড় বরং ভাল কতগুলো নিচ্ছি।"

গৌরাঙ্গিনী চ'লে গিয়েছিলেন। একটু এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে ছোটবৌ বলল, "কেন ভাই মেজ ঠাকুরঝি, তুমি কিছু নেবে না কেন? তোমার ত এখনও পরতে কিছু বাধা নেই? কেউ কিছু বলতে পারে না, আর ওখানে আমাদের চিনবেই বা কে? আর তুমি সব শাদা শাড়ী নিচ্ছ কেন? রঙীনগুলো কি হবে? শাদা কাপড় বেশী পরা যায় না, দু'দিনেই ময়লা হয়ে যায়। আবার কাচানোর হাঙ্গামা।"

গীতা বলল, "তোমার এক শাদা শাদা বাতিক ভাই। এই বাংলা দেশ ছাড়া এত শাদা কেউ পরে না। দেখ না মারাঠিদের, মান্দ্রাজীদের। চুল পেকে শনের নুড়ি হয়ে গেছে, কোমর বেঁকে গেছে, তবু লাল নীল হলদে বেগুনী কত রঙের, ঝক্‌ঝকে জরীর পাড় দেওয়া শাড়ী পরে বেড়াচ্ছে। বিধবারা শুদ্ধ লাল শাড়ী পরছে। আর আমরা সব ধর্ম্মিষ্ঠীর দল, কুড়ি পার না হতে বুড়ী, সব কস্তাপেড়ে শাদা শাড়ী ধরেছি। দেখতে পারিনা এই সব এঁচড়ে পাকামি।"

বোন এবং ভাজেদের বক্তৃতার চোটে সুমনাকে তার সব কিছুই আবার বদ্‌লে নিতে হ'ল। ভাল ভাল সিল্কের জামা শাড়ী নিল, তার ভিতর রঙীনও বেশ কয়েকখানা। একটা মুক্তোর মালা নিল এবং একজোড়া মুক্তো বসান বালা। বলল, "তোমাদের কথায় নিলাম বাপু, কিন্তু তোমরাই যেন হেসো না শেষে। এ সব পরা বহুকাল ছেড়ে দিয়েছি ত?"

আর একজন আছে, যে তাকে চিরকাল অতি সাদা-সিদা নিরাভরণ বেশেই দেখেছে। সে কি ভাববে? সুচিত্রার বিয়ের দিন অমন উজ্জ্বল চোখে তার দিকে চেয়ে ছিল কেন? তার চোখে কি সুমনা এখন সুন্দর হতে চায়? নিজের মনের কাছেই সে যেন লজ্জা পেয়ে গেল। কিন্তু জিনিসপত্র যা বার করেছিল, তা বাক্সে তুলেই নিল।

যাবার দিন এসে পড়ল। বিকাল থেকে মহা গণ্ড-গোল, একবার বাঁধা হচ্ছে আবার খোলা হচ্ছে। বার বার জিনিসপত্র গোনা হচ্ছে। গিন্নী ক্রমাগত সকলকে বকছেন এবং কর্ত্তার কাছে বকুনি খাচ্ছেন। কাতী ঝি নূতন কেনা ব্লাউস পেটিকোট পরে সগর্ব্বে দাঁড়িয়ে আছে, সে সঙ্গে যাবে এবার। রাধা বুড়ো হয়ে পড়েছে, তা ছাড়া সে বড় সেকেলে, তাই সুমনা কাতীকেই নেওয়া ঠিক করেছে: মুখে অবশ্য বলছে, "রাধা থাক, ও গেলে মায়ের বড় অসুবিধা হবে।"

যাক্, অবশেষে সব বাঁধাছাঁদা শেষ হ'ল, ট্যাক্সি ডাকা হ'ল, প্রণাম, আশীর্ব্বাদ প্রভৃতি বিনিময় করে সকলে

বেরিয়ে পড়ল। গৌরাঙ্গিনী চোখ মুছতে লাগলেন, চামেলী এবং রাণু রীতিমত কান্না জুড়ে দিল।

ট্রেনে আগে থেকেই কাম্‌রা নেওয়া ছিল। জিতেন হিতেন রয়েছে, পুরনো ড্রাইভারও রয়েছে, কাজেই রাসবিহারীকে কিছু কষ্ট করতে হ'ল না। মেয়েরাও গিয়ে আরাম ক'রে বসল। জিনিসপত্র সব তোলা হ'ল, কাতী গুণে নিল ক'টা আছে, গৌরাঙ্গিনীর নির্দ্দেশ মত।

ট্রেন চলতে আরম্ভ করল। জিতেন যতক্ষণ প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে ছিল, সুমনা ততক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রুমাল ওড়াল। সত্যি, বড়দাও গেলে ভাল হ'ত, দাদাদের মধ্যে তার সঙ্গেই সুমনার ভাব বেশী। হিতেনও লোক ভাল তবে চিরদিনই সে নিজেকে নিয়ে থাকতে ভালবাসে।

পরশু তারা পৌঁছবে। সঙ্গে ছোট ছেলেপিলে নেই, ঝামেলা নেই কিছু। গৌরাঙ্গিনী সঙ্গে থাকলে বাড়ীর থেকে বিপুল খাওয়ার আয়োজন নিয়ে বেরতে হয়, কারণ তিনি ট্রেনে যা খাবার দেয় তা ছোঁবেনও না। জলটুকু শুদ্ধ বয়ে নিয়ে যেতে হবে। আর সারাক্ষণ এই খাওয়া, বাসন ধোওয়া আর আচার-বিচারের হাঙ্গামা লেগেই থাকবে। এবারে তারা যাচ্ছে ঝাড়াঝাপটা হয়ে। বল্লভ দাসের হোটেলে খাবার কিনে দিব্যি খেয়ে নিচ্ছে। কাতীরও কিছু বাধছে না, তবে এক ঘটি গঙ্গাজল এনেছে সে সঙ্গে। মাঝে মাঝে মাথায় একটু ছিটিয়ে নিচ্ছে। মনে মনে বল্‌ছে, "কে বা জানছে? বৃহৎ কাষ্ঠে, গজপৃষ্ঠে নিয়ম নেই। তা এ বৃহৎ কাষ্ঠ নয় ত কি?" ক্রমশঃ

হুঁসিয়ার

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

মানবমনের অতলগুহার আঁধার হতে আজ
বেরিয়ে এলো বর্ব্বর উদ্দাম।
উল্লাস ওর জিঘাংসাতে, অধর্ম্মে নেই লাজ,
ওর কাছে নেই প্রাণের কোন দাম।
আদিমকালের গুহামানব বিংশ শতাব্দীতে
খেল্‌ছে আজও পুরানো সেই খেলা;
সঙ্কোচ নেই প্রতিবেশীর ঘরে আগুন দিতে,
ও হোলো সেই বন-মানুষের চেলা।
ঐ দানবের জয় হবে কি? মানব—সে কি রবে
উদ্ধত ঐ নরপশুর দাস?
মৃত অতীত সিংহাসনে বস্‌বে সগৌরবে?
প্রেতাত্মা তার হাস্‌বে অট্টহাস?
নূতন উষার স্বপ্নে বিভোর ঐ সাধকের দল!
রক্তে দেশের লিখলো ইতিহাস;
যাদের মৃত্যু আন্‌লো প্রাণের তরঙ্গ উচ্ছল,
লেখায় যাদের অত্যাচারীর ত্রাস—
দেবাসুরের দ্বন্দ্বে শেষে তাদের হবে হার?
জয়ের মালা পরবে দশানন?
সর্ব্বোদয়ের সীতার কভু হবে না উদ্ধার?
জোর-জুলুমের দুর্গ চিরন্তন?
ভেদবুদ্ধির অভ্যুদয়ে ব্যর্থ হবে কিরে
এত মাতার এত অশ্রুপাত?
দেখতে হবে লক্ষ বীরের রক্তনদীর তীরে
স্বাধীনতার হর্ম্ম্য ধূলিসাৎ?
ভুলে যাবো স্বামীজীর সেই প্রেমের উদার বাণী:
'মূর্খ ভারতবাসী আমার ভাই?'

বঙ্কিমকে ভুলে গিয়ে করবো হানাহানি?
'রবি'র বাঁশি বাজলো কি বৃথাই?
বৃথাই বীণা বাজিয়ে গেলেন কবি ডি. এল. রায়?
'আমার জন্মভূমি'—কি অলীক?
স্বদেশপ্রেমের গগন ছেড়ে গরুড় হবে, হায়,
কোটরের ঐ ঝগ্‌ড়াটে শালিখ?
শার্দ্দুল—সে আবার ফিরে মূষিক দেহ নিবে?
গঙ্গা হবে পঙ্কিল পুকুর?
আকাশের ঐ সূর্য্য হবে কেরোসিনের ডিবে?
বনের সিংহ হবে কি কুকুর?
মধ্যযুগের আঁধার-ঘেরা সেই যে অন্ধকূপ,
স্বাজাত্যবোধ—চোখ ফোটেনি তার,—
স্বর্গাদপি গরিয়সী জন্মভূমির রূপ
অন্ধমনে তোলেনি ঝঙ্কার,—
অভিশপ্ত সেই জীবনের গাঢ় অন্ধকারে
ফিরতে হবে? মরণ সে কি নাই?
ভেদাসুরের যূপকাষ্ঠে দেশমাতৃকারে
হত্যা করবে? দেখবো ব'সে তাই?
মীরজাফরের ওরে স্যাঙাত মনুষ্যত্বহীন,
দেশদ্রোহী, নির্লজ্জ শয়তান,—
মাতৃভূমির শবের উপর নাচবি তাধিন্‌ধিন্‌?
তোর জন্যে তৈরী মৃত্যুবাণ।
মাতৃপূজার মন্দিরে তুই নোংরা সারমেয়,
কালপুরুষের খড়্গে হবি বধ;
পুণ্যভূমি এই ভারতে তুই রে অপাঙ্‌ক্তেয়
মানবদেহে হিংস্র শ্বাপদ।

মেঘালোকে

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

কবে কোন দিনে পথ চিনে চিনে
গিয়েছিলে তুমি অলকায়
হে বীর ! তোমার জ্যোতির্মাল্য
কণ্ঠে বিজলী ঝলকায়,—
অনাদি কালের রস নির্ঝর
ঝরায়ে ভরায় এই চরাচর
রামগিরিপুরে দূর পরবাসী
বেঁধেছিল বুক ভরসায়,—
আজিও হে মেঘ ! অনাদি যক্ষ
কাঁদে অনন্ত বেদনায় ।

গগনে গগনে সেই ঘনঘটা
দ্রিংকি দ্রিমিকি মাদলের
সেই গুরু গুরু হিয়া দুরু দুরু
আর্দ্র নয়ন বাদলের,—
অনতি কথিত ব্যথিত বিদায়
অধরে পরাণ সমাগত প্রায়
সিক্ত সমিধ দগ্ধ ধুঁয়ায়
যজ্ঞ তিলক বিরহের,—
উজ্জয়িনীর সে বিরহিনীর
নয়ন গলিত কাজলের ।

ছায়ায় ঘিরিল অম্বরতল
ব্যথায় ভরিল ধরাতল
বিশ্ববিরহী নয়ন ধারায়
পাথার করিল ধারাজল,—
জীমূতমন্দ্রে গভীর আরাব
ছুটে নির্ঝরে গৈরিক স্রাব
আঁখির তড়িতে কৌতুকে নাচে
পেখম তুলিয়া শিখিদল,—
শুভ্র উদার রূপ-সম্ভার
হাসিতে ফুটায় শতদল ।

চুম্বিয়া নিয়া ধরার যে রস
রসাল হয়েছো আপনি
রস সিঞ্চিয়া রিক্ত হয়েছো
সঞ্চিয়া কিছু রাখোনি,—
শুষ্ক ধরণী করেছো সরস
অমৃত সিক্ত তোমার পরশ
শ্যামল জলদ শ্যাম সুধারস
সঞ্চারি দিলে লাবণি,—
মুকুলে ও ফুলে পুলকে বিবশ
তোমার প্রেয়সী ধরণী ।

অজগর সম গরজে তটিনী
তীরবেগে বহে বারিধার
পাটল পরাগ নব অনুরাগ
ছল-ছল-আঁখি কলিকার,—
বিষাদ বাষ্পরুদ্ধ বেদনা
উতলা বাতাস কহিছে কেঁদনা
তোলো মুখ তোলো, লাজময়ী ওলো
মেঘদূত এলো বরষার,—
জল-ভারাতুর জলদ মেদুর
বক্ষে মালিকা বলাকার ।

গিরি শৈবাল শষ্প উশীর
বন্য ভেষজ পরিমল
ধন্য হইল তৃণ শাদ্বল
শ্যামল হইল সমতল,—
সুদূরোত্থিত উর্মির মত
অস্ফুট বাণী কহিছ সতত
বন লক্ষ্মীর নয়ন যুগল
পুলকোজ্জ্বল ঢল ঢল,—
হে মেঘ ! তোমার বিজলী মাল্য
কণ্ঠে রহুক অচপল ।

ঈশ্বরের জন্ম

(প্রবাসী গল্প-প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত-গল্প)

শ্রীদীপক মজুমদার

শ্রাবণের আকাশের মেঘের মত চুল, আর গভীর দীঘির মত কালো দুটি চোখের একটি মেয়েকে বাসু দেখেছিল প্রথম যৌবনে। তন্বদেহভরা লাবণ্য দেখে পাগল হয়েছিল।

সেই মেয়েটাই কেমন করে তার ঘরে শেষকালে এলো —সে কথা ভাবতে আশ্চর্য লাগে বাসুর, বিশ্বাস হতে চায় না যেন। যেন সেই মেয়েটাই একটা মধুর স্বপ্নের মত হঠাৎ এসেছিলো, তার পরই কখন যেন হারিয়ে গেছে কোথাও। বাসুকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে অন্য কোনো পুরুষের হাত ধরে।

চুপচাপ দাওয়ায় বসে বসে তাই ভাবছিল বাসু হাজরা। ঘরের ভেতরে মাটিতে মাদুরের ওপর পড়ে পড়ে কাতরাচ্ছে পারুল। জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে, কেবলি ছটফট্ করছে অসহ্য যন্ত্রণায়, বিকারের ঘোরে ভুল বকছে অনবরত।

শুনতে শুনতে মেজাজ গরম হয়ে যায় বাসুর। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়, হন্ হন্ করে হাঁটতে হাঁটতে সোজা সিদ্ধেশ্বরের কাছে গিয়ে হাজির হয়। এতো ভোরে তাকে দেখেই সিধু মণ্ডল হাঁক-পাঁক করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। বলে, ব্যাপারটে কি রে বাসু, এতো সকালে কিসের তরে?

হড়বড় করে বাসু বলে যায়—গরু দুটো তোমার আজ বসে থাকছে তো? আমি বলি কি তোমার গরু দুটো দাও, আমার গাড়ীটা বার করি তাহলে আজ। সন্তোষপুরে পাট বোঝাই হতেছে—একটু থেমেই আবার বলে সে, ভয় করো নি—আদ্ধাআদ্ধি ভাগটা হবে ঠিকই।

—আরে পাগল হ'লি নাকি তুই বাসু? ভাগের কথা কে কইছে তোরে? কিন্তুক্ গরু তো আমার চলতে পারবে নি আজ।—সন্তোষপুরে কার পাট যাচ্ছে রে?

তার প্রশ্নের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে বাসু নিজের কথাটাই পাড়তে থাকে—দোহাই তোমার গরু দুটো একবার দাও, তোমার দুটি পায়ে—

বিনয়ের হাসি হাসে সিদ্ধেশ্বর—আরে পাগল কমনেকার!

আর একটা মাত্র কথাও খরচ না করে ঠিক যেমনি ভাবে এসেছিল তেমনি ভাবেই ফিরে যায়। সিদ্ধেশ্বর তাকে পিছু ডাকে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও একবার ফিরে আসে বাসু। কাছে এসে গলাটা নামিয়ে প্রশ্ন করে সিধু—বৌটা তোর আছে কেমন? ওষুধ-টষুধ দিয়েছিলি নাকিন্?

প্রশ্নটা অনাবশ্যক জেনেই করে, পরে পকেট থেকে একটা আধুলি বার করে বাসুর হাতে দেয়। বলে, নে, রাখ এটা।

বাসুর ইচ্ছে হয় পয়সাটা ছুঁড়ে মারে সিদ্ধেশ্বরের মুখে। কিন্তু ইচ্ছাটাকে মনে মনেই দমন করে, তার হঠাৎ মনে পড়ে কাল রাত্রি থেকে তার কিছু খাওয়া হয় নি। সিদ্ধেশ্বর আবার জিজ্ঞাসা করে—সন্তোষপুরে—

—মীরদের পাড়ায়। হালিম মিয়ার খামারে। কথা ক'টা বলে আর থামে না বাসু, একেবারে বনমালীর মুদিখানার দোকানে গিয়ে থামে। দু'আনার মুড়ি আর দু'টো বেগুনি কিনে ধীরে-সুস্থে খেতে বসে। সতর্ক দৃষ্টি সর্বদা মেলে রাখে রাস্তার দিকে—চোখ-কান খাড়া করে রাখে। এই রাস্তা দিয়েই খানিক পরে কালী ডাক্তারের সাইকেল আসবে। তারই মুখ চেয়ে খাওয়া হয়ে গেলেও পাথরের মত বসে থাকে চুপ করে। সামনে যুগলের চায়ের দোকানে এরই মধ্যে হুটোপাটি লেগে গেছে—চেঁচামেচিতে সমস্ত জায়গাটা সরগরম হয়ে রয়েছে। তবু ওদিকে ভিড়ের মধ্যে যায় না বাসু।

মনটা তার সুদূর অতীতে ভেসে চলে যায়। পারুলের কথা তার বিশেষ ভাবে মনে পড়ে। সরু চেহারার সুন্দর মেয়েটাকে প্রথম দেখাতেই ভালো লেগেছিল বাসুর। তখনকার কথা মনে পড়লে মনটা এখনও কেমন বিহ্বল হয়ে যায় বাসুর। রোজ ষষ্ঠীতলার পুকুরে যখন চান করতে আসতো পারুল, ঘাটের আড়ালে লুকিয়ে থাকতো বাসু। স্নান সেরে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসতে দেখতে পেতো সে বাসুকে, মিষ্টি হাসি হেসে বলতো, লজ্জা করে নে তোমার এমনিতর লুক্যে থাকতে?

তার কথা উত্তর দিতো বাসু উচ্চকণ্ঠে, উচ্ছল হাসিতে। পারুল অপরূপ ভঙ্গিমায় ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে চুপ করতে বলতো বাসুকে। তাই দেখে আরও জোরে হেসে উঠতো বাসু।

রাগ করে তাড়াতাড়ি চলে যেতো পারুল, সেই নির্জন ঘাটটায় অনেকক্ষণ বসে থাকতো বাসু। মনে মনে পারুলের ধ্যান করতো বুঝি বা।

হঠাৎ বাইসাইকেলের ঘণ্টার শব্দে চেতনা ফিরে আসে যেন বাসুর। সামনে তাকিয়ে দেখে—ডাক্তারবাবু ধীরে ধীরে সাইকেল চালিয়ে আসছেন। এই দোকান-গুলোর কাছে এসে উনি সব সময়েই আস্তে চালান। বাসু এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় তার সামনে, নমস্কারও করে একটা।

তার দিকে তাকিয়ে ডাক্তারবাবু হাসতে হাসতে বলেন, এ শালা আবার কে? তার কথা শুনে হাসে বাসু। বলে, আজ্ঞে পরিবারের অসুখ করেছে, ওষুধ দিতে হবে।

২

সব দিক থেকে সময়টা খারাপ চলছে মনে হয় বাসুর। চাষ-বাস তো এবার গেলই অগাধ জলের তলায়, তার ওপর মানুষের কাজকর্মের জোগাড় নেই—বাঁচবে কেমন করে? ক'দিন ধরে কাজের সন্ধানে ঘুরে হন্যে হ'য়ে নূতন একটা বুদ্ধি আঁটলো বাসু। ইউ. পি. স্কুলের পাশের যে খাদটা পড়ে আছে অনেক দিন হ'ল, সেটাতে মাছ ধরবার জন্যে উঠে-পড়ে লাগলো। দক্ষিণ-পাড়ার মদন আর গৌরকে নিয়ে পুরোদমে কাজ সুরু করলো বাসু। তাদের ডোঙা যোগাড় করে খাটিয়ে ফেললো। পুরো তিনটি দিন-রাত সমানে জল ছেঁচে ফেলেও কিছুই পাওয়া গেল না—সামান্য কিছু চুনোমাছ ছাড়া। শেষরাত্রে হঠাৎ বাঁধ ভেঙ্গে গেল আপনা-আপনি।

খেপে উঠলো বাসু ওদের দু'জনের ওপর—শালারা ইয়ার্কি করতে এসেছিস্! কেমনতর বাঁধ দিছিলি?

গজ গজ সে করতে থাকল অনবরতই। প্রাণপণে গৌর আর মদন নিজেদের দোষ কাটাবার চেষ্টা করতে লাগলো। সবার চেয়ে বেশী আশা করেছিল বাসুই। তাই তার ক্রোধ সীমাহীন হ'ল, রাগে চীৎকার করে উঠলো সে—যা মরগে শালারা এবার! দেনাগুলো শোধ কর এবার।

বেশ কিছু টাকা পার হয়ে গেল মাছ ধরার ব্যাপারে। বাসুর ভাগে পড়লো টাকা তিনেকের মত। ঐটাই হ'ল লাভ।

শুধু বাসুই নয়, আরো অনেকেই পেটের চিন্তায় পাগলের মত হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায়। পর পর দুটো সন শুকো গেছে—ক্ষেত-খামারে ধানের চিহ্নমাত্র নেই কারুর। আবার এ বছরের বন্যাটাও রাখলো না কিছু। বরাৎ বলে একেই! তবু খেয়ে-না-খেয়ে আবার নূতন করে বোরো ধান রুয়েছিল যারা তারাও মাথায় হাত দিয়ে বসেছে।

বাদার জলায় সব ক'টি মাঠ একটা বিলের জলের উপরই নির্ভর করে থাকে। জলার ঠিক মাঝখানেই হারাণ দাসের বিলটা। ঐটুকুর ওপরই আশা করেছিলো সব চাষীই। চুপিসাড়ে কখন যে সেটা জমাবন্দী করে দিয়েছে দাসমশায় তা কেউই টের পায় নি। যখন টের পেলো তখন করবারও কিছু রইলো না তাদের গালাগাল দেওয়া ছাড়া।

বেড়ে-ওঠা সতেজ-সজীব ধানক্ষেতগুলোতে গরু ছেড়ে দিলো যে যার। গো-মড়কটাও শুরু হ'ল। তবু যে-ক'টা দিন পারে, ভালো ভাবেই খেয়ে নিক কেষ্টর জীবগুলো।

মনে মনে হাসে বাসু—তাই বটে। তার অমন তেজী গরু দুটোর একটা তো মরল—আরটাও আর বেশী দিন নয়, যা হাল হয়েছে। অন্য সন শুধু গাড়ী নিয়ে বিস্তর টাকা কামিয়েছে বাসু।

তিন ক্রোশ রাস্তা ভেঙে মাটি কাটতে গিয়েছিল বাসু খাঁটোরায়। ভোরবেলায় বেরিয়ে ফেরে প্রায় বিকেল নাগাদ। হাত-পা না ধুয়েই দাওয়াতে বসে একটার পর একটা বিড়ি ফুঁকতে থাকে সে নিঃশব্দে। ঘরের ভেতর রুগ্ন শরীর নিয়ে উঠতে যায় পারুল, বারণ করে বাসু তাকে—দেহটা তোর খারাপ, তুই আর উঠিস্ নি।

তবু উঠলো পারুল, এক ফাঁকে উনুনেও আঁচ দিলো, বাসুর পাশ থেকে চালের পুটলিটা নিয়ে ভাতও চাপালো।

সাত বছর আগেকার সুন্দর সতেজ একটা মেয়েকে মনে পড়ে গেল বাসুর। কানাইডাঙার সাঁতরাপাড়ার পারুল। কত সুন্দর ছিল, সবুজ ধানের শীষের মত উচ্ছল, প্রাণপূর্ণ। আজ সে মেয়ের চিহ্নও যেন নেই পারুলের মাঝে। তার আদরের পরীকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না আজ ওর মধ্যে। প্রথমবার শুকোর সময়ে সন্তান একটা গর্ভে এসেছিল পারুলের। এমন অভাগা—মনে মনে ভাবে বাসু, আর সময় পেলো না আসবার। পৃথিবীর আলো আর দেখতে হয় নি তাকে, মায়ের গর্ভের গভীর অন্ধকারেই তার প্রাণটা চলে গেছে। সেই থেকে শরীরটা আর সারলো না পারুলের। বছর দুই তো প্রায় হলো।

ইদানীং অসুখটা তার বেড়েছে খানিক। মাঝে মাঝে কান্না পায় বাসুর, পরী বোধ হয় আর বাঁচবে না। অব্যক্ত একটা বেদনা যেন বাসুর মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। পরী মরলে সে আর এখানে থাকবে না, যতদূর চোখ যায়—অচেনা কোন দূরদেশে চলে যাবে। ঘর-সংসার সব ছেড়ে।

কি যে করবে ঠিক করতে পারে না বাসু। পরীর অসুখটা হয়ে খরচ তবু কমেছে কিছুটা। দু'আনার সাগু, বার্লি কিনলে সারাটা দিন চলে যায়। তাছাড়া ওষুধের পয়সাটা অবশ্য লাগে। চার-আনার ওষুধে দুটো দিন চলে। তবু সব সময়ে যোগাড় করতে পারে না বাসু। পারুল বোঝে সব কিছু—ওষুধ খেতে চায় না সে। তাকে ধমক দেয় বাসু, বলে, না ওষুধ খাবি তো অসুখ অমনি সারবে?

বেশী প্রতিবাদ করতে পারে না দুর্বল পারুল। ঝিম মেরে পড়ে থাকে নিঃসাড়ে।

ধর্মঠাকুরের গান শুরু হয়ে গেল—এটা যেন হঠাৎ খেয়াল হ'ল বাসুর। অন্ধকারে রাত্রিবেলা ঘরের বাইরে চুপ করে বসে থাকতে থাকতে শুনতে পায় দূর থেকে ভেসে-আসা গানের সুর। মহিষগোটের দিক থেকে গানের আওয়াজ আসতে থাকে। তা প্রায় ফাল্গুনের মাঝামাঝি হতে চললো—এইতো সময়। আর দিন সাতেকের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে ধর্মঠাকুরের স্নান। এত বড় মেলা এ তল্লাটে আর কোথাও হয় না। যে-ক'দিন মেলা থাকে, লোকের আনাগোনার বিরাম থাকে না সে-ক'দিন। আগেকার দিনে পারুলকে সঙ্গে নিয়ে মেলাতে যেতো বাসু। প্রত্যেক দিন, মনের মত জিনিস কিনতো পারুল—রাঙা-চুড়ি, আলতা, টিপ আর স্মিতহাস্যে তার দিকে তাকিয়ে হাসতো বাসু।

সেদিনকার কথা মনে করে চোখে জল আসে তার। অন্ধকারে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। গান শোনে কান পেতে। ও ঠিক জানে ওখানে ধর্মতলায় এখন মুক্তো মাঝির দল পুরোদমে গান করছে। অমন মিষ্টি গলা ওর—আহা যেন মধু ঝরে। বাসুর বন্ধুস্থানীয় লোক, এর আগে দলসমেত এখানে ওর বাড়ীতে এসে গান করেছে কয়েকবার। লোকজনে ভরে উঠেছে ঘরদোর।

সামনের কড়াইক্ষেতটার ধার দিয়ে একজনকে আলো হাতে যেতে দেখে ঘাড় ফেরালো বাসু। গলার স্বর সামান্য তুলে ডাক দিলো—কে গা বাদার মধ্যে দিয়ে যাও, রাস্তা হাইরেছো নাকিন্?

আলোটা হঠাৎ থেমে যায়, পরক্ষণেই বাসুর দিকে ফিরে আসে। লোকটা এবার সাড়া দেয়—বাসুদা আমি গো।

—অ, বিপ্‌নে, আয় বোস।—বাসুর আহ্বানে ঝপ করে বসে পড়ে বিপিন।

—কেমন আছিস্ রে? অনেক দিন তোরে দেখি নি।

বাসুর প্রশ্নে চমকে উঠে সে বলে—আর দাদা বল কেন, পেটের ধান্দায় আকাশ-পাতাল ঢুঁড়ে ফেলনু—

তার কথা শেষ হবার আগেই হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলে ওঠে বাসু—বলি বিপনে, তোর বগলের তলায় চাদরের নীচে কি আছে রে? বাজারে কি রকম মালটাল ছাড়ছিস্ আজকাল?

ইতিউতি তাকিয়ে ত্রস্তভাবে বলে বিপিন—আহা, একটু আস্তে বল। কোথায় কে শুনে ফেলবে—

তার কথাতে ভ্রুক্ষেপও করে না বাসু, বলতে থাকে—তুই বড় বাড়াবাড়ি শুরু করেছিস্ আজকাল—পুলিসে খবর একটা দিতেই হবে দেখছি।

বিপিন তড়াক করে লাফিয়ে উঠে এসে বাসুর মুখটা চেপে ধরে। বলে—কর কি দাদা, বিপদ একটা না বাধিয়ে ছাড়বে না?

তার ভঙ্গি দেখে হেসে ওঠে বাসু, বলে—বলিহারি বটে তোদের বুকের পাটা!

—ছাই। পেটের চিন্তায় চোখে সর্ষে ফুল দেখলে অমন বুকের পাটা সবাইরেই হয়। কথাগুলো ব'লে এবার ওঠে বিপিন—চললাম আজ, আবার পাড়াটায় যেতে হবে।

—কোন পাড়া?—প্রশ্ন করে বাসু, পরক্ষণেই হেসে ওঠে, বলে—ও বুঝেছি, যা। মেয়েমানুষগুলো থেকে একটু সাবধানে থাকিস্ কিন্তক্।

বিপিন উঠে যাবার পর আবছা আলোয় বাসু দেখতে পায়—দাওয়ার ওপর মাটিতে একটা টাকা পড়ে রয়েছে। সেটা তুলে ট্যাঁকে গুঁজতে গুঁজতে আপন মনেই বলে, শালাটা বড়ই সেয়ানা হয়েছে।

এই বিপিন ধাড়া কতবার কত রকমে মন যোগাবার চেষ্টা করেছে বাসুর। অনেক লোভনীয় প্রস্তাব এনেছে তার সামনে। বুঝিয়েছে নানাভাবে কত সহজে বেশী পয়সা রোজগার করা যায় তারই ফিকির। মদ চোলাইয়ের ব্যবসাটা তাদের জমেছে ভাল, বাসুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে তাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য।

কিন্তু বাসু রাজী হয় নি, কেন হয় নি কে জানে? পুলিসের ভয়, হাজতের ভয়ই হয়ত তার বেশী হয়েছিল। কিংবা বাসু মনে মনে ভাবে—সে ওপথে গেলে পারুল

ভীষণ কষ্ট পেতো, তাই সে রাজী হয় নি। কে জানে ঠিক কি তার মনে হয়েছিল তখন।

তবু যখন সংসারের অবস্থাটা একেবারে অচল হয়ে যায়, তখন ইচ্ছে হয় যা হবার হোক, তবু দুটি খেয়ে বাঁচা যাক। এমনি এক দুর্বল মুহূর্তে বাসু একদিন গিয়েও পড়েছিল ওদের আড্ডায়। পরম বিশ্বাসে ওকে ওরা দেখিয়েছে নানা কলাকৌশল—মদ চোলাইয়ের বিভিন্ন প্রণালী।

শেষ মুহূর্তে তবু পালিয়ে এসেছে বাসু। বলেছে—ওসব আমার পোশাবে নি রে বিপনে।

সে-সব কথা এখনও ভাবে বাসু। অনেক বিদ্রূপও তাকে সহ্য করতে হয়েছিল সেদিন। ওরা বলেছে, তুই একটা মেয়েমানুষ। ঘরে গিয়ে মাগের আঁচল ধরে বসে রইগে যা।—গালাগালগুলো শুনে মন ভারী করে বাড়ী ফিরে এসেছে বাসু। নিজের ওপরই তার রাগ ধরেছে। কিন্তু যখনই তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে পারুলের সুন্দর মুখখানা, তখনই ভুলেছে সব। রাত্রে বুকের কাছে তার সোহাগী পারুলকে টেনে নিয়ে তার চোখের ওপর দৃষ্টি রেখে বলেছে—তুই-ই আমার সর্বনাশ করবি, ডাইনি কমনেকার!

তার কথা বুঝতে না পেরে পারুল রাগে মুখ ভারী করে আলিঙ্গন ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে। আরো জোরে তাকে বুকের ওপর টেনে এনে চুমোয় চুমোয় মুখ ভরিয়ে দিয়েছে বাসু।

তার কথা আর কাজের মাথামুণ্ডু কিছুই বোধগম্য হয় নি পারুলের।

ধর্মঠাকুরের মেলাতে সেদিন হঠাৎ খেয়ালবশে গেল বাসু। পণ্ডিতপাড়ার ধর্মঠাকুরতলার কেন্দ্র করে চারিদিকে মেলা বসেছে। দোকানপাটে ভরে গেছে জায়গাটা। তবু যেন এবার সরগরম ভাবটা অনেক কম। এ তো আগেই জানতো বাসু। অমন আকালের বছর—লোকে খেতে পায় না, ট্যাঁকে পয়সা নেই, মেলা জোরদার হবে কি করে? নেহাৎ ঠাকুর দেবতার ব্যাপার তাই এটুকুও হচ্ছে।

মনসা মালিককে পাওয়া গেল মেলায়। নেশার আড্ডাটা ভালোভাবেই জমিয়ে বসেছে এক কোণে। বাসুকে দেখে টেনে নিয়ে গেল নিজের ডেরায়, বলল—মহাদেবের পেসাদটা তো তোমার চলবে নে ভাই, তুমি বাপু গেলাস দুই রসই টান বসে বসে।

সে বসল গাঁজার ছিলিমটা সেজে, তাড়ির হাঁড়িটা ঠেলে দিল বাসুর দিকে। আজ মেজাজটা তার অন্য রকম ছিল। অন্য দিন হ'লে কি হোত বলা যায় না—এক কথায় আজ বসে গেল বাসু।

আজ বিকেল থেকেই দখিনা হাওয়া প্রবল হয়ে উঠেছিল, আকাশে মেঘও জমেছিল কিছু। সন্ধ্যের পর থেকেই ঝড় এলো প্রবল দাপটে, সঙ্গে কোঁটা কোঁটা বৃষ্টি। ঘূর্ণি হাওয়ার মত ঝড় যেন সমস্ত মেলাটা লণ্ডভণ্ড করে দিতে লাগলো। নেশার ঝোঁকে আনন্দে লাফিয়ে উঠে চেঁচামেচি শুরু করল বাসু—আয় বাবা। দু'চার কোঁটা জল দে বাপু। চাষ করে বাঁচি এবার।

ফাল্গুনের মাঝামাঝি, এখন যদি কিছু বৃষ্টি হয়, চাষীরা আবার একবার উঠে-পড়ে লাগতে পারে। বছরের শেষ ফসল—তরমুজ, কাঁকুড় বসাতে পারে। কিছুটা সামলে ওঠা যাবে তাতে, কিন্তু তেমন ভাগ্য কি আর করেছে ওরা!

এই মুহূর্তে তবু বিশ্বাস করতে ভালো লাগলো ওদের—বৃষ্টি হবে, মাঠে জল দাঁড়াবে, আর ওরা সবাই তরমুজের খুপি কাটতে শুরু করবে। তাই কলরব করে উঠল ওরা।

কোণে ঝিম মেরে পড়েছিল এতক্ষণ যে মনসা মালিক—সেও সোল্লাসে চীৎকার করে ওঠে—জরুর পানী হোগা মহাদেব কৃপা করেগা আভি।

তাকে সমর্থন করেই চেঁচিয়ে ওঠে বাসু। আনন্দের আতিশয্যে নাচতে থাকে বাসু, পঞ্চা তার কাপড়টা ধরে টান মারতেই ধপ করে পড়ে যায় তার কোলের ওপর।

অনেক বেলায় তার পরের দিন নেশার ঘোর কাটে বাসুর। ঘরে গিয়ে যা দেখে তাতে তার চোখ কপালে ওঠবার উপক্রম করে। রাত্রে বৃষ্টি হয়েছে কি হয় নি সামান্য একটু কিন্তু সর্বনাশা ঝড়ের আর সীমা থাকে নি। তার ঘরের একটা দেওয়াল বন্যার সময় ভেজে পড়েছিলো। কোনো রকমে প্যাঁকাটির তাড়া দিয়ে ঠেকনো দিয়ে রেখেছিলো সেটা। কালকের ঝড়ে তার ওপরকার মটকার খড়গুলো উড়ে গেছে কোথায়। ঘরের ভেতর এক কোণে বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে পারুল। দেহটা তার একটুও কাঁপছে না—নিঃশ্বাস পড়ছে কি না সন্দেহ হয়। এমন ঘুম এই অবস্থায় কেমন করে ঘুমোতে পারছে পারুল—ভেবে পেলো না বাসু।

ঘরের ভিতর দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে—পরিপূর্ণ নীল আকাশ। বাহবা—কি জানি কি ভেবে আনন্দ হ'ল বাসুর। তার হঠাৎ মনে পড়ে গেল কবে কোন রেলষ্টেশনে এক বাউলের গান শুনেছিলো—

ও তোর ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো টিপিটিপি
মন কেমন করে—
বোষ্টুমী রে—

তারও ভাঙা ঘরে নিশ্চয়ই পূর্ণিমা রাতে জ্যোৎস্না এসে পড়বে। ঘর ভরিয়ে দেবে, সেই জ্যোৎস্নার আলোয় স্নান করবে সে ও তার পারুল। ভাবতে ভাবতে এমন দুঃসময়েও বাসুর মনটা উদাস হয়ে যায়।

তার পর পারুলের কাছে গিয়ে বসে তাকে ঝাঁকানি দিয়ে তুলে দেয়—ঘুমটা ভাঙিয়ে দেয় বাসু। গায়ের তাপে তার হাত জ্বালা করতে থাকে। কামরাঙা-লাল চোখ তুলে বিহ্বল দৃষ্টিতে সে তাকায় বাসুর দিকে। তার উষ্ণ নিঃশ্বাসে মুখটা জ্বালা করতে থাকে বাসুর। বিড়বিড় করে নিজের মনে অর্থহীন ভাবে বকতে থাকে পারুল, তার সে ভঙ্গি দেখে বাসুর গায়ের সব রক্ত যেন জল হয়ে যায়।

ছুটে বেরিয়ে আসে সে। পারুলের মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহসটুকুও যেন আর অবশিষ্ট থাকে না তার শরীরে। ঘরের ঠিক পিছনেই বাসুর গোয়ালঘর। তারই ভেতর থেকে গরুটা থেকে থেকে উচ্চৈস্বরে ডাকতে থাকে। তার ক্ষুধার্ত ডাক উপেক্ষা করে পাগলের মত ছুটতে থাকে বাসু। রাস্তায় দেখা হয় সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে। বাসুকে দেখে বলে—কি রে বাসু, অমনতরো ছুটিস কেনো?

তার হাত দুটো ধরে কেঁদে ফেলে বাসু ছেলেমানুষের মত। বলে—সিধুদাদা, পারুল আমার এবার মরে যাবে।

—দূর পাগল কমনেকার!

দু'জনে মিলে কালী ডাক্তারকে ধরে আনতে যায় ডিসপেনসারী থেকে। খড়ের চালের মাটির ঘরের ডাক্তারখানাটাও ঝড়ের হাত থেকে রেহাই পায় নি। তারও চালের খড় কিছু কিছু হাওয়ায় উঠে গেছে। কালী ডাক্তার তাই সারাবার তদারকিতে ব্যস্ত। বাসুর ডাক শুনে বলে—টাকাটা নগদ দিবি তো বাসু, দেখছিস এখন অবস্থাটা। ফেলে রাখিস নি যেন।

বাসু হাত জোড় করে বলে—না ডাক্তারবাবু, টাকাটা দিতে পারবো নি এখন। ওষুধের দামটুকু দেব'খন।

রীতিমত আঁতকে ওঠেন ডাক্তারবাবু—আবার ঝামেলা বাধালি দেখি। ওষুধটাই তবে নিয়ে যা এখন, কি আর দেখব গিয়ে? পেট ভরে খেতে দে—ও অসুখ আপনা থেকেই সেরে যাবে। বুঝলি—

বাসু চুপ করে থাকে। ডাক্তার তাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করেন—রোগের বৃত্তান্ত। তার পর বলে—এই নে ওষুধ।

লাল রঙের একটা ওষুধ আর গোটা দুই বড়ি দেয়। তাই নিয়ে ঘরে আসে বাসু, সিধুও আসে তার সঙ্গে সঙ্গে। পারুলকে দেখে বাসুকে উদ্দেশ করে তিরস্কারের ভঙ্গিতে বলে—অমন সোনার পিতিমে বৌটাকে তুই মেরে ফেলবি। যত্ন-আত্যি করিস না কিছু না।

বাসুর ইচ্ছে হয় সিদ্ধেশ্বরের গালে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দেয়! বেটা আস্ত শয়তান, পরের বৌয়ের জন্যে সোহাগ তার উথলে উঠছে যেন।

গোয়ালঘরে গরুটা বেদম চেঁচাতে থাকে। বাসুর সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে গরুটার ওপর। ঘর থেকে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে বেরিয়ে এসে লাঠি হাতে গোয়ালের দিকে ছুটে যায়। সিদ্ধেশ্বর চেঁচাতে থাকে—মারিস নি গরুকে, খেতে পায় নে একে। মরে যাবে।

তার কথায় কান না দিয়ে পিটতে থাকে গরুকে বাসু। জন্তুর মত হিংস্র ভঙ্গীতে মারতে থাকে। ঘরের বাইরে এসে সিদ্ধেশ্বর বলে, আরে করিস কি? গরুটা মরে যাবে যে!

—আপদ চুকে যাবে তাহলে। আমার গরু আমি মারবো, তাতে তোমার কি? এতক্ষণে একটা কড়া কথা বলতে পেরে সিদ্ধেশ্বরকে স্বস্তি পায় বাসু কিছুটা।

কিন্তু রাগে না সিদ্ধেশ্বর। বলে—ও গরু তুই রাখতে পারবি নে, আমায় দিয়ে দে। দু'কুড়ি টাকা দি।

তার কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায় বাসু। মায়াপুর থেকে সে সাড়ে সাত কুড়ি টাকা দিয়ে গো-আড়ৎ থেকে কিনে এনেছে এ গরু। এমন গরু এ তল্লাটে নেই। খোলভুসি খাওয়ালে আবার দু'দিনে সমান তেজী হয়ে উঠবে আগের মত। তার দাম বলে কিনা দু'কুড়ি টাকা!

ক্রোধে তার বাকস্ফুরণ হয় না। তার ভাব দেখে সিদ্ধেশ্বর বলে—অমন করে রয়েছিস যে! তুই কি খেপেছিস নাকিন? ও গরু তোর ওর চেয়ে বেশী দামে কেউ নেবে?

—না নেয় না নেবে, তোমার তাতে কি?—খেঁকিয়ে উঠলো বাসু।

আর একটিও কথা না বলে সিদ্ধেশ্বর চলে গেল। তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে তারই উদ্দেশ্যে বিশ্রী গাল পাড়ে বাসু।

অন্ধকারে ঝিম মেরে পড়ে থাকে বাসু মাকালতলায়।

মনে তার অসীম যন্ত্রণা, দুঃসহ বেদনায় তার মন ভরে থাকে। পারুলের অন্ন করে নি সারাদিনে এতটুকুও। থেকে থেকে এখনও সে পাগলের মত বকছে। তার পাশে সকাল থেকে বসেছিলো, না খেয়ে, না দেয়ে। এই এখন উঠে এলো সেখান থেকে—ক্লান্তিতে মনটা তার অবসন্ন হয়ে আছে। পাশের বাড়ীর টুকা সাঁতরার মেয়ে ধর্মদাসীকে বলে এসেছে—দেখিস্ একটু, বৌটা একা রইলো ঘরে।

তার পরে এখানে নিরিবিলি একা এসে বসেছে। স্নিগ্ধ হাওয়ার পরশে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে এক সময়ে। অন্ধকারে সেই মাকালতলা দিয়েই যাচ্ছিল পুঁটেগাছার যুগল রুইদাস। বাসুকে সেখানে পড়ে থাকতে দেখে হাত ধরে তাকে টেনে তোলে। বাসুর অনেক দিনের বন্ধু সে। বাসু যখন তার গরুর গাড়ী নিয়ে রাত্রে কোন দূর দেশে যেত, তার সঙ্গে থাকত যুগল। গায়ে হাতীর মত বল, বিরাট বুকে তার অসীম সাহস।

কিন্তু আশে-পাশের গ্রামে তার একটু দুর্নাম আছে। হাতটান অভ্যেসটা তো আছেই, উপরন্ত ছুটকো-ছাটকা চুরি-চামারীও তারই কাজ। যখনই কোথাও তা হয় চৌকিদার এসে আগে হাঁক পাড়ে যুগলের দরজায়। কয়েকবার এরই জন্যে হাজত বাসও তার হয়ে গেছে।

বাসু ধড়মড় করে উঠে পড়ে। যুগলের সঙ্গে সঙ্গে সে চলে—নির্জীবের মত। লণ্ঠনের আলোয় তার মুখের দিকে তাকিয়ে যুগল বলে ওঠে—তোর মুখখানা অমনতর শুকনো কেনো? সারাদিন কিছু খাওয়া হয় নে বুঝিন্?

বাসু কথা বলে না। যুগল বলে—ওঃ বুঝেছি—একটু পা চালিয়ে আয় তাড়াতাড়ি। বাসু গিয়ে উঠলো যুগলের ডেরায়। যুগল রান্নাঘরে গিয়ে বউয়ের কাছ থেকে এক গোছা রুটি আর কিছু গুড় নিয়ে এলো। বাসুর কোলে অর্দ্ধেক রুটি-গুড় ফেলে দিয়ে বাকী অর্দ্ধেক নিয়ে খেতে বসলো সে নিজে। বাসু চুপচাপ বসে রইলো তাই দেখে বললো যুগল—কি রে হাত গুটিয়ে বসে রইলি যে? খেয়ে নে তাড়াতাড়ি, এক জায়গায় যেতে হবে।

মেসিনের মত হাত চালিয়ে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলো বাসু। গলায় এক ঘটি জল ঢেলে ঘটিটা বাসুর দিকে এগিয়ে দিয়ে যুগল বলে—নে, চল এবার।

কিছুক্ষণ পরে বাসু বুঝতে পারলো যুগলের মতলবটা —নিজের গোপন ঘরটায় গিয়ে নিজের মুখেই ব্যক্ত করলো সে মনের কথাটি। বললে—বুঝলি বাসু, তুই আজ আমার সঙ্গে বেরোবি। আমি গেলাস দুই তাড়ি টেনে নি ত্যাতক্ষণ, তুই এ সব খাস নি, তা হলে পারবি নে। বুঝলি—

বাসু হ্যাঁ না কিছুই বললো না, পাথরের মত বসে থাকলো শুধু। যথাসময়ে যুগলের নির্দেশ অনুযায়ী অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে যুগলকে অনুসরণ করে চলতে থাকলো বাসু। অন্ধকারে কিছু ঠাহর হয় না যেন বাসুর—যুগলের দেহটা লক্ষ্য করে হোঁচট খেতে খেতে চলে।

একটি বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ায় দু'জনে। নিঃশব্দে সিঁধ কাটে যুগল, তার পর বাসুর দিকে ফিরে ফিসফিস করে বলে—নে, এবার ঢুকে পড়। দাঁড়া আগে পা গলিয়ে দেখে নে। ধীরে-সুস্থে ঢুকবি—যেন এতটুকু শব্দ না হয়।

যুগলের কথা শুনে ঘামতে থাকে বাসু। তার শরীরের সমস্ত রক্ত যেন উত্তাল হয়ে ওঠে। মাথার কপালের শিরা টন্ টন্ করতে থাকে।

তাকে অভয় দেয় যুগল—ভয় নেই, আমি আছি। তোকে রেখে আমি পালাবো নি।

প্রায় এক রকম জোর করে ঠেলে তাকে ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয় যুগল।

কিছুক্ষণ পরে বাসু বেরিয়ে আসে সিঁধটার গর্ত্ত দিয়ে, তার হাতের জিনিসগুলো নিজের হাতে নিয়ে যুগল নাড়াচাড়া করে দেখতে থাকে। কয়েকটা থালা, বাটি, গেলাস—যুগল ফিসফিস্ করে বলে—ওই-ই ঢের। বেশ এনেছিস। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেগুলো নাড়াচাড়া করতে থাকে—টুং টাং শব্দ হয়। নিঃশ্বাস বন্ধ করে চুপ করে থাকে বাসু আর যুগল। যুগল বাসুর হাত ধরে টানতে থাকে। বলে—ছুটে চলে আয় শীগগীর, বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকিস্ নি। নিজের ডেরায় ফিরে যুগল তার দিকে পাঁচ টাকার একটি নোট বাড়িয়ে দেয়, বলে —এই নে তোর চিন্তার দাম, কিছু বেশীই দিলাম, মনে রাখিস্ কিন্তুক্। কিন্তু খবরদার একথা কেউ-কমনে জানতে না পারে। তার পর বাসনগুলো গুছিয়ে তৈরী হয়ে নিয়ে বলে—আমি চলনু, এগুলো আজ ভোরেই সরিয়ে ফেলতে হবে। তুই বাড়ী চলে যা ধীরে ধীরে।

হাঁটতে হাঁটতে তার পর বাড়ী ফিরে আসে বাসু। নিজের ট্যাঁকে টাকাটার উষ্ণ স্পর্শ নিতে নিতে একটা অজানা আতঙ্ক তাকে তাড়া দিয়ে নিয়ে আসে যেন। ঘরে ঢুকেও নিশ্চিন্ত হয় না সে।

সকাল হলেই যদি লোকে জানতে পারে, যদি তাকে ধরে পুলিসে। টাকাটা সে লুকিয়ে রাখে ঘরের এক

কোণে একটা কৌটোর ভেতরে। তার পর মেঝেতে মাদুর পেতে পারুলের পাশে শুয়ে পড়ে। পারুলের কোন সাড়া পাওয়া যায় না।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকে বাসু। ভাবনার তার সীমা থাকে না। এক রাতেই পাঁচটা টাকা, ভাবতেও রোমাঞ্চ হয় তার শরীরে। আনন্দে চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করে।

কালই সে মুন্সীর হাট থেকে কানাই ডাক্তারকে নিয়ে আসবে। সে ডাক্তার একটা ওষুধ দিলেই সেরে উঠবে পারুল।

পরদিন পারুলের জ্বর অনেকটা কমে। ঘুম ভেঙে সে বলে বাসুকে—কাল রেতের বেলা তুমি ছিলে নে ঘরে, কেনো?

চমকে ওঠে বাসু, কিন্তু সে এক মুহূর্তের জন্যে। পরক্ষণেই হেসে উড়িয়ে দেয় কথাটা—তুইও যেমন, জ্বরের ঘোরে কি যে দেখেছিস—হা-হা।

জোরে জোরে সে হাসে। পারুল বুঝতে পারে না এত হাসি কিসের বাসুর। কিন্তু সে আর কোন প্রশ্ন করে না। বাসু তাকে আদর করতে করতে বলে—ধর্মঠাকুরের গান শুরু হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সেরে ওঠ—চানের দিন তোকে নিয়ে যাবো মেলায়।

ছেলেমানুষের মত তাকে প্রলোভন দেখায় বাসু। ফিরিস্তি দেয়, কি কি জিনিস এবার সে কিনে দেবে পারুলকে। পারুল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। তার সে দৃষ্টি লক্ষ্য করে বাসু বলে—ও টাকার কথা ভাবছিস তুই? দূর—টাকা যোগাড় হয়ে যাবে কমনে থেকে দেখবি'খন।

তার পর উঠে দোকান ধারে চলে যায় বাসু। চায়ের দোকানে গিয়ে বসে। একই কথা সকলের মুখে শুনতে পায়—ধর্মঠাকুরের মেলাটা এবার এখনও জমলো নি তেমন। আর মাত্র দু'দিন বাকী স্নানের। আরও একটা কথা সকলে বলাবলি করে—এবার ধর্মঠাকুরের ভর হ'ল নি কারুর ওপর। অথচ অন্যান্য বছর প্রত্যেক বারই প্রায় ঠাকুরের ভর হয় কারুর ওপর। যে বছর হয় না সে বছর, সকলেই ধরে নেয় দুঃখকষ্টের সীমা থাকবে না দেশের। দেশ শ্মশান হয়ে যাবে। অমন জাগ্রত দেবতা এ অঞ্চলে আর একটিও নেই।

[illegible] আলাপ-আলোচনা করে—কবে কার ওপর ধর্মঠাকুরের [illegible] হয়েছিলো। নিজের চোখেই ত ওরা দেখেছে—পরেশ মণ্ডলের বৌকে। যেন ভূতে পেয়েছিলো তাকে—পাগলের বিবস্ত্র মত প্রায় হয়ে লাফালাফি করেছিল—ঠেকিয়ে রাখা যায় নি। তার পরই হঠাৎ শান্ত হয়ে গেলো। তাকে নিয়ে যাওয়া হ'ল ধর্মঠাকুরের মন্দিরে—দেশ বিদেশ থেকে লোক হুমড়ি খেয়ে পড়ল যেন সেখানে। হত্যে হয়ে পড়ে রইলো দেবতার আশীর্বাদ পাবার জন্যে।

ঠিক এমনিই হয়েছিলো জীবন সামন্তর ছেলে পঞ্চুর। তাকেও ওঝা এসে দেখে অনেক মন্ত্র পড়ার পর বলে-ছিলো, কে তুই?

সে বলেছিলো হাসতে হাসতে—আমি ধর্মঠাকুর।

আর সকলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বলে বাসু—হবে নে, সাক্ষাৎ জাগ্রত দেবতা বলে কি আর সাধে!

দিনের বেলায় ঘরে এসে নিজের হাতে রান্না করে। পারুলকে সাবু, মিছরি জল করে খাওয়ায়। তার পর নিজে খেতে বসে। দুপুরটা গল্প করে কাটায় পারুলের সঙ্গে। বিকেলে বেরিয়ে যায় আবার ধর্মঠাকুরের মেলায়।

মনসা মালিকের আড্ডায় গিয়ে তাড়ি খায়, খুব বেশী খায় না। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঝিম-মেরে বসে থাকে। ধর্মঠাকুরতলায় গান শেষ হয়ে যায়, মেলা নিস্তব্ধ হয়ে যায়। তার পর ওঠে বাসু বাড়ী ফিরবার জন্য। মন্দিরের কাছটা এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় বাসু—মন্দিরের দরজাটা খোলা দেখে। হঠাৎ কি খেয়াল হয় আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে ঢুকে পড়ে ভেতরে। বিগ্রহের গা থেকে ক'টা অলঙ্কার খুলে নিয়ে বেরিয়ে আসে। এসেই পাগলের মত ছুটতে থাকে। এসে থামে মাকালতলায়, আবার ছুটে যায় বাড়ীতে। অন্ধকারে নিঃশব্দে ঘরের কোণ থেকে শাবলটা নিয়ে আবার মাকালতলায়। মাটি খুঁড়তে থাকে গাছের গোড়ায়, উত্তেজনায় সর্বাঙ্গ তার কাঁপতে থাকে থর থর করে। কোন রকমে অলঙ্কার-গুলো গর্তের মধ্যে রেখে দিয়ে মাটি চাপা দেয়, ঘাসের চাপড়া কিছু চাপিয়ে দেয় তার পর।

ঘরে ফিরে এসে ভাবতে বসে—এ কি করলো সে। কেন করলো, মাথায় হঠাৎ কোন ভূত তার চেপেছিলো! সারারাত্রি তার দু চোখে ঘুম আসে না। কেবলি মনে হয় ধর্মঠাকুর জাগ্রত দেবতা, ক্ষমা করবেন না বাসুকে। তার ইচ্ছে করে ছুটে কোথায় চলে যায়—অনেক দূরে—যেখানে কেউ তার নাগাল পাবে না। বিছনায় শুয়ে শুয়ে ছটফট করে বাসু। ঘরের কোণে রাখা লণ্ঠনটা জ্বালে। পারুল পাশ ফিরে শোয়, সেই শব্দে চমকে

উঠে আলোটা সঙ্গে সঙ্গেই নিভিয়ে দেয় বাসু। ঘামতে থাকে অবিরত যেন।

একবার ভাবে, এখনও রাত অনেক বাকী। সে গয়নাগুলো নিয়ে ঠাকুরের গায়ে আবার পরিয়ে দিয়ে আসে। মন্দিরের দরজা নিশ্চয়ই খোলা আছে এখনও। কিন্তু যদি ধরা পড়ে যায়। যাক তার চেয়ে যা হবার হোক সে আর ভাবতে পারে না।

কিন্তু ভাবতে তাকে হয়ই।

পরদিন সকালবেলা বিকট অট্টহাসি হেসে পাগলের মত দাওয়ায় মাথা খুঁড়তে থাকে বাসু। পাড়ার লোক ছুটে আসে, ভিড় করে দাঁড়ায়। চোখ দুটো লাল, কপালের খানিকটা কেটে রক্ত গড়াচ্ছে, সমস্ত মুখখানা তার বিভৎস দেখায়। খবর পেয়ে অনেকেই ছুটে আসে। সমস্ত ব্যাপার দেখে তাদেরই কেউ ডেকে নিয়ে আসে কালী গুণিনকে।

তাই দেখে পারুল কান্নায় ভেঙে পড়ে। লোকে বলাবলি করে—রেত-বিরেতে কোথায় কমনে অপদেবতা ভর করেছেন, কে জানে।

গুণিন বলে রোসো না দাদারা সবাই। দেখি কেমন অপদেবতা। আমার হাতে পড়েছেন য্যাখন ত্যাখন আর অক্ষ্যে নেই। এই আমি বলে দিনু।

ইষ্টমন্ত্র স্মরণ করে কাজ শুরু করে গুণিন। তাল গাছের গুঁড়িতে বেঁধে রাখে বাসুকে। আশশ্যাওড়ার ডাল দিয়ে বেদম মার দেয়। যন্ত্রণা-বিকৃত মুখ করে সহ্য করে বাসু। কালী জিজ্ঞাসা করে—কে, কে তুই বল শীগ্‌গির। বাসুর পরে ভর করেছিস কে?

—আমি ধর্মঠাকুর।

লোকে ফিস ফিস করে পরস্পরের মধ্যে। গুণিন তবু বলে—প্রমাণ দাও তবে, বললেই আমি শুনবো - তুমি তবে এই জলভর্তি ঘড়াটা দাঁতে করে তুলে নিম গাছটার গোড়ায় ফেলে এসো দিকি। তবে বুঝবো তুমি ধর্মঠাকুর।

রক্তচোখে তার দিকে তাকায় বাসু। বলে, বেশ, বাঁধন খুলে দাও তবে।

বাঁধন খুলে দেওয়া হয় তার। বিনবাক্যব্যয়ে বাসু ঘড়াটা অবলীলাক্রমে নিমগাছের গোড়ায় দাঁতে করে নিয়ে ফেলে আসে। বলে—কেমন, বিশ্বাস হ'ল? আমি ধর্মঠাকুর—হা-হা—প্রবল হাসিতে ফেটে পড়ে সে। কালী গুণিন ছুটে এসে এবার তার পায়ে পড়ে বলে—অপরাধ নিও নি ঠাকুর, আমরা সব মুখ্যু মানুষ।

তার পর সে ফিরে জনতাকে উদ্দেশ করে বলে ওরে তোরা শাঁখ বাজা, উলু দে ধর্মঠাকুর এসেছেন তোদের ঘরে।

কাঁসর ঘণ্টা শাঁখের আওয়াজ আর উলুধ্বনিতে ভরে ওঠে স্থানটা। বাসুকে সকলে বসায় দাওয়ার ওপর সুদৃশ্য আসন পেতে। তার পায়ের ধুলো নেবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠে সকলেই। বাসু নির্বিকার হয়ে বসে থাকে।

খবরটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে দাবানলের মত। ধর্ম-ঠাকুরের প্রধান সেবাইত বদন পণ্ডিত ছুটে আসে। বাসুর পা দুটো জড়িয়ে কাঁদতে থাকে। তার দু'চোখ দিয়ে সত্যি জল গড়িয়ে পড়ে। তার পর বলে, কিন্তু ঠাকুর তোমার অলঙ্কার কোন পাষণ্ড চুরি করেছে বল ঠাকুর। নইলে মহাপাতক হবে আমার।

বাসু সস্মিত মুখে বলে—বলছি শোন। যে নিয়েছে সে ফিরিয়ে রেখে গেছে আবার। তোমরা খোঁজো।

কোথায় আছে বলো ঠাকুর, বল, কান্নায় আকুল হয়ে ভেঙে পড়ে বদন পণ্ডিত।

একটু থেমে বাসু বলে—মাকালতলায় মাটির নীচে।

আর একবার কাঁসর-ঘণ্টা বেজে ওঠে। বদন পণ্ডিত ও আরো কয়েকজন ছুটে যায় শাবল হাতে মাকাল-তলায়। বাকী সকলে ভক্তি গদগদ হয়ে ঘিরে থাকে বাসুকে।

মুখে একটা প্রশান্তির হাসি ফুটিয়ে পাথরের মূর্তির মত বসে থাকে বাসু।

বিপ্লবীর জীবন-দর্শন

প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী

১৩

পিতৃদেবের প্রভাব যে কেবল প্রত্যক্ষ ছিল তা নয়। পরোক্ষ ভাবেও কত সোপান রচিত হয়েছিল তা আজ সঠিক বলতে পারব না। তার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে উপাসনায় যোগ দিয়ে শুনতে পেতাম কত ভাল ভাল কথা—চরিত্রগঠন, মনুষ্যত্বলাভ, পরসেবা এবং নানাপ্রকার কুসংস্কার-বিরোধী উপদেশ। আজও মনে আছে, শুনতে কত ভাল লাগত। জাতিগঠন, তেজস্বিতা, নির্ভীকতা, সত্যের জয়, পুরুষকার সম্বন্ধে আচার্যগণের উপদেশর প্রভাব বিপ্লবের পথে চলতে গিয়ে পদে পদে অনুভব করেছি। তখন শুনেছিলাম উপনিষদের মন্ত্র।

অসতো মা সদগময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যু মাং মৃতর্গময়

শুনতাম বেদমন্ত্র—

"আনন্দ রূপমমৃতং যদ্ বিভাতি"
"আনন্দ ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন্"

তার পর উত্তর জীবনে এসেছে ঝঞ্ঝা, মৃত্যুর তাণ্ডব-নৃত্য, কারাগারের ভীষণতা, কিন্তু কেন জানি না, ঐ সব মন্ত্রের প্রভাব মনে শক্তির দৃঢ়তা দিয়ে যেত। জীবন-মৃত্যুর প্রলয়লীলায় মেতে মনে হ'ত সত্যের সন্ধান পেয়েছি; অন্ধকার নিশীথে আলোর রেখা দেখতে পেয়েছি, মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের আস্বাদ পেয়েছি। মনে পড়ত তাদের প্রিয় ঈশোপনিষদের শ্লোক:

ঈশাবাস্য মিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগত
ত্যাগ ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা, মাগৃধ কস্যচিৎ ধনম্।

কি গভীর শক্তি লুকিয়েছিল এই কথাগুলির মধ্যে। ভগবান সর্বব্যাপী। যা কিছু সবই তিনি আচ্ছন্ন করে আছেন। ত্যাগী হয়ে ভোগ কর—পরধনে লোভ কর না। এই সমস্ত মন্ত্র-শ্লোকে আর কাদের কি হয়েছে জানি না, কিন্তু বিপ্লবী যুবকরা মনে শক্তির সঞ্চার অনুভব করত; সর্বজীবের মঙ্গলসাধনে অনুপ্রাণিত হ'ত, ত্যাগের মধ্যেই ভোগের সন্ধান লাভ করে নিস্পৃহ হয়ে কর্মে নিবৃত্ত হ'ত। এ সমস্ত শ্লোকের অপরূপ ব্যাখ্যা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। ছেলেবেলাতেই তাঁর ধর্মসম্বন্ধীয় রচনাবলী পাঠ করে সবিশেষ আনন্দ পেতাম।

প্রসিদ্ধ ব্রহ্মাচার্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ছত্রসমাজে একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেটা বোধ হয় পরে 'জাতীয় উন্নতির উপাদান' নামে পুস্তকাকারে ছাপা হয়েছিল। নির্ভীকতা, ত্যাগ, নিষ্ঠা, সময়ানুবর্তিতা, অনমনীয় দৃঢ়তা, কত কথাই তাতে ছিল। বিশেষ করে মনে পড়ে—অন্যায়ে অসহিষ্ণু হও, একতাবদ্ধ হও, জাতির কাহারও উপরে অন্যায় অত্যাচার হলে তীব্র জ্বালা অনুভব কর। অদৃষ্টের উপর দোষ দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকার কুফল বোঝাতে গিয়ে তিনি একটা গল্প বলেছেন—এক দরিদ্র মুচিকে কেউ তার অবস্থা ফেরাবার চেষ্টার কথা বললে সে বলত—"রামজী যো লিখনা করে, সোত হইবে করে।

এটাকে শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের জাতীয় চরিত্রের দোষ বলে আখ্যা দিয়েছেন। অতি সহজে বিদেশীকে বিশ্বাস করে পরনির্ভর হয়ে থাকা যে কতখানি অনিষ্টকারী তা বলতে গিয়ে তিনি উইলিয়াম ষ্টিডের (William Stead) উক্তি উল্লেখ করতেন। তিনি শাস্ত্রী মহাশয়কে বলেছিলেন, "তোমরা বিশ্বাস-প্রবণ জাতি" (you are a believing race)। এই ষ্টিড সাহেব ছিলেন বিলাতের রিভিউ অফ রিভিউ পত্রিকার সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক। এই মনীষী আরও বলেছিলেন, "বিদেশীরা তোমাদের মঙ্গলের জন্যই শুধু তোমাদের দেশ শাসন করছে, তোমাদের যাতে ভাল হয় তা সব তারাই করে দেবে—এ সব তোমরা বিশ্বাস করে বসে আছ। তোমাদের উন্নতি হবে কি করে?" তাইত শাস্ত্রী মহাশয় বলতেন যে পরনির্ভরশীলতার মত দুষ্ট ব্যাধি জাতীয় দেহ থেকে বিদূরিত করতে না পারলে আমাদের নিস্তার নেই।

শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা বা উপদেশ শোনার সৌভাগ্য আমার খুব বেশী হয় নি। তথাপি ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে উপাসনারত ঋষিতুল্য শাস্ত্রী মহাশয়ের শান্ত-সমাহিত মূর্তি আজও চোখে ভাসছে। সেই ছেলেবেলায় ব্রাহ্ম-সমাজে যেতাম, তার পর আর বড় যাই নি। কিন্তু

কেবল শাস্ত্রী মহাশয় কেন, সমস্ত আচার্যগণের শুভ্র বসন পরিহিত শান্ত-সমাহিত শুদ্ধ মূর্তি আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। তাঁদের কণ্ঠে—

সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম
শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি

আজও কানে ধ্বনিত হয়। মহাজ্ঞানী মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের ধ্যানলব্ধ এই সব বেদমন্ত্র শুধু অবাস্তব আধ্যাত্মিক জগতের কথা মনে হতে পারে, কিন্তু এই সব অমোঘ বাণী বৈপ্লবিক জীবনে সমস্ত ক্ষুদ্রতার উর্দ্ধে চিত্ত প্রসারিত করেছে—যে বিপ্লবী সে নিজেকে সকলের মধ্যে এবং সকলকে নিজের মধ্যে দেখবে। কুসংস্কার-বর্জ্জিত যুক্তি-বাদী এই ব্রাহ্মধর্ম আমার জীবনে বার বার পথ দেখাতে সহায়ক হয়েছে।

অবশ্য কেবলমাত্র ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবই আমার বাল্য-কৈশোরের সব তা নয়। আমার মাতৃদেবী ছিলেন আচারনিষ্ঠ তান্ত্রিক গুরুবংশের মেয়ে। তাঁর প্রভাবে বাড়ীতে পূজার্চনাও হ'ত। সুতরাং এই দুই ধার্মিক আবহাওয়ার মধ্যে আমি কাটিয়েছি বালক ও কিশোর হিসেবে।

১৪

ছেলেবেলার কথা বলতে গিয়ে পাঠশালার কথা একটু না বলে পারছি নে। পাঠশালাতেই আমার নিম্ন-প্রাইমারী পরীক্ষা পর্যন্ত কাটে। কারণ আমার পিতৃদেবের ধারণা ছিল যে, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজী স্কুলের চাইতে প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিই শ্রেয়।

পারিবারিক জীবনযাত্রার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হিসাব—মাসমাহিনা, জমিজমা, দরকষা, সুদকষার, শুভঙ্কর-রীতি পাঠশালায় শেখান হ'ত। এর ফলে পাঠশালার ছেলেদের দেখতাম বাজারে গিয়ে যেসব দুরূহ হিসাব অতি সহজেই মুখে মুখে করে নিত তা সমাধান করতে কলেজে পড়ুয়াদেরও কাগজ-কলম প্রয়োজন হ'ত। পত্রলেখা যা শেখাবার জন্য আজকাল কত উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা আছে তা পাঠশালাতেই শেখাম হ'ত। দরখাস্ত লেখা, জমি-বন্দোবস্তের দলিল, টাকা ধার করবার তমঃশুক সবই শিখতে হ'ত পাঠশালার ছাত্রদের।

অধিকাংশ মানুষই ছিল কৃষিজীবী। মুদি, মনোহারী আর কুসিদজীবী এদের নিয়েই সমাজজীবন। ব্যাঙ্কিং বা শিল্পজগতের জটিল হিসাব-নিকাশ তখন প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং কালানুযায়ী জীবন-যাপনের মত বিদ্যা পাঠশালাতেই ছেলেরা পেত।

এ ছাড়া সংস্কৃত টোল থাকত। ব্রাহ্মণরাই বহু বৎসর ধরে টোলে পড়ত। সর্বসাধারণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার অধিক যাওয়ার প্রয়োজনবোধ হ'ত না—সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণই অবশ্য এমনি বোধের কারণ। আজও ঢাকা এবং অন্যান্য মফঃস্বল শহরে পাঠশালাগুলি বর্তমান আছে। তবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের ফলে পাঠশালার শিক্ষাপদ্ধতিও দ্রুত বদলে যাচ্ছে।

আমি যে পাঠশালায় পড়তাম তা বসত নারায়ণগঞ্জ শহরে রামকানাই-এর আখড়ার চণ্ডীমণ্ডপে। পণ্ডিত ছিলেন চন্দ্রকান্ত মজুমদার। তিনি একাই সবাইকে পড়াতেন। বাংলা, অঙ্ক, হাতের লেখা, নামতা মুখস্ত সবই একই সঙ্গে চলছে এবং সঙ্গে চলছে বেতখানা। প্রতিদিন দু'একখানা নূতন বেত প্রয়োজন হ'ত। ছাত্র-দের কাছে পণ্ডিত ছিলেন যমতুল্য। ছেলেরাই সুর করে ছড়া বেঁধেছিল—"চন্দ্রকান্ত বড় শান্ত, চেতলে বড় দুরন্ত।" বাকিটা আমার আর আজ মনে নেই।

গালাগালি, স্কুল পালিয়ে তামাক খাওয়া, বই-স্লেট-পেন্সিল চুরি, মারামারি, উচ্চৈস্বরে নামতার সুর, পণ্ডিতের ধমক সব মিলে একটা হট্টগোল সব সময়ই লেগে থাকত। শাস্তির বিচিত্র ব্যবস্থা ছিল। দু'পা যতটা সম্ভব ফাঁক করে দাঁড়িয়ে কপালে একটা চাড়া কিংবা নুড়ি দিয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে হ'ত। পড়ে গেলে তার ওপর নিদারুণ বেত্রাঘাত হ'ত। অনেক সময় অপরাধের গুরুত্ব হিসেবে পূর্ববর্ণিত অবস্থার সঙ্গে দু'হাতে দু'খানা থান ইট নিয়ে দাঁড়াতে হ'ত। কারুর ভাগ্যে জুটত দু'পায়ের নীচ দিয়ে হাত চালিয়ে মাথা নীচু করে দু'কান ধরে থাকা। এক পায়ে দাঁড়ানো, চেয়ার নেই, কিন্তু চেয়ারে বসবার মত ভঙ্গি করা, এমনি আরও কত যে নিষ্ঠুর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল তার আজ আর সব মনে নেই। বাড়ীতে পণ্ডিতের বিরুদ্ধে নালিশ করেও কোন লাভ ছিল না, উপরন্তু অভিভাবকের কাছেও তার জন্য শাস্তি পেতে হ'ত। অবশ্য আমি এবং আর এক মোক্তারের ছেলে আলাদা বসতাম এবং পণ্ডিতের উপর নির্দেশ ছিল, তিনি যেন স্বহস্তে শাস্তি না দিয়ে অভিভাবকদের গোচরে আনেন আমাদের দোষত্রুটি।

আপাততঃ এমনি নিষ্ঠুর মনে হলেও দেখেছি কি গভীর স্নেহধারা তাঁর অন্তরে বইত। শুধু যে ছাত্ররাই অকৃত্রিম শ্রদ্ধা করত তা নয়; পণ্ডিতমহাশয়ের ছিল সমস্ত অভিভাবক এবং তাদের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। অনুন্নত শ্রেণীর পিতামাতারা পণ্ডিত-মহাশয়কে শুধু শ্রদ্ধা করতেন না, তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা

প্রকাশ করতেন শিক্ষাদাতা বলে। স্কুলের বেতন সকলের সব সময় দেওয়ার সাধ্য হ'ত না। তবু সামান্য কিছু দ্রব্য দিলেই পণ্ডিতমহাশয় খুশী থাকতেন। ছেলেদের অসুখ-বিসুখ করলে ত কথাই নেই, তাদের বাড়ীর কারুর অসুখ কিংবা বিপদ-আপদের সংবাদ পেলে তিনি ছুটে যেতেন সহানুভূতি জানাতে, আধুনিকতা ঘেঁষা মৌখিকতা ছিল না।

আজ কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে শিক্ষক-ছাত্রদের মধ্যে গুরু-শিষ্যের স্নেহময় সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। খুব বেশী হলে বলতে পারা যায় মিত্রবৎ। অবশ্য মিশনারী পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে অবস্থা একটু ভাল এদিক থেকে। বর্তমানে শিক্ষকরা পড়ায়, ছাত্ররা শোনে। ছেলেরা বেতন দেয়, শিক্ষক বেতন পান। বিদ্যালয়গুলি বিদ্যাপণ্য বেচাকেনার বাজার মাত্র। বাজার ভাঙ্গলে ক্রেতা-বিক্রেতার সঙ্গে কোন সম্পর্কই থাকে না।

পাঠশালাগুলি ছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজেরই একটা অংশ। দেশে রাজা সর্বশক্তিমান। গৃহে পিতামাতা বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। আর পাঠশালায় ছিলেন পণ্ডিত সর্বেসর্বা। তাঁর কথাই আইন। তাই তাঁরই ছিল শাসন, রক্ষা ও স্নেহ করার অধিকার। কিন্তু আজকের শিল্পভিত্তিক তথা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের যুগে ভূমি অধিকার গত আভিজাত্যের স্থানে টাকার আধিপত্য সর্বত্র। পয়সাওলারাই আজ সর্বত্র কর্তৃত্ব করছে। সুতরাং সমাজদেহের সর্বত্র এমনকি শিক্ষাক্ষেত্রেও একটা কেনাবেচার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে শিক্ষক ও শিক্ষিতের মধ্যে।

১৫

শুধু যে পাঠশালাতেই পড়েছি এবং ব্রাহ্মসমাজে গিয়েছি তা নয়, খ্রীশ্চিয়ান মিশনারীদের পরিচালিত সাণ্ডে স্কুলেও (Sunday School) নিয়মিত যেতাম। দেশীয় খ্রীষ্টানদের জন্য প্রতি রবিবার সকালে স্কুল বসত। একজন ইংরেজ ধর্মযাজক নানা গল্পচ্ছলে ধর্মোপদেশ দিতেন এবং বাইবেল পড়াতেন। তিনি মানুষ হিসেবে খুবই ভাল ছিলেন। সবার সঙ্গে যেমন তিনি অসঙ্কোচে মিশতেন তেমনি কোন ধর্মের নিন্দাও তার মুখে কোনদিন শুনি নি। যে সমস্ত খ্রীষ্টান পাদ্রী রাস্তায় ভিড় জমিয়ে বক্তৃতা করত তার সঙ্গে এই স্কুলের পাদ্রী সাহেবের ছিল আকাশ-পাতাল প্রভেদ। এদের কথাও রাস্তায় দাঁড়িয়ে অনেক শুনেছি। কত ঠাট্টা, তামাসা এবং লাঞ্ছনা সহ্য করতে হতো এদের তার আর অন্ত নেই। কেন জানি না আমার মনের কোণে এদের জন্য একটু মমতার ছোঁয়াচ ছিল যার ফলে এদের বিদ্রূপাংশে ভিড়ের সঙ্গে কখনও যোগ দিতে পারতাম না। উত্তর জীবনে দেখেছি এরা পেটের দায়ে স্বধর্ম ত্যাগ করে একান্ত বাধ্য হয়েই অদ্ভুত পোশাক-আশাক পরিধান করে নানান সুরে গান গাইছে, বক্তৃতা করছে।

সাণ্ডে স্কুলের পাদ্রী ছিলেন একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নির্যাতিত জনসাধারণের মনে জাগে একটা স্বাভাবিক বিদ্বেষ। এর তীব্রতা কিন্তু এই সাহেবকে দেখলে একেবারে লোপ পেত। যীশুর নির্মল মানবপ্রেম, আত্মত্যাগ, শাসক-শক্তির অকথ্য অত্যাচারের মধ্যেও অনমনীয় চরিত্র দৃঢ়তার দৃষ্টান্ত দিয়ে নিজেদের চরিত্র গঠন করতে যেসব উপদেশ দিতেন তা শুনতে আমার খুবই ভাল লাগত। আজও মনে পড়ে যীশুর ক্রুশ-বিদ্ধ অমর চিত্র সামনে রেখে যখন তাঁর জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করতেন, তখন আমার চোখ জলে ভরে আসত, শরীরে লাগত রোমাঞ্চ। মহামানবের অপূর্ব চরিত্র মনের পাতায় পাতায় অনপনেয় চিহ্ন রেখে যেত। ভবিষ্যৎ বিপ্লবী জীবনে আত্মত্যাগ করতে ও অত্যাচারীর সম্মুখে সত্যের জয় ঘোষণা করতে মনকে অনুপ্রাণিত করত। শত লাঞ্ছনার মধ্যেও প্রাণে শক্তি-রক্ষায় সাহায্য পেতাম। এই জন্যই বোধ হয় বিদেশী খ্রীষ্টান রাজত্বে বাস করেও তাদের ধর্মগুরুকে মহামানব বলে স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠা হয় না। এবং তার প্রচারিত ধর্মকে ছোট বলে ভাবতে পারি নি। কেননা অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার যেন প্রতীক এ।

সাণ্ডে স্কুলে অধীত বাইবেল পরীক্ষা দিয়ে পাস করেছিলাম। দশ আজ্ঞা (Ten Commandments) প্রায়ই মনে পড়ত। বিশেষ করে মনে হ'ত, প্রতিবেশীকে আপনভাবেই ভালবাস (Love Thy Neighbours as Thyself)। বিসয়ী লোকের পক্ষে বাস্তব জীবনে কায়-মনোবাক্যে একে গ্রহণ করা কতখানি সম্ভব বলতে পারি নে, কিন্তু বিপ্লবী জীবনে এই উপদেশ পরদুঃখ মোচনে ও আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করত। ভালবাসা ও ত্যাগ অবিচ্ছেদ্য। মানুষকে ভাল না বাসলে কেউ মানুষের জন্য আত্ম-বিসর্জন করতে পারে না।

আজ কিন্তু একটা প্রশ্ন মনে জাগছে—যেখানে স্বার্থের সংঘাত, শ্রেণীস্বার্থের বিরোধ সেখানে ব্যক্তি-শ্রেণী-নির্বিশেষে নিঃস্বার্থ ভালবাসা স্বাভাবিক কি না! যে ব্যবস্থায় শ্রমিককে তার ন্যায্য পাওনা দিলে মালিকের লাভের অঙ্কে কমতি পড়ে, চাষী মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জমিতে ফসল ফলিয়ে মালিকানা দাবি করলে জমিদারের

গোলা শূন্য থাকে, অর্থাৎ যেখানে পরকে বঞ্চিত করতে না পারলে নিজের তহবিল পূর্ণ হয় না সে সমাজে Love Thy Neighbours as Thyself কথার কথাই থেকে যায়। অবশ্য কোন একজন মানুষ ব্যক্তিগতভাবে পরের সেবায় সর্বস্ব দান করতে পারেন, কিন্তু তিনি সমাজে ব্যতিক্রম বলেই পরিগণিত হ'ন। তাঁর ব্যক্তিগত দানে, সেবায় দাক্ষিণ্য আছে, মমত্ববোধও হয়ত আছে, কিন্তু তাতে মানুষ হিসেবে মানুষের দাবির স্বীকৃতি ন্যায্য অধিকার মেনে নেওয়ার মনোবৃত্তি কতখানি আছে তা বলা শক্ত। যাদের শোষণ করে আমি পুঁজিপতি হয়েছি, সাময়িক উত্তেজনার বশে, পরকালে স্বর্গলোকে বা ইহকালে যশের আকাঙ্ক্ষায় অথবা অন্য কোন ক্ষণ-স্থায়ী উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সেই শোষিত জন-গণকে সর্বস্ব দান করে ফেলতে পারি। কিন্তু এতে সামগ্রিক ভাবে মানুষের মঙ্গল হয় না। সমাজ-ব্যাধির মূলে যে ব্যবস্থা লুকিয়ে আছে তা অপসারণের দিকে দৃষ্টি নিপতিত না হয়ে ধর্ম বা পুণ্য লাভের ক্ষণিক ধাঁধায় মানুষ বিভ্রান্ত হয়।

(১৬)

যদিও ইংরেজ বিদ্বেষভাব স্বদেশী যুগের কিছু আগে থেকেই লোকের মনে স্পষ্ট হতে সুরু হয়, মিশনারীদের উপর বিরূপভাব ছিল বহু বছর আগে থেকেই—বোধ হয় ব্রাহ্ম সমাজের অভ্যুত্থানের সময় থেকেই। তার পর হিন্দুর পুনর্জাগরণ (Hindu Revivalist) আন্দোলনের সময় হতেই এ তীব্ররূপে দেখা দেয়। রুশ-জাপান যুদ্ধে এবং বুয়র যুদ্ধের ফলেও কতকটা শ্বেতাঙ্গদের উপর অবজ্ঞার ভাব দেখা দেয়। এ প্রসঙ্গ যথাস্থানে আলোচনা করব।

নারায়ণগঞ্জে কিন্তু মিশনারী বিদ্বেষ তেমন কিছু ছিল না। এ শহরের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি ছিল পাটের ব্যবসায়ে। শ্বেতাঙ্গরা ছিল তার সর্বময় কর্তা। শহরের আর্থিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হ'ত তাদেরই দ্বারা। তৎকালীন মিশনারী পাদ্রী সাহেব ছিলেন সত্যিকারের মানবপ্রেমিক। তা ছাড়া আমরা গণ্যমান্য লোকের সন্তানেরা সাওে স্কুলে যেতাম। এ সব কারণে মিশনারীদের বড় কেহ একটা বিরুদ্ধাচরণ করত না।

তবে এ অবস্থা বেশীদিন চলতে পারে নি। আমি যখন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র তখন আমাদের শিক্ষক ক্লাশে মিশনারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় মন্তব্য করেন এবং আমাদিগকে সাওে স্কুলে যেতে নিষেধ করেন। তিনি বলেছিলেন এমনি আচরণ স্বধর্ম-বিরোধী এবং জাতীয়তার পরিপন্থী। সেদিন কথাটা খুব ভাল লাগে নি এবং অতি অনিচ্ছার সঙ্গেই সাওে স্কুলে যাওয়া ধীরে ধীরে বন্ধ করতে লাগলাম। পরে অবশ্য স্বদেশী আন্দোলনের আবর্তে পড়ে সেদিনকার শিক্ষক মহাশয়ের কথা যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছিল।

তবে এই মিশনারী বিদ্বেষ অনেক সময়ই সীমা লঙ্ঘন করত এবং এমন একটা ঘটনা ঘটল যার ফলে মনে তীব্র ব্যথা অনুভব করেছিলাম। পাদ্রী সাহেবের স্ত্রী হিন্দু পাড়ায় মাঝে মাঝে বেড়াতে আসতেন। একদিন তিনি আমাদের বাড়ীতে এলেন তার শিশুসন্তানকে নিয়ে। আমার মা তাকে যত্ন করে বসালেন এবং শিশুকে কমলা-লেবু দিলেন। এ কাজ পাড়ার লোকের মনঃপূত হয় নি। কারণ তাদের বাড়ি গেলে তারা এই ইংরেজ মহিলার প্রতি অসৌজন্য ব্যবহার ত করতই এমনকি বসতেও বলত না। সুতরাং আমার মাতৃদেবীর এবংবিধ আচার জাতীয়তা-বিরোধী বলে প্রচার করে আমাদের বিরুদ্ধে অসন্তোষের আবহাওয়া সৃষ্টি করতে লাগল। কথা চলল আমাদের বয়কট করবার। পাড়ার সঙ্গী-সাথী এবং যুবকরা আমাকে বিদ্রূপ করতে লাগল। যদিও অন্যায়টা পরিষ্কার কিছুই বুঝতে পারি নি কিন্তু মনে আছে লজ্জায় কয়েক দিন বাসা থেকে বার হই নি।

এ অবশ্য প্রথম স্বদেশীভাব-উদ্দামতার উচ্ছৃঙ্খলতা মাত্র। পরবর্তী কালেও যে, ছেলেমানুষী ইংরেজ বিদ্বেষ লক্ষ্য করিনি তা নয়। সর্ব্বত্যাগী স্বদেশপ্রেমিক থেকে সুরু করে যারা কস্মিনকালে কোনরূপ বিপদ্‌জনক কাজে হাত দিত না তাদেরও কারুর কারুর মধ্যে এমনি ভাবের বিকাশ দেখে কৌতুকবোধ করেছি। পুরাতন আইন-সভায় (Legislative Assembly) দেখেছি ইংরেজ সভ্যদের প্রতি অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টি এবং ঘৃণাব্যঞ্জক বাক্য-বাণ। ওরা হলো প্রবলপ্রতাপশালী ইংরেজের প্রতিভূ। আর আমরা দুর্বল নিরুপায় দেশীয় সভ্য। এর ফলে কারুর কারুর মনে যে হীনতাভাব বিরাজ করত তারই অক্ষম প্রকাশ এই গায়ের ঝাল মেটানোর মধ্যে। মনে মনে তখন যেমন দুঃখ পেয়েছি, হাসিও পেত কম না। বাক্-সর্বস্ব লোকের নিষ্ফল ক্রোধ বড় করুণ।

অসৌজন্য এবং অভদ্র আচরণ দুর্বলতা বলেই বিপ্লবীরা মনে করত। তারা আরও জানত যে শত্রু-মাত্রই ঘৃণ্য নয় বা অবজ্ঞার পাত্র নয়। তবে আত্মমর্যাদা ও কৃষ্টি প্রভাবহীন বিপ্লবী-নামধারী যে ছিল না তা নয়। তবে তারা ব্যতিক্রম বলেই পরিগণিত।

আজ ভারতের বিপ্লবীরা সমাজতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত। অবশ্য উগ্র স্বদেশপ্রেমিকরা ভিন্ন-মত পোষণ করেন। সমাজতন্ত্রের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে এ আদর্শে জাতিবিদ্বেষ থাকতে পারে না। সমাজতন্ত্র ভৌগোলিক সীমারেখা অতিক্রম করে গোটা মনুষ্যসমাজকেই একই বন্ধনে আবদ্ধ করে। অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে মানুষের মধ্যে যে শ্রেণীচেতনা জাগ্রত হয় তা কোন দেশেরই সীমারেখায় এসে থেমে যায় না। পৃথিবীব্যাপী সমস্ত ধনীদের স্বার্থ মূলতঃ একই। শ্রমিক-কৃষকের বেলাতেও একই কথা খাটে। সেজন্যই তাদের শ্লোগান—"Proletarians of all lands unite." ভারতীয় কিংবা ইংরেজ শ্রমিকের মধ্যে প্রকৃত স্বার্থের কোন সংঘাত নেই। এক অন্যের প্রতি বিদ্বেষহীন। সুতরাং ভারতীয় বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিকদের মধ্যে জাতি-বিদ্বেষ, এমনকি ভূতপূর্ব শাসক ইংরেজের উপরও বিদ্বেষ নেই। যারা শোষণ, উৎপীড়ন আর অত্যাচার করে তাদের কবল থেকে মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ করে রক্ষার জন্যই বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিকরা দৃঢ় মাত্র। সুতরাং শুধু যে জাতি হিসেবে তারা ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষহীন তা নয়, তারা ইংরেজ জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন একাত্মভাবাপন্ন। এ আলোচনা এখানেই থাক্।

ছেলেবেলার কথা বলতে গিয়ে আমাদের গৃহ-ভৃত্যদের কথা—বিশেষ করে সীতানাথ, দেবেন্দ্র (ওরফে দেবা) ও রাধানাথ, উল্লেখ না করলে আমাদের পরিবার তথা সেকালের সমাজজীবনের একটা চিত্র উহ্য থেকে যাবে। এদের প্রায় সকলের—প্রধানতঃ দেবার কোলে-পিঠেই মানুষ হয়েছি বলতে পারি। আমার এই বুড়ো বয়সেও সীতানাথ ও দেবা আমাকে তুই বলে সম্বোধন করেছে। অবশ্য কৌতুকভরে লক্ষ্য করেছি যে ওরা অপরিচিত লোকের সামনে কোন-কিছু সম্বোধন না করেই কার্য সমাধা করত। ছেলেবেলা থেকে আমরণ এরা আমাদের ঘরেই ঘুরে ফিরে কাজ করেছে।

এদের জন্ম দরিদ্র কায়স্থ বংশে কিন্তু এমনি নির্লোভ, সচ্চরিত্র, ও দরদী মানুষ উচ্চশ্রেণী শিক্ষিতের মধ্যেও কম চোখে পড়েছে। পরিবারের মধ্যে এদের আলাদা কোন সত্তা ছিল না। আমার পিতৃদেবকেই এরা পিতৃত্বের আসন দিয়ে প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধ ছিন্ন করে একই পরিবারের লোকে পরিণত হয়েছিল। সর্বস্ব দিয়েও এদের উপর নির্ভর করতে পারতাম। এই বিশ্বাস শুধু অর্থ বা ধন-সম্পত্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের, ভগ্নিপতি মনোরঞ্জনবাবুর এবং অন্যান্য স্বজন বন্ধুবান্ধবদের রাজনৈতিক কাজকর্মে এমনকি গুপ্ত সমিতির কাজে সীতা ও দেবা ভাতৃদ্বয়কে অবিশ্বাস করতে পারি নি। এরা অনেক কথাই জানতে পেরেছিল। অনেক পলাতক বিপ্লবী কর্মীকেও চিনত। কিন্তু কখনও—এমনকি পুলিসের লাঞ্ছনা কিংবা অর্থলোভ, এদের আনুগত্যের ভিত্তি শিথিল করতে পারে নি, পুলিস, গোয়েন্দা অফিসাররা প্রায়ই এদেরকে থানা বা নিজ বাসগৃহে নিয়ে গিয়ে ভয় এবং প্রলোভন দেখাত। কিন্তু ওরা ছিল বিশ্বাসে অটল, শত প্রলোভনে পড়েও এরা কোনদিন শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী, রমেশ চৌধুরী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং আশুতোষ কাহিলীর মত পলাতক কর্মীকে ধরিয়ে দেয় নি।

দেবাদের কথা বলতে গিয়ে একটা কাহিনী হয়ত একান্তই বিচ্ছিন্ন, না বলে পারছি না। কেন না এ বৃত্তান্তের মধ্যে যে রহস্যের ইঙ্গিত পেয়েছিলাম সেই একান্ত শিশু বয়সে তা বৃদ্ধ বয়সেও সমাধান করতে পারি নি।

আমাদের দেশে অনেক আগে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হ'ত অনেকটা দেশ বা গ্রামের প্রয়োজনে। লেন-দেন বিনিময় প্রথাতেই বেশীর ভাগ হতো। তাই লোকের হাতে তেমন কাঁচা পয়সার আমদানী হতো না, আর তার ফলে লোকসাধারণ বিলাসী হওয়ার সুযোগ পেত না। কিন্তু পাটচাষ প্রবর্তিত হওয়ার ফলে অবস্থার একটা বিরাট পরিবর্ত্তন সাধিত হলো। বিদেশী কোম্পানীগুলি এগিয়ে এলো কাঁচা পাট কিনতে তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য। দেশের লোকের হাতে অকস্মাৎ অনেক টাকা এসে পড়ল। দরিদ্র চাষীর পাট বিক্রী করে জমিদারের খাজনা, মহাজনের সুদ সব শোধ করেও হাতে কিছু থেকে যেত। আর যারা মধ্যবিত্ত তারাও পাটের আপিসে চাকরী করে বেশ দুপয়সা কামাত।

হঠাৎ-পাওয়া চকচকে রূপোর মুদ্রাগুলি শুধু চোখ ধাঁধায় না, মনও মাতায়। সেই স্রোতে নেমে আসে বিলাসিতা। তখনকার দিনে বেশ্যাসক্ত হওয়া বিলাসিতার একটা অঙ্গ ছিল। কাজেই উচ্চতর সমাজের অনুকরণে চাষী এবং মধ্যবিত্তরাও নেশার হাতছানি এড়াতে পারল না। নারায়ণগঞ্জের গণিকালয়গুলিও বেশ সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠতে লাগল। বর্তমানে যদিও অতি অল্পসংখ্যক পল্লী আছে, কিন্তু তখন সমস্ত শহর বেশ্যালয়ে আকীর্ণ ছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না।

এমনি একটা পল্লীর মধ্য দিয়েই আমাকে প্রতিদিন স্কুলে যাতায়াত করতে হ'ত। আর রাস্তার উপরের

এক বাড়ীতে থাকত আমাদের খুল্লতাতের এক রক্ষিতা। তারই বিশেষ অনুরোধে আমাদের দেবা একদিন সকলের অজান্তে আমাকে কোলে করে সেখানে নিয়ে গেল। নর-নারীর যৌন সম্পর্ক বা বেশ্যা কি তা বোঝবার বয়স আমার নয়। আমি গিয়েছিলাম দুপুর বেলা। গিয়ে তাকে শায়িত অবস্থায় দেখেছিলাম। আমি যেতেই উঠে বসল।

সে কোন্ যুগের কথা। কিন্তু সবটাই ছবির মত পরিষ্কার মনে আছে। তার আঁচল কোথায় কি ভাবে লুটিয়ে পড়েছিল, মাথার লুণ্ঠিত চুলের গোছা, উঠে বসার ভঙ্গি সবই চোখের সামনে যেন ভাসছে—আমি কোথায় বসেছিলাম, কি খেয়েছিলাম, কাপড়-জামা, দামী দামী বিলিতি পুতুল।

ব্যাপারটা মায়ের গোচরে আসতেই দেবা ভীষণ ভাবে তিরস্কৃত হ'ল। পিতৃদেব জানতে পারলে যে কি অনর্থ ঘটবে তাই ভেবে মা বিশেষ ভাবে শঙ্কিত হলেন। তাঁর কানে যাতে কোন প্রকারেই খবর না যায় সে বিষয়ে দেবা আমাকে এবং আর সকলকে সাবধান করে দিলে। আমার মনের মধ্যে একটা গোল বেধে গেল। জেগে উঠল একটা কৌতূহল।

তার পর, প্রতিদিন স্কুলে যাওয়ার সময় রক্ষিতার বাড়ীর দিকে চোখ পড়ত। দেখতাম, সে দরজা বা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। মায়ের তিরস্কারের কথা মনে করে চোখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিতাম। কয়েক-দিনের মধ্যেই দেবার কাছে শুনতে পেলাম বিকেলবেলার ফিরতি-পথে আমার শুষ্ক মুখ তাকে চঞ্চল করে তুলত। আমি যেন জলখাবার খেয়ে বাড়ী যাই। মনে মনে অত্যন্ত বিপদ বোধ করলাম। বাধ্য হয়ে ঘুর-পথে স্কুলে যাতায়াত আরম্ভ করলাম।

তার পর, যদিও জীবনে কোনদিন আর বেশ্যালয়ে পদার্পণ করার সুযোগ আসে নি, কিন্তু পরিণত বয়স এমনকি আজ পর্যন্তও যখন কলকাতা কিংবা অন্য কোন স্থানে বেশ্যাপল্লীর মধ্যদিয়ে যেতে হ'ত তখনই শৈশবের কথা মনে উদিত হয়ে যেত। এরা যেন এক ভিন্ন জগতের মানুষ। আত্মীয়-বন্ধুহীন সমাজপরিত্যক্ত এদের জীবন। এদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ কিছুই আজও জানি না। একটা রহস্য আর সংস্কারের বেড়া মনের মধ্যে অজান্তে গড়ে উঠেছে। একটা ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না।

সেদিন ছিল বাসন্তী পূর্ণিমা। সকালবেলাতেই অনেকদিন পশ্চিমে রাজনৈতিক কাজকর্ম করে কলকাতায় ফিরেছিলাম। সন্ধ্যার পর, চন্দ্রালোকে নগরবাসী আবীরের নেশায় মেতে উঠেছে। যদিও ট্রেনের ক্লান্তি সমস্ত দেহকে আচ্ছন্ন করেছিল, কিন্তু কেন জানি না একপ্রকার স্বেচ্ছাতেই পরিষ্কার ধবধবে কাপড়-জামা পরিধান করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। স্নিগ্ধ চাঁদিমা আর মৃদু বাতাসে দেহের সমস্ত ক্লেদ মুছে গেল।

রাস্তায় মাতামাতি। কিন্তু কই কেউ ত আসছে না আমার দেহে আবীর ছড়িয়ে দিতে। মন ক্লিষ্ট হয়ে উঠল। রাজনীতি, নেতৃত্ব, গাম্ভীর্য—সবকিছুর আবরণ খুলে দিয়ে এক হাল্‌কা পরিবেশে মনকে ঢেলে দিতে চাই। কিন্তু কই, আমি কি এদের পর! অবশ্য বেশীদূর যেতে না যেতেই কয়েকটি ছোট ছেলে অনুমতি চাইতেই সানন্দে মাথা পেতে দিয়ে নিজেকে অনেকটা সহজ বোধ করলাম। ক্রমে চীৎপুর রাস্তায় এসে উপস্থিত হলাম। সামনেই বারবণিতালয়গুলিতে দোলপূর্ণিমার তাণ্ডব চলছে। কেমন একটা নোংরামি ও বীভৎসতার স্পর্শ মনকে কুঞ্চিত করল। ঘুরে গ্রে ষ্ট্রীট দিয়ে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে এসে পড়লাম।

চলতে চলতে একটা রঙ্গালয়ের সামনে এসে মনে হ'ল আমার পুরাতন বন্ধু মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করে যাই। মনোরঞ্জনবাবু প্রথম জীবনে আমার বিপ্লবী বন্ধু ছিলেন। পরে তিনি অভিনেতার জীবন আরম্ভ করেন। রঙ্গমঞ্চ এবং সিনেমার সঙ্গে যুক্ত থেকেও তিনি চারিত্রিক সুনাম রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সেখানে তিনি মহর্ষি বলেই শ্রদ্ধা পেয়ে এসেছেন। সে যাই হোক, আমি গিয়ে দেখলাম মনোরঞ্জনবাবু কয়েক-জন অভিনেত্রীর সঙ্গে আলাপরত। পরিচয় করিয়ে দিলেন প্রসিদ্ধ জেলফেরৎ, প্রসিদ্ধ বিপ্লবী বলে। তারা আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে কক্ষান্তরে চলে গেল। কেমন যেন একটা অস্বস্তি ও শ্বাসরুদ্ধকর আবহাওয়ার মধ্যে পড়ে গেলাম। আমার এ মনোভাব যুক্তিবিচারের আওতায় পড়ে না জানি। হয়ত আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকরা বলবেন, এ আমার সংযমে পীড়িত চিত্তের বিকৃত বহিঃ-প্রকাশ। বৃহত্তর পর্যায়ে বিচার করে দেখতে পাই যে, এমনি মনোভাব বর্তমান সমাজ-গঠনের জন্যই দায়ী। ধনতান্ত্রিক সমাজে বেশ্যাবৃত্তি যেমন একরকম অপরিহার্য তেমনি সাম্যবাদী ভিত্তিতে গঠিত সমাজের সকল স্তরে নারী-পুরুষের সমানাধিকার থাকার ফলে সহজেই বেশ্যাবৃত্তি সমাজদেহ থেকে বিদূরিত হয়। এ কেবল নীতিগত কথা নয়, সোভিয়েট রাশিয়া এ বিষয়ে জলন্ত দৃষ্টান্ত। কিন্তু সংস্কারের সহসা মৃত্যু হয় না। তাই গণিকার সশ্রদ্ধ পদস্পর্শও মনকে কুঞ্চিত করে।

সে রাত্রিতে সর্বত্রই রং-এর মাতন। রঙ্গালয়ের

সাজঘর আরও রঙীন। মনোরঞ্জনবাবু বললেন, সকলের অনুরোধে একটু বসুন। চেয়ে দেখি একজন নামকরা অভিনেত্রী এগিয়ে সলজ্জভাবে দাঁড়িয়ে আছেন সম্মতির অপেক্ষায়। 'না' করার কথা ভুলে গেলাম। পায়ে আবীর লিপ্ত করে পুনরায় দাঁড়িয়ে রইল। এবার মাথা বাড়িয়ে দিতে হ'ল। সসম্ভ্রমে কপাল রঞ্জিত করে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে চলে গেল। বিস্মিত হলাম, মনের সহজভাবও ফিরে পেলাম। কিন্তু তার মুখের দিকে তাকাতে পারি নি। কোনদিনই তাদের সঙ্গে আমার বাক্যালাপ হয় নি, কিন্তু ঘটনাটাও কোনদিন ভুলতে পারলাম না।

তার পরও বহুদিন থিয়েটারের সাজঘরের অংশে গিয়েছি, প্রসিদ্ধ অভিনেতাদের সঙ্গে বসে গল্পগুজব এবং চা-পান করেছি। কিন্তু অভিনেত্রীদের মুখে লঘু পরিহাস শুনি নি বা অসঙ্গত ইঙ্গিতও দেখি নি। গায়ে পড়েও এরা কোনদিন আলাপ করতে আসে নি। ক্রমশঃ

কবি শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

তোমার তরে অশ্রু ঝরে বন্ধু রে—
কাছের মানুষ আজকে তুমি কোন দূরে?
প্রতিভা তো নয় সামান্য—ক্ষুদ্র নও
নিজের কথায় সদাই তুমি মৌন রও।
তুমি গভীর ধ্যানী মনের মানুষ যে—
ফেরনি কো একটি দিনও যশ খুঁজে।
সরল শুচি স্নিগ্ধ স্বভাব—উচ্চশির—
তেজস্বী ও নম্র এবং বীর ও ধীর।

সোনার ফসল বাঁধাই করে রাখতে না,
কাউকে তুমি দেখতে তাহা ডাকতে না।
করে গেলে জীবন ধরে তপস্যাই—
সিদ্ধি এলো—তাতে তোমার লক্ষ্য নাই।
ভাবতে নারি বন্ধু তুমি নাই রে নাই—
তোমার কথাই ব্যাকুল করে আজকে ভাই।

ক্ষণিকের অবসর

শ্রীআইভি রাহা

শুধু একদিন দাও মোরে প্রিয়—
ক্ষণিকের অবসর।
আমায় দেখেছ চাওনি দেখিতে
মোর সমুদ্র অন্তর।
প্রেম তপস্যায় তাপসী উমার বেশ,
ধূপসম জ্বলে নিজেরে করেছি শেষ।
মহীয়ান তুমি রাজ রাজেশ্বর
ত্রিলোকের দিবাকর,
রিক্ত উদাস হৃদয় আমার
রাখি তব হিয়াপর।
জীবনের শূন্য পুরী হয়েছে দুর্বহ
যৌবন ফিরিয়া যায় রূপরস সহ।
উছল বন্যাসম উপল পথে
বিমোহিত সমর্পণ—
উত্তাল তরঙ্গ বুঝি প্রতিঘাতে
ব্যর্থ উপেক্ষিত মন।

ভাগ্যাহত

'সত্যসুন্দর'

আকাশের বুক চিরে মেঘের গর্জ্জনের সঙ্গে চলেছে বিদ্যুতের খেলা। রাত্রি থেকে একটানা শ্রাবণের নিরবচ্ছিন্ন ধারার বিরাম নেই। নিশীথের বর্ষণ সকাল হতে অনেকটা কমে এলেও সম্পূর্ণ থেমে যায় নি। বড় রাস্তায়, অলিতে-গলিতে এক হাঁটু জল। যানবাহন চলাচল প্রায় সবই বন্ধ হয়ে গেছে।

ঠিক এমনি দিনে বৃষ্টিবাদল মাথায় করে ঘন-দুর্য্যোগের মধ্যে পথে বেরিয়ে পড়েছিল শান্তনু। ছাতি সঙ্গে নিলেও বৃষ্টির দুর্দ্দান্ত ঝাপটার হাত থেকে সে রেহাই পায় নি। ভিজে গিয়েছিল তার সর্ব্বাঙ্গ। কেবলমাত্র আপিসের ফাইলখানি ভিজে নষ্ট না হয়ে যায় তারই জন্ম সে সাবধানতা অবলম্বন করছিল সিক্ত সার্টের তলায় চাপা দিয়ে।

আজ এই অবস্থায় হয়তো অনেকে কোন কাজেই পথে বেরুবে না। বর্ষণমুখর রবিবারে চা-য়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে ঘরের বৈঠকখানা কিম্বা গলির মোড়ের চা-য়ের দোকান সদ্য-প্রকাশিত খবরের কাগজের বারি-পাত বৃত্তান্ত নিয়ে মুখর হয়ে উঠবে। কাজে না বেরুনো আজকের দিনে দোষণীয় নয়। বরং বেরুনোই যেন কোথাও আশ্চর্য্য লাগে। কিন্তু উপায় নেই শান্তনুর। সরকারী আপিসের সে একজন মাত্র বেয়ারা। পোষ্ট তার অস্থায়ী। যখন-তখন চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশে তার চাকরি চলে যেতে পারে। এ সবই তার অদৃষ্টের পরিহাস, নতুবা পেটের দায়ে বড় সাহেবের বাড়ীতে ফাইল নিয়ে তাকে ছুটতে হয় এই দুর্য্যোগে।

কে. ডি. মুখার্জ্জি—ফটকের গায়ে নেমপ্লেটে লেখা আছে বড় বড় হরফে। শান্তনু বাড়ীটার দিকে একবার চেয়ে দেখলে, তার পর একটু থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেটের মধ্যে ঢুকে পড়লো। বৃষ্টি তখন অনেকটা কমে এসেছে, কিন্তু দুর্য্যোগের যে আচ্ছন্ন ভাব তা' এখনও আকাশের বুক থেকে বিদায় নেয় নি। লনের ভিতর বৃক্ষশ্রেণী সিক্ত হাওয়ায় ঝিরঝির করে কাঁপছে। পত্র-পল্লবের মধ্য দিয়ে বৃষ্টির ফোঁটা টুপটুপ করে ঝরে পড়ছে ঘাসের ওপর। একটি পাখী তার ভিজে ডানা দুটি ঝেড়ে উড়ে গেল।

"কাকে চাই?" বাড়ীর আর্দ্দালী জিজ্ঞেস করে।

"সাহেব আছেন? বলো, আপিস থেকে লোক এসেছে কাগজ-পত্র নিয়ে।"

আর্দ্দালী একবার ভাল করে শান্তনুর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে দেখে নেয়, তার পর ভিতরে নিয়ে যেয়ে ড্রয়িং-রুমে তাকে বসতে বলে।

"সাহেব কাল রাত্রে কলকাতার বাইরে গেছে। মেমসাব আছেন, খবর দিচ্ছি।"

শান্তনু তাকে বাধা দেবার জন্য কিছু বলতে যায়, কিন্তু দেখে ততক্ষণে আর্দ্দালী তার চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়েছে।

সমস্ত ঘরটি জুড়ে সুদৃশ্য কার্পেট পাতা। আধুনিক রুচিসম্পন্ন দামী আসবাবে ঘরটি সাজানো। একটি সোফা ও তিনটি কোচের মাঝে সুন্দর গোল টেবিল। টেবিলের উপর একখানি ইংরেজী ম্যাগাজিন। এক পাশে দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করানো বুক-সেলফের উপর ফুলদানীতে একগোছা সীজন-ফ্লাওয়ার।

শান্তনু বসে নি। সিক্ত বস্ত্রে দাঁড়িয়েই ছিল। হঠাৎ বুক-সেলফের কিছু উপরেই টাঙ্গানো একটি যুগল ছবির প্রতি তার দৃষ্টি পড়লো। সে ধীরপদে ছবির কাছে দাঁড়ালো এসে। অপূর্ব্ব ভঙ্গিমায় তোলা সেই ছবিটি। ঝরণার ধারে একটি বড় পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছেন তার বস—কে. ডি. মুখার্জ্জি আর তার পাশে···একটু চমকে যায় শান্তনু। মন তার উধাও হয়ে যায় বিস্মৃতির এক অতল রাজ্যে।

থার্ড-ইয়ারের রূপসী ছন্দা ব্যানার্জ্জিকে কে না চেনে। ছেলেদের কাছে তার নাম একটি আলোচনার বস্তু ছিল। সে নিজেই ড্রাইভ করে আসতো কলেজে। যখন গাড়ীর দরজাটি বন্ধ করে একটি বিশিষ্ট ভঙ্গীতে অনুরাগী ভক্তদের দৃষ্টি উপেক্ষা করে কমন্-রুমের দিকে চলে যেত তখন মনে হতো সে যেন তার নিজের বৈশিষ্ট্যেই দ্যুতিমান থাকতে চায়। ছেলেদের হৃদয়ের এই বৃত্তি তার দুর্ব্বলতা বলেই মনে হতো। এই উপেক্ষা ছাত্রদের বুকে বাজতো লক্ষ্মণের শক্তিশেলের মতই। তারা বলতো, অহঙ্কারী দেমাকী মেয়ে। এ-হেন মেয়ে একদিন হঠাৎ কলেজের
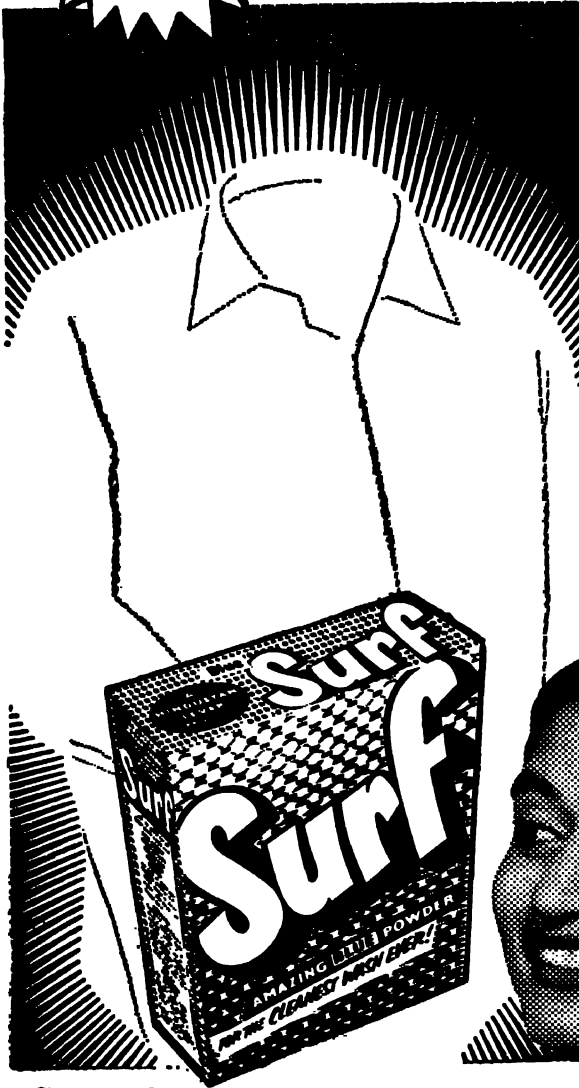
কাংশানে গান শুনে সমস্ত ছাত্রদের স্তম্ভিত করে দিশে শান্তনুর সঙ্গে যে নিজেই গিয়ে আলাপ করলো তা' এক বিস্ময়ের ব্যাপার।

কিছুদিনের মধ্যে এই আলাপ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হলো। ছুটির পর বাড়ী-ফেরার পথে ছন্দার পাশে গাড়ীতে দেখা যেত শান্তনুকে। তারা প্রায়ই লেকের একটি নির্দ্দিষ্ট নির্জ্জন স্থানে যেয়ে বসতো। সেখানে তাদের ভবিষ্যৎ-জীবনের সোনার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য হতো কতো মধুর কল্পনা। ছন্দার কৃষ্ণপক্ষ-ঘেরা মুগ্ধ চোখের পানে চেয়ে শান্তনু তার উচ্চাভিলাষের কথা জানাতো। বি-এ পাশ করে সে যাবে উচ্চশিক্ষার্থে সাগর পারে। সেখান থেকে ফিরে এসে দু'জনে বাঁধবে একটি স্বপ্নঘেরা ছোট্ট নীড়। ছন্দার মায়ামদির নয়নে নেমে আসতো ভবিষ্যৎ-স্বপ্নের সেই সোনালী ছবি। শান্তনুর কথা তাকে অনির্ব্বচনীয় মুগ্ধতায় বিভোর করে রাখতো।

বাপের একমাত্র আদুরে মেয়ে ছন্দার জন্মদিন উদ্‌যাপিত হতো খুব সমারোহের সঙ্গে। শান্তনুকে বিশেষ করে বলেছিল ছন্দা, বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো। কিন্তু সেই দিন সকাল থেকেই শান্তনু জ্বরে একেবারে অচৈতন্য।

ছন্দা ছুটে এসেছিল শান্তনুর শিয়রে। তার কোমল হাতের স্পর্শে শান্তনু ধীরে ধীরে চোখ মেলে তার একখানি হাত ধরে বলেছিল, "এ কি ছন্দা, আজকের দিনে তুমি বাড়ী ছেড়ে চলে এলে?"

"মুখটি করুণ করে ছন্দা বলেছিল, "তোমাকে ঘিরেই আজ আমার সব আনন্দ শান্তনু। তুমিই রইলে বিছানায় পড়ে, কাজ কি এই জন্মদিনে?"

মাথার বালিশের তলা থেকে একটি লাল পাথরের আংটি বের করে ছন্দার আঙ্গুলে পরিয়ে দিয়েছিল শান্তনু। তার পর তার হাত দু'টি ধরে বলেছিল, তোমার জন্ম-দিনে আমার এইটি উপহার ছন্দা। যদি এই অসুখ না সারে, যদি চলে যেতে হয় সবকিছু ছেড়ে তখন এই আংটির দিকে চেয়ে আমার কথা তোমার মনে পড়ে যাবে।"

ছন্দা তার মুখে হাত চাপা দিয়ে ব্যথিত কণ্ঠে বলে উঠেছিল, "ও কথা বলো না শান্তনু। তোমার কি এমন হয়েছে বল তো? আমায় এই সব কথা বলে দুঃখ দিতে তোমার ভাল লাগছে—না?" দু' চোখ তার ভরে উঠে-ছিল জলে। শান্তনুর চোখেও জল বাধা মানে নি।

আজ সেই হারিয়ে-যাওয়া দিনগুলি স্মৃতির পটে ভেসে উঠছে। যে অতীত, সে তো তার জীবন-রঙ্গমঞ্চ থেকে বহু দিন বিদায় নিয়েছে। বিদায় কি সত্যই নিয়েছে? অন্তরের গভীর তল থেকে কি তার কাঁদন উঠছে না। জীবন-বীণার তারে কি বেজে উঠছে না একটি স্মৃতির সুর! কিন্তু আজ রূঢ় বাস্তবের কাছে তার সোনার স্বপন নিঃশেষিত হয়ে গেছে চরম কণ্টকাকীর্ণ পথে। এই যে তার অভিশপ্ত জীবনযাত্রা, তার জন্য দায়ী কে?—হয় তো ভাগ্য!

পূর্ব্ববঙ্গে আগুন জ্বলে উঠলো। সাম্প্রদায়িকতার পৈশাচিক তাণ্ডবে কত নিরীহ প্রাণ হ'লো বলি। দেশের হাহাকারের মধ্যে কোল্‌কাতা ছেড়ে ছুটে চলে যেতে হলো শান্তনুকে পূর্ব্ববঙ্গে গ্রামের বাড়ীতে। কোনক্রমে মা ও একটি বোনকে হারিয়ে বৃদ্ধ পিতা, নাবালক একটি ভাই ও একটি বোনকে নিয়ে সে অতি কষ্টে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছিল কোল্‌কাতায়। কিছুই নিয়ে আসতে পারে নি, রিক্ত অবস্থাতেই নেমে ছিল শিয়ালদা ষ্টেশানে।

কোল্‌কাতায় বিশেষ আত্মীয় বলতে কেউই ছিল না। ষ্টেশনেই তাদের আশ্রয় নিতে হলো। কিছুদিন অনেক দুর্ভোগ ভোগ করার পর সরকারী ব্যবস্থায় অন্য উদ্বাস্তু-দের সঙ্গে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হলো উড়িষ্যার একটি গ্রামে।

কলোনীর একখানি ঘরে বুড়ো বাবা, আট বছরের ভাই ও বারো বছরের বোনকে নিয়ে সংসার পাতলো শান্তনু। অন্ন-সংস্থানের জন্য লোন নিয়ে খুললো একটি মুদিখানা। সে ও তার বাবা দোকানটি চালাচ্ছিল। দোকানের আয়ে কোনক্রমে দু'বেলা ডাল-ভাতটা জুটছিল তাদের।

ইতিমধ্যে আর একটি অঘটন ঘটলো। শান্তনুর বৃদ্ধ পিতার শরীর পূর্ব্ব থেকেই ছিল অসুস্থ। মানসিক ঝড়-ঝাপটায় শরীরটা একেবারে ভেঙে গিয়েছিল। একদিন দোকান বন্ধ করে রাত্রিতে বাড়ী ফিরে এসে শরীরটা কেমন করছে বলে বিছানায় শয়ন করলেন। সেই তাঁর শেষ, আর উঠলেন না। দোকানটি একজনের হাতে ছেড়ে দিয়ে, কলোনীতে আশ্রয়প্রার্থী পিসিমা ও পিসে-মশায়ের কাছে ভাই বোনকে রেখে তাদের আশ্বাস দিয়ে শান্তনু এল কোলকাতায় চাকরির চেষ্টায়।

কে দেবে চাকরি?—সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি প্রত্যেক অফিসের দোরে দোরে হানা দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লো সে। এক বেলা সস্তার হোটেলে কোনক্রমে দুটি ডাল-ভাত খাওয়া আর রাত্রে কোন বাড়ীর রকে কিম্বা গাড়ী-বারান্দার তলায় শোওয়া—এই ভাবে দিনের পর দিন চলতে লাগলো চাকরির চেষ্টা।

বীজ থেকে বৃক্ষ...

দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়দের কাছে গেলে তারা শুধু মৌখিক সহানুভূতির সহিত উপদেশ দেন, "রোজগার তো করা চাই। ভাই বোন দুটোকে তো মানুষ করতে হবে। চেষ্টা কর, যা হোক বি-এটা তো পাশ করেছ।"

চেষ্টা কর, চেষ্টা কর শুনে তার কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। চেষ্টা কি সে করছে না! সে কি চায় তার জীবন এই অভিশপ্ত ভাবেই কাটুক। আজকাল চাকরি পেতে হলে ওপরওয়ালার আত্মীয় হওয়া চাই নতুবা ভাগ্যের উপর নির্ভর করে বসে থাকতে হয়। এ কথা সে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছে।

হঠাৎ পুরনো বন্ধু সমীরের সঙ্গে সন্ধ্যেবেলায় গঙ্গার ধারে দেখা। তার মুখেই শান্তনু শোনে চন্দ্রারা পার্ক-সার্কেসের বাড়ী ছেড়ে অন্য কোথায় চলে গিয়েছিল। কলেজেও আর যায় নি। অনেক কথাবার্ত্তা হওয়ার পর শান্তনুর অবস্থার কথা শুনে সে খবর দিয়েছিল, একটা চাকরি খালি আছে, মাইনে মাসে পঁচাত্তর টাকা।

তার হতাশ মরুর জীবনে আশার এক বিন্দু বারি দেখে আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিল শান্তনু। আগ্রহে বন্ধুর হাতদুটি জড়িয়ে ধরে বলেছিল, "কোথায়! কোথায়!"

"তুই কি সে কাজ করবি? তোর উপযুক্ত সে কাজ নয়।"

হাসি পেয়েছিল শান্তনুর 'উপযুক্ত' কথাটা শুনে। দু'বেলা দু'মুঠো পেট ভরে খাবার জন্য চাকরি চাই। উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত তার বিচার করার সময় এখন নয়।

"বলতেও তোকে লজ্জা করছে, চাকরিটা কিন্তু একটা বেয়ারার জন্য। ভেবে দেখ তুই।"

"এখন আর ভাই মিথ্যে মর্য্যাদার কথা ভাববার মত অবস্থা নয়। বাঁচতে হবে নিজেকে, বাঁচাতে হবে ভাই-বোন দুটোকে।"

একটু ইতস্ততঃ করে সমীর বলেছিল, "তুই তো বি-এ পর্য্যন্ত পড়েছিস্, কিন্তু এখানে তা' বলা চলবে না। এখানে নন্-ম্যাট্রিক লোক চায়। পাশ করা জানলে বোধ হয় চাকরি পাওয়া যাবে না।"

লেখা-পড়া জানাও যে চাকরির ক্ষেত্রে অন্তরায় হতে পারে, তা শান্তনুর জানা ছিল না। এমনি অদৃষ্টের পরিহাস শান্তনুর, এত বছর ধরে যে বিদ্যা অর্জ্জন করেছে সে, আজ কি তার কোন মূল্য নেই?

ঠিকানা নিয়ে অফিসে ইণ্টারভিউ দেয় শান্তনু। ছোট সাহেব তার কথায় ও ব্যবহারে খুসী হন। সামান্য কিছু লেখা পড়া করেছে জেনে তাকে কাজে বহাল করেন। এখন সে তাই বেয়ারা।

'বেয়ারা', মন্দ কি এদের জীবন! তাদের সঙ্গে মিশে শান্তনু যেন মানুষের সন্ধান পায়। কেমন স্বচ্ছ, সরল, স্বল্প-তুষ্ট সন্তোষে ভরা জীবন। মুখোশ-ঢাকা সভ্যতার আড়ালে অন্তরের মানুষটা যেন ওদের মধ্যেই বেঁচে আছে।

সহসা কার পদধ্বনি শান্তনুর চিন্তাজাল ছিন্ন করে দিল। বিস্মৃতির পৃষ্ঠা থেকে ফিরে এল কঠিন বাস্তবে। চম্‌কে ঘুরে দাঁড়াতেই অন্দরমহলের দরজার কাছে দেখতে পায় একটি আভিজাত্যপূর্ণ সজ্জায় সজ্জিত তরুণীকে।

"আপনি অফিস থেকে আসছেন? উনি তো বাড়ী নেই। কাল সন্ধ্যে বেলায় টেলিগ্রামে বন্ধুর অসুখের খবর পেয়ে কোলকাতার বাইরে গেছেন। বোধ হয় আজই ফিরবেন।"

শান্তনু নমস্কার করতে ভুলে গেল। কেমন যেন বিহ্বলভাবে চেয়ে রইল তরুণীটির মুখের দিকে। হাঁ, চন্দা, ঠিক সেই রকমই আছে, বরং আরও বেশী সুন্দরী হয়েছে। আর শান্তনু! তাকে না-চিনতে পারা অপরাধ নয়। কঠিন বাস্তবের সঙ্গে যুদ্ধ করে তার জীবন হয়েছে ক্ষতবিক্ষত। সোনার মত রং পুড়ে তামা হয়ে গেছে। পরণের জামা-কাপড় ছিন্ন। যে সুন্দর স্বাস্থ্যের জন্য তাকে বন্ধুরা ঈর্ষার চোখে দেখতো না আজ দারিদ্র্যের নির্ম্মম কশাঘাতে হয়েছে শীর্ণ। মনে হয়, এ যেন অতীতের সে জীবন্ত শান্তনু নয়, এ যেন তার এক বিবর্ণ ছায়া।

সম্বিত ফিরে পেয়ে শান্তনু ফাইলটি তরুণীটির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, "এগুলি সাহেবকে দিয়ে দেবেন।"

তরুণীটি কয়েক পা এগিয়ে এসে ফাইলটি তার হাত থেকে নিয়ে রাখলো টেবিলে।

শান্তনু হঠাৎ চম্‌কে উঠলো। চন্দার আঙ্গুলে তার জন্মদিনে দেওয়া লাল পাথরের আংটিটি যেন জ্বলছে। তবে কি এখনও শান্তনুর স্মৃতি চন্দার মধ্যে বেঁচে আছে? "এইটুকু" সান্ত্বনাই তার শুষ্ক জীবনে পাথেয় হয়ে থাকবে। চন্দার গৌরবময় পরিপূর্ণ জীবনের সামনে তার নিজের দৈন্যের রূপ সে কিছুতেই তুলে ধরতে পারবে না। চন্দা যে-শান্তনুকে তার স্মৃতিপটে রেখেছে, এ শান্তনু তার প্রেতাত্মা।

চন্দাও চিনতে পেরেছে। বিস্ময়ে বলে ওঠে "তুমি! তুমি—শান্তনু!"

বিদ্যুৎ-পৃষ্টের মত চম্‌কে উঠে শান্তনু ঘর থেকে দ্রুত-গতিতে বেরিয়ে যায়।

চন্দা পিছু পিছু এগিয়ে গিয়ে আকুল স্বরে ডাকে "শান্তনু..."

কোন উত্তর শোনা যায় না। করুণ নয়নে চন্দা চেয়ে দেখে, শান্তনু তখন বৃষ্টির মধ্যে হনহন করে এগিয়ে চলেছে।

পঞ্চশীলার কুলত্যাগ

শ্রীঅমিয়া সেন

'লছমিয়া কুটীরে' আজ ছোটখাটো রকমের একটি জমকালো সভা আছে। কুটীরস্বামী শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র কুণ্ডুপ্যাটেল একটি সংস্কৃতি সম্মেলন করতে ইচ্ছুক। তাই তাঁর আমন্ত্রণে এ সম্বন্ধে পরামর্শদান করতে আসছেন নগরীর বিশিষ্টতম কতিপয় ব্যক্তি।

সভা আরম্ভ হবার এখনো আধঘণ্টাখানেক বাকি। অতিথিরা সবাই এসে পৌঁছন নি। এই ফাঁকে, সভারম্ভের পূর্ব্বে, 'লছমিয়া কুটীরের' যে একটি ইতিহাস আছে, সেটি পাঠকদের জানা দরকার। নইলে এ সভার তাৎপর্য্য বুঝতে একটু অসুবিধা হবে।

'লছমিয়া কুটীর' হ'ল নন্দন কানন সরসিতে শ্রীযুক্ত কুণ্ডুপ্যাটেল মহাশয়ের নবনির্ম্মিত গৃহখানির নাম। 'গৃহ' কথাটি আমার নয়, ওটি কুণ্ডুপ্যাটেলের বিনয়। আসলে এটি একখানি ম্যানসন। বিঘা আড়াই জমির ওপর তাঁর ভাষায়, 'একটু ভদ্রগোছের ভদ্রাসন।' চারধারে মার্ব্বেল পাথরের প্রাচীর। তার কোল ঘেঁষে উপচে পড়ছে ফুলকুমারীদের রংবেরঙের হাসি। বাড়ীর সামনে কৃত্রিম কাঞ্চনজঙ্ঘা। চূড়ো থেকে আঁকা-বাঁকা ভাবে অষ্টপ্রহর উৎসারিত হচ্ছে বৈজ্ঞানিক জলপ্রপাত। সেই জল আবার পাহাড়ের কোল ঘেঁষে বয়ে যাচ্ছে একটি ছোটখাটো পার্ব্বত্য নদীর মত। প্রবেশপথের দু'ধারে ছায়াসুশীতল ঝাউ আর বিলাতী পামের সারি। তার ওধারে ফুলের বাগান।

এই ঝাউ, পাম আর ফুল-বাগানের পিছনে কুণ্ডুপ্যাটেলের যত পয়সা খরচ হয়েছে, সারা বাড়ীতে তত লেগেছে কিনা সন্দেহ। কারণ, চার-ডবল রাজমিস্ত্রী লাগিয়ে যত তাড়াতাড়ি একটা বাড়ী ফিনিশ করা যায়, গাছের চারাকে তত তাড়াতাড়ি বড় করা যায় না। তাই কুণ্ডুপ্যাটেল মহাশয়কে সারা পশ্চিমী দুনিয়া ঝেঁটিয়ে বৃক্ষ-বিশেষজ্ঞ আমদানি করতে হয়েছে। তাঁরা এসে ইঞ্জেকসনের পর ইঞ্জেকসন দিয়ে দিয়ে গাছগুলিকে তড়িৎঘড়িত যৌবনবতী করে তুলেছেন।

নন্দন কাননের কোন নন্দনের বাড়ী গৃহপ্রবেশ উৎসবে এসে অতিথিরা যদি পথের দু'ধারে সাজানো বাগান আর যত্নপালিত-ললিত কুসুমের নীরব অভ্যর্থনা না পান, তবে উৎসবের বারো আনা মাহাত্ম্যই, কুণ্ডুপ্যাটেলের মতে, ডুবুডুবু প্রায়।

তা ছাড়া নন্দন কানন সরসিতে কুটীর খাড়া করা বড় সামান্য কথা নয়। কুণ্ডুপ্যাটেলের বহুকালের সখ এই সরসির একজন হওয়া। ব্যাপারী সমাজে সম্মানের কল্কে পেতে হলে এ ছাড়া যে কোন উপায় নেই, তা তিনি কলকাতায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই টের পেয়েছিলেন। কিন্তু সাধ থাকলেও সাধ্য ততখানি ছিল না। এখানে যাঁরা থাকেন তাঁরা হলেন ব্যাপারীকুলের শের। এই সব ভাটিয়া-ভুটিয়া মহাজনদের কারুর ভুঁড়িতে একটু টোল পড়লে তাবৎ ভারতবর্ষ বাসুকির মাথায় পৃথিবীর মত থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে। এঁদের মান-সম্মান-প্রতাপ সারা দুনিয়া জুড়ে।

বাইরের লোকদের এই সরসিতে ঢুকতে হলে, গেটপাশ দেখিয়ে, দু'ধারে সেলাম ঠুকতে ঠুকতে ঢুকতে হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের খাতিরে কুণ্ডুপ্যাটেলকে প্রায়ই আসতে হ'ত এখানে। সেবার কি হ'ল, লছমিয়া দেবী বায়না ধরে বসলেন, "শুনছি ওখানে গেলে নাকি এ জীবনেই স্বর্গ-দর্শন হয়ে যায়, আমাকে নিয়ে চল, আমি যাব।"

কুণ্ডুপ্যাটেল অনেক বোঝালেন, কিন্তু দেবী একেবারে নাছোড়বান্দা। তিনিও ত কেউকেটা নন, লাখপতি বিজনেসম্যানের মেয়ে, স্বামীও ডান হাতে বাঁ হাতে অনবরত লাখ লাখ টাকা ঢালছেন, ছুঁড়ছেন, সিন্দুকে পুরছেন দেখতে পান, তবে?

বেকায়দায় পড়ে গেলেন অক্ষয়মশায়। বুঝতে পারলেন স্ত্রীর কাছে মান-মর্য্যাদা আর রইল না। দুর্গানাম জপতে জপতে রওনা হলেন সস্ত্রীক।

গেটপাশ, সেলাম বাজানো সবই দেখলেন লছমিয়া দেবী। কিন্তু ষোল-কলা পূর্ণ হলো যখন শেঠ বিশ্বম্ভর ভাটিয়ার গেটের গোড়ায় দারোয়ানের পাশে তাঁকে বসিয়ে কুণ্ডুপ্যাটেল ভিতরে গেলেন শেঠজীর সঙ্গে মোলাকাৎ করতে। ওড়নায় মুখ ঢেকে হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগলেন কুণ্ডুপ্যাটেল-গিন্নী। দারোয়ানজী খৈনিটেপা বন্ধ করে, নিজের দাড়ির গোছা চেপে ধরে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার অনেক চেষ্টা করলে, ক্যা বাত
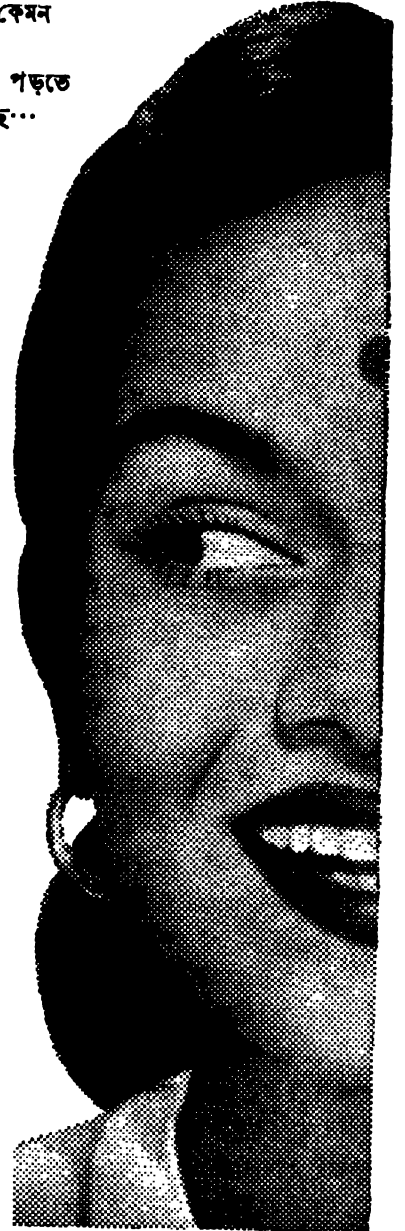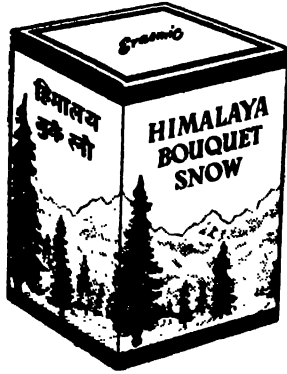
হায়, অরে রোতী কেঁও? রোনা মৎ মাঈজী, নন্দন কানন কী তো এহী আদত হায়। ছোটা ব্যপারী লোগোকী ঔরতে অন্দর নহী ঘুম পাতী, শেঠজী লোগ নারাজ হোতী হায়। কই বেকুব বিনা সোচ সমঝ ঘুস ভী জায় তো বড়ী মুসীবৎ প্যায়দা হো জাতী হায়। সারা সকাল গোউ কা গোবর সে ঘোসা পড়তা। ইসকা নাম হায় নন্দন কানন···

বাড়ী ফিরে লছমিয়া দেবী একেবারে যাচ্ছেতাই করলেন স্বামীকে। নেহাৎ বঙ্গ-সন্তান, তাই মুখ বুজে সহ্য করলেন কুণ্ডুপ্যাটেল। জাতকুলীন হলে সেদিন কি ঘটত, বলা যায় না। তা নয়, গৃহদেবতা হনুমানজীর সামনে তাঁকে ঘরে নিয়ে গিয়ে প্রতিজ্ঞা করালেন লছমিয়া দেবী, ঐ নন্দন কাননের বাসিন্দে হয়ে এই অপমানের শোধ তুলতে হবে কুণ্ডুপ্যাটেলকে।

মনে বড়ই দাগা পেলেন কুণ্ডুপ্যাটেল। আবু-হোসেনের মত হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যেন দেখতে পেলেন, তিনি রাজাও নন, বাদশাও নন, মাত্র ছেঁড়া কাঁথার মালিক। তবে আবুহোসেনের মত বেকুব বা আলসে তিনি ছিলেন না। উঠে পড়ে লাগলেন। প্রচণ্ড অধ্যবসায়ের কাছে শেষ পর্য্যন্ত হার মানতে হলো গণেশজীকে। গুটি গুটি এসে ধরা দিলেন। উনিশ শো পঁচাত্তরের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হলো ১৯৮৫-তে। নন্দন কানন সরসির রেজিষ্টারে প্লাটিনামের হরফে জল জল করে উঠলো একটি নূতন নাম, "শিরি অক্ষোয় চোন্দ্র কুন্ডু-প্যাটেল।"

কয়েকদিন আগে গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে বিস্তর ধুম-ধাড়াক্কা হয়ে গেছে। লণ্ডনের ব্যাণ্ডপার্টি, রাশিয়ার কন্‌সার্ট, আফ্রিকার সার্কাস, ফ্রান্সের অপেরা—এ সব ছাড়া চায়নার মুখোস-নৃত্য ত ছিলই। লোকে ধন্য ধন্য করেছে। এতটা আবার কেউ কল্পনা করতে পারে নি। সত্যিকথা বলতে গেলে আমোদ-প্রমোদের ব্যাপারে তিনি প্রায় সব শেঠজীদের ছাড়িয়ে গেছেন। ছাড়াবেন না-ই বা কেন, যে মাটি ধরে তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন, সেই মাটির সঙ্গে এই তাঁর শেষ কারবার। এবার থেকে আর নগরীর রাজপথে নয়, তাঁর মোটর সন্ সন্ করে ছুটবে ঝুলন্ত হাওয়াই পথ দিয়ে। নন্দন কাননের বাসিন্দারা কেউ মাটিতে চলাফেরা করেন না, তাই এটি তাঁদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। সারা ভারতের আকাশ আর মাটির মাঝামাঝি শূন্য দেশে তাঁদের জন্য তৈরী হয়েছে অসংখ্য হাওয়াই রাস্তা। সেই রাস্তা দিয়ে শেঠজীরা যখন মোটর হাঁকিয়ে যাবেন, তখন কোন এরোপ্লেনেরও এক্তিয়ার নেই সেই মোটরের উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া। হোক্ না প্লেনের আরোহী কোন মহা-মান্য ব্যক্তি। একবার কঙ্গু-চেঙ্গুর প্রধানমন্ত্রী ভারতে আসার সময়ে না জেনে এই রকম একটা ভুল করে ফেলেছিলেন, এজন্য আদালতে দাঁড়িয়ে তাঁকে পকেট খালি করে মানহানির খেসারত দিতে হয়েছিল।

এ থেকেই বোঝা যাবে নন্দন কাননের আভিজাত্য কি বস্তু। সুতরাং কুণ্ডুপ্যাটেলের সোল্লাস অর্থ ব্যয়ের কারণ খুব স্পষ্ট।

গৃহ-প্রবেশ পর্ব্বের পর এই তাঁর দ্বিতীয় অনুষ্ঠান, স্বদেশী সংস্কৃতি সম্মেলন।

এক এক করে এলেন সবাই! সরকারী বড়কর্ত্তা তারিণীতারণ চৌধুরী, হেড অব দি পুলিস, মিষ্টার করঞ্জাক্ষ, মিউনিসিপ্যালিটির তরফ থেকে শ্রীযুক্ত বিপদ-ভঞ্জন ভড়, সংস্কৃতি সাহিত্য আকাদেমীর সভাপতি, রামদুলার চোবে, এ ছাড়া চারটে বিশ্ববিদ্যালয়ের চার প্রধান, কল্যাণগঞ্জ—শ্রীযুক্ত শশধর পট্টনায়েক, চেংড়াপুর—শ্রীযুক্ত হংসবাহন তরফদার, গোবরহাটি—শ্রীযুক্ত কমলদলন বর্ম্মা, পুরাণ বাজার, শ্রীযুক্ত রুদ্রাক্ষ সান্যাল।

অতিথিরা আসন গ্রহণ করলে অক্ষয়চন্দ্র চা লেমনেড ইত্যাদি দিয়ে তাঁদের প্রাথমিক সৎকার সমাধা করলেন। তার পর নিয়মমাফিক বললেন, "আমি প্রস্তাব করছি, শ্রীযুক্ত রামদুলার চোবে মশায় এই সভার সভাপতি হয়ে আমাদের ধন্য করুন।"

সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টার করঞ্জাক্ষ মুখ থেকে লেমনেডের গেলাস নামিয়ে, বাঁ হাতে চায়ের পেয়ালা সামলাতে সামলাতে বলে উঠলেন, "আমি এ প্রস্তাব সমর্থন করছি।"

· বৃহত্তম কলকাতার ওয়াটার সাপ্লাই অধিকর্ত্তা বিপদভঞ্জন ভড়ের বারোমাস বরফ-চা খাওয়ার অভ্যেস। স্রেফ মাথা ঠাণ্ডা রাখবার জন্য। কারণ, স্বাধীনতার আদিপর্ব্বে কলকাতায় যা জনসংখ্যা ছিল, তার জল যোগাতেই নাকি কর্পোরেশন হিমসিম খেয়ে যেত, আর এখন ভড় মশায় সেই একই ট্যাঙ্কের সাহায্যে তার চেয়ে বিশগুণ বেশী লোকের জলীয় প্রয়োজনের ধাক্কা সামলাচ্ছেন।

সোঁৎ করে এক চুমুক চায়ের সঙ্গে আস্ত একখানা বরফ গালে পুরে যতটা সম্ভব একগাল হেসে বললেন, "সংস্কৃতি সম্মেলনের সভাপতিত্ব করার যোগ্যতা চোবে মশায়ের চেয়ে আর কার বেশী আছে? ওঁর বিশটা

একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় কাচা যায়

অর কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা

ঠাকুমারও পছন্দ: ঠাকুরমা কি আজকের লোক— তাঁর এতদিনের অভিজ্ঞতা! তিনিও খুশী হয়েছেন লক্ষীর সানলাইট সাবানে কাচা কাপড় দেখে। কি ধপধপে ফর্সা, আর ঝকঝকে রঙীন।

লক্ষী জানে যে অল্প একটু সানলাইটেই অনেক কাপড় কাচা যায় এবং লক্ষী এটাও দেখেছে যে ধুতি, সার্ট, বিছানার চাদর, তোয়ালে—সব কিছুই আশ্চর্য্য রকম সাদা ও উজ্জ্বল হয় সানলাইটে। সানলাইটের কার্য্যকরী, প্রচুর ফেনা ময়লার প্রতিটি কণাকে বার করে দেয়, কাপড় আছড়ানোর দরকার হয়না। আপনার পরিবারের কাপড় কাচার জন্য আপনিও সানলাইট সাবান ব্যবহার করুন না কেন?

সানলাইটে জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে

S. 268 C-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিঃ কর্তৃক প্রস্তুত।

চালের আড়ত, পঞ্চাশটি সর্ষের গোলা আর কাপড়ের গুদাম হচ্ছে গিয়ে—"

কমলদলন বর্মা বাধা দিয়ে বললেন কিন্তু ভড় মশায়, এটা সংস্কৃতি সম্মেলন নয়, সে সম্বন্ধে এক্সিকিউটিব বডি তৈরি করবার—

রুদ্রাক্ষ সান্যালের সন্ধ্যের সময় একটু মৌতাত করার অভ্যেস।

অরেঞ্জ কোয়াসের গ্লাসটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে তিনি মুখের কাছে তুলবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু ঝিমুনির জন্য পেরে উঠছিলেন না। কানের কাছে বিরামহীন ভাবে ধ্বনিত হচ্ছিল রম্ভা ষোড়শী ইত্যাদি স্বর্গীয় অপ্সরীদের নূপুর নিক্কণ।

বর্মার প্রতিবাদের স্বরে চমকে উঠে দুদ্দাড় করে পালিয়ে গেল অপ্সরীরা।

রুদ্রাক্ষ রক্তিম চোখ মেলে চেয়ে দেখলেন, রম্ভাও নয়, ষোড়শীও নয়, অক্ষয়চন্দ্রের বিরাট হলঘরে রেডিও গ্রামে শান্তিনিকেতনের ভারত-নাট্যম্ নাচ হচ্ছিল।

মনটি খিঁচিয়ে গেল। সরবতের গ্লাসটা টেবিলের ওপর ঠুকে বিরক্তভাবে বলে উঠলেন, "আমরা যদিও স্বাধীন হয়েছি, কিন্তু সভ্য হয়েছি কি না সেটি এখনো বিবেচনা সাপেক্ষ।"

হংসবাহন তরফদার এই যূথের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ। শিক্ষাক্ষেত্রে একটা বৈপ্লবিক্ কাণ্ড ঘটাবার জন্য অনেক মোটা মাইনের চাকরি ছেড়ে দিয়ে স্বেচ্ছায় এই দরিদ্র বিশ্ববিদ্যালয়-অধিকর্তার পদ বরণ করেছেন। দেশ এবং দেশবাসী সম্বন্ধে তাঁর আশা অনেক। গরম হয়ে বললেন, "এ কথা বলার মানে?"

শশধর পট্টনায়েক ধীর বুদ্ধি প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি কেবল একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকর্তাই নন, একজন অপ্রকাশিত সাহিত্যিকও। যৌবনে তিনি একখানা উপন্যাস লিখতে সুরু করেছেন, লিখতে লিখতে এখন পঞ্চাশোর্দ্ধে পৌঁছেছেন। তিনি আশা করেন, আর দু'চার বছরের মধ্যেই তাঁর দীর্ঘ দিনের সাধনা সমাপ্ত হবে, এবং সমাপ্ত হলে ঈশ্বর যখন মুখ তুলে চেয়েছেন, অর্থাৎ নন্দন কাননের জনৈক কুবেরের আমন্ত্রণ লাভের মত অলৌকিক ঘটনা যখন জীবনে সম্ভব হয়েছে, তখন একে ধরে বইখানি নোবেল কমিটিতে পেশ করবেন।

কুণ্ডু প্যাটেলের আমন্ত্রণ পাওয়া থেকে মনে মনে এইসব কল্পনাই তিনি করেছিলেন। এখন স্যান্যাল-তরফদারের কাণ্ড দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। মনে মনে এই শিক্ষিত হস্তীমূর্খদের মুণ্ডপাত করতে করতে প্রকাশ্যে কোমল কণ্ঠে মোলায়েম হেসে বললেন, "ডিয়ার ব্রাদারস্, এ আপনারা করছেন কি! ভুলে যাবেন না আপনারা কার বাড়ীতে কি উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছেন। মিষ্টার কুণ্ডুপ্যাটেলের অমূল্য সময় এই ভাবে ধ্বংস করা কি আমাদের উচিত?"

কথাগুলিতে কাজ হলো। অতিথিদের প্রত্যেকেরই যুগপৎ খেয়াল হ'লো, এটা রাইটার্স বিল্ডিং, কর্পোরেশন হল, লালবাজার থানা বা বিশ্ববিদ্যালয় ভবন নয়, তার চেয়েও মহৎ, বৃহৎ এবং সুদৃঢ় এক শেঠ ভবন।

মিষ্টার করঞ্জাক্ষ হেঁ হেঁ করে খানিক হেসে বললেন, ঠিক ঠিক। আচ্ছা আসুন, আমরা এখন খসড়াটা করে ফেলি।

কুণ্ডুপ্যাটেলজী বললেন, হ্যাঁ, খসড়াটা আপনারাই করবেন, তবে তার আগে আমার দু'চারটি কথা বলবার আছে।

—"বলুন, বলুন" একসঙ্গে আট জোড়া চোখ কুণ্ডু-প্যাটেলের মুখের ওপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কুণ্ডুপ্যাটেল বললেন, "দেখুন, বাংলা দেশের জলমাটির সঙ্গে এতদিন আমার কোন সম্পর্ক ছিল না বললেই চলে। ঠাকুরদা চাকরি করতে আমেদাবাদ গিয়ে হয়ে গেলেন ব্যবসায়ী। তার পর ওখানকার পাকাপাকি বাসিন্দা। ছেলের বিয়ে দিলেন গুজরাটি ব্যবসায়ীর মেয়ের সঙ্গে। সেই ছেলের ছেলে আমি। আমার স্ত্রী হলেন নির্ভেজাল কুলীন গুজরাটীর মেয়ে। আমেদাবাদে খুব ভালোই ছিলাম। কিছুর কমতি ছিল না আমার। তবু যে কলকাতায় এলাম তার কারণ শুধু নাড়ীর টান। বাঙালী মাত্রই আমার প্রিয়। নন্দন কাননের বাসিন্দে বলে আপনারা যে ভাববেন আমি নিজেকে সবার থেকে পৃথক মনে করি—"

চারদিক থেকে একটি প্রতিবাদের ঐকতান উঠল, "না—না, সে কি—"

স্মিত হেসে কুণ্ডুপ্যাটেল বলে চললেন, "বিয়ের পর শ্বশুর বললেন, 'অক্ষয়, তুমহারা ও সারনেম ছোড়নে পড়ে গা। প্লুটোক্রেসীকে কানুনমে বাঙালী সারনেম obsolete. তুম হমারা সারনেম লে লো।'

অত বড় মানী লোক, ইণ্টার ন্যাশনাল ব্যপারী, তাঁর কথা ত ঠেলতে পারি নে। কি করি, ছাড়লুম। কিন্তু দেখুন বাংলা দেশে এসেই আমি সেটিকে আবার নামের সঙ্গে জুড়ে নিয়েছি। অবশ্য শ্বশুরের পারমিশন নিয়েছি। তিনি কেবল মানী নন, জ্ঞানীও। লিখলেন, "য্যাসা দেশ এ্যাসা ভেস, তুমহারা কর্ম যোগ মে সুবিস্তা হোগা তো
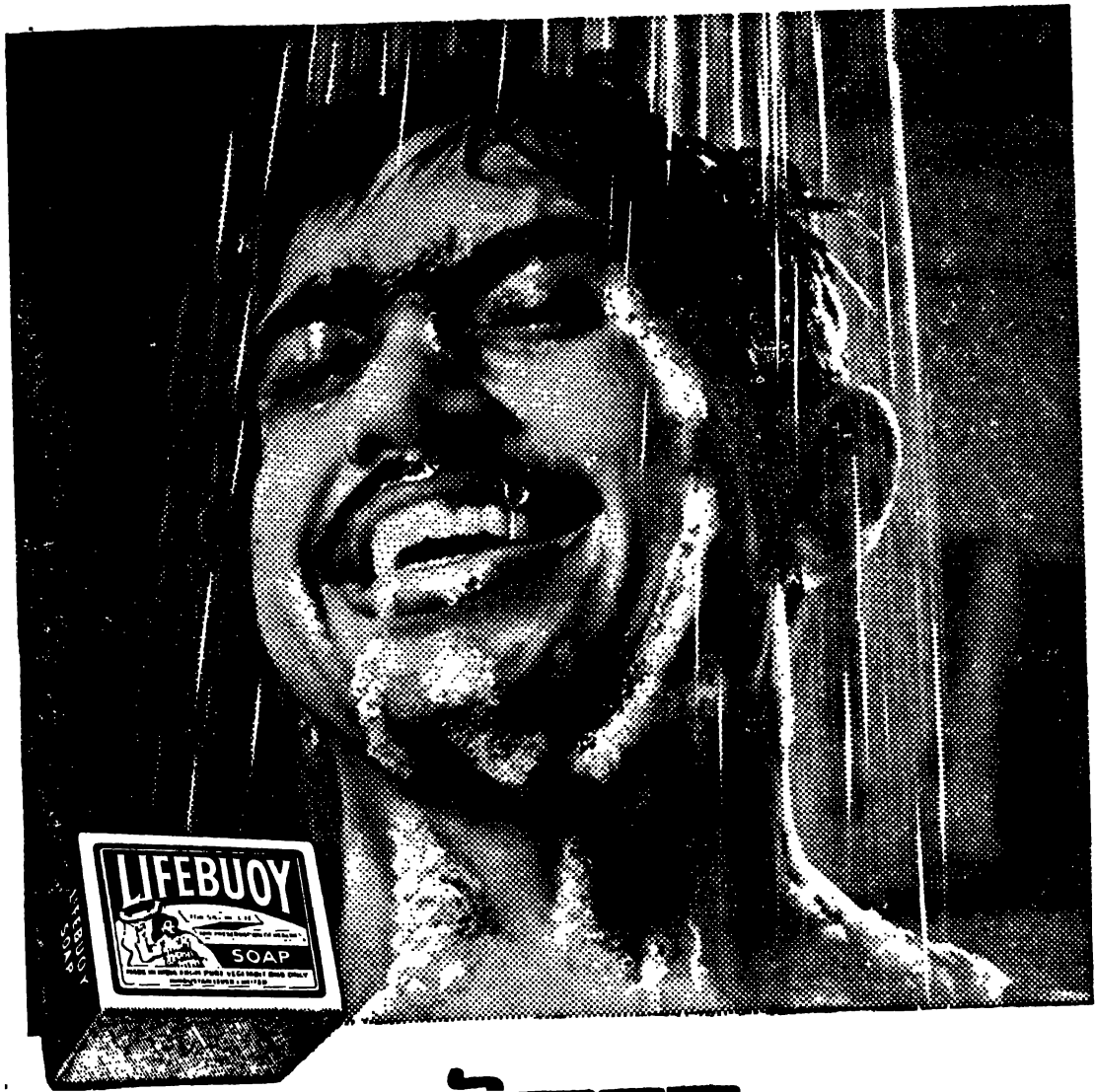
LIFEBUOY
SOAP

জরুর বাপ-দাদা কা সারনেম ভী প্যাটেল কে সাথ জোড় লো।"

—"অতি বিচক্ষণ লোক—অতি বিচক্ষণ লোক—" চার দিক থেকে সাধুবাদ।

—তবেই দেখুন, আমি বাঙালীদের কি রকম ভালোবাসি। আপনারা যে কলাশিল্পীদের নামের লিষ্ট করবেন তার মধ্যে কেবল প্রথিতযশা শিল্পীরাই নন, আমার ইচ্ছে, চুনো-পুঁটি কেউ যেন বাদ না পড়ে।"

অতিথিরা আর একবার সাধুবাদ দেবার উদ্যোগ করছিলেন, হল ঘরের ভিতরের দিকের পর্দা নড়ে ওঠায় বাধা পড়ল। ব্যগ্র কৌতূহলে সবাই চেয়ে দেখেন, লছমিয়া কুটীরের ভৃত্য-প্রধান আকন্দরাম ঘরে ঢুকলো। পিছনে নানাবিধ খাবারের প্লেট পূর্ণ ট্রে হাতে গুটি তিনেক বালক ভৃত্য। সবার পিছনে এক রূপসী, তন্বী তরুণী।

ট্রেগুলি যথা স্থানে ন্যস্ত হলো। ভৃত্যের দল অন্তর্দ্ধান করলো। পানীয় পরিবেশন করবার জন্ম তরুণী টেবিলের এক ধারে একটি সোফায় উপবিষ্ট হলো।

কুণ্ডুপ্যাটেল পরিচয় করিয়ে দিলেন, "আমার একমাত্র কন্যা বলুন, পুত্র বলুন এই কুমারী পঙ্কশীলা। গ্লাসগো ইউনিভারসিটি থেকে তর্কশাস্ত্রে এম্‌-এ পাশ করে এসে এখন এখানে ডাক্তার মবলঙ্করের আণ্ডারে গবেষণা করছে। গবেষণাটি যেন কিসের ওপর মা পঙ্কু ?"

পঙ্কু কেটলী থেকে টিপটের ভিতর গরম জল ঢালছিল। সংক্ষেপে জবাব দিল, রবীন্দ্রনাথের "ছেলেটা।"

হংসবাহন একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, "আপনাকে নমস্কার করব কি মিস কুণ্ডুপ্যাটেল, প্রণাম করতে ইচ্ছে হচ্ছে। উঃ, কি কঠিন বিষয়ই না আপনি রিসার্চের জন্ম চুজ করেছেন। এ সাহস আজ পর্য্যন্ত কারুর হয় নি।"

পঙ্কশীলা বেজার মুখে বললে, "এত বড় নাম-করা লোক, এত লেখা। কিন্তু পড়ে দেখলাম সবই যেন কেমন পান্‌সে পান্‌সে। ঐ ছেলেটার মধ্যেই যা একটু এ্যাডভেঞ্চারের স্পিরিট পাওয়া গেল।"

পট্টনায়েক নিমীলিত চোখে খাবারের ট্রেগুলির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, "লক্ষ্মী সরস্বতী দুই-ই কুণ্ডুপ্যাটেল মশায়ের ঘরে এসে গাঁটছড়া বেঁধেছেন। মা লক্ষ্মী তোমাকে তুমি বলছি, কিছু মনে কোরো না—"

পঙ্কশীলা তাঁর দিকে এক নজর তাকিয়ে সংক্ষেপে বললে, "আপনি বয়সে আমার পাপার চেয়ে বড়ো, বলবেন বৈকি !"

—"হ্যাঁ তাই। বলছিলাম কি, তোমার রিসার্চের বিষয় অতি দুরূহ সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি চমৎকৃত হচ্ছি কুণ্ডুপ্যাটেল মশাইয়ের বাংলা বুলি শুনে, এত সুন্দর শুদ্ধ ভাষা আর উচ্চারণ, কে বলবে উনি জন্মাবধি বাংলার বাইরে মানুষ।"

কুণ্ডুপ্যাটেল হেসে বললেন, কলকাতায় এসে শিখেছি। ঐ যে আমার শ্বশুর লিখে ছিলেন না, য্যাসা দেশ এ্যাসা ভেস, বড় মূল্যবান কথা। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আমি আমার এ সংস্কৃতি-সম্মেলনকে নিছক শো হিসেবে খাড়া করতে চাইনে। আমি চাই, খ্যাত অখ্যাত সবাই একত্র হয়ে এখানে এসে মন খুলে হৃদয় বিনিময় করুক। দেশের লোকের অন্তরের স্পর্শ পেয়ে আমিও ধন্য হই।

পঙ্কশীলা প্লেটে প্লেটে চামচ দিয়ে খাবার তুলছিল। বললে, "তুমি ধন্য হও বা না হও, তারা অন্ততঃপক্ষে এক পেয়ালা চা পেলেও ধন্য হবে। পুওর ফেলোরা চায়ের স্বাদ প্রায় ভুলেই গেছে। রং-করা কাঠের গুঁড়োর পাউণ্ডও ত এখন দশ টাকার কম মেলে না।"

বিদুষী পঙ্কশীলা লেখাপড়া ছাড়া আরও একটি কাজ করে থাকে। কার্ল মার্ক্সের সমাজতন্ত্রবাদ ও হিটলারের নাজীবাদ—দুইয়ের সংমিশ্রণে একটি নতুন ইজম সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে একটি বিরাট পার্টি সংগঠন করেছে। সে-ই এ পার্টির নেত্রী। পুওর ফেলোদের প্রতি তার ভালবাসা ইতিমধ্যেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

তারিণীতারণ চৌধুরী বৃদ্ধ ব্যক্তি। ইংরেজ, কংগ্রেস দুইয়ের সম্বন্ধেই তাঁর অভিজ্ঞতা প্রচুর। টাকায় এক মণ চালের যুগে জন্মে এখন একের পিঠে দুই শূন্য দামের চাল খাচ্ছেন। (অবশ্য পঞ্চাশের মন্বন্তরে ঢাকায় চালের দাম একশো কুড়ি টাকা অবধি উঠেছিল। তবে সেটা ছিল আকস্মিক সঙ্কটকাল। আমি নরম্যাল টাইমের কথা বলছি।)

অভিজ্ঞতা প্রচুর বলে তাঁর মুখে শব্দ নিঃসরণ হয় কম। এসে অবধি চুপ করেই বসে ছিলেন। এখন পঙ্কশীলার মুখে কাঠের গুঁড়োর দাম শুনে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। কোমল হেসে বললেন, "মা লক্ষ্মী, জিনিসের দাম বাড়াটা কিসের সাক্ষ্য দেয় ?"

করঞ্জাক্ষ ঝটিতি বলে উঠলেন, "হাই লিভিং ষ্টাণ্ডার্ডের।"

এতক্ষণ পরে কুমারী পঙ্কশীলার চারুমুখে অশনিপ্রভাবৎ এক ঝিলিক হাসি ঝিল্‌মিলিয়ে উঠলো। করঞ্জাক্ষকে অগ্রাহ্য করে চৌধুরীর দিকে চেয়ে বিনীত হেসে জিজ্ঞেস করলে, "জ্যাঠামনি, মনুমেন্টের গোড়ায়

রোজ সন্ধ্যায় ডাষ্টবিন কারগুলো গিয়ে জমা হয় কি জন্ম?

এবারো উত্তর দিলেন করঞ্জাক্ষ—"জানেন না বুঝি? মড়া তুলবার জন্ম, স্রেফ মড়া তুলবার জন্ম। দেশ-প্রেমিকের মুখোস-পরা একদল লোকার ময়দানটাকে করে তুলেছে যেন হাইড পার্ক। ভাগাড়ে শকুনের মত দেশের সর্ব্বত্র নিটোল শান্তি ত ওদের সহ্য হয় না, তাই দু'দশ জন লোক জড়ো করে মনুমেণ্টের গোড়ায় গিয়ে খামোকা সরকারকে গালাগাল দেবে আর 'অন্ধকার—অন্ধকার'—বলে পরিত্রাহি চেঁচাবে। লোকগুলোও এমনি বোকা-তাই শুনে হিটেড হয়ে টপাটপ মনুমেণ্টের চূড়োয় উঠবে আর ঝপাঝপ লাফ দেবে। যেন মরাটাই বাঁচার মস্ত বড় উপায়।

নিজের রসিকতায় নিজেই খানিক খি-খি করে হাসলেন করঞ্জাক্ষ।

বিপদভঞ্জন ভড় শিরঃসঞ্চালন করে বললেন—"হাসির কথা নয়। প্রসেসন, সত্যাগ্রহ, আন্দোলন—এ সবের মত অর্ডিনান্স জারী করে সরকারের উচিত ঐ হাইড পার্কের শ্বাপদও দূর করে দেওয়া। কিন্তু তা ত সরকার করবেন না। গণতন্ত্রের গায়ে আঁচড়টি লাগতে পারবে না এ দেশে। সাধে কি আর বিদেশীরা একে বলে রামরাজ্য।"

রুদ্রাক্ষ স্বান্ন্যালের ধাতটাই বিরক্ত বিরক্ত।

বলে উঠলেন, "নিকুচি করেছে রামরাজ্যের। সব কিছু ব্যান করেছেন আর গাছে চড়াটা ব্যান করতে পারছেন না? রাস্তা দিয়ে হাঁটবার জো নেই, গাছের ডালে ডালে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে বেটা-বেটিরা। মড়ার লাথি খেতে খেতে রাস্তা হাঁটো। ছ্যাঃ—"

বিদুষী পঞ্চশীলা খুকু খুকু মুখ করে বললে, "তা সেজন্ম রাগ করার কি আছে কাকামণি? ওটা ত হাই লিভিং ষ্ট্যাণ্ডার্ডেরই ফল। মরবার জন্মও লোকে দৌড়ুচ্ছে মনুমেণ্টের মাথায় নয় ত গাছের মগডালে।"

তারিণীতারণ মাঝে মাঝে কানে কম শোনেন। বয়স ত হয়েছে। এ সব কিছুই শুনতে পেলেন না। বললেন, "উনিশ শো সাতচল্লিশে সরকার যখন দেশের ভার নিলে, কি ছিল অবস্থা? আর আজ, উনিশ শো পঁচাশীতে চেয়ে দেখ, রাস্তায় একটা ভিখিরী নেই, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ নামে কোন দপ্তরের অস্তিত্বই নেই।"

পঞ্চশীলা হেসে বললে, "সে কথাই বলছিলেন আমা-দের প্যার্টির সেক্রেটারী ওল্ড ফেলো পিনাকীরাম। কি কাণ্ডই না হ'ত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের আমলে। একবার কি করে যেন বাইরের গোটা দুই ছোকরা ঢুকে পড়েছিল চাকরিতে, কাউন্সিলে তাই নিয়ে হাতাহাতি-কাটাকাটি। তা জ্যাঠামণি, তার পর থেকেই বুঝি তুলে দেওয়া হ'ল ঐ দপ্তরটা?"

করঞ্জাক্ষের গলায় রসমলাই আটকে গিয়ে বিষম খেলেন, পট্টনায়েক উপন্যাসখানির পরিণাম চিন্তা করে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তাড়াতাড়ি বললেন, "মা পঞ্চু, শিক্ষার অগ্রগতিটা একবার দেখ, নাইন্টিন সিক্সটি সেভেন টু নাইন্টিন এইট্টি ফাইভ, কম্পেয়ার কর। একটা জমাদার, ঝাড়ুদারও তুমি এখন নন্-গ্রাজুয়েট পাবে না। রুরকেলা, ভিলাই, দুর্গাপুর, চিত্তরঞ্জন ইত্যাদির মিস্ত্রি মজুরগুলো পর্য্যন্ত সায়েন্স স্কলার—"

—"পুওর ফেলোরা ও ছাড়া চাকরিই পায় না, তা ছাড়া ওরা বোধ হয় রামধুনও গাইতে পারে না—"

আহ্লাদী শেঠনন্দিনীর জ্যাঠামিতে ক্রমশঃ কায়ার হয়ে উঠছিলেন তারিণীতারণ, এবার বার্ষ্ট হতে হতে অনেক কষ্টে সেটাকে ছাদফাটানো হাসিতে পরিবর্ত্তিত করে ফেললেন। বাকীরা ভরামুখে যথাসাধ্য তাতে যোগ দিলেন।

হংসবাহন কোঁৎ করে মুখের ভীমনাগটি গলাধঃকরণ করে সোচ্ছ্বাসে বললেন, "মিস্ কুণ্ডুপ্যাটেলের কথা ত নয়, যেন কাব্য। হিউমারের মধ্যেও বাজে ছন্দের জলতরঙ্গ"—

পট্টনায়েক বললেন, "আর স্মরণশক্তি? সেই যে দু'বছর আগে এক বাঙালী সাইন্টিষ্ট বৈরিগী সেজে রামধুন গাইতে গাইতে দিব্যি বর্ডার পার হয়ে চায়নায় পালিয়ে গেল, মা লক্ষ্মী তা এ্যাগ্‌জ্যাক্টলি মনে করে রেখেছেন। শুনেছি সে বেটা নাকি সেখানে একটা চীনা মেয়ে বিয়ে করে সরকারী সিক্রেট গবেষণাগারে বসে রাতদিন খালি নতুন নতুন বোমার ফরমুলাই বানিয়ে দিচ্ছে। খুব খাতির-যত্ন পাচ্ছে।"

তারিণীতারণের তোবড়ানো গাল বিরক্তিতে কুঁচকে গেল। ঘড়ঘড়ে গলায় বললেন, "ও কুলাঙ্গারের কথা আর বোল না। ব্লাণ্ট ইনষ্টিটিউটে কেরাণীর কাজ করত। তা ছেড়ে চায়নায় গেল বোমা বানাতে। এর চেয়ে"—

—"আত্মহত্যা করাও ভালো ছিল।"

পাদপূরণ করে পঞ্চশীলা রিষ্টওয়াচের দিকে তাকালে, তাকিয়েই লাফিয়ে উঠলো। নমস্কারের ভঙ্গিতে দু' হাতের দুটি আঙুল একত্র করে বললে, "জ্যাঠামণি, কাকামণিরা আমার একটা মিটিং লীড করতে হবে সাড়ে সাতটায়। সওয়া সাঁত বাজে। আমি চললাম, সংস্কৃতি-সম্মেলনে আবার দেখা হবে।"

নাচের তালে পা ফেলতে ফেলতে চলে গেল।

কুণ্ডুপ্যাটেল এতক্ষণ হাস্যমুখে অতিথি-দুহিতা যুদ্ধপর্ব্ব এনজয় করছিলেন। এখন বিগলিত স্নেহে বললেন, "পঙ্কুকে বলেছিলাম ব্যারিষ্টারী পড়। কিন্তু পুওর ফেলো, পুওর ফেলো করেই আমার এই মা-টি অস্থির। বড্ড দয়ার শরীর।

পৌনে ন'টায় মিটিং শেষ করে কুণ্ডুপ্যাটেল অন্দরে এলেন। খুব খুশী খুশী মুড। গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে বিদেশী শিল্প-সংস্কৃতির মেলা বসিয়ে দিয়েছিলেন। এবার স্বদেশী। নন্দন কাননের তাবৎ নন্দনদের ত্রিলোকপূজ্য হতে যে সময়টা লেগেছে, তার চেয়ে ঢের কম সময়ে তিনি জাতে উঠবেন। চাই কি, অদূর ভবিষ্যতে এই সরসির প্রধান পাদপাদপ হওয়াও তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়।

অন্যমনস্ক কুণ্ডুপ্যাটেল ঠিক পান নি লিফ্‌টটা কখন তাঁকে লছমিয়া দেবীর ঘরের সামনে এনে ছেড়ে দিয়েছে। একটা কাতর বিলাপের শব্দে তাঁর চমক ভাঙল। ঘরে ঢুকে দেখেন, লছমিয়া দেবী হাতীর দাঁতের পালঙ্কে বপু এলিয়ে চিৎপাৎ হয়ে পড়ে আছেন। মুখ থেকে অবিরত নির্গত হচ্ছে, "উঃ-আঃ, জলে গেল রে—জলে গেল" ইত্যাদি ধ্বনি।

দেবীর খাস দাসী রামপ্যারী তাঁর পায়ে সন্তর্পণে চন্দনকাঠের পাখা দিয়ে মৃদু মৃদু হাওয়া দিচ্ছে।

পায়ের কাছে বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে আছে লছমিয়া দেবীর সান্ধ্যকালীন পায়ে তেলমালিশ করার ঝি বিনীতা চ্যাটার্জ্জী।

কুণ্ডুপ্যাটেল উদ্বিগ্নমুখে বললেন, "এ্যাঁ, ব্যাপার কি? কি হলো?"

উত্তরে লছমিয়া দেবীর কাতরোক্তি ছাদের কড়ি-বরগা ছুঁই ছুঁই হলো।

রামপ্যারী জানাল, বিনীতা চ্যাটার্জ্জী গরম তেল উপযুক্ত রকম ঠাণ্ডা না করেই মাঈজীর পায়ে ঢেলে দিয়েছে। তাইতে মাঈজীর পা জ্বালা করছে।

মুডটাই খারাপ হয়ে গেল কুণ্ডুপ্যাটেলের। বিনীতার দিকে চেয়ে ধমকের সুরে বললেন, "এ্যাঁ, কিরকম মেয়ে তুমি, পড়াশুনা কি অশ্বডিম্ব নাকি?"

বিনীতা কেঁপে উঠে কাঁদো কাঁদো সুরে বললে, "আজ্ঞে ডোমেষ্টিক সায়েন্স নিয়ে এম. এস-সি, পড়েছিলাম।"

—"পড়ে তো ছিলে, বলি পাশ করেছ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"তাতে পায়ে তেলমালিশ করার কোর্স ছিল?"

—"আজ্ঞে ছিল।"

—"তবে পা পোড়ে কি করে?" প্রচণ্ড ধমক দিলেন কুণ্ডুপ্যাটেল।

এবার সত্যি সত্যিই কেঁদে ফেললে বিনীতা চ্যাটার্জ্জী। কোঁপাতে কোঁপাতে বললে, "আজ্ঞে ছেলেটিকে রোজ বস্তিতে একলা রেখে আসি। পাশের বাড়ীর দুটো বড় বড় ছেলে আমি বেরিয়ে এলেই ওকে মারধর করে। কাল পাথর মেরে কপাল ফাটিয়ে দিয়েছে, আজ তাই কিছুতেই একলা থাকতে চাইলে না, নিয়ে এলাম। ওরই জন্য—"

—ছেলে? তাজ্জব হলেন কুণ্ডুপ্যাটেল, বলে কি! একশো টাকা মাইনের পায়ে তেলমালিশ করার ঝি, তারও আবার পুত্রসাধ?

ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন, ঘরের মধ্যে কোথাও ছেলের টিকি দেখা গেল না। বললেন, "কোথায় সে ছেলে?"

—"আজ্ঞে ঐ যে পেছনের বারান্দার এক কোণে বসে আছে।"

লছমিয়া দেবী পাখী পুষতে ভালোবাসেন। পেছনের বারান্দায় ময়না, টিয়া, হরবোলা আদি হরেকরকম পাখীর খাঁচা ঝুলছে। একপাশে একটি রূপোর কাজ করা পাথরের পিলারের ওপর একটা কাকাতুয়াও রয়েছে। এই পাখীরা রোজ সকালে রামধুন গেয়ে লছমিয়া দেবীর ঘুম ভাঙায়।

সন্ধ্যার সময়ে 'জয় জগদীশ হরে' বলে এরা দশাবতার স্তোত্র গীত করে। হাতীর দাঁতের পালঙ্কে শুয়ে তাই শুনতে শুনতে লছমিয়া দেবী পায়ে তৈল মর্দ্দন করান।

কুণ্ডুপ্যাটেল দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন, বারান্দার এক কোণে একটা হাড় জিরজিরে বছর পাঁচেকের ছেলে মুখে আঙুল পুরে হাঁ করে পাখীগুলোর দিকে—না, পাখীগুলোর দিকে নয়, পাখীদের খাবারের প্লেটের দিকে চেয়ে আছে। ওর মুখের আঙুল বেয়ে টপ টপ করে লালা ঝরছে।

কিছুই বোধগম্য হলো না কুণ্ডুপ্যাটেলের। ফিরে এসে বললেন, "ও ত বসে পাখী দেখছে, তবে?"

এবার মুচকে হেসে উত্তর দিলে রামপ্যারী, "জী, ও চিড়িয়া নহী দেখতা। চিড়িয়া কে ডিনার পরহী উসকী আঁখে জম গয়ী। বৃজলাল উসটাইম চিড়িয়াকী খানা লগা রহা থা ঔর উস ও লড়কা বার বার হিঁয়া

আকর মাসে পুছ রহা থা এ ক্যা হ্যায়—ও ক্যা হ্যায়, বস্ উসী ফিকর মেহী তো অচামক গরম তেল—"

—"এটা কি ওটা কি মানে? ও কখনো পাখী দেখে নি?"

লছমিয়া দেবী এতক্ষণে ককিয়ে উঠলেন, "পাখী কেন দেখবে না, যত সব হাড়হাবাতে—ও নাকি কখনো আপেল আঙ্গুর কলা পাঁউরুটি বিস্কুট এসব চোখে দেখে নি, ওই সব দেখেই—"

—হ্যাষ্টি, কুণ্ডুপ্যাটেল এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝলেন। বিরক্ত হয়ে বললেন, "এ সব হাবাতে বাচ্চা সঙ্গে নিয়ে আসা কেন? দু'দিন পরে আমার বাড়ীতে এত বড় একটা কাজ আর এখন এই বিপদ।"

—কি হয়েছে পাপা, নাচতে নাচতে কুমারী পঞ্চশীলা এসে ঘরে ঢুকলো।

—"এই দেখ না, বি, সি, চ্যাটার্জ্জী গরম তেল ফেলে তোমার মামির পা পুড়িয়ে দিয়েছে।"

—"কই দেখি," পঞ্চশীলা এগিয়ে গিয়ে মায়ের মেদ-মন্থর শ্রীচরণখানি ভালো করে নিরীক্ষণ করলে, হেসে বললে, 'ষ্ট্রেঞ্জ! এই চর্ব্বির পাহাড় ভেদ করে তেলের উত্তাপ তোমার শরীরে পৌঁছল কি করে মামি?"

—নে-নে, তুই আর জ্বালাস নে বেটি। য-ত্তো সব জোটে এসে আমার নসীবে···। মিসেস চন্‌চন্‌ওয়ালার বাড়ীতে এর বড় বোন তেল মালিশ করে, শুনলুম ভারী মিষ্টি হাত। তাই শুনেই না একে রাখা। আগে কি জানি!

পঞ্চশীলা ঠোঁট উলটে বললে, "মামির যে কি বুদ্ধি পাপা, কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা! এর বড় বোন বিমলা চ্যাটার্জ্জী হ'ল গিয়ে একটা স্কলার আর এ হ'ল গিয়ে একটি মামুলি এম. এস-সি, তার মত হাত এর কি করে হবে?"

বিনীতা চ্যাটার্জ্জীর মুখ দেখে রামপ্যারীর বোধ হয় দয়া হলো। মেয়েটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এমনি ভাবে কথার চাবুক খাচ্ছে, এটা তার ভালো লাগলো না। হাজার হোক স্ব-শ্রেণীর লোক ত! বললে, "পহলী কসুর মাফ কিজিয়ে মাইজী। পাঁচ রূপয়া জর্মানা করকে ছোড় দো। পর গরীব বেচারী নকদা রূপয়া কহাঁ সে দেগী, আপ তলব সেহী কাট লো।"

শুনে বিনীতা চ্যাটার্জ্জী হাউমাউ করে একেবারে লছমিয়া দেবীর পোড়া পায়ের ওপরেই হুমড়ি খেয়ে পড়লো, "দোহাই মা-জী টাকা কাটবেন না, মরে যাব। ষাট-টাকার কমে যে এখন চালের খুদও পাওয়া যায় না।"

পঞ্চশীলা সহানুভূতিতে গলে গিয়ে বললে, "আহা, তোমার বর বুঝি বেকার?"

—"ওই বেকারী জন্যেই ত", গলা বুজে এলো বিনীতা চ্যাটার্জ্জীর।

—"বেকারীর জন্যে, কি?" পঞ্চশীলা অবাক।

—"জাহাজের খালাসী হয়ে কি জানি কোন্ মুল্লুকে পালিয়ে গেছে। বলত, মরতে আমার সাধ নেই বিনু, আমি বাঁচব।"

—"খুব করেছে। য-ত্তো সব। এখন যাও। ভবিষ্যতে সাবধান হয়ে কাজ করবে। আর ও সব ছেলে-টেলে সঙ্গে করে কখনো আসবে না।"

মামলা ডিস্‌মিস্ করে দিলেন কুণ্ডুপ্যাটেল। মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন, "দেখেছিস পঞ্চু, বেশী লেখাপড়া শিখে দেশের হাল কি হচ্ছে? ছেলেগুলোর খালি বিদেশ বিদেশ বাই হয়েছে। কেন, চাকরি—চাকরি না করে ব্যবসা করতে পারিস্ নে?"

বাড়ীর পুব-দিকের খোলা জমির ওপর অস্থায়ী বিরাট কুণ্ডুপ্যাটেল প্যাভেলিয়ন খাড়া হয়ে উঠেছে। ভিতরে ঘূর্ণায়মান বিরাট মঞ্চ। এক সঙ্গে এক শো শিল্পী নাচবে. গাইবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গত করবে একশো বিশ আর্টিষ্ট। একই সময়ে মঞ্চের অপর দিকে হাজারখানেক সাহিত্যিক বসে স্ব স্ব রচনা পাঠ করবেন। মঞ্চ ক্রমাগত ঘুরবে আর দর্শকরা একই সঙ্গে নাচ, গান, গল্প, কবিতা উপভোগ করবেন। অবশেষে হবে চিত্রতারকা প্রদর্শনী।

দক্ষিণ দিকে এক কোণে কানাত দিয়ে ঘেরা আলু-কাবলির কিচেন। বড় বড় লোহার পিপেয় চায়ের জল সিদ্ধ হচ্ছে।

কুণ্ডুপ্যাটেল ভীষণ ব্যস্ত। যদিও শ'য়ে শ'য়ে লোক খাটছে, তাঁর নিজের বিশেষ কিছু করবার নেই—তবু আসলে যজ্ঞটা ত তাঁরই। এই সংস্কৃতি-সম্মেলনের সাফল্যের উপর তাঁর ব্যবসা-জীবনের সফলতাও অনেক-খানি নির্ভর করছে। সুতরাং তাঁর আর দম নেবার সময় নেই। দুপুরে খাবার জন্যও ভিতরে যান নি। চাকরের হাত থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খাওয়াটা সেরে নিয়েছেন।

সাতটায় সম্মেলন আরম্ভ। পাঁচটা বাজে বাজে। এদিকের কাজ প্রায় শেষ। এখন একবার আলু কাবলির কদ্দর হলো দেখে অন্দরে যাবেন। স্নানটান সেরে ফিট-ফাট হয়ে স্ত্রী-কন্যা সহ পুষ্পতোরণে এসে দাঁড়াতে হবে বিশিষ্ট অতিথিদের অভ্যর্থনা করবার জন্য।

কুণ্ডুপ্যাটেল কিচেনের সামনে দাঁড়িয়ে আলুকাবলির খোশবু টেষ্ট করছিলেন, এমনি সময়ে মূর্ত্তিমান ছন্দপতনের মত হঠাৎ সঙ্গীত শিক্ষক (চিড়িয়াদের) বলবীর শর্ম্মা উর্দ্ধশ্বাসে এসে তাঁর কাণে কাণে কি যেন বললেন।

কুণ্ডুপ্যাটেলের চোখের সামনে গোটা প্যাভেলিয়নটাই যেন সহসা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো। দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে তিনি লিফটের দিকে দৌড় দিলেন।

লছমিয়া দেবীর ঘন ঘন ফিট হচ্ছে।

রামপ্যারী শুক্‌নো কাপড়ে চোখ ঘষে ঘষে চোখের চামড়া প্রায় তুলে ফেলেছে। বাড়ীশুদ্ধ ঝি, চাকর, আমলা, কর্ম্মচারীর দল—যারা ভিতরে ছিল, কাঠের পুতুলের মত কেউ দাঁড়িয়ে কেউ বসে।

কুণ্ডুপ্যাটেলকে দেখে লছমিয়া দেবী ফিট ভেঙে ডুকরে উঠলেন, "ওরে পঙ্কু, তোর মনে এই ছিল রে—"

কুণ্ডুপ্যাটেল পালঙ্কের এক পাশে বসে প্রড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "রোসো, রোসো, অত অস্থির হোয়ো না। আমি এখনি প্লেন ছুটিয়ে দিচ্ছি—ব্যাপারটা সঠিক জেনে নিই আগে—"

—"জেনে আর নেবে কি, ঐ হতভাগা চতুর মিত্তিরকে যখন তুমি হেড সোপারের (লছমিয়া দেবী sweeperকে বলেন সোপার) পোষ্ট দিলে তখনি আমার ভালো লাগে নি। একটা বি-এ পাশ মুখ্যু ওকে দিলে তুমি মাথায় চড়িয়ে—কত বিদ্বান বিদ্বান লোক এসেছিল, তোমার পছন্দ হলো না। তুমি কিনা চেহারা দেখেই গলে গেলে—"

—গেছে গেছে একটু ঝাড়ুদারের সঙ্গে বেড়াতে, তাতে দোসটা কি হয়েছে। চাঁদের কলঙ্ক কি কেউ দেখে? আমার মেয়ের নামে কথা বলবে সাহস কার?

রামপ্যারী চোখে আঁচল চাপা দিয়ে বললে, লেকিন উনকো তো সাদি ভী হো গয়া—"

—এঁ্যা, সাদি—

—জী হাঁ। এ খত দেখিয়ে—

লছমিয়া দেবীর বালিশের তলা থেকে একখানা চিঠি বের করে রামপ্যারী কুণ্ডু প্যাটেলের হাতে দিলে।

পন্‌চশীলা লিখেছে,

পাপা, কাল সন্ধ্যায় মিষ্টার চতুর মিত্র ঝাড়ুদারকে আমি কোর্টে গিয়ে যথারীতি বিয়ে করেছি। 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—তোমাদের দেশের গেঁয়ো কবির এই থিয়োরীটা কিন্তু ভারী চমৎকার। আমার প্রাণের কথা তোমাকে জানাচ্ছি পাপা, ঐশ্বর্য্যে আমার অরুচি এসে গেছে। আমি চাই একটু নিরিবিলি শান্তির জীবন।

তুমি যখন এ চিঠি পাবে, তখন বোধ হয় আমি ওয়েষ্টার্ণ কান্ট্রির কোন বরফ ঢাকা পাহাড়ের ওপর চতুরকে স্কেটিং শেখাচ্ছি। পুওর ফেলো এ জগতের কিছুই দেখেনি। যাক্, আমি আমার হাত খরচার লাখ-খানেক টাকা—যা আমার কাছে ছিল—তাই নিয়ে চলে এসেছি। তবে এতে কুলোবে না। চতুরকে সারা ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা ঘুরিয়ে দেখাতে হবে। সব জায়গাতেই নন্দন কানন ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ আছে। তুমি ওদের ট্রাঙ্ককল করে জানিয়ে দিয়ো, যখন যেখানে যাব, আমি যেন ব্যাঙ্ক থেকে টাকা পাই। আর একটি দরকারী কথা, চতুরের জন্য একটি কাজকর্ম্ম কিছু ঠিক করে রেখো। তা বলে তুমি ওকে ব্যবসায় ঢুকাতে যেয়ো না। ও সুকুমার রায়ের আবোল তাবোলের ছড়া ছাড়া আর কিছুই ভালো বোঝে না। বড্ড সরল আর ধর্ম্ম-ভীরু। বেশী টাকার আমাদের দরকারও নেই, আমরা চাই দরিদ্র হয়ে দেশের অন্তরের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াতে। তুমি বরং ওর জন্য একটি মন্ত্রীত্ব উপমন্ত্রীত্ব কিছু ঠিক করে রেখো। মন্ত্রীত্বে ঝামেলা কম। কাজকর্ম্ম ত অফিসিয়ালরাই যা করবার করবে, ও শুধু নাম সই করবে আর আবোল তাবোল আবৃত্তি করবে।

আমি জানি এজন্য মুখের একটি কথা খসানো ছাড়া তোমার আর কোন কষ্টই করতে হবে না। তোমার জামাই মন্ত্রী হতে চায় শুনলে তারিণী জ্যাঠার দল হাতে স্বর্গ পাবে।

আশা করি তোমার সংস্কৃতি সম্মেলন খুব সুষ্ঠু ভাবেই উদ্‌যাপিত হবে। পুওর ফেলোদের একটু পেট ভরে চা আর আলুকাবলি খাইয়ে দিও।

মামি আর তুমি টা—টা—পাপা, টা—টা—

তোমার আদরের পন্‌চু।

দু'হাতে মাথা টিপে আর্ত্তনাদ করে উঠলো কুণ্ডু প্যাটেল,—'আমার জামাই—নন্দন কাননের জামাই হবে একটা মন্ত্রী! হা রামজী—'

হাতীর দাঁতের পালঙ্ক কাঁপিয়ে আর একবার মূর্চ্ছা গেলেন লছমিয়া দেবী।

দিনে
দিনে
দিনে
দি...
রেক্সোনা সাবানে 'কাডিল'
বলে একটি বিশেষ ধরনের তেল
মেশানো হয়, যাতে ত্বক আরও
কোমল, আরও সুন্দর, আরও
লাবণ্যময়ী হয়···! সুবাস ভরা রেক্সোনার
পরশ সারাদিন আপনাকে সজীব আর
সতেজ রাখে। সৌন্দর্য্য সাধনায় সর্বদা
রেক্সোনা ব্যবহার করুন।
Rexona
BLENDED WITH CADYL

শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

শ্রীঅবনীনাথ রায়

'আনন্দবাজার পত্রিকা' খুলে হঠাৎ শৈলেনবাবুর মৃত্যু-সংবাদ পড়ে চমকে গেলাম। চেহারাটাও ভুল হবার নয়। কিন্তু কি করে তিনি মারা গেলেন? অসুখ-বিসুখের কথাও ত কিছু শুনি নি। একেবারে অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদ।

শৈলেনবাবু লোকটিকে কেউ ভাল না বেসে পারেন নি, যাদের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন। এর প্রধান কারণ, তিনি ছিলেন সিন্‌সিয়ার (Sincere) বা আন্তরিকতাপূর্ণ প্রকৃতির লোক। তাঁর আন্তরিকতা অন্যের আন্তরিকতাকেও উদ্বুদ্ধ করতো। তিনি যাকে ভালবাসতেন, যাকে বন্ধু বলে মনে করতেন, তাকে সত্যই ভালবাসতেন। তাঁর মুখে মনে কোন পার্থক্য ছিল না। এখন এই বস্তুটি অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হয়েছে। বন্ধু চেনার জো নেই। অনেকে মুখে হয়ত ভাল কথাই বলেন, কিন্তু পিছনে আবার তাঁরাই নিন্দা করেন। শৈলেনবাবুর মধ্যে এ জিনিস ছিল না।

দ্বিতীয় কথা তিনি অত্যন্ত নিরহঙ্কার স্বভাবের লোক ছিলেন। নিজে এম-এ, বি-এল ছিলেন, কিন্তু সাহিত্য সম্বন্ধে যদি কেউ একজন স্কুলের ছেলেও তাঁকে উপদেশ দিত তিনি নিরুদ্বিগ্নচিত্তে তা শুনতেন। সেই ছেলেটি বুঝতেও পারতো না যে কত বড় একজন পণ্ডিতকে সে উপদেশ দিচ্ছে। বিদ্যার বাইরের দাপট তাঁর আদৌ ছিল না। কোন দিন কোন কথায় নিজেকে জাহির করতে দেখি নি। পোশাকে-পরিচ্ছদে কোন দিন বাহুল্য ছিল না। আড়-ময়লা একখানি ধুতি, আর আড়-ময়লা একটি পাঞ্জাবী। কিন্তু আভিজাত্য ছিল সোনার চশমায় এবং দীপ্তিমান দুটি চক্ষুতে। বাস্তবিক শৈলেনবাবুর চোখ দুটি অসাধারণ উজ্জ্বল ছিল।

তিনি আদর্শবাদের যুগে জন্মেছিলেন—নিজে ছিলেন আদর্শবাদী। ওকালতির প্র্যাক্‌টিস ছেড়ে দিয়ে সাহিত্য-সেবার উদ্দেশ্য নিয়ে 'প্রবাসী' এবং 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকার একদা সহকারী সম্পাদকরূপে যোগ দিয়েছিলেন। তারপর অনেক ঝড়-ঝাপটা গেল—'প্রবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মারা গেলেন—অনেক রদ-বদল হ'ল কিন্তু শৈলেনবাবু জীবনের শেষ দিন অবধি ঐখানেই টিকে রইলেন। তাঁর মত সর্বগুণোপেত ব্যক্তি আর কোথাও চাকরি পেতেন না, এ আমি মনে করি নি। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে 'প্রবাসী' এবং 'মডার্ণ রিভিউ'কে যে হৃদয়ের আতিথ্য নিবেদন করে দিয়েছিলেন তা আর ফিরিয়ে নিতে পারেন নি। সুখে-দুঃখে তাদের সঙ্গেই নিজেকে জড়িয়েছিলেন। অর্থ বা প্রতিষ্ঠার দুরাকাঙ্ক্ষা তাঁকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে নি।

'রবি-বাসর' নামক সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের তিনি ছিলেন প্রথম নম্বরের সভ্য। বছরে একবার তাঁর গৃহে বাসরের অধিবেশন হত। সেই দিন বন্ধুদের মধ্যে যদি কেউ সেই অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকতো তিনি মনে খুব দুঃখ পেতেন। তারপর দেখা হলেই তিনি সে কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দিতেন। তাঁর বাড়ীর সিটিং-এ খুব ভুরি-ভোজের আয়োজন থাকতো। জিজ্ঞাসা করে করে তিনি প্রত্যেককে খাওয়াতেন। দিন-কাল যে বদ্‌লেছে, জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে—সে কথা তিনি আমলে আনতেন না। এইখানেই ছিল তাঁর আভিজাত্য। তিনি কলকাতার বিশিষ্ট লাহা বংশেরই একজন ছিলেন।

শৈলেনবাবু রোম্যাণ্টিক প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁর কবিতাও রোম্যাণ্টিকধর্মী। সুরে, ছন্দে, রচনাশৈলীতে তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অনুগামী। তাঁকে আমি একজন প্রথম শ্রেণীর কবি বলেই গণ্য করি। যদিও তিনি নিজে রোম্যাণ্টিক কবিতা লিখতেন, কিন্তু কোনদিন তাঁদের পরবর্তী যুগের আধুনিক কাব্যকে নিন্দা করতে শুনি নি। তাঁর মধ্যে পর-মত অসহিষ্ণুতা ছিল না। তিনি কবিতা আবৃত্তি করতে পারতেনও চমৎকার।

শৈলেনবাবু চলে যাওয়ায় রবি-বাসরের সেই লোকটির স্থান শূন্য হয়ে গেল, যে-লোকটি সকলের আগে এসে সভায় আসন গ্রহণ করতো। এত নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন যে, নিজে আঘাত পেয়েও অপরকে প্রত্যাঘাত করতে জানতেন না। বাইরের জগতে অপ্রকট হলেও তাঁর বন্ধুদের হৃদয়-জগতে তিনি বরাবর চিরন্তন হয়ে থাকবেন।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া

পণ্ডিত শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী, পঞ্চতীর্থ

কেহ কেহ বলেন যে, বর্ত্তমানে সংস্কৃত ভাষা মৃত। এই কথা যে কতদূর অসত্য তার অন্যান্য বহু প্রমাণ রহিয়াছে। কিন্তু সেই সকলের মধ্যে একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হইল এই যে, বর্ত্তমান যুগে মৌলিক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা বিদ্বজ্জন-বরেণ্য পশ্চিম বঙ্গীয় সরকারের সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী এই বিষয়ে অগ্রগণ্য। সংস্কৃত গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর নাম দেশে-বিদেশে সুবিদিত। তাঁর বিরচিত সংস্কৃত সাহিত্যে নারীর দান, সংস্কৃত সাহিত্যে মুসলমানের দান, সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান, দূত কাব্য সংগ্রহ প্রভৃতি সীরিজে প্রকাশিত শতাধিক গ্রন্থ সংস্কৃত গবেষণা সাহিত্যের এক একটি অমূল্য রত্ন।

তাহার থেকেও অধিক সুখের বিষয় এই যে, তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া সংস্কৃত মৌলিক রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় রচিত দূত কাব্যের ইতিহাস এবং ঘট-কর্পর কাব্যের উপর শাশ্বতী, এবং পদাঙ্কদূতের উপর ভাস্বতী টীকা পণ্ডিত-সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। ইহা ব্যতীত তিনি বহু সংস্কৃত নাটক, সঙ্গীত ও কবিতা রচনা করিয়া যশোভাজন হইয়াছেন। ডক্টর চৌধুরীর নাটকগুলি তাঁহার ও তাঁহার বিদুষী পত্নী ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত প্রাচ্য-বাণী মন্দির কর্ত্তৃক ভারতের সর্ব্বত্রই অভিনীত হইয়াছে এবং সকলের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। এই নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক শ্রীমহাপ্রভুর লীলা সঙ্গিনী মহা-

জননী বিষ্ণুপ্রিয়ার পুণ্য জীবনের উত্তরাংশ অবলম্বনে বিরচিত ভক্তি বিষ্ণুপ্রিয়ম্। এই নাটকটি ভারতের বহু স্থানে বিশেষ প্রশংসার সহিত বহুবার অভিনীত হইয়াছে। এই নাটকটি ১৯৫৭ সনে অল ইণ্ডিয়া রেডিও হইতে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে আধুনিক লেখক বিরচিত সর্বপ্রথম নাটকরূপে যখন প্রচারিত হয়, তখনই তাহা শুনিয়া আমরা সকলেই বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলাম। এখন পুনরায় নাটকটি এক নিঃশ্বাসে পাঠ করিয়া বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়াছি।

প্রথমতঃ, নাটকটির ভাষা অতি সহজ, সরল, সুমিষ্ট ও প্রাঞ্জল। সংস্কৃত অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পক্ষেও গ্রন্থ বুঝিতে কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা কঠিন বলিয়া অকারণে ভীত হন, তাঁহারা এই নাটকটি পাঠ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিবেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

দ্বিতীয়তঃ, এই নাটকটির বিষয়বস্তু ডক্টর চৌধুরীর গবেষণা-লব্ধ সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। জননী বিষ্ণুপ্রিয়াকে কাব্যের উপেক্ষিতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ডক্টর চৌধুরী সেই মহাজননীরই অতি পবিত্র চরিত্র-মহিমা স্বীয় গবেষণালোকে জগৎ সম্মুখে উদ্ভাসিত করিয়া সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন।

তৃতীয়তঃ, এই নাটকটির শ্লোক ও সঙ্গীতের প্রাচুর্য ও উৎকর্ষ বিশেষ লক্ষণীয়। শ্লোকগুলি ছোট বড় বহু সংস্কৃত ছন্দে বিরচিত; তাহাদের ধ্বনিমাধুর্য ও ভাবমহিমা ইহাই প্রমাণ করিয়াছে যে, ডক্টর চৌধুরী সত্যই উচ্চস্তরের কবিপদবাচ্য। উদাহরণক্রমে, তাঁহার অসংখ্য কবিতা-মণিমালা হইতে একটিমাত্র এখানে উদ্ধৃত করিলাম। এটি মহাপ্রয়াণের পূর্বে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে নিবেদন করিতেছেন। এই সুন্দর কবিতাটি সুললিত মন্দাক্রান্তা ছন্দে বিরচিত এবং ইহাতে মহাজননী কি অপরূপ ভাবে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মধ্যে বিলীনা হইয়া যাইবেন, তাহাই অতি অনবদ্য ভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

> সিন্ধৌ বিন্দুস্তপন-কিরণে লীয়তে দীপলেখা
> তারাদীপ্তি হিমাকর-করে সৈকতে ধূলিলেশঃ।
> শব্দ ব্রহ্মণ্যতিসুচপলো বাহতঃ ক্ষুদ্রনাদস্
> ত্বচ্চাহং প্রিয়তমতপোরাশিলীনা ভবেয়ম্।

সর্বশেষে, নাটকের যে জিনিসটি আমার সর্বাপেক্ষা অধিক মর্মস্পর্শ করিয়াছে, তাহারই উল্লেখ করিব। তাহা হইল নাটকের অনুপম ভক্তিসুষমা। নাটকের প্রত্যেকটি ছত্র, প্রত্যেকটি শ্লোক, প্রত্যেকটি সঙ্গীত ইহাই নিঃসংশয়ে প্রকাশ করে যে, নাট্যকার কেবল সুধী পণ্ডিত নহেন, কেবল মরমিয়া কবি নহেন—তাহার অপেক্ষাও বড় কথা, তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত। সাধারণ ভক্তজনের আতিশয্য ও উচ্ছ্বাস বর্জন করিয়া সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানসম্মত এবং গবেষণার ভিত্তিতে তিনি তাঁহার হৃদয়ের সেই অনবদ্য ভক্তি-পুষ্পার্ঘ্য শ্রীমন্ মহাপ্রভু-জননী বিষ্ণুপ্রিয়ার পাদপদ্মে অর্পণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা নিশ্চয় গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ধন্য করিবেন।

আমরা আশা করি যে, ভারতবর্ষের প্রতি নগরে এবং জনপদে এই পবিত্র সুন্দর ও মধুর নাটকটি অভিনীত হইয়া একাধারে সংস্কৃত সাহিত্য ও ভক্তিধর্মের প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিবে।*

---

* ডক্টর শ্রীযতীন্দ্র বিমল চৌধুরী কর্তৃক রচিত এবং প্রাচ্যবাণী মন্দির কর্তৃক দেবনাগরী ও বাংলা উভয় হরফে স্বতন্ত্র সংস্করণে প্রকাশিত। প্রথম সংস্করণে অর্থাৎ নাগরী সংস্করণে ইংরাজী ভূমিকা এবং দ্বিতীয়ে বাংলা ভূমিকা সংযোজিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থল, প্রাচ্যবাণী মন্দির, ৩, ফেডারেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯। মূল্য—দুই টাকা।

আসন্ন—শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়। শান্তি লাইব্রেরী, ১০-বি, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। মূল্য—৪৲।

"জন-মানস কবিতাকে আতঙ্ক বা অবজ্ঞাভরে দূরে ঠেলে রাখবে, দুর্বোধ্যতার অজুহাতে অপাঠ্য বলে করবে উপেক্ষা, ঐতিহ্যহীন চিন্তা-ভাবনায় ভয়াবহ স্বাতন্ত্র্যের জন্যে দলীয় কয়েকজন বুদ্ধিমান্ রসিকের কাছেই তা আস্বাদযোগ্য হবে, আধুনিক কবিরা, যত দিন যাচ্ছে, এটা আর বরদাস্ত করতে পারছেন না।" যদিও আধুনিক-নামধেয় অনেক কবি বোধ হয় এখনও ঐ "ভয়াবহ স্বাতন্ত্র্যে"র পক্ষপাতী, তবু অমিয়রঞ্জন বাবু যে তাঁদের সমর্থক ন'ন, সে-কথা এই উক্তি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। তিনি জীবনের কথা সহজ সুরে বলতে চেয়েছেন। অথচ সে-কথা লঘু অনুভূতিমাত্র নয়, তার পিছনে আছে মনন ও পর্যবেক্ষণ। এ বইয়ের প্রায় সব কবিতাই গল্প বা জীবন চিত্র। কল্পনা এখানে অবাস্তব ভাব-বিলাসমাত্র নয়, অভিজ্ঞতা'র দৃঢ় ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। বারোটি কবিতা এতে আছে। আধুনিক জীবনের বিভিন্ন দিক্ ও সমস্যা এগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে অন্তরের নানা বৈপরীত্যে ও ঘাতপ্রতিঘাতে জমেছে কাহিনী। প্রকাশভঙ্গিতে নূতনত্ব আছে, কিন্তু অসঙ্গতি বা দুর্বোধ্যতা নেই। কবি-রূপে তিনি পূর্ব্বেই স্বীকৃতি পেয়েছেন। এ গ্রন্থে তাঁ'র বৈচিত্র্যসন্ধানী শিল্পী মনের আর একটি সুন্দর প্রকাশ লক্ষ্য করা গেল।

পাঁচ মিশালী—খোন্দকার মাস্তুরুর রহমান। প্রকাশিকা—বাদরোন্নেসা খাতুন, ১১২ শেরশাহ মেস, নতুন দিল্লী। মূল্য ২৲।

কবিতায় আজ সহজ সৌন্দর্য্য দুর্লভ বলেই অগভীর হলেও স্বচ্ছন্দ সাবলীল কবিতা দেখলে আনন্দ হয়। এ বইয়ের কবিতাগুলিতে হেঁয়ালী বা জড়তা নেই। ভাষা পরিষ্কার বাংলা। কোথাও কোথাও রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলের কবিতার ছায়া পড়েছে, সেটা নবীন কবির পক্ষে অমার্জনীয় নয়।

মুক্তিতীর্থ জালালাবাদ—শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য। প্রকাশক—শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য, ৩এ, বালুহাক্কাক লেন, কলিকাতা—১৭। মূল্য—৩০ নয়া পয়সা।

"চট্টগ্রামের বীর বিপ্লববাহিনীর জালালাবাদ যুদ্ধস্মৃতি উদ্‌যাপন দিবসে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রচারিত।" ক্ষুদ্র পুস্তিকা। ওজস্বিনী ভাষায় উদ্দীপনাময়ী কবিতায় কবি বীর বিপ্লবীগণের বন্দনা গেয়েছেন।

দীঘা—শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য, ১৬ আমির আলি এভেনিউ, কলিকাতা ১৭, হইতে শ্রীমতী শোভনা ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য—১৲।

সমুদ্র তীরবর্ত্তী দীঘা বাংলার একটি মনোরম স্থান হয়েও এত দিন উপেক্ষিত ছিল"। সম্প্রতি এর প্রতি সরকারের এবং সাধারণের দৃষ্টি পড়েছে। কালীপদ বাবু এই স্থানটির প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং শান্তিময় পরিবেশ সুন্দর কবিতায় বর্ণনা করেছেন। তাঁর রচনায় একটি গভীর দার্শনিক মনোভাবও ফুটে উঠেছে।

"প্রাণ হেথা ফুটে ওঠে দিব্য সুষমায়,
দিবারজনী চলে অমৃত ধারায়।"

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দিগন্তের মেঘ—শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী। রঞ্জন পাবলিশিংহাউস, ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা৩৭। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

'দিগন্তের মেঘ' একখানি কাব্য-সঙ্কলন। বই হিসাবে নূতন হইলেও, ইঁহার বহু কবিতা বিবিধ পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়া কবি হিসাবে তাঁহার নাম চিহ্নিত হইয়া আছে। রবীন্দ্রোত্তর যুগে যথার্থ কবির আত্মপ্রকাশ একটা বিস্ময়ের বস্তু। উগ্রপন্থী আধুনিক কবির আওতায় সত্যিকার গুণিজনের সন্ধান পাওয়া কঠিন। পাওয়া গেলে মন আনন্দে নাচিয়া উঠে। সন্তোষকুমার আধুনিক হইয়াও যথার্থ কবি। তাঁহার কবিতার প্রতিটি লাইন দরদে পূর্ণ।

"এপারে বালুর শয্যা,
আমি শুনি দূর অরণ্যের
বিচিত্র গুঞ্জন ; তার সঙ্গে সমুদ্র-ভাষা
অস্থির কল্লোলে ;
এপারে নীরব সন্ধ্যা। ছায়া নামে ম্লান অন্ধকারে
তীক্ষ্ণ হৃদয়ের 'পরে। ক্ষণিকের বালুর প্রাসাদে
ঘনাইয়া আসে রাত কুয়াশা নিবিড়।
হিমশান্ত মৌন সেই রাত্রির বিজন হতে
আলোকের দীপ্তি দেখি উত্তপ্ত মনের বেদনাতে।
সেই সত্য যদি,
এ আঁধারে অপূর্ণ হৃদয়ে তাকে
নাই বা দিলাম গান
আমার স্বপ্নের।"

এইরূপ অপূর্ব্ব ধ্বনি ও ভাব-বিন্যাসে কবিতাগুলি রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। ধ্বনিই হইল কাব্যের প্রাণ। যার ধ্বনি নাই সে কাব্য-পদবাচ্যই নয়। অথচ সেই কাব্যই আজ বাজারমাৎ করিয়া রাখিয়াছে। যে কবি-সত্তা সন্তোষকুমারের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে, তাহাই তাঁহাকে সিদ্ধির পথে লইয়া যাইবে একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। সব চেয়ে বড় কথা হইল, তাঁহার কবি-প্রাণ আছে। তাঁহার 'দিগন্তের মেঘ' কাব্য-জগতে সেই স্বীকৃতি।

শ্রীগৌতম সেন

দেশ-বিদেশের কথা

বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনের ১৯৫৯ সনের কার্য্যবিবরণী

মঠ

১। ১৯৫৯ সনের দৈনন্দিন পূজা উপাসনা যথা-নিয়মিত ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই বর্ষে ৩৬০টি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও আলোচনার অনুষ্ঠান হইয়াছিল এবং ৮টি ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সারা বৎসর যাবৎ প্রতি একাদশীর দিন শ্রীশ্রীরামনাম সংকীর্ত্তন, শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী, শ্রীশ্রীকালীপূজা, শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর, শ্রীমৎস্বামী বিবেকানন্দজী এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যান্য লীলা সহচরগণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে উৎসব-অনুষ্ঠান যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছিল।

২। আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগার ও তৎসংলগ্ন সাধারণ পাঠাগার পরিচালনার কার্য্য যথাযথভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল। গ্রন্থাগারে মোট ৩৪৩১টি পুস্তক ছিল। নিয়মিত ভাবে ৩০টি সাময়িক পত্রিকা এবং ৩টি দৈনিক পত্রিকা পাওয়া গিয়াছিল। পুস্তক গ্রাহক বা পাঠকের সংখ্যা ২৫৮৮ (গ্রন্থাগারের চাঁদাদাতা সভ্যসংখ্যা ৯৯৯ এ বিনা চাঁদায় গ্রাহকের সংখ্যা ১৫৮৯)।

মিশন

চিকিৎসা-বিভাগ

দাতব্য চিকিৎসালয়:

মিশন কর্ত্তৃক ৩টি দাতব্য ঔষধালয় ১৯৫৯ সনে যথাযথ ভাবে পরিচালিত হইয়াছিল। চিকিৎসিত রোগীগণের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১৯৫৯

বাঁকুড়া প্রধান দাতব্য চিকিৎসালয়

নূতন রোগী	১১২৫৫
পুরাতন রোগী	৫৭৫৬৫
মোট	৬৮৮২০
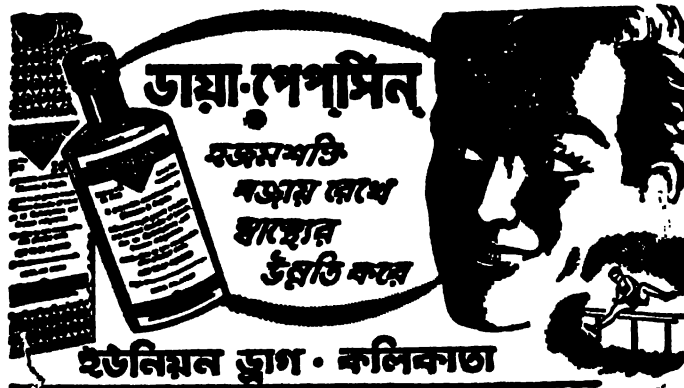
বাঁকুড়া দোলতলা শাখা দাতব্য চিকিৎসালয়

নূতন রোগী ২১৩৬
পুরাতন রোগী ৮৩৭৭
মোট ১০৫১৩

রামহরিপুর শাখা দাতব্য চিকিৎসালয়

নূতন রোগী ১৫৪৫
পুরাতন রোগী ৪৭৭২
মোট ৬৩১৭

সর্ব্বসাকুল্যে ৮৫৬৫০

শিক্ষাবিভাগ

সারদানন্দ ছাত্রাবাস, বাঁকুড়া :

১৯৫৯ সনে এই ছাত্রাবাসে ২০টি ছাত্র ছিল। এই ছাত্রদিগের মধ্যে ৫ জনকে বোর্ডিং-চার্জ্জ সম্বন্ধে সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল। ছাত্রাবাসের ১০ জন ছাত্র আই, এস্-সি, পরীক্ষা দিয়াছিল, তন্মধ্যে ১ জন প্রথম বিভাগে, ৩ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ৩ জন তৃতীয় বিভাগে—মোট ৭ জন কৃতকার্য্য হইয়াছিল। ৩ জন ছাত্র আই, এ পরীক্ষা দিয়াছিল, তন্মধ্যে ১ জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণ মিশন আরবেন (নাগরিক) জুনিয়ার বেসিক স্কুল, বাঁকুড়া :

আলোচ্য বর্ষে এই বিদ্যালয়ে মোট ৭৬ জন ছাত্র ছিল, তন্মধ্যে ৪৮ জন বালক এবং ২৮ জন বালিকা। ১৩ জন ছাত্রছাত্রী অবৈতনিক এবং ৬ জন অর্দ্ধবৈতনিক ছাত্ররূপে অধ্যয়ন করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল।

রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশন অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় :

এই বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ১০৩, তন্মধ্যে ২৪টি বালিকা-ছাত্রী। ৯ জন প্রাথমিক শেষ পরীক্ষা দিয়াছিল, তন্মধ্যে ৬ জন উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় :

এই বৎসর বিদ্যালয়ে মোট ২৪৩ জন ছাত্র ছিল। তাহার মধ্যে ২৪ জনকে অবৈতনিক ছাত্ররূপে এবং ৪৭ জনকে অর্দ্ধবৈতনিক ছাত্ররূপে পড়িবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। এই বৎসর কোনও ছাত্র এই বিদ্যালয়

হইতে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দেয় নাই যেহেতু তাহাদিগকে ১৯৬০ সনে উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে ৮০০ শত পুস্তক ছিল এবং ৪৯০টি পুস্তক ছাত্রগণ কর্তৃক গৃহীত এবং পঠিত হইয়াছিল।

বিদ্যালয় এবং সমাজ-শিক্ষা কেন্দ্র, রামহরিপুর :

প্রাপ্ত বয়স্কদের নৈশ-বিদ্যালয়ে ১৮টি ছাত্র ছিল। এতৎসংলগ্ন গ্রন্থাগারে পুস্তকসংখ্যা ছিল ৭৬১টি এবং সারা বৎসরের মধ্যে সর্ব্বসমেত ৭০৫ খানি পুস্তক বিদ্যার্থীগণের পাঠের নিমিত্ত দেওয়া হইয়াছিল। ৫টি স্থানে ম্যাজিক-লণ্ঠন সাহায্যে বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং প্রতিটি বক্তৃতাতে গড় ৪০০ শত শ্রোতার উপস্থিতি ঘটিয়াছিল।

সাহায্যদান কার্য্য

বাঁকুড়া শাখা :

বাঁকুড়া জেলার ছোট বীরভানপুর গ্রামের নয়টি অগ্নিপীড়িত পরিবারকে গৃহ-মেরামত ও ছাদন জন্য সাহায্য দান করা হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষের মধ্যে কয়েকজন দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে ২৫৺৫৫ নঃ পঃ আর্থিক সাহায্য করা হইয়াছিল।

রামহরিপুর শাখা :

এই অঞ্চলে এই মিশন কর্তৃক সরকারী টেষ্ট রিলিফের কার্য্য পরিচালিত হইয়াছিল।

মিশনের হিসাব

	আমদানী	ব্যয়
মিশনের সাধারণ তহবিল	৪,৫৩৪৺৯৬ টাকা	৪,০৮০৺১৮ টাকা
মিশনের দাতব্য ঔষধালয়	৪,১৬৮৺৭৫ „	৪,১৪৯৺৩৮ „
রামহরিপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়		
গৃহনির্ম্মাণ তহবিল	২০,৯২৯৺৯১ „	৪০,০৪৪৺৮৩ „
সাধারণ তহবিল অন্যান্য সংশ্লিষ্ট তহবিল সহ	৪৮,৪২৪৺০৪ „	৪৩,৩৪১৺৬৫ „
নগরাঞ্চলিক জুনিয়ার বেসিক বিদ্যালয়, বাঁকুড়া		
তহবিল অন্যান্য উপতহবিল সহ	৬,৯৭৩৺১৫ „	৯,৬৪৬৺৭১ „
বিদ্যালয় ও সমাজ-শিক্ষাকেন্দ্র, রামহরিপুর	৬৭০৺০০ „	৬৮৪৺৭১ „

লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজ

এ বৎসর আই. এ, আই. এস-সি, বি. এ. ও বি. এস্-সি. পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাসের হার যথাক্রমে ৩৬, ৪৮, ৩১ ও ৪৫ হলেও, লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজের পাসের হার যথাক্রমে আটানব্বই, নব্বই, পঁচানব্বই ও একশ'। এই কলেজের শ্রীমতী স্বপ্না রায়চৌধুরী, রাণু গুহ, ইন্দিরা রায় ও মালিনী বসু আই. এ. পরীক্ষায় সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, দশম ও একাদশ স্থান, এবং শ্রীরাণু গুহ আই. এ. ও আই. এস-সি. পরীক্ষায় ইংরেজীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। বি. এ. ও বি. এস-সি. পরীক্ষায় এই কলেজের শ্রীমতী শুক্লা মজুমদার, মিনতি বসু, আজ্‌রা খাতুন ও মঞ্জুশ্রী দে, যথাক্রমে সংস্কৃত, ভূগোল, পার্সী ও ফিজিওলজি অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান, ৫৫ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স এবং তিন জন ডিস্টিংসন লাভ করেছেন। এ বৎসর ভূগোল অনার্সে বি. এ. ও বি. এস-সি. পরীক্ষায় অন্য কেহ প্রথম শ্রেণী এবং বি. এস-সি. পরীক্ষায় কোনো ছাত্রী প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেন নি।

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯